বিষয়-সূচী—কার্ত্তিক, ১৩৬৪

'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'

৫৭শ ভাগ ২য় খণ্ড } কার্ত্তিক, ১৩৬৪ [illegible] সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

পথ ও পন্থা

বাংলার আনন্দের উৎসব আগতপ্রায়। কিন্তু যেরূপ ঝঞ্ঝাটের ভিতর দিয়া এখন দিন চলিতেছে তাহাতে মনে হয়, এবারে যেন বাংলা রাহুগ্রস্ত। বাঙালীর এই দুর্দ্দশার অভিশাপ দূর করিতে পারেন একমাত্র অন্তর্যামী।

আমরা আজ শক্তিহীন, শান্তিহীন অবস্থায় রহিয়াছি এবং সম্মুখে কোনও আশার আলো দেখিতেছি না। কিন্তু ভরসা ও আশা এই দুইয়ের উপরই আমাদের ভবিষ্যৎ, একথা যাঁহারা বুঝেন তাঁহাদের মনে এখনও আলোর ক্ষীণরশ্মি জাগ্রত আছে।

দেশের এ অবস্থার প্রতিকার করিতে হইলে আজিকার দিনে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কাজকর্ম্ম করা, কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে—অর্থাৎ বুদ্ধিজীবী বাঙালীর ক্ষেত্রে—নিদারুণ অভাব এই বিবেচনার।

ব্যাঙ্কের ধর্ম্মঘটের মূল বিষয় আলোচনা এখন অবান্তর, কেননা উহা এখন বিচারাধীন। কিন্তু ইহা সত্য যে, এই ধর্ম্মঘটের এখন যে রূপ দেখা দিয়াছে তাহাতে, শুধু ধর্ম্মঘটকারিগণ নহে, সমস্ত বাংলা দেশের উপর একটা বিপদের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। ক্ষুদ্র-বৃহৎ অনেক প্রতিষ্ঠানই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং বর্ত্তমানের জের ভবিষ্যতে অনেক দূর যাইবে সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই।

যাঁহারা এইরূপ ধর্ম্মঘটের ব্যবস্থা করেন, তাঁহাদের সম্মুখে শুধু কি তাঁহাদের বর্ত্তমানের ভাবনাই থাকে? ভবিষ্যৎ জিনিষটা কি এতই তুচ্ছ? আজ শুধু কলিকাতায়—অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে—এই ধর্ম্মঘট, অন্যত্র নাই কেন, একথা কি ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন নাই?

শুধু এই ধর্ম্মঘটের ব্যাপার নয়, অনেকক্ষেত্রেই বাঙালীর চিরদিনের খ্যাতি ছিল যে, সে চিন্তাশীল এবং বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ও তাহার ব্যক্তিত্বে একদিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য ছিল, অন্যদিকে ছিল দূরপ্রসারিত অনুভূতি, যাহার প্রভাবে বাঙালী দেশকালের গণ্ডী ছাড়াইয়া শিখ, রাজপুত, মহারাষ্ট্রীয় হইতে আরম্ভ করিয়া সারা ভারতের সঙ্গে আত্মীয়-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিল। সেই বাঙালীই আজ অতি ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া কূপমণ্ডূকে পরিণত হইয়াছে! আমাদের জানা প্রয়োজন এইরূপ অবনতির কারণ কি?

পরাধীনতার সময় বাঙালীর মতামতের গুরুত্ব সুদূর ব্রিটেনে অনুভূত হইত। তাহার কারণ তখনকার নেতৃত্ব ছিল ভিন্নপ্রকারের এবং তাহার প্রেরণার পিছনে ছিল দীর্ঘদিনের চিন্তা ও বিচার। আজ—স্বাধীনতার দিনে—বাঙালীর মতামতে কেহ কি ভ্রূক্ষেপও করে? তাহার কারণ আমাদের বিচারবুদ্ধির দৈন্য ভিন্ন আর কি? ভারতের সকল জাতিই এখন সক্ষম ও স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টা করিতেছে। প্রত্যেকেরই লক্ষ্য প্রগতির দিকে, শুধু যেন আমরাই ক্ষুদ্রত্বে অভিশপ্ত।

আজ শক্তির আবাহনে সমস্ত বাংলা দেশ ব্যস্ত। দেশের ছেলেমেয়েদের এ ত আনন্দের উৎসব। প্রত্যেকেরই মনে নূতন উৎসাহ জাগিয়া উঠিয়াছে।

এই উৎসাহ, এই উদ্দীপনা যাহাতে স্থায়ী হয়, আনন্দের স্রোত যাহাতে ক্ষণিক না হয়, তাহাই এখন আমাদের সকলের কামনা ও প্রার্থনা হওয়া স্বাভাবিক। যদি আমাদের মনে নূতন প্রেরণা আসে, যদি আমাদের সুষুপ্ত বিচারবুদ্ধি জাগ্রত হয়, যদি হৃদয়ে স্বাবলম্বন ও স্বাতন্ত্র্যের শক্তি উদ্বুদ্ধ হয়, তবে সেই নবজাগরণ ফলপ্রসূ হইতে বাধ্য।

বাঙালীর লুপ্ত গৌরব ফিরিয়া আসিবেই, তাহার হৃত-আসন সে ফিরিয়া পাইবেই, এই আশা যদি আমাদের থাকে, অতীতে যে সম্মান, যে প্রতিষ্ঠা আমাদের পূর্ব্বসূরিগণ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, ভবিষ্যতে আমরা তাহা পূর্ণরূপে অধিকার করিতে পারিব, এই ভরসা যদি আমাদের অন্তরে থাকে, তবে আমাদের কোনও চেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে না। বাঙালী বিভ্রান্ত ও বিকারগ্রস্ত অবস্থায় আজ আছে, কিন্তু তাহার দেহমনে সেই প্রাচীন শক্তিসামর্থ্যের বীজ ত এখনও আছে, সে ত উত্তরাধিকারসূত্রে তাহার অধিকারী, সে বিষয়ে কি সন্দেহ আছে?

আজ যদি বাঙালী সেই পুরাতন বিচারবুদ্ধির পথে ফিরিয়া যায়,

যদি ভারতবর্ষ জিগিরের ও দাবীর নিষ্ফল ও অস্বাস্থ্যকর চেষ্টা ছাড়িয়া তাহার পূর্ব্বপিতামহগণের বলিষ্ঠ ব্যক্তিদের [illegible] গ্রহণ করে, তবেই তাহার শক্তির আয়োজন সার্থক হইবে এবং [illegible] সন্তানসন্ততির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ও আনন্দময় হইবে। [illegible] প্রত্যেকের মনে সেই কামনা যেন সদাজাগ্রত [illegible] এই উৎসবে। আনন্দময়ীর আশীর্ব্বাদে আমাদের [illegible] নীচতা ও দ্বন্দ্বের অবসান হয়।

টাকার মূল্য হ্রাস

ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যে ক্রমবর্দ্ধমান ঘাটতি হইবার ফলে প্রশ্ন উঠিয়াছে যে টাকার স্বর্ণমূল্য হ্রাস করিয়া দেওয়া হউক, অর্থাৎ টাকার আন্তর্জ্জাতিক বিনিময় হার হ্রাস করিয়া দিলে ভারতের রপ্তানী বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহার ফলে ঘাটতি পূরণ হইবে। নীতির দিক দিয়া এই প্রস্তাবের যৌক্তিকতা থাকিলেও বাস্তবক্ষেত্রে ইহার ফল ভয়াবহ হইয়া উঠিবে। যে দেশকে অধিক পরিমাণে যন্ত্রপাতি, কলকারখানা ও বিদেশী মূলধন আমদানী করিতে হয় তাহার পক্ষে দেশীয় মুদ্রার আন্তর্জ্জাতিক বিনিময় হার হ্রাস করিয়া দেওয়া অতীব বিপজ্জনক ব্যাপার। মুদ্রার বিনিময় হার হ্রাস করিয়া দেওয়ার ফলে শুধু যে বাণিজ্যিক ঘাটতির পরিমাণ অধিক হয় তাহা নহে, ইহার ফলে আভ্যন্তরিক মুদ্রাস্ফীতি হয় এবং জীবনযাত্রার মান তথা উৎপাদন-খরচ বৃদ্ধি পায়।

১৯৪৯ সনের অভিজ্ঞতা হইতে বলা যাইতে পারে যে, মুদ্রার বিনিময়মূল্য হ্রাস দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক। ভারত বিভাগের অব্যবহিত পরেই অধিক পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য আমদানীর ফলে আমাদের বহির্ব্বাণিজ্যে ঘাটতি দেখা দেয়। সেই ঘাটতি পূরণের জন্য ভারতীয় মুদ্রার ডলারমূল্য তথা স্বর্ণমূল্য কমাইয়া দেওয়া হয়, উদ্দেশ্য ছিল যে, ইহাতে রপ্তানী বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু রপ্তানী বৃদ্ধি পাওয়া দূরে থাকুক, ইহা ক্রমহ্রাসমান। আমাদের আমদানীর পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং ফলে বাণিজ্যিক ঘাটতি পূরণ না হইয়া ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছে। টাকার বিনিময়মূল্য হ্রাস করিয়া দেওয়ার দরুণ আজ ভারতবর্ষকে তাহার আমদানীর জন্য পূর্ব্বের ১০০৲ টাকার নিমিত্ত বর্ত্তমানে ১৪৪৲ টাকা দিতে হইতেছে, অর্থাৎ টাকার মূল্য হ্রাস হওয়ার ফলে ডলার দেশগুলি হইতে ভারতবর্ষ যে খাদ্যদ্রব্য ও যন্ত্রপাতি আমদানী করিতেছে তাহার জন্য অধিক হারে আমাদের স্বর্ণ প্রদান করিতে হইতেছে। অধিক মূল্যে খাদ্যক্রয়ের ফলে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাইয়াছে আর যন্ত্রপাতি, কলকারখানার মূল্য অধিক হওয়াতেও রপ্তানীযোগ্য উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য অধিক হওয়াতে ভারতের রপ্তানী পৃথিবীর বাজারে তেমন বৃদ্ধি পায় নাই। টাকার মূল্য হ্রাস করিয়া দেওয়ার ফলে আন্তর্জ্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাঙ্ক হইতে ভারতবর্ষ যে বিরাট অর্থ ঋণ হিসাবে লইয়াছে ও লইতেছে তাহার জন্য প্রায় দেড়গুণ অতিরিক্ত হারে মূলধন ও সুদের অর্থ পরিশোধ করিতে হইতেছে।

ভারতবর্ষ যদিও বর্ত্তমানে একটি শিল্পপ্রধান দেশ তথাপি আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান দেশ বলিয়া পরিগণিত। কারণ শিল্পজাত দ্রব্যের খুব কম অংশই ভারতবর্ষ রপ্তানী করে। তাহার অধিকাংশই আভ্যন্তরিক প্রয়োজনে লাগে। যে দেশ প্রধানতঃ কৃষিজাত দ্রব্য রপ্তানী করে তাহার (বিশেষতঃ ভারতবর্ষের) রপ্তানী করার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। সুতরাং মুদ্রার বিনিময়মূল্য হ্রাস করিয়া বিশেষ কিছু লাভবান হয় না। বিক্রয়যোগ্য জিনিষ যদি অধিক পরিমাণে থাকে তবে মুদ্রার মূল্য হ্রাস করিয়া দিয়া রপ্তানী বৃদ্ধি করা যায়। আর যে দেশকে আমদানী বেশী করিতে হয় তাহার পক্ষে মুদ্রামূল্য হ্রাস করার অর্থ আত্মহত্যা করার সামিল, যেমন ১৯৪৯ সনে মুদ্রামূল্য হ্রাস করিয়া ভারতবর্ষ যে ভুল করিয়াছে তাহার খেসারত সে আজও দিতেছে, অর্থাৎ ১৯৪৯ সন হইতে ১৯৫৬ সন পর্য্যন্ত ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যে প্রায় ৮১০ কোটি টাকা ঘাটতি পড়িয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, টাকার বিনিময়মূল্য হ্রাস করিয়া দিয়া ভারতবর্ষ কিছুই লাভ করে নাই অধিকন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সুতরাং মুদ্রামূল্য হ্রাসের কথা আবার উঠে কেন?

মুদ্রার বিনিময়মূল্যের হ্রাসের প্রধান কারণ এই যে, তাহাতে দেশী জিনিষ বিদেশের বাজারে সস্তায় বিক্রয় হইতে পারে। কিন্তু রপ্তানীশুল্ক হ্রাস করিয়া দিয়া এ সুবিধা আরও অধিক করিয়া পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতীয় কর্ত্তৃপক্ষ সেদিকে একবারও ভাবিয়া দেখেন না, অধিকন্তু তাঁহারা এই বিষয়ে বিরুদ্ধ নীতিই পোষণ করিয়া আসিতেছেন, অর্থাৎ যখনই কোনও জিনিষের রপ্তানী বৃদ্ধি পায় তখনই তাহার উপর রপ্তানীশুল্ক বৃদ্ধি করিয়া দেন। ইহার ফলে সেই দ্রব্যের রপ্তানী অভাবিতরূপে হ্রাস পায়, যেমন হইয়াছে পাটজাত শিল্পদ্রব্যের ব্যাপারে। এবার ভারত সরকারের কু-নজর পড়িয়াছে চায়ের উপর।

চা রপ্তানী হ্রাস

চা রপ্তানী ও উৎপাদনে পৃথিবীর দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষ শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। গত বৎসর ১৪৩ কোটি টাকার মূল্যে প্রায় ৫১ কোটি পাউণ্ড চা ভারতবর্ষ রপ্তানী করিয়াছে এবং ভারতবর্ষের রপ্তানীর মধ্যে চা প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে। ১৯৫৭ সনের প্রথম ছয় মাসে গত বৎসরের তুলনায় প্রায় ৬ কোটি পাউণ্ড চা কম রপ্তানী হইয়াছে। ব্রিটেন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশগুলি ছিল ভারতবর্ষের বড় ক্রেতা, কিন্তু এই সকল দেশগুলিতে ভারতের চা রপ্তানী হ্রাস পাইয়াছে। সিংহলের উৎকৃষ্টতর চা মূল্যে সস্তা হওয়ায় আজ পৃথিবীর বাজারে ভারতীয় চা-কে হটাইয়া দিতেছে। ভারতের ৭৫ শতাংশ চা সাধারণ চা এবং ইহার মূল্যও অত্যন্ত অধিক। সেই কারণে ভারতীয় চা প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিতেছে না।

গত বৎসরের তুলনায় এ বৎসরে ভারতে চায়ের উৎপাদন অনেক কম হইবে। ইহার ফলে চাহিদার তুলনায় ঘাটতি পড়িবে। ভারতবর্ষ ৫০ কোটি পাউণ্ড চা রপ্তানী করে, আর তাহার আভ্যন্তরিক ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন হয় ২২ কোটি পাউণ্ড, অর্থাৎ মোট চায়ের

উৎপাদন প্রয়োজন অন্ততঃপক্ষে ৭২ কোটি পাউণ্ড, কিন্তু এ বৎসর ৬০ কোটি পাউণ্ডের কম চা উৎপন্ন হইবে। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসরে গড়ে এক কোটি পাউণ্ড করিয়া চায়ের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে। সিংহলে যখন চায়ের জমিও উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে, ভারতবর্ষে তখন ইহা হ্রাস পাইতেছে। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা ও নিষ্ক্রিয়তা আশ্চর্য্যজনক। চা রপ্তানী বৃদ্ধি করিতে হইলে রপ্তানীশুল্ক হ্রাস করিয়া দিতে হইবে। ইহাতে চায়ের রপ্তানী মূল্য হ্রাস পাইবে।

বিধানসভার দ্বিতীয় কক্ষ

পার্লামেণ্টে গৃহীত একটি বিলে অন্ধ্র রাজ্যের জন্য একটি বিধান-পরিষদ স্থাপনের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। এতদিন পর্য্যন্ত অন্ধ্র রাজ্যের আইনসভার কার্য্য কেবলমাত্র বিধানসভা দ্বারাই পরিচালিত হইতেছিল। এই নূতন আইনের ফলে এখন হইতে বিধানসভা এবং বিধান-পরিষদ এই দুইটি কক্ষ লইয়া অন্ধ্রের আইনসভা গঠিত হইবে। পার্লামেণ্টের এই নূতন আইনে অন্যান্য আটটি রাজ্যের বিধান-পরিষদগুলির সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধিরও অনুমোদন করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের বিধান-পরিষদেরও সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি অনুমোদিত হইয়াছে।

ভারতের এক চিন্তাশীল অংশ সর্ব্বদাই আইনসভাগুলির দ্বিতীয় কক্ষের বিরোধিতা করিয়া আসিতেছেন। রাজ্যের বিধান-পরিষদগুলি উঠাইয়া দিবার জন্য পার্লামেণ্টে একবার একটি বেসরকারী প্রস্তাবও আনা হয়, যদিও তাহা অগ্রাহ্য হইয়া যায়। অনেকেই মনে করিয়াছিলেন যে, রাজ্য পুনর্গঠনের সময় দ্বিতীয় কক্ষগুলির বিলোপ সাধিত হইবে। কার্য্যতঃ তাহা ত হয়ই নাই, উপরন্তু এখন তাহাদের সংখ্যা এবং সদস্যসংখ্যা উভয়ই বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

ভারতরাষ্ট্রে আইন সভাগুলির দ্বিতীয়কক্ষের কার্য্যতঃ কোন প্রয়োজনীয়তাই প্রায় নাই। দ্বিতীয় কক্ষের অস্তিত্বের সমর্থনে সাধারণ ভাবে যে সকল যুক্তি দেখান হয়—যেমন ইহারা নির্ব্বাচিত বিধানসভার সিদ্ধান্তগুলিকে পুনর্ব্বিচারের সুযোগ করিয়া দিতে পারে ইত্যাদি—ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের উর্দ্ধতন পরিষদগুলি কখনই সেই ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে নাই। তবে এই পরিষদগুলির একটি ভূমিকা—তাহা হইল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃবৃন্দ এবং সমর্থকদিগের জন্য স্থান দেওয়া। কিন্তু জাতীয় অর্থব্যয়ে এইরূপ সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থসাধন কতদূর বাঞ্ছনীয়?

বাঁকুড়ার সমস্যাবলী

বাঁকুড়া হইতে নব-প্রকাশিত সাপ্তাহিক "মল্লভূম" বাঁকুড়া জেলার সমস্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করিয়া এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন, "বাঁকুড়া পশ্চিমবঙ্গের দরিদ্রতম জেলা, দুর্ভিক্ষ ইহার চিরসহচর। অধিবাসীরা অধিকাংশই কৃষিজীবী বা কৃষির উপর নির্ভরশীল। চির-অবহেলিত মল্লভূমের কঙ্করময় ভূমির অভ্যন্তরে বিবিধ খনিজদ্রব্যের প্রাচুর্য্য থাকা সত্ত্বেও প্রচেষ্টার অভাবে কোনরূপ শিল্প বা কলকারখানা গড়িয়া উঠে নাই। ভূমিহীন মজুরের সংখ্যা অধিক এবং বৃহৎ অংশে আদিবাসী। জীবিকার জন্য বৎসরের পাঁচ মাস এরা পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে যাযাবরের জীবন যাপন করে। বিনোবাজীর প্রদর্শিত পথে ভূমিবণ্টনের সাহায্যে এদের সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব।"

বাঁকুড়া জেলায় প্রচণ্ড জলকষ্ট। এই জলকষ্টের কথায় 'মল্লভূম' লিখিতেছেন :

"জেলায় প্রায় ৪৪ হাজার পুকুর আছে। কিন্তু সংস্কারের অভাবে অধিকাংশই মজিয়া গিয়াছে। T. I. ও T. R. Depts. এর দ্বারা কিছু পুকুর সংস্কৃত হইলেও প্রয়োজনের তুলনায় ইহা যথেষ্ট নহে। স্বাধীনতার পর যে কয়টি সেচের খাল কাটা হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশ স্থানে জল অপ্রচুর। মনে হয়, পরিকল্পনায় গলদ থাকায় সাধারণের বহু অর্থ অপব্যয় হইয়াছে। জেলায় কয়েকটি নদী ও বহু ছোট-বড় খাল আছে, বর্ষার সময় সেগুলিতে প্রচুর জল আসে, কিন্তু জল আটক রাখার ব্যবস্থা না থাকায় ২।১ দিনের মধ্যে শুষ্ক হইয়া যায়। বাংলা সরকার বহু ব্যয়ে দুর্গাপুরে বাঁধ দিয়াছেন ও এ জেলার অভ্যন্তরে খাল কাটিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে এ জেলায় ২।৪টি থানার কিছু অংশ মাত্র উপকৃত হইতেছে।

"বাঁকুড়ার চির-দারিদ্র্য দূর করিতে হইলে কৃষির উন্নতি করিতে হইবে, মজা পুকুরগুলির সংস্কার (যাহা Test Relief-এর কাজে কিছুটা হইতে পারে) নদী ও জোড়ের জল সুপরিকল্পিত বাঁধ দ্বারা আটক ও ছোট ছোট খাল দ্বারা জল প্রবাহিত করিলে এই অর্দ্ধমরু অঞ্চল খাদ্যশস্যের দিক দিয়া স্বাবলম্বী হইতে সক্ষম হইবে। বৎসরের পর বৎসর ভিক্ষামুষ্টি দিয়া একদিকে অর্থব্যয়, অপরদিকে দরিদ্র জনসাধারণকে অলস ও ভিক্ষুক মনোবৃত্তি হইতে রক্ষা করা যাইবে। আশা করি, জেলার বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ এবিষয়ে অবহিত হইয়া বাংলা সরকারকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে চেষ্টিত হইবেন।"

ত্রিপুরার শাসনব্যবস্থা

ত্রিপুরার নূতন শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা গত সংখ্যায় আলোচনা করিয়াছিলাম। কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে যে, আঞ্চলিক-পরিষদ এবং ত্রিপুরা সরকারের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে গোড়াতেই মতবিরোধ দেখা দিয়াছে। ইহা ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ উন্নতির পক্ষে মোটেই শুভ নহে। ত্রিপুরার শাসনব্যবস্থায় যথেষ্ট দোষত্রুটী রহিয়া গিয়াছে। লোকসভায় বক্তৃতাকালে ২৪শে আগষ্ট ত্রিপুরার প্রতিনিধি কংগ্রেস দলভুক্ত শ্রীবংশীদেববর্ম্মা ত্রিপুরার প্রশাসনিক ব্যবস্থার সমালোচনা করিয়া বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকার কোটি কোটি টাকা এবং সহস্র সহস্র টন খাদ্য দিয়া ত্রিপুরাকে সাহায্য করিতেছেন। ত্রিপুরার অধিবাসী ভারত সরকারকে দোষারোপ করিতে পারে না। তবে কেন ত্রিপুরাবাসীর দুর্ভোগের সীমা নাই?"

ত্রিপুরার আঞ্চলিক-পরিষদ এবং ত্রিপুরা সরকারের মধ্যে যে মতান্তর ঘটিয়াছে সেই সম্পর্কে সাপ্তাহিক "সেবক" লিখিতেছেন :

"আঞ্চলিক-পরিষদের সহিত ত্রিপুরা প্রশাসনের সতত সহযোগিতা থাকিবে—পরিষদের উদ্বোধনী ভাষণে চীফ কমিশনার প্রদত্ত এই আশ্বাসবাণী কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় না বলিয়া ইতিমধ্যেই এক ক্ষীণ অভিযোগ শুনা যাইতেছে। এই অভিযোগটির মধ্যে সত্য কতটুকু আছে জানি না তবে অবস্থাদৃষ্টে মনে করা যায় যে, উপযুক্ত মর্য্যাদা দিয়া আঞ্চলিক পরিষদকে একটি জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে স্থানীয় প্রশাসনের যে দায়িত্ব রহিয়াছে তাহা পালন করিতে তাঁহারা তৎপর নহেন। আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হইলেই সরকারের দায়িত্ব শেষ হয় না, পরিষদকে সম্পূর্ণরূপে চালু করার যথাবিহিত ব্যবস্থা করাও সরকারের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যের অঙ্গীভূত। আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতা কি পরিমাণ আছে ইহা এখানে বিচার্য্য বিষয় নহে। আঞ্চলিক পরিষদ জন-নির্ব্বাচিত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। যদি গণতন্ত্রকে সাফল্যমণ্ডিত করা আমাদের জাতীয় সরকারের কর্ম্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহা হইলে আঞ্চলিক পরিষদকে চালু করার যে দায়িত্ব রহিয়াছে তাহা হইতে ত্রিপুরা প্রশাসন মুক্তি পাইতে পারে না।"

আঞ্চলিক পরিষদের অসুবিধাগুলির আলোচনা করিয়া উক্ত প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে :

প্রথমতঃ, "আঞ্চলিক পরিষদের আপিসের স্থান নির্ব্বাচনে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ মানসিক সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দিয়াছেন। আগরতলা শহরে গৃহ-সমস্যা যতই প্রবল হউক মিউনিসিপ্যালিটি আপিসে পরিষদের আপিস স্থাপন করার প্রস্তাবের মধ্যে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত ছিল ইহা সন্দেহ করিতে পারি। আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতা সম্পর্কে জনসাধারণের মনে নানাবিধ প্রশ্ন জাগিয়াছে। অতএব মিউনিসিপ্যালিটি আপিস-গৃহে পরিষদের আপিস স্থাপিত হইলে পরিষদ সম্পর্কে জনগণের মনে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিত। দ্বিতীয়তঃ ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়েও ত্রিপুরা প্রশাসনের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না। পরিষদ গঠনের মাসাধিককাল অতিবাহিত হইয়া গেলেও পরিষদের নিকট কি কি হস্তান্তর করা হইবে (এই প্রবন্ধ ছাপিতে যাওয়া পর্য্যন্ত) প্রকাশ পায় নাই। সংবাদে প্রকাশ ত্রিপুরা প্রশাসন যে সকল প্রতিষ্ঠান হস্তান্তর করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন, চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণ ইহাতে রাজী হন নাই অথবা হইবেন না। পরিষদের নিকট যে সকল ক্ষমতা থাকার কথা তন্মধ্যে জনস্বাস্থ্য এবং শিক্ষাই প্রধান। কলেজ এবং আগরতলার ভি, এম হাসপাতাল ব্যতীত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিভাগের অবশিষ্ট সমস্তই পরিষদের কর্ত্তৃত্বাধীনে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। গণতান্ত্রিক শাসন পরিচালনায় ত্রিপুরার অধিবাসিগণকে যোগ্য করিয়া তুলিতে হইলে প্রথম হইতেই ইহার প্রচেষ্টা থাকা বাঞ্ছনীয় এবং ইহার পরিপ্রেক্ষিতে আইনে যতটুকু ক্ষমতা দেওয়ার কথা উল্লেখ আছে তাহাই পরিষদের নিকট হস্তান্তর করাই যুক্তিসঙ্গত হইবে।"

ত্রিপুরা সরকার আঞ্চলিক পরিষদের হাতে প্রয়োজনীয় অর্থ হস্তান্তর করিতেও অযথা বিলম্ব করেন। "সেবক" লিখিতেছেন :

"প্রকৃতপক্ষে আর্থিক পুঁজি লইয়া পরিষদ গঠিত হয় নাই। নানাবিধ ব্যয়সঙ্কুলানের জন্য যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন রহিয়াছে। সংবাদে প্রকাশ, পরিষদ গঠিত হইবার পাঁচ দিন পূর্ব্বেই ১০ই আগষ্ট কেন্দ্রীয় সরকার পরিষদের হস্তে দেওয়ার জন্য তিন লক্ষ টাকার মঞ্জুরী প্রেরণ করিয়াছিলেন কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে কেন্দ্রীয় সরকার হইতে তাগাদা না আসা পর্য্যন্ত এই অর্থ প্রদান করা হয় নাই। ইহাও একটা রহস্যপূর্ণ ঘটনা বলিয়া মনে হয়।

"অবস্থা দৃষ্টে দেখিতেছি, স্থানীয় প্রশাসন পরিষদের গুরুত্ব বৃদ্ধি করিতে মোটেই আগ্রহশীল নহেন। গণতন্ত্রকে বরদাস্ত করিতে না পারিলে ইহাই স্বাভাবিক পরিণতি। ইহা শুভ লক্ষণ নহে। পরিষদ সম্পর্কে স্থানীয় প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গী যত সত্বর পরিবর্ত্তন হয় ততই মঙ্গল।"

করিমগঞ্জে চাউলের মূল্যবৃদ্ধির রূপ

করিমগঞ্জ শহরে সস্তাদরের চাউলের দোকান খোলা হইয়াছে। কিন্তু নিয়ম হইয়াছে যে, ঐ সকল দোকান হইতে সস্তা দরে চাউল কিনিলে সমপরিমাণ আটাও কিনিতে হইবে। আটা না কিনিলে চাউল বিক্রয় হইবে না। ইহাতে জনসাধারণের পক্ষে বিশেষ অসুবিধা হইতেছে এবং আটা ক্রয়ের বাধ্যতামূলক ব্যবস্থার জন্য অনেকেই চড়া দামে সাধারণ বাজার হইতে চাউল কিনিতেছেন। ফলে বাজারে চাউলের চাহিদা আরও বৃদ্ধি পাইয়া মূল্যবৃদ্ধি ঘটিতেছে। এ সম্পর্কে স্থানীয় সাপ্তাহিক "যুগশক্তি" এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন :

"আটা গ্রহণ বাধ্যতামূলক। অথচ এই অঞ্চলের লোকেরা আটা খাওয়ায় মোটেই অভ্যস্ত নহে। ফলে অনেকেই রেশন দোকানের চাউল গ্রহণ করিতেছেন না। সমপরিমাণ আটা গ্রহণ আপাততঃ শুধু শহরেই বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশেই এই ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইয়াছে। বাধ্যতামূলক আটা গ্রহণের বিরুদ্ধে পূর্ব্বে আরও বহু আলোচনা করা হইয়াছে—জনসভাদিতেও প্রতিবাদ জানান হইয়াছে। কিন্তু সরকার এ বিষয়ে পুনর্ব্বিবেচনা করা কর্ত্তব্য মনে করিতেছেন না। শুনা যায় আটা নাকি জাতীয় খাদ্য হিসাবে সকলের গ্রহণযোগ্য করার একটা পরিকল্পনা রহিয়াছে এবং তাহা কার্য্যকরী করাই এইভাবে আটা সরবরাহ করার উদ্দেশ্য।

"এদিকে রেশনের দোকান হইতে চাউল অনেকে গ্রহণ না করায় এবং কাছাড় জেলার কোন কোন মিল কর্ত্তৃপক্ষ নাকি বাহিরে চাউল চালান দিবার অনুমতি পাওয়ায় বাজারে চাউলের মূল্য পুনরায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। দিনকয়েক পূর্ব্বে যে চাউল ২৩৲ টাকা মণ দরে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে তাহার মূল্য গতকল্য ২৫৲ টাকায় উঠিয়াছে। রেশনের দোকানের চাউল যদি অধিকসংখ্যক লোক গ্রহণ করিতেন তবে বোধ হয় বাজারে চাউলের মূল্য এ ভাবে বৃদ্ধি পাইত না।

কিন্তু সমপরিমাণ আটা নেওয়ার বাধ্যবাধকতা একটা দুরূহ সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সমস্যার আশু সমাধান না হইলে এখানকার পরিস্থিতি গুরুতর আকার ধারণ করিবে।

"জেলার বাহিরে এখন ধান চাউল রপ্তানী করিতে দেওয়ার অযৌক্তিকতা সম্পর্কেও আমরা কর্তৃপক্ষকে হুসিয়ার করিয়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করি।

"অসংখ্য উদ্বাস্তু অধ্যুষিত ও অন্যান্য সমস্যাকণ্টকিত করিমগঞ্জে চাউলের মূল্য যাহাতে বৃদ্ধি না পায় তজ্জন্য সরকার সত্বর সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন—এই আশা আমরা করিতে পারি কি ?"

জঙ্গীপুর কলেজের অব্যবস্থা

জঙ্গীপুর কলেজটি স্পনসর্ড কলেজে পরিণত হইয়াছে। কলেজটির পরিচালনাভার কার্য্যতঃ এখন সরকারের হাতে। সরকার হইতে কলেজের অর্থনৈতিক ঘাটতি পূরণ করা হইতেছে। কেবল তাহাই নহে, অধ্যাপক নিয়োগ এবং পরিচালনা-সংক্রান্ত অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয়ও নির্দ্ধারিত হইতেছে। কিন্তু সরকারী আওতায় প্রায় পুরাপুরি আসিলেও কলেজটির বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই। অপর পক্ষে কয়েকটি বিষয়ে কলেজের অবনতিই ঘটিয়াছে। কলেজটির বর্ত্তমান অবস্থা সমালোচনা করিয়া স্থানীয় সাপ্তাহিক "ভারতী" যে সম্পাদকীয় মন্তব্য করিয়াছেন তাহা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

"ভারতী" লিখিতেছেন :

"পুরাপুরি সরকারী পরিচালনায় আসিবার পূর্ব্বে জঙ্গীপুর কলেজের যে সুনাম ছিল সরকারী পরিচালনাধীনে আসার পর তাহা ক্ষুণ্ণ হইতে দেখিয়া আমরা সত্যই বেদনা অনুভব করিতেছি। কলেজটিতে বি-এ ক্লাস খোলা হইল ছাত্রসংখ্যাও আশাতীতভাবে বাড়িল কিন্তু ইণ্টারমিডিয়েট পর্য্যায়ে থাকাকালীন যে কয়জন ইংরেজী শিক্ষক ছিলেন, তাহাও কমিতে সুরু করিয়া একজনে দাঁড়াইয়াছে। ইকনমিক্সে যেখানে কমপক্ষে দুই জন শিক্ষকের প্রয়োজন, স্পেশাল বাংলা খুলিয়া যেখানে কমপক্ষে তিন জন শিক্ষকের প্রয়োজন সেখানে শিক্ষকসংখ্যা যথাক্রমে এক জন ও দুই জন। দর্শন ও সংস্কৃত বিভাগ খুলিবার জন্য যে অতিরিক্ত সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগের প্রয়োজন তাহারও কোন ব্যবস্থা করা আজ পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই এবং ইহার ফলে এই বিভাগগুলিও আজ পর্য্যন্ত খোলা হইল না। বর্ত্তমানে বি-এ ক্লাসে ইতিহাস ও ইকনমিক্স ছাড়া অন্য কোন বিষয় শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। স্পেশাল বাংলাও শিক্ষক অভাবে বাতিল করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে বলিয়া শোনা যাইতেছে। টিউটোরিয়াল ক্লাসের সুবন্দোবস্ত করাও সম্ভবপর হইতেছে না।

"এই অবস্থায় কলেজ চলিতে থাকিলে শিক্ষার মান যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে এই ভাবিয়া আমরা আতঙ্কিত হইতেছি। যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক সংগ্রহ করা বর্ত্তমানে অবশ্য একটি সমস্যা ইহা আমরা স্বীকার করি কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে কেন যে গুণীজনের সমাবেশ ঘটিতেছে না তাহার তথ্যানুসন্ধানের দায়িত্বও আজ সরকারের। শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রের ন্যায় শিক্ষার ক্ষেত্রেও যোগ্যতাসম্পন্ন উপযুক্ত সংখ্যক মানুষ যে কোন উপায়ে সরকারকে সংগ্রহ করিতেই হইবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁহারা যদি বিমাতাসুলভ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন তাহা হইলে দেশের পক্ষে ঘোরতর দুর্দ্দিন বলিতে হইবে। জঙ্গীপুর কলেজটি আমাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান। ইহার গৌরব ও শ্রীবৃদ্ধি আমরা কামনা করি। আমাদের দেশের ছাত্রেরা এখানে শিক্ষালাভ করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করুক ইহা আমাদের সকলেরই অভিপ্রায়। কাজেই কলেজটি আজ শিক্ষকের অভাব ও অন্যান্য কারণে যে সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে তাহা দূরীকরণের জন্য আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।"

সরকারী প্রচারের নমুনা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহন বিভাগের ডিরেক্টর-জেনারেল শ্রী জে. এন. তালুকদার, আই-সি-এস রাষ্ট্রীয় পরিবহন বিভাগের দশ বৎসর পূর্ত্তি উপলক্ষে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, কলিকাতার যানবাহনে যাতায়াতের ভাড়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় প্রায় মধ্যনিম্ন। এই সঙ্গে তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, ভাড়া না বাড়াইলে কলিকাতার যানবাহন-সমস্যা মিটিবার বিশেষ আশা নাই। "বোম্বে সিভিক জার্নাল" পত্রিকার স্বাধীনতা দিবস সংখ্যায় প্রকাশিত বোম্বাই ইলেকট্রিক সাপ্লাই এবং ট্রামওয়েজ সংস্থার জেনারেল-ম্যানেজার শ্রী এম. জি. মোনানী, আই-সি-এস লিখিত প্রবন্ধ হইতে দেখা যায় যে, বোম্বাইতেও ভাড়া বাড়ানোর যুক্তি হিসাবে শ্রীমোনানী শ্রীতালুকদারের ন্যায় ঠিক একই কথা বলিয়াছেন। শ্রীমোনানী বলিয়াছেন যে, বোম্বাইয়ে যানবাহনের ভাড়া ভারতের মধ্যে প্রায় সর্ব্বনিম্ন—এমনকি পৃথিবীর মধ্যেও প্রায় সর্ব্বনিম্ন। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

আইনের গতি

ভারতে ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে, আদালতের বিচার-ব্যবস্থার গতি অত্যন্ত বিলম্বিত। হাইকোর্টে ছয়-সাত বৎসরের পূর্ব্বে দেওয়ানী আপীলে কোনও সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না। আর নিম্ন আদালতে ফৌজদারী মামলায় এত মুলতুবী দেওয়া হয় যে, তাহাতে বিচার শেষ হইতে অনেক সময় লাগে। যাহাতে বিচার-ব্যবস্থাকে আরও দ্রুতভাবে কার্য্যকরী করা যায় প্রধানতঃ সেই উদ্দেশ্য লইয়াই সম্প্রতি ভারতের প্রাদেশিক আইন-মন্ত্রীদের একটি অধিবেশন দিল্লীতে হইয়াছে। এই অধিবেশনে অনেক কিছুই প্রস্তাবও অনুমোদন করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটি অনুমোদনে বলা হইয়াছে যে, যদি সম্পত্তি কিংবা দাবীর মূল্য ২০০০৲ টাকার নিম্নে হয় তাহা হইলে হাইকোর্টের বিশেষ অনুমতি ব্যতীত দ্বিতীয় আপীল করা যাইবে না। কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই যে, জনসাধারণের হাইকোর্টের উপর অগাধ বিশ্বাস আছে এবং সেই কারণেই নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হাইকোর্টে আপীল করে। নিম্ন আদালতের রায়ের উপর জনসাধারণ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে পারে না। এ হেন অবস্থায় হাইকো

আপীল করিবার অধিকার রহিত করিয়া দিলে সামাজিক বিক্ষুব্ধি দেখা দিবে। জনসাধারণের আপীল করিবার অধিকার অবশ্যই থাকিবে কারণ তাহা থাকা উচিত; কিন্তু হাইকোর্টের উপর কাজের চাপ কমাইতে হইলে একমাত্র উপায় হইতেছে যে, আপীলে লিখিত যুক্তি-গ্রহণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। মৌখিক যুক্তি দেখানোর কালে এডভোকেটরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এত কথা বলেন যে, তাহার অনেকখানি অবান্তর ও অপ্রয়োজনীয় এবং তাহার ফলে হাইকোর্টের অনেক সময় নষ্ট হয়। লিখিত যুক্তি গ্রহণ করিলে হাইকোর্টের কার্য্য দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হইবে। আর দ্বিতীয় আপীলে দুইবার করিয়া শুনানীতে অনেক সময় নষ্ট হয়। আপীল ফাইল করিবার পর একটি শুনানীতে যদি বিষয়টি নিষ্পত্তি করা যায় তাহা হইলে হাইকোর্টের কার্য্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আর দুই-একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। এই অধিবেশন উদ্বোধন কালে পণ্ডিত নেহরু একটি ভাষণ দিয়াছিলেন এবং তাহাতে তিনি ভারতীয় বিচারকদের দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা করেন। "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকা এই সমালোচনার সমালোচনা করিতে গিয়া বলেন যে, ভারতবর্ষের কয়েকজন বিচারক দেশের প্রতিনিধি হিসাবে সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে পরিভ্রমণে গিয়াছিলেন। তাঁহারা আমেরিকার যে জায়গায়ই গিয়াছেন সেখানেই আমেরিকার তরফ হইতে প্রশ্ন করা হইয়াছে যে, ভারতীয় সংবিধানের প্রতি সংশোধনে ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব্ব করা হইয়াছে কেন? আর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের প্রতি সংশোধনে ব্যক্তিস্বাধীনতা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। আমাদের বিচারকেরা নাকি ইহার সদুত্তর দিতে পারেন নাই বলিয়া ষ্টেটসম্যান পত্রিকা বলিতেছেন। এই কথা পত্রিকা কেমন করিয়া জানিল জানি না, তবে ভাব দেখিয়া মনে হয়, বিচারকরা যেন ষ্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদকের কানে কানে তাঁহাদের বিব্রত অবস্থার কথা জানাইয়াছেন।

কিন্তু আমাদের বক্তব্য, এই প্রশ্নের সদুত্তর এত আছে যে, সাধারণ শিক্ষিত লোকও ইহার উত্তর দিতে পারিবে। সুতরাং যদি ভারতীয় বিচারপতিরা সত্যই কোনও উত্তর দিতে না পারিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। ইহার প্রথম উত্তর এই যে, আইন এক জিনিষ, আর তাহার প্রয়োগ ভিন্ন জিনিষ। ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্য আইন পাস করিলেই ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষিত হয় না। ইহার বড় নিদর্শন দেখিতে পাই ফ্রান্সে বিপ্লবের সময়। বিপ্লবী ফ্রান্স জনগণের সাম্য ও স্বাধীনতার অধিকার স্বীকার করিয়া লয়, কিন্তু সে অধিকার কার্য্যতঃ স্বীকৃত হয় নাই। বিপ্লবী ফ্রান্সের অন্যতম হোতা ভলটেয়ারকে প্রাণভয়ে পলাইতে হইয়াছিল ইংলণ্ডে। সুতরাং কেবলমাত্র আইনের ঘোষণা দ্বারা ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষিত হয় না এবং ইহার বর্ত্তমান নিদর্শন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র।

গণতন্ত্রের ভিত্তি সাম্য—সামাজিক সাম্য ও রাজনৈতিক সাম্য। কিন্তু আমেরিকায় মানুষের সঙ্গে মানুষের সাম্য নাই এবং এতদিন কোনও সাম্য ছিল না, অর্থাৎ আমেরিকার শ্বেতজাতির সহিত তথাকার নিগ্রোদের এক আসনে বসার অধিকার নাই, তাহাদের ছেলেদের একসঙ্গে একই স্কুলে পড়ার অধিকার নাই, তাহাদের জন্য রেলের কামরা, এমনকি কোনও কোনও প্রদেশে প্ল্যাটফরম পর্য্যন্ত আলাদা। আমাদের দেশের ছোট ছেলেরা যেমন ঢিল দিয়া ব্যাঙ মারে, তাহাদের দেশের লোকে তেমনি করিয়া নিগ্রোদের মারে এবং এতদিন এই ভাবে তাহারা নিগ্রোদের নিধন করিয়াছে। বৎসর দুই পূর্ব্বে একটি বিধবার একমাত্র সন্তানকে এই ভাবে হত্যা করা হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কোনও কোনও প্রদেশে নিগ্রোদের মনুষ্যপদবাচ্য বলিয়া ধরা হয় না। এ হেন দেশ ভারতবর্ষের উপর ফোপরদালালি করিতে আসে কোন্ সাহসে?

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ব্যক্তির অধিকার ও স্বাতন্ত্র্যের জন্য অবশ্য আইন আছে, কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কিংবা স্বাধীনতা কোথায়? সেখানে প্রত্যেক সরকারী কর্ম্মচারীকে ঘোষণা করিতে হয়, সে কম্যুনিষ্ট কিনা এবং যদি বলে যে, সে কম্যুনিষ্ট তাহা হইলে তাহার চাকুরী যায়। এই ভাবে প্রায় ২৫,০০০ হাজারেরও অধিক লোকের চাকুরী গিয়াছে এবং ইহাদের চাকুরী গিয়াছে কেবলমাত্র কার্য্যনির্ব্বাহনী শক্তির আদেশের বলে, কোনও আদালতের আইনের বিচারের দ্বারা নয়। এ বিষয়ে আমেরিকার গণতন্ত্র ও এক-নায়কতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? আমেরিকার গুপ্ত-পুলিসের রিপোর্ট (অর্থাৎ, যুক্তরাষ্ট্রীয় অনুসন্ধান সমিতি Federal Investigation Bureau) এই বিষয়ে চূড়ান্ত। ভারতবর্ষে কম্যুনিষ্ট বলিয়া ঘোষণা করিলে চাকুরী যায় না; এখানে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের স্বাধীনতা আছে।

আমেরিকার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক রোজেনবার্গ দম্পতির মৃত্যুদণ্ড স্মরণে আজও পৃথিবীর জনমন বিশেষ সন্দেহযুক্ত, কারণ বিচারের নামে ইহা হত্যার রূপান্তর মাত্র, অন্ততঃ সেই কথা মনীষী রাসেল বলেন। রোজেনবার্গ দম্পতিকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন সুপ্রীমকোর্টের বিচারক ডগলাস, কিন্তু ডগলাসকে অভিযুক্ত করা হইবে বলিয়া আমেরিকার আইন-পরিষদ হুমকি দেখায় এবং তাহাতে তিনি এ বিষয়ে আর অগ্রসর হইতে সাহস পান নাই। ইহার পরেও কি কেহ বলিবে যে, ভারতবর্ষের অপেক্ষা আমেরিকায় ব্যক্তিস্বাধীনতা অধিক আছে? ভারতবর্ষে বিচারকদের বিচার করিবার স্বাধীনতা আছে এবং তাহার জন্য আইন-পরিষদ কোনও হুমকি দেয় না। সুতরাং দেখা যায় যে, ভারতীয় প্রতিনিধিদের উত্তর দেওয়ার মত অনেক তথ্য ছিল।

গ্রামদানের আহ্বান

মহীশূরের নিকট অবস্থিত ইয়েলওয়াল গ্রামে ২১শে ও ২২শে সেপ্টেম্বর এই দুইদিনব্যাপী যে গ্রামদান সম্মেলন হইয়া গেল তাহা

কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইতিপূর্ব্বে অরাজনৈতিক কোন সম্মেলনে একজন সরকারী এবং বেসরকারী রাজনৈতিক নেতা যোগদান করেন নাই। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পরিকল্পনামন্ত্রী ব্যতীত কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের আরও নয়জন মন্ত্রী এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য যে, এই সম্মেলনে কম্যুনিষ্ট পার্টি হইতেও দুইজন সর্ব্বভারতীয় নেতা (শ্রীনাম্বুদ্রিপদ এবং ডাঃ জেড. এ. আহমদ) উপস্থিত ছিলেন। প্রজাসমাজতন্ত্রী দলের পক্ষ হইতে উপস্থিত ছিলেন দলের নেতা শ্রীগঙ্গাশরণ সিংহ। ইহা ব্যতীত শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ, কংগ্রেস সভাপতি শ্রীউচ্ছরঙ্গ রায় নওলশঙ্কর ডেবর, কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমন নারায়ণ, গান্ধী স্মারকনিধির সভাপতি শ্রী আর. আর. দিবাকর, শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী এবং সর্ব্বসেবাসঙ্ঘের শ্রীপ্যারেলাল, শ্রীপ্রাণলাল কাপাদিয়া এবং শ্রীধীরেন্দ্র মজুমদার। সর্ব্বোপরি ছিলেন বিনোবাজী।

অখিল ভারতীয় সর্ব্বসেবা সঙ্ঘের উদ্যোগে আয়োজিত দুইদিন-ব্যাপী অনুষ্ঠিত এই সর্ব্বদলীয় সম্মেলনের একটিমাত্র আলোচ্যসূচী ছিল: জাতীয় কার্য্যসূচী হিসাবে গ্রামদানের ভূমিকা: অধিবেশনের শেষে এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, সর্ব্বদলীয় গ্রামদান পরিষদ আচার্য্য বিনোবা ভাবের গ্রামদান আন্দোলনের লক্ষ্যে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

পরিষদের পক্ষ হইতে প্রচারিত বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসমূহের মন্ত্রীরা গ্রামদান আন্দোলনের প্রশংসা এবং উহাতে সহায়তার ইচ্ছাপ্রকাশপূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, সরকারগুলিকে অবশ্য নিজ নিজ রাজ্যের ভূমি-সংস্কার পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট জনগণের সম্মতি সহকারে সমবায় আন্দোলনের সমস্ত পর্য্যায়ের সম্প্রসারণ করিতে হইবে। ভূমি-সংস্কারের ভিত্তি হইবে সর্ব্বপ্রকার মধ্যস্বত্বভোগীর বিলোপসাধন এবং ব্যক্তিগত জোত-জমা সীমায়িতকরণ। এই সরকারী ব্যবস্থার সহিত গ্রামদান আন্দোলনের কোন বিরোধ নাই বরং এতদ্দ্বারা উহার প্রসারই সাধিত হইবে।

পরিষদ বিনোবাজীর গ্রামদান আন্দোলনকে সমর্থন করিবার জন্য দেশবাসীর নিকট আহ্বান জানান। পরিষদ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই আন্দোলনে সমষ্টিজীবন এবং সমষ্টিগত প্রচেষ্টার পূর্ণতর বিকাশে সহায়তা করিবে এবং পল্লীর অধিবাসীদের বৈষয়িক কল্যাণ এবং সর্ব্বাঙ্গীণ প্রগতির পথ প্রশস্ত করিবে। এই আন্দোলন সারা ভারতে ভূমিসমস্যা সমাধানের পক্ষে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করিবে। অহিংস পদ্ধতিই এই আন্দোলনের মূলকথা। এইরূপ একটা আন্দোলনকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য এবং সমর্থন করা উচিত। সমাজ-উন্নয়ন কর্ম্মসূচী ও গ্রামদান আন্দোলনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতম সহযোগিতার সৃষ্টি বাঞ্ছনীয় বলিয়াও পরিষদ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

ইয়েলওয়াল সম্মেলনে সরকারী এবং প্রধান সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। গ্রামদান আন্দোলনের প্রতি তাঁহাদের সমর্থনের সবিশেষ তাৎপর্য্য রহিয়াছে। কম্যুনিষ্ট পার্টি নীতি হিসাবে জমিদারদের জমি প্রয়োজনে বল-প্রয়োগেও দখল করিবার পক্ষপাতী। তথাপি কম্যুনিষ্ট নেতা ডাঃ আহমেদ বলেন যে, কম্যুনিষ্ট পার্টি আচার্য্য ভাবের আন্দোলনকে তাহাদের নিজস্ব ভূমিসংস্কার নীতির বিকল্প বলিয়া স্বীকৃতি দান করে। দেশের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনে গ্রামদানের ভূমিকার গুরুত্ব এখানেই আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

গ্রামদান আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য মানুষকে আত্মসচেতন এবং সক্রিয় করিয়া তোলা। সরকারী সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনায় যথেষ্ট প্রশংসনীয় কার্য্য হইয়াছে সত্য কিন্তু গ্রামবাসীকে স্বাবলম্বী এবং সক্রিয় করিবার দিক হইতে সেই প্রচেষ্টা সেইরূপ ফলপ্রসূ হয় নাই, সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার এই ব্যর্থতার কথা সরকারীভাবেই স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ভূদান আন্দোলনের সাফল্যের ভিত্তিই হইল গ্রামবাসীর সচেতনতা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা। গ্রামদান আন্দোলনের ভিত্তি হইল প্রত্যেকের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সহযোগিতা। ভারতীয় গ্রামগুলির উন্নতিসাধনে এই জনজাগরণের ভূমিকা অনস্বীকার্য্য।

ভূদান আন্দোলন এখন নূতন পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। এতদিন পর্য্যন্ত খণ্ড খণ্ড ভূমি দান হিসাবে গ্রহণ করা হইত। এখন হইতে আন্দোলনের উদ্দেশ্য হইবে সম্পূর্ণ গ্রাম হিসাবে ভূমি প্রার্থনা করা। সম্মেলনের সময় পর্য্যন্ত প্রায় তিন হাজার গ্রাম দান করা হইয়াছে।

ইয়েলওয়াল সম্মেলনের আর একটি উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত হইল সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার সহিত গ্রামদান আন্দোলনের সমন্বয়সাধন। এই সমন্বয়সাধন কি উপায়ে সম্ভব তাহা বিশেষ আলোচনা সাপেক্ষ। তবে ইহাতে কোন সন্দেহই নাই যে, এই দুইয়ের উপযুক্ত সমন্বয় সাধন করিতে পারিলে ভারতীয় গ্রামগুলিতে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে।

মফঃস্বলে সরকারী সংবাদ প্রচার

"বর্দ্ধমানবাণী" লিখিতেছেন:

"সাধারণতঃ জনমতের অভিব্যক্তি সংবাদপত্রের মাধ্যমেই ব্যক্ত হইয়া থাকে। এই সংবাদপত্রই আবার জনমত সৃষ্টি করিয়া থাকে। কাজেই সংবাদপত্র জাতীয় জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। তাই সংবাদপত্রের দায়িত্ব অসীম। তবে অনেক সময় সংবাদপত্রকে বহু অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। এই অসুবিধা আসে সরকারী মহল হইতে এবং জনসাধারণের তরফ হইতেও। সরকারী তথ্য পাওয়াও একপ্রকার দুঃসাধ্য ব্যাপার। প্রচার বিভাগও এমন ক্ষমতাসম্পন্ন নহেন যে, সংবাদপত্র যাহা চাহেন এবং যাহা পরিবেশন করিতে কোন বাধা নাই, তাহা সরবরাহ করিয়া সংবাদপত্রের উদ্দেশ্যকে সফল করিতে পারেন।

আবার অনেক সময় কোন ঘটনা স্বার্থমণ্ডিত হইয়া পরিবেশিত হয় যাহা সংবাদপত্রের সুনাম ক্ষুণ্ণ করে এবং সেই সঙ্গে জনসাধারণকেও ক্ষুব্ধ করিয়া তোলে। এই অবস্থায় সরকারী প্রচার দপ্তর বিশেষ করিয়া জেলা প্রচার বিভাগ যদি নিজ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটু সচেতন হইয়া স্থানীয় সংবাদপত্রসমূহকে বিবিধ তথ্য সরবরাহে সাহায্য করেন তাহা হইলে সংবাদপত্রগুলির অসুবিধার অবসান হয়।"

সরকারী শিক্ষাবিভাগের খেয়ালীপনা

করিমগঞ্জের "যুগশক্তি" লিখিতেছেন—

"আসাম সরকারের মধ্যস্কুল পরীক্ষা বোর্ড পরীক্ষার্থীদের জন্য মডেল প্রশ্নপত্র তৈয়ার করিয়া স্কুলগুলিতে পরিবেশন করিয়াছেন। এই প্রশ্নপত্রের রকম-সকম দেখিয়া পরীক্ষার্থী ছেলেমেয়েরা তো পরের কথা, আপাততঃ তাহাদের বাপজ্যেঠা ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চক্ষু চড়কগাছ হইয়া উঠিয়াছে।

"স্বাধীনতা লাভের পর সর্ব্ববিধ ব্যাপারেই আমাদের সরকারকে 'নূতন কিছু করা'র একটা বাতিকে যেন পাইয়া বসিয়াছে। রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ গত কয় বৎসরে রেলগাড়ীর সংস্কার সাধনের নামে হরেকরকম কসরৎ করিয়া জনসাধারণের অর্থ নিয়া ছিনিমিনি খেলিতেছেন; উদ্বাস্তদের ভাগ্য নিয়াও নিত্য নূতন এক্সপেরিমেণ্ট চলিতেছে, ট্যাক্সের দুর্ব্বিষহ বোঝা চাপানোর ব্যাপারে তো আমাদের শ্রীকৃষ্ণমাচারী সমগ্র বিশ্বে রেকর্ড স্থাপন করিয়াছেন। এত সব দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া আসামের মধ্যস্কুল পরীক্ষার ভারপ্রাপ্ত কর্ত্তারা বোধ হয় ভাবিলেন যে, তাঁহারাই বা কম কিসে? ফলে এম-ই পরীক্ষার্থীদের মগজের উপর নূতন এক্সপেরিমেণ্ট চালাইতে তাঁহারা মনস্থ করিয়াছেন। বালকবালিকাদের স্বাস্থ্য-রক্ষার্থ পুষ্টিকর, ভেজালহীন খাদ্যপথ্যাদির ব্যবস্থা করিতে কর্ত্তাদের একটুও মাথাব্যথা নাই, কিন্তু বেচারাদের কচি মাথা চিবাইয়া খাওয়ার ব্যাপারে তাঁহাদেরই সর্ব্বাপেক্ষা উৎসাহী বলিয়া মনে হইতেছে। না হইলে পরীক্ষার মাত্র একমাস পূর্ব্বে পরীক্ষাপদ্ধতির এই ধরনের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া পাইকারীভাবে প্রায় শিশুমেধ-যজ্ঞের ব্যবস্থা করিতেন না।

"আসাম রাজ্য সরকারের সুযোগ্য শিক্ষাধিকর্ত্তা ও শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে আমরা এই অনুরোধ জানাইতেছি যে, মধ্যস্কুল পরীক্ষার্থীদের নিয়া এক্সপেরিমেণ্ট করিবার পরিকল্পনাটি যাহার মস্তিষ্ক হইতেই বাহির হইয়া থাকুক-না-কেন তাহাকে নিরস্ত করার ব্যবস্থা হইতে পারে কিনা দয়া করিয়া সত্বর সেই চেষ্টা তাঁহারা করুন।"

মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি

মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি পরীক্ষার উপায় বৈজ্ঞানিকগণ আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই পরীক্ষার ফলে দেখা যাইতেছে যে, ক্রমশঃই মানুষের মধ্যে অতি অল্প বয়সেই বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশলাভ ঘটিতেছে। সম্প্রতি লণ্ডনে ১৯৪৫ সনের পরে জাত পাঁচ হাজার শিশুর বুদ্ধিবৃত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বয়সের তুলনায় তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি বিশেষভাবেই বেশি। ওলভারহ্যামপটন শিক্ষা কর্ত্তৃপক্ষের মনস্তাত্ত্বিকবিষয়ক পরামর্শদাতা ডাঃ ফোর্ড টমসন এই পরীক্ষাকার্য্য চালান। তিনি বলেন যে, ষ্ট্রনটিয়াম ৯০-এর অন্যান্য তেজস্ক্রিয় পদার্থের প্রভাবেই হয়ত এইরূপ হইয়াছে।

নব্বই জন ছেলেকে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির সূচক ১৪০ অর্থাৎ প্রায়-প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের সমতুল্য। সাধারণভাবে সকলেরই বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি লক্ষিত হয়।

পশ্চিম পাকিস্থান

১৭ই সেপ্টেম্বর পশ্চিম পাকিস্থানের বিধানসভা পশ্চিম পাকিস্থানকে ভাঙ্গিয়া পুনরায় প্রদেশে বিভক্ত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিন শত পাঁচ জন সদস্যবিশিষ্ট পরিষদে এই প্রস্তাবটি ১৭০-৪ ভোটে গৃহীত হয়। মাত্র ২৩ মাস পূর্ব্বে পশ্চিম পাকিস্থানের প্রদেশগুলির বিলোপসাধন করিয়া সমগ্র পশ্চিম পাকিস্থানকে একটি ইউনিটে পরিণত করা হয়। এই এক-ইউনিট পরিকল্পনার প্রধান সমর্থক ছিল মুসলীম লীগ দল। এবারে যখন পশ্চিম পাকিস্থান বিধান-পরিষদে এক-ইউনিট ভাঙ্গিয়া দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয় তখন মুসলীম লীগ সদস্যগণ ভোটদানে বিরত থাকেন।

গত মার্চ্চ মাসেও পশ্চিম পাকিস্থান বিধানসভায় এক-ইউনিট ভাঙ্গিয়া দেওয়ার জন্য একটি প্রস্তাব আনয়ন করা হয়। প্রস্তাবটি আনয়ন করেন স্বতন্ত্র সদস্য ডাঃ সৈয়ুদ্দীন স্বালে। মুসলীম এবং রিপাবলিকান দলের এক বিরাট অংশ ঐ প্রস্তাবটি সমর্থন করেন; কিন্তু তখন প্রস্তাবটি সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই।

পশ্চিম পাকিস্থানের এক-ইউনিট পরিকল্পনা কখনই জনমতের সমর্থন লাভ করিতে পারে নাই। সিন্ধু এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নেতৃবৃন্দ এই পরিকল্পনার বিশেষ বিরোধী ছিলেন। খান আবদুল গফ্ফর খাঁও এই পরিকল্পনার বিরোধী ছিলেন। প্রধানতঃ পঞ্জাবের লীগ নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টাতেই ঐ পরিকল্পনাটি গৃহীত হয়। এক-ইউনিট পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল পাক পার্লামেণ্টে পূর্ব্বপাকিস্থানের প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রতিহত করা। সেই উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। লোকসংখ্যার অনুপাতে যদিও পার্লামেণ্টে পূর্ব্বপাকিস্থানের প্রতিনিধিদেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের কথা, এক-ইউনিট এবং অন্যান্য নানাবিধ উপায়ে পশ্চিম পাকিস্থানের মুসলীম লীগ নেতৃবৃন্দ বাঙ্গালী মুসলমানদের প্রতিনিধি-সংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখিতে সক্ষম হন।

কিন্তু এক-ইউনিটের ফলে মুসলীম লীগ নেতৃবৃন্দেরই অসুবিধা দেখা দিল সর্ব্বপ্রথম। যতদিন মুসলীম লীগ ক্ষমতায় আসীন ছিল ততদিন এই সঙ্কট সেরূপ প্রকট হয় নাই। কিন্তু কেন্দ্রে এবং

পশ্চিম পাকিস্থানে যখন মুসলীম লীগ দল ক্ষমতাচ্যুত হইল তখন মুসলীম লীগের অনেক নেতাই মনে করিতে লাগিলেন যে, যদি সমগ্র পশ্চিম পাকিস্থানকে লইয়া একটি ইউনিট্ গঠন না করা হইত তবে হয়ত কোন না কোন প্রদেশে তাঁহারা ক্ষমতা ভোগ করিতে পারিতেন।

পশ্চিম পাকিস্থানের দায়িত্বশীল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কোন সময়েই এক-ইউনিট পরিকল্পনাকে উৎসাহের সহিত গ্রহণ করেন নাই। মুসলীম লীগ নেতৃবৃন্দও যখন ইহার বিরোধী হইয়া উঠিলেন তখন এক-ইউনিট বিরোধী প্রস্তাব পাশ হওয়া এমন কিছু বিচিত্র নহে। ইহাতে আর একবার এই সত্যই প্রমাণিত হইল যে, জনস্বার্থবিরোধী কোন ব্যবস্থাই অধিকদিন স্থায়ী হইতে পারে না।

প্রধানমন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দীর পরামর্শে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জ্জা অবশ্য পশ্চিম পাকিস্থান বিধানসভার প্রস্তাবে সম্মত হইতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রধান যুক্তি হইল এই যে, এখন যদি পশ্চিম পাকিস্থান ভাঙ্গিয়া ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন করা হয় তবে সাধারণ নির্ব্বাচন আরও পিছাইয়া দিতে হইবে। ১৯৫৮ সনে নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের পর নবনির্ব্বাচিত বিধানসভাই এরূপ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী বলিয়া প্রেসিডেন্ট মির্জ্জা এবং প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দ্দী অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

পূর্ব্বপাকিস্থানের গ্রামে আইন ও শৃঙ্খলা

পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্রই বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে আইন ও শৃঙ্খলার অবস্থা বিশেষ শোচনীয়। সর্ব্বত্রই প্রায় অরাজকতা বিদ্যমান। ইহাতে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে ; কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই হিন্দুদের ক্ষতি হইতেছে বেশি। গ্রামাঞ্চলে শান্তিরক্ষার জন্য ঢাকার সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ যে ব্যবস্থা করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন সেই সম্পর্কে শ্রীহট্টের সাপ্তাহিক 'জনশক্তি' লিখিতেছেন :

"চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি ক্রমে বাড়িয়াই চলিয়াছে। গ্রামাঞ্চলে ইদানীং চুরি-ডাকাতির সংখ্যাবৃদ্ধি সরকারী কর্ম্মচারিগণকেও শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। ঢাকা বিভাগের কমিশনার মিঃ রহমতুল্লা গ্রামে গ্রামে রক্ষিবাহিনী গঠনের জন্য এক আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। বৃদ্ধ এবং অযোগ্য গ্রাম্য চৌকিদারদের বরখাস্ত করিয়া তাহাদের স্থলে পুলিসের ট্রেনিংপ্রাপ্ত আনসারদের মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে গ্রাম্য পুলিস হিসাবে নিযুক্ত করিবার একটি প্রস্তাব মিঃ রহমতুল্লা করিয়াছেন। রক্ষকরাই ভক্ষক হইবে কি না সেই প্রশ্ন ছাড়াও গ্রামের লোকের আর্থিক সঙ্গতি ত্রিশ টাকা বেতনের পুলিস নিযুক্ত করিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত কি না তাহাও চিন্তা করিবার বিষয়। গ্রামের লোক দলবদ্ধ হইয়া গ্রামের পাহারার ব্যবস্থা নিজেরাই করিতে পারেন। এই আন্দোলন গ্রামে গ্রামে অবিলম্বে আরম্ভ হওয়া উচিত। সিলেট জেলার পুলিস কর্ত্তৃপক্ষ এই সম্পর্কে গ্রামের লোকের কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত করিবার চেষ্টা করুন। অবস্থা ক্রমেই আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। দেশের লোকের সক্রিয় সহযোগিতা না পাইলে দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষা করা অসম্ভব হইবে।"

পাকিস্থানে সরকারী ডাক্তারের দুর্ব্যবহার

শ্রীহট্টের "জনশক্তি" পত্রিকায় মৌলবীবাজারের অ্যাসিষ্ট্যান্ট সার্জ্জনের আচরণ সম্পর্কে যে সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন তাহা পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি হাসপাতালের ডাক্তারদের আচরণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সংবাদে প্রকাশ :

"প্রসব বেদনায় কয়েকদিন যাবত কাতর একটি রোগিণীকে রাত্রি দুই ঘটিকা হইতে পরদিন বেলা বার ঘটিকা পর্য্যন্ত কোন চিকিৎসা না পাইয়াই হাসপাতালে পড়িয়া থাকিতে হইল। বিশিষ্ট ব্যক্তির সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে এবং নগদ দক্ষিণা পঁচিশটি টাকা আদায় করিয়া এঃ সার্জ্জন সাহেব রোগিণীর চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন এবং প্রায় দুইটায় একটি জীবিত সন্তান প্রসব হইয়া কয়েক মিনিট পরই শিশুটি মারা গেল।" অ্যাসিষ্ট্যান্ট সার্জ্জন মহাশয় নাকি টাকা ছাড়া কোন কাজই করিতে প্রস্তুত নহেন।

ঢাকা হইতেও হাসপাতালে চিকিৎসকদের দুর্ব্যবহারের নানারূপ দৃষ্টান্ত প্রকাশ পাইয়াছে। চিকিৎসকদের আচরণে বিভিন্ন সংবাদপত্র বিশেষ ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকাশ যে, এই সম্পর্কে নাকি সার্জ্জন-জেনারেল এবং পূর্ব্বপাকিস্থানের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্তের মতানৈক্য ঘটিয়াছে। প্রাদেশিক সরকার সার্জ্জন-জেনারেল টি. ডি. আহম্মদকে পূর্ব্বপাকিস্থান হইতে সরাইয়া লইবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন। অপরপক্ষে সার্জ্জন-জেনারেল অভিযোগ করিয়াছেন যে, স্বাস্থ্য বিভাগ পরিচালনার ব্যাপারে রাজনীতিই প্রবল হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে "জনশক্তি" লিখিতেছেন, "স্বাস্থ্যবিভাগের পরিচালনার ব্যাপারে যে আবর্জ্জনা গত দশ বৎসর যাবত জমিয়া উঠিয়াছে তাহা পরিষ্কার করিয়া দিতে পারিলে প্রদেশের লোক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। যেখানে মানুষের জীবনমরণ-সমস্যা জড়িত সেইসব স্থলেও আমাদের দেশের সরকারী কর্ম্মচারিগণ কতদূর হীন আচরণ এবং জঘন্য মনোবৃত্তি প্রদর্শন করিতে পারেন তাহারই একটি দৃষ্টান্ত মৌলবীবাজারের এঃ সার্জ্জন দেখাইয়াছেন। অনুসন্ধান করিলে শুধু মৌলবীবাজার হাসপাতালে কিংবা ঢাকা মেডিকেল কলেজেই নহে—প্রদেশের সকল সরকারী হাসপাতালেই এই প্রকার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় মেডিকেল বিভাগের দুর্নীতিদমনের জন্য বদ্ধপরিকর হইলে দেশের লোকের পূর্ণ সমর্থনই পাইবেন। আমরা দেশবাসীর পক্ষ হইতে এই দাবি জানাইতেছি। সরকারী ডাক্তারগণের অতি লোভের হাত হইতে দেশের লোককে বাঁচাইবার জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টাই চালাইতে হইবে।"

থাইল্যাণ্ডের রাজনৈতিক পটপরিবর্ত্তন

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর থাইল্যাণ্ডের সেনাবিভাগের অধ্যক্ষ

ফিল্ড মার্শাল সারিত থানারাত-এর নেতৃত্বে থাই সেনাবাহিনী থাইল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী মার্শাল পিবুলসংগ্রামকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করে। প্রধানমন্ত্রী থাইল্যাণ্ড ত্যাগ করিয়া কাম্বোডিয়া চলিয়া যান।

মার্শাল সারিত থানারাত বলেন যে, রাজা ফুমিদন আতুলদেত তাঁহাকে সমর্থন করিতেছেন এবং রাজাই তাঁহাকে ব্যাঙ্ককের সামরিক অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছেন। থাইল্যাণ্ডের পুলিসবাহিনীর অধ্যক্ষ-জেনারেল ফাও শ্রীআনন্দের নিয়োগ লইয়া প্রধানমন্ত্রী পিবুলসংগ্রাম এবং সেনাবিভাগের কর্তৃপক্ষের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। সেনাবিভাগ জেনারেল ফাও-এর অপসারণ দাবি করেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তাহাতে স্বীকৃত হন না। জেনারেল ফাও পরে সামরিক বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং মেজর-জেনারেল পিচাই মন্ত্রী তাঁহার স্থলে পুলিসের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। নৌ-বিভাগের অধিনায়ক অ্যাডমিরাল ইয়ুত্তাসার্ত কোসল এবং বিমান-বিভাগের অধিনায়ক এয়ার মার্শাল ফুয়েন রোনাপাকও নাকি সৈন্যবিভাগের হাতে বন্দী হইয়াছেন।

মার্শাল সারিত বলেন যে, যদিও কয়েকজন সহযোগীর পরামর্শে পিবুল দেশের ক্ষতি করিয়াছেন তথাপি পিবুল থাইল্যাণ্ডের উন্নতির জন্য যাহা করিয়াছেন তাহা সামান্য নহে। তিনি বলেন যে, প্রধানমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাঁহার কর্মের জন্য (অর্থাৎ পিবুলকে পদচ্যুত করার জন্য) ক্ষমা চাহিয়া লইবেন। "আমি তাঁহাকে এখনও আমার নেতা বলিয়া মনে করি", মার্শাল সারিত বলেন।

১৮ই সেপ্টেম্বর রাজা ফুমিদন আতুলদেত থাই পার্লামেণ্ট ভাঙিয়া দিবার নির্দেশ দেন। নির্দেশনামায় বলা হয় যে, নব্বই দিনের মধ্যেই জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। ততদিন পর্যন্ত রাজা কর্তৃক (প্রধানতঃ সরকারী কর্মচারীদের মধ্য হইতে) মনোনীত ১২৩ জন সদস্যবিশিষ্ট একটি পার্লামেণ্ট দেশের শাসনভার চালাইয়া যাইবেন। থাই পার্লামেণ্টের অর্দ্ধেক সদস্য নির্বাচিত এবং অর্দ্ধেক সদস্য রাজা কর্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন। আগামী নির্বাচনও এই ভিত্তিতেই অনুষ্ঠিত হইবে।

২১শে সেপ্টেম্বর অস্থায়ী থাই জাতীয় পরিষদ শ্রী পোটে সরাসিনকে প্রধানমন্ত্রীরূপে নির্বাচিত করেন। শ্রী সরাসিন বর্ত্তমানে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তিসংস্থার (SEATO) সেক্রেটারী-জেনারেল। শ্রী পোটে সরাসিনের নিয়োগের ফলে থাইল্যাণ্ডের পররাষ্ট্রনীতি আরও বেশি পাশ্চাত্ত্য-ঘেঁষা হইবে বলিয়া রাজনৈতিক মহলের অনেকে মনে করেন। তবে চীনের সহিত থাইল্যাণ্ডের সম্পর্কের উন্নতি ঘটিবে বলিয়া মনে হয়।

মিঃ সরাসিনকে মন্ত্রিসভা গঠনের পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার মন্ত্রীসভায় ২৮ জন সদস্য থাকিবেন বলিয়া প্রকাশ।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও চীন

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ ২৪শে সেপ্টেম্বর পুনরায় চীনের সদস্যপদের প্রশ্নটি মুলতুবী রাখিয়াছে। চীনকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যরূপে গ্রহণ করিবার জন্য ভারতের পক্ষ হইতে একটি প্রস্তাব করা হয়। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের ষ্টীয়ারিং কমিটির একটি প্রস্তাব মারফত ভারতের প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হয়। ষ্টীয়ারিং কমিটির প্রস্তাবের দুইটি অংশ: প্রথম অংশে ভারতের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের জন্য সুপারিশ করা হয়, এবং দ্বিতীয় অংশে বর্ত্তমান অধিবেশনে কুয়োমিনটাং প্রতিনিধিকে স্থানচ্যুত করা অথবা কম্যুনিষ্ট চীনকে সদস্যপদ দান করা সম্পর্কিত আলোচনা স্থগিত রাখিবার কথা বলা হয়। ভোটে ষ্টীয়ারিং কমিটির প্রস্তাবের প্রথম অংশটি ৪৬-২৮ ভোটে গৃহীত হয় (সাতটি রাষ্ট্র ভোটদানে বিরত থাকে); এবং প্রস্তাবের দ্বিতীয় অংশটি ৪৭-২৭ ভোটে গৃহীত হয় (সাতটি রাষ্ট্র ভোটদানে বিরত থাকে)। ষ্টীয়ারিং কমিটির প্রস্তাবটি সমগ্রভাবে ৪৭-২৭ ভোটে (সাতটি রাষ্ট্র নিরপেক্ষ) গৃহীত হয়। যে সকল রাষ্ট্র ষ্টীয়ারিং কমিটির প্রস্তাবের বিপক্ষে অর্থাৎ চীনের সদস্যপদ লাভের পক্ষে ভোট দেন তাঁহারা হইলেন: আফগানিস্থান, আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, ব্রহ্ম, বাইলোরুশিয়া, সিংহল, চেকোস্লোভাকিয়া, ডেনমার্ক, মিশর, ফিনল্যাণ্ড, ঘানা, হাঙ্গেরী, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, আয়ার্লণ্ড, মরক্কো, নেপাল, নরওয়ে, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, সুদান, সুইডেন, সিরিয়া, উক্রেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং যুগোস্লাভিয়া। যে সাতটি রাষ্ট্র ভোটদানে বিরত ছিল তাহারা হইল কাম্বোডিয়া, ইস্রায়েল, লাওস, পাকিস্থান, পর্ত্তুগাল, সৌদি আরব এবং টিউনিস দক্ষিণ আফ্রিকা অনুপস্থিত ছিল।

এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যাহারা চীনের সদস্যপদ লাভের বিরোধিতা করিয়াছে তাহাদের মধ্যে থাইল্যাণ্ড এবং মালয় অন্যতম। মালয়ের প্রতিনিধি ডাঃ ইসমাইল বিন দাগে আবদুর রহমান বলেন যে, পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র তাঁহার রাষ্ট্র (মালয়ই) কেবল কম্যুনিষ্টদের সহিত সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত রহিয়াছে। তিনি বলেন, "আমরা দশ বৎসর যাবৎ কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে বিরাট অ[র্থ] এবং শক্তিব্যয়ে সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেছি।" তিনি আরও বলে[ন] যে, মালয়ে বিদ্রোহীদের অধিকাংশই বিদেশী। মালয় কম্যুনি[ষ্ট] চীনের সদস্যপদলাভ সেই কারণেই সমর্থন করিবে না।

মালয়ের প্রতিনিধির বক্তৃতার উত্তরে ভারতের প্রতিনি[ধি] শ্রীকৃষ্ণ মেনন বলেন যে, একটি নূতন সদস্যরাষ্ট্র অপর এক[টি] রাষ্ট্রের সদস্যপদলাভের বিরোধিতা করিতেছেন দেখিয়া তি[নি] দুঃখিত হইয়াছেন।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সর্বশেষ সিদ্ধান্তের ফলে এবারকার সাধারণ অ[ধি]বেশনেও চীনের সদস্যপদলাভ সংক্রান্ত আলোচনা করা চলিবে না তবে সাধারণ পরিষদে ভারতের প্রস্তাব সম্পর্কে যে আলোচ[না] চলে তাহাতে দেখা যায় যে, চীনকে কেন রাষ্ট্রসঙ্ঘে লওয়া যাই[তে] পারে না সে সম্পর্কে রাষ্ট্রগুলির কোন সুস্পষ্ট ধারণা নাই। ে

কেহ বলিয়াছেন চীন নূতন রাষ্ট্র; মালয় তাহার নিজের গৃহযুদ্ধের দোহাই পাড়িয়াছে। যুক্তিতে এই সকল বক্তব্যের কোনটিই টিকে না।

মালয় রাষ্ট্র-স্বাধীনতা লাভ করিবার এক সপ্তাহের মধ্যেই যদি রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যপদলাভ করিতে পারে তবে আট বৎসর অস্তিত্বের পরও কেন চীনকে "রাষ্ট্র" বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না তাহা সহজে বোধগম্য নহে। মালয়ের যুক্তি অনুরূপভাবে নিরর্থক। মালয়ে গৃহযুদ্ধ দশ বৎসর যাবৎ ব্রিটিশ সরকার চালাইয়াছে এবং সময়ের দিক হইতে মালয়ের গৃহযুদ্ধ কম্যুনিষ্ট চীনা সরকার অপেক্ষা প্রাচীনতর—কিন্তু সেজন্য চীন সরকারকে স্বীকার করিয়া লইতে ব্রিটিশ সরকারের বাধে নাই।

স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে, একটি বিশেষ রাষ্ট্র অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতার জন্যই রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধিকাংশ রাষ্ট্র (যাহারা নানাদিক হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী) খোলাখুলিভাবে তাহাদের মত প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। চীনের সহিত এখন কোন সরকারের বিরোধ নাই; ব্রিটেন চীনকে স্বীকার করে তথাপি রাষ্ট্রসঙ্ঘে সে চীনের বিপক্ষে ভোট দিয়াছে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের মৌলিক আদর্শ বিশ্বে শান্তি এবং মৈত্রী স্থাপন। এই উদ্দেশ্য কার্য্যকরী করিতে হইলে যথাসম্ভব বেশী রাষ্ট্রকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সংশ্রবে আনা প্রয়োজন। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার বিপরীত ঘটিতেছে। এমনকি রাষ্ট্রসঙ্ঘের আদর্শের বিরোধী মতবাদ সম্পন্ন রাষ্ট্রগুলিকেও লওয়া হইতেছে, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুখ চাহিয়া চীনকে লওয়া হইতেছে না। বলা বাহুল্য ইহাতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মর্য্যাদা বাড়ে নাই। কোরিয়া, ইন্দোচীন প্রভৃতি সমস্যার সমাধানে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নির্বীর্য্যতা এই মর্য্যাদা হানির সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

চীনকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যরূপে গ্রহণ করা হইলে দুই দিক হইতেই লাভ হইবে। প্রথমতঃ চীনের অন্তর্ভুক্তিতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের শক্তি এবং মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইবে। দ্বিতীয়তঃ চীন সম্পর্কে যাঁহারা সন্দেহ পোষণ করেন তাঁহারা রাষ্ট্রসঙ্ঘের মাধ্যমে চীনের উপর চাপ রাখিতে পারিবেন। (এখন চীনকে সংযত করিবার কোন উপায়ই তাঁহাদের নাই)। সদস্য রাষ্ট্রগুলির উপর রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিশেষ কোন কর্তৃত্ব নাই সত্য, কিন্তু মিশর আক্রমণ এবং হাঙ্গেরীর ঘটনাবলীতে ইহাও সপ্রমাণিত হইয়াছে যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রয়োজনীয়তা (এবং স্বভাবতঃ মর্য্যাদাও) এখনও রহিয়াছে। সুতরাং সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতেও চীনের রাষ্ট্রসঙ্ঘভুক্তির বিরোধিতার কোন যুক্তি থাকে না।

আলজিরিয়ার সমস্যাবলী

আলজিরিয়া-সমস্যা সমাধানের জন্য ফরাসী সরকার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন আলজিরিয়ার মুক্তি-ফ্রন্ট তাহা প্রত্যাখান করিয়াছেন। নূতন ফরাসী প্রস্তাবটিতে আলজিরিয়াতে একটি কেন্দ্রীয় শাসনসংস্থা গঠনের কথা বলা হইয়াছে। মূল প্রস্তাবে ঐ কেন্দ্রীয় শাসনসংস্থার জন্য একজন নির্ব্বাচিত প্রেসিডেণ্ট বা চেয়ারম্যান থাকিবার কথা ছিল, কিন্তু ফরাসী রক্ষণশীলদের বিরোধিতার জন্য ঐ ধারাটি পরিত্যক্ত হয়। রক্ষণশীলদল প্রথমে সমগ্র আলজিরিয়ার জন্য একটি কেন্দ্রীয় সরকার গঠনেও আপত্তি জানায়। পরে অবশ্য তাহারা উহাতে সম্মতি দেয়। ফরাসী পার্লামেণ্টে এখন ঐ বিল লইয়া আলোচনা চলিতেছে।

ফরাসী সরকারের প্রস্তাব হয়ত ফরাসী জাতীয়-পরিষদ অনুমোদন করিবেন। কিন্তু আলজিরিয়ার মুক্তি-ফ্রণ্ট এই নূতন প্রস্তাবকে পূর্ব্বাহ্নেই বাতিল করিয়া দেওয়ার ফলে উহার দ্বারা আলজিরিয়ার রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের পথ সুগম হয় নাই—হইবার কথাও নহে। কারণ মূল স্বাধীনতার দাবি সম্পর্কে ফরাসী প্রস্তাবটি সম্পূর্ণ নীরব।

আলজিরিয়ার মুক্তিফ্রণ্টের দুই জন নেতা সম্প্রতি কলিকাতা আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম ডাঃ লেমিন দেবাঘিন (Dr. Lemine Debaghine) এবং ম. শেরিফ গুয়েলাল (M. Cherif Guellal)। তাঁহারা বলেন, ফ্রান্স কর্ত্তৃক আলজিরিয়ার নেতৃবৃন্দের অপহরণের পর আলজিরিয়ার অধিবাসিগণ আর ফ্রান্সকে বিশ্বাস করিতে পারেন না। আলজিরিয়ার সমস্যা শান্তিপূর্ণ ভাবে সমাধানের জন্য গত বৎসর রাষ্ট্রসঙ্ঘ যে আহ্বান জানান আলজিরিয়াবাসিগণ তাহাতে আন্তরিকতার সহিত সাড়া দেয়। কিন্তু ফরাসী সরকার ঐ প্রস্তাব গ্রহণের আড়ালে আলজিরিয়াদের ধ্বংস করিবার অভিযান চালাইতে থাকে। বর্ত্তমানে আলজিরিয়াতে আট লক্ষ ফরাসী সৈন্য রহিয়াছে। ঐ সৈন্যবাহিনী উত্তর আটলান্টিক চুক্তি অনুযায়ী প্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। আলজিরিয়াতে ফ্রান্সের অনেকগুলি "ন্যাটো" (NATO) ডিভিসন সৈন্য রহিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত ফরাসী সৈন্যরা পাঁচ লক্ষ আলজিরিয়ানকে হত্যা করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক মরক্কো এবং টিউনিসে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে।

ডাঃ দেবাঘিন এবং ম. গুয়েলাল বলেন যে, আলজিরিয়ার মুক্তিফ্রণ্ট আলজিরিয়ায় সাধারণ নির্ব্বাচনের পক্ষপাতী। কিন্তু নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে তিনটি শর্ত্ত প্রতিপালিত হওয়া প্রয়োজন। সর্ত্ত তিনটি হইল: আলজিরিয়ার স্বাধীনতার দাবী স্বীকার, যুদ্ধবিরতি এবং অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা। তাঁহারা বলেন যে, ফ্রান্স অস্ত্রবলে আলজিরিয়া দখল করিয়াছিল, সুতরাং আলজিরিয়াতে থাকিবার তাহাদের কোন নৈতিক অধিকার নাই। আলজিরিয়াতে সংখ্যালঘু ইউরোপীয় অধিবাসীদের উল্লেখ করিয়া আলজিরিয়ান নেতৃদ্বয় বলেন যে, উহা কোন সমস্যাই নয়। মরক্কো এবং টিউনিসের ন্যায় স্বাধীন আলজিরিয়াতেও ইউরোপীয়গণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক সুযোগ-সুবিধা ভোগের অধিকারী হইবেন।

নাগা আন্দোলন

আগষ্ট মাসে কোহিমাতে অনুষ্ঠিত এক নাগা সম্মেলনে নাগা প্রতিনিধিগণ সিদ্ধান্ত করেন যে, তাঁহারা স্বাধীনতার দাবি পরিত্যাগ করিয়া স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকারসহ ভারতরাষ্ট্রের মধ্যেই থাকিবেন। তবে তাঁহারা বলেন যে, প্রস্তাবিত নাগা অঞ্চলটিকে যেন আসাম রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে রাখা হয়। স্বভাবতঃই আসাম সরকার এই প্রস্তাবে ক্ষুব্ধ হন—কারণ তাঁহারা সর্ব্বদাই নাগাদিগকে অসমীয়াদের সগোত্র বলিয়া চালাই-বার চেষ্টা করেন। কেন্দ্রীয় সরকার যাহাতে নাগাস্থানকে আসাম হইতে স্বতন্ত্র করিয়া গঠন না করেন তজ্জন্য আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিষ্ণুরাম মেধী দিল্লীতে দরবার করিতে আসেন। সর্ব্বশেষ সংবাদে দেখা যায় যে, শ্রীমেধীর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে।

২৫শে সেপ্টেম্বর ভারত সরকার ঘোষণা করেন যে, সরকার কোহিমা সম্মেলনের দাবি মানিয়া লইয়াছেন। স্থির হইয়াছে যে, আসামের নাগা হিলস-জেলা এবং উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত এজেন্সীর তুয়েনসাঙ ডিভিসন লইয়া সরাসরি কেন্দ্রের অধীনে একটি প্রশাসনিক ইউনিট গঠিত হইবে। ভারত সরকার আরও ঘোষণা করেন যে, উপক্রুত অঞ্চলে নাগাদের পক্ষ হইতে এত দিন পর্য্যন্ত যে রাষ্ট্রদ্রোহী কার্য্যকলাপ করা হইয়াছে ভারত সরকার তাহাও ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছেন। অতীতের রাষ্ট্রবিরোধী কার্য্যের জন্য কাহাকেও শাস্তি দেওয়া হইবে না। তবে অবশ্য ভবিষ্যতেও যদি এরূপ বিধ্বংসী কার্য্যকলাপ চলিতে থাকে তবে সরকার তাহা ক্ষমা করিতে পারেন না।

প্রস্তাবিত ইউনিটটি গঠন করিতে হইলে ভারতীয় সংবিধানের সংশোধন সাধন করিতে হইবে। ঐ ইউনিটটি ভারত সরকারের পক্ষ হইতে আসামের রাজ্যপাল কর্ত্তৃক শাসিত হইবে। ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তর এই অঞ্চলের শাসন পরিচালনার জন্য দায়ী থাকিবেন।

নাগা গণ-কনভেনশনের পক্ষ হইতে ডাঃ আও-এর নেতৃত্বে নয় জনের যে প্রতিনিধিদল দিল্লীতে আসেন তাহাদের সহিত আলোচনাকালে শ্রীনেহরু উপরোক্ত ঘোষণা করেন। শ্রীনেহরু বলেন যে, ভারত সরকার নাগাদের যুক্তপূর্ণ দাবীগুলি মানিয়া লইতে প্রস্তুত রহিয়াছেন, কিন্তু "স্বাধীনতা"র দাবী সরকার স্বীকার করিবে না।

নাগা প্রতিনিধিদলের সহিত অবশ্য বিদ্রোহী নাগাদের কোন যোগাযোগ নাই। সুতরাং ইহারা ভারত সরকারের প্রস্তাব গ্রহণ করিলেও নাগা অঞ্চলে শান্তি অবিলম্বে স্থাপিত হইবে কিনা বলা শক্ত। তথাপি এতদিন পর ভারত সরকার এমন একটি প্রস্তাব উপ-স্থাপিত করিয়াছেন যাহার ভিত্তিতে নাগা-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের পথ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। সরকার জঙ্গী মনোভাব পরিত্যাগ করিয়া যে রাজনৈতিক সমাধান খুঁজিতেছেন ইহাই হইল বড় কথা। ভারতের পূর্ব্ব সীমান্তে নাগা অঞ্চলে যে সামরিক কার্য্যকলাপ চলিতেছে ভারতের পক্ষে তাহা কোন দিক হইতেই লাভজনক নহে। যতশীঘ্র উহার অবসান ঘটে সকলের পক্ষে ততই মঙ্গল।

নাগাপাহাড়—সরকারী বিবৃতি

নাগাপাহাড় সম্পর্কে সরকারী ঘোষণা নিম্নরূপ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং আমরা ইহা নিম্নে দিলাম।

"নয়াদিল্লী, ২৫শে সেপ্টেম্বর—নাগাপাহাড় জেলা (আসাম) ও তুয়েনসাং সীমান্ত বিভাগকে (উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত এজেন্সী) ভারতের রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে একটি প্রশাসনিক ইউনিটরূপে গঠনের জন্য গত আগষ্ট মাসে অনুষ্ঠিত নাগা সম্মেলনে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, ভারত সরকার তাহা মানিয়া লইয়াছেন বলিয়া আজ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন।

আসামের রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির তরফে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই ইউনিটের শাসন পরিচালনা করিবেন। পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সংসদ কর্ত্তৃক সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন হইবে, তবে যথাসম্ভব উহা রূপায়িত করা হইবে।

প্রধানমন্ত্রী এই মর্ম্মেও ঘোষণা করেন যে, নাগারা অতীতে যে সব অপরাধমূলক কাজ করিয়াছে, ভারত সরকার তাহা ক্ষমা করিবেন। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে যে সব অপরাধ করা হইবে, সে সব ক্ষমা করা হইবে না।

আজ ডাঃ ইনকনগ্লিবা আও-এর নেতৃত্বে ৯ জন সদস্য লইয়া গঠিত নাগা প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সঙ্গে হায়দরাবাদ ভবনে সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা তাঁহাকে সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও গ্রামবেষ্টন ব্যবস্থা বর্জ্জন করিতে অনুরোধ করেন। যেহেতু শেষোক্ত ব্যবস্থার ফলে সংশ্লিষ্ট নাগাদের চরম দুর্গতি ভোগ করিতে হইতেছে। ভারত সরকার গ্রামবেষ্টন নীতি বর্জ্জন করিতে সম্মত হইয়াছেন। তবে বৈরিতামূলক কাজকর্ম্ম শেষ হইবার এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে তাহা করা হইবে। নাগা গ্রাম-গুলিকে আর পুনর্বিন্যাস না করিবার জন্য নির্দেশ জারী করা হইতেছে।

নাগা পাহাড়ের দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিবে এবং প্রতিনিধিগণ কোহিমা সম্মেলনে উপস্থিত ব্যক্তিগণও অন্যান্য উপক্রুত এলাকায় শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করিবেন—প্রধানমন্ত্রী এইরূপ আশা ব্যক্ত করেন।

তিনি আরও বলেন যে, সংশ্লিষ্ট নাগা জনগণ ও সরকারের পক্ষে প্রথম কাজ হইবে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, দ্বিতীয় কাজ হইবে দুর্ভোগগ্রস্তদের পুনর্ব্বাসন করা এবং তৃতীয় কাজ হইবে নাগা জনসাধারণের অবস্থা উন্নয়নে সহযোগিতা করা।

বৈঠক অন্তে ডাঃ আও ও প্রতিনিধিদলের সদস্য শ্রীজাকোসী আঙ্গামী সাংবাদিকদের নিকট বলেন যে, তাঁহাদের বৈঠক খুব আন্তরিক পরিবেশের মধ্যে হইয়াছে এবং উহা ফলপ্রসূও হইয়াছে।

২৭শে সেপ্টেম্বর নাগা নেতৃবৃন্দ নিজেদের এলাকায় ফিরিয়া যাইবেন। তাঁহারা বিদায়-সম্ভাষণ জানাইবার জন্ত আগামীকালও প্রধানমন্ত্রীর সহিত দেখা করিবেন।

নিম্নে সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রদত্ত হইল: "প্রধানমন্ত্রী ২৫শে সেপ্টেম্বর সকালে নাগা প্রতিনিধিদলের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ২২শে হইতে ২৬শে আগষ্ট কোহিমায় অনুষ্ঠিত নাগা সম্মেলনে এই প্রতিনিধিদিগকে নির্ব্বাচিত করা হয়। সম্মেলনের সভাপতি ডাঃ ইমকনগ্লিবী দলের নেতৃত্ব করেন এবং সম্মেলনের সম্পাদক শ্রীজাসোকী আঙ্গামীসহ অপর আটজন প্রতিনিধিদলে ছিলেন। দলনেতা কোহিম, সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী প্রধানমন্ত্রীর নিকট অর্পণ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, ভারত সরকার নাগা জনসাধারণের ন্যায়সঙ্গত প্রত্যাশা পূরণের জন্য সংবিধানের পরিবর্ত্তনসূচক প্রস্তাবাবলী বিবেচনা করিতে প্রস্তুত আছেন বলিয়া তিনি বহুবার খোলাখুলি বলিয়াছেন। সরকার স্বাধীনতা-ভিত্তিক কোন পরিকল্পনা আমল দিতে নারাজ। তবে কোহিমা সম্মেলনে গৃহীত বিভিন্ন প্রস্তাবে ইহার পথ সুগম হওয়ায় এবং প্রতিনিধিদের সহিত সাক্ষাৎ করায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

নাগা এলাকায় উপদ্রব ও গোলযোগ অবসানের প্রয়োজনীয়তার উপর প্রধানমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ও নিরুপদ্রব পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কোহিমা সম্মেলন আশ্বাস দেওয়ায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন যে, নাগা পাহাড় জেলা ও তুয়েনসাং সীমান্ত বিভাগকে রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে একটি প্রশাসনিক অঞ্চলরূপে গঠন করা হইবে বলিয়া সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। আসামের রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির তরফে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই অঞ্চলের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। প্রধানমন্ত্রী ভারত সরকারের পক্ষে এই প্রস্তাব মানিয়া লইয়াছেন এবং যথাশীঘ্র উহা কার্য্যে পরিণত করিতে সম্মত হইয়াছেন। তবে এই ব্যবস্থা কার্য্যকর করিতে হইলে সংবিধান সংশোধনের দরকার হইবে। কাজেই ১৯৫৭ সনের নবেম্বর-ডিসেম্বরে সংসদের অধিবেশনকালে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা সম্ভব হইবে। এই বিষয়ে সংসদের অনুমোদন লাভ করায় কোন অসুবিধা হইবে বলিয়া প্রধানমন্ত্রী মনে করেন না।

দক্ষিণ-ভারতে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা

মাদ্রাজের রামনাদ জেলাতে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি হরিজন এবং মারাবারদের মধ্যে এক সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ফলে এক শোচনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে। নরহত্যা, অগ্নিসংযোগ, দাঙ্গাহাঙ্গামার সুপরিচিত ধ্বংসকার্য্যের কোন পদ্ধতিই এই আত্মঘাতী কলহে ব্যবহৃত হইতে বাকী থাকে নাই। অবস্থার গুরুত্ব বুঝিবার পক্ষে একটি তথ্যই যথেষ্ট যে, ২১শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত চল্লিশ জন লোকের প্রাণহানি ঘটে। পুলিসের হস্তক্ষেপে অবস্থা আয়ত্তে আসে বটে, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে নাই। ২৪শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ৪৫০ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। নিম্নে পণ্ডিত নেহরুর মন্তব্য দেওয়া হইল:

"মাদুরা, ২১শে সেপ্টেম্বর—এখানে সরকারীসূত্রে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গিয়াছে যে, গতকল্য সায়াহ্নে সশস্ত্র পুলিস ফৌজ পূর্ব্ব রঘুনাথপুর জিলার মারাবার ও হরিজনদের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ থামাইতে গিয়া শিবগঙ্গা তালুকের মালভিরায়েগুল গ্রামে এক মারমুখী জনতার উপর গুলী চালায়। পুলিস এই লইয়া দশ দিনের মধ্যে পাঁচ বার গুলী চালাইল। বুলেটের আঘাতে একজনের মৃত্যু হয়। আর কেহ হতাহত হইয়াছে কিনা জানা যায় নাই। এই জিলায় পুলিসের গুলীচালনা ও দাঙ্গাহাঙ্গামায় ফলে মোট ৪০ জনের মৃত্যু হইল।

তদুপরি উক্ত সংবাদে ইহাও বলা হইয়াছে যে, পুলিস উন্মত্ত জনতা কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত খাদ্যশস্য, পণ্যদ্রব্য ও তৈজসপত্রাদি উদ্ধার করে। পূর্ব্বরামনাথপুরম্ জিলার অন্যান্য অংশ হইতে অগ্নিসংযোগ ও পুলিসের উপর চোরা-আক্রমণ সম্পর্কিত ঘটনার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। মুদুকুলাথুর তালুকের সন্নিকটবর্ত্তী আরুপ্পুকোট্টাই তালুক হইতে অগ্নিসংযোগ সংক্রান্ত ঘটনারও সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। গতকল্য সশস্ত্র মারাবারবা মাঙ্গুর থানার এলাকাধীন কাম্বিগুড়ি, কমাইয়াপট্টি থানার তারাগানেগুল ও নারিকুরি থানার এলাকাধীন কাম্বালী গ্রামে হরিজন ও নাদারদের গৃহে অগ্নিসংযোগ করে। এক উন্মত্ত মারাবার জনতা হরিজনদের ১১৫টা ভেড়া লইয়া চলিয়া যায়। তদুপরি মেস্বালেরী গ্রামের অধিবাসীরা তিরিকুলি এলাকায় কালথিকুলম ও কুণ্ডকুলম নারিকুড়ি এলাকায় কোয়াকুলম গ্রামে অগ্নিসংযোগ করে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সরকারীসূত্রে প্রাপ্ত অপর এক সংবাদে জানা যায় যে, মুদুকুলাথুর হইতে চার মাইল দূরবর্ত্তী কাকুর গ্রামে একদল টহলদার পুলিসের উপর গুলী চালানো হয়। পুলিস দল গুলী চালাইয়া পাল্টা জবাব দেয়। আততায়ীরা অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া পলায়ন করে। কেহই হতাহত হয় নাই। তদুপরি সংবাদে ইহাও বলা হইয়াছে যে, উক্ত এলাকায় তন্ন তন্ন করিয়া তল্লাসীর পর টহলদার পুলিসদল নিরাপদে ঘাটিতে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

অদ্য এখানে বেসরকারীসূত্রে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা যায় যে, আরুপ্পুকোট্টাই তালুকের বিভিন্ন গ্রামে হরিজনদের গৃহে অগ্নিসংযোগকারী সশস্ত্র মারাবাররা এক্ষণে মাদুরা জিলার তিরমঙ্গলম তালুকে উপস্থিত হইয়াছে এবং উন্মত্ত জনতা উক্ত তালুকের দুইটি গ্রাম পরিবেষ্টন করিয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। উক্ত গ্রাম দুইটি হইতে রামনাথপুরম কালেক্টরীতে জরুরী বিপদজ্ঞাপক বার্ত্তা আসিয়াছে। দেবকোট্টাই-এর তালুক ম্যাজিষ্ট্রেট গতকল্য সায়াহ্নে পুলিসের গুলীবর্ষণ সম্পর্কে তদন্তের আদেশ দিয়াছেন।

এই শোচনীয় ঘটনাটির উৎপত্তি হয় মাদ্রাজের রামনাথপুরম্ জেলার অন্তর্গত মুদুকালাথুর তালুকের এক অখ্যাত গ্রামে। সেখানে

একজন খ্রীষ্টান হরিজনকে হত্যা করা হয়। তারপরই হরিজন এবং মারাবার (থেবর)-দের মধ্যে দাঙ্গা আরম্ভ হইয়া যায়। দাঙ্গা প্রথমে ঐ তালুকে সীমাবদ্ধ থাকে; কিন্তু শীঘ্র দাবানলের ন্যায় উহা পার্শ্ববর্তী তালুকগুলি এমনকি পার্শ্ববর্তী মাদুরাই জেলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

ভারতে ইহার পূর্ব্বেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা গিয়াছে; কিন্তু পূর্ব্বে কোন দাঙ্গা (১৯৪৬ ছাড়া) এত অল্প সময়ের মধ্যে এইরূপ ব্যাপক এবং ধ্বংসকারী রূপ ধারণ করে নাই। দাঙ্গাকারীরা নির্দ্দয়ভাবে ঘরবাড়ী পোড়াইয়াছে এবং আবালবৃদ্ধবনিতা নির্ব্বিশেষে হত্যা করিয়াছে। একজন লোকের মৃত্যুর স্বাভাবিক পরিণতি-হিসাবে এরূপ ব্যাপক দাঙ্গা ঘটিতে পারে কি না তাহা বিশেষরূপে দেখা প্রয়োজন। দাঙ্গাকারীরা বন্দুক এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রসহ প্রকাশ্যেই ঘোরাঘুরি করিয়াছে। রকম দেখিয়া মনে হয় যে, এরূপ দাঙ্গার পিছনে কোন গভীর চক্রান্ত নিহিত রহিয়াছে। আরও মনে হয় প্রথমেই পুলিস যদি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিত তবে হয়ত দাঙ্গা এভাবে ছড়াইয়া পড়িতে পারিত না।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ধ্বংসলীলা ভারতবাসী যেরূপ দেখিয়াছে এরূপ বোধ হয় আর কেহই দেখে নাই। কিন্তু তাহাতে বিশেষ শিক্ষা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। রামনাথপুরমের দাঙ্গা তাহা না হইলে ঘটিতে পারিত না। তবে হয়ত দক্ষিণ-ভারতবাসী পূর্ব্ববর্তী দাঙ্গাগুলির দ্বারা সেরূপ প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হয় নাই বলিয়াই এরূপ দাঙ্গা সংঘটিত হইল। দাঙ্গাতে কাহার লাভ হইয়াছে শীঘ্রই তাহারা তাহা বুঝিতে পারিবে। কিন্তু সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ নর-নারীর নিঃস্বতা তাহাতে কিছুই কমিবে না। এখনও কি ভারতবাসী বুঝিবে না যে, আত্মঘাতী কলহে কখনও কোন উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না?" কলহ কত সাংঘাতিক তাহা নিম্নস্থ বিবরণে বুঝা যাইবে।

"মহীশূর, ২১শে সেপ্টেম্বর—আজ সন্ধ্যায় এখানকার বিরাট টাউন হল ময়দানে এক জনসভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজবাহরলাল নেহরু মাদ্রাজ রাজ্যের রামনাদ জেলায় বর্ত্তমানে হিন্দু সমাজের বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে যে মারামারি চলিতেছে তাহাতে বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি ইহাকে "আদিম ও নির্ব্বুদ্ধিতা-সূচক" আখ্যা দিয়া বলেন যে, পুনরায় ইহা দেশের ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইতেছে।

পক্ষকাল পূর্ব্বে এই বিবাদ সুরু হইয়াছে এবং এ পর্য্যন্ত পাঁচটি ক্ষেত্রে পুলিসকে গুলী চালাইতে হইয়াছে এবং পুলিসের গুলী-চালনা ও এইরূপ সজ্ঘর্ষের ফলে ৪০ ব্যক্তি নিহত হইয়াছে।

শ্রী নেহরু বলেন যে, দেশের উন্নতির পথের অন্তরায়স্বরূপ যাবতীয় সমস্যার সার্থক সমাধানের জন্য যে সময়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, ভাষায় ভাষায়, রাজ্যে রাজ্যে এবং বর্ণে বর্ণে সকল প্রকার ক্ষুদ্র ভেদ-বিবাদ ভুলিয়া সমগ্র জাতির একযোগে কাজ করা উচিত সেই সময়ে রামনাথপুরমের অধিবাসিগণ কেবলমাত্র বর্ণবৈষম্যের জন্য ঝগড়ায় মত্ত হইয়া কাটাকাটি মারামারি করিতেছেন, সময়ে সময়ে একে অন্যকে হত্যাও করিতেছেন। "ইহা এক ভয়ঙ্কর কাণ্ড।"

তিনি বলেন, "রামনাথপুরমের এই বিবাদ অতিশয় অযথা ব্যাপার। আমরা যদি এইরূপ আদিম মনোবৃত্তিসম্পন্ন ও নির্ব্বোধ হই; তবে আমরা কিভাবে অগ্রসর হইতে পারিব?"

শ্রী নেহরু বলেন যে, এই বর্ণবৈষম্যের জন্য গত কয়েক শতাব্দী ভারত বহু লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে। জাতীয় ঐক্যের পথে উহা বাধা ছিল এবং এখনও ইহা বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে। দেশকে গঠন করিতে হইলে দেশবাসীকে এই বর্ণবৈষম্য, প্রাদেশিকতা ইত্যাদি ভুলিতে হইবে।"

ব্যাঙ্ক ধর্ম্মঘট

আনন্দবাজার গত ২৬শে সেপ্টেম্বরে ব্যাঙ্ক ধর্ম্মঘট সম্পর্কে নিম্নস্থ বিবৃতি দিয়াছেন:

"বুধবার কলিকাতা ও শহরতলী অঞ্চলে ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীদের ধর্ম্ম-ঘটের অষ্টম দিবসে ঐ ধর্ম্মঘট সম্পর্কে নূতন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি দেখা দেয়।

এইদিন ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গের ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীদের পরি-পূরক ভাতা দানের দাবীটি সালিশীতে প্রেরণ করিয়া এক বিজ্ঞপ্তি দেন। শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের সদস্য শ্রীসলিম এম. মার্চেন্টের নিকটই উহা সালিশীর জন্য প্রেরিত হয়। তাহা ছাড়া, ভারত সরকার ১৯৪৭ সনের শিল্প-বিরোধ আইনের ১০(৩) ধারা অনুযায়ী ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘট চালাইয়া যাওয়া নিষিদ্ধ করিয়াও এক আদেশ জারী করেন।

অপরাহ্নের দিকে সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলির মারফৎ ব্যাঙ্ক ধর্ম্মঘটের বিষয় সালিশীতে প্রেরণের ঐ সংবাদ আসিয়া পৌঁছাইলে, অতঃপর কর্ম্মচারীরা ধর্ম্মঘট না চালাইয়া সালিশীর জন্য অপেক্ষা করিবেন এরূপ ভাবিয়া কলিকাতার বিভিন্ন মহলে অনেকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। কিন্তু সন্ধ্যার দিকে দিল্লী হইতে প্রদত্ত পশ্চিমবঙ্গ ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারী সমিতির সভাপতি শ্রীপ্রভাত করের বিবৃতিতে এবং রাত্রে কলিকাতায় সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীতুষার চক্রবর্তীর বিবৃতিতে বিষয়টি সালিশীতে প্রেরণ সত্ত্বেও ধর্ম্মঘট চালাইয়া যাইবার সিদ্ধান্ত প্রচারিত হওয়ায় অনেকের মনে হতাশার সঞ্চার হয়।

কেন্দ্রীয় সরকার তাঁহাদের বিজ্ঞপ্তিতে বলেন যে, ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারী-দের দাবীসংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তিসাধনের উদ্দেশ্যেই ঐ বিষয়টি সালিশীতে প্রেরণ করা হইতেছে এবং সরকার আশা করেন যে, "ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীরা পুনরায় কাজে যোগদান করিবেন এবং বিষয়টির সত্বর নিষ্পত্তির জন্য ট্রাইব্যুনালের সহিত সহযোগিতা করিবেন।"

কিন্তু ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারী সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রী চক্রবর্তীর বিবৃতিতে ধর্ম্মঘট চালাইয়া যাওয়ার কথা জানাইয়া বলা হয় যে,

"আমরা এখন পর্য্যন্ত ঐ সরকারী বিজ্ঞপ্তিটি দেখি নাই এবং সে অবস্থায় আমরা এখনও উহার তাৎপর্য্য বিচার করিতে সক্ষম নই।"

ইতোমধ্যে বুধবারও ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারী ধর্ম্মঘটের ফলে কলিকাতা ও শহরতলীতে জনসাধারণের, বিশেষ করিয়া ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ী মহলের অসুবিধা চলিতেই থাকে। লিখিবার সময় আনন্দবাজার এ বিষয়ে নিম্নস্থ বিবৃতি প্রকাশিত করিয়াছেন।

"বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক ব্যাঙ্ক কর্ম্মীদের পরিপূরক ভাতার প্রশ্নটি ট্রাইব্যুনালে প্রেরিত হওয়ায় এবং ধর্ম্মঘট বে-আইনী ঘোষিত হওয়ায় ব্যাঙ্ক মালিক সমিতি এবং কলিকাতা এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক এসোসিয়েশন এক বিজ্ঞপ্তিতে উপরোক্ত এসোসিয়েসন দুইটির অন্তর্ভুক্ত সমুদয় ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীদের অবিলম্বে কার্য্যে যোগদানের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। অন্যথায় কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে বলিয়া জানান হইয়াছে।

ঐদিন কয়েকটি বড় বড় ব্যাঙ্কে অন্য দিন অপেক্ষা বেশীসংখ্যক অফিসার এবং সুপারভাইজিং ষ্টাফের লোক কার্য্যে যোগদান করেন, অন্যদিনের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশীসংখ্যক লোক ঐদিন টাকা তুলিতে যান এবং অপরাহ্ন ৫টা ৫৷টা অবধি তাঁহাদের টাকা দেওয়া হয়।

একদিকে এই দিন ব্যাঙ্ক মালিকগণ যেমন ধর্ম্মঘটী কর্ম্মীদের কার্য্যে যোগদানের নোটিশ জারী করিয়াছেন, অপরদিকে তেমনি ব্যাঙ্ককর্ম্মীগণ এই দিন ভারত সভা ভবনে নিখিলবঙ্গ ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারী সমিতির উদ্যোগে আহূত সভায় ধর্ম্মঘট চালাইয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত অপরিবর্ত্তিত রাখিয়াছেন।

বৃহস্পতিবার লয়েডস ব্যাঙ্কের কিছুসংখ্যক ধর্ম্মঘটী কর্ম্মচারী কার্য্যে যোগদান করেন বলিয়া জানা যায়। প্রত্যেকটি ব্যাঙ্কের কাউণ্টারেই এইদিন টাকা তুলিবার জন্য লোকের ভীড় হয়।

ভারতের শিল্প বাণিজ্য

আনন্দবাজারের মাধ্যমে আমরা নিম্নস্থ বিবৃতি পাইয়াছি:

"ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই মঙ্গলবার বিকালে কলিকাতায় বঙ্গীয় বণিক সভা ভবনে অনুষ্ঠিত শিল্প পরিসংখ্যান 'ব্যুরো'র বার্ষিক সভা উদ্বোধনকালে বলেন যে, ভারতের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে পরিসংখ্যানের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে।

ঐ সভায় পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য, সাহায্য ও সরবরাহ মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সভাপতিত্ব করেন।

শ্রীদেশাই বলেন যে, ভারতের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলি সফল করিয়া তুলিবার জন্য বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় অত্যাবশ্যক এবং রপ্তানি বৃদ্ধির দ্বারাই একমাত্র সেই কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। পণ্যের মান উন্নত না হইলে রপ্তানি বৃদ্ধি সম্ভব নহে। এবং মাননিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেও পণ্যের মান উন্নত করিতে পারা যায়। আর এই মান নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে নির্ভুল পরিসংখ্যানের সহায়তা অপরিহার্য্য।

শিল্প-পরিসংখ্যান ব্যুরোর ন্যায় বে-সরকারী সংস্থার ভূমিকার উল্লেখ করিয়া শ্রীদেশাই বলেন যে, এই ধরনের সংস্থাগুলি সরকারকে নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান সরবরাহ করিয়া একদিকে যেমন সরকারকে পরিচালিত করিতে পারেন অপরদিকে তেমনি গঠনমূলক সমালোচনার দ্বারা সরকারের ভুলত্রুটিও শুধরাইতে পারেন।

সভাপতির ভাষণে শ্রীসেন পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র শিল্পের এক শোচনীয় চিত্র তুলিয়া ধরেন। তিনি বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্র শিল্পসংস্থা সংখ্যায় যদিও মাঝারি বা বড় শিল্পসংস্থার তুলনায় অনেক বেশী তথাপি নিয়োজিত মূলধন, কর্ম্মরত শ্রমিক এবং উৎপন্ন দ্রব্যের মানের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহা উক্ত দুই শ্রেণীর শিল্পের তুলনায় অনেক পিছাইয়া আছে।

শ্রীসেন বলেন যে, ক্ষুদ্র শিল্পকে কেন্দ্রীভূত না করিয়া পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া দিলে বেকার-সমস্যার ভাল রকম সমাধান করা যায়। কোন্ অঞ্চলে কোন্ শিল্প গড়িয়া তুলিতে হইবে তাহা স্থির করিতে হইলে তৎস্থানের কাঁচামাল, শ্রমিক, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং মূলধন সম্পর্কে ভালরকম পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। এই জাতীয় কার্য্য এই শিল্প-পরিসংখ্যান ব্যুরোর ন্যায় সংস্থার মাধ্যমেই ভালভাবে করা যায় বলিয়া শ্রীসেন মনে করেন।

ঐ ব্যুরোর সম্পাদক শ্রীটি. ঘোষ জানান যে, অর্থাভাবে এই সংস্থা আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতেছে না। তিনি রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় উভয় সরকারের নিকট এই সংস্থার কার্য্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য অর্থসাহায্য প্রার্থনা করেন।"

শিল্প বাণিজ্যের মূলে যে সত্য আছে—অর্থাৎ সততা—তাহার বিষয়ে ইঁহারা কেহই বিশেষ কিছু বলেন নাই।

বিশ্ববিদ্যালয় সমিতি ও পণ্ডিত নেহরু

নিম্নস্থ বিবরণে কল্যাণরাষ্ট্র সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরুর ধারণা বেশ স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে এবং উহাতে বুঝা যায় যে, পণ্ডিতজীর মনে বাস্তব ও কল্পনা রাজ্যের মধ্যে প্রভেদ কত অল্প।

"হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য), ২৩শে সেপ্টেম্বর—প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু আজ এখানে বলেন, "একমাত্র আমরা আমাদের নিজেদের চেষ্টায়ই ভারতকে গড়িয়া তুলিতে পারি—নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়িয়া তোলার জন্য অপরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা উচিত নয়।"

আন্তর্জ্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির ভারতীয় জাতীয় কমিটি কর্ত্তৃক আয়োজিত "কল্যাণরাষ্ট্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা" সম্বন্ধে এক আলোচনা-সভার উদ্বোধন করিয়া পণ্ডিত নেহরু এই কথা বলেন।

পণ্ডিত নেহরু বলেন, ভারতের উন্নয়ন-পরিকল্পনাগুলির ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য ভারত বাহিরের সাহায্য চাহিয়াছে। যাহারা আমাদিগকে সাহায্য করেন, আমরা তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু আপনারা যদি মনে করেন যে, অন্য কাহারও বদান্যতার উপরই আপনাদের ভবিষ্যৎ শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করে, তবে আপনারা ঠকিবেন। ভারতবাসীদেরই ভারতকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। অবশ্য অপরের নিকট হইতে সাহায্য ও সহযোগিতা লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ভারতকে গড়িয়া তুলিতে পারি একমাত্র আমরা নিজেরাই।

পণ্ডিত নেহরু বলেন, "ভারত গঠনের দায়িত্ব আমাদিগকেই বহন করিতে হইবে। অন্য কেহ আপনাদিগকে সাহায্য করিতে আসিবে বলিয়া যদি আপনাদের ধারণা থাকে, তবে তাহা অত্যন্ত মারাত্মক ভুল। ইহার একমাত্র অর্থ এই যে, দেশ পতনোন্মুখ হইয়া পড়িয়াছে।"

তিনি অবশ্য এ কথা স্বীকার করেন যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য অর্থ সংগ্রহে কিছু অসুবিধা দেখা দিয়াছে। কিন্তু কোন ব্যক্তি বা জাতিকে যদি দ্রুত উন্নতি করিতে হয়, তবে এই জাতীয় অসুবিধা ভোগ করিতেই হইবে এবং এজন্য "আমরা গৌরবান্বিত।"

প্রধানমন্ত্রী তাঁহার এক ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতায় আন্তর্জাতিক দৃষ্টি-ভঙ্গী গড়িয়া তোলার আবশ্যকতার উপর বিশেষ জোর দেন।

ভারত এমন এক দেশ যেখানে তিনি যুগপৎ উচ্চতম চিন্তাধারা ও দার্শনিক তত্ত্ব এবং নিকৃষ্টতম আচরণ দেখিয়াছেন। ভারতবাসী ভাল ও মন্দ দুই লইয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। দেশের যদি প্রগতি কাম্য হয়, তবে ভাল জিনিসের অনুশীলন করিতে হইবে এবং মন্দ জিনিস পরিত্যাগ করিতে হইবে।

যাহা কিছু ভেদ সৃষ্টি করে তাহাই মন্দ। এই প্রকার মন্দ জিনিসের অভাব আমাদের নাই, যেমন প্রাদেশিকতা, জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতা। যে ধর্ম্ম মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে বলিয়া বিশ্বাস করা হয়, সেই ধর্ম্মও একটা মন্দ জিনিসের পর্য্যায়ে পড়িয়া গিয়াছে। ভারতের একটি মৌলিক দোষ হইতেছে জাতিভেদ প্রথা। ইহার হয়ত ভাল দিক ছিল, কিন্তু মূলতঃ ইহা সঙ্কীর্ণচিত্ততার উৎসাহ দিয়া আসিয়াছে। এই সমস্ত প্রতিবন্ধক আমাদিগকে দূর করিতে হইবে, তার পর জাতিগত প্রতিবন্ধকও দূর করিতে হইবে।

পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, আজ পৃথিবীকে একটি পথ বাছিয়া লইতে হইবে—আন্তর্জ্জাতিকতাবাদ অথবা জাতিতে জাতিতে বিরোধ। পণ্ডিত নেহরু স্পষ্টতার সঙ্গে বলেন যে, কসমো-পোলিটানিজম বলিয়া যাহা প্রচলিত, তাহার উদ্ভব অনুভূতির অভাব হইতে—এই জিনিসকে আন্তর্জ্জাতিকতাবাদ বলে না। আন্তর্জ্জাতিকতাবাদ হইতেছে গঠনমূলক ও সঞ্জীবধর্ম্মী।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমেরিকা হউক, রাশিয়া হউক, বিদেশে তিনি দেখিয়াছেন লোক কত ভাল, কত তাহাদের অতিথিপরায়ণতা, কত তাহাদের দয়াদাক্ষিণ্য। যতক্ষণ বেসুরে কিছু বলা না হয় ততক্ষণই তাহারা ভাল। কিন্তু যেই ভুল তন্ত্রীতে আঘাত পড়িবে, অমনি স্বভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া যায়।

তিনি বলেন, আজ যুদ্ধ কেহই চায় না, তবুও যুদ্ধের আশঙ্কায় বিভিন্ন জাতি যুদ্ধের প্রস্তুতিতে শক্তি ও সম্পদের অপচয় ঘটাইতেছে।

প্রধানমন্ত্রী আচার্য্য ভাবের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া বলেন, তিনি তাঁহার মধ্যে মানুষের আত্মিকশক্তির বিকাশ লক্ষ্য করিয়াছেন।

পণ্ডিত নেহরু বলেন, আধ্যাত্মিক পটভূমিকা না থাকিলে সভ্যতা নিরর্থক—এইরূপ সভ্যতা লোককে ভ্রান্তপথে চালিত করে, বিশ্বযুদ্ধ ও সর্ব্বনাশের পথে লইয়া যায়।

পণ্ডিত নেহরু তাঁহার ছাত্র-জীবনের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তখন হইতে বিশ্ব ও ভারতে বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সময়ের এত ব্যবধান ঘটায় বর্ত্তমান সময়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের মানসিক জগতের কথা তিনি কতখানি বোঝেন, তাহা তিনি জানেন না। প্রত্যেক যুগেরই নিজস্ব চিন্তাধারা আছে। তিনি যে যুগে ছাত্র ছিলেন তাহা ছিল মহাত্মা গান্ধীর যুগ। তাঁহার দ্বারা এবং বিরাট স্বাধীনতা আন্দোলন দ্বারা তাঁহারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। সে যুগের ছাত্রদের মত বর্ত্তমান যুগের কতজন ছাত্র গান্ধীজীর ভাবে অনুপ্রাণিত, তাহা তিনি জানেন না। তাঁহার সময়ে ছাত্রদের সম্মুখে ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের আহ্বান। বর্ত্তমান যুগের ছাত্রদের সম্মুখে রহিয়াছে দেশগঠনের আহ্বান।

পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, তিনি গান্ধীবাদী ঐতিহ্যে লালিত-পালিত। "আমরা সকলেই গান্ধী-যুগের সন্তান। আমাদের নিকট লক্ষ্য অপেক্ষা লক্ষ্যসিদ্ধির উপায় বেশী না হইলেও সমান গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষ্যসিদ্ধির উপায় যদি বিকৃত হয়, তবে আমরা লক্ষ্যে নাও পৌঁছিতে পারি। আমরা যদি সৎ জীবন যাপন করিতে চাহি, তবে অসৎ উপায়ে তাহা অর্জ্জিত হইতে পারে না। এভাবেই যুদ্ধের কথা বলিয়া শান্তি স্থাপিত হইতে পারে না।"

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "দেশের দায়িত্ব বর্ত্তমান পুরুষের উপরই ন্যস্ত হইবে। আমি বর্ত্তমানের তরুণ, তরুণী ও শিশুদের মুখেই ভবিষ্যতের সন্ধান করিতেছি। পরিকল্পনা বা পরিসংখ্যানের মধ্যে ততটা নহে—তরুণ, তরুণী ও শিশু, তাহাদের আদর্শ, চরিত্র ও প্রেরণার মধ্যেই ভারতের ভবিষ্যৎ নিহিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে অসদাচরণ ও শৃঙ্খলাহীনতার প্রশ্ন রহিয়াছে। কতকগুলি অসদাচরণ ও উচ্ছৃঙ্খলতা তেমন দোষের নহে। কিন্তু এমন কতকগুলি জিনিস আছে যাহা নরহত্যা অপেক্ষাও বেশী অমার্জ্জনীয়। আত্মিক পতন নরহত্যার চেয়েও শোচনীয়। এরূপ চরিত্র হইতে মহৎ কিছু আশা করা যায় না।

তিনি বলেন, "সকল লোকেরই দোষ-ত্রুটি আছে, কিন্তু তাহার মধ্যেও যদি ভাল কিছু না থাকে তবে টিকিয়া থাকা কঠিন।"

তিনি সঙ্কীর্ণতা পরিহারের উপদেশ দিয়া বলেন, "ভারতের মাটি হইতেই তোমাদিগকে বড় হইতে হইবে।"

পূজার ছুটি

শারদীয়া পূজা উপলক্ষ্যে প্রবাসী কার্য্যালয় আগামী ১৩ই আশ্বিন ১৩৬৪ (৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৭) হইতে ২৬শে আশ্বিন ১৩৬৪ (১৩ই অক্টোবর ১৯৫৭) পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। এই সময়ে প্রাপ্ত চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা আপিস খুলিবার পর করা হইবে।

কর্ম্মাধ্যক্ষ, প্রবাসী

শঙ্করের "অধ্যাসবাদ"।

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

(১)

পূর্ব কয়েকটি সংখ্যায় (আষাঢ় --আশ্বিন, ১৩৬৪) "শঙ্করের ব্রহ্ম" সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। শঙ্করের মতে, ব্রহ্ম "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বলে স্বভাবতঃই প্রশ্ন হতে পারে যে, এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বজগতের উদ্ভব হ'ল কি করে, যেহেতু সে ক্ষেত্রে ব্রহ্ম ব্যতীতও অপর একটি তত্ত্ব, সত্য বা সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হয়। এই প্রসঙ্গে শঙ্কর তাঁর সুবিখ্যাত "বিবর্তবাদ" এবং তার ভিত্তিস্বরূপ "অধ্যাসবাদে"র অবতারণা করেছেন।

এরূপে, অধ্যাসবাদই হ'ল শঙ্করের অতুলনীয় অদ্বৈতবাদের মূলভিত্তি। সেজন্য ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য প্রারম্ভেই তিনি এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। "অধ্যাস-ভাষ্য" নামে খ্যাত এই অংশটি ভাবের মৌলিকতা ও ভাষার সরলতায় সত্যই বিশ্বের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি।

দু'প্রকার বস্তু আছে—আত্মা এবং আত্মার বহির্ভূত অনাত্মা। প্রথমটি "অস্মৎ-প্রত্যয়-গোচর-বিষয়ী", দ্বিতীয়টি "যুষ্মৎ-প্রত্যয়-গোচর-বিষয়"। "অস্মৎ-পদার্থ" হলেন চিৎ-স্বরূপ, অজড় আত্মা বা ব্রহ্ম; "যুষ্মৎ-পদার্থ" হ'ল জড়বস্তু বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। জড়বস্তু চিৎ-প্রকাশ্য বলে "বিষয়"; এবং সেই জন্যই চিৎস্বরূপ, অজড় আত্মা "বিষয়ী।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এই "অস্মৎ-পদার্থ" ও "যুষ্মৎ-পদার্থ", অজড় ও জড়, আত্মা ও অনাত্মা বা দেহ, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ড "তমঃপ্রকাশবদ্‌বিরুদ্ধ-স্বভাব"—আলোক ও অন্ধকারের মতই পরস্পরবিরুদ্ধ। সেজন্য তাদের "ইতরেতরভাব" বা "তাদাত্ম্য" সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। অর্থাৎ, তারা পরস্পরবিরোধী বলে তাদের এক ও অভিন্ন বলে গ্রহণ করা ভ্রম। একই ভাবে, তাদের নিজস্ব ধর্মসমূহের "ইতরেতরভাব", "তাদাত্ম্য" বা অভিন্নতাও ভ্রমাত্মক। এরূপে, দুই বিরুদ্ধস্বভাব বস্তুর এবং তাদের ধর্মের "ইতরেতর ভাব", "তাদাত্ম্য" বা অভিন্নতার নামই হ'ল "অধ্যাস", এবং যেহেতু দুই বিরুদ্ধস্বভাব বস্তুর মধ্যে অভিন্নতা সম্পূর্ণ অসম্ভব, সেহেতু এরূপ অধ্যাস সম্পূর্ণ মিথ্যা। সেজন্য, তাঁর বিশ্ববিশ্রুত "অধ্যাস-ভাষ্যে"র প্রারম্ভেই শঙ্কর বলছেন—

"যুষ্মদস্মৎ-প্রত্যয় গোচরয়োর্বিষয়-বিষয়িণোস্তমঃ-প্রকাশবদ্‌-বিরুদ্ধ স্বভাবয়োরিতরেতর-ভাবানুপপত্তৌ সিদ্ধায়াং তদ্ধর্মাণামপি সুতরামিতরেতরভাবানুপপত্তিরিত্যতোঽস্মৎ প্রত্যয়গোচরে বিষয়িণি চিদাত্মকে যুষ্মৎ-প্রত্যয়-গোচরস্য বিষয়স্য তদ্ধর্মণাঞ্চাধ্যাসস্তদ্বিপর্যয়েণ বিষয়িণস্তদ্ধর্মাণাঞ্চ বিষয়েঽধ্যাসো-মিথ্যেতি ভবিতুং যুক্তম্।" (অধ্যাস-ভাষ্য)

অর্থাৎ, অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় বিরুদ্ধস্বভাব যুষ্মদ্-প্রত্যয়-গোচর বিষয় (জড়দেহ ও বিশ্ব) এবং অস্মৎ-প্রত্যয়-গোচর বিষয়ীর (আত্মার) মধ্যে অভিন্নতা যুক্তিসিদ্ধ নয় বলে, তাদের ধর্মের মধ্যে অভিন্নতাও যুক্তিসিদ্ধ নয়। সেজন্য, অস্মৎ-প্রত্যয়-গোচর চিদাত্মক বিষয়ী বা আত্মা বা ব্রহ্মে যুষ্মৎ-প্রত্যয়-গোচর বিষয় বা দেহ ও বিশ্বের এবং তাদের ধর্মসমূহের অধ্যাস অপর পক্ষে, এই বিষয়ে বিষয়ী ও তাঁর ধর্মসমূহের অধ্যাস সম্পূর্ণরূপেই মিথ্যা—এই হ'ল যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত।

কিন্তু তা সত্ত্বেও, বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মুক্তপুরুষ ব্যতীত, অন্যান্য সকলেই এই মিথ্যা-প্রত্যয় বা অধ্যাসের বশীভূত হয়ে আছেন, এবং সাধারণ লোকযাত্রা নির্বাহিত হচ্ছে এই মিথ্যাভূত অধ্যাসেরই ভিত্তিতে। সত্য বস্তু হচ্ছেন অজড় আত্মা, অজড় ব্রহ্ম; মিথ্যা হচ্ছে জড়দেহ ও জড়জগৎ। কিন্তু অনাদিসিদ্ধ অজ্ঞানবশতঃ, আত্মা ও দেহ, ব্রহ্ম ও জগৎ—এই দুই অত্যন্তভিন্ন ও বিরুদ্ধস্বভাব বস্তুর মধ্যেও "অবিবেক" বা অভিন্নতা বোধ হয়। এরূপে, সত্য ও মিথ্যার এই অধ্যাসজনিত একীকরণ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে এই মিথ্যা জগৎসংসার। শঙ্কর বলছেন—

"তথাপি—অন্যোন্যস্মিন্নন্যোন্যাত্মকতামন্যোন্যধর্মাংশ্চাধ্যস্য ইতরেতরাবিবেকেনাত্যন্ত-বিবিক্তয়োঃ ধর্ম-ধর্মিণোর্মিথ্যা-জ্ঞান-নিমিত্তঃ সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্যাহমিদং মমেদমিতি নৈসর্গিকোঽয়ং লোক-ব্যবহারঃ।"

অর্থাৎ, "অস্মৎ-প্রত্যয়-গোচর" আত্মা এবং "যুষ্মৎ-প্রত্যয় গোচর" অনাত্মা পরস্পরবিরুদ্ধ স্বভাব হলেও, আত্মাতে অনাত্মার ও অনাত্মার ধর্মের অধ্যাস এবং অনাত্মাতে আত্মা ও আত্মার ধর্মের অধ্যাস করেই অত্যন্ত-বিলক্ষণ আত্মা ও অনাত্মাকে পরস্পরের থেকে অপৃথক্ বা অভিন্ন বলে গ্রহণ করা হয়। এরূপ, মিথ্যা জ্ঞান থেকে উদ্ভূত অধ্যাসই হ'ল 'অহং মম ভাব'মূলক সংসারের মূলীভূত কারণ—'আমি এই', 'এই আমার' প্রমুখ সাধারণ লোক-ব্যবহারের মূল হ'ল এই

সত্য (আত্মা) ও মিথ্যার (অনাত্মার) একীকরণ। এরূপ অধ্যাস স্বাভাবিক ও অনাদি।

প্রশ্ন হবে : এরূপ অধ্যাসের লক্ষণ কি ? শঙ্কর অধ্যাস-ভাষ্যে অধ্যাসের সংজ্ঞা দান করে বলছেন—

"আহ—কোঽয়মধ্যাসো নামেতি। উচ্যতে—"স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্বদৃষ্টাবভাসঃ।"

অর্থাৎ অধ্যাসের প্রণালী এইরূপ :—রজ্জু-সর্প ভ্রমের উদাহরণ ধরা যাক। যখন রজ্জুকে সর্পরূপে ভ্রম করা হয়, তখন রজ্জুরূপ অধিষ্ঠানে সর্প আরোপ করা হয়, এবং রজ্জু ও সর্পের অধ্যাস বা অভিন্নপ্রতীতি হয়। এক্ষেত্রে, ভ্রমকারী সর্পটিকে পূর্বেই অন্যত্র দর্শন করেছেন। পূর্বদৃষ্ট সেই সর্পটির স্মৃতিরূপ স্বরূপ, গুণ ও কার্যাবলী এখন তিনি ভ্রমবশতঃ অন্যত্র বা রজ্জুতে আরোপ করেন, এবং রজ্জুকে রজ্জুরূপে দর্শন না করে সর্পরূপেই দর্শন করেন। যদি তার সর্প সম্বন্ধে কোনরূপ জ্ঞান না থাকত, তা হলে ত তিনি এ স্থলে রজ্জুকে সর্পরূপে প্রত্যক্ষ করতে পারতেন না। যখন বাহ্যিক বস্তু ও মানসিক জ্ঞান বা প্রত্যয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকে, তখন তা হয় 'প্রমা' বা যথার্থ জ্ঞান। এক্ষেত্রে, সাক্ষাৎ ভাবে স্মৃতির প্রশ্ন নেই, যেহেতু বর্তমান প্রকৃত বস্তু থেকেই উদ্ভব হয় মানসিক প্রত্যয় বা জ্ঞানের। যেমন, প্রত্যক্ষকারীর সম্মুখে সত্যই একটি রজ্জু বর্তমান আছে, এবং সেই থেকে, তাঁর মনেও একটি রজ্জু-প্রত্যয় বা রজ্জু-জ্ঞানের উদয় হয়। অপর পক্ষে, রজ্জুটি প্রত্যক্ষকারীর সম্মুখে বিদ্যমান থাকলেও, রজ্জু জ্ঞান না হয়ে সর্প জ্ঞানের উদয় হলে, বাহ্যিক বস্তু ও মানসিক জ্ঞান বা প্রত্যয়ের মধ্যে কোনরূপ সামঞ্জস্য থাকে না। সুতরাং তা হ'ল 'অপ্রমা' বা ভ্রম। এক্ষেত্রে পূর্বদৃষ্ট সর্পের যে স্মৃতিই মাত্র আছে, তাকেই বাস্তব দ্রব্য বলে গ্রহণ ও ভ্রম করা হয়।

মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে, তিন শ্রেণীর প্রামাণিক জ্ঞানের কথা বলা যেতে পারে—প্রত্যক্ষ (Perception) প্রত্যভিজ্ঞা (Recognition) ও স্মৃতি (Memory)। প্রথম ক্ষেত্রে, যা উপরে বলা হয়েছে, একটি বস্তু বিদ্যমান থাকে এবং সেই সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। যেমন, রজ্জু বিদ্যমানে রজ্জু-জ্ঞান। এক্ষেত্রে, সাক্ষাৎ ভাবে স্মৃতির কোন প্রশ্ন নেই। দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও একটি বস্তু বিদ্যমান থাকে এবং সেই সম্বন্ধে প্রত্যভিজ্ঞা হয়। অর্থাৎ, সেই বস্তুটিকে পূর্বে দৃষ্ট বস্তুরূপেই চিনতে পারা যায়। যেমন, রজ্জু বিদ্যমানে রজ্জুপ্রত্যভিজ্ঞা বা তাকে পূর্বদৃষ্ট রজ্জু বলে চিনতে পারা। এক্ষেত্রে, প্রথম দৃষ্ট রজ্জুর স্মৃতির সঙ্গে দ্বিতীয় দৃষ্ট রজ্জুর প্রত্যক্ষের সমবায়েই প্রত্যভিজ্ঞা-জ্ঞানের উদ্ভব। তৃতীয় ক্ষেত্রে, কোন বস্তু বিদ্যমান থাকে না, সেজন্য কোনরূপ প্রত্যক্ষও থাকে না, কেবলমাত্র স্মৃতির সাহায্যেই একটি বস্তুর বিষয়ে জ্ঞান হয়। যেমন, রজ্জু অবিদ্যমানে রজ্জু সম্বন্ধে স্মৃতি।

অধ্যাস এই তিনটির একটিও নয়। প্রথমতঃ, প্রত্যক্ষের সঙ্গে অধ্যাসের প্রভেদ এই যে, প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষ এবং অধ্যাসের ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষ হলেও, প্রথম ক্ষেত্রে বাস্তব বা বিদ্যমান বস্তু থেকে উদ্ভূত প্রত্যক্ষ, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অবাস্তব বা অবিদ্যমান বস্তুর স্মৃতি থেকেই উদ্ভূত প্রত্যক্ষ হয় ; অর্থাৎ, যা কেবলমাত্র স্মৃতি তাকেই অন্য অধিষ্ঠানে আরোপ করে প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট সত্য বলে ভ্রম করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যভিজ্ঞার সঙ্গে অধ্যাসের প্রভেদ এই যে, উভয় ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ হলেও, প্রত্যভিজ্ঞার ক্ষেত্রে পূর্বদৃষ্ট বস্তুটির বিদ্যমানতায় প্রত্যক্ষ হয়, অধ্যাসের ক্ষেত্রে তা নয়। তৃতীয়তঃ, স্মৃতির সঙ্গে অধ্যাসের প্রভেদ এই যে, স্মৃতিতে বস্তুটির অবিদ্যমানতায় কেবলমাত্র স্মৃতিই থাকে, প্রত্যক্ষ নয় ; কিন্তু অধ্যাসে বস্তুর অবিদ্যমানতা সত্ত্বেও স্মৃতিই প্রত্যক্ষের ন্যায় প্রতিভাত হয়। এরূপে, অধ্যাস একটি বিশেষ ও অদ্ভুত রকমের মানসিক বৃত্তি—বস্তুতঃ, স্মৃতিমাত্র হলেও, তা প্রত্যক্ষরূপেই প্রতিভাত হয় ; অথচ আপাত-দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ হলেও, এতে প্রত্যক্ষ-যোগ্য বস্তুই নেই। সে জন্যই বলা হয়েছে যে, অধ্যাস একটি "অবভাসই" মাত্র। অর্থাৎ, অধ্যাসদৃষ্ট বস্তু সত্যরূপে প্রতীত হলেও, প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা।

উদাহরণ দিয়ে শঙ্কর বলছেন —

"তথা চ লোকেঽনুভবঃ—শুক্তিকা হি রজতবদবভাসতে, একশ্চন্দ্রঃ সদ্বিতীয়বদিতি।"

অর্থাৎ—শুক্তিকে রজতের মত দেখাচ্ছে, এক চন্দ্রকে দুই চন্দ্রের মত দেখাচ্ছে।

অধ্যাসের অপর একটি সমার্থক সংজ্ঞা প্রদান করে শঙ্কর "অধ্যাস-ভাষ্যে" বলছেন :

"অধ্যাসো নাম অতস্মিংস্তদবুদ্ধিরিত্যবোচাম।"

অর্থাৎ, যা যেরূপ নয়, তাতে সেরূপ জ্ঞান হওয়ার নামই 'অধ্যাস'।

উদাহরণ দিয়ে শঙ্কর বলেছেন যে, স্ত্রীপুত্র সুখ বা দুঃখে থাকলে, মানুষ অনুভব করেন : "আমি সুখে আছি, আমি দুঃখে আছি।" এ ক্ষেত্রে বাহ্য স্ত্রী-পুত্রের সুখদুঃখরূপ ধর্ম সে স্বীয় আত্মাতে অধ্যস্ত করে বলেই তাঁর ঐরূপ অনুভব হয়। একই ভাবে "আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি গৌরবর্ণ, আমি স্থিতি করছি, আমি গমন করছি, আমি লঙ্ঘন করছি" প্রভৃতি অনুভব বা জ্ঞান তাঁর হয়। এক্ষেত্রে তিনি দেহধর্ম আত্মায় অধ্যস্ত করেন। পুনরায়, "আমি মূক, আমি ক্লীব,

আমি বধির, আমি অন্ধ" প্রমুখ অনুভবও তাঁর হয়। এ-ক্ষেত্রে, তিনি ইন্দ্রিয়ধর্ম আত্মায় অধ্যস্ত করেন। এই সঙ্গে "আমি কামনা করি, আমি সংকল্প করি, আমি বিবেচনা করি, আমি সন্দেহ করি" প্রমুখ অনুভবও স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রে, অন্তঃকরণ ধর্মকে তিনি আত্মায় অধ্যস্ত করছেন।

বস্তুতঃ, ব্রহ্মস্বরূপ আত্মা জাগতিক বাহ্যবস্তু থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্। সেজন্য, বাহ্যবস্তু স্ত্রীপুত্রের সুখদুঃখ বা কোন বাহ্য-ধর্মের দ্বারা আত্মার প্রভাবান্বিত হওয়া অনুচিত। একই ভাবে, আত্মা দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ থেকেও সম্পূর্ণ পৃথক্, এবং সেজন্য ঐ সব বস্তুর ধর্ম আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও, অনাদি অবিদ্যাবশতঃ, জীব আত্মার এবং বাহ্যবস্তু, দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের অধ্যাস করেন, এবং আত্মায় বাহ্যধর্ম, দেহধর্ম, ইন্দ্রিয়ধর্ম ও অন্তঃকরণধর্মের আরোপ করেন। সেজন্যই সাংসারিক জীবনে আমাদের প্রতীতি হয় যেন, আমরাই সুখী, দুঃখী, স্থূল, কৃশ, মূক, বধির, কামনাকারী, সংকল্পকারী প্রভৃতি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, ব্রহ্মস্বরূপ, সচ্চিদানন্দ, নির্গুণ, নির্বিশেষ, নির্বিকার, নিষ্ক্রিয় আত্মা সুখীও নয়, দুঃখীও নয়, স্থূলও নয়, কৃশও নয়, মূকও নয়, বধিরও নয়, কামনাকারীও নয়, সংকল্পকারীও নয়, ক্রিয়াশীলও নয়, বিকারশীলও নয়। এরূপে আত্মস্বরূপ জীব এবং অনাত্মস্বরূপ বাহ্যবস্তু, দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন বলে, তাদের মধ্যে অধ্যাস বা একীকরণ সম্পূর্ণ মিথ্যা; এবং সেই অধ্যাসজনিত "আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি মূক, আমি বধির, আমি কামনাকারী, আমি সংকল্পকারী" প্রমুখ প্রত্যয়ও সম্পূর্ণ মিথ্যা। বস্তুতঃ, সংসারই মিথ্যা; আমাদের সাধারণ পার্থিব জীবনযাত্রা প্রণালীও এরূপ অবিদ্যাজনিত অধ্যাস এবং অধ্যাসজনিত মিথ্যাপ্রতীতির ভিত্তিতেই পরিচালিত হচ্ছে। সেজন্য শঙ্কর তাঁর অধ্যাসভাষ্যের শেষে সিদ্ধান্ত করছেন—

"এবমহং-প্রত্যয়িনমশেষ-স্বপ্রচার-সাক্ষিণি প্রত্যগাত্মন্যধ্যস্য তং চ প্রত্যগাত্মানং সর্বসাক্ষিণং তদ্বিপর্যয়েণান্তঃকরণাদিষ্বধ্যস্যতি। এবময়মনাদিরণন্তো নৈসর্গিকোঽধ্যাসো মিথ্যা-প্রত্যয়রূপঃ কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-প্রবর্তকঃ সর্বলোকপ্রত্যক্ষঃ।"

অর্থাৎ, অজ্ঞ জীব অহং-স্বরূপ অন্তঃকরণকে সাক্ষিস্বরূপ আত্মাতে, এবং আত্মাকে অন্তঃকরণে অধ্যস্ত করে। এরূপে, অনাদি, অনন্ত, স্বাভাবিক, মিথ্যাপ্রত্যয়স্বরূপ এবং কর্তৃত্ব—ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি সাংসারিক অবস্থার কারণস্বরূপ অধ্যাস সর্বলোকেরই প্রত্যক্ষ বা অনুভবগোচর।

"তমেতমবিদ্যাখ্যমাত্মানাত্মনোরিতরেতরাধ্যাসং।

এরূপে, অধ্যাসই হ'ল সকল সাংসারিক দুঃখক্লেশের কারণস্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে, জীবাত্মা ব্রহ্মস্বরূপ বলে সকল দুঃখক্লেশাতীত, সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। কিন্তু অবিদ্যাবশতঃ, জীব দেহেন্দ্রিয় মন প্রমুখ উপাধির সঙ্গে যেন সংশ্লিষ্ট হয়েই, যেন দুঃখশোকভাগী হয়ে পড়েন।

"জীবস্ত্বাপ্যবিদ্যাকৃত-নামরূপ-নিবৃত্ত-দেহেন্দ্রিয়াদ্যুপাধ্য-বিবেক-ভ্রম-নিমিত্ত এব দুঃখাভিমানো, ন তু পারমার্থিকোঽস্তি।"

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ২-৩-৪৬)

অর্থাৎ, জীবের অবিদ্যাকৃত, নামরূপবিশিষ্ট দেহেন্দ্রিয়াদি রূপ উপাধির সঙ্গে, জীব নিজেকে এক ও অভিন্ন বলে বোধ করে, এবং এরূপে দেহমনের দুঃখকে নিজের দুঃখ বলে অনুভব করে এই অধ্যাসবশতঃ। সেজন্য, জীবের দুঃখাভিমান পারমার্থিক নয়। উদাহরণ দিয়ে শঙ্কর বলছেন যে, অজ্ঞ ও ভ্রান্ত জীব অত্যন্ত বাহ্য পুত্র মিত্রাদির সুখদুঃখকেও যখন নিজের সুখদুঃখ বলে অনুভব করেন, তখন তিনি স্বীয় দেহমনের সুখ-দুঃখকেই বা স্বীয় আত্মার সুখ-দুঃখ রূপে গ্রহণ করবেন না কেন?

এই বিষয়ে আরও আলোচনা পরে করা হবে।
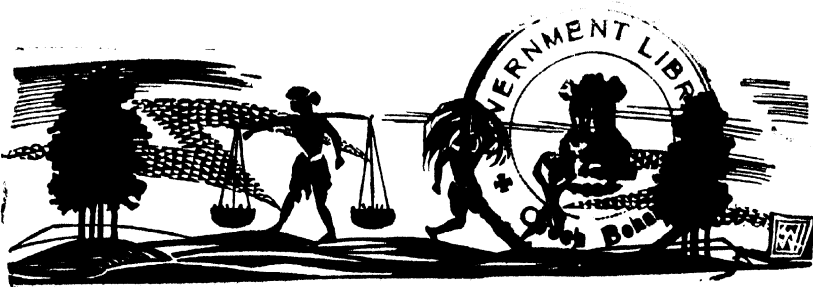
'ঠিক আছে'

শ্রীহরিহর শেঠ

ক্ষমতা কতটা আছে না আছে বা যাই থাক সে আলোচনার এখানে আবশ্যক নেই, তবে এ কথা ঠিক যে, বাল্যকাল থেকে লেখবার সখ আছে এবং কতকটা খেয়ালও আছে! যিনি দীর্ঘকাল থেকে আমার বিভিন্ন বিচিত্র বিষয়ের লেখার সঙ্গে পরিচিত তিনিই একথা স্বীকার করবেন।

আজ একটি সেইপ্রকার বিষয় নিয়ে বসেছি। আজ কয়েক বৎসর মাত্র আমাদের ভাষার মধ্যে এমন একটি কথা এসেছে, ঠিক নবাগত না হলেও অন্ততঃ নবসাজে উপস্থিত হয়েছে যা অভিনন্দিত হবার যোগ্য। অভিনন্দন পায় কে? যে বড় কিছু কাজ করে, যার ভিতরে বিশেষ কিছু গুণ বা কিছু জনহিতকর পদার্থ থাকে, অথবা যার হতে জনসমাজের উপকার হয়। এই নবসাজে সজ্জিত সেই কথাটি কতকটা সেই মত, সেটি হচ্ছে—'ঠিক আছে'।

আমাদের ভাষার মধ্যে এর সঙ্গে তুলনা হতে পারে এমন আর একটি কথা ত খুঁজে পাই না। তুলনা যদি করতেই হয়, ভাষার মধ্যে নেই, তবে নিত্যব্যবহার্য্য তরিতরকারী মধ্যে একটি মাত্র জিনিসের নাম মনে আসে সেটি হচ্ছে—আলু। ভাতে পোড়া থেকে আরম্ভ করে চচ্চড়ি, সুক্ত, ঘণ্ট, ডাল, টক, কালিয়া, খিচুড়ী, ঘি-ভাত, চপ, কোপ্তা পর্যন্ত সবেতেই এবং নিরামিষাশী ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব হতে চাটের দোকানে মাতালের কাছে এর স্থান আছে। শুধু স্থান আছে বললেই ঠিক বলা হয় না, অনেক ক্ষেত্রে এ ভিন্ন গতি নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না। গরীব মধ্যবিত্তের এ বড় সম্বল, বিলাসী ধনীর কাছেও প্রায় সমান আদরের। তাঁদেরও এ ভিন্ন চলে না। শুধু এদেশেই নয় হয়ত-বা সারা জগতে।

'ঠিক আছে' কথাটিও কি আজকাল ঠিক তাই নয়? কথাটি নূতন নয়, কিন্তু অধুনা এর যে ব্যাপক ভাবে এবং প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ব্যবহার হতে দেখা যাচ্ছে, এমন কি পূর্ব্বে ছিল বা এই ভাবে ব্যবহার হতে দেখা যায় এমন আর একটি কথা আছে কি? আমার ত মনে হয় না। কিশোর-যুবা-বৃদ্ধ, দরিদ্র-ধনাঢ্য, মাতাল ভণ্ড সাধু সজ্জন, কে না এর ব্যবহার করেন? হাটে-বাজারে, গৃহসংসারে, সভাসমিতি, বৈঠকখানায় কোথায় না এর স্থান আছে? কিন্তু এর বহুল ব্যবহারের জন্য এ প্রবন্ধের অবতারণা করি নাই। এমন বিবিধ অর্থে, বিপরীত অর্থে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন ভাবে আর কোন কথা ব্যবহৃত হতে শুনি নি।

কোন গৃহস্বামী ভদ্রলোকের সান্নিধ্যে অন্য এক ভদ্রলোক কোন কার্য্যে এসেছেন, প্রথম ব্যক্তি ব্যস্ত হয়ে তাঁকে আহ্বান করে বসবার আসন দেখিয়ে দিলেন। আগন্তুক তৎক্ষণাৎ বললেন, 'ঠিক আছে'। হয়ত-বা প্রথম ব্যক্তি সময়াভাবে বা কার্য্যগতিকে তাঁকে আলাপ আহ্বান করতে অক্ষমতা জানালেন, তাতেও উত্তর হ'ল 'ঠিক আছে।' হয়ত দ্বিতীয় ব্যক্তি নিষেধ সত্ত্বেও তাঁর বক্তব্য কথা জানাতে ব্যস্ততা প্রকাশ করলেন, তখন যদি গৃহস্বামীর আদেশে রূঢ় ভাবে তিনি অপসারিত হন, তখনও 'ঠিক আছে' বলে তিনি চলে যান।

নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ভোজনে বসে, পরিবেশকের অসাবধানতায় হয়ত একটি মিষ্টান্ন ভোজনপাত্র হতে গড়িয়ে মেঝেয় পড়ল, পরিবেশক সেজন্য হয়ত ক্রটিবাচক কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাতে বাধা দিয়ে নিমন্ত্রিত বলে উঠলেন, 'ঠিক আছে'। আবার হয়ত ভোক্তার আপত্তি সত্ত্বেও গৃহস্বামীর কথায় তাঁর পাতে অতিরিক্ত কিছু পড়ক, তখনও সেই 'ঠিক আছে'। এমনও হতে পারে ভোক্তা কোন কিছু পুনরায় চেয়ে পরিবেশকের কাছে না থাকায় পেলেন না, সে ক্ষেত্রেও সেই এক কথা 'ঠিক আছে'।

প্রার্থী দাতার নিকট আশানুরূপ না পেয়েও তাঁর সবিনয় অক্ষমতার কথায় উত্তর দেন 'ঠিক আছে'। আবার দাতার কর্কশ ব্যবহারে নিরাশ হয়ে যাবার সময়ও বলতে শুনা যায় 'ঠিক আছে'।

অধমর্ণ উত্তমর্ণের প্রাপ্য সমস্ত মিলিয়ে দিতে না পেরে বললেন বাকিটা পরবর্ত্তী মাসে দিবেন। সেখানে উত্তমর্ণের উত্তর হতে পারে 'ঠিক আছে।' অথবা সমস্ত মিটিয়ে বিলম্বের জন্য ক্রটির কথা উল্লেখ করায় সেখানেও 'ঠিক আছে'। আবার এ মাসে কিছু দিতে পারলেন না, সে ক্ষেত্রেও সদাশয় মহাজনের ঐ একই উত্তর হতে পারে 'ঠিক আছে।'

মোট কথা, সুন্দর কথা সুন্দর ব্যবহারে অর্থাৎ আদর-আপ্যায়নে বা এক ডিস মিষ্টান্নের দ্বারা সম্বর্দ্ধনার উত্তরে যেমন 'ঠিক আছে', তেমনই গালিগালাজ এমন কি সজোরে একটি চপেটাঘাতের পরিবর্ত্তেও পাওয়া যেতে পারে সেই এক কথা 'ঠিক আছে'।

প্রশংসায় নিন্দায়, উল্লাসে বিষাদে, দুঃখে আনন্দে, উৎসাহ ও অবসাদে, পর্ণকুটির হতে রাজপ্রাসাদে এক কথায় এমন বিবিধার্থে ব্যবহার বোধ হয় আর কোন কথা হয় না। হয়ত বড় জোর সুর-স্বরের মধ্যে কোন সময় কিছু তারতম্য থাকতে পারে।

আকাশ-পিপাসা

শ্রীউমা দেবী

ভোরে কবে এসেছিলে হয় না স্মরণ,
শুধু মনে আছে সেই আলোক-চেতনা,
যা প্রথম জাগালো এ ঘুমানো হৃদয়,
প্রথম আনলো মনে শান্ত বেদনা।
তার পর কত ছবি এঁকেছি বিজনে
কত সুর নিরালায় শুনেছি দুজন,
কত কাল কেটে গেছে ঘুমে জাগরণে,
তৃপ্ত আশায় কত করেছি কূজন।
আজো মনে আছে সেই প্রথম চেতনা,
কবে চলে গেছ আর হয় না স্মরণ,
এ হৃদয় জুড়ে আছে আলোক-বেদনা
জ্যোৎস্নার হাসিভরা রাতের মতন।
সেখানে আবেগ যত হারিয়েছে গতি,
সমস্ত পিপাসা যেন পেয়েছে বিরতি।

২

দাও দাও দাও আজ বিরাম ক্ষণেক
তোমরা অতীত থেকে অনুভূতিগুলি—
ঝড়ের দোলায় মিছে দুলালে অনেক
আনন্দে প্রভাতে হায় অকাল-গোধূলি।
ধুলায় জড়িয়ে যায় চোখের পলক,
চলে যেতে পদযুগ ভেঙে ভেঙে আসে,
বিকার কি পেল শেষে জটায় অলক
বিলাস ব্যসনখানি বাঁধে নাগপাশে।
দূরের দেউলে জাগে দেবতা আমার
যেখানে কুসুম থেকে ঝরে পীতরেণু,
মলিন হয় নি আজো প্রদীপ সোনার
পবনপরশ পেলে বাজে বনবেণু।
বহুদূরে যেতে হবে—পথ সাথীহীন—
তোমরা কোরো না হায় অতীতে বিলীন

৩

মিথ্যা গর্ব করি—জানি কাঙাল এ মন
জীবনের বেলাভূমে আসন্ন ছায়ায়
নিঃসঙ্গ প্রেতের মত করুণ মায়ায়
খুঁজে মরে আজো হায়—হারানো সে জন।
ছড়ানো ঝিনুক-চূর্ণ আজ চারিধার
খণ্ড-অস্থি-বিখচিত শ্মশানের মত,
হৃদয়ের সূত্র থেকে মুক্তারা বিগত—
সমুদ্রের অশ্রুগুলি রয়েছে কি আর!
হায়! মন! এখনো কি জল পিপাসায়
মরীচিকা মৃগ দেখে ভোল কি এখনো?
আজো কি হয়নি শেষ বাসনা সঘন—
হৃদয়ের আকিঞ্চন অরুণ আশায়?
ক্রমদীর্ঘ ছায়া কেন করেছ বিস্তার?
নিজেকে ভোলাতে চাও কতদিন আর!

৪

এই তুচ্ছ গণ্ডী আজ চূর্ণ করে দাও
তুলে ধর ঊর্দ্ধলোকে—যেখানে আকাশে
সহস্র জ্যোতিষ্ক-রেণু লুটায় আবেশে
—অনন্ত সমুদ্রে তারা বায়ুকণা যেন—
ম্রিয়মাণ আলোকের সঙ্কীর্ণ সংখ্যায়
আপন দীনতা যারা করেছে প্রকাশ
অব্যক্ত আঁধার পাশে—যেন মূক ভাষা
বৃথা খুঁজে পেতে চায় পূর্ব পরিচয়।
সেখানে আমায় নাও। ঊষায় সন্ধ্যায়
তৃণপ্রান্তে মুক্তায়িত হিমের কণায়
কেন দেখে নিতে চাও নীলকান্তদ্যুতি?
চাও ওই নীলাকাশে—দেখ নীলরূপ,
ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত ক'রে। মাটির উপরে
জলবিন্দু ফেলে কেন দেখ নভশ্ছবি!

অবেলায়

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

জননীর রাঙা চরণের পানে
চেয়ে আছি—করি নয়ন নীচু,
চাহিবার মোর কিছুই নাহিক,
বলিবার আর নাহিক কিছু।
ধন মান যশ পুরস্কারের—
চিন্তাও আমি করিনে মনে,
আমি যা পেয়েছি তাতেই তৃপ্ত,
ভুলাবে জগৎ কি প্রলোভনে ?
মেঘলা-জীবন জলপথে গেল,
আশার আলোক পাইনি অণু,
অবেলায় মোর আকাশ ভরিয়া
উঠিয়াছে দেখি ইন্দ্রধনু।

২

নিন্দা এবং সুখ্যাতি মোর
করেন এখনো যেথা যে কেহ,
সবাকারে আমি প্রণতি জানাই,
বুকে এসে লাগে সবার স্নেহ।
সব পরিধির বাহিরে এসেছি,—
লভিয়াছি এক মুক্ত ভুমি,
সকল হিসাব হতে বাদ দিয়ো—
এই কৃপা করো বন্ধু তুমি।
আমার জন্ত ভেব না তোমরা—
দুঃখিত কেহ হয়ো না মোটে,
আমি যা পেয়েছি হোক সামান্ত
ক'জনার তাহা ভাগ্যে জোটে ?

৩

জীবন আমার ব্যর্থ নহেকো,—
সাড়া পাইয়াছি সকল ডাকে,
আমি পারিজাত ফুটিতে দেখেছি,
জীর্ণ তরুর শীর্ণ শাখে।
ভাল করে আমি দেখিয়া চিনেছি,
প্রতি কাজে সেই হাতের চিনা,
কিছুই ঘটে না, ঘটিতে পারে না—
ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা বিনা।
এমন স্বাধীন, এত পরাধীন,
দেখি নি কখনো চক্ষু তুলি',
এখন মায়ের ভেল্‌কী দেখিয়া
আছি খাওয়া-দাওয়া সকল ভুলি'

৪

ভেল্‌কী মায়ের অবোধ-গম্য,
কতক বুঝেছি আঘাত পেয়ে,
বড়ই সদয়া, বড়ই চতুরা,
সত্য সে বাজিকরের মেয়ে।
সে জানায় যারে, সেই জানে শুধু,
আজ আমি ভাবি অবাক হয়ে,
ঘর করিয়াছি এতদিন এই
রহস্তময়ী জননী লয়ে ?
তবু সে মায়ের কি অপার স্নেহ—
চোখে জল আসে বলিতে কথা,
পদ্ম-হস্ত সেইখানে পাই
যেখানে দারুণ তীব্র ব্যথা।

৫

মনে যে আমার গর্ব্ব জমিছে
সব চেয়ে আমি হই না খাটো,
বিশ্বব্যাপী যে রহস্ত চলে
বুঝেছি তাহার কতকটা ত।
বিভিন্ন রূপ তারি এক রূপ,
কেবা কুৎসিত, সুশ্রী কেবা ?
জেনে, না জেনেও করিয়া এসেছি—
নানা ভাবে শুধু তাঁহারি পূজা।
সব সুর এক কণ্ঠেরি সুর,
যত কর্কশ ততই মিঠা,
যাহা দেখি শুনি তাতেই রয়েছে
সুধাসিন্ধুর সুধার ছিটা।

৬

গোপন করার ভঙ্গী কতই—
ধরিবার কার সাধ্য আছে,
তাঁর তারে-বাঁধা স্বতঃস্ফূর্ত্ত
জীবন্ত যত পুতুল নাচে।
কর্ম্মের গতি ঠিক করা আছে,
বিচিত্রতার সীমা না পাবে,
শত ঘুরপাক ঘূর্ণী রচিয়া
অবশেষে সেইখানেই যাবে।
ভেল্‌কীর কিছু শিখিতে পারিনি
বিশ্বাস রাজে হৃদয় ছেয়ে,
আমি ছেলে দশ-মহাবিদ্যার
মা আমার বাজিকরের মেয়ে।

কবি

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

চলতে চলতে গতি আপনিই মন্থর হয়ে এসেছিল, এক সময়ে রেলিঙে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। তখন পুলের প্রায় মাঝামাঝি এসে পড়েছি, তাইতে গঙ্গাকে আরও প্রশস্ত দেখাচ্ছে। সামনে বহুদূর পর্যন্ত গিয়ে ডান দিকে ঘুরে গেছে; পেছনে, কলকাতার দিকেও প্রায় অত দূর পর্যন্ত গিয়েই আর একটা বাঁক, এবার বাঁয়ে। দুদিকে, যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায় তীর-লগ্ন তরুরাজির নীল রেখা, তারই মাঝে মাঝে যেন মীনা করে বসান বাড়ি-ঘর-মন্দির-ঘাট জুটমিল—তার জেটি চিমনি···

মাঝখান দিয়ে এই বিরাটকায় বিবেকানন্দ ব্রিজ এপার-ওপার চলে গেছে।

আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, অস্তমান সূর্যের শেষ রশ্মি পড়ে তাতে হলদে, গোলাপী, সিঁদুর, বেগুনে—কত রকম যে রং তার হিসাব নেই। রঙের খেলা তীরের গায়ে, জলের ওপর, নৌকার ভরা পালে; দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-চূড়াগুলি ঝলমল করছে।

দক্ষিণে-হাওয়াটা এই সবে উঠল, সমস্ত দিনের গুমটের পর। ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে।

এসময় এখান দিয়ে গেলে দাঁড়িয়ে না পড়ে যেন উপায় নেই; একবার দাঁড়িয়ে পড়লে পা তুলে এগুনোও কঠিন।

রেলিঙে বুক চেপে দাঁড়িয়ে আছি, আমার পেছন দিয়ে পুলের দু'মুখো ট্রাফিকের স্রোত বয়ে চলেছে, মোটর, লরী, রিক্‌শা; পায়ে হেঁটেও চলেছে লোকে। অবশ্য খুব হালকা ট্রাফিক; চারিদিকের নিস্তব্ধতার গায়ে শব্দতরঙ্গ উঠছে মাঝে মাঝে, কখনও স্তিমিত, কখনও মুখর।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি অত খেয়াল নেই; হঠাৎ দেখি দুটি যুবক বেশ হন্তদন্ত হয়েই আসতে আসতে আমার থেকে দশ-বারো হাত দূরে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

একটু যে কেমন-কেমন ঠেকলই, তাইতেই মুখটা ঘুরিয়ে একটু ভাল করে দেখে নিলাম।

দুজনেরই বয়স প্রায় সমান বলে মনে হ'ল, পঁচিশ-ছাব্বিশের কাছাকাছি। চেহারা লপেটি গোছের, গায়ে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত পাঞ্জাবী। এদিকেরটি বাঙালী বলেই মনে হয়, অপরটি কিন্তু অন্য রকম, কাঠামোটা বাঙালীর মত হলেও চুলটা শিখেদের মত করে মাথার মাঝখানে জড়ো করা, দাড়ি গোঁফ অল্পই, কিন্তু অক্ষত। শিখধর্মাবলম্বী দু'একজন বাঙালী বা বিহারী দেখেছি; সেইরকম মনে হ'ল। নির্লিপ্ত-ভাবে সামনের দিকে চেয়ে থাকলেও ওরা যে, যে-কারণেই হোক, আমায় দেখেই দাঁড়িয়ে পড়েছে এটা বেশ টের পাওয়া যায়। কৌতূহল চেপে চুপ করেই রইলাম আমি।

খানিকক্ষণ গেল, এদিককার যুবকটি সামনের দিকে চেয়েই রেলিঙের মাথায় একটু তবলা বাজিয়ে অপরটিকে ফিসফিস করে কি বলল, তার পর দুজনেই এগিয়ে এসে প্রায় হাততিনেকের ব্যবধান রেখে দাঁড়াল। চুপ করেই রইলাম, কথাটাও ওরাই আরম্ভ করুক না।

একটু পরে এদিককারটিই একটু নড়েচড়ে যেন প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল, আর সময়ক্ষেপ না করে আমার দিকে মুখটা ঘুরিয়ে একটা নমস্কার করল, তার পর একটু হেসে প্রশ্ন করল—"গঙ্গার সিনুরি দেখছেন স্যার?"

বললাম—"অবশ্য চোখ বুজে নেই, তবে, বেশ হাওয়াটি দিচ্ছে, দাঁড়িয়ে আছি একটু।"

"এখানে এসে চোখ বুজে দাঁড়াবে, সাধ্যি কি কারুর, ঘর-ছাড়া করে টেনে আনে।"

আলাপটা দু'কথাতেই বেশ জমিয়ে ফেলেছে—এইভাবে একটু হেসেই সঙ্গীর দিকে ঘুরে চাইল। হয়ত কিছু ইসারাও করল, সেও হাত দুটো তুলে নমস্কার করল আমায়।

প্রথমটা মনে হ'ল চুপ করেই থাকি, উৎসাহ পেলে কথা-বার্তায় বোধ হয় মাত্রা রক্ষা করতে পারবে না। তার পর ভাবলাম, দেখাই যাক না, একটা যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসে দাঁড়াল তারও ত হদিস পাওয়া দরকার।

প্রশ্ন করলাম—"তোমরা আস নাকি রোজ?"

বলল—"আমরা!···আমরা নাকি মানুষ? চক্ষু থাকতেও অন্ধ। কি বলিস রে?"

সঙ্গীটি একটু লজ্জিত ভাবে হাসল।

এতটা আত্মগ্লানির জন্যই আমি বললাম—"অন্ধ কেন হতে যাবে? এই ত বললে—ঘরছাড়া করে টেনে আনে, কিছু একটা দেখেছ বলেই ত বললে।"

"আজ্ঞে, দেখছি বৈকি, দেখব না কেন?—জল দেখছি, আকাশ দেখছি, মেঘ দেখছি, কিন্তু সব মিলিয়ে যে সিনুরিটা

হচ্ছে সেটা দেখবার যে চোখ নেই। তার পর যদি-বা এল একটু ভাব মনে—কদাচ-কখনও ত সেটা যে একটু টুকে রাখব সে ক্ষ্যামতা ত নেই।"

বললাম—"টুকে যে রাখতেই হবে তার মানে কি ?"

"কি বলছেন স্যার, সেই ত সমিস্যে! আর সেই সমিস্যে নিয়েই ত ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছি চারিদিকে।"

উৎসাহ-দীপ্ত মুখে আমার দিকে চাইল যেন এতক্ষণে আসল কথাটা এসে পড়েছে। আমিও প্রশ্ন করলাম—"কি রকম ?"

"এই যে দেখছেন, এর নাম গুরুজিৎ সিং…"

"শিখ ?"

"শিখ, সে মাথার চুলে আর হাতে ঐ একটা লোহার বালা আছে, নইলে চার পুরুষ ধরে বাংলায় রয়েছে, এঁদো ডোবার জল শিখের আর কি রেখেছে ওর ? দেখছেনই চেহারা। এখন গুরুজিৎ বিয়ে করতে চায়…"

মুখের দিকে চেয়ে রইল; বললাম—"করুক না, এ আর এমন সমস্যা কি ?"

"সমিস্যে এইখানে যে শিখের মেয়ে ত পাচ্ছে না, ও এখন আমার এক শালীকে বিয়ে করবে বলে ঠিক করেছে…"

আমি একটু বিস্মিত হয়ে চাইলাম। একটু হেসে বলল—"আপনি আশ্চর্য হচ্ছেন, কিন্তু এ ত আখছারই হচ্ছে স্যার। ওদের জেতের মধ্যে মেয়ে বড় কম ত; ওরা অত বাছে না, শিখ হ'ল বহুৎ আচ্ছা, নয়ত বাঙালী, কি পশ্চিমা—হলেই হ'ল একটা—সংসার-ধর্ম করতে হবে ত। তবে গুরুজিৎ আবার একেবারে বাঙালী হয়ে গেছে।·· দু'একটা বাংলার নমুনা ছাড় না রে বাবুর কাছে, বুঝুন।"

গুরুজিৎ একটু লজ্জিত ভাবে চাইল। আমি বললাম—"থাক, নমুনার দরকার কি ? শিখ বাঙালী হয়ে যায়, বাঙালী শিখ হয়ে যায় এ ত ভালই, আর বিয়ের মধ্যে দিয়েই এটা ঠিকভাবে হবে। তোমার শালীর সঙ্গে হচ্ছে এ ত উত্তম কাজ। তোমাদের আগে থাকতে জানাশোনা আছে বলে মনে হচ্ছে।"

"একসঙ্গে কাজ করি আমরা সালকের একটা মোটর-মেরামতের কারখানায়। আমিই ত ওকে কথা দিলাম—কত আর খুঁজে হয়রান হবি ? আমার শালীটা ডাগর-ডোগর আছে, দেখতেও অপ্সরা না হোক্, নিতান্ত নিন্দের নয়, বলিস্ ত দু'হাত এক করে দিই। রাজী, শ্বশুর আর শালাকেও রাজী করিয়েছি। আপনি যেমন বললেন—সব উত্তম, সে সব দিক দিয়েই। দিন ঠিক, মেয়ে পছন্দ, গুরুজিৎ তিনশ' টাকাই দিতে রাজী হয়েছে; সব পাকা, তার পর এখন তরী বুঝি কিনারায় এসে বানচাল হয়।"

"মেয়ে বেঁকে বসেছে ?"—ঐখানটায় একটা খটকা লেগে ছিল বলে খুব বিস্মিত না হয়েই প্রশ্নটা করলাম।

উত্তর হ'ল—"মেয়ে ত ওকে ভেন্ন করতেই চায় না বিয়ে কাউকে। ওর মাস্‌তুতো বোন আবার শিখের হাতেই পড়েছে কিনা। তবে এক অন্য ফ্যাচাং তুলেছে। মিডিল পাসকরা মেয়ে কিনা, শহরে ত আজকাল কাউকে মুখ্যু থাকতে দিচ্ছে না, সেই হয়েছে বিপদ।…দেখা না রে চিঠিটা—সঙ্গেই ত অ ছে।"

"চিঠি!"—এবার সুদে-আসলে বিস্মিত হয়েই বলে উঠতে হ'ল আমায়।

"অনেক দিন থেকে কথা চলছে ত; লেখাপড়া-জানা মেয়ে, চিঠিটা সুরু করে দিয়েছে। গুরুজিৎ বাংলা বলে যাবে আপনার-আমার মত, কিন্তু ওদিকে ত অষ্টরম্ভা…"

গুরুজিৎ মুখটা একটু অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল—"আরম্ভ করেছি ত শিখতে।"

বেশ পরিষ্কার বাংলাতেই বলল। বললও বোধ হয় আমায় ভাষাটা শোনাবার জন্যই। সঙ্গী বলল—"শিখছে, দ্বিতীয় ভাগ প্রায় শেষ করেও আনলো রাত জেগে। কিন্তু ওর যা আবদার তা পুরো করে কি করে বলুন ?"

"কি বলে ও ?"

"পদ্য চাই বিয়েতে!"—আবদারের বহরটা জানিয়ে দিয়ে আমার মুখের দিকে চাইল, বলল—"না বিশ্বাস হয় চিঠিটা দেখুন না। আপনি দেখবেন তাতে আর হয়েছেটা কি ?"

বললাম—"থাক, চিঠি দেখাতে হবে না। বাঙালীর মেয়ে একটু কবিতার আবদার করবে, এতে আর অবিশ্বাসের কি আছে ?"

—"চিঠির উত্তর—মানে যেটা লভের দিক—আমি এক-রকম করে লেখাটা একটু বেঁকিয়ে দিয়ে যাচ্ছি—আবার চেনা হাত ত—গুরুজিৎ উদিকে ক-খ মক্‌সো করে যাচ্ছে—এদিকটা একরকম চালিয়ে যাচ্ছি আপনাদের পাঁচ জনের আশীর্বাদে, কিন্তু কবিতা কোথায় পাই ? তাই সকালে উদিকে ন'টা-দশটা পর্যন্ত, তার পর কারখানা বন্ধ হওয়ার পর দুজনে ঘুরে বেড়াচ্ছি…"

বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করলাম—"উদ্দেশ্য ?"

"একজন কবি খুঁজে বের করতে হবে ত ? এ দায় থেকে উদ্ধার করবে কে ?"

"কোথায় কোথায় খোঁজ ?"

"খোলা জায়গা—একটু যদি বাগানের মতন হ'ল, মাঠের দিকেও চলে যাই দুজনে, দু'দিন কলকাতার দুটো পার্কও ঘুরে এলাম। তারপর পুকুর ঘাট, গঙ্গার ঘাট..."

"ঘাট কেন?"

একটু সঙ্কোচের সঙ্গে হাসল, বলল—"ওনারা সব চান করতে আসে ত—মানে..."

কথাটা তাড়াতাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে বললাম—"ও!...তা ধরো না হয় পেলে খুঁজে, তার পর? লিখিয়ে নেবে কবিতা?"

"মাংনাতে কি স্যার? গুরজিৎ বিয়ের খাতে একটা বাজেট ঠিক করে রেখেছে তার জন্যে..."

একটু কি যেন ভেবে নিয়ে বলল—"অবিশ্যি, সবাই যে নিতেই চাইবে তা নয়, তবে যদিই চায় নিতে ত গুর্‌জিৎ... কত ঠিক করে রেখেছিস্ রে?"

গুর্‌জিৎ আবার মুখটা ওদিকে ঘুরিয়ে নিল, বলল—"পনেরো, বাড়তেও পারি।"

"সাইজ দেখে বাড়বে স্যার, ছোঁড়া আর যাই হোক, কেপ্পণ নয়!"

চুপ করে রইল। উদ্দেশ্যটা বুঝে আমিও একটু চুপ করেই রইলাম। বেশ লাগছে, দেখাই যাক্ না একটু। তার পর কেমন একটু মমতা এসে গেল, বললাম—"এক কাজ কর। একটা উপায় বাতলে দিচ্ছি, পয়সাও লাগবে না, এত খোঁজাখুঁজির হুজ্জৎ থেকেও বাঁচবে। একটা বিয়ের কবিতা কোনখান থেকে জোগাড় করে, নামধামগুলো বদলে ছাপিয়ে দাও, না হয় আগে ওর কাছে পাঠিয়েই দাও মঞ্জুর হয়ে আসবার জন্যে, যদি তা-ই চাই।...বিয়ের কবিতা ত পথেঘাটে ছড়ানো রয়েছে আজকাল।"

"চলবে না স্যার। ঐ পথেঘাটে ছড়ানো থেকেই ত কাল হয়েছে। তেত্রিশখানা যোগাড় করে রেখেছে কোথা থেকে কোথা থেকে। যেতেই হবে ধরা পড়ে।"

হেসে ফেলতে হ'ল, হাসতে হাসতেই বললাম—"আচ্ছা সেয়ানার পাল্লায় পড়েছ ত তোমরা! কি সিংজী, বাঙালী মেয়ের মোহ এখনও কাটে নি তোমার?"

লজ্জিত হয়ে মুখটা ঘুরিয়ে নিচ্ছিল, সঙ্গী বাঁ হাতে একটা ঠেলা দিল, মুখটা কানের কাছে নিয়ে গিয়ে চাপা গলায় বলল—"বের কর্. এই বোকা।"

আগাম ধরিয়ে দিতে চায় নাকি!

ছোক্‌রা কতকটা কুণ্ঠার সঙ্গে বাঁ দিকের পকেট থেকে একটা গোল করে পাকানো একসারসাইজের খাতা বের করল, একটা পেন্সিলও; ওর হাতে দিয়ে, মুখটা অল্প ঘুরিয়ে সামনের দিকে চেয়ে রইল। সঙ্গী এ দুটোকে আমার দিকে একটু বাড়িয়ে ধরে বলল—"খুঁজে খুঁজে নাজেহাল হয়ে আমি শেষকালে গুরোকে বললাম—এ কাজের কথা নয়। চল দু'জনে মা'র মন্দিরে ধন্না দিয়ে পড়ি, এতো কে এতো দিচ্ছেন, আর আমাদের একটা কবি জুটিয়ে দিতে পারবেন না? তা একবার মাহাত্মিটা দেখুন স্যার, যেতেও হ'ল না অত দূর, মাঝপথেই জলজ্যান্ত কবি শোভা করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন!—তোর পয় আছে গুরে।...নিন স্যার ধরুন।...জয় মা! হুজুরের কলকের ডগায় অধিষ্ঠান হও এসে।"
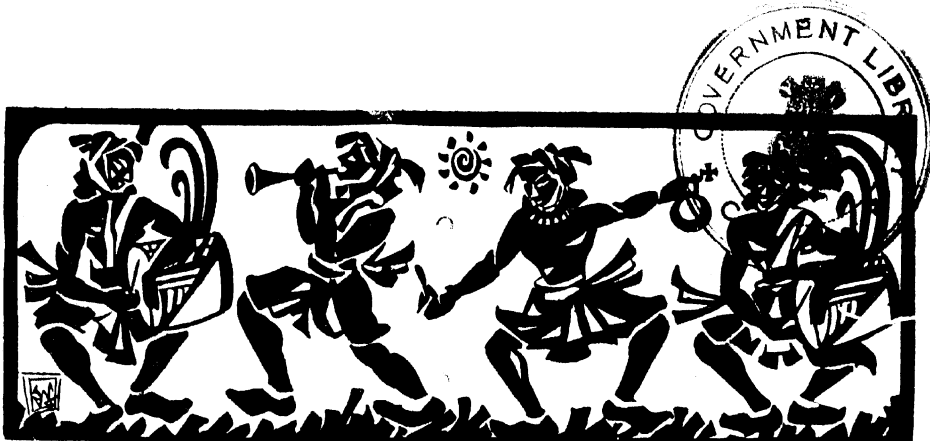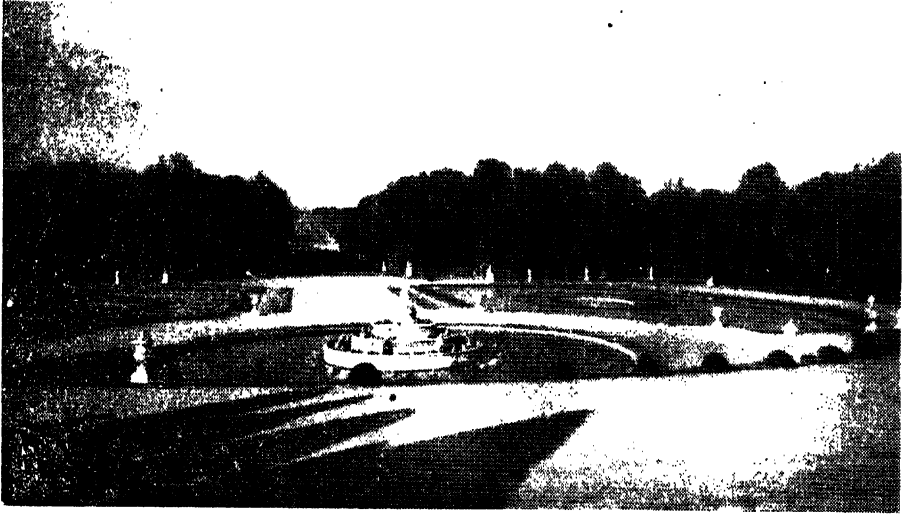
ভেরসাই উদ্যান

সাগর-পারে

শ্রীশান্তা দেবী

(৬)

লণ্ডন ছেড়ে যাবার দিন ঘনিয়ে এল। কিন্তু তেমন কিছু দেখা হ'ল না। ব্রিটিশ মিউজিয়ম আর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ঘরের কাছে, তাই সেই পাড়াতেই ঘোরাঘুরি একটু হয়েছে। তবে ত বড় মিউজিয়ম যে তার দুই-একটা কোণ ছাড়া বেশী কিছু দেখা হয় নি। এইটুকু ছোট দেশের একটা মিউজিয়ম দেখতেই মাসখানিক রোজ এলে হয়ত কাজ হয়, আর আমাদের বিরাট দেশে বড় বড় শহরের মিউজিয়মও মোটামুটি একদিনেই দেখে ফেলা চলে। আমাদের অনেক জিনিস আবার অন্য দেশে চলেও গিয়েছে। যাই হোক, ফিরবার পথে আর দুই-চারটা দেখবার মত জিনিস দেখব ঠিক করে রাখলাম।

লণ্ডনে তখন মাঝে মাঝে ব্রাহ্মবন্ধু সভার মিটিং হ'ত। অনেক বাঙালীদের দেখা যেত সেখানে। দেশে যাঁদের সঙ্গে আত্মীয়তা আছে, কিন্তু চোখে কখনও দেখি নি, এমনও দু'চার জনকে দেখলাম। বিদেশে মানুষ কত সহজে আপন হয় বিদেশে গেলেই বোঝা যায়। কেউ দু'দিনের চেনা, কেউ একদিনের চেনা, সবাই কত উৎসাহে গল্পে মেতেছে! তার সঙ্গে কিছু কিছু ইংরেজ বন্ধুরাও যোগ দিয়েছেন, সংখ্যায় অবশ্য তাঁরা খুবই কম।

বিখ্যাত হাইড পার্কে চেয়ারে চড়ে অনেকে বক্তৃতা করছে আর ভীড় করে লোকে শুনছে, বাস থেকে দেখতে দেখতে ফিরলাম। পথে দেখলাম একটি বাঙালী ছেলে স্বদেশী ভাবে ধুতি পাঞ্জাবী পরে চলেছে। কেউ তাকে তাড়া করছে না, সেটা আশ্চর্য্য।

লণ্ডন খুব খরচের জায়গা, কিন্তু ইউরোপে খরচ আরও অনেক বেশী। লণ্ডনে আমরা এবার দিন চব্বিশ পাঁচ জনে থেকেও হাজার দেড়েক টাকায় চালিয়েছিলাম, অবশ্য ট্রেণ ভাড়া ইত্যাদি তার মধ্যে নয় এবং অনেক বিষয় হিসেব করে চলতে হ'ত।

২৮শে জুলাই লণ্ডন ছেড়ে চললাম প্যারিসের দিকে। লণ্ডনের শীত বিখ্যাত, কিন্তু আমরা জুলাই মাসে বিশেষ

শীত পাই নি। আজ প্রথম ট্রেনে হাড়কাঁপানো শীত। তার উপর ক্ষণে ক্ষণে পাসপোর্ট আর ভিসা দেখাতে দেখাতে প্রাণান্ত। ভাবলাম, এর উপর ইংলিস চ্যানেল পার হতে গিয়ে যদি মাথা ঘুরে যায় তা হলে ত সোনায় সোহাগা!

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই জাহাজে কাটাতে হ'ল। বসবার একবিন্দু জায়গা নেই, মানুষে আর জিনিসে গাদাগাদি। জোরে ঝোড়ো ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, তারই মধ্যে ভারতীয় দেখে কেউ কেউ এসে ভাব করছে। কেউ বা স্বদেশী, কেউ বা বিদেশী। অল্প একটু খাদ্য সংগ্রহ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খেলাম এবং সাদায়-কালোয় মেশানো চক ক্লিফস দেখতে দেখতে চ্যানেল পার হয়ে গেলাম। কারোর মাথা ঘুরল না। বঙ্গোপসাগরের উত্তাল তরঙ্গমালার নৃত্যের সঙ্গে এখানকার তরঙ্গের কোন তুলনা হয় না। তবু ওরই মধ্যে অনেকে কেবিনে ঢুকে চোখ বুজে সোফায় পড়ে আছে, যেন জীবনমরণ সমস্যা। উপরে অনেকে গল্পগাছা করছে।

অত্যন্ত ভাঙাচোরা উঁচুনীচু জীর্ণ একটা বন্দরে এসে নামলাম। এই নাকি ফরাসী দেশ! প্রথমটা দেখেই মন খারাপ হয়ে গেল। ভাল জিনিস পরে দেখবার আশায় চোখকান বুজে ট্রেনে উঠে পড়লাম। ট্রেন এবং ষ্টেশন ভারতবর্ষের ষ্টেশন ও ট্রেনের মতই কালিমাখা ও ধূলি-ধূসরিত। ট্রেন থেকে দু'ধারে তাকিয়ে বনবাদাড় খুবই চোখে পড়ে, পানা-ডোবারও অভাব নেই। প্রাকৃতিক দৃশ্য ইংলণ্ডের মত কাটা-ছাঁটা ঘষামাজা সাজানো নয়। আমরা প্রকৃতিকে যেভাবে দেখতে অভ্যস্ত এও সেই রকম।

সন্ধ্যাবেলা প্যারিসে যে ষ্টেশনে আমরা এসে নামলাম সেখানে কোনই ভীড় নেই, কোন কিছু দেখেই তাক লাগল না। লিভারপুলের মত লোকারণ্য ব্যস্ততা কিছুই চোখে পড়ে না। বড় বড় কয়েকটা বাস এসে নানা দেশের টুরিষ্ট-দের নিয়ে গেল। এইটুকু মাত্র চোখে পড়ল।

ষ্টেশন থেকে হোটেল পর্য্যন্ত পথে আসতে দেশের নূতনত্ব ও বিশেষত্ব কিছু কিছু দেখা গেল। ঘরবাড়ী সবেতেই সেকেলে ধরনের সুন্দর স্থাপত্যের নমুনা, মোটা মোটা দেওয়াল, রেলিং দেওয়া বারান্দা, ভারী ভারী কাঠের দরজা, রাস্তা বড় বড় পাথর দিয়ে বাঁধানো। পথচারিণীরা সুন্দরী, চাঁছা-ছোলা সরু খোঁচালো নাক, পাতলা পাতলা ঠোঁট। মেয়েরা রং মাখে তাই রং বোঝা যায় না, পুরুষদের রং বেশ লালচে তবে সুদর্শন মূর্ত্তি। মেয়েদের পায়ে অনেকেরই মোজা নেই, বোধ হয় গ্রীষ্মকাল বলে।

ষ্টেশনে নেমে প্যারিসের যে ম্লান মূর্ত্তি দেখে দুঃখ হয়েছিল রাত্রে পথে বেরিয়ে দেখি সে মূর্ত্তি ইন্দ্রজালের মত কে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছে। শাঁজএলিসের পথ আলোয় আলোয় ঝল-

ভেয়ারসাই গির্জ্জা

মল করছে। সুন্দর স্থাপত্যের উপর আলোর খেলা আরোই খুলেছে। বিলাসব্যসনের খ্যাতিময়ী নগরী তার অসংখ্য বিপণিকে লোকের মনোহরণের কত রকমারি ভঙ্গী ও ফন্দিতেই সাজিয়েছে। পথের দু'ধারে যতখানি স্থান তার প্রতি ইঞ্চি মোটর গাড়ীরা দখল করে রেখেছে। আমাদের দেশে দশটা রাজার বিয়েতেও এত গাড়ী দাঁড়ায় না। খাদ্য বিপণিগুলির সামনে অসংখ্য চেয়ার পাতা, রাত্রে লোকে খাবে, পান করবে, তার পর ভিতরে গিয়ে নাচ-গান করবে। মানুষকে ধনে, মানে, বাসনায়, কামনায়, রসনায়, শ্রবণে, দৃষ্টিতে যত রকমের নেশার ফাঁদে আকর্ষণ করা যায় তার আয়োজন চারিদিকে। পথের ধারে বসে সুসজ্জিত স্ত্রী ও পুরুষ খাওয়া-দাওয়া চালাচ্ছেন এবং পথচারীদের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখে নিচ্ছেন এটাই আমার চোখে সবচেয়ে নূতন লাগল। আমরা ভারতীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত বলে আমাদের উপর প্রায় সকলের চোখ এসে পড়ল। মানুষকে ও-রকম করে হুমড়ি খেয়ে চক্ষুব্যাদান করে দেখা যে অভদ্রতা এটা কেতাদুরস্ত ফরাসীদেরও কেন মনে হয় না বুঝলাম না।

মানুষ, গাড়ী ও বিপণির ভীড় পার হয়ে এই সুবিস্তীর্ণ

চলে, গাড়ীগুলোই মানুষকে বাঁচিয়ে চলতে চেষ্টা করে। আমাদের দেখতেই ভয় করে। লোকে বলে প্যারিসের পথে নিরাপদে চলতে হলে সঙ্গে শিশুদের নিয়ে যেতে হয়। ছোট শিশু দেখলেই মোটর-বিহারীরা অত্যন্ত সাবধান হয়ে যায়।

ওখানে ভারতীয় এম্বাসির সাহায্য নিয়েছিলাম, তাই বোধ হয় অশোক মেহতারা একদিন বিকালে আমাদের চা খেতে ডাকলেন। এন, সি মেহতার স্ত্রী অনেক গল্প করলেন হিন্দীতে। পি এণ্ড ও কোম্পানী তাঁর একটুও পছন্দ নয় বুঝলাম। তাঁর পুত্রবধূ বিজয়লক্ষ্মী-কন্যা চন্দ্রলেখা মেহতা আমেরিকান কলেজে বিবাহের পূর্ব্বে পড়েছিলেন। তিনি সেখানের অনেক গল্প করলেন। শীতের সময় সাড়ী পরে সেদেশে কি রকম মুস্কিল হবে বললেন। তাঁরা শীতকালে স্ল্যাক্স পরতেন।

এ সব জায়গায় টুরিষ্টদের গাড়ী করে দ্রষ্টব্য স্থান দেখাবার খুব ভাল ভাল ব্যবস্থা আছে। গাড়ীতে ইতিহাস-বেত্তা গাইড থাকে। যারা ফরাসী ভাষা বোঝে না, তাদের জন্য ইংরেজী বলিয়ে লোক থাকে। মাদেলিনের গির্জ্জা, নেপোলিয়নের সমাধি ইত্যাদি বিখ্যাত দ্রষ্টব্য। লোকে দেখে এবং বর্ণনাও করে। তবে বাস্তবিক একবার চোখ বুলিয়ে কোথায় ৫২টা থাম আছে আর কোথায় যীশুর মূর্ত্তি কুড়ি ফুট উঁচু বলে মানুষকে এ গুলির সৌন্দর্য্য কিছু বোঝানো যায় না।

নেপোলিয়নের সমাধি মন্দিরে চতুর্দ্দশ লুইএর সময় হাত পা কাটা সৈনিকদের হাসপাতাল ছিল। পরে এখানে নেপোলিয়নের দেহ রক্ষিত হয়। মোগল বাদশাহদের সমাধি দেখতে গেলে যেমন উপর থেকে তাকিয়ে নিচে সমাধি দেখা যায় এখানেও সেই রকম উপর থেকে নিচে শয়ান নেপোলিয়নের সমাধি দেখা যায়। এখানে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় নেপোলিয়ন এবং মার্শল ফসের সমাধিও আছে। একটা স্থান এখনও খালি আছে। গাইড রসিকতা করে বলল, "তোমরা কেউ যদি নিজের জন্য এই স্থান রিজার্ভ করে রাখতে চাও ত রাখ।"

প্যারিস স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রাঙ্কন সকলের জন্যই সুবিখ্যাত। আর্টের দেশে ঘুরে ঘুরে কয়েকটা আর্ট গ্যালারি দেখলাম। Degas, Picasso প্রভৃতি আধুনিক শিল্পীদের ছবি একটা গ্যালারিতে অনেক আছে। দেখে খুব যে মুগ্ধ হলাম তা নয়। বোধ হয় আধুনিক আর্ট ভাল করে বুঝি না। Degasএর কয়েকটি ছোট ছোট মূর্ত্তি ও একটি বেণী দোলানো নাচিয়ে মেয়ের ছবি বেশ লাগল।

প্যারিসে বিখ্যাত থিয়েটারের পাড়া আলাদা। পূর্ব্বে

ভিনাস ডি মিলো
ফোটো—শান্তশ্রী নাগ

পথটি চলে গেছে শেষে দু'ধারে বাগানের মধ্যে। ঘাসে, গাছে, ফুলে চারিধারে রঙের খেলা, ক্রমে সেখানে পণ্যের বেচাকেনার চিহ্ন নেই আর। আমাদের দেশের এঞ্জিনীয়াররা কল্পনাকে আর একটু শান দিলেই এ রকম পথের পরিকল্পনা করতে পারেন, তবে ভাঙাগড়ার টাকা ঢালবে কে? আর তারপর সেই পথকে ভ্রাম্যমাণ গরু-মহিষ, স্তূপীকৃত আবর্জ্জনা, রৌদ্রপ্রার্থী ঘুঁটেগুল এবং শৌচাগারে অবিশ্বাসী জনসংঘের হাত হতে বাঁচিয়ে রাখবে কে?

ওই সুবিস্তীর্ণ পথে যেখানে পণ্যের মেলা, সেখানে সাড়ীর দোকান পর্য্যন্ত আছে। লেখা থাকে English is spoken here। কিন্তু কথা বলতে গিয়ে দেখেছি সামনে যারা আছে তারা কেউই ইংরেজী বোঝে না। অগত্যা পণ্য সজ্জা দেখতে দেখতে যেখানে গাছপালার মধ্যে শিশুরা খেলা করছে সেই মানুষের গড়া বনভূমির দিকে চলে গেলাম।

এদের শহরে এত গাড়ীর ভীড়, কিন্তু পুলিস পথ সামলায় না এটা খুবই বিচিত্র। পথ দিয়ে যার যেমন খুসী

মলেয়ার

ভেগার অঙ্কিত
নর্ত্তকী বালিকা

এখানে রাজপ্রাসাদ ছিল তাই পাড়ার নাম প্যালে রয়াল। ইহারই এক অংশে জাতীয় রঙ্গমঞ্চে (Theatre Francais বড় বড় নাটক অভিনীত হয়। মলেয়ারের নাটক সে সময় হচ্ছিল। ফ্রেঞ্চ ভাষা ত আমরা কিছুই বুঝি না, এক "গৃহকর্ত্তা" দীর্ঘদিন এদেশে ছিলেন তাই তিনি বোঝেন। তবু দেখতে গেলাম। এ দেশের বাড়ী সর্ব্বত্রই খুব সুন্দর, থিয়েটারের বাড়ীটি ত অপূর্ব্ব। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই বাড়ীই দেখতে ইচ্ছা করে। ঝাড় লণ্ঠনের আলো শোভিত থিয়েটার, সাজ পোষাক চমৎকার। তবে পথ প্রদর্শিকারা বকশিশ আদায় করতে মহা ব্যস্ত। একই দলের কাছে দু'দফা বকশিশ আদায় করল।

রাত্রে ভীষণ ভীড়ে টিউব রেলে ফিরতে হয়। তার গাড়ী এবং আসন লণ্ডনের চেয়ে অনেক খারাপ, ময়লা এবং রিক্ত দেখতে। এমন সুন্দর দেশে এই রকম যান দেখে কষ্ট হয়। বড় বড় সব জায়গাতেই সৌন্দর্য্য সৃষ্টির চেষ্টা আছে। তার মধ্যে Trocadero বাগানে এখন Museum of Man (Unesco) গড়া হয়েছে। ভারতীয় শিল্পের Musee Guimet'ও এই পাড়ায়। ইফেল টাওয়ারের তলায় বহুদূর পর্য্যন্ত সবুজ কার্পেটের মত ঘাসের চৌখুপি, মাঝে মাঝে ফুলের বাহার। সর্ব্বত্র বাগানে গাছের পাতাতেই সবুজ, কমলা, বেগুনী কত রঙের ছড়াছড়ি, পুকুরে শালুক ফুল, নিকটে পাথরের গুহা। অথচ যুদ্ধ বিধ্বস্ত ফ্রান্সে টিউবের গাড়ীগুলির অবস্থা শোচনীয়। এখানে মর্ম্মর মূর্ত্তির ত সর্ব্বত্র ছড়াছড়ি। কোন একটা প্রাচীন জিনিষ মানেই এদিকে ওদিকে নানা মূর্ত্তি এবং জমিতে বাগান। গিলটিনের ক্ষেত্রেও (আধুনিকনাম শান্তির চত্বর Place de la concord) বাগান এবং মূর্ত্তির সমারোহ। সেন নদীর জমকাল সব সেতুর উপরেও বিরাট মূর্ত্তি। প্যালে রয়ালের পথের ত আনাচে কানাচে খুপরিতে ভাস্কর্য্যের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য। ভলটেয়ার মলেয়ার প্রভৃতি বিখ্যাত মর্ম্মর মূর্ত্তি দেখলাম।

এরই একটু পরেই লুভার ষ্টেশন। সেখানে নেমে একদিন মিউজিয়াম দেখতে গেলাম। বিরাট ব্যাপার, তার উপর আমরা আনাড়ী। কোথায় সুরু করলে যে বাছা বাছা জিনিষ দেখে নেওয়া যায় তার কোন ধারণা আমাদের নেই। ঢুকেই ঈজিপট, ব্যাবিলোনিয়া ইত্যাদির অরণ্যে রামসিস, টুটেনখামিন আর স্ফিংস দেখে দেখে এবং যত রকম সম্ভব মাটির ও এনামেলের বাসন দেখে যখন ফিরছি, তখন হঠাৎ

নেপোলিয়নের সমাধি

ফ্লোরেন্সের একটি সাদা ম্যাডোনা মূর্ত্তি দেখে মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। সেখানে ডাঃ নাগ এসে জুটে গেলেন। তাড়াতাড়ি ভিনাস ডি মিলো দেখতে ছুটলাম। হাতকাটা সুন্দরী পাষাণী বেঁকে দাঁড়িয়ে আছেন, অসংখ্য লোক ভীড় করে বসে দাঁড়িয়ে দেখছে, অনেকেরই হাতে ক্যামেরা। আমার কন্যারাও ক্যামেরার সদ্ব্যবহার করলেন।

কিন্তু পাথরের নৌকার উপর দাঁড়িয়ে মাথাকাটা বিরাট victory মূর্ত্তি দেখে যেমন মুগ্ধ হয়েছিলাম এমন কোনটা দেখে হই নি। ঐ বিরাট পাষাণ স্তূপ যেন সত্যই ডানামেলে উড়ে চলেছে, যেন সত্যই হাওয়ার ঝাপটা লাগছে।

প্রাচীন ইউরোপীয় ছবির গ্যালারিতে র‍্যাফেলের ম্যাডোনা এবং আরো অনেক সুবিখ্যাত ছবি দেখে ধন্য হলাম। লিওনার্ডোর কি আদর! মোনালিসাকে প্রায় সিংহাসনে বসিয়ে রেখেছে। তার এবং ম্যাডোনা অব দি রকসের হাত মুখ ঠোঁট চোখ সবের বড় বড় এনলার্জ্জ করা ছবি সাজানো। দর্শকেরা আবার তাই থেকে নিজেরা ছবি তুলছে। শিল্পীশ্রেষ্ঠের প্রতিটি রেখাকে শিল্প-রসিকরা আলাদা করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে।

একদিন আমরা ভেয়ারসাইয়ে চতুর্দ্দশ লুইএর প্রাসাদ দেখতে গেলাম। কিছু পথ "টিউবে এবং কিছু পথ বড় ট্রেনে যেতে হয়। সাধারণ ট্রেনের চেয়ে এই ট্রেনগুলো অনেক ভাল লম্বা চওড়া গদিওয়ালা বড় বড় গাড়ী। রোলাঁ (Romain Rolland)দের পাড়া হয়ে ট্রেন ভার্সাই পৌঁছল। ১০০ ফ্রাঙ্ক করে মাথাপিছু ভাড়া নিয়ে ভিতরে ঢুকতে দিল। প্রাসাদটি খানিকটা হ্যাম্পটন কোর্টের প্রাসাদের মতই, তবে তার চেয়ে অনেক বড় এবং কোন কোন অংশ অনেক বেশী সাজান। তিনটি বিশেষ ষ্টাইলে প্রাসাদের ঘরগুলি সাজান। একটা রীতি সাদাসিধে বড় বড় ঘরে রাজারাণীদের তৈলচিত্র দিয়ে। সাজান দ্বিতীয় রকমে সিলিং চিত্র শোভিত, তাদে নাম Hall of Abundance, Hall of venus ইত্যাদি। এগুলিতেও ছবি, মর্ম্মরমূর্ত্তি সবই আছে। কিন্তু তৃতীয় রকম অট্টালিকাতে দরজা জানালা ছাদ দেয়াল সব এত গিল্টি করা, খোদাই কাজ, রিলিফের কাজও চিত্র মূর্ত্তি শোভিত যে ঐশ্বর্য্যের জাঁকজমক দেখে তাক লেগে যায়। ফরাসী রকমের বাদশাহী কারখানা আর কি। প্যারিসের যে প্রাসাদে মলেয়ারের থিয়েটার দেখলাম এখানেও সেই রকম থিয়েটার হল ও ভোজের হল। একই দেশের রাজারাজড়ার ব্যাপার, কাজেই ঝাড় লণ্ঠন, আসবাব রাজোচিত দরবারী গৃহ ইত্যাদি একই ধরনের হবেই। রাজাদের গির্জ্জাটি অপূর্ব্ব, আগাগোড়া ছবিও অলঙ্কারে শোভিত।

একটা বিরাট হলে যেখানে যে টেবিলে ১৯১৮ সনে জার্ম্মান চুক্তি সই হয়েছিল এবং ১৯৩৮ সনে ষষ্ঠ জর্জ্জ ও তাঁর রাণী ভোজ খেয়েছিলেন সেগুলি দর্শকদের দেখানো হয়, ফরাসী বিদ্রোহের সময় যে বারান্দায় রাজা রাণী বিচারের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন তাও দেখানো হয়। আজ কোথায় সেই রাজা রাণী। যেখানে হয় ত সেদিন বিদ্রোহী জনসঙ্ঘের উন্মত্ত তাণ্ডব চলেছিল, আজ সেখানে লক্ষ লক্ষ রঙীন ফুলের হাসি। কি চমৎকার উদ্যান শোভা। মোগল ধরনের বা পারস্য ধরনের ছক কাটা কাটা বাগান। আজ পাঁচ বৎসর পরে মারিয়া থেরেসার নানা বয়সের ছবি বা চতুর্দ্দশ লুইএর ছবি বিশেষ মনে আসে না, কিন্তু ঐ ফুলের বাগানের রঙের খেলা এখনও মনের মধ্যে জ্বলজ্বল করে।

ট্রেন থেকে প্রাসাদ পর্য্যন্ত পথে আমাদের অনেকখানি হাঁটতে হয়েছিল। গ্রাম্য পথে বৃষ্টি এসে গেল। একটা ছোট্ট চায়ের দোকানে ঢুকে আশ্রয় নিলাম। বিরাট রাজ-প্রাসাদের পরেই ছোট্ট দোকানটুকু কোন রকমে পাঁচ-সাত জনের বসবার জায়গা হয়, দেখে মনে হচ্ছিল সাধারণ মানুষ আর দৈবক্রমে রাজ পরিবারে জাত মানুষের মধ্যে কতখানি

ভেদ! তাই না বিদ্রোহের আগুন অমন করে জ্বলে উঠেছিল সব ভেদ চূর্ণ করবার জন্য। • কিন্তু পেরেছে কি অর্থের ও প্রতিপত্তির গরিমা ভেঙে ফেলতে?

রবিবারে 'দেখলাম নোতর্‌দাম' প্রভৃতি বিখ্যাত গীর্জ্জায় ভক্তরা হাঁটু গেড়ে মাতৃমূর্ত্তির সামনে বসে আছে, কোথাও বা মাতৃমূর্ত্তির সামনে বাতি জ্বেলে আরতি দিয়ে যাচ্ছে, অথবা নামজপ করছে। আমাদের দেশের পূজার সঙ্গে খুব প্রভেদ নেই। তবে এদের মন্দিরের শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ দেখে মনে পূজার ভাব আরও সহজেই আসে।

লুভার দেখা ত একদিনের ব্যাপার নয় তাই রবিবারেও একবার গেলাম। আজ ঢুকতে দর্শনী লাগে নি মনে হচ্ছে। অন্য দিনে মোটা পয়সা দিতে হয়। এখান থেকে কলেজ অব ফ্রান্সে গেলাম যেখানে ডাঃ নাগ ছাত্রাবস্থায় পড়েছিলেন। সেখানে মিশরীয় চিত্রলিপির প্রথম পাঠক Champollion সাঁপলিয়র মর্ম্মর মূর্ত্তির ফোটো নিলাম।

এক সপ্তাহ প্যারিস বাস করেই আমরা সেখানকার পাঠ তুললাম। হোটেল ম্যাডিসন বলে যে হোটেলে আমরা ছিলাম সেটা খুব বিখ্যাত পাড়ায়। শাঁজ এলিসের পাশেই একটা ছোট রাস্তায়। ভাল দুখানা ঘর, দুটি স্নানের ঘর সব দিয়েছিল। আসবাব টেলিফোন ঘরে ঘরে; ইংলণ্ডে এত সুবিধা পাই নি। অবশ্য ইংলণ্ডের ঘরগুলির একটু ভাড়া কম ছিল। উভয়ত্রই খাদ্য শুধু সকালে দিত। তাতে সাত দিনে পাঁচ জনের জন্য ৩৭০।৩৭৫৲ টাকা নিয়েছিল। কিন্তু বাকি তিন বেলার খাদ্য, বেড়ানোর ভাড়া এবং সর্ব্বত্র দর্শনী ও ছোটখাট কেনা নিয়ে আমাদের সাত দিনে মোট সাতশ'-আটশ' টাকা খরচ হয়েছিল, ট্রেন ভাড়া বাদে। লণ্ডনের চেয়ে এখানে অনেক আরামে এবং অনেক ভাল জায়গায় ছিলাম। বাড়ীর কাছেই দোকান থেকে খাদ্য কিনে আনতাম। সুন্দর মিষ্টি রুটি, দুধ, ফল, মাছমাংস সব। যখন-তখন বেড়াতে বেরোন যেত, হেঁটেই, সেন নদী, ট্রায়াম্ফাল আর্চ প্রভৃতি দেখা যেত। ফুলের বাগান আর ভাস্কর্য্যের সৌন্দর্য্য দেখে মুগ্ধ হতাম। কিন্তু পথের ধারের লোকের উগ্র কুতূহলী দৃষ্টি একটুও ভাল লাগত না।

শাপলেও

ফোটো—শান্তিশ্রী নাগ

প্যারিস থেকে সুইজারল্যাণ্ডে বার্নের পথে চললাম। ক্রমেই বাড়ীঘর কমে বড় বড় জমি আর সারি সারি গাছ দেখা দিতে লাগল। মনে হচ্ছিল মানুষ যেন কোথাও বাস করে না, কেবল গাছপালা আর ঘাস। সুইজারল্যাণ্ডের যত কাছে আসি ততই বড় বড় পাহাড় আর বিরাট বনভূমি।

কত লোক কতবার যে টিকিট আর পাসপোর্ট দেখল তার ঠিক নেই। সুন্দর পাথুরে পাহাড় আর ঘন বনের ভিতর দিয়ে প্রকৃতির লীলাভূমি সুইস দেশে ঢুকলাম। সরু সরু খালের মত নদী থেকে থেকে ছুটে চলেছে।

ঝরনার পতন

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

বড়লোকের মস্ত বাড়ীর দোতলায় সাজানো ড্রইং-রুম। জানালার ধারে একখানা শোফায় বসে বই পড়ছে ঝরনা। বড়লোকের মেয়ে ঝরনা, বয়স হবে বিশ, দেখতে সুন্দর। তার মাথার উপরে দেওয়ালে ঝোলানো একখানা ছবি, তাতে আঁকা বনের কিনারায় ছোট নদী, তার পাশে পলাশতলায় একখানি মাটির ঘর। পলাশগাছ ফোটাফুলে লাল, নদীর সামনে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে, কাঁখে তার মাটির কলসী, খোঁপায় তার পলাশফুল গোঁজা।

ঘড়িতে বাজে বিকেল চারটে, ব্যস্তভাবে ঘরে ঢোকে সমর।

সমর—(এগিয়ে এসে) তোমার আদেশমত ঠিক সময়ে উপস্থিত হয়েছি।

ঝরনা—(বই ফেলে দিয়ে) আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝি এলে না।

সমর—(আশ্চর্য হয়ে) একথা কেন ভাবলে?

ঝরনা—তোমার দেরি দেখে।

সমর—দেরি আমি এক মিনিটও করি নি, ঠিক চারটেতে তোমার ঘরে ঢুকেছি।

ঝরনা—আমি আশা করেছিলাম তুমি চারটের আগেই আসবে। প্রেমিকরা সাধারণতঃ চারটে বললে ছুটে তিনটেতে এসে হাজির হয়।

সমর—ছুটে আমিও এসেছি। আমার গাড়ী চালানো যদি দেখতে তা হলে নিশ্চয় বলতে লোকটা পাগল।

ঝরনা—(উঠে এসে সমরের সামনে দাঁড়িয়ে) পাগলই বটে! কেমন পরিপাটী চুল, ফ্যাসানদুরস্ত সুট, সুন্দর টাই, হাতে দামী হাতঘড়ি—এ বুঝি আধুনিক পাগল!

সমর—(বিব্রত ভাবে) বাইরেটা দেখে বিচার করো না, ভিতরটা দেখ, সেখানে আমি সত্যিই পাগল।

ঝরনা—আচ্ছা বল ত, আমার মত এমন একজন সাধারণ মেয়ের জন্যে তুমি পাগল হলে কেন?

সমর—তুমি ত সাধারণ নও—তুমি অসাধারণ।

ঝরনা—দূর থেকে দেখতে অসাধারণ মেয়ে বেশ, কিন্তু তাকে বিয়ে করা অন্য কথা। তার ঝক্কি সামলানো মোটেই সহজ নয়।

সমর—(উৎসাহের সঙ্গে) সহজ নয় বলেই তা চাই।

ঝরনা—(সমরের হাত ধরে সোফায় এনে বসিয়ে) এই অসাধারণ মেয়েকে নিয়ে তুমি করবে কি শুনি! তাকে খুশী করবার জন্যে কি আয়োজন করেছ?

সমর—তোমাকে খুশী করবার জন্যে আমি সব করতে পারি।

ঝরনা—মস্ত কারখানার মালিক তুমি, অনেক তোমার টাকা, করতে তুমি সব পার। তবু শুনি কি করবে?

সমর—আমি ভেবেছি কি জান—বিয়ের পরেই একখানা এরোপ্লেন চার্টার করে আমরা পৃথিবী ঘুরে আসব। প্রথমে পারস্য, পরে ঈজিপট, তার পরে ইটালী হয়ে সুইজারল্যাণ্ড।

ঝরনা—মনে করো সুইজারল্যাণ্ড পর্যন্ত গিয়ে আমি যদি বলে বসি—আর এগোব না! অসাধারণ মেয়ের পক্ষে সবই সম্ভব।

সমর—তা হলে সেখানে কোন পাহাড়ঘেরা হ্রদের ধারে ভিলা ভাড়া করে বাস করব।

ঝরনা—কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডের শীত আমি সহ্য করতে পারব না।

সমর—তা হলে চলে যাব সাউথ অব ফ্রান্সে।

ঝরনা—(মাথা নেড়ে) নর্থ অব গ্রীনল্যাণ্ডই বল, বা সাউথ অব ফ্রান্সই বল—দেশের মত কোন জায়গা নাই—নমো নমো নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি, গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি।

সমর—গঙ্গার তীর! ভারি সুন্দর, তাই হবে। দক্ষিণেশ্বর, বালি, না হয় উত্তরপাড়া কোথাও গঙ্গার ধারে একখানা চমৎকার বাড়ী করে সেখানে থাকা যাবে।

ঝরনা—কিন্তু গঙ্গার ধারে একা একা কতক্ষণ ভাল লাগবে!

সমর—তা হলে শহরের মাঝখানে তোমার জন্যে বাড়ী করব।

ঝরনা—বাপরে—শহরের ঘিঞ্জিতে! তা ছাড়া আমি যে রাত্রে আকাশের তারা দেখতে ভালবাসি।

সমর—(হেসে) এ আর একটা কঠিন কথা কি। আমি প্রকাণ্ড উঁচু দশ তলা বাড়ী করব—আজকাল তা সম্ভব। তোমার মহল থাকবে দশ তলায়, শহর অথচ শহর থেকে

ঘুরে। অন্ধকার রাত্রে আকাশের তারা দেখবে, জ্যোৎস্না রাত্রে দেখবে চাঁদ।

ঝরনা—সবই ভাল, তবে একটা অসুবিধে দেখছি।

সমর—(আগ্রহের সঙ্গে) কি সেটা?

ঝরনা—অত উঁচু বাড়ী আমার মোটে পছন্দ নয়, আমার পছন্দ একখানা ছোটঘর—ইঁট-পাথরের তৈরী নয়, মাটির দেয়াল, তার উপরে খড়ের চাল।

সমর—বেশ ত, ছাদের উপরে একখানা মাটির ছোট ঘর করে দেব—সুন্দর হবে।

ঝরনা—একটা পলাশগাছও চাই—ঘরখানা হবে একটা পলাশগাছের নিচে। ছাদের ওপরে কি অত বড় পলাশগাছ গজাবে?

সমর—(হেসে ওঠে)

ঝরনা—হাসছ কেন?

সমর—তুমি ব্যারিষ্টার মিষ্টার রায়ের মেয়ে—বিলেত ঘুরে এসেছ, তুমি থাকবে পলাশতলায় মাটির ঘরে! (হাসতে থাকে)

ঝরনা—হেসো না—আমি মাটির ঘরে থাকতে ভালবাসি। আচ্ছা, সত্যিই যদি তুমি আমি কোন এক পাড়াগাঁয়ে মাটির ঘরে সংসার পাতি তা হলে কেমন হয়!

সমর—(কিছুক্ষণ ভেবে) পাড়াগাঁয়ে ত রাস্তা আছেই, মোটর যাবার মতো তা একটু ভাল করে নেওয়া যেতে পারে। তা ছাড়া বিজলীর মেশিন, জলের কল, এসব ছোটখাটো টুকটাক ব্যবস্থা করে নেওয়া কিছুই মুশকিল নয়।

ঝরনা—(হেসে) তুমি আর তোমার ঐশ্বর্য অবিচ্ছেদ্য।

সমর—কিন্তু পাড়াগাঁয়ে মাটির ঘরে তোমাকে মানাবে কেন?

ঝরনা—আমাকে হয় ত মানাবে, তোমাকে কিছুতেই মানাবে না! মনে কর, কোন এক পার্টিতে আমি তোমার সঙ্গে চলেছি, পরনে কস্তাপেড়ে মোটা শাড়ি, খালি গা, হাতে দু'চার গাছা কাঁচের চুড়ি, খোঁপায় ফুল গোঁজা। কেমন হবে তা!

সমর—(বিব্রত ভাবে হাসে)

ঝরনা—তোমার অ্যারিষ্টোক্রাট বন্ধুরা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে, তোমার হবে নার্ভাস ব্রেক-ডাউন!

সমর—(হঠাৎ ঝরনার হাত ধরে) দেখ, এসব তামাশা ছেড়ে দাও—যে কথা বলবার জন্যে ডেকেছ সেই কথা এখন বল। বল তুমি আমাকে চাও কিনা!

ঝরনা—তুমি আগে বল তুমি আমাকে চাও কিনা।

সমর—তুমি কি কানেও শোন না, চোখেও দেখ না, তাই এ প্রশ্ন করলে? তুমি জান আমার দেহমন সবই তোমার।

ঝরনা—(হেসে) তা হলে তোমার দেহ নিয়েই প্রথমে আলোচনা করা যাক। ধর যদি আমি বলি তোমার কোট সার্ট নেকটাই খুলে ফেলে গা খালি করে একখানা খাটো-মোটা ধুতি হাঁটুর উপরে তুলে মালকোঁচা মেরে পরে কোদাল নিয়ে বাগানে মাটি কোপাও—পারবে তা করতে?

সমর—(একটু ভেবে) সার্ট আর পাজামা পরে হবে না?

ঝরনা—(মাথা নেড়ে) না।

সমর—বাগানে মাটি কোপানোর জন্যে আমার অনেক মালী রয়েছে।

ঝরনা—আবার যদি বলি দু'মাইল দূর থেকে বাজার করে তরকারির বোঝা কাঁধে নিয়ে হেঁটে আসতে হবে—পারবে তো?

সমর—এতগুলো চাকর আর গাড়ী রয়েছে কেন?

ঝরনা—(সমরের কাঁধের উপর হাত রেখে) আমার মাথার উপর যে ছবিখানা ঝুলছে তা দেখেছ?

সমর—(উপরে ছবির দিকে তাকিয়ে) নতুন কিনেছ বুঝি?

ঝরনা—কিনি নি, দিয়েছে একজন। বলো কেমন ছবি?

সমর—জঙ্গলের ছবি—তা হয়েছে এক রকম।

ঝরনা—(হেসে) ভাল লাগল না, মোটরের রাস্তা নাই, আলোর ব্যবস্থা নাই, জলের কল নাই! কিন্তু ঐ ছবি হচ্ছে আমার কল্পলোকের। আমি ভালবাসি বনের ধারে অমনই ছোট নদী, সারাদিন কুল কুল করে বয়ে যাবে। পলাশ-গাছটা কত সুন্দর, ফুল ফুটে লাল হয়ে আছে; ওর নীচে যে ছোট ঘর রয়েছে ঐরকম হবে আমার মাটির ছোট ঘর।

সমর—আর ঐ কলসী কাঁখে মেয়েটি বুঝি তুমি?

ঝরনা—আন্দাজ ঠিকই করেছ। ঐ রকম গাঁয়ের মেয়ে-দের মত মোটা শাড়ি এঁটে পরে' খোঁপায় ফুল গুঁজে আমার কলসী কাঁখে জল আনতে ইচ্ছে করে।

সমর—ওসব কল্পনা করতেই ভাল লাগে।

ঝরনা—না না, কেবল কল্পনা নয়, সত্যিই আমার ঐ-রকম সাজতে ভাল লাগে। আজকে ঐরকম, দেখবে তুমি?

সমর—(হেসে) ও সাজে তোমাকে মোটেই মানাবে না।

ঝরনা—ও মত বদলাতে হবে তোমার—পাঁচ মিনিট বসো।

(ঝরনা গায়ের সব দামী গয়না একে একে খুলে টেবিলের

উপর রাখে, তার পরে হেসে পাশের ঘরে গিয়ে ঢোকে। পনের মিনিট পরে ফিরে আসে, কস্তাপেড়ে মোটা শাড়ি আঁট করে পরা, হাতে কয়েক গাছা কাঁচের চুড়ি, খোঁপায় একটা গোলাপ ফুল গোঁজা। সমরের সামনে এসে ঝরনা দাঁড়ায়)

ঝরনা—এইবার দেখ।

সমর—(আশ্চর্য হয়ে) ঠোঁটে রুজ নাই, হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ নাই, পায়ে হাই-হিল জুতো নাই, একি অদ্ভুত সাজ তোমার।

ঝরনা—এখনও কিছু খুঁত আছে যেমন খোঁপায় পলাশ-ফুল হওয়া উচিত ছিল, তা নেই বলে গোলাপ গুঁজেছি, আর কাঁখে কলসী নেই।

সমর—তোমাকে চেনা যায় না।

ঝরনা—চাও একে ?

সমর—(একটু হেসে) একে চাই না, সত্যিকার ঝরনাকে চাই।

ঝরনা—এ-ই সত্যিকার আমি।

(দরজায় কে যেন ঘা দেয়)

ঝরনা—ভিতরে এস।

(ভিতরে প্রবেশ করে একটি যুবক, এলোমেলো চুল, আধময়লা জামাকাপড়, পায়ে পুরনো স্যাণ্ডাল)

সমর—(আশ্চর্য হয়ে) এ কে ?

ঝরনা—(হেসে) আমি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, ইনি হচ্ছেন শ্যামল সেন, আর্টিষ্ট।

শ্যামল—(এগিয়ে ঝরনার সামনে এসে) কি সুন্দর তোমাকে দেখাচ্ছে—যেন বনদেবী।

ঝরনা—শ্যামল, আমি প্রস্তুত হয়ে আছি।

শ্যামল—তা হলে চল।

ঝরনা—(সমরের কাছে এসে) ঐ ছবি এঁকেছে শ্যামল, কল্পনা করে আঁকে নি, সত্যি অমনি বনের ধারে নদী আছে, পলাশগাছ আছে আর পলাশগাছের নীচে মাটির ঘর আছে। সে ঘরে আমি থাকব আর থাকবে শ্যামল। নদীর ধারে বসে শ্যামল ছবি আঁকবে, আমি বসে থাকব পাশে, শ্যামল বাগানে মাটি কোপাবে, গাছ লাগাবে, আমি কলসী কাঁখে নদী থেকে জল আনব।

সমর—নিশ্চয় তুমি তামাসা করছ।

ঝরনা—না, তামাসা নয়, আমরা এখনই চলে যাব।

সমর—তোমার একি অধঃপতন ঝরনা ?

ঝরনা—পাহাড়ের মাথা থেকে ঝরনা যদি মাটিতে না পড়ে তা হলে সে সার্থক হয় না।

সমর—(অবাক হয়ে বসে থাকে)

ঝরনা—বন্ধুত্বের খাতিরে একটা কাজ করতে হবে তোমাকে। পাঁচটা বাজে, আমরা চলে যাচ্ছি, একটু পরেই বাবা আসবেন কোর্ট থেকে। তাঁকে আমার ঐ গয়নাগুলো দেখিয়ে দিও আর বলো ঝরনার পতনের কথা।

(শ্যামল ও ঝরনা চলে যায়—সমর নিঃশব্দে বসে থাকে—ঘড়িতে বাজে পাঁচটা)

গান

শ্রী—

মানবের হিয়ালগ্না অন্তরের সুরলক্ষ্মী মোর
চিরন্তন আনন্দের গ্রন্থী দিয়া বাঁধ প্রেমডোর
শাশ্বত সে সুন্দরের প্রেম সাথে মোর হিয়াখানি
সে ছোঁয়ায় নিঃসীমতা আমার প্রাণেতে দাও আনি
আপনার বেড়া দিয়া আপনারে রাখনি ঘেরিয়া
সবার হৃদয় মাঝে আপনারে দেহ সঞ্চারিয়া
আলিঙ্গনে দাও নাই ধরা
দৃষ্টি মাঝে নাই তুমি তব রূপে তবু মন ভরা
শুধু এক অনুভূতি স্পর্শ-ঘেরা সূক্ষ্ম নিবিড়তা
উত্তপ্ত প্রাণের ছোঁওয়া সৌন্দর্য্যের কল্যাণকামিতা।

সরলা দেবী চৌধুরাণী

(বিবাহোত্তর জীবন-কথা)

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

[সরলা দেবী ১৮৭২, ৯ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা জানকীনাথ ঘোষাল একজন বিখ্যাত দেশকর্ম্মী ও সমাজসেবী ছিলেন। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠানটি তিনি ইহার সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া আমরণ ইহার সেবা করিয়া গিয়াছেন। সরলা দেবীর মাতা বিখ্যাত মহিলা ঔপন্যাসিক স্বর্ণকুমারী দেবী। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যা। 'ভারতী' সম্পাদনায় তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। সরলা দেবী বেথুন স্কুল ও কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বেথুন কলেজ হইতে তিনি বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মহিলাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট পদ্মাবতী-পদক তিনিই প্রথম লাভ করেন। তিনি ১৮৯৫ সনে মহীশূরে মহারাণী গার্লস স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিয়াছিলেন।

কৈশোরে পদার্পণ করিয়াই সরলা দেবী সাহিত্যচর্চ্চায় মন দেন। 'সখা', 'বালক', 'ভারতী ও বালক', 'ভারতী' প্রভৃতি মাসিকে তাঁহার গদ্য-পদ্য রচনা প্রকাশিত হয়। শুধু 'ভারতী'তেই তাঁহার প্রায় দেড় শত রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। 'ভারতী' সম্পাদনাকালে তিনি বহু মনীষী ও বিখ্যাত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন, যেমন—মহাদেবগোবিন্দ রাণাড়ে, সিষ্টার নিবেদিতা, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি। রচনার উৎকর্ষের জন্য উনিশ বৎসর বয়সেই তিনি সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ প্রশংসা পাইয়াছিলেন। মাতুল রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে সাহিত্য-চর্চ্চায় তিনি যথেষ্ট প্রেরণা লাভ করেন। সঙ্গীত-বিজ্ঞানে সরলা দেবী এতখানি ব্যুৎপন্ন হন যে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-সাধনায় তিনি রসদ জোগাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি যুবসমাজে স্বাজাত্যবোধ উন্মেষ এবং ত্যাগপূত কর্ম্মৈষণার উদ্রেক কল্পে সাতিশয় তৎপর হন। উভয় উদ্দেশ্যে তিনি স্বগৃহে মহাষ্টমীর দিনে 'বীরাষ্টমী ব্রত' উদ্‌যাপন করেন। 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রতিষ্ঠা দ্বারা প্রাক্-স্বদেশী যুগেই বাঙালীদের দেশজ শিল্পদ্রব্যাদি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করেন। ১৯০৫ সনের অক্টোবর মাসে তিনি পঞ্জাবের আর্য্যসমাজী নেতা পণ্ডিত রামভজ দত্তচৌধুরীর সঙ্গে পরিণীতা হন। ইহার পর তিনি পঞ্জাব-প্রবাসী হন। 'দেশ' সাপ্তাহিকে (১১-১১.১৯৪৪—৯-৬-৪৫) প্রকাশিত "জীবনের ঝরা পাতা" নামক আত্মস্মৃতিতে সরলা দেবীর জন্মাবধি বিবাহকাল পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে।]

পঞ্জাব-প্রবাসে : সরলা দেবী আত্মজীবনীতে পঞ্জাব গমন পর্য্যন্ত বিবৃত করেন। রামভজ দত্তচৌধুরী পঞ্জাবের বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যৌবনে 'আর্য্যসমাজে' প্রবিষ্ট হন; এই সময় পিতৃকুলের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন হইয়াছিল। সময়ান্তরে এই সম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। রামভজ দত্ত চৌধুরী, প্রথমা পত্নীর বিয়োগের পর, দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন। পঞ্জাবের আর্য্যসমাজের সঙ্গে কলিকাতার আদি ব্রাহ্ম-

সরলা দেবী চৌধুরাণী

সমাজের ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এক সময়ে আর্য্যসমাজের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত পত্র ব্যবহার দ্বারা উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। সুতরাং আর্য্যসমাজী রামভজ দত্ত চৌধুরীর সঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দৌহিত্রী সরলা দেবীর পরিণয়ে সকলেরই আন্তরিক সমর্থন ছিল। সরলা দেবীও অভিভাবক-অভিভাবিকাদের অভিমতকে সসম্ভ্রমে মানিয়া লন।

রামভজ দত্তচৌধুরীর কর্ম্মস্থল ছিল লাহোরে। তিনি ঐ

সময়েই ব্যবহারাজীবরূপে বেশ নাম করিয়াছিলেন। উপরন্তু, তিনি আর্য্যসমাজী নেতা এবং বিবিধ-সমাজকর্ম্ম ও সমাজসেবায় উদ্যোগী; সরলা দেবীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার কর্ম্মৈষণা দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল; সরলা দেবীও পতির প্রতিটি কর্ম্মে যোগ্য সহযোগী হইয়া উঠিলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে আর্য্যসমাজের কেন্দ্র ছিল; এই সব কেন্দ্রে পুরুষ ও নারীদের বিবিধ অনুষ্ঠান-উৎসবে এই বিদগ্ধ দম্পতী যোগ দিতেন। সরলা দেবীর সময়োপযোগী ভাষণে আর্য্যসমাজী নরনারী চমৎকৃত হইতেন। এই সকল সামাজিক মেলামেশা এবং নারীজাতির অনুন্নত অবস্থা প্রত্যক্ষ করার ফলেই সরলা দেবীর মনে একটি নিখিল-ভারতীয় মহিলা সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার কল্পনা উদ্রিক্ত হইয়া থাকিবে। গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালনের সঙ্গে সঙ্গে সরলা দেবী বিবিধ সমাজকর্ম্মেও লিপ্ত হইয়া পড়েন। ১৯০৭ সনের ৩রা জানুয়ারী তাঁহাদের একমাত্র পুত্র পণ্ডিত দীপক দত্তচৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন।

১৯০৫-১৯২৩, এই আঠার-উনিশ বৎসর কাল সরলা দেবী পঞ্জাবে প্রবাস-জীবন যাপন করেন। এই সময়ে তিনি বহু সমাজ-হিতকর কার্য্যে লিপ্ত হইয়া ছিলেন। এসব কার্য্য শুধু আর্য্য-সমাজীদের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না; বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের গণ্ডী ছাড়িয়া সমগ্র ভারতীয় জনগণের উদ্দেশ্যেই ইহা প্রযুক্ত হইত। সরলা দেবীর সাহিত্যচর্চ্চা বরাবর অব্যাহত ছিল। 'ভারতী' মাসিকে এ সময়ও প্রবন্ধ, কবিতা প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। সরলা দেবীর সমাজ-কর্ম্ম নানা দিকে প্রসারিত হয়, এবং তাঁহার এই কার্য্যে স্বামী রাম-ভজের সমর্থনও ছিল যথেষ্ট।

ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল: সরলা দেবীর সমাজসেবার প্রধান অভিব্যক্তি—ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল। তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে পর্য্যটন করিয়া নারীজাতির অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন। ইতিপূর্ব্বে বাংলার যুবশক্তির উদ্বোধনকল্পে তিনি যাবতীয় শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এককভাবে নারীদের উন্নতি-প্রয়াস তাঁহার এই প্রথম। মাতা স্বর্ণকুমারীর 'সখি সমিতি' এবং দিদি হিরন্ময়ীর 'মহিলা শিল্পাশ্রম' এই প্রতিষ্ঠান দুইটির আদর্শ তাঁহার সম্মুখে। এই প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের যে যে অভাব ছিল তাহা পূরণকল্পেই এই ভারত-স্ত্রী মহামণ্ডলের প্রতিষ্ঠা। ১৯১০ সনে এলাহাবাদে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই সময়ে সরলা দেবীর উদ্যোগে একটি নিখিল ভারতীয় মহিলা সম্মেলনের অধিবেশন হয় জাজিরার মহারাণীর সভানেত্রীত্বে। অধিবেশনে সরলা দেবী ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল স্থাপনকল্পে একটি ভাষণ দেন। এই ভাষণে তিনি উক্ত মহামণ্ডলের উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া বলেন যে, ভারতের পর্দ্দানশীন নারীদের শিক্ষার কোনরূপ ব্যবস্থা নাই। গৌরীদানের প্রথা তখনও বলবৎ থাকায় অন্তঃপুরে স্ত্রী-শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার। কাজেই এ নিমিত্ত একটি সর্ব্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা সর্ব্বত্র অনুভূত হইতেছে। বেতন দিয়া শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করিতে হইলে অর্থের খুবই প্রয়োজন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের শাখা স্থাপন দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইবে। সরলা দেবীর এই সুচিন্তিত ভাষণটির প্রিয়ম্বদা দেবী কৃত অনুবাদ 'ভারতী'তে (চৈত্র, ১৩১৭) প্রকাশিত হইয়াছিল। সরলা দেবী ইহা পুস্তিকার আকারেও প্রকাশিত করেন।

এই সম্মেলনে বিজয়নগর, প্রতাপনগর, কপূরতলার রাণীগণ এবং ভূপাল ও ক্যাম্বের বেগম সাহেবারা উপস্থিত ছিলেন। সরলা দেবী তখন লাহোরের বাসিন্দা। তাঁহার চেষ্টায় সেখানে ইহার একটি শাখা গঠিত হয়, এবং উক্ত উদ্দেশ্যে কার্য্য হইতে থাকে। ক্রমে অমৃতসর, দিল্লী, করাচী, হায়দরাবাদ, কানপুর, বাঁকীপুর, হাজারীবাগ, মেদিনীপুর, কলিকাতা এবং আরও কয়েকটি স্থানে ভারত-স্ত্রী মহামণ্ডলের শাখা সমিতি স্থাপিত হইল।

কলিকাতার ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের শাখার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করি। কৃষ্ণভাবিনী দাসের চেষ্টাযত্নে ইহা একটি প্রকৃত সমাজহিতৈষী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। অন্তঃপুরে বিধবা, কুমারী ও অনাথা নারীগণকে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পশিক্ষা দানেরও ব্যবস্থা হয়। তিনি ছিলেন বৌবাজার-নিবাসী কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যবহারাজীব শ্রীনাথ দাসের পুত্র অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ দাসের সহধর্ম্মিণী। পতি এবং একমাত্র কন্যার প্রাণবিয়োগের পর কৃষ্ণভাবিনী বিধবা অবস্থায় ভারত-স্ত্রী-মহা-মণ্ডলের কার্য্যে নিজেকে একেবারে সঁপিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার ত্যাগপূত জীবন সকলেরই আদর্শস্থল। ১৯১৯ সনের প্রারম্ভে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যু হইলে কবি প্রিয়ম্বদা দেবী ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের সম্পাদিকা হইলেন। কয়েক বৎসর যাবৎ তিনিও ইহার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়া-ছিলেন। সরলা দেবী বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিলে ইহার পরিচালনা-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। এ সম্বন্ধে পরে বলিতেছি।

পত্রিকা সম্পাদন ও পরিচালন: "ভারতী" সম্পাদনে প্রযত্নের কথা সরলা দেবী আত্মজীবনীতেই বিবৃত করিয়াছেন। সাময়িক পত্র সম্পাদনে তাঁহার সাফল্যপূর্ণ বহুমুখী প্রয়াস সম্বন্ধে পাঠক-পাঠিকা-মাত্রেই হয়ত অবগত হইয়াছেন। সরলা দেবী রাজনীতিতে ছিলেন উগ্রপন্থী; বিপ্লবযুগের প্রথম দিকে বিপ্লবী ভাবধারার পরিপোষক কার্য্যেও নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। পণ্ডিত রামভজ দত্তচৌধুরীও উগ্রপন্থী রাজনীতিক ছিলেন। কাজেই এদিকেও উভয়ের যোগাযোগ পূর্ণমাত্রায় ঘটিয়াছিল। পণ্ডিত রামভজও গতানুগতিক রাজনৈতিক আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন না। রাজনীতি ক্ষেত্রে নবভাব প্রচারের নিমিত্ত তিনি হিন্দুস্থান নামক উর্দ্দু সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। ইহার সম্পাদকও ছিলেন তিনি। এই সময় সরলা দেবীর পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা রামভজের বিশেষ কাজে আসে।

'হিন্দুস্থান' পত্রিকায় উগ্র রাজনৈতিক মতামত প্রকাশের নিমিত্ত

সরকার চটিয়া আগুন। লাহোরের চীফ কোর্ট আদেশ দিলেন যে, পত্রিকার সম্পাদক এবং স্বত্বাধিকারী হিসাবে রামভজের নাম প্রকাশিত হইলে তাঁহার ব্যবহারাজীবের 'লাইসেন্স' বা অনুমতিপত্র বাতিল করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু সহধর্ম্মিণী সরলা দেবী এই সময়ে আসিয়া স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন। পণ্ডিত রামভজের পরিবর্ত্তে তাঁহারই নাম প্রকাশিত হইল হিন্দুস্থানের সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী রূপে। সরকারী অপচেষ্টা এইভাবে ব্যাহত হইল। সরলা দেবী প্রকাশ্যে পত্রিকার ভার লইয়া ইহার একটি ইংরেজী সংস্করণও বাহির করিলেন। বলা বাহুল্য, সরলা দেবী ইংরেজী রচনায় সুপটু ছিলেন। প্রাক-বিবাহ যুগে 'ভারতী' সম্পাদনাকালে তিনি 'হিন্দুস্থান রিভিয়ু'র মাধ্যমে কংগ্রেসী রাজনীতি এবং হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়া লালা লাজপৎ রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দের নিকট হইতেও প্রশংসালাভ করিয়াছিলেন। এ কথা হয়ত অনেকে জানেন না যে, মহাবোধি সোসাইটির জর্ন্যালের দুই সংখ্যায় সরলা দেবী রচিত স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক একটি পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়। ইহা বিদগ্ধজনের এত সমর্থন লাভ করে যে, তিনি ইহা পরিবর্ত্তিত করিয়া পুস্তিকাকারে ছাপাইয়াছিলেন ১৯০১ সনে। রাজনৈতিক মতবাদ প্রকাশে তাঁহার মৌলিকতা ও রচনাশৈলী ছিল অপূর্ব্ব। বিলাতের বিখ্যাত উদারনৈতিক পত্রিকা ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' হিন্দুস্থানের (ইংরেজী সংস্করণ) বিশেষ প্রশংসা করিতেন। 'হিন্দুস্থানে' প্রকাশিত কোন কোন রচনা র‍্যামজে ম্যাকডোনালড তাঁহার "Awakening of India" পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

পঞ্জাবের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সামাজিক জীবন : ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের আদিকল্পক এবং অধিনায়ক ছিলেন সরলা দেবী। লাহোরের বিভিন্ন পল্লীতে নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। অন্ততঃ পঞ্চাশটি স্থলে এইরূপ আয়োজন করেন বলিয়া প্রকাশ। লাহোরের নারীসমাজে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রবর্ত্তনে তিনি অগ্রণী হ'ন। বাংলা সঙ্গীতের হিন্দী ও পঞ্জাবী অনুবাদ করাইয়া তাহাতে সুর সংযোগ করেন তিনি। পর্দ্দানসীন নারীদেরও সমাজসেবায় তিনি উদ্বুদ্ধ করিতে থাকেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ও উৎসবে পুরুষের মত নারীরাও যাহাতে যোগদান করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা ও আয়োজন করিতেন। লাহোরে সরলা দেবীর কার্য্যকলাপ পঞ্জাবের অন্যান্য মফস্বল শহরেও অনুসৃত হয়। এই সব অঞ্চলের মহিলারা আত্মোন্নতির জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠেন।

আর্য্যসমাজীদের একটি প্রধান কার্য্য—অনুন্নতদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার দ্বারা তাহাদের উন্নতিসাধনের প্রচেষ্টা। পণ্ডিত রামভজ এই কার্য্যটির ভার নিজে লইয়াছিলেন। সরলা দেবী নারীজাতির মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে যেমন একদিকে লিপ্ত ছিলেন অন্যদিকে স্বামীর অনুন্নত জাতিদের উন্নতিপ্রচেষ্টারও বিশেষ সহায় হইলেন। সরলা দেবীর প্রগতিমূলক কার্য্যসমূহের দ্বারা বিশেষ ভাবে লাহোরে এবং সাধারণ ভাবে পঞ্জাবে এক নূতন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। বিষয়টি এখনও অনেকের স্মৃতিপথে জাগরূক রহিয়াছে।

প্রথম মহাসমর ও বাঙালী সেনাদল : সৈন্য বিভাগে প্রবেশে বাঙালীদের পক্ষে লিখিত ও অলিখিত বহু বাধানিষেধ ছিল। প্রাক্ বিবাহ যুগে সরলা দেবী 'ভারতী'র মাধ্যমে এই বাধা বিদূরণের নিমিত্ত লেখনী পরিচালনা করেন। আবার, বঙ্গ-সন্তানদের শারীরিক শক্তি ও মানসিক বল উদ্বোধনের জন্য সভা-সমিতি এবং অনুষ্ঠান-উৎসবের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। প্রথম মহাসমরের ঘোর সঙ্কট সময়ে, ১৯১৭ সনে, বাঙালী সন্তানদের সৈন্যবিভাগে প্রবেশের বাধা তিরোহিত হয়। তখন তাহারা দলে দলে যাহাতে সৈন্যদলে ভর্ত্তি হয় সেজন্য স্বদেশীয় নেতারা আন্দোলন উপস্থিত করেন। তাঁহারা নানা স্থানে সাধারণ সভার আয়োজন করিয়া যুবকগণকে সৈন্যবিভাগে প্রবেশ করিতে আবেগপূর্ণ ভাষায় উপদেশ দিতেন। আমাদের কৈশোরেও এই উপদেশ শুনিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল।

সরলা দেবী ১৯১৭ সনে লাহোর হইতে বাংলা দেশে আসিলেন এবং এখানে কিছুকাল থাকিয়া তাঁহার প্রচারিত পূর্ব্বাদর্শ মত বাঙালী যুবকদের সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইতে আবেদন জানাইলেন। তিনি কলিকাতা হইতে হুগলি, চুঁচুড়া, চন্দননগর, উত্তরপাড়া প্রভৃতি স্থানে উক্ত উদ্দেশ্যে গমন করেন। তিনি এই সময় প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, যুদ্ধকার্য্যে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য তিনি সঙ্গীতাদিও রচনা করেন। ইহাতে তৎকর্ত্তৃক সুর সংযোজিত হইয়া এই সকল সাধারণ সভায় গীতও হইতে লাগিল। তাঁহার 'যুদ্ধসঙ্গীত' ১৩২৪ সনের ফাল্গুন সংখ্যা ভারতীতে প্রকাশিত হয়। উক্ত সভাগুলিতে প্রদত্ত বক্তৃতাসমূহের সারাংশও এই সময়কার 'ভারতী'তে স্থান পাইয়াছিল। 'আহ্বান' (চৈত্র ১৩২৪), 'উদ্বোধন' (বৈশাখ ১৩২৫), 'অগ্নিপরীক্ষা' (জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫) প্রভৃতি রচনাগুলি এখানে উল্লেখযোগ্য। সরলা দেবী নিতান্ত কর্ত্তব্য-বোধেই প্রথম মহাসমরকালে বাঙালী যুবকদের রণবৃত্তি গ্রহণে অনুপ্রাণিত করেন।

পঞ্জাবের হাঙ্গামা—মহাত্মা গান্ধী—রাজনৈতিক কার্য্য : যে আশা-ভরসায় সরলা দেবী ও অন্যান্য নেতারা বাঙালী যুবকদের সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইতে উদ্বুদ্ধ করেন তাহা অকস্মাৎ বিলুপ্ত হইয়া গেল। সর্ব্বত্র বিপ্লবী সন্দেহে ভারতবাসিগণকে আটকবন্দী করিবার ব্যাপক ক্ষমতা লইয়া রৌলট আইন বিধিবদ্ধ হইল। ইহার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিক্ষোভকে মহাত্মা গান্ধী প্রকাশ্য রূপ দিলেন 'সত্যাগ্রহ' কথাটির মধ্যে। বিক্ষোভের ফলে নানা স্থানে হাঙ্গামা উপস্থিত হইল। বিক্ষুব্ধ জনতাকে দমন করিতে গিয়াই সরকারী ধুরন্ধরগণ এই হাঙ্গামা বাধাইল। পঞ্জাবে এই হাঙ্গামা চরমে উঠিল। ইহার পরিণতি হয় জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডে। দত্তচৌধুরী পরিবারের উপর সরকারের কোপ পড়িল বিশেষ করিয়া। 'হিন্দুস্থান' উর্দু ও ইংরেজী সংস্করণ দুই-ই সরকার বন্ধ করিয়া দিলেন।

'হিন্দুস্থান' প্রেসও বাজেয়াপ্ত হইল। পঞ্জাবের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পণ্ডিত রামভজও অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য নির্ব্বাসিত হইলেন। সরলা দেবীর এই সময়কার তেজস্বিতা সকলকেই চমক লাগাইয়া দেয়। তাঁহাকেও গ্রেপ্তার করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে কোন মহিলাকে আটক করার রীতি এদেশে তখনও চালু হয় নাই; একারণে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইতে নিরস্ত হন। পঞ্জাবে ব্রিটিশের অকথ্য অত্যাচারের আভাস পাইয়া বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সরকার-প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি বর্জ্জন করিলেন।

ভারতীয় নেতৃবৃন্দের পঞ্জাব প্রবেশে বাধা উঠিয়া গেলে তাঁহারা একে একে তথায় গমন করেন। সরলা দেবীর গৃহে মহাত্মা গান্ধীর আবাসস্থল স্থিরীকৃত হইল। সরলা দেবীর সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর পরিচয় কুড়ি বৎসরেরও পুরানো। তিনি স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ ও কর্ম্মপন্থায় বিশ্বাসী। পুত্র দীপক গান্ধীজীর সবরমতী আশ্রমে অধ্যয়নরত। সত্যাগ্রহ প্রচেষ্টায়ও তাঁহার সমর্থন ষোল আনা। মহাত্মা গান্ধীকে এই সময় বেশ কিছুকাল সরলা দেবীর গৃহে অবস্থান করিতে হয়। কারণ তখন কংগ্রেস তরফে যে কমিটি পঞ্জাবের অনাচার, মায় জালিওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের তদন্তে লিপ্ত ছিল, তিনি ছিলেন তাহার একজন সদস্য। ব্রিটিশের অত্যাচার-অনাচারের গুরুত্ব ও ব্যাপকতা দেশ-বিদেশে জানাজানি হইতে বাকী রহিল না। ১৯১৯ সনে অমৃতসর কংগ্রেস; কংগ্রেস অধিবেশনের পূর্ব্বেই পঞ্জাবের নির্ব্বাসিত নেতাদের মুক্তি দেওয়া হইল; রামভজও স্বগৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

ভারতীয় রাজনীতিতে নূতন কর্ম্মধারার প্রয়োজন বিশেষ ভাবে অনুভূত হইল। মহাত্মা গান্ধী অহিংস অসহযোগের প্রস্তাব আনিলেন। ১৯২০ সনে কলিকাতায় ন্যাশনাল কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন, সভাপতি—লালা লজপৎ রায়। ইতিমধ্যে ৩১শে জুলাই নিশীথে অকস্মাৎ লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। বাংলা ও মহারাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে গত শতাব্দীর শেষ দশকেই। লোকমান্য তিলক এবং সরলা দেবীর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কথা আত্মস্মৃতিতে পাওয়া যাইবে। তিলকের মৃত্যুতে সরলা দেবী স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি ছুটিয়া গেলেন বোম্বাইয়ে তিলকের বিরাট শব-শোভাযাত্রায় যোগদানের জন্য। তিলকের স্মৃতিরক্ষায় একাধিকবার নিজের মনোবেদনা অনবদ্য ভাষায় তিনি ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

'শহীদ' কথাটির আজকাল খুবই চল। ইংরেজী 'martyr' শব্দের বাংলা শহীদ। কিন্তু দৈহিক মৃত্যু না ঘটিলেও কোন বিশেষ আদর্শ বা মতবাদের জন্য যিনি আত্মবলি দেন তাঁহাকেও শহীদ বলা যায়। ঠিক এই অর্থেই সরলা দেবী চৌধুরাণী মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত অহিংস আন্দোলনের প্রথম মহিলা 'শহীদ'। তিনি মনপ্রাণ দিয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। চরখা, খদ্দরের প্রবর্ত্তনে তিনি মহাত্মা গান্ধীর দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। অসহযোগ প্রচেষ্টার প্রথম দিকে তিনি ছিলেন গান্ধীজীর একান্তই সমর্থক। পণ্ডিত রামভজ ছিলেন ক্ষাত্রতেজোদীপ্ত। তিনি অহিংসা তথা অহিংস আন্দোলনের তেমন পক্ষপাতী ছিলেন না, হয়ত এই কারণে উভয়ের মধ্যে খানিক মতানৈক্য উপস্থিত হইয়াছিল হয়ত।

হিমালয়-বাস—পণ্ডিত রামভজের মৃত্যু—লাহোর ত্যাগ : সরলা দেবী প্রাক্-বিবাহ যুগে স্বামী বিবেকানন্দ তথা রামকৃষ্ণ মিশনের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিয়াছিলেন। কিছুকাল হিমালয়ে মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রমে গীতা, উপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্রচর্চ্চায়ও তিনি মন দেন। বিবাহিত জীবনে তিনি সম্পূর্ণ গার্হস্থ্য জীবন যাপন করেন। কিন্তু এই সময়ে আবার হিমালয়ের আহ্বান আসিল। তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। শাস্ত্রে পুরুষের যেমন 'বানপ্রস্থ' অবলম্বনের বিধি আছে, তেমনি নারীর কেন থাকিবে না? আর্য্যসমাজ-কর্ত্তৃপক্ষ এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে বিলম্ব করেন নাই। পুরুষের মত নারীরও বানপ্রস্থ অবলম্বনে বাধা নাই—তাঁহারা এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিলেন। পণ্ডিত রামভজও ইহাতে বাদ সাধেন নাই। তাঁহার নিকট হইতেও সম্মতি পাইয়া সরলা দেবী সুস্থ চিত্তে হিমালয়ে হৃষিকেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

কিন্তু তাঁহার এবারকার হিমালয়-জীবন দীর্ঘায়ত হইল না। কারণ পণ্ডিত রামভজ দত্তচৌধুরী হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। সেবাপরায়ণা সরলা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অসুস্থতার সংবাদে তিনি স্বামীর নিকট ছুটিলেন। চিকিৎসা, সেবা-শুশ্রূষার সুব্যবস্থা সত্ত্বেও পণ্ডিত রামভজ ১৯২৩ সনের ৬ই আগষ্ট মারা গেলেন। সরলা দেবীর পক্ষে হিমালয়ে ফিরিয়া যাওয়া আর সম্ভব হইল না। পুত্র দীপকের যথাযথ শিক্ষা-ব্যবস্থাও তো করিতে হইবে, তাই তিনি স্বামীর মৃত্যুর অল্পকাল পরেই স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। পুত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা হইল রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে। কলিকাতা পুনরায় সরলা দেবী চৌধুরাণীর কর্ম্মস্থল হইল।

'ভারতী'-সম্পাদনা—সাহিত্যকর্ম্ম—সাংস্কৃতিক সভা-সমিতি : পঞ্জাব-বাসকালে নানা রকমের কর্ম্মপ্রচেষ্টার মধ্যেও সরলা দেবীর বাংলা সাহিত্যচর্চ্চা যে অব্যাহত ছিল তাহার উল্লেখ ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি। তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুনরায় সাহিত্য-সেবায় মনঃসংযোগ করিলেন। 'ভারতী'র সম্পাদনা-ভার স্বতঃই তাঁহার উপর পড়িল। তিনি ১৩৩১ সালের বৈশাখ মাস হইতে 'ভারতী'-সম্পাদনা সুরু করিলেন। তিনি আড়াই বৎসর পর্য্যন্ত একাদিক্রমে 'ভারতী'-সম্পাদনায় লিপ্ত ছিলেন। এই সময়ে তাঁহার সাহিত্যচর্চ্চা পুনরায় পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ হইল। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ সর্ব্ববিধ রচনায়ই তিনি হস্তক্ষেপ করিলেন। এ সময়ে তাঁহার বড়মামা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং দিদি হিরণ্ময়ী দেবী পরলোকগমন করেন। তাঁহাদের উপরে লিখিত সরলা দেবীর প্রবন্ধ দুইটিতে অনেক নূতন কথা জানা যাইতেছে।

তাঁহার কৃতি শুধু ভারতীর পৃষ্ঠায়ই নিবদ্ধ রহিল না। তিনি এই সময় কলিকাতা ও বিভিন্ন অঞ্চলে সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক সভা-

সমিতিতে আহুত হইতে লাগিলেন। তাঁহার ভাষণসমূহ 'ভারতী'তে যথাসময়ে প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার ভাবধারণা এই সকল পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় আমাদের পক্ষে জানিয়া লওয়া আজও সম্ভব। এই প্রসঙ্গে তাঁহার 'শ্রমিক' প্রবন্ধটি (ফাল্গুন ১৩৩২) এখনও শ্রমিক আন্দোলনের দিগদর্শন হইয়া আছে। প্রেস কর্ম্মচারীদের সভায় সভানেত্রীরূপে তিনি যে ভাষণ দেন, তাহাই 'শ্রমিক' নামে ভারতীতে প্রকাশিত হয়। ১৩৩২ সালের ২০-২১ চৈত্র বীরভূম-সিউড়ীতে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের সপ্তদশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইল। এই অধিবেশনে সাহিত্য-শাখার সভাপতি রূপে সরলা দেবী একটি সুচিন্তিত ভাষণ প্রদান করেন। এই অভিভাষণে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক, সমস্যা ও সুকৃতির কথা অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। ইহা 'ভাষার ডোর' শীর্ষে ১৩৩৩, বৈশাখ সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়।

ভারত-স্ত্রী-মণ্ডল—ভারত-স্ত্রী-শিক্ষাসদন : সরলা দেবী কলিকাতায় ফিরিয়া ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলকে পুনরায় সক্রিয় করিতে প্রয়াসী হইলেন। কবি প্রিয়ম্বদা দেবীর হস্তে মহামণ্ডলের কার্য্য পরিচালনার ভার অর্পিত ছিল। তিনি 'ভারতী'তে (বৈশাখ ১৩৩২) ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী পুনঃপ্রচার করিলেন। অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারকল্পে মহামণ্ডলের কৃতিত্বের কথা পূর্ব্বে কতকটা বলা হইয়াছে। কয়েক বৎসরের মধ্যে শুধু কলিকাতায় পাঁচ শত গৃহে অন্ততঃ তিন হাজার অন্তঃপুরস্থ মহিলাকে শিক্ষাদানে সমর্থ হন। বাংলা দেশে, বিশেষতঃ কলিকাতায়, পর্দাপ্রথা দ্রুত উঠিয়া যাইতে থাকে। বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইল, ছাত্রীরাও দলে দলে স্কুলে ভর্ত্তি হইতে লাগিল। ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের কার্য্য নূতন ভাবে পরিচালিত করা আবশ্যক বোধ হয়।

মহামণ্ডল পূর্ব্ব পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ এবং চারু-শিক্ষাদানের নিমিত্ত একটি প্রকাশ্য শিক্ষাসদন প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইলেন। ইহার উদ্যোগে ১৯৩০ সনের ১লা জুন ভবানীপুরে এই শিক্ষাসদন প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অধীনে প্রবেশিকা পরীক্ষার মান পর্য্যন্ত ছাত্রীগণকে পড়াইবার ব্যবস্থা করা হইল। সরলা দেবী ছাত্রীগণকে গীতার মর্ম্ম বুঝাইয়া দিতেন। মহামণ্ডল শিক্ষাসদনের অন্তর্গত একটি শিশু-সংরক্ষণ-কেন্দ্র খুলেন। মহামণ্ডলের গাড়ী এইসব শিশুকে বাড়ী হইতে আনয়ন এবং ফেরত পাঠানোয় ব্যবহৃত হইত। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার দুই মাসের মধ্যেই ইহার সুনাম ছড়াইয়া পড়িল। শিক্ষয়িত্রীগণ অনেকে স্ত্রীশিক্ষাসদন হইতে স্বতন্ত্র হইয়া নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠন করিলেন। ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল অতঃপর নিজ শিক্ষাসদনটি ১৯৩০ সনের ৭ই আগষ্ট তারিখে কলেজ স্কোয়ারস্থিত এলবার্ট হলে স্থানান্তরিত হইল। এখানেও একদল ত্যাগী কর্ম্মী ও শিক্ষাব্রতী পাওয়া গেল। সকল শ্রেণী ও ধর্ম্মসম্প্রদায় হইতেই ছাত্রীরা এখানে ভর্ত্তি হইতে পারিত। ছাত্রীসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল। শিক্ষাসদনের ছাত্রীদের লইয়া ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল একটি ছাত্রীনিবাসও খুলিলেন। শিক্ষাসদন এবং ছাত্রীনিবাস পরিচালনার জন্য মহামণ্ডল একটি স্বতন্ত্র অধ্যক্ষ-সভার উপরে ভার দিলেন। অধ্যক্ষ-সভা গঠিত হয় কলিকাতার বহু গণ্যমান্য সমাজকর্ম্মী মহিলা ও পুরুষকে লইয়া। অধ্যক্ষ-সভার শীর্ষস্থানে রহিলেন ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের প্রতিষ্ঠাত্রী সরলা দেবী চৌধুরাণী। ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল ক্রমে ভারত-স্ত্রী-শিক্ষাসদনে রূপান্বিত হইল। সরলা দেবীও ইহার সংস্রব ত্যাগ করিয়া অধ্যাত্ম-জীবনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নিজ ভবনে অধ্যাত্ম-সঙ্ঘ স্থাপন করিয়া নিয়মিত শাস্ত্র-চর্চ্চারও ব্যবস্থা করিলেন তিনি। তাঁহার জীবনে এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন আসিল ১৯৩৫ সনের মাঝামাঝি।

গোত্রান্তর : সরলা দেবী হাওড়ায় আচার্য্য শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মার সঙ্গে পরিচিত হন ১৯৩৫ সনে। তিনি আচার্য্যের সঙ্গে আলাপে এবং তাঁহার শাস্ত্রব্যাখ্যায় এতই মোহিত হন যে, তিনি তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিয়া লইলেন। শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ "দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর আমায় যেসব উপদেশ দিয়েছেন, যাতে করে আমার মনের অন্ধকার কেটে গিয়ে আমি আলোকের নিকটস্থ হচ্ছি বলে মনে করি"—সেই সব উপদেশ যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়া সরলা দেবী পুস্তকাকারে গ্রথিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৩৫৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস (১৯৪৭, মে-জুন) হইতে এই সকল "বেদবাণী" নামে প্রকাশিত হইতে থাকে। তাঁহার অধ্যাত্ম-জীবনের কিরূপে আমূল পরিবর্ত্তন (যাহা তিনি 'গোত্রান্তর' কবিতায় প্রকটিত করিয়াছেন) ঘটিল তাঁহার নিজের ভাষায়ই এখানে বলিতেছি :

"নকিপুরের বন্ধুবর যতীন রায় চৌধুরী আমার বাড়ীতে অধ্যাত্ম-সঙ্ঘে কোন পণ্ডিতপ্রবরের উপনিষদ ব্যাখ্যানে তৃপ্তি না পেয়ে হাওড়ায় তাঁর ঠাকুরের কথামৃত শোনাতে আমায় একদিন নিয়ে যেতে চাইলেন। শনিবার, ২১শে জুন, ১৯৩৫ সনের সকালে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

"সেখানে বিজয়কৃষ্ণ নামধেয় পুরুষটির দেহমন্দিরে যে ঠাকুরের বাস, প্রথম দিনই তাঁর সমীপস্থ হওয়া মাত্র তিনি পোঁ করে তাঁর সানাইয়ে একটি সুর ধরে শুনিয়ে দিলেন। বৈকু রাজার গল্পচ্ছলে গুরুকে শ্রদ্ধায় সর্ব্বস্ব অর্পণ করার কথাটা কানে তুলে দিলেন।

"আমি গুরুবরণের জন্য যাইনি। শুধু যতীনবাবুর কথায় প্রখ্যাত বিজয় চাটুজ্যের উপনিষদের রসাত্মক ব্যাখ্যান শোনবার প্রলোভনে গিয়েছিলুম, যদি আমার বাড়ীর স্বাধ্যায়মণ্ডলীতে উপনিষদতত্ত্ব শোনাতে মাসে এক-আধবার আমায় কৃপা করেন। একটা সিংহকে ধরতে গিয়েছিলাম—নিজে বাঁধা পড়ে গেলুম।...

"বাড়ী ফিরে একটা ভাব মনের ভিতর আলোড়ন করতে থাকল। সেটা দু'দিন পরে কবিতাকারে ফুটলো। যাঁকে উপদেষ্টা বলে, জ্ঞানী বলে শরণ নিয়েছি, যাঁর উপদেশ শুনতে আনাগোনা করছি, তাঁকে একেবারে 'গুরু' বলে কবুল সম্বোধনের সঙ্কোচ ধূলিসাৎ করলুম এত দিনে। দৃঢ়ভূমি, বদ্ধভূমি, বদ্ধমূল সংসারের

এক একটা প্রাচীর অতি কষ্টে, অতি অনিচ্ছায় যেন একে একে পড়ে যেতে লাগল।...সে কবিতাটি এই :

"গোত্রান্তর
গুরো!
চৈতন্যে কর সম্প্রদান!
গোত্রান্তর কর মোরে
হে মঙ্গলনিদান!

জন্ম যার ঘোর মৃত্যুগৃহে,
নিরানন্দের কূলে,
অমৃত-পাত্রস্থ কর তারে,
দাও আনন্দ-গোত্রে তুলে!
ভয়েতে বিমূঢ় যেই চমকায়
প্রতি বায়ুহিল্লোলে,
স পো তারে ভয়ানাং ভয়ে,
অভয় গোত্রে যাক সেই চলে!

নাহি যার শক্তি সাধ্য লেশ,
অনন্ত শক্তির সনে
বাঁধ তার দক্ষিণ পাণি,
শক্তি গোত্র হোক শুভখনে!

অহংনিলয়ে ভেদভাবে করে
আপন পর যে জ্ঞান,
আত্মা-আবাসে নিবাসিয়ে
তারে, রাখ সব ভূতগত প্রাণ!
গুরো!
আমায় আমিরে দেখাও দেখাও!
করাও অভিজ্ঞান!
আনন্দ, অভয়, শক্তি, প্রেম
হউক নিত্য তব অবদান!"

শেষ জীবন—মৃত্যু : ইহার পর মৃত্যুকাল পর্যান্ত, সরলা দেবী কায়মনে ধর্ম্মচর্চ্চায় মন দেন। তিনি ১৯৪১ সনে "শ্রীগুরু বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মানুষ্ঠিত শিবরাত্র পূজা" প্রকাশিত করেন। 'বেদবাণী' প্রথম খণ্ড হইতে এই মাত্র উদ্ধৃত করিয়াছি। তৎ-লিখিত গুরুর উপদেশাবলী একাদশ খণ্ড (পৌষ ১৩৫৭) পর্যান্ত বাহির হয়। ১৯৪৫ সনের ১৮ই আগষ্ট এই বিরাট কর্ম্মময় জীবনের অবসান ঘটে। এই কর্ম্মময় জীবনের একটি বিশেষ দিকের প্রতি শিক্ষিত সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। 'সাহিত্যিক' সরলা দেবীর সাহিত্য-সাধনার নিদর্শন মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায়ই আত্মগোপন করিয়া আছে। বিবিধ বিষয়ের উপরে লিখিত তদীয় সারগর্ভ রচনাবলী পুস্তকাকারে গ্রথিত হইলে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হইবে, একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়।

সরলা দেবীর একমাত্র পুত্র শ্রীদীপক দত্তচৌধুরী বর্ত্তমানে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন। বিভিন্ন সামাজিক কর্ম্মেও তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ পরিদৃষ্ট হয়।*

* সাহিত্য সংসদ কর্ত্তৃক প্রকাশিতব্য সরলা দেবী চৌধুরাণীর "জীবনের ঝরা পাতা" গ্রন্থের অন্যতম পরিশিষ্ট।—লেখক

শ্রীশ্রীবাশুলী দেবীর মন্দির—ছাতনা

কটকের সূক্ষ্ম রৌপ্যসূত্রের শিল্পকাজ
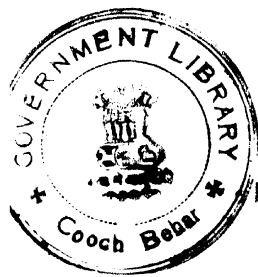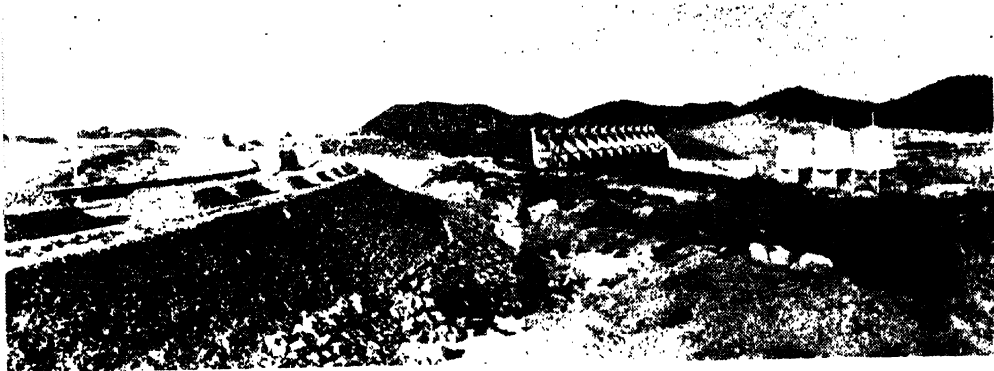
মাইথন বাঁধের দৃশ্য

রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ ঘানারাজ্যের অর্থমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর সহিত কথোপকথন করিতেছেন

ঘানারাজ্যের অর্থমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী গুরগাঁও জেলার শ্যামাশঙ্কর গ্রামোন্নয়ন কার্য্য দেখিতেছেন

ম্যাজিসিয়ান

শ্রীকৃষ্ণধন দে

ম্যাজিকটা ভাল করেই শিখেছিল যজ্ঞেশ্বর। এ দুস্তর সাধনাসমুদ্রে ভালো গুরু পেয়েছিল সে। গুরুর তখন দেশবিদেশে খুব নামডাক। বড় বড় বৈঠকে, রাজরাজড়ার দরবারে, বিশিষ্ট ভদ্র আসরে তিনি নিয়ে যেতেন যজ্ঞেশ্বরকে। নিজের ম্যাজিক দেখানো হলে ঘন ঘন হাততালির মাঝখানে তিনি ষ্টেজের উপর দাঁড়িয়ে যজ্ঞেশ্বরকে সকলের সঙ্গে পরিচিত করে দিতেন নিজের প্রিয় শিষ্য বলে। যজ্ঞেশ্বরও ম্যাজিক দেখাত। ফুটফুটে তরুণ ছেলেটির বাকচাতুর্যে, হাতের কৌশলে ফুটে উঠত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। গুরুর দিকে এগিয়ে দেওয়া মেডেলের ঝাক থেকে দু'চারটে ছিটকে এসে দুলত শিষ্য যজ্ঞেশ্বরের গলায়।

ম্যাজিকে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিল সে। শক্ত শক্ত কাজগুলোও দেখাতে পারত সে প্রায় গুরুর মতই। অনেক সময় গুরুর ফি-এর হার বেশী বলে ডাক পড়ত শিষ্যের। গুরু হাসিমুখে অনুমতি দিতেন যজ্ঞেশ্বরকে। ফিরে এসে যজ্ঞেশ্বর টাকাগুলো রেখে দিত গুরুর সামনে। গুরু আশীর্ব্বাদ করতেন তাকে, কিন্তু টাকা ফিরিয়ে দিতেন যজ্ঞেশ্বরের হাতে।

সেবার মফঃস্বলের এক বড় শহরে গুরুর সঙ্গে ম্যাজিক দেখাতে গিয়েছিল যজ্ঞেশ্বর। রাজবাড়ীর প্রাঙ্গণে বাঁধা ষ্টেজের উপর গুরুর খেলা দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলেন রাজা ও রাজপুরুষেরা। প্রায় হাজার দুই লোক জমায়েৎ হয়েছিল সেখানে। যজ্ঞেশ্বরের খেলা দেখেও চিকের আড়াল থেকে রাণীরা ধন্য ধন্য করেছিলেন আর দাসীর হাতে টাকা ও খাবার পাঠিয়েছিলেন যজ্ঞেশ্বরকে। তিন দিন ছিলেন গুরু সেখানে যজ্ঞেশ্বরকে নিয়ে। এই তিন দিন অবসর ছিল না যজ্ঞেশ্বরের। ষ্টেজের মধ্যে লোকের চোখে ধাঁধা দেবার অনেক কিছু কৌশল-কেরামতির যন্ত্র সাজাতে হয়েছিল তাকে। তার পর ম্যাজিক আরম্ভ হবার আধ ঘণ্টা আগে থেকেই দামী পোশাক পরতে ও সাজসজ্জা করতে তাকে রীতিমত মনোযোগ দিতে হ'ত। যাক, সে শহরে গুরুর ও তার সুনাম অক্ষুণ্ণ ছিল, এইটেই পরম লাভ।

ফেরবার সময় রাজাবাহাদুর তাঁর মোটরেই গুরু-শিষ্যকে রেল ষ্টেশনে পাঠিয়ে দিলেন। ট্রেন আসবার একটু দেরী ছিল। লোকজনের উৎসুকদৃষ্টি থেকে নিজেদের সরিয়ে প্ল্যাটফরমের বাইরে এসে দাঁড়ালেন গুরু, পাশে যজ্ঞেশ্বর।

রেল লাইনের একদিকে দূরে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে শহরের উঁচু বাড়ীগুলোর চূড়া। লাল রাস্তাটা ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে সোজা চলে গেছে সেদিকে। গাড়ী, সাইকেল রিক্সা যাতায়াত করছে সেই রাস্তা দিয়ে। লোকজনের ভিড়ও মন্দ নয়। দোকানপাট রাস্তার দু' পাশে ছড়িয়ে রয়েছে। আবার হয়ত ভবিষ্যতে আর কোন এক উপলক্ষে আসতে হবে গুরু-শিষ্যকে এখানে। ভালই লেগেছে শহরটাকে। অবশ্য কলকাতার কাছে কিছুই নয়, তবুও একে যেন আত্মীয়ের মতই মনে হয়েছে। কিন্তু রেল লাইনের অপর দিকটা? ধূ ধূ করছে সবুজ মাঠ, আর তার মাঝে মাঝে সাদা রংয়ের ছোট ছোট বাড়ী। একটা নদীও বয়ে চলেছে সেই মাঠের উপর দিয়ে। তার কাঠের পুল ও বাঁধানো ঘাট দূর থেকে ভালই লাগল দু' জনার।

—তুমি মানুষটি ত বেশ খেলা দেখাতে পার। মা গো মা, হেসে আর বাঁচি না, একেবারে অবাক কাণ্ড, ছোট্ট টুপির ভেতর থেকে বেরুতে লাগল কি না গোটা পাঁচেক খরগোস্, হিঃ হিঃ!—গুরু-শিষ্য দু'জনে ফিরে দেখে, শ্যামাঙ্গী তরুণীর হাসি যেন থামতে চায় না!

পরণে তার আধময়লা ডুরে সাড়ী, হাতে একটা ছোট্ট পুঁটুলীতে কি যেন রয়েছে। ছিটের ব্লাউজটার গলার কাছে খানিকটা ছেঁড়া অংশ বাতাসে কেঁপে উঠছে। নিখুঁত নিটোল মজবুত গড়ন, বয়স তেইশ চব্বিশ হবে। কিন্তু আশ্চর্য্য তার টানা টানা চোখ, উচ্ছল যৌবনের একটা সপ্রতিভ ভাব তার দৃষ্টি আর হাসিতে যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

—কোথায় থাক তুমি?—প্রশ্ন করলেন গুরু।

—ওই হোথায়, টিলা দেখছ নি? তার পাশে।

তার পর যজ্ঞেশ্বরের দিকে চেয়ে বললে, তুমিও ত ছোকরাটি সহজ মানুষ নও। আগুনের গোলাগুলো টপাটপ গিলতে লাগলে? মন্তরতন্তর জান নিশ্চয়। আর অত বড় ছুরিখানা দিয়ে জিভটা কেটে ফেলে আবার জোড়া লাগালে? মা গো মা, এক ফোঁটাও কি রক্ত পড়তে নেই! আচ্ছা ওসব কেমন করে হয়? যোগ-টোগ জান নাকি?

গুরু মৃদু হেসে বললেন, তুমি আর কোথাও এরকম ম্যাজিক দেখেছ?

—কোথায় আর দেখব গো? একবার গাজনের মেলায় পাল টাঙিয়ে ঐ যে কি বলে, বেলাক ম্যাজিক না ফ্যাজিক, তাই দেখাতে এসেছিল কলকাতা থেকে জনচারেক লোক। তাঁবুর বাইরে মুখোস পরে কি তাদের নাচ। মা গো মা, তাদের রঙ্গ দেখে হেসে আর বাঁচি না। তবে টিকিটের দাম নিয়েছিল দু' আনা।

—তোমার কে আছে?

—বাপ নেই, মা নেই, পিসীর কাছে মানুষ। সুতোর কলে কাজ করি আমি। পিসী বলে, বিয়ে কর পদ্ম। আমি বলি, মনের মানুষ পাই কোথা পিসী, যে বিয়ে করব? তবুও পিসী

ছাড়ে না, বলে, ধিঙ্গী হয়েছিস, লোকে পাঁচ কথা বলবে যে! আমি বলি, বললেই হ'ল আর কি! আমি কারুর খাই না পরি? বিয়ে করলেই হ'ল আর কি! কে যে মানুষটি কি রকম হবে তা কে জানে গা? বৈরাগী মিস্ত্রির মতন মাতাল হ'লেই গেছি! বৌয়ের গায়ে বমি করে দেয় মুখপোড়া। বৌও কি সহজে ছাড়ে, আঁশবঁটি নিয়ে তেড়ে আসে।

অগত্যা গুরু যজ্ঞেশ্বরকে বলেন, "চল, প্ল্যাটফরমেই যাই। ট্রেনের ত দেরী বেশী নেই।"

পদ্ম বলে, দাঁড়াও না একটু। সিগনাল ত পড়ে নি এখনও। আচ্ছা, জিভ কেটে ত জোড়া দিলে গো, মানুষ কেটে জোড়া দিতে পারো?

গুরু মৃদু হেসে বললেন, "পারি, কিন্তু লোক পাই কৈ? কে আর নিজেকে কাটতে দেবে বল?"

—ওমা, সত্যি পার? তা হলে ত তুমি পিচেশ-সেদ্ধ বট? এ যে অবাক কাণ্ড, তাই পিসী বলছিল, পদ্ম, ওরা মানুষ নয়। সত্যি বল না, কি করে কাট? থানা পুলিস হয় না?

কি জানি কেন গুরুর ভাললাগছিল পদ্মকে। এই অত্যন্ত বাচাল মেয়েটির মনের দ্বার সব সময়েই যেন খোলা। গুরুর মনে হ'ল বাইরের সবুজ মাঠের মত ওর মন এখনও সবুজ আছে। সেখানে ঝড় নেই, বাদল নেই, শুধু সকালের রৌদ্রে ঝলমল করছে সবটাই। তা ছাড়া আর একটা কথা মনে উদয় হ'ল গুরুর। করাত দিয়ে মানুষকাটার খেলাটাই অনেকদিন দেখাতে পারেন নি তিনি একটি সাহসী মেয়ের অভাবে। প্রথমে একবার একজনকে পেয়েছিলেন, কিন্তু ধোপে টিকল না সে, একদিনের রিহার্সেলের পরেই সরে পড়ল। অতটা স্নায়ুর জোর ছিল না তার। সবটাই যে ফাঁকি, শুধু চোখের ধাঁধা তা বুঝেও সে কিন্তু দ্বিতীয়বার ঘোরানো করাতের সামনে নিজেকে এগিয়ে দিতে পারল না। যাক সে কথা। পদ্মর মুখের দিকে চেয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন।

—কি ভাবছ গো আমায় দেখে? চাউনি ত ভাল নয়। এতখানি বয়সে এ কি রোগ তোমার?

—হ্যাঁ পদ্ম, সাহস আছে তোমার? তোমায় যদি কেটে জোড়া দি তুমি ভয় পাবে না ত?

—ওমা, সে কি কথা গো! আমি যে তখনি মরে যাব।

—না, মরবে না তুমি।

—খুব লাগবে ত?

—একটুও লাগবে না। আমরা যে যাদুকর। সেসব কৌশল পরে জানতে পারবে। সবটাই চোখের ধাঁধা। সবটাই ফাঁকি। তবে চাই শুধু সাহস।

—কি দিয়ে কাটবে? খাঁড়া দিয়ে, না কুড়ুল দিয়ে? বলি দেবে না কি?

গুরু এবার হাসেন। সহজ সরল প্রশ্ন, আতঙ্ক নেই, শুধু আছে কৌতূহল। পদ্মকে সত্যি ভাল লাগছিল তাঁর। অবাক্ হয়ে সব কথা শুনছিল যজ্ঞেশ্বর।

গুরু বললেন, খাঁড়া দিয়েও নয়, কুড়ুল দিয়েও নয়, করাত দিয়ে। একটা গোল করাত। তুমি টেবিলের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে থাকবে আর আমি করাত ঘুরিয়ে তোমাকে দু' টুকরো করব। তার পর সকলের সামনে তোমাকে জোড়া দোব। তুমি বেঁচে উঠে দাঁড়িয়ে সকলকে নমস্কার করবে।

—আমার সঙ্গে মসকরা করছ নাকি? আমাকে করাত দিয়ে কেটে দু' টুকরো করবে, আমি মরব না, আমার লাগবে না, আমি আবার বেঁচে উঠব, এ সব কথা বলছ কি করে?

—সত্যিই তাই। ঠিক করে বল, তোমার সাহস আছে ত পদ্ম? বন্ বন্ করে ঘুরছে এমন করাতের সামনে চুপ করে শুয়ে থাকতে পারবে?

—তুমি ত বললে, সবটাই চোখের ফাঁকি।

—হ্যাঁ তাই। তবে খুব সাহস থাকা চাই।

নিজের বাঁ-হাতের চেটোটা তুলে ধরে পদ্ম গুরুর সামনে। পদ্মর বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা কে যেন কেটে বাদ দিয়েছে।

গুরু বলেন, ও আঙুলটা কি করে কাটল?

হিঃ হিঃ করে মাথা দুলিয়ে হেসে ওঠে পদ্ম। তার পর গুরুর দিকে চেয়ে বলে, তুমি যে বলছিলে গো আমার সাহস নেই। এটা কাটল কি করে জান? আমিই কেটেছি। গেল বছর, বোধ হয় চোত মাস পড়েছে, সকালবেলা গরুকে জাব দিতে গেছি। খড় কাটা বটিখানা নিয়ে যেই খড় কাটতে বসেছি, অমনি খড়ের ঝুড়ি থেকে একটা কেউটে সাপ ফোঁস করে উঠে ছোবল মারল আমার কড়ে আঙুলে। আমি ত মাগো বলে লাফিয়ে উঠলাম, তার পর তখনি করলাম কি জান? খড়কাটা বঁটিতে আমার গোটা কড়ে আঙুলটাকে পেঁচিয়ে একেবারে কেটে বাদ দিলাম। আমি তখন ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে কাটা জায়গাটা চেপে ধরে পিসীকে ডাকতে লাগলাম। পিসী এসে ত আছাড়ি-পিছাড়ি। নকুড় ডাক্তারকে তখনি ডাকা হ'ল। ডাক্তার ত এসে ওষুধ দিয়ে বেঁধে দিলে ও জায়গাটা। তারপর আমার পিঠ চাপড়ে বললে, বেঁচে গেলি তুই পদ্ম। তবে তোর সাহস আছে বলতেই হবে, এমনটি কোথাও দেখি নি, শুনি নি। সাবাস মেয়ে বটিস তুই।

যজ্ঞেশ্বর এতক্ষণে কথা বললে, সাপটা কি হ'ল?

হিঃ হিঃ করে হেসে উঠে পদ্ম বললে, পালিয়ে গেল গো। আর কি সে সেখানে রয়?—তারপর হাসি থামিয়ে গুরুর দিকে চেয়ে বললে, লাও, বয়েস হলে কি হয়, তোমার এ সাগরেদটি এখনও সেয়ানা হয় নি, ও বলে কিনা সাপটা কি হ'ল? এইটুকু বোঝবার মাথা নেই ওর।

যজ্ঞেশ্বর এ কথায় একটু লজ্জিত হ'ল। ছোবল মেরেই সাপ যে পালিয়ে যায়, এ কথা সে জানত না। গুরু এবার পদ্মকে

প্রশ্ন করলেন, বুঝলাম তোমার সাহস আছে পদ্ম। কিন্তু তোমার পিসী আমার সঙ্গে তোমাকে যেতে দেবেন কেন?

—ওঃ, এই কথা বটে? তুমি আমার পিসীকে চেন না। ওর হাতে টাকা গুজে দিলে পিসী আমাকে ভাগাড়েও পাঠাবে। আচ্ছা, ঠিক করে বল ত, তুমি আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে নাকি? হাজার হোক্ অচেনা-অজানা লোক ত তোমরা।

—যদি নিয়ে যাই।

—সুতোকলের হপ্তা মারা যাবে যে! তারপর তারা দেবে আমাকে ছাড়িয়ে।

—ও চাকরি নাই-বা করলে? অনেক বেশী টাকা পাবে তুমি আমার সঙ্গে ম্যাজিক দেখালে। যাবে তুমি?

—লাও, এত তড়িঘড়ি কি বলি বল ত? একটু ভেবেচিন্তে বলতে হবে ত গা? আমি ও-সবের কিই বা জানি।

এই সময়ে ট্রেন হুইসল দিয়ে প্ল্যাটফরমে ঢুকল। যজ্ঞেশ্বর গুরুকে বললে, ট্রেন এসে গেছে, চলুন। লগেজগুলো আগেই ওঠাতে হবে যে। আমাদের লোকজন ওখানে দাঁড়িয়ে আছে।

গুরু বললেন, এ ট্রেনে আমরা যাব না যজ্ঞেশ্বর। এর পরের ট্রেনটাই না হয় ধরব।—তারপর পদ্মর দিকে চেয়ে বললেন, চল পদ্ম, তোমার পিসীর কাছে যাই।

হিঃ হিঃ করে হেসে পদ্ম বললে, পিসীকে কিন্তু ঐ যে কি বললে, করাত দিয়ে মানুষ কাটার কথা যেন বোলো না গো। পিসী আবার যে ভীতু, তা হলেই হয়েছে আর কি! একেবারে ভিরমি যাবে।

তিন জনে বড় সড়ক ছেড়ে রেল লাইন পার হয়ে মাঠের পথ ধরল। পদ্ম আগে আগে, মাঝখানে গুরু, শেষে যজ্ঞেশ্বর। যজ্ঞেশ্বরের মন কিন্তু পদ্মর ওপর খুশী নয়। কোথাকার উড়ো ঝঞ্ঝাট নিয়ে গুরু মেতে উঠলেন। গুরুর মুখের ভাব কিন্তু প্রসন্ন গম্ভীর। সেখানে যজ্ঞেশ্বরের বুদ্ধি পথ হারিয়ে ফেলেছে। ঠিক যেন বুঝতে পারছে না সে গুরুকে। গুরুর এ অবস্থা কোনদিন দেখে নি সে। কি যেন ভাবতে ভাবতে চলেছেন তিনি। যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গে বেশী কথাও কইছেন না।

টিলার পাশে উচুনীচু মাঠের মাঝখানে খানদশেক টিনের ঘর। পদ্ম তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে একখানা ঘরের সামনে চিৎকার করে ডাকল, পিসী, অ-পিসী। দরজা খোল, কারা এয়েছে দেখবে এস।

—কারা এল রে পদ্ম?—দরজা খুলতে খুলতে বুড়ী পিসী বললে। কিন্তু গুরু আর যজ্ঞেশ্বরকে দেখেই থমকে দাঁড়াল। পদ্মর কানে কানে বললে, কাল যারা খেলা দেখাচ্ছিল তারাই নয়?

—হু, পিসী। বড় ভাল লোক এরা। আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে, দেশ-বিদেশে খেলা দেখাবে, অনেক টাকা দেবে, তোমাকে বলতে এসেছে।

হঠাৎ পিসীর মুখ গম্ভীর হয়ে যায়, পিসী বলে, তোকে সঙ্গে নিয়ে যাবে কি রে? ব্যাপারখানা খুলেই বল না। মিন্সের মতলবটা কি? ড্যাবকা ছোড়াটাই বা সঙ্গে এল কেন? ওসব বেলেল্লাগিরি চলবে না এখানে, ডাক্ ত মানুকের বাপকে।

—তুমি থামো পিসী। বলছি ত ওরা ভাল লোক। থামকা হুজ্জোত লাগাও কেন? আমি কি আর কচি খুকীটি আছি? নিজের ভালমন্দ বুঝতে শিখ নি? সুতোকলে কাজ করবার সময় কেউ আমার নামে একটা কথাও বলতে পেরেছে? গোকুল সর্দার কার হাতে চড় খেয়েছিল, সে কথা সবাই জানে।

গুরু বলেন, সুতোকলে কাজ করে পদ্ম যা পায় তার চেয়ে অনেক বেশী মাইনে পাবে আমার কাছে। আমার কাজটা ইজ্জতের কাজ তা ত জান বাছা। পদ্ম ভালই থাকবে, আর তোমাকে মাসে মাসে অনেক টাকা পাঠাবে। ছুটি পেলেই সে আবার ছুটে আসবে তোমার কাছে। বছরে বর্ষাকালটাই আমাদের একরকম ছুটি। পদ্মর কোন ভয় নেই আমাদের দলে, সে মান-ইজ্জত বাঁচিয়ে থাকতে পারবে, এ আমি হলপ করে বলছি তোমার কাছে।

—দেশে এত মেয়ে থাকতে হঠাৎ পদ্মর ওপর তোমার টান পড়ল কেন গো?

মৃদু হেসে গুরু বললেন, তাদের ত কেউ সাপের ছোবল খেয়ে তখনি হাতের আঙুল কাটে নি।

—ও কথাটাও তুমি শুনেছ দেখছি। তা বেশ, সবই যে কালে জান, পদ্ম না হয় তোমাদের সঙ্গে যাক্। তবে সোমত্ত মেয়ে, ওকে একটু সাবধানে রেখো।

—আমাকে ভুল বুঝ না, পদ্মও যদি ভুল বোঝে, ও না হয় তখনি চলে আসবে!

—সে ত ঠিক কথা, কি বলিস পদ্ম?

পদ্ম সে কথায় কান না দিয়ে বলে, কবে যাচ্ছ তোমরা? আজই নাকি?

—হ্যাঁ আজই। তুমি তৈরি হয়ে নাও পদ্ম, পরের ট্রেনটা ধরতেই হবে। আর তোমার পিসীকে এই ক'টা টাকা দিয়ে যাও।—পকেট থেকে খানপাঁচেক দশ টাকার নোট বার করলেন গুরু।

হঠাৎ হাত বাড়িয়ে নোট ক'খানা পিসী একরকম গুরুর হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়। গুরু মৃদু হেসে বলেন, সামনের মাসে আরও পাঠিয়ে দেব।

একগাল হেসে পিসী বলে, তোমরা রাজা লোক, সে ত দেবেই। পদ্মকে যেন কোন কষ্ট দিও না গো, ও আমার বড় আদরের ভাইঝি। রাজবাড়ীতে তোমাদের জানাশোনা সব লোক আছে বলেই আমি যেতে দিচ্ছি পদ্মকে।

ট্রেন থেকে নেমে হাওড়া ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে অবাক

হয়ে যায় পদ্ম। ওমা, এই কলকাতা শহর! সামনে কত বড় গঙ্গা। ওপারে যেদিকেই চোখ ফিরান যায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী, নাম-না-জানা জিনিষপত্র দোকানে সাজান, কতরকমের গাড়ী, মোটর। ট্রাম এর আগে দেখে নি পদ্ম। দেখে ত অবাক। বাঁ-কনুই দিয়ে যজ্ঞেশ্বরকে ঠেলে চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করে, টেরামে চড়াবে একদিন?

পদ্মর কনুয়ের ধাক্কা খেয়ে যজ্ঞেশ্বর চটে উঠে বলে, এ আর শক্ত কিসের? যেদিন ইচ্ছে হয় চড়বে, রাস্তার মাঝখানে ও-রকম কর না।

—তুমি সঙ্গে থাকবে ত? নইলে টেরামে চড়তে আমার ভয় করবে।

বিজ্ঞতার ভাব দেখিয়ে যজ্ঞেশ্বর বলে, কিছু ভয় নেই, পয়সা দিয়ে টিকিট কিনবে। তবে ফার্ষ্ট ক্লাসেই যাওয়া ভাল, ভিড় কম হয়।

—ফাষ্টো কেলাস মানে রেলের ফাষ্টো কেলাসের মত গদি আঁটা বেঞ্চি? আমি আমাদের ইষ্টিসানে বাইরে থেকে উঁকি মেরে ফাষ্টো কেলাস দেখেছি যে গো। মনে হ'ত চুপি চুপি ঢুকে হাত-পা ছড়িয়ে খানিকটা শুয়ে নি। কিন্তু সে আর হবে কেমন করে? হয় তাড়িয়ে দেবে, নয় ত পুলিশে দেবে। তাই মনের সাধ মনেই চেপে রেখে দিতুম। একদিন পিসীকে বললুম—

যজ্ঞেশ্বর বলে, অত বক্‌বক্ করছ কেন? লোকে পাড়াগেঁয়ে বলে জানতে পারবে যে।

—ইস, ভারি ত শহুরে লোক,—যাও, তোমার সঙ্গে আমি কথাই কইব না, আমি কি আসতে চেয়েছিলুম গো, তোমার মুরুব্বিই ত আমাকে নিয়ে এল। বেশ ছিলাম বাপু। তোমাদের ঐ করাতের খেলা দেখবার জন্যেই ত আমাকে এত খোসামোদ করে নিয়ে আসা। সবকিছু ফাঁকি তোমাদের। দাঁড়াও না, তোমাদের মতো চোখে ধুলো দেওয়াটা একটু শিখে নি, তারপর তোমাদের জারিজুড়ি সব ভাঙব।

যজ্ঞেশ্বর চটে উঠে বলে, আঃ ফের বক্‌বক্ করছ? তোমার আচ্ছা বদ স্বভাব ত!

পদ্মও চটে ওঠে, বলে, আবার ধমকান হচ্ছে আমাকে গো! বলি, এদিকে ত দেখতে নেহাৎ গোবেচারা মেনিমুখো হয়ে চুপচাপ থাক দেখেছি, যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জান না, এখন ত আমাকে ধমকাবেই। বলি, আমার বদ স্বভাব কোনখানটায় দেখলে? আমাকে এত হেনস্তা কিসের জন্যে? ডাকব নাকি তোমার ওস্তাদকে? ঐ ত তিনি আগে আগে চলেছেন তোমাদের বাক্সোর সঙ্গে। অবাক হয়ে যাই আমি তোমার রকম-সকম দেখে। আমাকে চেন না, তাই মুখনাড়া দিয়ে উঠলে। দুটো ম্যাজিক শিখেছ তাই বুঝি দেমাকে ফেটে পড়ছ? নতুন জায়গা, শুধু দুটো কথা জিগ্যেস করেছি, তাতেই এত?

যজ্ঞেশ্বর প্রায় ক্ষেপে উঠে বলে তুমি থামবে, না, সারাটা পথ এমনিধারা চেঁচামেচি করতে করতে যাবে?

গুরু এবার দু'খানা ট্যাক্সি ভাড়া করে পিছন ফিরে যজ্ঞেশ্বর ও পদ্মকে ডাকেন, তাড়াতাড়ি এস, অত পিছিয়ে পড়লে কেন? নাও, মোটরে উঠে পড়।

গুরু একখানা ট্যাক্সিতে পদ্ম ও যজ্ঞেশ্বরকে নিয়ে ওঠেন, অন্য ট্যাক্সিখানায় ম্যাজিকের বাক্সগুলো ও দু'জন ভৃত্য। ট্যাক্সি দু'খানা হাওড়ার পুল পার হয়ে ছোটে বালিগঞ্জের দিকে।

আবার পদ্মর মুখ খোলে, কিন্তু এবার গুরুকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন—

ও-মা! হাওড়ার এত বড় পুল কে করেছে? গঙ্গায় বান এসে এ পুল ভাঙতে পারে কিনা? কলকাতায় এত লোক কি কাজ করে? এত ভিড় কেন? আরও কতরকম প্রশ্ন। গুরু দু'একটার উত্তর দেন। পদ্ম অবাক হয়ে দেখতে দেখতে এটা কি, ওটা কি এই ধরনের নানা কথা বলে। ট্যাক্সি অনেক পথ ঘুরে এসে দাঁড়ায় গুরুর বাড়ীর সামনে। নিজে আগে নেমে পদ্ম ও যজ্ঞেশ্বরকে বলেন, এস তোমরা। পদ্ম তবুও চুপ করে বাড়ীর দিকে চেয়ে বসে থাকে। গুরু মৃদু হেসে তাকে হাত ধরে নামিয়ে নেন।

দু'বছর কোথা দিয়ে যেন কেটে গেল। পদ্মর অনেক কিছু পরিবর্ত্তন হয়েছে এ দু'বছরে। গুরু কয়েকটি আসরে নিয়ে গেছেন তাকে। ছোটখাট কয়েকটা ম্যাজিকও শিখেছে সে। কথাবার্ত্তায় চালচলনে পদ্মকে অনেকখানি শিক্ষা দিতে হয়েছে গুরুর। স্ত্রী অনেকদিন আগেই মারা গেছেন, ছেলেপুলেও নেই তাঁর। বাইরের লোকজন নিয়েই সংসার।

পদ্মর সম্বন্ধে যজ্ঞেশ্বরেরও মত অনেকটা বদলে গেছে। বাচালতা পদ্ম বন্ধ করে নি, তবে গ্রাম্য মেয়ের রুক্ষ বাচালতা সেটা নয়, একটু শহুরে পালিশ ধরেছে তাতে। এখন কেমন যেন ভাল লাগে যজ্ঞেশ্বরের পদ্মকে। পদ্ম কিন্তু যজ্ঞেশ্বরকে সময়ে অসময়ে ব্যঙ্গ করতে ছাড়ে না। তাকে সাকরেদ বলে ডাকে। অবশ্য সেটা গুরুর সামনে নয়।

আগের দিন মফঃস্বলে গিয়েছিল তারা, ফিরেছে সবে সকালে। যজ্ঞেশ্বর ত এসেই তার বিছানায় শুয়ে পড়েছে, গুরু কি সব হিসাব-নিকাশ করতে লেগে গেছেন বাইরের ঘরে। পদ্ম চা তৈরী করে এনে এক কাপ চা গুরুর সামনে টিপয়ে রেখে আর এক কাপ নিয়ে যজ্ঞেশ্বরের ঘরে গেল।

—সাকরেদ, ওঠ, চা এনেছি।

যজ্ঞেশ্বর পাশ ফিরল কিন্তু হাত বাড়িয়ে চা নিলে না।

—ওই তোমার কি এক রকম। জেগে আছ তবু দেরী করে ঠাণ্ডা চা খাবেই খাবে। নাও, ওঠ। ভাল হয়ে বসে চা টা খেয়ে নাও দেখি।

—না, উঠব না।

—বেশ ত, ঘাড় কাত করে, শুয়ে শুয়েই খাও। মাগো মা,

এমন জ্বালাতনেও মানুষ পড়ে। চা খাওয়াবার জন্মে এত সাধ্য-সাধনা! আমার এত ঝঞ্ঝাট কিসের? তুমি আমার কে? রইল চা, এই ছোট টেবিলটার ওপরে, খুশী হয়, খেও। আমি চললাম।

পদ্ম টেবিলে চা রেখে চলে যাবার জন্মে পা বাড়াতেই যজ্ঞেশ্বর ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে, বলে, কানের কাছে কথার ঢাক পিটিয়ে চা দিলে সে চা ছোঁবে কে? আর বললে কি যেন কথা, আমি তোমার কে, নয়? তুমিই বা আমার কে?

যজ্ঞেশ্বরের কথার মধ্যে ঝাঁঝের চেয়ে করুণ সুরটাই বেজে ওঠে বেশী। পদ্ম এবার ফিরে এসে বিছানায় বসে, বলে, তোমার মত পুরুষের রাগই হ'ল সম্বল, আর ত কিছু শেখ নি, শুধু চোখ রাঙাতেই শিখেছ। কথাটা যখন বলেছ, তখন শুনেই রাখ, আমি তোমার কেউ না হতে পারি, কিন্তু তুমি আমার—

এইবার হিঃ হিঃ করে খানিকটা হেসে নেয় পদ্ম। তার পর যজ্ঞেশ্বরের দিকে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে চেয়ে বলে, ভাবছিলে বুঝি খুব একটা ভালবাসার কথা বলে ফেলব, নয়?

—তোমার আবার ভালবাসা!

—কেন, ওটা বুঝি তোমাদের একচেটে। দেখ সাকরেদ, মেয়েমানুষ সব সইতে পারে কিন্তু ভালবাসা নিয়ে ঠাট্টা সইতে পারে না। কেন, আমাদের ভালবাসাটা কি ফাঁকির ম্যাজিক দেখানো নাকি? যাক, ভাল হ'ল গো, ভাল হ'ল, বঁধুর পীরিতি বোঝা গেল। তোমার বরাতে এখন ঠাণ্ডা চা লেখা আছে তা আমি আর কি করব বল? তোমাকে এখন ঐ চা-ই খেতে হবে।

—বেশ, আমি ওটা ফেলে দিচ্ছি।

যজ্ঞেশ্বর চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে জানালা গলিয়ে চা ফেলে দিয়ে গম্ভীরমুখে বিছানায় বসল। ক্ষণিকের জন্মে পদ্মর মুখে যেন একটা কালো ছায়া পড়ে তার পর হঠাৎ হাসির বেগ সামলে সে যজ্ঞেশ্বরের পাশে বসে। তার হাতখানি নিজের হাতে তুলে নিয়ে মিষ্টি গলায় বলে, সত্যি রাগ করলে? কি দোষ করেছি আমি বল? মাগো মা, পুরুষের রাগটা তবু শুধু চায়ের ওপর দিয়েই গেল! বীরত্ব আছে বটে!

এবার যজ্ঞেশ্বরও হেসে ফেলে, বলে, দোষ করাটা শক্ত, কিন্তু দোষ দেওয়াটা সহজ তা জান?

কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য দেখিয়ে পদ্ম বলে, সত্যিই ত, এটা ত আমার জানা উচিত ছিল। আচ্ছা বেশ, আবার গরম চা আনছি।

যজ্ঞেশ্বরকে কি একটা কথা বলতে এই সময়ে ঘরে ঢোকেন গুরু। কিন্তু শিষ্যের বিছানায় বসে পদ্ম যে তার হাত ধরে এমন হাসাহাসি করতে পারে, এটা একদিনও ভাবেন নি তিনি। একটিও কথা না বলে ধীরে ধীরে ফিরে চলে যান গুরু।

চমকে উঠে পদ্ম। যজ্ঞেশ্বর শুধু বলে, ছি, ছি, উনি কি ভাবলেন বলত? আমরা দু'জনে পাশাপাশি বসে এমন করে—

পদ্ম কোন কথা না বলে খানিকক্ষণ বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। তার পর বলে, একসঙ্গে খেলা দেখালে যদি দোষ না হয়, এতে এমনকি আর দোষ হতে পারে? একই বাড়ীতে আছি আমরা, উঠছি বসছি একসঙ্গে, এতে দোষ ভাবলেই দোষ, নইলে পাশাপাশি বসে হাতে হাত রেখেছি বলে গুরুর যদি রাগ হয়, কি করতে পারি আমি?

যজ্ঞেশ্বর কোন কথা না বলে বিছানা থেকে উঠে বাইরে চলে যায়। পদ্মর মুখে কালো ছায়া পড়ে, সে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে।

সে-দিন দুপুর বেলায় যজ্ঞেশ্বরকে পাঠালেন গুরু কটা ম্যাজিকের জিনিষ কিনতে চৌরঙ্গীর এক দোকানে। আকাশে মেঘ ঘনিয়ে এসেছিল, অল্প অল্প বৃষ্টিও হয়ে গেল সুরু। ঘোলাটে দিনের আলো আর ঠাণ্ডা হাওয়া মিলে মনটাকে উদাস করে দিয়েছিল পদ্মর। সে চুপ করে তার বিছানায় শুয়ে ভাবছিল পুরনো দিনের কথা। সুতোর কলের কাজ সেরে বাড়ীতে এসেছে সে কতদিন এমনি কালো আকাশের নিচে বৃষ্টিতে ভিজে। এমনি ঠাণ্ডা হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে এসে সে পিসীকে বলেছে, আর ত পারি না বাপু, হপ্তায় কটা টাকাই বা দেয় ওরা, তার জন্মে এত দিগদারি কিসের? এর চেয়ে বাড়ীতে বসে ঠোঙা তৈরি করা ঢের ভাল। কর ত পিসী একটু আদা দিয়ে চা, মাগো মা, বিষ্টির কি লজ্জা আছে, ঠিক ছুটির ঘন্টির সঙ্গে সঙ্গেই নামবে। ভিজে কাপড়ে রাস্তা চলা কি যায়?

এমনি কত কথাই এসে আজ ভিড় করে পদ্মর মনে। এখান থেকে চলে যাবার ইচ্ছেও যে মাঝে মাঝে না হয় তার, তা নয়। কিন্তু এ কাজের একটা নেশা আছে, একটা জৌলুষ আছে। পাঁচ জনের কাছ থেকে হাততালি পাওয়ার মধ্যে একটু দেমাকের ছোঁয়াচ লাগে তার মনে। সে তা হলে আগেকার পদ্ম আর নেই। গুরু এবার একটা নূতন ম্যাজিকের তালিম দিচ্ছে তার সঙ্গে। তাকে করাত দিয়ে কাটা হবে, একেবারে দু'টুকরো, তার পরে জোড়া দিয়ে বাঁচিয়ে দেবেন গুরু। শিউরে উঠবে প্রথমটা সকলে, তার পর হাততালিতে ভরে উঠবে চারদিক। দেশবিদেশে গুরুর নামের সঙ্গে তারও নাম ছড়িয়ে পড়বে। যজ্ঞেশ্বরকেও কেমন যেন ভাল লাগে পদ্মর। এই বয়সে অনেকরকম ম্যাজিক শিখে ফেলেছে সে। আগের মত সে আর পদ্মকে চটায় না, কেমন যেন খুশী করতে চায় সে পদ্মকে। পদ্ম মনে মনে হাসে, বয়সের দোষ আর কি! কিন্তু কেন? বয়স ত দু'জনার সমানই। সেদিনের কথাটা কিন্তু ভুলতে পারে নি পদ্ম। যজ্ঞেশ্বরের হাতে হাত রাখাটা কেমন যেন ভাল লাগছিল তার। কিন্তু তার পর থেকেই সাবধান হয়েছে সে। যজ্ঞেশ্বরও চারদিকে চোখ ফিরিয়ে তবে তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে। পদ্ম মনে মনে কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ করে। গুরু কি ভাবে, কে জানে?

গুরুর বাড়ীর ছাদ থেকে সামনের ছোট্ট মাঠটা বেশ দেখা যায়। ওটাকে নাকি এখানকার লোকেরা পার্ক বলে। আর পাশের ঐ

বড় রাস্তাটা ? ট্রাম যায়, মোটর যায়, লোকজনের কত ভিড়। সন্ধ্যার অন্ধকারে ছাদে দাঁড়িয়ে আলোঝলমল রাস্তার দিকে চেয়ে থাকতে ভাল লাগছে পদ্মর। হঠাৎ পিছন দিকে কার যেন পায়ের শব্দ শুনতে পেল সে। যজ্ঞেশ্বর আসছে ঠিকই। ঐ রকম চুপি চুপি এসে হয়ত সে পিছন থেকে তার চোখ দুটো দু'হাত দিয়ে চেপে ধরবে। ছি, ছি, লজ্জার মাথাও খেয়েছে নাকি! পদ্ম কিন্তু ফিরে দেখবে না। দেখাই যাক না, ওর সাহস কতদূর বেড়েছে।

পায়ের শব্দ কিন্তু পদ্মর পিছন দিকে এসেই থেমে যায়। পদ্ম ছাদের রেলিংয়ের উপর ঝুঁকে পড়ে বাইরের রাস্তার দিকে চেয়ে থাকে। মনে মনে ভাবে, যজ্ঞেশ্বর হয়ত তাকে অন্ধকারে ভূতের ভয় দেখাবে আর নয়ত তার খোঁপাটা খুলে দেবে। তা যদি করে সে, তা হলে পদ্ম কিন্তু এবার শক্ত শক্ত কথা শুনিয়ে দেবে যজ্ঞেশ্বরকে। যখন-তখন ও-রকম মসকরা ভাল লাগে না তার।

পায়ের শব্দ কিন্তু আগের মতই পদ্মর পিছন দিকে থেমে রইল। মনে হ'ল কি যেন ভাবছে যজ্ঞেশ্বর। পদ্ম মনে মনে হাসে, তবুও কেমন যেন ভাল লাগে তার এই থেমে-থাকাটা। নিশ্চয় যজ্ঞেশ্বর অন্ধকারে দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে আছে। কেমন একটা মিষ্টি আমেজ আসে তার মনে। হঠাৎ যেন এই অন্ধকার রাতটা তার কাছে কত আপনার বলে বোধ হয়। ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে, পাশের বাড়ীর ছাদের টবে ফুলও ফুটেছে বেশ মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে। যজ্ঞেশ্বর তখনও ঠিক তার পিছন দিকে দাঁড়িয়ে। পদ্ম ভাবে, না, আর আসকারা দেওয়া ঠিক নয়, যজ্ঞেশ্বরকে একটু মিথ্যে ধমকানো যাক। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে কি যেন বলতে যায় পদ্ম, কিন্তু পারে না।

গুরু নিজেই এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন। এবার পদ্মর পাশে এলেন। একটু থতমত খায় পদ্ম।

—পদ্ম ?

—কি বলছেন ?

—অন্ধকার ছাদের উপর একেলা দাঁড়িয়ে আছ কেন ? কি ভাবছিলে বল।

—কি আর ভাবব বলুন, বাইরের ঐ রাস্তাটা দেখছিলাম। মাঝে মাঝে মন কেমন খারাপ হয় তাই। মাসখানেক হ'ল পিসীর খবর পাই নি।

—তোমার কি এখানে থাকতে ভাল লাগছে না ?

এবার পদ্ম একটু হাসে, বলে, ভাল লাগবে না কেন ? আপনি ত আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন।

—স্নেহ ? গুরুও এবার হেসে ফেলেন। স্নেহ ছাড়া আর কি কিছু ভাবতে পার না পদ্ম ?

মনে মনে কেমন যেন চমকে উঠে পদ্ম। গুরু এবার তার ডান হাতখানি নিজের হাতে তুলে নেন। পদ্ম কেমন যেন নির্বাক হয়ে যায়, সারা দেহ লজ্জায় বিস্ময়ে কাঁপতে থাকে। নিজের হাতখানি টেনে নিতে পারে না সে গুরুর হাতের মধ্য থেকে।

পদ্ম দেখতে পায় সিড়িতে কার যেন ছায়া। এল যজ্ঞেশ্বর। যজ্ঞেশ্বর ছাদের উপর এসেই থমকে দাঁড়ায়। ফিকে অন্ধকারে পদ্মের অত কাছে থাকা গুরুদেবকে চিনতে পারে। তার পর ধীরে ধীরে সিড়ি দিয়ে নেমে চলে যায়। গুরুদেব কিন্তু তাকে দেখতে পান না।

পদ্মর বুকে তখন ঝড় উঠেছে। গুরু যেন তাকে আরও একটু একটু করে কাছে টানতে চান। পদ্ম এবার ধীরে ধীরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সরে দাঁড়ায়, তার কেমন যেন কান্না পাচ্ছিল। ধরা গলায় গুরু বলেন, রাগ করলে পদ্ম।

পদ্ম ধীরে ধীরে বলে, না।

—তবে ?

—চলুন, নিচে যাই।

—বেশ, চল। গুরুর গলার স্বর হঠাৎ যেন করুণ হয়ে ওঠে। সিড়ি দিয়ে দোতলায় নেমে এসে গুরু পদ্মর মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখে! হঠাৎ পদ্মর যেন চমক ভাঙে। সে বলে ওঠে, আপনার যে খাওয়ার সময় হ'ল। ঠাকুরকে আপনার খাবার দিতে বলি।

—না, থাক শরীরটা ভাল নেই।

—একটু কিছু না খেলে সারাটা রাত কাটবে কি করে আপনার। এই বলে সে গুরুর দিকে একবার মাত্র চেয়ে হাসি-মুখে এগিয়ে যায় রান্নাঘরের দিকে।

ক'দিন থেকেই কথাটা বলি-বলি করছিল যজ্ঞেশ্বর, আজ সুযোগ পেয়ে নিরালায় পদ্মর সামনে এসে দাঁড়ায় সে। মন তার বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল।

—বলি এ লীলা-খেলা কতদিন চলবে ?

পদ্ম মিনিটখানেক যজ্ঞেশ্বরের দিকে চেয়ে থেকে বলে, এ কথা জিজ্ঞাসা করবার কি অধিকার আছে তোমার, সেটা আগে শুনি।

—বাঃ, বেশ ত গুছিয়ে কথা বলতে শিখেছ দেখছি। সুতা কলের মজুর গেঁয়ো পদ্মর মুখ থেকে পালিসকরা কথা বেরোচ্ছে, ব্যাপার মন্দ নয়।

—দেখ, এ নিয়ে অপমান করতে চেয়ো না, তোমরা ত সুতো কলের পদ্মকে চাও নি এখানে, চেয়েছ আর এক পদ্মকে, এটা ভুলছ কেন ? পদ্মর যা আছে তার জন্যেই ত তাকে যত্ন করে এনে রেখেছ।

—সেটা কি, শুনতে পাই ?

—সাহস। তুমিত নিজেই জান, দুরন্ত কয়াতের সামনে শুয়ে থাকতে ক'জন মেয়ে পারে ? তা ছাড়া এতদিন ধরে এর জন্যে কত কসরৎ দেখিয়ে দিয়েছেন গুরু। পা গুটিয়ে নিয়ে সমস্ত দেহটা

কৌশলে ছোট করে নেবার অদ্ভুত কায়দা তিনি যত্ন করে শিখিয়েছেন আমাকে—

—তারি প্রতিদানে বুঝি নির্লজ্জের মত ব্যবহার করছ গুরুর সঙ্গে?

বিরক্তি ও অভিমানে পদ্মর চোখ হঠাৎ জলে ভরে যায়, বলে, নির্লজ্জের মত আচরণটা কোথায় দেখলে?

—দেখেছি, তাই বলছি। সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে ছাদের উপর গুরুর হাতে হাত রাখতে, তাঁর অত কাছ ঘেসে দাঁড়াতে তোমার একটুও লজ্জা করল না?

—ছিঃ সাকরেদ ছিঃ। এ কথা তোমার মুখে আসে কি করে?

যজ্ঞেশ্বর এবার হঠাৎ পদ্মর হাতটা জোরে চেপে ধরে, বলে, তোমাকে আমি চিনেছি, সুতোকলে কাজকরা ছত্রিশ জাতের সঙ্গে ইয়ার্কি দেওয়া মেয়ে তুমি, আমার আর জানতে, বুঝতে কিছু বাকী নেই।

—হাত ছাড়। এত বেশী অপমানটা আর নাই বা করলে। আমি চলে গেলে তুমি কি সুখী হও?

—ও সব মেয়েলি মিষ্টি কথায় আর ভুলিও না। গুরুর সঙ্গে তোমার আচরণ—

—যজ্ঞেশ্বর!

দু'জনে চমকে উঠে ফিরে দেখে গুরু। পদ্মর হাত ছেড়ে দিয়ে যজ্ঞেশ্বর নতমুখে দাড়ায়।

গুরু যজ্ঞেশ্বরকে বলেন, পদ্মর সঙ্গে তোমার এ কি ব্যবহার? এতদিন তোমাকে আমি ভুল বুঝেছি তা হলে।

যজ্ঞেশ্বর কোন উত্তর দিতে পারে না।

গুরু বলেন, কিছুদিন আগে থেকেই আমি লক্ষ্য করেছি তোমাকে। আজও সাবধান করে দিচ্ছি।

যজ্ঞেশ্বর নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে।

গুরু বলেন, তোমরা জান আর এক সপ্তাহ পরেই রাষ্ট্রের বড় বড় নায়কদের সামনে দেখাব আমার করাতের খেলা। বিদেশের রাষ্ট্রদূতেরা থাকবেন সে আসরে। অত বড় ষ্টেজটাতে সাজাতে হবে আমার কৌশল-কেরামতির যন্ত্রপাতি। এত বড় বিস্ময় ম্যাজিক জগতে এর আগে কেউ আনতে পারে নি। তোমার আর পদ্মর উপর সাফল্যের অনেকটা নির্ভর করছে। কিন্তু এখন দেখছি তোমার মন গেছে অন্যদিকে।

গুরুর কণ্ঠস্বরে যেন হতাশার সুর বেজে উঠল। কি ভেবে যজ্ঞেশ্বর ধীরে ধীরে সেখান থেকে নিচে চলে গেল, পদ্মও যাচ্ছিল, গুরু ইঙ্গিতে তাকে দাঁড়াতে বললেন।

মিনিট খানেক পদ্মর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে তিনি যেন তার হৃদয়ের অন্তস্থল পর্যন্ত দেখতে পেলেন। কিন্তু পদ্মর দোষ কোথায়? সুতোকলে কাজকরা মুখরা মেয়ে পদ্ম। অদৃষ্টবশে পাঁচ জনের সঙ্গে মেশবার সুযোগ পেয়েছে সে। পাড়াগাঁয়ের সরলতা ও চঞ্চলতার মধ্যেই সে বড় হয়ে উঠেছে। তার সাহস ও ধৈর্য্য দুই-ই আছে। এ দু' বছরের মধ্যেই সে শিখে নিয়েছে করাতের খেলায় তার নিজের কসরৎটুকু। কিন্তু গুরু নির্কোধ নন্। তিনি পদ্মকে ভর্ৎসনাসূচক একটি কথাও বললেন না। তিনি পদ্মর দিকে চেয়ে স্নিগ্ধকণ্ঠে শুধু বললেন, মনে রেখো পদ্ম, সামনে কত বড় পরীক্ষা আসছে।

পদ্ম ঘাড় নেড়ে জানাল এ-কথা তার মনে আছে।

গুরু ধীরে ধীরে পদ্মর আর একটু কাছে সরে গেলেন। তারপর বললেন, এ পরীক্ষা শুধু তোমার নয় পদ্ম, আমারও। কত বড় ফাঁকি সত্যের নাম ধরে এ খেলায় রয়েছে তা বাইরের কোন লোক ধরতেই পারবে না। লোকের চোখ থাকবে ঘূর্ণন্ত করাতের দিকে, লোকের কান থাকবে আমার কথায়, আর ষ্টেজের উপর সাজান থাকবে এমন সব জিনিষ যেগুলো ক্ষণেকের জন্যে ভুলিয়ে দেবে দর্শকের মন। তারই মাঝখানে লম্বা কাঠের বাক্সের মধ্যে কেউ যে কৌশল করে অর্দ্ধেক দেহটাকে বাক্সের আধখানায় ভিতরেই এক পাশে গুটিয়ে নিতে পারে এ কথা কেউ ভাবতেও পারবে না। ঘুরন্ত করাত কেটে ফেলবে খালি বাক্সের আধখানা, দর্শকেরা দেখবে তোমার লম্বা শরীরটাই বুঝি দু'টুকরো হয়ে গেল। কিন্তু কত সাবধানে এ কাজ করতে হয় তা আমিই জানি। তোমার কসরতের একটু ত্রুটি, আমার মুহূর্ত্তের বিলম্ব কি ভয়ানক অনর্থ ঘটাতে পারে এ-কথা ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়! আমি জানি তোমার সাহস আছে, তাই তোমাকে নিয়ে এ খেলায় নামতে যাচ্ছি।

একটানা এতগুলো কথা বলে গুরু যেন হাঁপিয়ে পড়লেন।

পদ্মর এবার কথা বেরুল, আমাকে তার পরে দেশে পাঠিয়ে দেবেন ত?

মৃদু হেসে গুরু বলেন, তা দোব, কিন্তু সে দু-চার দিনের জন্যে। এ খেলা ত এবার থেকে আমার প্রোগ্রামের একটা অঙ্গ হয়ে রইল।

—যদি আর না আসি?

—কেন পদ্ম? আমার কাছে থাকতে তোমার ভাল লাগে না?

কথাটা গুরু এমন ভাবে বললেন যার অর্থ বুঝতে পদ্মর একটুও দেরী হ'ল না।

এবার যেন মুহূর্ত্তের জন্যে পদ্ম মুখরা হয়ে উঠল, বললে, কত বড় ভাগ্য হলে আপনার কাছে থাকা যায়, আপনার ভালবাসা পাওয়া যায়, সে আমি জানি। কিন্তু সে ভালবাসা অন্যভাবে নিতে চাচ্ছেন কেন আপনি? কি আর আমার আছে বলুন, আজ দু'বছর ধরে কথাবার্ত্তায় চালচলনে আপনি আমাকে আধুনিক ভাবে গড়ে তুলেছেন অনেকখানি। পাঠশালা পর্য্যন্ত যার বিদ্যের দৌড়, তাকে আপনি আরও একটু লেখাপড়ায় এগিয়ে দিয়েছেন। আপনার ঋণ কোনদিনই ভুলবার নয়, কিন্তু সেই ঋণকে বিষিয়ে দিতে চাইবেন আপনি, এ কথা যে ভাবতেও পারছি না।

—বিষিয়ে দিতে চাচ্ছি আমি ?—গুরুর কণ্ঠে ক্রোধের আভাস ফুটে উঠল।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে পদ্ম।

—পদ্ম জান, তুমি কার সঙ্গে ওকথা বলতে সাহসী হয়েছ ?

পদ্ম তবুও কোন কথা বলে না। ম্লানমুখে গুরুর মুখের দিকে চেয়ে স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।

—যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গে ইয়ার্কি দেওয়াটাই তোমার ভাল লাগে, না ? যখন-তখন তার হাতে হাত দিয়ে দাঁড়ান, হেসে হেসে কথা বলা, এক বিছানায় বসা, সবই লক্ষ্য করেছি আমি। মনে ভেবো না তোমার স্বভাব আমি বুঝি নি। যজ্ঞেশ্বরকে পাপের পথে তুমিই টেনে নিয়ে যাচ্ছ।

—পাপের পথে ?—শিউরে উঠে পদ্ম দু'হাতে মুখ ঢাকল।

—শোন পদ্ম, আমি যদি তোমাকে বিয়ে করি, তাতেও কি তোমার আপত্তি ?

মুখ থেকে দু'হাত সরিয়ে পদ্ম আশ্চর্য্য হয়ে বলে, আমাকে বিয়ে করতে চান আপনি ?

এবার গুরু আবেগে কেঁপে উঠলেন, বললেন, তাতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে ? ক্ষতিই বা কি ? আমি ম্যাজিসিয়ান, জাত-ধর্ম্ম কিছুই মানি না। আর তা ছাড়া তোমাকে ভাল লেগেছে আমার, হাঁ, সত্যিই ভালবেসেছি তোমাকে।

বলতে বলতে গুরু বিহ্বল হয়ে উঠেন, একটু এগিয়ে গিয়ে পদ্মর হাত ধরে তাকে কাছে টানতে চান।

—ছাড়ুন, ছাড়ুন, পায়ে পড়ি, সরে যান আপনি, ছিঃ ছিঃ—

হঠাৎ যজ্ঞেশ্বর এসে পড়ে সেখানে। গুরুকে কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছিল সে। চোখের সামনে পদ্মর প্রতি গুরুর ব্যবহার দেখে প্রথমে স্তম্ভিত হয়ে যায়, তার পরে সে আর নিজেকে সামলে রাখতে পারে না, সব ভুলে গিয়ে গুরুকে পদ্মর কাছ থেকে টেনে সরিয়ে দেয়।

—যজ্ঞেশ্বর !—গুরু ক্রোধে চিৎকার করে ওঠেন।

পদ্ম মাটিতে বসে পড়ে দু'হাতে মুখ ঢাকে।

—এতদূর সাহস তোমার যজ্ঞেশ্বর, আমার গায়ে হাত দাও !

—সাহস আপনারও কতদূর বেড়েছে, আপনি তা জানেন ?—আজ যেন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে যজ্ঞেশ্বর।

—কি ! এতদূর স্পর্দ্ধা তোমার ? স্কাউণ্ড্রেল, রোগ,—ঘুসি উঁচিয়ে তেড়ে যান গুরু।

যজ্ঞেশ্বরও হঠাৎ যেন মরিয়া হয়ে ওঠে, বলে,—মারবেন আমাকে ? তা মারুন, আমি আপনার কি করতে পারি জানেন ? আপনার ম্যাজিকের সব ফাঁকি লোকের চোখের সামনে ধরিয়ে দিয়ে আপনার জারিজুরি ভাঙতে পারি। এতকাল ধরে লোক ঠকিয়ে—

—শাট আপ,—গুরু গর্জ্জে ওঠেন।—গেট আউট অ্যাট ওয়ান্স—গেট আউট—

হঠাৎ পদ্ম গুরুর পা দুটো চেপে ধরে।—

পা দিয়েই পদ্মকে সরিয়ে দিয়ে গুরু আবার ঘুসি তোলেন।

হঠাৎ যজ্ঞেশ্বর কেমন যেন হাঁপাতে থাকে, তার পর পদ্মর দিকে একবার মাত্র চেয়ে সিঁড়ি দিয়ে তর্ তর্ করে নেমে নিচে চলে যায়।

তিন দিন যজ্ঞেশ্বরের কোন সন্ধান পান নি গুরু। যজ্ঞেশ্বর ফিরে আসে নি।

প্রথম দিন পদ্ম জলস্পর্শ করে নি। নিজের ঘরটিতে বিছানার উপর শুয়ে কত কি ভেবেছে সে ? দ্বিতীয় দিন গুরু নিজে এসে তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে পাশে বসিয়ে খাইয়েছেন। গুরুর সে রুদ্রমূর্ত্তি আর নেই, কতকটা যেন বিষণ্ণ ভাব। যজ্ঞেশ্বরের একবারও নাম করেন নি তিনি।

তিন দিন এমনি কেটে গেল। দুপুরের দিকে পদ্মর ঘরে এলেন গুরু। বিছানার উপর ধড়মড় করে উঠে বসল পদ্ম তন্দ্রা থেকে। গুরু তার পাশেই বসলেন।

গুরু বললেন, আর তিনটে দিন বাকী শো দেখাবার। চার-দিকে খবর ছড়িয়ে গেছে, এ শো ত বন্ধ করা যায় না পদ্ম।

পদ্ম বলে, অসুখ হয়েছে বলে যদি বন্ধ করেন, তা হলে কি চলবে না ?

—না, এতে অন্য কথা উঠবে। করাত দিয়ে মানুষ কাটা দেখবার জন্যে লোকের উৎসাহের অন্ত নেই। এখন বন্ধ করলে আমার দুর্নামের আর বাকী থাকবে না। তা ছাড়া এ্যাডভান্স বুকিং শেষ হয়ে গেছে।

বলি বলি করেও যজ্ঞেশ্বরের কথাটা তুলতে পারলেন না গুরু। পদ্মর অবস্থাও তাই। কিছুক্ষণ শো সম্বন্ধে কথা বলে গুরু উঠে গেলেন।

পদ্ম জানালার ধারে গিয়ে বসল এবার। স্তব্ধ মেঘলা দুপুরটা থমথম করছে। পথের পাশে কৃষ্ণচূড়া গাছের সারিতে হলদে ফুলের দোলা, পার্কের ওধারের চার-পাঁচতলা বাড়ীগুলো যেন তন্দ্রায় ঝিমিয়ে পড়েছে ঘোলাটে দুপুরে। মাঝে মাঝে রিক্সার টুংটাং আর মোটরের হর্ন ঘুমন্ত পুরীর ঘুম ভেঙে দিচ্ছে। পাতলা মেঘে ঢাকা আকাশের নিচে হু হু করে বয়ে-আসা বাতাসে এক একবার জানালার পাতলা পর্দ্দা পদ্মর মুখের উপর উড়ে পড়ছে। পদ্ম হঠাৎ যেন সুতোকলের বাঁশী শুনতে পায়। পিসী যেন বলছে : হ্যাঁ রে পদ্ম, যাবি না আজ কাজে ?

আপন মনে চমকে ওঠে পদ্ম। দু'বছর আগেকার ফেলে-আসা জীবনের এক টুকরা স্মৃতি আজ যেন তা'কে হাতছানিতে ডাকে। শহরের পাশেই টিলা আর বস্তী। সেখানে ক্ষেন্তির মা, জগাইয়ের দিদি, ফুলমণি, বটুর মাসী এখনও হয়ত দুপুরের তাসের আড্ডা জমিয়ে বসে। রামভজনের দোকানের ঠাণ্ডা পেঁয়াজী আর মগে ঢালা কষা চা কি ভালই লাগত তখন। আমগাছটার নিচে বসে

ছটটু আর জগগুর দাবা খেলতে খেলতে ঝগড়া, তার পর দু'জনেই ইট-হাতে উঠে দাঁড়াত। শেষে মানুকের বাপ এসে থামিয়ে দিত তাদের।

সুতোকলেও কি কম ঝঞ্ঝাট পোহাতে হ'ত পদ্মকে? গোকুল সর্দ্দার যখন-তখন ঠাট্টামশকরা করতে আসত পদ্মর সঙ্গে। গোমেশ সাহেবকে পদ্ম সে কথা বলে দিয়েছিল। গোমেশ চোখ রাঙা করে গোকুলকে ধমকাতেই গোকুল পদ্মর নামে কি একটা কথা বলে। পদ্ম শুনতে পেয়ে গোমেশ সাহেবের সামনেই গোকুল সর্দ্দারকে এক চড় কষিয়ে দিয়েছিল। গোকুল নিজের গালে হাত বুলাতে বুলাতে তখনি সরে পড়ল। পাংলুনের পকেটে দু'হাত ঢুকিয়ে গোমেশ সাহেবের তখন কি হাসি! পদ্মর নাম দিয়েছিল সাহেব "মিলিটারী জানানা।"

ছুটির পর সুতোকল থেকে ফেরবার পথে রেল লাইনের ধারে দেখা হ'ত ফটকের মায়ের সঙ্গে। ইঞ্জিনের পোড়া কয়লা কুড়িয়ে ঝুড়িতে ভর্ত্তি করত সে। তার পর সে সব কয়লা জলে ধুয়ে বস্তীতে বিক্রী করত। ফটকে কিন্তু বিয়ে করে বৌ নিয়ে থাকত ইষ্টীসানের গুমটিতে। রেলকুলীর কাজ করত সে। মায়ের দিকে ফিরেও দেখত না।

নাঃ, আর ওসব ভাবতে পারে না পদ্ম। কোথা থেকে একটা বেদনার কাঁটা খচ খচ করছে বুকে। হঠাৎ-জাগা একটা কালো ঝড় যেন তাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে কোন্ এক নিরুদ্দেশ যাত্রায়। বাইরের দিকে চেয়ে দেখে আকাশের পশ্চিম কোণ থেকে মেঘের পর্দ্দা ক'খন সরে গেছে আর তারই ফাঁকে এক ঝলক সোনালী রৌদ্র পার্কের সবুজ ঘাসের উপর পড়ে যেন বিদায়ের হাসি হাসছে। এতক্ষণে হুঁস হ'ল পদ্মর। বেলা তা হলে অনেকখানি গড়িয়ে গেছে। পার্কে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ভিড় একটু একটু করে বাড়ছে। আকাশে যেন একটা করুণ সুর, বাতাসে যেন একটু কোমল স্পর্শ। যজ্ঞেশ্বরকে মনে পড়ছে বার বার। সত্যি, সে রাগ করে গেল কোথায়? কবে আসবে ফিরে?

সন্ধ্যার আগেই গুরু ফিরে এলেন। পদ্মকে ডেকে নিয়ে নিজের ঘরে সোফায় বসতে বললেন। পদ্ম সোফায় না বসে একটা টুলের উপর বসল। গুরু সেটা লক্ষ্য করলেন কিন্তু পদ্মকে ও-বিষয়ে কিছু বললেন না।

কথা আরম্ভ হ'ল শো সম্বন্ধে। গুরু এবার অন্য লোকজন নিয়েই কাজ চালিয়ে নেবেন। একদিন আগে ষ্টেজে জিনিষপত্র সব সাজাতে হবে।

এবার গুরু পদ্মর কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে তাকে উপদেশ দিতে লাগলেন। ব্যাপারটা আসলে কিছুই নয়, শুধু পদ্মকে সাহস করে শুয়ে থাকতে হবে ঘুরন্ত করাতের সামনে। ইলেক্‌ট্রিকে করাত বন্ বন্ করে ঘুরবে কাঠ-চেরাই কলের মত। লম্বা বাক্সটার মধ্যে থাকবে পদ্মর দেহ, শুধু মুখটি বেরিয়ে থাকবে বাক্সের একদিকে। বাক্সের মাঝখানে একটা লম্বা রেখার উপর দিয়ে করাত সর্ সর্ করে কেটে যাবে। ঐ রেখাটিই হ'ল আসল। ওর এক দিকে থাকবে কৌশলে গুটিয়ে-নেওয়া পদ্মর শরীর। আর অন্যদিকে থাকবে বাক্সের খালি অংশটা। খুব হুঁসিয়ার হয়ে করাত চালাতে হবে, আর বেশী হুঁসিয়ার থাকতে হবে পদ্মকে, শরীর ঠিকমত গুটাতে না পারলেই সর্ব্বনাশ! তবে সাবধানের বিনাশ নেই। সব ঠিকমত হয়েছে এটা জানিয়ে দেবে পদ্ম চোখের ইঙ্গিতে। তার পর যা কিছু করবার করবেন গুরু।

পদ্ম চুপ করে শোনে। এতদিন ধরে যে কৌশল সে সাবধানে অভ্যাস করে এসেছে এবার তার কঠোর পরীক্ষা। যদি এ পরীক্ষায় সে সফলতা লাভ করতে পারে তা হলে গুরুর গলায় দুলবে যশের মালা, দেশদেশান্তরে ছড়িয়ে পড়বে তাঁর নাম। মনের কোণে কোথায় যেন একটা হাহাকার জেগে ওঠে পদ্মর। যজ্ঞেশ্বর আজও এল না কেন? গুরুর কথা শুনতে শুনতে কেমন যেন উদাস হয়ে যায় পদ্ম। গুরুর প্রশ্নের একটা এলোমেলো উত্তর দিতেই গুরু তার কপালের উপর হাত রাখেন, বলেন:

তোমার কি শরীর ভাল নেই পদ্ম?

পদ্ম টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে: কৈ, না ত!

গুরু এবার পদ্মর ডান হাতখানি তুলে নিয়ে, নিজের হাতের মুঠার মধ্যে রাখেন, বলেন: মনটা ভাল নেই বুঝি?

পদ্ম হাত সরিয়ে নেয় না, চুপ করে থাকে।

গুরু বলেন: এর পর আমরা যাব ভারতের সব বড় বড় শহরে। তার পরে যাব বিদেশে। চারদিকে আমার নামের সঙ্গে তোমারও নাম ছড়িয়ে পড়বে। সব খবরের কাগজে ছবি ছাপা হবে তোমার। তার পর একদিন—

পদ্ম জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে থাকে গুরুর মুখের দিকে।

মৃদু হেসে গুরু বলেন: বুঝতে পারলে না পদ্ম?

পদ্ম কোন কথা বলে না, দাঁড়িয়ে থাকে। গুরু এবার তার হাত ছেড়ে দিয়ে কি ভেবে বলেন: সন্ধ্যে হয়ে এল, আমাকে যেতে হবে চৌরঙ্গীর এক দোকানে। বিলেত থেকে কিছু ম্যাজিকের মাল আসবার কথা আছে আজ।

পদ্ম বলে: ফিরতে কি বেশী দেরী হবে আপনার?

—না, ঘণ্টা দুয়েক লাগতে পারে, দেরী হ'লে তুমি খেয়ে নিও।

পদ্ম উত্তর দেয় না, গুরু পদ্মর মুখের দিকে একবার স্নিগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে ধীরে ধীরে চলে যান।

মাঝে শুধু আর একটা দিন। গুরু খুবই ব্যস্ত। কাঠের লম্বা বাক্সের মধ্যে পদ্মকে কসরৎ করতে হয়েছে ক'বার। গুরু খুবই তারিফ করেছেন তাকে। সাফল্য নিশ্চিত তাঁর। প্লাকার্ড আর হাণ্ডবিলে শহর ছেয়ে গেছে। খবরের কাগজে বড় বড় বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। পদ্মও দেখেছে এ সব।

দুপুরের দিকে গুরু গেলেন ষ্টেজ দেখতে। সাহেবপাড়ায় নামজাদা প্রেক্ষাগৃহ। প্রাসাদ বললেও চলে। সহকারীদের নিয়ে গুরু সব বিষয়ে বন্দোবস্ত করতে খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আগামী কাল সন্ধ্যায় তাঁর অদ্ভুত যাদু-বিদ্যায় দর্শকেরা মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হয়ে যাবে। তাঁর নানা প্রদর্শনীর মধ্যে ঐ আশ্চর্য্য করাতের খেলাই লোককে আকর্ষণ করবে বেশী। ইলেকট্রিকের তার আর ষ্ট্যাণ্ড সঠিকভাবে বসান চাই। পর্দা খাটান আর আলোকসম্পাতের ব্যবস্থা নির্ভুল না হ'লে লোকের চোখে ধাধা দেওয়া যাবে না। গুরু প্রত্যেক জিনিষ নিজে পরীক্ষা করে দেখে তবে সাজানোর আদেশ দিচ্ছেন।

দুপুরের নিস্তব্ধতার মধ্যে পদ্ম চুপ করে শুয়েছিল তার ঘরে। বাইরের রৌদ্রোজ্জ্বল পৃথিবীর বুকে শান্ত হয়ে উঠেছে উচ্ছল প্রাণ-প্রবাহ। যেন ক্লান্তি ও অবসাদে একটু ঝিমিয়ে নিতে চায় নগরী। নীল আকাশের একাংশ দেখা যাচ্ছে জানালা দিয়ে, সেখানে উড়তে উড়তে ঘুরপাক খাচ্ছে এক ঝাঁক পায়রা। পার্কের পাম গাছের মাথা থেকে একটানা তীব্র স্বরে ডেকে চলেছে একটা চিল। ঝির্‌ঝিরে হাওয়ায় কেমন যেন নেশা নেমে আসে চোখে।

তন্দ্রা এসেছিল পদ্মর। তন্দ্রার ঘোরে তার মনে হ'ল একটা সাপ যেন তার হাতটা জড়িয়ে বেশ চাপ দিচ্ছে। ভয়ে ঘুমটা ভেঙ্গে যেতেই সে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে। দেখে, সামনে যজ্ঞেশ্বর দাঁড়িয়ে। সে হাত দিয়ে তাকে ঠেলে জাগিয়েছে।

তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে মেঝেয় নেমে এসে পদ্ম আশ্চর্য্য হয়ে বলে: কতক্ষণ এসেছ তুমি? ডাকনি কেন এতক্ষণ? কোথায় ছিলে এতদিন?

যজ্ঞেশ্বর বলে: একসঙ্গে এতগুলি প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় আমার হাতে নেই এখন। আমি তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে এসেছি।

—আমাকে? কোথায় নিয়ে যাবে শুনি?

—কেন, যাবার ইচ্ছে নাই নাকি?

—হঠাৎ এসে এ প্রশ্ন করার মানে? জান, গুরু এখনি এসে পড়তে পারেন।

—না, এখন আসবেন না গুরু। আমি সন্ধান নিয়ে এসেছি তিনি চৌরঙ্গীতে ষ্টেজ সাজাতে ব্যস্ত।

—তাই বুঝি চোরের মতন বাড়ীতে ঢুকেছ? কিন্তু জিগ্যেস করি, আমার জন্তে তোমার এত দরদ উথলে উঠল কেন?

—আমি যে তোমাকে ভালবাসি পদ্ম।

—ওঃ, তাই বল সাকরেদ।

—আমি আরও জানি, তুমি আমাকে ভালবাস।

এবার খিল খিল করে হেসে ওঠে পদ্ম। বলে, হ্যাঁ সাকরেদ, তুমি আবার গণৎকার হলে কবে? তা বেশ ত, দু'জনেই যখন এত ভালবাসাবাসি, তখন একবার গুরুকে বলেই দেখ না। পালিয়ে গিয়ে লাভ কি?

—ঠাট্টা রাখ পদ্ম। তোমার মনের ভাব স্পষ্ট করে বল, তুমি আমাকে চাও, না গুরুকে চাও?

এবার এগিয়ে এসে পদ্ম যজ্ঞেশ্বরের কাঁধে হাত রাখে, বলে, ছিঃ ছিঃ, তুমি এ কথা বলতে পারলে কি করে? আচ্ছা সাকরেদ, দুদিন পরেই না হয় ওসব কথা তুলো, তুমি জান গুরুর শো আরম্ভ হবে কাল। এখনি তুমি আমাকে এখান থেকে সরাতে চাচ্ছ? তোমার উদ্দেশ্য ত ভাল নয়। এতে গুরুর কি ক্ষতি হবে তুমি ত তা জান।

—হাঁ, জানি বলেই তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

—যদি না যাই?

—যেতেই হবে তোমাকে। পদ্ম, আমি জানি তুমি ছাড়া এ শো অসম্ভব। তাই গুরুর বিষদাঁত ভেঙে দিতে চাই আমি।

—বড্ড দেরী করে ফেলেছ সাকরেদ, বড্ড দেরী করে ফেলেছ। সাপের কামড় খাবার পর বিষদাঁত ভেঙে আর কি হবে। তার চেয়ে রোজা ডেকে বিষ ঝাড়াও।—

—পদ্ম!

—কি বলছ সাকরেদ?

—তুমি আমার সঙ্গে এখনি যাবে কিনা বল, স্পষ্ট করে বল:

—যদি না যাই?

হঠাৎ পদ্মর হাত জোরে চেপে ধরে' যজ্ঞেশ্বর বলে: যেতেই হবে তোমাকে—আমি কিছুতেই ছাড়ব না তোমায়—এস—এস আমার সঙ্গে—

—সাকরেদ—এ কি ব্যবহার তোমার—ছাড়—

—না, চলে এস আমার সঙ্গে—

—ছাড়, ছাড়, টানাটানি কোরো না—

হঠাৎ কার ধাক্কা খেয়ে যজ্ঞেশ্বর মেঝের উপর পড়ে যায়। পদ্ম চম্‌কে উঠে চেয়ে দেখে গুরু এসেছেন।

—বেআদপ, পাজী, ফের ঢুকেছিস আমার বাড়ীতে? গেট আউট—ঘুসি উঁচিয়ে এগিয়ে যান গুরু।

যজ্ঞেশ্বর উঠে দাঁড়ায়। জ্বলন্ত চোখে গুরুর দিকে চেয়ে বলে: আচ্ছা বেশ, কি করে এর প্রতিশোধ নিতে হয়, সে আমি জানি।

সিঁড়ি দিয়ে তর্‌ তর্‌ করে নেমে যায় যজ্ঞেশ্বর। পদ্ম পাষাণ মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে।

যেদিন করাত দিয়ে জীবন্ত মানুষ কাটা হবে ষ্টেজের উপর সকলের সামনে, অবশেষে সেদিন এল।

ঠিক ছ'টায় শো আরম্ভ। উপর নীচে দর্শকদের সব সীট ভর্ত্তি। প্রকাণ্ড হল যেন গমগম্‌ করছে। ব্যাণ্ডের মিশ্রিত ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ছে হলে। নর-নারী উৎসুক ভাবে চেয়ে আছে মঞ্চের দিকে। মঞ্চে তখনও ড্রপসীন ফেলা রয়েছে।

ঠিক ছটায় ড্রপসীন যেন একটু নড়ে উঠল। তার পরে সব

সব্ করে সীন সরে গেল দু'পাশে। ষ্টেজের উপর দেখা দিলেন গুরু, বিচিত্র বেশে। মাথায় উষ্ণীষ, গায়ে কালো ভেলভেটের পোষাক, পায়ে জরীর নাগরা। রঙবেরঙের পর্দার উপর আলোক-সম্পাতে রহস্যময় হয়ে উঠেছে ষ্টেজ। সহকারীদেরও উপযুক্ত পোষাক। টেবিলের উপর একটা মড়ার মাথা। সুগন্ধি সাদা ধোঁয়ার রেখা ছড়িয়ে পড়েছে ষ্টেজে।

একে একে অনেক খেলা দেখালেন গুরু। অদ্ভুত সব ম্যাজিক, দর্শকেরা স্তম্ভিত হয়ে দেখতে লাগল। বিশিষ্ট দর্শকেরা কেউ কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে মড়ার মাথা থেকে সে উত্তর আসতে লাগল। তাসের প্যাকেট থেকে তাসগুলি শূন্যে ছুঁড়ে দিতেই সে তাস ফুলের আকার নিয়ে শূন্যে ঝুলতে লাগল। একটা কুকুরছানা গুরু হাতে করে একটু উঁচুতে তুলে ধরলেন, সকলের চোখের সামনে কালো কুকুরছানা সাদা খরগোস হয়ে গেল। খানিকটা মোটা সাদা দড়ি শূন্যে ছুঁড়ে দিতেই সেই দড়ি আপনা থেকেই "নমস্কার" এই কথাটা শূন্যে লিখে ফেললে। এ ছাড়া তাঁর উড়ন্ত শিশু, নৃত্যশীল অগ্নিগোলক, তরল তলোয়ার, কঙ্কালের বক্সিং লড়াই, একটা লম্বা লোক বেঁটে হতে হতে এক ফুট মানুষে পরিণত হওয়া, চোখ বাঁধা অবস্থায় পিছন ফিরে যে-কোন বই পড়া ইত্যাদি খেলা দেখে দর্শকেরা করতালি ধ্বনিতে প্রেক্ষাগৃহ মুখর করে তুললে।

এইবার আরম্ভ হবে করাত দিয়ে মানুষ কাটার আশ্চর্য্য খেলা। গুরু নিপুণ অভিনেতার মত এই খেলার চমকপ্রদ ও রোমাঞ্চকর বিষয় বর্ণনা করে একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা দিলেন। তার পর পদ্মকে ষ্টেজের উপর সকলের সামনে এনে দাঁড় করালেন।

পদ্মর অঙ্গে শোভা পাচ্ছে লাল সাটিনের হাল্কা ঝলমলে পোষাক। মেক্‌আপের গুণে অপূর্ব্ব সুন্দরী দেখাচ্ছে তাকে। একটা লম্বা খালি কাঠের বাক্স সকলকে দেখিয়ে ষ্টেজের উপর রাখা হ'ল। করজোড়ে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে পদ্ম সেই কাঠের লম্বা বাক্সের মধ্যে শুয়ে পড়ল। শুধু মুখখানি বাক্সের একটা গোল গর্ত্তের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে রইল। এইবার সহকারীরা পেরেক দিয়ে ডালা আঁটা বাক্সটি ধরাধরি করে একটা লম্বা টেবিলের উপর রাখল। গুরু যেন এমন নির্ম্মম ভাবে নারী হত্যার জন্ম ভগবানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তার পর সুইচ টিপে লোহার ফ্রেমে-আঁটা গোল করাত বন্ বন্ করে ঘুরিয়ে দিয়ে ফ্রেমটি হাতে নিয়ে এগিয়ে এলেন বাক্সের দিকে।

সমগ্র প্রেক্ষাগৃহ নিস্তব্ধ, সকলের চক্ষু বিস্ফারিত। গুরু বললেন: ভদ্র মহোদয় ও মহোদয়াগণ, হৃদয় আমার ভেঙ্গে যাচ্ছে এ নিষ্ঠুর খেলা দেখাতে, কিন্তু তবুও এর মধ্যে রয়েছে প্রাচীন ভারতের আশ্চর্য্য যোগবল, এ বিদ্যা শিখতে আমি দুর্গম হিমাচলের তুষারাবৃত গুহায়—

মিথ্যা কথা!—ড্রেস সার্কেল থেকে চীৎকার করে এক যুবক এ-কথা বলল। সে যজ্ঞেশ্বর।

সকলের দৃষ্টি সেদিকে ফিরল। দর্শকেরা হৈ হৈ করে উঠল। কেউ কেউ ধমকে উঠে "সাইলেন্স!" "সাইলেন্স"! বলে চেঁচাতে লাগল। গুরু স্তম্ভিত হয়ে রইলেন।

কিন্তু যজ্ঞেশ্বর থামল না, বলতে লাগল—বড় বড় বোলচাল দিয়ে লোক ঠকানো কত বড় অপরাধ, আমি আপনাদের তাই দেখিয়ে দেব। ও-খেলার সব ফাঁকিটুকু আপনারা নিজে পরীক্ষা করেই দেখুন, বাজে বক্তৃতায় ভুলবেন না।

রীতিমত চাঞ্চল্য জেগে উঠল দর্শকদের মধ্যে। কেউ থামতে বলে, কেউ বলতে বলে। গুরু কাঠের বাক্সের সামনে তখনও দাঁড়িয়ে। তাঁর মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। বাক্সের বাইরে-থাকা পদ্মর মুখ ভয়ে যেন শুকিয়ে গেছে। দর্শকেরাও কৌতূহল দমন করতে পারছে না।

যজ্ঞেশ্বর বলে চলল: আপনারা পয়সা খরচ করে ধাপ্পাবাজীতে ভুলছেন, আমি প্রমাণ করে দিতে পারি, ও করাত মানুষ কাটে না, কাটে খালি বাক্স। কৌশলে দেহের আধখানা গুটিয়ে নিয়ে—

"যজ্ঞেশ্বর!—স্কাউণ্ড্রেল!—সাটআপ—" গুরু গর্জ্জে উঠলেন।

—"বলতে দিন—বলতে দিন—ওর কথা শুনতে চাই আমরা" —দর্শকেরা চেঁচিয়ে ওঠে।

গুরু স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, যজ্ঞেশ্বর বলে যায়: এক ফোঁটা রক্ত পড়বে না, মানুষ দু'খণ্ড হয়ে যাবে, আবার বেঁচে উঠবে, এসব ব্যাপার এ বৈজ্ঞানিক যুগে অচল—আমার বিশেষ অনুরোধ—আপনারা সব জিনিষ দেখে নিন, যাচাই করে নিন, মানুষ-কাটা নিজের চোখে পরীক্ষা করুন।

ভয়ানক হৈ-চৈ পড়ে গেল দর্শকদের মধ্যে। দু'একজন অবশ্য প্রতিবাদও করলে: পয়সা খরচ করে খেলা দেখতে এসেছি আমরা —ম্যাজিক যে চোখের ফাঁকি তা আমরা বুঝি, ড্রেস-সারকেলের ও লোকটা কে হে?

যারা আগে খেলা দেখেছিল তাদের কেউ কেউ যজ্ঞেশ্বরকে চিনতে পেরে বলে উঠল, ও যে ম্যাজিসিয়ানের সহকারী ছিল, ও অনেক কিছু জানে, ওর কথা শুনতে চাই আমরা।

কিন্তু ড্রেস-সারকেলে গুরুর পক্ষপাতী যেসব লোক বসেছিল তাদের অনেকে যজ্ঞেশ্বরকে টেনে বসিয়ে দিলে, তাকে শাসিয়ে বললে, শো টা মাটি করবেন না আপনি, যা বলবার আছে, পরে বলবেন।

যজ্ঞেশ্বর তবুও থামতে চায় না। সামনের সীটগুলিতে যারা বসেছিল তারা কিন্তু যজ্ঞেশ্বরকেই সমর্থন করতে লাগল। একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল। গুরু তখন কি বলতে গেলেন, কিন্তু তাঁর কথা কেউ শুনতে পেল না। শেষে সকলেই শো চালাতে বললেন তাঁকে।

অনেকক্ষণ বদ্ধ বাক্সের মধ্যে থেকে পদ্ম হাঁপিয়ে উঠেছিল। অসীম ক্লান্তিভরে ব্যাকুল চোখে সে গুরুর এই অবস্থা দেখে অন্তরে অত্যন্ত বেদনা বোধ করছিল। ক্রমে তার মুখ যেন রক্তশূন্য হয়ে

গেল, গভীর অবসাদে সে নিশ্চল হয়ে রইল বাক্সের মধ্যে। তার সংজ্ঞা যেন গেল হারিয়ে।

গুরুর চোখে এইবার দেখা দিল ক্রোধ ও দৃঢ়তা।

পদ্মর অবস্থা ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম না করে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, ওয়ান-টু-থ্রি—

বন বন করে ঘুরতে ঘুরতে করাত এগিয়ে এল বাক্সের দিকে। মুহূর্তের জন্ম বিরাট হল নিস্তব্ধ হয়ে গেল। একটা কাঠ কাটার শব্দ, একটা তীব্র করুণ আর্ত্তনাদ, তার পর বাক্সের ভিতর থেকে ফিনকি দিয়ে ঝরে পড়ল অবিশ্রান্ত রক্তধারা।

—খুন! খুন! বিহ্বল হয়ে আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল যজ্ঞেশ্বর। সমগ্র হল কেঁপে উঠল একটা বিরাট চিৎকারে, খুন! খুন!

গুরু তখন স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে। তার পর কাঁপতে কাঁপতে ঘূর্ণস্ত করাত ছুড়ে ফেলে তিনি বাক্সের উপর আছড়ে পড়লেন, পদ্ম! পদ্ম!

দর্শকদের অনেকে তখন আসন ছেড়ে লাফিয়ে ষ্টেজের উপর উঠে পড়েছে। মহিলাদের আর্ত্তনাদ, শিশুদের ক্রন্দন সব মিলে একটা বীভৎস মিলিত চিৎকারের সৃষ্টি করেছে। অনেকে তাড়াতাড়ি সরে পড়ছে। দরজার কাছে ভীষণ ঠেলাঠেলি। যজ্ঞেশ্বর পাগলের মত ড্রেস সারকেল থেকে কোন রকমে লাফিয়ে পড়ে ছুটে এসেছে ষ্টেজের উপর। বাইরে যারা বেরিয়ে গিয়েছিল তারা চিৎকার করতে লাগল—পুলিস! পুলিস!

ঘূর্ণস্ত করাতের মুখে বাক্সটা প্রায় দু'টুকরা হয়ে গিয়েছিল! দ্বিখণ্ডিত দেহ থেকে তখনও রক্ত ঝরে পড়ছে। বাইরে পুলিস-ভ্যানের শব্দ।

গুরু তখনও রক্তমাখা দেহে আঁকড়ে ধরে আছেন সেই বাক্স। যজ্ঞেশ্বর আছড়ে পড়ল গুরুর পায়ের কাছে।

ক্ষণিকের জন্ম গুরু একবার যজ্ঞেশ্বরের মুখের দিকে তাঁর বিহ্বল দৃষ্টি রাখলেন। নিদারুণ নৈরাশ্য, অপরিসীম বেদনা, মর্ম্মভেদী হাহাকার যেন জমাট বেঁধে উঠেছে সে দৃষ্টিতে। তার পর সে দৃষ্টি সহসা গেল স্নিগ্ধ করুণ হয়ে। যজ্ঞেশ্বর আর সহ্য করতে পারলে না, চিৎকার করে' বলে' উঠল—আমিই খুনী, আমাকে ধরুন আপনারা, আমাকে ধরুন।

পুলিসের দল ততক্ষণে এসে পড়েছে। গুরুর শ্লথ-কম্পিত দেহটাকে তুলে তারা তাঁর হাতে পরিয়ে দিল হাতকড়া। তার পর নিয়ে চলল বাইরে।

গুরু চীৎকার করে উঠলেন, যজ্ঞেশ্বর! যজ্ঞেশ্বর! পদ্ম রইল, ওকে তুমি দেখো—তোমারই হাতে পদ্মকে দিয়ে গেলাম! পদ্ম—

গুরুকে ততক্ষণে পুলিসভ্যানে তোলা হয়ে গেছে।

যন্ত্রযুগে

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

কবিতা সুন্দরী, এসো; আমাদের কাল
শেষ হোলো। এ যুগের তরণীর হাল
ধরিয়াছে যন্ত্রাসুর বিকট মূরতি।
বিষাক্ত নিঃশ্বাসে ম্লান আকাশের জ্যোতি।
কলুষিত নদীবক্ষ; ছিন্নিত কানন;
ভয়ার্ত্ত প্রকৃতি করে নীরবে ক্রন্দন।
কল-ভস্মলোচনের দৃষ্টির বহ্নিতে
জীবন পুড়িয়া যায় পল্লীতে পল্লীতে!

পাষাণের মরুভূমি ক্ষুধার্ত্ত শহর
গণ্ডূষে শুষিয়া লয় শ্যামল প্রান্তর।
সুন্দর—সে নির্ব্বাসিত! এসেছে অসুর
হাইড্রোজেন বোমা হাতে, পৃথ্বী ভয়াতুর
কাঁপে; দিক্‌চক্রবালে কোন আলো নাই!
কব্যলক্ষ্মী, আর কেন? চলো, বনে যাই!

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পী

শ্রী[illegible]কুমার নন্দী ও শ্রীলীনা নন্দী

বহু মানুষের তপস্যাপূতঃ এই আমাদের ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের শাশ্বত আত্মা একাগ্র সাধনায় তন্ময়। সে সাধনা বহুমুখী। কোথাও সে মানব-আত্মার নিভৃত লোকের পরমপুরুষকে ধ্যান করেছে। আবার কখনও সে আপনার পরম সুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে আপন সৃষ্টিতে। বিশ্ববিধাতার সৃষ্টিস্বপ্নকে মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে তার তৃতীয় নেত্রের বহ্নিদৃষ্টিতে, তাই ত মানুষের আপন সৃষ্টি অগ্নি-

ভারত নাট্যম

স্বাক্ষরিত। স্রষ্টা যে মানুষ সে বিধাতার সমানধর্মা। এই সৃষ্টিশীল, সৃজনধর্মী মানুষের দেখা পাওয়া দুরূহ সৌভাগ্য। সেদিন ঘূর্ণির শিল্পীপাড়ায় এমনই একজন মানুষের দেখা পেলাম, তাঁর কথা বলি।

শ্রীবিষ্ণু পাল। আয়ত চোখের তন্ময় দৃষ্টি বুঝি অতীন্দ্রিয়কে দেখে। মানুষের চর্মচক্ষে যা কিছু দেখা যায় তা ত অনির্বচনীয় নয়। শিল্পীর শিল্পব্যঞ্জনায় রয়েছে তার অতীন্দ্রিয়দর্শনের প্রসাদগুণ। বিষ্ণুবাবুদের কয়েকপুরুষের বাস এই পাড়ায়। কয়েক ঘর শিল্পী আজও এখানে বাসা বেঁধে আছেন। অনেক দুঃখ পেয়েছেন এঁরা সমাজের ঔদাসীন্যে। এঁদের প্রতিভা মানুষের কাছে স্বীকৃত হয় নি তাই ত যথাযথ মূল্য পান নি এঁরা এঁদের কাজের। দারিদ্র্য সুন্দরের সাধনাকে বার বার পথভ্রষ্ট করতে চেয়েছে। তবু এঁরা ঐহিক সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে পরিহার করে কলালক্ষ্মীকে সুপ্রতিষ্ঠ করেছেন আপন আপন অন্তরলোকে। রং-মাটি নিয়ে খেলে চলেছেন পুরুষানুক্রমে। এই লীলাই এঁদের উপজীব্য। এঁদের শিল্পীমানস তৃপ্তি পেয়েছে এই লীলার মধ্যে। শিল্পরসিক এই লীলা প্রত্যক্ষ করে ধন্য হয়েছে। মাটিকে ভেঙেচুরে রং-বেরঙের রূপসৃষ্টিই এঁদের ধর্ম, এঁদের বিলাস। এই ধর্মের পরিপূর্ণ স্ফূর্তি ঘটে অপ্রয়োজনের প্রয়োজনে—শিল্পীর লীলা-ব্যসনে। শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ শিল্পকর্মে মানুষের এই লীলাময় সত্তার স্বাক্ষর প্রত্যক্ষ কর-

মণিপুরী নৃত্য

লেন। আমরা বিষ্ণুবাবুর শিল্পালয়ে সে লীলা দেখে এলাম। বিষ্ণুবাবুর তপস্যা-লোকে রয়েছে সমাজ-ঔদাসীন্যের হাজারো স্বাক্ষর। সমাজ যে আজও শিল্প-সচেতন হয় নি, গুণীকে সমাদর করে না তার সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাব নেই। যেখানে সমাজের কর্তব্য ছিল এই শিল্পীদের অর্থ দিয়ে, সুবিধা দিয়ে, অযাচিত দাক্ষিণ্যে বাঁচিয়ে তোলা, সেখানে মানুষের ক্লান্তিকর ঔদাসীন্যে দুর্বহ করে তুলেছে এই শিল্পীদের জীবন। দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত পরিবেশেও শিল্পীর সৃষ্টিকর্ম অব্যাহত। কোন বাধাই বড় হয়ে পথ আটকে দেয় নি এই শিল্পীগোষ্ঠীর। এ শিল্পকর্ম ত আর এক পুরুষের নয়। পুরুষানুক্রমে এঁদের কাজ চলেছে। ভারতীয় শিল্প-সাধনার উত্তরসাধক হলেন কৃষ্ণনগরের এই মৃৎশিল্পীরা। কাজে কাজেই ভারত শিল্পধারা সম্বন্ধে সামগ্রিক ভাবে যে কথা প্রযোজ্য তা খণ্ডাংশ সম্পর্কেও প্রযোজ্য। মনে পড়ছে বিখ্যাত শিল্প-সমালোচক আনন্দ কুমারস্বামী তাঁর 'The Arts and Crafts of India and Ceylon' গ্রন্থে বলেছেন যে ভারতীয় শিল্প অধিকাংশ ক্ষেত্রেই

শিল্পীর বংশ-পরম্পরাকে আশ্রয় করে বেঁচে আছে। বিদ্যাটা পরিবারগত হয়ে পড়েছে।*

সমালোচকপ্রবরের এই উক্তিটি কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের উপর আন্তরিক ভাবে প্রযোজ্য। বিষ্ণুবাবু বললেন যে, তাঁর পিতা স্বর্গীয় রামনৃসিংহ পাল এই শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন

কথাকলি নৃত্য

বিষ্ণুবাবুর পিতামহ কান্তিচন্দ্র পালের কাছে। আর শিল্পবিদ্যায় বিষ্ণুবাবুর হাতেখড়ি হয় তাঁর পিতার কাছে। এমনি করেই ভারতীয় শিল্পসাধনার একটি শাখা-প্রবাহ কৃষ্ণনগরের মৃত্তিকাবাহী হয়ে আজও বেঁচে রয়েছে।

বিষ্ণুবাবু বললেন, "শিল্প হ'ল আমার প্রাণ। শিশুকাল থেকে মাটি দিয়ে পুতুল গড়াকে আমার ধর্ম বলে মেনেছি। কখনও কোথাও এ ধর্ম থেকে চ্যুত হই নি। ধর্মচ্যুত হবার আশঙ্কায় অর্থ ছেড়েছি, সম্মান ছেড়েছি, তবু আমার ধর্ম ছাড়িনি। আমি ব্রাত্য নই, মন্ত্রহীন নই। আমার সৃষ্টির মন্ত্র আকাশে বাতাসে অনুরণিত। গাছে পাতায়, যে রং দেখি তাকে ফুটিয়ে তুলি আমার চারুশিল্পে। কখন কখনও মনে হয় প্রকৃতি কোথাও বা ভুল রং লেপে দিয়েছে। তখনই আমি মাটির তাল গ'ড়ে প্রকৃতির অনুগমন করি। তারপর তার রং না চড়িয়ে আমার রং চড়াই। সে রং দেখে হয় ত অনেকের ভাল লাগে না। অবাস্তব বলে অনেকে তাকে অস্বীকার করেন। আবার দু'চার জন রসিক মানুষের চোখে আমার রং দেওয়া কাজটুকু অপূর্ব সৌন্দর্যে ঝলমল করে উঠেছে, এমন প্রমাণও পেয়েছি। যাঁরা ভাল বললেন না তাঁরা হয় ত আমার সৌন্দর্য-দর্শনটুকু ঠিকমত আয়ত্ত করতে পারেন নি।

আমরা সম্মতি দিই।" শ্রীমতী বললেন, এই ত শিল্পী-জনোচিত কথা। শিল্পী হবে নিয়তিকৃতনিয়মরহিতা—অর্থাৎ প্রকৃতিকে অনুগমন করেও শিল্প প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম হবে। যে রং, যে রূপ, যে রস প্রকৃতি তার ঐশ্বর্যভাণ্ডারে ভ'রে রেখে তা অবারিত করে দিয়েছে বিশ্বজনার চোখে তারই প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করা শিল্পকর্ম নয়। শিল্প যদি কেবল অনুভূতি হ'ত তা হলে শিল্পী হ'ত নকলনবীশ। নকলনবীশী করার জন্য শিল্পী সম্মানার্হ নয়। সে সৃষ্টিশীল, তাই ত তার সম্মান দেশ এবং কাল জুড়ে। বিষ্ণুবাবু এই ধরনের সৃজনধর্মী শিল্পী। কবির আলোয় তাঁর শিল্পদর্শনের সমগ্র রূপটুকু তাঁর চোখে অনায়াসে ধরা পড়ে। তিনি যা বলেন তাতে হয় ত কেতাবী বুকনি নেই, গভীর উপলব্ধিতে তা ভাস্বর।

১৯২০ সনে বিষ্ণুবাবুর জন্ম হয়। ৩৭ বৎসরের জীবন-সাধনায় তাঁকে অপূর্ব কলাকুশল করেছে। আশানুরূপ খ্যাতি তাঁর হয় নি কারণ খ্যাতিকে তিনি সযত্নে পরিহার করে চলেছেন। তাঁর পিতার মতই তিনি গোপনতাবিলাসী এবং সদাচারী। আপনাকে গোপন করে রাখার দুর্গত মন্ত্রটুকু তিনি তাঁর পিতৃদেবের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন। ১৯৩০ সালে বিষ্ণুবাবু যখন দশ বছরের ছেলে তখন থেকেই তাঁর পুতুল গড়ার কাজে হাতে খড়ি। বহরমপুর কংগ্রেস প্রদর্শনীতে এই বালক শিল্পীর তৈরী জীবজন্তু ও পুতুলগুলো প্রশংসা অর্জন করল। শিল্পী বললেন যে, ঐ দিনটি তাঁর জীবনে স্মরণীয়। প্রথম যেদিন তিনি দেশের রসিকসমাজের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করলেন। সে স্বতোৎসারিত প্রশংসায় শিল্পীচিত্তে আনন্দের জোয়ার বইল, অনুপ্রাণিত হ'ল শিল্পীর সৃষ্টিধর্মী মন। ধানবাদ প্রদর্শনীতে কিশোর শিল্পী আরও সম্মান লাভ করলেন। মানুষের প্রতিকৃতি গড়ে দিলেন কয়েক মিনিটের মধ্যে। আগন্তুক মানুষেরা অবাকবিস্ময়ে দেখল এই কিশোরের ভাস্কর্য। তার পর কত প্রদর্শনী এল, গেল। বিষ্ণুবাবু অনেক পদক, অনেক মানপত্র পেলেন—তবু তাঁর অন্তর্মুখী মন আপনার সৃষ্টিলোকের রহস্যটি খুঁজে ফিরতে লাগল আপন নিভৃত শিল্পলোকে। সৃষ্টি যেন তপস্যা। সেই তপস্যায় আত্মনিয়োগ করে বাইরের বস্তু-জীবনের সম্পদের মোহ খ্যাতির বিড়ম্বনাকে তিনি সহজেই অতিক্রম করলেন। আপনার সৃষ্টিলোকের বৈকুণ্ঠে তিনি অধীশ্বর। বাঁশের বেড়া দেওয়া ষ্টুডিওতে বসে আপন বিহ্বল

* 'All essential details are passed on from father to son in pupilary succession through successive generations, the medium of transmission consisting of example. Thus during many centuries the artists of one district apply themselves to the interpretation of the same ideas; the origin of those ideas is more remote than any particular example."

চোখের আয়ত দৃষ্টি তিনি এঁকে দিলেন তাঁর হাজারো পুতুলের চোখে। মণিপুরী নৃত্যে নৃত্যপরা নটীদের অপূর্ব নয়নভঙ্গিমা বিষ্ণুবাবুর অপূর্ব অঙ্কন কৌশলটুকুর সাক্ষ্য বহন করছে। এমন ব্যঞ্জনাময় চোখের চাহনি, এমন প্রকাশদক্ষতা আর ত বড় একটা দেখলাম না। ওঁর তৈরী ভারতীয় বিভিন্ন নৃত্যকলার মডেলগুলো ভারতীয় নৃত্যের ঐতিহ্যটুকু স্মরণ করায়। ভারতনাট্যম নৃত্যের নৃত্যভঙ্গী ও মুদ্রা ত্রুটিহীন।

ষ্টুডিওতে সৃষ্টিরত বিষ্ণুবাবু

উর্দ্ধায়িত এবং অবনমিত করতলদ্বয়ের সামীপ্য ও আঙুলের যথাযথ ভঙ্গী শিল্পীর দৃষ্টির বৈজ্ঞানিক স্বচ্ছতার কথা বলে। মণিপুরী নৃত্যের পুরুষবাদকের মনোহর বাদ্য- ভঙ্গিমা এবং নৃত্যপরা নটীদের বিলোল দিঠির ব্যঞ্জনামণ্ডিত চাহনি জীবনের পটভূমিকায় সুপ্রতিষ্ঠ হয়েও কোথায় যেন জীবনকে অতিক্রম করেছে। নৃত্যকলায় নৈর্ব্যক্তিক সৌন্দর্য শিল্পীর রসে রেখায় রসিকচিত্তে ছন্দোময় ঐতিহ্য রচনা করে। সে ঐতিহ্যের উত্তরসাধক বলেই আমাদের পথে শিল্পলোকে প্রবেশ সহজসাধ্য। ভারতীয় রসশাস্ত্রের অধিকারবাদ অগ্র স্মরণীয়।

বিষ্ণুবাবুর তৈরী শকুন্তলা বিরহ-কাতরার প্রতিমূর্ত্তি। শকুন্তলার চোখে মুখে যেন দুষ্যন্ত-বিরহজনিত একাকীত্বের নিরুত্তাপ চাঞ্চল্য। শকুন্তলার চোখের সীমাহীন আকাশে ব্যথা ও বেদনার মেঘ ভীড় করে আসে। বর্ষণ বুঝি আসন্ন। সেই আসন্ন বর্ষণমেদুর শকুন্তলার চোখে নিখিল বিশ্বের বিরহ। রসিকচিত্ত অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। মাটি দিয়ে গড়া পুতুলে রং এবং রেখার আঁচড় কেটে যে মানব-বেদনাকে এমন করে প্রকাশ করা যায়! সে তত্ত্বে প্রত্যয় রাখতে হলে একবার বাংলার এই নিভৃত পল্লী ঘুর্ণিতে আসা দরকার। সেখানে শিল্পীমনের কি বিস্ময়কর প্রকাশই না লক্ষ্য করলাম। বিষ্ণুবাবুর প্রকাশভঙ্গীটি অনবদ্য। তাঁর সৃষ্ট 'রাসলীলা'য় রাধা-কৃষ্ণের চোখে অতি মানবীয় প্রেমের আনন্দঘন মূর্তি। অনৈসর্গিক দিব্য প্রেমের জ্যোৎস্নাধারায় রাধাকৃষ্ণের আবেশ-বিহ্বল অক্ষি-ব্যোম সমুদ্ভাসিত। এ শিল্পীর আর এক ধরনের সৃষ্টি। যে তুলি শকুন্তলার বিরহ এঁকেছিল, তাই আবার আর এক পরিবেশে আঁকল রাধা-কৃষ্ণের মিলনস্নিগ্ধ

শকুন্তলা

পরিপূর্ণতা। এই নৈর্ব্যক্তিক সৃষ্টি-দক্ষতা হ'ল প্রতিভার জাদু। এই দক্ষতার আশ্বাস দেখলাম বিষ্ণুবাবুর সৃষ্টিতে। আমাদের দেশের অখ্যাত শিল্পীর মধ্যে দেখলাম বিলেতের Frank Dobson বা Richard Garbe-এর সমধর্মী ভাস্করকে। মন আনন্দে ভরে উঠল।
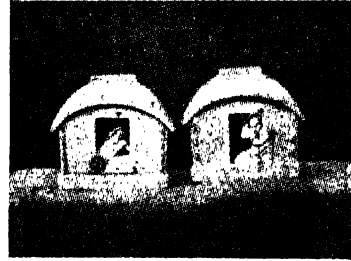
চাষীর পর্ণকুটীর

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে ভারতীয় শিল্পকে উজ্জীবিত করা এবং তার যথাযথ মূল্যায়ন করার গুরুদায়িত্ব আমাদের। এই গুরুদায়িত্ব পালনের ভার নিতে হবে রাষ্ট্রকে, সমাজকে এবং ব্যক্তি-মানুষকে। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীরা অধিকাংশই আজ অসচ্ছলতার অস্বচ্ছতায় সমাচ্ছন্ন। সেই দারিদ্র্যদীর্ণ পরিবেশ থেকে বাঙালীর এই মহার্ঘ শিল্প-ঐতিহ্যকে উদ্ধার করে তাকে বাঁচাতে হবে। এই শিল্প-উজ্জীবনের ভিতর দিয়েই নতুন ভারতবর্ষ আগামী দিনের ভূমিকা রচনা করবে।

বর্ত্তমান মিশর

শ্রীপ্রেমকুমার চক্রবর্ত্তী

অতীতের স্বপ্ন হইতে মিশর জাগিয়াছে। ফারাও, পারসীক সম্রাট, গ্রীক টলেমি সেটোর, রাণী ক্লিয়োপেট্রা, রোমক সম্রাট সকলেই অতীতের স্বপ্নমাত্র। তাহার পর আসিল তুর্ক সুলতান সালাদীন, তাঁহার বংশধরেরা ককেসাস অঞ্চল হইতে দৃঢ়কায় শক্তিমান মামলুক ক্রীতদাস আনয়ন করিল, সেই ক্রীতদাস ক্রমে মনিবে পরিণত হইল। এই মামলুকগণ মিশরে দীর্ঘ পাঁচশত বৎসর শাসক অথবা শাসকশ্রেণীর অভিজাত সম্প্রদায়রূপে বিরাজ করিয়াছে। ফরাসী বীর নেপোলিয়ন এই মামলুকদের যুদ্ধে পরাজিত করেন। সেই সময়কার ফরাসীদের প্রবল শত্রু ইংরেজ আসিয়া ফরাসীদের বিতাড়িত করে। তুর্ক প্রভুত্ব পুনরায় আবির্ভূত হইল। মহম্মদ আলী আসিলেন মিশরের "খেদিভ" রূপে। ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার ফার্দিনান্দ-ড-লেসেপস ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের সহায়তায় সুয়েজ খাল খনন করিলেন। সুয়েজ খাল কোম্পানীর অধিকাংশ "শেয়ার" ফরাসী ও মিশরের অধিকারেই ছিল। এই সময় অপব্যয়ী ইসমাইল পাশা মিশরের "খেদিভ।" তিনি অর্থের লোভে মিশরের দুই লক্ষ "শেয়ার" ব্রিটিশ সরকারের নিকট চার কোটি টাকায় বিক্রয় করিয়া দিলেন। সাম্রাজ্য রক্ষা ও বাণিজ্যের জন্য সুয়েজ খাল ইংরেজদিগের নিকট অত্যাবশ্যক হইয়াছিল। সেই সময় হইতে দলে দলে ইংরেজেরা চাকুরী ও ব্যবসায় প্রভৃতির অজুহাতে মিশরে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করিয়া দিল। এক কথায় মিশরে একটি ক্ষুদ্র উপনিবেশ স্থাপিত করিল। ক্রমশঃ তাহারা মিশরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। তাহার ফলে মিশরীয়দের মধ্যে অসন্তোষের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। ১৯১৪ সনে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইতেই ইংরেজেরা মিশর "রক্ষণাবেক্ষণে"র ব্যবস্থা করার জন্য মিশরে একটি সৈন্যঘাটি স্থাপন করিল। "খেদিভ"কে হাতে রাখার জন্য তাহাকে "সুলতান" উপাধি দিয়া সম্মান দেখাইল। অবশ্য অঙ্গীকার করিল যে যুদ্ধ শেষ হইলেই তাহারা রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। এই অঙ্গীকার তাহারা রক্ষা করে নাই। অসন্তুষ্ট মিশরীরা জগলুল পাশার নেতৃত্বে একটি দল গঠন করিল তাহার নাম "ওয়াফদ দল"। স্বাধীনতার আন্দোলন ক্রমেই প্রবলতর হইয়া উঠিল। জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে ওয়াফদ দল, রাজা ফুয়াদ ও ইংরেজের মধ্যে ত্রিদলীয় ক্ষমতার লড়াই চলিল। চার বছর তুমুল আন্দোলন চলার পর মিশরকে ইংরেজেরা স্বাধীন দেশ বলিয়া মানিয়া লইল; কিন্তু কয়েকটি শর্তও মিশরীদের মানিতে হইল, যেমন মিশরকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে ইংরেজই রক্ষা করিবে এবং সেইজন্য নির্দ্দিষ্টসংখ্যক ব্রিটিশ সৈন্য মিশরে থাকিবে, উপরন্তু সুদানের উপর ইংরেজের কর্তৃত্ব বজায় থাকিবে। জগলুল প্রধানমন্ত্রী হইয়া এই সর্ত্তসমূহের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন। জগলুলের মৃত্যুর পরেও মিশরের গোলযোগ মিটিল না। রাজা ফুয়াদ ইংরেজের পরামর্শে ওয়াফদ দলকে জব্দ করার উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিলেন।

১৯৩৫ সনে ইটালী যখন আবিসিনিয়া আক্রমণ করিল তখন সশঙ্কিত মিশরীরা ইংরেজের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। ইংরেজেরা মিশর হইতে সৈন্যবাহিনী সরাইয়া লইতে সম্মত হইল কিন্তু সুয়েজ খাল রক্ষার জন্য ইচ্ছামত ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত করিতে পারিবে বলিয়া জানাইয়া দিল। বৈদেশিক ব্যাপারেও মিশর ইংলণ্ডের সহিত পরামর্শ করিয়া চলিতে বাধ্য রহিল। এই সন্ধির কিছুদিন পরে রাজা ফুয়াদের মৃত্যু হইল এবং মিশরের শেষ রাজা ফারুক সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইতেই ইংরেজেরা পুনরায় মিশরে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। যুদ্ধের অবসানে ইংরেজ সৈন্য মিশর হইতে ঘাটি উঠাইয়া লইলেও, ত্রিদলীয় ক্ষমতা—রাজপ্রাসাদ, ইংরেজ ও ওয়াফদ দল অব্যাহত থাকিল।

১৯৫২ সনের ২৩শে জুলাই মিশরের ইতিহাসের একটি যুগসন্ধিক্ষণ। এই দিন মিশরীয় সেনাবাহিনীর কতিপয় যুবক অকস্মাৎ রাজা ফারুককে অপসারিত করিয়া মিশরকে প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিল ও রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা অধিকার করিয়া বসিল। এই ঘটনা যুগপৎ ত্রিদলীয় ক্ষমতার অবসান ঘটাইয়া দিল। ইহারা পুরাতন শাসনতন্ত্র অপসৃত করিল। পুরাতন রাজনীতিক দলগুলি ভাঙ্গিয়া নূতন মুক্তিবাহিনী গঠন করিল। প্রাচীন জায়গীর (feudal) প্রথার অবসান দ্বারা ভূমিবণ্টন ব্যবস্থার সংস্কার আরম্ভ করিয়া দিল। শাসনতন্ত্রের দুর্নীতির উচ্ছেদে বদ্ধপরিকর হইল। এক কথায় মিশরের ইতিহাসের নূতন পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইল। আকস্মিক ক্ষমতা অধিকারের (coup d'etat) ব্যবস্থা পরিচালনায় নেতৃত্ব করিয়াছিলেন বর্ত্তমান মিশরের নেতা গামাল আবদুল নাসের। এই ঘটনার সময় তাঁহার বয়স মাত্র ৩৪ বৎসর এবং বর্ত্তমান বয়স ৩৯ বৎসর। প্রাচীন দেশগুলির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, কোনও বয়োজ্যেষ্ঠকে সম্মুখে রাখিয়া বৃহৎ কোনও কাজে অগ্রসর হওয়া। সেই হিসাবে জেনারেল মহম্মদ নেগুইব উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি ক্ষমতার আসন হইতে অপসারিত হইয়াছেন। বিদ্রোহমাত্রেরই প্রকৃতি বিদ্রোহস্রষ্টার দুই চারিজনের পতন ঘটাইয়া দেওয়া। অনেকের মতে নেগুইবের অপসারণ রাজনীতিক জগতের একটি দুঃখজনক দুর্ঘটনা।

দীর্ঘকায় সুগঠিতদেহ নাসের। একাধারে নিষ্ঠাবান মুসলমান, দৃঢ়চিত্ত, অথচ পরধর্ম্ম-অসহিষ্ণু নহে। আত্মসুখ স্বাচ্ছন্দ্যে নিরাসক্ত, অপর দিকে নেতৃপদের শক্তিসম্পন্ন! তিনি ডাক বিভাগের সামান্য একজন কেরাণীর পুত্র। ১৭ বৎসর বয়সে ছাত্র আন্দোলনে ও রাজনীতিক দাঙ্গার যোগ দেওয়ার অপরাধে অনেকবার কারাবরণ করেন। ১৯৩৮ সনে তিনি সুদান ও ইজরাইলের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। সেনাবাহিনীর অধিনায়ক নাসের, রাষ্ট্রের নেতা নাসের, অথচ নিষ্কলুষচরিত্র, মিশরীয় রাজনৈতিক জীবনে নূতন ও অপ্রত্যাশিত। নাসের দেখিতে পাইলেন মিশরে ঐক্য প্রতিষ্ঠার দ্বারা শক্তি সঞ্চার করা এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দুর্নীতিমুক্ত করিয়া দেশবাসীর মন দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করা ও আত্মত্যাগে বলিষ্ঠ করা প্রয়োজন। সেনাবাহিনীর প্রায় চার শত উৎসাহী উচ্চপদস্থ যুবক কর্ম্মচারী লইয়া তিনি একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠন করিলেন। বলিতে গেলে, বর্ত্তমান মিশরে এই সভাই রাষ্ট্রের পরিচালক। নাসেরের অন্তরঙ্গ নয়-দশ জনকে লইয়া একটি কর্ম্মপরিষদও গঠন করিয়াছেন। এই পরিষদের নাম "বিন্‌বাসী" (তুরস্ক ভাষায় ইহার অর্থ 'মেজর')।

মিশর বহুদিন পর্য্যন্ত বিদেশীর অধীন থাকায় দেশবাসীর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, দেশের উচ্চ ক্ষমতায় আসীন ব্যক্তি মাত্রই বিদেশী বংশোদ্ভুত। সুতরাং নাসের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলে অনেকের মনে এই প্রশ্ন জাগিয়াছে তিনি তুর্ক বংশোদ্ভুত কিনা। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ খাঁটি মিশরীয়। কেহ কেহ মনে করেন তিনি বেশী দিন টিকিয়া থাকিতে পারিবেন না—অপর পক্ষে বহু মিশরবাসীর ধারণা (অধিকাংশের) তিনি মিশরের আতাতুর্ক (কামাল-পাশা)। নাসেরের স্বাধীনতার আদর্শ জনগণের মুক্তি, অন্যান্য বহু দেশের ন্যায় কেবল মাত্র ভৌগোলিক ভূখণ্ডের মুক্তি নহে।

মিশরে আরবী ভাষা ও বর্ণমালা প্রচলিত। কিন্তু মিশরীয়গণ আরবীয় নহে, আরবীয় বংশোদ্ভুতও নহে। অথচ আরবীয় জগতের শিক্ষাকেন্দ্র মিশর। এশিয়া ও আফ্রিকায় যে কোনও দেশবাসী হইতে মিশরীয়গণ সম্পূর্ণ ভিন্ন একজাতি। আরবগোষ্ঠীর সহিত তাহাদের যোগসূত্র ভাষা ও ধর্ম্ম। মহম্মদ আলী ও ইসমাইল পাশার আমল হইতে অবস্থাপন্ন ও নগরবাসী শিক্ষিত মিশরীয়গণ চালচলনে এমনকি পোশাকপরিচ্ছদেও অনেকখানি পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন। মিশরের আয়তন ৩৮৬,১৯৮ বর্গ মাইল (ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের প্রায় সাড়ে চার গুণ)। কিন্তু দেশের শতকরা সাড়ে ৯৬ ভাগ অংশই জনশূন্য মরুভূমি। কাজেই আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা অতি সামান্য অর্থাৎ ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের প্রায় অর্দ্ধেক। নীলনদের উভয় পার্শ্বের সঙ্কীর্ণ উপত্যকা, 'ব'দ্বীপসমূহ এবং বিচ্ছিন্ন মরুদ্যানগুলি একমাত্র বসবাসযোগ্য। কিঞ্চিদধিক হাজার বর্গ মাইল জমি সেচব্যবস্থার গুণে কৃষিকার্য্যের উপযোগী হইয়াছে। দেশের আয়তনের তুলনায় ইহা শতকরা আড়াই ভাগের কম। নীলনদ ও সেচব্যবস্থা মিশরের প্রাণ রক্ষা করে। মিশর ও সুদানের জমিতে পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট তুলা উৎপাদিত হয়। এই তুলা বিদেশীদের একটি প্রধান আকর্ষণ। মিশরের প্রায় দুই কোটি বিশ লক্ষ অধিবাসী নীলনদের অল্পপরিসর উপত্যকায় বাস করে তাহার ফলে এই সব স্থানের জনসংখ্যা অত্যধিক বেশী এবং এই জনসংখ্যা বৃদ্ধিও পাইতেছে। এই কারণে সেচব্যবস্থার সম্প্রসারণের আশু প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশে কেবলমাত্র দুইটি নগরীর জনসংখ্যা দশ লক্ষের অধিক এবং এই দুইটি নগরী মিশরেই অবস্থিত। তাহার একটি আলেকজান্দ্রিয়া এবং অপরটি সমগ্র মুসলীম জগতের বৃহত্তম নগরী কাইরো। কলিকাতা নগরীর ইউরোপ ও আমেরিকায় নির্ম্মিত মোটর গাড়ী ও শিখ মোটর চালক এবং মিশরের নগরীতে ইংলণ্ডে নির্ম্মিত মোটর গাড়ী ও সুদানী মোটর চালকের দৃশ্য অনেকটা এক প্রকার। ধনী সম্প্রদায়ের সাপ্তাহিক অবসরবিনোদন ও বিলাসপ্রমোদের স্থান মরু অঞ্চলের বস্ত্রাবাস (তাঁবু) এবং নীলনদের নৌগৃহ। দেশের অধিকাংশ জমি এত দিন পর্য্যন্ত "পাশা" প্রভৃতি মুষ্টিমেয় ধনী সম্প্রদায়ের অধিকারেই ছিল। শতকরা ৭৫ জনের অধিক মিশরবাসী অদ্যাবধি নিরক্ষর ও অশিক্ষিত। অপর দিকে পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলীম শিক্ষাকেন্দ্র আল-আজহর বিশ্ববিদ্যালয় মিশরে অবস্থিত। কাইরো নগরীতে অপর একটি লৌকিক (secular) বিশ্ববিদ্যালয়ও আছে। ইহাদের ছাত্রসংখ্যা ২৭ হাজারের অধিক। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা এবং প্রাচ্য রক্ষণশীল সভ্যতার একটি অদ্ভুত সমন্বয় এই মিশরে। স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের চেষ্টা ও পর্দ্দাপ্রথার স্বপক্ষে প্রচার উভয়ই দেখা যায়। নগরীর পথেঘাটে বিদ্যালয়গামী ছাত্র-ছাত্রীর সমাবেশ অনেক সময় দেখা যায়, বোরখাপরিহিতা ও প্রাসাদের সুরক্ষিত "হারেমে"র সংখ্যাও কম নহে। স্ত্রী-স্বাধীনতার আন্দোলন ও সভা-সমিতি আছে। খেলাধূলায়, ভোজনালয়ে, টেলিফোন আপিসের কর্ম্মচারী মহলে, অনেক স্থানেই স্ত্রী-স্বাধীনতার নিদর্শন কিছু পাওয়া যায়। একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের বিবাহিতা মহিলাকে প্রশ্ন করুন, সে বলিবে আমরা বেপর্দ্দা হইয়া বেইজ্জতী মুসলমান কখনই হইব না। ইহা অবশ্য সত্য নগরে। পল্লী-অঞ্চলে দারিদ্র্য অনেক ক্ষেত্রেই বহু নারীকে "বেপর্দ্দা" করিয়াছে। ইউরোপের ভূখণ্ড হইতে দূরে থাকায় নাসেরের সমস্যা আতাতুর্ক অপেক্ষা এক দিকে কঠিন অপর দিকে সহজ। ইসলামীয় আদর্শে দৃঢ় নিষ্ঠা অথচ পাশ্চাত্ত্য প্রগতিশীল আদর্শে উদ্বুদ্ধ। মিশরবাসী নাসেরের নিকট সমস্যার সমাধান চাহিয়াছে। রাজধানীর কোনও কোনও রাজপথ পাশ্চাত্ত্য জগতের অনেক প্রধান রাজপথের সমকক্ষ ও সৌন্দর্য্যমণ্ডিত, অপর দিকে সেই কাইরো নগরীর অন্যান্য বহু পথ অতি জঘন্য ও কদর্য্য যাহার তুলনা প্রাচ্যের কোনও দেশেও পাওয়া দুর্লভ। অন্ধ ও চক্ষুপীড়ায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা সম্ভবতঃ মিশরেই সর্ব্বাধিক। গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ শিক্ষা ও ভূমিহীন দরিদ্র মিশরবাসীর বাস। যদি কেহ বলিতে চান নাসেরের অদ্যাবধি মিশরবাসীর উন্নয়নের জন্য বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই,

তাহা হইলেও বলিতে পারা যায় একটি জিনিব তিনি মিশরবাসীকে দিয়াছেন, তাহা হইল "আশা"। এই নূতন "আশা" মিশরবাসীর মনে প্রবল উৎসাহ ও প্রেরণার সঞ্চার করিয়াছে। এই বস্তু অদ্যাবধি মিশরের কোনও নেতা জনগণের মধ্যে বিতরণ করিতে পারে নাই।

নাসের শাসনকর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া দুইটি সমস্যার সম্মুখীন হইলেন, (১) *অর্থ নৈতিক এবং (২) অশিক্ষা ও নিরক্ষরতা। মিশরে* উৎপাদিত তুলার উপর জাতীয় আয়ের অধিকাংশ নির্ভর করে। একটি মাত্র ফসলের উপর নির্ভর না করিয়া অন্যান্য শস্য উৎপাদন করিবার জন্য তিনি সেচব্যবস্থার একটি পরিকল্পনা করেন। জন-সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য মরু অঞ্চলের কিছু স্থান বাসযোগ্য করাও তাঁহার উদ্দেশ্য। আঠার কোটি পাউণ্ডে সাদ-এল-আলি (যাহা আসোয়ান বাঁধ নামে পরিচিত) বাঁধ নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত করেন। ইহা ভিন্ন আরও অন্ততঃ তিনটি বাঁধের পরিকল্পনাও আছে। এই সব পরিকল্পনার রূপায়ণে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য সাত কোটি ডলার ঋণ দেওয়ার প্রস্তাব করে। তদুপরি বিশ্ব ব্যাঙ্ক বিশ কোটি ডলার ঋণ দেওয়াও মনস্থ করে। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে তাহারা সহসা ঋণদানের প্রস্তাব প্রত্যাহার করে। পরিকল্পনা রূপায়ণের নিমিত্ত অর্থ-সংগ্রহে ব্যর্থকাম হইয়া ১৯৫৬ সনের ২৬শে জুলাই নাসের অকস্মাৎ সুয়েজ খাল দখল করিয়া সুয়েজ খাল কোম্পানীকে মিশরের জাতীয় সম্পদ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই ঘটনার তিন দিনের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং ফরাসী সরকার ১৮৮৮ সনের চুক্তির স্বাক্ষর-কারিগণের একটি সম্মেলন লণ্ডন নগরে আহ্বান করিলেন। মিশর এই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে। মিশর ভিন্ন অন্যান্য আঠারটি রাষ্ট্র একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিল। জওহরলাল বলিলেন মিশরের বিনাসম্মতিতে কোনও সিদ্ধান্তই হইতে পারে না। সম্মেলনের প্রস্তাব মিশরকে জ্ঞাপন করা হইল। নাসের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। আঠারটি রাষ্ট্র পুনরায় মিলিত হইয়া প্রস্তাব করিলেন যে, সুয়েজখাল ব্যবহারকারী রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধি লইয়া একটি যৌথ সমবায় সংস্থা গঠন করা হউক। এই প্রস্তাব রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা সংসদের বিবেচনার জন্য দেওয়া হইল। প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করার পদ্ধতি সম্পর্কিত দ্বিতীয় অংশ রুশিয়া না-মঞ্জুর (ভেটো) করেন। ইহার পর রাষ্ট্রসঙ্ঘ সম্পাদকের আয়োজিত মিশর, ব্রিটিশ ও ফরাসী রাষ্ট্রের প্রতিনিধির একটি বৈঠক আহ্বান বিফল করিয়া অকস্মাৎ সুয়েজ এলাকায় ইস্রাইল, ব্রিটিশ ও ফরাসী বাহিনীর অনুপ্রবেশ ও আক্রমণ আরম্ভ হইল। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক নিরাপত্তা পরিষদের সাত জন সদস্যের ভোটে একটি জরুরী বৈঠক আহ্বান করিলেন। তাহার ফলে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নির্দ্দেশে ব্রিটিশ ও ফরাসী মিশর ও খাল এলাকা হইতে অপসারিত হইল এবং রাষ্ট্র-সঙ্ঘবাহিনীকে খাল এলাকায় মোতায়েন করা হইল। ইস্রায়েল রাষ্ট্রসঙ্ঘের নির্দ্দেশ অমান্য করায় ১৯শে জানুয়ারী (বর্ত্তমান সনে) বিপুল ভোটাধিক্যে (৭৪-২) মিশর হইতে ইস্রায়েলী বাহিনী সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করার নির্দ্দেশ দেওয়া হইল এবং শেষ পর্য্যন্ত ইস্রায়েলী সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করে।

নাসের ১৮৮৮ সনের চুক্তি অনুসারে সুয়েজ খালে অবাধ ও স্বাধীন ভাবে নৌ চলাচলের শর্ত্ত সম্বন্ধে আপত্তি তোলেন নাই। *তিনি সুয়েজ খাল কোম্পানীর সম্পত্তি ও ঋণের দায়িত্ব উভয়ই গ্রহণ করিয়াছেন। তথাপি তাঁহাকে সন্দেহ করার তিনটি সম্ভব কারণ* অনুমেয়—

(১) নাসের বাগদাদ চুক্তির বিরোধিতা করিয়াছেন;

(২) আলজেরীয় স্বাধীনতা আন্দোলন সমর্থন করিয়াছেন;

(৩) রুশিয়ার অস্ত্রসম্ভার গ্রহণ করিয়াছেন;

ভারতের পক্ষে মিশরকে সমর্থন করার যুক্তি আছে। মিশর বান্দুং সম্মেলনে যোগ দিয়াছে এবং পঞ্চশীল প্রস্তাব মানিয়া লইয়াছে। ইহা ভিন্ন মিশর আক্রান্ত এবং এই ক্ষেত্রে আক্রমণ-কারী নহে। ইহা ভিন্ন ভবিষ্যতে খাল ব্যবহার ভারতের পক্ষেও প্রয়োজনীয় হইতে পারে। শ্রীজওহরলাল নেহরু এই সম্পর্কে ভারতের মতামত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—

(১) মিশরের সার্ব্বভৌমিকত্ব (Sovereignty) স্বীকার করিতে হইবে।

(২) সুয়েজ খাল এলাকাকে মিশরের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া মানিতে হইবে।

(৩) ১৮৮৮ সনের চুক্তি অনুসারে সকল দেশকে স্বাধীন ও অবাধ নৌচলাচলের সুবিধা দিতে হইবে।

(৪) কর ও শুল্ক প্রভৃতি দেশনির্ব্বিশেষে পক্ষপাতশূন্য ও ন্যায়সঙ্গত করিতে হইবে।

(৫) নৌচলাচলের সুবিধার উপযোগী রাখিবার জন্য খাল সংরক্ষণের ব্যবস্থাদি রাখিতে হইবে।

(৬) খালব্যবহারকারীদের স্বার্থের প্রতি নজর রাখিতে হইবে।

বর্ত্তমান মিশরের পক্ষে দুইটি বস্তু অত্যাবশ্যক—একটি রাজ-নীতিক স্থিরতা ও স্থায়িত্ব এবং অপরটি সময়। নাসের ও তাঁহার অনুচরবৃন্দ কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে ভুল করিয়া থাকিতে পারেন, তথাপি তাঁহার প্রদর্শিত পথই মিশরের পক্ষে বর্ত্তমানে শ্রেষ্ঠ পথ। মিশরের বিগত নির্ব্বাচনে গণতন্ত্রের ও জনগণের ইচ্ছার প্রকাশ আরও দৃঢ় হইয়াছে, যাহা নাসেরের অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করিবে ও তাঁহার শক্তি বৃদ্ধি করিবে। এই অবস্থায় নাসেরের পতন মিশরের পক্ষে অতি দুর্দ্দিন হইবে।

পিরামিড ও সমাধির দেশ মিশরের সমাধি হইতে পুনরুত্থান হইয়াছে। জনগণের মুক্তি যে রাষ্ট্রের মুক্তি সেই কথা আজ মিশর ঘোষণা করিয়াছে।
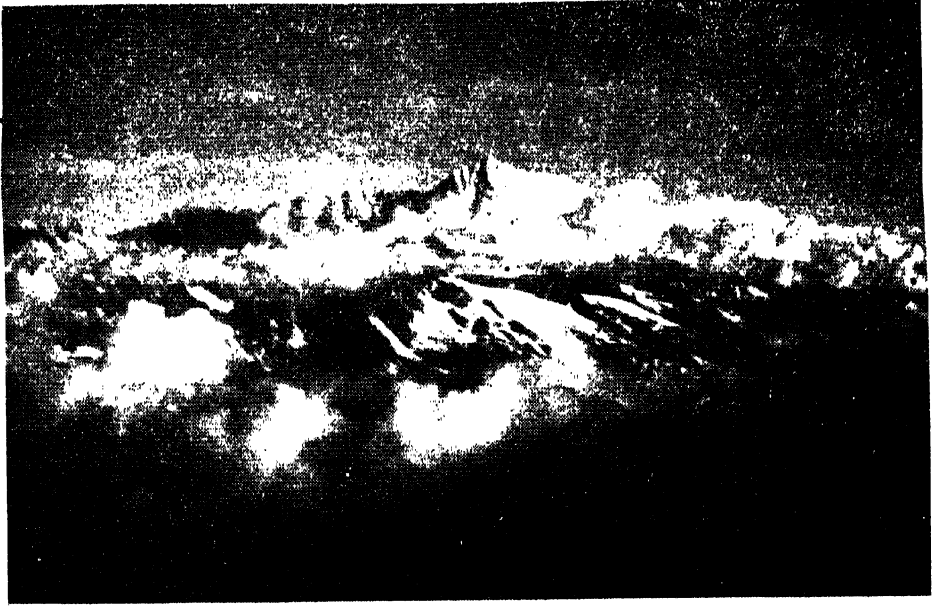
নাঙ্গাপর্ব্বত

গুলমার্গ

শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র কর

কাশ্মীরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলোর মধ্যে গুলমার্গ সমধিক প্রসিদ্ধ। তবে আমার প্রথম বারের গুলমার্গ দর্শন নেহাৎ ভ্রমণ উদ্দেশ্যেই ঘটে নাই।

১৯৪৭ সনের শেষভাগে পাকিস্থানের উপজাতীয়েরা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও যানবাহন লইয়া দুর্ব্বার গতিতে কাশ্মীরে প্রবেশ করে। উদ্দেশ্য শ্রীনগর ও সমগ্র কাশ্মীর পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত করা। উপজাতীয়রা বারামুলা ও গুলমার্গ পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। এই দুইটি স্থানই শ্রীনগর হইতে মাত্র চল্লিশ মাইল দূরে। বারামুলা ও গুলমার্গ পৌছিয়াই ইহারা লুণ্ঠনকাজে প্রবৃত্ত হয়। ফলে ইহাদের লক্ষ্য শ্রীনগরে পৌছার কথা ভুলিয়া যায়। ট্রাক ভর্ত্তি করিয়া ইহারা লুণ্ঠিত দ্রব্যসম্ভার রাওয়ালপিণ্ডি ও মুজাফরাবাদে পাঠাইতে থাকে। কাশ্মীরের এই শোচনীয় পরিস্থিতিতে উপজাতীয়দের প্রতিরোধকল্পে দিল্লী হইতে আকাশপথে কুমায়ুন ও শিখ পল্টন শ্রীনগরে প্রেরিত হয়। আমি শিখ পল্টনে চাকুরী করিতাম। কয়েকটি যুদ্ধের পরে পাকিস্থানীরা পিছু হটিতে আরম্ভ করে। আমরা পাকিস্থানের সীমান্তবর্ত্তী মুজাফরাবাদের] নিকট টিথোয়াল পর্য্যন্ত ইহাদিগকে ধাওয়া করিয়াছিলাম। আমি টিথোয়ালে পৌছিয়াই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাই আমাকে প্রথমতঃ শ্রীনগর এবং তথা হইতে টানমার্গের সামরিক হাসপাতালে পাঠান হয়। টানমার্গ হইতে গুলমার্গ মাত্র তিন মাইলের পথ। কাজেই সুস্থ হইয়াই আমি গুলমার্গ যাত্রা করিলাম।

গুলমার্গ প্রকৃতির লীলানিকেতন। প্রকৃতির অকৃপণ দাক্ষিণ্যে ও মানুষের সৌন্দর্য্যসাধনার প্রয়াসে গুলমার্গ ভ্রমণকারীর স্বর্গ। কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন তাহা শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল।

উপজাতীয়রা এখানে প্রবেশ করিয়াই বাজারটি লুঠ করে এবং স্থানীয় অধিবাসীরা বাধা দেওয়ায় তাহা ভস্মীভূত করে। বহু লোক ঘরবাড়ী ছাড়িয়া পলাইয়াছিল। আমরা প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতাম। এখানে অনেক আপেল ও আঙ্গুরের বাগান আছে। আট আনা পয়সা দিলেই এক ঝুড়ি ফল পাওয়া যাইত। একদিন বিখ্যাত নিড়োর হোটেলের চৌকিদারের সহিত দেখা হইল। সে কি ভাবে হোটেলটি লুণ্ঠিত ও পরে ভস্মীভূত

হইল তাহার কাহিনী আমাদিগকে বলিল। নিড়ো ছিলেন অষ্ট্রেলিয়ান। তিনি কাশ্মীরে বেড়াইতে আসিয়া একটি নিরক্ষর মুসলমান মেয়েকে বিবাহ করেন এবং কাশ্মীরে স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন। কাশ্মীরের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী মহম্মদ শেখ আবদুল্লার পত্নী এই নিড়োরই কন্যা।

গুলমার্গ

সম্মুখে যুদ্ধ চলিতেছে। হাসপাতালের অলস জীবনে কয়দিনের মধ্যেই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাই একদিন যখন মেজর কেহার সিং জীপ লইয়া আসিয়া হাজির হইল তখন হাসপাতাল হইতে বিদায় লইলাম। প্রায় দুই সপ্তাহ টানমার্গে থাকার পর আমি আবার পল্টনে যোগদান করি।

এর পর প্রায় আট বৎসর অতীত হইয়াছে। আমি আবার কার্য্যবশতঃ কাশ্মীর রওয়ানা হইয়াছি। পাঠানকোট হইতে স্থলপথে শ্রীনগর প্রায় ২৬০ মাইল এবং চল্লিশ ঘণ্টার পথ কিন্তু আকাশপথে মাত্র এক ঘণ্টারও কম সময় লাগে। তাই এবার আমি পাঠানকোট হইতে এরোপ্লেনেই যাত্রা করিলাম। অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা জম্মু অতিক্রম করিলাম। উপর হইতে দেখা যাইতেছিল, জম্মু হইতে সরীসৃপের মত আঁকাবাঁকা পথ দুস্তর পাহাড়ের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই পথটি আমার বিশেষ পরিচিত। কুদ এবং রামবন অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে এরোপ্লেনটি আরও উপরে উঠিতে আরম্ভ করিল এবং বেশ নাগরদোলার ঝাঁকানি অনুভব করিলাম। নবাগত যাত্রীদের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্যও দেখা গেল। বুঝিতে বিলম্ব হইল না আমরা বিখ্যাত বানিহাল পর্ব্বতশৃঙ্গের নিকটবর্ত্তী হইতেছি। বানিহালের চূড়া তখনও মেঘাচ্ছন্ন। তাই পাইলট অতি সতর্কতার সহিত মেঘের উপর দিয়া বানিহাল অতিক্রম করিল। বানিহাল পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা মর্ত্ত্যের অমরাবতী কাশ্মীর উপত্যকায় প্রবেশ করিলাম।

এ বৎসর কাশ্মীরে যত ভ্রমণকারী আসিয়াছে পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। রাস্তায় রাস্তায় দেখা যাইতেছে নানা ধরনের পোষাক-পরিহিত দেশ-বিদেশের নরনারী। এই বৈচিত্র্যের মধ্যেও এক বিষয়ে ঐক্য লক্ষ্য করা গেল—প্রায় সকলেরই পিটে একটি ক্যামেরা ঝুলানো। ভ্রমণকারীদের ইহাই একটি বৈশিষ্ট্য।

ডাল হ্রদ, সালিমার বাগ, নিশাদবাগ, চশমাশাহীতে যেন মেলা বসিয়া গিয়াছে। শ্রীনগরের দোকানগুলি শাল, রেশম এবং সূক্ষ্ম কাঠ ও রূপার জিনিষে পরিপূর্ণ দোকানীরা একই জিনিষ কাহারও নিকট দশ টাকায় আবার কাহারও নিকট ত্রিশ টাকায় বিক্রী করিয়া বেশ দু'পয়সা করিয়া নিতেছে। কাশ্মীর সরকার ভ্রমণকারীরা যাহাতে প্রতারিত না হয় তজ্জন্য নানা ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ বিষয়ে কাশ্মীর পুলিসের কর্ত্তব্যপরায়ণতার মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না।

এবারকার ও প্রথমবারের দেখা কাশ্মীরের মধ্যে কত পার্থক্য। তাই আমি আবার গুলমার্গ যাওয়া স্থির করিলাম।

শ্রীনগর হইতে গুলমার্গের পথ সমতল। টানমার্গ হইতে শেষ তিন মাইল মাত্র উৎরাই। রাস্তার দুই ধারে ধানের ক্ষেত এবং মাঝে মাঝে সবুজের সমারোহে ঘোর পল্লী। প্রত্যেকের গৃহের ছাদে ইহারা লঙ্কা, বেগুন এবং নানা সব্জী শুকাইতেছে। শীতের সময় কাশ্মীর উপত্যকা বরফে ঢাকা পড়ে বলিয়া ঐ সময় কোন সব্জী উৎপন্ন হয় না। তাই এই শীতের সঞ্চয়।

গুলমার্গের পথে পপলার বীথি বড়ই চিত্তাকর্ষক। টানমার্গ হইতে গুলমার্গের উৎরাই-এর উপর দিয়া আঁকাবাঁকা পথ। এই পথে জীপ, ট্যাক্সি যাইতে পারে কিন্তু বড় গাড়ীগুলিকে যাইতে দেওয়া হয় না। অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের বিছানাপত্র কুলির পিঠে দিয়া আমরা ঘোড়ায় চড়িলাম। আমার আট বৎসর বয়স্ক পুত্র পার্থ ঘোড়ায় উঠিয়াই দ্রুতগতিতে ঘোড়া ছাড়িয়া দিল। শ্রীনগরে তার ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস ছিল।

এই পথে ঘোড়ার পদস্খলন হইলে বহু নীচুতে পড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমরা যখন বেশ খানিকটা উৎরাই অতিক্রম করিয়াছি তখন এক 'জন গিলপিন' দ্রুতগতিতে ঘোড়া ছুটাইয়া আমাদিগকে অতিক্রম করিল। আমাদের ঘোড়াগুলিও ভয় পাইয়া অস্থির হইয়া উঠিল। আমি বিরক্ত হইয়া ভদ্রলোককে ধমক দিলাম—ভদ্রলোকের রাস্তায় অন্যান্য সহযাত্রীর কথাও বিবেচনা করা উচিত। ভদ্রলোক জবাব দিলেন যে, তিনি তাহার সহযাত্রীদের এবং নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে খুবই চিন্তিত কিন্তু তাঁহার ঘোড়াটিই এবিষয়ে একেবারে উদাসীন। আমি আগে যাইয়া ধাবমান ঘোড়ার মুখের লাগাম ধরিয়া ঘোড়াটিকে দাঁড় করাইলাম। ভদ্রলোক আমাকে ধন্যবাদ দিলেন।

আমরা গুলমার্গে পৌঁছিয়াই *দেখি পার্থ* হাসিমুখে দাঁড়াইয়া

খেলান মার্গ

এই পথে প্রায় তিন মাইল চলার পর আমরা বাপম ঋষির মন্দিরে পৌঁছিলাম। এই মন্দিরে হিন্দু ও মুসলমান সমভাবে পূজার জন্য আসিয়া থাকে। আমার ধারণা ছিল বাপম ঋষির মন্দির কোন হিন্দু যোগীর সমাধিতে নির্ম্মিত হইয়াছে। বাপম ঋষি প্রকৃত প্রস্তাবে একজন মুসলমান ছিলেন—তাঁহার নাম পিয়াউদ্দীন। তিনি ছিলেন কাশ্মীর রাজদরবারের সভাসদ। তিনি একদিন কতকগুলি ইঁদুরকে দেখিলেন যে, ইহারা শীতের সঞ্চয় করিতেছে। পিয়াউদ্দীন ভাবিলেন পরপারের জীবনের জন্য আমি ত কিছুই সঞ্চয় করি নাই। তাই লালাবাবুর মত তিনি একদিন গৃহত্যাগ করিয়া কঠোর তপস্যায় রত হন এবং অল্প সময়ের মধ্যে ঋষি বলিয়া এ অঞ্চলে খ্যাতি অর্জ্জন করেন। বাপম ঋষি ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে মহাপ্রয়াণ করেন এবং তাঁহার কবরের উপরই এই সমাধিমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

আছে। অল্প সময়ের মধ্যে কুলিরাও ছোট রাস্তায় আমাদের বিছানাপত্র লইয়া হাজির হইল।

আমরা একটি হোটেলে যাইয়া উঠিলাম। হোটেল ব্যবসায়ে কাশ্মীর সারা ভারতের মধ্যে অগ্রণী। এখানকার অতি সাধারণ হোটেলেরও মান আমাদের মফঃস্বলের হোটেল অপেক্ষা উন্নত।

হোটেলে জিনিষপত্র রাখার পর চা-পান করিয়া আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম। শ্রীনগরের তুলনায় এখানে বেশ শীত বোধ হইতে লাগিল। গুলমার্গের সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উচ্চতা আট হাজার ফুট। গুলমার্গকে বেষ্টন করিয়া আছে একটি সাত মাইল দীর্ঘ গোলপথ। অনেকে বলেন এর জন্যই ইহার নাম হইয়াছে গুলমার্গ। রাস্তার দুইধারে পাইন বন। সমগ্র পথটিই পাখীর কলরবে মুখরিত। আবেষ্টনটি কবিত্বপূর্ণ। এই রাস্তা হইতে নিম্নে সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকাকে চোখে পড়ে। অদূরে পাহাড়ের বুকে ফিরোজপুর নালার বারিপতনের শব্দ শোনা যাইতেছিল। এই নালাতে কয়েকটি ক্ষুদ্র ঝরণাও আসিয়া মিশিয়াছে। চারিদিকের নিবিড় নিস্তব্ধতার মধ্যে এই ঝরণার শব্দ শুনিয়া রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতার কয়েকটি ছত্র মনে পড়িয়া গেল—

"যত কাল আছে বহিতে পারি
যত দেশ আছে ডুবাতে পারি···"

গুলমার্গের পাহাড়ের নীচে কয়েকটি পল্লী চিত্রের মত মনে হইতেছিল। একটি গ্রাম হইতে গানের সুর ভাসিয়া আসিতেছিল। ইহাদের গানের সুর বাংলার পল্লীগীতির সহিত সাদৃশ্য আছে। এই গান আজ দূরদেশে আমাকে নিজের সুদূর গ্রামের কথা স্মরণ করাইয়া দিল।

হোটেলে ফিরিতে বেশ রাত হইয়া গেল। আমরা বারান্দায় বসিয়া রাতের গুলমার্গকে দেখিতে লাগিলাম। দূরে খিলানমার্গের উপর দিয়া দ্বিতীয়ার বাঁকা চাঁদ মেঘের আড়ালে দেখা যাইতেছিল। ঢালু পাহাড়ের বুকে পাইন বনের ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট বাংলো হইতে আলোক ঠিক্‌রাইয়া পড়িয়া রাতটিকে নিবিড় রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছিল। দূরে হিমালয়ের শৃঙ্গগুলি রাত্রির স্তিমিত আলোকে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মত প্রতীয়মান হইতেছিল।

পরদিন ভোরে উঠিয়াই আমরা খিলানমার্গ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে খিলানমার্গের উচ্চতা প্রায় এগার হাজার ফুট হইবে। গুলমার্গ হইতে পাইনবনের ভিতর দিয়া

গুলমার্গ

আঁকাবাঁকা একটি সরু পথ। সেখানে ঘোড়ায় পিঠে পৌঁছাইতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা গলফ্ কোর্সটি অতিক্রম করিলাম। খুব ভোর হইতেই যাত্রীরা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। আজ গুলমার্গে যেন মেলা বসিয়া গিয়াছে। বিচিত্র বসন-ভূষণে দেশ-বিদেশের নরনারী খিলানমার্গ যাত্রী। এর মধ্যে বৃষ্টি পড়িতে সুরু হওয়ায় রাস্তা বেশ কর্দমাক্ত ও পিচ্ছিল হইয়া উঠিল। কিন্তু ঘোড়াগুলো বেশ সতর্কতার সহিত চলিতে লাগিল। সৌভাগ্য-বশতঃ আমরা যখন খিলানমার্গে পৌঁছিলাম তখন বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। মনে হইল আমরা যেন এক নূতন জগতে প্রবেশ করিয়াছি।

এখান হইতে সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকাকে অতি স্বচ্ছভাবে চোখে পড়ে। খিলানমার্গ হইতে নীচে গুলমার্গকে পটে আঁকা ছবির মত মনে হয়। এখান হইতে নাঙ্গা পর্ব্বতের দৃশ্য (২৬,৬৬০ ফুট) অতি অপূর্ব্ব। বহু নিম্নে দূরে উলার ও ডাল হ্রদের স্ফটিকশুভ্র জলরাশি সূর্য্যালোকে ঝলমল করিতেছিল। হরি-পর্ব্বত ও শঙ্করাচার্য্যের মন্দির দেখা যাইতেছিল এবং অনেক দূরত্ব সত্ত্বেও মনে হইতেছিল যেন ইহারা মাত্র কয়েক মাইল দূরে।

শীতের সময় সমগ্র খিলানমার্গ বরফাচ্ছাদিত হয় বলিয়া এখন বরফের উপর স্কি খেলার জন্য একটি সাময়িক ক্লাব খোলা হয়। উত্তর মেরুর এই ক্রীড়াটি এর মধ্যে এদেশে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে!

খিলানমার্গ হইতে কিছুটা উৎরাই অতিক্রম করিলে একটি সুন্দর হ্রদে পৌঁছান যায়। এই হ্রদটির নাম আলপাথরি এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহার উচ্চতা ১৩,২৫০ ফুট। কিন্তু সন্ধ্যা সমাগত। তাই আমরা আবার গুলমার্গের পথে শ্রীনগরের পথ ধরিলাম।

ফুলের গন্ধে

শ্রীকালিদাস রায়

মনে পড়ে শেফালির গন্ধে
বাল্যের খেলাপাতি সখীদের সঙ্গে।
মনে পড়ে বকুলের গন্ধে
প্রবাসের গৃহখানি উত্তর বঙ্গে।
মনে পড়ে মালতীর গন্ধে
চতুষ্পাঠীর সেই প্রাঙ্গণ প্রান্ত,
যেখানে শকুন্তলা গ্রন্থে
হলাম স্বপ্নলোকে অভিনব পান্থ।
মনে পড়ে মহুয়ার গন্ধে
পালামৌয়ে প্রিয়া সহ জাগা সারা রাত্র।
স্মরি চীনা করবীর গন্ধে
সেই বন পথখানি যবে আমি ছাত্র।
মনে পড়ে কমলের গন্ধে
মায়ের বদনখানি অশ্রুতে সিক্ত।
মনে পড়ে আউচের গন্ধে
সাঁঝের সে মেঠোপথ বিজন বিবিক্ত।
মনে পড়ে কদমের গন্ধে
বৈরাগী আখড়ার ঝুলনের রাত্রি,
তারি মত পুলকিত অঙ্গে
মনোরথে ব্রজপথে হইলাম যাত্রী।

মনে পড়ে চম্পক গন্ধে
বধূর আঁচলে সেই কম্পিত লজ্জা,
প্রথম কল্পিত মম হস্তে
ছায়া মণ্ডপে, কেশে চম্পক সজ্জা।
এমনি নানান ফুল গন্ধে
জাগে মনে যৌবন, কৈশোর, বাল্য।
যেন তার সুরভিত ছন্দে
স্মৃতি রচিয়াছে গাঁথি নব গীতিমাল্য।
ফুল ফুটে ঝরে যায় নিত্য
গন্ধ অমর তার লয়ে বৈচিত্র্য।
কভু তা' পরশ, গীতি, চিত্র;
যাই হোক সে-ই মোর আজীবন মিত্র।
অতীত জীবন নানা খণ্ডে
অংশিত হয়ে রয় ছড়ায়ে বহুত্র
নানান ফুলের নানা গন্ধ
গাঁথিয়া রেখেছে তারে হয়ে যোগ সূত্র।
ভুলিয়া যেতাম কত দৃশ্য
কতই ঘটনা, কথা, কত শত তথ্য।
কুসুমের গন্ধের সূত্রে
বাঁধা পড়ে হয়ে আছে শাশ্বত সত্য।

শ্রীদীপক চৌধুরী

সুতপার বিবৃতি

দশ বছর পরে একখানা ভাল শাড়ি খুঁজতে বসলাম আমি। বিয়ের সময় দু'চারখানা ভাল এবং দামী শাড়ি কিনে দিয়েছিলেন বাবা। কোনদিনও পরি নি, কেনবার সময়েই বাবাকে বারণ করেছিলাম, বাবা তবু কিনলেন। তাঁর মত অবস্থায় মানুষের ত পাগল হয়ে যাওয়ার কথা! চার আনার ফুলুরী খেয়েও দিন কেটেছে আমাদের। বিয়ের আগে দেখলাম, বাবা গহনা কিনলেন, কাপড়চোপড়ও কম কিনলেন না। পাড়ার সবাই ভেবেছিল, বাবা বোধ হয় পয়সা দিয়ে একটা কলাগাছও কিনতে পারবেন না। অথচ কলাগাছ না হলে হিন্দু মেয়ের বিয়েই বা হয় কি করে? তার পর বিয়ের দিন আরও অনেক কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে। বাবা নাকি চার হাজার টাকা নগদ দিয়ে জামাই কিনে আনছেন! পাড়ার রামসদয় বাবু বললেন, 'তবু বলতে হবে এমন কিছু বেশি দাম পড়ে নি। লড়াই থেমেছে বটে, কিন্তু ভাল পাত্রের দাম কমল কই? অপেক্ষা করলে ছেলেটি হাজার দশেকও নগদ পেত।' রামসদয় বাবু নিজেই বোধ হয় হাজার দশেক দিতে প্রস্তুত ছিলেন। যুদ্ধের সময় ঠিকেদারী করে অনেক পয়সা করেছিলেন। তাঁর মেয়ের বয়স আমার চেয়ে এক বছর বেশি ছিল। বিয়ের দিন সকাল বেলায়ই এলেন তিনি। এলেন অনুসন্ধান করতে। তাঁর ধারণা ছিল, বাবা তখনও চার হাজার টাকা যোগাড় করতে পারেন নি। আমার স্বামীর ঠিকানা তিনি জানতেন, দু'দিন আগে লোক পাঠিয়ে খবর নিয়েছিলেন তিনি যে, পাত্রের হাতে তখনও নগদ টাকা গিয়ে পৌঁছয় নি। রামসদয় বাবু সেই থেকে লম্বা কোটের গুপ্ত-পকেটে হাজার দশেক নগদ নিয়ে ঘোরাঘুরি করছিলেন। অথচ বিয়ের দিন রাত্রে তিনি যখন নেমন্তন্ন খেতে এলেন তখন উপহারের জন্যে হাতে করে নিয়ে এলেন একখানা বই। বইটির নাম ছিল, 'মন্বন্তর'।

কি করে অত টাকা যোগাড় করলেন বাবা, তার জবাব তাঁকে দিতে হয় নি, হাত দুটো ত আগে থেকেই অবশ হয়ে গিয়েছিল। বিয়ের দিন শুনলাম, তাঁর জিভেও নাকি জড়তা এসেছে। বাবার সুবিধে হ'ল তাতে, হাজার হাজার প্রশ্নের উত্তর দিতে হ'ল না। ছবি-আকা পিঁড়িতে চেপে যখন ছাঁদনাতলার দিকে রওনা হব, তখন শুধু বাবা একবার কথা বলার চেষ্টা করলেন। আমার কানের কাছে মুখ নামিয়ে তিনি বলেছিলেন, "মা, ছেলেটি ভাল। বাপের কি একটা চার হাজার টাকার ঋণ ছিল। সেই জন্যেই চার হাজারের ওপরে একটা পয়সাও সে বেশি নিল না। রামসদয় ত আজ সকালেও হাজার দশেক দেওয়ার জন্যে সেখানে দালাল পাঠিয়েছিল।"

এর পরে বাবার মুখ থেকে আর একটি কথাও শুনি নি। মরবার দিন পর্যন্ত তিনি নীরব ছিলেন। অবিশ্যি আমার নীরবতাও ছিল সে সময়কার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বিয়ের পরেও আমি কথা কই নি। স্বামীর ঘরে ঢুকতে আমার ভয় করত, নাগপুর থেকে আমার এক ননদ এসেছিলেন আমার ভয় ভাঙাবার জন্যে। প্রথমে স্বামী সন্দেহ করেছিলেন আমি সম্ভবতঃ অন্য কোন পুরুষমানুষকে ভালবাসি। আমি বুঝতাম, মনে মনে তিনি কষ্ট পাচ্ছেন। আর দেহের কষ্ট যে তাঁর প্রতিদিন সহ্যের সীমা অতিক্রম করছে তা ত জানা কথা। ননদের কোন তুকতাকই কাজে লাগল না। বক্তৃতা দিয়ে ভেতরের রহস্য সব বোঝাবার তিনি কম চেষ্টা করেন নি! কাপড় পরবার অজুহাতে সবরকম খুঁটিনাটির দিকেও তিনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু স্বামীর ঘরে ঢুকলেই আমার কান্না পেত। কেঁদেছিও আমি। পাড়ার মেয়েরা ননদকে দু'এক দিন জিজ্ঞাসা করেছে, "নতুন বৌকে তোমার ভাই মারধোর করেন নাকি?"

শেষ পর্যন্ত এঁরা সবাই বুঝতে পারলেন, আমার পেছনে কোন ব্যর্থ প্রেমের জটিলতা নেই, আমি অসুস্থ। ঠাণ্ডা ব্যাধিতে ভুগছি আমি। ডাক্তাররা কেউ কেউ বললেন, এর পরে আমি হিষ্টিরিয়া রোগে ভুগব। অবিশ্যি তাঁদের কথা ঠিক হয় নি। বিয়ের পরে এমন বৌকে নিয়ে কেউ ত ঘর করতে চায় না—আমার স্বামীও চাইলেন না। তিনি মানুষ, ধৈর্য হারিয়ে অস্থির হয়ে ওঠা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিকই হ'ল। ফিরে এলাম বাবার কাছে। গহনাগুলো সঙ্গে

নিয়েই এসেছিলাম। সেগুলো বেচে চাল-ডাল কিনতে লাগলাম আমি। ওষুধ কেনবার জন্মে একটা পয়সাও খরচ করতে হয় নি। বাবা এক ফোঁটা ওষুধও খাবেন না বলে শয্যা নিয়েছিলেন। মেয়ে-বিয়ের সামাজিক কর্তব্য পালন করবার পর আর কোন কর্তব্য পালনের চেষ্টা তিনি করেন নি। সময় যখন এল তিনি চোখ বুজলেন। আমার চেয়েও বেশি বিপদে পড়লেন জেটমল মাড়োয়ারী। তাঁর কাছে বাড়ী বাঁধা রেখেছিলেন বাবা। এখন তাঁর টাকা শোধ করবার লোক রইল কে? তা ছাড়া এত বেশি টাকা নাকি তাঁর কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল যে, অমন বাড়ী দু'খানা বেচলেও উদ্বৃত্ত কিছু থাকবে না। আধুনিক রাজপুতনার ইতিহাসে লাভ-লোকসানের হিসেবটাই উজ্জ্বলতম অধ্যায়। মোকদ্দমা রুজু করলেন তিনি।

আজ একটা ভাল শাড়ি পরবার জন্মে ট্রাঙ্কের ডালা খুলে বসলাম। জর্জেট একটা হাতে ঠেকল। কালো জমিনের ওপর নানা রঙের লতাপাতার প্রিণ্ট। বাবার পছন্দ খুব খারাপ ছিল না। সাজতে-গুজতে অনেক সময় নিলাম আজ। জানি, সাজবার কোন দরকার নেই। নতুন করে ক্যাপটেনকে কিছু দেখবারও ছিল না, তবুও যত্ন নিয়ে সাজলাম আজ।

যেতে হবে লুডন ষ্ট্রীটে। ঠিকানা লেখা কাগজের টুকরোটা ব্যাগের মধ্যে ভরে রাখলাম। রতনকে বলে গেলাম ফিরতে দেরি হবে আজ, নইলে রতন হয়ত জেগে বসে থাকবে। সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টা হ'ল।

নিচে নেমে এলাম। এটা হোটেল, আর কাউকেই জানিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই—এমনকি মাসীমাকেও নয়। এই ভেবে বাগানের রাস্তায় নেমে পড়তে যাচ্ছিলাম, বলরাম এসে সামনে দাঁড়াল। সারা দুপুরটা হেঁটে হেঁটে সে এইমাত্র গোবিন্দপুর থেকে এসে পৌছল।

বলরাম বলল, "বাক্সটা একটু ধরবে, তপাদি?"

মাথার ওপরে রং-চটা একটা বত্রিশ ইঞ্চি মাপের টিনের ট্রাঙ্ক। তার ওপরে শতরঞ্জি দিয়ে বাঁধা মস্ত বড় একটা বিছানা। তার তলায় গোঁজা রয়েছে দু'খানা মাদুর। ট্রাঙ্কের হাতল দুটো দেখলাম এখনও খুলে পড়ে নি। হাতলের সঙ্গে দুটো মগ আর তিনটে কাঁসার ঘটি নারকোলের দড়ি দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছে। সম্ভবতঃ ব্যালান্স রাখবার জন্মেই চণ্ডীদা অন্য দিকের হাতলটাও খালি রাখে নি, বেশ বড় সাইজের একটা পেতলের কলসী দিয়েছে বেঁধে। ভাল করে নজর দিতে গিয়ে বুঝতে পারলাম, কলসীটা শূন্য নয়। বলরাম বলল, "এতে গঙ্গাজল আছে, তপাদি। বৌদি ছুটে গিয়ে ভটচাজদের গঙ্গা থেকে এক কলসী জল নিয়ে এলেন। বললেন, হোটেলের ঘরে হাজার জাতের যাওয়া-আসা। মাল ঢুকবার আগে ঘরটা ধুয়ে দিতে হবে। তুমি আজ সেজেছ কেন, তপাদি? ষষ্ঠীদা বুঝি মুখে তোমার রং মাখিয়ে দিলে?" চোখের ওপর থেকে লম্বা চুলের গোছা ঠেলে ঠেলে পেছন দিকে সরিয়ে রাখল সে।

বললাম, "বড়সাহেবের বাড়ী যাচ্ছি। শম্ভুঠাকুরকে বলিস, রাত্রে খাব না। হ্যাঁ রে, চণ্ডীদা পয়সা দিয়েছে?"

"না। বললে যে, ফুরণে যখন কাজ ধরেছি তখন সব মাল না নিয়ে এলে পয়সা পাব না। রবিবার দিন একসঙ্গে দেবে। তপাদি, শম্ভুঠাকুরকে একটু বলে যাও না—"

"কি? কি বলব রে, লক্ষ্মীছাড়া?" মুহূর্তের মধ্যে একটা কাণ্ড করে বসলাম!

রাগ সামলাতে না পেরে বলরামের গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিলাম। তার লম্বাচুলের গোছা ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলাম রান্নাঘরে। বললাম, "আহাম্মক, দুনিয়াসুদ্ধ লোকে ঠকিয়ে ঠকিয়ে হদ্দ করে দিচ্ছে, বুঝতে পারিস না? ষষ্ঠীদা ঠিকই করে। তোকে গাল দেয়, রিফিউজীর বাচ্চা বলে।"

"না, গাল দেয় না। ষষ্ঠীদা আমায় ভালবাসে।"

"ভালবাসে? চড় খেয়েও বাঙালের গোঁ যায় না দেখছি! ভালই যদি বাসে, তবে খাওয়ার বায়না সব আমার কাছে কেন? যা না ষষ্ঠীদার কাছে, যা না খাদ্যমন্ত্রীর দরজায়—আমি তোর কে? বল লক্ষ্মীছাড়া, আমি তোর কে?"

"তুমি আমার তপাদি। মারতে গিয়ে হাতে ব্যথা পেলে বুঝি?"

"না।"

"তবে কাঁদছ যে? অত জোরে মারতে গেলে কেন?"

"মারব না? বেশ করব। তোর মত আহাম্মককে সবাই মারবে। বাঙাল কোথাকার! তোর জন্মে কাঁদব, না ছাই!"

এই বলে একটা পাঁচ টাকার নোট ওর পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে এলাম রান্নাঘর থেকে।

মুখের পাউডার চোখের জলে গলে গিয়েছিল। আয়নায় দেখলাম, ছাতলার মত জায়গায় জায়গায় পাউডার সব জমে রয়েছে। বাড়ি থেকে বেরুতে দেরি হয়ে গেল। যে মন নিয়ে বড়সাহেবের বাড়ী যাচ্ছিলাম 'ডিনার' খেতে সে মন আর রইল না। সারাটা পথ বসে বসে শুধু ভাবলাম, বলরামকে সঙ্গে নিয়ে এলেই হ'ত। আমি আর কতটুকু খাব, টেবিল থেকে সব খাবারই ত বাবুর্চিখানায় ফিরে

যাবে। যাদের ঘরে প্রচুর খাবার আছে এবং যারা অপরকে খাওয়াতেও চায়, তারা কেন বলরামকে নেমন্তন্ন করে না ?

বড়সাহেব বাইরের গেটের সামনেই অপেক্ষা করছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন তিনি, "বাড়ীটা খুঁজে বার করতে দেরী হ'ল নাকি ?"

"না—একেবারেই পেয়ে গেলাম।"

দোতলায় উঠতে উঠতে তিনি বললেন, "আপিস থেকে বেরুতে আজ খুবই দেরি হয়ে গেল। ফিরেছি বোধ হয় মিনিট দশেক আগে।"

দেখলাম, আপিসের পোশাক তাঁর পরাই রয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম, "এত দেরি হ'ল যে ?"

"কর্মচারী ইউনিয়নের ছেলেরা সব এসেছিল দেখা করতে। তাদের কথা সব শুনতে হ'ল।"

"সিদ্ধান্ত কিছু দিতে হয় নি ত ?" কায়দা করে অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়লাম।

"না—গুরুতর ব্যাপার কিছু নয়। তবু ডিসিশন নিতে একটু সময় লাগবে। থাক, আপিস থেকে বেরিয়ে আপিসের আলোচনা আর ভাল লাগে না। ছবি আঁকার কাজই আমার ভাল ছিল। এ সব কাজে ঝঞ্ঝাট অনেক—"

"মাইনেও তাই পাঁচ দশ হাজার—।" হঠাৎ থেমে গেলাম।

বড়সাহেব হেসে ফেললেন। ড্রইং-রুমের ভেতরে গিয়ে বললেন তিনি, "তুমি এখানে বসে কফি কিংবা চা খাও। চট করে আমি আপিসের কাপড়টা বদলে নিই। ওখানে অনেক দেশের অনেক রকমের ম্যাগাজিনও আছে। কৃষ্ণবল্লভ—"

"জী—" ভেতরে ঢুকল কৃষ্ণবল্লভ সিং।

"মেমসাহেবকে কফি—"

"কফি আমি খাই নে ক্যাপটেন।"

"তা হলে চা দাও। আর কি খাবে ? বেয়ারা—" ঘুরে দাঁড়িয়ে বড়সাহেব বললেন, "মিঠাই আনবার কথা ছিল—"

"আনা হয়েছে হুজুর।"

"ভেরি গুড। লে আও।"

"এখন শুধু চা-ই খাব।" বললাম আমি।

"বেশ, বেশ—আমি তা হলে আসছি।" বড়সাহেব পর্দা ঠেলে ভেতর দিকে চলে গেলেন। কৃষ্ণবল্লভ গেল অন্য দিকে, অন্য দরজা দিয়ে।

আমাদের সরকার-কুঠির দু'খানা ঘরের সমান হবে বড়সাহেবের ড্রইং-রুমটা। জানালা-দরজার সংখ্যাও বড় কম না। প্রত্যেকটা জানালা ও দরজার ওপর থেকে পাতলা লেসের পর্দা টাঙানো। দু'দশ লোক একসঙ্গে বসে যেন গল্প করতে পারে তার ব্যবস্থা রয়েছে। ঘরের দু'দিকে দু'সেট সোফা। পর্দা, সোফা আর দেওয়ালের রং একই রকম—হলদের মধ্যে ঈষৎ গোলাপী মেশানো। ঘরের চার কোণায় চারটে টেবিল, বড় নয় মাঝারি সাইজের। প্রত্যেকটা টেবিলের ওপর একটা করে টেবিল-ল্যাম্প। ল্যাম্পের শেডগুলোও সব একই রঙের, পর্দার সঙ্গে ম্যাচ করানো। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, ঘরের কোথাও কোন ছবি নেই। দেওয়ালগুলি ফাঁকা। দেখলাম, দু'একটা নামহীন জংলী পোকা শুধু আলোর আকর্ষণে দেওয়ালের ওপর উড়ে এসে বসেছে। বোধ হয় লুডন ষ্ট্রীটের সেই নোংরা পার্কটাতে এদের আদি বসতি ছিল। আমি উঠে পড়লাম।

দক্ষিণ দিকের টেবিলটার দিকে হেঁটে গেলাম আমি। একগাদা ম্যাগাজিন উঁচু করে সাজানো রয়েছে। তারই পেছনে দেখলাম, ফ্রেমে-বাঁধানো একটা ছবি। সামনের দিক থেকে ছবিটা দেখা যায় না।

বছর পনর-ষোল বয়সের একটি চীনা ছেলে। বুকের ছাতি খুবই চওড়া। গোল-গলার উলের গেঞ্জি পরেছে বলেই বোধ হয় বুকটাকে অত বেশি চওড়া দেখাচ্ছে। মাথার ওপর কালো রঙের স্পোর্টস ক্যাপ বসান। মাথায় তার এত বেশী চুল যে, টুপীর তলা থেকে চুলের গুচ্ছ বেরিয়ে পড়েছে সামনের দিকে। চীনদেশের ছেলে, সে সম্বন্ধে ভুল করবার কোন কারণই নেই।

এরই মধ্যে কৃষ্ণবল্লভ চা নিয়ে এসেছে। সাজিয়ে দিয়েছে চায়ের সরঞ্জাম। আমি টেরই পাই নি, টের পাওয়ার কথাও নয়। সারা মেঝে জুড়ে পুরু কার্পেট পাতা। কৃষ্ণবল্লভ যখন আমার পেছনে এসে দাঁড়াল, তখন আমি ফটোখানা হাতে তুলে নিয়েছি। সে ডাকল, "মেমসাহেব—"

"ও, তুমি!" নামিয়ে রাখলাম ফোটো। কিছু একটা তাড়াতাড়ি বলতে হ'ল, জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি কি সাহেবের বাড়িতেও কাজ কর নাকি ?"

"জী না, শুধু আজকেই এসেছি। কাউকে নেমন্তন্ন করলে সাহেব আমাকেও ডাকেন।"

"ও, বেশ।" টেবিল থেকে একটা ম্যাগাজিন তুলতে গিয়ে প্রথমখানাই চীনদেশের কাগজ। কভারের ওপরে একটা ছবি রয়েছে। ছবিটার সঙ্গে ফোটোখানার কি অদ্ভুত সাদৃশ্য! সবকিছু কেমন যেন গুলিয়ে গেল। সরে এলাম সেখান থেকে। হয়ত আমারই ভুল হ'ল। ভুল ? না, আমি ঠিকই দেখেছি।

কৃষ্ণবল্লভ তখনও দাঁড়িয়েছিল সেণ্টার টেবিলের পাশে। চা ঢালতে ঢালতে জিজ্ঞাসা করলাম, "ফোটোখানা কার ?"

মনে হ'ল, ঠিক এই প্রশ্নটা শোনবার জন্যেই সে অপেক্ষা করছিল এবং জবাবটাও ঝুলছিল তার ঠোঁটের বাইরে। কৃষ্ণবল্লভ বলল, "হামি ঠিক জানি না, তবে শুনেছি, সাহেবের লেড়কা, বিলাইতে পড়া শিখছে।"

"লেড়কা ?" ধাক্কা খেলাম যেন! চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে বললাম, "ও ত চীনা ছেলের ফোটো ?"

"হা হা, সো ত আপনি ঠিকই বোলিয়েছেন। মগর শুনতা হায়, উনিকো লেড়কা। আচ্ছা মেমসাব, হামি বাবুর্চিখানায় যাচ্ছি, দোরকার হলে ডাকবেন। রোসগোল্লা খাবেন মেমসাব ?"

"না।"

চলে গেল কৃষ্ণবল্লভ।

বসে বসে আকাশপাতাল ভাবতে লাগলাম আমি। এ-যাবৎকাল যা ভেবেছি তার কেন্দ্র ছিল আমার নিজের মধ্যেই। বাইরের ঘটনা আমায় স্পর্শ করতে পারে নি। যে ঘটনার সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ নেই তার প্রতি আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। আজ বোধ হয় এই প্রথম পুরনো অভ্যাস ছাড়তে হ'ল আমায়। আমি একেবারে নিঃস্বার্থ ভাবে বড়সাহেবের কথাই ভাবছি। শেলী এ্যাণ্ড কুপার কোম্পানীর বড়সাহেবদের পুরনো বেয়ারা কৃষ্ণবল্লভ সিং। তার কথা হেসে উড়িয়ে দেওয়া অসম্ভব, আমি অন্ততঃ পারি নে। হাজার হলেও আমি ত ওই কোম্পানীর একজন সাধারণ ষ্টেনো-টাইপিস্ট। কৃষ্ণবল্লভের চেয়ে মাইনে আমার বেশি বটে, কিন্তু মর্যাদা আমার কম।

বড়সাহেব এলেন। 'ডিনার' খাওয়ার বিশেষ পোশাক তিনি আজ বর্জন করেছেন দেখলাম। স্যাটিন কাপড়ের সাদা ট্রাউজার আর নীল রঙের বুশ সার্ট পরেছেন তিনি। শেলী এ্যাণ্ড কুপার কোম্পানীর বড়সাহেব বলে আর তাঁকে চেনা যাচ্ছে না। বুঝলাম, লোকটিকে চিনতে সময় লাগবে।

মুখোমুখি হয়ে বসলাম আমরা। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "চা খেলে না যে ?"

চা খেতে ভুলে গেছি, মনেই ছিল না। বললাম, "ঠাণ্ডা চা খেতেই আমি ভালবাসি।" পেয়ালাটা তুলে নিলাম হাতে।

"ঠাণ্ডার প্রতি আকর্ষণ তোমার গেল না—" পাইপটা দাঁতের ফাঁকে ধরে রেখে ক্যাপটেন জিজ্ঞাসা করলেন, "আণ্টি কেমন আছেন ?"

"ভাল নেই।" জবাবটা সত্য হ'ল কিনা জানি না। আমি নিজে গিয়ে এখনও একবার মাসীমার খোঁজ নিই নি। আত্মকেন্দ্রিক মনন-রাজ্যে বাইরের হাওয়া ঢুকছে। আবদ্ধ-অর্গল খোলবার যে লোভ একটু হচ্ছে না অস্বীকার করি কি করে ?

"ক'টার সময় খাও ?" জিজ্ঞাসা করলেন বড়সাহেব।

"ঘড়ি মিলিয়ে খাওয়ার অভ্যাস আমার নেই। তুমি যখন বলবে তখনই খাব।"

"আচ্ছা সুতপা—" পাইপ নিবে গিয়েছিল, "আচ্ছা সুতপা, এই কোম্পানীতে কতদিন চাকরি করছ তুমি ?"

"পাঁচ বছর হয়ে গেছে।"

"ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত ঠেকছে আমার। সেই রক্ষিতের মোড় থেকে লুডন ষ্ট্রীট—কি ভীষণ পরিবর্তন! কি ভীষণ বিপ্লব!"

"বিপ্লব কোথায় দেখলে তুমি ?"

"বিপ্লব নয় ? তোমার বিয়ে হ'ল, অথচ—"

"অথচ স্বামী হারিয়ে গেল, এই ত ? যুদ্ধের সময় ত হাজার হাজার মেয়ে স্বামী হারিয়েছে। তাতে পৃথিবীর কি ক্ষতি হ'ল ? আমারও হয় নি।"

"কিন্তু তোমার স্বামী ত যুদ্ধে প্রাণ হারান নি ?"

ঠাণ্ডা চাটুকু এক চুমুকে খেয়ে নিলাম আমি। নিয়ে বললাম, "যুদ্ধ শুধু জলে, স্থলে এবং আকাশে হয় না। প্রত্যেকটি মানুষ নিজের মনের মধ্যেও যুদ্ধ করে। তার বাহ্যরূপ কিছু নেই। কিন্তু ভিকটিম আছে। যেমন আমার স্বামী।"

মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন বড়সাহেব। বললেন তিনি, "ভূমিকাটুকু ভাল। পরে আরও শুনব। চল, খেয়ে নিই।"

ডাইনিং রুমে উঠে এলাম আমরা! টেবিলে বসে বড়সাহেব বললেন, "জানি না, রান্না তোমার পছন্দ হবে কিনা। দিশী, বিলিতী দু'রকমই আছে।"

জবাব দিলাম না। মনে মনে ক্যাপটেনের হয়ে আমি বোধ হয় বলরামকে ডাকছিলাম। একটু বাদেই চমক ভাঙল আমার। যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। সুপ, ফিস্‌ফ্রাই থেকে কোর্মা কাবাব কিছুই বাদ যায় নি। বেছে বেছে খাওয়ার সুবিধে করে দেবার জন্যে বড়সাহেবের হুকুমমত সব খাবারই টেবিলের ওপর সাজিয়ে দিল কৃষ্ণবল্লভ। নানা রকমের ঘ্রাণ একসঙ্গে টানতে সুবিধে হ'ল বটে, কিন্তু গোটাতিনেক আইটেমের বেশি খেতে পারলাম না। খাওয়ার দিকে মনোযোগ ছিল না আমার। চীনা ছেলেটির মিষ্টি মুখখানা মাঝে মাঝেই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। তাড়িয়ে তোলবার চেষ্টা করেছিলাম আমিই। বড়সাহেবের মুখের সঙ্গে কোথাও কিছু মিল ধরা যায় কিনা সেই চেষ্টাই ছিল

আমার খাবার টেবিলের বিশেষ কাজ। খাওয়া শেষ হ'ল, কাজও ফুরলো।

বসবার ঘরে এসে প্রথমেই আমি ঘোষণা করলাম, "ক্যাপটেন, এমন কোন বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব না যার মধ্যে তর্কের সুযোগ আছে। তুমি আমায় গল্প শোনাও। তোমরা সভ্য দেশের মানুষ, একটা সভ্য গল্প বল।"

"সভ্য, না সত্য?" প্রশ্ন করলেন ক্যাপটেন। মনে হ'ল তিনি শুধু সত্য গল্প বলতে চান না, বিশেষ একটি গল্প তাঁর মনে পড়েছে। না পড়লেও যেন পড়ে, সেই চেষ্টা তাঁকে বুঝতে না দিয়ে বললাম, "মনে পড়ে মাসীমাকে তুমি একবার বলেছিলে—অবিশ্যি আজ থেকে প্রায় বারো বছর আগে বলেছিলে যে, কি এক অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে পড়ে তোমার জীবনের ধ্যানধারণা সব বদলে গেল। তুমি যে বদলেছ তা আমরা জানি। কারণ, ভারতবর্ষকে তুমি ভালবাস। কিন্তু কি অবস্থায় তুমি পড়েছিলে তার উল্লেখ সেদিন তোমার মুখ থেকে শুনি নি, কাহিনীটা শোনাও না।"

"সুতপা, তোমার কথা বলবার ধরন দেখে মনে হচ্ছে, মাঝখানের ক'টা বছর তোমার সত্যিই নষ্ট হয় নি।" এই বলে ক্যাপটেন হেওয়ার্ড রহস্যজনক ভাবে হাসতে লাগলেন। রহস্যের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ আছে আমি জানি। বিশেষ করে ওপরের রহস্য যে তাঁকে টানে তাও আমার অজানা নেই। মাসীমার উক্তি যদি সত্যি হয় তা হলে তাঁর কাছেই শুনেছি, 'ওপরের রহস্য' কথাটা ভগবানের বদলে ব্যবহার করেন ক্যাপটেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি হাসছ যে? না হয় চল, বেড়িয়ে আসি। তোমার ত তেলের অভাব নেই।"

"হ্যাঁ সেই বরং ভাল। কলকাতায় এসে গঙ্গার দিকটায় যাওয়া হয়ে ওঠে নি।"

ক্যাপটেন গাড়ি চালাচ্ছেন। তাঁর পাশেই বসলাম আমি, সাবধান হওয়ার দরকার হ'ল না। লুডন স্ট্রীট থেকে বেরিয়ে আসতে না আসতেই মনে হ'ল, লাহিড়ীসাহেব আর ক্যাপটেন হেওয়ার্ডের মধ্যে কত তফাৎ! একই পৃথিবীর দু'অংশের সভ্যতা একরকম নয়। গঙ্গার ধারে পৌঁছবার আগে ফস্ করে জিজ্ঞাসা করে বসলাম, "বড়সাহেব, আমায় তুমি বিলেত নিয়ে যাবে?"

"কি করবে সেখানে গিয়ে?"

"তোমাদের অংশে গিয়ে মানুষ দেখব।"

"অভাব পৃথিবীর সব অংশেই আছে, বিশেষ করে মানুষের। খরচ করে কষ্ট পেতে যাবে কেন?"

বাকি পথটা নিঃশব্দেই কাটল। উনিশশ' সাতান্ন খ্রীষ্টাব্দের স্মরণীয় রাত এটা। শেলী অ্যাণ্ড কুপার কোম্পানীর বড়সাহেবের পাশে বসে হাওয়া খেতে যাচ্ছি আমি। কৃষ্ণপক্ষের রাত। খোলা গাড়ির মাথার ওপরে আকাশ, বুকটা তার কালো কুচকুচে। নক্ষত্রগুলো মিটমিট্ করে জ্বলছে বটে, এবং তার সংখ্যাও অনেক, কিন্তু সমুদয় নক্ষত্রের আলোতেও বড়সাহেবের মুখটা দেখতে পেলাম না।

আউটরাম ঘাটের সামনে গাড়ীটা দাঁড় করিয়ে দিলেন মিষ্টার হেওয়ার্ড। দিয়ে বললেন, "জাপানীদের কাছে মার খেয়ে যে আমরা বর্মা থেকে পালিয়েছিলাম সে খবর ত তুমি জান।"

"গল্পটা পুরনো হয়ে গেছে, অনেকবার শুনেছি।"

"হেরে যাওয়ার গল্পটা শুনেছ, জেতবার গল্পটা শোন নি। শেষেরটা সাম্প্রতিক।"

"তার মানে? ইংরেজরা যে বর্মায় আবার ফিরে গিয়েছিল তার সন-তারিখ ত সাম্প্রতিক নয়?"

ক্যাপটেন চশমার কাচ মুছতে মুছতে বললেন, "আমি অবিশ্যি বর্মায় আর ফিরে যাই নি। তবুও জিতলাম। এটা আমার সম্পূর্ণই ব্যক্তিগত জয়ের সংবাদ, সুতপা। গল্প শুনতে চেয়েছিলে, গল্পটা শুরু করি রেঙ্গুনের জাহাজঘাট থেকে। সাতসমুদ্রের বুকে আমি বারদুই পাড়ি জমিয়েছি। কিন্তু রেঙ্গুন আর কলকাতার মাঝখানে যে জলটুকু দেখিতে পাচ্ছ তার মধ্যেই আমার জয়ের সূচনা ভেসে উঠল। পাঁচ হাজার টনের জাহাজটা ডক থেকে একটু দূরেই নঙ্গর ফেলে বসেছিল।

ইউনান সীমান্ত থেকে মার খেতে খেতে রেঙ্গুন এসে পৌঁছলাম। পৌঁছে দেখি, শহরটার ওপর বারকয়েক জাপানীরা বোমা ফেলে গেছে। বুঝতে পারলাম, জাপানী সৈন্যবাহিনী শহরে ঢোকবার পথ তৈরি করছে। তা করুক, আমাদের তখন বর্মা থেকে পালিয়ে আসবার কথা। জাহাজটা অপেক্ষা করছিল আমাদের নিয়ে রওনা হওয়ার জন্যে। আমার ব্যাটালিয়নের মধ্যে এক-চতুর্থাংশ মরেছে উত্তর-বর্মায়—সত্যি সত্যি যুদ্ধ করেই মরেছে। দ্বিতীয়-চতুর্থাংশ মরল পালিয়ে আসবার পথে। বাকী অর্ধেকটাকে যখন জাহাজে টেনে তুললাম তখন দেখলাম, খুব তাড়াতাড়ি কলকাতায় গিয়ে না পৌঁছতে পারলে আরও এক-চতুর্থাংশ মরবে ওষুধ না পেয়ে। অনেকেরই হাতে-পায়ে পচা ঘা, আর পেটে ব্লাড ডিসেনট্রি। জামাকাপড় পুরো কারো গায়েই নেই। বুকের চামড়ায় বারুদে পোড়া চিহ্নগুলো গুনতে গেলে আমায় আরও সাত দিন অপেক্ষা করতে হ'ত রেঙ্গুনের ডকে। হটে আসবার পথে ঘাড়ের বোঝা কমিয়ে আসতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত হাতের বন্দুকও নালা-নর্দমায় ফেলে

দিতে হ'ল। অনেকে বইতে পারল না, অনেক পারলও। যারা পারল তারা শেয়াল-কুকুর তাড়াবার জন্যেই হাতে রাখল বন্দুক। গুলিগোলার ষ্টক তখন একেবারে নিঃশেষ। অথচ নেমে আসবার পথে জাপানী স্নাইপারদের সংখ্যা কেবল বাড়ছে। অতএব বুঝতে পারছ, আমরা যখন জাহাজে এসে উঠলাম তখন দুনিয়ার কোন দিকেই দৃষ্টি ফেলবার মত আমাদের আর উদ্বৃত্ত উৎসাহ ছিল না। জাহাজের ক্যাপটেনকে বলে এলাম, আমরা সব উঠেছি। জাহাজ সে এবার ছাড়তে পারে। ছাড়বার জন্যে তৈরিও হ'ল সে। হঠাৎ কি মনে করে তাঁকে বললাম, 'একটু অপেক্ষা কর, দেখে আসি, দু'একটা আহত সৈনিক আবার পেছনে পড়ে রইল কিনা। ফাইনাল চেক-আপ'। আমরা মার খেয়েছি বটে, তবু আমি অফিসার। বন্দী না হওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত দায়িত্ব অনেক। একজন সৈনিক নিয়েও যদি ফিরতাম তবুও দায়িত্ব আমার কমত না। কারণ, তখনও আমি নামাঙ্কিত ডিভিশনের একটা অংশ। ফিরে গেলাম ডকে—আহত সৈনিক কেউ আর নেই। কিন্তু আহত সিভিলিয়ানদের সংখ্যা দেখলাম অনেক। এঁদের মধ্যে প্রায় সবাই আতঙ্কে আহত। এতক্ষণ এদের আমি কাউকে দেখতে পাই নি। মেজরিটি ভারতীয় এবং তাঁদের মধ্যে মেজরিটি স্ত্রীলোক এবং শিশু। কতবার আমি ডকে আসাযাওয়া করলাম, অথচ এঁদের আমি দেখতে পাই নি কেন? মার-খাওয়া ব্যাটালিয়নের অফিসার আমি—তবুও আমি ইংরেজ, দেখতে না পাওয়ার অভ্যাসটা দেড়শ' বছরের চেষ্টায় শিখতে হয়েছে—কিন্তু তাঁরা আমায় দেখছিলেন। একজন ভারতীয় বাঙালী মেয়ে এগিয়ে এলেন আমার কাছে, খুবই কাছে। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ সুতপা, আমার কাছে এগিয়ে আসতে কতটা তাঁর সাহসের দরকার হয়েছিল? হতে পারি আমি মার-খাওয়া ব্যাটালিয়নের অফিসার, কিন্তু আমি ইংরেজ। আমার ব্যাট্‌ল-ড্রেস পরা, কোমরের বেল্টে পিস্তল বাঁধা, হাতে মালাক্কা বেতের টুকরো, জিভের আগায় 'রুল ব্রিটানিয়া'র উষ্ণ অনুভূতি। তবুও বাঙালী মেয়েটি এগিয়ে এলেন। অনুরোধ করলেন, 'অফিসার, আমাদেরও সঙ্গে নিয়ে চল।' পালাবার পথ পরিষ্কার থাকা সত্ত্বেও এই প্রথম আমার মনে হ'ল, আমি পালাতে চাই না। আমি অফিসার, আমার কর্তব্য সবার শেষে পরিবহনের পাটাতনে পা দেওয়া। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ব্যাপারটা খুব সোজা ঠেকল না। মেয়েটি এমন একটা অনুরোধ করে বসলেন যার ওপরে আমার কর্তৃত্ব পুরো নেই। জাহাজের হুইসল বেজে উঠল, আমি উসখুস করতে লাগলাম। মেয়েটি দ্বিতীয়বার অনুরোধ করলেন, অনুরোধ করবার দরকার ছিল না। গোটা ভিড় তখন আমার চারদিকে ঘন হয়ে এসেছে। প্রত্যেকের মুখ আমি দেখতে পাচ্ছি। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার হাতে ওটা কি?'

'এ ডেড চাইলড! সাত দিন থেকে ডকের নোংরায় পড়ে ছিলাম। জন্মেছিল গতকাল মাঝরাত্রে, মরেছে ভোর বেলা।'

'আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, আমি দেখছি।'

ছুটে চলে এলাম জাহাজে। মুহূর্তের মধ্যে অনেক কথাই মনে পড়ল। যুদ্ধ, রাজ্যলোভ, অবিচার আর শোষণ-লিপ্সা—এই রকমের গাদা গাদা কথা। ক্যাপটেনের কাছে এলাম, বুড়ো মানুষ, জাহাজ চালাচ্ছেন অনেক দিন থেকে। সমুদ্র আর আকাশের বিস্তৃতি এঁরা সারাজীবন ধরে চেখে চেখে দেখছেন—অন্ততঃ চেখে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন, অবসর পেয়েছেন প্রচুর। সব কথা বললাম তাঁকে, জিজ্ঞাসা করলাম, 'পারবে এঁদের রক্ষা করতে?' জবাব দাও, ক্যাপটেন, দেরি করো না, জবাব দাও—'

'আমি আর কি জবাব দেব? দু'হাজার বছর আগে জবাব ত তিনিই দিয়ে গেছেন।'

'তার মানে?' রুখে উঠলাম আমি।

ক্যাপটেন বললেন, 'তিনি কি ঘোষণা করে যান নি যে, যখন তোমরা এই সব হতভাগ্যদের কোন উপকার করবে, তখন তা আমাকেই করা হবে? নিয়ে এস ওঁদের। হারি আপ!' সুতপা, কথা শুনে কেমন যেন হয়ে গেলাম আমি! আমার উচিত ছিল দৌড়ে যাওয়া, পারলাম না। খুব ধীরে ধীরে নিচে নামতে লাগলাম। আমার আগে নিচে নামলেন বুড়ো ক্যাপটেন। ডেকের ওপর থেকে আমাদের বাকী যা অস্ত্রশস্ত্র ছিল সব জলে ফেলে দেবার হুকুম দিলেন তিনি। হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'ভার কমাও, অনাবশ্যক জিনিস সব ফেলে দাও জলে।' আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'হারি আপ, বয়! নিয়ে এস। যারা আসতে চায় কাউকে ফেলে এস না। লেট ইট বি এ শিপ অফ মারসি! আরও অনেক মাল ফেলে দিতে হবে। কি ফেলব? জীবনের চেয়ে সোনার দাম ত বেশি নয়।' নাবিকদের ডেকে বললেন, 'কাম হিয়ার বয়েজ—ড্রপ দোজ বক্সেস, তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? কি দেখছ তুমি?' দেখছিলাম ক্যাপটেনকে! সুতপা, জাহাজ যখন জলে থাকে তখন তার ক্যাপটেন হচ্ছেন একচ্ছত্র সম্রাট। তাঁর মুখের কথাই আইন। জাহাজের মধ্যে তিনি বিচারক, ইচ্ছে করলে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দিতে পারেন ক্যাপটেন। জাহাজে যদি ডাক্তার উপস্থিত না থাকেন, তা হলে তিনি পারেন ওষুধ দিতে। দরকার হলে রোগীর হাত কিংবা পা কেটে ফেলে দিতে পারেন তিনি। শুধু তাই নয়, বিয়ে

দেওয়ার ক্ষমতাও তাঁর আছে। এমনকি কেউ মরলে, তাকে কবর না দিয়ে তিনি টান মেরে মৃতদেহ জলেও ফেলে দিতে পারেন। এত বেশী যাঁর ক্ষমতা তাঁকে তুমি সম্রাট বলবে না?"

জবাব দিলাম, "বলব।"

"কিন্তু এই ক্যাপটেনটির সাম্রাজ্যভোগের লোভ ছিল না।" মিষ্টার হেওয়ার্ড একটু থামলেন। তার পর বললেন, "কারণ, কালভেরিতে যাঁর মাথায় কাঁটার মুকুট পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁকেই তিনি একমাত্র সম্রাট বলে স্বীকার করেন।"

আউটরাম ঘাটের হাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। রাত নিশ্চয়ই অনেক হয়েছে। আমি চেয়েছিলাম রেঙ্গুনের সেই ডকটির দিকে। জিজ্ঞাসা করলাম, "বড়সাহেব, তুমি কি আর ডকে নামলে না? সব দায়িত্বই কি সম্রাটের ওপর চাপিয়ে দিলে? তুমি নিজেই ত বললে, ক্যাপটেনটি বুড়ো মানুষ।"

"না, আমি নেমে গেলাম তৎখুনি। সবাইকে জাহাজে তুলে দিয়ে আমি উঠলাম এসে সবার শেষে। গোটা ভারতবর্ষকে আমি দেখলাম। বাঙালী, মাদ্রাজী, পঞ্জাবী, উড়িয়া—সব ছিল সেই দলে। বাঙালী মেয়েটির দিকে হাত বাড়িয়ে বললাম, 'ডেড চাইল্ড, কোন কাজেই ত আর লাগবে না।'

'নাঃ! এই নাও, অফিসার।'

ডকের পাশে জলের মধ্যে টুপ করে ফেলে দিলাম রক্তমাখা পুঁটলিটা। ফেলে দিয়ে বললাম, 'দেখছ আরও পাঁচ-ছ'টা মৃতদেহ ভাসছে?'

চোখ খুলে মুখ নিচু করে মেয়েটি জলের দৃশ্য দেখল। তার পর দ্রুত পায়ে হেঁটে চলে গেল জাহাজের দিকে।

আমিও ফিরে আসছিলাম। শেষবারের মত পেছন দিকটা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে দেখি রেলিং ধরে একটি চীনা মেয়ে চেয়ে রয়েছে জলের দিকে। সঙ্গে কিছু নেই, মানে মালপত্র কিছু নেই। চেহারা দেখে মনে হ'ল, কষ্ট পেতে পেতে এখন আর কোন কষ্টকে ভয় পায় না। নির্বিকার, নির্লিপ্ত তার ভঙ্গী। দেহটাকেও ভাল করে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করে নি! ভাবলাম, মেয়েটির নিশ্চয়ই পালাবার দরকার নেই। কিংবা হয়ত দরকার আছে, আমাকে অনুরোধ করবার সাহস পাচ্ছে না। দাঁড়ালাম গিয়ে তার পাশে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি যেতে চাও?'

'কোথায় যাচ্ছ তোমরা?' ভাসমান মৃতদেহগুলোর দিকে তখনও তার দৃষ্টি নিবদ্ধ।

বললাম, 'আপাতত কলকাতায় যাচ্ছি।'

'আমার জন্যে জাহাজে কি জায়গা হবে?' এবার সে মুখ তুলে আমার দিকে চাইল। বুঝলাম, ঘুমোয় নি। এক-দিন দু'দিন নয়, বহুদিন চোখের পাতা বন্ধ করে নি।

বললাম, 'হ্যাঁ, হবে।'

'তা হলে নিয়ে চল। পয়সাকড়ি কিছু আমার সঙ্গে নেই। আমার নাম লী। ক'দিন আগে হংকং থেকে এসে পৌঁচেছি।'

লী সেদিন আমার শেষ প্যাসেঞ্জার। নঙর তুলল জাহাজ, ভেসে পড়লাম আমরা। দু'দিনের মধ্যে জাহাজের মজুদ খাবার সব ফুরিয়ে গেল। দুটি অসুস্থ যাত্রী পথে মারা গেল, একজনের বাচ্ছাও হ'ল একটি। সর্দি, কাসি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ম্যালেরিয়া এবং টাইফয়েডের উৎপাতও সহ্য করতে হ'ল। তৃতীয় দিন সকালবেলা মৃত্যুর অন্ধকার ঘনিয়ে এল আমাদের মাথার ওপরে। তিনখানা জাপানী উড়ো জাহাজ উড়তে দেখা গেল। আত্মরক্ষার কোন অস্ত্র আমাদের সঙ্গে নেই, ছুটে গেলাম ক্যাপটেনের কেবিনে। দেখলাম, তিনি মেঝেতে হাঁটু ভেঙে বসে প্রার্থনা করছেন। আমি দাঁড়িয়েছিলাম তাঁর পাশে। একটু বাদেই তিনি উঠলেন। ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি উপায় হবে? এনিমি উড়োজাহাজ মাথার ওপরে উড়ছে। এতগুলো জীবন—আত্মরক্ষার অস্ত্র কই?'

'অস্ত্র?' একটু হেসে ক্যাপটেন দৃষ্টি ফেললেন তাঁর টেবিলের ওপর। হ্যাঁ আমিও দেখলাম, টেবিলের ওপরে একটা ছবি রয়েছে।

এরই মধ্যে কয়েকটা বোমা পড়ছে জাহাজের দু'দিকে। বোধ হয় ইচ্ছে করেই বোমাগুলো জাহাজের ওপরে ফেলে নি ওরা। এটা ট্রুপ-শিপ কিনা সে সম্বন্ধে বৈমানিকেরা নিঃসন্দেহ হয় নি। বাঙালী মেয়েটি ভিড়ের মধ্যে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। একটু বাদে দেখাও পেল আমার। বলল, 'আমাদের ক'টি শাড়ীপরা মেয়েকে জাহাজের ছাদে নিয়ে চল—শীগগির।'

'কেন?'

'আমরাই পারব জাহাজটাকে রক্ষা করতে।'

'দশ-বারটি মেয়েকে ছাদে নিয়ে তুললাম। তারা সব শাড়ীর আঁচলগুলো উড়িয়ে দিল আকাশের দিকে। ব্রীজের তলায় লুকিয়ে লুকিয়ে ওদের কাণ্ড দেখছিলাম আমি। বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে পারছি না, আমার তখনও ব্যাটল-ড্রেস গায়ে। একটু বাদেই উড়োজাহাজ তিনটে ঘুরতে ঘুরতে অনেক নিচে নেমে এল। ভারতীয় মেয়েদের পরিষ্কার ভাবে দেখে নিল জাপানীরা। তার পর স্যালুট করবার ভঙ্গী করে উড়ো-জাহাজ সরে যেতে লাগল দূরে, অনেক দূরে, দিগন্তের বাইরে।

সাড়ে পাঁচ দিন পরে আমরা এসে পৌঁছলাম কলকাতায়। এই সেই আউটরাম ঘাট।"

"কিন্তু সেই চীনা মেয়েটির কি হ'ল ?"

"সে ত অন্ত গল্প—আজ নয় সুতপা। রাত কত হয়েছে জান ?"

"কত ?"

"প্রায় সওয়া একটা।"

"তাতে কি বড়সাহেব ? সওয়া একটার পরে গল্প শুনতে পারব না কেন ? জীবনে রাত ত কম জাগি নি। হিসেব রাখলে হাজার দুই রাত্রি ত হবেই।"

"তা নয় সুতপা। ভোর রাত্রে চ্যাং এসে পৌঁছবে দমদম বিমানঘাঁটিতে। তাকে আনতে যাব আমি।"

"চ্যাং ? সে কে ?"

"লীর ছেলে। কিন্তু লোকে বলে চ্যাং আমার ছেলে। আমার বিরুদ্ধে দুর্নাম রটায়। বিলেত থেকে ফিরছে সে। সিনিয়র পাস করে এল! তোমার কি চায়ের তেষ্টা পায় নি সুতপা ?"

"পেয়েছে। চল, আমরা এখনই দমদম যাই। আমি চ্যাংকে অভ্যর্থনা করব। বড়সাহেব, এখানে বসতে আর ভাল লাগছে না। পুলিশ-কনষ্টেবলটা বার বার করে আমাদের সামনে দিয়ে যাওয়া-আসা করছে!"

হো হো করে হেসে উঠে বড়সাহেব গাড়িতে ষ্টার্ট দিলেন।

বিমানঘাঁটির লাউঞ্জে ঢুকে পড়লাম আমরা। রাত্রি আর দিনের মধ্যে খুব কিছু তফাৎ নেই এখানে, চারদিকে উজ্জ্বল আলো। যাত্রীর সংখ্যাও অনেক। ভারতবর্ষের বাইরে যাচ্ছেন এঁরা। যাত্রীদের ওজন নেওয়া হচ্ছে। সাহেব-মেমের ভিড়ই সবচেয়ে বেশী। ভারতবর্ষের গরম থেকে পালাবার জন্যে এঁরা নিশ্চয়ই অস্থির হয়ে উঠেছেন। এঁদের ব্যস্ততার কাছে দাঁড়িয়ে মনটা কেমন উদাস হয়ে এল। ভোর-রাত্রির গায়ে যেন দূরের পোশাক পরা। ভারতবর্ষের খণ্ড-সীমান্তের বিস্তৃতি বুঝি আমার চোখের সামনে ক্রমশঃই প্রসারিত হচ্ছে। বড়সাহেবের সামনে বসে কফি খেতে খেতে আমি বোধহয় আমার ভৌগোলিক বিশেষত্বটুকুও হারিয়ে ফেললাম আজ। সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "অত তন্ময় হয়ে কি ভাবছ, সুতপা ?"

"ভাবছিলাম, পৃথিবীতে অতশত সীমান্ত সব না থাকলে ক্ষতি কি! উড়োজাহাজের যুগেও দেখছি দূরের মানুষ কাছে এল না। সীমান্তের সংখ্যা যেন প্রতিদিনই বাড়ছে। বড়সাহেব, জাতীয়তাবাদের খণ্ড-সীমান্তে মানুষ এখনও লড়াই করে মরছে। তোমার কি মনে হয় ?"

"ঠিকই বলেছ তুমি, কথাটা মিথ্যে নয়। কিউবা থেকে করাচী ত কম দূর নয়, সুতপা! উড়োজাহাজে ডাক-বিলি হয় বটে, কিন্তু খণ্ড-সীমান্তের ব্যবধান বেড়েছে বই কমে নি।"

এই বলে বড়সাহেব দ্বিতীয় পেয়ালা কফি ঢাললেন। আমি অবিশ্যি চা-ই খাচ্ছিলাম। প্রথম পেয়ালা শেষ করতে পারি নি। ঘাড় দেখছিলেন ক্যাপটেন, জিজ্ঞাসা করলাম, "ক'ঘণ্টা বাকী ?"

"ঠিক সময়ে পৌঁছলে ঘণ্টা দুই লাগবে।"

"চ্যাংয়ের বয়স কত হ'ল ?"

"প্রায় চৌদ্দ।"

"গল্পটা শুনি না। লী এখন কোথায় ?"

"সে নেই। মারা গেছে।"

"তা হলে জিতলে কি করে ? গল্পের সুরুতে তুমি বলেছিলে, রেঙ্গুনের ডকে তোমার জয় হয়েছে।"

"চ্যাং ফিরে আসছে—"

মাঝখানে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসলাম, "তুমি যে তার পিতা নও, তা কি সে বিশ্বাস করে ?"

"হয়ত পুরোপুরি করে না। সন্দেহ থাকা স্বাভাবিক। সেই বুড়ো ক্যাপটেন দ্বিতীয়বার পেনাং থেকে লোক উদ্ধার করতে গিয়ে বোমা খেয়ে মারা গেছেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে জাহাজটাও গেছে। তিনি বেঁচে থাকলে সুবিধে একটু হ'ত। কি করব, উপায় ত নেই। চ্যাংয়ের জন্মের পেছনে যে আমার কোন অন্যায় লুকনো নেই, ওকে তা একদিন পুরোপুরি বিশ্বাস করাতেই হবে। নইলে ওর মনে চিরটা কাল দাগ বসে থাকবে—খোঁচা দেবে যখন-তখন। একটু আগে কিউবার নাম বলছিলাম না তোমায় ?"

"হ্যাঁ।"

"একটা দৃষ্টান্ত দেখাতে গিয়ে হঠাৎ কিউবা নামটা মুখে এসে পড়ল। এখন ভাবছি, হঠাৎ নয়, নামটা আমার সর্বক্ষণই মনের মধ্যে গেঁথে রয়েছে। কারণ, লী জন্মেছিল কিউবায়। তিনপুরুষের বাস ছিল সেখানে। আখের ক্ষেতে কুলীর কাজ করবার জন্যে ঠাকুরদা গিয়ে প্রথমে ঘর বাঁধলেন সেখানে। রাজধানী হাভানা অঞ্চলে যেতে পারেন নি। পূর্ব-কিউবার সিয়েরামেসস্ত্রো পর্বতমালার কাছাকাছি কি একটা জায়গায় যে তিনি প্রথমে কাজ করতে গিয়েছিলেন লী-র তা মনে নেই। সেই অঞ্চলটা ছিল সবচেয়ে গরীব দেশ, কারণ আখের চাষ সবচেয়ে বেশি হ'ত ওইখানেই। ঠাকুরদাকে লী দেখেছে কি না মনে করতে পারে

নি। কিন্তু বাবার কথা পরিষ্কার মনে আছে। সানটিয়াগো শহরটা পূর্ব-অঞ্চলের নামজাদা জায়গা। লী-র বাবাও কাজ করতেন আখের ক্ষেতে, কিন্তু বাস করতেন এই শহরে। লী-র বর্ণনা যদি সত্যি হয় তা হলে রাজধানী হাভানার তুলনায় সানটিয়াগো ছিল নর্দমা। নর্দমার সবচেয়ে দুর্গন্ধযুক্ত অংশে লী-র বাল্যজীবনটা কাটে। বাবা ওর নেশা করতেন বটে, কিন্তু স্বপ্নও দেখতেন। তিনি স্বপ্ন দেখতেন, পয়সা জমিয়ে একদিন হাভানা শহরে যাবেন। তোমাদের কলকাতার মত হাভানার দুটো চেহারা ছিল না। বালিগঞ্জ আর চৌরঙ্গীর পাশে রাজাবাজার কিংবা বেনিয়াপুকুরের বস্তি দেখতে খারাপ হলেও সভ্যসমাজের কাছে কোনদিনও অসহ্য মনে হয় নি। হাভানার ধনপতিরা আগে থেকেই সতর্ক হয়েছিলেন। তাঁরা বস্তি গড়লেন সান্টিয়াগো অঞ্চলে, আর চৌরঙ্গী গড়লেন হাভানায়। লী-র যখন বারো বছর বয়স, তখন ওকে একা ফেলে বাবা ওর সরে পড়লেন। হাভানায় নয়, স্বর্গে। স্বর্গ বলতে কি বোঝায় তা তিনি জানতেন না বটে, কিন্তু মরবার সময় বলে গিয়েছিলেন, 'এ জায়গার চেয়ে স্বর্গ অনেক ভাল। পারিস ত দেশে পালিয়ে যাস।' স্বর্গে যাওয়ার সুবিধে অনেক, ভাড়া লাগে না। চায়নায় ফিরতে হলে পয়সা লাগবে। দু'দিকের একদিকেও লী যেতে পারলে না। রাগ পড়ল গিয়ে সব মায়ের ওপর। কি দরকার ছিল সংসারে ওকে টেনে আনবার? পুরুষমানুষেরা স্ফূর্তির জন্যে কি না করতে পারে! বিয়ে করলেই বুঝি ওদের সাতখুনও মাপ করতে হবে? বাবা প্রথম খুন করলেন মাকে। লী জন্মাবার পরেই মা মারা যান। বারো বছর বয়সে সে খুবই মুশকিলে পড়ল। পথ কিছু দেখতে না পেয়ে লী আখের ক্ষেতেই কাজ করতে লাগল। প্রথম দিন সে কি ওর ভয়! আখের ক্ষেতেই হারিয়ে গেল লী। ওর মাথার ওপরে আখের পাতা, আর ডাইনে-বাঁয়ে মোদোমাতাল। দ্বিতীয় দিনেও ভয় গেল না। তার পর সয়ে গেল সব। হাভানায় নয়, দেশে ফিরে যাওয়ার স্বপ্ন ওকে পেয়ে বসল। লী-র মুখেই শুনেছি, স্বপ্ন দেখা ওদের সাতপুরুষের রোগ। এই সময়ে ওর লুসের সঙ্গে দেখা হয়। একদিন সকালবেলা খবর এল, রাজধানী থেকে একজন মস্তবড় ধনীলোক আসছেন ক্ষেতের ফসল পরিদর্শন করবার জন্যে। হাভানার সবচেয়ে বড় দালাল তিনি, ব্যামন বারকুইন। মরবার সময়ও নামটা তাঁর মনে ছিল লীর। সকালের দিকেই আদেশ এল, মজুরদের সব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে হবে। আখের গোড়ায় যেন একটিও আগাছা না থাকে। ব্যামন বারকুইনের মত বিশেষজ্ঞের চোখে আবর্জনা সব ধরা পড়বে। ফসলের বুকে রসের পরিমাণ কত, তার হিসেব নিতেই আসছেন তিনি। খুরপি হাতে নিয়ে লী বেরিয়ে পড়ল। অনেকটা পথ হেঁটে গেলে তবে ওর অংশটায় পৌঁছনো যায়। সান্টিয়াগো থেকে মাইল পাঁচেক হবে, সিয়েরা-মেসস্ত্রো পর্বতমালার পায়ের কাছে। দলের সঙ্গেই সে যাওয়া-আসা করত, আজও সে দলের সঙ্গে পথ ধরল। হঠাৎ কোথা থেকে কুলীর সর্দার নাভারো এসে ওর পাশে পাশে হাঁটতে লাগল। আলাপ-আলোচনা সুরু হতেও দেরি হ'ল না। দুজনেই দল থেকে পেছিয়ে পড়ল একটু। নাভারো জিজ্ঞাসা করল, 'তোর কি মনে হয়, লী?'

'কি মনে হবে?'

'না, এই ফসলের কথা জিজ্ঞেস করছিলাম। কাল ত দেখলাম, আখের দেহ সব রসে টইটুম্বুর!'

'তা হলে ত দেখেছই তুমি, সর্দার।'

'খোঁচা দিয়ে ত দেখি নি—' এই বলে নাভারো লীর বুকের ওপর দৃষ্টি ফেলে বলতে লাগল, 'সোনালী রং ফেটে পড়ছে। বারকুইন দেখতে ভুল করবে না। তোর বয়স কত রে, লী?'

'তেরো চলছে।'

'দেখে ত তা মনে হয় না।'

'কত মনে হয়, সর্দার?'

'পনেরোর কম নয়। দাঁড়া হিসেব করি, তোর মা যখন মারা যায়—'

'অত কষ্ট করছ কেন সর্দার? আমার বয়স বাড়িয়ে তোমার লাভ কি?'

'দালালকে সব দেখাতে হবে ত। আর যে-সে দালাল নয়, স্বয়ং ব্যামন বারকুইন! শুনেছি, হাভানার আদ্দেকই তার।'

'তুমি ভয় পেয়ো না সর্দার, আমার জমিতে আগাছা একটিও থাকবে না।' খুরপিটা হলদে-হাতে একটু নড়েচড়ে উঠল।

'না, বলছিলাম কি—লী, তোর ত এখানে কেউ নেই। কিউবা তোর দেশই হয়ে গেল। বারকুইন হচ্ছে গিয়ে খাঁটি কিউবান। তার ঘরে যাবি?'

'না, দেশে যাব।'

'দেশ?'

'চায়না।'

'সে আবার কোথায় রে ছুঁড়ি? হাভানার হারেমে থাকতে কষ্ট করে দেশে যাবি কেন?' মুখ ভ্যাংচালো নাভারো,'আর বারকুইনের হারেম?'

হাতের খুরপি দোলাতে দোলাতে হাঁটতে লাগল লী। ভয় সে অবশ্যই পেয়েছে। এত অল্পবয়সে ভয় পাওয়ার কথা

ছিল না। কিন্তু ক্ষেতের মধ্যে ঢুকে একটু আড়াল পেয়ে লী তার খুরপির মুখটা বুকের ওপর বসিয়ে দিয়ে অনুভব করল, বয়সের অনুপাতে দেহটা একটু বেশি ভারি। আখের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লীও বোধ হয় মাটি থেকে রস টেনেছে। আট-দশ ঘণ্টা মাটির সঙ্গে লেগে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় ওকে প্রত্যেক দিন, তা-ও বছর প্রায় ঘুরে এল।

দুপুরনাগাদ ঘোড়ায় চেপে বারকুইন এল। দলবল সঙ্গেই ছিল তাঁর। পিছনে ছিল বিশ-তিরিশটা শিকারী কুকুর। সিয়েরা-মেসস্ত্রো পর্বতমালার দিকে বারকুইন শিকার করতে যাবে তেমন প্রোগ্রাম সে করেই এসেছিল। আখ-গাছের ফাঁক দিয়ে লী দেখল, বারকুইনের পোশাক-পরিচ্ছদ কাউবয়দের মত। হাতের চাবুকটা মাথার ওপরে ঘুরিয়ে নিল একবার। আওয়াজ হ'ল, আওয়াজটা লী-র কানেও এল। মাঠের কিনারে অপেক্ষা করছিল নাভারো। ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল বারকুইন। চাবুকটা হাতে নিয়ে সে আখের ক্ষেতে ঢুকল। দলবল কেউ এল না। সর্দার অবিশ্যি সঙ্গে রইল। পিছনদিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে লী অপেক্ষা কর-ছিল। চেয়েছিল মোটা একটা আখের দিকে। হঠাৎ সে ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল। মস্তবড় একটা কোবরা ল্যাজ দিয়ে আখটাকে জড়িয়ে ধরেছে। বাকী অংশটা এগিয়ে এনেছে লী-র কপালের কাছে। মস্তবড় ফণা! বিষ-দাঁতের লোভ লীকে প্রায় ছুঁয়ে দেয় আর কি! লী নড়তে পারছে না। পাথরের মত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কি করবে সে? পিছনদিকের পথ ত আরও বেশি ভয় সঙ্কুল। হাভানার সবচেয়ে বড় এবং বিষাক্ত কোবরাটা তখন লী-র গায়ের সঙ্গে লেগে দাঁড়িয়েছে। চাবুকের গোড়া দিয়ে লীর গায়ের মাংস খোঁচা মেরে পরীক্ষা করতে করতে র‍্যামন বার-কুইন দেখল, সাপের ফণা বিপজ্জনক এলাকায় ঢুকে ছোবল মারবার জন্যে প্রস্তুত। আকাঙ্ক্ষার আগুন তার নিভে যেতে এক মুহূর্তও লাগল না। আর ঠিক সেই মুহূর্তে লুসের ধারাল ছুরিটা এসে লুটিয়ে পড়ল র‍্যামনের পায়ের কাছে। আসবার পথে ছুরিটা আখটাকে দু'টুকরো করে এসেছে—টুকরো করেছে সাপটাকেও। ওপাশের আখের জঙ্গল থেকে লুসে মুখ বার করল। সবাই দেখল ওকে, বছর ষোল-সতেরো বয়সের একটি চীনা যুবক। বারকুইন জিজ্ঞাসা করল, 'ছোঁড়াটা কে?' জবাব দিল সর্দার, 'কাল থেকে কাজ করছে এখানে।'

'কিউবান?'

'চাইনীজ।' জবাব দিল লুসে, 'পাহাড়-অঞ্চলের কড়া জমিতে বাপ একসময়ে লাঙল চালাত। ম্যালেরিয়ায় মারা গেছে। আমার তাকত যেটুকু দেখলেন তা ওই সিয়েরা-মেসস্ত্রো পর্বতমালারই তাকত।'

'বটে?' এই বলে র‍্যামন বারকুইন কাটা সাপটার পেটের ওপর পা রাখল।...তার পর - সুতপা—"

"বড়সাহেব—"

"চিনি ফুরিয়ে গেছে দেখছি—" এই বলে তিনি বেয়ারাকে বললেন, "আউর চিনি। আরও এক পট কফি নেওয়া যাক।"

"আমিও কফি খাব—"

"বেশ, বেশ।" বড়সাহেব উল্লসিত হয়ে উঠলেন। তার পর তিনি পুনরায় ফিরে গেলেন কিউবায়। চিনির পাত্রটায় হাত বুলতে বুলতে গল্প সুরু করলেন হেওয়ার্ডসাহেব, "ভারতবর্ষে এখন প্রচুর চিনি হচ্ছে। কিউবা থেকে অল্প চিনিই আমদানী করতে হয়। তবুও কিউবার সমৃদ্ধি আজও চিনির ওপর নির্ভরশীল। সেদিন লুসে আর লী একসঙ্গেই সান্‌টিয়াগোর বস্তিতে ফিরে গেল। লী রান্না করলে, লুসে খেলে। দিনসাতেক পরে লুসে বলল, 'তোমার আর ক্ষেতে যাওয়ার দরকার নেই, ইস্কুলে যাও। খরচ যা লাগবে আমি জোগাব; বন্দোবস্ত করে এসেছি।' লী আপত্তি করল না। লীর ঠাকুরদা বোধ হয় বৌদ্ধ ছিলেন। বাবা কি ছিলেন তা লী কেন, বস্তির পুরনো লোকেরাও কেউ জানত না। লী ভর্তি হ'ল রোমান ক্যাথলিক ইস্কুলে। তা ছাড়া উপায়ও ছিল না, সান্‌টিয়াগোয় যে-ক'টা ইস্কুল ছিল তার সব ক'টিই পরিচালনা করতেন স্প্যানিশ ধর্মযাজকেরা। লেখাপড়ার প্রতি লীর আকর্ষণ বাড়তে লাগল দিন দিন। খুশী হ'ল লুসে। কিন্তু আসল লেখাপড়া লী শিখতে লাগল লুসের কাছে। লুসে শিখছিল হাভানার এক ইস্কুলের শিক্ষকের কাছে। শিক্ষকটি ইস্কুলের কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে এসে-ছিলেন আখের ক্ষেতে কাজ করতে। লুসে ছাড়া এ খবর আর কেউ জানত না। শিক্ষকটি আগাছা তুলতেন লুসের পাশে বসে। আর ইতিহাস ও সমাজের আগাছাগুলোর দিকে বিপ্লবের খুরপি তুলে বলতেন, 'এদের উপড়ে ফেলতে হবে।' কাদের? শিক্ষকটি চেয়ে থাকতেন হাভানার দিকে। তার পর ক্রমে ক্রমে লুসে বুঝতে পারল, শুধু হাভানা নয়, তাঁর খুরপিটা পৃথিবীর গোটা মানচিত্রটা প্রদক্ষিণ করছে। সুতপা, তুমি নিশ্চয়ই খবর রাখ না যে, আধুনিক কিউবায় নতুন ফসলের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। উনিশশ' ত্রিশ সালের সেই শিক্ষকটি এখন বেঁচে নেই বটে, কিন্তু খুরপির কাজ আজও থামে নি। সিয়েরা-মেসস্ত্রো পর্বতগুহায় কিউবার জননেতা কাস্‌ত্রো আজ তাঁর অফিস খুলেছেন। কিউবার বর্তমান প্রেসিডেন্ট বাতিস্তার ভাষায় কাসত্রো রিবেল, রিবেল

ত বটেই। কিন্তু ব্যক্তিস্তাব্ ধনতান্ত্রিক অভিধানে এই 'রিবেলিয়ানে'র যা ব্যাখ্যা দেওয়া আছে সানটিয়াগোর সবাই তা ভুল বলে জানে। গেরিলানেতা কাসন্ত্রো হচ্ছেন কিউবার নতুন ফসল। ফসল যেদিন সত্যিই তৈরি হবে সেদিন তোমরা সেই শিক্ষকটির নামের সঙ্গে লুসের নামটাও স্মরণ কর।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হওয়ার বছর দুই আগে লুসে টিকিট কাটল, দেশে যাওয়ার টিকিট। মাঞ্চুরিয়ার বুকের ক্ষত তখন পাতালের চেয়েও গভীর। জাপানীরা দেখতে বেঁটে বটে, কিন্তু তাদের কারখানা থেকে বেয়নেটগুলো যখন তৈরি হয়ে বেরুত তখন সেগুলো হ'ত লম্বা লম্বা। মাঞ্চুরিয়ার ক্ষত ছেয়ে গেল সারা চায়নার বুকে। ইংরেজের বাণিজ্য-বেয়নেট যে সেই ক্ষতটাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বড় করেছে তেমন সত্য কি তুমি অস্বীকার করতে পার? পার না। লুসে চলে এল দেশে, লী চলে গেল হাভানায়, ছোট্ট একটা ইস্কুলে শিক্ষকতার কাজ নিয়ে। মাঝে মাঝে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলত। বিপ্লবের চাপা-বহ্নি ভাষার বুকে গোপন থাকত। জাপানী গুপ্ত পুলিস টের পেল তা। টের পেতে সাহায্য করল হংকংয়ের ইংরেজ পুলিস। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হ'ল, বছর-দুয়েক পর্যন্ত লুসে আর লীর মধ্যে যোগাযোগ রইল না। হঠাৎ লীর কাছে কি করে যেন একটা চিঠি এসে পৌঁছয়—লী বুঝতে পারল চিঠিখানা লুসেরই। লুসে লিখেছে, ওকে হংকংয়ে আসবার জন্যে। কোথায় গিয়ে লী উঠবে তাও লেখা ছিল চিঠিতে এবং কোন্ মাসের কোন তারিখে লুসে হংকং এসে লীর সঙ্গে দেখা করবে তেমন সব খুঁটিনাটি বিবরণও ছিল তাতে। লী গিয়েছিল হংকং, জাপান তখনও যুদ্ধে নামে নি। পার্ল হারবার আক্রমণের ঠিক দশ মাস আগে। লীর জীবনে সেইটেই ছিল একমাত্র স্মরণীয় রাত। রাত্রির অন্ধকারেই লুসে এল লীর সঙ্গে দেখা করতে। এসেই সে বলল, 'শুধু একটা রাতই থাকতে পারব। তাও পুরো রাত নয়, ভোর রাত্রিতেই পালিয়ে যেতে হবে। আমায় ধরবার জন্যে জাপানী পুলিস ওপারে অপেক্ষা করছে। মনে হয়, ইংরেজরা আমার যাওয়া-আসার খবর সব জানে। বহুদূর থেকে এসেছি লী।'

'কিন্তু—' লী থেমে থেমে বলতে লাগল, 'কিন্তু আমাদের বিয়ের কি হবে? দুটো দিন অন্তত: থাক। আমি যে আর অপেক্ষা করতে পারছি নে, লুসে!'

'অপেক্ষা করতেই হবে যতদিন না বিপ্লব সার্থক হয়।'

লী উঠেছিল একজন ছুতোর মিস্ত্রির বাড়ীতে। থাকবার জন্যে ঘরও একটা পেয়েছিল। কিন্তু লুসে সেই ঘরে ঢুকতে সাহস করল না, সাহস পেল না মিস্ত্রিও। বাড়ীর পেছন দিকে ছিল চীনা মিস্ত্রির ভাঙাচোরা কাঠ রাখবার জায়গা। সেখানে দাঁড়াবার মত একটু খালি জায়গায়ও ছিল না। বুড়ো মিস্ত্রিটা এসে বলল, 'এখানেই থাক। আমার চাকরটাকে বিশ্বাস করি নে।'

এই বলে সে দুটো তক্তা পাশাপাশি সাজিয়ে দিল। দেখতে পাটাতনের মত হ'ল বটে, কিন্তু সমান হ'ল না। কাৎ হয়ে রইল। তার তলায় রইল শত শত কাঠের টুকরো। লুসে আর লী সেখানেই বসল। মিস্ত্রি চলে যাওয়ার পরে লুসে বলল, 'বড্ড দুর্গন্ধ আসছে।'

'আসবেই। কাঠের স্তূপের তলায় রয়েছে চওড়া একটা নর্দমা। নোংরা সব সরতে পায় না, কাঠের টুকরোর সঙ্গে সব আটকে যায়। লুসে—'

'বল—'

'আমি দেশে যাব কবে?'

প্রশ্নটার জবাব দিল না লুসে। ক্রমে ক্রমে কথাও বন্ধ হয়ে এল। লুসে পরিশ্রান্ত, তক্তার ওপর শুয়ে পড়ল সে। শুলো লীও। ওদের পূর্বপুরুষেরা বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, না মুসলমান ছিলেন দুজনের একজনও কেউ মনে রাখল না, রাখবার দরকার হ'ল না। ভোররাত্রি পর্যন্ত দুজনেই জেগে রইল, কথা কইল না। লীর মনে আছে, সেই ক'ঘণ্টার মধ্যে ওরা নর্দমার গন্ধ পর্যন্ত পায় নি! ভোর হওয়ার আগেই মিস্ত্রিটা দূরে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে কেসে উঠছিল। লুসে বুঝল, এবার ওর যাওয়ার সময় হয়েছে—গেলও। এত তাড়াতাড়ি গেল যে, লী শরীরের জড়তা ভাঙবারও সময় পেল না। তার পর লী চলে এল নিজের ঘরে। পেছন ফিরে দেখল, বুড়ো মিস্ত্রিটা তক্তা দুটো উপুড় করে রাখল। লুসে যে এখানে এসেছিল তার জন্যে বুড়োটার ভয় বড় কম ছিল না। গুপ্ত পুলিসের চোখে সবকিছু ধরা পড়তে পারে। এমন কি লুসের দেহটার উত্তাপ পর্যন্ত! পরের দিনই লী খবর পেল, লুসে জাপানী পুলিসের হাতে ধরা পড়েছে। তিন মাস পরে জানল, টোকিওর কুখ্যাত সুগানো জেলখানায় আছে। তার পর শুনল, আর ঠিকই শুনল, জাপানীরা ওকে গুলি করে মেরে ফেলেছে। হংকংয়ের ইংরেজ গবর্ণর পরে একদিন দুঃখ করে লীকে বলেছিলেন, 'জাপান যে এত বড় বেইমানী করবে বিলেতের ফরেন-আপিস তিন মাস আগেও তা বুঝতে পারে নি। লুসের জন্যে সত্যিই আমি দুঃখিত। তুমি কি করতে চাও?'

"কি করব, এখানেই এখন থাকব।'

লী তখন গর্ভবতী। গবর্ণর বললেন, 'কোন সাহায্যের দরকার হলে আমায় জানিও।'

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানের বিজয়-বাহিনী তুমুল কাণ্ড করতে লাগল। ভয় পেল লী। উড়োজাহাজে চেপে চলে এল ব্যাঙ্ককে, সেখান থেকে এল রেঙ্গুনে। এই ঘোরাঘুরির মধ্যে আরও প্রায় ছ'মাস কেটে গেল। তার পর একদিন আমার সঙ্গে দেখা হয় রেঙ্গুনের ডকে। চ্যাং জন্মাল জাহাজের মধ্যে। লী তার গল্প শেষ করল। দু'একটা অনুরোধ রাখবার প্রতিশ্রুতি আমার কাছ থেকে আদায় করে নিয়ে চোখ বুজল লী। জাহাজের ক্যাপটেনের অনুমতি নিয়ে মৃতদেহটা ওর ফেলে দিলাম জলে। আমরা তখন কাকদ্বীপের কাছাকাছি প্রায় পৌঁছে গেছি। সুতপা, এই ত গল্প, এই ত কাহিনী।"

"আর কিছু কি বলবার নেই, ক্যাপটেন?" জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

"আছে। আজ নয়। চ্যাংয়ের উড়োজাহাজ বোধ হয় মাটি ছুঁচ্ছে। চল, সময় হয়ে গেছে।"

লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে দেখি ভোর হয়ে গেছে। কলকাতার কাকগুলোর চেঁচামেচি এতক্ষণ আমার কানে যায় নি। বাইরে বেরিয়ে তাদের কর্কশ আওয়াজ আমি শুনতে পেলাম। ভোর সত্যিই হয়েছে। কাষ্টমস ব্যারিয়ারের এপাশে এসে আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম চ্যাংয়ের জন্যে।

বোধ হয় আধ ঘণ্টা পরেই ডাক্তারের আপিসের দিক থেকে যাত্রীদের গলা শুনতে পেলাম। সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে চ্যাংয়ের আরও প্রায় মিনিট পনের লাগল। আমাদের আর এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা নেই। আমাদের পায়ের কাছে বেড়া। বেড়ার পাশে পুলিস মোতায়েন করা আছে। তবুও বড়সাহেব মাথাটা এদিক-ওদিক হেলিয়ে, চুলিয়ে, নুইয়ে চ্যাংকে দেখবার চেষ্টা করছিলেন। আমাদের এত কাছে যে, সীমান্তের একটা বেড়া রয়েছে তা আমি দেখতে পাই নি। দমদম বিমানঘাঁটিতে এই আমি প্রথম এলাম।

দূরের করিডোর থেকে চ্যাং চেঁচিয়ে উঠল, "ড্যাড—"

"চ্যাং!" জবাব দিলেন বড়সাহেব। চ্যাং আসছে—চ্যাং হাঁটছে, তার পর চ্যাং দৌড়চ্ছে। দৌড়চ্ছে আর ডাকছে, "ড্যাড।" মনে হ'ল চৌদ্দ বছর বয়স হলে কি হবে, লম্বায় সে বড়সাহেবের সমান। মুখের আকৃতি পুরোপুরি চাইনীজ। দু'একটা খুঁতও আমার চোখে পড়ল। কিন্তু তাই নিয়ে প্রশ্ন করবার সময় এটা নয়। 'চায়না পিকটোরিয়াল ম্যাগাজিনের সেই ছবিটার সঙ্গে চ্যাংয়ের মিল আছে সেকথা ঠিক।

বেড়া ঠেলে চ্যাং বেরিয়ে এল। এমন ভাবে বেরিয়ে এল যে, বেড়ার অস্তিত্ব সে বোধ হয় বুঝতেই পারল না। পুলিস প্রহরীটাও কেমন বোকার মত মুখ করে সরে দাঁড়াল। চ্যাংয়ের মধ্যে বোধ হয় বেড়া ভাঙবার প্রতিভা আছে, কিংবা প্রতিভা থাকাও সম্ভব।

দৌড়তে দৌড়তে এসে চ্যাং লাফিয়ে পড়ল বড়সাহেবের ঘাড়ের ওপর। তিনি ওকে জড়িয়ে ধরলেন। আমি ঠিকই বলেছিলাম, চ্যাং লম্বায় বড়সাহেবের সমান। তাঁর ঘাড়ের ওপর মুখ গুঁজে চ্যাং আবার ডাকল, "ড্যাড!"

পরিচয় করিয়ে দিলেন বড়সাহেব। বললেন, "এই তোমার আন্টি।"

"আন্টি!" বড়সাহেবকে ছেড়ে দিয়ে সে জড়িয়ে ধরল আমাকে। পকেট থেকে চকোলেটের একটা বাক্স বার করে চ্যাং বলল, "আন্টি, সবটা তোমার।"

দেওয়ার আনন্দে চ্যাংয়ের মুখ লাল হ'ল।

মনে হয়, ভবিষ্যতেও রঙের পরিবর্তন কিছু হবে না।

(ক্রমশঃ)
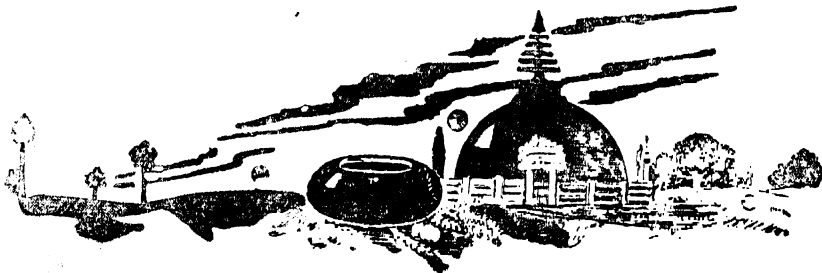
আউর লাও

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র
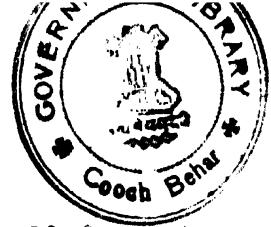
ইংরেজ আমলে, নিতান্ত যুদ্ধবিগ্রহের প্রয়োজনে না হ'ল বছরের মাঝখানে নূতন ট্যাক্স বসান হ'ত না—কেবল সেই ফেব্রুয়ারী মাসে বাজেট বার্ষিক বরাদ্দর সময় একটা চিন্তার কারণ হয়ে পড়ত। এখন মাঝে মাঝে জরুরী আইন বা অর্ডিনান্স দিয়েও বছরের যে কোনও সময়ে নূতন ট্যাক্স আদায়ের ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এখন কেবল এক কথা, "আউর লাও"—আরও আনো। কবি বলেছেন, "এ কেবল দিনে-রাত্রে, জল ঢেলে ফুটো পাত্রে, বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মিটাবারে।" সে যাই হ'ক, যা আছে তা বাড়িয়ে চলা যাক্‌ কিন্তু তাতেও যখন কুলায় না, তখন নূতন নূতন ফন্দি বার করা দরকার। বড় বড় মাথা তাতে ঘেমে উঠছে, নূতন নূতন পথেরও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে—মাথার ঘাম একেবারে বিফলে মাটিতে পড়ছে না, এই যা সান্ত্বনা।

সম্প্রতি প্রাক্তন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী (ণী) শ্রীমতী রাজকুমারী অমৃত কাউর ভাল দুটি ট্যাক্সের কথা বলেছেন: এবছর লোকসভায় গৃহীত হয় নি, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ থাকলে এসকল শীঘ্রই চালু হয়ে যাবে, সন্দেহ নেই। রাজকুমারী বলেছেন, (১) বিবাহের উপর এবং (২) তৃতীয় সন্তানের ভূমিষ্ঠ হওয়ার উপর ট্যাক্স চাপিয়ে দেওয়া চলে। কেবল বিবাহ কেন, যারা বিবাহিত জীবন, যতদিন না স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাৎ মাত্রেই কলহ আরম্ভ হওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে এবং বাড়ীর ভিন্ন ভিন্ন ঘরে অবস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে ততদিন একটা নির্দিষ্ট হারে ট্যাক্স আদায় করা যেতে পারে। তা হলে তৃতীয় সন্তানের কথা আর ভাবতেই হবে না।

তৃতীয় সন্তান হলেই ট্যাক্স! তা-ই মেনে নেওয়া গেল। তা হলে তার পর যত সন্তান হবে, যেহেতু নূতন সন্তানের মুখ দেখায় নূতন নূতন আনন্দ, তার ওপর বর্দ্ধিতহারে ট্যাক্স আদায় করা চলতে পারে। যেমন আয়-করের ওপর "সার-চার্জ" বা উপরন্তু ট্যাক্স, এ রকম না হলে যারা পরে আসবে, তাদের সম্মান ক্ষুণ্ণ হবে। এ-ও হতে পারে, তবে সম্ভাবনা কম—যে, এই ট্যাক্সের প্রতিবাদে যেমন মহাত্মাজী লবণ সত্যাগ্রহ করেছিলেন, সরকার নুন তৈয়ারী করতে দেয় না, অতএব আমরা মাটি আঁচড়ে জলে ধুয়ে নুন তৈরী করবই—সেইরকম তৃতীয় সন্তান থেকে যখন বেশী ট্যাক্স এবং সংখ্যার সঙ্গে উত্তরোত্তর ভারী এবং ভারীতর ট্যাক্স বসবার সম্ভাবনা, (অন্ততঃ তাই হওয়া উচিত) তখন দম্পতী যদি সত্যাগ্রহ করেন, তবে ফলটা নিতান্ত মন্দ হয় না। বে-আইনী নুন তৈরী করলে তখন জেল হ'ত। পিতামাতা ট্যাক্স দিতে রাজি না হলেও এক্ষেত্রেও জেলে দেবার ব্যবস্থা হবে। অনেকগুলি বাচ্ছাকাচ্ছা নিয়ে বাপ-মার অন্ততঃ একটা হিল্লে হয়ে যাবে। পৃথিবীর নিতান্ত যেকয়টার বড় দুঃখ, অর্থাৎ অন্ন-বস্ত্র এবং বাসস্থান, সেই তিনটেরই সমাধান হয়ে যাবে। এইসব বাচ্ছা-কাচ্ছা দ্বিতীয় ও পরবর্ত্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় "শ্রমদান" করতে পারবে, সরকারের আবার আয় বাড়বে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ মারা গিয়ে বড় বেঁচে গেছেন। শুনেছি রবীন্দ্রনাথ তাঁর চতুর্দ্দশ (?) সন্তান। "নেতাজী"ও পিতার নবম সন্তান।

ব্যয় একটু বেশী হলেই, ট্যাক্সের অন্তর্গত হবে, সেবিষয়ে আর সন্দেহ নেই। বলা যেতে পারে বিয়ের সম্পর্কে যেসকল দ্রব্যাদি কেনা হবে, তাদের ক্রয়শুল্ক অন্ততঃ মাল্লের দরের সঙ্গে সমান হবে। পঁচিশ টাকার সাড়ীতে আরও পঁচিশ টাকা ট্যাক্স দেওয়ার ব্যবস্থা করা সুবিধা, এখন টাকায় তিন পয়সা! একেবারে হাসির কথা! বোঝা যাচ্ছে, কেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাঁর আমলে সন্তানসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য শ্রীমতী লীলাবতী মুন্সী যে সামান্য অস্ত্রোপচার চালু করবার কথা বলেছিলেন, তাতে শ্রীমতী কাউর ঘোর আপত্তি জানিয়ে ছিলেন। দু'টির বেশী সন্তান না হলে সরকারের কি অসম্ভব ক্ষতি! তবে বিবাহ করলেই ট্যাক্স যখন দিতেই হবে, তখন ক্ষতির খানিক অংশ পূরণ হয়ে যাবেই। তবে অনেক নাম করা নেতা নাকি "বিবাহের চেয়ে বড়" কাজে জীবনাতিপাত করে বড় নামই রেখে গেছেন, তাঁদের জন্যে শ্রীমতীর প্রেসক্রিপসন বা ব্যবস্থা-পত্রটা পেলে খুব ভাল হবে।

তবে তিনি বিচার করেই কথা বলেছেন। যা সকল সন্তানের মূল, সেই বিবাহেই যখন ট্যাক্স আসলে আসছে তখন আর অন্য বিষয় ভাববার প্রয়োজন নেই। বিবাহে—ধনী-দরিদ্রনির্ব্বিশেষে—ট্যাক্স ধরা যাক্‌, গড়ে দশ টাকা। এর একটু রকমফের হবে। যাঁরা "বহুল ব্যয়" বা এক্সপেনডিচার-ট্যাক্সের আমলে আসছেন, তাঁদের ত একতরফা দিতেই হবে। আর যাঁরা চতুর, ট্যাক্সের ছন্দো বাদ দিয়ে সামান্য কম খরচ দেখাবেন, তাঁদের কাছ থেকেও ত কিছু কিছু টাকা পাওয়া চাই! নিমন্ত্রিত সংখ্যা সরকারকে জানাতে বাধ্য করা যেতে পারে, ধরুন মাথাপিছু দুই বা চার আনা ট্যাক্স, বিবাহের টোপর, সিঁদুর-চুপড়ী, ঘড়া, গাড়ু, পিলসুজ প্রভৃতি তৈজস, সাড়ী-ধুতি, যে দরের কেনা হবে, কখানা বাড়ীর গাড়ী বা ট্যাক্সী কাজে লেগেছে, বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠির বাহার, মাটির গ্লাস, সরা, সবের উপর টাকায় দু'পয়সা থেকে দু'-আনা ধরে নেওয়া যেতে পারে। যাঁরা এ হাঙ্গামায় আসতে চান না—"রেজেষ্টারী" করে বিবাহ করতে চান, তাঁরা ত দশ টাকা কি দেবেনই, উপরন্তু কতদিনের প্রেম, ট্যাক্সের চাপে বিবাহ পণ্ড হবার সম্ভাবনা আছে কিনা, এসব খবর রাখতে হবে। (যদি অন্য

উপায় না থাকে ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের সাইকোমেট্রি বিভাগের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে)। প্রেম গভীর, বিচ্ছেদে আত্মহত্যা অথবা উন্মাদ হওয়ার সম্ভাবনা ; অথবা প্রণয়াস্পদকে না পেলে অবিলম্বে অপর পাত্র বা পাত্রীতে মন ন্যস্ত করার উপযোগী 'লভ' হলে ট্যাক্সের মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে।

প্রশ্ন—এসকল খবর রাখা বা নেওয়া কি সম্ভব ? অর্ব্বাচীন করদাতা জানে না শ্রীকৃষ্ণের আয়-কর তদন্তের জন্য ইলিসিয়ম্ রো (গোয়েন্দা বিভাগ), হাঙ্গার ফোর্ড ষ্ট্রীটে রায়বাহাদুর সত্যেন মুখুজ্জের "এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চ" (চোরাকারবারী প্রভৃতি সন্ধান) বিভাগের গোয়েন্দা অপেক্ষা তুখড় গোয়েন্দা পোষা আছে। তাঁরা লোকের আয় সন্ধান করে বেড়ান। ধরুন, একজন চিকিৎসক ২৭শে ফেব্রুয়ারী তাঁর মোটর বা ভাড়া ট্যাক্সীতে সকাল থেকে যত জায়গায় গেছেন, তার পিছনে কোম্পানীর গাড়ী বা ট্যাক্সীতে আয়-কর বিভাগের গোয়েন্দা ঘুরে বেড়িয়েছেন। দেখা গেল ডাক্তারবাবু মোট সতের জায়গায়, সকাল সাতটা থেকে রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত ঘুরেছেন। যদি বত্রিশ টাকা ফি হয় তবে সেদিন তিনি পাঁচ শ' চুয়াল্লিশ টাকা পেয়েছেন, মাসে ষোল হাজার তিন শ' কুড়ি এবং বৎসরে ···। সুতরাং তার ওপর ট্যাক্স ধার্য্য হবে। কিন্তু হতভাগ্যের সেদিন সাত-আটটা কাজ ছিল যখন টাকা পায় নি। সকালেই ছিল মেয়ের ননদের পাকাদেখা। পাত্রপক্ষ আসতে ঘণ্টাখানেক বিলম্ব আছে শুনে তিনি একটা "কল" সেরে আসতে গিয়েছিলেন। ঘুরে এলেন মেয়ের বাড়ী। পশ্চাদ্ধাবিত, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ আয়-কর গোয়েন্দা বুঝলেন, ঐ বাড়ীর "কেসটা" খারাপ। সুতরাং এত তাড়াতাড়ি ঘুরে আসতে হয়েছে। আরও দু'এক বার আসা সম্ভব। বন্ধু থাকতেন বিদেশে। এসেই ফোনে খবর দিয়েছেন, সেখানে যাওয়া আছে ; গ্রামের স্কুলকমিটির মিটিংটা এবার কলকাতায় সভাপতির বাড়ীতে হচ্ছে ; সন্ধ্যার পরে হয়ত অপ্রকাশ্য কোন বাড়ীতে সপ্তাহে দু'এক বার ডাক্তারবাবুর যাতায়াত আছে, তার মধ্যে সেই ২৭শে ফেব্রুয়ারী বুধবারটাও পড়ে গেছে এইরকম আর ক'টা।

ডাক্তারবাবু হিসেব দিয়েছেন, তাঁর আয় মাসিক এগার হাজার টাকা। বছর দু'তিন বাদে ডাক্তারবাবুকে ডেকে যখন দেখানো হ'ল যে ঐদিন তাঁর আয় অত হয়েছিল, তখন এক জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ছাড়া কেউ হলফ দিয়ে বলতে পারবেন না যে, সত্যিই ঐ দিনে "অকারণে" কত জায়গায় যেতে হয়েছিল।

সুতরাং বিয়ের বাজার করতে কত টাকা খরচ হচ্ছে তার হিসাব রাখবার জন্য লোক রাখলেই হবে। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী হবে যদি বলেন, তার সোজা দুটো উত্তর আছে : (১) বেকারত্ব ঘুচবে অনেকের ; আর (২) এর নজির আছে। যথা, বার্ষিক তিন হাজার টাকায় আয়ের উপর শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও আয়কর ছিল। কিন্তু দেখা গেল, তাতে গবর্ণমেণ্টের যে আয় হয়, তার অপেক্ষা লোকজনের মাইনে, ভাতা, আপিসের খরচ প্রভৃতি মিলিয়ে ঢের বেশী খরচ হয়ে যায়। উপরন্তু সাধারণ লোক উত্যক্ত হয়ে ওঠে। তাইতে কর-যোগ্য-আয় বাৎসরিক বিয়াল্লিশ-শ' টাকা করা হয়েছিল। এবার শ্রীকৃষ্ণ আবার তিন হাজার অর্থাৎ মাসিক আড়াই শত এক টাকায় নামিয়েছেন। তবু তখন জিনিষপত্র সস্তা ছিল।

শ্রীকৃষ্ণ বড়ই শোক করেছেন যে, মৃত্যু-কর অর্থাৎ মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওপর মনের মত ট্যাক্স পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ বুড়ো হলে সংসারের মমতা বাড়ে বেশী, কেউ মরতে চাচ্ছে না। শ্রীকৃষ্ণ খুবই মর্ম্মাহত হয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে লোকসভায় ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন।

এত বড় নূতন ট্যাক্সবিশারদ অর্থমন্ত্রী এর একটা উপায় আবিষ্কার করতে পারলেন না যে, (বেটারা) যদি নাই-ই মরে তবে যেন "শ্রীকৃষ্ণমর্পণমস্তু" বলে সরকারী খাতে, না-মরা পর্য্যন্ত, কিছু কিছু ট্যাক্স দিয়ে যায়। ধরুন, পঞ্চাশ পার হলেই বাৎসরিক পাঁচ-সাত টাকা, পঞ্চান্ন, ষাট বছর হিসাবে উত্তরোত্তর ট্যাক্সের হার বাড়িয়ে দেওয়া যায়। নজির হিসাবে ১৫ই সেপ্টেম্বর (১৯৫৭) থেকে রেলের নির্দ্দিষ্ট মাশুলকে উল্লেখ করা যায়। আত্মহত্যা করা বে-আইনী ; বিফল হলে শাস্তি। কিন্তু ষ্টেটের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধে প্রাণদণ্ড হতে পারে। যারা মরতে চায় না গবর্ণমেণ্টকে ট্যাক্স ফাঁকি দেবার জন্যে, আর এই খাদ্যদ্রব্যের অভাবের দিনে বসে বসে খেয়ে চলেছে, তাদের একটা নির্দ্দিষ্ট বয়সের পর আত্মহত্যা করবার উৎসাহ দেওয়া যেতে পারে ; অন্যথায়, যাক্ সে কথা বলার প্রয়োজন নেই।

অন্য একটা সহজ উপায় আবিষ্কার করা যেতে পারে। দেশে আরামে খেয়ে-পরে, স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করে, রোগ প্রতিষেধক ও প্রতিরোধক ঔষধপত্রের সাহায্য পেয়ে, চোখের সামনে হাসপাতাল, ডিসপেন্সারি প্রভৃতি দেখতে পেয়ে লোকের পরমায়ু বেড়ে যাচ্ছে। এমন ব্যবস্থা সহজেই অবলম্বন করা যেতে পারে যাতে লোক ঐসবের সুযোগে ও সাহায্যে অতদিন না বাঁচে। এতে সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না। সরকার এখন অবাস্তর খরচ কমাতে বদ্ধপরিকর। কেউ কেউ শতকরা পাঁচ-সাত টাকা মাইনে কম নিয়ে বৎসরে সরকারের প্রায় দশ লাখ টাকা খরচ কমিয়ে ফেলেছেন। এক বৎসরে মাত্র এক শত কোটি টাকা ট্যাক্স সাধারণের মুখের গ্রাস, দেহের নিতান্ত প্রয়োজনীয় আচ্ছাদন, রোগের চিকিৎসা, উপার্জ্জন উপলক্ষে যাতায়াতের ব্যয়ের উপর থেকে আদায় হবে। সুতরাং দশ লক্ষ টাকা ত্যাগ স্বীকার করে সর্ব্বহারা দধীচিরা জগতে আদর্শ স্থাপন করেছেন। তা অপেক্ষা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শুচিতা, পরিবেশ, খাদ্যবণ্টন, চিকিৎসাব্যবস্থার জন্য অবাস্তর খরচ কমিয়ে দিলে বহু টাকা বেঁচে যেতে পারে, মানুষগুলোও সকাল সকাল মরবার সুযোগ পায়। এখন জন্ম ও মৃত্যুসংখ্যার ব্যবধানে বৎসরে লোকসংখ্যা বাড়ছে পঞ্চাশ লক্ষ। এখন মানুষ

একটু বেশী বয়সে বাৎসরিক লোকবৃদ্ধির সংখ্যা স্বরিতে হ্রাস পেয়ে যাবে। "কি আনন্দ হলো ব্রজে, (আহা) কি আনন্দ হলো।"

তাড়াতাড়ি না মলে বর্ণচোরাদের চেনা যাচ্ছে না। এক শ্বেতশুভ্র খদ্দরবস্ত্রধারী ঋষিকল্প, দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের অগ্রদূত, সর্ব্বত্যাগী, নিরভিমানী, স্বল্পভাষী মনীষী, যিনি কৃচ্ছ্র সাধন, কারাক্লেশ-ভোগ ও বুদ্ধিমত্তায় সকলকে পরাস্ত করে ১৯৩৭ সনে কংগ্রেসের অন্তর্ব্বর্তী মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রধান হয়ে আমরণ একরাজ্যের কর্ণধার হয়ে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর "ধুবড়ির মধ্যে খাসা জল",—তিনি মাত্র এক কোটি উনআশী লক্ষ টাকার সম্পত্তি রেখে গেছেন, স্ত্রী-পুত্র-কলত্র (এবং বর্ত্তমানে শ্রীকৃষ্ণ)-র জন্য। মনে হয়, মন্ত্রীমহোদয়দের মধ্যে কেউ কেউ মৃত্যুমুখে পতিত হলে এরূপ সম্পত্তির পরিচয় পাওয়া অসম্ভব নয়।

কিন্তু একটা কথা। এই প্রৌঢ়ত্ব ও বার্দ্ধক্য ট্যাক্স নিয়োগের সম্ভাবনা আছে কি না বিচার করা দরকার। ভারতের মধ্যে সভাপতি, উপ(সভা)পতি থেকে আরম্ভ করে রাজ্যের মন্ত্রীমণ্ডলীর যে কেউ বাদ পড়ছে না, এই ভয়। পঞ্চাশের নীচে বুদ্ধি পরিপক্ক হয় না। আর বুদ্ধি না পাকলে ভারতের এই টলটলায়মান তরী তীরে নিয়ে যাবার হুসিয়ার কাণ্ডারী পাওয়া যাবে না। তাই "বুড়ো হাবড়া" দিয়ে যত রাজ্য পরিচালনা করতে হচ্ছে। সুতরাং সেখানে এই নূতন ট্যাক্স চালু করাতে বেগ পেতে হবে। সুতরাং এ অধ্যায়ের হয়ত এইখানেই যবনিকাপাত।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, দানের টাকার ওপর শীঘ্রই ট্যাক্স চড়িয়ে দেবেন এবং যাতে কেউ ফাঁক না পায় তার জন্য তিনি খুব পাকা গোয়েন্দা লাগিয়ে দেবেন। বাঁচা গেল! একটা বড় জুয়াচুরি বন্ধ হবে। এখন বেশ বড় লোক ধরে প্রচুর ঘটা, বিরাট বা রসরাজ অমৃতলাল বসুর ভাষায় "রাক্ষুসে সভা" করে টাকার তহবিল (purse) দেওয়া হয়। কোনও কোনও ভাগ্যবান পুরুষ যেমন জনাব আগা খাঁ, প্রতি বৎসর তাঁর দেহের ওজনে অর্থ, রৌপ্য, স্বর্ণ, প্ল্যাটিনম, হীরা, জহরত পর্য্যন্ত পেয়েছেন। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী প্রতি বৎসর বয়সের হিসাবে তত হাজার টাকা দান (দয়া করে বেঁচে থাকার জন্য 'পুরস্কার' বলাই ঠিক) পান। এখন যিনি দেন, তাঁর প্রতিষ্ঠানের প্রচুর দেনা থাকা সত্ত্বেও, তাঁকে এবং গ্রহীতাকে ট্যাক্স দিতে হবে। তবে মুখ্য মন্ত্রী বলে যদি বাদ পড়েন, তবে বলা যায় না। কিন্তু এখানেও হয়ত "সাত তাল, এক ফাক" আছে। স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র বসু যখন দীর্ঘ কারাবাসের পর কলকাতায় আসেন তখন কলিকাতাবাসী তাঁকে (১,১১,১১১৲) টাকার এক "তোড়া" উপহার দিয়েছিলেন। তার মধ্যে সত্যি কত টাকা (বা নোট) ছিল তা যিনি হাতে করে দিয়েছিলেন এবং যিনি হাতে করে নিয়েছিলেন দু'জনেই জানতেন। [এসব তোড়া প্রকাশ্যে দান যে কি তা অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণের অজ্ঞাত নয়। যাই হউক, বাংলার প্রধানমন্ত্রী তিয়াত্তর, চুয়াত্তর-পঁচাত্তর হাজার টাকার চেকখানা পেয়েই হাজার হাজার লোকের সাক্ষাতে ঐ টাকাটা দান করে দেন। কোন্ ব্যাঙ্কের চেক এবং কার সহি তা দেখে যদি শ্রীকৃষ্ণের চর দাতা ও গ্রহীতা অর্থাৎ দ্বিতীয় দাতার ওপর ট্যাক্স আদায়ের জন্য যান, তবেই ভাল ফল হতে পারে। নচেৎ কারও ক্ষতি নেই। গোয়েন্দা ভদ্রলোক একটু কাজ দেখাবার সুযোগ পেতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, ভারতের লোক একনম্বরের শয়তান। জুতোর ওপর ট্যাক্স বসিয়ে দিলে সে জুতো পরবে না। কিন্তু যাও ত ইংলণ্ডে, দেখবে সেখানে ট্যাক্স, মানুষকে দমাতে পারে না, যত ট্যাক্সই হউক, লোক জুতো পরবেই। তা হলেও এজন্যে চা, চিনি, তেল, তামাক প্রভৃতি তিনি কিছুই বাদ দেন নি। এখন একটা-দুটো নূতন ট্যাক্স ধরা যেতে পারে। আজ ভারতের "মহী, সিন্ধু, ব্যোম"এর মালিক স্বয়ং গবর্ণমেণ্ট। যার নামে যা আছে তাকে নামমাত্র মালিক বলা যায়। তাছাড়া সর্ব্বসাধারণের বা লোকের যা লাগে, সেসব বস্তু, বা শিল্প সবই গবর্ণমেণ্টের বা পরে গবর্ণমেণ্টের মালিকানায় চালু থাকবে। এসবের ব্যক্তিগত অধিকার কংগ্রেস সরকার মানতে পারে না, প্রজা শ্রমিকদের দুঃখে বিগলিতপ্রাণ দলগুলি ত নয়ই। সুতরাং বায়ু যে সরকারী মালিকানার সম্পত্তি সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

কিন্তু বায়ুর অপেক্ষা সর্ব্বজনীন (বর্ত্তমানে আর "সার্ব্বজনীন" বলা হয়ত চলে না) সকলের প্রয়োজনে লাগে এমন কি বস্তু থাকতে পারে? সুতরাং দেহের প্রয়োজনে শ্বাস-প্রশ্বাসে যে বায়ু লাগে সেটার হিসাব নেওয়া দরকার। দেহের ওজন অনুযায়ী একটা এ্যাসেসমেণ্ট করা যেতে পারে, তাতে মাপটা হিসাবের সুবিধা হয়। এক মণ সায়ত্রিশ সের ওজনের ফুসফুসে কত কিউবিক ফুট (এখন লিটার-এ বলতে হবে) বায়ু প্রয়োজন, সেই হিসাবে নয়া পয়সার মত একটা চাট করে দিলে নয়া বা 'নভিস' অফিসার-দের ট্যাক্সের পরিমাণ ঠিক করতে কষ্ট হবে না। এখানে ট্যাক্স বসালে লোকে কিছু শ্বাস বন্ধ করে থাকতে পারবে না।

আসুন শ্রীকৃষ্ণ, এই কালীয় হ্রদের জল নিয়ে আলোচনা করা যাক। পূর্ব্বের মত দেহের ওজনের অনুপাতে পানীয় জলের ওপর ট্যাক্স দেবেই। উপরন্তু যাহারা স্বাস্থ্যের কারণে জ্ঞানীগুণী লোকের পরামর্শে বেশী জল পান করে থাকেন, তারা সারচার্জ্জ দিতে বাধ্য হবে। জল না খেয়ে ভবলীলা সাঙ্গ করতে পারা যাবে, কিন্তু বেঁচে থাকলে জল খেতেই হবে। ট্যাক্সের কৃপায় কালীয় হ্রদের পাণি (ইতি রাষ্ট্র ভাষা) বিষাক্ত হ'তে পারে, "গণ্ডুষমাত্রেণ" সকল জ্বালার মুক্তি হবে। ট্যাক্স বাকী রেখে ম'লে নূতন নূতন প্রতিষ্ঠিত এতগুলি মেডিকেল কলেজের ছেলে-মেয়েরা মহা আনন্দে হাড়গুলো সস্তায় কিনে নেবে।

গবর্ণমেণ্টের ট্যাক্স-আদায়কারী লোক সে টাকা সরকারী তোষা-খানায় জমা দিতে পারবে।

মোটা লোকের ওপর একটা ট্যাক্স ধরে দেওয়া যায় না কি?

ট্যাক্স-কাহিনী এক প্রবন্ধে শেষ করা যায় না। ধরুন না,

হিন্দুরা তীর্থযাত্রা করবেই। তীর্থে গেলেই রেল-কোম্পানী তত্তৎ তীর্থস্থানের উন্নতিকল্পে টিকিটের সঙ্গে ট্যাক্স নিয়ে নেয়। গবর্ণমেণ্টের আয়বৃদ্ধির জন্যে মাশুলের ওপর মাইলের দূরত্ব হিসাবে অতিরিক্ত ট্যাক্স আদায় হ'ল। কিন্তু সব ত তীর্থে যাচ্ছে না। ধরুন কাশী, গয়া, বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকা, দেওঘর, কন্যাকুমারী, কৈলাস, মানসসরোবর, কেদারবদরী, বাহান্নপীঠ প্রভৃতি স্থানে ট্যাক্সের অফিস বসালে কত টাকা চুঙ্গি বা octroi হিসাবে আয় হতে পারে! প্রথম প্রথম পুণ্যার্থীর সংখ্যা একটু কম হবে। নূতন ট্যাক্স বসলে ও রকম একটু হয়। কিন্তু দামবৃদ্ধির জন্য যে আয় হয় তা থেকেই লোকসানটা পুষিয়ে যায়। চিড়িয়াখানার প্রবেশমূল্য এক আনা স্থলে তিন আনাই হউক, আর এক পয়সার পোষ্টকার্ড এবং দুই পয়সার খাম যথাক্রমে পাঁচ নয়া পয়সা আর তের (পনের হবে) নয়া পয়সা হ'লেও বিক্রী বেড়ে চলেছে। হিন্দু নিঃশ্বাস নেওয়া হয় ত বন্ধ করবে, কিন্তু তীর্থে যাওয়া বন্ধ করবে না। এখন একটা পাকা কদলী ক্ষেত্র এখনও "আনটাচড বাই হ্যাণ্ড" বা অর্থমন্ত্রীর শ্রীহস্তস্পৃষ্ট হয় নাই। যেমন কুম্ভীরকে সন্তরণ শিক্ষা দেবার প্রয়োজন হয় না, সেই রকম কল্যাণরাষ্ট্রের কর্ণধারগণকে ট্যাক্স সম্বন্ধে কোন পরামর্শ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। এক বিখ্যাত অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক পত্রিকায় লিখিত হয়েছে, দেখা যাচ্ছে কেবলমাত্র জন্ম, প্রাতঃকৃত্য ও মৃত্যুর উপর ট্যাক্স নেই। কিন্তু কথাটা আংশিক সত্য।

"আউর লাও" (রাষ্ট্রভাষা) হুঙ্কার কার্য্যে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু সত্য সত্যই আর হয় ত "হনু" মিলবে না। বজবজ অঞ্চলে (সত্য ঘটনা) এক পাটকলের বড়বাবু (হঠাৎ ধনী) বাড়ীর দুর্গোৎসবে যাত্রাগানের ব্যবস্থা করেন—আখ্যানবস্তু ছিল রামায়ণের অংশ-বিশেষ। পূজায় প্রতিমা-ঘট-পুরুত না হলেও চলে, কিন্তু কলের সব সাহেব-মেমেরা নিমন্ত্রিত হয়েছেন। তাঁরা এক বর্ণও না বুঝে, চুপ করে তামাসা দেখছেন। অকস্মাৎ পুষ্টকায়, দীর্ঘলাঙ্গুল, দগ্ধবদন, পবননন্দন শ্রোতাদের মধ্য থেকে বিরাট লম্ফে "হুপ, হুপ" শব্দ করতে করতে আসরে অবতীর্ণ হলেন। আর যায় কোথা? সাহেব-মেমরা এতক্ষণে রামায়ণের কতকটা বুঝতে পারলেন, তাঁদের পদবিক্ষেপ ও করতালের ধ্বনিতে স্থান পূর্ণ হয়ে উঠল, টাকা, নোট, গিনি প্রভৃতি "প্যালা" পড়তে লাগল; উৎসাহে শ্রীহনু ভারার চার-পাঁচ হাত উচু এক পাড়ের উপর উঠলেন, মাটিতে ল্যাজ তখনও বিঘোৎখানেক পড়ে আছে। বিশেষ করে মেমরা বহুৎ খুস। সাহেবরা টাকা ছোড়েন, আর হাততালি, কলহাস্যের মধ্যে চীৎকার করেন "আউর হনু লাও"। অধিকারী মশাই মহা খুশী। প্যালার বহর দেখে অনেকেই হনুমান সাজতে আগ্রহ দেখাতে লাগল, কিন্তু যদিও পরিবর্ত্ত (substitute) হিসাবে এটা-ওটা যোগাড় হ'ল, ল্যাজের অভাবে সাহেবদের অতিরিক্ত তৃপ্তি বিধান সম্ভব হ'ল না। এখন "আউর লাও" ধ্বনি আছে, লোকের এটা-ওটা দেখে কর্ত্তাদের লোভও আছে, কিন্তু আর ল্যাজ আছে কিনা দেখে কে?

"তোমাদের মঙ্গল হবে, ট্যাক্স হবে, ট্যাক্স দাও, আরও ট্যাক্স দাও!" কৃষ্ণ কহে—"শুন, মেঘ বরিষার
নিজেরে নামিয়া দেয় বৃষ্টি ধার;
সর্ব্বধর্ম্মমাঝে ত্যাগধর্ম্ম সার ভুবনে।"

এখন সামান্য কৃচ্ছ্রসাধন করলেই জাতীয় আয় ধাপে ধাপে বেড়ে যাবে, বিদেশের লোকে বাহবা দেবে, সাবাস বলবে, ঋণ দিয়ে যাবে। দেশের লোকের শক্তিবিচার করে আর ট্যাক্সের পরিমাণ ঠিক হচ্ছে না। 'আউর লাও।' এই ভারতেরই ত—

"দীন নারী এক ভূতল শয়ন
না ছিল তাহার অশন ভূষণ।"

তাহারই কাছে "দান" চাই, সেই নারী তখন

"অরণ্য আড়ালে রহি কোন মতে
একমাত্র বাস নিল গাত্র হতে,
বাহুটি বাড়ায়ে ফেলি দিল পথে ভূতলে।"

রাজকোষ ভরবার চেষ্টায় এই জীর্ণ বস্ত্রেরও অভাব হয়ে পড়েছে। বাকি আছে কুরুরাজসভায় পাঞ্চালীর বস্ত্রহরণের উদ্যোগপর্ব্ব। কিন্তু কৈ সেই পতিতপাবন, দুঃখহরণ, লজ্জা-নিবারণ হরি! বিপর্য্যস্ত ভারত আজ তোমার আগমনের প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে আছে। আজ ট্যাক্স "অত্যাচারে, সভয় অন্তরে, ডাকিতেছে তব কাতর কিঙ্করে।" তুমি সুমতিরূপে কর্ত্তাদের মস্তিষ্কে স্থান গ্রহণ কর, বিপন্নত্রস্ত ভারতবাসীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচুক। 'নব আশে হিন্দুস্থান, ধরুক তান নূতন।"

ময়না

শ্রীবিশ্বপ্রাণ গুপ্ত
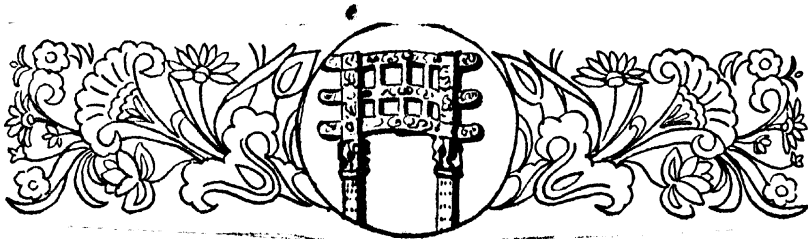
একদিকে মজা আত্রেয়ীর ধূ ধূ বালিয়াড়ি, আর একদিকে বুনো লতা-পাতা, আশ শ্যাওড়া আর বোনাইচার জঙ্গল। এরই মাঝে গড়ে উঠেছে বালুপাড়া রিফুজি-ক্যাম্প। আজ তিন মাস হ'ল। তিন মাস এখানে এই ক্যাম্পে কাটিয়েছেন নবেন্দু ঘোষ। রুক্ষ বৈশাখের চোখপাকানো রোদভরা একদিন দুপুরে তিনি এসেছিলেন। আর আগামীকাল চলে যাবেন।

ক্যাম্প উঠে যাচ্ছে।

আষাঢ় মাস। আকাশকে ঘনঘটা, বাতাসে মৌসুমী বায়ুর ভিজে উচ্ছাস। সকাল থেকেই ছিঁচকাঁদুনে মেয়ের মত টিপটিপ বৃষ্টি। বাতাস আর মেঘ। বিরক্তিকর, তবুও বাস্তবাগীশ নবেন্দু ঘোষের বিশ্রাম নেই। প্রতি মিনিট, প্রতিটি মুহূর্ত ব্যস্ত রয়েছেন তিনি। অথচ এ ছাড়া অন্য দিন, সকাল গড়িয়ে দুপুর, তারপর বিকাল, কর্মহীন অখণ্ড অবসর ভোগ করেছেন নবেন্দু ঘোষ।

কিন্তু আজ আর তা নয়। আজ সারাদিন লকলকে কঞ্চি হাতে নবেন্দু ঘোষ ঘুরছেন তাঁবু থেকে তাঁবুতে। সকলকে ধমকাচ্ছেন, তাড়া দিচ্ছেন সবাইকে।

—এই নগেন, মালপত্র বাঁধলি না? তাঁবু ভাঙলি না? তাড়াতাড়ি সব সেরে নে। নগেনের তাঁবুর কাছে এসে দাঁড়ালেন নবেন্দু ঘোষ।

—আজ্ঞে বাবু। জাল বুনছিল নগেন্দ্র। বাঁ পা-টা সরু লিক্‌লিকে। কাপড়ের আড়ালেও যেন বেমানান। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে এল নগেন্দ্র। জোড়হাত করে দাঁড়াল।

—তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও। এখনি গাড়ী এসে পড়বে। নগেনের স্ত্রীর মাংসল শরীরটার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে এগিয়ে গেলেন নবেন্দু ঘোষ। আর দাঁড়ালেন না।

খট-খট-খট। চারিদিকে তাঁবুর খুঁটি উপড়ানো চলছে। তিন মাসের রোদে-জলে-ঝড়ে জীর্ণ হয়ে গিয়েছে তাঁবুগুলো। আর বিবর্ণ, তবুও ছেঁড়া তাঁবুর ফাঁকে ফাঁকে দুপুরের রোদ আর রাত্রির জ্যোৎস্নার সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে সংসার করেছে ক্যাম্পের বাসিন্দারা। আজ সেই ক্যাম্প উঠে যাচ্ছে। এই ক্যাম্পে শ'দুই মানুষের পদরেখা এখন ধুয়ে মুছে যাবে। হাসি-কান্না কলরব-মুখরিত এক-একটি মুহূর্ত, এক-একটি দিন মিলিয়ে যাবে। তারপর শুধু স্তব্ধতা। পাখীর ডাক। আর বালিয়াড়ির গা বেয়ে বেয়ে আত্রেয়ীর চাপা কথার ফিস্‌ফিসানি। আকাশে এই-চুপ-এই-চঞ্চল-মেঘ। যেন দিশেহারা।

কাঁঠাল গাছটায় ছায়া-শীতলতায় থমকে দাঁড়ালেন নবেন্দু ঘোষ। দাঁড়িয়েই রইলেন এক মুহূর্ত। হাতের মুঠোয় লকলকে কঞ্চিটায় পিঠ চুলকালেন বার কয়েক। তারপর আবার হাঁকলেন, কইরে তোদের হ'ল? তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নে, খাওয়া-দাওয়া সেরে ফেল। এখনি গাড়ী এসে পড়বে।

তাঁবুতে তাঁবুতে উনানে আঁচ পড়েছে। পুরুষেরা ছাগল-পাঁঠা সামলাতে ব্যস্ত। মেয়েরা বাচ্চাদের। দুই-একটা তাঁবুতে এখনও জটলা চলছে। ক্যাম্প ছেড়ে কলোনীতে সুবিধা-অসুবিধার হিসাব-নিকাশ।

আকালু মুখের উপর স্পষ্টই বলে বসল, বেয়াদপি মাপ করবেন স্যার।

আকালুর দিকে তাকিয়ে ভ্রূ কুঁচকালেন নবেন্দু ঘোষ।

—কি তোমার? কি বলবে?

—আজ্ঞে, কলোনীতে আমাদের কি সুবিধা হবে? খাওয়ার জল নেই, থাকবার ঘর নেই, আবার ত স্যার তাঁবু ফেলতে হবে। এদিকে তাঁবুও ত ঝাঁজরা হয়েছে। শুয়ে শুয়ে ত চাঁদের আলো দেখি।

—বেশ কর। কঞ্চিটা বাঁ হাতে ঠুকলেন নবেন্দু ঘোষ। বললেন, আজ ক্যাম্প উঠে গেল। এবার কলোনীতে গিয়ে পুনর্বসতি নাও। ঘর-বাড়ী কর, কে আপত্তি করে?

আকালু কিছু বলল না। কিন্তু ওর মা, পিঠ-কুঁজো, চিল-চোখ দৃষ্টি ছড়িয়ে, লাঠিতে ভর দিয়ে ঠুক্ ঠুক্ করে এল।—বাবা একটা কথা।

—কি? বুড়ীর দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন, নবেন্দু ঘোষ। আমার বউমা পোয়াতী, আর একটা তাঁবু দিবা?

—দেব'খন। এগিয়ে চললেন নবেন্দু ঘোষ। আর দাঁড়ালেন না। দাঁড়ালেই বিপদ, একে একে দুইয়ে-তিনে পিঁপড়ার মত সারি বেঁধে আসবে তাঁবুর লোকগুলি। এটা-ওটা চাইবে। আবদার করবে, না দিলে অসভ্যের মত চীৎকার করবে, জংলীর মত। এ সব তিনি জানেন। গত পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা এসব। মনে মনে দাঁত ঘষলেন নবেন্দু ঘোষ। শালা! রিফিউজী ক্যাম্পের সুপারিনটেনডেন্টের চাকরি ভদ্রলোকে করে!

নগেন্দ্র তখনও তাঁবু ভাঙে নি। যেমন বসে বসে জাল বুনছিল তেমনি বুনতে লাগল। সারা শরীরে যেন বিছুটিপাতার প্রলেপ লাগাল কেউ। তিতিয়ে-বিষিয়ে উঠলেন নবেন্দু ঘোষ। আশ্চর্য্য মানুষ এই নগেন্দ্র! মাথাভরা বাবরি চুল, ছোট ছোট চোখ। সমাজ-সংসারকে ভেংচিকাটা একজোড়া বেপরোয়া গোঁফ। সারাদিন শুয়ে-বসে খোলে চাঁটি মারছে আর জাল বুনছে। ফুর্তিতে আছে ব্যাটা! নবেন্দু ঘোষ দাঁড়িয়ে রুমালে মুখ মুছলেন।

নগেন্দ্রের স্ত্রী মাথায় ঘোমটা টানল। ভরা-বুকের আলুথালু কাপড় সামলাল। কাগজ পুড়িয়ে দুধ গরম করছিল, তেমনি করতে লাগল। নবেন্দু ঘোষ সিগারেট ধরালেন। নগেন্দ্রের তাঁবুর বাঁ-দিকে ঝুলানো ময়নার খাঁচাটা। দরজাটা খোলা। বাটি উল্টানো। পাখীটা নেই।

নবেন্দু ঘোষ জানতে চাইলেন, তোর পাখী কোথায় নগেন ?

—আজ্ঞে এখনও ফেরে নি। নগেন্দ্র হতাশ চোখে তাকাল খাঁচাটার দিকে।

আর একদিনও এমনি হয়েছিল। সন্ধ্যায় তাঁবুর ভেতর এক সার টেবিল-চেয়ার আর আলমারী-ঘেরা আপিসঘরে বসে কাগজ দেখছিলেন নবেন্দু ঘোষ। পাশে বসে সিগারেট ফুকছিলেন ক্যাম্পের ডাক্তার বোসসাহেব। নগেন্দ্র এল। রক্তাক্ত ডান-পা'টা মেলে ধরে বলল, ময়নাটা ফেরেনি বলে জঙ্গলে ঘুরছিলাম ওর পিছনে পিছনে। তা মানে—বাবলা কাঁটা—মানে এই পায়ে বিঁধেছে।

—পাখীটা ফিরেছে ? নবেন্দু ঘোষ পাল্টা প্রশ্ন করলেন।

—আজ্ঞে তিনি ফিরেছেন—মানে শেষে খপ করে ধরেছি এক নাটাবনের ঝোপে।

—পাখীটা তোর সন্তানের মত না-রে ? নবেন্দু ঘোষের মুখে হাসি ফুটেছিল।

—না মানে—আমরা দুজনেই বড় ভালবাসি ওটাকে। নগেন্দ্র লজ্জিত হয়ে উঠছিল। জাল বুনা আর খোল বাজানো ছাড়া আরও একটা কাজ করত নগেন্দ্র। সকাল-সন্ধ্যা ময়নাটাকে বুলি শিখাতো, বল হরেকিষ্ট—বাবু প্রণাম।

পাখীটা সুর মিলাতো।

সিগারেটটা শেষ করে নবেন্দু ঘোষ যেন চঞ্চল হয়ে উঠলেন, কি রে নগেন্দ্র, যাবি নাকি? যাবি ত গুছিয়ে নে। দেরী করছিস কেন ? না হয় পাখীটা থাকলো।

—আজ্ঞে তা হয় না। পরিবার কান্নাকাটি করবে। বড় আদরের পাখী ওটা। নগেন্দ্রের দুই চোখ করুণ হয়ে উঠল। বলল—আজ্ঞে পাখীটা না ফিরলে কি করে যাই বলুন। পাখীটাই যে আমাদের সব।

—তুই ব্যাটা ভুগবি। তোর কপালে দুঃখ আছে। তোর আর যাওয়া হবে না। অভিজ্ঞ মানুষের মত ঘাড় নাড়লেন নবেন্দু ঘোষ।

—সে ত স্যার ঠিক কথা। কিন্তু মানে—এই পাখীটা মানে বড় ঝঞ্চাটে ফেলল আমাকে। তেমনি জোড়হাত করে দাঁড়িয়ে—খাঁচাটার দিকে তাকালো একবার। তারপর আশেপাশে, কাঁঠাল গাছের শাখায়, বোনাইচার মগডালে।

নবেন্দু ঘোষ আবার দু'পা এগিয়ে হাঁকলেন, কই রে তাড়াতাড়ি কর সব—এখুনি গাড়ী এসে যাবে।

গাড়ী এল। একটি দুটি নয়, আঠারোটি গাড়ী এল। গাড়ীর কনভয় যেন। চারিদিকে এখনও ধুলো উড়ছে। নবেন্দু ওখান থেকে দাঁড়িয়েই চিৎকার করে বললেন, যেতে চাও ত গুছিয়ে নাও নগেন্দ্র। নইলে এরপর দুই ক্রোশ পথ হেঁটে যেতে হবে। আমার আর কোন দায়িত্ব থাকবে না।

ক্যাম্পের অন্য সবাই ভেঙে ফেলেছে তাঁবু। এক-একটি তাঁবুর নীচে তকতকে নিকানো মাটি। এক-একটি মানুষ, এক-একটি পরিবার—এক-একটি জীবনের স্মৃতি। চারিদিকে সবুজের ইসারা। মাঝে মাঝে পরিপাটি করে নিকানো টুকরো টুকরো মাদুরের মত এই মাটি। তক্‌তকে, ঝক্‌ঝকে। এই বর্ষায় ওখানে ঘাস উঠবে। সবুজ ঘাস। নবেন্দু আর একটা সিগারেট ধরালেন।

লরী বোঝাই হচ্ছে, একটার পর একটা। ক্যাম্পের বাসিন্দারা উঠছে। ক্যাম্প ছেড়ে চলল সব পুনর্ব্বসতি নিতে। ঘরছাড়া এক-একটি মানুষ। এক-একটি পরিবার। উদ্বাস্তু। আজ অনেক—অনেক দিন পর হঠাৎ, হঠাৎই বুক টন্‌টন্ করে উঠল। ভিজে ভিজে ব্যথায় কোমল আর নরম হ'ল মন। মানুষগুলো সব চলল ক্যাম্প ছেড়ে। এই এত দিন, প্রায় তিন মাস—পুরো তিন মাস একসঙ্গে ছিলেন নবেন্দু ঘোষ মানুষগুলোর সঙ্গে সুখে-দুঃখে। আজ সব ফাঁকা।

লরীগুলো চলে গেল ধুলো উড়িয়ে। কতকগুলো জন্তু যেন হুঙ্কার করে ছুটে গেল। তারও পর, অনেকক্ষণ তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন নবেন্দু ঘোষ। সিগারেট টানলেন শ্লথ-মন্থর ধোঁয়া উড়িয়ে।

আকালুর মা ছুটতে ছুটতে এল। খানিকটা গিয়েই লরী থেকে ফিরে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, ছাগলটা নেওয়া হয় নাই—ওটা এখনও ঘাস খাচ্ছে।

হিঃ হিঃ হিঃ। নগেন্দ্র পাশে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল, বুড়ীর এবার—মানে, নাতি হবে কিনা—তাই মানে—ছাগলের দুধের ব্যবস্থা করছে। হিঃ হিঃ হিঃ।

—হাসির কি হ'ল নগেন্দ্র ? আকালুর মা ধমকাল।

লাঠিতে ভর করে এক পায়ে দাঁড়িয়ে, আর এক পা ঝুলিয়ে নগেন্দ্র তবুও হাসতে লাগল, হিঃ হিঃ হিঃ।

পর দিন ভোরে। ভোরের আলোয় শুকতারাটা হারিয়ে গিয়েছে সবে। আকাশের নীলিমায় মেঘের ছিটে। নীল ক্যানভাসে যেন ছোপ ছোপ কালির দাগ। নগেন্দ্র আর তার স্ত্রী একটা বটগাছের ছায়ায় পা মেলে বসেছে। পাশে একটা টিনের প্যাটরা, বিছানা-মাদুর। আর তাঁবু। নগেন্দ্রের বাঁ-পাশে সেই খাঁচাটা। ডান পাশে তেলে পাকানো লাঠি।

সেই রাত থাকতে বেরিয়ে পড়েছে নগেন্দ্র। সঙ্গে সাবু ওরফে সাবিত্রী। নগেন্দ্রের স্ত্রী। পথে ঐ বটগাছের ছায়ায় ওদের বিশ্রাম-আয়োজন। ক্যাম্প ছেড়ে কলোনীতে চলেছে ওরা।

লিকলিকে সরু বেমানান বাঁ পা'টার ওপর হাত বুলিয়ে নগেন্দ্র বলল, আঃ! আঃ! দে দে হাতটা বুলিয়ে দে সাবু। ব্যথায় টনটন্ করছে। উফ, আর পারি না বাবা। আরও এক ক্রোশ পথ হাঁটতে হবে। দে দে, পা'টা টেনে দে।

সাবু পা টিপতে লাগল। বলল, কেন সুপারিন্ বাবু ত বলেছিলেন তোমাকে গাড়ীতে যেতে, তা— কথার মাঝে বাধা দিয়ে নগেন্দ্র বলল, এই শয়তানটার জন্তই ত এই দুর্ভোগ কপালে। বাবু ফিরলেন এক প্রহর রাতে। পাখীর খাঁচাটাকে একবার ঝাঁকুনি দিলে নগেন্দ্র। খাঁচার ভেতর ঘাড় গুজে-থাকা ময়নাটা যেন চমকে উঠল হঠাৎ। পাখা ঝাপটালো বারকয়েক। তার পর ময়নাটাকে আদর করল নগেন্দ্র। খাঁচার ওপর চুমু খেল—সোনামণি।

—দে দে ভাল করে টিপে দে। আঃ! আঃ! দুই চোখ বুজে নগেন্দ্র আধ-শোওয়া ভঙ্গীতে বসল। একটু পরেই হঠাৎ উঠে বসে বলল, এই যাঃ, বড্ড ভুল হয়ে গেল যে! সুপারিন বাবুর কাছে একটা চার্টিফিকেট (সার্টিফিকেট) নেওয়া হ'ল না। দরকারী জিনিস। বাবুরা রিলিফ অফিসে হরদম চায়।

—কিসের চার্টিফিকিট। সাবিত্রী তাকাল স্বামীর দিকে। নগেন্দ্র হাসল, আমার চরিত্তির, এই আমি শুধু তোমাকে নিয়েই সন্তুষ্ট, না অন্য কোথাও ঘুর ঘুর করি তারই—ঘোমটার আড়ালে সাবিত্রী মুচকী হাসল, মরণ আমার, কথা শোন।

নগেন্দ্রও হাসল। আর তার পরই তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল দ্রুতবেগে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে লাঠিতে ভর করে। যাওয়ার আগে বলল, একটু অপেক্ষা কর, এই যাব আর আসব।

সাবিত্রী তাকিয়েই রইল অনেকক্ষণ। এবং স্পষ্ট, হ্যাঁ, স্পষ্টই অনুমান করে নিল, কষ্ট, খুব কষ্ট হচ্ছে নগেন্দ্রের।

কষ্ট হচ্ছিল বৈ কি? তবুও নগেন্দ্র এল। সারা শরীরে যেন ঘাম ঝরছে এই সকালে। সত্যি বড় ক্লান্ত লাগছে শরীরটা। মাঝে বার কয়েক নগেন্দ্র বসে ছিল পথে। নিজেই দু'হাতে পা টিপে, তার পর আবার হেঁটে এসেছে।

এতক্ষণে রোদ উঠেছে: বর্ষার সকালে ক্ষীণায়ু রোদ। সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট বাবুর বাড়ীর পাশে গঞ্জ। গঞ্জর দোকানপশার খুলেছে অনেকক্ষণ। জগবন্ধু সাহা তার খাবারের দোকানের বাইরে ছোলা ছিটাচ্ছিল, আয়, আয়, আঃ আঃ—আর ঝাঁক ঝাঁক পায়রা নেমেছে ওখানে। বক্ বকম্ বক্ বকম্ বক্। কলকলিয়ে আছে সব। খুশীতে আছে মৌজ করে। থাক্ থাক্, সব সুখে থাক। ভগবানের দুনিয়ায় সব সুখে থাক্।

কিন্তু ওকি? সুপারিন বাবুর ঘরে তালা ঝুলছে। লাঠিতে ভর দিয়ে থমকে দাঁড়াল নগেন্দ্র। দুই চোখে বিস্ময়। হতাশাও যেন দুলে উঠল একবার। পিছন ফিরতেই জগবন্ধু সাহার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময়।

—কি হে তুমি আবার কোত্থেকে? আর ত সব চলে গেল সন্ধ্যায়।

—এই ত—তা সুপারিন বাবু কোথায়?

—চলে গেল ভোরের বাসে।

—চলে গেল! নগেন্দ্র যেন হতাশ হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

বসেই পড়ত নগেন্দ্র। পা দুটো যেন আর চলছে না। টন্ টন্ করছে ব্যাথায়। আঃ—আঃ সম্মুখের দিকে একটা লম্বা ঝাকুনি দিল পায়ে। যেন লাথি ছুড়লো। কিন্তু বসল না নগেন্দ্র। ঐ পাথড়ার ঝাক খুটে খুটে খাচ্ছে। বাহারে বাঃ। বাহারে বাঃ। কিন্তু এই যা ভয়ঙ্কর ভুল হয়ে গিয়েছে নগেন্দ্রর। ময়নাটার এখনও খাওয়া হয় নি। লাঠিতে ভর করে খুড়িয়ে খুড়িয়ে আবার হাঁটতে লাগল নগেন্দ্র। দ্রুত ছন্দে। যেমন সে এসেছিল।

সাবু ওরফে সাবিত্রীকে দূর থেকেই দেখল নগেন্দ্র। অস্পষ্ট তবুও চিনতে দেরী হ'ল না। বট গাছের ছায়ায় সে আর বসে নেই। উঠে দাঁড়িয়েছে। আর হাত নেড়ে নেড়ে অসহায় হয়ে কাকে যেন ডাকছে। ইসারা করছে।

আরও কাছে এসে বুকে একটা ঝাকুনি খেল নগেন্দ্র। খাঁচার দরজাটা খোলা। ময়নাটা নেই। ওখান থেকেই চিৎকার করে উঠল নগেন্দ্র, পাখীটা কোথায়।

—ঐ যে গাছের ডালে। সাবু অপরাধীর মত বললে।

—কি করে গেল ওখানে? ততক্ষণে সাবিত্রীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে নগেন্দ্র।

—মানে জল-ছাতু খাওয়াচ্ছিলাম—মানে ইয়ে, তখন পালিয়ে গেল।

নগেন্দ্র কিছু বলল না। ভ্রূ কুঁচকাল। সাবিত্রীর দিকে তাকাল কটমট চোখে। এখনি ঝাপিয়ে পড়বে নগেন্দ্র। কিন্তু না। উত্তেজিত হয়ে নিজেই বার কয়েক চেষ্টা করল পাখীটাকে নামাতে। পারল না। তার পর একটা ঢিল ছুড়তেই পাখীটা উড়ল। বট গাছের ডাল ছেড়ে আকাশের শূন্যতায় ডানা ভাসিয়ে দিল।

—এ্যাই—এ্যাই—আবার ওড়ে—এ্যাই। পথ ছেড়ে মাঠে নেমে পড়ল নগেন্দ্র। তার পরেই ছুট। জল কাদা, নূতন চষা খেত, আর 'আল'। কিন্তু কোন জ্ঞান রইল না নগেন্দ্রর। লিক-লিকে বাঁ পা-টা উঁচুতে তুলে নিয়ে ছুটতে লাগল ছেলে বেলার 'এক্কা-দোক্কা' খেলার ভঙ্গীতে।

ঐ পাখীটা উড়ছে। ঐ—ঐ। ঐ সম্মুখের বাবলা গাছটার মজা ডালে বসল। এই—এই সুযোগ। আরও জোর ছুটছিল নগেন্দ্র। কিন্তু তার পরেই পড়ে গেল মুখ থুবড়ে। 'আলে' হোঁচট খেয়েছে নগেন্দ্র! আর সেই শব্দে পাখীটা সচকিত। তার পরেই আবার শূন্যতায় পাখা মেলল।

উঠে দাঁড়াল নগেন্দ্র। গা-হাত-পা ঝেড়ে নিয়ে তাকাল সাবিত্রীর দিকে।

সাবিত্রী হাসছিল নগেন্দ্রকে পড়তে দেখে। সারা শরীরের রক্তে যেন আগুন ধরল। তার পরেই সাবিত্রীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল নগেন্দ্র। কিল-চড়—ঘুষি, চুল ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে ফেলে দিল মাটিতে। আর বট গাছের গুঁড়িতে মাথাটা ঠুকে দিল। একবার দু'বার নয়, বেশ কয়েকবার। সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে উঠল, নিষ্কর্মা, অপদার্থ, পেটে ছেলে আসে না, পাখীটাও ধরে রাখতে পারে না—পারিস কি শুধু হাসতে আর গিলতে? সাবুর মাথাটা আরও কয়েকবার বট গাছের গুঁড়িতে ঠুকে দিল নগেন্দ্র। ময়নাটা হারিয়ে যেন বিকল্প সান্ত্বনার পথ খুঁজে নিল সে।

বেলা বেড়েছে অনেকক্ষণ। সাবিত্রী তখনও বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে। সারা মুখ ক্ষত বিক্ষত। আকাশ ঝাপসা হয়ে এসেছে মেঘে। ঝির ঝিরে প্রান্তরের হাওয়া। বৃষ্টি আসবে। কিছু মালপত্র মাথায় তুলে নিয়ে, আর কিছু সাবিত্রীর মাথায় চাপিয়ে নগেন্দ্র বলল, চল চল, তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চল। বৃষ্টি আসার আগেই কলোনীতে পৌঁছতে হবে। শূন্য খাঁচাটা ডান হাতে ঝুলিয়ে নিল নগেন্দ্র।

শরতের সুর

শ্রীকরুণাময় বসু

একটি চঞ্চল দিন ঝুরু ঝুরু দক্ষিণা বাতাসে
গুণ গুণ গান গায়, মুক্তাশুভ্র উজ্জ্বল আকাশে
বৃত্তাকারে এক ঝাঁক নীল পারাবত
বলে গেল, বনান্তরে এসেছে শরৎ।
হিমছোঁয়া সোণাঝুরি লতা
ফুল হয়ে চোখ মেলে, ছায়া-রোদে
এ কে রাখে প্রতিদিন প্রাণ-চঞ্চলতা।

একটি নিস্তব্ধ নদী নতুন আশ্বাসে
তাসায়ে দূরের ভেলা পথ হয়ে হাসে,
এই পথে জীবনের হাট থেকে ফেরা
অনেক পথিক আসে, দূর দেশে বিকি-কিনি করেছে বেদেরা,
তারাও জমায় পাড়ি,
নির্জন নিঃশব্দ স্রোতে সোজা আড়াআড়ি।
কখন শুনেছে ডাক
বহুদূর, বহুদূর প্রান্তরের প্রদীপের ডাক:
কার যেন নম্র চোখে শান্ত দৃষ্টি দূর্বাদল ছুঁয়ে যায়,
ক্লান্ত ফুঁয়ে বেজে ওঠে শাঁখ।

হঠাৎ গভীর মন
সৌন্দর্যের দৃষ্টি নিয়ে আসে
বলে আর কেন তৃষ্ণা, আমি যাব দূরতর দেশে
বৃহত্তর সৌন্দর্যের লাগি:
মহত্তর প্রজ্ঞায় প্রোজ্জ্বল, অবিচল সত্যের আদেশে।
বড় ক্ষুদ্র পৃথিবীর দিন,
দিনরাত্রি আলো আর আঁধারে বিলীন;
এখানে আমার সুর
অর্ধপথে থেমে যায়, মনে হয় বিষণ্ণ বিধুর;
তবু ভাবি আকাশে উজ্জ্বল আলোয়
আমার গানের সুর, আমার আত্মার দীপ্তি
বৃহত্তর জগতের প্রাণ-কেন্দ্র ছোঁয়।
তবু ভাবি কোনদিন প্রাত্যহিক তুচ্ছতার ক্ষুদ্র পথধূলি
ঢাকেনা আমার দিন, আমার সকল কর্ম,
প্রত্যহের সৎ চিন্তাগুলি।

শিখধর্মে নারীর স্থান

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী
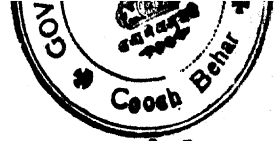
জগতের যে কোনও সম্প্রদায়ের আভ্যন্তরীণ উৎকর্ষ পরিমাপের একটি বিশেষ উপায়—নারীর প্রতি তাদের সম্মানপ্রদর্শনের রীতিনীতি ও গভীর আন্তরিকতা পর্যবেক্ষণ করা। মাতৃজাতিকে যে জাতি বা সম্প্রদায় যত অধিক সম্মানপ্রদর্শন করে, সেই জাতি তত অধিক সমুন্নত। চির-জ্যোতিষ্মান্ ভারতের মধ্যযুগের মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ড গুরু নানক এবং তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম নারীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পদে পদে নিবেদন করে গেছেন। তারই অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এখানে লিপিবদ্ধ করছি।

তাঁর "আসা-দি-ওয়ার" নামক গ্রন্থে গুরু নানক বলেছেন—যাঁরা 'সন্ততি'র মূল কারণ এবং সমস্ত সম্প্রদায়ের জনয়িত্রী, যাঁরা মহাপুরুষদেরও জননী—তাঁরা আবার পুরুষদের থেকে হীন হবেন কি করে? পুনরায় তিনি বলেছেন—এমন একজন নারী বের কর, যিনি ভগবানের প্রতি পুরুষের চেয়ে কম অনুরাগী; পুরুষ ও নারী প্রত্যেকেই যদি স্ব স্ব কাজের জন্য ভগবানের কাছে দায়ী হয়—তা হলে সত্যিকার দৃষ্টিভঙ্গীতে পুরুষ ও নারী ভেদে পার্থক্য হবে কেন? কাজেই ধর্মে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার তিনি ঘোষণা করে গেছেন। অধ্যাত্ম সঙ্গীতে নারীর একটি বিশেষ স্থানও নানক দিয়ে গেছেন। এমন কোনও সভাসমিতি নেই যেখানে নারী যেতে পারেন না বা পুরুষের সমান অধিকার থেকে তাঁরা কোনও দিকে বঞ্চিত।

শিখপন্থীদের দশ জন গুরুর মধ্যে তৃতীয় গুরু অমর দাস "সতীদাহ প্রথা"র বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন—"স্বামীর সঙ্গে যাঁরা পুড়ে মরেন, তাঁরা সতী নন; বরং তাঁরাই সতী—যাঁরা স্বামীর বিরহযন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে বিরহজনিত মূর্চ্ছা থেকে পুনরায় সংজ্ঞা ফিরে না পান। স্বামীর বিরহানলে জলে পুড়ে খাঁটি সোনা হয়ে যাঁরা তাঁদের স্মৃতি দেদীপ্যমান রাখেন, তাঁরাই প্রকৃত সতী"—। অমর দাস পুনরায় বলছেন—"স্বামীকে যাঁরা প্রকৃত ভালবাসেন, সে সকল নারী স্বামীর দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই যমযাতনা অত্যধিক ভাবে ভোগ করেন। স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা নেই যাঁদের—তাঁদের পুড়িয়েও বা কি লাভ?"

('সুহি-কি-ওয়ার' গ্রন্থ)।

গুরু অমর দাস নিজের জীবনের গরিষ্ঠতা অর্জনের দিক থেকে 'বিবি অম্রো'র কাছে অত্যন্ত ঋণী ছিলেন। এই কৃতজ্ঞতা তিনি কথায় কথায় সুব্যক্ত করতেন। গুরু অমর দাস পর্দাপ্রথারও বিরোধী ছিলেন। পর্দা-পরিহিতা হয়ে 'সঙ্গতে' আসবার জন্য তিনি হরিপুরের রাণীকে তিরস্কার করেছিলেন।

নারীর প্রতি তাঁর সমধিক শ্রদ্ধা তাঁর শিষ্য গুরু অর্জুনেও অনুবর্তন করেছিল।

ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দের কাছে তাঁর বিবাহ বিষয়ে অনুযোগ করায় তিনি ব্যক্তিবিশেষকে বলেছিলেন—"পুরুষের সত্যিকার বিবেক হচ্ছেন নারী"। নবম গুরু তেগ বাহাদুরের জীবনেও এমন ঘটনা ঘটেছিল যখন নারীদের ব্যক্তিগত আত্মত্যাগে সমগ্র অমৃতসরের পুরুষসমাজ রক্ষা পেয়েছিল এবং তেগ বাহাদুরও আনন্দে বলেছিলেন—"ভগবানের প্রকৃত ইচ্ছার অনুধাবন ও অনুসরণ করতে নারীরাই জানেন"।

শেষ অর্থাৎ দশম গুরু গোবিন্দ সিং স্বীয় লীলাসঙ্গিনী মাতা সাহিব "কৌর"কে সম্বোধন করে বলেছিলেন—১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে খালসা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা সময়ে বৈশাখ মাসে—"জীবনের অমৃতকে মধুময় করেন নারী। আজ আমি শিষ্যদের জন্য যে 'অমৃত' তৈরী করছি—তাকে তোমার প্রদত্ত 'পাতসা' বা মিষ্টিই করে তুলবে মধুময়"। তাঁর এই উক্তি খালসা সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেই এখনও খালসা ধর্মে দীক্ষার সময়ে কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করেন এবং গুরু গোবিন্দ সিং এবং মাতা কৌর উভয়কেই মাতাপিতৃরূপে যুগপদ্ভাবে প্রণতি নিবেদন করেন।

নারীজাতির প্রতি এই যে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন শিখ গুরুরা সকলেই—গুরু নানক থেকে দশম গুরু গোবিন্দ সিং পর্যন্ত—তাতেই শিখজাতির পরম উপকার সংসাধিত হয়েছিল। নারীদের আত্মমর্যাদা বোধ এবং সমাজ ও দেশ-সংরক্ষণ-তৎপরতা বারে বারে শিখসম্প্রদায়কে পূর্ণ মাত্রায় প্রোজ্জীবিত করেছে, সংপুষ্ট করেছে; জাগতিক ও পারমার্থিক উভয় সম্পদই স্বামীপুত্রদের অজস্র ভাবে দান করেছেন মায়েরা। 'আনন্দপুরে'র যুদ্ধে যখন কয়েক জন শিখ আর কষ্ট সহ্য করতে না পেরে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করলেন, তখন শিখনারীরা স্বীয় স্বামী-পুত্রদের এ কলঙ্ক সহ্য করতে পারলেন না। নারীরা—মায়েরা এলেন এগিয়ে। "মাই

ভাগো" নাম্নী জনৈকা মহিলা পুরুষের বেশ ধারণ করে এই সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্র-ত্যাগী পুরুষদের নিয়ে আবার সংগ্রামে যোগ দিলেন। 'মুক্তেশ্বরে'র যুদ্ধে তাঁরা সকলেই প্রাণ হারালেন। শিখেরা এখনও দৈনিক প্রার্থনায় তাঁদের স্মরণ করে থাকেন।

১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে গুরু নানক যে "হুজুর সাহিব" নামক নন্দের শিখমন্দিরে মানবলীলা সংবরণ করেন, তার থেকে পবিত্র ধর্মস্থান শিখদের, বিশেষতঃ, খালসাদের আর নেই। দাক্ষিণাত্যের মুসলমানেরা যখন এই ধর্মস্থান প্রায় অধিকার করে নিচ্ছিল, তখন দুই শত শিখ নারীর এক দুর্ধর্ষ বাহিনী মুসলমানদের আক্রমণপূর্বক সম্পূর্ণ পরাভূত করে দেন। এই যুদ্ধে তাঁরা শত্রুদের যে দুন্দুভি এবং পতাকা কেড়ে নেন, তা এখনও "হুজুর সাহিব" মন্দিরে সংরক্ষিত আছে।

যুগে যুগে ভারতীয় নারীদের স্থান পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে উচ্চাবচ হয়েছে। কিন্তু গভীর অনুশীলন না করেও—কেবল নারীর স্থাননির্ণয়-রেখাটি টেনে গেলেই—এটি বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না যে, ভারতবর্ষ যখন যখনই অবনত হয়ে পড়েছে, তখন তখনই নারীদের মর্যাদার অবনতি ঘটেছে। দূরদৃষ্টিশীল সমসাময়িক কোনও-না-কোনও মনীষী তার প্রতিকারের চেষ্টা করেছেন; সমাজের তথাকথিত নায়কেরা সে বাধা মানেন নি। শিখধর্মের অভ্যুত্থানের যুগ ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের একটি সুবর্ণ যুগ। তথাকার নারী-দের সম্পর্কে উপরিলিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে এই সত্যটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে মূর্ত হয়ে উঠে।

প্রতিশ্রুতি

শ্রীদিলীপকুমার রায়

এসেছি পুছি' সখী, এসেছি পুছি' আমি শোন্!
আসিবে মধুবনে ফিরে সে-বঁধু বিমোহন।

ধরণী সবুজের বিছানো সুগশেজ মনোহর!
লাজুক ফুলকলি দোদুল ডালে ডালে সুন্দর!
কত না সাজে সেজে সখীরা ধায় প্রিয়মিলনে!
কোকিল গায় নাচে ময়ুর আজ বঁধুবরণে!
শ্যামের আগমনী গায় মধুর সমীরণ!
এসেছি পুছি' সখী, শোন্।

দেবে সে দেখা আজ, রবে না তৃষিত এ আঁখি আর:
সে এলো বলে—পথ ছিলাম এতদিন চেয়ে যার!
রবে না পিপাসিত প্রাণ—বিরহানল শমিবে,
চরণ-ধ্বনি শোন্ তার—মোহন মন মোহিবে!
করুণামেঘ দেখ ছায় লো কান্ত গগন।
এসেছি পুছি' সখী শোন্।

আয় না মীরা!—বুঝি এসেছে কুঞ্জে সে-ঘনশ্যাম!
বৃথা না বয়ে যায় এমন সুলগন অবিরাম!
দেখা না পেয়ে তোর যেন না চলে যায় রুষি' সে!
শোন্ লো শোন্—বঁধু বাজায় বাঁশি তোরে তুষিতে!
ডাকে সে উছলিয়া ঝরায়ে মধুমূর্ছণ।
এসেছি পুছি' সখী শোন্।

(ইন্দিরা দেবীর সমাধিশ্রুত হিন্দিভজনের অনুবাদ)

রাবণ মূর্ত্তি ফোটো—লেখক

রামলীলা

শ্রীপরিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

পুরাকালে রাজারা শরৎকালে বার হতেন দিগবিজয়ে আর সওদাগরেরা বাণিজ্যে। যুগের সঙ্গে সঙ্গে রীতিনীতিও পালটে গেছে। তাই আজ আর রাজা কিংবা সওদাগরদের শরতের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। তবে মানুষের মত আর পথ বদলালেও শরৎ আজও তেমনি বকের মত শাদা মেঘের পালক মেলে সারা আকাশ ঘুরে বেড়ায়। আজও শিউলি ফুলের অর্ঘ্য মাতৃচরণ শোভিত করে, আর মানুষের অন্তর করে গন্ধে আমোদিত। বর্ষামুক্ত আকাশতলে মানুষ ছুটে বেরিয়ে এসে তেমনি উৎসবে মেতে উঠতে চায়। বাঙালীর ঘরে ঘরে আসেন জননী দশভুজা দশ দিক উজ্জ্বল করে, দক্ষিণ ভারতীয়রা পালন করে নবরাত্রি, শক্তি আসেন মহারাষ্ট্রীয় অন্তরে, আর সারা উত্তর-ভারতের একটা বিশাল অঞ্চলব্যাপী তারই লীলারঙ্গে লোক মেতে ওঠে যার কীর্ত্তির উৎস আদিকবি বাল্মীকিকে মহাকাব্য রচনার প্রেরণা দান করেছিল।

নবরাত্রি. শক্তি আর দুর্গাপূজা হয় মন্দিরে প্রতিমা গড়ে। কিন্তু রামলীলার প্রশস্ত স্থান উন্মুক্ত ময়দান। কেননা, রামায়ণের রূপায়ণ করতে বিশাল ক্ষেত্রেরই প্রয়োজন। অবশ্য কাহিনী রূপ দিতে গিয়ে স্থানবিশেষে, অর্থাৎ যেখানে খোলা মাঠ দুর্লভ সেখানে ষ্টেজ বেঁধে করবার রেওয়াজ যে নেই তা নয়। দেরাদুনেই এমনি করে কয়েক স্থানে লীলা-কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। জব্বলপুরে দেখেছি, জব্বলপুর কেন প্রায় সর্ব্ব স্থানেই, রামায়ণের পূর্ণ ঘটনা রূপায়িত হয় রাম-লীলার জন্য নির্দ্দিষ্ট ময়দানে। রূপায়ণের রীতিনীতিও স্থান বিশেষে আলাদা হয়। রাম সীতা, দশরথ, রাবণ বা এমনি বিশেষ চরিত্রের পাত্রপাত্রীদের জন্য সিংহাসন বা বসবার

দশহরা মিছিল—রামসীতার ডুলি ফোটো— লেখক

জায়গার ব্যবস্থা থাকে। আর সব পাত্রপাত্রীদের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই অভিনয় করে যেতে হয়। অভিনয় কখনও নির্ব্বাক, অর্থাৎ পাত্রপাত্রী উপস্থিত হয়ে কিছু সময় কাটিয়ে নীরবেই স্থান ত্যাগ করে চলে যায়। আবার কখনও নিজ নিজ বক্তব্য নাটকীয় ভঙ্গীতে প্রকাশ করে উপাস্থত দর্শকের মনে বিশেষ ছাপ দিয়ে প্রস্থান করে।

প্রচলিত নিয়মানুসারে উৎসব দশ দিনেই পরিসমাপ্তি ঘটে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আনুষ্ঠানিক পরিসমাপ্তির পরেও মাসখানেক ধরে অভিনয় আর উৎসব চলতে থাকে। অবশ্য সবই নির্ভর করে চাঁদার পরিমাণ আর ব্যবস্থাপকদের উৎসাহ ও কর্ম্মদক্ষতার ওপর। কেননা, ব্যক্তিগত অর্থ বা প্রচেষ্টা দ্বারা রামলীলা অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা অসাধ্য না হলেও কেউ করবার মত সাহস সঞ্চয় করতে পারে না।

যাঁরা বিভিন্ন ভূমিকার রূপদান করেন তাঁদের ব্যক্তিগত পরিশ্রম বাদ দিলেও, যতদিন অভিনয় চলতে থাকে ততদিন তাঁদের শুচিনিষ্ঠা মেনে চলতে হয়। জনসাধারণও এই সব পাত্রপাত্রীদিগকে তাঁদের যোগ্য সম্মান দিতে ভোলে না। অভিনয় দেখতে দেখতে এরা অনেক সময় ভুলে যায় যে, এক মহাকাব্যের রূপায়ণ দেখতে বসেছে। বিশেষ করে রাম, সীতা কিংবা লক্ষণ রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হলে তাঁদের উদ্দেশে কেবল প্রণাম জানায় না, সাধ্যমত দক্ষিণা দিতেও কসুর করে না। ক্ষণিকের জন্য হলেও এদের মন পবিত্রতার ছোঁয়ায় রোমাঞ্চিত হয়।

জনসাধারণের সহযোগিতা এ উৎসবের সাফল্যের মূল উৎস। আনন্দে এরা মাতোয়ারা হয়—তাই অনুষ্ঠান এত বিরাট। যেদিন রামসীতার বিয়ে অভিনীত হয় সে দিনটি স্থানীয় লোকের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকে। সারাটা বছর ধরে তারা ঐ দিনটির অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে দিন গুণতে থাকে। রামসীতার রাজরাণী বেশ। তাঁরা রথে সমাসীন। যুগল মূর্ত্তি নিয়ে বিরাট মিছিল—বুঝি ফিরে আসে সেই হারিয়ে-যাওয়া দিন। সেদিনের অযোধ্যা আজ প্রায় সারা ভারতব্যাপী! সানাইয়ের মিঠে সুরে গাছের পাতায়, গমের শীষে রোমাঞ্চ লাগে। প্রেমের ঠাকুর মিলিত হলেন তার শক্তির সঙ্গে। প্রসঙ্গতঃ একটা কথা উল্লেখ না করে পারছি না। আমাদের সমাজে রামসীতার বিয়ে আজও আদর্শ হিসেবে গণ্য হয়। আজও বিয়ের যাবতীয় লোকসঙ্গীত রাম সীতাকে কেন্দ্র করে গাওয়া হয়।

সাধারণতঃ বিজয়া দশমীর দিনই রাবণবধ পালা সাঙ্গ হয়। প্রকৃতপক্ষে সেদিনই রামলীলার পরিসমাপ্তি হয়। সেদিন দশাননের আকাশচুম্বী মূর্ত্তি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে দাঁড় করানো হয়। মূর্ত্তি বাঁশ, কাঠখড় আর কাগজের তৈরী। হাত-পায়ের পরিধি বট-অশ্বত্থ গাছের মত মোটা, আর দেহটা সেই পরিমাণে লম্বা। মূর্ত্তির খোলের মধ্যে স্তরে স্তরে সাজান থাকে অসংখ্য বাজি।

মূর্ত্তি পোড়ান উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হলেও প্রকৃত উৎসব সুরু হয় স্থানীয় প্রাণকেন্দ্র থেকে। সকাল থেকে হাজার হাজার লোক জমায়েত হতে থাকে। দুপুরের দিকে এরা এক বিরাট মিছিল নিয়ে বেড়িয়ে পড়ে রাবণমূর্ত্তি সমীপে জমায়েত হওয়ার জন্য। মিছিলের প্রধান অঙ্গ হিসেবে কয়েকটা ডুলিতে শিবদুর্গা, রামসীতালক্ষ্মণ রামায়ণের অন্য বিশেষ দৃশ্য এবং নানা সং-এর উল্লেখ করা যায়। জ্যান্ত মানুষ দিয়েই যে এ ডুলির দেবদেবী রূপায়িত করা হয় তা নয়, অনেক ক্ষেত্রে শিবের গলায় জীবন্ত সাপও দৃষ্ট হয়।

দিনের আলো যখন গোধূলির লোকে আশ্রয় নেয় সেই পরম শুভ মুহূর্ত্তেই সাধারণতঃ মূর্ত্তিতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। মিছিল ছাড়াও জনতা ঐ মূর্ত্তির নীচে অনেক আগে থাকতেই জমায়েত হতে থাকে। তাদের অধীর আগ্রহের যখন অবসান ঘটে তখন রাবণের সারা দেহ আগুনের লেলিহান জিহ্বাস্পর্শে প্রজ্বলিত। নানা আকার ও প্রকারের বাজির শব্দ আকাশবাতাস মুখরিত হতে থাকে—শোভিতও হয় বৈকি। অনেক ক্ষেত্রে বাজির মাধ্যমে রামায়ণের অনেক দৃশ্য সমবেত জনতার সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। দশ-বারো মিনিটের মধ্যেই মূর্ত্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। বিপুল জনতার উৎসবমুখরতা কি একটা বিয়োগ ব্যথায় ক্ষণিক স্তব্ধ হয়ে থেকে আবার চঞ্চল হয়ে ওঠে। প্রিয় পরিজন নিয়ে মেলার সবটুকু আনন্দ উপভোগ করতে করতে ক্লান্ত কিন্তু পরিতৃপ্ত মন নিয়ে বাড়ী ফিরে গিয়ে আবার একটি বছরের হিসাবনিকাশ নিতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

আমরা জানি দুর্গোৎসব ব্যাপারে, বিশেষ করে বারোয়ারী পূজোতে অপব্যয়ের অঙ্কটা মোটা হয়ে থাকে। দুর্গোৎসব অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু রামলীলা বারোয়ারী ভিন্ন হওয়ার উপায় নেই বললেই চলে। অপব্যয় না হয়ে যায় না। কিন্তু দুর্গোৎসব মারফত যেমন কুম্ভকার প্রভৃতি সমাজের একটা অঙ্গ নানাভাবে অর্থবণ্টন দ্বারা উপকৃত হয়, তেমনি রামলীলাতেও তার ব্যতিক্রম হয় না। কেবল রাবণমূর্ত্তিই নয়, এই উপলক্ষে আরও আনুষঙ্গিক সাজসজ্জা আর আয়োজনের মারফত যে ব্যয় হয় তদ্দ্বারা বহু লোকের অন্নসংস্থান হয়ে থাকে। তা ছাড়া এ আনন্দোৎসবের মাধ্যমে নানা স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা দ্বারা চারু-শিল্পের—পট, মূর্ত্তি, সাজসজ্জা, উৎসাহ বর্দ্ধন করে মানসিক উন্নতি বিধান করতে সহায়ক হয়। যে অঙ্কটা অপব্যয় হয় সেটা যারা ব্যবস্থাপনায় থাকেন তাঁদের একটু সজাগ দৃষ্টি থাকলেই অনেক লাঘব হতে পারে, পুরোপুরি বোধ করতে না পারলেও।

আজ সর্ব্বস্তরের মানুষের অধোগতি অতি ভয়ের সঙ্গে সমস্ত মনীষীরা লক্ষ্য করছেন। এমনি পরিস্থিতিতে রাম-গুণগান প্রত্যক্ষ না হলে পরোক্ষ ভাবেও যদি সামান্যতম প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয় তবে তা মানুষের প্রগতির পথে অনেকখানি সহায়ক হবে। ভালর সবই ভাল। সুতরাং সৎ চিন্তা বা চিন্তার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি মানুষের কল্যাণের পথ কিছু পরিষ্কার করবে বৈকি।

ভ্রম সংশোধন

'প্রবাসী' ভাদ্র (১৩৬৪) সংখ্যায় পৃঃ ৫৮৯ ১ম স্তম্ভ পংক্তি ২৫-২৬—"তাঁহার পরে আসেন জয়নগর গ্রামের শিবনাথ শাস্ত্রী" স্থলে "তাঁহার পরে আসেন মজিলপুর গ্রামের শিবনাথ শাস্ত্রী" হইবে।

বিন্দুতে বিরাজে সিন্ধু

শ্রীনবগোপাল সিংহ

মানবের জ্ঞান-সিন্ধু মাঝে
যে পৃথিবী রাজে,
পঞ্চমহাদেশ আর পঞ্চমহাসাগর বিধৃত
ভৌগোলিক সীমা নির্ধারিত,
কতটুকু তার পরিমাণ ?
এ মহাবিশ্বের মাঝে কোথা তার স্থান ?
বিশাল বারিধি মাঝে একবিন্দু বারি,
স্থিতি বুঝি বেশী হবে তারই।

এ সৌর জগতে—
ভ্রমিছে আবহমান আপনার ক্ষুদ্র কক্ষপথে,
কত তুচ্ছ, কত ক্ষুদ্র। (অনন্ত আকাশে
বিশ্বপথিক কোনো ভ্রমে যদি) তার পথ পাশে
আমাদের এ পৃথিবী হায়
উপলখণ্ডের মত পড়ে রবে বুঝি উপেক্ষায়।
আদিত্যের করুণা-প্রত্যাশী, ক্ষুদ্র বালুকণা—
এ গ্রহের কিবা সম্ভাবনা ?

তবু তার আছে ইতিহাস,
আছে জন্ম, আছে মৃত্যু, আছে প্রেম, স্বপন-বিলাস।
সৃজনের রহস্য-লিপিকা
এ গ্রহের আদি গ্রন্থে আছে আজো লিখা।

বিচিত্র সে আদি বর্ণমালা
অরণ্যে পর্বতে আর সাগর-সৈকতে আছে ঢালা।

ভূগর্ভের শত শত স্তর
মৃত্তিকা, প্রস্তর
বয়সের হিসেব সে রাখে
যুগে যুগে নিজ কোষ্ঠী আঁকে।
আদম-ইভের মাঝে প্রথম সে কবে
প্রেমের সূচনা হ'ল। সৃজন-উৎসবে,
তুচ্ছ হতে হ'ল বহু, সে রহস্য বুঝি
অনায়াসে পাওয়া যায় খুঁজি',
অধুনা-কথিত এই সভ্য পৃথিবীতে
আমাদেরই স্নায়ুতে, শোণিতে।
আছে—এর ইতিহাস আছে,
এ পৃথিবী তুচ্ছ নয় উচ্চতর জগতের কাছে।
পশুর সে সমগোত্র, মূক নর সৃজিল যে ভাষা
শত শাখা-প্রশাখায় সে তরুর অনন্ত প্রত্যাশা
রূপায়িত হ'ল চারি বেদে,
প্রলয়-পয়োধি-জলে স্রষ্টা যারে রাখে বুকে বেঁধে।

এ পৃথিবী তুচ্ছ নয়, নহে উপেক্ষিত
মাটির মানুষ হয়, স্বরগের দেবত্বে উন্নীত।
ভূলোকের প্রয়োজনে আলোক-রাজ্যের অধিপতি
যুগে যুগে আসে নেমে, কভু রথী, কখনো সারথি।
আকাশের সপ্তঋষি অত্রি আদি, আর ধ্রুবতারা
ধরারই মানব ছিল তারা।
পৃথিবীর সমুদ্র মন্থিয়া,
দেবতা অমর হ'ল অমৃতের পাত্র আহরিয়া।
হতে পারে ক্ষুদ্রতম গ্রহ,
বিশ্বের বিস্ময় এ যে, অনন্তের আদি বার্ত্তাবহ।

পার্লামেণ্টের সদস্যদের পরিচয়

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

আমাদের সংবিধান অনুসারে যে লোকসভা প্রত্যেক পাঁচ বৎসর অন্তর নির্ব্বাচিত হয়, তাহা নির্ব্বাচন করিবার অধিকার প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ভারতবাসীর আছে। ১৯৫২ সনে যে লোকসভা নির্ব্বাচিত হইয়াছিল তাহার সদস্যদের ও রাজ্য-সভার সদস্যদের বয়স, শিক্ষা, পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা ও পেশা ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

বয়স

প্রথমে বয়সের কথা ধরা যাউক। সংবিধানের ৮৪ ধারা অনুসারে লোক-সভায় নির্ব্বাচিত হইতে হইলে প্রার্থীর বয়স ২৫-এর উপর হওয়া চাই; আর রাজ্য-সভায় নির্ব্বাচিত হইতে হইলে প্রার্থীর বয়স ৩০ হওয়া চাই। বয়স হইলে মতিস্থির হয়, অভিজ্ঞতা বাড়ে এজন্য এইরূপ বিধান করা হইয়াছে। বিলাতে ২১ বৎসর বয়স হইলে ও অন্য যোগ্যতা থাকিলে ভোটার হওয়া যায় আর যিনিই ভোটার হইবেন তাঁহারই পার্লামেণ্টের সদস্য হইবার অধিকার থাকিবে। আমেরিকায় কিন্তু বয়স ২৫ না হইলে হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভের সদস্য হওয়া যায় না। আয়ারে সদস্য হইবার বয়স বিলাতের ন্যায় ২১ বৎসর। ব্রহ্মদেশে ১৮ বৎসর বয়স হইলে ভোট দিবার অধিকার, আর ২১ বৎসর হইলে সদস্য হইবার অধিকার জন্মে। ভারতে সদস্যদের বয়স বেশী হইবার বিধান আমেরিকার নিকট হইতে লওয়া হইয়াছে।

এক্ষণে ১৯৫২ সনে নির্ব্বাচিত লোক-সভার ও রাজ্য-সভার সদস্যদের বয়স কিরূপ ছিল তাহা দেখা যাউক।

বয়স	লোক-সভা সংখ্যা	লোক-সভা শতকরা	রাজ্য-সভা সংখ্যা	রাজ্য-সভা শতকরা
২৫-২৯	২৪	৫	১	...
৩০-৩৯	১১০	২২	৩৫	১৬
৪০-৪৯	১৪৪	২৯	৫৮	২৭
৫০-৫৯	১৩৫	২৭	৬০	২৮
৬০-৬৯	৩৯	৮	৩৮	১৮
৭০-৭৯	১	...	১১	৫
জানা যায় নাই	৪৬	৯	১৩	৬
	৪৯৯	১০০	২১৬	১০০

গড় হিসাবে লোক-সভার সদস্যদের বয়স ৪৬.৪৭ বৎসর। রাজ্য-সভার সদস্যদের বয়স ৫২র কাছাকাছি, পার্থক্য ৬.৭ বৎসর। রাজ্য-সভার সদস্যদের বয়স লোক-সভার সদস্যদের অপেক্ষা বেশী হইলেও এত বেশী নয় যে রাজ্য-সভাকে House of Elders বলা চলে।

এইবার আমরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলভুক্ত লোক-সভার সদস্যদের দল হিসাবে বয়স কিরূপ ছিল তাহা দেখাইব। যথা:

বয়স	কংগ্রেসী	কম্যুনিষ্ট	সোস্যালিষ্ট	হিন্দুমহাসভা-জনসঙ্ঘ	অন্যান্যদল	স্বতন্ত্র
২৫-২৯	১৩	২	১	১	৪	৩
৩০-৩৯	৭৫	১২	৭	—	৭	৯
৪০-৪৯	৯৯	৭	৭	২	১০	১৯
৫০-৫৯	১১১	৩	৩	৩	৫	১০
৬০-৬৯	৩০	—	৩	১	৪	১
৭০রের উপর	১	—	—	—	—	—
	৩২৯	২৪	২১	৭	৩০	৪২

এই হিসাব শতকরা হিসাবে সাজাইলে এইরূপ দাঁড়ায়। যথা:

বয়স	কংগ্রেসী	কম্যুনিষ্ট	সোস্যালিষ্ট	হিন্দুমহাসভা-জনসঙ্ঘ	অন্যান্য দল	স্বতন্ত্র
২৫-২৯	৪	৮	৫	১৪	১৩	৭
৩০-৩৯	২৩	৫০	৩৩	—	২৩	২১
৪০-৪৯	৩০	২৯	৩৩	২৯	৩৩	৪৫
৫০-৫৯	৩৪	১২	১৪	৪৩	১৭	২৪
৬০-৬৯	৯	—	১৪	১৪	১৩	২
৭০রের উপর	—	—	—	—	—	—
	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০

কংগ্রেসী দলের ১১১ জন সদস্য (শতকরা ৩৪ জন) ৫০-৫৯ বৎসর বয়সের ; ৪০-এর কম বয়সের সদস্যদের অনুপাত শতকরা ২৭ জন মাত্র। পক্ষান্তরে কম্যুনিষ্টদের মধ্যে ৪০-এর কম বয়সের সদস্য সংখ্যা শতকরা ৫৮ জন ; সোস্যালিষ্টদের মধ্যে শতকরা ৩৮ জন। হিন্দুমহাসভা ও জনসঙ্ঘ দলের সদস্যদের মধ্যে বেশী বয়সের সদস্যদের অনুপাত খুব বেশী। ৫০-এর উপর বয়সের সদস্যদের অনুপাত শতকরা ৫৭ জন—আর কম্যুনিষ্টদের মধ্যে শতকরা ১২ জন মাত্র।

কংগ্রেস বহুদিনের প্রতিষ্ঠান। তাঁহাদের মধ্যে ৫০-এর উপর বয়সের সদস্যদের অনুপাত শতকরা ৪৩ জন। এই অনুপাত কংগ্রেসের পক্ষে আদৌ হিতকর নহে। হিন্দুমহাসভা ও জনসঙ্ঘের মিলিত সদস্যসংখ্যা খুব কম; দুই-এক জনের বয়স বেশী হইলেই পাল্লা ভারী হইয়া যায়। কিন্তু কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা খুব বেশী ; তাঁহাদের মধ্যে বেশী বয়সের সদস্যদের অনুপাত বেশী হওয়ার অর্থ হইতেছে এই যে তাঁহারা নূতন নেতৃত্ব গড়িয়া তুলিবার জন্য উপযুক্ত অল্প বয়সের লোক সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না। যাঁহারা নেতা আছেন তাঁহারা নেতা থাকিয়া যাইতেছেন ; নেতৃত্ব করিতে পারে এমন লোককে তাঁহারা দলের প্রার্থী মনোনয়নের সময় সুযোগ ও সুবিধা দিতেছেন না। পূর্ব্বে নূতন নূতন উপযুক্ত লোকদের রাজনৈতিক parliamentary শিক্ষানবীসীর সুযোগ ও সুবিধা দেন নাই, কেবল কর্ত্তাভজারা সুযোগ ও সুবিধা পাইয়াছে, ফলে বাধ্য হইয়া বেশী বয়সের লোকদের লোক-সভায় পাঠাইতে হইয়াছে। কংগ্রেসী দলের যেমন নিয়মানুবর্ত্তিতা (party discipline) বেশী, তেমনই তাঁহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের চিন্তাশীল ব্যক্তির অভাব। ভারতীয় পার্লামেণ্টে সচেতকের (party whipয়ের) হুকুম মানিয়া ভোট দেওয়া এক জিনিষ ; আর চিন্তাশীল ব্যক্তিদের চিন্তার প্রভাব দলের কার্য্যাবলীর উপর পড়া আর এক জিনিষ। এবিষয়ে কংগ্রেসী দলের প্রধান সচেতক ডাঃ সত্যনারায়ণ সিংহ সচেতন আছেন। তিনি ইংরেজী ১৯৫৫ সনের জানুয়ারী মাসে All India Whips Conference-এ (যেখানে কংগ্রেসী দলের বহু সচেতক উপস্থিত ছিলেন) বলিয়া ছিলেন যে :—"We should devote our energies to improving the quality of the legislators in our charge."

নির্ব্বাচন-যুদ্ধে নবাগত ও নূতন নূতন রাজনতিক দলগুলির মধ্যে প্রবীণ লোকের অভাব—এজন্য তাঁহাদের কতকটা বাধ্য হইয়া অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের সদস্যদের পাঠাইতে হইয়াছে। বামপন্থী-দলগুলির মতবাদ অল্প বয়সের লোকদের মধ্যে যেরূপ প্রভাব বিস্তার লাভ করে বেশী বয়সের লোকদের মধ্যে সেরূপ করে না। ইহাও অল্প বয়সের সদস্যদিগের সংখ্যাধিক্যের একটি কারণ।

শিক্ষা

এইবার আমরা—সদস্যরা শিক্ষায় কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন তাহার একটা হিসাব দিবার চেষ্টা করিব। শিক্ষার সাধারণ মাপকাঠি কে কতদূর অবধি স্কুল-কলেজে পড়িয়াছে বা পাস করিয়াছে। কিন্তু এই মাপকাঠি কতকটা প্রকৃত শিক্ষার পরিচায়ক হইলেও সঠিক পরিচায়ক নহে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোনও পাস নহেন, অথচ তিনি শিক্ষায় দীক্ষায় জ্ঞানে গরিমায় আমাদের পাসকরাদের অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। অন্য মাপকাঠির অভাবে আমরা স্কুল-কলেজে পড়ার বা পাশ করার মাপকাঠি ব্যবহার করিব। এই মাপ স্থুল-মাপ। এইবার হিসাবটি পাঠকদের সম্মুখে ধরিব।—

সদস্যদের শিক্ষা	লোকসভা সংখ্যা	লোকসভা শতকরা	রাজ্যসভা সংখ্যা	রাজ্যসভা শতকরা
বিলাতী পাস	৪৫	৯	৩৫	১৬
গ্রাজুয়েট	২৪৬	৪৯	১০৫	৪৯
ইণ্টারমিডিয়েট	৬৬	১৩	৩১	১৪
উচ্চ বিদ্যালয়	৬০	১২	১৬	৭
মধ্য ,,	৭	১	৪	২
প্রাইমারী ,,	৮	১	৩	১
টোলে বা মাদ্রাসায় পড়িয়াছেন	১৬	৩	৮	৪
বাড়ীতে পড়িয়াছেন	৮	১	৬	৩
জানা যায় নাই	৪৩	৯	৮	৪
	৪৯৯	১০০	২১৬	১০০

যাঁহাদের শিক্ষার পরিমাণ জানা যায় নাই তাঁহাদের বাদ দিয়া দেখা যায় যে, লোক-সভার সদস্যদের মধ্যে শতকরা ১৮ জন ও রাজ্য-সভার সদস্যদের মধ্যে শতকরা ১৭ জন কলেজের মুখ দেখেন নাই। ইঁহারা সকলেই 'রবি ঠাকুর'—কলেজের মুখ না দেখিলেও পণ্ডিত ; অন্ততঃ পক্ষে রাজনীতিতে ! এবিষয়ে লোক-সভায় ও রাজ্য-সভায় বিশেষ প্রভেদ নাই। যাঁহারা গ্রাজুয়েট বা বিলাতী শিক্ষায় শিক্ষিত এরূপ সদস্যদের অনুপাত রাজ্য-সভায় লোক-সভা অপেক্ষা শতকরা ৭ জন বেশী। কলেজের মুখ দেখিয়াছেন এইরূপ সদস্যদের অনুপাত রাজ্যসভায় শতকরা ৮ জন করিয়া বেশী।

লোক সভায় সদস্যদের রাজনৈতিক দল হিসাবে ভাগ করিয়া কোন্ দলের কত লোক কতদূর অবধি লেখাপড়া করিয়াছেন তাহার হিসাব দিবার চেষ্টা করিব। দেশে বহু রাজনৈতিক দল—এ জন্য আমরা প্রথমে সদস্যদের কংগ্রেসী ও অ-কংগ্রেসী এই দুই ভাগে ভাগ করিয়া দেখাইব। অ-কংগ্রেসীদের মধ্যে কম্যুনিষ্টরা একটি বিশিষ্ট দল ; তাঁহাদের সদস্য সংখ্যা অন্যান্য দল অপেক্ষা বেশী—এজন্য তাঁহাদের আমরা আলাহিদা করিয়া দেখাইব :

সদস্যদের শিক্ষা	কংগ্রেসী		অ-কংগ্রেসী		কম্যুনিষ্ট	
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
বিলাতী পাস	২৮	৮	১৭	১৪	৩	১৩
গ্রাজুয়েট	১৮৫	৫৫	৬১	৫০	১০	৪৩
ইণ্টারমিডিয়েট	৪৯	১৫	১৭	১৪	৪	১৭
উচ্চ বিদ্যালয়	৪৩	১৩	১৭	১৪	৫	২২
মধ্য ,,	৭	২	×	×	×	×
প্রাইমারী ,,	৫	১	৩	২	×	×
টোল, মাদ্রাসা	১৪	৪	২	১	×	×
বাড়ীতে পড়িয়াছেন	৪	১	৪	৩	১	৪
	৩৩৫	১০০	১২১	১০০	২৩	১০০

কংগ্রেসীদের মধ্যে শতকরা ৬৩ জন গ্রাজুয়েট বা উচ্চ শিক্ষিত; অ-কংগ্রেসীদের মধ্যে অনুপাত শতকরা ৬৪ জন—পার্থক্য বিশেষ নাই, কিন্তু কম্যুনিষ্টদের মধ্যে এইরূপ সদস্যদের অনুপাত শতকরা ৫৬—বেশ কিছুটা কম। টোলে বা মাদ্রাসায় পড়িয়াছে এইরূপ সদস্যদের বালাই তাঁহাদের মধ্যে নাই। কম্যুনিষ্টরা অপেক্ষাকৃত কম বয়সের সদস্য পাঠাইতেছেন বেশী করিয়া; অথচ গ্রাজুয়েট বা উচ্চশিক্ষিত সদস্য সেই অনুপাতে পাঠাইতে পারিতেছেন না কেন? দেশে ত উচ্চশিক্ষার বিস্তার দ্রুততালে হইতেছে। পূর্ব্বাপেক্ষা ১৯২১ সন হইতে এই তাল দ্রুততর হইয়াছে। উচ্চ শিক্ষিতেরা সহজেই তাঁহাদের শ্লোগানের বা বুলির ভ্রম ধরিতে পারে বা যাহা রুশিয়ার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রযুজ্য তাহা ভারতের ক্ষেত্রে প্রযুজ্য নহে এই পার্থক্য বা limitation বুঝিতে পারে বা সম্পূর্ণভাবে নিজের আত্মসম্মান, ব্যক্তিত্ব বা স্বাধীন চিন্তাশীলতা ষোলআনা বর্জ্জন করিতে পারেন না বলিয়া বোধ হয় উচ্চশিক্ষিত সদস্যদের অনুপাত তাঁহাদের মধ্যে কম।

শাসন-সংক্রান্ত পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা

মানুষ দেখিয়া শিখে বা ঠেকিয়া শিখে। দেখিয়া শিখাই বুদ্ধিমানের কাজ; যাঁহারা ঠেকিয়া শিখেন তাঁহাদের "আক্কেল-সেলামী" দিতে হয়। লোক-সভায় সমগ্র ভারতের বহুবিধ সমস্যার আলোচনা ও তাহার সমাধান বা সমাধানের চেষ্টা হইয়া থাকে। সদস্যরা যদি শাসন-সংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়েন ত খুবই ভাল কথা। কিন্তু এই অভিজ্ঞতা তাঁহারা অর্জ্জন করিবেন কিরূপে? কেহ কেহ পূর্ব্বেকার ভারতীয় লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলীর বা সংবিধান প্রণয়নকারী এ্যাসেম্বলীর সদস্য ছিলেন। তাঁহারা দেখিয়া বা ঠেকিয়া শাসন-সংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন বলা যাইতে পারে। আবার কেহ কেহ প্রাদেশিক বিধানসভা সমূহের সদস্য হিসাবে এইরূপ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। কেহ কেহ স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠানের যেমন কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি বা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড বা গ্রাম্য পঞ্চায়েতের সদস্য হিসাবে বা কর্ম্মকর্ত্তা হিসাবে যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন তাহা দেশের বৃহত্তম কর্ম্মক্ষেত্র লোক-সভার কাজে লাগাইতে পারেন।

কথা হইতে পারে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, দেশের লোক-সভার সদস্যদের বিধান-সভার বা আইন-সভার অভিজ্ঞতা থাকা ভাল স্বীকার করিয়া লইলেও কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতিতে অভিজ্ঞতা থাকা লোকসভায় কি কাজে আসিতে পারে? রাষ্ট্রগুরু স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একবার নয়—বহুবার বলিয়াছেন যে, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানের সহিত কি সাধারণ সদস্য হিসাবে কি কর্ম্মকর্ত্তা হিসাবে সংযুক্ত থাকার অর্থ হইতেছে যিনি এরূপভাবে সংযুক্ত ছিলেন তাঁহার দেশের শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে "হাতে খড়ি" হইয়া গিয়াছে, তিনি কোন্ বিধানটি দেশের কল্যাণকর আর কোন্‌টি ক্ষতিকর, কোন্ কার্য্যটি আগে করিবার, কোন্ কার্য্যটি পরে করিবার এবিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। এইজন্যই তিনি লর্ড রিপন যখন স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠানে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি লইবার ব্যবস্থা করেন তখন ইহাকে "The ideal boon of local self-government" বলিয়া অভিনন্দিত করেন।

এইবার আমরা লোক-সভার ও রাজ্য-সভার সদস্যদের শাসন-সংক্রান্ত পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা কিরূপ ছিল তাহার হিসাব দিব। এই অভিজ্ঞতার দুইটি ভাগ—(১) লাট-কাউন্সিলে বা বিধান-সভায় বা সংবিধান প্রণয়নী সভার অভিজ্ঞতা ও (২) স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা—করিয়া দেখাইব।

পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা (লাট-কাউন্সিল ইত্যাদি)

যেখানে অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছেন	লোক-সভা		রাজ্য-সভা	
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
ভারতীয় বিধান-সভা ইত্যাদি	১২৬	২৬	৪৯	২৩
প্রাদেশিক বিধান-সভা	১২৪	২৫	৭৯	৩৭
কোন অভিজ্ঞতা নাই	২৮০	৫৬	১২৩	৫৭
জানা যায় নাই	২৬	৫	৪	২
	৪৯৯	১০০	২১৬	১০০

দেখা যায়, কোন পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা নাই এইরূপ সদস্যদের অনুপাত কি লোক-সভায় কি রাজ্য-সভায় অর্দ্ধেকের উপর বেশ কিছু বেশী। এখন দেখা যাউক, স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা ইঁহাদের মধ্যে কিরূপ—

পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা (মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি)

যেখানে অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছেন	লোক-সভা		রাজ্য-সভা	
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
মিউনিসিপ্যালিটি	৭৯	১৬	৪২	১৯
ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড	৬৫	১৩	২৭	১২
পঞ্চায়েত	২	×	২	১
কোন অভিজ্ঞতা নাই	৩৩৯	৬৮	১৫৭	৭৩
জানা যায় নাই	২৬	৫	৪	২
	৪৯৯	১০০	২১৬	১০০

কোনরূপ অভিজ্ঞতা নাই এইরূপ সদস্যদের অনুপাত রাজ্য-সভায় বেশী।

এইবার রাজনৈতিক দল হিসাবে সদস্যদের কাহার কিরূপ পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা আছে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব।

পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা (লাট কাউন্সিল ইত্যাদি)

	কংগ্রেসী		অ-কংগ্রেসী		কম্যুনিষ্ট	
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
ভারতীয় বিধান-সভা ইত্যাদি	১১১	৩৩	১৫	১১	...	...
প্রাদেশিক বিধান-সভা	১০৬	২৯	১৮	১৪	১	৪
কোন অভি-জ্ঞতা নাই	১৮০	৪৯	১০০	৭৫	২৩	৯৬
	৩৬৩	১১১	১৩৩	১০০	২৪	১০০

কংগ্রেসীদের বেলায় শতকরা হিসাবের যোগফল ১০০র উপর হইবার কারণ যে, কোন কোন কংগ্রেসী সদস্যের ভারতীয় বিধান-সভা ও প্রাদেশিক বিধান-সভা এই উভয় সভার অভিজ্ঞতা থাকায় তাঁহাদের উপরোক্ত হিসাবে দুইবার ধরা হইয়াছে। সদস্যদের সংখ্যার যোগফল ৩৯৭, অথচ মোট কংগ্রেসী সদস্য সংখ্যা হইতেছে ৩৬৩ জন। অন্ততঃ পক্ষে ৩৯৭-৩৬৩=৩৪ জনের উভয় সভার অভিজ্ঞতা আছে।

পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা (মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি)

	কংগ্রেসী		অ-কংগ্রেসী		কম্যুনিষ্ট	
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
মিউনিসিপ্যালিটি	৬৮	১৯	১১	৮	১	৪
ডিঃ বোর্ড	৫৮	১৬	৭	৫	১	৪
পঞ্চায়েত	১	×	১	×	—	—
অভিজ্ঞতা নাই	২৩৪	৬৪	১০৪	৭৭	১৯	৭৯
জানা যায় নাই	২	১	১০	২	৩	১৩
	৩৬১		১৩৩		২০	

পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কংগ্রেসী ও অ-কংগ্রেসী সদস্যদের মধ্যে যে পার্থক্য প্রথমেই চোখে পড়ে সেইটি হইতেছে যে,কংগ্রেসী সদস্যদের মধ্যে অর্দ্ধেকের উপর সদস্যের বিধান-সভায় কাজ করিবার পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা আছে। অ-কংগ্রেসীদের বা বিরোধীদলীয় সদস্যদের মধ্যে এইরূপ অভিজ্ঞতা সিকি সদস্যের আছে, আর কম্যুনিষ্টদের মধ্যে পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা খুবই কম। সদস্য মনোনীত করিবার সময় কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতার দিকে নজর রাখিয়াছিলেন, ফলে অভিজ্ঞ সদস্য পাইতে গিয়া তাঁহাদের বেশী বয়সের সদস্য মনোনীত করিতে হইয়াছে। আর অভিজ্ঞ সদস্যদের অনুপাত তাঁহাদের মধ্যে বেশী থাকায় যাঁহারা 'অনভিজ্ঞ' তাঁহাদের বেশ ভাল করিয়া তালিম দিবার সুযোগ পাইয়াছেন। এই সুযোগ কতটা তাঁহারা ব্যবহার করিয়াছেন তাহা তাঁহাদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া বাহির হইতে বুঝা যায় না।

বহু দল ও রাজনৈতিকবাদ লইয়া অ-কংগ্রেসী বা বিরোধী দল। অনেক দল শুধু নির্ব্বাচনের খাতিরে গড়িয়া উঠিয়া ছিল। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে অভিজ্ঞ সদস্যদের অনুপাত কম হওয়া স্বাভাবিক। কম্যুনিষ্টদল কংগ্রেসের ন্যায় পুরাতন দল না হইলেও অনেক দিনের দল। তাঁহাদের মধ্যে অভিজ্ঞ সদস্যদের সংখ্যা বা অনুপাত খুবই কম হইবার একটি কারণ আছে। কংগ্রেস বা অন্যান্য দল যখন ব্রিটিশ সরকারের সহিত বিধান-সভার মাধ্যমে বা তাহার বাহিরে রাজনৈতিক যুদ্ধ করিয়া ছিলেন, তখন কম্যুনিষ্টগণ জনসাধারণের মধ্যে কংগ্রেসের বা অন্যান্য দলের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ করিবার অভিপ্রায়ে ব্রিটিশ সরকারের সহিত বা তাঁহাদের গোলাম মুস্লিম লীগের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতা করিয়াছিলেন; রাস্তায় রাস্তায় 'জনযুদ্ধ' করিয়াছিলেন, 'নিমলার কলঙ্ক মুছে ফেল' চীৎকারে আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়াছিলেন। গঠনমূলক কোন কাজই তাঁহারা করেন নাই। স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা তাঁহাদের অনুরূপ, তবে বিধানসভার অভিজ্ঞতার অপেক্ষা অনেকটা ভাল। কংগ্রেসীদের অভিজ্ঞতা যেখানে শতকরা ৩৫ সেখানে অ-কংগ্রেসীদের অভিজ্ঞতা শতকরা ১৩, আর কম্যুনিষ্টদের আরও কম—শতকরা ৮।

মুসলীম লীগকে কেন আমরা ব্রিটিশ সরকারে গোলাম বলিতেছি সে সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলা দরকার। বড়লাট লর্ড মিণ্টোর ইঙ্গিতে আগা খাঁর command performance হইতে মুসলীম লীগের জন্ম। এ বিষয়ে লেডী মিণ্টোর ডায়েরী পড়িলে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। আর আগা খাঁ হইতেছেন বংশানুক্রমিক ইংরেজের এজেন্ট বা ফড়িয়া। তৃতীয় আগা খাঁর প্র-পিতামহ ইরাণের রাজ-জামাতা। তিনি তাঁহার সম্বন্ধী ইরাণের শাহানশাহের বিরুদ্ধে ইংরেজের হইয়া চক্রান্ত করায় শাহানশাহ তাঁহাকে ইরান হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেন। তিনি ভারতে আসিয়া বাস করেন সিন্ধুদেশে। ১৮৪৩ সনে ইংরেজ যখন সিন্ধু জয় করে তখন তিনি সিন্ধুর স্বাধীন আমীরদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি ও তাঁহাদের শক্তি সম্বন্ধে গোপন খবর ইংরেজকে সরবরাহ করেন এবং কয়েকজন আমীরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন। এইসব খবর ১৮৬৩ সনে লণ্ডনে প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় আছে—গ্রন্থকার করিম গোলাম আলি। একখণ্ড পুস্তিকা সংগ্রহ করিয়াছিলাম; ষ্টেটসম্যান পত্রিকার ডবলিউ. সি. ওয়ার্ডসওয়ার্থ এই পুস্তিকা সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করায় তাঁহাকে দিই।

ইংরেজ তদবধি আগা খাঁকে পুরুষানুক্রমিক বৃত্তি দেন। দুঃখের বিষয় স্বাধীন ভারতের সরকার এখনও এই বৃত্তি আগা খাঁকে দেন। যদিও যেসব রাজা-মহারাজা তাঁহাদের স্ব স্ব রাজ্য ভারতের অন্তর্ভুক্ত করিয়া পেন্সান পান, তাঁহাদের পেন্সান কমাইবার কথা

মাঝে মাঝে শুনিতে পাই ও তাঁহাদের মাঝে মাঝে কর্তৃপক্ষ পেন্সন কমাইবার জন্য হুমকী দেন।

মুসলীম লীগের আক্রোশ হিন্দুর উপর। অথচ যে ইংরেজ দিল্লীর শেষ বাদশার পুত্র ও পৌত্রকে 'কুকুর মারা' করিয়া আত্ম-সমর্পণের পর গুলী করিয়াছিল ও দেহ রাস্তার উপর দিয়া টানিয়া লইয়া গিয়াছিল তাহার উপর কোন ক্রোধ বা বিরক্তি নাই। যে ইংরেজ অযোধ্যার নবাবকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল তাহার উপর রাগ নাই, যে ইংরেজ বিহার ও উড়িষ্যার নবাব নাজিমকে 'পুতুল-নাচে'র পুতুল করিয়াছিল ও অবশেষে নবাব নাজিম উপাধি ও তোপ কাড়িয়া লইয়াছিল তাহার উপর বিরক্তি নাই। ভারতবর্ষ হইতে ইংরেজকে তাড়াইবার জন্য একটি মুসলমানও প্রাণ দেন নাই বা ইংরেজকে গুলি করেন নাই। "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্থান"—একটি ইংরেজের সঙ্গে লড়াই হয় নাই বা তাহার গায়ে হাত পড়ে নাই। "প্রত্যক্ষ সংগ্রামে" মরিয়াছিল হাজার হাজার হিন্দু। মুসলীম লীগের যত রাগ, যত বিদ্বেষ, যত লম্ফঝম্প সবই হিন্দুর বিরুদ্ধে। পাঠশালার দুষ্ট ছেলে যেমন নিজে পড়া পারে না বলিয়া ভাল ছেলের কলম ভাঙ্গিয়া দেয় বা দোয়াত লুকাইয়া রাখে ইহাদের মনোবৃত্তি অনেকটা সেইরূপ।

সদস্যদের চলে কিসে ?

আমাদের 'উপেন দা'—শ্রীঅরবিন্দের অন্যতম সহকর্ম্মী অগ্নি-বোমারু উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—কোন রাজনৈতিক "কর্ম্মী" বা "দেশসেবক" তাঁহার সহিত দেখা করিয়া দেশোদ্ধার সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিলে অনেক সময় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন 'ভায়া ! তোমার চলে কিসে' ? এই চলে কিসের উপর রাজনৈতিক মতামতের স্বাধীনতা, কর্ম্মক্ষমতা অনেকটা বজায় থাকে। অনেকটা বলিতেছি এইজন্য যে, এমন লোকও দেখিয়াছি যে অভুক্ত থাকিয়াও নিজের মত পরিবর্ত্তন করেন নাই। সেকালের "যুগান্তরের" প্রিণ্টার ফণীন্দ্রনাথ মিত্র এইরূপ একজন লোক।

লর্ড মেকলে যখন ব্যারিষ্টারী ব্যবসা ছাড়িয়া ভারতবর্ষে বড়লাট কাউন্সিলের আইন সচিব হইয়া আইসেন তখন তাঁহার কোন বন্ধু তাঁহাকে অনুযোগ করিয়া বলেন যে, আপনি উন্নতির মুখে ব্যারিষ্টারী ছাড়িয়া ভারতবর্ষে যাইতেছেন, ব্যবসা আর জমিবে না। মেকলে তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন যে আমার উদ্দেশ্য পার্লামেন্টের সদস্য হওয়া। ভারতবর্ষে যাইয়া ৫ বৎসরে যে টাকা রোজগার করিব তাহাতে আমার স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইবে। তখন আমার রাজনৈতিক মতামত সম্বন্ধে কেহ কোনরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিবে না। "It is impossible to be thought honest without a decent competence."

আমাদের লোক-সভার সদস্যদের চলে কিসে ? এই প্রশ্ন করা যতটা সহজ উত্তর দেওয়া ততটাই শক্ত। প্রথমতঃ তথ্যনির্ণয় করা খুবই শক্ত। বহু তথ্য জানিতে পারা যায় না। তথ্যের অভাব যেখানে নাই সেখানে তথ্যানুযায়ী শ্রেণী বিভাগের সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান করা প্রথমতঃ শক্ত, সমাধান করিলেও মত-ভেদের যথেষ্ট অবকাশ আছে। কথাটা দুই-একটা উদাহরণ দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিব। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বর্ত্তমানে ডাক্তারী হইতে কোনও আয় নাই; গত ১০ বৎসর তিনি কোনও ডাক্তারী করেন নাই। কিন্তু তিনি ডাক্তারী করিয়া যে টাকা জমাইয়া ছিলেন ও পিতার ওয়ারিশসূত্রে যে টাকা পাইয়াছিলেন তাহা তিনি বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠানে খাটাইতেছেন ও কলিকাতায় কয়েকটা সম্পত্তি কিনিয়াছেন। বর্ত্তমানে তাঁহার মুখ্যমন্ত্রীর বেতন, সম্পত্তির আয় ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত আয় হইতে চলে। তাঁহার মুখ্যমন্ত্রীর বেতন বেশী, না সম্পত্তির আয় বেশী, শিল্প-প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত আয় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ? এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান কাহারও নাই। তিনি বহুদিন দেশের কাজ করিতেছেন; বহুদিন বিধান-সভার সদস্য ছিলেন, কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন। এখন তাঁহাকে দেশসেবকের কোঠায় ফেলিব, না শিল্পপতির কোঠায় ফেলিব, না ডাক্তারের কোঠায় ফেলিব ? আপনি হয়ত বলিবেন, তাঁহার যেখান হইতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আয় সেই কোঠায় ফেলুন। এইটি করা কি সঙ্গত হইবে ? তাঁহার সম্পত্তির আয় তাঁহার ডাক্তারী করা টাকার ফল! ধরুন তাঁহার মুখ্যমন্ত্রীত্ব হইতে যে আয় হয় তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। তাহা হইলে তাঁহার পেশা "মুখ্যমন্ত্রীত্ব" বলিয়া ধরিব কি ? অথচ সহজ বুদ্ধিতে তাঁহাকে ডাক্তারের কোঠায় ফেলাই সঙ্গত। তাঁহাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনি কি ? তাহার উত্তরে তিনি নিশ্চয়ই নিজেকে ডাক্তার বলিয়া পরিচয় দিবেন।

মহাত্মা গান্ধীর কোন সম্পত্তি বা ব্যবসায়াদি ছিল বলিয়া জানি না বা কাহারও নিকট শুনি নাই। তাঁহার একান্তসচিব প্রভৃতি বহু লোককে সঙ্গে লইয়া তিনি ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিতেন। জনসাধারণ ভক্তি করিয়া তাঁহাকে যাহা দিত তাহাতেই তাঁহার ব্যয় সঙ্কুলান হইত। তাঁহাকে দেশসেবকের কোঠায় ফেলিব, না, আমাদের সাধু-সন্ন্যাসীদের যে কোঠায় ফেলি—অর্থাৎ ভিক্ষুকের কোঠায় ফেলিব ? ফৌজদারী আইনের ভাষায় তাঁহার ostensible means of livelihood ছিল না; তিনি ব্যারিষ্টারী পাস। আমরা তাঁহাকে দেশসেবক বলিয়াই জানি, এবং তাঁহাকে দেশ-সেবকের কোঠায় ফেলিব।

ভুল-ভ্রান্তি থাকার সম্ভাবনা সত্ত্বেও তথ্যসংগ্রহ করা যায়। এবং সংগৃহীত তথ্যসমূহ হইতে সদস্যদের মধ্যে কাহার কিসে চলে বা কে কোন শ্রেণীর তাহা সূক্ষ্মভাবে না হইলেও অনেকটা সত্য বা প্রকৃত শ্রেণীর কাছাকাছি নির্দ্ধারণ করা যায়। সদস্যদের প্রশ্ন করিয়া জানা যায় তাঁহারা নিজেদের কোন কোঠায় ফেলিতে চাহেন। দুই-এক জায়গায় তাঁহাদের উত্তর সহজবুদ্ধিতে সংশোধন

করিয়া প্রকৃত শ্রেণী বা কোঠা স্থির করিতে পারা যায়। দেশীয় রাজ্যের কোন কোন ভূতপূর্ব্ব রাজা, মহারাজা নিজেদের বেকার মনে করেন ; কিন্তু তাঁহারা ভারত সরকার হইতে একটা মোটা পেন্সন পায়েন ও তাঁহাদের রাজবাড়ি প্রভৃতি আছে ; তাঁহাদের ভূ-সম্পত্তির মালিক বলিয়া ধরিলে অন্যায় হয় না। আমাদের মতে তাঁহাদের এইরূপ কোঠায় ফেলাই সঙ্গত। সরকারী চাকুরী হইতে পেন্সন লইয়া যাঁহারা রাজনীতিতে যোগদান করিয়াছেন তাঁহাদের পেশা চাকুরি বলিয়া ধরিলে তাঁহাদের পেশার স্বরূপ বুঝা যায়। এইরূপ সংগৃহীত তথ্য ও তাহার বিচারে কিন্তু personal equation বা ব্যক্তিগত মতামতের প্রভাব থাকিয়া যায়। তথাপি এইরূপ সংগৃহীত তথ্য "নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল" হিসাবে আমরা ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা সত্ত্বেও ব্যবহার করিব।

আমরা নিম্নে যে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করিতেছি তাহা বিলাতের ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মরিস জোন্স কর্তৃক সংগৃহীত। তাঁহার সংগৃহীত তথ্যাদি হইতে জানা যায় যে, ১৯৫২ সনে নির্ব্বাচিত লোক-সভার ও রাজ্য-সভার সদস্যদের নিম্নের মত পেশা বা উপজীবিকা ছিল। যথা :

পেশা বা	লোক-সভা		রাজ্য-সভা	
উপজীবিকা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
ভূ-সম্পত্তির আয়	৯৩	১৯	৩৩	১৫
কারবারে, ব্যবসায়ে	৪৯	১০	২৮	১৩
ওকালতি	১২৭	২৫	৬০	২৮
সাংবাদিক	৩৮	৮	২০	৯
শিক্ষাব্রতী	৩৪	৭	২১	১০
চাকুরী	১০	২	১১	৫
অন্যান্য	২৪	৫	১২	৫
"দেশসেবক"	৮৫	১৭	২৯	১৩
জানা যায় নাই	৩৯	৮	২	১
মোট	৪৯৯	১০০	২১৬	১০০

দেখা যায় যে, আইন-ব্যবসায়ীরা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যায় কি লোক-সভায় কি রাজ্য-সভায় প্রবেশ করিয়াছেন। ওকালতির এখন দুর্দ্দিন—পূর্ব্বে বিধান-সভাসমূহ আইন-ব্যবসায়ীদের দ্বারা পরিপূর্ণ হইত। ১৮৯২ সনের ভারত কাউন্সিল আইনে সর্ব্বপ্রথম নির্ব্বাচন প্রথা (যদিও তাহা পরোক্ষ) দেখিতে পাই। ১৮৯২ হইতে ১৯০৯ পর্য্যন্ত মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশন, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড প্রভৃতি হইতে পরোক্ষে ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক লাট-কাউন্সিলে নির্ব্বাচিত ৪৩ জনের মধ্যে ৪০ জন ছিলেন উকীল। শতকরা হিসাবে ৯৩ জন আইন-ব্যবসায়ী। ইংরেজ সরকার উকীলদের এই প্রাধান্য ভাল চক্ষে দেখিতেন না। ১৯০৯ সনের মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কার আইনে এই নির্ব্বাচন-প্রথার আরও সম্প্রসারণ হয়। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্টে ১৯০৯, ১৯১২ ও ১৯১৬ সনের নির্ব্বাচনে উকীলরা কত আসন পাইয়াছিলেন তাহার অনুপাত দেওয়া আছে। যথা :

শতকরা কয়জন উকীল

	ভারতীয় বিধান-সভা	প্রাদেশিক বিধান-সভা
১৯০৯	৩৭	৩৮
১৯১২	২৬	৪৬
১৯১৬	৩৩	৪৮
গড়	৩২	৪৪

এই অনুপাতের হিসাব করিয়াছেন সবরকমের নির্ব্বাচন-কেন্দ্র ধরিয়া। কিন্তু "জমিদার" প্রভৃতি special নির্ব্বাচন-কেন্দ্র বাদ দিয়া সাধারণ-কেন্দ্র ধরিলে এই অনুপাত বাড়িয়া শতকরা ৭০-এ দাঁড়ায়। উকীলদের এই প্রাধান্য তাঁহারা ভাল চক্ষে দেখেন নাই, লিখিয়াছেন যে—এই প্রাধান্য "clearly not in the interests of the general community."

পার্লামেণ্টে আইন-ব্যবসায়ীদের অনুপাত কমিয়া সিকিতে দাঁড়াইয়াছে। ওকালতির এমন দুর্দ্দিন, অন্যদিকে বুদ্ধিবৃত্তির সঞ্চালনের সুযোগ না থাকায় উকীলের সংখ্যা অত্যধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে ; ফলে তাঁহাদের আয়, অভিজ্ঞতা ও তেজস্বিতা কমিয়া গিয়াছে। তাহার উপর নিত্য নূতন আইন পাশ হইতেছে যাহাতে বলা হইতেছে উকীল নিযুক্ত করিতে পারিবে না। যদি কোন বিরোধ উপস্থিত হয় তাহা সরকারী নিযুক্ত ব্যক্তিরা বা সরকারী কর্ম্মচারীরা ঠিক করিয়া দিবেন। আদালতে যাইতে হইবে না। এইরূপ বিধান ও ব্যবস্থা কতদূর সমাজ কল্যাণকর তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। এইরূপ বিধান ও ব্যবস্থা থাকায় ঘুষের প্রাবল্য ; অযোগ্যতার প্রাবল্য, দলাদলি ও ধরাধরির প্রাবল্য হইয়াছে।

এইবার আমরা রাজনৈতিক দল হিসাবে সদস্যদের পেশা বা উপজীবিকা দেখাইব। পূর্ব্বের ন্যায় আমরা কংগ্রেসী, অ-কংগ্রেসী ও কম্যুনিষ্টদের হিসাব দিব। কম্যুনিষ্টদের প্রথমে 'অ-কংগ্রেসী' দলভুক্ত ধরিয়া হিসাব করিয়াছি ও পরে আলাহিদা করিয়া দেখাইয়াছি।

লোক-সভা

পেশা বা	কংগ্রেসী		অ-কংগ্রেসী		কম্যুনিষ্ট	
উপজীবিকা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
ভূ-সম্পত্তির আয়	৬২	২১	৩১	২৬	৪	১৭
কারবার, ব্যবসায়	৩৭	১১	১২	১০	—	—
ওকালতি	১০৩	৩০	২৪	২০	২	৮
সাংবাদিক	২৫	৭	১৩	১১	২	৮
শিক্ষাব্রতী	২২	৬	১২	১০	৪	১৭
চাকুরি	৮	২	২	১	—	—
অন্যান্য	১৫	৪	৯	৭	২	৮
"দেশসেবক"	৬৭	২০	১৮	১৫	২০	৪২
	৩৩৯	১০০	১২১	১০০	২৪	১০০

কম্যুনিষ্টদের মধ্যে কোন কারবারী বা ব্যবসায়ী বা চাকুরিজীবী সদস্য নাই। এজন্য তাঁহারা বেপরোয়া ভাবে কারবারী ও ব্যবসায়ীদের লোক সভায়-আক্রমণ করেন। তাঁহাদের সমালোচনা অনেক সময়ে অজ্ঞতাজনিত অসঙ্গত হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে "দেশসেবক"-দের অনুপাত তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী; বহুকালের পুরাতন কংগ্রেসী দলের দ্বিগুণের অপেক্ষা বেশী। এই সব কম্যুনিষ্ট দেশসেবকদের চলে কিসে? পার্টির টাকায় না রুশিয়ার টাকায়? আর তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা "দেশসেবক" তাঁহাদের পূর্ব্ব ইতিহাস কি? কি ভাবে দেশ-সেবা করিয়াছিলেন, কয়বার ইংরেজের জেলে গিয়াছিলেন ইত্যাদি জানিতে আগ্রহ হয়। কংগ্রেসী দেশসেবকদের কিছু কিছু জানি, যদিও বর্ত্তমানে তাঁহাদের মধ্যে অনেক মেকী দেশসেবক পাওয়া যায়। কথাটি বিশেষভাবে চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে। এবিষয়ে বিশেষজ্ঞ মহল যদি আলোচনা করেন ত ভাল হয়।

লোক-সভার কার্য্যে আগ্রহ

অনেকে পার্লামেন্টের সদস্য হয়েন দেশ-সেবার সুযোগ পাইবেন বলিয়া। আবার অনেকে লোক-সভার সদস্য হয়েন কেবলমাত্র নিজের নাম জাহির করিবার জন্য। মন্ত্রী, উপ-মন্ত্রীদের সহিত পরিচিত হইয়া নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ খুঁজিতে থাকেন। তাঁহারা তাঁহাদের বেতন ও ভাতা পাইবার জন্য দিল্লী যায়েন, লোক-সভার হাজিরা বহিতে সহি দেন; কিন্তু আলাপ-আলোচনার সময় সভা-গৃহে থাকেন না—পলাইয়া পলাইয়া বেড়ান। প্রথম প্রথম কিছুটা উৎসাহ থাকিলেও ক্রমেই এবিষয়ে ভাঁটা পড়িতে থাকে। লোক-সভার বয়সবৃদ্ধির সহিত সদস্যদের হাজিরা কমিতে থাকে ও পলায়নের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

আমাদের লোক-সভার সদস্যসংখ্যা হইতেছে ৪৯৯ জন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা লোক-সভার হাজিরা বইতে নাম সহি করিয়াছিলেন তাঁহাদের সংখ্যা সেসান অধিবেশন হিসাবে যতদূর জানা গিয়াছে নিম্নে দেওয়া হইল। যথা:

	গড়ে হাজির সদস্যের সংখ্যা	শতকরা কয়জন হাজির
প্রথম সেসান	৪৩২	৮৬.৪
দ্বিতীয় ,,	৩৮৯	৭৭৮
তৃতীয় ,,	৩৭১	৭৪.২

এইরূপে লোক-সভার অধিবেশনে সদস্যদের হাজির না হইবার পক্ষে একটি সঙ্গত কারণ আছে। পূর্ব্বে দিল্লীর ভারতীয় বিধান-সভার অধিবেশন বৎসরে পঞ্চাশ-ষাট দিন হইত। এক্ষণে বাড়িয়া ১৩৭ দিন করিয়া হইতেছে—আরও বাড়িবার সম্ভাবনা আছে। একবার দিল্লী যাইলে একনাগাড়ে বহুদিন থাকিতে হয়—সকল সদস্যদের মধ্যে সকলের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় না। অধিবেশনের মধ্যে ছুটিছাটা, রবিবার প্রভৃতি আছে।

স্বর্গীয় যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, যিনি জে. চৌধুরী বলিয়া সাধারণে পরিচিত, ১৯২১ সনে দিল্লী ভারতীয় বিধান-সভায় নির্ব্বাচিত হন ও ১৯২৩ সন অবধি সদস্য থাকেন। তাঁহার সময়ে ভারতীয় লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলীর সেসান এইরূপ হইয়াছিল। যথা:

				ছুটি বাদ মিটিং হইয়াছিল
প্রথম সেসান	৩.২।২১	হইতে	২৯.৩.২৯=৫৫ দিন	২৮ দিন
দ্বিতীয় ,,	১।৯.২১	,,	৩০।৯।২১=২৯ দিন	১৫ দিন
তৃতীয় ,,	১০।১।২২	,,	২৮।৩।২২=৭৭ দিন	৪৪ দিন
	৫।৯।২২	,,	২৬।৯।২২=২১ দিন	১৫ দিন
	১৫।১'২৪	,,	২৭।৩।২৩=৭১ দিন	৫১ দিন
	২।৭.২৩	,,	২৮।৭.২৩=২৬ দিন	১৭ দিন

আর আমাদের সংবিধান অনুযায়ী লোক-সভার অধিবেশন হইয়াছিল এইরূপ:

প্রথম সেসান ১৩।৫।৫২ হইতে ১২।৮।৫২ — ৮৯ দিন···৬৬ দিন
দ্বিতীয় ,, ৫ ১১.৫২ ,, ২০।১২।৫২ — ৪৫ দিন···৩৬ দিন
তৃতীয় ,, ১১.২ ৫৩ ,, ১৫।৫।৫৩ — ৯৩ দিন···৭২ দিন

এইভাবে নিজ নিজ কর্ম্মস্থান বা বাসস্থান হইতে বহু দূরে দিল্লীতে একটানা একনাগাড়ে থাকা সকলের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। যাতায়াতে কিছুটা সময় যায়; সুদূর দাক্ষিণাত্য হইতে দিল্লী যাইতে তিন-চার দিন লাগে, আসিতেও এইরূপ সময় লাগে। তাহার উপর দিল্লীর গরম ও শীত অনেকের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর। বিশেষ করিয়া বাঙালীর ও মাদ্রাজের সদস্যদের পক্ষে।

দিল্লীর লোক-সভায় একটি নিয়ম আছে যে, প্রত্যেক ঘণ্টায় কতজন সদস্য সভাগৃহে উপস্থিত আছেন তাহার একটি হিসাব লোক-সভার কর্ম্মচারিগণ রাখেন। লোক-সভার মিটিং সাধারণতঃ পাঁচ ঘণ্টা ধরিয়া হয়। এই হিসাব হইতে আমরা যে গড় উপস্থিতির সংখ্যা পাই তাহা পূর্ব্বোক্ত হাজিরার সংখ্যা অপেক্ষা অনেক কম। প্রথম ঘণ্টায় নামসহি করিয়া সদস্য বাহিরে গেলেন; দ্বিতীয় ঘণ্টায় যখন উপস্থিত সদস্যসংখ্যা গোণা হইল তখন তাঁহাকে ধরা হইল না, তৃতীয় ও চতুর্থ ঘণ্টায় অবস্থা অনুরূপ। তাহার পর পঞ্চম ঘণ্টায় কেহ কেহ আসিলেন; আবার কেহ কেহ আসিলেন না। এইরূপে দৈনিক পাঁচ ঘণ্টায় উপস্থিত সদস্যসংখ্যার যে হিসাব প্রস্তুত হয় তাহা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে:

	গড় দৈনিক হাজিরা সহি হিসাবে	ঘণ্টা হিসাবের গড় ধরিয়া	যাঁহারা হাজিরা-বইতে সহি দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে শতকরা যতজন উপস্থিত
প্রথম সেসান	৪৬২	২৪৭	৫৭.২
দ্বিতীয় সেসান	৩৮৯	১৬৩	৪১.৯
তৃতীয় সেসান	৩৭১	১৪৪	৩৮.৮

লোক-সভার বয়সবৃদ্ধির সহিত লোক-সভার অধিবেশনে যোগ-

দানকারী সদস্তের সংখ্যা ও অনুপাত কমিতে থাকে। আবার যাঁহারা দিল্লী যান তাঁহারাও "স্কুল পালান", সভার হাজিরা-বইতে নামসহি করিয়াই পলায়ন করেন। আর এইরূপ পলায়নের মাত্রা খুব বেশী ও ক্রমবর্দ্ধমান। অর্দ্ধেকের উপর সদস্য এইরূপে পলাইয়া পলাইয়া বেড়ান। দিল্লীতে লোক-সভার অধিবেশনে যোগদান না করিবার বা যোগদান করিয়া নিজ নিজ কর্ম্মস্থানে বা বাসস্থানে ফিরিয়া আসিবার পক্ষে কিছুটা সঙ্গত কারণ আছে। কিন্তু দিল্লীতে যাইয়া লোক-সভার হাজিরা খাতায় নামসহি করিয়া এইরূপ "স্কুল পালান"র কোনও সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। যদি বলেন, একনাগাড়ে পাঁচ ঘণ্টা আলোচনায় যোগদান করা বা অন্যের বক্তৃতা শুনা ধৈর্য্যসাপেক্ষ, অনেকেই পারেন না, তাহার উত্তরে আমরা বলি যে, হাইকোর্টের, সুপ্রীম কোর্টের জজেদের পক্ষে যদি পাঁচ ঘণ্টা ধরিয়া উভয় পক্ষের সওয়াল শুনা সম্ভব হয়, আপিসের কর্ম্মচারীরা যদি আট ঘণ্টা কাজ করিতে পারেন, তাহা হইলে লোক-সভার সদস্যরাই বা উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না কেন? জনসাধারণের স্বার্থ দেখিবার জন্যই ত তাঁহাদিগকে নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে। তাঁহারা কি এইরূপে তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করেন? আপনি যদি বলেন যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও ত সবসময়ে লোকসভায় উপস্থিত থাকেন না, তবে সদস্যদের বেলায়ই অনুপস্থিতি দোষের হইল কেন? আমরা তদুত্তরে বলিব যে, পণ্ডিতজী যে-সময়ে লোক-সভার অধিবেশনে অনুপস্থিত সে-সময়ে তিনি তাঁহার বিভাগের নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য দেখেন ও আবশ্যক হুকুমাদি দেন। সব মন্ত্রীদের, উপ-মন্ত্রীদের এইরূপ করিতে হয়।

এই কামাই করার বা "স্কুল পালান"-র ফল কিরূপ গুরুতর হইতে পারে তাহা আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিব। লোক-সভার সদস্যসংখ্যা ৪৯৯ জন। তাহার মধ্যে কংগ্রেসী সদস্য ৩৬৪ জন; অ-কংগ্রেসী বা বিরোধী দলের সদস্যসংখ্যা ১৩৫ জন। প্রথম সেসনে ভোটগ্রহণের সময় কংগ্রেসের পক্ষে সদস্যসংখ্যা ১৮৬তে নামিয়াছিল, দ্বিতীয় সেসনে ১৪৯-এ নামিয়াছিল, তৃতীয় সেসনে ১২৯-এ নামিয়াছিল। বিপক্ষ দল হুসিয়ার ও একজোট হইলে তাঁহাদের পরাজিত করিতে পারিতেন। হয়ত মন্ত্রিসভার পতন ঘটিত।

হিন্দীতে বক্তৃতা

আমাদের সংবিধানের ৩৪৩ (২) ধারায় এইরূপ বিধান আছে যে:

"এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে যেসকল সরকারী উদ্দেশ্যে ইংরেজী ভাষা ব্যবহৃত হইত, (১) খণ্ডে যাহাই থাকুক না কেন, এই সংবিধানের প্রারম্ভ হইতে পনের বৎসর কাল পর্য্যন্ত সত্ত্বের সে-সকল সরকারী উদ্দেশ্যে ঐ ভাষা ব্যবহৃত হইতে থাকিবে।"

পূর্ব্বে ভারতীয় লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলীতে সর্ব্ববিষয়ে ইংরেজী ব্যবহৃত হইত। এক্ষণে সদস্যরা হিন্দী বুঝুন বা না বুঝুন হিন্দী-ভাষাভাষী সদস্যরা হিন্দীতে বক্তৃতা করেন। লালবাহাদুর শাস্ত্রী যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি তাঁহার policy speech হিন্দীতে দেন। দক্ষিণাত্যের সদস্যরা ইহার একবর্ণও বুঝিতে পারেন না—অথচ তাঁহাদের ইহার সমর্থন বা সমালোচনা করিতে হইবে। এই হিন্দী-বক্তৃতার বহর কিরূপ বাড়িয়া চলিতেছে তাহা নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে। যথা:

লোক-সভার	গড়ে প্রত্যহ যত মিনিট হিন্দীতে হইয়াছিল
প্রথম সেসনে	৩৬
দ্বিতীয় "	৩৫
তৃতীয় "	৫৮

পূর্ব্বে হিন্দীতে প্রদত্ত বক্তৃতার ইংরেজী অনুবাদ কার্য্যাবলীর ছাপার বইতে দেওয়া হইত। সাধারণ পাঠক পড়িয়া বুঝিতে পারিত যে, বক্তা কি বলিয়াছেন। এখন হিন্দী-বক্তৃতার ইংরেজীর অনুবাদ ছাপা হয় না। সুতরাং আমাদের মতন হিন্দী না-জানাদের পক্ষে কে কি বলিয়াছে জানিবার সুযোগ হয় না। পক্ষান্তরে সমস্ত ইংরেজী-বক্তৃতা অনুবাদ করিয়া লোক-সভার কার্য্যাবলীর একটি হিন্দী-সংস্করণ ছাপা হয়। কয়খণ্ড বিক্রয় হয় জানি না—কোন সদস্য এবিষয়ে প্রশ্ন করিলে ভাল হয়।

লোক-সভার তথা ভারতের শতকরা ৩০ জন হিন্দী-ভাষাভাষী। তাহাদের সুবিধার জন্য লোক-সভার কার্য্যাবলীর হিন্দী-সংস্করণ ছাপা হয়, আর শতকরা ৭০ জনের বুঝিবার সুবিধা হইতে পারে বলিয়া ইংরেজী কার্য্যাবলীতে হিন্দী-বক্তৃতার অনুবাদ পর্যন্ত দেওয়া হয় না। ইহাই কি গণতন্ত্র? ইহাই কি equal opportunities for all? আমরা ইহাকে হিন্দীর জুলুমবাজী বলিব।

যদি বলেন সংবিধানে আছে বলিয়া হিন্দী চালানো হইতেছে, তাহা হইলে আমরা বলিব সংবিধানে ত ১৫ বৎসর ইংরেজীর স্থান আছে। কেন ইংরেজী অনুবাদ পড়িতে পাইব না? আর মানুষের সুবিধার জন্য সংবিধান, সংবিধানের জন্য ত মানুষ নয়। গত ৬ বৎসরের মধ্যে আমাদের সংবিধান ৮.৯ বার সংশোধিত হইল। হিন্দীর বেলায় বা হইবে না কেন? হিন্দীপ্রচারের জন্য যে অপব্যয় হয় তাহাতে গরীব দেশের অনেক উপকার হইত। একটা উদাহরণ দিই। কয়েকটি স্থান হইতে হিন্দীতে টেলিগ্রাম পাঠানো যায়। রাঁচি হইতে হিন্দীতে টেলিগ্রাম করিলাম। এই হিন্দী টেলিগ্রাম টেলিফোনে ট্রাঙ্ক কল করিয়া দিল্লীতে পাঠান হইল, সেখান হইতে পুনরায় ট্রাঙ্ক-কল করিয়া পাটনা পাঠানো হইল। পাছে ভুল যায় এজন্য দুইবার করিয়া ট্রাঙ্ক-কল করিবার নিয়ম আছে। ইহাতে জনসাধারণের যাহারা ট্রাঙ্ক-কল করে—তাহাদের অসুবিধা হয়—trunk line engaged থাকে। ইহার জন্য মাহিনা করিয়া আলাহিদা লোক রাখিতে হইয়াছে ইত্যাদি বাড়তি

ধরন্ত আছে। আর হিন্দী ভাষাতত্ত্ববিদগণের মতে একটি ভাষা নহে। ডাঃ গ্রিয়ারসনের মতে মাগহি, মৈথিলী, ভোজপুরী, ব্রজবুলি, আউধী প্রভৃতি এক-একটি আলাদা ভাষা। সবগুলিকে মিলাইয়া ধরিলে হিন্দী-ভাষাভাষীদের অনুপাত বাড়ে।

এখন পশ্চিম বাংলা হইতে নির্ব্বাচিত লোক-সভার সদস্যদের সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধটি শেষ করিব। পশ্চিম বাংলা হইতে নির্ব্বাচিত সদস্যদের সংখ্যা হইতেছে ৩৪ জন। ইহাদের মধ্যে কংগ্রেসী সদস্যদের সংখ্যা ২৪ জন, কম্যুনিষ্ট সদস্য-সংখ্যা ৫ জন। এইসব সদস্যদের মধ্যে ৩,৪ জন ব্যতীত অপরে বড় একটা কেহ মুখ খুলেন নাই—বিশেষ করিয়া যাঁহারা কংগ্রেসী সদস্য। লোক-সভায় পশ্চিম বাংলার স্বার্থে বা বৃহত্তর স্বার্থে প্রশ্ন করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় না। এবিষয়ে সর্ব্বভারতীয় মান হইতে তাঁহাদের মান নিম্নস্তরের। এবিষয়ে আমাদের অবহিত হওয়া দরকার।*

* প্রবন্ধের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও সঙ্কলন বিষয়ে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ সাহা রায় এম, এ (কমার্স ও অর্থনীতি) আমাকে বহু সাহায্য করিয়াছেন, এজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

গ্রাম

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

সকল দিকেই যে গ্রামের অবস্থা শোচনীয় একথা গ্রামের সহিত জড়িত প্রত্যেককেই স্বীকার করিতে হইবে। রাস্তা-ঘাট, পানীয় জল, স্বাস্থ্য, চিকিৎসার অসুবিধা, শিক্ষা, অন্নবস্ত্র, গৃহ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব ও দুর্মূল্যতা প্রভৃতি গ্রামের সকল সম্প্রদায়কে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছে। ইহার উপর গ্রাম্য দলাদলি,বাদ-বিসম্বাদ, ঝগড়াঝাঁটি, হিংসা-দ্বেষ, স্বার্থপরতা গ্রামের আকাশ-বাতাসকে অধিকতর রূপে কলুষিত করিতেছে। নেতৃত্বের অভাবে গঠনমূলক কোন কাজই হইতেছে না। পল্লী-অঞ্চলে প্রায় সকল সম্প্রদায় দেশ যে স্বাধীন হইয়াছে তাহা এই দশ বছরেও উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না। স্বাধীন দেশের অধিবাসীদের দায়িত্ব সম্বন্ধেও তাহারা মোটেই সচেতন নয়। তাহারা মনে করে শাসকবর্গের দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে আলোচনা করাই তাহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। প্রত্যেক স্তরেই এই মনোভাব বিদ্যমান।

পূজার ছুটিতে বহু যুবক-যুবতী গ্রামে যাইবেন। তাঁহারা যদি গ্রামের বর্ত্তমান আবহাওয়ার উন্নতিসাধন করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহাদের গ্রামে যাওয়া সার্থক হইবে। তাঁহারা চেষ্টা করিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংঘ গঠন করিয়া গ্রামের কৃষি, শিল্প, রাস্তাঘাট, পানীয় জল প্রভৃতির প্রভূত উন্নতি করিতে পারেন। প্রথমতঃ, পল্লী-অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে তাহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে, তাহাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত করিতে হইবে। তাহাদিগকে বুঝাইতে হইবে দেশের উন্নতি কোন দলগত ব্যাপার নয়। সকল দলের সকল লোকই দেশের উন্নতিসাধনে হাত মিলাইয়া কাজ করিতে পারেন। আর একটি কথা, প্রত্যেকের মধ্যে যে স্বাদেশিকতা আছে তাহা সম্পূর্ণ দেশের কল্যাণে প্রয়োগ করাই প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। দেশকে কে না ভালবাসে? এই ভালবাসা প্রকৃত পথে চালিত করিতে পারিলে দেশের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। এই মহাপূজার সময় সকলকে সঙ্কল্প করিতে হইবে যে, ঈশ্বর আমাকে যেটুকু শক্তি দিয়াছেন বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও তাহা আমি দেশের কল্যাণে পরিপূর্ণরূপে নিয়োজিত করিব। সেই জন্য যে সকল যুবক-যুবতী পূজার সময় গ্রামে যাইবেন, তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা যেন পল্লী-অঞ্চলের সর্ব্বশ্রেণীর লোককে সংঘবদ্ধ করিয়া তাঁহাদের নিজ নিজ শক্তিতে তাঁহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করেন। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অনেক প্রকারের অভিযোগ থাকিতে পারে, কিন্তু সেই সকল অভিযোগ আমাকে যেন কর্ত্তব্যচ্যুত না করে। গ্রামের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে এই অনুভূতি জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আছে তাহাদের দূরীকরণের জন্য সমালোচনা যে করিতে হইবে না এই কথা বলিতেছি না, গঠনমূলক সমালোচনা করিতেই হইবে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজবাহরলাল নেহরু এইরূপ সমালোচনা আহ্বান করেন। আর একটি বিশেষ কথা এই যে, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যতই অভিযোগ থাকুক না কেন, নিজেদের মধ্যে যতই ভেদাভেদ ও মতানৈক্য থাকুক না কেন দেশের মর্য্যাদা যেখানে ক্ষুণ্ন হইবার সম্ভাবনা সেখানে সকলকেই এক হইতে হইবে। সেদিন এক বন্ধু বলিতে-ছিলেন, পাকিস্থানে অনেক দলাদলি; অভাব-অভিযোগ প্রভৃতি বিপুল ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু সেখানে যেমন সর্ব্বস্তরের লোকের মধ্যে দেশাত্মবোধ আছে ভারতবর্ষে তাহার একান্ত অভাব। এই কথা যদি সত্য হয়, ইহাকে আমাদের কলঙ্ক বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। দেশের যুবক-যুবতীর উপরেই এই কলঙ্ক মোচনের ভার অর্পিত আছে।
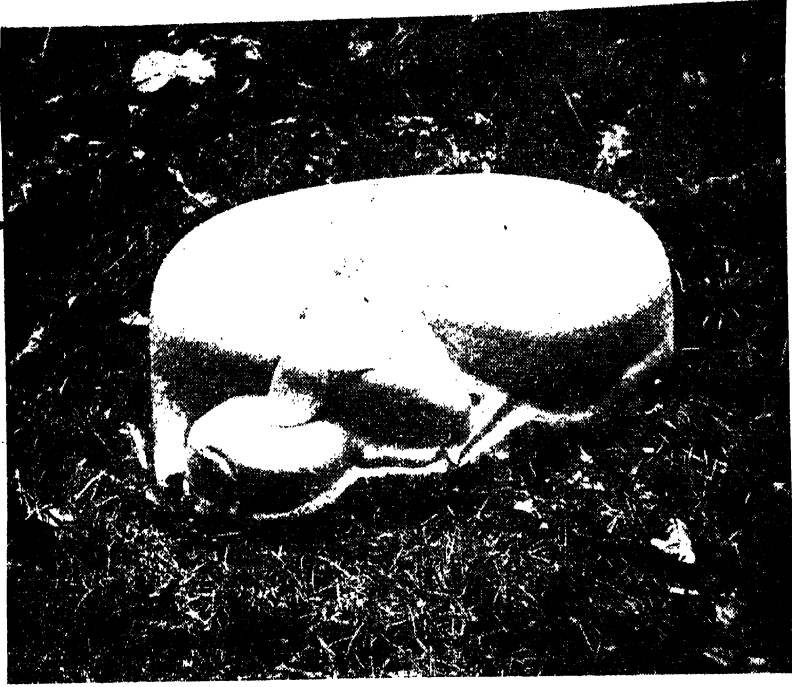
শাবকসহ মেষমাতা—জর্জ পাপাশভিলি গঠিত

জীবনে কিছুই অসম্ভব নয়

শ্রী

শিক্ষামূলক ছোট্ট একটি চলচ্চিত্র, মাত্র সাত মিনিট লাগে দেখতে। নাম দেওয়া হয়েছে, "পাথরের গায়ে রূপের খেলা"। একটা লোক পাথরের পর পাথর হাঁতড়ে বেড়াচ্ছে, ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফেলে দিচ্ছে—যেন, "ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশ পাথর।" তার পর দেখা গেল, পছন্দসই, হয়ত বেশ ভারী গোছেরই, একটা পাথর খুব কষ্ট করে গড়িয়ে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে লোকটা। দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার গাড়ী, তাতে নিয়ে তুলল পাথরটা। তার পরে এল সেই পাথর নিয়ে একটা গাছপালা-বাগান-জঙ্গলময় বাড়ীতে। এল একটা পাথরের মোটা দেয়ালঘেরা ঘরে। বসলো সেই প্রকাণ্ড পাথরের টুকরোটাকে আর কয়েকটা ছেনি, বাটালি, হাতুড়ি হাতে নিয়ে। একটুকরো খড়িমাটি দিয়ে পাথরটার গায়ে কিসের যেন নক্‌সা আঁকল, তার পর সুরু হয়ে গেল হাতুড়ি-ছেনিতে ঠুক্-ঠক, ঠুংঠাং।

সাত মিনিটে দেখানো ঐ ছবির শেষ পর্বে দেখা গেল, ঐ ধারালো চোখ আর টিকলো নাকওয়ালা লোকটার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা ষাড়, ঐ পাথরের টুকরো থেকে বেরিয়ে এসেছে।

নিখুঁত এনাটমি মাফিক, হুবহু ষাড়ের মূর্তি নয়। খুঁটি-নাটি খুঁটিয়ে দেখলে খুঁত পাওয়া যাবে মেলাই। কিন্তু দেখতে মন চাইবেই না। নির্ভুল ষাঁড়ের মূর্তিটা এমন নিখুঁত জীবন্ত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রয়েছে যা দেখে মন আপনা থেকেই বলে উঠবে, বাহবা ওস্তাদ!

সূক্ষ্ম শিল্পকর্মের সন্ধান মিলবে না এখানে। নিতান্ত মোটা কাজ, সাদামাটা গোছের। কিন্তু চোখ যেন আটকে থাকে—এমনই জীবন্ত ভঙ্গী। শিল্পের সার্থকতা, শিল্পীর সাফল্য এইখানেই।

পাথরের গায়ে রূপের খেলা দেখিয়ে এমন চমক যিনি

লাগিয়ে দিয়েছেন তাঁর নাম হচ্ছে জর্জ পাপাশভিলি। আদি নিবাস রুশ দেশে; ককেসাস পাহাড় এলাকায় জর্জিয়ার এক ক্ষুদ্র গ্রামে। এখন স্থায়ী বাসিন্দা হচ্ছেন আমেরিকার পেনসিলভেনিয়া রাজ্যের কোয়েকার টাউনের। শহরের একটেরেতে তাঁর খামার বাড়ী, বাগান, জঙ্গল, গাছপালা আর তারই মধ্যে চলেছে তাঁর এই শিল্পচর্চা, এই পাথরের গায়ে রূপের খেলা ফোটানো, রূপের মেলা বসানো।

এরটোবা ফার্ম অর্থাৎ পাপাশভিলির খামার বাড়ীতে ঢুকতেই এক পাশে প্রকাণ্ড এক কাটালপা গাছ নজরে পড়বে। আর সঙ্গে সঙ্গেই চোখকে টেনে নেবে একটা অদ্ভুত চেহারার যন্ত্র, আমেরিকান র‍্যাকুন—ঐ মোটা গাছটার গুঁড়ি ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে একখণ্ড পাথরের ওপরে। আশেপাশের পাতা-লতার সঙ্গে জন্তুটাকে এমন মানিয়েছে যে, মনে হবে ওখানেই বুঝি ওটার বাড়ীঘর। সুক্ষ্ম শিল্পকর্ম নয়, সাদামাটা কাজ আগেই বলেছি। কিন্তু শিল্পীর হাতের স্পর্শ এমনই সুক্ষ্ম চোখের দৃষ্টি এমন তীক্ষ্ণ, আর কল্পনার অনুভূতি এমন স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট যে, ঐ সাদামাটা কাজের মধ্যেই প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে। এমন ক্ষমতা সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না।

কর্মনিরত শিল্পী জর্জ পাপাশভিলি

এই অসাধারণ ক্ষমতাবান শিল্পীটি কিন্তু সাধারণতঃ জন্তু-জানোয়ারের মূর্তিই তৈরি করেন, মানুষের মূর্তি তৈরি করেন না এমন নয়। যা করেন তার মধ্যেও প্রাণসঞ্চার করবার আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয়ই পাওয়া যায়। তবে মানুষের মূর্তি অল্পই তৈরি করেন।

নানা রঙের নানা জাতের পাথরে এই সব জীবজন্তুর রূপ শিল্পী পাপাশভিলি ফুটিয়ে তোলেন। চুনাপাথর, বেলে-পাথর, সোডানাইট, এভেঞ্চুরিন, পোরফাইরি, গ্রেনাইট, রিয়োলাইট, জেড, জেসপার, অবসিডিয়ান, ডায়োরাইট, মার্বল এমনই সব রকমের পাথর। এইসব পাথর খুঁজতে, কুড়িয়ে আনতে পাপাশভিলি বেরিয়ে পড়েন তাঁর গাড়ী নিয়ে। পাহাড়ের গা থেকে, ঝর্ণার কোল থেকে, নদীর ধার, সমুদ্রের তীর, মরুভূমি, পুরনো পরিত্যক্ত খনির গহ্বর কোথায় না গিয়েছেন তিনি এই সব পাথরের খোঁজে? তার পর ভারী ভারী সব পাথর বয়ে নিয়ে গাড়ীতে তুলেছেন নিজে—একলাই। দেখতে ছোটখাটো মানুষটি দোহারা গড়নের। কিন্তু গায়ের জোর, ভার বইবার আর শরীরের টাল সামলাবার ক্ষমতা নিতান্ত কম নয়।

মণখানেকের ওপর ওজনের পাথর পর্যন্ত একাই বয়ে এনেছেন। পাপাশভিলির গড়া মূর্তিগুলির গড়নের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলেছে নানা পাথরের নানা রকম রং। রঙের বৈচিত্র্য ত বটেই, বস্তুর সঙ্গে রঙের সুক্ষ্ম সম্পর্কটাও দর্শকের চোখ আর মনকে যথেষ্ট তৃপ্তি দিয়ে থাকে।

এ্যালেনটাউন আর্ট মিউজিয়মের এক প্রদর্শনীতে এই প্রতিভাধর ভাস্করের শিল্পকর্ম প্রথমে লোকচক্ষুর গোচরে আসে ১৯৫১ সনের গোড়ার দিকে। ঐ বছরের শেষের

র‍্যাকুন—জর্জ পাপাশভিলি গঠিত

পাথরে কিভাবে ছেনি চালাতে হয়, তাই কি জানা ছিল তাঁর? পাহাড় থেকে যারা পাথর কেটে আনে, গেলেন তাদের কাছে। তাদেরই যন্ত্রপাতি দিয়ে শিখে নিলেন ছেনি আর বাটালির কায়দাকানুনগুলি, ঘণ্টা হিসেবে কিছু পয়সা তাদের দিয়ে।

ভাস্কর্যের অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে না জন্মালে এমন বিনা শিক্ষায়, বিনা অভিজ্ঞতায়, গুরুশিষ্য পারম্পর্যবিহীন এক প্রৌঢ়ের (পাপাশভিলির জন্মকাল ১৮৯৫ সন) পক্ষে এমন অদ্ভুত সৃষ্টি কখনও সম্ভব হতে পারে না। দরিদ্র কৃষকের ঘরে জন্ম, শিক্ষা নেই, দীক্ষা নেই—কিশোর বয়স থেকে সুরু করতে হয়েছে মেহনতি কাজ। তার পর কত দেশে বিদেশে, কত না রকমের কাজ করেছেন। বিচিত্র সে অভিজ্ঞতা।

এই অভিজ্ঞতার কথা দিয়েই একখানা চমৎকার বই লেখা যেতে পারে এবং লেখা হয়েছেও। শুধু লেখাই নয়, ছাপা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বইটি সেই মাসের সেরা বই বলে স্বীকৃতও হয়ে যায়। এটা ঘটে ১৯৪৫ সনের জানুয়ারীতে। তখনই এক সিনেমা কোম্পানী আর. কে. ও. রেডিও ত্রিশ হাজার ডলার দিয়ে বইটির চলচ্চিত্র রূপের স্বত্ব কিনে নিলেন —বইটির অতিরিক্ত সংস্করণ প্রকাশের অধিকার রইলপাপাশভিলির।

বইটি রচনা করেছেন জর্জ পাপাশভিলি এবং তাঁর স্ত্রী হেলেন দুজনে মিলে। ইংরেজী বলতে পারলেও পাপাশ-ভিলি এখন পর্যন্তও ইংরেজী লেখাটা রপ্ত করতে পারেন নি।

বইটির নাম দেওয়া হয়েছে, "এনিথিং ক্যান হ্যাপেন"—অর্থাৎ কিছুই ঘটা বিচিত্র নয়। পাপাশভিলি আমেরিকায় এসে বসবাস করছেন ১৯২৩ সন থেকে। তার পরের কুড়ি বছরের বিচিত্র অভিজ্ঞতা বইটির পাতায় পাতায় ছড়ানো। তার মধ্যে যেমন রয়েছে মানুষের অন্তরের বহু সদ্‌গুণের পরিচয়, তেমনই আছে প্রচুর হাস্যরস।

এক গ্রীক জাহাজে একেবারে নিচের শ্রেণীর যাত্রী হয়ে ১৯২৩ সনে পাপাশভিলি আমেরিকায় প্রথম পা দিলেন। নিউ ইয়র্কে পৌঁছেই এক ঠকের পাল্লায় পড়লেন। ফলে সেইদিনই এক চাকরী জুটেও গেল, খোয়াও গেল। চলল

দিকে তাঁর শিল্পকর্মের একটি একক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। তার পর থেকে লোকের মুখে তাঁর নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এখন তাঁর শিল্পের কদর যথেষ্টই বাড়ছে, আর্থিক প্রাপ্তিও অল্প হচ্ছে না।

এমন আশ্চর্য প্রতিভাবান শিল্পী। কিন্তু তার চেয়েও আশ্চর্য হচ্ছে, শিল্প বিষয়ে বা লেখাপড়ার দিক দিয়ে ইনি কোথাও কোনও দিন কোনও শিক্ষাই পান নি। পাথরের গায়ে তাঁর কল্পনার রূপকে একেবারে প্রত্যক্ষ করার মতই স্পষ্ট তিনি দেখতে পান। একটুকরো খড়িমাটি দিয়ে মোটা মোটা কয়েকটা রেখা টানেন পাথরের গায়ে। ঐ পর্যন্তই—না কাগজে ড্রইং না মডেলিং। তার পর বসে যান ছেনি আর বাটালি নিয়ে। এটা যান্ত্রিক যুগ, সুতরাং পাথর কুরবার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিও দু'একখানা তাঁকে ব্যবহার করতে হয় কাজের সুবিধা এবং সময় বাঁচাবার জন্যে।

অভিজ্ঞতার পর অভিজ্ঞতার' পালা, হ'ল জীবন-সংগ্রাম সুরু।

পুঁজি যা কিছু ছিল, জাহাজে খেয়েই নিঃশেষ। সরকারী কর্মচারীদের ধোঁকা দিয়ে ত বন্দরে নামলেন। কাজের সন্ধান করতে লাগলেন। কত কাজ জুটল, কত কাজ গেল! ডিশ ধোবার কাজটি গেল বেদম ডিশভাঙার জন্যে আর স্বয়ং হোটেলের মালিকের সাধের মাছের ডিমভাজা খেয়ে সাবাড় করার জন্যে।

গেলেন এক সিল্ক কারখানাতে কাজ করতে। সেখান থেকে এক আর্টিষ্টের কারখানায়—ছাঁচে ফেলে মূর্তি তৈরি করার কাজ করতে। দেখলেন, উট তৈরি করতে গিয়ে তৈরি করেছেন গরু। এখানে-ওখানে হাত লাগিয়ে গরুর চেহারার মধ্যে একটুখানি উটের ভাব আনছিলেন এমন সময় কর্তা আর্টিষ্টের নজরে পড়ে গেলেন। কর্তা রেগে টং, পাপাশভিলি কিছু বলবামাত্র তাঁকে শুনিয়ে দিলেন লণ্ডন, প্যারিস, ড্রেসডেন—এই সব জায়গা থেকে তাঁর শিল্পকলায় তালিম নেবার কথা। পাপাশভিলি জানেন ঐসব জায়গায় জ্যান্ত উটের নামগন্ধও নেই। জানলে হবে কি, চাকরিটি গেল। এমনই অসংখ্য আর বিচিত্র অভিজ্ঞতা সারাজীবন ভরে জমেছে পাপাশভিলির। তারই কিছু পরিমাণ বিতরণ করেছেন ঐ বইখানার মধ্যে।

এখানে সংক্ষেপে শুধু একটা ফিরিস্তি ধরে দিচ্ছি তাতেই কিছুটা আন্দাজ করা যাবে।

অর্থাভাবে ইস্কুলে পড়া হ'ল না। বাবা দিলেন কাজে ঢুকিয়ে—ঘোড়ার সাজ আর ইস্পাতের [illegible] তৈরির কাজ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে গেলেন সৈন্য হয়ে। [illegible] এরোপ্লেনের মিস্ত্রীর কাজ। জারের সৈন্যদলে [illegible] ছয় বছর। এল রুশবিপ্লব, যোগ দিলেন জর্জিয়ার জাতীয় সৈন্য-বাহিনীতে।

তার পর গেলেন কনষ্টাণ্টিনোপলে। কাটলেন ইঁদারা, চালালেন ট্যাক্সি, শিকার করলেন বুনো শুয়োর, কিছু পয়সা জমিয়ে পাড়ি দিলেন আমেরিকায়। নিউইয়র্ক বেশীদিন ভাল লাগল না, গেলেন পিটসবার্গ শহরে—ঢুকলেন এক কারখানায়, তিন দিন থেকেই বিদায়। তার পর এ-শহর ও-শহর করে হাঁটাপথে গিয়ে হাজির হলেন হলিউডে। রুশ কসাকের ভূমিকায় নামলেন কয়েকটা ছবিতে। আরম্ভ করলেন জলখাবার বিক্রীর ব্যবসা, যোগ দিলেন ন্যাশনাল গার্ড সৈন্যবাহিনীতে।

পরিচয় হ'ল ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হেলেন ওয়েইটের সঙ্গে ১৯৩০ সনে। হ'ল ঘনিষ্ঠতা, হলেন তাঁর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ। এটা-সেটার ব্যবসা চালালেন কিছুদিন। পেনসিলভ্যানিয়ায় এসে কিনলেন এক খামার। পর পর সেখানে আবাদ করলেন মুর্গী, ছাগল, মৌমাছি, ভুট্টা, ভেড়া, শুয়োর, শন এবং শেষ পর্যন্ত টমাটোর। মজা মন্দ হচ্ছিল না, কিন্তু হচ্ছিল না তেমন অর্থাগম। হেলেনের কিছু কিছু লিখবার অভ্যাস ছিল। বললেন পাপাশভিলিকে তাঁর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার গল্পগুলিকে সাজিয়ে ছাপতে দিলে খাসা জিনিস হবে। হ'লও তাই।
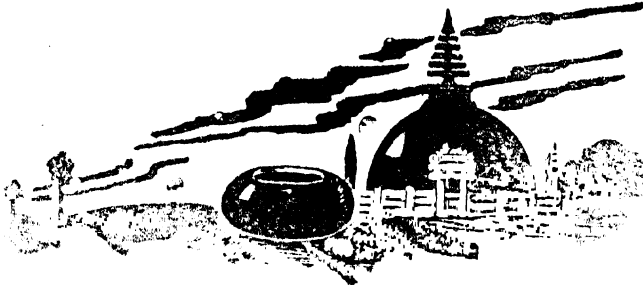
যক্ষি বুড়ী

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

অ মাষ্টারবাবু—

হাতের লাঠিখানাকে মাটিতে রেখে পোষ্ট আপিসের খোলা জানালার দুটি সিক দু'হাতে শক্ত মুঠায় চেপে ধরে কুব্জ দেহটিকে যথাসম্ভব সোজা করে বৃদ্ধা জগদীশের মা ফোকলা মুখখানিকে হাসবার চেষ্টায় আরও বিকৃত করে জিজ্ঞাসা করলে, আমার ট্যাকা আইচে নাকি?

চমকে উঠল মামুদনগরের পোষ্টমাষ্টার সিরাজউদ্দিন খান। অস্বাভাবিক মোটেই নয় বৃদ্ধাকে হঠাৎ দেখলে চমকে ওঠা। অতি কুৎসিত চেহারা তার। নারীর পক্ষে অস্বাভাবিক রকমের দীর্ঘ দেহ বয়সের ভারে কুব্জ; বর্ণ পোড়া কাঠের মত, শণের নুড়ির মত মাথার চুল, ছোট ছোট দুটি ঘোলাটে চোখ, ফোকলা মুখের অবশিষ্ট দু-তিনটি বিবর্ণ হরিদ্রাভ দাঁত হাসবার চেষ্টায় উদ্‌ঘাটিত হলে রীতিমত বীভৎস মনে হয় তাকে। তার উপর আবার একটি পা তার খোঁড়া। লোকে তাকে রাত্রে বা দিনের বেলাতেও হঠাৎ দেখলে ভয় পায়।

সিরাজউদ্দিন প্রথমে চমকে উঠেছিল, প্রশ্নটি বুঝে বিরক্ত হয়ে উত্তর দিল, আবার টাকা আসবে কি? এই না দিন সাতেক আগে টাকা নিয়ে গেলে তুমি?

তা অইলেও আবার আইতে পারে, বৃদ্ধা তার সেই ভয়ঙ্কর হাসি কান পর্য্যন্ত বিস্তৃত করে বললে, বড় ভাল মানুষ ঐ সতীশ। আমি তারে আবার চিঠি দিচি—শীতের দিনে একখান আলোয়ান লাগব আমার। আমার চিঠি পাইলে ট্যাকা সে না পাঠাইয়া পারব না।

তা তোমার টাকা এলেই তুমি পাবে, উত্তর দিল সিরাজউদ্দিন, ডাকপিওন তোমার বাড়ীতে গিয়েই তোমাকে টাকা দিয়ে আসবে। এখন যাও।

হাসি নিভে গেল বৃদ্ধার মুখের উপর থেকে; হা-করা মুখ জুড়ে গিয়ে কেমন যেন ছোট হয়ে গেল। কিন্তু দেখে একটুও নরম হ'ল না সিরাজউদ্দিনের মন; বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে আবার বললে, এত টাকা টাকা কেন কর তুমি? আমি তো শুনেছি যে, একবেলাও পেট পুরে তুমি খাও না। টাকা তুমি গোরে নিয়ে যাবে নাকি?

হঃ!—

হঠাৎ যেন একটা সাপ ফোঁস করে উঠল। জানালার সিক ছেড়ে দিয়ে পুনরায় লাঠিখানা আশ্রয় করে রাগে কাঁপতে কাঁপতে বৃদ্ধা বললে, হঃ! হগগলেই ট্যাকা দ্যাহে আমার—দ্যাহে না কেমুন সাত-সমুদ্দুরে সব লুইটা নিয়া গ্যাল। কিন্তু ভগবান আচেন—তিনি বিচার করবেন। আমার ট্যাকা দেখ্যা যাগর চক্ষু টাটায় তাগর চক্ষু কাণা কইরা দিবেন তিনি।—

ঠক্ ঠক্ ঠক্।

মুখের কথার তালে তালে হাতের লাঠি বারান্দার মেঝেতে ঠুকে ঠুকে খোঁড়া পাখানিকে টেনে নিয়ে কুব্জ পৃষ্ঠা বৃদ্ধা পরিচিত ও অপরিচিত সকলের সঙ্গে সঙ্গে নিজের অদৃষ্টকেও ধিক্কার দিতে দিতে নীচে নেমে গেল।

কিন্তু দেখে ভিতরের সিরাজউদ্দিনের মত বাইরের অনেকেরও ওষ্ঠপ্রান্তে কৌতুকের হাসি ফুটে উঠল। প্রায় একই সময়ে একাধিক দর্শক সমস্বরে বলে উঠল, যক্ষিবুড়ী!

ঐ বলেই গাঁয়ের লোকে বৃদ্ধাকে ডাকে, তার চেহারার জন্য হোক আর না হোক, তার স্বভাবের জন্য। সে কৃপণা, সে কুশীদজীবিনী। অসামাজিক তার প্রকৃতি, সে কটুভাষিণী। সকলকে অভিশাপ দিয়ে এবং সকলের অভিশাপ কুড়িয়ে রোগক্লিষ্ট, জরাজীর্ণ, কদাকার দেহ নিয়ে জীবনের দুর্বহ বোঝা একেবারে একাকিনী বয়ে চলেছে বৃদ্ধা জগদীশের মা।

দরিদ্র সে নয়—কলকাতা থেকে মাসে মাসে মনিঅর্ডার যোগে তার ভরণপোষণের জন্য টাকা যে আসে তা গ্রামের সকলেই জানে। তথাপি তার ছেড়া কাপড় ঘোচে না, দিনান্তে ভরপেট খেতে পায় না সে। কারণ একটি পয়সা খরচ হলে সে মনে করে যেন তার পাঁজড়ার একখানা হাড় ভেঙ্গে যাচ্ছে।

টাকা সে জমিয়ে রাখে, সুযোগ পেলেই চড়া সুদে ধার দিয়ে ফাঁপিয়ে তোলে তার সঞ্চয়ের আয়তন। নিজে সে চেয়ে-চিন্তে খায়। বছর তিনেক আগে কলকাতা থেকে ফিরে আসবার পর থেকেই এমনই চলেছে তার জীবনযাত্রা।

এই জন্যই সে যক্ষিবুড়ী। লোকে বলে যে, মৃত্যুর পরেও স্বর্গে না গিয়ে সে তার সঞ্চিত সম্পদ আগলাবার জন্য তার ঘরেই যক হয়ে থেকে যাবে।

সেদিন সতীশ ময়মনসিংহ যাবার পথে শিয়ালদহ ষ্টেশনে পাকিস্থানের গাড়ীতে বসে এই বৃদ্ধার কথাই ভাবছিল।

২

বছর দুয়েক পূর্ব্বে বৃদ্ধার সঙ্গে সতীশের প্রথম পরিচয়। পাকিস্থান তখন পর্যন্তও জিন্নাসাহেবের মগজে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের কৃতী ছাত্র সতীশ তখন বাস করে তার এক

ভগ্নীপতির সঙ্গে বেলেঘাটার এক বস্তিতে। পাশের ঘরে তাদের প্রতিবেশী পূর্ব্ববঙ্গের আই-এ পাশ কেরাণী জগদীশ। তার সংসার বলতে একা তার স্ত্রী দময়ন্তী। তাদের একটি সন্তান নাকি আঁতুরেই মারা গিয়েছিল, তার পর আর কিছু হয় নি। সেই নির্ঝঞ্ঝাট দম্পতীর ঘরেই বৃদ্ধার সঙ্গে সতীশের প্রথম দেখা।

জগদীশই ডেকে নিয়ে গিয়েছিল তাকে। তার মায়ের একখানা পা ভেঙে গিয়েছে, সতীশকে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিতে হবে—এমন কতজনের জন্যই তো সে করে।

বৃদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে সতীশ দেখলে তার নাতি নয়ানচাঁদকেও—রোগা, ফ্যাকাসে চেহারার বছর দশেকের একটি ছেলে; খালি গায়ে খড়ি উড়ছে, মাথায় লালচে বড় বড় চুলে কাকের বাসা; বিড়ালের চোখের মতই কটা ও প্রায় গোলাকার দুটি চোখ দিনের বেলাতেও যেন শিকারের সন্ধানে জ্বল জ্বল করছে।

মায়ের পায়ে আঘাত লেগেছে শুনে জগদীশ নিজেই দেশে গিয়ে ওদের দু'জনকেই কলকাতায় নিয়ে এসেছে।

আহত পা'টি মোটামুটি একবার দেখে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে সতীশ, কি করে চোট লাগল?

ঐ শত্তুরের লাইগ্যা—যেন গর্জ্জন করে উঠল বৃদ্ধা। তারই প্রসারিত দক্ষিণ-হস্তের তর্জ্জনী অনুসরণ করে সতীশের চোখ দুটি গিয়ে পড়ল নয়ানচাঁদের উপর। অপ্রতিভ হওয়া দূরে থাক, সে তখন তার অমার্জ্জিত নোংরা দাঁত বের করে হাসছে।

ঐ বালকটিই একদিন রেগে গিয়ে পিছন থেকে বৃদ্ধার পায়ে লাথি মেরেছিল। তারই ফলে উঠান থেকে একেবারে নীচে পড়ে গিয়ে বৃদ্ধার এই দুর্দ্দশা।

জগদীশের মুখে ঘটনার সালঙ্কার বর্ণনা শুনে সতীশ জিজ্ঞাসা করলে, ছেলেটি কে?

ছাওয়াল না, বাবা, আমার বুকের শেল, বৃদ্ধা নিজেই উত্তর দিল, আমার প্যাটের মাইয়া আমার বুকে এই শেল দিয়া গ্যাচে।

গোড়ার কাহিনীও শুনলে সতীশ। বৃদ্ধার কনিষ্ঠা কন্যা প্রথম প্রসবের সময় মায়ের কাছে এসেছিল। বৃদ্ধা গ্রামের ধাত্রীর সঙ্গে নিজেও গিয়েছিল কন্যার আতুর-ঘরে। আর সেই ঘরেই নবজাত শিশুটিকে তার ঠাকুরমার কোলে তুলে দিয়ে তার গর্ভধারিণী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল। সেই থেকেই ছেলেটি জগদীশের দেশের বাড়ীতে তার মায়ের কাছেই মানুষ হচ্ছে।

ওর বাবা ওকে নেয় নি?—জিজ্ঞাসা করলে সতীশ।

জগদীশ তিক্তকণ্ঠে উত্তর দিল, মা ছাড়লে তবে তো নেবে।

কি কইলি জগা? বৃদ্ধা আবার গর্জ্জন করে উঠল: আমি ওয়ারে আটকাইয়া রাখি নাকি? জানস না তুই যে দূর দূর কইরা খেদাইলেও ওডা আমারে ছাইড়া যায় না!

ফিরে সতীশের মুখের দিকে চেয়ে বৃদ্ধা অপেক্ষাকৃত নরম সুরে আবার বললে, তার লাইগ্যা ওয়ারে দোষ দেওয়ন যায় না, বাবা। ওর বাপ আবার বিয়া করচে। সৎমায় সতীনের পোলারে দুই চক্ষে দেখতে পারে না। বাপের কাছে ও গেলে ওয়ারে সেই রাক্ষসীডা মাইরা-ধইরা খেদাইয়া দেয়। জাইনা-শুইনা আমি কি এই দুধের পোলাডারে না রাইখা পারি?

মোটামুটি অবস্থাটা আন্দাজ করে নিলে সতীশ। সুতরাং ওটাকে আর টেনে না বাড়িয়ে নিজের কাজে মন দিলে সে।

তার যা সাধ্য তা সবই করলে সতীশ। নিজে সে ভাল করে বৃদ্ধার ভাঙা পা পরীক্ষা করলে, পরিচিত ডাক্তার ডেকে এনে তাকে দিয়ে পরীক্ষা করালে এবং তার পর সেই ডাক্তারেরই সাহায্যে বৃদ্ধাকে হাসপাতালে বিনা খরচের শয্যায় ভর্ত্তি করে দিয়ে মনে করলে যে, দায় মিটে গেল তার।

কিন্তু দায় অত সহজে মিটে না। কর্ম্ম করলেই তার ফলও ভুগতে হয়। ছাড়া পেলে না সতীশ।

হাসপাতালের চিকিৎসায় বৃদ্ধার যন্ত্রণার উপশম হলেও তার ভাঙা হাড় আর জোড়া লাগল না। খোঁড়া পা নিয়ে আবার জগদীশের বাসাতেই ফিরে এল সে এবং মাতৃত্বের দাবিতে যতটা হোক আর না হোক, শ্বশ্রুত্বের দাবিতে জগদীশের ঘরে কায়েম হয়ে বসল সে। তার সঙ্গে সঙ্গে তার ঐ নয়নচাঁদও। ফলে দু'জনেই সতীশেরও প্রতিবেশী হয়ে গেল। সুতরাং নিজের ইচ্ছা থাকলেও ওদের এড়িয়ে চলবার জো থাকল না সতীশের।

জগদীশের সংসারে এতদিন সমৃদ্ধি না থাকলেও শান্তি ছিল। কিন্তু বৃদ্ধা সেখানে অধিষ্ঠিতা হবার কিছুদিন পরেই সতীশ বুঝতে পারলে যে, তা ক্রমেই কুরুক্ষেত্র হয়ে উঠছে।

কলকাতার একখানি মাত্র সঙ্কীর্ণপরিসর ঘরের মধ্যে শাশুড়ী ও বধূর চিরন্তন সঙ্ঘর্ষ যেমন তীব্র তেমনই ভয়ঙ্কর। একান্তে স্বামী-সঙ্গপিয়াসী নারী চিত্তের অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা থেকে থেকেই আগুন হয়ে জ্বলে উঠে বৃদ্ধা শাশুড়ীর অবাঞ্ছিত উপস্থিতির বিরাট প্রতিবন্ধকতাকে পুড়ে ভস্ম করবার জন্য।

আর একা শাশুড়ীই ত কেবল নয়—তার সঙ্গে রয়েছে ঐ নয়ানচাঁদ। সে কোন কাজে লাগে না অথচ খায় ও পরে—এই ত তার বড় দোষ। এ ছাড়াও আরও অনেক কিছু আছে ছেলেটির যা সত্য সত্যই দোষ। সে স্বভাবে দুর্দ্দান্ত, অভ্যাসে নোংরা, প্রবৃত্তিতে লোভী এবং আচরণে বেয়াড়া। এর উপর আবার তার একটু হাতটান আছে। সকলের চেয়ে বড় দোষ তার যে, এত সব দোষ থাকতেও সে সত্য সত্যই বৃদ্ধার নয়নের চাঁদ।

সুতরাং জগদীশের বাসায় প্রায়ই কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের পুনরাভিনয় হয় এবং জগদীশ সব দিন সে যুদ্ধে নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা বজায় রাখতে পারে না।

আর একটি মাত্র পাঁচ ইঞ্চি দেওয়ালের ব্যবধানে বাস করে সতীশও নিজেকে ঐ যুদ্ধের উত্তাপ বা শৈত্য থেকে সম্পূর্ণরূপে বাঁচাতে পারে না। মাঝে মাঝে সালিশীও করতে হয় তাকে।

অধিকাংশ দিনই বৃদ্ধাই সতীশকে পাকড়াও করে দোর-গোড়াতেই। বিনিয়ে বিনিয়ে সে সতীশকে বলে তার দুঃখের

কথা, তার অভিযোগ। তার নালিশ বধূর বিরুদ্ধে, কিন্তু পুত্রকেও সে রেহাই দেয় না!

বলে, পরের মাইয়ার দোষ দিয়া কি করুম, বাবা—আমার নিজের প্যাটের ছাওয়ালই আমার পর অইয়া গেচে। তার আস্কারা না পাইলে কি ঐ ডাইনী মাগী আমারে খেদাইতে পারে।

দময়ন্তী সতীশের সঙ্গে কথা বলে না, কিন্তু দূর থেকে কথা শোনাতে তার দ্বিধা বা সংকোচ নেই। শাশুড়ী সতীশের কাছে নালিশ করছে বুঝতে পারলেই নিজের ঘরে বসেই দময়ন্তী তার যা প্রত্যুত্তর দেয় তা শুনে সতীশকে নিজের কানে আঙুল দিতে হয়।

জগদীশকে এড়াতে পারে না সতীশ। নিজে সে বৃদ্ধার পক্ষে কোনদিন তার কাছে ওকালতি না করে থাকলেও জগদীশের সাফাই শুনতে হয় তাকে।

দু'জনেই সমান অবুঝ, বুঝলেন সতীশবাবু?—বলে জগদীশ: কিন্তু আমি করি কি? কাকে তাড়াব আমি? মাঝে মাঝে আমার মনে হয় যে, দুটিকেই গলা টিপে মেরে থানায় গিয়ে ধরা দিই আমি। আমি একা এবং আগে মরলে যে ওদের দুঃখের অবধি থাকবে না।

খুব সহজ অবস্থাতেই জগদীশ একাধিকবার সতীশকে বলেছে, আমার বাড়ীর অশান্তির মূল কারণ ঐ নয়ানচাঁদ। আচ্ছা সতীশবাবু, ওকে দেওয়া যায় না কোন জায়গায়? কত নাকি অনাথ আশ্রম হয়েছে আজকাল? কোনটির খবর জানা নেই আপনার?

সেই মূল কারণই একদিন দূর হয়ে গেল এবং তা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ও অবাঞ্ছিত পথে।

সেদিন কলেজ থেকে ফিরেই চমকে উঠল সতীশ। বাড়ীতে পুলিসের ভিড় এবং সেটা জগদীশের ঘরের সম্মুখবর্তী বারান্দার ফালিটুকুতে। কৌতূহলের বশে উঁকি মারতেই তার চোখে পড়ল, পিঠমোড়া করে বাঁধা নয়ানচাঁদ মাথা হেট করে দাঁড়িয়ে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করছে, জগদীশের মা এলোখেলো বেশে কখনও মেঝেতে মাথা ঠুকছে আবার কখনও বা হাউমাউ করে কাঁদছে না অভিশাপ দিচ্ছে ঠিক ধরা যায় না।

দারোগার মুখ থেকেই বৃত্তান্ত শুনলে সতীশ। চৌরঙ্গী এলাকায় কার যেন পকেট মারতে গিয়ে হাতে হাতে ধরা পড়েছিল নয়ানচাঁদ। কিন্তু থানার সুবিবেচক ও সহৃদয় বড় দরোগাবাবু আসামীর অল্প বয়স দেখে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন তার অভিভাবকের কাছে। অভিভাবক মুচলেখা দিলে কেসটা আদালতে নেবার ইচ্ছা নেই তাঁর।

অথচ—উপসংহারে ছোট দারোগা বললে, এরা ত দেখছি ছেলেটির দায়িত্ব নিতে তেমন রাজী নন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের মধ্যে গর্জ্জন করে উঠল দময়ন্তী, সাফ কথা বলে দিয়েছি আমি। ও আজ একজনের পকেট কেটেছে, কাল আমার গলা কাটবে। এই ডাকাতকে যদি ঘরে রাখ তুমি ত এই রাত্রেই যেদিকে দু'চোখ যায় সেদিকে চলে যাব আমি।

জগদীশও প্রায় গর্জ্জন করেই উত্তর দিল, কেন চেচাচ্ছ তুমি? বাড়ীতে দু'জন ভদ্রলোক রয়েছেন না? সকলে মিলে এ রকম করলে আমিই গলায় দড়ি দেব।

সে যা হয় পরে করবেন আপনারা, দারোগা অসহিষ্ণুর মত বলে উঠল, আগে আমার কথার স্পষ্ট উত্তর দিন আপনি—ছোড়াটার জন্য জামিন হবেন?

তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল না জগদীশ, অসহায় চোখে সতীশের মুখের দিকে চেয়ে সে বললে, আমি কি করি, বলুন ত সতীশবাবু? এ-রকম ছেলের জামিন হওয়া যায়? অথচ মা—

বক্তব্যটি সম্পূর্ণ করবার অবকাশ পেলে না সতীশ, তার মা আবার হাউমাউ করে কেঁদে উঠল; কাঁদতে কাঁদতেই বৃদ্ধা বললে, আমি তরে জামিন অইতে কইচি নাকি? না কইয়া দে দারগারে। শক্ত রডারে নিয়া যাইক ওরা। ফাটক খাটুক ও—না অয় কইয়া দে ওডারে ফাঁসি দিবার। তাই ত তরা চাস। ও মরুক, তরা সুখে থাক।

তার পর আবার হাউহাউ করে কান্না।

অগত্যা দারোগা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, তা হলে নিয়েই যাই ছোঁড়াটাকে—উনি যখন জামিন হবেন না! কি বলেন আপনি?

সতীশ আর কি বলবে? মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই নয়ানচাঁদকে নিয়ে সদলবলে দারোগা চলে গেল।

এমনি ভাবেই আপদ বিদায় হ'ল। কিন্তু তাতে জগদীশের সংসারে শান্তি ফিরে এল না। বরং অশান্তি তাতে রূপ পরিবর্তন করে আরও দুঃসহ হয়ে উঠল।

সেদিন প্রায় সারাটা রাতই বৃদ্ধা বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদল। কিন্তু পরদিনই কিসে একেবারে বদলে গেল। এতদিন বৃদ্ধা পুত্র ও পুত্রবধূর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম চালিয়ে আসছিল, এবার শুরু হ'ল তার সত্যাগ্রহ। প্রায় সারা দিনই সে কাঁদে, কিন্তু নীরবে। ওদের ঘরে আর সে প্রবেশ করে না; প্রায় সারাটা দিনই সে উঠানে বা সদর দরওয়াজার কাছে যেখানে ছায়া পায় সেখানেই বসে কাটিয়ে দেয়, রাত্রে যেখানে-সেখানে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকে। পুত্রবধূর সঙ্গে কথা একেবারে বন্ধ হ'ল তার—দময়ন্তী ডাকলে সে আর সাড়াও দেয় না। বধূ রেগে গিয়ে চেঁচামেচি বা গালমন্দ শুরু করলেই বৃদ্ধা উঠান ছেড়ে সদর দরজায় এবং কোন কোন দিন আরও দূরে চলে যায়। জগদীশকে তখন বের হতে হয় বৃদ্ধাকে খুঁজতে; হাতে পায়ে ধরে সেধে ফিরিয়ে আনতে হয় তাকে, সাধ্য সাধনা করে খাওয়াতে হয়। এতে স্বভাবতঃই বধূর ক্রোধ বাড়তে থাকে, বৃদ্ধার অভিমান। অনিবার্য্য রূপে ঐরূপ কলহ ধীরে ধীরে স্বামী-স্ত্রীর কলহে পরিণত হয়।

দময়ন্তী হয়ত বলে, এরকম ন্যাকড়া কত আর সহ্য করা যায়? জগদীশ বলে, সহ্য না করে কি করব, মাকে খুন করতে বল তুমি?

দময়ন্তী আরও রেগে গিয়ে উত্তর দেয়, তা কেন বলব? তোমায় বলছি আমাকে খুন করতে। তুমি যদি তা না কর ত নিজেই গলায় দড়ি দেব আমি।

নিরবচ্ছিন্ন অশান্তি ওদের সংসারে। তার বিষে সারাটা বাড়ীর বাতাসই যেন বিষাক্ত হয়ে ওঠে। অন্যান্য ভাড়াটিয়াদের সঙ্গে সতীশও বিরক্ত হয়।

তাই সতীশের দিন যখন ফিরে গেল, পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে সে যখন একই সঙ্গে ভাল মাইনের চাকরি ও গৃহলক্ষ্মী লাভ করল এবং বাগবাজারের দিকে একটি ফ্ল্যাট বাড়ী ভাড়া নিয়ে নিজস্ব সংসার পেতে বসল তখন তার অন্তরের পাত্র যাতে কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল তা কেবল প্রাপ্তির আনন্দই নয়, মুক্তির স্বস্তিও। বস্তি জগতের স্বাভাবিক পূতিগন্ধময় আবহাওয়া থেকে মুক্তি পাওয়াই একটা বড় লাভ। বাগবাজারের ফ্ল্যাট বাড়ীতে প্রথম দিন আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে বসে মনে মনে এও অনুভব করলে সতীশ যে, জগদীশের সংসারে অশান্তি আর তাকে স্পর্শ করতে পারবে না—ঐ কদাকার, যুক্তিবোধহীনা, কলহপরায়ণা বৃদ্ধা থেকে থেকেই তার কাছে নালিশ জানাতে এসে আর তার শান্তি ভঙ্গ করবে না।

কিন্তু সেদিন বিধাতা বোধ করি অলক্ষ্যে মুখ টিপে হেসেছিলেন। মাস ছয়েক যেতে না যেতেই সেই বৃদ্ধাই একদিন সতীশের বাগবাজারের বাসাতে এসেই তাকে পাকড়াও করলে।

সতীশের কাছে যে ইতিপূর্ব্বে অনেক উপকার পেয়েছে বৃদ্ধা—সে ছাড়া এই ত্রিভুবনে আর কোন বান্ধব আছে তার!

যে কাহিনী সতীশ শুনলে তা যেমন করুণ তেমনি শঙ্কাজনক।

দময়ন্তী গলায় দড়ি দেয় নি, বৃদ্ধাও পুত্রের হাতে খুন হয় নি। মারা গিয়েছে জগদীশ নিজে এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কারণে। ভাল মানুষ অন্যান্য দিনের মত খেয়ে দেয়ে আপিসে গিয়েছিল, ফিরেও এসেছিল খুশ মেজাজ এবং বহাল তবিয়ৎ নিয়ে। কিন্তু সন্ধ্যার পরেই ভেদবমি শুরু হ'ল তার এবং তার পর ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল।

পরবর্ত্তী ইতিহাসের কাল তুলনায় দীর্ঘতর, কিন্তু কাহিনী সেই অনুপাতে যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি নির্ম্মম। দময়ন্তী শ্রাদ্ধ-শান্তির পূর্ব্বেই স্বামীর নগদ টাকা এবং সংসারের যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে তার পিত্রালয়ে ভাই-এর আশ্রয়ে ফিরে গিয়েছে।

একটা পয়সাও আমারে দিয়া যায় নাই, বাবা, ভাত খাইবার লিগা কাঁসার একখান থালও না—উপসংহারে এই বলে বৃদ্ধা ডুকরে কেঁদে উঠল।

ভারি অন্যায় ত! সতীশ সমবেদনায় কোমল স্বরে বললে।

অথচ ঐ সহানুভূতির কথাটাই কাজ করলে আগুনে ঘৃতাহুতির মত। আরও জোরে কেঁদে উঠে, উন্মত্তের মত নিজের বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বৃদ্ধা বললে, আমার নিজের ট্যাকাও আমারে দিয়া যায় নাই, বাবা। কড়কড়া পাঁচ শ' নগদ ট্যাকা জমা আমার থেইকা চাইয়া নিছিল যেদিন আমারে কইলকাতায় লইয়া আসে। যখনই চাইছি তখনই বাবা হাইস্যা আমারে কইছে, 'মা, তোমার ট্যাকার এক পয়সাও খরচ করি নাই আমি, আমি মইরা গেলেও তোমার ট্যাকা মারা যাইব না।' হেই ট্যাকারও একটা পয়সাও মাগী আমারে দিয়া যায় নাই—সব লইয়া বাপের বাড়ীতে পাড়ি দিল।

যত বলে বৃদ্ধা তার ক্রন্দনের বেগও যেন ততই বাড়তে থাকে। পুত্রবিয়োগের কথা আর নয়, কেবলই ঐ টাকার কথা—যেন টাকার শোকের নীচে বৃদ্ধার পুত্রশোক অতলে তলিয়ে গিয়েছে।

ক্ষণকাল পূর্ব্বেই সত্যই সমবেদনায় কোমল হয়ে উঠেছিল সতীশের মন, অকস্মাৎ তা বিতৃষ্ণায় সঙ্কুচিত হয়ে গেল।

কি কুৎসিৎ বৃদ্ধার মুখ—স্বার্থান্ধ, অর্থগৃধ্নু চিত্তের সমস্ত ক্লেদ মেখে বীভৎস হয়ে উঠেছে তা।

বন্যার ঢেউ-এর মতই যেন বৃদ্ধার ক্রন্দন সতীশের গায়ে মুখে এসে আছড়ে পড়ছিল, অথচ একেবারেই ভিন্ন জাতের এ ক্রন্দন। শোকের আর্ত্তনাদ এ নয়, এ যেন উত্তমর্ণের দাবি। বধূ যেন উপলক্ষ্য মাত্র—যেন তার মৃত পুত্রের কাছেই বৃদ্ধা তার প্রাপ্য অর্থের পরিশোধ দাবি করছে।

সেই পুত্রকেও সতীশের মনে পড়ে গেল—দরিদ্র কিন্তু হীন নয়; শান্ত, সৎ, নির্ব্বিরোধী, কর্ত্তব্যপরায়ণ সংসারী জীব; অসাধারণ রকমের মাতৃবৎসল; শিবের মত মন্থিত সংসারসমুদ্রের হলাহল নিজে পান করে মৃত্যু পর্য্যন্ত পরিবারকে সযত্নে রক্ষা করেছে সে।

হঠাৎ সতীশের মাথার মধ্যে কি যেন ঘটে গেল; সে বলে ফেলল, বৌদি আপনার টাকা নিয়ে যাবেন কেন? জগদীশবাবু ত সেই পাঁচ শো টাকা আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন। সে টাকা আমার কাছেই আছে,—আপনাকে এখনই দিচ্ছি আমি।

বিস্ময়ে কাঠ হয়ে গেল সতীশের স্ত্রী কল্যাণী। তার চোখের সামনেই বাক্স খুলে পাঁচ শত টাকার নোট তখনই বৃদ্ধার হাতের মধ্যে গুঁজে দিল সতীশ।

কাজ হ'ল একেবারে মন্ত্রের মত—কান্না থেমে গেল বৃদ্ধার।

সংকর্ম্মের স্বর্ণ শৃঙ্খলে আর একটি গ্রন্থি পড়ল।

নোটগুলি কোলের উপর ফেলে বৃদ্ধা হঠাৎ সতীশের একখানা হাত চেপে ধরে বললে, বাবা সতীশ, তুমিই আমার ছাওয়াল।

পরম আদরের সম্বোধন, কিন্তু গা শির শির করে উঠল সতীশের। তার মনে হ'ল যেন ক্লেদাক্ত কোন একটা সরীসৃপ অকস্মাৎ কঠিন বন্ধনে বেঁধে ফেলেছে তাকে।

নিজেকে সবলে মুক্ত করে নিয়ে সতীশ রুক্ষকণ্ঠে বললে, টাকা ত পেলেন—এখন যান।

কিন্তু উত্তরে বৃদ্ধা বললে, কোথায় যামু, বাবা?

কেন? নিজের বাসায়। যেখানে এত দিন ছিলেন।

তা কি আর আছে, বাবা? বাড়ীআলা যে আমার বিছানা টাইন্যা বাইরে ফ্যালাইয়া দিয়া ঘরে তালা লাগাইয়া দিছে।—বলতে বলতে বৃদ্ধা আবার ডুকরে কেঁদে উঠল।

প্রমাদ গুনলে সতীশ, শুষ্ককণ্ঠে সে বললে, তা হলে উপায় ?

ঘোলাটে চোখের অশ্রুসজল কাতর দৃষ্টি সতীশের মুখের উপর বিন্যস্ত করে বৃদ্ধা উত্তর দিল, উপায় বাবা তুমি। তুমিই আশ্রয় দিবা আমারে। না দিলে যামু কোথায় ?

হঠাৎ কল্যাণী এগিয়ে এল ; সতীশের হাত ধরে বললে— একটা কথা শোন ত !—

শোবার ঘরে সতীশকে টেনে নিয়ে গিয়ে কল্যাণী মৃদু কিন্তু কঠিন কণ্ঠে বললে, উনি কে, ওঁর সঙ্গে কি তোমার সম্পর্ক তা আমার জানা নেই। ওঁকে কেন যে অতগুলি টাকা তুমি দিলে তাও আমি জিগ্যেস করতে চাই নে। কিন্তু তোমার কাছে আমার অনুরোধ—ঝামেলা আর বাড়িও না তুমি। বাড়ালে তোমার যদি সয়ও ত আমার সইবে না।

তৎক্ষণাৎ মন স্থির করে ফেললে সতীশ, ফিরে গিয়ে সঙ্কল্পের কঠিন কণ্ঠে বৃদ্ধাকে সে বললে, আপনি দেশে যান জেঠিমা, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

কিন্তু প্রস্তাবটি বৃদ্ধা লুফে নিলে না ; ফ্যাল ফ্যাল করে সতীশের মুখে র দিকে চেয়ে সে বললে, দ্যাশে কার কাছে যামু বাবা ?

সতীশ উত্তরে বললে, নিজের দেশে নিজের বাড়ীতে যাবেন আপনি—সেখানে আপনার দেখাশোনা করবার লোকের অভাব হবে না।

তা অইলেও খামু কি হেইখানে ?

আমিই খরচ দেব, সতীশ মরিয়ার মত উত্তর দিল : ডাল-ভাতের অভাব হবে না আপনার।

কালো হয়ে গেল বৃদ্ধার মুখ, কতকটা যেন আপন মনেই বিড় বিড় করে সে বললে, আমার নয়ানচাদেরে যদি পাইতাম—

কানও দিলে না সতীশ, নির্মমকণ্ঠে সে বললে, চলুন, সেই বেলেঘাটার বাড়ীতেই আজ রাতের মত আপনার থাকার ব্যবস্থা করে দি। কালকের গাড়ীতেই আপনাকে দেশে পাঠিয়ে দেব।

প্রধানতঃ আত্মরক্ষার প্রবৃত্তির তাড়নায় এবং সাময়িক একটা আবেগ ও উত্তেজনার বশে সেদিন সতীশ বৃদ্ধাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার পর ক্রমান্বয়ে প্রায় তিন বৎসর কাল তা সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে আসছে। এ যেন সত্যাশ্রয়ী অধমর্ণের পক্ষে উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধ করা। একটি মাসও বৃদ্ধা তাকে রেহাই দেয় নি। মাসে মাসে তাকে পত্রাঘাত করে মাসোহারার টাকা ত নিয়মিত ভাবে আদায় করে নিয়েইছে, তার উপরেও অনিয়মিত ব্যবধানে কখনও রোগের চিকিৎসা, কখনও শীতের আচ্ছাদন, এমনকি পর্বাদি উপলক্ষে লৌকিকতার অসাধারণ খরচের টাকাও আদায় করে নিয়েছে। সতীশ বিপন্ন বোধ করেছে, বিরক্ত হয়েছে, স্ত্রীর কাছে তিরস্কৃত হয়েছে, কিন্তু কোন বারই বৃদ্ধাকে একেবারে বিমুখ করে নি সে।

কিন্তু এবার ?

৩

সারা পাকিস্থান নওজোয়ান সমিতির আমন্ত্রণে তাদের একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করবার জন্ত ময়মনসিংহের টিকেট কাটতেই সতীশের মনে পড়ে গিয়েছিল যে, জগদীশের বৃদ্ধা মা ঐ জিলারই অন্তর্গত একটি গ্রামে বাস করে। গাড়ীতে বসে সতীশ ভাবছিল যে অদূর ভবিষ্যতে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে মণি-অর্ডারযোগে টাকা লেনদেনের ব্যবস্থা বন্ধ হলে বৃদ্ধাকে মাসোহারার টাকা সে পাঠাবে কেমন করে। আর টাকা যদি পাঠানো সম্ভব না হয় তবে বৃদ্ধার কি করে চলবে ? কেমন আছে সে আজকাল ? একবার গেলে হয় না তাদের গ্রামে—ওর অত কাছেই যখন যাওয়া হচ্ছে ? এ সব প্রশ্নও বার বার মনে জাগছিল তার।

পরদিন উৎসবমুখর ময়মনসিংহ শহরে নানারকম অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকেও।

রাত্রে একটি ঘরোয়া বৈঠক শেষ হবার পর সতীশ জিজ্ঞাসা করলে, তোমাদের মধ্যে কেউ মামুদনগর চেন ?

সহাস্য মুখে একটি ছেলে উত্তর দিল, সেই গাঁয়েই ত আমার বাড়ী।—ছেলেটির নাম, সতীশ শুনলে, কানাই।

কিছুক্ষণ ইতস্তত: করবার পর সতীশ বলেই ফেললে, তোমাদের গাঁয়ে যদি আমি যেতে চাই, নিয়ে যাবে আমায় ?

প্রায় লাফিয়ে উঠল কানাই, সত্যি যাবেন স্যার আপনি ? গেলে আপনাকে মাথায় করে নিয়ে যাব আমি।

তার পর সে জিজ্ঞাসা করলে, কেন স্যার ? আমাদের গাঁয়ের কাউকে চেনেন আপনি ?

সতীশ জগদীশের নাম করলে। কানাই ঘাড় নেড়ে জানাল যে, তাকে সে দেখেছে।

আমি তার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

যক্ষিবুড়ী !—বলেই হেসে একেবারে লুটিয়ে পড়ল কানাই।

সতীশ সবিস্ময়ে বললে, ও কি ! কি বললে তুমি ?

কানাই হাসতে হাসতেই উত্তর দিল, সবাই তাকে যক্ষিবুড়ী বলেই ডাকে—বড্ড কৃপণ কি না !

কিন্তু পরক্ষণেই বোধ করি সতীশের গম্ভীর মুখ চোখে পড়ে গেল তার। বুদ্ধিমান ছেলেটি তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে নিয়ে অনুতপ্তের মত বললে, আমি তাকে ঠাকুমা বলে ডাকি স্যার। তবে ইদানীং অনেকদিন তার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি—শুনেছি যে তার খুব অসুখ—

সতীশ বললে, তা হলে তোমাদের গাঁয়ে আমার যাওয়াই দরকার। নিয়ে যাবে ঠিক ত ?

কানাই ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল, তার পর হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করলে, ঠাকুমাকে শুনেছি কলকাতা থেকে কে একজন সদাশয় ভদ্রলোক মাসোহারা পাঠান। আপনিই কি স্যার তিনি ?

প্রশ্ন শুনে বিব্রত বোধ করলে সতীশ, সেই ভাবটা গোপন করবার জন্তই যেন সশব্দে হেসে উঠে সে বললে, না ভাই—আমি সদাশয় নই, বড়লোকও নই, কাউকে মাসোহারা পাঠাবার সাধ্যই নেই আমার। তবে কলকাতায় জগদীশবাবুকে আমি চিনতাম, তার বাসাতেই তার মায়ের সঙ্গেও আমার পরিচয় হয়েছিল। তাই

ভাবছিলাম যে, জেলার সদর পর্য্যন্ত আসা যখন হ'লই তখন আরও একটু এগিয়ে গিয়ে দেখাই করে যাই জেঠিমার সঙ্গে।

নদীর ঘাট থেকেই সোজা জগদীশের বাড়ীতে গেল সতীশ, তার সঙ্গে কানাই।

সেকেলে ধরনের বড় বাড়ী জগদীশের, আটচালা টিনের ঘর। কিন্তু সংস্কার অভাবে জীর্ণ, যত্নের অভাবে বসবাসেরই যেন অযোগ্য হয়ে পড়েছে। ঘরের দাওয়া পর্য্যন্ত যাবার জন্য যে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে পার হতে হয় তা মনে হয় যেন বন। দুটি বড় বড় গাছের ছায়ায় দিনের বেলাতেও সে প্রাঙ্গণ অন্ধকার, জল কোমর, মাঝে মাঝে বুক পর্য্যন্ত উঁচু নানা জাতীয় আগাছা; তার ভিতর দিয়ে পায়ে চলার সরু পথ। প্রাঙ্গণে ঢুকতেই সতীশের গা যেন ছমছম করতে লাগল।

সাপ নেই তো কানাই?—বলেই ফেললে সে।

ঘাড় নেড়ে হাসিমুখে উত্তর দিল কানাই, না স্যার। আর থাকলেও দিনের বেলায় কোন ভয় নেই।

কিন্তু যাকে দেখবার জন্য এতদূর পর্য্যন্ত আসা সেই জগদীশের মাকে দেখে সত্যি ভয় পেল সতীশ।

রূপ বৃদ্ধার কোন দিনই ছিল না—অন্ততঃ যত দিন থেকে সতীশ তাকে চেনে। কিন্তু এখন তাকে দেখে সতীশের মনে হ'ল যে, সে যেন রক্তমাংসে গড়া জীবন্ত কোন মানুষই নয়, বিবর্ণ চামড়া দিয়ে মোড়া কদাকার একটি নরকঙ্কাল মাত্র। কাঠির মত সরু হাত-পা, উদ্ধত খাঁড়ার মত কণ্ঠ, চোয়াল ও গণ্ডের হাড়গুলি। চোখ বা মুখ আছে কি নেই তা বুঝাই যায় না, যেমন চেনা যায় না তার মাথায় যা আছে তাকে কেশ বলে অনাবৃত পা-দুটি ছড়িয়ে, দেওয়ালে হেলান দিয়ে, ঘাড়টা বেঁকিয়ে হাঁপানী রোগীর মত অনেক কষ্টে বৃদ্ধা শ্বাস নিচ্ছিল বলেই তার দেহটিকে মৃতদেহ বলে ভ্রম হ'ল না সতীশের।

কানাই তার নিজের কর্ত্তব্য যথোচিত পালন করলে। বৃদ্ধার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে নিজের পরিচয় দিল সে, বললে সতীশবাবুর আগমনের কথা।

ঘোলা চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে বৃদ্ধা বললে, ক্যাডা আইচে?

সতীশ নিজেই এগিয়ে গেল বৃদ্ধার কাছাকাছি; বললে, আমি কলকাতার সতীশ, জেঠিমা, আপনাকে দেখতে এসেছি।

চিনতে বেশ একটু সময় লাগল বৃদ্ধার; কিন্তু চিনেই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে বলে উঠল, তাই তো—আমার বাবাই তো! এতদিন পর এই আবাগীরে মনে পড়চে তোমার?

মুহূর্ত্তের বিদ্যুদ্দীপ্তি। উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বৃদ্ধার কুৎসিত মুখখানি; বড় বড় দুই ফোটা অশ্রু দেখতে দেখতে তার চোখের কোণে ফুটে উঠল।

কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই গভীর অন্ধকার। সতীশের কাছ থেকে বেশ একটু দূরে সরে বসে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত কণ্ঠে সে আবার বললে, শত্তুরেরা লাগাইচে বুজি আমার নামে? তাই দেখতে আইচ তুমি? কিন্তু বাবা সতীশ, এই দিনদুপুরে ঘরের চালের নীচে বইসা তোমারে আমি ধর্ম্মতঃ কই—একটা পয়সাও অপব্যয় করি নাই আমি। ওরা মিথ্যা কইয়া লাগাইচে তোমার কাছে—হিংসায় ফাইট্যা মরে কিনা শত্তুরেরা, তাই—

তার পরেই হাউ-হাউ করে কান্না—যেমন সে কাঁদত কলকাতায়।

সম্পূর্ণ অপরিচিত, সুপুরুষ, সুসজ্জিত সতীশকে এ-বাড়ীতে ঢুকতে দেখেছিল প্রতিবেশী কেউ কেউ; তার উপর আবার বৃদ্ধার ক্রন্দনধ্বনির অতিরিক্ত নিমন্ত্রণ। প্রাঙ্গণে ছোট একটু ভীড় জমে উঠল ক'জন আগন্তুকের।

এরকম একটা পরিণতি একেবারে অপ্রত্যাশিত; অত্যন্ত বিব্রত ও অপ্রতিভ হয়ে সতীশ বললে, সে কি জেঠিমা! কেউ ত কিছু বলে নি আমাকে? এ কি বলছেন আপনি?

না কইলে আইল্যা ক্যান তুমি? বললে বৃদ্ধা: আমি কি কিছু বুঝি না? ওরা আমার নামে না লাগাইলে—

কথার ফাঁকে ফাঁকে আবার সেই ডুকরে ডুকরে কান্না।

মাঝবয়সী একজন পুরুষ ধমক দিল বৃদ্ধাকে, একি হচ্ছে খুড়ী? কলকাতা থেকে ভদ্রলোক এলেন তোমাকে দেখতে, আর তুমি কি না এই মরাকান্না সুরু করলে! ছিঃ ছিঃ—

একজন মাঝবয়সী স্ত্রীলোক গালে হাত দিয়ে বলে উঠল, এমুন ব্যাভার বাজ্যে ছাখা যায় না। এই স্বভাবের জন্যই ত, দিদি, কেউ তোমারে দ্যাখতে পারে না।

পুরুষটি সতীশের কাছে এগিয়ে এল; উৎফুল্লকণ্ঠে বললে, আমার নাম হরেকৃষ্ণ কুণ্ডু। এইমাত্র আপনার নাম শুনলাম কানাইয়ের মুখে। সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকলেও আপনাকে আমরা চিনি। আপনিই ত মাসে মাসে টাকা পাঠান খুড়ীকে? আমি জানি—মনি-অর্ডারের ফর্ম্ম সই করে আমিই টাকা নিই কিনা!—

ফিরে বৃদ্ধাকে আবার ধমক দিল সে, বাড়ীতে এমন অতিথ তোমার—আর তুমি কি না—

ওমা—কোতায় যামু আমি!—সেই স্ত্রীলোকটি বললে: এমুন অতিথেরে বইবার একখান পীড়িও দেও নাই দিদি!

শুনে ক্রন্দন থামল বৃদ্ধার। তারপর সুরু হল সতীশের অভ্যর্থনার আয়োজন। উদ্যোক্তা ঐ বাইরের লোকেরাই। পীড়ি এল, তারপর পা-ধোবার জল। এসব ক্ষিপ্রহস্তে শেষ করে সেই স্ত্রীলোকটিই বৃদ্ধাকে বললে, তুমি দিদি বইস্যাই রইল্যা যে? অতিথেরে খাওয়াইবা কি?

এই প্রথম বৃদ্ধা যেন অপ্রতিভ হ'ল; মুখ কাঁচুমাচু করে সে বললে, তা তইলে মাতু, তোমারেই ত হগগল করন লাগে। আমি যে আইজ উঠবারও বল পাই না!—

মাতু, মানে মাতঙ্গিনী কি যেন উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কানাই

সকলের সকল সমস্যাই এক কথায় সমাধান করে দিল—সতীশবাবু বৃদ্ধাকে দেখবার জন্য এ গাঁয়ে এসে থাকলেও তিনি তাদের বাড়ীর অতিথি ; সুতরাং তাঁর আহারের কোন ব্যবস্থাই এ-বাড়ীতে করবার প্রয়োজন নাই।

বৃদ্ধা স্তব্ধ হয়ে থাকল কিছুক্ষণ ; তারপর ফোকলা মুখে হঠাৎ অদ্ভুত একরকমের হাসি ফুটিয়ে তুলে বললে, নিজের হাতে রাইন্ধ্যা সতীশেরে কাছে বসাইয়া খাওয়ামু, হে ভাগ্য কি আমার আছে ? তা অইলেও বস বাবা। ভগবান যখন তোমারে আইন্যা দিচে, একটা কথা কমু তোমারে।

উত্তরে সতীশ বললে, কথা ওবেলায় হবে, জেঠিমা।

তবে এখন আইস গিয়া—খাওয়া-দাওয়া করগা।

তা ত আমি করবই, কিন্তু আপনার খাওয়া-দাওয়ার কি হবে জেঠিমা ? এখানে ত রান্নাবাড়ার কোন আয়োজনই দেখছি নে।

একটু দেরীতে উত্তর দিল বৃদ্ধা, আমি আইজ আর ভাত খামু না বাবা। রাইত্রে জ্বর আইছিল—এখনতরি ছাড়ে নাই মোনে লয়।

চমকে উঠল সতীশ ; উদ্বিগ্নকণ্ঠে সে বললে, সে কি জেঠিমা ? আপনার শরীরও ত দেখছি খুব কাহিল হয়ে গিয়েছে। ডাক্তার কবিরাজ দিয়ে চিকিৎসা করান না আপনি ?

প্রশ্ন শুনে আবার সেই রকমের হাসি ফুটে উঠল বৃদ্ধার মুখে ; উত্তরে সে অপেক্ষাকৃত মৃদু কণ্ঠে বললে, আমাগো ব্যারামে আবার ডাক্তর-কবিরাজ লাগে নাকি ?

সতীশের বিহ্বল চোখ দুটি নিতান্ত আকস্মিকভাবেই সেই মাতঙ্গিনীর চোখ দুটির সঙ্গে গিয়ে মিলল। সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রীলোকটি চোখ ফিরিয়ে নিল ; কিন্তু পরক্ষণেই ফিরে সতীশের মুখের দিকে চেয়ে সে তিক্তকণ্ঠে বললে, কি যে আপনারে কমু বাবু—ঐ ওনার স্বভাব। পয়সা খরচ অইব ভয়ে কবিরাজের কাচে যায় না, ভাতও খায় না প্যাট ভইর‍্যা। সাধে কি আর লোকে দিদিরে যক্ষিবুড়ী কয় !

হঠাৎ সতীশের মনটাও তিক্ত হয়ে গেল যেন। কিন্তু কানাই তখন তাকে উঠবার জন্য তাড়া দিতে সুরু করছে।

অপরাহ্নেই বৃদ্ধার কাছে আবার যাবার ইচ্ছা ছিল সতীশের, কিন্তু কার্য্যতঃ তা হয়ে উঠল না।

কানাই গাঁয়ের ছেলে হলেও সহর-ঘেঁষা তরুণ। পাকিস্থানের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংস্কৃতির নামে রাজনীতি করে সে ; নিজের ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের ভিত্তি এখনই সে সুপ্রতিষ্ঠ করতে চায়। এ খেলার রীতিনীতি, আদব-কায়দা দেখেশুনে এই বয়সেই সে রপ্ত করে নিয়েছে। নিজ গ্রামের লোকের কাছে নিজেকে জাহির করবার এমন একটা সুযোগ হেলায় হারাবার ছেলে সে নয়। সুতরাং সহকর্মী ও অনুচরদের সাহায্যে সে বৈকালে সতীশের জন্য একটি সম্বর্দ্ধনা-সভার আয়োজন করে ফেললে। সে-সভায় সতীশ অনেকের অনেক রকম বক্তৃতা শুনবার পর নিজের অভিভাষণ যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করেও রাত্রি আটটার আগে সে ছুটি পেলে না। কানাইকে সঙ্গে নিয়ে বৃদ্ধার বাড়ীতে উপস্থিত হতে রাত হ'ল প্রায় ন'টা।

গিয়ে সে যা দেখলে তাতে তার চক্ষুস্থির।

সম্বর্দ্ধনা ঝিঁ-ঝিঁ পোকার ডাকে। ঝোপজঙ্গল সমাকীর্ণ বিস্তৃত প্রাঙ্গণে বিশালকায় জামগাছটির নীচে পুঞ্জীভূত গাঢ় অন্ধকার। ঘরের মধ্যে মিট মিট করে কেরোসিনের যে কুপী জ্বলছিল তার ক্ষীণ, বিবর্ণ আলোক-শিখার উদ্ধত প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বানের প্রত্যুত্তরেই যেন আরও কালো, আরও ঘন হয়ে উঠেছে প্রাঙ্গণের সেই অন্ধকার। ঘরের ভিতরটা আরও ভয়ঙ্কর। টিনের ঘর, মাটির দেওয়াল। বাতায়ন থাকলেও তার একটিও বোধ করি খোলা নেই। দীর্ঘকালের বন্দী বাতাস ঘরের মধ্যে মরে পচছে। তারই স্কন্ধে ভর করেছে অমার্জ্জিত গৃহের স্তূপীকৃত অসংস্কৃত আসবাব, অপরিষ্কৃত তৈজস পত্র, অপরিচ্ছন্ন কাঁথা-কাপড় ও রুগ্ন মানব দেহের সম্মিলিত দুর্গন্ধ। কেরোসিনের কালো ধোঁয়ার পাতলা জালের মধ্যে মুমূর্ষু আলোক-শিখার অস্থির আক্ষেপের বেতাল নৃত্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বস্তুর বিকৃত প্রতিবিম্বগুলি বিবর্ণ দেওয়ালের এখানে সেখানে ভৌতিক নৃত্য প্রদর্শন করছে যেন। একটি বহু প্রাচীন কাঠের সিন্দুকের উপর জীর্ণ, মলিন কাঁথাকাপড়ের স্তূপের মধ্যে আচ্ছন্নের মত শুয়ে আছে বৃদ্ধা জগদীশের মা।

কিন্তু ঘরে সে একা নয়। মেঝেতে মাদুর পেতে শুয়ে ছিল মাতঙ্গিনী। সে-ই প্রাঙ্গণে ওদের সাড়া পেয়ে অভ্যর্থনা করে ওদের দু'জনকে ঘরে নিয়ে এল।

মাতঙ্গিনীই বুঝিয়ে বললে ওদের। দুপুরের পর থেকেই বৃদ্ধার জ্বর বাড়তে বাড়তে এখন এ-ই ওর অবস্থা। ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গিয়েছে। বৃদ্ধা ঘুমিয়ে পড়েছে একটু আগে।

শান্তই দেখাচ্ছিল বৃদ্ধাকে, কিন্তু তাকে ভাল করে করে দেখে সতীশ নিজে অশান্ত হয়ে উঠল। কানাইকে সে জিজ্ঞাসা করলে, গাঁয়ে ডাক্তার নেই, কানাই ? কাউকে ডেকে আনতে পার ?

সতীশের মুখের ভাব লক্ষ্য করেই কানাই রাজী হয়ে গেল এবং তৎক্ষণাৎ রওনা হয়ে গেল সে।

জ্ঞান নেই বৃদ্ধার—বার বার ডেকেও সাড়া পেলে না সতীশ। কিন্তু তার মনে হ'ল যে তীব্র অনুভূতি রয়েছে বৃদ্ধার—সে অনুভূতি যন্ত্রণার।

মুহূর্ত্তের জন্য নিজের উপর বিরক্ত হ'ল সতীশ—কেন এই গাঁয়ে এল সে ? নিজের অদৃষ্টকে সে মনে মনে ধিক্কার দিল। ছুটে পালিয়ে যাবার একটা দুর্দ্দান্ত প্রবৃত্তিও পলকের জন্য তার মনের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে জেগে উঠল যেন। কিন্তু পরের মুহূর্ত্তেই নিজেকে সংযত করে সে বৃদ্ধার শিয়রের কাছে স্থির হয়ে বসল।

সাধারণতঃ ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে মাথা ঘামায় না সতীশ।

Cooch Behar
মীনাকুমারী তাঁর ত্বকের যত্ন নেন
লাক্স টয়লেট সাবানের সাহায্যে "এটি এত
সম্পূর্ণ রকম শুভ্র এবং বিশুদ্ধ!" তিনি বলেন
বিয়োগান্ত করুণ ছবির বিখ্যাত অভিনেত্রী
মীনাকুমারী আজ ভারতে সর্বাধিক জন-
প্রিয় চিত্র তারকাদের অন্যতম।
তিনি কিন্তু শুধু কুশলী অভিনেত্রীই নন,
তাঁর চেহারাও অত্যন্ত সুন্দর—শুটিংয়ের
সময় গরম আকল্যাম্পের তাতেও তাঁর
ত্বক থাকে মসৃন ও লাবণ্যময়! অবশ্য
লাবণ্যের যত্ন নেওয়ার একটি গোপন
উপায় তাঁর জানা আছে। "আমি
সর্বদা বিশুদ্ধ, শুভ্র লাক্স টয়লেট
সাবান ব্যবহার করি। এটি একটি
অপূর্ব মোলায়েম, সুগন্ধী সাবান।"
নিজে পরীক্ষা করে দেখুন। আপনি
দেখে অবাক হয়ে যাবেন যে আপনার
ত্বক কত সতেজ, কত সুন্দর হয়ে
উঠছে।
কমাল
আমরোহীর 'পাকীজা'
চিত্রের তারকা
লাক্স টয়লেট সাবান
চিত্র-তারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান
LUX
TOILET SOAP
LTS. 544-X52 BG

কিন্তু সেই মুহূর্তে মনে মনে ঈশ্বরের কাছে সে প্রার্থনা করলে—এ যদি তার পরীক্ষা হয় ত সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার শক্তি ঈশ্বর তাকে যেন দেন।

মাতঙ্গিনীকে উদ্দেশ করে সে মুখে বললে, বাটিতে খানিকটা জল দিন ত। আর একটি চামচ বা ঝিনুক।

ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে কানাই ফিরে এল আধ ঘণ্টাখানেক পর। ডাক্তারবাবুর বিদ্যা খুব বেশী ছিল না, কিন্তু অভিজ্ঞতা ছিল প্রচুর নিজের কর্তব্যটুকু নীরবে সম্পন্ন করে যাবার সময় গম্ভীর স্বরে সতীশকে বলে গেলেন তিনি, ভগবানের ইচ্ছায় সবই হতে পারে। তবে আমার মনে হয় যে শেষরাত্রে এর জীবনের সঙ্কট উপস্থিত হবে।

ডাক্তারকে বিদায় দিয়ে সতীশ আবার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল, কানাই বললে, আপনি বাড়ী চলুন স্যার, আমি ঠাকুমার আত্মীয়দের ডেকে আনছি।

সতীশ গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল, পারলে ডেকে আন তুমি। আমি রাতটা এখানেই কাটাব।

রাত কেটে গেল। বৃদ্ধা তেমনই অজ্ঞান, তেমনই অস্থির।

ভোরে আরও লোকজন এল। সবাই যে বৃদ্ধার আত্মীয়, এমন কি স্বজাতি, তাও নয়। স্ত্রী পুরুষ, প্রবীণ নবীনে ঘর ভরে গেল। গ্রামের প্রধানরাও এল দু'তিন জন। গ্রামবাসিনী নিঃসন্তান বৃদ্ধার সম্বন্ধে তাদের একটা দায়িত্ববোধ আছে। অতিরিক্ত প্রেরণা বৃদ্ধার মৃত্যুশয্যার পার্শে বিদেশী ভদ্রলোক সতীশের উপস্থিতি।

প্রবীণ রামরতন বসু সতীশকে বললে, মহাশয় ব্যক্তি আপনি—জগদীশের মায়ের মুখে আপনার গুণগান অনেক শুনেছি। তা উনি ত ভগবানের ইচ্ছায় এখনও আছেন। আমরা যখন এসে পড়েছি তখন এবার আপনি বাড়ী গিয়ে একটু বিশ্রাম করুন গে—সারাটা রাত ত শুনেছি একেবারে জেগে কেটেছে আপনার।

সতীশ নিজেও বিশ্রামের প্রয়োজন বোধ করছিল এবং ওর চেয়েও বেশী একটু নিরিবিলির। কিন্তু সেই সময়েই বৃদ্ধা চোখ মেলে তাকাল, ক্ষীণকণ্ঠে বললে, জল খাব।

শুনে সকলেই ছুটে গেল বৃদ্ধার মাথার কাছে—সতীশও। তার মুখে জল দিল মাতঙ্গিনী।

অস্থির বৃদ্ধার চোখের দৃষ্টি। পলকের জন্য মাতঙ্গিনীর মুখের উপর বিক্ষস্ত থেকেই আবার সরে গেল তা। সে দৃষ্টি কি যেন খুঁজছে।

খুঁজে খুঁজে সে চোখ সতীশের মুখের উপর গিয়ে পড়তেই অকস্মাৎ বৃদ্ধার মুখের উপর থেকে মৃত্যুর ঘনায়মান কালিমা অপসৃত হয়ে গেল যেন। ঘরের মধ্যে সব কয়জন লোককে রীতিমত ভড়কে দিয়ে বৃদ্ধা খপ করে সতীশের একখানি হাত চেপে ধরে ক্ষীণ কিন্তু উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল, বাবা সতীশ!

কি বলছেন? কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে সতীশ।

বৃদ্ধা ফিস ফিস করে বললে, একটা কথা বাবা তোমারে কমু—খালি তোমারে।

বাল্যকালে মহাভারতের কাহিনী পড়তে পড়তে একাগ্র দৃষ্টি সম্বন্ধে সতীশের যে ধারণা হয়েছিল তাই যেন এখন বৃদ্ধার চোখে দেখতে পেলে সে। অতগুলি লোক ঘরের মধ্যে, কিন্তু আর কেউ যেন তার চোখে পড়ছে না, কোন বস্তুই নয়। তার অস্থির চোখের উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি সতীশের চোখের উপর এসে একেবারে স্থির হয়ে গিয়েছে যেন।

সম্মোহিতের মত সতীশ বললে, কি কথা জেঠিমা?

আমার নয়ানচাঁদের কোন খবর পাও নাই তুমি?

তাকে মনেই ছিল না সতীশের; সে বিহ্বলের মত বলে উঠল, কার?

নয়ানচাঁদের গো!—উত্তর দিল বৃদ্ধা: সেই যে আমার মা-মরা নাতীডা—তোমাগো চক্ষের সমুখ থেইকাই দারগো যারে ধইর্‌যা লইয়া গেল!—

মনে পড়ল সতীশের, কলিকাতার ক্ষুদ্রায়তন একটিমাত্র ঘরের সঙ্কীর্ণপরিসর গৃহে নিম্নমধ্যবিত্তের সংসারে দারিদ্র্য ও ঈর্ষ্যাজর্জর সংঘাতসঙ্কুল জীবননাটকের প্রত্যেকটি দৃশ্যই। হঠাৎ স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ল তার অর্থও। বছর পাঁচেক পূর্ব্বে বাস্তবে যা প্রত্যক্ষ করে মাঝে মাঝেই সতীশ লজ্জা ও ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয়েছে এখন আকস্মিক বিদ্যুদ্দীপ্তিতে পুনঃরূপায়িত সেই জীবনেরই এক অনাবিষ্কৃত অন্ধকার কোণ যেন অপরিমেয় ঐশ্বর্য্য ও অপূর্ব্ব মাধুর্য্য নিয়ে সতীশের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

সতীশ রুদ্ধ নিশ্বাসে উত্তর দিল, না ত জেঠিমা!

তারে আর ছাখ নাই তুমি?

না।

বৃদ্ধা চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ, তার পরে হঠাৎ ঝর্ ঝর্ করে কেঁদে ফেললে সে; অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, বড় আশা ছিল বাবা—আমার নয়ানচাঁদ ফিরা আইব, তার বিয়া দিয়া চাঁদের মত বউ ঘরে আনুম আমি—আমার এই শ্মশানের মত ঘরবাড়ী মা-লক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদে আবার সোনার সংসার অইয়া ঝলমল করব। রাধামাধব আমার সেই সাধ মিটাইলেন না। তবু দিন ত ফুরাইল আমার!

সতীশ স্তব্ধ—অন্যান্য সকলেও তাই।

কিছুক্ষণ পর বৃদ্ধাই পুনরায় বললে, না আসুক নয়ানচাঁদ। তবু তার লাইগাই হগগল আমি জমাইয়া রাখছি। জগার যে টাকা তুমি শোধ দিছিলা, তার পর তুমি নিজে মাসে মাসে যে টাকা দিচ আর আমার শ্বশুর-সোয়ামীর যা যা আছিল, সব আমি জমাইয়া রাখছি, বাবা; সুদে খাটাইয়া বাড়াইছি। একটা পয়সাও অপব্যয় করি নাই আমি।

একটু থেমে যেন দম নিলে বৃদ্ধা; তার পর কণ্ঠস্বর আরও এক পরদা নীচে নামিয়ে বললে, শোন, বাবা সতীশ। আর কাউকে কই নাই এই কথা, খালি তোমারে কইতেছি—সব টাকা পয়সা,

যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সবসময়

<u>লাইফবয়</u> দিয়ে স্নান করেন!

শিশুদের পক্ষে ময়লা হওয়া খুবই স্বাভাবিক কিন্তু বেশিক্ষণ ময়লা অবস্থায় থাকা তাদের পক্ষে মোটেই ভাল নয়। কারণ, ময়লায় রোগের বীজাণু থাকে যার থেকে স্বাস্থ্যের সমূহ ক্ষতি হতে পারে।

লাইফবয় সাবান ময়লা-জনিত বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে। প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করুন।

L. 267-X52 BG

বন্ধকী সোনাদানা হগগল [illegible] এই সিন্দুকটার মধ্যে আছে। আমি মরলে সিন্দুক খুইল্যা [illegible] তুমি নিয়ো, বাবা।

আমি!
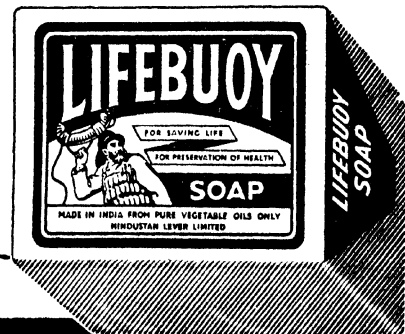
অকস্মাৎ তার [illegible] কাছে বজ্রপাত হলেও সতীশ বোধ করি এত বেশী চমকে উঠত না। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতই নিজের মাথাটাকে বেশ একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে সে আবার বললে এ কি বলছেন জেঠিমা? আপনার টাকা পয়সা আমি কেন নেব?

তা কি আর আমি জানি না, বাবা?

বলতে বলতে মুমূর্ষু বৃদ্ধার কদাকার মুখখানি কেমন যেন বিচিত্র হয়ে উঠল: তুমি যে নিবা না তা আমি জানি বইলাই না তোমারে নিবার কইলাম আমি। তুমি আমারে জবান দেও বাবা।

কিন্তু এই টাকা পয়সা নিয়ে কি করব আমি?

আমার নয়ানচাঁদেরে দিও।

ঐ তার শেষ কথা। বলেই চোখ বুজল বৃদ্ধা।

চমকে উঠল সতীশ; দুই হাতে চক্ষু মার্জ্জনা করলে সে। কোথায় গেল তার সেই বছর ছয়েক আগের চেনা জগদীশের কদাকার, কলহপরায়ণা অর্থগৃধ্নু, অসহিষ্ণু ও অসহনীয়া বৃদ্ধা মা? কোথায় গেল সেই মাসুদনগরের সর্ব্বজনধিকৃতা, কুসীদজীবিনী খক্কিবুড়ী!

বৃদ্ধার প্রাণহীন দেহের পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে সতীশ। কলকাতায় যখন সে ফিরে এল তখন বৃদ্ধার ভূতের বোঝা নিজের পিঠে তুলে নিয়েছে সে। নয়ানচাঁদকে তার খুঁজে বের করতে হবে

নিবেদন

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

পূর্ব্বাকাশ অরুণ-রাঙা, তরুণ ভানু হাসে,
সেদিন আমি এসেছি কাছে, এসেছি তব পাশে,
বলেছি, তুমি নয়ন মেল, রাত্রি অবসান,
এনেছি আমি ফুলের মালা, এনেছি আমি গান।

বসুধা জাগে, বিহগ-কলকাকলি ওঠে বনে,
অজানা এক আনন্দের ছন্দ জাগে মনে।
চাহ গো তুমি নয়ন তুলে, দৃষ্টি কর দান,
এনেছি আমি সুরের মালা, এনেছি আমি গান।

রৌদ্র এল, মিলাল সুর, পাখীরা গেল থামি,
ঊর্দ্ধে নীল শূন্যপানে চাহিয়া আছি আমি।
তপ্ত ধরা, চোখের 'পরে জাগিছে মরুমায়া,
কোথায় যাবে? ডাকিলে তুমি, এখানে আছে ছায়া।

চাহিনু ফিরে, চাহিলে তুমি মিনতিভরা চোখে,
স্নিগ্ধ সুধা কেমনে জানি আনিলে মরলোকে!
শাখার ঘন অন্তরালে মুকুলগুলি ফোটে,
বনের মাঝে পত্ররাশি মর্ম্মরিয়া ওঠে।

আমার ব্যথা, তোমার ব্যথা, এ নহে—নহে সব,
দুঃখ-মহাসাগরে হোক্ বিলীন কলরব।
অশ্রু বৃথা, মানব-প্রাণ অপূর্ণতা-ভরা,
পৃথিবী শুধু মাটির নহে বেদনা দিয়ে গড়া।

মানব শুধু নিজের পানে চাহে যে বারে বারে,
চিনিতে চায়, চিনিতে সে ত পারে না আপনারে।
তাই ত তার তৃপ্তি নাই, এমনি অসহায়,
নীরব তার রোদনে তাই ভুবন ভ'রে যায়।

কোথায় আলো, কোথায় ছায়া, কোথায় শ্যামলিমা,
বিশ্বময় বেদনা বাজে, নাহিক তার সীমা।
জীবন মহারহস্য সে—পরম-বিস্ময়,
খুঁজেছি আমি, আজিও তার পাই নি পরিচয়।

জীবন-গীতি গাহিতে চাহি, নাহিক তার ভাষা,
কেহ-বা বলে, সে শুধু—জানা, কেহ-বা, ভালবাসা।
রক্ত-রাঙা হৃদয় ধর: কোরো না অভিমান,
আনি নি মালা, আনি নি ফুল, আনি নি আজি গান।

ফা-হিয়েনের দেখা ভারত

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মুখোপাধ্যায়

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

এই সেই পাটলিপুত্র যেখানে বসে রাজা অশোক তাঁর রাজ্য-শাসনকার্য্য পরিচালনা করতেন। নগরীর মধ্যস্থলে এখনও দেখতে পাওয়া যায় তাঁর রাজপ্রাসাদ ও সভাগৃহগুলি। যদিও সেগুলি খুবই পুরাতন ও জীর্ণ হয়ে গেছে তবুও সে সব সূক্ষ্ম স্থাপত্যশিল্প এখনও তাদের মাঝে দেখা যায়। সেগুলি দেখলেই বোঝা যায় যে, জাগতিক কোন মানবের পক্ষেই এরূপ নির্ম্মাণকার্য্য সম্ভব নয়। কথিত আছে, রাজা অশোক দৈত্যদের দ্বারাই এইসব প্রাসাদ ও সভাগৃহগুলি নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন।

রাজা অশোকের এক কনিষ্ঠ ভাই ছিলেন। তিনি রাজগৃহের নিকট গৃধ্রকুট পর্ব্বতে বাস করতেন। কারণ নগরীর কোলাহল তাঁর মোটেই ভাল লাগত না। অনেকের মতে তিনি অরহন্তের পর্য্যায়ভুক্ত ছিলেন। রাজা অশোক অনেকবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁকে পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে কিন্তু সফলকাম হন নি। এমনকি তিনি দৈত্যদের দ্বারা প্রাসাদের মধ্যেই একটি ছোট পর্ব্বতগুহাও তাঁর ভাইয়ের জন্য তৈরি করিয়েছিলেন।

এই পাটলিপুত্রেই রাধাস্বামী নামে একজন ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনি বুদ্ধ অনুরক্ত ছিলেন এবং বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। সেইজন্য দেশের রাজা থেকে সুরু করে সবাইএর তিনি শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। দেশের রাজা এঁরই কাছ থেকে শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনতেন। রাজা এঁকে যেমন শ্রদ্ধা করতেন তেমনি ভয়ও করতেন। সাহস করে রাজা এঁর পাশে বসতে পারতেন না। একমাত্র এঁরই জন্য তদানীন্তন কালে অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ ক্ষতিসাধন করতে সাহসী হন নি বা পারেন নি।

এখানে অশোকের উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত অশোকস্তূপের পার্শ্বেই দুটি বিহারও নির্ম্মিত হয়েছে। একটিতে মহাযানপন্থী ও অপরটিতে হীনযানপন্থী ভিক্ষুরা বাস করেন। সর্ব্বসমেত প্রায় ৭ শত ভিক্ষু এখন এখানে বাস করেন। এই বিহার দুটিতে প্রচলিত নিয়মাবলী সত্যই প্রশংসার যোগ্য এবং বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। বিভিন্ন দেশের শ্রদ্ধাবান ভিক্ষুরা দলে দলে এখানে এসে ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন ও বিহারের নিয়মাবলী শিক্ষা করে যান। এই দুটি বিহারের একটিতে মঞ্জুশ্রী নামে একজন জ্ঞানী ব্রাহ্মণ শিক্ষক ছিলেন যাঁকে রাজ্যের সবাই বিশেষ ভাবে শ্রদ্ধা করতেন।

মধ্যরাজ্যের মধ্যে পাটলিপুত্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগর। এখানকার লোকেরা যেমন সুখী ও সম্পদশালী সেইরূপ পরহিতব্রতী। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মঙ্গলচিন্তা করেন। বৈশ্যপ্রধানেরা নগরীর বিভিন্ন স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেছেন। সেখান থেকে বিনামূল্যে ঔষধাদি দেওয়া হয়ে থাকে। দরিদ্র অনাথ আতুরদের খাওয়া-দাওয়া ও চিকিৎসালয়ের থাকার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা আছে। চিকিৎসকেরা বেশ যত্নসহকারেই তাঁদের রোগাদি পরীক্ষা করে যথাযোগ্য ঔষধাদি প্রদান করেন ও একেবারে সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে না গেলে রোগীদের চিকিৎসালয় ছেড়ে যেতে দেওয়া হয় না।

রাজা অশোক বুদ্ধের পূতাস্থির উপর নির্ম্মিত সপ্তস্তূপ ভেঙ্গে যখন ৮৪ হাজার স্তূপ নির্ম্মাণ করার সঙ্কল্প করেন তখন তিনি প্রথম স্তূপ নির্ম্মাণ করেন এই নগরেরই দক্ষিণ দিকে। স্তূপের সামনেই একটি স্থানে বুদ্ধের একটি পদচিহ্ন আছে যার পাশেই রাজা অশোক একটি বিহার নির্ম্মাণ করে দিয়েছিলেন। বিহারের দক্ষিণ দিকে একটি ১৫ ফুট চওড়া ও ৩০ ফুট উঁচু শিলাস্তম্ভ আছে এবং সেই স্তম্ভের গায়ে লেখা আছে যে, "অশোক জম্বুদ্বীপকে ভিক্ষুদের দান করে পরে অর্থ দিয়ে আবার তা কিনে নেন। এই রকম ভাবে পর পর তিনবার তিনি জম্বুদ্বীপকে কিনে নেন।"

স্তম্ভটির প্রায় ৪০০ হাত দূরে অশোক 'নীলে' বলে একটি নগরীর পত্তন করেন। সেখানেও একটি শিলাস্তম্ভ আছে যার শীর্ষদেশে একটি সিংহমূর্ত্তি স্থাপন করা হয়েছে। এই নগরী কেন নির্ম্মাণ করা হয়েছিল এবং নির্ম্মাণ করতে কতদিন লেগেছিল তার বিবরণও এই শিলাস্তম্ভে খোদিত করা আছে।

তীর্থযাত্রীরা এখান থেকে দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে ৯ যোজন পথ অতিক্রম করে একটি ছোট নির্জ্জন পাহাড়ের কোলে এসে পৌছন। পাহাড়ের শীর্ষদেশে একটি দক্ষিণমুখী গুহা[১] আছে। সেখানে দেবরাজ ইন্দ্র প্রেরিত বীণাবাদক পঞ্চশিখা বীণ বাজিয়ে বুদ্ধদেবকে শুনিয়েছিলেন। এই পাহাড়ে বসেই দেবরাজ ইন্দ্র বুদ্ধদেবকে ২৪টি প্রশ্ন করেছিলেন এবং বুদ্ধদেব প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় পাহাড়ের গায়ে একটি করে দাগ কেটেছিলেন। দাগগুলি এখনও দেখতে পাওয়া যায়।

এখান থেকে তীর্থযাত্রীরা ১ যোজন দূরবর্ত্তী শারিপুত্রের জন্মস্থান কলাপিনক গ্রামে এসে পৌছন। শারিপুত্র তাঁর জীবনের শেষদিনে পরিনির্ব্বাণলাভের উদ্দেশ্যে এখানেই পুনরায় ফিরে আসেন। এই উপলক্ষে এখানে একটি স্তূপও পরবর্ত্তীকালে নির্ম্মিত হয়েছে।

এর পর তীর্থযাত্রীরা রাজা অজাতশত্রুর নূতন রাজধানী রাজগৃহে

১। হিউ এন চাঙ্গ এই গুহাটিকে 'ইন্দ্রশিলা গুহ' বলে উল্লেখ করেছেন। (Travels of FA-hien pp. 80)

এসে পৌঁছন। নগরীর পশ্চিম দ্বারের ৩০০ হাত দূরে অজাতশত্রু বুদ্ধের পূতাস্থি নিয়ে ফিরে এসে তার উপর একটি স্তূপ রচনা করেন। স্তূপটি যেমন বড় দেখতে তেমনি সুন্দর। নগরীর দক্ষিণ দ্বারের বাইরে কিছুদূর অগ্রসর হলেই একটি উপত্যকা দেখা যাবে যার পাঁচ দিক ঘিরে রয়েছে পাঁচটি পাহাড়। সেগুলিকে নগরীর শৃঙ্গদ্বার হিসাবে ধরে নেওয়া যায়। এইখানেই ছিল রাজা বিম্বিসারের পুরাতন রাজগৃহ। এই পুরাতন রাজগৃহেই শারিপুত্র ও মুদগল্যায়ন অশ্বজিতকে দেখেন, নিগন্ধ বুদ্ধের জন্য বিষাক্ত ভাত রান্না করেন এবং রাজা অজাতশত্রু বুদ্ধকে আঘাত করার নিমিত্ত একটি কালহাতীকে সুরাপান করান। নগরীর উত্তর-পূর্ব্ব কোণে অম্বপালী জীবক[১] উদ্যানে একটি বিহার নির্ম্মাণ করে বুদ্ধদেব ও তাঁর ১,২৫০ জন শিষ্যকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেন। এখন কিন্তু এর চিহ্নমাত্রও নেই। সবই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এবং নগরী জনশূন্য হয়ে গেছে। উপত্যকার মধ্যে প্রবেশ করে পাহাড়গুলোকে দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে রেখে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে তীর্থযাত্রীরা গৃধ্রকূট পর্ব্বতের কোণে এসে পৌঁছন। পর্ব্বতের শীর্ষদেশের নিকটবর্ত্তী একটি গুহা আছে যেখানে বুদ্ধদেব সমাধিতে বসেছিলেন। এরই কিছুদূরে আনন্দও সমাধিতে বসেছিলেন। কিন্তু রাজা মর গৃধ্রের রূপ ধরে আনন্দের সামনে এসে বসেন যাতে আনন্দ ভয় পান। বুদ্ধদেব তখন আনন্দের ভয় ভাঙাবার জন্য তাঁর বিশেষ ক্ষমতাবলে পর্ব্বত গাত্রে একটি ফাটলের সৃষ্টি করেন এবং আনন্দের কাঁধে একটি হাত রাখেন। গৃধ্রের পদচিহ্ন ও বুদ্ধের সৃষ্ট ফাটল এখনও দেখতে পাওয়া যায়। এই ঘটনা থেকে এই পর্ব্বতের নামকরণ হয় গৃধ্রকূট অর্থাৎ শকুনির গুহা। এই গুহার সামনেই চারিবুদ্ধ সমাধিতে বসেছিলেন। এই পাহাড়েই দেবদত্ত-নিক্ষিপ্ত প্রস্তরে বুদ্ধদেব পায়ে আঘাতপ্রাপ্ত হন। বুদ্ধদেব এখানে যে সভাগৃহে তাঁর ধর্ম্মপ্রচার করেছিলেন এখন সেই সভাগৃহ ধ্বংসপ্রায়। কেবলমাত্র গৃহের ভগ্ন দেওয়ালগুলিই দৃশ্যমান।

ফা-হিয়েন যখন গৃধ্রকূট পর্ব্বতে আরোহণ করে পুষ্প ও ধূপাদি দিয়ে বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করছিলেন তখন দিনরবি গতপ্রায়। রাত্রির নির্জ্জন অন্ধকারে ফা-হিয়েন একাকী সেই গুহার সামনে বসে সারারাত ধরে সুরঙ্গমা সূত্র পাঠ করেন এবং পরদিন সূর্য্যোদয়ের পর নূতন রাজগৃহে ফিরে আসেন।

ফিরতি পথে ফাহিয়েন কারান্দ বাঁশবাগান দেখতে পেয়েছিলেন। সেখানে এখনও একটি বিহারে কিছুসংখ্যক ভিক্ষুর বাস আছে। এর কিছুদূরে আরও একটি গুহা আছে যার নামকরণ করা হয়েছে পপুল গুহা। বুদ্ধদেব সাধারণতঃ মধ্যাহ্ন ভোজের পর এই গুহাতেই সমাধিতে বসতেন। এরই কিছু দূরে শতপর্ণী গুহাটি অবস্থিত। বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ লাভের পর ৫০০ অরহত এখানে বসেই বৌদ্ধ সূত্রগুলি সঙ্কলন করার জন্য মিলিত হন। এই সভা পরিচালনা করেছিলেন মহাকাশ্যপ এবং শারিপুত্র ও মুদ্গল্যায়ন উভয়েই এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আনন্দ গুহাদ্বারেই দাঁড়িয়েছিলেন। কারণ তিনি সভায় ঢুকতে পারেন নি[১]।

এর পর তীর্থযাত্রীরা এখান থেকে ৪ যোজন দূরবর্ত্তী গয়া নগরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

তীর্থযাত্রীরা গয়া নগরীতে পৌঁছে দেখেন নগরী প্রায় জনশূন্য। সেখান থেকে তীর্থযাত্রীরা আরও দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে সেই স্থানে এসে পৌঁছন (বুদ্ধগয়া) যেখানে একদা বুদ্ধদেব বহু কৃচ্ছ্র সাধনের পর সমাধিমগ্ন হয়ে বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন।

প্রথমে একটি উত্তর পূর্ব্বমুখী শিলাখণ্ডের উপর বোধিসত্ত্ব পা মুড়ে বসে নিজের মনেই বলেছিলেন যে, "যদি আমাকে বুদ্ধত্বলাভ করতে হয় তা হলে বুদ্ধের একটি প্রতিচ্ছায়া আমার সম্মুখে দৃশ্যমান হোক্।" এই কথা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে শিলাখণ্ডের গায়ে তিন ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট একটি বুদ্ধের প্রতিচ্ছায়া প্রতিফলিত হয় যা আজও দেখতে পাওয়া যায়। বোধিসত্ত্ব তপস্যায় বসবার উদ্যোগ করতেই দৈববাণী হয় যে, "বুদ্ধত্ব লাভ করতে গেলে এখানে বসলে চলবে না। এখান থেকে অর্দ্ধ যোজন দূরে পত্রবৃক্ষের তলে তপস্যায় বসতে হবে। কারণ ঐ বৃক্ষতলে বসেই পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধেরা বুদ্ধত্বলাভ করেছিলেন।" এর পর দেবতারা বোধিসত্ত্বকে সঙ্গে করে নিয়ে এগিয়ে যান। মধ্যপথে একজন দেবতা ভূমি থেকে একগাছা কুশ ছিঁড়ে নিয়ে বোধিসত্ত্বকে দিয়ে বলেন যে, এই কুশই সফলতার নিদর্শন স্বরূপ। বোধিসত্ত্ব কুশগ্রহণের পর প্রায় ৫০০ হাত এগিয়ে যান এবং পত্রগাছের তলে ভূমিতে কুশগাছটি রেখে পূর্ব্বমুখী হয়ে তপস্যায় বসেন। এই সময় রাজা মর তাঁকে প্রলুব্ধ করার জন্য তিনটি অনন্যাসুন্দরী নারীকে বোধিসত্ত্বের নিকট প্রেরণ করেন এবং তিনি নিজেও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে উপস্থিত হন। বোধিসত্ত্ব তখন তাঁর পায়ের গোড়ালিটি একবার ভূমিতে ঠোকেন যার ফলে মর রাজার সঙ্গীরা অদৃশ্য হয়ে যায় এবং তিনজন নারীও বৃদ্ধায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। বুদ্ধদেব বুদ্ধত্বলাভের পর সাতদিন ধরে পত্রগাছের দিকে তাকিয়ে থেকে বিমুক্তিলাভের আনন্দ উপভোগ করেন। ভবিষ্যৎকালে উপরোক্ত প্রত্যেকটি স্থলেই স্তূপ নির্ম্মিত হয়। এ ছাড়াও আরও অনেক স্তূপ এখানে রচিত হয়েছে যার মধ্যে সেখানে দেবতারা বুদ্ধদেবকে সাতদিন ধরে পূজা করেছিলেন। সেখানে অন্ধ দৈত্য মুচলিন্দা বুদ্ধদেবকে সাত দিন ধরে আটকে রেখেছিলেন। যে ন্যগ্রোধ বৃক্ষতলে বসে বুদ্ধদেব দেবলোকের

১। রাজা বিম্বিসারের ঔরসে অম্বপালীর গর্ভজাত পুত্রের নামও জীবক। অনুবাদক।

১। এটা খুবই আশ্চর্য্যের বিষয় নয় কি যে, এইরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম্মসভায় আনন্দের মত এত বড় একজন অরহতকে কেউ আহ্বান করে সভামণ্ডপে নিয়ে যান নি এবং সভার কার্য্য আনন্দকে বাদ দিয়েই পরিচালিত হয়েছিল?—অনুবাদক

ব্রহ্মার ব্রহ্মার্ঘ গ্রহণ করেছিলেন, যেখানে ৫০০ বণিক তাঁকে সেঁকা রুটি ও মধু খেতে দিয়েছিলেন। যেখানে দেবরাজেরা তাঁদের ভিক্ষা পাত্র বুদ্ধের সম্মুখে এনে হাজির করেছিলেন এবং যেখানে কশ্যপ ও তাঁর সহস্র সঙ্গীকে বুদ্ধদেব বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দেন প্রভৃতি স্থানের উপর নির্ম্মিত স্তূপগুলিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে তিনটি বিহারও আছে যেখানে ভিক্ষুরা এখনও বাস করছেন। এখানকার অধিবাসীরাই ভিক্ষুদের খাদ্যশস্যাদি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করে থাকেন। বিহার-জীবন সাধনের নিয়মাবলী এখানকার ভিক্ষুরা বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন।

বুদ্ধদেব যে পত্রবৃক্ষের তলায় বসে বুদ্ধত্বলাভ করেছিলেন সে সম্বন্ধে একটি প্রবাদ চলিত আছে। প্রবাদটি হচ্ছে এই যে, পূর্ব্ব-জন্মে রাজা অশোক যখন শিশু ছিলেন তখন তিনি একবার পথি-পার্শ্বে খেলা করবার সময় শাক্যমুনি বুদ্ধকে বসে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ভিক্ষা করতে দেখেছিলেন এবং শিশু অশোক তাঁর সৌম্যমূর্ত্তি দেখে মুগ্ধ হয়ে একমুঠো মাটি বুদ্ধকে ভিক্ষা দেন। বুদ্ধ সেই মাটি তাঁর চলার পথে ছড়িয়ে দেন। এই শুভকর্ম্মের জন্যই পরজন্মে অশোক জম্বুদ্বীপের শাসনকর্ত্তা ও রাজচক্রবর্ত্তীরূপে অধিষ্ঠিত হন। রাজত্ব পাবার পর অশোক একবার রাজ্য পরিদর্শনে বেরিয়ে পর্ব্বতবেষ্টনীর মধ্যে একটি নরক দর্শন করেন। এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁর পারিষদ-বর্গকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন যে, এই নরক তৈরী করেছেন যমরাজা এবং এখানেই তিনি দুষ্কৃতিকারীদের শাস্তি দিয়ে থাকেন। এইকথা শোনার পর রাজা অশোক স্থির করেন, তিনি এই পৃথিবীর অধীশ্বর, তাঁর রাজ্যের দুষ্কৃতিকারীদের শাস্তিদানের নিমিত্ত নির্ম্মিত অনুরূপ একটি নরক তৈরী করার বিশেষ প্রয়োজন আছে এবং তা করেনও। এর পর দুর্ভেদ্য প্রাচীর দিয়ে ঘিরে তিনি একটি নরক তৈরী করান এবং তাঁর রাজ্যের সবচেয়ে নিষ্ঠুর একটি লোকের উপর এই নরকের সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেন।

একবার একজন ভিক্ষু ভিক্ষা সমাপ্ত করে বিরকম ভাবে এই নরকের মধ্যে ঢুকে পড়েন। নরকের রক্ষীরা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ধরে ফেলে ও তাদের প্রথানুযায়ী তাঁর উপর নির্য্যাতন সুরু করে। রক্ষীরা তাঁকে একটি ফুটন্ত জলের লৌহনির্ম্মিত কুম্ভের মধ্যে ফেলে দেয়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ভিক্ষুটিকে জলে নিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গে জলাধার একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে আসে এবং চুল্লীর অগ্নিও নির্ব্বাপিত হয়ে যায়। রক্ষীরা আরও বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করে যে, লৌহ-কুম্ভের মধ্য থেকে উদ্ভূত একটি পদ্মফুলের উপর ভিক্ষুটি মহা-সন্তোষে বসে আছেন। রাজাকে এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা জানালে, তিনি নিজে সেই নরকে আসেন এবং ভিক্ষুটির কাছ থেকে ধর্ম্ম উপদেশ শোনেন। অশোক তখন তাঁর এই নিষ্ঠুর খেলার কথা স্মরণ করে বিশেষভাবে বিমর্ষ হয়ে পড়েন এবং সমগ্র নরকটি ভূমিসাৎ করে দেন। এর পর রাজা চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রায়ই এই বোধিবৃক্ষতলে এসে বুদ্ধের উদ্দেশ্যে আকুল প্রার্থনা জানান যাতে তাঁর চিত্তশুদ্ধি ঘটে ও তাঁর কৃত পাপস্খালন হয়। রাজার এই ক্রমান্বয়ে রাজপ্রাসাদে অনুপস্থিতি দেখে রাণী বিশেষ চিন্তিত হন এবং যখন তিনি খবর নিয়ে জানতে পারেন যে, রাজা এই পত্রবৃক্ষতলেই বেশীর ভাগ সময় সমাধিতে কাটান তখন শত্রুতাবশে তিনি লোক লাগিয়ে এই বৃক্ষটি কেটে দেন। রাজা এই সংবাদ পেয়ে এই বৃক্ষমূলের সম্মুখে এসে ভূমিতলে অজ্ঞান হয়ে পড়েন এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে, বৃক্ষটিতে যদি আবার জীবনের কোন চিহ্ন না দেখতে পাওয়া যায় তাহলে তিনি এই অবস্থাতেই মৃত্যুকে বরণ করবেন। এই শপথ গ্রহণের পর এক সহস্র কলসী গো-দুগ্ধ বৃক্ষমূলে ঢালা হলে পুনরায় বৃক্ষটির সজীবতার লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে সেই বৃক্ষই তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিজের ছায়াতলে ঢেকে রেখেছে। রাজা অশোক এই বৃক্ষের চার ধারে বেশ সুউচ্চ একটা প্রাচীর গেঁথে দেন যাতে কেউ এর কোনরূপ ক্ষতি করতে না পারে।

তীর্থযাত্রীরা এর পর দক্ষিণ মুখে অগ্রসর হয়ে গুরুপদ পাহাড়ের কোণে এসে পৌঁছন। এই পাহাড়ের মধ্যে মহাকশ্যপের দেহ এখনও সমাহিত আছে। পাহাড়ের মধ্যে একটি ফাটল আছে। সেই ফাটল ধরে নীচে নেমে গেলে একটি গর্ত্ত দেখতে পাওয়া যায় এবং এই গর্ত্তের মধ্যেই সেই দেহ সমাধিস্থ হয়ে আছে। এই পাহাড়ের মাটির একটি বিশেষ গুণ যে, একটু মাটি নিয়ে মাথায় ঘষে দিলেই মাথার যন্ত্রণার উপশম হয়। পাহাড়ের আশেপাশে হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের উপদ্রব খুবই বেশী। তাই লোকেরা এ-অঞ্চলে খুব সাবধানে চলাফেরা করে থাকেন।

তীর্থযাত্রীরা এর পর পুনরায় পাটলীপুত্রে ফিরে যান।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

তীর্থযাত্রীরা পাটলীপুত্র হয়ে গঙ্গার তীর ধরে প্রথমে আতভী বিহার ও পরে বারাণসী নগরীতে এসে পৌঁছন। এই বারাণসীর কিছু দূরে একটি ঋষিদের বিশ্রামের জন্য উদ্যান আছে। এই উদ্যানে একজন বুদ্ধ বাস করতেন। তিনি দৈববাণী শুনে-ছিলেন যে, রাজা সুযোধনের পুত্র সংসারত্যাগী হয়ে প্রকৃত জ্ঞানের সন্ধান পেয়েছেন এবং খুব শীঘ্রই তিনি বুদ্ধত্বলাভ করবেন। দৈব-বাণী শোনার পরমুহূর্ত্তেই তিনি নির্ব্বাণলাভ করেন। বুদ্ধদেব এইখানেই কৌণ্ডিক ও তার চারিজন সঙ্গীকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা দেন। এখান থেকে তের যোজন দূরে 'গোশির বন' নামে একটি বিহার আছে। সেখানে বুদ্ধদেব কিছুকাল এই বিহারে বাস করেছিলেন; এখনও কিছুসংখ্যক হীনযানপন্থী ভিক্ষু এই বিহারে বাস করছেন।

তীর্থযাত্রীরা এর পর দক্ষিণমুখে দুই শত যোজন পথ অতিক্রম করে একটি বিহারে এসে পৌঁছন। বিহারটি কাশ্যপ বুদ্ধের উদ্দেশ্যে অর্পিত। একটি পাহাড় কেটে এই পাঁচতলা বিহারটি নির্ম্মাণ করা হয়েছে। সর্ব্বনিম্ন তলাটি দেখতে অনেকটা হস্তীর আকৃতি এবং এই তলায় প্রায় পাঁচশত ঘর আছে। দ্বিতীয় তলাটির আকৃতি সিংহের মত এবং ঘর আছে প্রায় চারিশতটি; তৃতীয় তলাটির আকৃতি অশ্বের মত এবং এই তলায় প্রায় তিনশতটি

ঘর আছে। চতুর্থ তলাটি যণ্ডাকৃতি এবং ঘর আছে প্রায় দুইশতটি, পঞ্চম তলাটির আকৃতি পায়রার মত এবং ঘর আছে প্রায় একশতটি। প্রত্যেক তলাতেই সংলগ্ন সিড়ি আছে। এই বিহারের নির্মাণ-প্রণালী এতই চমৎকার যে, বিহারের প্রত্যেকটি ঘরেই প্রচুর আলো ও বাতাস যাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাহাড়ের ওপর একটি ঝর্ণা আছে। তার জল উপর থেকে গড়িয়ে প্রতিটি তলায় প্রতিটি ঘরের সামনে দিয়ে নীচে বিহার-প্রাঙ্গণে এসে পড়ে ও নালী দিয়ে বিহারের বাইরে চলে যায়। বিহারটির নাম দেওয়া হয়েছিল-পারাবত-বিহার।

ভারতের এই অঞ্চলের ভূমি অনুর্ব্বর এবং মোটেই কৃষিযোগ্য নয়। সেই কারণেই বোধ হয় এই অঞ্চলটি অপেক্ষাকৃত জনহীন। বিহারের বহু দূরে কয়েকটি গ্রাম আছে। সেখানকার লোকেরা না বৌদ্ধধর্ম্মে না ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে বিশ্বাসী। এখানকার পথ-ঘাটও বিপজ্জনক। এখানকার রাজাকে প্রচুর অর্থ দিলে পর তিনি তাঁর রক্ষীদের পথিকদের রক্ষার জন্য নিযুক্ত করে থাকেন। রক্ষীরাই পথিককে পাহাড় দিয়ে নিরাপদে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়ে দেয়। ফা-হিয়েন দক্ষিণ ভারতের এই অঞ্চলটি সবটা ঘুরে দেখতে সক্ষম হন নি এবং তিনি উপরোক্ত তথ্যাদি যাঁরা এই পথে যাতায়াত করছেন তাঁদের মুখেই শুনেছেন।

তীর্থযাত্রীরা এর পর পুনরায় বারাণসী হয়ে পাটলিপুত্রে ফিরে আসেন। ফা-হিয়েনের পাটলিপুত্রে ফিরে আসার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে বিনয় পিটকের একটি পুথি সংগ্রহ করা। উত্তর ভারত পরিভ্রমণকালে ফা-হিয়েন বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বিহার-নিয়মাবলীর সন্ধান পেয়েছেন কিন্তু সেই সব নিয়মাবলী কোন পুথিতে বিধিবদ্ধ করা হয়নি। এগুলি যুগ যুগ ধরে মুখে মুখে প্রচারিত, সংবর্দ্ধিত ও সংরক্ষিত হয়ে এসেছে। এই কারণেই ফা-হিয়েনকে এই পুথির জন্য মধ্যভারতেও বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করতে হয়েছে। তিনি মধ্যভারতের সব কয়টি বিশিষ্ট স্থান ঘুরে শেষে এখানকার মহাযান বিহারে একটি বিনয় পিটকের সন্ধান পান। এই পিটকে 'মহাসাংগিক' নিয়মাবলী যা বুদ্ধের জীবিতকালে প্রথম ধর্ম্মসম্মেলনে লিপিব ও গ্রহণ করা হয়েছিল এবং যার মূল পুথিটি জেতবন বিহারেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল—সেইটি ফা-হিয়েন এখানে দেখতে পান। এ ছাড়া অন্যান্য ১৮টি পন্থাবলম্বীদের আর কোন নিয়মাবলীই তিনি দেখতে পান নি। তাঁরা তাঁদের গুরুর আদেশ অনুযায়ী নিয়মাদি পালন করে এসেছেন বা এখনও করছেন। মহাযান বিহারের এই পুথিটি সর্ব্বদিক দিয়েই সম্পূর্ণ এবং এর প্রতিটি সূত্রের পূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। এ ছাড়া ফা-হিয়েন সাত হাজার শ্লোক সমৃদ্ধ 'সর্ব্বাস্তিবাদ' শাস্ত্রের একটি পুথিও এখানে দেখতে পান।

ফা-হিয়েন এই বিহারে ছয় হাজার শ্লোক সমৃদ্ধ 'সম্মুখণ্ড বিধর্ম হৃদয় শাস্ত্র', আড়াই হাজার শ্লোক সমৃদ্ধ নির্ব্বাণ সূত্র, পাঁচ হাজার শ্লোক সমৃদ্ধ বিপুল পরিনির্ব্বাণ সূত্র এবং মহাসংগ্রাহীকা অভিধর্ম্ম পুথিও এখানে আছে দেখেছেন। ফা-হিয়েন তিন বছর ধরে এখানে সংস্কৃত-চলিত ও প্রাকৃত ভাষা অধ্যয়ন করে উপরোক্ত শাস্ত্র সূত্রাবলীর একটি করে প্রতিলিপি প্রস্তুত করেন। ফা-হিয়েন ও তাও চিং মধ্যরাজ্য পরিভ্রমণকালে এইসব নিয়মাবলীর অধ্যয়ন ও দৈনন্দিন জীবনে তারই প্রতিফলন দেখে বিশেষভাবে মুগ্ধ হয়ে যান। তাও চিং এসব দেখে এতই মুগ্ধ হন যে, তিনি এই ভারতবর্ষেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত করেন। ফা-হিয়েন অবশ্য স্বদেশে অর্থাৎ চীনে এইসব মহামূল্যবান পুথির উল্লিখিত অনুশাসন ও নিয়মাবলী প্রচলন করার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে একাকীই চীনদেশে ফিরে যাওয়ার সঙ্কল্প করেন। যে সঙ্কল্প নিয়ে তিনি দেশ ছেড়ে বেরিয়েছিলেন তা যতক্ষণ না পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ হচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁর সোয়াস্তি নেই।

এরপর ফা-হিয়েন একাকীই শাস্ত্র অনুলিপিসমূহ নিয়ে এখান থেকে যাত্রা করে গঙ্গার ধারা অনুসরণ করে পূর্ব্বমুখে অগ্রসর হতে থাকেন এবং প্রায় ১৮ যোজন পথ অতিক্রম করে তিনি চম্পানগরের দক্ষিণে এসে পৌঁছন। এখানে একটি বিহার আছে যেখানে চারিবুদ্ধ কিছুকাল ধরে বাস করেছিলেন। এখান থেকে আরও ৫০ যোজন পথ অতিক্রম করে ফা-হিয়েন তাম্রলিপ্ত নগরীতে এসে পৌঁছন। তাম্রলিপ্ত সমুদ্রতীরবর্ত্তী একটি বৃহৎ বন্দর। ফা-হিয়েন এখানে প্রায় ২২টি বিহার দেখতে পেয়েছিলেন এবং এর প্রত্যেকটিতেই এখনও ভিক্ষুরা বাস করে। বৌদ্ধধর্ম্ম এখানে বহুল প্রচারিত ও প্রসারিত। ফা-হিয়েন এখানে ২ বৎসর বাস করে অনেক সূত্রের প্রতিলিপি প্রস্তুত করেন এবং বিভিন্ন বৌদ্ধমূর্ত্তির প্রতিকৃতি নকল করেন।

এর পর তিনি একটি বিরাট সওদাগরী জাহাজে করে দক্ষিণ-পূর্ব্বমুখে সমুদ্র যাত্রা সুরু করেন। এখন শীতের পূর্ব্বাভাষ। তাই আবহাওয়া সমুদ্রযাত্রার অনুকূল। সমুদ্র যাত্রার ১৪ দিন পর ফা-হিয়েন সিংহল দেশে এসে পৌঁছন। এখানকার অধিবাসীদের মতে তাম্রলিপ্ত থেকে সিংহলের দূরত্ব প্রায় ৭০০ যোজন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সিংহল রাজ্যের সবটাই একটি দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত। এর আশেপাশে আরও প্রায় ১০০টি দ্বীপ আছে। এই দ্বীপপুঞ্জের নিকটবর্ত্তী সমুদ্র তলদেশে খুব ভাল জাতের মুক্তো ও দামী দামী পাথর পাওয়া যায়। এদেশের রাজা কর হিসাবে প্রতি দশটি সংগৃহীত মুক্তোর মধ্যে তিনটি করে মুক্তো সংগ্রাহকদের কাছ থেকে আদায় করে নেন।

প্রথমে এদেশে বাস করত নাগারা ও দৈত্য-দানবেরা। তার পর যখন সভ্য মানুষের বসতি হতে সুরু হ'ল তখন আস্তে আস্তে তারা বনে জঙ্গলে তাদের বাসা নিল এবং সভ্য মানুষের জগতে আর তাদের কোন চিহ্নই দেখতে পাওয়া গেল না। প্রথমে বিভিন্ন দেশের বণিকেরাই এদেশে বাস করতে আরম্ভ করেন পরে এরাই সিংহলী জাতি বলে নিজেদের পরিচয় দিতে থাকেন।

এখানকার আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ এবং এখানকার চাষ-আবাদের জন্য কোন নির্দিষ্ট কাল নেই। যখন ইচ্ছে খুশী এরা চাষ করে। জমির উর্ব্বরা শক্তি আছে, ফসল বেশ ভালই হয়।

বুদ্ধদেব যখন ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশে আসেন তখন তিনি তাঁর একটা পা রেখেছিলেন রাজনগরীর উত্তরে অপর পাটি রেখেছিলেন একটি পাহাড়ের চূড়ায়। এর মধ্যকার দূরত্ব হচ্ছে ১৫ যোজন। বুদ্ধের পদচিহ্নের ওপরই এদেশের রাজা একটি ৪০০ ফুট উঁচু স্তূপ নির্ম্মাণ করেছিলেন। স্তূপটি আজও দেখতে পাওয়া যায়। স্তূপটিকে বেশ সুন্দর করে সোনারূপা, মণিমাণিক্য দিয়ে সাজান হয়েছে। এর পাশেই অভয়গিরি নামে একটি বিহারও রাজা নির্ম্মাণ করে দিয়েছিলেন। এই অভয়গিরি বিহারে প্রায় ১০০০ ভিক্ষুর বাস আছে। বিহারের দালানে বুদ্ধের একটি সুন্দর মূর্ত্তিও স্থাপন করা হয়েছে।

এখানে আসার পর ফা-হিয়েনের মনটা স্বদেশের জন্য খুবই বিচলিত হয়। কারণ সেখান থেকে ভারত ভ্রমণে বেরোবার পর এতদিন ধরে কেবল বিদেশীদের সংস্পর্শেই তাঁকে দিন কাটাতে হয়েছে। তাঁর কোন স্বজাতির মুখই তিনি দেখতে পান নি। এখানে তিনি স্বদেশের একজন বণিককে দেখে বিচলিত হয়ে পড়েন। এ-দেশের একজন পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা ভারত থেকে পত্রগাছের একটি ডাল নিয়ে এসে এখানে পুঁতে দেন এবং ভবিষ্যৎকালে সেই ডাল থেকে গাছটি একটি বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়েছে। এই গাছের তলাতে আরও একটি বিহার নির্ম্মিত হয়েছে এবং একটি বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপন করা হয়েছে। এখানে বুদ্ধের একটি দাঁতও সংরক্ষিত আছে।

এদেশের রাজা নিজে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট এবং বেশ সংভাবেই জীবনযাপন করে থাকেন। এই সিংহলে কখনও কোন দুর্ভিক্ষ হয় নি বা কোন বিদ্রোহ হয় নি। এখানকার ভিক্ষুরা অনেক মুক্তো ও দামী পাথর সংগ্রহ করে তাঁদের বিহারে জমা করে রেখে দেন। এদেশের রাজা একদিন একটি বিহার দেখতে এসে সেইসব মহামূল্যবান রত্নাদি দেখে সেগুলি আত্মসাৎ করার সঙ্কল্প করেন। অবশ্য এর তিনদিন পরেই তিনি তাঁর এই পাপ সঙ্কল্পের কথা ভিক্ষুদের জানিয়ে তাঁদের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হন এবং অনুরোধ করেন যে, ভবিষ্যতে কোন নূতন ভিক্ষু কিংবা কোন রাজা বা রাজকর্ম্মচারীদের ভিক্ষুদের এই সংগ্রহশালা দেখতে না দেওয়ার একটা বিধিনিষেধ যেন ভিক্ষুরা আরোপ করেন।

এখানকার রাস্তাঘাটগুলি যেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন তেমনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এখানকার গৃহস্থেরা। নিজেদের ঘর-বাড়ীগুলি এরা বেশ সুন্দর করেই সাজিয়ে রাখে। প্রতি রাস্তার চৌমাথায় একটা করে উপাসনা গৃহ আছে যেখানে মাসের ৮ই, ১৪ই ও ১৫ই তারিখে ভিক্ষুরা সাধারণ অধিবাসীদের ধর্ম্মব্যাখ্যা শোনান। এখানকার অধিবাসীদের মতে সমগ্র সিংহলরাজ্যে প্রায় ৬০ হাজার ভিক্ষুর বাস আছে এবং তাঁরা প্রত্যেকেই সাধারণ শস্যাগার থেকে তাঁদের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যাদি পেয়ে থাকেন। যখনই প্রয়োজন হয় ভিক্ষাপাত্র নিয়ে শস্যাগার থেকে খাদ্যশস্যাদি নিয়ে আসেন।

তৃতীয় মাসের মাঝামাঝি এদেশে রক্ষিত বুদ্ধের দাঁতটিকে নিয়ে এখানে একটি শোভাযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শোভাযাত্রা বার করবার পূর্ব্বে দেশের রাজা একটি ঘোষককে একটি সজ্জিত হস্তীর উপর চাপিয়ে দিয়ে সমগ্র নগরী পরিভ্রমণের আদেশ দেন। ঘোষক তাঁর ঘোষণায় বুদ্ধের জীবনের বিশিষ্ট ঘটনাবলীর উল্লেখ করে বলে দেন যে, দশ দিন বাদে বুদ্ধের পূতাস্থি নিয়ে শোভাযাত্রা বার হবে। অতএব নাগরিকেরা যেন সেই পূতাস্থির প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করবার জন্য প্রস্তুত হন এবং তাঁদের বাড়ীঘর সব সাজাতে সুরু করেন।

এর পর ৫০০ বোধিসত্ত্বের প্রতিকৃতি, চিত্রাদি ও বুদ্ধের পূতাস্থিটি বেশ সাজিয়েগুছিয়ে নিয়ে একটি শোভাযাত্রা বের হয় এবং নগর থেকে বেরিয়ে নগরের বাইরে অবস্থিত অভয়গিরি বিহারে গিয়ে পৌঁছয়। সেখানে প্রায় ৯০ দিন ধরে বুদ্ধের পূতাস্থিটি সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধানিবেদনের উদ্দেশ্যে বাইরে সজ্জিত করে রাখা হয়। তার পর পুনরায় সেটিকে নগরীতে ফিরিয়ে আনা হয়।

অভয়গিরি বিহারের পূর্ব্ব পাহাড়ের উপর আরও একটি বিহার আছে যার নাম চৈত্য বিহার। বিহারে প্রায় ১০০০ ভিক্ষু বাস করেন। এই বিহারে ধর্ম্মগুপ্ত নামে একজন শ্রমণ আছেন যাঁকে রাজ্যের সবাই খুব শ্রদ্ধা করে। এই শ্রমণ এতই সহৃদয় যে, তাঁর গুহার মধ্যে সাপ ও ইঁদুরকে কোনরূপ বিবাদ না করে এক সঙ্গে বাস করতে দেখা গেছে।

ফা-হিয়েন এখানে একটি ভিক্ষুর দাহকার্য্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন। নগরীর দক্ষিণ দিকে ভিক্ষুদের জন্য নির্দ্দিষ্ট সমাধিক্ষেত্রে মৃতদেহটি নিয়ে যাওয়া হয়। চন্দন ও অন্যান্য সুগন্ধি কাষ্ঠের তৈরী একটি বিরাট পাহাড়ের শীর্ষদেশে একটি চুল্লী সাজান আছে। সেখানে মৃতদেহটিকে পুষ্প দিয়ে সজ্জিত করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং উপস্থিত সকলে মৃত ভিক্ষুর প্রতি তাঁদের শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনার্থে কিছু কিছু ফুল মৃতদেহের উপর ছড়িয়ে দিলে পর দেহটিকে চুল্লীর উপর রাখা হয়। মৃতদেহের উপর সুগন্ধি তেলও ঢেলে দেওয়া হয়। এর পর চুল্লীতে অগ্নিসংযোগ করা হয় এবং উপস্থিত সকলেই নিজেদের উত্তরীয়, ছত্র প্রভৃতি চুল্লীর উপর ফেলে দেন যাতেকরে আগুনটা বেশ ভাল করে জ্বলে ওঠে। মৃতদেহটা পুড়ে গেলে উপস্থিত লোকেরা পূতাস্থি নিয়ে ফিরে যায় এবং পরে এরই উপর একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করে থাকে।

ফা-হিয়েনের এখানে অবস্থানকালে এদেশের রাজা একটি নূতন বিহার নির্ম্মাণ করার পরিকল্পনা করেন। এই উদ্দেশ্যে প্রথমে তিনি একটি বিরাট সভা ডাকেন। তার পর একজোড়া বলদকে বেশ সুন্দর করে সাজিয়ে তাদের কাঁধে একটি স্বর্ণনির্ম্মিত জোয়াল লাগিয়ে দিয়ে যে জমির ওপর বিহারটি নির্ম্মিত হবে সেই জমিতে দাগ দিয়ে দেন। বিহার শেষ হলে পর এই বিহারের বিবরণী ও
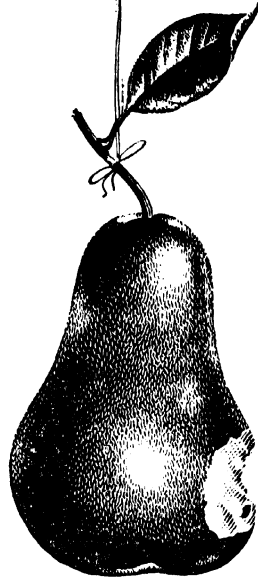
দেখে পরখ—আর চেখে পরখ...

অনেক জিনিষ আছে যা বাইরে থেকে দেখে পরখ করতে গেলে ঠকার সম্ভাবনাই বেশি। যেমন ধরুন ফল। বাইরে থেকে দেখে মনে হোল বেশ সরেস, কাটার পর দেখা গেল ভেতরে পোকায় খাওয়া। সেই জন্যে ফল কেনার সময় চেখে পরখ করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

কিন্তু সাবান বা অন্যান্য মোড়কের জিনিষ পরখ করা যায় কি করে? এর একটি নিশ্চিত উপায় বুদ্ধিমান দোকানদারদের জানা আছে — তাঁরা দেখেন জিনিসটির নামটি পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য কিনা এবং সেটি এমন মার্কার জিনিষ কিনা যা তাঁরা ব্যবহার করেছেন এবং নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

প্রায় ৭০ বছর ধরে জনসাধারণ হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী জিনিষগুলির ওপর আস্থাবান কারণ এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও এই **জিনিষগুলির** গুণাগুণের কোন তারতম্য হয়নি। এই **জিনিষগুলির** ওপর তাঁদের আস্থার আর একটি কারণ, এগুলি **বাজারে ছাড়বার** আগে আমরা পরখ করে তবেই ছাড়ি।

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী আমাদের সব জিনিষের ওপর — কাঁচা মাল থেকে তৈরী হওয়া পর্য্যন্ত, আমরা পরীক্ষা চালাই। এ ধরণের পরীক্ষা চলে প্রতি সপ্তাহে সংখ্যায় ১২০০। আমরা পরীক্ষা করে নিশ্চিন্ত হয়ে নিই যে এ জিনিষগুলি সব রকম আবহাওয়াতেই চালান এবং মজুদ করা যাবে। আমাদের পরীক্ষাগারে 'কৃত্রিম আবহাওয়া' সৃষ্টি করে আমরা দেখে নিই যে বিভিন্ন আবহাওয়াতে এ জিনিষগুলি কেমন থাকে। আপনারা বাড়ীতে এ জিনিষগুলি যে রকম ব্যবহার করে পরখ করেন, আমরাও ঠিক সেইভাবে এইগুলি পরখ করে দেখে নিই। আমাদের তৈরী জিনিষগুলির মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে — লাইফবয় সাবান, ডালডা বনস্পতি, গিবস্, এস আর টুথপেষ্ট অর্থাৎ সবগুলিই আপনাদের পরিচিত জিনিষ। এই জিনিষগুলির এত সুনাম কারণ এই জিনিষগুলি বিশ্বাসযোগ্য। কঠিন পরীক্ষা চালানোর পর বাজারে ছাড়া হয় বলেই এগুলি সর্বসাধারণের এত বিশ্বাস অর্জ্জন করতে পেরেছে।

দশের সেবায় হিন্দুস্থান লিভার

HLL. 5-X52 BG

দানের কথা ধাতুনির্ম্মিত ফলকে লিখে রাজা এই বিহারের গায়ে আটকে দেন যাতে তাঁর বংশধরেরা এ নিয়ে পরে ভিক্ষুদের ওপর কোনরূপ জোরজবরদস্তি করতে না পারেন।

ফা-হিয়েন সিংহল দেশে প্রায় ২ বৎসর ছিলেন এবং এখানেই তিনি মহীশশাকদের বিনয় পিটকের দীর্ঘাগম্‌, সম্যুখগম্‌ ও সান্নিপাত সূত্রের একটি করে অনুলিপি প্রস্তুত করেন। এর পর ফা-হিয়েন একটি চীনা সওদাগরী জাহাজে করে পুনরায় যাত্রা সুরু করেন। প্রথমে আবহাওয়া জাহাজ-চলাচলের বেশ অনুকূলেই ছিল, কিন্তু কয়েকদিন পর এই আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন দেখা যায় এবং জাহাজ সামুদ্রিক ঝড়ের সম্মুখীন হয়। জাহাজডুবির ভয়ে সওদাগরী বণিকেরা তাঁদের মূল্যবান দ্রব্যাদি সবই সমুদ্রের জলে ফেলে দিলে ফা-হিয়েনও তাঁর অনেক জিনিষ অর্থাৎ জলের কলসী,ঘটি প্রভৃতি জলে ফেলে দিলেন। পাছে বণিকেরা তাঁর এত কষ্টের সংগৃহীত ধর্ম্মপুস্তকাদি ও ধর্ম্মচিত্রাদি জলে ফেলে দেয় তাই তিনি মনে-প্রাণে অবলোকিতেশ্বরকে ডাকতে লাগলেন এবং প্রার্থনা জানালেন যেন নিরাপদেই তিনি এইসব অমূল্য পুস্তকাদি নিয়ে স্বদেশে পৌঁছতে পারেন। অবশেষে তের দিন পরে সেই ঝড়ের উপষম হয়। এরপর নাবিকেরা খুব সতর্কতার সঙ্গে জাহাজ চালাতে লাগলেন এবং প্রায় ৯০ দিন পর জাহাজ যবদ্বীপে এসে পৌঁছয়।

যবদ্বীপে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মেরই প্রাধান্য বেশী। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব এখানে নেই বললেই হয়। এখানে প্রায় পাঁচ মাস অবস্থানের পর ফা-হিয়েন অন্য একটি জাহাজে করে পুনরায় চীন অভিমুখে যাত্রা করেন। এবারও মাঝপথে জাহাজ সামুদ্রিক ঝড়ের মুখে পড়ে এবং জাহাজের গতিপথ বদলে যায়। নাবিকেরাও ঠিক করতে পারেন না যে, কোন দিকে তাঁরা অগ্রসর হচ্ছেন। জাহাজের যাত্রীরা এই হঠাৎ-আসা সামুদ্রিক ঝড়ের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ফা-হিয়েনের প্রতিই তাঁদের দৃষ্টি পড়ে। তাঁদের মধ্যে যখন সলাপরামর্শ চলছে যে, ফা-হিয়েনকে নিকটবর্ত্তী কোন দ্বীপকূলে নামিয়ে দিলেই বোধ হয় দেবতার কোপদৃষ্টি থেকে বাঁচা সম্ভব হবে তখন তাঁদেরই একজন বলেন যে, এই ভিক্ষুকে যদি এভাবে অকূলে ফেলে যাওয়ারই সিদ্ধান্ত করা হয় তাহলে ফা-হিয়েনের আগে তাঁকে নামিয়ে দিতে হবে। তিনি আরও বলেন যে, চীনের রাজা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান ভক্ত ও ভিক্ষুদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন। যদি তাঁরা এই ভিক্ষুকে মাঝপথে ফেলে যান তাহলে চীন-সম্রাটকে তিনি সেকথা জানিয়ে দিতে বাধ্য হবেন। এসব শুনে শেষপর্য্যন্ত নাবিকেরা ফা-হিয়েনকে মাঝপথে নামিয়ে দিতে সাহস করে না। প্রায় ৭০ দিন চলার পর নাবিকেরা জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে অন্যপথে চলতে সুরু করেন এবং ৮২ দিনের মাথায় চাং-কুয়াং-এর অন্তর্ভুক্ত লাওসানের দক্ষিণ-তীরে এসে নোঙ্গর ফেলেন। প্রথমে তাঁরা বুঝতেই পারেন না যে, কোন দেশে এসে পৌঁচেছেন। যাই হউক সমুদ্র-উপকূলের অধিবাসীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারেন যে, তাঁরা চীনদেশেই এসে পৌঁচেছেন। সমুদ্র অতিক্রম করে একজন ভিক্ষু ধর্ম্মশাস্ত্র ও চিত্রাবলী সংগ্রহ করে এনেছেন—এই সংবাদ পেয়ে এ-অঞ্চলের শাসনকর্ত্তা নিজে এসে ফা-হিয়েনকে সম্বর্দ্ধনা জানান। এরপর তিনি আরও দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে দক্ষিণ-দেশের রাজধানী চিয়েন-কাং-এ এসে পৌঁছন এবং সেখানে ভারতীয় ভিক্ষু বুদ্ধভদ্রের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে তাঁর সংগৃহীত পুস্তকাবলী ও ধর্ম্মচিত্রাবলীসমূহ দেখান।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

চাংগান থেকে যাত্রা করে ফা-হিয়েন ছ'বছর পথে কাটিয়ে মধ্যরাজ্যে পৌছন এবং সেখানে ছ'বছরকাল অবস্থান করে আরও তিন বছর কিংতি পথে কাটিয়ে প্রায় ১৫ বৎসর বাদে তিনি চিংচোতে এসে পৌছন। মরুভূমির পশ্চিম দিক থেকে ভারতে পৌছতে প্রায় ৩২টি দেশ তাঁকে অতিক্রম করতে হয়েছে। পথে যেসব শাস্ত্রজ্ঞ ভিক্ষুদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় তাঁদের পুরো বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে চীনদেশের ভিক্ষুদের শুধু এইটুকু জানানই সঙ্গত হবে যে, ফা-হিয়েন তাঁর নিজের জীবন তুচ্ছ করে মরুভূমি, সমুদ্র অতিক্রম করেছেন এবং পথে অনেক দুঃখকষ্ট পেয়েছেন বা অনেক বিপদাপদকে অতিক্রম করে ভগবান বুদ্ধের ঐশ্বরিক করুণাবশেই তিনি নির্বিঘ্নে স্বদেশে ফিরে আসতে পেরেছেন। তাঁর এই দুঃসাহসিক দুঃখকষ্ট, বেদনা ও আনন্দভরা ভ্রমণের ইতিবৃত্ত তিনি লিখে রেখে যাচ্ছেন এই ভেবে যে, গুণী পাঠকেরা তাঁর বর্ণিত ও লিখিত ঘটনাবলীর কথা জানতে পারবেন, উপলব্ধি করতে পারবেন এবং তাঁরই (ফা-হিয়েনের) মতই উপকৃত হবেন।

[ফা-হিয়েন স্ব-লিখিত ভ্রমণকাহিনী যা তিনি নিজের জবানীতে না লিখে ইতিবৃত্তকারে জবান লিখে গেছেন—এই খানেই তার সমাপ্তি, কিন্তু এরপর আরও একটি পরিচ্ছেদ তাঁর সমসাময়িক সহধর্মী ভিক্ষু উপরোক্ত ভ্রমণকাহিনীর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন—নিম্নে সেই পরিচ্ছেদের বিবরণ দেওয়া হ'ল]

* * * *

৪১৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে আমরা শ্রদ্ধেয় ফা-হিয়েনকে সম্বর্দ্ধনা জানাই। তিনি যখন আমাদের সঙ্গে ছিলেন তখন আমরা তাঁকে তাঁর ভারত ভ্রমণবৃত্তান্ত শোনাবার জন্য বার বার অনুরোধ করি এবং এই অনুরোধ রাখতে তিনি স্বীকৃত হন। তিনি আমাদের যা বলেছিলেন তার প্রতিটি বিবরণ আমাদের সত্য বলেই মনে হয়। সেইজন্য আমরা তাঁকে তাঁর বিবৃত সংক্ষিপ্ত ভ্রমণবৃত্তান্তের পুরো ইতিবৃত্ত শোনাতে পুনরায় অনুরোধ করি। তিনি আমাদের সেই অনুরোধও শেষপর্যন্ত রাখেন। তিনি আমাদের বলেছিলেন যে, যখন আমি ভাবতে চেষ্টা করি যে, কিভাবে আমি ভ্রমণ করেছি তখন আমার সারা গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। আমি শিউরে উঠি, আমার দেহ হিম হয়ে আসে। তিনি আরও বলেছিলেন যে, আমি যে এত বিপদের ঝুঁকি নিয়েছিলাম, তা আমার নিজের স্বার্থের জন্য নয়—আমার লক্ষ্য ছিল এক এবং মনপ্রাণ সেই লক্ষ্যের মধ্যে তন্ময় ছিল। সেইজন্যই আমি এমন এক ভ্রমণের সঙ্কল্প নিয়েছিলাম যাতে দশ হাজারের মধ্যে একটা লোকও বেঁচে ফিরে আসে না।

ফা-হিয়েনের বিবরণী শুনে আমরা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। এই ফা-হিয়েনের মত দৃঢ়মনা লোক প্রাচীন যুগে কেন বর্ত্তমান যুগেও বিরল। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম পূর্ব্বেই বহুল-প্রচারিত হয়েছে, কিন্তু ফা-হিয়েনের মত এমন নিঃস্বার্থ ভাবে পূর্ব্বে কেউই ধর্ম্মপুস্তকের সন্ধান করেন নি। এর থেকে আমরা এইটুকু বুঝতে পারি যে, মানুষের ইচ্ছাশক্তি যদি প্রবল থাকে এবং যদি কেউ একমন একপ্রাণ হয়ে কোন কাজে লেগে থাকে তাহলে জয়ী সে হবেই, ফা-হিয়েনও এই কারণেই জয়ী হয়েছেন। অপরে যেটাকে মূল্য দিয়েছেন ফা-হিয়েন সেটাকে মূল্য দেন নি। আবার অপরে যেটাকে মূল্য দেয় নি ফা-হিয়েন সেটাকেই মূল্য দিয়েছেন এবং মূল্যহীনকে অমূল্য দিয়ে বরণ করেছেন।

দেশ-বিদেশের কথা

স্বর্ণময়ী নারী-শিল্পতীর্থ

ময়মনসিংহে ১৯২৯ সনে দরিদ্র ভদ্রমহিলা ও বিধবাদের নানাবিধ সূচিশিল্প, তাঁত এবং প্রাথমিক লেখাপড়া শিক্ষাদানপূর্ব্বক সুষ্ঠু জীবিকা অর্জ্জনের ব্যবস্থা করিয়া দিবার প্রয়াসে স্বর্ণময়ী মহিলা বয়ন বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছিল। এই বিদ্যালয়ের উন্নতির মূলে উদ্যোক্তাগণের শ্রম ও ত্যাগ এবং পরহিতব্রতী দেশবাসীর ও তৎকালীন গবর্ণমেন্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীবৃন্দের সাহায্য, সহানুভূতি ও পরামর্শ ছিল। দেশবিভাগে আজ অনেকের জীবনব্যাপী কর্ম্ম-সাধনার কীর্ত্তিকলাপ বিলুপ্তপ্রায় ও বিচ্ছিন্ন।

বর্ত্তমানে শোচনীয় দুঃখ কষ্টে ও গুরুতর দুর্বিপাকের মধ্যে মধ্যবিত্ত নরনারীর সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে। দেশের ও জাতির উন্নয়নকল্পে প্রত্যেক মধ্যবিত্ত নারীর শিক্ষা-ব্যবস্থা যাহাতে সুপরিকল্পিত কর্ম্মসূচীর ভিতর দিয়া অগ্রসর হয় সে বিষয়ে সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু অর্থ নৈতিক সমস্যায় মধ্যবিত্ত পরিবারের নারীদের শিক্ষাব্যবস্থা অত্যন্ত শিথিল।

বর্ত্তমান অবস্থায় শিক্ষালাভের সুযোগের অভাবে বয়স্কা মেয়েরা নিজেদের পরিবারের গলগ্রহস্বরূপ মনে করিয়া জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া দিন যাপন করিতে বাধ্য হইতেছেন। দেশের ও জাতির উন্নতিকল্পে অবৈতনিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া সুপরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থায় প্রত্যেক নারীকে জ্ঞান, বুদ্ধি ও ধর্ম্মে, স্বাস্থ্য-বিদ্যায় ও শিল্প শিক্ষিত ও সক্ষম করিয়া তুলিবার জন্য প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির অগ্রণী হওয়া কর্ত্তব্য।

এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রণী মাননীয়া জ্যোৎস্নাময়ী দেবী বীরভূম জেলায় শিউড়ী শহরে একখণ্ড ভূমিদান করিয়াছেন। এই বিষয়ে পূর্ব্বপরিচিত পৃষ্ঠপোষক বহু গণ্যমান্য পরহিতব্রতী ভ্রাতা-ভগ্নীদের নিকট হইতে গরীব ও বাস্তুহারা মা-বোনদের শিক্ষাব্যবস্থায় উৎসাহবাণী ও সহায়তালাভের আশ্বাস পাওয়াতে উক্ত স্থানে একটি শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রচেষ্টা চলিতেছে।

উপরোক্ত মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত একান্ত প্রয়োজনবোধে ঢাকুরিয়ার মধ্যবিত্ত ঘরের ও বাস্তুহারা বোনদের শিক্ষাদানকল্পে গত ৮ই নবেম্বর ৭নং সেলিমপুর বাই-লেনে স্বর্ণময়ী শিল্পতীর্থ নামে একটি অবৈতনিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া শিক্ষাদানকার্য্য পরিচালন করা হইতেছে। শিক্ষাদানের সময় প্রতিদিন দিবা ১২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত। মোট ২৫০ জন ছাত্রীকে এখানে ভর্ত্তি করা হইবে। বর্ত্তমানে মোট ছাত্রীসংখ্যা ১৪২ জন হইয়াছে।

এই বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের বিষয়সূচী

(১) পাঠ্যবিষয়	(২) নানাবিধ সূচীশিল্প	(৩) ড্রইং
(১ বাংলা	বুননকার্য্য	চিত্রবিদ্যা
ইংরেজী	কাটিং	বস্ত্রবয়ন
অঙ্ক	টেলারিং	রংকরা
ইতিহাস	পিক্টোগ্রাফী	কেলিকো প্রিন্টিং
ধর্ম্মশাস্ত্র	চামড়ার কাজ	চরকা কাটা
স্বাস্থ্য ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিদ্যা		
(২) হিন্দী ভাষা		

এইরূপ একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বাড়ী থাকা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ সবিশেষ তৎপর হইয়াছেন।

ডাঃ প্রকাশচন্দ্র দাস

বিগত ৯ই সেপ্টেম্বর রাচি মানসিক ব্যাধি হাসপাতালের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ডাঃ প্রকাশচন্দ্র দাস মহাশয় তাঁহার পুরুলিয়া রোডস্থিত বাসভবনে করোনারি থ্রম্বসিস রোগে অকস্মাৎ দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৬৮ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তিনি স্ত্রী, এক পুত্র ও কন্যা এবং নাতি-নাতনী রাখিয়া গিয়াছেন। ডাঃ দাস ১৮৮৯ সালে মীরাটে জন্মগ্রহণ করেন। আগরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এস-সি অবধি অধ্যয়ন করিবার পর তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ছাত্ররূপে আগমন করেন এবং ১৯১৬ সনে এখান হইতেই এম-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তদনন্তর তিনি বিহার মেডিক্যাল সার্ভিসে যোগদান করেন এবং সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরকাল বিভিন্ন জেলায় সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করেন। মনস্তত্ত্ববিদ চিকিৎসকরূপে এককালে তিনি বিহারে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। এতদ্ব্যতীত চক্ষুরোগের চিকিৎসায়ও তাঁহার কিঞ্চিৎ পারদর্শিতা ছিল। মস্তিষ্কের ব্যাধি, বামহস্ত প্রবণতা এবং হুকওয়ার্ম অসুখ সম্পর্কে তাঁহার কয়েকটি সুন্দর রচনা আছে। সততা, সত্যবাদিতা ও সামাজিক সৌজন্যের জন্য তিনি সকলের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন।

দেখুন! অর্দ্ধেকটী সানলাইট
সাবানেই এসব কাচা
হয়েছে!
অতিরিক্ত ফেণার দরুণই
এ সম্ভব হয়
SUNLIGHT SOAP
SUNLIGHT SOAP
সানলাইট
সাবান
জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে কাচে
S. 249-X52 BG

সিপাহী বিদ্রোহের শতবার্ষিকী উপলক্ষে ইডেন গার্ডেন প্রদর্শনীতে বঙ্গীয় মূক-বধির সঙ্ঘের সভ্যগণ কর্ত্তৃক যে ষ্টল পরিচালিত হয় তাহাতে কংগ্রেস সভাপতি শ্রী ইউ. এন. ডেবর আগমন করিলে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জানান হইতেছে

শ্রীদিলীপকুমার নন্দী (সেক্রেটারী) শ্রী ইউ. এন. ডেবরকে সম্বর্দ্ধনা ও মূক-বধিরদের প্রতি সহানুভূতির আবেদন জানান। শ্রীনলিনীমোহন মজুমদার (নেহরুর ছবির নীচে) দোভাষীর কাজ করিয়া শ্রীডেবরকে সমস্ত বুঝাইয়া দেন।

ফুলের মত...
আপনার লাবণ্য রেক্সোনা
ব্যবহারে ফুটে উঠবে
রেক্সোনা সাবানে আছে ক্যাডিল
অর্থাৎ ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্যে
তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা
আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে
বিকশিত করে তুলবে।
Rexona
BLENDED WITH CADYL
একমাত্র ক্যাডিলযুক্ত টয়লেট সাবান
RP. 150-X52 BG
রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারী লিঃ, এর পক্ষে ভারতে প্রস্তুত

নয়ান বৌ—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য পাঁচ টাকা।

বিভূতি মুখোপাধ্যায় বলিতে স্মিতহাসিমণ্ডিত যে রচনার কথা প্রথমেই আমাদের মনে জাগিয়া ওঠে বইখানি তাহা হইতে ভিন্নধরনের। "নয়ান বৌ" উপন্যাস এবং উপন্যাসখানি করুণরসাত্মক। বিভূতিভূষণের স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকহাস্য ইহাতে নাই এমন নয়, তবে সমগ্রভাবে ধরিতে গেলে অশ্রুর সহিত ইহার সম্পর্ক অধিক। বৃহত্তর বাঙ্গালীসমাজের মধ্যে আরও কত সমাজই যে লুকাইয়া আছে তাহার খবর আমরা কতটুকু রাখি? চৈতন্যদেবের ধর্ম্ম যাহারা গ্রহণ করিয়াছে সচরাচর তাহাদেরই আমরা বৈষ্ণব বলি। বহু জাতির সমবায়ে আমাদের সমাজ। জাত-বৈষ্ণব বলিয়া যাহারা বঙ্গ-সমাজের অঙ্গীভূত হইয়া আছে সেই সম্প্রদায়ের লোকের সংখ্যা অল্প নয়। তাহাদের রীতি-নীতি আচার-আচরণ কতকটা ভিন্ন। লেখক সেই সম্প্রদায়ের ছবি আঁকিয়াছেন। গ্রন্থের নায়িকা এই সম্প্রদায়ভুক্ত। যে অভিজ্ঞতা থাকিলে শুধু বাহিরটা নয় মনের দিকটাও প্রকাশ করা যায়, এই সম্প্রদায় সম্পর্কে লেখকের সেই অভিজ্ঞতা শুধু যথেষ্ট নয় যথাযথ। অভিজ্ঞতার প্রাচুর্য্য উপন্যাসখানিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। উপন্যাসে অনেকগুলি চরিত্র আছে।
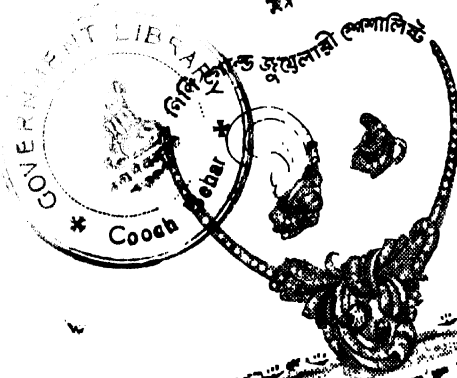
নায়িকা নয়ান বৌকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্যই অন্য সব চরিত্রের অবতারণা। এমন-কি নায়ক অনঙ্গকেও মুখ্য চরিত্র বলিতে পারা যায় না। নয়ান বৌয়ের চরিত্রাঙ্কনে লেখক সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

উপন্যাসে মনোভাবের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ আধুনিক প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিভূতিভূষণ সে প্রথার অনুবর্ত্তী নহেন। সংলাপের মধ্য দিয়া চারিত্রিক বিবর্তন প্রদর্শন তাঁহার লেখার বৈশিষ্ট্য। যাহার মুখে যে কথা এবং যে-ধরনের কথা শোভা পায় তাহার মুখে তাহাই বসাইয়া তিনি কৌতূহল উদ্দীপ্ত করেন। নাটকীয় মাধুর্য্য আছে বলিয়াই তাঁহার গল্পে-উপন্যাসে কথা-বার্ত্তার অংশ পাঠকের এত রুচিকর। উপন্যাসে লেখক যে সব চরিত্র আঁকিয়াছেন তাহাদের সবগুলির মধ্যেই কিছু-না-কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। গোঁসাই ঠাকুরের চরিত্রটি আমাদের বড় ভাল লাগে। পাঠান্তে বিচারশীল পাঠক মনে মনে বলিতে পারেন, উপন্যাসখানিকে হয়ত ট্র্যাজেডি না করিলেও চলিত। "কপালকুণ্ডলা"র নারীমনের মূলগত ঔদাসীন্যের মধ্যে এবং "ওথেলো" নাটকে ওথেলোর চরিত্রের মধ্যে ট্র্যাজেডির বীজ নিহিত। ঘটনার অবশ্যম্ভাবিতার দিক দিয়া বলিবার কিছু নাই, কিন্তু চরিত্রের দিক দিয়া যে অনিবার্য্যতা কাহিনীকে ট্র্যাজেডির দিকে লইয়া যায় সেই অনিবার্য্যতা সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান আছে কি না তাহাই বিবেচ্য। ট্র্যাজেডি হোক বা যাহাই হোক শেষ পর্য্যন্ত কাহিনীর আকর্ষণ কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। পরিবেশের নূতনত্বে বইখানি আরও চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছে। স্বকীয়তায় প্রোজ্জ্বল ছোট গল্পের গল্পকার হিসাবেই শুধু নয়, বিশিষ্ট উপন্যাসিক হিসাবেও শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। "নয়ান বৌ" উপন্যাসে সেই প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

মহানগরীর উপাখ্যান—শ্রীকরুণাকণা গুপ্তা। সাহিত্য-সংসদ, ৩২এ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—৯। মূল্য—২৷০ টাকা।

চার্লস ডিকেন্সের সুবিখ্যাত উপন্যাস এ টেল অব টু সিটিজ এর ছায়ানুসরণে লিখিত। বিদেশীয় নাম, নগর বা ঘটনাগুলিকে সম্পূর্ণ দেশী ছাঁচে ঢালিয়াছেন লেখিকা। ফ্রান্সের গণবিদ্রোহের পরিবর্তে বরেন্দ্রভূমির কৈবর্ত বিদ্রোহ বাছিয়া লওয়া হইয়াছে আর পাটলিপুত্র অবন্তীপুরের রাজ প্রতাপের সঙ্গে গৌর তাম্রলিপ্তির একটি করুণ ঘটনা যুক্ত হইয়া চমৎকার একটি কাহিনী রচিত হইয়াছে। ভাষা সাবলীল। ঘটনা সংস্থাপনে, চরিত্র-চিত্রণে, যুগোপযোগী আবহাওয়া সৃজনে—লেখিকার মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। বইখানি যে জনাদর লাভ করিয়াছে দ্বিতীয় সংস্করণই তার প্রমাণ।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

আপন প্রিয়—শ্রীরমাপদ চৌধুরী। প্রকাশক শ্রীকানাইলাল সরকার। ১৭৭এ, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা—৪। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯৪; দাম তিন টাকা।

গ্রন্থখানি লেখকের ছোট গল্পের চমৎকার একটি সংকলন। তাঁর যে গল্পগুলি তাঁর কাছে প্রিয় সংকলনটি সেগুলির। প্রত্যেকটি গল্পই যে রসোত্তীর্ণ হয়েছে এ কথা পাঠকমাত্রেই স্বীকার করবেন। ভাবের প্রকাশভঙ্গী ও উপমায়, ভাষার লালিত্যে ও শব্দচয়নে রচনাগুলি অনবদ্য হয়ে উঠেছে। "রেবেকা সোরেনের কবর", "সতীঠাকরুণের চিতা", "ঝুমরা বিবির মেলা" গল্প কয়টি অপরাপর গল্পগুলির মত রোমান্টিক হলেও বাংলার খনিপ্রধান অঞ্চলের শ্রমিক সমাজের যে চিত্র সেগুলিতে অঙ্কিত হয়েছে, তাতে লেখকের প্রশংসনীয় শক্তি যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি গভীর চিন্তারও বিষয় আছে। শিক্ষার অভাবে, অন্ধসংস্কারে দিনরাত সেখানে ঘটছে মনুষ্যত্বের অবমাননা। এদিক দিয়ে বিচার করলে বলতে হয় লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী কল্যাণময়। যাঁরা উৎকৃষ্ট ছোট গল্প পাঠ করতে ব্যাকুল গ্রন্থখানি যে তাঁদের প্রচুর আনন্দদান করবে এতে আর সন্দেহ নেই।

রত্নদ্বীপ—শ্রীহরিদাস ঘোষ। এ মুখার্জি এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২। দ্বিতীয় সংস্করণ। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৯৪; দাম আড়াই টাকা মাত্র।

গল্পকার রবার্ট লুই ষ্টিভেনসনের "ট্রেজার আইল্যাণ্ড" একখানি বিশ্ব-বিখ্যাত গ্রন্থ। আমাদের দেশে গ্রন্থখানির একাধিক অনুবাদ আছে। লেখক মূল গ্রন্থখানি অবলম্বন করে আলোচ্যমান গ্রন্থখানি রচনা করেছেন। লেখকের ভাষা মর্যাদাশালী, রচনাভঙ্গী সুন্দর। বাংলার কিশোর মহল গ্রন্থখানি পাঠে যথেষ্ট আনন্দ লাভ করবে।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস (প্রাইভেট) লিঃ, ১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

বিষয়-সূচী—অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪

বিষয়-সূচী—অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪

রঙীন ছবি

ব্রতচারী নৃত্য

শ্রীসতীন্দ্রনাথ লাহা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

কর্ম্মের সন্ধানে

[ফোটো : শ্রীসুনীল দাস

আদিবাসী জননী

[ফোটো : শ্রীসুনীল দাস

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৭শ ভাগ, ২য় খণ্ড | অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪ | ২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

দেশের অবস্থা

দিল্লীর ছত্রপতির দল এবং তাঁহাদের সহায়ক বিদগ্ধমণ্ডলী, কথার তুবড়ী ছুটাইয়া আকাশ-বাতাস গরম করিয়া তুলিতেছেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার স্বপ্নে তাঁহারা মাতোয়ারা, দেশের দিকে সাদা চোখে তাকাইবার অবসর তাঁহাদের কোথায় ?

আমরা ভবিষ্যতের গণনা জানি না, সুতরাং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেশের কি উন্নতি হইবে তাহা বলিতে পারি না, এমন-কি তাহা আদৌ দিবাস্বপ্নের রাজত্ব হইতে বাস্তব জগতে মূর্ত্ত হইবে কিনা তাহাও জানি না। আমরা বুঝি নিকট-অতীতের ফলাফল এবং অতি সাধারণ জনের চক্ষে দেখিতে পাই বর্ত্তমানের কঠোর বাস্তবকে, এবং সেই প্রত্যক্ষদর্শন ও অভিজ্ঞতার ফলে আমরা বিচার করিতে চেষ্টা করি দেশের অবস্থা ব্যবস্থার।

সেইরূপ বিচারে আমরা দেখিতেছি যে, দেশের লোকের—বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র গৃহস্থের—অবস্থা ক্রমেই অবনতির পথে চলিতেছে। প্রথম্ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার নির্দ্দিষ্টকাল উত্তীর্ণ হইবার পর আমরা তাহার সাফল্য সম্বন্ধে অনেককিছুই শুনিয়াছিলাম এবং পড়িয়াছিলাম। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে, উহার অর্দ্ধেক অসম্পূর্ণ, অর্থাৎ যাহা সফল হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল তাহার কার্য্যক্রম সময়মত শেষ হয় নাই, হয়ত এত দিনে শেষ হইতেছে। বাকি অংশের অর্দ্ধেক, অর্থাৎ পূর্ণ পরিকল্পনার এক-চতুর্থাংশ সফল হইয়াছে এবং তাহাতে সাময়িক ও আঞ্চলিক উন্নয়ন কিছু হইয়াছে। শেষ চতুর্থাংশ সম্বন্ধে যাহা লিখিত ও ঘোষিত হইয়াছিল তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। কিন্তু খরচের খাতে পূর্ণ পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরের জন্য যে খরচ বরাদ্দ করা হইয়াছিল, ঐ পাঁচ বৎসরে তাহা অপেক্ষা বেশ কিছু অধিকই খরচ হইয়াছে। অবশ্য ঐ খরচের মধ্যে চুরি কতটা, অপচয় কতটা এবং যথাযথ ভাবে খরচ হইয়াছে কতটা, সে হিসাব কিছু নিকাশ করা হয় নাই—এবং কোনদিন যে হইবে তাহা বলা যায় না।

কিন্তু দেশের লোকের দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক পরিবর্ত্তন কোন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী চলিতেছে না। যেদিন দিল্লীর মসনদে এবং মন্ত্রিসভায় বর্ত্তমান অধিকারীবর্গ আসীন হইলেন এবং তাঁহাদের তত্ত্বাবধায়ক রূপে উচুনীচু দুই স্তরে আমাদের মনোনীত বিধায়কবর্গ বসিলেন, সেই দিন হইতেই দেশের নৈতিক মানের শনৈঃ শনৈঃ অধঃপতন আরম্ভ হইল। তাহার পর আসিল খাদ্যাভাব ও বস্ত্রাভাব, যাহার ফলে দৈহিক ও মানসিক মানের অবনতিও দ্রুত হইল। তাহার পর প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেশে অনাচারের বানের জল ঢুকিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনার ষোল-কলা পূর্ণ হইলে দেশের কি হইবে তাহার নিদর্শন আজ আমরা হাড়ে হাড়ে পাইতেছি।

কর্ত্তাব্যক্তিরা জিদ ধরিয়াছেন যে, দেশের লোক মরুক বা বাঁচুক, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পূর্ণ করিতে হইবেই, দেশ যায় যাক উৎসন্নে। অবশ্য তাঁহারা আশা দিয়াছেন যে, যদি দেশের লোক এই ভীষণ দ্বিতীয় অগ্নিপরীক্ষা পার হইতে পারে তবে তাহাদের আয় শতকরা ২৫ ভাগ বাড়িয়া যাইবে। তাহাদের ব্যয়, মূল্যবৃদ্ধি, চোরাবাজার ইত্যাদির জন্য, কতটা বাড়িবে সে বিষয়ে অবশ্য তাঁহারা কিছুই বলেন নাই।

আজ গৃহস্থের অন্নবস্ত্র, আশ্রয়, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদি প্রত্যেকটি অত্যাবশ্যক জিনিষের নিদারুণ অভাব ও অনটন। আয় অপেক্ষা ব্যয়বৃদ্ধিই চতুর্দ্দিকে। ফলে, তাহার জীবনযাত্রার মান ক্রমেই নামিয়া যাইতেছে। এ অবস্থায় তাহার মনের জোর কতদিন থাকিবে যে, সে নীতির নির্দ্দেশ মানিয়া চলিতে পারিবে ?

আমরা দেখিতেছি, দেশ চাটুকারতন্ত্রের অধিকারে আসায় সৎ লোক প্রত্যেক পদেই মার খাইতেছে, অসৎ লোকেরই জয়জয়কার। পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে যাহা সম্ভব নহে তাহা খোসামোদে, চুরিতে, ঘুষে এবং ন্যায়ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিলে সহজে লভ্য। উপরন্তু দেখিতেছি যে, সমাজের প্রত্যেক স্তরেই যাহারা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে উৎপীড়ন করিতে প্রস্তুত, তাহাদেরই রাজত্ব। এমনকি জেলখানায় পর্য্যন্ত জলসা, পূজা ইত্যাদির নামে কয়েদীদের সামান্য দৈনিক চার-ছয় আনা মজুরীরও বড় অংশ জেল কর্ম্মচারীর সহযোগে জোর-জবরদস্তি আদায় করা হয়। তাহাদের গরীব পরিবার-পরিজন যে মাসিক দুই-চার টাকা পাইত তাহাও বন্ধ হইতে চলিয়াছে।

পরিকল্পনার বিপত্তি

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অর্থের অভাবে প্রায় ম্লানচাল হইয়া যাইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে। বৈদেশিক মুদ্রা ও মূলধনের অভাবই বর্ত্তমানে প্রধান সমস্যা। প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে পরিকল্পনার প্রগতি ব্যাহত হইতেছে এবং পরিকল্পনার কিছু অংশ হয়ত বাদ দিতে হইবে। বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন প্রথমে ১২০০ কোটি টাকায় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, কিন্তু অর্থমন্ত্রী তাঁহার আমেরিকা ভ্রমণকালে ঘোষণা করেন যে, প্রায় ২০০০ কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্য প্রয়োজন। তাহা না হইলে পরিকল্পনা সাফল্যলাভ করিবে না। শিল্প-মূলধন প্রধানতঃ দুই প্রকারের—বৈদেশিক ও আভ্যন্তরিক। বৈদেশিক বাণিজ্যে লাভ ও বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ দ্বারা বৈদেশিক মূলধন গঠিত হয়, তথাপি বাণিজ্যিক লাভই প্রধান। বৈদেশিক লেনদেনের গতি অনুকূল থাকিলে বৈদেশিক ঋণ পাওয়া যায়, কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি থাকিলে ঋণ পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে, কারণ ঋণগ্রহীতার পরিশোধ করার ক্ষমতা না থাকায় দাতারা ঋণ দিতে চাহে না। বর্ত্তমানে আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতির নীতি ও গতি অবশ্য আন্তর্জ্জাতিক অর্থনৈতিক ঋণদানকে বহুল পরিমাণে প্রভাবান্বিত করে।

গত সাত বৎসরে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যে ৮০২ কোটি টাকার ঘাটতি হইয়াছে এবং চলতি বৎসরে প্রায় ২৭৫ কোটি টাকার মত ঘাটতি হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে; সুতরাং বহির্ব্বাণিজ্যে লাভের দ্বারা বৈদেশিক মূলধন গঠন সুদূরপরাহত। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যকে কোনও প্রকারেই বৃদ্ধি করিতে পারে নাই। সুতরাং ভারতীয় পরিকল্পনার গোড়ায়ই গলদ ছিল। রাশিয়ার পরিকল্পনা-নীতি হইতে ভারতের দুইটি জিনিষ শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত ছিল। তাহা হইলে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ আজ যেভাবে হাবুডুবু খাইতেছেন অতখানি বিব্রত হইতে হইত না। অনুন্নত দেশের পক্ষে পরিকল্পিত অর্থনীতির মূল ভিত্তি হওয়া উচিত মৌলিক শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও বিদ্যুতিকরণ। ভিত্তিমূলক শিল্পের উন্নয়ন ব্যতীত পরিকল্পিত অর্থনীতির সাফল্য অসম্ভব। প্রথম পরিকল্পনায় মৌলিক ও ভিত্তিমূলক শিল্পের পরিকল্পনা ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না এবং প্রধানতঃ এই কারণে প্রথম পরি-কল্পনার অর্থনৈতিক সাফল্য কার্য্যতঃ তেমন কিছু দেখা যায় না, যদিও কাগজে-কলমে অবশ্য অনেক কিছুই দেখান হয়। এই সময়ে বৃদ্ধি পাইয়াছে মানুষের অভাব-অনটন, বেকার-সমস্যা, দ্রব্যমূল্য প্রভৃতি। রাশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে প্রধানতঃ মৌলিক ও ভিত্তিমূলক শিল্প-প্রতিষ্ঠা দ্বারা। প্রাকৃতিক প্রাচুর্য্যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পরই ভারতের স্থান, সুতরাং মৌলিক শিল্প-প্রতিষ্ঠার দিকে ভারতের বহু পূর্ব্বে নজর দেওয়া উচিত ছিল।

ভারতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দ্বিতীয় প্রধান দোষ এই যে, ইহাতে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাবোধের অভাব পরিলক্ষিত হয়; কথায় বলে আগের কাজ আগে, পরের কাজ পরে। ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার অনটন প্রথম পরিকল্পনার গোড়াতেই ধরা পড়ে; সুতরাং তখন হইতেই সাবধান হইলে আজ এই অবস্থা আসিত না। শিল্প-প্রতিষ্ঠার দিকে যথোচিত নজর না দিয়া যানবাহন বিস্তৃতির দিকে অযথা নজর দেওয়া হইয়াছে এবং ইহার ফলে বৈদেশিক মুদ্রার আয়বৃদ্ধির প্রচেষ্টা শুধু উপেক্ষিত হয় নাই, বৈদেশিক মুদ্রার খরচ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতীয় রেলপথের বৈদ্যুতিকীকরণ পরি-কল্পনার ব্যসন মাত্র, বাষ্পচালিত রেলযান আরও দশ বৎসর থাকিলে ভারতের কোন ক্ষতি হইত না, কিন্তু বৈদ্যুতিকীকরণের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা অপূরণীয়। এই অর্থের দ্বারা দেশে আরও একটি ইঞ্জিন নির্ম্মাণের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত এবং তাহাতে কোটি কোটি বৈদেশিক মুদ্রাব্যয়ে বিদেশ হইতে রেলের ইঞ্জিন এবং গাড়ী আমদানী করার প্রয়োজন হইত না। জাপান ভারতবর্ষ হইতে লৌহ আকর আমদানী-পূর্ব্বক ইঞ্জিন তৈয়ার করিয়া আবার ভারতবর্ষেই রপ্তানী করিতেছে, আর লৌহ আকর রপ্তানী করিয়াই ভারতবর্ষ ক্ষান্ত থাকিতেছে। বৎসর দুয়েক পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চিত্তরঞ্জন কারখানায় ইঞ্জিন উৎপাদনের খুব ঘোষণা করা হইত। ইহার এক শততি ইঞ্জিন নির্ম্মাণ পর্য্যন্ত জানা যায়। তাহার পর আর কয়টি ইঞ্জিন তৈয়ারি হইয়াছে সে খবর দেওয়া হয় নাই। বৎসরে ইহার ১৫০।২০০টি ইঞ্জিন উৎপাদন করার কথা এবং বলা হইয়াছিল যে, ভারতবর্ষ বিদেশ হইতে আর রেল ইঞ্জিন আমদানী করিবে না। কিন্তু ১৯৫৭ সনে ভারতবর্ষ বিশ্বব্যাঙ্ক হইতে প্রায় ৪৫ কোটি টাকা (৯ কোটি ডলার) ধার লইয়াছে বিদেশ হইতে ইঞ্জিন আমদানী করার জন্য। বৈদেশিক ঋণের উপর অতিরিক্ত হারে সুদ দিতে হয় এবং তাহার ফলে আসলের প্রায় দ্বিগুণ টাকা পরিশোধ করিতে হয়।

পশ্চিম জার্ম্মানীর শিল্প-উন্নয়নের জন্য আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রায় দুই বিলিয়ান ডলার অর্থাৎ প্রায় এক হাজার কোটি টাকা সাহায্য দিয়াছিল এবং তাহার ফলে পশ্চিম জার্ম্মানী বর্ত্তমানে রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে আমেরিকার পরই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতের ক্ষেত্রে আমেরিকার কার্পণ্যের কারণ ভারতের স্বাধীন বৈদেশিক নীতি, যাহা আমেরিকার মনঃপূত নহে। সেই কারণে ভারতের পক্ষে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করার অপেক্ষা নিজের উপর নির্ভর করা শ্রেয়ঃ। তাহার একমাত্র উপায় হইতেছে, অন্যান্য ব্যয় বর্ত্তমানে বন্ধ করিয়া দিয়া মৌলিক ও ভিত্তিমূলক বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠা করা। ইহাতে অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ যন্ত্রশিল্পে স্বাবলম্বী হইতে পারিবে এবং যন্ত্রপাতি রপ্তানি দ্বারা বহু প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জন করিতে পারিবে।

শিল্পনীতিতে ন যযৌ ন তস্থৌ নীতি ভারত সরকারের পক্ষে অবশ্যপরিহার্য্য। ক্ষুদ্রায়তন ও বৃহদায়তন শিল্পের পরস্পরবিরোধী নীতির আবর্ত্তে পড়িয়া বৃহদায়তন শিল্পপ্রগতি ব্যাহত হইতেছে।

আজ ভারতের পক্ষে বহির্বাণিজ্যে রপ্তানি বৃদ্ধি অতি অবশ্য প্রয়োজনীয় কারণ তাহার ফলেই অধিকতর পরিমাণে ভারতবর্ষ বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জ্জন করিতে পারিবে। সুতরাং বৃহদায়তন শিল্প-উৎপাদন ও বিস্তৃতি ব্যাপারে কোনরূপ বাধানিষেধ আরোপ করা উচিত নহে।

রাজস্ব-বাঁটোয়ারা

১৯৪৭ সনের অব্যবহিত পর হইতেই পশ্চিমবঙ্গ রাজস্ব-বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে আপত্তি জানাইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে কেবলমাত্র আয়কর ও পাট রপ্তানী-শুল্ক কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির মধ্যে ভাগ হইত; আয়করের অংশ সকল প্রদেশ পাইত, আর পাট রপ্তানী-শুল্ক কেবলমাত্র পাট-উৎপাদক প্রদেশগুলি পাইত। ১৯৩৫ সনে নিমেয়ার বাঁটোয়ারা অনুসারে বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের আয়করের প্রত্যেকের অংশ ছিল বিভাজ্য অংশের ২০ শতাংশ। কিন্তু বাংলা ভাগের পর বাংলার অংশ ২০ শতাংশ হইতে ১২ শতাংশে হ্রাস করিয়া দেওয়া হয়। কারণ দেখান হয় যে, বিভক্ত বাংলা আকারে ও জনসংখ্যায় অনেক ছোট হইয়া গিয়াছে। বাংলাদেশ অবশ্য খুব আপত্তি জানায়, এবং ইহার ফলে দেশমুখ বাঁটোয়ারায় বাংলাদেশের আয়করের অংশ নামমাত্র, অর্থাৎ ১২ শতাংশ হইতে ১৩·৫ শতাংশে বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়। আর পূর্ব্বে বাংলা পাট-রপ্তানী-শুল্কের দুই-তৃতীয়াংশ পাইত। দেশমুখ বাঁটোয়ারায় পাট রপ্তানী-শুল্কের আংশিক বাঁটোয়ারার পরিবর্ত্তে ১·০৫ কোটি টাকা পশ্চিমবঙ্গের অংশ হিসাবে নির্দ্ধারিত।

সংবিধানে বলা হয় যে পাট-শুল্কের পরিবর্ত্তে দেয় সাহায্য অর্থ ১৯৬০ সনের পর সংশ্লিষ্ট প্রদেশগুলিকে আর দেওয়া হইবে না। প্রথম রাজস্ব বাঁটোয়ারা কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের জন্য আয়করের বিভাজ্য অংশের ১১·২৫ নির্দ্ধারিত হয়। এই নির্দ্ধারণ করা হয় ৮০ শতাংশ জনসংখ্যার ভিত্তিতে আর ২০ শতাংশ আয়কর আদায়ের ভিত্তিতে। ১৯৫১ সনের রাজস্ব-বাঁটোয়ারা কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে মোট আয়কর আদায়ের ৫৫ শতাংশ রাজ্যগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। ১৯৫৭ সনে দ্বিতীয় রাজস্ব-বাঁটোয়ারা কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে রাজ্যগুলির আয়করের প্রাপ্য অংশ ৫৫ শতাংশ হইতে ৬০ শতাংশে বৃদ্ধি করা হইয়াছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের অংশ হইতে অনেক হ্রাস পাইয়াছে। নূতন সিদ্ধান্ত অনুসারে আয়করে পশ্চিমবঙ্গের অংশ ১১·২৫ শতাংশ হইতে হ্রাস পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ১০·০৮ শতাংশে। এই হ্রাসের প্রধান কারণ, দ্বিতীয় রাজস্ব-বাঁটোয়ারা কমিশন রাজ্যগুলির প্রাপ্য অংশ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ৯০ শতাংশ জনসংখ্যার ভিত্তিতে এবং বাকী ১০ শতাংশ আদায়ীকৃত অর্থের ভিত্তিতে। নূতন হিসাবের ফলে যে দুইটি রাজ্য হইতে আয়করের প্রধান অংশ আদায় হয় যথা: পশ্চিমবঙ্গ ও বোম্বাই। ইহাদের প্রাপ্য অংশ হ্রাস পাইয়াছে। কারণ জনসংখ্যার ভিত্তির পরিমাণ বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। বোম্বাই ও পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি হইতে অল্প, ফলে এই দুইটি রাজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে; আর লাভ করিয়াছে সেই সকল রাজ্য যেখান হইতে আয়কর আদায়ের পরিমাণ অত্যল্প। কেবলমাত্র ব্যক্তিগত আয়কর ভাগ করিয়া দেওয়া হয়, কোম্পানী হইতে আদায়ীকৃত আয়করের সমস্তটাই কেন্দ্র রাখেন। উত্তরপ্রদেশের জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশী। সেজন্য উত্তরপ্রদেশ সবচেয়ে বেশী পরিমাণে আয়করের অংশ পাইয়াছে।

জনসংখ্যার পরিমাণ ১৯৫১ সনের আদমসুমারী অনুসারে ধরা হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যে প্রায় ৫০ লক্ষ কি ততোধিক ব্যক্তি উদ্বাস্তু হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছে, তাহার হিসাব কমিশন করেন নাই; সেই হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের আয়করের অংশ আরও অধিক হইত। এই দিক দিয়া পশ্চিমবঙ্গের উপর অবিচার করা হইয়াছে। বোম্বাই ও পশ্চিমবঙ্গের গড়পড়তা মাথাপিছু রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ সর্ব্বাধিক, অর্থাৎ ভারতবর্ষে এই দুইটি রাজ্যই সর্ব্বাধিক হারে করভারে প্রপীড়িত। এই বিষয়ে কমিশন কোনপ্রকার উদারতা দেখান নাই। পশ্চিমবঙ্গে গড়পড়তা মাথাপিছু রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ১১·৩ টাকা। ইহা অবশ্য অত্যধিক।

পশ্চিমবঙ্গ প্রকৃতপক্ষে একটি সমস্যাসঙ্কুল প্রদেশ; উদ্বাস্তু, শিক্ষিত বেকার-সমস্যা, সরকারী ঋণ, খাদ্যাভাব প্রভৃতির চাপে এই প্রদেশ বিব্রত। গত বৎসর পর্য্যন্ত ২৫·৫৫ কোটি টাকার মত পশ্চিমবঙ্গের রাজস্ব ঘাটতি হইয়াছে। গত পাঁচ বৎসরে অতিরিক্ত করধার্য্য দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের ৩৬·৯ কোটি টাকা তোলার কথা ছিল, কিন্তু মোটে সাড়ে চার কোটি টাকা এই কয় বৎসরে উঠিয়াছে। ভারতীয় সংবিধানের ২৭০ ধারা অনুসারে প্রতীয়মান হয় যে, আয়কর যে প্রদেশে যে পরিমাণে আদায় হয় তাহার কিছু অংশ কেন্দ্র রাখিবে এবং বাকী অংশ সংশ্লিষ্ট প্রদেশকে দেওয়া হইবে। এক প্রদেশের আদায়ীকৃত অর্থ অন্য প্রদেশকে দান করিবার কথা সংবিধানের ভাষা হইতে প্রতীয়মান হয় না। প্রথম রাজস্ব-বাঁটোয়ারা কমিশন, অর্থাৎ নিয়োগী কমিশন এই যুক্তি গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন এবং ইহার ফলে যত বিভ্রাট দেখা দেয়।

দ্বিতীয় রাজস্ব-বাঁটোয়ারা কমিশন জনসংখ্যার ভিত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দিয়া সে অন্যায়কে আরও প্রকট করিয়া তুলিয়াছেন। উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন খনি হইতে যথেষ্ট আয় হয়। সেই তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের খনি হইতে আয় হয় অত্যল্প। উত্তরপ্রদেশের ভূমিরাজস্ব আদায় হয় ২০ কোটি টাকা, আর সেই তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে হয় মাত্র ৪·৫ কোটি টাকা। পাট রপ্তানী-শুল্কের অধিক পরিমাণ বাংলা ও আসামের প্রাপ্য, কিন্তু ১৯৬০ সন হইতে এই প্রদেশগুলি পাট রপ্তানী-শুল্কের কোনও অংশ পাইবে না। ভারতবর্ষে চা উৎপাদন ও রপ্তানীর প্রায় ৭০ শতাংশ আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে হয়; চা রপ্তানী-শুল্কের বেশ কিছু অংশ এই দুইটি প্রদেশের প্রাপ্য কিন্তু এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও

রাজস্ব-বাঁটোয়ারা কমিশন আশ্চর্যাজনকভাবে নীরব। পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম যাহাতে চা রপ্তানী-শুল্কের অংশ পায় তাহার জন্য দাবি করা উচিত।

কলিকাতায় বাসগৃহের সমস্যা

কলিকাতায় বাসগৃহের সমস্যা বিশেষ তীব্ররূপে দেখা দিয়াছে। গত বার বৎসর যাবত এই সমস্যা বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু যতই দিন যাইতেছে উত্তরোত্তর সমস্যার জটিলতা ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত জনসাধারণের উপর শহরের বাসস্থানের অভাব বিশেষভাবে পড়িয়াছে।

কলিকাতায় বাসগৃহের সমস্যার বহুবিধ কারণ রহিয়াছে। যুদ্ধোত্তর যুগে কলিকাতার লোকসংখ্যা যে দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাইয়াছে সেই অনুপাতে নূতন বাড়ী তৈয়ার হয় নাই—সমস্যার বর্ত্তমান তীব্রতার কারণ প্রধানতঃ ইহাই। বাড়ী নির্ম্মাণের পথে প্রধান বাধা হইতেছে গৃহনির্ম্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দুর্মূল্যতা। জমি, ইট, সিমেন্ট, কাঠ এবং অন্যান্য গৃহনির্ম্মাণোপযোগী দ্রব্যের এরূপ অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে যে, সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে কলিকাতায় গৃহনির্ম্মাণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। নানারূপ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার জন্য বিত্তবানদের পক্ষেও বাড়ী করা সহজসাধ্য নহে। তবে যে কয়েকজন ভাগ্যবান এবম্বিধ অসুবিধা সত্ত্বেও কলিকাতায় নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হয় তাহারা প্রকৃত ব্যবসায়ীর ন্যায় এই সকল বাড়ী অতি উচ্চ মূল্যে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী অথবা বিদেশী চাকুরিয়াদের ভাড়া দেয়। কলিকাতায় বাঙ্গালীদের পক্ষে বাড়ী পাওয়া সেহেতু বিশেষ দুষ্কর হইয়াছে। সাধারণভাবে কলিকাতার উন্নতি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃই একের পর এক অঞ্চল হইতে বাঙ্গালীরা হটিয়া যাইতে বাধ্য হইতেছে। কোন কোন অঞ্চলে বাঙ্গালীরা এরূপভাবে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে যে, সে স্থানে গিয়া কাহারও পক্ষে চিন্তা করাই কঠিন যে, সে বাংলা দেশে বাস করিতেছে। অঞ্চলবিশেষে যখন জমি বিক্রয় হয় তখন অবাঙ্গালীরা প্রয়োজন হইলে ষাট হাজার টাকা কাঠা পর্য্যন্ত দাম দিয়া সেই জমি কিনিয়া লয়।

এই অবস্থায় কলিকাতা বাঙালীদের শহর থাকিবে কিনা এই প্রশ্নের উত্তর জানিবার সময় আসিয়াছে। যদি কলিকাতায় বাঙ্গালী মধ্যবিত্তদের বাস রাখিতে হয় তবে অবিলম্বে কোন হাউসিং বোর্ড বা সরকারী প্রতিষ্ঠানের মারফত যথেষ্টসংখ্যক বাসগৃহ নির্ম্মাণ করা অবশ্য প্রয়োজন। নীতিগতভাবেও আজ সরকারের পক্ষে চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে যে, শ্রমিকদিগের বাসগৃহ নির্ম্মাণের জন্য যদি সরকার সাহায্যদানের নীতি গ্রহণ করিতে পারেন তবে বড় বড় শহরে নিম্নমধ্যবিত্তদের বাসোপযোগী গৃহনির্ম্মাণ পরিকল্পনাকেও তাঁহারা সাহায্য করিবেন কিনা। কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি শহরে জমির যেরূপ অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাহাতে মধ্যবিত্তদিগের পক্ষে স্বীয় বাসগৃহনির্ম্মাণ প্রায় সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব; কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এত অর্থ ব্যয় করিয়া বাসগৃহ নির্ম্মাণ-কার্য্যে ব্যাপৃত হইবে ইহা আশা করা বাতুলতামাত্র। অতএব সরকারী প্রচেষ্টাতেই বাসগৃহ সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু কলিকাতায় ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট তাহাদের নির্ম্মিত ফ্লাটের জন্য যে হারে ভাড়া ধার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছে তাহা অধিকাংশ বাঙ্গালী পরিবারের পক্ষেই দেওয়া অসম্ভব। সুতরাং Subsidised Industrial Housing Scheme, Subsidised Bustee Rehousing Scheme প্রভৃতির ন্যায় Subsidised General Housing Scheme গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক হইয়াছে। সরকার এই নূতন স্কীম গঠন করিবার সময় নির্দ্দেশ দিবেন যে, কোন অর্থনৈতিক গ্রুপের জন্য ঐ স্কীমে গৃহনির্ম্মাণ করা হইবে। তাহা হইলে ঘর ভাড়া দিবার সময় অবাঞ্ছিত প্রার্থীদের আবেদন নাকচ করিতে কোন অসুবিধা হইবে না। বর্ত্তমান যুগে অন্যান্য সমাজ-কল্যাণমূলক কার্য্যের মত মধ্যবিত্তদের বাসগৃহনির্ম্মাণ পরিকল্পনাকেও একটি অত্যাবশ্যক গঠনমূলক কর্ম্মসূচীরূপে গ্রহণ করা প্রয়োজন।

আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতা

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জন্য সংবিধানে আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের জন্য যে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহাদের হাতে কোন কোন ক্ষমতা থাকিবে ত্রিপুরার আঞ্চলিক পরিষদের হাতে কেন্দ্রীয় সরকার যে সকল ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন তাহা হইতে তাহার আংশিক পরিচয় মিলিবে। স্থান এবং অঞ্চলবিশেষে স্বভাবতঃই এই সকল প্রদত্ত ক্ষমতার তারতম্য ঘটে। প্রদত্ত বিবরণী হইতে দেখা যাইবে যে, আঞ্চলিক পরিষদগুলির হাতে কার্য্যকরী কোন ক্ষমতাই প্রায় দেওয়া হয় নাই। উপরন্তু, ইহাদের আয়ের পথ কি হইবে তাহাও স্পষ্ট করিয়া না বলায় ইহাদের অবস্থা অনেকটা বর্ত্তমান মিউনিসিপালিটি অথবা জেলাবোর্ডগুলির ন্যায় শোচনীয় হওয়াও বিচিত্র নহে।

কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দ্দেশে যে সকল ক্ষমতা আঞ্চলিক পরিষদের হাতে দেওয়া হইয়াছে বা যে সকল ক্ষমতা পরিষদের আওতার বাহিরে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে তাহা নিম্নরূপ:

(১) পরিষদের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহের গৃহ-নির্ম্মাণ ও মেরামত, (২) জাতীয় ও রাজ্য সড়ক (ঘোষণা করা হইবে) এবং বন ও মৎস্যবিভাগের সড়ক ব্যতীত সড়ক নির্ম্মাণ ও মেরামত, (৩) মৎস্য-উন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত পুষ্করিণী, রিজার্ভ ফরেষ্ট অঞ্চলের বৃক্ষ রোপণ ও রক্ষণ, মোটর ভেহিক্‌ল পরিচালনা-নিয়ন্ত্রণ, পশুচালিত গাড়ীর উপর ট্যাক্স বসাইবার অধিকার পরিষদের থাকিবে না, (৪) বেসরকারী বিদ্যালয়কে অনুমোদন করা এবং শিক্ষকগণের ট্রেনিং দেওয়ার দায়িত্ব পরিষদের থাকিবে না, (৫) ত্রিপুরা প্রশাসনের প্রধান কার্য্যালয়ে অবস্থিত এলোপ্যাথিক হাসপাতাল, ডিসপেন্সারী, অনাথ-আশ্রম এবং পুলিস ও জেল ডিসপেন্সারীর উপর পরিষদের কর্ত্তৃত্ব থাকিবে না, (৬) বাজারের উপর পরিষদের কর্ত্তৃত্ব থাকিবে, প্রশাসন-পরিচালিত সার্কিট-হাউস ও রেষ্ট-হাউসের

উপর পরিষদের দায়িত্ব থাকিবে না, (৭) জলের কল এবং উদ্বাস্তু, আদিবাসী ও অনুন্নত শ্রেণীর স্কীমের অন্তর্ভুক্ত কূয়া ও পুষ্করিণীর উপর পরিষদের দায়িত্ব থাকিবে না, (৮) কৃষিকার্য্যের প্রয়োজনে বাঁধ, খালনির্ম্মাণ ও মেরামত ব্যাপারে পরিষদকে এডমিনিষ্ট্রেটারের অনুমোদন লইতে হইবে, বন ও মৎস্যবিভাগের ভূমি-সংরক্ষণ স্কীম পরিষদের আওতার বহির্ভূত, (৯) কেন্দ্রীয় সরকারের ম্যালেরিয়া নিবারণ ও বি-সি-জি স্কীম পরিচালনায় পরিষদের দায়িত্ব থাকিবে না, (১০) প্রশাসন কর্ত্তৃক গৃহীত রিলিফ কার্য্য পরিষদের কার্য্যের আওতার বহির্ভূত, (১১) জনস্বাস্থ্য, কৃষি অথবা শিল্পপ্রসারের ব্যাপারে (যদি কিছু করার থাকে) এডমিনিষ্ট্রেটারের অনুমোদন লইয়া পরিষদ কর্ম্মসূচী গ্রহণ করিতে পারেন।

স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ অথবা পঞ্চায়েতের কার্য্যে এবং চলতি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হস্তান্তর করা হয় নাই, পরিষদ হস্তক্ষেপ করিবেন না।

পুলিসের নিষ্ক্রিয়তা

মফঃস্বল অঞ্চলে বিভিন্নপ্রকার বে-আইনী এবং দুর্নীতিমূলক কার্য্যদমনে পুলিসের নিশ্চেষ্টতার সমালোচনা করিয়া সাপ্তাহিক "বর্দ্ধমানবাণী" লিখিতেছেন :

"শহরে ছোটখাটো চুরির সংবাদ প্রায়শঃ পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে কিছু কিছু পুলিসের গোচরে আনা হয়—অধিকাংশই থানায় জানান হয় না। একটু বড় রকমের হইলে এবং থানায় সংবাদ দেওয়া হইলে পুলিস সাধারণতঃ দায়সারা-গোছের একটা তদন্ত করিয়া ইতিকর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকে। পুলিস সম্বন্ধে শহরবাসীর মোটামুটি ধারণা এইরূপ। এই ধারণা যে অমূলক তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। কেননা শহরে—মফঃস্বল এলাকার কথা বাদ দিয়া—যে সমস্ত চুরির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে শঙ্কিত হইবার কারণ যথেষ্ট রহিয়াছে। অল্প সময়ের ব্যবধানে শহরের জনবহুল এলাকা হইতে দুইটি সরকারী জীপ অপহৃত হইয়াছে আজও তাহার কোন কিনারা হয় নাই। বাঁকা নদীর রেলওয়ে ব্রীজের নিকট পঞ্জাব মেলের ব্রেকভ্যান ভাঙিয়া বহু মূল্যবান দ্রব্যাদি প্রকাশ্যভাবেই লুণ্ঠিত হইয়াছে। রেল পুলিস বা শহর পুলিস কোন সাহায্যে আসিতে পারে নাই। মাত্র ৫ দিন পূর্ব্বে রাজপ্রতাপপুর এলাকার গৃহসংলগ্ন গ্যারেজ হইতে একটি প্রাইভেট মোটর গাড়ী অপহৃত হইয়াছে। আজও সন্ধান মিলে নাই। ইহা ছাড়া অঞ্চলবিশেষে অবাধ গুণ্ডারাজ চলিতেছে—পকেটমার ও ওয়াগন ভাঙ্গার দল অবাধে বিচরণ করিতেছে। তাহা বন্ধ করিতে পুলিস চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিতেছে বলিলে কিছুমাত্র অতিশয়োক্তি করা হইবে না। আমরা বুঝিতে পারিতেছি না পুলিস বিভাগের দায়িত্ব কি আর করণীয়ই বা কি। পুলিসের বড় কর্ত্তা এ বিষয়ে আলোকপাত করিলে ভাল হয়।"

ইঙ্গ-মার্কিন সম্পর্ক

সম্প্রতি ইঙ্গ-মার্কিন সম্পর্কের উন্নতির জন্য উভয় রাষ্ট্রই বিশেষ সচেষ্ট হইয়াছে। ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিদর্শনে গিয়া বিশেষ অভিনন্দন লাভ করেন। তাঁহার সফরের প্রায় সঙ্গেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার এবং পররাষ্ট্রসচিব ডালেসের সহিত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ হ্যারল্ড ম্যাকমিলান এবং পররাষ্ট্রসচিব মিঃ সেলুইন লয়েডের মধ্যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল পরমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের সর্ব্বশেষ বিকাশ এবং মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি। আলোচনাসূচীর প্রথম বিষয় সম্পর্কে স্থির হইয়াছে যে, আটলাণ্টিকের উভয় পারের দেশগুলির মধ্যে আণবিক গবেষণার ব্যাপারে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা রক্ষা করা হইবে। প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার আশ্বাস দিয়াছেন যে, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণবিক আইনটির সংশোধনসাধনের জন্য কংগ্রেসের নিকট সুপারিশ করিবেন যাহাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন এবং অন্যান্য বন্ধুভাবাপন্ন দেশগুলির মধ্যে আণবিক গবেষণার ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠতর সহযোগিতা গড়িয়া তোলা যায়। সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্ত্তৃক মহাশূন্যে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণের ফলে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে রাশিয়া তাহাদিগকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। রুশ উপগ্রহটির তেমন বিশেষ সামরিক গুরুত্ব নাই, কারণ উপগ্রহ প্রেরণের ফলে মাত্র এইটুকু বুঝা গিয়াছে যে, রাশিয়ার নিকট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা বৃহত্তর রকেট রহিয়াছে যাহার সাহায্যে একটি আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র (Inter-continental ballistic missile) পাঁচ হাজার মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে প্রেরণ করা সম্ভব। আমেরিকানগণ মনে করে যে, এই অস্ত্রের ব্যবহারোপযোগী কার্য্যকারিতা আনয়ন করিতে এখন দেরী রহিয়াছে। যদি ইতিমধ্যে রাশিয়ার সহিত কোন যুদ্ধ লাগে তবে ইউরোপ এবং এশিয়ার বিভিন্ন ঘাটি হইতে ব্রিটেন এবং আমেরিকা সহজেই তাহাদের ক্ষুদ্রতর ক্ষেপণাস্ত্রগুলি সোভিয়েটের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে পারিবে। অতএব পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের অভিমতে সামরিক ক্ষেত্রের পূর্ব্ব-পশ্চিমের ভারসাম্য এখনও পূর্ব্বের মতই রহিয়াছে। তবে ক্ষেপণাস্ত্রের উন্নতিসাধনের জন্য পাশ্চাত্য শক্তিগুলির আরও অধিকতররূপে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রকেট সম্পর্কীয় উন্নতির অন্যতম প্রধান অন্তরায় স্থল, নৌ এবং বিমানবাহিনীর মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এবং প্রতিযোগিতা। মার্কিন কংগ্রেস এই সম্পর্কে তদন্ত করিবেন এবং ভবিষ্যতে উন্নততর সহযোগিতা আশা করা যাইতে পারে। ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রকেট গবেষণা সম্পর্কে পরস্পরের মধ্যে যে সংবাদ-বিনিময় পরিকল্পনা গ্রহণ করিবে স্বভাবতঃই উক্ত আটলাণ্টিক চুক্তি সংস্থার (NATO) অন্যান্য সদস্যবর্গ সে বিষয়ে জানিতে উৎসুক রহিয়াছেন। প্রকাশিত সংবাদে যতদূর জানা

যায়, ইঙ্গ-মার্কিন আলোচনার ধরনে উক্ত চুক্তি-সংস্থার অপরাপর ইউরোপীয় সদস্য পরিপূর্ণরূপে সুখী নহেন। তবে আইসেনহাওয়ার-ম্যাকমিলান আলোচনার শেষে যে যুক্ত বিবৃতিটি প্রকাশের পূর্ব্বে ন্যাটোর সেক্রেটারী-জেনারেল স্প্যাকের সহিত পরামর্শ করা হয় এবং যুক্ত বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, ন্যাটো কাউন্সিলের পরবর্ত্তী অধিবেশন একটি "বিশেষ রূপ ধারণ করিতে পারে"। অতীতে ইউরোপীয় শক্তিবর্গের নিকট আণবিক গবেষণা সংক্রান্ত তথ্যাদি দিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে দ্বিধা ছিল তাহার মূলে এই ভয় ছিল যে, হয়ত পশ্চিম ইউরোপের সরকারকে প্রদত্ত সংবাদ রাশিয়ানদের হস্তগত হইয়া যাইবে। কিন্তু বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে যে, রাশিয়া ইতিমধ্যেই নূতন নূতন টেকনিকের বিকাশে আমেরিকাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় সেই পুরাতন গোপনীয়তার আর কোন প্রয়োজনীয়তা নাই।

মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে আইসেনহাওয়ার-ম্যাকমিলান বিবৃতিতে কেবলমাত্র এই কথাই বলা হইয়াছে যে, তুরস্কের উপর যদি আক্রমণ চলে তবে বৃটেন এবং আমেরিকা তুরস্কের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইয়া আসিবে।

মহাশূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ

৪ঠা অক্টোবর মহাশূন্যে প্রথম মনুষ্যনির্ম্মিত কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ করিয়া সোভিয়েট ইউনিয়ন সমগ্র পৃথিবীকে চমকিত করিয়াছে। মহাশূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণের সম্ভাবনা সম্পর্কে কিছুদিন যাবতই জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল এবং আন্তর্জ্জাতিক জিওফিজিক্যাল বৎসরে (১৮ মাস) সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়েরই কৃত্রিম গ্রহ প্রেরণের কথা ছিল। কিন্তু বহির্বিশ্বের কেহই মনে করিতে পারে নাই যে, সোভিয়েট ইউনিয়নই এই কৃতিত্ব অর্জ্জনের সৌভাগ্যের প্রথম অধিকারী হইবে। বস্তুতঃ সোভিয়েট ইউনিয়ন যে কেবল প্রথম মনুষ্যনির্ম্মিত উপগ্রহ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহা নহে, প্রথম বারেই সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা এত বড় উপগ্রহ প্রেরণ করিয়াছেন যাহা বর্ত্তমানে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানীদের কল্পনারও বাহিরে। ইতিমধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়ন দ্বিতীয় আর একটি উপগ্রহ প্রেরণ করিয়াছে। এই দ্বিতীয় উপগ্রহটি আরও অনেক বেশী বড় এবং ইহার দূরত্ব ভূ-পৃষ্ঠ হইতে প্রায় সাড়ে নয় শত মাইল। দ্বিতীয় উপগ্রহটির মধ্যে একটি কুকুরকে পাঠানো হইয়াছিল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সাহায্যের জন্য এবং মহাশূন্য হইতে জীবন্ত প্রাণীকে কিরূপে ফিরাইয়া আনিতে পারা যায় তাহা দেখিবার জন্য। সর্ব্বশেষ সংবাদে দেখা যায় যে, কুকুরটির মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে—অর্থাৎ এখনও মহাশূন্য হইতে জীবন্ত প্রাণীকে ফিরাইয়া আনিবার সমস্যা অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছে।

মহাশূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটি অদ্ভুত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মহাশূন্য জয়ের জন্য মানুষের যে প্রচেষ্টা এরোপ্লেন-নির্ম্মাণের সময় হইতে শুরু হইয়াছে উপগ্রহ প্রেরণের ফলে সেই প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে একটি মহা সম্ভাবনাপূর্ণ পদক্ষেপ। মহাশূন্য বিচরণে মানুষের পক্ষে দুইটি বাধা ছিল: এক, বায়ুমণ্ডলের গঠনবৈচিত্র্য—বায়ুমণ্ডলে যতই উপরে উঠা যায় ততই বায়ুর স্তর পাতলা হইয়া আসে এবং অক্সিজেন সরবরাহ হ্রাস পায়। ভূ-পৃষ্ঠ হইতে ষাট মাইল উচ্চস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চতর স্তরে হাওয়া এত কম যে পক্ষবিশিষ্ট যান অথবা প্রাণীর তথায় বিচরণ করা অসম্ভব। অতএব সুদূর উচ্চে উঠিতে হইলে পক্ষহীন যানের সাহায্যে উঠিতে হইবে। মহাশূন্যে আরোহণের পথে দ্বিতীয় প্রধান অন্তরায় পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সকল পদার্থকেই ভূ-পৃষ্ঠের দিকে টানিয়া আনিতে থাকে। বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন, যদি কোন বস্তু ঘণ্টায় আঠার হাজার মাইল গতি-বেগ লাভ করিতে পারে, তবে উহা মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে এড়াইতে পারিবে। রকেট আবিষ্কারের ফলে এই দুই প্রধান সমস্যারই সমাধান হয়। রকেটের পাখা নাই অথচ উপরে উঠিতে কোন বাধা নাই। প্রয়োজনীয় অক্সিজেন রকেট সঙ্গেই রাখিতে পারে এবং সর্ব্বোপরি রকেট যে কোন গতিবেগেই চলিতে পারে। রকেটের উদ্ভাবন করেন জার্ম্মান বৈজ্ঞানিকগণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে, বিশেষতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে রকেট লইয়া বিশেষ গবেষণা চলে। অবশ্য রকেট গবেষণার মুখ্য বিষয় ছিল যুদ্ধকালে কি করিয়া বহুদূরবর্ত্তী শত্রুঘাঁটিতে আক্রমণ চালান যায় তাহার উপায় উদ্ভাবন করা।

প্রথম সোভিয়েট উপগ্রহটি, যাহাকে "স্পুৎনিক" (সাথী) নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা ২৩ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট ১৮৪ পাউণ্ডের একটি গোলাকার বস্তু। ঐ উপগ্রহটি প্রথমে একটি উপবৃত্তাকার পথ ধরিয়া ঘণ্টায় প্রায় ১৮ হাজার মাইল বেগে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছিল (অর্থাৎ উপগ্রহটি প্রতি ৯৬ মিনিট ২ সেকেণ্ডে একবার করিয়া পৃথিবীর চারিদিক ঘুরিয়া আসিতেছিল)। উপগ্রহটি যখন ছাড়া হয় তখন উহা ভূ পৃষ্ঠ হইতে ৫৬০ মাইল উপরে ঘুরিতে থাকে। পরে অবশ্য উহার গতিবেগ এবং উচ্চতা হ্রাস পায়। উপগ্রহটি এখনও তাহার কক্ষপথে পৃথিবী পরিক্রমায় রত রহিয়াছে। এই উপগ্রহটিতে দুইটি বেতার-প্রেরক যন্ত্র বসান আছে এবং তাহা হইতে প্রেরিত সঙ্কেতের সাহায্যে পৃথিবীস্থিত পণ্ডিতগণ মহাশূন্যের রহস্য আবিষ্কারে সচেষ্ট হইয়াছেন।

সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা ৩রা নবেম্বর দ্বিতীয় যে উপগ্রহটি মহাশূন্যে প্রেরণ করেন এবং যাহা এখনও শূন্যে পৃথিবী পরিক্রমায় রত রহিয়াছে তাহা প্রথমটি অপেক্ষা সকল দিক হইতেই আরও উন্নত ধরনের।

এই দ্বিতীয় কৃত্রিম উপগ্রহটির ভিতরে বসান রহিয়াছে: বর্ণালীর হ্রস্ব-তরঙ্গ অঞ্চলের ও অতি-বেগুনি রশ্মি-অঞ্চলের সৌর-বিকীরণ অনুশীলন করার জন্য যন্ত্রপাতি; মহাজাগতিক রশ্মি অনুশীলনের যন্ত্রপাতি; তাপ ও চাপ অনুশীলনের যন্ত্রপাতি; মহা-

জাগতিক দেশের পরিবেশে জীবিত প্রাণীর ক্রিয়াকলাপ অনুশীলনের জন্ম যন্ত্রপাতি এবং খাদ্যসহ, চাপ ও তাপনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্বলিত বায়ুপ্রবেশ-রোধক একটি আধারে পরীক্ষামূলকভাবে প্রেরিত একটি প্রাণী (কুকুর); বৈজ্ঞানিক মাপজোকের ফলাফলগুলি পৃথিবীতে বেতার-যোগে প্রেরণ করিবার জন্ম যন্ত্রপাতি ৪০,০০২ ও ২০,০০৫ মেগাসাইক্ল্ ফ্রিকোয়েন্সিতে (যথাক্রমে প্রায় ৭.৫ ও ১৫ মিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যে) কার্য্যরত দুইটি বেতার-বার্তাপ্রেরক যন্ত্র; শক্তি উৎপাদনের জন্ম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।

উপরিউক্ত যন্ত্রপাতি, পরীক্ষামূলকভাবে প্রেরিত প্রাণীটি এবং শক্তি-উৎপাদক ব্যবস্থাসহ এই কৃত্রিম উপগ্রহটির মোট ওজন হইল ৫০৮.৩ কিলোগ্রাম (প্রায় ১৪ মণ)।

পর্য্যবেক্ষণের ফলাফল অনুযায়ী, উপগ্রহটি প্রায় প্রতি সেকেণ্ডে ৮০০০ মিটার (প্রায় ২৬০০০ ফুট) বেগে ইহার কক্ষপথে ছুটিয়া চলিয়াছে।

বর্ত্তমানে প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা যেসব হিসাবকে মিলাইয়া দেখা হইতেছে সেই হিসাব অনুযায়ী ভূপৃষ্ঠ হইতে উপগ্রহটির সর্ব্বোচ্চ দূরত্ব হইল ১,৫০০ কিলোমিটারেরও (প্রায় ৯৩০ মাইল) বেশী; সম্পূর্ণ এক পাক ঘুরিয়া আসিতে ইহার সময় লাগে প্রায় ১ ঘণ্টা ৪২ মিনিট, ইহার কক্ষপথ ও পৃথিবীর বিষুবরেখার মধ্যবর্ত্তী কোণটি হইল প্রায় ৬৫ ডিগ্রী।

বোরিস প্যাষ্টারনক

বোরিস প্যাষ্টারনক ৬৭ বৎসর বয়স্ক বিশ্ববিখ্যাত রুশ কবি। তিনি রুশভাষায় ইংরেজী হইতে শেক্সপীয়রের বহু রচনা অনুবাদ করিয়াছেন। যদিও তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর বিশ্ববিখ্যাত লেখক তথাপি ১৯৩৪ সনের পর আজ পর্য্যন্ত তাঁহার কোন লেখাই প্রায় আর প্রকাশিত হয় নাই। ১৯৩৬ সনে "স্পেক্টোরস্কি" শীর্ষক আত্মজীবনীমূলক কবিতা প্রকাশিত হইবার পর হইতেই সোভিয়েট রাষ্ট্রে তাঁহার স্থান বহু নীচে নামিয়া যায়। যুদ্ধের সময় তাঁহার একটি কবিতাসঙ্কলন প্রকাশিত হয়, কিন্তু তদবধি তাঁহার লেখা আর প্রকাশিত হয় নাই। সম্প্রতি তিনি "ডাঃ জিভাগো" (Dr. Zhivago) অর্থাৎ "ডাঃ জীবনীশক্তি" শীর্ষক একটি উপন্যাস লেখেন। উপন্যাসটি বিশ্বকংগ্রেসের পরবর্ত্তীকালীন সাংস্কৃতিক মধুচন্দ্রিমার যুগে রুশ কমিউনিষ্ট নেতৃবৃন্দ কর্ত্তৃক প্রশংসিত হয়; কিন্তু ঠিক প্রকাশের পূর্ব্বেই রুশ নেতৃবৃন্দ পুস্তকটির প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেন। ইতিমধ্যে একজন ইতালীয় কমিউনিষ্ট প্রকাশক মিঃ জিয়াংজিয়াকোমো ফেলট্রিনেলী (Giangiacomo Feltrineli) পুস্তকটি প্রকাশের বিশ্বস্বত্ব ক্রয় করেন। তখন ইতালীয় কমিউনিষ্ট পার্টি মারফত এবং সরাসরিভাবে রুশ কর্ত্তৃপক্ষ উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটি ফিরাইয়া লইতে চান—কিন্তু ফেলট্রিনেলী উহা ফেরত দিতে অস্বীকার করেন। পুস্তকটি ইতালীয় ভাষায় ২২শে নবেম্বর প্রকাশিত হইবে। ইংরেজী ভাষাতেও আগামী জানুয়ারীতে প্রকাশিত হইবে। যাঁহারা পুস্তকটি সমগ্র পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা বলিতেছেন যে, উহা বিশ্বসাহিত্যের দরবারে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিসাবে পরিগণিত হইতে বাধ্য। আমরা পুস্তকটির ইংরেজী অনুবাদের অংশ-বিশেষ দেখিয়াছি ভালই লাগিয়াছে। প্রকাশক ফেলট্রিনেলী বলিয়াছেন যে, তিনি একজন কম্যুনিষ্ট এবং সমগ্র দায়িত্ব বিবেচনা করিয়াই তিনি এই পুস্তকটি প্রকাশের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; কিন্তু ইহাতে প্যাষ্টারনকের কোন হাত নাই। এই পুস্তকটি প্রকাশের জন্ম যদি প্যাষ্টারনকের কোন শাস্তি হয় তবে তাহা নিতান্তই বেদনাদায়ক হইবে। সর্ব্বশেষ সংবাদে মনে হয় যে, হয়ত শেষ পর্য্যন্ত পুস্তকটি রুশ ভাষাতেও প্রকাশিত হইতে পারে এবং হয়ত প্যাষ্টারনক নূতন নিগ্রহের হাত হইতে বাঁচিয়া যাইতে পারেন। ইহা "সমাজতান্ত্রিক" সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য দিক যে,একজন বিশ্ববিখ্যাত কবি কুড়ি বৎসর যাবত কোন রচনার প্রেরণা পাইলেন না এবং অবশেষে যখন তাঁহার প্রেরণা আসিল তখন পার্টি প্রথমে তাঁহার রচনা অনুমোদন করিয়া পুনরায় চাপিয়া দিতে চাহিল—এবং ইহাতে দেশে প্রায় কোন চাঞ্চল্যই দেখা দিল না।

পৃথিবীর সর্ব্ববৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ম্যাসাচুসেটস রাষ্ট্রের অধীনস্থ কেম্ব্রিজ শহরে অবস্থিত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীটি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী। পৃথিবীর অপর কোন বিশ্ববিদ্যা-লয়ের লাইব্রেরীই ইহার সমতুল্য নহে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যতগুলি লাইব্রেরী রহিয়াছে একমাত্র ওয়াশিংটনে অবস্থিত কংগ্রেসের জাতীয় লাইব্রেরী ব্যতীত অপর সকল লাইব্রেরী অপেক্ষাই হার্ভার্ড বিশ্ব-বিদ্যালয় লাইব্রেরীটি বৃহত্তর।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে ষাট লক্ষ পুস্তক রহিয়াছে। প্রতি বৎসর এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার পুস্তক এই লাইব্রেরীতে সংযোজিত হয়। জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতি বৎসর যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হয় তাহার প্রায় সবগুলিই এই লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়। কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট আরও তেত্রিশটি শাখা লাইব্রেরী লইয়া সমগ্র পাঠাগারটি গঠিত।

১৬৩৮ সনে জন হার্ভার্ড কেম্ব্রিজে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত কলেজের লাইব্রেরীর জন্ম যে ৪০০ পুস্তক দান করেন তাহার উপর ভিত্তি করিয়া এই তিন শত বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর সর্ব্ববৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীটি গড়িয়া উঠিয়াছে।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীটির স্থান সঙ্কুলান যেভাবে করা হইয়াছে তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশ্ববিদ্যালয়-লাইব্রেরীটির আয়তন বৃদ্ধির সহিত তাল রাখিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্ম ১৯৩৭ সনে কোয়েস মেটকাফকে লাইব্রেরীয়ান নিযুক্ত করা হয়। তিনি আসিয়া পুরাতন ভবনটিকে বাতিল করিয়া নূতন ভবন নির্ম্মাণ না করিয়া উহাকে একটি বিশেষ বিভাগে পরিণত করেন এবং

অন্যান্য লাইব্রেরী-ভবন নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে অন্যান্য শাখা সরাইয়া লন। পুরাতন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীটি এখন কেবল গবেষকদের ব্যবহার করিতে দেওয়া হয়।

আমাদের দেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয় ষাট লক্ষ পুস্তকের কথা চিন্তাও করিতে পারে না। ভারতের সর্ব্ববৃহৎ লাইব্রেরীতেই মাত্র সাড়ে সাত লক্ষ পুস্তক রহিয়াছে। দেশের জ্ঞানবিস্তারের পক্ষে লাইব্রেরীর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য। এ বিষয়ে আমাদের কর্ত্তৃপক্ষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং ব্রিটেন হইতে বহু প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে।

দিলীপ সিং সন্দ

ভারতীয় বংশোদ্ভূত, বর্ত্তমানে মার্কিন নাগরিক এবং মার্কিন কংগ্রেসের প্রতিনিধিসভার সদস্য শ্রীদিলীপ সিং সন্দ শীঘ্রই ভারতে আসিবেন। ভারত সফরের প্রারম্ভে তিনি ২৫শে নবেম্বর কলিকাতায় উপনীত হইবেন। কলিকাতায় কয়েকদিন অবস্থানের পর তিনি নয়াদিল্লী যাইবেন। ভারতে তিনি এক মাস সময় অবস্থান করিবেন। মিঃ সন্দ ভারতে আসিবার পূর্ব্বে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার দেশগুলি ভ্রমণ করিয়া আসিবেন।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া সফর আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ২৪শে অক্টোবর সানফ্রানসিসকোতে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, সফরকালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক কর্ম্মসূচীর কার্য্যকারিতা পর্য্যালোচনা করিবেন। ইহা ব্যতীত বিদেশে মার্কিন প্রচারদপ্তর কি ভাবে কার্য্য করিতেছে তাহাও তিনি অনুসন্ধান করিবেন। তাঁহার সফরের সরকারী উদ্দেশ্য ইহাই। তবে সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে সৌহার্দ্য বৃদ্ধি তাহার অন্যতম বে-সরকারী উদ্দেশ্য।

মিঃ সন্দ ভারতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আপন ভ্রাতা কার্ণাইল সিং ভারত সরকারের রেলওয়ে বোর্ডের অন্যতম সদস্য। আমরা আশা করি তাঁহার ভারত সফরকালে তিনি মার্কিন নীতির ব্যর্থতার কারণ অনুধাবন করিতে সমর্থ হইবেন এবং স্বরাষ্ট্রে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমেরিকাবাসীকে খোলাখুলিভাবে তাহা বলিবেন।

বাংলা দেশে শস্যহানি

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গেই সাম্প্রতিক অনাবৃষ্টির ফলে ব্যাপক শস্যহানির সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। বিলম্বিত বৃষ্টিপাতের ফলে সর্ব্বত্রই শস্যরোপণে অসুবিধা হইয়াছিল। অবশ্য পরে উপযুক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে আশা হইয়াছিল যে, আগামী শস্যবৎসরে হয় ত খাদ্যাভাব বর্ত্তমানের ন্যায় প্রকটরূপ ধারণ করিবে না। কিন্তু সর্ব্বশেষ অনাবৃষ্টির ফলে সেই আশার স্থলে এক অনুচ্চারিত আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। দুই মাস পূর্ব্বেও যে সকল স্থানে কৃষকদের চোখমুখে আশার আলো দেখা যাইত আজ সর্ব্বত্রই এক কালো ছায়া বিরাজমান। সরকার যদি বৎসরের প্রথম হইতেই খাদ্য সম্পর্কে কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারেন তবেই কোনও প্রকারে আগামী বৎসর কাটান যাইতে পারে। তাহা না হইলে পুনরায় এক ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে, সে সম্পর্কে কোনই সন্দেহ নাই। আমরা যেহেতু পূর্ব্বাহ্নেই এই ভয়াবহ সম্ভাবনার কথা চিন্তা করিয়া দেখিবার জন্য সরকারীমহলকে অনুরোধ জানাইতেছি।

পশ্চিমবঙ্গের মফঃস্বল অঞ্চল হইতে প্রকাশিত প্রায় সকল পত্র-পত্রিকাতেই এই শস্যহানির সম্ভাবনা সম্পর্কে উদ্বেগজনক আলোচনা রহিয়াছে। আমরা নিম্নে তাহার কয়েকটির আংশিক বিবরণ তুলিয়া দিলাম।

বাঁকুড়ার "মল্লভূম" লিখিতেছেন:

"এবার দেরীতে বর্ষা আসিলেও চাষীগণ বহু আশায় বুক বাঁধিয়া আমন-ধান্যের চাষ ক্ষমতার অতিরিক্ত ব্যয়ে শেষ করিয়াছিল। কৃষিঋণ, চাষের গবাদি ক্রয়ের ঋণ যদিও পর্য্যাপ্ত নহে ও গ্রামের সারকেন্দ্রসমূহে যথাসময়ে উপযুক্ত সার পাওয়া যায় নাই, আমন ধান্যের যে ছয় আনা অংশ চাষীগণ আশা করিয়াছিল, এক পশলা বৃষ্টির অভাবে ফুল আসিয়া জলাভাবে পূর্ণ তৈরি গাছগুলি শুকাইয়া গেল। ধানের বদলে চাষীগণ পাইবে "আঘড়া"। আকাশমুখী এ জেলা চিরদিন এইভাবে প্রকৃতির খেলার পুতুলের মত দুঃখ-দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছে। দ্বিতীয় পাঁচসালায় সেচ পরিকল্পনা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এ জেলার চাষের অবস্থা অনিশ্চিত। এখন হইতে সময় উপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে জেলার জনসাধারণ চরম দুর্দ্দশায় পতিত হইবে। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ, তাঁহারা যেন জেলার বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় অবাহিত হইয়া প্রাদেশিক সরকারকে যথাযথ সংবাদ প্রেরণ করেন।"

মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "ভারতী" লিখিতেছেন:

"দীর্ঘদিন বৃষ্টি না হওয়ায় জঙ্গীপুর মহকুমার সর্ব্বত্র ব্যাপক শস্যহানির সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। রাঢ় অঞ্চলে ধানের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। সুন্দর ধানগাছগুলি জল অভাবে ক্রমশঃই শুকাইয়া যাইতেছে। বৃষ্টির প্রত্যাশায় চাষী পুকুরতীরবর্ত্তী জমিগুলি 'দুন' দিয়া জল সেচ করিয়া গাছগুলিকে কোন রকমে এতদিন বাঁচাইয়া রাখিয়াছে এবং হয়ত ইহার ফলে এই সমস্ত জমিতে অল্প-বিস্তর ফসল কিছু পাওয়া যাইলেও অপেক্ষাকৃত উচু জমিগুলিতে ধান পাইবার বিশেষ কোন সম্ভাবনা নাই। মোটের উপর শতকরা ৫০ ভাগ ধান পাইলেই চাষীরা এবার ভাগ্যবান মনে করিবে সন্দেহ নাই। গত বৎসর অতিবৃষ্টি ও অসময়ে বৃষ্টিতে এতদঞ্চলের বহু ধান নষ্ট হইয়াছিল, এবার আবার অনাবৃষ্টির ফলে চাষী প্রমাদ গণিতেছে। বিস্তীর্ণ বাগড়ী অঞ্চলের অবস্থা বোধ হয় অধিকতর শোচনীয়। গত দুই-তিন বৎসর হইতে প্রকৃতি তাহাদের উপর এমন বিরূপ হইয়াছে যে চাষাবাদে আর তাহাদের এমন কি ব্যয়টুকুও সংকুলান হইতেছে না। এ বৎসর ভাদুই ধান ও পাট

একেবারেই বিনষ্ট হইয়াছে বলা চলে। চৈতালি ফসলও যে হইবে তাহারও কোন আশা নাই। বৃষ্টির আশায় চাষী জমিগুলি চাষ-আবাদ করিয়া এতদিন ফেলিয়া রাখিয়াছিল এবং অবশেষে বীজ বপনের সময় অতিক্রান্ত হইতে চলায় তাড়াহুড়া করিয়া উচ্চমূল্যে বীজ খরিদ করিয়া যদিও বা তাহারা কিছু কিছু জমিতে বীজ ছিটাইল তাহাও বৃষ্টির অভাবে অংকুরিত হইল না। চাষী আজ একান্ত নিঃস্ব ও অসহায়। শুধু চাষীই তাহার ঘটি-বাটি, লাঙ্গল-বলদ, গহনাগাটি বেচিয়া সর্ব্বস্বান্ত ও পথের ভিখারী হইয়াছে তাহাই নহে, চাষের উপর নির্ভরশীল পল্লী অঞ্চলের বিপুলসংখ্যক মধ্যবিত্তও আজ মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছে। একদিকে ফসল নাই, অপরদিকে কাজ নাই। আর্ত্ত মানুষের হাহাকারে আজ আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ।"

ত্রিপুরা রাজ্যে খাদ্যসমস্যা

ত্রিপুরা রাজ্যে খাদ্যসমস্যা এবং এই সমস্যা সমাধানে সরকারী প্রচেষ্টার আলোচনা করিয়া আগরতলা হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "সেবক" লিখিতেছেন যে, ত্রিপুরা রাজ্য কয়েক বৎসর যাবতই খাদ্য সরবাহের জন্য সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল হইয়াছে। কিন্তু ত্রিপুরার খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রাজ্য সরকার কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নাই। সম্প্রতি পুনরায় ত্রিপুরায় খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে এবং অবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করিয়া সরকার ন্যায্যমূল্য দোকান খুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্যের মূল্য বিভিন্ন। দেখা যায় একই সময়ে চাউলের মূল্য এক স্থানে ১২৲ টাকা, অন্য স্থানে ৩০৲ টাকা। "সেবক" লিখিতেছেন :

"বণ্টন-ব্যবস্থার মধ্যে কৃত্রিমতা না থাকিলে মূল্যের এইরূপ আকাশ পাতাল ব্যবধান থাকিত না। উদ্বৃত্ত অঞ্চল হইতে ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্য প্রেরণের সুব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। আমরা ইতিপূর্ব্বেও উদ্বৃত্ত অঞ্চলের ধান্য প্রকিউরমেণ্ট ব্যবস্থা দ্বারা সংগ্রহ করার জন্য সরকারকে পরামর্শ দিয়াছিলাম।

"অনাবৃষ্টির ফলে এই বৎসরে রাজ্যের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। অধিকন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য সরবরাহকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ায় কৃষকগণ ধান্য উৎপাদনে নিরুৎসাহ হইয়া পাট উৎপাদনে অধিক উৎসাহ প্রদর্শন করে। অতএব, ত্রিপুরা রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য সরবরাহ অব্যাহত গতিতে চলিতে থাকিবে।"

মুর্শিদাবাদের সমস্যাবলী

মুর্শিদাবাদ জেলার বর্তমান সমস্যাবলীর আলোচনা করিয়া সাপ্তাহিক "মুর্শিদাবাদ সমাচার" পত্রিকা এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :

"মুর্শিদাবাদ জেলায় জনগণের বেশীর ভাগ আজ এক অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছে। খাদ্যশস্য ও নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধির সহিত রোজগার কমিয়া যাওয়ায় বহু লোকের পক্ষে সংসার পরিচালনা অসম্ভব হইয়াছে। গত বৎসর বন্যার ফলে জেলার শস্যাধার কান্দী মহকুমায় ধান্য হয় নাই। এই বৎসরও রবিশস্য এবং আউশ অনাবৃষ্টি ও অসময়ে বৃষ্টির ফলে আশানুরূপ হয় নাই। বাগড়ী অঞ্চলের বহুস্থানে বন্যা, অনাবৃষ্টি ও অসময়ে বৃষ্টির জন্য পর পর অজন্মা হইয়া গিয়াছে। জেলার পশ্চিমাঞ্চলে ধান্য না হওয়ায় এবং পূর্ব্বাঞ্চলে রবিশস্য না হওয়ায় অবশ্যম্ভাবী ফল ফলিয়াছে। বিশেষভাবে পূর্ব্বাঞ্চলে বাগড়ী এলাকার অধিবাসীদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা চরমে উঠিয়াছে। সময়মত বৃষ্টির অভাবে আউশ, পাট বা আমনের চাষ তাহারা করিতে পারে নাই। বৃষ্টি হওয়ায় পর কৃষকেরা আপ্রাণ পরিশ্রম করিয়া জমিতে ফসল বুনিতে চেষ্টা করিলেও সমস্ত জমিতে চাষ সম্ভব হয় নাই, কিছু জমি পতিত থাকিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে যে সমস্ত জমিতে ফসল আছে, সেখানেও এক বিশেষ ধরনের পোকার উৎপাত সুরু হইয়াছে এবং কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগের দ্বারা শস্যরক্ষার চেষ্টা চলিতেছে। পর পর কয়েকবার ফসল না পাওয়ার ফলে সাধারণ কৃষকের সঞ্চয় ভাঙ্গিয়া সংসার চালাইতে হইতেছে। আমরা দেখিয়াছি স্থানীয় সোনা-রূপার বাজারে প্রত্যেক দিন মণ মণ রূপার গহনা গ্রামাঞ্চল হইতে বিক্রয় হইতে আসে এবং উক্ত রূপার গহনার খাদ গলাইয়া বাদ দিয়া চাদি কলিকাতার দোকানদার খরিদ করিয়া লইয়া যায়। মুর্শিদাবাদ জেলার মুসলমান কৃষকশ্রেণীর মধ্যেই রূপার অলঙ্কারের প্রচলন আছে এবং তাহারা বাধ্য হইয়া জীবনরক্ষার জন্য সেই অলঙ্কার বিক্রয় করিতেছে। শহরের বাজারে বহু মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবার তাহাদের সঞ্চিত স্বর্ণালঙ্কার এমনকি পিতল ও কাঁসার বাসনপত্রও বিক্রয় করিয়া দেয়। বর্ত্তমানে সোনা-রূপা বা কাঁসা-পিতলের দোকানে মাত্র পুরাতন মাল খরিদের কারবারই চলিতেছে। কদাচিৎ কেহ নূতন মাল খরিদ করে। গত বৎসরের খাদ্যাভাবের জের টানিতে জেলার নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অর্থ-নৈতিক দুরবস্থা চরমে ঠেকিয়াছে।"

পৌরসভা নির্ব্বাচন

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত জঙ্গীপুর পৌরসভার সাম্প্রতিক নির্ব্বাচন উপলক্ষে পর পর দুইটি সংখ্যায় সম্পাদকীয় আলোচনা করিয়া স্থানীয় সাপ্তাহিক 'ভারতী" লিখিয়াছেন :

"পৌরসভা কোন রাজনীতির লীলাক্ষেত্র নহে। কাজেই ইহার নির্ব্বাচন কোন বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদের ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া উচিত নহে। পৌর এলাকায় সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করা ও অন্যান্য জনপ্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতিবিধানে কিছুটা সহায়তা করাই পৌরসভার অন্যতম উদ্দেশ্য। এখানে রাজনৈতিক দলাদলি ও মতবাদের কচকচি অপেক্ষা প্রয়োজন গঠনমূলক মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গীর। কাজেই যাঁহারা সত্যিকারের গঠনকর্ম্মী বা সমাজসেবী তাঁহারাই পৌরসভায় প্রতিনিধিত্ব করিবার অধিকারী। আমাদের এই ক্ষুদ্র জনপদের এই ধরনের লোক বাছাই করিবার অসুবিধাও

বিশেষ নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় করদাতাগণ নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন চিন্তাও করেন না বা সমবেত ভাবে কার্য্যকরী কোন ব্যবস্থাও অবলম্বন করেন না। মানুষের এই নিষ্ক্রিয়তা বা ঔদাসীন্যের ছিদ্রপথে এক শ্রেণীর লোক জোট পাকাইয়া প্রার্থী সাজিয়া বসেন এবং ভোটদাতাগণও গতানুগতিক ভাবে প্রার্থিগণের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান কিছুই বিচার-বিবেচনা না করিয়া গতানুগতিকভাবে তাঁহাদিগকেই ভোট দিয়া তাঁহাদের আসন কায়েম করেন। কি ভাবে পৌরসভা গঠিত হইবে তাহার উদ্যোগ-আয়োজন যেখানে ভোটদাতাগণেরই করা উচিত সেখানে নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে প্রার্থিগণের উদ্যোগ-আয়োজনের বহর দেখিয়া স্তম্ভিত হই। ইহাদের উদগ্র জনসেবার আগ্রহ দেখিয়া মনে হয় মায়ের অপেক্ষা মাসীর দরদই বেশী। আমি উত্তম, অন্যে অধম—এই নির্লজ্জ মিথ্যার বেসাতি লইয়া ভোটপ্রার্থীকে যখন দ্বারে দ্বারে ফিরিতে দেখি, তখনই প্রশ্ন জাগে অবৈতনিক এই চাকরীর উমেদারীর সার্থকতা কি? জনসাধারণের মধ্যে কোন সংগঠন গড়িয়া না তুলিয়া বা তাহাদের সহিত কোন দায়িত্বের সম্বন্ধ পূর্ব্বাহ্নে স্থাপন না করিয়া আচম্বিতে জনসেবক সাজিয়া নির্ব্বাচন-প্রার্থী হিসাবে ভোট আহরণ করিবার প্রচেষ্টার পশ্চাতে কোন শুভ বুদ্ধি আছে বলিয়া মনে হয় না। সত্য কথা বলিতে গেলে যাঁহাদের কোন সংগঠন-শক্তি নাই, যাঁহাদের কোন কার্য্যক্রম বা কর্ম্মক্ষমতা নাই, যাঁহাদিগকে 'কেন ভোট দিব' জিজ্ঞাসা করিলে কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না, যাঁহারা কেবল ক্ষমতা দখলের হীন দলাদলিকেই মত্ত, যাঁহাদের অপদার্থতা বা অক্ষমতা বিভিন্ন জন-সেবার ক্ষেত্রে প্রমাণিত হইয়াছে, তাঁহাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা যাহাই থাকুক না কেন শুধু পৌরপ্রতিষ্ঠানই কেন, পৌর এলাকার কোন প্রতিষ্ঠানেই তাঁহাদের কোন স্থান নাই এই, সহজ সত্যকে উপলব্ধি করিবার আজ সময় আসিয়াছে।"

পৌরসভাগুলির নির্ব্বাচন সম্পূর্ণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক। এইরূপ ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতির কুফল আলোচনা করিয়া "ভারতী" লিখিতেছেন :

"শহরের তথাকথিত নেতৃত্বের প্রতি সাধারণ মানুষ আজ কত বীতশ্রদ্ধ এই নির্ব্বাচন সম্পর্কে তাহাদের উদাসীন মনোভাবই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্রার্থিগণের মধ্যে উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, শিক্ষকের অভাব নাই, কিন্তু ভোটদাতাগণের মধ্যে নাই কোন প্রেরণা, উৎসাহ, উদ্দীপনা। প্রার্থিগণ এককভাবে তাহাদের দ্বারে দ্বারে ভোট ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছেন এবং তাঁহাদের এই অসহায় অবস্থা দেখিয়া ভোটদাতাগণ কৌতুকবোধ করিতেছেন। ইহাই হইল বাস্তব অবস্থা। কোন আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি যে এইভাবে ভোটপ্রার্থী হইতে পারেন ইহা কল্পনা করা যায় না।"

পশ্চিমবঙ্গ পৌর সম্মেলন

সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জে পশ্চিমবঙ্গ পৌর সমিতির বিংশ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মাদ্রাজের প্রাক্তন মেয়র শ্রী এন, শিবরাজ। পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীঈশ্বরদাস জালান সম্মেলনটির উদ্বোধন করেন।

ভারতের বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গের পৌর-প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান সমস্যা হইল অর্থাভাব। বিভিন্ন খাতে ট্যাক্স আদায়ের মারফত যে অর্থ আদায় হয় তদ্দ্বারা মিউনিসিপ্যালিটিগুলি কোনও প্রকারে তাহাদের কর্ম্মীদের বেতন চুকাইতে পারে; পৌর-উন্নয়নের জন্য কোন অর্থ ই তাহাদের আর থাকে না। মিউনিসিপ্যালিটির কর্ম্মী-দের বেতন অত্যন্ত অল্প হওয়ায় তাহাদের মধ্যেও কাজে বিশেষ উৎসাহ নাই—ফলে মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স আদায় এবং অন্যান্য কাজগুলিও যথাযথ চলে না। লোক্যাল ফিনান্স অনুসন্ধান কমিটি এবং ট্যাক্সেশন এনকোয়ারী কমিটি মিউনিসিপ্যালিটিগুলির আর্থিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য কতকগুলি সুপারিশ করিয়াছেন—সেগুলি সম্পর্কে সরকার এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই।

সরকার হইতে এতদিন পর্য্যন্ত মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে বিভিন্ন ভাবেই আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইতেছিল; কর্ম্মীদের মহার্ঘ্য ভাতার সম্পূর্ণ অর্থ, জলসরবরাহ, পয়ঃপ্রণালী সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং রাস্তার জন্য সরকার এতদিন পর্য্যন্ত প্রয়োজনীয় অর্থের দুই-তৃতীয়াংশ সাহায্য এবং কোন কোন স্থলে বাকী এক-তৃতীয়াংশও ঋণ হিসাবে দিয়া-ছেন। তবে ইতিপূর্ব্বে রাস্তার জন্য সরকার কোন সাহায্য দেন নাই। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে সরকার জলসরবরাহের জন্য দুই কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন—কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় উহা নিতান্তই অপ্রতুল। উপরন্তু বর্ত্তমানে পরিকল্পনা যে ভাবে ছাঁটাই হইতেছে শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যতঃ কত টাকা মিউনিসিপ্যালিটি-গুলি পাইবে তাহা বিতর্কের বিষয়। রাজ্য সরকারের পক্ষেও এই অর্থ মিটান বিশেষ কষ্টসাধ্য। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে ঋণ হিসাবে যে পরিমাণ অর্থ দেন, রাজ্য সরকারকে তাহার দুই অংশ খয়রাতী (Subsidy) হিসাবে দিতে হয়।

পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি পৌর এলাকায় পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসনের ফলে ও অত্যধিক লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মিউনিসিপ্যালিটিগুলির উপর বিশেষ চাপ পড়িয়াছে এবং এই বর্ধিত জনসংখ্যার কল্যাণবিধানের জন্য অর্থ পাওয়া তাহাদের পক্ষে দুষ্কর হইয়াছে। এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার হইতে অর্থ আদায়ের জন্য চেষ্টা চলিতেছে।

আমাদের দেশের পৌরসভাগুলির দুর্গতির অন্যতম প্রধান কারণ দলাদলি। এই সম্পর্কে আমরা একটি স্বতন্ত্র মন্তব্যে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণ ব্যক্তিগত কলহ-বিবাদ ভুলিয়া দেশ ও জাতিসেবার মন লইয়া অগ্রসর না হন ততদিন পর্য্যন্ত মিউসিপ্যালিটিগুলি হইতে আশানুরূপ কার্য্য পাওয়া যাইবে না। কিরূপে ব্যক্তিগত স্বার্থ

মিউনিসিপ্যাল কার্য্য প্রতিহত করিতেছে একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলেই তাহা বোঝা যাইবে। কলিকাতারই নিকটবর্ত্তী কোন মিউনিসিপ্যালিটিতে চেয়ারম্যান ব্যক্তিগত ক্রোধ মিটাইতে প্রায় ৩০'৪০ হাজার টাকা অপব্যয় করেন। সরকারী অডিট হইতেও এ সম্পর্কে মন্তব্য করিতে হয়।

আসানসোলের বাজার

আসানসোলের বাজার সম্পর্কে আলোচনা করিয়া সাপ্তাহিক "বঙ্গবাণী" লিখিতেছেন যে, আসানসোলে একটিমাত্র বাজার মুন্সীবাজার। আসানসোল এবং পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল এমনকি বার্ণপুর হইতেও লোকেরা এই বাজারে তাহাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের জিনিষপত্র কিনিতে আসে। ফলে, বাজারটির উপর চাপ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু বাজারটি সম্প্রসারণের উপায় নাই। উপরন্তু "বাজারটি এত নোংরা এবং এত অব্যবস্থা যে উপায় থাকিলে কেহ এই বাজারে ঢুকিত না! বাজারে একই তরকারী দু'জায়গায় দু'রকম দর।"

আসানসোলের বাজার-সমস্যার সমাধানের উপায় আলোচনা করিয়া "বঙ্গবাণী" লিখিতেছেন:

"এই বাজারটি পৌরসভার নয় যে, পৌরসভা ইহাকে পুরাপুরি শাসনে বা আয়ত্তে আনে। ইহার মালিক যাহারা তাহারা বাজারটিতে দৃষ্টি দেওয়া অপেক্ষা বাজারে মুনাফা লুটিবার দিকে তাহাদের যত লক্ষ্য। সামান্য জল হইলে বাজারের যা দুর্ভোগ ভুগিতে হয় তাহা বলিবার নহে। পৌরসভার এডমিনিষ্ট্রেটর এই বাজারটি যাহাতে বাজার কর্ত্তৃপক্ষ সংস্কার করিয়া দেয় সেইজন্য প্রচুর সিমেন্টের পারমিট দেওয়ার ব্যবস্থা করেন কিন্তু বাজার কর্ত্তৃপক্ষ ঐ সিমেন্ট বাজারে না লাগাইয়া বাড়ীর কাজে লাগাইয়াছে এবং ইহার জন্য এডমিনিষ্ট্রেটর শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য নাকি কৈফিয়ৎ তলবও করিয়াছিলেন।

"এই বাজারের অত্যাচার এবং দুর্নীতি বন্ধ করিতে হইলে জনমত জাগ্রত হওয়া দরকার—পৌরসভাও যাহাতে আসানসোলে আরও তিনটি বাজার বসে সে বিষয়ে চেষ্টা করেন। স্থায়ী বাজার যদি এখনই বসান সম্ভব না হয় তবে আপকার গার্ডেন বা চেলিডাঙ্গায় সকালের দিকে একটি হাটের মত বাজার বসান যাইতে পারে, অনুরূপভাবে মহিশীলা কলোনীর নিকট ও রেলপারে দুইটি বাজার বসাইলে তবেই মুন্সিবাজারের অত্যাচার হইতে ক্রেতা-সাধারণ বাঁচে। আমরা এ বিষয়ে পৌরকর্ত্তা শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এবং মহকুমা-শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।"

বাংলা দেশে বাঙালীবিদ্বেষ

আজ সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়াই বাঙালীদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণের ঢেউ উঠিয়াছে। বহু ব্যবসায় এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিকরা বাংলা দেশে বসিয়াই বাঙালীদের বিরুদ্ধতা করিতেছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের আচরণের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ হইতে পর্য্যন্ত প্রতিবাদ করিতে হইয়াছে। কিন্তু কোন ফল তাহাতে হয় নাই।

বার্ণপুর হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "জি. টি. রোড" পত্রিকায় সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের এইরূপ বাঙালী-বৈষম্যের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। "জি. টি. রোড" লিখিতেছেন:

"বার্ণপুর যদিও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যের অন্তর্গত তথাপি বার্ণপুর কারখানায় বাঙালীর স্থান ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। ১৯৫৭ সনে শতকরা ২'১ জন হারে বাঙালীকে এই কারখানায় নিযুক্ত করা হইয়াছে—যদিও পশ্চিমবঙ্গের বেকারসমস্যা এক ভয়াবহ অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। অধুনা ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোংতে ব্লাষ্ট ফারনেস ও কোকোভেনে ৬৫ জন লোক নিযুক্ত করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে মাত্র দুই জন বাঙালীকে নিযুক্ত করা হইয়াছে বাকি ৬৩ জন লোকই অবাঙালী।

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় বাঙালীরা কাজ পাইবে বলিয়া যে আশা দেওয়া হইয়াছিল তাহাও পূর্ণ হয় নাই। দুর্গাপুরের প্রধান বেসরকারী কন্ট্রাক্টর সিমেন্টেশন প্যাটেল কোম্পানীর হাজার হাজার কর্ম্মচারীর মধ্যে একজনও বাঙালী নাই।

বাঙালী শ্রমিক নিয়োগের বিরুদ্ধে দুইটি যুক্তি দেখান হয়: এক তাহারা শ্রমে অপটু এবং দ্বিতীয়তঃ বাঙালী যুবকেরা ধর্ম্মঘটপ্রবণ। বার্ণপুরে "গো স্লো" ব্যাপারের পরে এই দুই যুক্তি যে নিতান্ত অমূলক তাহা বলা চলে না। কিন্তু এবিষয়ে কি কোন প্রতিকার চেষ্টাও অসম্ভব? নহিলে বাঙালীর বেকার সমস্যা বাড়িয়াই চলিবে।"

বাস দুর্ঘটনা

দেশব্যাপী যেন দুর্ঘটনার হিড়িক পড়িয়াছে। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে একপক্ষ কালের মধ্যেই তিনটি ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। ইহা ভিন্ন ট্রাম, বাস প্রভৃতির দুর্ঘটনা তো লাগিয়াই আছে। এই তো সেদিন ষ্টেট বাসের সহিত ধাক্কা লাগিয়া সেণ্ট-জেভিয়ার্স কলেজের জনৈক অধ্যাপক গুরুতররূপে আহত হন। ইহা ভিন্ন প্রতিদিন পত্রিকা খুলিলেই "ঘটনা দুর্ঘটনা" কলমে এইরূপ বহু খবর দেখিতে পাওয়া যায়।

মফঃস্বলের পত্রিকাদিতে প্রকাশিত সংবাদ এবং মন্তব্য হইতে দেখা যাইতেছে যে, কলিকাতার বাহিরেও এইরূপ দুর্ঘটনার হিড়িক পড়িয়াছে। এই সকল দুর্ঘটনা সম্পর্কে সাপ্তাহিক "বৰ্দ্ধমানবাণী" যাহা লিখিয়াছেন সকল দিক হইতেই সবিশেষ প্রণিধানযোগ্যবিধায় আমরা তাহা এখানে তুলিয়া দিলাম। "বৰ্দ্ধমানবাণী" লিখিতেছেন:

"মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে বৰ্দ্ধমান জেলায় পর পর কয়েকটি মোটর দুর্ঘটনায় প্রায় ২৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে। দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুকে কেবলমাত্র দুর্ঘটনা বলিয়া ভবিতব্যের দোহাই দিলে চলিবে না। অন্ততঃ এইসব ক্ষেত্রে। সম্প্রতি আসানসোল-পাঞ্চেৎ বাসে যে দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল—বৰ্দ্ধমান-তারকেশ্বর বাসে যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাকে স্রেফ দুর্ঘটনা বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না।

পাকেং বাসে ১৩ জন নিহত হইয়াছে, ৪০ জন অগ্নিদগ্ধ হইয়াছে। কাজেই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী কে তাহা নিরূপণ করিতে হইবে। সাধারণতঃ বাস দুর্ঘটনার জন্য তিনজনকে দায়ী করা হইয়া থাকে। প্রথমতঃ গাড়ীর মালিক—খারাপ গাড়ীর জন্য, দ্বিতীয়তঃ গাড়ীর চালক—অসতর্ক ও বেপরোয়া গাড়ী চালানোর জন্য, তৃতীয়তঃ পরিবহন কর্তৃপক্ষ।

"যাত্রীসংখ্যা বাড়িয়াছে। গাড়ীর সংখ্যা বাড়ানো হয় নাই। ৪ বৎসর পূর্ব্বে পাকেংগামী একটি বাস দেওয়া হয়। জানি না কোন অজ্ঞাত কারণে ঐ লাইনে দ্বিতীয় বাস দেওয়া হয় না। দুর্ঘটনায় আহত, মৃত এবং অক্ষত যাত্রীসংখ্যার সমষ্টি ন্যূনপক্ষে ৬০ জন হইবে। অর্থাৎ অত্যধিক যাত্রী বহন করা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। শুধু পুলিস নয় শাসনভার যাহাদের হাতে আছে তাহাদের নাসিকাগ্রে নিত্য ছয় বার এই গাড়ীখানি যাতায়াত করিতেছে। লক্ষ্য করিবার কেহ নাই—প্রতিবাদ করিবার কেহ নাই। কাজেই দুর্ঘটনা ঘটিলে ভবিতব্য বলিয়া ঘোষণা করা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করিয়া "বর্দ্ধমানবাণী" লিখিতেছেন, "ইহাদের কার্য্যপ্রণালীর ধারা অনুসরণ করিলেই বোঝা যায় যে, যাত্রীলাঞ্ছনা, দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু, অস্বাভাবিক ভিড়ের চাপ কোন কিছুই ইহাদের বিচলিত করিতে পারে না। প্রত্যক্ষভাবে যে দায়িত্ব ইহাদের হাতে আছে তাহা ইহারা নির্ব্বিবাদে এড়াইয়া যাইতে বদ্ধপরিকর।"

বর্দ্ধমান বিজয়চাঁদ হাসপাতাল

বর্দ্ধমান শহরের বিজয়চাঁদ হাসপাতালের বিরুদ্ধে নানারূপ অভিযোগ সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্ব্বে অনেকবার আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু ১লা কার্ত্তিক "বর্দ্ধমানবাণী" যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, এখনও পর্য্যন্ত অবস্থার কোনরূপ উন্নতি সাধিত হয় নাই। উক্ত পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হইয়াছে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ অব্যবস্থা দূরীকরণের কোন চেষ্টাই করেন নাই। উপরন্তু "ইহা স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্নীতির আস্তাবলে পরিণত হইয়াছে।"

বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া স্থানীয় দায়িত্বশীল জনসাধারণের অভিযোগসত্ত্বেও হাসপাতালটির কার্য্যব্যবস্থায় কোন উন্নতিসাধন করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হইল না। বোধ হয় কেবল আমাদের দেশেই এইরূপ অকর্ম্মণ্যতা (অথবা অযোগ্যতা) সম্ভব। অবশ্য আমাদের জাতীয় নেতৃবর্গ যেরূপভাবে বিশ্বসমস্যা সমাধানে ব্যস্ত সেক্ষেত্রে এসকল স্থানীয় ব্যাপারে মনোনিবেশ করিবার সময়ই তাঁহারা পান না।

কলিকাতার হাসপাতাল

বর্দ্ধমানের হাসপাতাল ত মফস্বলে। কলিকাতার হাসপাতাল সম্বন্ধে আনন্দবাজার গত ৩০শে কার্ত্তিক যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে দেওয়া গেল :

"কলিকাতার হাসপাতালগুলি সম্পর্কে অভিযোগের অন্ত নাই। ইদানীং রোগীর সহিত হাসপাতালের ডাক্তার এবং নার্সের হৃদয়হীন নিষ্ঠুর আচরণের অভিযোগ যেন ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। সেই সকল অভিযোগের যাচাই-বাছাই করা কিংবা ডাক্তার-নার্সের 'মৌখিক নির্ম্মমতার' সত্যতা নির্দ্ধারণ করা বা আইনের দিক হইতে প্রমাণ করা প্রতিটি ক্ষেত্রে হয় ত সম্ভব নয়; কিন্তু শয্যাশায়ী রোগীর অনুভূতিপ্রবণ মনে সেই নির্ম্মমতা, অবহেলা কোন কোন ক্ষেত্রে মর্ম্মান্তিক হইয়া ওঠে।"

"ইদানীং সমাজসেবার মহান দায়িত্বধারী এই সকল ডাক্তার-নার্সদের অনেকে নিষ্প্রাণ যন্ত্রের মত এমনভাবে কাজ সারিয়া যান যে, দুর্ব্বল রোগীর পক্ষে প্রয়োজনীয় সহানুভূতি ও সেবাযত্ন দিয়া রোগীকে সুস্থ করিয়া তোলার কোন তোয়াক্কা তাঁহারা রাখেন না বলিয়াই অনেকের মনে হয়। বরং তাঁহাদের দায়সারা-গোছের কর্ত্তব্যকর্ম্মে পরম ঔদাসীন্য অসহায় রোগীকে শোচনীয় পরিণতির দিকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে বলিয়া নানা অভিযোগ পাওয়া যায়। কলিকাতার সরকারী বে-সরকারী কোন হাসপাতালই অল্পবিস্তর ঐ সকল অভিযোগের হাত হইতে রেহাই পায় নাই। এমনকি এক শ্রেণীর অপরিণামদর্শী ডাক্তার-নার্সের হৃদয়হীনতার ফলে কোন কোন হাসপাতালের বহুদিনকার অর্জ্জিত সুনামও ক্ষুণ্ণ হইতে চলিয়াছে।

"সুখলাল কারনানী হাসপাতালের (পূর্ব্বতন প্রেসিডেন্সী জেনারেল) সুনামও বহুদিনকার। কিন্তু ঐ হাসপাতালের জনৈকা রোগীর স্বামীর নিকট হইতে এক মর্ম্মান্তিক অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

"রোগিণীর স্বামীর প্রদত্ত বিবরণ নিম্নোক্তরূপ :

"গলষ্টোন অপারেশনের জন্য শ্রীমতী পুষ্প রায় ২৮শে অক্টোবর ভর্ত্তি হন সুখলাল কারনানী হাসপাতালে। তাঁহাকে রাখা হয় উডবার্ণ ওয়ার্ডের তিন নম্বর কেবিনে। ২রা নবেম্বর তাঁহার অপারেশনের দিন স্থির হয়। অপারেশনের দায়িত্ব পড়ে কলিকাতার জনৈক খ্যাতনামা সার্জ্জনের উপর। ঐ সার্জ্জন ঐদিন বেলা ৩টা নাগাদ অপারেশন করিয়াই বোম্বাই চলিয়া যান। রোগীর দেহে অপারেশনের ফলাফল জানিবার জন্য যুক্তিসঙ্গত সময়ও তিনি দিতে পারেন নাই। এমনকি অপারেশন করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রোগীর অভিভাবককে জানানো হয় নাই যে, তিনি অপারেশন করিয়াই কলিকাতা ত্যাগ করিবেন। ইহা জানা থাকিলে অভিভাবকরা অন্যভাবে চেষ্টা করিতেন বলিয়া বিবরণে জানান হইয়াছে।

"পরদিন অভিভাবক গিয়া দেখেন যে, তাঁহার স্ত্রীর অবস্থা তেমন খারাপ নয়। ঐ সময় রোগীর তৃষ্ণা পাইলে তিনি নিজেই পাশের টেবিল হইতে জল লইয়া ঢকঢক করিয়া এক পেট জল পান করিয়া লন। তিনি একাধিকবার এরূপ জল পান করেন। হাস-

পাতাল হইতে এই ব্যাপারে তাহাকে কেহ নিষেধ করে না; অথবা বাধাও দেয় না। ইহার পরদিন হঠাৎ খবর আসে যে, রোগীর অবস্থা অবনতির দিকে। রোগীর স্বামী তাড়াতাড়ি হাসপাতালে গিয়া দেখেন যে, অবস্থা সত্যই তাই। তিনি দেখেন, একজন ডাক্তার রোগীর পার্শ্বে আছেন, কিন্তু নার্সের কোন দেখা নাই। ঐ ডাক্তার জানান যে, অবস্থা গুরুতর, রোগীর দেহে ব্রঙ্কাইটিস ও হাঁপানির আক্রমণ হইয়াছে।

ঐ সময় রোগীর অভিভাবক জানিতে পারেন যে, পূর্ব্বদিন রাত্রে ঐ ৩নং কেবিনের ভিতর জনৈক হাউস সার্জ্জন ও নার্সের মধ্যে তুমুল বচসা হইয়া গিয়াছে এবং নার্সকে ডিসচার্জ্জ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই নার্সকে রোগীর অর্থে মেট্রন নিয়োগ করিয়াছিলেন। (পরে এই সম্পর্কে জানা গিয়াছে যে, রোগীকে অক্সিজেন দেওয়ার যন্ত্র আনার ব্যাপারে গরমিল হওয়ায় নাকি ঐ গণ্ডগোল দেখা দেয়।)

রোগীর চিকিৎসা ও রোগ নির্ণয় লইয়া ডাক্তারদের মধ্যে একদিকে গবেষণা চলে, অন্যদিকে রোগীর অবস্থা ক্রমেই অবনতির দিকে যায়। ঐ সময়ের মধ্যেও রোগী প্রচুর জল খাইতে থাকেন। কেহই বাধা দেয় না। ঐদিনই একজন ডাক্তার জানান যে, এক্স-রে রিপোর্ট অনুযায়ী রোগীর নিউমোনিয়া হইয়াছে বলিয়াই মনে হইতেছে। রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইলেও তাহাকে ঐ অবস্থায় ৩নং কেবিন হইতে ৪নং কেবিনে সরাইয়া লওয়া হয়।

ঐদিন রাত্রে রোগীর অভিভাবকেরা দোদুল্যমান মানসিক অবস্থা লইয়া বাহিরে অপেক্ষা করিতে থাকেন। মাঝে মাঝে খবর আসে যে, রোগীর অবস্থা মোটেই ভাল নয়। অথচ ঐ সময় রোগীর কেবিনের সম্মুখে ডাক্তার-নার্সের মধ্যে উচ্চকিত কণ্ঠস্বরে হাসিঠাট্টার আওয়াজ শুনিতে পাওয়া যায়। অভিভাবকেরা দূর হইতে উহা দেখিয়া ভাবেন যে, তাহা হইলে হয়ত রোগীর অবস্থা ভালর দিকে যাইতেছে। কিন্তু সব আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব মিটাইয়া দিয়া রোগী শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ঐদিন ৪ঠা নবেম্বর রাত্রি দেড়টায়।

মৃত্যুকে কেহ আটকাইতে পারে না সত্য, কিন্তু অভিভাবকের মনে ঐ মৃত্যু সম্পর্কে যে কয়টি প্রশ্ন দেখা দিয়াছে, তাহাও উড়াইয়া দিবার নয়।

রেলে দুর্ঘটনা

সারা দেশে রেলে দুর্ঘটনা চলিতেছে। মনে হয় রেলবিভাগে কাজকর্ম্মের শৃঙ্খলা বোধ হয় আর নাই। আনন্দবাজার লিখিতেছেন:

"বৃহস্পতিবার সকালে কলিকাতা হইতে প্রায় ৫৮ মাইল দূরে পূর্ব্ব রেলওয়ের রাণাঘাট-বানপুর সেকশানের বগুলা ষ্টেশনে বাণপুর আপ লোকাল ট্রেনটি দুর্ঘটনায় পতিত হয় এবং তিনজন যাত্রী আহত হয়; তন্মধ্যে দুইজনকে কৃষ্ণনগর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করিতে হয়। হাসপাতালে আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন বলিয়া জানা গিয়াছে। ইহা ছাড়া আরও ১৫।২০ জন যাত্রীও প্রবল ঝাকুনিতে সামান্য আঘাত পান বলিয়া প্রকাশ।

"আপ বাণপুর লোকাল ট্রেনটি বগুলা ষ্টেশন প্লাটফরমে ঢুকিবার মুখে ইঞ্জিনের পিছনের পাঁচটি বগি লাইনচ্যুত হইয়া যায়। তবে সৌভাগ্যক্রমে ঐ বগিগুলি সামান্য কাৎ অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকে, একেবারে ভূমিসাৎ হইয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় না। না হইলে অনেক লোক হতাহত হইবার সমূহ আশঙ্কা ছিল।

"এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গত সাত দিনের মধ্যে শিয়ালদহ সেকশানে ইহা তৃতীয় ট্রেন দুর্ঘটনা। তবে বগুলা ষ্টেশনে এই দুর্ঘটনাটির কারণ অত্যন্ত অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। আমাদের মাজদিয়া এবং রাণাঘাটের সংবাদদাতাদ্বয় ঐ দুর্ঘটনা সম্বন্ধে যে বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ যে, ঐ ট্রেনটি ষ্টেশনে ঢুকিবার মুখে ট্রেনের ইঞ্জিনের ব্রেক রড ভাঙ্গিয়া রেললাইনের উপর পড়ে। উহারই ফলে ইঞ্জিনের পরবর্ত্তী চারিটি বগি সম্পূর্ণ লাইনচ্যুত হয় এবং পঞ্চম বগিটি আংশিকভাবে লাইন হইতে সরিয়া যায়।"

রেলে অনাচার

রেলে যে কি ঘোর অনাচার চলিয়াছে তাহার আর একটু নমুনা নিম্নস্থ সংবাদ যাহা আনন্দবাজার ২৭শে কার্ত্তিক দিয়াছেন:

"সোমবার অপরাহ্ণে বামুনগাছি রেলওয়ে ব্রীজের নিকট রেলের কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট দুই দলে এক সংঘর্ষের ফলে শ্রীবিষ্ণুপদ রায় নামে রেলের জনৈক ব্রীজ ইন্সপেক্টর এবং অপর কয়েকজন গুরুতর ভাবে আহত হন। শ্রী রায় এবং আরও প্রায় ছয় জনকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। রাত্রি দুইটার সময় বি. আর. সিং হাসপাতালে শ্রী রায়ের মৃত্যু ঘটে।

"জানা গিয়াছে যে, একদিকে একদল রেলরক্ষী পুলিস এবং অপরদিকে উক্ত ব্রীজ ইন্সপেক্টরের অধীনে কর্ম্মরত শ্রমিকদের মধ্যে এই সংঘর্ষে দুই দলে প্রায় ১৫০ জন লোক যোগ দেয়। সংঘর্ষকালে প্রচণ্ড মারামারিও হয়। শ্রী রায় যেরূপ গুরুতর আহত হন এবং পরে কয়েক ঘণ্টার ভিতরই মারা যান তাহাতে অনেকে এরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন যে, সঙ্ঘর্ষকালে নিশ্চয়ই তাঁহাকে লাঠি জাতীয় কিছু দিয়া আঘাত করা হইয়াছিল।

"ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, ঐদিন অপরাহ্ণে ৪টা নাগাদ কিছু-সংখ্যক শ্রমিক বামুনগাছির নিকট অবস্থিত একটি গুদাম হইতে কয়লা আনিতে যায়। নিজেদের ব্যবহারের জন্য তাহাদের মাঝে মাঝে উক্ত স্থান হইতে কয়েক সের কয়লা দিবার প্রথা চালু আছে। আরও প্রকাশ যে, তাহারা কয়লা লইয়া বাহিরে আসিলে গেটের নিকট প্রহরারত রেলরক্ষী দলের জনৈক সৈনিক নিয়ম অনুযায়ী কয়লা লইয়া যাইবার অনুমতি-পত্র বা 'পাস' দেখিতে চায়। শ্রমিকরা তাহার নিকট ঐ 'পাস' দেয়; কিন্তু পরে তাহারা আবার উহা ফেরত চাহে। তখন দ্বাররক্ষী সৈনিক 'পাস'টি ফিরাইয়া দিতে অস্বীকার করিলে বিবাদের সৃষ্টি হয় বলিয়া জানা গিয়াছে।"

"আরও প্রকাশ যে, ইতোমধ্যে একদিকে রেলরক্ষী পুলিস-বাহিনীর প্রায় ১০০ কর্ম্মচারী এবং অপরদিকে প্রায় ৬০ জন শ্রমিক ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। বাদানুবাদ হইতে যে সঙ্ঘর্ষের সৃষ্টি হয় তাহাতে উক্ত ট্রাফিক ইন্‌সপেক্টর এবং আরও ছয়-সাত জন আহত হন।"

"সমৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা"

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ত ইতিমধ্যেই জনসাধারণের সমাজে ডামাডোলের সৃষ্টি হইয়াছে। কর্ত্তা যাঁহারা তাঁহাদের সেদিকে দৃষ্টি নাই, শুধু আছে তাঁহাদের বক্তৃতার বহর। নিম্নে একটি নমুনা দেওয়া গেল। আমাদের প্রশ্ন এই মাত্র যে, সাধারণের দুর্দ্দশা নিবারণের কি ব্যবস্থা হইবে।

পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান শ্রী ভি. টি. কৃষ্ণমাচারী আকাশবাণীর দিল্লী কেন্দ্র হইতে "সমৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা" পর্য্যায়ে এক বেতার-ভাষণে বলেন :

"পরিকল্পনাটি জনগণের এবং ইহার সাফল্যের জন্য তাহাদিগকে মিলিতভাবে চেষ্টা করিতে হইবে—ইহা যাহাতে তাহারা অনুভব করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য দেশের কল্যাণে আত্মোৎসর্গকারী সহস্র সহস্র নারী ও পুরুষ দরকার। তাহারা পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য জনগণের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইবে এবং তাহাদের জীবনধারণের মান উন্নয়ন করিতে, তাহাদের স্বার্থ ত্যাগ করিতে তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিবে।

শ্রীকৃষ্ণমাচারী বলেন, আমাদের লক্ষ্যগুলি খুবই মামুলী। আমরা বিশ বৎসরে মাথাপিছু জাতীয় আয় ২৮১ টাকা হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৫৪৬ টাকা করিতে চাই। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই আয় ২৮১ টাকা হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৩৩১ টাকা করার লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কর্ম্মসংস্থান প্রসঙ্গে বলা যায় যে, যদি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হয় তবে ৮০ লক্ষ হইতে ১ কোটি লোকের কর্ম্মসংস্থান হইবে।

প্রথমতঃ, পণ্য উৎপাদন বিশেষতঃ কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে। পরিকল্পনা কমিশন মনে করেন যে, কৃষি-জাত দ্রব্যের উৎপাদন শতকরা ৪০ ভাগ বৃদ্ধি করা উচিত। তাহাতে দেশের প্রয়োজন মিটিবে এবং পরিকল্পনার শেষ দিকে কিছু কৃষিজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করিয়া বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জ্জন করা যাইবে।

দ্বিতীয়তঃ, আভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধি করিতে হইবে, বিশেষতঃ স্বল্প সঞ্চয় অভিযান জোরের সহিত চালাইতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, পণ্যমূল্য হার এমনভাবে বজায় করিয়া চলিতে হইবে যাহা উৎপাদক ও ব্যবহারক উভয়ের নিকট ন্যায্য বলিয়া বিবেচিত হয় এবং যাহার ফলে মুদ্রাস্ফীতি না ঘটাইয়া উন্নয়ন কর্ম্মসূচী রূপায়িত করা যায়।

এখানে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করিতে চাই। অনুন্নত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যেখানে বেকার ও অর্দ্ধ-বেকারের সংখ্যা বেশী, সেখানে সমষ্টির কল্যাণকর কাজের জন্য গ্রামাঞ্চলের অব্যবহৃত জনশক্তিকে কাজে লাগাইবার কর্ম্মসূচী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় সম্প্রসারণ-সংস্থা ও সমষ্টি-উন্নয়ন এলাকায় এ সম্পর্কে অনেক কাজ করা হইতেছে। শ্রমদান-সপ্তাহ পালন জনপ্রিয় হইতেছে। আগামী কয়েক বৎসরে গ্রামবাসীদের স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সেচ, বনায়ন, ভূমি সংরক্ষণ, জ্বালানির জন্য বৃক্ষরোপণ, উৎকৃষ্ট গোচারণ ভূমি প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রত্যেক জাতীয় সম্প্রসারণ-সংস্থার জন্য পঞ্চবার্ষিকী কর্ম্মসূচী রচনা করিতে হইবে। ঐ কর্ম্মসূচীতে প্রতি গ্রাম, গ্রামপুঞ্জ এবং সমগ্র ব্লকের কর্ম্মসূচী থাকিবে।

আমি যাহা বলিলাম তাহাতে সমষ্টি-উন্নয়ন আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা ব্যক্ত হইয়াছে। ইহার প্রধান কার্য্য হইল—উৎপাদন বৃদ্ধি ও সঞ্চয় বৃদ্ধির ব্যাপারে জনগণকে তাহাদের প্রচেষ্টায় সহায়তা করা। এ পর্য্যন্ত এই আন্দোলন গ্রামাঞ্চলেই চলিতেছে। কিন্তু ইহার পদ্ধতি ও কর্ম্মসূচী সহরাঞ্চলেও প্রযোজ্য। এই আন্দোলনটি স্বায়ত্তশাসনশীল পঞ্চায়েৎ ও সমবায় ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করিয়া প্রকৃতপক্ষে জনগণেরই আন্দোলন হইবে। নিম্নলিখিত ভাবে ইহা বিচার করিতে হইবে :

(১) প্রত্যেক পরিবারের উৎপাদন বৃদ্ধির কর্ম্মসূচী থাকিবে।

(২) প্রত্যেক পরিবার অন্ততঃ একটি সমবায় সমিতির সদস্য থাকিবে এবং পরিকল্পনার জন্য নিয়মিতভাবে অর্থ সঞ্চয় করিবে।

(৩) প্রতি পরিবার সমষ্টির স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির জন্য কিছুটা সময় ক্ষেপণ করিবে।

(৪) সকল অঞ্চলে সুষ্ঠুভাবে নারী ও যুব আন্দোলন চালাইতে হইবে।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই কথা বলা চলে যে, পরিকল্পনাটি যে জনগণের এবং ইহার সাফল্যের জন্য যে তাহাদিগকে মিলিতভাবে চেষ্টা করিতে হইবে একথা তাহাদিগকে অনুভব করাইতে হইবে।

শান্তিনিকেতন

আমরা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই পত্রিকায় লিখিয়াছিলাম যে, শান্তিনিকেতনের তখনকার অবস্থা অপেক্ষা উহা মহাশ্মশানে পরিণত হইলে ভাল ছিল। মধ্যে কিছু উন্নতি হইয়াছিল। বর্ত্তমানে যাহা চলিতেছে তাহা আনন্দবাজার হইতে আমরা তুলিয়া দিলাম :

"সম্প্রতি শান্তিনিকেতনে জনৈক অধ্যাপক অপর একজন অধ্যাপক কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হওয়ায় যে অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, শান্তিনিকেতনের দায়িত্বশীল আশ্রমিকগণের মধ্যেও তাহা গুরুতর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। বিশ্বভারতীর দুই জন ভূতপূর্ব্ব উপাচার্য্য—শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ও পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন—এবং শিল্পাচার্য্য নন্দলাল বসু প্রমুখ প্রবীণ ব্যক্তিগণও এই ঘটনায় বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

বিশ্বভারতীর উপাচার্য্য অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু গত সোমবার এলাহাবাদ হইতে শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এই ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত আরম্ভ করেন। ছাত্রমহল হইতে অভিযোগ করা হয় যে, ইংরেজীর অধ্যাপকের হাতে শিল্পী অধ্যাপক যে প্রহৃত হইয়াছেন, তাহার উপর গুরুত্ব আরোপ না করিয়া এক শ্রেণীর ছাত্রের হস্তে ইংরেজীর অধ্যাপকের লাঞ্ছনার বিষয়টি এই তদন্তের মূল উপজীব্য হইয়াছে। ফলে, ছাত্রদিগের মধ্যে ব্যাপকভাবে হতাশার সঞ্চার হইয়াছে এবং শান্তিনিকেতনের আশ্রমিকদের মধ্যেও ইহা বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

উপাচার্য্য অধ্যাপক বসু গত মঙ্গলবার ও বুধবার কয়েকজন ছাত্রকে এই ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং ছাত্রদের বক্তব্য 'টেপ রেকর্ডে' নথিভুক্ত করিয়া রাখা হয়। প্রকাশ, ইহাতে ছাত্রদের মধ্যে বিক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহারা 'টেপ রেকর্ডে' তাহাদের বক্তব্য নথিবদ্ধ করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। উপাচার্য্যের জেরার উত্তরে প্রায় প্রত্যেক ছাত্রই উক্ত ইংরেজীর অধ্যাপকের বিরুদ্ধে নানাবিধ গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করে বলিয়া জানা গিয়াছে।

আরও প্রকাশ, অধিকাংশ ছাত্রই এই অভিমত প্রকাশ করে যে, যে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের আদর্শের প্রতি আদৌ শ্রদ্ধাশীল নহেন, তাঁহার উপর বিশ্বভারতীর ন্যায় প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করার দায়িত্ব অর্পণ করা যাইতে পারে না।

ইতোমধ্যে উক্ত ইংরেজীর অধ্যাপককে এক মাসের জন্য বিশেষ ছুটি মঞ্জুর করা হইয়াছে বলিয়া বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও ছাত্রগণের বিক্ষোভ প্রশমিত করা যায় নাই। তাহারা উক্ত অধ্যাপকের পদচ্যুতির জন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পুনঃ পুনঃ চাপ দিতেছে এবং কর্ত্তৃপক্ষকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ইহাও জানাইয়াছে যে, যদি ছাত্রদের দাবি পূরণ করা না হয় তবে ভবিষ্যতে অবস্থা আরও ঘোরালো হইয়া উঠিতে পারে। প্রকাশ, নবেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে বিশ্বভারতী কর্ম্ম-সমিতির (সিণ্ডিকেট) অধিবেশনে এই বিষয়টি আলোচিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন তাঁহার বিবৃতিতে বলেন, "যে দুঃখ-জনক ব্যাপার আমাদের আশ্রমে সেদিন ঘটিয়া গেল, সেই সম্পর্কে যাহা শুনিতেছি তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে, এই আশ্রমের ভবিষ্যৎ বড়ই অন্ধকার।

"সেদিনকার ব্যাপার সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে কিছু বলিতে না পারিলেও ইহা বলিতে পারি যে, কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে এখানে যে আচরণ চলিতেছে তাহা বড়ই নৈরাশ্যজনক। সত্যই যদি এইরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে বলিতে হইবে, মৃত্যু আসিয়া আমাদের ধরিয়াছে। আমি বৃদ্ধ ও ক্লান্ত। কাজেই এই সকল ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে চাহি না। তবুও কয়েকটি কথা বলা উচিত মনে করিতেছি।

"এখানে কোনদিন নূতন-পুরাতনের বিরোধ ছিল না। প্রাচ্য-প্রতীচ্য, সম্প্রদায়গত বা প্রদেশগত কোন ভেদবুদ্ধি কখনই এখানে ছিল না। ১৯২১ সনে অত্যন্ত দারিদ্র্যের সম্ভাবনা স্বীকার করিয়া গুরুদেব যখন বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করিলেন তখন আমাদের সম্বল ছিল সাম্য ও মৈত্রী। ছাত্র ও শিক্ষক, নূতন ও পুরাতন—এইসব সাংঘাতিক বিরোধ-বাক্য কেহ জানিতেন না।

"এণ্ডরুজ পিয়াসন, এলমহার্ষ্ট ইঁহাদের কথা না-ই বলিলাম। তাঁহারা ছিলেন আপন ঘরের লোক। সিলভাঁ লেভী, উইণ্টারনিৎস, তুচ্চি, লেসনী, ফরমিকি কয়েকজন বিশ্ববিশ্রুত মহাপণ্ডিতের সহায়তাও আমরা পাইয়াছিলাম। তাঁহাদের কেহই কখনও নিজস্ব সুবিধা-অসুবিধার কথা মনে করিতে দেন নাই। আর আজ যাঁহারা নাকি নূতন সেবা করিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য এখন নাকি বিশেষ ব্যবস্থার দরকার অনুভূত হইয়াছে। এই বৈষম্যে যে বিপদ আছে সেকথা যদি কেহ বলেন, তবে তাঁহারাই নাকি মৃত্যু-ধর্ম্মী বাধা আমদানী করেন।..."

কাশ্মীর প্রসঙ্গ

নিরাপত্তা পরিষদে যে অপরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে সে সম্বন্ধে পণ্ডিত নেহরুর মন্তব্য নিম্নরূপ:

"১৫ই নবেম্বর—প্রকাশ, প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ এখানে পররাষ্ট্রবিষয়ক সংসদীয় উপদেষ্টা কমিটিতে বলেন যে, সুইডেনের প্রতিনিধি শ্রীগানার জারিং নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর সংক্রান্ত কয়েকটি 'আইনগত প্রশ্নে' আন্তর্জ্জাতিক আদালতের মতামত গ্রহণের যে পরামর্শ দিয়াছেন, ভারত তাহা প্রত্যাখ্যান করে নাই; পরামর্শটি কোন সুনির্দ্দিষ্ট প্রস্তাবের আকারে নিরাপত্তা পরিষদে উপস্থাপিত হইলেই শুধু ভারত এ সম্বন্ধে উহার অভিমত প্রকাশ করিতে পারে। শ্রীজারিং-এর এই পরামর্শ সম্পর্কে ভারত 'মন খোলা রাখিয়াছে'।"

ডাঃ ফ্র্যাঙ্ক গ্রাহামের মিশনকে পুনরায় ভারতে পাঠাইবার জন্য ইঙ্গ-আমেরিকান প্রস্তাবের উল্লেখ করিয়া শ্রীনেহরু নাকি বলেন যে, ভারত এই প্রস্তাবের ঘোর বিরোধী। এই মিশনকে পুনরায় ভারতে পাঠাইবার প্রস্তাব ভারত অগ্রাহ্য করিবে। প্রকাশ, শ্রীনেহরু বলেন, নিরাপত্তা পরিষদের বর্ত্তমান গঠন যেরূপ তাহাতে উহা "বাগদাদ চুক্তি পরিষদে" পরিণত হইয়াছে। ভারত প্রত্যাখ্যান করিলেও এই প্রকার প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদে পাশ করাইয়া লওয়া যাইবে। যাহা হউক, নিজের বক্তব্য পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দেওয়াই হইতেছে ভারতের কর্ত্তব্য।

হিন্দী "রাষ্ট্রভাষা"

হিন্দীকে সরাসরি সারা ভারতের স্কন্ধে চাপাইবার জন্য যে অবিবেচক দলগুলি বদ্ধপরিকর হইয়াছেন তাঁহাদের সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরুর নিম্নে প্রদত্ত মন্তব্য প্রণিধান যোগ্য:

"নয়াদিল্লী, ১০ই নবেম্বর—প্রকাশ, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু আজ এখানে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বলিয়া-

ছেন যে, অ-হিন্দীভাষিগণ যাহাতে কোন অসুবিধায় না পড়েন তজ্জন্য হিন্দীকে ভারতের সরকারী ভাষারূপে ব্যবহারের প্রশ্নটিকে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহযোগিতামূলক মনোভাব লইয়া বিবেচনা করা আবশ্যক।

সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের জন্য প্রার্থীদের পরীক্ষায় হিন্দীকে বাধ্যতামূলক বিষয় করা উচিত নয় বলিয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যে অভিমত প্রকাশ করেন, শ্রীনেহরু তাহা অনুমোদন করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

শ্রীনেহরু চণ্ডীগড় হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের অব্যবহিত পরই সোজা সভায় চলিয়া যান। তিনি পঞ্জাবের ভাষা আন্দোলনের উল্লেখ করিয়া পুনরায় বলেন যে, হিন্দী আন্দোলন জাতির স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর। যাঁহারা আন্দোলন পরিচালনা করিতেছেন, আন্দোলন প্রত্যাহার করিলে তাঁহাদের মর্য্যাদা কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ হইবে না।

শ্রীনেহরু এরূপ ইঙ্গিত দেন যে, সরকারী ভাষা কমিশনের রিপোর্ট বিবেচনার্থ নিযুক্ত পার্লামেণ্টারী কমিটি তাঁহাদের কাজ শেষ করিতে পারিলে ভাষার প্রশ্ন সংসদের অধিবেশনে উপস্থাপিত হইতে পারে। তিনি জোরের সহিত বলেন, দলীয় সদস্যগণের এ কথা পরিষ্কারভাবে মনে রাখা উচিত যে, এই প্রশ্নে যাহা কিছুই করা যাউক না কেন, তাহা সহযোগিতামূলক মনোভাব লইয়াই করিতে হইবে। সরকারী ভাষার প্রশ্নটি পার্লামেণ্টারী কমিটি কর্ত্তৃক বিবেচিত হইতেছে বলিয়া এ বিষয়ে তাঁহার কোন মতামত প্রকাশ করা উচিত হইবে না, তবে এ কথা তিনি না বলিয়া পারিতেছেন না যে, এই বিষয়ে ক্রমেই যে উত্তেজনা বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহা তাঁহাকে অত্যন্ত পীড়িত করিতেছে। সর্ব্বসম্মত সমাধান যাহাতে সম্ভব হয়, একমাত্র সেভাবেই প্রশ্নটির মীমাংসার চেষ্টা করা উচিত। একমাত্র এ ভাবেই অ-হিন্দীভাষীদের আশঙ্কা দূর হইতে পারে।

প্রকাশ, শ্রীনেহরু বলেন যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে হিন্দী প্রশ্ন সম্পর্কে মত প্রকাশ করেন। ওয়ার্কিং কমিটি দৃঢ়তার সহিত এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, অ হিন্দী-ভাষীদিগকে অসুবিধাজনক অবস্থায় ফেলা উচিত নহে এবং সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের জন্য প্রার্থীদের যে পরীক্ষা লওয়া হয়, তাহাতে হিন্দীকে বাধ্যতামূলক ভাষা করা উচিত নহে। পরীক্ষা পাসের পর সকল প্রার্থীদের হিন্দীতে পরীক্ষা দিতে বলা যাইতে পারে।

শ্রীনেহরু বলেন যে, ভাষার প্রশ্ন বিবেচনার সময় উত্তেজনার সঞ্চার যাহাতে না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অ-হিন্দী এলাকাগুলিতে লোকে স্বেচ্ছায়ই হিন্দী শিখিতেছে। স্বেচ্ছায় লোকে যাহাতে হিন্দী শিখে, তাহাতেই উৎসাহ দেওয়া উচিত, চাপ দেওয়া উচিত নহে।

বাংলার খাদ্যশস্যের অবস্থা

আনন্দবাজার নিম্নস্থ সংবাদটি দিয়াছেন। দেখা যাউক সরকার কি করেন :

"আগামী বৎসর পশ্চিমবঙ্গে চাহিদার অনুপাতে চাউল ও গমে মোট ১২ লক্ষ টন খাদ্যের ঘাটতি হইতে পারে বলিয়া সরকারী মহলের প্রাথমিক হিসাবে অনুমান করা হইতেছে। এইবার প্রধানতঃ অনাবৃষ্টির দরুন আমন ফসল ভাল না হওয়াই উহার কারণ। এই অবস্থায় আগামী বৎসর এই রাজ্যের খাদ্য-পরিস্থিতি সঙ্কটজনক আকার ধারণ করার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে এবং উহাতে সরকার ও সরকারবিরোধী উভয় মহলেই বিশেষ উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে বলিয়া জানা যায়।

প্রকাশ, বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ আকার ধারণ করিয়াছে যে, বাজারে আমন ফসল উঠিবার মুখে রাজ্যসরকার আগামী বৎসরের সম্ভাব্য খাদ্য-সঙ্কটের হাত হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য অবলম্বনীয় উপায়াদি নির্দ্ধারণকল্পে এখন হইতেই বিশেষভাবে চিন্তা করিতে সুরু করিয়াছেন। বামপন্থী নেতৃবৃন্দও বুধবার অপরাহ্ণে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঐ সম্পর্কে সরকারকে অধিকতর সক্রিয় হইবার জন্য চাপ দেন। রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ঐ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

উপরোক্ত বার লক্ষ টনের সম্ভাব্য ঘাটতির মধ্যে চাউলের ঘাটতি নয় লক্ষ টন এবং বাকি তিন লক্ষ টন গমের। এই ঘাটতি কিভাবে মিটানো যাইবে তাহাই রাজ্যসরকারের বিশেষ চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

পরলোকে শ্রীনির্ম্মলপদ চট্টোপাধ্যায়

আসানসোলের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক, সাপ্তাহিক "বঙ্গবাণী" সম্পাদক শ্রীনির্ম্মলপদ চট্টোপাধ্যায়, গত ২৬শে অক্টোবর পরলোক-গমন করেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স হইয়াছিল ষাট বৎসর। শ্রী চট্টোপাধ্যায় স্থানীয় বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুতে স্থানীয় সমাজসেবীদের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। আমাদের সহিত শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না, কিন্তু দূর হইতে তাহার নির্ভীক সাংবাদিক সততা এবং যুক্তিপূর্ণ সম্পাদকীয় মন্তব্যের জন্য তাঁহার সম্পাদিত "বঙ্গবাণী" পত্রিকা আমরা সাগ্রহে পাঠ করিতাম। আমরা বহুবার শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্যের সহিত মতৈক্য অনুভব করিয়াছি এবং একাধিকবার এই পত্রিকার মাধ্যমে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। আমরা তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অর্থ যোগাইতে আমদানী বন্ধ হওয়ায় বর্ত্তমানে ব্লকের প্লেট খোলা বাজারে আদৌ পাওয়া যাইতেছে না। প্লেট সবই চোরা বাজারে চলিয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় রঙীন ছবি, হাফ্‌-প্লেট প্রভৃতি কতদিন দেওয়া যাইতে পারিবে সন্দেহস্থল। পত্রিকার অঙ্গ হিসাবে এ যাবৎ যে পরিমাণে চিত্রাদি আমরা দিয়া আসিতেছি অতঃপর সে পরিমাণে পত্রস্থ করাও সম্ভব হইবে না। এজন্য পাঠকগণ আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন।

প্রবাসীর সম্পাদক।

শঙ্করের "অধ্যাসবাদ"

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

২

পূর্ব সংখ্যায় "অধ্যাসে"র স্বরূপ ও লক্ষণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বিবরণী দেওয়া হয়েছে। এই সংখ্যায়, "অধ্যাস" কি ভাবে সাধারণ সাংসারিক জীবনের কারণস্বরূপ হয়, সে বিষয়ে বিশদতর আলোচনা করা হচ্ছে।

বস্তুতঃ, শঙ্করের মতে সমস্ত লোকব্যবহারই অধ্যাসমূলক। সেজন্য সাধারণ লৌকিক ব্যবহারই কেবল নয়, এমন কি বৈদিক ব্যবহারও সমভাবে অধ্যাসমূলক। শঙ্কর বলছেন :

"তমেতমবিদ্যাখ্যমাত্মানাত্মনোরিতরেতরাধ্যাসং পুরস্কৃত্য সর্বে প্রমাণ-প্রমেয়-ব্যবহারা লৌকিকা বৈদিকাশ্চ প্রবৃত্তাঃ, সর্বাণি চ শাস্ত্রাণি বিধিপ্রতিষেধ-মোক্ষপরাণি।"

(অধ্যাস-ভাষ্য)

অর্থাৎ, আত্মা ও অনাত্মার অবিদ্যা নামক অধ্যাসের ভিত্তিতেই সমস্ত প্রমাণ-প্রমেয় ব্যবহার, সমস্ত লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার, সমস্ত বিধিশাস্ত্র, নিষেধশাস্ত্র ও মোক্ষশাস্ত্র উৎপন্ন হয়েছে।

এই বিষয়ে ব্যাখ্যা করে শঙ্কর বলছেন যে, প্রথমতঃ, প্রমাণ-প্রমেয়-ব্যবহারের মূল কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, এরূপ ব্যবহার সম্পূর্ণরূপেই 'অহং-মম' ভাবমূলক। যাঁদের দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ বা মনে 'অহং' ভাব নেই, অর্থাৎ, যাঁরা দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের সঙ্গে আত্মার অধ্যাস করেন না, অথবা দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনকে আত্মা বলে জ্ঞান করেন না— তাঁদের ক্ষেত্রে প্রমাতৃত্ব বা কর্তৃত্বাদি সম্ভবপরই নয়। কারণ, যাঁরা 'প্রমাতা' বা জ্ঞাতা, তাঁরা প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দপ্রমুখ বিভিন্ন 'প্রমাণের' মাধ্যমেই 'প্রমেয়' বিষয়কে জেনে, 'প্রমা' বা জ্ঞান লাভ করেন। এক্ষেত্রে, প্রত্যক্ষপ্রমুখ 'প্রমাণ' দেহেন্দ্রিয় মনের সাহায্যেই সম্ভবপর। যেমন, প্রত্যক্ষকারীর অনুভব বা জ্ঞান এরূপ হয় :—'আমি চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করছি, কর্ণ দ্বারা শব্দ শ্রবণ করছি, নাসিকা দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করছি, জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করছি, ত্বক দ্বারা বস্তু স্পর্শ করছি।' এক্ষেত্রে, দেহজ্ঞান বিলুপ্ত হলে ইন্দ্রিয়েরা কোন্ অধিষ্ঠানে থেকে স্ব স্ব কার্য নির্বাহ করবে? ইন্দ্রিয়জ্ঞান বিলুপ্ত হলে কে কি দিয়ে, কি প্রকারে দর্শন-শ্রবণ প্রভৃতি করবে? অন্তঃকরণজ্ঞান বিলুপ্ত হলে, কেই বা কি ভাবে অবধারণ করবে? সেজন্য যাঁদের ক্ষেত্রে 'অহং-মমাদি' ভাব নিবৃত্ত হয়েছে বা আত্মা ও দেহেন্দ্রিয় মনের অধ্যাস বিলুপ্ত হয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ব্যবহার অসম্ভব। এরূপে, প্রমাতা, প্রমেয়, প্রমাণ ও প্রমা—জ্ঞাতা, জ্ঞাতব্য বস্তু, জ্ঞানের উপায় ও জ্ঞান সমস্তই অধ্যাসের ফল।

দ্বিতীয়তঃ, সাধারণ ভাবে অন্যান্য লৌকিক ব্যবহারও অধ্যাসমূলক। লৌকিক ব্যবহারের দুটি রূপ—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। এইদিক থেকে, পশুদের ও মানবদের ব্যবহার একই। যেমন, পশু উদ্যত-দণ্ডধারী পুরুষকে দেখে, 'ইনি আমাকে মারতে আসছেন', এই ভেবে, পলায়ন করে—এই হ'ল 'নিবৃত্তি'; কিন্তু তৃণপূর্ণ হস্তে আগত পুরুষকে দেখে তাঁর অভিমুখে যায়—এই হ'ল 'প্রবৃত্তি'। অর্থাৎ, নিজের অনুকূল বস্তুলাভের আকাঙ্ক্ষা হ'ল 'রাগ' এবং তার ফলস্বরূপ প্রচেষ্টা হ'ল 'প্রবৃত্তি'; নিজের প্রতিকূল বস্তু বর্জনের আকাঙ্ক্ষা হ'ল 'দ্বেষ', এবং তার ফলস্বরূপ প্রচেষ্টা হ'ল 'নিবৃত্তি'। একই ভাবে, মানুষও উদ্যত খড়্গধারী ক্রুদ্ধ পুরুষকে দেখে পলায়ন করে, তদ্বিপরীত দেখে তাঁর অভিমুখী হয়। এরূপ রাগ-দ্বেষ-প্রবৃত্তি নিবৃত্তিমূলক ব্যবহার দেহমনের সুখদুঃখাদি ভেবেই করা হয়ে থাকে। সেজন্য এরূপ সমস্ত ব্যবহার, ক্রিয়াকলাপ, কর্মপ্রচেষ্টাদি আত্মা ও দেহমনের মধ্যে অধ্যাসেরই ফল। শঙ্কর বলছেন :

"অতঃ সমানঃ পশ্বাদিভিঃ পুরুষাণাং প্রমাণ-প্রমেয়-ব্যবহারঃ। পশ্বাদীনাঞ্চ প্রসিদ্ধ এবাবিবেকপূর্বকঃ প্রত্যক্ষাদি-ব্যবহারঃ। তৎ সামান্য-দর্শনাদ্ ব্যুৎপত্তিমতামপি পুরুষাণাং প্রত্যক্ষাদিব্যবহারস্তৎকালঃ সমান ইতি নিশ্চীয়তে"

অর্থাৎ, পশু ও মানবের প্রমাণ-প্রমেয়-ব্যবহার সমানই। অবশ্য পশুদের ব্যবহার যে অবিদ্যামূলক, তা সকলেই জানেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এমন কি জ্ঞানী পুরুষদের ব্যবহারও ঠিক পশুদের ব্যবহারের মতই অজ্ঞানপ্রসূত বা অধ্যাসমূলক।

এ স্থলে "জ্ঞানী" শব্দের অর্থ, লৌকিক দিক থেকে, সাধারণ অর্থে "জ্ঞানী", পারমার্থিক দিক থেকে, প্রকৃত অর্থে "ব্রহ্মজ্ঞানী" নয়।

তৃতীয়তঃ, এমনকি বৈদিক ব্যবহার অথবা শাস্ত্রোপদিষ্ট

যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপও পূর্বোক্তভাবে অধ্যাসমূলক ও অবিদ্যাপ্রসূত। অবশ্য একথা সত্য যে, পশুদের অপেক্ষা সাধারণ মানুষ যেমন অধিকতর জ্ঞানসম্পন্ন, ঠিক তেমনি সাধারণ মানুষদের অপেক্ষাও ধার্মিকগণ অধিকতর জ্ঞান-সম্পন্ন, যেহেতু তাঁরা, পরলোক, স্বর্গ প্রভৃতি সম্বন্ধে জানেন। কিন্তু তা' সত্ত্বেও স্বর্গ ও মোক্ষ যেমন এক নয়, তেমনি ধার্মিক বা পুণ্যকারী ও জ্ঞানীও এক নন। বিধিনিষেধমূলক শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্মও রাগ-দ্বেষ-প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিমূলক বলে অধ্যাসমূলক। শঙ্কর বলছেন :—

"তথাহি 'ব্রাহ্মণোযজেত' ইত্যাদীনি শাস্ত্রাণি আত্মনি বর্ণাশ্রম-বয়োঽবস্থাদি-বিশেষাধ্যাসমাশ্রিত্য প্রবর্তন্তে।"

অর্থাৎ, 'ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করবেন' এরূপ বিধি, আত্মায় বর্ণ, আশ্রম, বয়স, অবস্থা প্রমুখ অনাত্মা স্বরূপ বস্তু অধ্যস্ত করেই সার্থক হতে পারে, অন্যথায় নয়। কিন্তু আত্মার ত বর্ণ, আশ্রম, বয়স, বিভিন্ন অবস্থা প্রভৃতি কিছুই নেই ; সেজন্য, এমন কি, বৈদিক ক্রিয়াকলাপও আত্মার ক্ষেত্রে অসম্ভব।

উপরের অধ্যাস-ভাষ্য থেকে উদ্ধৃতিতে অবশ্য "মোক্ষ-শাস্ত্রের"ও উল্লেখ আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে "মোক্ষশাস্ত্রের" অর্থ হ'ল সেই শাস্ত্র যা আমাদের যাগ-যজ্ঞ-দান-ধ্যানপ্রমুখ পুণ্যকর্মে অনুপ্রেরণা দান করে, এবং স্বর্গলাভের উপায়-স্বরূপ হয়। প্রকৃত মোক্ষশাস্ত্র বা বেদান্তদর্শন যে অধ্যাস-মূলক নয়, তা ত বলাই বাহুল্য। ভারতীয় দর্শনের মতে, এমন কি স্বর্গও চরম লক্ষ্য নয়, চরম ও পরম লক্ষ্য হ'ল একমাত্র মোক্ষ বা মুক্তি। এই প্রসঙ্গেই শঙ্কর বলেছেন যে, বেদের কর্মকাণ্ড অধ্যাসমূলক, কেবলমাত্র নিম্ন অধি-কারীরই উপযোগী এবং কেবলমাত্র স্বর্গই এর ফল। কিন্তু বেদের জ্ঞানকাণ্ডই, প্রকৃত মোক্ষশাস্ত্র। সেজন্য অধ্যাস ভাষ্যের পরিশেষে শঙ্কর বলছেন :

"অস্যানর্থহেতোঃ প্রহাণায়াত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে সর্বে বেদান্তা আরভ্যন্তে।"

অর্থাৎ সকল অনর্থের মূলীভূত অবিদ্যার উচ্ছেদ এবং একাত্মবিদ্যা উৎপাদনের জন্য বেদান্তব্যাখ্যা আরম্ভ করা হচ্ছে।

"অধ্যাসের" প্রকৃত স্বরূপ বোঝাবার জন্য শঙ্কর, যা' অধ্যাসমূলক বা "মিথ্যা" এবং যা' উপমামূলক বা "গৌণ"— এই দুটির মধ্যে প্রভেদ দেখিয়েছেন যত্নের সঙ্গে (ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য ১-১-৪)। যে ক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন বস্তুকে ভিন্ন বলে' জ্ঞান থাকে না, অভিন্ন বলেই জ্ঞান হয়, সেক্ষেত্রে হয় "অধ্যাস"। যথা, রজ্জু-সর্প ভ্রমকালে, রজ্জু ও সর্প যে দুটি ভিন্ন বস্তু এরূপ জ্ঞানের অস্তিত্বই থাকে না, অর্থাৎ, রজ্জুতে রজ্জু-জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে', সর্প-জ্ঞানের উদয় হয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন বস্তুকে ভিন্ন বলে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও, সাদৃশ্যবশতঃ, একটিকে অন্যটি বলে' গ্রহণ করা হয়, সেক্ষেত্রে হয় "উপমা"। যথা, পুরুষকে সিংহরূপে গ্রহণকালে, পুরুষ ও সিংহ যে দুটি ভিন্ন বস্তু এই জ্ঞান সর্বদাই থাকে। অর্থাৎ, পুরুষে পুরুষ-জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সিংহ-শব্দ প্রয়োগ করা ও সিংহ-জ্ঞান হয়, পুরুষের শৌর্য-বীর্যাদির জন্য।

অবশ্য, শঙ্কর তাঁর ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের তৃতীয় অধ্যায়ে, "অধ্যাসের" যা' সংজ্ঞা দান করেছেন, তা' হল উপাসনার দিক থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক সংজ্ঞাই মাত্র।

"তত্রাধ্যাসো নাম দ্বয়োর্বস্তুনোরনিবর্তিতায়ামেবান্যতর-বুদ্ধাবন্যতরবুদ্ধিরধ্যারোপ্যতে। যস্মিংস্তরবুদ্ধিরধ্যস্যতে, অনুবর্তত এব তস্মিংস্তদ্বুদ্ধিরধ্যস্তেতরবুদ্ধাবপি।" (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ৩-৩-৯)।

অর্থাৎ, দুটি বিভিন্ন পদার্থের জ্ঞান বিলুপ্ত না হলেও, একে অন্যের আরোপই হ'ল "অধ্যাস"। এস্থলে, একে অন্যের জ্ঞান আরোপ করা হলেও সেই প্রথম বস্তুর জ্ঞান দ্বিতীয় বস্তুর সঙ্গেই বিদ্যমান থাকে, অথবা, বুদ্ধি বা জ্ঞান-পূর্বক, স্বেচ্ছায়, এক বস্তুতে অপর বস্তুর অভেদ চিন্তা করা হয়। যেমন, "নাম ব্রহ্ম" ধ্যানকালে, নামে ব্রহ্মবুদ্ধি অধ্যস্ত বা আরোপিত করা হলেও, নাম-বুদ্ধি বিলুপ্ত হয় না।

এরূপ, ব্যবহারিক বা সাধারণ "অধ্যাস" থেকে প্রকৃত অধ্যাসের মূলীভূত প্রভেদ। কারণ, উপরে উল্লিখিত প্রকৃত অধ্যাস বুদ্ধি বা জ্ঞানমূলক ও স্বেচ্ছাকৃত নয়, এবং প্রথম বস্তুর উপর দ্বিতীয় বস্তু অধ্যস্ত হলে প্রথম বস্তুর জ্ঞান বিন্দুমাত্র থাকে না।

উপরে যা' বলা হয়েছে, যখন দুটি বিভিন্ন বস্তুকে এক বলে গ্রহণ করা হয় তখনই যখন সেই দুটি বস্তু সম্বন্ধে আমাদের প্রকৃত জ্ঞান থাকে না। সেজন্য, অধ্যাস অজ্ঞান-প্রসূত বা অবিদ্যামূলক বলে তাকে বলা হয়েছে "অবিদ্যা"। অপর পক্ষে, দুটি বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে প্রকৃত প্রভেদ উপলব্ধির নাম "বিদ্যা"। শঙ্কর অধ্যাস-ভাষ্যে বলছেন :

"তমেতমেবং লক্ষণমধ্যাসং পণ্ডিতা অবিদ্যেতি মন্যন্তে, তদ্বিবেকেন চ বস্তু-স্বরূপাবধারণং বিদ্যামাহুঃ।"

"বিদ্যার" দ্বারা "অবিদ্যার" নিরাসের নাম "বাধ" বা "অপবাদ"। অপবাদের" সংজ্ঞা দান করে, শঙ্কর বলছেন :

"অপবাদো নাম যত্র কস্মিংশ্চিদ্ বস্তুনি পূর্বনিবিষ্টায়াং মিথ্যাবুদ্ধৌ নিশ্চিতায়াং পশ্চাদুপজায়মানা যথার্থা বুদ্ধিঃ পূর্বনিবিষ্টায়া মিথ্যাবুদ্ধের্নিবর্তিকা ভবতি।" (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ৩-৩-৯)।

অর্থাৎ, যে স্থলে, কোন বস্তুতে অধ্যস্ত মিথ্যাজ্ঞান

স্বরূপে থাকলেও, পরে উৎপন্ন সত্যজ্ঞান সেই পূর্বের মিথ্যাজ্ঞান বিদূরিত করে—সে স্থলেই হয় "অপবাদ" বা "বাধ"। যেমন, সত্য আত্মজ্ঞান দ্বারা মিথ্যা দেহাত্মবুদ্ধির "বাধ" হয়। অথবা যথার্থ দিগ্‌বুদ্ধি বা দিগ্‌দর্শন দ্বারা দিগ্‌ভ্রমের অবসান হয়।

এরূপে শঙ্কর বিশেষ জোরের সঙ্গে অন্যত্রও বারংবার বলেছেন যে, এরূপ অধ্যাস মানসিক ভ্রমই মাত্র, ভ্রমকারীর মিথ্যাজ্ঞান বা প্রত্যক্ষই মাত্র। যেমন তিনি "অধ্যাসকে" "মিথ্যাবুদ্ধি" নামে অভিহিত করে বলছেন :

"দৃশ্যতে চাত্মন এব সতো দেহাদি-সংঘাতেহনাত্মন্যাত্মত্বাভিনিবেশো মিথ্যাবুদ্ধিমাত্রেণ পূর্বপূর্বেণ।" (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ১-১-৫)

"অপিচ মিথ্যাজ্ঞান-পুরঃসরোহয়মাত্মনো বুদ্ধ্যুপাধিসম্বন্ধঃ।" (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ২-৩-৩০)

অর্থাৎ, অনাত্মা, দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি পূর্বপূর্ব বা অনাদি মিথ্যাবুদ্ধিরই ফলমাত্র।

আত্মার সঙ্গে বুদ্ধিরূপ উপাধির সম্বন্ধ মিথ্যাজ্ঞান থেকেই উদ্ভূত।

সুতরাং, অধ্যাস ভ্রম বা মিথ্যা জ্ঞানমাত্রই বলে অধ্যাসকালে বাস্তব দিক থেকে সেই দুটি বিভিন্ন বস্তুর স্বরূপের বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন হয় না। অধ্যাস-ভাষ্যে শঙ্কর বলছেন :

"তত্রৈবং সতি যত্র যদধ্যাসস্তৎকৃতেন দোষেণ গুণেন বা অণুমাত্রেণাপি স ন সংবধ্যতে।"

অর্থাৎ, যে বস্তুতে অপর এক বস্তুর অধ্যাস হয়, সেই বস্তু সেই অপর বস্তুর দোষ বা গুণ দ্বারা বিন্দুমাত্রও স্পৃষ্ট হয় না।

যেমন, রজ্জুতে সর্পের অধ্যাস হলে, ভ্রমকারী ব্যক্তি অবশ্য রজ্জুকে সর্প ও সেজন্য সর্পগুণবিশিষ্ট বলে গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু সেজন্য রজ্জু মুহূর্তের জন্যও সর্প ও সর্পগুণবিশিষ্ট হয়ে পড়ে না—সর্বদা রজ্জুই থাকে। বস্তুতঃ, পূর্বেই যা' বলা হয়েছে, এইখানেই হ'ল পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদের মধ্যে মূলগত প্রভেদ। পরিণামবাদানুসারে, এক বস্তু সত্যই অপর এক বস্তুতে পরিণত হয়ে' সেই বস্তুর আকার ধারণ করে—এটি বাস্তব সত্য, মানসিক ভ্রম বা ভ্রমকারীর মিথ্যা প্রত্যক্ষমাত্রই নয়। কিন্তু বিবর্তবাদানুসারে, এক বস্তু অপর এক বস্তুরূপে প্রতিভাত হয় কেবলমাত্র ভ্রমকারীর মানসিক প্রত্যয়ের দিক থেকে, বস্তুর সত্তার দিক থেকে নয়। সেজন্য এক্ষেত্রে মানসিক প্রত্যয়েরই কেবল পরিবর্তন সাধিত হতে পারে,—ভ্রমকারীর অজ্ঞানের বিলয়, ভ্রমের নিরাশ, ও জ্ঞানের উদয় হতে পারে। কিন্তু বস্তুর স্বরূপ প্রথম থেকে, শেষপর্যন্ত অপরিবর্তিতই থাকে—যা' তা'ই থাকে।

এই বিষয়ে, শঙ্কর বারংবার উল্লেখ করেছেন তাঁর ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে। যেমন তিনি বলছেন :

"ন চাবিদ্যাবত্ত্বে তদপগমে চ বস্তুনঃ কশ্চিদ্ বিশেষোঽস্তি।" (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ১-৪-৬)

অর্থাৎ, অবিদ্যাকালে অথবা অবিদ্যাপগম হলে,' বস্তুর স্বরূপের বিন্দুমাত্র প্রভেদ বা পরিবর্তন হয় না। অবিদ্যাবশতঃ, একটি বস্তুকে অপর একটি বস্তু বলে' ভ্রম করলেও যেমন তার স্বরূপের ক্ষয় হয় না, তেমনি সেই ভ্রম দূর হয়ে' গেলেও তার স্বরূপের পূর্ণতা লাভ হয় না, যেহেতু আদ্যোপান্ত বস্তুস্বরূপের কোনোরূপ বিচ্যুতিই ঘটে নি।

উদাহরণ দিয়ে শঙ্কর বলছেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি রজ্জুকে সর্প বলে ভ্রম করে, ভীতচিত্তে, কম্পিত কলেবরে, পলায়ন করে,' তা হলেও রজ্জু রজ্জুই থাকবে, রজ্জু থেকে সর্পে পরিণত হবে না ; একই ভাবে, যখন 'ভীত হয়ো না, এটি সর্প নয় রজ্জু' এই আশ্বাসবাক্য শ্রবণে তার ভ্রান্তি দূর হয়ে', ভয়, অঙ্গ-কম্পনাদিও দূর হয়, তখনও রজ্জু রজ্জুই থাকবে, সর্প থেকে পুনরায় রজ্জুতে পরিণত হবে না। (ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য ১-৪-৬)

অন্যত্রও শঙ্কর একই ভাবে বলছেন :

"ন হ্যুপাধিযোগাদপ্যন্যাদৃশস্য বস্তুনোঽন্যাদৃশস্বভাবঃ সম্ভবতি।" (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ৩-২-১১)

অর্থাৎ, উপাধিযোগের দ্বারা এক প্রকার বস্তু অন্য প্রকার হতে পারে না।

উদাহরণ দিয়ে শঙ্কর বলছেন যে, স্বচ্ছ, শুভ্র, স্ফটিক পাত্রে রক্তবর্ণ পুষ্প ন্যস্ত করলে, পাত্রটি দৃশ্যতঃ রক্তবর্ণ বলে বোধ হলেও, বস্তুতঃ স্বচ্ছ ও শুভ্রই থাকে, অস্বচ্ছ ও অশুভ্র হয়ে যায় না। (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ১-৪-৬)

এই প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ভাষ্যে, শঙ্কর একটি সম্ভাব্য আপত্তি খণ্ডন করেছেন। সেটি হ'ল এই :

"ননু কথমেকস্যৈবাত্মনোঽশনায়াদ্যতীতত্বং তদ্বত্ত্বঞ্চেতি বিরুদ্ধ-ধর্ম-সমবায়িত্বমিতি ? ন, পরিহৃতত্বাৎ। নাম-রূপ-বিকার-কার্য কারণ-লক্ষণ-সংঘাতোপাধিভেদ-সম্পর্কজনিত-ভ্রান্তিমাত্রং হি সংসারিত্বমিত্যসকৃদবোচাম, বিরুদ্ধ-শ্রুতি-ব্যাখ্যান-প্রসঙ্গেন চ যথা, রজ্জু-শুক্তিকা-গগনাদয়ঃ সর্পরজত-মলিনা ভবন্তি পরাধ্যারোপিত-ধর্মবিশিষ্টাঃ, স্বতঃ কেবলা এব রজ্জু-শুক্তিকা-গগনাদয়ঃ, ন চৈবং বিরুদ্ধধর্ম-সমবায়িত্বে পদার্থানাং কশ্চন বিরোধঃ।" (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৩-৫-১, শঙ্কর-ভাষ্য)

অর্থাৎ, বৃহদারণ্যক উপনিষদে উষস্ত-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে (৩-৪-১), যাজ্ঞবল্ক্য আত্মাকে প্রাণ, অপান, ব্যান ও উদান দ্বারা যথোচিত কার্যকারী অথবা দেহ-সম্বন্ধবান বলে বর্ণনা করেছেন। অথচ কহোল-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে (৩৫-১) যাজ্ঞবল্ক্য পরমুহূর্তেই সেই আত্মাকেই ক্ষুধ-তৃষ্ণা-শোক-মোহ-জরা-মৃত্যুর অতীত বলেও বর্ণনা করেছেন। একই আত্মায় এরূপ বিরুদ্ধ ধর্মের সমাবেশ সম্ভব কি করে? এর উত্তর হল এই যে, নামরূপ-বিকার-বিশিষ্ট, কার্যকারণ-সম্বন্ধ-লক্ষণ, উপাধি-জনিত-ভেদবান সংসার ভ্রান্তিমাত্রই। মিথ্যা ভ্রান্তি দ্বারা সত্য বস্তুর স্বরূপ বিকৃত বা স্পৃষ্ট হয় না। যেমন রজ্জুতে সর্পের, শুক্তিতে রজতের, গগনে মলিন কটাহতলের আরোপ বা অধ্যাস হলে, রজ্জু সর্প, শুক্তি রজত, ও গগন মলিন কটাহতল রূপে প্রতিভাত হয়, সত্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে রজ্জু রজ্জুই, শুক্তিই শুক্তি, গগন গগনই থাকে, তাদের মধ্যে সর্প, রজত বা মলিন কটাহতলের কোনো বিরুদ্ধ ধর্মের সঞ্চার কোনো কালেই হয় না। সেজন্য ব্রহ্মে জীবত্ব আরোপ করে' প্রাণ অপান প্রভৃতির অধ্যাস করলে, তা' তাঁর প্রকৃত স্বরূপ বা ধর্ম হয়ে পড়ে না।

ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ভাষ্যেও শঙ্কর একই ভাবে বলছেন:

"ন চাত্মা সংসারিত্বম্, অবিদ্যাধ্যস্তত্বাদাত্মনি সংসারস্য। ন হি রজ্জু-শুক্তিকা-গগনাদিষু সর্প-রজত-মলাদীনি মিথ্যাজ্ঞানাধ্যস্তানি তেষাং ভবন্তীতি।"

(ছান্দোগ্যোপনিষদ ভাষ্য ৮-১২-১)

অর্থাৎ, অবিদ্যাহেতু আত্মায় সংসার অধ্যস্ত হলেও, আত্মা সত্যই সংসারিত্ব প্রাপ্ত হয় না, যেমন, রজ্জুতে সর্প, শুক্তিতে রজত, গগনে নীলবর্ণাদি মিথ্যাজ্ঞানহেতু অধ্যস্ত হলেও, রজ্জু সর্প, শুক্তি-রজত, বা গগন নীলবর্ণ কটাহতল সত্যই হয়ে যায় না।

গীতাভাষ্যেও শঙ্কর বলছেন:

'তদৈবং সতি ক্ষেত্রজ্ঞস্য ঈশ্বরস্যৈব সতঃ অবিদ্যাকৃতোপাধিভেদতঃ সংসারিত্বং ভবতি। যথা, দেহাদ্যাত্মত্বমাত্মনঃ। সর্বজন্তূনাং হি প্রসিদ্ধো দেহাদিষু অনাত্মসু আত্মভাবো নিশ্চিতোঽবিদ্যাকৃতঃ। যথা, স্থাণৌ পুরুষনিশ্চয়ঃ ন চৈতাবতা পুরুষধর্মঃ স্থাণোর্ভবতি স্থাণুধর্মো বা পুরুষস্য, তথা ন চৈতন্যং দেহধর্মঃ, দেহধর্মো বা চৈতন্যস্য।" (গীতা-ভাষ্য ১৩-২)

অর্থাৎ, জীব ও ঈশ্বরের সমভাবে অবিদ্যামূলক উপাধি ভেদের জন্যই সংসারিত্ব হয়। যেমন, দেহাদিকে আত্মায় অধ্যস্ত করা হয়। অনাত্মা দেহাদিতে আত্মভাব বা বোধ অবিদ্যামূলক। যেমন স্থাণু বা শুষ্কবৃক্ষকে পুরুষ বলে গ্রহণ করলে, পুরুষের ধর্ম স্থাণুতে বা স্থাণুর ধর্ম পুরুষে উপগত হয় না, তেমনি অধ্যাসকালেও দেহধর্ম চৈতন্যে বা চৈতন্যধর্ম দেহে উপগত হয় না।

শঙ্কর তাঁর মাণ্ডুক্যোপনিষদের গৌড়পাদ-কারিকা ভাষ্যেও বলছেন:

'ততঃ প্রকৃতেঃ স্বভাবস্য অন্যথাভাবঃ স্বতঃ প্রচ্যুতিঃ ন কথঞ্চিৎ ভবিষ্যতি, অগ্নেরিব ঔষ্ণ্যস্য।"

(কারিকা-ভাষ্য ৮৮)

স্বভাবের অন্যথাভাব বা স্বরূপের প্রচ্যুতি কোনোরূপেই হতে পারে না। যেরূপ অগ্নির উষ্ণতা কোনোদিনই বিলুপ্ত বা অন্য প্রকার হয় না।

সেজন্য মাণ্ডুক্যোপনিষদের সুবিখ্যাত গৌড়পাদকারিকা বলছেন:

"ন ভবত্যমৃতং মর্ত্যং ন মর্ত্যমমৃতং তথা।
প্রকৃতেরন্যথাভাবো ন কথঞ্চিদ্ভবিষ্যতি" (১২২)

(অলাতশান্তি-প্রকরণম্)

অর্থাৎ, মরণশীল পদার্থ অমরণশীল হয় না, অমরণশীল পদার্থও মরণশীল হয় না; যেহেতু, কোনো প্রকারেই স্বভাবের অন্যথাভাব বা পরিবর্তন হতে পারে না।

এর পরবর্তী শ্লোকের ভাষ্যে, শঙ্করও বলছেন:

"তথা স্বাভাবিকী দ্রব্যস্বভাবত এব সিদ্ধা। যথা, অগ্ন্যাদীনামুষ্ণপ্রকাশাদিলক্ষণা। সাপি ন কালান্তরে ব্যভিচরতি দেশান্তরে চ। (শঙ্করভাষ্য, গৌড়পাদ-কারিকা ১২৩)।"

দ্রব্যের স্বভাব স্বাভাবিক এবং শাশ্বত—যেমন, অগ্নির উষ্ণতা, আলোক প্রভৃতি। এই স্বভাব কালান্তর বা দেশান্তরে কোনোদিনও পরিবর্তিত হয় না।

এই প্রসঙ্গে শঙ্কর আরোও বলছেন যে, যখন মিথ্যাকল্পিত জগতেও, কোনো বস্তুর স্বরূপ বা স্বভাব পরিবর্তিত হয় না, তখন, অজ-স্বভাব, অমৃতস্বরূপ, পরমার্থ বস্তুর স্বভাব ও স্বরূপ যে একই থাকে, অন্যথা হয় না—তা ত সর্বজন বিদিত সত্য।

আত্মা ও দেহেন্দ্রিয় মনের মধ্যে অধ্যাসপ্রসঙ্গে শঙ্কর অধ্যাস-ভাষ্যে ৩টি সম্ভাব্য আপত্তি খণ্ডন করেছেন। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যে বস্তুতে অপর এক বস্তুর অধ্যাস করা হয়, সেই বস্তুটি একটি জ্ঞেয় বস্তু বা জ্ঞানের বিষয়, এবং সেজন্য প্রত্যক্ষগোচর। যেমন, রজ্জু জ্ঞানের বিষয় ও প্রত্যক্ষগোচর বস্তু। কিন্তু প্রথমতঃ আত্মা জ্ঞানের বিষয় নয়, অবিষয়; এবং দ্বিতীয়তঃ আত্মা প্রত্যক্ষগোচরও নয়। সেজন্য আত্মায় অনাত্মার অধ্যাস অসম্ভব।

এর উত্তরে শঙ্কর বলছেন যে, প্রথমতঃ পারমার্থিক দিক্ থেকে, শুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ আত্মা জ্ঞেয় বস্তু বা জ্ঞানের

অবিষয়, সন্দেহ নেই। কিন্তু ব্যবহারিক দিক্ থেকে, আত্মা অহং জ্ঞানের বিষয় এবং সেই ভাবে প্রত্যক্ষ সিদ্ধ।

দ্বিতীয়তঃ, এরূপ কোন নিয়ম নেই যে, যে বস্তুর উপর অন্য এক বস্তুর অধ্যাস হয়, সেই বস্তুটিকে প্রত্যক্ষগম্য হতেই হবে। যেমন, আকাশ প্রত্যক্ষগোচর না হলেও, আকাশে কটাহতলের গোল আকার ও নীলবর্ণ আরোপ করা হয়। পুনরায়, পূর্বেই যা বলা হয়েছে, আত্মা অপ্রত্যক্ষ নয়, 'অহং' প্রত্যক্ষগম্য।

শঙ্করের প্রখ্যাত ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের উপক্রমণিকা এই 'অধ্যাস-ভাষ্য' সত্যই এক অপূর্ব দার্শনিক রচনা। মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে, ভ্রমের কারণ ও প্রণালী সম্বন্ধে নানারূপ মতবাদ আছে। কিন্তু সেই মনোবিজ্ঞানকে (Psychology) বিশ্ববিজ্ঞানের (Cosmology) স্তরে উন্নীত করা অল্প সাহস বা কৃতিত্বের কথা নয়। মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে, ভ্রমকালে, ভ্রমের সৃষ্টি স্থিতি-লয় ভ্রমকারীর মনেই সংঘটিত হচ্ছে—বাইরের অধিষ্ঠানকে কোনোরূপ স্পর্শ না করে। যেমন, রজ্জু সর্প-ভ্রমকালে, রজ্জুতে আরোপিত, অধ্যস্ত ও দৃষ্ট সর্পটির সৃষ্টি স্থিতি লয় হচ্ছে কেবলমাত্র ভ্রমকারীর মনে মনেই, বাহ্যিক, বাস্তব জগতে নয়। যেহেতু যতক্ষণ ভ্রমটির অস্তিত্ব, ততক্ষণই কেবল সর্পটিরও অস্তিত্ব। সাধারণ ভ্রমের ক্ষেত্রে, এই তত্ত্বটি উপলব্ধি কর সহজসাধ্য। কিন্তু বিশ্ববিজ্ঞানের দিক থেকে, সমগ্র পরিদৃশ্যমান জগৎকেও একই ভাবে মনোগত ভ্রমে পর্যবসিত করা সত্যই একটি আশ্চর্য দার্শনিক তত্ত্ব।

মাণ্ডুক্যোপনিষদ্-কারিকা-ভাষ্যেও শঙ্কর নানাভাবে তাঁর দর্শনের মূলীভূত এই অধ্যাসবাদ প্রপঞ্চিত করেছেন। যেমন, একস্থানে তিনি বলছেন:

"অতঃ কল্পিতা এব জাগ্রদ্ভাবা অপি স্বপ্নভাববদিতি সিদ্ধম্।" (বৈতথ্য-প্রকরণম্ ২-১৪)

অর্থাৎ, স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুসমূহের ন্যায়, জাগ্রৎ অবস্থায় দৃষ্ট সকল বস্তুও কল্পিত বস্তুই মাত্র।

"তদ্ধেতু-ফলাদি-সংসার-ধর্মানর্থ-বিলক্ষণতয়া স্বেন বিশুদ্ধ-বিজ্ঞপ্তিমাত্র-সত্ত্বাদ্বয়-রূপেণানিশ্চিতত্বাৎ জীবপ্রাণাদ্যনন্ত ভাবভেদৈরাত্মা বিকল্পিতঃ, ইত্যেব সর্বোপনিষদাং সিদ্ধান্তঃ।" (বৈতথ্য-প্রকরণম্ ২-১৭)

অর্থাৎ, এরূপ কল্পনার কারণ হ'ল, সেই অন্যরূপে কল্পিত বস্তুটির স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানাভাব। সেজন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ, অদ্বিতীয়, সংসার থেকে পৃথক্, আত্মার স্বরূপ জানা না থাকাতেই, সেই আত্মা জীব, প্রাণপ্রমুখ নানা আকারে বিকল্পিত হয়ে থাকে।

গীতা-ভাষ্যে শঙ্কর এই অধ্যাসের নাম দিয়েছেন "বিপরীত দর্শন" (৪-১৮)

"দেহাদ্যাশ্রয়ং কর্ম আত্মনি অধ্যারোপ্য 'অহং কর্তা' 'মমৈতৎ কর্ম, ময়াস্য ফলং ভোক্তব্যম ইতি চ…তত্রেদং লোকস্য বিপরীতদর্শনাপনয়নায়াহ…। অত্র চ কর্ম কর্মৈব সৎকার্যকরণাশ্রয়ং কর্মরহিতেহ বিক্রিয়ে আত্মনি সর্বৈরধ্যস্তং যতঃ পণ্ডিতোহপ্যহং করোমীতি মন্যতে। (গীতা-ভাষ্য ৪-১৮)

অর্থাৎ, দেহাদির আশ্রয়ে উৎপন্ন কর্মসমূহ আত্মায় আরোপ করলেই "আমিই কর্তা, এই আমার কর্ম, আমি কর্মফল ভোগ করব" ইত্যাদি প্রতীতি হয়। এরূপ প্রতীতিই হ'ল বিপরীত-দর্শন। এমন কি, পণ্ডিতেরাও নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার আত্মায় সর্ব বস্তুর অধ্যাস করে', নিজেদের কর্তা বলে মনে করেন।

এই প্রসঙ্গে অতি সুন্দর উপমা দিয়ে শঙ্কর বলছেন:

"নৌস্থস্য নাবি গচ্ছন্ত্যাং তটস্থেষু অগতিষু নগেষু প্রতিকূলগতিদর্শনাৎ, দূরেষু চক্ষুষা অসন্নিকৃষ্টেষু গচ্ছৎসু গচ্ছৎসু গত্যভাবদর্শনাৎ। এবমিহাপি অকর্মণি অহং করোমীতি কর্মদর্শনং, কর্মণি চ অকর্মদর্শনং বিপরীতদর্শনম্।" (গীতা-ভাষ্য ৪-১৮)।

অর্থাৎ, নৌকারূঢ় ব্যক্তি নৌকা চলতে থাকলে, তটস্থ গতিবিহীন পর্বত-বৃক্ষাদিকেও বিপরীত দিকে গতিশীল বলে' দর্শন করেন, পুনরায়, দূরস্থ গতিশীল বস্তুকেও গতিবিহীন বলে দর্শন করেন। একই ভাবে, অজ্ঞ জীবও অকর্মে বা আত্মায় কর্ম বা প্রপঞ্চ, এবং কর্মে বা প্রপঞ্চে অকর্ম বা আত্মা দর্শন করে।

এই সম্বন্ধে আরো কিছু আলোচনা পরে করা হবে।
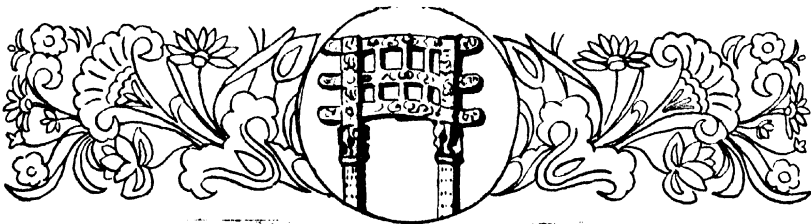
ধনাদার গল্প

শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী

অনেকে আছেন, যাঁদের হু'কলম লিখতে বলুন, কলম সরবে না। অথচ জাকিয়ে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আসর-জমানো গল্প বলে যাবেন, শুনতে একটুও বিরক্তি বোধ করবেন না আপনি। রুদ্ধশ্বাসে, পরম ধৈর্য্যে আপনি শুনে যাবেন আগাগোড়া। চমৎকার গল্প বলিয়ে, কিন্তু লিখতে বললেই সর্ব্বনাশ।

ধনাদা ঠিক এই ধরনের মানুষ। এক ডাকে লোকে চিনবে। সুপুরুষ ছিলেন এককালে, সেটা এই প্রাক্ বৃদ্ধবয়সেও স্পষ্ট বুঝতে পারবেন। মাথাটা বিরল-কেশ। যা আছে অবশিষ্ট তাও প্রায় সবই এসেছে সাদা হয়ে। সারা মুখে রেখায় রেখায় পড়েছে বয়সের ছাপ। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ তামাটে হয়ে এসেছে। কিন্তু ঠোঁটের প্রসন্ন হাসি আর চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টিটি এখনো অক্ষুণ্ণ। বছর তিনেক আগে রিটায়ার করেছেন সরকারী চাকরী থেকে। বিয়ে-থা করেন নি। ছোট্ট একতলা বাড়ীখানা করেছিলেন চাকরী করতে করতেই। বাকী জীবনটা সেখানেই কাটাবার ইচ্ছে। আত্মীয়স্বজন বলতেও কেউ নেই। গত বিশ বছর ধরে ওঁর সংসার চালিয়ে এসেছে জগুয়া। ঠাকুর বলুন তো ঠাকুর, চাকর বলুন তো চাকর, বন্ধু বলুন তো তাতেও আপত্তি নেই। একাধারে সব। আছে ফুলের সখ; নানা রং ও রকমের ফুলের চাষ করেন নিজের হাতে।

কিন্তু ওঁর আসল পরিচয় গল্প বলিয়ে হিসেবে। এমন জমিয়ে গল্প বলবার ক্ষমতা খুব কম লোকেরই দেখেছি। সন্ধ্যে নামতেই শ্রোতার দল এসে জুটতো ওঁর বৈঠকখানায়। ঘরে জ্বলতো সবুজ নিয়ন আলো। ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বসে বসে গড়গড়ার নল মুখে ভুড়ুক ভুড়ুক তামাক টানতেন ধনাদা। আর গল্প। রোজ নিত্য নতুন কত গল্পই যে জানতেন ভদ্রলোক, থই পেতাম না ভেবে। গল্পের ফাঁকে ফাঁকে এসে কল্কে-নলটি দিত জগুয়া। ঘর ম' ম' করত অম্বুরী তামাকের মিঠে গন্ধে। নিমীলিত চোখে ধনাদা গল্প বলে যেতেন একটার পর একটা। ওঁর বিচিত্র সংগ্রহ থেকে।

আমি ছিলাম ওঁর আসরের নিয়মিত শ্রোতা। কদাচিৎ অনুপস্থিত হতাম। ধনাদার গল্প শুনবার জন্যে হানা দিতাম প্রায় রোজ। সেই ছোট বেলা থেকেই। ওঁর মুখে নানা দেশ-বিদেশের বিচিত্র কাহিনী শুনবার লোভে অন্ধকার নামলেই ছটফট করতাম। কোন'দন না গেলে উসখুস করতেন ধনাদাও। কয়েকদিন পর পর যদি অনুপস্থিত থাকতাম তো খবর পাঠাতেন জগুয়াকে দিয়ে।

গেলে বলতেন, "কি হে, ক'দিন যে পাত্তাই নেই তোমার; গল্প শুনবার সখ ফুরিয়ে গেল নাকি?"

কৈফিয়ৎ না দিলে গল্প বন্ধ।

বলতেন, "কেন আস নি বল। না হলে এই মুখ বন্ধ করলাম।"

সেই ধনাদা।

হুদিন না গেলে ছোট ছেলের মত মুখ ভার করতেন, অভিমানে বন্ধ হ'ত গল্পকথা। সন্তোষজনক কারণ দেখিয়ে তবে আবার মুখ খুলতে হ'ত তাঁর। গল্প শুনতে না পেলে হাঁপিয়ে উঠতাম। আমিও। ধনাদা অস্বস্তিতে ঘর-বার করতেন গল্প করতে না পারলে।

স্কুল-কলেজ জীবনটা এমনি করেই কেটেছে।

চাকরীতে যেদিন চলে আসতে হ'ল ধনাদার অমন জমাট সান্ধ্য আসরটি ছেড়ে, চোখ আমাদের হু'জনেরই ছলছল করে এসেছিল। গড়গড়ার নলটি হাত থেকে খসে পড়েছিল ওঁর।

বলেছিলেন, "তুইও চললি শম্ভু? আর যেতে তো হবেই একদিন। তা গল্প শুনবার জন্যে রোজ যে ছুটে আসতিস, এখন তার জন্যে মন খারাপ হবে না রে?"

ওঁর স্নেহের গভীরতা উপলব্ধি করে মনটা আমারও ভারাক্রান্ত হয়ে এসেছিল। তবু বিদায় নিতে হয়েছিল, চলে আসতে হয়েছিল প্রবাসের কর্ম্মজীবনে।

আগে, মাঝে মাঝে চিঠি লিখে খোঁজ-খবর নিতাম ধনাদার। সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর আসত, কিন্তু ক্রমশঃ ভুলেই এলাম সেই সান্ধ্য-মজলিসকে। প্রায় বছর পাঁচেক ঘুরে বেড়াতে হ'ল বাংলা আর বিহারের বিভিন্ন জেলায় চাকরীর খাতিরে। ধনাদার স্মৃতিটিও ক্রমশঃ এল ঝাপসা হয়ে।

হঠাৎ একবার টুর পেয়ে গেলাম কলকাতার। এক সপ্তাহের জন্যে, কাজ শেষ হয়ে গেল চারদিনেই। বাকি তিন দিন, এখানে ওখানে, আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে যখন আর কাটছে না, মনে পড়ল ধনাদার কথা। ছুটলাম সঙ্গে সঙ্গে।

সে সান্ধ্য-আসর তেমনি চলছে। সন্ধ্যে তখন রাত্রি হতে চলেছে। ধনাদার বৈঠকখানায় জ্বলছে তেমনি নিয়ন আলো। গড়গড়ার নলে ভুড়ুক ভুড়ুক সুখ-টান দিতে দিতে নিমীলিত চোখে তেমনি গল্প বলছেন ধনাদা। শ্রোতারা গোগ্রাসে যেন গিলছে প্রতিটি কথা।

শুধু একটুখানি পরিবর্তন চোখে পড়ল। ধনাদার বিরল চুল-

গুলিও সাদা হয়ে এসেছে। বার্দ্ধক্য সারা মুখে হিজিবিজি আঁচড় টেনেছে আরও বেশী করে। একটু যেন কৃশ আগের চেয়ে, কিন্তু মুখের প্রসন্ন হাসিটুকু তেমনি আছে।

গিয়ে প্রণাম করতেই চমকে চোখ খুললেন।

প্রথমটা অবাক, তারপর সোৎসাহে একেবারে জড়িয়ে ধরলেন আমাকে। আনন্দোচ্ছল কণ্ঠে বললেন, "তুই"!

বললাম গত পাঁচ বছরের ইতিহাস। শুনে খানিকক্ষণ তেমনি করেই চেয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর বললেন, "খানিকটা যে চেপে যাচ্ছিস শম্ভু। সেটুকুও আমি জানি। তোর প্রায় সব-কয়টি গল্পই পড়েছি আমি—"

বসলাম পাশের একটি বেতের চেয়ারে।

চীৎকার করে জগুয়াকে ডাকলেন ধনাদা। এলে বললেন,— "দেখেছিস কে এসেছে? ও আজ থাকবে এখানে। ব্যবস্থা করিস রে—"

বললাম—"আমি কিন্তু শুধু গল্প শুনতেই এসেছি ধনাদা—"

শ্রোতারা এতক্ষণ নীরবে বসেছিলেন। গল্পের মাঝপথে বাধা পড়ায় উসখুস করছিলেন। লক্ষ্য করে বললাম—"আপনার গল্পটা কিন্তু চলছিল ধনাদা। এদের বোধ হয় অস্বস্তি হচ্ছে—"

গল্প সুরু হ'ল আবার। শেষ হতে রাত নটা।

রাত্রে শোবার ব্যবস্থা একই ঘরে পাশাপাশি খাটে।

গড়গড়ার নল মুখে তুলে নিয়ে ধনাদা বললেন—"এতদিন পর মনে পড়ল তোর, এ্যাঁ?"

বললাম—"দেখুন ধনাদা, চাকরীর দড়ি পড়েছে গলায়, ঘানি ঘোরাতেই ব্যস্ত। সময়ই পাইনি যে। আজ কিন্তু আর অন্য কথা নয়। শুধু গল্প শোনাতে হবে।"

"সেকি এখন আর ভাল লাগবে রে?" মৃদু হাসলেন ধনাদা, —"তা ছাড়া তুই আবার লিখছিস এখন। বেশ লাগল তোর গল্প। এবার তোরা বলবি, আমরা শুনব।"

হাসলাম আমিও। বললাম—"বলা আর লেখা যে দুটো জিনিষ ধনাদা। বলা ব্যাপারটা আমার একেবারে আসে না। এতদিন ত নানারকমের গল্পই শুনেছি আপনার কাছ থেকে। আজ আর তা নয়, আপনার নিজের কথা কিছু বলুন।"

"—নিজেকে নিয়ে কি গল্প বলা যায় রে?" ধনাদা শব্দ করে হেসে উঠলেন—"তা ছাড়া আমার জীবনে বোধ করি গল্পও নেই। নিটোল একঘেয়ে জীবন। তোদের ভাষায় 'ঘাত-প্রতিঘাত শূন্য'।"

—"তা হোক"—আমি অনুরোধ করলাম আবার—"আপনি বলুন না—"

ভুড়ুক ভুড়ুক ধোঁয়া টানতে লাগলেন ধনাদা। চোখ দুটো নিমীলিত হয়ে এল ধীরে ধীরে। বুঝলাম, ভাবছেন। এটা ওঁর কোন গল্প সুরু করবার আগের চেহারা।

খানিকক্ষণ পরে বললেন,—"শুনতে যখন চাইছিস শম্ভু, একটি গল্প তোকে বলি, শোন। গল্প একটি ছেলেকে নিয়ে। তবে এর মধ্যে আমিও ছিলাম—"

উন্মুখ হয়ে শুয়ে রইলাম।

ধনাদা বললেন,—"ঠিক গল্প নয় বোধ হয়, সেটা তুই বুঝতে পারবি। পুরাপুরিই সত্য ঘটনা। আমার ছেলেবেলাকার ব্যাপার।"

হাত বাড়িয়ে বেড-সুইচটা নিভিয়ে দিলেন ধনাদা। মাথার উপর সোঁ সোঁ করে পাখা চলছে। জানালাগুলি সব খোলা। বাইরে ঝিক্‌মিক্ তারায় ছাওয়া আকাশের এক-একটা ফালি চোখে পড়ছে জানালার ফাঁকে ফাঁকে। একটু করে জ্যোৎস্না এসে লুটিয়ে পড়েছে ধনাদার খাটের নীচে।

ধনাদা সুরু করলেন—

'যা আমি কোন দিন বলিনা, এটা সেই ধরনের। প্রেমের গল্প। ঠিক প্রেমও নয় সম্ভবতঃ। একে যে কি বলবি, জানিনা। আসল ঘটনাটা খুব বড় নয়, সংক্ষিপ্তই। কিন্তু সেই সংক্ষিপ্ত ঘটনাই অমিয়'র জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছিল একদিন।

"জন্মের দিক থেকে যদি দেখিস, তবে অমিয়র বাপ-মা গরীবই ছিলেন, বলতে হবে। দারিদ্র্য শুধু টাকা-পয়সারই নয়, মনেরও বটে। খোলার বস্তিতে থেকে, ক্রমশঃ দারিদ্র্যের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হতে হতে অমিয়র বাপ-মায়েরও নৈতিক অবনতি এসে-ছিল। সে অবনমন থেকে বাদ যায়নি অমিয়ও।

"লেখাপড়া প্রায় শেখেনি বললেই চলে। বাপের মতই বিদ্যের দৌড়, ক্লাস সেভেন-এইট পর্য্যন্ত। স্কুলেই বিড়ি সিগারেট টানতে শিখেছে বাপের পকেট মেরে। সেই পয়সায় ট্রাউজার হাঁকিয়ে কেতাদুরস্ত হবার চেষ্টা করেছে। রকবাজী করেছে পাড়ায় পাড়ায়। এক কথায়, আজ তোরা যাকে লোফার বলিস, তাই হয়েছে মনে প্রাণে।

'কিন্তু ঐ দারিদ্র্যের মধ্যেও একটি জিনিষ ছিল অমিয়র, যা সে কোন লোককে ওর দিকে আকৃষ্ট করিয়ে ছাড়ত। সে ওর সৌন্দর্য্য। কত আর বয়স তখন ওর, ধর, সতের কি আঠার। কিন্তু স্বাস্থ্যে ওকে মনে হ'ত পঁচিশ বছরের যুবক। আর তেমনি নিখুঁত চেহারা। দেব-দুর্লভ কান্তি। ওর দিকে তাকিয়ে চোখ জুড়াত না। জ্বলতে হ'ত মনে মনে। যেন আগুন ধরিয়ে দিত সৌন্দর্য্যের শিখায়।

"বাপ কোন এক সওদাগরী অফিসের পিওন। যা পায়, সংসার তাতে কিছুতেই চলে না। তবু চালাতে হ'ত। মাঝে মাঝে চলত অর্দ্ধাশন, অনশন। কিন্তু অমিয়র কোন ভ্রূক্ষেপ ছিল না তাতে। বিড়ির পয়সা জুটিয়ে নিতোই বাপের পকেট মেরে, তাতে খাওয়া চলুক আর না-ই চলুক। যা-তা বলে বাপ মহীতোষ কদর্য্য ভাষায় গালিগালাজ করত ছেলেকে। মা রাত্রে ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখত ছেলেকে খেতে দেবেনা বলে। কিন্তু অমিয় নির্ব্বিকার।

"রাতদুপুরে ঘরের দরজায় দুমদাম্ লাথির শব্দে ঘুম ভেঙে মহীতোষ চীৎকার করত। বলত—'হারামজাদার শুধু খাবার সম্পর্ক ঘরের সঙ্গে। এক পয়সার সাহায্য হবে না, রাতদিন টো-টো করে ঘুরে বেড়াবে পথে পথে। ইতর, নচ্ছার ছেলে কোথাকার—বেরিয়ে যা তুই, এ বাড়ীতে জায়গা হবে না তোর'—"

"কিন্তু লাথি বন্ধ হ'ত না। যতক্ষণ না দরজা খোলে। পাছে পাশের ঘরের লোকেদের সঙ্গে ঝগড়া লেগে যায়, এই ভয়ে মা এসে দরজা খুলত। বলত,— ছাই জোটে না তোমার? হাড় জ্বালিয়ে খেল হতভাগা। বাপ খেটে মরছে চব্বিশ ঘণ্টা, ছেলে রাতদুপুরে নবাবী করে ফিরলেন ঘরে! বলি, খাওয়াটা জোটে কোত্থেকে? মরণ হয় না তোমার'?"

"কিন্তু অমিয় নিঃশব্দ। যেন কিছুই হয় নি। ঘরে ঢুকে কড়কড়ে ঠাণ্ডা ভাতগুলো গোগ্রাসে গিলে চাদরমুড়ি দিয়ে শোওয়া—যতই বকো, ফল নেই কোন। বাপ—মাও গজর গজর করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ত এক সময়। এ ঘটনা বারোমাস, তিরিশ দিন। ঘরের সঙ্গে সম্পর্ক দুবেলা খাওয়ার আর রাতে ঘুমোবার। এবং বাপের পকেট মেরে দু'আনি সিকি আধুলী চুরি করবার।

"তা এই অমিয়কে নিয়েই আমার গল্প। অবশ্য শুধু এই অমিয়কে নিয়েই নয়, শুধু এই অমিয়কে নিয়ে বোধ করি গল্প হ'তও না। আরও সব বাউণ্ডুলে পথের ছেলেদের মতই, অমিয় হয়ত সারা জীবনটাই কাটিয়ে দিত। বিড়ি ফুঁকে, শীষ দিয়ে, সস্তা গানের কলি আউড়ে। না হয় পকেট মারত, অন্ধকার রাত্রে কোন একাকিনী মহিলার গলা থেকে হার ছিনিয়ে নিত, খুন-জখম-রাহাজানি করত। কিম্বা হতে পারত লম্পট, মাতাল, জুয়াচোর। যা হয়, যা হয়ে থাকে।

"কিন্তু সেসব কিছুই হতে পারল না অমিয়। যা হতে পারত, যা হওয়া উচিত ছিল, কিছুই হ'ল না। হ'ল ওর বাপ মহীতোষের মতই সওদাগরী আপিসের আরদালী। যা হওয়াকে মনে প্রাণে সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করত অমিয়। সবচেয়ে নীচু ভাবত। তবু কেন হতে হ'ল, সেটাই আমার গল্প। সেটাই বলছি শোন—

"অমিয়দের পাড়ায় হঠাৎ একবার নতুন ভাড়াটে এল। গলির ঠিক মুখটাতে, একতলা, ছোট বাড়ীখানায়। স্বাভাবিক কৌতূহলেই খোঁজ নিয়ে জানল অমিয়, এক সরকারী আপিসের কেরানী বাবু। বাপ-মা-ভাইবোন মিলিয়ে প্রায় দশ বারো জনের একটি পরিবার। কৌতূহলটা সম্ভবতঃ ঐ পর্যন্তই থাকত। কিন্তু সেটা কয়েকদিন পরেই বেড়ে গেল আরও, যখন একদিন ঐ বাড়ীরই পর্দা সরিয়ে শাড়ী ব্লাউজ পরা একটি বেণী দোলানো মেয়ে,চটি ফট ফট করে বই খাতা নিয়ে চলে গেল বড় রাস্তার দিকে।

"ইয়ার বন্ধুরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল পরস্পরের। প্রমোদ বলল—'খোঁজ নিতে হয় রে অমিয়। মন্দ বলে মনে হ'ল না ত?'

"হরেন বলল—'ইস্কুল না কলেজ রে? নাম-ধাম, যাতায়াত, সব খবর জোগাড় কর প্রমোদ। নীরস পাড়াটায় এবার একটু রসকষ যদি আসে—'

"অমিয় গুন গুন করে সুর ভাঁজতে লাগল। দূরের পথে, চলমান দোদুল বেণীর দিকে দৃষ্টি তখনও নিবদ্ধ। বিড়িটা বোধহয় হাতেই নিভে গেছে।

"খবর সব জোগাড় হ'ল। স্কুলই বটে। নাম বিভা।

"আর যাতায়াতের পথে ওদের আড্ডাটা স্থায়ী হয়ে বসল। সকাল, বিকেল, দুবেলা। বিড়ির ধোঁয়ায় আর খিস্তি খেউরে রক গরম হতে থাকত। যতক্ষণ না, আকাঙ্ক্ষিত চলনটি নজরে পড়ে। চোখে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে সব নিস্তব্ধ। অস্পষ্ট মূর্তিটা স্পষ্ট হয়ে হয়ে এক সময় ফট ফট শব্দ তুলে বেরিয়ে যেত সামনে দিয়ে। যতক্ষণ না পর্দার আড়ালে অদৃশ্য। ওদের একাগ্র, উন্মুখ দৃষ্টি যতক্ষণ না অনুসরণ করে করে স্থির হয়ে যেত ঐ পর্দার রহস্যে।

"তার পর রক ছেড়ে ওরা ঘুরত পথে পথে। তিন বন্ধু, তিন ইয়ার। কথা নয়, যা দেখল, তার চিন্তায় বিভোর। আড্ডা আর জমতো না তেমন। কথাবার্তা যা সেও ঐ বিভাকে কেন্দ্র করেই। তার প্রতিটি পদক্ষেপ যেন মুখস্থ হয়ে গেছে ওদের।

"তা বিভার চোখেও পড়েছিল বৈকি। অমিয়র দিকে চোখ না পড়ে উপায় ছিল না। নিজের সম্বন্ধে সচেতন অমিয় এটা জানত। এবং এই জন্যে সে ক্রমশঃ উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। চোখে চোখ পড়ে আরক্তিম হয়ে উঠত বিভা, বেশবাস সংযত করে নিত ত্রস্তে। লজ্জারক্ত মুখে ফুটে উঠত একটি সঙ্কুচিত হাসির রেখা। লম্বায়িত বেণী দুটা চলার গতিছন্দে দুলত মৃদু মৃদু।

"আর মনে মনে স্বপ্ন বুনত অমিয়। লাগাম ছেড়ে দিত চিন্তার। সম্ভব অসম্ভব কত কথাই যে ভীড় করে আসত মনের কোনে, হদিস পেত না ভেবে।

"হরেন বলল একদিন—'এত কি ভাবিস রে অমিয়? মন মরা হয়ে থাকিস রাত দিন, প্রেমে পড়ে গেলি নাকি মেয়েটার?'

পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করে তাতে অগ্নি সংযোগ করল অমিয়। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে মুখ ঘুরিয়ে বসল।

"হরেন আবার বলল—'বলিস ত একটা ব্যবস্থা দেখি, বুঝলি? মেয়েটা ত গররাজী বলে মনে হয় না রে?'

"সে সব কথা তোকে ভাবতে হবে না'—অমিয় বিরক্তি প্রকাশ করল—'আমার কথা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না তোকে। সরে পড় এখন—'

"রকের উপর বেশ চেপে বসল হরেন। একটা বিড়ি ধরিয়ে, তাতে নিঃশব্দে কয়েকটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল—'তুই বললেই ত আর চুপ করে থাকতে পারি না। চোখের সামনে মুখ গোমড়া করে ঘুরে বেড়াবি, কাঁহাতক সহ্য করা যায়,

বল দিকিন ? প্রেমে পড়ে শেষটা মেয়ের মত চোখের জল ফেলতে সুরু করবি নাকি ? কোমর বেঁধে এগিয়ে যা, দেখবি, বিভাও পেছুবে না—'

''বলছি তোকে উপদেশ ঝাড়তে হবে না—'রুখে উঠল অমিয় —এ ছেলের হাতের মোয়া নয়, যে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে নেব। ব্যাপারটা বুঝতেই পারছি না, কেমন যেন জগাখিচুড়ী বলে মনে হচ্ছে। এমন ত হয় নি কোন দিন—'

''তা আরও কিছুদিন ভাবতে হ'ল অমিয়কে। বিভার মতি-গতি লক্ষ্য করতে হ'ল ভাল ভাবে। যত দেখল, আশাটা তত পাকা হতে লাগল। চোখে চোখে তাকাতে বুকটা ধুক-ধুক্ করতে লাগল ততই।

''পথে-পাড়ায় বেসামাল মারপিটে যে ছেলের মন একটুও টলে নি, একটি মেয়ের চোখের দিকে তাকাতে গিয়ে তার মুখ চোখ কান গরম হয়ে উঠতে লাগল। কথা বলার চিন্তা করতেও লাল হয়ে উঠতে লাগল কিশোরীর মত। ভীরু মনটা পলায়নমুখী হয়ে উঠতে চাইল যেন। কিন্তু কি এক দুর্বোধ্য আকর্ষণ ওকে জোর করে টেনে রাখল দশটা চারটের পথে।

''যত আকর্ষণ, তত জ্বালা। যত জ্বালা, তত উন্মুখতা। অসহ্য অস্থিরতা, দুর্বার আকাঙ্ক্ষা। নিজেকে ধরে রাখা অসম্ভব হয়ে উঠল অমিয়র।

''তার পর একদিন। কম্পিতবক্ষে ল্যাম্প পোষ্টটার আড়াল থেকে, দ্বিধাজড়িত পায়ে বিভার সামনে এসে দাঁড়াল অমিয়। ফিস ফিস ডাকল—বিভা—

''চমকে চোখ তুলে তাকাতে গিয়েও লজ্জাবনতা হয়ে রইল বিভা।

''দু'জনেই নিশ্চুপ। কি বলতে এসেছিল, মনে নেই। গুলিয়ে গেছে মনের মধ্যে। শুধু একটা অবোধ্য আকুলি-বিকুলি সারা অন্তর জুড়ে। কে যেন জোর করে চেপে ধরেছে মুখটা। বলতে এসেও না বলতে পারার ব্যাকুলতায় আরক্তিম মুখখানা উন্মুখ। ব্যথ চোখ দুটি ছল ছল।

''আর বিভা আনতনয়না! কোথায় গেল ওর সেই চঞ্চল হরিণীদৃষ্টি! অমিয়র জ্বলন্ত রূপের সামনে মুখই তুলতে পারছে না যে! মনে মনে চাইছে, বলুক, অমিয় বলুক যা খুসী, যেমন করে খুসী; মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে যখন, উন্মুক্ত করে দিক মনের গহন কপাট। ব্যাকুল মনটা যত আন্দোলিত হতে লাগল, চোখের দৃষ্টি ততই লুকাল মাটিতে। সারা শরীরের রক্ত বুঝি উঠে এসেছে মুখে।

''মনে মনে অনেকখানি সাহস সঞ্চয় করল অমিয়। ফিস ফিস বলল—''আমি বলতে পারছিনা বিভা, তুমিই বুঝে নাও। তোমায় আমি···তোমাকে আমি···মানে···

''শুনতে শুনতে মনের সঙ্গে সঙ্গে, সারা পথটাই বুঝি দুলে উঠল পায়ের তলায়, দুরু দুরু বুকে আনন্দের অসহ্য মাতামাতি। চোখ দুটোয় বুঝি এবার জোয়ার আসবে বিভার—

''গলির পথে লোক চলাচল কম। তবু ভয়-কম্পিত বক্ষে এগুলো বিভা। পাশে পাশে অমিয়। পাশাপাশি, তবু যেন অনেকখানি দূর। বিভা তেমনি নিশ্চুপ। মনের ঝড়ে ঠোঁট দু'খানি কাঁপছে থর থর। গুটি গুটি চলছে আর সারা সত্ত্বায় যেন প্রতীক্ষা করছে, আরও কি বলবে অমিয়। কেমন করে বলবে, কতখানি বলবে। কিন্তু অমিয়ও গেছে স্তব্ধ হয়ে। যা বলবার ছিল, সবই ত হয়ে গেছে বলা। বুঝতে যদি না-ই পেরে থাকে বিভা, তবে দরকার নেই বুঝে। মন খালি করে, সারা হৃদয়ের অভিব্যক্তিতে ও যা উচ্চারণ করেছে, তার চেয়ে বেশী কি আর বলবার ছিল অমিয়র।

''সারাটা পথ একটি কথাও বলল না বিভা।

''বাড়ীর কাছাকাছি এসে মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করল অমিয়—'কাল দেখা করব ?'

''মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানাল বিভা। তার পর লজ্জারক্ত মুখে ছুটে গিয়ে ঢুকল পর্দ্দার আড়ালে। আর অমিয় অস্থির আনন্দে, আর আশ্চর্য্য হাল্কা মনে ছুটে বেড়াল পথে-পার্কে, ওকে স্বীকৃতি দিয়েছে বিভা, হয়ত ভালও বেসেছে। আর কিছু চাইবার নেই ওর, জানবার নেই।

''তার পর কেটেছে দিনের পর দিন। বিভার কাছে কাছে, পাশে পাশে। সঙ্গোপনে দুটি মন ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষায় স্বপ্ন বুনেছে। বাস্তব জগৎ মুছে গেছে ওদের চোখ থেকে। ওরা দুয়ে মিলে এক। দুটি মন একাত্ম।

''কিন্তু আশ্চর্য, এত কথা, এত আশা-আকাঙ্ক্ষার ছবি আঁকা, তবু বিভা একটিবারও প্রশ্ন করে নি অমিয়র ব্যক্তিগত জগত সম্বন্ধে। যেখানে ওর সবচেয়ে বড় ভয়। ওর বিদ্যা নেই, শিক্ষা নেই, বংশ-গৌরব নেই! এমনকি আর্থিক স্বাচ্ছল্যও নেই। যা আছে, সে ওর রূপ। যার টানে এগিয়ে এসেছে বিভা, যার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ওর বুকের রক্ত-গোলাপটি পাপড়ি মেলেছে। নিজের প্রস্ফুটনে মুগ্ধ-বিহ্বল বিভা,কোন প্রশ্ন জাগে নি তাই অমিয়র সম্বন্ধে। কিন্তু সে প্রশ্ন জাগবেই। অমিয় জানে, যখন বিহ্বলতার পর আসবে স্থায়িত্বের, নীড় বাঁধবার কথা, তখনই এ প্রশ্ন উঠবে। বিভাই তুলবে। প্রেমের কষ্টিপাথরে নয়, বিদ্যা-বুদ্ধি-অর্থের মানদণ্ডে বিচার করে নেবে ওকে। সে দিন ? অমিয় ভাবতে পারে না, সেদিন কেমন করে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে বিভাকে পাশে টেনে নেবে সে।

''কিন্তু সব চিন্তা দূর হয়ে যায়, যখন বিভা এসে দাঁড়ায় পাশে। মৃদু হেসে বলে—'এসে গেছ তুমি এরই মধ্যে ?'

উচ্ছলকণ্ঠে বলে অমিয়—'তুমিই ত টেনে আন। থাকব কেমন করে ?'

''এদিক-ওদিক তাকিয়ে বিভা বলে—'এখানে নয়, অন্য কোথাও চল। দেখে ফেলবে কেউ।'

''দেখলেই বা'—অমিয় বেপরোয়া—'একদিন ত দেখবে'

সেই দেখবার দিনটিই আসুক না এগিয়ে। যত তাড়াতাড়ি, ততই ত ভাল—'

"বিভা হাসে। পাশাপাশি ওরা হেঁটে চলে। মাঝে মাঝে বিভার হাওয়ায় দোদুল আঁচলটা এসে মৃদু স্পর্শ দিয়ে যায় অমিয়র হাতে। শির শির করে ওঠে ওর সমস্ত শরীর। ওর চুলের সুবাসিত তেলের গন্ধটা উন্মনা করে তোলে অমিয়কে। মনে হয়, মিছেই এত চিন্তা করছে অমিয়। প্রেম কি এতই দুর্ব্বল, যে বিদ্যা-শিক্ষা-অর্থের বেড়াজাল ডিঙিয়ে এগিয়ে আসতে পারে না কাছে? ওর সব কিছুই কি মিথ্যে হয়ে যাবে এই ছোট্ট কয়েকটা কথার জন্যে? না, না, না, সে ছিনিয়ে আনবে সব বাধা অতিক্রম করে, সব অসম্ভবকে সম্ভব করে।

"বিভা বলে—'মাঝে মাঝে এত সব কি চিন্তা কর বল ত?

"চমকে ওঠে অমিয়। বিভা কি বুঝতে পারছে তার মনের গভীরের গোপন চিন্তাধারাকে? তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ বিভার চোখে চোখে। বলে—'ভাবছি বিভা, সারা দুনিয়াটাই যদি বিপক্ষে যায়, প্রেম কি হেরে যাবে তাতে? সার্থক হতে পারবে না বাধাবিঘ্নকে পায়ে মাড়িয়ে?'

'এ কথা কেন?' সকৌতূহলে প্রশ্ন তোলে বিভা—'অসম্ভব চিরকালই অসম্ভব। তার দিকে হাত বাড়ানই ত ভুল। যদি অসম্ভবকে না চাই, তবে দুনিয়া বিপক্ষ হবে কেন?'

'যা আয়ত্তের বাইরে'—বলতে বলতে চোখ দুটো জ্বলে ওঠে অমিয়র, 'মানুষের আকর্ষণ ত তার উপরেই প্রবল বিভা। হাত বাড়ালেই যা পাওয়া যায়, চিরকালই তা থেকে যায় অনাদৃত। অসম্ভবকে চায় বলেই ত মানুষের মাঝে এত সংঘাত, এত অশান্তি। অসম্ভবকে সম্ভব করাই যে মানুষের সাধনা। যে একথা বিশ্বাস করে, এ পথে চলে, তার বিরুদ্ধে দুনিয়া ত যাবেই—'

"বিভা চেয়ে থাকে আশ্চর্য্য দৃষ্টি নিয়ে।

চলতে চলতে অমিয়, আবার বলে—'তা ছাড়া যোগ্যতার প্রশ্নও ত আছে। পরিণামের দিকে যতই এগুবে তুমি, ততই চাইবে যাচাই করে নিতে। এই ত নিয়ম। মানুষ চিরকাল ভয় করে চলে অজানাকে, অজানাকে যতদিন না জানছ, ততদিন ত নিশ্চিন্তে ঝাঁপ দিতে পারবে না। প্রশ্ন উঠবে যোগ্যতার। যাকে চাও জীবনে, সে সত্যিই উপযুক্ত কিনা, সাধারণ ভাবেই জানতে চাইবে তুমি। তখন ত সত্যিই জবাব দেবার মত কিছুই থাকবে না আমার—'

"শুনতে শুনতে বিভার কৌতূহল চরমে ওঠে। বলে—'কেন থাকবে না অমিয়? যা বিচার করবার, তা শেষ হয়ে গেছে বলেই ত চলেছি তোমার পাশে পাশে। এবার যা ভাববার সে তুমি ভাববে। আমার সব ভার তোমার হাতে তুলে দিতে পেরেছি বলেই আমি নিশ্চিন্ত। এবার দায়িত্ব তোমার। সে দায়িত্ব পালনে তুমি উপযুক্ত করে তুলবে নিজেকে। আমি সমর্পণ করেছি, তুমি গ্রহণ করতে পারবে কি পারবে না, সে চিন্তা আমার নয়। প্রেমই তোমাকে তৈরী করে নেবে। প্রেমই দেখাবে পথ। আমি কেন প্রশ্ন তুলব?'

"এবার অবাক হবার পালা অমিয়র। এমন করে ত ভাবে নি কখন। নিজের দিক থেকে ত বিশ্লেষণ করে নি ঘটনাটিকে। বিভাকে গ্রহণ করবার যোগ্যতা নেই বলে বিভার কাছ থেকে প্রত্যাখ্যানটাকে চরম সমস্যা বলে ভেবেছে, কিন্তু নিজেকে সে ভার মাথায় তুলে নেবার মত করে প্রস্তুত করেছে কিনা, এ কথা ত ভাবে নি—সে কি করে দাবী করবে? কেমন করে সুখী করবে বিভাকে?

"নতুন করে ভাবতে সুরু করল অমিয়। এ চিন্তা যেন পেয়ে বসল তাকে। নিজেকে গড়ে তুলতে পারে নি, এ দুঃখ বার বার তাকে বাধা দিতে লাগল বিভার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে। সে লেখা-পড়া শেখে নি। ভদ্র সমাজে মেশে নি। পথে পথে জঘন্য জীবন কাটিয়েছে দিনের পর দিন। কি করে সে বিভাকে দাবী করবে? কি করে রূপ দেবে তার জীবনের সবচেয়ে বড় সত্যকে?

"আশ্চর্য্য। সাধারণ কয়েকটি কথা ওকে এমন পাগল করে তুলল। ওকে শক্তি দিল আত্মবিশ্লেষণের। অস্থির হয়ে ও শুধু চিন্তা করতে লাগল। যত ভাবল, তত বাড়ল অস্থিরতা। ততই জ্বলতে লাগল মনটা। এ হতে পারে না। তার অযোগ্যতার সুযোগ নিয়ে অন্য কেউ ছিনিয়ে নেবে বিভাকে, এ কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না অমিয়।

"মন স্থির হয়ে গেল। বিভাকে পাবার জন্যেই ছাড়তে হবে বিভাকে। ওর জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করতে সময় চাই। সেই সময়টুকু থাক বিভা একা একা। অসাধ্য সাধনই করবে অমিয়। যত দিন লাগে, লাগুক, তার জন্যে যদি বিভা আড়াল হয়ে যায় চোখের, সেও ভাল। এমন ভাবে সে কিছুতেই বিভাকে টানতে পারবে না পাশে, কোন দিনই নয়। তাকে মানুষ হতে হবে। হতে হবে দশ জনের একজন। যার পাশে দাঁড়াতে কোন সঙ্কোচ, কোন লজ্জা হবে না বিভার। ততদিন যদি অপেক্ষা না-ই করতে পারে ও, ক্ষতি নেই। বিভা বেঁচে থাকবে চিরদিন। বেঁচে থাকবে ওর অন্তরের অন্তঃস্থলে। অমর প্রেম আত্মনিষ্ঠায় থাকবে অচঞ্চল।"

ধনাদা থামলেন।

রাত এসেছে গভীর হয়ে। বাইরে চাঁদের আলোর মাতামাতি। ছায়াময় গাছের অন্ধকার কোথায় বসে 'চোখ গেল—চোখ গেল' করে ডাকছে পাপিয়া। টুকরা টুকরা পুঞ্জ মেঘ ভাসছে জোৎস্না-প্লাবিত আকাশে।

আমি রুদ্ধ নিশ্বাসে শুনছি।

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ধনাদা।

তার পর আবার শুরু করলেন—

"দিনের পর দিন চলল মনের সঙ্গে সংগ্রাম। ক্ষত বিক্ষত হতে লাগল ওর অন্তর। যত রক্তক্ষরণ হ'ল, ততই হ'ল দৃঢ় সঙ্কল্প।

মনকে বাঁধতে হ'ল সর্ব্বস্ব খুইয়ে। তারপর ছুটল অপিসপাড়ায় দরজায় দরজায়। চাকরি চাই একটা।

"বাপ মহীতোষ অবাক। মাও বুঝতে পারে না, এ কি হ'ল অমিয়র! রাত দুপুর ছাড়া যে ছেলের সাক্ষাৎ পাওয়া যেত না, সে এতদিন ধরে চুপচাপ করে রইল ঘরের কোণে। নির্ব্বাক, নির্ব্বিকার হয়ে। তারপর কিনা চাকরির চেষ্টায় এ আপিস ও আপিস। বুঝতে না পেরেও সন্তুষ্ট হ'ল বাপ মা। কারণ যাই হোক, সুমতি হয়েছে অমিয়র। এইটুকুই যথেষ্ট। ঘরমুখী হয়েছে ওর মন, অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় মেতেছে, এটাই যে কল্পনাতীত। মনে মনে ওরা ধন্যবাদ জানাল ভগবানকে।

"চাকরি একটা জোগাড় করে দিল মহীতোষই। ওর নিজের আপিসেই। সাহেবকে বলে কয়ে ঢুকিয়ে নিল। আর্দ্দালীর পোষাক উঠল অমিয়র সর্ব্বাঙ্গে। কোথায় রইল ট্রাউজারের ঝকমকানি, সেদিকে দৃষ্টিই নেই অমিয়র। যাকে ঘৃণা করত সবচেয়ে বেশী, তাকেই সবচেয়ে আপন করে জড়িয়ে নিল সর্ব্বাঙ্গে। দেহের পোষাক ওকে যেন স্পর্শও করতে পারল না। মন জুড়ে যে দাউ দাউ আগুন জ্বলছে। ওকে দহন করছে নিরন্তর। চোখ দুটো অবিরাম টানছে বিভার সেই হাসিমাখ মুখখানার পানে। কি হ'ল কি পরল সে চিন্তাই নেই। এ ওর পথ। এই পথ বেয়েই ও পৌঁছবে বিভার কাছে। উঠবে প্রেমের চূড়ায়।

"মহীতোষ আরও অবাক, যখন প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই এক গাদা বই-পত্র কিনে এনে ঘরে ঢুকল অমিয়। ভেবেই পেল না, হঠাৎ কেমন করে এত অসম্ভব সম্ভব হতে সুরু করেছে অমিয়র জীবনে।

"জিজ্ঞাসা করল এসে, 'কি হবে এত সব বই-পত্তোর দিয়ে? মাইনে পেয়েই যে টাকাগুলি ফুঁকে দিয়ে এলি?'

"সংক্ষিপ্ত জবাব দিল অমিয়—'পড়ব'।

"ওর চোখ দুটো লাল। চোখের কোলে কালির রেখা। একটু কৃশও যেন। কিন্তু ওর সারা শরীরে যেন বিদ্যুতের ঝিলিক। মনে মনে রাগ করলেও আর কথা বাড়াতে সাহস করল না মহীতোষ।

"সারাদিন আপিস, আর গভীর রাত পর্য্যন্ত অধ্যয়ন। পড়া ত নয়, তপস্যা। বইয়ের পাতায় পাতায়, ছত্রে ছত্রে যেন বিভার নাম ছড়ানো। বিভাকে পাওয়ার জন্যেই ত তার এই দুশ্চর সাধনা। মনের ভিতর থেকে একনিষ্ঠ প্রেম ওকে অনুপ্রেরণা দিতে লাগল নিরন্তর।

"দিনের পর দিন, বছরের পর বছর।

"এমনই বোধ করি হয়। যার জন্যে এই সাধনা, এই কঠোর সংগ্রাম, সে রইল পড়ে একাকিনী, চোখের আড়ালে। দুই চোখে আকুল প্রতীক্ষা নিয়ে সে হয়ত বার বার ফিরে গেল। হয়ত অভিমানে ছল্ ছল্ করে এল চোখ। হয়ত দুই চোখে জ্বালা ধরল অমিয়র এ নীরবতায়। কত অশ্রু, কত দীর্ঘশ্বাস হয়ত ঝরল সংগোপনে। সে হিসাব রাখল না অমিয়, প্রেমের প্রেরণা ওকে ছুটিয়ে ছুটিয়ে এক সময় এনে ছেড়ে দিল আনন্দ ছড়ানো পথে পথে। ধীরে ধীরে আড়াল হয়ে দাঁড়াল প্রেম, মুখ্য হয়ে সামনে ছড়িয়ে রইল পুঁথি আর পুঁথি। তার পাতায় পাতায় কত বিভা ছড়ানো। এক বিভার সাধ্য কি সে আনন্দ দিতে পারে! কেন এ সাধনা, ভুলে গেল অমিয়। ভুলে গেল এ পথে সে শুধু পৌঁছতে চেয়েছিল বিভার কাছে। বিভাকে পাবার জন্যেই আঁকড়ে ধরেছিল বই। কিন্তু পথই সত্যি হয়ে উঠল ওর জীবনে। বিভা আড়াল হয়ে গেল ধীরে ধীরে। মুছে এল মন থেকে। অধীর আনন্দে পথকেই আঁকড়ে ধরল অমিয়। জীবন সর্ব্বস্ব করে। সব ভুলে, সব ছাড়িয়ে, সব হারিয়ে।

"অনেকগুলি বছর। শুধু পরীক্ষা পাস নয়, পরীক্ষা পাস ত সবাই করে। শুধু পরীক্ষা পাস করে কি এত আনন্দ? কত পরীক্ষাই ত পাস করল অমিয়, কিন্তু সেই পড়ার নেশা, পড়ার আনন্দ ত ফুরল না। ধাপে ধাপে প্রমোশন পেয়ে পেয়ে উপরে উঠল, মাইনে বাড়ল, মর্য্যাদা বাড়ল। আর্দ্দালীর পোষাক খসে গিয়ে ধুতি-পাঞ্জাবী, সুট-টাই উঠেছে চাকরির ক্রম-বিবর্দ্ধনে, কিন্তু সেদিকে খেয়ালই নেই অমিয়র। থাকবে কি করে? বইয়েই মশগুল যে!

"বাপ-মা অনেক সুখ পেয়ে গেল জীবনের শেষ দিনে। অনেক আশীর্ব্বাদ করে গেল। কিন্তু সেদিকেই কি নজর ছিল? সব তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল ওর জীবনে। সব গৌণ হয়ে গিয়েছিল। বহু দিন ধরে আনন্দ সমুদ্রে একটানা সাঁতার কেটে যখন পারে উঠল অমিয়, তখন দেরী হয়ে গেছে।"

আবার থামলেন ধনাদা।

বললাম—"থামবেন না ধনাদা, বলুন—

বললেন, "গল্প ত হয়েই গেল। বিভার কথা ভাবছিস ত? সে কি থাকে তত দিন? ভেবে দেখ, মাথার চুলে পাক ধরেছে, মুখে কুঞ্চন লেগেছে বয়সের। বিভা থাকলেই কি আর তার কাছে যেতে পারত অমিয়? ইচ্ছে থাকলেও তার সে পথ তখন বন্ধ।"

প্রশ্ন করলাম, "কিন্তু আপনি যে বললেন, এ গল্প আপনার? এ ত পুরোপুরি অমিয়র গল্প—আপনি কোথায় এর মধ্যে—"

"ও!" হো হো করে হেসে উঠলেন ধনাদা, প্রাণখোলা হাসি। বললেন, "আরে ও একই কথা। তোকে বলা হয় নি। আমাকে ছোটবেলায় অমিয় বলেই ডাকত বাবা-মা, বিভাও। ওদের সঙ্গে সঙ্গে নামটাও মুছে গেছে আমার জীবন থেকে। ওটা আমারই নাম রে, আমিই সেই অমিয়—"

চিঠি

শ্রীকৃষ্ণধন দে

দূর পাড়াগাঁয়ে ছোট এক চালাঘরে
পোষ্ট মাষ্টার ডাকের হিসাব করে,
বেড়াটির ফাঁকে ওঠে তেলাকুচ লতা,
মাঠের বাতাসে তালগাছ কয় কথা,
পাশে ছোট নদী, পাড়ে তার কাশবন,
এলোমেলো ঝড়ে নুয়ে পড়ে সারাখন,
দূরের আকাশে ফালি মেঘ ভেসে যায়,
বন-রেখা আঁকা ধূধূ মাঠ-সীমানায়,
সকালের রোদে নামে শালিকের দল
শঙ্খচিলের ডানা করে ঝলমল,
সে চালাঘরের ছোট জানালার পাশে
কিশোরী বধূটি চুপি চুপি রোজ আসে.
শুধায় প্রশ্ন, লজ্জায় তবু থামে,
—"এসেছে কি চিঠি সৌদামিনীর নামে ?"

সময়ের স্রোত বহে গেছে তার পর,
টিনের মূরতি ধরেছে সে চালাঘর।
পোষ্ট মাষ্টারও বদ্‌লি হয়েছে কত,
পল্লীর পথ নাই আর সেই মত।
দুপুরের রোদে তামারাঙা নীলাকাশ
পাকা ফসলের মাঠে ফেলে হু-হু শ্বাস,
ঘূর্ণি হাওয়ায় উড়িছে ধূলির কণা,
ঝল্‌সানো বনে ফুল বুঝি ফুটিল না।
কেঁপে কেঁপে ওঠে কোথায় ঘুঘুর সুর,
মাটিফাটা বুকে ধরণী তৃষ্ণাতুর,
পোষ্টাপিসের দরজার একপাশে
তরুণী বধূটি ধীরে ধীরে সরে' আসে,
শুধায় প্রশ্ন, সঙ্কোচে তবু থামে,
—"এসেছে কি চিঠি সৌদামিনীর নামে ?"

অপরাহ্ণের রবি পশ্চিমে হেলে,
পথে প্রান্তরে সুদীর্ঘ ছায়া ফেলে
পোষ্টাপিসের পুরানো বাঁধন টুটি'
টিনের ছাউনি হয়েছে ইঁটের কুঠী।
প্রাচীনতা যত একে একে যায় খসে'
ঢেঁকির বদলে ধানকল গেছে বসে।
রপ্তানি আর আমদানি সুপ্রচুর,
মাঝে মাঝে তবু আসে সে হারানো সুর।
দূরের আকাশ তেমনি রয়েছে নীল,
তালগাছে এসে তেমনি যে বসে চিল,
পোষ্টাপিসের গোল জানালার পাশে
প্রৌঢ়া রমণী ম্লানমুখে সরে' আসে,
শুধায় প্রশ্ন, কুণ্ঠায় তবু থামে,
—"এসেছে কি চিঠি সৌদামিনীর নামে ?"

সন্ধ্যার ছায়া নেমে আসে ধীরে ধীরে
খোয়া-ঢালা পথে, বাঁধাঘাটে, নদীতীরে।
বাজার বসেছে, বেপারীর আনাগোনা,
কত যে ভাষায় কলরব যায় শোনা,
বেসাতি-নৌকা আসে ঘাটে পাল তুলি'
লরীগুলি চলে উড়ায়ে সে পথে ধূলি,
পোষ্ট মাষ্টার হেথা একা নহে আর,
তার-বাবু তাল দেয় টরে-টক্কার।
ক্লাব সমিতিতে পল্লী যে গেছে ছেয়ে,
রেডিও বাজিছে নানা সুরে গান গেয়ে।
পোষ্টাপিসের আজো কাউন্টার পাশে
কম্পিতপদে স্থবিরা কে নারী আসে,
শুধায় প্রশ্ন, ক্ষীণ স্বর ধীরে থামে,
—"এসেছে কি চিঠি সৌদামিনীর নামে ?"
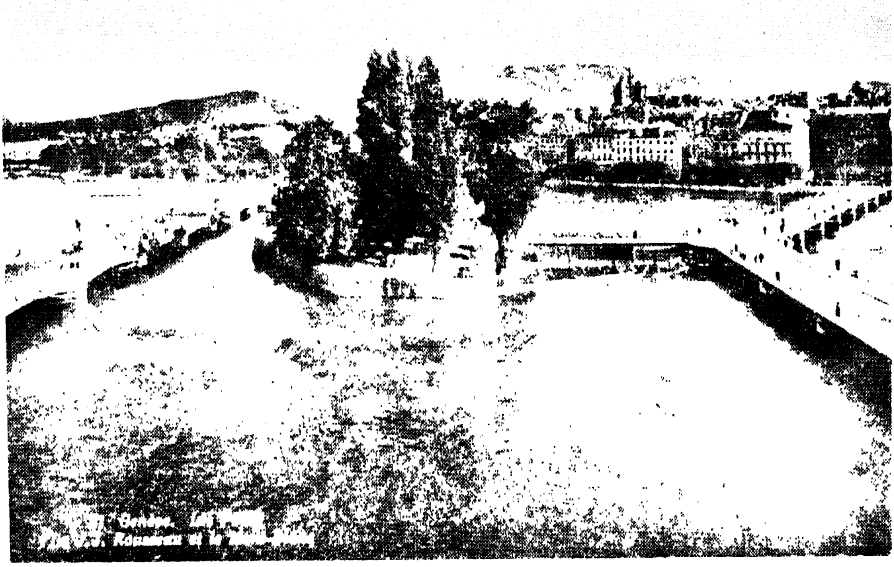
জেনিভা হ্রদের সাঁকো ও রুশোর স্মৃতিস্তম্ভ

সাগর-পারে

শ্রীশান্তা দেবী

প্যারিস ছেড়ে আমরা বার্ণ চললাম সুইজারল্যাণ্ডে। আমেরিকান এক্সপ্রেসের সঙ্গে এবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ট্রেনের টিকিট হোটেল ভাড়া সব তারাই ঠিক করে দিয়েছিল। সুতরাং খরচ অনেক বাড়ল।

পথে আসতে আসতে দেখলাম পাহাড়ে জমির গায়ে গায়ে ছোট ছোট ঝকঝকে তকতকে খেলনার মত সব বাড়ী, উজ্জ্বল প্রখর রোদ। এই রোদের দেশে কত লোকই রৌদ্র চিকিৎসার জন্য আসে অনেকেই জানেন। ঝলমলে আলোয় ছবির মত সাজানো দেশটি। লোকে বলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে এ দেশ ইউরোপে অতুলনীয়।

সন্ধ্যায় আমরা ষ্টেশনে পৌঁছলাম। আমেরিকান এক্সপ্রেসের দেখা মিলল না। এম্ব্যাসি থেকে এক ভদ্রলোক ভারতীয় গাড়ী নিয়ে এসেছিলেন, তিনিই আমাদের হোটেলে পৌঁছে-ছিলেন। রাত্রে এন সি. মেহতার মেয়েজামাই গাড়ী করে তাঁদের বাড়ী ডিনার খেতে নিয়ে গেলেন। সেখানে আরও চারজন ভারতীয়কে ডেকেছিলেন, কেউ কেউ দীর্ঘকাল ও-দেশে আছেন। একটি মহারাষ্ট্রীয় মহিলার ধরণধারণ সবই ইউরোপীয়, পানাহারও সেই রকম, কিন্তু তিনি গীতাও আওড়াতে পারেন দেখলাম। রাত্রের খাওয়া এবং গল্প-গাছা সেরে যখন হোটেলে ফিরলাম তখন খুব জ্যোৎস্না উঠেছে। স্বপ্নরাজ্যের মত লাগছিল, স্পষ্ট কিছু দেখা যায় না। মনে হচ্ছিল যেন দার্জ্জিলিং কি কার্শিয়াঙে বেড়াচ্ছি। নদীর ধার দিয়ে যেতে যেতে মেয়েরা অনেক বাংলা গান করল। মেহতারা বাংলা গান বেশ পছন্দ করেন দেখলাম। খালের মত বাঁধান নদীর ধার দিয়ে গাড়ী ছুটেছে, জলের তলায় পাথরগুলি দেখা যায়, যেন আমাদের ধলভূমের ছোট নদী। তবে এ নদীর স্রোত মন্থর। মানুষের হাতের বন্ধনে সংযত।

এ শহরে থাকবার সময় পেলাম না। পরদিন সকালে গোটা দুই মিউজিয়াম দেখে সেই দিনই আবার যাত্রা করতে হবে। কাঠের আসবাবের দেশ, মিউজিয়মে ৪০০ বছর আগেকার কাঠের ঘর ও নিখুঁৎ কারুকার্য্য করা আসবাব সাজানো রয়েছে। মনে হয় যেন ঘরগুলিতে কেউ বাস করে সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখেছে একটু ক্ষণের জন্য বাইরে গিয়েছে। চীন জাপান বালি, জাভা প্রভৃতি অন্যান্য দেশের অনেক সুন্দর জিনিষও এদের সংগ্রহে আছে। হল্যাণ্ডের একদল ছেলেমেয়েও আমাদের সঙ্গে মিউজিয়ম দেখতে জুটে গেল। তাদের হাতে হাতে ক্যামেরা। বিদেশী

দেখে ছবি তোলার তাদের উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। ছেলেমেয়েগুলির ব্যবহার খুব ভদ্র। একটি মেয়ে দৌড়ে এসে আমার মেয়েদের জড়িয়ে ধরে বললে, "তোমরা কি সুন্দর dark।" সৌন্দর্য্য বাড়াবার জন্য ওদেশের মেয়েরা রোদে পুড়ে কাল হয়।

একটা ছোট নদীর উপর সেতু পার হয়ে অন্য একটি মিউজিয়মে গেলাম। আল্পস্ পাহাড়ে চড়া ও-দেশের অনেক লোকের নেশা। এই মিউজিয়মে পাহাড়ে চড়বার পোষাক, আসাক, দড়ি, বর্শা, ম্যাপ, কি ভাবে কি করতে হয় সব দেখান আছে। পার্ব্বত্য পাখী জীবজন্তু সবই আছে। বরফের পাহাড়ে চড়বার আগে এই রকম মিউজিয়মে এসে যদি দিনকয়েক ভাল করে সব দেখা যায় তা হলে অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার ভয় থাকে না। ওদের দেশের লোকেরা এখানে এসে অনেক শিখে যায়।

বার্ণে আসবার সময় সুন্দর পার্ব্বত্য দৃশ্য ও বনভূমি দেখতে দেখতে এসেছি, যাবার সময় চললাম হ্রদ ও পর্ব্বত দুই দেখতে দেখতে। জেনিভা পর্য্যন্ত এই বিশাল হ্রদ। যেন সমস্ত দেশ ঘর বাড়ী সবই তার দুই তীর জুড়ে। দূরে বরফ গলা পাহাড়ের মন্দিরাকৃতি চূড়াগুলি দেখা যায়। সুইজারল্যাণ্ডের সৌন্দর্য্যের খ্যাতি চিরকাল শুনেছি। কল্পনায় যা দেখতাম তা ঠিক এই রকম নয়, মনে করতাম কাশ্মীরের মত। দেখলাম অন্য রকম। এত বড় হ্রদ আমাদের দেশে দেখিনি, এ যেন উপসাগর। তাছাড়া আমাদের দেশে প্রকৃতিকে এমন করে দু'ধার দিয়ে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলার কোন চিহ্ন নেই! মানুষ যেখানে প্রকৃতিকে কুৎসিত করে রাখে নি সেখানে আমাদের দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের তুলনা মেলে না, কিন্তু কাশ্মীরের মত স্বর্গশ্রী যেখানে সেখানেও দরিদ্র অশিক্ষিত মানুষ এমন কুশ্রীতার সৃষ্টি করেছে যে তারও বোধহয় তুলনা মেলে না। এই দুই রূপের মাঝামাঝি একটা হওয়া উচিত, যেখানে প্রকৃতি নিজের রূপৈশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য নিজের মত করে ঢেলে দিতে পারবে, মানুষ তাকে লাগাম বেঁধেও রাখবে না, অথবা কুশ্রীতার পঙ্কে নিমজ্জিত কিম্বা ধ্বংসের তাণ্ডবে উন্মত্ত হতেও দেবে না। আমাদের শিক্ষিত লোকের ইচ্ছা করলে এই শিক্ষার প্রচার অল্পে অল্পে করতে পারেন।

শহর জেনিভা ত হ্রদেরই কোলে। সন্ধ্যায় আমরা শহর জেনিভায় পৌঁছলাম। হ্রদেরই ধারে একটি হোটেল, নাম হোটেল রুশি। জানালা খুললেই দেখা যায় বড় বড় একদল রাজহাঁস হ্রদের জলে খেলা করছে, রাতেও যেমন দিনেও তেমন। হ্রদের প্রায় উপরেই রুশোর বিরাট মর্ম্মর-মূর্ত্তি। হ্রদের উপর দিয়ে সাঁকো ওপারে চলে গিয়েছে। হোটেলের জানালায় বসে দেখতাম ভোর থেকে অনেক রাত পর্য্যন্ত অবিশ্রাম লোক চলেছে সাঁকোর উপর দিয়ে বা অন্য রাস্তা দিয়ে। এত সাইকল কোথাও দেখি নি, গাড়ী এবং পদচারী পথিক তার তুলনায় অনেক কম। হ্রদ পার হওয়ার জন্য এটা সহজ বলে কি সাইক্লের ঘটা? জানি না।

জেনিভাতে নানাদেশের লোক সারাক্ষণ দেখা যায়, তাই বোধহয় বিদেশীদের দেখে কেউ বিস্ময় ও কৌতুকপূর্ণ নেত্রে চেয়ে থাকে না। শাড়ীপরা মেয়েও হোটেলের জানালায় বসেই মাঝে মাঝে দেখতাম। এদেশের লোক বেশীর ভাগ জার্ম্মানভাষী, কিছু ফ্রেঞ্চভাষী, কিন্তু এশিয়ারও লোক অনেক আছে, তারা ইংরেজী বলে।

আমরা জেনিভাতে ঘড়ি ও ক্যামেরা কেনবার জন্য দু'দিন বাজারে গেলাম। বাজার কোন কোন দিকে আমাদের দেশের মতই হলেও জিনিষপত্র ভারী সুন্দর করে সাজানো। ফুটপাথের পাশে ঘাসের জমির উপর ছবিও বিক্রীর জন্য সাজানো। অনেক মেয়ে উঁচু হিলের চটি-জুতো পায়ে বাজার করতে এসেছে। উঁচু-নীচু পাহাড়ে জমিতে বাজার। ফল-তরকারিও কত সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে। এত চকোলেট কোনো দেশে দেখা যায় না। ঘড়ির ত কথাই নেই। যারা বিক্রী করছে তারা ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ ও জার্ম্মান তিনটে ভাষাই বলতে পারে। প্যারিসের মত ভাষাসঙ্কট হয়না এখানে। এদের ব্যবহারও বন্ধুর মত। সব জিনিষ ভাল করে বুঝিয়ে দেয় অথচ অহেতুক কৌতূহল দেখায় না। যে মেয়েটির কাছে আমরা ক্যামেরা কিনেছিলাম সে এখনও প্রতি বৎসর আমাদের কার্ড পাঠায়, বোধহয় এটা দোকানের নিয়ম।

ঘড়ির দোকানে ঘড়িটি প্যাক করে তাকে কাগজের ফিতে দিয়ে ফুলের মত সাজিয়ে তবে আমাদের হাতে দিল।

হোটেল থেকে বেরিয়ে খাবার সন্ধান করতে যাবার সময় অকস্মাৎ ডাঃ রজনীকান্ত দাস মহাশয় ও তাঁহার পত্নী সোনিয়া দাসের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমার পিতৃদেবের এঁরা স্নেহভাজন এবং তাঁর বিশেষ ভক্ত ছিলেন। হঠাৎ পথে পেয়ে দুই পক্ষেরই খুব আনন্দ হ'ল। তাঁদেরই সঙ্গে হ্রদের ধারের চীনা লণ্ঠন জ্বালা পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হোটেলে গেলাম। গাছতলায় সুন্দর করে সাজিয়ে খাবার জায়গা করেছে গ্রীষ্মকাল বলে। মাছভাজা আর আইসক্রীম বলতে গেলে খাদ্য। সেইটুকু খাবারেই পাঁচ জনের জন্য পাঁচ পাউণ্ড বিল! বাড়তি বোধহয় দু'-পেয়ালা চা ছিল। গাছতলায় বসার দক্ষিণা কম নয়। অল্প অল্প শীতে ম্লান জ্যোৎস্নায় বসে খাওয়ার স্মৃতি আজও

মনে জাগায় আর একবার সেই হ্রদের ধারের গাছতলায় যাবার ইচ্ছা।

সব জায়গাই প্রায় ঘোড়দৌড়ের মত করে দৌড়ে দেখা, কাজেই জেনিভাতেও বিশেষ থাকবার সময় পেলাম না। ৬ই আগষ্ট কোনরকমে ইউনাইটেড নেশ্যানসের বাড়ীটা দেখে ফিরতে হবে। যখন লীগ অব নেশ্যানস ছিল সেই সময় ১৯২৬ কি ২৭ সালে আমার পিতৃদেব এখানে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। তাই আরও জায়গাটি দেখবার ইচ্ছা ছিল।

বিরাট বাড়ী আর বাগান। আয়নার মত ঝকঝকে মেঝে, প্রতি পদক্ষেপে মনে হয় এই বুঝি পা পিছলে পড়লাম। সারা পৃথিবীর প্রতিনিধি, কাজেই সারা পৃথিবীকে স্থান দেবার যোগ্যই বিরাট সব হল। অভ্যর্থনা-গৃহ, বক্তৃতা-গৃহ, ইত্যাদি নানা কাজের নানা আসবাবে ও চিত্রাদিতে শোভিত সব হল। নানা ভাষার লোকে নানা কথা এখানে বলেন, কাজেই সব প্রায় বিদ্যুৎগতিতে ভাষান্তরিত হবার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা আছে, দেখে ভারী সুন্দর লাগছিল। স্কুলের ছেলেমেয়েদের পৃথিবীর নানা দেশ ও নানা সমস্যা বিষয়ে শিক্ষা দেবার জন্যই বোধ হয় পাল পাল স্কুলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা সর্বত্র ঘুরে দেখছিলেন। আমাদের দেখে তাদের ভারতবর্ষ বিষয়ে কিছু হয়ত জ্ঞানলাভ হ'ল, তাদের সঙ্গে জুটে আমেরিকান টুরিষ্টরা অনেকে আমাদের ছবি নিল। লাল কাঁকরের পথের ধারে সবুজ ঘাসের কার্পেট, তার পাশে নানা রঙের ফুল বিরাট বাড়ীর পরিবেষ্টনীকে সুন্দর মনোরম করে তুলেছে। এমন ফুলের পাতার ও ঘাসের শ্রী দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। বাড়ীর ভিতরে রাখা ভারতের রোগ ও দারিদ্র্যের ছাবগুলির কথা মনে হলে মনটা যদিও খারাপ হয়ে যায়। বারো তলায় উঠে খোলা বারান্দায় ডাঃ ও মিসেস দাস আমাদের লঞ্চ খাওয়ালেন। লেকের ওপারে বরফের পাহাড় মঁ ব্লাঁ দেখা যাচ্ছিল। জলে সারাক্ষণ ষ্টিম বোট ছুটে বেড়াচ্ছে ভ্রমণকারীদের নিয়ে। মানুষের উৎপাতে বিস্তীর্ণ বারিধির স্থির সৌন্দর্য্য মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সচকিত হয়ে উঠছে।

খাওয়ার পর বনবাদাড় ভেঙে অর্থাৎ বাগানের অনাদৃত অংশের উপর দিয়ে দৌড়ে রাস্তায় বেরোলাম ট্রাম ধরবার জন্য। এদিকটা কি রকম জনহীন যত্নহীন মনে হ'ল। দাসরা যেখানে থাকেন সেখানটা কিন্তু আসল জেনিভার মতই মাজাঘসা, ইংলণ্ড এ রকম ঘসামাজা নয়, Paris ত কখনই নয়। তাদের ছোট্ট ফ্ল্যাট বা ঘরটি কোনো একজন বন্ধুর কাছে ধার করা। হাতে-আঁকা অনেক ছবি দিয়ে সুন্দর করে সাজানো। এখানে বসে অনেক গল্প হ'ল। কবে রবীন্দ্রনাথকে মিসেস দাস জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আন্তর্জ্জাতিক বিবাহ-বিষয়ে আপনার কি মত?" রবীন্দ্রনাথ রসিকতা করে জবাব দেন "আমি বাঙালী, বাঙালী মেয়েই আমার ভাল লাগে, তবে রাশিয়ান হলে আপত্তি করতাম না।" মিসেস দাস জাতিতে রাশিয়ান।

সারারাত বৃষ্টি হ'ল। তাতেও পথে জনস্রোতের বিরাম নেই। কাজের মূল্য এরা এত বোঝে যে জলঝড়কে গ্রাহ্যই করে না। পুরুষ মেয়ে সবাই বর্ষাতি নিয়ে চলেছে, কিন্তু মাথা প্রায় সকলেরই খালি। মেয়েরা ইউরোপে টুপি বোধ হয় আজকাল কেউ পরে না, ছেলেরাও অনেকেই খালি মাথায়। শীতে কি করে জানি না। আমেরিকায় ত শীতে সবাই মাথায় গরম বা রেশমের রুমাল বাঁধে। এবং প্রায় সকলেই গাড়ী করে বাড়ীর বাইরে যায়।

পরদিনই আমাদের ইটালী অভিমুখে যাত্রা করতে হ'ল। জেনিভা হ্রদের পাশ দিয়ে এসেছিলাম, আবার সেই হ্রদের পাশ দিয়েই ফিরলাম। মাঝে মাঝে ছোট ছোট দ্বীপ, তাতে নানা ধরণের ভারি সুন্দর সব বাগান। হ্রদের পর সুইস দেশের ঘন বন, কাঠের গুদাম ইত্যাদি। কাঠ এ দেশে অফুরন্ত বোধ হয় ফলও প্রচুর। বন কেটে কেটে পাহাড়ে থাকে থাকে ক্ষেত করছে, তাতে জল দিচ্ছে, গাড়ী থেকেই দেখা যায়। দুধের দেশ তাই বোধহয় গাড়ীতে ও ষ্টেশনে আইসক্রীম বিক্রী করে যাচ্ছে। ইটালীর হোটেলওয়ালারা ট্রেনেই তাদের বিজ্ঞাপন ঘোষণা করছে ঘণ্টা বাজিয়ে। যত ইটালীর কাছে আসছে তত ছোট ছোট নদীতে খড়ি গোলার মত জল। জলও কি শ্বেত পাথরের দেশে সাদা? ইটালীর সীমান্তে ষ্টেশনে মাথায় পালক গোঁজা টুপি করে তামাটে রঙের পুলিস বা সৈন্যদের দেখা গেল। ষ্টেশনের নাম প্রায় আকারান্ত, মনে হয় বাঙালী মেয়েদের নাম। Domodossela নামক একটা ষ্টেশনে যাত্রীরা ইটালীয় পয়সা জোগাড় করে খাবার কিনতে সুরু করল। ষ্টেশনে অনেক বেতের ধরণের বোনা টুপি ব্যাগ ইত্যাদি বিক্রী হচ্ছে, ফল খাবার ত হচ্ছেই। সুইস দেশের ঝকঝকে খেলনার মত সুন্দর বাড়ী আর দেখা যায় না। ক্রমে যে দরিদ্র দেশে আসছি তা ঘরবাড়ীর চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। এ দিকে পাথুরে পাহাড় বেশী, দাঁতের মত বহু চূড়া, মানুষ কেটে কেটে করেছে কি স্বাভাবিক জানি না। সেই সব পাহাড়ের থেকেই বোধহয় স্লেট ধরণের পাথর কেটে টালির মত করে জীর্ণ ঘরগুলি ছেয়েছে, বারাণ্ডায় ময়লা তোষক শুকোচ্ছে, স্বল্পজল চওড়া নদীতে নেমে মেয়েরা কাপড় কাচছে অনেকে স্নান করছে। বাড়ীতে বসে প্রচুর জল বোধহয় দরিদ্ররা পায় না।

মিলানে পৌঁছতে রাত হয়ে গেল। শহরটা কেমন যেন কলকাতার মত দেখতে। কোন কোন অংশে আমেরিকান ধরণের বারো-চৌদ্দতলা বাড়ীও রয়েছে। সেগুলি আধুনিক এবং সম্ভবতঃ আমেরিকান মূলধনেই তৈরি। ইটালিয়ানরা টাকার সন্ধানে আমেরিকায় খুব যায়, অনেক টাকা আসেও ইটালীতে। অনেক ইটালীয়ান আমেরিকার বাসিন্দা হয়ে সেখানেই থেকে যায়। আমরা যখন ইটালী ছেড়ে আমেরিকার পথে পাড়ি দিলাম তখন আমাদের সঙ্গে অনেক ইটালীয়ানও সেই জাহাজে উঠল।

রাত্রে হোটেল রেজিনাতে উঠলাম। তারই নীচের তলায় খাবার ঘর আছে। আলাদা টাকা দিয়ে খেতে হয়। খাদ্য বেশ ভাল। পরিবেষকরা নিমন্ত্রণবাড়ীর মত করে সেধেসেধে খাবার পাতে দিয়ে দিচ্ছিল। হোটেলের কর্মী এবং পথে-ঘাটে সাধারণ লোকেরা অনেকেই দেখতে খুব ভাল। আমাদের দেশের লোকের সঙ্গে একটা সাদৃশ্য আছে। ইউরোপের অন্যান্য দেশের বিশেষ ফরাসী দেশের লোকেদের মুখে যে একটা তীক্ষ্ণ ভাব আছে এদের সেটা কম। অনেকেরই নিখুঁত কাটা-ছাঁটা মুখ, কিন্তু বেশ একটা নরম স্নিগ্ধ ভাব। আমাদের দেশে যাদের আমরা সুপুরুষ বলি এমন অনেককে মনে পড়ে যায়। তবে একদল ইটালীয়ান আছে অতি খর্ব্বকায় এবং গোল গোল মুখ, মনে হয় অন্য জাত।

সময় বেশী নেই, কাজেই খাওয়ার পর রাত্রেই কাছাকাছি বেড়াতে বেরোলাম। এখানের জগদ্বিখ্যাত গির্জ্জা Duomo Cathedral হোটেলের কাছেই। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে সেটি দেখার সৌভাগ্য হ'ল। অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্যসমম্বিত শ্বেত পাথরের গির্জ্জা, কিন্তু দেখলে মনে হয় হাতীর দাঁতে খোদাই। শিল্পী যেন উর্দ্ধমুখী শত শত চূড়ায় চূড়ায় দেবতার স্তব গেয়েছেন। গেটে তাই বুঝি বলেছিলেন "পাষাণীভূত সঙ্গীত।" এত বছরের ঝড়ে জলে শ্বেত পাথরের গায়ে কালো কালো দাগ ধরে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। ব্রোঞ্জের দরজায় এবং রঙীন কাচের জানালায় যীশু খ্রীষ্টের জীবনের নানা ঘটনার ছবি আঁকা। আমরা পরদিন সকালে সেগুলি আরও ভাল করে দেখলাম। প্রাচীন ও নূতন বাইবেলের বহু ছবি।

এ দেশের লোকেদের বিদেশীদের সম্বন্ধে অদম্য কৌতূহল। গির্জ্জার চত্বরে আমাদের দেখেই একদল ছেলে বুড়োবুড়ী আমাদের পিছনে যেন মিছিল করে এসে জুটে গেল। কত তাদের প্রশ্ন! "কে মা, কে বাবা?" 'কোনটি ছোট, কোনটি বড়?' 'কেন এসেছ? কোথায় যাবে? কি করবে?' প্রশ্নের আর শেষ নেই। জন দুই তিন ত সঙ্গ ছাড়েই না। "চল, তোমাদের শহর দেখিয়ে আনি," বলে জোঁকের মত পিছনে লেগে রইল। ইটালীয় জীবন যাত্রার অনেকটা দেখা যায় The Arcade-এর ভিতর ঢুকলে। ঢাকা বাজারের মত জায়গা, আমরা গির্জ্জা থেকে সেখানে এলাম। বিরাট দালানে নানা দিকে পথ চলে গিয়েছে, কোথাও জিনিষ বিক্রী হচ্ছে, কোথাও সুমিষ্ট কণ্ঠে একটি গায়িকা আসর জমিয়ে গান গাইছে, বহুলোক ভিড় করে গান শুনছে, সঙ্গে বেহালা এবং পিয়ানোও বাজছে। এই গানের আসর বিনা পয়সার আসর, যার খুসী আসছে শুনছে। মেয়েটির গলা চমৎকার।

এ দেশের রেশম, রূপার গহনা, চামড়ার কাজ দেখবার মত। আমরা একটা দোকানে সাড়ীর কাপড় কিনতে গেলাম। কিন্তু সাড়ীর বহর পাওয়া শক্ত। অনেক কষ্টে একটি পেলাম, তার দাম ৮৮৭০ লিরা। এক পাউণ্ডে সচরাচর ১৭০০ লিরা দেয়, তার মানে শাড়ীর দাম পাঁচ পাউণ্ডের বেশী।

শিল্পীগুরু লিওনার্ডোর ছবি ও নক্সার পাণ্ডুলিপি একটি মিউজিয়মে আছে। দর্শনী দিয়ে সেখানে সব দেখতে হয়। লিওনার্ডো যে শুধু শিল্পী ছিলেন না, যন্ত্রপাতি এবং বায়ুযান ইত্যাদির সৃষ্টির কল্পনাও তাঁর ছিল তা এই নক্সাগুলি দেখলে বোঝা যায়।

এই শিল্পীর সুবিখ্যাত Last Supper ছবিটি একটি গির্জ্জার দেয়ালে আঁকা হয়। ৫০০ বছরের পুরানো গির্জ্জা, এখন প্রায় ভেঙে পড়েছে। ছবিটি ম্লান অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে অনেক জায়গায় রেখাও ধুয়ে গিয়েছে। সুখের বিষয় এর বহু সুস্পষ্ট প্রতিলিপি বহু দেশের মিউজিয়মে আছে। কিন্তু পুরাতন আদি ছবির ফোটো তুলতে দলে দলে লোক ভাঙা গির্জ্জায় ক্যামেরা নিয়ে এসে জুটছে। এই গির্জ্জার নাম বোধহয় St. maria della Grazie। গির্জ্জাটির এমন অবস্থাতেও কেন মেরামত করা হয় নি বুঝলাম না। ইটালীর অর্থাভাব?

মিলানে গাইডরা আমাদের বড় লোকদের সমাধি-ভূমি দেখাতে নিয়ে গেল। সেখানে বিরাট সব স্মৃতিসৌধ গড়ে মানুষ প্রিয়জনের প্রতি ভালবাসা জানাতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু দেখে কিছু ভাল লাগল না।

৩৮৬ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত Basilica of St Ambroze গির্জ্জা এখানের একটি দ্রষ্টব্য স্থান। গির্জ্জায় খ্রীষ্টপূর্ব্ব যুগের কিছু কিছু চিহ্ন আছে। স্বস্তিকা সর্পদেবতা প্রভৃতির খোদাই। বোধহয় এই গির্জ্জাতেই মেয়েদের ছোট হাতের জামা পরে ঢোকা বারণ। তাই টুরিষ্ট মেয়েরা কার্ডিগান ইত্যাদি যা হাতের কাছে ছিল পরে তবে ভিতরে ঢুকলেন। আমরা সাড়ীগুলি ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিলাম যেন হাত না দেখা যায়।

রুড়কী প্রসঙ্গ

শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার
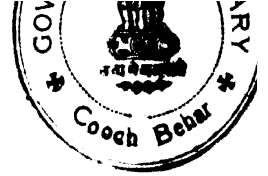
বহু বৎসর পূর্ব্বে যখন সরকারী কর্ম্ম উপলক্ষ্যে শিমলা শৈল হইতে কলিকাতা প্রত্যেক বৎসর যাতায়াত করিতে হইত তখন দুই-এক বার রুড়কীর পথ দিয়া যাইতে হইয়াছে। সেইসময়ে রুড়কী ষ্টেশনের অনতিদূরেই প্রবহমান সুবিস্তৃত গঙ্গার খালটি নয়নগোচর হইলে রুড়কী সহরে নামিয়া উহা একবার ভাল করিয়া দেখিবার ইচ্ছা মনে জাগিত। ভারত-বিখ্যাত রুড়কী ইঞ্জিনীয়ারীং কলেজটি দেখিবারও সুযোগ মিলিবে একথাও মনে হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমার অভিলাষটি সেইসময়ে সার্থক হইয়া উঠে নাই।

কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর কয়েক বৎসর হইল দিল্লীতে অবস্থান করিতেছি। রুড়কী এই স্থান হইতে বেশী দূরে নহে। কিছুকাল পূর্ব্বে আমার রুড়কী দেখিবার সুযোগ উপস্থিত হয় ও বহুদিনের অপূর্ণ বাসনা এতদিন পরে সার্থকতা লাভ করিবে এই আশায় মন রুড়কী যাইবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠে।

দিল্লী হইতে রুড়কীতে বাস অথবা ট্রেনে যাওয়া চলে। রেল-পথের তুলনায় বাসে পথের দূরত্ব প্রায় একত্রিশ মাইল কম পড়ে এবং সময়ও অল্প লাগে। গত এপ্রিল মাসের শেষে একদিন প্রাতে সপরিবারে দেরাদুন এক্সপ্রেসে দিল্লী যাত্রা করিয়া সেইদিনই অপরাহ্ণে বেলা আড়াইটার সময় রুড়কী পৌঁছাই। যে কামরাটিতে আমরা উঠিয়া ছিলাম তাহাতে বিশেষ ভীড় ছিল না। সহযাত্রী-রূপে একজন শিক্ষিত গৈরীকবস্ত্রধারী মধ্যবয়স্ক সাধুকে দেখা গেল। সম্ভবতঃ তিনি হরিদ্বারযাত্রী। কয়েকটি ভক্ত দিল্লী ষ্টেশনে আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। ভক্তি-ভাজন সাধুটির যাহাতে কোনরূপ কষ্ট না হয় সেজন্য প্রথম শ্রেণীতে তাঁহার যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন মনে হইল।

চারিখানা টাঙায় সঙ্গের দ্রব্যাদি তুলিয়া লইয়া আমরা ষ্টেশন ত্যাগ করিয়া ষ্টেশন রোড ধরিলাম। অল্প দূরেই ঈপ্সিত গঙ্গার খালটি নয়নগোচর হইল। উহার উপর যে সেতুটি ছিল তাহা অতিক্রম করিয়া আমরা মীরাট-রুড়কী রোডে আসিয়া পড়িলাম। ইহা সেনানিবাসের (ক্যান্টনমেণ্ট) মধ্য দিয়া গিয়াছে। ইহার কিছু পরেই সিভিল লাইন্সের চ্যাটারটন্ ষ্ট্রীটস্থ বাসায় আসিয়া পৌঁছিলাম। দ্বিতল বাসাটি বেশ নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত। কিছু দূরেই স্থানীয় "কাচারী" (কোর্ট)।

কলকোলাহলময় ও কর্ম্মব্যস্ত দিল্লী মহানগরী ত্যাগ করিয়া পরিস্কার, পরিচ্ছন্ন, পুষ্পোদ্যান শোভিত এই ছোট সহরটি তাহার মাধুর্য্যে আমাদের মন অচিরেই অধিকার করিয়া বসিল। সুপরি-কল্পিত, সুদূরপ্রসারী, ঋজু, প্রশস্ত, পথিকবিরল, ছায়া সুশীতল পথগুলির দুই ধারে সযত্ন-রোপিত শ্রেণীবদ্ধ সুবৃহৎ শাল, সেগুন, শিশু, ইউক্যালিপটস, বট ও অশ্বত্থ প্রভৃতি গগনস্পর্শী বনস্পতি-গুলি নগরের সৌন্দর্য্য যেন বহুগুণে বাড়াইয়া তুলিয়াছে। বাস্তবিক,
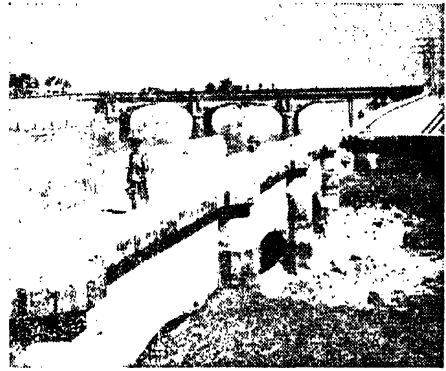
রুড়কী সহরে যাইবার পুল (বামে সহর)

ফলবান বৃক্ষের এরূপ বিচিত্র সমাবেশ ইতিপূর্ব্বে অন্য কোন সহরে চোখে পড়ে নাই। বিভিন্নজাতীয় আমগাছে ফলের প্রাচুর্য্য চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করিয়া উঠা কঠিন। লিচু, জাম, কাঁঠাল প্রভৃতি অন্যান্য বহুসংখ্যক ফলের গাছ এবং বকুল, শিরীষ, নানা-প্রকার চাঁপা ও বিচিত্রতর ফুলের গাছ দেখিয়া মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল। যে অঞ্চলে আসিয়া উঠিয়াছি তাহার নিকটবর্ত্তী বাড়ীগুলি ঘন সন্নিবিষ্ট নহে। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর সহিত সুপ্রশস্ত কম্পাউণ্ড বর্ত্তমান এবং ফুল ও ফলের গাছে তাহারা সমৃদ্ধ।

সুপ্রশস্ত খালটির পশ্চিম দিকে সহর। উহা সিভিল লাইন্স কোর্ট হইতে প্রায় এক মাইল দূরে। সহর ও সিভিল লাইন্স দ্বিধাবিভক্ত করিয়া খালটি প্রবহমান। সিভিল লাইন্স, রুড়কী বিশ্ববিদ্যালয় ও সেনানিবাস ইহার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। সহরের সহিত যোগাযোগ রাখিবার উদ্দেশ্যে দুইটি পাকা সেতু বর্ত্তমান। কিছু দূরে রেলওয়ে সেতুটিও চোখে পড়ে। আসল সহরটি কিন্তু বিশেষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নহে। উত্তরপ্রদেশের সহরগুলির সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহাদের কাছে ইহা নূতন কিছু বলিয়া ঠেকিবে না। সিভিল লাইন্স ও সন্নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের

সহিত তুলনা করিলে সহরের এই অবস্থা মনকে পীড়িত করিয়া তোলে।

সিচাই অনুসন্ধান সংস্থা

বাসা হইতে খালটি খুব নিকট বলিয়া রুড়কী পৌঁছিবার পর-দিনই খুব ভোরে উঠিয়া উহা দেখিতে যাই। পথে 'মহিলা আর্টস কলেজ' ভবনটি পড়িল। ইহা চ্যাটারটন্‌ ষ্ট্রীট ও মীরাট-রুড়কী রোডের সংযোগস্থলে অবস্থিত। শেষোক্ত রাস্তাটি অতিক্রম করিবার পর সুদৃশ্য "ইউনিভার্সিটি গেষ্ট হাউস।" খালের নিকটবর্ত্তী হইলে উহার বিস্তার ও গভীরতা দেখিয়া এবং বহু-দিনের আশা পূর্ণ হওয়ায় মন পরিতৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। এক-শত বৎসরেরও অধিক পুরাতন এই সুবিখ্যাত খালটির একটি চিত্তাকর্ষক ইতিহাস আছে। তাহার উল্লেখ যথাস্থানে করিব।

খালটির পূর্ব্বতীর ঘেঁষিয়া "কেন্যাল ব্যাঙ্ক রোড" নামক নির্জ্জন পথটি, সহরে যাইবার জন্য উত্তর দিকে যে সেতুটি আছে তথায় গিয়া মিলিয়াছে। এই রাস্তাটির উপরে উত্তরপ্রদেশের সেচ-বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের বাসের নিমিত্ত মনোহর উদ্যান-সমন্বিত ছয়টি বাংলো অবস্থিত। উহার মধ্যে একটির প্রবেশ-দ্বারে শ্রীঅমিয়প্রকাশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নাম দেখিলাম। পরে পরিচয় হইলে জানিতে পারি যে, তিনি প্রাদেশিক সেচ-বিভাগের পরিসংখ্যারক (Statistical Officer)। বাংলোগুলি ছাড়িয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলে খালের পশ্চিমতীরে প্রাদেশিক "সিঁচাই অনুসন্ধান সংস্থা"র (Irrigation Research Institute) নবনির্ম্মিত বৃহৎ ভবনটি চোখে পড়িল। ইহার সম্মুখে খালের দুইটি তীর একটি দৃঢ় লৌহ-তারের (Cable) দ্বারা আবদ্ধ। ক্ষুদ্র কপিকলযোগে ইহার সাহায্যে নৌকা সহজেই পারাপার করিবার ব্যবস্থা আছে।

কিছু দূরেই স্থানীয় "সূচনাকেন্দ্র" (পৌর ভবন) ও সাধারণের জন্য "বাচনালয়" (পুস্তকাগার)। ইহার পশ্চাতেই "গান্ধী বাটিকা" নামক এক ক্ষুদ্র উদ্যান। ইহার মধ্যস্থলে সুউচ্চ কয়েকটি লৌহস্তম্ভের উপর গোলাকার এক সুবৃহৎ জলাধার। নলকূপের সাহায্যে জল সংগৃহীত হইয়া ইহাতে সঞ্চয় করা হইয়া থাকে এবং সমগ্র সহরে তাহা সরবরাহ করা হয়।

শীঘ্র দিল্লী ফিরিয়া যাইবার তাড়া ছিল না বলিয়া ইহার কয়েক দিন পরে সুযোগ মত একদিন প্রাতে রুড়কী বিশ্ববিদ্যালয়টি দেখিতে যাই। বাটীর বাহির হইয়া দেখি, পথে লোক চলাচল আরম্ভ হয় নাই, পথের দুই দিকের বাগানগুলি পরিচিত ও অপরিচিত নানা বিহঙ্গের কলকাকলিতে পূর্ণ। বাংলা দেশের পল্লীগ্রামের কথা স্মরণ করাইয়া দিল। চ্যাটারটন্‌ ষ্ট্রীটটি পূর্ব্ব দিকে গিয়া যেখানে শেষ হইয়াছে উহারই বাম দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ও দক্ষিণ দিকে সেনানিবাসের সীমানা আরম্ভ হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানায় পা দিয়াই প্রথমে বামদিকে কয়েকটি সুরম্য দ্বিতল হোষ্টেল দৃষ্টিগোচর হইল। এই হোষ্টেলগুলিতে ছাত্র ও কলেজের কর্ম্ম-চারীরা কেহ কেহ থাকেন।

হোষ্টেলের কম্পাউণ্ডে সারিবদ্ধ কয়েকটি সুউচ্চ পাহাড়ী 'চীড়' (Pinus Longifolia) গাছ বর্ত্তমান। ইহারই নিম্নে অথবা হোষ্টেলের বারান্দায় ছাত্রদের মশারি টাঙ্গাইয়া খাটে শুইয়া থাকিতে দেখিলাম। রুড়কীতে মশার বেশ উপদ্রব আছে।

এখানে রাস্তার দুই পার্শ্বে ফুটপাথ বলিয়া কিছু নাই, কিন্তু দুই পার্শ্ব সযত্ন-রক্ষিত ঘন তৃণাচ্ছন্ন হওয়ায় উহা ফুটপাথের কাজ করে ও চলিতে কোনও কষ্ট হয় না, বরং চলিতে বেশ ভালই লাগে। ফুট-পাথের যে বিশেষ কোনও প্রয়োজন আছে তাহাও মনে হইল না যেহেতু মোটর, বাস প্রভৃতির চলাচল খুবই কম। বড় বড় সহরে পথে হাঁটিবার সময় যেমন ক্ষণে ক্ষণে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিতে হয়, এখানে তাহার সম্পূর্ণ অভাব।

হোষ্টেলগুলি (প্রায় ৬০।৭০টি হইবে) অতিক্রম করিয়া আম্রোদ্যান-শোভিত কয়েকটি সুদৃশ্য বাংলো বর্ত্তমান এবং উহা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপকদিগের বাসভবন বলিয়া বোধ হইল। ইহারই বাগানের এক কোণে সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলে শোভিত একটি অশোক গাছ দেখিলাম। তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই। বহু বৎসর পরে অশোক গাছ দেখিয়া কবির বর্ণনাটি মনে পড়িয়া গেল—

"অশোক রোমাঞ্চিত মঞ্জরিয়া
দিল তার সঞ্চয় অঞ্জলিয়া
মধুকর গুঞ্জিত
কিশলয় পুঞ্জিত
উঠিল বনাঞ্চল চঞ্চলিয়া"

নিকটেই আর একটি গাছ চোখে পড়িল। অজস্র পীতবর্ণের ফুলে গাছের পাতাগুলি একেবারে অদৃশ্য হইয়াছে এবং পুষ্পগুলির সুগন্ধে চারিদিকের বাতাস সৌরভ মন্থর হইয়া উঠিয়াছে। বাল্যকালে দৃষ্ট গাছটির নাম কিছুতেই মনে আসিতে ছিল না, অদূরেই একটি জমাদার রাস্তা ঝাঁট দিতেছিল, সে বলিয়া দিল যে, গাছটি 'অমলতাস'। মনে পড়িয়া গেল ইহাকে আমরা সোঁদাল

বলিয়া থাকি। সংস্কৃত-সাহিত্যে কর্ণিকারের উল্লেখ প্রায় দেখা যায়। কিন্তু আমাদের কাব্য-সাহিত্যে এই পুষ্পটি একরূপ উপেক্ষিতা হইয়াই আছে। সুকবি সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার 'ফুলের ফসলে" ইহার উল্লেখ করিয়াছেন কিনা ঠিক মনে পড়িতেছে না।

ক্রমশঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটবর্ত্তী হইলে চতুষ্পার্শ্বস্থ রাস্তাগুলিতে পীচের পরিবর্ত্তে 'সিমেন্ট কংক্রিট' ব্যবহৃত হইয়াছে দেখিলাম। রাস্তাগুলি ধূলিশূন্য ও পরিষ্কার। অনতিদূরেই সুউচ্চ চূড়াসমন্বিত বৃহদায়তন কলেজ ভবনটি লক্ষিত হইল। প্রবেশপথ অতিক্রম করিয়া উদ্যানের সম্মুখবর্ত্তী হইলাম। মনোরম সুবৃহৎ উদ্যানটি স্তর-বিন্যস্ত (Terrace Garden)। লাহোরের শালিমার উদ্যানের কথা মনে করাইয়া দিল। তখন গ্রীষ্মকাল। চতুর্দ্দিকে তৃণাচ্ছন্ন ভূমি বিবর্ণ ও ধূসরভস্ম ধারণ করিয়াছে, কিন্তু উদ্যানে প্রবেশ করিয়াই মাতা ধরিত্রীর নয়নাভিরাম শ্যামসমারোহ দেখিয়া মন মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিল না। এই উদ্যানটি রক্ষা করিতে বহুসংখ্যক মালী নিযুক্ত আছে দেখিলাম। উদ্যানটিতে কয়েকটি আম, বেল ও খেজুর গাছও বর্ত্তমান। ইহারই এক প্রান্তে নবনির্ম্মিত সন্তরণাগার (Swimming Pool)। প্রবেশদ্বারে অধ্যাপক ও ছাত্রেরা ইহা নির্ম্মাণ করিতে যে 'শ্রমদান' করিয়াছেন তাহার বিশেষ উল্লেখ আছে দেখিলাম।

রুড়কী সহরটি সর্ব্বত্র সমতল নহে। পর্ব্বতসান্নিধ্যই বোধ করি ইহার কারণ। বিদ্যালয়টি দেখিলাম সহরের সর্ব্বোচ্চ স্থানটিতে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই স্থান হইতে হিমালয়ের তিনটি পর্ব্বতমালা (শিবালিক শ্রেণী) স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, সর্ব্বশেষটি তুষারমৌলী। কলেজটি বন্ধ ছিল বলিয়া দেখিবার সুযোগ হইল না। প্রবেশ দ্বারটি সামান্যমাত্র উন্মুক্ত ছিল। তাহারই অন্তরালে একটি আবক্ষ প্রস্তরমূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইল। মনে হইল উহা হয়ত তদানীন্তন লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর টম্যাসন সাহেবের হইবে—যাঁহার নামে এই কলেজটি পরিচিত। কলেজের দক্ষিণ দিকে বৃহদায়তন "ইলেকট্রীকাল ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাবরেটারী (Electrical Engineering Laboratory)। ইহারই সান্নিধ্যে "শতাব্দী স্মারক পুস্তকাল"য়ের কার্য্য সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে দেখিলাম, মনে হয় অর্থাভাবে কার্য্যটিতে এতদিন হাত দেওয়া সম্ভব হয় নাই। কলেজের কারখানাটি অল্প দূরে।

কলেজের পূর্ব্বদিকে একটি বৃহৎ বাংলো। ইহা (Vice-Chancellor) বাসস্থান বলিয়া পরিচিত। বর্ত্তমানে Vice-chancellor Dr. A. N. Khosla ইহাতে বাস করেন। ভবনটির সম্মুখে প্রাচীন জটাজুট সমন্বিত একটি সুবিশাল বটবৃক্ষ। মনে হইল রুড়কী কলেজ স্থাপিত হইবার সময়ে ইহা রোপণ করা হইয়া থাকিবে। অদূরেই শতাধিক বিঘা ব্যাপিয়া সুবিশাল ক্রীড়াভূমি—উহারই শেষপ্রান্তে ওভারসিয়ার শ্রেণীর ছাত্রদের সুবৃহৎ দুইটি হোষ্টেল। বহু দূর হইতে ইহার লাল রং পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে।

ইউনিভার্সিটি দেখা শেষ হইলে পূর্ব্বদিকের রাস্তা ধরিয়া নবপ্রতিষ্ঠিত "কেন্দ্রীয় ভবন নিরীক্ষণ সংস্থা"র সম্মুখে আসিয়া পড়িলাম। বহু ব্যয়ে এই প্রতিষ্ঠানটি কিছুকাল পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে এবং এখানে নানাবিধ গবেষণা-কার্য্য চলিতেছে। ইহার বর্ত্তমান

রুড়কী বিশ্ববিদ্যালয় ভবন
(সম্মুখে স্তর বিন্যস্ত উদ্যান)

Director, Lieut. General Sir Harold Williams। বিশেষজ্ঞ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে। কয়েকজন বাঙালী বৈজ্ঞানিক-গবেষক এই সংস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট। এই Institute-এর অনতিদূরেই Afro-Asian Hostel। দুই মহাদেশের ছাত্রেরা রুড়কী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করিয়া এখানে বাস করিয়া থাকেন।

প্রত্যাবর্ত্তনের পথে একটি দীর্ঘচ্ছন্দঃ বৃদ্ধ বাঙালী ভদ্রলোকের সহিত হঠাৎ দেখা হইল। পথ চলিতে লক্ষ্য করিতেছিলাম তিনি কিছুদূর অগ্রসর হইয়া পুনরায় আমার দিকে ফিরিয়া আসিলেন এবং সম্ভবতঃ আমাকে এই সহরে নবাগত দেখিয়া, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার এই সহৃদয় ভাবটি আমার অন্তর স্পর্শ করিল। কথাবার্ত্তায় জানিতে পারিলাম ইনি রুড়কী বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব্বতন রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র পাল মহাশয়। আমার বাসার খুব নিকটেই সস্ত্রীক থাকেন। কিছুদিন হইল কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু রুড়কী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে Board of Engineering Education এর সম্পাদকপদে নিয়োগ করাতে আরও দুই বৎসর এখানে থাকিতে হইবে যদিও তিনি দেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য সমুৎসুক। রুড়কী আসিবার পূর্ব্বে পাল মহাশয় ঢাকা কলেজে আইনের অধ্যাপক ছিলেন। পরে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিষ্ট্রারের পদে অধিষ্ঠিত হন। বঙ্গবিভাগের পর তাঁহাকে ঢাকা ত্যাগ করিয়া আসিতে হয় এবং দিল্লীর Central College of Agriculture-তে যোগদান

করেন। রুড়কী কলেজটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হইবার পর উঁহার রেজিষ্ট্রার পদে নিযুক্ত হইয়া এখানে আসেন। পথে চলিতে দেখিলাম তিনি এখানে অনেকের নিকটই সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র।

একদিন প্রাতঃভ্রমণ শেষ হইলে পাল মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার বাটী গিয়া পুরাতন রুড়কী কলেজ ও গঙ্গার বিখ্যাত খালটি
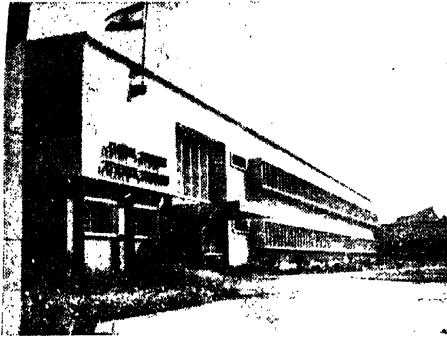
কেন্দ্রীয় ভবন নিরীক্ষণ সংস্থা

সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিলাম। পাল মহাশয়ের বাটীটি দেখিলাম বৃহদায়তন। কক্ষগুলির উচ্চতা কুড়ি ফুট। গ্রীষ্মতাপ নিবারণের জন্য এইরূপ উচ্চতা রাখিতে হইয়াছে শুনিলাম। সেনা-নিবাসের কম্যাণ্ড্যাণ্ট এই বাটীতে পূর্ব্বে বাস করিতেন জানিতে পারিলাম। ইহার পুষ্পোদ্যান সমন্বিত মনোরম বৃহৎ কম্পাউণ্ড দেখিলে আনন্দ হয়।

পাল মহাশয়ের নিকট জানিতে পারিলাম যে গঙ্গার খালটি তৈয়ারী করিবার সময়েই সুশিক্ষিত ইঞ্জিনীয়ারের অভাব অনুভূত হয় এবং তাহাই দূর করিবার নিমিত্ত ইঞ্জিনীয়ারীং কলেজটি ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়; যদিও কলেজটি স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে একটি ইনজিনীয়ারীং কলেজ স্থাপনার প্রস্তাব ভারত সরকারের বিবেচনাধীন ছিল কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। কলেজটি স্থাপিত হইবার তিনবৎসর পূর্ব্বে Lieut. Baird Smith কয়েকটি ভারতবর্ষীয় ছাত্র লইয়া একটি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলেন। পরে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড হার্ডিংজের বিশেষ উদ্যোগে এই প্রতিষ্ঠানটিই কলেজে রূপান্তরিত হয় এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের (বর্ত্তমান উত্তর প্রদেশ) লেফটেন্যান্ট গভর্ণরের নামে ইহা 'টম্যাসন কলেজ অফ সিভিল ইনজিনীয়ারীং' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। Lieut. R. Maclagan ইহার সর্ব্ব প্রথম প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হন। ইংরেজ এবং ভারতবর্ষীয় ছাত্রদের একত্র শিক্ষা দেওয়া হইত এবং ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থায়ই বলবৎ ছিল। অতঃপর ইংলণ্ডের কুপার্স হিল কলেজ হইতে ইংরেজ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবার নূতন ব্যবস্থা হওয়ায় কেবলমাত্র ভারতবর্ষীয় ছাত্রেরা এখানে শিক্ষা লাভ করিয়া আসিতেছে। বিদ্যালয়টি স্থাপিত হইবার পর ছাত্রদের নিকট বেতন লওয়া হইত না, অধিকন্তু প্রত্যেক ছাত্রই বৃত্তির অধিকারী হইত। ১৮৯৬ সনে এই ব্যবস্থা রদ করা হয়। তবে শিক্ষার্থী (apprentice) এবং সৈনিকদের পক্ষে পূর্ব্ব ব্যবস্থাই বহাল থাকে। দেড় লক্ষের অধিক টাকা ব্যয়ে এই কলেজ ভবনটি নির্ম্মিত হয়। বিদ্যালয়ে পূর্ব্বে প্রত্যেক বৎসর এক শত করিয়া ছাত্র ভর্ত্তি করা হইত। ১৯৪৯ সনে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবার পর সম্প্রতি নূতন নিয়মে ৩০০ করিয়া ছাত্র ভর্ত্তি করা হইবে শুনা যাইতেছে।

রুড়কী কলেজ হইতে কয়েকটি বাঙালী কৃতবিদ্য ছাত্র তাঁহাদের বিদ্যাবত্তার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পাল মহাশয়ের নিকট শুনিলাম উত্তরপ্রদেশের বর্ত্তমান সেচ-বিভাগের চীফ ইনজিনীয়ার শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র মিত্র—ইনি পূর্ত্তবিদ্যাবিশারদ এবং কার্য্যকুশল বলিয়া তাঁহার বিশেষ খ্যাতি আছে। বর্ত্তমানে দুই জন Lecturer নিযুক্ত আছেন—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনারায়ণ রায় ও শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে, ইহার সর্ব্ব প্রথম Pro-Vice Chancellor নৃপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় নির্ব্বাচিত হইয়া প্রবাসী বাঙালীদের মুখোজ্জ্বল করেন।

রুড়কী শহরটি সোলানি নদীর তীরে উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত। রুড়কী নামক একটি পরগণার কথা আইন-ই-আকবরিতে উল্লিখিত আছে বটে কিন্তু ইংরেজ অধিকারের পর, এমনকি ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে যখন গঙ্গার প্রসিদ্ধ খালটির কার্য্য আরম্ভ করা হয় তখন ইহা সামান্য মাত্র একটি গ্রাম ছিল। পরবর্ত্তীকালে ইহার যথেষ্ট উন্নতি হয়। সুবিন্যস্ত বাটী এবং সুপরিকল্পিত, প্রশস্ত ও ঋজু পাকা রাস্তাগুলি ইহার বৈশিষ্ট্য।

রুড়কী নামের উৎপত্তি লইয়া দুইটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। এক পক্ষের মত যে, একটি রাজপুত সর্দ্দারের স্ত্রীর নামে এই শহরের পত্তন হয়। স্ত্রীর নাম ছিল 'রুড়ী'। অপর পক্ষের মত হইল যে, গঙ্গার বৃহৎ খালটি কাটিবার সময় এত 'রোড়া' (প্রস্তর খণ্ড) বাহির হয় যে ঐ প্রস্তরগুলি দিয়াই বর্ত্তমান রুড়কী শহরটি গড়িয়া উঠিয়াছে। শেষোক্ত মতটি কত দূর যুক্তিসঙ্গত তাহা বলা যায় না। তবে শহরের চারিদিকে এমনকি খাল ও অন্যান্য রাস্তার পার্শ্বে এখনও স্তূপীকৃত শ্বেত ও ধূসর বর্ণের, বৃহৎ হইতে ক্ষুদ্র আকারের, প্রস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক প্রস্তর খণ্ডই মসৃণ ও ডিম্বাকার। রাস্তা প্রস্তুত করিবার সময় এই প্রস্তর বহুলরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে দেখিলাম। মনে হইল, কেহ কেহ গৃহ নির্ম্মাণ কালেও ইহা কাজে লাগাইয়া থাকেন।

রুড়কী মিউনিসিপ্যালিটি ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সৃষ্ট হয়। আয়ের অধিকাংশ 'চুঙ্গী' (octroi) হইতে আদায় হয়। ইহা সাহারাণপুর জেলার একটি সাব-ডিবিসন। লোকসংখ্যা প্রায় ত্রিশ হাজার হইবে। কয়েকটি স্কুল ও কলেজ আছে। বর্ত্তমানে আনুমানিক চল্লিশটি বাঙালী পরিবার এই শহরের অধিবাসী। বিদ্যালয়সমূহে বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীদের নিজ ভাষা শিক্ষা করিবার কোনও ব্যবস্থা

নাই—যেমন দিল্লীতে আছে। এখানে প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের অভাব দেখিলাম। কয়েক বৎসর হইতে কয়েকজনের সহিত সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। এখানে একটি যে সেনানিবাস আছে তাহার উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি। ১৮৫৩ সনে ইহার পত্তন হয়। সেই সময়ে ইহা 'Bengal Sappers and miners' সৈন্যদলের মুখ্যস্থান (Head quarters) নির্ব্বাচিত হয়।
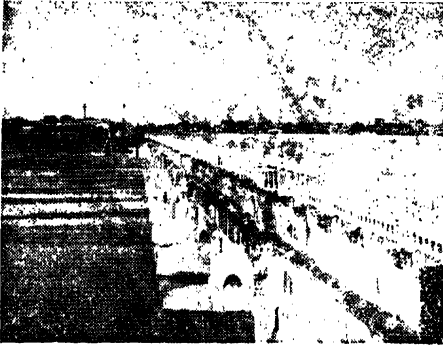
গঙ্গার জলসেতু—নীচে সোলানি নদী—বামে কারখানা

রুড়কী বাসকালে কয়েকটি স্থানীয় ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় ঘটে। তন্মধ্যে বৃদ্ধ ভাটিয়া মহাশয়ের কথা সর্ব্বাগ্রে মনে পড়িতেছে। এই মানুষটির সহিত পরিচয় হইয়া তাঁহার সরলতা ও ধর্ম্মপ্রবণতা দেখিয়া মুগ্ধ হই। গত ১৯৩৫ সনে কোয়েটায় যে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয় সেই সময়ে তাঁহাকে একটি পুত্র ব্যতীত স্ত্রী ও অন্যান্য সন্তান-দিগকে হারাইতে হয়। তিনি তখন নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়েতে কর্ম্ম করিতেন। তৎপরে ভগ্নহৃদয়ে ও ভগ্ন শরীরে কয়েক বৎসর কাজ করিয়া কিছুকাল হইল কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া এই শহরে আসিয়া বাস করিতেছেন। পাকিস্থানে পৈতৃক বাসভবন রহিয়া গিয়াছে। আমার নিকট প্রায়ই আসিয়া নানাবিধ বিষয়ে, বিশেষতঃ বৈদিক আর্য্যধর্ম্ম ও সভ্যতা সম্বন্ধে, আলোচনা করিতেন। দেখিলাম প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শাস্ত্রগুলির সহিত বেশ পরিচয় আছে। আমাকে তাঁহার বাগানের আম ও লিচু স্বহস্তে আনিয়া উপহার দিয়া যাইতেন। একদিন তাঁহার বাটী যাইলে তাঁহার প্রতিবেশী রায়সাহেব লালতা প্রসাদের 'গঙ্গা-ভবন' বাটীতে আমাকে লইয়া গিয়া তাঁহার সহিত আলাপ-পরিচয় করাইয়া দেন। লালতা প্রসাদজী নির্ম্মলচন্দ্র পাল মহাশয়ের অগ্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিষ্ট্রার পদে নিযুক্ত ছিলেন। কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে মনোনিবেশ করেন ও বর্ত্তমানে নানাবিধ ভেষজাদি প্রস্তুত করিয়া বিনামূল্যে সকলকেই বিতরণ করিয়া থাকেন।

অতঃপর গঙ্গার প্রসিদ্ধ খালটি সম্বন্ধে কিছু লিখিব। হরিদ্বার হইতে ইহা বাহির হইয়া রুড়কী শহরের প্রান্তস্থিত 'সোলানি' নদীর উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। খালটি একটি ছোট নদীরই মত দেখিতে। নদীর উপর যে জলসেতুটি (aqueduct) দেখিতে পাওয়া যায় সরকারী কাগজপত্রে উহাকে magnificent আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

গঙ্গার খালটি আরম্ভ হইবার কিছু পরেই রুড়কী শহরটি গড়িয়া উঠে ও ক্রমশঃ প্রসিদ্ধিলাভ করে। খালটি সম্পূর্ণ করিবার জন্য একটি বৃহৎ workshop ও লৌহ ঢালাইয়ের স্বতন্ত্র কারখানার প্রয়োজন অনুভূত হয়। ইহা ১৮৪৫-৪৬ সনে স্থাপিত হয়। প্রথমাবস্থায় ইহা একটি কোম্পানী দ্বারা পরিচালিত হইত। পরে ১৮৮৬ সনে পুরাপুরি গভর্ণমেণ্টের হাতে আসে। বর্ত্তমানে ইহার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একজন বাঙালী।

গঙ্গার এই খালটি বহু পুরাতন। ইহার শতবার্ষিকী উৎসব গত ১০ই ডিসেম্বর ১৯৫৪ সনে মহাসমারোহে হরিদ্বারে অনুষ্ঠিত হয়। সেই সময়ে রাষ্ট্রপতি, উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল এবং অন্যান্য মন্ত্রীবর্গ উপস্থিত ছিলেন। কিঞ্চিদধিক একশত কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের মধ্যে এই খালটিই সর্ব্বপ্রথমে কাটিবার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এ স্থানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষ যখন মুসলমানদের অধিকারে ছিল তখনও উত্তর প্রদেশে দুইটি খালের কথা লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যাইত। প্রথমটি মীরাটের নিকট ছিল। ইহার দৈর্ঘ্য ছিল সাড়ে বার মাইল এবং ইহাকে 'মহম্মদ আবু খাঁ' বলা হইত। পশ্চিম কালী নদী হইতে জলধারা ইহাতে প্রবাহিত করা হইত। অন্য খালটি কাটিবার পরিকল্পনা সাহজাহানের রাজত্বের সময় (১৬২৮-১৬৫৯ খ্রীঃ) গৃহীত হয়। ইহাকে 'পূর্ব্ব যমুনা খাল বলা হইত। শিবালিক পর্ব্বত ভেদ করিয়া যমুনা যেখানে সমতলভূমি স্পর্শ করিয়াছে, আলি সর্দ্দার খাঁর পরি-কল্পনানুযায়ী এই খালটি কাটা হইবে স্থির হয় কিন্তু বাস্তবপক্ষে মহম্মদ শাহের রাজত্বে ১৭৪৮ খ্রীঃ ইহাতে প্রথম হাত দেওয়া হয়। খালটি সম্পূর্ণ হইলেও ইহার দুই তীর ইটের গাঁথুনী দিয়া পাকা-পাকী ভাবে তৈয়ারি করা সম্ভব হইয়া উঠে নাই। ১৮২২ খ্রীঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইহার দুইটি তীর ইষ্টক ও প্রস্তরাদি দিয়া বাঁধাইয়া দেন। খালটি সম্পূর্ণ হইলে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের (বর্ত্তমান উত্তর প্রদেশের) প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। এই উন্নতি লক্ষ্য করিয়া ১৮৩৬ সনে Bengal Engineers-এর Col: Colvin গঙ্গা হইতে কোনও খাল কাটা হইতে পারে কিনা সে সম্বন্ধে বহু গবেষণা করেন এবং ভারত ত্যাগের পূর্ব্বে Col: Cautley-কে (পরে Sir Proby Cautley, এ বিষয়ে আরও গবেষণা করিয়া উহা সার্থক করা যাইতে পারে কিনা তাহা চেষ্টা করিতে বলিয়া যান। কিন্তু নানা বিঘ্ন-বাধা উপস্থিত হওয়ায় গবেষণা কার্য অধিকদূর অগ্রসর লাভ করিতে পারে নাই। ১৮৩৭-৩৮ খ্রীঃ উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং সেজন্য ভারত সরকার বিশেষ চিন্তিত হইয়া উঠেন। দুর্ভিক্ষের

করাল মূর্ত্তি দেখিয়া গভর্ণমেণ্ট Col: Cautleyকে গঙ্গার খাল কাটিবার কার্য্যে নিযুক্ত করেন। গবেষণা কার্য্য শেষ হইলে তিনি তাঁহার মতামত তদানীন্তন বড়লাট লর্ড অকল্যাণ্ডের গোচরে আনেন। দুইটি পরিকল্পনা বিবেচিত হইবার পর বর্ত্তমান খালটি ১৮৪২ সনে আরম্ভ করা হয় এবং ৭২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইহা ১২ বৎসর পরে সম্পূর্ণ হয়। লর্ড ডালহাউসি ইহার উদ্‌ঘাটন করেন। খালটি সম্পূর্ণ হইবার ফলে ৩০ লক্ষ বিঘা জমি কৃষি-কার্য্যোপযোগী হইয়া উঠে। এই খালটি হরিদ্বার হইতে বাহির হইয়া কাণপুরের নিকটে গঙ্গার সহিত মিলিয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০০ মাইল হইবে।
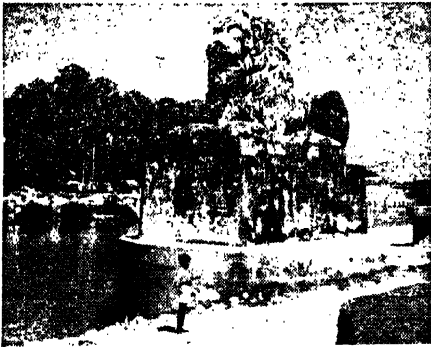
গঙ্গার খালে সিংহমূর্ত্তি

এই খালটি সম্পূর্ণ করিয়া সাফল্যলাভ করিবার পূর্ব্বে প্রথমাবস্থায় অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করতে হয়। হরিদ্বারের নিকট গঙ্গা দুইটি ধারায় প্রবাহিত। পশ্চিম ধারাটি ব্রহ্মকুণ্ড, মায়াপুর ও কনখলের পার্শ্ব দিয়া এবং নীল ধারাটি পূর্ব্বদিকে চণ্ডী পর্ব্বতের পাদদেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিত। বর্ত্তমান খালটি প্রথমোক্ত ধারা হইতে বাহির করা হইয়াছে। কার্য্য আরম্ভ করিবার পর দেখা যায় যে, হরিদ্বার হইতে রুড়কী পর্য্যন্ত প্রাকৃতিক বাধা একরূপ অনতিক্রম্য। রাণীপুর ও পাথরি নামক স্থানে দুইটি পার্ব্বত্য স্রোতস্বতী পড়ায় সুকৌশলে উহাদের নিম্নে সুড়ঙ্গ করিয়া খালটি প্রবাহিত করিতে হয় এবং কিছুদূর অগ্রসর হইলে আরও একটি বাধা প্রবল আকারে দেখা দেয়। তাহা হইল সোলানি নামক প্রশস্ত পার্ব্বত্য নদী। Col. Cautley পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়াছিলেন যে, নদীটির উপর দিয়াই খালটি প্রবাহিত করিবেন। সে সময়ে জনসাধারণের পক্ষে ইহা এক দুরূহ ব্যাপার বলিয়া বোধ হইয়াছিল। এমনকি, অনেকে ইহা যে একরূপ অসম্ভব সে কথাও ব্যক্ত করেন। কিন্তু Col. Coutley তাঁহার দৃঢ় অধ্যবসায় গুণে তাঁহার পরিকল্পনার সার্থক রূপ দিতে সক্ষম হন।

এই খালটির অসাধারণত্ব লইয়া সেই সময়ে যে দুইটি কিংবদন্তী জন্মলাভ করে তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমটি এই যে সোলানি নদীর উপর যখন সুদীর্ঘ abutmentটি নির্ম্মিত হয় উহা জলের ভারে ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং সকলেই খালটি সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। যে সময়ে এই জলসেতুটি নির্ম্মিত হয় তখন সিমেণ্ট আবিষ্কৃত হয় নাই, সাধারণ চূণ, বালি, সুরকি দিয়াই পূর্ত্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইত সুতরাং সন্দেহ কিছু অস্বাভাবিক ছিল না। পুলটি ভাঙ্গিয়া পড়িলে কিন্তু Col. Cautley হতাশ হন নাই। পূর্ণ উদ্যমে উহা পুনরায় নির্ম্মাণ করেন। কিংবদন্তী, Col. Cautley একজন ধর্ম্মশীল ব্যক্তি বলিয়া খ্যাত ছিলেন। খালটি আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে তিনি কতিপয় সাধুর সংস্পর্শে আসেন ও গঙ্গার পবিত্রতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া নিত্য গঙ্গাস্নান ও ভস্মধারণ করিতেন। খালে জল প্রবাহিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি ভগীরথের ন্যায় "সোলা-মুকুট" (টোপর ?) ও পদদ্বয়ে কাষ্ঠ পাদুকা ধারণ করিয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া, পুলের উপর দিয়া রুড়কী পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছেন। রুড়কী তাঁহার এত ভাল লাগিয়াছিল যে, তিনি এখানে এমন একটি সৌধ নির্ম্মাণ করেন যাহার প্রত্যেক কক্ষ হইতে খালটি দেখা যাইত।

অন্য পক্ষের মত এই যে, জলসেতুটি দ্বিতীয়বার নির্ম্মিত হইলে Col. Cautley অশ্বারোহণ করিয়া হরিদ্বার হইতে যাত্রা করেন। খালের পথ ধরিয়া পুল পর্য্যন্ত আসিয়া তথায় জলধারার অপেক্ষা করিতে থাকেন এবং এই মত প্রকাশ করেন যে, যদি জলের ভারে দ্বিতীয়বার পুলটি ভাঙ্গিয়া পড়ে তাহা হইলে সেই জলস্রোতে ভাসিয়া তাঁহার জীবনান্ত হইলেও দুঃখিত হইবেন না। সুখের বিষয়, এবারে তাঁহার অপরিসীম প্রচেষ্টা পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করে। খালটি সম্পূর্ণ হইলে উহা East India Irrigation কোম্পানী গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে দেড় কোটি টাকায় ক্রয় করে। কয়েক বৎসর পরে লাভের পরিমাণ অসম্ভব রূপে বৃদ্ধি পাওয়ায় উহা গভর্ণমেণ্ট কোম্পানী হইতে অধিক মূল্যে ক্রয় করিয়া স্বীয় কর্ত্তৃত্বাধীনে আনেন। বর্ত্তমানে খালটি হইতে বহু স্থানে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করা হইতেছে।

উত্তর প্রদেশ সরকার হইতে গঙ্গার খালটির সম্বন্ধে যে পুস্তিকা কয়েক বৎসর আগে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে পুলটি সম্বন্ধে নিম্নে কিছু উদ্ধৃতি দিলাম :

"রুড়কী কে পাস সোলানী নদী নীচে সে বহতী হৈ ঔর উপর তিন মীল লম্বা নহর কা পক্কা পুল বনা দিয়া গয়া হৈ। যহ কাম অদ্‌ভুত ঔর দুনিয়া কে দর্শনীয় কামো মে সে এক হৈ। ইসকে বনানে সে জো রোড়ে নিকলে উসী সে পাস কা নগর বনা ঔর উসকা নাম রুড়কী পড়া। নহর কে ইস জলসেতু ব এক্কডক্ট কো বনানে সে কিতনী ভারী কঠিনাইয়ো কা সাধনা করনা পড়া উসকী কল্পনা কা মূর্ত্তরূপ সামনে যখনে কে লিএ জলসেতুকে দোনো ঔর

দো দো শের পত্থর কে বড়ে বড়ে বলাকর খড়ে কিয়ে গয়ে হৈ।"
("গঙ্গা কী আধুনিক মহানী")

উপরের উদ্ধৃতিতে যে চারিটি সিংহের উল্লেখ আছে তাহা পুলটির দুই প্রান্তে দেখা যায়। চারিটি সিংহই রক্তাভ প্রস্তরে সুগঠিত ও আকারেও সুবৃহৎ। বহুদূর হইতে উহা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তোলায় মানুষ যে অভূতপূর্ব শৌর্য্য ও বীর্য্যের পরিচয় দিয়া কৃতিত্বের অধিকারী হয় তাহারই প্রতীকস্বরূপ এই সিংহগুলি ইংরাজরাজ স্থাপিত হয়।

রুড়কী পৌঁছিয়া অবধি জলসেতুটি দেখিবার জন্য মন ব্যগ্র হইয়াছিল কিন্তু এ বৎসর অতিরিক্ত গ্রীষ্ম পড়ায় এবং প্রচণ্ড "লু" বহিতে থাকায় উহা দেখা সম্ভব হয় নাই। অবশেষে বর্ষা পড়িলে শ্রাবণের এক বর্ষণক্লান্ত অপরাহ্নে উহা দর্শন করিবার জন্য যাত্রা করি।

বাসা হইতে সোলানি নদী প্রায় দুই মাইল হইবে। সাইকেল রিক্সা করিয়া যাওয়া সুবিধাজনক বলিয়া দুইখানি লওয়া হইল। যদিও বৃষ্টি ছিল না তবু আকাশ ঘন কাল মেঘে আচ্ছন্ন ছিল কেবলমাত্র পশ্চিমদিগন্তে ছিন্ন কালো মেঘের ফাঁকে রবির মৃদু রেখা দেখা যাইতেছিল। বৃষ্টির আশঙ্কা যে ছিল না এমন নহে। যাহা হউক, কিন্তু পরেই মীরাট-রুড়কী রোড ধরিয়া জলসেতুটির প্রান্তে আসিয়া পৌঁছান গেল। এই স্থানটির পার্শ্বেই উত্তর প্রদেশের প্রাচীন সুবৃহৎ workshop ও লৌহ ঢালাইয়ের কারখানা যাহার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। দিবা-রাত্রি এখানে কাজ হইয়া থাকে। workshopটির সুউচ্চ প্রাচীরগুলি সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। শুনিলাম, সিপাহী বিদ্রোহের সময় রুড়কীর ইংরাজেরা ইহা দুর্গরূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন।

জলসেতুট দেখিয়া মন বিস্ময় বিমুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিল না। নদীগর্ভ হইতে ইহা শতাধিক ফুট উচ্চে অবস্থিত মনে হইল। নিম্নে সোলানি নদী বহিয়া চলিয়াছে। খালটির বিস্তার ২২৫´ ফুট ও গভীরতা ১২´ দেখা গেল।

পথশ্রান্তি নিবারণের জন্য আমরা জলসেতুটির শেষ প্রান্তে একটি উচ্চস্থানে গিয়া বসিলাম। শীতল বাতাসের সংস্পর্শে শরীর স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল। দেখিলাম চতুর্দ্দিকের পরিবেশ অতি মনোরম। নিম্নে নদীর দুই পার্শ্বেই ছোট ছোট গ্রাম ও তৎসংলগ্ন কয়েকটি ক্ষেত। নদীর জল যেখানে অল্প সেই স্থান দিয়া গো-পালকেরা গোচারণ শেষ করিয়া গৃহাভিমুখী গাভীগুলিকে পার করাইতেছিল। তাহাদের পরস্পরের আহ্বান-ধ্বনি ক্ষীণভাবে কানে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। বহুদিন পরে বর্ষাকালের এই গ্রাম্য দৃশ্য পরম উপভোগ্য বলিয়া মনে হইল ও মন পরিতৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। "সোনার তরী"র কথা মনে পড়িয়া গেল—মনে হইল, হয়ত এমনই এক দিনে কবি উহা রচনা করিয়া থাকিবেন।

হঠাৎ আকাশের দিকে চাহিতে ঘন কালো মেঘের পট-ভূমিকায় কয়েকটি বলাকা তাহাদের তুষার-শুভ্র পক্ষ বিস্তার করিয়া হিমালয়ের দিক হইতে আমাদের মাথার উপর দিয়া দক্ষিণে উড়িয়া চলিয়াছে দেখা গেল।

সম্মুখেই উত্তর দিকে ধ্যানগম্ভীর হিমালয় 'স্বে মহিম্নি' বিরাজমান। তিনটি পর্ব্বতমালা রুড়কী শহর হইতে দেখা যায় পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এ স্থান হইতে উহারা যেন খুব নিকটবর্ত্তী মনে হইল। জলসেতু হইতে মসুরী নগরীর আলোকমালা রাত্রে দেখা যায়।

নব বর্ষার মেঘাবলী (monsoon clouds) পর্ব্বতগাত্রে স্থানে স্থানে পুঞ্জীভূত হইয়া উহার শোভা যেন আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। বহু বৎসর পরে পুরাতন দৃশ্য দেখিয়া সিমলার কথা স্বতঃই মনে জাগিয়া উঠিল।

যে স্থানটিতে আমরা বসিয়াছিলাম তাহার ঠিক পাশ দিয়াই প্রস্তর নির্ম্মিত অনেকগুলি সুপ্রশস্ত সিঁড়ি নিম্নে নদীগর্ভে গিয়া পড়িয়াছে। শহর হইতে প্রত্যাগত কয়েকটি কৃষক ও মজুর তাহাদের সুখ-দুঃখের কথা কহিতে কহিতে এই সিঁড়ি অবলম্বন করিয়া নিম্নে নামিয়া নদীর তীর ধরিয়া গ্রামের দিকে অগ্রসর হইল দেখা গেল। এই শহরে চাষী, মজুর প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা অধিক দেখিয়াছি। মনে হয়, উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমান দেশত্যাগ করিয়া গেলেও ইহারা জন্মভূমির মায়া ভুলিতে পারে নাই।

কিছু পরে আকাশের বর্ণ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা গেল। পশ্চিম দিগন্তে ঘন কালো মেঘের আড়াল অপসারিত হইয়া কখন বা সুনীল গগন আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহা দেখি নাই। অভ্রভেদী নগাধিরাজ হিমালয়ের সান্নিধ্যে অস্তোন্মুখ সূর্য্যের চারিদিকে গোলাপী বর্ণের মেঘের অপূর্ব্ব সমাবেশ—তাহারই অপরূপ ছায়া খালের ছোট ছোট ঢেউয়ে প্রতিফলিত হইয়া যেন এক-একটি স্বর্ণপথ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে—এত সুন্দর দৃশ্য ও রং-এর অপূর্ব্ব খেলা খুব কমই দেখিয়াছি। বহু বৎসর পূর্ব্বে সিমলা Fine Arts Exhibition-এ প্রখ্যাতনামা শিল্পী যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রদর্শিত একটি ছবির কথা মনে পড়িল। সেই বৎসরে ভারতীয় শিল্পীর এই ছবিটি সর্ব্বপ্রথমে বড়লাট প্রদত্ত প্রথম পুরস্কার লাভ করিবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করে। আজিকার এই নয়নাভিরাম দৃশ্যের সহিত সেই ছবিটির রং ও রেখার কোথায় যেন সামঞ্জস্য ছিল মনে হইল।

অবশেষে অন্ধকার নামিয়া আসিলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠিতে হইল। খালের উভয় তীরেই দেখিলাম নাগরিকেরা অনেকেই সান্ধ্য-ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। রাস্তায় বেশ ভীড় বোধ হইল। বাম পাশের পথ দিয়া তীর্থযাত্রী পূর্ণ কয়েকটি 'বাস' হরিদ্বার অভিমুখে দ্রুতগতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে দেখা গেল।
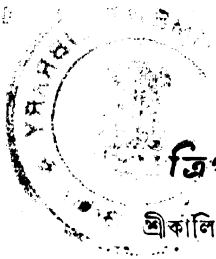
ত্রিপথ

শ্রীকালিদাস রায়

বাল্যে ছিল পথটি কাঁচা ধূলা কাদায় ভরা,
মাটি দিয়েই গড়া।
ধরণী মার পরশ পেতাম সেথায় অনুক্ষণ,
সে পথ দিয়ে রাখাল যেত সঙ্গে ধেনুগণ।
ছিল সে পথ ঝরা বকুল, ঝরা পাতায় ঢাকা,
ছটি ধারের তরুগুলি ধরত মাথায় ছাতা।
গোরুর গাড়ী আসত যেত উদাস গাড়োয়ান
চাকার ধ্বনির তালে তালে গাইত বাউল গান।

যৌবনে পাই লাল সুরকির শহরতলীর পথ,
ছুই পাশে তার জীর্ণ ইমারত
পুকুর, বাগান, ভাঙা দালান, মসজিদ, মন্দির,
ঘোড়ার গাড়ী ছুটত তাতে উড়ায়ে আবীর।
দেখতে পেয়ে রাজার সিপাই ঘোড়ায় চড়ে আসে
পাশ কাটিয়ে দাঁড়িয়ে যেতাম বাতিখুঁটির পাশে।
এ পথ আমায় নিয়ে যেত রাজ কলেজের পানে,
সে পথ আজো আমার বুকে রক্তডোরা টানে।
মধুর স্মৃতি আনে।

শেষে পেলাম শহুরে পথ কয়লা কাথে গড়া,
ঘরের মেজের মতন পালিশ করা।
কিন্তু তাতে নেইক আমার হাঁটার অধিকার,
ছুপাশ দিয়ে চলতে গেলেও প্রাণ বাঁচানো ভার।
ওপথ দিয়ে চলে শুধু বড় লোকের গাড়ী,
ছুধারে এর মস্ত কোঠা বাড়ী।
নই বড় লোক, এই পথেরই ধারেই তবু বাস,
সারা ছুপুর পাঠায় ঘরে বহ্নি জ্বালার শ্বাস।
শহরের বুক চিরে
এ পথ গিয়ে শেষ হয়েছে সুরধুনীর তীরে।
ত্রিপথ গা জীবন ধারা ত্রিপথ পার ঘাটে
মিলবে গিয়ে এ পথ দিয়ে চলব যেদিন ঘাটে।

"স্বপ্নো নু মায়া নু"

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

উপল ব্যথিত তন্বী তটিনীর তীরে
সিকতাবিলীন শুভ্র কলহংসীসম
সুবঙ্কিম কম্বুগ্রীবা তুলিয়া যখন
বসিয়া শুনিতেছিলে গোধূলি বেলায়
ভবনশিখরচূড়ে কপোতকূজন,—
মনে হ'ল তুমি নহ বিংশ শতাব্দীর!
মালবিকা নিপুণিকা-চতুরিকাদল,—
অয়ি সখি, তাহাদেরি নর্ম্মসখী তুমি।
নারিকেল তালীবনঘেরা এ কুটীর—
মনে হ'ল লাস্যময়ী অভিসারিকার
কলহাস্যমুখরিত মঞ্জু কুঞ্জবন!
সব স্বপ্ন!—রক্ত-ঝরা জীবনসংগ্রাম—
সত্য শুধু—আর এই তিক্ত বর্ত্তমান!

মরমের দোসর কোথায়

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

নিরাশার মরুভূমি মোর মনের ভূগোলে কাঁদে
ছুঃস্বপনের ঝড়ে!
হৃদয়ের মেঘ ওড়,—করুণার বিন্দু নাহি ঝরে।
সংসার-কল্লোল গীতি শুনি শুধু আর্ত্ত বেদনাতে!

স্মৃতির দিগন্তে জ্বলে' জীবনের তারকারা নিবে নিবে যায়
অনাগত দিবসেরা মায়ারণ্যে এসে আলোছায়া লয়ে—
গাবে গান ঋতুতে ঋতুতে নব নব পরিচয়ে;
তখন র'ব না আমি। মোরে কি স্মরিবে কেহ!
অন্তর শুধায়।

প্রতিটি প্রভাত সন্ধ্যা আনে বিষণ্ণতা,
দীনতা রিক্ততা মোরে করেছে যে প্রেতের সমান;
আয়ুর স্ফুলিঙ্গ লয়ে অমারাত্রে আলোর সন্ধান—
করি' ছুটিলাম আলেয়ার সাথে,—এলো বিপন্নতা।
প্রণয় সৌরভ আজো মধুরাতে পাই নাক মাধবীর বুকে,
নিস্ফল কামনা সাথে যুঝিলাম নিত্য নিরলস,
রাত্রিদিন ব্যাপ্ত মোর চারিভিতে কঠোর কর্কশ।
মরমের দোসর কোথায়? সান্ত্বনায় দেবে বাণী ছুঃস্থ ছুখে!

বেকার

শ্রীরামশঙ্কর চৌধুরী

—ও দাদা, বেরুচ্ছ যে বাজারে যাও। বলল কমলা।

—পারব না। উত্তর দিল কানাই।

—না পারলে আমিও ফ্যান-ভাত বেড়ে দোব।

—কত ত রাজভোগ দিস, তার আবার চ্যাটাং চ্যাটাং কথা।

সকালেই বেরিয়ে যাচ্ছিল কানাই, এমনি সময় বিতণ্ডা সুরু হ'ল। প্রত্যহই হয়, এর মধ্যে বৈচিত্র্য নেই—নূতনত্ব নেই। এসব কথা শুনতে শুনতে গা সওয়া হয়ে গেছে যদিও তবু মাঝে মাঝে কমলার কথায় গায়ে জ্বালা ধরে। বোন নয় ওটা, একটু মায়া-মমতা নেই, শত্রু। জন্মাবধি শত্রুতা করছে কমলা, আজও—এই আঠারো বছর বয়সেও শত্রুতা করতে ছাড়ে নি। সূর্পনখা! রাক্ষুসী!

—বেশ, না যাবে আমি বাবাকে বলে দিচ্ছি।

—আর বলতে হবে না, দাও থলি আর টাকা।

সংসারে ঐ একটি মানুষকেই ভয় করে কানাই। বাবা ত নন—যেন সি-এন-সি! হুকুম যখন যা করবেন তৎক্ষণাৎ তাই সম্পাদন করতে হবে নইলে সুরু হবে মহাভারতের পর্ব! যত দোষ গিয়ে বর্তাবে কানাইয়ের উপরেই। 'হত-ভাগা ছেলেকে মানুষ করলাম, লেখাপড়া শেখালাম, কোন কাজেই এল না···ইত্যাদি।" অথচ কিই-বা লেখাপড়া শিখিয়েছেন? ম্যাট্রিক পাস কানাই। কেন তাকে কি বি-এ, এম এ পাস করানো যেত না? খারাপ ছেলে ছিল না কানাই—তার চেয়ে কত বোকা ছেলে বি-এ, এম-এ পাস করে চাকরি করছে! সেও ত একটা স্কুল মাষ্টারিও জোটাতে পারত!

একটা থলি আর বাজারের টাকাটা এনে দিয়ে বলল কমলা, কুমড়ো এনো না। বাবা খেতে পারেন না।

—না পারলে আর কি করা যাবে? সস্তায় জিনিসও আনতে হবে—অথচ কুমড়ো আসবে না। শাক আনা চলবে না, দু'দিন পরে এই এক টাকায় কুমড়োও আসবে না, তা জানিস? গম্ভীর ভাবে বলল কানাই।

—তবে যা খুশি নিয়ে এস।

গলির মোড়েই একটি ভিখিরী দাঁড়িয়েছিল। কানাইকে হনহন করে এগিয়ে আসতে দেখে শীর্ণ হাতটি বাড়িয়ে দিয়ে আবেদন করল, একটি পয়সা দাও বাবু।

ভিখিরীটাও তাকে বিদ্রূপ করছে। কোন কথা না বলে, ভিখিরীটার গালে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে বলল কানাই, ভিক্ষে চাইতে লজ্জা করে না?

ভিখিরীটা কাঁদবে কি কাঁদবে না—তাই ঠিক করবার পূর্বেই কানাই গলিটা পেরিয়ে গৌর মণ্ডল রোডে গিয়ে পড়ল। গৌর মণ্ডল রোডের একপ্রান্তে পাশুটে রঙের একখানি তিনতলা বাড়ী। ঐ বাড়ীর উপর তলায় কিছু দিন হ'ল একটি ডাক্তার পরিবার এসেছেন। বিরাট পরি-বার—অনেকগুলি নানা বয়সের মেয়ে আছে—ওদের এক জনের নাম ললিতা। বেশ মিষ্টি নাম!—"ললিতা মরমি সখী—" গানটা শুনেছে কানাই। রেকর্ডের গান—গানের ঐ একটা কলিই মনে আছে কানাইয়ের। গানটি শোনার পর—মনে মনে ললিতার একটি রূপ গড়ে তুলেছিল কানাই। এই ললিতার রূপ-সৌন্দর্য অবিকল তার সঙ্গে মিলে যায়। গায়ের রং ফর্সা ললিতার—খানিকটা লালের আভা মেশানো। হলদে শাড়িতে বেশ মানায় ললিতাকে। গায়ে থাকে একটা অরগেণ্ডির ব্লাউজ ব্লাউজের নীচের বক্ষাবরণটি স্পষ্ট দেখা যায়। গায়ে আঁটসাঁট হয়ে বসে থাকে ব্লাউজটা। সেদিন কমলার কাছে এসেছিল ললিতা —উলের একটা প্যাটার্ণ শিখে নিতে। ব্যস! ঐ একদিনই। তার পর কমলাই যায় ললিতার কাছে। মাঝে মাঝে কমলাকে পৌঁছে দিয়ে যায় কানাই—সম্মান করে ললিতা। চেয়ারে বসতে দেয়, চা এনে দেয়, না খেলে মাথার দিব্যি দিয়ে বসে ললিতা। আস্তে আস্তে সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠতর হয়।

একটা দিনের কথা মনে আছে কানাইয়ের। সেদিনটা ছিল হোলির দিন। সন্ধ্যা তখনও হয় নি, শুধু হব হব করছিল। ফাল্গুন মাস। মনকে মাতাল করার গন্ধ নিয়ে বইছিল হাওয়া। যা দেখছিল কানাই, তাই ভাল লাগ-ছিল। "যৌবন সরসীতে মিলন শতদল" যেন টলমল করতে সুরু করেছিল। আনমনে "ললিতা মরমী সখী—" গানটির সুর ভাঁজতে ভাঁজতে আনমনে এগিয়ে যাচ্ছিল কানাই, হঠাৎ পাশুটে রঙের বাড়ীটার কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়েছিল কানাই। এনৃকেল! সামনেই ললিতা। একটা ফেরীওয়ালার কাছ থেকে কি যেন কিনছিল সে।

সেই হলুদে শাড়ী পরনে। মাথার চুল শাম্পু করা। হাওয়ায় উড়ছিল বেলুনের মত, একটা সুবাস ছড়িয়ে পড়ছিল চারিদিকে। তফাতে দাঁড়িয়ে সেই অপরূপার রূপের সৌন্দর্য খানিকটা উপভোগ করছিল কানাই। হঠাৎ ফেরীওয়ালার একটা কথা কানে আসতেই কানাই দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে ফেরীওয়ালাকে ধমক দিয়ে বলেছিল, আমাদের পাড়ায় এসে মেয়েদের ঠকিয়ে পয়সা নিয়ে যাবার বেশ ফন্দি ঠাওরেছ চাঁদ। এই ফিতার দাম ছয় আনা? যাও, বেরোও বলছি। আপনি নেবেন না এর কাছে। আমি বাজার থেকে এনে দোব।

সেদিন নিজের অজ্ঞাতেই যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কানাই, আজ তাই অকস্মাৎ মনে পড়ে গেল কানাইয়ের। ছিঃ ছিঃ এত দিন সে ভুলেছিল কেমন করে? হয়ত ললিতা কানাই সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা নিয়ে আছে।

গলিটা পেরিয়েই গৌর মণ্ডল রোড, তার পর হটন রোড—জি. সি. মিত্র রোড ধরে বাজারে এসে পা' দিল কানাই। গিস্‌গিস্ করছে ষাঁড়ে আর মানুষে। অসাবধান হলেই হয় পকেট নয় পিঠ যাবে। বাজারে একবার সব দোকানগুলি ঘুরে বিভিন্ন আনাজের দরটা জেনে নিল—কুমড়ো ছয় আনা, আলু দশ আনা, শাক ছয় আনা, এক-একদিন মাছ-মাংস খেতে সখ হয় কানাইয়ের কিন্তু সেদিকে যাওয়ার সঙ্গতি থাকে না। তবু একবার মাছের বাজারটা দেখে আসে সে। নিরর্থক, তবু যায়। যাই হোক্ আজ আর সময় নেই তার। বাজার করার অর্থ থেকেই দু'আনা পয়সা বাঁচিয়ে একবার মাণহারা দোকানগুলো ঘুরে এল কানাই। চাই মনোমত একখানা ফিতে। মাথায় জড়ানো থাকবে ললিতার। আরও সুন্দর লাগবে ললিতাকে।

—এই নে মুখপুড়ী।

বাজারের থলেটা রেখে বেরিয়ে যাচ্ছিল কানাই এমনি সময়েই কমলা বলে উঠল, কি আনলে তার হিসাবটা দিয়ে যাও।

—হিসাব আবার কি? শাক, কুমড়ো, আলু আনা হয়েছে তার আবার হিসাব! যাঃ, হিসাব নেই।

—পয়সা ফেরে নি?

—না।

আর কোন প্রশ্নের অপেক্ষা না করেই বেরিয়ে গেল কানাই। এখ্‌খুনি একবার ভোম্বলের কাছে না গেলেই নয়। দু'আনায় ফিতে হয় না, আরও কয়েক আনা পয়সা তার কাছে ম্যানেজ করতে হবে।

চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল কানাই। কোত্থেকে একটা গানের সুর ভেসে আসছে যেন, ভেসে আসছে একটি গানের খণ্ড অংশ, কান পেতে শুনল কানাই—"মাধবীর কানে কানে কহিছে ভ্রমর আমি তোমারই, আমি তোমারই"। পাশুটে রঙের বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে দেখল, ললিতার ঘরের জানালা খোলা। মাথায় রক্ত চড়ে গেল কানাইয়ের। সুরের অনুসরণ করে সে আবিষ্কার করল তারই বয়সী একটি ছেলেকে। এ পাড়ায় এই প্রথম দেখল তাকে।

—ওহে ভ্রমর শুনছ? কোমরে হাত দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল কানাই।

—আমাকে বলছেন? শিল্পীসুলভ নম্রতার সঙ্গে জিজ্ঞেস করল গায়ক।

—এখানে তুমি ছাড়া আর আছে কে যে বলব? বলি মাধবীর কানে কানে ভ্রমরকে যদি কথা বলতে হয় তবে এ পাড়াটা তার জায়গা নয়।

—আমি ত অন্যায় কিছু করি নি।

—না করনি। এখন কেটে পড়, সুবিধা হবে না ব্রাদার।

—সোজা রাস্তা দেখ।

গায়কটি অবাক হয়ে খানিক তাকিয়ে থাকল কানাইয়ের মুখের দিকে। চোখের দৃষ্টিতে ভয়ের চিহ্ন। তবু এত সহজেই এমনই একটা অন্যায়কে মেনে নিতে মন সায় দিল না তার। তাই জিজ্ঞেস করল, আপনি কে মশায়?

—পরিচয় চাও? দিয়ে দোব নাকি? জামার আস্তিনটা গুটালো কানাই।—নাঃ থাক্, এই প্রথম, সাবধান করে দিচ্ছি। মাধবী যদি খুঁজতে হয় তবে এ পাড়ায় সুবিধা হবে না। কথা বলতে বলতে চোখ দুটো লাল হয়ে গেল কানাইয়ের। আরও খানিকক্ষণ ওমনি দ্বন্দ্ব চললে হয় ত একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যেত। কানাইয়ের ক্রুদ্ধ রূপ দেখে আস্তে আস্তে উঠে গেল ছেলেটি। কানাইও গেল পিছু পিছু।

ভোম্বলকে কোন কথা গোপন না করে অকপটেই সব ব্যক্ত করে শেষ পর্যন্ত তার হাতে ধরে তাকে এই মুহূর্তে সাহায্য করবার কাতর অনুরোধ জানাল।

ভোম্বল কানাইয়ের কাতরতা লক্ষ্য করে আমোদ অনুভব করল। সে গম্ভীর ভাবে কানাইকে তিরস্কার করে বলল, শালা, পকেট যখন গড়ের মাঠ তখন প্রেম করতে যাস কেন? বেকারের আবার প্রেম! কুঁজোর আবার চিৎ হয়ে শোবার সাধ! লোকে শুনলে যে হাসবে রে কানাই।

—তা যে হাসে হাসুক, তোকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতেই হবে।

—তুমি করবে প্রেম আর আমি জোগাব ইন্ধন। তা হয় না হে তা হয় না।

—যাঃ মাইরি, তিরস্কার পরে করিস, এখন উদ্ধার কর।

—উদ্ধার পেতে চাস্ ত বাপের তহবিল তছরূপ কর। একটা কীর্তি থাকবে।

আরও কিছু উপদেশ দিতে যাচ্ছিল ভোম্বল। তা শুনবার সময় এবং ধৈর্য ছিল না কানাইয়ের, সে একরূপ বিফলমনোরথ হয়েই চলে যাচ্ছিল, ভোম্বল তাকে ডেকে বলল, চল আমিও যাই।

দুজনেই বাজারে এল ওরা। দোকানে দোকানে ঘুরে একটা দোকানে মনোমত একটা সিল্কের ফিতে কিনল কানাই, পয়সাটা দিয়ে দিল ভোম্বল।

—এখন আসি ভাই। হাসতে হাসতে বিদায় নেবার ভঙ্গিতে ডান হাতখানি উর্ধ্বে তুলে ধরল কানাই।

ফিতে কিনে কিন্তু একটা নূতন ভাবনার জন্ম নিল কানাইয়ের অন্তরে। কি বলে সে ললিতার হাতে তুলে দেবে এই অকিঞ্চিৎকর উপহার? সে যদি প্রত্যাখ্যান করে তা হলে কানাই আর কোন কালে বন্ধুসমাজে মুখ দেখাতে পারবে না। তবু একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? উপহার ত আরও অকিঞ্চিৎকর হতে পারে, কিন্তু তা যত বৃহৎ, পারিমাণিক মূল্য তার যত বেশীই হোক, তার সঙ্গে হৃদয়ের যদি স্পর্শ না থাকে তবে তা মূল্যবান হয়েও মূল্যহীন হয়ে পড়ে। একটা সিনেমায় এই ধরনের একটা ছবি দেখেছিল কানাই। ছবিটার নাম মনেনেই, কিন্তু ঘটনাটা মনে আছে হুবহু। কেমন করে কি বলবে তাও পথ চলতে চলতে কয়েকবার রিহার্সাল দিয়ে নিল কানাই।

কানাই বলবে, আমি তোমার জন্যে উপহার এনেছি ললিতা।

ললিতা উত্তর দেবে, উপহার ত আমি চাই নি কানাই।

কানাই বলবে, কি তুমি চেয়েছিলে মরমী সখী?

ললিতা উত্তর দেবে, আমি চেয়েছিলাম—বলতে বলতে রাঙা হয়ে যাবে ললিতার মুখখানি—আর সেই অবসরে কানাই ললিতাকে টেনে নেবে কাছে।

একটা পুলক শিহরণ কানাইয়ের সারা দেহকে আন্দোলিত করে তুলল।

—কি মশায়! পথ চলেন কি মদ খেয়ে?

চলতে চলতে একটি পথচারীর সঙ্গে ধাক্কা লেগে যেতেই ভদ্রলোক ধমক দিয়ে উঠলেন, খানিকটা অপ্রস্তুত হ'ল কানাই। ভাবনার ঘোর কাটলে ভদ্রলোকের হাতে ধরে বলল, আমাকে ক্ষমা করবেন।

পথচারী আর কোন কিছু না বলে চলে গেলেন আপন গন্তব্য স্থানে। কানাইও আস্তে আস্তে পাঁশুটে রঙের বাড়ীটার পাদদেশে এসে দাঁড়ালো। একবার চারিদিকটা দেখে নিয়ে তরতর করে একেবারে উপরে উঠে গিয়ে দরজায় মৃদু করাঘাত করল কানাই। ললিতা দরজা খুলে দিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে বলল, আসুন।

ললিতা কানাইকে নিয়ে গিয়ে আপনার কুঠ্‌রিতে বসালো। সুন্দর ঘরখানি, ঘরটিতে আসবাব সামান্যই আছে [illegible] আছে তাই কত সুন্দর। প্রতিটি আসবাবে সুরুচির [illegible]। ললিতার কল্যাণহস্ত যা ছোঁয় তাই বুঝি এমনই সুন্দর হয়ে উঠে।

—আপনি বসুন, আমি চা নিয়ে আসি। বলল ললিতা।

—চা আমি খাই না। তার চেয়ে এক গ্লাস জল হলে ভাল হয়।

বেশ, তাই নিয়ে আসি।

কানাই জল খেয়ে গ্লাসটা রেখে মুখখানি একবার ভাল করে মুছে নিল। তার পর পকেটে হাত পুরে মুঠোর মধ্যে ধরে থাকল ফিতেটি।

কমলার মারফৎ তাদের গার্হস্থ্য জীবনের সকল সংবাদই পেয়েছে ললিতা। এই বৃদ্ধ বয়সেও নবদ্বীপবাবুকে রোজগারের চেষ্টায় দোকানে দোকানে ঘুরতে হয়।

—আচ্ছা, আপনি চাকরি করেন না কেন?

অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন। এর উত্তর কানাইয়ের মুখেই লেগেছিল, ইচ্ছা হয়েছিল বলে, "পাই নি বলে" কিন্তু তা না বলে কানাই বলল, একজন দৈবজ্ঞ আমার কররকোষ্ঠী বিচার করে বলেছেন, বিজনেসে আমার লাভ।

—বেশ তাই করুন না।

—ঐ কমলা থাকতে তাও কি হবার জো আছে। যত ক'টি টাকা প্রভিডেন্ট ফণ্ডে পেয়েছিলেন বাবা—সবটাই কমলার নামে জমা দেওয়া আছে। ও বলে দিলেই বাবা এখনই রাজী হয়ে যান, কিন্তু—

—কমলাদি বলে না। এই ত?

—হাঁ, ওকে একবার রাজী করিয়ে দিন না। দেখি একটা চান্স।

এর জবাবে কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিল ললিতা, কিন্তু সেই মুহূর্তেই ললিতার ভগ্নীপতি ডাঃ ভট্টাচার্যের ডাক পড়ল—ললিতা।

—যাই। বেরিয়ে গেল ললিতা। নাঃ অত্যন্ত বেরসিক মানুষটি। সবে জমে-আসা আলাপ-আলোচনায় ব্যাঘাত ঘটতেই কানাইয়ের মনটা খিঁচিয়ে উঠল। ডাঃ ভট্টাচার্য

যদি ললিতার ভগ্নীপতি না হয়ে অন্য কেউ হতেন তবে আজ তাঁকে উচিত শিক্ষা দিয়ে দিত কানাই। আজ আর ললিতাকে একান্তে পাবার কোন ভরসা না থাকায় নীচে নেমে এল কানাই, তার পর গৌর মণ্ডল রোড ছাড়িয়ে একেবারে উঠল এসে নিকলস্ রোডের তেমাথায় চায়ের দোকানটায়।

বেশ জমে জায়গাটায়। ভোম্বল, ফটিক, নন্দ সবাই এসে জমা হয়। আর আসে কয়েক জন মধ্যবয়সী মানুষ। চা-খানায় তাস খেলা নিষেধ বলে, দোকানের সামনেই রাস্তার একটুখানি অংশ ভালো করে পরিষ্কার করে তারই [illegible] একটা কিছু বিছিয়ে নিয়ে প্রকাশ্যেই জুয়া খেলতে বসে। কানাই মাঝে মাঝে গিয়ে বসে ওদের পাশে।

ভোম্বল কানাইকে দেখেই গভীর ভাবে জড়িয়ে ধরে বলল, দে শালা আজ চায়ের খরচটা।

—কেন, আমি খাওয়াবো কেন? জিজ্ঞেস করল কানাই।

—ডুবে ডুবে জল খাও বলে মনে করেছ কেউ জানতে পারবে না—বলল নন্দ।

ভোম্বল তা হলে সব কথাই এদের বলে দিয়েছে। কানাই একটা কুপিত কটাক্ষ হানল ভোম্বলকে, তার অর্থ বুঝল ভোম্বল, খানিকটা আমোদ অনুভব করল, আরে এটা ত আমাদের ক্রেডিট। প্রেম করা অত সহজ নয়, দিন মশায় তিন পেয়ালা চা। এই ত নন্দ ছটফট করছে প্রেম করবার জন্যে, পেরেছে কি?—বলল ভোম্বল।

চায়ের দোকানের মালিক বৃদ্ধ ব্যক্তি। শুধু চা নয় ডিম, মামলেট, পাঁউরুটি, বিস্কুট ইত্যাদিও রাখেন দোকানে।

অর্ডারটা শুনেই বললেন, কানাইবাবুর নামে কয়েকটা টাকা পড়ে আছে এখনও।

—থাক্, ঘাবড়াবেন না শোধ করে দোব। এখন দিয়ে যান।

তিন পেয়ালা গরম চা দিয়ে গেল একটা দশ-বারো বছরের ছেলে।

চায়ে চুমুক দিয়ে কানাই বলল, না শালা, একটা চাকরি বাকরি না জুটলে আর চলছে না।

—পাবি কোথায় শুনি? এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে কত দিন আগে নাম লিখিয়েছিস? জিজ্ঞেস করল নন্দ।

—তা এক বছর হবে! বলল কানাই।

—তবে আরও কয়েকটা বছর ভুগতে হবে। আজ দু' বছরের উপর হয়ে গেল আমার নাম লেখা আছে। মাইরি বলছি, সব ব্ল্যাকে চলছে।

ভোম্বল টেবিলের উপর একটা চপেটাঘাত করে বলল, রাখ্ এখন ওসব আলোচনা। শোন্, আজ লক্ষ্মী মেলায় কলকাতার যাত্রা হবে, ব্যাটারা আবার টিকিট করেছে। দেখবি?

—তা হবে বৈকি? অত্যন্ত সহজ ভাবে উত্তর দিল কানাই।

—টাকা?

—টাকা আবার কিসের শুনি? যেদিন লক্ষ্মী মেলার মালিকের মা দীর্ঘকাল ক্ষয়কাশে ভোগার পর রক্ত উঠে মারা গেল, সেদিন আমি ছাড়া ত নিয়ে যাবার কেউ ছিল না, আমার নাম করে কমপ্লিমেণ্টারি নিয়ে আসিস।

—যদি না দেয়?

—তখন দেখা যাবে?

আজ সন্ধ্যাতেই বাড়ী ফিরল কানাই।

এই অসময়ে দাদাকে ঘরে আসতে দেখে খানিকটা বিস্ময় জাগল কমলার।

—আজ আমার যে বড় ভাগ্য।

—ভাগ্য-টাগ্য বুঝি না। খিদে পেয়েছে খেতে দে।

—এত সকালে তোমার ত কখনও খিদে পায় না দাদা।

—আগে পায় নি বলে কি আজও পাবে না? পরে তর্ক করিস। সি-এন সি আসবার আগেই আমাকে যেতে হবে।

—কোথায়? মড়া পোড়াতে?

—না রে না, লক্ষ্মী মেলায় যাত্রা হচ্ছে কলকাতার আমাকে ষ্টেজ ম্যানেজ করতে হবে। যাবি তুই?

—না।

কমলা দাদার জন্যে জায়গা করে খাবার বেড়ে দিয়ে কাছে বসল।

—আর ভাত দোব দাদা?

—না। তোরা খাবি রেখে দে।

এই বয়সে বাবার অবস্থা দেখে সত্যই দুঃখ হয় কমলার। যদি উপরি বিশটা টাকাও পেত কমলা, তা হলেও সে সংসারটাকে ম্যানেজ করে নিতে পারত। কিন্তু তা হবার উপায় নেই। বহু দিন ভেবেছে, দাদাকে বলবে এ কথা, কিন্তু সুযোগ পায় নি, আজ সেই সুযোগ আসায় কমলা বলল, একটা কিছু কর দাদা?

—করব, করব—ঠিক করেছি একটা বিজনেস করব কম পুঁজি দিয়ে। তোকে একটা কাজ করে দিতে হবে কমলা। বাবাকে বলে এক হাজার টাকা দেওয়াতে হবে।

—যে টাকা আছে তা থেকে একটা পয়সাও কাউকে দেবেন না বাবা।

হঠাৎ মেজাজ বিগড়ে গেল কানাইয়ের। ব্যবসা করবে বলে মনে মনে একটা প্ল্যানও করেছিল কানাই। এ পল্লীতে ভদ্রলোক থাকে না। তাই ঠিক করেছিল—এখান থেকে একটা ভদ্রপল্লীতে নিয়ে যাবে বাবা আর কমলাকে। একটি ভাল পাত্র দেখে বিয়ে দেবে কমলার। তার পর সে নিজে নিয়ে আসবে গৃহলক্ষ্মীকে।

এত বড় পরিকল্পনাটাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিল কমলা। এ কি সহ্য করা যায়?

—একটা কথা বলে দিয়ে যদি উপকার হয় তা করবি না?

কি দরদ দাদার উপর। ভাতের থালাটা ঠেলে দিয়ে অত্যন্ত কর্কশ সুরে বলল কানাই, তোরা সব শত্রু। সব শত্রু। যাব একদিন এই শত্রুপুরী ছেড়ে চলে।

উঠে দাঁড়াল কানাই।

কমলা ভাল করেই চেনে তার দাদাকে। যা বলে তাই করে ও। তাই ভয় পেয়ে কানাইয়ের হাতে ধরে বলল, এখন খেয়ে নাও ত।

—না। তোরা কেউ আমার জন্য চিন্তা করিস না। শুধু মুখেই তোদের দরদ। থাক তোরা দুই বাপ-বেটিতে, আমি চলেই যাব।

—দাদা খেয়ে নাও, নইলে আমিও খাব না বলে রাখছি।

এইখানেই কানাইয়ের দুর্বলতা। তার জন্যে অন্যে দুঃখ সহ্য করুক বা কৃচ্ছ্রসাধন করে তা সে চায় না। তাই আবার খেতে বসল কানাই।

খাবার পর বেরিয়ে পড়ল কানাই। রাত্রিবেলায় দোকানটায় ভিড় একটু জমে, যারা আসে তারা সবাই কিন্তু খদ্দের নয়। রাস্তার ধারে কয়েকজন তাস খেলছিল। ভোম্বল, নন্দ ফটিক কেউ আসে নি তখনও। তাই অগত্যা তাসের আড্ডায় বসে পড়ল কানাই। খেলাটা ভাল ভাবেই জানে কানাই। পকেটে পয়সা থাকলে এক হাত দেখে নিতে পারত সে, কিন্তু—

—এই যে আমাদের নেতা, শালা, দুনিয়া খুঁজে এলাম কোথাও আর পাত্তা নেই। বলি কোথায় ছিলে চাঁদ? কানাইয়ের চিবুক নাড়া দিয়ে বলল নন্দ।

—তোদের দর্শন পাবার জন্যেই ত এমনি বসে আছি। পেয়েছিস রে ভোম্বল?

—কমপ্লিমেণ্টারি দেবে না বলে দিয়েছে। বলল ভোম্বল।

—সব শালা বেইমান বুঝলি ভোম্বল, সব বেইমান নইলে এত শীঘ্রই ওর মায়ের কথা ভুলে যায়। চল দেখি কেমন করে আজ যাত্রা করে।

উঠে পড়ল কানাই। ওর পিছনে পিছনে ভোম্বল, নন্দ ফটিকও রওনা হ'ল।

পরদিন একটু বেলাতেই বাড়ী ফিরল কানাই। কমলা তখন সবেমাত্র তেজপাতা আদা ইত্যাদি সহযোগে চা জাতীয় একটা পানীয় তৈরী করছিল। নবদ্বীপবাবুর একটু সর্দির ধাত তাই চায়ের পরিবর্তে এই ঔষধী পানীয়ই পান করেন।

কানাই চুপি চুপি কমলার পাশে এসে বসল। চমকে উঠল কমলা। ঘাড় তুলে তাকাতেই দাদাকে পাশে দেখে বাবার মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্য বললে, বাবা দাদা এসেছে।

সারা রাতটা কি উৎকণ্ঠাতেই কেটেছে কমলা ও নবদ্বীপ বাবুর। নবদ্বীপ বাবু মাঝে মাঝে ঘর থেকে উঠে এসে দেখে গেছেন কানাই এসেছে কিনা। কমলাও জেগেই ছিল। পল্লীটা ভাল নয়, সারা রাত্রি দুষ্ট লোকের আনাগোনা।

এক দণ্ডের জন্যে দরজা খুলে রাখবার উপায় নেই, তাই দরজাটা অর্গল বন্ধ করে দিয়েছিল কমলা, কিন্তু পাছে বন্ধ দরজা দেখে আর কাউকে কিছু না বলে ফিরে যায় কানাই, তাই জেগেছিল। দরজাটা একটু খুট করলেই যেন খুলে দিতে পারে। কিন্তু সারা রাত্রির মধ্যে আর আসে নি কানাই।

সকাল হতেই লক্ষ্মীমেলার বড় মালিক রাসবিহারী মল্লিক নবদ্বীপের কাছে এসে নালিশ করে গেছে—শুধু কানাইয়ের জন্যেই নাকি তার কয়েক হাজার টাকা জলে গেছে। যাত্রা হতে পারে নি, কানাইকে কমপ্লিমেণ্টারী পাস না দেওয়ার জন্যে সে নাকি বিজলীবাতির তার কেটে দিয়েছে।

এই নালিশ শোনা অবধি কানাইয়ের প্রতি একটা বিজাতীয় ক্রোধে গুমরে গুমরে উঠছিলেন নবদ্বীপ বাবু। ছেলেটার জন্যে একটা দিনও যদি শান্তি পাওয়া যায়। এবার তাকে ভাল ভাবেই শিক্ষা দেবেন নবদ্বীপ বাবু।

কন্যার আহ্বানে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন নবদ্বীপ বাবু, যাঃ বেরো, হতভাগা। বাড়ী ঢুকেছিস কোন্ লজ্জায়? বাপের মুখে চুণকালি যে ছেলে দিতে পারে তার মুখ আমি আর দেখব না।

সারা রাত্রির পর বাড়ীতে ফিরে আসায় কোথায় একটু

আদর সম্ভাষণ করবে, তা নয় সবাই অগ্নিশর্মা হয়ে আছে। ধ্যেৎ শালা! কোন জবাবই করল না কানাই।

—এখনও দাঁড়িয়ে থাকলি? নির্লজ্জ, বেহায়া। যা বেরিয়ে যা। কয়েক পা এগিয়ে এসে তর্জনী তুলে বললেন নবদ্বীপ বাবু।

—কেন? জিজ্ঞেস করল কানাই। অকস্মাৎ চোখ দুটি হয়ে উঠল সজল।

—যে গুণ্ডামী করে তার এখানে স্থান নেই।

—কোথায় গুণ্ডামী করলাম?

—মল্লিকদের লক্ষ্মীমেলার ইলেকৃট্রিকের তার কেটে দিয়েছিলি কেন?

—বেশ করেছি। ওরা বেইমান?

নবদ্বীপ বাবুর মাথায় রক্ত উঠে গেল। ক্ষণকালের জন্য হলেও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে গেলেন তিনি। রাগে সারাটা গা কাঁপতে সুরু করল। আর আপনাকে সামলে রাখতে না পেরে কানাইয়ের গালে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে বললেন, তুই আমার চোখের সামনে আসবি না হারামজাদা।

বেশ তাই হবে। এ বাড়ী ছেড়ে বেরিয়েই যাবে কানাই, ভারী ত দু'বেলায় দুটো খেতে দেন।

কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল কানাই। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে পাঁশুটে রঙের বাড়ীটার সামনে দাঁড়াল। তখনও তার পকেটে সেই সিল্কের ফিতেটা বিরাজ করছে। একবার পকেট থেকে বার করে চোখের সামনে রেখে দেখল তার পর আবার পকেটে রাখল। এটা যার তাকেই দিয়ে দেওয়া উচিত, তা ছাড়া বাড়ী ছেড়ে যখন চলেই যাচ্ছে তখন একবার শেষবারের মত ললিতাকে দেখে নেওয়ার প্রলোভন সামলাতে পারল না কানাই।

কয়েকটা সিঁড়ি উঠেই মনে পড়ল সেই মেনীমুখো ডাক্তারটার কথা। তাই আর না গিয়ে সেইখানেই দেওয়ালের গায়ে আঙুলের নখ দিয়ে লিখে দিল, 'ললিতা আমি তোমাকে ভালবাসি'।

এর পর? কোথায় যাবে? সারাটা দিন কি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবে? এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জটা খোলা থাকলেও না হয় রোদে দাঁড়িয়ে থেকে ঘণ্টা তিন কাটত, তারও উপায় নেই। চায়ের দোকানে গিয়ে বসে থাকবে? না, ব্যাটা আজকাল ভয়ানক তাগাদা দেয়। অগত্যা রাস্তাকেই গ্রহণ করতে হ'ল কানাইকে।

পরিচিত পথটা ছেড়ে দিয়ে সে জি. টি. রোডের রাস্তা ধরল। সম্মান আছে রাস্তাটার, এই রাস্তা দিয়েই কোন্ যুগ থেকে কত মহৎ ব্যক্তি করেছেন আনাগোনা। কত দুর্ধর্ষ সেনানী গিয়েছে সৈন্যবাহিনী নিয়ে। ঐতিহ্য আছে জি. টি. রোডের। এখানে পা দিলেই সুদূর অতীত তার সান্নিধ্যে এসে পড়ে। নিজেকে কেমন শক্তিমান বলে মনে হয় তার। চলতে চলতে খানিক দাঁড়াল কানাই, দূরে পোষ্ট আপিসটার কাছে কয়েকটা পতাকা দেখা যাচ্ছে না? ভাল করে তাকিয়ে দেখল কানাই। হাঁ, পতাকাই। তারই পিছনে একটা মিছিল। মিছিলটা এগিয়ে আসছে কানাইয়ের দিকেই।

মিছিলটি কাছে আসতেই ফেস্টুনের উপর বড় বড় হরফে লেখা শ্লোগানগুলি নজরে পড়ল তার। এরাও চাকরি চায়?

ওদের, আপন সগোত্র বলেই মনে হ'ল কানাইয়ের। সে এক পা দু'পা করে এগিয়ে গিয়ে মিশে গেল মিছিলটির সঙ্গে। হারিয়ে গেল কানাই।

স্বপ্ন-মনস্তত্ত্ব

শ্রীনরেন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

মৃত্যু মানুষের নিকট চিরদিনই এক রহস্যময় ঘটনা। আজ পর্য্যন্তও এর যথার্থ কারণ সে খুঁজে পায় নি। কিন্তু এই মৃত্যুর রহস্য ভেদ করতে গিয়েই মানুষ উদ্‌ঘাটিত করেছে আধ্যাত্মিক জগতের অনেক বিস্ময়কর তথ্য। মৃত্যুর ন্যায়ই মানবজীবনের আর একটি বিস্ময়কর ঘটনা হচ্ছে স্বপ্ন। যুগ-যুগান্তর থেকে মানুষ এর রহস্য জানতে চেষ্টা করছে এবং এই রহস্যভেদ করতে গিয়ে মানবমনের যে সব তথ্য উদঘাটিত হয়েছে তাও কম বিস্ময়কর নয়।

স্বপ্ন কেন আমরা দেখি? জাগ্রত জগতের সঙ্গে স্বপ্নজগতের কি সম্পর্ক? স্বপ্নের সাহায্যে আমরা কি পরলোকের বা অন্য জগতের কথা জানতে পারি? মৃত ব্যক্তির আত্মা স্বপ্নে দেখা দেয় কি? এরকম ধরনের বহু প্রশ্নই আমাদের মনে প্রতিনিয়ত উঠে থাকে। সেই অনুসন্ধিৎসু মনকে জানাবার জন্য যাঁরা মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা চালিয়েছেন এ প্রবন্ধে আমি তাঁদেরই কথা আলোচনা করব।

সেই সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথম যাঁর কথা মনে আসে তিনি হচ্ছেন ডাঃ সিগমুণ্ড ফ্রয়েড। বহু বছর ধরে তাঁর গবেষণার ফলে স্বপ্নজগতের যে সব মূল্যবান তত্ত্ব উদঘাটিত হয়েছে তাতে বর্ত্তমান মনস্তত্ত্ব বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছে। ডাঃ ফ্রয়েডের স্বপ্ন-মনস্তত্ত্ব বুঝতে হ'লে তিনি অবচেতন মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে যা বলেছেন তা একটু বলা প্রয়োজন।

ফ্রয়েডের মতে মানবমনের তিনটি স্তর আছে—চেতন, প্রাক্‌-চেতন ও অচেতন এবং মানবব্যক্তিত্বের তিনটি সত্ত্বা আছে,—ইগো, সুপার-ইগো ও ইদ। তিনি বলেছেন, আমাদের মনের অধিকাংশ অবচেতন বা অচেতনে নিহিত রয়েছে, আর এই অচেতন মন নিষ্ক্রিয় নয়। সেটা চেতন মনের ন্যায়ই ক্রিয়াশীল। কেবল তাই নয়, চেতন মনের অনেক কার্য্য অচেতন মনের দ্বারা অহরহ প্রভাবান্বিত হয়, যদিও তা আমরা জানতে পারি না। অচেতন মনের কার্য্যাবলী আমরা বিশেষ কোন প্রক্রিয়া ব্যতীত কোনক্রমেই চেতন মনে জানতে পারি না। কিন্তু প্রাক্‌চেতন মনের কার্য্য একটু চেষ্টার দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়। ইদ, ইগো, ও সুপার-ইগো সম্বন্ধে ফ্রয়েড যা বলেছেন তা সংক্ষেপে বলতে গেলে এই বলা যায়:

ইদ—এর কার্য্য অচেতন মনের দ্বারা সংঘটিত হয়; এ নীতি-বোধশূন্য ও যুক্তি মানে না; এর কার্য্যাবলীর সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কোন প্রকারে সুখভোগ চরিতার্থ করা ও এটা সমস্ত জৈবিক সহজাতবৃত্তিগুলির আধার।

ইগো—চেতনশীল ও বাস্তবজগতের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে এর চলতে হয়। তাই একে যুক্তি মানতে হয়, একে তিনটি বিষয়ের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করতে হয়,—যথা, (ক) বহির্জ্জগত, (খ) পাশব সুখভোগের জন্য ইদের চাহিদা এবং (গ) সুপার-ইগোর অনুশাসন।

সুপার-ইগো—শিশুর জীবনের সুরু থেকেই এ ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে আরম্ভ করে শিক্ষা, ধর্ম্ম, কৃষ্টি, সামাজিক অনুশাসন, শিক্ষক, গুরুজনের উপদেশ ও বিভিন্ন আদর্শের দ্বারা। এ ইদের কার্য্যের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে ইগোর কার্য্যকে নিয়ন্ত্রিত করে। চেতন ও অবচেতন উভয় মনের উপরই এর প্রভাব রয়েছে। এটাই ইগোর মধ্যে নীতিবোধ জাগায়। এজন্য একে বিবেক বলা যেতে পারে।

সুতরাং এ দ্বারা আমরা বুঝি যে মানবব্যক্তিত্বের যে তিনটি সত্ত্বা আছে তাদের মধ্যে অহরহ দ্বন্দ্ব চলছে। ইগো হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব যাকে বাস্তবজগতের সঙ্গে কার্য্যের যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়। একদিকে সুপার-ইগো ও অন্যদিকে ইদ এই দোটানার মধ্যে থেকে ইগোকে এদের মধ্যে সমন্বয় বা সামঞ্জস্য রেখে চলতে হয়। পতঙ্গ কেবলমাত্র ইদের দ্বারা চালিত হয়। তাই আগুন দেখে তাকে উপভোগ করতে পতঙ্গ তাতে ঝাঁপ দিয়ে আপন প্রাণ হারায়। যদি ওর মধ্যে ইগোর প্রকাশ থাকত তবে হয়ত ঝাঁপ না দিয়ে দূর থেকে আগুনের সৌন্দর্য্য উপভোগ করত। মানুষের মধ্যেও এই ইদের কাজ তার অবচেতন মনে অহরহ চলছে। কিন্তু তার বেশীর ভাগই চেতন মনে আসতে পারে না, কেন না ইগোর এবং সুপার-ইগোর তাতে মত নেই। অতি শৈশব অবস্থায় অবশ্য ইদের কাজ স্বাভাবিক ভাবেই চলতে থাকে, কিন্তু ধীরে ধীরে মানবশিশুর মধ্যে ইগোর প্রভাব বর্দ্ধিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইদের প্রয়োজন সে পূরণ করতে নারাজ হয়। ক্রমে যখন তার সুপার-ইগো বর্দ্ধিত হয় তখন সে ইদের কাজ এবং ইগোর যে সব কাজ ও ভাব সমাজ, শিক্ষা ও কৃষ্টিবিরুদ্ধ তাতে বাধা দেয়। এতে শিশুর মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। এই দ্বন্দ্বের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য সে ঐ সমস্ত কার্য্য ও ভাবগুলি ভুলে যায় বা নির্জ্ঞান মনে ঠেলে দেয়। পূর্ব্বেই বলেছি আমাদের অচেতন মন অত্যন্ত ক্রিয়াশীল। এজন্য ইদ তার ভোগাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির জন্য আবার সেগুলি চেতন মনে জাগাবার চেষ্টা করে। কিন্তু ইগো ও সুপার-ইগো এজন্য এক কড়া প্রহরীকে চেতন ও অবচেতন মনের সীমানায় বসিয়ে রেখেছে। তাই বলে ইদ চুপ

করে বসে থাকে না, সে প্রহরীকে ফাঁকি দিয়ে চেষ্টা করে ঐসব অবদমিত ভাবসমূহকে আবার চেতন মনে কার্য্য করাতে। এজন্য অবদমিত ভাবসমূহকে সে অবস্থাভেদে বিভিন্ন ছদ্মবেশে পাঠায়।

নিদ্রাকালে আমাদের মানসিক বৃত্তিগুলি শিথিল হয়ে পড়ে। জাগ্রত অবস্থায় যে শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণ মনের থাকে তা অনেকটা নষ্ট হয়ে যায় এবং মনের প্রহরীও কিছুটা অসতর্ক হয়ে পড়ে। ফলে নানারূপ অদ্ভুত চিন্তা ও দৃশ্য মনে উদিত হয় এবং অবদমিত ইচ্ছা ও ভাবসমূহ তখন চেতন মনে এসে কাজ করতে সর্ব্বোত্তম সুযোগ পায়। নিদ্রাকালে যে প্রক্রিয়ার দ্বারা চেতন মনে এইসব কার্য্য চলে তাকেই বলে স্বপ্ন।

আধুনিক পাশ্চাত্য স্বপ্নতত্ত্ব আলোচনা করলে দেখা যায় বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে স্বপ্নের কারণ নির্ণয়ের দুটি ধারা আছে। একদল স্বপ্নের কারণ শারীরিক বলে মনে করেন; আর একদল মনে করেন স্বপ্নের কারণ মনের মধ্যেই আছে। একথা সত্য যে, শারীরিক উত্তেজনার দ্বারা স্বপ্ন সৃষ্টি হতে পারে। ধরা যাক, পাঁচজন লোক একই স্থানে ঘুমুচ্ছে। যদি বাইরে থেকে কয়েক ফোঁটা শীতল জল তাদের দেহে ফেলা যায়, তবে তারা সকলেই স্বপ্ন দেখবে, কিন্তু তাদের প্রত্যেকেরই স্বপ্নের বিষয়বস্তু আলাদা হবে,—কেউ দেখবেন বৃষ্টি হচ্ছে, কেউ হয়ত দেখবেন শীতল জলে স্নান করছেন, আবার কেউ দেখবেন খুবই ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। ঘড়িতে এলার্ম বাজার শব্দ বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্নরূপে স্বপ্ন ঘটাতে পারে,—যেমন এক পাদ্রী হয়ত স্বপ্ন দেখবেন প্রার্থনায় যাওয়ার জন্য গির্জ্জায় ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছে, কোন ছাত্রের নিকট ঐ শব্দ কলেজের বেল বাজছে হতে পারে, কোন কৃপণ ব্যক্তির স্বপ্ন হতে পারে স্বর্ণমোহর গোনা হচ্ছে, আবার কেউ হয়ত স্বপ্ন দেখবেন নর্ত্তকী নূপুরধ্বনি করে নৃত্য করছে।

সুতরাং এ দ্বারা বোঝা যায় শারীরিক উত্তেজনা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক। এই উভয়ের দ্বারা স্বপ্নের সৃষ্টি হলেও এর বিষয়বস্তু কি হবে তা নির্ভর করে স্বপ্নদ্রষ্টার মনের অবস্থার উপর।

ফ্রয়েডের মতে স্বপ্ন ঘুমের অবস্থায় একটি মানসিক ঘটনা যদ্দ্বারা অবচেতন মনের অবদমিত ভাব ও ইচ্ছাসমূহ চেতন মনে আসতে পারে। তিনি মনে করেন আমাদের প্রায় সমস্ত স্বপ্নই কোন না কোন ইচ্ছা পূর্ণতা লাভের চেষ্টা করে। স্বপ্নের মাধ্যমে আমাদের দু' প্রকার লাভ হয়—(ক) মনের অনেক অসম্পূর্ণ ইচ্ছা কাল্পনিক ভাবে পরিতৃপ্ত হয় ও এতে মনে শান্তি আসে। (খ) অনেক স্থলে নিদ্রার ব্যাঘাত দূর হয়। নিদ্রার ব্যাঘাত দূর হয় বলেই ফ্রয়েড বলেছেন স্বপ্ন নিদ্রারক্ষক। পূর্ব্বের কথিত দৃষ্টান্তে শীতল জলের স্পর্শ ও ঘণ্টাধ্বনি যদি ঘুমন্ত ব্যক্তিদের মনে স্বপ্নের সৃষ্টি না করত তবে নিশ্চয়ই তাদের ঘুম ভেঙে যেত। ফ্রয়েডের এ মত সাধারণ লোকের মতের ঠিক উল্টো। সাধারণ লোক মনে করে, স্বপ্ন দেখলে নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। ধরুন ঘুমের মধ্যে এক ব্যক্তি খুব তৃষ্ণার্ত্ত হলেন। খুব সম্ভব তিনি স্বপ্ন দেখবেন যে, একগ্লাস ঠাণ্ডা সরবত পাচ্ছেন। মনে করুন, এক ব্যক্তি পরীক্ষায় ফেল করেছেন। এতে তাঁর মনে তীব্র অশান্তি ও দুঃখ হ'ল। এই মানসিক অশান্তি তাঁর নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাবে। কিন্তু তিনি যদি স্বপ্ন দেখেন যে, পরীক্ষায় বেশ ভাল ফল করেছেন তবে এতে মনে শান্তি আসবে ও সঙ্গে সঙ্গে সুনিদ্রা হবে। অনেক সময় আমরা ভয়ের স্বপ্ন দেখি। এতে আমাদের ঘুমের ব্যাঘাত হয় বা ঘুম ভেঙে যায়। কিন্তু ফ্রয়েডের মতে এখানেও কোন না কোন ইচ্ছা ছদ্মবেশে পরিতৃপ্ত হয়—অর্থাৎ ভয়ের স্বপ্নে আমাদের অতৃপ্ত ইচ্ছা সোজাসুজি চরিতার্থ না হয়ে গুপ্তভাবে পরিতৃপ্ত হয়।

এক্ষণে দেখা যাক স্বপ্নে কি ভাবে ইচ্ছা পূরণ হয়। স্বপ্নে যে সব ইচ্ছা পূরণ হয় তার মধ্যে কতকগুলি জ্ঞাত ইচ্ছা ও অন্যগুলি অজ্ঞাত ইচ্ছা। প্রথম প্রকারের ইচ্ছা স্বপ্নে সোজাসুজি পূরণ হতে পারে—যেমন মনে করুন আমি পায়েস খেতে খুব ভালবাসি, কিন্তু অর্থাভাবে দুধ কিনতে পারি না ও পায়েস খাওয়াও হয় না। স্বপ্নে দেখলাম আমার কোন বন্ধু নিমন্ত্রণ করেছেন ও আমি সেখানে প্রচুর পায়েস খাচ্ছি। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের ইচ্ছা সম্বন্ধে আমাদের চেতন মন কিছুই জানে না। কেননা তা' বিবেক ও সমাজের অনুমোদন না থাকায়, নির্জ্জানে রয়েছে। এই অবদমিত ইচ্ছাই নিদ্রার সময় প্রকাশের সুযোগ নেয়। সেইজন্য দেখা যায় অতি শৈশবের অনেক অবাঞ্ছিত ঘটনা বা ইচ্ছা যার সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান বা স্মৃতি নেই স্বপ্নে তা প্রকাশ পায়। এ দ্বারা এই মনে হয় হয়ত কোন অভিজ্ঞতাই আমরা একেবারে ভুলি না। মনঃসমীক্ষণ বিশ্লেষণ দ্বারা জানা গিয়েছে যে বেশীর ভাগ স্বপ্নেই শৈশবের কোন না কোন স্মৃতির সন্ধান পাওয়া যায়। পরবর্ত্তীকালে অবদমনের ফলে যে সকল ইচ্ছার অস্তিত্ব আমরা বিস্মৃত হই বাল্যকালে তার মধ্যে অনেকগুলি আমাদের মনে স্পষ্ট থাকে। শৈশবের ঘটনাসমূহের সঙ্গে পরবর্ত্তীকালের রুদ্ধ ইচ্ছা নানারূপে জড়িত, এজন্য স্বপ্নে বাল্যকালের ঘটনার সমাবেশ অধিক হয়।

শিশুকে আমরা যে চোখে দেখি—যেন স্বর্গের একটি সদ্য-প্রস্ফুটিত ফুল—বাস্তবিক পক্ষে হয়ত তা নয়। অনেকের ধারণা কামপ্রবৃত্তির উন্মেষ বয়ঃসন্ধিকালে হয়ে থাকে; কিন্তু ডাঃ ফ্রয়েড ও বর্ত্তমান মনঃসমীক্ষণবিদগণ বলেন, শিশুর কামজীবন অতি বৈচিত্র্যময় এবং এই কাম প্রবৃত্তি ছাড়াও অন্যান্য অনেক অসামাজিক ভাব শিশুর মনে রয়েছে। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে এই সব অসামাজিক কামবৃত্তিগুলি কখনই একেবারে নষ্ট হয় না, নির্ব্বাসিত হয়ে রুদ্ধ অবস্থায় তারা অজ্ঞাত মনে থেকে যায়। এই রুদ্ধ প্রবৃত্তি হতেই পরবর্ত্তীকালে মানসিক রোগের উৎপত্তি হতে পারে। সম্পূর্ণ সুস্থ ব্যক্তির অজ্ঞাত মনেও শৈশবের অসামাজিক যৌনবৃত্তি রুদ্ধ অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অবদমিত ইচ্ছা বহুকাল রুদ্ধ থাকলেও ধ্বংস হয় না। জেলখানায়

দুর্দান্ত কয়েদীর মত সুযোগ পেলেই বাইরে এসে নিজ অভীষ্ট-সাধনের চেষ্টা করে। এই রুদ্ধ ইচ্ছা যাতে চেতনায় আসতে না পারে তার জন্য যে মানসিক প্রতিক্রিয়া হয় এই দুয়ের কোনটাই আমরা জানতে পারি না, কেননা এটা নির্জ্ঞান মনে সম্পাদিত হয়। নিদ্রাবস্থায় মনের প্রহরী অসতর্ক হলে সেই সুযোগে অবদমিত ইচ্ছা বিভিন্ন ছদ্মবেশে ও নানা প্রকার প্রতীকের সাহায্যে চেতন মনে আসার চেষ্টা করে এবং তখনই আমরা স্বপ্ন দেখি। তদ্রূপ মানসিক রোগের লক্ষণগুলিও প্রহরীকে ফাঁকি দিয়ে বা অভিভূত করে অবদমিত ইচ্ছার প্রকাশের চেষ্টার ফলেই উৎপন্ন হয়। অবদমিত বা রুদ্ধ ইচ্ছা ছদ্মবেশে যে ক্রিয়া দ্বারা চরিতার্থতা লাভের চেষ্টা করে সেই ক্রিয়াকে প্রতীক ক্রিয়া আর যে আকারে রুদ্ধ ইচ্ছা প্রকাশ পায় তাকে প্রতীক রূপ বলে। প্রহরী যত বেশী কঠোর স্বপ্নের প্রতীক তত বেশী দুর্জ্ঞেয় হবে। এজন্য অতি উচ্চ-শিক্ষিত কৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির স্বপ্নে প্রতীক ক্রিয়া বেশী হবে। কিন্তু অনেক সময় কেবল প্রতীকের সাহায্যে প্রহরীকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। সেজন্য স্বপ্নে আরও কতকগুলি পরিবর্তন ঘটে থাকে—এগুলি যথাক্রমে অভিক্রান্তি, সংক্ষেপণ ও নাটন।

স্বপ্নের অর্থ

অতি প্রাচীন যুগ থেকেই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ব্যক্তি স্বপ্নের নানারূপ ব্যাখ্যা করে এসেছেন; কিন্তু তাতে কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি না থাকায় সে সব আলোচনার কোন মূল্য নেই। পাশ্চাত্ত্য দেশে ফ্রয়েডই সর্বপ্রথম স্বপ্নের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন। স্বপ্নের অর্থ বের করতে গিয়ে তিনি প্রধানতঃ যে উপায় অবলম্বন করেছেন তার নাম—Free Association Method বা অবাধ ভাবানুষঙ্গ পদ্ধতি। স্বপ্নে যা দেখা যায় ফ্রয়েড তার নাম দিয়েছেন ব্যক্ত অংশ আর স্বপ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মনের যে সব চিন্তা ও ভাব গুপ্ত অবস্থায় থাকে তাকে বলেছেন স্বপ্নের অব্যক্ত অংশ। এই অব্যক্ত অংশের সন্ধান না মিললে স্বপ্নের অর্থ বের করা যায় না। পিতার প্রতি ভক্তি ভালবাসার ইচ্ছা ত যেমন আমাদের সকলের মধ্যে আছে সেই সঙ্গে তাঁর প্রতি একটা বিরুদ্ধ ভাবও আমাদের মনের মধ্যে থাকতে পারে। যে সব ছেলে পিতার মৃত্যুতে অনেক সম্পত্তি ও ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারী হয়, তাদের অবচেতন মনে "বাবা মরুক" এই অন্যায় ইচ্ছা অজ্ঞাত ভাবে থাকা অসম্ভব নয়। তারা হয়ত রাত্রে সোজাসুজি স্বপ্ন দেখতে পারে যে, বাবা হঠাৎ মারা গিয়েছেন, কিন্তু মনের প্রহরী যদি বেশী হুঁসিয়ার হয় তবে হয়ত প্রতীক ক্রিয়া দ্বারা পিতার মৃত্যু-ইচ্ছা স্বপ্নে পূরণ হতে পারে।

ভারতবর্ষের একজন বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ ডঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু এইরূপ একটি স্বপ্ন বিশ্লেষণ করেছিলেন। স্বপ্নটির বিশ্লেষণ ডঃ বসু তাঁর স্বপ্ন নামক বইতে উল্লেখ করেছেন। স্বপ্নটি দেখেছিলেন তাঁর এক বন্ধু। স্বপ্নটি হচ্ছে, "তে-তলার ষ্টুডিয়োর পশ্চিমদিক ভেঙে পড়ে গেল" এটাই স্বপ্নের ব্যক্ত অংশ। ডঃ বসু অবাধ ভাবানুষঙ্গের সাহায্যে স্বপ্নটির অব্যক্ত অংশটি বের করে দেখালেন যে, উক্ত বন্ধুটির অজ্ঞাত ইচ্ছা ছিল পিতার মৃত্যু। কেন না ষ্টুডিয়োর ঠিক নীচে তাঁর বাবার ঘর এবং ষ্টুডিয়োটি ভেঙে পড়লে বাবার নিশ্চয়ই মৃত্যু হবে একথা অবাধ ভাবানুষঙ্গের সাহায্যে বন্ধুটির মুখ থেকে প্রকাশ হয়েছিল।

পাশ্চাত্ত্য মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে স্বপ্ন নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন, তাঁদের মধ্যে ফ্রয়েড ছাড়া ইউঙ্গ ও অ্যাডলারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইউঙ্গ ও অ্যাডলার উভয়েরই স্বপ্ন ব্যাখ্যা ফ্রয়েডের ব্যাখ্যা থেকে কিছুটা ভিন্ন। এখানে তাঁদের স্বপ্নতত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়। তবে সংক্ষেপে এই বলা যেতে পারে, ফ্রয়েড স্বপ্নে অতীত ইচ্ছার পরিতৃপ্তির কথাই বলেছেন। অ্যাডলার এবং ইউঙ্গ স্বপ্নে অতীত ইচ্ছার অস্তিত্ব অস্বীকার না করলেও যথাক্রমে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ইচ্ছা ও কার্যক্রমের উপর জোর দিয়েছেন। ফ্রয়েডের মতে স্বপ্নে রুদ্ধ ইচ্ছার প্রকাশ অধিকাংশই কামভাব হতে উদ্ভূত। ইউঙ্গ ও অ্যাডলার একথা মানেন নি। ইউঙ্গের মতে স্বপ্নে অতীত ইচ্ছার পরিতৃপ্তি ছাড়াও ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সমস্যার সমাধানে প্রতীক নির্দেশ থাকে।

অ্যাডলারের মতে স্বপ্নে বর্তমান সমস্যা সমাধানে মন কিভাবে কার্য করছে তা প্রকাশ হয়।

অনেকের ধারণা পাশ্চাত্ত্য মনোবিজ্ঞানে স্বপ্ন সম্বন্ধে যা গবেষণা হয়েছে সেটাই বর্তমানে স্বপ্ন সম্বন্ধে শেষ কথা, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা স্বপ্ন সম্বন্ধে যা বলেছেন তা আলোচনা করলে বোঝা যায় যে, পাশ্চাত্ত্য স্বপ্নতত্ত্ব যে মনস্তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত তা কত সঙ্কীর্ণ এবং অর্দ্ধসত্য ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ। শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা স্বপ্নকে অনেক ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছেন এবং পাশ্চাত্ত্য মনোবিজ্ঞানীদের তুলনায় এর উপর অনেক বেশী মূল্য আরোপ করেছেন। এ সম্পর্কে শ্রীমায় একটি কথা এখানে উল্লেখ করলে বোঝা যায় তিনি স্বপ্নের উপর কত গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমরা জীবনের এক-তৃতীয়াংশ সময় ঘুমিয়ে কাটাই। ঐ সময় স্বপ্নের মাধ্যমে আমাদের জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ হয় ও বিবিধ ঘটনা ঘটে থাকে, অথচ ঐ এক-তৃতীয়াংশ জীবনের অভিজ্ঞতা ও ঘটনাসমূহ জাগ্রত জীবনের কাজে না লাগিয়ে নষ্ট হতে দিই। জাগ্রত জীবনে কার্য্যাবলী আমরা নিয়ন্ত্রণ করি, অভিজ্ঞতাসমূহকে সমস্যা সমাধানের কাজে লাগাই এবং এ দ্বারা জীবন উন্নত করার চেষ্টা করি। একই ভাবে স্বপ্নের কার্য্যাবলীকে যেমন ইচ্ছা তেমন চলতে দিয়ে জীবনের ঝঞ্ঝাট ও বাধাকে বাড়িয়ে না তুলে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন; এবং ঐ সময় মনেরও বিশ্ব-প্রকৃতির বিভিন্ন স্তরে যে অভিজ্ঞতা লাভ হয় তার দ্বারা জীবন উন্নত করার চেষ্টা করা যেতে পারে।

আমরা এ পর্য্যন্ত দেখেছি যে, স্বপ্নের মূল কারণ অচেতন মনেই রয়েছে। কিন্তু এই অচেতন মন সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য মনস্তত্ত্ববিদগণ যা জেনেছেন তা শ্রীঅরবিন্দের মতে সম্পূর্ণ অচেতন মনের এক-

দিকের খানিকটা অংশমাত্র। শ্রীঅরবিন্দ সম্পূর্ণ অচেতন মনকে বলেছেন, "সাবলিমিনাল"। এই সাবলিমিনালের যে অংশ মনের নীচের দিকে রয়েছে সেটাই অন্ধকারপূর্ণ কামনা বাসনাময় ইদের রাজ্য। শ্রীঅরবিন্দ সাবলিমিনালের এই নীচের অংশকে বলেছেন সাবকন্‌সিয়েণ্ট, যাকে ফ্রয়েড বলেছেন সাবকন্‌সাস। কিন্তু সাবলিমিনালের উপরের অংশ সুপার-কন্‌সিয়েণ্টের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করেছে—ফলে মানবের মধ্যে নিহিত পশুমানব যেমন তার আকাঙ্ক্ষা বাসনা স্বপ্নের সাহায্যে চরিতার্থ করতে চায়, তেমনিভাবে মানুষের মধ্যে নিহিত সেই মহামানব তার অন্তরাত্মা স্বপ্নের মাধ্যমে উচ্চস্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে থাকেন। অচেতন মনের সম্পূর্ণ রূপটি পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ববিদগণ জানতে পারেন নি বলে উচ্চস্তরের স্বপ্ন সম্বন্ধে তাঁরা কিছু বলতে পারেন নি।

শ্রীঅরবিন্দের মতে স্বপ্নকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে—প্রথম শ্রেণীর স্বপ্নকে বলে সাব-কনসিয়েণ্ট বা সাব-কনসাস যার কথা ফ্রয়েড বলেছেন, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর স্বপ্ন হচ্ছে সাবলিমিনাল স্বপ্ন যার সাহায্যে জীবনকে উর্দ্ধে তোলার চেষ্টা করা যায়। কেননা ঐ স্বপ্ন দ্বারা উচ্চস্তরের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে। প্রথম প্রকার অর্থাৎ সাবকনসাস স্বপ্ন আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায় তার এক জাতীয় স্বপ্ন অনেকাংশে শারীরিক অবস্থার দ্বারা উদ্ভূত হয়, যেমন স্বাস্থ্যের অবস্থা, হজমের ব্যাঘাত, শয়নের অবস্থাভেদ ইত্যাদি। কিছুটা আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ও সতর্কতা অবলম্বন দ্বারা এরূপ স্বপ্নের জাল থেকে নিজেকে অনেকটা মুক্ত করা যায়। দ্বিতীয় প্রকার স্বপ্ন ঘটে অবচেতন মনের গভীর স্তর থেকে। এই স্বপ্নসমূহ বিবিধ প্রকারের ও বৈচিত্র্যময় হয়। এপ্রকার স্বপ্নগুলি ঘটে চেতন মনের প্রহরী বা বিবেক ঘুমের অবস্থায় শিথিল হয়ে পড়লে আমাদের অবচেতন মনে রুদ্ধ বা অবদমিত ইচ্ছা বা ভাবসমূহের প্রকাশের চেষ্টা দ্বারা, যার কথা ফ্রয়েড বিশেষভাবে বলেছেন। যে সাধক দিবাভাগে নানারূপ সৎকার্য্য, জপ-তপ বা ধ্যান-ধারণা করে কাটান তিনি রাত্রিতে স্বপ্নের মাধ্যমে তার অধঃপতন দেখে খুব বিস্মিত হন; এবং যে স্বপ্নের দ্বারা তিনি রাত্রিতে লাঞ্ছিত হয়েছেন তার প্রভাবে জাগ্রত মনের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হওয়ার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হন। অবচেতন মনে নিহিত এ কালিমা ও নোংরা ভাবসমূহ যা মানুষের মনের বিবিধ রোগ ও বিকৃতির কারণ, যা মানবজাতিকে যুগ-যুগান্তর ধরে অন্যায় ও পাপকার্য্যে লিপ্ত করাচ্ছে তা অনেক সময় স্বপ্নের মাধ্যমে প্রকাশ পায় বলে মনঃসমীক্ষণ কার্য্যে 'স্বপ্ন-বিশ্লেষণ' একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। অবচেতন মনের অন্ধকার গুহায় মানবব্যক্তিত্বের যে বর্ব্বর ও আদিম সত্তাটি রয়েছে তার পরিশুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত মানুষ প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধ ও পবিত্র হয় না। সমস্ত জীবন ধরে সংযম শিক্ষা করে, সংযত ও সংজীবন যাপন করে যদি তার রাত্রির সুষুপ্তি-জীবন কলঙ্কিত হয় তবে জাগ্রত জীবনের সব সংযম ও চেষ্টা ব্যর্থই হয়ে গেল বলতে হবে। বাস্তবিকপক্ষে স্বপ্নই আমাদের জীবনের পবিত্রতার মাপকাঠি। যখন দেখা যাবে স্বপ্ন কামনা বাসনা দ্বারা বিক্ষুব্ধ নয়, কোন হানাহানি, সংঘাত ও দ্বন্দ্ব তাতে নেই এবং স্বপ্নের মধ্যেও আমরা শান্ত, সমাহিত ও পবিত্র তখনই বুঝব আমাদের জীবনে সত্যিকারের পবিত্রতা লাভ হয়েছে, তখন স্বপ্নের অভিজ্ঞতা আমাদের জাগ্রত জীবনের সাধনাকে ব্যাহত না করে এগিয়ে দেবে।

দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ সাবলিমিনাল স্বপ্ন সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের বা অন্য শ্রেণীর। এই সাবলিমিনালই আমাদের অন্তর মন, অন্তর প্রাণ ও সূক্ষ্ম দেহকে ধারণ করে রেখেছে। এদের দ্বারাই সাবলিমিনাল বিশ্ব প্রকৃতি ও বিশ্ব-চেতনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগসূত্র স্থাপন করতে পারে। ফলে উচ্চস্তরের বিভিন্ন সত্তার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটাতে পারে। এজন্য এ শ্রেণীর স্বপ্নের দ্বারা আমাদের জীবনে আধ্যাত্মিক প্রভাব আসতে পারে, কোন দুরূহ ও জটিল সমস্যার সমাধান হতে পারে, ভবিষ্যৎ কার্য্যপন্থা সম্পর্কে উপদেশ বা নির্দ্দেশ থাকতে পারে। এ সব স্বপ্নের মধ্য দিয়েই বিভিন্ন প্লেনে সংঘটিত ঘটনাসমূহের দর্শন ও অভিজ্ঞতা লাভ হয় এবং আমাদের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবন বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হতে পারে।

স্বপ্ন কেন আমরা ভুলে যাই এর উত্তর দিতে গিয়ে শ্রীমা স্বপ্ন সম্বন্ধে যা বলেছেন তার কিছু কিছু এখানে উল্লেখ করছি। শ্রীমা বলেছেন, আমরা সারারাত ধরেই স্বপ্ন দেখি; রাত্রের প্রথম ভাগে যখন আমরা ঘুমিয়ে পড়ি তখন দেহ শিথিল হয়ে যায় ও বিশ্রাম লাভ করে। ঐ সময় আমাদের প্রাণময় সত্তা অর্থাৎ ভাইটালও বিশ্রামের জন্য নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে, কিন্তু মনের কার্য্য তখন চলতে থাকে, মনের এ কার্য্যের জন্য যে স্বপ্নের সৃষ্টি হয় তাকে বলে মানসিক স্তরের স্বপ্ন। কিছুক্ষণ পরে মন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, আর সেই সময় আমাদের ভাইটাল বা প্রাণময় সত্তা ক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে এবং তার কার্য্য চলতে থাকে। এ সময় আমরা কখনও কখনও দেহ ছেড়ে বহির্গত হই এবং বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করি; এই ভ্রমণের পথে হয়ত কোনও সময় ভাইটাল প্লেনের অন্যান্য সত্তা দ্বারা আক্রান্ত বা উৎপীড়িত হই। আবার সময় সময় আমরাও অনেক দুঃসাহসিক কার্য্য করে থাকি। কখনও বা ভয়ের স্বপ্নের দ্বারা যন্ত্রণা ভোগ করি; ঐ স্বপ্নকে আমরা Nightmare বা দুঃস্বপ্ন বলি। এ ঘটে থাকে যখন কোন ভাইটাল প্লেনের সত্তা দ্বারা আমরা আক্রান্ত হই, তখন তাড়াতাড়ি করে দেহে ফিরে আসতে চাই, দেহে ফিরে আসতেই ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং স্বপ্নের বিপদে পড়ার কথা স্মরণ থাকে। এ সময়ের স্বপ্নকে বলে ভাইটাল বা প্রাণময় স্তরের স্বপ্ন। কিছুক্ষণ ধরে আমাদের ভাইটাল সত্তার এ ভাবে কার্য্য চলতে থাকায় তা ক্লান্ত হয়ে পড়ে ও বিশ্রাম করার জন্য নিস্তব্ধ হয়ে যায়। তখন জেগে উঠে আমাদের সূক্ষ্ম দৈহিক সত্তা এবং তখন যে স্বপ্নগুলি হয় তাকে বলে দৈহিক স্বপ্ন। এই স্বপ্নগুলি ঘটে শেষ রাত্রের দিকে, ঘুম শেষ হবার পূর্ব্বে। সুতরাং ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই দৈহিক স্বপ্নের কথা স্মরণ করতে পারি, কিন্তু ওর পূর্ব্বে ভাইটাল ও মানসিক স্বপ্নগুলির কথা স্মরণ করতে পারি

না যদি না তখনই ঘুম ভেঙ্গে যায়। এর কারণ এই তিনটি বিভিন্ন স্তরের মধ্যে কোন সেতু নেই। সেই সেতু তৈরি করা খুব সহজ কাজ নয়, হাওড়ার ঝুলানো সেতুর চাইতেও অনেক কঠিন কাজ। এখানে লক্ষ্য করা যেতে পারে পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ স্বপ্ন কেন ভুলে যাই এ সম্বন্ধে যা বলেছেন তার যুক্তি যথেষ্ট নয় এবং সকল প্রকার স্বপ্নকে তাঁদের যুক্তিতে আনা যায় না।

কি করে সব স্বপ্নগুলির কথাই আমরা স্মরণ করতে পারি সে সম্পর্কে শ্রীমা একটি পন্থার উল্লেখ করেছেন। যখনি আমাদের ঘুম ভেঙে যায়, তখন কোনরূপ নড়াচড়া না করে সেই ভাবেই শুয়ে থাকতে হয় এবং শেষের দিকে স্বপ্নের যে অংশটুকু মনে আছে, তাকেই সূত্র ধরে ধীরে ধীরে পিছন দিক থেকে এগিয়ে যেতে হয়। হয়ত খাপছাড়া দূরের দু' একটি অংশ মনে পড়বে, কিন্তু কিছুক্ষণ ধরে এই চেষ্টা করলে হয়ত একটি ক্রমিক ও সুসংবদ্ধ যোগসূত্র উদ্ধার করা যায়। অবশ্য দু' একদিনের চেষ্টায় এ হয় না, অনেক দিন ধরে চেষ্টা করলে সফল হওয়া যায়। এই প্রক্রিয়া সাধকের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়, কেননা এরূপ স্বপ্ন বিশ্লেষণ দ্বারা নিজেকে অনেকখানি জানা যায়।

কোন কোন সময় এরূপ ঘটে যে, বহির্জগতে কোন ব্যক্তিকে দেখে হঠাৎ মনে হয় এর পূর্ব্বেই তাকে যেন দেখেছি ও তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলেছি; এ কি করে সম্ভব হয়? এর উত্তর Conversation with the mother বইতে এক স্থানে পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, এদের দুজনার ভিতরে মনোময় ও প্রাণময় প্লেনে একটা একতা রয়েছে। সেজন্য ঐ দুই ব্যক্তির এ জগতে দেখা হবার পূর্ব্বে স্বপ্নের মাধ্যমে বিশ্ব মনোময় স্তরে ও বিশ্ব প্রাণময় স্তরে পরস্পরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং হয়ত পৃথিবীতে যেরূপ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে সেরূপ সম্পর্ক ছিল।

স্বপ্নের সঙ্গে আমাদের খাদ্যের কোন যোগাযোগ আছে কিনা সে সম্পর্কে শ্রীমা সোজাসুজি কিছু বলেছেন বলে মনে হয় না। তবে কথোপকথন ও প্রশ্নের উত্তরে তিনি এ বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা করেছেন। অতি গুরুভোজন করলে বা উত্তেজক খাদ্য খেলে পেট গরম হয়ে স্বপ্নের সৃষ্টি হতে পারে এ কথা সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু স্বপ্নের বিষয়বস্তু কখনও কখনও খাদ্যবস্তু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে তা সকলেই স্বীকার করেন না। মাংস আহার করলে কি ঘটে? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমা যা বলেছেন তা থেকে বোঝা যায় কখনো কখনো মাংস আহারে স্বপ্নের বিষয়বস্তু নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। শ্রীমার মন্তব্য থেকে এখানে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করছি—"Along with the meat that you take, you absorb also, in a large or small measure. the consciousness of the animal whose flesh you swallow." অর্থাৎ যে পশুর মাংস আহার করা যায় কমবেশী সেই প্রাণীর চেতনার প্রভাব তার মাংসের ভেতর দিয়ে আমাদের চেতনায় প্রবেশ করতে পারে। সেজন্য মাংস আহার করলে স্বপ্নের মধ্যে সেই প্রাণীর চেতনার অবস্থানুযায়ী আমাদের স্বপ্নের কার্য্যাদি ও বিষয়বস্তু খানিকটা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। অবশ্য এজন্য মাংস আহারের বিরুদ্ধে তিনি কিছু বলেন নি বরং সাধারণ লোক স্বাস্থ্যের জন্য মাংস খাবে এটাই ঠিক কিন্তু যারা সাধারণ জীবন থেকে উর্দ্ধে উঠতে চান, দেহ, প্রাণ ও মনের রূপান্তর ঘটাতে চান তাদের আহার সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হতে হবে; কেননা কতকগুলি খাদ্য আছে যাতে আমাদের শরীর হাল্কা ও শুদ্ধ হয়, আবার কতকগুলি খাদ্য আমাদের শরীরে প্রাণীর জড়তা এনে দেয়।

উপসংহারে আমি এই বলে শেষ করতে চাই, শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা স্বপ্নতত্ত্ব সম্বন্ধে যা বলেছেন তাতে এই মনে হয় যে, মনের চেতনার যে অংশ নিদ্রার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তা জাগ্রত চেতনা থেকে অনেক ব্যাপক। স্বপ্ন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা মানব মনের অজ্ঞাত অংশের যেসব অতি বিস্ময়কর তথ্য উদ্‌ঘাটিত করেছেন বর্ত্তমান পাশ্চাত্ত্য মনস্তত্ত্ববিদগণের নিকট সেগুলি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। এই স্বপ্নতত্ত্ব যে মনস্তত্ত্বের ওপর দাঁড়িয়ে আছে তা এত গভীর অর্থপূর্ণ ও ব্যাপক যে যথেষ্ট গবেষণা এদিকে হওয়া একান্ত প্রয়োজন। খানিকটা মিষ্টিসিজম স্বপ্নের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বলে হয়ত পাশ্চাত্ত্য মনোবিজ্ঞানীগণ এদিকটায় মনের অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় মনোনিবেশ করেন নি, ফলে স্বপ্ন-মনস্তত্ত্ব অবহেলিত হয়েছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস স্বপ্নতত্ত্বের মধ্যে মনস্তত্ত্বের এত তথ্য নিহিত আছে যে, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে এদিকে যথেষ্ট গবেষণা হলে বর্ত্তমান মনস্তত্ত্ব আরও সমৃদ্ধিশালী হবে ও উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে।
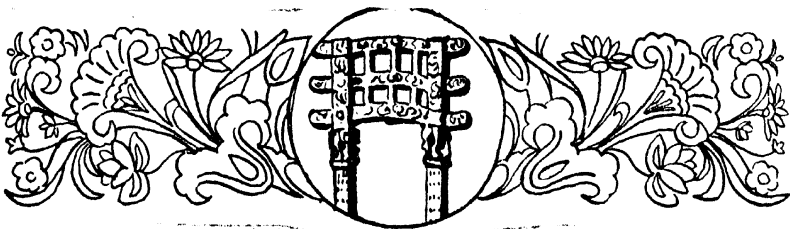
প্রাচীন রুশ-ভারত পথিক

জি. কুরিলেন্‌কো

দুঃসাহসী বণিক ও প্রতিভাবান লেখক আফানাসি নিকিতিনই প্রথম রাশিয়ান যিনি পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে "বিস্ময়ের দেশে" পৌঁছান। তিনিই ভারতবর্ষে তাঁহার তিন বৎসর অবস্থান কালে রুশ-ভারত মৈত্রীর প্রথম অঙ্কুর রোপণ করিয়া আসেন।

নিকিতিনের প্রত্যাবর্ত্তনের পরে মাস্কোভির গবর্ণর ও কতিপয় উৎসাহী রুশ বণিক ভারতবর্ষের সহিত নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন ও ভারতের সহিত ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্য সংগঠনের জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করেন। মসলিন, কাশ্মীরী শাল, নীল, চিনি ও মশলার জন্য ভারত তখন জগদ্বিখ্যাত ছিল। কিন্তু হিন্দুস্থানে গমনাগমনের পথ তখন দুর্গম। কত সাগর, পর্ব্বত ও মরুভূমি ভারতবর্ষকে রুশিয়ার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। ইহা ছাড়াও ছিল পরস্পরের সহিত বিবদমান প্রাচ্য রাষ্ট্রগুলির বাধা। এক কথায়, প্রকৃতি ও মানুষে মিলিয়া ভারতবর্ষের পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।

মাত্র জনকয়েক রুশ বণিকের ঐ সুদূর দেশে পৌঁছিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। কিন্তু ইহাদের প্রায় কেহই তাঁহাদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। সুতরাং তাঁহারা বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছেন। উঁহাদের দুই-চারি জনের সম্পর্কে টুক্‌রা টুক্‌রা তথ্য এখনও পাওয়া যায়। যেমন, আমরা আজ জানি, ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে বণিক লিওনতিয়েভিচ "বুখারেথ-এ (অর্থাৎ বুখারা ও মধ্য এশিয়ায়) ছিলেন এবং ভারতে ছিলেন সাত বছর।"

"সাত সমুদ্র তের নদী আর পাহাড় পর্ব্বতের ওপারে" সুদূর ভারতবর্ষে যাওয়া বণিকদের পক্ষে ছিল সুকঠিন কাজ। মোগল সাম্রাজ্যের সঙ্গে নিয়মিত সংযোগ স্থাপন করার উদ্দেশ্যে সপ্তদশ শতাব্দীতে রুশ গবর্ণমেণ্ট হিন্দুস্থানে কয়েকটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। সঙ্গে বন্দুকধারী পাহারা থাকা সত্ত্বেও বহুকাল সেই চেষ্টা সফল হইতে পারে নাই। মধ্য ও নিকট-প্রাচ্যের নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধবিগ্রহ প্রত্যেক পর্য্যটকেরই পথ বিঘ্নবহুল করিয়া তুলিয়াছিল। ১৬৭৬ সনে ইউসুফ কাসিমফের নেতৃত্বে এক কূটনৈতিক ও বাণিজ্য প্রতিনিধিদল মধ্য এশিয়া ও হিন্দুকুশের গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়া কাবুলে পৌঁছিতে সক্ষম হন। আফগানিস্থান ও মোগল সম্রাটের মধ্যে তখন যুদ্ধ চলিতেছিল বলিয়া কাসিমফ আর বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। ১৬৭৮ সনে তিনি মস্কোয় ফিরিয়া আসেন।

এই সব ব্যর্থতায়ও রুশ গবর্ণমেণ্ট দমিলেন না। ১৬৯৫ সনে যুবক প্রথম পিটার ভারতবর্ষে আর একটি প্রতিনিধিদল পাঠান। এই দলের নেতা ছিলেন নির্ভীক বণিক-কূটনীতিবিদ সেমিয়ন মার্তিনোভিচ মালেনকি।

প্রধানতঃ "কার" (সলোম পশুচর্ম্ম) ও অন্যান্য বিবিধ পণ্য লইয়া মালেনকি ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন। প্রথম পিটারের একখানি চিঠি তিনি সঙ্গে লইয়া যান। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পিটার সেই চিঠিতে ভারত সম্রাটের নিকটে উভয় দেশের পক্ষে লাভজনক বাণিজ্য সম্পর্কের প্রস্তাব করিয়া জানান, রুশ বণিকরা ভারতে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবে এবং ভারতীয় বণিকরাও অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবে রুশিয়ায়।

মালেনকি তাঁহার দলবল ও সশস্ত্র পাহারা সঙ্গে লইয়া মস্কো ত্যাগ করেন। মোট বিশ জন লোকের এই দলটি ভারতের সহিত সংযোগের মুখ্য স্থলবিন্দু আস্ত্রাখানে গিয়া পৌঁছায়। সেই সময় প্রায় একশত ভারতীয় বণিক ও কারিগর আস্ত্রাখানে স্থায়ী বসবাস স্থাপন করিয়াছিল। মালেনকি ইহাদের মধ্য হইতে একজন দোভাষী সংগ্রহ করিলেন তাঁহাদের সঙ্গে যাইবার জন্য। যে পথ দিয়া একদিন নিকিতিন গিয়াছিলেন সেই সুদীর্ঘ বিচিত্র পথে যাত্রা সুরু হইল আস্ত্রাখান হইতে।

রুশ যাত্রীদল সমুদ্রপথে বাকুর উপকূলে পৌঁছিলেন। সেখানে অর্থগৃধ্নু শেমাখ খাঁ তাঁহাদের ছয় মাস আটকাইয়া রাখেন। মূল্যবান সলোম পশুচর্ম্মখণ্ডের বিনিময়ে মুক্তি ক্রয় করিয়া ঐ দলবল স্থলপথে ৪৫ দিনে তৎকালীন পারস্যের রাজধানী ইস্পাহানে পৌঁছান। পারস্যের খান তাহাদের সহৃদয় স্বাগত জানান। পারস্যে কিছুদিন বিশ্রাম করিয়া ও সেখানে তাঁহার কূটনৈতিক কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া অতঃপর মালেনকি দলবলসহ দক্ষিণ দিকে নীলাম্বু পারস্য উপসাগরের উপকূলে পৌঁছান। তাঁহারা এবার উপনীত হইলেন বন্দর-নগরী আব্বাসে। আব্বাস বন্দরের ওপারে "গুরমিজ দ্বীপে" অবস্থিত বিখ্যাত নগরী ওর্মুজ। এই নগরীই কাব্যমণ্ডিত হইয়া আছে "সাদকো" গীতিনাট্যে। এই নগরী হইতেই একদা নিকিতিন জলপথে "বিস্ময়ের দেশ" অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন।

আব্বাস বন্দরে কিছুদিন থাকার পরে সোনার হিন্দুস্থানে যাইবার জন্য উদগ্রীব রুশরা জলপথে পূর্ব্বদিকে যাত্রা করে। অনুকূল বাতাসের কল্যাণে বিশ দিনের মধ্যেই জাহাজ বহুকাল-বাঞ্ছিত ভারতবর্ষের উপকূলে পৌঁছিল। ১৬৯৭ সনের জানুয়ারী মাসে জাহাজখানি আসিয়া ভিড়িল সুরাট বন্দরে।

দিন কয়েক অচেনা সুরাটের সঙ্গে পরিচয় লাভ করিয়া রুশ দলটি ভারত সম্রাটের তৎকালীন প্রশাসনিক কেন্দ্র বুর্হানপুরের দিকে অগ্রসর হয়। তিন মাস পথ চলার পর এ ছোট শহরটির মীনারগুলি চোখে পড়িল। সেমিয়ন, মালেনকি ও তাঁহার দলবলকে বৃদ্ধ সম্রাট ঔরঙ্গজেব ভালভাবেই গ্রহণ করেন। তিনি এ বিদেশী-দের আদরযত্নের ব্যবস্থা করিলেন। তিনি রুশ বণিকদের বিনা শুল্কে ভারতে ব্যবসা করার অনুমতি দেন। "সমস্ত রুশদের জারকে—তাঁহার রুশ ভাইকে" সম্রাট ঔরঙ্গজেব একটি হাতী উপঢৌকন পাঠান।

ভারত সম্রাটের দরবারে এক বৎসর কাটাইয়া মালেনকি ও তাঁহার দলবল ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভারত সফর করেন। তাঁহারা উত্তর-পশ্চিম ভারতের বহু শহর ও গ্রাম পরিদর্শন করেন। তাঁহারা দিল্লীর পথে আগ্রায় গিয়া মধ্যযুগীয় ভারত-স্থাপত্যের মধ্যমণি বিখ্যাত তাজমহল দেখেন।

রুশ পর্য্যটকদের ভারতবর্ষ খুব ভাল লাগে। পরে মস্কোতে এই প্রতিনিধি দলের একজন অভিমত জানান: "ভারতবাসীরা শান্ত প্রকৃতির লোক, হৃদয়বান, সামাজিক ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে সৎ।"

এই অতিথিপরায়ণ দেশে চার বৎসর কাটাইবার পর, ১৭০১ সনের জানুয়ারী মাসে এই পর্যটকগণ চিনি, আদা, গুড়, কোকো, রঞ্জনদ্রব্য ইত্যাদি নানা জিনিসে বোঝাই দুইটি জাহাজে চাপিয়া স্বদেশের দিকে রওনা হন।

এবারে আর আমাদের এই যাত্রীদলের প্রতি ভারত মহাসমুদ্র ততটা সদয় হয় নাই। ছয় সপ্তাহ ধরিয়া জাহাজ দুইটি উত্তাল সমুদ্রে ভাসিয়া চলিবার পরে তাঁহারা পারস্য উপসাগরের দুই তীর দক্ষিণে বামে অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইলেন। কিন্তু এখানে আবার তাঁহারা ভয়ঙ্কর মস্কট-জলদস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হন এবং জিনিস বোঝাই একটি রুশ জাহাজ এই জলদস্যুরা দখল করিয়া লয়। কিন্তু সেমিয়ন মালেনকি ও তাঁহার সঙ্গীদলের অধিকাংশই ছিলেন দ্বিতীয় জাহাজটিতে। ইহারা আব্বাস বন্দরে আসিয়া পৌঁছাইতে সমর্থ হন—এই আব্বাস বন্দর হইতেই তাঁহারা চার বৎসর পূর্ব্বে ভারত যাত্রায় রওনা হইয়াছিলেন।

আহত সঙ্গীগণ সুস্থ হইয়া উঠিবার পরে, এখান হইতে তাঁহারা দক্ষিণ ইরানের প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্য দিয়া উত্তর মুখে চলিলেন। আরেকবার তাঁহাদের চোখে পড়িল গাছ-গাছালির শ্যামল শোভাময় বন্ধুত্বে-ঘেরা ইস্পাহান শহর।···শেষ পর্য্যন্ত দিগন্তের ওপারে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন ককেশাসের তুষারশুভ্র চূড়াগুলি।

১৭০১ সনের গ্রীষ্মকাল শেষ হইয়া আসিতেছে; যাত্রীদল আজেরবাইজানের এই সামন্ত-প্রভুদের অশান্তিময় দেশ অতিক্রম করিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু আবার এখানে তাঁহাদের এক দুর্দ্দৈবের সম্মুখীন হইতে হইল। নিদারুণ ক্লান্তিতে আর শারীরিক কষ্টের ফলে দলের নেতা মালেনকি ও তাঁহার সহকারী আনিকিফ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং শেমাখ শহরে তাঁহাদের মৃত্যু ঘটিল।—এই অভিযানের প্রারম্ভে তাঁহারা শেমাখ শহরের মধ্য দিয়াই গিয়াছিলেন।

দুই প্রিয় সঙ্গীকে সমাধিস্থ করিবার পর দুঃখভারাক্রান্ত মনে এই প্রতিনিধিদল ১৭০১ সনে হেমন্তকালের শেষের দিকে স্বদেশের সীমান্তে আসিয়া পৌঁছিলেন। শেষে ১৭০২ সনের মে মাসে, পাঁচ বছরেরও বেশী অনুপস্থিত থাকিবার পরে, যাত্রীদল মস্কোর মাটি স্পর্শ করিলেন।

এইভাবে, আড়াই শতাব্দী পূর্ব্বে ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে প্রথম নিয়মিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ও বাণিজ্যিক লেনদেন স্থাপিত হয়। রুশ ও ভারতীয় জনগণের মধ্যে এই বন্ধুত্ব শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বাড়িয়াই চলিয়াছে।

প্রতিবিম্ব

শ্রীতরুণ গঙ্গোপাধ্যায়

মা আজও রাগ করলেন। রাগ ঠিক নয়, রাগতঃ সুরে অনেক দুঃখ করলেন। বললেন, নিজের পেটের মেয়েকে এই ভরা বয়সে মাথায় সিঁদুর মুছে থান কাপড় পরে ঘুরে বেড়াতে দেখলে কোন মায়ের না বুক ফেটে যায়? আজকাল কত লোকে কত কিছু করছে। অত করতে বলি না। অন্ততঃ কালো পাড় একটা শাড়ি আর হাতে দু'গাছা চুড়ি ত পড়তে পারিস। এই বয়সে অমন চেহারায়··· বাকি কথাগুলো অস্ফুট হয়ে থেমে গেল, চোখে আঁচল চাপা দিলেন মা।

অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে খাটে বসে কথাগুলো শুনছিল অনুভা। এ ধরনের কথা আগেও শুনেছে মার কাছে। জবাব সহজে কিছু দেয় না। কিন্তু ঐ বয়স আর চেহারার কথা শুনলেই সর্ব্বাঙ্গ কেমন আড়ষ্ট হয়ে যায়। শোকে ব্যথায় মনের সহজ সত্তাটুকু হারিয়ে বসে আছে অনুভা। নিজের জীবনের একটা আমূল পট পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে। এ সবই ক্রমশঃ সহ্য হয়ে এসেছে। কিন্তু ঐ বয়স আর চেহারার প্রসঙ্গটা এসে পড়লেই কেমন আড়ষ্ট বোধ করে নিজেকে। ভাবে এ দুটোর কেন কোন পরিবর্ত্তন ঘটল না? একটা পাথরচাপা মনকে অহেতুক আঘাত করার জন্যে ওদুটো আগের মত সতেজ সজীব রয়ে গেল কেন। এই বয়স আর চেহারা—এ ত আর নিজের নয়, ওর ওপর আর কোন অধিকারও নেই। অধিকার ছিল শুধু সমরেশের। সেই যখন নেই, তার যা কিছু অধিকারের বস্তু তার সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে।

মার শেষ কথাটায় মুখ তুলে তাকাল অনুভা। চোখ দুটো সজল হয়ে উঠেছে, বললে, এ বয়সে যাকে যাতে সাজায়, তাতেই যখন আমার আর অধিকার নেই, তখন মিছিমিছি···।

—চুপ কর তুই, ধমক দিলেন মা। একটু চুপ করে থেকে বললেন, [illegible] স্বামী নেই তার কিছু নেই, এ কথা আমি কি আর বুঝি [illegible] কিন্তু তোর এই চেহারা দেখলে কিছুতেই সুস্থির থাকতে পারি না যে।

মেয়ের মুখটা বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে অঝোরে কাঁদলেন মা। অনুভাও মার বুকে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কেঁদে উঠল, বললে, আমি কি করব মা? কোন কিছুতেই মন ওঠে না, আমি শুধু এসেছি তোমাদের কাঁদাতে আর কাঁদতে।

চোখের জল মুছে মা কিছুক্ষণ পরে চলে গেলেন। বিছানার ওপর চুপ করে বসে রইল অনুভা। ছোট বোন প্রতিভাকে আশীর্ব্বাদ করতে আসবে আজ সন্ধ্যায়। তাই সেই সকাল থেকে উদ্যোগ-আয়োজনের সাড়া পড়েছে বাড়িতে। দুপুর গড়িয়ে এল। আর ক'ঘণ্টাই বা বাকি রইল ওদের আসার? সারাদিন প্রায় ঘর থেকে বের হয় নি অনুভা। কিন্তু ওরা এলে ওদের সামনে গিয়ে হয়ত একবার দাঁড়াতে হবে। সবাই সাজবে গুজবে আনন্দ করবে—তাদের মাঝে এই নিরাভরণ বিষাদমূর্ত্তি নিয়ে দাঁড়ালে, মায়ের প্রাণ কেঁদে উঠবেই। তাই মায়ের আবার বেশী করে মনে পড়ে গেছে পুরানো প্রসঙ্গ, পুরানো কথা। ঘরে এসে ঢুকেছিলেন এক ফাঁকে। মেয়েকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু নিজেই যখন সবকিছু বোঝেন, তখন আর নূতন করে কিছু বোঝাবার থাকে না। তাই সাশ্রুনয়নেই আবার ফিরে গেছেন।

আঠার বছর বয়সে বিয়ে হয়ে বিশ বছর বয়সে বিধবা হয়েছে অনুভা। এক বছর হ'ল এখানেই আছে, আর ফিরে যেতে ইচ্ছে হয় না। যাকে নিয়ে ওখানকার রাজত্ব, সেই যখন নেই, তখন ওখানে ফিরে যাবার আর কোন মোহ নেই। একটি বছর পরম নিষ্ঠায় সব নিয়ম মেনে এসেছে অনুভা। এ মানায় কোনদিন মনে হয় নি এসব আত্মপ্রবঞ্চনা। মন যখন কিছু চায়ই না, তাকে প্রবঞ্চনা করার কোন প্রশ্ন ওঠে না। ভাল শাড়ি গহনায় নিজেকে সাজিয়ে তুলতে আর কোন সাধ নেই। সমরেশ আর কোনদিন তার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকবে না। বলবে না—আজ তোমায় কি সুন্দর মানিয়েছে অনু। আবার কোন এক সান্ধ্য মুহূর্ত্তে হাতটি ধরে কাছে টেনে নিয়ে বলবে না—আজ তুমি তোমার কালো জর্জ্জেটের শাড়িটা পর—তোমার ঐ আঁটসাট ফরসা চেহারায় ঐটিই সবচেয়ে সুন্দর মানায়। ওর কথামত, ওর মনের মত সেজে সামনে এসে দাঁড়াতে হয়েছে। স্বামীর মুগ্ধ প্রসন্ন দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি অনুভব করেছে—সাজটা ত্রুটিহীন হয়েছে সমরেশের মুখ দেখলেই বোঝা যায়। আয়নার সামনে নিজের প্রতিবিম্ব এতটা অপরূপভাবে ফুটে ওঠে না যতটা ফুটে ওঠে অপরের চোখে। দাঁড়িয়ে থেকে শেষটা লজ্জা পেয়ে যেত অনুভা। অমন বেহুঁসভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যদি কেউ চেয়ে থাকে লজ্জা না পেয়ে উপায় আছে।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল অনুভা। সে যখন নেই, এ সব সাধও আর নেই—এ সব মিটে গেছে, মুছে গেছে।

ঘর থেকে সামনের দরজা দিয়ে বাড়ীর ভিতরটা দেখা যাচ্ছে। ছোট ভাই দুটি বার কয়েক ছুটোছুটি করে এল গেল। কলতলায় ঝি কি যেন কাচছে। রান্নাঘরে মা কিছু একটা তৈরি করতে ব্যস্ত।

বাবা গেছেন বাজারে। কিন্তু প্রতিভা কৈ? কি করছে মেয়েটা? যাকে কেন্দ্র করে আজকের এই আনন্দোৎসব তাকে ত কৈ একবারও দেখতে পেলে না। ভারি সুন্দর, ভারি মিষ্টি মেয়ে প্রতিভা। আজকেই ওর নূতন জীবনের সূচনা—স্বামী, সংসার। ঘর, এ সব এবার পাবে প্রতিভা। একটি পুরুষ মানুষকে একেবারে নিজের করে পাওয়া, বয়সের জোয়ারে বেড়ে ওঠা দেহমন উচ্ছ্বসিত ও উদ্দাম হয়ে উঠেছে, এতদিন যেন কূল খুঁজে পায় নি—এবার পাবে। অনেক অপূর্ণতার, অতৃপ্তির এবার স্বাদ মিটবে। যেমন করে অনুভার একদিন মিটেছিল। কিন্তু এরই মত সব আবার খুইয়ে বসবে না ত প্রতিভা? সব চাওয়া-পাওয়ার উত্তুঙ্গ শিখরে বসে হঠাৎ পা পিছলে গভীর গহ্বরে পড়ে যাবে না ত সেও? বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল অনুভার। না না, এমনটি শুধু প্রতিভাই কেন, কারুর জীবনেই যেন না হয়। পেয়ে হারানর দুঃখ যেন কাউকে পেতে না হয়। প্রতিভার জীবন মধুময় হোক। মনে মনে তার জন্যে অনেক প্রার্থনা জানাল অনুভা।

কেমন যেন অপরাধী দৃষ্টি তুলে একবার তাকিয়েই চলে যাচ্ছিল সামনে থেকে প্রতিভা। সারাদিনই আজ দিদির কাছ ঘেঁসেনি। দিদির সব কথা না বুঝুক, কিছুটা বোঝে। বোঝে, থমথমে মুখ নিয়ে সেই সকাল থেকে দিদি নিজের জীবনের সব কথা কেন ভাবতে বসেছে। তাই কাছে যেতে সঙ্কোচ হয়েছে। উপলক্ষ্য যেই সেইই, এটুকু বুঝতে বাকি নেই প্রতিভার।

অনুভা ইশারায় ডাকল প্রতিভাকে—এই শোন্। প্রতিভা জড়োসড়ো হয়ে কাছে এসে দাঁড়াল। ওকে পাশে বসিয়ে, ওর দিকে ভাল করে একবার চেয়ে দেখল অনুভা। সত্যিই মেয়েটা ভারি সুন্দর দেখতে হয়েছে। এ বাড়ীর দুটি মেয়ের রূপের প্রশংসা সবাই করে। বিয়ের পর অনুভা নাকি আরও সুন্দর হয়েছে। ভরা নদীর উচ্ছলতা ওর সর্বাঙ্গে। এখনও এতটুকু ম্লান হয় নি। প্রতিভাও এবার ঐ রকমটিই হবে, আরও সুন্দর হবে, অনুভার সমান সমান হয়ে যাবে।

—আজ কি সব পরে সাজবি তুই? অনুভা বললে।

দিদির মনের গতিটা এখনও ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। প্রতিভা তাই একটু লজ্জা-পাওয়া তাচ্ছিল্যের সুরে বললে—যা হয় একটা কিছু পরলেই হ'ল। আজ ত আর পছন্দ-অপছন্দর বালাই নেই।

এতক্ষণে একটু হাসল অনুভা। প্রতিভা সাজতে ভালবাসে। আর সে সাজ যদি দিদি সাজিয়ে দেয় প্রতিভার আনন্দের সীমা থাকে না। কিন্তু সে কথা বলতে সাহসে কুলোচ্ছে না। পছন্দ করতে আসার দিন, দিদি সাজাতে আসে নি। তাই অমন একটা নিস্পৃহ ভাব দেখিয়ে চুপ করে বসে রইল প্রতিভা।

অনুভা ওর হাতটি কোলের ওপর টেনে নিয়ে দেখতে দেখতে বললে—তুই কি নোংরা রে! সাতজন্ম হাতটা রগড়ে কোনদিন ধুয়েছিস? তোর ছোটবেলার বদ অভ্যেসগুলো এখনও গেল না। আজ গা' ধুতে গিয়ে এক ঘণ্টার আগে কলঘর থেকে বের হবি না। ভাল করে সর্ব্বাঙ্গ রগড়ে আজ ধোয়া চাই। এতটুকু যদি নোংরা লেগে থাকে ত সেই ছোটবেলার মত আমি নিজে তোকে হিড়হিড় করে নিয়ে ঢুকব কলঘরে।

হাসছে প্রতিভা—হাসিতে-খুসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মুখটি। দিদির আদরভরা শাসনে সাহস করে বলে ফেললে—হ্যাঁ, তুমি যেমনটি করতে বল করব, কিন্তু একটি শর্ত্তে।

অনুভা হেসে বললে—বল না?

—তুমি বুঝতে পার না?

—পারি। সর্ব্বাঙ্গে স্নেহপরশ বুলিয়ে দিয়ে অনুভা বললে—আমি তোকে সুন্দর করে সাজিয়ে দেব। এই না চাস তুই?

—হু, মাথা নাড়ল প্রতিভা। তার পর কি সব পরতে হবে, কিভাবে সাজতে হবে, এই সব নিয়ে দুই বোনে খানিকক্ষণ আলোচনা হ'ল। মা একসময় কি কাজে ডাকতে উঠে চলে গেল প্রতিভা।

বিকেলবেলা বাড়ীতে বেশ হৈ চৈ। পাত্রের বাবা এসেছেন আশীর্ব্বাদ করতে। আর সঙ্গে পাত্রের এক বন্ধু। বাবা ওদের নিয়ে ব্যস্ত বাইরের ঘরে। পাড়ার বউ মেয়েরা এসেছে। মা ছুটোছুটি করছেন। অনুভা সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে নিজের ঘরে প্রতিভার অপেক্ষায় বসে। প্রতিভা এখনও কলঘরে। গা' ধুতে গেছে। মা তাড়া দিচ্ছেন। অনুভাও অনুচ্চস্বরে কয়েকবার ডাকল প্রতিভাকে। অনুভা সাজানর ভার নিয়েছে দেখে মা খুসি হয়েছেন।

একটা সাধারণ ডুরে শাড়ি গায়ে জড়িয়ে ছুটে ঘরে ঢুকে দোর ভেজিয়ে দিল প্রতিভা। চোখে মুখে কাঁধে জলবিন্দু। শুকনো তোয়ালে দিয়ে গা মুখ মুছল ভাল করে। দিদির সামনে এগিয়ে এসে বললে—এবার হ'ল তোমার মনের মত। হাত ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে বললে—উঃ কি লাল হয়ে গেছে হাতগুলো—রগড়ে রগড়ে রক্ত জমে গেছে।

হাত ধরে ওকে কাছে টেনে বসাল অনুভা। খসখসে সুন্দর সাদা গাটায় যেন আবীর ছড়ান। এমন গা না হলে কি পাউডার স্নো মাখিয়ে সুখ আছে! খুশী হয়ে পরিপাটি করে সাজাতে বসল অনুভা। নিবিষ্টচিত্তে কোথা দিয়ে আধঘণ্টা কেটে গেল। শেষটা চিবুকটি ধরে এপাশ ওপাশ ফিরিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বার কয়েক দেখল অনুভা। শাড়িও সুন্দর করে নিজের হাতে পরিয়ে দিল। তার পর বললে—যা, এবার ঐ বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়া গিয়ে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিভা একেবারে থ' হয়ে গেল। নিজেকে যেন চেনাই যায় না, বিশ্বাসই হয় না সে নিজে এত সুন্দর। দিদি তার সব বিদ্যেটুকু উজাড় করে সাজিয়ে দিয়েছে।

প্রতিভার রকমসকম দেখে অনুভা হেসে বললে—হাঁ করে তুই

আবার নিজেকে দেখছিস কি? যারা দেখবে তাদের জন্যেই তোকে অমনভাবে সাজিয়ে দিলাম।

ছুটে এসে দিদিকে জড়িয়ে ধরল প্রতিভা। অনুভাও খুশী হয়েছে। প্রতিভার তৃপ্তিতেই, ওর তৃপ্তি। বললে—ওরে পাগলী ছাড় ছাড়, সব সাজগোজ নষ্ট করে ফেলবি।

মা ঘরে ঢুকে বললেন—তোদের হ'ল রে? তার পর প্রতিভার দিকে চেয়েই যেন আর চোখ ফেরাতে পারলেন না। বাঃ তোকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে রে! অনুভার দিকে চেয়ে কি বলতে গিয়ে চুপ করে গেলেন। মুখের ভাবটা একেবারে বদলে গেল। বুকটা বুঝি আবার কেঁপে উঠল। যে অমনভাবে সাজাতে পারে, সে না জানি ওর চেয়ে আরও কত ভাল নিজে সাজতে পারে। কিন্তু তার কোন আর উপায় নেই। অনুভার পরণে আধময়লা থান কাপড়, চোখ, মুখ ভিজে একাকারে—একটা সদ্যপ্রস্ফুটিত ফুলের পাশে যেন একটা বাসি ফুল মিইয়ে আছে। মা বেরিয়ে গেলেন। পাড়ার মেয়েরা একটু পরে প্রতিভাকে নিয়ে গেল

চুপ করে দাঁড়িয়েছিল অনুভা। মার কথা ভাবছিল না। ভাবছিল প্রতিভাকে কি সুন্দর সাজাতে পেরেছে, যে দেখবে তারই তাক লেগে যাবে। একটু পরেই মা ঢুকলেন। অনেকটা যেন চুপিচুপিই। ঢুকেই দরজা ভেজিয়ে দিলেন, হাতে ধোপদুরস্ত কালো পেড়ে শাড়ী একখানা। কাছে এসে মেয়ের হাত দুটি হঠাৎ জড়িয়ে ধরলেন। কাতর অনুনয়ের সুরে বললেন, আজ তোর চেহারার একটু ছিরি বদলা মা। আমি মা হয়ে বলছি। উদগত অশ্রুভারে গলা বন্ধ হয়ে এল, আর কিছু বলতে পারলেন না। শাড়ীটা অনুভার হাতে গুঁজে দিয়ে আর দাঁড়ালেনও না। বাষ্পাকুল চোখ দুটো আঁচলে চেপে বেরিয়ে গেলেন ত্বরিতপদে।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অনুভা। অজস্র চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। মা'র কথার অবাধ্য হয়ে মাকে দুঃখ দিতে মন চায় না। কিন্তু নিজের ছিরি বদলাবার যে কোন ইচ্ছেই নেই অনুভার। কেন বদলাবে? কেন? শুধু মাকে খুশী করা ছাড়া এই কেনর আর কোন উত্তর নেই।

শাঁখ বেজে উঠল, উলুধ্বনিতে বাড়ী কেঁপে উঠল। প্রতিভার বোধ হয় আশীর্ব্বাদ হয়ে গেল। সবার সামনে প্রতিভাকে কেমন দেখাচ্ছে কে জানে। শাড়ীটা বিছানার উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল অনুভা! বাইরের ঘরের ভিড় ঠেলে একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মেঝেতে পাতা ফরসা চাদরের উপর মুখ নীচু করে বসে আছে প্রতিভা। ধান-দূর্ব্বা-চন্দনভরা আশীর্ব্বাদী থালা সামনে। বাবা একপাশে। বরের বাবাই বুঝি সামনেই এগিয়ে বসে। আর পাশের লোকটি? ঐ যার দীপ্ত শুভ্র গায়ের রং, খাড়া নাক, বড় বড় চোখ, দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা—ও কে? ওই বোধ হয় বরের বন্ধু। কিন্তু কেমন হাঁ করে দেখছে প্রতিভাকে। যেন এত রূপ কখন চোখে পড়ে নি।

মনে মনে হাসল অনুভা। সার্থক হয়েছে ওর সাজান। পাড়ার লোকেরাও গোল হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে প্রতিভাকে। সবার দিকে এক একবার করে চেয়ে ভারি আত্মতৃপ্তি বোধ করল অনুভা। সবাই দেখছে প্রতিভাকে, কিন্তু ওই লোকটার মত কেউ দিগবিদিগ-জ্ঞানশূন্য হয়ে দেখছে না। ওর দিকে আবার ফিরে চাইতে গিয়ে থমকে গেল অনুভা। এ কি? ওকি এবার অনুভাকেই দেখছে নাকি? আশে পাশে একবার চেয়ে দেখল অনুভা। অমনভাবে তাকিয়ে দেখার মত ত কেউ নেই ধারে কাছে। একটু পরে আড়-চোখে তাকাতে গিয়ে আবার চোখাচোখি হ'ল। এখনও সে তাকিয়ে। একটা অদ্ভুত অন্তস্পর্শী দৃষ্টি। অনুভা ভাবল কি বিচিত্র লোকটা। রূপের ডালা সাজিয়ে যে সামনে বসে তার দিকে তাকায় না কেন? নিজের এমন একটা বিশুষ্ক, বিরস চেহারার মধ্যে কি এমন দেখার বস্তু খুঁজে পেল! চোখের দৃষ্টিতে ওর অভদ্রতাকে ধমক দিতে চাইল অনুভা। স্পষ্ট কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে। কিন্তু না—বিস্ময়ে বিমুগ্ধ ওর দৃষ্টি, কোন সাড় নেই যেন।

অনেক—অনেক দিন পরে কিসের এক লজ্জায় আর সংকোচে সর্ব্বাঙ্গ অদ্ভুতভাবে কেঁপে উঠল অনুভার। ছুটে চলে এল ভেতরে। নিজের ঘরে। খাটের উপর এলোমেলোভাবে পড়ে থাকা মা'র দেওয়া শাড়ীটা তুলে নিল হাতে। চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। আবার একটা চিন্তার ঝড় বইছে। সেই সব পুরানো প্রশ্নগুলো মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। সবগুলোকে দুহাতে ঠেলে ঠেলে সরিয়ে দিল যেন অনুভা। এবার শুধু মা'র সেই বাষ্পাকুল মুখখানিই বড় বেশী করে মনে পড়ছে, মনে করতে ইচ্ছে হচ্ছে। আর সেই অনুনয়ভরা কণ্ঠস্বর কানে বাজছে। মা'র মনে দুঃখ দেওয়া সত্যিই উচিত কাজ নয়—কখনও নয়। আর দেরী করল না অনুভা। শাড়ীটা হাতে নিয়ে, তাক থেকে সাবান কেসটা তুলে নিয়ে কলঘরে চলে গেল।
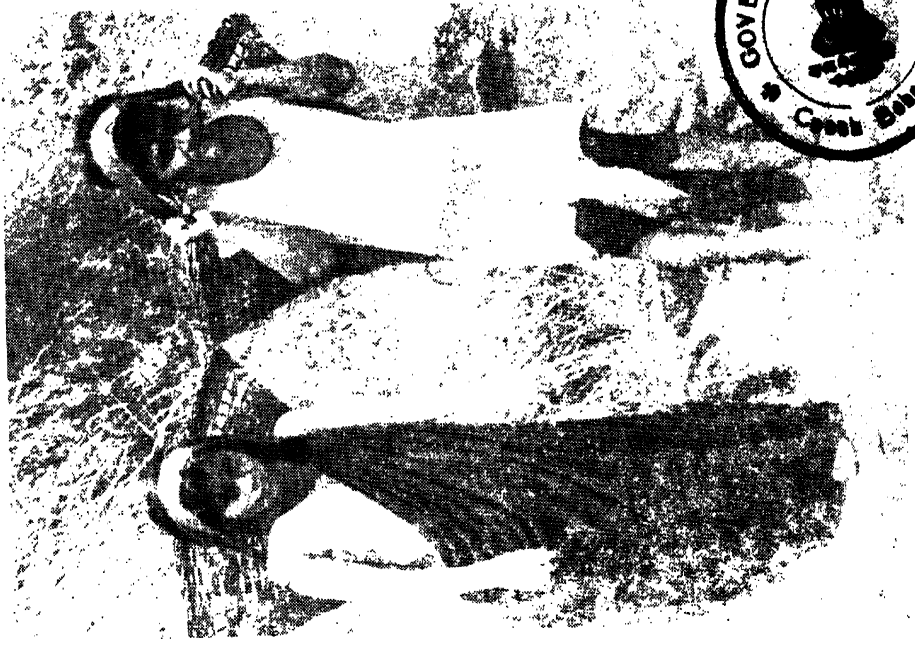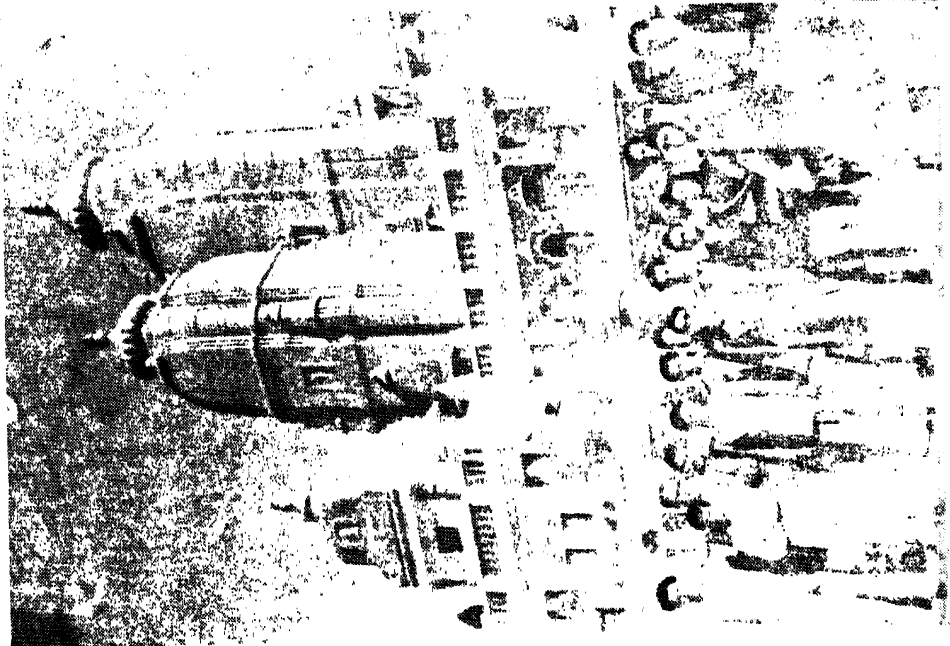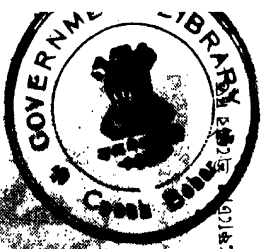
আণবিক বোমায় বিধ্বস্ত হিরোশিমার নর-নারীর স্মারকোপরি প্রধানমন্ত্রী
শ্রীজবাহরলাল নেহরু মাল্যদান করিতেছেন।

হানেদা বিমানঘাঁটিতে জাপানী তরুণী শ্রীজবাহরলাল নেহরুকে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করিতেছেন।

পশ্চিম বাংলার গ্রামের নাম পরিবর্ত্তন

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

পশ্চিম বাংলার গ্রামের নাম লইয়া আলোচনাকালে যে বিষয়টি প্রথমেই চোখে পড়ে তাহা হইতেছে একই নামের বহুগ্রাম থাকা। ইহার কারণ কি? বাঙ্গালী হিন্দুধর্মপ্রবণ; এজন্য ঠাকুর-দেবতাদের নামে গ্রামের নামকরণ হইয়াছে; হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতার কথা প্রবাদে থাকিলেও অল্প কয়েকটী প্রধান প্রধান দেব-দেবীর উপাসক তাঁহারা। এজন্য একই দেবতা বা দেবীর নামে বহুগ্রাম থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যাহা কিছু নাম-বৈচিত্র দেখা যায় তাহাও একই দেব-দেবীর বিভিন্ন নাম থাকার দরুন।

বাঙ্গালী হিন্দু নিজের পুত্র-কন্যাদের নামকরণও ঠাকুর-দেবতাদের নামে করেন। বহুকাল হইতে এইরূপ নামকরণ হইতেছে; পুরাতন বংশলতা আলোচনা করিলে এই বিষয়ের সত্যতা প্রতিভাত হইবে। ইংরেজী উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এই প্রথা প্রবল ছিল। কলিকাতায় বিলাতী সভ্যতার সংস্পর্শে এই প্রথা উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া হইতে কিছু কিছু শিথিল হইতে আরম্ভ করে। পূর্ব্বে আমাদের স্ত্রীলোকেরা গুরুজনদের নাম মুখে উচ্চারণ করিতেন না—ফলে সময়ে সময়ে তাঁহাদের হাস্যজনক সঙ্কট উপস্থিত হইত। এক মহিলার শ্বশুরের নাম মধুসূদন, ভাসুরের নাম তুলসী, স্বামীর নাম রাম। কবিরাজ আসিয়া বধূটিকে বলিয়া গেলেন যে, বাড়ীতে ত রামবাণ আছে; তুলসীপাতার রস ও মধু দিয়া মাড়িয়া খোকাকে খাওয়াও। শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, কবিরাজ কি ব্যবস্থা করিলেন? বধূটি উত্তর দিলেন:

'ভাসুর পাতার রস দিয়া ঠাকুরকে (শ্বশুরকে) দিয়া
ও'কে (স্বামীকে) মেড়ে খাওয়াতে বলিল।'

এইরূপ দেব-দেবীর নাম মানুষেরও থাকায় কোন জমিদার, রাজা বা মহারাজা যদি নিজের নামে বা বাপের নামে কোনও গ্রাম পত্তন করেন তাহা হইলেও সেই গ্রামের নামও ঠাকুর-দেবতাদের নামে হইবে। এই দুই কারণে পশ্চিম বাংলায় গ্রামের নামের বৈচিত্র যতটা হওয়া উচিত তাহা অপেক্ষা অনেক কম। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি ও অনুমান করিতে পারি তাহাতে মনে হয় পূর্ব্বে নাম-বৈচিত্র বেশী ছিল।

আমরা যে যে গ্রামের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারিয়াছি তাহার একটা ইতিহাস দিবার চেষ্টা করিব। যেখানে জানিতে পারিয়াছি পূর্ব্ব নামও দিবার চেষ্টা করিয়াছি।

কত সহজে গ্রামের নাম পরিবর্ত্তিত হইত বা হইতে পারে তাহার একটি উদাহরণ দিব। বীরভূম জেলায় (তখনকার বীরভূম জেলার এখনকার বীরভূম হইতে অনেক পার্থক্য ছিল সাওতাল পরগণার দেওঘর অবধি বীরভূমের অন্তর্গত ছিল) ইংরেজ রাজত্বের সূত্রপাতের সময় ভয়ানক ডাকাতি হইত। জীবন ডাকাতের ভাই বিসে, ভবানী ও উদিতলাল ৪০০ লোক লইয়া ডাকাতি করিত। জীবন ডাকাত ধরা পড়ে, তাহার জবানবন্দীর একাংশ এইরূপ:

Q. What places do you hold in farm in the District of Pachete and what Thannas are under your charge there?

A. Mushruff a Thannadar of the Rajah's gave me in farm the Village of Dhee Ranny Gunge to which place I gave the Name of my Mohun and it is called Mohunpore, and I pay for it Revenue of 250 Rupees……

(বীরভূম ডিষ্ট্রিক্ট হ্যাণ্ডবুকের clxxxv পৃষ্ঠা দেখুন)

এই জবানবন্দী ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে গৃহীত হয়। এই থেকে বুঝা যায় যে, গাঁয়ের ইজারাদারেরও গ্রামের নাম পরিবর্ত্তন করিবার অধিকার ছিল। জীবন ডাকাত তাহার ছেলে মোহনের নামে ডিহি রাণীগঞ্জের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া মোহনপুর রাখিল।

পশ্চিম বাংলায় ৪৮টি মোহনপুর আছে। এই মোহনপুর পাঁচেট (পঞ্চকোট) জেলায়—সুতরাং মানভূমেও হইতে পারে। এই মোহনপুর কোথায় তাহা আমরা নির্দ্ধারণ করিতে পারি নাই।

বর্দ্ধমান জেলায় ৪টি মোহনপুর আছে; তাহার মধ্যে ২টি আসানসোল মহকুমায়। সালনপুর থানার অন্তর্গত মোহনপুরের নাম পূর্ব্বে রাণীগঞ্জ ছিল বলিয়া কেহ কেহ বলেন। এই মোহনপুর জীবন ডাকাত কথিত মোহনপুর কিনা জানা যায় নাই।

টাকা পয়সা যেমন বাজারে চলিতে চলিতে ঘসিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তেমনি গ্রামের নামও লোকমুখে সময় সময় ছাটকাট হইয়া ছোট হইয়া যায় বা অন্য আকার ধারণ করে। দুই-একটা উদাহরণ দিই। বহরমপুর মুর্শিদাবাদ জেলার সদর শহর। ইহার নাম সম্বন্ধে বেভারিজ সাহেব ১৮৯২ সনের 'ক্যালকাটা রিভিউ'তে লিখিয়াছেন:

"Berhampore (Bahrampur) seems to be a corruption of the Hindu name of the place—Brahmapur, *i.e.* the city of Brahma, Brahmapur is the name which the original mauza, or village, bears on the Collector's revenue roll, Probably the

name comes from the place having been a settlement of Brahmans, one of the bathing places in the river is called Bipraghat, or the Brahman's ghat. The name does not appear to be in any way way connected with the Muhammadan name Bahram. There is a place about 5 miles to the north-east and on the high road to Murshidabad, which has the very simiiliar name as Bahramganj. Probably this has the same origin as Berhampore, though it may be connected with Bahram Jang, a son of Muhammad Reza Khan, otherwise Muzaffar Khan."

(*Old Places in Murshidabad*, Cal. Rev. 1892)

বেভারিজ সাহেবের মতে ব্রহ্মপুর (যে নাম কালেক্টারীর খাতায় পাওয়া যায়) হইতে বহরমপুর হইয়াছে। বর্ত্তমানে কিন্তু মুর্শিদাবাদ জেলায় যে 'ব্রহ্মপুর' পাওয়া যায় তাহা নবগ্রাম থানায়। নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

পশ্চিম বাংলায় বর্ত্তমানে ৮টি ব্রহ্মপুর পাওয়া যায়। ২টি বর্দ্ধমানে; ২টি ২৪ পরগণায়, ১টি মুর্শিদাবাদে, ২টি পশ্চিম দিনাজপুরে ও ১টি জলপাইগুড়ি জেলায়।

ঐ জেলায় জঙ্গীপুর একটি মহকুমা শহর। এই শহরের পূর্ব্ব নাম ছিল জাহাঙ্গীরপুর। এ সম্বন্ধে মুর্শিদাবাদ ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারের ১৯৮ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে :

"The name is a corruption of Jahangirpur, which is explained by a tradition that the Emperor Jahangir founded the place. During the early days of British rule it was an important centre of the silk trade and the site of a commercial residency. In the Nozamat office records there is a letter, dated 1773, addressed to Mr. Henchman, Collector of Jahangirpur, by Mr. Middleton, Resident of the Murshidabad Durbar and chief of Murshidabad."

জাহাঙ্গীরপুর জঙ্গীপুরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

বর্ত্তমানে পশ্চিম বাংলায় "জাহাঙ্গীরপুর" বলিয়া ৩টি গ্রাম বা মৌজা আছে। ১টি নদীয়া জেলার কোতয়ালি থানায়, ১টি মুর্শিদাবাদ জেলার খড়গ্রাম থানায়, আর ১টি পশ্চিম দিনাজপুরের তপান থানায়। দুইটি "জঙ্গীপুর" আছে ১টি মেদিনীপুর জেলার কাঁথী থানায়; অপরটি মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমার রঘুনাথগঞ্জ থানায় এই জঙ্গীপুর।

গ্রামের নাম পরিবর্ত্তনের ইতিহাস সহজে পাওয়া যায় না। স্থানীয় অনুসন্ধানে কিছু কিছু জানিতে পারা যায়। কোন কোন নাম পরিবর্ত্তন লিপিবদ্ধ আছে। সম্প্রতি প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ তাঁহার "পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি" নামক সুবৃহৎ পুস্তকে কয়েকটি গ্রামের বা স্থানের নাম পরিবর্ত্তনের ইতিহাস দিয়াছেন। বিনয়বাবু ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, তিনি পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ২০০ গ্রামে গিয়াছেন; এবং পাশাপাশি গ্রাম লইয়া প্রায় ৬০০ গ্রাম পর্য্যটন করিয়াছেন। এই হিসাবে তাঁহার সংগৃহীত তথ্য খুব মূল্যবান বলিয়া মনে করি।

কতকগুলি গ্রামের নাম পাওয়া যায়—কিন্তু সেই নামে কোনও মৌজা পাওয়া যায় না। হয় পূর্ব্বে এই নামে গ্রাম ছিল, রাজস্ব সংক্রান্ত কাগজে অন্য নাম থাকায় মৌজার নাম অন্যরূপ হইয়াছে; নহে ত মৌজার নাম লোকমুখে ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। অন্যান্য কারণও থাকিতে পারে।

কত সহজে গ্রামের নাম পরিবর্ত্তিত হইতে পারে তাহা জীবন ডাকাতের উক্তি হইতে বুঝা যায়। আবার গ্রামের নামের ইতিহাস সম্বন্ধে কত সহজে ভুল হইতে পারে তাহার একটি মজার উদাহরণ দিব। আমার মাতুলালয় এঁড়েদহ বা আড়িয়াদহ গ্রামে। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল কাব্যে এঁড়েদার উল্লেখ আছে। কয়েক বৎসর আগে এঁড়েদহ স্কুলে একটি সাহিত্য সভা হয়—বন্ধুবর সু-সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি ছিলেন। নানা লেখা পড়া হয়; গ্রামের একটি সুশিক্ষিত যুবক বলেন যে, গ্রামের নাম আর্য্যদহ, কারণ পোষ্ট আপিসের নাম Ariadaha. ইহার প্রকৃত বানান Aryadaha অর্থাৎ আর্য্যদহ। পোষ্ট আপিসের সাহেব কর্ম্মচারিগণ উচ্চারণের সুবিধার জন্য এইরূপ বানান পরিবর্ত্তন করিবার ফলে গ্রামের নাম লোকমুখে আড়িয়াদহ বা এঁড়েদহ হইয়াছে। আমার যতদূর জানা আছে তাহাতে আন্দাজ ১৮৯৮ সনে এঁড়েদহে ডাক-ঘর স্থাপিত হয়। তাহার পূর্ব্বে আন্দাজ ১৮৫০ সনের রেভিনিউ সার্ভেতে গ্রামের নাম আড়িয়াদহ পাওয়া যায়। তথাপি শিক্ষিত ব্যক্তির মুখে (তিনি এম, এ পাশ) নিজ গ্রামের নাম সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম।

আমরা প্রথমে বিনয়বাবু কর্ত্তৃক সংগৃহীত তথ্য হইতে কিরূপে গ্রামের নাম পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহার বিভিন্ন উদাহরণ দিব। পরে আমাদের সংগৃহীত তথ্যাদি দিব:

১। পোলবা (হুগলী জেলা)

বিনয়বাবু তাঁহার "পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি" নামক পুস্তকের ৫২৬-৫২৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে:

"কিংবদন্তী হ'ল, পোলবার পালবংশের আদিপুরুষ নারায়ণ পাল ও তাঁহার অনুজ জনার্দ্দন পাল (বা জটিল পাল) প্রায় চার শ'-সাড়ে চার শ' বছর আগে হুগলী জেলার এই অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেন। তখন এই অঞ্চল দিয়ে দামোদরের প্রশাখা ভাগীরথী অভিমুখে প্রবাহিত হত। বন্যায় পোলবা, মহানাদ, দ্বারবাসিনী প্রভৃতি অঞ্চল প্রায় ভেসে যেত। তাই পোলবার সদগোপ পালবংশের আদিপুরুষরা বেছে বেছে যতটা সম্ভব উঁচু জায়গায় বসতি স্থাপন করেছিলেন। প্রথমে তাঁদের গ্রামের নাম

ছিল জনার্দ্দনপুর (জনার্দ্দন পালের নামে), পরে পালবংশের বৃদ্ধির সময় তাঁরা যেখানে বসতি গড়ে তোলেন তার নাম হয় 'পালবাস'। এই পালদের বাসস্থান বা পালবাস নামই পরে বিকৃত হয়ে 'পোলবা' হয়েছে মনে হয়।"

পোলবা থানায় বর্ত্তমানে জনার্দ্দনপুর বলিয়া কোনও মৌজা বা গ্রাম নাই। ঐ থানার ১৯৪টি গ্রামের মধ্যে পোলবা পরিমাণে দ্বিতীয় ও জনসংখ্যায় প্রথম।

	পরিমাণ	জনসংখ্যা	শিক্ষিতের সংখ্যা
পোলবা	৪,৫১৮ বিঘা	২,২৩৪	৫৫৯
মোট্	৫,৫৯২ „	৯৩২	১৫

পশ্চিমবঙ্গে পোলবা এই নামের দ্বিতীয় গ্রাম নাই।

ইং ১৬৬০, ১৬৯০, ১৭৫৭ সালে দামোদরের গতিপথ ও বিভিন্ন শাখার সৃষ্টি ও লয় ইত্যাদি সম্বন্ধে হুগলী ডিষ্ট্রিক্ট হ্যাণ্ডবুকে যে তথ্যাদি দেওয়া আছে তাহা উক্ত কিংবদন্তির পোষক। ১৭৫৭ সন অবধি দামোদর (কানা নদী) পোলবা থানার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া নয়াসরাইতে ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইত।

২। শ্রীপুর (হুগলী জেলা)

পশ্চিমবঙ্গে শ্রীপুর নামে ২২টি গ্রাম আছে। জেলাওয়ারী ভাবে তাহাদের সংখ্যা এইরূপ। যথা:

বর্দ্ধমান—৪ ২৪ পরগণা—৩
বীরভূম—২ মুর্শিদাবাদ—২
বাঁকুড়া—১ মালদহ—৫
মেদিনীপুর—১ পশ্চিম দিনাজপুর—১
হুগলী—৩

হুগলী জেলার বলাগড় থানার অন্তর্গত শ্রীপুর সম্বন্ধে বিনয়বাবু তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন যে:

"রামেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ১৬৩০ শকাব্দে (১৭০৮) সনে গঙ্গার পূর্ব্বতীর উলাগ্রাম থেকে উঠে এসে পশ্চিম তীরে হুগলী জেলার আটিশেওড়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন এবং গ্রামের নূতন নামকরণ করেন শ্রীপুর। রামেশ্বরের অপর পুত্র অনন্তরাম শ্রীপুরের কিছুদূরে সুখড়িয়া গ্রামে গিয়ে বাস করেন। উলার মিত্রমুস্তৌফী বংশ এই ভাবে হুগলী জেলার শ্রীপুর ও সুখড়িয়ায় এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। এই সব অঞ্চল তখন প্রধানতঃ বাঁশবেড়িয়ার রাজাদের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাঁশবেড়িয়ার রাজা রঘুদেব আটিশেওড়া গ্রামে রঘুনন্দন মিত্রমুস্তৌফীকে ৭৫ বিঘা মহত্তরান ভূমি দান করেন। সেখানে রঘুনন্দন উলার বসতবাটির পারিপাট্য বজায় রেখে তার অনুকরণে গড়বেষ্টিত বাড়ি, দীঘি, পুষ্করিণী, চণ্ডীমণ্ডপ ইত্যাদি নির্ম্মাণ করেন।" (৫৩৬-৫৩৭ পৃষ্ঠা দেখুন।)

এই শ্রীপুরের জমির পরিমাণ ও বর্ত্তমান লোকসংখ্যা দিলাম। জমির পরিমাণ—২,০৩২ বিঘা, জনসংখ্যা ২,৫৫০ জন, শিক্ষিতের সংখ্যা ১১৯ জন।

বর্ত্তমানে পশ্চিম বাংলায় দুইটি আটিসাড়া (ইংরেজী Atisara হইতে অনুবাদ) পাওয়া যায়, একটি হুগলী জেলার সিঙ্গুর থানার অন্তর্গত, জমির পরিমাণ—২,৫৯৮ বিঘা, অপরটি ২৪ পরগণা জেলার নৈহাটি থানার অন্তর্গত, জমির পরিমাণ ১,৪৫৫ বিঘা। এই দুইটির সঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনীগ্রন্থে যে আটিসাড়া গ্রামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই বলিয়াই মনে হয়।

৩। বলাগড় (হুগলী জেলা)

বলাগড় সম্বন্ধে বিনয়বাবু তাঁহার পুস্তকের ৫৩৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে:

"শ্রীপুরের সংলগ্ন হুগলী জেলার বলাগড় গ্রাম রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণদের বসতির জন্য বিখ্যাত। বলাগড় গ্রামের পত্তন ও নাম সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, বলরাম ঠাকুর এখানে গড়বাড়ি তৈরি করে বসতি স্থাপন করেছিলেন।

"প্রবাদ আছে কেশরকুনী রাজা রাঘব বলরাম ঠাকুরের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রুদ্রঠাকুরকে বলপূর্ব্বক নিজ পিতৃব্য গোবিন্দ রায়ের কন্যার সহিত বিবাহ দেন, পশ্চাৎ বলরাম ঠাকুর গঙ্গাধর ঠাকুর রতিকান্ত ঠাকুর, মধুসূদন তর্কালঙ্কার প্রভৃতিকে আক্রমণ করেন। ঠাকুরগণ কুলরক্ষার্থ রাজার দৌরাত্ম্যে ফুলে (ফুলিয়া) পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গার পশ্চিম তীরে আসিয়া গঙ্গাধর ঠাকুর গুপ্তিপাড়া(?), রতিকান্ত ঠাকুর পাঁচগড়া, বলরাম ঠাকুর বলাগড়, মধুসূদন তর্কালঙ্কার ফেলেগড় ইত্যাদি গ্রামে বাস করেন। কেহ কেহ বলেন, বলাগড় গ্রামের নাম আভটিসেওড়া বিল; বলরাম ঠাকুর বাস করার দরুন ঐ নাম লোপ হইয়া বলাগড় নাম হয়।" (রোহিণীকান্ত মুখোপাধ্যায়—কুলসার সংগ্রহ, ৬৩ পৃষ্ঠার পাদটীকা)"

আমাদের মনে হয় অভেটি সেওড়া বিল ছাপার ভুল। ইহা 'আটিসেওড়া ছিল' হইবে। যে নামই হউক, তাহাতে কিছু যায় আসে না। কথা হইতেছে যে, পূর্ব্ব নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কৃষ্ণনগরের রাজা রাঘব ইং ১৬৩৩-৩৪ হইতে ৫১ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার খুড়তুতো বোনের বিবাহ তাঁহার রাজত্বের প্রথম ভাগেই ঘটা সম্ভব। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কৃষ্ণনগরের রাজাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকিলেও পরে মহারাজ রাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র ভূপ বাজপেয়ীর আমলের প্রতিপত্তির ন্যায় প্রবল ছিল না। ১৭শ' শতাব্দীতে সাজাহান বা আলমগীর দিল্লীর বাদশাহ —মোগল সাম্রাজ্য গৌরবের উচ্চ চূড়ায়, তখনও ভাঙ্গন ধরে নাই। বাংলাদেশ মোগলের দাপটে সু-শাসিত। গঙ্গার পশ্চিম তীরে বাঁশবেড়িয়ার রাজাদের তখন খুব প্রতিপত্তি ও প্রতাপ। তাহা না হইলে আলমগীরের রাজত্বে নূতন করিয়া অনন্ত বাসুদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করা সম্ভব হইত না। ইহারা দিনাজপুরের মহারাজা বাহাদুরের জ্ঞাতি (দিনাজপুরের বর্ত্তমান মহারাজারা দৌহিত্র বংশ) কেহ কেহ বলেন যে, রাজা গণেশ ইহাদের বংশোদ্ভূত। ইহারা

উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ ; কাশ্যপ গোত্র ; পদবী দত্ত। ইঁহারা বরাবর ব্রাহ্মণপালক। ইঁহাদের রাজ্যে গিয়া অত্যাচার করা বা জুলুম করা কৃষ্ণনগরের রাজাদের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। প্রবাদের সম্ভাব্য সত্যতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিনয়বাবু "কুলসার সংগ্রহ" কোন বৎসরে ছাপা হইয়াছিল দিলে ভাল হইত।

বলরাম ঠাকুর এইখানে গড়বাড়ি করিয়া বসবাস করেন। ইহা হইতে তাঁহার সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। বলাগড় গ্রামের পরিমাণ কিন্তু শ্রীপুরের তুলনায় খুব কম, প্রায় সিকি—৪৩৭ বিঘা মাত্র।

পশ্চিমবঙ্গে ৩টি বলাগড় আছে : (১) বর্দ্ধমান জেলার রায়না-থানায়। (২) হুগলী জেলার চুঁচুড়া থানায় ; আর (৩) ঐ জেলায় বলাগড় থানায়। হুগলী জেলায় ধনিয়াখালি থানায় বলাগড়ি আছে। আমাদের আলোচ্য বলাগড় বলাগড় থানায়।

'বলরাম'—দিয়া গ্রামের নাম আরম্ভ এইরূপ গ্রাম পশ্চিম বাংলায় আছে :

বলরাম বাটি	৩
বলরাম চক্	১
বলরাম ডিহি	২
বলরাম পোতা	১
বলরামপুর	৬৯

হুগলী শহরের মধ্যে যে বলাগড় আছে তৎসম্বন্ধে হুগলী ডিষ্ট্রীক্ট হ্যাণ্ডবুকের ৩২ পৃঃ এইরূপ লিখিত আছে যে :

"To the south is Bandel, a name evidently derived from the Bengali word bandar, meaning a port. Bandel appears to have been the port of Hooghly town in the time of the Portuguese and the Mughals, while Tieffenthaler (1785) refers to the whole town of Hooghly as Bander. The vernacular name is Balagar (the strong fort.)"

এখন যে গ্রামকে বলরাম ঠাকুরের গড় বা বলাগড় বলা হইতেছে পূর্ব্বে ইহার কি নাম ছিল? ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী স্থান, —ভাগীরথীর উভয় তীরেই বরাবর ঘন জন-বসতি ছিল ও আছে, এমতে এই স্থানে জন-বসতি থাকাই সম্ভব। জন-বসতি বা গ্রাম থাকিলে তাহার একটা নামও ছিল—এই নামটি কি?

৪। বাহিরগড় (হুগলী)

বিনয়বাবু তাঁহার উক্ত পুস্তকে ৫৫২-৫৫৮ পৃঃ হুগলী বাহিরগড় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। "হাওড়া-ময়দান থেকে চাঁপাডাঙ্গার লাইট রেলপথে 'বাহিরগড়া' নামে একটি ছোট্ট ষ্টেশন আছে। 'গড়' কথাটি লোকের মুখে মুখে গড়িয়ে 'গড়া' হয়েছে।" এই বাহিরগড়া হাওড়া হইতে ২২ মাইল দূরে। লোক-মুখে কিন্তু গ্রামটি বাহিরগড় বলিয়া পরিচিত। তারকেশ্বরের মোহান্তের বিখ্যাত মামলায় হরিপাল পরগণার নয়নগরবাসী আশুতোষ সিংহ এইরূপ বলিতেছেন :

"The Bahirgory Singh Roys are the chiefs of our caste."

বাহিরগড় বলিয়া কোন মৌজা পশ্চিমবঙ্গে নাই। ঐ গ্রামের মৌজার নাম হইতেছে কৃষ্ণনগর, অন্যান্য কৃষ্ণনগর হইতে পৃথক বুঝাইবার সময় লোকে বলে জাঙ্গীপাড়া-কৃষ্ণনগর। বিনয়বাবু লিখিয়াছেন যে, "পশ্চিমবাংলার তিনটি কৃষ্ণনগরের মধ্যে এটির নাম জাঙ্গীপাড়া-কৃষ্ণনগর। বাকি দুটি খানাকুল-কৃষ্ণনগর (হুগলী-আরামবাগ মহকুমা) ও গোয়াড়ী-কৃষ্ণনগর (নদীয়া)। সিংহরায়-দের গড়বাড়ির বাইরের অবশিষ্ট গ্রামকে বাহিরগড় বলা হ'ত। তাই থেকে গ্রামের নাম 'বাহিরগড়' হয়েছে। গড়ের বাইরে কয়েকটি প্রাচীন শিবমন্দির পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। তার মধ্যে 'দামোদর' নামে কথিত শিবমন্দিরটি অতি সুন্দর কারুকার্য্য-খচিত। মন্দিরের গায়ে খোদাই করা আছে—"শুভমস্তু শকাব্দ ১৬৬৫।" (৫৫৭ পৃঃ দেখুন)।

বর্ত্তমানে সিংহরায়দের ১০।১১ পুরুষ চলিতেছে। তাঁহারা এই অঞ্চলে আসেন আন্দাজ ইং ১৬৭৫ সনে। তাঁহারা প্রতিপত্তিশালী হইলেও মৌজার নাম পরিবর্ত্তিত হয় নাই। তাঁহারা আসিবার ৬৮ বৎসর পরে পূর্ব্বোক্ত শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা হইতে বুঝা যায় যে, গড়ের বাহিরে যাঁহারা বাস করিতেন তাঁহারা সমৃদ্ধিশালী ছিলেন।

জাঙ্গীপাড়া-কৃষ্ণনগর মৌজা পরিমাণে খুব বড়—৫,৩৮১ বিঘা। ১৯৫১ সনের জনসংখ্যা—৩,৬২৭ জন ; আর ইঁহাদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা—১,১০২ জন।

পশ্চিমবাংলায় ৩টি নহে ৪৮টি 'কৃষ্ণনগর' আছে। জেলাওয়ারী হিসাবে উহার সংখ্যা নিম্নে দিলাম। যথা :

বর্দ্ধমান	১
বীরভূম	২
বাঁকুড়া	৯
মেদিনীপুর	২০
হুগলী	৩
হাওড়া	১
২৪ পরগণা	৭
নদীয়া	৩
মুর্শিদাবাদ	১
পশ্চিম দিনাজপুর	১

পূর্ব্বেই বলিয়াছি 'বাহিরগড়' বলিয়া কোন গ্রাম বা মৌজা পশ্চিমবাংলায় নাই। "বাহির—" নাম দেওয়া আছে :

বাহিরবাগ	১
বাহিরচারা	১
বাহিরধনজোড়	১

বাহির দিয়া	১
বাহিরগাছি	৪
বাহির গঙ্গারামপুর	১
বাহিরঘন্না	১
বাহিরগ্রাম	২
বাহিরি	১
বাহির খণ্ড	১
বাহিরকুন্ডী	১
বাহিরপুর	১
বাহির রঘুনাথ চক্	১
বাহির রণগঙ্গা	১
বাহিরখণ্ড	১
বাহির সর্ব্বমঙ্গলা	১
বাহির সোনাথালি	১
বাহিরকাপ	১

এই গ্রামের নাম পরিবর্ত্তিত হইতেছে; এখনও সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তিত হয় নাই। মৌজার নাম এখনও কৃষ্ণনগর আছে; এখন জমিদারী-প্রথা লোপ পাইয়াছে, কাগজপত্রে পুরাতনের সঙ্গে সংযোগ রাখিবার যে আবশ্যকতা ছিল, যে প্রেরণা ছিল তাহা লোপ পাইয়াছে। এখন সরকার হুকুম দিলেই সহজেই গ্রামের নাম পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে।

৫। বীজপুর (২৪ পরগণা)

বিনয়বাবু তাঁহার পুস্তকের ৪৮২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে :

"সেন আমলে তীর্থকেন্দ্ররূপে ত্রিবেণীর প্রাধান্য খুব বেড়েছিল মনে হয়। মনে হবার কারণ শুধু পাথরে নিদর্শন নয়, লক্ষ্মণ-সেনের সভাকবি ধোয়ী বর্ণিত পবনদূত-কাব্যের বিজয়পুর রাজধানী ত্রিবেণীর কাছাকাছি, গঙ্গার পূবে বা পশ্চিমে, কোথাও ছিল মনে হয় (পশ্চিম তীরের হালিশহর-বীজপুর 'বিজয়পুর' বলে মনে হয়)।"

৪৯৮ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন :

"লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ধোয়ী সেনরাজাদের রাজধানী 'বিজয়পুর' বলে উল্লেখ করেছেন। 'পবনদূত' নামে যে দূতকাব্য ধোয়ী রচনা করেছেন তাহাতে বিজয়পুরের যে ভৌগোলিক অবস্থানের নির্দ্দেশ পাওয়া যায়, তা থেকে বোঝা যায় যে, বিজয়পুর ত্রিবেণীর কাছে গঙ্গার তীরে কোথাও অবস্থিত ছিল। ত্রিবেণীর পূর্ব্বতীরে হালিশহরের কাছে বীজপুর' অঞ্চল মনে হয় এই বিজয়-পুরের স্মৃতি বহন করছে।"

৬৪৯ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন যে :

"এই বিজয়পুর কোথায় তা নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে তর্ক চলছে। আমাদের মনে হয়, হালিশহর-কুমারহট্টের প্রাচীন নাম ছিল 'বিজয়পুর'। আজও হালিশহরের সংলগ্ন 'বীজপুর' নাম তার সাক্ষী দিচ্ছে। লক্ষণীয় হ'ল, 'পবনদূত' কাব্যে গঙ্গা থেকে নির্গত যমুনা নদীর বর্ণনা আছে, কিন্তু সরস্বতী নদীর কোন উল্লেখ নাই। তার পরেই আছে রাজধানী 'বিজয়পুরের' নাম। তাই মনে হয়, গঙ্গার অদূরবর্ত্তী এই রাজধানী পূর্ব্বতীরেই অবস্থিত ছিল, সরস্বতী-সংলগ্ন পশ্চিমতীরে নয়। শ্রীচৈতন্যের সময়েও বিজয়পুর নাম প্রচলিত ছিল মনে হয়, কারণ তাঁর সমকালীন 'মুখ' বংশীয় একটি বিখ্যাত বিদ্বদ গোষ্ঠীতে ভগবান ন্যায়াচার্য্য, গোপাল সার্ব্বভৌম প্রভৃতি সাত ভাই ছিলেন এবং সার্ব্বভৌমের নিবাসসূচক 'বিজয়পুরিয়া' পদ কুলগ্রন্থে পাওয়া যায়।"

হালিশহর-বীজপুর গঙ্গার পূর্ব্বতীরে; প্রথম উদ্ধৃতিতে যে পশ্চিম তীরের কথা আছে তাহা আমাদের মনে হয় ছাপার ভুল। বিনয়বাবুর অনুমান সঙ্গত বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। ত্রিবেণীর নিকট এই হালিশহর বীজপুর ছাড়া আর কোনও বীজপুর নাই। পশ্চিম বাংলায় ৩৯,০০০ গ্রামের মধ্যে ৪টি বীজপুর আছে। তাহাদের অবস্থানের পরিচয় নিম্নে দিলাম। যথা :

(১) জেলা বর্দ্ধমান	মহকুমা আসানসোল	থানা জামুরিয়া	
(২) „ বাঁকুড়া	„ সদর	„ ছাতনা	
(৩) „ „	„ বিষ্ণুপুর	„ পাত্রসায়র	
(৪) „ ২৪ পরগণা	„ বারাকপুর	„ বীজপুর	

যদি কোনও বীজপুরের সহিত সেন-রাজধানী বিজয়পুরের সম্বন্ধ থাকে ত তাহা এই হালিশহর-বীজপুরের সহিত থাকাই সম্ভব। 'বিজয়পুর' বলিয়া কোনও মৌজা পশ্চিম বাংলায় নাই। 'বিজয়—' নাম দেওয়া আছে 'বিজয়গড়' ২টি; আর ১টি 'বিজয়রামপুর'। ২৪ পরগণায় যে 'বিজয়নগর' আছে তাহা বসিরহাট মহকুমার সন্দেশখালি থানায়—ত্রিবেণী সঙ্গম হইতে বহুদূরে।

বীজপুর লক্ষ্মণ সেনের অন্যতম রাজধানী বিজয়পুর হউক বা না হউক ইহা যে এককালে বিজয়পুর বলিয়া পরিচিত ছিল তাহা আমরা কুলগ্রন্থের 'বিজয়পুরিয়া' এই পদ হইতে পাই। ভাষার বা শব্দের অবক্ষয়ে কালক্রমে বিজয়পুর বীজপুরে পরিণত হইয়াছে—এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই।

এই প্রসঙ্গে আমাদের আর একটি কথা মনে পড়িতেছে। ইং আন্দাজ ১৫০০ সনের বিজয়পুর যদি ৪।৫ শত বৎসরে বীজপুরে পরিণত হয় তাহা হইলে যে যে গ্রামের নামে 'বিজয়—' দেওয়া আছে তাহা তুলনায় নূতন গ্রাম বা তাহাদের এই নাম পরে হইয়াছে।

৬। আটিসারা-বারুইপুর (২৪ পরগণা)

পশ্চিম বাংলায় আটিসারা বা আঁটিসাড়া বলিয়া ২টি গ্রামের বা মৌজার নাম পাওয়া যায়। একটি হুগলী জেলার সিঙ্গুর থানায়, অপরটি ২৪ পরগণা জেলার নৈহাটী থানায়। একটি আটিসাড়া বা আটিশেওড়া হুগলী জেলার শ্রীপুরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আর একটি আটিসারার এইরূপে পরিবর্ত্তিত হইবার কথা বলিব। বিনয়বাবু তাঁহার পুস্তকের ৬১৭-৬১৮ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন :

"শ্রীচৈতন্য নীলাচলে যাত্রাপথে আদিগঙ্গার তীরে আটিসারা গ্রামে অবতরণ করেছিলেন। সেই গ্রামে শ্রীঅনন্ত নামে এক পরম সাধু বাস করতেন। একরাত্রির জন্য তাঁর গৃহেই শ্রীচৈতন্য আতিথ্যগ্রহণ করেছিলেন এবং সারারাত্রি কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করেছিলেন। পরদিন প্রভাতে অনন্ত পণ্ডিতের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আদিগঙ্গার পথে আবার তিনি নীলাচলে যাত্রা আরম্ভ করেন। বৃন্দাবন দাসের 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থে আটিসারা গ্রামের এই কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে :

হেনমতে প্রভু তত্ত্ব কহিতে কহিতে।
উত্তরিলা আসি আটিসারা নগরেতে॥
সেই আটিসারা গ্রামে মহা ভাগ্যবান।
আছেন পরম সাধু—শ্রীঅনন্ত নাম।
রহিলেন আসি প্রভু তাঁহার আলয়।
কি কহিব আর তাঁর ভাগ্য সমুচ্চয়।
অনন্ত পণ্ডিত অতি পরম উদার।
পাইয়া পরমানন্দ বাহ্য নাহি আর॥

(শ্রীচৈতন্য ভাগবত—অন্ত্য, ২য় অঃ)

আটিসারা গ্রামের অস্তিত্ব এখন বারুইপুরের মধ্যে বিলুপ্ত। তার স্বতন্ত্র কোন সত্তা নেই, কিন্তু এই আটিসারার জন্যই বারুইপুর আজ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রীপাট ও তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। কটকিপুকুর, সদাব্রতঘাট, কীর্ত্তনখোলাঘাট নামে আজও যে কয়েকটি পুষ্করিণী বারুইপুরে দেখা যায়, তা প্রাচীন ভাগীরথীর খাতের উপর স্থাপিত বলে স্থানীয় লোকের কাছে গঙ্গার মতনই পবিত্র। 'কটকিপুকুর' নামকরণের কারণ হ'ল, এই ঘাট থেকে শ্রীচৈতন্য কটকের পথে নৌকা করে যাত্রা করেছিলেন, অনন্ত পণ্ডিতের গৃহে একরাত্রি বিশ্রাম নিয়ে। 'সদাব্রত ঘাট' এখনও গঙ্গার খালের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে দেখা যায়, মাত্র কয়েক বছর আগেও খালপথে নৌকা এসে ঘাটে ভিড়ত। এখন পুকুরের মাছ রক্ষার জন্য খালের সংযোগপথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। 'কীর্ত্তনখোলা ঘাট' কুলপী রোডের ঠিক পাশে, গঙ্গার খালের ধারে। সারারাত্রি এই স্থানে শ্রীচৈতন্য কীর্ত্তন করেছিলেন, তাই এর নাম কীর্ত্তনখোলা ঘাট। গঙ্গার খালটি এখনও লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বারুইপুর থেকে রাজপুর, গড়িয়া, টালিগঞ্জ ঘুরে এসে কালিঘাটের আদিগঙ্গার সঙ্গে মিশেছে এবং বারুইপুর থেকে আরও দক্ষিণে মথুরাপুর খাড়ি—ছত্রভোগ পর্য্যন্ত গেছে। প্রাচীন ভাগীরথীর লুপ্তধারা চিনতে একটুও কষ্ট হয় না।"

ইং ১৯৫৩ সনে সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত Report on Agro-Economic Survey of Baruipore Block-এর ৩য় পৃষ্ঠায় আছে :

"Two other narrow streams pass through the block, one being commonly known as the Ganga and the other as the Banberekhal. Though boat communication seems to be feasible over some lengths of these channels during the rainy season, this means of transport do not seem to be utilised to any appreciable extent."

২৪ পরগণা ডিষ্ট্রিক্ট হাণ্ডবুকের ৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে :

"The original channel (of the Ganges) was identical with Tolly's Nullah from Kidderpore to Garia (8 miles south of Calcutta), from which point it ran to the sea in a south-easterly direction,............ The old channel may still be made out at various places, such as Barnipur, Dakshin Barasat, Jaynagar and Rajpur in the Sadar subdivision and Multi and Hansghar in the Diamond Harbour subdivision."

আদিগঙ্গার সংবাদ বারুইপুরে পাওয়া যায় ; কিন্তু বারুইপুর থানার মধ্যে আটিসারা বলিয়া কোনও মৌজা নাই। আটিসারার নাম বদলাইয়া কি হইয়াছে তাহা স্থানীয় লোকে বলিতে পারেন।

৭। কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

যেমন বিদ্যাসাগর বলিলে আমরা প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই বুঝি, তেমনই শুধু কৃষ্ণনগর বলিলে আমরা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কৃষ্ণনগরকেই বুঝি। কৃষ্ণনগর রাজবংশের রাজা রাঘব ইং ১৬৩৩-৩৪ হইতে ইং ১৬৮৪-৮৫ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি রেউইতে (Reui) রাজধানী স্থাপন করেন ও রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। রাঘবের পুত্র রেউইর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া কৃষ্ণনগর রাখেন। এইখানে বহু গোয়ালার বাস ছিল। তাঁহারা কৃষ্ণভক্ত ও কৃষ্ণপূজা করিত। এইজন্য নাম কৃষ্ণনগর রাখা হয় বলিয়া অনেকে মনে করেন। এই নাম পরিবর্ত্তন আন্দাজ ইং ১৭০০ সনে হয়। স্যর উইলিয়ম উইলসন হাণ্টার তাঁহার ষ্ট্যাটিষ্টিকাল এ্যাকাউণ্ট অব নদীয়াতে লিখিয়াছেন যে :

"Raghab was succeeded by his son Rudra Rai, whose carreer was eventful. Rudra Rai erected at Nabadwip a temple dedicated to Siva. He changed the name of the place Reui, where his father had built a royal residence, into (Krishnagor) Krishnanagar, in honour of Krishna. He also constructed a canal extending northward and southward, and connected it with the moat surrounding Krishnagar."

কৃষ্ণনগর মৌজার পরিমাণ হইতেছে খুব বেশী—১৪,৬৮৬ বিঘা বা ৭·৬ বর্গমাইল।

৮। রাণাঘাট (নদীয়া)

রাণাঘাট নদীয়া জেলার একটি মহকুমা শহর। মৌজার নামও রাণাঘাট। নদীয়া ডিষ্ট্রিক্ট হ্যাণ্ডবুকে লিখিত আছে যে :

"Very little seems to be known of the early history of this place. It is said to have been originally called Ranighat after the Rani of the famous Krishna Chandra, Maharaja of Nadia."

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাণীর নাম অনুসারে পূর্ব্বে এই স্থানের নাম রাণীঘাট ছিল। লোকের মুখে মুখে রাণাঘাটে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন যে পূর্ব্বে বিখ্যাত ডাকাত রাণার এইস্থানে ঘাটী ছিল। সেজন্য লোকে 'রাণার ঘাটী' বলিত। লোকমুখে 'রাণার ঘাটী' রাণাঘাটে পরিণত হইয়াছে। এখানকার সিদ্ধেশ্বরী কালীকে কেহ কেহ রাণাডাকাতের পূজিত কালী বলেন। পশ্চিম বাংলায় এই একটি রাণাঘাট আছে। রাণিঘাট বলিয়া কোনও গ্রাম বা মৌজা বর্ত্তমানে নাই। 'রাণি—' দিয়া বহু মৌজা পশ্চিম বাংলায় আছে। যথা :

রাণিবাঁধ—৩	রাণিডাঙ্গা—২	রাণিপাড়া—১
রাণিবড়—১	রাণিডিহি—২	রাণিপাথার—১
রাণিরাজার—১	রাণিগাছি—২	রাণিপুর—১৭
রাণিচক্—৮	রাণিগঞ্জ—৫	রাণিরবাজার—২
রাণিগড়—১	রাণিগ্রাম—১	রাণিরভেড়ী—১
রাণিহাটি—৬	রাণিঝোড়—১	রাণিসাই—২
রাণিথামার—১	রাণিনগর—৮	রাণিসোল—১

৯। শিবনিবাস-মাঝদিয়া (নদীয়া)

নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ থানার অন্তর্গত শিবনিবাস মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও মহারাজ শিবচন্দ্রের স্মৃতির সহিত বিজড়িত। মৌজার নামও শিবনিবাস; পার্শ্ববর্ত্তী মৌজার নাম মাঝদিয়া। নদীয়া ডিষ্ট্রিক্ট হ্যাণ্ডবুকের ৫১ পৃঃ লিখিত আছে যে :

"Sibnibas—A village on the bank of the Churni, nearly due east of Krishnagan of the Headquaters sub-division; the name of this village has been changed for the station Majhdia upon the main line of the Eastern Railway."

কালক্রমে লোকে শিবনিবাস নাম ভুলিয়া যাইবে।

১০। চণ্ডীদাস-নান্নুর (জেলা বীরভূম)

বহুকাল হইতে এই গ্রামের নাম কেবলমাত্র নান্নুর ছিল। প্রায় ৪০।৪৫ বৎসর পূর্ব্বে যখন সু-সাহিত্যিক ও কবি বরদাচরণ মিত্র বীরভূমের জেলা জজ ছিলেন, তখন তাঁহারই আগ্রহে নান্নুরের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া চণ্ডীদাস-নান্নুর রাখা হয়। এখন ডাকঘরেরও ঐ নূতন নাম। মৌজার নামও পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে—নাম হইয়াছে চণ্ডীদাস-নান্নুর। থানার নাম কিন্তু নান্নুর আছে; এবং বিধানসভার একটি ভোটকেন্দ্রের নামও নান্নুর।

১১। যোগেশগঞ্জ (২৪ পরগণা)

অনেক স্থলে জমিদারের ইচ্ছানুযায়ী নূতন প্রতিষ্ঠিত গ্রামের নামকরণ হইয়াছে। ২৪ পরগণা জেলার হাসানাবাদ থানার অন্তর্গত যোগেশগঞ্জ এইরূপ একটি নূতন গ্রাম বা মৌজা। ইহা পূর্ব্বে প্রখ্যাত কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেনের সুন্দরবন জমিদারীর অন্তর্গত ছিল। তাঁহার পুত্র রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র সেন—যিনি বহুদিন অতীব দক্ষতার সহিত ২৪ পরগণা জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান বা সভাপতির কার্য্য চালাইয়াছিলেন—তাঁহার নাম অনুসারে এই স্থানের নাম যোগেশগঞ্জ রাখেন। গত ১৯২৪-১৯৩১ সনের জরিপ জমাবন্দীর কাগজে এই নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ইহা একটি প্রকাণ্ড গ্রাম, ইহার পরিমাণ ৫,৪৮২ বিঘা; ১৯৫১ সনে জনসংখ্যা ছিল ২,৬৮৬ জন। এখানে প্রাইমারী স্কুল ও ডিসপেনসারী আছে, ফাল্গুন-চৈত্র মাসে ৮ দিন ধরিয়া একটি মেলা বসে।

পূর্ব্বে এই স্থানের কোনও নাম ছিল না। জুরিসডিক্সন লিষ্ট অনুযায়ী ইহা সুন্দরবন ১৭৩নং লাট, ১ম খণ্ড, বলিয়া পরিচিত ছিল।

১২। শিকড়া (২৪ পরগণা)

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মানস পুত্র রাখাল মহারাজ বা স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং নিখিল উড়িষ্যা উকীল সভার সভাপতি উপেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের জন্মস্থান শিকড়া বা শিকড়া-কুলীনগ্রামে। আরও অনেক প্রখ্যাত ব্যক্তি এই গ্রামের লোক। যে গ্রামে তাঁহাদের জন্ম সে মৌজার নাম কিন্তু শিকড়া নহে। ২৪ পরগণা জেলার আমডাঙ্গা থানায় শিকড়া বলিয়া একটি মৌজা আছে; ইহার সহিত স্বামী ব্রহ্মানন্দর জন্মস্থান শিকড়া বা শিকড়া কুলীনগ্রামের কোন সম্পর্ক নাই। এই শিকড়া কুলীনগ্রাম বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত। আমার মাতামহীর জন্মস্থান এই শিকড়া গ্রামে; বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার বয়স ৯৪।৯৫ হইত—১৮ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহ উপলক্ষে লিখিত একখানি চিঠি হইতে জানিতে পারি যে, শিকড়ার ঘোষ বংশ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ যে বংশের সন্তান) সম্ভ্রান্ত কুলীন কায়স্থ বংশ ইত্যাদি ইত্যাদি। শিকড়া নামটি ৮০।৮৫ বৎসর আগেও প্রচলিত ছিল—তাহারও কত আগে এই নাম প্রচলিত ছিল কে জানে ?

১৩। জগন্নাথপুর (কোন জেলায় ?)

ক্ষীরোদবিহারী গোস্বামী "শ্রীনিত্যানন্দ বংশাবলী ও সাধনা" বাংলা সন ১৩২১ সালে প্রকাশ করেন। ঐ গ্রন্থের ৫৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, শ্রীরামপুর মাহেশের জগন্নাথদেবের" সেবার জন্য

নবাব খানে আলি সাহ ১,১৮৫ বিঘা জমি (এক্ষণে জগন্নাথপুর নামে খ্যাত) লিখিত পাট্টাসহ বন্দোবস্ত করিয়া দেন। অধুনা সাং পাণিহাটির জমিদার গৌরীশঙ্কর রায় চৌধুরী মহাশয় নিজ ব্যয়ে তাহা লাখরাজভুক্ত করিয়া দেবোত্তর সম্পত্তির রক্ষার উপায় করিয়া আপন পুণ্যকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।"

পানিহাটির জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা দেওয়ান গৌরীচরণ রায় চৌধুরী (গৌরীশঙ্কর নহে) ইং ১৭৭০৮০ সনের লোক। এই নিষ্কর স্বীকারের ব্যাপার নিশ্চয়ই ইং ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বের ঘটনা। তাঁহার জমীদারী ২৪ পরগণা, বীরভূম, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় বিস্তৃত ছিল। প্রবাদ আছে যে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজের পরই দেয় রাজস্বের পরিমাণ এত বেশী আর কোনও জমিদারের তৎকালে ছিল না। কাগজপত্র দেখিয়া মনে হয় এই প্রবাদের মূলে কিছু সত্য আছে।

জগন্নাথদেবের দেবোত্তর বলিয়া এই ১,১৮৫ বিঘা জমির জগন্নাথপুর বলিয়া নাম হইল। হুগলী জেলায় ৫টি জগন্নাথপুর আছে। শ্রীরামপুর থানায় এক জগন্নাথপুর আছে—ইহার পরিমাণ ১৯৬ বিঘা। এই জগন্নাথপুর কোথায় তাহা আমরা ঠিক করিতে পারি নাই। পশ্চিম বাংলায় ৭০টি জগন্নাথপুর আছে, জেলাওয়ারী হিসাবে সাজাইলে এইরূপ দাঁড়ায়। যথা :

বর্দ্ধমান—৯	২৪ পরগণা—৫
বীরভূম—২	নদীয়া—৩
বাঁকুড়া—৮	মুর্শিদাবাদ—৪
মেদিনীপুর—৩১	মালদহ—৫
হুগলী—৫	পশ্চিম দিনাজপুর—৪
হাওড়া—২	

১৪। কেন্দুবিল্ব (বীরভূম)

জয়দেবের জন্মভূমি কেন্দুবিল্ব লোকের মুখে মুখে 'কেঁদুলি'তে পরিণত হইয়াছে। এখন জনসাধারণ কেঁদুলিকে 'জয়দেব কেন্দুবিল্ব' বলিতেছে। সরকারী সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার ম্যাপে ইহাকে জয়দেব কেন্দুবিল্ব বলিয়া দেখান আছে, মৌজার নাম কিন্তু কেঁদুলি, পরিমাণ ১,১৩৭ বিঘা, ১৯৫১ সনে জনসংখ্যা ৩৬৩ জন। ইহা সিউড়ি থানার অন্তর্গত. ঐ একই থানায় ২টি কেন্দুয়া নামে গ্রাম আছে, আর বোলপুর থানায় পদ্মাবতীপুর বলিয়া একটি গ্রাম আছে।

গ্রামের নাম আগে কেন্দুবিল্ব ছিল, লোকমুখে বা ভাষার অবক্ষয়ে কেঁদুলিতে পরিণত হয়, এখন আবার নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া জয়দেব কেন্দুবিল্ব হইয়াছে। যেখানে প্রচুর কেন্দু গাছ ও বিল্ববৃক্ষ আছে সেই স্থানকে লোকে কেন্দুবিল্ব বলা সম্ভব। বীরভূমে এখনও এই দুই গাছ যথেষ্ট পাওয়া যায়। মনে হয় এইভাবে কেন্দুবিল্ব নামের উৎপত্তি হইয়াছিল।

১৫। গর্ভাবাস (বীরভূম)

শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বীরভূম জেলার ময়ূরেশ্বর থানার অন্তর্গত বীরচন্দ্রপুরের সন্নিকট গর্ভাবাস গ্রামে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। বীরচন্দ্রপুরে মাঘ মাসে তাঁহার আবির্ভাব-উৎসব খুব ধুমধামের সহিত হয়। বীরভূম ডিষ্ট্রিক্ট হাণ্ডবুকের ৫৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে :

"Near this village (Birchandrapur) is a small village called Garbhabas, which is famous as the birth-place of the great Vaishnavite reformer Nityananda. It is a place of pilgrimage, and mela is held there every year in his honour."

কিন্তু কি ময়ূরেশ্বর থানায়, কি বীরভূম জেলার অন্যত্র, কি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে গর্ভাবাস বলিয়া কোন মৌজা বা গ্রাম নাই। বীরচন্দ্রপুরের জমির পরিমাণ ২,৪৯৬ বিঘা, জনসংখ্যা (১৯৫১ সনে) ১,২৩১ জন। ময়ূরেশ্বর থানার গ্রামের গড় জমির পরিমাণ ১,১৬১ বিঘা—মনে হয় বীরচন্দ্রপুর গর্ভাবাস গ্রামটিকে কুক্ষিগত করিয়াছে।

(আগামী বারে সমাপ্য)

কোনারক সূর্য্যমন্দিরের উপর দিকের শিল্প কাজ
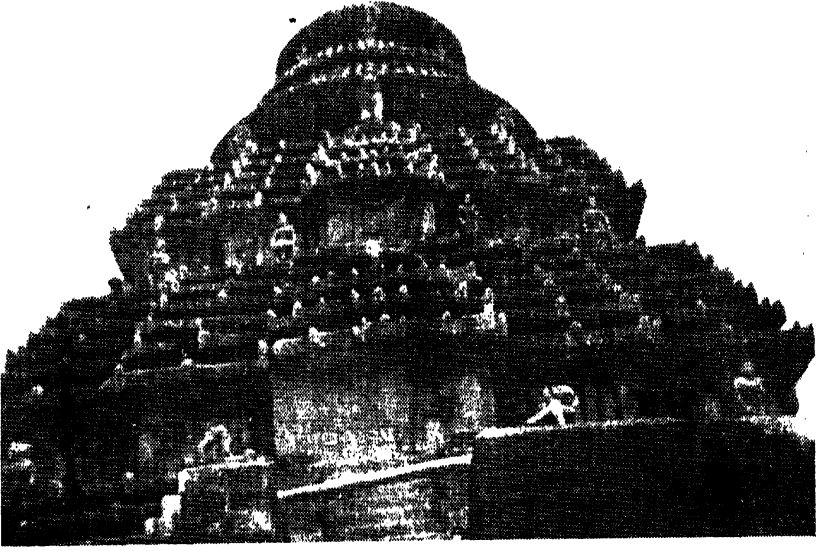
ওড়িষ্যার গ্রামে পথে

শ্রীমহীতোষ বিশ্বাস

সাড়ে ছ'টা নাগাদ ভুবনেশ্বরে গাড়ী এসে দাঁড়াল। তার আগেই আমরা আমাদের মোট-মুটরী সব বেঁধে ঠিক করে ফেলেছি। একে একে সব নামিয়ে ফেলা হ'ল। ষ্টেশনে এসেছেন নির্ম্মলবাবুর ছাত্র—শ্রীনিত্যানন্দ পট্টনায়ক মহাশয়। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-এ পাশ করে ওড়িষ্যা সরকারের চাকুরী নিয়েছেন। অতি অমায়িক লোক, মিষ্টভাষী, নির্ম্মলবাবুর সঙ্গে যেন ছোট্ট ছাত্রটির মতই ধীরে ধীরে ওড়িয়া ভাষায় কথা বলতে লাগলেন। আমাদের সমস্ত জিনিষপত্তর হিসেব করে কুলির মাথায় তুলে দিয়ে ষ্টেশনের বাইরে এসে রিক্সার ব্যবস্থা করে দিলেন। নিজেও এলেন আমাদের সঙ্গে হোটেলে, আমাদের কোনরকম যাতে অসুবিধা কিছু না হয় সেজন্য তিনি যথেষ্ট সাহায্য করলেন আমাদের।

সদর রাস্তার উপরই হোটেল। উপরের একখানা ঘরে আমি আর নির্ম্মলবাবু আছি। আরও নীচে উপরে চারখানা ঘরে ছাত্র-ছাত্রী ও মীরাদি উষাদি আছেন। সদর রাস্তা বলে অনবরত মোটর, রিক্সা লোকজনের চলাচল। জানালা দিয়ে চেয়ে দেখলাম গ্রামের লোক চলেছে দলে দলে, পায়ে হেঁটে, গরুর গাড়ি করে। ছোট ছোট কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে অনেক মেয়েরাও চলেছে। দেখেই মনে হয় এরা গ্রামের মানুষ।

খবর নিয়ে জানলাম আজ এখানে রথযাত্রা। একটু আশ্চর্য্য হলাম, রথযাত্রা? আজ? জগন্নাথদেবের রথ তো সেই আষাঢ় মাসে হয়, আমাদের বাংলাদেশেও তাই। কিন্তু ভাল করে জানলাম সত্যিই আজ এখানে রথযাত্রা। যেখানকার যে ব্যবস্থা।

নির্ম্মলবাবু আমাদের জানালেন, সব তৈরী হয়ে নিতে, একটু পরেই তিনি কাছের কতকগুলি মন্দির দেখতে নিয়ে যাবেন। হোটেলে এসে আর একবার চা-পর্ব্ব সেরে নিয়েছিলাম, সুতরাং তৈরী হতে আমাদের বিশেষ দেরী হ'ল না। অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা দল বেঁধে বেড়িয়ে পড়লাম।

রথযাত্রা উপলক্ষে পথের দু'ধারে অনেক দোকান-পসারী। সকাল থেকেই রথযাত্রী সব আসছে। অনেক দোকানদারও সবে জিনিষপত্তর নিয়ে এসে দোকান পাতবার আয়োজন করছেন দেখা গেল। মনে হয় ওবেলা মেলায় জমজমাট বেশী হবে। বেচা-কেনাও হবে ভাল।

পথের দু'পাশে আমাদের দেশের মতই ভিখারীর দল ভিক্ষা করতে বসে গিয়েছে। খুব সকাল থেকেই যে এইসব জায়গা তারা দখল করেছে তা বোঝা গেল। এ জাতের আর রকমারী নেই এদেশেও যা ওখানেও তাই। সেই কাতর ধ্বনি, খেতে দাও,

দূর হ'তে কোনারকের মন্দির

পয়সা দাও। নানা ভঙ্গিতে, নানা কথায়, নানা রকমে পথের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার প্রয়াস। এদের মধ্যে স্ত্রী, পুরুষ, বালক নানাজনের নানা বেশ। বিকলাঙ্গ রয়েছে কয়েকজন। একজন বাঙালী সন্ন্যাসী রয়েছেন মনে হ'ল।

"রাণীমা কিছু খেতে দাও, রাজাবাবু কিছু দান কর, ভগবান তোমাদের মঙ্গল করবেন বাবা।" সেই একই এদের বক্তব্য। তবে তা বাংলাভাষায় নয়, ওড়িয়া ভাষায় এই যা তফাৎ।

ভিখারী সর্ব্বত্র সকল দেশেই আছে মনে হয়, এমনকি আমেরিকার মত দেশেও ভিখারী রয়েছে, সেখানে শোনা যায় লক্ষ্মী অচলা।

কিন্তু আমাদের এই দেশের অর্থাৎ ভারতবর্ষের ভিখারীর মত এমন পথের দু'ধারে মিছিলের মত আড়ম্বরের সঙ্গে ভিক্ষা করতে দেখা যায় না আর কোন দেশে। এই ভিক্ষাবৃত্তি যে দেশের পক্ষে গৌরবের নয় তা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু তবুও দেখা যায় দেশ থেকে ভিখারী যায় না। তাদের পেশা বা বৃত্তি ঠিকই চলেছে। যারা বিকলাঙ্গ তাদের হয় ত কোন উপায় নাই। কিন্তু যারা সবলসুস্থ তারাও এই ভিক্ষাবৃত্তিকে লজ্জা বা অপমান বলে মনে করে না। সারা জীবন এই ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করে হাত পাতে এখানে-সেখানে এর-ওর কাছে। অপমান-লজ্জাকে এরা যেন মাথার মণি করে নিয়েছে।

ভাবলাম দু'একটা পয়সা এদের দিই। কিন্তু আমাদের মধ্যে তেমন কারও মন দেখলাম না। বিশেষ করে নির্ম্মলবাবু ভিক্ষাবৃত্তিকে তেমন আমল দেন না। খেটে কিছু নাও, তিনি তাই চান, সাহায্যও করেন। কাজেই তিনি অচল-অটল অবস্থায় চলতে লাগলেন। ভিখারীদের কথা তাঁর মনকে স্পর্শ করল কিনা কে জানে? আমরাও এদের উপেক্ষা ও নিরাশ করে পথ চলতে লাগলাম। কিন্তু হঠাৎ একটা ঘটনায় দৃষ্টি ও চিন্তাধারা অন্য দিকে মোড় ফিরল।

সাধারণ এক গ্রামবাসী দুটি মুখোস কিনে নিয়ে যাচ্ছিল। নির্ম্মলবাবু কত দাম জিজ্ঞাসা করতেই লোকটি একটি মুখোস তাঁর হাতে দিল কিন্তু সে কিছুতেই আর ফেরৎ নিল না এমনকি দাম দিতে চাইলে দামও নিল না। ওড়িয়াভাষায় জানাল, "মাপ করবেন।" একেই বলে সরল গ্রামবাসী। মুখোসটির দাম মাত্র এক আনা। নির্ম্মলবাবু আমার হাতে দিয়ে বললেন, "গ্রামশিল্প শিল্পীর কাছেই থাক। শেষে বললেন, "বেশ করেছে, না?" কিন্তু এত অল্প দামে দেয় কি করে?"

বললাম, "গ্রামের কারিগর, কত আর আশা করতে পারে, যা পায় তাই লাভ। তা ছাড়া বেশী দামে বিক্রিও হয় না।"

আমাদের বাংলায় যারা পুতুল তৈরী করে তারাই বা এমনকি পায়? ছাঁচ থেকে পুতুল তৈরী তার পর পোড়ান, রং, এসবের পরে মেলায় নিয়ে গিয়ে সারাদিনে বসে বসে হয় ত বিক্রি। কত আর মজুরী হয়? তবুও একদিন একসঙ্গে কয়েকটা টাকা যদি গ্রামের শিল্পী পায় তাই যথেষ্ট, সংসারে কত কাজে আসে। মুখোসটি যত্ন করে কাছে রাখলাম। কাগজের মুখোসে তুলির ছড় বা টানগুলি বড় ভাল লাগল। এসব আকার হাত অর্থাৎ এই তুলির টান বাংলা ওড়িষ্যার শিল্পীর একই রকম।

বেলা বেড়ে চলেছে, কিন্তু এরই মধ্যে রৌদ্রতাপ যেন অসহ্য। নির্ম্মলবাবু একখানা তোয়ালে মাথায় দিয়েছেন। ছাত্রীদল কেউ ছাতা, কেউ পাতার বুনুনি টুপি। মীরাদি, উষাদিও ছাতা নিয়েছেন। ছাত্রদের দু' একজনের টুপি। নির্ম্মলবাবুর সেই তোয়ালেতে যে রোদ আটকাচ্ছে ত নয়। কিন্তু তাঁর কথা স্বতন্ত্র। কোন অসুবিধাই তাঁকে যেন কাবু করতে পারে না। অনেকদিন তাঁর সঙ্গে চলতে চলতে দেখেছি, যখন দারুণ রোদে মাথা ফেটে যাবার মত তখনও তিনি ছাতা নিতে রাজী হন নি। অনুরোধ করলে একটু হেসে টাক মাথায় হাত দিয়ে বলেছেন, "রোদ লাগে না গড়িয়ে যায়।" আশ্চর্য্য মানুষ।

আমার ছাতাও নেই, টুপিও নেই। খালিমাথায় পথ চলতে একটু কষ্ট হচ্ছিল বৈকি। উষাদি কিন্তু তা লক্ষ্য করলেন। তাঁর ছাতাটি আমার হাতে দিলেন, নিজে দিলেন আঁচল টেনে মাথায়। আপত্তি করলাম, কিন্তু শুনলেন না। ছাতা আমার মাথাতেই থেকে গেল।

এতক্ষণে আমরা একটি মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। পথের ধারেই মন্দির। মন্দিরের প্রাঙ্গণ রাস্তার লেভেল থেকে একটু নীচু। এ মন্দিরের উচ্চতা খুব বেশী নয়। কিন্তু শিল্পকাজগুলি ভাল।

এখানে অর্থাৎ এই ভুবনেশ্বরে যে-সব মন্দির রয়েছে সে সম্বন্ধে এবং তার শিল্পকাজ সম্বন্ধে বলতে হলে একখানি পৃথক পুস্তক

রচনা হয়ে যায়। সুতরাং যে সব স্থানে সাধারণ তীর্থযাত্রীর ভিড় নেই অথচ সেখানকার মন্দিরগুলির গঠন-সৌন্দর্য্যে এবং তার শিল্প-কাজও অপূর্ব্ব, সাধারণতঃ আমি সেই মন্দিরগুলির কথাই উল্লেখ করছি।

এই রকম মন্দিরগুলির মধ্যে ব্রহ্মেশ্বর, বৈতাল, মুক্তেশ্বর, রাজা-রাণী প্রভৃতি মন্দিরের কথা উল্লেখ করা যায়।

প্রথম দৃষ্টিতেই এই সব মন্দিরের নির্ম্মাণ-কৌশল ও শিল্প-সৌন্দর্য্য চোখে পরে। যদিও একথা আজ পুরনো তবুও বলতে হয় যে, এখানকার ভাস্কর্য্য-শিল্পের নিদর্শনগুলি ভারতবাসীর সম্পদ, গৌরবের বস্তু। এইসব শিল্পকাজে যে সব বিষয়বস্তু গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে যদিও নারী-মূর্ত্তি বেশী তবুও নানা জীবজন্তু, গাছ ও নানা ধরনের নক্সাও রয়েছে। বিশেষ করে ভারতীয় শিল্পের যে বৈশিষ্ট্য-অলঙ্করণ তা এই সব মূর্ত্তির মধ্যে সুন্দর ফুটে উঠেছে। "বৈতাল" মন্দিরের দেব-দেবীর মূর্ত্তির মধ্যে মহিষাসুরমর্দ্দিনী, হর-পার্ব্বতী ও গণেশ অপূর্ব্ব ভাস্কর্য্য নিদর্শন।

মন্দির সম্বন্ধে বলতে হলে প্রথমেই বলা যায় এর নির্ম্মাণ-কৌশল। বড় বড় পাথর দিয়ে এত উঁচু মন্দির তৈরী হয়েছে, কিন্তু সিমেণ্ট, চূণ-সুরকী বা এই রকম কোন মশলা দিয়ে তা গাঁথা হয় নি। একখানা পাথরের উপর আর একখানা পাথর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে মাত্র। ভারসাম্যের উপর দৃষ্টি রেখে নীচে থেকে উপর পর্য্যন্ত এই ভাবে গাঁথা হয়েছে। পাথর সাজানো কাজ শেষ হলে তার পর এতে মূর্ত্তি খোদাইয়ের কাজ করা হয়েছে।

এই সব মন্দিরের দু'একটিতে এখনও শিবলিঙ্গ আছে। সকালে সন্ধ্যায় হয়ত কেউ এসে ফুল, বিল্বপত্র, সন্ধ্যাদীপ দিয়ে যায়, কিন্তু কোন তীর্থযাত্রীর ভিড় নেই। কখন কোনদিন হয়ত কোন শিল্প-রসিকের বা দু'একজন সাধারণ মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। "বৈতাল" মন্দির ছাড়া সব মন্দিরের গঠন একই ধরনের। বাংলার মন্দিরের সঙ্গে যেমন এর কোন তুলনা হয় না তেমনি কিছু তুলনা হয় মন্দিরের বহির্ভাগ সাজাবার শিল্পকাজে। পোড়া মাটির মূর্ত্তির সঙ্গে এই সব কাজের যদিও আশমান-জমিন তফাৎ তবুও বিষয়বস্তু একই ধরনের—সেই নারীমূর্ত্তি, জীবজন্তু, গাছ, ফুল, নানারকম নক্সা। নারীমূর্ত্তির গঠন এবং নক্সার লতাপাতার কারুকার্য্যের একটু যেন সামঞ্জস্য আছে। হয়তো এই সব মন্দির দেখেই বাংলার রাজা জমিদারদের সখ হয়েছিল এ ধরনের মন্দির নির্ম্মাণে। কিন্তু বাংলা দেশ শুধু মাটির দেশ তাই পাথরের পরিবর্ত্তে গ্রামের মূর্ত্তিকার মাটি দিয়ে মূর্ত্তিনির্ম্মাণে উৎসাহ পেয়েছে। তবে একটা জিনিষ লক্ষ্য করা যায়, তা হচ্ছে উড়িষ্যার এই সব মন্দিরে শিল্পকাজের বিভিন্ন বিষয়বস্তুর মধ্যে কোথাও কৃষ্ণলীলার কোন মূর্ত্তি নেই। কোথাও থাকলেও তা চোখে পড়ে না। বাংলার মন্দিরে কৃষ্ণ ও চৈতন্যলীলার চিত্ররূপের ছড়াছড়ি। এর কারণ আর কিছুই নয়, এই সব মন্দিরে দেখা যায় সবই শিবলিঙ্গ এবং বাংলার মন্দির নির্ম্মাণের বহু পূর্ব্বে এই সব মন্দির নির্ম্মাণ হয়েছে। সুতরাং তখনও বৈষ্ণবধর্ম্মের কোন প্রচার বা প্রভাব আসে নি। শৈব ও শাক্ত ধর্ম্মেরই তখন জয়-জয়কার।

একটি সূর্য্য মূর্ত্তি (হস্তদ্বয় ভগ্ন)

লিঙ্গরাজের মন্দির শহরের মধ্যে এবং এখানেই যাত্রীদের ভিড়! কিন্তু অন্যান্য মন্দিরগুলি শহর থেকে দু চার মাইল দূরে, এবং সেগুলি ঠিক এক জায়গায় নয়। এখানে একটি, আবার দুই মাইল দূরে একটি। কোন কোন মন্দিরে সন্ধ্যাদীপও পড়ে না। নির্জ্জন প্রান্তর মাঝে শুধু অতীতের সাক্ষীস্বরূপ মন্দিরটি দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এই সব মন্দিরে যে সূক্ষ্ম কাজের নিদর্শন রয়েছে তা দেখে শিল্প-রসিকমাত্রেই যে আনন্দ পাবেন তা বলতে পারি।

পরদিন বৈকালে হোটেলের ফটকে আমাদের রিজার্ভ করা বাস এসে দাঁড়াল। কাল থেকেই মনে হচ্ছিল এখানকার গ্রামের কথা। সেখানকার মানুষের জীবিকা, সুখ-দুঃখের কথা জানবার ইচ্ছা স্বাভাবিক। জীবনে রাজপ্রাসাদের ছবি কখন আঁকি নি, এঁকেছি অসংখ্য পল্লীচিত্র। পল্লীর রূপ আমার কাছে বড় ভাল, বড় মধুর। পল্লীতেই আমার নাড়ী পোঁতা। পল্লীর বালক আমার খেলার সাথী। পল্লীর পটুয়া আমার শিল্প-গুরু। পল্লীর মেটোপথ, ঘরবাড়ী গাছপাতা, সবুজ ক্ষেত, চাষী, লাঙ্গল, গরু, এই তো আমার আঁকার বিষয়বস্তু। তাই আজও যে দিকে তাকাই বাংলার পল্লীর শ্যামল রূপ যেন কত আমার আপন, কত প্রিয় মনে হয়। তাই এখানে এসেও গ্রামের কথা বার বার মনে হয়েছে।

বাস আমাদের নিয়ে পীচের রাস্তা ছেড়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই এল এক নদীগর্ভে। ওড়িষ্যার অনেক নদী আমাদের দামোদরের

মত বর্ষায় তুফান-স্রোত, বন্যা, কিন্তু গ্রীষ্মকালে শুকনো খটখটে, বালুচর মাত্র। এ যেন বর্ষায় যৌবন আর গ্রীষ্মে বার্দ্ধক্য।

চলাচলের সুবিধার জন্য এই গ্রীষ্মকালে নদীগর্ভে মাটি ফেলে সাময়িক ভাবে রাস্তা তৈরী হয়েছে। এই রাস্তায় মানুষ চলতে লাগে কিনা জানি না তবে গাড়ী চলতে মাশুল দিতে হয়। যাঁরা ইজারা নেন তাঁদেরই এই মাশুল আদায়ের অধিকার। আমাদের বাসও এই মাশুল আদায়ের ঘাটিতে এসে দাঁড়াল। কণ্ডাক্টর জানালে ফিরবার পথে দেওয়া হবে। গাড়ী আবার চলতে লাগল। নদীর মধ্য বরাবর এসে দেখলাম একেবারে শুকনো নয় মধ্যে দিয়ে এদিকে-ওদিকে সরু রূপার পাতের মত এঁকে বেঁকে জলের ধারা চলেছে নদীগর্ভ থেকে বাস এবার উঠল আবার পাকা রাস্তায়। এ রাস্তা পীচের নয়, লাল কাঁকরের রাস্তা। সোজা চলে গিয়েছে পুরীর দিকে। দু'ধারে সারি সারি গাছ, অনেকটা গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের মত। একপাশে নদী ওপাশে মাঠ, কিছু দূরে দূরে গ্রাম। এই রাস্তাটি গ্রামবাসীকে বন্যার হাত থেকে প্রতি বছরই বাঁচায়। রাস্তাও বটে, বাঁধও বলা যায়।

এই রাস্তা ধরে প্রায় দুই মাইল এসে বাস এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গেল। এখানেই আমাদের নামতে হবে, এখান থেকে গ্রাম বেশী দূর নয়।

সকলেই নেমে পড়লাম। আমাদের সঙ্গে এসেছেন নিত্যানন্দ বাবু ও অজিত বাবু। এঁরা দু-জনেই ওড়িষ্যা সরকারের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। এবারে আমরা গ্রামের দিকে চলতে লাগলাম। শুনলাম নিকটেই গ্রাম।

কয়েক মিনিট পথ চলার পর আমরা গ্রামে এসে পৌঁছলাম। বড় গ্রাম, লোকসংখ্যাও বেশ এবং অধিকাংশ গ্রামবাসীর শিল্পকাজ এবং চাষ। চাকুরিজীবী এ গ্রামে নেই বললেই হয়।

এখানকার গ্রামে গৃহনির্ম্মাণের একটা বিশেষত্ব এবং বসবাসের ব্যবস্থাও লক্ষ্যণীয়। আমাদের বাংলার গ্রামগুলিতে যেমন পূব-পাড়ায় পাঁচঘর, দখিন পাড়ায় দু'ঘর। বামুন পাড়ায় দশঘর, অর্থাৎ সমস্ত গ্রামখানিতে হয় ত একশ' ঘর লোক বাস করে, কিন্তু তা এখানে ওখানে ছড়িয়ে, ঠিক পাশাপাশি বলা চলে না। এখানে কিন্তু তা নয়। মধ্যে রাস্তা এবং দু'পাশে শ্রেণীবদ্ধভাবে বাড়ী তৈরী হয়েছে একজনের ঘরের পরই আর একজনের, এইভাবে। বাড়ীর প্রবেশপথও ঠিক পর পর সাজানো। দুধারে এমনিভাবে একজনের দেওয়ালের গায়ে আর একটি দেওয়াল উঠেছে। ঘরের চালাগুলিও ঠিক পর পর সাজানো দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন একজনের বাড়ী এমনি লম্বাভাবে তৈরী হয়েছে। ঘরগুলি সাধারণতঃ আমাদের দোচালার মত, কোথাও-বা চার চালও আছে।

আমরা চলেছি দল বেঁধে—সারিবদ্ধভাবে। সে এক দৃশ্য। ছাত্রীরাও সঙ্গে আছেন। তাঁদের বেশভূষায় যে আধুনিকতার যথেষ্ট ছাপ আছে তা বলা বাহুল্য। ছাত্রদেরও কারও কারও সাহেবী পোষাক। তা ছাড়া দলেও আমরা কুড়িজন। সুতরাং আমাদের প্রতি যে সাধারণ গ্রামবাসীর বিশেষ দৃষ্টি পড়বে তাতে আর সন্দেহ কি। অল্পক্ষণেই আমরা দেখলাম আমাদের আশেপাশে পিছনে বহু বালক, বৃদ্ধ এবং যুবক চলেছেন সঙ্গী হিসাবে। গ্রাম দেখায় তাঁরা আমাদের কিছু সাহায্য করেন এমন যেন তাঁদের মনোভাব। সকলেই উৎসুক।

পথের দু'ধারে যেমন বাসগৃহ তেমনি তাঁদের দোকান, কর্ম্মস্থল বা কারখানাও এসব বাড়ীর সম্মুখভাগে। যাঁরা শিল্পী তাঁদের কাজের ব্যবস্থাও এই রকম, অর্থাৎ আমাদের দেশের অনেক কামার-কুমোরের মত। বাড়ীর সামনের দিকে কারখানা, ভিতরে বাসস্থান। এখানেও ঠিক এই রকম সদর অন্দরের ব্যবস্থা একজন দুজনের নয় সকলেরই এইরকম ব্যবস্থা। এতে সুবিধার দিকটাও দেখবার, কারণ বাড়ীর সঙ্গে কারখানার যোগাযোগ থাকলে যেমন দিবারাত্র ইচ্ছামত কাজের সুবিধা হয় তেমনি এই সব শিল্পকাজে অনেক সময় বাড়ীর মেয়েদেরও অনেক সাহায্য পাওয়া যায়। দূরে কর্ম্মস্থল হলে এ সুবিধা হয় না।

একটা জায়গায় আমরা এসে দাঁড়ালাম। একটা ছোট্ট মজার ঘটনা ঘটে গেল। এক শ্রমিকের বাড়ীর সামনে ঘানিতে তেল হচ্ছে। ঘানি ঘুরছে, কিন্তু আমাদের দল দেখে ঘানির গরু যেন কেমন বেচাল হয়ে গেল ; এত জোরে সে ঘুরতে লাগল যে, বৃদ্ধ চালক ঘানি থেকে একেবারে মাটিতে। শ্রমিক ভদ্রলোক পড়ে যেতেই পিছনের পাশের বালক এবং আমাদের দু'একজনও হেসে ফেললেন। কিন্তু নির্ম্মলবাবুর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম তিনি যেন কঠিন হয়েছেন, এ লজ্জা যেন তাঁরই। ইঙ্গিতে তিনি আমাদের হাসতে নিষেধ করলেন।

বৃদ্ধ ধূলো ঝেড়ে উঠে আর ঘানিতে বসলেন না। একটি বালককে বসিয়ে দিলেন। গরু কিন্তু এবার স্বাভাবিক চলতে লাগল।

দেখা গেল এতে সরিষা ভাঙা হচ্ছে না অর্থাৎ সরিষার তৈল নয়, একপ্রকার ছোট ফল ভাঙা হচ্ছে, ওর তেল জ্বালানির জন্য ব্যবহার হয় সারা ওড়িষ্যা দেশে। খাদ্যতেল হিসাবে তিল তেল এখানে ব্যবহৃত হয়।

মীরাদি ঘানির একটি ফটো নিলেন। এ ঘানিও ঠিক আমাদের দেশের মত নয়। বাহির হতে কোথা দিয়ে যে তেল পড়ছে তা দেখা যায় না। ঘানিগাছের ভিতরে তেল রাখবার একটা ব্যবস্থা আছে মনে হ'ল।

এর পর আমরা এলাম এক কাঁসশিল্পীর বাড়ী। তাঁরও কারখানা বাড়ীর সামনের ঘরে। অনেকে ঘরের দাওয়ায় বসে কাজ করছেন। বাড়ীর ভিতরে বাসন কোঁদাই হচ্ছে। বাসনের নির্ম্মাণকৌশল এবং গঠন আমাদের এখানকার মত। তবে কোঁদাইয়ের যন্ত্রটি ভিন্নরূপ। যন্ত্রটি তাঁরা নিজেরাই তৈরি করে নিয়েছেন।

ছাত্রীদল গেলেন বাড়ীর অন্দরে মেয়েদের সঙ্গে আলাপ

করতে। বিশেষ করে তাঁদের আচার-ব্যবহার, কাজকর্ম্ম বিষয়ে জানতে। ওড়িষ্যার এইসব গ্রামবাসী সত্যাই খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বাড়ীগুলির দেওয়াল বেশ নিকিয়ে-চুকিয়ে পরিষ্কার করে নানা রকমের আলপনা বা চিত্রাঙ্কণ করা হয়েছে। সাধারণতঃ মেয়েরাই এইসব কাজ করেছেন। দরিদ্র হলেও এইসব কৃষক এবং গ্রামশিল্পীর রুচিবোধের সত্যাই তারিফ করতে হয়। আর্থিক সচ্ছলতার দিকে মনে হয় তেমন কোন সুবিধা নেই। আমাদের বাংলার কুটির শিল্পীদের মতই দিন আনা দিন খাওয়া। সেদিক দিয়ে এদেশেও যা ওদেশেও তাই। ফেরার পথে বহু গ্রামবাসী আমাদের সঙ্গে বাসের কাছ পর্যন্ত এলেন। আমরা কোলকাতা থাকি কিনা সে সম্বন্ধে অনেকে জানতে চাইলেন। কোলকাতা অনেকেই দেখেন নি জানলাম। সেজন্য তাঁদের কৌতূহল যথেষ্ট।

বাস আবার সেই নদীগর্ভে এসে দাঁড়াল। ফেরার পথে আমাদের যাতায়াতের মাশুল দিতে হবে। কণ্ডাক্টার নেমে গেল। এবার অনেকে নেমে পড়লেন। নির্ম্মলবাবু এবার ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে নদীর চরে ঘুরতে লাগলেন, তাঁদের আলোচনা মনে হয় নদীর গতি এবং "সয়েল" সম্বন্ধে।

আমিও নেমে পড়লাম। এমন জায়গায় কি বসে থাকা যায়? বেলা অপরাহ্ণ পড়ন্ত সূর্য্যের আলো চারিদিকে বিস্তৃত বালুচরে, ঝিরঝিরে নদীর জলে, এপারে-ওপারে ঝোপে-জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়েছে, অপরূপ দৃশ্য! নির্ম্মলবাবু ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে দূরে দূরে ঘুরছেন। দূর থেকে তা লক্ষ্য করছি। এ যেন এক মহাসমুদ্রের নীচে গুটিকয়েক লোকের চলাফেরা। কখন দেখছি তাঁরা বালুস্তূপের আড়ালে ঢাকা পড়লেন, কখন দেখছি স্তূপের উপরে তাঁরা দাঁড়িয়ে। এই বিস্তৃত নদীগর্ভে মনে হচ্ছে যেন তাঁরা কত ক্ষুদ্র, চেয়ে চেয়ে দেখছি বাতাসের খেলা, হু হু শব্দে বাতাস এসে নদীচরের সেই শুকনো বালি উড়িয়ে দিচ্ছে এদিকে-ওদিকে। নদীজলে যেমন বাতাসের ভরে ছোট ছোট ঢেউ হয় তেমনি দেখছি বালির ঢেউ। উঁচু নীচু হয়ে কেমন গড়ে উঠছে। ঢেউয়ের মত খুব ছোট ছোট স্তর। মনে হয় মানুষের বুঝি এ কাজ। কিন্তু তা নয় এ প্রকৃতির খেলা। এখানে দাঁড়িয়ে মনে হয় মানুষের জীবন-কথা। কালের গতিতে তার কত রূপ। জন্ম থেকে মৃত্যুকাল, শিশু থেকে বৃদ্ধ, এই যে সময়ের ব্যবধানে তার মূর্ত্তি বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ। তারই মাঝে রয়েছে যেন নদী-চরের জীবন-কথা। মানুষের সংসার, আশা-আকাঙ্ক্ষা সবই বুঝি এই নদীগর্ভের মত কখন উত্তাল তরঙ্গে যেন যৌবনের মত্ত-মাতঙ্গ, কখনও নিস্তেজ—দুর্ব্বল। পরপারের খেয়ার আশায় শুধু প্রতীক্ষা।

কেমন যেন আনমনা হয়েছিলাম। চমক ভাঙল নির্ম্মলবাবুর কথায়। তিনি এসে পড়েছেন। উঠে পড়লাম সবাই। বেলা যায়, যেতে হবে অনেক দূর—

আমরা এবার চলেছি অশোকের শিলালিপি দেখতে। কিন্তু সদর রাস্তায় কিছু দূর এসেই এক জায়গায় বাস থেমে গেল। ড্রাইভার জানাল বাস আর যাবে না, পথ খারাপ।

কিন্তু এখান থেকে আমাদের গন্তব্য স্থান অনেক দূর। সকলেরই মন খুং খুং করতে লাগল, চিন্তা শুধু এতটা পথ হাঁটতে হবে।

উড়িষ্যার শিল্পকাজ

উপায় নেই। সবাই নেমে পড়লাম। বেলা শেষ হয়ে আসছে। নির্ম্মলবাবু বললেন তাড়াতাড়ি চলতে।

কাঁচা রাস্তায় চলতে লাগলাম আমরা, সেই রকম দল বেঁধে। সারিবদ্ধ ভাবে। একটু গিয়ে একটি গ্রাম দেখা গেল। গ্রামের লোকসংখ্যা খুবই কম মনে হ'ল। গ্রামের মধ্য দিয়েই লোক-জনকে জিজ্ঞাসা করতে করতে চলেছি। শেষে সে গ্রামের পরে আরও দু'একটি গ্রামের প্রান্তে এসে পৌঁছলাম।

কিন্তু পথ আর ফুরায় না। বাঁশতলা, গাছতলা, এ বাড়ীর পিছন দিয়ে—ও বাড়ীর পাশ দিয়ে শেষে আমরা গ্রামের প্রান্তে এসে পড়লাম। নির্ম্মলবাবু চলেছেন আগে আগে, তাঁর লক্ষ্য দূরের একটি পাহাড়ের দিকে; সে দিকে দৃষ্টি রেখে চলেছেন সোজা এখান দিয়ে সেখান দিয়ে। কোন নির্দ্দিষ্ট পথে তিনি চলছেন না।

আমাদের যেতে হবে ঐ পাহাড়ের কোলে। সকলেই চলেছি প্রাণপণে, সকলেরই মনেই শঙ্কা বেলা বেশী নেই। মনে হয় পাহাড় বুঝি কাছেই কিন্তু যত চলি ততই যেন সে দূরে সরে যায়। পথ আর ফুরায় না।

আমরা এবার এক মাঠে এসে পড়লাম। দল ভেঙে গিয়েছে। চলেছি কেউ একা, কেউ দু'জন, তিন জনে এগিয়ে পিছিয়ে। কারও পায়ে কাঁটা ফুটছে, কারও আঁচল আটকে যাচ্ছে কাঁটা গাছে। আমার পায়ে স্যাণ্ডেল। মরি বাঁচি করে তবুও চলছি। আকাশের দিকে চেয়ে দেখছি সূর্য্য বুঝি এবার পাটে বসে। মনে আসছে আবার ফেরার কথা।

আমি লতিকা চলেছি পাশাপাশি। মীরাদি পেছিয়ে পড়েছেন। উষাদি বোধ হয় আগেই চলেছেন, নিত্যানন্দবাবু, অজিতবাবু ও ছাত্রদের দু'একজন নির্ম্মলবাবুর কাছাকাছি।

আমরাও চলছি যথাসম্ভব পা চালিয়ে। নির্দ্দিষ্ট পথ আমাদেরও নেই, যেখান দিয়ে পারছি চলছি। কখনও মাঠের আলের উপর, কখনও ঢিবির উপর, কখনও-বা ক্ষেতের ফসলের উপর দিয়ে। লক্ষ্য ঐ দূরের পাহাড়। যত শীঘ্র যাওয়া যায়।

ক্রমশঃ

কৃত্রিম চাঁদ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

চাঁদ চাওয়া জাতি—এবার পেয়েছে চাঁদ,
হাসবি ত হাস—না হাসিস যদি কাঁদ।
মহাকাল ভাল খালি করে ওরে দিতে—
খোকার কপালে আসে বুঝি টিপ দিতে,
উল্লাসে তোরা এখনি কোমর বাঁধ।

২

ও চাঁদ পাবে কি গ্রহের সমাজে স্থান ?
কাব্য কি ওরে মাধুরী করিবে দান ?
চন্দ্রভালীর সোহাগে আদরে বাড়ি'
হতে কি পারিবে অমৃতের অধিকারী ?
উদয়েতে মহাসাগরে আসিবে বান ?

৩

কিম্বা আনিছে ক্ষেপণাস্ত্রের যুগ—
দগ্ধোজ্জ্বল করিতে ধরার মুখ ?
কার কালাগ্নি কখন জ্বলিবে কোথা ?
কাহার কপালে ? নাহিক নিশ্চয়তা,—
সভ্যতা যাহা দেখিতে সমুৎসুক।

৪

উচ্ছন্নের উজ্জ্বল ছায়াপথ,—
গঠিত হবে কি ? যাবে বিদ্যুৎ রথ ?
মানুষ ক্রমশঃ মানুষ রবে না আর,
হইবে দানব কিম্ভুত কিমাকার—
প্রজ্জলিত যে তাদের ভবিষ্যৎ।

৫

হয় ত লভিবে ফিনিক্স হয়ে নর,
পাখার আগুনে পুড়িবার অবসর।
ঝটপটি পাখা উঠিবে নূতন জাতি,
সবাই ভস্মলোচনের যেন জ্ঞাতি,
বাড়িবে জ্বালানি পোড়ানির পরিসর।

৬

ও চাঁদ আনিছে, সুধা না জটিল বিষ ?
লোক-ক্ষয়কৃৎ কাল কি দিতেছে শিষ !
হয় ত ঘটিবে চাঁদে চাঁদে সঙ্ঘাত,
পূর্ণিমা নয় এসে যাবে কাল-রাত
কোথায় বিপদভঞ্জন জগদীশ !

৭

চাঁদ ত মিলেছে—হউক সে কৃত্রিম—
উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের যেন ডিম।
কৃত্রিমতায় এ ভুবন জর্জ্জর,
হয় ত আসিবে কৃত্রিম নারীনর,
আসে ত আসুক—কিন্তু ততঃ কিম্।

৮

তবুও সাবাস, বলিহারী সোভিয়েট !
বহু বন্ধুর মাথা যে করিলে হেঁট।
আকাশস্পর্শী যাহাদের দাবী দাওয়া,
ঘুচিল তাদের ঘুম, নাওয়া, খাওয়া দাওয়া,
দিকবধূগণ তোমারে পাঠায় ভেট।

অসাফল্যের একদিক

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

সম্প্রতি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের দশ বৎসর পূর্ণ হয়েছে। ভারতবর্ষের মত শত সমস্যাপূর্ণ একটা বিরাট দেশের পক্ষে এই দশটা বৎসর খুব বেশী সময় নয়, তবুও এই সময়টুকুর মধ্যে দেশের উন্নতির যা সম্ভাবনা ছিল তা হয় নি। অবশ্য বিভিন্ন পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে আর এই সব পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে কাজও কিছু কিছু এগোচ্ছে; প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার পাঁচটা বৎসর শেষ করে আমরা এখন দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার প্রথম অধ্যায় অতিক্রম করছি। আজ ভাকরা নাঙ্গাল, দামোদর পরিকল্পনার কাজ প্রায় শেষ হয়ে আসছে, ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা শেষ হয়ে ফল প্রদানের জন্যে অপেক্ষমান, তা ছাড়া নানান শহর গড়ে উঠছে, শ্যামল মাটির বুক চিরে উঠছে অনেক কলকারখানার চিমনী। কিন্তু স্বাধীনতার এই চাঞ্চল্য প্রধানতঃ শহরের মধ্যেই কেন্দ্রীভুত হয়ে রয়েছে। যে চাঞ্চল্যকে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত ছিল জনপদে জনপদে তা করা হয় নি। তবে ছড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা যে করা হয় নি তা নয়, কিন্তু তাকে কাজে পরিণত করার ভার যাঁদের হাতে আছে তাঁদের "নেকটাই" মনোভাবের জন্যে এই সংক্রান্ত সব পরিকল্পনা অতীতেও যেমন ব্যর্থ হয়েছে এখনও হচ্ছে। আর এই মনোধারণার এক্ষুণি অবসান না ঘটালে হাজার হাজার গ্রামে-জল বিদ্যুতের সাহায্যে আলো জ্বালালেও গ্রামীন জনসাধারণের জীবনের অন্ধকার ঘুচবে না।

আমাদের দেশের প্রাণশক্তির উৎস-ভূমি হচ্ছে গ্রাম। হাজার হাজার বৎসরের পুরানো যে সংস্কৃতি আর সভ্যতা নানান উত্থান-পতনের পরেও আজও অবিচল রয়েছে তার প্রধান কারণ খুঁজতে গেলে আমাদের গ্রামের জীবন ধারার মধ্যে অবগাহন করতে হবে। সমগ্র দেশের শ্রী-সমৃদ্ধি এই কৃষি-কেন্দ্রীক-গ্রাম সভ্যতার ফল। বিদেশী শক্তি নিজেদের স্বার্থেই শহরেই সীমাবদ্ধ রেখেছিল তাদের কর্মপদ্ধতি, ফলে ক্রমশঃ অবহেলায় অনাদরে একদা সমৃদ্ধ গ্রামগুলোর জীবন-বীর্য নষ্ট হয়ে যায়। পরাধীন থাকা কালে বিবেকানন্দ, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের চিন্তা ভাবনাকে প্রসারিত করে ছিলেন এই সমস্যার দিকে, আর তাঁরা এক বাক্যে বলে গেছেন ভারতবর্ষ তার পুরনো ঐতিহ্য ফিরে পেতে পারে যদি সে গ্রামোন্নয়নে ব্রতী হয়।

দেশ স্বাধীন হবার পর জাতীয় সরকারও সমষ্টি-উন্নয়ন ব্লক, জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনা এবং অন্যান্য বহু সর্বার্থ-সাধক কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন, উচ্চ ভাবাদর্শ-সম্পন্ন এই সব পরিকল্পনার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে অত্যাচার অনাচার পীড়িত ধ্বংসোন্মুখ গ্রামগুলোর দ্রুত উন্নয়ন। কিন্তু এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে উদ্দেশ্য নিয়ে পরিকল্পনার সূত্রপাত তা ব্যর্থ হয়েছে। জনসাধারণ হাঁসপাতাল পেয়েছে. উন্নত বীজ পাচ্ছে, দেখছে রাস্তাঘাট তৈরি হচ্ছে, কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যে উৎসাহ পাচ্ছে না। তাই তাদের দিক থেকে সঙ্ঘবদ্ধ সহযোগিতা আসছে না, সরকারী সাহায্য আর জনসাধারণের সহযোগীতা যদি মিলত তা হলে আমাদের প্রগতির গতি অনেক বেড়ে যেত। জনসাধারণের দিক থেকে সহযোগিতা না আসার কারণ ঐ সমস্ত পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য যাঁরা প্রত্যক্ষ ভাবে দায়ী তাঁরা তাদের সঙ্গে প্রাণ খুলে মেশেন না, তাদের অভিজ্ঞতা আর অনুরোধকে দাম দিতে সেই সমস্ত সরকারী কর্মচারীরা পরাঙ্মুখ। যাদের মঙ্গলের জন্যে তাঁরা-নিয়োজিত হয়েছেন তাদের সঙ্গে যদি তাঁরা মিশে যেতে না পারেন তা হলে জনসাধারণ ত বিরোধী মনোভাবসম্পন্ন হবেই, আর তার ফলে উন্নতি ব্যাহত হবেই। হতে পারে তারা অজ্ঞান নিরক্ষর কিন্তু মানুষ হিসেবে তাদের যে একটা মর্য্যাদা আছে এ বোধটাকে জাগিয়ে তুলতে হবে, তাদেরকে আত্ম মর্য্যাদাসম্পন্ন করে তুলতে পারলে সমস্যা অনেক সরল হয়ে আসবে। কিন্তু এই উদারতাটুকু দেখাতে সরকারী কর্মচারীরা অপারগ। মাঝে মাঝে কোন মন্ত্রী বা উচ্চপদস্থ কর্মচারী পরিকল্পনার কেন্দ্রে গেলেন, গ্রামের জনসাধারণের সঙ্গে মিশলেন, নিজের হাতে লাঙল দিলেন আর তাদের দেওয়া মুড়ি চিড়ে খেলেন, এতে করে তাদের সাময়িক আনন্দ দেওয়া হয় মাত্র, কিন্তু যাদের সংস্পর্শে তাদের প্রত্যহ আসতে হবে সময় অসময়ে উপদেশ নিতে হবে। তাঁরা যদি এদের দূরে সরিয়ে রাখেন তা হলে গ্রামের অন্ধকার ঘুচবে কবে?

গ্রামীন মানুষের অভিজ্ঞতার মূল্য না দেওয়ায় অনেক পরিকল্পনা যে বানচালের মুখোমুখী হয়েছিল তা গ্রাম সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল যাঁরা তাঁরা জানেন। বহু কোটি টাকা খরচ করে বড় বড় সেচ ব্যবস্থার সূচনা করা হয়েছে, কিন্তু গ্রামে

অনেক মজা নদী, বুজে যাওয়া খাল, ভেঙ্গে পড়া বাঁধ ইত্যাদির আশু সংস্কারের প্রয়োজন সত্ত্বেও তা করা হয় না। অল্প খরচে এগুলোর সংস্কারে দৈনন্দিন চাষবাসে যে গ্রামের লোকেদের কত সুবিধে হয় তা গ্রাম্য জনসাধারণের সঙ্গে কথা বললেই বুঝতে পারা যায়, কিন্তু এমনই মনোভাব সরকারী দায়িত্বশীল কর্মচারীদের যে তাঁরা এ বিষয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজনই মনে করেন না। জনসাধারণের অসময়ে বা অসুবিধেতে তাঁরা বিচলিত বোধ করেন না, কিন্তু আমাদের নিকট প্রতিবেশী প্রজাতান্ত্রিক চীন দেশে কোন অংশে এবারে বিশেষ অনাবৃষ্টি দেখা দেওয়ায় জনসাধারণ বিশেষ দুর্গতির সম্মুখীন হয়। খবরে প্রকাশ অনাবৃষ্টির হাত থেকে জমি আর অবশিষ্ট ফসলকে রক্ষা করার জন্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মচারীরা আপিসের ডেস্ক ছেড়ে চাষীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। এ দৃশ্য আমাদের দেশে এখনও কল্পনা করা অসম্ভব। বহু কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে কিন্তু তা জনসাধারণের মনের গোড়ায় নাড়া দিচ্ছে না, তাই গ্রামে গেলে একটা ক্ষুব্ধ অভিমান সমস্ত সাধারণ মানুষের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়, লোকায়ত্ত সরকারের প্রতি লোক সাধারণের এই মনোভাব সমস্ত উন্নতির পরিপন্থী এ কথা সর্বজন গ্রাহ্য।

পশ্চিমী সভ্যতার সূচনা থেকেই গ্রামবাসী অবজ্ঞার পাত্র হয়ে উঠেছে আর গ্রামকে আমরা নরকের সামিল মনে করতে শিখেছি। সেই শতাব্দীর অপমান অনাদর থেকে গ্রামকে বাঁচাতে গেলে কেবল উচ্চ ভাবাদর্শভরা পরিকল্পনা করলেই হবে না তাকে রূপ দেবার জন্যে দরদী কর্মচারীরও প্রয়োজন যে তাদের "অন্যায় হতে অনশন হতে অন্ধসংস্কার হতে রক্ষা করবে।"

পাথরের ফুল

শ্রীবিভা সরকার

শূন্য প্রান্তর পথে একেলা চলিতে
শুনেছিনু উদাসী ভৈরবী
চারিধার রিক্ততার আবরণ টানি
এঁকেছিলো বৈরাগ্যের ছবি।
তৃণহীন দীন ভূমি হয় নি আগাছা
ধূ ধূ শুধু রুক্ষ মরু নাই বনস্পতি
প্রাণের স্পন্দনহীন মৃত এ মাটিতে
জাগে বৃথা ধরিত্রীর বিফল আকুতি!
কাঁপিল হৃদয় মোর অজানা শংকায়
কেন আমি এ মৃত্যু পুরীতে?
জীবন শুধায় হেথা কার অভিশাপে
বন্ধ্যা কেন বসুন্ধরা পারি না বুঝিতে!
ভীত চিত্ত ভয় ত্রস্ত দীর্ঘ পদ ফেলি
ছুটিয়া পালাতে চায় কম্পিত চরণে
চেয়ে দেখ! আসিয়াছি জীবনের দূত
থাম ভ্রান্ত হে পথিক! বাজিল কি কানে
বিস্ময় বিহ্বল দেখি এ মরুতে একি অপরূপ
সুন্দর দেবতা তব দিব্য উপহার
কঠিন মাটির বুক চিরে মরি মরি! পাথরের ফুল
সূর্যপানে চকিতে তুলেছে মুখ তার!

শ্রীদীপক চৌধুরী

"লেখকের বিবৃতি"

এক

মাসীমার মারফৎ সবাই খবর পেয়েছে, পুরনো দিনের ক্যাপটেন হেওয়ার্ড আবার ফিরে এসেছেন শেলী এ্যাণ্ড কুপার কোম্পানীর বড়সাহেব হয়ে। তিনি এসে মাসীমার সঙ্গে দেখা করে গেছেন তা-ও জানে সবাই। ক'দিন থেকে হোটেলের আবহাওয়ায় অপরিমিত আনন্দের ঢেউ বইছে। কেউ বড় একটা কাজের দিকে আর মন দিচ্ছে না। চণ্ডী ভটচাজ বড় নোটখানা ভাঙিয়ে ঘরে বসে খরচ করছে। এ-সপ্তাহে বৌকে আনা হয় নি। দিনক্ষণ দেখে বেরুতে হবে বলে আগামী সপ্তাহের রবিবার তার আসবার কথা। জিনিসপত্র এসে গেছে। একতলার দক্ষিণ কোণের ঘরটা সে দখল করেছে। ঘরটা বড়, অন্য ঘরের চেয়ে এই ঘরটার ভাড়া এক টাকা বেশী। মাসীমার বালিশের তলা থেকে চাবি নিয়ে ঘরের তালা খুলে দিয়েছে বলরাম। চণ্ডী ভটচাজ ধরেই নিয়েছে শেলী এ্যাণ্ড কুপার কোম্পানীতে চাকরী করছে সে। প্রতি মাসের পয়লা তারিখে মাইনে সে পাবেই। পুরনো পঞ্জিকার গাদা ঝুড়ি ভরে বলরামের মাথায় চাপিয়ে ফেলে রেখে এসেছে চিলেকোঠার গুদামঘরে। সারা দিনের মধ্যে মাসীমার খোঁজখবর সে একবারের বেশী দু'বার নিতে পারত না। এখন ত ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঘরে ঢুকছে তাঁর, জিজ্ঞাসা করছে, "জ্বরটা বাড়ে নি ত আর? বুকের ব্যথাটা কম না বেশী? ক্যাপটেন কি আজ একবার আসবেন?"

বিজয় মাস্টার একটু আগেই বড়সাহেবের সঙ্গে দেখা করে ফিরল। জ্যান্ত কইমাছের মত লাফাচ্ছিল সে। এত কথা বলবার আছে যে, কোন্‌টা আগে বলবে আর কোন্‌টা পরে বলবে ভেবে কূলকিনারা করতে পারছে না সে। সব কথাই সমান সমান ভারী। কোনটার চেয়ে কোনটা ওজনে কম নয়। মাসীমা জিজ্ঞাসা করলেন, "ক'টার সময় গিয়ে পৌঁছলি?"

"এ্যাঁ? ক'টার সময়? ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দশটায়।"

"চিঠিটা দিলি আমার?"

"এ্যাঁ? দিলাম মানে? তখখুনি ডেকে পাঠালেন।"

"পাঁচ মিনিটও বসালি নে?"

"এ্যাঁ? পাঁচ মিনিট কি গো, দু'মিনিটের বেশী নয়। বড়সাহেবের কামরাটা কি ঠাণ্ডা মাসীমা! নিশ্বাস নিতেও আরাম, ফেলতেও আরাম।"

"ইশ্‌!" পাশে দাঁড়িয়ে মুখ দিয়ে আওয়াজ বার করল বলরাম।

চণ্ডী ভটচাজ তখন বিজয় মাস্টারের প্রায় গা-ঘেঁষে বসেছে। সেই তালি-দেওয়া ফতুয়াটা তার ঘাড়ের ওপর ঝুলছিল। ঠাণ্ডার কথা শুনে সে তাড়াতাড়ি ফতুয়াটা মাথা দিয়ে গলিয়ে দিল। তার পর অন্যমনস্ক ভাবে তলার দিকটা টেনে টেনে সে নাভিটাকে ঢাকবার চেষ্টা করতে লাগল। লম্বা করার মত রবারের ফতুয়া এটা নয়। নাভিটা ঢাকল না, কুঁজো হয়ে বসে বুকের দৈর্ঘ্য ইঞ্চিখানেক কমিয়ে ফেলল সে। যেন বড়সাহেবের ঠাণ্ডাঘরে চণ্ডী ভটচাজ ঢুকে বসে আছে!

মাসীমা জিজ্ঞাসা করলেন, "তার পর কি হ'ল? বাঁদরটা তোকে বললে কি?"

"এ্যাঁ? বাঁদর?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোদের কাছে বড়সাহেব। তার পর বল্‌।"

বিজয় মাস্টার বলতে লাগল, "আমার বয়স কত জিজ্ঞাসা করলেন। বললাম, সার্টিফিকেটের হিসেবে পঁচিশ, আসলে সাতাশ। সত্যি কথা শুনে সাহেব ড্যাম গ্ল্যাড।"

"তার পর?"

"এম-এ পাস করে এতদিন কি করছিলাম তাও জিজ্ঞেস করলেন।"

"কবে থেকে কাজে যোগ দিচ্ছিস্‌? কত করে মাইনে দেবে?" প্রশ্ন করতে করতে মাসীমা উঠে বসতে যাচ্ছিলেন। বাঘের মত লাফিয়ে পড়ে চণ্ডী ভটচাজ তাঁকে শুইয়ে দিয়ে বলল, "সর্বনাশ, করছ কি মাসীমা? তোমার অসুখ না?"

গল্‌গল্‌ করে ঘাম বেরুচ্ছিল বিজয় মাস্টারের। উঠে পড়ল সে—উঠে পড়ে বলল, "বড়সাহেব বললেন এ্যাপ্লিকেশন পাঠাতে। কালই নিয়ে যেতে হবে।"

"হাঁ রে চণ্ডীর কথা কিছু বললে সে?"

"চণ্ডী ? ও, হ্যাঁ, চণ্ডীর কথা বলছ, না ? কিন্তু পাসের কথা জিজ্ঞেস করলে চণ্ডীদা কি বলবে ?"

"সে ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না। চণ্ডী পাকা জ্যোতিষ। গণনায় ওর ভুল হয় না। তোদের মত ছোট-খাট পাস ও করতে যাবে কেন রে বিজয় ? বলি হ্যাঁ রে বলরাম, তপা কি তার ঘরে নেই ? ক'টা বাজল ?"

"তোমার বোধ হয় ওষুধ খাওয়ার সময় হ'ল, না মাসীমা ?"

উঠে পড়ল চণ্ডী। পাসের কথাটা শোনার পর থেকে মনটা তার হঠাৎ দমে গেল। একবার মনে হ'ল, মক্কেল ধরবার জন্যে নিয়মিত যেমন সে বাইরে বেরোয় আজও ওর তেমনি বেরুনো উচিত ছিল। একটা টাকার হাতের পাখী কি জঙ্গলের হাজারটার চেয়ে বেশী নয় ?

বিকেলের দিকে বিপ্রদাসবাবু এলেন। বললেন তিনি, "আজ সকালে বিজয়ের কাছে আপনার অসুখের কথা শুনলাম। কেমন আছেন ?"

"বসুন।" বললেন মাসীমা। ছ'খানা চেয়ার বলরাম ঘরে এনে রেখেছে। কাল থেকে লোকের ভীড় ক্রমশঃই বাড়ছে। বলরাম মনে মনে বিস্মিত বড় কম হয় নি। ব্যাপারটা ঠিক ও বুঝতে পারে নি—মাসীমাকে দেখবার জন্যে হঠাৎ এত লোক আসছে কেন ? তবে কি মাসীমার অসুখ খুব বেশী ?

বিপ্রদাসবাবুর তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে, সান্ধ্য-ভ্রমণের সময় প্রায় সমাগত। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "বিজয় বুঝি ইস্কুলের কাজে ইস্তফা দিচ্ছে ?"

"চাকরীটা পেলে ইস্তফা ওকে দিতেই হবে।"

"কত টাকা মাইনে হবে ?"

"শ'তিনেক ত বটেই।"

চিবুকের তলা থেকে ছড়িটা ঝট্ করে সরিয়ে ফেললেন বিপ্রদাসবাবু। চোখের মণিদু'টো চিক্‌চিক্ করে উঠল। সুস্থ হওয়ার জন্যে সময় নিতে হ'ল। তার পর তিনি বললেন, "বড়সাহেবকে আপনি অনুরোধ করলে বিজয়ের বোধ হয় আরও গোটা পঞ্চাশেক টাকা বাড়তে পারে।"

"বললে ত চারশ'ই দেবে !"

"দেবে ?" মাসীমার মুখের ওপর ঝুঁকে বললেন ভদ্রলোক, "দেবে ?"

"সুরুতে শ'তিনেকই ভাল।"

মিনিট দুই সময় কেউ কোন কথা বললেন না। এবার বিপ্রদাসবাবু কথাটা পাড়লেন, "আমার ছোট মেয়ে মলিনাকে আপনি ত দেখেছেন ?"

"দেখেছি।"

"একসময়ে মলিনা বোধ হয় আপনার এখানে খুবই আসত—"

"পাঁচ বছর আগে একবার এসেছিল মনে পড়ে। কত বড়টি হ'ল মেয়ে ?"

"কম কি, কুড়ি চলছে। বি-এ দেবে।"

আলোচনা করতে মাসীমার খুবই ভাল লাগছিল। লালু মরে যাওয়ার পরে সরকার-কুঠীতে কেউ কখনও আসত না। একেবারে একঘরে হয়েই ছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও মাসীমার মর্যাদা কিছু বাড়ে নি। সরকারী মন্ত্রীদের মধ্যে কেউ একজন এসেও যদি একবার পায়ের ধুলো দিতেন তা হলেও সন্তানহারা মায়ের বুকের জ্বালা কিছু কমত। লালু যদি ভুলও করে থাকে, তবুও সে দেশের জন্যে প্রাণ দিয়েছে, জলজ্যান্ত কচি ছেলেটাকে গুলি করে মেরে ফেলল বিপিন চাটুজ্জে! সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, চাকরীর উন্নতির পরে উনিশশ' আটচল্লিশ সনে বিপিন চাটুজ্জে এসেছিলেন মাসীমার সঙ্গে দেখা করতে! পঞ্চানন ঠাকুরের মন্দিরে পূজো দিতে গিয়েছিলেন তিনি! ক্ষমা চেয়েছিলেন বিপিন চাটুজ্জে, মুখের কথায় ক্ষমা প্রকাশ করা সোজা। কিন্তু অন্তরের খবর কেই বা রাখে!

বিপ্রদাসবাবু বললেন, "বিজয়ের সঙ্গে ভাবছি মলিনার বিয়ে দেব। আপনার মত না হলে ত কোন কিছুই স্থির হবে না। বিজয়ের আস্থা মাসীমার ওপর ষোল আনা।"

বুকের ব্যথাটা কমল। এত তাড়াতাড়ি মতটা দিয়ে দেবেন কি ? তা হলে বিপ্রদাস হয় ত সেই বিয়ের আগের দিন ছাড়া আর আসবেন না।

মাসীমা জিজ্ঞাসা করলেন, "বিজয়ের মত আছে ত ?"

"অমত কিছু নেই।"

"বেশ ত—" মত না দিয়ে মাসীমা অন্য পথ ধরলেন, "চাকরী পেলেই ত হ'ল না, থাকবার একটা জায়গা চাই। কলকাতায় বাড়ীঘর পাওয়া সোজা নয়। আমার অবশ্য দোতলায় ঘর আছে গোটা তিন। ছোট সংসারের পক্ষে ভালই হবে।"

"কিন্তু—" বারান্দায় কেউ কান পেতে কথা শুনছে কি না পরীক্ষা করে নিয়ে বিপ্রদাসবাবু বললেন, "বিজয় বলছিল, দোতলায় থাকতে ও সাহস পায় না। মিসেস রায়ের ভাইটি ত টি-বিতে ভুগছে।"

"বিজয়ের আস্পর্দ্ধা ত কম নয়। আপনার মেয়েকে বিয়ে করবে বলে ছেলেটাকে আমি রাস্তায় বার করে দেব নাকি ? দিন না আপনি, যাদবপুরের হাসপাতালে ওকে ভর্তি করে।

সেখানে ঢুকতে গেলে ত মন্ত্রীদের পায়ে তেল মাখতে হয়। আসুক বিজয়—"

"না, না, তেমন কোন কথা বিজয়ের সঙ্গে হয় নি। কথার পিঠে কথা উঠে পড়ল কিনা—থাক্, থাক্, দোতলার ব্যাপারটা পরে ভাবা যাবে। আর ভাববার আছেই বা কি? তিনখানা ঘর পাওয়া ত ভাগ্যের কথা। আজ চললাম, আবার আসব। কেমন থাকেন খোঁজ নেব এসে মাঝে মাঝে। মত আপনার তা হলে ত পাওয়া গেলই—"

"বিজয় কোথায় গেল?" বলরামের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন মাসীমা। শিশি থেকে বলরাম ওষুধ ঢালছিল। ঘরের বাইরে গিয়ে বিপ্রদাসবাবু বললেন, "দরখাস্তটা টাইপ করছে। আমার একটা টাইপরাইটার মেসিন আছে। চাকরীর জীবনে কিনে রেখেছিলাম। বাড়ী গিয়ে ওকে পাঠিয়ে দেব কি?"

"নাঃ, থাক্। আপনি আবার কবে আসবেন? আমার মতটা আপনাকে পরে জানাব।"

"বেশ ত, বেশ ত—এখন ত মাসের মাঝামাঝি, চাকরীতে যোগ দিতে দিতে সেই পয়লা তারিখই হবে। আচ্ছা, নমস্কার।"

একটু পরে বলরাম জিজ্ঞাসা করল, "তোমার কি অসুখ বেড়েছে, মাসীমা?"

"না, কমেছে।"

"তবে এত লোক আসছে কেন?"

"এত দিন আসেনি কিনা, তাই। বলরাম, দেখ ত বাইরে কেউ এল নাকি? পায়ের শব্দ পাচ্ছি।"

ঘরের বাইরে গিয়ে ঘুরে দেখে এসে বলরাম বলল, "না, কেউ নয়, টাইগার।"

"জানোয়ারটা ওখানে কি করছে?"

"আমাকে খুঁজছে। দুটো দিন ত তোমার কাছ থেকে ছুটি পাই নি।"

কি মনে করে মাসীমা টাইগারের আলোচনা বন্ধ করে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "ষষ্ঠী তোকে আজকাল খোঁজে না? তাকে ত আজকাল দেখতেও পাই না।"

গুপ্ত খবরটা ফাঁস করে দিল বলরাম, "গোয়ালের পেছন দিকে ষষ্ঠীদা একটা মন্দির তুলছে। ছোট্ট মন্দির, প্রায় শেষ হয়ে এল।"

"মন্দির?"

"হ্যাঁ। খুব ঘটা হবে প্রতিষ্ঠার দিন। ষষ্ঠীদা বলেছে, যারা পঞ্চানন ঠাকুরের মন্দিরে যায় তারা এখানে আসবে না। এই মন্দিরে দেবতা থাকবেন না, মানুষ থাকবেন।"

"ষষ্ঠী এসব কি করছে? কার কাছে অনুমতি নিল সে?" প্রশ্নগুলো যেন মাসীমা বলরামকে করলেন না।

"তোশকের তলায় ষষ্ঠীদার আর টাকা নেই। সব খরচ করে ফেলেছে।"

বলরামের ধারণা, সে বুঝি অনুপস্থিত ষষ্ঠীদার ভাল দিক-গুলো খুলে খুলে মাসীমাকে দেখাচ্ছে। ষষ্ঠীদা যে কত ভাল মানুষ মাসীমা তা জানেন না।

"একবার তপাদিকে ডেকে নিয়ে আয় ত। তাড়াতাড়ি আসতে বলবি, দেরি করিস নি বুঝলি?"

"আচ্ছা।"

পুজোর দিনটা সবিতা দেবীর ভাল কাটে নি। সারাটা দিন তিনি অস্বস্তি বোধ করেছেন। স্বামীকে দেওদার স্ট্রীট একলা ফেলে আসা উচিত হয় নি। সাব জজ অঘোর চক্রবর্তী ভাটপাড়ার বামুন এনেছেন বটে, কিন্তু সমস্ত দিন তিনি দৃষ্টি রেখেছিলেন মেয়ের ওপর। পুজো কিংবা দেব-দেবীর কথা মনেই ছিল না তাঁর। সন্তান মরলে আবার সন্তান জন্মাবে। স্বামী শুধু একবারই পাওয়া যায়। অঘোর চক্রবর্তী সন্দেহ করেছেন, মেয়ের সাংসারিক জীবন সুখের হয় নি। গুচ্ছেখোনিক টাকা খরচ করে জামাই কিনলেন তিনি, অথচ এক পয়সার সুখ নেই তপনের ঘরে। ব্যাপারটা কি? ব্যাপারটা অনুসন্ধান করবার জন্যে তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে শ্যামবাজার থেকে দেওদার স্ট্রীট এসেছিলেন সেই-দিন রাত্রেই—পুজোর আগের দিন, যেদিন সুতপা গিয়ে-ছিল ছোটসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। সুতপা তখন ওপরেই ছিল, বেয়ারাটা বসেছিল একতলার সিঁড়ির পাশে। খবর যা নেওয়ার সবই তিনি পেলেন একতলাতেই, ওপরে উঠবার দরকার হয় নি। সুতপা নীচে নেমে আসবার আগে অঘোরবাবু হাজরা রোডে বেরিয়ে এসেছিলেন। বেয়ারাটা সঙ্গে ছিল তাঁর। আটের-বি বাস ধরবার জন্যে হেঁটে ল্যান্স-ডাউন রোড পর্যন্ত যেতে হয়। যাওয়ার মুখেই খুঁটিনাটি খবর পেলেন সব। বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তিনি, "ওখানে বসে আছে কে?"

"জ্যোতিষ হুজুর।"

"ও, জ্যোতিষ—আচ্ছা, তুমি এবার যাও, আটের-বি ধরব আমি।"

ধরেওছিলেন অঘোর চক্রবর্তী। মাণিকতলায় বাস বদলাতে হ'ল। একটা ছেড়ে এবং অন্য একটা ধরে তিনি যখন শ্যামবাজারে পৌঁছলেন তখন রাত দশটা বেজে গেছে। পরের দিন পুজো তাড়াতাড়ি শেষ করবার জন্যে বামুনদের

তিনি তাগাদা দিলেন বার বার। মেয়েকে ডেকে বললেন, "পুজোর তাৎপর্য খুব গভীর⋯কিন্তু, দেওদার ষ্ট্রীটে তোর তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার।"

"কেন বাবা ?" জিজ্ঞাসা করেছিলেন সবিতা দেবী।

"হিন্দুর জীবনে পুজোপার্বণের পবিত্রতা খুবই বেশী অস্বীকার করি না, কিন্তু তার চেয়ে বেশী না হলে, প্রায় সমান সমান হচ্ছে স্বামী-ভক্তি। বয়-বাবুর্চি নিয়ে কেউ কেউ ঘরসংসার করছে বটে, কিন্তু ঘরের দেবতাকে একলা ফেলে আসতে নেই। দেবতার কি পা ফসকায় না ?"

সাব-জজ অঘোর চক্রবর্তীর ধর্মবোধ প্রবল। আদালতে ছুটি থাকলেই বেলুড় কিংবা দক্ষিণেশ্বর যান। বেলুড়ের দেবতা আর ঘরের দেবতা যে প্রায় সমান সমান তেমন থিয়োলজি সবিতা দেবী বিশ্বাস করলেন না। অঘোরবাবুকে সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন তিনি, "যে দেবতার পা ফসকায় তাকে তুমি দেবতা বল নাকি ?"

"এঁ্যা ? না, মানে—" মুহূর্তের মধ্যে তিনিও সোজা পথ ধরলেন, "থিয়োলজি থাক্। মোদ্দা কথাটা কি জানিস্, মা ? আপিসের সেই মেয়েটা যাওয়া-আসা করছে দেওদার ষ্ট্রীটে।"

"কোন্ মেয়েটা, বাবা ? আপিসে ত আজকাল অনেক মেয়ে।"

"সেই যে তপনের টাইপিষ্ট রে—"

ঈশ্বরতত্ত্বের চেয়ে ঈর্ষাতত্ত্ব বেশী কার্যকরী হ'ল। সাব-জজ অঘোর চক্রবর্তী তত্ত্ব কিছু কম জানেন না। যেটুকু অজানা আছে সেটুকু পেনসন নেওয়ার পরে জানলেই হবে। তা ছাড়া পেনসন নেওয়ার আগে ঈশ্বরতত্ত্ব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়ও না। মরণকালে হরিনাম করার ধর্ম তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন। এখন শুধু তাঁর আইনমন্ত্রীর নাম করাই কাজ। জেলা-জজ হয়ে পেনসন নিতে পারলে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা তিনি সুরু করতে পারেন।

তাঁর মুখ থেকে খবর শোনার পরে সবিতা দেবী বেশীক্ষণ আর শ্যামবাজারে থাকেন নি। পুজো শেষ হওয়ার আগেই ট্যাক্সি নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়েছিলেন। শেষপর্যন্ত অঘোর-বাবু ভাটপাড়ার বামুনদের সঙ্গে ঝগড়াই করে বসলেন। তাঁরা যত বেশী মনোযোগ দিয়ে পুজো করবার চেষ্টা করতে লাগলেন অঘোরবাবু তত বেশী তাঁদের মনোযোগ ভাঙবার ছুতো খুঁজতে লাগলেন। পাঁচটা দশ মিনিটের রাণাঘাট লোকাল ধরতে হলে তাঁদের যে শ্যামবাজার থেকে তিনটেতে বেরুতে হবে তা কি এঁরা জানেন না ? তিনটের মধ্যেই তিনি তাঁদের বার করে দিলেন। দিয়ে বললেন, "ট্রামে-বাসে বড্ড ভিড় আজকাল। সাবধানে ওঠানামা করবেন। ফতুয়ার পকেটে টাকা রাখবেন না। ভাড়ার পয়সা ক'টা হাতে রাখুন। বাকী টাকা সব ট্যাঁকে⋯"

বাকী টাকা বলতে চুক্তির অর্ধেক টাকা তিনি দিলেন। পুজো ত পুরো হয় নি ? গরীব-ব্রাহ্মণদের তর্ক করবার সময় দিলেন না অঘোরবাবু। রাণাঘাট লোকাল যদি বেরিয়ে যায় ? তবুও তিনি শুনলেন, বুড়ো বামুনটি অপর বামুনটিকে বলছেন, "বুঝলি তারিণী, আমরা হচ্ছি গিয়ে ভারতবর্ষের বামুন। ধম্মকম্ম নিয়ে থাকাই হচ্ছে আমাদের কাজ। সেইজন্যেই চিরকাল আমরা ঠকে এসেছি। চ' রাণাঘাট লোকাল আজ পাঁচটা দশ মিনিট পর্যন্ত হয় ত অপেক্ষা করবে না।"

গত দু'চার দিনের ঘটনাপ্রবাহে পরিবর্তন এসেছে। সে কথা সুতপা নিজেও জানে। আপিসে এখনও সে যায় না। ছুটি ফুরতে আরও পনর দিন বাকী। কিন্তু সুতপা আপিসের খবর কিছু কিছু রাখে। সবিতা দেবী আপিস থেকে স্বামীকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবার জন্যে গাড়িতে বসে অপেক্ষা করেন। দুপুরবেলা টেলিফোনে যখন-তখন স্বামীর সঙ্গে কথা বলেন। ছোটসাহেবের মানসিক বিপর্যয়ের মেঘ নাকি ক্রমশই তরল হয়ে আসছে। এমনি ধরনের দু'চারটে কথা কানে এসেছে সুতপার। আসবে তা সে জানত, যেন আসে সেইজন্যে সে কম চেষ্টা করে নি। সবিতা দেবীর মনে ঈর্ষার আগুন জ্বালাবার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা সুতপার নিজের চেষ্টাতেই হয়েছে।

বেলা শেষ হয়ে এল। আজ আর কোথাও যাওয়ার কথা নেই। সেদিন মহীতোষ এসে ফিরে গেছে। সঙ্গে নাকি কেতকীও ছিল। সন্ধ্যের পরে একবার ইউনিয়নের আপিসে যাবে বলে সুতপা মনে মনে স্থির করে রাখল।

একটু বাদে এল বলরাম। বলল, "মাসীমা তোমায় এখুনি একবার যেতে বললেন তপাদি।"

"তিনি কেমন আছেন ?"

"ভালই ত। দেরি কর না, চল।"

"যাচ্ছি। শোন্—হ্যাঁ রে, তোদের মন্দির কতদুর উঠল ? শেষ হবে কবে ?"

"শীগগীরই। তপাদি, মন্দিরের কথা মাসীমাকে সব বলে দিয়েছি। ষষ্ঠীদা শুনতে পেলে আমায় হয় ত গাঁট্টা মারবে।"

"তা মারুক, ষষ্ঠীদার হাতেই ব্যথা লাগবে।"

সুতপার কথা শুনে হেসে ফেলল বলরাম, "সেদিন তুমি আমায় মারতে গিয়ে নিজের হাতেই ব্যথা পেয়েছিলে, না ?"

"ব্যথা পেয়েছিলাম, কিন্তু হাতে নয়।"

"আর আমি বেশী ভাত খেতে চাইব না তপাদি। দিন দিন ক্ষিধে আমার কমেও আসছে।" এই বলে বলরাম বারান্দায় বেরিয়ে এল। দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসবার চেষ্টাও করল না সে। বোধ হয় ক্ষিদের সঙ্গে সঙ্গে ওর চঞ্চলতাও কমে আসছে।

একতলায় নেমে আসতেই সুতপা দেখল, দু'জন ভদ্রলোক বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন। সুতপাকে দেখতে পেয়ে নিজেদের পরিচয় দিলেন তাঁরা। রমাপ্রসাদ দাস ও দ্বিজেন্দ্রনাথ, গড়িয়ার কলেজে নতুন চাকরী নিয়ে এসেছেন। কলেজের কাছাকাছি থাকবার কোন জায়গা পাচ্ছেন না। তাঁরা শুনেছেন এটা হোটেল এবং ঘরও অনেক খালি পড়ে আছে। যিনি হোটেল চালান তাঁর সঙ্গে তাঁরা দেখা করতে পারেন কি? "পারেন, নিশ্চয়ই পারেন। একটু অপেক্ষা করুন।" এই বলে সুতপা চলে এল মাসীমার ঘরে। বলল, "কলেজে পড়ান এঁরা, লোক ভালই হবে। তোমার কিছু আয় বাড়বে। ঘরগুলো ত খালিই পড়ে রয়েছে।"

"এখানে ডেকে নিয়ে আয়।" আদেশ দিলেন মাসীমা। সুতপা ডেকে নিয়ে এল অধ্যাপক দুটিকে। দুখানা চেয়ার ত ছিলই। মাসীমা বললেন, "বসুন। গড়িয়ায় নতুন কলেজ হয়েছে বুঝি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। রাস্তার ধারে প্রশস্ত বড় বাড়ী উঠেছে।"

"কোন্ রাস্তায় বাবা?"

"বড় রাস্তায়, যেখানে পেট্রল-পাম্প আছে।"

"ত্রিশ বছর আগে ওখানে ভুট্টাক্ষেত ছিল। আশপাশে রাই সরষের চাষও কিছু হ'ত। কোথা থেকে একবার একটা বুনো শুয়োর এসে উৎপাত সুরু করে। চাষীদের ভুট্টা খেয়ে ফেলত। আজকাল সেসব জায়গা দেখলে চেনাই যায় না। ভুট্টাক্ষেতের ওপর অট্টালিকা! হ্যাঁ বাবা, শুনতে পাই আজকাল নাকি মানুষের ওপর মানুষের উৎপাত অনেক বেড়েছে? সে যুগে অবিশ্যি মোহন সামন্ত মাত্র একটা তীর ছুঁড়েই শুয়োরটাকে সাবাড় করে দিয়েছিল। কিন্তু আজকাল ত একটা-দুটো বন্দুকও কাজে লাগে না। সেই ভুট্টাক্ষেতও নেই, বুনো শুয়োরও নেই! সব মানুষ।"

শেষের দিকের আলোচনার সুরটা ধরে ফেললেন অধ্যাপক রমাপ্রসাদ দাস। অধ্যাপক নাথ কথাগুলো বোধ মনোযোগ দিয়ে শোনেন নি। তিনি ঘরের সিলিং দেখছিলেন। দেখছিলেন দেওয়ালগুলোও। মাসীমার কথা শেষ হতেই অধ্যাপক নাথ জিজ্ঞাসা করলেন, "বাড়ীটা খুবই পুরনো, না?"

"হ্যাঁ। শ্বশুরের ভিটে।"

"মেঝে থেকে ড্যাম্প ওঠে না?"

"আমি ত মেঝেতেই শুয়ে আছি, বয়সও কম হ'ল না। কই, ড্যাম্প ত লাগে নি?"

রমাপ্রসাদবাবু তাড়াতাড়ি বললেন, "দ্বিজেনবাবু, পুরনো হলে কি হবে, এসব বাড়ীর গাঁথুনি খুব ভাল। তাজমহলের মেঝেতে পাঁউরুটি ফেলে রাখুন তিন দিন, দেখবেন ছাতলা ধরে না। ড্যাম্প থাকলে ধরত। বাড়ী আমাদের পছন্দ হয়েছে, মাসে জনপ্রতি কত করে লাগবে? আমরা মাগগী ভাতা নিয়ে একশ' পঁচাশি টাকা পাই।"

"মাত্র?"

"মাত্র। সাহেব কোম্পানীর হেড বেয়ারা পায় একশ' পঁচিশ, এর ওপরে বকৃশিশ আছে। আমরা বকৃশিশ পাই না। ঝামেলা অনেক। ঢোকবার সময় সে কি ঝক্কাট! আলিপুরে চাকরির ইন্টারভিউ দেবার জন্যে যেতে হয়েছিল। কাল, নাদুসনুদুস চেহারার একজন অলমাইটি চেয়ারে বসে থাকেন—"

"থাক, থাক—" অধ্যাপক দ্বিজেন নাথ রমাপ্রসাদ বাবুকে পাল্টা দিলেন এবার, "থাক, থাক, আমাদের যেমন পাঁউরুটি নিয়ে তাজমহলে যাওয়ার দরকার নেই, তেমনি দরখাস্ত নিয়ে আলিপুরেই বা আর যাব কেন? আত্মীয়স্বজন কিংবা কোন সমাজভুক্ত না হয়েও যে, চাকরি পেয়েছি সেই ত যথেষ্ট। কোন্ ঘরটায় আমাদের থাকতে দেবেন?"

"ঘর ত আর খালি নেই, বাবা। সব ভর্তি হয়ে যাবে আগামী মাসের পয়লা তারিখের মধ্যে।"

মাসীমার কথা শুনে সবচেয়ে বেশী অবাক হ'ল সুতপা। দ্বিজেনবাবু তবুও জিজ্ঞাসা করলেন, "সবার কাছ থেকে আগাম পেয়েছেন?"

"কথা যখন পেয়েছি, তখন আগামের দরকার কি, বাবা?"

"সবাই ত আজকাল কথা রাখেন না।" দ্বিজেনবাবু উঠলেন।

"তবে আর ভুট্টাক্ষেতগুলোর ওপর বড় বড় অট্টালিকা তুলে লাভ হচ্ছে কি? বেকার-সমস্যা সমাধানের সুযোগ ত রাইসরষের মধ্যেও কম নেই।"

সুতপা বিব্রত বোধ করল। তাই সে একটু জোর দিয়েই বলল, "তোমার বোধ হয় হিসেব করতে একটু ভুল হ'ল, মাসীমা। একতলার একটা ঘর অন্ততঃ খালি থাকবেই।"

"না। সেখানে মহীতোষ আসবে। আর কেতকী যদি

সঙ্গে আসে, তা হলে দোতলার তিনখানা ঘর বিজয়কে দেওয়া চলবে না।"

আকাশ থেকে পড়লেও সুতপা এত বেশী অবাক হ'ত না। অথচ মাসীমাকে আর কিছু বলাও চলে না। মহীতোষ, কেতকী এবং বিজয়বাবু যে ভাগ করে সরকার-কুঠিটা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নিয়েছে তেমন খবর ত সে আজও শোনে নি। বোধ হয় মাসীমার কোন দোষ নেই! সে নিজেই ত ক'দিন থেকে বাইরের জগতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সরকার-কুঠির কোন খোঁজই রাখে নি সে।

নিরাশ হয়ে অধ্যাপক দুজন চলে গেলেন। সুতপা জিজ্ঞাসা করল, "বিজয়বাবু তিনখানা ঘর দিয়ে কি করবেন!"

"সংসার পাতবে। বিয়ে করছে সে। শ্বশুর হওয়ার জন্যে বিপ্রদাসবাবু কাল আমার অনুমতি নিতে এসেছিলেন।"

"বিপ্রদাসবাবু? শুনেছি, তিনি ত মেয়ের জন্যে বড় চাকুরে খুঁজছেন?"

"আসছে মাসে বিজয়ও বড় চাকরি পাবে। আমার চিঠি নিয়ে সে আজ গিয়েছিল ক্যাপটেনের সঙ্গে দেখা করতে। তুই ভেবেছিস্ কি? ওই কোম্পানীতে চাকরি পাবে চণ্ডীও। দেখিস, বলরামও বসে থাকবে না। সরকার-কুঠির ঋণ ইচ্ছে করলে ক্যাপটেনই মিটিয়ে দিতে পারে। এটাকে রক্ষা করার দায়িত্ব বড় কম নয়। তোদের ছোটসাহেব চিরদিন ছোটই থাকবেন। ক্যাপটেন আর তপন লাহিড়ীর মধ্যে তফাৎটা তুই আজও কি দেখতে পাস নি?"

"তুমি পেয়েছ, সেইটেই বড় কথা। না, তপন লাহিড়ী কোনদিনও সরকার-কুঠিকে রক্ষা করতে পারতেন না। সেই জন্যেই তাঁকে সবাই ছোটসাহেব বলে। বড় হওয়ার স্বপ্ন তাঁর নেই, মাসীমা।"

"সত্যি, খুবই সত্যি। তাঁকে চিনতে আমার মাত্র এক দিনই লেগেছিল। দ্বিতীয় দিন দেখার সুযোগ পেলাম না। বেশী রাত্রে এসেছিলেন তিনি। তপা, তোর কি কেতকীর সঙ্গে আলাপ হয় নি?"

"হয়েছে।"

"মহীতোষ ওকে নিয়ে এসেছিল সেদিন।" মাসীমা চুপ করে গেলেন। ইচ্ছে করলে তিনি আরও অনেক কথা বলতে পারতেন। বললেন না বলেই সুতপার মধ্যে একটু অস্থিরতা এল। না-বলা কথাগুলো কি হতে পারে তাই নিয়ে নিজের মনে প্রশ্নোত্তর তৈরি করতে লাগল সে। বাইরে থেকে মাসীমা টের পেলেন না তা।

"বলরাম কই রে, বলরাম।" বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন মেসোমশাই। সুতপাকে ঘরের মধ্যে দেখতে পেয়ে তিনি বললেন, "এই ছাখ, ষষ্ঠী কি কাণ্ড করেছে—কারও কাছেই কোন কথা শুধল না, গোয়ালের পেছন দিকটাতে একটা মন্দির খাড়া করেছে! জেটমল খবর পেয়ে ছুটে এসেছিল আজ।"

মুখ ঘুরিয়ে মাসীমা জিজ্ঞাসা করলেন, "আমরা মন্দির তুলব, না ভাঙব তাতে জেটমলের কি?"

"না—মানে, মোকদ্দমাটা শেষ হয়ে গেল কিনা।" মেসোমশাই এমন ভাবে চুপ করে গেলেন যে, সবাই বুঝল, গুরুতর কথা এইখানেই শেষ হ'ল না, আরও আছে। প্রকাশ করতে ভয় পাচ্ছেন তিনি। মাসীমা বললেন, "মোকদ্দমায় আমরা জিতব, তা ত কেউ বলে নি। মন্দির তুলতে আপত্তি কেন?"

"আপত্তি—মানে, বাড়ীটা নীলাম হবে কিনা। বুঝতেই পারছ, জেটমল ছাড়া আর ডাকবেই বা কে? পেলে লক্ষ্মণ গয়লাও নিত। ওপারেই ত ওর এলাকা, কিন্তু জেটমল লক্ষ্মণের সঙ্গেও দেখা করেছে।"

"বাড়ীটা বেচে জেটমলের দেনা চুকিয়ে দিয়ে আমাদের উদ্বৃত্ত কিছু থাকবে না?"

"থাকা ত উচিত ছিল। জমির দাম এত বেড়েছে যে, বেশ মোটা টাকাই উদ্বৃত্ত থাকা উচিত। কিন্তু শেকলের মত আইন-আদালতের সবকিছুই এমন ভাবে বাঁধা যে, যেখানেই একটু নরম জায়গা আছে মনে করে হাত রাখতে গেছি সেখানেই দেখি জেটমল আগেই গিয়ে জায়গা সব দখল করে বসে আছে। বুঝলি সুতপা, আইন-কানুনের জগতটাতে আদালত আছে দেখলাম, কিন্তু আইন কিছু নেই। শক্তিশালীর মুখ থেকে দুর্বলের রক্ষা পাওয়া একরকম অসম্ভব।"

"বক্তৃতা রাখ—" উত্তেজিত সুরে মাসীমা জিজ্ঞাসা করলেন, "আমরা কি তবে কিছুই পাব না?"

"বোধ হয় না। ভাড়া দিয়ে থাকতে চেয়েছিলাম, জেটমল তাতেও রাজী হচ্ছে না। বলে, ম্যানসন তুলবে।"

"আমার সংসারের এই সব হতভাগাগুলো কোথায় যাবে?"

"এর জবাব আদালত দিতে পারে না। আমিই বা কি করে দেব?"

"তা হলে কালকেই একবার ক্যাপটেনকে ডাক ত তপা। সে বড়সাহেব, ব্যবস্থা একটা সে করতে পারবেই।"

নিঃশব্দে সুতপা উঠে এল ওখান থেকে। মনে ভয় এসেছে ওর। মামলা-মোকদ্দমার খবর সে রাখত, কিন্তু সব সময়েই মনে হয়েছে, সরকার-কুঠি নষ্ট হবে না, বেঁচে

যাবে। কেমন করে বাঁচবে তার পথ অবশ্য সুতপার জানা নেই। এখন, এখখুনি যা ও শুনল, তাতে নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে, এর বাঁচবার কোন পথ নেই—সরকার-কুঠি মরবে। এমন একটা বিরাট মৃত্যুর জন্যে সুতপাই দায়ী। মেসোমশাই যে সুতপাকে কতখানি ভালবাসেন তার শেষ প্রমাণটা যেন ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল। জেটমলের লোক এসে বাড়ীটাকে ভাঙছে। সবার আগে তারা চূড়ার ওপর আঘাত করছে— মন্দিরের চূড়াটার মধ্যে অধিকারের সাক্ষী আছে। জেটমল সেই জন্যেই ভয় পেয়েছে। আবার ওকে হয়ত নতুন মামলা-মোকদ্দমা সুরু করতে হবে। সুতপা জানে, সুরু করলে শেষ হতে সময় লাগবে। সময় পেলে হয় ত নতুন ঘটনার সৃষ্টি হবে। রক্ষা পাওয়ার সুযোগ আসাও সম্ভব। সরকার-কুঠিতে আঘাত করলে সুতপা নিজেই বা আস্ত থাকে কি করে? না, ষষ্ঠীদার চেষ্টাকে সমর্থন করাই উচিত। সবাই মিলে সাহায্য করলে এতদিনে মন্দির-প্রতিষ্ঠার কাজ শেষ হয়ে যেত। জেটমলের ভয় বাড়ত বেশী, মিটমাটের উৎসাহ দেখাত সে। হিন্দু দেবতার মাথার ওপর আঘাত করা তার সাহসে কুলতো না। সুতপা যেন এই প্রথম নিজেকে হিন্দু বলে প্রচার করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল। ছত্রিশ কোটি না হোক, দু'চারটি হিন্দু দেব-দেবীর নামও সে মনে মনে আওড়াতে লাগল। ভোলে নি, এত বছর পরেও সুতপা হিন্দু দেবতার নাম মনে রেখেছে! মন্দিরের চূড়াটা না হয় ক'দিন পরেই শেষ হবে—আগে চাই বিগ্রহ। বিগ্রহ? থমকে দাঁড়িয়ে রইল সিঁড়ির তলায়। ষষ্ঠীদার ঘরের দিকেই যাচ্ছিল সে। ভাবতে হচ্ছে। বিগ্রহ কোথায় পাওয়া যায় তা ত সুতপা জানে না। হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে না বেরুলে ধর্মের ঐতিহাসিকতা প্রমাণিত হবে কি করে? আদালতে গিয়ে দেখাতে হবে, ধর্মপ্রাণ বিচারককে বোঝাতে হবে যে, বিগ্রহের সঙ্গে সভ্যতার যোগ রয়েছে। দু'চারশ' বছরের সভ্যতা নয়—কয়েক হাজার বছরের সভ্যতা। মাহেনজোদরো, হরপ্পা নয়, তারও আগে—আগের চেয়েও আগে। বুদ্ধি এবং বিশ্বাস নিয়ে বোঝাতে হবে, সবার আগে বিগ্রহই ছিল, একমাত্র বিগ্রহ যাঁর পরিকল্পনা থেকে বিশ্বের সৃষ্টি, সময়ের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। সে দু'চারশ' কিংবা দু'চার হাজার বছরের সময় নয়, কোটি কোটি বছরের কথাও নয়, একেবারের সুরুর কথা। ঘেমে উঠল সুতপা। এমন গভীর চিন্তার ধারে-কাছেও ত ওকে দাঁড়াতে হয় নি কোনদিন! বিগ্রহ না হলে যেন সমস্যা মিটবার দ্বিতীয় কোন পথ নেই। অন্ধকার বাগানে নেমে পড়ল সুতপা, সেই সুতপা—রক্ষিতের মোড়ে যার নাম ছিল সুতপা বিশ্বাস, সরকার-কুঠিতে যে এল সুতপা রায় নাম নিয়ে—আর এইমাত্র যে নেমে পড়ল বাগানে, তার নামের পেছনে বিশ্বাস কিংবা রায় নেই। এমনকি সে সুতপাও নয়, সে এক, যার দ্বিতীয় নেই, সে ভক্তি। সুতপা বিগ্রহ চায়। ছুটে এল গোয়ালের পেছনে। হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল মাটিতে। চোখ বুজল সে। মাটির তলায় কম্পন উঠল নাকি? ফাটল নাকি মাটি? বিগ্রহ আসুক। ভক্তির জল দিয়ে সে স্নান করাবে পাথরের নুড়ি।

কোন কিছুই এল না। অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল মানুষ। বেশ মোটাসোটা দেখতে, সারা মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, হাঁটুর ওপরে ধুতির প্রান্ত, গায়ে জামা নেই, হাতে একটা তুলি—মেয়েদের মুখে রং মাখাবার তুলি। নীচু হয়ে বসে লোকটা কি খুঁজছে? এগিয়ে গেল সুতপা, ঘাড়ে তার হাত রাখল সে। জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি খুঁজছ, ষষ্ঠীদা?"

"দাগ।"

"দাগ?"

"হ্যাঁ, তপাদি। সেই যে বিয়াল্লিশ সনে দাগ পড়েছিল এখানে সেইটে খুঁজছি। না, ভুল হয় নি, মন্দির ঠিক জায়গায়ই উঠেছে। আসছে রবিবারে মন্দির-প্রতিষ্ঠা হবে। প্রতিষ্ঠার জন্যে ব্রাহ্মণ-পুরোহিত ডাকব না—কাশী কিংবা ভাটপাড়ায় যাওয়ার দরকার নেই। পৌরোহিত্য করবেন স্বাধীন ভারতবর্ষের একজন রাষ্ট্রনেতা।"

"এ পাগলামী কেন করছ, ষষ্ঠীদা? লালু সরকারকে তুমি আর কোনদিনই বাঁচাতে পারবে না।"

"বাঁচাবার দায়িত্ব দিদি আমার নয়, রাষ্ট্রের। আমি শুধু ক্ষমা চাই—একটু ক্ষমা—ক্ষমা।" এই বলে ষষ্ঠী দত্ত হাতের তুলিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল খালের দিকে। অন্ধকারে কিছু দেখাও গেল না। মেক-আপ ম্যানের মুখোসটা সুতপার চোখে তবু মুখোস হয়েই রইল।

ক্রমশঃ

শিল্পে সরকারী হস্তক্ষেপ

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত

বর্তমান যুগে পৃথিবীর গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে শিল্প জাতীয়করণের উৎসাহ প্রবল হয়ে উঠেছে। অবশ্য যে সব কারণবশতঃ শিল্প জাতীয়করণের জন্য সরকার তৎপর হয়ে উঠেন সে সব কারণের গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। বিশেষ করে রাষ্ট্রের সমরনীতি শিল্পের জাতীয়করণ ত্বরান্বিত করে তোলে। তবে সমস্ত প্রকার শিল্পের জাতীয়করণ সমরনীতির উপর নির্ভরশীল একথা বলা চলে না। এমন কতকগুলি শিল্প আছে যেগুলির উন্নতি সাধন করতে কিম্বা যেগুলি প্রসারিত করতে গেলে প্রচুর টাকা লগ্নী করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। যেহেতু বে-সরকারী মালিকদের পক্ষে অত টাকা সংগ্রহ করা অসম্ভব সেহেতু শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রের পরিচালনাধীনে নিয়ে আসা ছাড়া উপায় থাকে না। অবশ্য শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার অবদান নেই একথা বলা ঠিক নয়। তবে এই ধরনের মালিকানায় যে সব শিল্প-প্রতিষ্ঠান পরিচালিত সে সব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে শিল্পের প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ লগ্নী করা অনেক ক্ষেত্রে একেবারে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং রাষ্ট্র যদি মূলধন সংগ্রহ করার জন্য সচেষ্ট না হন তাহলে শিল্পের বিকাশ ব্যাহত হবে। কাজেই সমরনীতি এই প্রকার শিল্পের জাতীয়করণের প্রধান কারণ নয়, শুধু তাই নয়। এই প্রকার শিল্পের সঙ্গে সমরনীতির সম্পর্কও হয়ত নেই। এক্ষেত্রে স্বভাবতঃই প্রশ্ন হতে পারে সমরনীতি কোন ধরনের শিল্পের জাতীয়করণ ত্বরান্বিত করে তোলে। এর উত্তর খুব সহজ। অর্থাৎ প্রতিরক্ষা-মূলক শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রের পরিচালনাধীনে রাখা হয়। এখানে আমরা প্রধানতঃ যুদ্ধে ব্যবহারযোগ্য অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম নির্মাণের কারখানার কথাই বলছি, যদিও যুদ্ধের প্রয়োজন এবং প্রতিরক্ষার দিক থেকে সমস্ত শিল্পের কমবেশী কিছু না কিছু গুরুত্ব আছে।

আজকের দিনে শিল্পের কতটা উন্নয়ন হয়েছে এবং কিভাবে শিল্প প্রসারিত হচ্ছে সেটার উপর প্রত্যেকটি আধুনিক রাষ্ট্রের উন্নতি নির্ভর করছে। তাই শিল্পের উন্নয়ন এবং বিকাশের জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্র যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার উদ্দেশ্যে বিশেষ ভাবে সচেষ্ট হয়ে উঠেছেন। প্রকৃতপক্ষে এই শিল্পের যুগে রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি এবং প্রগতির রূপও যেন বদলে গেছে। অর্থাৎ আজকাল যে রাষ্ট্রে শিল্পের ধারাবাহিক বিস্তার চোখে পড়ছে, এবং দেশ ও জাতির প্রয়োজনে সুশৃঙ্খলভাবে শিল্পের কাঠামো গড়ে উঠেছে সে রাষ্ট্রকে আমরা প্রগতিশীল আখ্যা দিয়ে থাকি এবং সে রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি সম্বন্ধে কোন সন্দেহের উদ্রেক হয় না।

বর্তমান যুগে অর্থনৈতিক ব্যাপারে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠেছে। অবশ্য এই প্রশ্ন নূতন মোটেই নয়। তবে শিল্পের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নটির গুরুত্বও বেড়ে চলেছে। অথচ এর উত্তর সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। প্রশ্নটি হ'ল, সাধারণভাবে শিল্প সম্পর্কে রাষ্ট্রের পক্ষে কি ধরনের মনোভাব অবলম্বন করা দরকার। আমাদের মনে হচ্ছে, রাষ্ট্রের পক্ষে অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করাই বাঞ্ছনীয়। রাষ্ট্র যদি মনে করেন, একচেটিয়া ব্যবসায়ীরা ইচ্ছা করে দেশের মধ্যে জিনিষপত্রের দাম চড়িয়ে দিচ্ছেন তাহলে এঁদের সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হবে। আবার হয়ত এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে যার ফলে ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত কোন কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা অপরিহার্য্য বলে মনে হবে। সে সময়ে চুপ করে বসে থাকলে চলবে না। ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদের জন্য রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। এছাড়া সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, শিল্প যাতে সুনিয়ন্ত্রিত হতে পারে সেজন্য রাষ্ট্রকে সচেষ্ট থাকতে হবে।

পৃথিবীর অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন বিগত ১৯৩০ সনের বাণিজ্যিক মন্দা কখনও তাঁদের দৃষ্টি এড়াতে পারে না। কিভাবে এই মন্দার ফলে পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে কর্মসংস্থান সমস্যা বিরাট আকার ধারণ করেছিল এখানে সেটা বিশদভাবে বিশ্লেষণ করার হয়ত প্রয়োজন নেই। তবে একথা উল্লেখ না করে পারা যাবে না, বেকার-সমস্যাজনিত দুঃখ-দুর্দ্দশা লাঘব করার জন্য রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়েছে। অবশ্য সব রাষ্ট্রের পক্ষে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভবপর হয় নি। তবে যাঁদের বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করতে দেখা গেছে তাঁদের আন্তরিকতা ছিল প্রচুর। তাঁরা এই সমস্যার আংশিক কিম্বা সাময়িক সমাধান চান নি। তাঁরা বিজ্ঞানসম্মত ভাবে গোটা সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছেন। তাঁদের ধারণা ছিল, যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি বেকারকে নানাভাবে কাজে নিযুক্ত করে অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করা না হবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত বেকার সমস্যার পূর্ণ সমাধান হতে পারে না। সুতরাং এই ভাবে যদি কোন রাষ্ট্র বেকার সমস্যার সমাধান করতে চান তাহলে সুচিন্তিত বৈষয়িক পরিকল্পনা ছাড়া সে রাষ্ট্র চলতে পারবেন না। তা' ছাড়া প্রয়োজন অনুযায়ী রাষ্ট্র বিভিন্ন দিকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণের দিকে নজর দিতে বাধ্য হবেন। অর্থাৎ বিগত ১৯৩০ সনের বাণিজ্যিক মন্দার ফলে যে বেকার-সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল সে

সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের দিক থেকে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সংগঠন অনিবার্য হয়ে পড়েছিল এবং এই সংগঠন রাষ্ট্রের সক্রিয় হস্তক্ষেপের উপর নির্ভরশীল ছিল। এখনও পর্যন্ত এই হস্তক্ষেপ বন্ধ হবার কোন চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না। বরঞ্চ দিনের পর দিন এটা ব্যাপকতর হয়ে উঠছে।

শিল্পের উন্নতি এবং প্রসারের জন্য বর্তমানে যে সব রাষ্ট্র সচেষ্ট সে সব রাষ্ট্রে শ্রমিকদের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থাগুলি সম্পর্কেও দু'একটা কথা বলা দরকার। কি ভাবে শ্রমিকের কল্যাণ হবে এবং শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবার পথ কি ভাবে সহজ হয়ে উঠবে এটাই হ'ল যে-কোন কল্যাণকামী রাষ্ট্রের প্রধান চিন্তার বিষয়। বর্তমানে কোন মালিক তাঁর নিজের খেয়ালখুশি অনুযায়ী শ্রমিককে কাজ করতে বাধ্য করতে পারেন না। আইনের সাহায্যে শ্রমিকের কাজের সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। শ্রমিকের চাকরীর সর্তাবলী এবং বার্ষিক ছুটির পরিমাণও আজকাল আইনের দ্বারা নির্দ্ধারিত হচ্ছে। এ ছাড়া মজুরী পরিশোধ আইন, কারখানা আইন ইত্যাদিরও যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। শুধু তাই নয়। যদি কোন মালিক এবং শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধ সুরু হয় তা হলে সহজে যাতে সে বিরোধের মীমাংসা হতে পারে সেজন্য বাধ্যতামূলক সালিশীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। মোট কথা হ'ল এই যে, শ্রমিকের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এগুলির ফলে শ্রমিকের জীবন-যাত্রার মান উন্নত হয়েছে কি না? শ্রমিকের অবস্থার কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে বলে মনে হয় না, যদিও অবলম্বিত ব্যবস্থাগুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এর অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল, বাজার দর স্থিতিশীল নয়। জিনিষপত্রের দাম দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। কাজেই অবলম্বিত ব্যবস্থাগুলো কল্যাণকর হওয়া সত্ত্বেও শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবার পথে গুরুতর অন্তরায় দেখা দিয়েছে।

আমরা আগেই বলেছি, পৃথিবীর যে সব রাষ্ট্রের উপর আধুনিক চিন্তাধারার প্রভাব এসে পড়েছে সে সব রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক সংগঠনের জন্য জোর চেষ্টা চলছে। কিন্তু বিবেচ্য বিষয় হ'ল, প্রত্যেকটি রাষ্ট্রে একই পদ্ধতিতে চেষ্টা চলছে কি না কিম্বা একই ব্যবস্থা অবলম্বিত হচ্ছে কি না। পৃথকভাবে প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের অনুসৃত নীতি কিম্বা অবলম্বিত ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর নয়। তবে আধুনিক চিন্তাধারার অনুপ্রাণিত রাষ্ট্রগুলিতে অর্থনৈতিক সংগঠনের যে আয়োজন চোখে পড়ছে তা থেকে আমাদের মনে হচ্ছে, প্রধানতঃ দশটি বিষয়ের উপর মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। এ কথা হয়ত উল্লেখ না করলেও চলে যে, প্রথমতঃ, বেকার-সমস্যার সমাধানের উপর সবচাইতে বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, শিল্প যাতে সুনিয়ন্ত্রিত হতে পারে সেজন্য চেষ্টার অন্ত নেই। তৃতীয়তঃ, শ্রমিকের স্বার্থ সংরক্ষিত করার জন্য সরকার সচেষ্ট। চতুর্থ বিষয় হচ্ছে শিল্প-বিন্যাস। পঞ্চমতঃ,বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিচালনার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। ষষ্ঠতঃ, বাণিজ্যিক লেন-দেনের বিবর্তন যাতে প্রভাবিত করা যায় সেজন্য চেষ্টা চলছে। সপ্তমতঃ, যুদ্ধের সময়ে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য যে সব ব্যবস্থা চালু ছিল কোন কোন আধুনিক রাষ্ট্রে সে সব ব্যবস্থা আঁকড়ে থাকার ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। অষ্টমতঃ, সামাজিক, বীমা-পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার জন্য চেষ্টা চলছে। নবমতঃ, কোন কোন রাষ্ট্রে যুদ্ধের পরে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থাগুলি এখনও চালু রাখার উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। দশম বিষয় হ'ল আয়ের সমতা বিধান।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা নিশ্চয় ফেডারেল ট্রেড কমিশনের নাম শুনেছেন। অবশ্য আরও কয়েকটা দেশে ষ্ট্যাটুটরী বডি গঠন করা হয়েছে। কি প্রণালী অনুযায়ী একচেটিয়া বাণিজ্যের কাজ চলছে সে সম্বন্ধে তদন্ত করাই হ'ল এই সংস্থার আসল উদ্দেশ্য। আমেরিকায় একচেটিয়া বাণিজ্যের গঠন অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। অবশ্য এই খবর কতটা খাঁটি সেটা বিচার করে দেখা দরকার। তবে দেখা যাচ্ছে, কোন কোন রাষ্ট্রকে দেশের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হচ্ছে। যে সব জিনিষ একচেটিয়া কারবার থেকে উৎপাদিত হচ্ছে একদিকে যে রকম সরকার সে সব জিনিষের নির্দ্দিষ্ট দর বেঁধে দিয়েছেন সেরকম অন্যদিকে সে সব জিনিষের বিক্রী সম্পর্কীয় ব্যাপারে সরকারকে কয়েকটা সর্ত আরোপ করতে হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে, সরকার কেন এই ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। প্রশ্নটি খুবই স্বাভাবিক, কারণ আজকাল প্রত্যেক ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতার তীব্রতা কমে যাচ্ছে এবং উৎপাদনের পরিমাণ বেশী ছাড়া কম নয়। অবাধ প্রতিযোগিতার তীব্রতা কমে গেলে এবং উৎপাদনের পরিমাণ বেশী হলে জিনিষপত্রের দাম কমে যায় এটা আমরা সবাই জানি। অথচ দেখতে পাচ্ছি, দাম চড়ে যাচ্ছে। এর কারণ হ'ল ব্যবসায়ের কর্তৃত্ব অল্প কয়েকজন লোকের হাতে গিয়ে পড়ছে। ফলে যাঁরা ক্রেতা তাঁদের দুর্দ্দশার সীমা নেই। কাজেই এই সব ক্ষেত্রে সরকারের হস্তক্ষেপ অনিবার্য্য হয়ে পড়ে।

সরীসৃপ রাজত্ব

শ্রীমিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়

অঙ্গার যুগের গাছপালা ও উভয়চর প্রাণীরা তুষার যুগে সমাধিস্থ ছিল শত শত শতাব্দী। হিমেল বাতাস ও বরফের আধিপত্য চলেছিল বহুকাল, জীবজন্তু গাছপালা সকলের দফা নিকেশ না করে নড়ে নি। সরলো যখন তখন দেখা গেল সে রেখে গেছে ধূসর ঊষর প্রান্তর আর সেই মরুময় বৃহৎ মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিছু গিরগিটি জাতীয় প্রাণী আহারের সন্ধানে। সরীসৃপরা পূর্ব্বে ছিল না এমন নয়। তবে সে নেহাৎ নগণ্য। সহস্র সহস্র বৎসরব্যাপী শীতের পর দেখা গেল যে, জলের সঙ্গে সম্বন্ধ এদের ঘুচে গেছে, তৈরী হয়ে গেছে চার ঘর-সংযুক্ত হৃৎপিণ্ড এবং সোজাসুজি বাতাস গ্রহণোপযোগী ফুসফুস; উভয়চরদের ন্যায় ডিম পাড়তে যেতে হয় না জলের কাছে, বার বার দেহকে জলে ভিজিয়ে আর্দ্র করে নেবার প্রয়োজন শেষ। জলে তখন তুষারের আচ্ছাদন, ছানারা জলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে কি করে, প্রবল শৈত্যই এদের পুরাপুরি করে দিল স্থলচর—দারুণ শীতে স্থলভাগ অধিকতর কাম্য। প্রাণীজগতের গোড়ার কথা হ'ল প্রতিবেশের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলতে না পারলে মৃত্যু ও অবধারিত ধ্বংস। এ সময়কার প্রাণীদের বাধ্য হয়েই শারীরিক আকৃতি ও গঠন বদলাতে হয়েছিল এবং যারা বদলাতে পারে নি তারা দ্রুত এগিয়ে গিয়েছিল ধ্বংসের পথে। বেঁচে রইল তারা যারা এই নূতন আবেষ্টনে সামঞ্জস্য বিধান করে নিল: পারমিয়ান যুগের অনাবৃষ্টি মরুময় পরিবেশ ও শৈত্যের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠল হিমরক্ত-প্রধান জীবেরা, সরীসৃপ সর্প, কুমীর ইত্যাদির পূর্ব্বপুরুষ, যারা গোটা জীবনটা স্থলভাগেই অতিবাহিত করে দিতে শিখল। শিলাময় পৃথিবীপৃষ্ঠের উপর দিয়ে আনাগোনা করবার ফলে শরীরের বাহিরের আবরণ সুকঠিন, মস্তকের আবরণ সুকঠিন মস্তিষ্ককে সযত্নে রক্ষার নিমিত্ত। আমেরিকার টেক্সাসের নিকটে একটি সরীসৃপ ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে, অবয়ব উভয় স্তরের সমতুল্য অথচ করোটির অস্থিগঠন ও সংবেশ দেখলে মনে হয় যে, স্তন্যপায়ী, এমনকি মানুষের সঙ্গে বিস্তর সাদৃশ্য, নাম দেওয়া হয়েছে 'সেমূরীয়া'। মাথার খুলি চোয়াল জিহ্বাস্থল পর্যবেক্ষণে বেশ বোঝা যায় যে, এরা স্তন্যপায়ীর পূর্ব্বপুরুষ।

স্তন্যপায়ীরা জল পরিত্যাগ করায় প্রথম প্রথম প্রভূত অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিল, ভ্রূণ পরিস্ফুরণের সমস্যা তার মধ্যে একটি প্রধানতম। আকৃতির নানারূপ পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন শেষ হওয়ায় ঐ অনুষ্ঠানটি (রূপান্তর, যেমন ডিম থেকে বেঙাচি অবস্থা শেষে ভেক) বাহুল্য হয়ে উঠল; একে পরিত্যাগ করবার উপায় নির্দ্ধারণে ভ্রূণে পর্য্যন্ত পানীয়ের আয়োজন। জলজ প্রাণীদের ভ্রূণের চারিপাশে সর্ব্বদা প্রচুর জলের সমাবেশ; উভয়চরদের প্রসব করতে নামতে হয় জলে (ভেক, সালমান্ডর); পরবর্ত্তী উন্নততর স্তর সরীসৃপ জলে বিনাপ্রবেশে অণ্ডে পানীয় রাখবার ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছে। ক্রমে বাষ্পীভবন ও মাংসাহারী শত্রুদের বাধা দিতে ভ্রূণ ঢাকা পড়ল শক্ত খোলসে, তার পর এল অণ্ডের শ্বেতাংশ। জলের চাপ যাতে ঠিক থাকে; দেহস্থিত আবর্জ্জনা নিকাশে অদ্রবণীয় ইউরিক এসিডের বন্দোবস্ত হল। কুসুম এল প্রাণধারণের জন্য, শ্বাস-প্রশ্বাসের সহায়তাকল্পে ও ভ্রূণকে রক্ষার্থে ঝিল্লির উদ্ভব। শরীরে উপাঙ্গ আদিরও অনেক পরিবর্ত্তন হ'ল। কারণ এখন থেকে অণ্ডের উপরকার আবরণ কঠিন হয়ে আসবার পূর্ব্বেই প্রাণীকে অভ্যন্তর ভাগ হতে বাহির হয়ে আসা প্রয়োজন।

জীবেরা জল পরিত্যাগ করায় নূতন পরিবেশের সৃষ্টি হ'ল বটে কিন্তু উন্নতি অধিক দৃষ্ট হ'ল দেহের অভ্যন্তরে। শিরা-উপশিরায় কেন্দ্রস্থল ও অস্থি ইত্যাদি উঠল সুগঠিত হয়ে, রক্তচলাচল প্রণালী ও যাতায়াতের উপযোগী অঙ্গের দ্রুত উন্নতি। মস্তকদেশের উন্নতি সর্ব্বাধিক ইন্দ্রিয়ের অভ্যুদয়: এক জোড়া চক্ষু, এক জোড়া কর্ণ, হস্তদ্বয়, পদদ্বয় ইত্যাদি। মেরুদণ্ডীদের আগমনের সময় থেকেই ইন্দ্রিয়ের কর্ম্মধারায় বেশ একটা সুষ্ঠু সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল, ইন্দ্রিয়গুলির কর্ম্মপন্থা এ সময়ে কিয়ৎ পরিমাণে সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে উঠার ফলে পৃথিবী ও জীবন এদের কাছে আরও সহজ হয়ে যায়। মেরুদণ্ডহীন প্রাণী যে চোখে নিজের পরিবেশ দেখত তা অত্যন্ত অস্পষ্ট অস্বচ্ছ আকৃতিশূন্য সীমাবদ্ধ। দৃষ্টির কিছু উৎকর্ষ সাধন হ'ল সরীসৃপদের আমলে এবং স্থলভাগকে গৃহরূপে গ্রহণ করায় শ্রুতির উন্নতি হয় যথেষ্ট। উভয়চরদের শ্রবণযন্ত্র মন্দ নয়, সরীসৃপেরা তার থেকে খুব বেশী উন্নতি করতে পেরেছিল বোধ হয় না। তবে এক বিষয়ে এদের প্রভূত উৎকর্ষ দেখা যায়, ঘ্রাণশক্তি। সরীসৃপের ঘ্রাণশক্তির উপর যতখানি নির্ভর অত নির্ভর সম্ভবত অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের উপর নয়। স্তন্যপায়ী বিবর্ত্তনের প্রথম দিকে এই ক্ষমতা এত অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে, গণ্ডার প্রভৃতি অনেক বিচরণশীল প্রাণী শুধু ঘ্রাণের সাহায্যেই জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় করে নিত।

জলাশয়, নদনদী, সমুদ্র ছেড়ে আসবার ফলে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল এরা। আহারের সন্ধানে হস্তপদে নির্ভর করে সারা পৃথিবীতে অভিযান আরম্ভ হ'ল। প্রথম দশায় সম্ভবতঃ নিজেদের ভিতর মারামারি ছেড়াছিড়ি কম হয়ে গিয়েছিল। আহার অবশ্য জলাকীর্ণ স্থানেই মিলত অধিক। সেজন্য জলার অভাব ঘটলে আহার

অনুসন্ধানে এমন সব স্থানে যেতে হ'ল যেখানে পূর্ব্বে কোনও জীবের পদধূলি পড়েনি—পাহাড় উপত্যকা অধিত্যকা মালভূমি গিরিখাত শৈলান্তরীপ। প্রকৃতির নিয়মানুসারে ক্রমশ এত বেড়ে উঠল যে, অপর কোন প্রাণীর কোন সময়ে এরূপ সংখ্যাধিক্য হয়ে ওঠেনি।

বিকিরণে অভিযোজন

অভিব্যক্তি প্রবহমান জলধারার মত। জীবনধারা ধরণীর বক্ষে প্রথম প্রাণসঞ্চার মুহূর্ত্ত থেকে আরম্ভ করে আজ পর্য্যন্ত সমগ্র জীবজগৎকে ক্রমপর্য্যায়ে উন্নতির পথে পরিচালিত করেছে, প্রাণীর ক্রমবিকাশের মূলে তার কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণ প্রতিনিয়ত অব্যাহত। প্রাণিজগৎ-বিকাশের ক্রমিক স্তরগুলি, অমেরুদণ্ডী—মেরুদণ্ডী—উভয়চর—সরীসৃপ—স্তন্যপায়ী—বনমানুষ—মানুষ, যেন মনে হয় জৈব-বিবর্ত্তনের বিশেষ বিশেষ ধারার ক্রমপ্যায়। কোন কোন ধারায় অবশ্য একটানা ক্রমোন্নতি দেখা যায় তথাপি অভিব্যক্তিকে উন্নতির প্রতিশব্দ মনে করা ভ্রম। বিবর্ত্তন প্রকৃতির প্রধান নিয়ম এবং জীবনের সঙ্গে এ নিয়ম অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত, যেখানে জীব, সেখানেই বিবর্ত্তন। প্রাণ-বিবর্ত্তনে অবনতির উদাহরণ প্রচুর, পরভৃত পরজীবী তার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ। সময় সময় দেখা যায় কোটি কোটি বৎসরেও কোন পরিবর্ত্তন নেই, কৃমিকীট এই জাতীয়, আবির্ভাবের কাল থেকে বিবর্ত্তনের সমস্ত শক্তিকে উপেক্ষা করেছে সদম্ভে, লিঙ্গগুলে 'ল্যাম্প-শেল' লক্ষ লক্ষ বৎসরে কিছুই বদলায় নি।

জৈব-বিবর্ত্তনের গতি একটানা জলস্রোতের মত নয় বরং সাগরাভিমুখী নদীর ন্যায় নিজেকে বহুধারায় বিভক্ত করে এঁকেবেঁকে চলেছে উচ্ছল তরঙ্গ তুলে, জীব-জীবনের অধ্যায়ে ক্রমিক উন্নতি বলে কিছু নেই। উন্নতি হয়েছে এখানে-ওখানে হঠাৎ কোনও ধারায়, একটানা উন্নতি তাকে বলা যায় না। জৈব-বিবর্ত্তনের প্রভাব অনেক সময় শরীরকে কোনও একটি বিশেষ দিকে চালনা করে, এর ফল বহু প্রকার: প্রথমতঃ অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কয়েক শত বংশের মধ্যে দেহের আয়তন বৃহদাকার হয়ে উঠল, সর্ব্বশরীর বিপুলভাবে বেড়ে বিরাটাকার প্রাণীর জন্ম, যেমন হয়েছিল সরীসৃপেরা মেসোজয়িকে, টারটিয়ারিতে স্তন্যপায়ীরা। দ্বিতীয়তঃ, শরীরের কোনও বিশেষ অঙ্গ কখন কখন অতি দ্রুতভাবে বেড়ে উঠে। পূর্ব্বের তুলনায় এগুলি সুবৃহৎ হয়, এদের প্রভাব দেহে প্রকট। আত্মরক্ষার সহায়-স্বরূপ ব্যবহৃত হওয়ায় এদের বৃদ্ধি কেবল একদিকে। উদাহরণ প্রচুর: জিরাফের গলা, হাতীর শুঁড়, নারহোয়ালের খড়্গ ইত্যাদির চমকপ্রদ ক্রমবিবর্ত্তনের মূলে আত্মসংরক্ষণের প্রয়াস। বংশপরম্পরায় উদ্যম একই দিকে নিয়োজিত হয়েছিল সেজন্য এই অঙ্গগুলির বাড়াবাড়ি। বিবর্ত্তনের ধারা আরও অনেক দিকে প্রবাহিত; সময়ে সময়ে বিভিন্ন প্রাণীরা জীবনরক্ষার্থে (আহার ও সঙ্গিনী অনুসন্ধান) আশ্রয় গ্রহণ করেছে একেবারে ভিন্ন প্রতিবেশে, সেই প্রতিবেশেই যদৃচ্ছা বৃদ্ধি, সেই প্রতিবেশেই বিস্তার। আকাশচারী পাখীদের উদ্ভব এইভাবে, ন্যূনপক্ষে ১৬,০০০ জাতীয় পক্ষী আজ আকাশে বিচরণ করে কিন্তু এদের সৃষ্টির প্রারম্ভে দুই-এক জাতির অধিক ছিল না: বাদুড় স্তন্যপায়ী হয়েও গগনচারী; তিমি মাছ নয় মোটেই, স্তন্যপায়ী জন্তু, শরীরে উষ্ণরক্ত, দেহ বিশালাকার ধারণ করায় সম্ভবতঃ সমুদ্রযাত্রা করেছিল পুরাকালে। এরা প্রথমাবির্ভাবকালে হয়ত একই কুলের একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল, একত্র থাকায় খাদ্যাভাব, দূরে গিয়ে আশ্রয় নিল, স্থানের ব্যবধান ক্রমশঃ স্বভাব ও শেষে শরীরকে পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করে দিল আমূল, তখন উভয়ের সম্বন্ধ নির্ণয় করাই ভার। দেশের ব্যবধান ও কালের ব্যবধান দুই মিলে অনন্ত ব্যবধান সৃষ্টি করেছে, নিকটাত্মীয়ের ভিতর, তৈরী হয়েছে নতুন জাতি, নতুন গণ, নতুন শ্রেণী। জীব ছড়িয়ে পড়ে কালক্রমে সম্পূর্ণ নতুন জাতির সৃষ্টি করেছে।

উত্থান পতন জাগতিক নিয়ম। এক রাজ্য গড়ে আর এক রাজ্য ভাঙে, এক সভ্যতা ওঠে অন্য সভ্যতা পড়ে, কোন সমাজই চিরকাল শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত থাকে না। জীব-বিবর্ত্তনেও ঠিক এইটি ঘটেছে বার বার। প্যালিজোয়িক যুগে জলজ অমেরুদণ্ডীরা প্রবল হয়ে উঠে, সিলুরিয়ান-ডিভোনীয়ানে মাছেদের আধিপত্য, অঙ্গার যুগ উভয়চরেদের, বৃহদায়তন ডাইনোসরগোষ্ঠী জুরাসীক-ক্রিটাসিয়াসে বিশিষ্ট, তার পর নতুন যুগে স্তন্যপায়ীদের অভ্যুদয় ও প্রভুত্ব অসুরাকৃতি সরীসৃপদের বিনাশ। মাইয়োসিনে সরীসৃপদের স্থান গ্রহণ করে স্তন্যপায়ী কিন্তু অধিক দিন রাজত্ব করতে পারে নি মানুষ আবির্ভূত হয়ে এদের সমস্ত জারিজুরি ভেঙে পৃথিবীর অধীশ্বর হয়ে বসে নিজেই—ভবিষ্যতের অনন্ত সম্ভাবনা তার অন্তঃস্থলে।

বসুন্ধরার বক্ষতলে প্রাণীর আবির্ভাব বহুকাল (প্যালিজোয়িক প্রায় ১,৫০০,০০০,০০০ ও মেসোজোয়িক ২০০,০০০,০০০ বৎসর বিস্তৃত), এর মধ্যে কত যে প্রাণী এল, কত গেল তার ইয়ত্তা নেই; কত নতুন জীবনের হ'ল উন্মেষ, কত পুরাতন লয়প্রাপ্ত কে তার সংখ্যার হিসাব রাখে! কিন্তু এর ভিতর সরীসৃপদের আবির্ভাব ও বিস্তার যেমন চমকপ্রদ তেমনি কৌতূহলজনক। ভগবতী বসুন্ধরা যেন এক বিশাল ল্যাবরেটরি: সৃষ্টি-ধ্বংস-অভ্যুদয়-বিলয়ের মধ্যে দিয়ে প্রকৃতির নিত্য নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যাকে অনুপযুক্ত মনে করেছে ঝরা শুষ্ক ফুলের মত ঝেড়ে ফেলে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে নি, সামান্যমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় যে দিয়েছে তার বংশের মধ্য দিয়ে পরীক্ষা চলেছে, যারা উত্তীর্ণ হতে পেরেছে অর্থাৎ জীবন-সংগ্রামে টিঁকে গেছে, তারা ছাড়া অন্য সকলকে জঞ্জালের মত ঝাঁট দিয়ে সরিয়ে দিয়েছে নিঃশেষে অস্তিত্ব মেলাও ভার এখন। পৃথিবীতে স্তূপীকৃত শিলাস্তরের আবরণে কঠিন পাহাড়ের গায়ে চাপা পড়ে গেছে এদের কঙ্কাল—খুঁজে বের করা আয়াসসাধ্য ও যথেষ্ট বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন।

সরীসৃপকুল ও পারিপার্শ্বিকতা

সরীসৃপের প্রধান প্রধান বর্গ আজ যারা আমাদের মধ্যে বিচরণ করে বেড়ায় সেদিনও তারা ছিল গোসাপ, সর্প, গিরগিটি, কুমীর ও কচ্ছপের জাতিগোষ্ঠীর দল। সকলকারই মন্দগতি, কুৎসিৎ আকৃতি দন্তপঙক্তি একরকমের ও আলগা; অন্তঃস্থলভাগে প্রসব করে, রক্ত শীতল। সাপকে খুব বেশী পুরাতন বলা চলে না! বোধহয় মেসোজোয়িক যুগে এরা ছিল না; এই যুগের শেষে গিরগিটির বংশধরেরা এত বৃহৎ হয়ে উঠে যে, কোন কোনটা লম্বায় ৮০।৯০ ফিট পর্য্যন্ত হ'ত। যেমন জলজ মোজাসর (৭০ ফিট), আহার অন্বেষণে প্রায়ই সমুদ্রতীরে আসত। আরও অনেক ধরনের সরীসৃপ ছিল অভ্যুদয়কালে, তবে কুমীর-কচ্ছপ জলচর হওয়ায় পুরানো স্তর থেকে কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়েছে শুধু এদেরই। ডাইনসর ও তার জ্ঞাতিগোষ্ঠীর নাম কারও অবিদিত নয়। ক্রমান্বয়ে কত ভীষণ ও বৃহদাকৃতি হয়ে উঠেছিল তাহা অনেকেরই ধারণার বাইরে। এদের ধরন-ধারন, স্বভাব-আকৃতি ভাল করে জানা গেছে তা নয়, তবে এখান-সেখানকার সূত্র ধরে যতটুকু পরিচয় সংগৃহীত হয়েছে তাও বিশ্বের বিস্ময়। এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে, অনেকে এসেছে অনেকে গেছে কিন্তু বৈজ্ঞানিক থেকে আরম্ভ করে সাধারণ পাঠকের অনুসন্ধিৎসা এত বিপুল আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে আর কেউ পারে নি; মরেছে বহুকাল কিন্তু যাদুঘরে রক্ষিত বিরাট কঙ্কাল বিস্ময়োদ্রেক করে আজও। এরা যেমন অপ্রতিহত ভাবে রাজত্ব করে গেছে তেমন আর কেউ করে নি, স্তন্যপায়ীরাও না কারণ তাদের নতুন নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী আসরে অবতীর্ণ হচ্ছিল। ডাইনসর পৃথিবীবক্ষ হতে নিঃসংশয়ে নিশ্চিহ্ন বহুদিন কিন্তু তাদের কথা স্মরণে রাখবার জন্য ছাপ রেখে গেছে কয়েকটি প্রাণীর গায়ে যাদের দেখলে ডাইনসর বলে ভ্রম হওয়া বিচিত্র নয়—কুমীর, উটপাখী, গণ্ডারের চেহারা বিশেষ ভদ্র নয়।

সে-সময়কার আবহাওয়া ও বৃক্ষলতা

সরীসৃপকুল তদানীন্তন জলবায়ু দ্বারা প্রভাবান্বিত। মেরুপ্রদেশ ব্যতীত অপর স্থানে উষ্ণত্ব অধিক ছিল। হিমরক্ত সরীসৃপ শীতকাল সহ্য করতে পারে না, এখনও শীতকালে কচ্ছপ সাপেদের টিকিটি দেখবার উপায় নেই, কুমীরের উপদ্রব কমে আসে, অন্য সমস্ত রক্ত শীতল প্রাণিবৃন্দ পালায় নিজ নিজ গহ্বরে, মাটির নীচে। মেসোজোয়িক গ্রীষ্মপ্রধান, সেজন্য উদ্ভিদ দল নানাভাবে বিস্তারলাভ করল, ছোট বড় নানাপ্রকার গাছপালায় পূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল বসুন্ধরা; প্রখর সূর্য্যালোকে আর্দ্র মাটির উপর অঙ্কুরিত হচ্ছিল নিত্য নতুন গাছপালা, অঙ্গার যুগের পর এত বিভিন্ন প্রকারের এবং এত ঘন উদ্ভিদ সমাগম আর হয় নি। প্রত্যেক তুষার যুগ সমাপ্তির পর বসন্তের আবির্ভাব, শীতের জড়তা অবসান, নতুন সঞ্জীবতা ও প্রাণোচ্ছ্বাসের আভাষ। মৃত্যুর হিমশীতল পরিবেশ থেকে পালিয়ে বেঁচেছিল যারা তারা অধিকার করল পূর্ব্ববর্তীদের পরিত্যক্ত স্থান, তার পর পৃথিবীময় বিস্তৃত হয়ে পড়ে তাদের আধিপত্য।

ট্রিয়াসিক-জুরাসিক সরীসৃপ যুগ। আবহাওয়া একটু উষ্ণ হয়ে আসতে না আসতেই ভিজে মাটীর উপর ফার্ণ সাইক্যাড মোচাকৃতি কর্ণিফার জাতীয় লতা পাইন প্রভৃতিরা নিজেদের আগমন ঘোষণা করতে বিলম্ব করে নি; প্রথম বীজযুক্ত গাছ সাইক্যাড ভিন্ন ভিন্ন আকারে জন্মাছিল, উদ্ভিদতত্ত্ববিদরা একে 'সাইক্যাড যুগ' বলেছেন; ছোট ছোট পাম গাছের মত এরা, যদিও আসল পাম জন্মাতে তখনও অনেক দেরী। অনেক স্থলে গরম ও শীতের মাঝামাঝি আবহাওয়া প্রসার হয়েছিল, পাতা-ভরা উচ্চ পাইন গাছ জন্মেছিল এই সব নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে, পাইন পাতা খাবার জন্য অনেক সরীসৃপকে দু'পায়ে ভর করে দাঁড়ান শিখতে হয়েছে। জীবজন্তু ও বৃক্ষলতার বর্ণনায় মনে হয় যে, এ সময়ে হাওয়ায় উত্তাপ ছিল যথেষ্ট, বৃষ্টিও হ'ত প্রচুর।

শেষের দিকে লতারা পুষ্পসজ্জিত হতে আরম্ভ করে। মৃত্তিকা মধ্যস্থিত রস যে মুহূর্ত্তে সূর্য্যকিরণে রূপ-রঙ-গন্ধ-সুষমায় ভরে উঠেছিল পৃথিবীর সে এক সন্ধিক্ষণ। কোন শুভক্ষণে প্রথম কোরকটি নব-কিশলয়ের ভিতর দিয়ে ভীরু নয়নে পরম পিতা বিভাবসুর পানে তাকিয়ে দেখেছিল, গন্ধবহ তার আগমনবার্ত্তা বহন করে নিয়ে গিয়েছিল দিকে দিকে, দেশে দেশে, তার পর প্রজাপতি ভ্রমর মধুপের আনাগোনা, ফুলে ফুলে মধুপান। নূতন করে জীবন আরম্ভ, পুরাতন একঘেয়ে জীবনযাত্রার অবসান, উদঘাটিত জীবনের একটা নূতন দিক। কুসুম-জীবন 'ক্ষণিকের অতিথির' মধুপানেই পর্য্যবসিত নয়, পরাগ আর রেণুর মেশামিশিতে সম্পূর্ণ নূতন জীবনের উদ্ভব। স্থানে স্থানে দিকে দিকে নবপুষ্পসমৃদ্ধ উদ্ভিদকুল বায়ুভরে হিল্লোলিত হয়ে ঘোষণা করতে লাগল যৌবনের তারুণ্যের জয়গান। সঙ্গে সঙ্গে মানসিক উন্নতি হতে লাগল মধুপদের, স্বাদ-গন্ধ-বর্ণ ইত্যাদি অনুভূতির অভ্যুদয়। সে সময় ধরণীর প্রথম আমন্ত্রণ-লিপি গিয়েছিল ঋতুরাজ বসন্তের দরবারে।

অনুকূল জলবায়ুর সঙ্গে সরস গাছপালা উদ্ভিদ সরীসৃপ বিস্তৃতির পথ সুগম করে দিয়েছিল। তাতে জন্মাতে লাগল অদ্ভুত ধরনের জীব। সে সময়কার ধরণীপৃষ্ঠ বিশেষতঃ ভূভাগ একেবারে ভিন্ন ছিল। উত্তর আমেরিকা থেকে গ্রীণল্যাণ্ড দিয়ে ইউরেশিয়া অবধি এক বিস্তৃত ভূখণ্ড, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে অতল সমুদ্রের বিস্তার ভারত মহাসাগর পর্য্যন্ত ভারত (দাক্ষিণাত্য), আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা একই ভূভাগ ছিল। পূর্ব্বে বলা হয়েছে যে, আদিম অবস্থায় সরীসৃপদের দৈহিক আকৃতি উভয়চরদের আকৃতির সঙ্গে বিশেষ পার্থক্য ছিল না, উত্তর আমেরিকার পারমিয়ান স্তরের 'সেমুরীয়া' তার প্রমাণ। সে সময়ে সরীসৃপেরা উভয়চরদের মত দেখতে, ২.৩ হাত থেকে ৮.১০ হাত লম্বা এবং বহুদিন পরেও এদের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নি। এমনকি উভয়চরদের প্রতিপত্তি বিনষ্ট হয়ে যাবার পরেও অনেককাল এরা প্রায় একরূপই ছিল।

পশ্চিমবাংলার বন্যাবিধ্বস্ত গ্রাম পুনর্গঠনের পরিকল্পনা

শ্রীঅণিমা রায়

১

অনেক ইংরেজ দার্শনিক ও সাহিত্যিক লিখে গেছেন "Misfortunes are blessings in disguise" অর্থাৎ দুর্ভাগ্য, ছদ্মবেশী আশীর্বাদ। কিন্তু ভগবানের মারের ছদ্মবেশ অপসরণ করে আশীর্ব্বাদটি ফুটিয়ে তুলতে প্রয়োজন হয়—একটি বিরাট কল্পনা, অদম্য সাহস ও পুরুষাকার, স্থির সঙ্কল্প প্রখর চিন্তাশক্তি এবং সেবা-ধর্ম্মে প্রবৃত্তি। একাজ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই রকম একটি কাজের ভার মাথায় তুলে নিয়েছেন। ফলাফল ভগবানের উপর নির্ভর করে।

পশ্চিম বাংলা নদীনালার দেশ। গঙ্গা, দামোদর, অজয় প্রভৃতি বড় বড় নদী ও তাদের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা দেশময় বয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া কত ছোট ছোট নদী এইসব বড় নদীতে এসে মিশেছে।

প্রতি বছর বর্ষাকালে এইসব ছোট বড় নদীতে বন্যা হয়। আশে পাশের গ্রাম জলমগ্ন হয়ে যায়। গরীব চাষীর বাসগৃহ সচরাচর মাটির দেওয়ালের উপর খড়ের চাল। জলে দেওয়াল গলে যায়, ঝড়ে চালা উড়ে যায়। প্রতি বছরই বন্যার উপদ্রবের কথা শোনা যায়। বহু লোক গৃহশূন্য হয়—তাদের সাহায্যের জন্য চাঁদার খাতা খোলা হয় এবং ছোট বড় শহরের রাস্তায় রাস্তায় সহৃদয় যুবকের দল ভিক্ষা করে বেড়ায়। রাজ-সরকার নানাবিধ সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। রামকৃষ্ণ মিশন, দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ সমিতি প্রভৃতি বহু বে-সরকারী জনকল্যাণ-সমাজ সাহায্য নিয়ে উপস্থিত হয়। চাষী গরীবদের মনে আশার আলোক দেখা দেয়। বন্যার শেষে বহু কষ্টে চাষীর দল আবার তাদের ভিটের উপর কাঁচা-ঘর বাঁধে। ভাল পাকাঘর তৈরী করতে অর্থের প্রয়োজন—চাষী গরীবেরা তা কোথায় পাবে? তারা ভাবে যা গিয়েছে তা গিয়েছে—ওটা ভগবানের মার—চারা নেই। যাক্ মাথা গোঁজবার ঠাঁইটুকুত বজায় হয়েছে, আবার খেটেখুটে সব জোগাড় করে নেওয়া যাবে।

এই সান্ত্বনা তাদের শক্তি এনে দেয়, তাদের ম্লান মুখে আবার হাসি ফুটে ওঠে। ওপরে দেবতাও হাসেন। দু'এক বছর যেতে না যেতেই আবার বন্যা, আবার ক্লেশ—আবার পুনর্মূষিকো ভব। এই ভাবে বহু বছর ধরে নদীতীরের গ্রামগুলির ভাঙাগড়া চলছে।

বর্ষার শেষে, ১৯৫৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসে, যখন নদীনালায় জল কানায় কানায় হয়ে আছে—ভীষণ ভাবে কয়েকদিন ধরে পশ্চিম বাঙলায় ঝড় বৃষ্টি হ'ল। এত জল বহন করবার শক্তি আর নদীনালার ছিল না। নয়টি জেলায় (নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, হুগলী, হাওড়া, বীরভূম, বাঁকুড়া, মালদহ এবং চব্বিশ পরগণা) ধ্বংসলীলার প্রতীকস্বরূপ বন্যা দেখা দিল। সেখানকার কাঁচাঘর বাড়ী সব নষ্ট হয়ে ত গেলই, অনেক পুরান পাকা বাড়ীও সে ধাক্কা সহ্য করতে পারল না।

এই নয়টি জেলায় বন্যার তাণ্ডবনৃত্য চলতে লাগল। বহু গ্রামের চিহ্ন পর্য্যন্ত রইল না—ধানের ক্ষেত, বাড়ী-ঘর, গরু বাছুর প্রায় সমস্তই ভেসে গেছে—চারিদিকে শুধু জল আর জল—প্রলয়ের ভীষণ মূর্ত্তি সর্ব্বত্র ফুটে উঠল। চারিদিকে হাহাকার ধ্বনি শোনা গেল। স্থানীয় বাসিন্দারা বলাবলি করতে লাগল যে এ-রকম বন্যা তারা জ্ঞানে কখনও দেখে নি।

বন্যার্ত্তদের সাহায্যের জন্য খাদ্য, ঔষধ, কাপড় প্রভৃতি নিয়ে চারিদিক থেকে লোক ছুটে গেল। বে-সরকারী বহু সেবাসমিতি কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বাংলা সরকারও গোড়া থেকেই নানাবিধ সাহায্য বিতরণ করতে লাগলেন। খাদ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রভৃতি সকলে ঘটনা স্থলে গিয়ে সমস্ত তদারক করলেন—যাতে এই ক্লিষ্ট লোকেদের দুঃখের কিছু লাঘব করা যায়। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় স্বচক্ষে এই দুর্দ্দশা দেখে এলেন।

তিনি দেখলেন যে দৈবদুর্ঘটনায় মানুষের মনে দুরকম ভাবের সৃষ্টি হয়—এক শ্রেণীর লোকের মনে থাকে শুধু হতাশা, তারা একেবারে জড়ভরত হয়ে পড়ে, আর বাকী লোক চিন্তা করতে আরম্ভ করে, কি করে এই দুর্দশা কাটিয়ে উঠে আবার পূর্ব্বের জীবনধারায় ফিরে যাবে। এই দুরবস্থা কাটিয়ে উঠে কি করে পূর্ব্বের চেয়ে উন্নত জীবন গঠন করব—এ কথা কেউ চিন্তার মধ্যেও আনতে পারে না।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এ বিষয়ে চিন্তা করতে করতে স্থির করলেন যে, যেসব গ্রাম একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, সেখানে পূর্ব্বের মতন গ্রাম না তৈরী করে আদর্শ গ্রাম তৈরী করতে হবে। সহজ অবস্থায় লোকের বাড়ী ঘর ভেঙে আদর্শ গ্রাম তৈরী করতে গেলে মহা গোলোযোগের সৃষ্টি হ'ত। দৈবদুর্ব্বিপাকে যা নষ্ট হয়ে গেছে, সেখানে আদর্শ গ্রাম তৈরী করলে কোন আপত্তি হবে না। নতুন প্রথায় সব গ্রাম তৈরী হয়ে গেলে লোকে বুঝতে পারবে যে এই বন্যাঘটিত দুর্ভাগ্যটি, ভগবানের মার হয় নি—হয়েছে তাঁর আশীর্ব্বাদ।

এই দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কাজ আরম্ভ করলেন। প্রথমেই ধ্বংসের পরিমাণ নির্ণয় করা প্রয়োজন। তাই স্থানীয় রাজকর্ম্মচারীদের দ্বারা জরীপ করিয়ে দেখা গেল যে, প্রায় দুই লক্ষ বাড়ী নষ্ট হয়েছে। নয়টি জেলায় প্রায় ৫৫০৬টি গ্রামের প্রভূত ক্ষতি হয়ে

গিয়েছে। এক বর্দ্ধমান জেলাতেই ৬২,০০০ এরও বেশী সংখ্যক বাড়ী নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পশ্চিম বাংলার পরিসংখ্যান বিভাগও জরীপ করে প্রায় একই তথ্য পেলেন। এই সব গ্রাম নতুন করে গড়তে গেলে যে টাকার প্রয়োজন তা খরচ করা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে এখন সম্ভব কিনা সেটাও ভাবা প্রয়োজন। এমন একটি পরিকল্পনা করা দরকার যাতে এই ক্লিষ্ট গ্রামবাসীদের জীবনযাত্রা প্রণালী উন্নত হবে অথচ রাজকোষে অর্থের অসংকুলান হবে না। এইসব মনে রেখে নতুন করে গ্রাম গঠনের একটি পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে।

এই পরিকল্পনাটির বিষয় এবার কিছু বলা হবে। জরীপ করে দেখা গেছে যে, (১) কতকগুলি গ্রামের ক্ষতি খুব কম হয়েছে—কয়েকটি মাত্র বাড়ীর অল্পবিস্তর ক্ষতি হয়েছে; (২) কতকগুলি গ্রামের বিশেষ ক্ষতি হয়েছে; (৩) কতকগুলি গ্রাম একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে। পরিকল্পনায় স্থির করা হয়েছে যে, প্রথম পর্য্যায়ের গ্রামগুলিতে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ীগুলির স্থানে আরও মজবুত বাড়ী নির্ম্মাণ করা হবে। আর অন্য দুটি পর্য্যায়ের গ্রামগুলিতে মজবুত বাড়ী তৈরী করা ত হবেই, তার সঙ্গে সাধারণের কল্যাণকর আরও অন্যান্য ব্যবস্থা করা হবে।

গৃহনির্ম্মাণ ও গ্রামোন্নয়নে কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপদ্ধতি জবরদস্তী করে গ্রামবাসীদের স্কন্ধে চাপান হবে না। এইটি গ্রামোন্নতি পরিকল্পনার প্রধান বিশেষত্ব। এমনভাবে তাদের কাছে প্রস্তাব করতে হবে যাতে তারা এই গ্রামোন্নয়নের কাজে নিজেরাই উৎসাহিত হয়ে উঠে এবং তাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে। তাদের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত শ্রমে, উৎসাহ ও উদ্দীপনায় এই মহৎ কাজ সম্পন্ন হবে এই ভাবটি জনসাধারণের মনে না জাগলে এত বড় কাজ সুসম্পন্ন হওয়া শক্ত হবে। এই কথাটি রাজকর্ম্মচারীরা যেন কখনও ভুলে না যান। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রামবাসীদের বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরামর্শ ও কর্ম্মপ্রণালী নির্দ্দেশ, অর্থ ও মালমসলা দিয়ে সাহায্য করবেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই পরিকল্পনাটি দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে—

(১) সাধারণের কল্যাণের জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা; (২) উন্নত প্রথায় মজবুত বসতবাড়ী নির্ম্মাণ।

পরিকল্পনায় সাধারণের কল্যাণ-কামনায় প্রতি গ্রামের জন্য নিম্নলিখিত কর্ম্মসূচী স্থির করা হয়েছে—

(ক) একটি পাকা ৩০ ফুট চওড়া রাস্তার দ্বারা গ্রামটিকে জেলাবোর্ডের রাস্তার সঙ্গে সংযুক্ত করা।

(খ) পানীয় জলের জন্য কয়েকটি নলকূপ বা ঢাকা দেওয়া সাধারণ কুয়া নির্ম্মাণ।

(গ) গ্রাম্য রাস্তাগুলির দু'ধারে খোলা কাঁচা নর্দ্দমা প্রস্তুত করা ও প্রয়োজন স্থলে সাঁকো নির্ম্মাণ করা।

(ঘ) কয়েকটি সাধারণের কল্যাণকেন্দ্র নির্ম্মাণ করা—যথা একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়; একটি গ্রন্থাগার ও পাঠাগার; কুটীর-শিল্পের হাতিয়ারাদি মেরামতের জন্য একটি ছোট কারখানা; বীজ, সার প্রভৃতি বিক্রয়ের জন্য গ্রাম্য সমবায় সমিতির দ্বারা পরিচালিত একটি দোকান।

(ঙ) কয়েকটি খোলা জায়গা ফেলে রাখা—গোচারণের মাঠের জন্য, ছেলেদের বেড়াবার ও খেলবার স্থানের জন্য, ইটখোলার জন্য, গ্রামের সমস্ত ময়লা ফেলার জন্য (যেখান থেকে পচা সার পাওয়া যাবে) এবং একটি ছোট জঙ্গল রাখার জন্য (যেখান থেকে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ হবে)।

পরিকল্পনার দ্বিতীয় অংশে ইট পুড়িয়ে ইটের দেওয়ালের উপর করকেট টিন ছাওয়া বাড়ী নির্ম্মাণ করার ব্যবস্থা হয়েছে—যাতে ঝড়ে বা বন্যায় সহজে নষ্ট হয়ে না যায়। প্রত্যেকটি বাড়ী ১৬০ বর্গ ফুটের উপর তৈরি হবে—তাতে একটি ঘর ও একটি বারন্দা থাকবে। কাদা দিয়ে দেওয়াল গাঁথা হবে ও বাঁশের বরগার উপর করকেট টিন আঁটা হবে। কাদায় গাঁথা দেওয়াল শুনে কেউ যেন ভয় না পান। রোদে শুকান ইট ও কাদার গাঁথুনীর বহু প্রাচীন মন্দির ও বাড়ী এই পশ্চিমবঙ্গে দু'শতাব্দী ধরে ঝড়, জল, বন্যা প্রভৃতি প্রকৃতির বহু অত্যাচার সহ্য করে এখনও দাঁড়িয়ে আছে। এইসব বাড়ীর ভিতও ইট, কাদা দিয়ে তৈরি করা হবে। যারা এইভাবে বাড়ী তৈরী করে নিতে চায়, তাদের প্রত্যেককে ইট পোড়াবার জন্য দেড় টন কয়লা দেওয়া হবে আর আড়াই হন্দর করকেট দেওয়া হবে। এ ছাড়া বাঁশ ও দরজা-জানলার কাঠ সরকার জোগাবেন।

প্রত্যেকটি বাড়ী করবার জন্য ৫,০০০ ইটের প্রয়োজন। ১২০ বর্গ ফুটের একটি ঘর এবং ৪০বর্গ ফুটের একটি বারান্দা তৈরী করতে বাড়ী পিছু ৩২৫ টাকা খরচ হবে। এ সমস্ত উপাদান সরকার দেবেন বটে, কিন্তু ইট পোড়াবার ভার ও বাড়ী তৈরী করবার ভার গ্রামবাসীদের উপর দেওয়া হয়েছে। তাদের বাড়ী তারা নিজেদের (শ্রমে) তৈরী করবে; এর জন্য কোন মিস্ত্রী বা মজুর নিযুক্ত করা হবে না। এইভাবে স্বাবলম্বী না হলে এত বড় কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। বাংলা সরকার অবশ্য গ্রামবাসীদের ইট পোড়ান, রাজমিস্ত্রীর কাজ ও ছুতোরের কাজ শেখাবার ভার নিয়েছেন।

এ ছাড়া পরিকল্পনায় আর একটি ধারা আছে যে, যাঁরা ইচ্ছা করবেন তাঁরা ইচ্ছামত বাড়ী করে নিতে পারবেন। তাঁরা পাকা-বাড়ী তৈরী করেন এইটাই বাঞ্ছনীয়। এই শ্রেণীর মধ্যে যাঁদের বাড়ী বন্যায় নষ্ট হয়ে গেছে, তাঁরা উপযুক্ত জামিন দিলে সরকারের নিকট ১৫০০ টাকা পর্য্যন্ত ধার পাবেন। এই ঋণের জন্য সুদ দিতে হবে না এবং এই ঋণের উপর বছরে শতকরা আড়াই টাকা প্রিমিয়াম থাকবে। ঋণ পঁচিশ বছরের মধ্যে সরকারকে সুদ দিতে হবে। যাঁরা এই ঋণ গ্রহণ করবেন সরকার তাঁদের বাড়ী করবার

কোন মাল-মশলা বা ইট কাঠ সরবরাহ করে সাহায্য করবেন না। সবই নিজেকে জোগাড় করে নিতে হবে।

পরিকল্পনায় আরও ছিল যে যারা গৃহশূন্য হয়েছে সে সব গ্রামবাসীকে সাময়িক ভাবে আদালতে, স্কুলে, থানায় বা যে কোন রাজকীয় বাড়ীতে এবং তাঁবু প্রভৃতিতে আশ্রয় দিতে হবে। এ কাজ করাও হয়েছিল। পরে গ্রাম নির্ম্মাণ করবার সময় গ্রামের একপাশে বা নিকটবর্ত্তী স্থানে, সেই গ্রামের বাসিন্দাদের সাময়িক-ভাবে থাকবার জন্য আশ্রয় তৈরী করে দিতে হবে। গ্রামে বাড়ী সব তৈরী হয়ে গেলে, গ্রামবাসী যে যার বাড়ীতে চলে যাবেন এবং যে আশ্রয়গুলি তাদের জন্য তৈরী হয়েছিল, সেগুলি সমাজ সেবার কাজের জন্য ব্যবহৃত হবে।

ধ্বংসপ্রাপ্ত যেসব গ্রাম অত্যন্ত নীচু জমির উপর ছিল সেখানে নূতন করে গ্রাম গঠন করা হবে না। নিকটবর্ত্তী কোন উঁচু জায়গার উপর সেই গ্রামগুলি গড়া হবে। ১২টি গ্রামের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সব উঁচু জমি আইন সাহায্যে হস্তগত করেছেন। প্রতি গৃহস্থকে এই জমি থেকে ৪০০ বর্গগজ লীজ দেওয়া হবে। আর ৬টি গ্রামের বাসিন্দারা সমবায় সমিতি গঠন করে উঁচু জমি সংগ্রহ করে নিয়েছেন। এইসব এক-একটি নূতন গ্রামে ৫০ থেকে ২০০ পর্য্যন্ত গৃহস্থের পাকা বাসস্থান নির্ম্মিত হবে।

আর্থিক অবস্থার হীনতার জন্য যেসব গ্রামবাসীর বিনা মজুরীতে শ্রমদান করা একেবারেই অসম্ভব তাদের বাংলা সরকার দৈনিক মজুরী কিছু কিছু দেবেন। তারা যে ক'দিন কাজ করবে, দৈনিক মজুরী পাবে, কিন্তু এই দৈনিক মজুরী দেড় টাকার বেশী কোন স্থানেই হবে না।

এই হ'ল পরিকল্পনাটির মোটামুটি রূপ। পরিকল্পনাটি তৈরী করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বসে নেই—রীতিমত কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। দুই লক্ষ বাড়ী ভেঙ্গেছে, কতকগুলি কম ভেঙ্গেছে, কতক-গুলি বেশী ভেঙ্গেছে আর কতকগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। পশ্চিম-বঙ্গ সরকার স্থির করেন যে, এক লক্ষ পাকা বাড়ী গোড়ায় নির্ম্মাণ করবেন। কিন্তু বাঙ্গালী গ্রামবাসী কোন নূতন পন্থার একেবারেই অনুরাগী নয়—৫০,০০০ গ্রামবাসী এই ভাবে গৃহনির্ম্মাণ করবার জন্য দরখাস্ত করেছেন। কাজেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপস্থিত লক্ষ্য ৫০,০০০ গৃহ নির্ম্মাণ করানো।

পরিকল্পনাটি ১৯৫৬ সনের ডিসেম্বর মাসে তৈরী হয়। সেটা বাংলার ধান কাটার সময়—কাজেই গ্রামবাসীরা খুব ব্যস্ত ছিল। ১৯৫৭ সনের জানুয়ারী মাস থেকে নিম্নলিখিত কাজ আরম্ভ করা হয়েছে :

(১) ইট গড়া, ইট পোড়ান, গাঁথনি করা, দরজা-জানলা তৈরী করতে শেখবার জন্য কাঁচড়াপাড়ায় একটি শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়েছে। ২৪১ জন লোককে এই শিক্ষাকেন্দ্রে আনা হয়। তাদের মধ্যে ২০৪ জন শিক্ষা সমাপ্ত করে বিভিন্ন গ্রামে চলে গেছে—তারা গ্রামবাসীর দ্বারা গৃহনির্ম্মাণ কাজ করাবে। বাকি ৩৭ জন এখন শিক্ষালাভ করছে।

(২) বিভিন্ন কেন্দ্রে ইট পোড়াবার জন্য যত কয়লা দরকার তা মজুত করা হয়েছে।

(৩) এই পরিকল্পনায় যত করগেটের প্রয়োজন হবে তা সংগ্রহ করা হয়ে গেছে।

(৪) নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, চব্বিশ-পরগণা, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান এবং বীরভূম এই সাতটি জেলায় কাজ আরম্ভ করা হয়েছে।

(৫) ১০·৬ কোটি ইট তৈরী হয়ে গেছে, তার মধ্যে ৮·৫ কোটি ইট পোড়ান হয়েছে। বাকি ২·১ কোটি ইট এখন পুড়ছে

(৬). এই ইট নিম্নলিখিত জেলায় ব্যবহৃত হবে :

নদীয়া	৫৫০০	বাড়ীর জন্য	৩·৯	কোটি
মুর্শিদাবাদ	১৩৭০	,, ,,	·৬৬	,,
চব্বিশ-পরগণা	৯০	,, ,,	·৬	,,
হাওড়া	৩০০	,, ,,	·২২	,,
হুগলী	২৯৪০	,, ,,	২·০৬	,,
বর্দ্ধমান	৪৩১০	,, ,,	৩·০২	,,
বীরভূম	৫৪০	,, ,,	·৩৮	,,

(৭) বরগা ও জানলা-দরজার জন্য যে কাঠ প্রয়োজন তার প্রায় অর্দ্ধেক যোগাড় হয়েছে ও বাকিটুকু জোগাড় হচ্ছে। গ্রাম-বাসীরা নিজেরা যদি কোনও গ্রামে এই কাঠ জোগাড় করতে পারে, তাহলে মূল্য বাবদ বাড়ী পিছু ২৬ টাকা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে পাবে।

(৮) বহু স্থানে গৃহনির্ম্মাণের কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। ১৭৫টি বাড়ী সম্পূর্ণ তৈরী হয়ে গেছে আর বহু বাড়ী অর্দ্ধ-সমাপ্ত অবস্থায় আছে।

বর্ষার জন্য গত দুই মাস কাজ কম হচ্ছে। আগামী মাস থেকে কাজ খুব দ্রুত চলবে। এ বছর বর্ষার পর থেকে আগামী মাসের বর্ষাকাল আসা পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রায় ১৬,০০০ বাড়ী তৈরী হয়ে যাবে। পরিকল্পনার প্রারম্ভে এই কাজে যোগ দেবার জন্য মোট ৫০,০০০ গ্রামবাসীর দরখাস্ত পাওয়া গিয়েছিল। এখন কাজ দেখে বহু গ্রামবাসী এই ভাবে বাড়ী করবার সুযোগ নিতে চান। বহু দরখাস্ত আসছে। এগুলির জন্য কাজ আরম্ভ হবে আগামী সনের বর্ষার পর।

এই বিরাট পরিকল্পনাটি কাজে পরিণত করতে তিন কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। ইট, কাঠ প্রভৃতি মালমসলা অক্ষম গ্রাম-বাসীকে বিনামূল্যে দেওয়া হবে। বাকি গ্রামবাসীর আর্থিক অবস্থা বুঝে, যার কাছে যে মূল্যটুকু পাওয়া উচিত, মাত্র সেইটুকু নেওয়া হবে। সাধারণের কল্যাণার্থে (অর্থাৎ বিদ্যালয়, ডাক্তারখানা প্রভৃতি) যা ব্যয় হবে তা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বহন করতে হবে। তা ছাড়া ইঞ্জিনীয়ার, তদারককারী প্রভৃতির বেতন আছে। মুখ্য-মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই তিন কোটি টাকা চেয়েছেন—অর্দ্ধেক এককালীন দানস্বরূপ ও বাকি অর্দ্ধেক ঋণস্বরূপ। কেন্দ্রীয় সরকারের এই কাজে যথেষ্ট সহানুভূতি আছে। তাঁরা এখনও এই প্রস্তাব ও মূল পরিকল্পনাটি পরীক্ষা

বন্যাবিধ্বস্ত গ্রামের নূতন রূপ
(পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিকল্পিত গ্রামের নক্সা)
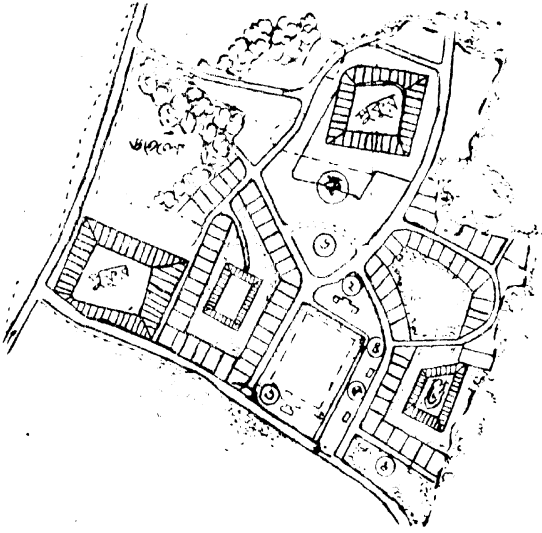
১। শিল্প কেন্দ্র।

২। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং খেলার মাঠ।

৩। সাধারণের মিলনকেন্দ্র এবং পাঠাগার।

৪। ডাক্তারখানা।

৫। সমবায় ভাণ্ডার।

৬। বাজার এবং দোকান।
মোট ৮০টি গৃহনির্ম্মাণের জমি আছে।

ক। ভবিষ্যতে আরও চল্লিশ ঘর বাসিন্দার বাসস্থানের সংস্থান।

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডেভেলপমেণ্ট বিভাগের সৌজন্যে)

করছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিধানবাবু যে এই মহৎ কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট তিন কোটি টাকা নিয়ে আসতে সক্ষম হবেন সে বিষয়ে কারও মনে সন্দেহ থাকা উচিত নয়।

জনহিতকর যেসব বিশেষত্ব (বিদ্যালয়, গোচারণের মাঠ প্রভৃতি) উন্নত গ্রামে রাখা হবে বলে পরিকল্পনায় স্থির করা হয়েছে তা বাংলায় নতুন নয়। ইংরেজ এখানে আসবার একশত বৎসর পরেও প্রতি গ্রামে গুরুমহাশয়ের পাঠশালা ছিল, গোচারণের মাঠ ছিল, জ্বালানী কাঠের জঙ্গল ছিল, চণ্ডীমণ্ডপ ও বারোয়ারীতলা (Community Centre) ছিল, পানীয় জলের পুষ্করিণী ছিল, ভাগাড় ছিল, (Dumping Ground) খেলার মাঠ ছিল, ধর্ম্ম-গোলা (Co-operative granary) ছিল, কামারশাল, ছুতোর বাড়ী, তেলের ঘানি, ঢেকিশাল, তাঁত এবং চরকা প্রভৃতি সবই থাকত। আর ছিল একটি অমূল্য সম্পদ—গ্রামবাসীর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, সহানুভূতি ও ভালবাসা। জাতিভেদ, ছুঁতমার্গ প্রভৃতি যা নিয়ে ইংরেজ ঐতিহাসিক বহু বিদ্রূপ করেছেন—সে সব ছিল সত্য। কিন্তু তার মধ্যেও একটি সামাজিক সাম্য ছিল যার জন্য ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ জমিদারের পুত্রকেও বাগ্দী পাইককে দাদা বা কাকা সম্বোধন করতে হ'ত। গ্রামবাসী জাতি ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে পরস্পরের ভাই, দাদা, কাকা, জামাই প্রভৃতি হয়ে পরমসুখে দিন কাটাত। প্রত্যেকটি গ্রাম্য সমাজ একটি বৃহত্তর বাঙালী সমাজের এক-একটি স্বাবলম্বী শাখা ছিল। সমস্ত নষ্ট হয়ে গেল ইংরেজের শাসন প্রথায় ও শোষণ প্রথায়। স্থানাভাবে এ প্রবন্ধে বিশেষ করে এ বিষয়ে লেখা সম্ভব নয়। পরিকল্পনায় বাদ পড়ে গেছে একটি কাজ—ইংরেজদের অবহেলায় গ্রামের জল নিকাশের পথগুলি বন্ধ হয়ে গেছে, এগুলি সব খুলে দিতে হবে। খুলে দিলে বন্যা গ্রামে ঢুকলেও আট দশ দিন জল দাঁড়িয়ে থেকে গ্রামের ও ক্ষেতের সর্ব্বনাশ করতে পারবে না।

ভূদান যজ্ঞের পুরোহিত বিনোবাভাবে ও দেশসেবক জয়প্রকাশ নারায়ণ ভূদানের সঙ্গে শ্রমদান যোগ করে নিয়েছেন। তাঁরা বুঝেছেন যে শ্রমদান না করলে ভূদান যজ্ঞ সফল না হতেও পারে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রামোন্নতির জন্য ইট, কাঠ, লৌহ, সিমেণ্ট, করকেটটিন, যন্ত্রপাতি, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন—গ্রামবাসীকে করতে হবে অকাতরে শ্রমদান। তবে পরিকল্পনা সফল হবে। বার বার দুর্ভোগ ভোগ করে ভাগ্যকে ধিক্কার না দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সুরে সুর মিলিয়ে, গ্রামবাসী গেয়ে ওঠ

"কিসের তরে অশ্রু ঝরে, কিসের তরে দীর্ঘশ্বাস?
হাস্য মুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।"

অকাতরে, অনন্যমনে এই গ্রাম গঠন কার্য্যে শ্রমদান কর। কল্যাণময়ের করুণাধারা অজস্রধারে সারা বাংলার উপর নেমে আসবে—সূর্য্যোদয়ে কুঝটিকার মত কেটে যাবে বাৎসরিক দুর্ভাগ্য, ফুটে উঠবে দেবতার আশীর্ব্বাদ, আর গড়ে উঠবে আবার সেই হারাণো-দিনের সোনার বাংলা—সুখের বাংলা—শান্তির বাংলা।

ইটালীর কথা

গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইউরোপের অধিকাংশ দেশের মতোই ইটালীও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তার রাষ্ট্রিক কাঠামো পরিবর্তিত হয়ে যায়। ফলে রাজ-তন্ত্রকে সরিয়ে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ইটালি ইট্রাসকান ও রোমক সভ্যতার লীলাভূমি। প্রাচীন ও মধ্যযুগে তার সমৃদ্ধি ছিল অতুলনীয়। ফ্লোরেন্স, ভেনিস, রোম প্রভৃতি প্রাচীন নগরী ইতিহাসে সাহিত্যে অমর হয়ে আছে। যেমন সমগ্র দেশটির নৈসর্গিক শ্রী অনবদ্য তেমনি ঐ সকল নগরের প্রাচীন ও মধ্যযুগের শিল্পকলাও মহান। সেগুলি এখনও কতকাংশে অটুট এবং যেগুলি ধ্বংসের পথে সেগুলিকেও রক্ষার প্রভূত চেষ্টা হচ্ছে।

মহাযুদ্ধের পরে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে গঠনের মনোভাব জেগেছে—কোথাও বা পুনর্গঠন করা হচ্ছে, কোথাও বা সম্পূর্ণ নূতন গঠন হচ্ছে। আমাদের দেশেও তার ঢেউ এসেছে যদিও আমরা ছিলাম যুদ্ধ এলাকার বাইরে সীমান্তে। গঠনের উদ্দেশ্য দেশবাসীর অভাবমোচন। সেজন্য কৃষি-সম্পদের উন্নতি, পথ-ঘাট নির্মাণ, যান-বাহন গঠন কলকারখানা স্থাপন ইত্যাদি নানারকমের কর্মে দেশগুলি তৎপর হয়ে উঠেছে।

ইটালিও সেজন্য উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে
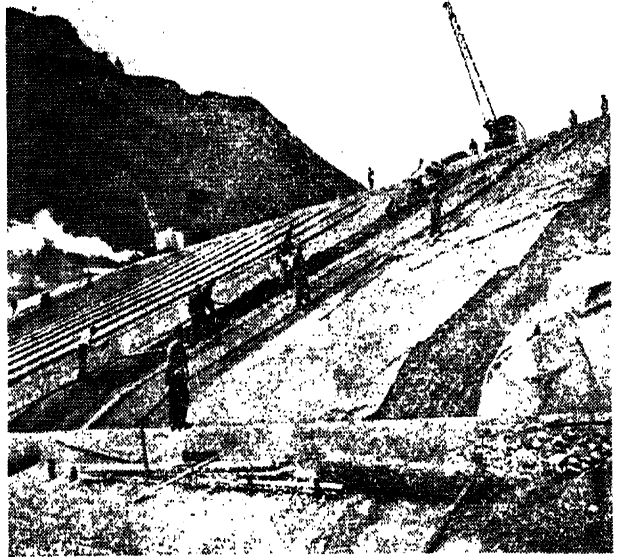
উত্তর ইটালির বেলুনো প্রদেশে জলবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ

উচ্চ পর্বতীয় প্রদেশ থেকে নিম্ন সমুদ্রতট পর্যন্ত সর্বত্র কর্মে তৎপর হয়ে উঠেছে। তার কর্মীরা দিন-রাত কর্মে নিযুক্ত।

ইউরোপে এক সময়ে এসেছিল বাষ্পযুগ। তখন জলীয় বাষ্পশক্তিকে কাজে লাগিয়ে জলে-স্থলে যানবাহন ও স্থলে কলকারখানা চালানো হ'ত। কিন্তু সে যুগ এখন অতীতের অন্ধকারে সরে যাচ্ছে। তার জায়গায় এসেছে তৈল-বাষ্প ও বিদ্যুৎ যুগ। এখন ও দুটিই পৃথিবীর সকল দেশে শক্তি জোগাচ্ছে। কিছুকাল পরে এই যুগও অতীতের বস্তু হয়ে আণবিক যুগের উজ্জ্বলতা ও বিস্ময়ের দিকে নীরবে তাকিয়ে থাকবে। ইতিমধ্যেই সে যুগের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে।
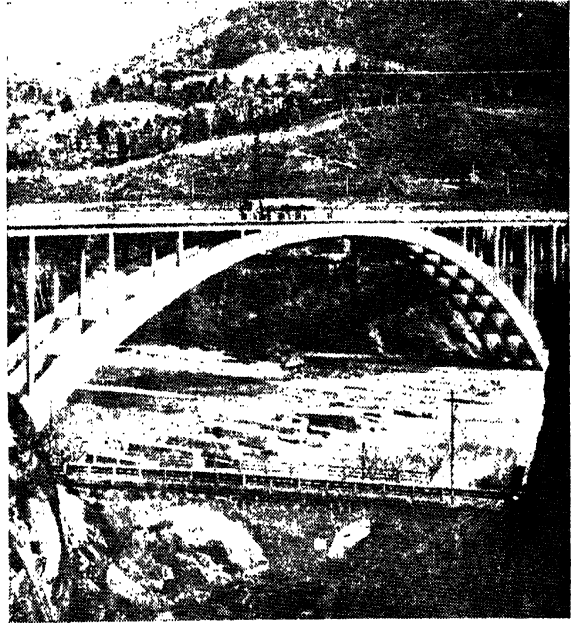
য়েনো নদীর উপর নূতন সেতু গ্যাসো মারকোনি
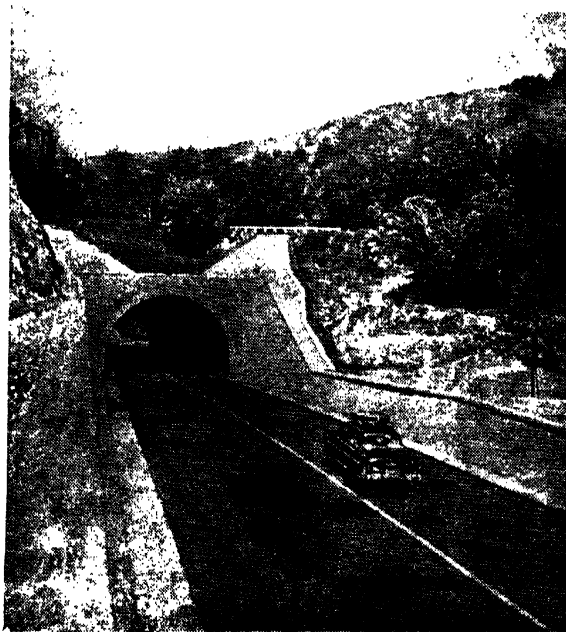
ইটালী বহু সুদীর্ঘ, সুন্দর রাজপথে সমাচ্ছন্ন। সেজন্য অধিকাংশ অঞ্চলই মোটরে সহজগম্য। এ কারণ সেখানে মোটর-শিল্পকে আরও উন্নত করা হচ্ছে। পর্বতীয় নদীর সংখ্যা অনেক হওয়ায় বাঁধ বেঁধে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সুবিধা আছে। সেজন্য অনেকগুলি বাঁধ বাঁধা হচ্ছে। আমাদের দেশে বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে শূন্যমার্গে রেলগাড়ি চালাবার ব্যবস্থা এখনও হয় নি। কিন্তু উত্তর ইটালীর পর্বতীয় প্রদেশে পর্বতশিখরে উঠে তুষার স্রোতের সৌন্দর্য উপভোগের ব্যবস্থা ঐভাবেই করা হয়েছে। তুষার-

টেরনি প্রদেশের গিরিবর্ত্মে নূতন সুড়ঙ্গ পথ

স্রোতের সৌন্দর্য উপভোগ করতে প্রতি বৎসর ইটালিতে হাজার হাজার বিদেশী পর্যটকের আবির্ভাব হয়। এর ফলে দেশের আয়ও বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। কাগজ নির্মাণোদ্দেশ্যে পরিকল্পনামত স্থানে স্থানে পপলার-শ্রেণী রোপণ এবং তার ফলে সুবিশাল বনভূমির সৃষ্টি করা হয়েছে। এই সকল বনের সৌন্দর্য

কাগজ-শিল্পের জন্য পপলার-অরণ্য
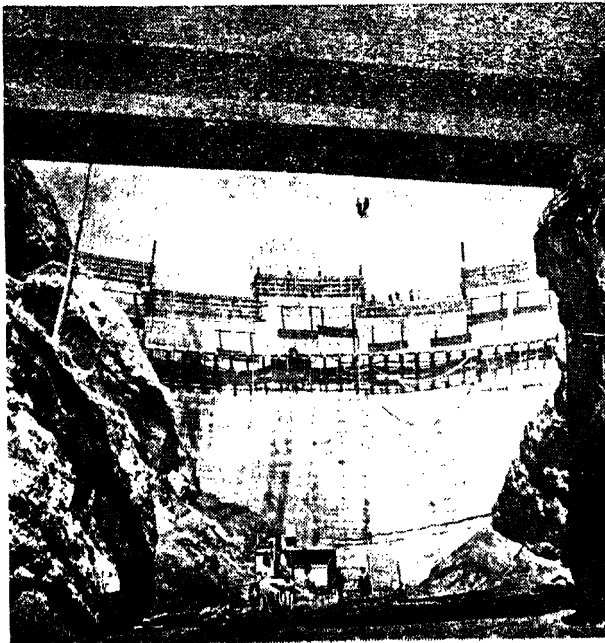
স্মরণে রাখবার মত। আমাদের দেশেও উত্তরের পর্বতীয়াঞ্চলে সুদীর্ঘ পপলার তরু দেখা যায়। পথের দু'ধারে শ্রেণী-বদ্ধভাবে রোপিত বৃক্ষগুলি অনুপম সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে পর্যটকগণকে প্রচুর আনন্দ দেয়। কিন্তু সেগুলি থেকে কাগজ তৈরির উপাদান সংগ্রহ করার তেমন আয়োজন আজও হয় নি।

টাপনিয়ামেনটো নদীর উপর জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র নির্মাণ

পুরনো সান রেমো নগরের একটি পথ

ইটালির সমুদ্রোপকূলেরও কতকগুলি অঞ্চল প্রকৃতি ও মানুষ এমনভাবে গঠন করেছে যে তা অনুপম সৌন্দর্যের আকর হয়ে উঠেছে। তেমন দৃশ্য বিরল। যে সকল পর্যটকের সেখানে যাবার সৌভাগ্য হয় তাঁদের কাছে সে দৃশ্য অবিস্মরণীয় হয়ে থাকে। আমাদের ভারতেও মালাবার অঞ্চলের দু-একটি স্থান সৌন্দর্যে অতুলনীয়। স্বদেশী-বিদেশী সকল পর্যটকেরই তা আনন্দের ক্ষেত্র।
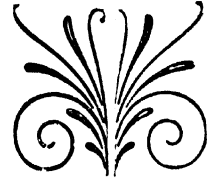
শিশুর প্রতি শিক্ষকের কর্তব্য

শ্রীচারুশীলা বোলার

শিশুশিক্ষার নব রূপায়ণ এবং শিশুর লালন-পালন ও শিক্ষা বিষয়ে পিতামাতার কর্তব্য সম্বন্ধে যথাক্রমে ১৩৬৩ ফাল্গুন ও ১৩৬৪ আশ্বিনের প্রবাসীতে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। আলোচনাগুলি ধারাবাহিক ভাবে পড়লে আমার উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হবে। শিক্ষাপ্রাপ্তির সময় পরিচালনার দায়িত্ব কেবল শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা আমাদের অধিকাংশ অভিভাবকের অভ্যাস হয়ে গেছে কিন্তু তার ফল যে ভাল হয় না তা কতকটা দেখিয়েছি। পিতামাতাকেও শিক্ষকের সঙ্গে পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে এবং একযোগে (in co-ordination) ও নিয়মানুবর্তী হয়ে (methodically) কাজ করতে হবে।

শিশুর শিক্ষাক্ষেত্রে আদর্শ গৃহপরিবেশের প্রভাব একান্ত প্রয়োজনীয় এবং গৃহ ও বিদ্যালয়ের পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা না থাকলে সু-শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়াও সম্ভব হয় না। বিশেষ করে পাঁচ বৎসর বয়সের পূর্বে শিশুর উপর গৃহের প্রভাব খুব বেশী পরিমাণ থাকে। বহুক্ষেত্রে দেখেছি যে, যে গৃহে পরিচ্ছন্নতার অভাব সেই গৃহের শিশুর শুধু পোষাক-পরিচ্ছদ নয়, হাত, পা, মুখ, মাথা সব নোংরা থাকে ; নানারকমের নোংরা অভ্যাসে সে অভ্যস্ত হয়—এমনকি তার আচার-ব্যবহারেও অপরিচ্ছন্নতা ফুটে ওঠে। দরিদ্র, অভাব-অনটনগ্রস্ত পরিবারের শিশুরা অনেক সময় বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিশুদের জিনিষ কিম্বা বিদ্যালয়ের ছোটখাটো জিনিষ লুকিয়ে নিয়ে যায়। যে শিশু পিতামাতার ভালবাসা বা আদর-যত্ন পায় না সে হয় বয়স্ক ব্যক্তির আশ্রয় খোঁজে অথবা একেবারে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যায়।

গৃহ ও বিদ্যালয় একই লক্ষ্যের সমান অংশীদার। শিক্ষা সম্বন্ধে পিতামাতার দৃষ্টিভঙ্গী অন্যান্য বয়স্ক ব্যক্তি থেকে ভিন্নরূপ হবে—এ বিষয়ে পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। ইংরেজীতে একটা কথা আছে, "It is the children who educate the parents." বিদ্যালয় যদিও শিশুর উপর প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করছে, পরোক্ষ ভাবে শিশুর পরিবারের উপর সেই প্রভাব বিস্তারিত হচ্ছে। আবার অন্যদিকে দেখা যায় শিশু যদি পিতামাতার কথায় প্রভাবিত হয়, পিতামাতাও শিশুর প্রভাবিত হয় কারণ সে বিদ্যালয়ের কাজ ও খেলা সম্বন্ধে পিতামাতার সঙ্গে গল্প করে আর বিদ্যালয়ে যে সব সদভ্যাসগুলি সে লাভ করেছে, বাড়ীতেও সেগুলিকে প্রয়োগ করতে ভালবাসে—গর্ববোধ করে। শিশুর পিতামাতা ও শিক্ষক শিশুর নৈতিক উন্নতি ও বুদ্ধিবিকাশের জন্যে যৌথ এবং সমভাবে দায়ী।

বর্তমান যুগে প্রায় সকল শিক্ষানবীশ এক কথায় স্বীকার করেছেন যে, শিশুকে কেন্দ্র করে তার শিক্ষা ব্যবস্থা করতে হবে এবং সেই শিক্ষা নির্ভর করবে শিশু-পর্য্যবেক্ষণের উপর। নানা কারণে শিশুকে পর্য্যবেক্ষণ করাও সহজ কাজ নয়—কারণ বংশানুগতি ও পরিবেশের প্রভাব শিশু-পর্য্যবেক্ষণকে জটিল করে তোলে। শিশুর খেলাগুলি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখা দরকার। নিপুণতা, দৃষ্টি, বুদ্ধি, বোধশক্তি ও আচরণ সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে তার কথাবার্তা ও প্রশ্ন মন দিয়ে শোনা দরকার। শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত, সামাজিক ও আনুভূতিক বিকাশের ভিতর দিয়েই শিশুর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনের পথ প্রশস্ত হয়। সুতরাং শিশু তার পরিবেশের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত যে, এই দুটিকে (শিশু এবং পরিবেশ) আলাদাভাবে কিছুতেই ভাবা যায় না।

শিশু-জীবন গঠনের চাহিদায় কতকগুলি মূল আবশ্যকের ভিতর নিরাপত্তাবোধের প্রয়োজন ছোট শিশুর অত্যন্ত বেশী। এ নিরাপত্তা বোধ না থাকলে সে কোনকিছুর অনুসন্ধান বা আবিষ্কার করতে সাহস পায় না, অনুভূতিগুলিকে প্রকাশ করতে পারে না অথবা অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে এগোতে চায় না। যেমন—তিন বৎসরের ছোট্ট বুবু বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর বহুদিন পর্যন্ত নূতন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে নি। প্রথমদিকে আসামাত্র বাড়ী ফেরার জন্যে কান্না সুরু করত। কিছুদিন পর কান্না যদিও থামলো অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে মিশতে সে তখনও পারে না। একা একা গাছের তলায় অথবা সিঁড়ির উপর বসে বসে অন্যদের খেলাধূলা দেখে। কারও ডাকে সাড়া দেয় না। শিক্ষয়িত্রীর কাছেও সে এগোতে চায় না। সর্বদাই ভীত-সঙ্কুচিত ভাব। বেশ কিছুদিন পর সে প্রথম একটা বল হাতে নেয়। অন্য সকলের দৃষ্টির আড়ালে বলটা একবার ফেলে আবার তোলে। সাথীরা কেউ ডাকলেই আবার বসে পড়ে।

দিনের পর দিন যায়। আবার বেশ কিছুদিন পর—২।৪ জন সমবয়সী সাথীদের সঙ্গে সে দু একটা কথা বলে। এই-ভাবে ক্রমে ক্রমে তার বিশ্বাস জন্মায় খেলার সাথীদের উপর ও শিক্ষয়িত্রীর উপর। এখন বুবু একটি স্বাভাবিক শিশুর মত সহজভাবে খেলাধূলা করে, সারাদিনের কাজের ভিতর তার সম্পূর্ণ নিরাপত্তাবোধ আছে। তাহলে দেখতে পাই, এই নিরাপত্তা শিশু উপলব্ধি করবে বিদ্যালয়ের অবাধ ও অনুকূল নিরাপদ পরিবেশের আশ্রয়ে।

শিশুর সারাদিনের কাজের ভিতর থাকবে শৃঙ্খলা, নিত্যকর্মের ব্যবস্থা ও কর্মছন্দ। অর্থাৎ শিশুর শিক্ষার জন্যে তার সারাদিনের কাজ ও খেলাধূলা সম্পর্কিত একটা প্ল্যান শিক্ষক তৈরি করে রাখবেন, একে অন্যের বাধা সৃষ্টি না করে শিশুরা আগ্রহ ও মনোযোগ সহকারে কাজ ও খেলা করে যাবে সেদিকে শিক্ষকের লক্ষ্য থাকবে, খেলা ও কাজের প্রতি থাকবে শিশুর ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দ, বিশেষ ধরন, নিয়মানুবর্তী হয়ে সে সব কিছু করে যাবে—এগুলির প্রতিও শিক্ষকের নজর রাখা বিশেষ প্রয়োজন। ব্যবস্থা অনুযায়ী আহার, বিশ্রাম ও যত্নের প্রয়োজন কেবল স্বাস্থ্যের জন্যে নয়, শিশুর অনুভূতির ও মানসিক পুষ্টি-সাধনের জন্যেও বটে।

'লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি' চাণক্যের এই বাক্য অনুযায়ী আমাদের দেশে চিরাচরিত প্রথা হচ্ছে পাঁচ বৎসর বয়সে শিশুর হাতে-খড়ি দেওয়া—অর্থাৎ শিশু তার গৃহের ক্ষুদ্র পরিবেশ ছেড়ে পাঠশালার বা বিদ্যালয়ের বৃহত্তর সমাজে প্রবেশ করে। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে ভালমন্দ অনেক ব্যাপারই শিশুর জীবনে ঘটে গেছে। যেমন দিলীপ (৫½) প্রথম বিদ্যালয়ে ভর্তি হতেই দেখা গেল সে অত্যন্ত ভীরু প্রকৃতির ছেলে; ডাকলে শুনেও সাড়া দেয় না—লেখা পড়া সম্বন্ধে আগ্রহ খুব কম—অন্যের হাত থেকে জিনিষ ছিনিয়ে নেওয়ার অভ্যাস আছে—যেখানে সেখানে থুথু ফেলে—বয়সে ছোট যারা তাদের মারধোর করে, আবার অন্যদিকে দিলীপের কয়েকটি গুণেরও পরিচয় পাওয়া গেছে—অন্যকে সাহায্য করার জন্যে সে সর্বদাই প্রস্তুত, কোনও কাজের দায়িত্ব পেলে তা রক্ষা করার চেষ্টা আছে, স্নেহশীল। সুতরাং বিদ্যালয়ে আসার পূর্বে যে ভিত একবার গাঁথা হয়ে গেছে তার উপরেই মাত্র নির্ভর করে তার বুদ্ধি বিবেচনার পরিমাপে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী তাঁদের কার্য্য পরিচালনা করতে পারেন। ভিত যদি পাকা না হয় তবে যতই দক্ষতার সঙ্গে হোক না কেন শিশুর জীবনে তার ফল স্থায়ী হয় না।

২—৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুর সাধারণ বৃদ্ধির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। অ-বিকল শিশুর এই স্বাভাবিক বৃদ্ধিই শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর পক্ষে পরিবেশ রচনা ও শিক্ষার ব্যবস্থার অনুকূল ক্ষেত্র, যার সঙ্গে শিশুর বৃদ্ধির চাহিদার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে।

শিশুবিদ্যালয় এমন একটি পরিবেশ যেখানে আছে—(১) প্রশস্ত অঙ্গন, যেখানে শিশু নড়ে চড়ে বেড়াবার এবং বেড়ে ওঠবার সুযোগ পায়, (২) মুক্ত বাতাস—যার মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে সে সুস্থ হয়ে বাঁচবে, (৩) পুষ্টিকর খাদ্য, (৪) ঘুমের ব্যবস্থা, (৫) সহৃদয় ব্যবহার, (৬) সৃষ্টির সুযোগ, (৭) পোষা জন্তুর প্রতি আদর-যত্ন করার স্বাধীনতা, (৮) সমবয়সী খেলবার সাথী এবং (৯) পাশে আছেন নির্ভরযোগ্য সহানুভূতিশীল বয়স্ক ব্যক্তি—যিনি তাকে বুঝতে পেরেছেন এবং তার শিক্ষার ব্যবস্থা কিভাবে করতে হবে তা তিনি জানেন। অর্থাৎ একটি আদর্শ গৃহের যা কিছু সুব্যবস্থা তার সমস্তই আছে এই রকম একটি পরিবেশ। মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই বিদ্যালয় গৃহের বিকল্প নয়, তবে গৃহেরই একটি প্রসারিত অংশ। এটি এমন একটি স্থান যে, এখানে শিশু স্বতঃই তার আকাঙ্ক্ষার উন্নতিসাধনে রত হয়। নিজের মনোভাব ও আবেগানুভূতি নিঃশঙ্কচিত্তে প্রকাশ করতে পারে এবং সমস্যা সমাধানের সুযোগ পায়।

শিশুবিদ্যালয়ের পরিবেশ রচনাকালে শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়। ছোট ছোট অভ্যাস, যথা, রোজ দাঁত মাজা, খাওয়ার আগে হাত ধোয়া ইত্যাদি থেকে অপেক্ষাকৃত গুরুতর অভ্যাস যথা, নিয়মিত ভাবে মলমূত্র ত্যাগ ইত্যাদি সমস্তই স্বাস্থ্য রক্ষার সহায়ক। এর ভিতরেও একটি শিক্ষাপূর্ণ তাৎপর্য আছে। কারণ এই সকল অভ্যাস শিশুর চরিত্রগঠনে সাহায্য করে। এই বিদ্যালয়ের আর একটি মূল নীতি এই যে, শিশুর কাজে কেউ হস্তক্ষেপ করে না। নূতন পরিবেশে খাপ খাওয়াবার জন্যে তাকে যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়—দেওয়া হয় চিন্তা করতে, স্বপ্ন দেখতে, খেলতে ও নিরঙ্কুশ আনন্দে বৃদ্ধি পেতে। আত্মপ্রত্যয় এবং সাহস অর্জন করতেও স্বাধীনতার প্রয়োজন। শিশু জীবনের দৈনিক প্রয়োজন মেটাবার জন্যেই এই বিশেষ পরিবেশ রচনা করা হয়।

২—৫ বৎসর বয়সের শিশুদের শিক্ষার ভার গ্রহণে সাধারণতঃ মেয়েরাই বেশী উপযুক্ত। কারণ বাড়ীতে 'মাকে' ছেড়ে এসে বিদ্যালয়ের পরিবেশে মাতৃরূপিণী কারও আশ্রয়ে শিশু নিরাপত্তা বোধ করে অনেক বেশী। গ্রেটব্রিটেনে দেখেছি যে, প্রায় সকল নার্সারী স্কুল পরিচালনার ভার শিক্ষিকাদের উপরই দেওয়া হয়েছে। এ ব্যবস্থা যদিও কোনও আইনের অন্তর্ভুক্ত নয় তবে জনসাধারণের বিশ্বাস ২—৫ বৎসর বয়সের শিশুদের শিক্ষা পরিচালনা শিক্ষিকারাই

করতে পারেন অনেক বেশী সুষ্ঠুভাবে। তবে শিক্ষার এই গুরুদায়িত্ব নেবার জন্যে শিক্ষিকাকে বিশেষভাবে ট্রেনিং নিতে হয়।

আদর্শ শিক্ষিকা হতে হলে শিশুর প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ, কর্মে আনন্দপূর্ণ রুচি ও নিষ্ঠা, সহানুভূতিপূর্ণ বিচারশক্তি, ধৈর্য্যশীলতা ও আন্তরিকতা থাকা প্রয়োজন। ট্রেনিং কলেজে শিক্ষা গ্রহণের সময় পরীক্ষামূলক বিদ্যালয়ে যখন কলেজের ছাত্রছাত্রীরা পাঠদান অভ্যাস করেন, বহু ছাত্রছাত্রী শিশু সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং তাদের সমস্যাগুলি জানবার আগ্রহও দেখা যায় যথেষ্ট, কিন্তু শিক্ষকতার কাজ সুরু করবার পরই তাদের আর সে আগ্রহ উদ্যম থাকে না। কারণ—(১) পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাবার মোহই আসলে এতদিন তাঁদের প্রেরণা যুগিয়েছে অথবা (২) আদর্শ শিক্ষক-শিক্ষিকা হবার মত উপরোক্ত স্বাভাবিক গুণগুলি তাঁদের মধ্যে ছিল না, অথবা (৩) বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি প্রয়োগ করার সুযোগ হয়ত তাঁরা বিদ্যালয়গুলিতে পান নি। ফলে, তাঁরা কেবল কঠোর নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে নিজেদের শক্তি প্রয়োগ করে একপ্রকার প্রভুত্বের আনন্দ পান কিম্বা কাজটিকে একঘেয়ে মনে করেন—কোনও আনন্দ বা আগ্রহ থাকে না-তিক্তবিরক্ত হয়ে কোনও রকমে দৈনেটুনে কাজ চালিয়ে যান। কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেখা যায় বিশেষ কোন শিশুর প্রতি অতিরিক্ত মাতৃত্ব জাগার ফলে তাঁরা প্রশ্রয়প্রবণ ও মোহান্ধ হয়ে পড়েন—ফলে পক্ষপাতিত্ব ও অন্য শিশুর প্রতি অবিচার এসে পড়ে। একজন অদক্ষ (in efficie it) কিম্বা অসন্তুষ্ট (dis satisfied) শিক্ষিকা শিশুদের পক্ষে শত্রুস্বরূপ। শিক্ষাক্ষেত্রে নামবার আগে প্রত্যেক শিক্ষণ-শিক্ষানবীশ ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাদান-রূপ পেশার (teaching profession) মধ্যে যে দায়িত্ব সেটা ভালভাবে বুঝে দেখা উচিত এবং এই গুরুদায়িত্ব বহন করবার ক্ষমতা না থাকলে কোনমতেই শিক্ষার কাজ নেওয়া তার উচিত নয়।

আদর্শ শিক্ষিকার গুণাবলী সম্বন্ধে যে একটি নির্দিষ্ট ধারণা আমাদের সকলেরই মনে মনে আছে—সে গুণাবলীর উল্লেখ পূর্ব্বেই করেছি। প্রশ্নে প্রশ্নে শিশু তাঁকে উদ্ব্যস্ত করে তুলবে। কারণ নূতন জগতে চোখ মেলে তার প্রত্যেক বস্তু ও ব্যাপার সম্পর্কে বিস্ময়ের অবধি নেই। সেজন্যে তাঁর অসীম স্নেহ ও ধৈর্য্য এবং পারিপার্শ্বিক ও নানা বিষয় সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানার্জনের বিশেষ আবশ্যক আছে। সেই উদ্দেশ্যে শিক্ষাবিষয়ক কাজ ছাড়াও নানাদিক থেকে জ্ঞান উপার্জনের আগ্রহ তাঁর থাকা উচিত। তা ছাড়া বিদ্যালয়ের বাস স্থানটিকে আপন গৃহ মনে করে তিনি বাস করবেন, এবং বন্ধুবান্ধবের এমন একটি সমাজ থাকবে যেখানে পারস্পরিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বা সমস্যার আদান প্রদান চলবে।

শিশুর শারীরিক, বৌদ্ধিক ও অনুভূতিঘটিত নানা অভিব্যক্তিও তার অন্তর্নিহিত শিশুমনস্তত্ত্বঘটিত তাৎপর্য প্রত্যেক শিক্ষিকাকে বিশদভাবে জানতে হবে। অনুভূতিক-বিকাশ হচ্ছে শিশুর অনুভূতির ক্রমবিকাশ, শারীরিক-বিকাশ—শরীর সম্পর্কীয় ক্রমবৃদ্ধি বৌদ্ধিক-বিকাশ—চিন্তা-শক্তির ক্রমবৃদ্ধি এবং সামাজিক গুণের বিকাশ মানে সমাজে মিশতে শেখা, পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা বজায় রাখা, অন্যকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করবার ক্ষমতা ইত্যাদি যার ভিতর অনুভূতি চাই, অনুভূতি প্রকাশ করবার ক্ষমতা চাই এবং অনুভূতি সংযত করার ক্ষমতাও চাই। শিশুকে ভালভাবে বুঝতে হলে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীকে বিজ্ঞানসম্মত তথ্যগুলি জেনে নিয়ে সেই মত চলতে হবে। শিশুর চলাফেরা আচার-ব্যবহার, বুদ্ধির ক্রম অনুযায়ী গুণ ও বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যবেক্ষণের সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে তার বিচার করতে হবে। এইজন্যেই সু-শিক্ষিকা হতে হলে শিশুশিক্ষার বিশেষ বিজ্ঞানসম্মত ট্রেনিং-এর প্রয়োজন।

প্রত্যেক শিক্ষিকার প্রথম এবং প্রধান কাজ শিশুর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ভয়, স্নেহ ভালবাসা ও ঘৃণা, আনন্দ ও নৈরাশ্য এইগুলির প্রতি বিশেষ 'খেয়াল' দেওয়া। শিশুকে একক ও দলগতভাবে এবং বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। শিশুর ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, পছন্দ, অপছন্দ, প্রয়োজন, অপ্রয়োজন সবকিছু পর্যবেক্ষণ করে তার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। অনুভূতিঘটিত যা কিছু সমপর্যায়ে যদি চালিত না হয় তবে শারীরিক এবং বৌদ্ধিক-বিকাশের সব কিছুই বাধাপ্রাপ্ত হবে।

শিশুর মানসিক অসুস্থতা সম্পর্কে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর তীক্ষ্ণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অমল পিছনের বেঞ্চিতে বসেই আছে, কিছুতেই অঙ্ক কষতে পারছে না; তপন অত্যন্ত ডানপিটে, দলের নেতা, ক্লাশ তোলপাড় করে, লেখা লিখতে অনেক সময় নেয়, বাড়ীতে কাজ দিলে ভীষণ ভয় পায়, কল্পনার মুখ সবদাই গোমরা, কারও কথা সহ্য করতে পারে না; মাধুরীর কথায় কথায় অভিমান; কৃষ্ণা অনবরত শিক্ষয়িত্রীর সাহায্য আশা করে ইত্যাদি। কেন? কারণ এই সব ক্ষেত্রে শিশুর দেহ, মন, বুদ্ধি অনুভূতি প্রভৃতি ক্রমবিকাশগুলি সুসমঞ্জস্যভাবে গঠিত হয় নি। সুতরাং যিনি আদর্শ শিক্ষক অথবা শিক্ষিকা তিনি প্রথমেই শিশুর এইরকম সমস্যার কারণ খুঁজে বার করবেন। যে শিশুর এই রকম ব্যবহার সে কখনই সুখী নয়। কত অল্প সময়ে কতখানি বিদ্যা গিলিয়ে দিতে পারা যায় এ ভাবনার চেয়েও

শিক্ষাকালে শিশু কত আনন্দে সেই শিক্ষা গ্রহণ করছে তার খোঁজ নেওয়ার অনেক বেশী প্রয়োজন। আরও জানতে হবে শিশুর শরীর সম্পর্কে, মেজাজ সম্পর্কে, এবং স্বাভাবিক-প্রবণতা (Instinctive drive) সম্পর্কে। এইসবগুলিই শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশকে প্রভাবিত করে এবং এগুলি বিভিন্ন শিশুর মধ্যে বিভিন্ন পরিমাপে (degreeতে) দেখা যায়।

শিশুকে জানতে হলে শিশুর গৃহ, পিতামাতা ও অভিভাবকের সঙ্গে পরিচয় থাকা একান্ত প্রয়োজন। শৈশব অবস্থায় সে কি ভাবে লালিত পালিত হয়েছে এ তথ্যও খুঁজে বার করতে হবে। এই কারণে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ও পিতামাতার সম্পর্ক ঘটবে ঘনিষ্ঠভাবে। ওদেশে দেখেছি শিশুবিদ্যালয়গুলিতে এই সম্পর্ক অত্যন্ত সহজ উপায়ে অবলম্বিত হয়। মায়েরা শিশুকে বিদ্যালয়ে নিয়ে আসেন, শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা হয়, পরে সভা-সমিতিরও ব্যবস্থা করা হয়। ছোট শহরে শিক্ষিকা ও পিতামাতার সৌহার্দ্য স্থাপন হয় খুব সহজে ও তাড়াতাড়ি। কিন্তু বড় শহরে এতটা সহজ নয়, অন্যরকম ব্যাপার, সুতরাং প্রধানা-শিক্ষয়িত্রী সরকারী (official) ভাবে পিতামাতা ও শিক্ষয়িত্রীগণের সম্পর্ক ঘটাবার ব্যবস্থা করেন। এ কথাও জানানো হয় যে, তিন মাস পর শিক্ষয়িত্রীগণ গৃহ-পরিদর্শনে গিয়ে শিশুর বিকাশ সম্পর্কে পিতামাতার সঙ্গে আলোচনা করবেন।

এই রকম দুই পক্ষের মেলামেশার ক্ষেত্রে শিক্ষয়িত্রীর কাজ হ'ল জোর দিয়ে কিছু না বলে প্রস্তাব (suggest) করা। কথাবার্তার ভিতর দিয়ে হয়ত দেখা যাবে শিক্ষয়িত্রীর ও পিতামাতার একই সমস্যা। চার বৎসরের দীপালি বিদ্যালয়ে তার জিদ্ ও অসহযোগিতার জন্যে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে কথা জানানো মাত্র তার মা বলেছিলেন 'বাড়ীতেও ও খুব চ্যাঁটা, রাগে গড়াগড়ি দেয় এবং এর জন্যে খুব মারও খায়।' এই সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ পিতামাতার ত্রুটি সম্বন্ধে স্বীকৃতি। শিক্ষয়িত্রী কখনই শিশুকে পরিচালনা করার ঠিক পথে অগ্রসর করতে পারবেন না, যতক্ষণ না পিতামাতা নিজেদের ত্রুটি প্রয়োজন মত স্বীকার করতে পারবেন। এই সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্যে কতকগুলি উপায়ের মধ্যে একটি উপায়—পিতামাতা ও শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের মিলনী-সভার (parents' day) ব্যবস্থা করা।

বিদ্যালয়ে অথবা গৃহে যে সমস্যাগুলি দেখা দেয়, পিতামাতার সঙ্গে একত্রে সেসব আলোচনা করলে সমাধানের উপায় সহজ হয়। এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় ও শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী সম্পর্কে পিতামাতার আস্থা অর্জন করা একটা বড় প্রয়োজন। বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি শিশুশিক্ষার উপর কিভাবে আরোপ করা হয় তার রীতিগুলি বুঝিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। কারণ প্রত্যেক পিতামাতা নিজ সন্তানের দক্ষতা অর্জন সম্বন্ধে অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। অথচ শিশু আত্মনির্ভরশীল হয়ে, নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী বাস্তবের সম্মুখীন হতে যখন প্রয়াস পায় শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী তখন সহায়তার কাজে এগিয়ে যান। এইখানেই শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ও পিতামাতার মধ্যে বিরোধিতা! এই বিরোধিতা দূর করতে হবে—পিতামাতার দৃষ্টিভঙ্গী বদলাতে হবে। আমাদের দেশে বহু পিতামাতা শিক্ষা সম্বন্ধে অজ্ঞ, সুতরাং শুধু পিতামাতা-সম্মিলনীর ভিতর দিয়েই তাঁদের জ্ঞান দানের ব্যবস্থা হবে না—অন্যান্য উপায়ও অবলম্বন করতে হবে। শিশুদের সঙ্গে নিয়ে মায়েদের সঙ্গে বনভোজন, শিক্ষামূলক ভ্রমণ (excursion), ছায়াচিত্রের ব্যবস্থা অথবা (visual aids), বিদ্যালয়ে প্রত্যক্ষভাবে শিশুদের কাজ দেখা। এ ছাড়াও শিক্ষিকার প্রধান কাজ হ'ল গৃহ পরিদর্শন। শৈশব অবস্থায় শিশু কি ভাবে লালিত-পালিত হয়েছে, তার প্রক্ষোভময় জীবনের ঘটনা, অসুখ-বিসুখ হয়েছিল কিনা, এইরকম নানা বিষয় পিতামাতার সঙ্গে আলোচনা করে তথ্যসংগ্রহ করা। কর্মক্ষেত্রে গ্রামের অশিক্ষিত বহু মায়ের কথাবার্তার ভিতর দিয়ে জেনেছি শিশুর ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে কিছু না বুঝলেও বিদ্যালয়ে যে শিশুর যত্ন নেওয়া হয় এবিষয়ে তাঁদের দৃঢ় ধারণা।

যে সুবিধা বড় শহরে নাই সে সুবিধা গ্রামে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। শিশুর গৃহ ও বিদ্যালয়, পিতামাতা ও শিক্ষয়িত্রী একযোগে শিশুর শিক্ষাক্ষেত্রে নেমে আসতে পারেন। বাংলা দেশে জনসংখ্যার বেশীর ভাগই কৃষিজীবী, গ্রামে বাস করে। সুতরাং গ্রাম্য-পরিবেশেও শিশুবিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজন অনেক বেশী। ইংলণ্ডে গত তিন-চার বৎসর থেকে কয়েকটি গ্রামে দুই পাঁচ বৎসরের শিশুর জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে—সফলতাও লাভ করছে বলে মনে হ'ল। আমাদের দেশে চাহিদা (needs) গ্রামগুলিতেই বেশী—যেখানে শিক্ষার আলোক বয়স্কদের মধ্যেও এখনও সামান্যই প্রবেশ করেছে।

আমাদের দেশের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর বেতন এত কম যে, তাদের সমাজে স্থানও অত্যন্ত নীচুতে। 'মাষ্টারণী!' তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই এই শব্দটি বেশীর ভাগ লোকে ব্যবহার করে থাকেন। বিদ্যালয়গুলিতে যেসব শিক্ষয়িত্রীর যত কম বিদ্যা তাদের তত ছোট শিশুদের শিক্ষার ভার দেওয়া হয়। ফলে সব নিষ্ফল। পুরাতনপন্থীদের রীতি-নীতি

ত্যাগ করে ছোট শিশুর শিক্ষার দায়িত্ব দিতে হবে শিশুর প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধাশীল বুদ্ধিসম্পন্ন জ্ঞানী শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর উপর। শিক্ষকের কার্যক্রম এমন প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ এবং আকর্ষণীয় হওয়া চাই যাতে জনসাধারণের মনে শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে শ্রদ্ধা এবং আস্থা জন্মে। ফলে অন্যদিকে শিক্ষক সম্প্রদায় সম্প্রতি সমাজে যে শ্রদ্ধার আসন হারিয়েছেন—সেই উচ্চাসন নিজেদের গুণেই সহজে জয় করে নিতে পারবেন, তার জন্যে তাঁদের চিত্তদাহকারী আন্দোলনের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে না। যেহেতু একথা স্বতঃসিদ্ধ যে 'বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে।'

বিদ্যানিধি-স্মরণে

শ্রীসুখময় সরকার

ইহজগতে ক্ষণমাত্র সজ্জন-সঙ্গতি যে ভবার্ণব-তরণের তরণী-স্বরূপ, মোহমুদ্গরের এই বচনে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি নাই। মহৎ ব্যক্তির সঙ্গলাভে হৃদয়ের কলুষ-কালিমা বিদূরিত হয়, তাঁহার বিমল-চরিত্রের বিভায় অন্তর উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। মহতের সঙ্গ যখন প্রত্যক্ষ ভাবে লাভ করা যায়, কেবল তখনই যে তাহা হৃদয়কে পবিত্র করে তাহা নহে; ইহার প্রভাব সুদূর-প্রসারী। দীর্ঘকাল পরেও যখন সেই মহৎ প্রসঙ্গ স্মৃতিপথে উদিত হয়, তখন মন আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হয়। এই আনন্দেই মুক্তি। যিনি এই আনন্দ আস্বাদন করেন, তাঁহার জীবন্মুক্তি ঘটে। এই অনুভূতি যাঁহার হয় নাই, তাঁহাকে বুঝানো শক্ত। লেখকের ভাগ্যে দীর্ঘ আট বৎসর ধরিয়া এক মহামনীষীর সঙ্গলাভের সুযোগ ঘটিয়াছিল। ইনি স্বর্গত আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, বিজ্ঞানভূষণ, এম্‌-এ, এফ-আর-এ-এস, এফ-আর-এম-এস, ডি-লিট। এই মহাপ্রাজ্ঞের জন্ম হয় ১২৬৬ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে; এ বৎসর ৪ঠা কার্তিক তাঁহার নবনবতিতম জন্মদিবস। এই উপলক্ষ্যে তাঁহার স্মৃতিকথার মাল্য রচনা করিয়া তাঁহারই চরণে অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছি। সেই জ্ঞানতপস্বীর জ্ঞানের সীমা নির্ণয় করিতে পারি এমন সাধ্য আমার নাই; তাঁহার সাধনার ক্ষেত্র এত বিস্তৃত যে, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে ধারণা করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু গোষ্পদে চন্দ্র যেমন প্রতিবিম্বিত হন, ভক্তহৃদয়ে ভগবান যেমন অধিষ্ঠিত হন, অনুরাগীর উন্মুখ চিত্তে বিরাট ব্যক্তিত্বের স্বরূপও সেইরূপ কথঞ্চিৎ উপলব্ধ হইয়া থাকে।

বাল্যকালে 'প্রবাসী'তে বিদ্যানিধি মহাশয়ের রচনা পাঠ করিতাম। তাঁহার আলোচ্য বিষয় সর্বদাই এত গভীর ও জটিল ছিল যে,তখন সে সব রচনা পাঠ করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। কিন্তু দুইটি বিষয়ের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইত। একটি তাঁহার রচনা-শৈলী (style), আর একটি তাঁহার অক্ষর। ডক্টর সুকুমার সেন ইঁহাকে "বঙ্কিমীরীতির শেষ শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক" বলিয়াছেন। আচার্য যোগেশচন্দ্রের এই বিশেষণটি আংশিক ভাবে সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। শব্দবিন্যাসে কিয়দংশে বঙ্কিমীরীতির অনুসরণ থাকিলেও যোগেশচন্দ্রের রচনায় আর একটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, যাহা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় পাওয়া যায় না। ইহা রচনার গাঢ়বন্ধতা। একটা অতি স্বল্প-পরিসর সরল বাক্যে যোগেশচন্দ্র একটা বিশাল ভাবকে বাঁধিয়া দিতে পারিতেন। এ বিষয়ে বরং রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার সাদৃশ্য দেখা যায়। পাঠক রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ', 'কালান্তর' ইত্যাদি গ্রন্থের রচনা-রীতির সহিত যোগেশচন্দ্রের 'রাণী বিশ্বেশ্বরী', 'কোন পথে?' ইত্যাদি গ্রন্থের রচনাশৈলী মিলাইয়া দেখিতে পারেন।

বিদ্যানিধি মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ের পর তিনি বলিতেন, "আধুনিক লেখকদের ভাষা ফাঁপা। যে-কথা একটি কি দুটি বাক্যে বলা যেতে পারে, সেই কথাটি বলবার জন্য তাঁদের একটি বড় প্যারাগ্রাফ লাগে। এটা যে তাঁদের অক্ষমতা, তা নয়। তাঁরা মনে করেন, সংক্ষেপে লিখলে তাঁদের বক্তব্য পাঠকেরা বুঝতে পারবে না। কিন্তু পাঠকের বোধশক্তির উপর এই ধরনের অবিচার এক রকমের অহঙ্কার ছাড়া কিছু নয়।" পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রকাশিত 'কথাবার্তা' ও 'স্বাস্থ্যশ্রী'র ভাষা শুনিয়া তিনি বিরক্ত হইতেন। তথাকথিত চলিত ভাষায় লিখিত ইতিহাস, ভূগোল ও বিজ্ঞানের বই পাঠ করিয়া তিনি ততোধিক বিরক্ত হইতেন। ইংরেজী ফ্রেজের (phrase) আক্ষরিক অনুবাদ করিয়া বাংলা ভাষাকে

যাঁহারা অপাঠ্য করিয়া তোলেন এবং মনে করেন যে, বাংলা-ভাষায় একটা নূতন 'স্টাইল' আমদানি করা হইতেছে, তাঁহাদের উপর তিনি হাড়ে হাড়ে চটিতেন। আচার্য যোগেশচন্দ্রের রচনা খাঁটি বাংলা। বাংলাভাষার একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা পরিত্যাগ করিলে বাংলা আর বাংলা থাকে না। এ সম্বন্ধে বিদ্যানিধি মহাশয়ের সুচিন্তিত মন্তব্য তৎপ্রণীত "কি লিখি ?" গ্রন্থের 'ইংরেজীর বাংলা', 'বাংলা ভাষার প্রসার চিন্তা' ইত্যাদি প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

যাঁহারা সাধুভাষাকে কৃত্রিমতার অপবাদ দিয়া 'চলিত' ভাষায় গ্রন্থরচনার প্রয়াসী, 'কি লিখি ?' গ্রন্থে আচার্য যোগেশচন্দ্র তাঁহাদের যুক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য লিখিয়াছেন, "কৃত্রিমতা বর্জন করিয়া বৃহৎ সংসারের অন্তর্গত থাকা অসম্ভব। অপর সহস্র ব্যাপারে অন্যের মন যোগাইয়া চলিতে হয়; কথাবার্তায়, বসন-ভূষণে আমাদের স্বাধীনতা নাই, ভাষাতেও নাই। পাঠক যে ভাষা সহজে বুঝিবেন লেখককে সে ভাষায় লিখিতে হইবে,......যদি না করেন, লেখকের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। যখন দেশ ও পাত্র-ভেদে মৌখিক ভাষার ভেদ আছে, তখন কোন্ দেশের কোন্ পাত্রের ভাষা আদর্শ ধরা যাইবে ? বাদী বলিয়াছেন, কলিকাতার মৌখিক ভাষা সে আদর্শ। কথাটা ঠিক নয়। কলিকাতার ভাষা বলিয়া একটা ভাষা নাই। কলিকাতা নানা স্থানের নানা বাঙ্গালীর মিলনক্ষেত্র বটে, কিন্তু মন দিয়া শুনিলে বুঝি সকলের পক্ষে বাহিরের ভাষা ও ভিতরের ভাষা এক নয়।......কাহারও পক্ষে সেটা কৃত্রিম, কাহারও পক্ষে অকৃত্রিম।"

আচার্যদেবের সহিত পরিচয়ের পূর্বে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত তাঁহার প্রবন্ধে কয়েকটি অক্ষরের বৈশিষ্ট্য দেখিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিলাম। পরে যখন তাঁহার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য হইল এবং আমাকে তাঁহার অনুলিখন-কর্মের ভার লইতে হইল, তখন অক্ষর সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য বুঝিতে পারিলাম। বাংলা সংযুক্ত-স্বরাক্ষর ও যুক্ত-ব্যঞ্জনাক্ষরে সর্বত্র সামঞ্জস্য নাই। এই সামঞ্জস্য-হীনতার জন্য শিশুকে যুক্তাক্ষর শিখিতে অযথা বহু শ্রম ও বহু কালক্ষেপ করিতে হয়। কেবল তাহাই নহে, ইহাতে অবাঙালীর পক্ষে বাংলা শিক্ষার পথ কণ্টকাকীর্ণ হইয়া পড়ে। তাই আচার্য যোগেশচন্দ্র চাহিয়াছিলেন, (১) সংযুক্ত স্বরাক্ষরের আকার সর্বত্র সমান থাকিবে; অর্থাৎ যেমন কু চু পু লেখা হয়, সেইরূপ গু রু শু হু লিখিতে হইবে। ক্+উ–কু, কিন্তু র্+উ=রু না হইয়া রু কেন ? হ+ঋ=হৃ হওয়া উচিত, হৃ নয়। (২) যুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষর স্পষ্ট দেখাইতে হইবে। এমনকি পূর্ববর্তী অক্ষরে হসন্ত দিয়াও যুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষর লিখিতে পারা যায়। ঙ্+গ=ঙ্গ। কোন্ যুক্তিতে ? ঞ্+চ=ঞ্চ, কিরূপে হয় ? ক্+ত=ক্ত, লিখিবার হেতু কি ? এই প্রশ্ন শিশুর মনে উদিত হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তর নাই। বয়ঃপ্রাপ্ত অবাঙালী বাংলা-শিক্ষার্থীর মুখেও এই প্রশ্ন শোনা যায়। বাংলাভাষার প্রসারের জন্য বাংলা লিপির সংস্কার অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। (৩) রেফ-যুক্ত দ্বিত্ব-ব্যঞ্জনের ব্যবহার সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, ইহা পরিহর্তব্য। বর্ত্তমান, বর্দ্ধমান, পর্ব্বত, আচার্য্য ইত্যাদির স্থলে বর্তমান, বর্ধমান, পর্বত, আচার্য লেখাই বাঞ্ছনীয়। ইহা অশুদ্ধ নয়, অথচ একটা অতিরিক্ত অক্ষর লেখার সময় ও শ্রম বাঁচিয়া যায় এবং যুক্তাক্ষর লিখিতে গিয়া অক্ষর বিকৃত করিতে হয় না।

আচার্যদেব বলিতেন, "আমি যে বাংলা অক্ষর-সংস্কার করতে চেয়েছিলাম, প্রথম প্রথম লোকে সেটা গ্রহণ করতে পারে নি। সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ লিখে পাঠাতাম, তার সঙ্গে ডিরেকশন থাকত, যেন আমার প্রবন্ধের অক্ষর পরিবর্তন করা না হয়। ফলে, আমার প্রবন্ধ ছাপা হ'ত না, ফেরত আসত। এর দুটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ, পত্রিকা-সম্পাদক আমার নীতি বুঝতে পারতেন না, দ্বিতীয়তঃ, প্রেসে আমার প্রস্তাবিত অক্ষরের 'টাইপে'র অভাব ছিল। আমি নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছিলাম। এমন অবস্থা থেকে আমায় রক্ষা করলেন আমার বন্ধু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। তিনি আমার অক্ষর-সংস্কার-নীতিতে আস্থাবান্ ছিলেন। আমার প্রস্তাবিত অক্ষরের জন্য নূতন টাইপ তৈরী করিয়ে তিনি আমার প্রবন্ধগুলো 'প্রবাসী'তে ছাপতে লাগলেন। 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধে নূতন অক্ষর দেখে একদল আমার যুক্তি সমর্থন করলে, আর একদল বিরোধিতা করতে লাগল। আনন্দবাজারের সুরেশবাবু আমার পন্থা গ্রহণ করে বাংলা লাইনো টাইপে পত্রিকা ছাপতে লাগলেন। আর একজন সমালোচক "যোগেশ বানান" প্রবন্ধ লিখে আমায় বিদ্রূপ-বাণ হেনেছিলেন। তিনি বুঝতে পারেন নি যে আমি বানান পরিবর্তন করতে চাই নি, আমি চেয়েছিলাম অক্ষর সংস্কার করতে।"

আচার্য যোগেশচন্দ্র প্রবর্তিত অক্ষর সংস্কারের মূলনীতি এখন যে প্রায় সকল প্রেসেই ব্যাপক ভাবে গৃহীত হইতেছে, তাহা সকলেই লক্ষ্য করিতেছেন। কিন্তু শিশু-শিক্ষায় ইহা তেমন ব্যাপক ভাবে গৃহীত হয় নাই। যাহাতে শিশু-শিক্ষাতেও অগৌণে এই নীতি গৃহীত হয়, তদ্‌বিষয়ে শিক্ষা-বিভাগের অবহিত ও সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি। কেবল বাল-পাঠ্য পুস্তক এই অক্ষরে লিখিলেই

চলিবে না ; এই অক্ষর শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষকগণকেও নির্দেশ দিতে হইবে।

বিদ্যানিধি মহাশয়ের সাধনার পথ অতি বিচিত্র ও বিস্ময়কর ছিল। কটকে রেভেনশ' কলেজে তিনি যখন বিজ্ঞানের অধ্যাপক, তখন তিনি বাংলা ব্যাকরণ ও বাংলা শব্দকোষ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার শব্দকোষ খাঁটি বাংলা ভাষার প্রথম অভিধান, এবং তাঁহার ব্যাকরণ খাঁটি বাংলা ব্যাকরণ। পরবর্তী কালে যাঁহারা বাংলা ব্যাকরণ ও শব্দকোষ রচনা করিয়াছেন তাঁহারা প্রায় সকলেই বিদ্যানিধি মহাশয়ের নিকট ঋণী এবং সে ঋণ তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ এই দুই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এখন এগুলি অপ্রাপ্য হইয়াছে। সাহিত্য-পরিষদ পুনরায় এগুলি প্রকাশের ভার লইলে দেশবাসিগণের, বিশেষতঃ বঙ্গভাষানুরাগিগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন, সন্দেহ নাই। সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে যদি এখন সে ভার দুর্বহ হয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার অক্লেশে তাহা বহন করিতে পারেন। শব্দকোষের প্রথম সংস্করণে যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল, আট-দশ বৎসর ধরিয়া আমাদের সাহায্যে ধীরে ধীরে তিনি তাহা সংশোধন করিয়া গিয়াছেন। শব্দকোষ-প্রকাশেচ্ছু যে-কেহ আচার্যদেবের উত্তরাধিকারিগণের নিকট অনুসন্ধান করিতে পারেন।

যোগেশচন্দ্রের প্রতিভা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র পথে পরিভ্রমণ করিয়াছিল। এমন বিষয় নাই যাহা লইয়া তিনি অন্ততঃ পাঁচ-সাতটা মনোজ্ঞ প্রবন্ধ না লিখিয়াছেন। ভাষা ও সাহিত্য, শিল্প ও কলা, অর্থনীতি ও সমাজনীতি, পদার্থবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা, জ্যোতিষ ও রসায়ন, বেদ ও পুরাণ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি—সকল বিষয়েই তাঁহার প্রতিভার আলোকে দীপ্ত হইয়া আজ আমাদের সম্মুখে নবরূপে প্রতিভাত হইতেছে। বহু লোক তাঁহাকে 'সাহিত্যিক' বলিয়া জানে, কিন্তু তিনি যাহা সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন তাহা 'সাহিত্য' নহে। সাহিত্য ভাবের বিষয়, রসের বিষয় ; কিন্তু আচার্যদেবের সকল সৃষ্টিই জ্ঞানের বিষয়। এক সময়ে তিনি বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, কবিকঙ্কনের চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গলগান ইত্যাদি লইয়া বিস্তর আলোচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে-সকল আলোচনায় সাহিত্যিক দিকটার প্রাধান্য নাই। তিনি ঐ সকল গ্রন্থের ভাষা, সংস্কৃতি ও প্রাচীনতা লইয়া ব্যাপক আলোচনা করিয়াছেন। এই সকল আলোচনার মধ্য দিয়া তাঁহার অজ্ঞাতসারে বাংলা ভাষাতত্ত্বের গোড়াপত্তন হইয়া গিয়াছে। তিনি যে বাংলা ভাষাতত্ত্বের একজন পথিকৃৎ তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ভাষাতত্ত্ব একটা বিজ্ঞান। আচার্য যোগেশচন্দ্র ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র, বিজ্ঞানের অধ্যাপক। সুতরাং এই বৈজ্ঞানিক বিষয়টি সহজভাবেই তাঁহার সাধনার বস্তু হইয়াছিল। বাংলার প্রাচীন কবিগণের কালনির্ণয় তাঁহার অক্ষয় কীর্তি। "কবি শকাঙ্ক" প্রবন্ধে পাঠক দেখিতে পাইবেন, কি অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রয়োগ করিয়া তিনি চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, মাণিক গাঙ্গুলী, রূপরাম ইত্যাদি কবিগণের গ্রন্থরচনা-কাল নির্ণয় করিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস-লেখকগণ তাঁহারই প্রদর্শিত পথে অদ্যাপি অপরাপর কবিদের কালনির্ণয় করিতেছেন। বাংলা সাহিত্যের কালানুক্রমিক ইতিহাস রচনায় আচার্য যোগেশচন্দ্রের দান অসামান্য।

কেবল বাংলাভাষা নয়, ভারতীয় বহু ভাষায় তাঁহার গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল এবং ভারতের প্রায় সকল ভাষাই তিনি অল্প-বিস্তর বুঝিতেন। ওড়িয়া, হিন্দী, মরাঠী ও গুজরাটী ভাষায় তিনি স্বচ্ছন্দে কথা বলিতে পারিতেন এবং দ্রাবিড় ভাষায় কথা বলিতে না পারিলেও উহা বুঝিতে পারিতেন। উৎকল-সাহিত্য-পরিষদের তিনি ছিলেন 'বরেণ্য সদস্য' এবং মহারাষ্ট্রের বহু সাহিত্যিক ও মনীষীর সহিত তাঁহার সখ্য ছিল। সংস্কৃত বিষয়ে তাঁহার অনন্যসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল এবং তাঁহার ইংরেজী রচনা যে কিরূপ সুখপাঠ্য, যিনি তৎ-প্রণীত Ancient Indian Life, First Point of Aswini ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তিনিই তাহা জানেন। তাঁহার পাঠাগারে এখনও বাংলা, ইংরেজী, হিন্দী, সংস্কৃত, ওড়িয়া, মরাঠী ইত্যাদি ভাষায় রচিত বহু জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ সজ্জিত রহিয়াছে। বহু ভাষায় জ্ঞান থাকার জন্য তাঁহার মনীষা এত বিশালতা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, তাঁহাকে সমুদ্র বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার 'বিদ্যানিধি' ও 'বিজ্ঞান-ভূষণ' উপাধি বর্ণে বর্ণে সার্থক হইয়াছিল।

বৈদিক কৃষ্টির প্রাচীনতা নির্ণয়, আমার মতে, আচার্যদেবের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি। বেদবিদ্যায় পারঙ্গম না হইলে ভারতে আর্য-সভ্যতার বয়স নির্ণয় অসম্ভব। উইন্টার্নিৎস, ম্যাক্ডোনেল, কীথ, ওয়েবার প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষিগণ ভারতে আর্য সভ্যতার কাল নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহারা প্রায় সকলেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভারতে খ্রী পূ ২০০০ অব্দে প্রথম আর্য উপনিবেশ স্থাপিত হয় এবং ঋগ্‌বেদ-সংহিতা খ্রী-পূ ১৫০০ অব্দের নিকটবর্তী কালে রচিত হয়। তাঁহাদের এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি প্রধানতঃ ঋগ্‌বেদের ভাষা কিন্তু কেবল ভাষা দেখিয়া ঋগ্‌বেদের প্রাচীনতা নির্ণয়ের প্রয়াস ধৃষ্টতা মাত্র। বেদ বুঝিতে হইলে তৎপূর্বে ষড়্‌-বেদাঙ্গে ব্যুৎপত্তি অর্জন করিতে হইবে। বেদের কাল নির্ণয় করিতে হইলে জ্যোতিষের প্রয়োগ অপরিহার্য। জ্যোতিষকে

"বেদচক্ষুঃ" বলা হয়, অর্থাৎ ষড়বেদাঙ্গের মধ্যে ইহাই দর্শনেন্দ্রিয়-স্বরূপ। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা জ্যোতিষের ধার দিয়া যান নাই। যদি-বা কেহ গিয়াছেন, তাঁহার নিরুক্ত-জ্ঞান পর্যাপ্ত না থাকায় সিদ্ধান্তকালে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। যুগ যুগ ধরিয়া ভারতবাসী জানে যে, বেদ পূর্বকালে ভূর্জপত্রে, ধাতুপট্টে কিংবা পর্বত-গাত্রে লিপিবদ্ধ হয় নাই—গুরুশিষ্য-পরম্পরায় মুখে মুখে বেদের সূক্তগুলি চলিয়া আসিয়াছে। মানুষের মুখে মুখে যাহা চলিয়া আসিয়াছে তাহার ভাষাগত রূপ পরিবর্তিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক, না হইলেই আশ্চর্যের কথা। ঋগ্বেদ-সংহিতাকে আমরা বর্তমানে যে আকারে পাইতেছি, তাহা লিপিবদ্ধ হওয়ার পরবর্তী রূপ। এই রূপটি খ্রী-পূ ১৫০০ অব্দের হইতে পারে কিন্তু তাহার পূর্বে বহুকাল ধরিয়া বেদ যখন 'শ্রুতি'রূপে ছিল, তখন তাহাকে বিপুল পরিবর্তনের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। এই সত্যটি পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অস্বীকার করেন। আর, আশ্চর্যের বিষয় আমাদের দেশের অনেক ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মত নির্বিচারে গ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য যোগেশচন্দ্র তাঁহাদের মত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, "ঋগবেদ পাঠ করে আমার মনে হ'ত, এর বয়স কখনও সাড়ে তিন হাজার বছর হতে পারে না, নিশ্চয় অনেক বেশী। কিন্তু প্রমাণ করি কেমন করে? আমাদের পুরাণে এমন অনেক উপাখ্যান রয়েছে যাদের বীজ ঐ বৈদিক সাহিত্যের মধ্যেই ছিল। অথচ, কি আশ্চর্য! পশ্চিমের পণ্ডিতেরা পুরাণকে বলেছেন 'বেদবাহ্য'! আমাদের পূজা-পার্বণে ছড়িয়ে রয়েছে বৈদিক সংস্কৃতি। কতকাল ধরে আমরা এ সব পালন করে চলেছি, কে জানে? ভাবতে ভাবতে মনে হ'ল, এ সমস্ত ব্যাপারের সঙ্গে জ্যোতিষ জড়িয়ে রয়েছে, জ্যোতিষ শিখতে পারলে নিশ্চয় বৈদিক-কৃষ্টির প্রাচীনতা প্রমাণ করতে পারব। আমি যখন কটক কলেজের প্রোফেসর, তখন দৈবক্রমে একদিন খণ্ডপড়া রাজ্যের এক জ্যোতির্বিদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়ে গেল। তাঁর নাম চন্দ্রশেখর সিংহসামন্ত। জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। তিনি নীরবে সাধনা করে চলেছিলেন, কারও কাছে আত্মপ্রকাশ করেন নি। বলতে গেলে আমিই তাঁকে আবিষ্কার করি। তিনি ইংরেজী জানতেন না, কেবল ওড়িয়া আর সংস্কৃত জানতেন। সংস্কৃত ভাষায় লেখা তাঁর 'সিদ্ধান্ত-দর্পণ' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পড়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। ইউরোপের জ্যোতির্বিদদের কোনও সিদ্ধান্ত তিনি জানতেন না; অথচ দেখলাম, জ্যোতির্বিক আবিষ্কারে তিনি ইউরোপের সঙ্গে সমানতালে এগিয়ে চলেছেন। আমি তাঁর 'সিদ্ধান্ত-দর্পণ' সম্পাদনা করে প্রকাশের ব্যবস্থা করলাম। আর, ইউরোপের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদদের কাছে এক কপি করে পাঠিয়ে দিলাম। ইউরোপে 'সিদ্ধান্ত-দর্পণে'র প্রশংসা হয়েছিল খুব। আর, আমি চন্দ্রশেখরের কাছে জ্যোতিষ শিক্ষার প্রেরণা লাভ করলাম। ভারতীয় জ্যোতিষ শিক্ষা করে আমি বাংলায় "আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ" লিখলাম। তার পর বৈদিক কৃষ্টির কালনির্ণয়ে জ্যোতিষের প্রয়োগ করতে লাগলাম।"

'বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল', 'পৌরাণিক উপাখ্যান' ও 'পূজাপার্বণ', এই তিন গ্রন্থে আচার্যদেব বৈদিক কৃষ্টির কাল নির্ণয় করিয়াছেন। 'বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল' গ্রন্থে তিনি বৈদিক দেবতাদিগকেও চিনাইয়া দিয়াছেন। বহু পৌরাণিক উপাখ্যানের বীজ যে বেদের মধ্যেই নিহিত আছে এবং পৌরাণিক যুগেও যে বৈদিক কৃষ্টির ধারা অব্যাহত ছিল, 'পৌরাণিক উপাখ্যান' গ্রন্থে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। পুরাণকে যাঁহারা 'গাঁজাখুরী গল্প' বলিয়া উড়াইয়া দেন, তাঁহাদিগকে একবার এই গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের কাল নির্ণীত হইয়াছে। তিনি দেখাইয়াছেন, খ্রী পূ ১৪৪২ অব্দে এই যুদ্ধ হইয়াছিল। তখন বৈদিক কৃষ্টির শেষ যুগ। বেদ ইহার বহু বহু কাল পূর্বে রচিত হইয়াছিল। ঋগবেদ সংহিতায় অন্ততঃ দশ সহস্র বৎসরের পুরাতন কথা আছে। অদ্যাবধি নানাবিধ পূজাপার্বণে আমরা বৈদিক কৃষ্টিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছি। বিশেষ বিশেষ পূজাপার্বণের জন্য বিশেষ বিশেষ দিন নির্দিষ্ট হইয়াছে কেন? ফাল্গুনী পূর্ণিমায় দোলযাত্রা কেন? দুর্গাপূজা অন্য দিনে না হইয়া আশ্বিনের শুক্লাসপ্তমীতে কেন? এত এত দিন থাকিতে মাঘ মাসের শুক্লাপঞ্চমীতে সরস্বতী পূজা হয় কেন? এ সকল প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে 'পূজাপার্বণ' পাঠ করুন এবং পাঠক দেখিতে পাইবেন, নির্দিষ্ট দিবসটির মধ্যেই ঐ পার্বণের প্রাচীনতা লুক্কায়িত আছে।

এই তিন গ্রন্থের কিয়দংশ তিনি স্বহস্তে রচনা করিয়াছিলেন। তার পর বার্ধক্য আসিয়া তাঁহার লিখন-পঠনের শক্তি হ্রাস করিয়া দিল। লেখাপড়া, বিশেষ করিয়া গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা প্রায় বন্ধ হইতে বসিয়াছিল। এমন সময় এক শুভক্ষণে তাঁহার সহিত আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় হইল। তখন তাঁহার বয়স ৮৮ বৎসর। আমাকে পাইয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। দিনকয়েক পরিচয়ের পরই তিনি বলিলেন, "এতদিনে আমার আশা হচ্ছে, আমি "Vedic Antiquity" শেষ করে যেতে পারব। একটু সাবধান হয়ে

লিখবে। আমার চোখ নেই, সময়ও আর বেশী নেই। সাবধান হতে বলছি এই জন্যে যে, তুমি আমার line of thinking বুঝে নাও। আমার যে কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, তুমি তা সম্পূর্ণ করতে চেষ্টা করো।"

সুদীর্ঘকাল অক্লান্ত পরিশ্রমে বঙ্গভারতীর জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়া আচার্য যোগেশচন্দ্র গত বৎসর শ্রাবণ মাসে ৯৭ বৎসর বয়সে অমরধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। সেই জ্ঞানযোগী এই লেখকের হৃদয়ে জিজ্ঞাসার বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার মাধুর্যময়ী স্মৃতিতে হৃদয় রাঙাইয়া দিয়া গিয়াছেন। বর্ষে বর্ষে তাঁহার জন্মদিবসে সেই মহামনীষীর পুণ্যস্মৃতি দেশবাসীর হৃদয়কে পবিত্র করিয়া তুলুক, ইহাই অন্তরের কামনা।

সূর্য্যাভিষিক্ত

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য্য

লক্ষসূর্য্যে স্নান করা এই জীবনের অভিষেক
পড়লো কি বাঁধা বধির অন্ধকূপে ?
মুক্তি কোথায়, দাও তা আমায়, চাই না এমন শেষ ,
আবার না হয় জন্মই নেবো রূপে।
আমি জানি আমি বহু বৎসরে, বহু কোটি বৎসরে,
বহুসূর্য্যের রুধির পানের ফলে—
রূপ হতে রূপে, স্তূপ হতে স্তূপে, জড়ের উপরে জড়ে,
জীবনমদের নেশায় পড়েছি ঢলে।
কতো হিমবাহ বয়েছে আমার সন্তরণের পথে,
মরণঘুমের নিথরে নিয়েছে টেনে ;
সে ঘুর্ণিপাক ব্যর্থ করেছি সূর্য্য চালানো রথে,
আলোর তৃষ্ণা বক্ষ নিয়েছে মেনে।
কতো আগ্নেয়-গিরির প্রলয়, গলিত ধাতুর স্রোত;
কতো ভূকম্প করেছে আমায় গ্রাস ;—
নতুন সূর্য্য আবার আমায় জীবন দিয়েছে হেসে,
সূর্য্য ছোঁয়া এ জীবনের নেই নাশ।
কতো জীবনের পরশ মেখেছি, কতো মৃত্যুর গান,
কতো কল্পের রক্ত আর্তনাদ !
জবাকুসুমিত সঙ্কাশ-রাঙা প্রভাতে করেছি স্নান,
সূর্য্য আবার করেছে আশীর্বাদ !
জীবনের পর জীবন দিয়েছে, চুঁইয়ে দিয়েছে তাপ,
ধূলোর জগতে নেমেছে আমার পাশে ;
কতো রাত্রির কালো আতঙ্ক ভয়ে হারিয়েছে স্বাদ,
আবার প্রভাত ভরে গেছে আশ্বাসে।
এতো সূর্য্যের এতো ভালোবাসামাখা এই 'আমি'-টুকু;
ভুলতে কি পারে নাড়ীর সে বন্ধন ?
স্মৃতি বিমথিত সূর্য্যপিপাসা করেছে জাতিস্মর,
প্রতিজীবনেই জলন্ত ক্রন্দন !
জন্মে আমার আলোর পিপাসা, আলোয় আমার প্রাণ,
উন্মদ তাপে পুষ্ট আমার সত্ত্বা,
আমি কি আবার বন্ধনে পড়ে সইবো এ অপমান ?
এ অন্ধকারে করবে আমায় হত্যা ?
তার চেয়ে আমি ভাঙবো এ সীমা, প্রাচীরঘেরা এ প্রান্তর,
শেষ হয়ে যাবে বিদ্রোহী এক চেষ্টায়।
সূর্য্যতেজের সন্ধান যদি পাই শত জীবনান্তর,
তবু তো পাবই সূর্য্যেই অবশেষটায় !
সূর্য্য আমায় বারবার ডাকে, সূর্য্যের আমি স্বত্ব,
লক্ষসূর্য্যে গঠিত আমার চিত্ত ;
সূর্য্য-ক্ষুধায় বুভুক্ষু আমি, সূর্য্য মদেতে মত্ত,
সূর্য্য বিহনে নির্মম একাকিত্ব।
লক্ষ্যসূর্য্যে অভিষেক সেরে এই যে আমার সৃষ্টি
ভাঙবে না ওগো ভাঙবে না এতো অল্পে !
কোথায় সূর্য্য অমিতবীর্য্য, করো আলোকের বৃষ্টি,
তৃষ্ণা আমার মিটবে কল্পে কল্পে।

উন্মেষ

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

শহরের উপান্তে ছোট সুদৃশ্য একখানি বাড়ী। চতুর্দ্দিকের পরিবেশের সঙ্গে সুন্দর মানানসই। সুচারু রায় বাড়ীর দিকে যতটা না দৃষ্টি দিয়েছেন তার চেয়ে ঢের বেশী লক্ষ্য রেখেছেন পারিপার্শ্বিকের প্রতি। তাই ফুলবাগান, খেলার মাঠ, সাঁতারের পুকুর, বিশ্রামের জন্ম লতাকুঞ্জের ব্যবস্থাও বাড়ীর সীমানার মধ্যে আছে।

হাল আমলের বড় লোক সুচারু রায়। গত লড়াইতে কণ্ট্রাক্টরী করে সোজা এবং বাঁকা পথে অনেক পয়সা তিনি রোজগার করেছেন। কিন্তু জোয়ারের জলে ভেসে-আসা ভাটার টানে নেমে যেতে পারে নি। সুচারু রায় তাকে সাবধানতার সঙ্গে উপযুক্ত আধারে ধরে রেখে সুযোগমত আরও বাড়িয়ে তুলেছেন।

সদালাপী, নিরহঙ্কারী ভদ্রলোক তিনি। যে অন্ততঃ একদিনের জন্যও তাঁর সংস্পর্শে এসেছে এ কথা তাকে স্বীকার করতেই হবে। যারা কাছে আসতে ভয় পায় তারাই নিন্দা করে বেড়ায় অসামাজিক আর আত্মম্ভরী বলে। সুচারু রায় এই ধরনের সমালোচনায় কখন হাসেন, কখন দুঃখিত হন কিন্তু কোনদিন প্রতিবাদ করেন না। নিজের লাইব্রেরী ঘরেই দিনের বেশীর ভাগ সময় অতিবাহিত করেন। তার উপর রয়েছে তাঁর সখের ফুলবাগান।

ছোট সংসার। স্বামী, স্ত্রী, একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। ছেলেটি বিদেশে আছে, উচ্চ ডিগ্রি নিয়ে বছর খানেক পরে ফিরে আসবে। মেয়ে বি-এ পড়ছে। বাপের ঠিক বিপরীত স্বভাব পেয়েছে। চুপ করে একমুহূর্ত্ত বসে থাকতে সে জানে না। অত্যন্ত চঞ্চল প্রকৃতির মেয়ে রুমা। দিনরাত বন্ধুবান্ধব নিয়ে হৈ চৈ করে বেড়ায়। মার তৈরী কড়াইশুটির কচুরী আর ফুলকফির সিঙাড়া খাওয়াতে তার প্রচুর উৎসাহ। মা বিরক্ত হন, রাগ করেন। সকলের অলক্ষ্যে শাসন করতেও চেষ্টা করেন, কিন্তু রুমা মার কথা গায় মাখে না। হুকুম করে চলে যায়, তোমার হাতের কচুরী আর সিঙারা খেতে ওরা খুব ভালবাসে মা আমি কিন্তু ওদের আজ নেমন্তন্ন করে ডেকে এনেছি। রুমা নৃত্যের ছন্দে চলে যায়।

মা তার চলার পথের পানে চেয়ে থাকেন। এতখানি বয়েস হ'ল তবু যদি একবিন্দু কাণ্ডজ্ঞান থাকে। তাঁর এই বয়েসে খোকা রীতিমত দাপাদাপী করে বেড়াত। রুমার বাপই মেয়েটার কপালটি খেলেন।

বই থেকে মুখ তুলে সুচারু বললেন, সত্যিই মেয়েটার একটুও কাণ্ডজ্ঞান নেই। তোমার খুবই কষ্ট হবে ঠিক কিন্তু রুমা যখন ছেলেগুলোকে নেমন্তন্ন করে এনেছে তখন আর উপায় কি? একটু থেমে তিনি পুনরায় বললেন, আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না? হরিহরকে আমার গাড়ীটা বার করতে বল—বাজার থেকেই না হয় জিনিষগুলো কিনে আনা হোক।

মিনতি রাগ করে জবাব দিলেন, বাজার থেকে আনিয়ে নিলে যদি হ'ত তা হলে তোমার কাছে বুদ্ধি নিতে আসতাম না।

সুচারু একটুখানি হেসে বললেন, আমি তৈরি করে দিলে যদি হ'ত।

মিনতি উষ্ণ কণ্ঠে বেজে উঠলেন, বাজে বকো না—থামো···

সুচারু বিন্দুমাত্র রাগ করলেন না। স্মিতহাস্যে বললেন, তা হলে কাজের কথা কোনটা তা তুমিই বাতলে দাও।

মিনতি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, আমার কোন কথাটা তুমি কানে তোলো? কিন্তু একদিন তার জন্যে তোমাকে আপশোষ করতে হবে।

এবারে সুচারুর বিস্মিত হবার পালা। তিনি বললেন, তোমার এ অনুযোগ একেবারেই অর্থহীন, কানে তোলার মত কোন কথাই তুমি বল না।

মিনতি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন। সহসা একটি চেয়ার টেনে তিনি বসতেই সুচারু খোলা বইখানা বন্ধ করে একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, মোদ্দা কথাটা কি বল দেখি? মনে হচ্ছে কোন দুরূহ ব্যাপার নিয়ে তুমি খুবই দুর্ভাবনায় পড়েছো?

মিনতি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। বললেন, মিথ্যে না। কথাটা নিয়ে অনেকদিন ধরেই আমি ভাবছি।

সুচারু দুঃখিত হলেন, বললেন, তুমি যদি একলা ভাবতে ভালবাস তা হলে আমি কি করতে পারি মিনতি।

মিনতি সহসা কণ্ঠস্বর পালটে দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিলেন, আমার অভিযোগ মুখ্যতঃ তোমার বিরুদ্ধে।

সুচারু হাসি মুখে বললেন, দেখছি ব্যাপারটা অনেকদূর গড়িয়েছে। প্রচুর জট পাকিয়েছে—খুলতে সময় নেবে। তুমি বরং চটপট হাতের কাজ শেষ করে ফেল। তার পরে ধীরে সুস্থে বরং দুজনেই হাত লাগাব।

একটু থেমে তিনি পুনশ্চ বললেন, মেয়ের হুকুম তামিল আগে—তার পরে অন্য কাজ। সুচারু ভারী অদ্ভুত ভাবে হাসতে থাকেন। মিনতি রাগ করে চলে যান। তিনি পুনরায় বই খুলে নিয়ে বসলেন। অনেকটা মূল্যবান সময় তাঁর মিথ্যা নষ্ট হয়েছে। এরা একটুতেই বড় ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু বইয়ের মধ্যে ডুবে

থাকতে তাঁর হ'ল না, অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে রুমা উপস্থিত হ'ল তার বন্ধুদের নিয়ে।

রুমা বলছিল, একটা সুইমিং পুল, টেনিস লন আর ফুলবাগান আর লতাকুঞ্জ দেখেই আমার বাবাকে চেনা যায় না। বাবার আসল পরিচয় ওখানে নয়, বাবার লাইব্রেরী না দেখলে।

কথাটা শেষ না করেই রুমা সকলকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলে। কিন্তু যত সহজে সে ওদের নিয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছে ওরা কিন্তু ততটা সহজ হয়ে উঠতে পারল না। একটা অস্বস্তি আর অকারণ জড়তায় সর্বক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে রইল।

সুচারু তাদের সাদরে গ্রহণ করলেন। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিভিন্ন লেখকের নানা রচনার সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিতে তৎপর হয়ে উঠলেন। কে তার কথা শুনছে আর কে শুনছে না সে দিকে পর্যাপ্ত হুস নেই। কিন্তু রুমার সজাগ দৃষ্টি ওদের প্রহরায় নিযুক্ত ছিল এবং তার বন্ধুদের অজ্ঞতায় আর অবাঞ্ছিত অনাসক্তিতে সে মনে মনে ক্ষুব্ধ হলেও মুখে কিছু বললে না। তার পরে এক সময় যেমন আকস্মিক ভাবে এসে উপস্থিত হয়েছিল তেমনি আকস্মিক ভাবেই সকলকে নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

সুচারু সেই দিকে চেয়ে আপন মনে বলে উঠলেন, মেয়েটা একেবারেই পাগল। এতখানি বয়সেও ছোটটিই রয়ে গেছে।

সহসা মিনতি এসে সেখানে উপস্থিত হলেন। সুচারুর মুখের কথাটা টেনে নিয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, বিশ বছরের খুকি! কথা শুনলে গা জ্বালা করে। মেয়েটার মাথাটি তুমিই আরও খেলে। এতটা স্বাধীনতা দেওয়া তোমার মোটেই উচিত হচ্ছে না। দিন দিন কি হয়ে যাচ্ছে তা কি একবারও তোমার চোখে পড়ে না?

সুচারু বললেন, বিলক্ষণ! এও কি একটা কথা হ'ল নাকি। চোখে পড়বে না কেন? কিন্তু তোমার মত আমি ভয় পাই না বরং আনন্দ হয় একটা তাজা আর জীবন্ত মানুষের সাক্ষাৎ পেয়ে।

মিনতি বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, আশ্চর্য্য! এ কথা তুমি ভাবতে পারলে কি করে?

সুচারু জবাব দিলেন, কি ভাবলে তোমার মনের মত হ'ত তা হলে সে কথাটা আমায় জানিয়ে দাও। ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখতে চাও? তা হলে লেখাপড়া শেখাতে গেলে কেন? মেয়ে কলেজে পড়ছে—বুদ্ধি-শুদ্ধিও আছে। তাকে তুমি নিজের বুদ্ধিবিবেচনার উপর নির্ভরশীল হতে দেবে না? ওকে নিজের মত করে এগোতে দাও।

মিনতি বাধা দিয়ে বললেন, তার পরে যদি পিছিয়ে আসবার পথ খুঁজে না পায়?

সুচারু বললেন, তুমি তোমার মেয়েকে বিশ্বাস করো না।

মিনতি বললেন, বিশ্বাস করব না কেন? কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটতে কতক্ষণ···তাই সাবধান হতে বলছি।

সাবধান হলেও দুর্ঘটনা হামেসাই ঘটে থাকে। সুচারু জবাব দিলেন।

মিনতি উষ্ণ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানালেন, সব সময় ঘটে না। আর যদি ঘটেও নিজের কাছে অন্ততঃ অপরাধী হয়ে থাকতে হয় না। তুমি জেগে ঘুমোচ্ছ।

সুচারু নিস্পৃহ কণ্ঠে জবাব দিলেন, তা হলে মেয়ের চেয়েও নিজেদের কথাটাই তুমি বেশী করে ভাবছ।

মিনতি রাগ করে চলে গেলেন। কার সঙ্গে তিনি মেয়ের ভালমন্দ নিয়ে পরামর্শ করতে গিয়েছিলেন! আশ্চর্য্য অন্যমনস্ক প্রকৃতির লোক। এর চেয়ে ঘরের দেওয়ালগুলোর সঙ্গে কথা বলাও ঢের ভাল।

খানিকটা বিরক্তি আর খানিকটা আশাভঙ্গের উত্তেজনা নিয়েই রুমা তার বাবার ঘর থেকে বার হয়ে এল। তার বন্ধুর দল এত অপদার্থ এ সে কল্পনাও করতেও পারত না। তার বাবাকে যোগ্য সম্মান না দেওয়ার বেদনা তাকে রীতিমত আঘাত করেছে তাই এই মুহূর্ত্তে ওদের সঙ্গও তার কাছে আনন্দদায়ক নয়। খানিকটা অবজ্ঞাভরেই সে পাশ কাটিয়ে লতাকুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করলে। রুমার এই সুস্পষ্ট অবজ্ঞার ওরা কোন সহজ অর্থ খুঁজে না পেলেও তাকে অনুসরণ করতে ওরা পারলে না। ওরা ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়ল এখানে সেখানে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসতে রুমা লতাকুঞ্জের মধ্য থেকে বার হয়ে এল। প্রথমেই সম্মুখে পড়ল নরেনের। অত্যন্ত খাপছাড়া ভাবে সে বললে, অনেক দেশ আমি ঘুরেছি রুমা। অনেক কিছু দেখবার সুযোগও আমার ঘটেছে! বাট নেভার আই কাউণ্ড···মানে সত্যিই তোমার সঙ্গে কারুর তুলনা হয় না। ইউ আর সিমপ্লি চারমিং···তোমার কি আজ শরীরটা ভাল নেই রুমা?···

রুমা কোন জবাব না দিয়ে পাশ কাটিয়ে অন্ধকারে গা ঢাকা দিলে কিন্তু পথ ভুল করে সে হীরেনের মুখোমুখী এসে দাঁড়াল।

হাত পেতেই সে দাঁড়িয়েছিল। বললে, প্রসন্ন হও দেবী। এই রিক্ত আর উপবাসী লোকটিকে তুমি বাঁচবার সুযোগ দাও।···

রুমা হেসে উঠে বলে, আপনাদের সঙ্গে সত্যিই পারা যাবে না। মা নিশ্চয় এতক্ষণ তৈরী হয়ে বসে আছেন। আপনারা দয়া করে গেলেই হয়।

হীরেন তার প্রশস্ত হাতের পানে তাকিয়ে হিসেব করে দেখছিল কতটুকু সে চেয়েছে আর কতখানি সে পেল।···

রুমা সেই সুযোগে পালাতে চেষ্টা করলে। কিন্তু সে যাবে কোথায়? অষ্টরথী বেষ্টিত হয়ে আছে সে। বেরুবার পথ খুঁজে পাচ্ছে না। পথের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে কমল। রুমা কাছে আসতেই সে একবার মুখ তুলে তাকিয়ে পুনরায় তা নত করলে।

রুমা কৌতুক করে বললে, তোমারও কিছু বলবার আছে বুঝি? এঃ তুমি অমন করছ কেন কমল? তোমাদের সকলের আজ হ'ল কি?

মানে···কমল নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছে। বললে, আমার দারিদ্র্য আমার অহঙ্কার। তার জন্যে আমার দুঃখ নেই।

না থাকাই উচিত। রুমা একটু হেসে বললে, এই কথাটা বলবার জন্তেই কি তুমি আমার জন্তে এখানে একলা অপেক্ষা করছিলে কমল?

কমল জবাব দিলে, হাঁ রুমা। এর বেশী আর কিছু বলবার প্রয়োজন আছে কি?

রুমা আমোদ পাচ্ছিল এদের রকমারি কথায়। এরা সকলে পরামর্শ করেই যেন তাকে অপদস্থ করতে চাইছে। কিন্তু নিজে সে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকেই জবাব দেয়, এর বেশী বললে সৌন্দর্য্য থাকে না কমল আর আমিও হয় ত ভুল বুঝতে পারি। তার চেয়ে তুমি খাবার টেবিলে যাও আমিও এখুনি আসছি।

কিছুদূরে অগ্রসর হতেই পুনরায় থামতে হ'ল। ওর কাপড়ে টান পড়েছে। অবস্থাটা বুঝে উঠবার পূর্ব্বেই দুখানি বলিষ্ঠ বাহু এগিয়ে এসে রুমাকে টেনে নিয়ে গেল দেবদারু গাছের আড়ালে। সে ধমক দিলে। এটা তোমার কেমন ভদ্রতা শিবনাথ। তোমার ব্যবহারে লজ্জা পাওয়া উচিত।

শিবনাথ বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হয়ে হেসে বললে, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে অত পোশাকি ভদ্রতা দেখান আমি পছন্দ করি না। মুখে তুমি হাজারবার বলবে বন্ধু আর বন্ধু অথচ হাত ধরে কাছে টানতে গেলেই কেতাবী সুরে কথা বলতে সুরু করবে। আমার অত রেখে ঢেকে কাব্য করা পোষায় না রুমা। আমি স্পষ্ট করে সব কথা জানতে ভালবাসি।

শিবনাথের ব্যবহার ঠিক সুস্থ এবং স্বাভাবিক মনে হ'ল না রুমার। তবুও খুব খারাপ লাগছে না ওর কথাবার্ত্তা। যদিও সে বেশ খানিকটা বিব্রত বোধ করছে।

শিবনাথ হয় ত আরও খানিকটা অগ্রসর হবার চেষ্টা করলে। রুমা তাকে বাধা দিয়ে বললে, তোমার কথা আমি ভেবে দেখব শিবনাথ।

সুচারুর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, তোমার বন্ধুরা সব গেলেন কোথায় রুমা। ওঁদের খেতে দেবে না? তোমার মা বহুক্ষণ ধরে অপেক্ষা করে রয়েছেন—

এইমাত্র ভোর হয়েছে। পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে রুমা তার স্প্রিঙের খাটের উপরে। একরাশ ভোরের ঝরা শিউলী ফুল। ওদের ঝাউ গাছের পাতায় পাতায় সকালবেলার মিঠে আর তাজা হাওয়ার স্পর্শ লেগেছে, স্পর্শ করেছে রুমার ঘুমন্ত চোখ দুটিকে, তার এলোমেলো চুলগুলিকে।

সুন্দরী রুমা অলসভাবে চোখ মেলেছে সে সুখস্পর্শে। একটা অত্যাশ্চর্য্য আবেশে ওর দেহ আর মন দুলে দুলে উঠছে। মনের মধ্যে দেখা দিয়েছে একটা রহস্যময় প্রশ্ন।

হাত বাড়িয়ে একটা পালকের বালিশ টেনে নিলে রুমা। সবলে বুকে চেপে ধরে ও যেন কিছু অনুভব করতে চায় একটা আলস্য-জড়ান উন্মাদনায়।

রুমা বিস্মিত হয় তার নিজের মধ্যে একটা আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে। এই পালকের বালিশ, ঐ সূর্য্যোদয় আর ভোরের স্নিগ্ধ বাতাস এরা ত রোজই দেখা দেয়, কিন্তু এমন সুন্দর এর আগে এদের আর কোনদিন মনে হয় নি।

রুমা বিছানার উপর উঠে বসেছে। বেশবাস ঠিক করে নিতে গিয়েও সে নিলে না। আগ্রহ ভরে সে নিজেকে আজ নতুন করে দেখছে। ওর গোটা দেহটা প্রতিফলিত হয়েছে আয়নাটেবিলে। ভারী ভাল লাগছে নিজেকে বারে বারে দেখতে। শুধু দেখতেই নয়—ঐ নরম আর সুন্দর দেহটিকে কেন্দ্র করে একটা মধুর কল্পনা করতেও।

খুব ভাল লাগছে আজকের সকালটা। ভাল লাগছে দেবদারু গাছটাকে আর পূব আকাশের কাঁচা রোদকে, নরেনের স্তাবকতা, হীরেনের কাঙ্গালপনা, কমলের লাজুকতা কিংবা শিবনাথের উন্মত্ত বাহুবেষ্টনের অর্থ তার কাছে আজ আর অস্পষ্ট নেই। ওরা সকলেই একটি বিশেষ বিন্দুতে গিয়ে থামতে চায় যদিও পথ ওদের এক নয়। আর ওদের এতখানি পথ এগিয়ে আসতে রুমাই আপন অজ্ঞাতে সাহায্য করে এসেছে। আপন জীবনের গোটা কয়েক অতীত অধ্যায় অত্যন্ত সাবধানে পর্য্যালোচনা করে দেখে এই কথাটাই বারে বারে তার মনে হচ্ছে।

কিন্তু এর পরে? এর পরে রুমা কতটুকু এগোবে আর কতটুকু পিছিয়ে আসবে সেইটেই হয় ত এক বিরাট সমস্যা হয়ে উঠবে।

রুমা দু'হাত তুলে আলস্য ভাঙলে। আপন দেহের গতি-প্রকৃতি লুব্ধ স্নেহে দেখছে সে। শিবনাথের দোষ কি···এত স্তব, স্তুতি আর কলগুঞ্জন যখন এই নরম এবং সুন্দর দেহটাকে ঘিরে··· কিন্তু এদের কারুর কাছেই সে আত্মসমর্পণ করে নি। সমর্পণের ভীরু আকাঙ্ক্ষা তাকে বিরস করলেও পাগল করতে পারে নি। তাই কঠিন হতে না পারলেও প্রশ্রয় দেয় নি।

নরেনের উচ্ছ্বাস, কমলের লাজুকতা আর হীরেনের সকরুণ আবেদন রুমার অভ্যস্ত চিন্তাধারাকে ভিন্ন পথে টেনে এনেছে। তাই সে থমকে দাঁড়িয়ে গভীর দৃষ্টিতে নিজেকে দেখছে। শুধু দেখছে না ভাবছেও।

খেলাধুলা, পাঠ্যপুস্তক, তার পরে সময় পেলেই তার বাবার সঙ্গে বসে দেশ-বিদেশের নানা বিষয় আলোচনা করেই তার জীবনের বিগত দিনগুলি কেটে গেছে।···কিন্তু আজ···

রুমার ঘরে মৃদু মৃদু হাওয়া বইছে। হাওয়া বয়ে যাচ্ছে দেবদারু গাছের পাতায় পাতায় মৃদু শিহরণ জাগিয়ে। শিহরণ জেগেছে রুমার আপন সত্তায় গভীরতম প্রদেশে। চোখের সম্মুখে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে একটা প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসার চিহ্ন।

রুমার ঘরের বন্ধ দরজায় মৃদু টোকা পড়েছে। সে রীতিমত বিরক্ত হ'ল। কিন্তু সাড়া দিলে না। সাড়া সে কিছুতেই দেবে না।

দিদিমণি চা—

তথাপি সাড়া দিলে না রুমা। হতভাগাটা এখুনি চলে যাক। আজকের এই মনোরম সকালবেলার এমন জমাট অনুভূতিকে সে চায়ের উত্তাপে গলিয়ে দিতে চায় না। প্রশ্ন আর উত্তরের খেলায় ডুবে থাকতে চায় না রুমা।

পুনরায় তার দৃষ্টি গিয়ে থমকে দাঁড়াল ড্রেসিং-টেবিলের আয়নায়। আশ্চর্য! তার দেহটাকে বেষ্টন করে ধরেছে সেই জিজ্ঞাসার চিহ্নটা। এ প্রশ্ন, নরেন কিংবা হীরেনকে নিয়ে নয়—কমল অথবা শিবনাথকে নিয়েও নয়। আজকের প্রশ্ন তার নিজেকে নিয়ে। তার মনের মধ্যে যে সুরের প্রচণ্ড ঢেউ উঠেছে তাকে প্রকাশ করবে সে কোন পথে? শুধু নিজে পাগল হওয়ার মধ্যে সার্থকটা কোথায় যদি না আর কাউকে সে পাগল করতে পারে··· কিন্তু কাকে পাগল করে সে নিজে সার্থক হয়ে উঠতে চায়? যারা পাগল তাদের ক্ষেপিয়ে লাভ কি—আনন্দ কতটুকু······কৃতিত্ব কতখানি। তার আজকের এই কল্পনাকে জীবনদান করবে কে—কে সে রাজার কুমার···কবে তার পদধ্বনি সে শুনতে পাবে···?

দেবদারু গাছের পাতাগুলি থর থর করে কাঁপছে। সেই সঙ্গে কাঁপছে রুমার দেহটা···তার মন তার আত্মা।

দরজায় আবার আঘাত করছে বাইরে থেকে। এবারে কিন্তু ভৃত্য নয়। তার মা এসেছেন। আর কত ঘুমুবি রুমি? তোর জন্যে উনিও যে চা খেতে পারছেন না। তোর জন্যে বসে আছেন। তা ছাড়া আর কে এসেছে জানিস?

মার কণ্ঠে খুশী উপচে পড়ছে। রুমার সজাগ কানে তা সঙ্গে সঙ্গেই ধরা পড়ল। ও চমকে উঠেছে তাঁর শেষ কথাটায়। নিজের অসম্বৃত দেহটার পানে দৃষ্টি পড়তেই অকারণে সে খানিক লজ্জা পেল। দ্রুত হাতে কাপড়-চোপড়গুলি ঠিক করে নিতে নিতে জবাব দিলে, একটু দাঁড়াও মা আমি এখুনি দোর খুলছি।

শব্দ না করে অতি সাবধানে দরজা খুলে দিয়ে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে, কে এমন রাজা-মহারাজা এলেন যে, খুশী চেপে রাখতে পারছ না মা?

মেয়ের কথার ধরনে মা শঙ্কিত ব্যস্ততার সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করেই দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

রুমা পুনরায় সাগ্রহে প্রশ্ন করলে, আমার কথার জবাব দিলে না যে মা?

মা প্রশান্ত হেসে মৃদু কণ্ঠে বললেন, আমিও তোকে ঐ একই প্রশ্ন করব বলে জবাব দিচ্ছি না। তবে এ তোর ঐ বখাটে বন্ধুদের কেউ নয় রুমি।

রুমা বললে, সে আমি জানি মা। তা হলে কি আর তুমি নিজে আমাকে ডাকতে আসতে! বেশ কথা আমার কাছ থেকেই যদি জবাব চাও তাই দেব। চল কোথায় যেতে হবে।

মিনতি বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, এই অবস্থায়—

রুমা হেসে বললে, তুমি ত আর মেয়ে দেখাতে নিয়ে যাচ্ছ না মা যে সেজেগুজে যেতে হবে।

রুমা উঠে দাঁড়াল। দ্রুত হাতে সাধারণভাবে কাপড়-জামাটা ঠিক করে নিয়ে সে বাথরুমে প্রবেশ করলে এবং অনতিকাল মধ্যে ফিরে এসে আর একবার হাল্কা হাতে চুলটা ঠিক করে নিয়ে মার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে সহাস্যে বললে, চল যাই দেখিগে কে এমন তোমার মহামান্য অতিথি এলেন।···

মিনতি মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলেও আর একটি কথাও বললেন না। মেয়েকে সঙ্গে করে ঘর থেকে বার হয়ে গেলেন।

মায়ের সঙ্গে চায়ের টেবিলে এসে উপস্থিত হ'ল রুমা। সুচারু একটি যুবকের সঙ্গে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কিছু নিয়ে আলোচনা করছিলেন। রুমা এগিয়ে এসে নিঃশব্দে তার বাবার পাশের চেয়ারে বসতেই তিনি যুবকের দিক থেকে দৃষ্টি না ফিরিয়েই অনুযোগ দিয়ে বললেন, আজ তোমার ঘুম অত্যন্ত দেরীতে ভেঙেছে মা। আমরা বহুক্ষণ তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছি।

রুমা মৃদু হেসে বললে, রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি বাবা তাই শেষ রাত্রের দিকে—

সুচারু মেয়েকে থামিয়ে দিয়ে অন্য প্রসঙ্গে এলেন। পার্শ্বে উপবিষ্ট যুবকটির পানে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, একে চিনতে পার রুমা?

রুমা বাবার প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই চোখ তুলে তাকিয়ে বিব্রতকণ্ঠে জবাব দিলে, আমি ঠিক···

সুচারুর প্রশ্নে আর রুমার উত্তর দেবার ধরনে যুবকটি কৌতুক-বোধ করছিল। সে হাসিমুখে বললে, এ আপনার অন্যায় প্রশ্ন।··· বার-চোদ্দ বছর আগে তখন রুমাও নিতান্ত ছেলেমানুষ আর আমিও বালক মাত্র···রুমার পরিচয় আগে থেকে জানা না থাকলে ওকে দেখে আমি বরং লজ্জাই পেতাম। চিনতে পারা দূরের কথা—

সকলে মিলে একসঙ্গে হাসতে থাকে।

যুবকটি পুনরায় বললে, আমি তো ভাবতেই পারি না যে, সেদিনের সেই রুমা একদিন এত সুন্দর হয়ে উঠবে!

মিনতির চোখ মুখ খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আর সুচারুর মুখে দেখা দিয়েছে এক ঝলক প্রশান্ত হাসি। রুমা লজ্জারুণ হয়ে উঠলেও একটা অদ্ভুত আগ্রহভরা দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছে যুবকটিকে। কথাগুলি ওর অত্যন্ত স্পষ্ট এবং কৃত্রিমতাহীন। সহজ কথা সুন্দর হয়ে উঠেছে বলার ভঙ্গীতে।

রুমা তার স্মৃতির সাগরে ডুবে গিয়ে প্রাণপণে হাতড়ে বেড়াচ্ছে, সন্ধান করে ফিরছে। তার অন্যমনস্ক মুখের পানে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে টিপে টিপে হাসছিল যুবকটি। সহসা সেইদিকে দৃষ্টি পড়তেই রুমার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বিচিত্র উল্লাসে হেসে উঠে বললে, কি আশ্চর্য! তুমি বিকু-দা না? তোমাকে চিনতে আমার এত দেরী হ'ল!

বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টিতে খানিক চেয়ে থেকে বিহ্বলকণ্ঠে বললে, তুমি আমায় সত্যিই অবাক করে দিলে রুমা।

স্মিতহাস্যে রুমা বললে, আরও আশ্চর্য সেই সঙ্গে এমন সব

কথা মনে পড়েছে যা কোনদিন ভুলেও একদিনের জন্যও মনের কোণে দেখা দেয় নি। বোধ হয় একটার সঙ্গে আর একটা জড়িয়ে ছিল। টান পড়তে সবগুলো একসঙ্গে আত্মপ্রকাশ করেছে। কি যে সব ছেলেমানুষী কাণ্ড বিকাশ-দা—

বিকাশ মুখ টিপে টিপে হাসতে থাকে। কথাগুলি তারও হয় তো মনে পড়েছে।

রুমার বাবা এবং মা এসব কথায় কানই দিলেন না। বার বছর পূর্ব্বের দুটি কিশোর বালক-বালিকার ছেলেমানুষী কাণ্ড নিয়ে তাদের মাথা ঘামাবার কিছু থাকতে পারে বলেও তাঁরা মনে করেন না।

কিন্তু রুমার ভবিষ্যৎ-জীবনে সেদিনের সেই সব ছেলেমানুষী খেলাকে কেন্দ্র করেই আবার নতুন করে ধীরে ধীরে সার্থকতার পথে এগিয়ে চলতে লাগল। সেদিনের সেই নকল ফুলের মালা যদি আজ আসল হয়ে ফিরে আসে রুমা তাকে কণ্ঠে ধারণ করে ধন্য হয়ে উঠবে। অথচ এ কথাটা আজ সে কিছুতেই বলতে পারছে না। কোথা থেকে এক বোঝা লজ্জা আর সঙ্কোচ এসে তার কণ্ঠরোধ করে ধরেছে।

রুমার বাবা মা এমনকি বিকাশ পর্য্যন্ত আশ্চর্য্য রকম নীরব। রুমার ভিতরে ভিতরে যত উৎকণ্ঠা বাড়ছে বাইরে সে ততই গম্ভীর হয়ে উঠছে। নরেন কিংবা হীরেন, কমল অথবা শিবনাথকে ইদানীং আর রুমার আশে-পাশে দেখা যায় না। তারা দূর থেকে উঁকি মেরে আরও দূরে সরে গেছে। আর অনেক দূরের যে সে অতি নিকটে চলে এসেছে। একদিনের ছেলেমানুষী খেলাটাকে আজ আর নিছক খেলার ছলেও রুমা মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না।

মিনতি মেয়ের এই পরিবর্ত্তন দেখে খুশী হন। যে বয়সের যা ধর্ম্ম। কিন্তু সুচারু উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন। রুমা তো এমন ছিল না। হঠাৎ ও যেন বুড়িয়ে গেছে। আমার মোটেই ভাল ঠেকছে না।

মিনতি একগাল হেসে বলেন, তোমার চশমার পাওয়ার বেড়েছে। তাই দেখতে পাচ্ছ না। কাঁচটা বদলে ফেল সব পরিষ্কার দেখতে পাবে।

কাঁচ বদলাবার প্রয়োজন হয় নি সুচারুর। খালি চোখেই তিনি সব দেখতে পেয়েছিলেন।

সেদিনের সকালটা আরও সুন্দর আরও বর্ণবৈচিত্র্যে রূপময় হয়ে উঠেছে। ঝাউগাছের পাতায় পাতায় কাঁচা রোদের লুকোচুরী খেলাটা আরও উপভোগ্য মনে হচ্ছে রুমার কাছে। ঝিরঝিরে মিষ্টি বাতাস আজ শুধু একলা আসে নি। চমৎকার মিষ্টি আর মাতাল-করা গন্ধ ও সুর বহন করে নিয়ে এসেছে।

বিকাশ ওকে গ্রহণ করে ধন্য হতে চায় আর রুমা তাকে আশ্রয় করে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে চায়।

রুমার ঘরে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। হাওয়া বয়ে যাচ্ছে দেবদারু গাছের পাতায় একটা পুলক শিহরণ জাগিয়ে। সে হাওয়া দোলা দিচ্ছে রুমার সদ্যজাগ্রত চেতনাকে। আবেশে ওর চোখ বুজে আসছে। হাত বাড়িয়ে পালকের বালিশটাকে সে বুকে তুলে নিলে। ওর ভবিষ্যৎ-জীবনের একটি পরম অনুভূতিকে।

ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রের এক দিক

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চোধুরী

মুসলমান সভ্যতার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ভারতবর্ষের সঙ্গে সম্পর্ক সংস্থাপিত হওয়ার সময় থেকেই মুসলমানেরা ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন।

১। ভারতের বাইরে

খলিফাদের রাজত্বের আরম্ভের দিকে ভারতীয় জ্ঞান সমাহরণের জন্য যখন তাঁরা ব্যস্ত, তখন সঙ্গীত, আয়ুর্বেদ, খনিজপদার্থবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে সংস্কৃত কতিপয় গ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা জ্যোতিষশাস্ত্রের কয়েকটি গ্রন্থও অনূদিত করিয়ে নেন। খ্রীষ্টীয় ৭৫০ সনে যখন আব্বাসীয় খলিফারা বাগদাদে নূতন রাজধানী প্রবর্তনপূর্বক জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা প্রবৃদ্ধির জন্য বদ্ধপরিকর, তখন একজন ভারতীয়ই বাগদাদে ৭৭১ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে ব্রহ্মগুপ্তের ব্রাহ্ম-সিদ্ধান্ত এবং খণ্ডখাদ্যক গ্রন্থ সেখানে প্রবর্তনের জন্য উদ্‌গ্রীব হন এবং তাঁর অনুরোধে[১] খালিফ আবু জফর অল মনসুর (৭৫৩—৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ) মহম্মদ ইবন ইব্রাহিম অল ফজেরির দ্বারা এই গ্রন্থদ্বয় অনুবাদ করান।[২] তখন ভারতবর্ষের সিন্ধুপ্রদেশ মুসলমানদের করতলগত ছিল। খলিফ হরুনের সময়েও (৭৮৬—৮০৬ খ্রীষ্টাব্দ) কয়েকটি জ্যোতিষের গ্রন্থ আরবীতে অনূদিত হয়।

সুলতান মহম্মদ গজনি (৯৭০—১০৩০ খ্রীষ্টাব্দ) যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন তাঁর সঙ্গে শেখ আবদুল রৈহান মহম্মদ ইবন আহম্মদ অলবেরুণীও (৯৭৩—১০৪৮ খ্রীষ্টাব্দ)

---

(১) খুব সম্ভবতঃ—ব্রহ্মগুপ্ত নিজেই। তিনি সেখানকার জ্যোতিষের অধ্যাপক ছিলেন।

(২) মতান্তরে খালিফ আবদুল্লা-অল-মামুন (৮১৩-৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ) এই সিদ্ধান্ত গ্রন্থটি মহম্মদ ইবন মুসা অল খ্বরিজমিকে (৭৮০-৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ) দিয়ে অনুবাদ করান।

ভারতে আগমন করেন। এদেশে অবস্থানকালে (১০১৭—১০৩১ খ্রীষ্টাব্দ) তিনি গ্রীক শিক্ষা দিতেন এবং নিজে সংস্কৃত শিক্ষা করতেন। ভারতবর্ষে অবস্থানকালে তিনি এত সুন্দর সংস্কৃত শিখেছিলেন যে তার সাহায্যে তিনি ভারতীয় সভ্যতার অন্তস্তলে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর লেখা "তারিখ অল হিন্দ" নামক গ্রন্থ সেই যুগের এবং তৎপরবর্তী যুগের ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর-গ্রন্থ, সন্দেহ নেই।

এই অলবেরুণী নিজে জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। তিনি সংস্কৃত থেকে আরবী ভাষায় কয়েকটি জ্যোতিষ-গ্রন্থ অনুবাদ করেন। মুসলমানদের নিকট ৯৫০ সন বা তৎপূর্ববর্তী সময়ে কি কি গ্রন্থ বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল, এ গ্রন্থ থেকে সে বিষয়ে অনেক সংবাদ পাওয়া যায়।

অলফজরী, ইয়াকুব বিন তারিক এবং অবু অলহসন নামক মুসলমান জ্যোতির্বিদগণ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধে হিন্দু জ্যোতিষিগণের গ্রন্থের সাহায্যাবলম্বনে জ্যোতিষের গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁরা প্রথমে হিন্দু জ্যোতিষ এবং পরে টোলেমির গ্রীক জ্যোতিষ শিক্ষা করেন। পূর্বোক্ত মনীষিগণের জ্যোতিষ-গ্রন্থ এখন কালের কুক্ষিতে বিলীন হয়ে গেছে. কিন্তু অলবেরুণী এই তিন জনের গ্রন্থই সঙ্গে করে ভারতবর্ষে এনেছিলেন। তাঁর গ্রন্থে প্রথম দু'জন গ্রন্থকারের মতাবলী প্রায়ই উদ্ধৃত দেখা যায়। এই সকল গ্রন্থে কাল ভান, মহাযুগ বা কল্পে গ্রহভগণ সংখ্যা, গ্রহকক্ষাযোজন, মধ্যমগ্রহসাধনের নিমিত্ত অহর্গণের নিয়মাবলী, ভুজজ্যা, গ্রহের অস্তোদয়, চন্দ্রদর্শন প্রভৃতি হিন্দু জ্যোতিষের অনেক বিষয় পর্যালোচিত হয়েছিল।

অলবেরুণী পুলিস-সিদ্ধান্ত নামক জ্যোতিষ-গ্রন্থ এবং তার একটি টীকাও অনুবাদ করেছিলেন। এই গ্রন্থ বিষয়ে অনেক বৃত্তান্ত তাঁর গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়। তিনি বলেন —গ্রীক "পৌলিশ" কথাটি থেকে "পুলিস" কথাটির উৎপত্তি। অলবেরুণীর গ্রন্থ থেকে এটি সুস্পষ্ট যে উৎপলোদ্ধৃত পুলিস-সিদ্ধান্ত তাঁর সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

অলবেরুণী অবু অল হসনের গ্রহভগণ সংখ্যা সম্বন্ধে যা উল্লেখ করেছেন, তা আর্যভট্টের মতানুযায়ী। খুব সম্ভবতঃ, খলীফ মনসুরের সময়ই "আর্যভট্টীয়" আরবী ভাষায় অনুদিত হয়েছিল। অলবেরুণী ৪২৭ শকাব্দ বরাহমিহিরের প্রাদুর্ভাব সময় বলে উল্লেখ করেছেন। বেরুণী খণ্ডখাদ্যের বলভদ্র-টীকার উল্লেখ মাঝে মাঝে করেছেন। বেরুণী এও বলেছেন যে, বলভদ্র গণিত, সংহিতা ও জাতক বিষয়ে মৌলিক গ্রন্থ ব্যতীত বৃহজ্জাতকের একটি টীকাও রচনা করেছিলেন। বেরুণী বৃহন্মানসকরণ গ্রন্থের উৎপলটীকা এবং লঘুমানস নামক তার একটি সংক্ষিপ্তসার গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। লঘুমানসের তারিখ ৮৫৪ শকাব্দ; কাজেই বৃহন্মানস তাঁর পূর্বে রচিত হয়েছিল, সন্দেহ নাই। বেরুণী বিত্তেশ্বরের করণসার নামক গ্রন্থ ৮২১ শকাব্দে রচিত বলে উল্লেখ করেছেন। বেরুণী পৃথূদক স্বামী নামক জ্যোতিষীর মত উদ্ধৃত করতে গিয়ে একস্থানে বলেছেন যে, তাঁর মতে উজ্জয়িনী থেকে কুরুক্ষেত্রের দূরত্ব ১২০ যোজন। করণগ্রন্থের মধ্যে তিনি রাহুন্নাকরণ ও করণপাত নামক গ্রন্থেরও উল্লেখ করেছেন। বেরুণীর মতে কাশীস্থ বিজয়নন্দীর করণতিলক গ্রন্থ ৮৮৮ শকাব্দে রচিত হয়েছিল। এভাবে অলবেরুণী আরও অনেক করণগ্রন্থের নামোল্লেখপূর্বক বলেছেন যে করণ পর্যায়ের অগণিত গ্রন্থ তখন বিদ্যমান ছিল।

অলবেরুণীর জ্যোতিষ-জ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনার জন্য একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের রচনা প্রয়োজন। এখানে আমাদের বক্তব্য এই যে, অলবেরুণী যে সকল গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, বিশেষতঃ যে সকল জ্যোতিষ গ্রন্থ তাঁর সময়ে আরবী ভাষায় অনুদিত হয়েছিল, সে সকল গ্রন্থের অনেকগুলিই নিশ্চয় মুসলমান-রাজন্যবৃন্দেরও মনোযোগ ও সমাদর লাভ করেছিল। মুসলমান-রাজন্যবৃন্দ এ সকল গ্রন্থ বিষয়ে উদাসীন থাকলে হিন্দু জ্যোতিষও বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যপত্তনে সমর্থ হ'ত কিনা সন্দেহ এবং অলবেরুণীর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই—এই জন্য যে যদি তিনি তাঁর রচনার মাধ্যমে এই সকল গ্রন্থের অংশবিশেষ সমুদ্ধৃত এবং তৎসম্বন্ধে পর্যালোচনা না করতেন তা হলে এ সকল গ্রন্থের অনেকগুলির নাম পর্যন্তও পৃথিবী থেকে ধুয়ে মুছে যেত।

২। ভারতবর্ষে

ভারতবর্ষে বিভিন্ন মুসলমান রাজবংশের রাজত্বসময়ে রাজা, সামন্ত এবং অন্যান্য বিদ্যোৎসাহিগণ সংস্কৃত শিক্ষা সংপ্রসারণ এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে জ্ঞানার্জনের বিষয়ে সচেষ্ট হয়েছেন। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা এখানে সম্ভবপর নয়।৩ বাঙালী পাঠকদের জন্য বিশেষ করে একটি কথা এখানে বলা দরকার যে—বঙ্গদেশে মুসলমান রাজত্বকালেই নব্যন্যায় এবং নব্যস্মৃতির মত দুইটি ব্যাপক ও বিশাল নবীন বিষয় জন্মলাভ করেছিল এবং শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সময় থেকে (খ্রীষ্টীয় ১৪৮৫—১৫৩৩ অব্দ) এক শত বৎসরের মধ্যে

(৩) এই বিষয়ে গ্রন্থকারের Muslim Patronage to Sanskrit Learning এবং Muslim Contributions to Sanskrit Literature নামক গ্রন্থমালাদ্বয় দ্রষ্টব্য।

কলেজে পড়া বৌ

সুনয়নী দেবীর দুঃখের অন্ত নেই। কি ভুলই না তিনি করেছিলেন ছেলেকে কোলকাতায় লেখা-পড়া শিখতে পাঠিয়ে। ছেলে কিনা বিয়ে করে বসল এক কলেজে পড়া মেয়েকে! ছেলের জন্যে তিনি পাত্রী ঠিক করেছিলেন কেষ্টনগরের বনেদী চাটুজ্যে পরিবারে। ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটি—বয়স একটু কম কিন্তু তাতে কিইবা এসে যায়? টাকার কথাটাও ফ্যালনা নয়। নগদ দশ হাজারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল চাটুজ্যেরা। কথাটা এখনও ভাবলে খচ্ করে লাগে সুনয়নী দেবীর বুকে।

সুতপা ঘরে এলো দুগাছি শাঁখা আর দুগাছি চুড়ী সম্বল করে। প্রথম দিন প্রণাম করতে যাওয়ার সময় সুনয়নী দেবী পেছিয়ে গিয়েছিলেন দু'পা, "থাক থাক মা,"—তাঁর মুখে বিষাদের ছায়া কলেজে পড়া মেয়ে সুতপার দৃষ্টি এড়ায়নি। সেই প্রথম দিনটি আজ প্রায় দেড় বছর পেছনে কিন্তু আজও শ্বাশুড়ী কলেজে পড়া বৌকে আপন করে নিতে পারেন নি। রান্নাঘরের কোন কাজে সুতপা সাহায্য করতে এলেই তিনি বলেন—"থাক থাক বৌমা—এসব তো তোমাদের অভ্যাস নেই, আবার মাথা ধরবে।"

বিমল কোলকাতার এক সদাগরী আফিসে ডেলি প্যাসেঞ্জারী করে চাকরী করে। থাকে সহর-তলীতে। রোজগার সামান্যই। বিয়ের আগে অস্বাচ্ছন্দ্য বিশেষ বুঝতে পারেনি। কিন্তু বিয়ের দেড় বছর পরে আজ বুঝতে পারে যে খরচ সং-কুলান করা দরকার। দায়ীত্ব অনেক বেড়ে গেছে, কিছু সঞ্চয়ও থাকা দরকার। মায়ের হাতেই সংসার খরচের টাকা সে তুলে দেয়। ইদানিং মাকে আকারে ইঙ্গিতে দু একবার বলেছে যে খরচ কিছু কমানো দরকার। কিন্তু সুনয়নী দেবী গেছেন চটে। "তোর কলেজে পড়া বৌ বুঝি তোকে এই সব বুদ্ধি দিচ্ছে? এত দিন তো তোর এসব মনে হয়নি?" ভয়ে বিমল আর কিছু বলতে পারেনি।

সুতপা কিন্তু ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেনি। "তুমি বুঝিয়ে বল মাকে। আর তিন মাস পরে আমাদের প্রথম সন্তান আসবে। এখন চারিদিক সামলে সুমলে না চললে চলবে কেন? তাছাড়াও ধর অসুখ বিসুখ আছে, সবাইয়ের সাধ আহ্লাদ আছে, কিছু তো বাঁচাতেই হবে। মায়েরই তো কতদিনকার সখ একটা গরদের থানের আর কত দিন তোমায় বলেছেন তরকারীর বাগানটা বেশ সুন্দর বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে দিতে।"

মরীয়া হয়ে বিমল গেল মায়ের কাছে। খুলে বলল তাঁকে মনের কথা। কিন্তু হিতে বিপরীত হোল। সুনয়নী দেবী গেলেন ক্ষেপে। "যখনই তুই ওই কলেজে পড়া মেয়েকে বিয়ে করেছিস তখনই জানতাম পরিবারে অশান্তি আসবে। থাক তুই তোর বৌ আর সংসার নিয়ে—আমি চললাম দাদার বাড়ী।" কিছুতেই আটকানো গেল না

তাঁকে। বাক্স প্যাঁটরা গুছিয়ে নিয়ে তিনি চলে গেলেন বরানগরে।

ফিরে এলেন তিনি প্রায় তিন মাস পরে। তাও এমনি নয়, বিমলের ছেলে হওয়ার খবর পেয়ে। বাড়ীতে ঢুকতে গিয়ে তিনি অবাক। তাঁর সাধের ঝিঙে আর লাউডগার বাগানের চারপাশ দিয়ে কচি বাঁশের সুন্দর বেড়া। গেলেন সুতপার ঘরে। ফুটফুটে নাতীকে নিলেন কোলে তুলে। বিমল এসে ঢুকলো গরদের থান নিয়ে। আনন্দে সুনয়নী

দেবীর চোখের দুই কোণে জল চিকচিক করে উঠল। সুতপা বিছানা থেকে ক্ষীণস্বরে বলল—"মা তোমায় আর কখনও বাড়ী ছেড়ে যেতে দেব না।" সুনয়নী দেবী তার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, "কি ভয় নিয়েই ফিরেছিলাম মা, হয়তো দেখব বাড়ীঘর সব ছারখার হয়ে গেছে—কিন্তু কি লক্ষ্মীশ্রী সারা বাড়ী জুড়ে, চোখ যেন জুড়িয়ে গেল—না মা কোথায় যাব এমন বৌ-নাতী ফেলে?"

এক দিন শুধু তিনি সুতপাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"কি করে এত গুছিয়ে চালালে তুমি মা?" সুতপা বলল—"মা খরচ কত দিকে বাঁচাই দেখুন! উনি আগে আপিসে পয়সা খরচ করে আজে বাজে খাবার খেতেন, এখন বাড়ী থেকে টিফিন বাক্সে আমি ওঁর খাবার দিই। এতে খরচ অনেক বাঁচে, আর খাওয়াটাও ভাল হয়। ঠিকে চাকরটাকে ছাড়িয়ে দিয়েছি— কাপড় কাচা, বাসন মাজা এসব কাজ আমি আর ঝি ভাগাভাগি করে করে নিই। আর সব চেয়ে বেশি সাশ্রয় করেছি খাবারে। আগে আপনি ঘি কিনতেন অত দামে—আর সে ঘি'ও সব সময় ভাল হোত না। আমি ঘিয়ের বদলে কিনি ডালডা মার্কা বনস্পতি। ডালডায় ঘিয়ের সমান ভিটামিন 'এ' থাকে। ভিটামিন 'এ' চোখ আর ত্বক সুস্থ রাখে। আর থাকে ভিটামিন 'ডি' যা হাড়কে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। ডালডায় রাঁধা সব খাবারই অত্যন্ত মুখরোচক হয়। এই সব কারণেই এবং স্বাস্থ্যদায়ক বলেই ডালডা আজ আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ পরিবারে নিত্য ব্যবহার হচ্ছে। ডালডা "শীল" করা ডবল ঢাকনা'ওলা টিনে সব সময় খাঁটি ও তাজা পাওয়া যায়। তাছাড়া ডালডায় ভেজালের কোন ভয় নেই কারণ খাঁটি ডালডা সব সময় পাওয়া যায় খেজুর গাছ মার্কা টিনে।"

সুনয়নী দেবী মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকেন তাঁর কলেজে পড়া বৌয়ের দিকে।

কেবল বঙ্গদেশ ও বৃন্দাবনেই শত শত সংস্কৃত গ্রন্থ বিরচিত হয়েছিল। এই গ্রন্থকারদের মধ্যে অন্যতম শ্রীল রূপ গোস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার করার জন্য বাদশাহ আকবর স্বয়ং দিল্লী থেকে বৃন্দাবন পর্যন্ত ছুটে এসেছিলেন। এই আকবর বাদশাহ এবং তাঁর বংশধরেরাই জ্যোতিষশাস্ত্রেরও বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

খ্রীষ্টীয় ১৫৫১ থেকে ১৬৫০ সনের মধ্যে মুসলমান রাজত্ব-সময়ে বিশেষতঃ, মোগলশাসিত ভারতীয় রাজ্য বা প্রদেশ-সমূহের যে সকল বিশিষ্ট দৈবজ্ঞ বা গণক স্বীয় মনীষা ও ও প্রজ্ঞাবলে রাজদরবারে ও সামাজিক জীবনে বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন, আমি এখানে তাঁদের নামোল্লেখ মাত্র করছি। এ পর্যন্ত এঁদের লিখিত দুই শতাধিক জ্যোতিষ-গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তন্মধ্যে সামান্য কয়েকটি মাত্র প্রকাশিত হয়েছে।৪

জ্যোতিষিগণের নাম

১। অনন্তদেব। ২। কেশব দৈবজ্ঞ। ৩। কৃষ্ণ গণক বা দৈবজ্ঞ। ৪। গঙ্গাধর দৈবজ্ঞ। ৫। গণেশ দৈবজ্ঞ। ৬। ঢুণ্ঢিরাজ। ৭। নারায়ণ দৈবজ্ঞ। ৮। নীলকণ্ঠ দৈবজ্ঞ। ৯। নিত্যানন্দ। ১০। প্রভাকর। ১১। বলভদ্র। ১২। মাধব জ্যোতিবিদ। ১৩। মণিরাজ দীক্ষিত। ১৪। রঘুনন্দন সার্বভৌম ভট্টাচার্য। ১৫। রাজর্ষি। ১৬। রাম। ১৭। রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি। ১৮। বিশ্বনাথ দৈবজ্ঞ। ১৯। বিশ্বরূপ দৈবজ্ঞ। ২০। বিষ্ণু দৈবজ্ঞ। ২১। শঙ্কর। ২২। শিব। ২৩। হরজি ভট্ট। ২৪। হরিদত্ত ভট্ট।

জ্যোতিষবিষয়ক জ্ঞান এক-একটি পরিবারের মধ্যে কি অপূর্ব ভাবে দীর্ঘকাল বিরাজমান থাকতে পারে—তার একটি উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত হচ্ছে অনন্ত দৈবজ্ঞের পরিবার। উপরি-লিখিত বিশিষ্ট জ্যোতিষী পণ্ডিতগণের অনেকেই গুরু-পরম্পরা বা পারিবারিক সম্পর্ক—বিশেষতঃ, পুত্রপরম্পরা-সূত্রে আবদ্ধ।

উপরিলিখিত জ্যোতিষিগণের মধ্যে নারায়ণ ভট্ট আকবরের থেকে "জগদ্‌গুরু" উপাধি প্রাপ্ত হন। একই সম্রাটের থেকে নৃসিংহ পান জ্যোতিবিৎসারস উপাধি। হোরাগণনায় সার্থক ভবিষ্যদ্বক্তির নিমিত্ত কেশব শর্মা সম্রাট জাহাঙ্গীর থেকে "জ্যোতিষরায়" উপাধি প্রাপ্ত হন। আকবর ও জাহাঙ্গীর নীলকণ্ঠ দৈবজ্ঞকেও অত্যন্ত ভালবাসতেন। নীলকণ্ঠ ১৫৮৭ সনে "তাজিক" রচনা করেন এবং পর পর আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করে সংস্কৃত জ্যোতিষশাস্ত্রকে পরম সুসমৃদ্ধ করে তুলেছেন। তাঁর ঢোডরানন্দ সুসম্পূর্ণ গ্রন্থ—এ গ্রন্থে গণিত, মুহূর্ত এবং হোরা—তিনটি স্কন্ধই রয়েছে।

মাধব দৈবজ্ঞ লিখেছেন যে তাঁর পিতা গোবিন্দ দৈবজ্ঞকে অত্যন্ত ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন সম্রাট জাহাঙ্গীর। শ্রীকৃষ্ণ দৈবজ্ঞ খানখানান আব্দার রহিমের কোষ্ঠী রচনা করেছেন "জাতক-পদ্ধত্যুদাহরণ" নাম দিয়ে৫; তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরেরও বিশেষ শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন বলে রঙ্গনাথ তাঁর গূঢ়ার্থ-প্রকাশিকা নামক সূর্য-সিদ্ধান্ত টীকায় স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন।

রঙ্গনাথের পুত্র মুনীশ্বরের অন্য নাম বিশ্বরূপ। সম্রাট শাহজাহান তাঁর অত্যন্ত গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি তাঁর সার্বভৌমসিদ্ধান্ত নামক গ্রন্থে সম্রাট শাহজাহানের সিংহাসনাধি-রোহণের হিজরী সাল, মুহূর্ত, লগ্নকুণ্ডলী প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। এ গ্রন্থ থেকেই সম্রাট শাহজাহানের রাজ্যাভিষেকের সময় অতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানা যায়। মুনীশ্বর বা বিশ্বরূপ দৈবজ্ঞ বলেছেন শাহজাহান ১০৩৭ হিজরী সালের মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথি সোমবারে সূর্যোদয়ের ঠিক তিন ঘটিকা পরে রাজ্যে অভিষিক্ত হন। ঐ তারিখ ইংরেজী গণনানুসারে ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী। এ প্রসঙ্গে এটাও উল্লেখযোগ্য যে সুপ্রসিদ্ধ কমলাকর ভট্টের সঙ্গে মুনীশ্বরের সাতিশয় বিরোধ ছিল।

নিত্যানন্দ ১৬৩৯-৪০ সনে কুরুক্ষেত্রের নিকটস্থ ইন্দ্রপুরে তাঁর "সর্বসিদ্ধান্তরাজ" গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত ইষ্টকাল শোধন ও নিষেধবিচার গ্রন্থ অত্যন্ত উপাদেয় জ্যোতিষ-গ্রন্থ। ইনি গৌড়ের অন্তর্গত "ডুলীনহট্টীয়" (?)। মুসলমান রাজত্বসময়ে অন্য বাঙালী জ্যোতিষীদের মধ্যে রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

মুসলমান রাজত্বকালে ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রের পরি-পুতির ইতিহাসে মুসলমান জ্যোতিষগ্রন্থকার খানখানান আবদুল রহমান একটি স্থায়ী স্থান পাওয়ার যোগ্য। এঁর রচিত "খেটকৌতুক" জ্যোতিষীমাত্রেরই অবশ্য নিত্যব্যবহার্য গ্রন্থ। জনসাধারণের উপযোগী করেই সকলের সুপরিজ্ঞাত ফারসী শব্দের সঙ্গে সংমিশ্রিত সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রথম শ্লোকেই খানখানান আবদুল রহমান বলছেন:

ফারসীয়পদমিলিতগ্রন্থাঃ খলু পণ্ডিতৈঃ কৃতা পূর্বৈঃ।
সংপ্রাপ্য তৎপদপথং করবাণি খেটকৌতুকং পদ্যম্‌॥

(৪) এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য বর্তমান লেখকের Khan-Khanan Abdur Rahim and Contemporary Sanskrit Learning নামক গ্রন্থের ১০৯ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ দ্রষ্টব্য।

(৫) এই গ্রন্থ প্রাচ্যবাণীমন্দির থেকে বিগত বৎসর বিস্তৃত ইংরাজী ভূমিকা সহ প্রকাশিত হয়েছে।

অর্থাৎ "পূর্ব পূর্ব পণ্ডিতেরা ফারসীয় পদের সঙ্গে সংস্কৃত সংমিশ্রিত করে গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাদের সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমি পদ্যে "খেটকৌতুক" গ্রন্থ রচনা করছি। ভাষার সংমিশ্রণের প্রকার নিম্নোক্ত শ্লোক থেকে বোধগম্য হবে ;

তবংগরশ্চাম্বজসৌখ্যযুক্ স্যাদ্ দানাগ্রণীর্ভূপপ্রিয়সূসিপাহী।
সদাবকঃ পাকদিলো দবীরুল্বন্ধকো যদা
যাপ্তিমকানগঃ স্যাৎ ॥৪৯

অর্থাৎ 'যদি বুধগ্রহ রাশিচক্রের একাদশ গৃহে থাকে, তা হলে সেই জাতক ধনী, পুত্রজনিত আনন্দযুক্ত, দানে অগ্রণী, রাজপ্রিয় এবং যুদ্ধে বিশারদ, নেতৃস্থানীয় এবং প্রশস্ত হৃদয়যুক্ত হয়'। এখানে তবংগর ধনী, সিপাহী সৈন্য, পাক-দিল উত্তমহৃদয়যুক্ত দবীরুল্বন্ধক বুধগ্রহ, যাপ্তিমকান একাদশ স্থান, ক্রমান্বয়ে এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যে যুগে এই সকল শব্দ সংস্কৃতের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে, সে যুগে হিন্দু-অহিন্দু শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই ঐ কথাগুলি বুঝতে পারতেন নিশ্চয়।

উপসংহার

এই গ্রন্থে এই প্রকারের যে সামাজিক চিত্র আমরা ভারতের জ্যোতিষ-চর্চার মধ্যযুগ বা মুসলমান রাজত্বসময়ের পটভূমিকায় দেখলাম, সেই চিত্র সঙ্গীত প্রভৃতি চারুকলার ক্ষেত্রেও সমভাবে দেখা যায়। মহম্মদ শাহ "সঙ্গীতমালিকা" নামক যে সংস্কৃত অমূল্য সঙ্গীতগ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তা প্রাচ্যবাণী মন্দির থেকে কয়েক বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। মহম্মদ দারা শুকোহের সংস্কৃত দার্শনিক গ্রন্থ "সমুদ্র-সঙ্গম"ও আমরা প্রকাশিত করেছি। মহম্মদ দারা শুকোহ বিভিন্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের নিকট নিজের হৃদয়ের আবেগ যেভাবে ব্যক্ত করেছেন, তাও বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। এই সব চিত্রের পাশাপাশি রাখলে কবি বংশীধর মিশ্র কি করে, কোন্ সাহসে প্রকাণ্ড রাজদরবারে দাঁড়িয়ে জগন্নাথ পণ্ডিতরাজকে একেবারে একটা প্রকাণ্ড গরু বলে প্রতিপন্ন করেছিলেন, তা সহজেই বোঝা যায়। বংশীধর বলেছেন :

"সিংহ চিরকাল দেবীর বাহন ; শাহজাহান-মহিষীর বাহন আমি—সিংহ আর অন্য কে হতে পারে ? শাহজাহান-শিবের বাহন তুমি—জাতিতে তুমি কি হতে পার, পার্ষদেরা বিবেচনা করবেন।" সভায় আনন্দের রোল পড়ে গেল।৬ এ হ'ল কাব্যে হিন্দু মুসলমান সৌখ্যের পরিচিতি।

সংস্কৃত সঙ্গীতশাস্ত্র, এমনকি রাজদরবার থেকে বহু দূরে স্থিত মুসলমান পল্লীকবিদেরও কি সুন্দর করায়ত্ত ছিল—তার একটি উদাহরণ ভাষা-সাহিত্য থেকে দিয়ে এ প্রবন্ধ সমাপ্ত করছি। এই কবি ভারতবর্ষের পূর্বতম শেষ প্রান্তে চট্টগ্রাম জেলার "কক্সলডেঙ্গা" গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন—নাম কমর আলী, হিন্দু-মুসলমান সকলেই সসম্ভ্রমে সাদরে তাঁকে পণ্ডিত কমর আলী বলে ডাকতেন। "খিতাপচর" গ্রামের চাঁপা গাজীর মত তিনিও আশেপাশের দশ গ্রামের হিন্দু-মুসলমান সকলেরই সঙ্গীত-গুরু ছিলেন। রাধার যে বারমাস্যা তিনি রচনা করেছেন, তাতে মাঘ মাসে রাধার কষ্ট বর্ণন করতে গিয়ে বলছেন :

"মাঘল মাসেতে রিত ন গুণ পড়ে জাড় ৭
ছাড়ি গেল প্রাণকৃষ্ণ কি গতি আমার।
বহি যাত্র মালব রাগ শ্যাম ব্রজে নাই।
কৈয় কৈয় রাগ রীত মাধবের ঠাঁই॥"

আবার বৈশাখ মাসে গরমের মধ্যে যখন বর্ষার রূপরেখা ধরা পড়ে, তখন মল্লারের মাধ্যমে রাধার দুঃখের জগদ্ব্যাপী আবির্ভাব :

"বৈশাখ মাসেতে রিত বহেরে নিদাঘ।
গাহিতে সুস্বর অতি মল্লার সুরাগ॥
শতদল কমল মোর হইল বিকাশ।
মোহর৮ ভোমর কৃষ্ণ নাই মোর পাশ"॥

শ্রাবণ মাসেতে যখন 'কোড়ার' পাখীর ডাকে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, তখন সে ক্ষত নিবারণের জন্য যে রাগের প্রয়োজন, সেই শ্রীরাগ কে গাহিবে—"শ্রীরাগ গাহিতে শ্যাম নাহি বৃন্দাবন॥" "আগ্রাণ" মাসে চার ধারে নয়া ধান ; এমনকি গরল পর্যন্ত মধু লাগে যে সময়ে, সে সময়ে কর্ণাট রাগ ছুটে চলেছে, সে সময়ে কানু কৈ—"মধু মিষ্ট লাগে মোর গরল সকল। বহি যাত্র কর্ণাট রাগ জীবন বিফল"॥ এ ভাবে সাহিত্য, সঙ্গীত, দৈনন্দিন জীবনযাত্রোপযোগী জ্যোতিষ—সর্বশাস্ত্রে কর্ণাট—রাগ বয়ে গেল, কিন্তু আমাদের মিলনের কানু আজ কোথায় ?

---

(৬) প্রাচ্যবাণী থেকে প্রকাশিত সংস্কৃত কোশকাব্যগ্রন্থ পদ্যামৃত-তরঙ্গিণীর ২০০-২০১নং শ্লোক দ্রষ্টব্য।

(৭) শীত। (৮) মোর বা আমার।

মান্দ্রাজে নবারাত্রি বা নৌরাত্র: ও কলু উৎসব

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

মান্দ্রাজে ও মহারাষ্ট্রে নৌরাত্র একটি বিশেষ পূজা-উৎসব, তবে দু'দেশের রীতিনীতিতে সামান্য কিছু প্রভেদ আছে। আমাদের দেশের দুর্গাপূজা এবং এই দুই প্রদেশের নবারাত্রি বা নৌরাত্র উৎসব ও পূজা মূলতঃ প্রায় একই বস্তু।

মহালয়া অমাবস্যার দিন নবারাত্রির পূজা ও উৎসব সুরু হয়। এই দেবীপূজা বিশেষ নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে করতে হয়। কারণ দেবী এই সময় মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং অবশেষে মহিষাসুরকে বধ করেন, তখন তাঁর মেজাজ থাকে উগ্র। তাই এই দানবদলনীর পূজাতে যাতে একটুও খুঁৎ না থাকে, তার জন্য মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণেরা বিশেষ শঙ্কিত থাকেন। তাঁরা মহালয়ার পূর্ব্বদিন স্নান করে ভিজে কাপড়ে, পূজার সময় যে বস্ত্র ব্যবহার করা হবে তা ধুয়ে শুকিয়ে তুলে রাখেন। যে পূজারী ব্রাহ্মণ পূজা করবে তার জন্য একখানা নূতন বস্ত্র হলুদের জলে চুবিয়ে রেখে রঙীন করা হয়, যারা ধনী তারা অবশ্য ব্রাহ্মণকে পট্ট-বস্ত্র দেয় পূজার সময়। এই নবারাত্রির উৎসবে নিজ নিজ অবস্থানুযায়ী লোকে আড়ম্বর করে ও এই পূজাতে পাঁচ-সাতশো থেকে সুরু করে হাজার দু'হাজার অবধি টাকা ব্যয় করে।

মহালয়ার দিন পূজারী ঘটস্থাপনা করেন। রৌপ্যনির্ম্মিত পাত্র, অথবা পঞ্চধাতুর তৈরী পাত্র এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। ঘটটি জলপূর্ণ করে তাতে আমপাতা, তুলসীপাতা, বেলপাতা ও অন্য দুটি পাতাতে সিন্দুর-ফোঁটা দিয়ে ঘটে রাখে, উপরে একটি নারকেল রাখে এবং এই ঘটকেই দেবীর প্রতীক হিসাবে পূজা করা হয়। গৃহস্বামী ও গৃহকর্ত্রী স্নানান্তে পূর্ব্বের ধৌতবস্ত্র পরিধান করে পূজাগৃহে বসেন, হরিদ্রারঞ্জিত নববস্ত্র পরিহিত পুরোহিত "কালিসম্" বা ঘটস্থাপনা করে দেবীকে আহ্বান করে মন্ত্রপাঠ আরম্ভ করেন এবং গৃহস্বামী ও গৃহস্বামিনী দেবীকে নিজ গৃহে মনে-প্রাণে আহ্বান করে স্বাগতম করেন।

যাঁরা খুব গোঁড়া ব্রাহ্মণ তাঁরা কালিসমের সঙ্গে সঙ্গে "আঘনডম" করেন। 'আঘনডম' হ'ল নয় দিন ও নয় রাত্ত ঘিয়ের প্রদীপ অহরহ জ্বলবে, কখনও নিভতে পারবে না। এই ঘিয়ের প্রদীপ আঘনডমে কিছু পর পর ঘি ঢালবার জন্য ও পূজাকার্য্যের সাহায্যের জন্য এক জন "সুমঙ্গলী" রাখা হয়। সুমঙ্গলী হলেন সধবা নিষ্ঠাবতী মহিলা, তিনি এই নয় দিন, রোজ স্নান করে ভিজে কাপড়ে যে কাপড় ধুয়ে শুকিয়ে রাখা হয়েছে সেই কাপড় পরে পূজাগৃহে থাকবেন ও সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডে সাহায্য করবেন, পূজা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত উপবাসী থাকতে হয় তাঁকে।

ভোরে ছয়টাতে পূজা আরম্ভ হয় এবং তিন ঘণ্টার অধিক সময় এই 'কালিসম' পূজা চলতে থাকে, পূজা শেষ হলে 'মহানৈবদ্যম' দেওয়া হয়। 'মহানৈবদ্যম' হ'ল দেবীর ভোগ, অতি নিষ্ঠাসহকারে অন্ন, ব্যঞ্জন, পায়স, মিষ্টি দইয়ের বরফি ইত্যাদি তৈরী করে ভোগ দেওয়া হয়, এতে টমেটো ও পেঁয়াজ নিষিদ্ধ।

'কালিসম' পূজা শেষ হলে হবে বালাপূজা (কুমারী পূজা)। আমাদের দেশেও কুমারী পূজার অনুষ্ঠান হয় দুর্গাপূজার সময়। গৃহকর্ত্রী অবস্থা অনুযায়ী পাঁচ হতে পঁচিশটি কুমারী পূজা করেন, সাধারণ গৃহে কমপক্ষে পাঁচটি কুমারী পূজা করতেই হবে। দেবীর সহস্র নাম, শত নাম ও অষ্ট নাম আছে, যে যার অবস্থা অনুযায়ী অষ্ট নাম বা শত-সহস্র নাম উচ্চারণ করে মন্ত্র পাঠ করতে পারে। পাঁচটি বালাকে নিমন্ত্রণ করে এনে পূজাগৃহে বসান হয়। পূজা শেষ হলে আবার নৈবদ্যম দেওয়া হয়, তাতে নারকেল, কলা, ফলমূলাদি

থাকে। পুরোহিত মন্ত্র বলতে থাকেন এবং গৃহকর্ত্রী যথারীতি হলুদ, কুঙ্কুম-চন্দন ও চাল দিয়ে বালাপূজা করেন ও আবাপোষণম করেন। আবাপোষণম হ'ল গৃহকর্ত্রী বালাদের প্রত্যেকের হাতে কিছু কিছু জল দেবেন হাত ধোবার জন্য মন্ত্র পাঠ করে। তার পর কলাপাতায় অবসরনৈবদ্যম প্রসাদ স্বরূপ খেতে দেন।

এই কালিসম্ ও বালাপূজার পর নববর্ণাপূজা হয়। দেবীর ললিতাসহস্র নাম নিয়ে নয় বার পূজা হয়। ঘটের উপর এক হাতে দুধ ঢেলে ও অন্য হাতে ফুল দিয়ে পুরোহিত মন্ত্র বলতে থাকেন ও নয় বার শুকনা ফল, কিসমিস ইত্যাদি নৈবেদ্য দিতে থাকেন। এবার দেবীর নিকট হবে বলি। দেবীর সামনে এক স্থানে নানা রঙের গুড়ো দিয়ে আলপনা দেওয়া হয়। তার পর অতি শুদ্ধমতে ভাত রান্না করে সেই ভাত চটকিয়ে পাঁচটি গোল বলের মত তৈরি করা হয়। সেই আলপনা দেওয়া জায়গায় গৃহকর্ত্রী সেই ভাতের পাঁচটি মণ্ড রেখে তার উপর সিন্দুর-ফোটা দেন। পুরোহিত মন্ত্র বলতে থাকেন ও গৃহকর্ত্রী একটি লেবু বলি দেন। মানে ছুরি দিয়ে লেবুটিকে দু'টুকরা করেন, এবং মন্ত্র বলার সঙ্গে সঙ্গে সেই কাটা-লেবুর রস পাঁচটি ভাতের মণ্ডের উপর ছড়িয়ে দেন।

এই নবারাত্রির পূজার জন্য কমপক্ষে পাঁচ জন পুরোহিত নিযুক্ত করা হয়। তাঁরা সবাই হরিদ্রারঞ্জিত ধৌত নববস্ত্র পরে পূজার কাজ করেন। এদিকে যখন বলি ও পূজা চলে তখন অন্যদিকে অন্য পুরোহিত "রুদ্রাভিষেকম" অর্থাৎ শিবের অভিষেক করেন।
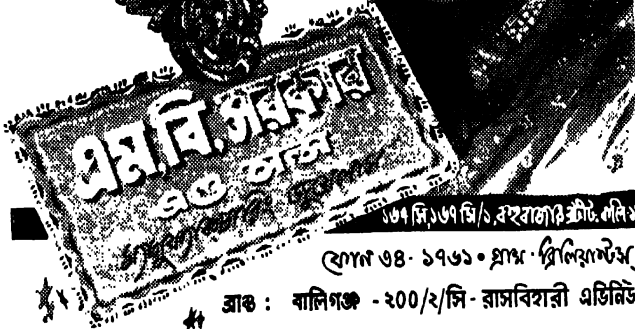
পুরোহিত সহস্র নাম নিয়ে শিবলিঙ্গকে দুগ্ধ, দধি, মধু, শর্করা ও জাফরান সহযোগে মন্ত্র বলে অভিষেক করেন। শিব-পূজায় বিল্ব-পত্র প্রচুর থাকা চাই।

একবার কালিসম অর্থাৎ বোধনের পর মহানৈবত্তম্ দেওয়া হয়। এবার দেবীর জন্য আবার ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে মহানৈবত্তম্ রান্না করে ভোগ দেওয়া হয়। কমপক্ষে পঁচিশটি ব্রাহ্মণ ভোজন করান হয়।

অন্য পূজারী "সূর্যায় নমস্কারম্" মানে সূর্যকে যথারীতি পূজা করেন এবং পায়স রেঁধে ভোগ দেন।

এর পর হবে 'বেদপারায়ণ'। বৈদিক মন্ত্রাদি পাঠের পর ব্রাহ্মণভোজন। শুধু পূজারী ব্রাহ্মণরা এই বৈদিকমন্ত্র পাঠ করতে পারেন।

দেবীপূজার জন্য যে সুমঙ্গলী নিযুক্ত থাকেন, পূজা শেষ হলে গৃহকর্ত্রী সেই সুমঙ্গলীকে দেবীজ্ঞানে কপালে চন্দন, সিন্দুর এবং পায়ে হলুদ দিয়ে পূজো করেন, হাতে জল দিয়ে "আবাপোষণম্" করেন। এতক্ষণ পর্যন্ত সেই সুমঙ্গলী এবং পাঁচ জন পুরোহিত উপবাসী ছিলেন, তাই প্রথমে তাঁরা ভোগের প্রসাদ মুখে দিলে তবে অন্যেরা ভোজন করতে পারবেন। সামনে কলাপাতা বিছিয়ে গৃহকর্ত্রী সুমঙ্গলী ও পাঁচ জন পূজারীকে ভোগের নৈবেদ্য পরিবেশন করেন। [illegible] নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণরা পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করে দক্ষিণা নিয়ে বিদায় হবেন। তাঁদের দু' টাকা থেকে পাঁচ টাকা অবধি প্রত্যেককে দক্ষিণা দেওয়া হয়, এবং সুমঙ্গলীকে শাড়ী ব্লাউজ ইত্যাদি দেওয়া হয়। শুধু ব্রাহ্মণরা এই 'মহানৈবেদ্যম্' খেতে পারেন, শূদ্র ও কায়স্থদের এই ভোগের প্রসাদ বিতরণ করা হয় না। ভোজনের পর প্রত্যেককে পান-সুপারী দেওয়া হয়। ভোজন ও বিশ্রামান্তে পুনরায় সন্ধ্যায় আবার দেবীর পূজা সুরু হয়। তখন শুধু 'রুদ্রাভিষেকম ও 'বালাপূজা' বাদ যায়। এভাবে নয় দিন ভোরে ছয়টা থেকে সুরু করে বারোটা অবধি এবং সন্ধ্যা ছয়টা হতে রাত দশটা অবধি পাঁচ জন পূজারী পূজা করেন। দু'বেলা ধূপ-কর্পূর জ্বালিয়ে আরতি করা হয়।

এই নবরাত্রের সময় বধূ ও কন্যাদের প্রধান উৎসব "নবরাত্র-কলু", কন্যারা একটি কক্ষ নানাপ্রকার পুতুল, খেলনা ইত্যাদি দিয়ে সাজায়, কৃত্রিম পাহাড় নদ-নদী জঙ্গল তৈরী করে এক সুরম্য উপবনের সৃষ্টি করে। রাত্রে নানা রঙ-বেরঙের বৈদ্যুতিক বাল্‌ব জ্বালিয়ে উজ্জ্বল করে তোলে। নয় দিন প্রতি পরিবার নিজেদের আত্মীয়া-বান্ধবী এদের কলু উৎসবে নিমন্ত্রণ করে। প্রত্যেকে নববস্ত্রে গয়নায় সুসজ্জিতা হয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসে। সুমঙ্গলী প্রত্যহ পূজা শেষ হলে ওখানে কলাপাতায় 'মহানৈবদ্যম' ভোগ দিয়ে যান। বৈকাল চারটা হতে রাত্রি নয়টা অবধি এই কলু উৎসবের নিমন্ত্রণ চলে। কন্যা ও সধবাদের হলুদ-কুঙ্কুম-পান-সুপারী-ছোলাভিজা-নারকেল ইত্যাদি দিয়ে সম্বর্দ্ধনা করা হয়।

এই কলু উৎসবে বধূ ও কন্যারা যে যত সুন্দর ও নতুনধরনে সাজাতে পারে তার চেষ্টা করে। বলতে গেলে এই কলুসাজানো নিয়ে একরকম প্রতিযোগিতাই সুরু হয়ে যায়।

এই নয় দিন অতি নিষ্ঠা ও ষোড়শোপচারে দেবীপূজা হয়, পূজাশেষে মন্ত্রপুষ্পম ও ধূপ-কর্পূর জ্বালিয়ে আরতি হয়। মন্ত্রপুষ্পম হ'ল অঞ্জলি দেওয়া। ঠিক আমাদের দেশের মতই, সবাই হাতে ফুল বেলপাতা নিয়ে দাঁড়ায়, পুরোহিত মন্ত্র বলেন, সঙ্গে সঙ্গে সবাই দেবীর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দেয়।

নবমীরাত্রে পূজা শেষ হলে আর একটি উৎসব হয় ঘট উঠানো। পুরোহিত মন্ত্র বলেন ও গৃহকর্ত্রী ঘটটি স্থানান্তরিত করেন। তার পর ঘটের নারকেলটি ভেঙ্গে সবাইকে প্রসাদস্বরূপ বিতরণ করা হয়। দেবী মহিষাসুর বধ করে উগ্র হয়ে পড়েন; তাই তাঁর শান্তির জন্য পাঁচ জন পূজারী ব্রাহ্মণ সহ স্বামী-স্ত্রী হোম করেন। যে যার অবস্থানুযায়ী ব্রাহ্মণ ভোজন করায় ও দক্ষিণা দেয়। যারা অবস্থাপন্ন তারা পঞ্চাশ জন ব্রাহ্মণ ভোজন করাবে ও প্রত্যেককে পাঁচ টাকা করে দক্ষিণা দিবে। সুমঙ্গলী, যিনি পূজার কাজ করেছিলেন তাঁকে একখানা ভাল শাড়ী, ব্লাউজ ও সিন্দুর দেওয়া হয়। এই নয় দিন ধরে যে বালা বা কুমারীদের পূজা করা হয়েছিল, তাদের 'মহা-নৈবত্তম' দিয়ে পরিতোষ সহকারে ভোজন করান হয় এবং প্রত্যেককে ব্লাউজ ও ঘাঘরার কাপড় ও প্রসাধনসামগ্রী দেওয়া হয়। বাড়ীর বধূ, কন্যা, গৃহিণীরা নতুন বস্ত্রালঙ্কারে এই কয়দিন সুসজ্জিতা থাকেন। মান্দ্রাজে "কল্পকাবলী" মন্দিরে ও মীনাক্ষী মন্দিরে এই নবারাত্রি উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়।

শাস্ত্রের বচন সব দেবদেবীর পূজার আগে গণেশের পূজা করতে হবে। মহারাষ্ট্রে ও মান্দ্রাজে গণেশ-চতুর্থীর দিন খুব ধুমধামে গণেশপূজা হয়। মহারাষ্ট্রে গণেশকে গণপতি এবং মান্দ্রাজে "বিনায়ক" বলে।

বিনায়ক পূজার দিন যে যার বাড়ী-ঘর, পূজার স্থান খুব সুন্দর-ভাবে সাজায় এবং গণেশের সামনে পুস্তক ও বাদ্যযন্ত্রাদি সাজিয়ে রাখে। বাংলাদেশে সরস্বতী পূজার সময় দেবীর সামনে বই রাখা হয়। বিনায়ক পূজা শেষ হলে তাঁর কাহিনী গৃহকর্ত্রী পড়বেন ব

বলবেন, এবং এই কাহিনী না বললে গণেশচতুর্থীর রাত্রে চন্দ্রমা দর্শন করলে খুব পাপের ভাগীদার হতে হয়। গণেশের গল্পটি হ'ল এই, গণেশ বা বিনায়ক চিরকালই একটু বেশিরকম ভোজন-বিলাসী।

অতিরিক্ত লাড্ডু মণ্ডা, মিঠাই ভোজনের ফলে তাঁর ভুঁড়িখানা গেল ফেটে, তখন তাড়াতাড়ি গণেশজননী মহাদেবের গলার নাগ এনে গণেশের ভুঁড়ি বেশ করে বেঁধে দেন। তাই গণেশমূর্ত্তির পেটে শাপ পেঁচান থাকে। গণেশের এই দুরবস্থা দেখে চন্দ্রমার হাসি পেল, সেই হাসি দেখে গণেশজননী রেগে চন্দ্রমাকে শাপ দিলেন, যে, গণেশচতুর্থীর দিন গণেশের পূজা না করে ও কাহিনী না শুনে যে আকাশের চন্দ্রমার দিকে তাকাবে, তারই পাপ হবে। বাংলা দেশেও নষ্টচন্দ্রের দিন কেউ কেউ চন্দ্র দর্শন করে না।

মাদ্রাজেও নানাবিধ পূজাপালি ব্রত আছে তার মধ্যে বিশেষ করে নারীদের উৎসব হ'ল কলু, মঙ্গল গৌরী ও মাঘ গৌরী এবং বরলক্ষ্মীব্রতম।

শ্রাবণমঙ্গলগৌরী উৎসব হ'ল নব বিবাহিতাদের জন্য। বিয়ের পর নববধূরা পাঁচ বৎসর এই ব্রত করে। শ্রাবণ মাসে প্রতি মঙ্গলবারে তারা "মড্ডী বস্ত্রম্" পরে এই পূজা করে। স্নান করে ভিজে কাপড়ে যে কাপড় কেচে শুকিয়ে তুলে রাখা হয় তার নামই মড্ডীবস্ত্রম। পূজা করবার সময় এটি শুদ্ধ বস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বধূরা হলুদ দিয়ে ছোট গৌরীমূর্ত্তি তৈরি করে একখানা থালার উপর একটি পান রেখে তার উপর এক মুষ্টি চাল রেখে গৌরী বসায়। ব্রাহ্মণের দরকার পড়ে না, বধূরা নিজেরাই মন্ত্রবলে দেবীকে আহ্বান করে। চালের গুঁড়ো গুড় দিয়ে মেখে পাঁচটি ছোট ছোট প্রদীপ তৈরি করে তাতে ঘি চুবিয়ে কাপাসের সলতে রাখে। ঐ চালের গুঁড়ো দিয়ে পাঁচটি গোল বল ও পাঁচটি লম্বা আকৃতির মুঠি বানায় ও কলাপাতায় নৈবেদ্য দেয়। ছোলা ভিজিয়ে রাখে ও অন্নসরনৈবেদ্যম ফলমূলকলা নারকেল ইত্যাদি দিয়ে সাজিয়ে দেয়। বধূ পূজা করে ঘি-এর সেই পঞ্চপ্রদীপ জ্বালায় এবং হাতে "অক্ষীণতলু" মানে আবীরমাখা চাল ও একখানা ছুরি নিয়ে বসে মঙ্গল গৌরীর গল্প বলতে। পরিবারের মহিলা ও শিশুরা, নিমন্ত্রিতা সধবারা সকলে গোল হয়ে বসে। বধূ হাতে চাল নিয়ে সেই ছুরিখানা ঘি-এর প্রদীপের উপর ধরে রাখে ও গভীর নিষ্ঠায় একে একে মঙ্গল গৌরীর কাহিনী বলতে থাকে, ততক্ষণে প্রদীপের শীষে ছুরির ফলায় কাজল তৈরি হতে থাকে। বধূ কাহিনী শেষ করে প্রথমে মার চোখে সেই ছুরিতে তৈরি কাজল পরিয়ে দেয়, কপালে সিন্দুর-হলুদের কোঁটা দিয়ে আঁচলে সেই ছোলা দেয়। এর পর ঠিক এভাবে নিমন্ত্রিত সুমঙ্গলীদেরও সম্বর্দ্ধনা করে। ব্রাহ্মণ সুমঙ্গলী বা সধবা হওয়া চাই। প্রথম বৎসর পাঁচ জন সুমঙ্গলী, দ্বিতীয় বৎসর দশ জন, এভাবে বেড়ে গিয়ে পাঁচ বছরে পঁচিশ জন সুমঙ্গলী নিমন্ত্রিতা হন ও ব্রত উদযাপন শেষ হয়।

বিয়ের পর যখন নব বর-বধূ নিজগৃহে প্রবেশ করে তখন তারা প্রথমে অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখে তবে দোরগোড়ায় দাঁড়ায়, ঘরে একজন সুমঙ্গলী যিনি পাঁচ বৎসর মঙ্গল গৌরী ব্রত শেষ করেছেন তিনি নির্জ্জলা উপবাস করে নতুন শাড়ী পরে নতুন পিতলের অথবা রূপার পাত্রে চালের গুড়ো দিয়ে পিঠে তৈরি করে পাত্রটি একটি নতুন ব্লাউজ দিয়ে বেঁধে হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন ও বর-বধূ এলেই প্রথমে বধূর হাতে তা তুলে দেন, তাতে নাকি মঙ্গল গৌরী ব্রতে যদি কোন দোষ-ত্রুটি কখনও হয়ে থাকে তবে তা খণ্ডন হয়ে যায়।

বরলক্ষ্মীব্রতমও শ্রাবণের এক শুক্রবারে করতে হয়। নববধূরা ঘরে রূপার বা পিতলের লক্ষ্মীমূর্ত্তি স্থাপনা করে। কেউ কেউ হয়ত 'কালিসম' বা ঘটস্থাপনা করে দেবীপূজা করে। দেবীকে নতুন শাড়ী পরায় এবং নানারূপ মিষ্টদ্রব্য, ক্ষীর ইত্যাদি তৈরি করে 'মহা-নৈবদ্যম' ভোগ দেয়। প্রথম বৎসর নববধূকে শাশুড়ী শাড়ীকাপড় গয়না উপহার দিয়ে থাকেন।

মাঘগৌরী—সারা মাঘ মাস ধরে রোজ বধূরা এই পূজো করে। এ ব্রতও পাঁচ বৎসর ধরে করতে হয়। হলুদ দিয়ে গৌরীমূর্ত্তি গড়িয়ে একটি পানের উপর একমুঠো চাল দিয়ে গৌরী বসান হয়, ধূপবাতি দিয়ে আরতি করে এবং প্রতিদিনই অষ্টোত্তম-সহস্রনামম্ দিয়ে পূজো করতে হয়। প্রথম বৎসর দেবীর সামনে রং-বেরং-এর গুড়ো দিয়ে পাঁচটি আলপনা দিতে হয় রোজ এবং প্রতি বৎসর এই আলপনা দেওয়ার সংখ্যা পাঁচটি করে বাড়তে থাকে। প্রতি বৎসরই পূজা শেষ হলে প্রথমে মাকে ও পরে অন্য ব্রাহ্মণ সধবাদের উপহার দিতে হয়। যারা ধনী তারা প্রথম বৎসর মাকে একটা রূপার কৌটাতে কুঙ্কুম ভরে তা একটা ব্লাউজ পিস দিয়ে ঢেকে দেয় এবং শাড়ী দেয়, একটি নারকেল ও খানিকটা হলুদ দেয়। দ্বিতীয় বৎসর একটি পাত্রে হলুদ ভরে ব্লাউজ পিস দিয়ে সেটা বেঁধে তৃতীয় বৎসর নুন, চতুর্থ বৎসর জিরা ও পঞ্চম বৎসর শুকনো নারকেল পাত্রে রেখে ব্লাউজ পিস দিয়ে সেটা বেঁধে সর্ব্বপ্রথমে মার হাতে দিয়ে পরে অন্যান্য সুমঙ্গলীদের দেবে, এটার নাম হ'ল "ওয়ায়েনম"।

এসব ছাড়া আরও ছোটখাট দু'চার রকমের পূজা-ব্রত ইত্যাদি ত আছেই, তার মধ্যে "গোব্যেমা" ও "মট্ট মঙ্গল" উৎসবও ঘরে ঘরে অনুষ্ঠিত হয়। 'মট্ট মঙ্গল' হ'ল গো পূজা। গরুকে পূজা করে গরুর কপালে হলুদ-সিন্দুর মাথায়, শিংগুলি লালরং-এ রাঙ্গায়, ভাল করে গরুকে খেতে দেয়, তার পর রাখাল গরুর গলায় নূতন দড়ি বেঁধে আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী ঘুরিয়ে আনে। এই উৎসবে তার বেশ দু' পয়সা আয় হয়। মধ্যপ্রদেশেও গো পূজার উৎসব বিশেষ ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। লোকেরা সেদিন বিশেষ ভাবে গরুকে সজ্জিত করে, সর্ব্বাঙ্গে রং-এর ছাপ দিয়ে গলায় নূতন ঘুঙুর বেঁধে সাজায় ও খুব যত্ন করে খেতে দেয়।

'গোব্যেমা' উৎসব হ'ল, সংক্রান্তির দিন ঘরে ঘরে দরজায় গোবরের ছোট ছোট মুঠি বানিয়ে চৌকাঠের উপর সারি সারি বসায়

এবং তার উপর ফুল রাখে। বাংলা দেশের কোথাও কোথাও চৈত্র সংক্রান্তির দিন ঘরের দরজায় এ ভাবে গোবরের উপর ফুল সাজিয়ে রাখে। অন্যত্র দেশে এই সংক্রান্তির দিন নারীরা কলু উৎসব করে। বধূ ও নারীরা নানা রকম ফুল লতাপাতা নিশান পুতুল ইত্যাদি দিয়ে কলু সাজায় ও সধবাদের নিমন্ত্রণ করে প্রসাদ বাঁটে। কিন্তু নবরাত্রি কলুর মান্দ্রাজে দেবীপূজার সঙ্গে যোগাযোগ আছে। কলুতে মহানৈবেদ্য ভোগ দেওয়া হয়। অন্যত্রে যেসব ভোগ বা ব্রাহ্মণের মন্ত্রপাঠ পূজা ইত্যাদির দরকার পড়ে না।

বড়ু চণ্ডীদাস ও জয়দেব

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত

ভাদ্রের প্রবাসীর বড়ু চণ্ডীদাস ও জয়দেব আলোচনার প্রসঙ্গ লইয়া প্রবন্ধ করি:

আমার নিকট ১৫৬৫ শকাব্দের অনুলিখিত একটি গীতগোবিন্দের প্রাচীন পুথি (সম্পূর্ণ) রহিয়াছে। ১২৯৪ সালের মুদ্রিত একটি গীতগোবিন্দের পুস্তকও রহিয়াছে।

ছাপা পুস্তকে এই তিনটি শ্লোক রহিয়াছে:

১

বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তরসৎ প্রমেয়রচনৈরাচার্য্য গোবর্দ্ধন স্পর্দ্ধী
কোঽপিনবিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ীকবিক্ষ্মাপতিঃ ॥১।৪

২

বর্ণিতং জয়দেবকেন হরেরিদং প্রবণেন।
কিন্দুবিল্ব সমুদ্রসম্ভব রোহিণীরমণেন ॥৩.৮

৩

শ্রীভোজদেবপ্রভবস্য বামাদেবীসুত শ্রীজয়দেবকস্য
পরাশরাদিপ্রিয়বন্ধুকণ্ঠে শ্রীগীতগোবিন্দকবিত্বমস্তু ॥১২।৬

প্রাচীন পুঁথিটিতে ১ম ২য় শ্লোক দুইটি রহিয়াছে। ২য় শ্লোকের 'কিন্দুবিল্ব' শব্দটি পুথিতে 'কেন্দুবিল্ব' রহিয়াছে। ৩য় শ্লোকটি প্রাচীন পুথিতে নাই। ছাপা পুস্তকের অনেক সংস্কৃত শ্লোক প্রাচীন পুথিতে নাই। রাগলক্ষণ বা নায়িকালক্ষণ (খণ্ডিতাদি) এর কোনও শ্লোকই প্রাচীন পুথিতে নাই। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্ভবতঃ ২য় ৩য় শ্লোক দুইটিকে সত্য বলিয়া ধরিয়াছেন, এবং প্রথমটিকে মিথ্যা বলিয়া ধরিয়াছেন। সত্য হইলে তিনটি শ্লোকই সত্য হয়। মিথ্যা হইলে তিনটিই মিথ্যা হয়। মিথ্যা হইলে জয়দেব আবার উড়িয়াও হইয়া যাইতে পারেন। জয়দেব বাঙালী ছিলেন সত্য হইতে পারে। কিন্তু তিনি লক্ষ্মণ সেনের পরবর্তী ছিলেন—কোনও বৃহত্তর বিরোধী প্রমাণ আবিষ্কৃত না হইলে কেমন করিয়া মনে করা যায়! এরূপ মনে করার পক্ষে কোনও কিম্বদন্তীও নাই।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের পদ:

"জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।
শ্রীকৃষ্ণচরিত্র তারা করিল প্রকাশ।"

বিষ্ণুপুররাজ শ্রীবীর হাম্বীরের রচিত পদ:

"শ্রীজয়দেব কবিকর রাজ।
বিদ্যাপতি তাহে মস্তকর সাজ॥
ছুটল গাঢ় তাহে শূরতরঙ্গ।
চণ্ডীদাস তাহে পদক পতঙ্গ॥
আর জত সব কবি তৃণসমতুল।
কহে এ নরবর হাম উড়হি ধূল।"

এই দুই পদে কবিদিগের নামোল্লেখের ক্রম দেখিয়া কে অগ্রবর্ত্তী মনে হইতে পারে?

বড়ু চণ্ডীদাসের দেশ ও কাল সম্বন্ধে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে সব কথা বলিয়াছেন, তাহাতে মনে হইতেছে ১৩৪২ বঙ্গাব্দের প্রথম সংখ্যা সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকাটি তাঁহার হাতে পড়ে নাই। উক্ত সংখ্যা পরিষৎ পত্রিকার চণ্ডীদাস প্রবন্ধে যোগেশ বিদ্যানিধি মহাশয় বড়ু চণ্ডীদাসের দেশ—ছাতনা বিষ্ণুপুর ও তাঁহার জন্মকাল ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দ নির্ণয় করিয়াছেন। পরিষৎ পত্রিকা—বিদ্বৎপত্রিকা। বিদ্যানিধি মহাশয়ের পাণ্ডিত্য অগাধ। বলবত্তর বিরোধী প্রমাণ আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার সিদ্ধান্ত ত মানিতেই হয়।

জয়দেব সম্বন্ধে এরূপ কিম্বদন্তীও আছে—তিনি পুরীর মন্দিরে দেবদাসী পদ্মাবতীর নৃত্যগীতে মৃদঙ্গ বাজাইতেন। পদ্মাবতীর সহিত প্রেম হওয়ায় তাঁহাদের উভয়কে সেখান হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। জয়দেব পদ্মাবতীকে লইয়া কেন্দুবিল্বে পলাইয়া আসেন; জয়দেবকে 'সহজিয়া বৈষ্ণব' বলিলে তিনি চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তীকালের হইয়া পড়েন। পুরীর মন্দির—বৌদ্ধ মন্দির। রথযাত্রা, বৌদ্ধ উৎসব। 'সহজিয়া' বলিতে বৌদ্ধই বুঝি। "পরকীয়া"—ভাবমাত্র। প্রকৃতি তিন। ধরণী—চন্দ্রাবলী; প্রকৃতি মায়া (গুণমায়া); মহাশক্তি (যোগমায়া বা স্বরূপশক্তি)। তত্ত্বতঃ সবই এক। মাধবেন্দ্রপুরী সহজিয়াদিগের নিকট হইতে প্রেরণা লাভ করেন নাই। আলোয়ার সচিকদিগের প্রভাব তাঁহাতে ছিল। শ্রীমদ্ভাগবতে যে বৈষ্ণব সচিকদের উল্লেখ আছে—

তাঁহারাই আলোয়ার। জ্ঞানে সহজিয়া—সহজছাড়া নির্ব্বাণ নাই; নিষ্কলুষ নিস্তরঙ্গ সহজের রূপ; সহজে মন নিশ্চল করিয়া যে সমরসসিদ্ধি করিয়াছে—সেই সিদ্ধ, শূন্য নিরঞ্জন—পরম মহাসুখ। ভক্ত্যে 'সহজিয়া' ভগবানের স্বরূপই প্রেম, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠায় ক্রমে রুচি, আসক্তি ও ভাব জন্মে; ভাবে প্রেম উপজে; প্রেম হইলেই স্বরূপের সঙ্গে যোগ হয় সহজ; এই সহজ যখন সিদ্ধ হয় তখনই জীবের চরম সার্থকতা। রতিক্রিয়ায় 'বাউল'রা মস্তকে রেতঃ উর্দ্ধগ করেন, কিন্তু কাম যায় না। বাউল গান আছে—"ছুঁচোর জল মড়কচাতে তুল।" 'ধারা'কে উল্টাইয়া তাহাদের 'রাধা'। অদ্বৈত ও দ্বৈতের সমন্বয়ে ভাগবত—সেখানে 'রাধা'কে পাওয়া যাইতে পারে কি প্রকারে?

বাসলী "বজ্রেশ্বরী" নন। ধর্ম্মপূজাও বৌদ্ধপূজা নয়। বাসলী 'বিশালাক্ষী'ও নন। বাসলীও গ্রামদেবী বাশুলীও গ্রামদেবী। যত তন্ত্র—সে তাপসী শ্রুতীর অন্তর্গত। নির্ব্বাণই তন্ত্রের উদ্দেশ্য, এই জন্য উহাকে বৌদ্ধশাস্ত্র বলা হয়। ইহা ব্রাহ্মণদিগের সহিত বৌদ্ধদিগের বিবাদের ফল। দেবী ভাগবতে আছে—যে সকল ব্রাহ্মণ পতিত—তাহাদের জন্য মহাদেব তন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। মন্ত্র থাকিলেই তান্ত্রিক দেবতা হইতে হইবে এবং তান্ত্রিক হইলেই বৌদ্ধ দেবতা হইতে হইবে এমন কোনও কথা নাই। বৈষ্ণব ধর্ম্মেও দুই গুরু। দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু। দীক্ষাগুরু মন্ত্রদাতা এবং শিক্ষাগুরু মহান্ত। বেদে, উপনিষদে, মনুতে আচার্য্য গুরুর কথা আছে। অর্থাৎ যাঁহারা বেদ পড়ান। তন্ত্রে মন্ত্রদাতা গুরুর কথা আছে। বড়ু চণ্ডীদাসের কালে বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তীকালে বাংলা দেশে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রসার ছিল নাই বা কেমন করিয়া বলিতে পারি! ৪র্থ শতাব্দীর শুশুনিয়া লিপির দাস্যভক্তি ঐতিহাসিকগণের বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের যোগমূলক শব্দগুলি বড়ু চণ্ডীদাসের প্রলয়জ্ঞানের পরিচয় বলা যাইতে পারে। প্রলয় না জানিলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। ঐ সকল শব্দ ধরিয়া তিনি কৃষ্ণভক্ত ছিলেন না—বলা যায় না বরং উহা তাঁহার পাণ্ডিত্যের লক্ষণ বলা যাইতে পারে।

বলরাম তো দ্বাপরের। কলিতে কৃষ্ণ ছাড়া আর কে অবতার আছেন? বৈষ্ণবশাস্ত্রে কৃষ্ণ অর্থে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। তিনি পূর্ণাবতার। স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ কলিতে গৌরাঙ্গরূপে পূর্ণাবতার করিবেন—এরূপ ভবিষ্যত বাণী যাঁহার কাব্যে, তিনি মহাকবি—ইহাই বুঝি। "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং" ইহা মতবাদ নয়। ইহা অবস্থা মাত্র।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আছে—অনেক জন্ম গ্রহণ করিতে করিতে জীবের ধর্ম্মে মতি হয়। প্রথম গণেশ উপাসনা, পরে সূর্য্যোপাসনা, পরে শৈব, পরে বৈষ্ণব, পরে শাক্ত। এই শক্তি উপাসনার পর মুক্তি হয়, তখন শ্রীরাধাকৃষ্ণ উপাসনার অধিকার জন্মে। তখন যদি সদ্গুরুর কৃপা হয়, তবে রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বসুধা পান করিয়া কৃতার্থ হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ হইতে নামবীজ গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচরণঠাকুরশিষ্য বৃন্দাবনদাস বিরচিত তত্ত্ববিলাস পুঁথিতে আছে:

"ব্রহ্মবৈবর্ত্ত নামে সে শাস্ত্রের ভিতরে।
তাহার ভিতরে ছিল বেদের আদরে॥
* * *
হেন নাম প্রকাশ যে কৈল দেশে দেশে॥
* * *
যে নাম লাগিয়া ব্রজে কৃষ্ণ অবতার॥
* * *
অতএব এই কথা নাস্তি ভাগবতে॥"

আলোচনায় অবতার, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ-প্রসঙ্গ পড়িয়া জয়দেবকে অর্ব্বাচীন বলিয়া মনে হইল।

'ম্লেচ্ছ' শব্দে মুসলমানই বা কেমন করিয়া বলিতে পারি? আর্য্যরা যাঁহাদের উপর কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই তাঁহাদিগকেই তাঁহারা তাঁহাদের শাস্ত্রে ম্লেচ্ছ, পাপ, রাক্ষস ইত্যাদি বলিয়াছেন। বেদের কীকট দেশকে সায়নাচার্য্য ম্লেচ্ছদেশ বলিয়াছেন। কীকট দেশে এক বুদ্ধ জন্মাইয়াছিলেন—সে বুদ্ধ গয়াসুর।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সুরসিক বলিয়াই জানি। রসকাব্য আলোচনায় 'দন্তরুচি কৌমুদি' 'দেহিপদপল্লব' প্রসঙ্গে তাঁহার যে—কে আগে কে পিছে, কে কাহার কাছে ঋণী প্রশ্ন মনে জাগিয়াছে তাহাতে তাঁহার রস-লাম্পট্যের কথা নূতন করিয়া মনে পড়িল। ব্রজলীলায়, কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাধার প্রথম মিলনে ললিতা বিশাখাদি আড়ি পাতিয়াছিলেন। সেদিনও তাঁহাদের মনে এই প্রশ্নই জাগিয়াছিল। এত হাবভাব, এত কলা, রাধা কাহার কাছে শিখল? তাঁহারা পৌর্ণমাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। পৌর্ণমাসী হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন—এ সংসারে ঐটিই কাহাকেও কাহারও কাছে শিখিতে হয় না, একমাত্র ঐটির জন্যই কেহ কাহারও কাছে ঋণী নয়।

চণ্ডীদাস মহাকবি। চণ্ডীদাস বাংলার আদিকবি। তিনি এক। তাঁহার আর দ্বিতীয় নাই। ব্যতিরেকমুখে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহাই প্রমাণ করিয়াছেন দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছি।

রূপময় ভারত—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র ও শ্রীরামেন্দ্র দেশমুখ্য। সাহিত্য সজ্ঞ, ১৬ বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য চার টাকা।

ভারতবর্ষ বৈচিত্র্যময়। উত্তর ও দক্ষিণে প্রভেদ অনেক, কিন্তু দেশের এই দুই বিভাগ যে একেবারে পৃথক তাও নয়। আমাদের তীর্থক্ষেত্র সারা দেশে ছড়াইয়া আছে। দাক্ষিণাত্যের তীর্থ উত্তর-ভারতের তীর্থ অপেক্ষা সংখ্যায় অল্প নয়, হয় ত অধিক। গড়নে এবং অলঙ্করণে এ দুই দেশখণ্ডের স্থাপত্য ভিন্নধরনের। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য। আমরা উত্তরের লোক, দক্ষিণের কথা জানিতে আমাদের কৌতূহল স্বাভাবিক। উত্তর-ভারতের মন্দিরাদির বৃত্তান্তই বা আমরা কতটুকু জানি? "রূপময় ভারত" ভ্রমণ-কাহিনী। বইখানি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র স্থাপত্যে এবং ভাস্কর্যে সুন্দর দক্ষিণের কথা বলিয়াছেন, দ্বিতীয় ভাগে শ্রীরামেন্দ্র দেশমুখ্য উত্তর ভারতের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভূমিকায় গ্রন্থকারদ্বয় লিখিতেছেন, "দু-জনেই আমরা সমস্ত জায়গা ঘুরে দেখেছি এবং শেষে লিখেছি। না দেখে কিছুই লিখতে যাই নি, বলে আমাদের লেখা ভারতের সমস্ত রূপ ও ঐশ্বর্য্যের বর্ণনা দিতে পারে নি।"

গত বৎসর নিখিল-ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন বসে মাদ্রাজে। প্রতিনিধিরূপে খগেন্দ্রনাথ সেই সম্মেলনে যোগদান করেন। অধিবেশন-শেষে মাদ্রাজ হইতে তিনি কাঞ্চিপুরমে যান। সেখানে পুরাণো কাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী ও শিবকাঞ্চী ঘুরিয়া এবং পক্ষীতীর্থ দেখিয়া লেখক পল্লব-কালের কীর্তি মহাবলীপুরমে গমন করেন। এখানেই আছে শিলাখণ্ডে রচিত পঞ্চ পাণ্ডবের রথ। সেখান হইতে ত্রিচিনপল্লীর শৈলমন্দির দেখিয়া কাবেরী পারে শ্রীরঙ্গমে যান। ত্রিচি হইতে ধনুষ্কোটি ও রামেশ্বরম্, পরে মাদুরাই। এখানেই সুপ্রসিদ্ধ এবং সুন্দর মীনাক্ষীর মন্দির। তার পর টিনেভেলি। সেখান হইতে লেখক মোটর পথে তিন সমুদ্রের মিলনতট কন্যা-কুমারিকায় যান। কন্যার মন্দিরটি বিশাল নয় কিন্তু মর্ম্মরমূর্ত্তিটি শিল্পীর অতুলনীয় সৃষ্টি। "অবর্ণনীয় তার করুণা, হাসি ও জিজ্ঞাসাভরা চোখ দুটির চাহনি।" যেখানেই লেখক গিয়াছেন সেইখানেই ছবি তুলিয়াছেন। দ্বিতীয় ভাগের লেখক শ্রীযুক্ত দেশমুখ্যও উত্তর ও পশ্চিম ভারতের মন্দির, স্তূপ ও মানুষের অনেকগুলি ফটো লইয়াছেন। তাঁহার রচনা কাহিনী ও কিম্বদন্তীমূলক. ভ্রমণবৃত্তান্তে খানিকটা ভৌগোলিক বিবরণের প্রয়োজন হয়। কাহিনীগুলি সুখপাঠ্য। 'অবিশ্বাস্ত' ছোট গল্পের পর্য্যায়ে পড়ে। বইখানি সবশুদ্ধ চৌত্রিশটি চিত্রে শোভিত। বর্ণনা মনোরম। রচনা সরস ও সাবলীল। দু-রকমের হইলেও উভয় লেখকের লিখনভঙ্গী মনকে আকর্ষণ করে। "রূপময় ভারত" পাঠকের চোখ এবং মনের তৃপ্তিসাধন করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

সমকালীন সাহিত্য—নারায়ণ চৌধুরী। এ. মুখার্জী এ্যাণ্ড কোং (প্রাইভেট) লিঃ, ২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২। মূল্য ৩় টাকা।

বাংলা-সাহিত্যে সমালোচনার ক্ষেত্রটি খুব প্রশস্ত নয়—অধিকাংশ স্থলে নিরপেক্ষ মনোভাবের দ্বারা গঠিতও নয়। পুরাতন সাহিত্য অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা চলিলেও হাল-আমলের সাহিত্য-কর্ম্মের হিসাবনিকাশ বড় একটা পাওয়া যায় না। ইহার

এক... কারণ হয়ত কালের স্নেহস্পর্শে এ বস্তুটি এখনও ঐশ্বর্য্যে পরিণত হইবার সুযোগ লাভ করে নাই। বর্ষাকালে কূলে কূলে ভরা নদীর স্বরূপ নির্ণয় করা যেমন কঠিন—তেমনি কষ্ট সাধ্য নানা দিক প্লাবিত যেন মুখরা ...নদীর আসল রূপটিকে চিনিয়া লওয়া। ভরা বলিয়া কূলের রেখায় ... নয় নদী, জলের রংটাও দৃষ্টি বিভ্রান্তকর। বর্ষায় নদীকে সমুদ্র বলিয়া ...শয়োক্তি করা যেমন সহজ—ঘোলা জল ও তরঙ্গবেগকে স্বাস্থ্যহানিকর ...য়া রায় দেওয়াও তেমনি স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক সাহিত্যের ...তিপ্রকৃতি লইয়া এ যাবৎ যে সমস্ত ...লোচনা ও বাদ-প্রতিবাদ হইয়াছে —সেগুলি প্রায়শঃ দুই প্রান্তীয় ঘোষণার দ্বারা ছায়াচ্ছন্ন—ইহার মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়াইয়া জিনিষটিকে স্বরূপে দেখিবার ও দেখাইবার প্রয়াস অল্পই হইয়াছে।

সুখের বিষয় আলোচ্য পুস্তকখানিতে শ্রীচৌধুরী নিরপেক্ষ দৃষ্টি লইয়া আধুনিক সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি নিরূপণ করিতে চাহিয়াছেন কয়েকটি সংক্ষিপ্ত ও নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে। বলা বাহুল্য, আধুনিক সাহিত্যকে উচ্ছ্বসিত মন্তব্যে অভিনন্দিত করার প্রধান অন্তরায় যে কাল সে কথাটি তিনি সর্ব্বক্ষণ স্মরণে রাখিয়াছেন। তাঁহার 'সাহিত্যে কালের প্রভাব' প্রবন্ধটি পড়িলে আধুনিক সাহিত্য বিচারের পদ্ধতিটা খানিক সরল হইয়া যায়। সেই আলোকেই পরবর্ত্তী প্রবন্ধগুলিতে লেখকের যুক্তিবাদকে স্বীকার করিতেও বাধে না।

মোটামুটি কয়েকটি প্রবন্ধে ত্রিশ বছরের সাহিত্য কর্ম্মকেই তিনি সমকালীন সাহিত্যের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। আবার এই সাহিত্য-কর্ম্মের মধ্যে কাব্য ও কথা-সাহিত্যের যে ভাগ তাহা আলোচনায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এক সময়ে প্রবন্ধ-সাহিত্যের সমাদর ছিল— নাট্য অভিনয়েও বাংলার রঙ্গমঞ্চগুলি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল, মহাকাব্য লেখার রেওয়াজও তখন ছিল। বর্ত্তমানে কথা-সাহিত্য জনচিত্তরঞ্জনের ভার লইয়াছে—সুতরাং সমকালীন সাহিত্য-বিচারে ইহার প্রভাবটা অগ্রাধিকার লাভ করা আশ্চর্য্য নহে।

...'আধুনিক বাংলা সাহিত্য', 'বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ,' 'বাংলা সাহিত্যের সমস্যা' প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধে 'কল্লোল' ও 'পরিচয়' পত্রিকার ভূমিকা ও পত্রিকা গোষ্ঠীভুক্ত লেখকবৃন্দের মানসপ্রকৃতির পরিচয় চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন লেখক। 'সৎসাহিত্য' ও 'জাতীয় সাহিত্য' প্রবন্ধ দু'টিতে পুরাতন কালের কষ্টিপাথরে সাহিত্যসৃষ্টিকে যাচাই করিবার সঙ্গে সঙ্গে দু'একটি প্রশ্নও করিয়াছেন—সত্য কি স্থির? এক যুগ থেকে আর এক যুগে বিবর্ত্তন মুখে সত্যের ধারণা কি পরিবর্ত্তিত হয় না? উত্তর দিয়াছেন ছোটখাটো সত্যের ধারণা হয় ত কিছু পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু মহত্তম সত্যগুলির প্রকৃতি স্থির থাকে। 'সাহিত্যে আতিশয্য,' প্রবন্ধটি সাহিত্যিকমাত্রেরই পঠিতব্য। 'সাহিত্যে বাস্তবতা' প্রবন্ধে আধুনিক কয়েকজন লেখকের সাহিত্য-কৃতির উল্লেখ আছে। প্রবন্ধটি সংক্ষিপ্ত এবং কয়েকটিমাত্র দৃষ্টান্ত দ্বারা পরিস্ফুটিত। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ছোট প্রবন্ধ আছে এবং অনেকগুলি প্রবন্ধে তাঁর রচনার দৃষ্টান্ত তুলিয়া সমালোচনার মানদণ্ডটি স্থির করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য—রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের দু'টি কালকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন—তাঁর পঞ্চাশোত্তর বয়সের রচনা সমকালীন সাহিত্যের অঙ্গীভূত। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাস্তববোধ ও প্রমথ চৌধুরীর বুদ্ধিবাদ ও সরস বাক্‌ভঙ্গী—দুইয়ের আলোচনা করিয়াছেন লেখক। প্রথমোক্ত দলের সাহিত্য-কৃতির অভ্যুদয়-পতন দোষগুণের যে সূত্রটি ধরিয়াছেন ফলে তাহার সঙ্গে একমত না হইতে পারেন, কিন্তু শিল্পী-মানসের পরিণতি কিম্বা স্খলন-ত্রুটির উপর পারিপার্শ্বিকের অনতিক্রম্য প্রভাবটা শিল্পীমাত্রই অনুভব করিয়া থাকেন।

প্রমথ চৌধুরীর মনন শীলতা ও বুদ্ধিবাদ সবুজপত্রের মারফৎ নূতন যুগের দিকে ত্বরান্বিত করিয়াছে—অতি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে এই কথাটি স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন লেখক। চৌধুরী মহাশয়ের একটি মূল্যবান উক্তিও এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইয়াছে:

"অধিকাংশ লোকই জানে না যে, তার অন্তরে কতটা শক্তি আছে। চলতি বুলির মায়া কাটালেই মানুষ নিজের অন্তরাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করে। আর সেই আত্মাই হচ্ছে সকল সাহিত্যের মূল।"

যে দৃষ্টিকোণ হইতে লেখক সমকালীন সাহিত্যকে দেখিয়াছেন তাহাতে বিতর্কের অবকাশ যে নাই তাহা নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—পল্লীজীবন চিত্রণকে অনগ্রসরতা দোষদুষ্ট বলিয়া রায় দেওয়া অনেকের মতে সমীচীন বোধ হইবে না, কিম্বা কোন কোন প্রবন্ধে মন্তব্যের দৃঢ়তা নির্দেশনামার মতও বোধ হইতে পারে। বিভিন্ন সময়ের লেখা কয়েকটি প্রবন্ধে পরস্পরবিরোধী উক্তিও কিছু আছে। এ সত্ত্বেও 'সমকালীন সাহিত্য' আধুনিক বাংলা সাহিত্য নিরূপণালায় যে আলোক প্রক্ষেপ করিয়াছে তাহার মূল্য যথেষ্ট।

কিশোর—শ্রীঅজয় ভট্টাচার্য। রামকৃষ্ণ প্রকাশনী ৩৬ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯। মূল্য—২৷০ টাকা।

আলোচ্য উপন্যাসখানি কিশোরদের জন্য লিখিত। সাধারণতঃ এই ধরনের উপন্যাসে কিশোরচিত্ত বিনোদনার্থ অনেক উদ্ভট ঘটনার সমাবেশ থাকে। আলোচ্য উপন্যাসটিতে তেমনি ঘটনা আছে, কিন্তু গল্পরচনার কৌশলে সেটা উদ্ভট বলিয়া বোধ হয় না। গল্প—হঠাৎ ঘুমভাঙ্গা একটি কিশোর শয়ন ঘরের জানালায় আসিয়া বসে—সামনে তার প্রাসাদতুল্য একটা ভাঙ্গা বাড়ী। কিশোরের মনে রাজবাড়ীর কল্পনা জাগায় বাড়ীটা; সুতরাং এই প্রাসাদের মধ্যে রাজা, রাণী, রাজকন্যা, অমাত্য, সিংহাসন, সৈন্য-সামন্ত, যুদ্ধ প্রভৃতি ঘটনার পর ঘটনার ছবি ফুটিয়া ছেলেটিকে সারা-রাত্রি জাগাইয়া রাখে। এমন এক রাত্রি নয়—কয়েকটি রাত্রি। এই ভাবে প্রতি রাত্রের ঘটনার সূত্র ধরিয়া পূর্ণাঙ্গ একটি কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। সে কাহিনীতে যত কৌতূহল, বিস্ময় আর আনন্দের প্রকাশ। একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া উপায় নাই। কয়েকটি রেখাচিত্রে কাহিনীটি দিব্য পরিস্ফুট হইয়াছে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

কাশ ফুলের দিন—নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। 'নবচেতনা' ৩৯, জোড়বাগান চৌধুরী লেন, শিবপুর, হাওড়া। মূল্য আড়াই টাকা।

'কাশ ফুলের দিন' একখানি নাটক। ভূমিকায় লেখক বলেছেন—"প্রচলিত প্রথা ভেঙে নূতন এক আঙ্গিকের আশ্রয় নিয়ে 'কাশ ফুলের দিন' নাটকটি লিখেছি। দুঃসাহস। ভেবে দেখেছি নাটকের পাঠক নেই, তার প্রচলিত ফর্মের জন্য।"

নূতন আঙ্গিকটা হচ্ছে নাটকের সঙ্গে নভেলের ভঙ্গিমার সংমিশ্রণ। পুরাতন যে আঙ্গিক তাতে সংলাপই প্রধান, বাকি যা কিছু দু'একটি সংক্ষিপ্ত শব্দে তার নির্দেশ থাকে—প্রবেশ, প্রস্থান, পতন ও মূর্চ্ছা ইত্যাদি। এ ভঙ্গিটা কিন্তু বহু দিন আগে শিথিল হয়ে গিয়ে নাটকেও দৃশ্য তথা ঘটনায় অল্পবিস্তর বর্ণনার প্রথা এসেই পড়েছে, সংক্ষিপ্ত শব্দের পরিবর্তে ছোট বড় বাক্যে। লেখক এই ভঙ্গিটিকেই আরও বিশদ এবং ব্যাপক করেছেন, সুতরাং দুঃসাহসে নেমেছেন বলে তাঁর আশঙ্কা করার কিছু নেই। এই ভঙ্গিতে ঘটনা সজ্জাতে পাত্রপাত্রীদের মনোভাব পর্যন্ত প্রকাশ করে যে আর এক ধাপ এগিয়ে গেছেন তাতে পাঠ্য নাটক হিসাবে বইটি আরও সার্থক হয়েছে।
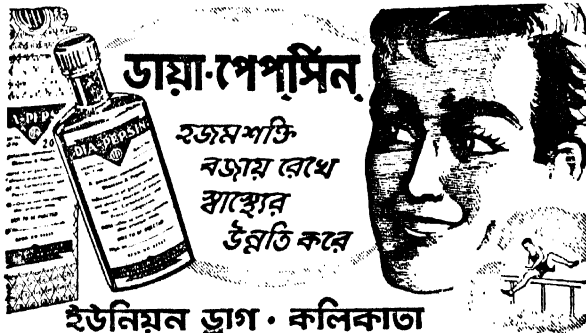
ঘটনা বিন্যাস এবং বিচিত্র চরিত্র সৃষ্টিতে লেখকের হাত আছে। চরিত্র সৃষ্টির দিক দিয়ে "মাথায় টিলে" অর্থাৎ অল্প-স্বল্প বিকৃত-মস্তিষ্ক যে তিনটি পাত্রকে নামিয়েছেন, বুদ্ধি আর মূঢ়তার মাঝামাঝি তাদের মনের ভাব বেশ টানাপোড়েনে দক্ষতার সহিতই রক্ষা করে গেছেন লেখক। তাদের জন্য 'কাশ ফুলের দিন' অর্থাৎ শরতের হাল্কা স্মিত রূপটি ফুটেছে ভালো।

মারাত্মক দুঃখের নাটক, সে হিসেবে ছোটটা একটু বেশী জটিল হয়েছে, আর একটু ঝরঝরে হলে ভালো হ'ত। হাস্যরস সৃষ্টিতে লেখকের ক্ষমতা আছে। এ ধরনের হাল্কা নাটক রচনায় সেটা বেশ সহায়তা করেছে। এ দিকে খাঁটি মেকীর নজরটা তাঁর বেশ সতর্ক।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

মরসুমী ফুল—শ্রীরামেন্দ্র দেশমুখ্য। অগ্রণী বুক ক্লাব, ১০, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা—৬। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০৬, দাম সাড়ে তিন টাকা।

উপন্যাসখানির উপজীব্য জনকয়েক ভ্রাম্যমান ক্যানভাসারের জীবন। সকল দেশেই বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান বর্তমান এবং গঠিত হচ্ছে। তারা দেশ বিদেশে তাদের উৎপন্ন পণ্য বিক্রয়াদেশে নানা ভাবে প্রচার করে থাকে। সেই সকল প্রচারের অন্যতম উপায় হচ্ছে ক্যানভাসার। এই কাজে হাজার হাজার লোক নিজ বাসভূমি ও প্রিয়পরিজন ছেড়ে দূরদূরান্তে ঘুরে বেড়ায়। কত নূতন মানুষের সান্নিধ্যে আসে, কত নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, কত নূতন পরিবেশে গিয়ে পড়ে, কত নূতন দৃশ্য দেখে এবং শেষে ঘুরে বেড়ানোর

ফুলের মত...
আপনার লাবণ্য রেক্সোনা
ব্যবহারে ফুটে উঠবে
রেক্সোনা সাবানে আছে ক্যাডিল
অর্থাৎ ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্যে
তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা
আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে
বিকশিত করে তুলবে।
Rexona
একমাত্র ক্যাডিলযুক্ত টয়লেট সাবান
BP. 150-X52 BG
রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারী লিঃ, এর পক্ষে ভারতে প্রস্তুত

অভ্যাসই তাদের চরিত্রে গড়ে ওঠে, সকলের মাঝে সমাজে স্থির হয়ে বাস করাটাই দায় হয়। চাকরির স্বল্প অবকাশে কেউ কেউ ঘরে ফিরে আত্মীয়-স্বজনের ভালবাসার মধুর স্বাদ লাভ করেই আবার বার হয়, নিজের নয়, কোম্পানীর কাজে, অর্থার্জ্জনের আশায়। না হলে তার সংসারের পোষ্য যারা তারা অনশনে শুকিয়ে মরবে, নিজের জীবনও বিপন্ন হবে। পরকর্ম্ম-ভারবাহী এই ভ্রাম্যমাণ মানুষগুলির জীবন সুখের নয়, চাকরীর স্থায়িত্ব নেই, ভবিষ্যতও অনুজ্জ্বল। লেখক গভীর দরদ দিয়ে চরিত্রগুলি পরিস্ফুট করেছেন। ক্যানভাসারদের বলেছেন, মরসুমী ফুল। কারণ তাদের সব সময়ে দেখা যায় না। বিশেষ ঋতুতে বিশেষ স্থানে ফুলগুলি ফুটে ওঠে। মরসুমী ফুলের শোভাই সার, গন্ধ নেই, এ ফুল পূজায়ও ব্যবহৃত হয় না। এরা অনেকেই সংসার পাতবার, সমাজে বাসের অবকাশ পায় না। তাই এদের গুণও বিকশিত হতে পারে না। এদের দাম্পত্য জীবন বিড়ম্বনাময়। উপন্যাসখানির প্রধান নায়কের সঙ্গে কাজের পথে ঘটনাচক্রে এক সুন্দরী ও গুণালঙ্কৃতা তরুণী শিক্ষয়িত্রীর পরিচয় ঘটে। শিক্ষয়িত্রীটির জীবনের শেষ পরিণতি অতি করুণ, এত করুণ যে, পাঠক অভিভূত না হয়ে পারে না। অসবর্ণ বিবাহটা গ্রন্থে এমন সহজ ও স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে ঘটানো হয়েছে যে, মনে হয় সেটা সমাজের কোন সমস্যাই নয়। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজেও সেটা তা হওয়া উচিত নয়। সমগ্র রচনাটি কবিতা-সুষমা মাখানো এবং উৎকৃষ্ট সাহিত্য পর্য্যায়ে পড়ে।

তারা তিন জন—শ্রীরমেশচন্দ্র সেন। প্রকাশক এস, চক্রবর্ত্তী, ৫ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩০, দাম দুই টাকা।

বারটি ছোট গল্পের সঙ্কলন। শেষ গল্পটির নামেই গ্রন্থখানির নামকরণ করা হয়েছে। ছোট গল্প রচনায় লেখকের নিপুণতার খ্যাতি বহু দিনের। সে খ্যাতি আলোচ্যমান গ্রন্থখানিতেও অটুট আছে। যাঁরা সুন্দর ছোট গল্পের রসাস্বাদ করতে চান তাঁরা গ্রন্থখানি পেলে খুশীই হবেন। প্রত্যেকটি গল্পের উপজীব্য সাধারণ, কিন্তু নিপুণ শিল্পীর হাতের স্পর্শে বিশেষ সৌন্দর্য্য লাভ করেছে। "তারা তিন জন," "সৈনিক", "সাদা ঘোড়া", "বিন্দি", "মৃত ও অমৃত" নামক গল্প কয়টিতে রস জমজমাট। পাঠে আনন্দ লাভ হয়, মনে চিন্তা জাগে, চোখে অশ্রুও দেখা দেয়। লেখকের দৃষ্টি কল্যাণময়। গ্রন্থখানি বাংলা ছোট গল্পের একটি উৎকৃষ্ট সঙ্কলন।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

শুধু তো নিসর্গ নয়—শান্তিকুমার ঘোষ। শতভিষা প্রকাশনী, ১এ বিজয় মুখার্জ্জি লেন, কলিকাতা—২৫। মূল্য ॥০।

'আধুনিক কাব্য পরিচিতি' নাম দিয়ে 'শতভিষা প্রকাশনী' কয়েকখানি ক্ষুদ্র কাব্য প্রকাশ করেছেন। তাঁদের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। আলোচ্য পুস্তিকাখানিতে ১৪টি কবিতা আছে। আধুনিক কবিতামাত্রেই অবোধ্য বা দুর্বোধ্য নয়, এ কবিতা কয়টি তার প্রমাণ। "মানুষের ভিড়ে মিশে তাদের উষ্ণতা আমি নিয়েছি হৃদয়ে" অথবা "সূর্যের আগুন থেকে তোমার পবিত্র প্রেম জ্বেলে নাও তুমি" চিরন্তন কবিতারই ভাষা, অপটু প্রচেষ্টার নিদর্শন নয়।

হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত। মহানাম সম্প্রদায় কর্তৃক প্রকাশিত, ৫৯ মানিকতলা মেন রোড, কলিকাতা-১১। মূল্য ৸০।

বিখ্যাত সাধক শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুর জীবনকথা। গ্রন্থকার শিশুসাহিত্যে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ। এ চরিত গ্রন্থখানি তাঁর রচনাগুণে সরস, সুখপাঠ্য এবং ভাবোদ্দীপক হয়েছে।

পাকিস্থান সম্ভব কাব্য—শ্রীকেশবলাল দাস। বনগাঁ, ২৪ পরগণা। মূল্য ॥০।

আদ্য, মধ্য ও অন্ত—তিন ভাগে পদ্যাকারে লেখক পাকিস্থান-জন্মবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেছেন।

প্রভাত—শ্রীদীপককুমার সেন। নবীনচন্দ্র স্মৃতি গ্রন্থাগার। ৪৪এ ক্লাইভ কলোনী, দমদম, কলিকাতা—২৮। মূল্য ॥০

তরুণ কবির 'বিদ্যালয়-জীবনের লেখা' এই কবিতাগুলিতে কবি-মনের এবং রচনা-দক্ষতার পরিচয় আছে।

আশ্চর্য শতেক—শ্রীকেশবলাল দাস। বনগাঁ, ২৪ পরগণা। মূল্য ১৲।

'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ', 'নলে সন্তান সৃষ্টি', 'চূণ-হলুদে রঙ-বদল', 'খণ্ডিত ভারত', 'চশমা', 'টেলিফোন' প্রভৃতি ১০ টি বিস্ময়ের ব্যাপার নিয়ে লেখক পদ্য লিখেছেন। তাঁর "উদ্দেশ্য অনুসন্ধিৎসু লোকের জ্ঞানস্পৃহা বর্দ্ধন।" উদ্দেশ্য সফল হলে আমরা সুখী হব। আমাদের কিন্তু আরও দুটি আশ্চর্য

ঘটনার কথা মনে হ'ল। এক, আলোচ্য গ্রন্থের এবং আরও তেরখানি পুস্তকের রচয়িতা নিজ নামের পূর্বে বসিয়েছেন 'নীরব কবি'। তিনি যদি নীরব, তবে সরব কে? দুই, আর-একটি উপাধিও তিনি আপন নামের পূর্ব্বে যোগ করেছেন—'জনবন্ধু'। এ উপাধি প্রয়োগ করা কি জনগণেরই কর্তব্য ছিল না,—বিশেষতঃ তিনি যখন তাদের 'জ্ঞানস্পৃহা বর্ধনে' উৎসাহী?

সৌরকন্যা—শ্রীরাধামোহন মহান্ত। ভারতী গ্রন্থ প্রকাশনী। প্রাচ্য ভারতী রোড, বালুরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর। মূল্য ১॥০।

কবির পূর্বতন কাব্য 'মনোগন্ধা'র আমরা প্রশংসা করেছি। এ কাব্যেরও ভাব এবং রচনাভঙ্গী প্রশংসনীয়। তত্ত্বের প্রভাবে দু'এক জায়গায় ভাষা একটু কঠোর হয়ে পড়েছে, কিন্তু তা এ যুগের কাব্যে প্রায় অপরিহার্য।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

এই আমার দেশ—দীপঙ্কর। চট্টোপাধ্যায় ব্রাদাস, ১।১।'এ ও বি বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট. কলিকাতা—১২। মূল্য দুই টাকা।

গল্প সংকলন। মোক্ষদা, মৃত্যুঞ্জয়, এই আমার দেশ, যে নদী মরুপথে প্রভৃতি নয়টি গল্প পুস্তকখানিতে স্থান লাভ করিয়াছে। গল্পগুলি আমাদের সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থার বিভিন্ন দিকে সুন্দর ভাবে আলোকপাত করিয়াছেন। ছোট গল্পের মূল্যরহস্য লেখকের আয়ত্তাধীনে। মোক্ষদা, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও স্বাধীনতা, মৃত্যুঞ্জয় ও তিলোত্তমায় লেখক প্রচুর মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়াছেন।

ভেলভেটের বাক্স—রেণুকা দেবী। ১০৯।৩২ হাজরা রোড, কলিকাতা—২৬। মূল্য দুই টাকা।

রহস্যোপন্যাস। এই শ্রেণীর উপন্যাসে প্রধান বস্তু হইল "সাসপেন্স"। আগাগোড়া এই "সাসপেন্স" বজায় রাখিয়া লেখিকা চমৎকার একটি কাহিনী বলিয়াছেন। যাঁহারা এই শ্রেণীর উপন্যাস পাঠ করিতে ভালবাসেন নিঃসন্দেহে পুস্তকখানি তাঁহাদের আনন্দ দানে সক্ষম হইবে।

ছোটদের বুদ্ধ—শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, ১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

বুদ্ধজীবনের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন দিক ছোটদের উপযোগী করিয়া সহজ ভাষায় সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁর আবির্ভাব হইতে আরম্ভ করিয়া মহানির্ব্বাণ পর্য্যন্ত এক নিশ্বাসে পড়িয়া যাইবার মত। পুস্তকখানি শুধু ছোটদের উপযোগীই নয়, শিক্ষণীয়ও বটে।

(১) কৃষ্ণকলি। (২) চৌমাথা—শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। "নবচেতনা", ৩৯ ক্ষেত্র ব্যানার্জি লেন, শিবপুর, হাওড়া। মূল্য যথাক্রমে—২॥০ ও ১॥০

(১) একাঙ্ক নাটিকা। চার অঙ্কে সমাপ্ত। নায়ক অসীম রায়, কবি, গায়ক, সুরকার। মধ্যবিত্ত সমাজের যুবক। অনিমা এবং কলি যুগ্ম নায়িকা। প্রথমটি শিক্ষিতা, সুন্দরী, সুগায়িকা ও আধুনিকা। দ্বিতীয়টি তথাকথিত

শিক্ষিতা নয়, আধুনিকা এবং সুন্দরীও নয়। অনিমার অসীমের প্রতি আসক্তি থাকিলেও পারিপার্শ্বিকের চাপে তাকে দূরে সরিয়া যাইতে হইল কিন্তু অসীমের চরম দুর্দ্দিনে কলি চোখের আড়ালে থাকিয়াও সেবায়, যত্নে, স্নেহে ও প্রীতিতে তার একান্ত নিকটতম হইয়া উঠিল। অসীম তাকে অনুভব করিত ওর প্রত্যেকটি কাজের মধ্য দিয়া। কলির একান্ত কামনা অসীম দশজনের একজনা হইয়া উঠুক কিন্তু নিজে সে তার পথে কোনদিন বাধা হইয়া দাঁড়াইবে না। অনিমাকে কাছে পাইয়া অনুযোগ দিয়া বলে, 'তোমার নিজের জিনিষ তুমি নাও ভাই নইলে লোকটি যে মরে যাবে।' সামান্য এই একটি কথার আঘাতে অনিমা নিজেকে যেন নূতন করিয়া ফিরিয়া পায় এবং যতখানি দূরে সে সরিয়া গিয়াছিল তার চেয়ে ঢের বেশী কাছে সে আগাইয়া আসিতে সচেষ্ট হইয়া উঠিল কিন্তু অসীমের সারা অন্তর জুড়িয়া তখন কলি—কলির অন্তরের গোপন কথাটিও তার জ্ঞাত। মোটামুটি কাহিনীটি এইরূপ।

নাটকীয় সংঘাতে, সূক্ষ্ম ভাবের ব্যঞ্জনায়, মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে এবং সংযত ও সুন্দর চরিত্রসৃষ্টিতে নরেনবাবু প্রচুর মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়াছেন।

(২) বর্ত্তমানকালে মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও ফুটপাথের মানুষদের জীবনের বিভিন্ন প্রকার সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া নাটিকাখানি একটি বিশিষ্ট ভঙ্গীতে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। জীবনসংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত শিক্ষিত রমেশ, আত্ম-স্বার্থ-সচেতন হেড মাষ্টার মহাশয়, জীবনে প্রতিষ্ঠিত বাঁশরী, শিক্ষা এবং সঙ্গতির অভাবে পথ-ভ্রষ্ট প্রহ্লাদ এবং কেষ্টধন রাম এবং পদ্ম এরা সকলেই আপন আপন চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে বড় সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। রমেন্দ্রবাবুর দৃষ্টি স্বচ্ছ। তাঁর দৃষ্টিতে ছোট বড় সকলেই ধরা পড়িয়াছে এবং তিনি ভাষার মাধ্যমে তাদের আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাঁর এই তুলিয়া ধরা সার্থক হইয়াছে।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা-সম্বলিত। সাহিত্য-সংসদ, ৩২এ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা—৯। মূল্য নয় টাকা।

আমরা বাল্যকালে বটতলায় ছাপা রামায়ণ-মহাভারত পড়িয়াছিলাম। তাহাতে ছবিও ছিল বিস্তর। পল্লীর বৃদ্ধা এবং বিধবাদের ইহা পড়িয়া শুনাইতাম। মনে পড়ে, কোন কোন দিন পড়িতে পড়িতে রাত্রির দ্বিতীয় যাম পার হইয়া যাইত। কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত ঐ সময় পড়িয়া প্রায় শেষ করিয়া ফেলি। তখন দেখিতাম এবং অদ্যাপি ভাবিয়া আশ্চর্য্য হই, নিরক্ষর নারীরা কোন্ অধ্যায়ে কি কি বিষয় বর্ণিত আছে তাহা পাঠের নির্দেশ দিতেন প্রায়ই। রামায়ণ-মহাভারতের বিষয়বস্তু তাহাদের প্রায় সবই জানা। রামায়ণ মহাভারতের গল্প ও কাহিনী বৃদ্ধাদের মারফত বালক-বালিকারা অনায়াসে জানিয়া লইত।

গত চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বৎসরের মধ্যে মানুষের রুচির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বটতলার রামায়ণ-মহাভারতের স্থান ক্রমশঃ মনোরম চিত্রসম্বলিত সুমুদ্রিত সংস্করণগুলি অধিকার করিয়া লইয়াছে। গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে রামায়ণের সুষ্ঠ সংস্করণও কয়েকখানি প্রকাশিত হইয়াছে। রামায়ণ রচনা ও রচয়িতা, রামায়ণের বিষয়বস্তু বৃহত্তর ভারতে রামায়ণের প্রভাব ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা-গবেষণাও হইতেছে কিছুকাল ধরিয়া। আলোচ্য পুস্তকখানি রামায়ণের অধুনা-প্রকাশিত সর্ব্বশেষ সংস্করণ; কাজেই ইহাতে ঐ সব বিষয় সন্নিবেশিত হইয়া ইহাকে একটি প্রামাণিক সংস্করণের মর্য্যাদা দান করিয়াছে। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বৃহত্তর ভারতে রামায়ণের প্রচার ও প্রভাব লইয়া প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত আলোচনা-গবেষণাও করিয়াছিলেন বিস্তর। আলোচ্য পুস্তকখানির ভূমিকায় তিনি এই সকল সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই জ্ঞানগর্ভ তথ্যভিত্তিক ভূমিকাটি সকল সুধীজনকেই পড়িয়া দেখিতে বলি।

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আলোচনা-গবেষণায় লিপ্ত রহিয়াছেন দীর্ঘকাল। তিনি পুস্তকের মুখবন্ধে কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণের কথা বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে কৃত্তিবাসের বংশতালিকা, কুলপঞ্জী ও জীবনকথার উপরও আলোকপাত করিতে যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন। বাংলার সমাজ-জীবনে রামায়ণী কথার প্রভাবের বিষয় আলোচনা করিতেও তিনি ক্ষান্ত হন নাই। এখানে একটি কথা না বলিয়া পারিলাম না। দুঃখ হয়, এক শ্রেণীর লেখক আজকাল পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য, পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি, অর্থনীতি, পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল প্রভৃতি সম্পর্কে পুস্তকাদি লিখিয়া আঞ্চলিক মনোবৃত্তি চরিতার্থ করিতেছেন। রাজনৈতিক কারণে পশ্চিমবঙ্গের উদ্ভব : ভূগোল, রাজনীতি, অর্থনীতি সুতরাং আলাদা। তাই বলিয়া বাঙালীর ভাষা, সাহিত্য সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ইতিহাস—এ সমুদয়ও কি আলাদা হইয়া গিয়াছে? সম্পাদক মহাশয় পশ্চিমবঙ্গে রামায়ণ প্রচার, রামায়ণ গান, রামায়ণী কথার প্রসার ও প্রভাব প্রভৃতির কথা বার বার বলিয়াছেন। প্রথমেই যে দৃষ্টান্তটি দিয়া এই লেখা আরম্ভ করিয়াছি, তাহার ঘটনাস্থল কলিকাতা হইতে অন্যূন দুইশত মাইল দূরে পূর্ব্বাঞ্চলে অবস্থিত এক নিভৃত পল্লী। বাংলার দিকে দিকে—উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব্ব-পশ্চিম সর্ব্বত্রই রামায়ণের প্রচার ও প্রসার; শুধু পশ্চিম-বঙ্গে নহে।

এখন, এই সংস্করণটির কথা বলি। সম্পাদকের সুষ্ঠ আলোচনার কোনরূপ ত্রুটি হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রক্ষিপ্ত অংশ বর্জ্জিত হইয়াছে; এইরূপ একটি প্রক্ষিপ্ত অংশবিবর্জ্জিত অথচ মূল অংশ সবটাই সংরক্ষিত অবস্থায় একখানি রামায়ণের অভাব আমরা বরাবর অনুভব করিতেছিলাম। এই সংস্করণটির প্রকাশে আমাদের এই অভাব বিদূরিত হইবে বলিয়া বিশ্বাস। তেইশখানি সুদৃশ্য চিত্র সমাবেশে পুস্তকের মর্য্যাদা খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। আমরা ছাপা বাঁধাই সম্বন্ধে সাধারণতঃ কিছু বলি না। কিন্তু এক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রমস্বরূপ বলিতে হইতেছে যে, এরূপ মুদ্রণ-পারিপাট্য কচিৎ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। পুস্তকের প্রচ্ছদপটের শুধু মুদ্রণ নয়, পরিকল্পনারও যথেষ্ট মৌলিকতা রহিয়াছে। এরূপ পুস্তক বাংলার ঘরে ঘরে আদরে রক্ষিত হইবে সন্দেহ নাই।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

খাদ্যকথা—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ৯৪ পৃষ্ঠা; মূল্য ৷৷০ টাকা।

স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যখন তাঁহার হিন্দুত্ব পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন তখন বলেন যে, আমার পুস্তকের যে দ্বিতীয় সংস্করণ হইবে ইহা আমি আশা করিতে পারি নাই—কারণ বাঙালী রম্য-রচনা ছাড়া অন্য বিষয়ের বই পড়িতে ভালবাসে না। খাদ্য-কথার যে তৃতীয় সংস্করণ হইয়াছে ইহা জাতির পক্ষে শুভ লক্ষণ এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই পুস্তক প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়া বাঙালী জাতির কল্যাণসাধন করিয়াছেন। এই বহুজন-প্রশংসিত পুস্তকের প্রশংসা করিবার ধৃষ্টতা আমার নাই। আশা করি এই সুখ-পাঠ্য, বহু তথ্যসম্বলিত বইখানি প্রত্যেক সুশিক্ষিত গৃহস্থের গৃহে পঞ্জিকার ন্যায় অবশ্য শোভা পাইবে।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস (প্রাইভেট) লিঃ, ১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

প্রবাসী, ৫৭শ ভাগ, প্রথম খণ্ড, ১৩৬৪

সূচীপত্র

বৈশাখ—আশ্বিন

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

বিষয়-সূচী

বিবিধ প্রসঙ্গ

চিত্র-সূচী

রঙীন চিত্র

একবর্ণ চিত্র

প্রবাসীর পুস্তকাবলী

রামায়ণ (সচিত্র) ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১০'৫০

সচিত্র বর্ণপরিচয় ১ম ভাগ—
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় '২৫

সচিত্র বর্ণপরিচয় ২য় ভাগ—ঐ '২৫

চ্যাটার্জির পিক্‌চার এল্‌বাম (নং ১০—১৭)
প্রত্যেক নং ৪'০০

কালিদাসের গল্প (সচিত্র)—শ্রীরঘুনাথ মল্লিক ৪'০০

গীত উপক্রমণিকা—(১ম ও ২য় ভাগ) প্রত্যেক ১'৫০

জাতিগঠনে রবীন্দ্রনাথ—ভারতচন্দ্র মজুমদার ১'৫০

কিশোরদের মন—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার '৫০

চণ্ডীদাস চরিত—(৺কৃষ্ণপ্রসাদ সেন)
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি সংস্কৃত ৪'০০

মেঘদূত (সচিত্র)—শ্রীযামিনীভূষণ সাহিত্যাচার্য্য ৪'৫০

খেলাধুলা (সচিত্র)—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার ২'০০
(In the press)

বিলাপিকা—শ্রীযামিনীভূষণ সাহিত্যাচার্য্য ১'১২

ল্যাপল্যাণ্ড (সচিত্র)—শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ ১'৫০

"মধ্যাহ্নে আঁধার"—আর্থার কোয়েষ্টলার
—শ্রীনীলিমা চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক অনূদিত ২'৫০

"জঙ্গল" (সচিত্র)—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী ৪'০০

আলোর আড়াল—শ্রীসীতা দেবী ১'৫০

ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯

বিষয়-সূচী—পৌষ, ১৩৬৪

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত

মুক্তির সন্ধানে ভারত

স্বাধীনতা আন্দোলনের আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস। সংশোধিত, পরিবর্দ্ধিত ও বহু চিত্রে শোভিত নূতন সংস্করণ। শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা

এই গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া বৃহৎ আকারে প্রকাশিত হইতেছে।

WOMEN'S EDUCATION IN EASTERN INDIA

বিশ্ববিশ্রুত ঐতিহাসিক আচার্য্য যদুনাথ সরকারের ভূমিকা-সম্বলিত। ভারতের শিক্ষার ইতিহাস পাঠেচ্ছুগণের পক্ষে এখানি অপরিহার্য। চিত্র সম্বলিত। মূল্য সাড়ে সাত টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়

বিষয়-সূচী—পৌষ, ১৩৬৪

রঙীন ছবি

নৃত্যের তালে তালে
শ্রীপঞ্চানন রায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

সিন্ধুপারের পাখী

তন্ময়া [ফোটো : শ্রীগৌর দত্ত

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫২শ ভাগ ২য় খণ্ড } পৌষ, ১৩৫৯ { ৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

অবস্থা ও ব্যবস্থা

পশ্চিম বাংলার অবস্থা আশাপ্রদ ছিল না বেশ কিছুদিন যাবত। শান্তিশৃঙ্খলার অভাব চতুর্দ্দিকেই, চুরি, রাহাজানি, নারীধর্ষণ এ ত প্রতিদিনের আইন-আদালতের সংবাদে ভর্ত্তি থাকেই; উপরন্তু অসংখ্য উৎপাত, অত্যাচার, এমনকি খুন-জখমের সংবাদও খবরের কাগজে ওঠে না, এমনই আজকের দিনের খবরের কাগজের অবস্থা! পথঘাটের অবস্থা ত অবর্ণনীয়, কি রাস্তার অবস্থা হিসাবে, কি পথচলার ও যানবাহনের নিরাপত্তার হিসাবে। এ দেশে যদি শাসকমহলে সত্যিকার মরদ কেহ থাকিতেন তবে লরীচালকরূপে যাহারা বাংলা দেশে চড়াও হইয়াছে, তাহাদের লাইসেন্স বাতিল করিয়া ও কঠোর সাজার ভয় দেখাইয়া দেশের সীমার অপর পারে পৌঁছাইয়া দিতেন। বেবী ট্যাক্সীরূপ উৎপাত এবং সরকারী ও বেসরকারী পরিবহন রথ ত মোটর-চালক এবং তাহার আরোহিগণের প্রাণান্ত করিতেই আছে।

কলিকাতায় দিনে চুরির মাত্রা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে, রাত্রে ত যে সকল অঞ্চলে গ্যাসের "আলো" সেখানে চোরের রাজত্ব। জিনিসপত্রের বাজারে ত দিনে ডাকাতি চলিতেছিলই, উপরন্তু পাঁচসালা পরিকল্পনার কল্যাণে আমদানী বন্ধ হওয়ায় বাজারে আরও অগ্নিমূল্য হইয়াছে। বাজার বলিতে অবশ্য পশ্চিম বাংলায় কালোবাজারই বুঝায়, সাদা বাজারের ঠিকানা শুধু আমাদের ত্রাণকর্ত্তাদের জানা আছে। তাঁহাদের ত রামরাজত্ব।

এই ত দেশের অবস্থা। ইহার উপর আবার অজন্মা ও দুর্ভিক্ষের কঙ্কালছায়া। না জানি বাঙালীর কপালে দুর্ভোগ আর কত আছে!

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এত বাধাবিঘ্ন, এত অবস্থা-বিপর্য্যয় সত্ত্বেও আমাদের মনেও চেতনার উদয় হয় না। আমাদের স্বভাব দাঁড়াইয়াছে এমন অদ্ভুত যে যতই বিপদ-আপদ, দুর্ঘটনা ও অত্যাচারে আমাদের দেহমন জর্জ্জরিত হউক না কেন, অন্যের উপর দোষ চাপাইতে পারিলেই যেন আমাদের সব কিছুর অবসান হয়। প্রতিকারের পথ খুঁজিয়া বাহির করা ত দূরের কথা, প্রতিকার যে প্রয়োজন তাহাও ভাবিতে আমরা প্রস্তুত নহি। এই ত সেদিন যে বৈদ্যুতিক রেলপথ চালনার উদ্বোধনে এক বিপরীত পরিণতি ঘটিল সে বিষয়ে জনসাধারণ ত নিশ্চল নিশ্চিন্ত, কর্ত্তৃপক্ষও একে অন্যের উপর দোষারোপেই ব্যস্ত। ক্লীবত্বের ব্যাপ্তি আর কতদূর যাইতে পারে?

দেশের এই অবনতির মূল কারণ যে রাজনৈতিক দলাদলির চক্রান্ত ও বিক্ষোভ সে বিষয়ে কি কাহারও সন্দেহ আছে? স্কুল-কলেজ আদি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, যানবাহনের ব্যবস্থা, কল-কারখানা হইতে আরম্ভ করিয়া সমাজকল্যাণ ও যাবতীয় লোক-সমাজের প্রগতির সকল ব্যাপারে এই দুষ্ট ব্যাধির ক্ষতচিহ্ন আজ দেখা দিয়াছে। কিন্তু এই ব্যাধির সর্ব্বাপেক্ষা বিষাক্ত লক্ষণ লোকের স্বাধীন চিন্তা-শক্তির ক্ষয় যাহার ফলে আজ আমরা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইতে চলিয়াছি।

যে ভাবে বাঙালীর জীবনযাত্রার পথ দিনের পর দিন বাধা-বিঘ্ন পূর্ণ হইয়া চলিতেছে তাহা কিরূপ শঙ্কাজনক তাহা আমরা ভাবিয়া দেখিতেও প্রস্তুত নহি। অন্যের উপর দোষারোপ বা দল বাঁধিয়া বিক্ষোভ বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, ইহাই যেন সকল দুঃখে সকল বিপদে একমাত্র ত্রাণের পথ।

১৯২৪ হইতে অদ্যাবধি এই পথে চলিয়া বাঙালী যে শুধু সর্ব্বস্বান্ত, দৈন্যগ্রস্ত ভিখারী হইয়াছে তাহাই নয় এখন সে অন্য দেশের এবং অন্য প্রদেশের লোকের চক্ষে ঘৃণ্য ক্লীব মাত্র। এ কথা বুঝিবার সময় কি হয় নাই?

এই খ্রীষ্টীয় বিংশশতকের প্রথম চতুর্থাংশে বাঙালীর স্থান কোথায় ছিল এবং আজ, সামান্য ত্রিশ বৎসর পরে কোথায়?

দেশ বিভাগের কথা বলিলে চলিবে না। সিন্ধী হিন্দুর মাতৃভূমির সবটাই গিয়াছে, পঞ্জাবীর গিয়াছে শ্রেষ্ঠাংশ। কিন্তু তাহারা মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইছে। তাহাদের কেহই, "নিশ্চল নির্বীর্য্য বাহু" বলিতে পারে না। তাহারা "গত গৌরব হৃত আসন" নহে। আমাদের সঙ্গে তাহাদের তুলনা চলে না, কোনক্রমেই কোনরূপেই।

আমাদের উচিত এখন পুরাতন পথে ফিরে যাওয়া। পূর্ব্বেকার দিনে দেশের বিপদ-আপদে প্রবীণ নবীন সকলে, ব্যক্তিগত ও দলগত চিন্তা ছাড়িয়া, সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ করিয়াছেন। দামোদরের বন্যা (১৯১৩), আত্রায়ী দুর্য্যোগের "সঙ্কটত্রাণ" সমিতি (১৯২২) মাত্র অল্পদিনের কথা। ঐরূপ কাজ করাতেই বাঙালীর ও বাংলার খ্যাতি আসিয়াছিল। কুখ্যাতি ও সর্ব্বস্ব নষ্ট হইয়াছে বর্ত্তমান পথে।

পশ্চিম বাংলার খাদ্য-পরিস্থিতি

পশ্চিম বাংলায় খাদ্য-পরিস্থিতি ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন মহাশয় অনুমান করেন যে, চলতি বৎসরে এই প্রদেশে প্রায় ১২ লক্ষ টন চাউলের ঘাটতি পড়িবে। খাদ্যশস্য তদন্ত কমিটির অনুমান অনুসারে সমগ্র ভারতবর্ষে ২০ হইতে ৩০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য ঘাটতি পড়িবে, আর কেবলমাত্র পশ্চিম বাংলায় ইহার অর্দ্ধেক ঘাটতি পড়িবে। বিধানসভায় খাদ্য-মন্ত্রী মহাশয় ধান্য উৎপাদনের যে হিসাব দিয়াছেন তাহার সবটাই গোঁজামিলে ভরা, সঠিক বুঝিবার কোনও উপায় নাই। ১৯৫৮ সনে পশ্চিম বাংলায় মোট ৩৪'৫২ লক্ষ টন ধান্য উৎপন্ন হইবে, ইহার মধ্যে আমন ধান্যের পরিমাণ ৩০'৫২ লক্ষ টন। ১৯৫৭ সনে মোট ৪৩'৩৬ লক্ষ টন ধান্য উৎপাদিত হইয়াছিল। ১৯৫৮ সনে রবিশস্যের উৎপাদন-পরিমাণ হইবে ৪ লক্ষ টন, সুতরাং খাদ্যশস্যের মোট পরিমাণ দাঁড়াইবে ৩৮ লক্ষ টনে। ইহার মধ্যে বীজধান ও নষ্টের পরিমাণ ১০ শতাংশ বাদ দিলে মোট থাকে ৩৪'৭০ লক্ষ টন। পশ্চিম বাংলার বর্ত্তমান অধিবাসীর সংখ্যা ২ কোটি ৯০ লক্ষ। ইহার মধ্য হইতে রোগী ও শিশু বাদ দিলে দৈনিক গড়ে মাথাপিছু প্রায় ৭ ছটাক করিয়া চাউল পাওয়া যাইবে। কাগজে-কলমে এই হিসাব অবশ্য নেহাৎ কিছু খারাপ নয়, কারণ বাকীটা গম দিয়া পূরণ হইতে পারে। তবে গ্রাম্য এলাকায় দৈনন্দিন গড়ে মাথাপিছু আধ সেরের অধিক চাউলের প্রয়োজন হয়, প্রায় ১২ হইতে ১৪ ছটাক চাউলের প্রয়োজন হয়।

খাদ্যমন্ত্রীর হিসাবে ধান্য ও চাউলের মধ্যে পার্থক্য না করা প্রধান গোঁজামিল। তিনি খাদ্যশস্য উৎপাদনের যে হিসাব দিয়াছেন তাহা ধান্য উৎপাদনের হিসাব, চাউল উৎপাদনের হিসাব নহে, সেইজন্য কাগজে-কলমে হিসাব ঠিক থাকিলেও বাস্তবক্ষেত্রে এই হিসাবে অনেকখানি ঘাটতি পড়ে। সেই ঘাটতি অবশ্য বহুলোকের অনাহারে ও অর্দ্ধাহারে পূরণ হয়, খাদ্যের দ্বারা নহে। সোজা কথায় এক মণ ধানে ২৮ সেরের বেশী চাউল হয় না, সুতরাং এক টন ধানে চাউলের উৎপাদন হয় মাত্র বিশ মণ। এই হিসাবে খাদ্যশস্যের হিসাব হইতে অনেকখানি বাদ চলিয়া যায় এবং ফলে ঘাটতির পরিমাণ হয় বেশী।

খাদ্যমন্ত্রীর অনেকখানি ভরসা আছে রোগবৃদ্ধির উপর অর্থাৎ, বসন্ত, কলেরা ও ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ বৃদ্ধি পাইলে খাদ্যের ঘাটতির পরিমাণ হ্রাস পাইবে। সেইজন্যই বোধ হয় এই রোগগুলিকে এই প্রদেশ হইতে বিতাড়ন করিবার বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আশ্চর্য্যজনকরূপে উদাসীনতা ও শৈথিল্য প্রকাশ পায়। খাদ্যমন্ত্রী এই প্রদেশের লোকদিগকে খাদ্য-অভ্যাস পরিবর্ত্তন করিবার উপদেশ দিয়াছেন ও অধিক পরিমাণে শাকসব্জী ও কলা খাইতে বলিয়াছেন। খাদ্যের অভাব হইলে যে জনসাধারণকে কলা খাইতে হইবে সে সম্বন্ধে খাদ্যমন্ত্রীর নূতন করিয়া কিছু না বলিলেও চলিত। খাদ্য সংরক্ষণের জন্য মন্ত্রীবর্গ কদলীভক্ষণ সুরু করিয়াছেন কিনা তাহা অনুসন্ধানযোগ্য।

প্রদেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারের উপর। এই বিষয়ে প্রাদেশিক সরকারগুলি বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁহাদের অকর্ম্মণ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। কৃষিঋণ, বীজ ও সার সরবরাহ ব্যাপারে সরকারী শৈথিল্য খাদ্যশস্য উৎপাদনে ঘাটতির জন্য বহুলাংশে দায়ী। অভাবের তাড়নায় চাষীরা বীজধান খাইয়া ফেলিতে বাধ্য হইয়াছে। বৎসরে পশ্চিম বাংলায় প্রায় ৪০ লক্ষ মণ বীজধানের প্রয়োজন হয়, সেই তুলনায় মাত্র ৪০ হাজার মণ বীজধান সরবরাহ দেওয়া হইয়াছে। এই প্রদেশে প্রায় তিন শত বীজ-উৎপন্ন-ক্ষেত্র স্থাপন করা প্রয়োজন, সেই তুলনায় ১৯৫৭-৫৮ সনে মাত্র ৯০টি ক্ষেত্র স্থাপিত হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

খাদ্যমন্ত্রী পশ্চিম বাংলার লোকসংখ্যা ধরিয়াছেন ২ কোটি ৯০ লক্ষে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাব অনুসারে পশ্চিম বাংলার জনসংখ্যা ২'৬৬ কোটি। ১৯৫৬ সনে খাদ্যশস্যের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল (রবিশস্য ব্যতীত) ৪২'৬৩ লক্ষ টন। ১৯৫৮ সনে হইবে ৩৪'৫২ লক্ষ টন। প্রদেশের প্রয়োজন প্রায় ৪৬'৫০ লক্ষ টন, সুতরাং ঘাটতি পড়িবে ১২ লক্ষ টন। এই ঘাটতি অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার মিটাইবেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি বিষয়ে প্রায় নিশ্চেষ্ট বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

খাদ্যশস্য বৃদ্ধির উৎপাদন ব্যাপারে ভূমিনীতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পশ্চিম বাংলার এলাকা ৩৪,৯৪৪ বর্গমাইল। ২'৬৬ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে ১'৫৮ কোটি কৃষিজীবী। এখানে চাষ হয় মোট ১'৩২ কোটি একর জমিতে এবং ইহার মধ্যে মোট ২৮'৫৫ লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ মোট চাষ-জমির মাত্র ১৯ শতাংশ জমিতে সেচের ব্যবস্থা আছে। নদী-পরিকল্পনা-গুলির ফলে জলবাহী শাখা ক্যানালগুলির অধিকাংশই আজ শুষ্ক, চাষীরা চাষের জন্য জল পায় না। এই বৎসর সুন্দরবনে ও মেদিনীপুর জেলার কোন কোন স্থানে ব্যাপকভাবে অনাবৃষ্টি হওয়ার ফলে চাষ-আবাদ একদম হয় নাই বলিলেও চলে। খাদ্যের অভাবে সুন্দরবন এলাকার লোকজন কলিকাতার পথে পথে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে। ইহারা কোন সরকারী সাহায্য পায় না।

ভূমিসংস্কার আইনের আওতা হইতে মৎস্য-জমি বাদ দেওয়া হইয়াছে। সুন্দরবন এলাকার এই সকল মৎস্য-জমির পরিমাণ কয়েক হাজার একর। ইহাদের মালিক মুষ্টিমেয় কয়েকজন ধনী এবং সরকারী মহলে ইহাদের যথেষ্ট প্রভাব থাকার ফলে ইহাদের স্বার্থে আঘাত দিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাহস পান না। কলি-কাতার মাছের বাজার ইহারা একচেটিয়াভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং সেই কারণে মাছের অগ্নিমূল্য। মৎস্য-জমিকে জাতীয়করণ দ্বারা সমবায় প্রথায় মাছের চাষ করিলে বহু কৃষকের সংস্থান হইত।

শিক্ষিত বেকার সমস্যা

পশ্চিম বাংলায় শিক্ষিত বেকারসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু সেই তুলনায় ইহাদের কার্য্যসংস্থানের সুযোগ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে না। ভারতবর্ষে বৎসরে ২০ লক্ষ করিয়া কার্য্যক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে মাত্র দেড় কোটি লোকের কর্ম্মসংস্থান করিবার কল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। বৎসরে বিশ লক্ষ করিয়া যে নূতন বেকারসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাদের মধ্যে অন্ততঃপক্ষে এক-পঞ্চমাংশ শিক্ষিত বেকার, ইহা প্ল্যানিং কমিশনও স্বীকার করিয়াছেন। শিক্ষিত বেকারসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণগুলির মধ্যে দেখা যায় যে, যুক্ত-পরিবার ব্যবস্থা রহিত হওয়া, শিক্ষার বিস্তার, ভূমিসংস্কার এবং স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ব্বাহ করিবার ইচ্ছা। শিক্ষিত বেকার সমস্যা অবশ্য নূতন কোন সমস্যা নহে, ইহা সাধারণ বেকার সমস্যারই অংশ মাত্র। তবে শিক্ষিত বেকার সমস্যার নিজস্ব কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে যথা: (১) জনসাধারণের মনে ধারণা আছে যে, ব্যক্তিগত শিক্ষার জন্য যাহা খরচা করা হয় তাহার দরুন লাভজনক চাকুরী সংস্থান হওয়া প্রয়োজন; (২) শিক্ষিত ব্যক্তি যে ধরনের শিক্ষা পাইয়াছে সেই ধরনের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে চায়। কার্য্যতঃ দেখা যায় যে, সেই প্রকার কার্য্যের যথেষ্ট অভাব আছে। কিন্তু অন্যান্য বহুপ্রকার কার্য্যের জন্য আবার লোকের অভাব দেখা যায়। ইহার প্রধান কারণ কার্য্য অনুসারে পরিকল্পিত শিক্ষার অভাব। তৃতীয়তঃ দেখা যায় যে, বাংলা দেশের লোক অন্য প্রদেশে সহজে যাইতে চাহে না কিংবা পশ্চিম বাংলারই এক জেলার লোক অন্য জেলায় যাইতে চাহে না। আঞ্চলিক আকর্ষণ শিক্ষিত বেকার সমস্যা সমাধানের একটি প্রধান অন্তরায়; দক্ষিণ ভারতবাসীর দ্বারা বাংলা দেশ প্রায় প্লাবিত; কিন্তু দক্ষিণ ভারতে বাংলাবাসীর সংখ্যা অতি নগণ্য। একদিন বাংলাবাসীর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বহির্মুখী, বর্ত্তমানে তাহা হইয়াছে গৃহাভিমুখী। অবশ্য বাঙালীদের বিরুদ্ধে সারা ভারতের দ্বার আজ রুদ্ধ। ইহার জন্য বাঙালী প্রদেশবদ্ধ হইতে অনেকখানি বাধ্য হইয়াছে। চতুর্থতঃ, শিক্ষিত বাঙালী অফিসে কেরাণীর চাকুরী ব্যতীত অন্যান্য কার্য্য গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক।

কিন্তু কারণ যাহাই হউক, শিক্ষিতদের চাকুরীর সংস্থান করিয়া দেওয়া রাষ্ট্রের অবশ্যকরণীয় কার্য্য এবং সেই দায়িত্ব প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের হিসাব দ্বারা নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, কারণ যে সংখ্যা নাম লেখায় তাহার অন্ততঃপক্ষে পাঁচ-ছয় গুণ অধিক বেকারসংখ্যা আছে। পশ্চিম বাংলার বোধ হয় প্রতি ঘরে একজন কি দুইজন করিয়া বেকার আছে এবং ইহারা সাধারণতঃ অর্থাৎ, অন্ততঃপক্ষে ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষা পাস করিয়াছে। মাধ্যমিক শিক্ষার পরিবর্ত্তন দ্বারা শিক্ষিত বেকার সমস্যার প্রকৃত কোনও সমাধান হইবে না, ইহা সমস্যাকে এড়াইয়া যাওয়ার প্রচেষ্টা মাত্র। এগারো বৎসরের শিক্ষা প্রণালীতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে লোপ করা যাইবে না, কিংবা শিক্ষিত বেকার সমস্যাকেও দূরীভূত করা সম্ভবপর হইবে না।

শিক্ষিত বেকার সমস্যার সমাধান করিতে হইলে প্রয়োজন দ্রুত কারিগরী বিদ্যাশিক্ষার ব্যাপক প্রচলন। ইহার জন্য কলিকাতায় কয়েকটি এবং প্রতি জেলায় একটি করিয়া কারিগরী বিদ্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন। শুধু বিদ্যালয়ের শিক্ষাই যথেষ্ট হইবে না, সেই সঙ্গে হাতে-কলমে ব্যবহারিক শিক্ষারও অবশ্যপ্রয়োজন। ইহার জন্য আইনের দ্বারা প্রতি শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে বাধ্য করা প্রয়োজন যাহাতে প্রতি শিল্পপ্রতিষ্ঠান নির্দ্দিষ্টসংখ্যক কারিগরী শিক্ষানবিশ লইতে বাধ্য হয় এবং ভবিষ্যতে ইহাদের মধ্য হইতেই কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইবে। জার্ম্মানীতে এই ব্যবস্থায় শুধু যে শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে তাহা নহে, বেকার সমস্যার সমাধান হয় এবং দেশে কারিগরী শিক্ষা প্রসারলাভ করে। কয়েকটি শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া সেখানে কারিগরী বিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত। শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদে কারিগরী শিক্ষা-নবিশ গ্রহণ করে। ইহার ফলে শিক্ষা শুধু নীতিগত থাকে না, ব্যবহারিক হওয়ার ফলে শিক্ষা তথা শিল্পোৎপাদনও উৎকর্ষ লাভ করে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এগারো বৎসরের শিক্ষাপ্রণালীর জন্য যে বিরাট বিরাট ইমারতাদি তৈয়ারীর পিছনে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিতেছেন তাহা প্রায় আলেয়ার পিছনে ধাবমান হওয়ার সামিল। ইহা শুধু অর্থের অপচয় নহে, ইহা পরিকল্পনার বিলাস মাত্র। ইহার প্রকৃত ফল হইবে হ, য, ব, র, ল। এই টাকায় কারিগরী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলে প্রকৃত কাজ হইত।

যে সকল সরকারী তথ্য প্রকাশিত হয় তাহাতে দেখা যায় যে, প্রতি মাসেই বাংলা ব্যতীত অন্যান্য প্রদেশে স্বল্পায়তন শিল্প, কুটীর-শিল্প ও শিল্পাঞ্চলগুলি ব্যাপকভাবে গড়িয়া উঠিতেছে। দুঃখের বিষয় যে বাংলা দেশের কৃতির কোনও উল্লেখই থাকে না। বাংলা দেশের বাহিরে শিক্ষিত বেকার সমস্যা এত সঙ্কটশীল নহে, যেমন ইহা বাংলা দেশে। কর্ম্মসংস্থানের জন্য বর্ত্তমানে গ্রাম্যব্যক্তিদের শহরমুখী গতি দেখা যায়, বর্ত্তমানে প্রায় ৪০ শতাংশ হারে জন-সাধারণ শহরমুখী হইতেছে। ১৯৫০ সন পর্য্যন্ত ইহার হার ছিল মাত্র ১৭ শতাংশ। শহরের উপর, প্রধানতঃ কলিকাতা শহরের উপর হইতে শিক্ষিত বেকারের চাপ কমাইতে হইলে প্রয়োজন গ্রাম ও গ্রাম্যসম্প্রদায়গুলিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও স্বাবলম্বী করা। শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ দ্বারাও গ্রামগুলিকে অর্থ-নৈতিক বিপর্যায় হইতে রক্ষা করা যায়। এ সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকার শুধু নিশ্চেষ্ট নহেন, উদাসীন। মাঝে মাঝে সদিচ্ছা প্রকাশ করিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত থাকেন। সাবান, দিয়াশলাই, কাগজ, চীনামাটির বাসন প্রভৃতির জন্য স্বল্পায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়া পঞ্জাব তাহার শিক্ষিত বেকার সমস্যা সমাধান করিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে বাঙালী নিয়োগ বৈষম্য

পশ্চিমবঙ্গেও যে বাঙালীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হইতেছে সেই সম্পর্কে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমরা গত সংখ্যায় আলোচনা করিয়াছিলাম। আমাদের মন্তব্য যে কতদূর সমীচীন এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবে তাহার সাক্ষ্য মিলিতেছে। ৬ই ডিসেম্বর বিধানসভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহাতে বলা হইয়াছে যে, চাকুরী দেওয়ার ব্যাপারে সওদাগরী ও শিল্প সংস্থাগুলিতে বাঙালীদের প্রতি বৈষম্য-মূলক আচরণ করা হইতেছে এবং যোগ্যতাসম্পন্ন হইলেও এই বয়সের লোকদের যথেষ্ট সংখ্যায় নিয়োগ করা হইতেছে না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই বিষয়ে তদন্ত করিয়া দেখিবেন বলিয়া প্রতি-শ্রুতি দিয়াছেন। তদন্তের পর রাজ্যসরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট যথোপযুক্ত সুপারিশ প্রেরণ করিতেও সম্মত হইয়াছেন।

মূল প্রস্তাবটি আনয়ন করে কমিউনিষ্ট পার্টি। প্রথমে শ্রীপাঁচু-গোপাল ভাদুড়ী (কমিউনিষ্ট) একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। পরে কমিউনিষ্ট পার্টি হইতেই প্রস্তাবটির একটি সংশোধনী আনা হয়। কংগ্রেস পক্ষ হইতে অধ্যাপক শ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য এই দ্বিতীয় কমিউনিষ্ট প্রস্তাবটির উপর আর একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনেন। অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যের সংশোধনী প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করিয়াই বিধানসভার প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

বিতর্ককালে বিদেশী শিল্পসংস্থায় বাঙালী ও ভারতীয়দের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ করিয়া শ্রীজ্যোতি বসু বলেন যে, বিদেশী, বিশেষতঃ ব্রিটিশ শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও সওদাগরী আপিসগুলিতে যে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা চলিতেছে তাহা আইনতঃ সম্ভব হইতেছে। এই প্রস্তাবের দ্বারা তাহার প্রতিকার চাওয়া হইয়াছে। ইহা শুধু ভাবাবেগ বা রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদার প্রশ্নও নয়, নৈতিক ও অর্থ নৈতিক উভয় কারণেই এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা বন্ধ হওয়া দরকার। ১০০ বৎসর যাবৎ এই বৈষম্য চলিতেছে। কিন্তু পূর্ব্বেকার তুলনায় এখন পার্থক্য এই যে, আগে উহা বেয়নেটের জোরে চলিত ও প্রতিবাদ করা যাইত না। বিশেষজ্ঞ যদি বিদেশ হইতে আনিতে হয় তাঁহাদের জন্য যত দরকার বেতন দিতে দেশ প্রস্তুত আছে। কিন্তু যেখানে বিশেষজ্ঞ বা টেকনিসিয়ানের প্রশ্ন নাই, সেখানে এই বৈষম্য চলিতে পারে না। আজকের এই প্রস্তাবে সমস্ত বিদেশী সংস্থাগুলির কর্ম্মচারী ভারতীয়করণের কথা বলা হইতেছে না। যত দিন ভারতীয়করণ না হইতেছে, ততদিনও বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা চলিবে কেন?

ইংরেজদের হাত হইতে কোম্পানী কেনার পর অনেক অবাঙালী মালিক বাঙালী কর্ম্মচারীদের বিতাড়ন আরম্ভ করিয়াছেন, এরূপ দেখা গিয়াছে। উহাও যেমন প্রতিরোধ করিতে হইবে, তেমনি বিদেশী কোম্পানীর বৈষম্যমূলক আচরণও প্রতিরোধ করিতে হইবে। কিন্তু এই দুইটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

অধ্যাপক শ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য তাঁহার সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে ভয়াবহ বেকার-সমস্যা রহিয়াছে। রাজ্য পরিসংখ্যান ব্যুরোর এক অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইয়াছে যে, পশ্চিমবঙ্গের একজন গ্র্যাজুয়েট তরুণও পাশ করিবার এক বৎসরের পূর্ব্বে কোন চাকুরী লাভের আশা করিতে পারেন না। এই যেখানে অবস্থা সেখানে অবাঙালী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি কর্ম্মচারী নিয়োগ সম্পর্কে এমন একটা নীতি গ্রহণ করিয়াছে যে, বাঙালী কর্ম্মপ্রার্থীরা ন্যায্য প্রতিযোগিতার সুযোগ পান না। লোক নিয়োগের ব্যাপারে এই সকল প্রতিষ্ঠানে বাঙালীদের সম্পর্কে প্রকাশ্য বা গোপন একটি বিরূপতা রহিয়াছে। বাঙালী কর্ম্মচারীদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হয়, যাহার ফলে তাঁহারা কাজ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন।

অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য বলেন যে, তাঁহারা বিহার বা আসামের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে চাহেন না। কিন্তু বিহারে বিহারীদের জন্য কিছু চাকুরী সংরক্ষিত করিয়া রাখা হইয়াছে একথা মনে রাখা দরকার। পশ্চিমবঙ্গেও যাহাতে প্রত্যেক কলকারখানা ও আপিসে কেবলমাত্র বাঙালীদের দ্বারা পূরণের জন্য শূন্যপদের একটা অংশ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা হয় সেজন্য তিনি প্রস্তাব করেন এবং প্রত্যেকটি শূন্যপদে যাহাতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের মারফৎ লোক নিয়োগ করা হয় সেজন্য তাহাদের উপর একটি বাধ্যবাধকতা আরোপ করিতে বলেন।

শ্রীযতীন চক্রবর্ত্তী অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যের প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলেন যে, শোষণ বা বৈষম্যমূলক আচরণ সাদা-চামড়ার ইংরাজই করুক বা কালা চামড়ার এক শ্রেণীর ভারতীয় করুক, উহার প্রতিবাদ করিতে হইবে। তিনি কতকগুলি সংবাদ দিয়া বলেন যে, ইংরেজ মালিকানায় পরিচালিত যে সকল ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি অবাঙালীদের অধিকারে গিয়াছে সেগুলিতে যোগ্য বাঙালী প্রার্থীরা কাজ পাইতেছে না, অথচ অবাঙালী কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হইতেছে। কতকগুলি প্রতিষ্ঠানে মালিকানা বদল হইবার পর পুরাতন বাঙালী কর্ম্মচারীদের চাকুরী গিয়াছে। এই অবস্থার প্রতিকার করার জন্য তিনি রাজ্য সরকারের নিকট দাবী জানান।

ডাঃ রায় কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রস্তাবের বিপক্ষে এবং কংগ্রেস দলের সংশোধন প্রস্তাবের পক্ষে বক্তৃতায় বলেন যে, এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্যটা কি? কোন একটা উদ্দেশ্য ছাড়া ত প্রস্তাব নেওয়ার মানে হয় না। বৈষম্যমূলক আচরণ দূর করার পর কি হইবে? বিরোধীদলের নেতা নিজেই ত একটা বৈষম্য করিতে যাইতে-ছেন—বিদেশী এবং দেশী কোম্পানীর মধ্যে। নিজের সংস্থা নিজের মতাবলম্বী লোক দিয়া পরিচালনা করার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। যদি জনমত খুব বিরুদ্ধ না হইত তাহা হইলে আমি বোধ হয় নিজের লোক একটি শিল্প সংস্থায় রাখিতাম। বাহিরের লোকের চেয়ে তাহাই আমি ভাল করিতাম। কাজেই কোন বিদেশী কোম্পানী যদি তাহারা নিজেদের কোন ভাইকে তাহাদের সংস্থায় রাখে, তাহা রাখিবার অধিকার আছে। প্রত্যেক সংস্থাই তাহার নিজের মতাবলম্বী লোক দিয়া সংস্থা চালাইতে চায়।

সংবিধানে আমরা ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করিয়া লইয়াছি এবং আমরা সব ব্যাপারে তাহাদের বলিতে পারি না তোমরা এটা কর, ওটা করিও না। সংবিধানে গবর্ণমেণ্টকে কতকগুলি নিদ্দিষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। সেই ক্ষমতার দ্বারা একটা তদন্ত করানো যায় এবং সে জন্যও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করিতে হয়। সরকারী প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হইতেছে বেকার সমস্যা দূর করা। জাতিবৈষম্যের ভিত্তিতে কোন প্রস্তাব রচনা করা যায় না। তিনি থাকিতে এইরূপ প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করিতে দিতে পারেন না। মিশর, রাশিয়া বা ইন্দোনেশিয়া ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী কাজ করে না। তাহারা যেভাবে চলিতে পারে, আমরা তাহা পারি না। উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য এই রাজ্যের লোককে চাকরীতে রাখিতে হইবে, একথা আমরা বলিতে পারি। ইহাই নীতি হওয়া উচিত। একটা শিল্প যদি কোন অঞ্চলে পূর্ণ সাফল্য লাভ করিতে চায়, তাহা হইলে ঐ অঞ্চলের লোক দিয়া কাজ চালানো উচিত। বৈষম্যমূলক আচরণের ভিত্তিতে রচিত কোন প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করিব।

আসামে বাঙালী ও বাংলা ভাষা

আসামে বহুসংখ্যক বাঙালীর বাস। কিন্তু দুঃখের বিষয় নানা-ব্যাপারেই তথায় বাঙালীদের উপর বৈষম্যমূলক আচরণ করা হইতেছে। কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, শিক্ষাকর্তৃপক্ষ সকলেই অল্পবিস্তর এইরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ করিয়া চলিতেছেন। বাঙালীদের তরফ হইতে বারংবার আবেদন-নিবেদন সত্ত্বেও অবস্থার কোন উন্নতি ঘটে নাই। আসামের অন্যতম বাংলা সাপ্তাহিক "যুগশক্তি" পর পর কয়েকটি সংখ্যায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আসামে বাঙালী বৈষম্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলা ভাষার প্রতি অবিচার সম্পর্কে যুগশক্তি যাহা লিখিয়াছেন আমরা তাহা এইখানে তুলিয়া দিলাম :

"বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট সকলে সব বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হইতে ন্যায়-বিচার পাইবার দাবী অবশ্যই করিতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাঙালী ও বাংলা ভাষার প্রতি শুধু উদাসীন এমন নহে, অনেকটা বিরূপ-ভাবাপন্ন বলিয়াও মনে করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে বাঙালী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা নগণ্য নহে। বর্ত্তমানে গোয়ালপাড়া ও আসামের অন্যান্য (একমাত্র কাছাড় জেলা ব্যতীত) বহু স্থানে বঙ্গভাষীদের মাতৃভাষা ত্যাগ ও অসমীয়াভাষা গ্রহণের ব্যবস্থা করিবার পরেও দেখা যায় যে, চলিত বৎসরে (১৯৫৭ ইং) গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় বঙ্গভাষাভাষী ও অন্যান্য পরীক্ষার্থীর সংখ্যা নিম্নরূপ :

	মোট	বাঙালী	অসমীয়া	অন্যান্য
ম্যাট্রিক	১৭৮৪১	৪৫২৭	১০৩৪৬	২৯৬৮
আই-এ	৪১৭৩	} ১৫০২	১৮৮১	২২৭৩
আই-এসসি	১৪৮৪			
আই-কম্	৪৭২	১৯৭		
বি-এ	২০৩৫	} ৪১৭	[illegible]	
বি-এসসি	৪১৯			
বি-কম্	১৯৩	৯৮	৭০	২৫

অথচ গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসামের বিপুলসংখ্যক বাঙালীদের শিক্ষা-সংস্কৃতি সংরক্ষণ বা সম্প্রসারণের কোন চেষ্টা করা দূরে থাকুক—বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠনের ব্যবস্থাটুকুও আজ পর্য্যন্ত হইল না। এজন্য বহু আবেদন-নিবেদন করিয়াও কোন ফল পাওয়া যাইতেছে না। আসামের একমাত্র সরকারী কলেজ 'কটন কলেজে' বাংলা 'অনার্স' খোলা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা পড়াইবার জন্য প্রয়োজনীয়সংখ্যক অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয় নাই। মাত্র দুই জন অধ্যাপকের উপর কলেজের সব শ্রেণীতে সাধারণ বাংলা, বিশেষ বাংলা এবং অনার্স কোর্স ইত্যাদি পড়াইবার দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছে। যেখানে ৫।৬ জন অধ্যাপক আবশ্যক, সেখানে অনার্সের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী ন্যূনতম তিন জন অধ্যাপকের ব্যবস্থাও করা হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে বিস্ময়করভাবে নির্ব্বিকার।—তাহা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক বা কর্ম্মচারী নিয়োগেও বাঙালীদের প্রতি নির্ম্মম উপেক্ষা প্রদর্শন করা হইতেছে।"

বঙ্গ সীমান্তে পাকিস্থানী হানা

বিগত দশ বৎসরে ভারত সীমান্তে যতবার বিদেশী (পাকিস্থানী) আক্রমণ ঘটিয়াছে, অন্য কোন রাষ্ট্রেই বোধ হয় তাহা হয় নাই। ভারত-পাকিস্থান প্রতিবেশী রাষ্ট্র, কিন্তু পাকিস্থান সরকার কোন দিক হইতেই প্রতিবেশীর মর্য্যাদা রাখে নাই। বৃহত্তর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পাকবিরোধের কথা বাদ দিলেও দেখা যায় যে, সামান্যতম ব্যাপারেও পাকিস্থান সরকার ভারতের সহিত সহযোগিতায় অনিচ্ছুক। কিছুদিন পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত চর তারাপুরের নিকটবর্ত্তী চর বাসুদেবপুরে পাকপুলিস ও আনসার দল হামলা দেয়। উদ্দেশ্য ছিল ঐ চরের উৎপন্ন ফসল লুঠপাট করা। কিন্তু তাহাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারত সরকারের সৈন্যবাহিনী দ্রুত অকুস্থলে আসিয়া পড়ায় এবং সম্ভাব্য সকল প্রকার পুলিসী ব্যবস্থা হওয়ার ফলে তাহাদের মতলব সিদ্ধ হয় নাই।

এই ঘটনা উপলক্ষ্যে মুর্শিদাবাদ সীমান্তে ঘন ঘন পাকিস্থানী হামলার উল্লেখ করিয়া স্থানীয় সাপ্তাহিক "ভারতী" লিখিতেছেন :

"সীমান্ত অতিক্রম করিয়া পররাষ্ট্র দখলের কোন দুরভিসন্ধি না থাকিলেও কিছু দিন হইতে এতদঞ্চলে পাকিস্থানীদের এই ধরনের হামলা প্রায় একটি নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য ভারত রাষ্ট্রের নাগরিক-গণের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করা ও তাহাদিগকে আতঙ্কিত ও বিব্রত রাখা। একশ্রেণীর গুণ্ডা ও দুষ্টপ্রকৃতির লোকই যদি এই ধরনের অপরাধজনক কার্য্যে লিপ্ত থাকিত তাহা হয়ত ক্ষমা করা যাইত

ইহার পশ্চাতে পাকিস্থান রাষ্ট্রের পুলিস ও আনসার বাহিনীর সক্রিয় সহযোগিতা এবং হস্তক্ষেপ কোনক্রমেই ক্ষমার্হ নহে। যাহাতে সীমান্তে পুনঃ পুনঃ এইরূপ দুর্ঘটনা না ঘটে তজ্জন্য আমাদের সরকারের অবিলম্বে সর্ব্বপ্রকার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। সীমান্ত অধিকতর সুরক্ষিত না করিলে ও চর এলেকায় স্থায়ী ব্যাপকতর পুলিসী পেট্রোলের ব্যবস্থা না থাকিলে এইরূপ বিরক্তিকর অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিবে না ইহাই আমাদের ধারণা। মাঝে মাঝেই সৈন্য, পুলিসবাহিনী ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদের রাহা-খরচে অর্থব্যয় না করিয়া উপরোক্ত স্থায়ী ব্যবস্থার জন্য এই অর্থ বিনিয়োগ করিলে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হওয়া সম্ভব।

"এই প্রসঙ্গে রঘুনাথগঞ্জ থানার পাক-ভারত সীমান্ত অঞ্চলের অপর একটি ঘটনার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন মনে করি। প্রায় চার-পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে উপরোক্ত থানার দয়ারামপুর ইউনিয়নের বাখরালী, বাগডাঙ্গা, পিরোজপুর, বাজিতপুর প্রভৃতি মৌজাগুলির নবোদ্ভূত চর পাকিস্থানীরা জবর-দখল করিয়া লয় এবং পরে উভয় সরকারের সহিত আলাপ-আলোচনায় স্থির হয় যে, যতদিন না বাগে কমিশনের রোয়েদাদ অনুসারে জরিপ করিয়া সীমান্ত চূড়ান্ত নির্দ্ধারিত হয় ততদিন কোন পক্ষই ইহা দখল করিবে না তবে অন্তর্ব্বর্ত্তীকালে এই চরের উৎপন্ন ফসল উভয় পক্ষের তত্ত্বাবধানে রাখা হইবে। ভারতীয় নাগরিকগণ তাহাদের জমির ন্যায়সঙ্গত অধিকার হইতে এইভাবে বঞ্চিত হইলেও তাহারা মুর্শিদাবাদ জেলা শাসকের নির্দ্দেশ মানিয়া লয় ও সেই অনুসারে কার্য্য করে। কিন্তু পাকিস্থানীরা নির্ব্বিবাদে আজ পর্য্যন্ত এই বিরোধীয় চর দখল করিয়া আসিতেছে ও নিয়মিতভাবে ফসল আত্মসাৎ করিয়া লইতেছে। যাহা হউক দীর্ঘ দিন আবেদন-নিবেদনের ফলে অবশেষে প্রায় বৎসরখানেক পূর্ব্বে বিরোধীয় চর বাগে রোয়েদাদ অনুসারে জরিপ করা শেষ হইয়াছে কিন্তু শুনা যাইতেছে, পাকিস্থান সরকার নাকি বর্ত্তমানে তাহা মানিয়া লইতে অস্বীকার করিয়াছেন। ইহা যদি সত্য হয় তবে আর কতদিন ভারত সরকার এই নির্ব্বিকল্প ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকিবেন? কতদিনই বা আর ভারতীয় নাগরিকগণ পাকিস্থানী জুলুমের কাছে নতি স্বীকার করিয়া তাহাদের মুখের গ্রাস অন্যের হাতে তুলিয়া দিবে? পাকিস্থান সম্পর্কে ভারত সরকারের এই দুর্ব্বল নীতি জনস্বার্থবিরোধী ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে এবং যত শীঘ্র তাঁহারা ইহা পরিহার করেন ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল।"

পাকিস্থানে যুক্তনির্ব্বাচন ও হিন্দুসমাজ

ধর্ম্মের ভিত্তিতে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম অপসৃষ্টি। ভারতের প্রগতিশীল জনমত হিন্দুমুসলমান নির্ব্বিশেষে এই স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন ব্যবস্থার বিরোধিতা করিয়াছে। প্রধানতঃ মুসলীম লীগের সুবিধার জন্যই ভারতে ব্রিটিশ সরকার ঐরূপ স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর প্রায় সকলেই এই স্বতন্ত্র ব্যবস্থার অসারতা বুঝিতে পারিয়াছেন। ফলে আমরা দেখিয়াছি যে, অবিভক্ত ভারতে যে সকল মুসলমান নেতা হিন্দু-মুসলমানের স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের জন্য গলা ফাটাইয়া চীৎকার করিয়াছেন, পাকিস্থানের "ইসালামীয় প্রজাতন্ত্রে" পর্য্যন্ত তাঁহারা যুক্তনির্ব্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের উদ্যোগী হইয়াছিলেন। বলাই বাহুল্য যে, হিন্দুসম্প্রদায়ের অধিকাংশ চিরকালই যুক্ত নির্ব্বাচনের পক্ষপাতী। পাকিস্থান ইসলামীয় প্রজাতন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও যে তথায় যুক্ত নির্ব্বাচনপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে স্বভাবতঃই একদল গোঁড়া সাম্প্রদায়িক পাক-মুসলমান নেতার তাহা ভাল লাগে নাই। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই—কারণ যাঁহারা রাজনৈতিক ভাবে পাকিস্থানে হিন্দুদিগকে দমাইয়া রাখিতে চাহেন তাঁহারা হিন্দুদিগকে একটি পৃথক এবং নিম্নতর রাজনৈতিক শ্রেণীতে পরিণত করিতে চাহিবেন ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। কিন্তু আশ্চর্য্য হইতে হয় যখন দেখা যায় যে, দায়িত্বশীল হিন্দু নেতাও এই সকল বিভেদপন্থীদের অনুগামী হন।

এই সম্পর্কে শ্রীহট্টের "জনশক্তি" ২৭শে কার্ত্তিক, ১৩৬৪ যাহা লিখিয়াছেন আমরা তাহা বিস্তারিত তুলিয়া দিলাম। বলা বাহুল্য, এই বিষয়ে "জনশক্তি"র মন্তব্যের সহিত আমরা সম্পূর্ণরূপে একমত। "জনশক্তি" লিখিতেছেন:

"পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় ষ্টেটমন্ত্রী শ্রীঅক্ষয়কুমার দাস মহাশয় সম্প্রতি এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, পৃথক নির্ব্বাচনপ্রথা ব্যতীত কোন ব্যবস্থায় তপসিলি সম্প্রদায় কখনই সম্মত হইবে না। তিনি আরও বলেন—'আমরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিশেষ করিয়া তপসিলি জাতি আন্তরিকভাবে ইহা বিশ্বাস করি যে, একমাত্র পৃথক নির্ব্বাচন ব্যবস্থাই আমাদের রাজনৈতিক অধিকারের পক্ষে গ্যারাণ্টি স্বরূপ।'

"পাকিস্থান সংবিধান রচনার সময়ে পাকিস্থান কন্‌ষ্টিটুয়েণ্ট এসেম্বলীতে নির্ব্বাচনপ্রথা সম্পর্কে অক্ষয়বাবুর বক্তৃতায় ছিল—'We want joint electorate. We want it because the country may develop a national outlook so that the people may feel that they belong to one nation. This is essential for the stability and solidarity of the State. We want that there should be one electorate so that Muslims and non-Muslims may mix with each other freely; so that we may call ourselves as part of one nation; so that there may not be any differential treatment. So I request that joint electorate be provided in the constitution." দেশের জন্য সংবিধান রচনার সময় অক্ষয়বাবু সুস্পষ্ট ভাষায়ই যুক্ত নির্ব্বাচন দাবী করিয়াছিলেন!

"ঐ সময়ে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী মিঃ ব্রোহী ঘোষণা করেন যে, যদি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যুক্ত নির্বাচনপ্রথাই দাবী করেন তবে অবশ্যই দেশের আইনে যুক্ত নির্বাচনের ব্যবস্থাই করিতে হইবে। মিঃ ব্রোহীর এই ঘোষণার মর্ম্মানুযায়ী বিগত সাধারণ নির্ব্বাচনের সময় পূর্ব্ব পাকিস্থানের সমগ্র হিন্দুসমাজ একবাক্যে যুক্ত নির্ব্বাচনপ্রথা দাবী করেন। কংগ্রেস দল ছাড়াও ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ পার্টি এবং তপসিলি সমাজের একযোগেই যুক্ত নির্ব্বাচন ব্যবস্থা দাবী করেন। শ্রীঅক্ষয়কুমার দাস মহাশয়ও নির্ব্বাচনের সময়ে যুক্ত নির্ব্বাচনপ্রথাই সমর্থন করিয়া ভোট সংগ্রহ করিয়াছেন। নির্ব্বাচন ব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্ব্ব পাকিস্থান ব্যবস্থা পরিষদে যখন প্রস্তাব গৃহীত হয় তখনও অক্ষয়বাবু যুক্ত নির্ব্বাচনপ্রথাই সমর্থন করেন। এক বৎসর পূর্ব্বে ঢাকাতে জাতীয় পরিষদে যখন এই সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হয় তখনও অক্ষয়বাবু যুক্ত নির্ব্বাচন ব্যবস্থার পক্ষেই ছিলেন। আজ মন্ত্রিত্ব লাভের গরজে অক্ষয়বাবু উল্টা কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি না। মন্ত্রিত্বলোভী অক্ষয়বাবুর অনেক কীর্ত্তিকলাপের কথাই আমাদের স্মরণে আসিতেছে—সেই সব উল্লেখ করিতেছি না। তবে এই কথা আমরা দাবী করিব যে, তিনি তাঁহার ভোটারদের নিকট হইতে তাঁহার নূতন মতের সমর্থন লাভ করিবার জন্য পদত্যাগ করিয়া এই ইস্যু লইয়া নূতন ভাবে নির্ব্বাচিত হইয়া যাওয়ার সৎসাহস প্রদর্শন করুন।

গত দশটি বৎসর যাবৎ অক্ষয়বাবু মন্ত্রিত্বকামী হইয়া করাচীতে বিভিন্ন দলের দরজায় বিভিন্ন সময়ে ধর্ণা দিয়া যে সমস্ত ডিগবাজী খেলিয়াছেন তাহা দেশের লোক লক্ষ্য করিয়াছেন। যখন তিনি মন্ত্রিত্বের গদীতে আসীন থাকেন না তখনও তাঁহার সময় করাচীতেই কাটে। তাঁহার নিজ জেলার তপসিলি সমাজের লোকদের অসংখ্য অভাব-অভিযোগ দূরীকরণের জন্য শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাস এবং শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুকিশোর সেনগুপ্ত মহাশয়গণকেই মন্ত্রীদের নিকট এবং স্থানীয় রাজকর্ম্মচারিগণের নিকট দৌড়াদৌড়ি করিতে হয়। গ্রামে গ্রামে গত দশ বৎসর যাবৎ তপসিলি সমাজের অসংখ্য লোকের উপর যে ছোট বড় অত্যাচার-উৎপীড়ন চলিয়াছে তাহার একটি সম্পর্কেও অক্ষয়বাবু প্রতিকারের কোন চেষ্টা করা তাঁহার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন নাই। তিনি মন্ত্রিত্বের গদীতে বসিবার ফলেই তপসিলি সমাজের অভাব-অভিযোগ দূর হইয়া যায় নাই। বর্ণহিন্দু নেতাগণকেই এই সব বিষয়ে খাটিতে হইয়াছে এবং আজও খাটিতে হইতেছে। তপসিলি সমাজকে উদ্ধার করিয়া দিয়া যোগেন্দ্র মণ্ডল মহাশয় পশ্চিমবঙ্গে পলাইয়া গিয়া চিরতরে রাজনীতি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।"

পাকিস্থানের রাজনৈতিক সমস্যা

মাত্র সাত সপ্তাহ পূর্ব্বে গঠিত পাকিস্থানের ষষ্ঠ মন্ত্রিসভা গত ১১ই ডিসেম্বর পদত্যাগ করে। মন্ত্রিসভাটি প্রধানতঃ মুসলীম লীগ এবং রিপাবলিকান দলের সদস্যগণ লইয়া গঠিত হইয়াছিল। সুরাবর্দী মন্ত্রিসভার পতনের পর গত ১৮ই অক্টোবর ইসমাইল ইব্রাহিম চুন্দ্রীগড়ের নেতৃত্বে উক্ত মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

সুরাবর্দী মন্ত্রিসভার পতনের কারণ বাহ্যতঃ ছিল এই যে, রিপাবলিকান পার্টি পশ্চিম পাকিস্থানের এক ইউনিট ভাঙ্গিয়া দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু উক্ত প্রস্তাব জাতীয় পরিষদ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হওয়া সত্ত্বেও সুরাবর্দী মানিয়া লন নাই। ফলে রিপাবলিকান পার্টি সুরাবর্দী মন্ত্রিসভার উপর হইতে সমর্থন সরাইয়া লয়। সুরাবর্দী পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু মন্ত্রিত্ব ত্যাগের পর সুরাবর্দী প্রকাশ্যে যেভাবে প্রেসিডেন্ট মির্জ্জার সমালোচনা করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় যে সুরাবর্দী মন্ত্রিসভার পদত্যাগের পিছনে এই বাহ্যিক কারণ ছাড়া অন্য কারণও ছিল। সুরাবর্দীর পতনের পর মুসলীম লীগ, রিপাবলিকান পার্টি, কৃষক-মজদুর পার্টি এবং নিজামে ইসলাম দল সম্মিলিত ভাবে মুসলীম লীগ সদস্য চুন্দ্রীগড়ের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠন করে। কিন্তু তাহাও টিকিতে পারিল না। চুন্দ্রীগড় মন্ত্রিসভার পদত্যাগেরও মূলে রহিয়াছে বাহ্যতঃ রিপাবলিকান দল। পদত্যাগ সম্পর্কে যে, সরকারী ইস্তাহার দেওয়া হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে, রিপাবলিকান দল কর্ত্তৃক যুক্ত নির্ব্বাচন বর্জ্জন এবং পৃথক নির্ব্বাচনের পুনঃ প্রবর্ত্তনের সমর্থনের ভিত্তিতেই কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু রিপাবলিকান দল তখন চুক্তি হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। অতএব মন্ত্রিসভার পদত্যাগ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। চুন্দ্রীগড় মন্ত্রিসভার পদত্যাগের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেন্ট মীর্জ্জা এক স্বতন্ত্র ঘোষণায় পাকিস্থান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখিবার নির্দ্দেশ দেন।

গোয়া ও ভারতের পর্তুগীজ অধিকৃত অঞ্চল

বোম্বাই-এর দ্বিমাসিক "ইউনাইটেড এশিয়া" পত্রিকার অক্টোবর সংখ্যাটি "গোয়া বিশেষ সংখ্যা" হিসাবে প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত সংখ্যায় বিভিন্ন প্রবন্ধে বিভিন্ন লেখক গোয়া সমস্যার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। প্রবন্ধগুলিতে ঐতিহাসিক তথ্য এবং যুক্তির সাহায্যে দেখান হইয়াছে যে, গোয়া দখল করিয়া রাখিবার কোন অধিকারই পর্তুগালের নাই। পর্তুগীজ শাসনে গোয়ার জনসাধারণ আজ সকল দিক হইতেই নিষ্পেষিত। যতশীঘ্র গোয়ার মুক্তি সাধিত হয় গোয়াবাসী এবং ভারতের পক্ষে ততই মঙ্গল।

প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "ইউনাইটেড এশিয়া" লিখিতেছেন, গোয়াকে সময় সময় দক্ষিণের কাশ্মীর বলা হইয়া থাকে। এখন ইতিহাসের পরিহাসে এই তুলনার একটি করুণ দিক ফুটিয়া উঠিতেছে। সৌন্দর্য্য ও শক্তির রাজ্য কাশ্মীর এখন আন্তর্জ্জাতিক ঈর্ষাপরায়ণতার বিশ্বশক্তি-সংঘর্ষের কেন্দ্র, গোয়াও ক্রমশঃই বৃহৎ শক্তির লড়াইয়ে জড়াইয়া পড়িতেছে। গোয়া এখন চোরাচালান-

কারী, দুঃসাহসী এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অত্যাচারীদের কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। নির্যাতিত মানবতার চীৎকারে, হস্তনির্মিত বোমা বিস্ফোরণে বা রাইফেলের গুলীর আওয়াজে আজ গোয়ার শান্তি বিনষ্ট হইতেছে।

পর্তুগালের ফ্যাসিস্ত শাসক সালাজার গোয়াকে খৃষ্টধর্মরক্ষার অন্যতম ঘাঁটি হিসাবে খাড়া করিবার প্রয়াসী হইয়াছে। কিন্তু কার্যতঃ গোয়ার পর্তুগীজগণ খৃষ্টধর্মের পরম শত্রু। ভারতীয় খৃষ্টানগণ কখনই পর্তুগালকে তাহাদের ধর্মের রক্ষক বলিয়া মনে করে না।

গোয়াকে পর্তুগালের অচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে দেখাইবার যে চেষ্টা পর্তুগীজ সরকার করিতেছে সে সম্পর্কে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট যে, গোয়া যদি পর্তুগালের অংশ হয় তবে কলম্বিয়ার অন্তর্গত ওয়াশিংটন নগরীও (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী) ব্রিটেনের অঙ্গ। গোয়াতে পর্তুগীজ সরকারের কোন অধিকার নাই। যেরূপভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকগণ ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল, গোয়াবাসীরাও পর্তুগীজ সরকারের বিরুদ্ধে সেইরূপ লড়াই করিবে।

গোয়া সমস্যার সমাধানের উপায় কি? গোয়া মুক্তি-সংগ্রামের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ নেতা ড. ত্রিস্তাও ব্রাগাঞ্জা কুনহা লিখিতেছেন যে, ভারত সরকার গোয়ার ব্যাপারে গান্ধীজীর নীতি অবলম্বন করেন নাই বলিয়াই গোয়া সমস্যা এরূপ জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। গান্ধীজী ভারত হইতে ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদের সংগ্রামে ব্যাপৃত থাকিলেও গোয়ার কথা কখনও বিস্মৃত হন নাই এবং তিনি চাহিয়াছিলেন যেন ব্রিটিশ শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে পর্তুগীজ শাসনেরও অবসান ঘটে। গোয়া সম্পর্কে গান্ধীজী গোড়া হইতেই দৃঢ় নীতি গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯৪৬ সনে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের অব্যবহিত পরে যখন পর্তুগীজ সরকার গোয়াতে ড. রামমনোহর লোহিয়াকে গ্রেপ্তার করে, তখন মহাত্মা গান্ধী লিখিয়াছিলেন: "ভারতে যখন জাতীয় সরকার রহিয়াছে তখন জনগণের উচিত, জাতীয় সরকার এবং আহত ড. রামমনোহর লোহিয়াকে সমর্থন করা। তাঁহাকে যে আঘাত করা হইয়াছে তাহা গোয়াতে অবস্থিত আমাদের দেশবাসীর উপর এবং তাহাদের মধ্য দিয়া সমগ্র ভারতবর্ষকেই আঘাত করা হইয়াছে।" গান্ধীজীর প্রস্তাবিত নীতি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই পর্তুগাল সরকার ড. লোহিয়াকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু গান্ধীজীর মৃত্যুর পর ভারত সরকারের নির্জীবতা এবং ভারতীয় উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের গাফিলতী, সকীর্ণতা এবং ঔপনিবেশিক মনোভাবের জন্য গোয়া সমস্যা ক্রমশঃই জটিলতর রূপ ধারণ করিতেছে। গান্ধীজী বলিয়াছিলেন, "স্বাধীন ভারতে স্বাধীনরাষ্ট্রের আইনের বিরোধী সংস্থা হিসাবে গোয়ার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিতে পারে না।" ড. কুনহা বলিতেছেন যে, গোয়া সম্পর্কে গান্ধীজীর প্রস্তাবিত নীতি পুনর্গ্রহণ করিলে অচিরেই সমস্যার সমাধান ঘটিবে, মিঃ পিটার আলভারেজ এবং শ্রীমধু লিমায়ের প্রবন্ধেও ভারত সরকারের বর্তমান নীতির বিশেষ সমালোচনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, সরকার যদি দৃঢ়তা অবলম্বন না করেন তবে এই সমস্যার আশু সমাধানের কোন আশা নাই।

গোয়া সমস্যা সমাধানে পর্তুগাল সরকারের কোনরূপ আগ্রহ নাই, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। পর্তুগীজ সরকার বহুদিন যাবৎ রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যপদ লাভ করিতে পারে নাই। মাত্র ১৯৫৫ সনে ভারতের সমর্থনসহ পর্তুগাল রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যপদ লাভ করে। "কৃতজ্ঞতার" চিহ্নস্বরূপ সদস্যপদলাভের কয়েকদিনের মধ্যে পর্তুগাল বিশ্ব আদালতে ভারতের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিয়া দেয় যাহাতে ভারতের অন্তর্ভুক্ত প্রাক্তন পর্তুগীজ ছিটমহলগুলি পর্তুগাল পুনর্দখল করিতে পারে। এই সম্পর্কে ভারত যে ছয়টি প্রাথমিক আপত্তি তুলিয়াছিল, বিশ্ব আদালত ইতিমধ্যে তাহার চারটি বাতিল করিয়া দেয়। বাকী দুইটি আপত্তি সম্পর্কে আদালত এখনও কোন রায় দেয় নাই। বিশ্ব আদালতের সঙ্কীর্ণ আইনগত দৃষ্টিভঙ্গীতে এই ব্যাপারে যদি ভারতের পরাজয় ঘটে, ভারত তাহা কোনক্রমেই মানিয়া লইতে পারে না। পর্তুগীজ সরকার তাহাদের দখলদারী প্রমাণ করিবার জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে সম্পাদিত একটি মরাঠা চুক্তি খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে। বিশ্ব আদালতের নিকট ইহার দাম থাকিলেও ইতিহাস এবং জনমতের দরবারে এই সকল জরাজীর্ণ নথিপত্রের কোন মূল্য থাকিতে পারে না। এইরূপ চুক্তির সারবত্তা স্বীকার করিলে অবস্থা এরূপ হইবে যে, যদি কয়েক বৎসর পরে ব্রিটিশ সরকার বলে যে, পার্লামেন্টের যে আইনে ভারতের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছিল তাহা নাকচ করিয়া দেওয়া হইল, অতএব ভারত পুনরায় ব্রিটিশ সরকারের অধীন হইল—তাহাও অস্বীকার করিতে পারা যাইবে না। মোট কথা, এই সকল ঘটনা হইতে গোয়া সম্পর্কে পর্তুগালের আসল মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় এবং ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে বড় খুঁটির জোর না থাকিলে—অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন প্রমুখ শক্তিশালী পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গের উস্কানী না থাকিলে—ক্ষুদ্র পর্তুগাল কখনই ভারতের বিরুদ্ধে এরূপ ভাবে দাঁড়াইবার সাহস পাইত না।

রাজনীতিতে সন্ত্রাসবাদের পুনরাবির্ভাব

রাজনীতিতে—বিশেষতঃ স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজনীতিতে সন্ত্রাসবাদ প্রগতিশীল জনমত কখনই সমর্থন করে নাই। কেবলমাত্র যে সকল রাষ্ট্রে জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার নাই—যেমন পরাধীন রাষ্ট্রগুলিতে—তথায় জনগণ প্রকাশ্যে সরকারের বিরোধিতা করিতে পারে না বলিয়াই সময় সময় গুপ্ত আন্দোলন এবং সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়—যেমন হইয়াছিল ভারতবর্ষে বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে এবং যেরূপ ঘটিতেছে আলজিরিয়া, সাইপ্রাস প্রভৃতি পরাধীন রাষ্ট্রগুলিতে। কিন্তু

স্বাধীনতাকামী জনসাধারণের সম্মুখে যখনই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ প্রশস্ত হইয়াছে তখনই তাঁহারা সন্ত্রাসবাদের পথ পরিত্যাগ করিতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করেন নাই।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদ প্রধানতঃ প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতিয়ার। যাহাদের পক্ষে কোন যুক্তি নাই, যাহাদের জনসাধারণের সম্মুখে আসিবার ক্ষমতা নাই, তাহারাই সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় গ্রহণ করে। আব্রাহাম লিঙ্কন হইতে মহাত্মা গান্ধীর হত্যা পর্য্যন্ত রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডগুলির কথা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, সন্ত্রাসবাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। আউঙ সাঙ, লিয়াকৎ আলী প্রমুখ রাষ্ট্রনায়কদের হত্যাও এই পর্য্যায়ে পড়ে।

সম্প্রতি কয়েকটি রাষ্ট্রে—বিশেষ করিয়া ইন্দোনেশিয়া এবং ইস্রাইলে জননেতাদের উপর যে কাপুরুষোচিত আক্রমণ চলে তাহাতে আক্রমণকারীদের হীন উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন সন্দেহ করিবার আশঙ্কা থাকে না। ইন্দোনেশিয়াতে প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণর উপর যে আক্রমণ চলে তাহার বিবরণ পণ্ডিত নেহরু দিয়াছেন। নিতান্ত ভাগ্যবশেই প্রেসিডেণ্ট রক্ষা পান। ২৯শে নভেম্বর ইস্রাইলের পার্লামেণ্টের (Knesset) অভ্যন্তরে মন্ত্রীদের উপর ঐরূপ বর্ব্বরোচিত আর একটি আক্রমণ চলে। পার্লামেণ্টের অভ্যন্তরস্থিত গ্যালারী হইতে ২৫ বৎসর বয়স্ক মোশে বেন ইয়াকভ ডুএগ নামক এক যুবক হঠাৎ মন্ত্রীদিগকে লক্ষ্য করিয়া একটি হাত বোমা ছুঁড়িয়া মারে। ফলে প্রধানমন্ত্রী বেন গুরিয়ন সহ পাঁচ জন মন্ত্রী আহত হন। তাঁহাদের মধ্যে মোশে শাপিরোর আঘাতই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। সুখের বিষয় তাঁহারা সকলেই আরোগ্যের পথে। সংবাদে প্রকাশ যে, ডুএগ বৎসরখানেক পূর্ব্বে একটি মানসিক চিকিৎসালয় হইতে বাহিরে আসে। তাহার মনের মধ্যে একটি ধারণা জন্মিয়াছে যে, জুইশ এজেন্সী তাহার খুব ক্ষতি করিয়াছে। অতএব জুইশ এজেন্সীর সহিত তাহার হিসাব মিটাইতে হইবে।

আমরা এই রাষ্ট্রবিদগণের জীবনরক্ষায় সবিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। তবে এই সকল ঘটনা হইতে সকল রাষ্ট্রেরই সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইবে।

ন্যাটোর আসন্ন অধিবেশন

১৬ই ডিসেম্বর হইতে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা (ন্যাটো) কাউন্সিলের অধিবেশন বসিবে। প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় মনে হইয়াছিল যে, হয়ত তিনি ন্যাটো সম্মেলনে যোগদান করিতে পারিবেন না। সর্ব্বশেষ সংবাদে দেখা যাইতেছে, তিনি সম্মেলনে যোগদান করিতে পারিবেন।

ন্যাটোর কাউন্সিলের বর্ত্তমান বাৎসরিক সম্মেলনের বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। সাধারণতঃ বাৎসরিক সম্মেলনে সদস্য-রাষ্ট্রগুলির পররাষ্ট্র মন্ত্রীরাই যোগদান করেন। কিন্তু এই বৎসর রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করিতেছেন।

ন্যাটো সম্মেলনে যে সকল সমস্যা আলোচিত হইবে বিশ্বশান্তির ভবিষ্যতের সহিত তাহারা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। ইউরোপের শান্তি, মধ্যপ্রাচ্য, দূরপ্রাচ্য প্রভৃতি আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রধান প্রধান সকল বিষয়ই যে সম্মেলনে আলোচিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠী সোভিয়েট ইউনিয়নের নিকট যে ধাক্কা খাইয়াছে তাহারই প্রতিবিধানকল্পে রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ উচ্চতম পর্য্যায়ে পারস্পরিক আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছেন এবং সেজন্যই অত্যন্ত গুরুতর অসুস্থতার অব্যবহিত পরই প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার ইউরোপে আসার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছেন। সম্মেলনের সম্মুখে প্রধান প্রশ্ন, কি ভাবে পশ্চিমী রাষ্ট্রজোটের ঐক্যবৃদ্ধি করা সম্ভব।

ন্যাটো একটি সামরিক প্রতিষ্ঠান। ১৯৫০ সনে ন্যাটোর অধীনে বার ডিভিসন সৈন্য, ৪০০ সামরিক বিমান এবং ৪০০ জাহাজ ছিল। সাত বৎসরে সৈন্যসংখ্যা ৪।৫ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে ও অস্ত্রবল, সংগঠন সকল দিক হইতেই তাহাদের উন্নতি হইয়াছে। বিশ্বরাজনীতিতে ন্যাটো যে একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়াশীল শান্তি-সংস্থা ভারতের প্রধানমন্ত্রীপ্রমুখ একাধিক নিরপেক্ষ রাজনীতিবিদ্ তাহা বারংবার বলিয়াছেন। বস্তুতঃ পক্ষে দেখা গিয়াছে যে, ন্যাটোর নীতি অবিসংবাদিতরূপে পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা কায়েম করিবারই পক্ষে রহিয়াছে। গোয়া, আলজিরিয়া, পশ্চিম ইরিয়ান, সাইপ্রাস—সকল ক্ষেত্রেই ন্যাটোর সদস্যগণ ঔপনিবেশিক শক্তিবৃন্দকে সমর্থন করা উচিত মনে করিয়াছেন। বর্ত্তমান অধিবেশনে ওলন্দাজ সরকার নিশ্চিতরূপে পশ্চিম ইরিয়ানের প্রশ্ন তুলিবে। যদিও কানাডার প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ লেষ্টার পীয়ার্সন বলিয়াছেন যে, পশ্চিম ইরিয়ানের ব্যাপারে ন্যাটোর হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়, তথাপি এ সম্পর্কে ন্যাটোর আগামী সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জনচিত্তে আশঙ্কা না থাকিয়া পারে না।

পশ্চিম ইরিয়ানের (নিউগিনির) সমস্যা

পশ্চিম ইরিয়ান (নিউগিনির ওলন্দাজ-অধিকৃত অঞ্চল) লইয়া দক্ষিণ এশিয়ার শান্তি ব্যাহত হইবার বিশেষ আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। এইরূপ বিপজ্জনক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে যে সংস্থা বিশেষ রূপে কার্য্যকরী হইতে পারিত বারংবার অনুরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সেই রাষ্ট্রসঙ্ঘ এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে অস্বীকার করিয়াছে।

পশ্চিম ইরিয়ানের সমস্যা—ক্ষয়িষ্ণু ঔপনিবেশিকবাদের সমস্যা। ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদীরা ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার সহজে করে নাই। সশস্ত্র সংগ্রামেও যখন স্বাধীনতাকামী ইন্দোনেশীয়দিগকে দমন করা গেল না, কেবলমাত্র তখনই তাহারা ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করে। ১৯৪৯ সনে ইন্দোনেশিয়া এবং নেদারল্যাণ্ড সরকারের মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তাহাতে নেদারল্যাণ্ড সরকার ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লয়। ঐ চুক্তির একটি শর্ত্তে বলা হয় যে, চুক্তি সম্পাদনের এক বৎসরের মধ্যেই পশ্চিম ইরিয়ানের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ স্থিরীকৃত হইবে।

এক বৎসরের বদলে আট বৎসর অতীত হইতে চলিয়াছে—কিন্তু পশ্চিম ইরিয়ানের ভবিষ্যৎ এখনও পূর্ব্ববৎ অনিশ্চিত রহিয়াছে। ১৯৫১ সনে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে একটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়; কিন্তু নেদারল্যাণ্ড সরকার দাবী করেন যে, পশ্চিম ইরিয়ানের উপর যদি ইন্দোনেশিয়ার সরকার সার্ব্বভৌমত্ব দাবী করেন তবে কোন আলোচনা করা অসম্ভব। স্বভাবতঃই ইন্দোনেশিয়া সরকার এই অযৌক্তিক দাবী স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই। তখন হইতেই ইন্দোনেশিয়া এবং নেদারল্যাণ্ড সরকারের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটিতে থাকে এবং ইন্দোনেশিয়া নেদারল্যাণ্ড-ইন্দোনেশিয়া ইউনিয়ন সম্পর্ক ছেদ করিয়া দেয়।

ইন্দোনেশিয়ার পশ্চিম ইরিয়ান ফিরিয়া পাইবার দাবী সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। ইন্দোনেশিয়া সরকার এই সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। এশীয়-আফ্রিকা রাষ্ট্রগোষ্ঠীর মারফত ইন্দোনেশিয়া বারংবার এই সমস্যার প্রতি রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধিকাংশ সদস্যই যে এই সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান চাহেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৯৫৪ এবং ১৯৫৫ সনে রাষ্ট্রসঙ্ঘ এই সমস্যার সমাধানের জন্য ইন্দোনেশিয়া এবং নেদারল্যাণ্ড সরকারকে অনুরোধ জানান। কিন্তু কয়েকটি প্রধান প্রধান রাষ্ট্রের বিরোধিতার ফলে রাষ্ট্রসঙ্ঘ এই সমস্যা সমাধানের জন্য কোন সক্রিয় কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করিতে পারিতেছে না। প্রধানতঃ সেই কারণেই গত ফেব্রুয়ারী মাসে যখন পশ্চিম ইরিয়ান বিরোধ মীমাংসার জন্য তিন জন সদস্য বিশিষ্ট একটি মধ্যস্থ কমিটি গঠনের জন্য প্রস্তাব আনা হয় তাহা রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন লাভ করিতে পারিলেও প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোট না পাওয়ায় প্রস্তাবটি কার্য্যকরী হয় না। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের দ্বাদশ অধিবেশনে এই সম্পর্কে সেক্রেটারী-জেনারেলকে লইয়া একটি মধ্যস্থ ব্যবস্থার জন্য যে প্রস্তাব আনা হয় তাহাও উপযুক্ত সংখ্যক ভোটের অভাবে বাতিল হইয়া যায়।

এদিকে নেদারল্যাণ্ড পশ্চিম ইরিয়ানে রণতরী পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং এই ব্যাপারে সাহায্যলাভের জন্য উত্তর আটলাণ্টিক চুক্তিসংস্থার কাউন্সিলের অধিবেশন ডাকিয়াছে। সুতরাং অবস্থা বিশেষ জটিল আকার ধারণ করিয়াছে।

পশ্চিম ইরিয়ান ছাড়িয়া যাইতে ওলন্দাজদের অনিচ্ছার পিছনে রহিয়াছে উহার খনিজ তৈলসম্পদ। পশ্চিম ইরিয়ানের খনিজ তৈল উত্তোলনে ব্রিটিশ মার্কিন-ওলন্দাজ ব্যবসায়ীবৃন্দ সংযুক্তভাবে নিযুক্ত রহিয়াছে। হয় ত সেই কারণেই ইরিয়ানের শান্তিপূর্ণ সমস্যা সমাধানের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের হস্তক্ষেপের প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনার সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকে এবং ব্রিটেন ও ফ্রান্স বিপক্ষে ভোট দেয়।

নেপালের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ

ভারতের অন্যতম প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপাল। ১৯৫১ সনের প্রথমভাগ পর্য্যন্ত নেপালে কোনরূপ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই ছিল না। ১৯৫১ সনের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর নেপালে স্বৈরাচারী রাণাশাহীর অবসান ঘটে; কিন্তু সাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার তখনও পর্য্যন্ত উপযুক্ত স্বীকৃতি লাভ করে নাই, করা সম্ভবও ছিল না। কারণ প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে একটি নির্ব্বাচনও অনুষ্ঠিত হয় নাই। কেবল ভোটের মাধ্যমেই যে জনসাধারণ তাঁহাদের সকল অধিকার ফিরিয়া পাইবেন তাহা মনে করা ভুল। কিন্তু প্রাপ্ত-বয়স্কের ভোটাধিকার যে গণতন্ত্রের অচ্ছেদ্য অঙ্গ। স্বাভাবিকভাবেই নেপালের জনসাধারণ তাঁহাদের এই মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি চাহিয়াছেন; কিন্তু সরকার হইতে এবিষয়ে এযাবত বিশেষ কিছুই করা হয় নাই; সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য বৎসরাধিক পূর্ব্বে তারিখ ঠিক করা সত্ত্বেও আজও পর্য্যন্ত তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। নেপালের রাজনীতি অনেকটা পাকিস্থানী রাজনীতির মত। উভয় রাষ্ট্রেই স্বার্থসন্ধানী রাজনৈতিক নেতাদের দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া রাষ্ট্রের কর্ণধার নিজেদের ক্ষমতা খাটাইতেছেন: পাকিস্থানে যেরূপ প্রেসিডেণ্ট মির্জ্জা, সেরূপ নেপালে রাজা মহেন্দ্র।

গত অক্টোবর মাসে নেপালে সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ছিল, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হয় নাই। এইরূপ রাজনৈতিক দীর্ঘসূত্রিতায় নেপালের রাজনীতিতে যে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়াছে তাহা অপনয়নের জন্য নেপালের প্রধান তিনটি রাজনৈতিক দল—নেপালী কংগ্রেস, নেপালী জাতীয় পরিষদ এবং প্রজাপরিষদ মিলিত ভাবে ছয় মাসের মধ্যে নেপালে সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী করেন। এই সম্পর্কে উক্ত তিনটি দল লইয়া গঠিত গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টের সহিত নেপালের নির্ব্বাচন কমিশনারের আলোচনা চলে, কিন্তু আলোচনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। ফলে ৭ই ডিসেম্বর হইতে গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টের নেতৃত্বে সমগ্র নেপালে এক গণ-সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয়। এই সত্যাগ্রহ প্রভূত সাফল্য লাভ করে। অবশেষে রাজা মহেন্দ্র ১৪ই ডিসেম্বর ঘোষণা করেন যে, আগামী ১৯৫৯ সনের ফেব্রুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে নেপালে সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। রাজার নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থগিত থাকিবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। আশা করা যায় যে, নির্ব্বাচনের তারিখ আর পরিবর্ত্তন করার প্রয়োজন হইবে না।

ইঙ্গ-ভারত সম্পর্ক

নবেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত রোটারী ক্লাবের ভোজসভায় বক্তৃতাদানপ্রসঙ্গে ভারতস্থিত ব্রিটিশ হাই-কমিশনার মিঃ ম্যালকম ম্যাকডোনাল্ড ইঙ্গ-ভারত সম্পর্কের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় ব্রিটেন ভারতকে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে। মিঃ ম্যাকডোনাল্ড

বলেন, "অনেকে মনে করেন এবং বলিয়াও থাকেন যে, অর্থনৈতিক ব্যাপারে ব্রিটেন কর্তৃক ভারতকে প্রদত্ত সাহায্যের পরিমাণ নিরতিশয় অল্প, অপ্রচুর এবং আন্তরিকতাবিহীন। কিন্তু বস্তুতঃ, পক্ষে ব্রিটেন কর্তৃক ভারতকে প্রদত্ত সাহায্য অবিরাম, প্রভূত এবং অন্য যে কোন দেশ কর্তৃক প্রদত্ত সাহায্য অপেক্ষা অনেক অধিক।"

কিন্তু মিঃ ম্যাকডোনাল্ড এই বক্তব্যের সমর্থনে যে সকল তথ্য এবং যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহা বিশেষ সারবান নহে। প্রথমতঃ তিনি ভারতীয় বহির্বাণিজ্যে ব্রিটেনের অংশের কথা উল্লেখ করেন। ইহা অবশ্যই সত্য যে, ভারতের বহির্বাণিজ্যের একটি মোটা অংশই ব্রিটেনের সহিত সংশ্লিষ্ট; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্মরণ করা প্রয়োজন যে, ব্রিটেন ভারত হইতে যত পণ্য আমদানী করে ভারতও ব্রিটেন হইতে তত পণ্যই আমদানী করে। এইরূপ পারস্পরিক বাণিজ্য আজ নূতন চলে নাই, বহু শত বৎসর হইতেই চলিতেছে; সুতরাং কি ভাবে এই বহির্বাণিজ্য মারফত ব্রিটেন ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ সাহায্য করিতেছে তাহা অনুধাবন করা শক্ত। উপরন্তু, ব্রিটেন ভারত হইতে তাহার নিজস্ব প্রয়োজনীয় জিনিষই লয়; যদি ইহা দ্বারা ব্রিটেন ভারতকে সাহায্য করিতেছে মনে করে, তবে সেই অনুপাতে ভারতও ব্রিটেনের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করিতেছে। ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নহে।

অবশ্য ব্রিটেন নিশ্চয়ই ভারতের উন্নয়নে সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু সেই সাহায্যের পরিমাণ কোনক্রমেই "অবিরাম, প্রভূত এবং অন্য যে কোন দেশ কর্তৃক প্রদত্ত সাহায্য অপেক্ষা অনেক অধিক" নহে। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির কথায় প্রথমেই মূলধনের প্রশ্ন উঠে। স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে যদিও ভারতে নূতন ব্রিটিশ মূলধন নিয়োজিত হইয়াছে, তাহার পরিমাণ নিতান্তই অল্প। তবে আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের মারফত ব্রিটেন ভারতকে ১৮ হাজার পাউণ্ড ঋণ দিয়াছে। তৃতীয়তঃ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ব্রিটিশ কোম্পানী কর্তৃক মিলিতভাবে ভারতে একটি ইস্পাত কারখানা নির্ম্মাণ।

প্রথম স্পুটনিকের রকেট ভূপতিত

মস্কো হইতে ৭ই ডিসেম্বর "তাস" কর্তৃক প্রচারিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে:

"প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহের পরিবাহী রকেটটির পর্য্যবেক্ষণ হইতে জানা গিয়াছে, ৩০শে নবেম্বর তারিখের শেষের দিকে উহার পৃথিবী পরিক্রমার কাল লক্ষ্যণীয় ভাবে কমিয়া আসে এবং রকেটটি নামিয়া আসিতে আরম্ভ করে। এই অবতরণ বিশেষ ভাবে দ্রুত হইয়া উঠে ১লা ডিসেম্বর তারিখে আলাস্কার চুকোৎকা উপদ্বীপে ইব্‌কুৎস্ক এলাকার উপরে এবং আমেরিকার পশ্চিম-উপকূলবর্ত্তী অঞ্চল বরাবর আরও নীচের দিকে।

এই পথ ধরিয়া যাইবার কালে পরিবাহী রকেটটি বায়ুমণ্ডলের ঘনতর স্তরগুলির ভিতরে প্রবেশ করে এবং বাষ্পীভূত ও বিশ্লিষ্ট হইয়া যাইতে সুরু করে। হাতে যে সব তথ্য রহিয়াছে সেই অনুযায়ী, পরিবাহী রকেটটির অবশিষ্টাংশগুলি উত্তর-আমেরিকার পশ্চিম-উপকূলে ও আলাস্কায় ভূপতিত হইয়াছে।

প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহের এই পরিবাহী রকেটটি সর্ব্বসমেত প্রায় ৩৯০ লক্ষ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করিয়াছে এবং পৃথিবীর অন্যতম উপগ্রহ হিসাবে উহা প্রায় ৫৮ দিন ধরিয়া পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরপাক খাইয়াছে। ইহার এক পাক পৃথিবী প্রদক্ষিণের প্রাথমিক গতি ছিল ৯৬.২ মিনিট এবং ইহার অপভূ (পৃথিবী হইতে দূরতম বিন্দুটি) ছিল প্রায় ৯০০ কিলোমিটার উর্দ্ধে।"

এই ভূপতিত রকেটটি লইয়াও সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মনকষাকষির সৃষ্টি হয়। সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা ক্রুশ্চেভ বলেন যে, রকেটটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পড়িয়াছে; কিন্তু মার্কিন সরকার অভিসন্ধিপূর্ব্বক উহা ফেরত দিতেছেন না। অপর পক্ষে মার্কিন সরকার দাবী করেন যে, রকেটটি মার্কিন ভূমিতে পড়ে নাই।

কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণে মার্কিন প্রচেষ্টা

এক মাসের মধ্যে দুইটি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাশূন্যে প্রেরণ করিয়া সোভিয়েট বিজ্ঞানীগণ সমগ্র বিশ্বকে চমৎকৃত করিয়াছেন। এই বৈজ্ঞানিক অভিনবত্বায় সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন—কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া। স্বাভাবিক কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনঃকষ্ট ঘটিয়াছে। পৃথিবীতে প্রথম পরমাণবিক অস্ত্র প্রস্তুত এবং ক্ষেপণের কৃতিত্ব তাঁহাদেরই—জার্ম্মান বৈজ্ঞানিকগণ কর্তৃক প্রস্তুত রকেট নির্ম্মাণের কৌশল তাঁহারাই প্রথম আয়ত্ত করেন এবং জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিকদের গবেষণালব্ধ অনেক তথ্যও তাঁহাদের হাতে আসে। তদুপরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যান্ত্রিক উন্নতির কথা স্মরণ রাখিলে সহজেই ধরিয়া লওয়া যায়—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষেই মহাশূন্যে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণের জয়মাল্য লাভ করা উচিত। মার্কিন বিজ্ঞানীগণও সেইরূপই ভাবিয়াছিলেন কিন্তু কার্য্যতঃ ঘটিল সম্পূর্ণ বিপরীত। সোভিয়েট ইউনিয়ন পর পর দুইটি কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ করিল, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটিও পাঠাইতে পারিল না। মার্কিন বিজ্ঞানীদের পক্ষে স্বভাবতঃই তাহা বিশেষ মনস্তাপের কারণ হইয়াছে। উপরন্তু ৫ই ডিসেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ফ্লোরিডার কেপক্যানাভেরাল নামক স্থানে প্রথম মার্কিন উপগ্রহ তুলিতে গিয়া যে বিপত্তি ঘটিয়াছে তাহাতে তাঁহাদের লজ্জা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঐদিন আমেরিকার প্রথম কৃত্রিম চন্দ্র লইয়া যে ভ্যানগার্ড রকেটের মহাশূন্যে যাত্রার কথা ছিল তাহা মাটি হইতে মাত্র কয়েক ফুট উপরে উঠিয়াই ফাটিয়া যায়।

মার্কিন ব্যর্থতার পরিমাপ করিতে হইলে দুই-একটি তথ্যই যথেষ্ট। সোভিয়েট ইউনিয়ন যে দুইটি স্পুটনিক (কৃত্রিম উপগ্রহ) পাঠাইয়াছে তাহাদের ওজন যথাক্রমে ১৮৪ পাউণ্ড এবং ১১১৮ পাউণ্ড। আর মার্কিন কৃত্রিম চন্দ্রের ওজন মাত্র সোয়া তিন

পাউণ্ড। কিন্তু তাহাও পাঠান গেল না! অবশ্য এই একবারের ব্যর্থতা রাজনৈতিক মর্য্যাদার দিক হইতে যতই লজ্জার কথা হউক না কেন, বৈজ্ঞানিক দিক হইতে তত হতাশার কথা নয়। কারণ একটি কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠাইতে হইলে যে জটিল পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হয় তাহাতে ভুল হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। কৃত্রিম চন্দ্রের মধ্যস্থিত দশহাজার যন্ত্রাংশের কোন একটিও যদি যথাযথ কাজ না করিতে পারে তবেই তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে। সৌভাগ্যক্রমে সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের নৈপুণ্যে তাহাদের কোনবারই কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃত্রিম চন্দ্র প্রেরণে প্রাথমিক ব্যর্থতার মূলে রহিয়াছে আন্তঃবিভাগীয় কলহ। বিমানবাহিনী তাহাদের রকেট কৃত্রিম চন্দ্র প্রেরণের জন্য ব্যবহার করিতে দিতে নারাজ এবং সামরিক বিভাগের গবেষণালব্ধ বহু তথ্যও সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিকদিগকে জানান হয় নাই। এই সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তির মূল্য হিসাবে তাহারা বিশ্বের বৈজ্ঞানিক দরবারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাথা হেঁট করিতেও দ্বিধা করে নাই।

গ্রামাঞ্চলে পুলিসের "তৎপরতা"

বর্দ্ধমান হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "বর্দ্ধমানবাণী" ২৭শে অগ্রহায়ণ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে পুলিসী "তৎপরতা" সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন আমরা বিনা মন্তব্যে তাহা তুলিয়া দিলাম। পাঠকগণ সহজেই নিজের নিজের সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে পারিবেন। "বর্দ্ধমানবাণী" লিখিতেছেন :

"হঠাৎ আবগারী বিভাগের কর্ম্মচারীদের তৎপরতা যেন বৃদ্ধি পাইয়াছে। গ্রামে গ্রামে হানা দিয়া বেআইনী পচাইমদ ধরিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ফলে এই ফসল কাটার সময় সাঁওতাল সম্প্রদায়ই বেশীর ভাগ ইহাদের কোপে পড়িয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। অবশ্য আমরা আদৌ বলিতে চাহি না যে, আবগারী বিভাগ পল্লী-অঞ্চলের বে-আইনী মদ তৈয়ারি বন্ধ করিতে শৈথিল্য প্রকাশ করুক। তবে তাহাদের এই কড়াকড়ি ভাব শহর অঞ্চলে দেখিতে পাইলে সুখী হইতাম। কেবল আমরা নহি শহরের প্রায় প্রত্যেক অধিবাসী জানেন। কোন কোন দোকানে অবাধে, প্রকাশ্যে এবং বেপরোয়া ভাবে মদ বিক্রয় হইয়া থাকে। কৈ আবগারী বিভাগকে ত এ দিকে বিশেষ নজর দিতে দেখি না। আমরা জানি এই বিভাগের বিভিন্ন সার্কেলের ইনসপেক্টর, সাব-ইনসপেক্টরগণ কয়েক বৎসর হইতে একই স্থানে রহিয়াছেন। একই স্থানে বহু কাল থাকিলে পরিচয়জনিত দুর্ব্বলতা আসিয়া পড়ে এবং অন্যান্য যাহা ঘটে তাহা আশা করি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের ভালভাবেই জানা আছে। কাজেই পল্লী-অঞ্চলে হানা দিয়া ইহারা কর্ম্মতৎপরতা দেখাইয়া থাকেন।

আসানসোলে পথ-দুর্ঘটনা

সাপ্তাহিক "বঙ্গবাণী" এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আসানসোল শহরে গাড়ী চাপা পড়িয়া পথচারীদের শোচনীয় মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা করিয়া লিখিতেছেন : "আসানসোলে পথ-দুর্ঘটনা আসানসোলের পথচারীদের এক অভিসম্পাতের মত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইহা এমন স্তরে আসিয়াছে যে, কেহ রাস্তা দিয়া বাহির হইলে সে ব্যক্তি বাড়ী ফিরিবে কিনা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।"

ঘন ঘন পথ-দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে আলোচনা করিয়া উক্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধটিতে বলা হইয়াছে যে, দুইটি কারণে আসানসোলে পথ-দুর্ঘটনা ঘটে : প্রথমতঃ ড্রাইভারদের বেপরোয়া গাড়ী চালান এবং দ্বিতীয়তঃ উপযুক্ত রাস্তাঘাটের দরুন। প্রথম কারণটি পুলিস সহজেই নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। তবে আসানসোলের ক্ষেত্রে রাস্তাঘাটের অভাবের গুরুত্বই অধিকতর।" কারণ জি. টি. রোড ব্যতীত গাড়ী চালাইবার অন্য কোন রাস্তা নাই। পত্রিকাটির ভাষায় যতদিন না দ্বিতীয় কোন পথে গাড়ী চলাচল করিবে ততদিন এই দুর্ঘটনা কমিবার কোন সম্ভাবনা নাই।"

দুর্ঘটনা নিবারণের উপায় সম্পর্কে গঠনমূলক পরামর্শ দিয়া "বঙ্গবাণী" লিখিতেছেন :

"আসানসোলে ইয়ং রোডটি যদি সংস্কার করা হয় এবং ঐ পথে বিহারগামী গাড়ীগুলিকে চালান যায় তবে কিছুটা পথ-দুর্ঘটনা নিবারণ হইতে পারে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই রাস্তাটি প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও আজ দ্বিতীয় পরিকল্পনার দুই বৎসর গত হইতে চলিল তবু এই রাস্তাটির কাজে হাত দেওয়া হইল না। এই একটি মাত্র রাস্তা নির্ম্মিত হইলে আসানসোলের পথচারী অনেকখানি শঙ্কাহীন হইয়া পথ চলিতে পারে। আমরা সরকারকে এই রাস্তাটি অবিলম্বে সংস্কার করিতে অনুরোধ করি।"

আসানসোলের অতিরিক্ত জেলা জজ

১১ই ডিসেম্বর সংখ্যায় এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সাপ্তাহিক "জি. টি. রোড" পত্রিকা লিখিতেছেন :

"আসানসোল কোর্টে যে একজন অতিরিক্ত জেলা জজ দেওয়া হইয়াছিল ৩১শে ডিসেম্বর হইতে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দ্দেশে তাহা উঠিয়া যাইতেছে। মহামান্য হাইকোর্ট নাকি মন্তব্য করিয়াছেন যে আসানসোলে অতিরিক্ত জেলা জজ রাখিবার কোন কারণ নাই। ফলে আসানসোল মহকুমার বিচারাশ্রয়ী (litigant people) বহু মানুষকে আবার আপীল প্রভৃতির জন্য বর্দ্ধমান ছুটিতে হইবে।

"আসানসোল আর ১৯৪৭ সনের মত অপ্রধান মহকুমা নহে। এখন এই মহকুমায় যেরূপ জনসংখ্যা বাড়িতেছে সেইরূপ কোর্টের কাজ বাড়িতেছে। এবং সেই জন্যই আসানসোলে একটি অতিরিক্ত

জেলা জজের পদ সৃষ্টি হইয়াছিল। এই পদ উঠাইয়া দেওয়ার হেতু তো নাই-ই বরং আসানসোলকে জেলা করিয়া একটি পুরাপুরি জেলা আদালত করিবার সিদ্ধান্ত সরকারের গ্রহণ করা উচিত। এমন যদি হইত অতিরিক্ত জেলা জজের পদ সৃষ্টি করিয়া কোন ফল হয় নাই অর্থাৎ অতিরিক্ত জেলা জজের আদালতে কোন মামলা নাই তাহা হইলে মহামান্য হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্ত অসমীচীন হইত না। কিন্তু আসানসোলে দিন দিন এত মামলা বাড়িতেছে যে আরও একজন অতিরিক্ত জেলা জজ দিলে অন্যায় হইবে না। সে ক্ষেত্রে যে একজন জেলা জজের পদ তুলিয়া দেওয়া হইল তাহাতে আসানসোলবাসীর উপর মহা অবিচার করা হইয়াছে।

"বর্ত্তমান সরকারের নীতি হইতেছে অতি দ্রুত মামলা নিষ্পত্তি করা এবং প্রজাসাধারণকে খরচ এবং হয়রানি হইতে বাঁচান কিন্তু এই জেলা জজের পদ উঠাইয়া দেওয়ার সহিত সরকারের উক্ত নীতির কোন সামঞ্জস্য নাই। আমরা মহামান্য হাইকোর্টকে এই সিদ্ধান্তটিকে পুনর্বিবেচনা করিতে অনুরোধ জানাই।"

উচ্ছৃঙ্খল জনতা ও বৈদ্যুতিক ট্রেন

বিগত ২৮শে অগ্রহায়ণ যে নূতন বৈদ্যুতিক রেলপথ চালনার উদ্বোধন হয়, তাহাতে প্রথমে আনন্দ, তাহার পর বিশৃঙ্খলা এবং শেষে দুর্ঘটনায় পূর্ণ হয়। ঐ দুর্ঘটনার ব্যাপার লইয়া সরকার-বিপক্ষদল নানা প্রকার বাদানুবাদ চালাইতেছেন। এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী কে তাহা নির্ণয়ের জন্য তাঁহাদের যতটা উৎসাহ দেখা গিয়াছে তাহার এক শতাংশও যদি তাঁহারা দেশে শান্তিশৃঙ্খলা আনয়নে প্রয়োগ করিতেন তবে হয় ত এ জাতীয় বিশৃঙ্খলা দেশে এতটা বাড়িত না।

এই ব্যাপারের জন্য মুখ্যতঃ দায়ী উচ্ছৃঙ্খল জনতা ও গৌণভাবে কয়েকটি রাজনৈতিক দল যাঁহারা শুধু জানেন দেশে উত্তেজনা ও বিক্ষোভ জাগাইতে। নিম্নে আনন্দবাজারের বিবৃতি দেওয়া হইল:

"'বাষ্পীয় যুগ হইতে বিদ্যুতের যুগে ভারতীয় রেলপথের ঐতিহাসিক যাত্রাকে' স্বাগত জানাইয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজবাহরলাল নেহরু শনিবার অপরাহ্ণে পূর্ব্ব রেলপথের বৈদ্যুতিক ট্রেন চলাচলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। হাওড়া ষ্টেশন প্ল্যাটফর্ম্মে একটি সুসজ্জিত সভামণ্ডপে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী-সভায় শ্রী নেহরু এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে 'পুরাতন যুগের সহিত নূতন যুগের উদ্বাহবন্ধন' রূপে উল্লেখ করিয়া জনগণের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করিতে রেলকর্ম্মীদের আহ্বান জানান।

কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম এই অনুষ্ঠানে ঘোষণা করেন যে, শিয়ালদহ সেকসনে বৈদ্যুতিকরণের কাজ পূর্ব্ব ঘোষণা অনুযায়ী সুরু হইবে। ঐ পরিকল্পনার কোন কাটছাট হইবে না বলিয়া তিনি আশ্বাস দেন।

কিন্তু উদ্বোধনী-অনুষ্ঠানের পরমুহূর্ত্তে হাওড়া হইতে ১৪ মাইল দূর সেওড়াফুলিগামী একটি বিশেষ বৈদ্যুতিক ট্রেন প্রধানমন্ত্রীকে লইয়া অগ্রসর হইলে এক শ্রেণীর অত্যুৎসাহী উন্মত্ত জনতা উহাতে উঠিবার চেষ্টা করিয়া বিভ্রাট ঘটায় এবং ইহার পরিণতিস্বরূপ চলন্ত ট্রেন হইতে ছিটকাইয়া পড়িয়া ২ জন লোক নিহত হয় এবং প্রায় ৫০ জন লোক আহত হয়। তন্মধ্যে প্রায় ২০ জনকে লিলুয়া হাসপাতালে এবং ৯ জনকে হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হইয়াছে। প্রকাশ যে, নিহতদের মধ্যে একজনের মৃতদেহ প্ল্যাটফর্ম্মের পাশে লাইনের ধার হইতে পাওয়া যায়। এই ঘটনার ফলে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রেন চলাচলের ঐতিহাসিক ঘটনার উৎসাহ ও আনন্দ বহুলাংশে নিষ্প্রভ হইয়া যায়।

হাওড়া ষ্টেশন হইতে ঐ বৈদ্যুতিক ট্রেনটি ছাড়িবার মুখে এবং তৎপর যাত্রাপথের অন্যান্য স্থানে বেপরোয়া শৃঙ্খলাহীন জনতার চাপে বারবার নিরাপত্তা-ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। কেবলমাত্র নিমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য বিশেষভাবে সংরক্ষিত এই বৈদ্যুতিক ট্রেনে চলন্ত অবস্থায় উঠিতে গিয়া ফুটবোর্ড হইতে পড়িয়া কিংবা পাশের সিগন্যাল পোষ্টে ধাক্কা খাইয়া একজনের পর একজন আহত হইতে থাকে। ফলে ট্রেনটির যাত্রা কিছুক্ষণ পর পরই ব্যাহত হয় এবং পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত প্রায় সমস্ত কার্য্যসূচী পণ্ড হইয়া যায়।

এই বিশৃঙ্খলা দেখা দিলেও পথের দুই পার্শ্বে বহু নরনারীকে ঐ ট্রেন দেখিবার জন্য সারিবদ্ধভাবে শৃঙ্খলার সঙ্গে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে দেখা যায়। চলন্ত ট্রেন হইতে "নেহরু জিন্দাবাদ" "নেহরুজী কি জয়" ইত্যাদি উল্লাসধ্বনিও শুনিতে পাওয়া যায়। অনেক গৃহস্থ বধুকেও ছেলে কোলে নিয়া রাস্তার পাশে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা যায়।"

দেশে অরাজকতা

দেশের অবস্থা দিনের দিন কি হইতেছে তাহার উদাহরণরূপে আমরা সামান্য দুইটি ঘটনা সাময়িকপত্র হইতে তুলিয়া দিতেছি:

"হাওড়া, ১৩ই ডিসেম্বর—আজ সন্ধ্যায় ব্যাটরা থানার অন্তর্গত সারকুলার রোডে একটি সিনেমা গৃহের সন্নিকটে চা-এর দোকানে চা-পানরত এক যুবক অপর এক যুবকের গুলিতে আহত হয়। ঐ যুবককে চিকিৎসার জন্য হাওড়া হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, আজ সন্ধ্যা আন্দাজ ৫-৪৫ মিঃ সময় সারকুলার রোডে চা-এর দোকানে যখন দুইজন যুবক চা-পান করিতেছিল ঐ সময় অপর ৪ ৫ জন যুবক হঠাৎ দোকানের সম্মুখে উপস্থিত হয় ও তাহাদের একজন বে-আইনী 'রিভলবার' হইতে ঐ দুইজন যুবককে লক্ষ্য করিয়া দুইটি গুলী নিক্ষেপ করে। ফলে, শ্রীনিমাই আদক নামক ২৪ বৎসর বয়স্ক এক যুবকের মুখে একটি গুলীবিদ্ধ হয় ও অপর যুবকটি কোনক্রমে বাঁচিয়া যায়। স্থানীয় জনসাধারণ ঐ দুর্বৃত্ত দলকে ধরিবার জন্য পশ্চাদ্ধাবন করিলে তাহারা কৈলাশচন্দ্র লেনে গিয়া একটি বোমা নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করে। এই ঘটনার পর ঐ অঞ্চলের সকল দোকান-পাট বন্ধ হইয়া যায় ও কিছুক্ষণ ঐ অঞ্চলে লোক-চলাচল বন্ধ থাকে। এ বিষয়ে এখনও কেহ গ্রেপ্তার হয় নাই।

উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গত এক মাস যাবৎ শিবপুর ও ব্যাটরা থানা এলাকায় দুইটি দলে বিবাদ চলিতেছে ও তাহাদের দ্বন্দ্বে দুইবার বে-আইনী 'রিভলবার' হইতে গুলীও নিক্ষিপ্ত হয়। এ সম্পর্কে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'তেও দুইবার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। গত সোমবার প্রাতে ব্যাটরা থানা এলাকায় বৃন্দাবন মল্লিক লেনে কয়েকজন দুর্বৃত্ত একজনকে লক্ষ্য করিয়া দুইটি গুলী ও একটি বোমা নিক্ষেপ করে। ঐ ঘটনায় কেহ আহত হয় নাই। এই অঞ্চলে 'গুণ্ডামি' চরমে উঠিয়াছে।

শনিবার ভোর সাড়ে ছয়টায় তালতলা বাজারের নিকট সি-আই-টি পার্কে এক অজ্ঞাতনামা হিন্দু যুবকের রক্তাপ্লুত মৃতদেহ পাওয়া যায়। ইহা হত্যাকাণ্ড সন্দেহে আততায়ীর সন্ধানের নিমিত্ত পুলিস-কুকুর 'মিতা' ও 'লাকি'কে নিয়োগ করা হয়। কুকুর দুইটি পৃথক পৃথকভাবে অগ্রসর হইয়া তাহাদের সহজাত প্রবৃত্তিবশে গন্ধ শুঁকিতে শুঁকিতে কিভাবে একই পথে একই বাড়ীর একই ঘরে উপস্থিত হয়, শনিবার সন্ধ্যায় পুলিস অফিসারগণের সহিত সাংবাদিক হিসাবে আমিও কৌতূহলের সহিত লক্ষ্য করি।

শনিবার রাত্রি পর্য্যন্ত অবশ্য আততায়ীর সন্ধান মিলে নাই। তবে পুলিস-কুকুর দুইটির তদন্তের সূত্র ধরিয়া পুলিস এই ব্যাপারে আরও তদন্ত চালাইতেছে।

পুলিস সন্দেহ করিতেছে যে, পূর্ব্বদিন রাত্রে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। কেহ বা কাহারা ঐ ব্যক্তিকে খুন করিয়া দেহটি উক্ত পার্কে ফেলিয়া গিয়াছে। মৃতদেহের গলা, চোখ, মুখ, মাথা, সর্ব্বাঙ্গ ছোরার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় পার্কের একটি বেঞ্চির পাশে শায়িত অবস্থায় ছিল।

মৃতের পরিধানে ডোরাকাটা শার্ট, পুলওভার গেঞ্জি, ট্রাউজার এবং পায়ে স্যাণ্ডেল ছিল। বয়স আন্দাজ পঁচিশ। পুলিস তাহাকে পশ্চিমা বলিয়া অনুমান করিতেছে।"

আসন্ন দুর্ভিক্ষ

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যাভাব সম্পর্কে এত দিনে সরকারী মুখ খুলিয়াছে। নীচে দুইটি বিবৃতি আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করা হইল :

"পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য ও ত্রাণমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সোমবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্যদের নিকট রাজ্যের খাদ্য-পরিস্থিতি সম্বন্ধে এক দীর্ঘ বিবৃতি পেশ করেন। বিবৃতিতে তিনি পশ্চিমবঙ্গের অন্নভোজী অধিবাসীদিগকে অধিক পরিমাণে গম ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ জানান এবং সুষম খাদ্য ব্যবহারের উপর বিশেষ জোর দেন। পশ্চিমবঙ্গে এই বৎসর (১৯৫৮ সনে) খাদ্যশস্যের মোট ঘাটতি বার লক্ষ টন হইবে বলিয়া তিনি জানান।

সহজে উৎপন্ন হয় এইরূপ ফল—কলা এবং অন্যান্য শাকসব্জী উৎপাদন করিয়া খাদ্যশস্যের ঘাটতি পূরণে সহায়তা করার জন্য তিনি পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের নিকট আবেদন জানান।

বিধানসভায় অধিবেশনের সুরুতে বিরোধীদলের পক্ষ হইতে রাজ্যের সম্ভাব্য খাদ্যসঙ্কট সম্বন্ধে আলোচনার দাবি উত্থাপিত হইলে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বলেন যে, খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের খাদ্য-পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি বিবৃতিদানের পর এই সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। তদনুসারে ঐ দিন বিধানসভার সদস্যদের নিকট খাদ্যমন্ত্রীর বিবৃতিটি প্রচার করা হয়।

এই বৎসর সারাটা চাষ-আবাদের কাল জুড়িয়া খরা অনাবৃষ্টি পশ্চিম বাংলার এক শুষ্ক রুক্ষমূর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছে। চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী ও পশ্চিম দিনাজপুরের ২২,৫০০ বর্গমাইল ভূখণ্ড, তেইশ লক্ষ চাষী পরিবার এবং দুই কোটি মানুষ ঐ রুক্ষমূর্ত্তির অভিশাপ-কবলে পড়িয়াছে। ব্যাপকতায়, তীব্রতায়, স্থায়িত্বে ও ক্ষতিসাধনে সাতান্ন সনের অবস্থা চুয়ান্ন সনের দুর্য্যোগকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য বিভাগ হইতে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত এক বিবরণীতে এই তথ্য সন্নিবদ্ধ করিয়া মঙ্গলবার বিধানসভা-কক্ষে সদস্যগণের মধ্যে উহা বিতরণ করা হয়।

এই বিবরণে আরও বলা হয়, সামান্য যে বারিপাত হইয়াছে, তাহা একান্তভাবে বিক্ষিপ্ত। বর্ষাঋতুর সূচনা যথাযথ হইল না, জুন, জুলাই ও আগষ্ট মাস ভরিয়া কার্য্যতঃ খরা গেল। সেপ্টেম্বরের প্রথমভাগে কিছু বৃষ্টি হইল বটে, কিন্তু তাহা অব্যাহত থাকিল না। অক্টোবর ও নবেম্বরে যে বর্ষণ হইল, তাহা কৃষির বিনষ্ট সম্পদ উদ্ধার করিতে পারিল না। অপ্রতিরোধ্য সূর্য্যকিরণজালে পশ্চিম বাংলার সাড়ে বাইশ হাজার বর্গমাইল ভূখণ্ড পোড়ামাটি হইয়া রহিল। এই অবিচ্ছিন্ন শুষ্ক আবহাওয়া ক্ষেতের গম, ছোলা, ডাল, সরিষা, আলু ও তিসির ক্ষতি করিল, আম্রকাননের মুকুল অপরিণত অবস্থায় ঝরিয়া পড়িল।"

ব্যাঙ্ক ধর্ম্মঘটের পরিণাম

পশ্চিমবঙ্গের ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারিগণের দাবী সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি নিম্নে দেওয়া হইল। তাঁহাদের দাবীর ত শেষ নিষ্পত্তি হইল কিন্তু তাঁহাদের এই অযথা ধর্ম্মঘটের ফলে বহু লক্ষ নিরীহ লোকের যে ক্ষতি হইল তাহার ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব কাহার?

"নয়াদিল্লী, ৩রা ডিসেম্বর—কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্ম্মসংস্থান মন্ত্রণালয় হইতে নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছে—

পশ্চিমবঙ্গের ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারিগণ ক্ষতিপূরণ ভাতার জন্য যে দাবী করিয়াছিলেন, তাহা ব্যাঙ্ক সিদ্ধান্তের আওতায় পড়ে কি না সে বিষয়ে বিচার করিবার জন্য ভারত সরকার গত ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে বিষয়টি লেবার আপীল ট্রাইব্যুনালের সদস্য শ্রী সালিম এম. মার্চেন্টের নিকট আবেদন করেন। মালিকগণ বলেন যে, ইহা ইতিপূর্ব্বে ব্যাঙ্ক সিদ্ধান্তের আওতায় পড়িয়াছে, কিন্তু কর্ম্মচারিগণ এ কথা মানিয়া লন নাই।

বিষয়টি বিচারের জন্য প্রেরিত হওয়ার পর ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারিগণ ১৪ই সেপ্টেম্বর হইতে এক মাসকাল ধর্ম্মঘট করেন।

বিরোধ মীমাংসার জন্য ভারত সরকার ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে সালিশ বিচারের জন্য বিষয়টি ঐ একই ট্রাইব্যুনালের নিকট পাঠান

এবং বলেন যে, ব্যাঙ্ক সিদ্ধান্তের কথা বিবেচনা করিলে ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীদের ক্ষতিপূরণের ভাতার দাবী মানিয়া লওয়া উচিত কি না তাহা বিচার করিতে হইবে এবং যদি মানিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে ক্ষতিপূরণ ভাতা কি পরিমাণ দিতে হইবে, তাহাও স্থির করিতে হইবে।

ট্রাইব্যুনাল তাঁহাদের কাজ শেষ করিয়াছেন এবং সরকারের নিকট তাঁহাদের সিদ্ধান্ত জানাইয়া দিয়াছেন। আজ উহা ইণ্ডিয়া গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

ট্রাইব্যুনাল মনে করেন যে, ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীদের ক্ষতিপূরণের ভাতার দাবী ব্যাঙ্ক সিদ্ধান্তের আওতায় পড়ে। কাজেই তাহাদের দাবী মানিয়া লওয়া চলে না। সেজন্য ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীদিগকে কি পরিমাণ ক্ষতিপূরণ ভাতা দিতে হইবে, তাহার সালিশ বিচারের কথা উঠে না।"

চাকুরী প্রার্থীর জ্ঞান

নীচের বিবৃতি সম্পর্কে কোনও মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। দেশে শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থার নিদর্শনরূপে আমরা উহা দিলাম:

"নয়াদিল্লী, ৯ই ডিসেম্বর—সাধারণতঃ চাকুরী প্রার্থীগণের নিজ নিজ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান নাই এবং তাহাদের প্রশ্নোত্তর কেবলমাত্র মুখস্থ বিদ্যা। ব্যক্তিত্ব পরীক্ষার সময় এই জ্ঞানাভাব প্রকট হইয়া উঠে। ইহার কারণ বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় প্রার্থীদের মানসিক উৎকর্ষ লাভ সম্পূর্ণ হয় না। আবার নিয়মানুবর্ত্তিতা, শিক্ষাগত কৃতিত্বের মান, চাকুরীতে উন্নতি এ সকলই শিক্ষার মানের উপর নির্ভরশীল। ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন ১৯৫৬ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৫৭ সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত তাহাদের যে বার্ষিক কার্য্যবিবরণী অদ্য সংসদে পেশ করেন, তাহাতে এইরূপ মন্তব্য করা হইয়াছে।

কমিশনকে নির্দ্দিষ্ট কাজ ছাড়াও এ বৎসরে ভারতীয় প্রশাসনিক বিভাগে বিশেষ নিয়োগ এবং নব-গঠিত শিল্প পরিচালনা সংস্থার জন্য প্রাথমিক নিয়োগকার্য্যে যথেষ্ট সময় দিতে হইয়াছে। প্রশাসনিক বিভাগে বিশেষ নিয়োগের জন্য গৃহীত লিখিত পরীক্ষাটি ১৯৫৬ সনের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে গৃহীত হইয়াছিল। এই পরীক্ষায় যোগদানের জন্য কমিশনের নিকট ২২,১৬১টি আবেদন আসিয়া পৌছায় এবং তন্মধ্যে ২০,৭১১ জন উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হন। আবার ১৭,৭৫৯ জন মাত্র লিখিত পরীক্ষা দিয়াছিলেন।

আলোচ্য বৎসরে কমিশনের পরিচালনাধীন ২৫টি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মোট ৫৯,১৯৯ জন আবেদনকারীর মধ্যে ৪৪,৬১৮ জন প্রার্থী পরীক্ষায় যোগদান করিয়াছিল। ভারতীয় প্রশাসনিক চাকুরীর যুক্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা, ভারতীয় পুলিস এবং কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরী, যুক্ত ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস পরীক্ষা ও সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার পরীক্ষা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সাধারণতঃ পরীক্ষার্থীগণের নিজ নিজ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান নাই এবং তাঁহাদের উত্তর কেবলমাত্র মুখস্থ বিদ্যা। ব্যক্তিত্ব পরীক্ষার সময় এই জ্ঞানাভাব প্রকট হইয়া উঠে। কমিশন বিবরণীতে এই মন্তব্য করিয়াছেন। তবে ভারতীয় প্রশাসনিক বিভাগ, ভারতীয় পুলিস বিভাগ, ভারতীয় পররাষ্ট্র বিভাগ এবং কেন্দ্রীয় অন্যান্য চাকুরীতে নিয়োগের জন্য অনুষ্ঠিত যুক্ত পরীক্ষায় অনেক চৌখোস প্রার্থী পাওয়া গিয়াছে। তাহারা শিক্ষা এবং মানসিক উৎকর্ষের দিক দিয়া নিজ নিজ পদের বিশেষ উপযোগী। একথা অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে, ৬,০০০ প্রার্থীর মধ্যেও কয়েকজন প্রার্থী মাত্র নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন।"

বীমা কর্পোরেশনের নীতি

সম্প্রতি লোকসভায় জীবনবীমা কর্পোরেশনের অর্থ বিনিয়োগ লইয়া তুমুল ঝড় চলিতেছে। ইহার পূর্ব্বে শ্রীত্রিদিবকুমার চৌধুরীও এ বিষয়ে প্রশ্নাদি করেন, তাহা অনেকের মনে নাই। সে সময় অর্থমন্ত্রী সে প্রশ্ন এড়াইয়া যান। এইবার তাহা চাপা দিতে বেগ পাইতে হইতেছে:

"নয়াদিল্লী, ৪ঠা ডিসেম্বর—অদ্য লোকসভায় জীবনবীমা কর্পোরেশনের অন্তর্বর্ত্তীকালীন রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনাকালে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী সদস্য শ্রীত্রিদিবকুমার চৌধুরী জীবনবীমা কর্পোরেশনের অর্থ-বিনিয়োগ নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। কর্পোরেশনের বিনিয়োগ কমিটি যেভাবে কতিপয় বেসরকারী কোম্পানীর শেয়ার, ডিবেঞ্চার এবং প্রেফারেন্স শেয়ারে অর্থ লগ্নী করিয়াছেন, তাহা অনুমোদন না করার জন্য শ্রী চৌধুরী একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

কর্পোরেশন সম্প্রতি মাড়বার কোম্পানীসমূহে যে অর্থ বিনিয়োগ করিয়াছে, তিনি বিশেষভাবে তাহার সমালোচনা করেন।

অদ্য লোকসভায় মূলধন (নিয়ন্ত্রণ) আইন সংশোধন বিল গৃহীত হয়। এই বিলের বিধান অনুযায়ী অংশতঃ আদায়ীকৃত শেয়ার সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত শেয়াররূপে গণ্য করার উদ্দেশ্যে অথবা বিক্রীত শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সঞ্চয় তহবিল মূলধন হিসাবে নিয়োগের পূর্ব্বে সরকারের অনুমোদন লাভ করিতে হইবে। এই বিলে মূলধন সংগ্রহ সম্পর্কে সরকারের অনুমোদন বাতিল অথবা পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা সরকারকে দেওয়া হইয়াছে।

অর্থমন্ত্রী শ্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারী সম্মতি বাতিল করা সম্পর্কে যে বিধিনিষেধ আছে তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন, সম্মতি বাতিল করিবার আদেশ কেন দেওয়া হইবে না, তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য কোম্পানীসমূহকে ন্যায়সঙ্গত সুযোগ দেওয়া হইবে।"

ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

গত শুক্রবার ১৩ই অগ্রহায়ণ ময়মনসিংহ গৌরীপুরের বিশিষ্ট জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী তিরাশী বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

তিনি সঙ্গীত ও নাট্যকলার একজন বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক *ছিলেন।* *বিভিন্ন* সমাজকল্যাণ ও সাংস্কৃতিক সংস্থার সহিত তিনি *সংশ্লিষ্ট ছিলেন।* কোচবিহারের মহারাজের সহিত তিনি বেঙ্গল *জিমখানা* ক্লাব স্থাপন করেন।

স্বদেশী আন্দোলনের সহিত রায়চৌধুরী ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

স্বদেশী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ, আশুতোষ চৌধুরী, রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য, কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী বৈপ্লবিক আন্দোলনেরও একজন বিশিষ্ট সমর্থক ছিলেন। ইহার জন্য তিনি কেবলমাত্র প্রভূত অর্থসাহায্য করেন নাই ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধাও অনেক ত্যাগ করিয়াছেন।

দীনেশচন্দ্র সেনের স্মৃতিরক্ষা

স্বর্গতঃ দীনেশচন্দ্র বাংলা-সাহিত্যে মৌলিক গবেষণার ঐতিহ্যের স্রষ্টা। তাঁহার পরলোকগমনের পর বহু বৎসর অতীত হইয়াছে, কিন্তু বঙ্গভারতীর এই একনিষ্ঠ সেবকের স্মৃতিরক্ষার জন্য এতদিন কোনই চেষ্টা করা হয় নাই। সম্প্রতি মহাবোধি সোসাইটি হলে দীনেশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার্থে জনমত গঠনের জন্য যে সভা অনুষ্ঠিত হইয়া গেল তাহাতে মনে হইল যে, বাঙালী-হৃদয়ে দীনেশচন্দ্রের স্মৃতি সুপ্ত ছিল, লুপ্ত হয় নাই। দীনেশচন্দ্র শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী ছিলেন, ডাঃ কালিদাস নাগ সত্যই বলিয়াছেন, বাংলাভাষা, সাহিত্যের গবেষণা ও জাতির হৃদয় আবিষ্কারে দীনেশচন্দ্র একা এক লক্ষ লোকের কাজ করিয়া গিয়াছেন। বাংলার বহু বিশিষ্ট অধ্যাপক, গবেষক, সাহিত্যিক এবং সাহিত্যানুরাগীর উপস্থিতিতে মহাবোধি সোসাইটি হলে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় এই পথিকৃৎ সাহিত্য-সাধক মনীষীর বরেণ্য নামের সহিত যুক্ত করিয়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক একটি বক্তৃতামালা প্রবর্তনের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট অনুরোধ জানান হয়।

সভাপতির অভিভাষণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার অধ্যাপক শ্রীনির্ম্মলকুমার সিদ্ধান্ত বলেন যে, দীনেশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই কর্তব্য; কিন্তু তাঁহার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্ত্তি ও সাধনা-উপলব্ধি এবং বিচার দ্বারা নিজেদের সেই মহান্ পথে চালিত করাই শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা।

উক্ত সভায় দীনেশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার্থে একটি স্মৃতিরক্ষা কমিটি গঠন করা হয়। আচার্য দীনেশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার জন্য যে প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা সর্ব্ববিষয়ে যুক্তিসঙ্গত।

ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস জন্মশতবার্ষিকী

ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস জন্মশতবার্ষিকী শীঘ্রই উদ্‌যাপিত হইবে। এই সময় সভা-সমিতিতে তাঁহার সুকৃতির কথা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইবে আশা করি। ডাঃ দাস যৌবনে ব্রাহ্মসমাজের গুণী-জ্ঞানী উন্নতিশীল ব্রাহ্ম-নেতৃবৃন্দের সংস্পর্শে আসেন। তিনি ছাত্রাবস্থায় নবগোপাল মিত্রের হিন্দুমেলা এবং ন্যাশনাল জিমনাসিয়ামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মনেতা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর দ্বারা তিনি খুবই প্রভাবান্বিত হন। বিপিনচন্দ্র পাল, তারাকিশোর চৌধুরী (পরে, সন্তদাস বাবাজী) ও অপর কয়েকজন যুবকের সঙ্গে একযোগে পণ্ডিত শাস্ত্রীর সম্মুখে বুকের রক্ত দিয়া একটি সঙ্কল্প-পত্র লেখেন। তাহার মূল কথাগুলির মধ্যে এই ছিল যে, এই যুবকগণ ভারতবর্ষের 'স্বায়ত্তশাসন' লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত সরকারের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করিবেন না এবং সমাজে জাতিভেদাদি বৈষম্যও মানিয়া লইবেন না। সুন্দরীমোহন আজীবন এই সঙ্কল্প অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়াছিলেন। তিনি নিজ জীবনকে স্বদেশের সেবায় এবং সর্ব্বপ্রকার বন্ধন-মুক্তির প্রয়াসে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া তিনি মাতা ও শিশুদের রোগ-নিরাময়েই বিশেষভাবে নিয়োজিত হইলেন। ধাত্রীবিদ্যা সম্পর্কীয় তাঁহার পুস্তকসমূহ এক সময়ে খুবই জনাদর লাভ করে। এই সকল প্রসূতিদের সাধারণ জ্ঞানলাভে এবং প্রসূতি-চিকিৎসায় সাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিস্তারেও অত্যন্ত সহায় হইয়াছিল। পূর্ব্বে সাধারণ অজ্ঞতা এবং ঔদাসীন্যের জন্য প্রসূতি ও শিশুমৃত্যুর হার অত্যধিক ছিল। ডাঃ সুন্দরীমোহনের অক্লান্ত চেষ্টায় তাহা খানিকটা প্রশমিত হয়। তিনি চিকিৎসাবিদ্যার এই দিকে বিশেষ দক্ষতাও অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি ন্যাশনাল মেডিক্যাল স্কুলের প্রতিষ্ঠাবধি ইহার প্রিন্সিপাল ছিলেন। এই স্কুলটি বর্ত্তমানে কলেজে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু প্রথম দিকে ইহা গড়িয়া তোলার সময় সুন্দরীবাবু যে কৃতিত্ব দেখান ও ত্যাগস্বীকার করেন তাহা সর্ব্বদাই আমাদের কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতে হইবে। দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই বিদ্যালয়টি একটি প্রথম শ্রেণীর চিকিৎসা-শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হইতে পারিয়াছে।

ন্যাশনাল মেডিকেল স্কুল সম্পর্কে বলিবার কালে সুন্দরীবাবুর অন্য কৃতির কথাও আমাদের মনে পড়িতেছে। তিনি নিরলস নিষ্ঠাবান কর্ম্মী, দীর্ঘকাল অন্তরালে থাকিয়াই দেশসেবা করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি অন্তরালে থাকিতে পারেন নাই। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ কলিকাতা কর্পোরেশনকে স্বরাজ্য-দলের অধীন করিয়া লইলে, ইহার রচনাত্মক কর্ম্মে সুন্দরীবাবু মনে-প্রাণে যোগ দিয়াছিলেন। কর্পোরেশনের হেলথ কমিটির চেয়ারম্যানরূপে তিনি কলিকাতা শহরের স্বাস্থ্যোন্নতিমূলক ব্যবস্থাদি করিতে বিশেষ ভাবে প্রয়াস পান। কলিকাতার বিভিন্ন জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান হেলথ কমিটির সুপারিশে কর্পোরেশনের অর্থসাহায্য পাইয়া জনসেবায় তৎপর হইয়া উঠে। সুন্দরীমোহনের সহধর্ম্মিণী হেমাঙ্গিনী দাস স্বামীর সকল কার্য্যে সহায় হন। স্বদেশী যুগে স্বামী-স্ত্রী উভয়ই নিজ নিজ ক্ষেত্রে সেবাকার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই সময়ের অর্দ্ধোদয় যোগে প্রথম স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠনে সুন্দরীমোহনের কৃতিত্ব ছিল প্রচুর। আজ এই জন্ম-শতবার্ষিকীতে আমরা ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।

শঙ্করের "অধ্যাসবাদ"

৩

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

৩

পূর্ব সংখ্যায়, অধ্যাসই যে বিশ্বভ্রমের মূলীভূত কারণ, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। এই সংখ্যায় "অধ্যাসের" স্বরূপ সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা করা হচ্ছে।

শঙ্কর তাঁর "অধ্যাস-ভাষ্যে" জগতের মূলীভূত কারণ এই অধ্যাসকে বারংবার "নৈসর্গিক", "অনাদি" ও "অনন্ত" বলে নির্দেশ করেছেন। প্রথমতঃ, "নৈসর্গিক" কথার অর্থ হ'লঃ স্বাভাবিক। জীবের অবিদ্যা স্বাভাবিক অথবা জীবত্বের সাধারণ ধর্ম বলে অবিদ্যামূলক অধ্যাসও তাই। সেজন্য, সমস্ত বদ্ধ জীবই অধ্যাসের বশবর্তী হয়ে বিশ্বপ্রপঞ্চকে সত্যরূপে প্রত্যক্ষ করে। এই কারণেই সংসার সকল জীবের নিকটই সমভাবে সত্য বলে প্রতিভাত হয়, এবং পুনরায় সেই কারণেই সংসারকে মিথ্যা বলে গ্রহণ করা এরূপ কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ, যা সার্বজনীন এবং যুগে যুগে কোটি কোটি ব্যক্তির নিকট যুগপৎ সত্যরূপেই প্রতিভাত হয়, তাকে মিথ্যা-প্রত্যয়ই মাত্র বলা যায় কি করে? সাধারণতঃ, যা মিথ্যা, যা ভ্রমই মাত্র, তা সার্বজনীন হয় না, যুগপৎ সর্বদেশ, সর্বকাল ও সর্বব্যক্তিগত হয় না—পৃথক্ ভাবে, কোন কোন বিশেষ দেশ-কাল-ব্যক্তিগতই হয় মাত্র। যেমন, রজ্জুতে সর্পভ্রম যুগপৎ সর্বদেশে, সর্বকালে, সর্বব্যক্তির কোনদিনও হয় না—কেবল পৃথক্ ভাবে, একজন, কি কয়েকজন ব্যক্তির একটি বিশেষ দেশে, বিশেষ কালেই হয় মাত্র। এর উত্তর হ'ল এই যে, প্রথমতঃ, যা নৈসর্গিক বা স্বাভাবিক, তা নিশ্চয়ই সর্বদেশে, সর্বকালে, সর্বব্যক্তির ক্ষেত্রেই সমান প্রযোজ্য। জীবের অবিদ্যাও স্বাভাবিক বলে, জীবের অধ্যাসও তাই; এবং সেজন্যই ব্রহ্মে জগতের অধ্যাস বা জগদ্‌ভ্রম সার্বজনীন। জীব যখন তার এই মিথ্যা জীবত্ব ত্যাগ করে তার প্রকৃত ব্রহ্মত্ব উপলব্ধি করে, তখনই কেবল সে অবিদ্যা ও অধ্যাসমুক্ত হয়ে সংসারকেও মিথ্যারূপে প্রত্যক্ষ করে। পুনরায়, ভ্রম যে কেবল ব্যক্তিগতই হয়, সার্বজনীন নয়—সেকথাও সত্য নয়। যেমন, আকাশকে গোলাকার ও নীলবর্ণ বলে যে ভ্রম তা ত সার্বজনীন, সূর্য উদিত হচ্ছে বলে যে ভ্রম তাও তাই। যে কোনো ব্যক্তি কম্পমান জলে সূর্যের প্রতিবিম্ব দেখলে, অকম্পিত সূর্যকেও কম্পমান দেখতে বাধ্য, যে কোন ব্যক্তি ধাবমান যানারোহণকালে পথিপার্শ্বস্থ নিশ্চল বস্তুদেরও ধাবমান দেখতে বাধ্য। এরূপে, ভ্রমের কয়েকটি মূলীভূত কারণ সার্বজনীন হলে, ভ্রমও যে তাই হবে—তা আর আশ্চর্যের বিষয় কি?

দ্বিতীয়তঃ, এই জীবগত অবিদ্যা স্বাভাবিক বলে অনাদি, সেজন্য অবিদ্যামূলক অধ্যাসও তাই। বস্তুতঃ, ভারতীয় মতে, সংসার অনাদি। ভারতীয় দর্শন কর্মবাদের ভিত্তিতেই সৃষ্টি-রহস্যের সমাধানের প্রচেষ্টা করেছে। কর্মবাদানুসারে, প্রত্যেক 'সকামকর্ম'ই একটি উপযুক্ত ফল প্রসব করে, যে ফলটিকে কর্মকর্তার ভোগ করতেই হয়। 'সকামকর্ম' হ'ল সেই কর্ম যা কর্মকর্তা স্বেচ্ছায়, একটি বিশেষ ফললাভের আকাঙ্ক্ষায় ও আশায় সম্পাদিত করেন। সেজন্য, ন্যায়বিচারের দিক থেকে তাঁকে নিশ্চয়ই সেই কর্মের ফল ভোগ করতেই হবে। কিন্তু বর্তমান জন্মে একজন ব্যক্তি এরূপ অসংখ্য সকাম-কর্ম সম্পাদিত করেন যে, নানা কারণে, তার সকল ফলই তিনি এই জন্মেই ভোগ করে যেতে পারেন না। সেজন্য সেই সকল অভুক্ত কর্মের ফলভোগের জন্য তাঁকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয়। কিন্তু এই নূতন জন্মেও তিনি অসংখ্য নূতন সকাম কর্মে লিপ্ত হন, যে জন্য তাঁকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয়। এই ভাবেঃ জন্ম—কর্ম—পুনর্জন্ম—কর্ম—পুনর্জন্ম—কর্ম—পুনর্জন্ম ইত্যাদি প্রণালীতে চলে জন্ম ও কর্মের নিরন্তর প্রবাহ। এরই নাম হ'ল "সংসার-চক্র":—

সকাম কর্ম—কর্মফল—কর্মফলভোগ—জন্ম—সকাম কর্ম—কর্মফল—কর্মফলভোগ—পুনর্জন্ম ইত্যাদি।

এই নিরন্তর ঘূর্ণায়মান সংসার-চক্র থেকে পরিত্রাণ লাভের একমাত্র উপায় হ'ল "নিষ্কাম-কর্ম" সাধন। নিষ্কাম-কর্ম হ'ল সেই কর্ম যা ফলের আকাঙ্ক্ষা না করেই, কেবলমাত্র কর্তব্যের প্রেরণাতেই সম্পাদন করা হয়। এরূপ নিষ্কাম কর্মের ক্ষেত্রে কর্মকর্তার কর্মফলোপভোগের কোনরূপ প্রশ্ন নেই। সেজন্য কোন নূতন জন্মে যদি কোন ব্যক্তি নূতন কর্মসমূহ সম্পূর্ণ নিষ্কাম ভাবেই সাধিত করেন, তা হলে পুরাতন সকাম কর্মের ফলভোগ শেষ হলেই, তিনি সাধন-বলে মুক্তিলাভ করেন, যে হেতু, সেই সকল নূতন নিষ্কাম কর্মের ফলোপভোগের জন্য তাঁকে পুনরায় জন্মপরিগ্রহ করতে হয় না।

এ ক্ষেত্রে একটি স্বাভাবিক প্রশ্ন উঠতে পারে এই যে, যদি কর্ম থেকেই জন্ম হয়, অথচ জন্ম না হলে কর্ম হতে পারে না—তা হলে কর্মই জন্মের হেতু, অথবা জন্মই কর্মের হেতু? কোন্‌টি কোন্‌টির পূর্বে, কোন্‌টি কোন্‌টির পরে? ভারতীয় দর্শনের মতে, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না, সেজন্য ভারতীয় দর্শন এ ক্ষেত্রে "বীজাঙ্কুর ন্যায়ে"র অবতারণা করেছে। বীজ থেকে অঙ্কুরের, পুনরায় অঙ্কুর থেকে বীজের উদ্ভব হয়—সেজন্য বীজই অঙ্কুরের পূর্বে, অথবা অঙ্কুরই বীজের পূর্বে তা সঠিক বলা অসম্ভব। অতএব বীজাঙ্কুরের সম্বন্ধকে অনাদি সম্বন্ধ বলে গ্রহণ করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। একই ভাবে, কর্ম ও সৃষ্টি বা জন্মের সম্বন্ধও অনাদি সম্বন্ধ।

ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে, শঙ্কর সৃষ্টির অনাদিত্ব সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন (২।১।৩৫-৩৬)। তিনি বলছেন যে, ব্যবহারিক দিক থেকে, সৃষ্টির প্রশ্নই যদি ওঠে, তা হলে স্বীকার করতে হয় যে, ঈশ্বর জীবের কর্মানুসারেই সৃষ্টি করেন, অন্যথায় তিনি "বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যদোষে" দুষ্ট হয়ে পড়েন। যদি আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, কর্ম থেকে সৃষ্টি, অথচ সৃষ্টি হলেই কর্ম—এরূপে "ইতরেতরাশ্রয়" দোষের উদ্ভব হয়, তার উত্তর :—

"নৈষ দোষঃ, অনাদিত্বাৎ সংসারস্য। ভবেদেষ দোষঃ যদ্যাদিমানয়ং সংসারঃ স্যাৎ। অনাদৌ তু সংসারে বীজাঙ্কুরবদ্ধেতুমদ্ভাবেন কর্মণঃ সর্গবৈষম্যস্য চ প্রবৃত্তির্ন বিরুধ্যেত।"
(ব্রহ্মসূত্র ২।১।৩৫, শঙ্কর-ভাষ্য)

অর্থাৎ, সংসার অনাদি বলে এরূপ ইতরেতরাশ্রয়িত্ব-দোষ হয় না। সংসার অনাদি না হলে অবশ্য ঐ দোষ হতে পারত। কিন্তু বীজাঙ্কুর সম্বন্ধের ন্যায়, কর্ম ও সৃষ্টি-বৈষম্যের মধ্যেও অনাদি পরম্পরাশ্রয়ী সম্বন্ধ।

পরের সূত্র-ভাষ্যে (২।১।৩৬) শঙ্কর বলছেন যে, সংসারের অনাদিত্ব যুক্তি-শ্রুতি-স্মৃতি-সিদ্ধ। যুক্তি হ'ল এই : সংসার অনাদি না হলে, আদিমান হলে, তার আকস্মিক উৎপত্তি হয়, তা স্বীকার করে নিতে হয়। সে ক্ষেত্রে পূর্ব পূর্ব সৃষ্টির সঙ্গে পর পর সৃষ্টির কোন অঙ্গাঙ্গি-সম্বন্ধ থাকে না—একটি সৃষ্টির হঠাৎ আরম্ভ হ'ল এবং যথাবিহিত শেষ হ'ল, অন্য কোন সৃষ্টির সঙ্গে এর সম্পর্ক মাত্র রইল না। সুতরাং পূর্বসৃষ্টিতে সংঘটিত ব্যাপার পরসৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে যেতে পারে। যেমন, পূর্বসৃষ্টিতে মুক্তিপ্রাপ্ত জীবও পরসৃষ্টিতে বদ্ধ হয়ে সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে পারেন। পুনরায়, কর্ম না করেও ফলভোগ ও কর্ম করেও ফলভোগের অভাব হতে পারে ("অকৃতাভ্যাগম" ও "কৃতনাশ")। জীবের সুখদুঃখ বৈষম্যের কোনরূপ ন্যায়সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না, ঈশ্বরও বৈষম্যদোষে দুষ্ট হয়ে পড়েন।

সেজন্য শঙ্করের মতে, সংসার অনাদি, সংসারের মূল কারণ অধ্যাসও তাই, অধ্যাসের মূল কারণ অবিদ্যাও তাই। অন্যান্য মতবাদানুসারেও ত সকাম কর্ম ও জন্মজন্মান্তরের সম্বন্ধকে পূর্বোক্ত ভাবে অনাদি বলে স্বীকার করে নিতে হয়। একই ভাবে, অবিদ্যামূলক অধ্যাস ও তার ফল মিথ্যা সংসার-প্রতীতিকেও অনাদি বলে গ্রহণে বাধা নেই। বস্তুতঃ, সকাম কর্ম ও অবিদ্যা বা অধ্যাসমূলক। সেজন্য, কর্ম থেকে সৃষ্টি এবং অবিদ্যা বা অধ্যাস থেকে সৃষ্টি—একই কথা।

এ বিষয়ে শঙ্কর তাঁর মাণ্ডুক্যোপনিষদ্‌ কারিকা-ভাষ্যে (২।১৬) আরও বিশদ করে বলেছেন, অধ্যাসের স্বরূপই "স্মৃতিরূপ", যে বিষয়ে পূর্বেই বলা হয়েছে। অর্থাৎ, রজ্জুতে সর্প অধ্যস্ত হলে, পূর্বদৃষ্ট সর্পের স্মৃতিই সেইক্ষণে সর্প প্রত্যক্ষের ন্যায় প্রতিভাত হয়। একই ভাবে, ব্রহ্মে জগৎ অধ্যস্ত হলেও, সেই সময়ে পূর্বদৃষ্ট জগতের স্মৃতিই জগৎ-প্রত্যক্ষের ন্যায় প্রতিভাত হয়। সেজন্য প্রশ্ন এই : এক পক্ষে, অধ্যাস হলে জগৎ, জগৎ থাকলে জগতের প্রত্যক্ষ, জগতের প্রত্যক্ষ হলে তার স্মৃতি সম্ভবপর হয়। অন্য পক্ষে, পূর্বদৃষ্ট জগতের স্মৃতি না থাকলে, "স্মৃতিরূপ" অধ্যাস সম্ভবপর নয়। সেজন্য, অধ্যাস পূর্বে কি জগৎ পূর্বে—তা বলা যায় না, বীজাঙ্কুরের ন্যায়ই তাদের অনাদি সম্বন্ধ।

তৃতীয়তঃ, এরূপ অধ্যাস "অনন্ত" এই বিশেষ অর্থে যে, যাঁরা এই ভাবে অনাদি অবিদ্যাগ্রস্ত, তাঁদের সেই স্বভাবগত অবিদ্যার ক্ষালন জন্মজন্মান্তরেও হয় না, এমন কি কোনদিনও হয় না, যদি না প্রকৃত আত্মৈকত্বজ্ঞান লাভে তাঁরা ধন্য হন। অবিদ্যার ও তার ফলস্বরূপ অধ্যাসের কবল থেকে মুক্তিলাভ করা যে অতি কঠিন—তা বোঝাবার জন্যই অধ্যাসকে "অনন্ত" বলা হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, বদ্ধ জীব কোনদিনও অবিদ্যা ও অধ্যাসের হস্ত থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে না—সে ক্ষেত্রে ত মুক্তি বা মোক্ষই অসম্ভব হয়ে পড়ে। সেজন্য প্রকৃতকল্পে, বুভুক্ষুর নিকট অনন্ত হলেও, মুমুক্ষুর নিকট অবিদ্যা ও অধ্যাস অনাদি, কিন্তু অনন্ত নয়।

অধ্যাস বা সংসারকে "অনন্ত" বলবার দ্বিতীয় অর্থ হ'ল এই যে, বুভুক্ষু বা সকাম কর্মকারী জীবের সংখ্যার শেষ নেই—যতই না কেন মুমুক্ষু সাধকগণ প্রতি জন্মেই মুক্তিলাভ করুন। সেজন্য সংসার চিরদিনই চলবে—স্বল্প কয়েকজনের মুক্তিলাভ হলেও।

কি প্রণালীতে অধ্যাস জীবজগতের তথাকথিত সৃষ্টি করে, সে সম্বন্ধে শঙ্কর মাণ্ডুক্যোপনিষদ-কারিকা-ভাষ্যে বলেছেন। গৌড়পাদ-কারিকায় একটি শ্লোক আছে—

"জীবং কল্পয়তে পূর্বং ততো ভাবান্ পৃথগবিধান্।
বাহ্যানাধ্যাত্মিকাংশ্চৈব যদবিদ্যাস্তথাস্মৃতিঃ॥'
(২।১৬)

এই শ্লোকটির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শঙ্কর বলছেন—

"যোঽসৌ স্বয়ং-কল্পিতো জীবঃ সর্বকল্পনায়ামধিকৃতঃ, স যথাবিদ্যঃ যাদৃশী বিদ্যা বিজ্ঞানমস্যেতি যথাবিদ্যঃ তথাবিধৈব স্মৃতিস্তস্য, ইতি তথা স্মৃতির্ভবতি স ইতি। অতো হেতুকল্পনা বিজ্ঞানাৎ ফলবিজ্ঞানং, ততো হেতু-ফলস্মৃতিঃ, ততস্তদ্‌বিজ্ঞান-তদর্থক্রিয়া-কারক-তৎ-ফলভেদ—বিজ্ঞানানি। তেভ্যস্তৎস্মৃতিঃ, তৎস্মৃতেশ্চ পুনস্তদ্ বিজ্ঞানাদি ইত্যেবং বাহ্যান্ আধ্যাত্মিকাংশ্চ ইতরেতর-নিমিত্ত-নৈমিত্তিক-ভাবেন অনেকধা কল্পয়তে।'
(শঙ্কর-ভাষ্য)

অর্থাৎ, সর্বপ্রথম বিশুদ্ধ, সুখদুঃখবিহীন ব্রহ্মে সুখদুঃখ-ভাগী, কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বশীল জীবের রজ্জুতে সর্পের ন্যায় অধ্যাস বা কল্পনা করা হয়। পরে, সেই জীবের ভোগার্থ নানারূপ বাহ্য ও আন্তর বস্তু কল্পনা করা হয়। এরূপে, স্বয়ংকল্পিত এবং সমস্ত কল্পনাকারী জীবের যেরূপ জ্ঞান সেরূপই স্মৃতি হয়। সেজন্য প্রথমে হেতুকল্পনা, অর্থাৎ সেই বিষয়ে অধ্যাস বা মিথ্যাজ্ঞান হয়, তার থেকে ফল-কল্পনা বা অধ্যাস, তার থেকে হেতু-ফল-স্মৃতি, তার থেকে পুনরায় সেই বিষয়ে এবং তার অর্থক্রিয়া, কারক ও ফলবিশেষের বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান বা অধ্যাস হয়। পুনরায়, তার থেকে সেই বিষয়ে স্মৃতি, তার থেকে অধ্যাস, তার থেকে স্মৃতি, তার থেকে পুনরায় অধ্যাস —এই ভাবে, পরস্পর কার্যকারণ ভাবে বাহ্য ও আন্তর বহু-বিধ কল্পনা বা অধ্যাস করা হয়।

এই ভাবে, সর্বপ্রথম কল্পনাকারী বা অধ্যাসভাগী জীবের কল্পনা বা অধ্যাস হয়, ভোক্তার তথাকথিত সৃষ্টি বা 'বিবর্ত' হয়, পরে সেই ভোক্তার দ্বারা ভোগ্য জগতের কল্পনা বা অধ্যাস করা হয়।

"তত্র জীব-কল্পনা সর্বকল্পনা-মূলমিত্যুক্তম্।'
(শঙ্কর-ভাষ্য, মাণ্ডুক্য-কারিকা, ২।১৭)

এরূপ কল্পনাকারী বা অধ্যাসভাগী জীব যে স্বয়ংই অবিদ্যা ও কল্পনা বা অধ্যাসের ফল তা পূর্বেই বলা হয়েছে সেজন্য জীব ও অধ্যাসের মধ্যে বীজাঙ্কুর-ন্যায় অনুসারে অনাদি সম্পর্ক, জগৎ ও অধ্যাসের মধ্যেও ঠিক তাই।

একটি দৃষ্টান্ত ধরা যাক। রজ্জুতে সর্পের অধ্যাস হলে, পূর্বদৃষ্ট সর্পের স্মৃতিই সর্প-প্রত্যক্ষরূপে সেই সময়ে প্রতিভাত হয়। কিন্তু পূর্বদৃষ্ট সর্পটিও ত অধ্যাসের ফল বা তারও পূর্ব-দৃষ্ট সর্পের স্মৃতির ফল, পুনরায় সেই পূর্বদৃষ্ট সর্পটিও একই ভাবে অধ্যাসের ফল—এই ভাবে, অধ্যাস ও স্মৃতি বা জীব-জগতের মধ্যে বীজাঙ্কুর-ন্যায় অনুসারে অনাদি সম্পর্ক।

এরূপে শঙ্করের মতে, বীজাঙ্কুর-ন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ না করলে সৃষ্টি-সমস্যার সমাধান অসম্ভব। অন্যথায়, অবিদ্যা জীবাশ্রিত, অথচ স্বয়ং জীবই অবিদ্যার ফল, অধ্যাস পূর্বদৃষ্ট বস্তুর স্মৃতির ফল, অথচ পূর্বদৃষ্ট বস্তুই স্বয়ং অধ্যাসের ফল— এই ভাবে স্ববিরোধ দোষের উদ্ভব হয়। অবশ্য, অন্যান্য সম্প্রদায়ও যখন কর্ম ও জন্মের মধ্যে স্ববিরোধ-দোষ বর্জনের জন্য বীজাঙ্কুর-ন্যায়ের সাহায্য গ্রহণে বাধ্য হয়েছে, তখন অন্ততঃ সেদিক থেকে শঙ্করের মতবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করা চলে না।

বস্তুতঃ, ভারতীয় দর্শনের এরূপ অনাদি সংসার-সৃষ্টি-কল্পনা অযৌক্তিক বা অজ্ঞতার পরিচায়ক নয়। এই মতানুসারে, সর্বপ্রথম সৃষ্টির ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না—পরের সৃষ্টিসমূহ ত জীবের অভুক্ত সকাম কর্মসমূহপ্রসূত, কিন্তু সর্বপ্রথম সৃষ্টির কারণ কি? পূর্বে সৃষ্টি হবে, পরে কর্ম। তা হলে সর্বপ্রথম সৃষ্টির কারণ কি? কিন্তু ভারতীয় মতানুসারে এরূপ সর্বপ্রথম সৃষ্টির প্রশ্নটিই অযৌক্তিক। কারণ, বলাই হয়েছে যে, সংসার একটি চক্র, চক্রের ত সরল রেখার ন্যায় আদিও নেই, অন্তও নেই। একটি সরল রেখার ক্ষেত্রে, এক বিন্দুতে আরম্ভ করে অপর এক বিন্দুতে শেষ করা যায়, চক্রের ক্ষেত্রে তা করা যায় না। সেজন্য সংসারকে যদি চক্রই বলা হ'ল, তা হলে তার আদি ও অন্তের প্রশ্নই বা উত্থাপিত হবে কেন? যিনি অন্ত বা মুক্তি আকাঙ্ক্ষা করবেন এই চক্র থেকে, তাঁকে বর্জন করে বেরিয়ে আসতে হবে সেই চক্র থেকে, অন্য কোন উপায় নেই। কিন্তু সংসারকে চক্রই বা বলা হ'ল কেন, সরল-রেখা না বলে? তার উত্তর এই যে, যে স্থলে কেবল একে অপরের আশ্রয় হয়, একে অপরের কারণ হয়, এবং একে অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করে, সে স্থলেই কেবল সরল রেখার উপমা দেওয়া চলে। যেমন, ক→খ। এস্থলে, একমাত্র 'ক'ই 'খ'য়ের আশ্রয় ও কারণ, 'খ' 'ক'য়ের নয়; একমাত্র 'ক'ই 'খ'কে প্রভাবান্বিত করছে, 'খ' 'ক'কে নয়। কিন্তু যে স্থলে দু'ই পরস্পরের আশ্রয় ও কারণ, এবং দু'ই পরস্পরের উপর সমান প্রভাব বিস্তার করে, সেস্থলে, চক্রের উপমাই প্রযোজ্য। এস্থলে, 'ক' 'খ'য়ের আশ্রয় ও কারণ, 'খ'ও তার দিক থেকে সমভাবে 'ক'য়ের আশ্রয় ও কারণ। এরূপ পরস্পরাশ্রয়ী বস্তুর মধ্যে কোন্‌টি কার পূর্বে এবং সর্বপ্রথম কোন্‌টি ছেড়ে কোন্‌টি ছিল—এরূপ প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, জানা কথাই যে, কারণ পূর্বে, কার্য পরে থাকে। সে ক্ষেত্রে দুটিই যদি দুটির কারণ ও কার্য দুই হয়, তা হলে কোন্‌টি

কার পূর্বে এবং কোন্‌টি সর্বপ্রথম ছিল—সে প্রশ্ন ত উত্থাপিতই হয় না। এরূপে, সকাম কর্ম ও জন্ম-পুনর্জন্মের পরম্পরাশ্রয়িত্ব নির্দেশ করবার জন্যই ত সংসারকে অনাদি, অনন্ত, নিরন্তর ঘূর্ণায়মান চক্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

"অধ্যাসবাদই" অদ্বৈতবেদান্তের মূল ভিত্তি বলে, গৌড়পাদ, শঙ্কর থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী সমস্ত অদ্বৈতবাদিগণই এই সম্বন্ধে নানাবিধ বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সে বিষয়ে উল্লেখ অবশ্য এস্থলে সম্ভবপর নয়। তবে অদ্বৈতবেদান্তের সার সংগ্রহ করে খ্রীষ্টীয় শতাব্দীতে আচার্য সায়ণ মাধব তাঁর সুবিখ্যাত দর্শন-সংকলন গ্রন্থ "সর্বদর্শনসংগ্রহে" এ সম্বন্ধে যে বিবরণী দিয়েছেন, তা সংক্ষেপে উদ্ধৃত করছি।

সায়ণমাধব তাঁর প্রসিদ্ধ "সর্বদর্শন-সংগ্রহের" শঙ্কর-দর্শন অধ্যায়ে অধ্যাসের প্রকারভেদের উল্লেখ করেছেন। "অধ্যাসের" সংজ্ঞা দান করে তিনি বলছেন—

"প্রমাণ-দোষ-সংস্কার-জন্মান্যস্য পরাত্মতা
তদ্ধীশ্চাধ্যাস ইতি হি স্বয়মিষ্টং মনীষিভিঃ।"

অর্থাৎ, অধ্যাস হ'ল "অন্যস্য পরাত্মতা" বা একের অন্য রূপে প্রতীতি। এরূপ অধ্যাসের উৎপত্তির কারণ তিনটি: প্রমাণ বা চক্ষু-প্রমুখ ইন্দ্রিয়, দোষ বা দূরত্বাদি, এবং সংস্কার বা পূর্বদৃষ্ট সর্পের (রজ্জুতে সর্পের অধ্যাসকালে) স্মৃতি। এরূপে, অন্ধকার, দূরত্ব প্রমুখ কারণের জন্য ভ্রমকারী রজ্জুতে সর্পের অধ্যাস করে' সর্প ই প্রত্যক্ষ করেন।

এরূপ অধ্যাস দ্বিবিধ: অর্থাধ্যাস এবং জ্ঞানাধ্যাস। রজ্জুতে সর্পের অধ্যাস হ'ল "অর্থাধ্যাস"। আত্মায় মিথ্যাভূত জ্ঞানের অধ্যাস হ'ল "জ্ঞানাধ্যাস" ("আমি কর্তা, ভোক্তা" প্রভৃতি প্রতীতি)। প্রথম ক্ষেত্রে, এক বস্তুর অপর এক বস্তুতে অধ্যাস করা হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, এক মিথ্যা প্রতীতির আত্মাতে অধ্যাস করা হয়।

অন্য দিক থেকেও অধ্যাস দ্বিবিধ: নিরুপাধিক ও সোপাধিক। আত্মায় অহঙ্কারের অধ্যাস হ'ল নিরুপাধিক অধ্যাস। একই ব্রহ্মে উপাধি জীব ও উপাধি ঈশ্বররূপে যে ভেদের অধ্যাস, তা হ'ল সোপাধিক অধ্যাস।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, "অধ্যাস-ভাষ্যে" শঙ্কর অধ্যাসবাদের বিরুদ্ধে দুটি আপত্তি খণ্ডন করেছেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে আরো একটি স্বাভাবিক আপত্তিও উত্থাপিত হতে পারে, যে সম্বন্ধে "অধ্যাস-ভাষ্যে" উল্লেখ নেই, অন্যত্র আছে। সেটি হ'ল এই যে, যখন এক বস্তুতে অপর এক বস্তু আরোপিত বা অধ্যস্ত করে, এক বস্তুকে অপর এক বস্তু বলে ভ্রম করা হয়, তখন সেই দুটি বস্তু পরস্পর-বিভিন্ন হলেও পরস্পর-সদৃশ হয়—অন্যথায় তাদের মধ্যে অধ্যাসের সম্ভাবনা নেই, যেহেতু সাধারণতঃ এক বস্তুকে সম্পূর্ণ বিসদৃশ অপর এক বস্তু বলে ভ্রম করা যায় না। যেমন, রজ্জুকেই সর্প বলে ভ্রম করা যায়, রজ্জুকে মুক্তা বলে নয়, শুক্তিকেও সর্প বলে নয়,—যে হেতু রজ্জু ও সর্প দুটি বিভিন্ন বস্তু হলেও দৈর্ঘ্য, ক্ষীণতা প্রভৃতির দিক থেকে পরস্পর-সদৃশ, কিন্তু ব্রহ্ম ও জগৎ কেবল পরস্পর বিভিন্ন নয়, সম্পূর্ণরূপে পরস্পর-বিসদৃশও সেই সঙ্গে। সে ক্ষেত্রে ব্রহ্মে জগতের অধ্যাস, ব্রহ্মকে জগৎ বলে ভ্রম করা সম্ভবপর কিরূপে?

সায়ণমাধব এই প্রশ্নের উত্তর অতি সুন্দর ভাবে দিয়েছেন তাঁর সুপ্রসিদ্ধ "সর্বদর্শনসংগ্রহের" শঙ্করদর্শনের অধ্যায়ে। সে স্থলে তিনি বাচস্পতি-মিশ্রের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে বলছেন:

"ননু জীব জড়য়োঃ সারূপ্যাভাবেন চিদ্‌বিবর্তত্বং প্রপঞ্চস্য ন সংপরিপদ্যত ইতি প্রাগবাদিষ্মেতি চেৎ – নৈতৎ সাধু। ন হি সারূপ্যনিবন্ধনাঃ সর্বে বিভ্রমা ইতি ব্যাপ্তিরস্তি, অসরূপাদপি কামাদেঃ কান্তালিঙ্গনাদিবিব স্বপ্নবিভ্রমস্যোপলম্ভাৎ। কিংচ কাদাচিৎকে বিভ্রমে সারূপ্যাপেক্ষা নানাদ্যবিদ্যানিবন্ধনে প্রপঞ্চে। তদবোচদাচার্যবাচস্পতি:—

বিবর্তস্তু প্রপঞ্চোঽয়ং ব্রহ্মণোঽপরিণামিনঃ।
অনাদিবাসনোদ্ভূতো ন সারূপ্যমপেক্ষতে॥"

অর্থাৎ, যদি আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, জীব ও জড় চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মসদৃশ নয় বলে, ব্রহ্মে তাদের অধ্যাস হতে পারে না—এর উত্তর এই যে, দুটি বস্তুর মধ্যে অধ্যাস হলে তাদের মধ্যে সাদৃশ্য থাকা অত্যাবশ্যক নয়। যেমন, স্বপ্নকালে কামনাবশতঃ স্ত্রীসঙ্গ লাভরূপ ভ্রম হয়। এস্থলে কামনার কোন রূপ নেই বলে তা কোন বস্তুর সদৃশ নয়। কোন কোন স্থলে অবশ্য সাদৃশ্য বা সারূপ্য-নিবন্ধন ভ্রম হয়। কিন্তু ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রম এরূপ সাদৃশ্যের অপেক্ষা রাখে না। সেজন্য বাচস্পতি মিশ্র বলেছেন যে, অপরিণামী ব্রহ্মের বিবর্তমাত্রই হ'ল এই বিশ্বপ্রপঞ্চ এবং অনাদি বাসনা থেকেই তার উদ্ভব। সুতরাং ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে সাদৃশ্যের কোন প্রশ্ন নেই।

শঙ্করের অদ্বৈত-বেদান্তের মূলস্বরূপ "অধ্যাসবাদ" সম্বন্ধে সামান্য কিছু আলোচনা করা হ'ল। যে অতি সহজ, সুমিষ্ট ভাষায় এবং যে গভীর যুক্তিবিচারের সাহায্যে শঙ্কর তাঁর এই নিগূঢ় মতবাদ প্রপঞ্চনা করেছেন তা সত্যই অতি বিস্ময়কর। জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে অজ্ঞানের অস্তিত্ব সম্ভবপর কি করে, নির্গুণ ব্রহ্মে মায়া-শক্তিই বা থাকতে পারে কি করে, ব্রহ্ম যদি অজ্ঞানের আশ্রয় না হন, জীবই বা তার আশ্রয় হবে কি করে যেহেতু স্বয়ং জীবই ত অজ্ঞানের কার্য—এই ভাবে অবশ্য নানারূপ আপত্তি শঙ্করের অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে

উত্থাপিত হতে পারে, এবং সেই সকল আপত্তির খণ্ডনও পুনরায় করা যেতে পারে যুক্তিতর্কেরই সাহায্যে। কিন্তু সমস্ত বাদানুবাদের ঊর্দ্ধে, যে মহিমময় সত্যটি সত্যদ্রষ্টা ঋষি শঙ্কর দর্শন করে ধন্য হয়েছিলেন তা এক অতি সহজ সত্য, যার জন্য যুক্তিতর্ক, বাদানুবাদের কোন প্রয়োজনই নেই। সেই সহজ সত্য হ'ল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মস্বরূপত্ব। 'ব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই ব্রহ্মাণ্ড'—এই সত্যকে স্বীকার করে নেবার জন্য ত বাদানুবাদের প্রয়োজন হয় না—কারণ ব্রহ্ম যদি থাকেন, তবে তাঁর মধ্যেই আর সব কিছুই থাকবে, এবং তাঁর মধ্যে থাকলে তাঁর স্বরূপ হয়েই থাকবে—এর মধ্যে তর্কের অবকাশ কোথায়? ভগবান শঙ্কর এই অনিবার্য সত্যকেই ত তুলে ধরেছেন আমাদের সম্মুখে তার অপরূপ সৌন্দর্যে। দার্শনিক বলে' তিনি অবশ্য যুক্তিতর্কেরও অবতারণা করেছেন। কিন্তু তাঁর স্থির অনুভূতির শাশ্বত দীপ্তিই সমস্ত বিচার-বিশ্লেষণের মধ্যেও উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে উজ্জ্বলতম ভাবে। তাঁর সেই স্থির অনুভূতি যদি আমাদেরও সুপ্ত অনুভূতিকে জাগ্রত করতে পারে, যে বোধ অতি সহজ-সরল, অথচ আলোক-বাতাসের মত নিত্য বিরাজমান বলে যা আমরা যেন নিত্য অনুভব করেও করি না—সেই মহা-বোধকেই যদি উদ্‌বুদ্ধ করতে পারে, তা হলেই হবে আমাদের শঙ্কর-দর্শন-পাঠ সার্থক এবং তাই হ'ল এই দর্শনের মূলীভূত মহিমা। সেদিক থেকে নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, শঙ্কর-দর্শনই ভারত-দর্শন, যেহেতু ভারত-আত্মার মর্মোত্থ বাণী বিশ্বাত্মবাদের বাণী শঙ্কর-দর্শনে যেরূপ সুমধুর ভাবে ধ্বনিত হয়েছে, সেরূপ অন্য কোথাও নয়।

প্রেমের বীজগণিত

শ্রীকৃতান্তনাথ বাগচী

কোনখানে যে সুরু তোমার, কোথায় হ'ল সারা
ভেবে না পাই কূলে,
অরূপ রূপের জটার জালে ছিলে সুরের ধারা
নামলে বাঁধন খুলে।
ছড়িয়ে চলে খুশীর নেশায় নানা রঙের নুড়ি,
তাই কুড়াতে, মন পুড়াতে মেলে না আর জুড়ি।
শিউরে ওঠে শিরীষ কেশর, বিভোর প্রদোষ ক্ষণ
প্রতি পদের ধ্যানে,
মরীচিকার মায়ায় ভোলে পিয়াসী যৌবন
দিশাহারার টানে।
উচ্ছ সিত কলরবের মিনার মূর্চ্ছি পড়ে
শকুন্তলার রং যে মোনালিসার রসে ভরে।
ব্যর্থ আমার অনেক সাধের পসরা অহঙ্কার
অবাক হয়ে ভাবি,
ভোরের আলোর কনক কাঁকন রচবি মণিকার
ঝঙ্কারিয়া দাবী!
সেই যে ব্যথার প্রসাদ পেয়ে হৃদয় চিরধন্য
অনন্যা তার জাদুর ছোঁয়ায় মরে সকল দৈন্য।
সারা বেলায় হেলাফেলার সেধেছিলেম সুর,
ভেবেছিলেম কাছে,
বেঁধেছিলেম বাহুডোরে, জানতো কে সুদূর
এমন করে আছে
তরুণ তনুর পরাগরেণুর সৌরভেতে ভরি,
কেমন করে পলাতকা আঁচল তোমায় ধরি!
কাঁদে আমার মনের কোণে নবজাতক রাত
অপরাজিত নীল,
তিলের কালো খসিয়ে দিলে তিলোত্তমার হাত
রসলোকের খিল।
অস্তরাগের প্রসাধনে নিপুণ বেণীবোনা,
সাগর পারের ডানায় তোমার হাতছানি যায় শোনা।
শমীর অমায় বেতাল মাতাল, মন্ত্রবিহীন যন্ত্র
দুঃস্বপনের ঝাঁক,
ইতিহাসের কবর রচে শকুনিদের তন্ত্র;
দেব তোমায় ডাক।
তবু তোমার আপেলকপোল অশ্রু যখন আঁকে
অশ্রুত গান, তখন কি আর কাঁটার প্রশ্ন থাকে?
বল্লে বুলু "চোখের জলে বুক যদি রয় ভিজে
শ্যামল মুক্তি নৃত্যে মাতে মরু জপের বীজে।"

বাংলার পালবংশের উৎপত্তি ও আদি বাসস্থান

ডক্টর শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধ হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত পালবংশীয় নৃপতিগণ গৌড় ও মগধ শাসন করেন। এই বংশের আদি পুরুষদের সম্বন্ধে খালিমপুর তাম্রশাসনে উল্লিখিত হইয়াছে যে১—"মনোহারিণী লক্ষ্মীর উৎপত্তি স্থান যেমন সমুদ্র, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আহ্লাদ-জনয়িত্রী কান্তির উৎপত্তি স্থান (সম্ভব) যেমন শশধর, সেইরূপ অবনি-পালকুলের সার্ব্বোৎকৃষ্ট বংশধরের বীজপুরুষ (প্রকৃতি) সর্ব্ব-বিদ্যাবিশুদ্ধ, দয়িতবিষ্ণু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যিনি বিপুল কীর্ত্তিকলাপে সসাগরা বসুন্ধরাকে বিভূষিত করিয়া-ছিলেন, অরাতিনিধনকারী, (সর্ব্বকার্য্যে) কুশল, প্রশংসনীয়, সে বপ্যট (দয়িত বিষ্ণু হইতে) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" এই তাম্রশাসনে আরও উল্লিখিত হইয়াছে যে, "মাৎস্যন্যায়" দূর করিবার অভিপ্রায়ে প্রকৃতিপুঞ্জ যাহাকে করগ্রহণ করাইয়া দিয়াছিল নরপালকুলচূড়ামণি গোপাল নামক প্রসিদ্ধ রাজা বপ্যট হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

তাম্রশাসনের এই বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে, গোপাল পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। গোপালের পিতামহ দয়িত-বিষ্ণু সর্ব্ববিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। সর্ব্ববিদ্যা বলিতে বিষ্ণু পুরাণোক্ত অষ্টাদশ বিদ্যা বুঝায়। ধনুর্বিদ্যা অষ্টাদশ বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আছে যে, রাজ-পুত্রের ভবিষ্যতে রাজ্যশাসনে পারদর্শিতা লাভের জন্য সর্ব্ব-বিদ্যা যথা, যুদ্ধবিদ্যা, পুরাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যায়িকা, উদাহরণ, ধর্ম্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, ইতিহাস প্রভৃতি আয়ত্ত করিতে হইবে। দয়িতবিষ্ণুর পুত্র বপ্যট অরাতিনিধনকারী সমর-কুশল ছিলেন। এই সব আলোচনা করিলে মনে হয় দয়িতবিষ্ণু ও বপ্যট কোন রাজবংশসম্ভূত ছিলেন।

গোপালের পুত্র ও উত্তরাধিকারী ছিলেন নৃপতি ধর্ম্ম-পাল। পণ্ডিত হরিভদ্র ধর্ম্মপালের সমসাময়িক ছিলেন। নেপালে প্রাপ্ত হরিভদ্র লিখিত 'অষ্ট সাহস্রিকা প্রজ্ঞা-পারমিতা'র টীকায় লিখিত আছে যে, ধর্ম্মপাল "রাজভটাদি বংশ পতিত" ছিলেন।২ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে 'রাজভট' অর্থ কোন রাজার সেনাপতি এবং 'রাজভটাদি বংশপতিত' অর্থ কোন সেনাপতির বংশোদ্ভূত বুঝায়। ধর্ম্মপাল উত্তর-ভারতে প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট ছিলেন এবং হরিভদ্র তাঁহাকে গৌরবান্বিত করিবার জন্য তাঁহার এই বংশ-পরিচয় দিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের মত গৃহীত হইলে ধর্ম্মপালের এই বংশ-পরিচয় অস্পষ্ট ও অর্থশূন্য হইয়া পড়ে। কেহ কেহ 'রাজভট' রাজার নাম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই নৃপতি খড়্গবংশের শেষ রাজা রাজভট ছিলেন বলিয়া মনে করেন। এই মতই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। 'পতিত' শব্দটি রাজভট ও ধর্ম্মপালের রাজত্বের মধ্যবর্ত্তীকালে খড়্গবংশের পতন সূচিত করে। কিন্তু এই মত গ্রহণের পক্ষে এক আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। খড়্গবংশের রাজা ছিল বঙ্গ-সমতটে এবং পাল-বংশ গৌড় মগধে রাজত্ব করে। বঙ্গ-সমতট পালবংশীয়দের রাজ্যভুক্ত ছিল বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং পাল-রাজাদের অভ্যুত্থান গৌড়-মগধে হইয়াছিল স্থির করিতে হইবে। তাঁহারা যদি খড়্গবংশীয় হইতেন তবে তাঁহাদের অভ্যুত্থান বঙ্গ-সমতটে হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। এই কারণে কেহ কেহ পালবংশীয় নৃপতিরা খড়্গবংশোদ্ভব ছিলেন। এই মত যুক্তিহীন মনে করেন। কিন্তু ইদানীং প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, বঙ্গদেশ আদিতে পালবংশীয় নৃপতিদের রাজ্যভুক্ত ছিল। সুতরাং উপরোক্ত বিরুদ্ধ মত মূল্যহীন বলিয়া পরিগণিত হইবে।

ধর্ম্মপাল দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটবংশের নরপতি তৃতীয় গোবিন্দের সমসাময়িক ছিলেন (৭৯৪—৮১৪ খ্রী)। তৃতীয় গোবিন্দের রাজত্বকালে ৭২৭ শকাব্দে (৮০৫ খ্রী) উৎকীর্ণ নেসারি তাম্রশাসনের অপঠিত অংশের পাঠোদ্ধার করিয়া ডাঃ শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার পালবংশের ইতিহাসে নূতন আলোক-পাত করিয়াছেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীজি. এইচ. খারে তাঁহার রচিত "দক্ষিণ-ভারতের ইতিহাসের উপাদান" পুস্তকে এই তাম্রশাসনটি অনূদিত করিয়াছেন। ইহার ৩৫-৩৭ পংক্তিতে আছে যে, তৃতীয় গোবিন্দ পাণ্ড্য, পল্লব, চোল, গঙ্গ, কেরল, অন্ধ্র, চালুক্য ও মৌর্য্যরাজগণের লাঞ্ছনা (রাজচিহ্ন) কাড়িয়া লইয়াছিলেন এবং গুর্জ্জর, কোশল, অবন্তী এবং সিংহলের রাজাদের পরাজিত (?) করিয়াছিলেন। ৩৭ পংক্তির শেষ ভাগের পাঠ তিনি উদ্ধার করিতে সমর্থ হন নাই। ডক্টর মজুমদারের পাঠানুযায়ী এই অপঠিত অংশে

---

১ গৌড় লেখমালা, পৃঃ ১৮-১৯

2. History of Bengal, Vol. I, P. 98, Published by the Dacca University.

আছে৩—"(তা)রা ভগবতীং খ্যাত্যাং ধর্ম্মাদ্বংগাল ভূমি(প)।" ইহার অর্থ এই যে, তৃতীয় গোবিন্দ বঙ্গাল দেশের রাজা ধর্ম্মের নিকট হইতে ভগবতী তারার মূর্ত্তি বলপূর্বক কাড়িয়া লইয়াছিলেন। তৃতীয় গোবিন্দের পুত্র অমোঘবর্ষের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ সঞ্জন তাম্রশাসনে আছে যে, তৃতীয় গোবিন্দ উত্তর-ভারতে সৈন্যাভিযান করিলে ধর্ম্ম ও চক্র তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, উল্লিখিত ধর্ম্ম ও চক্র পালবংশের ধর্ম্মপাল ও কনৌজের রাজা চক্রায়ুধ বুঝায়। সুতরাং নেসারি তাম্রশাসনে লিখিত বঙ্গাল দেশের রাজা ধর্ম্ম যে পালবংশের ধর্ম্মপাল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

প্রাচীনকালে বর্ত্তমান বাংলা দেশ (পশ্চিম ও র্ববঙ্গ) কোন এক বিশেষ নামে অভিহিত হইত না। এই দেশ কয়েকটি ভৌগোলিক ভাগে বিভক্ত ছিল, যথা—গৌড় (উত্তরবঙ্গ), রাঢ়া (পশ্চিমবঙ্গ), বঙ্গ (ঢাকা বিভাগ) ও সমতট (চট্টগ্রাম বিভাগ)। প্রাচীন লিপি ও পুঁথিতে বঙ্গাল দেশের উল্লেখ আছে। ১০২৫ খ্রীষ্টাব্দে তিরুমল্ল শিলালেখ বর্ণিত হয়েছে যে, রাজেন্দ্র চোল দক্ষিণ রাজ্যসমূহ জয় করিয়া অগ্রসর হইলে বঙ্গাল দেশ হইতে গোবিন্দচন্দ্র পলায়ন করেন। গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্বকালে নির্ম্মিত এক প্রস্তর-মূর্ত্তি ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। পণ্ডিতেরা মনে করেন, গোবিন্দচন্দ্র বঙ্গের চন্দ্রবংশের রাজা শ্রীচন্দ্রের উত্তরাধিকারী ছিলেন। চন্দ্রবংশের রাজধানী ছিল বিক্রমপুর। প্রাচীন তিব্বতী গ্রন্থে আছে যে, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বঙ্গাল দেশের অন্তর্গত বিক্রমণিপুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিক্রমণিপুর এবং বিক্রমপুর অভিন্ন বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। চন্দ্রবংশের পর যাদববংশ বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করে। বিপুলশ্রী মিত্রের 'নালন্দা লেখ'তে আছে যে, বঙ্গাল দেশের সৈন্যেরা সোমপুর (বর্ত্তমান রাজসাহী জেলার পাহাড়পুর গ্রাম) বিহারের অন্তর্গত আচার্য্য করুণাশ্রী মিত্রের ঘরবাড়ী অগ্নি-ভস্মীভূত করিয়াছিল। প্রমাণ আছে যে, এই বঙ্গাল সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন যাদববংশের রাজা জাতবর্ম্মণ। এই সব প্রমাণ হইতে এবং চীনা গ্রন্থ ও মুসলমান ঐতিহাসিকদের বিবরণ হইতে প্রমাণিত হইয়াছে বঙ্গ ও বঙ্গাল অভিন্ন দেশ।৪

নেসারি তাম্রলিপিতে ধর্ম্মপালকে বঙ্গাল ভূমিপ বলে উল্লেখ করায় মনে হয় ধর্ম্মপাল মূলতঃ বঙ্গ-বঙ্গাল দেশের রাজা ছিলেন। কান্যকুব্জের প্রতীহাররাজ ভোজের গোয়ালিয়র-প্রশস্তিতে আছে যে, তাঁহার পিতামহ দ্বিতীয় নাগভট বঙ্গরাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন। এই বঙ্গরাজ ধর্ম্মপাল ছিলেন বলিয়া ঐতিহাসিকেরা মনে করেন। ধর্ম্মপালকে রাষ্ট্রকূট ও প্রতীহাররাজগণের লেখতে বঙ্গ-বঙ্গাল দেশের রাজা বলিয়া অভিহিত করায় ইহা সূচিত হইয়াছে যে, পালবংশের মূল রাজ্য বঙ্গ-বঙ্গাল দেশ ছিল।

বাক্‌পতি দেব বিরচিত গৌড়বধ কাব্য হইতে জানা যায় যে, খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে কান্যকুব্জের রাজা যশোবর্ম্মণ গৌড়রাজকে যুদ্ধে নিহত করেন ও তারপর বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। বঙ্গের অধিবাসীরা তাঁহাকে বাধা প্রদান করে। কিন্তু পরাজিত হইয়া তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করে। এই বশ্যতা স্বীকারের সময় তাহাদের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়াছিল, কেননা এইপ্রকার হীনতা স্বীকারে তাহারা অভ্যস্ত ছিল না। অনেকের মতে এই সময় খড়্গবংশের রাজভট বঙ্গের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। যশোধর্ম্মের বঙ্গবিজয়ের পর খড়্গবংশের পতন হয় ও বঙ্গদেশে অরাজকতা আরম্ভ হয়। পালবংশের আদি বাসস্থান বঙ্গদেশ ছিল এবং এই দেশেই তাঁহাদের প্রথম অভ্যুত্থান হয়। সুতরাং অরাজকতা বঙ্গদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া মনে করিতে হইবে। ইহা গৌড় ও রাঢ়ায় ব্যাপৃত হইয়াছিল ইহা অনুমান করিবার কারণ নাই। তিব্বতের লামা তারানাথের ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত বিবরণীতে আছে যে, ভঙ্গল রাজ্যে রাজা না থাকায় জনগণের দুর্দ্দশার অন্ত ছিল না। অবশেষে তাহারা গোপালকে তাহাদের রাজা মনোনীত করে। তারানাথের কাহিনীতে অনেক অনৈতিহাসিক ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বঙ্গাল দেশের অরাজকতা সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি সত্য বলিয়া মনে হয়।

উপরোক্ত সমস্ত প্রমাণাদি সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া পালবংশের আদি বাসস্থান ও উৎপত্তির মোটামুটি ইতিহাস রচনা করা যাইতে পারে। খড়্গবংশের রাজত্বকালে বঙ্গের অধিবাসীবৃন্দ উন্নত ও স্বাধীনতাপ্রিয় ছিল। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে যশোবর্ম্মণের বঙ্গবিজয়ের পর খড়্গবংশের আধিপত্য ক্ষুণ্ন হয়, দেশে অরাজকতা আরম্ভ হয়। এই অরাজকতা কিছুকাল স্থায়ী হয়। খড়্গরাজবংশের সন্তান দয়িতবিষ্ণু ও তাঁহার পুত্র বপ্যট দেশে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিয়া সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হয় নাই। ইহার পর বঙ্গের অমাত্যবর্গ ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা সমবেত হইয়া বপ্যটের পুত্র গোপালকে রাজ্যশাসনে উপযুক্ত মনে করিয় নৃপতিপদে অধিষ্ঠিত করেন। গোপাল দেশে শান্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

3. Journal of the Asiatic Society, Letters, Vol. XXII, No. I, 1956, P. 133.

4. Vangala-desa, by the author, Indian Historical Quarterly, Vol, XIX; 1943, Py. 287-317.

সাগর-পারে

শ্রীশান্তা দেবী

৯ই আগষ্ট দুপুরবেলা আমরা ইটালীর সুবিখ্যাত ফ্লরেন্স নগরীতে এলাম। গাড়ীতে কি অসম্ভব ভীড়! তার উপর ঢোকবার দরজা মাত্র একটা। কোন রকমে উঠে অনেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চলল। কবি দান্তের নামের সঙ্গে এখানকার নদীর নাম জড়িত। পথে একটি বড় অন্তঃসলিলা নদী ও অন্য একটি স্রোতস্বিনী দেখলাম, কোনটির কি নাম জানি না। পাহাড়ে দেশ, তাই ছোটবড় অনেক সুড়ঙ্গের

র‍্যাফেল অঙ্কিত "অবগুণ্ঠনবতী"

ভিতর দিয়ে ট্রেণ এল। পথে দেখলাম অনেক ইটালীয়ানই বেশ খর্ব্বকায়, তবে অনেকের মুখশ্রী খুবই সুন্দর। বিদেশীয় বিশেষতঃ বিদেশিনী সম্বন্ধে এদের আগ্রহের শেষ নেই, তবে অনেক ক্ষেত্রে তা অশোভন ভাবে প্রকাশিত হয়।

প্রাচীন শহর, অনেক দিক দিয়ে ভারতের প্রাচীন শহরগুলির সঙ্গে তুলনীয়। এখানে এসেই দেখি অশ্বতরেরা মালগাড়ী টানছে, আর অশ্বেরা ফিটন-গাড়ী টানছে। ডক্টর নাগ ভুল করে গাড়ীর চালকদের সঙ্গে মাঝে মাঝে হিন্দী বলে ফেলছিলেন। তারা অবাক হয়ে তাকাচ্ছিল।

হোটেলে ঢুকেই দেখি ঘরদোর লণ্ডভণ্ড, অপরিষ্কার। শুনলাম এই মাত্র একজনরা ঘর ছেড়ে গিয়েছে, তাই পরিষ্কার করবার সময় হয় নি। দোতলা বাড়ী, ভাঙা পাথর ছড়ানো রাস্তা, যেমন আমাদের দেশে অনেক রাস্তা পড়ে থাকে। ধারে ধারে ছোট ছোট দোকান। তারই একটা থেকে আমরা রুটি, মাখন কিনে আনতাম। দোকানদার ইংরেজি বোঝে না। আমরা আঙুল দিয়ে খাবার দেখিয়ে দিতাম এবং সে আঙুল দিয়ে পয়সা-টাকা দেখিয়ে দিত। খাবার কিনতে কখনও ১২০০ কখনও ৯০০ লিরা খরচ হ'ত। এ অবশ্য হোটেলের রান্নাকরা খাবার নয়, দোকানের টিনের খাবার ও আস্ত রুটি ইত্যাদি।

এই রকম খাবার কিনে খেয়ে একটু বিশ্রামের পর আমরা সাড়ে তিনটা আন্দাজ ঘোড়ায় টানা ফিটন-গাড়ীতে বেড়াতে বেরোলাম। গাড়ীতে একটা নানা রঙের মস্ত ছাতাও থাকে। এখানকার বড় ক্যাথিড্রাল (Duomo) বিরাট বিশাল দেখতে। ভিতরে বহু সুবিখ্যাত শিল্পীর আঁকা প্রাচীরচিত্র, মর্ম্মরমূর্ত্তি, রঙীন কাচের ছবি। বাইরে একটা উঁচু চূড়া এবং একটা মস্ত বড় ডোম বড় বড় মার্ব্বেল পাথর দিয়ে তৈরী। এত পাথরের ছড়াছড়ি কোথাও দেখি নি। এদেশ রোম্যান ক্যাথলিকদের দেশ, আমাদের দেশের মতই অনেকটা পূজা-অর্চ্চা ও মানসিক করার প্রথা আছে। তাই মন্দিরে মেরী মাতা ও যিশুখ্রীষ্টকে মানত করে কত যে সোনারূপো আর মুক্তোর গহনা লোকে দিয়েছে তার ঠিক নেই। অসংখ্য সোনার heart তাঁদের আশেপাশে ঝুলছে। এখানকার Duomo মিলানের Duomoর মত সূক্ষ্ম কাজে ও ছবিতে সজ্জিত নয়, কিন্তু সাদাসিধে হলেও কি বিরাট আর গাম্ভীর্য্যপূর্ণ চেহারা। এই মন্দিরের সামনেই জন দি ব্যাপটিষ্টের ব্যাপটিস্টেরী। সেখানে আশ্চর্য্য একটি সোনা ও ব্রঞ্জের কারুকার্য্যমণ্ডিত দরজা। বাইবেলেরই সব ছবি, গাছের পাতা, নদীর জল সব এমন করে এঁকেছে ও গড়েছে যে রেশমের সেলাই মনে হয়। চোখে না দেখলে বোঝা যায় না।

রোজই আমরা ঘোড়ার গাড়ীতে ঘুরতাম, চালকটি

খানিকটা গাইডওবটে। সে সব বলে বলে দিত। 'আর্ণোনদীর ব্রিজের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে আনল, কবি দান্তে ও বিয়াত্রিচের স্মৃতি-জড়িত নদী ও সেতু। শহরটা প্রাচীন দেখতে, নদীর জল সবুজ ও মন্থর, সেই জলেই ছেলে' মেয়েরা স্নান করছে, তীরে মস্ত চওড়া রাস্তা, কিন্তু লোক বেশী নেই। সব জড়িয়ে প্রাচীনতার একটা ছায়া যেন আজও ভেসে বেড়াচ্ছে চারদিকে। আধুনিক ইউরোপের শহর বলে মনে হয় না। পশ্চিম-ভারতের শহরগুলিরমত সরু সরু পাথর বাঁধানো গলি, পাথর ও ইটে গড়া বাড়ী এব খোলার চালের ছাউনির ভিতর দিয়ে অনেক ঘুরলাম। এদেশে ধুলা-ময়লার অভাব নেই, ভাঙা বাড়ী প্রচুর, মানুষগুলো লুঙ্গী আর পায়জামা পরলে মানাত ভাল।

মেডিচি সমাধি মন্দিরে—"রাত্রি" মাইকেল এঞ্জেলো

ঘুরতে ঘুরতে একটা গির্জ্জায় এলাম, সেখানে দান্তে, গ্যালিলিও, লিওনার্ডো, ম্যাকিয়াভেলি প্রভৃতির সমাধি। স্মৃতিস্তম্ভগুলি এমন ভাবে সজ্জিত যে এতকাল পরেও মানুষের মন ব্যথিত হয়ে ওঠে। গ্যালিলিও-মূর্ত্তির হাতে গ্লোব আর টেলিস্কোপ, দান্তে তাঁর বিরাট সমাধিভূমিতে পত্র-মুকুট পরে এবং দু'পাশে শোকরতা দুই তরুণী দাঁড়িয়ে লিওনার্ডোর আরও বিরাট সমাধি। একই জায়গায় এতগুলি মহামানবের স্মৃতিস্তম্ভ। মনটা বিষণ্ণ হয়ে আসে। এমন সব মানুষ পৃথিবীতে যদি জন্মেছিল, তবে আজ অস্থিমাত্র হয়ে মানুষের পায়ের তলায় পড়ে কেন? মিথ্যা প্রশ্ন, তবু এ কথা বার বার মনে হয়।

মাইকেল এঞ্জেলোর মিউজিয়ম ও মেডিচিদের সমাধি স্থানের পরিকল্পনা ভারি সুন্দর। এখানে মাইকেল এঞ্জেলোর কয়েকটি সমাপ্ত ও অর্দ্ধসমাপ্ত মূর্ত্তি রয়েছে। পুরুষ-মূর্ত্তি শক্তির প্রতীক, মেয়েগুলি রূপে ও লালিত্যে মার্ব্বেলকে যেন মোম করে তুলেছে। এই সব মূর্ত্তির কত ছবি দেশে দেশে মানুষ যত্ন করে রাখে, বই ও পত্রিকাতে ছাপে।

শিল্পীদের দেশ! ন্যাশনাল মিউজিয়ম ও ন্যাশনাল গ্যালারিতে কি অসংখ্য মূর্ত্তি ও ছবি। প্রাচীন রোমের ইতিহাস তাদের মধ্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। জুলিয়াস সিজার, মার্কাস অরিলিয়স সবাই আমাদের আশেপাশে বিরাজিত। গ্রীক দেবদেবীদের মূর্ত্তিরও ছড়াছড়ি। ম্যাডোনা ও শিশু খ্রীষ্টের ছবি এখানে যত আছে, ইংলণ্ড-ফ্রান্সে মোটেই তেমন নেই। সে সব দেশে প্রাচীন ও আধুনিক নানা বিষয়ের নানা ধরণের ছবি। এখানে ম্যাডোনাই সকলের উপরে। এক-একটি ম্যাডোনা দেখলে নিজের মায়ের মুখ মনে পড়ে যায়। র‍্যাফেল, বত্তিচেলি প্রভৃতির মূল ছবি এতগুলি কখনও দেখব ভাবিনি। দেখে যেন চোখ সার্থক হ'ল। রঙে রেখায় অপূর্ব্ব সব ছবি! ন্যাশনাল গ্যালারির জানালা দিয়ে শহরের অনেকখানি চোখে পড়ে। "আর্ণো" নদীর সেতু, বিরাট Duomoর গম্বুজ ও চূড়া, সারি সারি পুরনো বাড়ীর খোলার চাল, যেন বহু শতাব্দীর ধূলিধূসরিত প্রাচীন একটি ছবি।

শহরের এই সব খোলার চাল যদিও ধূলিধূসরিত, তবু এক-একটা দিক সম্পূর্ণ অন্য রকম। বিকালে ঘোড়ার গাড়ি করে পাহাড়ের সুন্দর পথে বেড়িয়ে ক্লাবের পাশ দিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় গেলাম। এখানে সন্ধ্যায় প্রচুর লোকের ভীড়। তবে মানুষগুলি বিশেষ ভদ্র নয়, সবাই চক্ষু বিস্ফারিত করে আমাদের দেখছিল এবং সঙ্গে হাসি, গান ও নানা মন্তব্য করছিল। পথটা কাশ্মীরের বাগানের মত সুন্দর, তবে ফুল একটু কম এবং মাজাঘষা বেশী। পাহাড়ের চূড়ায় মাইকেল এঞ্জেলোর ডেভিড-মূর্ত্তি দাঁড়িয়ে। লোকগুলো যদি আর একটু ভদ্র হ'ত তা হলে হয়ত ওখানের সৌন্দর্য্য আর একটু উপভোগ করা যেত। আমরা অল্পক্ষণ দাঁড়িয়েই আইসক্রীম কিনে ফিরলাম।

নূতন মানুষের চেয়ে প্রাচীন অর্থাৎ বিগত মানুষরাই বেশী আনন্দের খোরাক জোগাতে পারে বুঝে আরও মিউ-জিয়ম এবং 'পিটি প্যালেসে' ঘুরতে গেলাম। কি ছবির

মেডিচি সমাধি মন্দিরে মাইকেল এঞ্জেলো গঠিত অসমাপ্ত মূর্ত্তি

মেলা! ভ্যানডাইক, টিসিয়ান, মুরিলো, র‍্যাফেল, তন্ত্র গুরু কত আর নাম করা যায়? এখানে বসে অনেকে ছবি কপি করছে। কেউ কেউ লোকের ফোটো চেয়ে তখনই তখনই নকল করে দিচ্ছে।

মেডিচিদের ঘরদোর, স্নানের ঘর, আসবাব, ঝাড়লণ্ঠন ইত্যাদির ঐশ্বর্য্য দেখে চোখ ঠিক্‌রে আসে। ইউলিসিস, ইলিয়াড ইত্যাদির নামে এক-একটা ঘরের নাম। দরিদ্র ইটালীর এক যুগে কত ঐশ্বর্য্যই ছিল দেখে বিস্মিত হতে হয়! জন্ম থেকে মরণ পর্য্যন্ত যত খেলা সকলই ঐশ্বর্য্য ও শিল্পসম্ভার মণ্ডিত।

এদেশে শুধু যে মর্ম্মরমূর্ত্তি আর ছবির ছড়াছড়ি তা নয়, এখানে গহনা, চামড়ার কাজ প্রভৃতিও আশ্চর্য্য সুন্দর। নদীর কাছেই ছোট ছোট সারি সারি দোকান। সুন্দর সুন্দর গহনা কিন্তু দাম ভীষণ বেশী। রূপার কাজের উপর পাথর বসানো অথবা সোনার জল করা। "তোমাদের দেশে রত্নের কি রকম দাম" জিজ্ঞাসা করাতে তারা বললে, "তোমরাই ত রত্নের দেশ থেকে আসছ।" এক জোড়া রূপার ফুলের দাম নিল ১৭০০ লিরা, অর্থাৎ ১৩।০ কি ১৪\ টাকা। পরে রোমে আমরা পলা-বসানো এক জোড়া দুল কিনেছিলাম, তার দাম ৩৮০০ সোন.র লিরা। চামড়ার দোকানে কাজ করমেনিব্যাগ, চশমার খাপ, চিরুণীর খাপ ইত্যাদি জিনিষ অপূর্ব্ব সুন্দরী দুটি মেয়ে বিক্রী করছিল। একটা সাড়ে চারইঞ্চি লম্বা ব্যাগের দাম বাইশ-তেইশ টাকা। তবে জিনিষগুলি বহুদিন ভাল অবস্থায় থাকে। আমাদের দেশের জিনিসের মত শীঘ্র নষ্ট হয়ে যায় না।

ফ্লরেন্সে যে কয়দিন ছিলাম বেশ কেটেছিল। এত অল্প সময়ে এত শিল্প সৌন্দর্য্যসম্ভারের সাক্ষাৎ কোথাও পাই নি। তবে কোন কোন কারণে একটু ভয় ভয় করত। রাত্রে অনেক সময় দেখতাম পাইপ বেয়ে লোক নীচ থেকে উপরে উঠছে। জানালা খোলা রাখতে ভয় করত।

ফ্রান্সের মত এখানেও সর্ব্বত্রই দর্শনী দিয়ে ঢুকতে হয়। কার্ড বিক্রী ও ছোট ছোট বই বিক্রীতেও এরা খুব লাভ করে সব মিউজিয়মে। গহনার দোকানে আমেরিকান মেয়েরা বড় বড় ভারী ভারী গহনা খুব কেনে। এই সময় তাদের দেশ ভ্রমণের মরশুম।

ফ্লরেন্সে এই সময় আমার কন্যার বন্ধু শ্রীমতী হৈমন্তী সেন চিত্রবিদ্যা শেখার জন্য ছিলেন। তাঁর সঙ্গে দু'-তিন দিন দেখা হয়েছিল। আর কোন ভারতীয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ বোধ হয়নি।

জিদ
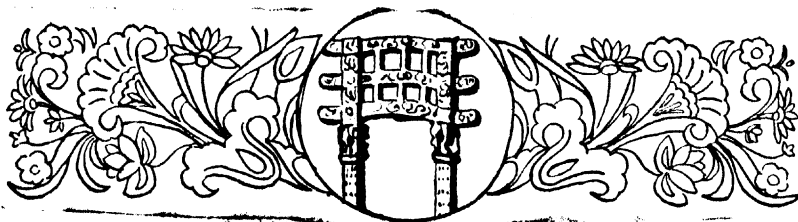
শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়

সব ঠিক।

দিন, ক্ষণ, তারিখ এমনকি লগ্নটি পর্যন্ত ঠিক।

সিদ্ধার্থের সঙ্গে বিয়ে মন্দাকিনীর।

একথা সিদ্ধার্থ জানে, একথা মন্দাকিনী জানে। একথা মন্দাকিনীর মা জানেন আর জানেন মন্দাকিনীর বাবা। সুতরাং গরমিল নেই কোথাও, শুধু দু'হাত এক হতে বিলম্ব যা।

এ ভালবাসার বিয়ে কিনা কেউ জানে না। তবে এ পছন্দের বিয়ে। দু'জনেই পছন্দ করেছে দু'জনাকে। জানাশুনো ছিল, চেনাশুনো হ'ল, ভাবও হ'ল বেশ। তার পর কথা উঠতে তর সইল না। লুফে নিল দু'পক্ষই।

টস্‌টসে মেয়ে মন্দাকিনী।

চক্‌চকে রং তার নয়, তবে মাজা রং। গিনি সোনার ঔজ্জ্বল্য নেই কিন্তু পাকা সোনার সৌন্দর্য আছে। কিছুটা গাম্ভীর্যও আছে। আঁটো দেহ, তরঙ্গসঙ্কুল। লাবণ্য চোখে-মুখে, লাবণ্য দেহভঙ্গিমায়, হাতপায়ের আঙুলগুলিতে, গতিচ্ছন্দে। পারিজাতের সুষমা আর মন্দারের মাধুরিমা নিয়ে দেহ ভরা।

সিদ্ধার্থও কম যায় না।

ঋজু বলিষ্ঠ দেহে টক্‌টকে রং, লক্ষ্মণের দোসর। চোখে-মুখে কথা আর মুক্তোর মত দাঁতে মিষ্টি মিষ্টি হাসি।

খুশী দু'জনেই। তাই চোখে-মুখে হাসি চলকে পড়ছে ক্ষণে ক্ষণেই। সুতরাং সবই ঠিক, এখন দু'হাত এক হতে বিলম্ব যা।

অবশ্য এক যে হয় নি কোনদিন একথা বলা যায় না। তরুণ-তরুণীর গোপন খবর কতটুকুই বা পাওয়া যায়। তবে অপ্রকাশ্যে যাই ঘটুক, প্রকাশ্যে ওকে বিধিসম্মত করা চাই।

কিন্তু সেইখানেই আচম্বিতে বাধল গোল। যা ছিল ঠিক, হল বেঠিক। মিলের মাঝে দেখা দিল গরমিল। সেদিন মন্দাকিনী অকস্মাৎ যেন ফেটে পড়ল। সবেগে মাথা নাড়া দিয়ে বলল, না।

—না? না মানে? প্রশ্ন করলেন বাপ-মা হকচকিত হয়ে।

—এ বিয়ে হবে না। কখ্‌খনো না। ভেঙে দাও এ বিয়ে।

—সে কি!

—হ্যাঁ।

ধরে পড়ল বৌদি। বলল, না কেন, বল? অমন ছেলে লাখে মেলে না একটাও। এত ভাব-ভালবাসা তোমাদের, তবে হবে না কেন, জবাব দাও।

মন্দাকিনীর জিদ বেড়ে চলে। বলে, হবে না—বললাম। কেন—জিজ্ঞাসা করো না, সেকথা আমি বলতে পারব না ভাই বৌদি।

বৌদি নাছোড়বান্দা, বলতেই হবে তোমায় ঠাকুরঝি। এই দিব্যি দিলাম—দেখি, কি করে না বল।

—বেলেল্লাপনা আমার দু'চক্ষের বিষ। আমি সইতে পারি না বৌদি, তাই সইতে পারি নি কাল। মাগো কি বেহায়া, কি নির্লজ্জ! ইতর কোথাকার! আবার জিদ বাড়তে থাকে মন্দাকিনীর।

—বল, লক্ষ্মীটি! আমি বলব না কাউকেও। কাল রাতে সিদ্ধার্থ ঠাকুর করেছিলেন কি?

—ঠাকুর নয়, কুকুর বৌদি। রাগ করে বলে মন্দাকিনী, বিয়ের আগেই চাই তার সব। সাহস কম নয়। মুখের কাছে মুখ নিয়ে আসে, ছিঃ, ছিঃ! লজ্জা করল না একটুও।

বৌদি হাসে। বলে, একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন ঠাকুর। মদন দেবের জ্বালা, বড় জ্বালা, তর সয় না তিল-মাত্রও। ভেবেছিলেন নিজের জিনিস যখন, দোষ কি এতে। তুমি পাগল ঠাকুরঝি। না হয় একটু 'নাই' দিলে ঠাকুরকে।

মন্দাকিনীর জিদ বেড়ে ওঠে আকাশস্পর্শী হয়ে। বলে, না, এ সব বেয়াদপির প্রশ্রয় দেব না আমি।

শেষ পর্যন্ত জয় হ'ল মন্দাকিনীর। এই 'না'-কেই বজায় রাখল সে, জিদের বশে বিয়েটাকেই দিল 'না' করে।

কিন্তু তাই বলে বিয়ে আটকালো না তার। চক্‌চকে মেয়ে, বিয়ে হয়ে গেল ভাল ঘরে, ভাল বরে। সিদ্ধার্থের মত না হলেও বর অপছন্দের হ'ল না কিছু। অবস্থাও তার মোটামুটি ভাল।

অবশ্য অনুশোচনা যে না এসেছিল পরে তা নয়। বিয়ের দিন মন্দাকিনীর মনটা ভরে গিয়েছিল অনুশোচনায়। কি ভাবে যে কেটেছিল দিনটা তার, একথা জানল না কেউ।

এমনকি তার বৌদিদিও না। তবে ধরা পড়ে গিয়েছিল মালাবদলের সময় আর ধরা পড়ে গিয়েছিল শুভদৃষ্টির সময়। মন্দাকিনী চোখ তুলে বরের মুখের দিকে তাকাতে পারে নি কিছুতেই। তবুও জিদ বজায় রাখল সে।

এক পক্ষ 'পার' হয়ে গেল বটে, কিন্তু 'পার' হ'ল না আর এক পক্ষ। বিয়ে হ'ল না সিদ্ধার্থর। বৌদিদি বলল, বিয়ে করল না সিদ্ধার্থ। অমন ছেলের আবার মেয়ের অভাব।

মন্দাকিনী মুখ ফিরিয়ে নিল। বলল, বাউণ্ডুলের আবার বিয়ে! তাদের বৌও হবে বাউণ্ডুলে। পথেঘাটে ঘুরে বেড়াবে তারা।

বছর দুয়েক পর।

আবার দেখা দু'জনার—সিদ্ধার্থ আর মন্দাকিনীর। সারা দেহে রূপ আর ধরে না মন্দাকিনীর। তাকে যেন ভেঙে গড়েছে কে। ইন্দ্রাণীর সৌন্দর্যে আর রাজেন্দ্রাণীর মাধুর্যে সারা দেহ তার ভরা। কোলে ছ'মাসের শিশু।

সিদ্ধার্থ হাসে। সেই মুক্তোর মত দাঁতে মিষ্টি মিষ্টি হাসি তেমনিটিই আছে। ছেলের তুলতুলে গাল টিপে দিয়ে বলে, বেশ আছ তুমি।

মন্দাকিনী উত্তর দেয় কাজলমাখা চোখ টান করে, ঘাড় বেঁকিয়ে মধুর ভঙ্গিমায়, না কেন। বেলেল্লাপনা ত করি না আমি।

—মানে? বেলেল্লাপনা করি আমি?

—ভেবে দেখ, সে রাত্রের কথা। নিশ্চয় ভুলে যাও নি এত শীগগির?

—না, ভুলে যাই নি, আর ভুলবও না কোনদিন। কিন্তু বেলেল্লাপনা করি নি আমি।

—না। তীক্ষ্ণ শ্লেষ মেশানো মন্দার স্বরে।

—হ্যাঁ তাই। তুমি ভুল করেছ!

—কি?

—তোমার ভুল হয়েছে মন্দা। কিন্তু নিজের ভুল স্বীকার করবে না তুমি। অহঙ্কারে বাধবে, কিন্তু সত্যিই সে রাতে ভুল হয়েছিল তোমার।

মন্দাকিনী তাকিয়ে থাকে বোকার মত সিদ্ধার্থর মুখের দিকে।

সিদ্ধার্থ বলে, সে রাত্রে তোমার কানে কানে বলতে চেয়েছিলাম, তুমি সুন্দর, তুমি প্রিয়। সুন্দরকে পেতে চাই আমি সুন্দরতম রূপে, প্রিয়কে প্রিয়তম রূপে। কি সে কথা বলতে দাও নি তুমি।

—না, মিথ্যে কথা। তুমি চেয়েছিলে আমাকে অপবিত্র করতে।

—সেই ভুল ধারণাই তোমায় পথভ্রষ্ট করেছিল মন্দা। কিন্তু অতখানি হীন কি আমি? দেখেছ কি কোন দিন? নিজের পবিত্রতাকে শ্রদ্ধা করি আমি, তাই অপরের পবিত্রতার প্রতিও শ্রদ্ধাহীন নই।

মন্দার মুখ সাদা হয়ে আসে। বিমূঢ়ের মত বলে, একথা আমায় বিশ্বাস করতে বল তুমি?

—বলি। নিছক সত্য কথা, এর মধ্যে লুকোচুরি নেই, মিথ্যের ভেজাল দেওয়া নেই।

মন্দাকিনী দাঁড়িয়ে থাকে সিদ্ধার্থের মুখোমুখি। যেন হারিয়ে ফেলে নিজেকে। সেই অতীত দিনে ফিরে যেতে চায়। কিন্তু সম্বিৎ ফিরে পায় সিদ্ধার্থ। বলে, আজ চলি মন্দা। বিশেষ কাজ আছে একটা।

সিদ্ধার্থ চলে যায়। মন্দাকিনী দাঁড়িয়ে থাকে নিষ্পলক চোখে, সিদ্ধার্থের গতিপথের দিকে তাকিয়ে। তার কানে তখন বাজছে, তুমি সুন্দর, তুমি প্রিয়। সুন্দরকে পেতে চাই আমি সুন্দরতম রূপে, প্রিয়কে প্রিয়তম রূপে। কিন্তু সেকথা বলতে দাও নি তুমি।

তিন বছর পর আবার দেখা হয়।

এই তিন বছরে মন্দাকিনী নিষ্ফলা থাকে নি। তার মেয়ে হয়েছে আরও দুটি। এর জন্য দায়ী তার তরঙ্গায়িত যৌবন, তার পারিজাতের সুষমা আর মন্দারের মাধুরিমা। তবে এবার ভাটা দেখা দিয়েছে ওসবে। ইন্দ্রাণীর সৌন্দর্যে আর রাজেন্দ্রাণীর মাধুর্যে কে যেন ডিক্রীজারী করেছে কিছুটা। অনুপম তনুশোভাতে ছায়া পড়ে এসেছে অলক্ষ্যে। সিদ্ধার্থ এগিয়ে আসে। তেমনি মিষ্টি হেসে বলে, শুনলাম তুমি এসেছ। তাই দেখা করতে এলাম মন্দা।

মন্দাকিনী হাসবার চেষ্টা করে—একফালি ক্ষীণ অপ্রস্তুতের হাসি।

সিদ্ধার্থ বলে, ভালই হয়েছে দেখা হয়ে। বিদায় নিয়ে যাব সকলের কাছে। জানি না, আর দেখা হবে কিনা।

—কেন? চমকে ওঠে মন্দাকিনী।

—এ দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি মন্দা। কয়েক দিন পরেই জাহাজে চড়ব আমি।

মন্দাকিনী বিহ্বল চোখে তাকায়। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে সিদ্ধার্থকে আজ, যেন সদ্য ফোটা ফুল।

সিদ্ধার্থ বলে, শোন নি, বিলেত যাচ্ছি আমি।

—বি-লে-ত। মন্দাকিনী অবাক হয়ে যায়। ঘাড় নেড়ে বলে, না ত। ফিরবে কবে?

—জানি না। বেঁচে যদি থাকি, হয় ত চার-পাঁচ বছর পরে।

—সৌভাগ্য তোমার। এর বেশী আর কিছু বলতে পারে না মন্দাকিনী। বুকের ভেতরটা মোচড় দিতে থাকে কি এক অজানিত বেদনায়।

সিদ্ধার্থ বলে, অনেক দিন পরে দেখছি। মনে হচ্ছে যেন আগের চেয়ে অনেক রোগা হয়ে গেছ তুমি। অসুখ-বিসুখ করেছিল নাকি তোমার?

—কই না। মন্দাকিনী বোঝে, তাই সিদ্ধার্থের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করবার চেষ্টা করে।

—ছেলেপুলে হ'ল ক'টি? শুনলাম আরও ছুটি মেয়ে হয়েছে নাকি তোমার?

লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে মন্দাকিনী। এই পাঁচ বছরে তিনটে। শুনতে ভাল লাগে না, শোনাতেও না।

—বেশ আছ কিন্তু। সিদ্ধার্থ হাসতে থাকে।

কিন্তু মন্দাকিনী নীরব।

—কই বললে না ত? সিদ্ধার্থ প্রশ্ন করে।

—কি?

—সেই কথা। বেলেল্লাপনা ত করি না আমি।

—না। শান্ত কণ্ঠে উত্তর দেয় মন্দাকিনী।

—কেন? আঘাত পাব বলে?

মন্দাকিনী উত্তর দেয় না একথার।

সিদ্ধার্থই বলে, না, কোন আঘাতই পাব না মন্দা। সব আঘাতের বাইরে আমি আজ।

মন্দাকিনী বলে, তাও না। অনেক দিনের কথা, ভুলে গেছি সব।

—সেই ভাল, এ সব কথা মনে না রাখাই ভাল। আচ্ছা আজ চলি মন্দা।

সিদ্ধার্থ চলে যায়। যেন হাওয়ায় পাখা মেলে উড়ে গেল সে।

মন্দাকিনী অবাক হয়ে যায়। ভাবে, এ কেমন করে হয়। এক দিকে ভাঙন আর এক দিকে গড়ন। যৌবন নিঃশেষিত হয়ে আসছে একজনের আর মুকুলিত হয়ে উঠছে আর একজনের।

পাঁচটা বছর কবে যে কেটে গেছে এ খবর জানতে পারে নি মন্দাকিনী। সংসারের চাপে আর তাপের মাঝে সময় কেটে গেছে হু হু করে। তাই এ খবর প্রথম জানল সে, যেদিন দেখা হ'ল সিদ্ধার্থর সঙ্গে ট্রামলাইনের ধারে।

পাঁচটা বছর সুদীর্ঘ হলেও বড় একঘেয়ে। তবে একঘেয়ে হলেও অফলপ্রসূ হয় নি মন্দাকিনীর ভাগ্যদোষে। ফলবতী করে তুলেছিল তাকে দু-দু'বার। দু'বারেই এসেছে ছুটি নিষ্পাপ সরল শিশু। তবুও ভাবলে গা'টা রি রি করে ওঠে তার, মনটাও ভরে যায় বিষাদে। ত্রিশটা বছর বয়স এখনও পুরো হয় নি মন্দাকিনীর। এরই মধ্যে তার ইন্দ্রাণীর সে ঐশ্বর্য, রাজেন্দ্রাণীর সে মাধুর্য গেছে মিলিয়ে। তরঙ্গায়িত দেহের সচঞ্চল তরঙ্গ আজ শুব্ধ। ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে সমভূমিতে। মুখের সৌরভ আজ হৃতগৌরব। কে যেন শুষে নিয়েছে নির্মমভাবে। পাঁচটি সন্তানের জননী। চোখের কোলে কটাক্ষ খেলে না আর। চোখ জ্বালা করে করে শুষ্ক হয়ে যায়। মন্দাকিনীর জীবনের যত সাধ আজ বিষাদে পরিণত।

একদিনের অস্ফীত সংসারে সচ্ছলতা ছিল, স্বাচ্ছন্দ্য ছিল। কিন্তু স্ফীতায়তন সংসারে সে বালাই নাই। এখন মন্দাকিনীকে দেখতে হয় অনেক, করতে হয় অনেক। তাই সে ব্যস্ত সবসময়। ছেলেপুলের ভারে বিব্রতও সব সময়।

ঠিক এমনি দিনে আবার দেখা হয় তাদের—বিলেত-ফেরত সিদ্ধার্থ আর সংসারভার-পীড়িতা মন্দাকিনীর। ট্রাম লাইনের ধারে দাঁড়িয়েছিল মন্দাকিনী ছোট ছেলেটির হাত ধরে আর বাচ্চা মেয়েটিকে কোলে নিয়ে। আজকাল অনেক দিনই বেরুতে হয় তাকে সংসারেরই কোন-না-কোন একটা কাজে। ট্রামে করে যায় আবার ট্রামেই ফেরে। আজ ট্রামের দেখা নাই। তাই বিব্রত হয়ে পড়েছে মন্দাকিনী। এমনি সময়ে তার পাশে এসে দাঁড়াল সিদ্ধার্থ—ঝকঝকে মোটর থেকে নেমে।

বলল, তুমি? মন্দা, তুমি এখানে?

মন্দাকিনী চমকে ওঠে। ভুলে-যাওয়া গীত কানে এসে পশে। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সিদ্ধার্থের মুখের দিকে।

—বা রে! চিনতে পারছ না আমায়?

মন্দাকিনী কোনমতে ঘাড় নাড়ে। কিন্তু ও নাড়া না-নাড়ারই সামিল। কিন্তু দোষ দেওয়া যায় না মন্দাকিনীকে, সত্যই চেনা যায় না সিদ্ধার্থকে। কে যেন নতুন করে গড়েছে তাকে। সুপুরুষ ছিল সে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ রূপের সঙ্গে তুলনা হয় না তার, এ যেন কন্দর্পকান্তি। বয়স যেন কমে গেছে আরও দশ বছর, দীর্ঘ দেহ হয়ে উঠেছে দীর্ঘতর। কমনীয় আভা ঝরে পড়ছে সারা অঙ্গে, লালিমা ফেটে পড়ছে ছুটি গালে। স্বপ্নাতুর চোখের দৃষ্টি ছায়া-সুনিবিড়। মুক্তার পাত দাঁতগুলি আরও ঝকঝকে, আরও মনোহর। অঙ্গে সাহেবী পোশাক, তাতেও তাকে মানিয়েছে খাসা।

পাশে দাঁড়িয়ে নতুন দামী মোটর। ড্রাইভারের আসনে ষ্টীয়ারিং ধরে বসে আছে একটি মেয়ে। প্রসাধন তারও বড় কম নয়। মার্জিত চেহারায় আভিজাত্যের চিহ্ন সুপরিস্ফুট। অপরিচিত মেয়ে, মন্দাকিনী কখনও দেখে নি তাকে।

এক মুহূর্ত দু'জনে তাকিয়ে রইল দু'জনার দিকে। তার পর চোখ নামিয়ে প্রশ্ন করল মন্দাকিনী মৃদু স্বরে, ফেরা হ'ল কবে?

সিদ্ধার্থ অপ্রস্তুতে পড়ে। বলে, মাসখানেক হয়ে গেছে বোধ হয়। এখনও দেখা করা হয়ে ওঠে নি কারো সঙ্গে। একটু কাজে ব্যস্ত ছিলাম এ ক'দিন।

—হুঁ। অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে কথাটা উচ্চারণ করল মন্দাকিনী।

সিদ্ধার্থ বোঝে। বলে, দু'একদিনের মধ্যেই তোমাদের বাড়ী যাব মনে করেছিলাম।

—যেও। সুবিধে মত। যেদিন কাজ থাকবে না তোমার।

—কিন্তু ওখানে দাঁড়িয়ে কেন তুমি?

—অপেক্ষা করছি ট্রামের জন্যে।

—ট্রামের জন্যে? কি সর্বনাশ! উঠবে কি করে, এই ভীড়ে? তার ওপর সঙ্গে আছে দু'দুটো কচি ছেলে?

এ প্রশ্নের উত্তর দেয় না মন্দাকিনী, শুধু একটুখানি হাসে —শ্লেষের হাসি।

সিদ্ধার্থ বলে, কাজ নেই তোমার ট্রামে গিয়ে। সঙ্গে গাড়ী আছে, বাড়ী পৌছে দিয়ে আসি চল।

—না।

—না কেন?

—তুমি ত জান বেলেল্লাপনা পছন্দ করি না আমি। মন্দাকিনী বলে শান্ত কণ্ঠে।

—বেলেল্লাপনা? সিদ্ধার্থ হাসে, ওকথা না ভুলে গিয়েছিলে তুমি?

—গিয়েছিলাম। কিন্তু মনে করিয়ে দিলে তুমি আবার।

সিদ্ধার্থ চকিতে একবার দেখে নেয় গাড়ীর দিকে। তার পর বলে, তুমি ভুল করছ মন্দা, ও,শিখা। তুমি মন্দাকিনী, ও শিখারিণী। বিলেত গিয়েছিল সোস্যাল সায়েন্স পড়তে। সেইখানেই আমাদের আলাপ। একসঙ্গেই আমরা ফিরি বিলেত থেকে, একই জাহাজে। আজ আসছিলাম। পথে দেখা। ও লিফট দিল আমাকে। ভারী ভাল মেয়ে শিখা।

—হুঁ জানি।

—জান? ভালই হয়েছে, তা হলে ত আপত্তি থাকতে পারে না কিছু। চল, পৌঁছে দিয়ে আসি তোমাদের।

মন্দাকিনী সজোরে ঘাড় নাড়ে। তার পর ছোট্ট করে বলে, না। কথাটা ছোট কিন্তু বড় গভীর। গভীর ভাবেই বেরিয়ে আসে মন্দাকিনীর ওষ্ঠ ভেদ করে।

সিদ্ধার্থ এবার যথার্থই অবাক হয়ে যায়। বলে, সেই রকম জেদীই আছ তুমি আজও। এই জেদের বশেই একদিন কষ্ট দিয়েছিলে আমাকে আর সেই জেদের বশেই আজ কষ্ট দিতে চাইছ শিশুদের।

— তুমি যাও। পরের মোটরে চড়তে না পেলে ওদের কষ্ট হবে না একটুও।

—পরের মোটরে? তুমি বল কি মন্দা? বিস্ময়ে মূক হয়ে যায় সিদ্ধার্থ।

—ঠিক বলেছি, তুমি যাও। তুমি যাও, ওদের ভাবনা ভাবতে হবে না তোমায়।

সিদ্ধার্থ সম্বিত ফিরে পায়। বলে, ভুল করেছি মন্দা। কিছু মনে করো না তুমি, আমি যাচ্ছি। তার পর সহসা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, চল শিখা আমরা যাই।

শিখা গাড়ীতে স্টার্ট দেয়। প্রকাণ্ড গাড়ী ধ্বক্‌ধ্বক্ করে ওঠে। সিদ্ধার্থ গিয়ে বসে শিখার পাশটিতে। তার পর গাড়ীর বাইরে গলা বাড়িয়ে বলে ওঠে, বাই বাই মন্দা, বাই বাই। গাড়ীর ছুটে চলে পাখীর মত হাওয়া ভেদ করে।

আর মন্দাকিণী! সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকে দু'চোখ ভরা আগুন দিয়ে। তখন তার জ্বলন্ত দৃষ্টি ছুটে চলেছে সিদ্ধার্থের পেছনে পেছনে। এ তার ত্রিনয়নাগ্নি নয় তাই রক্ষে, নইলে সে ভস্মীভূত করে ফেলত সিদ্ধার্থকে, তার অনুপম রূপকে, তার কবিত্বময় যৌবনকে।

ট্রাম আসে পর পর, কিন্তু মন্দাকিনীর ওঠা হয় না। সে তখনও দাঁড়িয়ে থাকে তার জ্বলন্ত দৃষ্টি নিয়ে সিদ্ধার্থকে ভস্মীভূত করবার জন্য।

শিক্ষক—অভিভাবক—ছাত্র

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

ভারতবর্ষ আজ পৃথিবীর মধ্যে এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আসনের অধিকারী, বিশ্বের বিভিন্ন জটিল ব্যাপারে ভারতবর্ষের মতবাদ বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়ে থাকে। কেবল যে দেশের ভৌগোলিক সীমার বাইরেই আমাদের দেশ সম্মান লাভ করে ক্ষান্ত আছে তা নয়, দেশের অভ্যন্তরে নানা কর্মযজ্ঞের সূচনা করে অর্থ নৈতিক অবস্থার আমূল উন্নয়নে ভারতবর্ষ আজ ব্রতী হয়েছে। নানা সমস্যার সম্মুখীন বর্তমান ভারতের এই প্রচেষ্টা বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু আমি মনে করি না কোন দেশের বৈষয়িক উন্নতি কেবলমাত্র শিল্প এবং কৃষির সম্প্রসারণ করে অব্যাহত রাখা যায়। প্রাকৃতিক সম্পদকে মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহার করতেই হবে কিন্তু দেশের জনসম্পদকে যুগোপযোগী করে তোলা সবার আগে দরকার। আজ সমস্ত সমস্যার মধ্যে যে সমস্যা আমাদের কাছে প্রচণ্ড "চ্যালেঞ্জ" স্বরূপ দাঁড়িয়েছে তা আপাতদৃষ্টিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর মনে হলেও তা আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তিমূলে রয়েছে। তাই সে সমস্যার সমাধান সর্বাগ্রে প্রয়োজন। আমি শিক্ষা-সমস্যার কথাই বলছি। স্বাধীনতা লাভের বহু পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "আমার মত এই যে, ভারতবর্ষের বুকের উপর যত কিছু দুঃখ আজ অভ্রভেদী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার একটি মাত্র ভিত্তি হচ্ছে অশিক্ষা। জাতিভেদ, ধর্মবিরোধ, কর্মজড়তা, আর্থিক দৌর্বল্য সমস্তই আঁকড়ে আছে এই শিক্ষার অভাবকে।" আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য যদি তাদের পরিচালনার জন্যে সৎ শিক্ষিত কর্মী মেয়ে পুরুষের অভাব ঘটে। একমাত্র বিদ্যালয় কলেজ ইত্যাদিতে উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে কালোপযোগী শিক্ষাপ্রাপ্ত নারী-পুরুষরাই এই অভাব পূরণ করতে পারেন। তাই আজ প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়।

একথা অনস্বীকার্য বহু অর্থব্যয়ে অট্টালিকাসদৃশ অনেক বিদ্যালয়-গৃহ আজ তৈরী হচ্ছে, কিন্তু যতই আধুনিক আর যন্ত্রপাতি-সমন্বিত হোক না কেন, বিদ্যালয় বলতে বিদ্যালয়-গৃহ বোঝায় না। মূলতঃ বিদ্যালয় একটা জটিল জীবন্ত চেতনাসম্পন্ন সংস্থা। শেষ বিশ্লেষণে বিদ্যালয় ভাল অথবা মন্দ শিক্ষক-শিক্ষিকার সমাবেশরূপে দাঁড়ায়, যাঁদের হাতে বিদ্যালয় পরিচালনার ভার থাকে। এঁদের ওপরই ভবিষ্যৎ ভারতের সমৃদ্ধি অথবা পতন নির্ভরশীল, এঁরাই সক্ষম আমাদের স্বাধীনতাকে উন্নতির উচ্চ শিখরে নয় ত অবনতির অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করতে। বস্তুতঃ প্রাচীন ভারতের যে তপোবন সভ্যতা একদিন অনগ্রসর পৃথিবীতে বিস্ময়ের সঞ্চার করেছিল তার মূলে ছিলেন জ্ঞানতপস্বী আচার্যেরা।

সুতরাং ভবিষ্যৎ সমাজ-গঠকের পরিপ্রেক্ষিতে নব-ভারতীয় সমাজে শিক্ষক-শিক্ষিকা বিশিষ্টতম স্থান লাভের যোগ্য। যে কোন শিক্ষিত ব্যক্তি অল্প কয়েক ঘণ্টার জন্যেও শিক্ষকতা করে বুঝতে পারবেন ছাত্রদের জীবন-গঠনে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কি প্রচণ্ড প্রভাব। বিদ্যালয়-শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য শিশু-চরিত্রের উন্মেষ এবং উৎকর্ষ সাধন, আর এই উদ্দেশ্য শিক্ষক ছাত্রের সাহচর্যের ওপর নির্ভরশীল। এই পারস্পরিক সহমর্মিতার তুলনায় বিদ্যালয়ে যে পুঁথিগত বিদ্যা দেওয়া হয়ে থাকে তার মূল্য অনেক অল্প। কিন্তু এই সাহচর্য বা সহদানটাই বড় কথা নয়, শিক্ষক ছাত্রকে সখ্যতার মাধ্যমে কি দিতে পারছেন আর তার পরিমাণ কতখানি সেটাই বিবেচ্য। শিক্ষকের জীবনাদর্শ চিন্তা-ভাবনা তিনি অবিরাম ছাত্রকে দিয়ে যান, যদি শিক্ষকের জীবন উৎসর্গীকৃত হয় যদি ঈশ্বর এবং সেবাই তাঁর জীবনের লক্ষ্য হয় তা হলে তিনিই মানব মঙ্গল সাধনের সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট শক্তির অধিকারী। কিন্তু অনেক শিক্ষক আছেন যাঁরা স্বার্থসন্ধানী, তাঁরা ছাত্রের মানসিক উন্নতি নয় ঘড়ির কাঁটার আবর্তনের ওপর লক্ষ্য রেখে দৈনন্দিন কর্তব্য সমাধা করে থাকেন, এঁরাই হলেন সমাজের নিকৃষ্টতম শত্রু।

শিশুকে যদি জাতির ভবিষ্যৎ বলে মেনে নিতে হয় তা হলে আমরা দেখতে পাই জাতির মেরুদণ্ড দৃঢ়ীকরণে শিক্ষকের দায়িত্ব কত বেশী। সুতরাং আমাদের সমস্ত পরিকল্পনার মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণকে তাঁদের দায়িত্বের উপযোগী করার পরিকল্পনাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা দিতে হবে, তাঁদের জীবনের মান-উন্নয়নে সহায়তা করতে আর কালোপযোগী দক্ষিণা দিতে হবে। কেবল বক্তৃতা প্রবন্ধে তাঁদের জীবিকাকে মহৎ বলে ঢাক বাজিয়ে লাভ নেই। সেই মহৎ মর্যাদার উচ্চাসনে তাঁদের অধিষ্ঠিত করতে হবে। একথা সত্যি, ভাগ্য অন্বেষণে বিশেষ কেউ শিক্ষকতার জীবিকা গ্রহণ করেন না, শিক্ষকত

আমাদের দেশে যাঁরা করেছেন তাঁরা দুঃখ স্বীকার করে শিক্ষকতা করে গেছেন, কিন্তু দরিদ্র হলেও সমাজে, রাজ-দরবারে তাঁদের নাম ছিল, স্থান ছিল। তারপর পশ্চিমী সভ্যতার ঝটিকাপ্রবাহে আমাদের দেশের চিন্তা চেতনার মধ্যে যে পরিবর্তন আসে তাতে করে সমাজ আর সরকার শিক্ষকদের মহান্ কর্তব্যকে যথাযথ স্বীকৃতি দানে পরাঙ্মুখ হলেন আর শিক্ষকেরা পেতে সুরু করলেন এই দুর্মূল্যের বাজারে পিয়নের চেয়ে স্বল্প বেতন। তাই আজ আর বিদ্যা দান করা হয় না বিদ্যা বিক্রয় করা হয়। জীবনের তাড়নায় অনন্যোপায় হয়ে শিক্ষকরা আজ শিক্ষকতা ছাড়াও আরও বহু কাজ করে দুর্মূল্যতার সঙ্গে পাল্লা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন, শিক্ষককে যদি শিক্ষকতাকে জীবনের 'মিশন' বলে ধরে নিতে হয় তা হলে দেশের পারিপার্শ্বিককে তদনুরূপ করে তুলতে হবে, আর তা করবার দায়িত্ব সমাজ আর সরকার উভয়েরই।

শিক্ষা-সমস্যা সমাধানে অভিভাবকের ভূমিকাও ন্যূন নয়, আজকের যুব-সমাজের মধ্যে যে উচ্ছৃঙ্খলতা আর অনিয়মানুবর্তীতা দেখা যাচ্ছে তার মূলে অভিভাবকদের উদাসীনতা খানিকটা আছে। দেশ এখন পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলছে, প্রাচীন রীতিনীতি কর্মধারাকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হচ্ছে, এই পরিবর্তনের ফলে সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে সাধারণ নিয়ম রীতিনীতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে দেখা যায়। এ দৃশ্য আজ আর কল্পনার বাইরে নয়, বিদ্যালয়ের ছেলেরা ক্লাসে ঢোকবার আগে নিকটবর্তী দোকানে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেয়ে নিচ্ছে বা প্রচণ্ড গ্রীষ্মে বই-খাতা নিয়ে সিনেমার দীর্ঘ লাইন দীর্ঘতর করছে। অভিভাবক সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে কর্তব্য সমাধা করে থাকেন, সন্তানকে উপযুক্ত পথের ইঙ্গিত নানান কারণে তিনি দিতে পারেন না। আজকাল স্বল্পতম বেতনে বহু ছাত্র-গৃহশিক্ষক পাওয়া যায়। অনেক অভিভাবক এ রকম একজন গৃহশিক্ষককে নিযুক্ত করে আপন সন্তানের প্রতি শিক্ষা-সংক্রান্ত কর্তব্য সমাধান করতে পেরেছেন বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, কিন্তু এ রকম ছাত্র-গৃহশিক্ষকের মধ্যেই অনেকেরই বিদ্যাবুদ্ধি হাস্যকর, এঁদের হাতে সন্তানকে ছেড়ে দিলে সে অশিক্ষাই পাবে। কয়েক সংখ্যা আগেকার 'প্রবাসী'তে আমেরিকার ছেলেমেয়েদের সুকুমার বৃত্তিকে জাগিয়ে তোলবার আর বুদ্ধির উন্মেষ সাধনের জন্যে সে দেশের অভিভাবকেরা যে চেষ্টা করে থাকেন প্রসঙ্গক্রমে তা লিখেছিলাম। আমাদের অভিভাবকদেরও সেই পন্থা অবলম্বন করতে হবে। বিদ্যালয় আর গৃহ উভয় মিলেই সন্তানকে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা দিতে পারে—দুজনের মধ্যে একজন নয়।

আমার মনে হয়, আজকের ছাত্ররা যে জীবনাচরণে অনিয়মিত হয়ে উঠছে তার অন্যতম কারণ হচ্ছে বর্তমান পাঠ্যসূচীতে ছাত্রদের নৈতিক উৎকর্ষ সাধন সম্পর্কিত বিষয়ের অভাব। রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ বলে যে বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী থেকে ধর্মসম্বন্ধীয় বিষয়কে সযত্নে বিদায় দিতে হবে এর অর্থ বোধগম্য নয়। সর্বত্রই আজ দেখতে পাচ্ছি শিক্ষাকে মুখ্যতঃ ভবিষ্যৎ জীবনের অর্থ উপার্জনের উপায় হিসেবে ধরা হচ্ছে, সন্তানের বা ছাত্রের আত্মিক উৎকর্ষ বা আত্মোন্নতির দিকে কোন লক্ষ্যই রাখা হয় না। সম্প্রতি কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষে শ্রীরাজাগোপালাচারী বলেছেন, আমাদের দেশের যা কিছু অমঙ্গলকর ঘটনা ঘটছে তার মূল কারণ আমরা ঈশ্বরকে বিস্মৃত হয়েছি। তাঁহার মতে "God-less education"-এর কোন মূল্যই নাই। আমাদের দেশের শিক্ষা-নিয়ন্ত্রণকারিগণ এই কথাটা মনে রাখলে দেশের মঙ্গল হবে।

সম্প্রতি দার্জিলিংয়ে সেণ্ট পলস স্কুলের রেক্টর মিঃ এল, জি, গডার্ড, ও-বি-ই, এম-এ (ক্যাণ্টাব) এই সম্বন্ধে এক সুচিন্তিত ভাষণ দিয়েছেন। আশা করি তাঁরা 'ভাষণ শিক্ষাদপ্তরে পৌঁছেছে এবং শিক্ষা বিভাগ তাকে "ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি"তে নিক্ষেপ করে তাঁদের কর্তব্য সাধন করবেন না।

কেশবচন্দ্র সেন ঃ জাতি-গঠনে

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে যে-সব যুগন্ধর মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কেশবচন্দ্র সেনের স্থান অতি উচ্চে। তাঁহাকে লইয়া এক বিরাট সাহিত্যও গড়িয়া উঠিয়াছে। তাঁহার জীবিতকালে প্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকা ও পত্র-পত্রিকায় এমন বহু প্রকাশিত হইয়াছে যাহা হইতে তাঁহার তথ্য মহিমময় জীবন সম্বন্ধে বিস্তর নূতন কথা জানা সম্ভব। এসমুদয় তথ্যের ভিত্তিতে জাতি-গঠনে কেশবচন্দ্রের কার্য্যকলাপ বিষয়ে কিছু আলোচনা করিব।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সংস্রব : কেশবচন্দ্র ছাত্রাবস্থাতেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে পরিচিত হন। নব্য-শিক্ষিত সুরুচিসম্পন্ন কেশবের ধর্ম্মপ্রাণতা শীঘ্রই দেবেন্দ্রনাথকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিল। দেবেন্দ্রনাথ হিমালয়-যাত্রার পূর্ব্বেই তত্ত্ববোধিনী-সভার উপর বিরক্ত হইয়া পড়েন। কলিকাতা-প্রত্যাবর্ত্তনের পর তাঁহার প্রথম কার্য্য হয়—তত্ত্ববোধিনী সভা রহিতকরণ (মে, ১৮৫৯)। ইতিপূর্ব্বেই কেশবচন্দ্র আসিয়া দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। ১৮৫৯ সনের সেপ্টেম্বর-নবেম্বর মাসে তিনি দেবেন্দ্রনাথ ও তদীয় মধ্যম পুত্র কেশব-বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথের সহিত সিংহল ভ্রমণ করিয়া আসেন। এই সময়ে দেবেন্দ্র-নাথ কেশবচন্দ্রকে একান্ত ভাবে পরখ করিয়া দেখিবার সুযোগ লাভ করেন। তিনি অতঃপর তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহায়তায় দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজকে সক্রিয় ও সতেজ করিয়া তুলিতে অগ্রসর হইলেন। দেবেন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা ও সেবাপরায়ণতার দ্বারাও তিনি সবিশেষ অনুপ্রাণিত হইয়া উঠেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮ই মে ১৮৫৯ দিবসে ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে প্রতি সপ্তাহে বাংলায় বক্তৃতা দিতেন স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ এবং ইংরেজীতে বক্তৃতা করিতেন কেশবচন্দ্র। সিংহল ভ্রমণের পর কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ পুনর্গঠনে মন দিলেন। ১৮৫৯, ২৫শে ডিসেম্বর নূতন অধ্যক্ষ-সভার উপর সমাজ-পরিচালনার ভার অর্পিত হইল। অধ্যক্ষ সভার সভাপতি হইলেন রাজা রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ রায় এবং সম্পাদক—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেন। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ

এতদিন তত্ত্ববোধিনী সভার আওতার মধ্যে ছিল। শেষোক্ত সভা রহিত করিয়া দিয়া দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সভারূপে পরিচালিত হইবার সুযোগ করিয়া দিলেন। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের অন্যতর সম্পাদকের কার্য্য সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের কর্ম্মও করিতে লাগিলেন ১৮৫৯ সনের নবেম্বর মাস হইতে। এই ব্যাঙ্কের সঙ্গে পিতামহের সময় হইতেই তাঁহার পরিবারের ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। কেশবচন্দ্র ব্যাঙ্কের কর্ম্মে লিপ্ত ছিলেন ১৮৬১ সনের ১লা জুলাই পর্য্যন্ত। এই তারিখে কর্ম্মে ইস্তফা দিয়া তিনি সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি যুবক-সমাজের উদ্দেশ্যে বারটি উদ্দীপনাপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করিয়া প্রকাশিত করিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বাধীনে এবং কেশবচন্দ্রের সক্রিয় সহযোগিতায় অতঃপর ব্রাহ্মসমাজ নব নব কার্য্য সম্পাদনে অগ্রসর হয়। কেশবচন্দ্র তেইশ বর্ষীয় যুবক, দেবেন্দ্রনাথ প্রৌঢ়ত্বে উপনীত। উভয়ের ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতায় ও রচনায় একদল ছাত্র ও যুবক আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন—'অমৃত বাজার পত্রিকা'র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষের জ্যেষ্ঠাগ্রজ বসন্তকুমার ঘোষ, উমেশচন্দ্র দত্ত, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, মহেন্দ্রনাথ বসু, উমানাথ গুপ্ত, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, অঘোরনাথ গুপ্ত, অমৃতলাল বসু প্রভৃতি। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল (চিরঞ্জীব শর্ম্মা), আনন্দমোহন বসু, গিরিশচন্দ্র সেন ইঁহাদের কিঞ্চিৎ পরে আসিয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ কর্ম্মমুখর হইয়া উঠিল। প্রধানতঃ কেশবচন্দ্রের প্রেরণায় এবং উৎসাহে সঙ্গত-সভা এবং ব্রাহ্মবন্ধু-সভা স্থাপিত হইল যথাক্রমে ১৮৬১ ও ১৮৬৩ সনে। সঙ্গত-সভা মুখ্যতঃ ধর্ম্মবিষয়ক। ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠানপত্র এই সঙ্গত-সভারই আলোচনার ফল। ব্রাহ্মবন্ধু সভায় সাধারণভাবে সমাজোন্নতিমূলক নানা বিষয়ের ও কার্য্যের আয়োজন হয়। 'অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা' প্রচেষ্টা ব্রাহ্মবন্ধু-সভার একটি প্রধান কার্য্য। এ বিষয়ে আমি অন্যত্র বিশদ আলোচনা করিয়াছি।* ব্রাহ্মবন্ধু-সভায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঁচিশ বৎসরের ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত-বিষয়ক বক্তৃতা এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধীয় ধারাবাহিক বক্তৃতা প্রদত্ত হইয়াছিল।

সেবাকার্য্যে তৎপরতা: ঈশ্বর-প্রীতি ও পরোপকার—এই দুইটি ছিল দেবেন্দ্রনাথ-উপদিষ্ট এবং কেশবচন্দ্র-পরিপোষিত ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল কথা। ঔপনিষদিক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার এবং জাতীয় সেবাকার্য্য দুই দিকেই দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র অগ্রসর হইলেন। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ-প্রশমনে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে একটি সাহায্য-সভা অনুষ্ঠিত হয়, জাতীয় জীবনে এই সভার একটি বিশিষ্ট স্থান। ১৮৬১-৬২ সনে ভাগীরথীর উভয় তীরে ভীষণ ম্যালেরিয়া মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয় এবং সহস্র সহস্র নরনারী মৃত্যুমুখে পতিত হইতে থাকে। এই সময়ে কেশবচন্দ্র সদলবলে ঐ সব অঞ্চলে গিয়া জনসাধারণকে সময়োচিত সাহায্য দিয়া এবং বিপদে ধৈর্য্যধারণের আশ্বাস দিয়া বিশেষ হিতসাধন করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্র যে মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন তাহা যুবচিত্তে সেবাধর্ম্মের প্রেরণা জাগায় বিশেষভাবে, সুশিক্ষা ও সৎশিক্ষা প্রচারও এই সমাজের কর্ম্মসূচীর এক প্রধান অঙ্গ হইল। 'ব্যবস্থা-দর্পণ'-প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ শ্যামাচরণ শর্ম্ম-সরকারের সভাপতিত্বে ৩রা অক্টোবর ১৮৬১ তারিখে সমাজ-গৃহে এক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। সভার উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া কেশবচন্দ্র যে বক্তৃতা করেন তাহাতে প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালী সম্পর্কে তাঁহার গভীর উদ্বেগ প্রকাশ পায়। নীতিধর্ম্মবিহীন শিক্ষা সমাজের পক্ষে কি অনিষ্টকর এবং নীতিধর্ম্ম-ভিত্তিক শিক্ষা সমাজের কত কল্যাণসাধন করিতে পারে এই সকল বিষয় ইহাতে বর্ণনা করিলেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষার অব্যবস্থা সম্বন্ধেও বক্তৃতায় আবেগভরে উল্লেখ করিলেন। এই উদ্দেশ্যে বিলাতের মনীষীবর্গের নিকটে একখানি আবেদনপত্র প্রেরিত হয়। আবেদনের ফল শুভ হইল। সেখানে অর্থ সংগৃহীত হইলে, কলিকাতায় একটি আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার নামকরণ হয় 'কলিকাতা কলেজ'। সেযুগে 'কলেজ' কথাটি দ্বারা উচ্চ বিদ্যালয়ও বহু ক্ষেত্রে বুঝানো হইত। কলিকাতা কলেজও ছিল প্রকৃতপক্ষে আধুনিক কালের একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়। কলেজ-পরিচালনার ভার পড়িল কেশবচন্দ্র সেনের উপর। এই কলেজ হইতে তদীয় অনুজ কৃষ্ণবিহারী সেন এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। সংবাদপত্র পরিচালনায়ও কর্ম্মতৎপরতা দেখা দিল।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা অধ্যক্ষ-সভার নিজস্ব মাসিকপত্র। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যুবক-ছাত্র পরবর্ত্তী কালের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ইংরেজীনবিস মনোমোহন ঘোষের সম্পাদনায় 'ইণ্ডিয়ান মিরর' নামে একখানি প্রথম শ্রেণীর পাক্ষিকপত্র প্রকাশিত করিলেন ১৮৬১, ১লা আগষ্ট হইতে। 'হিন্দু-পেট্রিয়ট' সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর এরূপ একখানি জোরালো পত্রিকার অভাব অনুভূত হইতেছিল। 'ইণ্ডিয়ান মিররে'র ম্যানেজিং এডিটর বা বৈষয়িক সম্পাদক পদে বৃত হন কেশবচন্দ্র। কেশবচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র নরেন্দ্রনাথ সেন প্রায় প্রথম হইতেই মিররের নিয়মিত লেখক ছিলেন। পরে, এই কাগজখানির সম্পূর্ণ স্বত্ব-স্বামিত্ব কেশবচন্দ্রের হইয়া যায়, এবং ১৮৬৬ সনে সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে পরিণত হইয়া নরেন্দ্রনাথেরই সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হইতে থাকে। কেশবচন্দ্র ১৮৬৫, অক্টোবর মাস (কার্ত্তিক ১৭৮৬ সাল) হইতে আর একখানি মাসিকপত্র বাহির করেন 'ধর্ম্মতত্ত্ব' নামে। এই পত্রিকাখানি সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এখনও পাক্ষিকপত্ররূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

* "স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনে কেশবচন্দ্র সেন"—প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭

কৃষ্ণনগর : কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্মের কার্য্যে এবং বিবিধ লোকহিতে মনপ্রাণে যোগ দিলেন ; এজন্য তাঁহাকে প্রায়ই কলিকাতায় থাকিতে হইত। তবে তিনি ব্যাঙ্কের কর্ম্মে নিযুক্ত থাকাকালীন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারোপলক্ষে ১৮৬১ সনের এপ্রিল-মে মাসে কৃষ্ণনগরে একবার গমন করেন। তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিষয়ক বক্তৃতায় রক্ষণশীল হিন্দুরাও মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং কেশবচন্দ্রকে আন্তরিক সাধুবাদ করেন। ইহার একটি কারণ ছিল। নদীয়া-কৃষ্ণনগরের খ্রীষ্টান মিশনরীদের নিরতিশয় প্রভাব-প্রতিপত্তি বিগত চতুর্থ দশক হইতেই পরিলক্ষিত হইতেছিল। এযাবৎ হিন্দুসমাজের পক্ষ হইতে ইহার প্রতিরোধের কোন চেষ্টাই একরূপ হয় নাই। কেশবচন্দ্রের প্রচারের ফলে খ্রীষ্টানী প্রচেষ্টায় ভীষণ ব্যাঘাত জন্মিল, আবার হিন্দুসমাজও অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া উঠিল। কেশবচন্দ্রের বক্তৃতার তীব্র প্রতিবাদ করেন একটি সভায় কৃষ্ণনগরস্থিত পাদ্রী ডাইসন। কিন্তু এই বক্তৃতায় বিশেষ ফলোদয় হইল না। রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজ ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারকদের সঙ্গে হাত মিলাইয়া খ্রীষ্টানদের বিরোধিতা করিতে প্রয়াস পাইল। ইহার তিন বৎসর পরেও কেশবচন্দ্রের কৃতিত্বের প্রশংসায় কৃষ্ণনগরবাসী মুখর ছিলেন। বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ প্রমথনাথ বসু ১৮৬৪ সনে নয় বৎসর বয়সে কৃষ্ণনগরে অধ্যয়ন করিতে গিয়া ইহা অবগত হইয়াছিলেন। তিনি নিজ স্মৃতিকথায় বাল্যেই শ্রুত এই কথার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মে ঐকান্তিক আসক্তি এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারে নিষ্ঠা দেখিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬২ সনের ২৩শে জানুয়ারী কেশবচন্দ্রকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধিতে ভূষিত করেন। ঐ সনের ১৩ই এপ্রিল নববর্ষের দিনে কেশবচন্দ্র "আচার্য্য"পদ প্রাপ্ত হইলেন। দেবেন্দ্রনাথ ইহার পর 'প্রধান আচার্য্য'রূপে আখ্যাত হইতে থাকেন। ইহার পর ১৮৬৩ সনেও কেশবচন্দ্র একবার পাদ্রীদের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হন। এবার তাঁহার প্রতিপক্ষ ছিলেন 'ইণ্ডিয়ান রিফর্ম্মার' পত্রের সম্পাদক রেভারেণ্ড লালবিহারী দে। রেভারেণ্ড দের উক্তির প্রতিবাদে কেশবচন্দ্র যে বক্তৃতা দেন তাহাতে ইউরোপীয় পাদ্রীরা স্তম্ভিত হইলেন। কেশবচন্দ্রের সার্থক জবাবে পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডাফ পর্য্যন্ত এই মন্তব্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন : "The Brahmo Samaj is a power of no mean order in the midst of us"। গত শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকের প্রথমার্দ্ধে সাধারণ মানুষের ভিতরে নূতন চেতনার দ্বারা আত্মপ্রত্যয় ফিরাইয়া আনিবার পক্ষে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ তথা কেশবচন্দ্রের কৃতিত্ব বিশেষভাবে স্মরণীয়।

মাদ্রাজ ও বোম্বাই পরিক্রমা : এতাবৎকাল কেশবচন্দ্রের কার্য্যকলাপ কলিকাতার মধ্যেই প্রায় নিবদ্ধ ছিল, যদিও তাঁহার শক্তি ও কৃতির কথা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ১৮৬৪ সনের প্রথম দিকে তিনি দক্ষিণ ভারত পর্য্যটনে বাহির হইলেন। এই বৎসর ৯ই ফেব্রুয়ারী তিনি কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ যাত্রা করেন এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাই পরিভ্রমণ সমাপনান্তে এপ্রিল মাসে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। এই দুই প্রদেশে দুই মাসের অধিককাল থাকিয়া তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে রত হন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও তিনি ঐ দুই প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গমন করিয়া নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে মিলিতে থাকেন। সাধারণ শিক্ষিতদের অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভেরও সুযোগ পাইলেন তিনি। নানা সভায় বক্তৃতা দিয়া তিনি তাঁহাদের ভিতরে চেতনার উদ্রেক করিতে প্রয়াসী হন। পরবর্ত্তীকালের বিখ্যাত দেশকর্ম্মী কংগ্রেস-প্রেসিডেণ্ট বিলাত প্রবাসী দাদাভাই নৌরজীর সঙ্গে বোম্বাইয়ে কেশবচন্দ্রের পরিচয় ঘটে। ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে বোম্বাই ও মাদ্রাজে ধর্ম্মসমাজ স্থাপিত হইল। বোম্বাইয়ের সমাজ প্রার্থনা-সমাজ নামে আখ্যাত হয়। প্রার্থনা-সমাজের প্রাণ ছিলেন মহাদেবগোবিন্দ রাণাড়ে। পূর্ব্ব দশকে রাজনীতিক্ষেত্রে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের আদর্শে মাদ্রাজে ও বোম্বাইয়ে রাজনৈতিক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ষষ্ঠ দশকে ধর্ম্ম-সমাজও স্থাপিত হইল। আধুনিক যুগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ঐক্যবোধের উন্মেষে বাঙালী নেতৃবৃন্দ আগাইয়া আসেন। ব্যক্তিগত কারণ ব্যতিরেকে, সমষ্টিগত মহৎ উদ্দেশ্য সাধনকল্পে ভারত-পরিক্রমায়ও তাঁহারা লিপ্ত হন। বর্ত্তমানকালে কেশবচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম ইহার পথ দেখান। কেশবচন্দ্র দক্ষিণ ভারত পর্য্যটনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বেথুন সোসাইটির ১২ই জানুয়ারী ১৮৬৫ দিবসীয় মাসিক অধিবেশনে বক্তৃতা করেন। অভিজ্ঞতার কথা বলিয়া তিনি এই মর্ম্মে মন্তব্য করিলেন :

"The lecturer then proceeded to discuss the question, which, a comparative view of native society in the three Presidencies, had suggested to his mind, namely, the mission, which each was destined to fulfil in the great future of India. The mission of Bombay seemed to him to be the promotion of the material prosperity of India, her activity and enterprise, and her first rate business habits and talents, rendering her peculiarly qualified for that great task. Madras, he thought, would, from her conservatism and orthodoxy, effectively prevent the introduction of foreign fashions into the country, and guard her against inroads on the purity of her national institutions and primitive manners. The mission of Bengal was the promotion of intellectual and political prosperity."*

বোম্বাইয়ের ব্যবসা-বাণিজ্য, মাদ্রাজের রক্ষণশীলতা এবং বঙ্গের

* The Proceedings and Transactions of the Bethune Society, from November 10th, 1859 to April 20th, 1869. P. LXX.

ধাত্রীয় কর্ম্মপ্রচেষ্টা ভাবী ভারত সংগঠনে বিশেষ কার্য্যকরী হইবে—কেশবচন্দ্রের উক্তি হইতে এই কথা সূচিত হয়। গত যুগের ইতিহাস পর্য্যালোচনায় কেশবচন্দ্রের উক্তির দূরদর্শিতা ও যাথার্থ্য আমাদের সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইতেছে।

ভাঙা-গড়া : ১৮৬৫ সনটি কেশব-জীবনের একটি কঠিন পরীক্ষা-কাল। তিনি এই সময়ে এরূপ কতকগুলি কার্য্যে হাত দেন যাহাতে তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিরাগভাজন হইয়া উঠেন। কেশবচন্দ্র ও তাঁহার অনুগামী যুবকদল সমাজ-সংস্কারকে ত্বরান্বিত করিতে চাহেন, উপাচার্য্যদের উপবীত ত্যাগ ও গ্রহণাদি কয়েকটি ব্যাপারের প্রতিবাদ দেবেন্দ্রনাথ এবং তাঁহার অনুবর্ত্তীরা পছন্দ করেন না—কেশবচন্দ্র ও দেবেন্দ্রনাথের মতবিরোধ ও মনান্তর কারণস্বরূপ এই বিষয়গুলির উল্লেখ করা হয়। কিন্তু সমসাময়িক ঘটনাসমূহ একটু তলাইয়া দেখিলে এগুলিকে গৌণ কারণ বলিয়াই প্রতিভাত হইবে। কেশবচন্দ্র সংস্কারমূলক ব্যাপারগুলি ত্বরান্বিত করিতে চাহিতেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের পর একটি প্রতিনিধিস্থানীয় মণ্ডলী স্থাপন করিতে অভিলাষী হন, যাহা শুধু বাংলার নহে, বোম্বাই ও মাদ্রাজের ধর্ম্ম-সমাজগুলির মধ্যেও যোগাযোগ স্থাপন করিয়া পরস্পরের উন্নতি সাধনে তৎপর হইবে। বঙ্গদেশে প্রতিনিধি-সভা গঠিত হইল, নিয়মাবলীও রচিত ও গৃহীত হইল। এইরূপ প্রতিনিধি-সভার কয়েকটি অধিবেশন এই ১৮৬৫ সনেই হইয়াছিল। কিন্তু এইরূপ প্রতিনিধি-সভা গঠনের প্রস্তাবেই দেবেন্দ্রনাথ শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। পাছে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃত্বভার প্রতিনিধি-সভার হাতে চলিয়া যায় এই আশঙ্কায় তিনি ট্রাষ্টীর ক্ষমতাবলে উহার কর্ত্তৃত্বভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন পরিচালকপদে বিভিন্ন ব্যক্তিকে বসান। কেশবচন্দ্রের পক্ষ হইতে ইহার প্রতিবাদ হইল; কেশবচন্দ্র প্রকাশ্য সভায় এরূপ কার্য্যের সমালোচনা করিতে ছাড়িলেন না। এইভাবে বিরোধ ক্রমে বিচ্ছেদে পরিণত হইল। কেশবচন্দ্র সদলে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি নিজ হস্তে 'ইণ্ডিয়ান মিরর'-এর পরিচালনা-ভার গ্রহণ করিলেন। ১৮৬৫ সনের শেষভাগে কেশবচন্দ্র—অঘোরনাথ গুপ্ত ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে লইয়া পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণে বাহির হন। এই প্রথম তিনি ফরিদপুর, ঢাকা ও ময়মনসিংহ পরিভ্রমণ করেন। এই সময় ময়মনসিংহে গিরিশচন্দ্র সেন তাঁহার সঙ্গে পরিচিত হন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা : কেশবচন্দ্র স্বপক্ষীয়দের লইয়া কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু কর্ম্মের গতি আদৌ ব্যাহত হইল না, উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল। ১৮৬৬ সনে তাঁহার কর্ম্মপ্রতিভা দিকে দিকে প্রসারিত হইতে লাগিল। যেমন চিন্তাজগতে তেমনি কর্ম্মক্ষেত্রে নূতন নূতন বিষয়ের অবতারণা করা হইল। এই সনের ১৪ই ফেব্রুয়ারী তাঁহারই উদ্যোগে একটি মহিলা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ ধরনের সম্মেলন এই প্রথম। মনে হয় এই সম্মেলন হইতে 'ব্রাহ্মিকা সমাজে'র উৎপত্তি। ভারতীয় মহাজাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনে নারীরও যে সহযোগিতা আবশ্যক এবং তদুপযোগী শিক্ষায়ও যে তাহাদিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে এ বিষয়টি কেশবচন্দ্র মনেপ্রাণে বুঝিয়াছিলেন। এই বৎসরে তাঁহার দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য কার্য্য—কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থিয়েটারে তৎকর্ত্তৃক Jesus Christ : "Europe and Asia" বক্তৃতা প্রদান (৫ই মে ১৮৬৬)। এই বক্তৃতা লইয়া তখন তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। ইংরেজগণ তাঁহাকে 'খ্রীষ্টান' বলিয়া ধারণা করিয়া লইল। এই বক্তৃতাপাঠে তৎকালীন বড়লাট লর্ড লরেন্স তাঁহার সঙ্গে পরিচিত হইতে আগ্রহান্বিত হন। দেশীয়দের মধ্যে অনেকে, বিশেষতঃ দেবেন্দ্রনাথের পক্ষীয়েরা, এই বক্তৃতার সবিশেষ সমালোচনা করেন। এই সব তর্ক-বিতর্ক ও ভুল-বুঝাবুঝি দেখিয়া কেশবচন্দ্র এই বৎসরের ২৮শে সেপ্টেম্বর "Great Men" শীর্ষক দ্বিতীয় বক্তৃতা দিলেন। এই বক্তৃতায় জগতের মহাপুরুষদের জীবনাদর্শ বিবৃত করিয়া তিনি তাঁহাদের প্রতি নিজ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিলেন। জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে সারাংশ সংগ্রহপূর্ব্বক এ সনের 'শ্লোক-সংগ্রহ' বাহির করা হইল।

এদিকে ব্রাহ্ম প্রতিনিধি শেষে সভার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে 'ইণ্ডিয়ান মিররে' কেশবচন্দ্র স্বনামে ও তাঁহার অনুপ্রেরণায় অন্যেরা প্রবন্ধাদি লিখিতে লাগিলেন। বার বার এই সভার অধিবেশনও হইল। শেষে ১লা নবেম্বর শতাধিক ব্রাহ্মের আহ্বানে প্রতিনিধি-সভার একটি সাধারণ সম্মেলন আহূত হইল। ১১ই নবেম্বর (১৮৬৬) সভার অধিবেশনে "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ" স্থাপিত হইল। "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ" নামকরণের হেতু কি? এ বিষয়ে অনেকের হয়ত পরিষ্কার ধারণা নাই। বাংলাদেশে কেশবচন্দ্রের জন্ম, বাংলার অবস্থা তাঁহার বিশেষ জানা। দক্ষিণ-ভারত পরিভ্রমণ করিয়া বোম্বাই ও মাদ্রাজের বিষয়ও তিনি অবগত হইয়াছেন। উত্তর-ভারত পর্য্যটনে তিনি তখনও বাহির হন নাই। কিন্তু স্বীয় অভিজ্ঞতা ও দূরদৃষ্টিবলে তিনি সমগ্র ভারতের ঐক্য সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হইয়াছিলেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন ভারতের শুধু ব্রিটিশ-শাসিত অঞ্চলসমূহের ঐক্য কল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু কেশবচন্দ্র ধর্ম্মক্ষেত্রে সমগ্র ভারতের ঐক্যচিন্তাকে এই কথাটির মধ্যে রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন—তাই তৎপ্রতিষ্ঠিত সমাজের নাম 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' ইংরেজী নাম—"The Brahmo Samaj of India"; মাত্র 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া' নহে। ধর্ম্মক্ষেত্রের এই ভারতীয়তাবোধ ক্রমে অন্য ক্ষেত্রেও প্রসারিত হইয়াছিল, উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসজ্ঞমাত্রেই একথা জানেন।

মিস মেরী কার্পেণ্টার : ১৮৬৬ সনের শেষ ভাগে বিলাত হইতে মিস মেরী কার্পেণ্টার ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি কলিকাতায় আসিলেন ২০শে নবেম্বর তারিখে। বিলাতের সমাজ-বিজ্ঞান-সভার অন্যতম উদ্যোক্তা; কারা-সংস্কার, অপরাধী এবং দরিদ্র ইংরেজ সন্তানদের মধ্যে শিক্ষাদান-ব্যবস্থা প্রভৃতি দ্বারা তিনি

বিলাতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ভারতবাসীদের, বিশেষতঃ ব্রাহ্ম-ধর্মাবলম্বীদের নিকট আর একটি কারণে তিনি শ্রদ্ধার পাত্র। রাজা রামমোহন রায়ের শেষ জীবনে, বিলাত-প্রবাসকালে, মিস কার্পেন্টার তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসেন। 'রামমোহনের শেষ জীবন' শীর্ষক তাঁহার একখানি ইংরেজী পুস্তকও ছিল। তাঁহার ভারতবর্ষে আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—এখানকার স্ত্রীজাতির উন্নতি-সাধন এবং সেহেতু সুষ্ঠু শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। কেশবচন্দ্র স্বতঃই তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিলেন। কলিকাতায় একটি ফিমেল নর্ম্মাল স্কুল স্থাপনের জন্ত তিনি মিস কার্পেন্টারকে সকল রকম সাহায্য করিলেন। বেথুন স্কুলের সঙ্গে সরকার এই নর্ম্মাল স্কুল বা শিক্ষয়িত্রী-শিক্ষণ বিভাগও খুলিয়াছিলেন। এদেশে আসিবার পর মিস কার্পেন্টার বিলাতস্থ সভার আদর্শে কলিকাতায় একটি সমাজ-বিজ্ঞান-সভা গঠনেও উদ্যোগী হন। বলা বাহুল্য, কেশবচন্দ্র এ বিষয়েও মিস কার্পেন্টারকে সবিশেষ সহায়তা করেন। ১৮৬৭ সনের ২২শে জানুয়ারী 'বেঙ্গল সোশ্যাল সায়ান্স এসোসিয়েশ্যান' নামে এই সভা স্থাপিত হয়। বিলাত হইতে ফিরিবার পর কেশব-চন্দ্র এই সভার সঙ্গে একান্তভাবে যুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। একথা পরে বলিব।

উত্তর-ভারত পরিক্রমা : ইহার পর কেশবচন্দ্র উত্তর-ভারত পরিক্রমায় বাহির হন। তিনি বর্দ্ধমান হইতে ৭ই জানুয়ারী (১৮৬৭) রওনা হইয়া পাটনা, এলাহাবাদ, কানপুর, লাহোর, অমৃতসর, দিল্লী, এবং পরে মুঙ্গের হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন (১৫ই এপ্রিল)। এই উত্তর-ভারত-পরিক্রমা নানা দিক দিয়াই সার্থক হইয়াছিল। দক্ষিণ-ভারতের মত উত্তর-ভারতেও একটি বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া সর্ব্বপ্রথম পরিভ্রমণ করিলেন কেশবচন্দ্র। ধর্ম্মপ্রচার তাঁহার মূল উদ্দেশ্য; প্রত্যেকটি স্থলে বক্তৃতা, উপদেশ ও উপাসনার মাধ্যমে তিনি শিক্ষিত সাধারণের মনে ধর্ম্মভাব জাগ্রত করিতে প্রয়াস পান। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়দের ভিতরকার সুপ্ত জাতীয়তার ভিত্তিতে ঐক্যবোধের উন্মেষে এই সমুদয় বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছিল। তিনি পঞ্জাবে অবস্থানকালে শিখজাতির ঐতিহ্যপূর্ণ আচার-আচরণ প্রত্যক্ষ করেন। এই সমাজের ভালমন্দ অনেক কিছুই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু এই শিখ সম্প্রদায় ভারতবর্ষে একটি শক্তির মূলাধার। শিখ সমাজের মধ্যেই ভারতবর্ষে আধুনিককালের গণতন্ত্রের অনুরূপ শাসনপদ্ধতি প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্ব-সমাজের ভিতরেও শিখ সমাজের গণতান্ত্রিক প্রথা চালু করিতে উদ্বুদ্ধ হইলেন। কয়েক মাস পরে ১৮৬৭, ১২শে ডিসেম্বর বেথুন সোসাইটির অধিবেশনে এবারেও তিনি একটি বক্তৃতা করেন তাঁহার উত্তর-ভারত পর্য্যটনের অভিজ্ঞতার অংশ-বিশেষ লইয়া। এবারে তাঁহার বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল—"A Visit to the Punjab।" শিখ জাতির কথাই ছিল তাঁহার বক্তৃতা প্রধান বিষয়বস্তু। এই বক্তৃতার শেষেও তিনি ভারতে মহাজাতির সংগঠনের ভিত্তি-কথার উল্লেখ করেন। উপসংহারে তিনি বলেন :

He concluded by saying that from what he had seen of Madras, Bombay, Bengal and the Punjab, he was of opinion that···had a noble and distinctive mission to accomplish, and that much depended upon the blending of all the races by instituting a system of active co-operation among the educated natives of all Presidencies and Provinces."*

প্রচলিত ধারণা, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিত সাধারণের একটি মিলনক্ষেত্র রচনার কথা সর্ব্বপ্রথম এলন অক্টেভিয়াস হিউমই বলিয়াছিলেন। এখন দেখা যাইতেছে, কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠার প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে কেশবচন্দ্র সেন এরূপ একটি মিলন-ক্ষেত্র রচনার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। আর শুধু উল্লেখ করা নয়, তিনি বেথুন সোসাইটিকে এরূপ একটি মিলন-ক্ষেত্র রচনায় অগ্রণী হইতে অনুরোধ জানান।

বিবাহ-আইন আন্দোলনের সূচনা ও দ্বিতীয়বার উত্তর-ভারত পরিক্রমা ও অন্যান্য কার্য্য : কেশবচন্দ্রের সমাজোন্নতির ভাবনা ও কর্ম্মৈষণা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল। ১৮৬৮, ২২শে জানুয়ারী কলিকাতায় বর্ত্তমান কেশব সেন ষ্ট্রীটস্থ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। ব্রাহ্মগণ শ্রেণীবৈষম্য স্বীকার করেন না। কিন্তু বিভিন্ন বর্ণের পুত্র-কন্যাদের মধ্যে যে-সব বিবাহ হইতেছিল তাহার বিধিবদ্ধ করাইবার প্রয়োজন অনুভূত হইতেছিল। কেশবচন্দ্র অগ্রণী হইয়া এই উদ্দেশ্যে নেতৃস্থানীয় ব্রাহ্মদের সভাও আহ্বান করিয়াছিলেন। অসবর্ণ বিবাহ ও সবর্ণ বিবাহও (ব্রাহ্মমতে) আইনসঙ্গত করিয়া লইবার প্রচেষ্টা এই যে আরম্ভ হইল ইহা শেষ পর্য্যন্ত এক অভিনব আকার ধারণ করে এবং ১৮৭২ সনের আইনসিদ্ধ হইয়া '১৮৭২ সনের ৩ আইন' নামে সাধারণের নিকট পরিচিত হয়। এই সনে কেশবচন্দ্র বাংলাদেশের কোন কোন জেলা-শহরে যান এবং দ্বিতীয়-বার উত্তর-ভারত পরিক্রমায় গমন করেন। কেশবের বাগ্মিতা, ধর্ম্মপ্রাণতা এবং সদাচরণ ঐ সব অঞ্চলের লোকেদের একেবারে আপন করিয়া লইয়াছিল। মুঙ্গেরস্থ এক বিশেষ দল তাঁহাকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিতেও অগ্রসর হন। এই ব্যাপারে কলিকাতায় ও অন্যত্র নেতৃবৃন্দদের মধ্যে এবং পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায়, এমনকি নিজের অন্তরঙ্গদের মধ্যেও প্রতিবাদ উপস্থিত হয়। কিন্তু নির্লিপ্ত ও নিরপরাধ কেশবচন্দ্রের সময়োপযোগী উক্তিতে এই সকল সন্দেহ ও প্রতিবাদের নিরসন হইল।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির : নানা কৃচ্ছ্রতার মধ্যেও 'ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির' প্রতিষ্ঠা কেশবজীবনের একটি প্রধান কীর্ত্তি। ১৮৬৯

---

* The Proceedings and Transactions of the Bethune Society,···etc., P. CXV.

খ্রীষ্টাব্দের ২২শে আগষ্ট সাড়ম্বরে এই মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করা হয়। উপাসনা হয় সমস্তদিনব্যাপী। এখানে নরনারীর সমান অধিকার প্রকাশ্যে ঘোষিত হইল। এইদিন সায়ংকালীন উপাসনার পূর্ব্বে ব্রহ্মমন্দিরে আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, কৃষ্ণবিহারী সেন, ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রমুখ একুশ জন আনুষ্ঠানিক ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইঁহারা ব্যতীত দুই জন মহিলাও ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন, একজন আনন্দমোহন বসুর পত্নী স্বর্ণপ্রভা বসু এবং দ্বিতীয় কৃষ্ণবিহারী সেনের নবমবর্ষীয়া পত্নী…। ইহার পর হইতে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা চলিতে লাগিল। প্রধান-উপদেষ্টা—কেশবচন্দ্র সেন। মন্দিরের উপাসনা ও বক্তৃতা হইত বাংলায়। কেশবচন্দ্রের সুললিত বাংলা বক্তৃতায় জ্ঞানী-গুণীরাও আকৃষ্ট হইতেন। কথিত আছে, বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতায় অবস্থান-কালে প্রতিদিন কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শুনিতে যাইতেন। তাঁহার সহজ সরল বাংলা বঙ্কিমচন্দ্রকে বড়ই আকৃষ্ট করিত। কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের সার্থক উক্তি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।* ইনি কেশবচন্দ্রের কোন কোন সারগর্ভ বক্তৃতার দ্বারা হয়ত অনুপ্রাণিত হইয়াও থাকিবেন। অবশ্য এ বিষয়টি আরও অনুধাবন ও অনুসন্ধানসাপেক্ষ। ১৮৬৯ সনের শেষ ভাগে ইংলণ্ড ভ্রমণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে তিনি প্রকাশ্যে ব্যক্ত করিলেন। সমাজের কার্য্য-ক্ষেত্র ইতিমধ্যেই বিস্তৃত হইয়াছে। সমুদয় ব্যবস্থা করিতে তাঁহার কিঞ্চিৎ সময়ও লাগিয়া যায়। স্থির হইল, ১৮৭০ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তিনি বিলাত যাত্রা করিবেন।

ইংলণ্ড-ভ্রমণ: বিলাতে গিয়া ইংরেজ জাতিকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবেন এবং নিজের ও দেশের উন্নতি সাধনের উপায়াদি বিশেষ ভাবে জানিয়া লইবেন—এই ছিল কেশবচন্দ্রের ইংলণ্ড-যাত্রার মূল উদ্দেশ্য। পূর্ব্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী ১৮৭০ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী পাঁচ জন সঙ্গীসহ তিনি কলিকাতা হইতে বিলাত যাত্রা করিলেন। তাঁহার পাঁচ জন সঙ্গী ছিলেন যথাক্রমে ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ (শ্রীঅরবিন্দের পিতা), আনন্দমোহন বসু, রাখালচন্দ্র রায়, গোপালচন্দ্র রায় এবং প্রসন্নকুমার সেন। প্রসন্নকুমার কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিগত সঙ্গী ও সচিব ছিলেন। এক প্রসন্নকুমার ব্যতিরেকে সঙ্গীগণ বিলাতে নিজ নিজ শিক্ষা ও কর্ম্মে লিপ্ত লইয়া পড়েন। কেশবচন্দ্র একুনে কিঞ্চিদধিক সাত মাস পরে ১৮৭০, ২০শে অক্টোবর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি বিলাতে যে সব বক্তৃতা করেন তাহাতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরেজ সাধারণের বিশেষ কৌতূহলের উদ্রেক হয় এবং এখানে ব্রিটিশ শাসনের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাহাদের কতকটা ভুয়োদর্শনও ঘটে। ইহার ফলে ভারতবর্ষ ও ইউরোপীয় সমাজে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। নানা দিক হইতেই কেশবচন্দ্রের বিলাত গমন জাতির পক্ষে অত্যন্ত কল্যাণকর হইয়াছিল।

সম্প্রতি অন্যত্র কেশবচন্দ্রের বিলাত-ভ্রমণ সম্পর্কে একটি তথ্য-ভিত্তিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।* অনুসন্ধিৎসু পাঠক ইহা হইতে অনেক নূতন কথা জানিতে পারিবেন। কেশবচন্দ্র বিলাতে গিয়া স্বভাবতঃই একেশ্বরবাদী ধর্ম্মপ্রাণ ইংরেজ নরনারীর সঙ্গে পরিচিত হইলেন। বিখ্যাত বেদবিদ্যাবিদ অধ্যাপক ম্যাক্সমুলর, দার্শনিক জন ষ্টুয়ার্ট মিল, সমাজসেবী মিস মেরী কার্পেণ্টার প্রমুখ ইংরেজ-প্রধানদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। আবার রাজনৈতিকপ্রবর গ্লাডষ্টোনের সঙ্গেও তাঁহার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হয়। ভারতবর্ষ হইতে আগত পুরুষ-প্রধান কেশবচন্দ্রকে দেখিবার জন্য রাণী ভিক্টোরিয়াও উদগ্রীব হইলেন। তাঁহার সঙ্গে কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎকার ঘটে ১৩ই আগষ্ট তারিখে। বলা বাহুল্য, এ আলোচনারও মূল বিষয় ছিল ভারতবর্ষ সম্পর্কে, ইহা ছাড়া, কেশবচন্দ্র বিলাতের বিভিন্ন প্রগতি-শীল অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিয়া উহাদের কার্য্যকলাপ প্রত্যক্ষ করেন। ব্রিষ্টল ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে মিস কার্পেণ্টার 'ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' স্থাপন করেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল—বিশেষ ভাবে ভারতীয় নারীজাতির সর্বপ্রকার উন্নতি-সাধন প্রচেষ্টা। কেশবচন্দ্র এই সভায় উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতা দেন এবং মিস কার্পেণ্টারের এবম্বিধ সদভিপ্রায়ের আন্তরিক সমর্থন জানান। ভারতবর্ষের নারীজাতির অবস্থা ও উন্নতিপ্রয়াস সম্পর্কে কেশবচন্দ্র একাধিক সভায় বক্তৃতা করিলেন। ১লা আগষ্ট তারিখে ভিক্টোরিয়া ডিসকাশন সোসাইটির মাসিক অধিবেশনে প্রদত্ত 'ভারতের নারীজাতি' শীর্ষক কেশবচন্দ্রের বক্তৃতায় কোন কোন ইংরেজ মহিলা ভারতবর্ষে নারীগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। মিস এনেট একুরয়েড (পরে মিসেস বিভারিজ) তাঁহাদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া এদেশে আসেন এবং নারীদের শিক্ষা দানে রত হন।

বিলাতে রাজনৈতিক কার্য: ভারতবর্ষের শাশ্বত ধর্ম্ম ও ভারত-বাসীর ধর্ম্মপ্রবণতা, ভারতীয় নারীজাতির উন্নতি-সাধনপ্রয়াস, সমাজ-সংস্কারের আবশ্যকতা প্রভৃতি সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র বিভিন্ন বক্তৃতায় যেমন ইংরেজ সাধারণকে সজাগ করিয়া তুলিয়াছিলেন অন্যদিকে তেমনি ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের সু ও কু দিকের প্রতিও তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি একাধিক সভায় ভারতবর্ষের প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য, 'সরকারের মাদকদ্রব্য নীতি', প্রভৃতি বক্তৃতায় এদেশস্থ ব্রিটিশ শাসকদের তীব্র সমালোচনা করিলেন এবং এই নীতি পরিবর্তন করিয়া কিরূপে এই শাসন জাতির পক্ষে কল্যাণকর হইতে পারে সে বিষয়েও নিজ অভিমত ব্যক্ত করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই সকল বক্তৃতার ফলে শাসকমহলে বেশ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। ভারতবর্ষের রক্ষণশীল সংবাদপত্রসমূহ কেশবচন্দ্রের উক্তিগুলির সমালোচনা না করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। 'অমৃত বাজার পত্রিকা

* কেশবচন্দ্র সেন: প্রথম জীবন, কার্ত্তিক ১৩৬৩।

* ইংলণ্ডে কেশবচন্দ্র সেন—শ্রীঅমিতাভ গুপ্ত। দ্রঃ শারদীয়া 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ১৩৬৪, পৃ. ২০৫-২১৩।

(তখন বাংলা ও ইংরেজী) বিলাতে কেশবচন্দ্রের কৃতকর্ম্মের আন্তরিক সমর্থক ছিলেন। 'সোমপ্রকাশ' ছিলেন তাঁহার উপর বড়ই চটা, তাঁহার রাজনৈতিক কার্য্যেরও নিন্দায় যখন এই পত্রিকাখানি রত হইলেন তখন 'ঢাকাপ্রকাশ' ও 'অমৃত বাজার পত্রিকা' কঠোর ভাষায় ইহার নিন্দাবাদ করেন। 'পত্রিকা' কেশবচন্দ্রের সমর্থনে লেখেন :

"কেশববাবু ধর্ম্মশাস্ত্র বক্তা বলিয়া ইংলণ্ডে মহা সমাদর পাইয়াছেন, রাজনৈতিক বক্তা বলিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহার বোধ হয় সেখানে স্থান হইত না। তাঁহার বক্তৃতাশক্তিও চমৎকার আছে, ইংলণ্ডবাসীরা তাঁহাকে ধার্ম্মিক ও সত্যবাদী বলিয়া লইয়াছেন। এমত অবস্থায় কেশববাবুর দ্বারা আমরা দেশের কত উপকার প্রত্যাশা করিতে পারি। অতএব তাঁহাকে ভারতবর্ষীয় মাত্রেরই প্রাণপণে সমর্থন না করিয়া যেখানে কেহ কেহ বিপক্ষতা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেখানে আমরা ইহাই বলি যে, ভারতবর্ষের পাপের অদ্যাবধি শেষ হয় নাই।" (২১ জুলাই, ১৮৭০)

বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচয়, সভাসমিতিতে যোগদান, বিভিন্ন স্থলে জনসভায় বক্তৃতা—এই সমুদয় কার্য্যেই কেশবচন্দ্র সকল সময় ক্ষেপণ করেন নাই। তিনি ইংরেজ পরিবারের অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পর্কেও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন। এই কাঠামোই তাহাদের সর্ব্ববিধ উন্নতির মূল। ভারতবর্ষে ফিরিয়া কেশবচন্দ্র জাতির আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাবিষয়ক উন্নতির দিকে সবিশেষ মনোযোগী হইলেন। জাতি-গঠনের মূলে যে রচনাত্মক কার্য্য তাহা ভুলিলে চলিবে না।

* "India Called Them" by Lord Beveridgo. P. 85

চিতা জ্বলে

শ্রীআরতি দত্ত

শীতের কুহেলী-ঘেরা অস্তমিত দিনান্তের পথে
একদিন এসেছিনু কর্ম্মক্লান্ত চেনা পথ হতে
তোমার মরণস্নিগ্ধ উদাত্ত আহ্বানে,
পথপ্রান্তে ক্লান্ত রবি রোমাঞ্চিত ধরণীর পানে
চেয়েছিল বিদায়ের চোখে, মত্ত কুহেলিকা
মুছে দিল সে মিলন, জ্বলে বহ্নিশিখা
মরণের প্রমত্ত উল্লাসে, জীবনের স্মৃতিচিহ্নলিখা
নিভে আসে চিতাবহ্নিতলে—
ধুমায়িত আকাশের তলে, তবু চিতা জ্বলে!

মায়া, মোহ, চাওয়া, পাওয়া, জীবনের স্বপ্নভরা দিন
এমনি মরণতলে চিতাভস্মে হতেছে বিলীন।
তবুও মানুষ কল্পনার মায়ারথে দুদিনের তরে
হাসে কাঁদে ঘর বাঁধে, কত সাধ করে,
ভ্রান্তি তার ছেয়ে থাকে শেষ পরিণাম,
ভুলে যায় প্রাচুর্য্যের কতটুকু দাম!
আজি তব পথপার্শ্বে, হে মহাশ্মশান—
শুনি যেন মরণের প্রশান্ত আহ্বান,
ভালো লাগে, তাই তব শুষ্ক বক্ষতলে
ছুটে আসি দিনশেষে, দূরে চিতা জ্বলে।

তোমাময় আমি

অনামিকা

তোমারে ঘিরিয়া যে স্বপন জাগে
ব্যর্থ স্বপন একি?
তবে কেন আজ আমার আমারে
তোমাময় শুধু দেখি?

আমার মাঝারে তব এ প্রকাশ
অপরূপ অভিনব।
আমার মধ্যে রূপ নিল যেন
নূতন মূর্ত্তি তব।
জনম লভিলে তব প্রিয়া মাঝে
তাই এত উৎসব?
তাই কি আজিকে ধরাভরা এই
আনন্দ-কলরব?

তবে থাক পড়ে থাক জীবনবেদের—
অপূর্ণতার গ্লানি;
তোমারে বরিণু এ জীবনে মোর
বিধাতা-আশিস মানি।

বিনোদিনী

শ্রীকৃষ্ণধন দে

ওগো নেয়ে, তুমি পাল তুলে কোথা যাও ?
একটি গাঁয়ের সন্ধান আজো পাও ?
মোহানা পেরিয়ে ছোট গাঙে দিও পাড়ি,
দেখো ডান দিকে সুপারীগাছের সারি,
বুড়ো বটগাছ ভাঙা দেউলের পাশে,
গাঁয়ের মেয়েরা জল নিতে যেথা আসে,
শুধায়ো তাদের সেটা কি কেতকী গ্রাম ?
—ভুলে গেছে সবে যেথা বিনোদিনী নাম।
বিশ বছরের পুরানো সে-সব কথা
কারো মনে আর জাগায় না আকুলতা,
তবু চেয়ে দেখো সবুজ মাঠের 'পরে
শঙ্খচিলেরা নেমে এসে ভিড় করে,
তবু চেয়ে দেখো বাঁ দিকের কেয়াঝাড়ে
বিনোদিনী আজো দাঁড়ায় যে নদীপাড়ে।

ওগো নেয়ে, তুমি পাল তুলে কোথা যাও ?
একটি গাঁয়ের সন্ধান আজো পাও ?
জলভরা ছোট কলসীটি লয়ে কাঁখে
যদি কোন মেয়ে পথ চেয়ে সেথা থাকে,
বনতুলসীর গন্ধ-বুলানো দেহে
গোধূলির রবি সোনা ঢালে কত স্নেহে,
গ্রাম-দেবতার ভাঙা মন্দির-পাশে
বৈকালী ডালি সাজায়ে পূজারী আসে,
সন্ধ্যা বিছায় ছায়ার আঁচলখানি,
প্রথম তারাটি কি স্বপন দেয় আনি,
উঠি-উঠি চাঁদ সেঁজুতিবনের 'পরে,
ঘাসের গন্ধে মাঠের বাতাস ভরে,
পল্লীর পথে ঝিল্লীর ঝিনিঝিনি,
হয় ত সেথায় দেখা দেবে বিনোদিনী

ওগো নেয়ে, তুমি পাল তুলে কোথা যাও ?
একটি গাঁয়ের সন্ধান আজো পাও ?
বকুলের ডালে দেখো দোলা বাঁধা আছে,
কিশোরী মেয়েরা ফুল নিতে জুটিয়াছে,
ছুটাছুটি করে সেথা তারা এলোচুলে
হাসে অকারণ কলরব-ঢেউ তুলে,
ফিরে যেও সেথা বিশটি বছর আগে
মনের ছবিতে যদি বিনোদিনী জাগে!
ঝুমকো লতায় ঘেরা বেড়াটির পাশে
গাছে গাছে যেথা করঞ্জ ফুল হাসে,
তারি তল দিয়ে পথটি গিয়াছে ঘুরে
সে পথে দেখিবে একটি কুটীর দূরে,
বাতাসে কাঁপিছে কেয়াপাতা অবিরাম,
দেখা পাবে তার বিনোদিনী যার নাম।

ওগো নেয়ে, তুমি পাল তুলে কোথা যাও ?
একটি গাঁয়ের সন্ধান আজো পাও ?
পূবের আকাশে মেঘ জমে কালো কালো,
সাঁঝ না হতেই নিভেছে দিনের আলো,
গাঙে নাচে ঢেউ, বনে বনে জাগে ঝড়,
ঈশানকোণে যে বাজ ডাকে কড়কড়,
হাজার নাগিনী মেলে বিদ্যুৎ-ফণা,
আকাশে বাতাসে প্রলয়ের ঝনঝনা,
ঝরে যায় পাতা, উড়ে উড়ে যায় ফুল,
ঢেউয়ের আঘাতে ভেঙে ভেঙে পড়ে কূল,
তালগাছগুলো ঝম্‌ঝম্ করে ত্রাসে,
দুরন্ত মেয়ে মাঠ হতে ছুটে আসে,
শুধু বলো তারে—"তোমারে যে আমি চিনি,
এ গাঁয়ের মেয়ে তুমি সেই বিনোদিনী।"

শ্রীদীপক চৌধুরী

লেখকের বিবৃতি

দুই

হ্যারিসন রোডের হোটেলটা ছেড়ে দেবার ইচ্ছে মহীতোষের আজকের নয়, কয়েক মাস আগের। সরু মত পাঁচতলা বাড়ীটায় হাওয়া-বাতাস পাওয়া যায়—মহীতোষ পায়। এত উঁচুতে ওর ধরনা যে, উল্টো দিকের কোটিপতির বাড়ীটা হাওয়া-বাতাস রুখতে পারে না। এমনকি তাঁদের টাকার উত্তাপ পর্যন্ত মহীতোষের গায়ে একবিন্দু ফোস্কা ফেলতে পারেনি। তবুও এবার সে হোটেলটা ত্যাগ করবার সিদ্ধান্তই করেছে। ছোটখাট একটা ফ্ল্যাট-বাড়ীতে উঠে যাওয়ার ইচ্ছাই ছিল। কিন্তু টাকার পরিমাণ এত কম যে, বিজ্ঞাপন পড়ে ভাড়া নিতে গেলে একটা স্নানঘর ভাড়া নিতেও ওর পুরো মাসের আয় যেত ফুরিয়ে। অতএব সে মাসীমার হোটেলেই উঠে যাওয়ার ব্যবস্থা মনে মনে পাকা করেছে। কিন্তু নতুন গণ্ডগোল বাধিয়েছেন ছোটসাহেব। শ্যামনগরে তাকে নাকি যেতেই হবে। যেতেই হবে? কেন যাবে? হোটেলের পাঁচতলার ছাদে পায়চারি করতে লাগল মহীতোষ ঘোষ। আপিস বন্ধ আজ। কেতকীর আসবার কথা আছে। সুতপাও আসবে বলে কত দিনই কথা দিয়েছিল, আসেনি। হোটেলের পাঁচতলায় এত দিন বাস করতে করতে সে প্রায়ই চেয়ে থাকত রাস্তার দিকে। কার্নিসের ওপরে হাতের কনুই দুটো ঠেকিয়ে রেখে রাস্তার লোক দেখত সে। দেখেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মানুষগুলোকে অত ওপর থেকে ছোট ছোট দেখায়। মানুষ দেখতে গিয়ে মহীতোষ মেয়েদেরও দেখত। কতদিন মনে হয়েছে, দেখতে ছোটই হোক না, দু'একটি মেয়ে কি পাঁচতলায় উঠে আসতে পারে না? এসে একটু গল্প করে গেলে বড় মেয়েদেরই বা ক্ষতি হ'ত কি? কিন্তু মহীতোষ বেঁচে যেত। মরুভূমির সঙ্গে পাঁচতলাটা সে তুলনা করতে চায় না। তবুও এক এক সময় চোখ দিয়ে জল পড়ত ওর। স্নেহ-মমতা, এমনকি নরম ব্যবহারের একটু স্পর্শ পেলেও হোটেলের জীবনটা এত কঠিন মনে হ'ত না। আপিসের অত্যাচারও সে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দোহাই দিয়ে সহ্য করে যেত। কিন্তু পরিবেশের পরিবর্তন হ'ল কই? কখনও-সখনও নিচে-ওপরে ওঠানামার সময় অপর বাসিন্দাদের ঘরে দু'একটি মেয়েকে গল্প করতে মহীতোষ দেখেছে—দাঁড়িয়ে গেছে একটু। তাইতেই যেন সে গঙ্গা-স্নানের পুণ্য নিয়ে আপিসে গিয়ে ঢুকেছে। কাজ করেছে ডবল উদ্যম নিয়ে। সুতপা বোধ হয় মহীতোষের এত বেশী খবর রাখে না—রাখতে চায়নি। অথচ এইটুকু ছাড়া মহীতোষের আর কোন ব্যক্তিগত খবর কিছু ছিল না। যাক সে জন্যে অনুতাপ করে লাভ নেই। চোখের জল ফেলবার মত দুর্বলতাকে সে জয় করেছে। মহীতোষ আর একা নয়। গোটা আপিসটাই ওর গায়ের সঙ্গে লেগে রয়েছে। এত বড় একটা বৃহৎ অস্তিত্বকে ছাদের ওপর থেকেও ছোট দেখায় না।

কার্নিসের ওপরে একটু বেশী ঝুঁকে দাঁড়াল মহীতোষ। হোটেলের দরজা দিয়ে কেতকী ঢুকছে। এসেছে কেতকী, কেতকী আসছে। মহীতোষ নীচে নামতে লাগল। চারতলা থেকে তিনতলায় নামল সে। নামতে হবে দোতলাতেও। মহীতোষ কেতকীকে একতলা থেকেই সঙ্গে করে নিয়ে আসতে চায়। হোটেলের বাসিন্দারা সবাই দেখুক—কি দেখবে যেন? প্রশ্নটার উত্তর খুঁজতে গিয়ে মহীতোষ দাঁড়িয়ে পড়ল কোন্ একটা তলার মাঝামাঝি জায়গায়। আধ মিনিট দেরী করতে হ'ল। কেতকী তখন ওর সামনেই এসে দাঁড়িয়েছে।

"এস, এস—" বেশ জোরে জোরে, গলার আওয়াজ ওপর দিকে তুলে, অভ্যর্থনার গায়ে মেদমজ্জার বাহুল্য দিয়ে মহী-তোষ বলতে লাগল, "তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। এস, দাঁড়িয়ে পড়লে যে?"

"আর ক'তলা বাকি?" জিজ্ঞাসা করল কেতকী। উত্তেজনার মুখে মহীতোষও চট করে বলতে পারলে না, ঠিক কোন তলার কোন্ জায়গায় সে দাঁড়িয়ে আছে। পেছন দিকে সিঁড়ির মুখে ঘরের নম্বরটা দেখে সে বলল, "এই আদ্ধেকটা উঠলে, আর মাত্র একটা।"

মহীতোষ সাড়ে তিনের মধ্যে তা হলে দাঁড়িয়ে পড়ে-

ছিল। যত তাড়াতাড়ি লাফিয়ে লাফিয়ে ও নামছিল ভেবেছিল, তত তাড়াতাড়ি সত্যিই সে নামতে পারেনি।

মহীতোষের ঘরে ঢুকে, না জিরিয়েই কেতকী বলল, "খবর শুনেছ? বড়সাহেব নাকি কোম্পানীর টাকায় সরকার কুঠিটা কিনছেন।"

"খুব ভাল। ওই মাড়োয়ারীটার গ্রাস থেকে হোটেলটা বাঁচবে। আমি ত ওখানেই উঠে যাব ভাবছি।"

"হোটেল থেকে হোটেলে গিয়ে লাভ কি? আমার কিন্তু নিরিবিলিতে আলাদা ভাবে থাকতে ইচ্ছে করে।" একটু বেশীই যেন এগিয়ে পড়ল মনে করে কেতকী পিছুবার চেষ্টা করল, "ছেলেবেলা থেকে হাজার রকম লোক দেখে দেখে আমার একলা থাকতে সাধ হয়। তুমি ত জান, রাঁচীতে আমাদের একটা হোটেল মত বাড়ী আছে?"

"হ্যাঁ, তুমি বলছিলে বটে, সেই বাড়ীটাই তোমার পরিচয়।"

"পরিচয়টা দেবার জন্যেই তোমার কাছে আজ এসেছি।"

"জানবার কৌতূহল কিন্তু আমার একটুও নেই, কেতকী!"

"কমরেড—" ফস করে কথাটা বেরিয়ে গেল কেতকীর মুখ দিয়ে। বেরিয়ে যখন গেছে তখন আর রোখবার দরকার নেই। কেতকী বিরতিটাকে আর বিলম্বিত করল না। সামলে নিয়ে বলল, "কমরেড, আমার দরকারেই তোমায় বলছি। তুমি ইউনিয়নের কর্মকর্তা, সবার সব ইতিহাসই তোমার জানা উচিত। তা ছাড়া কলকাতায় এসে সত্যি কথা বলার অভ্যাসটা একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এখন আমার কতটা উন্নতি হয়েছে তা কি তুমি জানতে চাও না?"

মুহূর্তের মধ্যে অভিভূত হয়ে পড়ল মহীতোষ। এত বেশী হ'ল যে, ওর মুখ দিয়ে আর একটি কথাও সরতে চায় না। চেষ্টা করে সরাল মহীতোষ, "তা হ'লে বলো, শুনি।"

পাঁচতলার ঘরে নতুন ঐশ্বর্য! উলটো দিকের কোটিপতির বাড়ীটাও কত ছোট দেখাচ্ছে আজ। দেখাক. ছোট হতে হতে বিন্দুর মত হয়ে যাক। বিন্দুটা গলে গিয়ে ঘামের মত শুষে যাক ধরিত্রীর বুকে, মহীতোষ সেদিকে আর দৃষ্টি দিতে চায় না। কেতকীর সামনে আজ আর রাজনীতির আগুন জ্বালাল না মহীতোষ। সুতপা আর কেতকী এক ডালের ফুল নয়। হয়ত সুতপা অনেক ওপরের ডালে ফুটে আছে, কেতকীর ডালটি সর্বনিম্নে। তা হোক, ফুল যে ডালেই ফুটুক তবুও সে ফুল। আলোচনাটা মহীতোষ নিজের মনে মনেই করছিল—করে সুখী হ'ল সে। সুখের জন্যেই সে পয়সা রোজগার করছে, সুখের জন্যেই সে বেঁচে আছে। এই ত ওর এক লাইনের রাজনীতি। অথচ, সুতপা হাজার লাইন না হলে যেন সুখ কথাটার অর্থও বুঝতে পারে না। মহীতোষের খুব ইচ্ছে হ'ল সুতপা এসে দেখুক, হ্যারিসন রোডের এই সরুমত লম্বা খাঁচের হোটেলের পাঁচতলার ছাদ থেকে সে আজ সুখের পায়রা ওড়াচ্ছে। পায়রাটি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে রাঁচীর কেতকী মিত্র।

"তুমি ত জান—" একেবারে খাঁটি মেয়েলি সুরে সুরু করল কেতকী—"আমার বয়স যখন ছ'মাস, বাবা তখন মারা গেলেন। মায়ের বয়স তখন আঠারো, মাত্র আঠারো। তার মানে, আমার আর মায়ের মধ্যে মাত্র আঠারো বছরের তফাৎ। এই কথাটার সবচেয়ে দরকারী দিকটা হ'ল আমার যখন বিশ বছর বয়স, মায়ের তখন আটত্রিশ। গোড়ার দিকে আর্থিক কষ্ট তাঁর যথেষ্টই হয়েছিল। কিন্তু আমি যখন যুবতী, তখন তাঁর কষ্ট কিছু ছিল না। তবে ঔদ্ধত্যও কখনও দেখিনি। রাঁচীতে বহু জায়গা থেকে হাওয়া পরিবর্তনের জন্যে লোক আসেন। মা পেইং-গেষ্ট রাখতেন। রেখে আসছেন বহু বছর আগে থেকেই। বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী এবং কলকাতার একাধিক ধনী ও প্রতিষ্ঠাবান লোকেদের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা মুখে মুখে সারা ভারতবর্ষে প্রচার হয়ে পড়ে। একবার যাঁরা আসতেন তাঁদের মধ্যে দেখেছি অনেকেই আবার আসবার জন্যে কথা দিয়ে যেতেন। আজ থেকে পাঁচ বছর আগে সকালবেলার ট্রেনে এক ভদ্রলোক এসে উপস্থিত হলেন আমাদের বাড়ী। পেইং-গেষ্ট। শহরে কোথায় খোঁজ পেয়ে তিনি এখানে চলে এসেছেন। জায়গা হবে কি? মা বললেন, হবে। টাকাকড়ির কথাও সব পাকা হয়ে গেল। আগাম দিলেন সাত দিনের। ভাল লাগলে আরও সাত দিন থাকবেন। শেষ পর্যন্ত তিনি দু' বছর রইলেন। আমি তাঁর দিকে যখন চোখ মেলে চাইলাম, তখন তাঁর ছ'মাস থাকা হয়ে গেছে। ধনীলোক নন, মধ্যবিত্ত। বয়স পঞ্চাশ, চুল সব পাকা। চুল বেশী ছিলও না, সবটাই প্রায় টাক। স্বাস্থ্য তাঁর এমন কিছু ভাল নয়। ভাল নয় বলেই ত রাঁচী এসেছিলেন হাওয়া পরিবর্তনের জন্যে। নেশা করতেন না, এমনকি শখ করে একটা সিগারেট পর্যন্ত খানিন। কোন সূত্রে তাঁর আত্মীয়স্বজন কিংবা বন্ধুবান্ধবকেও আমরা চিনতাম না। তিনি যা ঠিকানা দিয়েছিলেন তাতে আমরা জানতাম তিনি শ্যামবাজার অঞ্চলের লোক। ঠিকানা ভুল নয়, সেই ঠিকানা থেকে মাঝে মাঝে তাঁর কাছে চিঠি আসতো। তাঁর বড় ছেলে

লিখত খামে, স্ত্রী লিখতেন পোষ্টকার্ডে। বড় ছেলের বয়স তখন পঁচিশ। মোটামুটি ভাল চাকরীই করত সে। প্রথমে চিঠি আসত ঘন ঘন। বছর শেষ হওয়ার পর চিঠির সংখ্যা কমে গেল। ভদ্রলোক পেনশন পেতেন। স্বাস্থ্য ভাল নয় বলেই তিনি মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। মায়ের সঙ্গে তাঁর খুব ভাব হ'ল। প্রথমে আমি মায়ের পাশের ঘরেই থাকতাম। ছ'মাস পরেও আমি সেই ঘরেই ছিলাম, কিন্তু মা তাঁর ঘর বদলে ফেললেন। এমন ভাবে বদলালেন যে, তাঁর একটা আলাদা মহল হয়ে গেল। সবচেয়ে পুরনো চাকর ছাড়া সেদিকে কেউ যেতে পারত না। বুঝতেই পারছ, সেই ভদ্রলোকটিও ওই মহলে থাকতেন। এক ঘরে থাকতেন কিনা দু'বছর চেষ্টা করেও আমি দেখতে পাইনি। কিন্তু শহরের যারা বাঙালী তারা দেখতে পেল। যে-সব সম্বন্ধ মানুষ সহজে দেখতে পায় না, সেগুলোই তাদের চোখে পড়ল আগে। শুনলে তুমি আশ্চর্য হবে যে, প্রথম সাত দিনের পরে শিবদাস বাবু একদিনের জন্যেও বাড়ীর বাইরে বেরোননি। ক্রমে ক্রমে শুধু রাঁচী নয়, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে দুর্নামের হাওয়া বইতে লাগল। পেইং-গেষ্ট শেষ পর্যন্ত কেউ আর এসে এখানে উঠত না।"

দম নেবার জন্যে কিংবা পুরনো ঘটনা স্মরণ করবার জন্যে কেতকী একটু থামল।

মহীতোষ জিজ্ঞাসা করল, "মাকে তুমি প্রশ্ন করোনি?"

"প্রথম দিকে ঘন ঘন করতাম, শেষের দিকে একটাও না। তিনি শুধু বলতেন, বাড়ীঘর টাকা-পয়সা সব তাঁর। জবাবদিহি করতে তিনি রাজী নন। আমায় রোজগারের পথ দেখতে বলতেন তিনি। কিংবা বিয়ে করতে। বিয়ে করতে যখন বললেন, তখন রাঁচীর ডুরাণ্ডাপাড়া দিয়ে বাঙালীরা যাওয়া-আসা করত বটে, কিন্তু বিয়ের পাত্র সেখানে আসত না। এই প্রথম আমি ভবিষ্যতের কথা ভাবতে লাগলাম। ওখানকার কলেজে আই-এ পড়ছিলাম আমি। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে উঠেও এলুম। শিবদাস বাবুর যখন এক বছর থাকা হয়ে গেল, আমি তখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে উঠেও বেরিয়ে এলাম কলেজ থেকে। কেবল মেয়েরা নয়,. কলেজের বাঙালী অধ্যাপিকারাও আমাকে কেন্দ্র করে গল্পগুজব সুরু করে দিলেন। প্রথমে আড়ালে, শেষের দিকে একেবারে সামনাসামনি। কথাটা রটল মা এবং আমাকে কেন্দ্র করে। যদিও আমাদের দু'-জনের মধ্যে আঠারো বছরের তফাৎ, তবুও পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকলে মা-মেয়েকে চিনে নিতে লোকের অসুবিধেই হ'ত। মায়ের মুখে নয়, বাইরের লোকের মুখে শুনতে পেলুম, শিবদাসবাবু বিরাট জমিদার। শ্যামবাজার থেকে নয়, বেলগাছিয়া কিংবা পাইকপাড়া থেকে তিনি এসেছেন। যদিও শিবদাসবাবুর উপাধি ছিল চ্যাটার্জি, কিন্তু এঁদের মারফৎ খবর রটল তিনি সিংহ। তাঁকে সিংহ এবং জমিদার না করলে পাইকপাড়ার ঠিকানার কোন অর্থ থাকে না। শিবদাসবাবুর গায়ের রং ময়লা। অথচ সারা শহরে তিনি ধবধবে ফরসা মানুষ বলে প্রচারিত হতে লাগলেন। শিবদাস-বাবু প্রথম সাত দিনের মধ্যে দিন দুয়েক বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। সাইকেল রিকসায় চেপে প্রথম দিন বেরিয়েছিলেন। দ্বিতীয় দিন বেরলেন হেঁটে, ফিরলেন রিকসায়। কিন্তু কলেজের এক অধ্যাপিকার মুখে আমি নিজের কানে শুনে এলাম, শিবদাস সিংহ মস্ত বড় একটা গাড়িতে আমাদের নিয়ে হাওয়া খেতে যান। অধ্যাপিকা কলকাতার টালা ট্যাঙ্কের সন্নিকটে থাকতেন। সেখান থেকেকলেজ ষ্ট্রীটের বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ পড়তে আসতেন। পাইকপাড়ার সিংহবাবুদের বড় গাড়ীটা তিনি বাসে বসে টালার পোল পার হতে দেখেছেন, একদিন নয়, অনেক দিন। সেই গাড়িটাই নাকি আমাদের বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। অধ্যাপিকা নিজে দেখেননি, তবে লোকের মুখে যে রকম বর্ণনা তিনি শুনেছেন তাতে পাইকপাড়ার সেই গাড়িটাই হবে। আর সেই গাড়িটাই যদি হয়, তা হলে শিবদাস সিংহের অনেক টাকা—লক্ষ লক্ষ, কিংবা কোটির চেয়েও বেশী। কলেজের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি শুধু টাকার হিসেবই দিচ্ছিলেন না, কি করে অত টাকা এল তার মূলের খবরও দিলেন। জমিদারী না থাকলে কি হবে, উচ্ছেদ-আইন পাস হওয়ার আগেই শিবদাসবাবু লাখ পঞ্চাশের কোম্পানীর কাগজ কিনে ফেললেন। জমিদারী বেচবার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। কি করে পেলেন? মুচকি হেসে অধ্যাপিকা বললেন, জমিদারী-উচ্ছেদ আইনের কথা যখন বাংলা দেশের কেউ জানত না, শিবদাস সিংহ তখন জানতেন। ভাবছ, আমি প্রতিবাদ করিনি? করেছিলাম। সব কথা মেনে নিয়েও আমি যখন বলতাম যে, তিনি সিংহ নন, চ্যাটার্জি—মহীতোষ, তুমি জান না, এমন ভাবে এঁরা সবাই হেসে উঠতেন যে, শেষ পর্যন্ত আমিও তাঁকে সিংহ বলে ভাবতে লাগলাম। ঘর থেকে তিনি বাইরে আসতেন না, তবুও যেন হঠাৎ কখনও সখনও আমার মনে হ'ত, পাইক-পাড়ার সেই বড় গাড়িটায় চেপে আমরা হাওয়া খেতে যাচ্ছি রামগড় পাহাড়ের দিকে। এমনি অবস্থায় দুটো বছর কেটে গেল। মায়ের কিছু ক্ষতি হ'ল কিনা জানি না, আমার হ'ল। শিবদাস চ্যাটার্জি নামে একজন পেনসনপ্রাপ্ত বুড়ো মানুষের সঙ্গে নামটা আমার জড়িয়ে গেল। লোকের মুখে

শুনে মনে হ'ল, কেবল ফাঁকা নামটা নয়, আমার দেহটাও কলঙ্কিত হয়েছে। তাতেও বিচলিত হইনি আমি। বিচলিত হলাম দু'বছর পরে, যেদিন শিবদাসবাবুর বড় ছেলে অমিয় চ্যাটার্জি এসে উপস্থিত হ'ল আমাদের বাড়ী। বাবাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছে সে। আগেই বলেছি বয়স তার পঁচিশ বছরের বেশী নয়। এখন বলছি, অমিয় দেখতেও সুন্দর—অবিবাহিত। খেলোয়াড়দের মত শরীরের বাঁধুনি তার শক্ত, গায়ের রং ফরসা। আরও নানাবিধ গুণের অধিকারী ছিল সে। গান গাইতে পারে। পারে যে তার প্রমাণ অমিয় আজও কলকাতার বেতার-কেন্দ্রে গিয়ে গান গায় নি। কিন্তু বেতার-কেন্দ্রে সে গেছে—গেছে বাংলা-সাহিত্যের সমালোচক হয়ে। অমিয়র শুধু একটা দোষই আমার চোখে পড়েছিল। সে তোতলায়, কথা কইতে কইতে প্রায়ই তার জিভ যেত আটকে। সাহিত্যের সঙ্গে ওর বিশেষ কোন যোগাযোগ ছিল না, তবুও ওকে সমালোচক হতে হয়েছিল। বেতার-কেন্দ্রের একাধিক পরিচালকের মধ্যে ওর এক বন্ধুও ছিলেন উচ্চাসনে উপবিষ্ট। অমিয় বাধ্য হয়েই সমালোচক হ'ল। বন্ধুটির জন্যেই হতে হ'ল। তিনি নিজে সাহিত্য ভালবাসেন। বিনা খরচে উপহারের বই পেয়ে পেয়ে তাঁর সাহিত্যপ্রীতি জন্মায়। এসব কথা অমিয় আমায় বলেছিল। ওর সামনে আমিও একদিন গান গেয়েছিলাম। গান শুনে সে আমার কলকাতায় বেতার-কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার জন্যে উৎসাহ দেখিয়েছিল এবং নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা প্রমাণ করতে গিয়ে সে তার বন্ধুর কথা উল্লেখ করে। সেই সঙ্গে ওর নিজের কীর্তির দৃষ্টান্ত দিতেও বাধ্য হয়। তোতলামির জন্যে কলকাতার কেন্দ্রে ওর কোন অসুবিধে হয় নি। দু' বছর পর পিতাপুত্রের মিলন হ'ল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম আমি। বাবাকে সে নিয়ে যেতে এসেছে। শুনলাম, শিবদাসবাবু দু'দিন পরেই চলে যাচ্ছেন। এই দু'দিন অমিয়র সঙ্গে মেশবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছি। তোমাকে বলতে আপত্তি নেই মহীতোষ, ওই দু'দিনের মধ্যে আমি আমার ভবিষ্যতের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাই নি। ভেবেছি, শিবদাসবাবুর জন্যে যতটা ক্ষতি হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী লাভ হবে অমিয়র জন্যে। অমিয়র মূলধন আছে—বয়স ও স্বাস্থ্যের মূলধন। ওর সঙ্গে দু'দিন পর আমিও কলকাতা যেতে পারি কিনা তেমন প্রশ্ন যে অমিয়কে করি নি তাই-বা বলি কি করে? করেছি—অবশ্যই করেছি। ঝড়ের মুখে অমিয়-বন্দরটিকে নিরাপদ মনে হয়েছিল। দু'দিন পরে শিবদাসবাবুকে ট্রেনে তুলে দিয়ে অমিয় ফিরে এল। বেরুবার আগে থেকে ঘরের মধ্যে দরজায় খিল লাগিয়ে বসেছিলাম আমি। শিবদাসবাবুর মুখ আমি দেখতে চাই নি। গত দু'বছরের অদর্শনে তাঁর মুখের সঠিক আকৃতি আমার মনেও ছিল না। সে যাক, তিনি বিদায় হয়ে গেলেন। ফিরে এসে অমিয় বলল, 'ট্রেন ছাড়বার পরও আমি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দূরের সিগনালটা যখন পার হয়ে গেল, তখন বেরিয়ে এলাম।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'এত দেরি করলে কেন? ট্রেন ত প্রায় এক ঘণ্টা আগে ছেড়ে গেছে?'

'বাইরে বেরিয়ে দেখি বাংলা দেশের দু'জন সাহিত্যিক একসঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছেন। একজন কবি, সমালোচক ও নামকরা মাসিক কাগজের সম্পাদক। আর অন্যজন সরকারী চাকরী করতেন, সেই সঙ্গে সাহিত্য। এখন তিনি চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। দু'জনেই স্টেশনের উলটো দিকের হোটেলে এসে উঠেছেন—বি-এন-আরের হোটেল। এসেছেন আলাদা আলাদা। এঁরা দুজন সাহিত্য-ক্ষেত্রেও আলাদা ছিলেন। আজ একসঙ্গে দেখলাম। বিকেলে চা খেতে ডেকেছেন আমায়।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমায় কেন?'

'বেতার-কেন্দ্র থেকে আমি উপন্যাস-গল্পের সমালোচনা করি যে।'

বাড়ীর সামনের বারান্দায় বসে গল্প করছিলাম আমরা। পুরনো চাকরটা এসে বলল, অমিয়কে মা একবার ডাকছেন। বোধ হয় তিনি জানতে চাইছেন যে, শিবদাসবাবু নিরাপদে গাড়িতে উঠতে পেরেছেন কিনা। অমিয় মায়ের সঙ্গে দেখা করতে ভেতরে গেল—তার পর যখন বেরুলো তখন ছ'মাস পার হয়ে গেছে!"

"কি বললে?" মহীতোষের গলায় যেন ইনক্লাব জিন্দা-বাদের সুর!

"বললাম, অমিয়কে ছ'মাস আর দেখতে পাই নি। প্রথম মাসে প্রতি সপ্তাহে পোস্টকার্ড আসত একটা করে। খামও আসত একখানা। শিবদাসবাবু পোস্টকার্ডে লিখতেন, আর তার মা লিখতেন খামে। মাস-দুই পর চিঠির সংখ্যা কমে এল। অমিয়র সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা আমি কম করি নি। কিন্তু মা সব সময়েই আমার ওপর চোখ রাখতেন।"

"তাঁকে প্রশ্ন কর নি?"

"প্রথম দু'দিন জবাব পেয়েছি, তার পরে পাই নি।"

"কি জবাব তিনি দিয়েছিলেন?"

"একই রকম। বাড়ীঘর, টাকাপয়সা, চাকরবাকর সবই তাঁর। অসুবিধে বোধ করলে, অন্য জায়গায় উঠে যেতে বললেন আমায়। কিংবা বিয়ে করতেও পারি। মায়ের জবাব শুনে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'পাত্র কোথায়?'

'রাজা, জমিদার, কেরানী, মেথর, মুদ্দোফরাস, চাই কি মাড়োয়ারীও যদি পাস, বিয়ে করতে পারিস। চাকরি-বাকরি একটা দেখে নে না।' মহীতোষ, কোন কিছু নেওয়ার আগে শহরে একদিন বেরুলাম। এক সময়ে বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা আমার কম ছিল না। তাদের সঙ্গেই দেখা করতে গেলাম। গিয়ে অবাক হলাম খুবই। সবাই আমার সঙ্গে হেসে কথা কইল, অমিয়কে নিয়ে ঠাট্টা কেউ করল না। তার খবর সবাই রাখে। সে দেখতে ফরসা, সুন্দর এবং জোয়ান, তাও এরা জানে। অথচ তার নাম জড়িয়ে আমার গায়ে মৃদু খোঁচা পর্যন্ত কেউ মারল না! বরং আমার উলটো ধারণাই হ'ল। আমি যেন সতী-সাধ্বীর পুণ্য আজ মাথায় করে নিয়ে এসেছি। শিবদাসবাবু বিদায় হওয়ার পর আমার চরিত্রে আর কোন দাগ নেই! এই প্রথম—হ্যাঁ, প্রথম আমার মনে হ'ল, এদের কথাগুলো সব অশ্লীল। আমি চেয়েছিলাম, অমিয়র সঙ্গে জড়িয়ে আমার বিরুদ্ধে ওরা দুর্নামের তুফান তুলুক। মহীতোষ, তুমি হয়ত জিজ্ঞেস করবে, তাতে লাভ কি হ'ত? লাভ কিছু হ'ত না, কিন্তু ব্যাপারটা স্বাভাবিক হ'ত। আমার দেহে অশ্লীলতার আঁচ লাগত না। আমার মত সুন্দরী স্বাস্থ্যসম্পন্নার মুখে চুণকালি মাখিয়ে দিল অমিয়! তাকে আমি আকর্ষণ করতে পারলাম না। ইতিহাসের ঔরঙ্গজেব আমায় দেখলে কি করতেন জানি না, কিন্তু অমিয় আমায় উপেক্ষা করল! প্রতি মুহূর্তের নৈতিক মৃত্যু আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। পালিয়ে এলাম। দু'বছর আর রাঁচীর দিকে যাই নি। অমিয় ছ' মাস পরে ফিরে এসেছিল কলকাতায় সে খবর আমি রাখি। মায়ের পরিচয় আমি জানতে পারলাম না। মহীতোষ, তোমার কি মনে হয়?''

"মনে হয়, তোমার মা বোধ হয় তুকতাক জানেন।''

"আমার তা মনে হয় না। তা যদি হ'ত, তবে শিবদাস বাবুকে নিয়ে সময় নষ্ট করতেন না। পয়লা নম্বরের পেইং-গেষ্টের ভিড় ত সেখানে কম ছিল না। পয়সা ছাড়া, এক পেয়ালা চা দিয়েও তিনি কাউকে আপ্যায়ন করেন নি।''

"তবে?" মহীতোষ উঠে বসল।

"সে প্রশ্ন ত আমারও। হয় ত চেষ্টা করলে, প্রশ্নের উত্তর একটা পাওয়া যাবে। ভাবছি, আবার আমি রাঁচী যাব।"

"তার আগে চল, মাসীমার ওখানে যাই। তাঁকে কথা দিয়ে আসি, দোতলার দু'খানা ঘর আমরা নিলাম।"

"আমরা?"

"আমরা—তুমি আর আমি।"

"তপাদি'র ঘরের পাশে?"

"তাই।"

লটারী পাওয়ার উত্তেজনা যেন পেয়ে বসল কেতকীকে। মিনিট পাঁচেক পর্যন্ত মুখ দিয়ে তার কথা বেরুলো না। হ্যাণ্ড-ব্যাগটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। মনে হ'ল, কথা যেন এখনও তার ফুরয় নি। রহস্যের মুখে আব্রু দেওয়া আছে। এ নতুন রহস্য, নতুন আব্রু।

মহীতোষ বলল, 'মাসীমার পায়ের ধুলো নেব আমরা এবং তা আজই! তোমার আপত্তি নেই ত?"

"আপত্তি? না।" এই বলে সে হ্যাণ্ডব্যাগটা খুলে ফেলল। সিদ্ধান্তে পৌঁছতে ওর আর সময় লাগল না, ছোট সাহেবের লেখা চিঠিখানা ব্যাগ থেকে বার করে নিয়ে কেতকী বলল, "পড়ে দেখ।"

"কি আছে ওতে?''

"আমার স্বপ্নের চিত্র—ব্ল্যাক এ্যাণ্ড হোয়াইট।''

"আমি দেখতে চাই নে, ছিঁড়ে ফেলতে পার।''

"মহীতোষ, এ চিঠিখানা তুমি দেখবে বলেই সঙ্গে নিয়ে এসেছি। নইলে আগেই আমি ছিঁড়ে ফেলতাম।''

চিঠিখানা পড়ল মহীতোষ। একবার নয়, দু'বারই পড়ল সে। তার পর টেবিলে স্তূপীকৃত কাগজের ওপর চিঠিখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে বলল, "একদিন একসঙ্গেই আমরা রাঁচী যাব। তোমার মা আমাদের পেইং-গেস্ট রাখবেন ত? কেতকী—''

"মহীতোষ—"

কেউ কিছু বলল না। দু'জন দু'জনের দিকে চেয়ে রইল শুধু। সরু লম্বা ধাঁজের হোটেলটার পাঁচতলার ছাদে প্রচুর হাওয়া আজ। কেতকীর দু'-একটা চুল মহীতোষের মুখের ওপর উড়ে পড়ল। আদিম মানুষের মুখের স্বাদ ভাল লাগল আজ—কেতকী এবং মহীতোষ দু'জনারই।

তিন

ধর্মঘটের বিজ্ঞপ্তি পেশ করা হয়ে গেছে। বড়সাহেবের হাতে পৌঁছে দিয়ে এসেছে মহীতোষ নিজেই। দাবির দফা একটা নয়, অনেক। মহীতোষকে সরাবার চেষ্টা না করলে হয়ত এত তাড়াতাড়ি কোন দাবির কথা উঠতই না। কিন্তু এখন উঠেছে। অ্যাকশন কমিটি তৈরী হয়েছে। মহীতোষের বদলির অর্ডার প্রত্যাহার করলেই চলবে না। মাইনে বাড়াবার দাবি মানতে হবে। পুজো আসছে, পুজো-বোনাস চাই। ক্যাণ্টিনের জন্য দু'খানা ঘর চাই। কর্মচারীদের অসুখ করলে ডাক্তার পাওয়া যায় না। পেলেও অনেক

ভিজিট, ডাকা সম্ভব হয় না। বৌকে সন্তুষ্টকরবার জন্যে বাচ্ছা ছেলেকে হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাওয়াতে হয়। তাকে বোঝাতে হয় যে, হোমিওপ্যাথি ওষুধই হচ্ছে খাঁটি ওষুধ। ওতে ব্যবসা নেই, ব্যবসা সব এলোপ্যাথির রাজ্যে। অতএব কর্মচারীদের জন্যে এলোপ্যাথি চিকিৎসার বন্দোবস্ত করে দিতে হবে। দাবির তালিকা হাতে পেয়ে বড়সাহেব মনোযোগ দিয়ে পড়লেন। একটা দাবিও অন্যায় দাবি বলে মনে হ'ল না তাঁর। বিলেতের আপিসে এর চেয়েও অনেক বেশী সুবিধে দেওয়া হয়। কিন্তু এখানে ক্ষমতা তাঁর সীমাবদ্ধ। তিনি চাকরি করতে এসেছেন, তাঁর হাত-পা বাঁধা। বিলেতের আপিসের সঙ্গে দু'-তিন দিন শুধু তার বিনিময় চলল। হেওয়ার্ড সাহেবের সাধ্যে যতটা কুলোয় ততটা তিনি করলেন। প্রথম দিনের তারগুলোতে আশার কথা ছিল। কোম্পানীর ডিরেক্টররা মিটিং ডাকছেন। একটা মিটিং হয়েও গেছে। হেওয়ার্ড সাহেবের সহানুভূতির কথা সব মিটিংএ পেশও হয়েছিল। ডিরেক্টরা সন্তুষ্ট। কোম্পানীর একটা বড় গুদাম-ঘর চাই। গড়িয়ায় একটা বাড়ী পাওয়া গেছে, জমিও কম নয়! ভাড়া নেওয়ার চাইতে কিনে ফেলা ভাল। এত সস্তায় কলকাতায় এত বেশী জমি, তাও দোতলা বাড়ীশুদ্ধ, পাওয়া খুব ভাগ্যের কথা। কোম্পানীর যখন পুঁজি আছে তখন কিনে ফেলাই ভাল। বিলেতের আপিস থেকে পাকা আদেশ তাড়াতাড়ি পৌঁছনো চাই। বাড়ীটার জন্যে অন্য খদ্দেররাও সব ওৎ পেতে বসে আছে, ইত্যাদি। গত দু'দিনের মধ্যে যে সব জবাব এসেছে তাতে পাকা-আদেশ পাওয়া যাবে—যাবেই ভাবলেন হেওয়ার্ড সাহেব। জেটমলকে টাকা সব দিয়ে দেওয়া হবে বলে তিনি খবরও পাঠিয়েছেন। খবর পেয়ে জেটমল খুশী হয় নি।

কিন্তু দিনতিনেক পরে বিলেতের জবাবগুলো সব এলোমেলো হতে লাগল। মাইনে কিছু বাড়ানো যেতে পারে। হেড আপিস তার করেছে, বাড়ী কেনা এখন কি উচিত হবে? এসপ্লানেড থেকে গড়িয়া কত দূর? এমনিধারা প্রশ্নের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। হেওয়ার্ড সাহেবের সন্দেহ হ'ল, অন্য দিক থেকেও হেড-আপিসের সঙ্গে তার-বিনিময় চলছে। ওখানে বসে ডিরেক্টরেরা এদিকের খুঁটিনাটি খবরও সব পাচ্ছেন। কোম্পানীর গুদামে যে, তিনি ইউনিয়নকে আপিস খুলতে দিয়েছেন তাতে ডিরেক্টররা অসন্তুষ্ট হন নি। কিন্তু এত অল্প ভাড়ায় দেওয়াতে সন্তুষ্ট হবেন কি করে? ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীটে প্রতি স্কোয়ার-ফুট ফ্লোর-স্পেসের রেট যে কত তাও তাঁরা জেনেছেন। প্রতি দিনই হেওয়ার্ড সাহেবের বিস্ময় বাড়ছে। এখান থেকে কে তার পাঠাচ্ছে? কর্মচারীদের যাতে ভাল হয় সেই জন্যেই চেষ্টা করছেন তিনি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তাঁর চেষ্টার কুঁড়িতে ফল ধরবে না। গড়িয়ার কুঁড়িটি ঝরেই গেছে বলে ভাবলেন বড়সাহেব। কর্মচারীদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরও উত্তেজনা বাড়তে লাগল।

আপিসের পরিবর্তনও চোখে পড়ল সবার। মহীতোষকে যেসব রুই-কাৎলারা পুঁটিমাছ ভেবে এযাবৎকাল তার দিকে চেয়ে দেখেন নি, তাঁরা এখন ওকে ভাল করে দেখছেন, ইজ্জৎ বেড়েছে মহীতোষের। শুধু মহীতোষের নয়, কম মাইনের পুঁটিমাছদের সবার। বড়বাবু পর্যন্ত অরিন্দমের সঙ্গে কথা কইছেন! অরিন্দমের কাছে বেয়ারা মারফৎ বড়বাবু কাল নাকি এক বাক্স কাঁচি সিগারেটও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিছুদিন আগে অরিন্দমকে একটা বিড়ি দিয়েও সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করেন নি তিনি। সন্তুষ্টি, অসন্তুষ্টির কথাটা বড় নয়, উল্লেখযোগ্য নয়। মহীতোষ ভাবল, আপিসের মাঝখানে এরই মধ্যে একটা বিপ্লব ঘটে গেছে। কর্মচারীরা মানুষ হিসেবে সম্মান পেয়েছে। পুরো না পেলেও কিছুটা পেয়েছে, ক্রমে ক্রমে পুরোই পাবে। যারা মেহনত বেচে পয়সা রোজগার করছে তাদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ থাকতেই পারে না। মাইনের উঁচু-নীচু থাক, তাতে মহীতোষের আপত্তি নেই।

মহীতোষের টেবিলের সামনে বড়বাবু এসে দাঁড়াবেন তেমন স্বপ্ন পাগল পর্যন্ত দেখে না। আজ তিনি একটা ফাইল হাতে নিয়ে মহীতোষের সামনে এসে বললেন, "এই যে মহীবাবু—ফাইলটা একটু দেখুন ত—"

"ছি ছি, আপনি আবার উঠে এলেন কেন? আমাকে ডেকে পাঠালেই পারতেন।" মহীতোষ উঠে দাঁড়াল।

"থাক, থাক, বসুন আপনি। দু'পা হেঁটে আসতে আমার এমন কষ্ট কি হ'ল? সারাটা দিন বসে বসে ডায়াবেটিস ডেকে নিয়ে এলাম।" মাথাটা মহীতোষের দিকে হেলিয়ে দিয়ে বড়বাবুই বললেন, "ধর্ম্মঘট ছাড়া আর ত কোন পথ দেখতে পাচ্ছি নে। পয়লা তারিখ থেকে ধর্ম্মঘট হবে ত?"

"দাবি না মানলে হবে।"

খবরটা সংগ্রহ করে তিনি এসে আবার নিজের চেয়ারে বসে পড়লেন।

একটু আগে লাহিড়ী সাহেব চারতলা থেকে নেমে এলেন। বড়সাহেব তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। হেওয়ার্ড সাহেব নাকি অনুরোধ করেছিলেন, "আপাতত মহীতোষকে বদলি করার দরকার নেই। তুমি তোমার অর্ডারটা প্রত্যাহার কর, মিষ্টার লাহিড়ী!"

"আপিসের ডিসিপ্লিন সব নষ্ট করেছে মহীতোষ।

প্রত্যাহার করা অসম্ভব। ইচ্ছে হয়, আমার অর্ডার তুমি বাতিল কর।"

"মিষ্টার লাহিড়ী, তবুও একবার তোমায় ভেবে দেখতে বলছি—"

"ভেবে দেখেছি। আমি প্রত্যাহার করতে পারি নে।"

হেওয়ার্ড সাহেব বার বার পাইপ ধরাতে লাগলেন। আজ সকালে যে বিলেত থেকে কেব্‌লটা এসেছে তাতে তাঁর আঘাত লেগেছে খুব। তাঁর একটা অনুরোধও কোম্পানী রাখতে চায় না। বড় মিটিংটা আগামীকাল বসবে, সব ক'টি ডিরেক্টরই সেই জন্যে লণ্ডনে এসে হাজির হয়েছেন।

মিষ্টার হেওয়ার্ড শেষ পর্যন্ত দু'-তিনটে কাঠি জ্বেলে পাইপটাকে অগ্নিময় করে নিলেন। তার পর অত্যন্ত ঠাণ্ডা মেজাজে একটা খাম লাহিড়ী সাহেবের হাতে দিয়ে বললেন, "তোমার ছুটির অর্ডার—তিন মাসের। ইচ্ছে করলে বিলেত থেকেও ঘুরে আসতে পার। ডিরেক্টররা তোমার মুখ থেকেই সব কথা শুনতে পাবেন।"

"থ্যাঙ্ক ইউ, সার।" লাহিড়ী সাহেব মচকালেন, তবু ভাঙলেন না। চলে এলেন নিজের কামরায়। খবরটা ছড়িয়ে পড়তে বোধ হয় মিনিট দশ লাগল। কেতকী তার চেয়ারে বসে উসখুস করছিল। নোট নেওয়ার জন্যে আজ তার একবারও ডাক পড়ে নি। মহীতোষও কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। ওর যেন একবার মনে হ'ল, সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে কোথায় যেন একটু ব্যক্তিগত ঈর্ষা আছে। ধর্ম্মঘটের পরিকল্পনাটা পুরোপুরি পরিচ্ছন্ন নয়, নৈর্ব্যক্তিকও নয়। পেট ভরে খেতে পাচ্ছি নে বলে ধর্ম্মঘট করছি সেকথা ঠিক। ইউনিয়নটাকে নষ্ট করবার জন্যে ছোটসাহেব চেষ্টা করছেন তাতেও কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তবুও—

সামনের দিকে চেয়ে মহীতোষ দেখল, ছোটসাহেব কামরা থেকে বেরিয়ে পড়েছেন। হলঘরটার মাঝখান দিয়ে মাথা নীচু করে তিনি হেঁটে যাচ্ছেন লিফটের দিকে। সবাই চেয়ে চেয়ে তাঁকে দেখছে, তিনি কাউকে দেখছেন না। পাঁচটা প্রায় বাজে, মহীতোষ উঠে পড়ল, ছুটে গেল লাহিড়ী সাহেবের পেছনে পেছনে। লিফট তখন ওপরে উঠছে। মহীতোষ ডাকল, "সার—"

"কে ?" ঘুরে দাঁড়ালেন ছোটসাহেব, "কি চাই ?"

"চাই না কিছু, বরং দিতে এসেছি।"

"তুমি আমায় কি দিতে পার ?"

চট করে পকেট থেকে তাঁর লেখা চিঠিখানা লাহিড়ী সাহেবের দিকে ধরে মহীতোষ বলল, "মিসেস লাহিড়ী বসে আছেন গাড়ীতে, তাই এইখানেই দিলাম।"

"থ্যাঙ্ক ইউ।" চিঠিখানা হাতে নিয়ে পকেটে ঢুকিয়ে ফেললেন তিনি। লিফটে ঢুকে পড়লেন লাহিড়ী সাহেব। মহীতোষ বলল, "কেতকী আমার ভাবী স্ত্রী।"

লিফট নেমে গেল নীচে। কতটা নীচে তা দেখবার জন্যে মহীতোষ আর সেখানে দাঁড়াল না।

ক্রমশঃ

ভরতচন্দ্র শিরোমণি

শ্রীগোপিকামোহন ভট্টাচার্য্য

বাঙালী মনীষার পীঠস্থান সংস্কৃত কলেজ। উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় জীবনে যে নবচেতনার অভ্যুদয় হইয়াছিল তাহাতে সংস্কৃত কলেজের বিদ্বদ্‌গোষ্ঠীর স্থান কোন অংশেই ন্যূন নহে। ভারতের জ্ঞানসমুদ্র মন্থন করিয়া যে কয়েকজন প্রতিভাবান্ পুরুষ সে যুগে চিন্তায় ও কর্ম্মে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশই সংস্কৃত কলেজের বেদীমূলে দীক্ষিত। প্রাচীনপন্থী হইয়াও দৃষ্টির উদারতা ও আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠার জন্য তাঁহারা বাঙালীর মনন-রাজ্যে চিরস্মরণীয় হইবার যোগ্য। ভরতচন্দ্র শিরোমণি এমনই একজন প্রতিভাবান পুরুষ। কিন্তু তাঁহার জীবনী আজিও প্রত্নতত্ত্বের বিষয়ীভূত হইয়া রহিয়াছে। সংস্কৃত কলেজের প্রাচীন নথিপত্র হইতে ভরতচন্দ্রের জীবনীর যেটুকু উপাদান সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

দক্ষিণ চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত আদিগঙ্গার তীরবর্ত্তী লাঙ্গলবেড়িয়া গ্রামে দাক্ষিণাত্য বৈদিক বংশে ইং ১৮০৪ সনে ভরতচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার প্রপিতামহ রামকিশোর প্রথম এই গ্রামে আসিয়া বসবাস করেন। ভরতচন্দ্রের পিতার নাম রামতনু। তিনি পিতার মধ্যম সন্তান। 'দত্তকমীমাংসা'র স্বকৃত 'বালবিবোধনী' টীকার শেষে ভরতচন্দ্র আত্মপরিচয় দিয়াছেন—"বিদ্বান্ রামকিশোর আদি-পুরুষস্তদ্বংশজঃ শঙ্করঃ। পুত্রো রামতনুর্ব্বভূব মতিমান্ তস্যাত্ম-বংশোচিতঃ॥ তৎপুত্রো ভরতঃ·········"

তাঁহার বংশলতিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

রামনাথ বিদ্যালঙ্কার
|
ধনঞ্জয়
|
রামজয় বিদ্যারত্ন
|
রামকিশোর
|
রামশঙ্কর
|
রামতনু
| | | | |
রামচন্দ্র ভরতশিরোমণি লক্ষ্মণচন্দ্র শত্রুঘ্ন প্রাণকৃষ্ণ
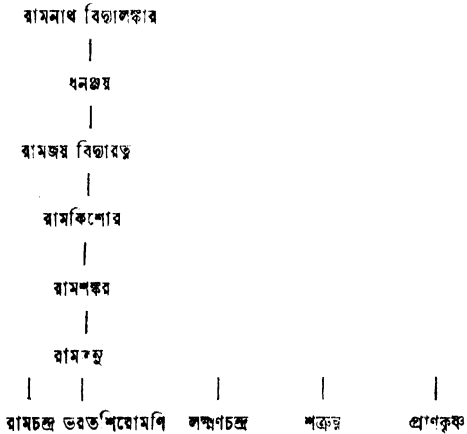
ছাত্রজীবন :—সেকালের প্রথামত ভরতচন্দ্র প্রথম জীবনে স্বগ্রামে সংস্কৃতের পাঠ গ্রহণ করেন। সংস্কৃত কলেজের পুরানো নথিপত্র হইতে জানা যায় যে, ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা হইবার পরই ভরতচন্দ্র স্মৃতি-বিভাগের ছাত্ররূপে ভর্ত্তি হন। ১৮২৪ সনের জানুয়ারী মাসের ছাত্রদের নামের তালিকায় তাঁহার নাম পাইয়াছি। সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রথম বৎসরের বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপক ও ছাত্রসংখ্যার হিসাব নিম্নে দিতেছি :—

বিভাগ	অধ্যাপকের নাম	ছাত্রসংখ্যা
ব্যাকরণ (মুগ্ধবোধ)	রামদাস সিদ্ধান্ত পঞ্চানন (২য় শ্রেণী)	১৬ জন
	হরনাথ তর্কভূষণ (১ম শ্রেণী)	
সাহিত্য	জয়গোপাল তর্কালঙ্কার	১১
স্মৃতি	রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার	৬
অলঙ্কার	কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার	৫
কৌমুদী (পাণিনি)	গোবিন্দরাম উপাধ্যায়	৫
ন্যায়	নিমাইচন্দ্র শিরোমণি	৭
		মোট—৫০ জন

বহিরাগত ছাত্রের সংখ্যা ছিল ২৬। ভরতচন্দ্রের সহাধ্যায়ীদের নাম আনন্দচন্দ্র, চতুর্ভুজ শিরোমণি, গোবর্দ্ধন তর্কালঙ্কার ও মধুসূদন ভট্টাচার্য্য। স্মৃতি-বিভাগের কৃতী ছাত্ররূপে তিনি নিজের পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৮২৬ ও ১৮২৮ সালের পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্রদের নামের তালিকায় দেখা যাইতেছে যে, তিনি যথাক্রমে ১৬৲ টাকা ও ২০৲ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। ডব্লু প্রাইস তখন সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী। ১৮২৪ হইতে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভরতচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের স্মৃতি-বিভাগে অধ্যয়ন করিয়া ১৮২৯ সনের এপ্রিল মাসে কলেজ ত্যাগ করেন বলিয়া মনে হয়। ১৮২৯ সনের মে মাসের ছাত্রদের নামের তালিকায় তাঁহার নাম পাই নাই। ১৮৩৯ সনের রিপোর্টে সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের বিবরণে লিখিত আছে যে, ভরত "Studied five years in law class" এবং শিক্ষা-সমাপনান্তে "স্মৃতিশিরোমণি" উপাধি লাভ করেন (obtained the degree of knowledge in Smriti)। সংস্কৃত কলেজ হইতে উপাধিদানের ব্যবস্থা ১৮২৯ সন হইতে প্রচলিত হইয়াছিল স্মৃতিশাস্ত্রে নিম্নোক্ত উপাধিসমূহ বিতরণ করা হইত :—স্মৃতিরত্ন, স্মৃতিভূষণ, স্মৃতিচূড়ামণি, স্মৃতি-

দান্তে ও বিয়াত্রিচের সাক্ষাৎ

অমল ধবল পালে লেগেছে— [ফোটো : শ্রীরমেন বাগচী

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু নয়াদিল্লীর তালকাটোরা উদ্যানে চতুর্থ আন্তবিশ্ববিদ্যালয় যুব উৎসবে উদ্বোধনী ভাষণ দিতেছেন

রাষ্ট্রপতি ড. শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ আই-এল-ও'র ডিরেক্টর-জেনারেলের পত্নী শ্রীমতী মোরসের সহিত কথোপকথন করিতেছেন

শিরোমণি, স্মৃতিকণ্ঠ।১ ১৮২৯ সনে ২৫ বৎসর বয়সে তিনি সংস্কৃত কলেজ হইতে উপাধি লাভ করেন।২

ভরতচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে স্মৃতি-শ্রেণীতে রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার (১৮২৪-১৮২৫, নভেম্বর), কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন (১৮২৫-১৮২৭, এপ্রিল) এবং রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

কর্ম্মজীবন:—সংস্কৃত কলেজ হইতে উপাধি লাভ করিয়া ভরতচন্দ্র ১৮৩০ সনের জানুয়ারী মাসে হিন্দু ল' কমিটির পণ্ডিতের কার্য্য গ্রহণ করেন। সংস্কৃত কলেজের পুরাতন নথিপত্র৩ হইতে ভরতচন্দ্রের চাকুরী জীবনের পরিচয় দিতেছি :—

পদ	বেতন
হিন্দু ল' কমিটির পণ্ডিত	৪০
সারণ জিলার জজপণ্ডিত (Law officer)	৬০
বর্দ্ধমান জেলার জজপণ্ডিত	৬০
সংস্কৃত কলেজের স্মৃতির প্রধান অধ্যাপক	৮০

কার্য্যকাল

জানুয়ারী, ১৮৩০ হইতে মে, ১৮৩৭
(৭ বৎসর ৫ মাস)

জুন ১৮৩৭ হইতে অক্টোবর ১৮৩৯ (৩)
(২ বৎসর ৫ মাস)

নভেম্বর ১৮৩৯ হইতে নভেম্বর ১৮৪০
(১ বৎসর ১ মাস)

১লা ডিসেম্বর ১৮৪০ হইতে ১লা জানুয়ারী ১৮৭২
(৩১ বৎসর ১ মাস)

১৮৩৭ সনের মে মাসে তৎকালীন স্মৃতির অধ্যাপক রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের পদচ্যুতির পর সংস্কৃত কলেজে স্মৃতির অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। ঐ কলেজের ব্যাকরণের (মুগ্ধবোধ) প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপক হরনাথ তর্কভূষণ কিছুদিন স্মৃতি-বিভাগে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। ১৮৩৮ সনের ২৬শে জানুয়ারী কলেজের রিপোর্টে তাঁহাকে আমরা স্মৃতির অধ্যাপকরূপে দেখিতেছি। বর্দ্ধমান জেলার জজপণ্ডিত থাকাকালে ১৮৪০ সনের শেষের দিকে সংস্কৃত কলেজের শূন্য স্মৃতির পদের জন্য শিরোমণি দরখাস্ত করেন। উপযুক্ত প্রার্থী নির্ব্বাচন করিবার জন্য কলেজ সব কমিটি কর্ত্তৃক একটি স্পেশাল কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটিদ্বয় কর্ত্তৃক ভরতচন্দ্র নির্ব্বাচিত হন। ১৮৪০ সনের ৫ই নবেম্বর সংস্কৃত কলেজের অস্থায়ী সম্পাদক ডক্টর টি. এ. ওয়াই "জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকসান" এর সম্পাদককে লিখিতেছেন :

I am directed by the Sub-committee of the Sanskrit College to forward to you herewith the report of the special committee appointed to select the best qualified persons to fill the Law-chair vacant at the Sanskrit College.

The Sub-committee desire me to state that they concur in recomendation of the Special Committee to appoint Bhurat Chandar Seromoni... to fill the Law chair on a salary of 80 Rupees..."

১৮৪০ সনের ২৫শে নবেম্বর ভরতচন্দ্রের মনোনয়ন সরকারের অনুমোদন লাভ করে :

To T. A. Wise, Esq. M.D.

Secretary, General Committee of
Public Instruction

Sir,

His Lordship in council is pleased to approve nomination of Bharut Chunder Sero-

1. "The practice of awarding Sanskrit Titles to the students of the Sanskrit College has been in existence since 1829." Letters from Principal Mahesh Chandra Nyayaratna to A. W. Croft, Offg. Director of Public Instruction, dated the 6th February, 1878 and the 23rd March, 1878 (Sanskrit college Records—Letters sent).

২। প্রাক্তন ছাত্রদের বিবরণীতে ১৮৩৯ সনে তাঁহার কর্ম্ম সম্বন্ধে লিখিত আছে—Pandit of Zillah Burdman left College at 21 years of age. উহাতে বয়সের হিসাব ঠিক দেওয়া হয় নাই।

3. Service report sent by the Principal, Sanskrit College to W. S. Atkinson, D. P. I., on the 11th December 1871.

(৪) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ভরতচন্দ্রের Previous appointments সম্বন্ধে এক রিপোর্ট প্রেরণ করিয়াছিলেন। তখন ভরতচন্দ্রের বয়স ৫১ এবং ২৫ বৎসর চাকুরী-জীবন পূর্ণ হইয়াছে। উহাতে দেখা যায় ১১ই ডিসেম্বর ১৮৩৭ হইতে ২রা নভেম্বর ১৮৩৯ পর্য্যন্ত তিনি সারণ জেলার জজপণ্ডিত ছিলেন।

"Pandit of the Hindu Law Examination committee from 1830 to 1837 and the Law officer of the Zillah Court of Saran from 11 December 1837 to 2nd November 1839, the same of Zillah Burdwan"—Vidyasagari report on 1.5.1855

mony now holding the situation of Pundit of the Judgs' Court at Burdwan to fill the vacant Law Chair at the Sanskrit College on a salary of Company's Rupees 80 per month.

I am Sir,

Council Chamber — Sd/ G. A. Bushby
The 25th November — Secretary to the
1840 — Govt. of India

ফোর্ট-উইলিয়ম হইতে সংস্কৃত কলেজের অস্থায়ী সম্পাদক টি. এ. ওয়াই-এর নিকট ভরতচন্দ্রের নিয়োগ-পত্র আসে ১৮৪০ সনের ৩০শে নবেম্বর। ১লা ডিসেম্বর শিরোমণি স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। সংস্কৃত কলেজে তিনি ৩১ বৎসর ১ মাস স্মৃতির অধ্যাপকপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সর্ব্বসমেত ৪২ বৎসর তাঁহার কর্ম্মজীবন। সংস্কৃত কলেজে তিনি কোন্ সময়ে কত বেতনে কার্য্য করিয়াছিলেন তাহার সঠিক সংবাদ নিম্নরূপ :

কার্য্যকাল	বেতন
ডিসেম্বর ১৮৪০ হইতে জানুয়ারী ১৮৪১	৮০৲
ফেব্রুয়ারী ১৮৪১ হইতে মে ১৮৬৩	৯০৲
জুন ১৮৬৩ হইতে ফেব্রুয়ারী ১৮৬৬	১০০৲
মার্চ ১৮৬৬ হইতে এপ্রিল ১৮৭০	১২০৲
মে ১৮৭০ হইতে ডিসেম্বর ১৮৭১	১৫০৲

আইনানুযায়ী Previlege, Preparatory এবং casual leave ব্যতীত ভরতচন্দ্র এই সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবনের মধ্যে মাত্র ১৬ দিন ছুটি লইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার মোট কর্ম্মজীবন দাঁড়ায় ৪১ বৎসর ১০ মাস ১৪ দিন। সংস্কৃত কলেজে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ই. বি. কাওয়েল, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী ও মহেশ ন্যায়রত্নের অধ্যক্ষতাকালে কার্য্য করিয়াছিলেন। অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী ছুটি লইলে তৎকালীন দর্শনের অধ্যাপক মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ১৮৭১ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী অস্থায়ী অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। ঐ পদে তিনি ঐ বৎসরের ২৫শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়াছিলেন। বহু বৎসর ধরিয়া কৃতিত্বের সহিত ভরতচন্দ্র স্মৃতির অধ্যাপনা করিবার পর ১৮৭১ সালের ২১শে আগষ্ট 'ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকসান' সরকারী চাকুরীর নূতন নিয়মের কথা অধ্যক্ষ মহেশ ন্যায়রত্নকে জানাইলেন—উক্ত প্রবর্ত্তিত নিয়মের ফলে ৫৫ বৎসর বয়সে অবসর গ্রহণের কাল নির্দ্ধারিত হইল। তখন শিরোমণির বয়স ৬৮ বৎসর এবং ৩০ বৎসর ৯ মাস কার্য্যকাল পূর্ণ হইয়াছে। অধ্যক্ষ মহাশয় অন্ততঃ নূতন বৎসরের (১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ) জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ভরতচন্দ্রের কার্য্যকাল বহাল রাখার আবেদন জানাইয়া লিখিলেন "Sanskrit College will deeply feel the loss of the services of these two eminent professors (ভরতচন্দ্র ও তারানাথ তর্কবাচস্পতি) …who have so long been an honour and ornament to it" অধ্যক্ষ মহেশ ন্যায়রত্নের মতে 'ভরতচন্দ্র বঙ্গের শ্রেষ্ঠ স্মার্ত্ত' (is justly reputed to possess the soundest knowldge of Hindu Law among all the pundits in Bengal"১)। ১৮৭২ সালের ১লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত ভরতচন্দ্রের স্বীয়পদে অধিষ্ঠিত থাকার অনুমোদন আসিল।২

১৮৭১ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী ছুটি-শেষে কার্য্যে যোগদান করিয়া পূর্ব্বোক্ত সরকারী নোটিশের কথা জানিলেন। এবং ভরতচন্দ্রের অবসর-আদেশ নাকচ করাইবার আবেদন জানাইলেন। শিরোমণি মহাশয়ের পাণ্ডিত্যের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তিনি অকপটচিত্তে লিখিলেন শিরোমণি "most eminent Sanskrit Scholar" এবং "in his own department has not his equal in Bengal।" এই বৃদ্ধ বয়সেও ভরতচন্দ্রের স্বাস্থ্য ছিল অটুট এবং তিনি সম্পূর্ণ কর্ম্মক্ষম ছিলেন। অধ্যক্ষ মহোদয় লিখিলেন :

"Pundit Bharat Chandar … is still thoroughly able to discharge his onerous duties ably and satisfactorily. Both of them (ভরতচন্দ্র এবং তারানাথ তর্কবাচস্পতি) had a large reputation and their connection with the college reflects great honour upon it in the estimation of all classes of Hindu Community. I beg most respectfully to solicit the favour of your moving the Government to allow them to continue in the service as long as they are not incapacitated or if that is impossible for a period of five years more."3

এই আবেদনপত্রে কোন ফল হয় নাই। সরকারী সিদ্ধান্তই বহাল রহিল। ১৮৭১ সনের ৮ই ডিসেম্বর ভরতচন্দ্র পেনসনের জন্য দরখাস্ত করিলেন। তাহা নিম্নরূপ :

To Babu P. K. Sarvadhikari,

Principal, Sanskrit College, Calcutta

Sir,

The Govt. of Bengal having ordered me to retire from service on the First of January

1. Letter from the Principal, Sanskrit College to Atkinson, D.P.I, on the 6th September, 1871.

2. Letters from R. H. Wilson, Offg. Secy. Govt. of Bengal to the D.P.I. on 5.19.1871.

3. Letter dated the 6th November, 1871.

next in consequence of advanced age, I beg most respectfully to apply for Superannuation pension from that date, though I feel myself still quite able to go on with my task.

I have, Sir,

Calcutta Sanskrit College — সহী শ্রীভরতচন্দ্র শিরোমণিঃ

8th December 1871 — Professor of Hindu Law

১৮৭২, ১লা জানুয়ারী হইতে ভরতচন্দ্র পেনসন গ্রহণ করিলেন। ১৮৭১ সনের ১১ই ডিসেম্বর সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী 'ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকসান' ডব্লিউ এস. এটকিনসন-এর নিকট ভরতচন্দ্রের সংস্কৃত কলেজে চাকুরীর বিবরণ পেশ করিয়া লিখিলেন :

"I beg leave to propose that in consideration of the great ability of the professor and his uniformly able and faithful service for a very long period the full scale of pension allowed by the rules viz. Rs. 65/- per month being the half of the average monthly pay for the last five years be granted to him."1

ভরতচন্দ্রের পেনসনের পরিমাণ ছিল ৬৪ টাকা ১২ আনা ৬ পাই। পেনসন-সংক্রান্ত সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের রিপোর্টে শিরোমণি মহাশয়ের আকৃতির নিম্নরূপ পরিচয় পাওয়া যায় :

"Complexion Fair, Body obese with a little protuberant belly—nose aquiline. One small wart over the left upper jaw close to the nose. Brilliant and expressive eyes—Bald head. 5 feet 5 inches height." Age 67-8 months on 1871, 11 December.

ভরতচন্দ্রের কোন চিত্রের সন্ধান পাই নাই।

ভরতচন্দ্রের শূন্য পদে সংস্কৃত কলেজের নূতন কাহাকেও নিযুক্ত না করিবার জন্য অধ্যক্ষ মহোদয় কর্ত্তৃপক্ষকে জানান। তৎকালীন দর্শনের অধ্যাপক মহেশ ন্যায়রত্নকে ৫০ টাকা বেশী মাহিনা দিয়া স্মৃতিবিভাগেরও ভার অর্পণ করা হয়। দ্বারিকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত "সোমপ্রকাশ" "কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের স্মৃতির পদ" শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিলেন "শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়কে পেনসন দিয়া বিদায় করাতে কলেজের গৌরবহানি হইয়াছে। * * * তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন।২"

শোভাবাজারের রাজবাড়ীর মহারাজা নবকৃষ্ণের পৌত্র কালীকৃষ্ণ দেববাহাদুর শিরোমণিকে ঐ পদে রাখার জন্য গবর্ণমেণ্টকে পত্র লেখেন।৩ কিন্তু শত অনুনয়ে কিছু হইল না। শত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও শিরোমণিকে পেনসন গ্রহণ করিতে হইল।

মৃত্যু—১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই ডিসেম্বর ৭৩ বৎসর ৮ মাস বয়সে শিরোমণির মৃত্যু হয়।

পাণ্ডিত্য—ভরতচন্দ্র শিরোমণি ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ স্মার্ত্ত। সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবনে তিনি ল' কমিটির পরীক্ষক এবং স্মৃতি-শাস্ত্রের কৃতী অধ্যাপকরূপে আপন যশঃসৌরভ বিকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন। স্মৃতির আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার জটিলতা ও বাদ-বিচারে তাঁহার মনোযোগ বিশেষ আকৃষ্ট হয় নাই। দায়তত্ত্বের আলোচনাই তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের একমাত্র সাধনা ছিল। গবর্ণমেণ্ট বহুবার জমিদারী-সংক্রান্ত জটিল মামলা সম্পর্কে প্রশ্নপত্র পাঠাইয়া তৎসম্বন্ধে তাঁহার মতামত ও ব্যবস্থাপত্র চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে Board of Revenue-এর সেক্রেটারী "পিতার মাতুলের ধনে অধিকার আছে কি না" এ বিষয়ে তাঁহার মতামত চাহিয়া পাঠান। এতদবিষয়ে সুবিস্তৃত ও যুক্তিসম্বলিত যে ব্যবস্থাপত্র তিনি দিয়াছিলেন—তাহাতে একাধারে তাঁহার মননশীলতা ও পাণ্ডিত্যের ব্যাপকতার পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃত কলেজের প্রাচীন নথিপত্রের মধ্যে উহার প্রতিলিপি আমি দেখিয়াছি। উহার প্রথম অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :

"পিতুর্ম্মাতুলস্য ধনাধিকার বোধকং বঙ্গদেশপ্রচলিতদায়ভাগাদি-বেহারাভিধেয় দেশ পশ্চিমদেশপ্রচলিতমিতাক্ষরাদিনিবন্ধেষু লিখিতং ন কিমপি স্পষ্টতয়া প্রতিভাতি মিতাক্ষরাবীরমিত্রোদয়ে লিখনানু-সারিন্যা কয়াচিদ্যুক্ত্যা তদধিকারস্য সম্ভাবনীয়ত্বেঽপি নাসৌ সমীচীনতয়া প্রতিভাসতে যুক্তিরিতি পিতুর্ম্মাতুলস্যাধিকারো নাস্মাকং মতে যুক্তিসিদ্ধ ইতি।৪" জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও মহেশ ন্যায়রত্নও উক্ত ব্যবস্থাপত্রে অনুমতিসূচক স্বাক্ষর প্রদান করেন। গবর্ণমেণ্ট শিরোমণির ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। হরিশ্চন্দ্র "সেকালের সংস্কৃত কলেজ" শীর্ষক মূল্যবান প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

1. Letter from the Principal, Sanskrit College to W. S. Atkinson, D.P.I., Fort William, dated December 11, 1871. (Sanskrit College Record—Letters Sent)

২ সোমপ্রকাশ ১১ই আষাঢ় সন ১২৭৯ সাল (২৪শে জুন, ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ)। সরকারের উক্ত কার্য্যের প্রতিবাদে জনৈক ব্যক্তি এক প্রতিবাদ পত্র প্রকাশ করেন—২৫ আষাঢ় ১২৭৯ সাল, 'চাঙড়ীপোতা' গ্রামে বিদ্যাভূষণ লাইব্রেরীতে সোমপ্রকাশের কয়েক খণ্ড দেখিয়াছি।

৩ সোমপ্রকাশ, ১লা শ্রাবণ, ১২৭৯ সাল (সম্পাদকীয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)

৪ ১৩ই জানুয়ারী ১৮৬২ সনে ব্যবস্থা-পত্রটি প্রেরিত হইয়াছিল। (Sanskrit College Record, Letters sent)

"হাইকোর্টের বিচারকগণ তাঁহার মত গ্রাহ্য করিতেন। একবার দুইটি দত্তক গ্রহণ করা যায় কিনা, এই মর্ম্মের একটি প্রশ্ন উঠে। হাইকোর্টের প্রধান বিচারক মহাশয় স্মৃতির পণ্ডিতকে তলব করেন। হাতীবাগানের ৺ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ হাইকোর্টে গিয়া স্ব স্ব মত দিয়া আসিয়াছিলেন। শিরোমণি মহাশয় যে মত দেন, তাহাই গ্রাহ্য হইয়াছিল অর্থাৎ একবার একটি দত্তক লইলে আবার একটি দত্তক লওয়া যায় না, এই দত্তক মীমাংসা প্রভৃতি গ্রন্থের মত। তৎকালে কোন ধনী লোকের দুই পত্নী—প্রত্যেকে এক-একটি দত্তক লইয়াছিলেন, তজ্জন্য এই মোকদ্দমা উঠে। আমার মনে হয়, এইটি দুলাল সরকারের বাড়ীর মোকদ্দমা।"১

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বে কলিকাতা হাইকোর্টের ফুল-বেঞ্চে আসামের গোলাঘাটের বিখ্যাত কেরী কলিতানীর মামলার বিচার আরম্ভ হয়। বিচার্য বিষয় ছিল—"হিন্দু রমণীর স্বামী বিয়োগান্তে স্বামিপরিত্যক্তা বিষয়ের একবার উত্তরাধিকারিণী হইলে পর, যদ্যপি তাহার চরিত্র কলঙ্কিত হয় তাহা হইলে হিন্দুশাস্ত্রমতে পুনরায় সে অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে কিনা।" এ সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের অভিপ্রায় জানিবার জন্য "বিদ্যাসাগর, মহেশ ন্যায়রত্ন, ভরত শিরোমণি ও তারানাথ তর্কবাচস্পতি এই কয়েকজন বিখ্যাত শাস্ত্রজ্ঞ মহামহোপাধ্যায়কে আদালতে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের মতামত জিজ্ঞাসা করা হয়।"২ শিরোমণি মত দেন যে, উক্ত রমণী বিষয়-চ্যুতা হইবে। মহেশ ন্যায়রত্ন ও তারানাথ তর্কবাচস্পতি শিরোমণির স্বপক্ষে মত দেন। বিশিষ্ট আইনজ্ঞ দ্বারকানাথ মিত্র সমেত তিন-জন বিচারপতি শিরোমণির উক্ত মত গ্রহণ করেন। বিরুদ্ধ মত দেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। ইংরেজী আইনজ্ঞ বিচারকগণ সংখ্যাধিক্যের বলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত গ্রহণ করেন। কিন্তু দ্বারকানাথ মিত্র যে যুক্তি দেখান তাহা আইন-জগতে চিরঅনুকরণীয় এবং ইহার মূলে ছিলেন ভরতচন্দ্র শিরোমণি।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত হইয়া (২২শে জানুয়ারী ১৮৫১ সাল) পাঠ্যতালিকার পরিবর্ত্তন সাধনে মনোযোগ দিয়াছিলেন। ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিধি-বিচার বিষয়ক গ্রন্থসমূহ তাঁহার পূর্ব্বে স্মৃতি-বিভাগে পাঠ্য ছিল। তিনি নূতন পাঠ্যক্রম নির্দ্ধারণ করিলেন:—

মনুসংহিতা, মিতাক্ষরা, দায়ভাগ, দত্তকমীমাংসা (২য় অধ্যায়), দত্তকচন্দ্রিকা, ব্যবহারতত্ত্ব, দায়তত্ত্ব, দায়ক্রমসংগ্রহ১। শিরোমণি মহাশয় এক বৎসরে দায়ভাগ সমগ্র, দত্তকমীমাংসা, দত্তকচন্দ্রিকা এবং মিতাক্ষরা (ব্যবহারাধ্যায়) পড়াইয়া দিতেন২। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা ত্যাগ করার পর উক্ত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্র পাঠের আবশ্যকতা আছে কিনা এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট সন্দেহ পোষণ করেন এবং এতদ্বিষয়ে রিপোর্ট পেশ করার জন্য তৎকালীন অধ্যক্ষ ই. বি. কাওয়েলকে নির্দ্দেশ দেন। গভর্ণমেণ্ট স্মৃতির পঠন-পাঠন উঠাইয়া দিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। নিঃসন্দেহে শিরোমণির প্রখর ব্যক্তিত্ব এবং পাণ্ডিত্যের জন্যই সরকার ঐ কার্য্য হইতে বিরত হন। স্মৃতির অধ্যাপকের মান-মর্য্যাদা তখন কোন অংশেই ন্যূন ছিল না। বস্তুতঃ স্মৃতিশাস্ত্রে জ্ঞান না থাকিলে সমাজে তাঁহার পণ্ডিত বলিয়াই পরিচয়ই হইত না। তৎকালীন অধ্যক্ষ ই. বি. কাওয়েল লিখিলেন—

"Native community .. would hardly admit a person's claim to the title of Pundit, who was ignorant of this branch of Hindu Learning."3

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখিয়াছিলেন যে, শিরোমণি "সামান্য ব্যক্তি নহেন। ইনি কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ে ত্রিশ বৎসর, ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যাপনা কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক রাজদ্বারে অতি মহতী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন এবং দীর্ঘকাল অবাধে ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবসায় করিয়া অদ্বিতীয় স্মার্ত্ত বলিয়া সর্ব্বত্র পরিগণিত হইয়াছেন"। তিনি বলিয়াছেন, "মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত ভরতচন্দ্র শিরোমণি", "সর্ব্বমান্য শিরোমণি" প্রভৃতি৪ বহুবিবাহ বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিবাদী বরিশালনিবাসী রাজকুমার ন্যায়রত্নের মতেও "প্রসিদ্ধ পণ্ডিতস্মার্ত্তের মধ্যে শিরোমণি বহুদর্শী প্রাচীন মহাত্মা।" সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন ছাত্র তারানাথ তর্কভূষণ লিখিয়াছেন—

---

(১) প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৩২, পৃঃ ৬৫১। সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন ছাত্র কবিরত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধটি বিশেষ মূল্যবান্। কিন্তু তিনি লিখিয়াছেন—"বিদ্যাসাগর মহাশয় ও গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার ছাত্র ছিলেন। ইহা কবিরত্ন মহাশয়ের অতি বার্দ্ধক্যবশতঃ ভ্রম বলিয়াই মনে হয়। ভরতচন্দ্রের ছাত্ররূপে বিদ্যাসাগরকে আমরা কোন নথিপত্রে পাই নাই। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকগণের নিকট হইতে যে প্রশংসাপত্র পান তাহাতে ভরতচন্দ্রের নাম নাই। বস্তুতঃ ঈশ্বরচন্দ্র যখন অলঙ্কার-শ্রেণী হইতে আসিয়া স্মৃতি-শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেন তখন হরনাথ তর্কভূষণ সাময়িকভাবে স্মৃতির অধ্যাপকপদে অধিষ্ঠিত। বিদ্যা-সাগর-অনুজ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখিয়াছেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তর্কভূষণ মহাশয়ের পাঠন-রীতিতে তৃপ্ত না হইয়া হরচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

(২) কালীপ্রসন্ন দত্ত—"দ্বারকানাথ মিত্র" (১২৯৯ বৈশাখ) পৃঃ ১১০। (বিদ্যাসাগর জীবনচরিত পৃঃ ৩৬)

1. Sanskrit college Records—Letters Sent, 1850

২ "সেকালের সংস্কৃত কলেজ"—প্রবাসী ১৩৩২ ভাদ্র।

3. Report from E. B. Cowel, Principal, Sanskrit College to the Officiating D. P. I. on the 9th July, 1859.

৪। "বহুবিবাহ" ২য় পুস্তক, ১৮৭২ মার্চ্চ পৃঃ ১৭৩-৭৪

"স্মৃতিশাস্ত্রে ভরতচন্দ্র শিরোমণির সমকক্ষ ব্যক্তির নাম এ পর্যন্ত শুনি নাই। ইনি তথায় স্মৃতির শ্রেণী অলঙ্কার করিয়াছিলেন৫।"

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীর মতে ভরতচন্দ্র "the venerable Professor of Hindu Law।" শুধু স্মৃতি নয়, কাব্য- অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। শিরোমণি-রচিত শ্লোকগুলি আলোচনা করিলেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার অধ্যাপনায় বঙ্গদেশের অন্যতম পীঠস্থান সংস্কৃত কলেজের গৌরবের দিন ছিল। অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমারের ভাষায়:

"Whose extensive study and profound knowledge of the subject, combined with a thorough scholarship in other departments of Sanskrit Learning has made his connection with the college so glorious to the latter.'2'

নব্যন্যায়শাস্ত্রের ভাষার সহিত যে তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন তাহা তাঁহার ব্যবস্থাপত্র হইতে জানা যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "ঠাকুর আইন অধ্যাপক" ও ফেলো শ্যামাচরণ সরকার মহাশয় শিরোমণির নিকট হইতে হিন্দু আইনের দায়ভাগ বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন; শ্যামাচরণ ব্যবস্থাদর্পণ ("a digest on Hindu Law as current in Bengal") গ্রন্থ রচনার সময় শিরোমণির অকুণ্ঠ সহায়তা লাভ করেন।৩

সংস্কৃত কলেজে ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজী বিভাগ স্থাপিত হয়। পরে ১৮৩৫ সালে 'জেনারেল কমিটি অব এডুকেশনে'র রিপোর্ট অনুসারে ইংরেজী বিভাগ লুপ্ত হয়। ১৮৩৯ সালের মে মাস হইতে ছাত্রদের দুই ঘণ্টা বাংলা ক্লাসে পদার্থবিদ্যা অধ্যয়ন করিতে হইত। ঐ শাস্ত্রের অধ্যাপক নবকুমার চক্রবর্তী লোকান্তরিত হইলে কলেজের ৮৬ জন ছাত্র বাংলার পরিবর্তে ইংরেজী পাঠের অনুমতিদানের প্রার্থনা করেন। ভরতচন্দ্র ইংরেজী জানিতেন না, কিন্তু প্রখর দূরদৃষ্টির বলে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ইংরেজীশিক্ষার দ্বারাই অর্থনৈতিক ক্ষেত্র প্রশস্ত হইবে—সেইজন্য ছাত্রদের উক্ত আবেদন তিনি গ্রহণ করিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। রসময় দত্ত তখন সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী। তাঁহাকে ছাত্ররা লিখিলেন:

"যদি আমাদিগের উপকার করা গবর্ণমেণ্টের কর্তব্য হয় তবে বাংলা শিক্ষক নিযুক্ত না করিয়া দুই ঘণ্টা কাল ইংরেজী পাঠের অনুমতিদানপূর্বক ইংরেজী শিক্ষক নিযুক্ত করুন ইহা হইলে আমাদের বিশেষ উপকার হইবেক নচেত বৃথা অর্থব্যয় নিষ্প্রয়োজন কিমধিকমিতি" (২০শে মে, ১৮৪২)। ২৩শে জুলাই শিক্ষাবিভাগ হইতে অনুমতি আসিল। ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৪২ সনে রসিকলাল সেন ৯০৲ টাকা মাহিনায় ইংরেজীর প্রথম শিক্ষক এবং ৭০৲ টাকা মাহিনায় শ্যামাচরণ সরকার দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন।

সমাজ-সংস্কার—ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া স্মৃতিশাস্ত্রের অগাধ পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াও ভরতচন্দ্র শিরোমণি ছিলেন যুক্তিবাদী। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। যে অনমনীয় দৃঢ়তা সমাজ-সংস্কারক বিদ্যাসাগরের মধ্যে আমরা পাই, গোঁড়া ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও ভরতচন্দ্র শিরোমণির চরিত্র ছিল সেইরূপ। অচলায়তনের চাপে তাঁহার বজ্রকঠোর হৃদয় নিষ্পেষিত হয় নাই। পঙ্গু সমাজ-জীবনের প্রতিটি স্তর যে জীর্ণ তাহা তিনি অনুভব করিয়াছিলেন। সেই কারণেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের পক্ষে তাঁহার অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল।

১৮৫৫ সনে বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে পুস্তক রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। ইহার কিছুদিন পূর্বে কলিকাতা পটলডাঙ্গা-নিবাসী শ্যামাচরণ দাস স্বীয় বিধবা কন্যার বিবাহ দিবার মানসে ভবশংকর বিদ্যারত্ন প্রভৃতি কয়েকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের স্বাক্ষরিত বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে এক ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ করেন। ঐ ব্যবস্থাপত্র সম্বন্ধে রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুরের ভবনে এক বিচার-সভার অনুষ্ঠান হয়। ভরতচন্দ্র শিরোমণি বিচার-সভার মধ্যস্থের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।১ বিচার্য শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতকেই মধ্যস্থের পদে বরণ করা হইত। উক্ত বিচারে নবদ্বীপের তৎকালীন প্রধান স্মার্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্নকে বিচারে পরাস্ত করিয়া ভবশংকর বিদ্যারত্ন বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়ত্ব প্রমাণ করিলেন।২ ১২৬৩ সালের ২৪শে অগ্রহায়ণ কলিকাতা সুকিয়া ষ্ট্রীটস্থ রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবনে বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু অর্থব্যয়ে সর্বপ্রথম বিধবা-বিবাহ দিলেন। উক্ত বিবাহে ভরতচন্দ্র শিরোমণির সম্পূর্ণ সমর্থন ছিল এবং তিনি বিবাহ-বাসরে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন২ বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহের

১। "তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবনী এবং সংস্কৃত বিদ্যার উন্নতি" (১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ) পৃঃ ৪৭

2. Letter from the principal, Sanskrit College to the D.P.I. on the 11th December, 1871.

3. "The most learned Pundit Bharat Chandar Siremoni whose opinion I have obtained on difficult and doubtful points and whose valuable assistance I have received on these and many other occasions."

১ বিদ্যাসাগর-অনুজ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন—"বিদ্যাসাগর জীবন-চরিত" পৃঃ ১১৩।

১। কেহ কেহ লিখিয়াছেন—ভবশংকর বিদ্যারত্নই পরাস্ত হইয়াছিলেন—

দ্রষ্টব্য—তারানাথ তর্কভূষণ,—তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবনী পৃঃ ৪৭।

শাস্ত্রীয়তা সমর্থনের জন্য যে পুস্তক রচনা করেন তাহাতে উদ্ধৃত বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণ ভরতচন্দ্র সংগ্রহ করিয়া দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেছেন—"কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ধর্ম্মশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুত ভরতচন্দ্র শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমার প্রার্থনা অনুসারে নিম্ননির্দ্দিষ্ট প্রমাণগুলি বহিষ্কৃত করিয়া দেন।৩ বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় ভরতচন্দ্রকে সমাজে বহু নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহ আন্দোলন সুরু করেন। এই বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলনেও শিরোমণির সমর্থন ছিল। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ্চ ২১,০০০ জনের স্বাক্ষর-যুক্ত এক আবেদনপত্র রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর বাংলার লাট স্যার সিসিল বিডনের হস্তে সমর্পণ করেন। উক্ত আবেদনপত্রে স্বাক্ষরকারীরূপে আমরা ভরতচন্দ্রের নাম দেখিতে পাই। তিনি স্বয়ং রাজাবাহাদুরের সঙ্গে লাটবাহাদুরের কাছে যান। বিদ্যাসাগর-চরিতকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিতেছেন, "বঙ্গের বাছা বাছা আরও ২০.২২ জন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন, তন্মধ্যে পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ মিত্র, প্যারীচরণ সরকার, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতির নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।"৪

এসিয়াটিক সোসাইটি—ভরতচন্দ্রের প্রখ্যাত পাণ্ডিত্যের জন্য "এসিয়াটিক সোসাইটি" 'বিবলিওথিকা ইণ্ডিকা'র অন্তর্গত পুঁথি-সম্পাদনে তাঁহাকে নিযুক্ত করেন। হেমাদ্রির মত এক বৃহৎ গ্রন্থ তাঁহার সুনিপুণ সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। উক্ত পুস্তকে তাঁহার রচিত পাদটীকা দেখিলেই উহার সম্পাদনায় তাঁহাকে যে ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী

সুদীর্ঘ কর্ম্মময় জীবনে শিরোমণি বহু গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্পাদিত ও রচিত বহু গ্রন্থ বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস' (১ম খণ্ড) গ্রন্থে ভরতচন্দ্রের রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের একটি তালিকা দিয়াছেন। উহা সম্পূর্ণ নহে। সংস্কৃত কলেজ এবং অন্যান্য গ্রন্থাগারে রক্ষিত শিরোমণির যে গ্রন্থগুলি আমি দেখিয়াছি তাহার পরিচয় নিম্নে দিলাম :

১। দায়ভাগঃ / জীমূতবাহনকৃতঃ / শ্রীকৃষ্ণ তর্কালংকার বিরচিত টীকা সহিতঃ / সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরে স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপকেন / শ্রীভরতচন্দ্র শিরোমণিনা / সংস্কৃতঃ / কলিকাতা / সংস্কৃতযন্ত্রে মুদ্রিতঃ / সং বং ১৯০৭, পৃঃ ২৫৯।

২। দত্তকমীমাংসা—নন্দপণ্ডিত-বিরচিত। ভরত শিরোমণি-কৃতা বালবিবোধনী টীকা সহিত। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ। পৃঃ ১১৯। টীকাটি সুবিস্তৃত। উহার শেষে শিরোমণি বলিতেছেন—

নাস্ত্যাং ব্যাখ্যাপটুত্বং ললিতমপি বচয় সজ্জনারঞ্জনং যৎ।
নাস্ত্যাং বিস্তারতোঽর্থাবগতিরিধিরিয়াং যেন সংবোধনং স্যাৎ।
নাস্ত্যাং বালাববোধে চতুরমপি বচো যেন বালাগ্রহঃস্যাৎ
কিন্ত্বস্যামাদরো যৎ ভবতি মতিমতাং কেবলং নব্যভাবাৎ॥

এই গ্রন্থে শিরোমণি স্বীয় বংশ-বর্ণনা করিয়াছেন।

৩। দত্তকচন্দ্রিকা / মহামহোপাধ্যায় কুবেরকৃতা / শ্রীভরতচন্দ্র শিরোমণিকৃত বালসংবোধনী টীকা / সহিতা / Calcutta / The Sanskrit Press / College Square No 1 / Printed and Published / by / Harish Chandra Tarkalankara / 1857. পৃঃ ৩৮।

গ্রন্থের শেষে সাতপৃষ্ঠাব্যাপী "দত্তকচন্দ্রিকাতাৎ পর্যার্থবিবৃতি" তাঁহারই রচিত। নিজের গ্রন্থকে তিনি বালকের প্রলাপবাক্যের সহিত তুলনা করিয়াছেন। ইহা নিছক বিনয়ের প্রকাশ। টীকার মধ্যে বহুস্থলে তিনি স্বমতের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

৫। 'ইত্যস্মভ্যং ন রোচতে' বলিয়া প্রচলিত মতের খণ্ডন করিয়াছেন।

টীকা সম্বন্ধে বলিতেছেন—"ক্বঃ গ্রন্থসুদুরূহবাক্য ঘটিতশ্চার্থে গুরুঃ সর্বথা

টীকা ত্বর্থবিসংস্থুলা ক্বচন মে বালপ্রলাপোসমা।
সদ্ভিঃ কৌতুকবুদ্ধিতঃ কিমিতি সা নো দৃশ্যতে সাদরং
তেনৈবার্থবতী কৃতির্মম ভবেৎ প্রার্থ্যং বিদাং বীক্ষণম্" ॥

একই বৎসর রচিত হইলেও দত্তকমীমাংসা পূর্ব্বে রচিত কারণ দত্তকচন্দ্রিকার বালসংবোধনী টীকার একস্থলে (পৃঃ ৩৭) তিনি বলিতেছেন—'অপরশ্চ বিশেষোঽস্মৎকৃতায়াং দত্তকমীমাংসা-টীকায়াং দ্রষ্টব্য ইতি।"

৪। দত্তকপুত্র গ্রহণ প্রয়োগঃ

৫। দায়ভাগঃ / মহামহোপাধ্যায় শ্রীজীমূতবাহনকৃতঃ / শ্রীশ্রীনাথাচার্য চূড়ামণি, শ্রীরামভদ্র ন্যায়ালংকার, শ্রীমদচ্যুতানন্দ চক্রবর্ত্তি, শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য / শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য, শ্রীশ্রীকৃষ্ণ তর্কালংকার কৃত ষড়বিধটীকা সহিতঃ / শ্রীযুত ভরতচন্দ্র শিরোমণি ভট্টাচার্যেন / পরিশোধিতঃ / শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ানুমত্যা / কলিকাতা / মির্জাপুরীয় ৫৮।৫ সংখ্যক ভবনে / বিদ্যারত্ন যন্ত্রে / শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নেন যত্নেন মুদ্রিতঃ / শকাব্দাঃ ১৭৮৫, ইংরেজী ১৮৬৩ সাল / অগ্রহায়ণে।

৬। ষড়বিধ টীকা সহিত / দায়ভাগস্য / অতিরিক্ত টীকা / নবদ্বীপনিবাসী শ্রীকৃষ্ণকান্ত শর্ম বিদ্যাবাগীশ প্রণীতা / শ্রীযুক্ত ভরত-শিরোমণি ভটাচার্যেন পরিশোধিতা / শ্রীল শ্রীযুক্তবাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ানুমত্যা কলিকাতা / মৃজাপুরীয় ৫৮।৫ সংখ্যকভবনে / গিরিশবিদ্যারত্ন যন্ত্রে / শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নেন যত্নেন মুদ্রিতা / শকাব্দাঃ ১৭৮৭, ইং ১৮৬৬ সাল ১৫ আগষ্ট শ্রাবণে মাসি।

২। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন—বিদ্যাসাগর জীবনচরিত, পৃঃ ১২৫, এবং তারানাথ তর্কভূষণের পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ পৃঃ ৪৮।

৩। "বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব"—(বিজ্ঞাপন), ৪র্থ সংস্করণ ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ।

৪। বিদ্যাসাগর—পৃঃ ৩২৯ (৪র্থ সং)।

৭। দত্তকশিরোমণি / ভারতবর্ষীয় হিন্দুসমাজ প্রচলিত দত্তকমীমাংসা, দত্তকচন্দ্রিকা / দত্তকনির্ণয়, দত্তকতিলক, দত্তকদর্পণ, দত্তককৌমুদী, দত্তক / দীধিতি, দত্তসিদ্ধান্ত মঞ্জরী নামক সুপ্রসিদ্ধ দত্তকগ্রহণ / ব্যবস্থাপক গ্রন্থটি নিখিল সারসংগ্রহঃ / শ্রীভরতচন্দ্র শিরোমণি ভট্টাচার্যেন সুপ্রণালীপূর্বক / মেকবিংশত্যধ্যায়েন সংঘটিতঃ প্রত্যধ্যায়াবসানে / কৃতসংক্ষিপ্তসারসংগ্রহঃ / শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুর সি. এস. আই মহাশয়ানুমত্যা / কলিকাতা / গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে / মুদ্রিতঃ / শকাব্দাঃ ১৭৮৯, ইং ১৮৬৭ সাল।

ইহা দত্তকগ্রহণ সম্বন্ধে প্রচলিত আটটি পুস্তকের সার সংকলন। একুশটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই গ্রন্থটির প্রতিটি প্রকরণের শেষে নিজ ভাষায় বিচার্য বিষয়ের সার সংকলন করিয়াছেন এবং সুধীভিবিভাবনীয়ম বলিয়া নিজ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

৮। স্মৃতিচন্দ্রিকায়াঃ / দায়ভাগপ্রকরণম্ / দ্রাবিড়দেশীয় / মহামহোপাধ্যায় শ্রীদেবানন্দ ভট্ট প্রণীতম্ / কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃতবিদ্যালয়স্থ / ধর্মশাস্ত্রাধ্যাপকেন শ্রীভরতচন্দ্র শিরোমণিনা / শ্রীশ্যামাচরণ শর্মাসরকার সাহায্যেন / মুদ্রিতম্ / ... / কলিকাতা / ... / ১৮৭০ জানুয়ারী, পৃঃ ১১৮ গ্রন্থের শেষে প্রায় ২৫ পৃষ্ঠাব্যাপী সরল সংস্কৃতে গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের সার-সংক্ষেপ আছে।

৯। হেমাদ্রি বিরচিত চতুর্বর্গ চিন্তামণি / Edited by Pandita Bharat Chandar Siromoni / Vol I / Dana Khanda / Calcutta / Printed at the Ganesa Press / 1873.

এই গ্রন্থ সম্পাদন শিরোমণির শ্রেষ্ঠ কৃতি। পূর্বে এ গ্রন্থ আর মুদ্রিত হয় নাই। সম্পাদনকালে তিনি সংস্কৃত কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন (সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরস্থ স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপকচরেণ ময়া ইত্যাদি)। সংস্কৃতে রচিত গ্রন্থের বিজ্ঞাপন পাঠে জানা যায় যে, এই গ্রন্থ-সম্পাদনে "বহুতর পরিশ্রম" তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে। জনগণের মঙ্গল কামনা করিয়াছেন—

"প্রবর্দ্ধন্তাং তস্যাঃ প্রকৃতিনিচয়াঃ সন্তু হৃষিতাঃ।
বিপক্ষাঃ সংপক্ষাঃ প্রকৃতিগুণতঃ সন্তু চ বশাঃ॥"

এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে উক্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়।

১০। মনুসংহিতা (কুল্লুক টীকা সমেত)—ভরত শিরোমণিকৃত বঙ্গানুবাদ। সহযোগী ছিলেন যদুনাথ ন্যায়পঞ্চানন। ১২৮৪ বঙ্গাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উহা প্রকাশ করেন। চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায় সতীশ মুখোপাধ্যায় বলিতেছেন—"বাংলার পাণ্ডিত্য-জ্যোতিঃ-স্বরূপ, স্মার্ত আচার্য্যপ্রবর ভরতচন্দ্র শিরোমণির সর্বজনসুবোধ্য সরল অনুবাদে" ইত্যাদি।

১১। বিক্রমাদিশতক—ভরত শিরোমণিকৃত পৃঃ ২০, সন ১২৬৪। এ পুস্তকটি আমি এখনও দেখি নাই।

শিরোমণি মহাশয় পূর্বোক্ত দত্তকমীমাংসা ও দত্তকচন্দ্রিকার যে টীকা রচনা করিয়াছিলেন তাহার বিরুদ্ধে সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন স্মৃতিশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক মধুসূদন স্মৃতিরত্ন উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের উপর টীকা রচনা করেন। 'সোমপ্রকাশে' উহার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল। কাশীনাথ স্মার্তবাগীশ স্মৃতিরত্নের উক্ত টীকাদ্বয়ের ভ্রম প্রদর্শন করাইয়া শিরোমণি মহাশয়ের ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে 'রত্নবিভ্রম' নামে একটি পুস্তিকা (পৃঃ ২৬) প্রণয়ন করেন। ১২৯৫ সনে উহা প্রকাশিত হয়। আমার নিকট রক্ষিত উক্ত পুস্তিকাটির প্রারম্ভে লেখক যাহা বলিয়াছেন শিরোমণি মহাশয়ের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে তাহা শ্রেষ্ঠ অভিমত—

"স্মার্তচূড়ামণি পূজ্যপাদ ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের যে টীকা করিয়াছেন তাহাতে কঠিন স্থলগুলি এরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, যাহার সংস্কৃতে কিঞ্চিন্মাত্র ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে সে ব্যক্তিও অধ্যাপকের বিনা সাহায্যে উক্ত পুস্তক বুঝিতে পারেন।.........ভরত শিরোমণি কেন, কেবলমাত্র শিরোমণি মহাশয় বলিলে যে সেই সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপক অদ্বিতীয় স্মার্তচূড়ামণি বলিয়া কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, জর্ম্মনি এবং বিলাত পর্য্যন্ত যে বুঝিতে পারিবে তাহার আর অনুমাত্র সংশয় নাই।"‡

‡ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর গৌরীনাথ শাস্ত্রী মহোদয় কলেজের রক্ষিত প্রাচীন নথিপত্র দেখিতে অনুমতি ও উৎসাহ দিয়াছেন।
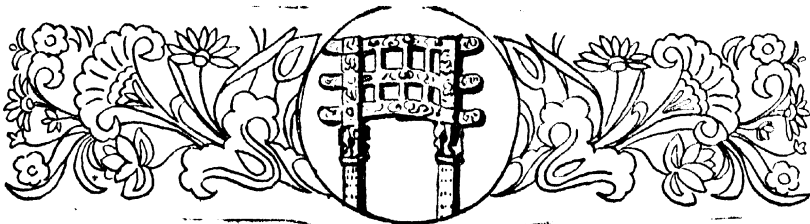
স্রোতের টানে

শ্রীবীণা বন্দ্যোপাধ্যায়

আসাম লিঙ্কের আমিনগাঁও ষ্টেশনে পৌঁছবার পর ষ্টেশনে যেন হৈ-চৈ পড়ে গেছে। যাত্রী, কুলি ও মাল ওঠানামার ব্যস্ততায় যখন সকলেই তটস্থ সেই সময় ধীরে ধীরে একটি বছর চব্বিশ-পঁচিশ-এর সুন্দরী মেয়ে গাড়ী থেকে নেমে কুলীর মাথায় মোট চাপিয়ে ষ্টীমার-ঘাটের দিকে এগিয়ে চলল। মেয়েটির ধীর গতি জানিয়ে দিল যে এ লাইনে যাতায়াতে এর প্রথম নয়। ব্রিজ পার হয়ে ষ্টীমারে উঠে ফার্ষ্ট ক্লাস ডেকচেয়ারে বসে সে ব্রহ্মপুত্রের উত্তাল বীচিভঙ্গির দৃশ্য একমনে দেখছে। বর্ষার প্রথম উচ্ছ্বাসে নদীর মারমুখী মূর্ত্তিখানির গর্জ্জন-দৃশ্য স্বভাবতঃই মনে বিস্ময় আনে, মেয়েটিও সেদিকে তাকিয়ে আছে।

ষ্টীমার তখন চলতে সুরু করেছে, মাত্র বিশ মিনিটে ওপারে পৌঁছান যায়। এরই মধ্যে কত যাত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে টেবিলের চারপাশে খেতে বসে গেছে। তাদের খাওয়ার তাড়া দেখে বুঝা যায় যে তীর এই এল বলে। মেয়েটির কিন্তু কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, পারে পৌঁছে ঠিক স্বাভাবিক ভাবেই সে গাড়ীতে উঠবে। হঠাৎ ষ্টীমারখানি একটু দোল খেয়ে থেমে যেতেই দেখা গেল প্রায় চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে—সবাই কুড়ির নীচে বয়স হবে—একটি ত্রিশ-বত্রিশ বয়স্ক যুবকের সঙ্গে নীচের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যুবকটির শ্যামবর্ণ চেহারার মধ্যে তার চোখ ও দীর্ঘাকৃতি চেহারাটা বেশ একটা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয়, জ্বলজ্বলে চোখ দুটিতে এমন একটি গভীর ভাব লুকিয়ে আছে যে, তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছা করে। মেয়েটির মনে হ'ল একে যেন কোথায় দেখেছে কিন্তু স্মৃতির মণিকোঠায় আলোড়ন করেও ঠিক ধরতে পারল না কোথায় এবং কবে দেখা হয়েছিল। ওদের চোখোচোখি হতে মনে হ'ল যুবকটিও তাকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করছে। নাঃ কিছুই ধরা গেল না যখন, তখন চিন্তা ঝেড়ে ফেলে অন্য কিছু ভাবা ভাল। তার পর ভিড়ের মধ্যে এক সময় দুপক্ষই অদৃশ্য হয়ে গেল।

পরের দিন সকালে তিনসুকিয়া ষ্টেশনে গাড়ী থামতেই সকাল প্রায় ছটা বেজে গেল। ওখান থেকে গাড়ী বদল করে মেয়েটি যখন ডিগবয়ের গাড়ীতে উঠতে যাবে দেখতে পেল সেই যুবকটি একটি কাল রঙের প্রাইভেট-কারে তার দলবল নিয়ে উঠে বসেছে। আবার দু'জনের ক্ষণিক দৃষ্টিপাত, আর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী ধুলো উড়িয়ে অদৃশ্য হ'ল।

এবার সুমিতা নিশ্চয় চিনতে পেরেছে। মেদিনীপুরে তার বাবা তখন চাকরী করতেন। ওখানকার উচ্চ-বিদ্যালয়ের হেড-মাষ্টার ছিলেন তিনি। সুমিতা ও সুজাতা রথীনবাবুর দুই মেয়ে। তিনি বিপত্নীক ছিলেন। বড় মেয়ে সুজাতার ডিগবয়ে বিয়ে হয়েছে। তার স্বামী ওখানকার তেল-কোম্পানীতে পদস্থ চাকুরিয়া। সুমিতা সেই সময় কলকাতায় একটা কলেজের ফোর্থ ইয়ারের ছাত্রী। গ্রীষ্মের ছুটিতে বাবার কাছে মেদিনীপুর গিয়ে অলকের বাবার সঙ্গে তার পরিচয় হয়। অলকের বাবা তখন দু'চার মাস আগে মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে আসেন। তিনি সুমিতাকে দেখে রথীনবাবুর কাছে অলকের সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাব তোলেন। সে সময় অলক তার মাকে নিয়ে পশ্চিমে বেড়াতে গিয়েছে, কাজেই কর্ত্তার একার মতেই প্রস্তাবটা দানা বেঁধেছিল। পাত্র হিসেবে অলক সুপাত্র কিন্তু অলকের মা ফিরে এসে এ কথা শুনে একেবারে বেঁকে বসলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের ছেলে জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটের ঘরেই বিয়ে করবে. কাজেই বিয়ে গেল ভেঙে। ইতিমধ্যে কথাটা দু'চার কান হওয়ায় পাত্রপাত্রীও শুনল। অলকের সুমিতাকে বেশ পছন্দ হয়েছিল, কিন্তু মায়ের মুখের সামনে নিশ্চুপ। এ ঘটনার পরে সুমিতার বিয়ের চেষ্টা আর হয় নাই, তার বিয়ের ব্যাপারে কেমন একটা বিতৃষ্ণার ভাব রয়ে গেছে। সুরূপা কন্যা, তার ওপর বিদ্যার লোলুপ আছে, রথীনবাবু ইচ্ছে করলেই ভাল পাত্র যোগাড় করতে পারতেন কিন্তু পিতা কন্যা দু'পক্ষই উদাসীন।

এর পর পাঁচ বছর কেটে গেছে। অলকের বাবা আর মেদিনীপুরে নেই। ওদের কোন খবরই সুমিতারা জানে না। ধীরে ধীরে পাঁচ বছরে সবই ঝাপসা হয়ে গেছে। কলকাতায় এক বিশিষ্ট কলেজে সুমিতা রায় অর্থনীতির অধ্যাপিকা। ছুটিছাটাতে এখানে ওখানে ঘুরে সময় কাটে। ডিগবয়ে গ্রীষ্মাবকাশে তার ছুটি কাটাবার ইচ্ছা অন্ততঃ দিন দশেক ত বটেই। এতকাল পরে অলককে দেখে তার কত প্রশ্ন মনে এল। এখানে কোথায় সে এসেছে, কেন, ইত্যাদি কত এলোমেলো চিন্তা হতে হতে এক সময় গাড়ীখানা ষ্টেশনে পৌঁছে যেতেই দিদি-জামাইবাবুর কলকণ্ঠের সম্বর্দ্ধনায় সেই ভাব থেকে ছাড়া পেয়ে বেঁচে গেল।

পরের দিন সকালবেলা সুমিতা বসে বসে তার দিদি ও তার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গল্প করছে এমন সময় মিসেস বোস, ওখানকার একজন ডাক্তারের পত্নী, এলেন বেড়াতে। মনীষা বোসের সুজাতার সঙ্গে একটু হৃদ্যতা বেশী। তার ছেলেমেয়ে দুটিই বড় হয়ে গেছে কাজেই আজ জলসা কাল পিকনিক ইত্যাদি হৈচৈতে মেতে থাকতে ভালবাসেন। একটা পিকনিক পার্টির ব্যবস্থা করবার ব্যাপারে সুজাতার কাছে এসেছেন, সুমিতাকে পেয়ে খুব খুসী হলেন। এর

সাহায্যে পার্টির আনন্দ আরও বাড়বে ভেবে এই তরুণী অধ্যাপিকাকে কর্ম্মকর্ত্তদের মধ্যে একজন ধরে নিলেন। সুমিতা অবশ্য আপত্তি করে নাই বরং খুশী মনে যোগ দিল।

তার পর চলল বাড়ী বাড়ী চাঁদা আদায়, খাওয়া-দাওয়ার যোগাড়যন্ত্র। ঠিক হ'ল আসছে রবিবার শিলং রোডে মিঃ এ কে রায়ের ডাকবাংলোতে বসবে পিকনিকের আসর। মিঃ রায় অবিবাহিত মানুষ তার পর মাঝে মাঝেই বাইরে চলে যেতে হয়—ফাকা বাড়ী পেতে অসুবিধা হ'ল না। পিকনিকের আগের দিন সকালে মিঃ রায় বলে পাঠালেন তিনি চাকর-বেয়ারা সব রেখে গেলেন, কর্ম্মকর্ত্তারা এসে কোথায় কি কি ব্যবস্থা হবে যেন দেখে নেন।

দুপুরের পর হতে সুমিতাকে মিসেস বোস ও-বাড়ীর ব্যবস্থা করতে পাঠালেন। বাইরে ঘোরাফেরায় সুমিতার অপছন্দ, এক জায়গায় কাজ করতে অসুবিধা নেই। মিসেস বোস আরও দুচার জন মহিলার সঙ্গে বিকেলের শেষে এসে দেখে গেলেন আর বলে গেলেন ন'টার মধ্যে তাকে বাড়ী নিয়ে যাবেন।

সুমিতা চাকরদের সাহায্যে আনাজপাতি কুটিয়ে রাখছে, জলের জায়গা ঠিক করছে, খাওয়ার জায়গা, বিশ্রামের জায়গা সব ঘুরে ঘুরে ঠিক করছে। খেলাধূলার ব্যবস্থা হৈ-চৈয়ের আসর সব-কিছুর স্থান নির্ব্বাচন ও বন্দোবস্ত করতে রাত প্রায় সাড়ে আটটা বেজে গেল, কিন্তু একি! মিসেস বোসের পাত্তা নেই। কাজ-শেষে অপরিচিত পরিবেশে ওর কেমন অসোয়াস্তি লাগছে। গৃহস্বামী তার অপরিচিত, তিনিও অনুপস্থিত—ফাঁকা বাড়ীটায় ঘুরে ঘুরে এক সময় ক্লান্ত হয়ে বাগানে বেঞ্চীতে বসে পড়ল। ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় রকমারী ফুলের শোভায় পরিবেশটি বড় চমৎকার। গৃহকর্ত্তার বেশ পুষ্পপ্রীতি আছে বলতে হবে। হঠাৎ গাড়ীর হর্ণ শুনে সুমিতা গেটের দিকে তাকাল। মনীষাদির এতক্ষণে আসার সময় হ'ল! অনুযোগের সুরে বলে উঠল, 'মনীষা-দি—বেশ লোক আপনি, এতক্ষণে সময় হ'ল?' বলে গাড়ীর কাছে এগিয়ে যায়। কিন্তু উত্তর না পেয়ে আর চাকরদের কর্ম্ম-ব্যস্ততায় বুঝল তার অনুমান ভুল হয়েছে, স্বয়ং গৃহকর্ত্তা উপস্থিত। এরকম বলে ফেলে চোখ তুলে তাকাতেই যেন ভূত দেখেছে এমনি তার মুখের চেহারা হ'ল। একি! এ যে সেই ছেলেটি যাকে সেদিন তিনসুকিয়া ষ্টেশনে দলবলের সঙ্গে দেখেছে। পূর্ব্ব সম্বন্ধের কল্পনায় তার কানের পাশদুটো গরম হয়ে ওঠে। অলক রায়ই তা হলে মিঃ রায় জিওলজিষ্ট। এমন যে হতে পারে তার কল্পনায়ও আসে নাই। দু'জনেই কিছুক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে মূক হয়ে যায়। অলকই প্রথম তাকে এ রকম অবস্থা থেকে মুক্তি দিল। অবস্থাটা সহজ করবার জন্য একটা কিছু বলা দরকার। সুমিতা কেমন করে এল সেটা পরে ভাবলেও চলবে।

'মিস মিত্র, আপনাদের সব ব্যবস্থা ঠিক আছে ত? কোন অসুবিধা হলে আমাকে জানাবেন' ইত্যাদি আরও কিছু বলবার আগেই মনীষা বোসও এসে উপস্থিত। তিনি বললেন—'এই যে মিঃ রায়—আপনার বাড়ীটা তাহলে দেড় দিনের জন্য আমাদের দিলেন? বাব্বা, কি কাজের মানুষ, সমস্ত দিন পাত্তা নেই! কালকেও কি এরকম করবেন নাকি?'

অলক বলল, 'না—কাল পিক্‌নিকে ঠিকই আছি।'

মিসেস বোসের খেয়াল হ'ল মিঃ রায়ের সঙ্গে সুমিতার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় নাই, তাই ত্রুটি সেরে নিতে বলল—

'আপনার সঙ্গে ত এর পরিচয় নেই, ইনি হলেন মিস সুমিতা মিত্র, কলিকাতায় একটি কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপিকা—এখানকার মিসেস বিশ্বাসের বোন। ওকে এ সময় পেয়ে বড় উপকার হ'ল।'

বাধ্য হয়েই অলক আর সুমিতাকে নমস্কার-বিনিময় করতে হয়; আর দু'-চারটা প্রয়োজনীয় কথা সেরে সুমিতাকে নিয়ে মনীষা বোস চলে গেলেন।

গাড়ীখানা অদৃশ্য হতেই অলকার মনে আবার এলোমেলো কথাগুলি ভীড় করে তুলল। সুমিতার সঙ্গে বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়ার পর একরকম মায়ের উপর অভিমান করেই সে কলকাতা চলে আসে। জিওলজিতে ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হয়ে এখানে সেখানে কিছু দিন কাজ করবার পর এই আসাম অয়েল কোম্পানীর চাকুরী পেয়ে বছর খানেক হল এখানে এসেছে। বাপ তার রিটায়ার করেছেন। কিছুতেই ছেলেকে বিয়েতে রাজী করতে না পেরে তার উপর ছেড়ে দিয়েছেন বিয়ের ভার। তাঁরা কাশীবাস করছেন, মাঝে মাঝে অলক যায় সেখানে। এবারও কাশী থেকে কলকাতা হয়ে—ডিগবয় আসতে পথে সুমিতার দেখা পেয়ে যায়। তার সঙ্গে মিঃ কিরণ বসুর ছেলেমেয়েরা কলকাতা থেকে একই গাড়ীতে আসে।

সুমিতার মত মেয়েকে দেখলে সহজে অন্য মেয়ে পছন্দ না হতে পারে। অলক না হয় বিবাহবিমুখ—কিন্তু সুমিতা কেন বিয়ে করল না, তবে কি—কিন্তু এই কি-টা যে কি হতে পারে, অলক ভেবে পায় না। আশা-নিরাশার ঘাত-প্রতিঘাতে রাতের তিন ভাগ কাটিয়ে একসময় সে ঘুমিয়ে পড়ে।

ভোরের আকাশে সবে আবীরের ছড়াছড়ি সুরু, এমনি সময়ে মিসেস বোস, মিসেস বিশ্বাস, মিসেস ধর প্রভৃতি কয়েক জন মহিলা ও সুমিতা অলকের বাড়ীতে এসে পৌঁছল। একতলাটা জুড়ে কর্ম্ম-মুখরতার অন্ত নেই। আটটা-ন'টার পর থেকে ভীড় জমতে সুরু হবে, তার আগে শেষ গোছগাছটা সেরে নিতে হবে।

সুমিতার সে কি অসোয়াস্তি, না পারে বলতে না পারে ছাড়তে—শেষ মুহূর্ত্তে এত বড় একটা কাজের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে মন চায় না—পিকনিকের আনন্দ তার ভোগ করা হ'ল না। আর পিছিয়ে গেলে অলকা কি ভাববে, তার চেয়ে কোন রকমে কাটিয়ে দিতে পারলে বাঁচে।

সব শেষে রান্নামহলে চাকর-বামুনদের কতটা কি ব্যবস্থা করা

দরকার বোঝান হল। এখন কিছু সময় তারা বসে কথাবার্ত্তা বলতে পারে।

কোন্ সকালে বেরিয়েছে, একটু চা হলে মন্দ হয় না—মিসেস বোস চায়ের যোগাড়ে রান্নার জায়গায় যাবেন ভাবছেন এমনি সময়ে দেখা দিল অলকের বেয়ারা। বললে, 'সাহেব উপরে আপনাদের চা খেতে ডাকছেন।'

'ওরে বাপরে! এ যে মেঘ না চাইতেই জল। নাঃ, মিঃ রায়ের বিবেচনা আছে বলতেই হবে। চল—চল শীগগির,' বলে মনীষা বোস দলবল শুদ্ধ উঠে পড়েন। সুমিতা কিন্তু ওঠে না, বলে, 'আপনারা যান মনীষাদি, আমি আর চা খাব না।'

'খাবে না? কেন?'

'এমনি ইচ্ছে করছে না; বরং এ দিকটা দেখাশোনা করি, আপনারা সেরে আসুন।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা এক্ষুণি আসব।' বলে তিনি ওদের নিয়ে উপরে চলে গেলেন।

ওদের পায়ের শব্দ সিঁড়িতে শোনা যাচ্ছে। অলকের মনে খুশী উপচে পড়ছে। এল—সুমিতা তার গৃহ-মন্দিরে এল। কিন্তু ওকি, সুমিতা কোথায়, কেন সে এল না, জিজ্ঞেস করবে কিনা ভাবছে—'নাঃ থাক, কি মনে করবেন ওরা।'

এর পর ঘণ্টা দুই বাদে জমতে সুরু হয় পার্টি। রকমারী পোষাকের বাহারে মেয়েরা ঝলমল করছে, ছেলেদের স্যুট-টাইয়ের বহরও কম নয়। বিবাহিত, অবিবাহিত, স্বামী-স্ত্রী তাদের ছেলে-মেয়ে যে যার দলে ভিড়ে পড়ল।

গল্পগুজবের ফাঁকে চা-পর্ব্ব শেষ হ'ল। তারপর ঝোপেঝাড়ে বাগানে যে যার খুসী মত গল্প করছে। আবার সঙ্গীতের রেশও ভেসে আসছে।

সুমিতার মনটা কেমন খাপছাড়া লাগছে, ভীড় ছাড়িয়ে বাগানের একটা নির্জ্জন অংশে বসে রইল সে, কিছু ভাল লাগছে না তার। ওদিকে তখন গল্প-হাসি-ঠাট্টার মরশুম চলেছে।

অলক তার কয়েকজন বন্ধু ও সহকর্ম্মীর সঙ্গে গল্প করছে। ওদের একজনের নজর সুমিতার ওভাবে বসে থাকার দিকে পড়তেই অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। মিঃ পালিত মিঃ দাশকে বলছে—'আচ্ছা উনি মিসেস বিশ্বাসের বোন না?'

'হাঁ—কেমন সুন্দর চেহারাখানা', মিঃ দাশ বলেন।

'দেখতে ভাল হলে কি হবে, মনে বোধ হয় রসকষ নেই' মিঃ ধর ফোড়ন কাটেন।

'তুমি কেমন করে জানলে?' পালিত জিজ্ঞেস করে।

'আরে উনি ত আরও দু'-এক বার ডিগবয় এসেছেন। আমি বাপু নাম বলতে চাই না, এখানকার দু'-তিন জন ভদ্রলোক ওর দিদির কাছে ওকে বিয়ে করবার অভিলাষী হয়ে আবেদনও জানিয়েছেন কিন্তু সাফ জবাব, বিয়ে করবেন না। নিশ্চয়ই কাউকে পছন্দ করতেন—সেখানে হয় নাই' বলে—ধর তার বক্তব্য শেষ করে।

ওদের আলোচনায় অলক এতক্ষণ চুপ করেই ছিল, শেষের কথাটায় মনে ভীষণ দোলা লাগে। মনের ভাব চেপে রেখেই বলে, 'তোমাদের যত বাজে আলোচনা। একজন মহিলা চুপ করে বসে আছেন আর কল্পনার পাখায় চড়ে যার যা ইচ্ছা বলে যাচ্ছো।'

'আরে না হে তুমি জানবে কি করে? তবে শোন, আমার বৌদির সঙ্গে ওর দিদির খুব ভাব আছে। অতি সংগোপনে তিনি দিদিকে একথাটা বলেন, আবার বৌদি যখন দাদার কাছে বলেন আমি শুনে ফেলি।'

অলকের মনে খুশীর বান ছোটে। তবে এখনও সময় আছে হয়ত, সুমিতার কাছে তাকে বলতেই হবে—সুমিতা আমি তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি—দয়া করে আমাকে গ্রহণ কর।

কিন্তু কেমন করে কোন্ পথের নিরালা বাঁকে হবে ওদের দেখাশোনা তাই ভেবে পায় না। বহুর মধ্যে সুমিতা বসে আছে একক হয়ে, নিরালায় পাওয়া যাবে কি?

এদিকে হৈ-চৈ পুরোদমে চলছে, খাওয়ার ঘণ্টা ঢং ঢং করে বেজে গেল। একসঙ্গে দারুণ ভীড় জমে উঠল। কল-কোলাহলের নাগালের অদূরে সুমিতা তার খাওয়াটা সেরে নিচ্ছে। তারই পাশে আরও চার-পাঁচ জন মহিলা খেতে বসেছেন। ওদের কাউকে সুমিতা চেনে না, কথাবার্ত্তা ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক কানে যাচ্ছে। একজন বলছে, "দেখ, রাঙুদি দেখ—মিসেস ঘোষের রকমটা দেখ, আবার গায়ে পড়ে মিঃ রায়ের সঙ্গে কথা বলছে।'

আর একজন বলছে, 'করবে না? ওকে ত জান না—ওর ভাবখানা এই—এক বার না পারিলে দেখ শত বার। মেয়েটিকে কি মিঃ রায়ের সঙ্গে বিয়ে দেবার কম চেষ্টা করলেন? রায় বড় শক্ত মানুষ।'

মিঃ রায়—কথাটায় সুমিতা উৎকর্ণ হয়ে রইল। কার কথা বলছে, অলক নয় ত?

পরচর্চ্চার সুযোগ পেলে মেয়েরা সহজে থামতে চায় না। এ আলাপ আরও কিছুক্ষণ চলল। তার বিষয়বস্তু হ'ল মিসেস ঘোষ। তার মেয়ের সঙ্গে অলকের বিয়ের কথা উঠেছিল, কিন্তু অলক নাকি বিয়েই করবে না, সকলকেই নিরাশ হতে হয়।

তখন আলাপটা আবার অন্য খাতে বয়। মিঃ রায় নিশ্চয় কোন মেয়েকে ভালবাসতেন ইত্যাদি অনেকরকম মন্তব্য চলতে থাকে, না হলে মাইনে ত মোটা পান, বাবা-মার এক সন্তান, কারণ আর কি হতে পারে!

সুমিতার মনে ঘুরেফিরে আবার অলকের কথাই আসছে। যত ভাবে এ লোকটার কথা ভাববে না ততই যেন আরও বেশী করে মনে পড়ে।

অলকও বিয়ে না করেই আছে! না করেছে ত বয়ে গেছে, সুমিতার তাতে কি!

সন্ধ্যার ছায়া ধীরে ধীরে নেমে আসছে, সুমিতা সুজাতাকে বলে বাসার চলে গেল, তার ভাল লাগছে না ওখানে থাকতে। অলকের চোখ ওর পরেই চুপি চুপি ঘুরছিল, গাড়ীটা বাঁক ঘুরতেই নিরুৎসাহ মনে বসে থাকে। ওদের আনন্দের মাঝে না থেকে উঠে চলে গেল নিজের ঘরে। একের মনের ছোঁয়াচ অপরকে টেনে নিয়েছে। সুমিতার মনের বিক্ষোভ অলকের চোখে ধরা পড়েছে, লগ্নভ্রষ্ট হয় নাই তা হলে—তা হলে এখন অলক রায় কি করবে?

সেদিনের পার্টির পর চার দিন হয়ে গেছে। সুমিতা পাঁচ-ছয় দিনের মধ্যে কলকাতা ফিরবে। যাওয়ার আগে ডিগবয়ের ঝোপ-ঝাড়ে-পূর্ণ অয়েল ফিল্ডগুলি মাইলের পর মাইল গাড়ীতে করে ঘুরে বেড়ায়, লোকালয়ে বেড়াবার উৎসাহ তার নিবে গেছে, কোথাও আবার অলকের সঙ্গে দেখা হয়ে পড়ে!

জামাইবাবুকে বলে আসছে সোমবারের ট্রেনের টিকিট কেনা ও বার্থ রিজার্ভ পর্য্যন্ত হয়ে গেছে। পূর্ব্বের সেই হাসিখুসী ভাবটি ঠিক বজায় থাকছে না এটা সুজাতার নজর এড়াল না। এক সময় সে সুমিতাকে জিজ্ঞেস করে—'সুমি, তোর শরীরটা কি ভাল নেই?'

'কেন? শরীর ত আমার বেশ ভাল আছে', সুমিতা উত্তর দেয়।

সুজাতা বলে—'সব সময়ই মনে হয় যেন কিছু ভাবছিস, কারও বাড়ীতেও বেড়াতে যেতে চাস না—'

'ও এই! এমন পাহাড়-জঙ্গলের দৃশ্য ছেড়ে লোকের বাড়ীতে বেড়াতে ভাল লাগে! ইট-কাঠের কলকাতা ছেড়ে সবুজের ছায়ায় চোখ জুড়িয়ে গেছে, আবার ত সেই মানুষ আর বাড়ী, ট্রাম আর বাস' বলে সুমিতা থেমে পড়ে।

ক্রমে সোমবারও এসে গেল। বিকাল পাঁচটায় সুজাতা ও মিঃ বিশ্বাস এসে তাকে গাড়ীতে তুলে দিল। ষ্টেশনের শেষ ঘণ্টার শেষে গাড়ী ধীরে ধীরে প্ল্যাটফর্ম্ম ছেড়ে গেল। ঝোপঝাড়, পাহাড়, সমভূমি সব একাকার হয়ে গেছে সুমিতার চোখে, জানালার বাইরে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, কি যে ভাবছে নিজেই জানে না।

এমনি করে ঘণ্টাখানেক চলে গেল। গাড়ী তিনসুকিয়া ষ্টেশনে পৌঁছল। সুমিতা আবার প্ল্যাটফর্ম্ম বদলে এক্সপ্রেস ট্রেনে গিয়ে বসল।

সুমিতা ত কলিকাতা যাওয়ার ব্যবস্থা করছে, এদিকে মিঃ রায় কি করবেন—কেমন করে ওর সঙ্গে দেখা করা যায় ভাবছেন। বন্ধু, সহকর্ম্মী কয়েকজন বেশ অন্তরঙ্গ আছে কিন্তু মনের গোপন কথা বলতে পারে সেরকম কেউ নেই। অলক্ষিতে চোখ রেখে দেখে মিঃ বিশ্বাসের সবুজ গাড়ীখানা সুমিতাকে নিয়ে অয়েলফিল্ড ঘুরছে। যাবে নাকি ওর কাছে—কিন্তু না, এত ছোট জায়গা, কেউ না কেউ দেখে ফেলতে পারে, মিঃ রায়ের ইচ্ছা হয় না। তার পর তার আবেদন সুমিতা মঞ্জুর করবে কিনা জানলেও না হয় হ'ত।

সেদিন সন্ধ্যার ছায়া সবে নামতে সুরু হয়েছে, অলক বাড়ী ঢুকল। ক্লাবে যেতে একটুও ইচ্ছা হয় না। বসে বসে বই, মাসিকপত্রিকা নাড়াচাড়া করছে। এদিকে মিঃ ধর এসে ঢুকল ওর ঘরে। ক'দিন সে ক্লাবে যায় নি, বন্ধুমহল খবর নিতে ওকে পাঠাল। এ সময়ে অলককে চুপ করে বসে থাকতে দেখে ত অবাক!

'কি হ'ল তোমার, ক্লাবে যাচ্ছ না? ক'দিন ত হয়ে গেল।'

কি আর করে সে, শরীর খারাপের দোহাই দিয়ে কৈফিয়ৎ দেয়। ধর হয়ত কিছু খবর রাখতে পারে ওর বৌদির ত ও-বাড়ী যাতায়াত আছে কিন্তু কেমন করে সুরু করা যায়, এরা আবার যা চালাক সেদিন সুমিতার পাণিপ্রার্থীদের সম্বন্ধে যেভাবে বলল! থাক—তার চেয়ে কলকাতা গিয়ে সুমিতাকে ধরবে, ছুটি না হয় আবার নেবে, উপরওয়ালা খুসী আছে তার ওপর।

একথা-সেকথার পর অলক বলে, 'সেদিনের পার্টিটা বেশ enjoyable হয়েছিল, না?'

'তা মন্দ হয় নাই—' ধর বলতেই অলক আবার বলে—'মিসেস বোসের এসব করবার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে।'

'সে ত ঠিক কথা, তবে এবারকার পার্টিতে অত নিখুঁত ব্যবস্থা মিস মিত্র করেছিলেন।'

'মিস মিত্র?' বিস্ময়ের সুরে যেন কথাটা বলে অলক।

'হ্যাঁ, মিসেস বিশ্বাসের বোন। পিকনিক উপলক্ষ্যে বেশ হৈ-চৈ করা গেল। আমার বৌদি, মিসেস বোস ওরা ত আজ মিঃ বিশ্বাসের বাড়ী গেলেন ওর সঙ্গে দেখা করতে—কাল ত উনি চলে যাচ্ছেন।

অলক অদম্য চেষ্টায় তার স্বাভাবিক ভাবটি বজায় রাখে। সুমিতা—সুমিতা কাল চলে যাবে—এখন কি করা যায়—আর ক'দিন সে কেবল বসে বসে ভাববে, এবার কিছু করা চাই-ই?

পরদিন সকালে উঠেই সে তার সাহেবের কাছে গেল। তার পর ষ্টেশনে গিয়ে সেখানকার কর্ম্মচারীদের সঙ্গে কি সব ব্যবস্থা করে ফিরে এল। বাড়ী এসে চাকরকে বলল, আজই বিকেলে সে কয়েক দিনের জন্য বাইরে যাবে।

যথোচিত তৈরি হয়ে বিকাল তিনটা নাগাদ সে তার গাড়ীখানা নিয়ে বের হয়ে পড়ে। যখন সব সহকর্ম্মীরা আপিসে বসে কাজ করছে অলকের ড্রাইভার তখন তাকে নিয়ে তিনসুকিয়ার পথে রওনা হয়েছে। সেখানে পৌঁছে যখন সে কলকাতার গাড়ীতে উঠবে সুমিতা কি ভাবতে পারবে তার পাশের বার্থে অলক যাচ্ছে!

আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে অলকের সুন্দর মুখখানায় করুণ-বিষণ্ণ ভাবের ছায়া নেমেছে। কি-ই বা আর সঙ্গে নেবে, একটা সুটকেস আর বেডিংই যথেষ্ট। হবে কি না হবে তার প্রার্থনা পূর্ণ, সেটাই বড় কথা।

এক্সপ্রেস ট্রেনখানা ৭-৩০ মিনিটের সময় ধীরে ধীরে তিনসুকিয়া

জংসন ছেড়ে যাচ্ছে। জানালার ধারে বসে সুমিতা দেখছে যাত্রীদের সঙ্গে কুলীদের দরাদরি, গার্ডের নিশান ওড়ান, ডিসট্যান্ট সিগন্যালের লাল আলো। ক্রমে ষ্টেশন দূরে পড়ে রইল। আরও কিছুক্ষণ অন্ধকারের ভিতর তার দুই চোখ মেলে ধরে আবছা দূরের পাহাড়গুলি দেখল তার পর—তার পর এক সময় প্রায় ঘণ্টাখানেক পর কামরার ভিতরে তাকাল। সেই ফার্ষ্টক্লাস কামরায় যাত্রী বেশী ছিল না। মাত্র চার জন—সে নিজে, দু'জন মাদ্রাজী স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি বসে গল্প করছে আর একজন সুটপরা ভদ্রলোক তার বার্থের কাছেই আর বেঞ্চিতে বসে আছে। তার মুখটা জানালার দিকে রয়েছে, মনে হয় বাঙালী হতে পারে, হাতে একখানা ইংরেজী কাগজ। অবশ্য সেদিকে তার নজর নেই বাইরের দিকে মুখ নিয়ে বসে আছে। কামরাটায় মোটামুটি চোখ বুলিয়ে মণিবন্ধের ঘড়িটাতে দেখল রাত তখন মোটে ৮-৩০ হবে। একখানা বই খুলে বসল সে। অন্ততঃ নটার আগে খেতে ইচ্ছে করছে না, আসার সময় সুজাতা টিফিন-কেরিয়ারে লুচি তরকারি-মিষ্টি কি যেন সব দিয়েছে, তখন খুললেই হবে।

বই পড়তে পড়তে একটা ষ্টেশন পার হয়ে গেল।

ওদের গাড়ীতে কেউ উঠল না, গাড়ী ছাড়তে নিশ্চিন্ত হয়ে বাইরে থেকে মুখ ফিরিয়ে সোজা হয়ে বসতেই একেবারে অলকের সঙ্গে আবার মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। বিস্মিতা সুমিতা নিশ্চল চোখে তাকিয়ে দেখছে—সে কি স্বপ্ন দেখছে নাকি? সত্যি কি অলক ওখানে বসে আছে, না অন্য কেউ? একরকম চেহারা ত কত সময় দেখা যায়।

অলক আগে থেকেই ওর দিকে তাকিয়ে ছিল আর এটাও বুঝতে পেরেছিল—সুমিতা ওকে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যাবে। সুমিতার দৃষ্টির সঙ্গে চোখ মিলাতে মৃদু হাসিতে মুখ ভরে উঠল তার। এখন সে আর সুমিতা—দীর্ঘ সময়—এই ত সুযোগ—পারবে না কি সে খুসী করতে তাকে!

আসন ছেড়ে উঠে এল অলক তার কাছে কিন্তু কেমন করে সুরু করবে তাই ভাবছে। বঙ্গভাষায় শব্দ-সম্ভার যে কত অকিঞ্চিৎকর এই প্রথম তার বোধ হ'ল। কিছু একটা বলতেই হয়।

'মিস মিত্র' বলে অলক একটু চুপ করে থাকে। সুমিতা জিজ্ঞাসু ভাবে চোখ তোলে ওর দিকে। কালো তারায় কোন্ ভাষা ফুটে ওঠে অলক কেমন করে জানবে? তাই ওর নীরব চাউনির সামনে বলে—'মিস মিত্র—স্বপ্নভ্রষ্ট হয়ে দু'জন দুদিকে ছিটকে চলে গিয়েছিলাম, আবার আপনার দেখা পেয়ে এ ক'দিন স্বপ্নের জাল বুনেছি। স্বপ্ন কি সফল হয় না?' অলকের স্বরের কম্পনটা স্পষ্ট হয়ে সুমিতার কানে বাজে।

কিছুক্ষণ সে চুপ করে থাকে—তার পর বলে: 'দেখুন যা চুকে শেষ হয়ে গেছে তাকে আর যোড়া দিয়ে লাভ নেই।' বলে সুমিতা চুপ করে। তার জবাবটা এত স্পষ্ট ও সতেজ যে একটা আকস্মিক আঘাতে অলকের সমস্ত মনটা অসাড় করে দেয়। তবুও শেষ চেষ্টা করে অলক—'কিন্তু আমি যে আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম'—বলে করুণ ভাবে তাকিয়ে থাকে।

'নাঃ তা আর হয় না'—সুমিতা উত্তর দেয়।

এই কি সুমিতার শেষ কথা—এরই জন্য এতখানি পথ ছুটে এল সে—মুহ্যমান হয়ে নিজের আসনে গিয়ে বসে রইল অলক। আর সুমিতা তার বইয়ে মন দিল।

হু হু করে ট্রেন চলেছে, রাত ক্রমশঃ গভীর হয়ে এল, ওদের খাওয়ার কথা মনেও পড়ে না। অলক সূচীভেদ্য অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দেখে, তার মনের আঁধার এর চেয়েও গাঢ় হয়ে নেমেছে, সেখানে আর পূর্ণিমায় উদয় হবে না, দ্বিতীয় বার হারাবার দুঃখ যেন আরও তীব্র হয়ে উঠল।

অবিশ্রান্ত ট্রেনের দোলানিতে এক সময় অলকের চোখ বুজে আসে। কিছুক্ষণের জন্য সে ঘুমিয়ে পড়ে। সমস্ত কামরাটায় জাগরণের চিহ্ন নেই। কিন্তু সুমিতা কি ঘুমিয়েছে—আধঘুম আধজাগা অবস্থায় কাটিয়ে ভোর হওয়ার কিছু আগে সে উঠে বসে।

অলকের দিকে চোখ পড়তেই রাতের কথা মনে পড়ে। ওর ঘুমন্ত মুখের মধ্যে বিষাদের ছায়া নেমেছে। সুন্দর অলক আরও সুন্দর হয়েছে। ডিগবয়ের কত মেয়ের মায়েরা ওকে মেয়েদের জন্য চেয়েছে, সে কথা ত সে নিজের কানেই শুনেছে। কয়েক ঘণ্টা আগে অলক নিজের মুখে বলেছে যে, সে তারই জন্য অপেক্ষা করে আছে।

আচ্ছা সুমিতা কি করল—মন যাকে অত করে চাইছে মুখে কেন এত বিরূপ ভাষা বলল—কি করবে সে এখন? পরে আবার সান্ত্বনা খোঁজে—যদি তারই জন্য আসা হয়ে থাকে ত কলকাতা পর্য্যন্ত নিশ্চয় টিকিট কেনা আছে। আপোষ হতে পারবে।

ভোরের আলো ফুটতে সুমিতা মুখ ধুয়ে শাড়ী বদলে নিল, প্রসাধন সূক্ষ্ম ভাবে করে আবার নিজের জায়গাটিতে বসে অলকের দিকে তাকিয়ে থাকে। বেলা বেড়ে চলে।

রোদের ঝাপটা চোখে পড়তেই অলকের ঘুম ভেঙ্গে যায়। চোখ খুলে চারদিকটা তাকাতেই দুঃস্বপ্নের মত সব কথা মনে ওঠে। আর উঠতেও ইচ্ছা হয় না—কপালের উপর হাত রেখে চোখ ঢেকে শুয়ে থাকে, ভাবছে কি করবে? ফিরে যাবে কর্ম্মস্থলে? কিন্তু সাহেব কি বলবে আর তাতেই বা সুখ কি, তার চেয়ে দেখি না শেষ পর্য্যন্ত কি হয়।

বেলা আটটা পর্য্যন্ত কোন রকমে শুয়ে থেকে অলক উঠে বসে। অমন সুন্দর চোখ দুটিতে রাত্রি-জাগরণের ছাপ সুস্পষ্ট, উঠে মুখ-হাত ধুয়ে এসে আবার নিজের আসনে চুপ করে বসে থাকে।

বাইরের গাছপালা ঝোপঝাড় নদীনালা সব শূন্যদৃষ্টির সামনে পার হয়ে যেতে থাকে।

বয় এসে চা দিতেই অলকের সুমিতার কথা মনে পড়ে, তাকেও

ত কাল থেকে কিছু খেতে দেখছে না। সুমিতা তাকে গ্রহণ করুক আর না করুক, তার খোঁজ নেওয়া ত অলকের কর্তব্য। দু'কাপ চা ঢেলে এক কাপ সুমিতার দিকে এগিয়ে দিতেই সুমিতা মৃদু আপত্তি তুলতে অলক বলে ওঠে—'চাতেও কি দোষ আছে মিস মিত্র? পরিচিত লোকের কাছ থেকে এটুকুও কি নেওয়া চলে না'—বলে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। আপত্তি আর চলে না—নিতেই হয় চায়ের পেয়ালা—সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে কাল ওদের কারও খাওয়া হয় নি, কাছের টিফিন-কেরিয়ারটা খুলে সুজাতার দেওয়া কয়েক রকম মিষ্টি ও নিমকি বের করে দু'খানা প্লেটে সাজিয়ে নেয়, তার পর একটা অলকের হাতে দিয়ে বলে—'নিন, কাল থেকে ত উপোষ দিচ্ছেন, শুধু চা আর খেতে হবে না'—বলে ওর দিকে তাকাতেই দেখে অলকের হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি ওর উপরই পড়ে আছে। কিছু না বলে খাবার ও চা-তে মন দিল।

দুপুরে স্নান সেরে নিয়ে সুমিতা বের হয়ে এসে দেখে অলক তখনও ঘুমিয়ে আছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল সে, এ লোকটার স্নানটান নেই নাকি। ডাকবে কিনা ভাবছে। একটু পরে ট্রেন একটা ষ্টেশনে এসে দাঁড়াতেই অলকের ঘুম ভেঙে গেল। সদ্য স্নান করে এসেছে সুমিতা, ষ্টেশনের দিকে চোখ চেয়ে আছে, অলকের মুগ্ধ দৃষ্টি ওর 'পরে পড়ে আছে সে টের পাচ্ছে না। সুমিতা একটু নড়েচড়ে এদিকে তাকাতেই অলক উঠে পড়ে। স্নান সেরে পোষাক বদলে ফিরে এসে দু'জনের মত খাবার অর্ডার দেয়। যেন এটাই স্বাভাবিক এমনি ভাবে বয়কে হুকুম দিচ্ছে।

বার বার আপত্তি করে সিন তৈরী করতে ভাল লাগে না—কি আর করবে, যে ভাবে চলে চলুক।

এমনি করে দিনের আলো শেষ হতে ওরা পাণ্ডু পৌঁছে যায়। এবার আর অলকের সঙ্গে কোন দলবল নেই। কুলীর মাথায় ওদের মোটঘাট রওনা করে নিজেরা এসে ষ্টীমারে উঠল।

বর্ষার জলোচ্ছ্বাসে নদীর বুকে জেগেছে অশান্ত যৌবন, বাঁকা ঢেউগুলির দাপাদাপিতে মাঝে মাঝে পাড় ভেঙে পড়ছে, ঝুপঝাপ শব্দে ঘূর্ণীর স্রোতে পাড় মিলিয়ে চলছে।

অলক ও সুমিতা ডেকে এসে দাঁড়াল। নদীর উদ্দাম নর্ত্তন সুমিতা রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দেখছে। অপরাহ্ণের শেষ রক্তিম ছটায় পশ্চিম আকাশ ছেয়ে গেছে' তার আভা সুমিতা ও অলকের মুখে এসে পড়েছে কি? না হলে ওদের মুখ অত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে কেন? প্রকৃতির রূপ-বৈচিত্র্যে ওদের মনের গোপন তার বেজে উঠেছে, সেখানে নহবতের সানাই পূরবীর সুরে গেয়ে চলেছে।

সাধ্য কি সুমিতা অলকের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে থাকে? সে টের পেয়েছে অলক তার খুব কাছে দাঁড়িয়ে আছে। নিঃশব্দে অলকের একখানা হাত সুমিতার হাতখানা ধরে রইল, মনের কন্দরে দু'জনেই অনুভব করছে মিলনের বাঁশী বেজে চলেছে। সুমিতার হাতখানা পরম নিশ্চিন্তে ওর হাতের মুঠায় রয়ে গেল।

আস্তে আস্তে অলক সুমিতার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলছে—'সুমিতা একবার বল প্রার্থনা মঞ্জুর ত?' মুখ ফুটে দুষ্টামীভরা হাসিতে মুখ তুলে সুমিতা ওর দিকে চেয়ে আবার নীচু দিকে তাকিয়ে থাকে।

ষ্টীমার চলে ছুটে···

পশ্চিম বাংলার গ্রামের নাম পরিবর্ত্তন

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

(২)

১৬। চন্দ্রকোণা (মেদিনীপুর)

চন্দ্রকোণা বহুদিনের শহর। খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে ইহার নাম ছিল মানা ও স্থানীয় রাজার নাম ছিল খয়রা মল্ল। তাঁহার রাজত্বকালে চন্দ্রকেতু বলিয়া এক রাজপুত্র পুরী যাইবার পথে দেবগিরিতে (দেবগিরি বলিয়া কোন মৌজা নাই) ছাউনী করেন ও যুদ্ধে রাজাকে পরাজিত করেন। চন্দ্রকেতু নিজের নামানুসারে এই স্থানের নাম চন্দ্রকোণা রাখেন। (মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্ট হাণ্ডবুক, ১০৩ পৃঃ দেখুন) পশ্চিম বাংলায় ৩টি চন্দ্রকোণা আছে। যথা :

বাঁকুড়া	জেলায়	ওন্দা	থানায়	১টি
মেদিনীপুর	,,	চন্দ্রকোণা	,,	১টি
২৪ পরগণা	,,	ক্যানিং	,,	১টি

২৪ পরগণা জেলার চন্দ্রকোণার নামকরণ সম্বন্ধে মামলা মোকর্দ্দমা ব্যপদেশে একটি কথা শুনিতে পাই যে,মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা থেকে কোন বড় লোক এইখানে বসবাস করেন ও গ্রামের পত্তন করেন—তাই থেকে ইহার নাম চন্দ্রকোণা হইয়াছে। গ্রামের পরিমাণ ৮৫৩ বিঘা ও জনসংখ্যা ১৯৫১ সনে ১৪০ জন, লিখন-পঠনক্ষম লোকের সংখ্যা ১৫ জন। মামলা-মোকর্দ্দমা ব্যপদেশে অর্দ্ধ-শিক্ষিত লোকের কথা অন্য প্রমাণের অভাবে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না, তবে গ্রামের ছোট আয়তন ও কম লোকসংখ্যা দেখিয়া মনে হয় ইহার মধ্যে কিছু সত্যও থাকিতে পারে।

মেদিনীপুর-চন্দ্রকোণা মিউনিসিপ্যালিটির জনসংখ্যা কিরূপ কমিয়াছে তাহা নিম্নের হিসাব হইতে দেখা যাইবে।

১৮৭২—২১,৩১১ জন	১৯১১—৮,১২১ জন
১৮৮১—১২,২৫৭ ,,	১৯২১—৬,৪৭০ ,,
১৮৯১—১১,৩০৯ ,,	১৯৩১—৬,০১৬ ,,
১৯০১—৯,৩০৯ ,,	১৯৪১—৬,৪১১ ,,
	১৯৫১—৫,৭১৭ ,,

৮০ বৎসরের লোক-সংখ্যা সিকি হইয়াছে। মিউনিসিপ্যাল এলাকার পরিমাণ ৬.৪ বর্গমাইল, চন্দ্রকোণা মৌজার পরিমাণ ৮২৮ একর বা ১·৩ বর্গমাইলেরও কম। এককালে চন্দ্রকোণায় ৫২ বাজার ছিল।

১৭। বীরভানপুর (মেদিনীপুর)

চন্দ্রকেতুর বংশধরগণ খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগ অবধি চন্দ্রকোণা অঞ্চলে রাজত্ব করেন। বীরভানু সিং নামক এক চৌহান রাজপুত রাজকুমার তাঁহাদের রাজত্ব কাড়িয়া লন। বীরভানুর পুত্র হরিনারায়ণ মল্লবংশে বিবাহ করেন। তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরিতে লিখিত আছে যে, ইং ১৬১৭ সনে হরিনারায়ণ বিদ্রোহ করেন। পাদসাহনামাতে মনসবদারদের তালিকায় তাঁহার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। লালজীর মন্দিরে এক উৎকীর্ণ প্রস্তরে হরিনারায়ণের রাণী লক্ষ্মণাবতী (নারায়ণ মল্লের ভগিনী) যে নবরত্ন মন্দির তৈয়ার করেন তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় (ইং ১৬৫৫)। তখন হরিনারায়ণের পুত্র মিত্র সেন রাজা। বীরভানু ক্ষীরপাইয়ের ২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে 'বীরভানপুর' বলিয়া নিজ নামানুসারে একটি গ্রাম স্থাপন করেন। ইং আন্দাজ ১৫৯০-১৬০০ সনে বীরভানপুর স্থাপিত হয়। বীরভানপুর মৌজার পরিমাণ ২,১৯৮ বিঘা ও বর্ত্তমান (১৯৫১) লোকসংখ্যা মাত্র ৪৩৭ জন। মেদিনীপুরের অপর ৩টি বীরভানপুরের কালি যথাক্রমে ১,৩০৪, ৬৪৬ ও ২৯৩ বিঘা।

চন্দ্রকোণা থানার মৌজার গড় পরিমাণ ১,২০১ বিঘা। বীরভানপুরের জমির পরিমাণ গড় পরিমাণের প্রায় দ্বিগুণ। ইহা হইতে মনে হয় যখন ঐ গ্রাম পত্তন হয় তখন এখানে লোকবসতি বড় একটা ছিল না বা কোনও গ্রাম ছিল না। নামটিতে পশ্চিমা ভাষার—হিন্দীর বা রাজস্থানীর—বেশ একটা রেশ বা টান আছে। এখনও সম্পূর্ণভাবে বাংলা 'বীরভানুপুরে' পরিণত হয় নাই। বাংলা গ্রামের নামের আলোচনাকালে আমরা যেন একথা ভুলিয়া না যাই যে কতক কতক নাম ভাষার স্বাভাবিক অবক্ষয়ে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ; আর কতক কতক নাম এখনও তাহার জন্মের ইতিহাস বহন করিতেছে ; আবার কতক কতক নাম নানা কারণে একেবারেই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বা বদলাইয়া গিয়াছে।

পশ্চিম বাংলায় ৬টি বীরভানপুর ও ১টি বীরভানুপুর আছে। 'বীরভানপুর'-এর অবস্থান নিম্নে দেওয়া হইল।

১।	বর্দ্ধমান জেলা	সদর মহকুমা	থানা ফরিদপুর
২।	মেদিনীপুর জেলা	,, ,,	থানা সালবনী
৩।	,, ,,	,, ,,	,, ,,
৪।	,, ,,	ঘাটাল মহকুমা	,, চন্দ্রকোণা
৫।	,, ,,	ঝাড়গ্রাম ,,	,, বিনপুর
৬।	,, ,,	,, ,,	,, ঝাড়গ্রাম

"বীরভানুপুর"—মেদিনীপুর জেলার সদর মহকুমার সাবঙ্গ থানায়। ইহার পরিমাণ ৩৩৪ বিঘা।

১৮। উলা বা বীরনগর (নদীয়া)

উলা অতি প্রাচীন ও বিখ্যাত গ্রাম। কেহ কেহ বলেন ৺উলা চণ্ডী ঠাকুরাণীর নাম হইতে উলা নামের উৎপত্তি; আবার কেহ কেহ বলেন যে, উলুবনাকীর্ণ বিস্তীর্ণ চরের আবাদ হইতে এই নামের উৎপত্তি হইয়াছে। নাম যে কারণেই হউক নামটি প্রাচীন। আইন-ই-আকবরীতে সরকার সুলেমানাবাদের অন্তর্গত উলা পরগণার উল্লেখ দেখা যায়। মহাল উলার রাজস্ব ধার্য্য ছিল ৮৯,২১১ দাম (=২,২৩২ টাকা, ৪০ দামে ১ টাকা ধরিয়া)। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত "চণ্ডী মঙ্গলে" উলার নাম পাওয়া যায়; যথা :—

"বাহ বাহ বল্যা ঘন পড়ে গেল সাড়া।
বাম ভাগে শান্তিপুর ডাহিনে গুপ্তিপাড়া॥
উলা বাহিয়া খিসমার আশে পাশে।
মহেশপুর নিকটে সাধুর ডিঙ্গা ভাসে॥"

মুকুন্দরাম আন্দাজ ইং ১৫৫০ সনে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র ৺নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষগণ এই খিসমা হইতে কলিকাতায় আসেন।

উলানিবাসী দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত প্রাচীন পদ্যগ্রন্থ "গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণীতে" আছে যে :—

"অম্বিকা পশ্চিম পারে শান্তিপুর পূর্ব্ব ধারে
রাখিল দক্ষিণে গুপ্তিপাড়া,
উল্লাসে উলার গতি, বটমূলে ভগবতী,
চণ্ডিকা নহেন যথা ছাড়া॥"

এই উলা নাম কেমনে সরকারী আদেশে ও দেশের লোকের বীরত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সাধারণ আগ্রহে বীরনগরে পরিবর্ত্তিত হইল এইবার তাহার কথা কিছু বলিব। আন্দাজ ইং ১৮০৩ সনে উলার বিখ্যাত মুস্তৌফি বংশের অনাদিনাথ মুস্তৌফি নামক এক যুবক শেষ রাত্রিতে চাকদহে "গহনার" নৌকা ধরিবার জন্য বাটী হইতে যাত্রা করেন। তিনি মুস্তৌফী বাটীর পেড় বাংলা মন্দিরের দক্ষিণ দিকে আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার অগ্রে ডাইন দিকে জামাইদিগের অবস্থানের গৃহ "জামাই কোঠার" দোতলার ছাদে একটি লোক পা ঝুলাইয়া কার্ণিসের উপরে বসিয়া আছে। অনাদি জিজ্ঞাসা করিল, "ছাদে কে?" সে লোকটি জবাব দিল, "তোর বাবা।" অনাদি আর কোন কথা না বলিয়া পুনরায় বাটীর দিকে ফিরিল ও মন্দিরের গলিপথ দিয়া জামাই কোঠার পশ্চাৎ দিক দিয়া অতি সন্তর্পণে ও নিঃশব্দে সিড়ি দিয়া দোতলার ছাদে উঠিল। পরে পিছন দিক হইতে হঠাৎ সেই লোকটির দুই হাত সজোরে পিঠমোড়া করিয়া ধরিল। সেই লোকটিও হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অনাদি রোগা ছিল ও খুব বলবান ছিল না; অনাদি চীৎকার করিয়া ভাইকে পাতকুয়ার দড়ি আনিতে বলিল। দড়ি আসিলে দুই ভাইয়ে তাহাকে পিঠমোড়া করিয়া বাঁধা হইল। সে লোকটি তখন চেঁচাইয়া দলের লোকদিগকে সাবধান করিয়া দিল; বলিল, "ওরে! আমি মশার হাতে পড়িয়াছি, তোরা সব জাল গুটো।" তাহার দলবল যে যেখানে ছিল সকলে পলাইল।

ঐ লোকটির নাম শিবেশনী, সে জাতিতে গোয়ালা, বাড়ী শান্তিপুরে—সে সেকালের একজন বিখ্যাত ডাকাইত। সকালে মুস্তৌফীদের সিংহদরজার সম্মুখে তাহার ডান হাতের কনুই পর্য্যন্ত কাটিয়া দেওয়া হইল। শিবেশনীর তখনও মদের নেশার ঘোর কাটে নাই—সে হাত কাটিয়া দিলে বলিল যে, এখন আমি বাঁ হাত দিয়া সিঁদ কাটিব ও ডান হাতের কনুই দিয়া মাটি টানিব। তখন তাঁহার দুই হাতের বাহুমূল অবধি কাটিয়া দেওয়া হইল—প্রচুর রক্তপাতের ফলে সেই ডাকাত মারা গেল। সেই সময় এই অঞ্চলের লোকে একটি গান রচনা করিয়াছিল, তাহার একটি পদ হইতেছে—

"শিবেশনী মাতাল চোর,
ছোকরাতে করেছে পাকড়া,
ধন্য উলা বীরনগর।"

শিবেশনীর মৃত্যুর পর তাহার ভগ্নী মধ্যে মধ্যে মুস্তৌফি বাবুদের বাটীতে আসিয়া ভাইয়ের জন্য শোক করিত ও সাহায্য পাইত।

আর একবার ইং ১৮০০ সনে উলায় মহাদেব মুখোপাধ্যায়ের (ইনি বিখ্যাত বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের পূর্ব্বপুরুষ) বাটীতে ডাকাত পড়ে। ডাকাতরা সদর দরজা ভাঙিয়া উঠানে প্রবেশ করিলে মহাদেববাবু দোতলা হইতে বলেন যে, তোমরা ত টাকার জন্য আসিয়াছ, মারকাট করিও না, আমি টাকা দিতেছি। এই বলিয়া তিনি তোড়া তোড়া টাকার মুখ খুলিয়া উঠানে ছুড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন। ডাকাতরা টাকা কুড়াইতে ব্যস্ত, তখন তিনি কৌশলে গ্রামবাসীদের খবর দিলেন। গ্রামবাসীরা চালাঘরের চাল কাটিয়া আনিয়া সদর দরজার সম্মুখে ফেলিয়া অগ্নি সংযোগ করিলে ডাকাতরা বন্দী হইল ও তাহাদের দলের অনেক লোক ধরা পড়িল। তখনকার বিখ্যাত ডাকাত 'বদে বিশে' বৈদ্যনাথ ও বিশ্বনাথ এই ডাকাতদলের নেতা। ডাকাইতদের সহিত লড়াইয়ে ৯ জন উলা-বাসী আহত হয় ও ২৮ জন ডাকাইত ধরা পড়ে। বিচারে অনেকের দ্বীপান্তর ও যাবজ্জীবন কারাবাসের হুকুম হয়। জজ ক্যামাক সাহেব উলার লোকদের বীরত্বের জন্য তাহাদিগকে সম্মানিত করিবার অভিপ্রায়ে লিখেন—

"It is a term of reproach to be called an an inhabitant of Ooloo. It is the same as if calling a man an idiot. The Spirited conduct of the inhabitants of Ooloo on the present occassion entitles their town to be designed with a more worthy name and to some mark of distinction. The name of the village should

be changed to Beernagar, that is, town of heroes."

অর্থাৎ কোন লোককে উলার লোক বলিলে তাহাকে গালি দেওয়া হয়। উলার লোক মানে আহাম্মক পাগল। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে উলার লোকেরা যে সাহসের ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে তাহার জন্ত তাহাদের গ্রামের একটি যোগ্য নাম দিয়া সম্মান করা উচিত। এই গ্রামের নাম বীরেদের গ্রাম—"বীরনগর" রাখা উচিত।

পরে ইংরেজ সরকার ঢেড়া দিয়া উলার নাম বীরনগরে পরিবর্ত্তন করেন। এখন সরকারী কাগজপত্রে, ডাকঘর, রেলে ও মিউনিসিপ্যালিটিতে বীরনগর নাম ব্যবহৃত হইলেও সাধারণ লোক দেড়শত, বৎসর পরেও "উলা" এই নাম ব্যবহার ভুলে নাই। উলার পাগল, উলার মহামারী, উলার ম্যালেরিয়া প্রভৃতি বলে। উলাই চণ্ডীর মাহাত্ম্য ইহার অন্যতম কারণ বলিয়া মনে হয়।

১৯। মুর্শিদাবাদ।

মুর্শিদাবাদ শহরের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। ওলন্দাজ Tieffenthaler বলেন, ইহা বাদশাহ আকবরের সময় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইং ১৬৬৬ সনের টাভেরনিয়ার এখানে আসেন, তিনি ইহার নাম Madesonbazarki বলিয়া লিখিয়াছেন। সয়ের-উলমুতাখরিণের অনুবাদক রেমণ্ড সাহেব বলেন যে :

"it was first called "kolaria", then "Maesoodabad" and finally Moorshoodabad. Kolaria was a place in the east of the town, where Murshid Kuli Khan had his residence."

অর্থাৎ এই জায়গার নাম আগে কোলারিয়া ছিল—যেখানে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ বাস করিতেন, পরে ইহা মুকসুদাবাদ ও সর্ব্বশেষে মুর্শিদাবাদ নাম ধারণ করে।

মুর্শিদাবাদ থানায় কোলারিয়া বা মুর্শিদাবাদ বলিয়া কোনও মৌজা নাই। মুর্শিদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির ভিতরে নিম্নলিখিত মৌজাগুলি আছে। যথা :

১।	বাজার মনসুর খাঁ—	৯২'৪৭	একর
২।	বুধাম পাড়া	৭৮'৪৭	,,
৩।	গোলাপবাগ	৫৬'৫১	,,
৪।	হোসেন নগর	৭৮'৮০	,,
৫।	জাফরাগঞ্জ	১৮০'৪২	,,
৬।	করিমাবাদ	১১০'৯৫	,,
৭।	করিমাবাদগঞ্জ	৫৩'৭৯	,,
৮।	কিল্লা নেজামত	৮১'৫৭	,,
৯।	কুমরাপুর	১৪১'২৪	,,
১০।	কুম্মিটোলা	১৯৫'৪৩	,,
১১।	লালবাগ	৯৯'৯০	,,
১২।	মহিমাপুর	২৮৭'০২	,,
১৩।	মোগলটুলি	৮২'৬৩	,,
১৪।	নগিনাবাগ	৫৬'২১	,,
১৫।	নশীপুর	৩৪৮'৪৩	,,
১৬।	রাজাবাজার	৬২'১৪	,,
১৭।	সাহানগর	৬৫'৭৮	,,
১৮।	শ্যামপুর হায়দারগঞ্জ	১৮৩'০৯	,,
১৯।	উর্দ্দু বাজার	৮২'৭০	,,
	মোট	২৩৯৭'৫৫	একর

মুর্শিদাবাদ জেলায় 'কোলারা' বা কোলোরা বা কোলারিয়া বলিয়া কোন গ্রাম বা মৌজা নাই, যদিও পশ্চিম বাংলার অন্যত্র ৩টি 'কোলারা' ও ১টি কোলোরা নামের মৌজা বা গ্রাম আছে। কোলারিয়া বলিয়া কোন গ্রাম বা মৌজা পশ্চিম বাংলায় নাই।

মুর্শিদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত মৌজাগুলির নাম দেখিয়া মনে হয় যে, কতকগুলি নাম মুর্শিদাবাদ বাংলার রাজধানী হইবার পর প্রদত্ত হইয়াছে, যেমন কিল্লা নিজামত, উর্দ্দু বাজার ইত্যাদি। ভাগীরথীর উভয় তীর বিশেষ করিয়া রাঢ়ের এই অঞ্চল বরাবর লোকবসতিপূর্ণ, সুতরাং এইখানে গ্রাম ছিল ও তাহার নামও ছিল। বর্ত্তমান নাম দেখিয়া মনে হয় যে, পূর্ব্ব নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। স্যর উইলিয়াম হাণ্টার লিখিয়াছেন যে :

"The new city [Murshidabad] also was situated on the line of trade, along which the treasures of India were now beginning to find their way to the European settlements on the Hooghly ; and it commanded the town of Cossimbazor, where all the foreigners had important factories. Moreover, the situation in those days was regarded as very healthy."

২০। কালিয়াগড় (জেলা হুগলী)

হুগলী জেলার বলাগড় থানায় বলাগড়ের সন্নিকট কালিয়াগড় বলিয়া একটি মৌজা পাওয়া যায়। মৌজার জমির পরিমাণ ৭৬২ বিঘা, ও লোক-সংখ্যা বর্ত্তমানে (ইংরেজী ১৯৫১ সনে) ৩৯৪ জন। লোকমুখে কেলেগড়। এই স্থানে সিদ্ধেশ্বরী কালী প্রতিষ্ঠিত। শোনা যায়, গঙ্গাতীরের জঙ্গলে কোন বিখ্যাত ডাকাত এই কালী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল বা ইহার পূজা করিয়া ডাকাতি করিত। অধিকারীরা কালীর পূজারী ছিলেন—এখন তাঁহাদের দৌহিত্র বংশীয়েরা—চাটুজ্জেরা—এই কালীর পূজারী বা সেবায়েত। দেবীস্থানের নিকটে একটি মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত

আছে, এই শিবের নাম মহাকাল ভৈরব। কেহ কেহ স্থানটিকে উপপীঠ বলেন—বলেন এইটি হইতেছে বলয়োপপীঠ।

কালীর গড় বলিয়া গ্রামের নাম কালীগড়, মৌজার নাম কালিয়াগড়, লোকমুখে কেলেগড় হইয়াছে।

২১। আন্দপুর (আমোদপুর) (বীরভূম)

বীরভূম জেলায় আহ্মদপুর একটি রেল-জংসন। ইষ্টার্ণ রেলের এই ষ্টেসন হইতে কাটোয়া পর্য্যন্ত একটি সরু রেলপথ গিয়াছে। এই স্থান সাইথিয়া থানার অন্তর্গত। বীরভূম জেলায় একটি আহমদপুর মৌজা আছে—সেটি রাজনগর থানায়। রাজনগর থানা এই স্থান হইতে অনেক দূরে। এই স্থানের নাম লোক-মুখে আমোদপুর। চিঠিপত্রে, বিজ্ঞাপনে লিখে আমোদপুর, যেমন "সস্তায় ছাপা হয়—চণ্ডী প্রেস, আমোদপুর" ইত্যাদি। অথচ আমোদপুর বলিয়া কোন মৌজা বীরভূম জেলায় নাই। প্রকৃত নাম উভয়ক্ষেত্রেই চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

বাংলাদেশের বহু গ্রাম বা মৌজার নাম এমন কি যে, সব গ্রামের নাম মৌজার তালিকায় পাওয়া যায় না—কেন এইরূপ হইল ? প্রশ্ন করা সহজ, উত্তর দেওয়া সহজ নয়। কোন কোন নামের উৎপত্তির কারণ জানা যায়। আমরা যেগুলি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা দিলাম। পাঠকগণের মধ্যে সকলে যদি নিজ নিজ গ্রামের নামের উৎপত্তির কারণ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করেন ত কিছুটা তথ্য সহজে সংগৃহীত হইতে পারে। এবং এই সকল তথ্য হইতে কি কি শ্রেণীর কারণ গ্রামের নামকরণ সম্পন্ন করিয়াছে তাহার একটা প্রাথমিক হদিস মিলিতে পারে।

২২। কান্দি (মুর্শিদাবাদ)

মুর্শিদাবাদ জেলায় কান্দি একটি মহকুমা শহর। এখানে কুমার ৺গিরিশচন্দ্র সিংহের দানে একটি ভাল হাসপাতাল বহু বৎসর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়। অখণ্ড বাংলার ৮৪টি মহকুমার মধ্যে এই একমাত্র মহকুমায় ভাল হাসপাতাল ছিল। এখন সরকারের অধীন হইয়াছে আইনের বলে। এই স্থানে পূর্ব্বোক্ত গিরিশচন্দ্র সিংহের চেষ্টায় ইং ১৮৬৯ সালের ১লা এপ্রিল হইতে একটি মিউনিসি-প্যালিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মিউনিসিপ্যাল আফিসের হেড ক্লার্ক প্রভৃতির এক বৎসরের মাহিয়ানা ৬০০৲ টাকা নিজ হইতে দিয়া মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠা করান। মিউনিসিপ্যাল এলাকার পরিমাণ ৫·০ বর্গমাইল। কান্দি ও তাহার পার্শ্ববর্তী রসোড়া, বাঘডাঙ্গা, জেমো প্রভৃতি কয়েকটি গ্রাম লইয়া মিউনিসিপ্যাল এলাকা। কেবলমাত্র কান্দি মৌজার জমির পরিমাণ ৭২৭·১৭ একর বা ২২০০ বিঘা। ১৯৫১ সনে মিউনিসিপ্যাল এলাকার জনসংখ্যা ১৫,২২০ জন।

কান্দি নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, বল্লাল সেন এক ডোম-কন্যার পানিগ্রহণ করিলে অনেক উচ্চ-জাতীয় উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী রাজবাটীতে তাঁহার সহিত আহার করিতে অসম্মত হয়েন। রাজা পীড়াপীড়ি করিলে তাঁহারা বলেন যে, আপনার মহাসান্ধিবিগ্রহিক দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ নারায়ণ দত্ত (লক্ষণ সেনের এক তাম্রশাসনে 'সান্ধিবিগ্রহিক শ্রীনারায়ণদত্তঃ' লিখিত আছে) বা আপনার অন্যতম সচিব উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ ব্যাসসিংহ যদি আপনার সহিত আহার করেন, তাহা হইলে আমরাও আপনার সহিত আহার করিব। নারায়ণ দত্ত রাজা তাঁহাকে তাঁহার সহিত একত্রে আহার করিবার কথা বলিবার পূর্ব্বেই তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেনের সহায়তায় রাজকার্য্য উপলক্ষ্য করিয়া রাজধানী ত্যাগ করিয়া মগধে যায়েন। রাজার সহিত আহার করেন না। বল্লাল সেন এজন্য রাগান্বিত হইয়া থাকেন, পরে যখন সমাজ-সংস্কার করেন তখন ছলছুতা করিয়া তাঁহাকে নিকুলীন করেন।

ব্যাস সিংহকে আহার করিতে অনুরোধ করিলে তিনি সরাসরি অস্বীকার করেন। রাজা ব্যাস সিংহকে বলেন যে, হয় আপনি আমার সহিত আহার করুন, নচেৎ আপনাকে করাত দিয়া কাটিয়া দুই ভাগ করিয়া ফেলিব। তথাপি ব্যাস সিংহ রাজার সহিত আহার করিতে অসম্মত হয়েন। তাঁহাকে করাত দিয়া কাটিয়া ফেলা হয়। ব্যাস সিংহকে কাটিয়া ফেলিলে তাঁহার পিতা লক্ষ্মীধর সিংহ ব্যাস সিংহের দুই নাবালক পুত্রকে লইয়া রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে পলাইয়া যায়েন ও সেখানে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বনবাস করিতে থাকেন। তিনি পুত্রশোকে সর্ব্বদাই কাঁদিতেন। কোন সাধু তাঁহাকে সেই স্থানের নাম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সাধুর কথা ভাল বুঝিতে না পারিয়া বলেন যে, (আমি) কান্দি। সেই হইতে লক্ষ্মীধর সিংহের বাসস্থান কান্দি বলিয়া প্রচারিত হয়। ব্যাস সিংহের বংশধরগণ অদ্যাপি 'করাতিয়া ব্যাস সিংহের' বংশ বলিয়া সমাজে পরিচিত। লর্ড সিংহ ও রাজস্বমন্ত্রী বিমলচন্দ্র সিংহ এই ব্যাস সিংহের বংশধর।

এই প্রবাদ সত্য হইলে কান্দি গ্রামের পত্তন আজ হইতে ৮০০ শত বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছে ; এবং নামেরও কোনওরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই। কান্দিতে দক্ষিণা কালিকার মূর্ত্তি (একটি অদ্ভুত আকারের সিন্দুর-লেপিত প্রস্তরখণ্ড) আছে। এই মূর্ত্তি সেনরাজাদের সময় আবিষ্কৃত বলিয়া লোকে বলে ; মন্দিরটিও পুরাতন, ২৫০।৩০০ বৎসরের হইবে বলিয়া অনেকে মনে করেন। কাছেই কয়েকটি শিবমন্দির আছে।

অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার তাঁহার বক্তৃতাবলীতে দেখাইয়াছেন যে, ভাষাতাত্ত্বিক নিয়মে (laws of phonetic decay) ভাষার বাক্যাবলী কালক্রমে পুরাতন টাকা-পয়সার ন্যায় নিয়ত ব্যবহারের ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ঘষিয়া-মাজিয়া এমনই হইয়া দাঁড়ায় যে, টাকা-পয়সার উপর লেখার ন্যায় সহজে পড়া যায় না বা তাহাদের প্রকৃতি বা স্বরূপ ধরা যায় না। আমরা এখন চোখের জল ফেলাকে সচরাচর 'ক্রন্দন' বা 'কান্দি' বলি না—যদিও পুরাতন বাংলা সাহিত্যে এইরূপ বহু পদ পাওয়া যায়, বলি 'কাঁদি'।

কিন্তু 'কান্দি' কথাটি স্থানের নামের সহিত যুক্ত হওয়ায় ভাষাতাত্ত্বিক নিয়মে যে ক্ষয় হয় তাহা হইতে অনেকটা বাঁচিয়া গিয়াছে। সব সময়ে যে বাঁচিয়া যায় তাহা নহে; তবে অবক্ষয়ের পরিমাণ অনেকটা কম হয়। এ বিষয়ে আইজাক টেলর সাহেব তাঁহার সুবিখ্যাত Words and Places পুস্তকের ৩৩৬ পৃষ্ঠায় এইরূপ লিখিয়াছেন যে:

"In the case of local names the raw materials of language do not lend themselves with the same facility as other words to the processes of decomposition and reconstruction, and many names have for thousands of years remained unchanged, and even linger round the now deserted sites of the places to which they refer."

কান্দি এই নিয়মের একটি উদাহরণ। পশ্চিমবঙ্গের ৩৯,০০০ হাজার গ্রামের মধ্যে কান্দি এই নামের আর কোনও গ্রাম বা মৌজা নাই। ইহাতে মনে হয় কান্দি নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে প্রবাদ আছে তাহার মূলে সত্য আছে। পূর্ব্বে কান্দি অঞ্চল জঙ্গল ছিল, স্থানের কোনও নাম ছিল না; পরে নাম কান্দি হইয়াছে।

সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় 'বিশাললোচনী বা বিশালাক্ষীর গীত' প্রকাশিত হইয়াছে। ১৩৬১ সালের ১১২ পৃষ্ঠায় আমরা যতগুলি গ্রামের নাম পাই, এই সব গ্রাম বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলায়। ইহাদের নাম কতদূর অপরিবর্ত্তিত বা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা নিম্নে দিলাম। এই গীত ইং ১৫৭৭ সালে রচিত—সুতরাং ৪০০ শত বৎসর ধরিয়া গ্রামের নাম অপরিবর্ত্তিত আছে; আর যেখানে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে সেখানে কতটুকু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহাও ধরা যায়।

পুরাতন নাম (যেমন বিশাললোচনীর গীতে আছে)	বর্ত্তমান নাম
১। বর্দ্ধমান	বর্দ্ধমান
২। বড় মোউল	বড় শূল বা বোড়শূল
৩। জামদহ	জামদহ
৪। বেউর গ্রাম	বেউড় গ্রাম বা বেউর গ্রাম
৫। হিরণ্য গ্রাম	হিরণ্য গ্রাম
৬। মউলা	(পাই নাই)
৭। জাড়গ্রাম	জাড়গ্রাম
৮। দশঘরা	দশঘরা
৯। বৈন্তপুর	বৈন্তপুর
১০। তেঘরা	(পাই নাই)
১১। চণ্ডীপুর	চণ্ডীপুর
১২। (দ্বীপ) দ্বারহাটা	দ্বারহাটা
১৩। জাঙ্গিপাড়া	জাঙ্গিপাড়া
১৪। ডিঙ্গপল হাট	ডিঙ্গল হাট

যে ১২টি গ্রামের নাম আমরা বর্ত্তমানে পাইয়াছি, তাহার মধ্যে ১০টির নামের কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই। ১টির (২ নং) পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ৪ নং-এর পরিবর্ত্তন সন্দেহজনক।

২৩। লালগোলা (মুর্শিদাবাদ)

মুর্শিদাবাদ জেলায় লালগোলা একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। রাজবাড়ীর কালীমূর্ত্তির ন্যায় কালীমূর্ত্তি বাংলার অন্যত্র আছে বলিয়া অবগত নহি। এক হাতে খড়্গ, এক হাতে অভয়, অন্য দুই হাতে করতালির ভঙ্গিতে মা মহাকাল শিবের উপরে নৃত্যছন্দে দণ্ডায়মানা, পাশে জয়া-বিজয়া, লক্ষ্মী-সরস্বতী, কার্ত্তিক-গণেশ। লালগোলার স্বর্গীয় রাও মহারাজা স্যর যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়ের জন্য লালগোলার নাম শুনেন নাই এরূপ শিক্ষিত বাঙালী বাংলায় নাই বলিলেও চলে। এই গ্রামের নাম কেন লালগোলা হইল তৎসম্বন্ধে একটি গল্প বা প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, গিরিয়ার যুদ্ধের সময় নাকি একটি লাল গোলা এই স্থানে পতিত হইয়াছিল, সেই হইতে এই জায়গার নাম লালগোলা হইয়াছে।

গিরিয়ার যুদ্ধ হয় দুইবার, একবার নবাবী লইয়া নবাব সরফরাজ খাঁয়ের সহিত আলিবর্দ্দী খাঁয়ের। এই যুদ্ধে সরফরাজ খাঁ নিহত হইলে নবাব আলিবর্দ্দী বাংলার মসনদ অধিকার করেন। এই যুদ্ধ হয় ইংরেজী ১৭৪০ সনে। আর একবার ইংরেজদের সহিত নবাব মীরকাশিমের। নবাব যুদ্ধে পরাজিত হয়েন। এই যুদ্ধ হয় ইং ১৭৬৩ সনে।

যে যুদ্ধেরই লাল গোলা এই জায়গায় পড়িয়া ইহার নাম লালগোলা হউক ইহা ইংরেজী ১৭৪০ সনের আগের ঘটনা নহে। পশ্চিমবঙ্গে একটি মাত্র লালগোলা আছে, তাহাতে মনে হয় নামকরণের হেতু সত্য। পূর্ব্বে এই স্থানের নাম কি ছিল? খুব সম্ভব এই স্থান জঙ্গল ছিল বলিয়া কোন নাম থাকা সম্ভব নহে।

সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন তাঁহার বীরভূম-বিবরণী ১ম খণ্ডে বীরভূম জেলার কয়েকটি গ্রামের নামের ইতিহাস দিয়াছেন। আমরা যতদূর সম্ভব তাঁহার ভাষায় এই সব গ্রামের নামের ইতিহাস দিবার চেষ্টা করিব।

২৪। রাঘবপুর (বীরভূম)

এই রাঘবপুর দুবরাজপুর থানার অন্তর্গত হেতমপুরের নিকটবর্ত্তী গ্রাম। "এইরূপ প্রবাদ আছে যে রাঘবানন্দ রায় নামক জনৈক ব্রাহ্মণ কুমার বহু যত্নে জঙ্গল কাটাইয়া কতিপয় প্রজা সংগ্রহপূর্ব্বক বর্ত্তমান (১৩২৩) ভগ্নদুর্গের দক্ষিণে শাল নদীর উপকূলে এক ক্ষুদ্র গ্রাম স্থাপন করেন এবং স্বীয় নামানুসারে এই গ্রামের নাম রাঘবপুর রাখিয়াছিলেন। তদবধি এই অরণ্যপ্রদেশ তিনি নিষ্করূপে ভোগদখল করিতেন। কোন্ সময়ে এই গ্রামের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহা ঠিক জানিবার উপায় নাই, তবে তিনি খাজা কমল খাঁয়ের রাজত্বসময়ের শেষ ভাগে ও আসাদুল্লার রাজত্বসময়ে জীবিত ছিলেন

এরূপ প্রবাদ শুনা যায়। উক্ত রাজদ্বয় প্রায় ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বীরভূমের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই কারণে অনুমান হয় যে, রাঘবানন্দ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কিম্বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে উক্ত রাঘবপুরের প্রতিষ্ঠা করেন।" পূর্ব্বে এই স্থানের কোনও নাম ছিল না বলিয়া মনে হয়।

বর্ত্তমানে রাঘবপুর বলিয়া কোন মৌজা দুবরাজপুর থানায় পাওয়া যায় না।

২৫। হেতমপুর (বীরভূম)

রাঘবানন্দ বিদ্রোহ করিলে বীরভূমরাজ বৃদ্ধ হাতেম খাঁকে তাহা দমন করিতে পাঠান। হাতেম খাঁ বিদ্রোহ দমন করিয়া একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া এই স্থানে বসবাস করিতে থাকেন। এইখানে কেবল মুসলমানের বসবাস ছিল। হেতমপুরে প্রথমতঃ হিন্দুর বাস ছিল না:—'হেতমপুরে হিন্দুর নাস্তি মুলুকে চাভিরামপুরে" বলিয়া একটি ছড়া প্রচলিত আছে।"

বীরভূমের "রাজাসাহেব হাতেমের স্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার জন্ত তদীয় নামানুসারে ঐ পল্লীর নাম রাখেন হাতেমপুর; হাতেমপুর যথাক্রমে হেতমপুর নামে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।" হেতমপুর প্রতিষ্ঠার সময় আন্দাজ ইং ১৭১০ সন।

'হাতেমপুর' উচ্চারণ করিবার সময় বলি 'হাত-এম্-পুর'; ভাষাতাত্ত্বিক নিয়মে সংক্ষিপ্ত করিয়া 'হেতম-পুর' হইয়াছে। "আ" উচ্চারণ করা অপেক্ষা "এ" উচ্চারণ করিতে অল্প সময় লাগে।"

আইজাক টেলর লিখিয়াছেন:—

"The great tendency is to contraction, as Horne Tooke puts it, letters like soldiers, being very apt to desert and drop off in a long march."

এখানে শ' দেড়েক বৎসরের মধ্যে হাতেমপুর হেতমপুরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কারণ শতাধিক বৎসর পূর্ব্বেও হেতমপুরের উল্লেখ দেখিতে পাই।

২৬। ধামুরিয়া (বীরভূম)

"বর্ত্তমানে নূতন বরকতিপুরের পশ্চিম প্রান্তে কয়েক ঘর ধুনুরি আসিয়া বাস করে। ক্রমে ইলামবাজার হইতে কয়েক ঘর নবি আসিয়া তথায় বসবাসপূর্ব্বক গালা ও আল্‌তার ব্যবসা আরম্ভ করে। সেই সময় কয়েক ঘর কলু আসিয়া নবিদের সহিত বাস করিতে লাগিল। ধুনুরিয়াদের প্রথম বাস বলিয়া লোকে প্রথমতঃ উহাকে ধুনুরিয়া পাড়া বলিত; কিন্তু কালক্রমে উক্ত নাম রূপান্তরিত হইয়া ধামুড়িয়া নামে পরিচিত হইয়াছে এবং ধুনুরিয়া বংশেরও একেবারে বিলোপ ঘটিয়াছে।" বর্ত্তমানে ধামুরিয়া বলিয়া কোন মৌজা নাই।

ভাষাতত্ত্বের Grimms Law অনুযায়ী ল্যাটিন "ম" ফরাসী, ইতালিয়ান, স্পেনীয় প্রভৃতি ভাষায় "ন"-এতে পরিবর্ত্তিত হয়। এ মতে হয়ত বাংলা ভাষার বিশেষত্বের দরুন 'ধুনুরি—'ধুমুরি'তে পরিবর্ত্তিত হয়। আমাদের ভাষাতত্ত্বের জ্ঞান নাই—এজন্য বিশেষ আলোচনা সম্ভব হইল না।

২৭। সীতারামপুর (বীরভূম)

হরেকৃষ্ণ বাবু লিখিয়াছেন যে, "পল্লীত্রয় বন্দোবস্তের জন্য রাজা বদীউজ্জমান খাঁ উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থবংশীয় সীতারাম ঘোষ নামক জনৈক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে এই স্থানে প্রেরণ করেন। তাঁহার সঙ্গে কয়েকজন আমীন ও মুহুরী আসেন, তাঁহারাও অনেকে কায়স্থ ছিলেন বলিয়া জানা যায়। সীতারাম ঘোষ দীর্ঘকাল এ স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক পল্লীত্রয়ের জরিপ করিয়া বাস্ত ও উদ্বাস্তর জমা ধার্য্য করেন। তাঁহার কার্য্যকুশলতায় আমদ্ খাঁ বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুরস্কার প্রদান করিতে ইচ্ছুক হয়েন। কিন্তু সীতারাম ঘোষ অন্য পুরস্কার গ্রহণ না করিয়া হেতমপুর বাসের অনুমতি ও তজ্জন্য কর্ম্মচারীবর্গ লইয়া নূতন বরকতিপুরের পশ্চিমদক্ষিণাংশে যে স্থানে বাস করিতেছিলেন সেই স্থানটি লাখেরাজ প্রার্থনা করেন।

এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, বৃদ্ধ সীতারাম ঘোষ যেস্থানে বাস করিতেন, তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থিত পতিত ভূমি আমদ খাঁ অশ্বারোহণে প্রদক্ষিণ করিয়া অশ্বপদচিহ্নের মধ্যবর্ত্তী ভূমিখণ্ড সীতারাম ঘোষকে লাখেরাজস্বরূপ প্রদান করেন এবং সীতারামের নামানুসারে এই পল্লীর নামকরণ হয়, কিন্তু ইংরাজের প্রথম অধিকারের সময় যে থাকবস্তার জরিপ হইয়াছিল, তাহাতে সীতারামপুর লাখেরাজ বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই, অদ্যাবধি (১৩২৩) সেই ক্ষুদ্র পল্লীতে কায়স্থদের বাস আছে।" (৩০ পৃঃ দেখুন)

এই আমদ খাঁ ইং ১৬৯৭ হইতে ইং ১৭১৮ সন পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এ মতে সীতারামপুর প্রতিষ্ঠা ও তাহার নামকরণ আন্দাজ ইং ১৭১৩ সনের কিছু পরে হয় বলিয়া মনে করি।

এই সীতারামপুরের নাম মৌজা-তালিকায় নাই যদিও পশ্চিমবঙ্গে ২৩টি সীতারামপুর মৌজা পাওয়া যায়। বীরভূম জেলায় একটিও সীতারামপুর মৌজা নাই, ২৩টির মধ্যে ১০টি মেদিনীপুর জেলায়, ২৪ পরগণায় ৪টি, বাঁকুড়ায় ৭টি পাওয়া যায়।

২৮। রাধাবল্লভপুর (বীরভূম)

হেতমপুরের রাজাদের পূর্ব্বপুরুষ রাধানাথ চক্রবর্ত্তী "১২১০ সনে রাধাবল্লভের সেবা প্রকাশ করিলেন; তদবধি এই ব্রাহ্মণপল্লীর নাম রাধাবল্লভপুর হইয়াছে।" বীরভূম জেলার ইলামবাজার থানায় একটি রাধাবল্লভপুরের নাম পাই। এই রাধাবল্লভপুর সেই রাধাবল্লভপুর কিনা বলিতে পারি না।

২৯। আচিপুর (২৪ পরগণা)

বজবজের ৬।৭ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কাটিগঙ্গার তীরে আচিপুর গ্রাম। এই গ্রামে চীনাদের একটি মন্দির আছে; প্রতি বৎসর মাঘ-ফাল্গুন মাসে একটি উৎসব উপলক্ষে কলিকাতাপ্রবাসী চীনারা

এইস্থানে আসেন। ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময় টং আচু নামক একজন চীনা এইস্থানে একটি চিনির কল স্থাপন করেন। ইংরেজী বানান Tong Achew বা Atchew। টং আচু ১৭৮৩এর পূর্ব্বে মারা যান। টং আচু বর্দ্ধমানরাজের নিকট হইতে পাট্টা-মূলে ৬৫০ বিঘা জমি বার্ষিক ৪৫৲ টাকা খাজানায় বন্দোবস্ত লন। এইস্থানে টং আচুর অশ্বক্ষুরাকৃতি সমাধি আছে। তাঁহার নাম হইতে এই গ্রামের নাম আচিপুর হইয়াছে। গত জরীপ-জমাবন্দী কালে আচিপুর মৌজার পরিমাণ ২১৪·৮ একর বা ৬৪৯·৯ বিঘা সাব্যস্ত হয়। দেখা যায় দেড়শত বৎসরে মৌজার পরিমাণ সমান আছে।

৩০। কৃষ্ণবাটী (২৪ পরগণা-নদীয়া)

কাঁচড়াপাড়ার প্রাচীন নাম কাঞ্চনপল্লী। বৈষ্ণব সাহিত্যে ইহা সেন 'শিবানন্দের পাট' বলিয়া খ্যাত সেন শিবানন্দের প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণ রায় বিগ্রহ আজও কাঁচড়াপাড়ায় নিত্য পূজিত। যশোহররাজ প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত-পুত্র রাঘব বা কচু রায় দিল্লী হইতে "যশোহরজিত" উপাধি ও বাদসাহী সনদ লাভ করিবার পর কৃষ্ণ রায়ের নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন ও সেবার জন্য "কৃষ্ণবাটী" নামে একটি গ্রাম নিষ্কর তালুক করিয়া দেন। এই মন্দির গঙ্গাগর্ভে পতিত হইবার পর কৃষ্ণ রায়ের নূতন মন্দির কলিকাতার নিমাইচরণ মল্লিক ইং ১৭৮৫ সনে করিয়া দেন। "কৃষ্ণবাটীর" স্থান কেহ কেহ ২৪ পরগণায়, আবার কেহ কেহ নদীয়ায় বলেন। এই দুই জেলায় কৃষ্ণবাটী বলিয়া কোনও মৌজা নাই।

৩১। প্রতাপপুর (২৪ পরগণা)

গোবরডাঙ্গা একটি প্রসিদ্ধ স্থান। গোবরডাঙ্গার জমিদার জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের শিকারী বলিয়া খুব সুনাম ছিল। লর্ড কিচেনার একবার তাঁহার সহিত গণ্ডার শিকারে যান। বহুকাল পূর্ব্বে হড়-চৌধুরীরা এখানকার জমিদার ছিলেন। ইঁহাদের স্থাপিত একটি প্রাচীন ও বৃহৎ নবরত্ন মন্দির ও জোড়বাংলা আছে। গোবরডাঙ্গার নিকটস্থ রেলওয়ে-সেতুর দক্ষিণে যমুনার উপর প্রতাপ-পুর পল্লী মহারাজা প্রতাপাদিত্যের স্মৃতি বহন করিতেছে। এইরূপ শুনা যায় যে, হড়-চৌধুরী বংশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত রাঘব সিদ্ধান্ত-বাগীশের উপর কোনও কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতাপাদিত্য সসৈন্যে আসিয়া যমুনার ধারে ছাউনি করেন। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় ছদ্মবেশে তাঁহার ছাউনিতে প্রবেশ করিয়া নিজ হস্তে মহারাজার পূজার ব্যবস্থা করিয়া রাখেন। পূজার ব্যবস্থা দেখিয়া প্রতাপাদিত্য সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বলেন কে এইরূপ সুচারু বন্দোবস্ত করিয়াছে? সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় তখন ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া আত্মপরিচয় দেন। তখন তাঁহাদের বিবাদ মিটমাট হইয়া যায়। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় তখন মহারাজাকে আহারাদি করিতে অনুরোধ করিলে প্রতাপাদিত্য বলেন যে, পররাজ্যে তিনি অন্নগ্রহণ করেন না। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় তখনই দলিল করিয়া প্রতাপাদিত্যকে ছাউনির স্থানটি প্রদান করিয়া আতিথ্য গ্রহণে বাধ্য করেন। তখন হইতে ছাউনির স্থানটি প্রতাপপুর বলিয়া লোকমুখে খ্যাত হইয়া আসিতেছে।

দুর্গাচরণ রক্ষিত প্রণীত খাঁটুরার ইতিহাস ও কুশদ্বীপ কাহিনীতে বিস্তৃত বর্ণনা আছে। কিন্তু এই পুস্তক দেখিবার সুযোগ আমাদের হয় নাই।

রেভিনিউ সার্ভের সময়ও প্রতাপপুর বলিয়া কোন মৌজা পাওয়া যায় না। অথচ অদ্যাবধি প্রতাপপুর নাম চলিয়া আসিতেছে।

৩২। মথুরাবাটী (হুগলী)

হুগলী জেলার জাঙ্গিপাড়া থানার অন্তর্গত মথুরাবাটী গ্রাম। ইহার পরিমাণ ১৮৪·৭ একর বা ৫৫৪ বিঘা। ১৯৫১ সনে ইহার জনসংখ্যা ৩২৮ জন মাত্র। ভারতের ভূতপূর্ব্ব আইনসচিব ও কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রদ্ধেয় শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় এই গ্রামের সন্তান। অধুনালুপ্ত কৌষিকী নদীর তীরবর্ত্তী প্রাচীন শিবাক্ষেত্র। কৌষিকী লোকমুখে কানানদী—শিবাক্ষেত্র লোকমুখে শিয়াখালা। জনশ্রুতি যে ৪০০।৪৫০ বছর পূর্ব্বে এক ব্রাহ্মণ বাড়ী হইতে বিতাড়িত হইয়া কৌষিকীতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে আসিলে, দৈববাণীর নির্দ্দেশ অনুসারে প্রাণ বিসর্জ্জন না দিয়া এই নদীগর্ভ হইতে এক ক্ষুদ্র পাষাণ প্রতিমার উদ্ধার সাধন করিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। এই দেবী হইতেছেন বিশালাক্ষী—নাম উত্তরবাহিনী।

গৌড়ের সুলতান হোসেন সাহার প্রধানমন্ত্রী বা উজীর ছিলেন গোপীনাথ বসু বা পুরন্দর খাঁ। পুরন্দরের পুত্র কেশব খাঁ ছত্র-নাজিরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে কেশব খাঁর নামোল্লেখ আছে। তিনি ছত্রনাজির বা Grand Master of the Royal Umbrella ছিলেন বলিয়া অনেক স্থলে কেশব 'ছত্রি' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। রাজসরকারে পিতা-পুত্রের অসীম প্রতিপত্তি ছিল। পুরন্দর খাঁ শিয়াখালার রাজাকে পরাজিত করিয়া তথায় স্বনামে পুরন্দরগড়ের প্রতিষ্ঠা করেন। পুরন্দর খাঁ দেবীর একজন বিশেষ ভক্ত ছিলেন। দেবীর মন্দিরাদি তিনিই নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এই মন্দির লোপ পাইয়াছে—তাহার স্থলে বর্ত্তমানে বারান্দাযুক্ত ঠাকুরবাড়ী জনসাধারণের চাঁদায় কয়েক বৎসর আগে নির্ম্মিত হইয়াছে। ঠাকুরবাড়ীর সম্মুখে কৌষিকীর খাতের চিহ্ন আছে, উহা 'ডিঙ্গি ডোবার খাত' নামে প্রসিদ্ধ। পুরন্দর খাঁ ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ দক্ষ ছিলেন। তিনি দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজের সংস্কার করিয়াছিলেন। বল্লাল সেনের পরে আর কেহ সমাজ-সংস্কার করেন নাই। তাঁহার প্রবর্ত্তিত কতকগুলি কুল-বিধি এখনও দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থসমাজে প্রচলিত আছে।

কালক্রমে ইহার বংশবৃদ্ধি হইলে সরিকগণের মধ্যে একস্থানে বসবাসের অসুবিধা হইতে থাকে। পুরন্দর খাঁ হইতে ৪।৫ অধস্তন

মথুরানাথ শিয়াখালার বাস ত্যাগ করিয়া নদী হইতে প্রাপ্ত বিশালাক্ষী মূর্ত্তি লইয়া (এ বিষয়ে ভীষণ মতভেদ আছে, কেহ কেহ বলেন যে, নদীগর্ভ হইতে প্রাপ্ত ক্ষুদ্র মূর্ত্তি এখনও শিয়াখালায় আছে) মথুরাবাটীতে চলিয়া আসেন। মথুরানাথের বাটী বলিয়া যেস্থানে তিনি নূতন বাস পত্তন করিলেন সেই স্থানের নাম মথুরাবাটী বলিয়া লোকসমাজে প্রচারিত হয়। এই নামকরণ মথুরানাথের চলিয়া আসার কিছু পরে হইয়াছিল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। মথুরাবাটীর নামকরণ খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে হইয়াছিল বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি। এ মতে এই নাম গত ৩০০ বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে।

৩৩। হরিপাল (হুগলী)

কলিকাতা হইতে রেলপথে ২৮ মাইল দূরে হরিপাল। ইহা একটি প্রাচীন স্থান। ইহার পুরাতন নাম সিমুল। "দিগ্বিজয় প্রকাশ" নামক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে নরপতি ভূরপালের হরিপাল ও অহিপাল নামে দুই পুত্র ছিল। হরিপাল সিংহপুর বা সিঙ্গুরের পশ্চিমে হাট-বাজার ও দীঘি-সরোবর শোভিত একটি মহাগ্রাম স্থাপন করিয়া নিজের নামানুসারে উহার নাম 'হরিপাল' রাখেন। এই হরিপালের কন্যা কানেড়ার বীরত্ব-কাহিনী মানিকরাম গাঙ্গুলি প্রণীত ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত আছে। গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপাল কানেড়ার সৌন্দর্য্য ও সাহসের খ্যাতি শুনিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য হরিপালের নিকট ভাট প্রেরণ করেন। ধর্ম্মপালের ভয়ে হরিপাল কন্যাদান করিতে রাজি থাকিলেও কানেড়া এই বিবাহে অসম্মত হন। কানেড়া মনে মনে ধর্ম্মপালের সেনাপতি লাউসেনকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন।

এই কাহিনীর মূলে কিছু সত্যও থাকিলে হরিপাল গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালের সমসাময়িক। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ লিখিয়াছেন যে, ধর্ম্মপাল কনৌজ জয় করেন ইংরেজী ৮১০ সনের পূর্ব্বে। ধর্ম্মপালের পুত্র দেবপালের সেনাপতির নাম লাউসেন বা লবসেন। এই বীর সেনাপতি আসাম ও কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন। এই হিসাবে ইংরেজী ৮০০ হইতে ৮৫০ সন হরিপালের সময় ধরা যাইতে পারে। হরিপাল প্রায় ১১০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং একই নামে এই গ্রাম পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

হরিপাল মৌজা কিন্তু ছোট। পরিমাণ মাত্র ৮৫·৬ একর বা ৫৫৭ বিঘা। ইহার কারণ কি?

আমাদের হরিপালের পরিমাণ কম হওয়ার সম্বন্ধে যাহা মনে হয় লিখিতেছি। আমাদের যুক্তি কতদূর সঙ্গত তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন রেভিনিউ সার্ভে হয় তখন হরিপাল নামে কোনও মৌজা ছিল না। বর্ত্তমানের হরিপাল মৌজা গোপালনগর (রেঃ সাঃ নং ১৩৬৭), শিববাটী (রেঃ সাঃ নং ১৩৬৯), বলরামপুর (রেঃ সাঃ নং ১৩৭১) ও রাধাকৃষ্ণপুর (রেঃ সাঃ নং ১৩৭২) লইয়া গঠিত।

পূর্ব্বে হরিপাল একটি মহাগ্রাম ও বহুবিস্তৃত থাকিলেও কালক্রমে বিভিন্ন অংশ বা পাড়া ব্যক্তিবিশেষের বা দেবতাবিশেষের নামে পরিচিত হইতে লাগিল। লোকে ভুলিয়া গেল মূল হরিপাল কতদূর অবধি বিস্তৃত ছিল। হুগলী জেলার সার্ভে ও সেটেলমেণ্ট-কালে (ইং ১৯৩৫) লোকে যে যে গ্রাম হরিপালের অংশ বলিয়া ভুলে নাই তাহারই কিছুটা সেটেলমেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষের কৃপায় হরিপাল মৌজা বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

হরিপাল নাম কিন্তু লোকে ভুলে নাই। ১৮৮০ সনে হরিপালে থানা স্থাপিত হয়। ১৮৮০ সনের ২রা জুন তারিখের কলিকাতা গেজেট দেখুন। হরিপাল থানা ভাঙ্গিয়া তারকেশ্বর থানা সৃষ্ট হয়। রেভিনিউ থানা হিসাবে হরিপালেরই নাম পাওয়া যায়। সুতরাং লর্ড কর্ণওয়ালিস যখন ইংরেজ-রাজত্বের প্রথম যুগে পুলিসের থানা সৃষ্টি করেন তখন হরিপাল এই নামই দিয়াছিলেন। হরিপাল মৌজা নহে, অথচ নাম আছে এইরূপ গ্রামের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এই প্রসঙ্গে ২৪ পরগণা জেলার বীজপুর থানার অন্তর্গত কোনা গ্রামের কথা আলোচনা করা যাউক। দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজের কোনা একটি সমাজ-গ্রাম। কায়স্থ-কারিকায় কোনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—এ মতে এই নাম ৪০০.৫০০ বৎসরের পুরাতন। দত্তবংশের ৩০টি সমাজের মধ্যে কোনা একটি সমাজ; পালিতদের ২টি সমাজের মধ্যে কোনা অন্যতম; সেনদেরও ২টি সমাজের মধ্যে কোনা একটি সমাজ।

বর্ত্তমানে কোনা মৌজার পরিমাণ ৪২৬ বিঘা—এইটি একটি ছোট গ্রাম। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে রেভিনিউ সার্ভে হইয়াছিল তাহাতে দেখা যায় এই ৪২৬ বিঘার মধ্যে আছে ঈশ্বরী-নগর, কালিকাপুর, ভাতারকোলা, বাড়লিয়া, দুর্গাপুর ও কোনা। নিজ কোনা সামান্য একটি পাড়া মাত্র। অথচ কোনা একটি বিখ্যাত সমাজ-গ্রাম। এইরূপ হইবার কারণ কোনা'র এক-একটি অংশ বিভিন্ন জমিদারের এলাকায় পড়ায় তাঁহারা বিভিন্ন নামকরণ করিয়াছেন। লোকে কিন্তু দুর্গাপুরকে কোনা বলিতে ভুলে নাই, এইরূপ অন্যান্য গ্রামের লোকেও তাহাদের গ্রামকে কোনা বলিয়া পরিচয় দিত।

৩৪। ভদ্রেশ্বর (হুগলী)

ভদ্রেশ্বর ভাগিরথীর পশ্চিম কূলে অবস্থিত একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ স্থান। এখানকার ভদ্রেশ্বর শিবের নাম হইতে গ্রামের নাম ভদ্রেশ্বর হইয়াছে। লোকের বিশ্বাস যে কাশীর বিশ্বেশ্বর ও দেওঘরের বৈদ্যনাথের ন্যায় ভদ্রেশ্বরও স্বয়ম্ভুলিঙ্গ। শিবরাত্রি, বারুণী ও পৌষ-সংক্রান্তির সময় বহু যাত্রী আসিয়া থাকে। বিপ্রদাসের "মনসামঙ্গলে" ভদ্রেশ্বরের উল্লেখ আছে।

৩৫। বৈদ্যবাটী (হুগলী)

ভদ্রেশ্বরের নিকটবর্ত্তী বৈদ্যবাটীতে ভদ্রেশ্বরের শক্তি ভদ্রকালী দেবী আছেন। এই দেবী বিশেষ জাগ্রত বলিয়া লোকের বিশ্বাস।

বৈদ্যবাটীর যে অংশে এই দেবী আছেন এই দেবীর নামানুসারে সেখানকার নাম ভদ্রকালী হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত বিপ্রদাসের "মনসামঙ্গল" কাব্যে বৈদ্যবাটীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বিপ্রদাস লিখিয়াছেন যে, এই স্থানে গঙ্গাতীরে চাঁদ সদাগর একটি নিমগাছে পদ্মফুল ফুটিতে দেখিয়াছিলেন। উহা নিমতীর্থের ঘাট বলিয়া পরিচিত।

ভদ্রেশ্বর ও বৈদ্যবাটী নাম বহুদিনের। চারিশত বৎসরেও কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ইহারও বহু পূর্ব্বে ভদ্রেশ্বর, ভদ্রকালী ও বৈদ্যবাটী একটি মহাগ্রাম ছিল। বৈদ্যবাটীতে বহু বৈদ্যের বাস ছিল—এজন্য লোকে এই অংশকে বৈদ্যবাটী বলিত। কালক্রমে এলাকার পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

৩৬। মাকড়দহ (হাওড়া)

মাকড়দহ হাওড়া হইতে ৮৷৯ মাইল দূর—সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত। এখানকার মাকড়চণ্ডী খুব প্রসিদ্ধ। এই দেবী শ্রীমন্ত সদাগর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া লোকে বলে। পূর্ব্বকালে এই মন্দিরের পাশ দিয়া সরস্বতী প্রবাহিত ছিল। সরস্বতী নদীর ছাড়তি বিল বা দহের উপর এই গ্রাম প্রতিষ্ঠিত। এই দহে একটি মকর বা শ্বেত ঘড়িয়াল ধরা পড়ে বা থাকিত। সেই হইতে এই স্থানের নাম মকরদহ ও দেবীর নাম মকরচণ্ডী হয়। লোকমুখে ভাষার অবক্ষরে মাকড়দহে ও মাকড়চণ্ডীতে পরিণত হইয়াছে। যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে মনে হয় সরস্বতীর ছাড়তি বিল বা দহ সৃষ্টি হয় ইংরেজী ১৫৫০-এর পূর্ব্বে। এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান প্রয়োজন।

৩৭। চিন্তামণিপুর (২৪ পরগণা)

২৪ পরগণা থানায় মথুরাপুরের অন্তর্গত চিন্তামণিপুর একটি বৃহৎ গ্রাম। পরিমান ৬৫৮·২৪ একর বা ১৯৯১ বিঘা। ১৯৫১ সনে জনসংখ্যা ৬৯৭ জন। এই গ্রাম যাঁহার জমীদারীভুক্ত ছিল তাঁহার পিতামহী চিন্তামণি দাসীর নামে গ্রামের নাম চিন্তামণিপুর রাখা হইয়াছে।

চিন্তামণিপুর বলিয়া মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর থানায় ও বর্দ্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ থানায় আর দুইটি গ্রাম বা মৌজা আছে।

৩৮। খিসমা (নদীয়া)

নদীয়া জেলার রাণাঘাট থানায় রাণাঘাটের নিকট খিসমা। কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র একবার বলিয়াছিলেন যে সাত-আট পুরুষ হইল তাঁহারা খিসমা হইতে কলিকাতায় আসিয়াছেন। এ মতে আন্দাজ ইং ১৭৫০ সনে খিসমার নামের সহিত আমাদের পরিচয় হয়। নির্ম্মলবাবুরা দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ। দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থদের মধ্যে তিন ঘর কুলীন, আট ঘর সন্মৌলিক আর বাকী ৭২ ঘর মৌলিক। কুলীনরা প্রথম প্রথম এই ৭২ ঘরের সঙ্গে বিবাহাদি আদান-প্রদান করিতেন না। পরে তাঁহারা ক্রমে ক্রমে ইহাদের সঙ্গে আদান-প্রদান করিতে থাকেন।

বাগবাজারের ৺নন্দলাল বসু মহাশয় ইং ১৮৮৩ সনে তাঁহার বহু গবেষণা-লব্ধ কায়স্থ-কারিকা প্রকাশ করেন। ইহার ১৬শ পৃষ্ঠায় এইরূপ লিখিত আছে যে :—

"কুলাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন যে নারায়ণ পাল, কলাধর নাগ, রাজ্যধর অর্ণব, বলভদ্র সোম, শিবানন্দ রুদ্র, গোপাল আদিত্য, সদানন্দ আচ, বুদ্ধিমন্ত রাহা, রাজীব ভঞ্জ, হরি হোড়, বসন্ত তেজ, মুকুন্দরাম ব্রহ্ম, গৌরীকান্ত বিষ্ণু, নন্দী খাঁ নন্দী, রাজেন্দ্র রক্ষিত ও খিসিমা চন্দ্র এই ষোড়শ ব্যক্তি সময়ে সময়ে কুলীনগণকে বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়া স্ব স্ব বংশের যশঃ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।"

হরি হোড় ভবানন্দ মজুমদারের পূর্ব্ববর্ত্তী আন্দাজ ইং ১৫৫০ সনে বর্ত্তমান। খিসিমা চন্দ্রকে আমরা ১৬শ শতাব্দীর লোক বলিয়া ধরিয়া লইলাম। ইঁহার নামানুসারে গ্রামের নাম খিসিমা বা খিসমা হইয়াছে। যদি বলেন যে বাঙালীর এইরূপ নাম হয় না, সুতরাং খিসিমা বা খিসমারচন্দ্র বলিয়া কায়স্থ-কারিকায় এইরূপ নাম দেওয়া হইয়াছে, আমরা বলিব এই আপত্তি সঙ্গত নহে। কারিকায় আর ১৫ জনের যথাযথ নাম দেওয়া হইল, কেবল ইঁহার বেলায় গ্রামের নাম দিতে যাইবে কেন? লোকের যেমন ডাকনাম থাকে ইহাও সেইরূপ ডাকনাম। ছাতুবাবু লাটুবাবু বলিলে আমরা রামদুলাল সরকারের দুই পুত্রকে বুঝি। ইঁহারা বিখ্যাত 'বাবু' ও দাতা ছিলেন। কিন্তু সাধারণ বাঙালীদের মধ্যে কয়জন তাঁহাদের প্রকৃত নাম—আশুতোষ দেব, প্রমথনাথ দেব জানে? রামকৃষ্ণ পরমহংসকে আমরা ঐ নামেই জানি; গদাধর চাটুয্যে বলিলে কে বুঝিবে?

খিসিমাচন্দ্রের ডাকনাম হইতে তাঁহার বসবাসের গ্রাম খিসিমা বলিয়া পরিচিত। তিনি নিজেও যেমন তাঁহার ডাকনামে সমাজে পরিচিত ছিলেন, তাঁহার বসবাসের গ্রামও তাঁহারই ডাকনামে পরিচিত। লোকমুখে 'খিসিমা' 'খিসমা'য় পরিণত হইয়াছে।

নিশির ডাক

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার রায়

ট্রেনের সময় হয়ে এল। রেললাইনের পাশে সেই পরিচিত উঁচু ঢিবিটার ওপর প্রতিদিনের মত সখিয়া আজও এসে দাঁড়িয়েছে। দুইদিকগামী প্রতিটি ট্রেনকে অভ্যর্থনা জানানোটা তার দৈনন্দিন কাজ। খেতে বসলে খাওয়া ছেড়ে, এমনকি খেলতে থাকলে খেলা ফেলেও ট্রেনের সময় হাজিরা তাকে দিতেই হবে। রামশরণের সহকর্মীরা ঠাট্টা করে তাকে বলে—তোমার ছেলে নাই-বা থাকল শরণ, মেয়েই সময়ে তোমার কাজে বাহাল হতে পারবে।

রামশরণের বাড়ী কোন্ সুদূর আরা জেলায়। উদরান্নের অনুরোধে সে সস্ত্রীক বাংলাদেশে এসে এই ষ্টেশনে বহুদিন ধরে কাজ করছে। তার স্ত্রী ক'বছর হ'ল দুটি শিশুকন্যা রেখে মারা গেছে। দেশভাইরা তাকে দ্বিতীয়বার বিয়ের জন্য বহু ধরাধরি করেছিল কিন্তু কি জানি কেন সে কিছুতেই রাজী হয় নি। মেয়ে দুটিকে সে প্রায় মায়ের মতই মানুষ করেছে, তাদের আদর-আবদার অভাব-অভিযোগ পূরণ করার কোন ত্রুটিই রাখে নি। উপস্থিত সখিয়া আট বছরের এবং লখিয়ার বছরখানেক হ'ল বিয়ে হয়েছে।

ট্রেন এল। রামশরণ যথাসময়ে নেমে ঢিবিটার ওপর সখিয়াকে দেখতে পেয়ে সোজা তার কাছে গেল। পদক্ষেপ তার একটু সঙ্কুচিত, দৃষ্টি বিষণ্ণ। সখিয়া এসব বোঝে না, রামশরণ আদর করে তার মাথায় হাত দিতেই সে চট্ করে পাশ কাটিয়ে তার দিকে পিছন ফিরে ট্রেনের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল—লখি কই? দিদি? ওকে আগে শীগগির নামিয়ে আন, ট্রেন ছেড়ে দেবে যে।

রামশরণ ব্যস্ত হ'ল না। সখিয়ার বাঁ হাতটা ধরে একটু ব্যগ্রভাবে নিজের কাছে টেনে নিতে নিতে বলল—না রে পাগলী না, সে আসেই নি।

অতর্কিতে সখিয়ার স্বপ্নসৌধ খান খান হয়ে ভেঙে পড়ল। মুখ উঁচু করে যথাসম্ভব স্পষ্টভাবে রামশরণের মুখের পানে চেয়ে অস্ফুট কণ্ঠে থেমে থেমে বলল—দিদি আসে নি? আ-সে-ই—নি?

লখিয়া না আসাতে রামশরণের যত না দুঃখ হয়েছিল তার বেশী ভয় হয়েছিল ঠিক এই জন্যই। এ এখন জায়গা যেখানে ছোট্ট একটি 'না' বলতে তার দীর্ঘ সবল দেহের সমস্ত স্বরশক্তি নির্জীব হয়ে আসে। কত মণ বোঝা যেন অমানুষিক পরিশ্রমের সঙ্গে টানতে টানতে হাঁফিয়ে পড়ে সে। কোন রকমে আবার বলে ফেলল—না রে বিটিয়া, না।

বাড়ি ঢুকে রামশরণ তাড়াতাড়ি বিশৃঙ্খল সমস্ত জিনিস-গুলো গুছিয়ে নিয়ে রান্নার জোগাড় করতে বসে যায়। সখিয়ার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করবার উদ্দেশ্যে সে তাকে দু'-একটা খুঁটিনাটি ফরমাসও করল কিন্তু সখিয়া নিরুত্তরে সেই যে ছোট সিঁড়িটার ওপর বসে পড়েছে, কোন তাগিদেই আর স্থানচ্যুত হবার লক্ষণ দেখাল না। তার মনে রাগ বা দুঃখ কোনটাই এখন নাই, শুধু রয়েছে আকস্মিক আঘাত-জনিত একটি দুর্বোধ্য অতিবিস্তৃত বিহ্বলতা। ছোট ষ্টেশনের ট্রেন, কখন চলে গেছে। প্রতিদিনের মত সে তাকে নৃত্য-গীতের সঙ্গে বিদায় দিতে পারে নি। আর যে তাকে এমন নিষ্ঠুর আঘাত দিয়ে যেতে পারে সে তার অভিনন্দনেরই বা কতটুকু অপেক্ষা রাখে। সখিয়ার কণ্ঠ নীরব, হাত-পা নিঃসাড়। শুধু ট্রেনের দীর্ঘ বিলম্বিত 'কু' ধ্বনিটা একটা দূর-দুরান্তরের বিস্তৃত চেতনা নিয়ে তার অচেতন বোধশক্তির আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল মুদিত কমলের পাশে লুব্ধ সহচর ভৃঙ্গটির মত। ক্রমে ক্রমে তার নিস্তেজ চিত্তশতদল একটু একটু করে সচেতন হয়ে জেগে উঠতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে যায় অনেক কথা—কিংবা শুধু একটি কথা—দিদি আসে নি!

রামশরণ নুনের পাত্রটা হাতড়ে দেখে বলল—যা ত সখি, মাষ্টারবাবুর বাড়ি হতে একটু নুন নিয়ে আয় ত, একেবারে ফুরিয়ে গেছে।

ষ্টেশনমাষ্টারের কোয়ার্টার ও নিম্নস্তরের কর্মচারীদের আস্তানাগুলো প্রায় গায়ে গায়ে লাগা। ষ্টেশনমাষ্টারটি বহু-দিনের লোক, ছোট ষ্টেশন বলেই হোক বা যে কারণেই হোক বদলি হবার লক্ষণটি নেই। রামশরণের পরিবারটি ষ্টেশনমাষ্টারের পরম অনুগৃহীত, তাদের বিপদে-আপদে তিনি বহুবার বহুভাবে সাহায্য করেছেন, এখনও করেন। রাম-শরণের স্ত্রী ধনিয়া এই বাড়িতে বহুদিন ধরে কাজ করেছে, সে সূত্রেও তাদের সম্বন্ধটা একটু ঘনিষ্ঠ। মা-হারা ছোট

মেয়ে দুটির তাদের বাড়িতে অবাধ গতি, বিশেষ করে পরেশবাবুর মা আনন্দময়ী তাদের অত্যন্ত স্নেহ করেন। এবারেও সখিয়া যখন রামশরণের সঙ্গে দিদির শ্বশুরবাড়ী যাবার বায়না ধরল তখন রামশরণ এই আনন্দময়ীরই শরণ নিয়েছিল। লখিয়াকে তার শ্বশুর পাঠাবেন কিনা সে বিষয়ে তার প্রচুর সন্দেহ কিন্তু সখিয়া একবার গিয়ে দিদিকে দেখে কি পরিমাণ গণ্ডগোল বাধিয়ে তুলবে সে বিষয়ে একটুও সন্দেহ নাই। জ্যেষ্ঠ ভগিনীচ্যুতা মা-হারা অশ্রুমুখী ছোট মেয়েটিকে দেখে আনন্দময়ীর কিন্তু মায়া হয়েছিল, তিনি একবার বলেও-ছিলেন—নিয়েই যাও না রামশরণ, একবার দেখেও ত আসতে পারবে। এখানে আনন্দময়ীর নিজের একটি গোপন ব্যথা আছে, রামশরণ বোঝে। সে সসংকোচে বলেছিল, নিয়ে যাওয়া ত কঠিন নয় মাইজী, ফিরিয়ে আনাই কঠিন। আপনি ত জানেন। আনন্দময়ী সখিয়ার ঘন রুক্ষ চুলভরা মাথায় হাত রেখে সস্নেহে বলেছিলেন, বেশ তাই হোক। তোমার কোন ভাবনা নেই, তুমি যাও। ও আমার কাছেই থাকবে এ ক'দিন।

সখিয়া ষ্টেশনমাষ্টারের সদর দরজায় পা দিয়েই ভেতরে একটা বাদানুবাদ শুনতে পেল। বাথরুমের দেওয়ালের আড়াল হতে উঁকি দিয়ে সে দেখতে পেল উত্তর দিকের বারান্দায় চৌকির ওপর বসে স্বয়ং ষ্টেশনমাষ্টার পরেশবাবু। ভাবে মনে হয় ট্রেনটাকে বিদায় দিয়ে এইমাত্র এসে বসেছেন কারণ সখিয়া তাঁকে একটু আগেই ষ্টেশনঘরের বারান্দায় বসে হিসেব মেলাতে দেখেছিল।

পরেশবাবু বলছিলেন—তোমায় বার বার বলছি খোঁজ তার যথেষ্ট করা হচ্ছে কিন্তু সে নিজে যদি কোন খোঁজ না দেয় তবে আমরা কতটুকু কি করতে পারি বল।

আনন্দময়ী চৌকির অনতিদূরে একটা থামের ওপর ঠেস দিয়ে বিষণ্ণ ভঙ্গিতে বসেছিলেন। বোঝেন তিনি সবই কিন্তু মন ত বোঝে না। একটু থেমে অসহায় ভাবে বলে ওঠেন—কিন্তু ওর ত কোন বিপদও হয়ে থাকতে পারে, সে অবস্থায় খবর দেবে কি করে বল ?

পরেশবাবু এমনিতে লোক মন্দ নয় কিন্তু দিনের পর দিন এই একঘেয়ে পুনরাবৃত্তির চাপে পড়ে মানুষের ধৈর্যও সব সময় থাকে না। এ কথায় তিনি একটু উত্তেজিত ভাবেই বলেন—তাই যদি হয় তবে আমরাই বা খোঁজ পাই কেমন করে ? হাত ত আর গুণতে জানি না!

সখিয়া বুঝতে পারে। ব্যাপারটা হ'ল এই—আনন্দময়ীর ছোট ছেলে নরেশের বছরখানেক থেকে কোন খোঁজ-খবর পাওয়া যাচ্ছে না। সে পড়াশোনায় বরাবরই ভাল ছেলে ছিল, বছর পাঁচেক আগে যখন সে সসম্মানে বি-এ পাস করে সেই বছরই তাদের বাবা মারা যান। তিনি ছিলেন রেলবিভাগের বড় একজন কর্মচারী। তাঁর চেষ্টাতেই বড় ছেলে পরেশনাথ তার অল্প বিদ্যে নিয়েও আজ এই ষ্টেশন মাষ্টার হয়ে বসেছে। নরেশ কিন্তু তার বেশী বিদ্যে নিয়েও তদ্বিরাদির অভাবে কোন চাকরিই জোগাড় করতে পারল না। অবশেষে সে একদিন বিরক্ত হয়ে কাউকে না জানিয়েই পাইলটের কাজে যোগদান করে এবং আনন্দময়ীর বহু আপত্তি সত্ত্বেও শিক্ষার্থী হিসাবে দিল্লী চলে যায় ও সেখান হতে অনেক জায়গা বদল হবার পর এখন নাকি ভারত-বর্ষের বাইরে কোন্ যুদ্ধক্ষেত্রে চলে গেছে। সেখানে যাবার কিছুদিন পর হতেই নরেশের কোন চিঠি পাওয়া যায় না, এদিক থেকে যে চিঠিগুলো যায় সেগুলোরও কোন উত্তর নাই।

এ পর্যন্ত সবাই জানে কিন্তু আর একটি কথা আছে যেটি সখিয়া বা পরেশবাবু কেউই জানে না। সেটি হ'ল আনন্দ-ময়ী গত দু'রাত্রি পরপর স্বপ্ন দেখেছেন নরেশ বাড়ি ফিরে এসেছে। ট্রেন থামার সঙ্গে সঙ্গে তাই তিনি দাওয়ার ওপর অমন উদগ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করছিলেন।

ব্যাকুলকণ্ঠে আবার তিনি বলেন—এমনও ত হতে পারে সে তোর চিঠি পায়ই নি, সেখান থেকে হয়ত তাকে অন্য কোনখানে পাঠান হয়েছে।

পরেশবাবুর মনটা আবার কোমল হয়ে ওঠে। খোলা বোতামগুলো অন্যমনস্কভাবে আবার বন্ধ করতে করতে বল-লেন—সে ত খুবই স্বাভাবিক। কিংবা ধর এমন অবস্থায় আছে যে, চিঠিপত্র লেখার কোন সুবিধে নেই বা বারণ আছে। যুদ্ধের ব্যাপার, জানই ত!

ইতিমধ্যে সখিয়ার শরীরের সবখানিই দেওয়ালের আড়াল হতে বার হয়ে পড়েছিল, রান্নাঘরের দাওয়া হতে মাষ্টারগিন্নী দেখতে পেয়ে বললেন—কি রে সখি, তোর দিদি এল ? রামশরণ ফিরে এসেছে ?

সখিয়া কিছু বলল না। কিন্তু তার বিষণ্ণ ভাবান্তর দেখে মাষ্টারগিন্নী সবই বুঝতে পারলেন, আপনমনেই বললেন—আরে তখনই বলেছিলাম, ছাগলবেচা করে মেয়ে বেচলে এই রকমটাই হয়। কাণ্ড!

ব্যাপারটা হচ্ছে মেয়ের বিয়েতে টাকা নেওয়াটা কেনা-বেচার ব্যাপার নয়, রামশরণদের ওটা দেশাচার। ওতে কেউ কিছু মনে করে না কিন্তু রামশরণ যেন কিছুটা বেশী টাকার জন্যই মেয়ের বিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল কারণ তার স্ত্রীর চিকিৎসা ও মৃত্যুর আনুষঙ্গিক খরচের জন্য যে ঋণটা হয়ে-ছিল সেটা বহুদিন ফেলে রাখার ফলে তখন জোর তাগিদা

আসছিল শোধ করার জন্য। সেইজন্যই লখিয়ার বিয়ের এই টাকাটা লোকের এত নজরে পড়ে। আর যে ঘরে লখিয়ার বিয়ে হয়েছে তারা রামশরণদের স্বজাতি হলেও অনেকটা উচ্চ স্তরের। তাই তারা মেয়েটাকে নিয়ে গিয়েই অন্য সব সম্বন্ধ অস্বীকার করেছে, আদানপ্রদান একটুও রাখতে চায় না। কিন্তু সেও কি রামশরণের দোষ ?

কিন্তু যে যাই বলুক লখিয়া সুখেই আছে—উনুনে কাঠগুলো ভাল করে গুঁজে দিতে দিতে রামশরণ একমনে ভাবে ও সেই সঙ্গে নিজের জ্বালাটাও ভুলতে চায়।

বাবা!

কে, সখি ? নুণ পেয়েছিস ? আয় বোস দেখি আমার কাছে—। বলতে বলতে রামশরণ তাড়াতাড়ি চোখ দুটো মুছে নিয়ে নিজেও ভাল হয়ে নড়েচড়ে বসে।

বাবা, তুমি লখিকে বিক্রী করে দিয়েছ বুঝি ?

বিক্রি করেছি! রামশরণ চমকে উঠে সখিয়ার পানে তাকায়, দেখে তার ঠোঁট দুটো অধীর আবেগে কাঁপছে, চোখে কেমন অদ্ভুত চাহনি! এই মুহূর্তে যেন তাকে আর ছোট মেয়ে বলে চেনা যায় না।

হ্যাঁ, ছোটমা বলল। আর বিক্রিই যদি না করেছ তবে আনতে পারলে না কেন ?

রামশরণ সহসা কোন জবাব দিতে পারে না। শুধু এই নিদারুণ প্রশ্নচিহ্নটার দুই পারে একজন বসে ও অন্য জন দাঁড়িয়ে পরস্পরের পানে চেয়ে থাকে।

সখিয়ার চোখে পরিস্ফুট বিদ্রোহ—ভাবখানা যেন, এ কেমন বাবা, যে বিনাদোষে দিদিকে অমন বিক্রি করে দিয়ে এল! এরা সব পারে!

আর ওদিকে ফেন গড়িয়ে গড়িয়ে হাঁড়ির গা দিয়ে অজস্র ধারে পড়তে থাকে কিন্তু রামশরণের কোন হুঁস নাই, সে কেবল ভাবে—তাই ত, বিক্রিই যদি না করেছ তবে আনতে পারলে না কেন ?

এমনি কয়েকটি দীর্ঘবিলম্বিত মুহূর্ত। তার পর।

বাবা!

কি রে বিটিয়া ? একি, কাঁদছিস কেন—বলতে বলতে রামশরণ ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়ে ও সখিয়াকে কোলে টেনে নিয়ে আবার উনুন-গোড়ায় এসে বসে। তার পর মেয়ের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে আদরের সুরে বলে—কাঁদছিস কেন রে বেটি ? এতে কাঁদবার কি আছে ?

সখিয়া তখন সব ভুলে গিয়ে ওই বিক্রেতা পিতার বুকেই মুখ লুকিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে কান্নায় কাতর কণ্ঠে প্রশ্ন করে—লখি কি তা হলে আর আসবেই না বাবা ?

রামশরণ তেমনি আদর করতে করতে যন্ত্রচালিতের মত উত্তর দেয়—পাগলী! নিশ্চয়ই আসবে!

কিন্তু তুমি যে তাকে বিক্রি করে দিয়েছ ?

দূর, মানুষ আবার বিক্রি হয় নাকি!

তার পরে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার ভঙ্গিতে পিতা কন্যার উদ্দেশে বলে ওঠে—আয় দেখি বিটিয়া, হাঁড়িটা নামিয়ে আগে দুটো ভাত খেয়ে নিই দু'জনে মিলে। তোর নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছে।

রাত তখন বারোটা। চারিদিক নিষুতি। ষ্টেশনমাষ্টারের কোয়ার্টারের ঠিক বাইরের দিকে সিমেণ্ট-বাঁধানো রকটার এক কোণে অন্ধকারে আপাদমস্তক ভাল করে ঢেকে বসে আনন্দময়ী ঠিক এই কথাটাই ভাবছিলেন—মানুষ বিক্রি হয় না ? খুব হয়। নরেশকে ত অমনি সবাই মিলে ধরে বেঁধে বিক্রিই করে দিয়েছে। হতে পারে মাইনে বেশী কিন্তু এটা কেউ বোঝে না যে ওটা চাকরির মাইনে নয়, প্রাণের মূল্য। যুদ্ধের চাকরিই যে তাই।

আনন্দময়ী ব্যথিত দৃষ্টিতে শূন্যে আকাশের পানে চেয়ে থাকেন।

এরোপ্লেনগুলো রাত্রে ঠিক ঐ তারাগুলোর মতই জ্বলে। লাল নীল হলদে—কত রকমারি সুন্দর রঙ, কত সুন্দর আলো। উঃ কতদূর!

হঠাৎ একটি তারা তীর্য্যক ভাবে আকাশের কোলে খসে পড়ে। আনন্দময়ীর বুকটা সেই সঙ্গে ছাঁৎ করে ওঠে। ডাঙার মানুষ আকাশে ওঠে, ওই উঁচুতে উঠে মানুষের মাথার ঠিক থাকে! আর ধর যদি কোন কলকব্জাই বিগড়ে গিয়ে থাকে তবে বিপদ ঘটতে কতক্ষণ ? নরেশ একবার তাকে চিঠিতে লিখেছিল - সে অনেক দিন আগে—এরোপ্লেন চালানো এমন মজার ব্যাপার জান মা, বিশেষ করে যখন ভাবি নিচে পৃথিবীর লোক হাঁ করে আমার চালানো দেখছে। তুমি রাত্রিবেলার কাজকর্ম শেষ করে নিশ্চয়ই তোমার ঘরের বারান্দায় বসে আকাশের পানে চেয়ে কিছুক্ষণ ভগবানের নাম কর। হতে পারে কোনদিন তেমন সময় আমি আলো জ্বালিয়ে এরোপ্লেন চালিয়ে ঠিক তোমার মাথার ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছি। রাত্রে আলো-জ্বালানো এরোপ্লেন এমন সুন্দর দেখায় মা, দেখেছ ত ? তুমি হয়ত শব্দ শুনে হাঁ করে চেয়েই থাকবে, একটুও চিনতে পারবে না কোন্‌টা তারা আর কোন্‌টা আমি। আবার এত উঁচুতে রয়েছি ত কিন্তু ঝাঁপ দিয়ে নিচে নেমে পড়বারও সুন্দর ব্যবস্থা আছে। তার নাম হ'ল প্যারাশুট, একটা ছাতার মত জিনিস। ধর

ঠিক সেই সময় এরোপ্লেন চালাতে চালাতে এমন বিদঘুটে খিদে পেয়ে গেল যে, রুটি-বিস্কুটে কিছুতেই পেট ভরছে না, জেদী ঘোড়ার মত মনটা কেবলই বলতে থাকে—বহুদিন তোমার কাছে বসে খাই নি, তখন কি করতে পারি মনে করছ? ঐ ছাতাটা মাথায় দিয়ে বলা নেই কওয়া নেই, সোঁ করে একেবারে তোমার বারান্দার ধারে উঠোনের পাশটিতে গিয়ে হাজির হব। দরজা খোলার হাঙ্গামা নেই, হাঁকডাক গণ্ডগোল নেই—শুধু তুমি যখন তোমার হরিনামের মালাটা নিয়ে ভগবানের নাম নেওয়ার কোন্ ফাঁকে একবার ভেবে ফেলেছ—নরেশ এখন কোথায় কত দূরে!—তখন তোমার ভগবান যেখানে যত দূরেই থাকুন না কেন আমি কিন্তু একেবারে তোমার পাশটি ঘেঁষে বসে পড়ে বলব—আজ রান্নার কি কি হয়েছে বল দেখি মা, বড় খিদে পেয়ে গেছে।

চিঠিখানা লেখা এমনই হাল্কা সুরেই কিন্তু তার ভারেই এই মুহূর্তে আনন্দময়ীর চোখ দিয়ে আবার জল গড়িয়ে পড়ে, আজ তার নিরুদ্দেশ সন্তানের স্মৃতির সঙ্গে এই তীব্র ক্ষুধাটাই একসঙ্গে জড়িয়ে গেছে—ক্ষুধিত নরেশ যেন আজ দিকে দিকে শুধু কেঁদেই বেড়াচ্ছে—বড় খিদে পেয়ে গেছে মা, বড় খিদে!

কতক্ষণ পরে মনে নেই, হঠাৎ ট্রেনের সঙ্কেতঘণ্টা নিষুতি রাত্রির জড়তা ভেদ করে প্রবল ভাবে বেজে উঠল। আনন্দময়ী সম্বিৎ পেয়ে সেই দিকে চাইলেন—হঠাৎ কিছুদূরে ঠিক রেললাইনের পাশেই দেখতে পেলেন আবছা কুয়াশা-ঘেরা ক্ষীণ চাঁদের আলোয় যেন একটি শীর্ণ মানুষ উৎসুক নিশ্চল ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে।

ঘণ্টা তখন বাজছিল, সেই সঙ্গে আনন্দময়ীর বুকটা প্রচণ্ড ভাবে দুলে উঠল, চোখে ভেসে উঠল গত দু'রাত্রির স্বপ্নে-দেখা সেই আবছা সন্তানমূর্তি এবং কানে বেজে উঠল—তখন তোমার ভগবান যেখানে যতদূরেই থাকুন আমি কিন্তু একেবারে তোমার পাশটিতে…।

আনন্দময়ী সম্মোহিতের মত উঠে দাঁড়ালেন।

উঃ কি অন্ধকার! কি ঠাণ্ডা! কুয়াশায় ঢাকা সিগন্যালটা মোটে দেখতে পাওয়া যায় না। শীতে কাঁপতে কাঁপতে সখিয়া ঢিবিটার ওপর যথাসম্ভব উঁচু হয়ে নিজের চারিদিক ভাল করে দেখে নেবার চেষ্টা করে। হঠাৎ এক জায়গায় গিয়ে তার চোখ দুটো বিস্ময়ে থমকে থেমে যায়, কে একজন মানুষের মত ঠিক তারই দিকে এগিয়ে আসছে…আস্তে আস্তে আস্তে…যেন লুকোচুরি খেলা…আর মেয়েমানুষ বলেই ত মনে হচ্ছে।

পরমুহূর্তে স্থানকালপাত্র ভুলে গিয়ে সখিয়া প্রচণ্ডভাবে চীৎকার করে ওঠে—দিদি! দিদি! দিদি!

সখি? তুই এখানে? করছিস কি এত রাত্রে?

দিদিমা? দিদি—। সখিয়ার কণ্ঠস্বর এবার কান্নায় ভেঙে পড়ে।

আনন্দময়ী তাড়াতাড়ি এগিয়ে ঢিবিটার একধারে উঠে এলেন, এসে সখিয়ার একান্ত সন্নিকটে দাঁড়িয়ে তার শিশির ও অশ্রুসিক্ত মুখখানা নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। ততক্ষণে ব্যাপারটা তিনি বুঝেছেন।

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ। তার পর আনন্দময়ী কোমলকণ্ঠে বললেন—বাড়ী যাই চল্ সখি, কেমন?

দূরে ট্রেনের শব্দ শোনা যাচ্ছে, সেই সঙ্গে একটা আলোক-বিন্দুও অন্ধকার ভেদ করে আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠছে। সখিয়া সেই দিকে চোখ উঠিয়ে ও কান পেতে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল—কিন্তু দিদি? গাড়ি—

সব গাড়িতে সবাই আসে না রে বোকা মেয়ে! আর দাঁড়িয়ে মিছিমিছি ঠাণ্ডা লাগিয়ে কি হবে, তার চেয়ে চল ভেতরে যাই—। বলতে বলতে তিনি সখিয়াকে দুই হাতে বেষ্টন করে এক রকম টানতে টানতেই ঢিবি হতে নেমে বাড়ির পানে হাঁটেন।

তার পর তারা অতি সন্তর্পণে বারান্দা ডিঙিয়ে নিজেদের নির্দিষ্ট জায়গায় ফিরে চলে, অতি ধীরে ধীরে, যেন একটুও শব্দ না হয়, যেন কেউ হঠাৎ জেগে উঠে তাদের এই অন্ধকারের অবগুণ্ঠন নিষ্ঠুর আঘাতে চিরে ফেলে জিজ্ঞেস না করে বসে—তোমরা এমন সময় কোথায় গিয়েছিলে বা কোথা থেকে আসছ?

কারণ আর যাই থাক, ও প্রশ্নের কোন জবাব নেই।

রাজগৃহ

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

চলেছি রাজগৃহে। বক্তিয়ারপুর ষ্টেশনে নামলাম। এটি মোগল-সরাইয়ের পথে পূর্ব্ব-রেলওয়ের মেন লাইনের একটি জংশন-ষ্টেশন। চড়তে গেলাম বি-বি-এল-আরের ছোট্ট গাড়ীতে। ছোট্ট একটি ডিজেল-ওয়েল-চালিত ইঞ্জিন আর তার সংলগ্ন ছোট ছোট দুটি কামরা। আলপিন ফেলবারও জায়গা নেই কোথাও। গার্ড-সাহেবকে কাকুতি করায় তিনি মালপত্তরগুলি লাগেজ ভ্যানে নিলেন। কিন্তু সচল লাগেজ আমাদের কি ব্যবস্থা হবে? এক অভিনব ব্যবস্থাই হ'ল। আমরা ট্রেনের ছাদে চাপলাম। হ'ল। সব সময় পতনের ভয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে অনাবিল আনন্দটুকু উবে গেল। তবুও মজা মন্দ লাগ্‌ছিল না। গাড়ী থামলে আর চলতে চায় না। মাঝে মাঝে ইঞ্জিন খুলে নিয়ে মোটরের মত ষ্টার্ট নেবার জন্য ঠেলতে হয় কোন কোন ষ্টেশনে।

বিহার-শরীফ এই লাইনের বড় ষ্টেশন। এখানে কোর্ট আছে। সাব-ডিভিশন এটি। গাড়ী প্রায় খালি হয়ে গেল এখানে। আমরাও নীচে নেমে এসে কামরার মধ্যে স্থান দখল করলাম। নামতে গিয়ে কাঁটা-তারের বেড়ায় লেগে প্রায় সকলেরই

দিগম্বর জৈন মন্দির, বৈভার

পারসনাথ মন্দির, বৈভার

জামা-কাপড় এক-আধটুকু ছিঁড়ল। বেড়াটি এত নিকটে যে, পাশ ফিরতে গেলেই তাতে দেহ-সংযোগ ঘটে। রেলকর্ত্তৃপক্ষ এদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন নি। গার্ডসাহেব মালগুলি লাগেজ-ভ্যান থেকে বের করে দিলেন। আমরা সেগুলি বুঝে নিয়ে নিজেদের কাছে রাখলাম। এখানে লাগেজ-ভ্যান ভর্ত্তি হয়ে উঠল নানারকম পেটিতে। বিশেষ করে আলুর বস্তা তোলা হ'ল অনেক। সব যাবে নালন্দা-রাজগীরের দিকে। আলু জন্মায় এখানে প্রচুর। বছরে তিন বার করে আলু হয় এখানে।

এই ভাবেই যেতে হবে ৩৩ মাইল পথ। মার্টিন কোম্পানীর ছোট গাড়ী যখন হাওড়া-ময়দানে আসে, তখন নজরে পড়ে অনেকেই ট্রেনের ছাদে চড়ে অফিস করতে আসছেন। এবার ট্রেনের ছাদে চড়ার অভিজ্ঞতা হয়ে গেল। এ ট্রেনও ছিল মার্টিন কোম্পানীর। অধুনা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড নিয়েছে। অতঃপর সরকার বাহাদুর নেবেন, এমন কথা হচ্ছে।
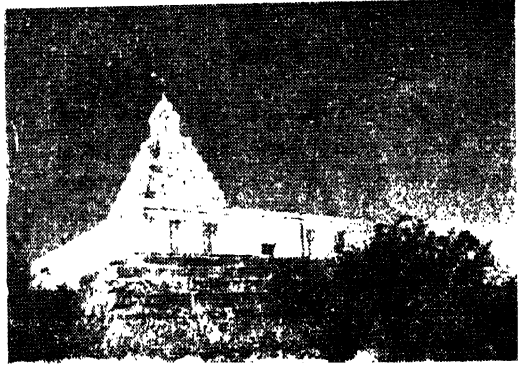
রাজগীর পর্য্যন্ত যাত্রী কম যায় না। অথচ কখনও দুটির বেশী কামরা হ'ল না রেলগাড়ীর। ঢিকির ঢিকির করে ঢিমে তেতালায় গাড়ী চলল। পাশের পিচ-ঢালা রাস্তায় সাইকেলওয়ালারা কেউ কেউ গাড়ীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাইকেল চালাতে লাগল। বলা বাহুল্য, জিত হ'ল বাইসাইকেলওয়ালাদেরই। ছাদে বসে আছি। কখনও কোন বৃক্ষশাখা মাথায় ঠেকল অমনি মাথা নীচু করতে

ধূ ধূ করছে দিগন্তপ্রসারী মাঠ। মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম। বেশ বড় আমবাগান আছে এ অঞ্চলে। তালবীথিও চোখে পড়ছে এখানে-ওখানে। ঘর-বাড়ীতে দারিদ্রের ছাপ পরিস্ফুট। টালি আর মাটির ঘর; পোড়ামাটির গ্লাসগুলি যেন দু'ভাগে ভেঙে চালের ওপর উপুর করে রাখা হয়েছে। এই হ'ল অঞ্চলের

টালি-ছাওয়া ঘর। কোন কোন বাড়ীতে মাটির প্রাচীর। অধিকাংশ বাড়ী পথিকের উপর তাদের লজ্জা-সরমের ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে। গ্রামবাসীরা চাষ করে। তাদের পরিধানে স্বল্প বেশ-বাস। কোথাও গরু দিয়ে পুলি-সিষ্টেমে জল তোলা হচ্ছে কুয়া থেকে ক্ষেতে দেবার জন্যে।

পাবা পুরীর ফটক
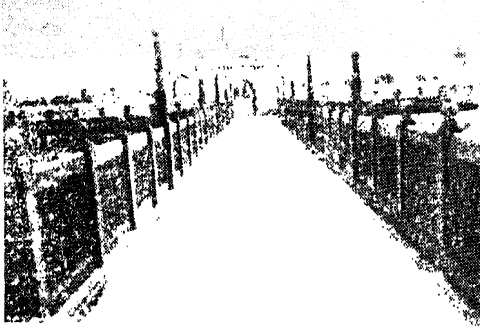
হাঁসফাঁস করে ছুটে চলেছে ছোট্ট ইঞ্জন। গাড়ী ফাঁকা হওয়াতে এক চোখ অন্ধ এক ভিক্ষুক জলতরঙ্গ বাজাতে বাজাতে আমাদের কামরায় প্রবেশ করলে। তার পিছু পিছু প্রবেশ করলে কাল জামা-প্যান্ট পরা একজন চেকার। হুঙ্কার দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল চেকারবাবু—আপলোক আগে বাড় যাইয়ে···আরে ডাকু, হিঁয়া কেয়া মিলে গা···ভাগো ঃ ভদ্রলোক শালীনতার ধার ধারেন না। জুতোর ঠোক্কর দিলেন ভিক্ষুকের গায়ে। পরের ষ্টেশনে প্লাটফর্ম্মের উপর 'কেরুয়া দে দো' বলে একজনকে চুল ধরে মারতে দেখলাম ঐ একই চেকারবাবুকে। এদিকের লোকগুলি চেহারায় ষাড়, কিন্তু মনে মেষ। অত বড় একটা যোয়ান গন্ধর্ব্ব প্রহার হজম করলে শব্দ না করে।

আবার ভিড় জমল পরের ষ্টেশনে। একদল ছাত্র উঠল। তারাও চলেছে রাজগীর। আজ সেখানে মহালয়া অমাবস্যার মেলা। কুনুইয়ের গুতো খেতে খেতে চলেছি গাড়ীতে। ছোকরাগুলি ভদ্রতা জানে না। অকারণ হাসি আর চীৎকারে কামরাখানাকে চৌচির করে দিলে। ইংরেজী ভাষা তারা হামেশাই ব্যবহার করছে, কিন্তু ভাষার অপপ্রয়োগই বেশী কানে ঠেকল। তবে অনেক বাঙালী ছেলের চাইতে তারা দ্রুত ইংরেজী বলতে পারে, হোক তা ভুল। তাদের আচরণ গর্হিত। সিগারেট টেনে ধোঁয়া ছাড়ে মেয়েদের মুখের দিকে লক্ষ্য করে। প্রাদেশিকতার দুষ্ট ব্রণ তাদের সর্ব্বাঙ্গে।

রাজগীরে গাড়ী পৌঁছাল নির্দ্দিষ্ট সময়ের আড়াই ঘণ্টা পরে। গাড়ী আপন মর্জ্জিতে চলে, এর কোন কৈফিয়ৎ নেই। নেমে নয়ন ভরে উঠল পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত ধূসর পাহাড় দেখে। রাজগীর ছোট্ট ষ্টেশন। কিন্তু ভিড় বেশ। সকলে এসেছে রাজগীর-কুণ্ডে স্নান করতে অমাবস্যার যোগে। ষ্টেশনের সন্নিকটে একটি বাড়ীতে উঠলাম আমরা। তিন টাকা ভাড়াতে দুখানি রুম পাওয়া গেল দু' দিনের জন্যে। এখানে রামকৃষ্ণ মিশন আছে, নাহারদের বিরাট বাড়ী ও মন্দির আছে, কয়েকটি ভাল জৈন ধর্ম্মশালা আছে, সনাতনী ধর্ম্ম-সংস্থা আছে, শিখ সঙ্গত আছে, আনন্দময়ী মায়ের আশ্রম আছে, আর আছে গবর্ণমেন্টের ডরমিটারী ও ডাক-বাংলো। থাকার কিছুমাত্র অসুবিধা নেই।

ষ্টেশনের সামনেই বাজার। শ' দেড়েক চালা-ঘর আছে বাজারে। কামারশালা, কুমোরশালা, চায়ের দোকান, পানের দোকান, মুদিখানা, ছোট্ট দুটি দাওয়াইখানা, আর আছে সীতারামের টাটকা ভেজিটেবিল ঘিয়ের পুরী পেঁড়া মিঠাইয়ের দোকান। কিছু কিছু সব্জীও মেলে বাজারে। আলু, কফি, পালংশাক নেহাত মন্দ নয় এখানের। দুধে ভেজাল থাকলেও ভাল দুধ দুষ্প্রাপ্য নয়। হোটেলও আছে একটি। নাম যমুনা হোটেল। তবে আহার্য্য মুখে দিলে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসবে পেট থেকে। স্বপাক ভোজনই প্রশস্ত এখানে। সস্তাও বটে।

এই সেই পঞ্চপর্ব্বত বেষ্টিত রাজগৃহ, যার পাহাড়ে পাহাড়ে ইতিহাস আর পুরাণ জমাট বেঁধে আছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ধর্ম্মের উত্থান-পতন লক্ষ্য করেছে এখানের শৈল-শিলা। ব্রহ্ম, তিব্বত, শ্যাম, চীন, জাপান, সিংহল এখনও এখানে আতিথ্য স্বীকার করে। ভগিনী নিবেদিতা একদা রাজগীরকে বলেছিলেন, ভারতের ব্যাবিলন। প্রাগৈতিহাসিক পুরাতত্ত্বের বিখ্যাত ক্ষেত্র এটি।

আমাদের বাসস্থান অর্থাৎ ষ্টেশন-এলাকা থেকে যে রাস্তা চলেছে সোজা দক্ষিণে সেই পথেই অগ্রসর হলাম আমরা। মধ্যাহ্ন গড়িয়ে গেলেও উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান করব আজই। কিছু পরে পথ দ্বিধাবিভক্ত হ'ল। একভাগ পথ চলে গেছে নয়া ডাক-বাংলো ঘুরে নয়া-কেল্লার দিকে। ঐ পথেরই অন্যদিকে পড়ে বেণুবন। বুদ্ধদেবের প্রিয় বাসস্থান। এখানে তিনি বর্ষাযাপন করেছিলেন, বিম্বিসার বুদ্ধকে দান করেন এই বেণুবন, কলন্দকনিবাপ নামক জলাশয়েরও চিহ্ন পাওয়া যায় এখানে। বেণুবন বিহারের ধ্বংসাবশেষের আভাসও এখানকার মাটিতে মিশিয়ে আছে। মাটি খনন করতে গিয়ে বৌদ্ধ মন্ত্রযুক্ত ফলক আবিষ্কৃত হয়েছে এখানে।

বেণুবন আবার নূতন করে গড়া হচ্ছে। বুদ্ধ-জয়ন্তীর পর রাজগীরের রূপ ফিরে গেছে। পীচের রাস্তা, বিজলী বাতি, নূতন নূতন বাড়ী সব মাথা তুলেছে সরকার বাহাদুরের অর্থানুকূল্যে। তীর্থকামী পর্য্যটক ও স্বাস্থ্যান্বেষীরা বাসা বেঁধেছে এখানে। এখানকার উষ্ণ-প্রস্রবনের জল অজীর্ণ, বাত, পক্ষাঘাত-গ্রস্তদের পক্ষে মৃতসঞ্জীবনী তুল্য। এখানের পাহাড়ে মৃতসঞ্জীবনী-গুল্ম পাওয়া যায় প্রচুর আর তার থেকে রোগহর ঔষধ তৈরি হয়। চলেছি বেণুবনে। বেণুবনের মধ্যস্থলের ব্যাপীতীরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

দেখলাম বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির নবরূপায়ণ। মূর্ত্তিটি নূতন ফলকে সংবদ্ধ হয়েছে জয়ন্তী উৎসবের সময়। অন্তঃকর্ণে যেন শুনতে পেলাম তথাগতের অমৃতবাণী :

অক্কোচ্ছি মং, অবধি মং, অজিনি মং, অহাসি মে,
যে চ তং উপনয্হন্তি বেরং তেসং ন সম্মতি।
অক্কোচ্ছি মং, অবধি মং, অজিনি মং, অহাসি মে,
যে চ তং নূপনয্হন্তি বেরং তে সূপসম্মতি।

হৃদয়ঙ্গম করলাম সাম্য-মৈত্রী নীতি, সহাবস্থানের প্রয়োজনীয়তা, পঞ্চশীলের গুরুত্ব, নিজেকে সুন্দর ও সুসংযত করার সুগত-মন্ত্র।

নূতন করে সাজান হয়েছে বেণুবন-চারকোণে বেণুপত্রগুলি ঝিরঝিরে বাতাসে দুলে উঠছে। কত না ফুলগাছ মুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে। ভুর্জ্জপত্র, কামিনী, জিনিয়া, খসখস, শিউলি, গাঁদা, বেলা, টগর, চাঁপা, চন্দ্রমল্লিকা, রজনীগন্ধার চারাগুলি বাড়ন্ত হয়ে উঠছে। কালে বেণুবন গন্ধমধুর হয়ে উঠবে।

একটি স্তূপের ধ্বংসাবশেষের আভাস পাওয়া যায় এখানকার এই বেণুবনে। হয়ত এইটিই প্রসিদ্ধ তপোদারাম মঠ ছিল। এখানেই বুদ্ধ তাঁর জ্ঞানের বাণীতে উজ্জীবিত করেছিলেন সুপ্ত মগধবাসীকে। কে জানে কত ইতিহাস চাপা পড়ে আছে এখানকার মাটির স্তরে স্তরে। বেণুবনের পাশেই বয়ে চলেছে ক্ষীণতোয়া সরস্বতী, আজ তার শুধু ধারাটুকুই বেঁচে আছে।

বেণুবন থেকে বেরিয়ে আমরা সোজা উত্তরে অগ্রসর হয়ে বড় রাস্তা ধরে আবার দক্ষিণে হেঁটে চললাম। পাহাড় ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হয়ে আসছে। সম্মুখে বৈভারগিরি, ঠিক তার উত্তরে বিপুলগিরি, দুটি পর্ব্বতের অবকাশে প্রবাহিতা ক্ষীণা সরস্বতী। বৈভার পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছলাম, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের পুল পার হলাম। সামনেই সরস্বতী কুণ্ড, সিঁড়ি দিয়ে উঠলে ডাইনে বেহ্মাকুণ্ড ও কাশীকুণ্ড, উপরদিকে বরাহমন্দির। এই মন্দিরটি সপ্তধারা কুণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব্বকোণে অবস্থিত।

সপ্তধারা কুণ্ডে থামলাম। স্নান করলাম এখানে। এই কুণ্ডে সাতজন মুনির নামে সাতটি ধারা আছে। দুটি ধারা বেগবতী। অপরগুলি হতে অপেক্ষাকৃত কম জল নির্গত হচ্ছে। স্নান করবার জন্য ধারাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে নলের মুখে গোমুখের মধ্যে এনে ফেলা হয়েছে। জল ঝরে পড়ছে চত্বরে, সেখান থেকে চৌবাচ্চার মত জায়গায়। আবার সেখান থেকে প্রায় দোতলা নীচে সেই জলই ঝরে পড়ছে অন্য সব নলের মুখে। নীচেও অনুরূপ চত্বর এবং চৌবাচ্চা। একসঙ্গে উপরে সাতজন এবং নীচে সাতজন অবলীলাক্রমে স্নান করতে পারে। তবে নীচে স্নান বড় একটা কেউ করে না। কাপড় কাচে নীচের জলে লোকে। নীচের জল অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণ। উপরের জল গায়ে পড়লে লাফিয়ে উঠতে হয় প্রথমটা। তার পর সেটা সহ্য হয়ে যায়। পরে বেশ আরাম বোধ হয়। পথের ক্লান্তি সমস্ত দূর হয়ে গেল আমাদের সপ্তধারার উষ্ণ সলিলে স্নান করে।

স্নান সারা হতেই প্রায় বেলা সাড়ে তিনটা অতিক্রান্ত হয়ে গেল। এবার পর্ব্বতারোহণ-পর্ব্ব। সপ্তধারার উত্তর-পশ্চিমে বৈভার গাত্রে অনন্ত ঋষিকুণ্ড। ঠিক তার পাশেই দক্ষিণাদেবী আর গণেশের মন্দির। অনন্ত ঋষিকুণ্ডের পশ্চিমে গঙ্গাযমুনা কুণ্ড। সপ্তধারার পশ্চিমে দত্তাত্রেয় শিবমন্দির। এর দক্ষিণে ব্যাসকুণ্ড, মতান্তরে বৌদ্ধযুগের তপোদারাম বিহার এখানেই অবস্থিত ছিল। সপ্তধারা কুণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিমে অমাবা রাজবাড়ী, এ রাজবংশের বংশধরেরা জরাসন্ধের বংশের সঙ্গে তাঁদের কি একটা যোগাযোগ আছে দাবী করেন। একটু উপরে উঠলে পাওয়া গেল প্রস্তরখণ্ড-গ্রথিত বিশাল স্তূপ, এটি জরাসন্ধকা বৈঠক নাম খ্যাত। বৌদ্ধ-গ্রন্থে একেই বলা হয়েছে পিপ্পলীভবন বা মন্ত্রণালয়। পাণ্ডা বললে জরাসন্ধ এখানে পাশা খেলতেন। পাশা খেলার ফাঁকে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণাও চলত এখানে, কিন্তু কি করে এতদূরে এসে পাশা খেলা বা মন্ত্রণা চলত ভেবে পেলাম না। পাঁচ পাহাড়ে ঘেরা ছিল জরাসন্ধের পুরী, তার পরিধি ছিল বিশাল। রাজবাটী ছিল এখান থেকে কমপক্ষে সাত মাইল দূরে। কাজেই এখানে এসে পাশা খেলা বা মন্ত্রণা করা কোনটাই জরাসন্ধের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। এটা নগর-প্রবেশ-পথের উত্তর তোরণ। কাজেই নগররক্ষীদের পর্য্যবেক্ষণ-কেন্দ্র এখানেই স্থাপিত ছিল এমন অনুমান করা অসঙ্গত নয়। এই বৈঠকের পাশ দিয়ে পথ চলে গেছে পাহাড়ের সানুদেশে। পর্ব্বতশীর্ষে কয়েকটি জৈনমন্দির আছে, এগুলি শান্তিনাথ, মহাবীর, আদিনাথ ও গোতমস্বামীর মন্দির, এ সব মন্দির আধুনিক কালের সংযোজন। অতি-প্রাচীনত্বের দাবী এরা কেউই করতে পারে না। গোতমস্বামীর দিগম্বর জৈনমন্দিরটি বৈভারের উচ্চতম স্থানে প্রতিষ্ঠিত। শীর্ষদেশের অপর একটি পুরাতন মন্দিরে একটি ভগ্ন, চৌচির শিবলিঙ্গ দৃষ্ট হ'ল। পাণ্ডা বললে, এইটিই জরাসন্ধ-পূজিত আদি শিবলিঙ্গ, মুসলমান অভিযানের সময় এটি হাতুড়ি পিটে ভাঙা হয়েছিল। কয়েকটি স্তূপেরও ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয় এখানে।

দাঁড়িয়ে আছি বৈভার-শীর্ষে। সরু যজ্ঞোপবীতের মত সরস্বতী নদী রাজগৃহকে বেষ্টন করে বয়ে গেছে। এর সঙ্গে স্থানে স্থানে মিশেছে গিরিদরি ধারা। চোখের সামনে দমকা হাওয়ায় অতীত ইতিহাসের ছিন্ন পৃষ্ঠা উল্টে যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছি গিরিব্রজপুর, রাজগৃহ, কুশাগারপুর, বসুমতী, মগধপুর—যুগে যুগে রাজগীরের নামের ও বিভবগরিমার পরিবর্ত্তনের ইতিবৃত্ত।

রামায়ণ বলেন, রাজা বসু নামে এক রাজা প্রতিষ্ঠা করেন গিরিব্রজ। মহাভারত বলেন, বসু নামে এক রাজা স্থাপন করেন এই নগর। বৃহদ্রথ তাঁর পুত্র। অপুত্রক ছিলেন তিনি। চণ্ডকৌশিক ঋষি রাজা বৃহদ্রথকে একটি আম্রফল দান করেন। তিনি তাঁর দুই মহিষীকে আম্রটি দ্বিধাবিভক্ত করে ভক্ষণ করার জন্য প্রদান করেন। সন্তানসম্ভবা হলেন উভয়ে। কিন্তু প্রসব করলেন সন্তান নয়, মাংসপিণ্ড দুটি। ক্ষোভে রাজা নিক্ষেপ

করলেন শিশু দুটিকে মহাশ্মশানে। সেখানে জরা নামে এক রাক্ষসী শিশু দুটিকে ভক্ষণ মানসে জোড়া দিতে গিয়ে এক পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটিত হতে দেখলে। দেখলে শিশু দুটি জোড়া দিতেই এক অনিন্দ্যসুন্দর শিশু সরল হাস্যে মহাশ্মশানকে মুখর করে দিলে। সেই শিশুই হ'ল জরাসন্ধ—মগধরাজ পরাক্রান্ত জরাসন্ধ। তাঁর বিংশ অক্ষৌহিনী কত রাজাকে শ্মশান করেছে। কত রাজাকে গিরিকারাগারে বন্দী করেছে। যাদবশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে জরাসন্ধের ভয়ে মথুরা হতে দ্বারকায় রাজধানী স্থানান্তরিত করতে হয়েছিল। শৈব জরাসন্ধের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ দেখেছিল সেদিনের আর্য্য ভারত। তারপর যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান, ভীমের হস্তে মল্লযুদ্ধে জরাসন্ধনিধন, জরাসন্ধ-পুত্র সহদেবের সিংহাসনারোহণ এবং যুধিষ্ঠিরের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার বা তাঁর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডব পক্ষে যোগদান—এ সব মহাভারতের কাহিনী। এখনও পাণ্ডারা দেখায় একটি পল্বল যেখানকার জলে শ্রীকৃষ্ণ ভীমকে জরাসন্ধের জন্মবৃত্তান্ত জানিয়ে দেন একটি তৃণের দ্বারা জলকে আবর্ত্তিত করে ছায়াছবির মাধ্যমে। ইঙ্গিত করেন, দুই পদ ধরে জরাসন্ধকে দ্বিধাবিভক্ত করতে। অন্যায় এবং মল্লযুদ্ধনীতিবিরুদ্ধ হলেও সেদিন জরাসন্ধনিধন তার দেহকে পায়ের দিক হতে দ্বিধাবিভক্ত করেই সম্ভব হয়েছিল।

জরাসন্ধ ছিলেন মহাভারতের প্রসিদ্ধ মল্লবীর, বৈভার পাহাড় থেকে কিছুদূরে জরাসন্ধকা আখাড়া বলে একটি ভগ্নশিলাস্তূপ দেখায় পাণ্ডারা। এটি নাকি জরাসন্ধের কুস্তীশিক্ষাগার ছিল। আজও এখানকার সাদা মাটি সারা অঙ্গে মাখে মল্লবীরেরা। পর্ব্বতে আরও কত চিহ্ন দেখায় পাণ্ডারা, বলে এখানে রণক্লান্ত জরাসন্ধ হাঁটু গেড়ে ছিলেন, আবার কোন চিহ্নকে বলে, ও হ'ল মগধরাজের রথচক্রের দাগ, কোন ভগ্ন শিলাস্তূপকে বলে, মগধরাজের কারাগার। হয়ত সবই উপকথা। বৈভারের দক্ষিণ গাত্রে সোনভাণ্ডার নামে একটি গুহা আছে। সাধারণের বিশ্বাস এটি জরাসন্ধের রত্নাগার ছিল। সোনভাণ্ডারের বহির্গাত্রস্থ উৎকীর্ণ শিলালিপি হতে জানা যায় যে মুনি বৈরদেব আনুমানিক চতুর্থ শতাব্দীতে এই গুহাতে অর্হৎমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

জরাসন্ধের বংশের রাজারা প্রায় এক হাজার বছর রাজত্ব করে ছিলেন। তাঁদের অনেকেই রাজচক্রবর্ত্তী হয়েছিলেন। রাজগৃহের মাটি বীর্য্যবতী। ক্ষাত্রতেজ এ মাটিতে এখনও লুকানো আছে। তাই বোধ হয় এ অঞ্চলের মাটি নিঃসৃত ঝরণাগুলির জল তপ্ত। উষ্ণ প্রস্রবণগুলি যেন সুপ্ত শক্তির প্রতীক। হয়ত এ অঞ্চলে সলফার আছে প্রচুর মাটির নীচে তাই জল এত উষ্ণ। অথবা এমনও হতে পারে, পাহাড়গুলির কোনটি হয়ত প্রচ্ছন্ন আগ্নেয়গিরি যার বহিঃপ্রকাশ নেই কোনকালেই অথচ অভ্যন্তরে প্রচণ্ড উত্তাপ সঞ্চিত। সেই উত্তাপে সলিল উষ্ণ হয়ে ধারামুখে নির্গত হচ্ছে।

জরাসন্ধের রাজবংশ বার্হদ্রথ বংশ নামে পরিচিত ছিল। শেষ নৃপতি পুরঞ্জয় গতাসু হলে, পুরাণের উপর ছেদ পড়ল। ইতিহাস মাথা তুলে দাঁড়াল এবার। শিশুনাগ বংশ মগধের সিংহাসন দখল করলে। মাঠে মাঠে পাহাড়ের সানুদেশে সে বংশের অতীত অভিজ্ঞান আজও উঁকি দিয়ে ধরা দিচ্ছে। খ্রীষ্ট জন্মের পাঁচশো বছর পূর্ব্বে রাজগৃহে বিম্বিসারের প্রাসাদে দীপশিখা উজ্জ্বল হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করলে। উপত্যকা থেকে গিরিশিখর, গিরিশিখর থেকে প্রস্তর—সুবিস্তৃত, সুসংস্কৃত উচ্চ-প্রাচীর-বেষ্টনে আবদ্ধ হয়ে গেল। রচিত হল নূতন দুর্গ। সে দুর্গ রচনা করে ছিলেন বিম্বিসার-পুত্র অজাতশত্রু। আজও বৈভার পাহাড়ে দাঁড়ালে অতীত প্রস্তর-প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষের ক্ষীণরেখা আগন্তুকের চোখেও ধরা পড়ে। আর অজাতশত্রুর তিন মাইল পরিধি বেষ্টিত গড়ও সরকার বাহাদুর প্রস্তর-আবেষ্টনে কায়েমী করে দিয়েছেন। গড়ের পাশেই অজাতশত্রুর স্তূপ। হয়ত এই স্তূপেই একদিন বুদ্ধসেবিকা দাসী শ্রীমতীর আরতির ক্ষীণ দীপশিখা কেঁপে কেঁপে নিভে গিয়েছিল নিষ্ঠুর খড়্গাঘাতে শুভ্র পাষাণফলককে রক্তরেখায় কলঙ্কিত করে শ্রীমতীর শেষ নিঃশ্বাস বহির্গত হবার সঙ্গে সঙ্গে। থেমে গিয়েছিল বুদ্ধ-বন্দনা, কিন্তু সে ক্ষণিক। অজাতশত্রু বৌদ্ধধর্ম্মের গতিরোধ করতে পারেন নি। সারা মগধ, শুধু মগধ কেন, তৎকালীন ভারতবর্ষ বৌদ্ধধর্ম্ম-প্লাবনে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। আজও অসংখ্য মঠ-বিহার-চৈত্যে, ফাহিয়ান আর হিউয়েন সাংয়ের বিবরণীতে সে কাহিনী বিবৃত হয়ে আছে। আজও দাঁড়িয়ে আছে বৈভার পাহাড়ের পাশে গৃধ্রকূট, আর তার সানুদেশে জীবকাম্রবন। প্রথম বৌদ্ধ-সঙ্গীতির স্মৃতি বহন করছে আজও বৈভারের সপ্তপর্ণী গুহাদ্বার। বুদ্ধের দেহাবসানের পর অজাতশত্রুই সপ্তপর্ণীর পার্শ্বে স্তূপ নির্ম্মাণ করান। বুদ্ধবিরহে ব্যথিত অজাতশত্রু রাজগৃহ ত্যাগ করে প্রথমে চম্পায় এবং অবশেষে পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। রাজবৈদ্য জীবকের পরামর্শে পিতৃহন্তা অজাতশত্রু সেদিন শান্তি পেয়েছিলেন, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি—মন্ত্র উচ্চারণ করে। রাজপরিত্যক্ত হলেও রাজানুগ্রহপুষ্ট রাজগৃহ ধর্ম্মচর্চ্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্ররূপে শাশ্বত হয়েছিল ইতিহাসের পৃষ্ঠায়।

প্রাচীন রাজগৃহ বৈভার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি ও চৈত্যক নামক পঞ্চপর্ব্বত বেষ্টিত ছিল। এখন পর্ব্বতগুলি ঠিকই আছে, ঘটেছে নামের পরিবর্ত্তন। পর্ব্বতগুলির আধুনিক নাম হ'ল, বৈভার, বিপুল, রত্ন, উদয় ও সোনাগিরি। পর্ব্বতগুলির চারিপাশে পরিখা ও প্রাচীর-চিহ্ন আজও পরিস্ফুট। এখন পর্ব্বতশিরে শোভা পাচ্ছে আধুনিক কালের জৈনমন্দির। পর্ব্বতশীর্ষে জৈন-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জৈনধর্ম্মের কেন্দ্র পাবাপুরী রাজগৃহ হতে বেশী দূরে নয়। সেখানে মহাবীর দেহত্যাগ করেন। সেখানের মঠ এবং জল-মন্দির দর্শনীয়। কবিবর নবীনচন্দ্র রৈবতক কাব্যে রাজগৃহের বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলেছেন—

অজাগর মত
ছুটিয়াছে তদুপরে দুর্গের প্রাচীর।
প্রাচীরে প্রহরিগণ, শত্রু অদর্শিত
কি সাধ্য মগধ-সীমা করিবে লঙ্ঘন ?

শ্রীকৃষ্ণ ভীমসেনকে জরাসন্ধবধের পূর্ব্বে মগধযাত্রার সময় সুরক্ষিত মগধপুরীর কথা জ্ঞাপন করছেন। কবির এ বর্ণনা আজও মিলে যায়। এখানের পাহাড়ে পাহাড়ে কুণ্ড। কোথাও শুষ্ক, কোথাও সজল। সর্ব্বত্রই উষ্ণ প্রস্রবণ। বৈশ্বানর এখানে মূর্ত্তিমান।

অজাতশত্রুর গড় পূর্ব্ব-পশ্চিমে তিন হতে চার মাইলব্যাপী ছিল বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন! গড় খনন করতে গিয়ে বেষ্টনী-মধ্যে অট্টালিকার ভিত্তি চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে। মাটির মূর্ত্তি, মাটির সীল, তাম্রমুদ্রা প্রভৃতিও পাওয়া গেছে ওখানে! গড়ের পশ্চিমপার্শ্বে সরস্বতী নদীর নিকট ভরতমুনি, বৈতরণী তীর্থ, বেণী-মাধব প্রভৃতির স্থান। অন্য তীর্থস্থানে যেমন, এখানেও তেমন—এ সবই পাণ্ডা মহাপ্রভুদের স্বকপোলকল্পিত জিনিষ! কেউই প্রাচীনত্বের দাবী করতে পারে না! সরস্বতীর অপর তীরে যে ঢিবি, সেটি হয়ত অশোক স্তূপ, কারণ খনন করতে গিয়ে ঐ ঢিবির মধ্য হতে মৌর্য্য যুগের ইষ্টকাদি, জৈনমূর্ত্তি প্রভৃতি পাওয়া গেছে! গড়ের পূর্ব্বদিকে একটি ঢিবির উপর বর্ম্মী সাধু উ-কোগুণ্য ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে এক নবীন বৌদ্ধমন্দির ও যাত্রিনিবাস নির্ম্মাণ করিয়েছেন। কেউ কেউ অনুমান করেন ঐ উঁচু জায়গাটিতে পুরাকালে একটি দুর্গ ছিল।

পরদিন প্রত্যূষে আমরা নগরের বহির্বেষ্টন-প্রাকার দেখতে গেলাম। বহিঃপ্রাকার বৈভার পর্ব্বতের জরাসন্ধ বৈঠক নামক প্রস্তর স্তূপের পাশ হতে আরম্ভ হয়ে বৈভারের উপর দিয়ে পশ্চিমাভিমুখে গিয়ে সমতলভূমিতে নেমে দক্ষিণ-মুখে সোনাগিরিতে উঠেছে। এইভাবে পাঁচটি পাহাড়কেই সংযুক্ত করেছে প্রাচীর। প্রাগৈতিহাসিক এই প্রাচীর। কোন যুগে এর প্রথম আরম্ভ তা ঠিক জানা যায় না। অনুমান জরাসন্ধের সময়েই এর সৃষ্টি। পরবর্ত্তী কালে বহুবার এই প্রাচীরের সংস্কার হয়েছে নূতন নূতন বংশের প্রতিষ্ঠার সময় কিংবা নূতন রাজার অভিষেকের সময়। জয়নগরের আন্তঃপ্রাচীর বহুস্থানে বিধ্বস্ত। সরস্বতীর স্রোতাবেগে এর উত্তরাংশ ভেঙে গেছে মনে হয়। দক্ষিণ প্রাচীরেরঅবস্থা কিছু ভাল, এ প্রাচীরটি ৩০ হতে ৪০ ফুট উঁচু হবে। মার্শাল সাহেব অনুমান করেছেন অন্তর্দ্বারের প্রায় ৮০ গজ উত্তরে নগরের বহির্দ্বার অবস্থিত ছিল। ঐ আনুমানিক বহির্দ্বারের পাশে একটি দুর্গের অবস্থানের চিহ্নও পাওয়া গেছে।

রাজগৃহের মধ্যস্থলে মণিয়ার মঠ। এখানে ব্লক সাহেব খনন-কার্য্য পরিচালন কালে ধ্বংসস্তূপের নীচে এক বিরাট গাঁথনি আবিষ্কার করেন। এর পাদদেশ চূণ-বালির আস্তরে নির্ম্মিত বহু মূর্ত্তি দ্বারা শোভিত ছিল। মূর্ত্তিগুলি গণেশ, মণিনাগ, শিবলিঙ্গ, বাণাসুর প্রভৃতির। একটি নাগমূর্ত্তি সহ শিলালেখ পাওয়া গেছে

রাজগির কুণ্ড

এখানে। শালিভদ্রের চরণচিহ্নাঙ্কিত প্রস্তর-ফলক পাওয়া গেছে এখানে। পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীর ভাস্কর্য্যসুষমার অনেক নিদর্শন এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর মথুরাধর্ম্মী নাগমূর্ত্তিও পাওয়া গেছে এখানকার মণিনাগ নামোৎকীর্ণ শিলালিপিতে। মহাভারতের মণিনাগের নিবাসের উল্লেখ আছে রাজগৃহে। জৈনগ্রন্থে নাগশালিভদ্রের বাসস্থানের উল্লেখপ্রসঙ্গে এই রাজগৃহেরই নাম করা হয়েছে। রাজগৃহে পূর্ব্বে ব্যাপকভাবে নাগপূজা প্রচলিত ছিল। অসংখ্য মৃৎপাত্রে নাগফণার চিহ্ন পাওয়া গেছে এখানে। এখনও রাজগীর নাগদের প্রিয় বাসস্থান। নাগ-ভয়ে আগন্তুকদের ডি-ডি-টি বা কার্ব্বলিক অ্যাসিড আনতে হয়। বিশেষ করে যাঁরা পাহাড়-ঘেষা বাড়ীতে বাসা বাঁধবেন তাঁদের ঐ দুটো জিনিষের যে কোন একটা অপরিহার্য্য। মুসৌরী-নৈনিতালে ঘরে মেঘ ঢোকা; রাজগৃহের ভাড়াটে বাড়ীগুলিতে সাপ ঢোকা নৈমিত্তিক ঘটনা।

আরোহণ করলাম বিপুলগিরিতে। বৈভারের পূর্ব্বদিকে এই পর্ব্বত। এর পাদদেশে রামকুণ্ড, গণেশকুণ্ড, সোমকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড ও সীতাকুণ্ড। পর্ব্বতের চূড়ায় এক জঙ্গলাকীর্ণ স্তূপ আর প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা গেল।

বিপুল পর্ব্বতের দক্ষিণভাগে রত্নগিরি। এই রত্নগিরিই হয়ত বৌদ্ধগ্রন্থোক্ত পাণ্ডব-শৈল। রত্নগিরির দক্ষিণে গৃধ্রকূট। এটি রত্নগিরির সংলগ্ন। এই গৃধ্রকূটে বুদ্ধকে বধ করার জন্য দেবদত্ত এক বিশাল প্রস্তর নিক্ষেপ করেছিলেন। কোথায় হারিয়ে গেছে সেদিনের সেই নিষ্ঠুর পাথর। তবুও পাণ্ডারা একটি পাথর দেখিয়ে কিছু রূপকথা শুনিয়ে দু' পয়সা দাবী করে। ঐ ওদের জীবিকা। এখানেও পর্ব্বতশীর্ষে আছে বনাকীর্ণ এক পুরাতন স্তূপ। সন্নিকটে আছে কয়েকটি গুহা। একটির নাম আনন্দগুহা।

রাজগৃহপর্ব্বতমালার দক্ষিণাংশে উদয়গিরি আর সোনাগিরি: উদয়গিরির উপরে পারশনাথ ও শান্তিনাথ মন্দির। এই পর্ব্বতে প্রাচীন রাজগৃহের বহিঃপ্রাকার প্রায় অক্ষত অবস্থাতে দেখতে পাওয়া গেল। সোনাগিরিতে আছে ভগ্নস্তূপ আর জঙ্গল। উদয়গিরির পাদদেশে আছে বাণগঙ্গা শিলালেখ। কেউ কেউ এই শিলালেখ-

নব বেণুবনে বুদ্ধের স্মৃতি

গুলিকে মহাভারতের যুগের মনে করেন। আজ পর্য্যন্ত এগুলির পাঠোদ্ধার হয় নি।

আবার ঘুরে ঘুরে সেই সপ্তকুণ্ড। যেখান থেকে যাত্রা সুরু হয়েছিল সেখানেই ঘটবে সমাপ্তি। এবার পঞ্চপাহাড়কে প্রণাম জানিয়ে বিদায় নেব। আবার সেই ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সেতু অতিক্রম করলাম। বসে আছে কয়েকজন লোক সেতুর উপরে। দূরের ভগ্নমিটারি দেখিয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করলাম—ও কেয়া হায়, ভেইয়া। একজন উত্তর দিলে, আংরেজকা কোঠি হজুর। স্তম্ভিত হলাম কথাগুলো শুনে। এখনও সরকার বলতে ওরা 'আংরেজ' বোঝে। হায়! রাজগৃহ যেখানে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালা হয়েছিল সেখানে আজ ঘন-তমসা।

বাসায় ফেরার পথে মেলা ঘুরে একনজর দেখে নিলাম গরুর গাড়ীতে গাড়ীতে স্থানটি ভর্ত্তি। বসেছে চায়ের দোকান নাপিত দাড়ি কামাচ্ছে, নীল লাল রঙ-করা সরবৎ গ্লাসে গ্লাসে ভর্ত্তি হয়ে ক্রেতার অপেক্ষা করছে। ছোট ছোট খাবারের দোকান। বেশী ভিড় জমেছে কাচের বেলোয়ারী চুড়ি-বিক্রেতাদের সামনে ক্রেতা মেয়েরা। আর এ মেলাতে মেয়েদের সংখ্যাই বেশী তাদের হাতে উল্কি, চোখে মায়া-কাজল। গোলাপী আর হলুদ রঙটারই প্রচলন এ অঞ্চলে বেশী। প্রায় সব মেয়েই হলদে বা গোলাপী রঙের শাড়ী পরেছে। বুড়ীরাও এখানে রঙীন শাড়ী পরে। পুরুষরাও রঙের পক্ষপাতী। তাদের হাতে ছোট ছোট লাঠি। কেনা-কাটার মধ্যে মেয়েরা চুড়ী, চুল-বাঁধা ফিতে, চিরুণী, টাসেল, কপালের টিপ, পেতলের নাকছাবি—এই সবই কিনছে বেশী। রাস্তায় গোল হয়ে বসে কাতারে কাতারে গল্প করছে। মেলাটা উপলক্ষ্য, পরস্পরের মনের কথা বলাটাই লক্ষ্য। মসফালি আর পাকৌড়ি খাচ্ছে কেউ। কেউ তেলমাখানো আগুনে পোড়া ভুট্টা কামড়াচ্ছে পরমানন্দে। খাদ্যদ্রব্য যদি পড়ে গেল পথের ধুলোয় অমনি খপ করে সেটা কুড়িয়ে অবলীলাক্রমে মুখে ফেলে দিলে। পথের ধুলোয় যে রোগের জীবাণু থাকতে পারে এবং তা পেটে গেলে রোগ হওয়া স্বাভাবিক—এ ধারণা এদের নেই। আবার মনে হ'ল, হায় রাজগৃহ! তুমি আজ তমসাচ্ছন্ন, অজ্ঞতার কুক্ষিগত। বোধির আলোক কবে মিলিয়ে গেছে তোমার জীবন থেকে।

* আলোকচিত্রী—শ্রীঅমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়।

অসামান্য

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

কিছুই যায় না ফেলা—এ-জীবন অসামান্য তাই।
দুঃখ এরে স্নিগ্ধ করে, সুখ তার সমস্ত সত্তার
দাক্ষিণ্যে অঢেল শান্তি ঢেলে দেয়। অফুরন্ত আর
তৃষ্ণা আনে, তৃপ্তি তা-ও। দুইরূপ দ্বিপ্রকাশ। তবু
দুঃখ-দাহ দুর্ব্বিসহ। স্নায়ুভরে যে-আঘাত পাই
তার তীব্র প্রচণ্ডতা—অনুভূতি নির্ম্মম কঠিন
সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত রাখে। এ-দুঃখরজনী তাই কভু
প্রলম্বিত মনে হয় চন্দ্রমা, নক্ষত্র অবলীন।

তবু যায় দুঃখরাত্রি। তার ভীম তাণ্ডব নর্ত্তন
দুঃসহ যন্ত্রনা জ্বালা, জ্বর। সুখ নম্র পদভরে
রাত্রির বিভ্রান্তি শেষে নামে।—রৌদ্র-সুধারস। ঝরে
স্বর্গের স্খলিত ধারা—আশীর্ব্বাদ যেন। ব্যাপ্ত হ্লাদ
শর্ব্বরী-অনলে দহে' পরিশুদ্ধ তৃপ্ত করে মন।
সুখ-দুঃখ—দিবারাত্রি দু-ই দামী, চাই সে আস্বাদ।

ওড়িষ্যার গ্রামে পথে

শ্রীমহীতোষ বিশ্বাস

(২)

পাহাড়ের পাদদেশে রয়েছে এই শিলালিপি। কিন্তু এ লিপি পড়বার ভাষা আমাদের জানা নেই। ব্রাহ্মী অক্ষরে এ লেখা। অবশ্য ইংরেজী-বাংলায় এর অনুবাদ আছে দু'একটি বইতে। একখানি বড় পাথরের উপর লেখা। পাথরের মাথায় এক হস্তী-মূর্ত্তি। হস্তীর শুঁড় ভেঙে গিয়েছে, কিন্তু আর সব এখনও ঠিক আছে। এ জায়গা উঁচু। চারদিকে তাকালে বিস্তৃত মাঠের অনেকদূর পর্য্যন্ত বেশ নজরে পড়ে।

রাজারাণী মন্দিরে আমরা কয়েকজন

সরকার থেকে শিলালিপির উপর একটা পাকা ছাদ করে দেওয়া হয়েছে যাতে রৌদ্র-জলে লিপির কোন অংশ নষ্ট না হয়। আমাদের সঙ্গে নিত্যানন্দবাবু ও অজিতবাবু রয়েছেন। নির্ম্মলবাবু তাঁদের জানালেন যে, শীঘ্রই ওড়িষ্যায় প্রদর্শনী হবে, তাতে এই শিলালিপির ফটোগ্রাফ ও লিপির ইংরেজী অনুবাদ লিখে দেখাবার জন্য। এই শিলালিপির ইতিবৃত্ত তিনি কিছু বললেন। সম্রাট অশোকের কলিঙ্গজয়ের কথা আমরা জানি। অশোকের মনে যুদ্ধের ভয়াবহ দৃশ্য, মৃত্যুলীলা দেখে অনুতাপ এসেছিল, সেই কারণে তিনি যুদ্ধ, হত্যা বন্ধ করে দেন তাঁর রাজ্যে। তাঁর ধর্ম্ম-নীতি হয় জীবের প্রতি ভালবাসা। তিনি এখানে এই শিলা-লিপিতে লিখে তাঁর শাসনকর্ত্তার প্রতি নির্দ্দেশ দেন যে, তিনি তাঁর সকল প্রজাদের পুত্রবৎ স্নেহ করবেন। সকলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হবে। জীব-হিংসা থাকবে না। তা ছাড়া পিতামাতার প্রতি ভক্তি এবং আরও অনেক নীতিবাক্য এখানে লেখা হয়েছে। সে আজ হতে বহু শতাব্দী পূর্ব্বে। কিন্তু আজও তাঁর সেই নিদর্শন রয়েছে এই নির্জ্জন পাহাড়ের পাদদেশে। হয়তো একদিন এই স্থান সমৃদ্ধিশালী এক গ্রাম ছিল কিন্তু আজ শুধু ধূ ধূ মাঠ, লোকালয়ের চিহ্ন নেই।

দেখতে দেখতে সূর্য্য ডুবে গেল। সন্ধ্যা নেমে এল। যদিও জ্যোৎস্না রাত, তবুও যে পথে আমরা এসেছি সে পথে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। নির্দ্দিষ্ট পথ বার করতে হবে। ভাগ্যক্রমে একজন গ্রামবাসীর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হতে নির্ম্মলবাবু ওড়িয়া ভাষায় আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে বললেন, অবশ্য বক্‌শিস দিতে তিনি কার্পণ্য করলেন না।

গ্রামশিল্পী—কাঁসার বাসন তৈরী করছে

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক চলার পর আমরা আবার সেই পাকা রাস্তায় এসে পৌঁছলাম। গ্রামের লোকটি রাস্তার ওপারে আবার মেঠো রাস্তায় চলে গেল। কিন্তু আমরা যে জায়গায় এসে পৌঁছলাম এখান থেকে আমাদের বাস প্রায় এক মাইল দূরে দাঁড়িয়ে আছে শুনলাম। সুতরাং নির্ম্মলবাবু দু'জনকে পাঠালেন বাস এখানে নিয়ে আসতে।

এখানে নিকটে রয়েছে একটি নদীর পুল। একটু এগিয়ে গিয়ে পুলের উপর আমরা বসলাম। জ্যোৎস্নার আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সে আলোতে দেখা যাচ্ছে নদীর জল, সামনে-পিছনে এপাশে-ওপাশে বিস্তৃত অসমতল মেঠো জমি, নির্জ্জন-নিস্তব্ধ। মানুষের সাড়াশব্দ নেই। এমনকি সহসা একখানা গাড়ীও যেতে দেখলাম না। নির্ম্মলবাবু আর আমি পুলের এক কোণে বসে। নানা কথার ভিড় আসছে মনে। অশোকের কলিঙ্গজয়ের কথা, উড়িষ্যার ভাস্কর্য্য, গ্রামের কথা, এখানকার

সমাজজীবন। শেষে বিদেশী পর্য্যটকদের, বিশেষ করে আমেরিকানদের সম্বন্ধে বললেন। ওদেশের লোকের জানবার, দেখবার আগ্রহ কত বেশী। তিনি যে কয়জন আমেরিকানকে সঙ্গে করে এনেছেন তাঁদের জ্ঞান অর্জ্জনের ইচ্ছা এবং এদেশের শিল্পকলা বিষয়ে জানবার আগ্রহ দেখে বিস্মিত হয়েছেন, আনন্দও পেয়েছেন। তারপর দুঃখের সঙ্গে বললেন, আলোর নীচেই যেমন অন্ধকার তেমনি

রাজারাণী মন্দির

আমরা এদেশের অধিবাসী হয়েও আমাদের তেমন যেন এই সব শিল্পসম্পদের প্রতি সন্ধানী দৃষ্টি নেই। এ সম্বন্ধে কোন কৌতূহলও আমাদের মনে যেন জাগে না। এমনকি আমাদের দেশের অনেক ছাত্রেরও তেমন কোন জানবার-বোঝবার আগ্রহ দেখা যায় না। এই ভুবনেশ্বরে যাঁরা তীর্থদর্শন-হিসাবে আসেন তাঁদের শুধু মন্দিরের বিগ্রহ-দর্শনেই তীর্থদর্শন শেষ হয়। আর যুবকেরা যাঁরা আসেন তাঁরাও ঐ পুরীর সমুদ্র-দর্শন আর এখানে একটু ওখানে একটু দেখে চলে যান। ভারতের অপূর্ব্ব এসব শিল্পসম্পদ। ঐতিহাসিক স্থানগুলি কিংবা গ্রাম সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা তাঁরা অর্জ্জন করে যেতে পারেন না। এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে নির্ম্মলবাবু যেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। দেশকে যাঁরা সত্যই ভালবাসেন তাঁরা ব্যথা পান যদি না দেশের মানুষ আপন সম্পদ চিনতে না শেখে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ একদিন অবনীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, দেশের আপন শিল্পকলার জীবন ফিরিয়ে আনতে। শোনা যায় স্বামী বিবেকানন্দের চোখ দিয়ে দরদর ধারে জল গড়িয়ে পড়ত, শুধু ঈশ্বরের প্রতি প্রেম-ভক্তির জন্য নয়, সেদিনের এই পরাধীন ভারতীয় জাতির কথা চিন্তা করে আর স্বাধীন পাশ্চাত্ত্য জাতির ঐশ্বর্য্যের কথা চিন্তা করে এবং আর সে জাতির আত্মবিশ্বাস এবং দেশাত্মবোধ দেখে। তখনকার দিনে ভারতের স্বাধীনতা ত স্বপ্ন। স্বামীজী সন্ন্যাসী হলেও ভারতের কথা তিনি ভুলতে পারতেন না, স্বাধীনতার স্বপ্ন তিনিও দেখতেন।

বসে বসে এই সব কথা চিন্তা, আর সেই দিগন্তবিস্তৃত মাঠের মধ্যে আঁলো-আঁধারের খেলাও উপভোগ করছিলাম মনে-প্রাণে। এমন নিসর্গ দৃশ্য যেন মনকে কোথায় কোন্ স্বপ্নরাজ্যে নিয়ে যায় যেখানে—আত্মবিস্মৃতি এনে দেয়—আপনাকে যেন হারিয়ে ফেলতে হয়।

আজ ১লা বৈশাখ ১৩৬৪ সাল। আর একটি বছর পিছনে ফেলে আজ প্রত্যুষে ঘুম ভাঙল। কোনারকের সূর্য্যমন্দির দেখে ফিরতি-পথে পুরী যাবার ব্যবস্থা হয়েছে। সকাল ৬টার মধ্যেই বাস এসে গেল আমাদের হোষ্টেলের ফটকে। কোনারকের পথে দেখা গেল মাঝে মাঝে নদীর সেতু ও কোন কোন জায়গায় রাস্তাও মেরামত হচ্ছে, সে কারণে বাস চলতে লাগল নির্দ্দিষ্ট পথ ছেড়ে কখন কখন মেঠো পথে। বাসের ঝাকানি খেতে খেতে শরীরের যেন হাড়গোড় ভাঙা অবস্থা। পরে পিপলি গ্রামে বাস এসে দাঁড়াল। এ জায়গাটাকে একটা জংশন বলা চলে। একদিকে গিয়েছে পুরীর রাস্তা, একদিকে ভুবনেশ্বর, একদিকে কোনারক। তেমাথায় এসে বাস দাঁড়াল। এখানে পথের ধারে মাটির ঘরে দোকান-পসার। খাবারের দোকান থেকে সব রকমের প্রয়োজনীয় জিনিষের দোকানই রয়েছে। এখানে একজন শিল্পী তাঁর দোকানে বসে নানারকম রংয়ের কাপড়ের টুক্‌রো কেটে সেলাই করে বেশ রঙিন ছবির মত তৈরী করছেন দেখা গেল, আমাদের মধ্যে মীরাদি দুখানা কিনলেন।

নির্ম্মলবাবু বাসের মধ্যে জানালেন, এক শ্রেণীর লোক দেখাব, তাদের বাসস্থান দেখে বলতে হবে তারা কতদিন সেখানে বাস করছে। তাঁর কথামত পথের ধারে এক জায়গায় বাস এসে দাঁড়াল। একদিকে শুকনা খটখটে উঁচু নীচু বিস্তৃত জমি যেন দিগন্ত ছুঁয়ে আছে। অন্যদিকে কিছু গাছপালা, শুক্‌নো নদীর খাদ। এক বিরাট অশ্বত্থগাছ পথের ধারে তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে সেখানটা কিছু ছায়াশীতল করে রেখেছে।

বাস থেকে নেমে আমরা সেই ধূলোবালি দিয়ে এগিয়ে গিয়ে কয়েকখানা কুঁড়ের সামনে এসে দাঁড়ালাম। এগুলি এক রকমের কুঁড়ে ঘর যার দেওয়াল নেই, আগাগোড়া গোল করে তালপাতা দিয়ে ছাওয়া। অদ্ভুত ধরনের, দু'জন মানুষ হয়ত এর মধ্যে বাস করতে পারে। কিন্তু মাথা উঁচু করে এর ভেতর দাঁড়াতে পারে না। নীচু হয়ে ঢুকতে হয়, আবার বেরুতে হয় তেমনি করে।

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত সকল সময়েই এ জাতটি এই ঘরে বাস করে। এরা তেলেগু জাতি। ব্যবসা—শূকর পালন ও বিক্রয়। আমরা যেতেই দু'-একজন স্ত্রীলোক বেরিয়ে এল। কৌতূহলবশতঃ তাদের ছেলেমেয়েরাও আমাদের দিকে হাঁ করে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। চারিদিকে বিশ্রী একটা দুর্গন্ধ, নিঃশ্বাস যেন আটকে আসে। জানা গেল এরা এখানে এইভাবে প্রায় চল্লিশ বছর বাস করছে।

বেলা ক্রমশ বেড়ে চলেছে, রৌদ্রের ঝাঁঝও বাড়ছে। আরও অনেক গ্রাম চলে গেল। গ্রামের মধ্যে দিয়ে যখন বাস চলছিল তখন দেখা যাচ্ছিল দু'ধারেই বাড়ী, সবই মাটির বাড়ী, অনেক

বাড়ীর দরজার দু'পাশে নানা রংয়ের আল্পনা, ছবি আঁকা। এগুলি গ্রাম-শিল্পীর আঁকা, বেশীর ভাগ বাড়ীর মেয়েদের হাতের কাজ। নানা রংয়ে লতা-পাতা মানুষ, পাখী-পক্ষীর ছবি সুন্দর একটা গ্রাম্য পদ্ধতিতে ফুটে উঠেছে। ওড়িষ্যার বহু গ্রামে এই রকম চিত্র রচনার সূক্ষ্ম রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

বেলা প্রায় এগারটার সময় আমরা কোনারক মন্দিরের কাছে ডাকবাংলার ধারে এসে পৌঁছলাম। ডানদিকে তাকিয়ে দেখি অদূরে কালোপাথরের সেই পরিচিত মন্দির, যার রূপ শুধু ছবিতে এতদিন দেখেছি। এখানে আর এক ধরনের নির্জ্জনতা আছে আবার কিছু দূরে ঝাউগাছের মাথা দুলছে বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দে। কিন্তু বেশী দূরে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় গাছ নেই, শুধু ধু ধু করছে উঁচু নীচু বালুচর, সমুদ্রের নিশানা পাওয়া যায়। পরে শুনলাম এখান থেকে সমুদ্র মাত্র দেড় মাইল দূরে। অসম্ভব বালি, রোদে গরম হয়েছে তেমনি, তাড়াতাড়ি চলার উপায় নেই, বালিতে পা বসে যায়, তাই ধীরে ধীরে গরম বালির উপর দিয়ে আমরা মন্দিরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

মন্দিরের কাছে গিয়ে যেন কথা সরে না, শুধু চেয়ে থাকি ক্ষণিক বিস্ময়ে! কি অপূর্ব্ব—কি সুন্দর! প্রথমেই দৃষ্টি পড়ল দু'টি পাথরের হাতীর দিকে আর মন্দিরের নীচের অংশে সেই পরিচিত চাকা। পাথরের প্রাচীর চারপাশে। প্রাচীর আরও উঁচু ছিল কিনা বোঝা যায় না। কিন্তু চওড়ায় প্রায় ৬ ফুট হবে। দু'জন লোক পাশাপাশি বেশ চলতে পারে। কোন দিক দিয়ে মন্দির-প্রাঙ্গণে আসবার দরজা ছিল এখন তা ঠিক বোঝা যায় না, একদিকের প্রাচীরের পাথর সরিয়ে এখন মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করা হয়। মন্দির-প্রাঙ্গণে এখন চারপাশের জমি থেকে অনেক নীচে। বালি পড়ে হয়ত ঐ জমি উঁচু হয়েছে। মন্দির-প্রাঙ্গণেও কেবল বালি, কোথাও মাটি দেখা যায় না। বালি খুঁড়ে নূতন একটি ছোট মন্দির আবিষ্কার করা হয়েছে, তা ছাড়া সূর্য্যমন্দিরের নীচের অংশ এক স্থানে খুঁড়ে ভিত কতটা আছে তা দেখার ব্যবস্থা হচ্ছে দেখা গেল।

সূর্য্যমন্দিরের নীচের অংশে যে চাকা আছে তা গুণে দেখা গেল মোট বারো জোড়া। কোনারকের এই রথচক্র শিল্প রসিকদের কাছে আজ বিশেষ পরিচিত। অপূর্ব্ব এর কারুকার্য্য। মন্দিরের নীচের অংশে যে মূর্ত্তিগুলি আছে তার বিষয়বস্তু, রচনাভঙ্গি বড় অশ্লীল। এ সম্বন্ধে অনেক মতামত আছে। মন্দির দেখতে দেখতে এক ভদ্রলোক এর কারণ আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, আমার মনেও নানা প্রশ্ন আসে। এগুলি কি সাধারণ অশিক্ষিত শিল্পীদের খেয়ালের নমুনা? কিন্তু একটু চিন্তা করলে দেখা যায় তা নয়, কারণ এই মন্দিরের ভাস্কর্য্য-রচনায় শিল্পীদের হাত থাকলেও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন দেশের রাজা-মহারাজা এবং পণ্ডিতমণ্ডলী। কাজেই শিল্পীর খেয়াল-খুসী মত এগুলি রচনা হয় নি, তা বোঝা যায়। সাধারণ ভাবে যা মনে আসে, তা হচ্ছে সাধনক্ষেত্রের কথা। মানুষের মধ্যে যে পশুবৃত্তি রয়েছে তাকে পদদলিত বা দমন করে সংযমের দ্বারা সাধনক্ষেত্রে উচ্চ চিন্তাধারার জন্ম মনের ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করতে হয়। প্রকৃত সাধনার এই পথ।

একটি গ্রামের ঘর-বাড়ী

সুতরাং সাধারণ মানুষের মন এইসব মূর্ত্তির সম্মুখে বিচলিত হতে পারে কিন্তু সাধকের মন যদি হয় তবে তা সাধনার পথ থেকে নেমে আসবে পতনের পথে। সাধন-ভজন-ক্ষেত্রে একটা পরীক্ষার জন্যই হয়তো এই সব মূর্ত্তিনির্ম্মাণ প্রয়োজন হয়েছে।

অন্যান্য মূর্ত্তির মধ্যে সূর্য্যমূর্ত্তি অপূর্ব্ব। বিশেষ করে বিরাটত্বের দিক থেকে এই মূর্ত্তি অভিনবত্ব, শিল্পীর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। সাত ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন সূর্য্যদেব, মনোমুগ্ধকর ভাব, কি তার অলঙ্করণ, কি ছন্দ! কোমরে যে "কোমরবন্ধের" অলঙ্করণ করা হয়েছে তারই বা কি অপূর্ব্ব কারুকার্য্য, দেখে যেন আর আশা মেটে না। বিভিন্ন ধরনের মূর্ত্তির মধ্যে নানা বিষয়বস্তু, নানা ভঙ্গি রয়েছে। হাতীর মূর্ত্তি তো ছড়াছড়ি। নীচের অংশে ১৫৯৭টি হাতীর মূর্ত্তি খোদাই করা হয়েছে। অন্যান্য মূর্ত্তির মধ্যে নারী-মূর্ত্তি বেশী। তবে পুরুষ মূর্ত্তি বা পশুপক্ষীর মূর্ত্তিও বহু আছে। মন্দিরের উপরে উঠবার সিঁড়ি আছে, তবে তা খোলা। পাথর বসিয়ে সিঁড়ি করা হয়েছে তবে এখন অনেক জায়গায় তা ভেঙে গিয়েছে। মন্দিরের উপরে উঠলে মনে হয় দুরন্ত ঝড়ো বাতাস এই বুঝি ফেলে দিল। মন্দিরের উপরের দিকে অতি সূক্ষ্ম শিল্পকাজ আছে, মূর্ত্তিগুলিও খুব বড় আকারের। এই সব রচনা নারী-মূর্ত্তির, বিভিন্ন ভঙ্গিমায় কেউ নৃত্য করছে কেউ বাদ্য বাজাচ্ছে। নীচে এক জায়গায় দেখলাম একটি মাতৃমূর্ত্তি। সাধারণ মাতৃমূর্ত্তিতে একটি শিশু দেখা যায় কিন্তু এ মূর্ত্তিতে রয়েছে দুটি শিশু। একটি মায়ের কোলে বসে অপরটি মায়ের হাত ধরে। অপূর্ব্ব এর রচনাভঙ্গী, মূর্ত্তিটি ছোট এবং অনেক জায়গায় ক্ষয়ে তার কারুকার্য্য অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। এই সব শিল্পকার্য্যের উল্লেখযোগ্য কথা হ'ল "কম্পোজিশন ও অলঙ্করণ"। ভারতীয় শিল্পের অবশ্য এই দিকটাই বিশেষত্ব, যা আর কোন দেশের শিল্পরচনার মধ্যে দেখা যায় না।

এক জায়গায় এসে নির্ম্মলবাবু একটি রচনার দিকে আমার দৃষ্টি

আকর্ষণ করলেন। রচনাটি "প্যানেল" ধরনের লম্বালম্বি ভাবে রয়েছে। খুব ছোট ছোট মূর্ত্তি। শূকর, হরিণ, গাছ, লতাপাতার নক্সা। বললেন, এটির একটি ছবি করে নন্দবাবু আমাকে দিয়েছেন। আমাকেও বললেন, এর একটা স্কেচ করে নিতে। বসে বসে একটা স্কেচ করে নিলাম। আর একটি রচনার প্রতি দৃষ্টি পড়ল, নিতান্ত সাধারণ পল্লীসমাজের চিত্র, যাকে বলা যায় ঘর-কন্নার ছবি। নির্ম্মলবাবু একটু মজা করে সঙ্গের ছাত্রীদের বললেন, "দেখ, ওর থেকে বেশ বোঝা যায় তখনকার দিনেও মেয়েরাই রান্না-বান্না করত"। মেয়েরা শুনে হেসে উঠল।

আর এক ধরনের রচনা রয়েছে, এগুলি থেকে বোঝা যায় রাজা বা নবাব-বাদশাহদের ভেট বা উপহার দেওয়া হচ্ছে। এমন মূর্ত্তি রয়েছে যার মধ্যে জিরাফ প্রদান করা হচ্ছে। প্রকৃতির কাছ থেকে এবং বাস্তব জীবনধারা থেকে শিল্পিগণ যে ভাস্কর্য্যের বিষয়বস্তু গ্রহণ করেছিলেন তা আজও স্পষ্ট বোঝা যায়। কতদিনে এইরূপ একটি মন্দির নির্ম্মাণ শেষ হতে পারে তা নির্ম্মলবাবুকে জিজ্ঞাসা করলে বললেন, "যতদূর জানা যায় তাতে মনে হয় প্রতিদিন এক-জন শিল্পী মাত্র দু' ইঞ্চি করে কাজ করতে পেরেছে।" শুনে বিস্ময় প্রকাশ ছাড়া আর কি বলার থাকে!

মন্দির দেখার পর বালির উপর বসে স্কেচ করছি, দারুণ রোদে কণ্ঠতালু যেন শুকিয়ে আসছে। এখানে জল পাওয়া যায় কোথায় বুঝতে পারলাম না, তবে ডাব প্রচুর, সস্তাও বটে। দুটো ডাবের জল খেয়ে শরীরের ক্লান্তি গেল অনেকটা।

নির্ম্মলবাবুর* কাছে শুনলাম এ জায়গা ছিল মানুষের একরকম অগম্য। এক সন্ন্যাসী এখানে বাস করতেন এখানকার বিরাট বটবৃক্ষ তলে। এ গাছ এখনও এখানে রয়েছে। এই সন্ন্যাসীর আশ্রয়ে থেকে তিনি দিনের পর দিন এই মন্দিরের নানা তথ্য সংগ্রহ করেছেন। পরে তা সাধারণের কাছে প্রচারের চেষ্টা করেছেন। এখন অবশ্য এই কোনারকের সূর্য্যমন্দির দেখার কোন অসুবিধা নেই। ভুবনেশ্বর বা পুরী থেকে বাস পাওয়া যায় প্রত্যহ। ডাক-বাংলো রয়েছে, ইচ্ছা করলে পূর্ব্বে ব্যবস্থা করে এখানে থাকা যায়, তবে এখনও এ জায়গা তেমন নিরাপদ কিনা কে জানে! নিশুতি-রাত্রে এই নির্জ্জন প্রান্তরের রূপ কেমন তা না দেখলে বোঝা যায় না।

মন্দিরের এক অংশ ভেঙে গিয়েছে, ওদিকে কি ছিল তা আজ বোঝা যায় না। সরকার থেকে অবশ্য এখন এর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে বিশেষ সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছে দেখা গেল। মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায় না। ভিতরে বালি প্রভৃতি দিয়ে ভরাট করে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য ভিতরে কোন শিল্পকাজ ছিল কিনা আজ তা বোঝবার উপায় নেই।

একদিনে এই সব মন্দিরের শিল্পকাজ দেখে শেষ হয় না, যেন "বাঁশবনে ডোম কানা", কোন্‌টা দেখি কোন্‌টা না দেখি এমন অবস্থা। মন্দির দেখতে দেখতে একটা কথা মনে হ'ল। তা হচ্ছে এই যে, যারা ভাবের সমুদ্রে ডুব দিয়ে তার তলা থেকে এমন শিল্প-সম্পদ নিয়ে এল—তাদের কথা, নাম আজ কেউ জানে না। এই মন্দিরের কোথাও একটি অক্ষরেও শিল্পী নিজের পরিচয় রেখে যান নি।

পরিশ্রম, ধৈর্য্য, একাগ্রতা, মূর্ত্তি-নির্ম্মাণ-কৌশল এবং সর্ব্বোপরি ভারতীয় শিল্পশৈলীর যে অপূর্ব্ব অঙ্কন, সে শিক্ষায় যে জ্ঞান ও সাধনার প্রয়োজন তার কথা মনে করে সত্যই শুধু বিস্ময় জাগে না, সেই সব অজ্ঞাত শিল্পীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে।

সূর্য্যমন্দিরের একপাশে রয়েছে একটি মিউজিয়াম, বহু মূর্ত্তি এখানেও রাখা হয়েছে। তা ছাড়া নিকটে একটি গৃহে সপ্ত-মাতৃকা-মূর্ত্তি রয়েছে। ঐ মূর্ত্তির এখন নিত্যপূজা হয়। এগুলিও আমরা দেখলাম। চারদিকেই মূর্ত্তি-শিল্পের ছড়াছড়ি, দেখার যেন আর শেষ নেই, মনের খোরাক এখানে প্রচুর। এ স্থান ভারতীয় শিল্পীর তীর্থক্ষেত্র। কারণ ভারতীয় শিল্প-ঐতিহ্যের যে রূপ, তার নিদর্শন হিসাবে এগুলি ভারতবাসীর গৌরব, অমূল্য সম্পদ।

* অধ্যাপক নির্ম্মলকুমার বসু। ফটোগুলি তুলেছেন অধ্যাপিকা মীরা গুহ, শ্রীতারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমৃগেন্দ্র সিংহ।

ভারতের খাদ্য-সমস্যা

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত

বিগত ১৯শে নভেম্বর তারিখে অশোক মেটা কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। দেশের খাদ্যশস্য সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য শ্রীঅশোক মেটার সভাপতিত্বে এই কমিটি গঠন করা হয়েছিল বিগত ২৪শে জুন তারিখে। কমিটির সদস্য হিসাবে ছিলেন শ্রীথিরুমল রাও, শ্রীএস. এফ. বি. তায়েবজী, শ্রীভি. এন. তিভারী, নলগড়ের রাজা সুরেন্দ্র সিং এবং ডাঃ বি. কে. মদন। ডাঃ এস. আর. সেন সদস্য সেক্রেটারী ছিলেন। খাদ্যশস্য সম্বন্ধে তদন্তের জন্য কমিটি মোট চৌদ্দটি রাজ্য সফর করেছেন। বলা হয়েছে নয় শত লোক কমিটির নিকট সাক্ষ্য দিয়েছেন। এ ছাড়া প্রায় এক হাজার স্মারকলিপি কমিটির কাছে পেশ করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কমিটি ১৯০ পৃষ্ঠার রিপোর্ট দাখিল করেছেন।

এ কথা অনস্বীকার্য্য যে, ভারতের অর্থনীতি সম্প্রসারণশীল। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, এই ধরনের অর্থনীতিতে মূল্য-বৃদ্ধির একটা বিশেষ প্রবণতা থাকে। অশোক মেটা কমিটিও এটা স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে কমিটি এই মর্ম্মে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, একটা বিষয়ে জাতির সবচাইতে বেশী লক্ষ্য রাখা দরকার। অর্থাৎ যাতে খাদ্যমূল্য খুব বেশী কিম্বা হঠাৎ হ্রাস বা বৃদ্ধি পেতে না পারে সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

ভারতের বিরাট আয়তন সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কাজেই আমরা আশা করতে পারি না, এই বিরাট দেশের সর্ব্বত্র একই ধরনের প্রাকৃতিক আবহাওয়া বিদ্যমান থাকবে। হয়ত কোন সময়ে একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে অনাবৃষ্টি কিম্বা প্লাবন দেখা দিতে পারে এবং এই অনাবৃষ্টি কিম্বা প্লাবনের ফলে গুরুতর শস্যহানি অসম্ভব নয়। সুতরাং যে অনুপাতে ফসলের পরিমাণ হ্রাস পাবে সে অনুপাতে ঘাটতির পরিমাণ বেড়ে যাবে। মনে হচ্ছে, এই প্রকার পরিস্থিতির আশঙ্কা অশোক মেটা কমিটির সদস্যদের মনেও জেগেছে, কারণ তা না হলে তাঁরা এই মর্ম্মে সুপারিশ করতেন না যে, কলকাতা, বম্বে, মাদ্রাজ ইত্যাদি যে সব জনবহুল শহর এবং অত্যধিক ঘাটতি এলাকা আছে সে সব এলাকা বেষ্টন করে খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করা দরকার। শুধু তাই নয়। এমন ভাবে কয়েকটি খাদ্য-অঞ্চল গঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে কমিটি মন্তব্য করেছেন যাতে অবাধে খাদ্যশস্য স্থানান্তরের বিরুদ্ধে আঞ্চলিক বাধা-নিষেধ বলবৎ করতে কোন অসুবিধা হবে না। এ ছাড়া যে সব উদ্বৃত্ত এলাকা আছে সে সব এলাকাকে বেষ্টন করতে হবে। উদ্দেশ্য হ'ল, বেষ্টিত এলাকাগুলি থেকে খাদ্যশস্য কেনা এবং স্থানান্তরের একচেটিয়া অধিকার একটা সরকারী সংস্থার হাতে ন্যস্ত করা। কমিটি আরও বলেছেন, যে সব চাষী কিম্বা জোতদারের হাতে এক-শত বিঘার বেশী জমি আছে সে সব চাষী কিম্বা জোতদারের কাছ থেকে ফসলের একটা অংশ যাতে সরকারী গোলায় বিক্রী করা হয় সে জন্য বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

খাদ্যশস্য সম্পর্কে তদন্ত করে অশোক মেটা কমিটি যে সব সুপারিশ করেছেন, সে সব সুপারিশ কার্য্যকরী করার উদ্দেশ্যে কয়েকটি সর্ব্ব-ভারতীয় সংস্থা গঠনের জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, সংস্থাগুলি হবে সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন। এখানে উদাহরণস্বরূপ আমরা কয়েকটি সংস্থার উল্লেখ করছি। প্রথমতঃ অশোক মেটা কমিটি একটি মূল্যস্থিতি সংসদ গঠনের কথা বলেছেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বাজার-দর স্থিতি করা। আবার এই সংসদের অধীনে আরেকটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা হবে। এই প্রতিষ্ঠানের হাতে খাদ্যশস্যের সরবরাহ স্থিতি করার এবং কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের অধীনে দেশের সর্ব্বত্র সরকারের পক্ষ থেকে খাদ্যশস্য কেনার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে। এ ছাড়া একটি খাদ্য উপদেষ্টা কমিটি নিয়োগ করার কথা বলা হয়েছে। এই কমিটিতে এক দিকে যে রকম কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি থাকবেন সে রকম অন্যদিকে বে-সরকারী ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণী এবং সংস্থার প্রতিনিধিদের স্থান দেওয়া হবে। এই কমিটি খাদ্য সম্পর্কে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিবেন। বাজার-দর সম্পর্কীয় তথ্যাদি সঙ্কলন এবং প্রচার করার জন্য একটি মূল্য সঙ্কলন বিভাগ গঠন করা হবে। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, খাদ্য সমস্যা সমাধানের দিক থেকে এই সব কমিটির কি গুরুত্ব আছে। কোন কোন অর্থনীতিবিদ্ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, এই সব কমিটির কার্য্যাবলী দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বনের পথে হয়ত অন্তরায় সৃষ্টি করবে।

খাদ্য-সমস্যা যে আকার ধারণ করেছে সে আকার সম্পর্কে অশোক মেটা কমিটি ভারতের নানা স্থানে কি ভাবে তদন্ত করেছেন সেটা আমরা আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি। কিন্তু এই সমস্যার আসল রূপ এবং এর প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে কমিটি যে ছবি এঁকেছেন সেটা সকলের মনেই উদ্বেগ সঞ্চার করবে। দেশে খাদ্যের সম্ভাব্য ঘাটতি সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। কমিটির ধারণা, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষের দিকেও বছরে প্রায় বিশ লক্ষ টন খাদ্যের ঘাটতি থাকার আশঙ্কা আছে। তাই এই মর্ম্মে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে যে, আগামী কয়েক বছর ধরে বিশ থেকে ত্রিশ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানী করতে হবে।

শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন হলেন ভারতের খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী। তিনি বিগত ২৭শে নভেম্বর তারিখে নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস পালা-

মেণ্টারীদলের সভায় বলেছেন, অনাবৃষ্টির দরুণ ভারতের এক শত সত্তর হাজার বর্গমাইল অঞ্চলে চূড়ান্ত খাদ্য-সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে আট কোটি লোক বিপন্ন হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। অনুমান করা হয়েছে, খাদ্যশস্যের ক্ষতির পরিমাণ ত্রিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ টনের কাছাকাছি হবে। শ্রীজৈন বলেছেন, এই সমস্যার কোন আশু প্রতিকারের সুপারিশ অশোক মেটা কমিটি করতে পারেন নি। কমিটি দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা সুপারিশ করেছেন। তাই শ্রীজৈন এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, আশু সঙ্কট সমাধানের জন্য খাদ্য-শস্য আমদানী ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

অশোক মেটা কমিটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত রিপোর্টে খাদ্য-শস্যের বণ্টন এবং মূল্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। কমিটি বণ্টন এবং মূল্যের ব্যাপারে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী নন। আবার অন্যদিকে পূর্ণ বিনিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা বলবৎ করা হউক এটাও কমিটি চান না। কমিটির অভিমত হ'ল, খাদ্য-সমস্যার যদি সমাধান করতে হয় তা হ'লে এমন একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যেটা ঠিক পূর্ণ অবাধ বাণিজ্য কিম্বা পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের পর্য্যায়ে পড়ে না। অর্থাৎ কমিটি পূর্ণ অবাধ বাণিজ্য এবং পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের মাঝামাঝি ব্যবস্থার উপর সবচাইতে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন, এবং এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা নিরামক ধরনের হ'লে ভাল হয়। আসল কথা হচ্ছে, নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা সঙ্কোচক ধরনের হউক এটা কমিটি চান না। আমাদের অনেকেরই হয়ত জানা আছে, গোটা ভারতে কমপক্ষে প্রায় পাঁচ লক্ষ গ্রাম আছে এবং শহরের মোট সংখ্যাও কয়েক হাজার হবে। সুতরাং খাদ্য-সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে গোটা ভারতে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা সফল হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। অথচ বিগত তিন-চার বৎসর ধরে অবাধ ব্যবসার মাধ্যমে খাদ্য-সরবরাহের অবস্থা খুব সঙ্কটজনক হয়ে উঠেছে। বোধ হয় এইজন্য একটা মাঝামাঝি পথ অনুসরণ করার জন্য অশোক মেটা কমিটি সুপারিশ করেছেন। তা ছাড়া বণ্টন-ব্যবস্থায় যে সব ত্রুটি আছে, কি ভাবে সে সব ত্রুটি সংশোধন করা যেতে পারে সে সম্বন্ধেও এই কমিটির পক্ষ থেকে তদন্ত করা হয়েছে। ভারতে এমন বহু এলাকা আছে যে সব এলাকায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যশস্য পাওয়া যায় না। কমিটি সে সব এলাকায় ন্যায্য দরে বিক্রীর দোকান এবং ক্রেতাদের দ্বারা গঠিত সমবায়মূলক দোকান খুলিবার উপদেশ দিয়েছেন, কারণ তা হলে নাকি একদিকে যে রকম খুচরা দর স্থিতি করা যাবে, সেরকম অন্যদিকে প্রত্যেক ব্যক্তিকে খাদ্য-সরবরাহের সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হবে। কমিটির এই উপদেশে আমরা ঠিক আশান্বিত হতে পারছি না। এর কারণ হ'ল অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা। ন্যায্য দরে বিক্রীর দোকান খোলার প্রস্তাব মোটেই নূতন নয়। অতীতে এই প্রকার দোকান চালু করার অনেক চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সুফল পাওয়া যায় নি। তা ছাড়া শস্য-ভাণ্ডার গড়ে তোলার জন্য যে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে সে পরামর্শ দেশবাসীর মনে কোন আশার উদ্রেক করতে পারছে না। অবিশ্যি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে সরকার কর্ত্তৃক এই প্রকার শস্যভাণ্ডার গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার উপর অশোক মেটা কমিটি জোর দিয়েছেন, কারণ তা না হ'লে স্বাভাবিক অবস্থায় বাজার-দর স্থিতি করা কষ্টকর হবে। কিন্তু এই প্রস্তাবের সমর্থনে কমিটি যে সব যুক্তির অবতারণা করেছেন সে সব যুক্তি একঘেয়ে হয়ে গেছে। সরকারী মুখপাত্রদের মুখ থেকে এই যুক্তি আমরা বহুবার শুনেছি। শুধু তাই নয়। এই প্রস্তাব কার্য্যকরী করলেও সমস্যার সমাধান হবে না। তা ছাড়া প্রস্তাবটি বেশ ব্যয়সাধ্য। এটাকে কার্য্যকরী করতে গেলে অনেক পরিশ্রম করাও প্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে।

অশোক মেটা কমিটি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব মেনে নিয়েছেন, এ কথা আমরা আগেই বলেছি। অর্থাৎ একদিকে যে রকম পাইকারী বাণিজ্যের একটা অংশ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন করতে হবে, সে রকম অন্যদিকে পাইকারী বাণিজ্যের যে অংশ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের আওতার বাইরে থাকবে সে অংশের ব্যবসায়ীদের উপর যাতে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যেতে পারে সেজন্য লাইসেন্স-প্রথার প্রবর্ত্তন করা দরকার। কমিটি বেসরকারী ব্যবসায়িগণ কর্ত্তৃক খাদ্যশস্য ক্রয়-বিক্রয় এবং মজুতের পরিমাণ সম্পর্কীয় পাক্ষিক হিসাব দাখিল করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। তাই এই ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা বাঞ্ছনীয় বলে কমিটি মন্তব্য করেছেন। কমিটির প্রস্তাবটি ভাল, সন্দেহ নেই। কিন্তু বেসরকারী ব্যবসায়ীদের উপর লাইসেন্স গ্রহণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করলেও সব ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে খাদ্যশস্য ক্রয়-বিক্রয় এবং মজুতের পরিমাণ সম্পর্কে সঠিক হিসাব পাওয়া যাবে কি না সেটা নিশ্চিতভাবে বলা কষ্টকর। তাছাড়া যে সব ব্যবসায়ী শস্য মজুত করেন প্রয়োজনের সময়ে তাঁদের মজুত শস্য আটক করার পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সরকার সে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন কি না, সে সম্পর্কে আজ অনেকের মনে সন্দেহ জেগেছে।

যাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ গম এবং চাউলের মজুত রক্ষা করা হয় সেজন্য অশোক মেটা কমিটি সুপারিশ করেছেন। এমনকি গম এবং চাউলের নিয়মিত আমদানীর উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তবে কমিটি বলেছেন, আমদানীর পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, নিয়মিত ভাবে খাদ্যশস্য আমদানী করতে হলে যে প্রচুর অর্থব্যয় প্রয়োজনীয় হয়, সে অর্থব্যয় ভারতের পক্ষে সম্ভবপর কি না। এ কথা অনস্বীকার্য্য যে, ভারত অনগ্রসর দেশ। কাজেই ভারতকে যদি খাদ্যশস্য আমদানীর জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করতে হয় তা হ'লে উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলো কার্য্যকরী করার উদ্দেশ্যে ভারত কিছুতেই প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থব্যয় করতে পারবেন না। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা না হলে খাদ্য-সমস্যার স্থায়ী এবং সুষ্ঠু সমাধান হবে না। তবে সে ঘাটতি আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি করে পূরণ করতে হবে। কি ভাবে

আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে অশোক মেটা কমিটিও কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছেন, এখানে উদাহরণ স্বরূপ আমরা তিন-চারটি সুপারিশের উল্লেখ করছি। প্রথমতঃ কমিটি সেচ-ব্যবস্থা সম্প্রসারণের উপর জোর দিয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ বলা হয়েছে, একই জমি থেকে দুটো ফসল চাষের ব্যবস্থা করতে হবে। তৃতীয়তঃ কমিটি বলেছেন, যাতে অধিকতর পরিমাণে রাসায়নিক এবং জান্তব সার প্রয়োগ করা হয় সেদিকে নজর দিতে হবে। চতুর্থতঃ সাধারণ ভাবে এমন সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার যেগুলো কৃষি-উন্নয়নের উপযোগী।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, অশোক মেটা কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্টে আরও একটা জিনিষের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব করা হয়েছে। সেটা হ'ল সহকারী খাদ্য। যাতে এই ধরনের খাদ্য গ্রহণ করা হয় এবং এই ধরনের খাদ্য উৎপাদনে যাতে প্রয়োজনীয় উৎসাহ দেওয়া হয় সেজন্য কমিটি জাতির কাছে আবেদন জানিয়েছেন। অশোক মেটা কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে দি ষ্টেটসম্যান পত্রিকা মন্তব্য করেছেন :

"Perhaps detailed reading of the full report will show that recommendations uniformly measure up to needs. In any event, governmental authorities, as anxious as official witnesses (and the Committee) "to distil from past experience significant conclusions for future action" should have no difficulty in seeing that the path pointed out ads towards further physical controls and concentrated attention to agriculture."

প্রকৃতি দুলাল

শ্রীকালিদাস রায়

বৈশাখের বেলা দুটা আকাশে অগ্নির জ্বালা ক্ষরে
দুয়ার জানালা সব রুধিয়াছি দোতালার ঘরে
খুলে দিয়ে বিজলীর পাখা।
পশ্চিমের জানালাটা খসখসটাটি দিয়ে ঢাকা।
জানালার নীচে আছে একটি বাগান
তার মাঝে ঘুরিতেছে ধনীর সন্তান
পাঁচ বছরের ছোট ছেলে একা একা।
জানালার ফাঁকে গেল দেখা।
দুয়ার জানালা রুদ্ধ প্রকাণ্ড বাড়ীর,
যেন সেথা সুপ্ত রয় রৌদ্রস্নাত নিশীথ গভীর।
দারোয়ান পাচক চাকর
সকলেই ঘুমে অকাতর।
শুধু অই ছোট শিশু ঘুমন্ত মায়েরে দিয়ে ফাঁকি।
পলায়ে এসেছে হেথা ঘুরিছে একাকী।
পাতা ছেঁড়ে ফুল তোলে উপড়ায় ঘাস,
গাছে উঠিবারও লাগি করে সে প্রয়াস।
ডাল ধ'রে ঝুল খায়, গাছেদের সঙ্গে কথা কয়
চারা গাছে-নাড়া দেয়, বুকে টেনে লয়।
গাছতলে ঘাসের উপরি
দেয় গড়াগড়ি।
'একাকী' বলিনু বটে, একাকী সে নয়,
বেজি কাঠ-বিড়ালীরা কাছে আসে করে নাক ভয়।
তাড়া দিলে তাহারা পালায়
তাহাদের কাছে ডাকে বলি 'আয় আয়।'
ছুটে গিয়ে গিরগিটি ধরে।
ফুল দিয়ে পূজা করে একটি পাথরে।
পাখীগুলি করে কলরব
ধমকিয়ে বলে 'থাম, মন্তর যে ভুলে যাব সব।'
দেখে দেখে তার ছেলেখেলা
কৌতুকে ও কৌতূহলে কেটে গেল বেলা।
অতি সভ্য নাগরিক ধনীর সন্তান
আজো শিশু, তাই তার অকৃত্রিম অনাবিদ্ধ প্রাণ।
চৌদিকে মানুষ দেখি নানা রঙা জীবন্ত ফানুস,
ভুলেছি কেমন ছিল আসল মানুষ
প্রকৃতির অঙ্ক ছায়ে লালিত পালিত।
দেখিলাম সে মানুষে প্রকৃতির ইঙ্গিতে চালিত
শিশুর আকারে
অকস্মাৎ, দাঁড়াইয়া জানালার ধারে।
যে মানুষ ঘুমায় না সৌধ অঙ্কে পালঙ্কের স্নেহে
বৈশাখের খর রৌদ্রে শান্তি পায় প্রকৃতির গেহে ;
দেখিলাম সে মানুষে, লতা গুল্ম, তক্ষক, বেজিরে,
আপন বলিয়া জানে, বন্ধু যার রয় তৃণ-নীড়ে।
মানুষের সাথে প্রকৃতির
যে প্রীতি সম্বন্ধ গূঢ় নীবিড় গভীর
পাইয়াছি ডরোথীর অগ্রজের* কবিকল্পনায়
তাই চোখে মূর্ত হয়ে ভায়।

---

* ওয়ার্ডসওয়ার্থ

স্মৃতি-রস

শ্রীসুধীর গুপ্ত

১

গরুর গাড়িটা তোমারে আমারে পাড়াগাঁর পথে চলেছে নিয়া,
কিশোর-বেলার কাহিনী-কাকলী বুকে তোলপাড় করে না প্রিয়া ?
আঁকা-বাঁকা এই মেঠো পথ দিয়া কত আনাগোনা করেছি সবে,
চকিত করেছি বন-বিহগেরে পুলকে-পূরিত কণ্ঠ-রবে ;
কত ফুলে-ফলে ভরেছি কোঁচড়, কত লুকোচুরি খেলায় বেলা
কাবার ক'রেও আবার চেয়েছি খেলার-সাথীরই মিলন-মেলা !
বনে ও বাদাড়ে চড়ুই-ভাতির সাথীর সাথেই এলাম ফিরে,
এই জীবনের বিকাল-বেলায় সকাল বেলার সুখের নীড়ে।
সবই তো সাবেক রয়েছে বুঝি গো,—উল্লাসই হায় ধূসর হোলো ;
তবু একবার সজনী, তোমার হারানো স্মৃতির দুয়ার খোলো।

২

রূপালী সুতার মতন সোতাটি আঁকিয়া বাঁকিয়া ওই যে বহে,—
গাছের ছায়ারা মায়া বোনে শুধু নিটোল কোমল ও রূপ-দহে।
মাছের নয়নে নিদ নামে না কো,—নটিনী ওদেরও ভুলালো বুঝি ;
তোমার আমার হারানো কিশোর ওই সোতাতেই ফিরিয়া খুঁজ।
সোতার দু'ধারে নাবাল জমিতে ধানের শীষেরে রাঙিছে রবি ;—
কি যে পরিবেশ ! পাড়াগাঁ তো নয়, স্বর্গ হেথায় রচিলো কবি।
ঝোপে-ঝাড়ে-ঘেরা কত শাখা-পথ স্বাদে ও সুবাসে ভুলায় হিয়া ;
হেথায় ছড়ানো কিশোর-জীবন সাধ জাগে যেতে কুড়ায়ে নিয়া।
উল্লাসে-ভরা সে মন তো নাই ; কিশোর কুড়ানো হবে না ফিরে ;
এ জীবনও হায় মরণে মিশায় স্মৃতিতে যতই রাখি না ঘিরে।

৩

গরুর গলার ঘণ্টা বাজিছে বিষাদ-মধুর কোমল সুরে ;—
বাতাসে কোথায় সুর ভেসে যায়, মনও ভেসে যায় অনেক দূরে।
কবে সে দ্বাপরে গোকুলে গোচরে গল-ঘণ্টের উঠিত ধ্বনি !
জীবন মথিয়া তখনও গোপীরা এমনই গোপনে তুলিত ননী ;—
জীবন-যমুনা-তীরে তীরে শুধু ছড়ায়ে গিয়েছে কত না স্মৃতি ;
সে স্মৃতি চাখিয়া ভোলে তো মানুষ প্রীতিতে গীতিতে মরণ-ভীতি।
ভয় কি তা' হ'লে—হাতে হাত রাখো, স্মৃতি-সুধা লও লেহিয়া ধীরে ;
এই স্মৃতি-রস মোরাও ঢালিয়া যাই যেন সখি পৃথিবী-তীরে।
এই পথে যা'রা আসিবে আবার এই পাড়াগাঁর রূপেতে ভুলি'
মোদের দরদ তা'রাও লেহিবে,—হলেম না হয় মোরাই ধূলি।

মিনু বৌদি

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

মিলি মিত্তির আমার হেলাফেলার আত্মীয়া নয়, আমার আপন পিসতুতো বোনের আপন পিসতুতো বোন। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, ছোট পিসির বাড়িতে আমার যাতায়াত থাকা সত্ত্বেও মিলিকে কোনদিন সেখানে দেখি নি। অবশ্য আমি শুনেছিলাম শান্তাদের কেষ্টনগরের পিসেমশাই এখন বালি না বালিগঞ্জ কোথায় যেন থাকেন, কিন্তু যাদের চোখে কোনদিন দেখি নি তাদের বিষয়ে আমি কোনদিন মাথাও ঘামাই নি। এখন সন্দেহ হয় হয় ত সেখানে শুনে থাকব মিলির কথা, কিন্তু সে নাম আমার কানের ভেতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে নি।

যাই হ'ক, মিলিকে আমি প্রথম দেখলাম ছোট পিসির বড় মেয়ে রাতার বিয়ের দিন। পরিবেশকদের লিষ্টে আমারও নাম ঢোকানো হয়েছে নির্ভরযোগ্যসূত্রে সংবাদটা জানতে পেরে আমি এমন কড়া মাঞ্জার পোষাক চড়িয়েছিলাম যে, হেড-পরিবেশক ছোট পিসির বড় ছেলে গুণ্দা আমাকে আর কিছু বলতে সাহস পায় নি। সুতরাং খানিকটা ফোঁপরদালালি সেরে বরযাত্রীদের পরের ব্যাচেই দুর্গা দুর্গা বলে পঙক্তিতে বসে পড়লাম। পঙক্তিতে বললে একটু ভুল হবে—বেঞ্চিতে। ছোট পিসিরা কলকাতার যে অঞ্চলে থাকেন সেখানে পঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, মরাঠা, দ্রাবিড়, উৎকল, বঙ্গের বিচিত্র সমাবেশ হয়েছে। ভারতের, বিশেষত বাংলার মাটিতে এতগুলো সংস্কৃতি একত্রিত হলে তার যোগফলটা একটু পশ্চিম-ঘেঁষা হতে বাধ্য। আমি এটা জানতাম যে, রাতার বিয়েটা খাঁটি বাঙালী মতে হলেও নিমন্ত্রিতদের জন্যে অনিবার্য্য কারণে কিঞ্চিৎ বিলিতিয়ানা থাকবে, অর্থাৎ তাদের বসতে হবে কাঠের বেঞ্চিতে, ভোজ্য পরিবেশিত হবে কদলীপত্রে এবং জল দেওয়া হবে মৃৎপাত্রে। ঘরপোড়া গরুর মতন আমি এটাও জানতাম যে, এ হেন ডিনার টেবিলে বসে শুধু অঙ্গুলির সাহায্যে মুগের ডাল, ফুলকপির ডালনা, মাছের কালিয়া, মাংসের ঝোল ও টোমাটোর চাটনির সদ্ব্যবহার করার পর কেউ যদি আমার গিলে-করা ধুতি-পাঞ্জাবিকে এবং সাদা শালখানাকে আধুনিক আর্টের নমুনা বলে ভাবেন তবে তাকে আমি দোষ দিতে পারব না। স্বীয় নিরাপত্তার জন্যে আমি তাই সময় থাকতে বিয়ে-বাড়ি থেকে একটু অবৈধ উপায়েই একটা দেড়-হাতী টার্কিশ তোয়ালে জোগাড় করে রেখেছিলাম। কোলের উপর সেটা পেতে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো সজাগ রেখে অতি সতর্কভাবে খাওয়া আরম্ভ করেছি, উদ্বেগ সত্ত্বেও বেশ কিছুদূর এগিয়েছিও, এমন সময় এমন একটা জিনিস আমার চোখে পড়ল যা দেখে পরিবেশকের ধাক্কা লেগে গেলাস উল্টে পড়া, পাঞ্জাবির হাতায় তরকারির ছোপ লেগে যাওয়া, তক্তা বেয়ে মাংসের ঝোল গড়িয়ে পড়া প্রভৃতি সব কিছুর আশঙ্কা আমি মুহূর্ত্তে বিস্মৃত হয়ে গেলাম।

প্রথমতঃ দেখলাম একটি নারী। দুটো বেঞ্চি আগে, আমার বাঁ ধারে সে বসেছে, আমি শুধু তার মুখের ডান দিককার একটু-খানি আভাস দেখতে পাচ্ছি। আর দেখতে পাচ্ছি তার পিঠের দু'দিকে দুটি দীর্ঘ এলায়িত বিনুনি। শ্বেত গ্রীবার নিচে টকটকে লাল ভেলভেটের ব্লাউজ, ভেলভেটের উপর এক-জোড়া কৃষ্ণসর্পের মতন দুটি কেশগুচ্ছ। বিনুনির প্রান্তদেশে খয়েরি রিবন। তরুণীর পরিধানে আকাশী-রঙের মহীশূর শিফন, চওড়া পাড়টা তার লাল, মধ্যে মধ্যে জরি ঝিক্‌মিক্‌ করছে। উজ্জ্বল আলোতে ক্ষণে ক্ষণে দ্যুতিমান হয়ে উঠছে হাঁসুলির স্বর্ণসূত্র আর কর্ণাভরণের পান্না। কিন্তু না, এ সব নয়, আমাকে মুগ্ধ করল তরুণীর অন্য একটি বৈশিষ্ট্য—তার আহার্য্য-দ্রব্যের স্বাদ গ্রহণ করার প্রণালীটা। এক-একটা গ্রাস মুখে দেবার পরক্ষণেই সে বুড়ো আঙুল থেকে কড়ে আঙুল আর তার পর সমস্ত করপল্লবখানি তার লম্বা সরু এবং লাল জিভটি দিয়ে চেটে চলেছে অতি নিবিষ্টচিত্তে। এক বার চাটা হয়ে গেলে সে আর একটা গ্রাস মুখে দিচ্ছে আর তার পর আবার গোড়া থেকে আরম্ভ হচ্ছে তার চাটনক্রিয়া।

পারিপার্শ্বের কথা বিস্মৃত হয়ে বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকবার পর খেয়াল হ'ল। একটু ভয়েভয়েই আশেপাশে তাকালাম। না, শুধু আমিই নই, আরো কয়েকজন উপভোগ করছে দৃশ্যটা। আমার ডানদিকে বসেছিল লম্বা-চওড়া একজন যুবক, আমার চেয়ে সামান্য একটু বড় হবে হয় ত বা। খেতে বসেই তার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। নিম্নকণ্ঠে বললাম, "দেখেছেন, ভদ্রমহিলা কি রকম হাত চাটছেন!"

যুবকটি মুখ তুলে তাকাল, তার পর হঠাৎ হি হি করে হেসে উঠল। আমি বিব্রত হয়ে বললাম, "চুপ করুন, চুপ করুন, শুনতে পাবে।"

সে থামল না। তার ডান পাশের আর একটি ছেলেকে, বোধ হয় ভাইকে, কনুইয়ের খোঁচা মেরে বলল, "এই দ্যাখ, দ্যাখ, ভদ্র-মহিলা কি রকম হাত চাটছেন দ্যাখ!"

ভাই কি যেন বলতে গেল, বড় জন চোখ ইশারা করে বলল, "চুপ! একদম চুপ!"

ছোট ভাই মুখ খুলল না বটে, কিন্তু আমাদের শব্দহীন হাসিতে যোগ দিল। মেয়েটি কাকে যেন দেখতে এক বার একটু ঘাড় ফেরাল, আমাদের হাসি তার চোখে পড়ল। কিন্তু ঠিক সেজন্য

নয়, অন্য একটা কারণে আমার হাসি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। অকস্মাৎ আবিষ্কার করে ফেললাম মেয়েটির বিপরীতদিককার বেঞ্চিতে আমাদের মুখোমুখি বসে একটি তরুণী বধূ আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন নিথর দৃষ্টিতে। সে দৃষ্টি দেখে আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে এল। তাতে শুধু ভর্ৎসনা নয়, প্রভুত্বও মেশান রয়েছে। কিন্তু এমন ভাবে তাকাতে পারেন কে এই ভদ্রমহিলা? ছোট পিসেমশায়ের গাদা খানেক বোন আছেন শুনেছি, সারা ভূ-ভারতে তাঁরা ছড়িয়ে থাকেন। তাঁদের সবাইকে আবার দেখিও নি কোনকালে। তাঁদেরই কেউ নন ত? তাহলে ত সেরেছে। বাকি সময়টা মুখ গুঁজে রইলাম। মাঝে মাঝে আড়চোখে না তাকিয়ে অবশ্য পারলাম না। দেখলাম তরুণীটি সে ভাবেই হাত চেটে চলেছে আর বধূটিও সে ভাবেই তাকিয়ে রয়েছেন আমার দিকে।

দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটা ভালভাবেই সম্পন্ন করলাম। পান-টান খেয়ে উপরে উঠছি। বারান্দার সিঁড়ির মুখে সেই ছেলেটি দাঁড়িয়ে। তার কাছে যাব এমন সময় পাঞ্জাবিতে টান পড়ল। পিছন ফিরে তাকাতেই আমার বুকটা ধড়াস ধড়াস করে উঠল। ছোট পিসির মেঝ মেয়ে শাস্তা আমার জামা টেনে ধরেছে আর পাশে—হ্যাঁ সামনাসামনি না দেখলেও চিনতে ভুল হ'ল না—শাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে সেই লাল ভেলভেট, সেই আকাশী শিফন, সেই জড়োয়া হাঁসুলি আর ঝুমকোর ঝিলিমিলি।

আমার বুকটা কেঁপে উঠল দ্বিবিধ ভয়ে। প্রথমটা লোকভয়। অপরাধীর মন ত, প্রথমেই মনে হ'ল খেতে বসে আমরা তাকে দেখেই হেসেছি একথা বুঝতে পেরে সে শাস্তার কাছে গিয়ে নালিশ করেছে। দ্বিতীয়টা প্রাণভয়। যে মেয়েদের পিছন থেকে সুন্দর দেখায় তাদের সম্মুখভাগের রূপ সম্বন্ধে আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতাই আমাকে একটু সন্দিগ্ধচিত্ত করে তুলেছে। এই কারণেই মরাল গ্রীবার স্নিগ্ধ ধবলিমা, স্বর্ণাভরণের দীপ্তি ও মণিকণিকার দ্যুতি এবং শিফনের উজ্জ্বল কমনীয়তা সত্ত্বেও আমি মেয়েটির সম্বন্ধে অধিক কল্পনার প্রশ্রয় দিই নি। কিন্তু তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমায় চমৎকৃত হতে হ'ল। আমার অঙ্কশাস্ত্র এখানে ভুল, একেবারে মারাত্মক রকমের ভুল। এ রকম প্রাণঘাতী ভুলের দিকে চোখ তুলে তাকালে কার না বুক ঢিপ ঢিপ করে?

দ্বিতীয় ভয়জনিত অস্বস্তি থেকে তখুনি নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় ছিল না তবে শাস্তা প্রথমটা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত করল। একগাল হেসে বলল, "চিনতে পারলি নন্তুদা?"

আমি আবার চমৎকৃত। আজ আমার হ'ল কি? এ যে মেঘ না চাইতেই জল! শাস্তার কথাটার অর্থ এই যে আমি মেয়েটিকে এককালে চিনতাম। কিন্তু অনেক ভেবেও, মানে আধ সেকেণ্ডের মধ্যে যতটা ভাবা সম্ভব ততটা ভেবেও ঠিক করতে পারলাম না তাকে কোথায় দেখেছি। তা এসব ক্ষেত্রে বোবারও মুখ খোলে আর আমি ত শুধু একটু গোবেচারা মাত্র। শশব্যস্তে হেসে বললাম, "বিলক্ষণ! কি যে বলিস, ওঁকে চিনব না! তা কেমন আছেন? অনেক দিন পরে দেখা হ'ল কিন্তু।"

আমি হাত তুলে নমস্কার করলাম। সেও করল। হেসে বলল, "আমি কিন্তু আপনাকে প্রথমবার দেখেই চিনতে পেরেছি।"

শাস্তা হেসেই খুন, "ওমা, তোরা এ রকম আপনি আপনি আরম্ভ করলি কেন? যেন এই তোদের প্রথম দেখা হ'ল। এই সেদিনও কেষ্টনগরের বাড়ীর চিলেকোঠায় চড়ুইভাতি করেছি মনে নেই? আর সেই মারামারিটা? তুই ছিলি পালের গোদা। তোর আদেশ না মানায় মিলিকে ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দিয়েছিলি মনে নেই?"

যাক, দুটো কথা জানা গেল। মেয়েটির নাম মিলি আর ঘটনাটা কেষ্টনগরের। চটপট বলে ফেললাম, "খুব মনে আছে। মিলির সে কি কান্না! বাড়ীতে সেদিন আমার পিঠে ক'টা পাথার বাঁট ভেঙেছিল রে? আর ঘটনাটা কিন্তু এই সেদিনের কথা নয়। ক' বছর হবে মিলি?"

"বারো চোদ্দ ত হবে নিশ্চয়ই" মিলি জবাব দিল।

আমি দ্রুত চিন্তা করে চলেছি। শাস্তারা, মানে ছোট পিসিরা কলকাতায় এসেছেন মাত্র বছর সাতেক, তার আগে তাঁরা কেষ্টনগরে থাকতেন। বারো-চোদ্দ বছর আগে আমি যখন কেষ্টনগরে গিয়েছি মেয়েদের সঙ্গে খেলা করার বয়স হয় ত তখন ছিল কিন্তু সেখানে আমি কখনও দু'-একদিনের বেশি থাকি নি। তাছাড়া আমার মতন গোবেচারার পক্ষে শাস্তার মতন দস্যি মেয়েকে ছাড়িয়ে পালের গোদাহওয়াও নিতান্তই অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

হঠাৎ অনেকটা আলো দেখতে পেলাম। ছেলেবেলায় আমার দাদা কয়েক বছর কেষ্টনগরে ছিল, শাস্তা আর মিলি ব্যাপারটা গুলিয়ে ফেলেছে। দাদা বরাবরই একটু ডানপিটে, যে কারণে সে ছিল ছোট পিসির গ্যাওটা। দাদা যেখানেই গেছে, চিরদিনই একটি ভক্তের দল সৃষ্টি করেছে। আর তার উপর হিটলারি করেছে। আহা, মিলির মতন এমন টুকটুকে মেয়ের গায়ে হাত তোলা চণ্ডাল দাদাটার পক্ষেই সম্ভব। দাদার উপর আমি একটু ক্রুদ্ধ না হয়ে পারি না।

ছেলেবেলায় দাদা যাই করুক, মিলি যে দাদারই এককালের ক্রীড়াসঙ্গিনী এ কথা জানার পর ব্যাপারটা খোলাসা করে নেয়াই উচিত ছিল কিন্তু আমি বেমালুম চেপে গেলাম কেননা দুনিয়াসুদ্ধ লোক জানে ছেলেবেলাকার বান্ধবীর বিষয়ে দাদা এখন আর মোটেই উৎসাহ বোধ করবে না। খেতে বসার আগে দাদার নাম করে গুণুদার সুপারিশে চারটে সিগ্রেট জোগাড় করে ছাদে উঠেছিলাম একটু নিশ্চিন্ত মনে ধূমপান করব বলে। কিন্তু ছাদের দুয়ার থেকেই আমাকে পালিয়ে আসতে হয়েছে। এই দুরন্ত শীতের মধ্যে ছাদের একটা নিরালা কোণে দাঁড়িয়ে দাদা আর দাদার ইয়ে।

সুতরাং আমার সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে ফেললাম। এ সব ব্যাপারে একটু-আধটু জালিয়াতি দোষের নয়। ধরা পড়লে না হয় বলাই

যাবে অনেক দিন আগেকার ব্যাপার, আমিও ভুল করেছিলাম। কৌশলে মিলিকে প্রশ্ন করতে লাগলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমার অনুমাণ সত্য প্রমাণিত হ'ল। মিলি হচ্ছে শান্তার সেই কেষ্টনগরের পিসেমশাইয়ের মেয়ে।

আমরা আত্মীয়; আলাপে সঙ্কোচের প্রয়োজনীয়তা নেই। আমার মুখে খই ফুটছে। মিলিরও। কয়েক হাত দূরে সেই ছেলে দুটি অবাক হয়ে আমাদের দিকে চেয়ে রয়েছে, আমিও মাঝে মাঝে সগর্ব্বে তাদের দিকে তাকাচ্ছি।

মিলি এক সময় প্রশ্ন করল, "মার সঙ্গে দেখা করেছ?"

জবাব দিলাম, "না। তিনি আমায় চিনবেন কি?"

"খুব চিনবেন। এস আমার সঙ্গে।"

"হ্যাঁ চল, তোমার দাদাদের সঙ্গেও পরিচয় হওয়া দরকার নূতন করে।"

"দাদাদের কেন বলছ, বড়দার সঙ্গে বল। মেজদা আর ছোটদার সঙ্গে ত খুব জমিয়ে নিয়েছিলে দেখলাম।"

আনন্দের ঠেলায় একটু অসতর্ক হয়ে পড়েছিলাম। অন্যমনস্ক-ভাবে বললাম, "আমি? কই না ত!"

ততক্ষণে আমরা সেই ছেলে দুটির কাছে এসে পড়েছি। মিলি হেসে বললে, "যাও আর ঠকাতে হবে না।" তার পর ছেলে দুটির একজনকে উদ্দেশ্য করে বললে, "খেতে বসে কি দেখে তোমরা অত হাসাহাসি করছিলে মেজদা?"

আমার মাথায় বজ্রাঘাত। কি সর্ব্বনাশ! এই জন্যেই তারা হেসে গড়িয়ে পড়তে চাইছিল? ভয়ঙ্কর লোক ত এরা!

কিন্তু যে খায় চিনি তারে জোগান চিন্তামণি। সপ্রতিভভাবে হেসে বললাম, "আপনি ত ভীষণ খারাপ লোক! এমনি করে ভালো-মানুষদের ঠকাতে হয়!"

মিলি বলল, "চিনতে পারলে না? শান্তার মামাতো ভাই, সেই যে কেষ্টনগরে থাকত।"

রমেশদা আমার পিঠে প্রচণ্ড এক থাবা মেরে বলল, "অ্যাঁ সন্তু! এত বড় হয়ে গেছিস! তাই আমার কেমন চেনা-চেনা মনে হচ্ছিল।"

মিলি বলল, "ও সন্তু নয়—নন্তু। সন্তু হল ওর ছোট ভাই।"

ধরা পড়ে গেছি। বললাম, "হ্যাঁ আমি নন্তুই। কিন্তু সন্তু আমার দাদার নাম। দাদাই কেষ্টনগরে থাকত, আমি নই।"

মিলি হতভম্ব। শান্তা বোধ হয় আগেই নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিল, কিন্তু এতক্ষণ কিছু বলে নি। এবার ও হি হি করে হেসে উঠল: "তুই কি বোকা নন্তুদা!" মনে মনে হয় ত উল্টো কথাই বলল।

মিলির দিকে তাকালাম। ওর মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে।

এমন সময় দেখি সেই তরুণী বধূটি এদিকে আসছেন। হঠাৎ সন্দেহ হ'ল ভদ্রমহিলা এদেরই কেউ নয় ত? কাছে আসতেই মিলির দু'ভাই মিলিটারী কায়দায় অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে স্যালুট করল। রমেশদা বললেন, "ইনি হচ্ছেন আমাদের কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ—মাননীয়া বৌদি শ্রীচরণ কমলেষু।"

বধূটি আমার দিকে সেই হিম-শীতল দৃষ্টিতেই তাকিয়ে রয়েছিলেন। দেওরদের স্যালুট গ্রাহ্য না করে আমার আপাদমস্তক দেখে নিলেন। রমেশদা বলল, "তোমার অগণিত দেওরের দলে আর একটি দেওরের নাম লিখে নাও বৌদি। কই হে, ঝটপট দিয়ে ফেল নিজের পরিচয়টা। বৌদির আমাদের তুলনা নেই। দোষের মধ্যে আমাদের প্রতি সর্ব্বদাই একটু বাম হয়ে থাকেন। কিন্তু একবার প্রসন্ন করতে পারলে শ্রীহস্তে প্রস্তুত খাস্তা কচুরি, জিভে গজা আর মটন-চপের গ্যারাণ্টি মারে কে? আর বৌদির হাতের খাবার—আহা-হা মনে করতেও টস টস করে জিভ দিয়ে জল গড়ায়। শুনেছি বিয়ের আগে পাড়ার ছেলেদের মধ্যে···"

অগ্নিগর্ভ দৃষ্টিতে ভদ্রমহিলা তাকালেন রমেশদার দিকে। বয়েস তাঁর বাইশ-তেইশের বেশী মনে হ'ল না। তা হ'ক, বৌদি ত। টক করে একটা পায়ের ধুলো নিয়ে নিলাম। বৌদি খুশী হলেন। কিন্তু না হাসার চেষ্টা করে বললেন, "তোমার নামটি কি ভাই?"

বৌদির ভারিক্কী চাল দেখে হাসি পেল। বললাম, "আমার নাম শ্রীমান নন্তু ওরফে শ্রীযুক্ত বাবু মানসকুমার বসু, পিতা শ্রীসঞ্জয়-কুমার বসু। বাস পিতার হোটেল, পেশা রকবাজী, বিদ্যেটুকু আর বুদ্ধি আপনার দেওরদের জিজ্ঞেস করুন।"

এবার বৌদি হাসলেন অল্প একটু। বললেন, "সেটা আমিই বুঝতে পারছি। তা একদিন এস না আমাদের ওখানে?"

"একদিন কেন বৌদি হাজার দিন যাব। আপনি না বললেও যাব। আপনার যা পরিচয় পেয়েছি তাতে ঠ্যাঙা নিয়ে তাড়া না করা পর্য্যন্ত যাওয়া বন্ধ করা যায়!"

বৌদি আবার হাসলেন। হাসিটার অর্থটা ঠিক হৃদয়ঙ্গম হল না।

দুই

মীনাক্ষী দেবীর অর্থাৎ মিনু বৌদির সঙ্গে তাঁর দেওরদের প্রীতির সম্পর্কটা বড় ভাল লেগেছিল। মিত্তির-বাড়িতে এসে দেখলাম বউদির সেই গাম্ভীর্য্য নিতান্তই একটা আবরণ নয়, সত্যিই তিনি একটু গম্ভীর। কথা তিনি একটু কমই বলেন। সর্ব্বক্ষণই তিনি কাজে ব্যস্ত—রান্না-বান্নায় যতটা না হোক, টুকি-টাকি কাজে। দিনের মধ্যে তিনি সহস্র বার আলনা গোছান, ফার্নিচার মোছেন আর টেবিল-চেয়ার-টিপয় ঠিক ঠিক জায়গায় সরিয়ে রাখেন। ঘড়ি ধরে তাঁর সব কাজ, কেউ তাতে বিঘ্ন উপস্থিত করলেই মিনু বৌদির রসনা খর খর করে উঠে। অবশ্য আমি এ নিয়মের বাইরে। চায়ের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পর সে বাড়িতে গেলে আমি গম্ভীর হয়ে বলি, "দেখুন কি ভীষণ রকমের পাংচুয়াল! ঠিক এক ঘণ্টা পরে এসেছি।" বৌদি হেসে জবাব দেন, "আর ক'টা দিন যাক্। তার পর বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে দেব।"

ইঞ্চির ভগ্নাংশে হিসেব-করা মাপমত জায়গায় রাখা ইজি-চেয়ারটাকে

ঘরের মাঝখানে টেনে এনে বলি, "কি ছাই জানালার পাশে এটা রাখেন, একটুও মানায় না।" "বৌদি চোখ পাকিয়ে বলেন, "কুটুম মানুষ, তাই ছেড়ে দিলাম। যখন পুরনো হয়ে যাবে, কান ধরে ঠিক জায়গায় সরিয়ে নেব।"

মোট কথা অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই আমার সঙ্গে মিনু বৌদির হৃদ্যতার সম্পর্ক স্থাপিত হ'ল। কিন্তু সে সম্পর্কে যেন ফাটল ধরার লক্ষণ দেখা গেল যখন মিলির সঙ্গেও আমার হৃদ্যতার সম্পর্ক স্থাপিত হতে চলল। সবিস্ময়ে অনুভব করলাম বৌদি যেন আমার সঙ্গে আর ঠিক তেমন ভাবে হাসেন না, ঠিক সে ভাবেও কথা বলেন না। অবশ্য আমার প্রতি তাঁর আদর-যত্নে কোন ত্রুটি দেখা গেল না, বরং সত্যি বলতে কি তাঁর ব্যবহার যেন আরও নিখুঁত হয়ে উঠল। সে বাড়িতে যাওয়া মাত্র ব্যস্ত হয়ে কুশল জিজ্ঞাসা করা, সময় যাই হোক না। কেন, সঙ্গে সঙ্গে চা তৈরি করা, বিদায় নেবার সময় দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দেওয়া প্রভৃতি আগে যা হ'ত না, তা পর্য্যন্ত শুরু হয়ে গেল। বলা বাহুল্য, এর ফলে প্রথমে আমার ঘরদোর অগোছাল করা বন্ধ হ'ল, তার পর বন্ধ হ'ল অনিয়মিত সময়ে আসা। বৌদির সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা, এমনকি কথার পরিমাণও ধীরে ধীরে কমে এল। কিন্তু তাঁর এই পরিবর্ত্তনের কারণটা কি? তাঁর গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে ব্যাপারটার কোন সম্পর্ক নেই তো? কয়েকদিন সজাগ দৃষ্টি রেখে চলতেই এমন একটা জিনিস আমার চোখে পড়ল যা আগে লক্ষ্য করি নি। মিনু বৌদির স্বামী থেকে আরম্ভ করে শ্বশুর-শাশুড়ী পর্য্যন্ত তাঁকে যেন একটু সমীহ করে চলেন। বাইরের লোকের উপস্থিতিতে যেটা সমীহ নিজেদের মধ্যে সেটা দূরত্ব নয় তো? হয়তো এটাই আসল ব্যাপার, আমি বাইরের লোক হয়ে এতদিন বুঝতে পারি নি।

অবশ্য আমি শুধু সাংসারিক কারণটা অনুমান করেই নিশ্চিন্ত ছিলাম না, অন্য একটা বাস্তব সম্ভাবনার কথাও আঁচ করতে লাগলাম। বউদির এই পরিবর্ত্তনের কারণটা আমিই নই তো? মিলির সঙ্গে আমার মেলামেশা কি তাঁর অভিপ্রেত নয়? সন্দেহটা একটু আকস্মিকভাবেই মনে জেগেছিল। একদিন মিলির কি একটা কথায় আমি হেসেছিলাম। বৌদিকে প্রসন্ন করার উদ্দেশ্যে আমিও মিলির কথার জবাবে একটা কথা বললাম। বউদি হাসলেন আর সে হাসি দেখে আমি চমকে উঠলাম—এ যে কাষ্ঠ-হাসি। চকিতে মনে পড়ল রাতার বিয়ের দিন ঠিক এইরকমই হাসি আমি বৌদির মুখে দেখেছিলাম, প্রথম আলাপ বলে যে হাসির অর্থটা তখন ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি।

আমার আশঙ্কাটা যে সত্য অর্থাৎ মিনু বৌদি যে আর আমাকে সুনজরে দেখছেন না সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে খুব বেশী দেরি লাগল না। কলেজের টিউটোরিয়ালে একদিন কড়া রকমের ধমক খেয়ে মিলি কাঁদো কাঁদো হয়ে বাড়ী ফিরল। ভাগ্যক্রমে আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম। নিমজ্জমান ব্যক্তির খড়কুটো আঁকড়ে ধরার রীতি অনুযায়ী মিলি আমাকেই জিজ্ঞেস করে বসল ঝটপট আমি ওর বকেয়া টাস্কগুলো করে দিতে পারব কিনা। আমি একটু অনিচ্ছার ভাব দেখিয়ে রাজী হলাম। একদিনের মধ্যেই ওর টাস্কগুলো করে দিলাম আর তা দেখে শুধু মিলি নয়, মিলির প্রফেসাররা পর্য্যন্ত মুগ্ধ হয়ে গেলেন। অবশ্য তাঁদের মুগ্ধ না হয়ে উপায় ছিল না, কেননা সেটা মোটেই আমার হাত দিয়ে বেরোয় নি, আমাদের পাড়ার বেষ্ট বয় সন্তোষকে সিনেমার টিকিট ঘুষ দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিলাম। স্বভাবতঃই এহেন দুর্লভ বিদ্বানকে মিলি হাতছাড়া করতে চাইল না, বড়দাকে দিয়ে অনুরোধ করালে ওকে মাঝে মাঝে একটু দেখিয়ে দিতে। তাঁর অনুরোধ আমি এড়াতে পারলাম না, মিলির অনারারি মাষ্টারের পদ গ্রহণ করলাম।

মিত্তির-বাড়ীতে প্রথম পদার্পণের পর কয়েকটা মাস কেটে গেলেও আমি তখন পর্য্যন্ত খুব ঘন ঘন সে বাড়িতে যাওয়া-আসা আরম্ভ করতে পারি নি—নিত্য-নূতন অজুহাত উদ্ভাবন করে চললেও তাতে কুলিয়ে উঠছিল না। মিলির পরীক্ষার আর বেশি দেরি নেই, সুতরাং প্রথম থেকেই ওর প্রতি মনোযোগ দিতে হ'ল। পর পর কয়েকদিন আমাকে দেখে বৌদি আমার দিকে কেমন ভাবে যেন তাকালেন, আর তার পর একদিন কুশল প্রশ্ন করার বদলে ফিক করে হেসে বললেন, "আজকাল কোন্ দিকে সূর্য্য উঠছে?"

বহুদিন পর বৌদির মুখে হাসি। আমি খুশীতে উপচে পড়লাম। কি জানি আমার প্রতি তাঁর মনোভাবের পরিবর্ত্তনও হয়ে যেতে পারে। তার যেন লক্ষণও দেখলাম। অন্যদিন বারান্দায় চায়ের ডাক পড়ত, আজ বৌদি মিলির ঘরেই চা নিয়ে এলেন। আমাকে মাথা নিচু করে একাগ্র ভাবে লিখে যেতে দেখে বৌদি বললেন, "এ আবার কি হচ্ছে ঠাকুরপো?"

আমি ভারিক্কী চালে বললাম, "মাষ্টারি। এখন থেকে আর ঠাকুরপো নই, মাষ্টারমশাই।"

"তা হঠাৎ মাষ্টারি কেন? মিলি বলেছে বুঝি?"

মিলি বলে উঠল, "হ্যাঁ বৌদি, নন্তুদা খুব ভাল মাষ্টার। ওর নোট দেখে প্রফেসাররা কত সুখ্যাত করলেন।"

বৌদির গলায় অকৃত্রিম বিস্ময় বেজে উঠল, "বটে! কিন্তু শাস্তা যে বলে নন্তু ঠাকুরপোর ছাত্রজীবনের কীর্ত্তি দেয়ালে বাঁধিয়ে রাখার মতন।"

বৌদির কথাটাকে আমি পরিহাস বলে ভাবতে চেষ্টা করলেও কানদুটো নিদারুণ গরম হয়ে উঠল। মিলি আমাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করলে, "ভাল ছাত্র হলেই ভাল মাষ্টার হবে এমন কোন কথা নেই বৌদি। মাষ্টারি করাটা একটা আর্ট।"

"দেখি আমাদের নন্তুবাবু কি রকম আর্টিষ্ট।" এই বলেই মিনু বৌদি খাতাটা টেনে নিলেন ফস করে।

বৌদির মুখে হাসি দেখে প্রাণে যে খুশীর বান ডেকেছিল তাতেই মন থেকে ধুয়ে-মুছে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল রাত্রি জেগে অনেক যত্নে মুখস্থ করা সন্তোষের আদ্যোপান্ত নোট। সুতরাং

এতক্ষণ আমি যা লিখছিলাম বা যা লেখার চেষ্টা করছিলাম সেটা নির্ভেজাল আমারই লেখা। অল্পক্ষণের মধ্যেই অনার্স গ্র্যাজুয়েট মিনু বৌদির নাসিকা কুঞ্চিত হয়ে উঠল। সেই রকম মর্ম্মভেদী কাষ্ঠহাসি হেসে বললেন, "এই বুঝি আর্টিষ্টের ইংরেজী!"

আমার মাথায় রক্ত চলে গেল। মুহূর্ত্তে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, "আমি মাষ্টারি করতে এসেছি, মাষ্টারির পরীক্ষা দিতে নয়। আপনার স্বামী অনুরোধ করেছিলেন বলেই পড়াতে রাজী হয়েছিলাম কিন্তু এখন দেখছি তিনি ভুল করেছেন। আচ্ছা নমস্কার!"

চায়ের কাপটা একপাশে ঠেলে দিলাম। ভরা কাপ থেকে ছলাৎ করে খানিকটা চা উপচে পড়ল টেবিল ক্লথের উপর। জুতোটা পায়ে গলিয়ে গট গট করে বেরিয়ে এলাম।

মাথার রক্তটা কবে নামত জানি না, সদাহাস্যময় রমেশদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ট্রামে। সেই প্রকাণ্ড থাবাটা সশব্দে আমার পিঠে বসিয়ে দিয়ে বললেন, "কি রে ছোড়া, আজকাল যে আর ঘাস নে বড়? বৌদির বকুনি খেয়েছিস নাকি?"

আমি আমতা আমতা করতে লাগলাম। ভীষণ ব্যস্ত, চাকরির খোঁজ-খবর করছি, দু'চারটে ইন্টার-ভিউও পেয়েছি, একটা কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় বসব ভাবছি ইত্যাদি ইত্যাদি। রমেশদা এক ফুৎকারে সমস্ত অজুহাত উড়িয়ে দিয়ে আমার কলার ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন। বৌদির সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললেন, "এই যে তোমার পলাতক আসামী।"

বৌদির মুখে বিশেষ ভাবান্তর দেখা গেল না। বললেন, "ও, ভাল আছ ত? বস।"

রমেশদার হৈ চৈ শুনে মিলি কৌতূহলী হয়ে বাইরে এল। কিন্তু আমাকে দেখেই হঠাৎ লাল হয়ে উঠল ওর গাল দুটি। কিছু না বলেই পায়ে পায়ে পিছনে সরে পড়ল।

বৌদির ঘরে ডাক পড়ল। পট থেকে চা ঢালতে ঢালতে বৌদি গম্ভীর ভাবে বললেন, "এতদিন আস নি কেন?"

চুপ করে রইলাম।

ঠোঁটের কোণে একটু বাঁকা হাসি ফুটে উঠল বৌদির। বললেন, "রাগ করেছিলে বুঝি?"

আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল। বললাম, "আপনি সর্ব্বজ্ঞ, সুতরাং আপনার প্রশ্নের জবাব না দিলেও বোধ হয় চলবে।"

বৌদি বললেন, "সর্ব্বজ্ঞ না হলেও ভেবেছিলাম তোমাকে চিনেছি। আমার ধারণা হয়েছিল ঐ সামান্য কথাটা তুমি গায়েও মাখবে না। কিন্তু এখন দেখছি ভুল করেছি। নিঃসন্দেহে তুমি একটা সেন্টিমেণ্টাল ফুল।"

বৌদির কণ্ঠে পরিহাসের তরলতা। আমার কাছে সেটার একটাই মাত্র অর্থ—ভিতরের বিদ্রূপ ঢাকা দেবার প্রচেষ্টা। তিক্ত স্বরে জবাব দিলাম, "সেটা আমিও জানি। সেইজন্তেই ত বুদ্ধিমানদের থেকে দূরে থাকতে চাই।"

স্বল্পভাষিণী মিনু বৌদি হেসে গড়িয়ে পড়তে চাইলেন, "শরীরে এত রাগ থাকলে কিন্তু কিছুই করে উঠতে পারবে না বলে দিচ্ছি।"

রান্নাঘরে চলে গেলেন বৌদি। আমি উঠে আসছিলাম··· কিন্তু মিলি কোথায়? সেই যে দেখা দিয়েই চলে গেল তার পর ত আর এল না।

খুঁজতে খুঁজতে ছাদে দেখা পেলাম। যা অনুমান করেছিলাম তাই। মিলি অচঞ্চল দীপশিখার মতন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কাছে যেতেই অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

হেসে বললাম, "কোথায় বৌদির হয়ে ক্ষমা চাইবে তা নয় উল্টে এমন ভাব দেখাচ্ছ যেন আমিই গরু চুরির দায়ে ধরা পড়েছি।"

"হেসো না। বৌদি তোমায় এমন কি বলেছিল যে তোমায় রাগ করে চলে যেতে হবে? একটু ঠাট্টাও বোঝ না।" মিলি বলল।

আমার আর সহ্য হ'ল না, বলে উঠলাম, "আমি নেহাৎ দুগ্ধ-পোষ্য শিশু নই মিলি, অমন করে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা না করলেও চলবে। তোমার বৌদিকে চিনতে আমার বাকি নেই, তোমাদের সঙ্গে ওঁর কি সম্পর্ক তাও জানতে বাকি নেই। কি জবাব দিচ্ছ না যে বড়?"

আমার এই আকস্মিক বিস্ফোরণে কিন্তু মিলিকে বিচলিত বোধ হ'ল না। মনে মনে হাসলাম। কে জানে হয়ত মিলির সঙ্গেও বৌদির এক হাত হয়ে গেছে। কিন্তু সেদিকে না গিয়ে মিলি একটু ফিকে হেসে বললে, "কিন্তু এও বলব তোমার না আসার কোন কারণ ছিল না। দাদার চেয়ে বৌদি বড় নয় নিশ্চয়ই। তুমি এত দিন এলে না, আমার কত ক্ষতি হ'ল ভেবে দেখ নন্তুদা।"

আমি ভেবে দেখলাম এবং তার পর ভাবতে ভাবতেই মিলির পড়ার টেবিলে গিয়ে বসলাম। আবার তুলে নিলাম কাগজ পেন্সিল। মিনু বৌদি একবার এসে দেখে গেলেন। আমি চামড়াটা গণ্ডারের মতন শক্ত করে বসে রইলাম, না, আর অত সহজে রাগ করছি না। অবশ্য মিনু বৌদিও কিছু বললেন না। ঘড়ি দেখবার অছিলায় মুখ তুলে দেখলাম তাঁর ঠোঁটের কোণে সেই বাঁকা হাসিটি লেগেই রয়েছে।

তিন

কিন্তু গণ্ডারের চামড়া যত পুরুই হোক বিশেষ রকম গুলী ভেদ করবেই। মিনু বৌদির নিক্ষিপ্ত গুলী আমার চামড়া ভেদ করে কলজেটা ঝাঁঝরা করে দিতে লাগল কিন্তু আমি ধরাশায়ী হয়েও মাটি কামড়ে পড়ে রইলাম মিত্তিরবাড়ীর। লজ্জা মান ভয় তিন থাকতে নয়। বৌদি আর একটার প্রতি আঙুল নির্দ্দেশ করেছেন—রাগ। এই চার রিপুর একটার বশীভূত হয়েছ কি একেবারে মরেছ।

দুর্জ্জনকে বিতাড়নের উদ্দেশ্যে বৌদি এবার যে প্রণালীটা গ্রহণ করলেন তা একটু ভিন্ন রকম—বাক্য নয় ব্যবহার। মিলিরা তিন ভাই, এক বোন। শ্বশুর-শাশুড়ী বৃদ্ধ হয়েছেন—উপরেই থাকেন তাঁরা। দোতলায় থাকেন বৌদি আর দাদারা। মিলির পাশের ঘরটায় থাকে মিলির দুই দাদা যদিও রাত ন'টার আগে তারা বাড়ীতে ফেরে না। বারান্দার অন্য ধারে রান্নাঘর। সন্ধ্যের পর সাধারণতঃ বৌদির রান্নার তদারকেই ব্যস্ত থাকার কথা কিন্তু কি আশ্চর্য্য, যখনই মিলির ঘরের দরজার দিকে তাকাই তখনই দেখি বৌদি পাশ দিয়ে চলে গেলেন। কোনদিন হয় ত তাঁর সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে যায়। তাঁর মুখভাব সেই রকমই গম্ভীর, দৃষ্টিতে নিরাসক্ত একটা স্তব্ধতা—দেখলেই মনটা দমে যায়। মাথা গুঁজে লিখতে লিখতে হয় ত এক সময় ক্লান্ত হয়ে মাথা তুলেছি, হঠাৎ চমকে উঠে দেখি মিনু বৌদি ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে—কতক্ষণ ধরে কে জানে! নির্ব্বিকার ভাবে তিনি প্রশ্ন করেন, "তোমার ঘড়িটা ঠিক আছে ত ঠাকুরপো?" হয় ত অনেকক্ষণ বক্ বক্ করে সবে নীরব হয়েছি, হঠাৎ চমকে উঠি—মিলির দাদাদের ঘর থেকে বৌদির গুন্ গুন্ গান ভেসে আসছে। বলা বাহুল্য, আমার তরুণ রক্তটা ছলাৎ করে উঠত কিন্তু মিলির কাছ থেকেই পেয়ে গেলাম শিক্ষা। বৌদির এত কলকারখানা ও যেন কিছুই বোঝে না। মনে মনে মিলির তারিফ করে আমিও সেই পন্থা অবলম্বন করলাম। যস্মিন দেশে যদাচার। শুধু দেশে নয়, গৃহেও। বোবারও শত্রু থাকতে পারে কিন্তু যে জেগে ঘুমোয় তাকে জাগান সত্যিই দুষ্কর।

তা সত্ত্বেও আমার দিন ঘনিয়ে এল। মিলির থার্ড ইয়ারের পরীক্ষা হয়ে গেল, ফল মোটেই আনন্দজনক নয়। অবশ্য মিলি আগেও কোন দিন এর চেয়ে ভাল রেজাল্ট করে নি এবং এবারকার জন্যেও ওকে বিশেষ লজ্জিত মনে হ'ল না। কিন্তু হতভাগ্য মেষ-শাবককে কোতল করার পক্ষে ব্যাঘ্র মহাশয়ের এই অপরাধই যথেষ্ট। কম্পিতবক্ষে সেই প্রতীক্ষাই করছি। একদিন ডাক পড়ল বৌদির ঘরে। বৌদির মুখ গম্ভীর। গম্ভীর ভাবেই বললেন, "বসো ঠাকুরপো, তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে।"

ফাঁসির আসামীর মতন উচ্চারণ করলাম, "বলুন।"

বৌদি বললেন, "তুমি ভাই আমাদের অনেক উপকার করেছ কিন্তু নিমকহারাম মিলিটা চিরকালের ফাঁকিবাজ, তোমার পরিশ্রমের মর্য্যাদা রাখতে পারলে না। ওর দাদাদের আর বাপ-মাকে ত তুমি ভাল করেই চেনো—কে কি করছে না করছে সেদিকে কারোরই নজর নেই। সবই এই দাসী-বাঁদীকে দেখতে হয়। তুমি আসা অবধি আমি নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম কিন্তু এখন দেখছি তোমাকে ভাল-মানুষ পেয়ে মিলি আরও বেশী করে ফাঁকি দিচ্ছে। তাই কিছু-দিন ধরে ভাবছিলাম, একজন মাষ্টার রাখব কিনা। তুমি ওর গার্জ্জিয়ান টিউটার হয়ে রইলে আর মাষ্টার, ওকে কান ধরে পড়াবে। এ না হলে ওর লেখাপড়া হওয়া অসম্ভব। তুমি কি বল?"

আমি তখন মা ধরণীকে দ্বিধা হতে বলছি। এর চেয়ে খোলা-খুলি বলাও ভালো ছিল—তুমি আর এস না। কিন্তু না, আর নিজেকে ধরা দেব না। একটা মস্ত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললাম, "তা হলে বৌদি, একটা সত্যি কথা বলি। আমি ছাত্র হিসেবে কোন কালেই ভালো ছিলাম না, মাষ্টার হিসেবে তার চাইতেও অপদার্থ। কিন্তু মিলি যখন সাহায্য করতে অনুরোধ করেছিল, তখন পিছিয়ে যেতে পারিনি—পাছে কেউ আমাকে ভীতু ভাবে। এটা বোধ হয় এ বয়েসেরই দোষ—ভীরুতার অপবাদ কিছুতেই সহ্য করা যায় না। অবশ্য অল্পদিনের মধ্যেই আমি আমার অযোগ্যতা বুঝতে পেরেছিলাম কিন্তু তখন পেছনে হটা আরও অসম্ভব। আজ আপনার কাছে গোপন করব না বৌদি, আমার দোষেই মিলির ভালো রেজাল্ট হয় নি। ওর জন্যে মাষ্টার রাখার কথা আমিই অনেক দিন ধরে বলব বলব ভাবছিলাম, আপনি বলাতে আমার কাজটা সহজ হয়ে গেল। যদি বলেন ত আমি ভালো মাষ্টারের সন্ধানও দিতে পারি। আমার এক বন্ধু আছে। ব্রিলিয়াণ্ট বয়—"

থেমে পড়লাম। মিলির কথা সন্তোষ জানে, ওর নোট যে আমার বেনামীতে মিলিকে দিচ্ছি, তাও ও জানে। ও মিলির মাষ্টার হলে আমার পক্ষে সেটা মন্দের ভালোই হবে। কিন্তু সন্তোষ ব্যস্ত মানুষ, এখন থেকে বৌদিকে কথা দেওয়া ঠিক হবে না।

বৌদি বললেন, "খুব ব্রিলিয়াণ্টের দরকার কি? কয়েকদিন আগে কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম বক্স নম্বরে, জবাবে অনেকগুলি চিঠি এসেছে। একজনকে আমার পছন্দও হয়েছে, সন্তোষ রায় না কি যেন নাম ভদ্রলোকের। ইকমিক্সে ফার্ষ্ট ক্লাস।"

আমি সর্পদষ্ট ব্যক্তির মতন চমকে উঠলাম। সন্তোষ! ব্যাপারটা এতদূর এগিয়েছে! মাষ্টারিটা অনেকটা ধাতস্থ হয়ে আসাতে আজকাল আর ওর কাছে রোজ যেতে হয় না। সপ্তাহ খানেকের মধ্যে দেখা হয় নি তাই এ বিষয়ে কিছু জানতে পারি নি। কিন্তু সন্তোষ পড়াবে মিলিকে? যে চেয়ারটি আমি দখল করে ছিলাম এতদিন, সেই চেয়ারে এসে বসবে সন্তোষ? ওর উজ্জ্বল চোখে নিজের শান্ত চোখ দুটি মেলে মিলি পড়ার আলোচনা করবে? ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির নীচে মাথা নীচু করে মিলি লিখে যাবে ঐ লাল রঙের পেন্সিলটা দিয়ে? আর তখনও কি মিনু বৌদি এমনি করেই দরজার পাশ দিয়ে চলে যাবেন বার বার? বেশ তাই হ'ক। সন্তোষ শুধু ভালো ছাত্রই নয়। ভালো ছেলেও এবং ভালো চেহারারও অধিকারী। সর্ব্ব দিক দিয়েই ও আমার চেয়ে যোগ্যতর।

নিজের মনের ভিতর থেকে আবার আমাকে চমকে উঠতে হয়। এক মুহূর্ত্ত আগে নিজে যাকে মিলির মাষ্টাররূপে কল্পনা করেছিলাম তারই সেই পদে নিয়োগের সম্ভাবনায় এত বিচলিত হয়ে উঠছি কেন? এ কি ঈর্ষ্যা? অবিশ্বাস? ছি ছি, এত দুর্ব্বল মন কেন? সন্তোষ আমার বন্ধু, প্রিয়তর বন্ধু। ছাত্রীটি

যে মিলি এ কথা জানতে পারলে ও হয় ত নিজে থেকেই এ মাষ্টারিতে অস্বীকার করবে। আমি যদি মুখ ফুটে নাও বলতে পারি, শান্তা বললেও হবে। শান্তার সঙ্গে ওর একটু ইয়েটিয়ে আছে। আমিই ওকে প্রথম পিসির বাড়ী নিয়ে গিয়েছিলাম। শান্তাকে ও প্রায়ই পড়া-টড়া দেখিয়ে দেয়। তবে কি শান্তাকেই গিয়ে ধরব? কিন্তু···এত কাঙালপনা কেন আমার? যেখানে আমি এতই অবাঞ্ছিত সেখানে নিজেকে আর কত হেয় করব? না থাক, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক বউদি!

সংযত কণ্ঠে বউদিকে জানালাম, সন্তোষ রায়কেই আমার পছন্দ। তার পর সে প্রসঙ্গ ছেড়ে অন্য কথায় এলাম। তার মধ্যে মধ্যে জানিয়ে দিলাম এবার আর চাকরি-বাকরি না পেলে আমার চলবে না। সেই চেষ্টায় এখন থেকেই ঘোরাঘুরি করছি, রোজ রোজ আসা হয়ত আর সম্ভব হবে না আমার পক্ষে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু বউদি অবুঝ। বার বার বলতে লাগলেন, যত-দিন মিলির মাষ্টার ঠিক না হয় আমি যেন নিয়মমত আসি। তা ছাড়া ওর জন্যে অতগুলো টাকা খরচ করা আদৌ সম্ভব হবে কিনা তাও চিন্তার বিষয়। সে যাই হোক আমি যেন অন্ততঃ ততদিনের জন্যে আসতে ভুল না করি।

একটা পার্কে ঢুকে বেঞ্চিতে গা এলিয়ে দিলাম। আর যে পারি না ভগবান! আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে বহু আগেই, কিন্তু তবু আমাকে চাই—ছাই ফেলতে যেমন ভাঙা কুলোটার কথা মনে পড়ে সবার আগে। আর গার্জিয়ান টিউটর? ছেলেমানুষের মত এই ফাঁকা কথাটা ব্যবহার না করলেই বুদ্ধিমতীর কাজ করতেন মিসু বউদি।

পড়ানো অব্যাহত রইল। আমার প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হব না—নিজেকে আর অত বোকার মত ধরা দেব না। ঘড়ি ধরে যাই, ঘড়ি ধরে আসি। প্রতিদিনই আশা করি যে, হয়তো গিয়ে দেখব সন্তোষ রায় এসেছে। যেদিন আসবে সেদিনই আমার ছুটি। মাষ্টার আসে না, বউদিও কিছু বলেন না, আমিও নীরবতা ভাঙি না। কিন্তু আশ্চর্য্য, মিলিও নীরব কেন?

চার

শরীরটা একটু খারাপ ছিল, দু'দিন পড়াতে যাই নি। তৃতীয় দিনে শান্তা এল। মামা-বাড়িতে, মানে আমাদের বাড়িতে এলে ধিঙ্গি শান্তাটা যেন কচি খুকুটি হয়ে পড়ে। ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে এসে গুম্ করে আমার পিঠে একটা কিল বসিয়ে দিয়ে বলল, "পিসির বাড়ি গিয়েছিলাম তোর খোঁজে, ওখানে না পেয়ে আসছি। সু-খবর আছে রে সন্তুদা। আগে মিষ্টির টাকা বের কর।"

রুদ্ধকণ্ঠে বললাম, "চাকরি?"

ঠোঁট বেঁকিয়ে শান্তা জবাব দিল, "তোকে কে চাকরি দিতে যাবে? তুই যে জন্যে হন্যে হয়ে উঠেছিলি সেই টিউশানি। খুব আরামের চাকরি। কিন্তু সবার আগে আমাকে একটা মাদ্রাজি ভ্যানিটি ব্যাগ দিবি বল—সেদিন নিউ মার্কেটে দেখে এসেছি।"

আমার নিশ্বাস যেন আরও বন্ধ হয়ে এল। "টিউশনি! কখন পড়াতে হবে?"

"সন্ধ্যেবেলায়। রোজ পড়াতে হবে। কিন্তু আগে বল্ ব্যাগটা দিবি?"

আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। সন্ধ্যেবেলায়!

টিউশনির জন্যে আমি কিছুদিন আগে একটু ব্যস্ত হয়ে উঠে-ছিলাম, সেকথা সত্যি। বাবার কাছ থেকে যা বেকার-ভাতা পেতাম আর দাদার কাছ থেকে ধাপ্পা দিয়ে যা আদায় করতাম, তাতে আমার দিনগুলো বেশ নিরুদ্বেগেই কেটে যাচ্ছিল। মিলির সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকে আমার খরচ অনিবার্য্য কারণে দু'-আড়াই গুণ বেড়ে গেলেও সমস্যার সমাধান হয়ে যায়—দাদা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয় আর তার পর থেকেই দাদার দিল একেবারে দরাজ হয়ে ওঠে। আর আমার বউদি মেয়েটিও সত্যিই লক্ষ্মী। রাত্রে শূন্য পকেটে বাড়িতে ফিরলেও পরদিন ফাঁকা পকেট নিয়ে বাড়ি থেকে বেরুতে হ'ত না। কিন্তু লক্ষ্মীর কৃপা সত্ত্বেও আমার অনটন দেখা দিয়েছিল মিলির অনারারি মাষ্টার নিযুক্ত হবার পর। সন্তোষ আমার যত বন্ধুই হোক রোজ রোজ তাকে খাটিয়ে নেবার বদলে অন্ততঃ মাঝে মাঝে তার সিনেমা রেস্তোরা এবং খেলার টিকিটের খরচ আমায় জোগাতে হয়ই। সেই সঙ্গে আরও এক জনের পাউডার লিপষ্টিক, স্নো সেন্টের খরচ জোগাতে হ'ত। তিনি আমার বোন শান্তা।

ব্যাপারটার একটু ইতিহাস আছে। সন্তোষকে দিয়ে লেখানো নোট যেদিন প্রথম মিলিকে দিয়েছিলাম তার দু'-একদিন পরেই শান্তা মিলিদের বাড়িতে আসে। মিলি কথায় কথায় আমার লেখার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে আর সেটা শান্তাকে দেখায়। নোটগুলোর দিকে তাকিয়েই শান্তা সব বুঝতে পারে। প্রায় একই নোট সন্তোষ তাকে দিয়েছে। শান্তা তখন মিলির মতই থার্ড ইয়ারে পড়ত। এর পর শান্তার মতন দজ্জাল মেয়ের পক্ষে যা স্বাভাবিক তাই হ'ল। ও ছুটে আমার কাছে এল। ভয় দেখাল মিলিকে বলে দেবে সবকিছু। আমাকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা ওর সফল হ'ল। আমি সঙ্গে সঙ্গে ওকে নিয়ে গ্র্যাণ্ডে ছুটলাম। তার পর খেলার মাঠের গ্যালারিতে বসে বললাম অনেক কথা। বললাম, ওর মত মেয়ে এ জগতে আর দ্বিতীয়টি নেই, রূপে-গুণে বিদ্যায়-বুদ্ধিতে ও আমাদের গোষ্ঠীর উজ্জ্বলতম রত্ন। এটাও জানিয়ে দিলাম যে, এমন গুণধর বোনের মামাতো ভাই হবার সৌভাগ্যে এবার থেকে ওর প্রসাধনদ্রব্যগুলো জোগান দেবার ভারটা আমিই নেব।

সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই আমি দু' একটা টিউশনির জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। তবে সেটা কয়েক মাস আগেকার কথা। এখন আমি ছুটি নিতে পারলেই বাঁচি। কিন্তু···কিন্তু···তাই যদি

হবে তবে সন্ধ্যেবেলায় পড়াবার নাম শুনে অমন করে চমকে উঠলাম কেন? নিজের অন্তরের রূপটা দেখে নিজেকেই আমি ধিক্কার দিয়ে উঠলাম। এখনো আমি আশা করে আছি! ছিঃ। মিলির মাষ্টার আসার আগেই ছুটি নেবার এই তো শ্রেষ্ঠ সুযোগ।

ধ্যান ভঙ্গ হ'ল শান্তার কথায়। "টিউশানির নাম শুনেই যে তোর ভাব লেগে গেল নন্তুদা!"

আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললাম, "তোকে যে কি বলে আশীর্ব্বাদ করব ভেবে পাচ্ছি না শান্তা। সত্যি তোর মত মেয়ে হয় না। একটা কেন দুটো ব্যাগ তোকে দেব। ঠিকানাটা বল।"

"এই যাঃ, ঠিকানাটা তো আনি নি। মিলির কাছেই আছে।" শান্তা অপ্রস্তুত হয়ে জবাব দিল।

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, "মিলির কাছে কেন?"

"ও তোকে বলতে ভুলে গেছি। মিলির কাছে একদিন বলেছিলাম তোর মাষ্টারটির কথা। ঐ তো ঠিক করে দিয়েছে। ওর বউদির এক আত্মীয়ের ছেলেকে পড়াতে হবে। তুই দুদিন ধরে যাচ্ছিস না, তাই জানতে পারিস নি। তোর জন্যে মিলি অনেক পরিশ্রম করেছে।"

আমি স্তম্ভিত। মিলি ঠিক করে দিয়েছে টিউশানি! যে মিলির জন্যে আমি প্রিয় বন্ধুদের ত্যাগ করেছি, প্রিয়তম আড্ডা ত্যাগ করেছি, এমনকি প্রাণাপেক্ষা প্রিয় রোয়াক পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়েছি সেই মিলির আমাকে বিতাড়নের জন্যে এত ব্যস্ততা? এতদিনে বুঝতে পেরেছি মিলির নীরবতার অর্থ। এতদিনে চিনতে পেরেছি মিলিকে। ভালই করেছিস শান্তা, ভালই হয়েছে। ভালই হয়েছে স্বপ্ন ভেঙে গিয়ে।

চোখ-মুখ ভীষণ জ্বালা করছিল, একটা অজুহাত দেখিয়ে বাথ-রুমে গিয়ে ভাল করে ধুয়ে এলাম। ঠাণ্ডা জল পান করলাম এক গ্লাস। বাইরের জ্বালা কমল, ভিতরটা জ্বলতে লাগল হু হু করে।

ঠিকানা জানতে এবং মিলিকে শেষবারের মত পড়াতে মিত্তির-বাড়িতে এসেছি। গতকাল শান্তাকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছিলাম, আজ যাব। শান্তাকেও বলেছিলাম ও যেন সঙ্গে থাকে। উত্তেজনার মুখে পাছে বেফাঁস কিছু বলে ফেলি সেই আশঙ্কাতেই এই সতর্কতা। দোরগোড়াতেই মিনু বউদির সঙ্গে দেখা। উজ্জ্বল হয়ে তিনি বললেন, "আরে নন্তুবাবু যে! এস এস। কি ব্যাপার বল ত? বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলে কেন?"

বৌদির মুখে অকৃত্রিম হাসি। কিন্তু আর আমার মাথা ঘুরল না। বরং গাটা জ্বালা করতে লাগল। সংক্ষেপে শুধু বললাম, "সর্দ্দি হয়েছিল।"

বৌদি চট করে মুখের ভাব বদলে ফেললেন। উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, "খুব ভিজেছিলে বুঝি?"

শান্তা হেসে বলল, "তুমি ক্ষেপেছ বৌদি! ব্যাঙের আবার সর্দ্দি! ছেলেবেলা থেকে ভিজে ভিজে ও সর্দ্দিপ্রুফ হয়ে গেছে অথবা বলতে পার সর্দ্দি ওর বারোমাসই লেগে রয়েছে। নতুন করে ওর সর্দ্দি লাগবে কি?"

কিছুদিন আগে হলেও ইঙ্গিতটা বেশ উপভোগ করতাম, কিন্তু এখন শান্তার কথাগুলো ছুঁচের মতন বিঁধতে লাগল। বিরক্তি গোপন না করেই এগিয়ে যাচ্ছিলাম, বৌদি খপ করে হাতটা ধরে বললেন, "জ্বর নেই ত? না বাপু তুমি সাবধানে থেক ঠাকুরপো। সময়টা বড় খারাপ।"

বৌদি প্রথমে আমার হাত, তার পর কপাল পরীক্ষা করলেন। আমার প্রতি তাঁর এতখানি স্নেহ আগে কোনদিন দেখা যায় নি, আমার স্বাস্থ্যের বিষয়েও এতটা চিন্তিত তাঁকে হতে দেখি নি। কিন্তু তাতে আমি বিস্ময় বোধ করলাম না। এতক্ষণে আমি বুঝে গেছি বৌদির এই পরিবর্ত্তনের কারণ। তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, আমাকে বিতাড়ন করতে সক্ষম হয়েছেন, এত বড় আনন্দ বাইরে প্রকাশ না হয়ে পারে?

বৌদির ন্যাকামি বুঝতে পারি কিন্তু মিলির ভণ্ডামি অসহ্য! আমার গলা শুনে ও দৌড়ে এল। কলকল করে বলল, "তুই বুঝি নন্তুদাকে ধরে নিয়ে এলি শান্তা? কি ব্যাপার নন্তুদা, এ রকম ডুমুরের ফুল হয়ে উঠলে কেন?"

সে কথার জবাব না দিয়ে বললাম, 'তিন দিন আসি নি, কি টাস্ক করলে দেখি। শান্তা সঙ্গে আছে, কনসাল্ট করা যাবে।"

বড় বড় চোখ করে মিলি বলল, "ও বাবা, এত সিরিয়াস মাষ্টার! না আজ পড়ব না, শুধু গল্প করব। তুইও আয় শান্তা।" বলেই একটা কাণ্ড করল। আমার একটা হাত ধরে বলল, "চল।"

হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, "আমার সময় কম। পড়ার কিছু না থাকলে আমি চললাম।"

বৌদি পাশেই দাঁড়িয়ে। মিলি আবার হাতটা টেনে ধরে বলল, "কবে থেকে এত কাজের মানুষ হলে শুনি? তুমি আসবে জেনে আমি আর বৌদি দু'জনে মিলে কত খাবার তৈরি করেছি, সেগুলোর কি হবে? আর শুধু খাবার নয়, খবরও আছে।"

টিপয়টার চারদিকে আমরা চারজন বসলাম। খাবার আজ সত্যিই প্রচুর। কিন্তু আমি সামান্যই খেতে পারলাম—সবই বিস্বাদ মনে হচ্ছে। বৌদি মিলি আর শান্তা তিন জনে খুব কথা বলে চলেছে, আমি প্রায় নীরব। শুধু মাঝে মাঝে হুঁ হাঁ জবাব দিচ্ছি। বৌদি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার আজ কি হয়েছে ঠাকুরপো?"

"মাথা ধরেছে", জবাব দিলাম।

মিলি আর শান্তা হেসে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ল। কথাটায় এত হাসির কি আছে বুঝতে পারলাম না।

বৌদি চলে গেলেন। একটু পরে শান্তাও উঠে গেল। মুখরা মিলি থেমে গেল অকস্মাৎ। বড় ঘড়িটার টক্ টক্ শব্দ স্পষ্ট শোনা যায়। মিনিটের কাঁটাটা এগিয়ে চলেছে লাফিয়ে লাফিয়ে।

মিলি একেবারে চুপ। মাথা নিচু করে পেন্সিল দিয়ে হিজিবিজি কাটছে, চোখ তুলে তাকাচ্ছে না একটিবারও। বহুক্ষণ কেটে গেল নীরবতায়। অবশেষে আমি দাঁড়িয়ে উঠে বললাম, "চলি।"

নত দৃষ্টিতেই মিলি বলল, "খবরটা শুনে গেলে না?"

"শুনেছি, শান্তার কাছ থেকে।"

মিলি একটু যেন চমকে উঠল, "শুনেছ!"

তার পর একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, "আমি কিন্তু ওকে বলতে মানা করে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম আমিই তোমাকে বলে চমকে দেব।"

তা বটে। চমকে দেবার মতই ব্যাপার বটে। বললাম, "ঠিকানাটা দাও"

এতক্ষণে মিলি চোখ তুলে তাকাল। "কিসের ঠিকানা?"

"ছাত্রের ঠিকানা। কাল থেকেই শুরু করব।"

মিলির দৃষ্টি আবার নেমে এল। একটু ভাবল মিলি। তার পর বলল, "আচ্ছা শান্তা তোমায় কি বলেছে বল ত?"

বিরক্ত হয়ে জবাব দিলাম, "সে তুমিও যেমন জান আমিও জানি। আমার মাথাটা বড্ড ধরেছে, আর দাঁড়াতে পারছি না। ঠিকানাটা লিখে দাও। ছাত্রের নামটাও লিখ।"

"ঠিকানা বৌদির কাছে আছে, এক্ষুণি এনে দিচ্ছি" এই বলে মিলি চলে গেল। বেশ একটু পরে ফিরে এল এক টুকরো কাগজ হাতে করে। বলল, "এই যে নন্তুর নাম-ঠিকানা। বৌদি বলল কাল থেকেই শুরু করতে হবে।"

সে কি আর আমার অজানা আছে! মনে মনে একটু ক্রুর হাসি হেসে কাগজটা নিলাম। লেখার দিকে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গেই আমার হাতটা কেঁপে গেল। ধপ করে বসে পড়ে বললাম, "এর অর্থ?"

চিরকুটে লেখা রয়েছে মিলির নাম আর ঠিকানা। হস্তাক্ষর মিনু বৌদির।

মিলি নিরুত্তর। এতক্ষণে লক্ষ্য করলাম ওর মুখখানা যেন একটু রাঙা। ফ্যাল ফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললাম, "এসব কি মিলি? এর মানে কি?"

"আমি জানি না। বৌদিকে জিজ্ঞেস করে এস।"

যন্ত্রচালিতের মতন আমি উঠে দাঁড়ালাম। মিলি আমার জামাটা টেনে ধরে বলল, "ওকি, সত্যিই চললে নাকি? বোকা কোথাকার!"

আমি আবার বসে পড়লাম। চোখের সামনে ভেসে উঠল অনেক কিছু। বৌদির অপ্রসন্ন মুখখানা, মাষ্টারের বিজ্ঞাপন। আমার মাষ্টারী···সবকিছু তালগোল পাকিয়ে একাকার হয়ে গেছে। আকুল হয়ে বললাম, "কিন্তু আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না মিলি!"

পর মুহূর্তেই সবকিছু জলের মতন স্পষ্ট হয়ে গেল। এ ত অতি সহজ ব্যাপার। আমি টিউশানি খুঁজছি এ কথা শান্তার মুখ থেকে শুনলে এদের মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে আমি যে টাকা চাই এটাই প্রকারান্তরে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাই এরা আমাকে মাইনে দেবে ঠিক করেছে। পরেরটুকু শান্তার দুষ্টুমি। ছি ছি কি লজ্জার ব্যাপার! হায় শান্তা তুই জানিস না কি ক্ষতি আমার করলি!

চারপাশে তাকালাম। ঘরে তৃতীয় ব্যক্তি কেউ নেই। পর্দাটা ভালো ভাবে টানা রয়েছে। মিলির পাশে বসে ওর হাতখানা ধরে বললাম, "তোমার দিব্যি দিয়ে একটা কথা বলব মিলি, বিশ্বাস করবে?"

"কি কথা?"

"শান্তা কি বুঝেছে আর কি বলেছে জানি না কিন্তু বিশ্বাস কর তোমাদের কাছ থেকে টাকা নেবার চিন্তা আমি স্বপ্নেও করিনি।"

"তা আমি জানি, শান্তাও জানে। আমরা সবাই তা জানি।"

ক্ষুব্ধ হয়ে বললাম, "তবে এ সব টাকা-পয়সার ব্যাপার কেন? ছি ছি মিলি, এত বড় লজ্জা আমি জীবনে পাইনি; হতচ্ছাড়ী শান্তাটা—"

"শান্তাকে দোষ দিচ্ছ কেন? ও ত টাকার কথা কিছুই বলে নি।"

"বলে নি?"

"না।"

আমি বিস্মিত। মিলি কি তাহলে শান্তাকে ঢাকতে চাইছে? মিলি বললে, "না, সত্যিই শান্তার এতে কোন হাত নেই। তোমার খরচ বেড়ে গেছে তাই বৌদি বাবাকে বলে তোমার হাত-খরচের সামান্য কিছু ব্যবস্থা করে দিয়েছে।"

মিলির কথাটা আমার ঠিক বোধগম্য হ'ল না। আমার মিলি-সংক্রান্ত বাহ্যিক খরচের পরিমাণ মিত্তির-বাড়ীতে আসার প্রথম দিকে যা ছিল এখনও তাই আছে, আর সে খবর মিনু বৌদির কেন, কারুর কাছেই গোপন করার চেষ্টা আমি আদৌ করিনি। তা'হলে আমার খরচ বেড়ে গেছে এতদিন পরে হঠাৎ এ কথা বলার অর্থ?

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড সন্দেহ হ'ল। বললাম, "কে বলেছে আমার খরচ বেড়ে গেছে?"

বিচিত্র দৃষ্টিতে মিলি তাকাল আমার দিকে: "কেউ বলেনি। আমরা সবাই জানি।"

কম্পিত বক্ষে প্রশ্ন করলাম, "কি জান?"

"অনেক কিছু। তোমার বন্ধু সন্তোষ রায়ের পেছনে মাসে কত টাকা খরচ কর?"

আমি ধরো ধরো গলায় চেঁচিয়ে উঠলাম, "মিলি।"

"তুমি যে সন্তোষ রায়কে দিয়ে নোট লিখিয়ে আমাকে দাও তা শান্তা ছাড়া আমি জানি আর বৌদিও জানেন।"

আমি পাগলের মত চেঁচিয়ে বললাম, "কবে থেকে জান?"

"প্রথম থেকেই। শান্তাই বলে দিয়েছিল।"

"আর বৌদি ?"

হঠাৎ ঘরের আলোটা নিভে গেল। নিভে গেল বৌদির ঘরের। তার পাশের ঘরের আর বারান্দার সব আলোগুলিও। আমি লাফিয়ে উঠলাম। মিলি কিন্তু চিন্তিত হল না। বলল, "দোতলার ফিউজটা পুড়ে গেল বোধ হয়। মাঝে মাঝে এমনি হয়।"

আমি বসলাম। বুকের ভিতরে তখনও প্রলয় চলেছে। রুদ্ধ কণ্ঠে বললাম, "জবাব দাও মিলি, বৌদি কবে জেনেছেন ?"

"সেই দিনই। আমিই বলেছিলাম।"

আমি সজোরে মিলির হাতখানা চেপে ধরলাম: "তুমি !"

দূরাগত আলোর ক্ষীণ আভাস ঘরের অন্ধকারকে একটু তরল করে তুলেছে। সেই আভাসেই জ্বল্ জ্বল্ করছে মিলির হাতের কঙ্কন আর কানের ঝুমকো। মুক্ত কেশগুচ্ছ থেকে দুটি-একটি চুল বাতাসে উড়ে উড়ে আমার মুখে এসে পড়ছে। বাতাসের তরঙ্গে তরঙ্গে ভেসে আসছে সুবাস—ওর কেশতৈলের, মুখের প্রসাধনের আর বক্ষের পুষ্পহারের। অতি—অতি নিকটে আমার ওষ্ঠের কাছে অনুভব করছি ওর উষ্ণ নিশ্বাস। আমাদের নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে সারা পরিমণ্ডল। আমাদের হৃদপিণ্ডের উত্থান-পতনের শব্দে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে পৃথিবীর বুকের স্পন্দন। পাশের ঘর থেকে মিনু বৌদি আর শান্তাও কি তা শুনতে পাচ্ছে ?

মিলি অতি মৃদুস্বরে বললে, "হ্যাঁ আমিই বলেছিলাম বৌদিকে—যে বাড়ীর ছেলেরা নিজেদের পরিচয় গোপন রেখে তাদের বোনকে নিয়ে অপরিচিত লোকের সঙ্গে নির্ভয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে পারে সে বাড়ীর বৌকে তুমি এতদিনেও চিনতে পারলে না ?"

অনুশোচনায় মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে বললাম, "আমি—আমি—আমায় ক্ষমা কর···"

হঠাৎ সব আলোগুলি একসঙ্গে জ্বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আমি স্প্রিংয়ের মতন ছিটকে সরে এলাম সোফার অন্য পাশে। আর তার পরেই যা দেখলাম তাতে আমার লোম খাড়া হয়ে উঠল। দেখি বাঁদিকের ইজিচেয়ারে আরাম করে শুয়ে রয়েছেন মিনু বৌদি, কোলে একখানা খোলা বই। তন্ময় হয়ে তিনি তাকিয়ে রয়েছেন, দৃষ্টি ছাদের দিকে নিবদ্ধ। যেন পড়তে পড়তে বই থেকে আপন মনে দৃষ্টি সরিয়ে এনেছেন নায়িকার কথা চিন্তা করার জন্যে। আলো জ্বলে ওঠায় তিনি নড়েচড়ে উঠে বসলেন। মুখে একটু বিরক্তি ফুটে উঠল। বইটা মুড়ে পাশের টিপয়ে রেখে আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, "শান্তাটা বড্ড বেশী দুষ্ট হয়ে পড়েছে। মেন বন্ধ করলি ত এত তাড়াতাড়ি খুলবার কি হয়েছিল রে বাপু !"

তার পর মিনু বৌদি ধীরপদে বেরিয়ে গেলেন সে ঘর থেকে।

তুমি ও আমি

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

সেই কানে কানে কথা রাতের গভীরে !
সেই যেতে যেতে চেয়ে দেখা ফিরে ফিরে !
সেই পরশনে তনু আবেশে অবশ !
সেই দূরে চলে গেলে পৃথিবী নীরস !
সেই পদধ্বনি শুনে চমকিয়া চাওয়া !
সেই কাছে এলে তুমি সব ভুলে যাওয়া !
সেই স্বপ্নভরা রাত, ডানা-মেলা দিন
অতীতের গর্ভে যদি হয়ে থাকে লীন—

দুঃখ নাই। ধরিয়াছ নূতন মূরতি !
কোথায় মিলালো সেই বধূ লজ্জাবতী !
কূজনেগুঞ্জনে ভরা সে দিনের ঘর
ঊর্মিল সিন্ধুর গানে আজিকে মুখর !
নীড় গেছে—আছে মহা-মানবের ভিড় !
তুমি আমি দু'য়ে আজ সারা পৃথিবীর !

বিলেতের বাঙালী পরিবার

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

ডাঃ কে, সি, ভট্টাচার্য, এম-বি (ক্যাল), এম-আর-সি-এস (ইংলণ্ড), এল-আর-সি-পি (লণ্ডন), এল-এম-এস-এস-এ (লণ্ডন) এখানকার বাঙালী সমাজের একজন জনপ্রিয় ও পরিচিত ব্যক্তি। বিশেষ করে তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী আশা দেবীর নামডাক খুব। তিনি কেমন একবার তাঁকে দেখবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু বাড়িটা জানতাম না বলে আর একজন সঙ্গী না পাওয়ায় এতদিন যেতে পারি নি।

সেদিন মিঃ বোসকে সঙ্গী পেলাম। এক বাসাতেই থাকি, কথায় কথায় আশা দেবীর কথা উঠল।

ডাঃ ভট্টাচার্যের ডিসপেনসারির ঠিকানা হচ্ছে, ১২২, কিংস ক্রস রোড, ডবলু সি, ১। কিন্তু সেখানে নয়। ওর বাড়িতে গেলাম। বাড়ির ঠিকানা, ৪২ গ্রীন ওয়াক, হেনডন, এন ডবলু ৪। মিঃ বোস কি সূত্রে যেন এঁদের বাড়িতে একদিন গিয়েছিলেন। যাবার আগে বলেছিলেন, একটা ফোন করে গেলে ভাল হয়। কোন্ সময় আশা দেবী থাকেন কি, না থাকেন—লণ্ডনের এইটেই হচ্ছে নিয়ম।

সে কথায় আমি সায় দিই নি। প্রথমতঃ ফোন করতে গেলে তিন পেনি লাগে, তার পর আবার যাবার খরচ। তিন পেনি খরচ করে মিঃ বোস যদি ফোন করতেন কিছুই আপত্তির থাকত না। কিন্তু আমি চেয়েছিলাম কপাল ঠুকে চলে যেতে। অত খরচ করতে আমার সাধ ছিল না। দেখা হলে ত ভালই, না হলে আর কি করতে পারি? ডাঃ ভট্টাচার্যের ভাই কলকাতার এক্সাইজ ইনসপেক্টর। দাদাকে উদ্দেশ্য করে তাঁর একখানা চিঠি ছিল আমার কাছে। এত দিন পড়েই ছিল ফাইলে। সেটার সদ্ব্যবহারও যাতে এই সুযোগে হয়ে যায়—সঙ্গে নিলাম।

কোনখান থেকে কি বাসে করে যেতে হয় অত আর লক্ষ্য করলাম না। অপরের সঙ্গে যেতে গেলে চোখ-কান বুজেই যাওয়া ভাল। দায়িত্বটা তখন আমার নয়—তাঁর। একটা বাস ছেড়ে আর একটা বাসে গিয়ে উঠলাম।

গ্রামাঞ্চলের পরিবেশের মধ্যে ডাঃ ভট্টাচার্যের বাড়ি।

বেল টিপতেই এক মিনিট পরে একটি মহিলা বেরিয়ে এলেন। পরনে সাদাসিধা শাড়ি, বেশ গোলগাল গড়ন, খুব চটপটে। কিন্তু তাঁকে অত্যন্ত ছেলেমানুষ-ছেলেমানুষ মনে হচ্ছিল। আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না, ইনি ডাঃ ভট্টাচার্যের স্ত্রী না মেয়ে। কারণ ডাঃ ভট্টাচার্যকে একদিন দেখেছিলাম ক্ষণিকের জন্য ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেণ্টস ব্যুরোর হোটেলে। তিনি খাচ্ছিলেন। খুব কালো এবং বয়স্ক লোক বলে মনে হয়েছিল। তাঁর স্ত্রী এত ছেলেমানুষ হতে পারেন না।

পরিষ্কার জিজ্ঞেস করে বসলাম, শ্রীমতী ভট্টাচার্যকে দেখতে চাই। তিনি কোথায়?

ওমা! তিনি ত আপনার সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন।

আশা দেবীর কি সুললিত হাসি!

বললাম, মাফ করবেন আপনাকে দেখে ঠিক বুঝতে পারি নি।

তাঁকে তাঁর দেওরের লেখা চিঠিখানা দিলাম। তিনি পড়ে রেখে দিলেন। হঠাৎ আপনি থেকে তুমিতে চলে এলেন। বললেন, বসো তোমরা।

ড্রয়িংরুমে অনেকগুলি গদিমোড়া কৌচ ও সুখাসন ছিল, টেলিভিশন ছিল। টেলিভিশনে 'কিং লিয়র' পালা হচ্ছে। সুন্দর ঘর, দোতলা বাড়ি, বাইরে একটু বারান্দা। বারান্দার শেষে একফালি খাল বয়ে যাচ্ছে, গাছপালায় খালটি আবৃত। একটু ফুলের বাগান, বাগানে প্রচুর গোলাপ গাছ, গাছে থোকা থোকা ফুল ফুটেছে। একটি চামড়ার কৌচে বসে লক্ষ্য করতে লাগলাম চারিধার।

আশা দেবী জিজ্ঞেস করলেন, কবে তুমি এসেছ, কতদিন থাকবে, কবে ফিরছ ইত্যাদি ইত্যাদি।

বললাম সব।

আমার সঙ্গে কথা বলে তিনি বোসকে নিয়ে পড়লেন—আমাদের অমুক দিনে যে ফাংসন হ'ল, তাতে তুমি গেলে না?

বোস বললেন, যেতে পারি নি। হাতে একটা কাজ ছিল।

যাই হোক, ২৭শে সেপ্টেম্বর শনিবার। বেলা পাঁচটা নাগাদ এস।

কোথায়?

ওয়ারেন ষ্ট্রীট—টিউব ষ্টেশনের নাম। ৪১নং ফিডস রয় স্কয়ারে একটা সভা আছে, তুমি আসবে?

আশা দেবী আমার দিকে চাইলেন।

বললাম, আমি ত সভাসমিতিতে যেতে চাই, কিন্তু কি রকম সভা? গান-টান আছে?

এ সভায় গান বোধ হয় হবে না। একজনের বিদায়-উপলক্ষ্যে সভা। ভারত গবর্ণমেণ্টের তিনি একজন ডান হাত।

বললাম, যাই ত আপনাকে পরে ফোন করব।

কোরো।

বললাম, এ রকম কোন সভা হয় না, যেখানে রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাওয়া হয়?

কেন হবে না? এই ত পঁচিশে বৈশাখ হয়ে গেল কত জায়গায়, রবীন্দ্র-সঙ্গীত প্রচুর গাওয়া হয়েছে। আমার মেয়েও ভাল রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইতে পারে।

আপনার মেয়ে কোথায়?

বড় মেয়েটির নাম মায়া, তার বিয়ে হয়ে গেছে, কলকাতায় আছে। মাঝে মাঝে আসে। ছোট মেয়ে ছায়া এখানে। তার পরীক্ষা সামনে, তাই এখন পড়ছে।

দুই মেয়ে বুঝি?

হাঁ। ছায়াকে ডাকছি, বসো। আশা দেবী ভিতরে চলে গেলেন।

খানিক পরেই ফিরে এলেন। বললেন, আসছে সে।

আমরা বাইরের বারান্দায় গিয়ে বসলাম। ঘরে দুর্দান্ত গরম হচ্ছিল।

আশা দেবী বললেন, এ বছর লণ্ডনে একটা এবনরম্যাল গরম পড়েছে, এরকম বড় একটা পড়ে না।

তার পর যে কত গল্প হতে লাগল, তার শেষ নেই।

তাঁর বাড়িতে চুরি হয়ে গিয়েছিল—সে গল্প তিনি বললেন। কলকাতা থেকে এনেছিলেন তাঁর যাবতীয় গহনা। মা তাঁর সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিলেন। এ বাড়িতে একটা ইংরেজ ঝি থাকত। বাইরের সার্জেণ্টের সঙ্গে তার ষড় ছিল। এক সময় তিনি ও ডাঃ ভট্টাচার্য বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, এসে দেখেন সব শেষ। যে রক্ষক, সেই ভক্ষক! পুলিশই চুরি করল। ধরা পড়ল, কিন্তু কিছুই তেমন হ'ল না। আইনের ফাঁক ছিল, পুলিশ রক্ষা পেয়ে গেল।

মিঃ বোস বললেন, এবার আমরা উঠি।

তখনও ছায়া এসে দেখা দেয় নি।

আশা দেবী বললেন, সে কি কথা? একটু চা না খেয়ে উঠবে কি? দাঁড়াও দেখছি, ছায়ার কি হ'ল।

বললাম, পরীক্ষার পড়া পড়ছেন উনি। নাই-বা এলেন?

না না, আসবে বৈকি।

আশা দেবী আবার ভিতরে চলে গেলেন।

বিপন্ন বোধ করতে লাগলাম। হয় ত মেয়েটি আড়াল থেকে দেখেছে, বুঝেছে আমরা নেটিভ। আমাদের কাছে আসবার তার কি প্রয়োজন? অথচ মায়ের যে রকম ব্যাকুলতা—মা তাকে দেখাবেনই।

শেষ পর্যন্ত আসরে এসে অবতীর্ণ হতে হ'ল ছায়াকে।

দু'হাত এক করে আমাদের উদ্দেশে নমস্কার জানালো সে।

সঙ্গে সঙ্গে আমিও প্রতিনমস্কার জানালাম। মেয়েটির দিকে ভাল করে চাইলাম। খুব অহঙ্কারী বলে তাকে মনে হ'ল না। তবে নিছক বাঙালীর মেয়ে—এটা তাকে দেখলেই বোঝা যায়। পরনে শাড়ী, চোখে মোটা লেন্সের চশমা। আর চেহারা স্বাভাবিক, আমাদেরই মত গায়ের রং, আর খুব রোগা।

বললাম, মা আপনাকে একান্তই বার না করে ছাড়লেন না।

ছায়া বললে, আমি আসতাম, আপনারা ত এসেই চলে যেতে পারেন না, তাই একটু পড়াশোনায় মন দিয়েছিলাম।

বললাম, আপনার পড়ায় ব্যাঘাত হয় এটা চাই না। শুধু আপনাকে দেখতে চেয়েছিলাম। দেখা ত হ'ল, এবার পড়ুন গিয়ে।

ছায়া হাসল, না পড়া একরকম আজকের মত শেষ হয়েছে। আপনারা এসেছেন, একটু কথা বলি।

অনেক কথা হ'ল ছায়ার সঙ্গে। বাংলার চেয়ে দেখলাম ইংরেজীতেই কথা বলার তার বেশী আগ্রহ, ইংরেজীতে কথা বলতেই সে ভাল পারে।

এক ফাঁকে আশা দেবী এলেন। বললেন, এ ত জন্মেছে লণ্ডনে। আর পড়ছেও কেমব্রিজের হোস্টেলে থেকে। ব্যারিষ্টারী পড়ে, কাজেই যখন বাড়িতে আসে তখন বাংলায় কথা বলে, নইলে ত হরদম ইংরেজি।

ছায়াকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কলকাতায় গেছেন?

মায়ের সঙ্গে গেছি কয়েকবার।

কেমন লাগে জায়গাটা?

আমার তত ভালো লাগে না। কেমন যেন পরাধীন হয়ে থাকতে হয় মেয়েদের। তার পর যা নোংরা শহর! সময় কাটানোই মুসকিল।

কথাটা মিথ্যে বলে নি ছায়া। যে মানুষ লণ্ডনের আব-হাওয়ায় সতেরোটা বছর কাটিয়েছে, কলকাতা তার পক্ষে কিছুতেই ভাল হতে পারে না।

খুব যত্ন করে আশা দেবী চা দিলেন। একটা বড় কেক এনে কাটতে বসলেন। কিন্তু খানিক আগেই ডিনার খেয়ে গেছি বলে কেক খাওয়ার মত খিদে ছিল না, সেকথা বার

বার জানালাম। আশা দেবী তবু স্নেহের অধিকারে খানিকটা কেকও জোর করে খাওয়াতে লাগলেন।

তখন রাত সাড়ে ন'টা। উঠব উঠব করছি, ডাঃ ভট্টাচার্য এসে হাজির।

ডাঃ ভট্টাচার্যকে ইতিপূর্বে যত খারাপ দেখেছিলাম, ঠিক তত খারাপ আজ লাগল না। তিনি মিঃ বোসকে একদিন তাঁর বাড়িতে পেয়েছিলেন, ভাল করে আলাপ হয়ে গেছে। তাই আলাপের পালাটা আজ তাঁর সঙ্গে না হয়ে সুরু হ'ল আমার সঙ্গে, আপনার ক'খানা বই, কি কি লিখেছেন, শরৎ বাবুর লেখা কেমন লাগে ইত্যাদি।

আর না উঠলে চলছে না।—মিঃ বোস জানালেন।

সহসা টেলিফোন বেজে উঠল বাড়িতে।

আশা দেবী ফোন ধরলেন। অনেকক্ষণ ধরে হেঁকে হেঁকে কথা বললেন। তার পর ফিরে এলেন আমাদের কাছে।

আমরা দাঁড়িয়ে উঠেছিলাম বিদায় নেবার জন্য।

আশা দেবী বললেন, কোথা যাচ্ছ?

বাড়ি, অনেক রাত হয়ে গেছে। আপনাদের অনেক কষ্ট দিলাম।

তা দিয়েছ, বেশ করেছ। আর একটু কষ্ট দাও, এই আমরা চাই। আর মিনিট দশেক বসো। একজন লোক আসছেন ভিক্টোরিয়া স্টেশনে, এইমাত্র তাঁর আত্মীয় ফোন করছিলেন, তাঁকে আমরা দেখতে যাব। একসঙ্গেই যাওয়া যাবে গাড়িতে, ততক্ষণ আমরা খেয়ে নিচ্ছি, কেমন?

এর পর আর কি বলা চলে? বসতে হ'ল।

আশা দেবী বললেন, বাগানে নয়, ঘরে এসে বসো। টেলিভিশন দেখতে পাবে।

তারপর আমাকে উদ্দেশ করে—তোমার ত আর বৌ নেই এখানে। তুমি অত ব্যস্ত কেন? কলকাতায় যাবার আগে আর একবার এস—কেমন?

ঘাড় নাড়লাম।

আশা দেবী খাওয়া-দাওয়া চুকোতে গেলেন রান্নাঘরে।

মিনিট সাতেক পরেই দেখি, ছায়া চলে এল আমাদের কাছে।

বললাম, খেয়েছেন?

হাঁ।

কি খেলেন এত তাড়াতাড়ি?

ছায়া জবাব দিল না, মৃদু হাসল। একটা বড় চকোলেটের কৌটো খুলে সামনে এগিয়ে ধরল।

সাহেবী কায়দায় একটা তুলে ধন্যবাদ দিলাম।

তারপর ঘরদোর বন্ধ হতে সুরু হ'ল; আলো নেভানো হ'ল, দরজাটা নেড়ে দেখা হ'ল খোলা যায় কিনা। তার পর সকলে মিলে চড়লাম ডাঃ ভট্টাচার্যের মোটরে।

ডাঃ ভট্টাচার্য ড্রাইভ করতে লাগলেন। আশা দেবী তাঁর বাঁ পাশে।

পিছনের সীটে ছায়া, আমি, আমার পাশে মিঃ বোস।

সুইস কটেজের পাশে এসে মোটর দাঁড়িয়ে গেল।

আমি আর মিঃ বোস নেমে পড়লাম।

ছায়া হাত তুলে নমস্কার করল।

সকলের উদ্দেশে প্রতিনমস্কার জানিয়ে যখন এগোতে যাব, আশা দেবী বললেন, আবার একদিন এস।

আসব।

মোটর বেরিয়ে চলে গেল—দৃষ্টির সীমানা ছাড়িয়ে।

মহাপ্রয়াণে সক্রেটিস্

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

বিচারের প্রহসনে প্রাণদণ্ড হইলে আদেশ,
অবিচল সক্রেটিস, নাই চিত্তে লেশমাত্র দ্বেষ,
স্থায়নিষ্ঠ প্রজা বলি, বলি দিতে আপনার প্রাণ,
ধর্ম্মাধিকরণ জ্ঞানে, স্বদেশের সে আদেশ দান
লইলেন মাথা পাতি।

অভিভূত বেদনার ভারে
ক্রিটো তবে কহিলেন,—"কহ দেব শুধাই তোমারে
আমাদের পরে ন্যস্ত কি আদেশ রহিল তোমার,
উজ্জ্বল তোমার স্মৃতি, অসমোর্দ্ধ জ্ঞানের ভাণ্ডার,
গৌরবাঢ্য ইতিহাস,—ইতিহাসে রাখিবারে পারি
হেন উপদেশ দাও, শিষ্য মোরা তব আজ্ঞাকারী
কর আজ্ঞা মহামতি"।

স্মিতমুখে সক্রেটিস কন
"কৃপণের মত ক্লেশে অর্জ্জিলে যে বিদ্যাবোধি ধন
বিতরিও জনে জনে।

চিত্রপটে মূর্ত্তি লিখি মম
অথবা ভাস্কর্য্য রচি বিরচিয়া শিল্প মনোরম
নাহি কোন ফল বৎস! এ নশ্বর শরীরের লাগি
নাহি কর বহ্বায়াস, নাহি হও বৃথা অনুরাগী,
মাটির শরীর জানো মাটিতেই মিলাইবে শেষে
দেহ ছাড়ি অশরীরী আত্মা বাহিরিবে কায়ক্লেশে
কায়ার নির্ম্মোক-মুক্ত মুক্তি লভি বিহঙ্গের মত
বিচরিবে মহাকাশে"।

ক্রিটো তবে করি মুখ নত
প্রশ্ন করিলেন তাঁরে—"উপদেশ কর তবে আর
কোন ভাবে পূতদেহ সমাধিস্থ করিব তোমার
আত্মার প্রয়াণ হলে"?

"যথা ইচ্ছা"—সক্রেটিস কন
মৃদুহাস্য পরকাশি শিশু হেন স্বভাবে আপন
সুমধুর পরিহাসে,—"দেখো ভাই! যেন আত্মা মোর
কোনো ইন্দ্রজাল বলে তোমাদের কাটি স্নেহডোর
ফাঁকি দিয়া হেথা হতে কোনোমতে নারে পলাইতে
ভাল করে মাটি দিও কফিনে প্রোথিয়া চারিভিতে
উপরে প্রস্তর আঁটি"।

পরে মুখ করিয়া গম্ভীর
কহিলেন মহাঋষি,—"মহামোহ এই পৃথিবীর
ঘুচাইতে তোমাদের করিয়াছি নিষ্ফল প্রয়াস
আত্মার যে মৃত্যু নাই, চিত্তে তার সুদৃঢ় বিশ্বাস
পারি নাই প্রতিষ্ঠিতে।

গোধূলির ধূম্র কুহেলিকা
চিত্তেরে আচ্ছন্ন করি, সুজটিল প্রশ্ন প্রহেলিকা
শ্যামল উর্ব্বর চিত্তে উঠেছিল কাঁটাগাছ কত
উন্মূলনে সিদ্ধকাম হই নাই সাধ ছিল যত
সিদ্ধান্ত স্থাপন লাগি।

প্রাণহীন পড়ে রবে দেহ
সে দেহ তো আমি নই, তাহা হায়! বুঝিলে না কেহ
তাই তো হতাশ হই।

প্রাণপাখী চকোরের মত
পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রে সুধাপানে চিত্ত তার রত
উড়িবে আনন্দলোকে; নেত্রে রশ্মি চঞ্চুপুটে সুধা
কৌমুদী-মদির হর্ষে মত্ত হয়ে ত্যজিবে বসুধা
দগ্ধ মরুভূমি সম।

ধর্ম্মাধিকরণে মোর লাগি
আপনি প্রতিভূ তুমি হয়েছিলে—মোর অনুরাগী
পলাইয়া যাবো নাকো দণ্ডভয়ে সুদূর প্রবাসে
বিচারকে প্রতিশ্রুতি তুমি দিয়াছিলে অনায়াসে
ক্লেশলব্ধ ধনসহ।

আজি কার প্রতিভূ কে হবে?
সমাসন্ন মহাক্ষণ জীবন-প্রদীপ নিভে যবে
ফুরায়েছে পরমায়ু বহে বায়ু বেগ বাড়ে আর
তৈল নাই বর্ত্তি নাই বক্ষে তাই অগ্নি লাগে তার
যামিনী প্রভাতপ্রায় আগমনী গায় শুকতারা
পুরানো এ প্রদীপের প্রয়োজন হয়ে এল সারা
নবজীবনের কূলে।

জীবনের রঙ্গমঞ্চ মাঝে
ফিরে কি আসিব পুনঃ আসিলে আসিব কোন সাজে
কোন শিষ্য সখা মোর, মোর লাগি ধরিবে সে ধ্যান
আত্মার আত্মীয় সত্য সিদ্ধ যার হ'ল আত্মজ্ঞান
বিবেকবিচার বলে।

দগ্ধ চূর্ণ কিম্বা সমাহিত
যাই কর এই দেহ, আত্মা রবে অবিসংবাদিত
নিত্য সত্য সর্বকালে। মৃত আত্মা কহে যেই জন
একান্ত অসত্যতম অসত্যের কলঙ্ক লেপন
করে সে আত্মার পরে। দেহটারে লোকাচার মত
পৃথ্বীরে ফিরায়ে দিও ধূলায় করিও পরিণত
ধূলার পুত্তলিকারে।
স্নানাভ্যঙ্গ করি সমাপন
সানন্দে কলত্রপুত্রে সক্রেটিস করি সম্ভাষণ
আত্মীয় বান্ধবগণে স্নিগ্ধমনে করি আশীর্বাদ
বিদায় মাগিয়া নিয়া হাসিমুখে সবার সংবাদ
লইলেন জনে জনে।
ধীরে ধীরে ছায়া দীর্ঘ হয়
পশ্চিমে নেমেছে রবি রশ্মি তার শুভ্র আর নয়
ম্লান তবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তিগ্মকর আরক্ত অরুণ
আতাম্র পিঙ্গলবর্ণ রোষে যেন বর্ষয়ে আগুন
পৃথিবীর নারীনরে। বিচারের হেন ব্যভিচার
সূর্য্য কি স্মরিতে নারি পলাইতে রথচক্র তার
করে দ্রুত অস্তাকাশে? নিরপেক্ষ বিচার না করে
ধর্ম্মাধিকরণে বসি অসমীক্ষ্যকারিতা আচরে—
একদেশদর্শিতায়। একাদশ বৃহস্পতি সম,
একাদশ বিচারক দণ্ডাদেশ দিল কি নির্ম্মম,
বিষপানে প্রাণদণ্ড!
সেই দণ্ডে বিষভাণ্ড নিয়া
সমাগত কারারক্ষী সবিনয়ে কহিল আসিয়া
সক্রেটিসে করি নতি :—
"জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ তুমি মহামতি
আমি ঘৃণ্য দণ্ডদূত তোমারেই দণ্ডিতে সম্প্রতি
আসিয়াছি যন্ত্রবৎ, যন্ত্রে যেন চালিত পুতুল
আমারে বুঝিতে সুধী তুমি যেন করিও না ভুল
আমারে করিও ক্ষমা আমারেও করো আশীর্বাদ
তোমার হউক মুক্তি আত্মা তব অমৃত আস্বাদ
করিয়া অমর হোক।
বিষ নহে মাত্র হলাহল,
বিষেও অমৃত হয়, অমৃতেও উপজে গরল,
বিধির বিধান গুণে।
দয়া কর, ক্ষমা কর তুমি
তোমার চরণস্পর্শে পুণ্যতীর্থ হ'ল এই ভূমি!
অজ্ঞ যারা আসে হেথা—প্রাণ নাশে আমি আসি যবে
দেয় গালি অভিশাপ আর্ত্তনাদ করে তারা সবে
সদ্যমৃত্যু হেরি চোখে!

কিন্তু তব চিত্ত সমুদার,
মুখে নির্ব্বিকার হাসি, তুমি ক্ষমা করিও আমার
নিরুপায় অক্ষমতা।
তুমি মোরে করিবে বিশ্বাস
নিজ প্রাণ দিলে রক্ষা হইবার হইলে এ দাস
দিত তাহা হাসিমুখে।
এই তুচ্ছ কুক্কুরের প্রাণ
দিয়া, হে পুরুষসিংহ! চাহিলাম দিতে মুক্তিদান
তোমারে অর্গল খুলি; কিন্তু চিত্ত নিরুদ্বেগ তব,—
'তোমারে বিপন্ন করি প্রাণভয়ে মুক্তি কেন লব'
কহিলে বিচিত্র বার্ত্তা—বুঝাইলে আত্মার বন্ধনে
দেহই শৃঙ্খল তব!" গদগদ কণ্ঠে সরোদনে
কহে দূত মুখ ঢাকি।
ক্ষমা সুপ্রসন্ন দুটি আঁখি
কহিলেন সক্রেটিস তার পানে স্নিগ্ধ দৃষ্টি রাখি :—
"শান্ত হও বৎস তুমি, মোর লাগি না হও কাতর
তোমার মহত্ত্ব হেরি বিগলিত আমার অন্তর
শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞ চিত্ত।
আশীর্ব্বাদ করিয়াছ মোরে
সেই আশীর্ব্বাদ আমি ফিরাইয়া করিলাম তোরে
আত্মজ্ঞান লাভ করি মুক্ত আত্মা কর্ত্তব্য পালনে
হও তুমি দৃঢ়ব্রত যথাআজ্ঞা অনবহেলনে
পালিয়া আদেশ মাত্র; যথাকালে প্রাণ যবে যাবে
অম্লান অপাপবিদ্ধ আত্মা তব উর্দ্ধগতি পাবে
নাহিক সংশয় তায়।
তুমি পুনঃ করিলে প্রমাণ
জনে জনে এক আত্মা দুঃখে সুখে সদা কম্পমান
এই জ্ঞান এই সত্য আত্মজ্ঞান কর উদ্বোধন
এক আত্মা তুমি আমি, সেই আত্মা নিত্য নিরঞ্জন
তাহারি ধারণা কর।
এই ব্যক্তি মহান উদার
আপন ঔদার্য্য গুণে আপনি করিল অধিকার
উদাস অন্তর মম।
কারাগারে আসিলাম যবে
সেইদিন হতে নিত্য মোর দুঃখ সুখ অনুভবে
একান্ত আত্মীয়সম।
আজ তার কার্য্য হোক শেষ।"
"আনো, দাও, বিষ কোথা, প্রস্তুত করিতে উপদেশ
দাও যদি দিতে হয়।"
ক্রিটো কন—"পর্ব্বতশিখরে
এখনো সূর্য্যের রশ্মি স্বর্ণবর্ণে ঝলমল করে

এখনো রয়েছে বেলা, সূর্য্যাস্তের হয় নি সময়
তবে কেন ব্যস্ত হও, দেখি যেন বিলম্ব না সয়
যাইতে মোদের ছাড়ি।

মৃত্যুদণ্ডে যাহারা দণ্ডিত
তাহারা মৃত্যুর পূর্বে দীর্ঘসূত্রে করে বিলম্বিত
যতটুকু পায় কাল, ভোগ করে লয় আয়ুষ্কাল
প্রিয়জন-সঙ্গসুখ, হৃদ্য স্বাদু রসসারসাল
আহার্য্য পানীয় নিয়া, তুমি কেন মরিতে অস্থির
ভাবিতে বিস্ময় মানি।"

"তার হেতু, আমি জানি স্থির
বন্ধন মোচন লভি পোতাশ্রয় হতে মোর তরী
ভাসিবে অনন্ত পানে, ভূমার সন্ধানে পরিহরি
এ তুচ্ছ দেহের বাস, অমৃতের শাশ্বত কুলায়
পিঞ্জরে আবদ্ধপ্রাণ পক্ষী মোর ছুটে যেতে চায়
তাই ব্যাজ নাহি সহে, যে অনন্ত পথের পথিক
আনন্দের তীর্থপথে সে বিলম্ব করে কি অধিক
যেটুকু নহিলে নয় সেটুকু সময় যেন তার
পারের তরীর দেরী পারার্থীর সহে নাকো আর
পলার্দ্ধে প্রহর হেন।

কহ তুমি অন্য যার কথা
মৃত্যু তার অন্ধকার যমদণ্ড উদ্যত সর্বথা
সর্বদা বীভৎস মূর্ত্তি মরণের নির্যাতন ভয়,
ভয়েরে দেখার পূর্বে ভয় হতে আরো ভয় হয়
তাই সে বিলম্ব করে, অবশ্যম্ভাবীর সম্ভাবনা
নিরুপায় নিঃসহায় সহে যেন তারি বিড়ম্বনা
ঝটিকার নীড়ভ্রষ্ট পাখী।

বিশ্বাস আশ্বাসহারা,
যে ডাল পড়িবে ভাঙি, সেই ডাল জড়াইয়া তারা,
এড়াইতে চায় মৃত্যু, বাড়াইতে বাঁচার সময়
দেহেরে আশ্রয় করি তাহার সর্বস্ব বিনিময়
করিয়া বাঁচিতে চাহে।

আমার তো নাহি অধিকার
যে প্রাণ গৃহীত দণ্ডে অযথা সে প্রাণ ধরি আর
পরস্ব বহন করি? কভু তার অধিক সে ভারী
গুরু হতে গুরুতর মনে হয় বহিতে না পারি
যাবৎ উত্তরি তারে, যাবৎ দায়িত্ব করি শোধ
লৌহের কঙ্কণ পরি অলঙ্কার কে করিবে বোধ
উদ্দাম উন্মাদ বিনা? অথবা যে নিতান্ত বালক
খেলাসুখে বহে ভার, অথবা যে কৃতার্থ বাহক
রাজভৃত্য ভারবাহী। নিজকরে মুকুর সে ধরি
বালক বিকৃত মুখ কিবা সুখে দেখে আহা মরি।
আপন স্বভাব গুণে।

আদিষ্টের কর অনুষ্ঠান
যাহা যোগ্য তাহা করি, কর মোর সদ্য পরিত্রাণ
দায়গ্রস্ত প্রাণ হতে"।

ক্রিটো তবে তারে আহ্বানিল
সমাদিষ্ট কারারক্ষী হস্তে যার বিষপাত্র ছিল
হস্তে হস্তে সমর্পিতে হস্ত তবু কাঁপিল তাহার
যদিও অভ্যস্ত তাহে, কিন্তু হস্ত কাঁপিল না তার
যাহারে সে পাত্র দিল।

সক্রেটিস কন তারে ডাকি—
"তুমি বহুদর্শী, ভাই, কিছু উপদেশ দিবে নাকি
যথাযথ সম্পাদনে"?

রক্ষী কহে "শুন মহাশয়
এই পাত্র পান করি এই কক্ষে দণ্ডার্দ্ধ সময়
মন্দ মন্দ পদক্ষেপ কর যদি কিছু পরে তার
মনে হবে দুই পদে বাঁধা যেন প্রস্তরের ভার
এমনি তুলিতে ভারী। তার পরে করিবে শয়ন
পদদ্বয়ে স্পর্শবোধ বেশী আর রবে না তখন
ক্রিয়া তার হবে দ্রুত সংক্রামিত হবে দ্রুততর
আপাদমস্তকে বিষ সঞ্চারিত হবে; ততঃপর
আর কিছু নাহি জানি।"

বিষপাত্র দিলে তুলি হাতে
একান্ত সহজভাবে স্বাভাবিক শান্ত দৃষ্টিপাতে
ধরিলেন সক্রেটিস, মুখে চোখে কিঞ্চিৎ চিন্তার
ললাটে কুঞ্চন রেখা অধরে বা বিরক্তি বিকার
কিছুই না যায় দেখা।

পাত্র নিয়া শুধালেন তারে,
"লেশমাত্র ইহা হতে দেবোদ্দেশে পারি কি দিবারে
পরম পিতারে মোর, সর্বভোজ্য করি নিবেদন,
ভোজনের পূর্বে আমি, পরে তাঁর প্রসাদ ভোজন
নিত্য যেইমত করি"?

রক্ষী কহে "শুন মহাশয়
একের মৃত্যুর মত মাত্রা মোর পর্য্যাপ্ত নির্ণয়
তাহা হতে বেশী নহে; কারাবৈদ্য দিল সে নির্দ্দেশ
আর কি কহিব আমি, মোর পরে ইহাই আদেশ
আমি আজ্ঞাকারী মাত্র, উদ্বৃত্তের কিছু পরিমাণ
ইহাতে নাহিক বেশী"।

উর্দ্ধাকাশে দৃষ্টি করি দান
কহিলেন সক্রেটিস—"বুঝিলাম অর্থ তব ভাই,
ইহা হতে লেশমাত্র দিতে তবে আমি নাহি চাই

দেবতার উদ্দেশেও, শুধু আমি করিব প্রার্থনা
ইচ্ছা তাঁর পূর্ণ হোক, বৃথা কালক্ষেপ করিব না
যাত্রা মোর শুভ হোক, সুরু হোক অনন্তের পথে
যে পথ সংযোগ সেতু, বাঁধিয়াছে স্বর্গে ও মরতে
স্রষ্টার বিধান মতে"।

অতঃপর অধরাগ্রে ধরি
নিঃশেষিল বিষপাত্র ইতস্ততঃ মাত্র নাহি করি
নিতান্ত নিশ্চিন্ত মনে।

এ যাবৎ যত শিষ্যগণ
কোনমতে ধৈর্য ধরি, ছিল যারা সকলে এখন
হইল সংযমহত, ধৈর্য মাত্র রহিল না লেশ
রোদনে সুতপ্ত অশ্রু-নির্ঝরের নাহি হয় শেষ
ঝরিয়া বহিয়া যেন।

নীরবে সরবে কেহ কেহ
পুরুষ পৌরুষ ভুলি অভিভূত শোকে নিঃসন্দেহ
রমণীসুলভ স্নেহে।

সক্রেটিস অচল অটল,
সমুদ্রগম্ভীর যেন তটিনীর স্রোতে অচঞ্চল,
অকম্পিত-করে পুনঃ বিষপাত্র নিপীত নিঃশেষে
রাখিলেন যথাস্থানে।

ক্রিটো অ্যাপোলোডোরাস শেষে
উভয়ে হারায়ে ধৈর্য উচ্ছ্বাসে আবেগে উচ্চরবে
উঠেন রোদন করি

সক্রেটিস কহিলেন তবে
"রোদন রমণীধর্ম্ম, পুরুষের নহে এই জানি
নারীদের নিবারিয়া ফিরাইয়া দিনু অনুমানি
এমনি করুণ দৃশ্য। মহান্ মৃত্যুর ক্ষণ যবে,
শান্তিতে করিবে যাত্রা এই উপদেশ দেয় সবে,
নিস্তরঙ্গ ভবসিন্ধু বক্ষে তার ভাসাইব ভেলা
অবলীলাক্রমে ভাসি চলিবে সে করি অবহেলা
দিক দেশ কালত্রয়ে।

অতএব হও সবে স্থির
নির্লিপ্ত চলিয়া যাক প্রাণ যথা পদ্মপত্রে নীর
বিন্দুজল সিন্ধুজলে"।

ধৈর্য্য তাঁরা ধরিলেন তবে,
বিড়ম্বিত বীর যথা ফিরে আসে আহত-গৌরবে
পরাভব নিবারণে নিজ সৈন্যমাঝে।

ধীরে ধীরে
সক্রেটিস কক্ষতলে পদচার করি ঘুরে ফিরে
অবশ হইছে পদ, বুঝিলেন এলাইছে গা,
উপদেশ দিল সবে, অঙ্গ যবে আর চলিছে না,
ভূতলে রাখিতে দেহ, পৃষ্ঠদেশ পাতি মৃত্তিকায়
শয়ান সে মহাপ্রাণ মহীতলে মহতী নিদ্রায়
জননীর ক্রোড়ে শিশু শয়ান যেমতি।

বিষদাতা,
গুল্‌ফ পদ জানু জঙ্ঘা অঙ্গে অঙ্গে স্পর্শ করিয়া তা
পরীক্ষিল স্পর্শবোধে, ক্রমে দেহ নিঃসাড় কঠিন
কবোষ্ণ, নহেক উষ্ণ, ক্রমে হ'ল শীতল তুহিন
প্রাণহীন কটিদেশাবধি।

বস্ত্রে ঢাকা ছিল মুখ
সরাইয়া সক্রেটিস, মুখে যেন সস্মিত কৌতুক,
কহিলেন ধীরে ধীরে—"ক্রিটো মোর আছে এক ঋণ
আস্ক্লিপিয়াসের কাছে, একটা মোরগ একদিন
নিয়াছিনু দিব বলি, তোমার কি রহিবে স্মরণ
তাহারে আমার ঋণ মনে করি করি প্রত্যর্পণ
অনৃণী করিতে মোরে" ?

ক্রিটো কন—"অবশ্য নিশ্চিত
আর কিছু আজ্ঞা যদি থাকে কহ করিব বিহিত
শিরোধার্য্য করি সবে"।

আর নাহি আসিল উত্তর
চিরতরে নিরুত্তর সমুদ্র গম্ভীর কণ্ঠস্বর।
এইরূপে সেইদিন সে মহাজীবনে যবনিকা
পড়িল আঁধারমঞ্চে সে রহস্যে কে লিখিবে টীকা
পরত্র-প্রয়াণ-ভাষ্য।

প্লেটো কন—"হে একক্রেটিস!
শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, শ্রেষ্ঠ সাধু, শ্রেষ্ঠ গুরু জানি সক্রেটিস
আপনার জ্ঞান যিনি হিসাবের তৌলে তৌল করি
বলিতেন—'জ্ঞান' হতে 'অজ্ঞানে'র নব সূত্র ধরি
'অজ্ঞানে' চিনিতে পারি, 'অবিমিশ্র জ্ঞান' নাহি পাই,
'আমি যে জানি না, শুধু এই জানি, তাহাই জানাই"

কলেজে পড়া বৌ

সুনয়নী দেবীর দুঃখের অন্ত নেই। কি ভুলই না তিনি করেছিলেন ছেলেকে কোলকাতায় লেখা-পড়া শিখতে পাঠিয়ে। ছেলে কিনা বিয়ে করে বসল এক কলেজে পড়া মেয়েকে! ছেলের জন্যে তিনি পাত্রী ঠিক করেছিলেন কেষ্টনগরের বনেদী চাটুজ্যে পরিবারে। ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটি—বয়স একটু কম কিন্তু তাতে কিইবা এসে যায়? টাকার কথাটাও ফ্যালনা নয়। নগদ দশ হাজারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল চাটুজ্যেরা। কথাটা এখনও ভাবলে খচ্ করে লাগে সুনয়নী দেবীর বুকে।

সুতপা ঘরে এলো দুগাছি শাঁখা আর দুগাছি চুড়ী সম্বল করে। প্রথম দিন প্রণাম করতে যাওয়ার সময় সুনয়নী দেবী পেছিয়ে গিয়েছিলেন দু'পা, "থাক থাক মা,"—তাঁর মুখে বিষাদের ছায়া কলেজে পড়া মেয়ে সুতপার দৃষ্টি এড়ায়নি। সেই প্রথম দিনটি আজ প্রায় দেড় বছর পেছনে কিন্তু আজও শ্বাশুড়ী কলেজে পড়া বৌকে আপন করে নিতে পারেন নি। রান্নাঘরের কোন কাজে সুতপা সাহায্য করতে এলেই তিনি বলেন—"থাক থাক বৌমা—এসব তো তোমাদের অভ্যাস নেই, আবার মাথা ধরবে।"

বিমল কোলকাতার এক সদাগরী আফিসে ডেলি প্যাসেঞ্জারী করে চাকরী করে। থাকে সহর-তলীতে। রোজগার সামান্যই। বিয়ের আগে অস্বাচ্ছন্দ্য বিশেষ বুঝতে পারেনি। কিন্তু বিয়ের দেড় বছর পরে আজ বুঝতে পারে যে খরচ সং-কুলান করা দরকার। দায়ীত্ব অনেক বেড়ে গেছে, কিছু সঞ্চয়ও থাকা দরকার। মায়ের হাতেই সংসার খরচের টাকা সে তুলে দেয়। ইদানিং মাকে আকারে ইঙ্গিতে দু একবার বলেছে যে খরচ কিছু কমানো দরকার। কিন্তু সুনয়নী দেবী গেছেন চটে। "তোর কলেজে পড়া বৌ বুঝি তোকে এই সব বুদ্ধি দিচ্ছে? এত দিন তো তোর এসব মনে হয়নি?" ভয়ে বিমল আর কিছু বলতে পারেনি।

সুতপা কিন্তু ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেনি। "তুমি বুঝিয়ে বল মাকে। আর তিন মাস পরে আমাদের প্রথম সন্তান আসবে। এখন চারিদিক সামলে সুমলে না চললে চলবে কেন? তাছাড়াও ধর অসুখ বিসুখ আছে, সবাইয়ের সাধ আহ্লাদ আছে, কিছু তো বাঁচাতেই হবে। মায়েরই তো কতদিনকার সখ একটা গরদের থানের আর কত দিন তোমায় বলেছেন তরকারীর বাগানটা বেশ সুন্দর বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে দিতে।"

মরীয়া হয়ে বিমল গেল মায়ের কাছে। খুলে বলল তাঁকে মনের কথা। কিন্তু হিতে বিপরীত হোল। সুনয়নী দেবী গেলেন ক্ষেপে। "যখনই তুই ওই কলেজে পড়া মেয়েকে বিয়ে করেছিস তখনই জানতাম পরিবারে অশান্তি আসবে। থাক তুই তোর বৌ আর সংসার নিয়ে—আমি চললাম দাদার বাড়ী।" কিছুতেই আটকানো গেল না

তাঁকে। বাক্স প্যাঁটরা গুছিয়ে নিয়ে তিনি চলে গেলেন বরানগরে।

ফিরে এলেন তিনি প্রায় তিন মাস পরে। তাও এমনি নয়, বিমলের ছেলে হওয়ার খবর পেয়ে। বাড়ীতে ঢুকতে গিয়ে তিনি অবাক। তাঁর সাধের ঝিঙে আর লাউডগার বাগানের চারপাশ দিয়ে কচি বাঁশের সুন্দর বেড়া। গেলেন সুতপার ঘরে। ফুটফুটে নাতীকে নিলেন কোলে তুলে। বিমল এসে ঢুকলো গরদের থান নিয়ে। আনন্দে সুনয়নী

দেবীর চোখের দুই কোণে জল চিকচিক করে উঠল। সুতপা বিছানা থেকে ক্ষীণস্বরে বলল—"মা তোমায় আর কখনও বাড়ী ছেড়ে যেতে দেব না।" সুনয়নী দেবী তার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, "কি ভয় নিয়েই ফিরেছিলাম মা, হয়তো দেখব বাড়ীঘর সব ছারখার হয়ে গেছে—কিন্তু কি লক্ষ্মীশ্রী সারা বাড়ী জুড়ে, চোখ যেন জুড়িয়ে গেল—না মা কোথায় যাব এমন বৌ-নাতী ফেলে?"

এক দিন শুধু তিনি সুতপাকে জিজ্ঞাসা করে-ছিলেন—"কি করে এত গুছিয়ে চালালে তুমি মা?" সুতপা বলল—"মা খরচ কত দিকে ধাঁচাই দেখুন! উনি আগে আপিসে পয়সা খরচ করে আজে বাজে খাবার খেতেন, এখন বাড়ী থেকে টিফিন বাক্সে আমি ওঁর খাবার দিই। এতে খরচ অনেক বাঁচে, আর খাওয়াটাও ভাল হয়। ঠিকে চাকরটাকে ছাড়িয়ে দিয়েছি—কাপড় কাচা, বাসন মাজা এসব কাজ আমি আর ঝি ভাগাভাগি করে করে নিই। আর সব চেয়ে বেশি সাশ্রয় করেছি খাবারে। আগে আপনি ঘি কিনতেন অত দামে—আর সে ঘি'ও সব সময় ভাল হোত না। আমি ঘিয়ের বদলে কিনি ডালডা মার্কা বনস্পতি। ডালডায় ঘিয়ের সমান ভিটামিন 'এ' থাকে। ভিটামিন 'এ' চোখ আর ত্বক সুস্থ রাখে। আর থাকে ভিটামিন 'ডি' যা হাড়কে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। ডালডায় রাঁধা সব খাবারই অত্যন্ত মুখরোচক হয়। এই সব কারণেই এবং স্বাস্থ্যদায়ক বলেই ডালডা আজ আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ পরিবারে নিত্য ব্যবহার হচ্ছে। ডালডা "শীল" করা ডবল ঢাকনা'ওলা টিনে সব সময় খাঁটি ও তাজা পাওয়া যায়। তাছাড়া ডালডায় ভেজালের কোন ভয় নেই কারণ খাঁটি ডালডা সব সময় পাওয়া যায় খেজুর গাছ মার্কা টিনে।"

সুনয়নী দেবী মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকেন তাঁর কলেজে পড়া বৌয়ের দিকে।

ডাইনসর

শ্রীমিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়

সিরীজ সরীসৃপদের আকৃতিগত পরিবর্ত্তনের আরম্ভ-ফল ডাইনসরদের অভ্যুদয়। প্রকৃতির সাধারণ নিয়মে কোনও জীব এক ভাবে স্থির থাকতে পারে না, হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। ফসিলতত্ত্বে দেখা গেছে যে যখনই কোন প্রাণী কোন বিশেষ শ্রীবৃদ্ধির দিকে ধাবিত হয়েছে, সে পরিবর্ত্তন দৈহিকই হোক বা পারিবেশিকই হোক, বংশানুক্রমে তার পরিস্ফুরণ, বিশেষতঃ প্রথম দিকে যদি কিছু সাফল্য দৃষ্ট হয়। জৈব উন্নতির কারণ এবং তার ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ এই তথ্যের মূল। জৈবিক ইতিহাসের মালমসলা কোন পুঁথিপত্রে নিবদ্ধ নেই, সহস্র-লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে যে সকল প্রাণী অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে তাদের অশ্মীভূত কঙ্কাল মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়া জীর্ণ চূর্ণ দেহে পাওয়া যায়। এজন্য বিশেষজ্ঞের দৃষ্টির প্রয়োজন। এরা ফসিলতত্ত্ববিদ। জাতির ক্রমোন্নতি জৈব-বিবর্ত্তনের ধারা ধরে এগিয়ে চলে, পথে বাদ পড়ে অনেক কিছু, যেমন যোগ হয় বিস্তর। প্রাণদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে আরম্ভ করে অনেক কিছু যোগ-বিয়োগ হয়, অনেক সময় জাতিগণ বর্ণ-শ্রেণী-নির্ব্বিশেষে অবলুপ্ত, স্থান অধিকার করে নূতন আগন্তুকদল। জাতির ক্রমোন্নতির ধারাবাহিক ইতিহাস লেখা থাকে পূর্ব্বপুরুষ ও উত্তর-পুরুষদের কঙ্কালের তুলনামুলক পর্য্যালোচনায়: প্রত্নজীববিদ্যার গোড়ার কথা এই যে, জীবের আকৃতি ধাপে ধাপে উন্নতির পথে এগিয়েছে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে নয়। হয়ত সাময়িক উন্নতিও হয়েছে প্রতিবেশ ও অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে। তবে সকল অবস্থাতেই ব্যক্তিজীবন স্বীয় উন্নতির চেষ্টা করে, না হলে জীবন-সংগ্রামে পরাজয় অনিবার্য্য। শেষ অবধি সেই থাকতে পারে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সমান তালে চলবার শক্তি যে অর্জ্জন করেছে। উন্নতির সোপানে আরোহণের অর্থ নিত্য-নূতন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পত্তন নয়। প্রথম প্রথম হরিণদের শৃঙ্গ ছিল না, পরে ছোট ছোট শৃঙ্গের উদ্ভব হয়, শেষে শৃঙ্গ শাখা-প্রশাখা সম্বলিত হয়ে মস্তক ভারাক্রান্ত করে তোলে কয়েক জাতীয় হরিণদের, ফলে তারা লুপ্ত; পুনর্মুষিকো ভবঃ হয়ে আধুনিক যুগে ছোট শিংয়ের মৃগরা রইল বেঁচে। সেজন্য কোনও বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি প্রকৃত উন্নতি নয়। যুগে যুগে নানা প্রকার জীবকুলের আবির্ভাব হয়েছে, প্রত্যেকে যে পূর্ব্ববর্ত্তী জীবদের অপেক্ষা উন্নত ধরনের একথা মনে করা অনুচিত।

ডাইনসর পৃথিবীতে হঠাৎ আসে নি। রাতারাতি কেউ প্রবল হয়ে ওঠে না। সামান্য পরিবর্ত্তনে সহস্র সহস্র বৎসর প্রয়োজন, লক্ষ বৎসরে একটি জাতির সৃষ্টি হয়। আদিম সরীসৃপবৃন্দের আবির্ভাব-কালে উভচরেরা দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করছিল, প্রাণ বাঁচিয়ে ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াত এরা, কারণ নয়-দশ ফুট দীর্ঘ ও দেড়-দুই ফুট চওড়া লেবরিনথোডন নিশ্চয়ই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকামাকড়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করত না, জলের মাছ ও স্থলের একমাত্র জীব সরীসৃপ-মাংসে তাদের উদরপূর্ত্তি। তার পর চাকা গেল ঘুরে। পৃথিবী সরীসৃপদের বাসোপযোগী হয়ে উঠল এবং এরাই ক্রমে হল সর্ব্বেসর্ব্বা।

বিবর্ত্তন-ধারায় কখনও কখনও চরম সীমা উপস্থিত হয়, ইন্দ্রিয়-উৎকর্ষের শেষ অবস্থা। মেরুদণ্ডীদের ঘ্রাণশক্তি, অশ্ব, মৃগ, শশক প্রভৃতির গতিবেগ অন্তঃসীমায় পৌঁছলে পরিস্ফুরণ স্তব্ধ, বিবর্ত্তন-ধারা এখানে যেন নিশ্চল, ব্যক্তিগত প্রাণশক্তি তার স্বল্প পরিসরে আবদ্ধ, রুদ্ধ শ্রীবৃদ্ধির সমস্ত পথ। এ অবস্থায় যন্ত্রের (আত্মরক্ষা ও আক্রমণের অংশ) বিবর্ত্তন না ঘটলে কার্য্যক্রমের উন্নতি অসম্ভব, প্রাণশক্তি তখন মনোনিবেশ করে যান্ত্রিক গঠনে।

সরীসৃপকুল প্রথমে ক্ষুদ্র ছিল, সময় পরিবর্ত্তনের সঙ্গে হয়ে উঠতে লাগল বৃহদাকৃতি, শেষে কারও কারও কলেবর এরূপ বিপুল-কায়ে ও কিম্ভূতকিমাকারে পরিণত হ'ল যে, আজও সে দুঃস্বপ্ন। বিস্ময়ের কিছু নেই, আশ্চর্য্য শুধু মনে হয় বিভিন্ন প্রকার রূপ ধারণে। সহস্র সহস্র প্রকার দানবাকৃতি ডাইনসরের ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে, মনে হয় প্রতিবেশের অল্প পরিবর্ত্তনে রূপান্তরিত হয়েছে দেহাকৃতি। চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ে যে যেখানে সুবিধা পেল নিজের আস্তানা জমিয়ে নিল, পরে নিজ নিজ প্রতিবেশে বৃদ্ধি পেতে পেতে এমন হয়ে পড়ল এবং পরস্পরের আচার-ব্যবহার-চেহারায় এত দূর পার্থক্য দেখা দিল যে, বিশেষজ্ঞ ভিন্ন এদের গোষ্ঠী যে এক তা কেউই বিশ্বাস করবে না। কেউ পাড়ি জমাল গুল্মাচ্ছাদিত প্রান্তরে—সে তৃণভোজী, কেউ উদ্ভিদভোজী। আবার মাংসাশীরা এদের মাংসে জীবিকা নির্ব্বাহ করত। একদল গেল সমুদ্রের গভীরে মৎস্যের সন্ধানে, পরিশেষে একদল উড়ল আকাশে কীট-পতঙ্গকে তাড়া করে।

কৌতূহলজনক বটে সরীসৃপদের বিবর্ত্তন।

প্রথমে সাধারণভাবে এরা বৃহদাকার হয়ে উঠল। খাবার ব্যবহার বিশেষ জানত না। দৈহিক শক্তিও নয়, কেবল দন্ত ব্যবহার করত অস্ত্র হিসাবে, এরাই 'ডইনসর' অর্থাৎ ভয়ঙ্কর সরীসৃপ নামে অবহিত। স্বভাবে সকলেই যে নির্ম্মম ক্রূর ছিল তা নয় তবে দেহাকৃতি প্রত্যেকেরই অপরূপ। টিরাসিকের শেষপাদে যে সকল 'অসুর' বিচরণ করে বেড়াত তাদের যথার্থ ডাইনসর বলা যুক্তিযুক্ত নয়, তারা গিরগিটির বিশাল সংস্করণ। এদের মধ্যে 'মোজাসর' নামে

এক জলজ প্রাণীও পাওয়া গেছে, প্রায় পঁচাত্তর ফুট লম্বাদেহ, এই প্রাণী কানকো-সমন্বিত। তা থেকে মনে হয় সমুদ্র ও বিশাল হ্রদে এরা অবাধে সাঁতার কাটত, নদী এই বিপুল দেহকে আশ্রয় দিতে পারে না—এখনকার নদী ও তখনকার নদীতে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। সারা মেসোজয়িকের আট কোটি বৎসর ধরে যারা সমস্ত পৃথিবীতে অপ্রতিহত শক্তিতে রাজত্ব করেছে তাদের মোটামুটি এই কয় ভাগে ভাগ করা যায় :

(১) ডাইনসর
(২) থারমরফাস
(৩) অহিগ্রীবী সামুদ্রিক প্লেসিওসর
(৪) মৎস্যাকৃতি সামুদ্রিক ইখথাইসর
(৫) পেচর টেরোডক্টিল

প্রত্যেকে আদি সরীসৃপ বংশসম্ভূত হলেও কালক্রমে আকৃতি ও স্বভাব ভিন্ন হয়েছিল যথেষ্ট এবং লক্ষ লক্ষ বৎসরে অসংখ্য জাতির জন্ম দিয়ে এক-একটি গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল।

ডাইনসরেরা সকলেই বেশ বৃহদায়তন। কেউ কেউ বিশাল দৈত্যের মত শরীর নিয়ে শুষ্ক জমির উপর চলাফেরা করত। সেজন্য হস্তপদ বিপুলদেহ বহনোপযোগী। এই সম্পর্কে ঈগনোডনের নাম করা যায়। বর্তমান গোসাপের দাঁতের সঙ্গে অনেকটা মিল দেখা যায় সেজন্য নিঃসন্দেহে বলা চলে যে এরা মাংসাশী নয়। পঞ্চাশ-ষাট ফুট দীর্ঘ এই কূর্মচঞ্চু অতিকায় জীবটি পিছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে চলাফেরা করত, দেহের সঙ্গে শিলার অক্ষরে পাওয়া গেছে পশ্চাদ-পদের তিন আঙুলের থাবার দাগ। সম্মুখের হস্ত পিছনের পদ অপেক্ষা ক্ষুদ্র, পদদ্বয় লাফানো দৌড়ান উলম্ফনের উপযোগী, শরীরের ভার আঙুলের উপরে অধিক, উরুর অস্থিখণ্ড তিন ফুট, এদের জ্ঞাতিভাই আতলান্তোসরের এই অস্থি ছয় ফুট আবার এই অস্থির দৈর্ঘ্য জায়গ্যান্টোসরের এগার ফুট। পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় নিবাস ছিল এই ছেদন-দন্তহীন প্রডেনটটা গোষ্ঠীর, কষের দাঁত দিয়ে ঝাউপাতা, পাইনশাখা চর্বণ করত। 'সেরাটপ' 'টি সেরাটপদের' মাথাটা বিরাট। দুটি শিং, একটি ঠিক নাসিকার অগ্রে, অপরটি কপালের মধ্যভাগে; নিম্নোষ্ঠ ছুঁচলো, কাটবার উপযুক্ত। 'টিরসরদের' মাথায় ছিল এক খড়্গ; হংসচঞ্চু দানব 'ত্রাচোডন মীরাবিলিস' নিরামিষভোজী ডাইনসর, সম্মুখের হস্তদ্বয় পশ্চাদপদের প্রায় অর্দ্ধেক হওয়ায় লাফিয়ে চলত অধিক সময়, তবে মাঝে মাঝে চতুষ্পদ জন্তুর মত চার হাত-পায়ে ভর করে চলত না এমন নয়। ষাট ফুট দীর্ঘ উদ্ভিদভোজী 'ব্রন্টোসর' ক্যাঙারুর মত চলত লাফিয়ে, ওজন আনুমানিক ২০ টনের কাছাকাছি। আরও কয়েক প্রকার শাকপাতা-ভোজী ডাইনসরের সন্ধান পাওয়া গেছে। তারা সরোপডা ও প্রডেনটটা। শ্বদন্ত শ্বাপদের ন্যায় বিকশিত নয়, বরং কষের দন্ত দেখে অনায়াসে অনুমান করা যায় যে, এরা হিংস্র ছিল না। সরোপডা আকারে কুমীরদের আত্মীয়, এই গোত্রের বেশীর ভাগ চতুষ্পদ তবে অনেকক্ষেত্রে সম্মুখের পদদ্বয় (হস্তদ্বয়?) পশ্চাতের চেয়ে খর্ব্ব, যেমন 'ক্যামেরাসর', 'মরসর'। এদের দেহ বিশেষ দীর্ঘ নয়, দীর্ঘ গ্রীবা ও ততোধিক দীর্ঘ লাঙ্গুলও দেহের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করত; লম্বা গলার স্বাধীনতা খানিকটা ছিল, এপাশ-ওপাশ বেশ ঘোরান যেত। সুদীর্ঘ লেজ শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করলেও কোন কাজে লাগত না, ভারস্বরূপ হয়ে পড়েছিল পরে। প্রডেনটটাদের অধিকাংশ চলত দু'পায়ে, পশ্চাদ্ভাগ পক্ষীর অনুরূপ, দেহে প্রিডেন্টরী অস্থি তাই নাম প্রডেনটটা। সরোপডার দেহাস্থি জুরাসিক স্তরে অধিক, তাই মনে হয় প্রডেনটটা গোষ্ঠীর পূর্ব্বেই এরা আসর জমিয়ে বসেছিল। আদি বাসস্থান ফ্রান্স, ইংলণ্ড, পূর্ব্ব আমেরিকা, ম্যাডাগাস্কার ও ভারত। নিরামিষভোজীদের আহারের সন্ধানে বিশেষ দৌড়াদৌড়ি করতে না হওয়া নিবন্ধন স্থূলকায় দেহ। 'ডিপ্লোডকাস কার্নেগী' দৈর্ঘ্যে ৯০ থেকে ১০০ ফুট; অদ্ভুত দেহ, ৩০ ফুট দীর্ঘ, গ্রীবার অগ্রভাগে ক্ষুদ্রাকৃতি মুখমণ্ডল, জলহস্তীর মত মেদবহুল দেহভাগ, পশ্চাতে সর্পের মত ৩৫ ফুট দীর্ঘ লেজ। এই চতুষ্পদ প্রাণী সাধারণতঃ পছন্দ করত জলাভূমি, জলজ গুল্মলতা ইত্যাদি ভক্ষ্য। প্রায় আট কোটি বৎসর পূর্ব্বেকার উত্তর আমেরিকা ও জার্ম্মানীর ভূস্তরে রয়েছে এদের দেহ। যারা মাটির উপর দাঁড়িয়ে রসাল বৃক্ষপত্রে উদর পূর্ণ করত তারা মাটি থেকে ৩০,৩৫ ফিট অবধি পাড়া হতে পারত নিশ্চয়; পশ্চিমে গ্রীনল্যাণ্ড ও দক্ষিণে অষ্ট্রেলিয়া থেকে আরম্ভ করে মঙ্গোলীয়ার গোবী, ভারত, আফ্রিকায় এরা বিচরণ করত অবাধে। প্রডেনটটার পিছনের অস্থি অনেকটা পাখীর অস্থির ন্যায়। এ অনুমান অসঙ্গত নয় যে, খেচরের উদ্ভব হয়েছিল প্রথম এই জাতি হতে। ডাইনসরদের চর্ম্মের উপরিভাগ সাধারণতঃ মসৃণ, অনেকক্ষেত্রে শরীরে লোমের সন্ধান নেই, যেমন 'ত্রাচোডন'। আবার অনেক সময় ত্বকের উপর কঠিন আঁশের আবরণ, যথা: 'প্যারিয়াসর বিনি'—নিরামিষাশী, সুদৃঢ় আঁশের আবরণে গণ্ডদ্বয় ও মাথার খুলি ঢাকা। একটির নামকরণ হয়েছে 'সেন্টসর'—বিরাটকায় বন্যমহিষ ও গণ্ডারে মেলান চেহারা। এই জীবটি যেন রাতের বিভীষিকা কিন্তু আশ্চর্য্য এরা নিরীহ, উদ্ভিদভোজী, স্রেফ আত্মরক্ষার জন্য বর্ম্ম আঁশ, শৃঙ্গ ও খড়্গের উদ্ভব।

মাংসাশী ডাইনসরেরাও অল্প ছিল না। বৈজ্ঞানিক এদের নাম দিয়েছেন থেরপোডা অর্থাৎ পশুপদ। পদচতুষ্টয়ের সুতীক্ষ্ণ নখর এদের স্থান নির্দ্দেশ করে দেয় নিঃসন্দেহে এবং তা নিরামিষাহারী-দের সঙ্গে নয়। কত বিভিন্ন রকমের এরা হ'ত তা বলে শেষ করা যায় না। কেবল ডাইনসর ভিন্ন অপর কোন শ্রেণীতে এত অধিক-সংখ্যক হিংস্র প্রাণী পাওয়া কঠিন। ক্ষুদ্র মার্জ্জারাকৃতি থেকে আরম্ভ করে 'মেগলোসরের' মত বিরাট সরীসৃপ আবিষ্কৃত হয়েছে। অদ্ভুত এদের আকৃতি, অপরূপ এদের আচরণ। কেউ চলবার সময় চারি পায়ের সাহায্য গ্রহণ করত, কেউ দু'পায়ে ভর দিয়ে ক্যাঙারুর মত লাফিয়ে বেড়াত আর শক্তিশালী লেজ দেহের ভারসাম্য রক্ষা করত।

গোবেচারা শাকাশী থেকে ক্ষুধার কড়া তাগিদে ডাইনসরেরা

কালক্রমে হিংস্র জীবে পরিণত। উদরের প্রয়োজনে জীবজগতে অনেক অজ্ঞাতপূর্ব্ব অপরিসীম ঘটনা ঘটেছে, এও তার মধ্যে অন্যতম। নিকটস্থ ঘাসপাতা ফুরিয়ে গেলে প্রথমে ছোট ছোট জীবের মাংসে ক্ষুধা নিবৃত্তি চলতে লাগল, পরে বৃহদাকার ডাইনসরদের উপর আক্রমণ আরম্ভ হ'ল, বিপুলায়তনরা নির্জীব অকর্ম্মণ্য। এ কাজ সহজসাধ্য নয়। খামচাখামচি, মারামারি, কাটাকাটি হ'ত বিস্তর। আক্রমণ করতে গেলে আত্মরক্ষার প্রয়োজন, আক্রমণ প্রথমটা ক্ষুধার তাড়নায়, পরে স্বভাবজ প্রকৃতিতে। পরস্পরকে পরাজিত করবার সদভিপ্রায়ে আজকাল যেমন যুদ্ধের সময় নতুন নতুন মারণাস্ত্র আবিষ্কৃত হচ্ছে এরাও ঠিক তেমনি অস্ত্রশস্ত্রের উদ্ভব করতে লাগল নিজ দেহভাগে। কেমন করে সম্ভব?

ধরা যাক্, দুটি প্রাণীর মধ্যে জীবনমরণ রণ হচ্ছে দন্ত, নখর, থাবা, লাঙ্গুল ও দৈহিক শক্তির সক্রিয় ব্যবহারে। বিজিত পক্ষ যদি চম্পট দানে সক্ষম হয় তবে তার একমাত্র কামনা হবে শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি করে প্রতিশোধ গ্রহণ করা, ভবিষ্যতে দেহে হয়ত দেখা দেবে বর্ম্মের সুকঠিন আবরণ। বিজয়ীকে যে সব অঙ্গ (অস্ত্র) সম্মান (ও রসদ) লাভে সাহায্য করেছে তাদের পুষ্টিসাধনে সে যত্নবান হবে; হয়ত অনুরূপ অন্যান্য যুদ্ধে তার জয় হবে এবং তার দৈহিক পরাক্রম দন্ত, খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্রের উপর অনন্যনির্ভর হয়ে উঠবে। বারংবার ব্যবহারে শক্তিমত্তা ও নিজস্ব অস্ত্রগুলি সুদৃঢ়। সে রেখে যাবে এমন সন্তান-সন্ততি যারা নিজ পিতামাতার মত আস্থাবান ও পরাক্রান্ত। বংশপরম্পরায় মানসিক সাফল্যের সঙ্গে দৈহিক সংগঠনের দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি। সমস্ত মানসিক শক্তি নিয়োজিত হয় দৈহিক শক্তিবৃদ্ধির জন্য, শত্রুকে বিনষ্ট করে প্রতিবেশে আধিপত্য লাভের জন্য, এককথায় প্রাণরক্ষার জন্য। মনঃশক্তির প্রভাব যে কতদূর তীব্র তা হৃদয়ঙ্গম করা যায় কয়েকজন বিশ্ববিখ্যাত মনীষীর জীবন অনুধাবন করলে। প্রাচীন গ্রীসের শ্রেষ্ঠ বক্তা ডিমস্থিনিস প্রথম বয়সে তোতলা; মল্লবীর সাণ্ডো, ভীম ভবানী বাল্যে প্রহৃত; কিশোর নেপলীয় অপমানিত হয়েছিলেন সমবয়স্কদের কাছে। অবমাননা ও পরাজয়জনিত ক্ষোভ-বেদনা প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ারূপে জীবন-সংগ্রামে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করে পরিয়ে দেয় জয়ের তিলক। আত্মরক্ষার্থ বর্ম্মের উদ্ভব সম্ভবতঃ এই ভাবে। অন্যদিকে আবার বিজয়সাফল্য জীবনে উদ্ঘাটিত করে সৌভাগ্যের পথ, মনীষী তথা বিদ্বজ্জনসমাজে এ উদাহরণ ভূরি ভূরি। হিংস্র ডাইনসরদের অস্ত্রশস্ত্র ও শক্তিমত্তার উদ্ভব হয়েছিল শেষোক্ত ধারায়।

সরীসৃপ পশু, বুদ্ধিহীন হলেও পুনঃ পুনঃ সাফল্যের প্রতিক্রিয়াশক্তি ও অস্ত্রে যে আস্থা স্থাপন করল তার উৎকট বেগ নানা ভাবে দেহকে যুদ্ধ, আক্রমণ ও বিজয়ের উপযোগী করে তুলল, শত্রুকে দমন করবার বিজাতীয় আকাঙ্ক্ষা পরিবর্ত্তন আনল তনু-মনে, তার প্রকাশ বহিরঙ্গ। বংশপরম্পরায় এই জৈবিক মনঃশক্তির প্রচণ্ড বেগ ধাবিত শক্তিমত্তাভিমুখে, প্রাচীন ডাইনসরবর্গের যুদ্ধসাজ-সজ্জায় এর প্রবল প্রভাবচিহ্ন। অনেক ক্ষেত্রে শক্ত আঁশে আবরিত হয়েছিল শরীরের উপরাংশ, মাঝে মাঝে গজিয়ে উঠত পিঠে অস্থির প্লেট ও তীক্ষ্ণাগ্র কীলক হঠাৎ আক্রমণ থেকে বাঁচবার উপায় হিসাবে। ষ্টেগোসর এরূপ একটি সরীসৃপ, দেহের ঊর্দ্ধাংশে কঠিন আঁশ এবং মস্তক হতে লেজ পর্য্যন্ত দুই সারি চেপ্টা খাড়া পয়াল, প্রায় ২৫ ফুট দীর্ঘ এই জীব উদ্ভিদভোজী; আসল ডাইনসর আবির্ভূত হবার আগে এইরূপ অনেক বর্ম্মসমন্বিত সরীসৃপ দেখা যেত। উত্তর-আমেরিকার 'ডিমিট্রোডনের' মেরুস্থি পৃষ্ঠের উপর সজারুর কাঁটার মত উঠে কঠিন বর্ম্মাকারে উপবৃত্ত রূপ।

হিংস্র দানবদের মধ্যে 'মেগেলসর' সম্ভবতঃ সর্ব্বাধিক প্রাণহারক, শ্বাপদের মত সম্মুখে ও পাশে শক্ত দন্তপংক্তি। 'সিরাটোসরের' লেজ দর্শনে মনে হয় যুদ্ধে অবাধে ব্যবহার হত, দীর্ঘ আঙুল ও ধারাল নখর আক্রমণাত্মক স্বভাবের পরিচয়। আরও কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন জাতির সন্ধান পাওয়া গেছে, ট্যানিষ্ট্রফাস, কয়েলরাস, কমসোগনেথাস। শেষোক্ত জীবটি বোধ হয় ক্ষুদ্রতম ডাইনসর, পাওয়া গেছে ব্যাভেরিয়া থেকে। মজার কথা যে এর গর্ভে একটি প্রাণের নিদর্শন। শিলাস্তরে যে অশ্মীভূত পদচিহ্ন বর্ত্তমান তা থেকে বোধ হয় আক্রমণকালে সোজা দাঁড়িয়ে এবং লাফিয়ে লাফিয়ে যুদ্ধ করত, বিশাল চোয়ালে বসান ক্ষুরধার চার-পাঁচ ইঞ্চি লম্বা লম্বা দাঁত ও সিংহের ন্যায় থাবা কাজ দিত বেশ।

জলচর ও খেচর—সমুদ্রের বেলাভূমি নদীতট জলা বাদা ও শুষ্ক উষর মাঠে অবাধ আধিপত্য করে যখন স্থান সঙ্কুলান হ'ল না তখন ডাইনসরকে নামতে হ'ল জলে। জলজ ডাইনসর বহুত।

প্লেসিওসর অহিগ্রীব, কোনরূপ বর্ম্ম বা আঁশের আভাস নেই শরীরে। রাজহংসাকৃতি (অবশ্য বহুগুণে বড়), দীর্ঘ-বঙ্কিম গ্রীবা এবং নৌকার দাঁড়ের মত ত্রিভুজাকার চারিটি পদ। প্যাডেলের মত পদচতুষ্টয়ের সহায়তায় ইনি আহারের খোঁজে আসতেন উপকূলভাগে, আহার অগভীর জলে গুল্মলতা, ছোট-খাট মাছও পেলে ছাড়তেন না কারণ শুধু জলজ গুল্মলতায় ঐ বিরাট উদর কতটা পূর্ণ হ'ত সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। শক্তিমত্তার কোন পরিচয় নেই দেহে, সুদীর্ঘ গলার জন্য দ্রুত সন্তরণ সম্ভব ছিল না, কেবল চুপিসাড়ে মুণ্টি জলের উপর ভাসিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অগভীর জলতলে পড়ে থাকত বিপদের আভাসে, সেজন্য বহু শক্তিমান জলজ প্রাণীর ভক্ষ্য। প্রায় ২০টি বিভিন্ন জাতের সন্ধান পাওয়া গেছে, তার মধ্যে 'প্লিয়সর' ও 'মেগালসর' বিপুলকায়, গ্রীবা দীর্ঘ নয়, মস্তকের আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছিল। কঠিন চোয়াল ও শক্ত দন্তপংক্তি দেখে মনে হয় যে, এদের সামর্থ্য গিয়েছিল বেড়ে এবং মৎস্যাশী হয়ে উঠেছিল কালক্রমে। খড়িস্তরে 'প্ল্যাসোডস' নামে এই জাতীয় জলচর জীবের উপরের চোয়ালে দুই সারি সুকঠিন দাঁত দেখলে বুঝতে পারা যায় যে, বর্ম্ম আবরিত মাছ শিকারকালে সহজেই দিত বর্ম্মভেদ করে, ১৮.২০ ফুট দীর্ঘ এই সামুদ্রিক সরীসৃপদের বাসস্থান উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ ও ভারতের দক্ষিণসাগর।

'ইথথাইসর' অপর এক বর্গের জলজ সরীসৃপ, ৪০:৪২ ফিট

সানলাইটের ফেণার আধিক্যই এর কারণ!
SUNLIGHT
SOAP
সানলাইট দিয়ে কাচলে কাপড়জামা
সাদা ও উজ্জ্বল হয়।
S. 248-X52 BG

লম্বা, দন্তপংক্তিতে অসংখ্য তীক্ষ্ণ দন্তরাজি হিংস্র স্বভাবের সাক্ষ্য দেয়। বিরাটকায় মৎস্যের মত দেহ গলাবিহীন, বৃহৎ মস্তক, কুমীরের ন্যায় প্রকাণ্ড মুখবিবরধারী জীবটি অম্লানবদনে সবকিছুই গলাধঃকরণ করে ফেলতেন। ১২ ফুট চওড়া মাছের ডানা ও সুবৃহৎ চারিটি প্যাডেল দ্রুত সন্তরণের উপযোগী, দেহের গড়ন সমস্তটাই তাড়াতাড়ি চলাফেরার জন্য উদ্ভূত—জলতলের এই দুর্দান্ত অসুর মৎস্যকুল ও অপরাপর প্রাণীর বিভীষিকা। কতকটা মৎস্যাকৃতি আর নিশ্বাস গ্রহণ করত উন্মুক্ত বায়ু, জলমেশা অক্সিজেন নয়। প্রায়ই আসত সমুদ্রসৈকতে বালুকারাশির উপর দিয়ে আহারের খোঁজে। সে সময়কার সমুদ্র বাত্যাবিক্ষুব্ধ, সেজন্য গভীরতম অংশে গতিবিধি; দৃষ্টিশক্তি প্রখর অক্ষিগোলকের নির্মাণ-কৌশলে তার পরিচয়। এদের সন্তানপ্রসব বৈজ্ঞানিকের নিকট এক প্রহেলিকা, জলেই সন্তান প্রসব করত সম্ভবতঃ এবং মীনাকৃতি এই দুর্দান্ত দানব কি নিজের সন্তান ভক্ষণ করত, অন্ততঃ একটি ফসিলের সুস্পষ্ট নির্দেশ তাই। মোট কথা অসুরসদৃশ এই হিংস্র প্রাণী জলে নেমেছিল অল্পদিন, খড়িস্তরের শেষ পাদে। তাই জলে শ্বাস-প্রশ্বাসের যন্ত্র উদ্ভব করতে পারে নি, আবার হয়ত জরায়ুজ।

প্রাণী যে প্রতিবেশে জন্মগ্রহণ করে বর্দ্ধিত হয় চিরকাল সেই প্রতিবেশে থাকে তা নয়। জনাকীর্ণ জলভাগ পরিত্যাগ করে আসতে হয়েছিল কোন কোন মাছকে, এদের পূর্ব্বে অনেক অমেরুদণ্ডী (শামুক, কীট, কর্কট) জল ছেড়ে উঠে এসে পুনরায় জলে ফিরে গিয়েছিল। অতিগ্রীব প্লেসিওসর ও মীনাকৃতি ইছ্থাইসর জলবাসী হ'ল, কিন্তু কেন যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'ল তার সঠিক বিবরণ নেই। সম্ভবতঃ এই সময়ে জলে নামে কুমীর ঘড়িয়াল কচ্ছপ পরাক্রান্ত ডাইনসরদের হস্ত হতে পরিত্রাণ লাভের আশায়, পৃষ্ঠদেশে কঠিন কবচের উদ্ভব সেই কারণে। এরা রক্ষা পেয়েছে, আজও অক্ষয় হয়ে রয়েছে। কূর্মের পৃষ্ঠ অস্থি-বর্ম্ম ক্রমশঃ এত কঠিন ও গুরুভার হয়ে উঠতে লাগল যে, এক-একটির ওজন ২০।২৫ মণের কম হ'ত না, শরীর বৃহৎ নয় কিন্তু পিঠে বিরাট ঢাল, মস্তকে শৃঙ্গ। ভারতের শিবালিক পাহাড়স্তর থেকে এরূপ একটি কচ্ছপের ধ্বংসাবশিষ্ট আবিষ্কৃত হয়েছে। বর্ম্মের আবরণে সকলের উপর টেক্কা দিয়েছে সামুদ্রিক কাছিম। অস্থি-বর্ম্মভারে এত বেশী ওজন যে চলাফেরা দায়, তবু বেঁচে রইল অথচ সমগোত্রের ডাইনসরেরা আজ লুপ্ত, ওজন কমেছে। ৬।৭ মণের অধিক কচ্ছপ আর দেখা যায় না।

জল ও স্থলে যখন পূর্ণ আধিপত্য চলছিল সে সময় ডাইনসর আকাশে উড়ল। প্রডেনটটা গোষ্ঠীর সরীসৃপদের পশ্চাদ্‌ভাগ অনেকটা পাখীদের মত, সম্ভবতঃ এইখান থেকে আকাশচারীদের অভ্যুত্থান। এদের আকাশে ওড়া—সরীসৃপদের আকাশে ওঠা জীব-জীবনের ইতিহাসে পরম রোমাঞ্চকর অধ্যায়। দুঃসাহসিকতার দিক থেকে অদ্বিতীয় বললে অতিরঞ্জন হয় না।

ছোট ছোট প্রাণীরা শাকপাতা, কচি ডাল চিবিয়ে খেতে বৃক্ষ-লতার উপরে উঠত অবশ্য, সেখান থেকে কীট-পতঙ্গ শিকার আরম্ভ হয়েছিল। এক গাছ থেকে অন্য গাছে লম্ফ দিয়ে যাওয়া, খানিকটা ব্যবধান শূন্যের মধ্য দিয়ে স্বীয় গতিবেগে পার হওয়া—এসব আরম্ভ হয়েছিল। ভূমিতলে দৌড়াদৌড়ি থেকে বৃক্ষারোহণ আয়ত্ত করা বিশেষ কঠিন নয়, বিশেষ করে প্রয়োজনের তাগিদে। এই অবস্থায় বৃক্ষ-জীবনকে বিরাট শিক্ষাক্ষেত্র বলা উচিত। গাছের ডালে ডালে লম্ফ-ঝম্ফ ওঠা-নাবার ফলে ক্রমশ তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়ে গতি দ্রুত হচ্ছিল, মাটিতে অবতরণের প্রয়োজন গেল কমে। বৃক্ষকুল পত্র-পুষ্প নবোদ্গত-শাখা রসাল সুমিষ্ট ফলের অফুরন্ত ভাণ্ডার জীব-জগতের সম্মুখে উন্মুক্ত করে দিয়ে লোভনীয় করে তুলল বৃক্ষোপরি জীবন-যাত্রা। নীচেকার জীবনযাত্রা নিরাপদ ছিল না বরং দিন দিন বিপদসঙ্কুল হচ্ছিল। প্রাণ হাতে করে নীচে, ভূমিতলে রোজ রোজ যাওয়া-আসা করবে কোন নিরীহ প্রাণী? সেক্ষেত্রে এক শাখা হতে অন্য শাখায় এবং পরে এক বৃক্ষ হতে অন্য বৃক্ষে যাওয়ার প্রয়োজন আহারের সন্ধানে—দূর লঙ্ঘনের পরীক্ষার সূত্রপাত। বহুকাল গাছে বসবাস করার সম্মুখের আঙুলগুলি ডাল আঁকড়ে ধরবার উপযোগী হয়ে উঠেছে, বদলেছে সরীসৃপ দেহাকৃতি। জলে নেমে ডাইনসরদের হাত-পাগুলি ক্রমশঃ যেমন প্যাডেলে রূপান্তরিত হয়েছিল ঠিক সেই মত শূন্য ভাগে সাঁতার দেওয়ার ফলে চর্ম্মের ঝিল্লি প্রস্তুত হতে লাগল পায়ের গোড়ালি থেকে আরম্ভ করে জঙ্ঘা পর্য্যন্ত এবং অন্য দিকে হাতের আঙুল-গুলিকে জুড়ে, বাহু থেকে আঙুল অবধি বিস্তৃত এই ঝিল্লী।

সহস্র, অযুত লক্ষ বৎসর নিঃশব্দে পার হয়ে গিয়েছিল নভো-মণ্ডলে অধিকারবিস্তারের আয়োজন করতে করতে। এগুলি এক একটি যুদ্ধ, বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির দ্বন্দ্ব, প্রতিবেশের সঙ্গে জীবনের যুদ্ধ, প্রতিবেশজয়ের উদ্যম। বিজয়লাভ অবশ্য আসে শেষে, দৃঢ় মানসিক শক্তিকে অন্য কোনও শক্তি প্রতিরোধ করতে পারে না, প্রবল ইচ্ছাশক্তির নিকট সমস্ত বাধাবিঘ্ন অপসারিত। বিজয়লক্ষ্মীকে অঙ্কশায়িনী করতে প্রাণ আহুতি হয় নিঃশেষে, জাতি প্রজাতি গণ বর্গ পর্য্যন্ত নিশ্চিহ্ন তবে লক্ষ লক্ষ বৎসরের আপ্রাণ প্রয়াস প্রতিকূল অবস্থাকে করে তোলে অনুকূল, ওড়ে সন্তান-সন্ততির বিজয়-বৈজয়ন্তী। জীব-বিবর্ত্তনের ইতিহাসে সকল ছোট বড় পরিবর্ত্তন, আমূল পরিবর্ত্তন—যেগুলি বিবর্ত্তন ধারাকে অন্য খাতে প্রবাহিত করেছে—তাদের মূলে একই প্রয়াস।

পাখার উদ্ভব ক্রমশঃ, ধীরে ধীরে। প্রথমে আঙুলের খানিকটা মুড়ে গেল চর্ম্মের আবরণে, দ্রুত গমনাগমনে দেহের অগ্রভাগ ছুঁচলো। পরে এল অন্য সব আনুষঙ্গিক; প্রথম মেরুদণ্ডী আকাশচর টেরডেক্‌টিল পালকের পাখা কখনই পায় নি। এর উদ্ভব আরও পরে। আকাশজয়ের প্রচেষ্টা আগেও হয়েছে। উড়ুক্কু মাছের কথা সকলেই জানি, এদের বাস ভূমধ্যসাগর, কঙ্গো উপত্যকা ও দক্ষিণ-আমেরিকায়। সম্পূর্ণ বিজয়ী ছাড়া মধ্যপথের জীব অর্থাৎ যারা খানিকটা উড়তে পারে অথবা খানিকটা অনায়াসে লাফ দিয়ে পার হয়ে যায় মেলে অনেক। চীন, জাপান, সিংহল,

মাডাগাস্কারে একজাতীয় ভেকের সন্ধান পাওয়া গেছে যাদের আঙুলগুলি ঝিল্লি দিয়ে জোড়া। বোর্ণিও, ফিলিপাইনে এক জাতের কাঠবিড়াল সন্তানপৃষ্ঠে এক গাছ থেকে অন্য গাছে ভ্রমণ করে অবলীলাক্রমে (প্রায় ৭০ গজ অবধি এদের পাল্লা)। উঁচু গাছ থেকে শূন্যে ভর করে ভূমিতে নামা অতি সহজ। সাইবেরিয়া ও উত্তর-আমেরিকায় এইরূপ এক প্রকার শশকের অস্তিত্ব জানা গেছে। মালয়ের উপদ্বীপে কবেগো নামে লিমরের কনিষ্ঠ আঙুল হতে পা পর্য্যন্ত স্থিতিস্থাপক পাতলা চামড়া দিয়ে জোড়া, কীট-পতঙ্গের পিছনে এক গাছ হতে অন্য গাছে অক্লেশে তাড়া করে যায়। এই সকল আধুনিক জীবের স্বভাব ও দেহের গঠন দেখলে মনে হয় আকাশে ওঠবার প্রয়াস যেন অর্দ্ধপথে পরিসমাপ্ত। তা হলে আরও এগিয়েছে অনেকে। টেরডেক্‌টিলদের জন্মবৃত্তান্তে এরা এক-একটি অধ্যায়।

বৃষ্টিধৌত গাঢ় নীলাকাশতলে প্রখর সূর্য্যালোকে টেরসরদের মন্দ লাগত না ভেসে বেড়াতে। তবে এ কথা মনে করা ভুল যে, এরা আধুনিক পাখীদের মত দেশ-দেশান্তর ভ্রমণে সক্ষম ছিল। এই পক্ষবিশিষ্ট আকাশচারী সরীসৃপেরা কোন সময়েই একটানা অনেকক্ষণ উড়ে বেড়াবার ক্ষমতা পায় নি, অনুমান করা যায় যে বাদুড়দের চেয়ে অধিক দূর ওড়বার শক্তি ছিল না। আকৃতিতে বিস্তর পার্থক্য, ঘুঘু পক্ষীর আকার থেকে আরম্ভ করে বিরাট ছয় মিটার দীর্ঘ কঙ্কাল রক্ষিত আছে যাদুঘরে। সম্মুখের অংশ ছুঁচলো হওয়ায় অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, ছোঁ মেরে নীচের দিকে আসতে ওস্তাদ এবং যেহেতু মাছ পছন্দ করত বেশী (উদরপূর্ত্তির সদুদ্দেশ্যে) পাহাড়ের গায় ওৎ পেতে প্রতীক্ষা, কোন মৎস্যাবতারকে দেখলে বীরদর্পে লাফিয়ে পড়ত ঘাড়ে। ভুল হ'ত না তা নয়, মূল্যস্বরূপ প্রাণটি খোয়াতে হ'ত শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর পাল্লায় পড়ে; কেউ কেউ স্থলচর প্রাণীদের সঙ্গে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হ'ত, তবে সর্ব্বপ্রকার বর্ম্মের আচ্ছাদন ও অস্ত্রশস্ত্র বিরহিত হওয়ায় প্রায়শঃ পরাজয়। সাতাক টেরোডক্‌টিলের নাম দেওয়া হয়েছে 'হেসপারোরনিজ'। দন্তবিশিষ্ট ইক্‌থিওরনিজের দাঁত ফাঁক ফাঁক, চোয়ালের শেষে, পরে দন্ত বিলুপ্ত হয়ে কাঁটার মত শক্ত মাড়িই অবলম্বন। ঞ্যাক্টোডবিষ্টল অবিনদোচীরাসের একমাত্র অস্ত্র ধারাল নখর-সমন্বিত থাবা। সরীসৃপ শরীর ও প্রকাণ্ড লেজ নিয়ে আকাশে ঘুরে বেড়াত। ডানা বার হ'ত কনিষ্ঠ আঙুল থেকে, অপর আঙুলগুলি অবিকৃত; পালকহীন ডানা পদদ্বয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত, সেজন্য সাচ্ছন্দ্য ছিল না পায়ে যেমন আধুনিক পাখীদের পদদ্বয় মুক্ত থাকায় ভূমির উপর চলাফেরা করতে পারে অনায়াসে। টেরানডন উন্নততর-ভারী চোয়ালবিশিষ্ট, দাঁত নেই, সারসের মত লম্বা চঞ্চু, লেজ ছোট, পাখীর খুলির মত মাথার খুলি। আকাশচারী অসুরদের মধ্যে বৃহত্তম 'প্যালিওরনিস' কেবল শক্তিশালী নয় সুগঠিত সম্মুখের হাত (ডানা) দেখে মনে হয় যে শূন্যে বিচরণ করবার ক্ষমতা সর্ব্বাধিক, পশ্চাদভাগের ব্যবহার বেশী হ'ত না।

আকাশে উঠে আর একটি সুবিধা হ'ল, বংশবৃদ্ধি। ডিম পাড়বার জন্য মাটিতে নেমে আসবার প্রয়োজন নেই, পাহাড়ের ফাটলে বৃক্ষচূড়ায় সে কার্য্য সম্পন্ন। ঐ স্থানগুলি ভূমির শত্রুদের নাগালের বাইরে, রক্ষণাবেক্ষণ না হলেও ক্ষতি নেই। অল্প সময়ের মধ্যে আকাশে আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছিল এই কারণে। জীব-বিবর্ত্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে বলতে হয় যে খেচরদের জন্ম হয়েছে হঠাৎ, তবে কুলজী মিলিয়ে দেখা যায় যে 'টেরসর' ও কয়েক জাতের ডাইনসরের সঙ্গে সম্বন্ধ গভীর, বিশেষতঃ দেহের পশ্চাদভাগে। ব্যাভেরিয়া চূণাপাথর, খনিতে আবিষ্কৃত হয়েছে কতকগুলি পাখনা-সংযুক্ত কঙ্কাল, যেন প্রক্ষিপ্ত সরীসৃপ।

ডাইনসর বংশ ধ্বংস

পূর্ব্বে বলা হয়েছে যে, এ দুনিয়ায় এসেছে অনেকে এবং গেছে অনেকে কিন্তু এমন অভিনব আসা-যাওয়া আর কেউ দেখাতে পারে নি। বংশধর বেশী নেই, যারা আছে তাদের প্রতাপ সামান্য নয় ভয়েতে সকলে থরথরিকম্প। নদীজলে কুমীর, মাটির ভিতরকার বাসিন্দা সাপের দাপট* না বললেও চলে। ঠিক এই রকম একাধিপত্য করে গেছে এদের আদিপুরুষ জুরাপর্ব্বত ও খড়িমাটির সমস্ত কাল ধরে জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে। ট্রিয়াস যুগ থেকে ডাইনসর গোষ্ঠীর সন্ধান মেলে, জুরায় এদের বিস্তার এবং খড়িযুগে এদের চরমোৎকর্ষ। সব সময়কার অশ্মীভূত জীবাস্থি আমরা পেয়েছি তা নয়, অনেক স্থানে অনুমানের উপর নির্ভর। উত্তর-আমেরিকার মধ্য ভাগে, ভার্জ্জিনিয়া-ক্যারোলীনা-ম্যাসাচুসেটের ট্রিয়াস-স্তরে লেখা আছে পরিচয়—সমুদ্রসৈকতে শিকারের আশায় থাকত ওৎ পেতে, সেখানে রেখে গেছে বিরাট বিরাট পদচিহ্ন। তদানীন্তন পৃথিবীর সর্ব্বত্র লেখা রয়েছে গতিবিধির সংবাদ, পুরাতন প্রায় সকল দেশের প্রস্তর-স্তরে মিশে যাওয়া কঙ্কাল।

অনুমান হয় কিঞ্চিদধিক ৮ কোটি বৎসর ধরে অতিকায় সরীসৃপের রাজত্ব চলেছিল আজ থেকে অন্ততঃ আরও ৬।৭ কোটি বৎসর পূর্ব্বে। সবারই শেষ আছে, এই বুদ্ধিহীন হিংসাপরায়ণ যুগও একদিন শেষ হয়ে গেল, অকস্মাৎ এ যুগের উপর নেমে এল মৃত্যুর হিম-শীতল যবনিকা। আবার আরম্ভ হ'ল তুষারপাত, ঝঞ্ঝা, গাঢ় কুয়াসা, সমুদ্রে শক্ত কঠিন হয়ে উঠল হিমবাহ, পর্ব্বত থেকে

* অহিকুল বিষধর বলে কুখ্যাত অথচ সমগ্র সর্পকুলের দুই-তৃতীয়াংশ নির্বিষ, অবশিষ্ট শতকরা ৯০ ভাগ নিজেরাই ত্রস্ত, পলায়নে তৎপর। সাপের প্রধান অস্ত্র বিষদন্তের বিবর্ত্তন বিস্ময়কর। সর্প-বিবর্ত্তনের প্রথম দিকে বিষের লেশমাত্র ছিল না, বিষোদ্গম শিকার আয়ত্তকরণে। সাপের মাথা-মুখ সমান অর্থাৎ শিকার বড় হলে উপর নীচের চোয়াল এক লাইনে হতে পারে। মাথার দেওয়াল কঠিন নয়, গিলে খাওয়া জীবন্ত শিকার মস্তক ভেদ করে পালাবার চেষ্টা করবে তাই বিষ দন্তের উদ্ভব। প্রথম প্রথম শিকারকে অসাড় অবচেতন করে দিত, এখন বিষযন্ত্র আরও উন্নত, ক্ষয়ক্ষতি পূর্ণ হতে দেরী হয় না।

নাচতে নাচতে নেমে আসতে লাগল হিমানী-সম্প্রপাত। সমস্ত হানাহানি, আক্রমণ, হিংস্র রক্তপাত, বিসম্বাদের অবসান। কোথা গেল খড়্গ, করালদংষ্ট্রা-নখর সজ্জিত মাংসাশী ডাইনসরদের বিক্রম, কোথায় বা গেল টিরানোসর-ব্রাইগ্যান্টোসরদের শারীরিক অসুরবলের অহঙ্কার, ধ্বংসরূপী শীত এসে উচ্ছেদ করে দিল সব। শুধু শীতকেই দোষী করা চলে না, আরও অনেক কারণ ছিল। শীত অবশ্য একেবারে সহসা আসে নি, বেশ কিছুদিন ধরে আসব আসব করছিল। সেই সুযোগে অনেকে একেবারে ভোল বদলে ফেলেছিল, যেমন খেচর সরীসৃপদের দেহে দেখা দিচ্ছিল রোম-কম্বলের আভাস, তবে এত করেও রক্ষা পায় নি সর্ব্বনাশা শীতের হাত থেকে।

এদিকে আবার বেশ কিছুকাল ধরে লোকচক্ষুর (?) অন্তরালে ধীরে ধীরে হচ্ছিল আর একটি ভিন্ন বর্গের উদ্ভব। অতি সংগোপনে বিশালকায় হিংস্র ডাইনসরদের এড়িয়ে চলত এরা, একবার সামনে পড়ে গেলে ত আর রক্ষা নেই। মাটির ভিতর গর্ত্ত করে থাকত আর ডিম পাড়ত এই নিরীহ জীবেরা, এরাই হয়ে দাঁড়াল ডাইনসরদের সবচেয়ে ভীষণ শত্রু। ডাইনসররা যেখানে সেখানে অণ্ড প্রসব করত তার পর আর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, আবহাওয়া উষ্ণ, স্বাভাবিক নিয়মে ডিম ফুটে বাচ্চা বার হ'ত। ওই নিরীহ জীবগুলি, কেন বলতে পারা যায় না, ডাইনসর-অণ্ডের অত্যন্ত ভক্ত হয়ে উঠল অর্থাৎ খুব খেতে লাগল। বোধ হয় এগুলি সহজলভ্য ছিল, অন্য কোন খাদ্য সুলভে পাওয়া যেত না ওই ভয়ঙ্কর যুগে, কাল্পনিক 'রক-পক্ষী অণ্ডের' মত বড় বড় অণ্ড খেত উদরপূর্ত্তি করে, ভাঙত ফেলত ছড়াত। নেহাৎ বোকা নয়, বুঝতে পারত কি যে এই ডিম-নিঃসৃত জীব পরম শত্রু। সেজন্য যেখানে দেখত সেখানে নষ্ট করে ছাড়ত। এইভাবে একদিকে সন্তানের প্রতি ঔদাসীন্য অন্যদিকে রাক্ষসবৃত্তির ফলে বিরাট প্রাণীদের বংশ সমূলে নির্মূল হবার দিকে গেল এগিয়ে। এত সহজে এরা যেত না যদি না নিজেদের ধ্বংসের পথ নিজেরা প্রশস্ত করে দিত। যেমন যেমন দ্রুত পরিবর্ত্তনের দিকে এগিয়ে চলেছিল ঠিক সেই অনুপাতে কারও শরীরের পরিধি বেড়ে চলছিল কারও দেহ কঠিন কণ্টকময় বর্ম্মে আচ্ছাদিত করেও গজিয়ে উঠেছিল আক্রমণের অস্ত্রশস্ত্র, ধারালো নখরসংযুক্ত থাবা, করালদংষ্ট্রা সুতীক্ষ্ণ খড়্গ, কণ্টকময় লাঙ্গুল—ক্রোধ ও সংগ্রাম-প্রবৃত্তির প্রাবল্য থাকায় এ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উদ্ভব। দৈহিক শক্তিতে শত্রুকে বিনাশ করব, এই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। সারা জীবন ধরে বিশেষ শক্তির উপাসনা সন্তান-সন্ততির মনে সংক্রমিত হবেই, সন্তান উত্তরাধিকারীসূত্রে সে সাধনাকে উত্তরোত্তর সিদ্ধির পথে পরিচালিত করবে। নিরীহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরীসৃপদের ভীষণকায় ও হিংস্রতম ডাইনসরে পরিণত হবার মূলে এই তত্ত্ব। তবে এ বিবর্ত্তন-ধারা সাধারণভাবে অগ্রগতি অভিমুখে যায় নি, ধাবিত হয়েছিল তির্য্যকগতিতে, বেড়ে উঠেছিল একতরফা একদিকে। অন্তর্নিহিত সংগ্রামবৃত্তি অন্য কোন দিকে যেতে দেয় নি মানসিক বৃত্তিকে, তাকে একটি দিকে নিয়োগ করে বৃদ্ধি করেছে দৈহিক বল, বিজিগীষা। উৎকর্ষ এসেছে বক্রভাবে, পাশবিক শক্তির পরিস্ফুরণে। লক্ষ কোটি বৎসরে প্রকৃতির গবেষণাগারে শুধু ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ডাইনসরই তৈরি হয় নি, ক্রোধ ও হিংসাবৃত্তির দৌলতে যুগে যুগে অসুরসদৃশ প্রাণীরা আবির্ভূত হয়ে ধরাতল রক্তপ্লাবিত করেছে।

অভিব্যক্তির মূলধারার সঙ্গে এগিয়ে না গিয়ে অন্যদিকে অপ্রত্যাশিত উৎকর্ষ লাভের চেষ্টায় একতরফা বৃদ্ধি হয় খানিকটা। তবে সে বক্র। প্রথমদিকে দৈহিক শক্তি ও আয়তন বৃদ্ধি হয় প্রভূত, নূতন নূতন বর্ম্ম ও অস্ত্রের সৃষ্টি হয় দেহে। ডাইনসরকুলের পরিস্ফুরণ বক্রধারাকে কেন্দ্র করে, বিপুলায়তন হয়ে উঠল দেহ, শক্তিশালী প্রত্যঙ্গের আবির্ভাব অথচ মন রইল পঙ্গু হয়ে, একতরফা বৃদ্ধির জন্য দেহ ও মনের একসঙ্গে উন্নতি হ'ল না। ক্ষতি যা হ'ল তার সীমা নেই। বুদ্ধির উপর এরা কোনকালে আস্থা রাখে নি, কৌশলচাতুর্য্য ধূর্ত্তমি জানে না, কর্ম্মনৈপুণ্য স্থূল। প্রতিক্রিয়াও আরম্ভ হ'ল ভীষণরূপে। বড় বড় ১০০.১২০ ফুট লম্বা দেহ অথচ মস্তিষ্ক-আধার অবিশ্বাস্যরূপে ক্ষুদ্র, টনের হিসাবে দেহের ওজন, মস্তিষ্ক কয়েক আউন্সও নয়।* অল্পবুদ্ধিকে আমরা গর্দ্দভ আখ্যা দিই, প্রকৃত গাধা ছিল এরা। প্রতিবেশ অনুকূল ছিল যতদিন ততদিন বেশ চলছিল, দুর্দ্ধর্ষ হয়ে উঠেছিল। আবহাওয়া পরিবর্ত্তনকালে প্রতিবেশ যখন বদলাল, এরা পারল না তাল রেখে চলতে, নিকট-প্রতিবেশের অনুরূপ পারল না স্বভাব বদলাতে। দীর্ঘ গ্রীবার সাহায্যে ব্রন্টেসর ডিপ্লোডেকাস আহার সংগ্রহ করত জলা-বাদায় অলসভাবে পড়ে থেকে, বিশাল শরীর অথচ দুর্ব্বল পা, মাটি যখন শক্ত আঁট হয়ে গেল, উদ্ভিদ-খাদ্য গেল ফুরিয়ে, এরা কি করবে ভেবেই পেল না। ক্ষুদ্র বুদ্ধি অথচ বিপুল শ্লথ দেহ, অশক্ত পা সে-দেহ নিয়ে ভেঙে পড়ল। হস্তপদ, অন্যান্য অঙ্গ দেহের সঙ্গে অনুপাতহীন, কোনটা বিশাল বড়, কোনটা ছোট, সামঞ্জস্য থাকবে কি করে? ব্রাসেলের সীসের খনিতে ২২টা ঈগনোডনের দেহাবশেষ একত্র পাওয়া গেছে, কোনও বিপৎপাত ঘটেছিল বোধ হয়।

একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বলেছেন যে, জীব-বিলুপ্তির কারণ

---

* ভীমকায় ডাইনসরদের মস্তিষ্ক হাস্যকররকমে ক্ষুদ্র, তবে এই বিরাট দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ন্ত্রণ হ'ত কিরূপে? মেরুদণ্ডের নিম্নপ্রান্তে একটি নার্ভকেন্দ্রের উদ্ভব হয়েছিল এদের দেহে, যার ওজন মস্তিষ্কের প্রায় ১০ গুণ। আলাদা এই দ্বিতীয় নার্ভকেন্দ্রের আগমন ও কার্য্য আপাতদৃষ্টিতে আত্মরক্ষা তথা আক্রমণ-প্রণালী পরিচালনা করলেও সুফল ঘটে নি কিছুই। মস্তিষ্ক হতে বিচ্ছিন্ন নূতন পরিচালনা-কেন্দ্র সর্ব্বনাশ সাধন করল এদের, সুষ্ঠু ও সংযত হয়ে উঠল না কার্য্যরীতি, অভিব্যক্তি-ধারা থেকে স্থানচ্যুত এ অঙ্গ একদেশদর্শী হয়ে গড়ে উঠল শুধু আক্রমণ-কার্য্যে এবং ধ্বংস এল দ্রুতপদসঞ্চারে।

মৃত্তিকা-স্তরের পরিবর্ত্তন। কিছু সত্য আছে এতে অভিব্যক্তির। ইতিহাসে সহস্র বৎসর বিশেষ কিছু নয়, নগণ্য। সহস্র সহস্র বৎসরে আমূল পরিবর্ত্তন হয় স্থলভাগে, হীনবুদ্ধিরা পরিবর্ত্তিত প্রতিবেশে তাল রেখে চলতে না পেরে ধুয়ে মুছে নিঃশেষ। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে যে যুগপরিবর্ত্তনের সূচনা হচ্ছিল ডাইনসরদের স্বল্পবুদ্ধি তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে শেখে নি, নূতন প্রতিবেশে দাঁড়িয়ে মার খেল অর্থাৎ সবংশে নির্ব্বংশ। উদ্ভিজ্জভোজী যত কমতে লাগল মাংসাশীদের ততই অসুবিধা, কিছুটা নিজেদের মধ্যে হানাহানি করে কিছুটা অনাহারে এরাও স্রেফ গুণ্ডামীর জোরে বেশীদিন টিঁকল না।

রয়ে গেল মাটিতে মিশে যাওয়া কিছু জীবাশ্ম, চিরকাল যারা সাক্ষ্য দেবে যে, বলদৃপ্ত আক্রোশ-বিদ্বেষ কখনও জীবন-সংগ্রামে জয়ী হতে পারে না, হিংসা-ক্রোধের উপর যে শক্তি প্রতিষ্ঠিত তার নিজের মধ্যেই উপ্ত রয়েছে ধ্বংসের বীজ।

ফুলের মত...
আপনার লাবণ্য রেক্সোনা
ব্যবহারে ফুটে উঠবে
রেক্সোনা সাবানে আছে ক্যাডিল
অর্থাৎ ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্যে
তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা
আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে
বিকশিত করে তুলবে।
Rexona
BLENDED WITH CADYL
একমাত্র ক্যাডিলযুক্ত টয়লেট সাবান
RP. 150-X52 BG
রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারী লিঃ, এর পক্ষে ভারতে প্রস্তুত

যেন ভুলে না যাই—প্রকাশক শ্রীনির্ম্মল বোস। ২১এ, জাস্টিস চন্দ্রমাধব রোড, কলিকাতা-২০। দাম তিন টাকা।

বইখানি উপন্যাস নয়, অ্যাদলফ রুদনিচকি সম্পাদিত 'Lest we forget' নামক পুস্তকের অনুবাদ। ইহাতে আছে গত মহাযুদ্ধে জার্ম্মানদের ইহুদি উৎসাদনের নির্ম্মম কাহিনী—যাহা অপরাধমূলক উপন্যাসের চেয়ে কল্পনাতীত ঘটনায় পরিপূর্ণ। গত মহাযুদ্ধের কথা আমরা জানি, যুদ্ধে লোকক্ষয়ের হিসাবও মোটামুটি পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু রণভূমির পিছনে পাইকারী হারে নরহত্যার আয়োজন বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা-গর্ব্বিত মানুষের পক্ষে অকল্পনীয় ব্যাপারই। এমন নৃশংস ঘটনা নাৎসী কন্‌সেনট্রেশন ক্যাম্প-গুলিতে প্রতিদিনই ঘটিত। এই ক্যাম্পগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল 'আউশ ভিৎস' ক্যাম্প। এই একটি মাত্র ক্যাম্পে ১৯৪৪ সনের জুলাই মাসে একদিনে ২৪ হাজার নরনারীকে গ্যাস চেম্বারে পুরিয়া হত্যা করা হয়। ব্যাপকভাবে ইহুদি উৎসাদনে—লাঠি, বন্দুক, গ্যাস এবং নানাবিধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যেভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা পড়িতে পড়িতে সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠে। গ্রন্থ-পরিচিতি প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় সত্যই বলিয়াছেন, এই হত্যা এমন পৈশাচিকভাবে করা হইয়াছে যে, সেই কাহিনী সুস্থচিত্তে পাঠ করা পর্য্যন্ত কঠিন। গা রী রী করিতে থাকে, একটা অসহ্য মানসিক যন্ত্রণা হৃদয়বান পাঠককে আচ্ছন্ন করে।

তিনি আরও বলিয়াছেন, ১৯৩৯ সনের সমগ্র পোলিশ জন-সংখ্যার শতকরা ২২·২ ভাগ হত্যা করা হইয়াছে।···একমাত্র ওয়ারশ শহরের ১৩ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ৭ লক্ষকে খুন করা হইয়াছে। জার্ম্মান-অধিকৃত পোলিশ অঞ্চলের ২ কোটি ১০ লক্ষ লোকের মধ্যে ৬০ লক্ষ লোককে সাবাড় করা হইয়াছে।···বিশেষ ভাবে বাছিয়া আবার ইহুদী এবং বুদ্ধিজীবীদিগকে মারা হইয়াছে।

···এমন নির্ম্মম বীভৎস হত্যা-আয়োজন অপরাধমূলক কাহিনীতেও পাওয়া যায় না। অথচ এগুলির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। যে সমস্ত যুদ্ধবন্দী এই নারকীয় পরিবেশ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে—তাহাদের বর্ণনা, পোলিশ যুদ্ধ-বিচারালয়ে যুদ্ধাপরাধীদের জবানবন্দী ও সাক্ষ্য প্রমাণাদি, চিঠিপত্র, হত্যার সাজ-সরঞ্জাম প্রভৃতি হইতে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে—বহুলক্ষ নরনারী, দুগ্ধপোষ্য শিশু হইতে স্থবির-বৃদ্ধ পর্য্যন্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী নিহত হইয়াছে।

যুদ্ধ শেষ হইয়াছে—দুঃস্বপ্নের অবসান হইয়াছে কি? বিজ্ঞানের যে নূতন মারণাস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার প্রয়োগ সম্বন্ধে পৃথিবীর মানুষের অবহিত হইবার সময় আসিয়াছে। জাতি বা দেশের গৌরবটাই আজিকার বিশ্বে জীবন-মরণের প্রশ্ন নহে, সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষা এবং জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সুস্থদেহে ও মনে বাঁচিয়া থাকার দাবিটাই আজ সর্ব্বাগ্রগণ্য। কোন অসতর্ক মুহূর্ত্তে জাতিগত বিদ্বেষে মানবীয় শুভবুদ্ধির বিলোপ ঘটিলে এবং পৃথিবী ধ্বংসের সঙ্কট মুহূর্ত্ত ঘনাইয়া আসিলে "যেন ভুলে না যাই"-এর লেখাগুলি নিষেধবাণীর কাজ করিবে। এই কাহিনী শুধু অতীতের নৃশংস হত্যাকাহিনী মাত্র নয়—ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার সতর্কবাণী; গ্রাম, শহর, মানুষ, সভ্যতা, সংস্কৃতি প্রভৃতি সবকিছুকে বাঁচাইয়া রাখার শান্তিমন্ত্র। বইখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

সাতটি তারা—শ্রীনারায়ণ সেনগুপ্ত। সংহতি প্রকাশনী, ২০৩,২বি কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য দেড় টাকা।

সারথি, আবর্ত্ত, রোগ, জীবিকা প্রভৃতি সাতটি গল্প এই সঙ্কলনে আছে। গল্পগুলি ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। [illegible] জোলো গল্প নয়। লেখক নবাগত হইলেও বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। লেখার ধরনটিও ভাল। ভূমিকা লেখকের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলা যায়—লেখক ভবিষ্যতে তাঁর সাহিত্য-জীবনের সম্ভাবনা বিষয়ে উন্নততর রচনার প্রতিশ্রুতি দিতে পারিবেন।

পিতা ও পুত্র—ভেরা পানোভা। অনুবাদ—শিউলি মজুমদার। পপুলার লাইব্রেরী, ১৯৫।১বি কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ২·৭৫ নয়া পয়সা।

কিছুদিন হইতে বাংলা-সাহিত্যে অনুবাদ-পুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং অনুবাদকের সংখ্যাও। লক্ষণ শুভ। সেই সঙ্গে আর একদিক দিয়া শঙ্কিত হইবার কারণও রহিয়াছে। সে হইল নির্ব্বিচারে ইংরেজী-ভাষান্তরিত যে-কোন বইকে অনুবাদযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করা। সাম্প্রতিককালে প্রচারকার্য্যের জন্যও এমন কতকগুলি পুস্তক অনূদিত হইয়াছে—যাহা সাহিত্য-গুণান্বিত নহে।

এ ছাড়া ভাল বইয়ের অক্ষম অনুবাদও আছে। এই সব কারণে অনুবাদ-পুস্তক হাতে পড়িলে পুলকিত হওয়ার কথা নহে। সুখের বিষয় আলোচ্য পুস্তকখানির গোত্র স্বতন্ত্র। এখানি সুনির্ব্বাচিত, অনুবাদেও লেখিকার কৃতিত্ব পরিস্ফুট। গল্পের নায়ক একটি সপ্তম বর্ষীয় শিশু; ঘটনাস্থল ছোট পল্লীগ্রাম, অতি সাধারণ কয়েকটি চরিত্র তার চারিপাশে। রোমান্সের রমণীয়তা বা ঘটনা-বিন্যাসের চমৎকারিত্ব ইহাতে নাই, অথচ কি সুন্দরভাবেই না শিশু-মনস্তত্ত্বের অধ্যায়গুলি পরস্পর সংযুক্ত হইয়া একটি সাবলীল কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে।

বইখানি ডিকেন্স প্রণীত ডেভিড কপারফিল্ডের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। একই সমস্যা, কিন্তু যে প্রথার অন্ধকার দিকটি

লইয়া দ্বিবেজ তৎকালীন সমাজে আলোড়ন তুলিয়াছিলেন, তাহারই অপর দিকে বি-পিতার সঙ্গে ছোট একটি শিশুর স্নেহ-ভালবাসার সম্পর্কটি মধুর হইয়া ফুটিয়াছে। আলোচ্য বইখানিতে এই অন্তরঙ্গতার কাহিনী কৌতূহল সৃষ্টি করে, মনকে ভরাইয়াও তোলে। অনুবাদে লেখিকার অকপট চেষ্টা প্রশংসনীয়। শুধু একটিমাত্র জিজ্ঞাসা পাঠক-মনে রহিয়া যায়। মূল বইয়ের নাম ও রচয়িতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় কেন নাই? আশা করি পরবর্তী সংস্করণে অনুবাদিকা এই প্রশ্নের অবকাশ রাখিবেন না।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

অম্বর চরকা—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু। অভয় আশ্রম, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৬৪, মূল্য ৸০ আনা।

উন্নত ধরনের চরকা উদ্ভাবনের জন্য ১৯২৩ সনে গান্ধীজী ৫০০০৲ পুরস্কার ঘোষণা করেন। বহুলোক চেষ্টা করিয়াও এই বিষয়ে কিছু করিতে পারে নাই। ১৯২৯ সনে গান্ধীজী 'অখিল ভারত চরকা সঙ্ঘের' মাধ্যমে পুনরায় উন্নত ধরনের চরকা আবিষ্কারের জন্য এক লক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় অবশ্য ছয়টি সর্ত্ত ছিল। দেশী-বিদেশী বহু লোক নানা মডেল বা নমুনা তৈয়ার করিয়া গান্ধীজীর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় কোনটাই তাঁহার যোগ্যতার মানে পৌঁছিতে পারে নাই।

গান্ধীজীর মৃত্যুর পর তাঁহার পরিকল্পিত চরকার রূপদানে সমর্থ হইল একজন সাধারণ কৃষক পরিবারের সন্তান— শ্রীএকাম্বর নাথম্। ইনি মাদ্রাজ প্রদেশের তিরুনেলভেলী জেলার পপনকুলম গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। একাম্বর নাথম মাতৃভাষা তামিল ব্যতীত ইংরেজী বা হিন্দী জানে না। চরকার প্রতি গভীর অনুরাগ এবং দীর্ঘ একনিষ্ঠ সাধনাই তাঁহাকে এই মহত্তম সৃষ্টির অধিকারী করিয়াছে। একাম্বর নাথম কয়েক বৎসর ধরিয়া নানারূপ চরকা তৈয়ার করিয়া পরীক্ষা করিতে থাকেন। ১৯৫২ সনে ওয়ার্দ্ধায় সেবাগ্রামের একদল কাটুনী মাদ্রাজের কোবিনপট্টিতে সুতাকাটার এক প্রদর্শনীতে সুতাকাটা প্রদর্শন করিতে যান। এখানে একাম্বর নাথমও সুতাকাটা প্রদর্শন করিতে যান। শ্রীকৃষ্ণদাস ভাই একাম্বর নাথমকে কিছু কিছু সংশোধনের পরামর্শ দেন। ইহার পরেই অম্বর চরকার প্রয়োগ ও ব্যবহারিক পরীক্ষা চলিতে থাকে। আচার্য্য বিনোবাভাবে এই অম্বর চরকা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন এবং গান্ধীজী-পরিকল্পিত চরকার যোগ্যতর অধিকারী বলিয়া ইহাকে ঘোষণা করিয়াছেন।

অম্বর চরকা ৪টি টেকো বিশিষ্ট কাঠের ফ্রেমে গঠিত একটি হস্তচালিত যন্ত্রবিশেষ। ইহাতে সুতাকাটা এবং সুতা জড়ান একটি হাতল ঘুরাইলে নিজে নিজেই হয়। ১২ হইতে ১৩০ নম্বর সুতা কাটা যায় এবং শক্তি ও সমানতায় তাহা মিলের সুতার সমতুল্য—যে কোন সাধারণ তাঁতি বুনিতে পারে। ১২ হইতে ১৬ নম্বরের সুতা ১ ঘণ্টায় প্রায় ২৫০০ হইতে ৩০০০ হাজার গজ কাটা যায়। ৮ ঘণ্টা সুতা কাটিয়া সাধারণতঃ ।৵০ হইতে ১৲ পর্য্যন্ত একজন রোজগার করিতে পারে। এই চরকা লম্বায় ২১ ইঞ্চি, চওড়ায় ১৬ ইঞ্চি। ওজন ২৬ পাউণ্ড বা প্রায় ১৩ সের।

লেখক আটটি অধ্যায়ে অম্বর চরকাকে সর্ব্বসাধারণের নিকট পরিচিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। নিবেদন ব্যতীত রূপায়ণ—অর্থনৈতিক সমস্যা ও অম্বর চরকা, তুলা বোনা, পাঁজ তৈরি, সুতাকাটা, অম্বর যন্ত্রাংশের মাপ এবং সুতার বর্গমূল ও ওজন অধ্যায়ে এই যুগান্তরকারী চরকার বিশদ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। দরিদ্র ভারতে বস্ত্রের চাহিদা মিটাইতে ও কর্ম্মসংস্থান ও বেকার-সমস্যার সমাধান করিতে অম্বর চরকার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রায় ৭০০০ কোটি টাকার বরাদ্দ করা হইয়াছে—ইহার প্রধান উদ্দেশ্য বেকার সমস্যার সমাধান। এই পরিকল্পনায় গ্রামীন ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-সংগঠনের জন্য বরাদ্দ ২০০ কোটি টাকা।

ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে কমিটির রিপোর্ট হইতে জানা যায় ভারতের ৩৬ কোটি লোকের মধ্যে ২৫ কোটি লোকই উপযুক্ত খাদ্য ও বস্ত্র পায় না। ভারতের মোট বার্ষিক বস্ত্র চাহিদা ৮২০ কোটি গজ। মিলে উৎপন্ন হয় ৫০০ কোটি গজ, হস্তচালিত তাঁত এবং খদ্দরে উৎপন্ন হয় ১৭০ কোটি গজ। বাকী ১৫০ কোটি গজের উৎপন্ন অম্বর চরকা দ্বারাই হইতে পারে যদি সরকারের এবং দেশবাসীর সক্রিয় সহানুভূতি পাওয়া যায়। ২৫ লক্ষ অম্বর চরকা চালু হইলে ১৫০ কোটি গজ কাপড় তৈরি হইবে। ২৫ লক্ষ অম্বর চরকা চলিলে ৮০ লক্ষ লোকের কর্ম্মসংস্থান হইবে এবং তাহাদের মাথাপিছু আয় হইবে ২৯৭৲। মিলে ঐ ১৫০ কোটি গজ কাপড় তৈরি করিতে ১। লক্ষ লোক কার্য্য পাইবে, ৯০টি নূতন মিল বসাইতে হইবে, ৩৬ কোটি টাকা খরচ বাড়িবে। ভারতের আর্থিক সমস্যার সমাধানে এবং গান্ধীজীর স্বপ্নের রামরাজ্য

প্রতিষ্ঠায় চরকায় স্থান কত উচ্চে তাহা আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না।

অবশ্য কেহ যেন "অম্বর চরকা" পাঠ করিয়াই উক্ত চরকায় সুতা করিতে পারিবেন এরূপ মনে করিলে ভুল বুঝিবেন। এই পুস্তকের সাহায্যে এবং উপযুক্ত শিক্ষকের নির্দেশে যে কেহ অম্বর চরকায় পারদর্শী হইবেন ইহা নিঃসন্দেহ। এইরূপ সুলিখিত পুস্তকের বিপুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। পুস্তকখানি হস্তনির্মিত কাগজে মুদ্রিত।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত
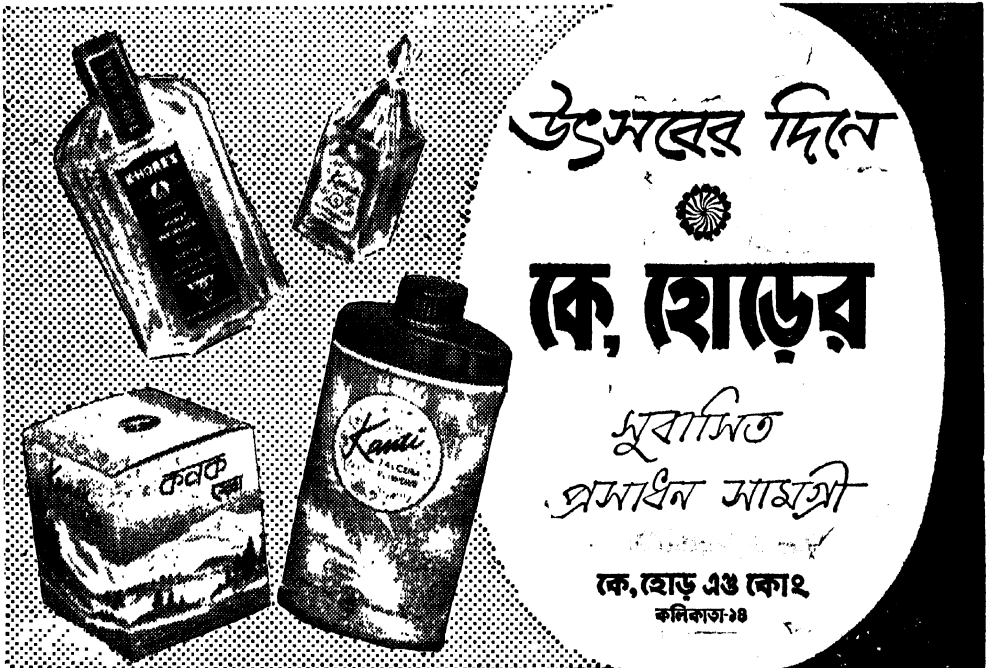
ইউরোপের গান্ধী: ডাঃ আলবার্ট শুইৎজার—শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন বসু রায়। শৈবলিনী-কুটীর, সন্তোষপুর, যাদবপুর, কলিকাতা-৩২। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯২, মূল্য ১·৫০ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি বিখ্যাত মনীষী ডাঃ আলবার্ট শুইৎজারের (Dr. Albert Schweitzer) একটি ক্ষুদ্র জীবনালেখ্য। ডাঃ শুইৎজার একাধারে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক, শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতশিল্পী, শ্রেষ্ঠ দার্শনিক এবং শ্রেষ্ঠ শান্তিকামী। তাঁহার সমগ্র জীবনই তিনি আর্ত মানবের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন। লেখক এই মহা-মনীষীর জীবনী সংক্ষেপে বাঙালী পাঠকদের সামনে তুলিয়া ধরিয়া সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। গ্রন্থটির ভাষা সাবলীল এবং প্রচ্ছদপট ও মুদ্রণ সুন্দর।

গ্রহ থেকে গ্রহে—এ. স্তার্নফেল্দ্। অনুবাদক অমল দাশগুপ্ত। পপুলার লাইব্রেরী, ১৯৫।১বি, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৩। মূল্য এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

৪ঠা অক্টোবর সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্তৃক মহাশূন্যে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ উড়ানর পর জনসাধারণের মধ্যে আন্তঃগ্রহ (inter-planetary) ভ্রমণ সম্পর্কে ঔৎসুক্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য পুস্তকখানি এই সকল জিজ্ঞাসা নিরসনে বিশেষ সাহায্য করিবে। পুস্তকখানিতে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে ছাড়াইয়া বাহির হইবার সমস্যা, রকেট, মহাশূন্যে ভ্রমণের বিপদ, মহাশূন্য হইতে পৃথিবীতে অবতরণের সমস্যা, কৃত্রিম উপগ্রহের গঠন এবং ব্যবহার এবং পৃথিবী হইতে গ্রহান্তরে যাইবার সম্ভাবনা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক আলোচনা করা হইয়াছে। সোভিয়েট ইউনিয়নে মহাশূন্যে বিচরণ সম্পর্কে নানাবিধ গবেষণা হইয়াছে। সেদিক হইতে একজন রুশ বিজ্ঞানী কর্তৃক লিখিত এই পুস্তকটি সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। উপরন্তু, লেখক স্তার্নফেল্দ বিষয়টি বিশেষ প্রাঞ্জলতার সহিত আলোচনা করিয়াছেন। অনুবাদের ভাষাও বিশেষ সাবলীল। বাংলা ভাষাতে এইরূপ জটিল বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বেশি বই লেখা হয় নাই। সে কথা স্মরণ রাখিলে অনুবাদকের কৃতিত্বে বিস্মিত হইতে হয়। পপুলার লাইব্রেরী প্রকাশন ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত

নবাগত। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লইয়া তাঁহারা কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশ করিবার কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন। আলোচ্য পুস্তকখানি সকল দিক হইতেই তাঁহাদের সুনাম বৃদ্ধি করিবে সন্দেহ নাই।

শ্রীসুভাষচন্দ্র সরকার

প্রাণগঙ্গা—শ্রীঅবিনাশ সাহা। প্রকাশমহল, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। ভারতী লাইব্রেরী। মূল্য পাঁচ টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩১৮ ডিমাই।

বাস্তবধর্মী উপন্যাস। উপন্যাসের প্রাণকেন্দ্র পূর্ব্ববঙ্গের একটি চর। নাম চরকুট নগর। এই চরের মালিক হইতে শুরু করিয়া সাধারণ এবং অতি-সাধারণ বৈচিত্র্যপূর্ণ চরিত্রের বহু মানুষের সাক্ষাৎ ঘটিল। এবং আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন সর্ব্বক্ষণ সুস্পষ্ট হইয়া রহিল। মানুষে মানুষে জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে এই যে হৃদ্যতা এবং আত্মীয়তা তাহা কি কারণে আজ তাহাদের মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে?' ইহার জন্য দায়ী কাহারা?

"প্রাণগঙ্গার" পাত্রপাত্রী—জমিদার, নায়েব, গোমস্তা, জমিদারের মোসাহেব, সুদখোর মহাজন। আর ইহাদেরই বেষ্টন করিয়া আছে চরের কৃষকশ্রেণীর বহু হিন্দু ও মুসলমান প্রজা। বিশেষ করিয়া এই প্রজাদেরই জীবনযাত্রার নানা সুখদুঃখের কাহিনী উপন্যাসের পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাদের সামাজিক কাঠামো আলাদা—এখানে করিম আর দীনুর মধ্যে কোন তফাৎ নাই, বরং ইহাদের গভীর আত্মীয়তাবোধের বহু মধুর নিদর্শন উভয়ের জীবনপথের বাঁকে বাঁকে উজ্জ্বল হইয়া আছে।

পুস্তকখানিতে নানা চরিত্রের বহু মানুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্রই আপন আপন ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। বিশেষ করিয়া মনকে আবিষ্ট করিয়া রাখে দীনুর সবল, সরল ও সুন্দর জীবনাদর্শ, খ্যান্তর কৌটিল্য, রামকান্তের ধর্ম্মকর্ম্মের বর্ম্মেঢাকা নারী-মাংস লোভী মন, সুদখোর নিতাইর হৃদয়হীনতা, আদর্শচরিত্র পলান, চরের তেজী মানুষ ওসমান আর গনি এবং নিষ্পাপ সরল-প্রকৃতির দুর্গা। সাদাসিধা ভালমানুষ আনন্দ লেখকের এক সার্থক সৃষ্টি—যাহাকে প্রথম দর্শনে একটি পেটসর্ব্বস্ব বুদ্ধিহীন মানুষ বলিয়াই ভুল হয়, কিন্তু প্রয়োজনে যে এই মানুষটিই কত বড় কর্ম্মক্ষম হইয়া উঠিতে পারে সে পরিচয় তাহার বহু কাজের মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

"প্রাণগঙ্গা"র নায়ক বা নায়িকা বলিয়া কাহাকেও বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করিলে ভুল করা হইবে যদিও ময়না এবং নিশি নামে দুটি ছেলেমেয়ের কাদা ছোড়াছুড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া তাহাদের বিবাহের পূর্ব্বে এবং পরেও কিছুটা ভিন্ন ধরনের রস পরিবেশন করা হইয়াছে।

অবিভক্ত পূর্ব্ব বাংলার একটি চরের যে মানুষগুলির কাহিনী পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে—চরিত্রানুযায়ী স্বাভাবিক ভাষায় তাহাদের মনের কথা যে ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা সত্যই অনুপম। প্রচ্ছদপট ও ছাপা আকর্ষণীয়।

আধুনিক ভারতের গল্প সঞ্চয়ন—অনুবাদক বি, বিশ্বনাথম্। সাধন সরকার, অরবিন্দ নগর, বেলঘরিয়া। মূল্য এক টাকা।

ভারতীয় চৌদ্দটি ভাষার সমসংখ্যক গল্প পুস্তকখানিতে স্থানলাভ করিয়াছে। প্রায় সবগুলি গল্পের সুরই এক। বঞ্চিত মানুষের জীবনের সুখদুঃখ, ব্যথা-বেদনার ইতিহাস গল্পগুলির মধ্যে এমন ভাবে পরিবেশিত হইয়াছে যে, মনকে শুধু ভারাক্রান্ত করিয়াই তোলে না উত্তেজিত করিয়াও তোলে।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভাবধারার সঙ্গে পরস্পরের পরিচয় ঘটাইয়া দিবার এই প্রয়াস সত্যই প্রশংসার্হ। গল্পগুলি সুনির্ব্বাচিত।

বটুক মাষ্টার—শ্রীবীরেশ্বর মজুমদার। এস, সি, সরকার এণ্ড সন্স (প্রাইভেট) লিমিটেড। ১সি কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ১২। মূল্য দেড় টাকা।

চার অঙ্কে সমাপ্ত নাটক। বটুক মাষ্টার রায়গড় হাইস্কুলের শিক্ষক। আদর্শচরিত্র নিষ্ঠাবান শিক্ষক। যার ফলে সংঘাত দেখা দিল পরিচালকগোষ্ঠী এবং স্বার্থান্বেষী শিক্ষকদের সহিত। বিভিন্ন পরিবেশে এই সংঘাতগুলি সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে কিন্তু নাটক যেখানে "ক্লাইমেক্‌স"-এ উঠিয়াছে সেইখানেই কেমন ঝাপসা হইয়া গিয়াছে। এদিকে দৃষ্টি দিলে নাটকখানি আরও উপভোগ্য হইতে পারিত।

শ্রীভূতিভূষণ গুপ্ত

কেষ্টনগরের পুতুল—শ্রীদীপক চৌধুরী। বিহার সাহিত্য ভবন (প্রাইভেট) লিঃ, ৬ ভবানী দত্ত লেন, কলিকাতা—৭। মূল্য—দু' টাকা বার আনা।

দীপক চৌধুরী বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে খ্যাত হয়েছিলেন। তাঁর বৈশিষ্ট্য তাঁর সুতীক্ষ্ণ মননে, অসাধারণ বিষয় বস্তুর নির্ব্বাচনে ও বিষয়বস্তুর যোগ্য ব্যবহারে এবং রচনার কলা-কৌশলের অভিনবত্বে। তাঁর রচনার বিষয়বস্তু জাতীয় ও আন্ত-র্জাতিক কঠিনতম সমস্যা ও মনস্তত্ত্বের জটিলতম রহস্য নিয়ে। কল্পনায়, চিন্তার ব্যাপকতায় দীপক চৌধুরীর মত দুঃসাহস কম লেখকই দেখিয়েছেন। আলোচ্য বইখানি তাঁর একখানি ছোট গল্পের বই। প্রথম গল্পটির নামে বইয়ের নামকরণ করা হয়েছে।

সব কয়েকটি গল্পেই গভীর সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং চমকের সৃষ্টি করে দেখা দিয়েছে আশ্চর্য্য মধুর সমাধান। যেমন, 'জ্বর' গল্পে। সুকুমারী-দিলীপের জীবন-সমস্যার সমাধান দেখা দিল আশ্চর্য্য ভাবে একটি নষ্ট থার্মোমিটার প্রয়োগের খামখেয়ালিকে আশ্রয় করে। তেমনি একটি খুশী ভাব ছড়িয়ে পড়েছে 'বন্ধু নীরেন বসু' গল্পে। 'লগ্ন উদ্ধার' ও 'নবনীতার লাঞ্ছনা' গল্প দুটিতে আছে জটিল সমস্যা—বিশেষ করে আগেরটিতে। 'লগ্ন উদ্ধার গল্পের যে সমস্যা তা ভয়াবহ এবং তার যে সমাধান তাতে ব্যক্ত হয়েছে মানবজীবনের এক বলিষ্ঠ স্বীকৃতি। যে সংস্কার শুধু বাহির থেকে তাড়না করে তা নয়, যা অন্তরের গভীরে বেঁধেছে বাসা এবং সেখান থেকে মানুষের চিন্তা-ভাবনা, পছন্দ-অপছন্দ ও জীবনের প্রতি attitude নির্দ্ধারণ করছে—সেই রকম সংস্কার থেকেও উত্তরণের কাহিনী অম্বিকা গুপ্তের জীবন-কাহিনী।

এ বই উপভোগ করবার মত বই। তবে আর একটি কথাও বলা প্রয়োজন। দীপক চৌধুরীর অন্যান্য রচনাতেও যা ধরা পড়েছে —তা তাঁর অতি-অস্থিরতা। লেখক তাঁর সাহিত্য-কল্পনায় স্থিত-প্রত্যয় নয়। তাঁর বক্তব্য থাকে—সে অনেকটা তত্ত্বের মত জিনিস, পঠন ও চিন্তার ফল। সেই বক্তব্যকে যথেষ্ট পরিমাণে সাহিত্য-রসে সিক্ত করে পরিবেশন করতেও তিনি পারেন। কিন্তু যা তিনি ভেবেছেন তা দ্রুত লিখে ফেলার দিকে বোধ করি তাঁর একটি ঝোঁক থেকে থাকবে—সেজন্যে লেখা অনেক সময় গাঢ় বর্ণঢ্যতা লাভ করে না—জার্ণালিষ্টের চেয়ে কল্পনার প্রসার দেখা যায় না। সাহিত্যে রূপকর্ম্ম বলে একটি জিনিস আছে—সেখানে তিনি অনেক সময়েই ব্যর্থ হন। অন্ততঃ এ বইয়ের দু'একটি গল্পে হয়েছেন। তবু পাঠকদের বইটি ভাল লাগবে।

শ্রীমন্মথকুমর চৌধুরী
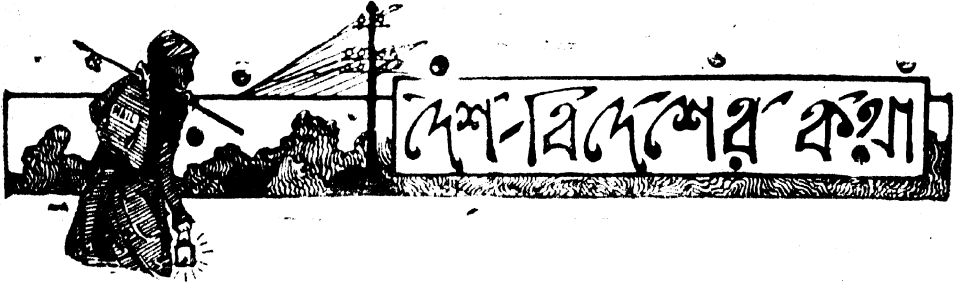
হীরালাল দত্ত

শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজ হইতে উচ্চতর কৃষি কোর্স সমাপ্ত করিয়া পাশ্চাত্ত্য কৃষিবিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের জন্য হীরালাল দত্ত সরকারি বৃত্তি লইয়া আমেরিকায় যান এবং তথায় কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এস-এ ডিগ্রী লইয়া ১৯০৭ সালে দেশে ফিরিয়া আসেন। এই সময় পুরাতন বাংলার ভাগলপুর জেলায় সাবোর কৃষি-কলেজ স্থাপিত হয় এবং তিনি এই কলেজে কীটতত্ত্বের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে এই প্রথম কৃষি কলেজ এবং এই রাজ্যগুলির কৃষি বিভাগের বহু উচ্চ পদস্থ গেজেটেড কর্ম্মচারী তাঁহার ছাত্র। পাণ্ডিত্যপূর্ণ অধ্যাপনা, অমায়িক ও সরল ব্যবহারের জন্য তিনি ছাত্রদের বিশেষ প্রিয় ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। আবাসিক কলেজ বলিয়া ছাত্রেরা সর্ব্বদা তাঁহার নিকট যাইত এবং তিনি একজন হিতৈষী অভিভাবকের ন্যায় তাঁহাদের সকল রকমে সাহায্য করিতেন। ইহার ফলে ছাত্রদের সহিত তাঁহার এক মধুর সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার নিখুঁত নোট ও কীটতত্ত্ব বিষয়ের গবেষণাপূর্ণ পুস্তক ছাত্রেরা খুব মূল্যবান জিনিষ মনে করিত।

কর্ম্মজীবনে কীটতত্ত্বের বহু গবেষণা ও পোকার উপদ্রব হইতে ফসল রক্ষা করিবার বহু পরিকল্পনা তিনি করিয়াছিলেন এবং এই সব কাজের শিক্ষা ও দায়িত্ব গ্রহণের জন্য বহু কর্ম্মচারী তাঁহার নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিহার হইতে তিনি উড়িষ্যা সরকারের অধীনে কটকে কৃষি বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর হইয়া যান। পারিবারিক সুখ-সুবিধা উপেক্ষা করিয়া তিনি নিষ্ঠার ও সততার সহিত নিজ কর্ত্তব্য সর্ব্বদা পালন করিতেন এবং তাঁহার এই আদর্শ দ্বারা অপর কর্ম্মচারীরা অনুপ্রাণিত হইতেন। তাঁহার কর্ম্মকুশলতার জন্য তিনি উড়িষ্যার কৃষি অধিকর্ত্তার পদে উন্নীত হন এবং এই নবগঠিত প্রদেশের কৃষি-বিভাগকে গড়িয়া তুলিতে তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা ও অবদানের বিষয় তথাকার কর্ম্মচারী ও জনসাধারণ কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করেন। তাঁহার অপূর্ব্ব দক্ষতা, নিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তার জন্য অবসর গ্রহণের পরেও পর পর তিনবার এই পদে পুনর্নিয়োগের সুযোগ পাইয়াছিলেন।

দত্ত মহাশয় কলিকাতা সিমলা (বিডন ষ্ট্রীটের) প্রসিদ্ধ দত্ত পরিবারের মতিলাল দত্তের ৪র্থ পুত্র। ইঁহারা সাত ভাই ও চার ভগিনী।

হীরালাল দত্ত

তাঁহার অন্তর্দ্ধানে কৃষি বিজ্ঞানের একজন নীরব সাধকের কর্ম্মজীবনের সমাপ্তি হইল। তাঁহার অমর আত্মার কল্যাণ কামনা করি।—শ্রীসরযূ দত্ত

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস (প্রাইভেট) লিঃ, ১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

বিষয়-সূচী—মাঘ, ১৩৬৪

বিষয়-সূচী—মাঘ, ১৩৬৪

রঙীন ছবি

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

গ্রামের প্রান্তে
শ্রীচুনীলাল ভট্টাচার্য্য

কাজের ফাঁকে [ফোটো : শ্রীতুলসীদাস সিংহ

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৭শ ভাগ
২য় খণ্ড

মাঘ, ১৩৬৪

৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বাঙালীর সংস্কৃতি

কলিকাতায় প্রতি বৎসর শীতকালে, অর্থাৎ অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ মাসে, নানাপ্রকার জলসা, সম্মেলন, উৎসব ও প্রদর্শনী চলিতে থাকে। এ বৎসরও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই, বরং কিছু বেশী মাত্রায়ই হইয়াছে। বলা বাহুল্য, পশ্চিমবঙ্গ বলিতে এখানকার শাসনতন্ত্রের অধিকারীবর্গ কলিকাতাই বুঝেন এবং ভিন্ন প্রদেশের ও বিদেশী লোকেও তাহাই বুঝে। সেই কারণে আমরাও ধীরে ধীরে পশ্চিমবঙ্গ বলিতে কলিকাতাই বুঝিতে আরম্ভ করিতেছি।

এই সমস্ত সঙ্গীত, সংস্কৃতি, সাহিত্য, ললিতকলা ইত্যাদির সমারোহ একসঙ্গে কলিকাতায় হওয়ায় সাধারণ লোকের সুবিধা অপেক্ষা অসুবিধাই বাড়ে। কতকগুলি হুজুগে লোক বা সমিতি কিছু অর্থাগমের ও অপব্যয়ের ব্যবস্থা করেন এবং খবরের কাগজের খোরাক কিছু জোটে। কিন্তু বাস্তবপক্ষে ইহাতে দেশের বা দেশের লোকের কোনও স্থায়ী লাভ ত হইতেই পারে না বরং দলাদলি ও গাত্রদাহের বৃদ্ধি হওয়ায় এক-একটি ভাল সংস্থা বা সমিতি ভাঙিয়া দুইটি বা তিনটি হয় এবং বহু প্রকৃত শিল্পী অযোগ্য লোকের সংসর্গে আসিয়া এবং অত্যধিক বাহবা পাইয়া মাথা খোয়াইয়া ফেলেন।

ইহা ভিন্ন সম্প্রতি এই সব ব্যাপারে একটা বিশ্রীরকম রেষারেষি দেখা দিয়াছে, যাহার ফলে স্থানীয় লোকের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আমরা কোথাও পাই না। সঙ্গীতে ভিন্ন প্রদেশ হইতে নামজাদা ওস্তাদ ও যন্ত্রশিল্পী আনিয়া তাঁহাদের গীতবাদ্য শোনানোর একটা সার্থকতা আছে আমরা স্বীকার করি, কিন্তু যদি শুধু তামাসা হিসাবে বা সম্মেলন পরিচালকবর্গের বাহাদুরী দেখানোর জন্যে তাহা করা হয় তবে তাহাতে কোনও স্থায়ী লাভ হওয়া সম্ভব নহে। বরঞ্চ অপকারের সম্ভাবনা যথেষ্টই আছে।

এইবার সঙ্গীত ও সংস্কৃতির নামে যে সকল সম্মেলন, কনফারেন্স ইত্যাদি হইয়াছে, সেগুলির কার্য্যপ্রকরণ, দিন ও সময়ের ব্যবস্থা এবং শিল্পীদের নামের তালিকা দেখিয়া মনে হয় যে, উদ্যোক্তার দল বোম্বাইয়া সিনেমাওয়ালাদের পথ অবলম্বন করিতেছেন। দেশের সংস্কৃতির খোঁজ ত উহার মধ্যে কোথায়ও পাইবার উপায় নাই, আছে শুধু হুল্লোড় এবং উদ্দাম রেষারেষি, যাহার ফলে যেটুকু পশ্চিমবঙ্গে আছে তাহার চরম অবনতি অবশ্যম্ভাবী।

চিত্রশিল্পের ও ভাস্কর্য্যশিল্পের ক্ষেত্রেও ঐ কারণে স্থানুভাব আসিয়া গিয়াছে এবং অবনতিও বেশী দূরে নাই। একমাত্র গবর্ণমেণ্ট কলেজ অব আর্টের প্রদর্শনী দেখিলে মনে হয় যে, দেশের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এখনও প্রাণ আছে, যথেষ্ট উৎসাহ দিলে পুনর্জ্জাগরণ সম্ভব। তবে সে উৎসাহদানের ব্যবস্থা যথাযথ হওয়া দরকার, অর্থাৎ শিল্পীর গুণানুসারে তাহার সমাদর এবং বাস্তবক্ষেত্রে তাহার পুরস্কার প্রাপ্তি হওয়া প্রয়োজন। সাহিত্যের পারিতোষিক যে ভাবে দেওয়া হইতেছে তাহা শিল্পের ক্ষেত্রে পৌঁছাইলে তাহার দ্রুত অবনতি অবশ্যম্ভাবী।

দুঃখের বিষয় এই যে, গুণীজন ভিন্ন গুণের যথার্থ সমাদর সম্ভব নহে। আজিকার রাজনৈতিক চৌর-চাটুকার সঙ্ঘে গুণীজনের স্থান নাই কেননা তাঁহারা চৌর্য্যবিদ্যাবিশারদ বা চাটুকার চূড়ামণি নহেন। অন্য দিকে রাজনৈতিক চৌরচক্রে পূজা নাহি দিলে বা চক্রে অধিষ্ঠিত না হইলে সমাজে প্রতিষ্ঠা বা ধনলাভ কোনটাই সম্ভব নহে। সুতরাং শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ ক্রমেই নীচে নামিয়া যাইতেছে।

সরকারী দল ত এখন পূর্ব্বের বর্দ্ধিষ্ণু সমাজকে ধ্বংস করিয়াছেন। অবশ্য তাহার অধিকাংশের এমনই অধঃপতন হইয়াছিল যে, তাহাকে বাঁচাইয়া রাখারও বিশেষ সার্থকতা ছিল না। কিন্তু যাঁহারা তাঁহাদের হটাইয়া অধিকারী হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যেও জ্ঞানী-গুণী লোকের একান্তই অভাব। এইরূপ অবস্থায় যাহা হয় তাহাই ঘটিতেছে, অর্থাৎ বাঙালীর ধনমান ত আগেই গিয়াছে, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার গৌরব অস্তাচলের পথে।

অবশ্য সরকারী হিসাবে শিল্পী ও সাহিত্যিকদিগের সমাদরের একটা প্রহসন চলিতেছে। তাহাতে চক্রান্ত ও মনোমালিন্য বৃদ্ধি ভিন্ন আর কিছু হইতেছে না। সরকার যাহাতে হস্তক্ষেপ করিতেছেন তাহাই কলুষিত হইতেছে। এমনই গুণ আমাদের কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্থ অধিকারীবর্গের।

জীবনবীমা কর্পোরেশনের কার্য্যাবলী

মুন্দ্রা শিল্পগোষ্ঠীতে শেয়ার ক্রয় করিবার জন্য ভারতের পার্লামেণ্টের শীতকালীন অধিবেশনে গুরুতর অভিযোগ আনয়ন করা হয় এবং শ্রীফিরোজ গান্ধী এই প্রকার কার্য্যাবলীর জন্য অনুসন্ধান দাবী করেন। জীবনবীমা কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, মুন্দ্রা শিল্পগোষ্ঠীতে জীবনবীমা কর্পোরেশন মোট ১ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকার অংশ ক্রয় করিয়াছে। ইহার মধ্যে ১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকার শেয়ার একদিনেই, অর্থাৎ ১৯৫৭ সনের ২৫শে জুন তারিখে ক্রয় করা হয়। বাকি টাকার শেয়ার এই তারিখের পূর্ব্বে ও পরে ক্রয় করা হয়। এঞ্জেলো ব্রাদার্স, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া কর্পোরেশন, জেসপস, ওসলার ইলেকট্রিক ল্যাম্প, স্মিথ ষ্টানিষ্ট্রীট এবং রিচার্ডসন ও ক্রুড্ডাস প্রভৃতি মুন্দ্রাগোষ্ঠীর শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির শেয়ার ক্রয় করা হইয়াছে।

১৯৫৭ সনের ২৫শে জুন যে ১·২৪ কোটি টাকার শেয়ার ক্রয় করা হইয়াছে তাহা খোলা বাজারে ক্রয় করা হয় নাই, ব্যক্তিগতভাবে শ্রীমুন্দ্রার নিকট হইতে ক্রয় করা হইয়াছে। এই শেয়ারগুলির জন্য বাজারদর হইতে অতিরিক্ত হারে মূল্যধার্য্য করা হয় এবং সেইভাবেই মূল্য প্রদান করা হয়। ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এইপ্রকার স্থিরীকৃত বিক্রয়ের জন্য কয়েকদিন পূর্ব্বেই মূল্যস্ফীতি করা হইয়াছিল। ২৫শে জুন যে সকল শেয়ার ক্রয় করা হইয়াছে সেগুলি যদি ২১শে জুন তারিখের মূল্যের ভিত্তিতে ক্রয় করা হইত তাহা হইলে জীবনবীমা কর্পোরেশনকে ১০·৭৩ লক্ষ টাকা কম মূল্য দিতে হইত। এই মূল্যভিত্তিতে ১৯শে জুন ক্রয় করিলে ১১·৫২ লক্ষ টাকা কম দিতে হইত। ১৮ই জুন ক্রয় করিলে ১৩·৪৭ লক্ষ টাকা কম দিতে হইত; ১৭ই জুন ক্রয় করিলে ১৩·৬২ লক্ষ টাকা কমে পাওয়া যাইত এবং ১০ই জুন ক্রয় করিলে ২০·৮৩ লক্ষ টাকা কম হইত। জীবনবীমাকে দিয়া শেয়ার ক্রয় করানো হইবে বলিয়া স্তরে স্তরে তাহাদের মূল্য বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

১৩ই ডিসেম্বর নাগাদ ১·২৪ কোটি শেয়ারের মূল্য ৩০ শতাংশ হ্রাস পাইল, অর্থাৎ প্রায় ৩৭ লক্ষ টাকার মূল্য হ্রাস পাইল। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই শেয়ার ক্রয় করার ব্যাপারে জীবনবীমা কর্পোরেশনের ইনভেষ্টমেণ্ট কমিটি কিংবা জীবনবীমা বোর্ড কেহই কিছু জানিত না এবং তাহাদের কোনও পরামর্শও লওয়া হয় নাই। স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, উপর হইতেই এই আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, এবং প্রশ্ন এই, কে এই আদেশ দিয়াছিল, এবং কেন দিয়াছিল। জীবনবীমা জাতীয়করণের পূর্ব্বে বিভিন্ন জীবনবীমা কোম্পানীর খাতে এই শেয়ারগুলি মাত্র ৪৯·৩২ লক্ষ টাকায় ক্রীত ছিল। সেই সময় এইগুলি প্রথমশ্রেণীর শেয়ার বলিয়া পরিগণিত হইত।

জীবনবীমা কর্পোরেশন যখন এই শেয়ার ক্রয় করে তখন ইহারা তৃতীয় শ্রেণীর শেয়ার বলিয়া পরিগণিত এবং কোনও বিচক্ষণ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান এইপ্রকার তৃতীয় শ্রেণীর শেয়ারে অর্থ বিনিয়োগ করিতে রাজী হইবে না। শ্রীমুন্দ্রা ষ্টেট ব্যাঙ্ক ও ন্যাশনাল ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ডেভেলাপমেণ্ট কর্পোরেশনের নিকট ইহার পূর্ব্বে এই শেয়ারগুলির পক্ষে অর্থসাহায্য চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা এই শেয়ার ক্রয় করিতে অস্বীকার করেন। কিছুদিন হইতে শ্রীমুন্দ্রা ফাটকাবাজি প্রভৃতিতে এই সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থনৈতিক স্থায়িত্বকে বিপর্য্যয়ের মুখে টানিয়া আনিতেছিলেন। দেনার দায়ে শ্রীমুন্দ্রা প্রায় হাবুডুবু খাইতেছিলেন এবং কয়েকদিন পূর্ব্বে কানপুরে একটি কাপড়ের কল বন্ধ করিয়া দিবেন বলিয়া হুমকী দিয়াছিলেন। শ্রীমুন্দ্রাকে আর্থিক বিপর্য্যয় হইতে যেন রক্ষা করিবার জন্যই জীবনবীমা কর্পোরেশন এত অধিক মূল্যে এই গোষ্ঠীর শেয়ার ক্রয় করিয়াছে। জাতীয়করণের পূর্ব্বে জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানগুলি যে সকল অপরাধে লিপ্ত ছিল, জাতীয়করণের পরও দেখা যায় যে, জীবনবীমা কর্পোরেশন সে সকল অপরাধে লিপ্ত আছে। প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ জীবনবীমাকারীর অর্থ লইয়া এইরূপ ছিনিমিনি খেলিবার অধিকার কোনও সরকারী প্রতিষ্ঠানের থাকিতে পারে না। এই ব্যাপারের পিছনে যে ষড়যন্ত্র আছে তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বহু উষ্মার সহিতই অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

ম্যাকমিলানের দৌত্য

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ভারত-ভ্রমণ যদিও তাঁহার কমনওয়েলথ-ভ্রমণ-তালিকার একটি অংশমাত্র, তথাপি ইহার কিছু গুরুত্ব আছে। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর ভারতে এই প্রথম আগমন এবং স্বদেশে মন্ত্রীপরিষদের গোলযোগকে উপেক্ষা করিয়াও যখন কমনওয়েলথ ভ্রমণে পাড়ি দিয়াছেন, তখন ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার এই ভ্রমণের পিছনে আছে বিশেষ কোনও লক্ষ্য। ভারতের প্রধান মন্ত্রীর সহিত তাঁহার কি আলোচনা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ গোপন আছে সুতরাং সঠিক করিয়া কিছু বলিবার উপায় নাই। তবে ইহাও অবশ্য ঠিক যে, প্রত্যক্ষভাবে ভারতের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোনও বিষয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী তত আগ্রহান্বিত নহেন, যত ইংলণ্ডের স্বার্থ-বিজড়িত কোনও বিষয়ে।

ব্রিটেনের বর্ত্তমান রক্ষণশীলদলের মন্ত্রীপরিষদ কয়েকটি সমস্যা সম্বন্ধে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করিতেছেন,প্রথমতঃ মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি, দ্বিতীয়তঃ ইঙ্গ-ভারতীয় মনোমালিন্য। কমনওয়েলথের অন্যান্য দেশগুলি ভ্রমণ প্রধানমন্ত্রীর গতানুগতিক ভ্রমণের সামিল হইলেও তাঁহার ভারত-ভ্রমণ কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, কারণ এই দুইটি সমস্যা সম্বন্ধে ভারতবর্ষ বর্ত্তমানে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। মধ্যপ্রাচ্য সম্বন্ধে ব্রিটেনের উদ্বেগের কারণ স্বাভাবিক, কারণ মধ্যপ্রাচ্যে বিভিন্ন দেশে ব্রিটেনের বহু টাকা তৈলশিল্পে নিয়োজিত আছে, এবং বর্ত্তমানে আমেরিকার সহিত ব্রিটেনের মধ্যপ্রাচ্য নীতি লইয়া মনোমালিন্য দেখা দিতেছে। সমৃদ্ধিশালী সমস্ত উপনিবেশগুলিই ব্রিটেন বর্ত্তমানে প্রায় হারাইয়াছে, যেগুলি আছে সেগুলিতেও গোলযোগ

লাগিয়া আছে। মধ্যপ্রাচ্যের উপর কর্তৃত্ব না থাকিলে সমস্ত ভূমধ্যসাগরের উপরেই ব্রিটিশ কর্তৃত্ব সঙ্কটপূর্ণ হইয়া উঠিবে। সমুদ্রের রাণী ব্রিটেনের প্রাধান্য নির্ভর করে প্রধানতঃ ভূমধ্যসাগরের আধিপত্যের উপর, মাল্টা ও সাইপ্রাস দ্বীপগুলি ব্রিটেনের ভূমধ্যসাগরে বড় ঘাটি। মিশরের সহিত বিবাদের ফলে ভূমধ্যসাগর তথা মধ্যপ্রাচ্যের উপর ব্রিটেনের আধিপত্য শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। এতদিন পর্য্যন্ত ভূমধ্যসাগরের দুইটি মুখই ব্রিটেন নিয়ন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছে যথা, জিব্রাল্টার ও সুয়েজ এবং সেই কারণে ব্রিটেনের এই অঞ্চলে ক্ষমতা ছিল অপ্রতিহত। কিন্তু ঘটনার দ্রুত পট পরিবর্তনে বৃটেনের সামরিক শক্তি ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা দুইই প্রবল বাধার সম্মুখীন। সুয়েজ বর্তমানে মিশর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

সম্প্রতি কায়রোতে যে এ্যাফ্রো-এশিয়ান অধিবেশন হইয়া গেল তাহাতে ভারতীয় বৈদেশিক নীতিই এই দেশগুলি কর্তৃক সমর্থিত হইয়াছে। তাহারা ঔপনিবেশিক শাসনপ্রথার বিরুদ্ধে নিজেদের অভিমত জানাইয়াছে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে ভারতের নিরপেক্ষ নীতির পক্ষপাতী। তাহারা ইঙ্গ-আমেরিকান শক্তির বিরোধী, কিন্তু রাশিয়াকে ও তাহার নীতিকেও সর্বতোভাবে বিশ্বাস করিতে পারে না। অর্থাৎ রক্ষা করার অজুহাতে এই দুইটি বিবদমান শক্তিবর্গ আশ্রিত দেশগুলিকে গ্রাস করিতে চায়, বিশেষতঃ রাশিয়া যেমন করিয়া পূর্ব্ব ইউরোপের দেশগুলির উপর নিজের আধিপত্য বজায় রাখিতেছে, তাহা এশিয়া ও আফ্রিকার স্বাধীনতাকামী দেশগুলির মনঃপূত নহে। তাই স্বভাবতঃই তাহারা এমন একটি দেশের সহায়তা চায় যে দেশের নিজস্ব স্বার্থ কিছু নাই, কিন্তু অপরের স্বাধীনতাকে রক্ষা করিবার প্রচেষ্টা রাখে, এবং সেই দেশ হইতেছে ভারতবর্ষ। বৃহত্তর শক্তিবর্গের ইচ্ছাতেই হউক আর অনিচ্ছাতেই হউক, ভারতবর্ষ আজ তৃতীয় শক্তিবর্গের নেতা হিসাবে স্বীকৃত, তাই মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থা সম্বন্ধে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর সহিত আলোচনা করিয়া থাকিবেন, যাহাতে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী তাহার ব্যক্তিগত প্রভাবের দ্বারা মধ্যপ্রাচ্য দেশগুলির বিশেষতঃ মিশরের ব্রিটিশবিরোধী নীতিকে প্রশমিত করিবার প্রয়াস পান।

দ্বিতীয়তঃ, পাকিস্থানকে সন্তুষ্ট করিতে যাইয়া ব্রিটেন নিরাপত্তা পরিষদে পরিস্ফুটভাবে পাকিস্থানের কাশ্মীরনীতি সমর্থন করিয়া আসিতেছে। গ্রেহাম মিশন পুনরায় প্রেরণ ব্যাপারে ভারতবর্ষ প্রকাশ্যভাবে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিয়াছে যে, ব্রিটেন অযথা ও অন্যায়ভাবে কাশ্মীর দখলে রাখিবার জন্য পাকিস্থানকে সমর্থন করিতেছে। বিলাতের শ্রমিক দল এই বিষয়ে রক্ষণশীল-দলের বিরুদ্ধে প্রচার সুরু করিয়া দিয়াছে। মেজর এটলী সম্প্রতি ভারতবর্ষ ও পাকিস্থান ভ্রমণ করিয়া গিয়া পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে, পাকিস্থানে শুধু ভারত-বিরোধিতা ব্যতীত অন্য কোনও কথা শোনা যায় না। ভারতবর্ষ তাহার নিজের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন লইয়া ব্যস্ত, কিন্তু পাকিস্থান অর্থনৈতিক পুনর্গঠন কার্য্যাবলী উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র ভারত-বিরোধী কার্য্যাবলীতে ব্যস্ত। তাঁহার অভিমত এই যে, এহেন দেশকে অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়ার অর্থ কিছু হয় না।

গ্রেহাম মিশন সম্বন্ধে নিরাপত্তা পরিষদে ভারতবর্ষ যে প্রকার অনমনীয় দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছে তাহাতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, গ্রেহাম মিশন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে যদি পাকিস্থান কাশ্মীর হইতে তাহার সৈন্য অপসারণ করিয়া না লয়। গ্রেহাম মিশন প্রেরণ বিষয়ে ভারতবর্ষ ও ব্রিটেনের মধ্যে যে তিক্ততার সৃষ্টি হইয়াছিল ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী তাহা ক্ষালনের খানিকটা চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহার ভারত ভ্রমণ দ্বারা।

মিঃ ম্যাকমিলান যতই প্রচেষ্টা করুন না কেন, ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে কাশ্মীর বিষয়ে পক্ষপাতদুষ্ট সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। পাকিস্থান কাশ্মীর আক্রমণ ও দখল করিয়া রাখিয়া যে ভারতের এলাকা বলপূর্ব্বক দখল করিয়া রাখিয়াছে, সেই কথাটি স্বীকার করিতে ব্রিটেন ও আমেরিকার কণ্ঠে আটকাইয়া গিয়াছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের ভারত ও পাকিস্থান কমিশনের ১৯৪৮ সনের ১৩ই আগষ্ট প্রস্তাব অনুসারে পকিস্থান কর্তৃক জম্মু ও কাশ্মীর এলাকা হইতে তাহাদের সৈন্য অপসারণের দাবী করা হইয়াছে; কিন্তু ব্রিটেন ও আমেরিকা সেই প্রস্তাবকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে। অর্থাৎ, পাকিস্থানের ভারত আক্রমণকে ব্রিটেন ও আমেরিকা কার্য্যতঃ আইনসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে এবং পাকিস্থানের ভারত-বিরোধী কার্য্যকে সমর্থন করিয়া আসিতেছে। সুতরাং মিঃ ম্যাকমিলানের কাশ্মীর বিবাদ বিষয়ে নিরপেক্ষতার সাফাই-গাওয়া মিথ্যা ব্যতীত সত্য নহে।

বৈদেশিক এবং আভ্যন্তরিক নানা কারণে ইংলণ্ডে রক্ষণশীল দলের অবস্থা তেমন সুবিধাজনক নহে; ভবিষ্যৎ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে তাহারা খুব আশান্বিত নহে। এবং ভারতের সহিত প্রকাশ্য বিরোধিতা তাহাদের প্রতিকূলে যাইবে। সেইজন্য প্রস্তাব উঠিয়াছে ইংলণ্ডের রাণীর ভারত ভ্রমণের জন্য। রাণী একবার ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া গেলে রক্ষণশীল দল প্রমাণ করিতে পারিবে যে, ভারতের সহিত তাহাদের কত সৌহার্দ্দ্য আছে। কিন্তু ভারত সরকার আমন্ত্রণ না জানাইলে রাণীর পক্ষে ভারত-ভ্রমণ সম্ভবপর নহে; সুতরাং ভারত সরকার যেন এই প্রকার ভুল না করেন। কাশ্মীর-বিরোধ সম্বন্ধে ব্রিটেন ও আমেরিকা ভারতবর্ষকে কোনদিনই সমর্থন করে নাই, এবং ভবিষ্যতেও করিবে না; এমন কি শ্রমিকদলের শাসনকালেও কাশ্মীর বিরোধে ব্রিটেন ভারতের বিরোধিতা করিয়াছে।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ হ্যারল্ড ম্যাকমিলান সম্প্রতি ভারত সফর করিয়া গেলেন। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম একজন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ভারতে আসিলেন, সেদিক হইতে ইহা

একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে সর্ব্বত্রই যথাযোগ্য সমাদর দেখান হইয়াছে। সফরান্তে যথারীতি একটি যুক্ত বিবৃতিও প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ভারত-সফরে ভারত-ব্রিটিশ সম্পর্কের যে কোনরূপ উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা মনে হয় না। ভারতে থাকিয়াই মিঃ ম্যাকমিলান বলিয়া গেলেন যে, কাশ্মীর সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার "নিরপেক্ষ।" এই "নিরপেক্ষতা" বাস্তবে কি রূপ গ্রহণ করিয়াছে, ভারতবাসী তাহা জানে। গোয়া সম্পর্কেও ম্যাকমিলান সরকার "নিরপেক্ষ" কিনা তাহা প্রকাশ পায় নাই। নেহরু-ম্যাকমিলান যুক্তবিবৃতিতে বিশ্বশান্তি সম্পর্কে অনেক কথাই আছে, নাই কেবল ভারতের নিজের শান্তির পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয় কাশ্মীর এবং গোয়ার কথা।

লণ্ডনের "ডেইলী মেল" পত্রিকা মিঃ ম্যাকমিলানকে "অজ্ঞাত" প্রধানমন্ত্রীরূপে আখ্যাত করিয়াছেন। মিঃ ম্যাকমিলান "অজ্ঞাত" হইলেও ভারত এবং কমনওয়েলথের অন্যান্য সদ্য-স্বাধীন দেশগুলি ভ্রমণের সিদ্ধান্ত করিয়া যে বাস্তব জ্ঞান এবং দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা নিশ্চিতরূপে ব্রিটেনের স্বার্থরক্ষায় বিশেষ সহায়ক হইবে। এই বিষয়ে মিঃ ম্যাকমিলান তাঁহার পূর্ব্ববর্তী প্রধানমন্ত্রীদের অপেক্ষা অধিকতর প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন।

ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা-সমস্যার সমাধান

ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা-সমস্যা বৃহত্তর অর্থনৈতিক সমস্যারই একটি দিক মাত্র। কোন কোন অর্থনীতিবিদ্ টাকার মূল্যহ্রাসে (devaluation) এই সমস্যার সমাধান দেখিতে পাইয়াছেন। কিন্তু মুদ্রামূল্য হ্রাস দ্বারা এই সমস্যা সমাধানের আশা সুদূরপরাহত। যাঁহারা টাকার মূল্যহ্রাসের কথা বলেন তাঁহারা মনে করেন যে, মুদ্রা-মূল্য হ্রাস করিলে আমাদের রপ্তানী বাণিজ্যের উন্নতি ঘটিবে। কিন্তু আমাদের রপ্তানীযোগ্য পণ্যদ্রব্যের তালিকা দেখিলে সহজেই বুঝা যায় যে, ঐ সকল সামগ্রীর রপ্তানীর পরিমাণ টাকার মূল্যহ্রাসে বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। অপর পক্ষে টাকার মূল্য হ্রাস করিলে আমাদের রপ্তানী পণ্যের মূল্য কমিয়া যাইবে এবং আমদানী দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি ঘটিবে। বৈদেশিক মুদ্রা-সমস্যার আংশিক সমাধান হইতে পারে টাকার বৈদেশিক মূল্যমান নির্দ্ধারণে বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণের দ্বারা। ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলি এইরূপ বৈষম্যমূলক মুদ্রামূল্য নির্দ্ধারণ-নীতি গ্রহণ করিয়া উপকৃত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ষান্মাসিক পত্রিকা "অর্থনীতি"তে প্রকাশিত প্রবন্ধে ডঃ সরোজকুমার বসু যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডঃ বসু লিখিতেছেন যে, প্রভূত পরিমাণ দেশী এবং বিদেশী মুদ্রা বেসরকারী ভাবে মজুত রহিয়াছে বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে। ভারতের মধ্যে প্রভূত অর্থ সোনা ও দামী দামী গহনা রূপে মজুত করা হইয়াছে। ব্যাঙ্কের সেফ ডিপোজিট ভল্টগুলিতে স্থানের জন্য আবেদনকারীদের সংখ্যা এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, ব্যাঙ্কগুলি সকল চাহিদা মিটাইয়া উঠিতে পারিতেছে না। দেশের শান্তিশৃঙ্খলার পরিস্থিতির হঠাৎ কোন অবনতির জন্য ব্যাঙ্কের সেফটি ভল্টের নিরাপত্তার জন্য যে এই হুড়াহুড়ি পড়িয়াছে তাহা নহে। সম্প্রতি এমন কোন বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই যাহাতে কেহ মনে করিতে পারে যে, তাহার সম্পত্তির নিরাপত্তা ব্যাহত হইতে চলিয়াছে। তবে কেন ব্যাঙ্কের ভল্টগুলির চাহিদা এইরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে?

ডঃ বসু প্রস্তাব করিয়াছেন যে, সরকার যেন এই সকল ভল্ট খুলিয়া দেখিবার অধিকার লাভের নিমিত্ত উপযুক্ত ক্ষমতা অর্জ্জন করেন। ঐ ভল্টগুলি খুলিয়া উহাদের মধ্যকার জিনিষপত্রের একটি লিষ্ট প্রস্তুত করিয়া সরকার যদি ঐ সঞ্চিত সোনা ও গহনার এক-দশমাংশ জাতীয় পরিকল্পনা ফণ্ডে নিয়োগের জন্য অনুরোধ জানান তবে ডঃ বসুর মতে সেই আবেদন ব্যর্থ হইবে না। উপরন্তু সরকারের এই আবেদনে কিরূপ সাড়া আসে তাহাতে পরিকল্পনার প্রতি জনসাধারণের মনোভাবেরও পরিচয় মিলিবে। ডঃ বসু লিখিতেছেন যে, এই আভ্যন্তরীণ সম্পদ ব্যতীত ভারতীয় নাগরিকদিগের হাতে বহু বিদেশী মুদ্রাও সঞ্চিত রহিয়াছে। ইহা সুবিদিত যে, কোনরূপ মুদ্রানিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সাহায্যেই মুদ্রা স্থানান্তর সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা যায় না। রাষ্ট্রসঙ্ঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে যে সকল ভারতীয় নাগরিক কাজ করেন তাঁহাদের হাতেও কিছু পরিমাণ ডলার এবং ষ্টার্লিং মজুত থাকিতে পারে। তাঁহাদিগকে যদি তাঁহাদের বিদেশী মুদ্রা সরকারের হস্তে সমর্পণ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ভারতীয় মুদ্রা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয় তাহা অন্যায় হইবে না। যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ নাগরিকগণ তাঁহাদের সঞ্চিত সকল বিদেশী সম্পদই সরকারের হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন।

শেখ আবদুল্লার মুক্তি ও কাশ্মীর

কাশ্মীর সরকার শেখ আবদুল্লাকে মুক্তি দিয়াছেন। উহাতে সকলেই বিশেষ সন্তুষ্ট হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রায় চার বৎসর পাঁচ মাস কারাবাসের পর শেখ আবদুল্লা মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

মুক্তিলাভের পর শেখ আবদুল্লা যে সকল উক্তি করিয়াছেন তাহাতে সকল ভারতীয়ই বিশেষ দুঃখিত হইবেন সন্দেহ নাই। তবে সাড়ে চার বৎসর কারাবরণের পর শেখ আবদুল্লা যে অন্য কোনরূপ মনোভাব অবলম্বন করিবেন তাহা আশা করিবার কোন কারণ ছিল না। অন্ততঃ ভারত সরকার নিশ্চয়ই তাহা পুরাপুরিই জানিতেন। সুতরাং এ কথা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, শেখ আবদুল্লার মনোভাব সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত থাকিয়াই ভারত সরকার তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছেন। তবে গ্রাহাম মিশন ভারতে আসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই শেখ আবদুল্লার মুক্তির পিছনে যে কি যুক্তি রহিয়াছে তাহা বুঝা কঠিন। অবশ্য এ বিষয়ে বক্সী গোলাম

মহম্মদের সম্মতি নিশ্চয়ই ছিল এবং তিনি শেখ আবদুল্লার ক্ষমতার পরিমাপ ভালভাবেই জানেন।

এই প্রসঙ্গে কাশ্মীর সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতি বিষয়ে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। ভারতের কাশ্মীর-নীতি একটি জগাখিচুড়ী বিশেষ। এক অস্বাভাবিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কাশ্মীর ভারতের সহিত যুক্ত হয়। যখন কাশ্মীরের একটি বিরাট অংশ পাকিস্থানী আক্রমণকারীদের দ্বারা অধিকৃত হয় কেবলমাত্র তখনই কাশ্মীর সরকার ভারতের সহিত যুক্ত হইবার জন্য ভারতকে অনুরোধ করে। ভারত কাশ্মীর সরকারের এই অনুরোধ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবেই স্বীকার করিয়া লয় এবং তাহারই ভিত্তিতে কাশ্মীর রক্ষার জন্য অগ্রসর হয়। অবশ্য পণ্ডিত নেহরু ঘোষণা করেন যে, কাশ্মীর হইতে পাকিস্থানী আক্রমণকারীদিগকে বিতাড়িত করিবার পর ভারতভুক্তি সম্পর্কে কাশ্মীরের জনগণের অভিমত গণভোট মারফত জানিয়া লওয়া হইবে। পাকিস্থানকে অনুরোধ করিবার পরও যখন কাশ্মীর হইতে পাকিস্থানী বাহিনীকে অপসারণ করা হইল না তখন পণ্ডিত নেহরু রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিকট এই আক্রমণ সম্পর্কে অভিযোগ আনয়ন করেন। ইহার পর হইতেই ভারতীয় নীতির মধ্যে নানারূপ গোঁজামিল দেখা দিতে আরম্ভ করে। রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতীয় প্রতিনিধিদিগের বক্তৃতায় ভারতের প্রধান অভিযোগ—কাশ্মীরে পাকিস্থানী আক্রমণ সম্পর্কে উপযুক্ত জোর দেখা যায় না।

ভারত যদি উপযুক্ত রূপে তাহার প্রধান অভিযোগ—কাশ্মীরে পাকিস্থানী আক্রমণ সম্পর্কে বিশ্বের জনমতকে অবহিত করিবার চেষ্টা করিত তবে আজ ভারতকে যে হাস্যকর অবস্থায় পড়িতে হইয়াছে তাহাতে পড়িতে হইত না। পণ্ডিত নেহরু ঝোঁকের বশে বিনা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনায় যাহা করিয়াছেন তাহার শোধন দুরূহ।

এ কথা অনস্বীকার্য্য যে, নানা কারণেই কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণ করা অসম্ভব। কিন্তু ভারত সরকার বিশ্বসমক্ষে উপযুক্ত কারণগুলি তুলিয়া ধরিতে পারেন নাই। একথা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে যে,কাশ্মীর সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য ভারত সরকার ভারতীয়দিগকেও জানান নাই। সেজন্যই কাশ্মীরের প্রায় প্রত্যেকটি ঘটনাই আমাদের নিকট বিস্ময়কর মনে হয়। শেখ আবদুল্লার গ্রেপ্তার হইতে আরম্ভ করিয়া কাশ্মীরের বর্ত্তমান অনিশ্চয়তা কোনটির কারণই ভারতীয় জনগণ জানে না। কাশ্মীরে গত দশ বৎসরে ভারত সরকার যত অর্থ ব্যয় করিয়াছেন অনুপাতে অন্য কোন রাজ্যেই সরকার তত অর্থ ব্যয় করেন নাই। তথাপি দেখা যাইতেছে যে কাশ্মীরে ভারতবিরোধীদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে।

কাশ্মীর সম্পর্কে ভারত সরকারের বর্ত্তমান যে অভিমত—তাহাতে গ্রাহাম মিশনের কোন স্থান নাই। কিন্তু তবুও সরকার গ্রাহাম মিশনকে এ দেশে আসিতে দিয়াছেন। ইহার পিছনে কি যুক্তি আছে? কাশ্মীরে গণভোট হইতে পারে না—একথা সর্ব্ববাদী সম্মত। তবে গ্রাহাম মিশন করিবেন কি? কাশ্মীর হইতে পাকিস্থানী আক্রমণকারীদিগকে বিতাড়িত করিবার কোন উদ্দেশ্যই গ্রাহাম মিশনের নাই। এই অবস্থায় গ্রাহাম মিশনকে আসিবার অনুমতি দিবার পিছনে কি যুক্তি রহিয়াছে তাহা বুঝা কঠিন। অবশ্য রাষ্ট্রসঙ্ঘ যদি শুধু দেখাবার জন্য এই মিশন পাঠাইয়া থাকেন তবে অন্য কথা।

ভারত-পাকিস্থান সম্পর্কের নূতন রূপ

১১ই জানুয়ারী করাচীতে পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী শ্রীফিরোজ খাঁ নুন ঘোষণা করেন যে, পূর্ব্বপাকিস্থানে যে দুই লক্ষ ভারতীয় রহিয়াছে তিনি তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার আদেশ দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, গ্রেপ্তারের পর ভারতীয়দিগকে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে আটক রাখিয়া রাস্তা এবং গ্রাম নির্ম্মাণের কাজে নিযুক্ত করা হইবে। ১২ই জানুয়ারী অপর এক সংবাদে ঐ উক্তি সমর্থিত হয়। পরে অবশ্য সংশোধনী হিসাবে বলা হয় যে, পূর্ব্বপাকিস্থানে যে সকল ভারতীয় বিনা পাসপোর্টে রহিয়াছেন, কেবলমাত্র তাহাদিকেই গ্রেপ্তার করা হইবে।

পাকিস্থান সরকার পাকিস্থানস্থিত ভারতীয় নাগরিকগণ সম্পর্কে যে আদেশ দিয়াছেন, আন্তর্জাতিক রাজনীতির ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। ইহা দ্বারা অবশ্য পাকিস্থান সরকার একটি "ঐতিহাসিক" নজীর সৃষ্টি করিবার কৃতিত্ব দাবী করিতে পারেন।

পাকিস্থান সরকারের আচরণ হিটলার সরকার এবং সোভিয়েট রাষ্ট্রে ষ্ট্যালিনের আচরণের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। হিটলার এবং ষ্ট্যালিন উভয়েই অবশ্য নিজ নিজ রাষ্ট্রের নাগরিকদের উপরই বর্ব্বর আচরণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময় সকল রাষ্ট্রই অল্পবিস্তর বর্ব্বরতার আশ্রয় গ্রহণ করে—সুতরাং সে বিষয়ে হিটলার এবং ষ্ট্যালিনকে বিশেষ ভাবে দায়ী করা উচিত হইবে না।

আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে পাকিস্থানে যদি কোন ভারতীয় বিনা পাসপোর্টে অথবা বিনা ভিসায় থাকে তবে পাকিস্থান সরকার তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া ভারতে পাঠাইয়া দিতে পারেন।

ভারত এবং পাকিস্থান প্রতিবেশী রাষ্ট্র। ঐতিহাসিক সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও আজ একদল রাজনৈতিক নেতা এই দুই রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক তিক্ততর করিয়া তুলিবার জন্য খুবই সচেষ্ট। অথচ যখন আমরা পৃথিবীর অন্যত্র তাকাই তখন দেখি যে, যে সকল রাষ্ট্র পূর্ব্বে বিশেষ ভাবে বৈরীভাবাপন্ন ছিল, তাহারাও আজ পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করিতেছে। পশ্চিমের একাধিক রাষ্ট্র আজ বাণিজ্যিক এবং অর্থনৈতিক বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করিয়া পারস্পরিক সহযোগিতা করিতেছে আর ভ্রান্ত আদর্শের বশবর্ত্তী হইয়া পাকিস্থানী নেতৃবৃন্দের একাংশ ভারত-পাকিস্থান সম্পর্কে অবনতি ঘটাইবার জন্য সক্রিয় চেষ্টা করিতেছেন। আজ পাকিস্থানী জনসাধারণের এই কথা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। ভিয়েৎনাম এবং চীন সতের বৎসর পর পুনরায় উভয় দেশের মধ্যে রেলসংযোগ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। চীন

এবং রাশিয়া বহু অর্থব্যয়ে দুই দেশের মধ্যে প্রত্যক্ষ রেলপথ স্থাপন করিয়াছে। কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুত্বের কথা সুবিদিত। বেলজিয়ম, নেদারল্যাণ্ড, লুক্সেমবুর্গ প্রভৃতি রাষ্ট্র সক্রিয় ভাবে পারস্পরিক সহযোগিতা করিতেছে—আর পাকিস্থান সরকার সর্ব্বপ্রকারে ভারতের সহিত সম্পর্কের অবনতি ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছেন। ভারত-পাকিস্থান সম্পর্কের ইতিহাসে ইহাই হইবে নির্ম্মম সত্য।

এখানে ভারত সরকারের আচরণ সম্পর্কেও কয়েকটি কথা বলিবার আছে। পাকিস্থান সরকারের এইরূপ ধৃষ্টতামূলক আচরণেও ভারত সরকার কোনরূপ প্রতিবাদ জানায় নাই ইহা বিস্ময়কর। যদি পাকিস্থান সরকার পাকিস্থানস্থিত ভারতীয় নাগরিকগণ সম্পর্কে নূন সাহেবের ঘোষিত নীতি কার্য্যকরী করিতে উদ্যত হয় (এবং এই নীতি যে কেবলমাত্র পাসপোর্টরহিত ব্যক্তিদিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তাহার কোন আশ্বাস নাই) তবে ভারত সরকারের উচিত অবিলম্বে এই বিষয়ের প্রতি প্রতিকারমূলক কঠোর ব্যবস্থা করা। এবং সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্থান হইতে আগত লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর আশ্রয়দান সম্পর্কেও আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। প্রবাদ আছে, যে যেরূপ তাহার সহিত সেরূপ আচরণই করা উচিত। পাকিস্থান সরকার যখন ভারতকে উত্যক্ত করাই তাহাদের মুখ্য রাজনীতি বলিয়া স্থির করিয়াছেন তখন ভারতের উচিত পাকিস্থান সরকারকে উহার বোধগম্য ভাষায় উত্তর দেওয়া।

পাকিস্থানী আভ্যন্তরীণ রাজনীতির রূপ

পাকিস্থানের বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের কর্ণধার মেজর-জেনারেল ইস্কান্দার মির্জ্জার ভূমিকা সম্পর্কে শ্রীহট্টের সাপ্তাহিক "জনশক্তি" পত্রিকা যে সম্পাদকীয় আলোচনা করিয়াছেন তাহা বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। "জনশক্তি" লিখিতেছেন :

"পাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জ্জা করাচীতে পাকিস্থান বার এসোসিয়েশনের সভায় গত ২২শে ডিসেম্বর তারিখে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে যে উক্তি করিয়াছেন তাহাকে আমরা বিশেষ দুঃখজনক বলিয়া মনে করিতেছি। নির্ব্বাচকমণ্ডলী গঠন সম্পর্কে সর্ব্বশেষ যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে তাহাকে প্রেসিডেন্ট মীর্জ্জা দক্ষিণাভিমুখী পরিবর্ত্তন বলিয়াছেন। প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদকেই সাধারণতঃ দক্ষিণাভিমুখী মতবাদ বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। যুক্তনির্ব্বাচন প্রথা দেশকে প্রতিক্রিয়াশীলতার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্যই গৃহীত হইয়াছে ইহাই দেশের উভয় অংশের সুস্পষ্ট অভিমত। নিজেদের প্রতিক্রিয়াশীল মনোবৃত্তির কোন সমর্থন দেশের লোকের নিকট না পাইয়া আরও অনেকের মতই প্রেসিডেন্ট মীর্জ্জাও মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছেন এবং অপর পক্ষকেই প্রতিক্রিয়াশীল মনোবৃত্তিসম্পন্ন বলিয়া গালি দিয়া মনের ঝাল মিটাইতে চাহিয়াছেন। যুক্ত-নির্ব্বাচনপ্রথা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার ফলে অনেকেরই রাজনৈতিক বেকারত্ব ঘটিবার সম্ভাবনা দাঁড়াইতেছে। প্রেসিডেন্ট মীর্জ্জাও সেই আতঙ্কেই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া মনে করা হয়ত খুব ভুল হইবে না। রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে রাজনৈতিক দলাদলির উর্দ্ধে থাকিয়া জনমতের অভিব্যক্তিকে পরিপূর্ণ মর্য্যাদা দেওয়ার যে দায়িত্ব তাঁহার রহিয়াছে সেই কথা ভুলিয়া তিনি দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে নিজস্ব অভিমত দেশের লোকের নিকট প্রচার করার প্রলোভন সংযত করিবেন—দেশবাসী তাঁহার নিকট ইহাই আশা করে।

আগামী নবেম্বরে নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারিবে কিনা সেই সম্পর্কেও প্রেসিডেন্ট মীর্জ্জা সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। "নির্ব্বাচকমণ্ডলীর তালিকা প্রণয়ন যে দুঃসাধ্য কার্য্য তাহা জনসাধারণ বুঝিতে পারে না বলিয়া নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানে বিলম্বের জন্য কর্ত্তৃপক্ষের উপর দোষারোপ করিয়া থাকে"—এই উক্তি করিয়া প্রেসিডেন্ট মীর্জ্জা প্রকারান্তরে নির্ব্বাচনী কর্ত্তৃপক্ষকে কাজে ঢিলা দেওয়ার জন্যই প্ররোচিত করিতেছেন বলিয়া যদি কেহ মনে করেন তবে তাহা খুব দোষণীয় হইবে না। মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া মিঃ চুন্দ্রীগড় দেশকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহাতে এইরূপ সন্দেহ পোষণ করার কোনই অবকাশ ছিল না, এবং সম্প্রতি মিঃ ফিরোজ খান নুন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া আগামী নবেম্বরেই নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া যে উক্তি করিয়াছেন তাহাও অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়াই করা হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। এমতবস্থায় প্রেসিডেন্ট মীর্জ্জা যে উক্তি করিয়াছেন তাহাকে আমরা দায়িত্বজ্ঞানহীন বলিয়া অভিহিত করিতে কুণ্ঠিত হইব না। রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে আজ প্রেসিডেন্ট মীর্জ্জার ইহাই বিশেষ দায়িত্ব যে, তিনি দেশের লোকমত মান্য করিয়া আগামী নবেম্বর মাসেই যাহাতে নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে পারে তজ্জন্য সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে কর্ত্তব্যে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবেন। তাহা না করিয়া তিনি প্রকারান্তরে এই সম্পর্কে তালবাহানা করিবার যে প্রশ্রয় দিতে চাহিয়াছেন তাহা খুবই দুঃখজনক।"

পোলিশ বিজ্ঞানীর দেশত্যাগ

বিশ্ববিখ্যাত পোলিশ বিজ্ঞানী ডঃ জেজরি লিথ লোইনস্কি গত ২রা জানুয়ারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করেন। তিনি কৌশলে তাঁহার স্ত্রী ও পরিবারকে পোল্যাণ্ডের বাহিরে আনাইয়া লন এবং তাহার পরই তিনি তাঁহার দেশত্যাগের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন।

কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলির একটি বৈশিষ্ট্য বুদ্ধিজীবীদের নির্য্যাতন। ষ্টালিনের আমলে সহস্র সহস্র বুদ্ধিজীবীকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করা হয়। অনেকে (যেমন প্রখ্যাত রুশ কবি মায়াকভস্কি) নির্য্যাতন সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করেন। সেই জন্য কম্যুনিষ্ট দেশগুলির একটি বৈশিষ্ট্য হইল দেশ হইতে বুদ্ধিজীবীদের পলায়ন।

কোন নাগরিক সহজে দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না। যখন একজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী তাঁহার নিজের দেশ ত্যাগ করিয়া যান তখন ঐ দেশের আভ্যন্তরীণ আবহাওয়া যে কিরূপ বিষাক্ত আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না।

ম্যাকলীন ও বার্গেসের অভিপ্রায়

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ব্রিটেনের পররাষ্ট্র বিভাগের দুইজন উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারী মিঃ ম্যাকলীন এবং মিঃ বার্গেস স্বদেশ ত্যাগ করিয়া পলাতক হ'ন। পরে প্রকাশ পায় যে, তাঁহারা সোভিয়েটে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এই দুইজন কর্ম্মচারীর পলায়নের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, ব্রিটিশ পুলিশ প্রায় এক বৎসরেরও উপর হইতে এই দুইজন কর্ম্মচারীর গতিবিধির উপর নজর রাখে এবং তাঁহাদের সকল কাজকর্ম্ম সম্পর্কেই ওয়াকিবহাল থাকে; কিন্তু তথাপি পুলিশ ইহাদের গ্রেপ্তার করে নাই; কারণ ইহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ সপ্রমাণ করিবার মত উপযুক্ত প্রমাণ পুলিশের হাতে ছিল না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পুলি য আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত ইহা তাহার একটি দৃষ্টান্ত।

সে যাহাই হউক, স্বদেশ হইতে পলায়নের পর কয়েক বৎসর যাবত ম্যাকলীন এবং বার্গেসের অন্তর্দ্ধান একটি রহস্যই থাকিয়া যায়। মাত্র বৎসর খানেক পূর্ব্বে তাঁহারা আত্মপ্রকাশ করেন মস্কোর এক হোটেলে। সর্ব্বশেষ সংবাদে দেখা যাইতেছে যে, ম্যাকলীন এবং বার্গেস তাঁহাদের কৃতকার্য্যের জন্য অনুতপ্ত হইয়াছেন এবং সোভিয়েট রাশিয়ার মোহ তাহাদের ঘুচিয়া গিয়াছে—তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনে বিশেষ ভাবে উৎসুক। প্রকাশ যে এই সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের অভিমত জানিতে চাওয়া হইয়াছে। সোভিয়েট ইউনিয়নে এই দুই ইংরেজ যে কিরূপ মানসিক অশান্তি ভোগ করিতেছেন, বার্গেসের অত্যধিক মদ্যপানের মধ্যে তাহার ইঙ্গিত দেখা যায়। মিথ্যা আদর্শের পিছনে ছুটিয়া যখন মোহভঙ্গ হয়—তাহার মত শোচনীয় অবস্থা বোধ হয় আর কিছুতেই হয় না।

মস্কো কম্যুনিষ্ট সম্মেলন

সোভিয়েট বিপ্লবের ৪০তম বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে বিশ্বের কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দ মস্কো নগরীতে মিলিত হন। ঐ উপলক্ষে বিভিন্ন দেশে ক্ষমতায় আসীন কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলি (যুগোস্লাভিয়া বাদে) একটি বিবৃতি দেয় এবং সকল পার্টিগুলির প্রতিনিধিগণ সম্মিলিত ভাবে শান্তির আবেদন জানাইয়া অপর একটি যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করেন। এই সম্পর্কে ইংরেজ লেখক ডেভিড ফ্লয়েড লিখিতে-ছেন:

সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রধান মিঃ নিকিতা ক্রুশ্চেভ রাশিয়ার সামরিক শক্তি সম্পর্কে এবং তাহার স্বাধীন বিশ্ব ধ্বংস করার ক্ষমতা সম্পর্কে অনেক কথাই জোর গলায় বলিয়া আসিয়া-ছেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও দেখা যাইতেছে আন্তর্জ্জাতিক আন্দোলন হিসাবে কম্যুনিজম এক কঠিন সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে। ১৯৫৩ সনে ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর পর কম্যুনিষ্ট শিবিরের মধ্যে মতবিরোধ কিংবা স্বার্থের সংঘাত এত বেশী স্পষ্ট হইয়া আর কখনও দেখা দেয় নাই।

সম্প্রতি মস্কোয় বলশেভিকদের ক্ষমতা অধিকারের ৪০তম বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়, এতদুপলক্ষে সমগ্র সোভিয়েট ব্লক ও বিশ্বের অন্যান্য অংশের কম্যুনিষ্ট নেতৃবর্গ মস্কোয় আসিয়া সমবেত হন। এইরূপ অনুমান করা গিয়াছিল যে, তাঁহারা হয়ত এই সুযোগে কম্যুনিষ্ট পার্টিসমূহের ঐক্যের কথা এবং সেই সঙ্গে নূতন কম্যুনিষ্ট প্রোগ্রামের কথা বিশ্ববাসীকে জানাইয়া দিবার জন্য এক যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করিবেন।

কিন্তু কিছুই হয় না। কম্যুনিষ্ট নেতৃবর্গ উৎসব অনুষ্ঠানের পর প্রায় দুই সপ্তাহ মস্কোয় কাটান, কিন্তু কোন ফলই তাহাতে হয় না।

প্রধান প্রধান বিষয়ে মীমাংসার পরিবর্ত্তে তাঁহারা অধিকাংশ সময় কলহ করিয়াই কাটাইয়া দেন। প্রকাশ্যে আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা না করিয়া রুদ্ধদ্বার কক্ষে গোপন সভা অনুষ্ঠান করিয়াই তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকেন। এই গোপন সভা চলে দুই দিন ধরিয়া এবং সকলেই যে এই সভায় যোগদান করেন তাহাও নয়।

সভার ফলাফলও উল্লেখযোগ্য হয় না; যে দুইটি বিবৃতি সভার পর প্রকাশ করা হয় তাহা কোন ছাপই স্বাধীন বিশ্বের উপর রাখিয়া যাইতে পারে না।

একটি বিবৃতি হইল বিশ্বে শান্তিপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে—ইহা একটি সাধারণ ঘোষণা মাত্র, এই ঘোষণায় স্বাক্ষর দান করেন প্রায় ৬৮টি কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখপাত্রগণ। ইহাতে নূতন কথা কিছুই বলা হয় না; সমস্ত কথাই কম্যুনিষ্টদের আগেকার "শান্তি" আন্দোলনগুলিতে বলা হইয়া গিয়াছে। রাশিয়া যে পররাষ্ট্র নীতির অস্ত্র হিসাবে শক্তি বা শক্তির হুমকী পরিহার করিতে ইচ্ছুক এমন আভাসও ইহার মধ্যে পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় দলিলটি কিছু গুরুত্বপূর্ণ, যদিও ইহাতে স্বাক্ষর দান করেন বিশ্বের মাত্র বারটি কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধিগণ এবং রাশিয়ার তাঁবেদার রাষ্ট্রসমূহের ক্ষমতাসীন পার্টিগুলির প্রতিনিধিগণ, যাঁহারা নিজেদের অস্তিত্বের জন্য ক্রেমলিনের উপর নির্ভর না করিয়া পারেন না। বর্ত্তমান কম্যুনিষ্ট বিশ্বের চমৎকার একটি চিত্র ইহা হইতে পাওয়া যায়।

যাঁহারা মস্কোর এই ঘোষণায় নূতন কিছু দেখিতে চান তাঁহারা নিরাশ হইবেন। ১৯৫৬ সালের যে ঘটনাবলী কম্যুনিষ্ট বিশ্বকে নাড়া দিয়াছিল তাহার কোন আভাসই ইহাতে নাই। ক্রেমলিনের পার্টি ধুরন্ধরগণ যে পোলিশ এবং হাঙ্গারীর বিপ্লবে বিচলিত হইয়া-ছিলেন তাহাও ইহা হইতে বুঝা যায় না।

পোলাণ্ডে গোমুলকার আবির্ভাব, যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেণ্ট টিটোর স্বাধীন সত্তা, কিংবা চীন প্রজাতন্ত্রের চেয়ারম্যান মাও-সে-

ভুক্তের মৌলিক মতবাদ যে বিশ্বের ঘটনাবলী সম্পর্কে রুশ-চিন্তাকে প্রভাবিত করিয়াছে তাহার কোন লক্ষণই বিবৃতির মধ্যে প্রকাশ পায় না। ইহা হইতে এই কথাই বুঝা যায় যে, ক্রেমলিনের কর্ণধারগণ আজও সমান ভাবে ষ্ট্যালিনী নীতিই অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন, ষ্ট্যালিনের সহিত তাঁহাদের পার্থক্য এই যে, তাঁহারা ষ্ট্যালিনের চেয়ে যুদ্ধকে একটু বেশী করিয়া ভয় করেন।

মস্কো ঘোষণায় যুগোশ্লাভ কম্যুনিষ্ট পার্টি প্রতিনিধি স্বাক্ষর দান করেন না। আরও একটি কথা হইল এই, বিবৃতির খসড়া প্রস্তুতকারীদের পোলিশ ও চীনা প্রতিনিধিগণ যাহাতে ইহা অগ্রাহ্য না করেন সেই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়; সেই জন্য বিবৃতির মধ্যে এমন কোন কথা বলা হয় না যাহা মিঃ গোমুলকা কিংবা মিঃ মাওর আপত্তির কারণ হইতে পারে, কিংবা যাহা হইতে বুঝা যাইবে তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার ক্ষমতা আছে।

স্বাধীন বিশ্বের কোন কম্যুনিষ্ট পার্টিও ঘোষণায় স্বাক্ষর দান করিতে পারেন না। ইহার মূল কারণ হইল ক্রেমলিনের শাসকগণ বিরুদ্ধ মতগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়—এই বিরুদ্ধ মত সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত হইল এই যে, ইটালীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা সিনর তোগলিয়াত্তি একদিকে যেমন চান কম্যুনিজমকে 'বহু-কেন্দ্রিক' করিতে, তেমনই অন্যদিকে ফরাসী নেতা মঃ জ্যাকুইস চান কম্যুনিজমকে সম্পূর্ণভাবে মস্কোর নির্দ্দেশাধীন করিতে।

কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দ এক্ষণে স্ব স্ব দেশে ফিরিয়া আসিয়া ভিন্ন ভিন্ন ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন। পোলদের সমস্যা হইল প্রধানতঃ অর্থনৈতিক সমস্যা। পূর্ব্ব-জার্ম্মানদের আছে দেশবিভাগের সমস্যা, এই বিভাগ ব্যবস্থা রক্ষার জন্য সেখানে আছে ৩০টি সোভিয়েট ডিভিসন। মিঃ মাও-সে-তুং অর্থনৈতিক সমস্যা লইয়া ইতিমধ্যে যথেষ্ট বিব্রত বোধ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহার জন্য তাঁহাকে নির্লজ্জ ভাবে রাশিয়ার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইতেছে। যুগোশ্লাভিয়া স্বাধীনতার স্বাদ লাভ করায় সর্ব্বদা কম্যুনিষ্ট ফাঁদের ভয়ে ভীত এবং আজ সে যুক্তরাষ্ট্রের দিকে সাহায্যের জন্য তাকাইয়া আছে।

রুশ-ভারত বন্ধুত্বের নমুনা

৯ই জানুয়ারী পাক্ষিক "হিন্দুবাণী" লিখিতেছেন :

"রাশিয়াপ্রবাসী ভারতীয়েরা (প্রায় সকলেই বৈদেশিক বিভাগের চাকুরিয়া) 'হিন্দুস্থানী সমাজ' নামক একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য অনুমতি চাহিয়াছিলেন। সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক কার্য্যকলাপ চালানই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল। রাজনীতি বা বিকল্প রুশ-সরকার গঠনের কোন উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ছিল না।

"প্রথমে রুশ সরকারের লোক আপত্তি করেন নাই। প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন প্রায় সব ঠিক, শিক্ষাসচিব উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিবেন বলিয়া কার্ড ছাপান হইয়া গিয়াছে' এমন সময় রুশ সরকার জানাইলেন, অনুমতি দেওয়া হইবে না। এইরূপ অনুমতি দিবার নজীর হইয়া গেলে অন্যান্য জাতির লোকেরাও 'কালচার' করিতে করিতে অন্য কিছু করিয়া বসিতে পারে। ভারতীয়েরা অনেক ধরাধরি করিয়াও শেষ পর্য্যন্ত নিস্ফল হয়। রাশিয়া ভারতের বন্ধু, কিন্তু প্রবাসী ভারতীয়দের কালচার চর্চ্চার সুযোগ দিতেও তাহারা রাজী নহেন।"

হিন্দুবাণীর খবর ঠিক হইলে উহা আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিতে হইবে। অবশ্য অন্য যাঁহারা রাশিয়ায় আছেন তাঁহাদের কার্য্যকলাপের উপর যুদ্ধকালীন ব্যবস্থার অনুরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা রাশিয়া বাঞ্ছনীয় মনে করিতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও এরূপ অনুমতি দানে অসম্মতি আশ্চর্য্য।

দক্ষিণ মেরু অভিযান

গত ৩রা জানুয়ারী এভারেষ্ট-বিজয়ী স্যার এডমণ্ড হিলারী দক্ষিণ মেরুতে গিয়া পৌঁছান। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ডাঃ ফুক্সের নেতৃত্বে যে অভিযাত্রীদল দক্ষিণ মেরু অভিযানে অগ্রসর হ'ন তাহাদের অগ্রগামী দল হিসাবে স্যার এডমণ্ড ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা কাজ করেন। পূর্ব্ব ব্যবস্থামতে হিলারীর দক্ষিণ মেরুতে যাইবার কোন কথাই ছিল না, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি দক্ষিণ মেরুতে চলিয়া যান। অবশ্য দক্ষিণ মেরুতে তিনি বেশিক্ষণ থাকেন নাই।

স্যর এডমণ্ডের এই উদ্যম প্রশংসনীয়। ১৯৫৩ সনে তেনজিং নোরকের সহিত তিনি এভারেষ্ট আরোহণের গৌরব অর্জন করেন। কিন্তু তিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন নাই। প্রকৃতির দুর্গমতা ভেদের চেষ্টা তাহার অদমিতই থাকে এবং শেষ পর্য্যন্ত স্কটের পর তিনিই সর্ব্বপ্রথম দক্ষিণ মেরু গমনের কৃতিত্ব অর্জন করেন। এভারেষ্ট আরোহণ এবং মেরু প্রদেশে গমন—কোন একক ব্যক্তিই ইতিপূর্ব্বে এরূপ কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না। এভারেষ্ট আরোহণের সময়ের ন্যায় মেরুবিজয়ের সময়ও হিলারী এক বিতর্কমূলক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন। হিলারী ডাঃ ফুক্সকে সাহায্য করিবার জন্য ডাঃ ফুক্সের নেতৃত্বেই কাজ করিতেছিলেন; অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছিয়াই তিনি বলিয়া দিলেন যে, ডঃ ফুক্সের আর আসিবার প্রয়োজন নাই। স্বাভাবিক ভাবেই ডঃ ফুক্স হিলারীর এই অযাচিত উপদেশ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

বহু পূর্ব্বেই দক্ষিণ মেরু বিজিত হইয়াছিল। সুতরাং এখন কেবলমাত্র মেরু প্রদেশে যাওয়াই কোন উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নহে। এখনকার অভিযানগুলির উদ্দেশ্য মেরু প্রদেশগুলি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্য আহরণ করা। ডঃ ফুক্সের অভিযানের মুখ্য উদ্দেশ্য তাহাই। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে হিলারী এই উদ্দেশ্যের সহিত নিজের কার্য্যপ্রণালী মিলাইতে পারেন নাই। হিলারীর মেরুগমনে মেরু প্রদেশ সম্পর্কে বিশ্ববাসীর কোন জ্ঞানবৃদ্ধিই হইবার সম্ভাবনা নাই। ডঃ ফুক্স তাঁহার যাত্রাপথে বহু প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক

তথ্য সংগ্রহ করিয়া চলিতেছেন, তাঁহার বিলম্বের অন্যতম প্রধান কারণ ইহাই ; উপরন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগও তাঁহার যাত্রা ব্যাহত করিয়াছে। কিন্তু তাঁহার অভিযান সফল হইলে মেরু প্রদেশ এবং অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ সম্পর্কে বহু অজ্ঞাত তথ্য জানা যাইবে। আমরা তাঁহার সফলতা কামনা করি।

চন্দ্রে যাত্রার সম্ভাবনা

মহাশূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ দুইটি ছাড়ার পর হইতেই পৃথিবী হইতে চন্দ্রে যাত্রার সম্ভাবনা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকগণের উৎসাহ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সোভিয়েট বিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে, আর দশ বৎসর অর্থাৎ ১৯৬৮ সনের মধ্যেই চন্দ্রে পৌঁছান সম্ভব হইবে। মস্কো হইতে প্রকাশিত "যুগেসত" পত্রিকায় এক প্রবন্ধে অধ্যাপক য়ুরি পোবেদানোসত্সেফ চন্দ্রযাত্রার উদ্যোগ-আয়োজন সম্পর্কে আলোচনা করিয়া লিখিতেছেন যে :

মহাশূন্যদেশ সম্পর্কে মানুষ এতকাল ধরিয়া যেসব তথ্য সংগ্রহ করিয়াছে, কৃত্রিম উপগ্রহ দুইটি উৎক্ষেপণ করিবার ফলে মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তাহার চেয়ে ঢের বেশী সংবাদ জানা গিয়াছে। ঊর্দ্ধবর্ত্তী বায়ুস্তরের তাপাঙ্ক ১০০০ ডিগ্রির বেশী কিনা, অতি-উচ্চতায় দিগদর্শনযন্ত্রের চুম্বক কাঁটাটি এলোমেলো ভাবে ঘুরিতে থাকে কেন, পৃথিবীর চৌম্বক গুণটির সঠিক স্বরূপটি কি, ইত্যাদি নানা প্রশ্নের উত্তর এই স্পুৎনিক দুইটি দিতেছে এবং এইসব তথ্যের ভিত্তিতে গ্রহান্তর-যাত্রার প্রাথমিক প্রস্তুতিকার্য্যকে ত্বরান্বিত করিয়া তোলা হইতেছে।

ভবিষ্যতে যেসব স্পুৎনিক ক্রমান্বয়ে ছাড়া হইবে, সেগুলি মহাশূন্যদেশ সংক্রান্ত অন্যান্য সংবাদ পাঠাইবার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য গ্রহের পৃষ্ঠদেশের খবরও জানাইবে : মঙ্গল গ্রহের রহস্যময় খাল-গুলির কথা, শুক্রের ঘন মেঘ এবং বৃহস্পতি ও শনির বিরাট আয়তনের কথা। অতিতপ্ত ও বিস্ফোরণশীল তারকাগুলির গোপন রহস্যও জানা যাইবে ; অন্য গ্রহের বায়ুমণ্ডলের উপাদান, ঘনত্ব ইত্যাদির সঠিক হিসাব করা যাইবে এবং তখনই চূড়ান্তভাবে নির্দ্ধারণ করা হইবে যে,ঐ সব গ্রহে গিয়া মানুষ কি ভাবে প্রাণরক্ষা করিবে।

সোভিয়েট বিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে, দুই মাসের মধ্যেই চন্দ্রে একটি রকেট পাঠান সম্ভব হইবে। এই সম্পর্কে আলোচনা করিয়া অপর একজন সোভিয়েট বিজ্ঞানী অধ্যাপক কে, স্তান্যুকোভিচ লিখিতেছেন :

স্পুৎনিকের পরিবাহী-রকেটটির সহিত যদি আরও দুই বা তিনটি পর্য্যায় যোগ করিয়া দেওয়া যায়—অর্থাৎ তিন-পর্য্যায়ের রকেটকে যদি চার বা পাঁচ পর্য্যায়ের রকেটে পরিণত করা যায়—তাহা হইলে এই রকেটের শেষ পর্য্যায়টি প্রতি সেকেণ্ডে সাড়ে-সাত মাইল বেগ অর্জ্জন করিতে পারিবে এবং এই বেগ চন্দ্রে গিয়া পৌঁছাইবার পক্ষে উপযুক্ত। এই রকেটটি চন্দ্রের জমিতে গিয়া এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটাইবে যাহার উজ্জ্বল দীপ্তি পৃথিবী হইতে দেখা যাইবে এবং উহার বর্ণালী বিশ্লেষণ করিয়া চাঁদের জমির উপাদান সম্পর্কে আমরা অনেককিছু জানিতে পারিব।

অধ্যাপক স্তান্যুকোভিচ লিখিতেছেন, এইরূপ একটি রকেট চাঁদে পাঠাইবার পূর্ব্বে একে একে অনেকগুলি কৃত্রিম উপগ্রহ ছাড়া হইতে থাকিবে যেগুলি ক্রমান্বয়ে চাঁদের নিকটতর কক্ষপথে পরিক্রমা করিবে। বিশেষ যন্ত্র ব্যবহার সাহায্যে এই কৃত্রিম উপগ্রহগুলি চন্দ্রপৃষ্ঠের আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়া দিবে। অবশ্য এই ফটোগুলি খুব একটা আশ্চর্য্য নূতন তথ্য জানাইবে বলিয়া মনে হয় না। চন্দ্রযাত্রীদের প্রথম দলটি সেখানে গিয়া বিশেষ স্বাগত-সম্বর্দ্ধনা পাইবে বলিয়াও মনে হয় না। কোন কোন বৈজ্ঞানিক মনে করেন, চাঁদের পৃষ্ঠদেশ এক প্রকার চূর্ণ-পদার্থের পুরু প্রলেপে ঢাকা। মহাজাগতিক ধূলিকণা সদাসর্ব্বদা চন্দ্রের গায়ের উপর আসিয়া পড়িতেছে, এবং এই প্রক্রিয়ার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মানুষকে অত্যন্ত ভারী ধাতব-পাতের পোশাক পরিয়া থাকিতে হইবে। তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, মানুষ ভবিষ্যতে চাঁদের উপরে কোন-না-কোন সময়ে এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত মানমন্দির স্থাপন করিবে। তখন চন্দ্রকে মানুষ ব্যবহার করিবে অন্য গ্রহে যাইবার জন্য একটি বিমান বন্দর হিসাবে এবং পরীক্ষামূলক পারমাণবিক গবেষণার জন্য একটি সুবিপুল ল্যাবরেটরি হিসাবে।

এশীয়-আফ্রিকা সম্মেলন

২৬শে ডিসেম্বর হইতে ১লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত এই সাতদিন ব্যাপিয়া মিশরের রাজধানী কায়রোতে এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদিগের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনটি মুখ্যত: বেসরকারী স্তরে হইলেও এশিয়া ও আফ্রিকার একাধিক সরকার এই সম্মেলনকে সক্রিয় ভাবে সাহায্য করিয়াছেন। এই সকল সরকারের মধ্যে চীন, ইন্দোনেশিয়া, মিশর ও সিরিয়ার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। সম্মেলনে ৪৪টি বিভিন্ন দেশ হইতে পাঁচ শতাধিক প্রতিনিধি যোগদান করেন। সম্মেলনে বিভিন্ন দেশ হইতে প্রায় শতাধিক সংবাদদাতা উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের উদ্বোধনের সময় মিশরের মন্ত্রীসভার সদস্যগণ এবং মিশরস্থিত বিদেশী রাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূতগণ উপস্থিত থাকেন। এই সম্মেলনের সংবাদ প্রায় সকল দেশেই বিশেষ ফলাও করিয়া প্রকাশিত হইলেও কোন অজ্ঞাত কারণে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই।

বিদেশী সংবাদপত্র এবং সংবাদ প্রতিষ্ঠানগুলির প্রদত্ত সংবাদ হইতে দেখা যায় যে, সম্মেলনে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লইয়া মনযোগের সহিত আলোচনা চলে এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অভিমত জ্ঞাপন করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সম্মেলনে গোয়া সম্পর্কে ভারতের দাবী

পশ্চিম ইরিয়ান সম্পর্কে ইন্দোনেশিয়ার দাবী এবং ফরমোজা সম্পর্কে চীনের দাবীর প্রতি পরিপূর্ণ সমর্থন জানান হয়। সম্মেলনের অপর উল্লেখযোগ্য ঘটনা অর্থনৈতিক সাহায্য সম্পর্কে সোভিয়েট প্রতিনিধির প্রকাশ্য ঘোষণা। সোভিয়েট প্রতিনিধি সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, এশিয়া ও আফ্রিকার যে কোন রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক উন্নতিবিধানের জন্য বিনাসর্তে যে কোন সাহায্যদানের জন্য সোভিয়েট সরকার প্রস্তুত রহিয়াছেন। এশিয়ার রাষ্ট্রগুলিকে অর্থনৈতিক সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইলেও ইতিপূর্ব্বে সোভিয়েট ইউনিয়ন এরূপ জোরের সহিত তাহার সাহায্যদানের ক্ষমতা অথবা ইচ্ছার কথা ঘোষণা করে নাই।

ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা

মাধ্যমিক শিক্ষার অনুকরণে প্রাথমিক শিক্ষার জন্যও একটি সর্ব্ব-ভারতীয় কাউন্সিল গঠন করা হইয়াছে। একুশ জন সদস্যবিশিষ্ট এই কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হইলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তরের সেক্রেটারী শ্রী কে. জি. সেইদাইন* এবং সেক্রেটারী হইলেন ডাঃ পি. ডি. শুক্ল। ভারতীয় সংবিধানের ৪৫নং ধারায় বলা হইয়াছে যে, সংবিধান চালু হইবার পর দশ বৎসরের (অর্থাৎ ১৯৬০ সনের) মধ্যে ভারতের সকল শিশুদের চতুর্দ্দশবর্ষ প্রাপ্তি পর্য্যন্ত অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের জন্য রাষ্ট্র (সরকার) সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করিবে। কিন্তু বর্ত্তমানে অবস্থা যেরূপ তাহাতে উক্ত সময়ের মধ্যে সংবিধানের নির্দ্দেশ প্রতিপালিত হইবার কোনই আশা নাই। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যে হারে অগ্রগতি ঘটিতেছে তাহাতে আরও কুড়ি বৎসর পরেও সাধারণের জন্য অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন হইবে কিনা সন্দেহ। গত সাত বৎসরে এই ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি ঘটিয়াছে তাহা নিম্নরূপ: কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণাদপ্তরের ১৯৫৫-৫৬ সনের কার্য্যবিবরণী হইতে দেখা যায় যে, ঐ সময়ে সমগ্র দেশের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের উপযোগী বয়সের (৬-১১) বালকবালিকাদের মধ্যে শতকরা ৫৩·১ জন বিদ্যালয়ে পাঠরত ছিল। বিভিন্ন রাজ্যে এই হার বিভিন্ন প্রকার। ত্রিবাঙ্কুর কোচীন (বর্ত্তমানে কেরালা) রাজ্যে উক্ত বয়সের শতকরা একশত জনই স্কুলে পাঠরত ছিল, বোম্বাই ও পশ্চিমবঙ্গে ছিল শতকরা ৮৭ জন; অপরপক্ষে রাজস্থানে ঐ হার ছিল মাত্র শতকরা ২২·৬। যে সকল রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে প্রগতি বিশেষরূপে পশ্চাদপদ রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা ও রাজস্থানের নাম উল্লেখযোগ্য। ঐ সকল রাজ্যে বিদ্যালয়ে পাঠের উপযোগী জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশেরও কম বর্ত্তমানে বিদ্যালয়ে পাঠের সুযোগ পাইতেছে। পাঠরত বালক বালিকাদের মধ্যে বালিকাদের সংখ্যা খুবই কম। বালিকাদের এই সংখ্যাল্পিষ্ঠতার পিছনে স্থানবিশেষে স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে কুসংস্কার দায়ী। তবে আরও বেশি সংখ্যায় শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করিতে পারিলে যে বালিকা শিক্ষার্থীনীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষাবিস্তারের অন্যতম প্রধান অন্তরায় গ্রামবাসীদিগের নিদারুণ দারিদ্র্য। অপরপক্ষে গ্রামে অধিবাসীরা ছড়াইয়া থাকে—সেজন্য স্থানবিশেষে ছাত্রদের পক্ষে দূরবর্ত্তী বিদ্যালয়ে গিয়া পড়াশোনা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। যতদিন পর্য্যন্ত না ভারতের প্রতিটি গ্রামে একটি করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে ততদিন এই সকল সমস্যার সমাধান হইবে না। সরকারী পরিসংখ্যান হইতে দেখা যায় যে, ১৯৫৫-৫৬ সনে ভারতের ৪ লক্ষ ৫০ হাজার গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এখনও অনেক কাজই বাকী রহিয়াছে।

প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের পথে সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় অর্থাভাব। রাজ্যসরকারগুলি শিক্ষাখাতে বর্ত্তমানে যে অর্থব্যয় করিতেছে তাহা বৃদ্ধি করিবার কোন সহজ উপায় নাই। কিন্তু ভারতীয় গণতন্ত্রকে সজীব রাখিতে হইলে দেশের এক বিরাটসংখ্যক মানুষকে নিরক্ষর রাখা যাইতে পারে না। সুতরাং কি প্রকারে যথাশীঘ্র ভারতের সকল নাগরিক বিশেষতঃ বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী বালক বালিকা-দিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারা যায় সে বিষয়ে সকলেরই মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। সংবিধানে বালক বালিকাদিগকে নয় বৎসর (৬-১৪) শিক্ষাদানের কথা বলা হইয়াছে। মাদ্রাজ সরকার তৎপরিবর্ত্তে শিক্ষাকাল পাঁচ বৎসর করিতে বলিয়াছেন। ইহাতে আংশিকভাবে আর্থিক সুরাহা হইতে পারে, কিন্তু শিক্ষাদান সময়ের এইরূপ সঙ্কোচনে শিক্ষাদানের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। বর্ত্তমান স্কুলগুলিতে দুই শিফটে কাজ করাইতে হইলেও শিক্ষকদিগকে ডবল বেতন দিতে হইবে। তবে উহাতে নূতন করিয়া স্কুল-গৃহ নির্ম্মাণের ব্যয় এবং ডবল সাজসরঞ্জামের ব্যয় বাঁচিয়া যাইবে। সুতরাং এই উপায় অবলম্বন করিয়া দেখা যাইতে পারে। আর একটি উপায় হইতেছে বর্ত্তমান স্কুলগুলির ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি করা। ইহা সুবিবেচনার কাজ হইবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ এখন যে সংখ্যক ছাত্র রহিয়াছে শিক্ষকদের পক্ষে তাহাদিগকে মানাইয়া রাখাই এক সমস্যা; শিক্ষক বৃদ্ধি না করিয়া যদি উহার উপর ছাত্রসংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা হয় তাহাতে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতে বাধ্য। প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের দায়িত্ব প্রধানতঃ রাজ্যসরকারসমূহের। সুতরাং অবস্থানুযায়ী প্রত্যেক রাজ্যসরকারকেই উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রণয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল হইলেও এখনও শতকরা প্রায় ১৫ জন বিদ্যালয়ে পাঠক্ষম বালকবালিকা তাহাদের প্রাপ্যশিক্ষা হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে।

নিখিলভারত প্রাথমিক শিক্ষাসংসদ (All India Council for Primary Education) আলোচনার মারফত অভিজ্ঞতা বিনিময় ব্যতীত অন্য কোনপ্রকারে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারে রাজ্য-সরকারগুলিকে সাহায্য করিতে পারে কিনা তাহা অদূরভবিষ্যতেই বুঝা যাইবে।

সরকারী শিক্ষা বিভাগের অযোগ্যতা

বর্দ্ধমান রাজ কলেজের পরিচালনা ভার বর্ত্তমান সরকারের হাতে। সরকারী পরিচালনায় কলেজটির দুরবস্থার কথা আলোচনা করিয়া বর্দ্ধমানের সাপ্তাহিক "দামোদর" পত্রিকা লিখিতেছেন :

"কংগ্রেসী সরকার যাহাতেই হাত দিতেছেন তাহাই সোনা হইয়া যাইতেছে দেখিতেছি। বর্দ্ধমানের বিখ্যাত রাজ কলেজ যতদিন বে-সরকারী ছিল, তাহাতে সর্ব্ব বিষয়ের বহু অভিজ্ঞ ও বিশিষ্ট অধ্যাপকমণ্ডলী ছিলেন। যখন প্রস্তাব উঠিল কলেজ সরকারের পরিচালনাধীনে যাইবে তখন আমরা আশা করিয়াছিলাম, এবার বোধহয় সকল বিষয়ে অধিকতর উন্নতি হইবে। কিন্তু যে দিন হইতে উহা সরকারের পরিচালনাধীনে আসিয়াছে, সেই দিন হইতেই বিখ্যাত অধ্যাপকগণকে বয়সের অজুহাতে বিদায় দেওয়া হইতেছে। বর্ত্তমানে অবস্থা এমন পর্য্যায়ে আসিয়াছে যে, অধিকাংশ বিষয়ে অধ্যাপকই নাই। ছাত্রেরা অধিকাংশই দরিদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। তাহাদের অভিভাবকগণ রক্ত-জল-করা অর্থ হইতে কলেজের বেতন ও অন্যান্য দাবি যোগাইয়া চলিতেছেন এবং তাঁহাদের পুত্রকন্যাদের সরকার-পরিচালিত বিশিষ্ট শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত আছেন। কিন্তু কলেজের পরিচালক সমিতি তাঁহাদের রক্ষক অর্থাৎ অভিভাবকদের অভিভাবক সাজিয়া জাতির ভবিষ্যতের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন। আমরা জানিয়া অবাক হইলাম, দীর্ঘ দিন ধরিয়া উক্ত কলেজের সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিভাগে উপযুক্তসংখ্যক অধ্যাপক নাই। ছাত্রদের সম্মুখে পরীক্ষা আসিতেছে, কিন্তু কে পড়াইবে ? তাই ছাত্রগণ আতঙ্কিত হইয়া নিজদিগকে অসহায় বোধ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত প্রতীক ধর্ম্মঘট করিয়াছে। গত ১২ই নবেম্বর তাহারা সহরের প্রধান রাস্তাগুলি পরিভ্রমণ করিয়া ছাত্রদের দাবি জনসমক্ষে ও জেলা-শাসককে জানাইয়াছেন। আমরা এই ব্যাপারে আমাদের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী ছাত্রছাত্রীদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করিতেছি এবং সরকারকে অবিলম্বে ইহার প্রতিকারে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিতেছি।"

এ বিষয়ে শিক্ষা বিভাগ কি বলেন ?

বাংলা পাঠ্যপুস্তক সমস্যা

নূতন স্কুল-বৎসর আরম্ভ হইবার আর বিশেষ বিলম্ব নাই। এই প্রসঙ্গে আমরা একটি বিষয়ের প্রতি জনসাধারণ এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই—তাহা হইল বাংলা ভাষায় লিখিত পাঠ্যপুস্তক সমস্যা। পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন এবং নির্ব্বাচন ব্যাপারে বাংলা দেশে যে দুর্নীতি চলিতেছে, তাহার সহিত বোধ হয় আর কোনরূপ দুর্নীতির তুলনা হয় না। ওই দুর্নীতিতে সরকারী শিক্ষা বিভাগ (যাহার অযোগ্যতা এবং দুর্নীতি বর্ত্তমানে প্রবাদবাক্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে), বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং পুস্তক-প্রকাশক ও গ্রন্থলেখক সকলেই অল্পবিস্তর অংশগ্রহণ করিয়া থাকেন—তবে প্রথমোক্ত তিন দলেরই গুরুত্ব এক্ষেত্রে বেশি (যাঁহারা সত্যকার লেখক তাঁহাদের সহিত এই সকল নোংরামীর কোনই সম্পর্ক নাই)।

অধিকাংশ বিদ্যালয়ে যে সকল পুস্তক পাঠ্য হিসাবে মনোনীত হয় বহুক্ষেত্রেই সেগুলি পাঠের অযোগ্য তথ্য, বানান এবং ব্যাকরণের ভুলে পরিপূর্ণ। সম্প্রতি "যুগান্তর" পত্রিকায় এককলমী একটি বিজ্ঞানের পুস্তক হইতে যে সকল উদ্ধৃতি তুলিয়াছেন, তাহা ভয়াবহ। শিশুশ্রেণী—যেখানে বালকবালিকাদের শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়—সেই সকল শ্রেণীর পুস্তকগুলি সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। বেশি বয়সেও যে আজ অনেকেই সঠিক বানান এবং ভাষা লিখিতে পারে না, হয়ত এই ভ্রান্তিপূর্ণ গোড়াপত্তনই তাহার জন্য দায়ী। উত্তর কলিকাতার একটি শ্রেষ্ঠ শিল্প-শিক্ষায়তনেও এই ধরণের বইই পড়ান হয়। এই অবস্থার সত্বর প্রতিবিধান না করিতে পারিলে জাতির সমূহ বিপদ।

দক্ষিণ-ভারতে নেহরুর অবমাননা

জানুয়ারী মাসের প্রথমদিকে প্রধানমন্ত্রী নেহরু যখন মাদ্রাজ যান তখন একদল লোক তাঁহাকে কৃষ্ণপতাকা প্রদর্শন করে এবং বিমানঘাটি হইতে তিনি যখন রাজভবনে যাইতেছিলেন তখন তাঁহার দলের উপর ইষ্টকবর্ষণ হয়। বহু ইষ্টক কৃষ্ণবর্ণ কাপড়ে আবৃত ছিল। এই ঘটনা সম্পর্কে মাদ্রাজের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী এম, ভক্তবৎসলম্ যাহা বলেন তাহার সারাংশ হইল এইরূপ : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরুর বিরুদ্ধে বিক্ষোভপ্রদর্শনের জন্য দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাঘাম দল মাদ্রাজ শহরে সভা অনুষ্ঠান করিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু সরকার তাহাতে সম্মতি দেন নাই। তবে সরকার কাজাঘাম দলকে কৃষ্ণপতাকা প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের অনুমতি দেন। যেদিন প্রধানমন্ত্রী মাদ্রাজে পদার্পণ করেন সেদিন রাজ্যের বিভিন্ন স্থান হইতে দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাঘাম এবং দ্রাবিড় কাজাঘাম দলের সমর্থকরা দলে দলে মাদ্রাজ শহরে আগমন করে এবং বিমানঘাটি হইতে রাজভবন পর্য্যন্ত রাস্তায় ভিড় করে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

হাওড়ার গুণ্ডামী, পুলিস ও সরকার

হাওড়ায় যে অরাজকতা অনেকদিন ধরিয়াই চলিতেছে সংবাদপত্রগুলির আন্দোলনের পূর্ব্বে সে সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ কিছু করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। হাওড়ার ঘটনাবলী সম্পর্কে যখন সংবাদপত্রে বিশেষভাবে আলোচনা আরম্ভ হইল তখন পশ্চিমবঙ্গ পুলিসের বড়কর্ত্তা শ্রীহীরেন্দ্রনাথ সরকার এক বিবৃতিতে বলিলেন যে, গুণ্ডাদিগকে যাহাতে গ্রেপ্তার না করা হয় তজ্জন্য বিশেষ বিশেষ মহল হইতে পুলিসের উপর চাপ দেওয়া হইতেছে—আংশিকভাবে সেই কারণেই পুলিস যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিতেছে না।

এই অভিযোগ যে অনেকাংশেই সত্য তাহা অবিশ্বাস করিবার

উপায় নাই। বিশেষভাবে একজন সরকারী কর্ম্মচারী যে প্রকাশ্যে এই অভিযোগ করিতে পারিলেন তাহাই এই অভিযোগের সত্যতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, শ্রী সরকারের এই অভিযোগের প্রকাশ্য কোন বিরোধিতা করা হয় নাই। পুলিসের উপর প্রভাব বিস্তার (যাহার সম্পর্কে পুলিসের বড়কর্ত্তা প্রকাশ্যে অভিযোগ করিতে পারেন) করিতে পারে কেবল মুষ্টিমেয় কয়েকজন: অর্থাৎ সরকার—অর্থাৎ মন্ত্রীমহল। অপর কোন মহল হইতে প্রভাবিত হইলে সেই প্রভাব সম্পর্কে পুলিসের কর্ত্তা অভিযোগ করিয়া নিষ্কৃতি পাইতেন না। তাহার জন্য সরকার হইতে তাহাকে অভিযুক্ত করা হইত। যেহেতু সরকারের উচ্চপদস্থমহল হইতেই পুলিসকে প্রভাবান্বিত করিবার চেষ্টা হয় সেহেতু স্বভাবতঃই সরকার শ্রী সরকারের বিরুদ্ধে কোনরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন নাই। দেশের শাসনব্যবস্থা যে ক্রমশঃই ভাঙিয়া পড়িতেছে ইহা তাহার অন্যতম নিদর্শন।

ইন্দোনেশিয়ায় বর্ত্তমানে যে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা রহিয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে সরকারী কর্ম্মচারী (বিশেষতঃ সামরিক বাহিনীর কর্মচারিগণ) কর্ত্তৃক সরকারের প্রকাশ্য বিরোধিতা। সরকারের—অর্থাৎ মন্ত্রীমহলের—দুর্নীতি এবং অন্যান্য দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়াই যে ইন্দোনেশিয়ার সরকারী কর্ম্মচারিগণ নির্ব্বিবাদে ঐরূপ আচরণ করিতে পারিতেছেন তাহা সকলেই জানেন। পশ্চিমবঙ্গের পুলিসের বড়কর্ত্তাও যে প্রকাশ্যে সরকারের পরোক্ষ সমালোচনা করিতে সাহস পাইয়াছেন বর্ত্তমান সরকার অর্থাৎ মন্ত্রীমণ্ডলীর অযোগ্যতাই তাহার কারণ। বলা বাহুল্য, এই অবস্থা দেশের ভবিষ্যতের পক্ষে বিশেষ বিপজ্জনক।

শ্রী সরকারের অভিযোগের গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য আলোচনাকালে পুলিসের দুর্নীতি এবং অকর্ম্মণ্যতারও উল্লেখ করিতে হয়। পুলিসবিভাগে যে ব্যাপক দুর্নীতি এবং অকর্ম্মণ্যতা রহিয়াছে সে সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। বহু অঞ্চলেই গুণ্ডাবাহিনী কোনরূপ রাজনৈতিক সমর্থন ব্যতিরেকেও পুলিসের সস্নেহ আশ্রয় পাইয়া থাকে। ইনস্পেক্টর-জেনারেল যে তাহা জানেন না তাহা নয়। কিন্তু তিনি তাহার উল্লেখ করেন নাই—হয়ত বিভাগীয় কর্ত্তাহিসাবে উহার উল্লেখ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। হাওড়াতেও যে পুলিসের সহিত দুর্বৃত্তদের যোগাযোগ রহিয়াছে একজন সাব-ইনস্পেক্টরের সাসপেনশনের আদেশে তাহার পরোক্ষ পরিচয় মিলে। পুলিসের এই সকল সুবিদিত গাফিলতী সত্ত্বেও যে পুলিসবিভাগ রাজনৈতিক চাপের অভিযোগ নির্ব্বিবাদে করিতে পারিল তাহা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

গ্রামাঞ্চলে জুয়াখেলা

'ভারতী' পত্রিকা এক সম্পাদকীয় আলোচনায় লিখিতেছেন:

"আমাদের এই অঞ্চলের গ্রামগুলির অজন্মার ফলে অর্থ নৈতিক দুরবস্থাও যেমন মজ্জাগত হইয়াছে রকমারী সমাজবিরোধী কার্য্যকলাপও তদনুপাতে বৃদ্ধি পাইতেছে। জুয়াখেলা ইহাদের মধ্যে অন্যতম। সাধারণতঃ চুরি, ডাকাতি, রাহাজানির ঘটনাগুলি পুলিস কর্ত্তৃপক্ষের নজরে আসে এবং প্রতিকার না হইলেও প্রতিরোধের প্রচেষ্টা হয়; কিন্তু জুয়াখেলা লোকচক্ষুর অন্তরালে চলিতে থাকে বলিয়া পুলিস কর্ত্তৃপক্ষ ইহার প্রতিবিধানকল্পে বিশেষ মাথা ঘামান না। রঘুনাথগঞ্জ থানার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে দিন দিন যে ভাবে জুয়াখেলার হিড়িক বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে আমরা উদ্বিগ্ন বোধ না করিয়া পারিতেছি না।

গ্রামাঞ্চলের কিছুসংখ্যক মোড়ল-মাতব্বরেরা ইহার সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জড়িত থাকে। এতদিন নির্দ্দিষ্টসংখ্যক জুয়ারীর গণ্ডীর মধ্যে এই পাপচক্র আবর্ত্তিত হইত কিন্তু বর্ত্তমানে গৃহস্থ ও দিনমজুরেরাও ইহার দুর্নিবার আকর্ষণে মাতিয়া উঠিয়াছে। জুয়ারীর দল বিভিন্ন গ্রাম ও শহরাঞ্চলের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া নিয়মিতভাবে আড্ডা জমাইতেছে বলিয়া শোনা যাইতেছে। অনতিবিলম্বে ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা না হইলে এই অঞ্চলটি জুয়ারী-স্থানে পরিণত হইবে। গ্রামবাসীরা ইহার বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রতিকার করিতে পারে না ফলে এককভাবে যিনিই অগ্রণী হইবেন তাহারই খড়ের চালে আগুন ধরিবে, না হয় মাঠের ফসল মাঠেই মারা যাইবে। গ্রাম্য চৌকীদারেরা গ্রামেরই বাসিন্দা। কাজেই ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের হুকুম থাকা সত্ত্বেও তাহারা এড়াইয়া যাইতে চায় কারণ অনেক ক্ষেত্রে গ্রামের মোড়ল-মাতব্বরেরা জড়িত থাকে। তাহা ছাড়া চৌকিদারদের মুখ বন্ধ করিবার রকমারী ব্যবস্থাও হয়। পুলিস বসাইলেও হয়ত একই অবস্থা হইবে। গ্রামাঞ্চলের মেলাগুলি সাধারণতঃ জুয়ারীদের বড় আড্ডা এবং শোনা যায় মেলার অধিকাংশ খরচই জুয়ারীরা বহন করিয়া থাকে। এইভাবে প্রশ্রয় পাইয়া জুয়াখেলা ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছে ও জুয়ারীরা বেপরোয়া হইয়াছে। গ্রামের মধ্যে দলাদলি ও শত্রুতার ফলে সমাজ-বিরোধীরা মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে এবং গ্রামাঞ্চলের মানুষের ধন-প্রাণের নিরাপত্তা রীতিমত বিঘ্নিত হইতেছে। সম্প্রতি স্থানীয় পুলিস কর্ত্তৃপক্ষ এই অঞ্চলের দাগী চোর-ডাকাতদের সায়েস্তা করার জন্য ব্যাপক অভিযান সুরু করিয়াছেন বলিয়া শোনা যাইতেছে। আমরা আশা করি পুলিস কর্ত্তৃপক্ষ অনতিবিলম্বে ইউনিয়ন বোর্ড ও গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় জুয়াখেলা রোধ করিতে পারিলে এই অঞ্চলের বিপন্ন গ্রামগুলির উপকার সাধিত হইবে।"

ইহাতে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস ইউনিয়ন বোর্ড ইত্যাদিতে কর্ম্মঠ সৎলোক থাকিলে এইরূপ অবস্থা হইতে পারে না।

মোটর দুর্ঘটনা

কলিকাতা এবং কলিকাতার বাহিরে যে সকল স্থানে মোটরগাড়ী চলাচল করে প্রায় সর্ব্বত্রই মোটর দুর্ঘটনার সংখ্যা বিশেষরূপে

বৃদ্ধি পাইয়াছে। মোটর দুর্ঘটনার কারণ সর্ব্বত্রই প্রায় একই। আমরা অনেকবার এ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি। মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর-লালগোলা লিঙ্ক রোডে ঘন ঘন কয়েকটি মোটর দুর্ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া সাপ্তাহিক "ভারতী" পত্রিকা এইপ্রকার দুর্ঘটনা প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :

"বর্ত্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে পথঘাট উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে ও মানুষের প্রয়োজনের তাগিদে মোটরযান চলাচল অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তাহার ফলে পথচারীর বিপদাশঙ্কাও যেরূপ অনিবার্য্যরূপে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে দুর্ঘটনা প্রতিরোধকল্পে সম্ভাব্য সকলপ্রকার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা যে একান্ত প্রয়োজন এ সম্বন্ধে দ্বিমত থাকিতে পারে না।

এখন প্রশ্ন এই যে, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে সরকারের যে সব আইন-কানুন আছে তাহা যথাযথ ভাবে প্রতিপালিত হইতেছে কিনা তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবার পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা আছে কিনা? প্রায়ই দেখা যায় এই সব পথে অতিকায় লরীগুলি পর্ব্বতপ্রমাণ মাল লইয়া যাতায়াত করে। তা ছাড়া অধিকবার 'ক্ষেপ' দিবার উদ্দেশ্যে অনেক সময়েই ট্যাক্সিগুলি ঘণ্টায় ৬০ থেকে ৭০ মাইলেরও অধিক গতিবেগে যাতায়াত করে। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব যাহাদের উপর ন্যস্ত তাহাদের চোখের সামনে এই সমস্ত ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটিতে থাকিলেও দুঃখের বিষয় ইহার কোন প্রতিকার হয় না। আজ পর্য্যন্ত এই পথে উপরোক্ত ধরণের অপরাধে কাহাকেও দণ্ডিত করা হইয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই; তবে কি ধরিয়া লইতে হইবে এলেকাটি অরণ্য-আইনের দ্বারা শাসিত?

বর্ত্তমানে মোটরচালক শ্রেণীর শুভবুদ্ধির উপর পথচারীর ভাগ্য ছাড়িয়া দিলে বিপদ-আপদের আশঙ্কা মন্দীভূত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই ইহা বলা বাহুল্য। ইহাদের মধ্যে অনেকেই অল্পদিন শিক্ষানবিশী করিয়াই কোনরূপে একটি চালকের লাইসেন্স সংগ্রহ করিয়া বসেন এবং অনেকেরই আবার শিক্ষা-দীক্ষা ও দায়িত্ববোধ এত কম যে, তাহাদের কাহারও উপরই নির্ভর করাও চলে না। কাজেই এ অবস্থায় সরকারী নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাকে কঠোরতর করা ছাড়া আমাদের মনে হয় কোন গত্যন্তর নাই। ইহার ফলে হয়ত বা ব্যক্তিবিশেষের কিছু অসুবিধা হইতে পারে কিন্তু জনসাধারণের সামগ্রিক নিরাপত্তার কথা চিন্তা করিলে ইহা সর্ব্বতোভাবে সমর্থনযোগ্য। দুর্ঘটনাগুলির কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, গাড়ীগুলির অস্বাভাবিক গতিবেগই ইহার জন্য মুখ্যতঃ দায়ী। উচ্চগতিসম্পন্ন গাড়ীর "ষ্টিয়ারিং" বা "ব্রেক" নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য কাজেই সর্ব্বপ্রযত্নে গাড়ীর গতিবেগ ও তৎসঙ্গে "ওভারলোডিং" (অতিরিক্ত বোঝাই) সংযত করা একান্ত প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি।

এই প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য এই যে, এই রাস্তার লোকালয়গুলির সন্নিকটে এবং বিশিষ্ট বিশিষ্ট মোড়গুলিতে "স্পীড লিমিট" প্ল্যাকার্ড টাঙাইয়া দিয়া চালকগণকে সতর্ক করা দরকার। তা ছাড়া জঙ্গীপুর ও লালগোলায় পুলিস কর্ত্তৃক যদি মোটরগুলি ষ্টাণ্ড হইতে ছাড়িবার ও পৌছিবার সময় রেকর্ড করার বন্দোবস্ত করা হয় তাহা হইলেও মধ্যবর্ত্তী পথে গতিবেগ কতকটা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। মোটরের উপর পুলিস কর্ত্তৃপক্ষ কতকটা সজাগ হইলে এবং মাঝে মাঝে চেকিং-এর ব্যবস্থা করিলে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা কমিতে পারে বলিয়া আমাদের ধারণা। আমরা এ বিষয়ে ঊর্দ্ধতন পুলিস কর্ত্তৃপক্ষ ও বিশেষ করিয়া জেলা-শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।"

ত্রিপুরার সমস্যা

ত্রিপুরা রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে একটি ইউনিয়ন টেরিটরি। ত্রিপুরার নানাবিধ রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া সম্প্রতি আগরতলা হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "সেবক" পত্রিকা কয়েক সপ্তাহ যাবত কয়েকটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। "সেবক" পত্রিকা কংগ্রেসের সহিত যুক্ত—সেইদিক হইতে ত্রিপুরার সমস্যাবলী সম্পর্কে সেবক যে সকল মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বিশেষ ভাবে তাৎপর্য্যপূর্ণ।

ইউনিয়ন টেরিটরিগুলিতে কোন বিধানসভা নাই—ত্রিপুরাতেও নাই। ত্রিপুরার কর্ম্মকর্ত্তা হইলেন এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর (যদিও প্রাক্তন চীফ কমিশনার নাম এখনও বদলান হয় নাই), তাঁহার কোন কার্য্যের জন্যই স্থানীয় জনসাধারণ তাঁহার নিকট কৈফিয়ত দাবী করিতে পারেন না, কোন বিষয়েই তিনি স্থানীয় জনসাধারণের নিকট দায়ী নহেন। তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিকট দায়ী। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী—অর্থাৎ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মারফত তিনি পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী—ইহাই হইল তত্ত্বগত কথা। কিন্তু বাস্তবে এই দায়িত্ব কিরূপে প্রতিপালিত হইতেছে?

"সেবক" লিখিতেছেন :

"পার্লামেণ্ট ভারতে সর্ব্বোচ্চ পরিষদ এবং দেশের শাসনকার্য্য পরিচালনার নীতি নির্দ্ধারণ করাই পার্লামেণ্টের প্রধান কাজ। বৎসরের ৬ মাস পার্লামেণ্টের অধিবেশন চলে। ৬ মাসের মধ্যে সাড়ে পাঁচ মাস কালই উচ্চতম বিষয়বস্তু লইয়া আলোচনা চলে, ত্রিপুরার মত ক্ষুদ্র অঞ্চলের শত সহস্র কথা থাকিলেও আলোচনার সুযোগ দুর্লভ। পার্লামেণ্টের সদস্যসংখ্যা সাত শতাধিক। সকলেই সমগ্র ভারতের নীতি নির্দ্ধারণ লইয়া ব্যস্ত, ক্ষুদ্র ত্রিপুরায় কি ঘটিল বা কি হইবে তাহা লইয়া ভাবিবার সময় বা ধৈর্য্য থাকিবার কথা নহে। কতকগুলি প্রশ্ন করা এবং সুমধুর জবাব (অনেক ক্ষেত্রেই দেওয়া হয় না) পাওয়া ব্যতীত পার্লামেণ্টে ত্রিপুরার অধিবাসীর কোন অভিযোগের প্রতিকার হয় নাই এবং হইতেও পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, ত্রিপুরায় আইনসভা না থাকায় পার্লামেণ্ট ত্রিপুরার জন্য আইন প্রণয়নের জন্য দায়ী। "গ" শ্রেণী রাজ্য হিসাবে ৭ বৎসর এবং ইউনিয়ন টেরিটরির রূপে ১ বৎসর, সর্ব্বমোট ৮ বৎসরে দেখা গিয়াছে পার্লামেণ্ট ত্রিপুরার প্রয়োজনে একটি আইনও বাতিল বা প্রণয়ন করিতে

পারেন নাই যদিও বহু বেআইনী আইনের খড়্গ ত্রিপুরাবাসীর মাথার উপর দশ বৎসর যাবত ঝুলিতেছে। স্থানীয় শাসন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য, স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা সমভাবে ভোগ করার জন্য নিজস্ব একটি আইনসভা বা বিধানসভা না থাকায় ত্রিপুরার অগ্রগতি আজ রুদ্ধ।"

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যপরিস্থিতি

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যপরিস্থিতি বিশেষ সঙ্কটজনক অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। এখন দেশব্যাপী শস্যাহরণের সময়—কিন্তু চাউলের মূল্য কলিকাতায় এখনও সর্ব্বনিম্ন ২৮।২৯ টাকা প্রতি মণ। ইতি-পূর্ব্বে কলিকাতায় চাউলের মূল্য এইরূপ অস্বাভাবিক পর্য্যায়ে উঠে নাই।

শহরে যখন চাউলের এইরূপ অগ্নিমূল্য—তখন সরকারের কর্ডন নীতির ফলে গ্রামাঞ্চলে ধানের দর ক্রমশঃ নামিয়া যাইতেছে। শস্য উঠার পর কৃষকগণ সকলেই এখন ধান বিক্রয়ের জন্য উন্মুখ। ধান্যের মূল্য নিম্নগামী হওয়ায় চাষীদের অধিকাংশই ধানের ন্যায্য মূল্য পাইতেছেন না। কিন্তু চাষীদের ধানের মূল্যবৃদ্ধির জন্য অপেক্ষা করিবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং তাহারা নিম্নমূল্যেই ধান বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য হইতেছেন। ফড়িয়ারা এই ধান নিম্নমূল্যে ক্রয় করিয়া সহরে অগ্নিমূল্যে বিক্রয় করিতেছে অথবা মজুত করিয়া রাখিতেছে। চার মাস পরে ঐ চাষীদের নিকটই তাহারা ঐ ধান দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রয় করিবে। এই প্রসঙ্গে সাপ্তাহিক "বর্দ্ধমানবাণী"র মন্তব্য আমরা নিম্নে তুলিয়া দিলাম:

"চাউড়ী বাউড়ীর সময় ধান্যের মূল্য হ্রাস হয়—ইহা সকলেরই জানা আছে। কিন্তু এখনই যে ভাবে ধান্যের মূল্য হ্রাস পাইয়াছে তাহাতে দরিদ্র কৃষককুল আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। এদিকে দৈনিক সংবাদপত্রে জানা যাইতেছে যে, চাউলের অভাব আছে—তাহা পূরণ করিতে বেগ পাইতে হইবে। কাজেই ধান্যের মূল্য-বৃদ্ধি স্বাভাবিক ভাবেই ঘটিবার কথা। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে মূল্য-হ্রাস এক অস্বাভাবিক ঘটনা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সরকার ধান্য সংগ্রহের জন্য কোন নীতি গ্রহণ করিবেন তাহা এখনও সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয় নাই। অথচ অপর দিকে ধান্যমূল্যের আনুপাতিক হারে চাউলের মূল্য মোটেই হ্রাস পায় নাই। ফলে ধান্য যাহারা বিক্রয় করে এবং যাহারা চাউল ক্রয় করে তাহারা একই অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে। এই অসাম্য অবস্থার উপর সরকারের বিশেষ করিয়া স্থানীয় শাসকগোষ্ঠীর দৃষ্টি কেন পতিত হয় নাই তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না। ব্যবসায়ী মহল কি ইহার পূর্ণ সুযোগ লইতেছে না? দশ-এগারো টাকা মণ দরে ধান্য ক্রয় করিয়া ২৪।২৫ টাকা দরে চাউল বিক্রয় সর্ব্বপ্রথম এ বৎসরই দেখা যাইতেছে। সরকার সত্বর প্রতিকার-ব্যবস্থা না করিলে দরিদ্র চাষী এবং দরিদ্র শহরবাসীর অবস্থা কোন পর্য্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইবে তাহা আমরা ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছি না। এই অসম অবস্থার অবসান ঘটাইতে হয় সরকারকে সরাসরি সমগ্র ধান্য ক্রয় করিবার একচেটিয়া ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে অথবা ব্যবসায়ীদের কঠোর হস্তে দমন করিতে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে।"

পশ্চিমবঙ্গে অরাজক

পশ্চিমবঙ্গে শান্তিশৃঙ্খলা ও দেশরক্ষা যে অযোগ্য লোকের হাতে ন্যস্ত হইয়াছে তাহার প্রমাণ শুধু কলিকাতা, হাওড়া ও মফঃস্বলের গুণ্ডারাজেই আবদ্ধ নহে। দেশের সীমান্তের অবস্থা কি তাহাও আমাদের জানা প্রয়োজন। সেই জন্য 'আনন্দবাজার পত্রিকা' হইতে নিম্নস্থ দুইটি সংবাদ উদ্ধৃত হইল:

"মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, রঘুনাথগঞ্জ থানার নিকটবর্ত্তী একটি নূতন চর লইয়া পাক-ভারত বিরোধ উদ্বেগের কারণ হইয়া পড়িয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে যে পিরোজ-পুর-বাজিতপুর চর লইয়া বিরোধ দেখা দেয়, তাহার নিষ্পত্তি না হইতেই দেড়শত পাক পুলিশ পিরোজপুর-বাজিতপুর চরে ঘাটি গাড়িয়াছে। সরেজমিনে সকল অবস্থা পর্য্যালোচনার জন্য ভারত-অন্তর্গত মুর্শিদাবাদের ও পাকিস্থান-অন্তর্গত রাজসাহীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদ্বয় বুধবার দ্বিপ্রহরে এক বৈঠকে মিলিত হইতেছেন। মুর্শিদাবাদের পদস্থ পুলিশ কর্ম্মচারিগণও ম্যাজিষ্ট্রেটদ্বয়ের সম্মেলনস্থল অভিমুখে রওনা হইয়া গিয়াছেন বলিয়া খবর পাওয়া গেল।

জানা গেল, গত সোমবার ৫ই জানুয়ারী ভোর ৬টায় রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত জয়রামপুর সীমান্ত ফাঁড়ির টহলদার পুলিশ যখন পিরোজপুর-বাজিতপুর চরের নিকটবর্ত্তী এক নূতন চরে টহল দিয়া ফিরিতেছিল তখন পাক পুলিশবাহিনীর একজন হাবিলদারের নেতৃত্বে বারজন পাক কনেষ্টবল পিরোজপুর-বাজিতপুর চর অতিক্রম করিয়া ঐ নূতন চরে অনধিকার প্রবেশ করে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পিরোজপুর-বাজিতপুর চর লইয়া ইতঃপূর্ব্বে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে স্থির হয় যে, চূড়ান্ত মীমাংসা সাপেক্ষে কোন পক্ষই স্ব স্ব সীমান্ত হইতে ঐ চরে ৫০ গজের মধ্যে প্রবেশ করিবে না এবং ক্ষেতের ফসল ক্ষেতেই থাকিবে।

এই অবস্থায় নূতন চরে পাক পুলিশদলের অনধিকার প্রবেশে ভারতীয় টহলদার পুলিশ আপত্তি জানায় এবং পাক পুলিশদলকে তাড়া করিয়া যায়। পাকিস্থান-অন্তর্গত রাজসাহী জেলার নবাব-গঞ্জের এস-ডি-পি'ও স্বয়ং ঘটনাস্থলে হাজির হন এবং সমগ্র চরটি পাকিস্থানভুক্ত বলিয়া দাবী করিয়া ভারতীয় টহলদার পুলিশকে তাড়া করেন। কেবল তাহাই নহে, নূতন চরে যে সরিষার ক্ষেত আছে, তাহা পরিদর্শনের জন্য জেদ প্রকাশ করেন। ভারতীয় টহলদার পুলিশ প্রবল আপত্তি করিলে তিনি চর ছাড়িয়া যান।

রঘুনাথগঞ্জের সার্কেল ইনস্পেক্টর খবর পাইয়া সদলে ঘটনা-স্থলে উপস্থিত হন। ইহা দেখিয়া পাক পুলিশদল পশ্চাদপসরণ

করিয়া পিরোজপুর-বাজিতপুর চরের কাশবনে ঘাটি গাড়ে এবং পাক পুলিশের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়। রাত্রিভাগে পাকবাহিনী বাজিতপুরের চরে ছাউনী ফেলে এবং অন্ধকারের আড়ালে সেখানে টহল দিয়া ফিরে। শুধু তাহাই নহে, সর্ব্বতোভাবে ভারত ইউনিয়ন অন্তর্ভুক্ত নূতন চরেও তাহারা টহল দিতে আরম্ভ করে।

মুর্শিদাবাদের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট রাজসাহীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এই সম্পর্কে একটি কড়া অভিযোগপত্র প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়াও জানা গেল।

পশ্চিম বাঙ্গলার নদীয়া জেলা সীমান্ত বরাবর বিবিধ পণ্যের চোরাই-কারবারে ১৯৫৭ সনের সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত চার মাসে ২৫০ জন ধরা পড়িয়াছে। কত ধরা পড়ে নাই, তাহা বলা শক্ত।

১৯৫৬ সনের তুলনায় সাধারণ চোরাই-কারবারে কিছু 'মন্দা' দেখা দিলেও সোনা রূপার কারবারে বেশ 'তেজী' চলিতেছে বলিয়া মনে হয়। এই সময়ে দুই শতাধিক তোলা সোনা ও পাঁচ সহস্রাধিক তোলা রূপা উদ্ধার করা গিয়াছে।

১৬২ মাইলব্যাপী সীমান্ত বরাবর চায়ের দোকানের সারি; সীমান্ত আনাগোনায় চায়ের তেষ্টায় এই দোকানে দুই রাষ্ট্র প্রতিবেশীদের বড় ভীড়। পুলিসের নাকে দুর্গন্ধ। চায়ের দোকানের মেজে খুঁড়িয়া পাওয়া যায় এক পাতালপুরী—সেখানে স্তরে স্তরে সাজানো সুপারী, খয়ের, সাগু, নারিকেলের দড়ি ইত্যাদি। চাপরা থানার বরণডুগিয়া গ্রামে এই চায়ের দোকান।

এমনি আরও অনেক সীমান্ত গ্রামে। পুলিস, জাতীয় রক্ষীদল, কাষ্টমস ও গ্রাম্য প্রতিরোধবাহিনীর সমবেত চেষ্টায় সাধারণ চোরাই-কারবারে মন্দা দেখা দিয়াছে। ১৯৫৬ সনে প্রতি মাসে চোরাই-কারবারের আর্থিক পরিমাণ ছিল লক্ষ টাকা; ১৯৫৭ সনে উহার মাসিক পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩০,০০০৲ টাকা।

প্রকাশ, পশ্চিম বাংলার ইনস্পেক্টার-জেনারেল অব পুলিস এই মর্ম্মে পুলিস সাহেবদের নিকট একটি ইস্তাহার জারী করিয়াছেন যে, তাঁহারা যেন চোরাই-কারবারকে এক "জাতীয় সমস্যা" বলিয়া গণ্য করেন। দেশে খাদ্যাভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহারা যেন পাচার প্রতিরোধ-ব্যবস্থা কঠোরতর করেন এবং সমাজবিরোধী লোকদের সম্পর্কে কোন শৈথিল্য প্রকাশ না করেন।

কিন্তু ভাবনা এই, এদিকে এত সতর্কতা সত্ত্বেও কোন কোন জেলায় চাউল সংগ্রহের কাজে নিয়োগের জন্য সীমান্ত এলাকা হইতে অনেক পুলিস সরাইয়া আনা হইতেছে বলিয়া জানা গেল। ইহাতে সমগ্র চোরাই-কারবার নিবারণ ব্যবস্থাতেই শৈথিল্য দেখা দিতে পারে।

চোরাই-কারবারীদের চেষ্টা কতকাংশে অবশ্য ব্যর্থ হইয়াছে, কিন্তু সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ধরা না পড়িলে ৬০,০০০৲ টাকা মূল্যের সরিষার তৈল, লবণ, বিড়ির পাতা, কাপড়, সিল্ক, ব্যাটারী, ব্লেড, ঔষধ, চন্দনকাঠ, সিন্দুর, যন্ত্র-সরঞ্জাম, পেরেক ইত্যাদি খোয়া যাইত।

সোনা রূপা আনিবার রকম শুনিলে লজ্জা পাইতে হয়। শরীরের এমন একটি জায়গায় তাহা বাহিত হয় যে, নামোচ্চারণ করা যায় না। কিন্তু কারবারটা চোরাই; সুতরাং চোরা পথটাও অপ্রকাশ্য; সহজে আবিষ্কার করা কঠিন। আবিষ্কার করা গেলে ৩৬,০০০৲ টাকার সোনাও পাওয়া যায়।

বানপুর কাষ্টমসের বড় দারোগা পুলিসের ওয়াচার কনষ্টেবলদের এই ব্যাপারে সতর্ক করিয়া দেন, কয়েকজন সন্দেহভাজনের ফোটোও দেখাইয়া দেন।

কলিকাতা কর্পোরেশন

পশ্চিমবঙ্গের দ্রুত অবনতির আর একটি চিত্র নিম্নে দেওয়া গেল:

শুক্রবার কলিকাতা কর্পোরেশন সভায় মেয়র ডাঃ ত্রিগুণা সেন এক বিবৃতি প্রসঙ্গে মিউনিসিপ্যাল আদালতসমূহে বিপুল সংখ্যায় বিচারাধীন মামলার ভীড় জমিয়া যাওয়া, নগরীর বিভিন্ন স্থানে এলোমেলোভাবে সরকারী কলোনীর উদ্ভব, নগরীর হাসপাতাল-সমূহের অবস্থা সম্পর্কে তদন্তের জন্য কর্পোরেশনের ষ্ট্যাণ্ডিং হেলথ কমিটি কর্ত্তৃক গঠিত সাব-কমিটির নিকট প্রধান প্রধান কয়েকটি হাসপাতালের পক্ষ হইতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করিতে অস্বীকৃতি প্রভৃতি বিবিধ সমস্যার উল্লেখ করেন।

মেয়র মিউনিসিপ্যাল আদালতগুলিতে বিচারাধীন মামলার ভীড় জমিয়া যাওয়া সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে গিয়া তাঁহাদের অনেক সময় পুলিসের শরণাপন্ন হইতে হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় নানা কারণে সকল সময় পুলিসের সাহায্য পর্য্যাপ্ত অথবা সন্তোষজনক হয় না। মেয়র বলেন, এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, প্রসিকিউটিং অফিসার এবং সংশ্লিষ্ট পৌরসভা কর্ম্মচারীদের আদালতে অনুপস্থিতিই এই প্রকার বিলম্বের প্রধান কারণ। এমতাবস্থায় ম্যাজিষ্ট্রেটকে শুনানী দিনের পর দিন মুলতুবী রাখিতে হয়। ইহা অত্যন্ত গুরুতর বিষয়। পৌরসভার কর্ম্মচারীরাই বা কেন পুনঃপুনঃ তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদনে অবহেলা করিবেন? মেয়র কতগুলি মামলা বিচারাধীন আছে এবং উহাদের নিষ্পত্তির ব্যাপারে বিলম্বের কারণ প্রভৃতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া আগামী একপক্ষ কালের মধ্যে এই ব্যাপারে অন্ততঃপক্ষে একটি অন্তর্ব্বর্ত্তিকালীন রিপোর্ট কর্পোরেশনের নিকট পেশ করিবার প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, যে সকল কর্ম্মচারী স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদনে পরাঙ্মুখ হইবেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

মেয়র বলেন, শহরের বিভিন্ন স্থানে নিতান্ত এলোমেলোভাবে সরকারী কলোনী গজাইয়া উঠিতেছে। এইগুলি সরকারী সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হওয়ায় প্রস্তাবিত কলোনীর নক্সা বা তথায় নির্ম্মিত

ভবনাদি সম্পর্কে কর্পোরেশনের মঞ্জুরী লওয়ার প্রয়োজন হয় না। প্রকৃতপক্ষে কোন নিয়মের তোয়াক্কা না রাখিয়া নির্ম্মিত এই উপনিবেশগুলিকে "নূতন বস্তী এলাকা" বলা যায়। রাজ্য সরকারের উচ্চতর অধিকারের নামে সকল প্রকার আইন-কানুনবিধি অমান্য করা হইবে, ইহা কেমন কথা? কর্পোরেশনকেই বা কিরূপ স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা অর্পণ করা হইল তাহাও তিনি বুঝিতে পারেন না। তাঁহার মতে কর্পোরেশনের পক্ষে এ বিষয়ে সরকারের সহিত আলোচনা করা উচিত।

মেয়র বলেন যে, টালীগঞ্জ এলাকার উদ্বাস্তু কুটীরসমূহসহ সকল সম্পত্তি সম্পর্কে মূল্য নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন। উদ্বাস্তু কুটীরের অধিকারীদিগকেও ধার্য্য রেটের অংশ দিতে হইবে। তিনি ধার্য্য করের অর্দ্ধাংশ জমি ও তথায় নির্ম্মিত বাড়ীর অধিকারীর নিকট হইতে এবং অর্দ্ধাংশ জমিদার অথবা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে আদায় করিবার প্রস্তাব করেন। এতৎপ্রসঙ্গে তিনি জানান যে, সরকার টালীগঞ্জ এলাকায় অবস্থিত উদ্বাস্তু কলোনীগুলি যথসম্ভব বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

ডাঃ সেন জানান যে, নগরীর হাসপাতালসমূহের অবস্থা সম্পর্কে তদন্তের জন্য গঠিত সাব-কমিটির নিকট কয়েকটি প্রধান প্রধান হাসপাতাল কোন তথ্য সরবরাহ করিতে অস্বীকার করায় উক্ত সাব-কমিটির কাজ চালান প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বিভিন্ন হাসপাতালের পরিচালক-সংস্থায় কর্পোরেশনের যে সকল প্রতিনিধি আছেন তাঁহাদের এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া একপক্ষ কালের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করার জন্য অনুরোধ জানান।"

কাশ্মীর

শেখ আবদুল্লাকে ত ছাড়া হইয়াছে। কিন্তু কাশ্মীরে পাকিস্থানী ষড়যন্ত্র উত্তরোত্তর বাড়িতেছে।

"শ্রীনগর, ২৯শে ডিসেম্বর—কাশ্মীর পুলিস সন্ধান পাইয়াছে যে, পাকিস্থান কাশ্মীরে নূতন করিয়া একদফা অন্তর্ঘাতী কার্য্য চালাইবার পরিকল্পনা করিয়াছে।

যুদ্ধবিরতি সীমারেখা পার হইয়া ভারতে প্রবেশ করিবার অপরাধে কাশ্মীর পুলিস হবিবুল্লা এবং আজিজ জোনলো নামক দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

প্রকাশ, তাহাদের নিকট হইতে জানা গিয়াছে যে, সেতু উড়াইয়া দিবার জন্য এবং সরকারী আপিস, মসজিদ এবং মন্দির, পোড়াইবার জন্য তাহাদের বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। পুলিসকে তাহারা জানাইয়াছে যে পাক সীমান্ত নিরাপত্তা রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত সাজোয়াল খান যুদ্ধবিরতি সীমারেখার অত্যন্ত নিকটে মৌরী ময়দানে তাঁহার হেড কোয়ার্টার স্থাপন করিয়াছেন। তিনি সেখানে প্রভূত পরিমাণ বোমা ও অন্যান্য বিস্ফোরক দ্রব্য মজুত করিয়াছেন। তিনি পাক অধিকৃত কাশ্মীরের অধিবাসীদের মধ্যে উহা বিতরণ করিতেছেন এবং জোর করিয়া তাহাদের যুদ্ধবিরতি সীমারেখা পার হইয়া কাশ্মীরে আসিয়া অন্তর্ঘাতী কাজ চালাইবার জন্য পাঠাইতেছেন।

প্রকাশ, ইহারা আরও জানাইয়াছে যে, পাক অধিকৃত কাশ্মীরের যে সমস্ত অধিবাসীদের আত্মীয়স্বজন ভারতে আছে তাহাদের একটা তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। পাক গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গঠিত সরকারী এজেন্সীতে ইহাদের ভুক্ত করিয়া তাহাদের অন্তর্ঘাতী কার্য্যকলাপ শিক্ষা দিয়া আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার অছিলায় ভারতে প্রেরণ করাই ইহার উদ্দেশ্য। এই অন্তর্ঘাতী কার্য্যকলাপে অংশ গ্রহণে অসম্মত হইয়া কারাভোগ করিতেছে, এরূপও বহু ব্যক্তি আছে বলিয়া ইহারা জানাইয়াছে। গত সপ্তাহের প্রথম দিকে কাশ্মীর পুলিশ উরিতে তিন জন পাকিস্থানী অন্তর্ঘাতককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। গত ৯ই ডিসেম্বর তাহারা সেখানে এক বোমা বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।"

নিখিল-ভারত মেডিক্যাল সম্মেলন

নিখিল-ভারত মেডিক্যাল সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন সম্প্রতি বাঙ্গালোরে হইয়া গিয়াছে। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হইল:

"বাঙ্গালোর, ২৬শে ডিসেম্বর—অদ্য এখানে নিখিল-ভারত মেডিক্যাল সম্মেলনের ৩৪শ অধিবেশন হয়। মহীশূরের রাজ্যপাল শ্রীজয়চামরাজা ওয়াদিয়া সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এবং সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন ডাঃ ডি. ভি. ভেঙ্কাপ্পা। সম্মেলনে প্রায় চারি শত প্রতিনিধি যোগদান করেন।

ডাঃ ভেঙ্কাপ্পা তাঁহার ভাষণে সকল রাজ্য সরকারকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাঁহাদের চিকিৎসানীতি ঘোষণা করিয়া জনগণের চিকিৎসা-সাহায্য করিতে আবেদন করেন এবং বলেন যে, তাঁহারা যদি কোন সুনির্দিষ্ট নীতি ও কর্ম্মতালিকা গ্রহণ না করেন তাহা হইলে জনগণের চিকিৎসা-সাহায্য ব্যবস্থা স্বপ্নই থাকিয়া যাইবে।

ডাঃ ভেঙ্কাপ্পা বলেন যে, নূতন নীতি নির্দ্ধারণকালে চিকিৎসা-সংক্রান্ত সাহায্য দানের বর্ত্তমান ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া সকল রাজ্যের জন্য একইরূপ ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। সে ব্যবস্থায় যেন যে সকল চিকিৎসককে পাওয়া যাইবে তাঁহাদের সকলকেই নিয়োগ করা সম্ভব হয় এবং হাসপাতালের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায়। ডাঃ ভেঙ্কাপ্পা কমপক্ষে প্রতি পাঁচ হাজার লোকের জন্য একটি করিয়া হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছেন।

ডাঃ ভেঙ্কাপ্পা বলেন যে, এই রকম কোন নীতি যদি গ্রহণ করা না হয় এবং আগামী দশ বৎসরের মধ্যেই এতদসংক্রান্ত একটি পরিকল্পনা যদি রূপায়িত করা না হয়, তবে জনগণকে সত্যকারের চিকিৎসা-সাহায্য দানের ব্যাপারটি অসমাপ্ত এক সরকারী প্রতিশ্রুতি হিসাবেই রহিয়া যাইবে। জনগণ যে আশার মুখ চাহিয়া আছে, তাহা কখনই সফল হইবে না।"

মকর-সংক্রান্তি

শ্রীসুখময় সরকার

বৈচিত্র্য ব্যতিরেকে মানুষ বাঁচিতে পারে না। জীবনে বৈচিত্র্যসৃষ্টির জন্যই নানাবিধ পূজা-পার্বণের বিধান হইয়াছে। হিন্দুর প্রত্যেক পূজা-পার্বণ বিচিত্র। একটি পর্বের সহিত অন্য পর্বের সাদৃশ্য নাই। স্মৃতির বিধান, স্থানীয় লোকাচার, আর্তব পরিবেশ ইত্যাদি মিলিয়া এক-একটি পর্বে যে বৈচিত্র্যের সমাবেশ হয় তাহাতে মানুষের ইন্দ্রিয়-গ্রাম পরিতৃপ্ত হয়, চিত্তবৃত্তি বিকাশপ্রাপ্ত হয়, প্রিয়-সমাগমে হৃদয় উল্লসিত হয়। আমরা যাহাকে 'শিক্ষা' বলি, তাহা প্রকৃতপক্ষে চিত্তবৃত্তির অনুশীলন মাত্র। পূজা-পার্বণের মাধ্যমে চিত্তবৃত্তির অনুশীলন পর্যাপ্ত পরিমাণেই হইয়া থাকে। সুতরাং পূজা পার্বণগুলি শিক্ষারও অপরিহার্য অঙ্গ। বিপুল বৈচিত্র্যময় এবং অশেষ কল্যাণকর এইরূপ বহু-সংখ্যক পূজা-পার্বণের মধ্যে এই প্রকরণে অদ্য আমরা 'মকর-সংক্রান্তি' আলোচনা করিয়া তাহার উৎপত্তি ও প্রাচীনতা চিন্তা করিব।

'মকর-সংক্রান্তি' বলিতে আমরা সৌর পৌষের শেষ দিবস বুঝি। এইদিনে বঙ্গদেশে গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমে যে স্নান-যাত্রার মেলা বসে, তাহা সমগ্র ভারতের একটি উল্লেখযোগ্য উৎসব। ভারতের নানা প্রদেশ হইতে আগত অগণিত পুণ্যার্থী নরনারী সেদিন গঙ্গা-সাগরে স্নান ও প্রার্থীদিগকে দান করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করে। প্রয়াগে ত্রিবেণী-সঙ্গমে, হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে, অজয়তটে জয়দেবের জন্মস্থান কেন্দুবিল্ব গ্রামে, পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর ঘাটে ঘাটে সেদিন স্নান-যাত্রার মেলা। যেখানে গঙ্গা নাই সেখানে অন্য স্রোতস্বিনীতে, যেখানে নদী দূরবর্তী সেখানে দীঘি ও সরোবরে স্নান করিয়া লোকে পবিত্র হয় এবং দান করিয়া পুণ্যার্জন করে। মকর-সংক্রান্তির মেলা যে কত গ্রামে হয় তাহার সংখ্যা নির্ণয় দুরূহ ব্যাপার। এখানে আমি আমাদের গ্রামের পৌষ-সংক্রান্তির মেলা বর্ণনা করিতেছি।

গ্রামের নাম দুলালপুর। পার্শ্ববর্তী দেউলী গ্রামটি ইহার সহিত এতই সংলগ্ন যে, পৃথক গ্রাম বলিয়া চিনিবার উপায় নাই। দুই গ্রামের উত্তর প্রান্তে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র, তারপর পূর্ববাহিনী শিলাবতী নদী। নদীতীরে প্রায় চল্লিশ বিঘা ভূমির উপর একটি বিরল-সন্নিবিষ্ট পলাশের উপবন। উপবনের একপ্রান্তে নদীর স্রোতের অতি সন্নিহিত একটি উচ্চ প্রস্তরবেদীতে 'মাকড়া-সিনী' দেবীর স্থান। বলা বাহুল্য, ইনি অনার্য দেবতা। কেহ কেহ ইঁহার মকরেশ্বরী নামকরণ করিয়া আর্যত্ব আরোপ করিতে প্রয়াসী হন। কিন্তু 'মাকড়া' মকর নহে, মর্কট (বানর) এবং 'সিনী' শব্দেই দেবীর অনার্যত্ব প্রকট। দেবীর মূর্তি নাই, একখণ্ড ভগ্ন শিলায় তাঁহার পূজা হয়। শিলাটি অতি প্রাচীন কোন পাষাণ-প্রতিমার ভগ্নাংশ বলিয়া মনে হয়, সে প্রতিমা এখন দুর্লক্ষ্য। আর, সে প্রতিমা যে কেহ মাকড়া-সিনীর প্রতিমা বলিয়া নির্মাণ করিয়াছিল, তাহাও নহে। দেবীর পূজার অর্ঘ্য-স্বরূপ বহু মৃণ্ময় হস্তী ও অশ্ব প্রতি বৎসর প্রদত্ত হয় বেদীর উপর সে সকল হস্তী ও অশ্ব স্তূপীকৃত হইয়াছে। দেউলী গ্রামের ভূমিজেরা ইঁহার পূজারী। পূজা প্রত্যহ হয় না, বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে হয়; মকর-সংক্রান্তিতে কিঞ্চিৎ আড়ম্বরের সহিত হয়। মকর-সংক্রান্তিতে এখানকার পলাশ-উপবনে যে মেলা বসে, তাহা দেবীর নামানুসারে 'মাকড়ার পরব' নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। মাকড়া-সিনী দেবী প্রাচীনা, কিন্তু 'মাকড়ার পরব' প্রাচীন নহে। দেউলী গ্রামের ফেলারাম গোস্বামী নামে এক সাধু-পুরুষ ৩০।৩২ বৎসর পূর্বে এই মেলাটির প্রবর্তন করিয়া যান। সংসার ত্যাগ করার পর তিনি আর গ্রামে ফিরিয়া আসেন নাই। কেহ বলে তিনি হরিদ্বারে আছেন, কেহ বলে তিনি দেহরক্ষা করিয়াছেন। প্রথম যে বৎসর তিনি মেলাটি বসাইলেন সে বৎসর অষ্টপ্রহর হরিনাম-সংকীর্তন হইয়াছিল। অষ্টপ্রহরের সংকল্প হইলেও পরে পরে চব্বিশ-প্রহর, পঞ্চরাত্রি, সপ্ত-রাত্রি, এমনকি নব-রাত্রি পর্যন্ত হরিনাম-সংকীর্তন হইয়া থাকে। দেউলী গ্রামের 'সর্দার' উপাধিধারী ভূমিজেরাই এখন এই মেলার উদ্যোক্তা; তবে পার্শ্ববর্তী চারি-পাঁচটি গ্রামের মুখ্য ব্যক্তিগণ মেলার কার্য নির্বাহ করেন। প্রয়োজনীয় অর্থের কিয়দংশ ভূমিজেরা দেয়, কিয়দংশ মেলায় তোলা ও চাঁদা হইতে সংগৃহীত হয়।

পলাশ-কুঞ্জের প্রায় মধ্যস্থলে একটি আটচালা। সেখানে সুসজ্জিত মঞ্চের উপর রাধা-কৃষ্ণ ও গৌর-নিতাইয়ের প্রতিমা স্থাপন করিয়া তাহার চতুর্দিকে মণ্ডলাকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হরিনাম করা হয়। কৃষ্ণলীলার গান নয়, 'রাধা-গোবিন্দ' নাম নয়, 'হরেকৃষ্ণ' নাম নয়, কেবল "হরিবোল হরিবোল হরিবোল বল রে।" ইহাতে কোনও প্রকার আঁখর যোগ

করা হয় না, কেবল সুর-লহরীর মাধুর্যে ইহাতে বৈচিত্র্য সৃষ্ট হয় এবং শ্রুতি-সুখকর হয়। কেবল মৃদঙ্গ ও করতাল যোগে হরিনাম, অন্য বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয় না, তথাপি হৃদয় গলাইয়া দেয়। নামগান অবিরাম চলিতে থাকে, ছেদ পড়িবার জো নাই। প্রহরে প্রহরে একজন 'গোস্বামী' ভোগ-নিবেদন করিয়া যান। পৌষ-সংক্রান্তির উষাকাল হইতে এইরূপ তিন দিন, পাঁচ দিন, সাত দিন অথবা নয় দিন পর্যন্ত চলিতে থাকে। যেদিন ধূলাট হয়, সেদিন কিছুক্ষণ 'রাধা-গোবিন্দ' নাম হইয়া থাকে। 'রাধানাম' আরম্ভ হইলেই লোকে বুঝিতে পারে যে 'ধূলিখেলা'র আর বিলম্ব নাই।

লীলা-কীর্তন যে হয় না তাহা নহে, তবে তাহা আটচালা হইতে দূরে। পলাশ গাছের ছায়ায় পাল টাঙাইয়া আসর পাতা হয়। নিকটবর্তী বা দূরবর্তী গ্রামের কীর্তনিয়াগণ রাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলা গান করেন, রসিক শ্রোতারা শ্রবণ করেন। নাম-কীর্তনের ও লীলা-কীর্তনের বহু দল বিভিন্ন গ্রাম হইতে আসে। তাহাদের জন্য দীর্ঘ চালাঘর বাঁধিয়া দেওয়া হয়। চালাঘরে খড়ের আচ্ছাদন এবং দেওয়ালগুলিতে সপত্র শাল-শাখার আবরণ। নদীতীরে পৌষ মাসের দুরন্ত শীতেও লোকে এই ঘরে অকাতরে কয়েক দিন কাটাইয়া দেয়।

ক্ষীণস্রোতা শিলাবতীর জলধারা শীতকালে কাকচক্ষুর ন্যায় স্বচ্ছ হয়। কিন্তু স্নান করিবার উপযুক্ত প্রচুর জল থাকে না বলিয়া মেলা বসিবার পাঁচ-ছয় দিন পূর্ব হইতে জলধারার গতিরোধ করিয়া বাঁধ দেওয়া হয়। পৌষ-সংক্রান্তির দিন যথেষ্ট জল জমে। সেদিন সূর্যোদয়ের প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব হইতে পুণ্যস্নান চলিতে থাকে। পার্শ্ববর্তী প্রায় ৫০-৬০টি গ্রামের পাঁচ-ছয় সহস্র নরনারী ঐদিন মাকড়ার ঘাটে শিলাবতীর পুণ্য-সলিলে স্নান করিয়া গঙ্গাস্নানের পুণ্য অর্জন করে। শীতের প্রকোপে ছেলেমেয়েরা কোনপ্রকারে 'ডুব' দিয়া উঠিয়া পড়ে, সাঁতার কাটিয়া এপার-ওপার করিয়া দুরন্তপনা করিতে পারে না। কত বৃদ্ধ বৃদ্ধা জরাক্রান্ত, লোল-চর্ম, কম্পিত দেহ গঙ্গা স্মরণ করিয়া নদীজলে নিমজ্জিত করেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধনই তপস্যা; তপস্যা ব্যতীত চিত্তশুদ্ধি হয় না। স্নান করিয়া ঘাটে উঠিয়া দাঁড়াইলে কোন বৈষ্ণব জয়দেবের পদাবলী গাহিতে গাহিতে স্নাত ব্যক্তির ললাটে আবীর অথবা চন্দনের তিলক আঁকিয়া দেয়। কেহ বৈষ্ণবকে একটা পয়সা দেয়, কেহ বা দেয় না। স্নান করিয়া সকলেই কিন্তু মাকড়া-সিনীর স্থানে গিয়া দুই-একটা পয়সা দিয়া প্রণাম করে। দেবী ভয়ঙ্করী। তাঁহাকে প্রণামী না দিয়া উপায় নাই। প্রতি বৎসর মকর-সংক্রান্তির মেলার সময় নিকটবর্তী কোন গ্রামে অন্ততঃ একটি লোকের মৃত্যু হয় এবং মৃতদেহ আনিয়া মাকড়ার ঘাটে দাহ করা হয়। লোকে বলে, 'দেবীর মাহাত্ম্য'।

দেবীকে প্রণাম করিয়া বালক ও যুবকেরা 'মকরকুঁড়ে' জ্বালাইয়া থাকে। নদীর কূলে কূলে বিভিন্ন গ্রামের বালক-যুবকেরা শুষ্ক তালপত্র, খড় ইত্যাদি দিয়া কুটির নির্মাণ করিয়া রাখে। মকর-স্নানের পর ঐ কুটিরগুলিতে অগ্নি-সংযোগ করিয়া বালক-বালিকারা এবং যুবকেরা বিপুল হর্ষধ্বনি করিতে থাকে। কোন কোন স্থানে ইহার নাম 'বুড়ির ঘর পোড়ানো'। বীরভূমে দেখিয়াছি, মকর-সংক্রান্তির দিন প্রত্যুষে মাঠে মাঠে বহু 'বুড়ির ঘর' পুড়িতেছে এবং কাঁসর-ঘণ্টার নিনাদ সহকারে বিপুল হর্ষধ্বনি হইতেছে।

'মকর-কুঁড়ে' জ্বালাইবার পর সকলেই আটচালায় গিয়া হরিকে প্রণাম করে এবং কিছুক্ষণ হরিনাম শ্রবণ করে। কেহ কেহ কীর্তনদলের সহিত যোগ দিয়া নাম-সংকীর্তন করিতে করিতে মঞ্চ প্রদক্ষিণ করে। কেহ বা ভাবাবেশে দুই বাহু তুলিয়া নৃত্য করে। তার পর সকলেই মেলা দেখিতে যায়। পথে অগণিত ভিক্ষুক, কেহ হাত পাতিয়া, কেহ-বা আঁচল পাতিয়া বসিয়া আছে। সকলেই সাধ্যমত কিছু-না-কিছু দান করে। মকর-সংক্রান্তির দিন স্নান করিয়া দান না করিলে পুণ্য হয় না।

বিস্তীর্ণ ভূমির উপর মেলা বসিয়াছে। নদীর ঘাট হইতে একদিকে সারি সারি চালাঘরে মিঠাইয়ের দোকান, আর একদিকে সারি সারি চালায় মনিহারী দোকান। মিঠাইয়ের দোকানগুলি নিকটবর্তী গ্রামসমূহ হইতে আসিয়াছে, কিন্তু মনিহারী দোকানগুলি দূরবর্তী শহর হইতেও আসিয়াছে। লোকে কিছু কিনুক বা না কিনুক মনিহারী দোকানের জৌলুস দেখিয়া সেখানে ভিড় জমাইতেছে। মেলার একদিকে এক সারি চায়ের দোকান। শীতকালে চায়ের খরিদ্দার প্রচুর। কেহ চীনামাটির বাটিতে, কেহ কাচের গেলাসে, কেহ-বা মাটির কটোরায় চা খাইতেছে। একপ্রান্তে ভুষি-মালের পাঁচ-সাতটা দোকান; এখান হইতেই মিঠাই ও চায়ের দোকানের প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ হইতেছে। নিকটে লালবাজার গ্রাম, কাঁসার বাসন-শিল্পের জন্য বিখ্যাত। সেখান হইতে বহু কাঁসার বাসনের দোকান আসিয়াছে। মিলের কাপড়ের দোকানও দুই-একটা আসিয়াছে, তবে স্থানীয় তাঁতীদের তাঁতের রঙীন কাপড়, মোটা ধুতি, গামছা ও চাদরের দোকানই বেশী। নিকটে মলিয়ান গ্রামে বহু কুম্ভকার ও ডোম আছে। তাহারা বিচিত্র গঠনের মাটির বাসন ও বাঁশের ঝুড়ি-পেতে টোকা-চুপড়ী বেচিতে

আসিয়াছে। নিকটের জুনবেদিয়া গ্রামের 'যুগী'রা মনিহারী দ্রব্য ফেরি করিয়া বেড়ায়; তাহারাও সারি সারি ছোট ছোট মনিহারী দোকান পাতিয়াছে। প্রত্যেক দোকানে বাউরী, হাড়ী, ডোম ও সাঁওতাল মেয়েরা কাচের চুড়ি পরিতেছে। নিকটে তেঁতুলিয়া ও দেবীদিয়া গ্রামের শুঁড়িরা বড় চাষী। তাহারা আলু, কপি, বেগুন, মটরশুঁটি ইত্যাদি শাকসব্জী বেচিতে আসিয়াছে। দেউলী গ্রামের কামারেরা খুন্তী, হাত', কুঠার, লাঙ্গলের ফলা, বঁটি ইত্যাদি দ্রব্যের দোকান করিয়াছে। নন্দী-বান্দসা গ্রামের ছুতারেরা কাঠের পুতুল, খাটের খুরা ও বাজু, পাই-পোয়া, গাড়ীর চাকা, লাঙ্গল ও জোয়াল বিক্রয় করিতেছে। আর একটু অগ্রসর হইলে দেখিবেন, কত লোক পাট, শণ ও বাবুইয়ের দড়ি বেচিতেছে। পার্শ্ববর্তী কোন গ্রাম হইতে 'পাথর কাটা'রা পাথরের বাসন আনিয়া সারি সারি দোকান সাজাইয়াছে। থালা, বাটী, গেলাস, খুরী, শিল, নোড়া, আরও কত কি! আপনি কিনুন বা না কিনুন, শিল্পকর্ম দেখিয়া আপনার চোখ জুড়াইবে। এ সকল শিল্প শিক্ষার জন্য কোনও বিদ্যালয় নাই; শিল্পীরা বংশপরম্পরায় স্বাভাবিক ভাবেই এই শিল্প-প্রতিভার অধিকারী হইয়াছে।

সমস্ত মেলাটি কলরবে পরিপূর্ণ। কেহ পাঁচ হাত দূরে দাঁড়াইয়া কথা কহিলে শুনিতে পাইবেন না। হরিনাম সংকীর্তনের সহিত খোল-করতালের শব্দ, প্রত্যেক দোকানে ক্রেতা-বিক্রেতার বাগবিনিময়, ফেরিওয়ালার বিচিত্র হাঁক, সার্কাসওয়ালার বিলাতী দামামার ধ্বনি এবং বালক-বালিকার মুখে বেলুন-বাঁশির শব্দে মেলাটি নিরন্তর মুখর হইয়া আছে।

মেলা ছাড়িয়া একটু দূরে নদীকূলে পলাশবনের ভিতর প্রবেশ করুন। দেখিবেন সেখানে নানা সম্প্রদায়ের 'সাধু'র সমাগম হইয়াছে। কেহ লোটা-চিমটা লইয়া ধুনী জ্বালাইয়া বসিয়া আছেন; তাঁহার দেহ ভস্মাবৃত, মস্তকে জটাজুট। কাহারও মস্তক মুণ্ডিত, কটিতে কৌপীন। কাহারও ললাটে শ্বেত চন্দনের তিলক, কাহারও বা গোপীচন্দনের ত্রিপুণ্ড্র-রেখা। কেহ ভগবদ্গীতা পাঠ করিতেছেন, কেহ চিমটা বাজাইয়া গান গাহিতেছেন, কেহ বা শিষ্যসমভিব্যাহারে গঞ্জিকা সেবন করিতেছেন। দীর্ঘ-শ্মশ্রু-সমন্বিত, আলখাল্লা পরিহিত কোন বাউল একতারা বাজাইয়া ভবপ্রীতার অথবা জগতের ঝুমুর গাহিতেছে; তাহার ঝুলিতে দুই-চারিটা পয়সা পড়িতেছে। কোথাও দুই সম্প্রদায়ের সাধুর মধ্যে তর্ক আরম্ভ হইয়াছে; মূর্খ শ্রোতারা তাহা শুনিয়া হাসিতেছে, বিদ্বানেরা উপভোগ করিতেছেন। যদি সময় থাকে, আর একটু অগ্রসর হইয়া হর-গাঙ্গুলীর কিংবা নিকুঞ্জ-গোঁসাইয়ের লীলা-কীর্তন শ্রবণ করুন। সে 'লীলামৃত' "হরে মন, হরে কান, হরে প্রাণ।" অবশ্য সিনেমা ও রেডিয়োর গান শুনিয়া যাঁহাদের রুচি-বিকার ঘটিয়াছে, তাঁহারা ইহাতে রস পাইবেন কিনা সন্দেহ।

এক কথায়, সমস্ত মেলাটি কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, সঙ্গীত, ধর্ম ও দর্শনের একটি বৃহৎ প্রদর্শনী। দুর্গাপূজার এক মাস পূর্ব হইতে যেমন নানা আয়োজনের সহিত লোকে উৎসবের আনন্দ অনুভব করে, এ অঞ্চলে সেইরূপ মকর-সংক্রান্তির বহু পূর্ব হইতেই 'মাকড়ার পরবে'র আগমন-প্রতীক্ষায় আনন্দ অনুভব করিতে থাকে।

মকর-সংক্রান্তির দিন বিষ্ণু-বিগ্রহের অথবা শালগ্রাম-শিলায় বিষ্ণুর বিশেষ পূজা ও অভিষেক হয়। সন্ধ্যাকালে আবীর-মর্দন করিয়া বিষ্ণুর শৃঙ্গার অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর আড়ম্বরের সহিত আরতি ও ভোগরাগাদির অনুষ্ঠান হয়। গ্রামে বিষ্ণুমন্দিরের চত্বরে হরিনাম সংকীর্তন, প্রসাদ বিতরণ ও প্রীতি-সম্মেলনে সেদিনকার সন্ধ্যাটি সুন্দর হইয়া ওঠে।

মকর-সংক্রান্তির পূর্বদিন হইতেই গ্রামে গ্রামে 'পিঠা-পরব' চলিতে থাকে। ইহা এক বৃহৎ ব্যাপার। পাঁচ-সাত দিন পূর্ব হইতেই পিঠার আয়োজন চলিতে থাকে। নূতন ধান্য গৃহগত হইয়াছে, নূতন আখের গুড়ও হইয়াছে। মাঠে মাঠে কৃষ্ণতিল উৎপন্ন হইয়াছে। কয়েকদিন ধরিয়া চাউলের গুঁড়ি প্রস্তুত করিতে এবং তিল, নারিকেল, বরবটী ও ক্ষীরের পুলি প্রস্তুত করিতে গ্রামের নারীরা নিরন্তর ব্যস্ত থাকে। এই সকল পুলি সংযোগে যে পিষ্টক প্রস্তুত হয়, তাহা যেমন সুস্বাদু, তেমনই উপাদেয়। নগরবাসীরা পিঠা-পরবের আনন্দ বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু পল্লীগ্রামে, "মেয়েদের পা পড়ে না গরবে—মকর-পরবে।" বঙ্গদেশে এমন গ্রাম নাই যেখানে হিন্দুর সন্তান মকরস্নান ও পিঠা-পরবের আনন্দ উপভোগ করে না।

এখন মকর-সংক্রান্তির উৎপত্তি চিন্তা করি। মকর-সংক্রান্তি নামেই প্রকাশ, সেদিন রবি মকর-রাশিতে সংক্রমিত হন। সমগ্র সৌর মাঘমাস রবি মকর-রাশিতে অবস্থান করেন। কিন্তু সে জন্য উৎসব কেন? স্নান-দানের বিধান কেন? মকর-সংক্রান্তি দিবসের বৈশিষ্ট্য এই যে এককালে সেদিন রবির উত্তরায়ণ হইত। অদ্যাপি আমাদের পঞ্জিকায় মকর-সংক্রান্তির দিনকে "উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি" নামে অভিহিত করা হয়। এখন অবশ্য ৩০শে পৌষ রবির উত্তরায়ণ হয় না, ৭।৮ই পৌষ হয়। অয়ন-দিন ২১৬২ বৎসরে এক মাস পশ্চাদ্গত হয়। কিঞ্চিদধিক ১৬০০ বৎসরে অয়নদিন ২৩ দিন পশ্চাদ্গত হইয়াছে। জ্যোতিষিক গণনায় পাওয়া গিয়াছে, ৩১৯ খ্রীষ্টাব্দে সৌর পৌষের শেষ দিবসে রবির

উত্তরায়ণ হইত। সে বৎসর হইতেই গুপ্তাব্দ-গণনা আরম্ভ হইয়াছে। অদ্যাপি আমরা সেই স্মৃতি ধরিয়া সৌর পৌষের শেষ দিবসে উত্তরায়ণ-উৎসবের অনুষ্ঠান করিতেছি, স্নান-দান করিতেছি।

কিন্তু উত্তরায়ণ-দিনেই বা উৎসব কেন? সেদিন মকর-কুঁড়ে জ্বালাইয়া হর্ষ-প্রকাশ করা হয় কেন? বহুকালের পুরাতন কথা বলিতেছি। সেকালের কথা বুঝিতে হইলে মনকে সেই প্রাচীনকালে লইয়া যাইতে হইবে; প্রাচীন-কালের মানুষের সঙ্গে একাত্ম হইয়া ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। প্রাচীনেরা মনে করিতেন, এই যে আলোকে দেখিতে পাই, বায়ুতে জীবনধারণ করি, বৃষ্টিতে কৃষিকর্ম করি, এ সমস্ত দেবতার মাহাত্ম্য। আর ঐ যে দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির ফলে অবগ্রহ সৃষ্টি হয়, প্রবল শীতে জীবজগৎ কাতর হইয়া পড়ে, এ সমস্ত অসুরদের দৌরাত্ম্য। অতি প্রাচীনকালে, ঋগবেদের যুগে আর্যগণ পঞ্জাবে বাস করিতেন। পঞ্জাবে দুরন্ত শীত। শীতের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য তাঁহারা অত্যন্ত ব্যাকুল হইতেন; শীত নিবারণের জন্য শীতঋতুর আদিত্য সবিতার স্তুতি করিতেন; ঋগবেদের বহু সূক্তে তাহার উল্লেখ আছে। ঋগবেদের কালে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে শীতঋতু ছিল, ফাল্গুনী পূর্ণিমায় রবির উত্তরায়ণ হইত, দোলযাত্রায় তাহার স্মৃতি রক্ষিত আছে। দোলযাত্রার পূর্বরাত্রে যে বহ্ন্যুৎসব বা চাঁচর অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সকলেই জানেন। একটা মেষের আকৃতিবিশিষ্ট দানব নির্মাণ করিয়া হর্ষধ্বনি-সহকারে উহা দগ্ধ করা হয়। পুরাণে এই দানবের নাম মেণ্ঢাসুর। মেণ্ঢাসুরকে দগ্ধ করিয়া এত আহ্লাদ প্রকাশ কেন? বিশ্বাস ছিল যে ঐ অসুরই শীতের কারণ, সে যতদিন জীবিত থাকিবে ততদিন দিবামান বৃদ্ধি পাইবে না, শীতের প্রকোপও হ্রাস পাইবে না। উত্তরায়ণদিনে মেণ্ঢাসুরের প্রতিকৃতি দগ্ধ করার পর প্রাকৃতিক নিয়মেই দিবামান ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইত, কিন্তু সাধারণ লোকে মনে করিত যে অসুরটা মরিয়াছে বলিয়াই দিবামান বৃদ্ধি পাইতেছে। ঋগবেদের যুগের এই পুরাতন স্মৃতি আধুনিক কালেও আসিয়া পড়িয়াছে। মকর-সংক্রান্তিতে মকর-কুঁড়ে বা বুড়ির ঘর পোড়াইয়া যে হর্ষপ্রকাশ করা হয়, তাহা ঋগবেদের যুগের মেণ্ঢাসুর দহনের স্মৃতির অনুবর্তন মাত্র। পূর্বেই বলিয়াছি, মকর-সংক্রান্তির দিন রবি মকর-রাশিতে সংক্রমণ করেন। মকর-রাশির তারাগুলি যোগ করিলে একটা ছাগ বা মেষের আকৃতি পাওয়া যায়। মকর-রাশির গ্রীক নাম Capricornus. গ্রীক তারাপটে Capricornus একপদবিশিষ্ট ছাগ। এই আশ্চর্য সাদৃশ্য কি প্রকারে আসিল, তাহা চিন্তার বিষয়। যাহা হউক, প্রাচীনকালের মেণ্ঢাসুর এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের মকরের (Capricornus) আকৃতিগত সাদৃশ্যে এইটুকু বুঝিতেছি যে, দোলের 'চাঁচর' এবং মকর-সংক্রান্তির 'মকর-কুঁড়ে পোড়ানো' ব্যাপার দুইটা মূলতঃ একই।

পূর্বে আরও উল্লেখ করিয়াছি যে, মকর-সংক্রান্তির দিন বিষ্ণুর বিশেষ পূজা, অভিষেক এবং আবীরমর্দনপূর্বক শৃঙ্গার অনুষ্ঠিত হয়। ঋগবেদে সূর্যই বিষ্ণু। উত্তরায়ণদিনে তিনি দক্ষিণ কাষ্ঠায় থাকেন। এই কাষ্ঠার নাম মকর-ক্রান্তি (Tropic of capricorn)। সেদিন তিনি যেন দক্ষিণ সমুদ্রে স্নান করিয়া নূতন করিয়া উত্তর-যাত্রা আরম্ভ করেন। উত্তরায়ণ-দিনের সূর্য উদয়কালে গাঢ় রক্তবর্ণ দেখায়। সূর্যের সেই রক্তিমচ্ছটা বিষ্ণুর আবীরমর্দনে দ্যোতিত হয়। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার 'পূজাপার্বণ' গ্রন্থে (দোলযাত্রা প্রবন্ধ) দেখাইয়াছেন যে, প্রায় ছয় সহস্র বৎসর পূর্বে দোলযাত্রার দিন রবির উত্তরায়ণ হইত এবং সে যুগের 'হিমবর্ষ' আরম্ভ হইত। নববর্ষের আনন্দোৎসব দোল-পূর্ণিমার অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমানে মকর-সংক্রান্তির দিন যদিও কোথাও নববর্ষ আরম্ভ হয় না, তথাপি উত্তরায়ণ দিনে নববর্ষের পুরাতন স্মৃতি ইহার সহিত যুক্ত হইয়া থাকায় অদ্যাপি আমরা এইদিনে নানাবিধ আমোদ-আহ্লাদ করিতেছি।

এই প্রসঙ্গে আমাদের একটি কৃত্য স্মরণীয়, তাহার নাম 'মাকরী সপ্তমী'। মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমীর নাম 'মাকরী সপ্তমী'। রবি তখন মকর রাশিতে অবস্থান করেন বলিয়া সপ্তমীর এই বিশেষণ হইয়াছে। এই সপ্তমী 'রথসপ্তমী' এবং 'আরোগ্য-সপ্তমী' নামেও অভিহিত হয়। মাকরী সপ্তমীর পরদিন ভীষ্মাষ্টমী। প্রসিদ্ধি আছে, কুরুকুলপতি মহাত্মা ভীষ্ম এই অষ্টমীতে স্বর্গারোহণ করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শরাহত হইয়া তিনি উত্তরায়ণ দিনের অপেক্ষায় ৫৮ দিন শরশয্যায় শয়ান ছিলেন। তখন লোকের বিশ্বাস ছিল যে, দক্ষিণায়নে মৃত্যু হইলে দেবযান পাওয়া যায় না, তাই ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্ম উত্তরায়ণ দিনের অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইহা হইতে বুঝিতেছি, মহাভারতের যুগে মাকরী-সপ্তমীর দিন রবির উত্তরায়ণ হইত। অয়ন-চলন (Precession of the Equinoxes)-হেতু উত্তরায়ণ-দিন পশ্চাদ্‌গত হইতে হইতে ৩১৯ খ্রীষ্টাব্দে সৌর পৌষের শেষ দিবসে আসিয়া পড়িয়াছিল, আবার এক্ষণে ৭ই পৌষে আসিয়া পড়িয়াছে। মাকরী সপ্তমী মাঘ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ধরিতে পারি। সুতরাং উত্তরায়ণদিন তদবধি প্রায় দেড় মাস পশ্চাদ্‌গত হইয়াছে। অয়নদিন এক মাস পশ্চাদ্‌গত হইতে ২১৬০

বৎসর লাগে। অতএব প্রায় ২১৬০ × ১২ = ৩২৪০ বৎসর পূর্বে মাকরী সপ্তমীতে রবির উত্তরায়ণ হইয়াছিল। অর্থাৎ খ্রী পূ ত্রয়োদশ শতাব্দীর কথা। প্রায় ঐ সময়েই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল, এইরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। আচার্য যোগেশচন্দ্র সূক্ষ্মতর গণনায় দেখাইয়াছেন, খ্রী-পূ ১৪৪২ অব্দে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল। তখন আর্যকৃষ্টির শেষ যুগ। ইহার কতকাল পূর্ব হইতে ভারতে আর্যকৃষ্টির ধারা চলিয়া আসিতেছিল, কে জানে?
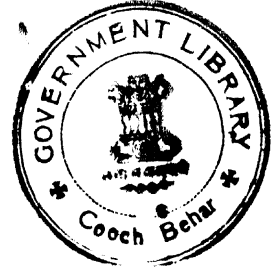
সেকালের একটি চিত্র

শ্রীকালিদাস রায়

নতুন হয়েছে বিয়ে, ঘোরে নি বছর,
তখনো রোজই রাতে মোদের বাসর।
মনে পড়ে শাঁওনের বরষা রাতি,
গৃহকোণে মিটিমিটি জ্বলত বাতি।
ঝুপঝুপ ঝরত সে বৃষ্টিধারা
ডোবায় গাইত ব্যাঙ রাত্রি সারা।
আসত যুঁইয়ের বাস জানালা দিয়ে
ভাবতাম কখন বা আসবে প্রিয়ে।
ডাকত তোমায় পোষা কপোতগুলা,
সহসা আসতে তুমি মাথায় কুলা।
শাঙনে আঙিনা কাদা পঙ্কে ভরে,
পঙ্কজ ফুটিয়ে সে পঙ্ক 'পরে
এসে ত্বরা কুয়া পারে ধুইতে চরণ,
ম্লান হ'ত আলতার উজল বরণ।
বলতাম—এত দেরি কী যে ছাই কাজ,
বলতে—কোথায় দেরী শিগগিরই আজ।
খাওয়া-দাওয়া শেষ আজ সকাল সকাল
ঘড়ি দেখ, সবে সাঁঝ, হায় রে কপাল!
শুকাতো না বাদলায়, এলোচুল তাই,
আজিও আমলা-বাস সে চুলের পাই।
বলতাম, ছেড়ে ফেল শাড়ীটা ভিজে,
বলতে—কোথায় ভিজে? বলছ কী যে!
বলতাম, কত শাড়ী তোরঙভরা,
একখানা বার করে পরো না ত্বরা।
এতে তুমি মোর 'পরে রাগতে ভারী,
বলতে—ভাঙব কেন পোশাকী শাড়ী।
বলতাম খুলে ফেল গয়নাগুলো,
নিশ্চয় ওরা নয় নরম তুলো।
ফুলের গয়না যার পরার কথা
কঠিন ধাতুতে তার কেন মমতা?
বলতে দুলিয়ে দুল নাচায়ে আঙুল,
মালিনী একটা রাখো যোগাবে সে ফুল।
চাবির রিঙ্‌টা খুলে টেবিলে থুয়ে
প্রদীপ নিভাতে যেতে মুখের ফুঁয়ে।
বলতাম—ও কি করো দাও জ্বলতে,
বরং উসকে দাও ওর পলতে।
এই নিয়ে হ'ত কত কলহের ছল,
মিলন-মাধুরী গাঢ় করতে কেবল।
লাগত বাদলরাত মধুর বড়,
করত নিভৃত গৃহে নিভৃততর।
আকাশবাতাস মেঘ মাতত রাতে,
জোরে জোরে কথা বলা চলত তাতে।
চমকাত বিদ্যুৎ ধমকাত মেঘ,
নিকটে আনত তোমা সভয় আবেগ
মেঘের ডাকের কী যে আসল মানে,
নবদম্পতি ছাড়া কেই বা জানে?
মনে হ'ত এ বরষা হউক অশেষ,
নওল প্রেমের এ যে খাঁটি পরিবেশ।

শঙ্করের "মায়াবাদ" ও "উপাধিবাদ"

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

(১)

পূর্ব সংখ্যায় বলা হয়েছে যে, শঙ্করের মতে, জীবের দিক থেকে, অনাদি অবিদ্যাই জগতের কারণ। ব্রহ্মের দিক থেকে, তাঁর ভ্রম-সংঘটনকারী শক্তিবিশেষই জগতের কারণ। এই শক্তির নাম "মায়া"। এস্থলে শঙ্কর মায়াবী ও তাঁর মায়াশক্তির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। নিপুণ মায়াবী বা ঐন্দ্রজালিক তাঁর মায়াশক্তির সাহায্যে, এক বস্তুর স্থলে অপর এক বিভিন্ন বস্তু সৃষ্টি করে' দর্শকবৃন্দকে প্রতারিত ও মোহ-গ্রস্ত করেন। যেমন, তিনি বংশদণ্ড, রজ্জু প্রভৃতিকে তাঁর মায়া বা ইন্দ্রজাল-প্রভাবে আকাশবিহারী পুরুষরূপে প্রকটিত করেন। এরূপ আকাশবিহারী পুরুষ দর্শকবৃন্দের নিকট প্রত্যক্ষীভূত সত্য হলেও, প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা, মায়াই মাত্র। সেজন্য, মায়াবীর নিজের দিক থেকে এই মিথ্যা আকাশ-বিহারী পুরুষ তাঁর মায়াশক্তির ফল; দর্শকগণের দিক থেকে তা' হ'ল তাঁদের অবিদ্যার ফল, যেহেতু তাঁরা বংশদণ্ড, রজ্জু প্রভৃতিকে বংশদণ্ড, রজ্জু প্রভৃতি রূপেই যদি জানতেন; তা হলে তাঁদের এরূপ ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ হতে পারত না।

এইভাবে, যেন মায়ারূপ উপাধিযুক্ত হয়ে, ব্রহ্ম স্রষ্টা ঈশ্বর, এবং যেন অবিদ্যারূপ উপাধিযুক্ত হয়ে' তিনি সৃষ্ট জীব-জগৎরূপে প্রতিভাত হচ্ছেন। স্বরূপের দিক দুই অভিন্ন বস্তুর মধ্যে আকার ও প্রতীতির দিক থেকে ভেদের সৃষ্টি যা করে, তার নাম হ'ল "উপাধি"। যেমন ঘটাকাশ ও মহাকাশে স্বরূপের দিক থেকে কোনোরূপ ভেদ নেই। কিন্তু মনে হয় যে, ঘটের দ্বারা যেন ঘটের মধ্যস্থিত আকাশ বাহিরের অনন্ত প্রসারী আকাশ থেকে ভিন্ন হয়ে গেছে। সেজন্য ঘটকে বলা হয় "উপাধি"। প্রকৃতকল্পে, পারমার্থিক দিক থেকে, সৃষ্টিও নেই, স্রষ্টা কারণও নেই, সৃষ্ট কার্যও নেই—কেবলমাত্র নির্বিশেষ, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার, এক ও অদ্বিতীয়, শুদ্ধ ব্রহ্মই আছেন। কিন্তু ব্যবহারিক দিক থেকে, সৃষ্টি স্বীকার করে, নিতে হয় বলে' স্রষ্টা কারণ ও সৃষ্ট কার্যের মধ্যে ভেদা-ভেদও গ্রহণ করতে হয়। সেজন্য ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও জীব-জগতের ভেদ উপাধিকল্পিত ও অপারমার্থিক, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা এক ও অভিন্ন।

এরূপে, সকল দিক থেকেই আলোচনা করলে প্রমাণিত হবে যে, সৃষ্টি মিথ্যা, মায়াই মাত্র। ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে শঙ্কর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মায়াময়ত্বের বিষয়ে বারংবার নানাভাবে উল্লেখ করেছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত হ'ল নিম্নলিখিত রূপ—

"প্রথমেঽধ্যায়ে সর্বজ্ঞঃ সর্বেশ্বরো জগত উৎপত্তিকারণং, মৃৎ-সুবর্ণাদয় ইব ঘটরুচকাদীনাম্, উৎপন্নস্য জগতো নিয়ন্তৃত্বেন স্থিতিকারণং, মায়াবীব মায়ায়াঃ; প্রসারিতস্য জগতঃ পুনঃ স্বাত্মন্যেবোপসংহারকারণম্, অবনিরিব চতুর্বিধস্য ভূতগ্রামস্য।"
(ব্রহ্মসূত্র ২।১।১, শঙ্করভাষ্য)।

অর্থাৎ, ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, সর্বজ্ঞ, সর্বেশ্বর জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ। এরূপে, মৃত্তিকা যেরূপ মৃন্ময়ঘটের এবং সুবর্ণ যেরূপ স্বর্ণহারের উৎপত্তির কারণ, তিনিও সেরূপ জগতের উৎপত্তির কারণ। পুনরায়, মায়াবী যেরূপ মায়া বা মায়িক বস্তুর স্থিতির কারণ, জগতের নিয়ন্তারূপে তিনিও সেরূপ জগতের স্থিতির কারণ। পরিশেষে, সমস্ত পার্থিব বস্তু যেরূপ পৃথিবীতে লয়প্রাপ্ত হয়, সেরূপ প্রসারিত জগতও তাঁরই মধ্যে লয়প্রাপ্ত হয় বলে' তিনি জগতের লয়েরও কারণ।

শঙ্করের ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের উপরে উদ্ধৃত অংশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও চিন্তোদ্দীপক। কারণ, এতে সৃষ্টিপ্রসঙ্গে পরিণামবাদসম্মত উদাহরণ, স্থিতিপ্রসঙ্গে বিবর্তবাদসম্মত উদাহরণ এবং লয়প্রসঙ্গে পুনরায় পরিণামবাদসম্মত উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। সেজন্য মনে হওয়া আশ্চর্য নয় যে, শঙ্করের উক্তি এ স্থলে স্ববিরোধ-দোষদুষ্ট; অথবা, এই উদাহরণ তিনটির বিশেষ কোন অর্থ নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, শঙ্করের ন্যায় ন্যায়বিচারপারগ দার্শনিক এ স্থলে স্ববিরোধী মতও প্রপঞ্চিত করেন নি, নিরর্থকও কিছু বলেন নি—তিনি ইচ্ছা করেই, একটি নিগূঢ় উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়েই, এরূপ তিনটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ এই প্রসঙ্গে করেছেন। প্রথমতঃ, সৎকার্য-বাদ মতে, তা' সে পরিণামবাদই হোক বা বিবর্তবাদই হোক্, সৃষ্টির পূর্বে ও লয়ের পরে কার্য কারণে অব্যক্ত ভাবে, অভিন্ন ভাবে নিহিত হয়ে থাকে। সেজন্য, সৃষ্টি ও লয়কালে কারণ ও কার্যের অনন্যতা বা অভিন্নতা বিবর্তবাদের দিক থেকে পৃথক্ ভাবে প্রমাণিত করার প্রয়োজন নেই;

প্রয়োজন আছে, কেবল স্থিতিকালে, কারণ ও কার্যের অনন্যতা অর্থাৎ কারণের সত্যত্ব ও তথাকথিত পৃথক্ কার্যের মিথ্যাত্ব প্রমাণের। অতএব, কার্য-কারণ-সমস্যার দিক্ থেকে, স্থিতির সমস্যাই হ'ল প্রকৃত সমস্যা। অর্থাৎ, এস্থলে প্রশ্ন হ'ল এই যে : সৃষ্টির পরমুহূর্ত থেকে ও লয়ের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত যে কার্যটি স্থিতি করছে, কারণের সঙ্গে তার প্রকৃত সম্বন্ধ কি? সেই জন্যই, শঙ্কর এস্থলে পরিণামবাদসম্মত উদাহরণ সহজতর বলে বোধসৌকর্যার্থ সৃষ্টি ও লয়প্রসঙ্গে ঐরূপ দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। কিন্তু আসল জায়গায় তিনি বিন্দুমাত্রও এদিক-ওদিক করেন নি, নিজের মত পরিষ্কার ও স্পষ্ট ভাবেই বলেছেন যে, মায়াসৃষ্ট বস্তু যেরূপ মিথ্যা, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডও ঠিক তাই।

দ্বিতীয়তঃ, এরূপ পরিণামবাদমূলক উদাহরণ গ্রহণের আর একটি হেতু হ'ল এই যে, বেদান্তমতে, ব্রহ্ম বিশ্বের অভিন্ন উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, কেবলমাত্র নিমিত্তকারণ নন, যা' ন্যায়-বৈশেষিকাদির মত। ব্যবহারিক দিক থেকে, শঙ্করও ঈশ্বরকে জীবজগতের অভিন্ন উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ বলে স্বীকার করেছেন। সেজন্য, মৃত্তিকা যেরূপ ঘটের উপাদান-কারণ, সুবর্ণ যেরূপ হারের উপাদান-কারণ, পৃথিবী যেরূপ পার্থিব বস্তুর উপাদান-কারণ, ঈশ্বরও সেরূপ জীবজগতের উপাদান-কারণ—অবশ্য ব্যবহারিক দিক থেকে এই হ'ল অন্যান্য বৈদান্তিকের ন্যায় শঙ্করেরও মত। অথচ, পারমার্থিক দিক থেকে, ব্রহ্ম কোন বস্তুই সৃষ্টি করেন না, তথাকথিত ও তথাদৃষ্ট সৃষ্ট বিশ্ব মায়াসৃষ্ট বস্তুর ন্যায়ই মিথ্যা। সেজন্য, উপরে উদ্ধৃত অংশে শঙ্কর সুনিপুণ ভাবে, সৃষ্টি সম্বন্ধে স্বমত ব্যক্ত করেছেন পারমার্থিক ও ব্যবহারিক উভয় দিক থেকেই এই তিনটি উদাহরণের সাহায্যে। অর্থাৎ, ব্যবহারিক দিক থেকে, ঈশ্বর যে বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্তা ও তার অভিন্ন উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ, অথচ, পারমার্থিক দিক থেকে, ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার ও বিশ্বপ্রপঞ্চ মিথ্যা মায়ামাত্র—স্বমতের এই সারার্থ শঙ্কর এস্থলে একই সঙ্গে বিবৃত করেছেন।

তৃতীয়তঃ, এস্থলে প্রধান কথা হ'ল এই যে, মৃত্তিকা ও ঘট, পৃথিবী ও পার্থিব বস্তু—এই দুটিকে পরিণামবাদের উদাহরণরূপে সাধারণতঃ গ্রহণ করা হলেও, শঙ্করের মতে, এ সকল ক্ষেত্রেও, প্রকৃতকল্পে পারমার্থিক দৃষ্টিতে কার্য কারণ থেকে ভিন্ন বস্তু নয়, কারণের সঙ্গে অভিন্ন, এবং কারণের কার্যে সত্যই পরিণতি হয় নি। এ সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হয়েছে। সেজন্য শঙ্কর তথাকথিত পরিণামবাদসম্মত উদাহরণ ও বিবর্ত-বাদসম্মত উদাহরণ একত্রে উদ্ধৃত করে এই কথাই বোঝাতে চাচ্ছেন যে, সমস্ত ক্ষেত্রেই ব্রহ্মই একমাত্র সত্য,—এমনকি, যে ক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে পরিণামবাদই সিদ্ধ হয়েছে বলে মনে হয়, সে ক্ষেত্রেও কেবল ব্রহ্মই আছেন, তাঁর কোন কার্য, বিকার বা বিভেদ নয়।

সেজন্য, বৃহদারণ্যকোপনিষদ-ভাষ্যেও (৩৷৫৷১) শঙ্কর একত্রে পরিণামবাদসম্মত ও বিবর্তবাদসম্মত উদাহরণ দিয়েছেন। এস্থলে পূর্বপক্ষীয় আপত্তি উত্থাপিত হয়েছিল যে, ব্রহ্মাতিরিক্ত নাম-রূপাত্মক উপাধি স্বীকার করলে, ব্রহ্মের একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্বের হানি হয়। উত্তরে শঙ্কর বলছেন—

"ন, সলিল ফেন-দৃষ্টান্তেন পরিহৃতত্বাৎ, মৃদাদিদৃষ্টান্তৈশ্চ। যদা তু পরমার্থদৃষ্ট্যা পরমাত্মতত্ত্বাৎ শ্রুত্যনুসারিভির্বস্ত্বেন নিরূপ্যমাণে নামরূপে মৃদাদি-বিকারবৎ বস্ত্বন্তরে তত্ত্বতো ন স্তঃ সলিল-ফেন-ঘটাদি-বিকারবৎ, তদা তদপেক্ষয়া একমেবাদ্বিতীয়ম্, 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' ইত্যাদি পরমার্থ-দর্শন-গোচরত্বং প্রতিপদ্যতে"। (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্-ভাষ্য ৩৷৫৷১)।

অর্থাৎ, জলের ফেনা প্রভৃতি যেমন জল থেকে স্বতন্ত্র বস্তু নয়, ঘট প্রভৃতি যেমন মৃত্তিকা থেকে স্বতন্ত্র বস্তু নয়, তেমনি নামরূপবিশিষ্ট বিশ্বপ্রপঞ্চও ব্রহ্ম থেকে স্বতন্ত্র, দ্বিতীয় বস্তু নয়। সেজন্য পারমার্থিক দৃষ্টিতে ও শ্রুতি অনুসারে পরমাত্মাকে বিচার করলে দেখা যায় যে, মৃত্তিকার বিকার ঘটাদি ও জলের বিকার ফেনার ন্যায়ই নামরূপবিশিষ্ট সংসার, স্বতন্ত্র, সত্য বস্তু নয়, এবং সেই দিক থেকেই ব্রহ্মকে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" প্রভৃতি বলা হয়েছে।

উপরে উদ্ধৃত অংশে সৃষ্টি ও লয় প্রসঙ্গে শঙ্কর পরিণাম-বাদসম্মত উদাহরণ দিলেও, সৃষ্টি ও লয় যে মিথ্যা, তা' তিনি এই ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায়েই অন্যত্র পৃথক ভাবেও প্রপঞ্চিত করেছেন। যেমন, ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে (২৷১৷১৪), পূর্বপক্ষীয় আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে যে, ব্রহ্ম যদি এক ও অদ্বিতীয় হন, তা' হলে তাঁকে প্রথম অধ্যায়ে (১৷১৷২) জগৎ-কারণ বলা হ'ল কেন? এর উত্তরে শঙ্কর বলছেন: সাংখ্য-সম্মত অচেতন প্রধান যে জগতের উপাদান-কারণ নয়, তাই প্রমাণ করবার জন্যই প্রথমে বলা হয়েছে যে, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় "নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বরূপ, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি" ঈশ্বর থেকেই হয়েছে, প্রধান থেকে নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে—

"অবিদ্যাত্মক-নামরূপ-বীজ-ব্যাকরণাপেক্ষত্বাৎ সর্বজ্ঞত্বম্। ...সর্বজ্ঞস্যেশ্বরস্যাত্মভূতে ইবাবিদ্যাকল্পিতে নামরূপে-তত্ত্বান্য-ত্বাভ্যামনির্বচনীয়ে সংসারপ্রপঞ্চ-বীজভূতে সর্বজ্ঞস্যেশ্বরস্য মায়া-শক্তিঃ প্রকৃতিরিতি চ শ্রুতি-স্মৃত্যোরভিলপ্যেতেত্যাভ্যামন্যঃ সর্বজ্ঞঃ ঈশ্বরঃ"। (ব্রহ্মসূত্র ২৷১৷১৪, শঙ্কর-ভাষ্য)

অর্থাৎ, সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টা ঈশ্বরকে অবিদ্যামূলক নামরূপ-

বীজ অথবা সংসার-বীজের প্রকাশের জন্যই কল্পনা করে নিতে হয়। এরূপে, ব্যবহারিক দিক থেকে, সৃষ্টি স্বীকার করলে, স্রষ্টাকেও স্বীকার করতে হয়। এই অবিদ্যাকল্পিত, সদসদবিলক্ষণ, অনির্বচনীয় সংসার-প্রপঞ্চের বীজস্বরূপ নামরূপ সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের আত্মভূত ; এবং শ্রুতি-স্মৃতিতে এই নামরূপকেই ঈশ্বরের "মায়াশক্তি", ও "প্রকৃতি" নামে অভিহিত করা হয়েছে।

ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শঙ্কর ভাষ্যের অপর এক স্থলেও (২।১।২৭), অপর একটি পূর্বপক্ষীয় আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে যে, নিরবয়ব ব্রহ্মের একাংশের বিশ্বপ্রপঞ্চে পরিণাম সম্ভব কি করে? এর উত্তরে শঙ্কর বলছেন যে, ব্রহ্মের সত্যই কোনোরূপ পরিণতিই হয় না, সেজন্য উক্ত আপত্তি অকিঞ্চিৎকর।

"নৈষ দোষঃ। অবিদ্যা-কল্পিতরূপভেদাভ্যুপগমাৎ। ন হ্যবিদ্যা-কল্পিতেন রূপভেদেন সাবয়বং বস্তু সম্পদ্যতে। ন হি তিমিরোপহত-নয়নেনানেক ইব চন্দ্রমা দৃশ্যমানোঽনেক এব ভবতি। অবিদ্যা-কল্পিতেন চ নাম-রূপ-লক্ষণেন রূপ-ভেদেন ব্যাকৃতাব্যাকৃতাত্মকেন তত্ত্বান্যত্বাভ্যামনির্বচনীয়েন ব্রহ্ম পরিণামাদি-সর্বব্যবহারাস্পদত্বং প্রতিপদ্যতে, পারমার্থি-কেন চ রূপেণ সর্বব্যবহারাতীতমপরিণতমবতিষ্ঠতে। বাচা-রম্ভণমাত্রত্বাচ্চাবিদ্যা-কল্পিতস্য নামরূপভেদস্য ন নিরবয়বত্বং ব্রহ্মণঃ কুপ্যতি। ন চেয়ং পরিণাম-শ্রুতিঃ পরিণাম প্রতি-পাদনার্থা, তৎপ্রতিপত্তৌ ফলানবগমাৎ। সর্বব্যবহারহীন-ব্রহ্মাত্ম-ভাবপ্রতিপাদনার্থা ত্বেষা, তৎপ্রতিপত্তৌ ফলাব-গমাৎ।" (ব্রহ্মসূত্র—২।১।২৭, শঙ্কর-ভাষ্য)।

অর্থাৎ, নিরবয়ব ব্রহ্মের একাংশে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিণতি অসম্ভব বলে যে আপত্তি উত্থাপিত হয়েছিল, তা এক্ষেত্রে প্রযোজ্যই নয়, যেহেতু—রূপভেদ অথবা বিশ্বচরাচর অবিদ্যা-কল্পিতই মাত্র, পারমার্থিক তত্ত্ব নয়। সেজন্য বিশ্বপ্রপঞ্চ কেবল অবিদ্যা দ্বারাই কল্পিত বলে, তা ব্রহ্মের অংশও নয়, একাংশের পরিণামও নয়, এবং ব্রহ্ম এই কারণে সাবয়বও হয়ে পড়েন না। যেমন, চক্ষুরোগগ্রস্ত ব্যক্তি এক চন্দ্রের স্থলে বহু চন্দ্র দর্শন করলে, চন্দ্র সত্যই বহু হয়ে পড়ে না, তেমনি নিরবয়ব, নির্বিকার ব্রহ্মকে জীবজগতে পরিণতরূপে বহু বলে' দর্শন করলেও তিনি কোনোদিনও বহু বা পরিণাম-শীল হন না। এরূপে, অবিদ্যা-কল্পিত, প্রলয়কালে অব্যক্ত ও সৃষ্টিকালে ব্যক্তরূপ, সদসদবিলক্ষণ, অনির্বচনীয় নাম-রূপ বা বিশ্বপ্রপঞ্চের জন্যই ব্রহ্মকে ব্যবহারিক দিক থেকে পরিণামশীল বলে বোধ হয়। কিন্তু পারমার্থিক দিক থেকে তিনি সাধারণ ব্যবহারিক জীবনের ঊর্দ্ধে ও অপরিণামী। সেজন্য কেবল বাক্যমাত্র যে নামরূপভেদ বা বিশ্বসংসার, তার জন্য ব্রহ্মের নির্বিকারত্ব ও নিরবয়বত্বের বিন্দুমাত্র হানি হয় না। বস্তুতঃ, যে সকল শ্রুতিবাক্যে পরিণামবাদ প্রপঞ্চিত হয়েছে বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, তাদের তাৎপর্য সত্যই তা নয়, অর্থাৎ, পারমার্থিক দিক থেকে পরিণামবাদ গ্রহণীয় নয়, কারণ এরূপ ভেদাভেদ মোক্ষ-বিরোধী। সেজন্য সেই সকল শ্রুতিতে প্রকৃতপক্ষে পারমার্থিক ব্রহ্মতত্ত্বই প্রপঞ্চিত হয়েছে।

এরূপে, শঙ্কর বারংবার স্পষ্টতমভাবে বলেছেন যে, সৃষ্টি বা ব্রহ্মের পরিণাম বা পারমার্থিক তত্ত্ব নয়—অবিদ্যা-কল্পিত, অধ্যাসমূলক, মায়াজনিত, মিথ্যা প্রতীতিই মাত্র।

একই ভাবে, লয়ও পারমার্থিক তত্ত্ব নয়—অবিদ্যামূলক, মায়িক প্রতীতি। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে (২।১।৯) একটি পূর্বপক্ষীয় আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে যে, প্রলয়কালে কার্য কারণে বিলীন হয়ে যায় ; সেক্ষেত্রে অশুদ্ধ সংসারও প্রলয়কালে শুদ্ধ ব্রহ্মকে দূষিত করে তোলে। এর উত্তরে শঙ্কর বলছেন যে, পারমার্থিক সৃষ্টিই যখন নেই তখন সৃষ্ট জগৎ ব্রহ্মকে দূষিত করতে পারে না।

"অস্তি চায়মপরো দৃষ্টান্তঃ। যথা, স্বয়ং প্রসারিতয়া মায়য়া মায়াবী ত্রিষ্বপি কালেষু ন সংস্পৃশ্যতে, অবস্তুত্বাৎ, এবং পরমাত্মাপি সংসারমায়য়া ন সংস্পৃশ্যতে। যথা চ স্বপ্নদৃগেকঃ স্বপ্নদর্শন-মায়য়া ন সংস্পৃশ্যতে, প্রবোধ-সম্প্রসাদয়োরনন্বগত-ত্বাৎ, এবমবস্থাত্রয়-সাক্ষ্যেকোঽব্যভিচার্যবস্থাত্রয়েণ ব্যভি-চারিণা ন সংস্পৃশ্যতে। মায়ামাত্রং হ্যেতৎ পরমাত্মনোঽবস্থা-ত্রয়াত্মনাবভাসনং রজ্জ্বা ইব সর্পাদিভাবেনেতি।" (ব্রহ্মসূত্র ২।১।৯, শঙ্কর-ভাষ্য)।

অর্থাৎ, যেমন মায়াবী বা ঐন্দ্রজালিক কোনোদিন স্বপ্রসারিত মায়াজাল দ্বারা স্বয়ং স্পৃষ্ট হন না, যেহেতু মায়া-সৃষ্ট বস্তু সত্যই বস্তু নয়—তেমনি পরমাত্মাও সংসার-মায়া দ্বারা স্পৃষ্ট হন না। যেমন, স্বপ্নদর্শী স্বাপ্নিক মায়ায় স্পৃষ্ট হন না, যেহেতু তিনি জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি কালেও বিরাজ করেন—তেমনি এই তিন অবস্থাদর্শী অপরিবর্তিত পরমাত্মা সেই সকল পরিবর্তনভাগী অবস্থার দ্বারা স্পৃষ্ট হন না।

এরূপে, শঙ্কর তাঁর ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে, এবং অন্যান্য গ্রন্থেও বারংবার বিশেষ জোরের সঙ্গে এই তত্ত্বই প্রপঞ্চিত করেছেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সকলই অবিদ্যাপ্রসূত ও মিথ্যা মায়ামাত্র।

মাণ্ডুক্যোপনিষদকারিকা-ভাষ্যেও শঙ্কর বারংবার মায়াবাদ প্রপঞ্চিত করেছেন ঃ যথা, আগম-প্রকরণ, ১।১৪, ১৬, ১৭ ; বৈতথ্য-প্রকরণ ২।১২, ১৮, ১৯ ; অদ্বৈত-প্রকরণ ৩।২৭।২৯ প্রভৃতি)। যেমন—

"মায়ামাত্রমিদং দ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ"—

(গৌড়পাদকারিকা ১।১৭)।

এই শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্কর বলছেন—

"রজ্জ্বাং সর্প ইব কল্পিতত্বাৎ ন তু স (প্রপঞ্চো) বিদ্যতে। .... তথেদং প্রপঞ্চং মায়ামাত্রং দ্বৈতং, রজ্জুবৎ মায়াবিবচ্চ অদ্বৈতং পরমার্থতঃ।"

অর্থাৎ, রজ্জুতে সর্পের ন্যায়, প্রপঞ্চ ব্রহ্মে কল্পিত হয়েছে, সেজন্য প্রপঞ্চ বিদ্যমান নেই। বস্তুতঃ, প্রপঞ্চ বা দ্বৈত মায়ামাত্র, ব্রহ্ম বা অদ্বৈত পারমার্থিক সত্য, যেমন রজ্জু সত্য, কিন্তু সর্প মিথ্যা ; মায়াবী সত্য, কিন্তু মায়াসৃষ্ট বস্তু মিথ্যা।

পুনরায়—

"সতো হি মায়য়া জন্ম যুজ্যতে ন তু তত্ত্বতঃ"

(গৌড়পাদকারিকা, অদ্বৈত-প্রকরণ ৩।২৭)

এই শ্লোকটির ভাষ্যে শঙ্কর দুটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন ঃ

"যথা সতো মায়াবিনো মায়য়া জন্মকার্যং, এবং জগতো জন্মকার্যং গৃহ্যমাণং মায়াবিনমিব পরমার্থং সত্তমাত্মানং জগজ্জন্ম মায়াস্পদমেব গময়তি।

"অথবা, সতো বিদ্যমানস্য বস্তুনো রজ্জ্বাদেঃ সর্পাদিবৎ মায়য়া জন্ম যুজ্যতে, ন তু তত্ত্বত এবাজস্য আত্মনো জন্ম।"

অর্থাৎ, যেমন সৎ মায়াবী থেকে মায়ার জন্ম, তেমনি সৎব্রহ্ম থেকে জগতের জন্ম।

অথবা, সৎ বা বিদ্যমান বস্তুর কেবলমাত্র রজ্জু থেকে সর্পের সৃষ্টির ন্যায় মায়িক জন্মই হতে পারে ; পারমার্থিক জন্ম নয়, যেহেতু অজ বা জন্মরহিত বস্তুর জন্ম অসম্ভব, এবং জীবজগৎ অজ।

এ সম্বন্ধে আরো আলোচনা পরে করা হবে।
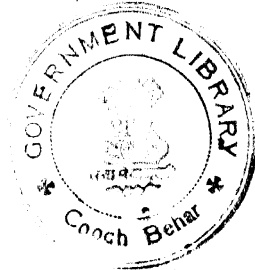
অপ্রত্যাশিত

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

সে দিন নিশীথে পারিনু বুঝিতে
মধু হতে তুমি কতো মধুর,—
তুলি গুণ্ঠন চুম্বন ধন
লুণ্ঠিত যবে বিরহাতুর!
এতো দিন সুধাসাগর বেলায়
ক্ষুধা নিয়ে বৃথা ছিনু বসি' হায় ;
নিম্বের স্বাদে তিক্ত রসনা ;—
দ্রাক্ষার রস ছিল সুদূর!
কহো কুহকিনী, আঁখির আড়ালে
এ রূপপুঞ্জ ছিল কোথায় ?
ভুঞ্জিতে চায় বঞ্চিত হিয়া
গুঞ্জি' মঞ্জু মধুপপ্রায়!

সারাটি প্রহর কাজের নেশায়
দূর হতে শুধু দেখেছি তোমায় —
ফেলি' কাঞ্চন অভাজনসম
কাঁচের খণ্ড কুড়াই হায়!
এতো সঞ্চয়—তবু নিঃস্বতা
রহিয়াছে ঘিরি' চিরজীবন,
থাকিতে সিন্ধু বিন্দুর লাগি'
করি নাই কভু আকিঞ্চন!
আজি অফুরান এ তোমার দান
কোথা রাখি ভেবে নাহি পায় প্রাণ,
এতো সুখ—একি সহিবে কপালে ?—
তাই ভেবে কাঁদে উতল মন!

অদৃশ্য রঙ

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

ব্যাপারটা অদৃষ্টেরই কৌতুক বলে বোধ হ'ল গোপেনের। কোথায় বাংলা দেশের অখ্যাত এক গ্রাম রঘুনাথপুর—আর কোথায় বিংশ শতাব্দীর সুখস্বাচ্ছন্দ্য-লালিত একটি আধুনিক শহর দেরাদুন। পাতাল আর স্বর্গ—মাঝখানে মর্ত্যের ব্যবধানটা দুরতিক্রম্য। অথচ সে ব্যবধান অতিক্রম করে যেতেই হবে গোপেনকে, ডাক পাঠিয়েছে শীলা।

শীলা জন্মান্তরে ছিল শৈল। সে যে বেলেডাঙ্গা গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র যেতে পারে এ-কল্পনা কেউই করে নি।

রঘুনাথপুর আর বেলেডাঙ্গার মধ্যে একটি মাত্র বড় মাঠের ব্যবধান। রীত-চরিত্তে দুটি গ্রামই ভিন্ন গোত্রের। রঘুনাথপুরের স্বল্পবসতি ঘিরে অফুরন্ত মাঠ, আউশ ধান আর আনাজপাতির সম্পদ নিয়ে গৃহস্থেরা সচ্ছল, আর বেলেডাঙ্গায় চারিদিকে খটাখট তাঁতের শব্দ। শান্তিপুরী বস্ত্রশিল্পের বনিয়াদি ধরণ-ধারণটুকু এরাও রপ্ত করে নিয়েছে। পাড়ের বৈচিত্র্য কম, কিন্তু ঠাসবুননি জমিনের খ্যাতি বাংলা জোড়া। এ গ্রামের বাসিন্দারা জাতিতে না হলেও, পেশাতে প্রায় সকলেই তন্তুবায়। বসু উপাধিধারী শৈলরাও তেমনি—তাঁতকে উপজীবিকা করে ওদের সংসার চলে।

রঘুনাথপুর চাষী-প্রধান গ্রাম হলেও দু' ঘর বসু—আর এক ঘর মিত্র ছিলেন। মিত্ররা বহু বিঘা জমিতে লেবু, কলা, আনারস আর পেঁপের চাষ করে সচ্ছলভাবে দিনাতিপাত করতেন।

গোপেন মিত্রবংশের একমাত্র সন্তান। ছেলেবেলা থেকেই ডানপিটে, দুর্দান্ত। রঘুনাথপুরে কোন ইস্কুল ছিল না—প্রত্যহ বেলেডাঙ্গার উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তে যেত। মাঝখানের মাঠটা ওর মতই দুরন্ত—একটু ঘুরেও যেতে হয়। কাজেই সকালে ভাত খেয়ে গেলেও মাঝখানে কিছু খাওয়ার প্রয়োজন হয়। মিত্রদের অতি দূর-সম্পর্কের আত্মীয় ছিলেন বসুজা—তাঁরাই ছেলেটির জলখাবারের ভারটা স্বেচ্ছায় ও সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন।

শৈলও কাছাকাছি একটা মেয়ে ইস্কুলে পড়ত। ইস্কুলটা আগে চালাত পাদ্রী মেয়েরা। তারা সহবৎ শেখাত, সেলাই শেখাত, ত্রাণকর্তা যীশুর ভজনা-গান গাওয়াত। এইভাবে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যাবার যতকিছু কলা-কৌশল—সবই প্রয়োগ করত ছাত্রীদের উপর। দু' একটি মেয়ে আলোকপ্রাপ্ত হব-হব-কালে গ্রামবাসীদের কাছে ব্যাপারটা স্পষ্ট হ'ল। তার ফলে বিশ্রী একটা ব্যাপার ঘটে গেল, মেমরা তল্পী-তল্পা গুটিয়ে চম্পট দিলে। ইস্কুলটা কিন্তু পাঁচজনের সুবন্দোবস্তের ফলে রয়ে গেল। এটা অবশ্য উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের সোপান মাত্র। তা হোক—বুদ্ধিমতী মেয়ে শৈল শিক্ষার সোপান বেয়ে তাড়াতাড়ি উপরে উঠতে লাগল।

শুধু মুখে চোখে বুদ্ধির দীপ্তি নয়—নিখুঁত গড়ন, ভাসন্ত চোখ, দুধে-আলতা রং—সবকিছু মিলিয়ে শৈল সুন্দরী ও প্রাণময়ী মেয়ে। জ্যাকার্ড কলে একশো দু'শো ডাঙ্গির কাপড়-বোনার খটাখট শব্দের মাঝেও যেন একটি সঙ্গীতের সুর। অনেকেই ভবিষ্যদ্বাণী করত, এ মেয়ে তোমার রাজরাণী হবে বোসজা !

বোসজার মনেও একটি আকাঙ্ক্ষা ছিল। কোথায় কোন্ রাজ্যে ধীরে ধীরে লালিত হচ্ছে রাজপুত্র—সে চিন্তা করেন নি তিনি। তাঁর মনে গোপেন ছেলেটি খানিকটা রঙ ধরিয়েছিল। দুরন্ত স্বাস্থ্যবান ছেলে—সম্পন্ন ঘরের একমাত্র সন্তান—সত্যকার একটি সিংহাসনে বসবার সৌভাগ্য না হলেও চাষী-গ্রামের সেরা গৃহস্থ মুকুটহীন রাজাই তো মিত্রজা। দায়ে-অদায়ে সবাই ছুটে আসে ওঁর কাছে, পরামর্শ নেয়, দেবতার মত মান্য করে, ভালবাসে আত্মীয়ের মত। ওঁর সঙ্গে আত্মীয়তা গড়ে ওঠা সৌভাগ্যেরই কথা।

ইস্কুলের শিক্ষা শেষ হবার মুখে একদিন কথাটা পাড়লেন মিত্রজার কাছে।

মিত্রজা বললেন, এ আর বেশী কথা কি। মনে করেছি ছেলেটাকে উচ্চ-শিক্ষা দেব। শিক্ষা দিয়ে অবশ্য গ্রামেই রাখব। যদি কোনদিন সরকারের দৃষ্টি পড়ে কৃষির উন্নতির দিকে, এই গ্রামে কি কাছে-পিঠে একটা কৃষি-কলেজ হয়—সেই কলেজে ও প্রফেসার হবে। রাজার কাছে মান্যটাও তো চাই ভাই !

তা হলে শুভ কাজটা আগে হয়ে গেলেই ভাল নয় ?

এ বিষয়ে আমার ভিন্ন মত ভাই। কৈশোরে ছেলেরা রোমান্টিক হয়—নানা দিকে নানা শোভা দেখে গন্ধ শুঁকে চঞ্চল হয়—এ ছাড়াও সহজাত প্রবৃত্তিটি বড় কম নয়। আমার আঠারো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল, সেই বয়সে দুর্গেশনন্দিনী, দেবী চৌধুরাণী পড়া শেষ হয় আর নিজেকে জগৎসিংহ, ব্রজেশ্বর কল্পনা করতে সুরু করি। বাবা ছিলেন কড়া প্রকৃতির লোক, বাস্তব নিয়ে ছিল তাঁর কারবার। হাল-বলদ কাস্তে-বিদে জল-কাদা জোঁক কেন্নই আকাশের চেহারা আর মাটির রং এই সমস্ত চিনে চিনে পাকা চাষী হয়েছিলেন—যার দৌলতে এত বোলবোলাও। বই দু'খানা কেড়ে নিয়ে পিঠে লাগিয়েছিলেন কড়া বেত, কানে ধরে নামিয়েছিলেন কাদা-ভরা ক্ষেতে—সেই থেকে সবুজের সঙ্গে বন্ধুত্ব। ঐ বয়েসটা বিশ্রী ভাই—স্বপ্ন দেখার ইন্ধন যোগাবে না এ সময়। তবে কথা

দিচ্ছি—ছেলে কৃতী হয়ে এলে—শৈল মাকে এই ঘরের লক্ষ্মী করেই আনব।

×

গোপেন সেই বয়স থেকেই স্বপ্ন দেখতে সুরু করেছিল। ঠিক শৈলকে নিয়ে নয়—অবসরকালে একটি লাবণ্যবতী কাল্পনিক মেয়ের ছবি মাঝে মাঝে উঁকি মারত মনে, কখনও কবিতা আবৃত্তির সঙ্গে চকিত বিদ্যুৎ-রেখায় উদ্ভাসিত হ'ত দিগন্ত। এক-এক দিন আবেশ-ভরা চাহনি নিয়ে চাইত শৈলর দিকে। ভাবত—এমনি একটি মেয়ে যদি সঙ্গিনী হয়—মন্দ কি! কিন্তু শৈলর সে সম্পর্কটা অন্য ধরণের। প্রণয়ের অঞ্জন তখনও আঁখিপল্লবে ক্ষীণ রেখা টানেনি। নিত্য দেখা ও সাধারণ আলাপের মাধ্যমে সে জিনিষকে ধরাও কঠিন।

এই ভাব বেশী দিন অশরীরী রইল না—সেও মফঃস্বল শহরে চলে গেল কলেজে পড়তে—এবং কিছুদিন পরে ফিরে এল পূজার ছুটিতে, তখনই অভাবের নিকষ-পাথরে এর প্রথম সোনায় কষটি রেখাপাত করল। একটি দিনের ঘটনা তখনও জ্বলজ্বল্‌ করছে।

বিদ্যাপতি-বর্ণিত বয়ঃসন্ধি-সঙ্কটাপন্ন শ্রীরাধিকার সঙ্গে সেদিন আশ্চর্য্যভাবে মিলে গেল শৈল।

তখন অপরাহ্নবেলা। আশ্বিনের খাটো দিনে হিমের আবিলতা জমেনি—পরিপূর্ণ নীল আকাশ অনেকখানি উঁচুতে উঠেছে—আর ভাস্বর দেখাচ্ছে।

দেখা হ'ল শৈলর সঙ্গে। নাতিদীর্ঘ প্রবাসবাসের পর প্রথম দেখা—অথচ ওকে দেখে শৈল আগেকার মত আবেগে উদ্বেল হয়ে উঠল না। গায়ের কাপড়খানা টেনেটুনে শালীনতায় সুষ্ঠু হয়ে একপাশ ঘেঁষে মুখ হেঁট করে দাঁড়িয়ে শুধু বলল, ভাল আছেন গোপেন-দা?

গোপেন চাইল ওর দিকে, বেশীক্ষণ চেয়ে থাকতে পারল না। সেই শৈল—কয়েকটি মাসে নূতন একটি মূর্ত্তি নিয়েছে। অপরিচয়ের পটভূমিটি বিস্তৃত হয়েছে, অথচ অন্তরঙ্গতার আকাশে রঙ হয়েছে ঘন। সে রঙ বিচিত্র নয়, তবু কল্পনা-জগৎকে বৈচিত্র্যে ভরিয়ে দিতেও পারে। দিলেও ভরিয়ে।

বেশী কথা বলল না শৈল—গোপেনের কথা শুনে গেল। গল্প করতে করতে উৎসাহের জোয়ার এলো। সারা পথ ভাবলে শৈলর কথা।

তারপর কয়েকবার রূঢ় আলোকপাত হ'ল বাস্তব-ক্ষেত্রে। প্রথম শৈলর বাবা যখন অকস্মাৎ মারা গেলেন। তখন কলেজের পরীক্ষা আসন্ন—খবরটা শুনেও দেশে ফেরা হয়নি—একখানা চিঠি দিয়েছিল শৈলকে। সেইটিই প্রথম চিঠি, শেষও। বিপন্ন শৈলর ছলছল চোখ দুটি মনে পড়ে বুকটা হু হু করেছিল কেবলই। কিন্তু বেশী কথা লিখতে পারেনি পত্রে। মনে যে ভাব জেগেছিল—ভাষায় তা যথাযথ প্রকাশ করা মানেই ত নাটকীয়তা। সে দুঃসহ লজ্জা থেকে তার অপটু লেখনীই তাকে রক্ষা করেছিল। গোপেন লিখেছিল, খবরটা পেয়ে পর্য্যন্ত কিছুই ভাল লাগছে না, ইচ্ছে হচ্ছে তোমাদের ওখানে যাই, কিন্তু পরীক্ষা আসন্ন। পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে···

এমনি দু'একটি কথা · সব মনে পড়ে না। বিপদটা তারও কম ঘটেনি। পরীক্ষান্তে বাবার কাছ থেকে জোর তলব এল। তখন বৈশাখ মাস। নূতন বছর অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এসেছে। প্রায় প্রত্যেকটি গাছে নবজীবনের সঙ্কেত—প্রকৃতি হরিৎবসনা। দিনে অসহ্য উত্তাপ, রাত্রির আকাশে অপরূপ দীপালী-সজ্জা। পুরাতনকে দগ্ধ করে নূতনকে প্রকাশ করার ত্বরা সর্ব্বত্র। বাবাও জানালেন নবজীবন-প্রবেশমুখের বার্ত্তা। মন নেচে উঠল—এত দিনে বুঝি সার্থক হতে চলেছে স্বপ্ন।

ওদিকে যাওয়া উচিত নয়—তবু পায়ে পায়ে বেলেডাঙ্গার দিকেই গেল গোপেন। ফিরে এল ভাঙা মন নিয়ে। মাত্র দুটি মাসে একি পরিবর্ত্তন! শৈলরা দেশ ছেড়েছে। কে ওর নিকট-আত্মীয় আছেন কলকাতায়—সেইখানে চলে গেছে। প্রতিবেশীরা কেউ ঠিকানা দিতে পারল না। শুধু বলল, আত্মীয়টি রীতিমত ধনী। শৈলর মা চিঠি লিখে সাহায্য-প্রার্থনা করেছিলেন। সেই বাড়ীর একটি প্রৌঢ় এসেছিলেন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। কাজকর্ম্ম মিটলে তিনিই ওঁদের নিয়ে গেছেন। গ্রামবাসীরা ওঁর জীপখানা দেখেছে—সঙ্গের চাকরটির মুখে শুনেছে বাবুর ঐশ্বর্য্যের কাহিনী। কে জানে, শৈলর ভাগ্যে হয়ত বা রাজপাটই নির্দ্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন বিধাতা পুরুষ।

যথাকালে গোপেনের বিয়ে হয়ে গেল। দান-সামগ্রী যা এল সেও তুচ্ছ করবার মত নয়—নগদ টাকার কিছুটা খরচ করে বাবা পঞ্চাশ বিঘে ভাল জমি কিনে ফেললেন। হিসাবী মানুষ তিনি।

এ সব খবর বিয়ের পরে পেয়েছিল গোপেন, তখন ত হাতের তীর ছুটে গেছে। বাপের অন্নে লালিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবার সাহস ওর ছিল না। ক্ষুব্ধ হয়েছিল বইকি, মনে জমেছিল গ্লানি—অপরাধ না করেও অপরাধী হওয়ার বেদনা।

শৈলর মা পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে একখানি পত্র দিয়েছিলেন মিত্রজাকে। পত্রখানি আজও ফাইলে গাঁথা আছে। মিত্রজার উত্তরটি অনুমান করে নিয়েছিল গোপেন; কার্য্য-কারণের হেতু এখানে অস্পষ্ট নয়।

তারপর দীর্ঘদিন। আলো নয়—অন্ধকারও নয়, দিনও নয় রাত্রিও নয়, অখণ্ড কালকে ভাগ ভাগ করে দিনে সপ্তাহে পক্ষে মাসে যে অয়নগতির চক্র আবর্ত্তিত হয়েছে, তার সঙ্গে না চলে উপায় ছিল না। সুতরাং গোপেন থামে নি। স্রোতে ভেসে গেছেন মা—ভেসে গেছেন বাবা, ভেসে এসেছে বিষয়-সম্পত্তি—নূতন পরিজন—স্নেহ-মায়ায় গ্রন্থি পড়েছে পর পর। সব চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা—এই সুদীর্ঘ সময়ে শৈলর কথা ভেবে মন খারাপ

হয় নি। প্রথম প্রথম অবশ্য কাউকে ভাল লাগত না, নূতন বউকে পর্য্যন্ত নয়, অভ্যাসের বশে এরাও সয়ে গেছে। শুধু সয়ে যায় নি—আশ্চর্য্য ভাবে মিশে গেছে জীবনে। বাড়ীঘর ক্ষেত-খামার—খন্দ-কুটো স্ত্রী পুত্র পরিবার সবই এক সুরে বাঁধা। এখন সংসারে শিকড় নামিয়েছে গোপেন—জমির সঙ্গে জীবন আর জীবনের সঙ্গে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা। কোথাও ফাক নাই এতটুকু।

দীর্ঘ দশ বছর পরে শৈল পত্র দিয়েছে। শৈল এখন শীলা। অখ্যাত গ্রামের মেয়ে নয়, অভিজাত শহরের মহিলা। বিপন্ন হয়ে ডাক পাঠিয়েছে শীলা। একদিন ওর বিপদে সান্ত্বনা দেবার জন্য মন যে ভাবে উতল হয়েছিল—আজ সেই পরিমাণ তীব্রতা না থাকলেও—পুরাতন তারে কিছুক্ষণের মত আঘাত এসে লাগল যেন।

কার্ত্তিকের প্রথম, ক্ষেত-খামার ফেলে যাওয়া কি এতই সহজ! সেদিন কলেজের পরীক্ষা যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল, আজকের বাধা তার চেয়ে কম নয়। কার্ত্তিকে রবিশস্যের খবরদারি করা একান্ত আবশ্যক। কলাই-এর চারা অবশ্য বড় হয়েছে—মুগের অঙ্কুর সবে দেখা দিয়েছে। খেসারি মটর মসুর ছোলা এসব বুনবার সময় হ'ল। বেগুনের ক্ষেতে মাটি আলগা করে ঘাস-আগাছা উপড়ে ফেলতে হবে, লাউ আর সীম-শসার মাচায় শক্ত বাঁধন না দিলে ফলন্ত লতার ভার সইবে কেমন করে। মূলো, লঙ্কা আর পালং যা-তা করে লাগিয়ে দিলে চলে না। ট্যাড়স শেষ হয়েছে—বরবটি প্রায় পেকে গেছে—এখন বাঁধাকপির ক্ষেতে উঠেপড়ে লাগতে হবে। ফুলকপি ভাল হয় না এ জমিতে, সে চেষ্টাও করে না গোপেন। এ ছাড়া কার্ত্তিকশালের ধান পেকেছে, কাটার ব্যবস্থা না করলে পাখীতে নষ্ট করবে, ঝড়ে ভূমিশায়ী হবে, যাকে বলে পাকা ধানে মই—সেই অবস্থা।

শীলা লিখেছে :

বড় বিপন্ন আমি—তোমার সাহায্য চাই গোপেনদা। না এলে অতান্তরে পড়ব।

অতএব না গিয়ে উপায় নাই।

কৌতূহল জেগেছে মনে—সেই শীলা! অর্থ-সম্পদের শিখরে বসেও গোপেনকে তার প্রয়োজন হ'ল কেন, কে জানে! গোপেন ত প্রায় ভুলেই গেছে। সংসারের স্রোত একটানা সম্মুখের পানে, পিছন ফিরে চাইবার যো কি! কিন্তু চাইতে হ'ল ফিরে। ক্ষেত-খামারের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করে গোপেন রওনা হয়ে গেল দেরাদুনে।

*

দু'জনের দৃষ্টিতেই বিস্ময়।

গোপেনের রোদে জলে পাক-করা চেহারা দেখে শীলা ভাবছে—কে এ? গ্র্যাজুয়েট কিশোরের মুখেচোখে শিক্ষার জলজলে ছাপটা গেল কোথায়? সেই কমনীয় কান্তি, মিষ্ট হাসি?

গোপেন ভাবছে, শৈলর কিছুমাত্র অংশ ত এর মধ্যে নাই। আপাদমস্তক নগর-সভ্যতার পালিশে মুড়ে এ কোন্ বিদুষী মহিলা তার সামনে দাঁড়িয়ে পুরাতন দিনকে নূতন পরিচয়ের আলোতে স্পষ্ট করে তুলতে চাইছে! একে ত কোনদিন স্বপ্নেও কল্পনা করে নি গোপেন। এই টেবিল-চেয়ার-ডিভান-সেটি-সোফা সজ্জিত ড্রয়িংরুম—টেবিলে শ্বেত-পাথরের ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি, টিপয়ে সোনার জলে নাম লেখা ইংরেজ কবির কাব্য-গ্রন্থাবলী, এক ধারে দামী রেডিও সেট—অন্য কোণে বৃহৎ পিতল-ভাসে গোলাপঝাড়, মিষ্ট গন্ধে মোহসঞ্চার হচ্ছে। এখানে আর এক পৃথিবী—মাটির পৃথিবী সে নয়। আধুনিক কালের পৃথিবীতে মাটি মহার্ঘ্য, সংস্কৃতির পালিশটা চড়া, ষ্টাইল উগ্রগন্ধী চুরুটের মত সবকিছুকে আচ্ছন্ন করে স্বপ্রকাশ। এর মধ্যে শীলাকে মানিয়েছে, শৈলকে ভাবাই যায় না।

প্রথম সঙ্কোচ ও বিস্ময় কাটলে শীলা বলল, বিশ্রাম করুন—এর পরে কথা হবে। ফিরবার তাড়া নেই ত? থাকলেও শুনব না।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, উনি অর্থ সঞ্চয় করেছেন প্রচুর, খ্যাতি-প্রতিপত্তিও যথেষ্ট কুড়িয়েছেন, শুধু আপনার লোককে কাছে টানতে পারেন নি। তাই ওঁর অবর্ত্তমানে বিপদে পড়েছি। অবশ্য বলতে পারেন—যার অর্থ আছে—তার বিপদ কি! সুস্থ হোন—সবই শোনাব।

প্রাথমিক চা-পর্ব্ব শেষ হ'লেও কোন কথা জানাল না শীলা। শুধু বলল, টেবিলে ডিনার খেতে আপত্তি নেই ত? শীতের দেশ বলে—

না না—ওতে আর অসুবিধে কি? গোপেন হাসল।

আর একটা কথা, একটু থেমে শীলা বলল, অবশ্য সেটা বিংশ শতাব্দীর কোন মানুষকে জিজ্ঞাসা করাই মূঢ়তা। এখন দেশেও কোন সমাজ নাই—সমাজপতিরাও পাঁতি দিতে পারেন না, তবু মানুষের মনের মধ্যকার ছুৎমার্গের খুঁত-খুতুনিটা একেবারেই ঘোচে না ত। মানে আমাদের সংসার প্রকৃতপক্ষে বয়-বাবুর্চ্চিরাই চালায়, তারা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণসন্তান নয়—

হোটেলে খাওয়া অভ্যাস আছে আমার। গোপেন অভয় দিলে শীলাকে। জমিজমার ব্যাপার নিয়ে প্রায়ই যেতে হয় মফঃস্বল শহরের কোর্টে, সেখানে হোটেলের অন্ন গ্রহণ করতে হয়।

সে ত বিশুদ্ধ হিন্দু হোটেল। শীলা হাসতে হাসতে জবাব দিল। এখানে সবটাই শুদ্ধির ব্যাপার।

গোপেন জবাব না দিয়ে হাসতে লাগল।

শীলা বলল, যাক নিশ্চিন্ত, বিশ্রাম করুন।

কিন্তু যে জন্য ডেকে আনিয়েছ—

ব্যস্ত কি, হিমালয়ের শোভাটাই কি হেলাফেলার জিনিস! কত মানুষ বেড়াতে এসে এখানে আজীবন কাল থেকে গেছে, দু'দিন বিলম্ব না হয় হ'লই। জানালা বন্ধ করে দিচ্ছি, রেষ্ট নিন।

চোখ বুজলেই যদি বিশ্রাম নেওয়া যেত! গোপেন ভাবতে লাগল। হিমালয়ের সৌন্দর্য্য মনকে টানে সত্য, কিন্তু মনের টান যে দেশের মাটিতেই—সে খবর শীলা জানবে কেমন করে? কাদা-দুরন্ত জীবন এখানকার। মাঠে-বিলে রোদে-জলে পরিশ্রমের মূল্য যে জীবনকে প্রতি দণ্ডে অনুভব করে গোপেন—হিমালয়ের সৌন্দর্য্য-স্বাদে তা কেমন করে স্বাদু হয়ে উঠবে! এ শুধু দৃষ্টির সামনে ভাসা সৌন্দর্য্যের স্রোত—একটানা বয়েই চলেছে—মনের আঙিনায় আসন পেতে বসবার ফুরসুত এর নাই। সমস্ত পরিবেশটাই এইটুকু সময়ের মধ্যে কৃত্রিম লাগছে।

টেবিলে একসঙ্গে ডিনার খেতে বসেও এই ভাবটা গেল না। শীলার গল্পের ভাণ্ডার অফুরন্ত—গোপেনের মনের কপাট অর্গলাবদ্ধ। এই ভোজন ও আলাপ কৃত্রিমতার গণ্ডী ভাঙতে পারল না। কিন্তু আসল কথাটা কি শীলার? হাজার মাইল পথ ভেঙে কাজকর্ম্মের ক্ষতি করে এই ছেলে-ভুলানো গল্প শুনতে আসে নি গোপেন।

রাত্রিতেও কিছু বলল না শীলা। বৈকালে দেরাদুনের চমৎকার রাস্তা দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে অতীত জীবনের দুই-একটি কাহিনী মাত্র শুনিয়েছে। শীলার স্বামী ওকে বিদুষী করবার জন্য যথাসাধ্য করেছেন—পরিশ্রম তাঁর নিষ্ফল হয় নি। সংসার চালনার ভার শীলার হাতে ছিল, কিন্তু উপার্জ্জনের সব সূত্রের সন্ধান রাখত না শীলা। তাতে অসুবিধা কিছু হয় নি এতকাল—এখন জানা প্রয়োজন হয়েছে।

বেড়াতে বেড়াতে ওরা বাস-ষ্ট্যাণ্ডের কাছে এসে পড়ল। সন্ধ্যার ধূসর ছায়া নামতে-না-নামতে সামনে পিঠ-উঁচু পাহাড়টায় দীপান্বিতার উৎসব সুরু হ'ল।

বাঃ—চমৎকার! গোপেন মুগ্ধকণ্ঠে বলে উঠল।

ওটা মুসৌরি যাবার রাস্তা—পাহাড়টার নাম ক্যামেলস ব্যাক। আসছে সপ্তাহ নাগাদ মুসৌরি যাওয়া যাক্—কি বলেন?

গোপেন বলল, মন্দ কি। চল এবার ফেরা যাক্।

সেকি—আর একটু থাকুন। অন্ধকার হলে আরও ভাল লাগবে।

গোপেনকে থাকতে হ'ল। অন্ধকার ঘন হ'ল, কিন্তু উজ্জ্বলতর আলোর ফুল তাকে মুগ্ধ করতে পারল না। ও ভাবতে লাগল—আরও এক সপ্তাহ থাকতে হবে! কেন? কি প্রয়োজন শীলার?

*

এক সপ্তাহ কেটে গেল। যে জন্য গোপেনকে ডেকে পাঠিয়েছে শীলা, তা জানা হয়েছে। কত তুচ্ছ সেই প্রয়োজনটুকু! গোপেনের সাহায্য না নিয়েই শীলা ব্যাঙ্কের চেক সই করে টাকা তুলছে, চাকরটাকে নিয়ে নিজেই বাজারে যাচ্ছে, বাবুর্চ্চিকে রান্নার ফরমায়েস করছে, অতিথি-অভ্যাগতের সম্মান রাখছে, বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছে ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে। এ মেয়ে ইনসিওরেন্স কোম্পানীর মোটা টাকা আদায় করতে নিশ্চয় গোপেনকে ডেকে আনে নি। কি করে টাকার দাবি জানাতে হয়, সাক্‌সেশান সার্টিফিকেট, ডেথ সার্টিফিকেট, সনাক্তীকরণ সবকিছুর অন্ধি-সন্ধি জানে শীলা।

*

গোপেনকে নিয়ে দেরাদুন পরিক্রমা সুরু করল শীলা। একদিন মুসৌরী গেল। ল্যাণ্ডোর বাজার দেখালে—কলকাতার চৌরঙ্গীর একাংশ, ম্যল্ থেকে কুলরী বাজারের ঘোরা-পথে নিয়ে গেল নির্জ্জন প্রাকৃতিক শোভা দেখাতে, সেখান থেকে গেল কেম্পটি ঝরণায়। ল্যাণ্ডোর থেকে লাল-টিব্বা পাহাড়ে উঠিয়ে শীতের প্রতাপটা অনুভব করালে। একদিনেই সবকিছু সারা হ'ল না। মুসৌরীতে থাকতে হ'ল দু'দিন। এখানে থাকবার জায়গার অভাব কি—এ তো হোটেলময় শহর। বাংলার সঙ্গে এর সম্পর্ক কতটুকু! হিমালয়ের কোলে পশ্চিমী-মেজাজের শহরটি গড়ে তুলেছিল ইংরেজ। ইংরেজ চলে গেছে, শহরটা ইংরেজি সহবৎ ভোলে নি—সর্ব্ব অবয়বে সেই চিহ্নগুলি ধরে রেখেছে সযত্নে।

একদিন সন্ধ্যাকালে দেরাদুনের প্রশস্ত পথ দিয়ে ফিরবার সময় শীলা বলল, আপনার বোধ করি ভাল লাগছে না? কাজের ক্ষতি হচ্ছে তো?

ভাল লাগছে বই কি, তবে কাজের যে ক্ষতি হচ্ছে না তা নয়।

কিন্তু কাজই কি মানুষের জীবনে সব?

শীলার গাঢ় প্রশ্নে গোপেন থমকে দাঁড়াল। রাস্তার আলোটা ওর পিছনে পড়েছিল—মুখভাব দেখা গেল না।

শীলা বলল, জানেন তো—কবি বলেছেন:

> কর্ম্ম যখন দেবতা হয়ে জুড়ে বসে পূজার বেদী
> চার দিকে তার পাষাণ প্রাচীর অভ্রভেদী—

ওটা কাব্যের কথা। বাধা দিয়ে গোপেন বলল।

না, জীবনের কথা। জীবনের একদিকে কর্ম্ম আর একদিকে কাব্য। সদর আর অন্দর মহল। কোন্‌টাতে মন খুলে দেয়া যায়?

জানি না, কাব্যচর্চ্চা করি নি তো।

না গোপেন-দা, একথা আমি মানব না। যে মানুষটি আমাকে সংসারে মূল্যবান করতে চেয়েছিলেন—এ তাঁরই মুখের কথা। তাঁর কথামত চলেছি দশ বছর, তৃপ্তি পাই নি। কিন্তু বেলেডাঙ্গার সেই দিনগুলি, অন্ততঃ কয়েকটি দিন, আমি ভুলব না। তোমার মুখে তখন যে ছাপ লেগে থাকত—তা কর্ম্মের নয়, কাব্যেরই। কলেজ থেকে ফিরে এসে যেদিন আমাদের বাড়ী এলে—মনে পড়ে সেদিনের কথা?

শীলার স্বর ভারী হয়ে আটকে গেল।

মনে মনে অস্বস্তি বোধ করল গোপেন। জোর করে ঝেড়ে ফেলতে চাইল সে ভাব। তাচ্ছিল্যভরে বলল, ছেলেবেলার সব কথাই কি মনে থাকে!

সব কথা মনে থাকে না—বিশেষ একটি ঘটনা বা কথা মন থেকে মুছেও যায় না তো। মনে হ'ল একটি নিঃশ্বাস চাপল শীলা।

গোপেন উত্তর না দিয়ে পথ চলতে লাগল। চলতে চলতে দীর্ঘপথ শেষ হয়েছে কখন। বাড়ীর অঙ্গনে পা দিয়ে শীলা সংযত হ'ল। একটি নিঃশ্বাস ফেলে বলল, ঠিক কথা, যা যায়—তা ফেরে না। তোমার এখন মস্ত সংসার, অনেক কাজ।

তার পর টেবিলে বসে চা খেলে—খাবারও খেলে—অতীত কালের কোন প্রসঙ্গই তুলল না শীলা।

রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে গোপেন হঠাৎ একটা দিক দেখতে পেলে। অতীতের কাহিনী শুনিয়ে শীলা কি অতীতের স্বপ্নজগতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায় গোপেনকে? অতীত কি অল্পে অল্পে মোহ সঞ্চার করছে মনে, না হিমালয়ের এই সৌন্দর্য্য ভাল লাগছে?

*

পরের দিন চায়ের টেবিলে বসে গোপেন বলল, অনেক দিন হ'ল এসেছি—

শীলা বলল, জানি—তোমার কাজের ক্ষতি হচ্ছে। আর আটকাব না—আইডেন্টিফিকেশনটা আজই হয়ে যাবে, কাল গেলে ক্ষতি হবে না ত?

না—না, দু' একটা দিনে কি আর ক্ষতি!

গোপেনের উদার প্রসন্ন সুরটা শীলার শ্রুতিতে লেগে রইল। আড়চোখে চেয়ে স্যাণ্ডউইচের ডিসটা এগিয়ে দিতে দিতে বলল, চলবে কি?

নিশ্চয়! গোপেন সাগ্রহে টেনে নিলে ডিসটা।

মটন গ্রেভি?

দিতে পার।

এই সব বিজাতীয় খাবার আগে কিন্তু পছন্দ করতে না।

ওটা আমার দোষ নয়, রসনার রুচি। হাসল গোপেন।

মোট কথা গোপেন যে পরিমাণে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, শীলার গাম্ভীর্য্য বেড়ে গেল সেই পরিমাণে।

বিদায়-দিনে বলল, ডেকে এনে কষ্টই দিলাম শুধু।

গোপেন হাসিমুখে বলল, এমন কষ্ট বারে বারে পেয়েও তৃপ্তি! আবার আসব।

আসবেন। দু'টি শিথিল কর এক করে কপালে ঠেকিয়ে নিরুচ্ছসিত কণ্ঠে বলল শীলা।

শীলা কি আঘাত পেল, ভুল বুঝল?

*

বাড়ী এসে চিঠি লিখলে গোপেন, আর যদি না যেতে পারি দুঃখ করো না শীলা। বেশ বুঝেছি ওই ক'দিনে—তোমার আর আমার ধর্ম্ম এক নয়। তুমি চেয়েছ পিছনে ফিরে যেতে, আমার লক্ষ্য ছিল সামনে। এখানে যে আকাশ—দেরাদুনেও সেই আকাশ, মাটি কিন্তু এক নয়। ভাগ্যিস তোমার কামনার সঙ্গে আমার কামনাকে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা করিনি—তা হ'লে সে আঘাত থেকে কেউই নিষ্কৃতি পেতাম না…

চিঠিখানা দু'বার—তিনবার পড়ল গোপেন। খামের মধ্যে পুরল। তার পর হঠাৎ সেখানা বার করে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিলে। যে আঘাত দিয়ে এসেছে শীলাকে—তাই যথেষ্ট, আর কেন পত্রাঘাত?

অন্যপথ

শ্রীঅশোক মিত্র

থাক্ না সে আজ অন্ধকারে পথ হারিয়ে
ঘরের কোণে দীপ জেলে কি মিলবে অভিজ্ঞান?
ছোট্ট সুখের গণ্ডী আঁকা পথ ছাড়িয়ে
করুক না সে আজ আঁধার রাতে দীর্ঘ অভিযান?

হয়তো অনেক বাধার প্রাচীর পড়বে পথের বাঁকে
হয়তো শুধুই আশার কপাট ভাঙবে বারংবার—
তবুও সে আজ ভ্রূকুটি হেনে, দীপ্ত কঠিন হাঁকে
উচ্চকিত করুক না এই—নিঝুম অন্ধকার?

ছিন্ন সেদিন হবেই জানি মেঘের আবরণ
সূর্য্য প্রদীপ উঠবে জলে নীল আকাশের কোণে
তখনই সে বন্ধ করে ব্যর্থ রোমন্থন—
এই জীবনের তীর্থ পথে চলবে মুখর মনে।

মেক্সিকো দেশের চারু-শিল্প

ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ
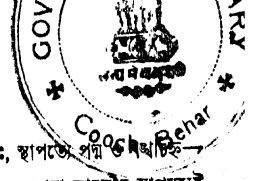
মেক্সিকো দেশ প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি। আসিরিয়া, ব্যাবিলন, মিশর, পারস্য, চীন ও ভারতবর্ষ যেমন অতীতের গৌরবান্বিত, মেক্সিকো দেশও তেমনই অতি প্রাচীন সংস্কৃতির মহিমায় মহিমান্বিত।

খেলা ওখানে বিদ্যমান। দ্বিতীয়তঃ, স্থাপত্যে পদ্ম ও শঙ্খচিহ্ন—পদ্ম ও শঙ্খ কেবল লাবণ্যের প্রতীক নহে, তাহা ভারতীয় স্থাপত্যেই একমাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ ভারতীয় হস্তীর প্রতিমূর্ত্তি।

এই বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান কর্ত্তব্য। আমি যখন বিশ্ব-

বামন

স্ত্রীমূর্ত্তি

মেক্সিকো দেশে মায়া জাতি এক আশ্চর্য্য প্রতিভার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছে। দেওয়ান চমনলাল তাঁহার হিন্দু আমেরিকা নামে কৌতূহলোদ্দীপক পুস্তকে লিখিয়াছেন, মেক্সিকো দেশ সংস্কৃতি মাক্ষিক দেশের রূপান্তর। মাক্ষিক কথার অর্থ স্বর্ণ, মেক্সিকো স্বর্ণ-ভূমি, কাজেই চমনলালের অনুমান বেশ যুক্তিসহ মনে হয়। বহু প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতও বলেন যে, মেক্সিকো দেশে হিন্দু জাতির প্রভাবের সুদৃঢ় পরিচয় বর্ত্তমান।

নিউইয়র্ক সহরে অধ্যাপক একহলমের সঙ্গে আমার এই সুন্দর মতবাদ নিয়া আলোচনা হইয়াছিল, তিনি অভ্রান্ত বিশ্বাসে বলেন যে, মেক্সিকোর সভ্যতা হিন্দু দিগ্বিজয়ীদের অবদান। তাহার কয়েকটি প্রমাণ তিনি বলেন—প্রথমতঃ আমাদের দেশের দশ-পঁচিশ

পরিক্রমায় গিয়াছিলাম, তখন এই বিষয়ে গবেষণা করিবার জন্য ভারত সরকারের সহায়তা চাহিয়াছিলাম—আমাদের শ্রদ্ধেয় মুখ্য-মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় মহাশয় আমার হইয়া শিক্ষা-দপ্তরে সুপারিশও করিয়াছিলেন—দুর্ভাগ্যক্রমে ফলোদয় হয় নাই। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এবিষয়ে চেষ্টা হইবে।

লণ্ডনের টেট গ্যালারিতে মেক্সিকো রাষ্ট্রের সহায়তায় এক প্রদর্শনী হইয়াছিল। ফিরিবার পথে এই প্রদর্শনী দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। প্রদর্শিত ছবির প্রতিলিপি পাঠকগণকে উপহার দিয়া তাহাদের চিত্তরঞ্জন করিবার উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

মেক্সিকোর অতীতের শিল্পকলা ধর্ম্মের পরিবেশে উদ্ভূত। আমা-

দের পূজা-পার্ব্বণ যেমন নাক্ষত্রিক তিথির সহিত সংযুক্ত, উহাদের উপাসনাও সেইরূপ নাক্ষত্রিক পঞ্জিকার দ্বারা পরিচালিত হইত।

মেক্সিকোর প্রাচীন জাতি নানা ভাগে বিভক্ত ছিল। মায়াদের সমসাময়িক এক জাতির নাম ওলমেক। ৯০০ খ্রীষ্টাব্দের নিকটে টলটেক জাতি মধ্য-মেক্সিকো দেশে তাহাদের রাজ্যস্থাপন করে। ইহারা জ্যোতিষ ও গণিতের নানাবিধ উন্নতি করে।

বীর

ইহার পর আজটেক জাতি প্রাধান্য লাভ করে। ইহারা মায়া জাতির মত কুশলী শিল্পী ছিল না। ইহাদের দেবতা ছিল হিংস্র—তাহার নিকট ইহারা নরবলি দিত। ডক্টর লিন এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—"The Aztecs dived in a theocratic society and they sacrificed to their gods human hearts, the symbol of life. Aztec religion as revealed in their art is characterized by a sombre fatalism a worship of destretive powers in fact 'a death culture.'

প্রাচীন মেক্সিকো নানা জাতির বাসভূমি ছিল, কিন্তু বিচিত্র ভাষাভাষী নানা জাতির সমবায়ে গঠিত ভারতবর্ষে যেমন এক মৌলিক ঐক্য অতীতে ছিল এবং এখনও আছে, মেক্সিকোর নানা জাতির মধ্যেও এক আশ্চর্য্য একত্ববোধ ছিল। তাহাদের প্রতিমা ও শিল্পকলার মাঝে এক অতীন্দ্রিয় প্রেরণা ছিল। ইহা আজও সর্ব্ব জাতির মনে বিস্ময় ও শ্রদ্ধা জাগায়।

স্পেনের বর্ব্বর দস্যুদল এই মহিমাময় সভ্যতার আমূল ধ্বংস-সাধন করিয়াছে। ধাতুদ্রব্য গলাইয়া ফেলিয়া দিয়া, শাস্ত্রগ্রন্থ পুড়াইয়া দিয়া, মন্দির-স্তূপ ইত্যাদি ভাঙিয়া ফেলিয়া দিয়া ইহারা অতীতের বিরাট অবদানকে লোকচক্ষুর অগোচর করিয়াছে। তথাপি যে সামান্য বাঁচিয়াছে, তাহা হইতেই মেক্সিকোর প্রাচীন অধিবাসী-দের শিল্পবোধ ও সভ্যতার বিস্ময়জনক পরিচয় পাওয়া যায়।

ন্যাংটা মূর্ত্তি

স্পেনীয় সেনাপতি আজটেক জাতির রাজা মকটেজুমার নিকট হইতে যে সব উপহার-দ্রব্য আদায় করিয়া ১৫২০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে রাজা পঞ্চম চার্লসের নিকট পাঠাইয়াছিল, তাহা দেখিয়া শিল্পরসরসিক ডুরার লিখিয়াছেন :—"আমার জীবনে এই সমস্ত আশ্চর্য্য ও শিল্প-সুন্দর দ্রব্য দেখি নাই, ইহা দেখিয়া আমার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিয়াছিল। এই বিদেশী জাতি যে কলা-নৈপুণ্যের অপূর্ব্ব পরিচয় দিয়াছে তাহাতে আমি একান্তভাবে বিস্মিত হইয়াছি।"

টেট গ্যালারীর প্রদর্শনীতে অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত মেক্সিকোর শিল্পকলার পরিচয়ের প্রচেষ্টা হইয়াছিল, তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। আমি মাত্র কয়েকটি প্রতিলিপি দিয়া কেবল দিকদর্শন করিবার দুরাশা করিতেছি।

প্রথম চিত্রটি একটি বামন-মূর্ত্তি। পোড়ামাটির পুতুল, জালিস্কো

নামক স্থানে পাওয়া গিয়াছে। যে মৃৎশিল্পী এইটি নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহার রসবোধ আমাদিগকে অভিভূত না করিয়া পারে না। ইহার আশ্চর্য্য ভঙ্গিমা উচ্চ শিল্পবোধের পরিচয় দিতেছে। দ্বিতীয় চিত্রটি একটি উপবিষ্টা নারীর। নয়ারিট নামক স্থানে পাওয়া গিয়াছে। ইহাও পোড়ামাটির পুতুল, পশ্চিম মেক্সিকোর শিল্পের একটি বিশিষ্ট উদাহরণ। অনাদিকালের এক বেদনা যেন শিল্পীর সৃষ্টি-চাতুর্য্যে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। নারীর মস্তকাবরণ, পরিধেয় বস্ত্র বেশ সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে।

মৃতদেহের ভস্মপাত্র

তৃতীয় চিত্রটি একজন যোদ্ধার—গদাহস্তে ভীমের মত যেন সে বিশ্ববিজয়ে উদ্যত। ইহাও পশ্চিম মেক্সিকোর শিল্প, নয়ারিটে পাওয়া গিয়াছে। মূর্ত্তিটি সাড়ে সতের ইঞ্চি উচ্চ, সজীবতা এমনই মধুর যেন মনে হয় যোদ্ধার ত্বরিত আহ্বানে প্রতিদ্বন্দ্বী অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। গতির সুষমা প্রকাশভঙ্গিমায় সুব্যক্ত হইয়াছে।

চতুর্থ চিত্রটি ওলমেক জাতির সংস্কৃতির ঐতিহ্য বুঝাইবার জন্য প্রদর্শিত হইয়াছিল—ইহা ধূসর-সবুজে মেশানো জেড পাথরে তৈরী—ভেরাক্রুজ প্রদেশে পাওয়া গিয়াছে। ছোট ছেলেটি কাঁদিতেছে বলিয়া মনে হয়।

পঞ্চম চিত্র দেখিলে মনে হয় ইহা যেন এক বীর সৈনিকের মূর্ত্তি, কিন্তু আসলে ইহা একটি ভস্মাধার। মৃতদেহের ভস্ম এই সব সুন্দর পাত্রে রাখা হইত। ইহা ওয়াক্‌সাকা নামক স্থানে পাওয়া গিয়াছে—পোড়ামাটির তৈরী। ইহা জাপোটেক জাতির শিল্প-

যুবা
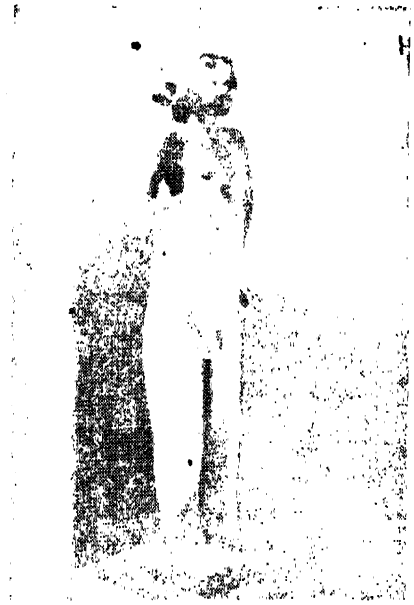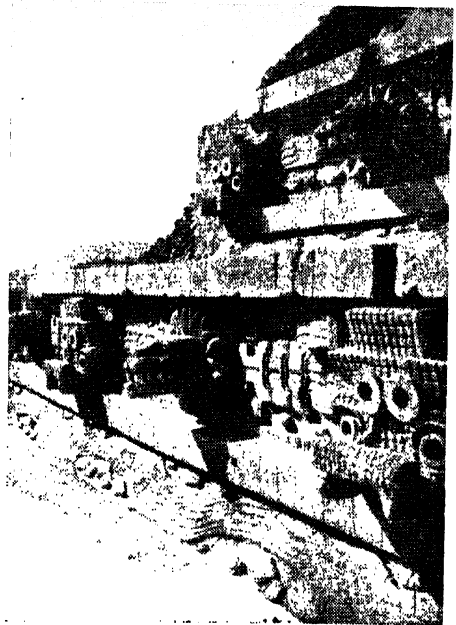
সর্প দেবতার মন্দির

প্রতিভার পরিচয়। জীবনের চিরন্তন পরিণতির বেদনাকে যে শিল্পী মানিতে চাহেন না, মৃত্যুর নৈঃশব্দের নিস্তব্ধ সাগরে কবি-শিল্পী যেন জীবনের বিজয়ধ্বনিকে বাজাইতে চাহিতেছেন। মরণের সমস্ত জ্বালাকে ভুলাইয়া যেন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দরস বহাইয়া দিতেছেন। যে মৃৎশিল্পী এই পাত্রটি নির্মাণ করিয়াছেন তাঁহার প্রশংসনীয় কৃতিত্ব কালজয়ী মাধুর্য্যে মহিমাময়। বালু পাথরে নির্ম্মিত এক যুবকের প্রতিমূর্ত্তি ষষ্ঠ চিত্রে দেখা যাইতেছে। উচ্চতায় সাড়ে পঞ্চাশ ইঞ্চি, টামুইন নামক স্থানে ইহা পাওয়া গিয়াছে।

চিত্র ভাষার পাণ্ডুলিপি

এটি হুয়াক্সটেক জাতির শিল্প। পঞ্চমরাগে নবযৌবনের ভাটিয়ালি যেন বাজিতেছে। কালস্রোতের বালুডাঙ্গায় বালুপাথর যেন এক অবিস্মরণীয় বস্তু সৃজন করিয়াছে। ইহা সহজ সাধনলব্ধ নহে—অতিশয় আনন্দের সহিত এই অজানা স্থপতির মুগ্ধ শিল্প-নিবেদনের প্রতি শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিতে ইচ্ছা করে।

সপ্তম চিত্রে আমরা একটি মন্দিরের কারুকার্য্য দেখিতে পাইতেছি। এটি কোয়েটজাল কোটল দেবতার—এই দেবতা সর্পের প্রতিমূর্ত্তি—শিখিপুচ্ছ সুশোভিত সর্প। মেক্সিকো উপত্যকায় টিওটিহুয়াকান সভ্যতার বিকাশ ৩০০ হইতে ৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সঙ্ঘটিত হয়। এই অলঙ্কার-মণ্ডিত মন্দির সেই সভ্যতার প্রকৃষ্ট পরিচয়। স্থপতি-যাদুকরের মোহন স্পর্শে বিরাট প্রস্তরখণ্ড সম্মিলিত হইয়া নানা বর্ণরাগে সুশোভন হইয়া উঠিয়াছে।

অষ্টম ও নবম চিত্র দুইটি মুখোস। ইহা মৃতদেহের জন্য ব্যবহৃত হইত। এই দুইটি মুখোসও টিওটিহুয়াকান সভ্যতার দান—প্রত্যেকটি সাড়ে সাত ইঞ্চি দীর্ঘ।

দশম চিত্র মিক্সটেক এবং পুয়েবলা জাতির চিত্র-ভাষার প্রতিলিপি। বর্ণমালা আবিষ্কারের পূর্ব্বে মানুষ ছবি আঁকিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিত। মৃগচর্ম্মে লেখা এই ছবির ভাষা কি বলিতেছে তাহা সঠিক জানা যায় নাই তবে মনে হয় ইহা এক দ্বৈরথ যুদ্ধের উত্তর-প্রত্যুত্তর। অর্থ যাহাই হউক না কেন—চিত্রগুলি যে সজীব, ভাবব্যঞ্জক এবং তৃপ্তিদায়ক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

একাদশ চিত্রে খোদিত নৃমুণ্ড—আজটেক জাতির মৃত্যুদেবতার প্রতীক। স্ফটিক পাথরে খোদাই আটের বোলর তিন ইঞ্চি এই শিল্পবস্তুটি খোদাইকারের নৈপুণ্য এবং শিল্প-সমৃদ্ধির পরিচায়ক।

ক্ষোদিত নৃমুণ্ড
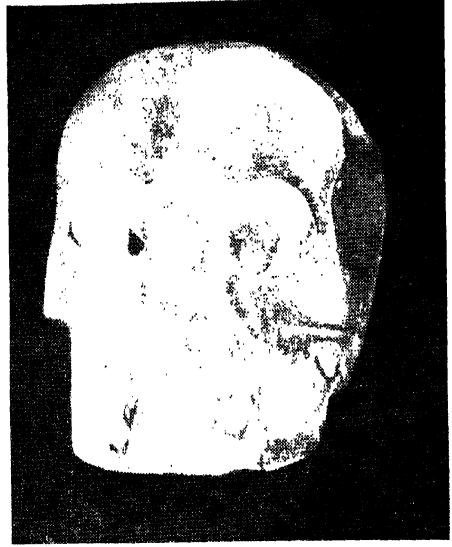
জীবনের অন্তরালে মৃত্যুর স্বাদগন্ধ অভিব্যক্ত করিয়া নিপুণ শিল্পী বিজয়ী হইয়াছেন, এ বিষয়ে দ্বিমত হইবার সম্ভাবনা নাই বলিলেই হয়। স্ফটিকের ঔজ্জ্বল্য মৃত্যুর গম্ভীর বেদনাকে যেন প্রকট করিয়া তুলিয়াছে। অতীত যুগের কথাই কেবল বলিব না। বর্ত্তমানের কিছু পরিচয়ও দিব। স্পেনের সভ্যতার স্পর্শে মেক্সিকোর আদিম সংস্কৃতি নষ্ট হইয়া গিয়াছে বটে, তবে অতীতে একেবারে লুপ্ত হয় না—অলক্ষিতে সে আপন শিকড় বাড়াইয়া দেয়। তাই নবকালের শিল্পকর্ম্মের মধ্যেও অতীতের একটি আমেজ যেন ভাসিয়া আসে।

দ্বাদশ চিত্রে আমরা দেখি পশুদল—রুফিনো টামায়ো নামক শিল্পীর আঁকা তৈলচিত্র। ক্ষুধাতুর পশুর লোলুপতা যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। ত্রয়োদশ চিত্রে শিল্পী খীসাস গুয়েরেরো গালভান জননী মেক্সিকোর এক দুঃখবিধুর মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন। চতুর্দ্দশ চিত্রে মৃত্যুদণ্ডের পর মৃতের আত্মীয়স্বজনের শোকের বিহ্বলতা—শিল্পী কার্লো রোমেরোর তুলির টানে অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মাতা মেক্সিকো

প্রাণদণ্ডের পর

পঞ্চদশ চিত্রে রুটি তৈরীর ছবি আঁকিয়াছেন শিল্পী রিভেরা। মেক্সিকোবাসীরা ভারতীয় লোকেরই মত রুটি তৈরী করিয়া থাকে। লস এঞ্জেলসের একটি রেঁস্তরায় এই রুটি খাইয়াছিলাম।

ষোড়শ চিত্রে শিল্পী জোসে অরোজকোর আঁকা গম্বুজের সেপ চিত্রের ছবি। অনবদ্য শিল্প-চাতুর্য্যের নিদর্শন।

মেক্সিকো এক চমৎকার দেশ। ইতিহাসের অলিখিত কাল থেকে এর আকাশে বাতাসে, এর আচারে আচরণে, ধর্ম্মবোধের স্নিগ্ধ হোম-সুরভি বর্তমান। মহাকালের বিচিত্র অঙ্গনে আজ অনেক কিছুই স্থান পায় নি—তবু যাহা আছে—তাহাকে সুস্পষ্ট ভাবে এবং সুনিশ্চিত ভাবে জানা সকল মানুষের কর্ত্তব্য। সেই সকল মানুষের মধ্যে ভারতীয় মানুষের এক বিশেষ আকর্ষণ আছে। হয়ত পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় আমরা পাব বন্ধুত্বের এক মিলনসূত্র—আমাদের অভিযাত্রীরা অতীতে যে রাখী বাঁধিয়াছিলেন, কালের কঠোর বিধানকে উপহাস করিয়া তাহা যেন আজ আমাদের অক্ষয় সম্পদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সৃজন-মনীষার নিকট তাই আমার আবেদন—আমরা যেন মেক্সিকোকে আত্মীয় করিবার সাধনায় প্রবৃত্ত হই।

গান

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য
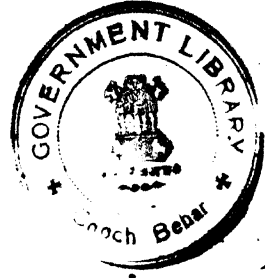
যখন আমি মরবো ওগো আমার প্রিয়তম
দুখের কোন গান গেয়ো না তুমি আমার তরে;
গোলাপ ফুলের গাছ রুয়ো না শিয়রে মোর তুমি,
কিম্বা ছায়া-যুক্ত তরু আমার মাথার 'পরে!

হোয়ো সবুজ ঘাস তুমি গো আমার সমাধিতে,
তুষারকণায় শিশিরফোঁটায় সিক্ত থেকো তাতে,
স্মরণ করতে চাও যদি তো স্মরণ কোরো মোরে,
ভুলতে হলে ভুলেই থেকো মিশে সবার সাথে।

দেখবো না তো আমি কভু গাছের ঘন ছায়া,
বৃষ্টিধারা পারবো না তো করতে অনুভব;
শুনতে আমি পারবো না রে দোয়েল পাখীর গান,
যতই দুখের ডাক্ না গেয়ে শুনবো না তার রব।

ক্ষীণ আলোকের ভেতর দিয়ে চলবে স্বপন দেখা,
হয় না যাহার উদয় কিম্বা যায় না অস্তাচলে,
দৈবাৎ আমি স্মরণ করতে হয় তো পারি তাকে,
ভুলেও যেতে পারি দৈবাৎ মনের একটা ছলে।

Roselti, Christina Georgina অবলম্বনে।
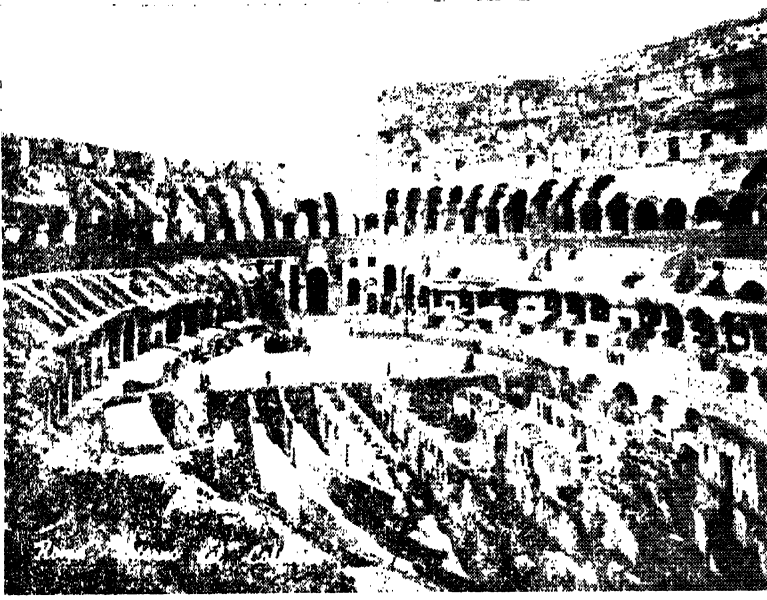
রোমের বিরাট 'কলোসিয়াম'

সাগর-পারে

শ্রীশান্তা দেবী

ইটালীয়ান ভিসা সংগ্রহ করবার সময় কলকাতার কন্সাল মোচি মহাশয় আমাদের কাছে টাকা নেন নি। তিনি বলে-ছিলেন, "ঐ টাকা দিয়ে রোমে গিয়ে ফুল কিনো।" রোম দেখবার সখ অবশ্য তার বহুদিন পূর্ব্ব থেকেই ছিল। ছেলে-বেলায় যখন রোমের রাজারাণীদের বিলাস-ব্যসনের কথা এবং গ্লাডিয়েটারদের যুদ্ধের কথা পড়তাম তখন থেকেই রোম দেখবার প্রবল ইচ্ছা ছিল, যদিও তখন জানতাম না যে আধুনিক রোমে সবাই আধুনিক সাহেব মেম, রোমান টোগা ও ফিতে-বাঁধা স্যাণ্ডালের যুগ বহুকাল অতীত হয়ে গিয়েছে।

ফ্লরেন্স ছেড়ে আধুনিক ট্রেণের ভীষণ ভীড়ের মধ্যে রোম যাত্রা করলাম। কেউ ভদ্রতা করে একটু বসবার জায়গা দিল না। অগত্যা দাঁড়িয়েই রইলাম। তখন রেলের ইউনিফরম-পরা এক ব্যক্তি আমাদের জোর করেই প্রথম শ্রেণীর কামরায় নিয়ে গেল। বোধ হয় কিছু বকশিসের আশা ছিল। বলল, "তোমরা যেন কিছু খাচ্ছ-দাচ্ছ এই ভাবে একটু খাবার নিয়ে বসো।" সেখানে ভীষণ হোমরা-চোমরা মুখ করে এক ভদ্রলোক কামরায় বসেছিল। বিদেশী দেখে ভদ্রতা করবার কোন চেষ্টা করল না। ডাঃ নাগ একটু কথা পাড়বার চেষ্টা করাতে কোন জবাব দিল না। যাই হোক, আরামে বসলাম, অনেক নদ-নদী ও পর্ব্বত পার হয়ে পাহাড়ে-ঘেরা একটি নীল হ্রদের পর আমরা তিনটা আন্দাজ রোম ষ্টেশনে পৌঁছলাম। যে লোকটি আমাদের প্রথম শ্রেণীতে বসিয়েছিল তাকে ৫০০ লিরা বকশিস দেওয়াতে সে অম্লান বদনে নিয়ে নিল এবং নমস্কার করল। ৫০০ লিরা সাড়ে চার পাঁচ টাকার বেশী নয়। তাতেই লোকটি খুশী।

ইটালীর অন্যান্য শহরের মত এখানেও লোকেরা মেয়ে-দের দেখে চক্ষু বিস্ফারিত করে তাকাচ্ছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মধ্যে নানা মন্তব্য করছিল। তাদের বোধ হয় ধারণা যে, ভারতবর্ষীয়েরা ঠিক ওদের স্তরের মানুষ নয়। তার উপর ওদের মুখের ভাষা যখন বুঝছে না তখন চোখ এবং হাতের ভাষাও বুঝছে না।

ষ্টেশনের খুব কাছেই বিরাট একটা চত্বর ও চৌমাথার সামনে 'আলবারগো কণ্টিনেন্টাল' নামক হোটেল। ইংলণ্ড থেকে আরম্ভ করে এখন পর্য্যন্ত যত হোটেলে থেকেছি এর মত পথঘাট ও পারিবেষ্টনীর এমন রাজোচিত সমারোহ কোথাও দেখি নি। জেনেভাতে হ্রদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য মনোহরণ করে কিন্তু পথঘাট দেখে বিস্মিত হতে হয় না। এখানে পথ-ঘাট চত্বর প্রাচীন ধ্বংসাবলী সবই এত বিশাল যে, মানুষ-গুলোকে অতি তুচ্ছ মনে হয়। কথায় বলে "রোম একদিনে তৈরী হয় নি।" বহু যুগে তৈরীর নিদর্শন শহরে ঢোকা মাত্র চোখে পড়ে। কত সম্রাটের, কত শিল্পীর মস্তিষ্ক রোমনগরীর পিছনে খেটেছে। আমাদের হোটেলের একপাশে প্রাচীন রোমের বিশাল ভাঙা দেওয়াল, একটু দূরে একটি সুউচ্চ চূড়ার উপর সোনালী রঙের যীশুখ্রীষ্ট বা কোন সেন্টের সুন্দর মূর্ত্তি। সবটাই প্রাচীনতার সুর মনে জাগায়। কিন্তু কাছেই একটা সাধারণ ফলের দোকান থেকে পথচারীরা পথে যেতে যেতে কাটা তরমুজ কিনে কিনে খাচ্ছে এবং সারা বিকাল রাস্তা-ধোওয়া পাইপে মুখ দিয়ে পবিত্র জল সবাই পান করে যাচ্ছে দেখে বর্ত্তমান বাস্তবকে স্পষ্ট করেই মনে পড়ে যায়। ষ্টেসন, হোটেল বড় বড় দোকান সবই খুব কাছে বলে বোধ হয় এইখানেই বাস দাঁড়াবার জায়গা। যাত্রীরা বোধ হয় সহজে জায়গা পায় না তাই গাড়ীগুলো ছাড়বার এক ঘণ্টা-দেড় ঘণ্টা আগেই তারা ঠেলাঠেলি করে গাড়ীতে ঢুকে বসে থাকে। ঘাগরা-পরা একটু গ্রাম্য ধরণের মেয়েরা মাথায় মোট নিয়ে এসে গাড়ীতে উঠছে। অনন্তকাল দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ একসময় গাড়ীগুলো ছেড়ে যায়। কেউ কেউ তখনও আলস্যভরে চত্বরের বেঞ্চে চুপ করে বসে আছে। প্রাচীন রোমের স্বপ্নে তারা বিভোর নয়, আধুনিক আলস্য বা নেশাই আসল কারণ। এখানে বড় বড় চওড়া রাস্তা, মস্ত চওড়া ফুটপাথ, খানিক খানিক সিঁড়ি দিয়ে উঠে যেতে হয়। দোকান, হোটেল ইত্যাদি সবের বাড়ীই খুব মোটা মোটা দেওয়ালের, জমকালো করে তৈরী। আধুনিক তুচ্ছতা অনেক চোখে পড়লেও রোম বাস্তবিকই কল্পনার রোমের মত জমকালো। যেগুলি ধ্বংসস্তূপ সেগুলি আরও সুবিশাল। যখন আপন মহিমায় উদ্ভাসিত ছিল তখন না জানি কি অপূর্ব্ব ছিল দেখতে! কোন জিনিস ছোটখাট পলকা দেখতে নয়। সম্রাটদের ও শিল্পীদের নজর উঁচু ছিল, মানুষের সৃষ্টি মানুষকে অনেকখানি ছাড়িয়ে গিয়েছিল বোঝা যায়।

শহরে রাত্রে খুব আলো জ্বলে। আমাদের এত আলো দেখা অভ্যাস নেই। হোটেলের ঘরের ভিতর থেকেই শহরের জাঁকজমক খুব চোখে পড়ে। রাত্রের আলোতে সুবিস্তীর্ণ পথের বিস্তৃতি যেন আরও বেড়ে যায়। একটা জগদ্বিখ্যাত জায়গায় যে এসেছি তা বলে দিতে হয় না। বিখ্যাত জায়গায় অখ্যাত লোকদের ভিড়ও হয়। তাই হোটেলের পাইপ বেয়ে ওঠা কিম্বা জানালা দিয়ে হাত বাড়ানো দেখে আতঙ্কিতও যে না হয়েছি, তা নয়।

এখানে রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের খুব দেখা যায়। সন্ন্যাসিনীরা অনেকে একেবারে কাশী কি বৃন্দাবনের অশিক্ষিত বিধবাদের মত দেখতে, কেউ কেউ মিষ্টি কনে' বউয়ের মত, আবার অনেকে বেশ সুমার্জ্জিত ও সুশিক্ষিত উচ্চ চিন্তাশীল ধরণের। যারা অশিক্ষিত ধরণের সন্ন্যাসিনী তারা পথে আমাদের দেখলে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, নিজেদের মধ্যে আমাদের নিয়ে আলোচনা করে এবং গাড়োয়ানকে নানা প্রশ্ন করে, ঠিক যেমন আমাদের দেশের সাধারণ লোকে করে।

অনেক পুরুষ মানুষ গলায় সরু চেনে গোল মাদুলির মত পরে। মনে হয় তারাও সাধারণ লোক। জাহাজে একটি ষোল-সতের বছর বয়সের নাবিক বালককে এই রকম মাদুলি পরা দেখেছিলাম।

পরদিন আমরা পথে বেড়াতে বেরোলাম। রোদ খুব বেশী বলে অনেক দোকানের সামনেই একটু ঘোমটা টানা আছে। যেসব দোকানের বাড়ী সিঁড়ির উপরের রাস্তায় সেগুলি অনেক জায়গায় গাড়ীবারান্দার মত করে ঢাকা, যদিও গাড়ী যেতে পারে না। ফ্লরেন্সের মত গহনা প্রভৃতির দোকান চোখে পড়ে না, আমদানী-করা ঘড়ি ও ক্যামেরা সর্ব্বত্র। খাবার দোকান, মদের দোকান এই সবই কাছা-কাছি।

প্রাচীন রোম দেখবার জন্য বিকালে গাড়ী করে বেরোলাম। তবে আধুনিক রোমেরও সর্ব্বত্রই ধ্বংসস্তূপ চোখে পড়ে। গীর্জ্জা চারিদিকে অসংখ্য। বড় বড় রাস্তা ও ধ্বংসাবলীর মধ্য দিয়ে কলোসিয়াম পৌঁছলাম। কি বিরাট রূপ! যেটুকু আজও দাঁড়িয়ে আছে তার চেয়ে অনেক বেশীই ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তবু অংশমাত্র দেখে এবং প্রাচীন রোম-শিল্পীদের সৃষ্টি বাকিটা কল্পনা করেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে থাকতে হয়। কলোসিয়ামের সহিত রোমের ইতিহাসের কত বিলাস-ব্যসন, ঐশ্বর্য্য ও দম্ভ জড়িত, সে কথা আজ এই ধূলিধূসরিত খিলান, চত্বর ও সিঁড়ি দেখে মনে পড়ে যায়; যেন চোখে দেখতে পাই সম্রাট-সম্রাজ্ঞীরা সদলবলে পাত্রমিত্রভৃত্যদাসদাসী নিয়ে হীরায় জহরতে কিংখাবে জড়িত হয়ে এই পথ এই সিঁড়ি দিয়ে চলেছেন কত নিষ্ঠুর লীলাখেলা দেখতে। কিন্তু হায় কোথায় তাঁরা আজ? আর কোথায় বা সেই হতভাগ্য ক্রীড়নকেরা?

কালস্রোতে সকলেই এক অতল গহ্বরে তলিয়ে গিয়েছেন। আজ পাথরের থাম আর বড় বড় নকসা-কাটা মাথাগুলি ধুলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে। খ্রীষ্টীয় যুগের মহিমা প্রচার করে অনেক জায়গায় ক্রশ আঁকা ও বসানো আছে। ধ্বংসস্তূপের শ্মশানোচিত গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে ঠিক খাপ খাচ্ছে না সেগুলি।

এই কলোসিয়াম-রঙ্গমঞ্চের অনুকরণে ফ্রান্স প্রভৃতিতে অনেক থিয়েটার গঠিত হয়েছে। সেগুলি দেখতে খুবই সুন্দর। কিন্তু এর তুলনায় তারা কত ছোট ছোট! কলোসিয়ামের পর জুলিয়াস সীজারের পার্লামেণ্ট, তাঁর হত্যা-স্থান ও শনিদেবতার মন্দির ইত্যাদি দেখতে গেলাম। এই ধ্বংসাবলীতে প্রায় কিছুই নেই। আধুনিক রাস্তার চেয়ে অনেকটা নীচুতে বিরাট একটা প্রাঙ্গণের মধ্যে সাদা সাদা কয়েকটা থাম মাত্র দাঁড়িয়ে আছে। বাকি স্থানগুলিতে ভাঙা বাড়ীগুলির ভিত্তির নকসা মাত্র বোঝা যায়। নীচে নেমে গেলে গাইডরা কোথায় কি ছিল বলে দেয়। কিন্তু মনে হ'ল উপর থেকে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে সবটা দেখা এবং কল্পনায় জুলিয়াস সীজারের রঙ্গভূমি মনে এঁকে নেওয়াই ভাল। অত বিরাট প্রাঙ্গণ এক মোড় থেকে আর এক মোড় পর্য্যন্ত হাঁটা বড়ই শক্ত। শনিদেবতার মন্দিরের স্তম্ভ-গুলির অনেক ফোটোগ্রাফ অনেকেই দেখেছেন। মিউজিয়মে ঢুকতে পারলে হয় ত শনিদেবের মূর্ত্তিও কিছু দেখা যেত। কিন্তু আমরা এমন সময় রোমে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম যে, উপরি উপরি তিন-চার দিন ছুটি পড়ে সব মিউজিয়ম বন্ধ ছিল। সুতরাং ফ্লরেন্সে দেখা সীজারের মূর্ত্তি স্মরণ করেই খুশী হতে হ'ল।

এখান থেকেই একটু দূরে একটা গীর্জ্জায় সেণ্ট পিটাররা লুকিয়েছিলেন দূর থেকে দেখলাম। তার পর গেলাম অন্য একটি গীর্জ্জায় যেখানে মাইকেল এঞ্জেলোর গড়া মোজেজের (মূশা) মূর্ত্তি আছে। মহামানবের মূর্ত্তি ত্রিকালজ্ঞ পুরুষেরই মত! হাত ছুটি যেন এখনই নড়ে উঠবে। শিরায় শিরায় ধমনীতে যেন রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। সমস্ত মূর্ত্তিটি অফুরন্ত প্রাণ ও অদম্য শক্তিতে যেন চঞ্চল! শিল্পী কোথায় এর আদর্শ পেয়েছিলেন কে জানে? কোন একটি মাত্র মানুষের চেহারা হতে এই বিরাট পুরুষের রূপ কল্পিত হয় নি নিশ্চয়। কিন্তু এই বিরাট কল্পনার পিছনে কোন পূজ্য কোন বরেণ্যের বাস্তব রূপ কি নেই? আমাদেরও ত মনে হয় আমাদের এক অতি প্রিয়জনের স্মৃতি ঐ হাত ছুটি ঐ পা চুখানির মধ্যে জেগে উঠছে।

এই মন্দিরে ভারতবর্ষীয় কয়েকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল। তার ভিতর কেউ কেউ বাঙালী এবং অর্দ্ধ-পরিচিত।

নানা দিকে ঘুরে আমাদের চুদিনের পরিচিত হোটেলে খেয়ে রাত্রে দেখতে গেলাম একটি থিয়েটার। এ রকম থিয়েটার রোম ছাড়া আর কোথাও দেখা সম্ভব ছিল না। নটনটীদের জন্য বলছি না, বলছি আবেষ্টনীর জন্য। ইহা ইটালীর মুক্ত প্রাঙ্গণের থিয়েটার। ভার্দে লিখিত Aida নামক অপেরা। একটি বিরাট প্রাচীন রোমান বাথকে রঙ্গমঞ্চ করা হয়েছিল এবং দর্শকরা বসেছিলেন খোলা মাঠে কাঠের মাচায়। তিন হাজার মানুষ অভিনেতা। রঙ্গমঞ্চে গরু ঘোড়া মানুষ গাড়ী কি যে না এল, বলা যায় না। পোশাকে-আশাকে রঙে আসবাবে সাজানোতে প্রাচীন মিশর যেন জেগে উঠল। বিংশ শতাব্দীর থিয়েটার, কি সভ্য প্রাচীন মিশর তা ভুলে গিয়েছিলাম। গায়ক, বিশেষতঃ গায়িকার যে ও রকম জোরালো গলা কখনও হয় জানতাম না। মাঠ যেন ভেঙে পড়ছিল। পিছনে রোমান বাথের বিরাট বাড়ী অন্ধকারে দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে। সামনে জীবন্ত মিশর নেচে গেয়ে সুখদুঃখের খেলা খেলে চলেছে। দূর থেকে ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে আর মাথার উপর অসীম আকাশের চাঁদোয়া। অভিনব অনুভূতি জীবনে।

কেশবচন্দ্র সেন ঃ নবজীবন-সঞ্চারে

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

পূর্ব প্রবন্ধে জাতি-গঠনে কেশবচন্দ্র সেনের কৃতির কথা সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। গত শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে তিনি বাঙালী-জীবনে যে ভাব-বন্যা আনিয়া দেন, সপ্তম দশকে তাহা কর্ম্মের মধ্যে বিশেষভাবে স্থিতিলাভ করে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রার্থনা-বক্তৃতাগুলি শুনিতে যাইতেন, এরূপ জনশ্রুতির কথা বলিয়াছি। দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীয় ইংরেজী আত্মজীবনীতে যুবচিত্তে কেশবচন্দ্রের প্রভাবের কথা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সপ্তম দশকের প্রথমে আরও বহু কিশোর এবং যুবক তাঁহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী পরবর্ত্তীকালে নানা কারণে কেশবচন্দ্রের উপর বিরূপ হইয়া উঠেন। কিন্তু যৌবনের প্রথম উন্মেষে কেশবচন্দ্রের আদর্শে কত গভীরভাবে তিনি আলোড়িত হইয়াছিলেন, আত্মচরিতে তাহার সাক্ষ্য রাখিয়া গিয়াছেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কৈশোরেও কেশবচন্দ্রের পূর্ণ প্রভাব অনুভূত হয়। অধ্যক্ষ ক্ষুদিরাম বসু কিরূপে খ্রীষ্টান হইতে হইতে কেশবচন্দ্রের প্রাণমাতানো প্রার্থনায় 'হিন্দু'ই রহিয়া গেলেন, নিজে তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। ভারত-প্রসিদ্ধ নেতা অশ্বিনীকুমার দত্তকে বলা হইত "Keshab Chunder Sen of Eastern Bengal", অর্থাৎ, 'পূর্ব্ববঙ্গের কেশবচন্দ্র সেন'। কেশবচন্দ্রের নীতিধর্ম্মমূলক উপদেশ ও প্রার্থনা দ্বারা অশ্বিনীকুমার ছাত্রজীবনে কলিকাতায় বাসকালে অনুপ্রেরণা লাভ করেন। পরবর্ত্তীকালের বিখ্যাত নেতৃবর্গ বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি, ছাত্রজীবনের প্রথম অবস্থায় কেশবচন্দ্রের প্রার্থনা ও বক্তৃতা দ্বারাও তৎপ্রতি আকৃষ্ট হন। এক কথায়, সপ্তম দশকের প্রথমার্দ্ধে কেশবচন্দ্র বাঙালী-জীবনে যে এষণার উদ্রেক করেন, তাহা দ্বারা সমাজ পরিশুদ্ধ হইয়া নূতন কর্ম্মশক্তি লাভ করে—আর এই কর্ম্মশক্তিই শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, বিজ্ঞানচর্চ্চা প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে আত্মপ্রকাশ করে। পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের সংযোগ এই সময়কার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

কেশবচন্দ্র ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম দুইটিকেই জীবনের লক্ষ্য করিয়া লইয়াছিলেন। ষষ্ঠ দশকে এই দুইটিই এক বিশিষ্ট পথে চলিয়াছিল। ধর্ম্মের ভিত্তিতে ব্রাহ্মসমাজের সংস্কার ও পুনর্গঠনই ছিল তাঁহার মুখ্য কার্য্য। কিন্তু তাঁহার বরাবর লক্ষ্য ছিল জাতির সেবা, এবং জাতিগঠনকল্পে বিভিন্ন ভাবধারার মধ্যে ঐক্য-প্রতিষ্ঠা। প্রথমে দক্ষিণ-ভারত এবং পরে উত্তর-ভারত পরিক্রমায় জাতীয় ঐক্য-প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে তিনি স্থিরনিশ্চয় হন। ইংলণ্ড পরিভ্রমণের ফলে তাঁহার এই ধারণা অধিকতর দৃঢ়বদ্ধ হইল। এ উদ্দেশ্যে বাধাবন্ধহীন ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবর্গ ও কর্ম্মীদের দায়িত্ব অনেক ; কিন্তু ব্যাপকতর ও বৃহত্তর সমাজ-জীবনের প্রতি স্তরে এই ঐক্য-প্রচেষ্টার প্রতিফলন আবশ্যক। আর ইহা সম্ভব সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি দৃঢ়তর হইলে। কেশবচন্দ্র বিলাত-প্রবাসকালে বিবিধকাজকর্ম্মের মধ্যেও ইংলণ্ডবাসীর আভ্যন্তরীণ শক্তির মূলাধার প্রত্যক্ষ করিতে ভুলেন নাই। ভারতবর্ষে প্রত্যাগমনের পর তাঁহার প্রধান কার্য্য হইল বৃহত্তর সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো দৃঢ়ীকরণ। সুনীতি, সদাচার, উন্নত-ধর্ম্ম পালন ও অনুষ্ঠান সার্থক করিতে হইলে সাধারণের মূল অভাব ও দৈন্য জানিতে হইবে। এই দুইটি জানিয়া, যত সামান্য আকারেই হউক, ইহা নিরাকরণে প্রয়াসী হইতে হইবে। সমাজের ক্ষতের কারণ শুকাইয়া গেলে দেহ সুস্থ ও শক্তিমান হইয়া উঠিবে। কেশবচন্দ্রের জীবন যাঁহারাই আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারাই তাঁহার ধর্ম্মচর্চ্চার বিভিন্ন ও বিচিত্র প্রয়াসের বিষয় অবগত হইয়া বিমুগ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু এই 'ধর্ম্মবীর' কেশবচন্দ্রের চিত্তে বৃহত্তর ভারতীয় সমাজের উন্নতি-চিন্তাও ফল্গুধারার মত অগোচরে নিয়ত বহিয়া চলিতেছিল। ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া অগোচরবাহী সমাজোন্নতি-চিন্তা কর্ম্মের ভিতরে আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিল। 'ধর্ম্মবীর' কেশবচন্দ্র 'কর্ম্মবীর' হইলেন।

ভারত-সংস্কার সভা : কেশবচন্দ্র স্বদেশে ফিরিয়াই কর্ম্মসমুদ্রে যেন ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। তিনি ১৮৭০, ২০শে অক্টোবর কলিকাতায় পৌঁছেন, আর ইহার মাত্র বার দিনের মধ্যে একটি বৃহৎ কর্ম্ম-সংস্থা গঠন করেন। তাঁহার সহকর্ম্মী ও অনুবর্ত্তীরা তাঁহার সঙ্গে সোৎসাহে এই কর্ম্ম-সংস্থায় আসিয়া যোগ দিলেন। এই সংস্থাটির নাম—'ভারত-সংস্কার সভা'; ইংরেজী নামকরণ হয়—"The Indian reform Association" নামকরণেও বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। কেশবচন্দ্রের কর্ম্মক্ষেত্র বঙ্গদেশ, কিন্তু ভারতবর্ষের কল্যাণার্থেই ইহার প্রতিষ্ঠা। কোন প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক হিতার্থে কেশবচন্দ্র ইহা প্রতিষ্ঠিত করেন নাই, সমগ্র ভারতবর্ষ এবং সমুদয় মানুষই তাঁহার লক্ষ্য। ভারত-সংস্কার সভার পাঁচটি বিভাগ, এবং প্রত্যেকটি বিভাগের ভার যোগ্য কর্ম্মীদের উপর প্রদত্ত হয়। সম্পাদকগণের নামসহ বিভাগগুলি এইরূপে বিভক্ত হ'ল : (১) স্ত্রীজাতির উন্নতি, সম্পাদক—উমেশচন্দ্র দত্ত ; (২) শিক্ষা : শিল্প-বিদ্যালয় ও শ্রমজীবীদের জন্য বিদ্যালয়, সম্পাদক—জয়কৃষ্ণ সেন (২য় বর্ষে অমৃতলাল বসু ও কৃষ্ণবিহারী সেন); (৩) সুলভ সাহিত্য, সম্পাদক—উমানাথ গুপ্ত ; (৪) সুরাপান ও মাদক নিবারণ, সম্পাদক—যাদবচন্দ্র রায় (২য় বর্ষে কানাইলাল পাইন),

এবং (৫) দাতব্য, সম্পাদক—কান্তিচন্দ্র মিত্র। সভার কার্য্য প্রধানতঃ এই পাঁচটি ভাগে বিভক্ত হইলেও আনুষঙ্গিক অনেক বিষয়ও ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়।

ভারত-সংস্কার সভা প্রতিষ্ঠিত হইবার পর বিভিন্ন বিভাগে ইহার কার্য্য অবিলম্বে সুরু হইল। স্ত্রীজাতির উন্নতি বিভাগে শিক্ষয়িত্রী, বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, ছাত্রীদের সভা ('বামাহিতৈষিণী সভা') প্রভৃতি স্থাপিত হয়। এই বিভাগের কথা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে* আলোচনা করিয়াছি। ভারত-সংস্কার সভার কার্য্য সুষ্ঠুরূপে পরিচালনা এবং সহকর্ম্মী ব্রাহ্মদের ভিতরে একটি অর্থনৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠাকল্পে কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে 'ভারত-আশ্রম' স্থাপিত হয় (১৮৭২)। এবিষয়ও অন্যত্র বলা হইয়াছে।† ১৮৭০, ২৮শে নবেম্বর কলুটোলায় কেশব-ভবনে দ্বিতীয় বিভাগের কার্য্য উদ্‌ঘাপিত হয়। এই দিনকার সভায় বহু গণ্যমান্য দেশী-বিদেশী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতি হন হাইকোর্টের বিচারপতি ভারতহিতৈষী জে. বি. ফিয়ার। শিল্প-বিদ্যালয় এবং শ্রমজীবী বিদ্যালয় এই সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপিত হইল। শিল্প-বিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয়গুলি দাঁড়া হয় এইরূপ: (১) সূত্রধরের কার্য্য, (২) সূচীকার্য্য, (৩) ঘড়ি মেরামত, (৪) মুদ্রাঙ্কন ও লিথোগ্রাফ, (৫) এনগ্রেভিং বা খোদাইয়ের কাজ। এই বিদ্যালয়টি প্রাতে বসিবার কথা হয়। শ্রমজীবী বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয় ছিল: (১) ভাষা, (২) গণিত, (৩) সাধারণ ও প্রাকৃতিক ভূগোল, (৪) ভারতবর্ষের ইতিহাস, (৫) বস্তুবিচার, (৬) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, (৭) নীতিশিক্ষা। এ ধরনের বিদ্যালয়গুলির হিতকারিতা সভায় সভাপতি এবং অন্যান্য বক্তাদের দ্বারা বিশেষভাবে ব্যক্ত হয়। ইংলণ্ডের মধ্যবিত্ত পরিবারসমূহের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনদৃষ্টে কেশবচন্দ্র প্রথম বিদ্যালয়টি স্থাপনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় বিদ্যালয়টি ভারতবর্ষের শ্রমিকদের একটি আদর্শ শিক্ষা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি গঠন করিয়াছিলেন। সাধারণ শ্রমজীবীরা (ইহাদের মধ্যে কৃষককেও ধরিতে হইবে) ভারতবর্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাহাদের মধ্যে জ্ঞানের আলো বিকীরণ করিলে তাহারা নিজেদের জীবন ও জীবিকাকে উন্নত এবং পরিশুদ্ধ করিয়া লইতে পারিবে। শ্রমজীবীদের উন্নতি-চিন্তা ও তদনুরূপ কর্ম্মপ্রয়াস দ্বারা কেশবচন্দ্র এ বিষয়ের পথপ্রদর্শক হইয়া রহিয়াছেন। এই দশকেই বরাহনগরে সেবাব্রত শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রমজীবীদের আর্থিক ও নৈতিক উন্নতি-সাধনের নিমিত্ত সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সাধারণ জ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি 'ভারত-শ্রমজীবী' পত্রিকা (১৮৭৪) প্রকাশ করেন।

তৃতীয় বিভাগের কার্য্য আরম্ভ হইল ১লা অগ্রহায়ণ (১৫ই নবেম্বর, ১৮৭০) এক পয়সা মূল্যের সাপ্তাহিক 'সুলভ সমাচার' প্রকাশ দ্বারা। ইহার পূর্ব্বে এত কম মূল্যের কোন পত্রিকা প্রকাশিত হয় নাই। সর্ব্বসাধারণে দেশ-বিদেশের সংবাদ পরিবেশন করাই ছিল এরূপ পত্রিকাপ্রকাশের মূল উদ্দেশ্য। পত্রিকায় যে-সব বিষয় স্থান পাইত, প্রথম সংখ্যায়ই তাহার এইরূপ ফিরিস্তি দেওয়া হইল—"হিত উপদেশ, নানা সংবাদ, আমোদজনক ভাল ভাল গল্প, আমাদের দেশের ও বিদেশের ইতিহাস, বড় বড় লোকের জীবন, যে সকল আইন সাধারণের পক্ষে জানা নিতান্ত আবশ্যক, চাল ডাল প্রভৃতির দর এবং বিজ্ঞানের মূল সত্য সকল যতদূর সহজ কথায় লেখা যাইতে পারে।" সহজ সরল ভাষায় 'সুলভ সমাচারে'র নিবন্ধ ও সংবাদগুলি রচিত হইত। ইহার ভাষারই অনুবর্ত্তী ছিল স্বদেশী যুগের ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্পাদিত 'সন্ধ্যা'র ভাষা। পত্রিকার 'শারদীয়া সংখ্যা' প্রকাশের রেওয়াজ আধুনিক কালের; কিন্তু দেখিতেছি, গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে 'সুলভসমাচার' 'ক্রোড়পত্র'রূপে এইরূপ সংখ্যা প্রথম প্রকাশ করিয়াছিলেন। 'সুলভ সমাচারে'র প্রথম সম্পাদক উমানাথ গুপ্ত। প্রকাশাবধি ইহার প্রচার অতি দ্রুত বাড়িয়া যায়। এই প্রসঙ্গে ইংরেজী 'ইণ্ডিয়ান মিরর'-এর কথাও বলি। ১৮৭১, ১লা জানুয়ারী হইতে কেশবচন্দ্র এখানিকে দৈনিকরূপে বাহির করিলেন। এদেশীয়-পরিচালিত এখানিই কলিকাতার প্রথম ইংরেজী দৈনিক পত্র। কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র নরেন্দ্রনাথ সেন ইহার সম্পাদক হইলেন।

'সুরাপান ও মাদকদ্রব্য নিবারণ' এবং 'দাতব্য' বিভাগ সম্বন্ধেও এখানে কিছু বলা প্রয়োজন। সুরাপান ও মাদক দ্রব্যের ব্যবহার সমাজ-দেহকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছিল। পঞ্চাশ ও ষষ্ঠ দশকে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ইহার অপকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়া ইহার নিরোধে তৎপর হন। ১৮৬৪ সনে প্যারীচরণ সরকার মাদক দ্রব্যের ব্যবহার নিরোধকল্পে একটি সভা গঠন করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র তাহার একজন সভ্য ছিলেন। প্যারীচরণ তখন 'হিতসাধক' এবং 'well-wisher' নামে বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় দুইখানি পত্রিকাও প্রকাশ করেন। কেশবচন্দ্র এই বিষয়টিকে ভারত-সংস্কার সভার অঙ্গীভূত করিয়া লইয়া সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করিয়া দেন। 'সুরাপান ও মাদক-নিবারণ' বিভাগের মুখপত্র ছিল 'মদ না গরল!' (১৮৭১)। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রথমে ইহার সম্পাদনা করিতেন। এখানি প্রতি মাসে হাজার খণ্ড মুদ্রিত হইয়া বিনামূল্যে বিতরিত হইত। এই বিভাগের কার্য্য দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। ভারত-সংস্কার সভার পক্ষ হইতে কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে সকৌন্সিল বড়লাটের নিকটে আবেদন করা হয়। ইহাতে খানিকটা ফল ফলিল। মাদক দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণকল্পে কতকগুলি বিধি সরকার প্রবর্ত্তন করেন। কেশবচন্দ্র কিন্তু ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া ১৮৭৮ সনে মুখ্যতঃ সুরাপানের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে তরুণ ছাত্রদের

---

* "স্ত্রীশিক্ষা-আন্দোলনে কেশবচন্দ্র সেন"—প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭।

† "বামাহিতৈষিণী সভা ও ভারতাশ্রম"—প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৫৭।

লইয়া 'আশালতা দল' (Band of Hope) গঠন করিলেন। কেশবচন্দ্রের নির্দ্দেশে সভা মাঝে মাঝে পুস্তিকা প্রচার করিতেন। সুরাপান ও মাদক দ্রব্যের ব্যবহার নিবারণকল্পে অষ্টম দশকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ভারত-সভার পক্ষ হইতেও জোর আন্দোলন চলিয়াছিল। পরিশেষে ইহা ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের একটি প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়। 'দাতব্য' বিভাগে কার্য্য ছিল—দরিদ্র ছাত্রদের বেতন ও পুস্তক দিয়া সাহায্য করা, অন্ধ, খঞ্জ, বধিরকে অর্থসাহায্য, বিধবা ও দুঃস্থ পরিবারদিগকে নিয়মিত মাসিক সাহায্য, অনাথ আতুরদিগকে ঔষধপথ্য বিতরণ প্রভৃতি। এই বিভাগও নিজ উদ্দেশ্যসাধনে অগ্রসর হয়।

ভারত-সংস্কার সভা জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম নির্বিশেষে সমগ্র ভারতবাসীরই উন্নতিমূলক ও হিতকর প্রতিষ্ঠান। এ দিক দিয়া ইহা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পুরোবর্ত্তী। রাজনীতি ক্রমে কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য লইয়া দাঁড়ায়। ভারত-সংস্কার সভার অভ্যুদয়কালে ভারতের রাজনীতিবিষয়ক আন্দোলনের ভার পড়িয়াছিল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশান বা ভারতবর্ষীয় সভার উপর। তখনও রাজনীতি সমাজ-জীবনের সমুদয় বিভাগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে নাই, আবার এমন বহু ব্যক্তি ছিলেন যাঁহাদের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগ দেওয়া সম্ভবপর ছিল না, অথচ তাঁহারা ভারতবাসীর একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষীই ছিলেন। কেশবচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত ভারত-সংস্কার সভা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান না হইয়াও একটি ব্যাপকতর ও বৃহত্তর উদ্দেশ্যসাধনে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল। ইহাতে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টানধর্ম্মাবলম্বী বহু মনীষী যোগদান করেন। সরকারী কর্ম্মচারী, খ্রীষ্টান পাদ্রী, প্রগতিশীল ব্যক্তি, রক্ষণশীল হিন্দু কাহারও যোগ দিতে কোনরূপ বাধা ছিল না। সভার সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন মতের ও ধর্ম্মের মনুষ্যসমষ্টির মিলন ঘটিয়াছিল। সভার প্রতিটি বিভাগই জনকল্যাণকর। কাজেই তাঁহারা সাগ্রহে ইহার কার্য্য সম্পাদনেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে ও বিশেষতঃ গান্ধী-যুগে কংগ্রেস জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। রাজনীতি বাদ দিলে, ইহার যাবতীয় কর্ম্মসূচীরই সূচনা দেখিতে পাইতেছি এই ভারত-সংস্কার সভার মধ্যে। ভারত-সংস্কার সভার কার্য্য ১৮৭৯ সন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল প্রায় সর্ব্ব বিভাগে। ইহার পরে নানা কারণে সভার কার্য্য অনেকটা সঙ্কুচিত হয়। কলিকাতাস্থ ভারত-সভা সমাজোন্নতিমূলক বহু কার্য্যের ভার তখন গ্রহণ করে। স্ত্রী-জাতির উন্নতি ও শিক্ষা-প্রচেষ্টা কিন্তু তখনও চলিয়াছিল। তবে তখন ইহা ভিন্ন খাতে চলিতে আরম্ভ করে।*

* ভারত-সংস্কার সভার বার্ষিক রিপোর্টগুলি শ্রীযুক্ত সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নিকট হইতে পাইয়াছি। ১৮৭৯ সনের বিবরণ 'আচার্য্য কেশবচন্দ্র, দ্বিতীয় খণ্ড' (উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় প্রণীত) পুস্তকের ১৪২৫-৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভা, ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা : ভারতবর্ষের শুধু সামাজিক নয়, সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি-চিন্তাও করিয়াছেন কেশবচন্দ্র। বিজ্ঞানের উন্নতি ভারতবাসীর কাম্য। কিন্তু কোন্ সূত্র ধরিয়া ইহার সূচনা সম্ভব, মনীষিগণ তাহার চিন্তায় লিপ্ত হইয়াছিলেন। এই সময় ১৮৬৬ সনের শেষদিকে ভারতবর্ষে আগমন করেন মিস মেরী কার্পেণ্টার।* তাঁহার আগমনে বঙ্গদেশে কিরূপ কর্ম্মতৎপরতা দেখা দিয়াছিল তাহার আভাস আমরা ইতিপূর্ব্বেই পাইয়াছি। বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভা ("The Bengal Social Science Association") প্রতিষ্ঠান এতাদৃশ কর্ম্মতৎপরতার একটি উৎকৃষ্ট ফল। বিজ্ঞান-অনুশীলনে স্বাভাবিক আসক্তি কেশবচন্দ্রের ছিল। আবার সমাজের সেবা ও উন্নতির পক্ষে সমাজ-বিজ্ঞান-চর্চ্চা একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভা প্রতিষ্ঠায় যে তাঁহার যোগ থাকিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া কেশবচন্দ্র যেমন ভারত-সংস্কার সভা স্থাপন করিলেন তেমনি বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভার সঙ্গে যুক্ত হইলেন। শেষোক্ত সভার চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন হইল ২রা ফেব্রুয়ারী ১৮৭১ তারিখে। এই অধিবেশনে কেশবচন্দ্র অধ্যক্ষ-সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ইহার শিক্ষা-বিভাগের সভাপতি-পদও তিনি প্রাপ্ত হইলেন। এই পদে তাঁহার পূর্ব্বে নিযুক্ত ছিলেন পাদরি লঙ। পর পর দুই বৎসর (১৮৭১ ও ১৮৭২) তিনি সভাপতির আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই দুই বৎসরে শিক্ষা-শাখার সম্পাদক ছিলেন চন্দ্রনাথ বসু ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। সমাজ-বিজ্ঞান সভার কার্য্যবিবরণ ১৮৭৮ সন পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। কেশবচন্দ্র শেষ বৎসর পর্য্যন্ত ইহার অন্যতম অধ্যক্ষ ছিলেন। শেষ কয় বৎসর মূল সভার সম্পাদক ছিলেন মৌলবী আবদুল লতিফ খাঁ।

কেশবচন্দ্র ভারত-সংস্কার সভার মাধ্যমে স্ত্রীজাতির উন্নতি সাধনে বিশেষভাবে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। সমাজ-বিজ্ঞান সভার সভাপতি-পদ গ্রহণ করিয়া তিনি স্ত্রীশিক্ষা এবং সাধারণ শিক্ষা উভয় বিষয়েই সবিশেষ অবহিত হইলেন। শিক্ষা-বিভাগের সভাপতি-পদ প্রাপ্ত হইয়াই প্রথম সুযোগেই তিনি "ভারতের নারীজাতির উন্নতি" সম্বন্ধে ১৮৭১, ২৪শে ফেব্রুয়ারী একটি বক্তৃতা দিলেন। এই বক্তৃতায় হিন্দুযুগ হইতে বিভিন্ন সময়ে নারীজাতির শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে এবং বিশেষভাবে ব্রিটিশ আমলের শিক্ষারীতির সবিস্তারে উল্লেখ করেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের ইতিহাস বর্ণনাকালে বক্তৃতাটিতে কিছু কিছু তথ্যগত ভুল দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাসের একটি আনুপূর্ব্বিক ধারা আমরা ইহার মধ্যে পাইতেছি। এরূপ ইতিহাস রচনার ইহাই বোধ হয় প্রথম প্রয়াস। স্ত্রীশিক্ষার প্রসারকল্পে বিভিন্ন উপায়ও তিনি এই বক্তৃতায় বিস্তৃতভাবে বিবৃত করিলেন। পর বৎসর, ১৮৭২ সনের ১৪ই মার্চ্চ সমাজ-বিজ্ঞান সভার বার্ষিক অধিবেশনে কেশবচন্দ্র "Recons-

* "কেশবচন্দ্র সেন : জাতি-গঠনে"—প্রবাসী, পৌষ ১৩৬৪

-truction of Native Society" বা 'দেশীয় সমাজের পুনর্গঠন' শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতায় এই কয়টি বিষয় আলোচিত হয়: (১) শিক্ষাযোগে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রভাব বিস্তার, (২) খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম প্রচার, (৩) ব্রাহ্মসমাজ, (৪) ব্যবস্থাপক সভার সংস্কারমূলক প্রস্তাবাবলী। ইহার পরে দেশের পুনর্গঠন বিষয়ে তিনি বলেন:

"সর্ব্বপ্রথমে চরিত্রগঠন নিতান্ত প্রয়োজন। জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যদি চরিত্রের উন্নতি না হইল তাহা হইলে জাতির গঠন কিছুতেই হইল না। প্রতি ব্যক্তির চরিত্র যাহাতে গঠিত হয়, তজ্জন্য বিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষা দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু নীতিশিক্ষা দিতে গেলেই ধর্ম্মের সহিত তাহার যোগ থাকা চাই। গবর্ণমেণ্ট ধর্ম্ম সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিতে চান না, এজন্য বিদ্যালয়ে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিতে গবর্ণমেণ্ট অসম্মত। ইহা অবশ্য ভাল, কিন্তু অসাম্প্রদায়িক 'প্রাকৃতিক ধর্ম্মবিজ্ঞান' (Natural Theology) অনায়াসে বিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া শিক্ষকেরা আপনারা সচ্চরিত্র হইয়া দেশের প্রতি, গুরুজনের প্রতি এবং অপরের প্রতি কর্ত্তব্যশিক্ষা দিতে পারেন। কতকগুলি চরিত্রবান শিক্ষিত লোক হইলে, তাঁহারা আপনাদের প্রভাব চারিদিকে বিস্তার করিতে পারিবেন। নৈতিক বিশুদ্ধতা বিনা সমাজ কখন পুনর্গঠিত হইতে পারে না। প্রতি ব্যক্তির চরিত্র গঠন করিতে গেলে, গৃহের সংশোধন সর্ব্বদা প্রয়োজন। সামান্য শিক্ষালাভ করিয়া নারীগণের বিশেষ অলাভ হইয়াছে। একদিকে তাঁহারা প্রাচীন আচার-ব্যবহারাদির সহিত সহানুভূতি রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। গৃহকার্য্যে অনিপুণা হইয়া পড়িতেছেন, অপর দিকে নূতন জ্ঞানালোকেও উন্নত হইতেছেন না, নূতনভাবে গঠিতচরিত্র হইতেছেন না।...নারীগণের শৃঙ্খলমোচন নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া আন্দোলন উপস্থিত। নারীগণ সর্ব্ববিধ কার্য্যে ও ব্যবহারে স্বাধীনতা সম্ভোগ করিবেন ইহার প্রতিরোধ কে করিবে? তবে নারীগণের বিদ্যাশিক্ষা, নীতিশিক্ষা, সমাজ-সংস্কারের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ শৃঙ্খলমোচন হয় ইহাই আকাঙ্ক্ষণীয়। শৃঙ্খলমোচনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক আচার-ব্যবহারাদির সংশোধন নিতান্ত আবশ্যক। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ইত্যাদি অকল্যাণকর ব্যবহার উঠিয়া গিয়া, উপযুক্ত বয়সে বিবাহ প্রভৃতি মঙ্গলকর ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হওয়া সমুচিত।"*

সমাজ-বিজ্ঞান সভায় প্রদত্ত এই বক্তৃতায় কতকটা ফল হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট 'প্রাকৃতিক ধর্ম্মবিজ্ঞান' শিক্ষাদান বিষয়ে চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন। সচ্চরিত্র সেবাপরায়ণ 'মানুষ' গঠনে অশ্বিনীকুমার দত্ত পরবর্ত্তীকালে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। ইহাও মনে হয় কেশবচন্দ্রের বক্তৃতার একটি প্রত্যক্ষ ফল।

প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় কেশবচন্দ্র আদৌ সন্তুষ্ট ছিলেন না। উপরোক্ত বক্তৃতায় এবং পূর্ব্ববর্ত্তী কথাতেও তাহা বেশ বুঝা গিয়াছে। কেশবচন্দ্র ১৮৭২ সনে ভারত-সংস্কার সভার সভাপতি এবং সমাজ-বিজ্ঞান সভার অন্তর্গত শিক্ষা-বিভাগের নায়ক। কাজেই এ সময় প্রকাশ্যভাবে নিজ নাম দিয়া বড়লাটকে পত্র লেখা হয় ত সমীচীন মনে করেন নাই, 'Indo Philus' (ভারত-বন্ধু) ছদ্মনামে বড়লাট লর্ড নর্থব্রুককে শিক্ষা-সংস্কারের উদ্দেশ্যে নয়খানি পত্র লিখিলেন। এই পত্রগুলি 'ইণ্ডিয়ান মিরারে' ১৮৭২ সনের ৮ই মে হইতে ১৬ই আগষ্টের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পত্রগুলিতে কেশবচন্দ্র জনসাধারণের শিক্ষা-ব্যবস্থা, উচ্চশিক্ষা, নীতিশিক্ষা, শিল্পশিক্ষা, নারীশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেন। এই পত্রগুলি প্রকাশে তখনই কোন ফল না হইলেও শিক্ষা-সংস্কারের প্রতি সুধী ও মনীষী ব্যক্তিদের এবং সরকারের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়।

বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভার সঙ্গে কেশবচন্দ্রের সংযোগ শেষ দিন পর্য্যন্ত বজায় ছিল। তিনি বরাবর ইহার অধ্যক্ষ-সভার সদস্য থাকিয়া ইহার সকল কর্ম্মে সহযোগিতা করিয়াছেন। এই সভা দ্বারা সমাজের যে কত উপকার হইয়াছে তাহা আমি ইতিপূর্ব্বে কয়েকটি প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। এদেশে কারা-সংস্কার এবং শিশু-অপরাধী সংশোধনের কোন ব্যবস্থা ছিল না। সমাজ-বিজ্ঞান সভার আন্দোলনের ফলে গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে উদ্যোগী হন। বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভার প্রধান উদ্যোক্তা মিস মেরী কার্পেণ্টারের মৃত্যু হইলে, এই সভা ১৮৭৭, ২৮শে জুলাই একটি শোকসভার আয়োজন করেন। এই সভায় কেশবচন্দ্র মিস কার্পেণ্টারের জীবনব্যাপী কর্ম্মসাধনার সংক্ষিপ্ত পরিচয়সহ ভারতবর্ষের হিতার্থে তাঁহার কৃতির বিষয় বিশদরূপে বর্ণনা করেন। বক্তৃতাটি সভার 'Transactions'-এ এখনও আত্ম-গোপন করিয়া আছে। কেশবচন্দ্রের ইংরেজী বক্তৃতা-গ্রন্থে এটিও সন্নিবেশিত হওয়া বিধেয়।

'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা' ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। এই প্রতিষ্ঠানটি বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠান-গুলির শীর্ষস্থানে রহিয়াছে। ইহার প্রতিষ্ঠাকালেও কেশবচন্দ্র ডাঃ সরকারের বিশেষ সহায় হন। কয়েক বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ডাঃ সরকার ১৮৭৬, ২৯শে জুলাই ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা স্থাপন করিলেন। সভার প্রথম অধ্যক্ষ-সভায় বাংলার গণ্যমান্য দেশী-বিদেশী মনীষী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা স্থান পাইয়া-ছিলেন। কেশবচন্দ্রকেও সভার একজন অধ্যক্ষরূপে দেখিতে পাইতেছি। সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া দীর্ঘদিন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও এই সভা জীবিত ছিল। বর্ত্তমানের নূতন পরিবেশে ইহা এক বিরাট গবেষণাগারে পরিণত হইয়াছে।

এলবার্ট ইনষ্টিটিউট: পঞ্চম দশকের শেষে এবং ষষ্ঠ দশকের

---

* আচার্য্য কেশবচন্দ্র, ২য় খণ্ড—উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, পৃ. ৯৩৬-৭।

প্রথম দিকে সিপাহী যুদ্ধের শোচনীয় পরিণতির ফলে জাতির জীবনে এক সঙ্কটময় অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল। সপ্তম দশকের মধ্যভাগেও এইরূপ সঙ্কট দেখা দিয়াছিল। শিক্ষিত বাঙালী ও শ্বেতাঙ্গ সমাজের মধ্যে বিরোধ ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া পড়ে, আর ইহাতে ইন্ধন জোগাইতে থাকে সরকারের অনুসৃত বিধি-বিধানগুলি। এ দেশের বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মধ্যেও স্বার্থগত বিরোধ প্রকট হইয়া পড়ে। রাজনৈতিক কারণে উচ্চশিক্ষিত বাঙালী তথা ভারতবাসীদের মধ্যে ঐক্যবোধের উন্মেষ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাকে সুষ্ঠু রূপ দিবার নিমিত্ত মানবিকতার ভিত্তিতে শ্রেণী ধর্ম্ম বর্ণ ও মতবাদ নির্ব্বিশেষে আত্মোৎকর্ষমূলক একটি মিলনক্ষেত্র রচনাও আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। এই মিলনক্ষেত্র সৃষ্ট হয় এলবার্ট ইনৃষ্টিটিউটের মধ্যে। সাধারণের নিকট ইহা 'এলবার্ট হল' নামেই ক্রমে প্রসিদ্ধি লাভ করে। যে সমুদয় উদ্দেশ্য লইয়া পরবর্ত্তীকালে কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার বীজ অনেকাংশে এলবার্ট ইনৃষ্টিটিউটের মধ্যেই পরিদৃষ্ট হয়। আর উহার প্রথম পরিকল্পনা-রচনার ও প্রতিষ্ঠার সম্মান কেশবচন্দ্রের অনুবর্ত্তী ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারেরই প্রাপ্য।

এলবার্ট হল বা ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা সম্পূর্ণই কেশবচন্দ্র সেনের। ১৮৭৫-৭৬ সনে যুবরাজ (সপ্তম এডওয়ার্ড) ভারতবর্ষে আগমন করেন। এই উপলক্ষে তাঁহার পিতা এলবার্টের নামের সঙ্গে যুক্ত করিয়া কেশবচন্দ্র এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের উদ্যোগ আয়োজন করেন। ইহার উদ্দেশ্য এইরূপ বর্ণিত হয় :

"That in commemoration of Royal Highness the Prince of Welse 'Visit to British India' an Association be formed to be styled the Albert Institute, with a view to promote literary and social intercourse among all classes of the community, and that in connection with the above Institute there be a Public Hall to be styled the Albert Hall."

সাহিত্যিক ও সামাজিক আলাপ-আলাপনের নিমিত্ত এলবার্ট ইনৃষ্টিটিউটের স্থাপনা, আর এই উদ্দেশ্যে 'এলবার্ট হল' নামে একটি সাধারণগম্য হল বা ভবনের পত্তনের আয়োজন হইল কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে। এলবার্ট হলের দ্বার-উন্মোচন উৎসব আনুষ্ঠানিক ভাবে সম্পন্ন হইল ১৮৭৬ সনের ২৬শে এপ্রিল। বঙ্গের ছোটলাট সার রিচার্ড টেম্পল এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। কেশবচন্দ্র প্রস্তাবনায় এলবার্ট ইনৃষ্টিটিউটের পরিকল্পনার কথা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া ইহা দ্বারা যে মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে তদুদ্দেশ্যে বলেন :

"In the midst of jarring and conflicting interests and the numerous growing political and religious divisions in native society, consequent on a state of exitement which a liberal English education has produced, it was thought desirable to provide a place for kindling social intercourse, where men of all classes and creeds at least for the time being might forget their difference and enter into social fellowship and friendly communion. It was therefore thought that a Hall such as this would prove to be of immense advantage to the people of the country for Hindu, Mahomedans, Christians, Native Christians and Brahmos and where all political parties might meet for simple co-operation and intercourse. This Hall will not belong to any exclusive political or religious party but will be the common property of all classes of native society."*

বিভিন্নমুখী ও বিরোধীভাবাপন্ন মতবাদের লোকেদের মিলনক্ষেত্র হইবে এই ইনৃষ্টিটিউট বা হল। কেশবচন্দ্র বলেন, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, দেশীয় খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম—সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায় এখানে আসিয়া সম্মিলিত হইবেন একই উদ্দেশ্যে। একটি কমিটি বা অধ্যক্ষসভার উপরে এই প্রতিষ্ঠানটির ভার অর্পিত হইল। ১৮৭৭, ২৮শে এপ্রিল গবর্ণমেণ্টের নিকট যে মেমোর্যাণ্ডাম প্রেরিত হয়, তাহাতে অধ্যক্ষ-সভার সদস্যদের নাম এইরূপ পাইতেছি : সভাপতি সার এশলি ইডেন ; সহকারী সভাপতি—রমানাথ ঠাকুর ; সদস্য—নরেন্দ্রকৃষ্ণ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কমলকৃষ্ণ, আর্কডিকন বেলী, এইচ বেল, ঈ লার্কো, সি এইচ টনি, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মহেন্দ্রলাল সরকার, আমীর আলি, আসগর আলি, আবদুল লতিফ খাঁ ; সম্পাদক—কেশবচন্দ্র সেন ; সহঃ সম্পাদক—আনন্দমোহন বসু। হলের ট্রাষ্টিও গঠিত হইল। কলিকাতায় এলবার্ট হল কলিকাতার একটি প্রথম শ্রেণীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানরূপে অবিলম্বে পরিচিত হয়। গ্রন্থাগার, পাঠাগার এই ইনৃষ্টিটিউটের অঙ্গ। এখানে ব্রহ্মবিদ্যালয়, কলিকাতা স্কুল, কলিকাতা কলেজ, বেদবিদ্যালয় প্রভৃতিও ক্রমে স্থাপিত হয়। প্রধান 'হল'-ঘরে সাধারণের চিত্তোৎকর্ষক বক্তৃতাদিরও ব্যবস্থা হইতে থাকে। দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এলবার্ট হল বা ইনৃষ্টিটিউট দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া সাংস্কৃতিক মিলনক্ষেত্ররূপে বাঙালী জাতির অশেষ কল্যাণসাধন করিয়াছে। এই কল্যাণকর জাতীয় প্রতিষ্ঠানটি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে উঠিয়া গিয়াছে।

* *The Indian Daily News*, April 28, 1876 : "Opening of the Albert Hall."

ধর্ম্মচর্য্যা, সাধুসঙ্গ, উত্তর-ভারত পরিক্রমা : পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া 'ধর্ম্মবীর' কেশবচন্দ্র 'কর্ম্মবীর'রূপে ভারতভূমে অবতীর্ণ হইলেন। কেশবচন্দ্রের কর্ম্মৈষণা কিরূপ উত্তরোত্তর বাড়িয়া যায় তাহার আভাস আমরা এতক্ষণে যথেষ্ট পাইলাম। কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মচর্য্যা কিন্তু সমানে চলিয়াছিল। মন্দিরে প্রদত্ত তদীয় প্রার্থনা-বক্তৃতাগুলি যুবচিত্তে কি উন্মাদনাই উদ্রেক করিত! প্রতি বৎসর মাঘোৎসবকালে কলিকাতা টাউন হলে কেশবচন্দ্র ইংরেজীতে বক্তৃতা দিতেন। এই সকল সভায় বাংলার গুণী-জ্ঞানী ইউরোপীয় ও ভারতীয়েরা উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার ধর্ম্মোপদেশে বিমোহিত হইতেন। ভারতের বড়লাট, বঙ্গের ছোটলাট এবং পদস্থ ইংরেজ ও ভারতীয়েরাও এই সকল বক্তৃতা শুনিতে যাইতেন। শুধু প্রার্থনা বা বক্তৃতা দ্বারা মানুষের প্রাণে ধর্ম্মভাব স্থায়ী করা যায় না। এই উদ্দেশ্যে মণ্ডলী গঠন, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ, পুস্তক-পুস্তিকা প্রচার প্রভৃতিতেও কেশবচন্দ্র মনঃসংযোগ করিলেন। তৎপ্রতিষ্ঠিত 'ভারত আশ্রমের কথা উল্লেখ করিয়াছি। ১৮৭২ সনের ৫ই ফেব্রুয়ারী বেলঘরিয়াস্থ জয়গোপাল সেনের উদ্যানবাটিকায় এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আশ্রম কেশবচন্দ্রের যাবতীয় কর্ম্মের কেন্দ্র হইয়া উঠে। কোন্নগর ও শ্রীরামপুরের মধ্যবর্ত্তী মোড়পুকুর নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত 'সাধন-কানন' আর একটি সাধন ও কর্ম্মকেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। 'সাধন-কাননে' আধুনিক কালের 'গ্রাম-সেবার' কার্য্যসূচী আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়, অবশ্য ইহাও ধর্ম্ম-বিষয়াদি ছাড়া। ইহার বিবরণ সমসাময়িক সংবাদপত্রে এই মর্ম্মে বাহির হয় :

"অল্পদিন হইল, যে উদ্যান (সাধনকানন) ক্রয় করা হইয়াছে, তাহাতে কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার অনুযায়িগণ প্রাচীনকালের অথচ নূতন প্রকারের ধরনে বাস করেন। তাঁহারা বৃক্ষতলে কুশাসন, বনাতের আসন এবং ব্যাঘ্রচর্ম্মের উপরে বসিয়া প্রাতঃকালে একত্র উপাসনা করিয়া থাকেন।...উপাসনার পর তাঁহারা রন্ধন করেন, এবং দুপ্রহরের মধ্যে তাঁহাদের ভোজনকার্য্য শেষ হয়। আহারের পর অর্দ্ধঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া, একঘণ্টাকাল তাঁহারা সৎপ্রসঙ্গ করেন। তদনন্তর কেহ কেহ লেখাপড়া ও অন্যান্য সামান্য কাজ করিয়া থাকেন। অপরাহ্নে জল তোলা, বাঁশ কাটা, পথ প্রস্তুত ও সমান করা, গাছ পোঁতা, গাছ সরাইয়া দেওয়া ও জল সেচন, তাঁহাদের কুটির প্রস্তুত করা, নানা স্থান পরিষ্কার করা এই সকল কার্য্য করিয়া থাকেন; কেউ মাথা খুলিয়া, কেউ মাথায় ভিজা গামছা বাঁধিয়া, রৌদ্রে খুব পরিশ্রম করেন। ছয়টা পর্য্যন্ত এইরূপে কার্য্য করিয়া, অর্দ্ধঘণ্টা বিশ্রামের পর সকলে নির্জ্জন সাধনে গমন করেন। সন্ধ্যা ঘোর হইয়া আসিলে—মনে কর, সাড়ে সাতটা হইলে—তাঁহারা সংকীর্ত্তন আরম্ভ করেন। তৎপর কীর্ত্তনের দল বাঁধিয়া বনে-আচ্ছন্ন পাড়ায় রাস্তায় বাহির হন, প্রায় গরিবদের কুটিরে প্রবেশ করিয়া গৃহস্থের কল্যাণার্থ কীর্ত্তন ও প্রার্থনা করেন। এই সকল কার্য্যের ভিতরেও বাবু কেশবচন্দ্র সেন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী এবং অন্যান্য বড়লোকের সঙ্গে পত্রালাপ, আলবার্ট হলের উন্নতি ও ভাল অবস্থার জন্য উদ্যমসাধ্য উপায় গ্রহণ, সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লেখা ইত্যাদিরও সময় পান।"*

কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মচর্য্যা যে সর্ব্বদা নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইয়াছে এমন নহে, তাঁহার ব্রাহ্মবন্ধু ও সহকর্ম্মীদের নিকট হইতে সময়ে সময়ে বাধাও পাইয়াছেন যথেষ্ট। ১৮৭২ সনের তিন আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে তিনি এবিষয়ক প্রচেষ্টায় আদি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে ভীষণ বাধার সম্মুখীন হন। উক্ত সনের ১৯শে মার্চ্চ এই বিবাহ-আইন বিধিবদ্ধ হয়। কিন্তু যে আকারে ইহা বিধিবদ্ধ হয় তাহা আদৌ কেশবচন্দ্রের মনঃপূত ছিল না। উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী হইয়া মন্দিরে পুরুষের মত নারীরও প্রকাশ্যে উপাসনায় যোগদানের দাবি জানান। কেশবচন্দ্রের দ্বারাই ইহার মীমাংসা হইয়া যায়। কিন্তু তৎকর্তৃক উপাসক ও প্রচারক-মণ্ডলী গঠন লইয়া ব্রাহ্মসাধারণের মধ্যে আবার কলহের গুঞ্জন ধ্বনিত হইয়া উঠে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রতিপক্ষের মুখপত্র-স্বরূপ 'সমদর্শী' নামে একখানি মাসিক পত্রও (অগ্রহায়ণ ১২৮১) হইতে প্রকাশ করিলেন। কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের আন্দোলন বিশেষ দানা বাঁধিয়াছিল তাঁহার প্রথমা কন্যার বিবাহ লইয়া। এ বিষয় পরে বলিব।

কেশবচন্দ্র বঙ্গের ও বঙ্গের বাহিরের সাধুসন্তদের সংস্রবে আসিলেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রধান দুই জন—দয়ানন্দ সরস্বতী এবং পরমহংস রামকৃষ্ণ। দয়ানন্দ আর্য্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১৮৭২ সনের প্রথম দিকে বাংলায় আগমন করেন এবং কলিকাতার উপকণ্ঠে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাগানবাড়ীতে আসিয়া উঠেন। এখানে কেশবচন্দ্র সদলবলে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। দয়ানন্দের সঙ্গে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিয়া তাঁহারা বিশেষ প্রীত হন, এবং কেশবচন্দ্রের অনুরোধে তিনি কলিকাতা নগরীর মধ্যে প্রকাশ্য জনসভায় বক্তৃতা দেন। দয়ানন্দ সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা করিতেন। বক্তৃতার ভাষা এত সরল ও প্রাঞ্জল হইত যে, সামান্য শিক্ষিতেরাও তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিতেন। কেশবচন্দ্র পরমহংস রামকৃষ্ণদেবেরও সংস্রবে আসিলেন ১৮৭৫ সনের প্রথম দিকে। উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিল, এবং কেশবচন্দ্রের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই ঘনিষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ ছিল। প্রথমবার সাক্ষাৎকারের বিবরণ ২৮শে মার্চ্চ ১৮৭৫ তারিখের 'ইণ্ডিয়ান মিরর' এইরূপ দিয়াছেন :

"We met one (a sincere Hindu devotee). not long ago, and were charmed by the depth, penetration and simplicity of his spirit. The

---

* আচার্য্য কেশবচন্দ্র—দ্বিতীয় খণ্ড—উপাধ্যায় শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়, পৃ, ১০৯৭-৮। ৪ঠা জুন, ১৮৭৬ তারিখের 'ইণ্ডিয়ান মিররে' প্রকাশিত বিবরণের মর্ম্ম।

never-ceasing metephoss and analogis in which he indulged, are most of them as apt as they are beautiful. The characteristics of his mind are the very opposite to those of Pundit Dayananda Saraswati, the former being as gentle, tender, and contemplative as the later is tardy, masculine and polemical. Hinduism must have in it a deep source of beauty, truth and goodness to inspire such men as these.

কেশবচন্দ্র ১৮৭৩ হইতে ১৮৭৬ সনের মধ্যে অন্তত: তিন বার উত্তর-ভারত পরিক্রমা করেনএইরূপ মুহুর্মুহু পরিক্রমার উদ্দেশ্য মুখ্যত: ধর্ম্ম-প্রচার হইলেও ভারতবাসীদের ঐক্যবোধের উন্মেষে ইহা বিশেষ সহায় হইয়াছিল। ১৮৭৩ সনে তিনি লক্ষ্ণৌ, বাঁকিপুর, এলাহাবাদ, বেরিলী, দেরাদুন, লাহোর, অমৃতসর, আগ্রা, কানপুর, জব্বলপুর প্রভৃতি স্থলে গমন করেন। প্রতিটি স্থলেই তিনি ধর্ম্মমূলক বক্তৃতা প্রদান করেন। লাহোরের সালেমারবাগে তিনি প্রথম বক্তৃতা দিলেন হিন্দী ভাষায় (৭ই নবেম্বর, ১৮৭৩)। ১৮৭৬, ডিসেম্বর মাসে তিনি দিল্লীর দরবারে যোগ দিতে যান। ১৮৭৭ সনে দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারত-সভার পক্ষে সিভিল সার্ব্বিস আন্দোলন পরিচালনার জন্য সমগ্র উত্তর-ভারত পর্য্যটন করিলেন। কেশবচন্দ্রের উত্তর-ভারত পরিক্রমা তাঁহার সাদর সম্বর্দ্ধনার পথ পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত করিয়া দেয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 'সিভিল সার্ব্বিস' আন্দোলন উপলক্ষে কলিকাতা টাউন হলে যে বিরাট জনসভা হয় তাহাতে কেশবচন্দ্র সাগ্রহে যোগ দিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটিরও তিনি ছিলেন একজন সদস্য।

কেশবচন্দ্র ১৮৭৬ সনের ডিসেম্বর মাসে দিল্লীর দরবারে যোগ দিলেন। তিনি ভারতবর্ষে ইংরেজ আগমনকে 'বিধাতার আশীর্ব্বাদ' বলিয়া মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিতেন। এই হেতু তখন বাংলাদেশে যে নব্য বিপ্লবী ভাবধারা যুবকমনে নিবিষ্ট হইয়াছিল, তাহা কেশবচন্দ্রের উক্ত ভাবনার বিরোধী ছিল। এই সময়কার নব্য ভাবোদ্দীপ্ত যুবক বিপিনচন্দ্র পরবর্ত্তীকালে কেশবচন্দ্রের ভাবনার সার্থকতা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র রাণী ভিক্টোরিয়ার 'এম্প্রেস অফ ইণ্ডিয়া' নামগ্রহণ উপলক্ষে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সরকার-প্রদত্ত কোনরূপ উপাধি গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে একটি কৌতুককর কাহিনী প্রচলিত আছে। "K. C. S. I." উপাধি প্রদানের কথা উঠিলে তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমি ত মনুষ্য-প্রদত্ত কে. সি. এস. আই. হইতে পারি না, জগদীশ্বর স্বয়ং আমাকে কে. সি. এস. আই. করিয়াছেন,' "অর্থাৎ তিনি যে Keshab Chunder Sen of India'

১৮৭৭-৭৮ সনে কেশবচন্দ্রের আরও কয়েকটি কার্য্য এখানে উল্লেখযোগ্য। কলুটোলার পৈতৃক ভবন ত্যাগ করিয়া তিনি ১৮৭৭ সনের ১২ই নবেম্বর আপার সারকুলার রোডস্থিত নূতন বাটিতে ('কমলকুটীর', বর্ত্তমানে ভিক্টোরিয়া কলেজ) চলিয়া আসেন। সমাজের প্রচারকগণের জন্য পৃথক পৃথক বাসভবন লইয়া 'মঙ্গলবাড়ী'ও এই সময় স্থাপিত হইল। বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভায় মিস মেরী কার্পেন্টারের মৃত্যু উপলক্ষে তাঁহার মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতার কথা বলিয়াছি। মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষে সাহায্য প্রেরণের ব্যবস্থাও তাঁহার উদ্যোগে করা হয় ১৮৭৭ সনের মাঝামাঝি সময়ে। কলিকাতা স্কুলের নাম এই বৎসর হইতে 'এলবার্ট স্কুল' রাখা হইল। ১৮৭৮, ২৪শে জানুয়ারী তিনি 'আশালতা দল' ("Band of Hope") গঠন করেন, উদ্দেশ্য—সুরাপাননিবারণে যুবকচিত্তের উদ্বোধন। পরবর্ত্তী মে মাসে কেশবচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বালকবন্ধু' নামে একখানি সচিত্র পাক্ষিক পত্রিকা বাহির হয়। 'সুলভ সমাচার' ছিল সাধারণ শিক্ষিতদের পাঠ্য, 'বালকবন্ধু' বালক-বালিকাদিগের বোধগম্য সরল ভাষায় লেখা হইত।

কুচবিহার-বিবাহ ও তাহার প্রতিক্রিয়া : কিন্তু ১৮৭৮ সনের প্রথমার্দ্ধেই কেশবচন্দ্র এক ভীষণ আবর্ত্তের মধ্যে পড়িলেন। ইহার মূল কুচবিহারের রাজকুমারের সঙ্গে তাঁহার কিঞ্চিদধিক তের বৎসর বয়সের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুনীতি দেবীর বিবাহ (৬ই মার্চ্চ, ১৮৭৮)। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের এক দল ব্রাহ্ম কেশবচন্দ্রের উপর পূর্ব্ব হইতেই নানা কারণে বিরূপ হইয়াছিলেন। এই বিবাহ লইয়া তাঁহারা ভীষণ আন্দোলন সুরু করিয়া দিলেন। ১৮৭২ সনের তিন আইন অনুযায়ী এ বিবাহ নিষ্পন্ন হয় নাই—ইহাই ছিল প্রতিবাদকারীদের মৌলিক আপত্তি। তাঁহারা কেশবচন্দ্রের মতামত ও আচরণের মধ্যে সামঞ্জস্যহীনতা দৃষ্টে এতই আপত্তি জানাইতে লাগিলেন যে, উভয় দলের মধ্যে মিলনের আশা সুদূরপরাহত হইল। এই বিরোধী দল ১৮৭৮ সনের ১৫ই মে কলিকাতা টাউন হলে এক জনসভার অনুষ্ঠান করিয়া 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করিলেন। কেশবচন্দ্রের বহু অন্তরঙ্গ এবং অনুরক্ত ব্রাহ্মও নূতন সমাজে যোগ দিলেন। নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠায় শিবচন্দ্র দেব, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, দুর্গামোহন দাস প্রভৃতি বিশেষ অগ্রণী হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে স্বতন্ত্র হইলেও, ইহার কার্য্যকলাপ নূতন সমাজ অনেকাংশে অনুসরণ করেন। মন্দির স্থাপন, প্রচারক নিয়োগ, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ, বিদ্যালয়াদি প্রতিষ্ঠা, যুবসভা প্রভৃতি বহুবিধ কার্য্যে নূতন সমাজ-পরিচালকগণ হাত দিলেন।

কেশবচন্দ্রের পক্ষে এই বিচ্ছেদ খুবই মর্ম্মান্তিক হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে রহিলেন তাঁহাদের লইয়াই তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার প্রতিভা নূতন নূতন কর্ম্ম-প্রণালীর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। ১৮৭৯ সনে অনুষ্ঠিত ভারত-সংস্কার সভার বার্ষিক সভায় তাঁহার এই কর্ম্ম-প্রণালীর আভাস আমরা পাইয়াছি। এলবার্ট স্কুলে তিনি ব্রহ্মবিদ্যালয় পুনঃস্থাপন করিলেন। কেশবচন্দ্র ইতিপূর্ব্বে বয়স্কা মহিলাদিগের মধ্যে ঈশ্বর-প্রীতি ও সেবার ভাব উদ্রেক করিবার

নিমিত্ত ব্রাহ্মিকা সমাজ গঠন করিয়াছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মরা আলাদা হইয়া গেলে, তাঁহাদের পত্নীগণ আনন্দমোহন বসুর সহধর্ম্মিণী স্বর্ণপ্রভা বসুর নেতৃত্বে বঙ্গমহিলা সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের অধ্যক্ষতায় তাঁহার অনুবর্ত্তিনীদের দ্বারা আর্য্যনারীসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। কেশব-সহধর্ম্মিণী জগন্মোহিনী দেবী এই সমাজের নেতৃস্থানীয়া হইলেন। আর্য্যনারী সমাজের মুখপত্রস্বরূপ 'পরিচারিকা' মাসিকপত্র বাহির করেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র চর্চ্চার ব্যবস্থা : কেশবচন্দ্র এই সময়ে আর যে একটি কার্য্যের সূচনা করিলেন তাহা দেশের, সমাজের এবং বাংলা সাহিত্যের বিশেষ হিতকারী হইয়াছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের আন্তরিক মিলনের পক্ষে এই উপায়টির সার্থকতা সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে। কেশবচন্দ্র তাঁহার অনুবর্ত্তীদের মধ্যে কয়েকজনের উপর বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র ও সাহিত্যচর্চ্চার ভার প্রদান করিলেন। খ্রীষ্টান শাস্ত্র অনুশীলন ও আলোচনার নিমিত্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার নিয়োজিত হইলেন। প্রতাপচন্দ্র অতি নিষ্ঠার সহিত জীবনের অবশিষ্ট কাল খ্রীষ্টান ধর্ম্ম ও শাস্ত্র আলোচনায় কাটাইয়াছিলেন। তৎসম্পাদিত ইংরেজী পত্রিকা এবং তাঁহার রচিত ইংরেজী পুস্তকাবলী তাহার প্রমাণ। অঘোরনাথ গুপ্ত বা সাধু-অঘোরনাথ বৌদ্ধ-শাস্ত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। তিনি মাত্র দুই বৎসর পরে ১৮৮১ সনে ইহধাম ত্যাগ করেন। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি বুদ্ধদেব এবং বৌদ্ধধর্ম্মের উপরে কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। তাঁহার পুস্তকাবলী অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণার পরিচায়ক। গিরিশচন্দ্র সেন গ্রহণ করেন মুসলমান ধর্ম্ম ও শাস্ত্র আলোচনার ভার। তাঁহার কোরাণের মূলামূল অনুবাদ প্রসিদ্ধ। গিরিশচন্দ্রের মহম্মদীয় শাস্ত্রভিত্তিক অন্যান্য রচনাও বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। সাধারণের নিকট তিনি 'মৌলবী গিরিশচন্দ্র' নামে পরিচিত হন। হিন্দুধর্ম্ম ও শাস্ত্র আলোচনার ভার নেন উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়। তাঁহার গীতা ও অন্যান্য শাস্ত্র-গ্রন্থের উপরে ভাষ্যাদি রচনা বিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেয়। ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ('চিরঞ্জীব শর্ম্মা') সঙ্গীত-নায়করূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের 'চারণ'-কবি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের আলোচনায় তিনি ব্যাপৃত হইলেন। কেশবচন্দ্র ১৮৭৯ সনের শেষে বিহারের নানা স্থলে ধর্ম্মপ্রচারার্থ গমন করেন। ইহার পর তিনি ব্রাহ্ম-সমাজ পুনর্গঠনেও বিশেষ অবহিত হইলেন। এই সময়কার উপদেশ, প্রার্থনা ও বক্তৃতা কেশব-অনুবর্ত্তী ব্রাহ্মদের মনে নূতন উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। বাংলা সাহিত্যও এ সমুদয়ের দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়াছে।

নববিধান : কেশবচন্দ্র প্রতিভাবান্ পুরুষ ; ধর্ম্মক্ষেত্রেও তাঁহার প্রতিভা ক্রমশঃ স্ফুরিত হইতেছিল। হিন্দুধর্ম্মের সার লইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম, আবার ব্রাহ্মধর্ম্ম সার্থক হইবে জগতের সকল ধর্ম্মের সমন্বয়-সাধন দ্বারা। কেশবচন্দ্র নিজ জীবনে—দৈনন্দিন আচার-আচরণে জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও মহাপুরুষদের রীতি অনুষ্ঠানে মন দিলেন, যীশুখ্রীষ্ট, শাক্যমুনি, মহম্মদ, চৈতন্য—বিভিন্ন মহাজনগণের সাধনভজনে নিজেকে অভ্যস্ত করিতে লাগিলেন ; আর এই পথেই কেশবচন্দ্র যে সত্য আবিষ্কার করিলেন তাহার নাম দিলেন 'নববিধান'। স্বল্পকথায় তিনি 'নববিধানের' এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেন :

"গগনে উড়িতেছিল কেবল হিন্দুধর্ম্মের নিশান, হিন্দুধর্ম্মের নিশানের পরিবর্ত্তে এখন গগনে সার্ব্বভৌমিক নববিধানের নিশান উড়িল। হিন্দুস্থানের ব্রহ্ম এখন সমস্ত জগতের ব্রহ্ম হইলেন, বেদান্তের সঙ্গে এখন বেদ, পুরাণ, বাইবেল, কোরাণ, ললিতবিস্তর প্রভৃতি সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্র মিলিল। নববিধানের বেদের অন্ত নাই, কেননা সত্যই ইহার বেদ। ইনি দেশকালে বদ্ধ নহেন, সমুদায় বিধানের সঙ্গে ইনি সংযুক্ত। ইহাতে সমস্ত নীতি ও সমস্ত ধর্ম্ম একীভূত। সকল বিজ্ঞান ইহার অন্তর্গত। যোগাদি ধর্ম্মের সমুদায় অঙ্গকে ইনি আপন বলিয়া গ্রহণ করেন। সকল প্রকার সাধনের প্রতি ইনি অনুরাগী। জড়রাজ্য, মনোরাজ্য, ধর্ম্মরাজ্য সমুদায় ইহার রাজ্যের অন্তর্গত। নববিধান বিজ্ঞানের ধর্ম্ম—ইহার মধ্যে কোনপ্রকার ভ্রম, কুসংস্কার, অথবা বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ কোন মত স্থান পাইতে পারে না। ইনি সকল শাস্ত্রকে এক মীমাংসার শাস্ত্রে পরিণত করিবেন, সকল দলের মধ্যে সন্ধিস্থাপন করিবেন।"*

কেশবচন্দ্র অন্যত্র বলিয়াছেন, পৃথিবীর জন্য না হউক অন্ততঃ ভারতের জন্য এই নববিধান একটি আশীর্ব্বাদতুল্য। এই বিষয়ে তাঁহার বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও উক্তি তাঁহার উপদেশাবলীতে প্রদত্ত হইয়াছে। কেশবচন্দ্র আমৃত্যু নববিধানের সাধন ও প্রচারকল্পে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেন। "The New dispensation" পত্রিকায় (২৪শে মার্চ্চ, ১৮৮১ হইতে প্রকাশিত) তিনি প্রতি সপ্তাহে এই বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রদান করিতে থাকেন। অন্যান্য কার্য্যেও তিনি সমান তৎপর ছিলেন। কলিকাতার অক্সফোর্ড মিশনের প্রতিষ্ঠা, মুক্তিফৌজের অভিনন্দন এবং সরকারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন, কলিকাতায় সুষ্ঠুভাবে বেদচর্চ্চার জন্য বেদ-বিদ্যালয় পত্তন, নূতন করিয়া স্ত্রীবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বহু বিষয়ে তিনি সোৎসাহে অগ্রসর হইয়াছিলেন। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলর প্রমুখ মনীষীবৃন্দ ও বিভিন্ন দেশী-বিদেশী ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির সঙ্গে তাঁহার পত্রালাপও চলিতেছিল অবিরত। এই সকল কার্য্যে অতিরিক্ত পরিশ্রম হেতু ১৮৮৩ সনের প্রথম হইতেই কেশবচন্দ্রের শরীর ভাঙিয়া পড়ে। তিনি সিমলায় কয়েক মাস সপরিবারে অবস্থান করিলেন। কিন্তু স্বাস্থ্য আর ফিরিয়া পাইলেন না। তাঁহারই পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ম্মিত নবদেবালয়ের দ্বার উন্মোচন করিলেন কেশবচন্দ্র ১৮৮৪ সনের ১লা জানুয়ারী তারিখে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের

* আচার্য্য কেশবচন্দ্র, তৃতীয় খণ্ড ; পৃ. ১৬৫৭-৫৮।

সঙ্গে মতবিরোধ থাকিলেও উভয়ের মধ্যে হৃদ্যতার কখনও অপ্রতুলতা ছিল না। ইতিপূর্ব্বেও দেবেন্দ্রনাথ 'কমল কুটীরে' পদার্পণ করিয়াছেন. কেশবের অসুস্থতার সংবাদে তিনি সত্বর আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। পরমহংস রামকৃষ্ণদেব তাঁহার জন্য আকুল হইয়া পড়েন, তিনিও কেশবচন্দ্রকে বার বার দেখিয়া গেলেন। পরমহংস রামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের একাত্মতা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। পরস্পরের আলাপ-আলাপনে এক স্বর্গীয় ভাবের উদয় হইত 'পার্ষদ্'গণের চিত্তে।

মৃত্যু: ১৮৮৪ সনের ৮ই জানুয়ারী ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ইহলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এবং শোকসভায় তাঁহার গুণাবলী পরিকীর্ত্তিত হইয়াছিল। এই সময়ে কেশবচন্দ্র সম্পর্কে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র (মাঘ ১৮০৫ শক) উক্তি কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করি:

"এই শ্রীমান্ ধর্ম্মপ্রচারক্ষেত্রে অটলপদে দাঁড়াইয়া যে কল্যাণসাধন করিয়াছেন, জগৎ তাহা কখনও ভুলিবে না। ইঁহার পবিত্র উপদেশ দীপ্ত দিবালোকের ন্যায় বিস্তৃত হইয়া, অনেককেই মনুষ্যত্বের পথ দেখাইয়াছিল। সঙ্কটে অধ্যবসায়, গন্তব্য পথের কণ্টকশোধন করিবার জন্য চেষ্টা, প্রতিপক্ষের অত্যাচার সহিবার জন্য মহানুভবতা এবং সকলকে একসূত্রে বাঁধিবার জন্য দক্ষতা কেবল ইঁহারই ছিল। এই সমস্ত বিষয়ে এই মহাত্মার পদাঙ্ক বালুকারাশির উপর নয়, শিলাপটে পতিত আছে। এক্ষণে এই উজ্জ্বল ভারত-নক্ষত্র অস্তমিত, যদিচ ইদানীং আমাদের সঙ্গে তাঁহার কোন কোন বিষয়ে কিছু মতবিরোধ ঘটিয়াছিল, তথাচ আমরা একজন প্রকৃত বন্ধু ও ভ্রাতাকে হারাইলাম এবং প্রধান আচার্য্য মহাশয় এক সময়ে যাঁহার উপর ব্রাহ্মসমাজের সমস্ত আশা-ভরসা স্থাপন করিয়াছিলেন, তিনিও একটি সর্ব্বপ্রধান সংশিষ্যকে হারাইলেন।"

স্পেন

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

ঘুমন্ত দেশ স্পেন, তার ভাঙেনি এখনো ঘুম,
সোনালী যবের ক্ষেতে ক্ষেতে রাঙা রোদ্দুর কুঙ্কুম!
শীতের হাওয়ায় ঝরা পাতা যায় পিল পিল করে উড়ে,
তুষারশুভ্র 'পীরিনীজ' জাগে দিগন্ত-রেখা জুড়ে!
তারই কোল ঘেসে গীর্জাশাসিত পড়ে আছে স্পেন,
নব্য বেকার ক্যাথলিক করে তন্ত্রীর লেন-দেন!
লটারী-কাটকা-ফ্যাসিজমে আজ আকাশ-স্বপ্ন বোনা,
তরুণী মেয়েটি মুটেপিষি করে—বুড়া বাপ উন্মনা!
চোরাকারবারী স্থান পেয়েছিল একদিন বারা জেলে,
জন ফষ্টার ডালেস তাদের গদীতে তুলেছে ঠেলে!
ব্লকেলারের প্রতিদ্বন্দ্বী নিকলাস ফ্রাঙ্কো সে,
গঞ্জিকা ঘুন সমাজকে দিয়ে শোষণ করছে বসে!
ভিখারী-অধম-গরীব লোকের নরক আজি ...!
বিগত দিনের স্মৃতিকথা নিয়ে অন্ধ অহঙ্কার!
ক্যাথলিক বই আড়াল দিয়েও তারি মাঝে কোন লোক—
ইলিয়া এলেনবুর্গ ও আন্দ্রে জীদেতে দিয়েছে চোখ।
কাকে গুলজার টাকার স্বপ্নে—পকেট গড়ের মাঠ,
ঈশ্বর নাকি বিরূপ, তাই তো বিষণ্ণ তল্লাট!
যে জারক রসে ভিজানো, তাতেই ভিজেছে তো আখরোট,
এই দেশেতেই জন্মেছিলেন শ্রীডনকুইক্‌সট!
ভিন্‌সেণ্ট ভ্যান গগের আর্ট্‌স, কি মাধুরী থরে থরে,
সিনোরিতা, এটা ঘুমন্ত দেশ—ঘুমাও টালির ঘরে!

ভ্রম-সংশোধন

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	হইবে না	হইবে
২৮৯	১	৩৪	দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	কেশবচন্দ্র সেন
ঐ	২	৩	রাধাপ্রসাদ	রমাপ্রসাদ
২৯০	২	২৪	তদীয় অনুজ কৃষ্ণবিহারী সেন এবং	
ঐ	ঐ	৩৫	ভ্রাতুষ্পুত্র	জ্যেষ্ঠতাতপুত্র
২৯৪	১	৮	পত্নী···	পত্নী যাদুমোহিনী দেবী

শাশ্বত গণতন্ত্র

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

মর্ত্ত্যেতে সেই সত্যিকারের মহান্ গণতন্ত্র
মৈত্রীবাঁধা ঐক্যে যেথায় সবাই সমান অংশী,
দুর্দ্দশাতে সেথায় কভু কাঁদবে নাকো জনগণ
জাতির জীবনকুঞ্জে সেথায় বাজবে সদাই বংশী।
বাসিন্দা তার আদর্শ সব পবিত্র আর নিষ্পাপ
দুর্নীতদের নেই সেথা ঠাঁই সমাজনাশের জন্যে
কাজেই সেথায় লাভের লোভে জনগণের ধ্বংসি
পর্বতেরি মুনফা কেহই বাঁধবে নাকো পণ্যে।
জনগণেরি প্রত্যেকে ভাই করবে সেথায় চেষ্টা
সমাজবুকে ঘৃণ্য কোনই না হয় যাতে কর্ম,
জাতির যাতে সর্বনাশ আর মৃত্যুপথ হয় তৈরী
প্রাণপণে তাই বন্ধ করা তাদের হবে ধর্ম।
থাকবে নাকো সে রাজ্যেতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা
ধর্ম নিয়ে মর্ম হানা রক্তপাতের বন্যা,
থাকবে নাকো গুণ্ডা ডাকাত এবং নারীধর্ষক
নিরুদ্বেগে থাকবে সকল অঙ্গনা ও কন্যা।
খাদ্য সেথায় পবিত্র সব অমৃতেরি তুল্য
ধনিকদেরে দেখব সেথায় দেশের হিতে ফিরতে,
শাসকদেরি কর্ম সেথায় জাতির হিতের জন্যে
শাসনবেদী গড়বে তারা কল্যাণেরি তীর্থে।
খাদ্য এবং বস্ত্র সেথায় সদাই সহজলভ্য
বাসিন্দাগণ কিনবে তাহা নিত্য সুলভমূল্যে,
উঠবে নাকো ধনের পাহাড় দীন শোষণের অর্থে
এই কথাটি কক্ষনো ভাই চলবে নাকো ভুললে।
ভিন্নমতের ধর্মীরা সব একটি গাছের বৃন্তে
থাকবে সেথায় ফুল ফুটিয়ে খুলবে স্বরগ দ্বার গো,
ধর্মেরি এই সাম্যবাদে দেশবিদেশের লোকরা
সম্ভ্রমেতে রইবে চেয়ে লাগবে চমৎকার গো।
গোধন হবে প্রধান সেথায় থাকবে চরম লক্ষ্য
তাদের যাতে রক্ষা এবং হয় চিরদিন বৃদ্ধি,
দুগ্ধে ঘৃতে ধান্যে ধনে থাকবে সে দেশ পূর্ণ
তবেই হবে সে দেশ বড় স্বাধীনতার সিদ্ধি।

পুরুষরা তার বজ্র হবে অঙ্গনারা বিদ্যুৎ
দুঃখজয়ীর দলরা সেথায় বুকবাধা সব ঐক্যে,
রাষ্ট্রচালক স্বয়ং ত্যাগী পুলিসরা সব নির্লোভ
জনগণ এবং রাষ্ট্র সেথায় বন্দী সদাই সখ্যে।
রাষ্ট্র সেথায় রথের মতন চক্র সেথায় জনগণ
অশ্ব তাহার পৌরুষ এবং বলগা তাহার ধৈর্য্য,
সারথ্য তার কর্বে স্বয়ং মনস্বী আর বীররা
জগৎ তাকে কর্বে প্রণাম এমনি তাহার শৌর্য্য।
এতই হবে মহান্ সে ভাই থাকবে না তার শত্রু
প্রজ্ঞাতে সে সূর্য্য সমান করবে আলোক সম্পাত
হিংসারি সব খড়্গ রবে তাহার কাছে স্তব্ধ
জগৎজনে করবে সে দান সর্বজয়ের সংবাদ।
স্বর্গ সমান শিক্ষা তাহার দীক্ষা তাহার ভাগবত
কল্যাণেরি গঙ্গা তাহার ঝরবে জটায় ঝর্ঝর,
শান্তি এবং শৌর্য্যে তাহার বাজবে বিজয়ডঙ্কা
জগন্নাথের রথের মতন ছুটবে সে ভাই ঘর্ঘর।
সেই ধ্যানেরি রাজ্য মোদের চিরন্তনের কাম্য
সব মানবের জীবন যেথায় পদ্ম হয়ে ফুটবে,
নরনারীরা নিষ্পাপ এবং সর্বজয়ী চিত্তে
দুঃখমেঘের বুক ফাটিয়ে বিদ্যুৎ হয়ে ছুটবে।
এমনি গুণ আর শৌর্যে যাদের চিত্ত পরিপূর্ণ
স্বাধীনতার স্বর্গসুধা তাদের লাগিই ভোগ্য,
এমনিতর জগৎজয়ী মহান্ গণতন্ত্র
ধাতার মহান্ শ্রেষ্ঠ এ দান তারাই পাবার যোগ্য।
মহান্ সে ভাই রাজ্যবেদী সত্য এবং সুন্দর
তীর্থ সমান তার মাটীকে পুজবে সবাই বন্দি',
মর্ত্ত্যে তারে সর্বজয়ী কর্বে স্বয়ং ঈশ্বর
সর্বকালের বক্ষে সে ভাই থাকবে চির নন্দি':
সেই মহিমার সিংহাসনে লিখবে সবাই দাসখৎ,
ঈশ্বরেরি রাজ্য সে যে বিশ্বেতে সে শাশ্বত।

শ্রীদীপক চৌধুরী

সুতপার বিবৃতি

এক
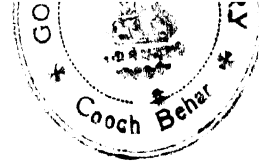
উনিশ শো সাতান্ন সালের আগষ্ট মাসটা কিছুতেই যেন শেষ হতে চায় না। পয়লা সেপ্টেম্বর আমার আপিসের কাজে যোগ দেওয়ার কথা। দিন গুণছিলাম আমি। ভেবেছিলাম, কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে পারলে বাইরের অশান্তি অনেক কমবে। অন্তত গায়ে লাগবে না। ঘটনার দাগ তবুও গায়ে আমার লাগলই। মনের প্রশান্তি জলবিন্দুর মত টলমল করে উঠল। আগষ্ট মাসটা এগুতে লাগল দাগ কেটে কেটে। গ্রহনক্ষত্রের বুকেও ক্ষতের চিহ্ন বর্তমান। গত ক'দিন থেকে চণ্ডীদা আর গণনা-বিদ্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। তাই সে বেঁচে গেছে। আগষ্ট মাসের বাকী ক'টা দিনের ভবিষ্যৎ সে দেখতে পায় নি।

শনিবার দিন সকাল দশটা নাগাদ বড়সাহেব হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন সরকার-কুঠিতে। আগু-খবর কিছু পাওয়া যায় নি। পাওয়া গেলে এখানে প্রবেশ করতে তাঁর কষ্টই হ'ত। ফটকের সামনে ভিড় দেখতে পেতেন তিনি।

খবর পেয়ে আমি নিচে নেমে আসছিলাম। পেছন থেকে রতন আমায় ডাকল, "দিদি, বড়সাহেব এসেছেন, না?"

"বলরাম ত তাই বললে।"

"তাঁকে জিজ্ঞেস কর, আমি চেঞ্জে যাব কবে।"

"করব।"

"কলকাতার বাইরে মাস তিন ত থাকতেই হবে—"

"মাত্র তিন মাস কেন রে রতন?"

"আমি টাকাপয়সার কথাই ভাবছিলাম। দিদি, বড়সাহেবের কাছ থেকে তুমি বরং কিছু বেশী টাকাই ধার চেয়ে নিও। যদি ছ' মাস থাকতে হয়? যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ। তিনি হয়ত একা একা বসে আছেন।"

"আমি যাব তোমার সঙ্গে?"

"না, না রতন!"

"কেন, হাঁটতে আমার ত কষ্ট হয় না—"

"নিচে নামতে কষ্ট হবে, ভাই। আর ওপরে উঠতে— না, রতন, আমি বরং বড়সাহেবকে এখানেই ডেকে নিয়ে আসব।"

আমার কথা শুনে রতন বিছানার ওপর উঠে বসল। আমি ভাবতে পারি নি, হঠাৎ ও এত বেশী উত্তেজিত হয়ে উঠবে। আনন্দের আতিশয্যে রীতিমত হাঁপাতে লাগল সে। কথা বলবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগল। অনেক কথা। রাঙা-ভবিষ্যতের স্বপ্ন ওকে পাগল করে তুলল! চোখের পাতা দুটো ক্রমাগত মিটমিট্ করতে লাগল। নাকের নিশ্বাস দ্রুত। ঠোঁটের শুষ্কতা সারা মুখে ওর কম্পন তুলেছে। ফুটো ফুসফুসের সুস্থতা গলে যাওয়ার উপক্রম! ভয় পেলাম আমি। শুইয়ে দিয়ে বললাম, "ব্যস্ত হওয়ার কোন কারণ নেই, রতন। ব্যবস্থা সব পাকা।"

বসবার ঘরেই বসেছিলেন ক্যাপটেন হেওয়ার্ড। দেওয়ালের গর্ত দুটোর দিকে দৃষ্টি ছিল তাঁর। এতগুলো বছর পরেও গর্ত দুটো বোজাবার কেউ চেষ্টা করে নি। যেন স্বাধীন ভারতবর্ষের ফুসফুসে ও দুটো চিরদিনের জন্যে স্থায়ী হয়ে রইল।

ঘরে ঢুকতেই মিস্টার হেওয়ার্ড বললেন, "আন্টি এখনও ঘুমচ্ছেন। তাঁর ঘরে গিয়ে দেখে এসেছি।"

"ডেকে দিচ্ছি আমি—"

"থাক, তিনি অসুস্থ। রতন কেমন আছে?"

"প্রত্যেক দিনই খুব বেশি করে ভাল হয়ে উঠছে। আমি ত অবাক।"

"অবাক কেন?"

"তুমি এখানে আসবার পর থেকেই তার এত বেশি উন্নতি। আজ সে একতলায় নেমে আসবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল।"

"কিন্তু—" বড়সাহেব পুনরায় দেওয়ালের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন, "কিন্তু আমি ত ওর জন্যে কিছুই করতে পারি নি! কার জন্যেই বা কি করলাম সুতপা?"

"কর নি? ভারতবর্ষকে স্বাধীন করে গেলে তোমরা—"

চট্ করে হেওয়ার্ড সাহেব দেওয়ালের দিক থেকে চোখ

ছুটো সরিয়ে নিয়ে এলেন। তার পর সেই দিকে পেছন দিয়ে বসলেন। আমার মনে হ'ল, স্বাধীনতা কথাটা শুনে লজ্জা পেলেন তিনি। কিন্তু একটু পরেই আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হ'ল। বড়সাহেব লজ্জিত হন নি, অপমানিত বোধ করেছেন। তিনি এমন ভাবে ঘুরে বসলেন যে, গর্ত ছুটোর দিকে দৃষ্টি পড়ার আর কোন পথই রইল না। বললাম, "মাপ কর বড়সাহেব। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সকালটায় রাজনীতির উল্লেখ না করাই উচিত ছিল।"

"তোমার আর দোষ কি? আধুনিক সভ্যতার কোন্ অংশে রাজনীতি নেই? পৃথিবীর প্রতিটি পরমাণুতেও রাজনীতির বারুদ! কিন্তু—" হেওয়ার্ড সাহেব পাইপটা দাঁতের ফাঁকে ধরে রেখে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, "কিন্তু কি?"

"মানুষের প্রতি মানুষের অবিচার সব সময়ে রাজনীতির আয়নায় প্রতিবিম্বিত হয় না সুতপা।"

এই সময়ে সরকার-কুঠির বাগানে বেশ বড় রকমের একটা ভিড় জমে উঠেছে। মুখে মুখে বৈষ্ণবঘাটার মোড় পর্যন্ত বড়সাহেবের আগমন-সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে আধ ঘণ্টার বেশি সময় লাগে নি। বিজয়বাবু রক্ষিতের মোড় থেকে ছুটতে ছুটতে আসছেন। তিনি এসে যে পৌঁছতে পেরেছেন সেটা বড় খবর নয়। ভেজিটেবল ঘি আর ভারতরাষ্ট্রের বিষাক্ত সরষের তেল খেয়েও যে তিনি ছুটতে পারেন সেইটেই সব চেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা। চণ্ডীদা ভোরবেলা গোবিন্দপুর থেকে রওনা হয়েছিল। বৌকে নিয়ে সে যখন বাস থেকে নামল তখনই খবরটা তার কাছে পৌঁছে গেছে। অসুস্থ বাচ্চাটা তার কোলেই ছিল। সরকার-কুঠির ফটকের কাছে পৌঁছে সে আর বোঝা বইতে পারল না। বৌয়ের হাতে পুঁটলিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চণ্ডীদা দ্রুতপায়ে হেঁটে এসে পৌঁছে গেল বারান্দায়। বাকি পথটুকু বৌ তার এল একা একা। ভিড়ের মধ্যে বিপ্রদাসবাবুও ছিলেন, ঘরে বসে আমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছিলাম। প্রথম দৃষ্টিতে আমি তাঁকে চিনতে পারি নি, পরে পারলাম। ধুতি-পাঞ্জাবী আজ তিনি বর্জন করেছেন। প্যাণ্ট-কোট পরে এসেছেন বিপ্রদাস বাবু। হাতের ছড়িটি রেখে এসেছেন রক্ষিতের মোড়ে। গলায় 'টাই' বেঁধেছেন। পেনসন নেওয়ার পরে তাঁকে সাহেবী পোশাক পরতে হয় নি। ব্যবহার করতে করতে এবং ফেলে রাখতে রাখতে প্যাণ্ট-কোটের রং সাদা কিংবা কালো নেই—দু'তিন রকমের রং গলে গিয়ে সর্বধর্মসমন্বয়ের মত বিশেষ একটি সমন্বয় হয়ে ফুটে বেরুবার চেষ্টা করছে বটে, কিন্তু সমন্বয় ঘটে নি। কোটের বুক-পকেটের রংটা কালোর দিকে, অথচ ঘাড় দুটো দেখাচ্ছে যেন রোদে-পোড়া কলাপাতার মত।

ব্যাপারটা বুঝলেন বড়সাহেব। তিনি বললেন, "আমি এবার চলি, তুমি সন্ধ্যের সময় লুডন স্ট্রীটে চলে এস। রাত্রের খাওয়া ওখানেই খাবে। তোমার সঙ্গে কথা কইতেই এসেছিলাম। কিন্তু—"

"ভিড় দেখে ভয় পাচ্ছ নাকি?"

"না, ভয় পাচ্ছি না। ভিড়ই ত ভগবান—"

"কি বললে বড়সাহেব?" কথাটা কেমন অদ্ভুত শোনাল, শুধু অদ্ভুত নয়, উলটো। জবাব দিলেন না বড়সাহেব। তিনি বারান্দায় বেরিয়ে গেলেন। বাগানের মধ্যে গড়িয়ার অনেক চেনা এবং অচেনা লোকই ছিল। বিজয়বাবু ভিড় সরাতে লাগলেন, সরাতে হ'ল পথ তৈরি করবার জন্যে। বিপ্রদাস বাবুকে তিনি অভ্যর্থনা করে সেই পথ দিয়ে নিয়ে আসছিলেন। তাঁর জুতো কিংবা কোট-প্যাণ্টে দাগ লাগল না। ভিড় সরে দাঁড়িয়েছে, তিনি উঠে এলেন বারান্দায়, মাথাটা নুইয়ে দিলেন নিচের দিকে। তার পর ডান হাতটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, "গুড-মর্নিং সার।"

আমি লক্ষ্য করলাম, বড়সাহেব এবার অপমানিত বোধ করলেন না, লজ্জা পেলেন।

বিপ্রদাসবাবু বলতে লাগলেন, "বিজয়ের সঙ্গে আমার ছোট মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব পাকা হয়ে গেছে। আমাদের আর ক্ষমতা কতটুকু বল? আমরা কিছুই করতে পারি না, আমরা যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী—আই মীন, যিনি সব করাচ্ছেন তিনি ওপরে—" বিপ্রদাসবাবু সত্যি সত্যি ওপর দিকে দৃষ্টি দিতে গেলেন। কিন্তু পলস্তারা-খসা সিলিঙের গায়ে ধাক্কা খেয়ে দৃষ্টি তাঁর ফিরে এল। বড়সাহেব বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। বিজয়বাবু মাস্টার, তিনি কান পেতে শুনছিলেন আর গর্ববোধ করছিলেন মনে মনে। তাঁর ভাবী শ্বশুর পেনসন নেওয়ার পরেও ইংরেজী-ব্যাকরণের নিয়মকানুন সব মনে রেখেছেন! কর্তা, কর্ম এবং ক্রিয়াপদের মধ্যে একবারও গোলযোগ ঘটে নি। তাঁর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে না হলেও দুঃখ নেই। স্বাধীন ভারতবর্ষের মানুষও যে ইংরেজী ব্যাকরণ মনে রেখেছেন সেই ত গর্বের বিষয়। আমার পাশে দাঁড়িয়ে বিজয়বাবু এতক্ষণ এই কথাই বলছিলেন। তাঁর কথা শুনে আমিও মুগ্ধ হলাম। তিনি বললেন, "ইস্কুলে আমি ইংরেজী ব্যাকরণ পড়াই।"

পেছনে দাঁড়িয়ে চণ্ডীদা আর ধৈর্য ধরতে পারছিল না, ছটফট করছিল। বিজয় মাস্টারের ওপর রাগ হচ্ছিল তার। চাকরি কি সে একাই করতে যাবে? রঙ্গমঞ্চের সবটুকু জায়গা সে বিপ্রদাসবাবুকে দিয়ে দখল করিয়ে রাখল। ব্যাপারটা কি? বিজয় মাস্টারের কি বিন্দুমাত্র ধর্মবুদ্ধি নেই? বক্তৃতা দেওয়ার সময় বিজয় মাস্টার গরীবদের জন্যে

কেঁদে-কেটে অস্থির হয়। অথচ যেমনই একটু সুযোগ পাওয়া অমনই গিয়ে গরীবদের মাথার ওপর পা দিয়ে দাঁড়াল! ছেঁড়া ফতুয়া গায়ে দিয়েছে বলে বিজয় মাস্টার চণ্ডীদাকে দেখতেও পাচ্ছে না! ক্রমে ক্রমে উত্তেজনা সহের সীমা অতিক্রম করল। ফস্ করে চণ্ডীদা বড়সাহেবের ডান হাতটা টেনে নিল নিজের হাতে। জনতা যেন নিশ্বাস বন্ধ করে এক পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে রইল। বিজয়বাবু লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছিলেন। বিপ্রদাস বাবু চণ্ডীদার ফতুয়ার কোণ ধরে বার দুই টান মারলেন, কিন্তু চণ্ডীদার তন্ময়তা ভাঙতে পারলেন না তিনি। বড়সাহেবের হাতের ওপর ঝুঁকে পড়ে গণনার মধ্যে ডুবে গেল সে। রাশি-নক্ষত্রের ছায়াপথে দুষ্টগ্রহটির পিছু নিয়েছে চণ্ডীদা। সে জানে সময় তার বেশী নেই, ফতুয়ার কোণ ধরে টানাটানি সুরু হয়ে গেছে। দেরী করলে বিজয় মাস্টার হয়ত তাকে ল্যাং মেরে ফেলে দেবে। সরকার-কুঠির ফুসফুসের মত তার নিজের ফুসফুসও খুব দুর্বল!

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চণ্ডীদা বলল, "দুষ্টগ্রহটির সন্ধান পেয়েছি। বিপদ খুব সামনে এসে গিয়েছে। সাহেব, এখান থেকে শীগগিরই পালাও তুমি।"

বাধা দিয়ে বিজয়বাবু বললেন, "উনি এলেন ত এইমাত্র। আমার শ্বশুর, মানে বিপ্রদাসবাবুর কথা এখনও শেষ হয় নি। থামকা ভয় দেখাচ্ছ কেন?"

"আমি কিছুই দেখাচ্ছি না, বিজয়! চাকরি তুমি একা করবে না, আমরাও করব, কিন্তু চাকরির কথা এখন থাক। তপাদি, পূর্ণিমার মুখে সাহেবের সমূহ বিপদ। পালাতে বল তাঁকে।"

জনতা তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। বিজয়বাবু শুধু উসখুস করছিলেন। বিপ্রদাস বাবুর শেষ কথাটি এখনও বলা হয় নি। সুরুতে বিজয়বাবুর মাইনে যদি সাড়ে তিনশ' হয়, তা হলে বাড়ী ফিরে গিয়ে তিনি কোট-প্যাণ্ট ছেড়ে একটু বিশ্রাম করতে পারেন। কিন্তু কোন কথাই আর কেউ বলতে পারলেন না। বড়সাহেব নেমে গেলেন বাগানে। দরজা খুলে ড্রাইভারটি অপেক্ষা করছিল, গাড়ীর পাদানিতে পা দিয়ে বড়সাহেব ইশারা করে চণ্ডীদাকে ডাকলেন। চণ্ডীদা হেঁটেই যেতে পারত, কিন্তু সে বারান্দার ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ল বাগানে। বড়সাহেব পকেট থেকে একখানা বড় নোট বার করে বললেন, "তোমার মজুরী।"

সরকার-কুঠির ভাঙা রাস্তা দিয়ে বড়সাহেবের গাড়ীটা যেন হোঁচট খেতে খেতে বেরিয়ে গেল বড় ফটকের বাইরে, কেউ কোন কথা বলল না। বিপ্রদাসবাবু শুধু বললেন, "বিজয়, সুরুতে তিনশ' টাকা খারাপ নয়।"

দুপুরবেলা সরকার-কুঠির কোন খবর রাখি নি, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম যখন ভাঙল বেলা তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ওপাশের ঘর থেকে রতন আমায় ডাকছিল, বার দুই ওর আমি ডাক শুনেছি। জিজ্ঞাসা করলাম, "কি ভাই?"

"কখন থেকে তোমায় ডাকছি দিদি। কাল রাত্রে কি তুমি ঘুমোও নি?"

"আজ রাত্রিটা জাগব কিনা। বড়সাহেবের ওখানে নেমন্তন্ন খেতে যাব, কখন ফিরি ঠিক নেই। ডাকছিলি কেন?"

"সমস্তটা দুপুর ঘুমতে পারি নি।"

"কেন রে?"

"মনে হচ্ছে, দোতলার ঘরে বোধ হয় বাসিন্দা এল, নতুন লোকের সব আওয়াজ পাচ্ছি, ঘরদোর ধোয়া হচ্ছে। কে এল দিদি?"

"বিজয়বাবুর ত বৌ নিয়ে এসে এখানে ওঠবার কথা। কিন্তু আমি জানি, সকালেও বিজয়বাবুর বিয়ে হয় নি। চণ্ডীদা হয় ত বেশী ভাড়া দিয়ে দোতলার তিনটে ঘরই দখল করল। দেখব নাকি?"

"ত্যাখ না, মেয়েমানুষের অচেনা গলা—"

"চণ্ডীদা যে তার বৌকে নিয়ে এসেছে গোবিন্দপুর থেকে।"

"না দিদি, ইংরেজী বলছিল মাঝে মাঝে। তা ছাড়া একতলাতেও খুব হল্লা-চিৎকার হচ্ছিল।"

"একতলায় আর এখন নামব না ভাই, এখানকার খবর নিয়ে আসছি। আমার বেশী সময় নেই, দেখি বলরামকে ডাকছি, ওর কাছেই খবর সব পাওয়া যাবে।" এই বলে আমি দরজা খুলে বারান্দায় এলাম, আশপাশে কাউকে দেখতে পেলাম না।

একেবারে কোণের ঘরটায় উঁকি দিয়ে দেখলাম, বলরাম বালতি আর ঝাঁটা হাতে নিয়ে সেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। প্রশ্ন করবার আগে বলরাম বলল, "জল আনতে যাচ্ছি। আর এক বালতি আনলেই কাজ শেষ হবে। সবশুদ্ধ সাতখানা ঘর ধুয়ে দিতে হ'ল, বাসিন্দে আসছে।"

"ওপরে কে আসছে? বিজয়বাবুর ত এখনও বিয়ে হয় নি।"

"ওপরে মহীতোষ বাবু আসবেন। তপাদি, মহীতোষ বাবুর বোধ হয় বিয়ে হয়ে গেছে।"

"কি করে জানলি?"

"দেখলুম যে, কি তিরিক্ষি মেজাজ! সহজে খুশী করা যায় না, তার ওপরে আবার খুঁতখুঁতে। জান, ওদিকের ঘরটা তিনি পাঁচবার করে ধোয়ালেন? নিচে থেকে জল

টানা কি সোজা কাজ ? এই নিয়ে বোধ হয় একশ' বালতি জল টানলুম। একশ' পর্যন্ত গুনতে জানি না, হয়ত দু'শ' বালতিই টানলুম—টাইগার দেখেছে।" এই বলে বলরাম চলে যাচ্ছিল সিঁড়ির দিকে। বুঝলাম, মেজাজটা ওর আজ ভাল নেই। কাজ করতে বলরাম ভালবাসে সত্যি, কিন্তু—

ওকে ডাকলাম, "একটু দাঁড়া, আমার ওপর রাগ করলি নাকি ?"

"তোমার ওপর রাগ করব কেন ? তবে রাগ করেছি তা সত্যি।"

"কার ওপরে ?"

"চণ্ডীদার ওপরে, ফুরণ করে মাল বয়ে আনলুম, তিন দিনে এক টাকা আট আনা দেওয়ার কথা। কই দু'সপ্তাহ চলে গেল, মজুরী পেলুম না।"

"তাগাদা দিস নি ?"

"দিই নি আবার! প্রত্যেক দিন শুধু বলে, আর দুটো দিন সবুর করতে। তপাদি, ষষ্ঠীদার ফণ্ডে একটা টাকাও আমি দিতে পারলাম না। কাল মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিন, কত বড় মেলা বসবে, খরচের আর অন্ত নেই ষষ্ঠীদার। চণ্ডীদাকে বলে আমার মজুরীটা আদায় করে দাও না, তপাদি ? আমি রিফিউজী বলে মজুরীও পাব না বুঝি ?"

জবাবের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল বলরাম। কি বলব ভাবছিলাম, কিছুই বলতে পারলাম না। এত সহজ প্রশ্নের জবাব কত কঠিন বলে মনে হতে লাগল! চলে যাচ্ছিল সে, জিজ্ঞাসা করলাম, "মহীতোষবাবু এসেছিলেন নাকি ?"

"তিনি মাসীমার সঙ্গে গল্প করছেন। তাঁর সঙ্গে সেও এসেছে।"

"সে কে ?"

"বোধ হয় বৌ-টৌ হবে। তপাদি, কাল তিনটের সময় কিন্তু কোথাও চলে যেও না। মস্ত বড় মেলা বসবে এখানে। তোমরা না থাকলে ষষ্ঠীদা ব্যথা পাবে। বড়সাহেবকে নেমন্তন্ন করবে না ?"

"করব।"

"হ্যাঁ, তাঁকেও আসতে বলবে।"

বলরাম আর অপেক্ষা করল না। ঘরে এসে রতনকে সব খবর দিলাম, খবর শুনে রতন খুশী হ'ল। তার খুশী হওয়ার কারণ ছিল—ঘরের পাশে লোক থাকবে। সারা দিন ওকে একা একা থাকতে হয়। খাবার দেবার সময় শুধু বলরাম কিংবা মাসীমা আসেন, সম্প্রতি মাসীমা আসতে পারেন না। বলরামও বাইরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। মাসীমার পরিচর্যার ভারও ওর ওপর। আজকাল খাবার দিয়ে যায় পরেশের মা—সরকার-কুঠির ঠিকে ঝি।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই তৈরি হয়ে নিলাম। বড়সাহেবের নেমন্তন্ন রক্ষা করতে যাচ্ছি, যেতেও কম সময় লাগবে না, এক ঘণ্টা ত বটেই।

মাসীমার ঘরে এসে দেখলাম, মহীতোষ আর কেতকী পাশাপাশি বসে আছে। ওদের ঘনিষ্ঠতার কথা মুখে প্রচার করবার দরকার হ'ল না, দেখেই বুঝতে পারলাম। মাসীমার মুখেই শুধু বৈচিত্র্যের অভাব। অসুস্থতার চিহ্ন ছাড়া তাঁর মুখে লক্ষ্য করবার মত আর কিছু ছিল না।

মহীতোষ বলল, "তোমার জন্যেই বসে আছি। পয়লা সেপ্টেম্বর আমরা উঠে আসছি মাসীমার এখানে। ওপরের তিনখানা ঘরই আমরা নেব।"

"বিজয়বাবু কোথায় থাকবেন ?"

জবাব দিলেন মাসীমা, "বিজয় থাকবে একতলার উত্তর দিকের অংশে। সেখানেও তিনখানা ঘর আছে।

"ছ'খানা ঘরের হিসেব ত দিলে, কিন্তু বলরাম বলছিল যে, সাতখানা ঘর ধুয়েপুঁছে পরিষ্কার করেছে সে।"

"বলরাম ঠিকই বলেছে। পেছন দিকের ছোট ঘরখানা চণ্ডীকে দেব। চণ্ডীর ভাগে একটা ঘর কম পড়লেও ক্ষতি হবে না।"

"না—চণ্ডীদার দুটো ঘরেই কুলিয়ে যাবে। বলরাম হিসেব দিচ্ছিল, আজ ওকে প্রায় একশ' বালতি জল টানতে হয়েছে। বোধ হয় একশ' নয়, তারও বেশী হবে। ভাবছি বলরামকে এবার একটা ধারাপাত কিনে দেব। একশ' পর্যন্ত গুণতে না শিখলে ও ত পদে পদে ঠকবে। তারপর কেতকী, তোমার খবর কি ?"

"ভাল। বড়সাহেব আমায় স্থায়ী কাজ দিয়েছেন আপিসে, অবশ্য গ্রেড আপনার চেয়ে কম।"

বললাম, "ধর্মঘটের পরে গ্রেড বাড়বে। পয়লা সেপ্টেম্বর কি আপিসে যাব নাকি মহীতোষ ?"

"আপাততঃ ধর্মঘট বন্ধ রইল।"

"কেন ?"

"ছুটির পরে লাহিড়ী সাহেব আর এ আপিসে আসবেন না। তাঁকে বোম্বাইয়ের আপিসে বদলী করে দিয়েছেন বড়-সাহেব। তা ছাড়া, মাইনেও সবার কিছু কিছু বাড়বে।"

"ও—তা হলে তুমি আর শ্যামনগর যাচ্ছ না ?" কথা আমার প্রায় ফুরিয়ে এল।

মহীতোষ বলল, "না, আমরা এখানেই থাকব—আমি আর কেতকী। অবশ্য বিয়ের পরেই থাকব।"

"বিয়ের আগে এসে থাকলেও আমরা তোমাদের বাধা

দেব না। তোমরা পাশে থাকলে রতনের নির্জনতাবোধ কমবে। এবং তাড়াতাড়ি আসতে পারলে ওর নির্জনতা-বোধও তাড়াতাড়ি কমবে।"

"আমরা আগামী সপ্তাহে বিয়ের দলিল সই করব।" বলল মহীতোষ।

"দলিল? হ্যাঁ, কিছু একটা সই করা দরকার। নারায়ণ শিলার সামনে সই করতে হয় না বটে, কিন্তু মন্ত্র পড়তে হয়। দু'রকম বিয়েতেই সাক্ষী চাই। তা তোমরা ত জাতগোত্র মিলিয়েই ভাব করলে, সামাজিক বিয়েতেও বাধা কিছু ছিল না।"

এবার মাসীমা আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। আমার দিকে চেয়ে তিনি বললেন, "হ্যাঁ রে তপা, তুই কি ওদের বিয়ে না করেই ওপরের ঘরে গিয়ে বাস করতে বলছিস?"

বললাম, "রতনের সুবিধে হ'ত তাতে। তা ছাড়া, বলরামকে দিয়ে তোমরা ত ঘরখানা পরিষ্কার করিয়েই রাখলে! আমি ত কোন অসুবিধে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। হ্যারিসন রোডে গিয়ে বিছানাটা ট্যাক্সিতে চাপিয়ে নিয়ে আসতে—" হাত ঘড়িতে সময় দেখে বললাম, "হ্যাঁ, সাড়ে আটটার মধ্যে মহীতোষ ফিরে আসতে পারে। ফেরবার মুখে কেতকীর বিছানাটাও নিয়ে আসতে পারে সে। সব মিলিয়ে ওজন এমন কি বেশী হবে মাসীমা?"

"তুই ত ঘড়ি দেখে সমস্যা মিটিয়ে দিলি। কিন্তু আমাদের আরও অনেক কিছু দেখতে হয়।"

মাসীমার পরে কথা বলল মহীতোষ। খোঁচা মারবার সুযোগ খুঁজছিল সে। বলল, "সুতপা ত বিপ্লবের ঘড়ির দিকে না চেয়ে একটি কথাও কয় না।"

কথাটা টেনে নিলেন মাসীমা। নিয়ে বললেন, "তোমার কথা মিথ্যে নয়, বাবা মহীতোষ! কিন্তু তপাকে একটা কথা না বলে আমি পারলুম না। বহুদিন আগেও বিপ্লব কথাটা আমার কানে আসত—কতবার কত রকম পরি-স্থিতিতে ও কথাটা আমায় শুনতে হয়েছে। হ্যাঁ রে তপা, ওরা যে দু'জন দু'জনকে বিয়ে করছে তার মধ্যে কি তুই ভাল কিছু দেখতে পাচ্ছিস নে?" প্রশ্ন তিনি করলেন বটে, কিন্তু জবাব তিনি চান না। মাসীমাকে আমি চিনি, আমি তাই চুপ করে রইলাম। মাসীমার মুখের দিকে আমরা তিন জনেই চেয়েছিলাম। দু'মিনিট বিরতির পরে বলতে লাগ-লেন, "মহীতোষ আর কেতকী ভাল করেছে। তপা, কোথায় কেমন করে 'ভাল করার' বিপ্লব একটা ঘটেও ঘটছে না। সেইটেই বোধ করি পৃথিবীর শেষ বিপ্লব। ভাল করার বিপ্লবের মধ্যে গোটা পৃথিবীটাকে টেনে নিয়ে আয়। গড়িয়া-হাটের রক্তের দাগটা টেনে সাতসমুদ্রের সঙ্গে মিশিয়ে দে। তাতে যদি শতবার্ষিকী পরিকল্পনা করতে হয়, তবে তাই কর। তোদের জীবনে যদি না কুলোয়, বলরামের জীবনটা জুড়ে দে সেই সঙ্গে। রিফিউজীর জীবনে এর চেয়ে মহত্তর কাজ ত আর কিছু দেখতে পাই না। নগদ টাকার বখরা-বিনিময় করে পুনর্বাসন দপ্তরের আয়ু বাড়ানো যেতে পারে, সমস্যা মেটানো যায় না। আশ্চর্য হচ্ছিস্, না রে?"

বললাম, "মাসীমা, আশ্চর্য হওয়ার বয়স আমার পেরিয়ে গেছে। আমি বড়সাহেবের বাড়ী যাচ্ছি, কখন ফিরি ঠিক নেই।"

"রাত্রে ফিরবি ত?"

"যদি অসুবিধে না হয়। মহীতোষ, কাল তোমরা আসছ ত? মেলা বসবে বলে বলরাম ত বাতি হাতে নিয়েও নেচে বেড়াচ্ছে। কাল তিনটেতে কে একজন রাষ্ট্রনেতা আসছেন শহীদ-স্মৃতি মন্দিরের উদ্বোধন করতে, তোমরা এস। একটু ভিড় না জমলে ক্ষুণ্ণ হবে বলরাম, ক্ষুণ্ণ হবে ষষ্ঠীদাও। সর্বস্ব খরচ করেছে ষষ্ঠীদা। কেন খরচ করেছে তার কারণ আমি জানি না। হয়ত—হয়ত কেন, নিশ্চয়ই ষষ্ঠীদা আদর্শবাদী।"

দেখলাম, মাসীমার মুখের চামড়া কুঞ্চিত হয়ে এল। কিছু বললাম না। মহীতোষ বলল, "কাল রবিবার, তাড়া-তাড়ি আসব।"

কেতকী আর মহীতোষ দু'জনেই উঠে পড়ল। ওরা চলে যাচ্ছে দেখেও মাসীমা ওদের কাল আসবার জন্যে একটি কথাও বললেন না। শেষ পর্যন্ত খুব ক্লান্ত সুরেই তিনি থেমে থেমে বলতে লাগলেন, "লালু ত আমারই ছেলে। কি দরকার ছিল স্মৃতি-সৌধ তোলবার? মানুষ-পুজোর মেয়াদ স্থায়ী হয় না, তবুও এস বাবা তোমরা। ক্যাপটেনকে এক-বার দেখা করতে বলিস্। বিলেতের পাকা খবর কি এসে এখনও পৌছয় নি? তা ছাড়া আপাততঃ সরকার-কুঠিকে রক্ষা করার দ্বিতীয় কোন পথ দেখতে পাচ্ছি নে। উনি ত আশা এক রকম ছেড়ে দিয়েই বসে আছেন। সরকার-কুঠির মাটির সঙ্গে ওরই যোগাযোগ সবচেয়ে বেশী। তপা, বলরামকে একবার ডেকে দিস্ ত। আমার বোধ হয় ওষুধ খাওয়ার সময় হ'ল।"

বড়সাহেব আজও আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন বাড়ীর বাইরে। বসবার ঘরে এসে বসলাম আমরা, সেদিনের মত আজও দেখলাম সব কিছু গুছনোই আছে, কোন জিনিষ নড়চড় হয় নি। শুধু কোণের সেই টেবিলের ওপর মাসিক-পত্রগুলো নেই।

বড়সাহেব বললেন, "চ্যাং একটু বাইরে গেছে। ও ফিরে এলে একসঙ্গেই খেতে বসব। তোমার ক্ষিধে পায় নি ত?"

"না, চ্যাং এলেই খাব।"

নতুন একজন বেয়ারা চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এল। টেবিলের ওপর সাজিয়ে দিয়ে চলেও গেল সে। বড়সাহেব বললেন, "কৃষ্ণবল্লভ গেছে চ্যাংএর সঙ্গে।" এই বলে তিনি পেয়ালায় চা ঢালতে লাগলেন, বাধা দিলাম না। আমার মনে হ'ল, চা ঢালবার অবসরে ক্যাপটেন কি একটা জরুরী কথা যেন ভাবতে ভাবতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলেন। বোধ হয় তিনি এখানে উপস্থিত নেই। কিউবার আখের ক্ষেতে হয়ত বা তিনি লুসে আর লীর পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছেন। সিয়েরা মায়স্ত্রা পর্বতমালার পাদদেশে স্মৃতির খুর্‌পী চালাচ্ছেন ক্যাপটেন হেওয়ার্ড। আজও হয়ত সেখানে আগাছার অভাব নেই। উপড়ে ফেলবার জন্যে গেরিলা-নেতা ফিদেল কাস্ত্রো খুর্‌পীর মুখে বিপ্লবের ধার তুলছেন। কিন্তু বড়সাহেবের হাতে আজ কি আছে? মানবসমাজের বুক জুড়ে আগাছার অরণ্য আজ হাহাকার তুলেছে, তিনি তা শুনতে পেয়েছেন। স্মৃতির খুর্‌পী দিয়ে হাহাকার তিনি রোধ করতে পারেন না। অরণ্যের গোড়ায় কোপ বসাবার জন্য অস্ত্র চাই।

জিজ্ঞাসা করলাম, "কি খুঁজছ সাহেব?"

"চিনি—" চিনির পাত্রটা সত্যিই খালি। বেয়ারা এসে পাত্রটা আবার ভরে দিয়ে গেল। আমি বললাম, "মনে হয়েছিল তুমি বুঝি ফিরে গেছ কিউবায়।"

"কিউবায় ফিরে গিয়ে কি হবে? চ্যাং ভোররাত্রে চলে যাচ্ছে পিকিং।"

"পিকিং?"

"হ্যাঁ সুতপা; আমার কর্তব্য শেষ হ'ল। লীকে কথা দিয়েছিলাম, লুসের সন্তানটিকে ফিরিয়ে দেব—দিলামও।" পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বড়সাহেব ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন। চৌদ্দ বছরের অতীতটা ভোররাত্রে উড়োজাহাজে উঠবে, রওনা হবে পিকিঙের দিকে। তার পর আর কিছুই দেখা যাবে না—সীমান্তের ওপর জমে উঠবে ঘন কুয়াশা। বড়সাহেবের হাত থেকে চোদ্দ বছরের অতীতটা ফসকে যেতে বসেছে। তাঁর ব্যথার অংশ আমাকেও যেন নতুন উপলব্ধির সীমান্তে এনে দাঁড় করিয়ে দিল।

তিনি বলতে লাগলেন, "চ্যাং যখন দু'দিনের লী তখন মারা যায়। সন্তান হওয়ার সময় জাহাজের ক্যাপটেন, কাছেই ছিলেন, না থাকলে চ্যাং বাঁচত না। ধাত্রীবিদ্যার জ্ঞান আমার ছিল না, বুড়ো ক্যাপটেনটা দেখলাম সব জানেন। চ্যাংকে কোলে তুলে নিয়ে তিনি চলে গেলেন নিজের কেবিনে। জাপানী উড়োজাহাজ তখন আমাদের পিছু নিয়েছে। লী বুঝতে পারছিল সবই, হঠাৎ সে একসময় বলে উঠল, 'জাপান লুসেকে নিয়েছে, ওকে নিতে দিও না। যদি দরকার হয়, বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে না?'

বললাম, 'পারব।'

মৃদু হেসে লী বলল, 'পারা উচিত। উপনিবেশ গড়বার জন্যে তোমরা ত কম সাঁতরাও নি—সাত সমুদ্রের জল তোমাদের চেনা আছে।'

'আমায় বলছ কেন ওকথা, লী? আমি ত ডাঙার সৈনিক—অফিসার।''

তৃতীয় দিন আমাদের সত্যিকারের সংগ্রাম সুরু হ'ল। জাপানীরা জাহাজের আশেপাশে বোমা ফেলতে আরম্ভ করেছে। লী আমায় ডেকে পাঠাল, চ্যাংকে কোলে করে নিয়ে এলাম আমি। বাচ্চাটার দিকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত চেয়ে রইল সে। তার পর বলল, 'ওর নাম রাখলাম চ্যাং। মুখটা অবিকল লুসের মত।'

লীর আয়ু তখন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, দরকারী কথাগুলো শেষ করার জন্যে বার বার চেষ্টা করতে লাগল সে। আমার আপত্তি সে কানে তুলল না। বলল, 'চ্যাংএর সবটুকুই চায়নার। ক্যাপটেন, ওর গায়ে হাত দিয়ে দেখো, বিপ্লবের রক্ত কেমন টগবগ করছে! সবটুকু রক্তই চায়নার। লুসের সঙ্গে আমার বিয়ে হয় নি, তবুও সন্তান হ'ল। হ'ল এই জন্যে যে, আমার বিয়ে হয়েছিল বিপ্লবের সঙ্গে। ক্যাপটেন কথা দাও, চ্যাংকে তুমি ইংরেজ করে তুলবে না—ওর ষোল আনাই চাইনীজ।'

বললাম, 'কথা দিলাম চ্যাং চাইনীজই থাকবে।'

'প্রতিজ্ঞা কর, ওকে একদিন তুমি দেশে পাঠিয়ে দেবে—'

'লী!' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। ঝিমিয়ে পড়েছিল লী, আমার চীৎকার শুনে চোখ মেলল সে। বলল, 'এখনও বেঁচে আছি তোমার কাছ থেকে প্রতিজ্ঞাটা কেড়ে নেব বলে। প্রতিজ্ঞার কথা ভুলি নি। ক্যাপটেন, ইংরেজরা সাম্রাজ্যবাদী। তাই বলে প্রতিটি ইংরেজই ত সাম্রাজ্যবাদী নয়। তবে প্রতিজ্ঞা করতে ভয় পাচ্ছ কেন? দেরী করলে আমি যে শেষ কথাটা জেনে যেতে পারব না।'

'হ্যাঁ, প্রতিজ্ঞা করলাম, চ্যাংকে আমি চায়নায় পাঠিয়ে দেব।'

'আঃ! কি শান্তি! ক্যাপটেন এতদিন পরে আমি

সত্যিই কিউবা থেকে বেরিয়ে এলুম। মনে হচ্ছে, চায়নার মাটিতে পা দিয়েছি—দেশের হাওয়া গায়ে লাগছে আমার! র‍্যামন বারকুইনদের আর আমি দেখতে পাচ্ছি নে। ওরা সব কোথায় লুকিয়েছে ক্যাপটেন? পারবে—চ্যাং এদের মানুষ করতে পারবে। লুসের রক্ত পেয়েছে চ্যাং। ক্যাপটেন—'

'বল—'

'তুমি কোথায়?'

'এই ত লী—'

'একটু জল খাওয়াতে পার?'

"সুতপা, জল খাওয়ার পরে লী বোধ হয় ঘণ্টা দুই বেঁচে ছিল।" এই বলে বড়সাহেব হাঁক দিলেন, "বেয়ারা, বেয়ারা—"

"জী।" বেয়ারা এসে দাঁড়াল সামনে।

"এক গেলাস পানি—"

জল খেয়ে বড়সাহেব বললেন, "চোদ্দ বছরের দায়িত্ব ভোর রাত্রে শেষ হবে! কিউবার বিপ্লব ফিরে যাচ্ছে চায়নার মাটিতে। সারা দেশটা ওর জন্যে হাত বাড়িয়ে আছে। চোদ্দ বছরের পুঁজি ওর কতটা কাজে লাগবে জানি না—তবে চ্যাং লী আর লুসের কাছ থেকে সম্পদ যা পেয়েছে তার মোট পরিমাণ কম নয়। হয়ত সমাজতান্ত্রিক চায়নার মূলধন বাড়বে। সুতপা, মূলধন শুধু ব্যাঙ্কের সিন্দুকে বন্দী হয়ে থাকে না, মানবসমাজের মনেও তা জমে ওঠে। খণ্ডসীমান্তের বেড়া সে ডিঙোতে পারে। কাষ্টমসের প্রহরীদের চোখে তেমন মূলধন যদি বেআইনী বলে মনে হয় তা হলে দোষ সব রাষ্ট্রব্যবস্থার, মানুষের নয়। চ্যাং ভোররাত্রে বেড়া টপকে চলে যাবে, বেড়া ভাঙবার আদর্শ নিয়ে। কিউবার আখের ক্ষেতের কিংবা ভারতবর্ষের চা-বাগানের র‍্যামন বারকুইনেরা খবর পেয়েছে চ্যাং রওনা হচ্ছে। ওকে লুফে নেওয়ার জন্যে সমগ্র চায়নার প্রস্তুতি বড় কম নয়! লুসের ছেলে অপরিচয়ের অন্ধকারে ডুবে যায় নি। মাসিকপত্রের বুকে চ্যাংএর ছবি একবার নয়, বহুবার বেরিয়েছে। গোটা দেশটাই ওকে চেনে। ভোররাত্রে লীর স্বপ্ন উড়োজাহাজ চেপে এতকাল পরে সার্থক হতে চলল—চ্যাং পিকিং যাচ্ছে। সুতপা, বর্মায় ইংরেজ সৈন্যবাহিনী হেরে গিয়েছিল বটে, কিন্তু ক্যাপটেন হেওয়ার্ড জিতেছে। যেখানে দাঁড়িয়ে আমি জিতলাম, সেই জায়গাটুকু কি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আমি! রেঙ্গুনের সেই ডকের ওপর রেলিং ধরে যেখানে লী দাঁড়িয়েছিল, আমার জয়ের চিহ্ন আজ সেই জায়গাটুকুতে খোদাই করা থাক্। এর বেশী আমার আর কিছু চাইবার নেই, দেখবারও নেই।"

বড়সাহেব চশমার কাচ মুছতে লাগলেন। দরজার দিকে মুখ করে বসে রইলাম আমি। একটু বাদেই 'ড্যাড, ড্যাড' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে সেই দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল চ্যাং। আমি দেখলাম, ওর পোশাক-পরিচ্ছদ সব বদলে গেছে। খাঁটি চীনা পোশাক পরেছে চ্যাং।

খাওয়া শেষ হতে প্রায় এগারোটাই বাজল। বড়সাহেব বললেন "চ্যাং,তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও। আমরা রাত তিনটের সময় দমদম রওনা হবো।"

"ড্যাড, আন্টি কি আমাদের সঙ্গে দমদম যাবে না?"

আমি বললাম, "যাব।"

"তা হলে তুমিও একটু ঘুমিয়ে নাও, আন্টি! আমার পাশে জায়গা রইল। ড্যাড, আর একটা বালিশ পাঠিয়ে দিও। গুডনাইট ড্যাড, গুড নাইট আন্টি!"

আমরা আবার এসে বসলাম ড্রইং-রুমে। আলোচনা চালু করলেন বড়সাহেব। দুঃসংবাদগুলো ক্রমে ক্রমে শুনতে লাগলাম আমি। মিস্টার হেওয়ার্ড বললেন, "সরকার-কুঠি রক্ষা পেল না, দু'দিন আগেই খবর পেয়েছিলাম। জেটমলকে আজ সকালে জানিয়ে দিয়েছি, শেলী এ্যাণ্ড কুপার কোম্পানী সরকার-কুঠি কিনবে না। সুতপা, বিলেতের হেড আপিসে সত্যি-মিথ্যে অনেক কথাই গিয়ে পৌঁচেছে। কে পৌঁছে দিয়েছে, জান?"

"না।"

"মিষ্টার লাহিড়ী। গত ক'মাসের মধ্যে লোকটিকে আমি চিনতে পারলাম না। তুমি ত তাঁর কাছে কাজ করছ পাঁচ বছর। লোকটি কি রকম?"

"ভাল।"

"ভাল? তা হলে তাঁকে আমি বোম্বে আপিসে বদলি করে দিলাম কেন? কলকাতার আপিসের কেউ ত তাঁকে পছন্দ করে না।"

"মিষ্টার লাহিড়ীর পারিবারিক জীবন সুখের হয় নি, মনেও অশান্তি অনেক। সেই জন্যে—মনে হয়, সেই জন্যেই রোখের মাথায় তিনি দু'চারটে এমন কাজ করে ফেলেছেন যার পরিণতি ভাল হয় নি। ইউনিয়নের প্রতি লাহিড়ী সাহেবের সত্যিই রাগ নেই, রাগ সব মহীতোষের ওপর। তাঁর সাংসারিক অসন্তোষ সব বেরুবার পথ খুঁজছিল, আপিসের মধ্যে পথ তৈরী হ'ল সহজেই। প্রতিপক্ষ খোঁজবার জন্যে অন্য কোথাও যেতে হ'ল না। এই ত মানুষের স্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব। বড়সাহেব, মনস্তত্ত্বের গায়ে ভালমন্দের দাগ নেই। তিনি খারাপ লোক নন। তাঁর বদলির অর্ডারটা কি এখন বাতিল করে দিতে পার না?"

"না, এখন আর বাতিল করা যায় না। দেওদার ষ্ট্রীটের বাড়ীটা ছেড়ে দেবার অর্ডারও তাঁর কাছে পৌঁছে গেছে।"

"যাক, লাহিড়ী সাহেবের ব্যাপার তা হলে চুকেই গেছে। বড়সাহেব, বিজয়বাবু কিংবা চণ্ডীদার ব্যবস্থা কি করলে?"

"কিছুই করতে পারলাম না।" মিষ্টার হেওয়ার্ড একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন, "আণ্টির কাছে আর মুখ দেখাতে পারব না। সুতপা, কাল সকালে বিলেতের কেবল্ পাওয়ার পর আমি নিঃসন্দেহ হলাম, আমি কত দুর্বল, কত অক্ষম আর কত অসহায়!"

"তুমি একা নও সাহেব, প্রতিটি মানুষই তাই।" ঘোষণা করতে বাধ্য হলাম আমি। আমার ঘোষণার সত্য তিনি স্বীকার করলেন কিনা বুঝতে পারলাম না। ক্যাপটেন বললেন, "আণ্টির একটা কথাও রাখতে পারলাম না। কি লজ্জা বল ত? তোমার স্বামীকে খুঁজে দিতে পারলেও ধর্ম রক্ষা হ'ত—"

"আমার স্বামী নেই, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম তাও ত কম দিন হ'ল না।"

"তা হোক, ভারতবর্ষে যদি থাকতাম তা হলে নিশ্চয়ই খুঁজে আনতাম তাঁকে।"

"তুমিও কি পিকিং চললে না কি?"

"বিলেত থেকে নতুন একজন বড়সাহেব আসছেন। হয়ত কাল সকালেই তিনি এসে পৌঁছবেন। হেড-আপিস থেকে আমারও বদলীর আদেশ এসে গেছে। সুতপা, আমিও চললাম।"

"কবে যাচ্ছ বড়সাহেব?"

"ভোর রাত্রে। চ্যাং ধরবে থাই এয়ারওয়েজের উড়ো জাহাজ, আমি ধরব কে-এল-এম। ওরটা উড়বে আগে, আমারটা পরে, মিনিট দশেকের তফাৎ। সোমবার থেকে লুডন ষ্ট্রীটের বাড়িতে থাকবেন তোমাদের নতুন বড়-সাহেব।"

"না, ভারী অন্যায়—"

"কার অন্যায়?"

"হেড-আপিসের। তুমি থাকো, বড়সাহেব—আমাদের সরকার-কুঠিতে আবার উঠে এস। তোমার মত দক্ষ লোকের কাজের অভাব হবে না। আমাদের স্বাধো কত কাজ সুরু হয়েছে। ইস্পাতের কারখানা, লোহালক্কড়ের ফ্যাক্টরী—কত কি! দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্যে বিশেষজ্ঞ চাই—তোমার মত বিশেষজ্ঞের কত অভাব এদেশে জান? বড়সাহেব, তোমায় যেতে দেব না—" আমি জড়িয়ে ধরলাম ক্যাপটেনকে। মুহূর্ত কয়েক কোন কথা হ'ল না। তিনি নিঃশব্দে চশমার কাচ মুছতে লাগলেন। তার পর আমার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলেন চ্যাংএর শোবারঘরের সামনে। বললেন, "ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নাও। সময় হলে আমি ডেকে দেব।"

বাইরে থেকে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে তিনি চলে গেলেন।

আলো জ্বালিয়েই চ্যাং ঘুমোচ্ছিল। প্রায় ছ'ফুট লম্বা দেহটা কুঁকড়ে রয়েছে বিছানার ওপর। পার্ক ষ্ট্রীটের বড় দোকানের খাটও ওর পক্ষে ছোট। বেচারী চ্যাং! মায়ের দেহ থেকে বেরিয়ে চলে এল বুড়ো নাবিকের হাতে। সেখান থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল বড়সাহেবের কোলে। কাল আবার লাফিয়ে পার হয়ে যাবে ভারতবর্ষের উঁচু সীমান্ত! হাজার কীর্তির ভবিষ্যৎ হাতছানি দিয়ে ওকে ডাকছে। কীর্তির পাশে শুয়ে পড়তে লোভ হচ্ছিল আমার, পড়লামও শুয়ে। ঘুম এল না, আসার কথাও নয়। ঘুমের চেয়েও বড় নেশা আমায় পেয়ে বসেছে। লীর মত আমিও একদিন স্বপ্ন দেখেছিলাম। সে স্বপ্ন লালুদা সার্থক করে তুলতে পারে নি। রক্তমাংসের বিপ্লবী-বাস্তব আমার দেহেও জন্ম নিতে পারত। মাঞ্চুরিয়া থেকে লুসে ছুটে এসেছিল হংকং। বহু দূরের পথ অস্বীকার করছি না, কিন্তু রক্ষিতের মোড় থেকে সরকার-কুঠিতে ছুটে আসবার পথটা এমন কি কম ছিল? বিয়াল্লিশের বারুদ ছড়ানো ছিল সারা পথটাতে। লক্ষ্মণ গয়লার খাটাল আমার পথ বন্ধ করতে পারে নি—বিপিন চাটুজ্জেদের চোখ আমায় ভয় দেখাতে পারে নি—গড়িয়ার খালটাই বা আমায় রুখতে পারল কই? আমি গিয়েছিলাম সরকার-কুঠিতে। লালুদা আমায় ছুঁতে চাইল না। কোন কিছুই রেখে যেতে পারল না সে, সবটুকু আগুন সে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। গড়িয়া খালের ধারে শুধু পড়ে রইল এক মুঠো ছাই। তাও ত ঝিরঝিরে হাওয়ায় ছাইটুকু কোথায় যে উড়ে গেছে, এ যুগের একটি সন্তানও তা দেখতে পেল না। ইতিহাসের পাতায় ছাইটুকুর পরিচয় নেই।

নেশা কাটল আমার। ওপাশের দরজাটা দেখলাম একটু খোলা রয়েছে, বোধ হয় আলো জ্বলছে ওই দিকটাতে। মনে হ'ল ওটা বড়সাহেবের ঘর। তিনি ঘুমোন নি, খুটখাট আওয়াজ আসছিল। চ্যাংএর মাথায় হাত বুলোচ্ছিলাম। রেশমী সুতোর মত চুলগুলো ওর মসৃণ, এবং কালো—কুচকুচে কালো। নেমে পড়লাম খাট থেকে।

দরজার ফাঁক দিয়ে সবই দেখা যাচ্ছিল। দু'তিনটে সুটকেস গুছনো শেষ করলেন বড়সাহেব। একটা সুটকেসই তাঁর যেন গুছনো শেষ হচ্ছে না। জিনিসগুলো একবার ভরে রাখছেন আবার সেগুলো বার করছেন তিনি। বার বার ক'বারই তিনি বার করলেন আর রাখলেন। গুছনো তাঁর মনঃপূত হচ্ছে না, হওয়ার কথাও নয়। চ্যাংএর ছেলে-

গ্রামের পথে

মাটির টানে [ফোটো : শ্রীরমেন বাগচী

দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী সকাশে রুমানিয়ার সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিবৃন্দ

দিল্লীতে রুমানিয়ার সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলের নেতা মিঃ এ. ব্যুকোন ও ডক্টর রাধাকৃষ্ণন করমর্দ্দনরত

বেলাকার খেলনাগুলো হাতে তুলে নিয়ে পর্যবেক্ষণ করছেন বড়সাহেব। চোদ্দ বছরের স্মৃতি সব ছেড়ে দিতে হবে, তুলে দিতে হবে থাই এয়ারওয়েজের উড়োজাহাজে। ভোর রাত্রির ভবিষ্যৎ তাঁকে বিচলিত করে তুলেছে। চোখ দিয়ে জল পড়ছে তাঁর। বার বার করে চশমার কাচ মুছতে হয় বলে চশমাটি তিনি খুলে রেখেছেন। হাতে সময় আর বেশী নেই, রওনা হওয়ার মুহূর্ত ঘনিয়ে আসছে। দেয়াল-ঘড়িতে দেখলাম আড়াইটা। বড়সাহেব এবার সুটকেসের তালা বন্ধ করতে গিয়ে অন্য একটা খেলনা তুলে নিয়ে এলেন হাতে। শোলার, না টিনের জাহাজ বুঝতে পারলাম না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জাহাজটা দেখতে লাগলেন তিনি। আর ঘণ্টাখানেক সময় পেলে ক্যাপটেন নিজেই আজ জাহাজটাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন, জলের অভাব কিছু হ'ত না। রুমাল দিয়ে চোখ মুছলেন বড়সাহেব। আমি সরে এলাম দরজার কাছ থেকে। ওপাশ থেকে তিনি ডাকলেন,"সুতপা, সুতপা—"

"আমি জেগেই আছি।"

"চ্যাংকে তুলে দাও। আধ ঘণ্টার মধ্যে রওনা হতে হবে।"

চুলের মসৃণতায় হাত বুলিয়ে চ্যাংকে তোলা গেল না, ধাক্কা মারতে হ'ল। প্রথমটা আস্তেই মারলাম, কাজ হ'ল না। দ্বিতীয়টি জোরে মারতে হ'ল। চ্যাঙের চেয়ে বলরামের দেহ বেশী শক্ত। হওয়াই স্বাভাবিক—বলরামকে ফুরণে মোট বইতে হয়, বাসন মাজতে হয়, মসলা বাঁটতে হয়। চ্যাং এখনও নরম আছে। চোদ্দ বছরে শক্ত হওয়ার কথাও নয়।

ধাক্কা খেয়ে চ্যাং উঠে বসল। জড়সড় ভাবে চিবুকের সঙ্গে হাঁটু ঠেকিয়ে চুপ করে বসে রইল সে। জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হ'ল রে? বাথরুমে যাবি নে? সময় আছে মাত্র আর আধ ঘণ্টা।"

"আ'ন্টি!" ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল চ্যাং। বালিশের তলা থেকে একটা ছবি বার করল সে। ছবিটা বড়সাহেবের। এতক্ষণে চ্যাং বোধ হয় বুঝতে পেরেছে, ওকে যেতে হবে, ছাড়তে হবে ড্যাডকে। বললাম, "আর ত সময় নেই, ভাই।"

"যাচ্ছি।" গম্ভীর হ'ল সে।

"তোর জন্যে চায়না হাত বাড়িয়ে রয়েছে। একটা-দুটো হাত নয়, কোটি কোটি হাত। যাবি না?"

"যাচ্ছি।" আরও বেশী গম্ভীর হ'ল চ্যাং। ছবিখানা বুক-পকেটে রেখে সে স্নানঘরে ঢুকল।

বেয়ারা-বাবুর্চি-দারোয়ান সবাই উপস্থিত ছিল, কেউ ঘুমোয় নি। ঘুমোলেও পারত, সোমবার সকালে নতুন সাহেব আসবেন। হেওয়ার্ড সাহেবের আগে হেণ্ডারসন সাহেব ছিলেন। তাঁর আগে কে ছিলেন আমার তা জানা নেই। বয়-বাবুর্চিদের কাজকর্মের ব্যতিক্রম কখনও ঘটে না। একজন যাচ্ছেন, অন্য জন আসবেন বলে এদের উদ্বেগ কিংবা উত্তেজনা কিছু নেই। বোধ হয় বকশিসের অঙ্ক গুণতে হবে বলে এরা কেউ ঘুমোয় নি। কিংবা এরা হয়ত সত্যিই হেওয়ার্ড সাহেবকে ভালবাসে। এই দলের মধ্যে কৃষ্ণবল্লভকে দেখলাম না। রবিবারটা ছুটি বলে সে হয়ত বাড়ীতে ডিউটি দিতে আসে নি। বকশিস সে অবশ্যই পেয়েছে গতকাল আপিস ছুটি হওয়ার আগে। অতএব হেওয়ার্ড সাহেবের জন্যে কৃষ্ণবল্লভ কেন শনিবারের রাত্রিটা জাগতে যাবে? কৃষ্ণবল্লভকে সত্যিই দোষ দেওয়া যায় না, শিক্ষিত সমাজের কোন্ অংশটায় স্বার্থ ছাড়া মানুষ রাত্রি জেগে বসে থাকে?

আপিসের গাড়ী চেপেই আমরা দমদম এলাম। চ্যাং শক্ত হয়েছে, শক্ত হয়েছেন বড়সাহেবও। হাসিখুশীর কথা দু'চারটে হ'ল। ওখানে পৌঁছে চ্যাং আমায় চিঠি লিখবে বলে ঠিকানা চেয়ে নিয়েছে। ঠিকানা-লেখা কাগজের টুকরোটাও সে বুক-পকেটে রাখল। আমি জানি, হারাবার কোন ভয় নেই। চ্যাংএর বুক-পকেটে বড়সাহেবের ছবিখানাও ছিল।

দমদম এসে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করে বসে থাকতে হ'ল না, চটপট কাজ সারতে হ'ল। কলকাতার আকাশে আর অন্ধকার নেই। থাই এয়ারওয়েজ কোম্পানীর ঘোষণা আমরা শুনতে পেলাম। যাত্রীদের এবার সামনে এগুতে হবে। বেআইনী জিনিসপত্র কেউ সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছেন কিনা পরীক্ষা করে দেখবেন সরকারী কর্মচারীরা। মাথা নীচু করে চ্যাংও এগুতে লাগল সামনের দিকে। আমরা ওর পিছু পিছু গেলাম—খানিক পর আর যেতে পারলাম না। সরকারী আইন চ্যাং আর আমাদের মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল। আমাদের সঙ্গে করমর্দন করল চ্যাং। তারপর —ছোঁয়াছুঁয়ির বাইরে চলে গেল সে। খানিক বাদে থাই এয়ারওয়েজের উড়োজাহাজ আকাশে উড়ল। বাইরে থেকে আমরা দেখতেও পাচ্ছিলাম। বড়সাহেব দূরবীণ নিয়ে এসেছেন সঙ্গে করে। দূরবীণের ক্ষমতা যত বেশীই হোক, খণ্ডসীমান্তের বাইরে সে যেতে পারে না। আজও পারল না।

কিছুই ত আর দেখবার নেই, বলবারও নেই। আমরা চলে এলাম ভেতরে। বড়সাহেব বললেন, "আপিসের

গাড়ী তোমায় গড়িয়ায় পৌঁছে দেবে। ড্রাইভারকে বলা আছে।"

কে-এল-এম কোম্পানীর ঘোষণা কানে এল। এবার বড়-সাহেবকেও যেতে হবে। আমি একা পড়লাম। তাঁর সঙ্গে হেঁটে হেঁটে আবার সেই পুরনো জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। সেই আইন, সেই প্রহরী সবই দাঁড়িয়ে আছে তেমনি ভাবে। বেড়ার এ ধারে একা পড়লাম আমি—আমি সুতপা বিশ্বাস। করমর্দন শেষ করে জিজ্ঞাসা করলাম, "বড়সাহেব, তোমার বিলেতের ঠিকানা কি ?"

"আমি ত বিলেত যাচ্ছি না। চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছি।"

"তবে তুমি কোথায় যাচ্ছ ? বড়সাহেব, তুমি যেও না। তুমিই শুধু ভারতবর্ষকে ভালবাস না, ভারতবর্ষও তোমায় ভালবাসে। থাকবে বড়সাহেব ?"

আমার অনুরোধের ভাষা ভিজে উঠেছে, চোখও শুকনো ছিল না। বহুদিন, বহু বছর আমি কাঁদি নি। কাঁদবার সুযোগ ত কতবারই এসেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সামলে নিয়েছি। প্রতিবারই মনে হয়েছিল, চোখের জল ফেলবার মত স্মরণীয় ঘটনা ওগুলো নয়। আজ বোধ হয় এই প্রথম নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটল। মনে হ'ল, খুবই নিকটের মানুষ দূরে চলে যাচ্ছে, যাচ্ছে চিরদিনের জন্যে। ধরে রাখবার আগ্রহে বুঝি দেহটা আমার কেঁপে কেঁপে উঠছে। হাত বাড়িয়ে দিলাম বড়সাহেবের দিকে। দিয়ে বললাম, "তুমি যেও না বড়সাহেব—"

তিনি দু'পা এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন আমার কাছে। আমি তাঁকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম। বুকের ওপর মাথা রেখে কাঁদতে কাঁদতে আবার তাঁকে অনুরোধ করলাম, "তুমি যেও না—"

"আমায় যে যেতেই হবে সুতপা !"

বিমানঘাঁটির জনতা অবাক হয়ে চেয়েছিল আমার দিকে। উনিশশ' বিয়াল্লিশ সালের 'কুইট ইণ্ডিয়া' অস্ত্রটা আমি আজ নিজের হাতে ভেঙে ফেললাম বুঝি। বোধ হয় ইতিহাস আজ প্রকাশ্য দিবালোকে প্রতিশোধ নিচ্ছে। তা নিক, খণ্ডসীমান্তের কলঙ্ক তবু মুছে যাক। দূরের মানুষ কাছে আসুক। কাছের মানুষকে আর আমরা দূরে যেতে দেব না।

বড়সাহেবের আলিঙ্গনে বাঁধা পড়েছিলাম আমি। বোধ হয় মিনিট পাঁচেক পরে হঠাৎ আমার চেতনা ফিরে এল। একটু দূরেই দাঁড়িয়েছিল শেলী এ্যাণ্ড কুপার কোম্পানীর ড্রাইভার। অবাক সে কম হয় নি। আপিসের বেয়ারা এবং দারোয়ানরা কোনদিনও ভারতীয় মেয়েদের কাজ করতে দেখে নি। আমিই প্রথম শেলী এ্যাণ্ড কুপার কোম্পানীর আপিসে কাজ নিয়ে ঢুকেছিলাম। আমি জানতাম, ওরা নিজেদের মধ্যে আমায় 'কালি মেমসাহেব' বলে ডাকত। ড্রাইভারটা আজ এ কি দেখছে ? 'কালি মেমসাহেব'কে বড়সাহেব জড়িয়ে ধরেছেন দু'হাতের মধ্যে !

কিন্তু তার চেয়েও বড় ঘটনা ঘটে গেল আজ। দেহের জড়তা অন্তর্হিত হ'ল অতি অকস্মাৎ। কোথা থেকে যেন উষ্ণ উত্তেজনা ঢুকে পড়ল আমার সারা শরীরের মধ্যে। মনে হ'ল ঠাণ্ডা ব্যাধির আক্রমণ থেকে নিষ্কৃতি পেলাম বুঝি ! মনের রাজ্যে লোভের আগুন জ্বলে উঠতে সময় লাগল না। স্বামীর কথা মনে পড়ল আমার। সরে গেলাম বড়সাহেবের কাছ থেকে। গড়িয়া খালের ঠাণ্ডা হাওয়া আর বোধ হয় আমার দেহে জড়তা আনতে পারবে না। লালু সরকার সত্যিই আমায় মুক্তি দিয়েছে আজ।

সময় ছিল না আর। আমি এবার তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলাম, "ক্যাপটেন, তোমার নতুন ঠিকানাটা কি আমায় দিতে চাও না ?"

"নতুন ঠিকানা ? নতুনই বটে !" এই বলে ক্যাপটেন হেওয়ার্ড হাসলেন একটু, তার পর বললেন, "আমি যাচ্ছি বেলজিয়ামে। সেখানকার মনাষ্ট্রীতে ঢুকছি আমি।"

"মনাষ্ট্রি ?"

"হাঁ সুতপা, তোমরা যাকে মঠ বল।"

কোথা থেকে কি যেন হয়ে গেল, বুঝতে পারলাম না ! মনে হ'ল, বিমানঘাঁটির মেঝের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছি বুঝি। একটু আগেই যাঁকে সবচেয়ে উঁচু আসনে বসিয়ে-ছিলাম তাঁরও পতন বুঝি অনিবার্য হয়ে উঠল। কি যে বলব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। যৌবনের সুরুতে লালুদা পালিয়ে গেল। তার পর এলেন আমার স্বামী, তিনিও সরে পড়তে দেরি করলেন না। সরকার-কুঠির ভাঙা রঙ্গমঞ্চে হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন ক্যাপটেন হেওয়ার্ড। ভেবে-ছিলাম, একজন সত্যিকারের বলিষ্ঠ মানুষ এল বুঝি। এবার নিশ্চয়ই মেরামতের কাজ সুরু হবে। কিন্তু মানবজীবনের শূন্যতা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে ক'টা দিনই বা লাগল !

হঠাৎ বড়সাহেব দূর থেকেই ডেকে উঠলেন, "হ্যালো—"

"ছুটতে ছুটতে আসছি, সার ! কালই এসে পৌঁচেছি। আমি জানতাম না, আপনি আজই চলে যাচ্ছেন।"

বড়সাহেব আবার একটু এগিয়ে এলেন। এসে বললেন, "সুতপা, তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই। ইনিই তোমাদের নতুন ছোটসাহেব সীতাংশু রায়। সুতপা তোমার ষ্টেনো, সীতাংশু। বাই, বাই—"

বড়সাহেব জেনে যেতে পারলেন না যে, সীতাংশু আমার স্বামী।

ক্রমশঃ

ভাষা প্রসঙ্গে

শ্রীরমাপ্রসাদ দাস

(Perhaps if ideas and words were distinctly weighed and duly considered, they would afford us another sort of logic and critic than what we have hitherto been acquainted with.
—JOHN LOCKE)

ভাষা মানুষের বিস্ময়কর সম্পদ। ভাষার (ও যন্ত্রের) ব্যবহার জানে বলেই মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক। ভাষা আমাদের বিবৃতি ও চিন্তার বাহন (অবশ্য ভাব, অনুভব, আদেশ, অনুরোধ প্রভৃতিও সাধারণতঃ ভাষার সাহায্যে প্রকাশ করি)। ভাষাকে চিন্তার বাহন বলে বর্ণনা করলে ভাষা ও চিন্তার নিবিড় সম্বন্ধের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয় না। কার্ত্তিকের বাহন ময়ূর; সময়বিশেষে কার্ত্তিক বাহনহীন হতে পারে। ভাষা কিন্তু বাহনমাত্র নয়, কারণ চিন্তা সম্ভবতঃ ভাষাবাহন থেকে মুক্ত হতে পারে না। ভাষা ও চিন্তা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ বলে মনে হয়। বলা বাহুল্য যে, এ সম্বন্ধ উভয়মুখী নয়, একমুখী। ভাষা ছাড়া চিন্তা করা যায় না। কিন্তু ভাষামাত্রই চিন্তার অভিব্যক্তি নয়। অনুভব, উচ্ছ্বাস, জিজ্ঞাসা প্রভৃতিও ভাষায় ব্যক্ত হয়। আর অর্থহীন বাক্যকেও কেউ কেউ বাক্য বলে থাকেন।

উপরে যা বলা হ'ল তা এমন কিছু অভিনব নয়, সর্ব্বজনবিদিত এবং সম্ভবতঃ, সর্ব্বজনগ্রাহ্য। কিন্তু ভাষা ও ভাবনার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের তাৎপর্য্য সম্পর্কে আমরা সবাই অবহিত নই। এদের অবিচ্ছিন্নতার তাৎপর্য্য এই যে আমাদের ভাবনা ও বক্তব্যের বহু ভ্রম ও বিভ্রান্তির মূলে আছে ভাষার অপব্যবহার। বহু তাত্ত্বিক ও তাত্ত্বিক ভ্রম-বিভ্রান্তি প্রকৃতপক্ষে ভাষাগত। এটাই স্বাভাবিক। কারণ যখনই আমরা চিন্তা করি, তখন কোন না কোন ভাষা, অন্তত আন্তরিক ভাবে, ব্যবহার করি। এই সত্য হেতুবাক্য থেকে, আমাদের অজ্ঞাতসারে, আমরা এ ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে আসি যে, যখন কোন ভাষা ব্যবহার করি তখনই চিন্তা করি। আমরা ভুলে যাই যে, চিন্তা না করেও, কোন বক্তব্য না থাকলেও, ভাষা ব্যবহার করা যায়। তা ছাড়া যেহেতু ভাষার ব্যবহার ছাড়া ভাবনা সম্ভব নয়, সেজন্য ভাষাগত ত্রুটি-বিচ্যুতি চিন্তা ও বিবৃতিতে সংক্রামিত হবেই।

একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। ধরা যাক দু'জনের মধ্যে বিতর্ক চলছে। একজন বলছে: রাশিয়ায় গণতন্ত্র বলে কিছু নেই। কারণ সেখানে ব্যক্তি-স্বাধীনতা নেই, স্বাধীনভাবে শ্রমিকসঙ্ঘ গড়ার অধিকার নেই, স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করার অধিকার নেই ইত্যাদি ইত্যাদি। অপর পক্ষে, অন্য জন বলছে: একমাত্র রাশিয়াই প্রকৃত গণতান্ত্রিক দেশ। কারণ রাশিয়াতে বেকারী নেই, জনগণের আর্থিক পরনির্ভরতা নেই, আছে প্রকৃত স্বাধীনতা —কাজ করার স্বাধীনতা, আর্থিক স্বাধীনতা ইত্যাদি, ইত্যাদি। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, বাদী ও প্রতিবাদীর বক্তব্যের মধ্যে বাস্তব বিরোধিতা নেই। কেবল সিদ্ধান্ত দুটিকে বিরোধী বলে মনে হতে পারে। সিদ্ধান্ত দুটি বাদ দিয়ে অন্যান্য বিবৃতির মধ্যে সঙ্গতি দেখান যেতে পারে। তবু যে মনে হয় যে, বাদী ও ও প্রতিবাদীর বিবৃতির মধ্যে প্রকৃত বিরোধ আছে তার কারণ গণতন্ত্র শব্দটি বাদী ও প্রতিবাদী ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে যাচ্ছে। "গণতন্ত্র"-এর ভিন্নার্থ বিশ্লেষণ করে বাদী ও প্রতিবাদীর সিদ্ধান্তের যৌক্তিক অসঙ্গতি দূর করা যায়। প্রথম বক্তার মতে গণতন্ত্র মানে সর্ব্বসাধারণের সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতা, আর দ্বিতীয় বক্তার মতে গণতন্ত্রের অর্থ আর্থিক নিরাপত্তা। উক্ত বিরোধ তা হলে প্রকৃত নয়—মানে তাত্ত্বিক নয়, ভাষাগত। বাদী ও প্রতিবাদী বিভিন্ন ভাষায়—মানে একই ভাষায় বিভিন্ন অর্থে কথা বলেছে বলে তারা পরস্পরকে ভুল বুঝেছে।

ভাষা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকলে, ব্যবহৃত ভাষা বিশ্লেষণ করে দেখলে, এ ধরণের বহু তর্কবিতর্কের অবসান হ'ত। ভাষা যে বহু তত্ত্ব ও তথ্যগত অনর্থের মূল এ কথা নূতন নয়। প্লেটো থেকে আজ পর্য্যন্ত বহু দার্শনিক এ কথা বলে গেছেন। কিন্তু ভাষা-বিশ্লেষণের কাজে কেউ বিশেষ উৎসাহ দেখান নি। (পাশ্চাত্য দর্শনের কথা মনে রেখে এ উক্তি করা হ'ল। ভারতীয় দার্শনিকদের সম্বন্ধে এ উক্তি সত্য নয়। ভারতীয় নৈয়ায়িক, আলঙ্কারিক ও বৈয়াকরণেরা ভাষাতত্ত্ব ও ভাষাবিশ্লেষণ নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন।) উল্লেখ্য একটি ব্যতিক্রম হ'ল সাম্প্রতিক একটি দার্শনিক সম্প্রদায়। এ সম্প্রদায়ের দার্শনিকরা ভাষাবিশ্লেষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এ দের মধ্যে যাঁরা চরমপন্থী তাঁদের একজন পথিকৃৎ হলেন হ্বিটগেনষ্টাইন। হ্বিটগেনষ্টাইন বলেছেন all philosophy is critique of language—দর্শনমাত্রই ভাষাবিচার। এ কে অনুসরণ করে অধ্যাপক গিলবার্ট রাইল বলেছেন (বরং বলা উচিত তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলতে বাধ্য হয়েছেন) যে, দর্শনের কাজ হ'ল the detection of the sources in linguistic idioms of recurrent misconstructions and absurd theories, অর্থাৎ ভাষা

অনেক বহুপ্রচলিত ভ্রান্তি ও উদ্ভট তত্ত্বের উৎস, দর্শনের কাজ এ সবের (ভাষাগত) উৎস সন্ধান। হ্বিটগেনষ্টাইন আরও বলেছেন যে :

(most propositions and questions, that have been written about philosophical matters, are not false, but senseless .... Most questions and propositions of the philosophers result from the fact that we do not understand the logic of our language.)

অর্থাৎ দার্শনিক আলোচনায় যে সব প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় সে সব প্রশ্ন নিরর্থক, যে সব উক্তি করা হয় সে সব যে মিথ্যা তা নয়—উক্তিগুলি অর্থহীন, এ সব অর্থহীন দার্শনিক বিবৃতি ও জিজ্ঞাসার মূলে আছে ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতা।

সাধারণ ভাবে দার্শনিক আলোচনা যুক্তিবদ্ধ ও বিচারবিশ্লেষণ-মূলক। দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা সম্বন্ধে হ্বিটগেনষ্টাইনের উক্তি যদি অংশতও সত্য হয় তা হলে সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য-সমালোচনার নামে যে ভাব, উচ্ছ্বাস, নিন্দাবাদ ও ব্যক্তিপ্রশস্তি প্রকাশ করি, যে সব প্রশ্ন উত্থাপন করে থাকি, সে সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য-সমালোচনা নামীয় পদার্থ যে সম্পূর্ণ নিরর্থক তা কে অস্বীকার করবে? তবে হ্বিটগেনষ্টাইন ও অন্য বিশ্লেষণবাদী দার্শনিকের উক্তি "বেদবাক্য" নয়। এদের ভাষাতত্ত্ব মেনে না নিয়েও ভাষা-বিশ্লেষণের গুরুত্ব স্বীকার করে নেওয়া যায়।

এবার ভাষার প্রকৃতি ও ভাষার অপপ্রয়োগ সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু'চারটি কথা বলব। ভাষার উপাদান হ'ল শব্দ। শব্দ দু রকমের—ধ্বনি ও বর্ণ। পশুপাখীর কণ্ঠস্বর, বাদ্যযন্ত্রের শব্দ প্রভৃতি ধ্বনি (বলা বাহুল্য যে, ধ্বনিবাদীদের ধ্বনির কথা বলা হচ্ছে না, এটা নৈয়ায়িকদের ভাষা)। ভাষার উপাদান হ'ল বর্ণ বা অক্ষর। ধ্বনি ভাষার উপকরণ বা অংশ হতে পারে না। অক্ষর বা অক্ষরসমষ্টিকে বলি শব্দ বা পদ। শব্দ কথাটি তা হলে শেষোক্ত অর্থে ব্যবহার করব—এ শব্দ কেবল শ্রাব্য নয়, দৃষ্টিগ্রাহ্যও বটে। শব্দ এক রকমের চিহ্ন, সংকেত বা প্রতীক। চিহ্ন বলতে বুঝি কোন চিহ্নিতের চিহ্ন, সংকেত হ'ল সংকেতিত পদার্থের চিহ্ন, প্রতীক প্রতীকীকৃত বস্তুর নির্দেশসূচক। চিহ্ন (বা সংকেত) আর প্রতীক অবশ্য অভিন্ন নয়। এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রভেদ আছে। তবে বর্তমান প্রসঙ্গে সে প্রভেদ আলোচনার প্রয়োজন নেই। প্রতীক এক বিশেষ প্রকারের সংকেত—এ কথা মনে রাখলেই চলবে।

প্রতীক আর প্রতীকীকৃত পদার্থের সম্বন্ধ অনেকটা বস্তুবিশেষ ও (চিহ্নিতকরণের জন্য) তার গায়ে লাগান লেবেলের সম্বন্ধের মত। যেমন "মানুষ" হ'ল মানুষ নামক পদার্থের লেবেল। "প্রতীকীকৃত" পদার্থের পরিবর্তে আমরা "প্রতীকার্থ" ব্যবহার করতে পারি। পদার্থ মানে যেমন পদের অর্থ বা সংকেতিত বিষয়, সেরূপ প্রতীকার্থ মানে প্রতীকের নির্দেশিত বিষয়। বস্তুত যদি শব্দপ্রতীকের কথাই বলি, তা হলে "পদ" আর "প্রতীক"কে, "পদার্থ" আর "প্রতীকার্থ"কে সমার্থবোধক পদ হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এবার প্রতীক আর প্রতীকার্থের সম্বন্ধের কথায় ফিরে আসা যাক। মানুষ প্রতীকটি আর মানুষ এক নয়, প্রথমটি প্রতীক আর দ্বিতীয়টি প্রতীকার্থ। আমরা ব্যবহার করি প্রতীক কিন্তু বলি প্রতিকার্থ সম্বন্ধে।

ভাষা যে জাতীয় প্রতীকের ব্যাকরণশাসিত সংযোগ সে প্রতীক সম্বন্ধে প্রথম কথা হ'ল এই যে, প্রতীকগুলি পৃথক ও বিচ্ছিন্ন হলেও সংযুক্ত হতে পারে, আবার প্রতীকসমষ্টি থেকে প্রতীকগুলির বিযুক্তিও সম্ভব। একই প্রতীক বিভিন্ন প্রতীকগোষ্ঠীর অঙ্গীভূত হতে পারে। একই বাক্য প্রতীকের অংশ অন্য প্রতীক গোষ্ঠীর অঙ্গীভূত হতে পারে। শুধু আকাঙ্ক্ষা-যোগ্যতা-সন্নিধির নিয়ম ভঙ্গ না করলেই হ'ল। শব্দ-প্রতীকের উক্ত বিশেষত্বের ফলেই মানুষের ভাষা অন্যান্য প্রাণীর ভাষা (একেও যদি ভাষা বলা হয়) থেকে পৃথক। "পশুভাষা"র প্রতীকগুলি বিশেষ বিশেষ ভাবে যূথবদ্ধ, এদের জীবন আবদ্ধ গোষ্ঠীজীবন। মানবীয় ভাষার প্রতীকের মত এদের এক গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন করে অন্য প্রতীকগোষ্ঠীর অঙ্গীভূত করা যায় না। চিত্র ও ভাস্কর্যও এ জাতীয় প্রতীক—"পশুভাষা"র প্রতীকের মত এ প্রতীকগুলি প্রত্যেকটি বিশেষ, অনন্য। সমগ্র প্রতীকের একাংশ অন্য কোন প্রতীকের অংশ নয়। এ ধরণের প্রতীক হ'ল চিত্রধর্মী প্রতীক, আর মানুষের ভাষার প্রতীককে বলা যায় বাদধর্মী প্রতীক। ইংরেজীতে এ প্রভেদ প্রকাশ করার জন্য non-discursive symbol ও discursive symbol—এই বাক্যাংশ দু'টি ব্যবহার করা হয়। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক: আকবর বাদশার সঙ্গে হরিপদ কেরাণীর কোন ভেদ নেই। এ বাক্য-প্রতীকটি আটটি পদ-প্রতীকের দ্বারা গঠিত। এ পদ-প্রতীকগুলির প্রত্যেকটি আবার অন্য বাক্য-প্রতীকের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। কিন্তু কোন চিত্র বা মূর্তির অংশগুলি (এক অর্থে এ সব অংশহীন) অন্য কোন চিত্রের বা মূর্তির অংশ হতে পারে না। মানুষের ভাষার প্রতীক যে বাদধর্মী এ কথা উল্লেখ করবার তাৎপর্য্য এই যে—শিল্পে, সাহিত্যে প্রতীক কথাটি চিত্রধর্মী প্রতীক অর্থে ব্যবহৃত হয়। ভাষাকেও প্রতীকসমষ্টি বলে বর্ণনা করলে প্রতীক পদটির দ্ব্যর্থতা থেকে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। এজন্য "প্রতীক"-এর দ্বিবিধ প্রয়োগের পৃথককরণ করা হ'ল।

প্রতীক ও প্রতীকার্থের সম্বন্ধ সম্পর্কে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হ'ল এই যে, এদের সম্বন্ধ কৃত্রিম ও প্রথাগত। কোন পদ ও তার সংকেতিত পদার্থের মধ্যে "স্বাভাবিক" সম্বন্ধ নেই। কোন শব্দকে বিশেষ কোন অর্থে ব্যবহার করব, বিশেষ পদার্থের নাম মনে করব বলে স্বীকার করে নিলেই ঐ শব্দ প্রতীকের মর্য্যাদা পায়। প্রতীকসৃজন প্রথাগত ব্যাপার, এক ধরণের সামাজিক আচার। মানুষকে "মানুষ" প্রতীকের দ্বারা চিহ্নিত

করব বলে আমরা স্বীকার করে নিয়েছি। কিন্তু মানুষকে "মানুষ" না বলে "আকাশ", এবং আকাশকে "মানুষ", বললে কোন যৌক্তিক অসঙ্গতি হ'ত না, বাস্তব অসুবিধাও হ'ত না যদি এ ব্যবহার আমরা নিয়মিত ভাবে মেনে নিতাম। একই পদার্থ যে বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন প্রতীকের দ্বারা সংকেতিত হয়—এ কথা কে অস্বীকার করবে। প্রতীক ও প্রতীকার্থের সম্বন্ধ সম্পর্কে যা বলা হ'ল তা মনে রাখলে বহু ভাষাগত বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা পাব।

তা হ'লে, প্রথমত কোন পদের প্রকৃত বা স্বাভাবিক অর্থ অনুসন্ধান করার বৃথা চেষ্টা করব না। কোন প্রতীকের কোন "স্বাভাবিক" অর্থ থাকতে পারে না। কারণ প্রতীকের অর্থ নির্ভর করে সামাজিক রীতির উপর। কোন বক্তা বা লেখক এ বিশেষ প্রতীকটি কোন্ অর্থে ব্যবহার করেছেন তা অবশ্যই গবেষণার বিষয় হতে পারে। শুধু 'পারে' নয়, এই অর্থে পদ-প্রতীক ও বাক্য-প্রতীকের অর্থ অন্বেষণের বিশেষ প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, কোন শব্দকে প্রতীক বলে দাবী করা হ'লেই এর সংকেতিত প্রতীকার্থের অস্তিত্ব থাকবে—এ ধারণাও দূর হওয়ার দরকার। অর্থাৎ তথাকথিত প্রতীক থেকে প্রকৃত প্রতীকের পৃথককরণের প্রয়োজন। প্রতীক মানুষের সৃষ্টি। সাধারণতঃ কোন পদার্থের নির্দ্দেশকরণের জন্য প্রতীকসৃজনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এ চিহ্নটিকে একটা প্রতীক বলে দাবী করা হচ্ছে, সুতরাং এর প্রতিরূপ প্রতীকার্থ আছে—এটা সুযুক্তি নয়, অপযুক্তি। এমন "শব্দ"-এর উদ্ভাবন করা যায় যে "শব্দগুলি" প্রকৃত প্রতীক নয়। যেমন :

(For Portsymasser and Purtsymessus and Pertsymiss and Partsymasters, like a prance of fiindigos, with a shillto shallto slipny stripny.—JAMES JOYCE)

এ উদ্ধৃতির অধিকাংশ পদ অপ্রকৃত প্রতীক। তা ছাড়া, ভাষার দ্রব্য বা গুণবাচক প্রতীকগুলিকে এমনভাবে যুক্ত করা যায় যে, ঐ প্রতীকসমষ্টি আর দ্রব্য বা গুণ পদার্থের প্রতীক থাকে না, যেমন "সোনার পাথরের বাটি।" যে পদার্থের অস্তিত্বের যৌক্তিক বা বাস্তব-অসম্ভাব্যতা আছে, "সোনার পাথরের বাটী" সে সামান্য পদার্থের প্রতীক।

তার মানে আমরা অসম্ভব, কাল্পনিক ও আজগবী পদার্থেরও নামকরণ করে থাকি। নাম আছে বলেই নামীয় পদার্থ দ্রব্য বা গুণ, নামের প্রতিরূপের বাস্তব অস্তিত্ব থাকবে—একথা সত্য নয়। এ সহজ কথাটাও আমরা অনেক সময় ভুলে যাই। যেমন বলি যে : ভূত যদি নাই থাকবে তা হলে ভূত কথাটা এল কেমন করে? অনেক দার্শনিকও (যেমন সেণ্ট এন্‌সেলস, দেকার্তে) এ জাতীয় অপযুক্তির আশ্রয় নিয়েছেন, বলেছেন যে, ঈশ্বর কথাটি যে আছে তার থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

উপরে যা বলা হ'ল তার থেকে বোঝা যায় যে এমন "শব্দে"র উদ্ভাবন করা যায়, এমন ভাবে শব্দ ব্যবহার করা যায়, যে শব্দের বিন্যাস বা উদ্ভাবিত 'শব্দ'গুলি ধ্বনি বা কালির আঁচড় মাত্র—পদার্থের প্রতীক নয়। এ ধরণের 'প্রতীক' ব্যবহারের একটি উর্ব্বর ক্ষেত্র হ'ল সাহিত্য-সমালোচনা। দেখান যায় যে আধুনিক সাহিত্য-তত্ত্ব আলোচনায় ব্যবহৃত বহু 'শব্দ' ও শব্দসমষ্টি—এ জাতীয় 'প্রতীক'—মানে প্রকৃত প্রতীক নয়। জর্জ্জ অরওয়েল এক জায়গায় বলেছেন যে শিল্পবিচারে ব্যবহৃত "romantic, plastic, values, human, dead, sentimental, natural, vitality" প্রভৃতি শব্দগুলি বস্তুত অর্থহীন ("meaningless, in the sense that they not only do not point to any discoverable object but are hardly expected to do so by the reader")। অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে প্রতীক বলে মনে হ'লেও উক্তরূপ শব্দ প্রকৃত প্রতীক নয়—মানে এরা বাচক শব্দ নয়, এদের বাচ্যার্থ নেই। অরওয়েলের উক্ত উক্তির সঙ্গে তুলনীয় :

Construction, Design, Form, Rhythm, Expression…are more often than not mere vacua in discourse, for which a theory of criticism should provide explainable substitutes.

I. A. Richards.

বলা হ'ল যে, কোন পদের সংকেতিত পদার্থ বা বাচ্যার্থ না থাকলে ঐ 'পদ'কে প্রকৃত প্রতীক বলে মনে করা যায় না। কিন্তু এ উক্তি সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ পদ-প্রতীকের বাচ্যার্থেই এর সমস্ত অর্থ নিঃশেষিত হয় না। প্রতীকের অর্থ প্রধানতঃ দু'প্রকার : (দ্রব্যগুণ কর্ম্ম প্রভৃতি)-নির্দ্দেশক ও ভাবদ্যোতক, জ্ঞানবহ ও ভাববহ, বিবৃতিসূচক ও আবেগসঞ্চারী। বলা বাহুল্য যে, উক্ত শব্দযুগলগুলির প্রথম শব্দগুলি সমার্থবোধক, সে রকম দ্বিতীয় শব্দগুলিও। মানুষ, কাগজ-কলম প্রভৃতি (দ্রব্য)-নির্দ্দেশক; উঃ, অহো, বাঃ, মরিমরি, বন্দেমাতরম্, জয় হিন্দ প্রভৃতি দ্রব্যগুণাদির প্রতীক নয়; অনুভব, ভাব, উচ্ছ্বাস প্রভৃতি উদ্রেক করে অথবা প্রকাশ করে। বাক্য-প্রতীকও প্রধানত দু'রকমের, বরং বলা উচিত যে, বাক্য-প্রতীকের ব্যবহার মুখ্যত দু'ধরণের : বিবৃতি-বোধক ও ভাবদ্যোতক। যেমন এ গোলাপটি লাল, ছেলেটা বেঞ্চিতে পা দোলায়, কাছে এল পূজোর ছুটি, সবাই নেমে গেল পরের ষ্টেশনে——প্রথম প্রকারের ব্যবহারের দৃষ্টান্ত; আর, আমার বক্ষের কাছে পূর্ণিমা লুকান আছে, এ গান যেখানে সত্য অনন্ত গোধূলিলগ্নে সেইখানে বহি চলে ধলেশ্বরী, বধূ-আগমনগাথা গেয়েছে মর্ম্মরচ্ছন্দে অশোকের কচি রাঙা পাতা, প্রভৃতি দ্বিতীয় প্রকারের ব্যবহারের দৃষ্টান্ত।

ভাষার উল্লিখিত ব্যবহার দুটি সম্বন্ধে আমাদের অনেকের পরিষ্কার ধারণা নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ সমালোচনার পদ্ধতি সংক্রান্ত সাম্প্রতিক একটি প্রবন্ধের* একাংশ উদ্ধৃত করব। প্রবন্ধটিতে

* সমালোচনার পদ্ধতি : অমলেন্দু বসু, চতুরঙ্গ, বৈশাখ—আষাঢ়, ১৩৬৩।

অত্যন্ত বিভ্রান্তিমূলক আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে :

ভাষা প্রয়োগের প্রকার দু'টি : referential, উল্লেখী বা নির্দেশী, emotive, আবেগবান বা অনুভবী। ইংরেজী ভাষায় প্রকার দুটির নানা নামকরণ হয়েছে : denotation, connotation…; statement, suggestion…; direct, oblique …referential, emotive…। চরম বিচারে এই বিভিন্ন নামকরণে একই তারতম্য বোঝায়, যে তারতম্য ভারতীয় ন্যায় ও অলঙ্কার শাস্ত্রে ব্যক্ত্যর্থ বা বিশেষাভিধান ও জাত্যর্থ বা সামান্যাভিধান নামক দ্বৈততায় সুস্পষ্ট।

লক্ষ্যণীয় যে, লেখক referential—emotive, denotation— connotation, statement— suggestion, direct—oblique ও ব্যক্ত্যর্থ (বিশেষাভিধান)—জাত্যর্থ (সামান্যাভিধান)—এই পাঁচটি শব্দযুগলকে সমার্থবোধক বলে ঘোষণা করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে উক্ত শব্দদশকের অন্তর্ভুক্ত একটি শব্দ—'emotive' —ব্যতীত বাকি সব সমপর্য্যায়ের, মানে বাকি নয়টি লেখকের 'উল্লেখী'র অন্তর্গত। কেন না, denotation (পদার্থ, ব্যাপনা) ও connotation (লক্ষণ, দ্যোতনা) উভয়ই পদের নির্দেশসূচক অর্থ; connotationকে কোন ভাবেই পদের 'অনুভবী' অর্থ বলা যায় না। লক্ষণ (connotation) হ'ল কতকগুলি গুণের সমষ্টি; এ গুণসমষ্টি প্রয়োগ করে এর সঙ্কেতিত জাতিকে সনাক্ত করা যায়, জাতিবাচক শব্দের যথার্থ প্রয়োগ সম্ভব হয়। অর্থাৎ যে গুণাবলীর দ্বারা কোন জাতিবাচক শব্দের যথার্থ প্রয়োগ নিয়ন্ত্রিত হয়, সে গুণাবলীই ঐ জাতিবাচক শব্দের নির্দেশিত জাতির লক্ষণ। connotation-এর সঙ্গে আবেগের কোন সম্পর্কই নেই। আরও লক্ষ্যণীয় যে, statement ও referential ব্যবহার denotationএর সমার্থবোধক নয়। কারণ, denotation হ'ল পদসংক্রান্ত, referential ব্যবহার পদসংক্রান্ত ও বাক্যসংক্রান্ত, আর statement হ'ল বাক্যের বিবৃতিসূচক ব্যবহারের ফল।

তার পর, suggestion (অভিভাবন) আর "অনুভবী" একার্থবাচক নয়। অভিভাবন দু'রকমের হতে পারে : বিবৃতিবোধক (যথা শ্লেষ, বক্রোক্তি) ও ভাবদ্যোতক। অভিভাবন যদি দ্বিতীয় প্রকারের হয় তা হলেই emotive অর্থ ও suggestion সমার্থবোধক বলে গণ্য, নতুবা নয়। তির্যক অর্থও ভাবোদ্যোতক নয়, নির্দেশক। কোন বিবৃতিকে তির্যক বা পরোক্ষভাবে প্রকাশ করলে বিবৃতি তার লক্ষণ হারিয়ে আবেগসঞ্চারী হয়ে ওঠে না।

এবার "ব্যক্ত্যর্থ" ও "জাত্যর্থ"-এর কথা। প্রথম শব্দটি সম্ভবতঃ ব্যক্ত্যর্থ হবে, "ব্যক্ত্যর্থ" আলোচ্য প্রসঙ্গে অর্থহীন। কারণ লেখক জাতির (সামান্যের) সঙ্গে বিশেষের (ব্যক্তির) প্রভেদের কথা বলেছেন। ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের মধ্যে, বিশেষাভিধান ও সামান্যাভিধানের মধ্যে, লেখকের "অনুভবী" মানে কোথায় লুকান আছে তা কিন্তু বোঝা গেল না। উভয়ই ত নির্দেশক অর্থ। লেখক মনে করেন যে "ব্যক্ত্যর্থ" হ'ল "ঋজু, প্রত্যক্ষ" অর্থ, আর জাত্যর্থ হ'ল "তির্যক পরোক্ষ" অর্থ। পূর্ব্বেই বলেছি যে, কোন বিবৃতিকে "তির্যক পরোক্ষ" ভাবে প্রকাশ করলেই ঐ প্রয়োগ emotive হয়ে ওঠে না। তা ছাড়া এ কথা সম্ভবত সত্য নয় যে, সাধারণতঃ "ভারতীয় ন্যায় ও অলঙ্কার শাস্ত্রে ব্যক্ত্যর্থ বা বিশেষাভিধান ও জাত্যর্থ বা সামান্যাভিধান" ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

তবে এ কথা সত্য যে, ভারতীয় দার্শনিকরা শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য্য প্রসঙ্গে 'ব্যক্তি' ও 'জাতি'র উল্লেখ করেছেন। তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন : যখন কোন শব্দ ব্যবহার করি তখন ব্যবহৃত শব্দটি কিসের বাচক, মানে কি অর্থ (পদার্থ) নির্দেশ করে? এ জিজ্ঞাসার তিন-চারটি উত্তর দেওয়া হয়েছে। কোন কোন সম্প্রদায়ের (যথা সাংখ্য দার্শনিকদের) মতে শব্দ নির্দেশ করে "ব্যক্তি", কোন কোন সম্প্রদায়ের (যথা জৈন দার্শনিকদের) মতে শব্দ নির্দেশ করে "আকৃতি", আর কোন কোন দার্শনিক (যেমন বৈদান্তিক ও মীমাংসক) মনে করেন যে শব্দ নির্দেশ করে "জাতি"কে। নৈয়ায়িকরা এ বিরুদ্ধ মতগুলির সমন্বয়-সাধন করার চেষ্টা করেছেন। কোন কোন নৈয়ায়িক মনে করেন যে, পদের নির্দেশিত পদার্থ হ'ল "জাতিবিশিষ্টব্যক্তি"। আবার অন্য নৈয়ায়িকদের মতে শব্দের সংকেতিত অর্থ হ'ল "জাত্যাকৃতিবিশিষ্টব্যক্তি।" কিন্তু উক্ত আলোচনার বিষয় হ'ল শব্দের নির্দেশ, শব্দের emotive ব্যবহার নয়।

মনে হয়, আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক নৈয়ায়িক ও আলঙ্কারিকদের বাচ্যার্থ (শক্যার্থ, মুখ্যার্থ) ও ব্যঙ্গার্থের (ব্যঞ্জনা, প্রতীয়মান অর্থের) কথা বলতে চেয়েছেন। এ অনুমান যদি অসঙ্গত হয় তা হলেও বাচ্যার্থ ব্যঙ্গার্থ-এর উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ব্যঙ্গার্থের নানা রকম ব্যাখ্যা আছে। সাধারণভাবে ব্যঙ্গার্থ ও ভাবদ্যোতক অর্থ এক নয়। ব্যঙ্গার্থ "তির্যক পরোক্ষ" অর্থ, অভিভাবীয়, কিন্তু নির্দেশক অর্থ। ব্যঙ্গার্থের দু'একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। নিম্নোক্ত দৃষ্টান্ত দু'টি "ধ্বন্যালোক" থেকে সংগৃহীত— "ধ্বন্যালোক"-এর প্রথম ও দ্বিতীয় উদাহরণ :

হে ধার্ম্মিক, তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া ভ্রমণ কর। আজ সেই গোদাবরীতীরস্থ লতাকুঞ্জবাসী কুকুর সেই দৃপ্তসিংহের দ্বারা নিহত হইয়াছে।

এইখানে আমার শাশুড়ী শয়ন করেন অথবা নিদ্রায় নিমগ্ন হয়েন, এইখানে আমি শয়ন করি। তুমি দিনের বেলায় ভাল করিয়া দেখিয়া রাখ। হে রাতকাণা পথিক, তুমি আমাদের শয্যায় শয়ন করিও না।*

---

* সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও কালীপদ ভট্টাচার্য্য কৃত অনুবাদ।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের অভিভাবিত অর্থ পরিষ্কার। কোন কামার্ত প্রোষিতভর্তৃকা তার রূপমুগ্ধ কোন বিরংসু পথিককে নিষেধের ছলে আহ্বান জানাচ্ছে। এ দৃষ্টান্তে বাচ্যার্থে আছে নিষেধ আর ব্যঙ্গার্থে বিধি। অপর পক্ষে, প্রথম দৃষ্টান্তে বাচ্যার্থে বিধি ও ব্যঙ্গার্থে নিষেধ প্রকাশ করা হয়েছে। এ দৃষ্টান্তে যে উক্তি করা হয়েছে তার প্রসঙ্গ হ'ল এই যে, কোন ধার্মিক এক প্রেমিকার প্রিয়সংগমের স্থানে পুষ্পচয়নের জন্য যাতায়াত করত এবং স্বভাবতঃই প্রেমিক-প্রেমিকামিলনের বাধাসৃষ্টি করত। ধার্মিক ব্যক্তিটির যাতায়াত বন্ধ করার জন্য উক্ত উক্তি। যে ব্যক্তি কুকুর দেখে ভয় পায় তাকে দৃপ্তসিংহের খবর দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ভ্রমণ করার উপদেশ দিলেও সে সিংহের ভয়ে আর প্রেমিকার নিভৃত সংকেতস্থানে যাতায়াত করবে না—এ কথা বলাই বাহুল্য। দৃষ্টান্ত দু'টি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, ব্যঙ্গার্থ অভিভাবিত অর্থ, emotive অর্থ নয়। এ কথা অবশ্য বলা হচ্ছে না যে, কাব্যপ্রসঙ্গেও ভারতীয় আলঙ্কারিকরা উক্তরূপ ব্যঙ্গার্থের কথাই বলে থাকেন, অথবা তাঁদের মতে যে কোন রকমের ব্যঙ্গার্থ থাকলেই বাক্যসমষ্টি কাব্য হয়ে ওঠে। কিন্তু এ কথা অসংশয়ে বলা যায় যে, সাধারণভাবে ব্যঙ্গার্থ ও emotive অর্থ এক নয়।

তা হলে আমরা বাক্যের তিন রকমের ব্যবহারের সন্ধান পেলাম: বাচ্যার্থবাচক, ব্যঙ্গার্থবাচক ও ভাবদ্যোতক। বাক্যার্থ আরও নানা রকমের হ'তে পারে। তত্ত্ব-আলোচনার দিক থেকে উক্ত ব্যবহার তিনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আলোচনা হয় বিবৃতিসমষ্টি, এবং বিবৃতি ব্যক্ত হয় নির্দেশক (বাচ্যার্থবাচক) বাক্যের দ্বারা। সুতরাং আদর্শ আলোচনায়—তাত্ত্বিক কি তাত্ত্বিক আলোচনায়—ভাষার প্রতীকগুলি যথাসম্ভব কেবল বাচ্যার্থবোধক হবে। এ ক্ষেত্রে শব্দের বা বাক্যের ভাবদ্যোতক বা অনুরূপ অবাচ্যার্থবোধক প্রয়োগ একটা দোষ। তার মানে, ভাষা-বিশ্লেষণের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হ'ল অন্যান্য প্রয়োগ থেকে নির্দেশক প্রয়োগের পৃথককরণ। এ রকম পৃথককরণ করা না হলে আবেগ, উচ্ছ্বাস প্রভৃতিকে বিবৃতি বলে ভুল করার সম্ভাবনা থাকে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যে ভাষায় রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনা করেছেন সাধারণভাবে সে-ভাষা আলোচনার ভাষা নয়, মুখ্যত কাব্যের ভাষা, আবেগসঞ্চারী ভাষা। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন যে, "সত্য আলোচনা-সভায় আমার উক্তি অলঙ্কারের ঝঙ্কারে মুখরিত হয়ে উঠে।" রবীন্দ্রনাথ মহাকবি, তাঁর কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু আলোচনার ভাষার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করা অনুচিত। কারণ—আমরা রবীন্দ্রনাথ নই। রবীন্দ্রোত্তর যুগে যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনা করার চেষ্টা করেছেন, দেখা গেছে যে, তাঁদের "আলোচনা" নিকৃষ্ট কাব্যে পরিণত হয়েছে। আর রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব বুঝতে হলে তাঁর সাহিত্যতাত্ত্বিক রচনার সৌন্দর্য্য—ভাষার মাধুর্য্য, অলঙ্কারের ঝঙ্কার প্রভৃতি দেখেই অভিভূত হলেই চলবে না। তাঁর "ভাব-ভাষার ইন্দ্রজাল"-কে, "স্বয়ংপ্রভ মনোজ্ঞ···অলঙ্কৃত, ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত, মহীয়ান, অনবদ্য মধুর গদ্যরচনা"কে* বিশুদ্ধ তত্ত্বের ভাষায়, অর্থাৎ বিবৃতিবোধক গদ্যের ভাষায় "অনুবাদ" করে তাঁর বক্তব্য বুঝতে হবে। সাধারণত এ চেষ্টা না করে আমাদের মুগ্ধবোধ নিয়েই আমরা অভিভূত হয়ে থাকি। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে, আমরা মহাকবি নই, "গানের সুরের আলোয়···সত্যকে" দেখলে আমাদের চলবে না। তা ছাড়া কাব্য ও তত্ত্ব সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের বিষয়। তত্ত্ব বুদ্ধিগ্রাহ্য, কাব্য হৃদয়গ্রাহ্য, কাব্যের আবেদন আবেগ-অনুভবের আবেদন, আর তত্ত্বের আবেদন বিচার বিশ্লেষণের আবেদন। এজন্য কাব্যের ভাষা ভাবদ্যোতক, আর তত্ত্ব আলোচনার ভাষা নির্দেশক। তত্ত্বশ্রবণে (বা পাঠে) আমাদের যে প্রতিক্রিয়া হয়, কাব্যপাঠে (বা শ্রবণে) আমাদের সেরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না, এবং হওয়া বাঞ্ছনীয়ও নয়। যাঁরা আলোচনায় কবিত্ব খোঁজেন অথবা কাব্যে তত্ত্বের অনুসন্ধান করে থাকেন, তাঁরা তত্ত্বও বোঝেন না, কাব্যরসের স্বাদও পান না।

---

* গদ্যের উৎকর্ষ প্রসঙ্গে আমরা সাধারণত কি ধরণের বিশেষণ প্রয়োগ করি তার নমুনা হিসাবে এ বিশেষণগুলি উল্লেখ করা হ'ল। এগুলি সুকুমার সেনের "বাংলা সাহিত্যে গদ্য" থেকে উদ্ধৃত।
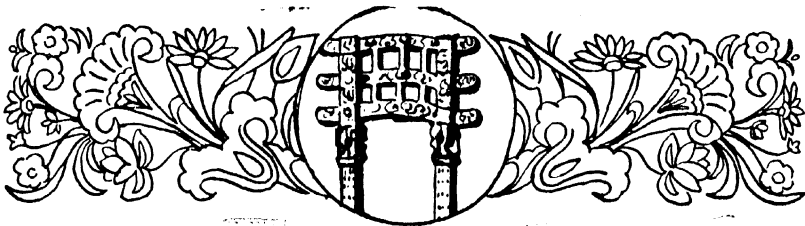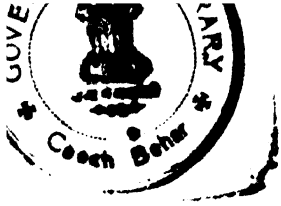
পুনরাবৃত্তি

শ্রীরেণুকা দেবী

সুরথ হঠাৎ একটা সাম্রাজ্য পেয়ে গেল। সাম্রাজ্যটা বিশেষণ হলেও, রাজত্ব বলাটা অর্থগত ভুল হবে না হয় ত। দাদা বদলী হয়ে গেলেন আলিপুর থেকে জলপাইগুড়ি। আর গোটা ফ্ল্যাটটার অধিকারী হয়ে গেল সুরথ। এই বাজারে, একা একজন লোক চারখানা ঘর সমেত স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা ফ্ল্যাট পেলে একটা রাজত্ব পাওয়ার সমানই হয়। মুখোমুখি দুটি করে ঘর, প্রথম দুটি বড়, শেষ দুটি ছোট আর ঘর-বরাবর লম্বা, আট ফুট চওড়া দালান। দালানটার এক প্রান্ত সিঁড়ির মুখে একটি দরজায়, ও অপর প্রান্তটি দুটি দরজায় বিভক্ত, দরজা দুটি রান্নাঘর ও বাথরুমের। রাজত্ব যত ক্ষুদ্রই হউক, তার সত্বাধিকারী হওয়ার পর থেকে, সুরথের কাছেও জনকুলের আসা-যাওয়া সুরু হ'ল। সে রাজ্যের এক অংশে স্থান পাওয়ার জন্য অনেকে আবার নজরানা দিতেও রাজী ছিল। কিন্তু সুরথ অটল, সুচ্যগ্র স্থানও দিতে রাজী নয় সে। অভ্যর্থনা-গার, পাঠাগার, শয়নাগার ও ভোজনাগার, চার ভাগে বিভক্ত করে ফেলল নবলব্ধ রাজত্ব। এতদিন একখানি ঘরে কষ্ট করে বাস করার শোধ তুলবার বাসনাতে। পুরোপুরি ভাড়ার টাকা দণ্ড দিয়ে, দার্জ্জিলিং টি কোম্পানীর, ছ'শ টাকার মাইনের চাকুরে, সুরথ চক্রবর্ত্তী একশ' কুড়ি টাকা খরচ করে একটু সুখে থাকতে চায়। বাপরে বাপ, হাঁফ ধরে গিয়েছিল তার, একটু নিঃশ্বাস নিয়ে আগে বাঁচুক ত।

হিন্দুস্থান পার্কের এই ফ্ল্যাটটাতে আগে ভাড়া ছিলেন এক মাদ্রাজী ভদ্রলোক। মিষ্টার নায়ারই বিজ্ঞাপন দেন একখানি ঘর সাবলেট করবেন বলে। হোটেলে থাকতে ভাল লাগছিল না, তাই চেষ্টা করেছিল। ভাগ্য ভাল, মিসেস নায়ার তাকেই পছন্দ করেছিলেন। প্রথম দিনকতক বাইরেই খেত, তার পর বাবা পুরাণো চাকর দয়ারামকে পাঠিয়ে দেন। এর বছরখানেক বাদে ছোড়দা বদলী হয়ে এলেন আলিপুর। নানা অসুবিধা করে থাকতে হচ্ছিল, বাসা করতে হ'ল বেলুড়ে। মাস সাতেক পরে শুনল, মিষ্টার নায়ার বদলী হচ্ছেন, ইতিমধ্যে ওঁদের সঙ্গে বেশ হৃদ্যতা হয়েছিল। বৌদি বললেন, হাতছাড়া হয় না যেন ফ্ল্যাটটা। এরপর সুরথের নামে বাড়ী ট্রান্সফার করে চলে গেলেন নায়ার দম্পতি তারপর বৌদি এলেন, দাদা এলেন, দুটি ছেলেমেয়ে, তবু বড়টি দিল্লীতে পড়ে, বোর্ডিং-এ থাকে। বেশ কিছু মালপত্র, তবুও মাসে মাসে বেড়ে চলেছে জিনিস। বৌদির অধিকারের তিনটি ঘর ছাড়াও একদিন তার ঘরে স্থান নিল বেতের জিনিষের একজিবিশান থেকে কেনা সোফা, সেট।

বৌদি বাজার করে ফিরলেন হাতে অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি-বাটি-কোট, ফিরলেন সঙ্গে কাঁচের বাসন, ষ্টেনলেশ টিনের থালা-বাটি, কাঠের কেঠো বারকোশ। সুরথ হিসাব করে দেখেছে, খাওয়া-পরা ইত্যাদি অনিবার্য্য ব্যয়ের মতই অনিবার্য্য এই ব্যয় আছে তার বৌদির। দাদা নির্ব্বিকার, বড় জিনিষ ছাড়াও ছোট-বড় অসংখ্য কাঠের জিনিষ। হাঁফ ধরে আসে তার, একটু ছিমছাম প্রকৃতির সে বরাবর। বলতে গিয়ে ধমক বৌদির কাছে। বোঝে কি সে সংসারের, সবই প্রয়োজন। বাবা! কত প্রয়োজন হয়, এই সংসারে। যাক, বৌদির সঙ্গেই যাচ্ছে তার প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি।

জিনিসপত্র বাঁধাই হ'ল, আর নামানো যখন হ'ল তখন সুরথ অবাক হয়ে ভাবল, এতগুলো জিনিষ ছিল কি করে? শিয়ালদহ ষ্টেশনে দাদা-বৌদিকে "চোখের দুর" করে দিয়ে এসে খালি ঘরটার মধ্যে বার কতক পরিক্রমা করল। সেকালের কোন রাজা-মহারাজা বা একালের কোন ব্রিগেডিয়ারের মতন কোন একটা দেশজয়ের আনন্দ পেল। আর প্রতিজ্ঞা করে ফেলল, রাজত্বটা একাই উপভোগ করবে। একটু সুখেই থাকবে, তার ত আর বৌ ছেলেমেয়ে নেই, একা মানুষ, কিন্তু হায়রে সুখ। ব্রিটিশ রাজত্বে রাজকর্ম্মচারীরা যেমন করে টেররিষ্ট পার্টির গন্ধ পেতেন, এই গণতন্ত্রের যুগে সুরথের এই ফ্ল্যাট-রাজত্বের সংবাদও তেমনি করে সম্ভব-অসম্ভব ব্যক্তিরা পেতে লাগলেন। রাজতন্ত্রকে সাধারণ-তন্ত্র করে দেওয়ার মন্ত্রনাও অনেকে দিতে থাকলেন।

সেদিন আপিসে বসে কাজ আরম্ভ করবার আগেই বেল বেজে উঠল মধ্যবর্ত্তী ফোনের, "চক্রবর্ত্তী একবার আসতে পারবেন?"

—কখন স্যর, জবাব দেয় সুরথ। বলে, খুব জরুরী কি?

—হ্যাঁ জরুরী, তবে আমার নিজস্ব ব্যাপার।

—আচ্ছা, যাচ্ছি স্যর।

ঘরে ঢুকতেই সুরথের প্রায় ভাগ্যবিধাতা এ. এন. বসুর মোলায়েম স্বর শুনতে পেল—বসুন।

—শুনলাম, আপনার সন্ধানে মানে আপনার দাদা যে ফ্ল্যাটটা ছেড়ে গেছেন সেটা নাকি খালিই আছে। ওটা কিন্তু আমার একজন, মানে আমার sister-in-law-কে দিতে হবে। সে বিশেষ অসুবিধায় আছে।

—কিন্তু ফ্ল্যাটটা পুরোপুরি খালি নয় স্যর।

—তবে যে শুনলাম, আপনার দাদা বদলী হয়ে সপরিবারে চলে গেছেন।

—আমি ত বদলী হই নি, আমি তথাকি সেখানে।

—ওঃ, আপনি থাকেন, সরি, তাহলে ওই ফ্ল্যাটেই থাকেন আপনি ! কি করা যাবে, যাক ! কোন খোঁজ পেলে,···

—নিশ্চয়ই স্যার, অন্ত খোঁজ পেলেই বলব।

বাড়ী ফিরেই দেখল, বসবার ঘর আলো করে বসে আছেন বড়দি। তার বড় জ্যেঠামশায়ের বড় মেয়ে।

—বড়দি যে, কি ভাগ্যি !

—তা আমি এলাম এটা ভাগ্য বই কি ! যা হাত-মুখ ধুয়ে আয়, তারপর ভাগ্য ফলাস।

নিবিষ্ট মনে সুপুরি কেটে চললেন বড়দি, ওই এক স্বভাব, অবসর পেলেই থলি থেকে বার হবে যাঁতি আর সুপুরি, খুব পান-দোক্তা খান। হাত-মুখ ধুয়ে এসে দেখল লুচি, আলুর দম, সন্দেশ সাজানো, অর্থাৎ বড়দি এসে শুধু সুপুরিই কাটেন নি। এইজন্যেই বড়দিকে সবাই ভালবাসে। খুশী হয়েই সুরথ বলে—

—কি ব্যাপার বড়দি, বৌদি নেই অথচ তুমি··

—বক্‌বক্ করিস নে, আগে গিলে নে ত।

—গিলছি, কিন্তু ফ্ল্যাটের কোন কথা নয় ত ?

—কি করে জানলি, গোণা-গাঁথা কিছু শিখছিস নাকি ?

—ও শেখার দরকার করে না।

—খেয়ে নে ত, বলছি সব।

—খেয়ে হাত ধুয়ে এসে সুরথ বলল, আলুর দমটা নাইস হয়েছে বড়দি !

বড়দি উত্তর না দিয়ে, শুধু চাইলেন সুরথের দিকে। তার পর বললেন, তুই যোগ্য হয়ে গিয়েছিস বিনু। হ্যাঁরে, ছোড়দারা কতদিন হ'ল গিয়েছে, মাস দেড়েক হবে ?

ছোড়দার চেয়ে ক'মাসের ছোট বড়দি।

হিসাব করে বলি দু' মাস ছ'দিন।

আসল কথা পেড়ে বড়দি আরম্ভ করলেন, তুই আমার পিসতুত ননদ হেমলতার নাম শুনেছিস ?

—না তোমার ওই রাবণের গুষ্ঠী শ্বশুরবাড়ীর অসংখ্য ধরণের ননদ-দেওরদের মনে রাখার চেয়ে, যে কোন সাবজেক্টে, এম, এ পরীক্ষা দেওয়া সহজ। সেবারে গয়াতে থাকতে, দৈনিক প্রায় দশ জন করে আসতে দেখেছি, শুনেছি, সবাই তোমার ননদ দেওর কেউ না কেউ।

একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বড়দি বলেন ফের। নারে, সে সব রাবণবধের সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে। রাবণ অর্থাৎ বড়দির শ্বশুর। তার সঙ্গে সঙ্গে সবই গেছে। বড় গাছ হলেই তবে না নানান পক্ষী বাসা বাঁধে। বহু লোক ছায়া পায়। কি দিনই সব গেছে ! এক বাড়ীভরা লোক, আপন-পর অনেকে খেয়েছে, থেকেছে সাহায্য নিয়েছে। দিতে পারতেন বলেই লোকে নিত। এই ত যখন দেখল দেবার মত লোক নেই, কেউ আর আসে না। শুধু হেম ঠাকুরঝি, আমাকে চিঠিপত্র লেখে খোঁজ নেয়। সমবয়সী ছিলাম, দুজনে খুব ভাব ছিল। যাক হেম ঠাকুরঝি কিছুদিনের জন্য কলকাতা আসতে চায়। বড় কান্নাকাটি করে চিঠি লিখছে আমায়। কিন্তু আমার বাড়ী জায়গা কোথায় ? সব ভাগ-ভিন্ন হয়ে যা হয়েছে, শুধু মাথা গোঁজার অবস্থা। তার উপর বাইরের লোকের ওপর তোর জামাইবাবু যা খাপ্পা ! একটা মাস থাকতে চেয়ে এত করে লিখল। রাজী হলেন না।

—যতীশবাবু ঠিক বলেছেন। দেখ বড়দি, তোমার ওই আগেকার মত, সেই শরণাগত-রক্ষক, আশ্রিতবৎসল কাল চালাবার দিন এখন নয়। তা কি হ'ল, তোমার সেই হেম ঠাকুরঝি, কি চান এখন তিনি ?

—ক'টা মাস কলকাতায় থাকতে চায়, বড্ড ধরেছে আমার, অন্ততঃ একটা মাস যদি রাখি, ত ছোট মেয়েটাকে এখানে এনে বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারে। সম্বন্ধ যদি বা হয়, গ্রামে গিয়ে মেয়ে দেখতে অনেকেই চায় না। গাঙ্গুলী মশায়ও চোখটা দেখাবেন। আজ আমি, আমরা থাকতেও একটু আশ্রয় পাচ্ছে না। থাকবে নিজেরা খরচ করেই, তাই বলছিলাম।

—সর্ব্বনাশ, আমার এখানে ?

—তোর ত এতগুলো ঘর দরকার নেই, একটা ঘর, তিনটে মাসের জন্য শুধু। কি বল, লিখে দি ওদের আসতে।

—না—না—বড়দি সে ভারি ঝামেলা হবে। তোমার হেম ঠাকুরঝি তার স্বামী, মেয়ে, ওরে বাবা, তার পর যদি না যায়।

—যাবে না, তারা বাড়ীঘর ছেড়ে এখানে থাকবে, খাবে কি, আর সে ভার আমার।

—এখনি কিছু লিখো না, দেখি ভেবে, দুদিন পর বলব।

—লক্ষ্মীটি, বিনু অমত করিস নে যেন, বড্ড ধরেছে আমায়।

পরের দিন আপিস যাওয়া পর্য্যন্ত ঠিক ছিল, যে না বলে দেবে বড়দিকে। কিন্তু আবার ডাক পড়ল বোস সাহেবের ঘর থেকে—ঘরে ঢুকতেই বললেন, চক্রবর্ত্তী, বসুন !

—কি বলে অনীতা, মানে আমার সিষ্টার ইন ল, জিজ্ঞাসা করছিল, ঘর ক'টা আপনার ফ্ল্যাটে, আপত্তি না থাকলে, একবার দেখাতে পারা যাবে। শেয়ারে দুটো পেলেই ওর চলবে।

সুরথ নিরুত্তর।

—ভাবছেন। বুঝতে পারছেন, দেখাতে পারলেও আমি যে চেষ্টা করছি সেটা অন্ততঃ বোঝাতে পারব।

—না আমার বড়দি, সে···মানে···

—ও আপনার বড়দি আসছেন, থাকবেন তিনি, আচ্ছা যদি না আসেন বা চলে যান জানাবেন কিন্তু।

—না, মহা মুস্কিলে পড়া গেল, দুখানা বেশী ঘরও ভাড়া করে বাস করার উপায় নেই। বোস সাহেব এমনি লোক ভাল। কাজেই অকারণে তাঁকে অখুশী করে লাভ নেই। অবশেষে ভাবল বড়দির কথা তুলে কাজই হয়েছে। বড়দি না হন, তার কোন আপন বা প্রিয়জন ত বটেই, তাকেই আসতে দিয়ে আত্মরক্ষা

করা ভাল। তারা মাস তিনেক থাকলেই, তিনখানা শূন্যঘর যে তার দখলে এই অপপ্রচারটা থেমে যাবে। কিন্তু "বসের" সিষ্টার ইন ল, যদি একবার এসে গ্যাঁট হয়ে বসেন ত ভবিষ্যতে তাকেই খসে পড়তে হবে। এতে কোন ভুল নেই। বন্ধু অনিমেষ, প্রবীর, ধীরাজ এদের মত হচ্ছে,আখের গুছিয়ে রাখ বাপু, কাজ দেবে। "বসের" ঐ শ্যালিকা, শ্যালক এদের খুশী রাখা মানে নিজের খুশীর পথ ক্লিয়ার করা। প্রবীর বলে, কি তোর লাভ হবে চারখানা ঘরে? কোন মানে হয় না এতগুলো টাকা ভাড়া গোণা। হাফ দিলে হাফ ভাড়া ত পাবি। ধীরাজ বলে, কলিকাতা হেন স্থানে ঘর বেশী রাখা মানে হোটেল খোলা। ঐ যে কোন ঠাকুরঝি বললি, কাল তিনি, পরশু ঠাকুরপো, তার পর মামা, কাকা, দাদা লেগে থাকবেই। কার চাকরী খোঁজা, কার গঙ্গা নাওয়া, কেউ দুদিন বাজার করবেন। তার চেয়ে, বোস সাহেবের শ্যালিকাকে দিয়ে দে। আর তোর দয়ারাম যা চৌকশ চাকর, দোখস নিজেদের সুবিধেটাই গুছিয়ে নেবে।

—দেখ ভাই, ভ্রাতৃজায়ার হুকুম, যদি কাউকে আশ্রয় দিই, তবু যেন প্রশয় না দিই, অর্থাৎ এই কলিকাতা হেন স্থানের, এই স্থানটুকুর অর্থকৃত লব্ধ অধিকার যেন না ছাড়ি।

—বেশ ত ভাড়ার বিল, যেমন তোর নামে আছে তেমনিই থাকবে।

—কিন্তু ওপক্ষ থেকে অনুরোধ আসে যদি।

—না—না, তা কখনও করে!

তবু কিছুটা ভেবে দেখল সুরথ। বড়দিকেই জানিয়ে দিল আসবার জন্য লিখতে, খাল কেটে কুমীর আনার চেয়ে, বড়দি হেন তমীর হাল ধরা অনেক ভাল। বাড়ীটা বেহাত হবে না এ ভরসাটুকু করা চলে।

দিন আষ্টেক পরে, একদিন আপিস-ফেরত গিয়ে দেখল, অতিথিরা এসে গিয়েছেন। বড়দির হেমঠাকুরঝির স্বামী ভোলানাথবাবু এসে একটু কুণ্ঠিত ভাবে বললেন, এলাম আপনার উপর অত্যাচার করতে। তবু যে অনুগ্রহ করে ইত্যাদি! কোন মতে কথা সেরে, নিজের ঘরে এল সুরথ। চা দিয়ে দয়ারাম বলল, অনারা এসেছেন বেলা দেড়টা হবে। খাবারের সঙ্গে ওঁদের দেওয়া ছানার বড়া দিল। আবার যত ঝামেলা, ভেবে, অন্যদিনের চেয়ে একটু আগেই বেরিয়ে গেল সুরথ। পরদিন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বোস সাহেবকে জানিয়ে দিল, স্বামী সন্তানসহ বড়দি এসে গিয়েছেন। বৌদিই ব্যবস্থাটা করে গিয়েছিলেন। দু-একদিন যেতেই সুরথ বুঝতে পারল, ওঁরা একখানি ঘরই ব্যবহার করছেন। আর এত চুপচাপ ভাবে আছেন যে, আছেন না জানলে ওর পক্ষে টের পাওয়া কঠিন হ'ত। যদিও গোলমাল করবার মত বয়স কারও নয়, তবুও তিনজন লোকের একটা সংসার, খাওয়া-নাওয়া চলা-ফেরা ইত্যাদি ক্রিয়া-কর্ম্মগুলি ত আছে। কোনও দিন সে তার বাথরুমের দরকারের সময় বাধা পায় নি। খাওয়ার ঘরে ঢুকে দেখে নি কেউ খাচ্ছে সেখানে। কেবল দুটি ঘরের মাঝখানে দালানটায়, যেখানে সস্তা ক্যানভাসের ইজিচেয়ার পাতা আছে দুটি। তার মধ্যে তার ঘরের পাশেরটা ছেড়ে খাবার ঘরের পাশেরটাতে ভোলানাথবাবুকে কাগজ পড়তে দেখেছে। তোয়ালেটা কাঁধে ফেলে তাকে বার হতে দেখে উঠে দাঁড়াতেন ভদ্রলোক। সুরথ, আপনি কেন উঠছেন বলার পর আর উঠতেন না, মুখ থেকে কাগজটা নামাতেন শুধু। সুরথের মনে হত, ওর এখানে আশ্রয় নিয়েছেন বলেই এমন সঙ্কুচিত ওঁরা।

দিন চারেক বাদে সাড়ে আটটার সময়, খেতে এসে দেখল, হেমলতা দেবী এসে পাশের চেয়ারটায় বসলেন। সস্তা ছোট টেবিল, তেমনি দুটি চেয়ার এই ছোট ঘরটায়। সুরথ দেখল খাদ্যে অন্যদিনের ব্যতিক্রম। দিনের পর দিন সে খেয়ে যায়, আলু ভাতে, খানিকটা মাখন, মাছের ঝোল, আর দৈ। অবশ্য দয়ারামের নিন্দে করবে না, রান্নায় তার হাত পাকা, আর অতি যত্ন করে খেতে দেয় তাকে। এমন কি বৌদির আমলেও এর চেয়ে বেশী কিছু হত, তাও না। আজ দু'রকম ভাজা, একটা তরকারি, মাছের ঝাল। ভাত বাড়াটা অন্য হাতের তা দেখেই বোঝা যায়। ভদ্রমহিলা নিজে থেকেও রান্না সম্বন্ধে কিছু বললেন না। আটটায় খেয়ে যাওয়া, তাতে মানুষের স্বাস্থ্য, শরীর বিষয়ে একটা-দুটো কথা বলে বললেন, বৌদির সুবাদে তুমিই বলছি, কথা না বলে খেয়ে নাও! রাতে দেখল, সে একা নয়, ভোলানাথ বাবু ও তাকে এক সঙ্গে খেতে দেওয়া হয়েছে। পর পর দু'দিন এই ব্যবস্থা দেখে দয়ারামকে ডেকে বলল, এই বুদ্ধু, আমাদের রান্না এদের ঘাড়ে চাপিয়েছ কেন।

—আমি কেন চাপাব, মা-ঠাকরুণ ত প্রথম দিন থেকেই বলছিলেন। আমি তবু না-না করে ক'দিন কাটালাম, উনি শুনলেন না। কেন দু'জনের জন্যে আলাদা হাঙ্গামা, আমরা ত না খেয়ে, না বেধে দিন কাটাব না। ওনারা ত আবার আমার রান্না খাবেন না।

—কিন্তু এটা কি ঠিক হচ্ছে, থাকতে দিয়েছি বলে—একটু পরামর্শই করে সুরথ, যতই হোক পঁচিশ বছরের পুরাণো লোক—বাজার ইত্যাদি করে দাও ত?

—হ্যাঁ গো, সে সব দিই, চাল, তেল, নুন, সব, আর আমি যে তার ফিরতি ওনাদের বাসন মাজা, মশলা করা, বাজার সব করে দিই।

দয়ারামের নীতি জ্ঞানে প্রীতিলাভ করে সুরথ। ভাবল, যাক লোক এরা ভালই। আর যে ধরণের ঝামেলা হবে ভেবেছিল, ঘরে-দোরে আসা উৎপাত আশঙ্কা করেছিল সে সব কিছুই নেই। কতটুকুই বা থাকে সে, তবে অতিথিরাও বড় বেশীক্ষণ থাকেন না। প্রায়ই বিকালে এসে দেখে ওঁরা নেই, কি বাইরে যাচ্ছেন, তিন-জনের মধ্যে দু'জনকেই দেখেছে। আর একজনকে দেখে নি এখনও, মানে চোখের দেখা কি আর দেখে নি এত কাছাকাছির

মধ্যে, তবে সামনা-সামনি দেখার মত করে দেখা নয়। হয়ত বাইরে যাওয়ার সময় কি ফেরবার মুখে বা কখনও পরদাটা সরে যাওয়াতে তাড়াতাড়ি ঠিক করে দিতে আসায় হঠাৎ নজরে পড়েছে সুরথের। মেয়েটির অমন গোপনভাবে থাকাটা ভারি মজা লাগে তার। হতে পারে আশ্রয় নেবার জন্ম তার মা-বাবার একটু সঙ্কোচ হতে পারে কিন্তু মেয়েটির যেন এখানে উপস্থিত নেই এমন ভাবে লুকিয়ে থাকার কারণ কি। কারণ কি সুরথ? বাইরে যখন যায় তখন যে "পুরুষম অদৃশ্যা" মানে কোন পুরুষের দ্বারা দেখিত হয় নি, তা নয়। তাহলে সুরথকে কি বাঘ-ভালুক কিছু ভেবেছে নাকি। যদিও সে সামনে এলে সুরথ কৃতার্থ হয়ে যাবে আর না এলে দারুণ ব্যর্থ একটা কিছু হবে তা নয়, তবুও।

ভোলানাথবাবু সরকারী আবগারি বিভাগে ছোট চাকরী করতেন। আবগারি বিভাগে চাকরি হলেও কোন রকম বাটপাড়ি করবার মত সাহস ও বুদ্ধি ছিল না তাঁর। চোখের মন্দ অবস্থার জন্ম দু' বছর আগেই পেনসান নিতে হয়। দু'টি মেয়ে, একটি ছেলে, বড়টির বিয়ে হয়েছে চাকরী থাকতেই, আর এইটিকে নিয়ে সমস্যা। বাইশ বছর বয়স হ'ল, আই-এ পাশ করার পর আর পড়াতে পারেন নি। ছেলেটি ফাষ্ট-ইয়ারে পড়ে, গ্রাম "কাদাই" থেকে বহরমপুর কলেজে বাসে যেতে হয়। খরচ অনেক, সামান্য, পেনসান। এ সব তাঁর মুখ থেকেই শুনেছে সুরথ। দেশে কিছু জমিজমা আছে, কোন মতে চলে। মেয়ের জন্মে বড় জোর তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা খরচ করতে পারেন, তার বেশী নয়, ওতেই ধার হবে। সম্বন্ধ হলেও কেউ গাঁয়ে যেতে চায় না। একটু ভাল যাতে হয়, তাই এখানে আসা। এখন সব ভাগ্য! এ সব কথাও চুপ করে শুনে যায় সুরথ। সরল ভাল মানুষ, সহজভাবেই বলেন কথাগুলো। কথাই একটু বেশী বলেন।

হেমলতা দেবীকে দেখলে বোঝা যায়, এককালে বেশ ভালই দেখতে ছিলেন। স্ত্রীলোক হলেও কথা খুব কমই বলেন। খুব চটপটে পরিচ্ছন্ন স্বভাবের একটু সেকেলে ভাবের মহিলা। মেয়েটিকে যতটুকু দেখেছে তাতে বোঝা যায়, রং মায়ের মত ফর্সা নয়। এমনি খুব লম্বা নয় তবে মুখটা লম্বাটে ধরণের। খুব লম্বা ঘন চুল। কপালের চার পাশ দিয়েও এত চুল যে অনেকটা অংশ ঢাকা আর সেই জন্ম কালো মনে হয়। ঘন ভুরু আর নাক-চোখ দিয়ে মুখখানা বেশ ভালই। দেখলেই চমৎকার মনে হওয়ার মত নয় বটে, কিন্তু ভাল করে একটুখানি সময় তাকিয়ে দেখলে মনে হয়, বেশ দেখতে। তাই মাঝে মাঝে যেটুকু দেখেছিল সুথে তারও বেশ ভাল লেগেছিল, কিন্তু তার এই বেশ লাগাতে কি এসে যায়! বেশ—ও বেশ চমৎকার, সুন্দর কত মেয়েই ত সুরথ দেখেছে। পরিচিত, আত্মীয় বন্ধু, আপিস, সব মহল আর রাস্তায়,কত জায়গায় কত মেয়ে যেমন দেখেছে তেমনি, নিছক ভদ্র মন নিয়ে একটি ভদ্র মেয়েকে দেখেছে মাত্র। মাসখানেক কেটে গেল ইতিমধ্যে, তার মধ্যে ভোলানাথ বাবুর কাছে শুনেছে, কোথায় তাঁর মেয়েকে পছন্দ করে নি, কোথায় কুষ্ঠি অমিল হ'ল, কোন স্থানে টাকার দাবি বেশী, তাঁর চশমার কথা ইত্যাদি অনেক। স্বল্পবাক হেমলতা দেবী শুধু বলেছেন, একমাস কেটে গেল, আশা ত কিছুই দেখছেন না। এদের সঙ্গে ভাব হওয়াতে সুরথ বলেছিল, ঘর যা দরকার হয় ব্যবহার করবেন, কিছু না মনে করে।

এই সময়ে একদিন আপিস থেকে ফিরে, অর্দ্ধ সমাপ্ত করে রেখে যাওয়া "ডফিনডুমরিয়ার"-এর "মাই ক্যাজিন র‍্যাচেল" বইটা নিয়ে গড়াতে গিয়ে ঠিক বালিশের পাশে নজর পড়ে। হাতে করে তুলে দেখে, দীর্ঘ একগাছি কেশ। আধ মিনিট চুপ করে ভাবল সুরথ। তা হলে "কেশবতী" কন্যা এ ঘরে শুধু আসেন না, শয়নও করেন। হঠাৎ মুখ নামিয়ে বালিশে ঘ্রাণ নেয়, না কোন সুগন্ধ ছড়ানো নেই। কিন্তু তার ঘরে, তার শয্যায় কেন? বিরক্ত হয়ে দয়ারামকে ডাকল কিন্তু দয়ারাম আসবার আগেই বিরক্তির মধ্যেও মনটা কেমন খুসী লাগল। দয়ারাম এলে বলল, কিছু না, যা। চা দেওয়ার পর খাবার দিতে আবার যখন এল দয়ারাম, সুরথ বলল—

—হ্যাঁরে দুপুরে আমার ঘর খুলে রাখিস নাকি?

—তা তালা দিতে বল নি। আর প্রথম যখন দেওয়া হয় নি এখুন দিলে ওনারা কি ভাববেন।

—না এমনি বলছিলাম, যা ঠিক আছে।

এর পর একটা রবিবারে ভোলানাথবাবু বললেন, আজ এখানেই তাঁর মেয়েকে দেখতে আসবে। প্রথম পুরুষরা আসবেন, তাদের পছন্দ হলে মেয়েরা পরে আসবেন। তা তারই বাড়ী যখন, আর রবিবার—সে যদি উপস্থিত থাকে। অবশ্য বড়দি-যতীশবাবুরাও আসবেন। আড়াইটে থেকে তিনটের মধ্যে। আপত্তি করা যায় না।

বড়দিরা যথাসময়ে এলেন। ঠিক হ'ল, সুরথ যে ঘরটায় থাকে ঐ ঘরে মেয়ে দেখান হবে। ঘরটা একটু সাজান-গোছান হ'ল। সকলের সঙ্গে নিজের শয়ন-ঘরে কনে দেখার মত করে মেয়েটিকে দেখল সুরথ। নাম বলতে শুনল, রমলা দেবী। মেয়ে দেখা, জলযোগ-পর্ব্ব সাঙ্গ করে আগন্তুক দলের সঙ্গে সিঁড়ি ধরে নেমে গিয়েছিলেন সকলেই। শুধু সুরথ নিজের ঘরেই ছিল। তারও যাওয়া উচিত কি না ভেবে যখন ঘর থেকে বার হচ্ছে, ঠিক সামনেই নিজের ঘরের পর্দ্দা ঠেলে দিয়ে সেখানে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটি। সুরথকে সামনে দেখে সরে গেল না এতটুকু। বরং চেয়ে রইল তার দিকে। চোখে চোখ পড়তেই সুরথই চলে এল নিজের ঘরে।

এর পর ফলাফল কি হয়েছে সুরথ জানে না, কোন দিন দ্বিপ্রহরে মেয়েরা এসেছিলেন কিনা। শুধু শুনল হেমলতা দেবীরা চলে যাচ্ছেন। যাওয়ার সময় সুরথ উপস্থিত থাকবে না, কারণ ট্রেন বেলা দুটোয়, তাই সকালেই বিদায়ের পালা সাঙ্গ করা হ'ল। সুরথ কেন যেন আশা করেছিল, হয়ত সেদিনের মত

দেখতে পাবে পর্দা-সমান একটা দৃষ্টি। দু'একবার ইতস্ততঃ করে থেমেছিল আপিস যাওয়ার সময়ে। বৃথা, টান-টান করে পর্দা টেনে দিয়ে আত্মগোপন করে রইল মেয়েটি। সারাদিন আপিসে বসেও ভাবল এই সব। রাগ হ'ল নিজের ওপর। একি, সুরথ কি জীবনে কোন মেয়ে দেখে নি! আর যে মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবে অন্য লোকের সঙ্গে, সে মেয়ে তাকাবেই বা কেন তার দিকে। কোন কারণে কোন তরুণী মেয়ে কাছাকাছি ছিল বলেই কি তার কথা ভাববে সে! নিজের অন্যায়কেই দোষ দিল। বাড়ী ফিরেই ফিরে পেল নিজের অধিকারের খালি ঘর। কিন্তু সব সত্ত্বেও, বৌদি চলে গেলে যে খালি ঘর পেয়ে আনন্দে বুকভরা নিঃশ্বাস নিয়েছিল, ঘরের মধ্যে এসে আজ সেই খালি ঘরে এক বুকশূন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলল যেন। নিজের ঘরে বসে জামা-জুতো ছেড়ে শুয়ে পড়ল বিছানাতে। দুই হাতের যুক্ত তালুতে মাথা রেখে সোজা হয়ে। হঠাৎই আবার উঠে বসে, খুব ভাল ভাবে নজর করে বালিশের দুপাশে, যদি থাকে কোন চিহ্ন অবশেষ একগাছি কেশ। না! কিছু না, এবার সুরথ চটেই উঠল, অবশ্য নিজের উপরেই, কি পাগলামো করছে সে। সে কি মেয়েটিকে ভালবাসে, না তাকে বিয়ে করবে, তবে? যদিও বিয়ে করবে না এমন প্রতিজ্ঞা সুরথ করে নি, তবুও যখনই বিয়ের কথা হয়েছে অমত জানিয়েছে সে। বলতে গেলে নিজের বিয়ের কর্তা সে নিজে। মা নেই, বাবা আছেন। গয়াতে থাকেন, বড়দা সেখানে ডাক্তার। বাবাও সরকারী কাজের শেষে ওখানেই বাড়ী করেছেন। নিজের কোন বোন নেই। তিন ভাই, সেই ছোট, ছোড়দা জুডীসিয়াল অফিসার। সাবজজ হয়ে বদলী হলেন। বিয়ের কথা হ'লে কেন যে আপত্তি করেছে, তা বোধ হয় নিজেও সঠিক জানে না, ঠিক কত আয় হলে বিয়ে করা চলে, এই হিসাবটাই ঠিক করতে পারে নি বলেই হয়ত। আর আজকাল বৌদিরা, ঠিক চাপ দিয়ে বিয়ে ঘটিয়ে দায় ঘাড়ে নিতে চান না। তা না হ'লে বিবাহের কথাতে যে মনটা একটু রঙিন হয়ে ওঠে নি, কি কোন বিয়ের নেমন্তন্ন খেয়ে এসে নিজের পাশেও একটি বৌয়ের কল্পনা করে নি এমন ঠাণ্ডা আর সাধু মন সুরথের নয়। তবুও না বিবাহিত হয়েই রয়ে গিয়েছে সে। হয়ত নিজের এত কাছে একটি মেয়ে ও তার বিয়ের ব্যাপারের কথাবার্তার জন্যেই মনের এই উত্তেজনা। জোর করেই সহজ হতে চায় সে।

সন্ধ্যা হওয়ার পরও চুপ করে শুয়েছিল। হঠাৎ দয়ারামকে ডেকে বলল, শোন ঘরদোরগুলো পরিষ্কার করে যেমন সতরঞ্চী পাতা ছিল আর ইজিচেয়ার দুটো ছিল, ঐ ঘরে রাখ বুঝলি। বুঝেও দয়ারাম বার হয় না। হাত কচলে বলে—দাদাবাবু!

—কিরে ভনিতা করছিস কেন?

—একটা কথা বলব।

—বল না, শায়িত অবস্থা থেকে উঠে বসে সুরথ।

দয়ারাম খাটের কাছে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে। বলে, তুমি আপিস গেলে ত, আর ও বাবু-মাঠাকরুণ কি সব কিনতে বার হয়ে গেলেন। তখন পেরায় ন'টা থেকে এগারোটা পর্যন্ত ওই যুঁই দিদিমণি তোমার বিছানায় শুয়ে বালিশে মুখ ঢেকে কাঁদছিলেন।

—সত্যি? উত্তেজিত ভাবেই কথাটা বলেই লজ্জিত হয় সুরথ।

—দাদাবাবু, তুমিই কেন যুঁই দিদিমণিকে বিয়ে কর না! দিদিমণি বড্ড ভাল মেয়ে।

তখুনি স্বভাবসুলভ তাড়া দিতে পারে না সুরথ। পরে বলে, যা ভাগ, বকতে হবে না। দয়ারাম বুঝতে পারে খুসীই হয়েছে সুরথ।

যে ভাবনা ভাববে না ভেবেছিল তাই ভাবতে বসল আবার। কি করা উচিত তার? দয়ারাম বলছে বিয়ে করতে। তা কি করে হবে! বোধ হয় মেয়ের বিয়ের ঠিক হয়েছে বলেই ওঁরা চলে গেলেন তিন মাসের আগেই। সে আর হয় না। হয় না তবু ভাবনাও থামে না। এর মধ্যে দয়ারাম নানা কথার মধ্যে শুনিয়েছে ওনারা ত পেরায় বার হয়ে যেতেন, সবদিন দিদিমণি যেতেন না। তিনি নিজের ঘর থেকে এসে তোমার ঘরেই শুয়ে থাকতেন গোটা দুপুর। সুরথ ভাবে, আশ্চর্য্য মেয়ে ত! কোন দিন যে কথা বলার ইচ্ছা ত দূরের কথা, সামনে পড়ার চেষ্টাও করে নি, সে এসে কেন তার বিছানায় শুয়ে থাকত? যাবার দিন দেখাও দিল না, চোখের জলে বুক ভাসিয়ে গেল। তার বিছানায় শুয়ে এই সব কেন, কিন্তু তবু যত গণ্ডগোলে ব্যাপারগুলো সুরথের মাথা ঘুলিয়ে দিল। অকারণেই নিজেকে দেখল আয়নার সামনে এসে। হাঁ, যদিও বর্ণটা তার অনুজ্জ্বল শ্যাম, কিন্তু চেহারাটা ভালই। আটাশ-উনত্রিশ বছরের দীপ্ত-যৌবন দেহের প্রতিচ্ছবির দিকে তাকিয়ে ঠাসা ঘন-চুলে-ভরা মাথাটার উপর হাত বুলিয়ে দেখল বারে বারে। হতে পারে তার চেহারা, কিংবা বিখ্যাত টি কোম্পানীর অ্যাসিষ্টান্ট একাউন্টান্ট সি এ, এম কম, সুরথ চক্রবর্তীর পদ ও প্রাপ্যার্থ দুই-ই অবহেলা করবার মত নয়, তাই বলে কি শুধু সেইজন্যেই তার শয্যাতে শুয়ে পরম সুখ লাভ, বা বিদায়বেলায় চোখের জল ফেলেছিল মেয়েটি। কিন্তু কেন আবার।

প্রায় দশ-বার দিন পরে বড়দি আবার এলেন, ওরে বিনু শোন, হেমঠাকুরঝির চিঠি পেলাম। ওই যারা মেয়ে দেখেছিল, তাদের মেয়ে পছন্দ হয়েছে। এখন যদি দেনা-পাওনায় মেটে তা ওরা নিস্তার পায়, হেমঠাকুরঝি লিখেছে তুই যদি আর দুটো-তিনটে দিন ওদের আশ্রয় দিস তা হলে এখান থেকেই বিয়ে দেয় ওরা। বরযাত্রী নেওয়ার খরচ দিতে হয় না, আর গাঁয়ে কাজ করলে অনেককেই বলতে হয়, ঠিক যদি হয় ত দুটো-তিনটে দিনই তো।

আপনা থেকেই হঠাৎ মিথ্যে কথা বলে ফেলল সুরথ, তা ত হবে না। এই ক'টা দিন পরেই বোস সাহেবের শালীকে

দিচ্ছি দুটো ঘর, আর কি হবে আমার এত ঘরে! নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে গেল বলে।

—ওমা তাই বুঝি, যাক যা হয় হবে। বড়দি চুপ করেন।

বড়দি চলে যাওয়ার পর সুরথ ভাবল, এ কি বলল সে, আর কেনই বা বলল! এতেই কি বিয়েটা বন্ধ করা যাবে। বিয়েটা বন্ধ হোক তাই কি চায় সে? অথচ যার বিয়ে, সে নিজে কি চায় তা জানে না সুরথ। কেন যাবার দিন চোখের জলে বিছানা ভিজিয়েছিল তা জানে না সুরথ। কিন্তু সুরথ পুরুষ, সুরথ যুবক। তাই যখন একজন পুরুষের জন্য একজন স্ত্রীলোক, যুবকের জন্য তরুণী চোখের জল ফেলেছে এই কথা সেই পুরুষ বা যুবক জানতে পারে, তখন তার চোখে সব রূপগুণের অতীত হয়ে "অরূপ গুণবতী" হয়ে ওঠে সেই মেয়ে। সেদিন রাত্রে দু'তিন বার ঘুম ভেঙে কানের পাশে জল দিল সুরথ। মনে হচ্ছিল নাম দুটি, রমলা আর যুঁই, দুটিই ভাল বেশ। পরের দিনও এলোমেলো চিন্তার মধ্যে হঠাৎ আপিস কামাই করল সে। গোটা দেড়েকের সময় একটা ফোন করে এল শরীর খারাপের দোহাই দিয়ে। ফিরে এসে চুপ করে শুয়ে থাকল। তখন দয়ারাম একটু ছুটি চাইল বাইরে যাওয়ার জন্যে। পুরানো আর চতুর চাকর দয়ারাম সোজা গেল বড়দির বাড়ী।

এর পর বড়দি এসে হৈ-হৈ করলেন। ওমা, তোর পণ বিয়ে করব না! কাকাবাবু কিছুর মধ্যে নেই। এমন সম্বন্ধে ত বৌ-গিন্নীরা নাক সিঁটকোবেন, তাই কোন কথা পাড়ি নি আমি। এ ত হেমঠাকুরঝি আর মেয়ের পরম সৌভাগ্য ইত্যাদি। তর সয় না ব্যবস্থা করতে তাঁর। স্থানে স্থানে তার করে দিলেন। লম্বা চিঠি দিলেন কোথাও। তার পর একদা সুক্ষণে যে ঘরে যে মুখ থেকে কান্না ঝরে পড়েছিল, সেই ঘরে সেই মুখের হাসি উছলে উঠল। প্রথম সুযোগেই কান্নার কারণ জানতে চাওয়াতে চির-পৌরাণিক ধারায় উত্তর শুনেছিল "জানি না।"

—তা হ'লে কি আশ্রয় পাওয়ার পরই একেবারে আশ্রিতা হওয়ার বাসনা হ'ল।

—আর তোমার, ঘর পাওয়ার পর ঘরণী আনবার ইচ্ছে হ'ল?

তারও পরে একটি করে দিন কেটে তখন চারটে বছর পার হয়ে গিয়েছে। তাদের দুজনের মধ্যে থেকে আবির্ভাব হয়েছে আরও দুটো মানুষ। একদিন সেই খালি খালি ঘর চারটের দিকে তাকিয়ে সুরথের মনে হল, ঠিক যেন সেই বৌদির জিনিসভরা ঘরের মতন লাগছে। সেই কোটরাটা-টুল-টেবিল। এত জিনিসের কি দরকার বলতেই শুনেছে, সংসার করতে গেলে সবই প্রয়োজন হয়। আবার ভাবে সুরথ, তাই ত একদা এই পৃথিবীতে ছিলেন আদম আর ইভ মাত্র দু'জন। শূন্য পৃথিবীতে, কিংবা একা স্বয়ম্ভু মনু। অর্থাৎ মানব। যিনি নিজের প্রয়োজনে অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ করেছিলেন একটি মানবীর জন্যে। তার পর থেকেই ত সমাজ সংসার, শৃঙ্খলা, রক্ষা ব্যবস্থা—সবই কেবল প্রয়োজনে। এ পৃথিবী প্রয়োজনে ভরা।

শুভ-দৃষ্টি

শ্রীহেমলতা ঠাকুর

মানুষ যেদিন জন্ম নিল রাঙ্গা হলো এই পৃথিবী,
রঙিন বেশে রঙের দেশে বলল এসে আমায় নিবি?
বহুদিন সে জড়ের সাথে শূন্যপথে ফিরতে ছিল,
শূন্যে যেথা মহাশূন্যে অনন্ত প্রাণ লুকিয়ে ছিল।
কার প্রেরণায় ঝরণাধারায় ঝরল যে প্রাণ পৃথিবীতে,
প্রাণীর জগত উঠল জেগে পাখীর কণ্ঠে কলগীতে।
ডাকছে কোকিল, গাইছে দোয়েল, গাইছে শ্যামা সুদূরকুলায়,
বাতাস এসে আকাশে তার সুরের রঙের তুলি বুলায়।
সুর সে যে গো অনন্তসুর আকাশে তার আনাগোনা,
বাতাসে সুর ছড়িয়ে পড়ে সুদূর হতে যায় যে শোনা।
সুরের পাখী সুরের পাখী রঙ দিল কে তোমার পাখার,
রঙিন হয়ে উঠল যে প্রাণ ফুটল যে ফুল শাখায় শাখায়।
আলোক ঝরা আকাশখানা করল যে তায় আবেষ্টন,
মানুষ ওগো মানুষ তোমার সেই ত শুভ জন্মক্ষণ।
মানুষ আমার মনের মানুষ ফিরছি খুঁজে তোমায় আমি,
সবার মনের একটি মানুষ সেটি সবার অন্তর্যামী।
এলো এলো মানুষ এলো সৃষ্টি হলো মধুময়,
মানুষ সাথে এই পৃথিবীর শুভদৃষ্টি বিনিময়।

সংস্কৃত ও রাষ্ট্রভাষা

অধ্যাপক শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্ত্তী

১৯৪৭ সনে দীর্ঘদিনের পরাধীনতার শৃঙ্খল-মুক্তিতে নবযুগের সূচনা হ'ল ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনে। মানুষের সর্ব্বাত্মক বিকাশের জন্য প্রয়োজন অনুকূল রাষ্ট্রব্যবস্থা। বৈদেশিক শাসক সুশাসক হলেও জীবনের কতকগুলো দিক পঙ্গু থেকে যাবেই। তাই পূর্ণ-স্বাধীনতা এবং তার মাধ্যমে অনুকূল রাষ্ট্রশক্তির আকাঙ্ক্ষাই সেদিন ধ্বনিত হয়েছিল দেশমাতৃকার মুক্তিকামী সন্তানদের কণ্ঠে। আমাদের সনাতন শাস্ত্রেও রয়েছে পূর্ণ-স্বাধীনতা রক্ষার নির্দ্দেশ। দেশের বিপদে সংগ্রামবৃত্তিধারী ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করবার জন্য তপশ্চরণকারী ব্রাহ্মণদের পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমনকি, পরাধীন দেশে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মকর্ম্মাদি নিষ্ফল হবে বলে বলা হয়েছে।

এইভাবে যে স্বাধীনতার কথা উল্লিখিত হয়েছে, তা অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ। কেবলমাত্র, স্বকীয় রাষ্ট্রের অধীনতাই স্বাধীনতা নয়। স্বাধীনতার দুটো দিক—সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিক। বর্ত্তমানে আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা এসেছে। কিন্তু, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা এখনো আসে নি। সংস্কৃতি মানুষের সমষ্টিগত সামগ্রিক জীবনকে ধরে রাখে এবং বিভিন্নভাবে করে তার বৈচিত্র্যময় বিকাশ ও প্রকাশ। অন্তরজীবন নিয়েই সংস্কৃতির কাজ। জাতির অন্তরঙ্গ জীবনকে সংস্কৃত করে সুন্দর করে তোলাই হ'ল সংস্কৃতির লক্ষ্য। অন্তরজীবনের স্বাধীনতা তথা সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা যদি না আসে তবে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাও বেশীদিন স্থায়ী হয় না। তাই, জাতিকে আত্মস্থ হতে হলে, পূর্ণ-স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে হলে সর্ব্বাগ্রে সাংস্কৃতিক দাসত্ব (cultural slavery) হতে মুক্ত হতে হবে। তখনই মানুষ কবিকণ্ঠে বলতে পারবে—

"মনের শিকল ছিঁড়েছি, পড়েছে হাতের শিকলে টান।"

তাই, আজকে জাতির সর্ব্বাত্মক বিকাশের কথা ভাবতে হলে এবং তার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকেও স্থায়ী রূপ দিতে গেলে আমাদের প্রয়োজন চিন্তা এবং চর্য্যায় কতগুলো বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন। ১৯৪৯ সনের ২৬শে নভেম্বর নব সংবিধানের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নবীন ভারত কল্যাণগর্ভ অগ্রগতির পথে সুরু করেছে তার নতুন যাত্রা। ফলে, দিকে দিকে দেখা যাচ্ছে নব নব রূপান্তর। পুরাণো দিনের অনেক কিছুই নির্ম্মোকের মত পরিত্যাগ করে জাতি গ্রহণ করেছে নূতন উত্তরীয়। তারই অনুবর্ত্তনে রাষ্ট্রভাষা পরিবর্ত্তনের কথাও উঠেছে এবং এই নিয়ে জেগেছে নানা জটিলতা। দীর্ঘদিন ধরে ইংরেজী ভারতের রাষ্ট্রভাষারূপে প্রচলিত থাকায় স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর কোন ভারতীয় ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করার কথা সবাই ভাবছেন। তাই, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে শাসকগণ একরকম রাতারাতি হিন্দীকেই রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণের নির্দ্দেশ দেন। কেউ কেউ এর পেছনে দেখছেন অপর ভাষাভাষী-দের সর্ব্বপ্রকারে বঞ্চিত করে বিশেষ এক ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর সর্ব্বাধিপত্যবিস্তারের দুর্বুদ্ধিপ্রসূত দুরভিসন্ধি। ফলে, বিভিন্ন প্রদেশে আত্মরক্ষার তাগিদে হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ধূমায়িত হচ্ছে প্রবল অসন্তোষ। রাজ্যপুনর্গঠনের ব্যাপারে কোথাও কোথাও সেই প্রধূমিত ক্ষোভ রূপান্তরে লেলিহান শিখা বিস্তার করে দিগদাহী বহ্নির রূপ ধারণ করেছে; বিশাল ভারতের অখণ্ড যোগ-সূত্রকে ধ্বংস করতে হয়েছে উদ্যত। মানুষের মধ্যে যখন সঙ্কীর্ণ ভেদবুদ্ধি জেগে উঠে, তখন সকল কল্যাণবুদ্ধিকে বিসর্জ্জন দিয়ে সে ছিন্নমস্তার ভূমিকায় করে অভিনয়। বিভেদের বিষবাষ্পে মনের আকাশ আচ্ছন্ন থাকায় সে হারিয়ে ফেলে স্বচ্ছ দৃষ্টি। তাই, দেখেছি ভেদবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত মানুষের দানবীয় উন্মত্ততার যূপকাষ্ঠে ভারতকল্যাণের বলিদান—অগণিত মানুষের দুঃখ-দুর্গতির কারণস্বরূপ খণ্ড ভারতের প্রতিষ্ঠা। আজকে, আবার যদি ভেদ-বুদ্ধির রন্ধ্রপথে সর্ব্বনাশের শনি ভারতের ভাগ্য-জীবনে প্রবেশ করে, তা হলে অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর বুকে আমাদের অস্তিত্ব-রক্ষা দুষ্কর হয়ে উঠবে। তাই, আজ সর্ব্বভারতীয় রাষ্ট্রভাষা স্থিরী-করণে প্রয়োজন বিশেষ বিবেচনা, সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি এবং অনাবিল কল্যাণবুদ্ধি। নিখিল ভারতের সামগ্রিক সাধনা ও চেতনাকে প্রকাশ করা, সকল ভাষাভাষী জনগণের সমভাবে উন্নতির সহায়তা করা এবং নিখিল ভারতের প্রদেশগুলিকে পরস্পর এক যোগসূত্রে বন্ধন করে তোলাই হবে রাষ্ট্রভাষার প্রধান লক্ষ্য। উপলক্ষ্য থাকবে অবশ্য আরো অনেক। কিন্তু, হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষারূপে স্থিরীকরণে এই সব কথা ভাবা হয় নি। ভাবাবেগই লাভ করেছে প্রাধান্য। ফলে, তার প্রতিবাদে প্রচলিত ইংরেজীকেই রক্ষা করার জন্য অনেকে আবার উঠে পড়ে লেগেছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত ভাষা কমিশনের বহুমত রিপোর্টে দেখি ভাষাচার্য্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ডক্টর পি. সুব্বারায়ণ আপাততঃ প্রচলিত ইংরেজী ব্যবস্থাকে রক্ষায় পক্ষপাতী। হিন্দীর প্রতিবাদ করতে গিয়ে ইংরেজীর ওপর অতিরিক্ত জোর দেওয়ায় ভারতীয় ভাষা-সমূহের স্বাধিকার রক্ষার কথাও তাঁরা বিস্মৃত হয়েছেন। একদিকে হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ, অপরদিকে নতুন ইংরেজী মোহ, এর কোন্‌টি কল্যাণকর অথবা অন্য কোন্‌ ভাষা এই বিষয়ে যথোপযুক্ত—এইটি বিশেষভাবে বিবেচনার দিন আজ এসেছে। সংস্কারমুক্ত মন এবং

উদার দৃষ্টিতে পর্য্যালোচনা করে স্থির করতে হবে নতুন সিদ্ধান্ত। ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে সুষ্ঠু বিচারে দেখা যায় সংস্কৃতই নিখিল ভারতের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার সর্ব্বাধিক যোগ্যতা দাবি করে।

ভারতীয় সংবিধানে প্রতিটি নাগরিকের ব্যক্তিসত্তার প্রতি মর্য্যাদা জানিয়ে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তারই অনুবর্ত্তনে যে ১৪টি ভাষাকে ভারতের আঞ্চলিক ভাষারূপে সংবিধানের ৮ম শেডিউলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে—আসামী, বাংলা, গুজরাটী, হিন্দী, কান্নাড়া, কাশ্মীরী, মালয়ালম, মারাঠী, উড়িয়া, পঞ্জাবী, সংস্কৃত, তামিল, তেলেগু ও উর্দু।

এখানে আমরা দেখি, কেবলমাত্রই সংস্কৃতই কোন অঞ্চল বিশেষের ভাষা নয়। তবু একে স্বীকৃতি দেওয়ার কারণ বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ এবং গভীর বিবেচনাপ্রসূত। অঞ্চলবিশেষের ভাষা না হয়েও একমাত্র সর্ব্বভারতীয় ভাষারূপে এর স্থান অনস্বীকার্য্য। বহুদিনের সাংস্কৃতিক দাস মনোভাবের জন্য এর পূর্ণ মর্য্যাদাদানে কুণ্ঠিত হয়েও একে অস্বীকার করলে একদিন নিজেদের অস্তিত্বও বিচলিত হতে পারে বুঝে আংশিক সুবুদ্ধিতে আঞ্চলিক ভাষারূপে হলেও এর স্বীকৃতি না দিয়ে পারেন নি সংবিধান-প্রণেতৃগণ। হাজার হোক, ভারতের মানসিকতায় গীতার বাণী অজ্ঞাতসারে হলেও কাজ করে চলেছে—

"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।"

পৃথিবীর অন্যান্য সংযুক্তরাষ্ট্রের সরকারী ভাষা সর্ব্বত্র একরকম নয়। একই ভাষাভাষী রাজ্যসমূহের সংযুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রভাষা বিষয়ে কোন জটিলতা নেই। কিন্তু, বিভিন্ন ভাষাভাষী রাজ্যসমূহের সংযুক্তরাষ্ট্রে কোথাও একটি, কোথাও বা একাধিক ভাষা রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃত হয়েছে। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ এবং আমেরিকায় শুধু ইংরেজী, কানাডায় ইংরেজী এবং ফরাসী দুইই সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃত। সুইজারল্যাণ্ডে তিনটি ভাষা গৃহীত। যুগোশ্লাভিয়া ও সোভিয়েট দেশে ত আছেই। তবে এই ভাষাগুলি পরস্পর ভগ্নী স্থানীয় এবং সমপরিণত। মনে রাখতে হবে, সংস্কৃতের মত একটি অতিপরিণত এবং তাদের সমস্ত ভাষার জননীস্থানীয় ও সামগ্রিক সংস্কৃতির ধাত্রীস্বরূপা কোন ভাষা সেখানে বর্ত্তমানে প্রচলিত নেই। তাই, তাদের বাধ্য হয়ে বর্ত্তমানে ঐ পন্থা অবলম্বন করতে হয়েছে।

গ্রীক-ল্যাটিনের সঙ্গে সংস্কৃত একই গোত্রীয় এবং গ্রীক-ল্যাটিনকে বাস্তবজীবনে অত্যধিকভাবে গ্রহণ না করেও যেমন সেই সব দেশ এগিয়ে চলেছে, আমরাও সংস্কৃতকে ছেড়ে পারব না কেন, বলতে চান কেউ কেউ। তবে তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই গ্রীক এবং ল্যাটিন যে স্তরে রয়েছে, সংস্কৃত সেই স্তরে নেই। ভাষা হিসেবে এটি আরো পরিণত এবং সমৃদ্ধ। এই সম্বন্ধে কয়েক জন বিশ্ববন্দিত ভাষাবৈজ্ঞানিক ও মনীষীর সুগভীর গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত বিবেচনা করে দেখলে আমাদের ধারণা কতকটা বদলাতে পারে।

স্যার উইলিয়াম জোন্স :—

"It is of a wonderful structure more perfect than Greek, more copius than Latin, more exquisitely refined than either. Whenever, we direct our attention to the Sanskrit literature, the notion of infinity presents itself. Surely, the longest life would not suffice for a single perusal of works that rise and swell protuberant like the Himalayas, above the bulkiest compositions of every land beyond the confines of Iudia."

অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার :—

"Sanskrit is the greatest language in the world, the most wonderful and the perfect. It is difficult to give an idea of the enormous extent and variety of the literature. The achievements of grammatical analysis are still unsurpassed in the grammatical literature of any country."

অধ্যাপক বপ :—

"Sanskrit was at one time the only language of the world."

ডক্টর ম্যাকডোনেল :—

"Since the renaissance there has been no event of such worldwide significance in the history of culture as the discovery of Sanskrit literature in the later part of the 18th century.

যাঁরা স্বদেশীয় সংস্কৃতি এবং তার চাবিকাঠি সংস্কৃতভাষা সম্বন্ধে অজ্ঞ কিংবা প্রত্যক্ষভাবে না জেনেও জানেন বলে মনে করে অশিক্ষিত পটুত্ব প্রদর্শন করেন এবং বিলেতের রঙীন চশমার মধ্য দিয়ে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে স্বদেশীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি-ভাষাকে বিচার করেন, তাঁদের অবগতির জন্যই এই সব বহুমানিত পাশ্চাত্ত্য মনীষীর কথাই উল্লেখ করা হ'ল।

এ ছাড়াও গ্রীক এবং ল্যাটিন ভাষায় এখন নতুন সৃষ্টি আর হচ্ছে না। কিন্তু সংস্কৃতে নিত্য-নতুন গ্রন্থরচনা অব্যাহতভাবেই চলেছে। রাষ্ট্রশক্তির এবং তথাকথিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অবহেলা এবং প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সুরভাষার মন্দাকিনীধারা মানব-মনীষাকে সুজলা-সুফলা করে প্রবাহিত হচ্ছে এখনো। অন্ততঃ বিশ কোটি ভারতীয় নিত্য এই ভাষা আশ্রয় করে তাঁদের আধ্যাত্মিক জীবনের পথে এগিয়ে চলেছেন, দৈনন্দিন জীবনে জন্ম-মৃত্যু-বিবাহাদি সামাজিক সংস্কার এবং পূজার্চ্চনাদি মঙ্গলানুষ্ঠান করে চলেছেন।

প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতসম্প্রদায় বহু অবজ্ঞা এবং ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও অচল-অটলভাবে এই সংস্কৃতবিদ্যার ধারাকে প্রাণপণে রক্ষা করে চলেছেন। এই বাংলা দেশেই যে অগণিত গ্রন্থ সংস্কৃতে রচিত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে একটু চক্ষুরুন্মীলন করলেই দেখা যাবে। এই বাংলা দেশেই অবিমিশ্র সংস্কৃতবিদ্যার কেবলমাত্র টোলের পরীক্ষার ছাত্র-সংখ্যাই হচ্ছে ১৯৫৬ সনে প্রায় দশ হাজার। স্কুল-কলেজের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় বৃটিশ ভারতে প্রথম স্থাপিত হ'ল, তাতে তখন স্নাতকশ্রেণী পর্য্যন্ত সংস্কৃতকে অবশ্যপাঠ্যবিষয় হিসেবে ধরা হয়েছিল। এই সঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, আর কোন ভারতীয় ভাষাকে তখন সংস্কৃতের মত উচ্চশিক্ষার উপযোগী মনে না করায় ঐরকম মর্য্যাদা বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষায় স্বীকৃত হয় নি। পরে যখন বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, শরচ্চন্দ্রের অবদানে বাংলাভাষা সমৃদ্ধ হ'ল, তখন কর্ম্মবীর আশুতোষের চেষ্টায় বাংলাভাষা স্বীকৃতি পেল বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে। হিন্দী প্রভৃতি অন্যান্য ভাষা তো এখনো বাংলারই তুলনায় অনেক অপরিণত। আর, সংস্কৃতের সঙ্গে তো তুলনা চলেই না। যাই হোক্, এই সব নানা কারণে গ্রীক-ল্যাটিন যে ভাবে মৃতভাষা, সংস্কৃত তো তা মোটেই নয়। বৈজ্ঞানিক যুগে ল্যাটিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা শিক্ষার কোন প্রয়োজন আছে কিনা বিবেচনা করতে ইংলণ্ড প্রথম মহাযুদ্ধের পর লয়েড জর্জ্জ একটি কমিটি গঠন করেন। পূর্ণ প্রয়োজন রয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করেন কমিটি। ল্যাটিনের সঙ্গে তাঁদের যা সম্পর্ক, আমাদের সংস্কৃতের সঙ্গে আরো নিবিড়তর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সর্ব্ববাদীসম্মত। ইউরোপের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের গ্রীক-ল্যাটিনের প্রতি বৈরূপ্য তো নেই-ই, বরঞ্চ আছে আগ্রহ। তবু তাকে তাঁরা সংস্কৃতের মত স্থান দিতে পারছেন না। কিন্তু ভারতের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অজ্ঞতা, বিরূপতা এবং প্রতিকূলতার মধ্যেও সংস্কৃত যে এখনো স্বীয় আসনে সমাসীন আছে, এটি তার প্রাণশক্তির অনন্ত প্রাচুর্য্যের কথাই ঘোষণা করে, মৃত্যুর নয়। অন্ধ সূর্য্যকে দেখতে পায় না বলেই সূর্য্য নেই—এই কথা বলা চলে না। সীমিত দৃষ্টি এবং খণ্ড বুদ্ধির দ্বারা যাঁরা সংস্কৃতকে মৃতভাষা বলতে চান, তাঁদের কথা কতদূর গ্রাহ্য, বিচারশীল সত্যানুসন্ধানী যাঁরা, তাঁরা যুক্তিনিষ্ঠ মন নিয়ে বিচার করে দেখুন—এই অনুরোধ।

হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করার বিপক্ষের কারণগুলো বহু আলোচিত। প্রথমতঃ, অন্যভাষাভাষী জনগণের স্বার্থরক্ষা হবে না। ফলে, সকলের স্বার্থরক্ষা এবং সুযোগ দানের যে প্রতিশ্রুতি আমাদের সংবিধানে দেওয়া হয়েছে, সেটি লঙ্ঘিত হবে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে হিন্দীভাষাভাষী জনগণের একাধিপত্য হতে বাধ্য। অন্যভাষাভাষী জনগণ হবে বঞ্চিত। যে কোন আঞ্চলিক ভাষাকে বহুভাষাভাষী ভারতের রাষ্ট্রভাষা করতে গেলে এই সমস্যা জেগে উঠবেই। হিন্দী করলে যেমন কেউ কেউ বঞ্চিত হচ্ছে, বাংলা করলেও আবার অনেকে বঞ্চিত হবে, মালয়ালম করলেও হবে তাই। একমাত্র কোন সর্ব্বভারতীয় ভাষাই এই সমস্যার সমাধান করতে পারে সুষ্ঠুভাবে।

তা ছাড়া হিন্দী ভাষা এখনও অত্যন্ত অপরিণত। প্রশাসনিক সমস্ত কাজ এই ভাষার মাধ্যমে চালাতে গেলে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। বিভিন্ন বিষয়ের পরিভাষা তৈরী করতে গিয়ে এই অসুবিধা পদে পদে দেখা যাচ্ছে। তাই, সংস্কৃত হতে অজস্র তৎসম শব্দ সব গ্রহণ করতে হচ্ছে। এই সত্য উপলব্ধি করাতেই প্রধানতঃ সংস্কৃতের সাহায্যেই হিন্দী ভাষাকে প্রশাসনিক ব্যবহারের উপযুক্ত করে তোলার জন্য ভারতীয় সংবিধানে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে :

"It shall be the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language, to devolop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India and to secure its enrichment by assimilating without interfering its genius, the forms, style and expressions ... by drawing, whenever necessary or desirable, for its vocabulary, primarily on Sanskrit and secondarily on other languages." (The Constitution of India, p. 170, para 351)

এই ভাষাকে কার্য্যোপযোগী করতে সময় এবং অর্থের অপচয় অবশ্যম্ভাবী। অন্য যে কোন আঞ্চলিক ভাষার পক্ষেও এই অসুবিধা দেখা দেবে। প্রায় সমস্ত ভাষার মাতৃস্থানীয় এবং সর্ব্বাধিক পরিণত ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করলে এই সব অসুবিধার কোনটিই থাকে না।

হিন্দী কিংবা কোন আঞ্চলিক ভাষা রাষ্ট্রভাষারূপে গৃহীত হলে কেবল সেই ভাষার উন্নতিসাধনেই সরকারী উৎসাহ এবং সাহায্য প্রযুক্ত হবে। অন্যান্য ভাষাগুলো হবে অনাদৃত। হিন্দী প্রভৃতি ভাষাগুলি ভগ্নীস্থানীয়া বলে একের উন্নতিতে অপরের কোন লাভ নেই। ভারতের বিচিত্র সংস্কৃতির বাহন হিসাবে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার আত্মবিকাশের পথে সাহায্য করা সরকারের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। সংস্কৃতের প্রতি অজ্ঞতা ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে শক্তিহীন করে তুলছে। যাঁরাই আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে বিভিন্ন দিকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁরা সংস্কৃতের অনন্ত রত্নভাণ্ডার থেকে মণি-মাণিক্য করেছেন আহরণ। মাতার স্বাস্থ্য ভাল থাকলে স্তন্যপায়ী সন্তানও ভাল থাকবে এই প্রাকৃতিক নিয়ম। তাই, উৎসস্থানীয় সংস্কৃত ভাষার প্রচার এবং প্রসারে সরকারী সক্রিয় উৎসাহ পাওয়া গেলে, তার দ্বারা পরম্পরাক্রমে আঞ্চলিক ভাষাসমূহও হবে সমুন্নত। হিন্দী ভাষার একমাত্র উল্লেখযোগ্য অতুলনীয় গ্রন্থ তুলসীদাসের "রাম-চরিত-মানস" সংস্কৃত রামায়ণের শুধু ঘটনা নয়, ভাষাকেও বহুলভাবে গ্রহণ করেছে বলেই এত হৃদয়গ্রাহী। এক বাংলা ভাষার

নিশ্মাতৃগণের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে এই সত্য উপলব্ধি করা যায়। বৈষ্ণব সাহিত্য এবং মধ্যযুগের অন্যান্য সাহিত্য ছেড়ে দিয়ে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেই দেখি না কেন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ভূদেব, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর, হরপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি যুগন্ধর বঙ্গ-সাহিত্যরথীগণের অপরিমেয় সংস্কৃত-জ্ঞান তাঁদের প্রতিভাকে সৃজনশীল করে তুলেছিল। কেবলমাত্র বিষয়বস্তু নয়, শব্দ, অলঙ্কার, আদর্শ এবং সাহিত্যিক কলা-কৌশলও কি করে তাঁরা সংস্কৃত হতে নিয়ে আত্মস্থ করে মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করে তুললেন, এ এক গবেষণার বিষয়। বিশেষ কি, বর্তমান বাংলা-সাহিত্যের অবিসংবাদিত সাহিত্যগুরু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি রচনা বিশ্লেষণ করলে এর পরিচয় মেলে। তাই তিনি নিজে বাংলা-শিক্ষার্থীদের প্রথমে সংস্কৃত শিখতে উপদেশ দিতেন এবং শান্তিনিকেতনে প্রথমের দিকে নিজেই সংস্কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়াতেন ছাত্রদের। সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ শিক্ষককে বাংলা পড়াতে দিতেন না। তাঁর প্রথম যুগের সংগৃহীত শিক্ষকমণ্ডলী মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী, আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী, পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, ভূপেন সান্যাল প্রভৃতি প্রায় সকলেই সংস্কৃতাশ্রিত বিদ্যায় ছিলেন পারংগত। বহুদিন পূর্ব্বে একবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতকে আবশ্যিক-এর পরিবর্তে ঐচ্ছিক করার সিদ্ধান্ত করা হলে তিনিই তার প্রতিবাদে আন্দোলন করে অসাধু সঙ্কল্প পরিত্যাগ করতে বিশ্ববিদ্যালয়কে বাধ্য করেন। বিশেষ কি, যেখানে সর্বভারতীয় জাতীয়তার প্রশ্ন তিনি দেখেছেন, সেখানে নির্বিচারেই তিনি সংস্কৃতকে করেছেন গ্রহণ। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হতে তাঁকে যখন সম্মানাত্মক "ডি-লিট" উপাধি দেওয়া হয়, তিনি সেই সমাবর্তন-সভায় তাঁর উত্তর দান করেন বাংলায় নয়, হিন্দীতে নয়, ইংরেজীতে নয়, একমাত্র সর্ব্বভারতীয় জাতীয় ভাষা সংস্কৃতে। চীনদেশ হতে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল শান্তিনিকেতনে এসে তাঁদের সংস্কৃতির বাহন চীনা ভাষাতেই ভাষণাদি দেবেন বলায়, রবীন্দ্রনাথও সেই সমস্ত সভা পরিচালন করলেন ভারতীয় সংস্কৃতির বাহন সংস্কৃত ভাষায়। আজ তিনিও নেই, দেশেরও দুর্দ্দিন। ১৩০৯ বঙ্গাব্দের নববর্ষে রবীন্দ্রনাথ যে কথাগুলি বলেছিলেন, আজকের জাতীয়তাবিহীন আন্তর্জাতিকতার দিনে সেগুলি আরও বেশী করে স্মরণ করা প্রয়োজন—

"দারিদ্র্যের যে কঠিন বল, মৌনের যে স্তম্ভিত আবেগ, নিষ্ঠার যে কঠোর শান্তি, এবং বৈরাগ্যের যে উদার গাম্ভীর্য্য, তাহা আমরা কয়েকজন শিক্ষাচঞ্চল যুবক বিলাসে, অবিশ্বাসে, অনাচারে, অনুকরণে এখনও ভারতবর্ষ হইতে দূর করিয়া দিতে পারি নাই। শান্তির মর্ম্মগত এই বিপুল শক্তিকে অনুভব করিতে হইবে, স্তব্ধতার আধারভূত এই প্রকাণ্ড কাঠিন্যকে জানিতে হইবে। আমরা আজ যাহাকে অবজ্ঞা করিয়া চাহিয়া দেখিতেছি না, জানিতে পারিতেছি না, ইংরেজী স্কুলের বাতায়নে বসিয়া যাহার সজ্জাহীন আভাসমাত্র চোখে পড়িতেই লাল হইয়া মুখ ফিরাইতেছি, তাহাই সনাতন বৃহৎ ভারতবর্ষ, তাহা আমাদের বাগ্মীদের বিলাতী পটহতালে সভায় সভায় নৃত্য করিয়া বেড়ায় না—তাহা আমাদের নদীতীরে রুদ্ররৌদ্রবিকীর্ণ বিস্তীর্ণ ধূসর প্রান্তরের মধ্যে কৌপীনবস্ত্র পরিয়া তৃণাসনে একাকী মৌন বসিয়া আছে। তাহা বলিষ্ঠ ভীষণ, দারুণ সহিষ্ণু, উপবাস-ব্রতধারী। তাহার কৃশপঞ্জরের অভ্যন্তরে প্রাচীন তপোবনের অমৃত-অশোক-অভয় হোমাগ্নি এখনও জ্বলিতেছে। আর আজিকার দিনের বহু আড়ম্বর, আস্ফালন, করতালি, মিথ্যাবাক্য, যাহা আমাদের স্বরচিত, যাহাকে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা একমাত্র সত্য, একমাত্র বৃহৎ বলিয়া মনে করিতেছি, যাহা মুখর, যাহা চঞ্চল, যাহা উদ্বেলিত পশ্চিম সমুদ্রের উদ্গীর্ণ ফেনরাশি—তাহা, যদি কখনও ঝড় আসে উড়িয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবে। তখন দেখিব ঐ অবিচলিত-শক্তি সন্ন্যাসীর দীপ্ত চক্ষু দুর্যোগের মধ্যে জ্বলিতেছে; তাহার পিঙ্গল জটাজুট ঝঞ্ঝার মধ্যে কম্পিত হইতেছে। যখন ঝড়ের গর্জ্জনে অতি বিশুদ্ধ উচ্চারণের ইংরেজী বক্তৃতা আর শুনা যাইবে না, তখন ঐ সন্ন্যাসীর কঠিন দক্ষিণ বাহুর লৌহবলয়ের সঙ্গে তাহার লৌহদণ্ডের ঘর্ষণঝঙ্কার সমস্ত মেঘমন্দ্রের উপর শব্দিত হইয়া উঠিবে। এই সঙ্গহীন নিভৃতবাসী ভারতবর্ষকে আমরা জানিব; যাহা স্তব্ধ তাহাকে উপেক্ষা করিব না, যাহা মৌন তাহাকে অবিশ্বাস করিব না, যাহা বিদেশের বিপুল বিলাস-সামগ্রীকে ভ্রূক্ষেপের দ্বারা অবজ্ঞা করে, তাহাকে দরিদ্র বলিয়া উপেক্ষা করিব না; করজোড়ে তাহার সম্মুখে আসিয়া উপবেশন করিব, এবং নিঃশব্দে তাহার পদধূলি মাথায় তুলিয়া স্তব্ধভাবে গৃহে আসিয়া চিন্তা করিব।…অদ্যকার নববর্ষে আমরা ভারতবর্ষের চিরপুরাতন হইতেই আমাদের নবীনতা গ্রহণ করিব; সায়াহ্নে যখন বিশ্রামের ঘণ্টা বাজিবে তখনও তাহা ঝরিয়া পড়িবে না; তখন সেই অম্লান গৌরবমাল্যখানি আশীর্ব্বাদের সহিত পুত্রের ললাটে বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে নির্ভয়চিত্তে সবল হৃদয়ে বিজয়ের পথে প্রেরণ করিব। জয় হইবে, ভারতবর্ষেরই জয় হইবে। যে ভারত প্রাচীন, যাহা প্রচ্ছন্ন, যাহা বৃহৎ, যাহা উদার, যাহা নির্ব্বাক, তাহারই জয় হইবে। আমরা যাহারা অবিশ্বাস করিতেছি, মিথ্যা কহিতেছি, আস্ফালন করিতেছি, আমরা বর্ষে বর্ষে—

মিলি মিলি যাওব সাগরলহরী সমানা।"

আজ কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথ এবং ভারতীয় সংস্কৃতির নাম ভাঙিয়ে বিশ্বের দুয়ারে আমরা মান ভিক্ষা করতে যাই। কিন্তু, নিজেদের রাষ্ট্রীয় জীবনে সেই রবীন্দ্রনাথের নির্দ্দেশ এবং ভারতীয় সংস্কৃতির একমাত্র বাহন সংস্কৃত ভাষাকে করি অনাদর এবং অবজ্ঞা।

বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলিতে "মহাভারত" উপহার দিয়ে সাংস্কৃতিক মিলনের যোগসূত্র রচনা করে চলেছি। কিন্তু ভারতের শতকরা কয়জন লোককে মহাভারত পড়ার মত সংস্কৃত জ্ঞান অর্জ্জন করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, ভাববার বিষয়। এক সময় এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ভারতের সংস্কৃতাশ্রিত সংস্কৃতিতে দীক্ষিত হয়েছিল বলেই বৃহত্তর ভারত এবং দ্বীপময় ভারত গড়ে উঠেছিল। সেই পুরাণো প্রেমবন্ধনের কথা বলেই আজও আবার বিভিন্ন রাষ্ট্রের

সঙ্গে আমরা মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হতে চলেছি; কিন্তু তার বাহন সংস্কৃতকে করি অবহেলা। এইভাবে সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা না করায় আমাদের জীবনে ও বাণীতে, চিন্তা এবং চর্য্যায় দেখা দিয়েছে বিরাট ব্যবধান। এই ব্যবধান দূর করতে না পারলে তাসের ঘরের মত এই বিশাল ভারতের উন্নতির প্রাসাদ একদিন ভেঙে পড়বে, মিথ্যে আত্মপ্রসাদ ডেকে আনবে ধ্বংস। তীব্র জাতীয়তাবোধের দৃঢ় ভিত্তির ওপর রাষ্ট্রের বনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত না হলে, দীর্ঘদিন স্থায়িত্ব লাভ করে না সেই রাষ্ট্র। এই ভাবে নিখিল ভারতের সমস্ত আঞ্চলিক ভাষাগুলির সমভাবে উন্নতি, জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্বের দরবারে নিজেদের পরিচয়কে সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপিত করার জন্য সংস্কৃতকেই রাষ্ট্রভাষা করা প্রয়োজন।

কোন আঞ্চলিক ভাষাই সর্ব্বভারতীয় সনাতন ভাবধারাকে যথার্থরূপে ধারণ করতে পারে নি, কেবলমাত্র অঞ্চলবিশেষের সাধনা-সংস্কৃতিকে করেছে ধারণ ও পোষণ। তাই সুদূর অতীত কাল হতেই সর্ব্বভারতীয় ক্ষেত্রে যখনই যে রাজ্য কিছু করতে গিয়েছে, তখনই অবলম্বন করেছে সংস্কৃত ভাষা। তাই দেখি কেরলের শঙ্করাচার্য্য যখন সমগ্র ভারতে তাঁর নতুন আদর্শের প্রচারে বহির্গত হলেন, তখন অবলম্বন করলেন সংস্কৃত ভাষা। ফলে, নিখিল ভারতের সাংস্কৃতিক দিগ্বিজয়ে বিজয়লক্ষ্মী তাঁকেই বরণ করে নিলেন। তখনকার ভারতবর্ষ বিভিন্ন রাজার দ্বারা শাসিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হলেও এক সংস্কৃত ভাষাই ছিল সকল দেশের সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রিক ও ধর্ম্মনৈতিক ভাষা। আচার্য্য শঙ্কর সেই সকল ভারতবাসীর একমাত্র যোগসূত্র সংস্কৃতকে অবলম্বন করেন বলেই সার্থকতা অর্জ্জনে হলেন সমর্থ। পরবর্ত্তীকালে গৌড়বঙ্গের প্রাণপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও এই সংস্কৃত ভাষাকে অবলম্বন করেই করেন তাঁর উত্তরাপথ এবং দাক্ষিণাত্য পরিক্রমা। সুরসরস্বতীর খাতেই প্রবাহিত করেন তাঁর প্রেম-প্রবাহিণীর অমিয়ধারা। এই সেদিনও ভারতের নবযুগের উদ্গাতা মহাত্মা রাজা রামমোহন মাদ্রাজে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করছেন সংস্কৃত ভাষার আশ্রয়েই। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম উদ্ভবস্থানে প্রাকৃত ভাষাতে প্রচারিত হলেও পরে সমগ্র ভারতে যখন প্রচারিত হতে গেল, তখন অবলম্বন করল সংস্কৃত ভাষাকেই। ফলে বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শন ও সাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডার গড়ে উঠল সংস্কৃতকেই অবলম্বন করে। সুতরাং নিখিল ভারতের খণ্ড সংস্কৃতিকে নয়, সামগ্রিক সংস্কৃতিকে বহন করে চলেছে যে ভাষা এবং কালের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে গেছে যার শক্তি, সেই সংস্কৃত ভাষাই ভারতের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার সর্ব্বাধিক যোগ্যতা দাবি করে। স্বাধীন ভারতবর্ষও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আদর্শ হিসেবে যে সব আদর্শ প্রকাশক বাণী সরকারী চিহ্নের সঙ্গে সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে গ্রহণ করেছে, সেগুলো পুরোপুরি সংস্কৃতই। যেমন আমাদের রাষ্ট্রচিহ্ন অশোকচক্রের নীচেই সন্নিবেশিত করা হয়েছে সংস্কৃত "সত্যমেব জয়তে", ভারতীয় বেতার কেন্দ্রে গৃহীত হয়েছে সংস্কৃত বাণী—"বহুজনসুখায় বহুজনহিতায়", ভারতীয় বিমান পরিবহনে গৃহীত হয়েছে—"যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।" এইভাবে সর্ব্বভারতীয় ক্ষেত্রে সংস্কৃতকে গ্রহণ না করে পারেন নি বর্ত্তমান সরকারও। তাই সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করলে সেই সর্ব্বভারতীয় সামগ্রিক দৃষ্টিকে কার্য্যক্ষেত্রে সার্থক করে তোলা হবে; বিশাল ভারতের বিভিন্ন বৈচিত্র্যের মধ্যে রক্ষিত হবে পরম ঐক্য, যা কোন আঞ্চলিক ভাষায় একেবারে অসম্ভব।

ভারতের সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই স্নাতকোত্তর মান পর্য্যন্ত সংস্কৃত-শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু হিন্দী কিংবা অন্য কোন আঞ্চলিক ভাষা স্বকীয় অঞ্চল ছাড়া অন্যত্র বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষায় সর্ব্বোচ্চ মান পর্য্যন্ত শিক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেই। তাই যদি সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করা হয়, তবে জনসাধারণকে অতি সহজেই এই ভাষায় শিক্ষিত করে তোলা যাবে।

সংস্কৃত ভাষা শাশ্বত সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতির ধারণ, বহন ও পোষণ করে আসছে অনাদি কাল হতে। স্বাধীন ভারতবর্ষ তার ঐতিহ্যকে জানুক এবং তারই পাথেয় নিয়ে ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে চলুক—এই তো কাম্য। বর্ত্তমানের উন্নতির মর্ম্মমূল প্রোথিত রয়েছে অতীতের বুকে। তাই কবির কথায়ই বলি:

"চোখের সামনে ধরিয়া রাখিয়া অতীতের সেই মহা আদর্শ
জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ॥"

(দ্বিজেন্দ্রলাল)

তরুলতার মূল ছিন্ন করে দিলে, তার ফুল এবং ফল ঝরে পড়বে—এই প্রাকৃতিক নিয়ম। বিবেকানন্দ, তিলক, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথের ভারতকে ভালভাবে জানতে গেলে সংস্কৃত ভাষাই জানতে হবে প্রথম। উপনিষদ্ প্রেরণা যুগিয়েছিল রামমোহনকে; দয়ানন্দ বেদের ভিত্তিতে ভারত পুনর্গঠন করতে চেয়েছিলেন; শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ এবং গুরুকুলে লালা মুন্সীরাম প্রাচীন সংস্কৃত বিদ্যায়তনের আদর্শকেই করেছেন গ্রহণ। তিলক, অরবিন্দ, গান্ধীজী, এঁদের সকলেরই রাজনৈতিক প্রেরণার উৎস সংস্কৃত শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা। বাংলার অগ্নি-শিশু ক্ষুদিরাম, কানাইলাল এই সংস্কৃত গীতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং মৃত্যুকে জয় করার সাধনায় হয়েছিলেন সিদ্ধ। নেতাজী সুভাষচন্দ্রেরও নৈতিক জীবন গড়ে উঠেছিল সংস্কৃতগীতা প্রভৃতি গ্রন্থের আদর্শের ভিত্তিতে। বেদান্তকেশরী স্বামী বিবেকানন্দ দেশ-বিদেশে সংস্কৃত দর্শন-বেদান্তের মহিমা প্রচার করেছিলেন এবং দেশে বৈদিক শিক্ষার প্রচলনে করেছিলেন আকাঙ্ক্ষা।

সংস্কৃত বিশ্বভাষাসমূহের অন্যতম। সংস্কৃতভাষা এবং তদাশ্রিত সংস্কৃতির জন্যই ভারতের আন্তর্জ্জাতিক সম্মান ও গৌরব। যদি অপেক্ষাকৃত অনুন্নত হিন্দী বা কোন আঞ্চলিক ভাষা বা ইংরেজী রাষ্ট্রভাষা হয়, তবে জাতিসঙ্ঘে ভারতের যথোপযুক্ত রাষ্ট্রভাষার অভাব প্রকট হয়ে উঠবে। ফলে, ভারতের মর্য্যাদাহানি ঘটবে নিশ্চয়ই। সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা হলে সেই সম্মান শুধু অক্ষুন্নই থাকবে

না, পরিবর্দ্ধিতও হবে বলে মনে হয়। মাইকেল মধুসূদনের সংস্কৃত কথোপকথনের অক্ষমতা লণ্ডনের বিশিষ্ট মনীষীর কাছে কি ভাবে নিন্দিত হয়েছিল, তা অনেকেরই জানা আছে। এখনো সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ যে-সব ভারতীয় বিদেশে যান, তাঁদের কিরকম অপদস্থ হতে হয়, ভুক্তভোগীমাত্রেই ভাল করে জানেন।

হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করায় যেমন নানা প্রদেশ হতে আপত্তি উঠছে, সকল প্রদেশের কাছে সমান সংস্কৃতকে করলে তেমনটি হবে না। রাজ্যপুনর্গঠনের ব্যাপারে কোথাও কোথাও যে অসন্তোষের বহ্নি প্রধূমিত হচ্ছে, ভস্মাচ্ছাদিত হয়ে আছে, হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করলে সেই অনল আবার সহস্র শিখায় জ্বলে উঠবে। সংস্কৃতকে করলে সেই সব প্রতপ্ত স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে শান্তিবারি। ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কৌটিল্যপ্রতিম সূক্ষ্মদর্শী নেতা কুশাগ্রধী চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন যে, "হিন্দী রাষ্ট্র-ভাষা হলে ভারত শতধা বিভক্ত হয়ে যাবে। ঐক্যবোধ বিলুপ্ত হওয়ায় হয়তো দেখা দেবে গৃহযুদ্ধ।" সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা হলে বরং বিভেদের মধ্যেই স্থাপিত হবে ঐক্য, সকল প্রদেশ এক ভাষার মাধ্যমে এক প্রেমবন্ধনে পড়বে বাঁধা। মিলনের রাগিণী সুরবাণীর বীণাতেই চিরদিন ঝঙ্কৃত হচ্ছে। সাধারণ জলশুদ্ধির মন্ত্রে পর্য্যন্ত দেখি উত্তরাপথ ও দাক্ষিণাত্যের মিলনের কথা: "গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরী জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥" রামায়ণ, মহাভারত, কিংবা ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাসকে কেউ নিজ প্রদেশীয় নয় বলে অবজ্ঞা করেন না, বরঞ্চ সাগ্রহে করেন সমাদর। নবজাত ভারতরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গস্বরূপ বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সহযোগিতা ও ঐক্য আজ বড়ই প্রয়োজন। ভারতের নিজস্ব জাতীয়তার নৈতিক ভিত্তিতে এই সর্ব্বভারতীয় অখণ্ড ঐক্যবোধ জাগ্রত করতে পারে একমাত্র সংস্কৃতভাষা। প্রাদেশিকতার মর্ম্মান্তিক দোষ হবে দূরীভূত।

মুসলমান শাসকগণ বৈদেশিক বলে সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে ফার্সীকে রাষ্ট্রভাষা করলেও সংস্কৃত চর্চ্চায় বরাবরই বিশেষ উৎসাহ দিয়ে এসেছেন। আকবর, শায়েস্তা খাঁ, শাজাহান প্রভৃতির দরবারে বহু বড় বড় সংস্কৃত কবি সমাদর পেয়েছিলেন। যিনি "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা", বলে সংস্কৃতে শ্লোক রচনা করেছিলেন সেই নব কালিদাস আকবরের সভায় ছিলেন বলে তাঁকে বলা হ'ত "আকবরীয় কালিদাস"। শ্রেষ্ঠ আলঙ্কারিক এবং কবি পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ শাজাহানের রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন। মহম্মদ শাহ সংস্কৃতে সঙ্গীতগ্রন্থ "সঙ্গীতমালিকা", শেখ ভাবন "অল্লা উপনিষদ্", খান্‌খানান্ আবদুল রহমান্ "খেটকৌতুকাদি" গ্রন্থত্রয়, আবদুল রহমান "সন্দেশরাসক" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। রাজপুত্র দারা-সুকো "সমুদ্রসঙ্গম" নামক বিখ্যাত সংস্কৃত কাব্যের রচয়িতা। তাঁরই অনূদিত উপনিষদের সুললিত ফার্সী অনুবাদ ওলন্দাজ ভাষায় অনূদিত হয়ে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে এবং শোপেনহাওয়ার প্রভৃতি দার্শনিককে করে মন্ত্রমুগ্ধ। বাঙালী মুসলমান দরাব খাঁ সংস্কৃতে গঙ্গাস্তুতি রচনা করেন। দৌলতকাজি, আলাওল প্রভৃতি সংস্কৃত-নিষ্ঠ বাংলা কবির কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। এই সেদিনের পূর্ব্ব-বাংলার ঋষিকল্প মনীষী সাহিত্যবিশারদ আবদুল করিমের সংস্কৃতপ্রীতির কথা কে না জানে? পূর্ব্ব-পাকিস্থানের ভাষা-আন্দোলনের পুরোধা এবং প্রেরণাদাতা এই অশীতিপর বৃদ্ধ সারস্বত-সেবককে দেখেছি গ্রামে গ্রামে সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করে বেড়াতে, ক্ষেপা যেমন খুঁজে ফিরছিল পরশপাথরের সন্ধানে। এই সব কারণে দেখি সংস্কৃতকে গ্রহণ করতে গিয়ে কেউ কোনদিন প্রাদেশিক কিংবা ধর্ম্মীয় ভেদবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয় নি। এই বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীতেও আফগানদের দেশে কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা অবশ্যপাঠ্যরূপে গৃহীত হয়েছে এবং তার পঠন-পাঠনও চলছে। মনীষী আলবেরুণী গজনীতে বসেই সংস্কৃত শিখছেন দেখতে পাই। সংস্কৃত সঙ্গীত "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রের মত চৈতন্য সম্পাদন করেছিল দেশপ্রেমিক সমস্ত ভারতবাসীর জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে; দেশের জন্য প্রাণোৎসর্গে করেছিল উদ্বুদ্ধ। দীর্ঘদিন ধরে মুসলমান আমলে ফার্সী এবং ইংরেজ আমলে ইংরেজী রাজভাষা হলেও সংস্কৃতচর্চ্চার প্রবাহ কখনো যায় নি হারিয়ে, শাসকের শোষণেও হয় নি শুষ্ক। অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত এখনো প্রবাহিত হয়ে চলেছে ভারতীয় মননভূমির অভ্যন্তরে।

মেকলে যখন নব্যবঙ্গে সংস্কৃতচর্চ্চার কেন্দ্র সংস্কৃত কলেজের নানা প্রতিকূলতা করছিলেন, তখন পণ্ডিত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ শ্লোকে লণ্ডনস্থিত মনীষী উইলসনকে ব্যাধরাজ মেকলের শর হতে সংস্কৃত-বিদ্যাকেন্দ্ররূপ কুরঙ্গকে রক্ষার আবেদন জানান। তাঁর উত্তরে মহাচার্য্য উইলসন শ্লোকাকারেই আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন যে— "সংস্কৃতের প্রতি বিধাতার অসীম করুণা। তাই সর্ব্বদা বহু প্রাণীর পদাঘাতে নিষ্পিষ্ট, প্রখর সূর্য্যকিরণে দগ্ধ, ছাগাদির দ্বারা ভক্ষিত এবং কোদাল দিয়ে পরামৃষ্ট হয়েও দূর্ব্বা যেমন বেঁচে থাকে, সংস্কৃতও তেমনি সকল প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে বেঁচে থাকবে।"

"নিষ্পিষ্টাপি পরং পদাহতিশতৈঃ শশ্বদ বহুপ্রাণিনাং
সন্তপ্তাপি করৈঃ সহস্রকিরণেনাগ্নিস্ফুলিংগোপমৈঃ।
ছাগাদ্যৈশ্চ বিচর্বিতাঽপি সততং মৃষ্টাঽপি কুদ্দালকৈঃ
দূর্বা ন ম্রিয়তে কৃশাঽপি নিতরাং ধাতুর্দয়া দুর্বলে॥" (উইলসন)

সুদূর অতীত কাল হতেই বৃহত্তর ভারতে এবং নিখিল বিশ্বে সংস্কৃতকে অবলম্বন করেই ভারতের সাংস্কৃতিক অভিযান চলেছে। ঐতিহাসিক সত্য এই যে, অন্ততঃ তিন হাজার বছরের ওপর সংস্কৃতই ভারতীয় মনীষার একমাত্র ভাষা ছিল। তক্ষশীলা, নালন্দা, বিক্রমশীলার সর্ব্ববিদ্যায়তনে বিভিন্ন দেশের জ্ঞানভিক্ষু বিদ্যার্থীর দল এই সংস্কৃতেই করতেন নানা বিদ্যার চর্চ্চা। খ্রীষ্টপূর্ব্ব দুইশত বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত ভিলসার কাছে এক গরুড়স্তম্ভ ও শিলালিপি পাওয়া গেছে। হেলিওডোরস নামক গ্রীক রাজদূত ভগবান বাসুদেবের উদ্দেশ্যে সেটি উৎসর্গ করেছিলেন এবং তার ভাষাও সংস্কৃত। বাংলাভাষার সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থ "চর্য্যাচার্যবিনিশ্চয়ে"রও

টীকা সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত। অধিক-প্রচলিত ভাষাতেই টীকা-টিপ্পনী রচিত হওয়া স্বাভাবিক। হিন্দী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষায় এই বিরাট ঐতিহ্য ও অফুরন্ত সম্পদ নেই বললেই চলে। আজও বিশ্বের দরবারে মর্য্যাদা পেতে হলে সংস্কৃতকেই রাষ্ট্রভাষা করা একান্ত প্রয়োজন।

সর্ব্বভারতীয় ভাষারূপে বর্ত্তমানে সংস্কৃত এবং ইংরেজীকেই আমরা দেখতে পাই। নিজেদের সংস্কৃতের মত সমুন্নত ভাষা থাকতেও স্বাধীনতার পর যদি সেই জোর করে চাপানো ইংরেজীর মোহ ত্যাগ করতে না পারি, তবে সেটি লজ্জা এবং পরিতাপের বিষয়। ইউরোপের জার্ম্মেনী, রাশিয়া, এশিয়ার জাপান, চীন প্রভৃতি বিজ্ঞানে উন্নত দেশগুলোতে কিন্তু ইংরেজী রাষ্ট্রভাষা নয়। তবুও তাঁদের অগ্রগতি তথা আধুনিক প্রগতি কোথাও ব্যাহত হয় নি। কেউ কেউ যে ইংরেজী রাষ্ট্রভাষা না হলে আমাদের প্রগতি রুদ্ধ হয়ে যাবে বলে মনে করেন, তা নিতান্ত অযৌক্তিক বলেই মনে হয়।

আঞ্চলিক ভাষাগুলির সঙ্গে নিবিড় নৈকট্যের জন্য ইংরেজী থেকে আরও অল্প সময়ে এবং অল্প পরিশ্রমে সংস্কৃত শিখতে পারা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ইংরেজী এবং সংস্কৃতের পাশের হার তুলনা করে দেখলে এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করা যায়। বাংলা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই অতি শৈশবেই আমরা ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করি এবং শিক্ষাকালে সবচেয়ে বেশী জোর দেওয়া হয় ইংরেজীর ওপর, আর তা ছাড়া ভাল ইংরেজী শিক্ষার ফলে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রলোভন ত আছেই। তবু প্রতি বৎসর ইংরেজীতেই সর্ব্বাধিক ছাত্র মর্ম্মান্তিক ভাবে ফেল করে। আর সংস্কৃত অত্যন্ত অবজ্ঞার সঙ্গে দায়সারা গোছের করে ৬ষ্ঠ কিংবা ৭ম শ্রেণী হতে পাঠ করা হয়। বাড়ীতে, বিদ্যালয়ে, সমাজে এবং রাষ্ট্রে কোন উৎসাহ কিংবা বৈষয়িক উন্নতির কোন সম্ভাবনা এর নেই। তবু সংস্কৃতের শতকরা ৯০ জন ছাত্রই পাশ করে। এই ভাবে দেখি, ইংরেজী হতে অনেক সহজেই সংস্কৃত শেখা যেতে পারে; সংস্কৃত ব্যাকরণের দুরূহতা নিয়ে কেউ কেউ বলে থাকেন। তাঁদের বলতে চাই—সংস্কৃত ব্যাকরণ দুরূহ নয়, সুশৃঙ্খল বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। হিন্দী কিংবা ইংরেজীর তুলনায় অনেক সরল। ভাষার ক্ষেত্রে অবৈজ্ঞানিক বিশৃঙ্খলাই দুরূহতার কারণ। সংস্কৃতের মত শৃঙ্খলিত সুসংবদ্ধ ভাষা আর নেই। সংস্কৃত প্রচারের পরই পাশ্চাত্ত্যদেশে Philology বা ভাষাবিজ্ঞান নামক শাস্ত্রের উদ্ভব সম্ভব হ'ল। বাংলা দেশের বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অতুলনীয় কীর্ত্তি "ব্যাকরণ কৌমুদীর" জ্ঞানই সংস্কৃত পঠন-পাঠনে যথেষ্ট। ইংলণ্ড, ফরাসী, জার্ম্মেনী, হল্যাণ্ড এবং বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশে ৬ মাসে কার্য্যকরী সংস্কৃত শিখিয়ে দেওয়া হয়। আবার যাঁরা ব্যাকরণ নিয়ে গবেষণা করতে চান, তাঁদেরও বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র রয়েছে ত্রিমুনি ব্যাকরণের গহন কাননে। সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্বন্ধে Mexmuller, Hunter, Weber, Thompson প্রভৃতি কয়েকজন ভাষা-বৈজ্ঞানিক মনীষীর কথা বিবেচনা করা প্রয়োজন।

সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, শিল্পকলা, আইন, শারীরবিদ্যা প্রভৃতি জ্ঞানবৃক্ষের সকল শাখারই চর্চ্চা সংস্কৃতে হয়েছিল এবং এখনও হতে পারে এবং হচ্ছেও। হিন্দী প্রভৃতি আঞ্চলিক ভাষার এখনও সে শক্তি আসে নি।

দৈনন্দিন জীবনে কথ্যভাষা না হয়ে এবং ভারতীয় ভাষাসমূহের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন হয়েও ফার্সী ভাষা ভারতে পাঁচ শত বৎসর এবং ইংরেজী দেড়শত বৎসর রাষ্ট্রভাষারূপে এখানে প্রচলিত হওয়ায় যদি কোন অসুবিধা না হয়, তবে একান্ত সম্পর্কযুক্ত, সুপরিণত ও সুসমৃদ্ধ সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা হ'লে সুবিধা আরও বেশী হবে বলে মনে হয়। এই বাংলা দেশেই সেন আমল পর্য্যন্ত সংস্কৃতই ছিল রাষ্ট্রভাষা।

সংস্কৃতকে মৃত ভাষা বলে যাঁরা পাশ্চাত্ত্যের দুয়ারে ধর্ণা দিয়েছেন তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি পাশ্চাত্ত্য মনীষী প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাতনামা আচার্য্য Dr Louis Renou-র কথাটি—

"There is no living culture without a living tradition. If, India is beloved and cherished among the elite of the west, it is on account of her traditional culture. And this culture is embodied above all in the treasures of Sanskrit. Sanskrit and India are inseparably connected, in spite of all the transitory harangues of the politicians."

এ ছাড়া, বিহারের ভূতপূর্ব্ব রাজ্যপাল ডাঃ মাধবদাস শ্রীহরি আনে, ভূতপূর্ব্ব কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ডাঃ চিন্তামন দ্বারকানাথ দেশমুখ, সুপ্রীমকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি স্বর্গীয় ডাঃ বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষীর সুচিন্তিত অভিমত ত রয়েইছে।

পরিশেষে স্মরণ করি বাংলার স্বর্গত রাজ্যপাল, পণ্ডিত-মূর্দ্ধণ্য জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের বংশধর, রাজর্ষিকল্প মনীষী ও কুলপতিকল্প আচার্য্য ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের সুচিন্তিত কথাগুলি—

"বহু ভাষা, বহু ধর্ম্ম, বহু কৃষ্টির সমন্বয়ে গঠিত এই বিশাল ভারতবর্ষের মিলনসূত্রটি নিহিত হয়ে আছে এই বিশাল দেব-ভাষার অন্তর্দ্দেশে। মৃতভাষারূপে আখ্যাত হলেও প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতই ভারতের চিরজাগ্রত জীবন্ততম ভাষা, চিরপুরাতন অথচ চিরনবীন ভাষা। যে ভাষার অমৃত-উৎস থেকে জন্মলাভ করেছে অন্যান্য ভারতীয় প্রায় সব প্রাদেশিক ভাষা, যে ভাষার মাধ্যমে গড়ে উঠেছে নিখিল ভারতীয়, নিখিল বিশ্বব্যাপী এক সার্ব্বজনীন কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, সেই ভাষা ভারতের রাষ্ট্রভাষারূপে নামতঃ গৃহীত না হলেও কার্য্যতঃ হিন্দী, বাংলা, গুজরাতী প্রভৃতি ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাষাসমূহের জননী ও অন্তর্নিহিত শক্তিরূপে সংস্কৃতই হয়ে থাকবে ভারতের একমাত্র শাশ্বত ভাষা।"

যমুনা

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

শহরতলীর সারিবদ্ধ কুঠরীর একটি দখল করে যমনা স্বামী ও শিশু-কন্যা নিয়ে সংসার পেতেছে। সে যেদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এল, তখন সঙ্গে ছিল তার এক বছরের মেয়ে রেবা। রেবার চেহারাটা এখনও চোখে ভাসে। মেয়েটার হাত-পাগুলো সরু লিক্‌লিকে, পেটটা যেন ঢাক, মাথায় শনের নুড়ির মত দু'এক গাছা চুল, হাতে ছোট দুটো রুপোর চুড়ি। মেয়েটাকে দেখে মনে হত তার প্রাণখানা বেরুবার আর বেশী দেরী নেই। যমুনা কাজে বের হত, সঙ্গে রেবা আর একটা ছালা নিয়ে। কাজের বাড়ীতে মেয়েটাকে ছালা বিছিয়ে বসিয়ে দিত, আর দুটো মুড়ি-মুড়কি ছড়িয়ে দিয়ে কাজে লেগে যেত।

কিন্তু সেই রুগ্ন মেয়েটা তখন না মরে দিব্যি বেঁচে উঠল, শরীরে একটু একটু করে মাংস গজাল, মাথায় ইঞ্চি তিন-চারেক চুল লম্বা হল, রংটা একটু ফর্সা হতে লাগল। নাক-কাণ জন্মের বার দিন পরেই বেঁধান হয়েছিল, সেই ছেদাগুলো অলঙ্কৃত হ'ল লাল পাথর-বসানো ছোট দুটি পেতলের দুলে, আর একটা নোলকে। যমুনার সখের অন্ত নেই! ওই মেয়েটার জন্য সুন্দর ছিটের কাপড়ের ফ্রক তৈরী করে এনেছে, গলায় পরিয়েছে লাল পুতির মালা।

যমনার পর পর দু-তিনটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েই শৈশবে মরেছে, বহু তুক্‌তাক্ করে তবে এই রেবা বেঁচেছে। যমুনার নয়নের মণি রেবা, তা অন্যের কাছে সে দেখতে যতই কুৎসিত হোক।

রেবা যখন পাঁচে পা দিল, তখন যমুনার আর একটি ছেলে হ'ল। আনন্দে যমনা বাজনা আনাল। বাজনাওয়ালারা এসে তার বাড়ীর সামনে খুব সানাই-ঢোল বাজাল। যমনা বাড়ী বাড়ী নারকেল পাঠিয়ে ছেলের জন্মখবর দিল, বাজনাওয়ালারা পাড়া-পড়শীর যাদের সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠতা তাদের বাড়ীতেও পাঁচ পাঁচ মিনিট বাজিয়ে চার আনা আট আনা বক্‌শিস নিতে লাগল। তারপর অনেক দিন কেটে গেছে—

ছেলে যখন দু'মাসের হ'ল তখন এনে আমাকে দেখাল, সুন্দর সুস্থ শিশু, রং ফর্সা। আনন্দ আর গর্বের হাসিতে যমনার বসন্তের দাগওয়ালা মুখখানা ভরে উঠল। বললে, "মাতাজী, বহু কষ্টে লোকের কত তুক্‌তাক্ আর অপদেবতার হাত থেকে তবে এই ছেলেকে বাঁচিয়েছি।"

অবাক হয়ে বললাম, "সে কি রকম?"

যমনা উত্তর দিলে, "জান না বুঝি, একদল মেয়েলোক আছে তারা কারও ভাল দেখতে পারে না, নিজেদের সন্তান বাঁচে না বলে তারা পরের অনিষ্ট করতে চায়। এই ছেলের জন্মের আগে কত-দিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে বের হব কি, দেখতাম একটু গোবরের ওপর একটা লেবু দু-টুকরো করে কেটে চৌকাঠের ওপর কে রেখে গেছে।"

"তাতে কি হল?"

—"ওমা, তুমি জান না তাই বলছ কি হ'ল। ভীষণ অনর্থ হয় মা, যদি কেউ কারও অনিষ্ট করতে চায় তবে ওঝার কাছ থেকে মন্ত্র বলিয়ে লেবুটা নিয়ে আসে, আর কেটে দু-টুকরো করে দুয়োরে রেখে যায়। কেউ যদি না দেখে লেবু মাড়িয়ে দিলে বা ডিঙ্গিয়ে গেল, তবে তার বাড়ীতে কারও খুব অসুখ হবে, নয়ত কেউ মরে যাবে। কেউ কেউ শাড়ীর আঁচলের কোণা কেটে নিয়ে যাবে তাতে যার শাড়ী তার বিপদ হবে, এমনি কত কি।

"ছেলের জন্মের তিনদিন আগে আমি খুব যন্ত্রণায় ব্যথায় মরি, আমার শ্বশুর-শাশুড়ী সবাই বললে, ও ত আর কিছু নয়, কোন দুষমণে তুক্‌তাক্ করেছে, কিছুতেই সন্তানের জন্ম হবে না। তখন আমি কালীমার কাছে মানত করলাম। আমার ছোট দেওর গিয়ে ডাক্তারণী বাঈকে নিয়ে এল, দুটো সুচ লাগাল (ইনজেকসন দিল) তবে ত আমার এই ছেলের জন্ম হ'ল। এখন তোমাদের আশীর্বাদে ছেলে ছয় মাসের হয়েছে, মানত পূজো দিতে হবে, মাথা মুণ্ডন করাতে হবে।"

ছেলের কি নাম রেখেছিস?

"বিজয়।"

বললাম, "খাসা নাম হয়েছে।"

যমনা একগাল হেসে বললে, "আমার রেবা কি লক্ষ্মী হয়েছে মা, ঐ দেখ পাড়ার মেয়েরা সব খেলতে যায়, কিন্তু আমার রেবা, তার ছোট ভাইকে আগলে রাখে বসে থেকে। যতক্ষণ না ঘুমোবে সে ঝোলা দুলিয়ে ভাইকে ঘুম পাড়াবে, তারপর চাদর দিয়ে ঢেকে দরজা ভেজিয়ে তবে খেলতে যাবে। তার ভরসাতেই ত মা আমি বিজয়কে রেখে কাজে বের হই।"

"তবে তোর আর ভাবনা কি, রেবা আর একটু বড় হলেই ত তোর অর্দ্ধেক কাজ করে দেবে।"

তৃপ্তির হাসিতে মুখ ভরে উঠল, বললে, "সত্যি মা, রেবা বড় হলে আর কোন চিন্তা নেই।"

একদিন যমনা তাড়াতাড়ি এসে বললে, "মা, কাল বিজয়ের মানত-পূজো দিতে যাব এ বড় সড়কের ওপর দিয়ে, তুমি দাঁড়িয়ে দেখো।"

বিকেলে পাঁচটার সময় ঢাক-ঢোলের আওয়াজ শুনে তাড়াতাড়ি

সামনের বারান্দায় দাঁড়ালাম, দেখতে পেলাম বিচিত্র দৃশ্য! রং-বেরং-এর শাড়ী পরিহিতা পনের-বিশ জন নারী গান গাইতে গাইতে চলেছে, পেছনে বিপুল তাণ্ডবে বাজনা বাজিয়ে চলেছে একদল লোক। চারজন অল্পবয়স্কা বধূর মাথায় চারটে নূতন ঘড়াতে "ভুজরিয়া"। নবদুর্গা বা নৌরাত্রের সময়ে একটা নূতন হাঁড়ি মাটি-গোবরে ভর্ত্তি করে ঘরের ভেতরে বা অঙ্গনে এক কোণায় রেখে দেয়, রোজ স্নান করে তাতে জল ঢালে, সেই জল পেয়ে ছায়ায় ছায়ায় শ্যাম দুর্ব্বাদলের মত গমের চারা ওঠে, সেই চারা হ'ল "ভুজরিয়া"। নবদুর্গা পূজার সময় এই "ভুজরিয়া" নিয়ে যেতে হয়। নবদুর্গা পূজার এই নয় দিন যমনার শ্বশুর একবেলা খেয়ে আছে, সে আজ পূজো করবে, তার শরীরে দেবীর আবির্ভাব হবে। সে হাতে একটা ত্রিশূল নিয়ে চলেছে, দেবী শরীরে এলে নাকি সে ত্রিশূলটা গলাতে বিঁধিয়ে দেয়, এক ফোঁটা রক্তও বের হয় না।

একটা পুরুষলোক,আধ হাত তার বাবরি চুল, পরনে লাল সালু, সমস্ত কপাল কুঙ্কুমে লেপা, সে ভীষণভাবে হাত-পা ছুঁড়ছে তার নাকি শরীরে এরি মধ্যে—"দেউ" দেবতা, এসে গেছে, তার সেই তাণ্ডব নৃত্যের তালে তালে অদ্ভুত একঘেয়ে সুরে এক রকম বাজনা বাজছে। একটা লোকের হাতে ধুনুচি তাতে গন্ধক আর ধূপ খানিক পর পর ছেড়ে দিচ্ছে, আর দপ করে আগুন জ্বলে উঠে শোভাযাত্রাকে আরও রোমাঞ্চকর করে তুলছে।

সব চেয়ে আশ্চর্য্য লাগল আমাদের যমনাকে দেখে, সে একখানা রঙীন নূতন শাড়ী পরেছে, সর্ব্বাঙ্গে গয়না। সে সেই শোভাযাত্রার মধ্যে সোজা দুহাত লম্বা করে জমিতে শুয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করল, আবার দাঁড়াল, আবার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করল, এ ভাবে নাকি দেড় মাইলের চেয়েও বেশী রাস্তা সে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতে করতে দেবীর মানত পূজো দিতে যাবে।

বাদ্যভাণ্ডসহ মিছিল দূরে মিলিয়ে গেল, আমি ভাবতে লাগলাম, মানুষের সন্তান-স্নেহ কত প্রবল, এই সন্তানের জন্য মানুষ কত কষ্টই না বরণ করে!

—তার কয়েক মাস পরের কথা। তখন ঘোর গ্রীষ্ম। অসংখ্য নক্ষত্রখচিত আকাশের নীচে অন্দরের মুক্ত প্রাঙ্গণে আমাদের সারি সারি খাটিয়া পড়ে গেছে। বেশ গভীর রাত, হঠাৎ একটা কান্নার সুর কানে এল, লাফিয়ে উঠে চারদিক চেয়ে দেখতে লাগলাম, একটু দূরে যমনা বসে কাঁদছে। আমি উঠে বসেছি দেখে সে ডুকরে কেঁদে উঠে বললে, "মা আমাকে সাতটা টাকা ধার দাও আমি ভোরে চলে যাব।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "ভোরে কোথায় চলে যাচ্ছিস, কি হয়েছে তোর?"

কাঁদতে কাঁদতে যমনা বললে, "আমার ঘরওয়ালা (স্বামী) বাড়ী আসতেই আমার শাশুড়ী আর জা আমার নামে চুকলী কেটেছে, তার ফলে দেখ আমার স্বামী আমাকে কি মারটাই না মেরেছে, কাল সকালে তোমাকে সব দেখাব।"

"তোর বাপ-মায়ের কাছে গিয়ে কদিন থেকে আয় না?" সে বললে, "হায় মা, আমার মা-বাপ কোথায়? বাপ-মা অনেকদিন হয় মারা গেছে। ঝাঁসীতে আমার বাপের বাড়ী। তবে আমার এক ভাই বুরানপুরে আছে, তার কাছেই চলে যাব। আমি বড় দুঃখী, আমাকে কেউ দেখতে পারে না। তুমি হয়ত জান মা, শাশুড়ীর কত মার-বকুনি খেয়ে সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খেটে তাদের মন যোগাচ্ছি তবু আমাকে কেউ দেখতে পারে না। আর আমার ছোট জা, সে কিনা কম্পাউণ্ডের মেয়ে তাই তার আর আদরের অন্ত নেই, সে কেমন ঠমকে চলে দেখো না।"

তাকে রাত্তিরের মত সান্ত্বনা-বাক্যে বিদায় করলাম। পরদিন সকালে সে এল, বললে, "আজ আর আমি কাজে বের হব না, কি করেই বা কাজ করব? আমার হাত ফুলে গেছে"—বলে হাতের আঙ্গুলগুলো দেখালে, আর ঝর ঝর করে তার চোখে জল ঝরতে লাগল। দেখলাম সেই শ্রীহীন হাতের মোটা মোটা আঙ্গুলগুলি বেতের আঘাতে ফুলে উঠেছে। পিঠের চোলী তুলে দেখাল, অর্দ্ধেক পিঠে কালশিরা পড়ে গেছে বেত খেয়ে। বউটার বয়স খুব বেশী নয়, ত্রিশের নীচে হবে, কিন্তু যে বয়সে লোকে আমোদ-আহ্লাদ করে সে বয়সটা তার কেটেছে শুধু কঠোর তাড়না আর মারধোরের ওপর। সে কাপড়ে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

তার অবস্থা দেখে মনটা গভীর দুঃখে, রাগে ছেয়ে গেল কিন্তু এর প্রতিকারের উপায় কি? স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া, আমি কিই বা করতে পারি! যমনাকে বললাম, "তোদের দেশে ত পাট বিয়ের চল আছে, তুই ত ইচ্ছে করলে তোর স্বামীকে নোটিশ দিয়ে ছেড়ে দিয়ে পাট বিয়ে করতে পারিস।"

—সে কিছুক্ষণ নিশ্চুপে বসে রইল, তার পর বললে, "মা, আশীর্ব্বাদ কর আমার রেবা আর বিজয় বেঁচে থাক, তারা বড় হলে আর আমার কিসের দুঃখ! তবে পাট বিয়ে করব না, আর পাট বিয়ে আমাকে কেই বা করবে? আমার কি জোর আছে বল, না আছে অর্থ, না আছে মা-বাপ যে, পিছে দাঁড়িয়ে আমাকে সাহায্য করবে। আমি যদি আদালতে নালিশ করি তবে উল্টো ঘুষ দিয়ে আমার শ্বশুর-শাশুড়ী-স্বামী আমাকে জব্দ করবে। আমার ত্রিভুবনে কে আছে মা ভগবান ছাড়া?"

জিজ্ঞেস করলাম, "বুরহানপুরে গেলি না?"

সে বললে, "সেখানেই ভাই-এর কাছে যাব ভেবেছিলাম, তা আমাদের জ্ঞাতি-কুটুমরা বলতে লাগল, যাস নে কোথায়ও, আমরা পঞ্চায়েত বসিয়ে এ সবের বিচার করব, আমরা তোর সাহায্য করব।

"এদের কথায় এত ভরসা না হলেও সারারাত ভেবে দেখলাম, মানে-সম্ভ্রমে ভাইএর বাড়ীতে গেলে আলাদা কথা ছিল, কখনও ভাইয়ের বাড়ীতে যাই নি, এখন দুরবস্থায় পড়ে গেলে ভাই ফেলতে পারবে না, তবে ভাই-বৌ যদি আমল না দেয়, তার কাছে দূর দূর হেনেস্থা ভাব পাওয়ার চেয়ে নিজের ঘরই আঁকড়ে থাকব। নিজে

রোজগার করছি সারাদিন খেটে খেটে, মাইনে মন্দ পাই না, তাতেই আমার আর রেবার পেট ভরে যায়। আর শাশুড়ীর ঘরে যাব না, মরদের সঙ্গেও থাকব না", বলে যমনা চোখ মুছতে মুছতে চলে গেল।

সুন্দর প্রভাতের সমস্ত মাধুর্য্য নষ্ট হয়ে গেল, একটা ব্যথায় মনটা মুষড়ে গেল। ওর শাশুড়ীকে ডেকে অনেক বোঝালাম। শাশুড়ী আমতা আমতা করে বললে, "ওদের স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া, আমি কি করব?"

বললাম, "তোর ছেলে, তুই শাসাতে পারিস না? বউটাকে অমন নিষ্ঠুরের মত মারে!"

শাশুড়ী বললে. "বউটা বড় চোপাখোর, শুধু মুখে মুখে চোপা করে। আমার ছেলে সেদিন বউকে বললে, তুই আলাদা হেঁসেলের খরচ কেন করিস, মার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া কর, তা বউ বলে কি তোমার মা-বোনের সঙ্গে আমার পোষাবে না, আমি আলাদা থাকব। বল দিকি কেমন কথার ছিরি,"—বলে চোখে অাচল দিয়ে কাঁদতে লাগল।

বললে, 'কত কষ্টে বাড়ী বাড়ী বাসন মেজে ছেলেগুলোকে মানুষ করেছি, কোনদিন এতটুকুন আরাম করি নি, ভাল কাপড়-গয়না পরি নি। বুড়ো একদিকে খেটেছে, আমি আর একদিকে খেটেছি। রোজ দুপুরে চারদিক ঘুরে ঘুরে গোবর কুড়িয়ে শুকনো ডাল জমিয়ে রান্না করেছি। আটার রুটি দিয়েছি ছেলেদের খেতে. নিজেরা বুড়াবুড়ি খেয়েছি যোয়ারের রুটি। এত কষ্টে ছেলে মানুষ করেছি, সাধ করে বিয়ে দিয়েছি, বউকে গলার হাঁসুলী, হাতের কড়, পায়ের বেঁকি আর কত কি দিয়েছি, আর আজ কিনা সেই ছেলের বউ আমার সঙ্গে এমন ব্যাভার করে! আমার মনে লাগে না?"

শাশুড়ী বউ, দুইয়ের দুঃখের কাহিনী মনে লাগল, এই দুইয়ের প্রশ্নের জবাব কি?

পরদিন যমনাকে বললাম, "তুই শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া করিস কেন?"

যমনার চোখ দুটো ধক্ ধক্ করে জ্বলে উঠল, বললে "আমার শাশুড়ী কেমন লোক তুমি ত জান না মা, তোমার কাছে এসে ভিজে বেড়াল সেজেছে, সে অতি নিষ্ঠুর শয়তানী। আমার মা নেই, বাপ নেই, আমার মুখ চেয়ে আহা-উহু করবার কেউ নেই। বিয়ের স্বামী ছিল, দিনরাত কানে মন্ত্র দিয়ে তাকেও বিগড়িয়েছে। নইলে আমার স্বামী আগে অমন ছিল না।"

বললাম, "আচ্ছা শোন, তোর ছেলে বিজয় আছে, কত কষ্টে যত্নে মানুষ করেছিস, বড় হয়ে সে বিয়ে করে যদি বউ নিয়ে পর হয়ে যায় তবে তোর কি রকম লাগে?"

সে উত্তেজিত হয়ে বলল, "তুমি ত ভেতরের কথা জান না মা, তাই আমাকে দুষছ, শাওড়ী কি রকম খারাপ জান? আমার স্বামী পরবশ, তবু তাকে শাসন করে না। আমাকে অগ্নি সাক্ষী করে বিয়ে করে এনেছে, না দেয় আমার কাপড়-চোপড়, না দেয় আমার খাওয়ার খরচ, তাও সয়ে নিয়েছিলাম। ভগবান আমার গতর দিয়েছেন, খেটে পেট ভরব, কিন্তু স্বামীটা যে আমার ঘরে আসত তাও বন্ধ হয়েছে। ওই যে আমার সুন্দরী জা এসেছে সেই আমার সর্বনাশ করল, সে ডাইনী আমার স্বামীকে ভুলিয়ে নিয়ে পর করে দিচ্ছে।"

পরম ঘৃণাভরে বললাম, "সে কি, তোদের দেশে ভাসুরের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি চলে?"

যমনা বললে, "চলে না, আবার চলেও। শাশুড়ী বেটি জেনে-শুনেও চোখে ঠুলি দিয়ে বসেছে, নিজের ছেলেকে অসৎ পথ থেকে ফেরাতে পারে না। আমাকে কখনও বেচাল চলতে বা কারও সঙ্গে ফাজলামী-ইয়ার্কী করতে দেখেছ মা? ঘুম থেকে উঠে মুখ বুজে সারা দিন কাজ করি। সন্ধ্যে হলে আমার রেবা বিজয়কে নিয়ে ঘরের দরজায় বসে থাকি, কারও সাতেও নয় পাঁচেও নয়। জায়ের বদমায়েসী শয়তানী সহ্য করে ছিলাম, ভেবেছিলাম স্বামীও পর হয়েছে হোক, আমার রেবা আছে বিজয় আছে, কিন্তু জায়ের তাও সহ্য হচ্ছে না। মিথ্যে মিথ্যে রেবাকে গালিগালাজ করছে, আমার নামে যা-তা লাগিয়ে আমাকে মার খাওয়াচ্ছে।"

"তোর দেওর কোথায় গেল? সে কি বলে?"

"সে আর কি বলবে মা, সে ত চাকরীতে অন্যত্র থাকে, মাঝে মাঝে ঘরে আসে, আর সে ত ছেলেমানুষ। বৌটা ত দেওরের চেয়ে বয়সে বড়, পাকা শয়তান, চরিত্তর বলে কোন জিনিস নেই, তাই না এত বড় ধাড়ী মেয়ের এতদিন বিয়ে হয় নি।"

আমি অবাক হয়ে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কথাগুলো শুনছিলাম। যমনা উত্তেজিত হয়ে বললে, "আমি ছাড়ব না ছোট বউকে, আমার স্বামী কেড়ে নিয়েছে। ওর কথা সব বলে দেব পঞ্চায়েতকে। শিগগিরই পঞ্চায়েত বসবে আমার বাড়ীতে, সর্দ্দারকে দুটো টাকা দিয়ে এসেছি, সে সব জ্ঞাতি-ভাইদের ডেকে সভা বসাবার উদযোগ করছে।"

সে দিন যমনা এলে জিজ্ঞেস করলাম, "কাল রাত্তিরে নাকি তোদের ওখানে খুব হৈ-চৈ হচ্ছিল?"

সে বলল, "আমার শ্বশুরের শরীরে 'দেউ' এসেছিল। পাড়ার সব লোক জড় হয়েছে, নাচতে নাচতে শ্বশুরের শরীরের দেবতা বললে আমাকে, দেখ, তুই দোষী, তোর শ্বশুর-শাশুড়ীকে অমান্য করিস, ভাল হবে না।"

"তা আমার কি ভয় মা, সত্যি ত আমি কোন দোষ করিনি, পরমেশ্বর জানেন। আমি বললাম, দেবী আমার কি দোষ, তুমি যদি দেবী হও তবে ত সবই জান, আমার ত্রিভুবনে কেউ নেই—আমার শ্বশুর-শাশুড়ী আমাকে যন্ত্রণা দেয়, স্বামীও পর হয়ে গেছে, তুমিই এর বিচার কর দেবী।"

"দেবী কি বললে?"

যমনা এক গাল হেসে বললে, "ও সব দেবীটেবী কিছু না, সব

শ্বশুর-শাশুড়ীর শয়তানী।" নাচতে নাচতে বাহানা করে বললে, দেবী এসেছে শরীরে নিজের কাজ হাঁসিল করবার জন্তে।

তার কথা শুনতে শুনতে মনে হ'ল আমি যেন সম্পূর্ণ অন্ত জগতে চলে গেছি।

সেদিন যমনা এসেছে, হাতে তার একটা থলে, চুল উস্কুখুস্কু, চোখ-মুখ ফোলা, শরীর আভরণ-শূন্য, চেহারা দেখে মনে হয় যেন সর্ব্বগ্রাসী রিক্ততা তার দেহ ছেয়ে আছে। সে বললে, "মা, ঐ গয়নাগুলো আমার আর রেবার, তোমার কাছে রেখে দাও, কেউ চাইতে এলে দিও না, শুধু আমি যখন চাইব তখন দিও।"

বললাম, "আবার কি হ'ল তোর ?"

"হবে আবার কি ? আমি কাজে গিয়েছি এই ফাঁকে আমার শাশুড়ী আর ছোট দেওর এসে এই বড় বড় পেতলের দুটো হাঁড়ি উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছে, আমার বাক্স থেকে চল্লিশটা টাকা চুরি করে নিয়েছে। এদের সঙ্গে আমি থাকিবকি করে বল! আজ আমার জল ভরবার হাঁড়ি নেই, বাজার থেকে কিনতে হবে, তাই আমার শেষ সম্বল এই গয়নাগুলো তোমার কাছে গচ্ছিত রাখছি, কখনও যদি আপদ বিপদ হয় তবে ওগুলো বেচে খাব, বলে জমিতে থলে উপুড় করে একরাশ রূপোর গয়না ঢাললে। মোটা মোটা হাতের বালা, গলার হাঁসুলী, টাকা গেঁথে গেঁথে মালা, বাজু, পায়ের ভারী ভারী মল আর রেবার হাতের ছোট ছোট এক জোড়া বালা, কানের দুল, নোলক ইত্যাদি। একরাশ গয়না আর শাউড়ী-স্বামীর নির্য্যাতিতা সহায়হীনা যমনার ব্যথা-বেদনা-ভরা মুখের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম।

দিন পনের পর যমনা ব্যস্তসমস্ত হয়ে এসে বললে, "মা, গয়না-গুলো দাও দিকি।"

"কেন রে ?"

"আমাদের সর্দ্দার এসেছে, তার কাছে ওগুলো সব নিয়ে যাচ্ছি, ওরা আমার সব জিনিসপত্র লিষ্টি করে রাখবে, শিগগিরই পঞ্চায়েত-সভায় আমার উপর কেন এত মারপিট করে তার বিচার হবে।"

তার গয়নাগুলো ফিরিয়ে দিলাম, সে ত্রস্ত গতিতে চলে গেল। বেচারা অনাদৃতা যমনা! আমার কাছে একটু সহানুভূতি আর স্নেহ পেয়ে আমাকে আঁকড়ে ধরেছে, তার দিকে চেয়ে মনে হ'ল, আহা ওর জ্ঞাতি-ভাইরা যদি সমাজের পঞ্চায়েত বসিয়ে ওর একটা সুব্যবস্থা করে দেয় তবে বউটা একটু শান্তিতে থাকতে পারবে।

গ্রীষ্ম ছেড়ে বর্ষা নেমেছে, কিন্তু উপযুক্ত ভাবে বৃষ্টি হচ্ছে না। দু-চার দিন সামান্ত ঝিরঝিরে বৃষ্টি, আবার কড়া রোদ, বিকেল পড়তেই আকাশে একটা গুমট ভাব, চারদিকের আবহাওয়া বিষাক্ত হয়ে উঠেছে, ভীষণ আতঙ্কের ভিতর দিয়ে দিন কাটছে, শহরে মারাত্মকভাবে কলেরা সুরু হয়ে গেছে দিকে দিকে, ইনজেকসন, ডিসইনফেকসন, আর ঔষধপত্রের ধুম। সিভিল-সার্জ্জন আর বড় বড় ডাক্তারদের বিশ্রাম নেই, তাদের গাড়ী অনবরত শহরে ঘুরছে। আর গণ্ডা গণ্ডা মিঠাই, টুকরী টুকরী আম, আবর্জ্জনা-স্তূপে ঢেলে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। মিঠাইওয়ালারা আর ফলওয়ালারা মুখ চুণ করে বসে আছে, বোধ হয় মনে মনে ডাক্তারদের মুণ্ডপাত করছে।

জায়গায় জায়গায় পুজোপালি সুরু হয়ে গেছে। দু-চারদিন হ'ল পাড়ার যোয়ান ছেলেরা গণেশতলীতে খুব ধুমধাম করে পুজো করল। জনা-বিশেক লোক বসে ভৈরুবাবার (মহাদেবের) পুজো-আরাধনা করতে লাগল। নাচ-গান করতে করতে দুজন লোকের শরীরে দেবতার আবির্ভাব হ'ল। ভৈরুবাবা বললেন, দুটো বকরা আর দুটো শূয়োর উৎসর্গ কর তবে ধরা শান্ত হবে, কলেরা বন্ধ হবে।

ভৈরুবাবার আদেশ পেয়ে ভক্তরা উল্লসিত হয়ে উঠল। পরদিন যথারীতি পূজা-অর্চনার পর দুটো বকরা আর দুটো শূয়োর উৎসর্গ করে বলি দেওয়া হ'ল, তারপর ওগুলো মাটির নীচে পুঁতে ফেলল। ভক্তরা বলতে লাগল আমাদের পুজোতেই ত টিপি টিপি বৃষ্টি সুরু হয়েছে, এবার ধরা বলি পেয়ে শান্ত হয়েছে।

ওদিকে যমনা এসে বলল, তার ছোট ছেলেটির নাকি শরীর খারাপ, ভয় করছে। আমি বললাম, "ছেলেটাকে যত্ন করে রাখ, আর রেবাকেও সামলে রাখিস, দিনকাল ভাল নয় যা-তা খেতে দিস না।"

—যমনা বললে,"রেবা বড় লক্ষ্মী, মা,আমি কিছু হাতে তুলে না দিলে খায় না, আর বাড়ী ছেড়ে ও কোথায়ও যায় না, সেই তার ভাইটাকে কোলে নিয়ে বসে আছে।"

মাঝ-রাত্তিরে হঠাৎ সুস্থ রেবার ভেদ-বমি সুরু হ'ল, রেবার বাপ ছুটে বড় ডাক্তার নিয়ে এল, ডাক্তার রেবাকে ইনজেকসন দিলেন, কিন্তু ভরসা দিতে পারলেন না। সকালে আটটায় আবার যখন ডাক্তার এলেন তখন যমনার আর্ত্তস্বর ভেসে এল, "ও আমার রেবা, তুই কোথায় গেলি রে, তোকে ছেড়ে আমি কি করে থাকব! ও-ডাক্তারবাবু তোমার পায়ে পড়ি আমার রেবাকে ভাল করে দাও! রেবাকে কোলে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে যমনা বলতে লাগল, "ও আমার রেবা মা" চোখ খোল একবার তোর ভাইয়াকে দেখ, কিন্তু রেবা আর চোখ খুলল না, ফিরে এল না, চলে গেল চিরদিনের মত মায়ের কোল শূন্য করে।—আজ যমনার নির্ভরকারিণী পরম আদরের সেই ছোট্ট রেবা, দুঃখিনী মায়ের সব আশা-ভরসা-আনন্দ চূর্ণ করে চলে গেল পৃথিবী থেকে। পাঁচ বছরের রেবার হাতের ছোট বালা, কাণের ছোট দুল, আর ড্যাবড্যাবে চোখে চেয়ে থাকা মূর্ত্তিটা চোখে ভাসতে লাগল যমনার 'রেবা রে রেবা মা রে' আর্ত্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে।

কি দুঃখী এই যমনা! সরলা দুঃখী বউটার দিকে মুখ তুলে চাইবার কেউ নেই। বাল্যে বিয়ে হয়ে সুদূর ঝাঁসী ছেড়ে শ্বশুর-শাশুড়ীর আশ্রয়ে এসেছে, কোনদিন তাদের কাছে এতটুকুন স্নেহ-মায়া পায় নি, পেয়েছে শুধু তাড়না আর লাঞ্ছনা। তার পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য নিয়ে সারাদিন খেটে চলেছে মোষের মত। স্বামী দোকানে

...ন্তর কাজ করে, দিনান্তে ঘরে ফিরে কর্মক্লান্ত দেহ নিয়ে প্রায়ই ...য় আর ভাই-বৌর নালিশ শুনে নিষ্ঠুরের মত মার লাগায় ...মনাকে। স্বামীর কাছে যমনা কোন দিন আদরের বাণী শোনেনি। ...ধুই পেয়েছে তার উপেক্ষা।

যমনার রূপ নেই, বুদ্ধি নেই, পৃথিবীতে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকবার মত শঠতা নেই। এই অনাদৃতা বউটি কি করে সারা জীবন কাটাবে লাঞ্ছনা আর নির্যাতন সয়ে? ভাগ্যহীনার যে শিশু দুটি ছিক্লমনে আনন্দের ও শান্তির খনি ছিল, তার একটিকে ভগবান কেড়ে নিলেন আজ।

নূতন লাল সালু-কাপড়ে মুড়ে রেবাকে নিয়ে গেল যমনার কোল থেকে ছিনিয়ে, চীৎকার করে মাটিতে আছড়ে পড়ল যমনা। পড়শী বৃদ্ধ শীতল আচলের খুটে চোখ মুছে বলল, "ভগবান দুঃখীকেই কেবল দুঃখ দেন, দুঃখের বোঝা বাড়াতে।

বেহিসাবী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

নয় গো তারা, নয়কো তারা, মোটেই হিসাবী,
নাইকো তাদের খাতা, খতেন, বাক্স কি চাবি।
খতায় না ত জীবন ধরে তাদের লাভালাভ—
অনুরাগে কাজ করে যায়—তাই তাদের স্বভাব।
পূজা করে, অশ্রু ঝরে,—বসেই থাকে চুপ
বলতে নারে কি ফুল দিলো, পুড়লো ক'টা ধূপ।
সাধনাতে সিদ্ধি চাহে যুদ্ধে চাহে জয়—
তারা যোগভ্রষ্ট নহে, হোক না ক্ষতি ক্ষয়।
মৎস্যপানে দৃষ্টি—নাহি অন্য দেখার খেদ
তারা জানে করতে হবে মৎস্য-চক্র ভেদ।

২

রসে ভরা আঙুরই খায় মিটায়ে তৃষ্ণা,
গুচ্ছে ক'টা দ্রাক্ষা ছিল? তোরা সুধাস না।
যজ্ঞ পরিপূর্ণ হ'ল, তৃপ্তি তাদের ভাই—
কত খরচ হ'ল তাহার হিসাব তাদের নাই।
রোপা গাছে ফুল ফুটেছে তাতেই আনন্দ,
ফুল ফুটেছে ক'টা? জানে মদির গন্ধ।
আকাঙ্খিত মুক্তা পেলে, সাধের গজমতি—
লয় না খপর ওজন তাহার ক'মাষা, ক'রতি?
পূর্ণতা যে দেয় ভুলায়ে সকল রিক্ততায়—
ভোজনশেষে কে আর এঁটো পাতার পানে চায়।

৩

দেখে তারা উজ্জল আলো হয় না যেন ক্ষীণ
বলতে নারে পুড়লো তাতে ক'সের কেরোসিন।
ঝড়ের মত মন যে উধাও উল্লাসেতে হায়,
বলতে নারে মিনিটে সে কত মাইল যায়।
তারা বলে এক শত আট পদ্ম গুণে হায়—
দুর্ব্বল এ সাধকদলের পূজা করাই দায়
মন যে গোটা থাকে নাকো—হায় রে অনুরাগী
খানিকটা তার রাখতে হবে গোণা গাঁথার লাগি।
তারা বলে হবো নাকো হয়েও নাই সুখ—
আধেকখানা তবিলদার আর আধেকটা ভাবুক।

৪

ভ্রমর নারে বলতে তাহার চাকের কি ওজন—
গড়তে লাগে মোম কতটা? সময় কতক্ষণ?
কত ফুলের মধুতে তা পূর্ণ করা যায়?
মধুব্রত খোঁজ রাখে না—গুঞ্জনে ভুলায়।
ভাবের জোয়ার নামে আহা গঙ্গাধারা প্রায়
হিসাবের ও ঐরাবত যে কোথায় ভেসে যায়।
রসিক তারা প্রেমিক তারা নয় তারা চৌকস—
একটি জিনিস নিয়ে থাকে ভিঁয়ায় যে এক রস।
হিসাবী নয়—দোষ ধরো না, দোষ ধরো না কেহ,
প্রেম যে সুধার ঝরণা মোটেই নয়কো পরিমেয়।

স্বাস্থ্য-সাধনা

শ্রীনীরদ সরকার

নিয়মিত ভাবে ব্যায়ামদ্বারা শক্তিধর ও কষ্টসহিষ্ণু হওয়া সকলের পক্ষেই যেমন সম্ভব, পেশীবহুল সুন্দর দেহ গঠন করা সকলের পক্ষে তেমন সম্ভব নয়। সুন্দর পেশীবহুল দেহ যোগ্যমত চেষ্টা দ্বারা সকলের পক্ষেই গঠন করা সম্ভব হয় না, তবে মোটামুটি সুস্থ-সবল ও সামঞ্জস্যপূর্ণ দেহ যে কেহই গঠন করতে পারে এবং সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল ও স্বাভাবিক রেখে অসাধারণ কর্মতৎপর, শক্তিধর ও কষ্টসহিষ্ণু হতে পারে। এমনকি নিয়মিত ভাবে অল্প সময়ে সহজ ও সরল ব্যায়াম দ্বারা মোটামুটি ভাবে সুস্থ দেহে দীর্ঘজীবনও লাভ করা যায়।

দেহের গড়নের উপর সুন্দর পেশীবহুল শরীর গঠন করা নির্ভর করে, আর নির্ভর করে মাতাপিতার স্বাস্থ্যের উপর। পিতামাতার গ্রন্থির সুস্থতা-অসুস্থতার উপর নির্ভর করে সন্তানের স্বাস্থ্য ও দেহের গড়ন। এক-এক জনের গড়ন এক-এক প্রকার। যাদের দেহ পেশীবহুল সুন্দর হয় তাদের অল্প চেষ্টায়ই হয়ে থাকে। আবার অনেকে বহু চেষ্টা করেও দেহকে পেশীবহুল, সুন্দর করতে পারে না। দেহকে সুন্দর, পেশীবহুল করতে গিয়ে অধিক ব্যায়াম করে স্নায়ুকে ত দুর্বল করে ফেলেই তা ছাড়া কষ্টসহিষ্ণুতা, মস্তিষ্ক-বিকাশের ক্ষমতা-কর্ম্মতৎপরতাও নষ্ট হয়ে যায়। এমনকি এত যত্নে যৌবনের তৈরি দেহের বাহার যৌবনান্তেই নষ্ট হয়ে যায়। তা ছাড়া ব্যায়াম না করা সাধারণ লোকের মতও কর্ম্মতৎপরতা থাকে না। যারাই পেশীতে অধিক চাপ দিয়ে আমাদের জলবায়ুর প্রতিকূল ব্যায়াম করে পেশীবহুল দেহ গঠন করে, তাদের অধিকাংশই সুষ্ঠুভাবে মস্তিষ্কচালনার বা বিকাশের ক্ষমতা ত হারায়ই, দৈহিক কর্ম্মতৎপরতা ও ক্ষিপ্রতাও হারিয়ে থাকে এবং অধিকাংশই আয়াসী ও দর্শন-ধারী হয়। পেশী ও স্নায়ুর উপর অত্যধিক চাপ পড়াই এর প্রধান কারণ। ব্যায়াম করে যদি সাধারণ লোকের চেয়ে কর্ম্মতৎপর, কষ্টসহিষ্ণু না হওয়া যায় ও মস্তিষ্কচালনার ক্ষমতা ব্যাহত হয় তা হলে সেরূপ ব্যায়ামে লাভ কি ?

দেহকে সুস্থ ও কর্মক্ষম করার প্রধান উপায় হ'ল নিয়মিত ব্যায়াম ও পরিমিত আহার। ব্যায়াম করতে হলে বয়স, দেহের গঠন, রোগ-ত্রুটি ও সহ্য-শক্তি বুঝে সাধ্যমত ব্যায়াম করাই শ্রেয়ঃ। দেহের যদি কোন ত্রুটি বা রোগ থাকে, প্রথমেই ঐ রোগ-ত্রুটিনিবারক ও আরোগ্যমূলক ব্যায়ামদ্বারা দূর করে তার পর গঠনমূলক ব্যায়াম করা উচিত। আর যারা দেহকে মোটামুটি সুস্থ রেখে কর্ম্মজগতে কর্ম্মতৎপর থেকে দীর্ঘজীবন লাভ করতে চায়, তাদের স্বাস্থ্য-বিধির নিয়মপালনের সঙ্গে পরিমিত আহার এবং সকাল বা সন্ধ্যায় দেশীয় মিশ্রব্যায়াম আর বয়স্কদের মৃদু ব্যায়ামই যথেষ্ট। যারা বিশেষ ভাবে শক্তিধর হতে চায়, তাদের প্রথমতঃ দৈহিক ত্রুটি ও রোগ দূর করে তার পর দেশীয় ব্যায়ামদ্বারা দেহের ভিত স্থাপন করে নিয়ে সহ্যশক্তি ও বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ব্যায়ামের গুরুত্বও বাড়াতে হয়। ব্যায়াম করার সময় পেশীতে অধিক চাপ দিয়ে ব্যায়াম করা উচিত নয়। যাতে সমস্ত অঙ্গেরই ব্যায়াম হয় এবং প্রত্যেকটি অঙ্গ কমবেশী সমভাবে পুষ্ট হয়ে দেহের নমনীয়তা, কমনীয়তা, ক্ষিপ্রতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা যেন বৃদ্ধি পায়, উপরন্তু দেহটি যেন সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। ব্যায়াম করে দেহ কমতৎপর, কষ্টসহিষ্ণু ও সামঞ্জস্যবিহীন হলে বুঝতে হবে সেটি ব্যায়ামের কুফল। সুসামঞ্জস্যপূর্ণ দেহ এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হলে আমাদের জলবায়ুর অনুকূল দেশীয় ব্যায়াম যত কার্যকরী ও ফলপ্রসূ হয়, সে রকম অন্য কোন ব্যায়ামে হয় কিনা সন্দেহ। এ ছাড়া ব্যাপক ভাবে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্যে বিনা ব্যয়ে, বিনা আড়ম্বরে, অল্প সময়ে নানা কর্মব্যস্ততার মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবে বা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে সর্বসাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্যে আমাদের দেশীয় ব্যায়াম ও আসন শ্রেষ্ঠ সহায়ক। আমাদের দেশেরই স্বর্গত শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি চিরস্মরণীয় শক্তিধর আদর্শ ব্যক্তিদের কথা অনেকেরই জানা আছে। তাঁরা আমাদের দেশীয় প্রথায় ব্যায়াম করে যেরূপ শক্তি অর্জন করেছিলেন ও সমাজে নানা ভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে অসাধারণ দেহবল ও মনোবলের পরিচয় দিয়েছিলেন, সে তুলনায় বর্তমান পেশীবহুল দেহীরা ত তুচ্ছই। তা ছাড়া তাঁরা যেরূপ শক্তিপূর্ণ খেলা নিছক অবলীলাক্রমে দেখাতেন, সেই সমস্ত খেলার মধ্যে কোন কোন খেলা এ যুগে অনেকেই অপকৌশলের সাহায্যে দেখিয়ে প্রকৃত শক্তিচর্চাকে হেয় প্রতিপন্নই করে থাকে।

অনেকেরই ধারণা ব্যায়াম করলেই বেশী খেতে হয়—এ ধারণা ভুল। আমাদের জলবায়ুর অনুকূল সাধারণ সহজ-

পবন মুক্তাসন (খ)

চন্দ্রাসন

পবন মুক্তাসন (ক) দ্বিতীয় পর্য্যায়

পবন মুক্তাসন (ক)

পাচ্য খাদ্য পরিমিত ভাবে গ্রহণ করলেই সুস্থ, সবল, কর্মক্ষম থাকা বা হওয়া যায়। ডাল-ভাত, তরিতরকারী, মাছ, সাধ্য হলে দুধ-দই, ফলমূল, চিঁড়া-মুড়ি প্রভৃতিই দেহের ক্ষয় পূরণ ও পুষ্টিসাধনের পক্ষে যথেষ্ট। এ ছাড়া ঘি, মাখন, ছানা, ডিম-মাংস যাঁদের জোটে তাঁদের কথা ভিন্ন। বেশী খেলেই যে স্বাস্থ্য ভাল ও শক্তি বেশী হয়, তা নয়। আহার্য পরিমিত হওয়া চাই এবং যা গ্রহণ করা হয় তা যেন সুচারু রূপে হজম হয়। উগ্র মশলাযুক্ত খাদ্য, মুখরোচক, ভেজাল প্রভৃতি খাদ্য লোভে পড়ে খেতে নেই। সাদাসিধে সহজপাচ্য খাদ্যই সুস্থ ও সবল হবার পক্ষে উত্তম। অনেকে বেশী পরিশ্রম করে দেহ দ্রুত বৃদ্ধির জন্যে বেশী খাদ্য খায়। ফলে কিছুদিন পর যখন আর পূর্বের মত বেশী শ্রম করতে পারে না তখন দেখা যায় অপ্রয়োজনীয় মেদে দেহ ভরে যায়, না হয় অন্যান্য রোগ হয়ে থাকে। অপ্রিবল পরিশ্রম ও বয়সানুপাতিক পরিমিত খাদ্য গ্রহণ, মাঝে মাঝে উপবাস, নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম ও আসন, সংযমরক্ষা স্বাস্থ্যসাধনায় সফল হওয়ার একমাত্র উপায়। জলবায়ুর অনুকূল ব্যায়াম ও আসন দ্বারা দেহ ও মনকে সুস্থ, সবল এবং কর্মক্ষম রেখে জীবনে কর্ম্ম-তৎপর থাকাই বর্তমান যুগে স্বাস্থ্যসাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য বলে মনে করি। অবশ্য যারা বিশেষ ভাবে উন্নত হতে চায় তাদের কথা স্বতন্ত্র।

অর্দ্ধ চন্দ্রাসন

চিত্রের মত সোজা দাঁড়িয়ে দুই হাত মাথার উপর তুলে শ্বাস স্বাভাবিক রেখে সাধ্যমত যত দূর সম্ভব পেছন দিকে বাঁকিয়ে যতক্ষণ পারা যায় থেকে, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ (আট-দশ সেঃ) বিশ্রাম করে পুনরায় চিত্রের মত পিছনে বাঁকিয়ে সাধ্যমত থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ান। এই ভাবে পর পর তিনবার করতে হয়। প্রথম অবস্থায় চিত্রের মত এত বাঁকাতে না পারলেও চিন্তার কিছু নেই, অভ্যাস করতে করতে চিত্রের মত হবে। এ ভঙ্গি করার সময়েও শ্বাস স্বাভাবিক থাকবে।

এ আসনে দেহের উপরাঙ্গ বেশ নমনীয় হয়, বিশেষ ভাবে যে-কোন প্রকার কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়। সকালে শয্যা-ত্যাগের পরই এ আসনটি পর পর তিন বার করে দু'তিন মিনিট পরে এক গ্লাস জল পান করলে যে-কোন প্রকার কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়। আমাশয়ের দোষগ্রস্ত ব্যক্তিদের এ আসনটি করতে নেই। এই ভঙ্গিতে শ্বাস স্বাভাবিক রেখে একবারে তিন মিনিট থাকতে পারলে একবারই করতে হয়, তা হলে তিনবার করতে হয় না। এ আসনে পেটেরও মেদ কমায়।

পবন মুক্তাসন (গ)

পবনমুক্তাসন

'ক' চিত্রের ভঙ্গির মত চিং হয়ে শুয়ে ডান পা মুড়ে দুই হাতে সাধ্যমত জোরে চেপে ধরে (শ্বাস স্বাভাবিক রেখে)
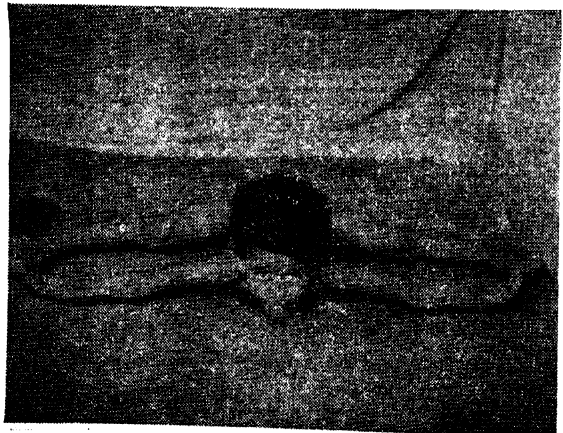
সুপ্ত বিভক্ত পদহস্তাসন

অর্দ্ধ চন্দ্রাসন

বিভক্ত বজ্রাসন

সাধ্যমত সময় সহজ ভাবে থেকে পা ছেড়ে দশ পনের সেকেণ্ড শবাসন করে ডান পায়ের অনুরূপ বাম পা ভেঙ্গে বাম পা চেপে ধরে শ্বাস স্বাভাবিক রেখে সাধ্যমত সময় থেকে পা ছেড়ে দিয়ে শবাসন। তার পর 'খ' চিত্রের মত দুই পা চেপে ধরে সাধ্যমত থেকে পা ছেড়ে শবাসন (দশ-পনের সেকেণ্ড) করে উঠে বসে 'গ' চিত্রের মত দুই পা মুড়ে চেপে ধরে থেকে পা ছেড়ে দিয়ে শবাসন। ক, খ ও গ ভঙ্গিতে কিছুদিন অভ্যাস করে ক চিত্রের মত পা ধরে উঠে বসে গ চিত্রের মত ডান পা ধরে থেকে শুয়ে পড়া ও পা ধরে কিছুক্ষণ থেকে পা ছেড়ে শবাসন করে ডান পায়ের অনুরূপ বাম পা ধরে উঠে বসা ও কিছুক্ষণ থেকে শুয়ে ও কিছুক্ষণ থেকে শবাসন করা। এই-রূপে দু'পা ধরে উঠে বসে কিছুক্ষণ থেকে শুয়ে পড়ে ও পা ধরে কিছুক্ষণ থেকে তার পর ছেড়ে দিয়ে ১—২ মিনিট শবাসন করা।

এই পবনমুক্তাসন সকাল-সন্ধ্যা যে কোন সময়ই করা চলে তবে যাদের পেটে বায়ু হয় তাদের পক্ষে সকালে শয্যা-ত্যাগের পূর্বে শয্যায় শুয়েই করা উচিত। পবনমুক্তাসন ক, খ, গ ভঙ্গি করে দু'তিন মিনিট পর এক গ্লাস জলপানে বিশেষ উপকার হয়। প্রতি রকম ভঙ্গি করার পরই শবাসন অবশ্যকরণীয় তবে সমস্ত রকম করে শেষে অন্ততঃ ১—২ মিঃ শবাসন করা উচিত। বয়স্ক ব্যক্তিদের প্রথম পর্যায় করাই উচিত তবে প্রথম পর্যায় খুব সহজ হলে তার পর দ্বিতীয় পর্যায় করা উচিত। তবে কিশোর ও যুবকদের দ্বিতীয় পর্যায়ই করা উচিত কারণ এতে পেটের পেশীকে অত্যন্ত মজবুত করে।

এই আসনে বিশেষ ভাবে পেটের বায়ু কমায়, হতেও দেয় না, কোষ্ঠ পরিষ্কার করে ক্ষুধাও বাড়ায়, পেটের মেদ কমায়, পেটের পেশীকে দৃঢ় ও মজবুত করে যকৃতের দোষ দূর করে, যকৃতকে সুস্থ করে। এ আসনটি ছোটবড় কিশোর-যুবক-বৃদ্ধ স্ত্রীপুরুষ সকলেই করতে পারে।

বিভক্ত বজ্রাসন

বজ্রাসনে বসে চিত্রের ভঙ্গির মত দুই হাঁটু ছড়িয়ে বসে সাধ্যমত যতক্ষণ পারা যায় থেকে শবাসন—এইভাবে পর পর তিনবার করতে হয় আর একবারে তিন মিনিট কাল পারলে একবার করে শবাসন করতে হয়। এই আসনে বিশেষভাবে সায়াটীকা ও নিম্নাঙ্গের কোনপ্রকার বাত হতে পারে না, হলেও সত্বর নিরাময় হয়।

চন্দ্রাসন

এ আসনটি ছোট ছেলেমেয়েদের দেহ নমনীয় ও কমনীয় করতে এবং রাখতে অত্যন্ত সহায়ক। মেরুদণ্ডের হাড়ের জোড় নরম করতে বুকেরবেষ্টনীর হাড় বাড়াতে ও শ্বাসনলী মোটা করতে অত্যন্ত চমৎকার আসন। এটি দ্রুত গতিতে করানই ভাল। এই ভঙ্গিতে কোষ্ঠকাঠিন্যতা দূর করে ক্ষুধাও বৃদ্ধি করে। ভঙ্গিটি বেশ কঠিন।

আঁটপুরের কথা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর সন্ধ্যার সময়, ধুনীর সম্মুখে, নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) আঁটপুরের বড় ঘোষ পরিবারভুক্ত বাবুরাম ঘোষের (স্বামী প্রেমানন্দের) গৃহের প্রাঙ্গণে অন্তরঙ্গ আট জন সঙ্গীসহ সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনের চরম সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। এই আট জন সঙ্গীর নাম :

১। শ্রীনিত্যনিরঞ্জন ঘোষ (স্বামী নিরঞ্জনানন্দ)
২। শ্রীবাবুরাম ঘোষ (স্বামী প্রেমানন্দ)
৩। শ্রীতারকনাথ ঘোষাল (স্বামী শিবানন্দ)
৪। শ্রীশশিভূষণ চক্রবর্ত্তী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ)
৫। শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (স্বামী সারদানন্দ)
৬। শ্রীকালীচন্দ্র চন্দ্র (স্বামী অভেদানন্দ)
৭। শ্রীগঙ্গাধর গঙ্গোপাধ্যায় (স্বামী অখণ্ডানন্দ)
৮। শ্রীসারদাচরণ মিত্র (স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ)

গত কয়েক বৎসর হইতে এই পুণ্যময় দিনটি স্মরণ করিবার জন্য আঁটপুরের বড় ঘোষেদের বাড়ীর উক্ত স্থানে প্রত্যেক বৎসর ২৪শে ডিসেম্বর একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইতেছে। স্বামী প্রেমানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শান্তিরাম ঘোষ কর্ত্তৃক ঐ স্থানে একটি প্রস্তর-ফলক স্থাপিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে গত ২০শে ডিসেম্বর আঁটপুরে গিয়াছিলাম, এবং সেখানে কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলাম। আঁটপুর আমার জন্মভূমি। খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এই অনুষ্ঠানে সর্ব্বসাধারণকে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছিলেন, পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন বেলুড়মঠের স্বামী অচিন্ত্যানন্দ। একটি সুষ্ঠু কর্ম্মসূচী অনুসারে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হইয়াছিল, যথা উষাকীর্ত্তন, পূজা, ভোগবিতরণ, সভা, সন্ধ্যারতি এবং ধুনীর সম্মুখে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জীবনী আলোচনা। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বরের আঁটপুরের এই ঘটনাটিকে রোমাঁ রোঁলা বলিয়াছেন, "It is a confluence of the Jordan and the Ganges."—এই ঘটনা জর্ডান নদী ও গঙ্গানদীর সঙ্গম। মোটামুটি ভাবে বলিতে পারা যায় যে, অনুষ্ঠানে যদিও জনসমাগম বেশী হয় নাই, তথাপি অনুষ্ঠানটি গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। জানি না বার্ষিক এই অনুষ্ঠানের ফলে স্থানীয় জনসাধারণ পরমহংসদেবের, স্বামী বিবেকানন্দের এবং স্বামী প্রেমানন্দের ভাব, আদর্শ ও শিক্ষার কতটা গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন। স্বামী প্রেমানন্দ আঁটপুর মিত্রবাটির দৌহিত্র ছিলেন। তাঁহার মাতুলালয়ে অর্থাৎ আঁটপুর মিত্রবাটীতে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মস্থানে একটি মন্দির স্থাপনের প্রচেষ্টা চলিতেছে। স্বামী প্রেমানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীহরেরাম ঘোষ এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এই সম্বন্ধে অগ্রণী হইয়াছেন।

আঁটপুরে অবস্থানকালে স্থানীয় অর্থনৈতিক অবস্থার সহিত কতকটা সাক্ষাৎ পরিচয় হইয়াছে। প্রথমেই অতি সংক্ষেপে চাষবাসের কথা বলিতেছি। বৃষ্টির অভাবে ডাঙা-জমিতে ধানের ফলন খুবই কম। স্থানে স্থানে ফসল 'মড়ক' হইয়াছে, অর্থাৎ গাছ হইয়াছে, শীষ হয় নাই। "ডহরা" অর্থাৎ 'নাবাল' জমিতে ফলন অপেক্ষাকৃত ভাল। মোটের উপর বিঘাপ্রতি ৩৷৪ মণের বেশী ফলন হয় নাই। এই অনুপাতে খড়ও কম হইয়াছে, গড়ে বিঘাপ্রতি ৮৷১০ পণের বেশী হয় নাই। এই বৎসর পাটের ফলনও কম হইয়াছিল। বিঘাপ্রতি দুই-তিন মণের বেশী হয় নাই। উপযুক্ত সময়ে বৃষ্টির অভাবে, সব জমিতে পাট বুনিতে পারা যায় নাই। আবার উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত পরিমাণ বৃষ্টির অভাবে 'ডাইল' শস্যের চাষ খুব কম হইয়াছে, একরূপ হয় নাই বলিলেই চলে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে অল্পপরিমাণ জমিতে "ডাইলের" চাষ হইয়াছে, তাহাতেও "শুঁটি" হইতেছে না। সকলে এটম বোমাকেই ইহার জন্য দায়ী করিতেছে। আলুচাষ সম্বন্ধে কথা এই যে, চাষের পরিমাণ কম না হইলেও ফলনের পরিমাণ কম হইবে, ইহার প্রধান কারণ সেচের অভাব। পুকুর, নালা, ডোবা প্রভৃতিতে জল নাই, সেচের জন্য "ডোঙ্গার"ও অভাব। তবে ক্যানেল অঞ্চলে ফসলের অবস্থা ভাল। আর সব তরিতরকারির ফলন জলাভাবশতঃ কম। নূতন ধানের দাম মণ পিছু ১৪ টাকা, নূতন চাউলের দাম মণ পিছু ২৫ টাকা, পাটের দাম মণ পিছু ২৮ টাকা, কপি, বিলাতী বেগুন প্রভৃতি দুর্ম্মূল্য। দুধ ও মাছ নাই বলিলেই চলে। দেশী তরিতরকারির মূল্য অনেকটা সস্তা। এক মণ কুলি বেগুনের মূল্য দশ আনা মাত্র। এক মণ কুলি বেগুন বিক্রয় করিলে দশ আনায় এক সের চাউল পাওয়া যাইবে।

"কণ্ট্রোলে"র চাউল সেরপ্রতি সাত আনা এবং আটা সের-প্রতি সাত আনা এক পয়সা দরে সামান্য পরিমাণ সরবরাহ করা হইয়াছিল। শুনিলাম, এখন তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। 'কণ্ট্রোলে'র চাউল ও আটার বণ্টনব্যাপারে জনসাধারণের বিক্ষোভের কথাও শুনিলাম। সাধারণতঃ দিনমজুরদিগের অর্থসঙ্গতি এমন থাকে না, যাহাতে তাহারা নির্দ্দিষ্ট দিনে 'বরাদ্দ' অনুসারে সম্পূর্ণ পরিমাণ চাউল ও আটা একেবারে ক্রয় করিতে পারে। একটি উদাহরণ দিলে আমার বক্তব্য বুঝা যাইবে। বর্ত্তমানে দিনমজুরের পারিশ্রমিকের হার হইতেছে দৈনিক এক টাকা। পরিবারের জনসংখ্যা অনুযায়ী সপ্তাহের বরাদ্দ অনুসারে, হয় ত সে চোদ্দ সের চাউল ও আটা মিলিত ভাবে পাইতে পারে। কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে একই দিনে তাহার হাতে ঐ পরিমাণ চাউল ও আটার মূল্য থাকে না। তাহার সঙ্গতি অনুসারে তাহাকে চাউল ও আটা ক্রয় করিতে হয়। সপ্তাহের মধ্যে সে অর্থসংগ্রহ করিতে পারিলেও তাহার প্রাপ্য অবশিষ্ট পরিমাণ চাউল ও আটা সে 'কণ্ট্রোলে'র দোকান হইতে ক্রয় করিতে পায় না। খোলাবাজারে প্রতি সের দশ আনা হিসাবে তাহাকে চাউল ক্রয় করিতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দিনমজুরেরা তাহাদের উপার্জ্জনের দ্বারা পরিবারের জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় পরিমাণ চাউল-আটা কিনিতে পারে না। মাসের অনেক দিন তাহাদের অর্দ্ধাশনে বা অনশনে থাকিতে হয়। গ্রামাঞ্চলে ইহাদের সংখ্যা বড় কম নহে। নিম্নমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অবস্থাও করুণ ও শোচনীয়।

রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জনসাধারণের 'বিক্ষোভের' অন্ত নাই। জমিদারী উচ্ছেদঘটিত নানা রকম আশঙ্কার উদ্ভব হইতেছে। এক দলের মতে, যে সকল ভাগচাষীর নামে জমি রেকর্ড হইতেছে, সেই সকল ভাগচাষী নিঃসন্দেহ যে, কালক্রমে তাহারাই জমির মালিক হইয়া যাইবে। তাহারা জমি ভাল করিয়াই চাষ করুক, আর মন্দ করিয়াই করুক, ভবিষ্যতে জমি তাহাদের হাতছাড়া হইবে না। ইহার ফলে, কৃষির অবনতি অবশ্যম্ভাবী। পক্ষান্তরে জমির মালিকগণ (বিশেষতঃ অল্প জমির) এই আশঙ্কা করিতেছেন যে, বর্ত্তমানে যে পরিমাণ জমি তাঁহাদের আছে, তাহারও পরিমাণ ভবিষ্যতে হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ভাগচাষীদের ধারণা এবং জমির মালিকগণের আশঙ্কা দূর করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে? বিধানসভার স্থানীয় প্রতিনিধিগণের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করিতেছি।

কত রকম বিক্ষোভের কথা আর বলিব? কলিকাতা হইতে আঁটপুর পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা হইয়াছে। আমরা সকলেই গ্রামাঞ্চলেও পাকা রাস্তা চাই। এই পাকা রাস্তা হওয়ার ফলে বর্ত্তমানে লরীর সাহায্যে কলিকাতা হইতে মাল আমদানী করা হইতেছে। আবার ইহার ফলে যাহারা গরুর বা মহিষের গাড়ী চালাইয়া সংসার প্রতিপালন করিতেছিল, তাহারা বেকার পর্য্যায়ভুক্ত হইতে চলিয়াছে। ইহার প্রতিকার কি? স্বতঃই মনে হয়, সুষ্ঠুভাবে জমির বণ্টন ও গ্রামাঞ্চলে শিল্পের প্রসার এবং কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যের সুষ্ঠু বিক্রয়ব্যবস্থাই ইহার একমাত্র প্রতিকার।

যাহা হউক, স্থানীয় অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে কৃষিপ্রধান অঞ্চলে কৃষির উন্নতির চেষ্টাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। ব্যাপকভাবে কৃষির উন্নতির জন্য বড় বড় পরিকল্পনার প্রয়োজন—একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহা সময়সাপেক্ষ। অতএব, অন্তর্ব্বর্ত্তী-কালে, আমাদের স্থানীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেই হইবে। এই পরিকল্পনার মধ্যে প্রধান হইতেছে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত পরিমাণ সেচের জন্য খাল-বিল-নালা প্রভৃতির সংস্কার। একথা পূর্ব্বে অনেকবার লিখিয়াছি, আবার লিখিলাম।

স্থানীয় একটি ভূমিহীন শ্রমিকের আয়ব্যয়ের হিসাব মোটামুটি ভাবে দিতেছি—পরিবারের কর্ত্তা হইতেছে সতীশচন্দ্র মালিক। সতীশই একমাত্র উপার্জ্জনকারী, পরিবারের লোকসংখ্যা—স্বামী, স্ত্রী ও পাঁচটি নাবালক ছেলেমেয়ে—মোট সাত জন। ভাত, মুড়ি প্রভৃতির জন্য সতীশের দৈনিক সাড়ে তিন সের চাউলের প্রয়োজন। যদি মাসের প্রত্যেক দিন সতীশ কাজ পায় তাহা হইলে তাহার মাসিক উপার্জ্জন হয় ৩০-৩৫ টাকা। কিন্তু তাহার একমাত্র চাউলের জন্যই ২৫৲ হিসাবে মণ ধরিলেও মাসে প্রায় ৬৫ টাকার দরকার। ইহা ছাড়া, ডাল, মশলা, তরিতরকারী, তৈল, লবণ প্রভৃতিতে অন্ততঃ ১৫ টাকা দরকার। ইহা ব্যতীত পরিধেয়, চিকিৎসা, গৃহসংস্কার, লোকলৌকিকতা প্রভৃতির ব্যয় আছে। সতীশ সংসার চালায় কি করিয়া কেহ বলিতে পারেন কি? গ্রামাঞ্চলে 'সতীশের' সংখ্যা কম নয়।

আঁটপুর উচ্চ বিদ্যালয় বর্ত্তমানে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। কলা ও বিজ্ঞান পঠিতব্য বিষয় হইয়াছে। শিক্ষাবিভাগ কর্ত্তৃক গবেষণাগার প্রস্তুতের জন্য অর্থসাহায্য পাওয়া গিয়াছে। অট্টালিকা মাথা খাড়া করিয়া উঠিতেছে; কিন্তু বার বার বহুলপ্রচারিত সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াও যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক পাওয়া যাইতেছে না। ইহার ফলে ছাত্রদের শিক্ষা ও পরীক্ষায় সফলতা কি স্তরে পৌছিবে, তাহা শিক্ষাবিদগণ অনায়াসেই অনুমান করিতে পারেন। গ্রামাঞ্চলের সকল উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়েরই অবস্থা এইরূপ। শিক্ষাবিভাগ

এই সঙ্কট কি করিয়া দূর করিবেন জানি না। অথচ বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের শিক্ষকগণকে,—এমনকি প্রধান শিক্ষকগণকেও—পাবলিক্ সার্ভিস কমিশনের নিকট হইতে "ছাড়-পত্র" লইয়া আসিতে হইবে। শিক্ষকনির্ব্বাচনে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের উপযুক্ততা সম্বন্ধে শিক্ষাবিদগণ একমত নহেন।

আঁটপুরে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মহোদয়ের স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর নামে প্রধানতঃ অনুন্নত শ্রেণীর বালিকাদিগের জন্য একটি নূতন ধরণের প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। এই উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের স্ত্রীশিক্ষা বিভাগের প্রধান পরিদর্শিকা শ্রীমতী মনোরমা বসু, এম-এ (লণ্ডন) গত ২৪শে ডিসেম্বর আঁটপুরে আসিয়াছিলেন। তিনি আঁটপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়টির জন্য নির্ব্বাচিত স্থান প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়টি স্থাপন সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ণ সহযোগিতা ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

গত ৪ঠা জানুয়ারী আঁটপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে হুগলী জেলার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিস একাদশ এবং শ্রীরামপুর মহকুমা শাসকের একাদশের মধ্যে এক প্রদর্শনী ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মহকুমা শাসক মিঃ জি. গোমেশ তাঁহার একাদশের মধ্যে একজন ছিলেন। খেলাটি উচ্চস্তরেরই হইয়াছিল। আঁটপুরে এইরূপ খেলা এই প্রথম। প্রবেশ মূল্য হইতে সংগৃহীত অর্থ স্কুলের সাহায্যে ব্যয়িত হইবে। খেলাটিকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য প্রধান শিক্ষক শ্রীসন্তোষকুমার চক্রবর্ত্তী, তাঁহার সহকর্ম্মীগণ ও ছাত্রছাত্রীগণ বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মানুষ্ঠানের কথা বলিয়া প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছিলাম। ঠিক তাহার বিপরীত বিষয়ের উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতেছি। গত ১৮ই ডিসেম্বর, আঁটপুর মিত্রবাটীর শ্রীশ্রী৺রাধাগোবিন্দজীউর মন্দিরে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। মন্দিরের পুরোহিত এবং একজন পাহারাদার (যাঁহারা মন্দিরে প্রতিদিন রাত্রে থাকেন) নিদ্রিত ছিলেন। এইরূপ প্রকাশ যে, ডাকাতের দল তাঁহাদিগকে অকস্মাৎ মুখে কাপড় গুঁজিয়া দিয়া বাক্‌রোধ করিয়া দেয় এবং বিছানার সহিত বাঁধিয়া ফেলে। তাহারা টর্চ্চের আলো ফেলিয়া এবং ছোরা দেখাইয়া মন্দিরের চাবি লয়। পুরোহিত মহাশয় জমিদারী উচ্ছেদ বিভাগের তহশীলদারের কাজ করেন। ডাকাতের দল বিগ্রহের অলঙ্কারাদি এবং পুরোহিত মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত সরকারী খাজনা ১২৫ টাকার উপর লইয়া চলিয়া যায়। পুলিস তদন্ত চলিতেছে। গত ২৭শে ডিসেম্বর রাত্রেও মিত্রবাটীর এক পরিবারের বাড়ীতে চুরি হয়। গ্রামের যুবকগণ কর্ত্তৃক সংগঠিত রক্ষীবাহিনীর শ্রীপ্রসাদচন্দ্র মালিক নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া ঐ রাত্রেই দলের একজন চোরকে ধরিয়া ফেলে। শুনা যায়, ধৃত চোরটি শ্রীশ্রী৺রাধাগোবিন্দজীউর মন্দিরে ডাকাতির সম্বন্ধেও কিছু সংবাদ দিয়াছে।

আর বেশী বাড়াইতে চাহি না। গত ২৪শে ডিসেম্বর (ধর্ম্মানুষ্ঠানের দিন) সকাল নয় ঘটিকার সময় লেখকের গৃহ হইতে তিন শত টাকার উপর চুরি হইয়াছিল; কিন্তু, ইহার কিছুক্ষণ পরেই উহা উদ্ধার হয়। এইরূপ চুরি-ডাকাতি এই অঞ্চলে খুবই বাড়িয়াছে। জনসাধারণ অতি আতঙ্কে আছেন। ডাকাতির ভয় দেখাইয়া কাহারও কাহারও নামে 'উড়োচিঠি' আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। ৬ই জানুয়ারী স্থানীয় পোষ্টমাষ্টার এইরূপ চিঠি পাইয়াছেন। আমার অতি "পুরাতন ভৃত্য" এককড়ি বলিল—লোকের অভাব বাড়িতেছে এবং স্বভাব নষ্ট হইতেছে বলিয়াই এইরূপ চুরি-ডাকাতি হইতেছে।

বিদ্যাসাগর-যুগের শিশুসাহিত্য

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

বিদ্যাসাগর সাহিত্য রচনা করেছেন। বিদ্যাসাগরকে নিয়ে সাহিত্য রচিত হয়েছে। যাঁরা যুগন্ধর তাঁরাই সাহিত্যের উপজীব্য হ'ন। বিদ্যাসাগরের জীবনকাল ১৮২০-১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ। কিন্তু তাঁর প্রথম গ্রন্থ "বেতালপঞ্চবিংশতি" প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে। এই সময়ের পর থেকে বাংলা শিশুসাহিত্যে প্রায় পঁচিশ বৎসরকাল তিনি ছাড়া আর কারো প্রাধান্য দেখা যায় না। সে কারণ বাংলা শিশুসাহিত্যে এই সময়টিকে আমরা বিদ্যাসাগর-যুগ বলার পক্ষপাতী।

শিশুসাহিত্যের সংজ্ঞা সম্বন্ধে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে কিঞ্চিৎ আলোচনা হয়, বিংশ শতাব্দীতেও মধ্যে মধ্যে হয়ে থাকে। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের "হাসিখুসী"র প্রথম প্রকাশে সুরেশ সমাজপতি লেখেন, যোগেন্দ্রবাবু···"সাহিত্যের আর এক দিকে যুগান্তর আনিলেন।" তিনি "শিশুসাহিত্য" শব্দটি ব্যবহার করেন নি। "হাসিখুসীর" প্রথম প্রকাশ বর্তমান শতাব্দীর প্রায় প্রারম্ভে। উনবিংশ শতাব্দীর বালকবালিকা-পাঠ্য কোন গ্রন্থ বা পত্রিকায়ও শব্দটি আমরা পাই না। না পাবার কারণ মনে হয়, অনেক গ্রন্থ বা রচনা সকল বয়সের লোকেরই পাঠ্য ছিল। তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত পরে উল্লেখ করেছি। আমাদের কালে বিদ্যায়তনের ছাত্র-ছাত্রীদের বয়স ভাগ করে, তাদের উদ্দেশ্যে রচিত সাহিত্যকে তদনুযায়ী নাম দেওয়া হয়, শিশুসাহিত্য ও কিশোরসাহিত্য।

বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দী পুস্তক "বেতালপচ্চৈসি" অবলম্বনে "বেতালপঞ্চবিংশতি" নামক গ্রন্থখানি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সিবিলিয়ান ছাত্রদের জন্য রচনা করেন। কিন্তু গ্রন্থখানি সকল বিদ্যালয়েরই পাঠ্য হয়, একথা গ্রন্থ-ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করেছেন। সেকালে গল্পপিপাসু বয়স্কগণের মধ্যেও গ্রন্থখানির বহু পাঠক ছিল। এমন হবার কারণ, রচনার ঔৎকর্ষ ও গল্প-উপন্যাসের অভাব। একালে "বেতালপঞ্চবিংশতির" পাঠকমহল বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিদ্যাসাগর-পূর্ব্ব যুগেও সাহিত্য রচিত হয়, কিন্তু সেগুলির প্রায় সমস্তই ছিল বিদ্যালয়ের পাঠ্য। বিংশ শতাব্দীতে বিদ্যালয়-পাঠ্য সাহিত্যের বাইরে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে যে সাহিত্য রচিত হয়, তাই শিশুসাহিত্য নামে অভিহিত। বিদ্যাসাগরযুগ পূর্ব্বের যুগকে এদিক দিয়ে সম্পূর্ণ অতিক্রম করে না। এই যুগে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণের উদ্দেশ্যে যে সকল সাহিত্য-পুস্তক রচিত হয়, সে সকলের অধিকাংশই ছিল পাঠশালা বা বিদ্যালয়ের পাঠ্য। এমন হবার কারণ, আর্থিক। বাংলা না শিখে ইংরেজী শিখলে চাকরী পাওয়া সহজ ছিল এবং তার ফলে জীবিকার সংস্থান হতো। সে জন্য বাংলা গ্রন্থপাঠে অভিভাবকেরা ছেলে-মেয়েদের উৎসাহ দিতেন না। তাই কেবল বিদ্যালয়ে যেটুকু না পড়লে নয় সেটুকুই তারা পড়ত। কাজেই বিদ্যাসাগরযুগের শিশুসাহিত্য ছিল পাঠ্যপুস্তকধর্ম্মী এবং সেগুলির প্রধান বিষয় ছিল, নীতি। সে যুগের অধিকাংশ সাহিত্য রচিত হয় নীতিশিক্ষাদানোদ্দেশ্যে। এই অবস্থা পূর্ব্বযুগেও ছিল। পরের যুগও এই বিষয়মুক্ত নয়। কিন্তু বিদ্যাসাগর-যুগে যে পনেরখানি বালক-বালিকা-পাঠ্য সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, সেগুলি নীতিশিক্ষার গণ্ডী ছাড়িয়ে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে পাঠক-পাঠিকাগণের মনকে বিস্তৃত করে। একমাত্র এইখানেই সে যুগের শিশুসাহিত্য ছিল মুক্ত, স্বাধীন। আবার, পাঠ্যপুস্তকধর্ম্মী হলেও সে যুগের শিশুসাহিত্য সরকারী নির্দ্দেশানুযায়ী বিষয় নির্ব্বাচন করে রচিত হ'ত না; কারণ, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে টেক্সট কমিটির মতো কোন সরকারী কমিটিও পুস্তক পরীক্ষার জন্য গঠিত হয় নি। ফলে গ্রন্থকারগণ বিষয়-নির্ব্বাচন ও রচনা বিষয়ে ছিলেন স্বাধীন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনাগুলির অধিকাংশই ছিল বালক-বালিকাগণের পাঠ্য, এ কথা সুপরিজ্ঞাত। এই সকল পুস্তক তিনি রচনা করেন ১৮৪৭ ও ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, তাঁর "আখ্যানমঞ্জরী" দ্বিতীয় ভাগ। এই সময়ের পর তিনি আর কোন বালক-বালিকা-পাঠ্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলে আমাদের জানা নেই। বালক-বালিকাদের জন্য তিনি যে সকল গ্রন্থ রচনা করেন সেগুলির অধিকাংশই ইংরেজী, হিন্দী বা সংস্কৃত গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত। "কথামালা" ও "জীবনচরিত" অবশ্য অনুবাদ। কিন্তু সে অনুবাদ এমন স্বচ্ছ, সাবলীল ও শ্রীমণ্ডিত যে, মনে হয় গল্পগুলির উপজীব্য ব্যতীত আর সমস্তই তাঁর নিজস্ব। অনুবাদ মূলের প্রতি নির্ভরশীল। তবে ভাবানুবাদ তা নয়। জীবনচরিতের অনুবাদ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উক্তি পরে উদ্ধৃত হয়েছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই রচনাগুলিকে দু'ভাগে বিভক্ত করলে এক ভাগে থাকে তাঁর শিশুসাহিত্য, যেমন বর্ণ পরিচয়, দ্বিতীয় ভাগ, কথামালা, অপর ভাগে কিশোর-সাহিত্য, যেমন জীবনচরিত, বেতালপঞ্চবিংশতি, আখ্যানমঞ্জরী, বোধোদয়, সীতার বনবাস প্রভৃতি। কিন্তু আমরা এই সমস্তগুলিকেই বালক-বালিকা-পাঠ্য সাহিত্যের অন্তর্গত করার পক্ষে। এই হিসাবে তিনি ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শিশুসাহিত্য রচয়িতা। তাঁর যুগে বালক-বালিকাদের জন্য এত গ্রন্থ আর কেউই রচনা

করেন নি। কেবল তাই নয়, গ্রন্থগুলি উৎকর্ষের দিক দিয়ে ছিল শ্রেষ্ঠ এবং আদর্শ রচনাস্বরূপ। তাঁর রচনার লক্ষ্য ছিল, "বালক-দিগের ভাষাজ্ঞান ও আনুষঙ্গিক নীতিজ্ঞান"—কেবলমাত্র নীতি-জ্ঞান দান নয়। সাহিত্য আনন্দ ও শিক্ষা দান করে, ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি করে থাকে। ভাষার রম্যতার অভাবে নীতিশিক্ষাদান ব্যর্থ।

তিনি ছিলেন অসাধারণ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও যুক্তিবাদী। ইংরেজী ভাষায়ও প্রচুর ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তার ফলে সেক্স-পীয়ারের গ্রন্থও অনুবাদ করেছিলেন। যুক্তিবাদিতাই তাঁকে বিজ্ঞানীদের চরিতকথা রচনায় আকৃষ্ট করে। তাঁর পূর্ব্বে আর কেউই জীবনচরিত, বিদেশীদের জীবনচরিত, রচনা করেন নি। তাঁরই আদর্শ গ্রহণ করে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেন—"নীতিবোধ"। নীতিবোধও অনুবাদ, কিন্তু জীবনচরিতের মতই অবিকল নয়। দেখা যায় উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার শিশুসাহিত্য গদ্য ও অনুবাদপ্রধান। কিন্তু অনুবাদকগণ কেউই অবিকল অনুবাদ করেন না। অবিকল অনুবাদের অসুবিধাগুলি সকলেই গ্রন্থ-ভূমিকায় ব্যক্ত করে ভাবানুবাদ করার কারণ ব্যক্ত করেছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর "জীবনচরিতে"র "বিজ্ঞাপনে" বলেছেন, "বাঙলায় ইংরেজীর অবিকল অনুবাদ করা দুরূহ কর্ম্ম; ভাষাদ্বয়ের রীতি ও রচনাপ্রণালী পরস্পর নিতান্ত বিপরীত; এই নিমিত্ত অনুবাদক অত্যন্ত সাবধান ও যত্নবান হইলেও অনুবাদিত গ্রন্থে রীতি বৈলক্ষণ্য, অর্থ প্রতীতির ব্যতিক্রম ও মূলার্থের বৈকল্য ঘটিয়া থাকে। আমি ঐ সমস্ত দোষ অতিক্রম করিবার আশায় অনেক স্থলে অবিকল অনুবাদ করি নাই।..."

কেবল যে ইংরেজী থেকে বাংলায় ভাষান্তরিত করবার বেলায় তখন এই রীতি অবলম্বন করা হয় তা নয়, উর্দু থেকে বাংলায় অনুবাদও এই ভাবেই করা হয়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "নীতিমালা" নামক গ্রন্থের ভূমিকার রচয়িতা "বিজ্ঞাপনে" বলেছেন, "নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক প্রসিদ্ধ পারস্য গ্রন্থ কিমিয়া সাদতের উর্দু অনুবাদ অকসির হেদায়েত নামক পুস্তক হইতে এই প্রথম ভাগ নীতিমালার প্রবন্ধ সকল গ্রহণ করা গেল। ইহা অনুবাদ মাত্র, কিন্তু সর্ব্বাংশ সম্পূর্ণ অবিকল অনুবাদ নহে।..."

জীবনচরিতের কিঞ্চিৎ এই—নিকলাস কোপর্ণিকাস

পূর্ব্বকালে কাল্ডিয়া, ইজিপ্ট, গ্রীস, ভারতবর্ষ প্রভৃতি নানা জনপদে জ্যোতির্বিদ্যার বিলক্ষণ অনুশীলন ছিল, কিন্তু খৃষ্টীয় শকের ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে, জ্যোতিষ্কগুলীর বিষয় বিশুদ্ধরূপে বিদিত হয় নাই। পূর্ব্বকালের পণ্ডিতগণের এই স্থির সিদ্ধান্ত ছিল যে, পৃথিবী স্থির ও অন্তরীক্ষ (?) বিক্ষিপ্ত জ্যোতিষ্ক সমুদায়ের মধ্যস্থিত চন্দ্র, শুক্র, মঙ্গল, সূর্য্য, অন্যান্য গ্রহগণ ও নক্ষত্র-মণ্ডল তাহার চতুর্দ্দিকে এক এক মণ্ডলাকার পথে পরিভ্রমণ করে..."
জীবনচরিতের সঙ্গে বহু বঙ্গবাসীর পরিচয়। তাই বাহুল্য বোধে অধিক উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন।

এই সঙ্গে বিদ্যাসাগর পূর্ব্বযুগের ভাষার তুলনা করলে বোঝা যায় বিদ্যাসাগর গদ্য রচনায় কিরূপ কল্যানৈপুণ্য প্রদর্শন করেন।

"স্বকীয় দেশপ্রতি স্নেহ

আপনার দেশ ও দেশস্থের প্রতি আদর ও মান্যতা ও ভক্তি ও স্নেহ অবশ্য কর্ত্তব্য ইহার দ্বারা সাধুতা হয় সাধুতা দ্বারা পরম জ্ঞান তদ্দারা পরম সুখ হয়। আর স্বদেশস্থ যদ্যপি নীচ ও নিন্দনীয় হয় তথাপি তাহাকে আদর করিবেন এবং স্বদেশ যদি মরুভূমি হয় তথাপি তাহাকে প্রশংসা করিবে..." (জ্ঞানচন্দ্রিকা। গোপাললাল মিত্র। প্রকাশকাল ১৮০৮ খৃষ্টাব্দ) বিদ্যাসাগরপূর্ব্ব-যুগের মৌলিক গদ্য রচনার ভাষা এইরূপ ছিল।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যেমন নিজে বালক-বালিকাগণের জন্য সাহিত্য রচনা করেন তেমনি অপরকেও এই মহৎ কর্ম্মে উৎসাহ দেন। তাঁদের মধ্যে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দ্বারকানাথ বিদ্যা-ভূষণের নাম উল্লেখযোগ্য। দ্বারকানাথকে তিনি বালক-বালিকাদের জন্য "ভাল ইতিহাস" রচনারও পরামর্শ দেন।

বিদ্যাসাগরযুগে শিশুসাহিত্যে ছোট গল্পে মৌলিকতার ভিত্তি স্থাপন করেন স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়। তাঁর "বর্ণপরিচয়" দ্বিতীয় ভাগে, "ভুবন ও তাহার মাসী" নামক গল্পটির ভাষা, সংলাপ ও প্লট অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচায়ক। এই গল্পটির পূর্ব্বে বাংলা-সাহিত্যে আর কোন মৌলিক ছোট গল্পের সন্ধান আমরা পাই না। কাজেই গল্পটিকে বাংলা-সাহিত্যে আদি মৌলিক ছোট গল্প বলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। বালক-বালিকাদের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় যা কিছু রচনা করেন সকলই সরস। সে কারণ চিত্তগ্রাহী। ঐ গল্পটির আদর্শেই দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর "নীতিসার" (১ম ও ২য় ভাগ) নামক পুস্তক দুখানির গল্পগুলি রচনা করেন। তবে সেগুলি প্লট ও সংলাপে ঐ গল্পটির তুল্য হয় না।

বিদ্যাসাগরযুগে জনকয়েক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতও বালক-বালিকা-দের জন্য ইংরেজী থেকে বাংলায় কয়েকখানি গ্রন্থ তর্জ্জমা করেন। তাঁদের মধ্যে রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ও মথুরানাথ তর্করত্নের নাম উল্লেখযোগ্য। স্থানাভাবে তাঁদের গ্রন্থগুলির আলোচনা করা গেল না। রামনারায়ণের "অদ্ভুত ইতিহাস" ও "নানকের জীবনচরিত" সেকালের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। শেষোক্তখানি ঠিক বালক-বালিকা-পাঠ্য ছিল না, কিন্তু এই গ্রন্থে গুরু নানকের জীবনকে যথার্থ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীতে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা হয়। এজন্য মূলের রচয়িতা পঞ্জাবের জনৈক ইংরেজ বিচারপতি বহুস্থান পর্য্যটন করে নানা তথ্য সংগ্রহ করেন। গ্রন্থখানির প্রকাশকাল ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ। আর "অদ্ভুত ইতিহাস" প্রকাশিত হয় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। মথুরানাথের "জীবনবৃত্তান্ত" প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে।

বিদ্যাসাগরযুগেই কলিকাতায় ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় বঙ্গানুবাদকসমাজ বা ভার্ণাকুলার লিটারেচার কমিটি। এই কমিটির

অন্যতম অধ্যক্ষ ছিলেন পাদ্রী জেমস লঙ। অনুবাদকসমাজ বালক-বালিকা ও প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকগণের উদ্দেশ্যে বিবিধ গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন। অনুবাদকসমাজের সহকারী কর্ম্মসচিব মধুসূদন মুখোপাধ্যায় ছিলেন বিদ্যাসাগরযুগের অন্যতম বিখ্যাত অনুবাদক ও শিশুসাহিত্যের রচয়িতা। তিনি বিবিধ গল্পপুস্তক ও সামান্য-জীবসম্বন্ধীয় ইংরেজী প্রবন্ধাবলী বাংলায় তর্জ্জমা করেন। তিনি কয়েকখানি মৌলিক পুস্তকও রচনা করেছিলেন। সেগুলির মধ্যে গার্হস্থ্য উপন্যাস "সুশীলার উপাখ্যান" অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। ডেনমার্কের বিখ্যাত রূপকথাকার হানস অ্যাণ্ডারসেনের জীবনকাল ১৮০৫ থেকে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ। মধুসূদন অ্যাণ্ডারসেনের জীবদ্দশাতেই তাঁর কতকগুলি রূপকথা "কুৎসিৎ হংসশাবক", "হংসরূপী রাজপুত্র", "চকমকির বাক্স", "চীনদেশীয় বুলবুল পক্ষীর বিবরণ" নাম দিয়ে ইংরেজী থেকে বাংলায় তর্জ্জমা করেন। এই সকল পুস্তক "বাংলা গার্হস্থ্য পুস্তক সংগ্রহ" প্রতিষ্ঠানে বিক্রয় হ'ত এবং সকল বয়সের গল্পরসপিপাসুগণের পিপাসা মিটাত। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী "হংস-রূপী রাজপুত্র" ও "চকমকির বাক্স" নামক গ্রন্থ দুইখানির কথা তাঁর "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজে" উল্লেখ করেছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এই সকল গ্রন্থই ছিল বাংলা গল্পপাঠকগণের সম্বল। গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয় ১৮৫৭-১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। পাদ্রী লঙ বাংলার বালক-বালিকাগণের সামান্যজীবসম্বন্ধে জ্ঞানবৃদ্ধিকল্পে বিবিধ ইংরেজী পুস্তক ও বাংলার কৃষক-ধীবরাদির কাছ থেকে নানা তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলি প্রবন্ধাকারে ইংরেজীতে রচনা করেন। কিন্তু রচনাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় না। মধুসূদন সেগুলিই বাংলায় তর্জ্জমা করেন এবং তা "জীবরহস্য" নামক দুইখানি গ্রন্থে ১৮৫৯-১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়। এই তিন বৎসরেই প্রাণিবিদ্যা-সম্বন্ধীয় আরও দুইখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সেগুলিও রচিত হয় বাংলার বালক-বালিকাদের জন্য। বাংলা পাঠশালা, পূর্ব্বের হিন্দু-কলেজ পাঠশালার শিক্ষক সাতকড়ি দত্ত রচিত "প্রাণিবৃত্তান্ত" (প্রথম ভাগ) প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে এবং তারকব্রহ্ম গুপ্ত রচিত "প্রাণিবিদ্যা" প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে। গ্রন্থ দুখানি কোন ইংরেজী গ্রন্থের তর্জ্জমা নয়, কিন্তু বিষয়টি কয়েকখানি ইংরেজী গ্রন্থ থেকে সকলিত। প্রাণিবৃত্তান্তের কিঞ্চিৎ।

"পশুদিগের বিবরণ।

সকল পশুর মধ্যে সিংহ অতিশয় বলবান ও পরাক্রান্ত; এজন্য লোকে ইহাকে পশুরাজ কহে। ইহার শরীর পিঙ্গলবর্ণ চিক্কণ লোমে আবৃত, ঘাড়ে লম্বা লম্বা কোঁকড়া কোঁকড়া লোম আছে, তাহাকে কেশর কহে। সিংহের শরীর উচ্চে তিন হাত; চক্ষু প্রায় গোল, বৃহৎ এবং হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল..." (প্রাণিবৃত্তান্ত)

সাতকড়ি দত্তের গ্রন্থখানির ভাষা সুখপাঠ্য, আলোচনাও চিত্তগ্রাহী।

প্রাণিবিজ্ঞান ছাড়াও পদার্থবিদ্যা, শারীরবিদ্যাদি শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেও গ্রন্থ রচিত হয়। সে গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন ঢাকা-নিবাসী প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থখানির নাম ছিল "বাল-বোধ"। গ্রন্থখানি ঢাকায় ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ-খানির রচনাগুলি ছিল মৌলিক।

বিদ্যাসাগরযুগেই বাংলার শিশুসাহিত্য বৈজ্ঞানিক বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সমৃদ্ধি লাভ করে। এইদিকে যাঁর দান সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান, যাঁর নাম কাল অতিক্রম করেও আমাদের কালে উজ্জ্বল, যাঁর রচনাবলী শিশুসাহিত্যে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে আদর্শস্বরূপ তিনি অক্ষয়কুমার দত্ত। অক্ষয়কুমারের বহু প্রবন্ধ "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তত্ত্ববোধিনী বালক-বালিকা-পাঠ্য পত্রিকা ছিল না। কিন্তু অক্ষয়কুমারের রচনায় ভাষা ও বিষয় এমনই ছিল যে, তা সকল বয়সের পাঠক-পাঠিকাগণের পাঠযোগ্য হতো এবং সকলের কাছেই ছিল জ্ঞানের আকরস্বরূপ। অক্ষয়কুমারের "চারু-পাঠের" প্রবন্ধাবলীর অধিকাংশ প্রথমে প্রকাশিত হয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এবং পরে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় গ্রন্থাকারে। "চারুপাঠ" তিন খণ্ডে বিভক্ত এবং তিনটি বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়।

"চারুপাঠ" ১ম ভাগে "স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন" নামক প্রবন্ধের কিঞ্চিৎ—

"একত্র সমাজ-বদ্ধ হইয়া বাস করা যেমন মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম এমন আর কোন জন্তুর নহে। যদিও অন্যান্য প্রাণীরও এ প্রকার স্বভাব দৃষ্টি করা যায়, তাহারা দলবদ্ধ হইয়া একত্র অবস্থান ও একত্র গমনাগমন করিতে ভালবাসে, কিন্তু মনুষ্য যেরূপ সকল বিষয়ে পরস্পর সাপেক্ষ, অন্য কোন প্রাণী সেরূপ নহে...।" অক্ষয়কুমারের রচনাশৈলী তাঁর নিজস্ব যদিও রাজনারায়ণ বসু তাঁর বক্তৃতামালায় বলেছেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তা প্রথম প্রথম সংশোধন করে দিতেন।

এই সময়েই প্রকাশিত হয় খৃষ্টান স্কুল বুক সোসাইটির "বঙ্গীয় পাঠাবলী।" বেঙ্গলী ইনসট্রাকটর বা হিতোপদেশ। গ্রন্থখানি চারটি খণ্ডে বিভক্ত ছিল এবং প্রকাশকালও চারটি বিভিন্ন সময়। আমরা তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড দেখেছি। গ্রন্থগুলিতে বিভিন্ন বিষয়ের সমাবেশ করা হয়েছিল। তৃতীয় খণ্ডে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ আছে। নিবন্ধগুলি প্রথমে প্রকাশিত হয়, জোয়াকিম মার্শম্যান সম্পাদিত ও ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "দিগদর্শন" নামক কিশোর-পাঠ্য মাসিক পত্রিকায়। কথিত হয়, নিবন্ধগুলি রাজা রামমোহন রায়ের রচনা। এইগুলি পরে রামমোহন রায়ের পত্রিকা "সংবাদ কৌমুদীতে" পুনঃ প্রকাশিত হয় তবে কিছুটা পরিবর্ত্তিত আকারে। "বঙ্গীয় পাঠাবলী"র রচয়িতা বা রচয়িতাগণ ঐ নিবন্ধগুলি "সংবাদ কৌমুদী" থেকেই সঙ্কলন করেন মনে হয়। এই থেকে দেখা যায় রাজা রামমোহনের দানেও উনবিংশ শতাব্দীর বালক-বালিকাপাঠ্য সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। বঙ্গীয় পাঠাবলী বিদ্যাসাগর-যুগেরই গ্রন্থ।

এর অনেক রচনাবলী ইংরেজীর অনুবাদ। স্কুল বুক সোসাইটি গ্রন্থের বিষয় প্রথমে ইংরেজীতে রচনা করে পরে তা বাংলায় তর্জমা করাতেন। "বঙ্গীয় পাঠাবলীর" কয়েকটি কবিতাও ইংরেজী থেকে অনূদিত। একটির অনুবাদক ছিলেন পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। স্থানাভাবে একটিও উদ্ধৃত করা গেল না। "বঙ্গীয় পাঠাবলী" তৃতীয় ভাগের কতকগুলি রচনা সেকালের জ্ঞানান্বেষণ, বিজ্ঞানসারসংগ্রহ, সমাচার দর্পণ, সংবাদ রসসাগর প্রভৃতি বয়স্কপাঠ্য সংবাদপত্র থেকে সঙ্কলিত। এই সকল রচনা অবশ্য মৌলিক, কিন্তু বিষয় সর্বদা বালক-বালিকাগণের উপযোগী ছিল এমন কথা বলা যায় না।

বিদ্যাসাগরযুগেই ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় তারাশঙ্কর তর্করত্নের বাণভট্ট রচিত "কাদম্বরী" ও ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসী কবি ফেনেলা রচিত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "টেলিমেকাস"। অনুবাদসাহিত্যে দুখানিই উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এবং এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীতে পাঠ্য ছিল। আবার ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় "হিতোপাখ্যানমালা"। গোলেস্তাঁ ও বুস্তা শেখ মশালুদ্দিন শাদীর অমর গ্রন্থ। হিতোপাখ্যানমালা এই দুখানি গ্রন্থের সুন্দর অনুবাদ।

অনুবাদ-গ্রন্থগুলির অধিকাংশই ছিল সুখপাঠ্য, সঙ্কলিত গ্রন্থগুলি রচনাগুণে ছিল উৎকৃষ্ট। বিদ্যাসাগরযুগে বালক-বালিকাগণের জন্য মৌলিক সাহিত্য-গ্রন্থ কিছু কিছু রচিত হয়। কিন্তু সেগুলির ভাষা ছিল সংস্কৃত-ঘেষা, কোন কোন রচয়িতা বাক্যের মধ্যে বা সমাপ্তিতেও বিরামচিহ্ন ব্যবহার করেন নি। জানি না সেকালে বালক-বালিকাগণের পক্ষে গ্রন্থগুলি সহজ পাঠ্য ছিল কিনা। একালে এমন রচনা অচল।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বালক-বালিকাগণের জন্য লেখনী ধারণের তিন বৎসর পরে ১৮৫০খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র কর্ম্মকারের পুস্তক "বালক-বোধকেতিহাস" প্রকাশিত হয়। প্রথমে পদ্যে একটি নীতিবাক্য, তার পর গদ্যে একটি গল্পে তার উদাহরণ এই রীতিতে গ্রন্থখানি রচিত। গল্পগুলি ভারতীয়। ভারতীয় গল্পের সঙ্কলন করে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ "জ্ঞানপ্রদীপ" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থখানি দুটি খণ্ডে বিভক্ত ছিল। এখানি প্রকাশিত হয় ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে আর প্রথমখানির প্রকাশকাল ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "জ্ঞানপ্রদীপে"র সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন, "বালক-দিগের শিক্ষার্থ বিবিধবিষয়ক প্রস্তাব ও দৃষ্টান্ত সকল।" প্রথম ভাগের তের বৎসর পরে দ্বিতীয় ভাগের প্রকাশে মনে হয়, গ্রন্থখানি পাঠকমহলে সমাদৃত হয় না। প্রথম খণ্ডের প্রথম গল্পের কিঞ্চিৎ উদ্ধৃতি দেওয়া গেল—"...এক সময়ে কোন গর্হিত ব্যাপার দর্শন করিয়া মহারাজ বিক্রমাদিত্য কালিদাসকে রাজসভা হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন তাহাতে কালিদাস অপমানিত হইয়া বিক্রমাদিত্যের অধিকার পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্দীপন রাজ্যে চন্দ্রকুমার নৃপতির নিকট উপস্থিত হইলেন। পণ্ডিত লোকের নীতি আছে কোন রাজার সহিত সাক্ষাৎকালে কবিতা পাঠ করিয়া ভূপতিকে আশীর্ব্বাদ করেন..."

বিদ্যাসাগরপূর্ব্ব-যুগে বালক-বালিকা পাঠ্য গ্রন্থের রচনা এর চেয়ে উৎকৃষ্ট ছিল না। কিন্তু বিদ্যাসাগরযুগে এমন রচনা, বিদ্যাসাগরের রচনাপাঠের পর আদরণীয় না হবারই কথা। সে কারণ ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত দ্বিতীয় খণ্ডেরও তেমন প্রসার হয় না। তুলনায় পুরানো মনে হয়। দ্বিতীয় খণ্ডের একটি গল্পের কিঞ্চিৎ এই—"চন্দ্রপ্রভা নামক মহারাজ্যে উগ্রতপা নামা এক ভূপতি ছিলেন ঐ পৃথীপাল স্বীয় প্রবল প্রতাপরূপ মহীবেদীর উপরিভাগে সিংহাসন স্থাপন করিয়া সসাগরা পৃথিবীর সম্রাট হইলেন, ফলতঃ সুশিক্ষিত সৈন্যাধ্যক্ষতা ও সংগ্রামক্ষমতায় উগ্রপ্রতাপ মহীপতির শাসন সময়ে সমকালীন লক্ষ লক্ষ ভূপালমধ্যে এত ক্ষমতাবান ছিলেন না..."

এই গ্রন্থেরই তিন বৎসর পূর্ব্বে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় মদনমোহন তর্কালঙ্কারের "শিশু শিক্ষা" তৃতীয় ভাগ। কিন্তু গ্রন্থের ভাষা এইরূপ—"গণ্ডার হস্তী অপেক্ষা আকারে ছোট; কিন্তু বল ও বিক্রমে তাহা অপেক্ষা নূন নহে। গণ্ডার হিংস্র জন্তু নহে; অথচ ভাল পোষ মানে না। কখনও কখনও ইহার এমন রাগ উপস্থিত হয় যে, কোন মতে সান্ত্বনা করা যায় না..." এই গ্রন্থের ভূমিকায় তর্কালঙ্কার বলেছেন, "অসম্বদ্ধ অবাস্তবিক বিষয় সকল প্রস্তাবিত না করিয়া সুসম্পন্ন নীতিগর্ভ আখ্যান সকল সম্বদ্ধ করা গেল।" বিদ্যাসাগর যুগের শেষ দিকে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে স্বর্ণকুমারী দেবী বালক-বালিকা-পাঠ্য "গল্প স্বল্প" নামক যে গ্রন্থ রচনা করেন, তার ভাষা তর্কলঙ্কারের ভাষার চেয়েও সহজ, সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ ছিল। তর্কলঙ্কারের গ্রন্থে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখনীর স্পর্শ ছিল। এ কথার উল্লেখ গ্রন্থের নামপৃষ্ঠায় দেখা যায়। আবার, এই বিদ্যাসাগরযুগেই রজনীকান্ত গুপ্ত বালক-বালিকাগণের জন্য গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর "আর্য্যকীর্ত্তির" প্রকাশকাল ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে। আর্য্যকীর্ত্তির ভাষায় শব্দাড়ম্বর সত্ত্বেও রচনায় লালিত্য আছে। স্থানাভাবে উদ্ধৃতি দেওয়া সম্ভব হ'ল না। এ বিষয়ে আমার যন্ত্রস্থ গ্রন্থ "শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য—১৮১৮-১৯১৮ খৃঃ"তে বিশদভাবে আলোচনা করেছি। বিদ্যাসাগরযুগের শিশু-সাহিত্য প্রধানতঃ ইংরেজী প্রভাবান্বিত। ইংরেজীর আদর্শে ইংরেজী থেকে বিষয় গ্রহণ করে এই সাহিত্য গড়ে উঠেছে এবং পূর্ব্বাপর একই অবস্থা চলে এসেছে।

এই যুগে যেমন গল্প, ইতিহাস, বিজ্ঞান-গ্রন্থ ও চরিতকথাদি রচিত হয়ে বাংলা শিশু-সাহিত্যের ভিত্তি দৃঢ় করেছে, তেমনি একটি-দুটি করে কবিতা-কুসুমও প্রস্ফুটিত হয়ে সাহিত্যকাননে সৌরভ বিতরণ করেছে যেগুলির কতকগুলি আজও অম্লান।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর "রসতরঙ্গিণী" নামক কবিতা-পুস্তক সেকালের একখানি সুপরিচিত গ্রন্থ। তাঁর পূর্ব্বে আর কেউ বাংলা শিশুসাহি

কোন মৌলিক কবিতা রচনা করেছিলেন বলে আমাদের জানা নেই। তখন কবি ঈশ্বরগুপ্তের কাল। কিন্তু তাঁরও কোন কবিতা বালক-বালিকাদের জন্য রচিত হয় বলে জানা যায় না। তর্কালঙ্কার প্রথম দিকে বেথুন স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তিনি শিশুদের জন্য রচনা করেন "শিশুশিক্ষা"। শিশুশিক্ষা তিন খণ্ডে বিভক্ত। গ্রন্থগুলির রচনাকাল ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দ। প্রথম খণ্ডের একটি কবিতা সেকালের ও একালের শিক্ষিতসমাজে পরিচিত—কবিতাটির প্রথম চরণ "পাখী সব করে রব" ইত্যাদি। এই কবিতাটির স্নিগ্ধ "প্রভাতী" সুর ও নির্মল রূপ পরবর্তীকালের অধিকাংশ শিশুপাঠ্য প্রভাতবর্ণনা-সম্বলিত কবিতায়ও অল্পবিস্তর পাওয়া যায়। কবি মোজাম্মেল হকই বাংলা শিশুসাহিত্যে প্রথম মুসলমান লেখক। তাঁর "পদ্যশিক্ষা" গ্রন্থের প্রথম কবিতা "প্রাতঃকালে" তর্কালঙ্কার যে প্রভাত দর্শন ও বর্ণন করেন তারই আলোক প্রতিফলিত। "পদ্যশিক্ষা" প্রকাশিত হয় শিশুশিক্ষার চল্লিশ বৎসর পরে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে। তর্কালঙ্কারের কবিতাটি প্রভাতের মতই শাশ্বতকালের ও নির্মল।

মাইকেল মধুসূদনও বালক-বালিকাদের জন্য কতকগুলি নীতি-মূলক কবিতা রচনা করেন। কবিতাগুলির রচনাকাল, যোগীন্দ্র-নাথ বসুর মতে "১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ"। তিনি বলেন, "নিজের অর্থাভাব দূর করিবার আশায়, বিদ্যালয়ে পাঠ্যগ্রন্থ হইবার জন্য, মধুসূদন তাহা রচনা করিয়াছিলেন।" সে সকল কবিতার মধ্যে "রসাল ও স্বর্ণলতিকা" ও "মেঘ ও চাতক" সুপরিচিত। আবার এইগুলির দুই বৎসর পরে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে আষাঢ় সংখ্যা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয় দীনবন্ধু মিত্রের প্রভাতবর্ণনাত্মক কবিতা "রাত পোহালো ফর্সা হলো" ইত্যাদি। এই সকল কবিতা আজও বাংলার বালক-বালিকা-পাঠ্য সাহিত্যে দেখা যায়।

সেকালে কবি রাজকৃষ্ণ রায় বাংলা-সাহিত্যে বেশ প্রসার করেছিলেন। তিনিও বালক-বালিকাদের জন্য বিবিধ বিষয়ের উপর কতকগুলি ছোট ছোট কবিতা রচনা করেন। এই সকল কবিতার সমষ্টি ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর "শিশুকবিতা" নামক গ্রন্থ। গ্রন্থখানি সচিত্র ছিল। শিশুকবিতা ছিল দুটি খণ্ডে বিভক্ত। রাজকৃষ্ণ রায়ের জীবন বিয়োগান্ত নাটকের মত। তাঁর কবিতাগুলির কথা লোকে বিস্মৃত। ঠিক তাঁরই মত বিস্মৃত সেকালের শিশু-সাহিত্য-রচয়িতা কবি যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়। তাঁর খ্যাতি ছিল যথেষ্ট, গ্রন্থের চলনও ছিল খুব, কিন্তু কবিতাগুলি ছিল কিছু গুরুগম্ভীর এবং উপমা ও যমকে সুকুমারমতি বালক-বালিকাগণের যোগ্য ছিল না। তাঁর "পদ্যপাঠের" পঁচিশটিরও অধিক সংস্করণ হয়। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর "পদ্যপাঠের" উনত্রিশ সংস্করণও আমরা দেখেছি এবং বিংশশতাব্দীর প্রথম ভাগে তাঁর সন্ধ্যাকালের বর্ণনাত্মক কবিতাটিও পাঠ করেছি। তার পর তা অতীতের অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ছিলেন বাংলার অন্যতম বিশিষ্ট শিশুসাহিত্য-রচয়িতা। তাঁর সকল রচনাই কবিতায়। তিনিও এই সময়ে "বাঙালীর ছবি" নামক শিশুপাঠ্য কবিতাবলীসম্বলিত একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থখানির প্রকাশকাল ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। আর ছয় বৎসর পরে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর "শিশুরঞ্জন রামায়ণ"। এই গ্রন্থই তাঁর বিংশশতাব্দীর গোড়ার দিকের বিখ্যাত গ্রন্থে "টুকটুকে রামায়ণের" সূচনা। সে সময়ে রচিত নবকৃষ্ণের অনেক-গুলি কবিতা এখনও বালক-বালিকারা সানন্দে পাঠ ও কণ্ঠস্থ করে।

প্রায় এই সময়েই ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় স্বর্ণকুমারী দেবীর "গল্প-স্বল্প"। এই গ্রন্থের "দ্বিপ্রহর" কবিতাটি সার্থক রচনা। কবিতাটি বাংলার শিশুসাহিত্যে উৎকৃষ্ট কবিতাবলীর অন্যতম। এমন বর্ণনাত্মক কবিতা শিশুসাহিত্যে অতি অল্পই রচিত হয়েছে।

> "দ্বিপ্রহর।
> নিস্তব্ধ নিঝুম দিক ;
> শ্রান্তিভরে অনিমিখ
> বসন্তের দ্বিপ্রহর বেলা।
> রবির অমল কর,
> শীতলিতে কলেবর
> সরোবরে করিতেছে খেলা…"
>
> (গল্প-স্বল্প)

এইভাবে বিদ্যাসাগরযুগে বাংলা শিশুসাহিত্য কবিতা-কুসুমে সমৃদ্ধ ও সুরভিত হয়ে ওঠে।

কেবল গ্রন্থেই নয়, শিশুপাঠ্য সাময়িক পত্রিকাও বিদ্যাসাগর-যুগের বালক-বালিকা-পাঠ্য সাহিত্যকে পুষ্ট করে। মাসিক, পাক্ষিক ও সাপ্তাহিকে এই যুগে পনেরোখানি শিশুপাঠ্য সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই যুগেই প্রকাশিত হয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পাক্ষিক, পরে মাসিক পত্রিকা "বালক-বন্ধু" (১৮৭৮ খ্রীঃ), বিহারী-লাল চক্রবর্তীর "অবোধবন্ধু" (১৮৬৮ খ্রীঃ), প্রমদাচরণ সেনের "সখা" (১৮৮৩ খ্রীঃ) ও জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর "বালক" (১৮৮৫ খ্রীঃ)। এই সকল পত্রিকার গদ্যে ও কবিতায় অনেক-গুলি উৎকৃষ্ট ও শাশ্বত রচনা প্রকাশিত হয়। এই সকল পত্রিকা পরবর্তীকালের শিশুপাঠ্য সাময়িক পত্রিকার পথনির্দেশ করে। এই সকল পত্রিকাপাঠেই জানা যায়, বাংলার বহু মনীষী বাংলা শিশু-সাহিত্যকে "ছেলেখেলা" বলে অবজ্ঞা করেন নি, অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এই সাহিত্য-রচনায় ব্যাপৃত হন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় বা অক্ষয়কুমার এই সকল পত্রিকার কোনটিতে যে নিজ রচনা দিয়েছেন, এমন নিদর্শন কোথাও পাওয়া যায় না। কোন পত্রিকার সঙ্গে তাঁদের যোগ ছিল বলে মনে হয় না।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তিরোধান হয় ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে। এই বৎসরেই জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত হয় যোগীন্দ্রনাথ সরকারের "হাসি ও খেলা"। এই গ্রন্থখানি বাংলা শিশুসাহিত্যে নবযুগের, বিদ্যাসাগরোত্তর যুগের সূচনা করে। সরকার মহাশয় গ্রন্থের প্রারম্ভে "নিবেদন" করছেন, "আমাদের দেশে বালক-বালিকাদিগের

উপযোগী স্কুলপাঠ্য পুস্তকের নিতান্ত অভাব না থাকিলেও গৃহপাঠ্য ও পুরস্কার-প্রদানযোগ্য সচিত্র পুস্তক একখানিও দেখা যায় না। এই অভাব কিয়ৎ পরিমাণে দূর করিবার জন্য 'হাসি ও খেলা' প্রকাশিত হইল।..."

এই গ্রন্থের দ্বারাই পাঠ্যপুস্তকের নিগড়ের বাইরে বালক-বালিকাদের জন্য সাহিত্যরচনার পথ উন্মুক্ত হয়। এর পরই বাংলা শিশুসাহিত্যে কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়। আর যোগীন্দ্রনাথ সরকারই নবযুগের পথিকৃৎ।*

* প্রবন্ধকারের "শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য" (১৮১৮-১৯১৮ খ্রীঃ) নামক যন্ত্রস্থ গ্রন্থের একাংশ।

সমাজদেবো ভব

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

'শরীরের কোন অঙ্গ ক্লিষ্ট হলে আমাদের সকল লক্ষ্য তাতে নিবদ্ধ হয়। উত্তম সমাজের হওয়া চাই শরীরের মত। সমাজের দুঃখী অঙ্গের দিকে সারা সমাজের লক্ষ্য নিবদ্ধ হওয়া চাই।'

উদ্ধৃত উক্তিটি বিনোবার। ভূদান-গ্রামদানের লক্ষ্য যে কি তা বিনোবার এই কথা হতে বোঝা যাবে। গ্রামদান নূতন সমাজ-রচনার কাজ।

আমাদের সমাজের দুঃখী অঙ্গের প্রতি সারা সমাজের নজর আছে কি? না অন্য সব দেশের সমাজেরই আছে? যদি থাকত তবে পথে ফেলা ভাতের কণা কুকুরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লোকে কুড়িয়ে খেত না, তবে পুলের নীচে মানুষের আশ্রয় নিতে হ'ত না, তবে হাসপাতালের দ্বারদেশে বিনা ওষুধে মানুষের রোগদীর্ণ দেহের খাঁচা ধূলায় লুটাত না, তবে পেটের তাড়নায় রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে লোকে চুরি করতে বেরুত না, আর ধরা পড়ে তাকে জেলে যেতে হ'ত না।

ধরুন, কোন লোক কাজ পাচ্ছে না। পুত্র-কন্যাকে খেতে দিতে পারছে না। চুরি করাকে সমাজ পাপ মনে করে। ঐ লোকটিও পাপ মনে করে। পেটের ক্ষুধায় শিশু পুত্র-কন্যাকে কাঁদতে দেখে সে পাগল হয়। তাদের জন্য কিছু সংগ্রহ করার জন্য রাত্রির অন্ধকারে সে বেরিয়ে পড়ে। সে ধরা পড়ে। বিচারকের বিচারে তার ছয় মাস কি নয় মাস জেল হয়। সাজা ত হ'ল। কিন্তু হ'ল কার? তার? না তার পুত্র-কন্যার? যাকে জেলে পাঠান হ'ল সে ত তিন বেলা ভরপেট খেতে পাবে। আর যাদের জন্য অপরাধী না হয়েও অপরাধীর মত কিছু সংগ্রহ করতে বেরিয়েছিল, তারা—তার নির্দোষ পুত্র-কন্যা-স্ত্রী ঘরে শুখাবে। একথা না ভাবলেন বিচারপতি আর না ভাবল সমাজ। উল্টা দেখুন: যারা কলে-কৌশলে, ছল-চাতুরীতে দিন দুপুরে চুরি করে, তারা সমাজে গণ্যমান্য সম্মানী লোক। এই ত সমাজের রূপ!

এবার রাষ্ট্রের দিকে ফিরুন। আমরা গণতন্ত্রের কথা বলি, ওয়েলফেয়ার ষ্টেটের কথা বলি, সোস্যালিজমের কথা বলি, কম্যুনিজমের কথা বলি। কিন্তু এই সব তন্ত্রে গণের স্থান কোথায়? তাকে পুছে কে, গণে কে? শাসন চলে জনকয়েকের খেয়াল-মর্জ্জিতে। হাঁ, গণ পাঁচ বছরে এক দিন রাজা—সেই দিনটি ভোটের দিন। ভোট ফুরল ত কাজী হয়ে যায় পাজী!

গণের বন্ধনমুক্তি না চায় ডেমোক্রেসি, না চায় ওয়েলফেয়ার ষ্টেট, না চায় সোস্যালিজম, না চায় কম্যুনিজম। যদি চাইত ত তাদের আচরণ হ'ত পিতার আচরণের মত। পিতা চান কি, করেন কি? পিতার অনুক্ষণের চিন্তা পুত্র কবে সাবালক হবে, তাঁর অনুক্ষণের চেষ্টা কি করলে পুত্র নিজ পায়ে দাঁড়াবে, তাঁর অনুক্ষণের প্রতীক্ষা কত শীঘ্র সংসারের সকল ভার, সকল দায় পুত্রের হাতে সঁপে দিয়ে তিনি মুক্ত হবেন। ডেমোক্রেসি বলুন, ওয়েলফেয়ার ষ্টেট বলুন, সোস্যালিষ্টিক ষ্টেট বলুন, আর কম্যুনিষ্ট ষ্টেটই বলুন—এদের সবারই দৃষ্টি ও ভাবনা পিতার দৃষ্টি ও ভাবনার বিপরীত। এরা চায় সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব, সর্ব্বকালের জন্য। এরূপ সমাজ ও এরূপ রাষ্ট্র দিয়ে এই যুগের কাজ চলতে পারে না। চলছেও না। মানুষ এগিয়ে গেছে; সমাজ ও রাষ্ট্র আছে পেছনে পড়ে। তাই চারিদিকে এমন অশান্তি। প্রয়োজন হয়েছে এ যুগের উপযোগী সমাজের রচনা, প্রয়োজন হয়েছে এ যুগের উপযোগী রাজনীতির প্রবর্ত্তনা। না, বলতে ভুল হ'ল। রাজনীতি নয়। তা ফেল হয়েছে। তার স্থানে চাই লোকনীতি। আর লোকনীতির আবাহনের জন্য চাই জনশক্তির বোধন। এই জনশক্তির বোধনের

জন্য বিনোবা আজ সাড়ে ছয় বছর গাঁয়ে গাঁয়ে নিরন্তর ঘুরছেন। ঐ বোধনের মন্ত্র হচ্ছে :

সমাজদেবো ভব

ব্যক্তি-মালিকানা ছাড়, সমাজকে সব কিছু অর্পণ কর। তার উপায় ভূদান-গ্রামদান। ভূদান-গ্রামদান সফল হলে প্রতিটি গ্রাম হবে এক-একটি ক্ষুদে পল্লীপ্রজাতন্ত্র—অন্ন-বস্ত্র ইত্যাদি জীবনের আবশ্যিক বস্তুতে স্বয়ং-স্বাবলম্বী, অন্য সব বিষয়ে একে অন্যের সহযোগী। তার মানে স্বরাজের যে পুঁটুলী লণ্ডন থেকে দিল্লীতে এসেছে তা আসবে গ্রাম-স্বরাজ্যের হাতে গ্রামবাসীদের জাগ্রত শক্তিতে। একেই বলেন বিনোবা শাসন ক্ষমতার বিভাজন, শাসন কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ। শিল্পও যথাসম্ভব বিকেন্দ্রিত হবে। তখন গণের বন্ধন ঘুচবে।

কিন্তু এ ত দেখছি সামাজিক বিপ্লবের কথা, রাজনৈতিক বিপ্লবের কথা! হাঁ, তাই। আমূল বিপ্লবের কথা! এই বিপ্লব সংঘটনের কাজই বিনোবা করছেন। বিনোবা বলেন :

'গাঁয়ে গাঁয়ে বিনোবা ঘুরছে না, ঘুরছে বিপ্লব!'

বিনোবা গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরছেন আর লোককে বলছেন—নারায়ণ, তুমি জাগো! তোমার বিধি-ব্যবস্থা তুমি নিজে কর, দিল্লীর দিকে, কলকাতার দিকে তাকিয়ে থাকলে তোমার চলবে না! অন্যে খেলে যেমন তোমার চলে না! তোমার ক্ষুধা পেয়েছে! আমি খেলে কি তোমার পেট ভরে, না তোমার দেহের পুষ্টিসাধন হয়? স্বাধীনতার কথায়ও তা-ই!

গরীবই ত দুনিয়ায় বেশী। তবু তারা মুষ্টিমেয় লোকের তাঁবে চিরকাল আছে। তার হেতু তারা—গরীব কৃষক, গরীব শ্রমিক—নিজেরাই নিজেদের শত্রুতা করছে! যার সামান্য একটু জমি আছে বা গুটিকয়েক টাকা আছে সেও নিজেকে মালিক মনে করে আর স্বপ্ন দেখে জমিদার হবে, পুঁজিপতি হবে। আর তাই যারা তাদের দুঃখের কারণ তাদেরই দ্বাররক্ষকের কাজ তারা করছে। যে মুহূর্তে এ কথাটা তারা বুঝবে ও ব্যক্তি-মালিকানা ছেড়ে সমাজদেবো হবে, সে মুহূর্তে তাদের মধ্যে লোকশক্তির স্ফুরণ হবে। ভূদান-গ্রামদান জনশক্তির সঞ্চারক, সঙ্ঘটক ও সঞ্চালক।

গ্রামদান কি? গ্রামের ভূমির মালিকানা এজমালী করলেই গ্রামদান হ'ল, তা নয়! গ্রামদানী গ্রামের সকলে—ধনী-দরিদ্র, স্বাক্ষর-নিরক্ষর, সবল-দুর্ব্বল সকলে—নিজ নিজ শক্তির এক অংশ গ্রামের কল্যাণের জন্য দিবে, এ হচ্ছে গ্রামদানের মুখ্য কথা! এখানে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, গান্ধীর তথা বিনোবার ভাষায় হ্যাভ-নট (সম্পদহীন) কথাটি নাই! সকলেই হ্যাভ বা সম্পদশালী। কারও জমি আছে ত কারও ধন, কারও শারীরিক শক্তি আছে ত কারও আছে বুদ্ধিশক্তি। যার যা আছে তা দিয়ে সে সমাজের সেবা করবে আর সমাজ-দেবতার কথা ভাববে। অতএব সঞ্চয়ের কথা আজকের মত লোকের ভাবতে হবে না। সঞ্চয়-বৃত্তি থাকবে না, তাই চৌর্যবৃত্তিও থাকবে না। কারণ সঞ্চয় চৌর্য্যের জনক। বিনোবার কথায় বললে :

চুরি পাপ হয় ত সঞ্চয় তার বাপ

এখানে প্রশ্ন হবে : সঞ্চয় করতে পাবে না ত লোকে খাটতে যাবে কেন? ছোট ছেলে-মেয়ে ভাল কিছু করে ত মা বলেন, সাবাশ! আর আদর করে পিঠে হাত বুলিয়ে দেন। তাতে মায়ের কাজ করার উৎসাহ তাদের বাড়ে। সমাজের জন্য যে যত বেশী কাজ করবে, সমাজদেব সাবাশ! বলে তার পিঠে তত বেশী হাত বুলোবে, তাকে তত বেশী সম্মান দেবে।

গ্রামদানে সকলের কল্যাণ হবে। ধনীও উন্নত হবে, গরীবও উন্নত হবে। ধনী পরিহার করবে তার মান-অভিমান; আর গরীব পরিহার করবে তার দীনতা। আজ কে নিজকে মনে করে বড়, আর কে নিজকে মনে করে দীন? আজ ধনী ক্ষয় হয় আলস্যে, বিলাস-ব্যসনে, অতি ভোজনে আর গরীব ক্ষয় হয় অতি খাটুনিতে ও পুষ্টির অভাবে। গ্রামদানে এই দুই ক্ষয়ই নিবারিত হবে। সমাজের দুঃস্থ অঙ্গের দিকে সারা সমাজের নজর যাবে। তাই গ্রামদান হবে

'অঞ্জুলিগত সুভ সুমন জিমি সম সুগন্ধ কর দৌত।'

অঞ্জলিবদ্ধ সুগন্ধ পুষ্পের মত উভয় হস্তকেই তাহা সমান সুগন্ধ করবে।

আজ আমাদের দশা দয়নীয়। আংশিক অজন্মা হয় ত অন্য দেশের দোরে ভিক্ষা-পাত্র হাতে আমাদের ধন্না দিতে হয়। ওদিকে চাষবাস উপেক্ষিত। যেখানে তিন দানা ফলতে পারে সেখানে এক দানা ফলাই। তার কারণ, জমি যারা চাষ করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জমি তাদের নয়। পরের জমিতে তারা সোনা ফলাতে যাবে কেন! ঠেকার বেগার তারা খাটে। দেহে সে অশক্ত, মনে সে অতুষ্ট। তার হালের গরুও তার মতই অশক্ত। জমিতে সার দেওয়ার শক্তি তার নেই। অন্য দিকে যাদের সেই সংগতি আছে সেই বহু জমির মালিকেরা এদিকে উদাসীন। তারা জানে যেমন-তেমন ভাবে চাষ-আবাদ হলেও তাদের ঘরে সংবৎসরের খোরাক আর তদতিরিক্তও আসবে। বহু জমির মালিকদের অনেকেই শহরবাসী। তাদের অন্য ধান্দা আছে। জমি হতে যা পায় তা তাদের কাছে উপরিপাওনা। তাই জমির দিকে তাদের নজর নেই। জমি থেকে যা আসে তা-ই তাদের দৃষ্টিতে লাভ। দেশের ক্ষতির খতিয়ান টানার গরজ তাদের নেই। তাই ত আমাদের অন্নাভাব। গ্রামদানে চিত্র বদলে যাবে। তখন উভয়েই হবে জমির সেবায় আগ্রহশীল। আর সেবায় তুষ্ট ভূমি তখন বরদান করবে, দেশের অন্নের অভাব মিটবে। মঙ্গরোটে (প্রথম গ্রামদানী গ্রাম) সে সূচনা দেখা যাচ্ছে।

অন্য দিকেও গ্রামের রূপ বদলাবে। মামলা-মকদ্দমা করে গ্রামের লোকে তখন আজকের মত সর্ব্বস্বান্ত হবে না। মহাজনের

করলে পড়েও তাকে ফতুর হতে হবে না। তা ছাড়া পুরাতন পল্লীশিল্প সঞ্জীবিত ও নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হবে। অশান্তি যাবে, শান্তি আসবে। তাই গ্রামদান, বিত্তদান, শ্রমদান ইত্যাদির দানপত্রকে বিনোবা বিশ্ব-শান্তির ভোটপত্র বলেন।

সবই হ'ল। কিন্তু কাজটা কি এতই সহজ! সহজ মোটেই নয়! উল্টা, অতি কঠিন। সহজ যদি হবে তবে গান্ধীর মত, বিনোবার মত লোকে এ কাজ করতে যাবেন কেন? সৃষ্টির কাজ কোনও দিন সহজ নয়। ভূ-দান—গ্রামদান নব রচনার কাজ, নব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির কাজ—সে ব্রহ্মাণ্ড হচ্ছে সর্কোদয় ব্রহ্মাণ্ড। ব্রহ্মাণ্ড মানে বিশাল কল্পনা, বিশাল প্রচেষ্টা। বিনোবা নূতন মূল্যমান সৃষ্টি করছেন, সৃষ্টি করছেন নূতন পরিবেশ: বিনোবা নূতন মানুষ, নূতন সমাজ গড়ছেন। আমরা ভাগ্যবান, এমন পুরুষার্থের কাজ আমাদের সামনে উপস্থিত। মনে পড়ে কোন আমেরিকাবাসীর সঙ্গে কথোপকথন প্রসঙ্গে জনৈক নরওয়েবাসীর একটি উক্তি:

আমেরিকান ভদ্রলোক—আপনাদের দেশ একরত্তি দেশ। কিন্তু এত এত বড় লোক এখানে জন্মেছেন—আশ্চর্য্য!

নরওয়েবাসী ভদ্রলোক—Our adversities are our strength—আমাদের আপদ-বিপদই আমাদের মঙ্গল।

নরওয়েবাসী ভদ্রলোকের মত আমাদের বলতে হবে, কঠিনের সাধনাই আমাদের সাধনা। জাতি ওঠে কঠিনের সাধনায়, জাতি ডোবে সহজের সাধনায়, ভোগ-বিলাসে। ভোগ-উপভোগ ত পশুও করে! পশু নিজের কথা, নিজ শাবকের কথা ভাবে। তার বাইরে পশুর ভাবনা প্রসারিত হয় না। তাই সে পশু। মানুষ নিজের কথা ছাড়া নিজ সন্তান-সন্ততির কথা ছাড়াও অপরের কথা ভাবে। আর তাই সে মানুষ। যে সমাজের লোকে অন্যের কথা যত বেশী ভাবে সে সমাজ তত উত্তম, তত উন্নত। গ্রামদানের লক্ষ্য উত্তমতম সমাজের রচনা, উন্নততম সমাজের রচনা। সে সমাজ সকলের কথা ভাববে। সে সমাজের সকলের দৃষ্টি সর্ব্বাগ্রে নিবদ্ধ হবে দুঃস্থ অঙ্গের ওপর।

ঘরে ঘরে যেমন রামায়ণের চর্চ্চা চলে, গ্রামে গ্রামে এখন তেমন গ্রামায়ণের চর্চ্চা চলবে।

সমাজদেবো ভব

বীর গৌরব

শ্রীকালিদাস রায়

দুঃখ দুর্যোগের কথা জীবনের যত আমি স্মরি
ভাবি তবু বেঁচে আছি, যাই নাই মরি।
বুঝিয়াছি বহুবার বহু শঙ্কা সঙ্কটের সাথে
স্বেদসিক্ত এই রিক্ত হাতে।
বিজয়ী হয়েছি আমি পড়িয়াছি বীরের গৌরব,
স্মরি যবে আপনার প্রতি শ্রদ্ধা করি অনুভব।
সুপ্তশক্তি জাগিয়াছে। পাইয়াছি তার পরিচয়,
শক্তির প্রয়োগে মোর জন্মিয়াছে এ আত্মপ্রত্যয়।

আনন্দ পেয়েছি দুঃখ বিপদের রণভঙ্গী দানে
এ আনন্দ বীরভোগ্য, তাহা কে না জানে?
বিজয়ানন্দের মত কি আনন্দ আছে?
বীরবৃন্দ তাই বুঝি সন্ধি নয়, বিগ্রহই যাচে।
ক্ষতচিহ্ন পরম্পরা শোভে বক্ষে জয়মাল্যসম,
কবচকুণ্ডল যেন রাধেয়ের, অঙ্গীভূত মম।
এ সংসার রণাঙ্গন, দুঃখ দিয়া গড়া এ জগতী,
আনন্দ ত দুঃখ জয়, দুঃখেরি বিরতি।

দ্বিতীয় চর্ম্মের মত বর্ম পরি শিবিরে শয়ান
আছি আমি, শরভরা তূণীরেরে করি উপাধান।

শ্মশানবন্ধু

শ্রীঅশোককুমার গুপ্ত

অতিথির শেষ নেই শঙ্কামারীতে। শেষ নেই মানুষের জন্ম-মৃত্যুর।

ভোর রাতে ছোট কাকীমার বোন সুরুচি মাসী মারা গেলেন। মৃতদেহ নিয়ে শঙ্কামারীতে পৌছতে পৌছতে দুপুর হ'ল।

অভ্যাস মত নূতন অতিথির সাড়া পেয়েই ছুটে এল পুরন্দর চক্রবর্ত্তী। স্বভাব মত জিজ্ঞেস করল, মরে বাঁচল কে স্যার?

হেসে বললাম, বর্ষীয়সী। হার্টের রুগী।

শুনে পুরন্দর চক্রবর্ত্তীও হাসল। বড় বড় দাড়ি আর মোচের ফাঁকে একটু হাসি। বুদ্ধিদীপ্ত বড় বড় চোখ দুটি কৌতুকে জ্বল-জ্বল করে উঠল। বলল, সুন্দর বলেছেন স্যার। এমন কথা অনেকদিন শুনিনি। এখানে এসে লোক ত হাসে না, কাঁদে।

রেজিষ্ট্রারের ঘরের পাশে বাঁকা নিমগাছটার তলায় এসে আমরা বসলাম। আমি আর পুরন্দর চক্রবর্ত্তী।

সামনে ক্ষীণকটি করতোয়া। শান্ত, স্তব্ধ। মাথার উপর নিঃশব্দ নিমগাছের পাতা। চারিদিকে ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। ওপাশে তখনও একটা চিতা জ্বলছে। গলগল করে ধোঁয়া উঠে একটুকরো আকাশ কালোয় কালো হয়ে গেছে।

পরিচয় জিজ্ঞেস করতে পুরন্দর চক্রবর্ত্তী বলল, ওসব বাদ দিন স্যার। আসল পরিচয় আমাদের কাজে। আমরা শ্মশানবন্ধু। আমি আর ঐ বুড়ী ত্রিলোচনী। সাপ আর বেজী। সময় অসময়ে মড়া নিয়ে যারা আসে, সাহায্য করি তাদের। তবে এ্যামেচার নই, প্রফেশনাল।

সাপের সান্নিধ্যে বসেছিলাম, বেজীকে চিনতেও কষ্ট হ'ল না। সমস্ত শ্মশানে ঐ একটি মাত্র মেয়েমানুষ। প্রেতমূর্ত্তির মত, ঐ দূরে, যেখানে চিতা জ্বলছে তার কাছাকাছিই, তিনটে ইটের উপর একটা হাঁড়ি চাপিয়ে বসে ছিল ও।

—ঐ দেখুন স্যার, বুড়ি কেমন পিটপিট করে চাইছে এদিকে। ভাত রাঁধছে, নইলে দেখতেন কেমন ছুটোছুটি সুরু করে দিত। এই নিয়ে এর আগে কতদিন ঝগড়া হয়ে গেছে ওর সঙ্গে আমার। শকুনের মত তুচ্ছ চাওয়া-পাওয়া নিয়ে ঝগড়া। কাড়াকাড়ি। কিন্তু এখন আর ওসব হয় না।

—কি করে মিটলো এমন ঝগড়া?

বুড়ী নিজেই মিটমাট করে নিল স্যার। সেদিন সন্ধ্যায় এই নিমগাছটার নীচেই বসেছিল ও। কাছে ডাক দিয়ে বলল, বস না। কথা আছে তোর সঙ্গে।

বসতে বসতে বললাম, কি কথা রে বুড়ী? তোর মতলবটা কি?

ফোকলা দাঁতে হাসল বুড়ী। বলল কি জানেন স্যার?

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে বললাম, কি বলল?

কানের পাশে রাখা আধ-খাওয়া বিড়িটা ঠোঁটের ভাজে গুঁজে দিয়ে, নাক দিয়ে একরাশ ধোঁয়া বের করে দিল পুরন্দর চক্রবর্ত্তী। এত কেন তুচ্ছতার ভীড় রে আমাদের জীবনে?

সেদিন ওর কথা শুনে অবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম স্যার। সামনে করতোয়ার জল মাঝে মাঝে আনন্দে কলকল করে উঠছিল। নিম-গাছের পাতাগুলো বিকেলের অনুরাগে মৃদু মৃদু কাঁপছিল। দুপুর থেকে কোন মড়া আর পোড়েনি সেদিন। বাতাস বিকেলে তাই বোধ হয় হ'ল উতলা।

বুড়ীর যে কি হয়েছিল সেদিন। একটু থেমে আবার বলল, জীবনে বড় দুঃখ পেয়েছিস না রে? আমিও পেয়েছি বড়। ভালই হয়েছে রে এতে, জানবি ভালই হয়েছে। আত্মপরীক্ষার বড় একটা সুযোগ মিলেছে জীবনে।

সুযোগ নয়, শাস্তি। শুধু শাস্তিই ও ভোগ করে এসেছে এতদিন জীবনের সবচেয়ে বড় অংশটা। কথায় কথায় পরে একদিন সামান্য একটু আভাস দিয়েছিল বুড়ী আমাকে।

এইটুকু বলে পুরন্দর চক্রবর্ত্তী আবার একটু থামল। বিড়ির শেষটুকু দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে করতোয়ার দিকে চেয়ে রইল কিছু-ক্ষণ। তার পর বলল, কি শাস্তি পেল জানেন স্যার? ব্যভিচারিণীর শাস্তি। অন্যায় আর অযৌক্তিক সন্দেহে ওকে ত্যাগ করল ওর স্বামী।

সে সব অনেক কথা স্যার। সব কথা আমাকে ও বলেনি। আমিও শুনতে চাইনি। তবে এইটুকু বুঝেছিলাম, ভাঙা জিনিস আর জোড়া লাগে না। বুড়ীর জীবনেও লাগেনি। সেদিন, সেই প্রথম বুড়ী যখন কাছে ডাকল আমাকে, এত সব কথা তখন আর জানা ছিল না, তাই বেশ একটু অবাক্ হয়ে চেয়েছিলাম ওর মুখের দিকে।

প্রসারিত দৃষ্টির মাঝে আশ্চর্য্য ভাব-গম্ভীর লাগছিল ওর মুখটা। মনে মনে হাসছিল বুড়ী। আপন মনেই হাসছিল। আরও কয়েকবার হেসে নিল বুড়ী। তার পর চোখ নামিয়ে এনে বলল, সুখের শয্যা ত আর সবারই হয় না রে, আমারও হয় নি। সে যাক গে। আজ দুপুরে ত তোর খাওয়া হয় নি, না?

খদ্দের নিয়ে যার সঙ্গে এত কাড়াকাড়ি আর মারামারি, শেষে

তার চোখেও ধরা পড়ল, আমার খাওয়া হয়নি। ভাবতে গিয়ে কেমন একটু লজ্জা হ'ল, বললাম—কে বলল? খেয়েছি ত?

—মিথ্যে বলিস কেন রে? তোর যে পয়সা নেই, তা কি জানি না আমি? আমার কাছে আছে, নিবি?

তার পর আর কি বলব স্যার, আপত্তির আর অপেক্ষা রাখল না বুড়ী। নোংরা আঁচলের খুঁট থেকে পাঁচ আনা পয়সা বের করে গুঁজে দিল আমার হাতে। যা, খেয়ে আয় কিছু।

দু' পা এগিয়েছি আবার ডাক দিল বুড়ী—এই শোন্।

কাছে গিয়ে দাঁড়াতে বলল, দেখ ঝগড়া-ঝাঁটি ভাল না। কাল থেকে যত মড়া আসবে, পুরুষ হলে হবে তোর। আর মেয়ে হলে আমার। বুঝলি?

কথা রেখেছে বুড়ী। সেদিন থেকে মড়া নিয়ে আর কাড়াকাড়ি করে নি। কিন্তু ঝগড়ার একটুও কমতি হয়নি স্যার। খুঁটিনাটি নিয়ে লেগেই আছে ওতে আর আমাতে।

এখানেই থামল পুরন্দর চক্রবর্তী। ভাব দেখে মনে হ'ল আরও অনেক কথাই বলবে ও।

শঙ্কামারীর নিস্তব্ধ তপ্ত বিষণ্ণতার উপর বিকেলের শান্ত ছায়া নামল। বাতাসের ছোঁয়ায় করতোয়ার জল শিহরিত হ'ল। এক ঝাঁক পাখী উড়ে গেল আকাশে। মনে হ'ল একরাশ মেঘ নিম-গাছের মাথার উপর থেকে দূরে সরে গেল।

আরও অনেক কথাই হয়ত বলত পুরন্দর চক্রবর্তী। কিন্তু তা আর বলা হ'ল না। বুড়ী ত্রিলোচনীকে এগিয়ে আসতে দেখেই উঠে দাঁড়াল। চলি স্যার। ও আবার সন্দেহ করবে আমাকে।

ঠিক কথাই ভেবেছিল পুরন্দর চক্রবর্তী। বিড় বিড় করে অনেক কথাই বলতে বলতে এগিয়ে এল বুড়ী। শত্তুর শত্তুর, আর জন্মে ও শত্তুর ছিল এ জন্মেও জ্বালাতে এসেছে। হ্যাগো দাদাবাবুরা, কি বলছিল আমার নামে ঐ পাগলটা।

যতই তিক্ততা থাক ওর কথাগুলোয়, প্রশ্নটা কিন্তু অনেক শান্ত মনে হ'ল।

ইসারায় বসতে বললাম ওকে।

আমাদের কাছাকাছিই একটুকরো ঘাসের জমির উপর পা ছড়িয়ে বসে পড়ল বুড়ী। প্রশ্নটার উত্তর পর্যন্ত চাইল না।

চাইবে না, আমি জানতাম। অন্তত ভাব দেখে ত তাই মনে হয়েছিল আমার।

নিস্তেজ সূর্য্যের ম্রিয়মান আলো ঠিকরে পড়েছিল তখন করতোয়ার জলে হঠাৎ কেমন চুপ করে গিয়েছিল বুড়ী ত্রিলোচনী।

আর কেন জানি না, আশ্চর্য্য সুন্দর দেখাচ্ছিল বুড়ী ত্রিলোচনীকে। সৌম্য, শান্ত মূর্ত্তি। যৌবনে যে রূপ ছিল, গোলাপের রং ছিল ঠোঁটে—বুঝতে কষ্ট হয় না।

অনেকক্ষণ পর বুড়ী ত্রিলোচনী বিড় বিড় করে উঠল আবার: পাগল, পাগল।

—কে পাগল, কোথায় পাগল?

—ঐ যে গো, ছোকরা পুরন্দর। ওর কথাই ত বলছি।

মুখ ঘুরিয়ে বসল বুড়ী ত্রিলোচনী। সে কি কান্না সেদিন ওর, বাপ রে, থামতেই চায় না কিছুতে। সারা রাত ধরে চলল কান্না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল বেচারী।

—কেন, কি হয়েছিল সেদিন ওর। হঠাৎ যে কাঁদতে গেল!

—সে কি বলতে চায় দাদাবাবু! যত বলি শোন শোন, কি হয়েছে বল। মাথা আর ওঠায় না পাগলটা। ওঠালও না। পরদিন ভোরে একটু শান্ত হ'লে যখন জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছিল রে তোর?

ও হাসল। বড় করুণ দেখাল ওকে। অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল, কাল বিকেলে যে মেয়েমানুষটাকে পোড়াতে এসেছিল, দেখেছিস তাকে?

—ঐ অল্পবয়সী বউটা ত?

পুরন্দর মাথা নাড়ল।

বললাম, কেন রে? তোর বুঝি কেউ হয়?

হঠাৎ সজল হয়ে এল ওর দুটো চোখ। ফ্যাকাসে হাসি জেগে উঠল ঠোঁটের কোণে। ধরা গলায় বললে, হ্যাঁ।

—তা, পোড়াতে যখন নিয়ে এল, পালিয়ে এলি কেন?

উত্তর দিল না ছোকরা।

দু-চোখ থেকে দু ফোঁটা জল শুধু গড়িয়ে পড়ল ওর।

—এত যে কাঁদছিস, খুব বুঝি আপনার লোক ছিল মেয়েটা?

আবার মাথা নাড়ল পুরন্দর।

এবার সন্দেহ হ'ল, বললাম, ভালবেসেছিলি বুঝি?

চোখ দুটো মাটিতে নামিয়ে নিল ছোকরা।

—দেহের সৌন্দর্য্য এই আছে, এই নেই। ভুলেছিলি ত! পেলি না কেন?

—সে সব অনেক কথা। শুনে কি করবি রে বুড়ি?

—মনের কথা শোনবারও লোক চাই, বুঝলি? না হয় বললিই, তা হয়েছে কি?

আর আপত্তি জানাল না পুরন্দর। কিন্তু চুপ করে রইল অনেকক্ষণ। তার পর ফিসফিস করে বলল, চেষ্টা ত করেছিলাম। কিন্তু পেলাম কৈ?

—ভালবাসা পেলি না অথচ ভালবাসলি, কেমন লোক রে তুই? আর মেয়েটাই বা কেমন। কি বলেছিল তোকে?

—খুব স্পষ্ট করে বলেছিল, মেয়েদের ভালবাসা পেতে হলে আগে চাই রূপ। তোমার আছে কি যে ভালবাসব তোমাকে। গোলাপের চেয়ে চন্দ্রমল্লিকার দাম আমার কাছে অনেক বেশী।

রূপ, রূপ। কোথায় পাব রূপ, বুকের ভেতরটাই শুধু জ্বলেপুড়ে গেল। এসিডের শিশি নিয়ে কয়েকবার নাড়াচাড়া করলাম, কিন্তু…।

এই পর্য্যন্তই। এর বেশী আর একটা কথাও সেদিন বলল না পুরন্দর।

বললাম, কিন্তু, কিছুতেই মরতে পারলি না, না রে? মুক্তি খুঁজেছিলি, পেলি না। মুক্তি একমাত্র মৃত্যুতেই। কর্ম্ম আর ভোগের শেষ না হলে সে মৃত্যু ত আসবে না।

শুনে চুপ করে রইল পুরন্দর।

পরে একদিন আবার জিজ্ঞেস করলাম ওকে, হ্যাঁরে, সবই ত বুঝলাম। কিন্তু ফুলের বনে আগুন লাগল কি করে, জানিস?

প্রথমে বুঝতে পারল না পুরন্দর। কি কথা বলছি, কার কথা বলছি। পরে বুঝতে পেরে বলল, আগুন এমনি লাগে নি, লাগিয়ে দিয়েছে কেউ।

চমকে উঠে বললাম, বলিস কি?

অনেকক্ষণ পরে ও বলল, হ্যাঁ, ঠিক কথাই বলেছি। না হ'লে পাগলের মত এত কেন ছুটোছুটি করে মরব। পালিয়ে বেড়াব।

—পারলি? এতটা নির্দ্দয় হতে পারলি তুই? এত না ভালবেসেছিলি মেয়েটাকে।

—পারলাম। ভালবাসায় মানুষ বোধ হয় সবকিছু করতে পারে। তার পর একটু চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে পুরন্দর বলে গেল সে কাহিনী।

"সে একটা রাত। আবছা চাঁদ জেগেছিল আকাশে। বুকের ভিতরটা অসম্ভব জ্বালাপোড়া করছিল। কয়দিন থেকেই করেছে। প্রত্যাখ্যানের জ্বালা, ভালবাসার জ্বালা। বিনিদ্র রাত্রিযাপনের মধ্যে শুধু বেদনাবোধ আর অসহায় মনের তীব্র আকুতি। বড় একটা ব্যর্থতা। আর কিছু নয়, বা অন্য কোন ভাবনা নয়। তবু সে রাতেই সেই প্রথম হঠাৎ জেগে উঠল সে প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবার মনোবৃত্তি। আর ধরে রাখতে পারলাম না নিজেকে। এসিডের শিশিটা পকেটে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে পড়লাম ঘর থেকে।

দোতালায় ওর নিজের ঘরে অঘোরে ঘুমোচ্ছিল চন্দ্রা। একটুকরো জ্যোৎস্নার মত পড়েছিল ও। সব চেনা, সব জানা। এমন কি ও-যে দক্ষিণ দিকে মাথা দিয়ে শোয় তাও। শুধু মনটাই জানতে ছিল বাকি। মস্ত বড় একটা ফাক।

প্রথমেই স্পষ্ট চোখে পড়ল ওর মুখটা। ঘুমন্ত মুখ। এত সুন্দর, এত শান্ত! ঐ রূপের মাঝেই ত অপরূপ হতে চেয়েছিলাম। ব্যর্থ হ'ল উপাসনা, ফকির হতে হ'ল উপাসককে। প্রত্যাখ্যানের ভাষাগুলো আবার মনে হ'ল। মনের ভিতরে কে যেন বিষ ঢেলে দিল কিছুটা।

"তুমি নীচ, তুমি অনেক ছোট। আমার রূপের মর্য্যাদা তুমি দিতে পারবে না। পারবে শুধু সৌন্দর্য্যকে নষ্ট করে দিতে।"

মাথার ভিতর আবার জ্বলে উঠল আগুন। মনে মনে বললাম, রূপ তোমার বেশী হয়ে গেছে চন্দ্রা! স্নিগ্ধ হ'লে তাও ছিল কথা কিন্তু এ যে পুড়িয়ে মারবে! আর নয়, আর এক মুহূর্ত্ত নয়, এসিডের শিশি সমেত হাতটা ঢুকিয়ে দিলাম জানলা দিয়ে। হাত কাঁপছে, মাথা ঘুরছে—পারছি না, কিছুতেই—কিছুতেই পারছি না ঢেলে দিতে। মনটা হঠাৎ যেন দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে।

না, না পারব না। হাত টেনে আনছি আবার। হঠাৎ একটু বেশী রকমই কেঁপে উঠল হাত। বেশ কিছুটা এসিড ছলকে পড়ল ওর বাঁ-হাতটায়। সারাটা দেহ কেঁপে উঠল। তার পর চীৎকার। ত্রস্ত পদক্ষেপ। ভীত ব্যস্ত চলাচল। অস্ফুট কোলাহল।

তার পর পালানো। ছুটে পালিয়ে আসা। দেশ ছেড়ে, দশজনকে ছেড়ে। অপরিচয়ের জলধিতে।"

পুরন্দরের কাহিনী শেষ হ'ল। আবার একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল বুড়ী ত্রিলোচনী।

সেই যে গেছে আর ফেরে নি পুরন্দর চক্রবর্ত্তী। কথা ছিল খবর দেবে আমাদের। কিন্তু সময় বুঝি আসে নি। ঠিক কথাই বলেছিল ও, বেশ একটু দেরী হবে স্যার। দুটো মরা পুড়বে তার পরে ত আপনাদের।

এখানেও লাইন। কতক্ষণে অপেক্ষার শেষ হবে জানি না।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে ফিরে এল পুরন্দর চক্রবর্ত্তী। দেখেছেন স্যার, ব্যাটাদের কাণ্ড দেখেছেন।

দেখলাম। ফুলের মত ছোট একটা শিশু আগুনে পুড়ছে।

বড় করুণ দৃশ্য। আপনা থেকেই মন খারাপ হয়ে যায়।

—এর কোন মানে হয় স্যার, আপনিই বলুন? কত বললাম, মাটি দে, মাটি দে! তা শালারা কিছুতেই শুনল না। আরে বাবা, খুব যে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করছিস, ধর্ম্মের তোরা বুঝিস কি—আর কতটুকুই বা মানিস। হিন্দু হয়ে সম্‌নে না মুর্গির মাংস চালাচ্ছিস!

একটু থেমে পুরন্দর আবার বলল, পাপের শরীর আর ভোগের শরীর নয় পুড়ল কিন্তু এই নিষ্কলঙ্ক আর নিষ্পাপ শিশু কেন পুড়ে শেষ হবে স্যার?

এ কেন'র উত্তর নেই। অর্থ হয়ত আছে। কিন্তু মনের ধর্ম্ম জানছে না মানুষের সৃষ্টি ধর্ম্মকে। বিশেষ করে পুরন্দরের মত যারা, তাদের।

—যেতে দে, যেতে দে। সব তাতেই তোর মাথা ব্যথা কেন রে?

—তুই চুপ কর ত বুড়ী। সব তাতেই কথা বলা কেন রে তোর?

বুড়ি ত্রিলোচনী হাসল। খুব যে রেগে গেছিস! ওরা বুঝি কাজে লাগায় নি তোকে:

—না, লাগায় নি। লাগালেও, পয়সার জন্য তোর মত শিশু পোড়ানোর সহায়তা আমি করতাম না, বুঝলি?

যেন বুঝেছে। আর বুঝেছে বলেই থেমে গেল বুড়ী।

পুরন্দর চক্রবর্ত্তীও অনেকক্ষণ চুপচাপ রইল। পরে বলল, নিন স্যার, এবার উঠতে হবে আপনাদের।

রাতের শঙ্কামারী। শান্ত অথচ বিষণ্ণ। আকাশ ভর্ত্তি তারা। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। আশ্চর্য্য অপরূপ তবু।

শ্মশানের যে ভয়াবহতা, কুকুর-শৃগালের তাণ্ডব উল্লাস, বিক্ষোভ আর আশঙ্কা সবকিছু হঠাৎ যেন চোখে পড়তে চাইল না আমার।

শম্ভু কেঁদে উঠল। সুরুচি মাসীর ছোট ছেলে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না। হয়ত শেষবারের জন্যই কাঁদল। কাঁদুক, একটু কেঁদে নিক ও।

চিতা জ্বলল। সুরুচি মাসীর চিতা।

বিচিত্র মানুষের আচার-অনুষ্ঠান আর রীতিনীতি। নিরর্থক নির্ম্মমতা।

চেয়ে চেয়ে দেখলাম। আকাশতলের আমরা কটি মানুষ। দূরে ঐ আকাশের অসংখ্য তারা কয়েকটির মত। নিস্তব্ধ নির্ব্বাক চোখে আর নিশ্চল বেদনাবোধে।

মানুষ আজ আছে কাল থাকবে না। সুরুচি মাসীও কাল বেঁচে ছিলেন, আজ নেই। কিন্তু গেছেন কোথায়? কোন্ অদৃশ্যলোকে?

মৃত্যু কি? ইচ্ছে হ'ল, তাই জিজ্ঞেস করলাম বুড়ী ত্রিলোচনীকে।

প্রশ্ন শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল বুড়ী ত্রিলোচনী বেশ কিছুক্ষণ। একটু যেন ভাববার দরকার ছিল ওর। বোধ হয় তাই। পরে বলল, আত্মা ও মনের বিজাতীয় সম্বন্ধনাশের নাম মৃত্যু। একটা জীবনের শেষ পরিণতি। তাই ত আমার গুরুদেব বলতেন, দৃশ্যজগত থেকে মনকে ফিরিয়ে নিয়ে অদৃশ্য সচ্চিদানন্দময় রাজ্যে নিয়ে যাবার সাধনা কর।

—সেই সাধনাই ত করছি কিন্তু দৃশ্যজগতের অনুরাগ থেকে মনকে ফেরাতে পারলাম কৈ? একটু হতাশা আর আক্ষেপ যেন ধরা পড়ল বুড়ীর কথায়।

আবার একটু খানিকের জন্য মৌনতা। নির্ব্বাক নিস্তব্ধতা। তার পর নিস্তব্ধতা ভাঙল বুড়ী নিজেই; তাই যখন অন্যের মৃত্যু দর্শন করি, চিন্তা করি আমাকেও ত সেই পথে যেতে হবে। কিন্তু যে সময় যাচ্ছে তা ত আর ফিরে আসবে না।

না, তা আর ফিরে আসবে না। যা যায়, তা আর ফিরে আসে না।

আরও একটু রাত হ'ল। পীচ-কালো রাত। পুড়ে শেষ হয়ে এল সুরুচি মাসী।

এবার বাড়ী ফিরবার পালা। বাকী শুধু পাবের কড়ি মেটানো।

কিন্তু পুরন্দর চক্রবর্ত্তীকে অনেকক্ষণ দেখছি না। কোথায় গেল ও এক মিনিটের জন্যও সুস্থির হয়ে বসে থাকতে পারে না লোকটা। পারে না, কথা না বলে।

পাওনা যা প্রাপ্য হয়েছিল, তা বুড়ীর। সে কথা জানে পুরন্দর। আর জানে বলেই বোধ হয় ধারে-কাছে নেই।

সত্যিই ত। থেকেই বা কি লাভ!

পয়সা হাতে পেয়েই মাথায় হাত ছোঁয়াল বুড়ী ত্রিলোচনী। বলল, একটা কথা রাখবেন দাদাবাবু?

ভাবলাম, ও বুঝি চাইবে আরও কিছু পয়সা। যা দিয়েছি তাতে সন্তুষ্ট হয় নি ও। কিন্তু না, ওসব কিছু নয়। হঠাৎ একটু শুধু চমক লাগিয়ে দিল বুড়ী। অনেক মিনতি করে বলল, এই পয়সা ক'টা ওকে পৌঁছে দেবেন বাবু! আমি দিলে ত আর নিতে চাইবে না। বেচারী বড় কষ্টে পড়েছে আজ।

বললাম, আচ্ছা দেব কিন্তু তোমার কাছ থেকে নিয়ে নয়, আমার পকেট থেকেই দেব।

শুনে খুব যেন কৃতজ্ঞ হল বুড়ী, কৃতজ্ঞতার ভাষা ফুটে উঠল ওর চোখে। অস্ফুটে কি যেন বলল। আশীর্ব্বাদের ভাষার মত।

পুরন্দরকে পেলাম, সেই নিমগাছের তলাতেই। পয়সা দিতে অবাক হ'ল খুব। কয়েকবার মাথা নেড়ে বলল, না, না তা হয় না।

বললাম, খুব হয়। উপকার তোমার কাছে যে পাই নি তা ত নয়, পেয়েছি।

এর পর আর আপত্তি জানাল না পুরন্দর। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল, খুব বাঁচালেন স্যার! পয়সা পেয়ে খুব উপকার হ'ল আমার। না হলে আজ আর খাওয়া জুটত না। আর ঐ বুড়ীটা আসত খালি জ্বালাতে। সাধাসাধি করে শেষ পর্য্যন্ত রাগ করে চলে যেত। তাও ভাল। কিন্তু সব জেনে শুনে ত আর ওর পয়সা নেয়া যায় না, কি বলেন স্যার?

তা ত বটেই কিন্তু বলে কি বুড়ীটা!

—সে কথা আর বলবেন না স্যার। উদ্দেশ্য একটাও ভাল নয় বুড়িটার। সেদিন বলে কি জানেন স্যার? বলে, আর জন্মে তুই আমার ছেলে ছিলি, এ জন্মেও ছেলের কাজটা করিস। মরলে পিণ্ডিটা দিস।

শুনেছেন স্যার ওর কথা। শুনেছেন?

শিশুশিক্ষার নবরূপায়ণ

শ্রীচারুশীলা বোলার

১৩৬৩ ফাল্গুন ও ১৩৬৪ আশ্বিন ও অগ্রহায়ণের 'প্রবাসী'তে "শিশুর প্রতি পিতামাতার কর্ত্তব্য" ও "শিশুর প্রতি শিক্ষকের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা কালে উল্লেখ করেছি যে, 'শিশুর শারীরিক, মানসিক, আনুভূতিক ও সামাজিক বিকাশের ভিতর দিয়েই তার চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনের পথ প্রশস্ত হয় এবং এ জ্ঞান পিতামাতা বা অভিভাবক ও শিক্ষক উভয়েরই থাকা প্রয়োজন।' পূর্ব্বালোচনাকালে এ কথাও বলেছি যে, 'একমাত্র শিশুকে আগ্রহ ও মনোযোগ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করলে বিকাশের তথ্যগুলি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। পর্য্যবেক্ষণ অর্থে শিশুর খেলাগুলিই বিশেষভাবে মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করা বোঝাচ্ছে।

শিক্ষাব্রতী ফ্রোয়েবল বলেন, "Play can be the helpmate and the hand maiden of education and that a little child learns most naturally, most willingly through the medium of play." প্রথম কথা এইটুকু আমাদের মনে রাখা দরকার যে, 'খেলা' বলতে বয়স্করা যা বোঝেন, (অর্থাৎ 'work' বলতে যা বুঝি তার থেকে আলাদা করে একটা reaxation বা recreation বা amusement,) শিশুর বেলায় কিন্তু তা নয়। শিশুর work and play অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। খেলা বলে হাল্কা করে দেখার অভ্যাস শিশুর খেলার বেলায় আমাদের ছাড়তে হবে। তবেই আমরা বুঝতে পারব যে, শিশুর খেলাটা খেলাই মাত্র নয়—শিশুর জীবনবিকাশের সেটা রাজপথ—শিশুর নিজস্ব জগতের জীবন-যজ্ঞ।

প্লেটো বলেছেন, ''তিন, চার, পাঁচ ও ছয় বৎসরের শিশুদের আমোদ-প্রমোদের নিজস্ব একটা ধরণ আছে, সেটা তারা একমাত্র উপভোগ করে যখন তারা সমবয়সী সঙ্গীদের সঙ্গ পায়।" শিশুর জীবন বিকাশে আবশ্যক জিনিসগুলির মধ্যে একটি অতি আবশ্যক জিনিষ হচ্ছে উপযুক্ত খেলার সঙ্গী। তার ক্রমবৃদ্ধি প্রকাশ পায় এই খেলার ভিতর দিয়েই। খেলার ভিতর দিয়েই তার চারিপাশের জগতের সকল রকম বস্তু এবং মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঘটে। শিশুর কাছে খেলার অর্থ কি জানতে হলে প্রথমেই জানা চাই যে, বিভিন্ন বয়সের এবং বিভিন্ন পরিবেশের আওতায় অবস্থান করে কার কি রকম মানসিক পরিণতি, অর্থাৎ বিচারক্ষমতা, রুচি, আগ্রহ এবং প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, খেলার সঙ্গে তার উপস্থিত সম্পর্কটা কি এবং প্রতিদিন পারিপার্শ্বিক অবস্থায় খাপ খাওয়ানোর মধ্যে প্রতিটি বিভিন্ন শিশুর চাহিদাই বা কি।

শিশুর খেলাকে মোটামুটি দুইটি স্বতন্ত্র ভাগে ভাগ করে দেখা যায়। যদিও একটি অন্যটির উপর আবশ্যিকভাবে নির্ভরশীল। একটি তার মানসিক অন্যটি তার শারীরিক বৃদ্ধির পক্ষে উপযোগী। বিভিন্ন বয়সের শিশুরা খেলার ভিতরে এমন অনেক কাজ করে যেগুলো তাদের বুদ্ধি, বিবেচনাশক্তি, পর্য্যবেক্ষণের ক্ষমতা এবং অভিজ্ঞতা বাড়িয়ে তোলে। আবার এমন ধরণের খেলাও করে যার দ্বারা তার মাংসপেশীর পুষ্টিসাধন হয়। বিদ্যালয়ে পাঠ সুরুর পূর্ব্বে শিশুর শারীরিক গতি ও ভঙ্গী যাতে স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল হয় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে তার খেলাধূলা নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়োজন আছে। বর্দ্ধিত শিশু লাফাতে, উঁচু জায়গায় চড়তে, দৌড়তে, বল খেলতে আনন্দ পায় এবং ক্রমাগত তা করতেই থাকে—এতে তাদের হাত, পা, আঙুলের শক্তি ও ক্ষিপ্রতা (agility) বৃদ্ধি পায়।

পান্টুর এক বৎসর বয়স পর্য্যন্ত খেলার প্রকৃত উপকরণের তেমন প্রয়োজন হয় নি। তার হাত, পা, মুখই তার আনন্দের খোরাক জুটিয়েছে। ভোর হতেই তার মুখের ভাষাহীন কলরবে বাড়ীসুদ্ধ লোকের ঘুম ভেঙে যেত। হাত ও পায়ের কত রকমের কসরৎ। বারবার উঠতে ও বসতে তার বড় পছন্দ। সুযোগমত মা, মাসি কিংবা অন্য বড় কারও আঙুল ধরে "হাঁটি হাঁটি, পা, পা" করতে তার কি আনন্দ! কিছুদিন পর টলে টলে নিজেই সে হাঁটতে চেষ্টা করল। ক্রমে ক্রমে শরীরের ভারসাম্য বজায় রেখে সহজভাবে চলতে সুরু করল। এখন তার দুই বৎসর পূরে গেছে—ভাল করে হাঁটতে পারে এবং যতক্ষণ জেগে থাকে ততক্ষণ ঘর বারান্দা উঠোন চষে বেড়ায়। এমন কি এখন একটু একটু সে দৌড়তেও পারে যদিও সহজেই হোঁচট খায়। তবু সে দৌড়য়, পেয়ারা গাছে দড়িবাঁধা নীচু দোলনাটায় বসে দোলও খায়। এসব করব বলে যে করে তা নয়—আবার উদ্দেশ্যহীন তাও বলা যেতে পারে না। শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত্ত এই খেলাগুলি

কোনটাই অর্থহীন নয়। এই বয়সের শিশু স্বভাবতঃই চঞ্চল। সেই কারণেই এত রকম ভঙ্গীর গতিশীলতা তার মধ্যে প্রকাশ পায়।

বাড়ীর সামনের মাঠে খেলছে কুমকুম, বীণা, চীনু, সন্তু—এরা পান্টুর চেয়ে বয়সে বড় (৪-৫ ; ৬-৭)। পান্টু সামনের বারান্দার সিঁড়ির ধাপে বসে বসে মনোযোগ দিয়ে তাদের খেলা দেখে। তাদের মাতামাতিতে সেও খুশী হয়ে উঠে—হাততালি দিয়ে হি হি করে হাসে। ওদের উত্তেজনাতে মনে-প্রাণে যোগ দেয়। ওরা খেলতে ডাকলে কিন্তু পান্টু কিছুতেই যেতে চায় না। তার সহজাত সংস্কার (instinct) তাকে বাধা দেয়। শরীরের ভারসাম্য থাকে না বলে আকার ও দূরত্বজ্ঞান বিচার করতে সে পারে না। সে ভিতরে ভিতরে কেমন একরকম করে অনুভব করে যে, ওদের মত সে পারবে না। ওদের শক্তি-সামর্থ্য বেশী—ওদের সঙ্গে সঙ্ঘাতে সে বিপদগ্রস্ত হবে। এটা তার instinct of self preservation—সহজাত আদি সংস্কার। অন্য শিশুদের সহজেই সে ভয় পায় পাছে তারা ধাক্কা দিলেই সে পড়ে যায়। সুতরাং সে একাই এদিক-ওদিক চলাফেরা করে, দৌড়য়, সিঁড়ির ওপর ওঠা-নামা করে, মাটির উঁচু ঢিবির ওপর চড়তে চেষ্টা করে—এই খেলার ভিতর দিয়েই অনবরত সে শারীরিক দক্ষতা লাভের চেষ্টা করতে থাকে।

মিহির, চন্দন, মঞ্জু, বিমলু, গোপু (তিন থেকে চার) এরা সবাই শিশুবিদ্যালয়ে আসে। বিদ্যালয়-পরিবেশে তাদের উপযুক্ত দৈহিক পটুতা লাভ করবার সরঞ্জামের জন্যে আছে উঁচু মাচা, সরসরি (slide), নাগরদোলা (see-saw), মই, বাঁশের সেতু, চাকাওয়ালা গাড়ী, দোলনা, ছোট ছোট কোদাল, খুরপী, নিড়ুনী ইত্যাদি। এই বয়সে এরা দূরত্ব বিচার করতে পারে, আর ভাল দৌড়তে পারে। চারদিকে ছুটাছুটি করে লুকোচুরি, চোর চোর খেলে বেড়ায়। অন্যের ধাক্কায় পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও কম—নিজেকে সামলে নিতে পারে। আবার একটানা একই খেলা এদের ভাল লাগে না—অনবরত বদল করছে। মিহির ছোট কোদাল দিয়ে খুঁড়ে মাটি ওঠায়—চন্দন ছোট টিনের চাকাওয়ালা গাড়ীতে ভরে সেই মাটি আর এক জায়গায় ফেলে স্তূপাকার করে—এই তাদের খেলা। এ সবের প্রয়োজন গতির সংযমে পেশীকে অভ্যস্ত করতে। এর ভিতর দিয়েই তারা শারীরিক সুস্থতা, ও আত্মবিশ্বাস লাভ করে।

অন্যদিকে গোপাল (সাত) মইয়ে চড়ে হাত ছেড়ে দিয়ে শিক্ষয়িত্রীর বাহবা পেতে চাইছে, হাবু (পাঁচ) সরসরিতে মাথা আগে দিয়ে উবু হয়ে মাছের সাঁতারের মত সরসর করে নামছে ; আলো (চার) ও গৌরী (সাড়ে চার) দোলনায় চেপে খুব উঁচুতে দোল খেতে খেতে চেঁচিয়ে বলছে 'দ্যাখো—দ্যাখো'। এই বয়স থেকে শুধু যে আত্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে শরীরের ভারসাম্য বজায় রেখে ভালভাবে হাঁটতে বা দৌড়তে পারে তা নয়, সুন্দর সুস্পষ্ট কথা বলতে ও যুক্তিপূর্ণ প্রশ্ন করতে পারে। এই বয়সে শিশু খুবই সচেতন যে, সে আর ছোটটি নেই। ভারসাম্য-নিয়ন্ত্রণের এই দ্রুত ক্রমবিকাশ ও পটুতা আরও কঠিন ও উত্তেজনাপূর্ণ কাজ করার প্রবল আকাঙ্ক্ষাকে শিশুর মনে জাগায়। এই বয়সের শিশুকে প্রায়ই বলতে শোনা যায়, দ্যাখো, দ্যাখো, আমি কি করছি। এর কারণ, সে যে বড় হয়েছে, বড়দের কাছে তা তার প্রমাণ করা চাই। নিজেকে জাহির করে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করবার চেষ্টার এটাই প্রথম সোপান।

এই ক্রীড়াকৌশল শিক্ষার জন্যে কেবল উপযুক্ত উপকরণগুলি শিশুকে যুগিয়ে দিতে হবে, তার স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করা চলবে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে খেলে যাবে। যে ভাবে সে খেলতে চায় খেলুক, একটু আধটু পড়ে গেলে বা চোট লাগলে ঘাবড়াবার কিছু নেই তবে বয়স্ক ব্যক্তি সজাগ থাকবেন যেন কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে, বা তাঁর প্রদত্ত খেলনা নিয়ে সে দিশাহারা হয়ে না পড়ে।

চার বৎসর বয়স থেকেই শিশু হাত দিয়ে বেশ দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে পারে। গতি-নিয়ন্ত্রণ-শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই রং, তুলি, পেন্সিল, কাঁচি এগুলোর সাহায্যে কাজ করতে সে আনন্দ পায়। তিন চার বৎসরের শিশুরা নিজেদের দৈনিক কাজগুলি নিজেরাই করবার চেষ্টা করে এবং তাতে গৌরব বোধ করে। নিজে হাতে খেতে পারে, পোষাক পরতে পারে, মুখ হাত ধোয়া ও অন্যান্য প্রয়োজন মত যা কিছু কাজ নিজেরা প্রায় সমস্তই করতে পারে। শিশু খেলা করে নিজের বৃদ্ধির প্রয়োজনে। সীতু (আড়াই) ছোট মগে জল ভরে পা পা করে হেঁটে নিয়ে আসে মাটি মাখবে বলে—কত সাবধানতার সঙ্গে, যেন একটুও জল পড়ে না যায়। এখানে মনে রাখতে হবে খাবার সময় দুধের গ্লাস তুলতে গিয়ে সামান্য চলকে পড়লে বা নিজে হাতে খেতে গিয়ে ছড়িয়ে ফেলে খেলে, অভিভাবক বা শিক্ষক যদি বিরক্ত হয়ে উঠে বকেন, তা হলে সুন্দর কাজ করার ওপর তার রুচি ও প্রবৃত্তি থাকবে না। বয়স্ক ব্যক্তি সাহায্য করবেন কিন্তু তিনি বিরক্ত বা বাধাস্বরূপ হবেন না। শিশু নিজে নিজে যখনই কিছু করে তখন কখনও বাধা দেওয়া উচিত নয়। এই শৈশব অবস্থায় বয়স্ক ব্যক্তি যত বেশী ধৈর্য্যসহকারে, সময় নিয়ে তার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন না করে, শুধু তার উপর নজর রেখে তাকে খেলার সুযোগ দেন, শিশু তত তাড়াতাড়ি আত্মনির্ভরশীল হবে। অন্য ব্যক্তির উপর

শিশুর নির্ভরশীলতার অর্থ শিশুর ক্রমবৃদ্ধির পক্ষে বাধা।

খেলা হচ্ছে শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত চেষ্টার প্রকাশ। সুতরাং খেলা তার পক্ষে 'খেলা' মাত্রই নয়। খেলা হ'ল তার "হয়ে ওঠার" তার "গড়ে ওঠার" জৈবিক অভিব্যক্তি। সামাজিক পরিবর্তনশীল পরিবেশের ভিতর শিশু খেলতে খেলতেই চিন্তা করে সমস্ত কাজের একটা নক্সা তৈরি করে নেয়। স্বাধীন ভাবে খেলতে দেওয়ার অর্থই পরবর্তী বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেখার জন্য ও ভবিষ্যৎ জীবনের জন্যে শিশুকে তৈরি হয়ে উঠতে বাধা না দেওয়া। সে গড়ে, সৃষ্টিও করে, পরীক্ষা করে এবং আবিষ্কার করে। দিনে দিনে তার নূতন নিপুণতা বাড়ে ও পরিচিত কাজগুলি সম্বন্ধে তার শক্তি পটুতা পূর্ণতা লাভ করে।

খেলার ভিতর দিয়েই শিশুর বুদ্ধিবৃত্তি (intellect) বৃদ্ধি পায়। ভুল করতে করতে সে শেখে। বড় হয়ে ওঠার অভিজ্ঞতা লাভের জন্যে নানা রকম উপকরণ তার চাই—জল, বালি, কাদা, মাটি. ইঁট, ছোট বড় নানা আকারের কাঠের টুকরো, রঙীন চক, রং, তুলি, কাঁচি, আঠা, কাগজ, ছোট হাতুড়ি, পেরেক, কাঠ ইত্যাদি। এর ভিতর দিয়েই তার উদ্দেশ্য সার্থক হয়, কল্পনার জগতকে সে বাস্তবে পরিণত করে। নিখিল (পাঁচ) বাড়ী বরিশালে—দু টুকরো কাঠ পেরেক ঠুকে এড়োএড়ি ভাবে লাগিয়ে কাল্পনিক একটা এরোপ্লেন তৈরি করেছে। সকলকে দেখিয়ে সে বলে "আমার এই এরোপ্লেনে চড়ে আমি উড়ে বরিশালে চলে যাব ঠাকমার কাছে।" দেখা যাচ্ছে, ইচ্ছাকে কাজে রূপ দেবার চেষ্টায় সে বড়দের সরিক হয়ে উঠেছে।

পরীক্ষামূলক কাজের কোন আদি-অন্ত নেই। শিশুর কৌতুহল বড় প্রবল। পুতুলের জামাকাপড়, অথবা মুখ হাত মোছার নিজের ঝাড়নটি সাবান দিয়ে কাচার সময় সাবানের ফেনা নিয়ে শিশুরা নানাভাবে খেলে অর্থাৎ পরীক্ষা করে। কখনও জলের উপর ফেনার বড়ি ফেলছে, কখনও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী যোড়া দিয়ে গোলের ভিতর ফুঁ দিয়ে বেলুনের মত উড়োচ্ছে—কখনও বা দুই হাত ঘসে মোলায়েম করার চেষ্টা করছে। এইভাবে সর্বদাই তারা লক্ষ্য করছে, তুলনা করছে, মনে মনে সবকিছুর যুক্তি দিয়ে বিচার করবার চেষ্টা করছে। অনবরত তারা ভাবছে কেন এটা হয়। 'কেমন করে হ'ল', 'যদি হয় তা হলে কি হবে।' কখনও বা নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিচ্ছে, আবার কখনও অন্যের কথায় তর্ক করে যুক্তি দিয়ে তার সত্যতা প্রমাণ করছে।

বুদ্ধিবৃত্তি এবং অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে চার বৎসরের শিশু নিশ্চয়ই দুই বৎসরের শিশুর চেয়ে অনেক বেশী অগ্রসর। কাল্পনিক জগতে একটু বাধা পেলেই সে মুষড়ে পড়ে। বাবলু (চার) হাপুস নয়নে চীৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে এসে জানাল, স্বপন তার 'মহিষ'-এর পা'টা ভেঙে দিল—(হাতে তার ডিম্বাকৃতি মাটির একটা ঢেলা, তাতে তিনটি সরু সরু লম্বা মাটির থাম আঁটা, চতুর্থটি ভাঙা)। "আমি একটা গাড়ি (মাটির তৈরি লম্বা ধার উঁচু ছোট একটা বাক্সের মত) বানিয়েছি, আর এতক্ষণ ধরে এই 'মহিষটা' বানালাম গাড়ী টানবে বলে, স্বপন এটার পা'টা ভেঙে দিল।" এই বলে বাবলুর সে কি কান্না! আবার দুই-আড়াই বৎসরের শিশুর কাজে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বয়স্ক ব্যক্তি যদি হস্তক্ষেপ করেন তবে সে সেই কাজে তার আগ্রহ (interest) হারিয়ে ফেলে। সীতু (আড়াই) কোদালের ফলাটা কাঠের ডাঁট থেকে খুলে আবার লাগাতে চেষ্টা করছে—কিন্তু কিছুতেই পারছে না—কিছুক্ষণ পর শিক্ষয়িত্রী তার হাত থেকে নিয়ে লাগিয়ে দিলেন—অমনি তার আগ্রহ উবে গেল, সীতু সেটা ফেলে দিয়ে অন্য আর একটা ব্যাপারে মন দিল।

বড় বয়সের শিশুদের কাল্পনিক খেলার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন—যেখানে তারা বুদ্ধি ব্যবহার করতে পারবে। এমন উপকরণ চাই যেগুলি তারা নানাভাবে ব্যবহার করবে, তারই ভিতর দিয়ে চলবে তাদের গবেষণা। যুক্তি ও চিন্তাশক্তি বৃদ্ধির সুরু হয় সেই সব খেলার ভিতর দিয়ে, যেগুলি শিশুর কল্পনা-শক্তি ও হাতের কৌশল (manipulation) দেখাবার সুযোগ দেয়। গোড়াতেই সে কাল্পনিক খেলার ভিতর একটি বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টি করে নেয়; তার পর তার সত্য আবিষ্কারের কাজ শুরু হয়। মাকু (৪) নির্দ্দেশে অন্য কয়েকজন শিশু তাদের বসার হালকা ছোট গোটা-আষ্টেক চেয়ার ঘর থেকে খেলার মাঠের একধারে নিয়ে গিয়ে চারখানি করে সামনাসামনি দুটি লম্বা সারিতে সাজালো—চেয়ারের ঠেসান দেওয়ার পিছন-অংশটি রইল মাঠের দিকে, যেখানে অন্যান্য শিশুরা খেলাধূলায় মেতে আছে। ক্রমে ক্রমে প্রত্যেকটি চেয়ার ভরে গেল এবং প্রত্যেক শিশু পিছন ঘুরে ঠেসান দেওয়া অংশে দুই হাতের উপর থুৎনী রেখে চুপ করে খুব মনোযোগ দিয়ে অন্যদের খেলা দেখতে লাগল। শিক্ষয়িত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, "কি ব্যাপার তোমরা যে চুপচাপ বসে?" মাকু গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "আমরা রেলের কামরায় বসে আছি কিনা! জানালা দিয়ে সব দেখছি।"

পরীক্ষামূলক খেলার ভিতর দিয়ে চিন্তাশক্তির বৃদ্ধি হয়। কখনও বা সমস্যার সম্মুখীন হয়ে তার সমাধান নিজেই করতে

চেষ্টা করে। যেমন—শ্যামল (৩॥) ফানেলের ভিতর জল ঢালছে কিন্তু নলের ফুটো দিয়ে জল পড়ছে না ত! কেন? ফানেলটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে দেখে নিল—উঁচু করে বার বার ফুটোটা দেখল—তার পর ছুটে গিয়ে একটা কাঠি এনে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কাদা বার করে আবার জল ঢালতে সুরু করল। লম্বা সরু কাঠের দু'টুকরো ফালি চওড়া জায়গা ছেড়ে পাশাপাশি পেতে একদল তিন-চার বৎসরের ছেলে-মেয়ে রেললাইন তৈরী করেছে। প্যাকিং বাক্সের তৈরী চাকাওয়ালা গাড়ীখানা সেই লাইনের ওপর বসাতে হবে, সেটি হবে রেলগাড়ী, কিন্তু উঁ—হুঁঃ! গাড়ী ত ঠিক লাইনের ওপর বসছে না। কত পরীক্ষা সেই লাইনের ওপর! কতবার সরাতে হচ্ছে, কখনও চওড়া, কখনও বা সরু হয়ে যায়। অবশেষে দু'চার জন মিলে গাড়ীখানা একটু উঁচু করে ধরার পর অন্য সবাই ঠিক চাকার নীচে লাইন পেতে দিল।

শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরও কতকগুলি কাজ আছে যেগুলি তার সৃজন-শক্তির (creative) চাহিদার সঙ্গে যুক্ত। দুই বৎসরের শিশু যখন উপকরণগুলি নেড়ে-চেড়ে তার বিশেষত্ব জানবার জন্যে ব্যস্ত, তিন বৎসরের শিশু তখন বালি, মাটি বা রং দিয়ে জিনিস তৈরী করতে শিখে গেছে। এই সৃজনশক্তি তার ক্রমিকবৃদ্ধির একটি প্রয়োজনীয় স্তর। এই সৃষ্টিই তার মনের আবেগ ও উত্তেজনার তুষ্টিসাধন করে, আত্মবিশ্বাস জন্মায়; তার মানসিক অনুভূতি স্থিরতা ও সংযম লাভ করে। 'গড়বার' আকাঙ্ক্ষা শিশুর ভিতর প্রবল দেখা যায়। শিশুর খেলার মধ্যেও দেখা যায় সাধারণতঃ সে কিছু একটা বানাবার চেষ্টা করে। তিন বৎসর বয়সে কোনও জিনিস পর পর সাজিয়ে ঘর, মন্দির অথবা রেলগাড়ী ইত্যাদির রূপ দেয়; কিন্তু চার-পাঁচ বৎসরের শিশু তিন বৎসর অপেক্ষা অনেক বেশী স্বাধীন ও বর্দ্ধিত। এই কারণে দুই থেকে পাঁচ বৎসরের শিশুকে উপযুক্ত উপকরণ দিতে হবে যাতে সে সেগুলি ব্যবহার করতে করতে আকার, দূরত্ব, ওজন প্রভৃতি বিচার করতে শেখে। শিক্ষক থাকবেন পাশে যিনি উপকরণগুলি নিত্য-নতুন ও আরও জটিল উপায়ে ব্যবহার করতে শিশুকে উৎসাহিত করবেন।

'ভান' করা শিশুর খেলার আর একটা দিক। তিন বৎসরের অন্ত রাগ প্রকাশ করে বা বাঘ সেজে মা-মাসীদের ভয় দেখায়। পূজোর সময় কালীমূর্ত্তি দেখে এসে জিভ বার করে কালী সাজে—ইত্যাদি। এই বয়সের শিশুও তার কথাবর্জিত খেলার ভিতর কল্পনাশক্তির পরিচয় দেয় অথবা তার মনের কথা ভাবে-ইঙ্গিতে জানিয়ে দেয় যদিও প্রকাশ করতে পারে না। আবার অন্য দিকে বয়স্ক ব্যক্তিকে অনুকরণ করে শিশু নিজেকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে। দোলন (২ বৎসর ৯ মাস) তার তুলো-ভরা কাপড়ের বড় পুতুলটাকে চুপ করায় কত রকম কথা বলে—যেন সে না কাঁদে। "কি হয়েছে—মন খারাপ করছে? মা ইস্কুলে গেছে? পড়াতে গেছে? আবার আসবে।" শিশুর এই আবেগপূর্ণ কথাগুলি আমরা প্রায়ই এড়িয়ে যাই। প্রায়ই দেখা যায়, পাটকাঠি দিয়ে শিশু তার বাবার মত সিগারেট খায়; উঁচু টুলের ওপর দাঁড়িয়ে সে পাহাড়ে উঠেছে মনে করে, মুখে হুস্ হুস্ শব্দ করে দৌড়তেই নিজেকে এঞ্জিন মনে করে, আরও কত কি!

তিন থেকে পাঁচ বৎসর বয়সে কাল্পনিক খেলাগুলি বেশ ভাবপূর্ণ এবং এই সব খেলায় শিশু নিজেকে খুব নিপুণভাবে প্রকাশ করতে পারে। কল্পনার মধ্যে পরিবেশের অনেক কিছু ফুটে ওঠে—কখনও পিতামাতার অভিনয়, কখনও বা নবজাত শিশু, কখনও ডাক্তার, কখনও-বা পিয়ন, কখনও শিক্ষক, কখনও পুলিস, কখনও-বা দোকানদার। এ ছাড়াও বাঘ, কুমীর, বাঁদর, ব্যাং, রেলগাড়ী, উড়োজাহাজ এ সবও তারা হতে ছাড়ে না। একখানা লাল কাপড়ের টুকরো মাকু মাথায় পাগড়ীর মত জড়িয়েছে। চারদিকে শিশুদের মধ্যে একটু উত্তেজনার ভাব—অনেকেই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাছে দৌড়ে পালিয়েছে। কি সমাচার? "পুলিস আসছে—আমাদের ধরবে"। মাকু হাতে একখানা লাঠি নিয়ে সকলের পিছনে তাড়া করছে চোর ধরবে বলে। শিশুর এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও কাল্পনিক খেলার ভিতর দুটি বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। প্রথম হচ্ছে একটি বাস্তব জগত সে তৈরী করে যেখানে পর্য্যবেক্ষণ ও তুলনা করার সুযোগ পায়। মনে রাখার সুযোগও ঘটে কারণ অতীতের যেসব বাস্তব অভিজ্ঞতা তার মনে পড়ে যায়, সেগুলো তার অভিনীত খেলায় জীবন্তরূপে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। দ্বিতীয় হচ্ছে, কাল্পনিক খেলা শিশুর ভূত ও ভবিষ্যৎ জ্ঞানবোধের পুষ্টিসাধন করে। শিশু পূর্ব অভিজ্ঞতা স্মরণ করে বর্ত্তমান সমস্যা সমাধান করতে চেষ্টা করে। বাইরের সে জগতের আভ্যন্তরিক বিরোধগুলি এই নাটকীয় খেলার ভিতর ফুটিয়ে তোলে এবং আত্মপ্রকাশের সাহায্যে সেই প্রবল সংঘর্ষের উপশম হয়। লরেন্স কিউবি যেমন বলেছেন:

"We must learn how to free the child from his conflicts, his terrors, & his rages. It is not enough merely to overpower him & to force his rebellions conflicts underground as we do to-day."

কাল্পনিক খেলায় শিশু দেখাতে চায় যে সে বড় হয়েছে। বাড়ীতে মা যে সব কাজ করেন, একটি তিন-চার বৎসরের

মেয়ে পুতুলের ঘরে অতি সহজে, যত্ন সহকারে এবং নিপুণতার সঙ্গে সেগুলি করার চেষ্টা করে। যেমন—ঝাঁট দেওয়া, কাপড় ভাঁজ করা, রান্না করা, কোনও কিছু ঢালা, মিশানো, খোলা ও বন্ধ করা ইত্যাদি।

ছবি আঁকার ভিতর দিয়ে দুই থেকে পাঁচ বৎসরের শিশু তার আভ্যন্তরিক জীবনকে প্রকাশ করে। ছবি আঁকার ভিতর দিয়ে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির ওপর যে সব শিক্ষাবিদের বিশ্বাস, তাঁরা বলেন, "ছবি আঁকার ভিতর দিয়ে শিশু যত শীঘ্র আবেগানুভূতির পীড়ন থেকে মুক্তি পায় এ-রকম আর কোনও কিছুর মাধ্যমে সম্ভবপর হয় না।"

ছবি আঁকা চঞ্চল শিশুর ভাবপ্রকাশের একটি সুনিশ্চিত নির্গম পথ। দুরন্ত শিশুর জন্যে এটি একটি নিরাপত্তা সৃষ্টির পথ, কারণ তার যত দুরন্তপনা ঐ তুলি আর রঙের ওপর দিয়েই চলে। অনেক শিশু ছবির ভিতরেই তার দুশ্চিন্তার ভাব প্রকাশ করে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। যে সব শিশু সমাজে মিশতে পারে না, একা থাকতে ভালবাসে, ছবি আঁকার ভিতর তারা খুবই একটা আশ্রয় এবং সঙ্গ পায়। শিশু-বিদ্যালয়ে দেখি, যেমন বাবুয়া (৪) অত্যন্ত দুরন্ত, অবাধ্য ও অত্যাচারী প্রকৃতির ছেলে, কিন্তু ছবি আঁকতে পেলে সে আর কিছুই চায় না। ছবির ভিতর প্রায়ই তার বিষয়বস্তু থাকে একটি মোটর-গাড়ীতে সে বসে চালাচ্ছে—সামনে আর একটি মোটর আসছে। ছবির বর্ণনা জিজ্ঞাসা করলেই সে বলে, "সামনের মোটরটাকে এখখুনি ধাক্কা দেব।"

কল্পনা (৫) অত্যন্ত ভীরু স্বভাবের, কারও সঙ্গে মেশে না, একপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে—ছবি আঁকতে সে চায়; একটি বড় টুকরো কাগজে নানা রঙের লেপ মাত্র,—এই-ই তার আঁকা ছবি। ছবির বর্ণনায় হয় সে বলে, "রাস্তা" না হয় "মাঠ"। বোধ হয় শিশু মাঠ ও রাস্তার মত খোলা প্রশস্ত জায়গায় নিজেকে মুক্ত করতে চায়।

সৃজনধর্মী খেলার (constructive play) ভিতর শিশু খুশীমত জিনিস গড়ে ও ভাঙে। এই ভাঙাগড়ার ভিতর দিয়ে তার বিদ্রোহী ভাবের উপশম হয়। বেশীর ভাগ খেলার ভিতর শিশু তার ইচ্ছাপূরণের ভাব প্রকাশ করে। কিন্তু তার ক্ষুদ্রতা ও শক্তিহীনতা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। এই জন্য খেলার ভিতর সে শক্তিশালী, বীরপুরুষের পার্ট অভিনয় করে।

শিশুর আবেগময় (emotional) জীবন তীব্র ও গভীর। খেলার ভিতর দিয়েই সে তার কোমল ও বিরুদ্ধ ভাব প্রকাশ করে প্রীতি ও ঘৃণার পরিচয় দেয়। শৈশব অবস্থায় সংযমের ভাব তার খুব কম থাকে। শিশুর ভালবাসা বড় গভীর। যাদের সে ভালবাসে তাদের উপস্থিতিতে সে উল্লসিত। শিশুকে বুঝতে দিতে হবে যে, পিতামাতা ও শিক্ষক উভয়েই স্নেহপরায়ণ ও বিশ্বস্ত। পরিবেশে শিশুর সাড়া দেওয়ার পরিণামই হচ্ছে এই আবেগপূর্ণ বিকাশ (emotional growth)। শিশু যদি সমবয়সী সঙ্গীর সঙ্গে খেলার সুযোগ পায় এবং বুদ্ধি ও সহানুভূতিসম্পন্ন বয়স্কব্যক্তি পাশে থাকেন তবে সে আরও বেশী কর্মঠ (active), স্বাধীন, সজীব ও সুখী হয়। সাহচর্য্যের প্রভাব এমনকি দুই বৎসরের শিশুরও ক্রমবিকাশে সাহায্য করে।

নার্সারী স্কুল এমন একটি স্থান যেখানে শিশু সঙ্গলোভে সমবয়সী সঙ্গীদের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে সুযোগ পায়। তিন বৎসর বয়সের আগে সে সর্ব্বদাই স্বতন্ত্র থাকতে ভাল-বাসে ও একা একাই মনের আনন্দে খেলা করে যায়। অন্যান্য শিশুদের মধ্যে থেকেও এরা নিজের সম্বন্ধে তেমন সচেতন নয় বা লাজুকভাবাপন্ন নয়। বিদ্যালয়ে এসে তাদের পরিবেশের সঙ্গে ভাল ভাবে পরিচয় হয় এবং ধীরে ধীরে পরস্পরের সঙ্গে মিলে-মিশে খেলতে শেখে। এই মেলা-মেশার মধ্যেই তার সামাজিক চরিত্রের ভিত্তি গঠিত হয়। অল্পসংখ্যক বড় উপকরণ নিয়ে সে যৌথভাবে খেলতে শেখে, যেমন—দোলনা, সরসরি, নাগরদোলা ইত্যাদি।

শিশু তার স্বতঃস্ফূর্ত, স্বনিয়ন্ত্রিত খেলার ভিতর দিয়ে সামাজিকতার নানা সদ্‌গুণ লাভ করে এবং এটা ক্রমাগত চলতে থাকে শৈশব অবস্থায়। সব রকম খেলাই কিন্তু সহ-যোগিতার পরিচয় নয়। অনেক সময় দেখা যায়, শিশুরা একসঙ্গে একটি নির্দ্দিষ্ট জায়গায় খেলা করছে, ঘুরছে-ফিরছে স্বাধীনভাবে বটে কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক অর্থে তারা দলভুক্ত নয়। প্রত্যেকেই যে যার স্বাধীনভাবে খেলছে। প্রত্যক্ষ অভিপ্রায় কিন্তু প্রত্যেক শিশুর নিজস্ব। যেমন—রান্নাবান্না খেলায় প্রত্যেক শিশু তার নিজস্ব চিন্তাধীন হয়ে এক-একটা কাজ করে যাচ্ছে, কেউ ধুলোর ভাত, কেউ পাতার শাক রাঁধছে; কেউ-বা কাদার সন্দেশ-রসগোল্লা বানাচ্ছে—প্রত্যেকেই নিজের নিজের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, উদ্দেশ্যপূরণের জন্যে কাজ করছে। পুতুলের ঘরেও দলভুক্ত হয়ে অনেকেই একসঙ্গে খেলছে—কিন্তু কেউ চামচে করে পুতুলকে দুধ খাওয়াচ্ছে, কেউ পুতুলকে জামা পরাচ্ছে, কারও পুতুলের জ্বর, মাথার কাছে ছোট্ট খেলার বালতি রেখে মাথা ধোয়াচ্ছে, কারও পুতুল কাঁদছে, মাতারূপী ছোট শিশু তাকে চুপ করাতে ব্যস্ত। এইভাবে প্রত্যেক শিশু নিজের মনের অনুভূতি প্রকাশ করছে তার ব্যক্তিগত কাজের ভিতর দিয়ে।

সৃজনধর্মী খেলার ভিতর সামাজিকতার ভাব ফুটে ওঠে। চার-পাঁচ জন শিশু বিভিন্ন রকম উপকরণের সাহায্যে যা কিছু একটা জিনিস গড়ে তোলে। যেমন—কাঠের টুকরো-

গুলি দিয়ে মন্দিরের দেওয়াল উঠল; হালকা ছোট ছোট ছবি আঁকার বোর্ড দিয়ে ছাদ হ'ল, সরু লম্বা কাঠের টুকরো দিয়ে মন্দিরের সিঁড়ি তৈরী হ'ল, কার্ডবোর্ডে-কাটা বিভিন্ন নক্সাগুলি জোড়া দিয়ে সামনে বাগান, বাগানের ফুলগাছ তৈরী হ'ল, মন্দিরের চূড়ো গম্বুজ হ'ল এবং মন্দিরটিকে নানা ভাবে সাজানো হ'ল। এইটাই হচ্ছে কয়েকটি শিশুর সমবেত কাজের ফল। এই সৃজনধর্মী কাজের জন্যে শিশুকে দিতে হবে বিভিন্ন আকারের কাঠের টুকরো—ছোট, বড়, চ্যাপটা, চৌকোণ, ত্রিকোণ, লম্বা, গোল ইত্যাদি; এ ছাড়া হালকা ছোট তক্তা, চাকা, ছোট ছোট কাঠের বা কার্ড-বোর্ডের বাক্স, কাঠের তৈরী ছোট ছোট রঙচঙের জীব-জানোয়ার, ছোট খেলার রেলগাড়ী, মোটরগাড়ী, গরুর গাড়ী, এরোপ্লেন ইত্যাদি। চার বৎসর বয়স থেকে বিশেষ করে দলভুক্ত হয়ে পরস্পরের সহযোগিতায় এই ধরণের খেলা করতে দেখা যায়।

দলবদ্ধ খেলায় সজীবতা আছে এবং বিভিন্নভাবে খেলা যায়। দলবদ্ধভাবে খেলার যে গুণাবলী, সেগুলি বৃদ্ধি পায় পাঁচ-ছ' বৎসর বয়সে। কিন্তু যে সব শিশু চার পাঁচ বৎসরে নার্সারী স্কুলে ভর্ত্তি হয় এবং যাদের পূর্ব্বজীবনে এসব সুযোগ একেবারেই ঘটে নি, তারা দু'তিন বৎসরের শিশুর মত স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলে। পর্য্যবেক্ষণে দেখা গেছে বিশৃঙ্খল স্বভাবের, উদ্ধত এবং ভীতু শিশুরা দলবদ্ধ হয়ে খেলতে পারে না। স্বাধীনভাবে অন্যদের সঙ্গে খেলতে তারা কম আনন্দ পায়। যে শিশু চুপচাপ থাকে সে দলের কাছে যেতেই ভয় পায়। যে শিশু তার কলহপ্রিয়তা ও বিরুদ্ধতায় উদ্বিগ্ন তাকেও দেখা গেছে মাঝে মাঝে অন্য শিশু-দের দলে যেতে কিন্তু সে খুব কমই আমল পায় কারণ সর্ব্বদাই সে সকলকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলে। অন্য শিশুর খেলা নষ্ট করে দেওয়া আর একটি বিশেষ বিপত্তিজনক কাজ। শুধু যে অন্যের খেলনাটির প্রতি আকর্ষণ তা নয়—রাগ, জিদ ও হিংসাই এর প্রধান কারণ।

সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি শুধু বয়স্কদেরই অভিভূত করে না। শিশুর শিক্ষাক্ষেত্রে সঙ্গীতের দান অতুলনীয়। গানের মধুর সুর ও ছন্দে শিশু মুগ্ধ হয়। সকলের সমবেত কণ্ঠে যে পরিবেশের সৃষ্টি হয় তাতে কি ভীরু, কি উদ্ধত, কি চঞ্চল স্বভাবের শিশু নিজের কথা ভুলে গিয়ে সকলের সঙ্গে যোগ দেবার জন্যে ব্যগ্র হয় মনে মনে। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার আবশ্যক; তা পরে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল।

কাল্পনিক খেলাকে কেন্দ্র করে দলবদ্ধভাবে খেলাগুলি স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়ে ওঠে। ঝগড়া-বিবাদ না করে সব সময়ে শিশুরা আনন্দে খেলতে পারে না, আবার সব সময় একলাও খেলতে পারে না। এস্থলে বয়স্কব্যক্তির সাহায্য ও পরিচালনার প্রয়োজন। বয়স্কব্যক্তির এই পরিচালনের ভিতর দিয়ে সে নিরাপত্তাবোধ করে অবশ্য যদি শিশু বুঝতে পারে যে, তিনি শিশু চাহিদা বুঝতে পারেন। সৃজনধর্ম্মী খেলার উদ্দেশ্যে এবং কাজে শিশুদের পরিচালিত করলেই তারা খুশী হয়। সুতরাং বুদ্ধিসম্পন্ন ও প্রতিভাশালী জ্ঞানী শিক্ষকের পক্ষে উপযুক্ত সরঞ্জামে সুসজ্জিত একটি শিশু-বিদ্যালয়ে এই ধরণের সাহায্য দেওয়া অত্যন্ত সহজ।

অতএব খেলাই শিশুর শিক্ষা। শিশুর ক্রমবিকাশের (growth & development) জন্যে খেলার যে কত মূল্য, একথা আমরা যেন ভুলে না যাই। খেলতে না দেওয়ার অর্থ তার সক্রিয় আবেগগুলিকে (Active impulse) গলা টিপে মারা এবং তা শিশুহত্যার নামান্তর মাত্র। শিশুর এই যে চঞ্চলতা, চুপ করে বসতে না পারা, হাত-পা নোংরা করা, দৌড় ঝাঁপে জামা ছেঁড়া, অথবা তার অনুসন্ধানের ব্যগ্রতা ও অনর্গল প্রশ্ন, এগুলো দুর্ভাগ্য বা দুর্ঘটনামূলক নয়; এগুলো থেকে তাকে ধমক বা শাস্তি দিয়ে নিরস্ত করাও উচিত নয়। এগুলোই হচ্ছে মানবশিশুর ঐশ্বর্য্য—তার পৈত্রিক সম্পত্তি (heritage)। জীবের ক্রমবিকাশের জন্যে খেলাই (অর্থাৎ যা আমাদের কাছে খেলা বলে মনে হয়), একমাত্র পথ। শিশুর কাছে খেলাই কাজ। খেলা যত প্রাণপূর্ণ হবে, মানসিক স্বাস্থ্যেরও তত উন্নতি হবে, এই সজীবতা যেখানে নাই, বুঝতে হবে জন্মগত কোনও বিকলতা (defect) সেখানে আছে।

মোগলমারি

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত
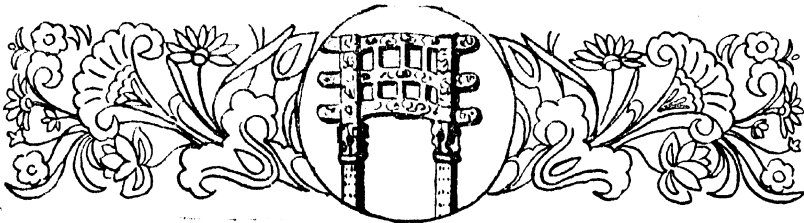
বাংলা ও উড়িষ্যার সীমান্তে মেদিনীপুর জেলার দাঁতন থানায় মোগলদের সঙ্গে পাঠানদের ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধক্ষেত্রের নাম মোগলমারি বলিয়া লোকমুখে প্রসিদ্ধ। মোগলমারি নামের অর্থ হইতেছে, যে স্থানে মোগলদের মারা হইয়াছিল বা যেখানে বহু মোগল মারা পড়িয়াছিল। বাংলায় মোগলদের আগমনের পূর্ব্বে এই নামের উৎপত্তি হইতে পারে না। মোগলরা বাংলায় আসিয়াছিল ইং ১৫৭২ সাল। মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে মেদিনীপুর জেলার দাঁতন থানার অন্তর্গত দাঁতন হইতে ২ মাইল দূরে এক মোগলমারির উল্লেখ আছে। এই মোগলমারিতে মোগল-পাঠানে ইং ১৫৭৫ সনে ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল, প্রথমে মোগলরা হটিয়া যায় বটে, কিন্তু পরে রাজা টোডরমল্লের পরিচালনার গুণে তাহারা পাঠানদের সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করে ও তাহাদের উড়িষ্যায় তাড়াইয়া দেয়। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও বহু মোগলসেনা নিহত হয়। বহু পুরাতন ইষ্টক, প্রস্তর ও ধ্বংসাবশেষ এখানে পাওয়া গিয়াছে। মোগলমারির যুদ্ধ সম্বন্ধে উক্ত ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারের ২৩-২৪ পৃষ্ঠায় এইরূপ লিখিত আছে যে :

"উভয়পক্ষে সৈন্যসংখ্যা সমান সমান থাকিলেও আফগানের ২০০ হাতী ছিল। হাতীর সাহায্যে তাহারা মোগলব্যূহ ভেদ করিয়া তাহাদের অশ্বারোহী প্রেরণ করিবে এই মতলব ছিল। অপর পক্ষে মোগলদের গাড়ীর উপর বসান ছোট ছোট কামান ও সুইভেল কামান ছিল। এই কামানের সাহায্যে তাহারা হাতীদের ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। আফগান অশ্বারোহীরা মোগলব্যূহের মধ্যভাগ ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয় এবং মোগল সেনাপতি খাঁ-ই-আলমকে কাটিয়া ফেলে ও খাঁ-খানান মুনিয়েম খাঁকে আহত করে। খাঁ-খানানের ঘোড়া তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করিলে মোগল সৈন্যদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। মনে হয় যুদ্ধে মোগলরা হারিয়া গিয়াছে। এমন সময়ে টোডরমল্ল যিনি মোগল সৈন্য-বাহিনীর দক্ষিণ বাহু পরিচালনা করিতেছিলেন, আফগানদের উপর ভীম আক্রমণ চালান; বলেন, খাঁ-খানান মারা যাইলেই বা কি? খাঁ-খানান পলাইলেই বা কিসের ভয়? বাদশাহী আমাদের। তাঁহার আক্রমণের সম্মুখে আফগানেরা পশ্চাদপদ হয় ও আফগান-মধ্যভাগে যেখানে দাউদ খাঁ স্বয়ং ছিলেন সেই দিকে ফিরে। যুদ্ধের অবস্থা খারাপ দেখিয়া ও তাঁহার বহু সেনাপতি হত হওয়ায় দাউদ খাঁ ভয় পাইয়া কটকে পলায়ন করেন। ইং ১৫৫৭ সনের এপ্রিল মাসে দাউদ সন্ধি করেন ও বাদশাহ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিলে তাঁহাকে উড়িষ্যা রাখিতে দেওয়া হয়। এই যুদ্ধ ১৫৭৫ সনের ৩রা মার্চ হয়—বাংলায় মোগল ও আফগানদের মধ্যে এইটি প্রথম বড় যুদ্ধ। যুদ্ধক্ষেত্র আন্দাজ ৬ মাইল ধরিয়া বিস্তৃত ছিল। আকবরনামায় ইহাকে তুকারইয়ের (বর্ত্তমানে তুকুর্যাচর) যুদ্ধ বলা হইয়াছে। তবাকতী ইহাকে বাচোয়ার, বদাউনী ইহাকে বিচোয়ার, সম্ভবতঃ বরিয়াচরের যুদ্ধ বলিয়াছেন। উড়িষ্যা যাইবার বড় সড়কের ধারে তুকাইর হইতে ৬ মাইল দূরে মোগলমারি গ্রাম এই যুদ্ধের স্মৃতি বহন করিতেছে। মোগলমারির যুদ্ধ (অর্থাৎ যুদ্ধে মোগলরা কাটা পড়িয়াছিল) বলিয়া সাধারণতঃ এই যুদ্ধ পরিচিত।"

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় দাঁতন থানায় মোগলমারি বলিয়া কোন মৌজা বা গ্রাম নাই। কোন গ্রামের বা মৌজার নাম মোগলমারি না হইলেও যে স্থলে যুদ্ধ হইয়াছিল—বিশেষ করিয়া যে স্থলে মোগলরা কাটা পড়িয়াছিল সেই স্থল আজও লোকমুখে সাড়ে তিন শত বৎসরের উপর ধরিয়া মোগলমারি বলিয়া পরিচিত।

এইরূপ কেন হইল? আমাদের মনে হয় এই সব জায়গায় ঐ যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতে অনেকদিন ধরিয়া বেশ লোকবসতি ছিল ও সেই সব বসতির বা গ্রামের নাম ছিল। গ্রামের নাম পরিবর্ত্তন করার কোন হেতু নাই—সেজন্য গ্রামের নাম পরিবর্ত্তন হয় নাই। অথচ এই জায়গায় মোগল-পাঠানে ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল, বহু লোক মারা পড়িয়াছিল, এবং যুদ্ধের ফলে পাঠানরা বাংলা হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল। যেখানে যুদ্ধ হইয়াছিল—বিশেষ করিয়া যে জায়গায় মোগলেরা পরাজিত ও কাটা পড়িয়াছিল—সেই স্থানটি লোকমুখে বরাবর মোগলমারি বলিয়া উল্লিখিত হইয়া আসিতেছে। আমাদের এই ধারণা কতদূর ঐতিহাসিক ঘটনা-সম্মত তাহা ঐতিহাসিকগণ বিচার করিয়া মতামত প্রকাশ করিলে ভাল হয়।

এইখানে "শশিসেনার পাঠশালা" নামে পরিচিত একটি প্রাচীন ইষ্টকস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ, এই জায়গায় রাজা বিক্রমকেশরীর কন্যা শশিসেনা বা সসিসেনার সহিত অহিমাণিকের প্রথম দেখা হয় ও প্রথম দর্শনেই উভয়েই উভয়ের প্রেমে পড়েন। ইহাদের প্রণয়-কথা কবি ফকিররামের 'সসিসেনা' কাব্যে বিবৃত হইয়াছে।

পশ্চিম বাংলায় মোগলমারি বলিয়া ২টি মৌজা বা গ্রাম আছে। একটি বর্দ্ধমান জেলার রায়না থানার অন্তর্গত, হুগলী জেলার আরামবাগ শহর হইতে খুব বেশী দূরে নহে, অপরটি মেদিনীপুর

জেলার গড়বেতা থানার অন্তর্গত—দাঁতন-মোগলমারি হইতে আন্দাজ ৫০।৫৫ মাইল দূরে। এই দুইটি গ্রামের তথ্য নিম্নে দিলাম। যথা :

	পরিমাণ	বাড়ীর সংখ্যা	জনসংখ্যা	শিক্ষিতের সংখ্যা
বর্দ্ধমান-রায়না				
জে. এল নং ৫৯				
মোগলমারি	১৪৯৫ বিঘা	৬২	৩১৩	১১২ জন
মেদিনীপুর গড়বেতা				
জে. এল নং ৮১০				
মোগলমারি	১০৩ বিঘা	৩২	১২১	২ জন

এই দুই স্থানে মৌজার নাম মোগলমারি হওয়ার কারণ আমাদের এইরূপ মনে হয়। মৌজা দুইটি বিরলবসতি—জমির অনুর্ব্বরতাই সম্ভবতঃ ইহার প্রধান কারণ। পূর্ব্বে এই দুই জায়গায় লোকবসতি বা গ্রাম ছিল না। এই স্থানে মোগল-পাঠানে যুদ্ধ হওয়ার ফলে এই সব স্থানের নাম লোকমুখে—পূর্ব্বোক্ত দাঁতন-মোগলামারির ন্যায় মোগলামারি বলিয়া উল্লিখিত হইতে থাকে। পরে লোকবৃদ্ধির জন্য বা অন্য কারণে এই সব জায়গায় লোকবসতির বা গ্রামের পত্তন হইলে গ্রামের নাম বা মৌজার নামও মোগলমারি হইয়াছে।

বর্দ্ধমান জেলার রায়না থানার অন্তর্গত মোগলমারি আরামবাগ শহর (পূর্ব্বনাম জাহানাবাদ) হইতে বেশী দূরে নহে। মহারাজ মানসিংহ যখন পাঠানদের দমন করিবার জন্য বাংলায় আসেন তখন তিনি জাহানাবাদে কিছুকালের জন্য ছাউনী স্থাপন করিয়া তাহাদের দমন করিবার চেষ্টা করেন। একটি যুদ্ধে মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ পাঠানদের নিকট পরাজিত হন। এ বিষয়ে মেদিনীপুর ডিষ্ট্রীক্ট গেজেটিয়ারে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য এই :—

"১৫৯০ সনে দেশের এই অংশ আফগানদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইবার জন্য মোগলরা আর একবার চেষ্টা করেন। বিহারের সুবেদার মানসিংহ উড়িষ্যা আক্রমণ করিবার জন্য দক্ষিণ মুখে অভিযান করেন। কিন্তু বর্ষা আসিয়া পড়ায় হুগলী জেলার জাহানাবাদে (বর্ত্তমানে আরামবাগে) শিবির স্থাপন করেন। এক ক্ষুদ্র সৈন্যদল যাহা তিনি তাঁহার পুত্র জগৎসিংহের অধীনে অগ্রগামী হিসাবে পাঠাইয়াছিলেন পরাজিত হয়। কিন্তু অল্প পরে কতলুখাঁ ধরমপুর অবধি অগ্রসর হইয়া মারা যাইলে আফগানদের সহিত আবার সন্ধি হয়। এই সন্ধিও তাহারা অন্যান্য সন্ধির ন্যায় ভঙ্গ করিয়াছিল। আফগানরা জগন্নাথ মন্দির ও বিষ্ণুপুরের রাজার রাজত্ব (বর্ত্তমান বাঁকুড়া জেলা) দখল করিলে মানসিংহ পুনরায় তাহাদের বিরুদ্ধে ১৫৯২ সনের নভেম্বর মাসে অভিযান চালান। সুবর্ণ রেখার তীর বরাবর ভীষণ যুদ্ধ করেন বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন।"

জগৎসিংহের সহিত পাঠানদের যে যুদ্ধ হইয়াছিল ও যাহাতে মোগলরা পরাজিত হইয়াছিল তাহা খুব সম্ভব এই বর্দ্ধমানের মোগলমারিতে হইয়াছিল। ইহা আমাদের অনুমান মাত্র—অনুমানের পোষকে ঐতিহাসিক তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। দুই-একজন ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তির নিকট আমাদের মত প্রকাশ করিলে, তাঁহারা ইহা সম্ভবতঃ সত্য হইতে পারে বলেন।

গড়বেতা থানার মোগলমারি সুবর্ণরেখা হইতে বহুদূরে। মোগল-পাঠান সংঘর্ষ শেষ হয় সুবর্ণরেখার তীরে—পাঠানদের পরাজয়ে। হয়ত (ইহা আমাদের কল্পনা মাত্র) এই মোগলমারিতে পাঠানরা কোনও যুদ্ধে মোগলদের সাময়িকভাবে নিহত ও পরাজিত করিয়াছিলেন। গ্রামের পরিমাণও কম—মাত্র ১০০ বিঘা।

দাঁতন-মোগলমারির প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ মহাশয় "পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি" পুস্তকের ৪১০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে :—

"সাধারণতঃ সকলে এই কথাই বলেন যে, মোগলমারি কথার উৎপত্তি হয়েছে, মোগলদের যেখানে মারা হয়েছে, এই অর্থ থেকে। কিন্তু এ কথার ভাষাগত এই অর্থ মনে হয় ভুল। মৌলবী আবদুল ওয়ালী মন্তব্য করেছেন যে, ইতিহাস ও ভাষাতত্ত্ব, দু'দিক থেকেই এ কথার অর্থ তা হয় না। মোগলরা এখানে পাঠানদের মেরেছিল, পাঠানরা মোগলদের মারে নি। আর কথাটা 'মারী' নয় 'মাড়ী'। মাড়ী কথার অর্থ পথ বা রাস্তা। 'মোগলমাড়ী' কথার অর্থ মোগলদের পথ। এই পথের উপরে মোগল-পাঠানের যুদ্ধ হয়েছিল বলে নাম মোগলমাড়ী (মোগলমারী নয়)। এ ছাড়া অন্য ভাবে একথার অর্থ করা সবদিক দিয়েই ভুল। নারায়ণগড়ের রাজার উপাধি ছিল মাড়ী-সুলতান বা পথের সম্রাট। বাদ্শাহী পথের রাজা। মোগলমাড়ী কথার অর্থও তাই :—

"To interpret the word differently would be historically, geographically and philosophically incorrect. (Maulavi Abdul Wali : Notes on Archaeological Remains in Bengal: Journal of the Asiatic Society", Vol. 20, No. 7)

বিনয়বাবু নামের উৎপত্তি বা ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নলিখিত কারণে সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। প্রথমতঃ বর্ত্তমানের উড়িষ্যা ট্রাঙ্ক-রোডের নিকট দাঁতন-মোগলমারী। ইং ১৫৬৮ সন অবধি উড়িষ্যা স্বাধীন রাজ্য ছিল। ১৫৬৮ থেকে ১৫৭৫ এর মধ্যে পাঠানদের বাংলা থেকে উড়িষ্যা অবধি বাদসাহী সড়ক প্রস্তুত করিবার সুযোগ বা সময় তাহাদের হয় নাই, বিশেষ করিয়া যখন ১৫৭২ সনে বাংলা থেকে পাঠানরা নিজেরাই বিতাড়িত হন। বাদসাহী সড়ক পরে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

আর তাঁহার যুক্তি সঙ্গত হইলে আমাদের রায়না থানার মোগলমারি ও গড়বেতা থানার মোগলমারির নিকটে বাদশাহী সড়ক কল্পনা করিতে হয়। বরং রায়না-মোগলমারির নিকট

পুরাতন পাঠান আমলের রাস্তা আছে কিন্তু গড়বেতা-মোগলমারির নিকট কোনও রাস্তা নাই।

দ্বিতীয়তঃ "মাড়ী" কথাটি "পথ" অর্থে বাংলা শব্দ নহে। কে এই জায়গাকে "মোগলমাড়ী" নাম দিল? বাঙালী জনসাধারণ মোগলমারি বা মোগল-সড়ক বা তদ্রূপ কোন নামকরণ করিবে— "মোগলমাড়ী" বলিবে না। বাদশাহী কাগজপত্রে—"মাড়ী" থাকিলেও, কেবলমাত্র কোন বিশিষ্ট জায়গাকে 'মোগলমাড়ী' বলিয়া অভিহিত করিবে কেন? সারাটি রাস্তার নামই মোগলমাড়ী হইবে—যেমন কাশী অবধি রাস্তার নাম অহল্যাবাই সড়ক। বর্ত্তমান গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের পূর্ব্ব নাম সেরসাহী সড়ক বা সাহী সড়ক।

তৃতীয়তঃ যেমন গিরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রের একাংশ এখনও জালিম সিংয়ের মাঠ বলিয়া পরিচিত, তেমনই কোন যুদ্ধক্ষেত্রের একাংশ যেখানে মোগলেরা মার খাইয়া ছিল বা কাটা পড়িয়াছিল, তাহাদের সেনাপতি খাঁ-ই-আলম নিহত হইয়াছিল ও খাঁনখানান মুনিম খাঁ আহত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল বলিয়া মোগলমারি নামে পরিচিত হওয়া তাদৃশ অসঙ্গত নহে—যদিও যুদ্ধের ফলাফলে পাঠানরা সম্পূর্ণ ভাবে পরাজিত হইয়াছিল এবং উড়িষ্যায় পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

চতুর্থতঃ তর্কের খাতিরে 'মোগলমাড়ী' কালক্রমে লোকমুখে 'মোগলমারি'তে পরিণত হইয়াছে স্বীকার করিয়া লইলেও বর্দ্ধমান রায়নার ও গড়বেতার মোগলমারির বেলায় তাহাদের পূর্ব্বরূপ যে 'মোগলমাড়ী' ছিল এ কথা স্বীকার করা যায় না। কারণ রাজস্ব সংক্রান্ত কাগজে দেওয়া মৌজার নাম লোকমুখে যেরূপ দ্রুত পরিবর্ত্তন হয় সে রকমটি সাধারণতঃ সহজে হয় না। 'মোগলমাড়ী' নাম ইং ১৬০০ সন আন্দাজ দেওয়া হইল—এই নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া মোগলমারিতে পরিণত হইল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (ইং ১৭৯৩ এর) পূর্ব্বে। ২০০ বৎসরের মধ্যে নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ধরিতে হয়। ১৭৯৩ সনে জমিদার বা কানুনগো দপ্তরের লোক এই মৌজার নাম যে পূর্ব্বে 'মোগলমাড়ী' ছিল তাহা ভুলিয়া গিয়া 'মোগলমারি' বলিয়া লিখিয়াছে ধরিতে হয়। এইরূপ পরিবর্ত্তন যে হয় না তাহা নহে, তবে হওয়াটা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। এই প্রসঙ্গে আইজাক্ টেলর তাঁহার "Words and Places" পুস্তকে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা নিম্নে আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"In the case of local names the raw materials of language do not lend themselves with the same facility as other words to the processes of decomposition and reconstruction, and many names have for thousand of years remained unchanged, and even linger round the now deserted sites of the places to which they refer. The names of five of the oldest cities of the world—Damascus, Hebrou, Gaza, Sidon and Hamath—are still pronounced by the inhabitants in exactly the same manner as was the case thirty, or perhaps forty centuries ago, defying often times the persistent attempts of relers to substitute some other name. ....

"Tenedos and Argos still bear the names which they bore in the time of Homer." (p. 336-337)

বিনয়বাবুর যুক্তি বা আমাদের যুক্তি কাহারটি সঙ্গত বা অসঙ্গত তাহাতে কিছু যায় আসে না। এ বিষয়ে সুধীজন যদি আলোচনা করেন ও পথ দেখাইয়া দেন ত ভাল হয়।

বাংলায় মোগলরা ইং ১৫৭২ হইতে ইং ১৭৫৭ সন পর্য্যন্ত অপ্রতিহত ভাবে রাজত্ব করে। মোগলদের নামে, মোগলদের প্রভাবসূচক মৌজার বা গ্রামের সংখ্যা কিন্তু খুব কম। পশ্চিম বাংলার ৩৯,০০০ গ্রামের মধ্যে ২টি মোগলমারির কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। আরও দুইটি গ্রাম মোগলদের নামের সহিত জড়িত আছে। মোগলটুলি মৌজা মুর্শিদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত। জমির পরিমাণ ৮০ একর মাত্র। নাম হইতেই বুঝা যায় যে এককালে এখানে বহু মোগলের বাস ছিল। এখনও বহু মুসলমানের বাস এই গ্রামে আছে বলিয়া শুনিয়াছি—তবে তাঁহারা মোগলদের বিশুদ্ধ বংশধর কিনা বলিতে পারিব না। মোগলপুর বলিয়া একটি গ্রাম হুগলী জেলার পোলবা থানায় আছে। গ্রামের পরিমাণ ৯১৬ বিঘা, বর্ত্তমান লোকসংখ্যা ২৯০ জন মাত্র। এইটি পাঠানদের দৌরাত্ম্য নিবারণের জন্য মোগল শিবির ছিল—বেশী লোককে কাছেপিঠে বসতি করিতে দেওয়া হয় নাই, তাহার প্রভাব আজও আছে। স্থানীয় অধিবাসীরা অনেকেই মুসলমান বলিয়া শুনিয়াছি। এ বিষয়ে আরও তথ্য, আরও অনুসন্ধান প্রয়োজন।

মোগলদের প্রভাবসূচক মৌজার বা গ্রামের সংখ্যা খুব কম থাকিলেও তাহাদের প্রভাবসূচক নাম লোকমুখে এখনও চলতি আছে। এ বিষয়ে দাঁতন-মোগলমারী একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বিনয়বাবু তাঁহার উক্ত পুস্তকের ৪১১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে :—

"কুরুমবেড়া ছাড়াও পাঠান-মোগল আমলের ঐতিহাসিক নিদর্শন কেশিয়াড়ী অঞ্চলে অনেক আছে। পাশাপাশি স্থান ও গ্রামের নাম রয়েছে মোগলপাড়া, ঔরঙ্গাবাদ, কাশিমপুর, হাসিমপুর, রেজ্জাকপুর ইত্যাদি। প্রাচীন ভগ্ন মসজিদেরও অভাব নেই।"

মোগলপাড়া বলিয়া কেশিয়াড়ী থানায় কোনও গ্রাম বা মৌজা নাই। ঔরঙ্গাবাদ, কাশিমপুর, রেজ্জাকপুর বলিয়াও কোনও গ্রাম বা মৌজা নাই। ঔরঙ্গাবাদ, কাশিমপুর, রেজ্জাকপুর বলিয়াও কোন গ্রাম নাই। পঃ বঙ্গে ৭টি হাসিমপুর আছে; তাহার মধ্যে মেদিনীপুর জেলায় ৩টি—কেশিয়াড়ী থানায় ১টি। এই হাসিম-

পুর বিনয়বাবুর হাসিমপুর কিনা বলিতে পারি না ; কারণ আমার স্থানীয় জ্ঞানের একান্ত অভাব।

হুগলী সহরে 'মোগলপাড়া' আছে। এই সম্বন্ধে হুগলী ডিষ্ট্রীক্ট হাণ্ডবুকের ৩২ পৃঃ লিখিত আছে যে :—

"Mughalpara, which lies across the present Chakbazar road, was occupied by Irani Mogul traders, and is so named in contradistinction to Turanigarh."

মোগলমারির নিম্নলিখিতরূপ বিবরণ আছে (২১১ পৃঃ দেখুন)। যথা :—

Mughalmari—A village... situated about two miles north of Dantan. The name means the slaughter of the Mughals and commemorates the great battle between the Afghans under Daud Khan and the Mughals under Munim Khan and Todar Mal, which took place in 1575. In this battle the Mughals were not defeated as might be supposed from the name ; for though they were driven back at first, they were rallied by Todar Mal and eventually secured the victory. Remains of old buildings have been found, and numerous old bricks and stones unearthed, during the excavations made for the Rajghat Road,"

অর্থাৎ দাঁতন হইতে ২ মাইল দূরে মোগলমারি গ্রাম অবস্থিত। মোগলমারির অর্থ মোগলরা কাটা পড়িয়াছিল। এই নাম ১৫৭৫ সনে দাউদখাঁর অধীনে আফগানদের সহিত মুনিম খাঁ ও টোডরমল্ল পরিচালিত এক ভীষণ যুদ্ধের স্মৃতিসূচক। নাম থেকে যাহা মনে হয় মোগলরা এই যুদ্ধে পরাজিত হয় নাই ; যদিও প্রথমে তাহারা হটিয়া গিয়াছিল তাহারা টোডরমল্লের অধীনে সামলাইয়া লয় ও পরে জয়লাভ করে। পুরাতন বাটীর ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায় ও রাজঘাট রাস্তা নির্ম্মাণকালে বহু পুরাতন ইট, পাথর মাটির ভিতর হইতে পাওয়া যায়।

বৃষ্টি এলো

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য

বৃষ্টি এলো !
সবুজের বলিরেখা পাহাড়ের মুখে চোখে মনে,
ধোঁয়াটে স্বপ্নের তুলি বোলানো, ভোলানো শালবনে ;
আশাবারা কুয়াশার উত্তরীয়ে ভেবেছি যা ঢাকা—
সে কি মেঘ বৃষ্টিঝরা ? অথবা সে ইন্দ্রলোক-পাখা ?
তৃষায় আতুর রুক্ষ বনস্পতি শাখার বিস্তারে
দীর্ণকণ্ঠ, নাভিশ্বাস ; চিৎকার করেছে বারে বারে ;
সেই ডাকে আত্মহারা এলো, মাটি দয়িতেরে পেলো ;
এলো বৃষ্টি, বৃষ্টি নেমে এলো !

এলো, এলো, বৃষ্টি নেমে এলো ;
পাহাড়ের পথে পথে, শিলালিপি-স্বাক্ষরিত স্রোতে,
গ্রাম সমাজের ভীড়ে আন্দোলন তুলে রীতিমতে,
পাহাড়তলির মোড়ে, চাষার হু'ফালি স্বর্গে নেমে,
ধীরে ধীরে স্পর্শ রেখে, মায়ের মতন থেমে থেমে,
ধরণীর গূঢ়তৃষ্ণা ধূসর সিঞ্চনে দেয় ঢেকে ;
স্বর্গ ছেড়ে শয্যা পাতে, ধূলার লাবণ্য নেয় মেখে ;
বৎসরে বৎসরে ধরা জন্ম থেকে জন্মান্তর পেলো ;—
তাই এলো, বৃষ্টি নেমে এলো।

এলো বৃষ্টি, বৃষ্টি নেমে এলো ;
যেমন সে এসেছিলো দ্রৌপদীর নয়নের কোণে
দ্যূতসভালাঞ্ছনার আগুন জ্বালানো সেই ক্ষণে ;
যেমন সে এসেছিলো প্লুটোরাজ্যে প্রসপিল চোখে ;
এসেছিলো উর্বশীর স্বপ্নঝরা কলাকল্পলোকে ;
এলো বৃষ্টি মরূদ্যান, বালুবেলা-বুকের পিপাসা,
বনানীর কাব্যগাথা, নির্ঝরের সঙ্গীতের ভাষা,
আমার মনেতে বৃষ্টি চিরশয্যা পেলো;
বৃষ্টি এলো।

দেশ দেশ ছোঁয়া বৃষ্টি এলো !
আলতাই চূড়া ছোঁয়া, কাম্ব্রিয়ান্, ইতাম্বির শিরে,
কাপেলাদিনারি-সারি, এ্যণ্ডিজ, এ্যটলাস ঘিরে,
অন্ধকার করে সেরা-মাস্ত্রে কি এ্যপেলাচিয়ান্
কিলিমাঞ্জারো, রকী, ককেশাস্, সেণ্ট আলবান্,
মঁ-ব্লাঁর শুভ্র শিরে, নায়াগ্রার ঝর্ঝর প্রপাতে,
ভিক্টোরিয়া-নিয়াঞ্জায় বৃষ্টি ঝরে, সেরা নাভাদাতে ;
কালে কালে কালো বৃষ্টি কতো কোল পেলো ;
বৃষ্টি এলো, বৃষ্টি নেমে এলো।

চোর

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

উপর্য্যুপরি দু'-দু'বার প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়—

প্রথম বার বন্যা—আর তার পরের বছরেই অনাবৃষ্টি। বানে ভেসে গেল—বাড়ীঘর ভেঙে গেল। ক্ষেতের ফসল ক্ষেতেই অথৈ-জলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। অন্য সকলের মত পরেশও ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে হাটতলায় উঁচু জায়গা দেখে, হাটতলার টিনের ছাউনিতে উঠল। চোখের সামনে বাপ-পিতামহের বাস্তুভিটা ঘর-দুয়ার ভেঙে পড়ল। হাটতলার উঁচু জায়গা থেকে সবই দেখা যাচ্ছিল। ওদিকে বানের জল বাড়ছে—আর সেই সঙ্গে বৃষ্টিরও কামাই নেই। লোকজন কেউ রেললাইনে, কেউ বা গাঁয়ের স্কুলঘরে, কেউ বা হাটতলায় এসে উঠেছে। চোখের সামনে হুড়মুড় করে যখন মাটির দেওয়াল আর খড়ের চালা বানের জলের ওপর শুয়ে পড়ল, তখন পরেশের মনে হ'ল তার মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল। পরেশ হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠল। পরেশের বৌ দামিনী বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বলতে লাগল, হেই মা—যাঃ, সব যে গেল! হে ভগমান, হে নারায়ণ এ কি করলে—এই দুগ্‌গতি ললাটে দিলে—হেই ভগমান—! পরেশ নির্নিমেষ নয়নে সেই উত্তাল জলরাশির দিকে তাকিয়ে রইল। তার জগত-সংসারে যা-কিছু সঞ্চয় ছিল, সমস্তই বন্যার জলে ভেসে গেল—ডুবে গেল। তার সাধের ঘর, গোয়ালঘর, গরু-বাছুর, গোলার ধান, ধানের মড়াই, লাঙ্গল-মই, ঘর-গেরস্থালীর বাসন-কোশন—সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। চোখের ওপর নিজের এই মৃত্যু—এই অপঘাত মৃত্যু দেখতে দেখতে পরেশ বুঝি পাথর হয়ে গেল। বহু লোকের বুক-ফাটা আর্ত্তনাদ তার কানে আর পৌঁছোচ্ছে না। চারিদিকে প্রলয়ঙ্কর বিপর্য্যয়—নানা চীৎকার, হট্টগোল, কোথাও করুণ কান্না এ সবই যেন পরেশের কাছে মিথ্যে হয়ে গেল। পরেশ নির্লিপ্ত, নিস্পৃহ চোখে, বিস্ফারিত দৃষ্টি নিয়ে অত্যন্ত ধৈর্য্যের সঙ্গে সে সব দেখতে লাগল। তার ভাবলেশহীন মুখে আর কোন শোক-দুঃখের চিহ্ন নেই, তার দেহ স্থির, দুটি চোখ নিস্পলক। উপরের অন্ধকার আকাশ থেকে হঠাৎ মেঘের প্রচণ্ড গর্জ্জন কড় কড় করে ডেকে উঠল, আবার দিগ্বিদিক আঁধার করে মুষলধারে বৃষ্টি নেমে এল। আবার বন্যার উত্তাল তরঙ্গ তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলে শতসহস্র মৃত্যুদূতের মত সেই সব ভগ্ন-কুটীরগুলির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বন্যার স্ফীত অতি-ঘূর্ণায়মান গেরুয়া রঙের জল তীব্রবেগে সমস্ত গ্রাম, সমস্ত পাড়া, সমস্ত ক্ষেত ও লোকালয়কে ধ্বংস করতে যেন ছুটে চলতে লাগল। পরেশ তাই শুধু নিস্তব্ধভাবে দেখতে লাগল।

বৃষ্টিটা বন্ধ হ'ল সেদিন বিকেল বেলাতেই। কিন্তু বানের জল কম পড়ল না—বরং দিন দিন বেড়েই যেতে লাগল। চারিদিকে একটা সাড়া পড়ে গেল। হাট-বাজার, দোকান-পাট বন্ধ। বাজারে কোন মাল পাওয়া যায় না। চাল, ডাল, মুড়ি, চিড়ে কেরোসিন সবই হয়ে উঠল সোনার মত দামী—বহুমূল্য। বাইরে থেকে মাল আনার উপায় নেই। কাছাকাছি শহরেও বান ঢুকেছে। শহরের লোক ঘর ছেড়ে ছাদে উঠেছে। সেখানেও সুরু হয়েছে হাহাকার। সরকারী বাঁধান রাস্তা দিয়ে তীরবেগে বানের জল ছুটছে। শহরের সব দোকান বন্ধ। অনেকের দোকান ডুবেছে, গুদাম ডুবেছে বানের জলে। রেল বন্ধ। রেললাইন ভেসে গেছে, রেল আসে না, ডাক আসে না। এমনি বিপর্য্যয়ের মধ্যে জিনিসের দাম দিনের পর দিন চড়তে সুরু করেছে। লোভীর দল এই দুরবস্থার মধ্যে ডবল মুনাফা লুটবার সুযোগ পেয়ে যেন তারা হাতে স্বর্গ পেয়েছে।

হাটের চালা-ঘরে পরেশ আর পরেশের মত অভাগারা সংসার পেতে বসেছে। কাগজে কাগজে ছাপার অক্ষরে এই সব দুর্গতদের দুঃখের কাহিনী সবিস্তারে বেরিয়েছে। বহু লোক হা-হুতাশ করে বড় বড় প্রবন্ধ লিখেছেন। ভিন্ন জেলার শহরে শহরে সরকারকে নানাভাবে দোষী করে রাজনৈতিক দলগুলি জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতার ঝড় বইয়ে দিয়েছে। বহু গরম গরম তর্ক-বিতর্ক হয়েছে, কিন্তু পরেশদের বিশেষ লাভ হয় নি।

পরেশরা—পরেশদের মত দুর্ভাগারা সেই হাটতলায় ঠাণ্ডাজল, কাদা, স্যাঁতসেঁতের ভেতর ছেলে-বউ নিয়ে রাতের পর রাত দিনের পর দিন কাটিয়েছে। খিদের জ্বালায় ছেলেরা কেঁদেছে, কাঁদতে কাঁদতে ওরা সেই কাদার মাঝেই গড়াগড়ি দিয়েছে, আর পরেশের স্ত্রী কেঁদেছে, ভগবানকে ডেকেছে। এতেও পরেশ কোন কথা বলে নি। সে যে সেই পাথরের মত বসে ছিল ঠায় এক জায়গায়, তেমনি বসে বসে শুধু বানের উন্মত্ত বীভৎসতা লক্ষ্য করেছে—অথবা সংসার যে মায়াময়, এই জগতে যে কিছুই স্থায়ী নয়, এই সত্যই বুঝি উপলব্ধি করে কোন দিকে কান দেয় নি।

কিন্তু দামিনী যখন কাঁদতে কাঁদতে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে পরেশকে দু' হাত দিয়ে ঠেলা দিতে দিতে বলতে লাগল, হাঁগো তুমি কি পাষাণ! দেখছ না ছেলেমেয়ে দুটো খেতে না পেয়ে মরতে বসেছে। একটুও হুঁস নেই—নাও ওঠ, ওঠ—

পরেশ তার আরক্ত চক্ষু মেলে বলল, অ্যাঃ—। দামিনী দেখিয়ে দিল ছেলেমেয়ে দুটিকে। ওরা রাস্তায় ফেলে দেওয়া

কলাপাত চাটছে—একটা পোড়া বেগুনের খোসা নিয়ে নিজেরা মারামারি কামড়াকামড়ি করছে—কুকুরগুলোর মুখ থেকে পোড়া-ভাত কেড়ে নিয়ে খাচ্ছে। দামিনী বলল, সরকার নাকি চাল-ডাল বিলুচ্ছে। ওরা সব চাল আনতে গিয়েছে পিসিডেণ্টবাবুর বাড়ী। তুমি যাও—বলগে আমরা দুদিন উপোসী। বলগে আমাদের চাল, ডাল, নুন, তেল সব দিতে—যাও বসে থেক না—

দামিনী পরেশকে একরকম ঠেলে ঠেলে পাঠিয়ে দিয়ে সেই চালাঘরখানা ঝাট দিল। চাল-ডাল এনে ভাত চড়াবে। দুদিন থেকে একরকম উপোস—শুধু খেয়েছে জল—আর কেঁদেছে, বুক চাপড়িয়েছে—আর ভগবানকে ডেকেছে। কিন্তু এখন আর পারা যায় না—খিদের জ্বালা বড় জ্বালা। সমস্ত শরীর মাথা ঝিমঝিম্ করছে—হাত-পা ভেঙে পড়ছে। দামিনীর কেবলই মনে হচ্ছে এক হাঁড়ী ভাত যদি পায়, শুধু নুন দিয়ে সব খেয়ে ফেলতে পারে। দামিনী বার বার পরেশের জন্য রাস্তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

দামিনী বন থেকে কাঠ ভেঙ্গে এনে, দু'খানা ইট সাজিয়ে আথা তৈরী করেছে—একটা হাঁড়ী যোগাড় করে জল দিয়ে, আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আথার উপর টগবগ করে জল ফুটছে—এখন শুধু চাল এলেই হয়। ছেলেমেয়ে দুটো বার বার মার কাছে আসছে, আর হাঁড়ীর দিকে লুব্ধ দৃষ্টি দিয়ে বলছে, মা, ভাত দাও। দামিনী আশ্বাস দিয়ে বলছে, এই ত বাবা ভাত চড়ালাম, সবুর কর একটু। আগে তোর বাপ আসুক। কিন্তু কোথায় পরেশ? কোথায় চাল-ডাল-নুন-তেল? সন্ধ্যা হয়-হয় তখন এল পরেশ। কিন্তু হাত খালি। দামিনী আর্ত্তকণ্ঠে চেঁচাল—চাল-ডাল সে সব কই? নেই। পেলাম না—সব ফুরিয়ে গিয়েছে—

দামিনী পাগলের মত বলল, নেই?—ফুরিয়ে গিয়েছে? তবে—তবে কি না খেয়ে মরব? চোর—চোর—সব চোর। সরকারের জিনিস চুরি করিস তোরা। দীন-দুঃখীর মুখের জিনিস চুরি করিস সব। ভর সন্ধ্যাবেলায় বলছি ভাল হবে না—তোদের ভাল হবে না। হে ভগমান, তুমি বিচার কর-তুমি দেখ ভগমান—। ভাল হবে না—ভাল হবে না। পরেশের মুখ গম্ভীর, একটা দৃঢ় সঙ্কল্পের ছায়া যেন তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে। পরেশ বলল, কালুর মা ভাবিস নে, আজ রাতেই চাল-ডালের ব্যবস্থা করছি। শুধু একটু সবুর কর। ঘণ্টা দু-তিন সবুর কর—

দামিনী ঝেঁঝে বলে উঠল, আবারও সবুর করতে বলছ খোকার বাবা? দু'দিন থেকে উপোসী—পেট জ্বলছে—রাক্ষুসে খিদেয় যে সাড়া শরীর পুড়িয়ে খাচ্ছে। আর আমার বাছারা না খেতে পেয়ে—ঐ দেখ নেতিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। হায় ভগমান—হায় ভগমান—এত দুঃখু ললাটে দিয়েছ। পরেশ একবার তাকাল ছেলেদের দিকে, তারপর রাতের অন্ধকারে মিশে গেল।

অনেক রাতে পরেশ ফিরল। মাথায় করে এনেছে একটা বস্তা। তার পর আরও একটা বস্তা মাথায় করে এনে ডাকল দামিনীকে—দামিনী ধড়মড় করে উঠে বসে বলল, কি, ডাকছ নাকি?

—হাঁ, ঝপ করে লম্প জ্বালা—আর দে কাপড়ের আবডাল, আরও টেনে দে—হাঁ—টেনে দে। দেখ এবার—দেখছিস—

দামিনী দুই চোখ রগড়ে অবাক হয়ে দেখল, সত্যি ত, কত চাল, ডাল, মুড়ি—দেশলাই আরও কত কি—

—কোথায় পেলে গো? এ যে দেখছি মিছরীর কুঁদো—সাবু—সাবান—চায়ের বাক্স—বিস্কুটের এত—গাদা, এ সব কোথায় পেলে?

—চুপ। কথা না আর—নে, থপ করে আগুনে কাঠ দে। ভাত চড়া, ভাতে আলু আর ডাল ফেলে দে—দে বেশী করে চাল, আজ ভরপেট ভাত খাব। ওরা ঘুমুচ্ছে ঘুমুক, ভাত হলে ছেলে-মেয়েকে ডাকবি—নে তাড়াতাড়ি। দামিনী আর কথা বলল না। উনুনের আগুনে অনেক কাঠ দিয়ে হাঁড়ি চাপিয়ে ভাত চড়িয়ে দিল। উনুনের আগুনের দিকে চেয়ে ঘুমন্ত ছেলেমেয়ের মাথায় হাত দিয়ে কি যেন বুঝতে চাইছে দামিনী। পরেশ বলল, কালুর মা, আমি বুঝছি তুই কি বলবি। কিন্তু কোন আর উপায় নেই রে! পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। এ যে কোন বারণই শোনে না। দেখিস নি, উপযুক্ত জোয়ান ছেলে মরেছে—বাপ-মা কত কান্নাকাটি করল, কত মাথা খুঁড়ল, কেঁদে গলা ভাঙ্গল। কিন্তু দুদিন পর সেই ভাত খেল। সবকে ভোলা যায়—বড় শোকও মানুষ দুদিন পর ভুলতে পারে কিন্তু পারে না ভুলতে পেটকে। ঐ যদু দোকানীর হাতে-পায়ে ধরলাম, বললাম, যদুদা ধার দাও। সময় এলে কড়ায় গণ্ডায় সব শোধ দেব। কিন্তু যদু দোকানী বলল, কোথায় আমার চাল—চাল নেই। কিন্তু ওর ঘরে দেখলাম, বস্তা বস্তা চাল-ডাল মাটি থেকে কড়িকাঠ পর্য্যন্ত থাক দেওয়া রয়েছে। তাই বাধ্য হয়ে এই কাজ করলাম। কিন্তু আমি চোর নই, চুরি করা ঘেন্নার কাজ—কিন্তু ছেলেমেয়ের মুখ চেয়ে বাপ হয়ে কি করে চুপ করে থাকি! ভাবিসনে তুই রাঁধ এখন।

পরেশের রাগ হয়েছিল দু'জনের ওপর। এক যদু দোকানী আর এক ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট রামহরিবাবুর ওপর। যদুর যথেষ্ট চাল থাকতেও তাকে এক সেরও ধারে দেয় নি আর প্রেসিডেণ্টবাবু চাল থাকতেও তাকে হাঁকিয়ে দিয়েছিলেন, চাল নেই বলে। কিন্তু শুধুমাত্র রাগ থাকলেই চলে না। কাজ উদ্ধার করার কৌশল জানা না থাকলে কাজ উদ্ধার হয় না। হয় কাজ পণ্ড। তাই পরেশ পরদিন প্রেসিডেণ্টবাবুর লুকানো চালের ঘরে সিঁদ দেবার সময় ধরা পড়ে যায়।

পরেশ মার খেল প্রচুর। প্রেসিডেণ্টবাবুর শঙ্করমাছের চাবুক পরেশের সারা গায়ে লাল স্বাক্ষর দিয়ে দিল যে, সে চোর। ওর পিঠের সমস্তটা চামড়া কেটে রক্তারক্তি হয়ে গেল—গাল ও চোখের কোণ কেটে ফুলে চোখই ঢেকে দিল। তবুও পরেশ হাসছে—লোকের ভীড়ের দিকে তাকিয়ে জোর গলায় বলল, দুদিন ছেলে-

বউ নিয়ে উপোসী। বাবুর কাছে সরকারী চাল চাইলাম—বাবু বললেন, নেই, ভাগ, ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু দেখুন ভাইসব ঘরে কত চাল!

কিন্তু কিছু হ'ল না। পরেশকে ধরে নিয়ে গেল, নীলজামা গায়ে দেওয়া দুজন চৌকিদার—

দামিনী কত কাঁদল—কত হাতে-পায়ে ধরল, কিন্তু কোন ফলই হ'ল না।

দামিনী বুক চাপড়ে ডাকতে লাগল, হে ভগমান—এর বিচের তুমি কর—বিচের কর—। ঈশ্বর বোধ করি দামিনীর কথা শুনলেন। কাঁকর-মেশান মোটা মোটা চাল আর খেঁসারী ডালের খিচুড়ী খেয়ে লোকগুলো মরতে লাগল। অমন উপাদেয় খাদ্য হজম করতে না পেরে, বার কয় দাস্ত আর বমি করে ওরা চোখ বুজতে লাগল। একনাগাড়ে দশ দিনে বহু লোক সাবাড় হয়ে যাবার পর, কিছু ব্লিচিং পাউডার আর ইন্‌জেক্‌সনের ওষুধ নিয়ে এলেন স্যানিটারী বাবু। কিন্তু তখন আর উপায় নেই—লোকগুলি তখন আধ-পোড়া অবস্থায় শ্মশান-ঘাট আলো করে পড়ে রয়েছে—ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ও লোকদের শ্মশান-ঘাটের শেয়াল-কুকুর ছেঁড়াছেঁড়ি করে খাচ্ছে। পরেশের সেই ছেলেমেয়ে দুটি আর দামিনী নিজে একদিনে সর্ব্বদুঃখকে এড়িয়ে পরেশকে ফাঁকি দিয়ে পরম শান্তিলাভ করল। হাটতলায় চালা-ঘরে পড়ে রইল ভাঙা একটা মাটির হাঁড়ী—ছেঁড়া সাড়ী—পরেশের একটা ধুতি—আর ছেলেগুলির ভাঙাচোরা ছাইভস্ম গোটাকয় খেলনা। ওদিকে পরেশ তখন বোধ করি মহানন্দে জেলখানায় বসে বসে লপসী ভোগ খাচ্ছে আর জেলখানায় ফুলবাগান পরিষ্কার করছে।

ছ'মাস পর পরেশ জেলখানা হতে বেরিয়ে এসে দেখল বান আর নেই বটে, তবে তার ভিটেয় কে যেন লাঙল দিয়ে ফসল বুনে দিয়েছে। বান সরে যাওয়ার পর পলিমাটিতে ফসল ভালই ফলবে অবশ্য। পরেশ শুনল তার ছেলেমেয়ে আর বউয়ের খবর। দু'কান পেতে শুনল তার বউ আর ছেলেমেয়ের কথা। দামিনী খালি কাঁদত—ছেলেমেয়েরা বাবা বাবা বলে ডাকাডাকি করত। খালি ওরা ডাকত—বাবা আয়, ক্ষিদে লেগেছে—আয়, ভাত খাবি—আয়, মা ডাকছে—কাঁদছে। বাবা বাড়ী আয়। পরেশ শূন্যমনে চেয়ে রইল—ঘুরে বেড়াল সেই হাটতলায়—সেই চালা ঘরে—তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল সব। দেখল ছেলে আর বউকে এই ঘরে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা! অনেকক্ষণ কেঁদে কেঁদে বোধ করি হাল্কা হ'ল। তার পর দেখল যদু দোকানীকে—যদু দোকানীর ভুড়ীর বেড় আরও বেড়ে গিয়েছে আর প্রেসিডেন্টবাবুর আরও যেন জৌলুস বেড়ে গেছে। বান এসে ওদেরই হয়েছে লাভ। পরেশ পোড়া বিড়িটা ছুঁড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

পরেশ চলে এল কলকাতায়। গাঁয়ে আর কিসের টানে থাকবে? ছেলে নেই—বউ নেই, বাড়ী-ঘর শেষ হয়েছে—জমি-জিরেৎও নেই যে, মন বাঁধা থাকবে। আর খাটবেই বা কার জন্তে—নিজের পোড়া পেট—যেমন তেমন করে চলে যাবে। পরেশের মনে হ'ল, কোলের মেয়েটাও যদি থাকত তবে সে কি আসত? কিন্তু আর টান নেই। মায়া-মোহের সব শেকড় দুর্য্যোগের ঝড় এসে সব উপড়ে দিয়ে গিয়েছে। এ ছাড়া আর দেশে থাকাও চলে না। লোকে জানে পরেশ চোর। তাই কেউ তাকে বিশ্বাস করবে না—কাছে ডাকবে না—বোধ করি ভাল করে কথাও বলবে না। আর নিত্যি পুলিস এসে জ্বালাতন করবে—রাত দুপুরে এসে হাঁকবে—এই দাগী, ঘরে আছিস। কোথাও চুরি হলেই আগে ধরবে তাকে—সোজা থানায় চালান দেবে। রুলের গুঁতো আর চড়-থাপ্পড় মেরে দোষ স্বীকার করাবে। কারণ সে যে দাগী, সে যে চুরি করেছিল। তাই পরেশ পালিয়ে এল কলকাতায়। পোড়া পেটের জন্যে তাকে একটা কিছু করতেই হবে। কিন্তু কিই বা সে জানে? সে চাষার ছেলে, জানে চাষ আবাদ। কিন্তু এখানে তা হবার উপায় নেই। পরেশ চেষ্টা করে পেল একটা চাকরী চাকরগিরির। এ মন্দ নয়। বরং এই ভাল।

মুনিব সারদাবাবু প্রথম দিনই বললেন, কিরে বাপু, চুরিটুরি করবি নে ত। অভ্যেস যদি থাকে—এখনও বল। কিছু বলব না। কিন্তু ও বদস্বভাব যদি থাকে, তবে বাবা বুঝতেই পারছ—একেবারে শ্রীঘর যেতে হবে। এক বেটা এর আগে চাকর ছিল। বেটা বাড়ীতে করল চুরি, এখন জেল খাটছে। এ কথা মনে রাখবে কিন্তু!

পরেশ দুই হাত কচলে বলল, কি যে বলেন কর্ত্তা? চুরি করব কেন? আমি চাষার ছেলে—চাষবাস করতাম। কিন্তু বাবু ওই যে বললাম। বানে ক্ষেত-খামার ডুবে গেল—জমি-জিরেৎ সব নষ্ট হ'ল। ছেলে-বউ ওরাও মারা গেল, তাই দূর ছাই বলে, তোর সংসারের নিকুচি করেছে বলে বেরিয়ে পড়লাম। ইচ্ছে ছিল, চিমটে হাতে নিয়ে ছাই মেখে সন্ন্যাসী সাজব। কিন্তু হুজুর এও ভাবলাম, ও কাজটাও সহজ নয়।

সারদাবাবু বললেন, কাজটা আবার কঠিন কিরে বেটা। তোর মাগ নেই, ছেলে নেই, ঘর-সংসার সব যখন গেছে, তখন তুই ত সন্নিসী হবার উপযুক্ত পাত্র। বেটা দিনরাত কেমন ভগবানকে ডাকতিস। বাপু সংসারের ঝামেলা কি কম? এক-একদিন আমারই মনে হয়, যাই যেদিকে দু চোখ যায়। কিন্তু তা আর পারি নে। ঘানিগাছের চার পাশে কলুর বলদের মত খালি পাক দিয়ে মরছি। মায়ার বাঁধন ভারী শক্ত বাঁধন রে! বেশ, লেগে যা কাজে। কিন্তু বাপু, সন্নিসী হলেই ভাল কাজ করতিস।

পরেশ ছিল চোর—হ'ল চাকর। অবশ্য চোরের চেয়ে চাকরের কাজ মহা সম্মানের। সারদাবাবু গৃহিণীর হাতে পরেশকে সঁপে দিয়ে প্রস্থান করলেন। গৃহিণী মোটা মানুষ, তাঁর নড়তে চড়তেই দিন ফুরিয়ে যায়। দোতলার মস্ত বারান্দায় মাদুরের

উপর মস্ত বড় তাকিয়ায় হেলান দিয়ে গিন্নীমা শুয়েছিলেন। পাশে এক ডাবর পান। মুখের ভিতর গোটাকয় খিলি ফেলে দিয়ে আর অনেকখানি জর্দা মুখের ভিতর ঢেলে জিজ্ঞাসা করলেন—নামটা কি তোর ?

পরেশ তাঁর পায়ের কাছে উবু হয়ে বসে বলল, আজ্ঞে আমার নাম পরেশ। আমরা ভাল জাত মা ঠাকরুণ। জেতে আমরা কৈবর্ত্ত।

—তা বেশ। কিন্তু বাপু মশলা পিষতে পার ত ? নিতাই বেটা অনেকদিনের চাকর ছিল, কিন্তু তার যে হঠাৎ কি দুর্ম্মতি হ'ল তা ভগবানই জানেন। বড় মেয়ে শ্বশুর বাড়ী হতে এল—গায়ে অনেক টাকার গয়না। মেয়ের গয়না চুরি করল হারামজাদা। কর্ত্তাকে কত বারণ করলাম—তা শুনলেন না। দিলেন থানা-পুলিস করে। জেল হয়ে গেল এক বছর। যাবার সময় তার কি কান্নাকাটি! এর পায়ে ধরে, ওর হাতে ধরে—আর কি মারটাই না খেল ? তা তুমি মশলা পিষতে পার ত—বলি ও ঠাকুর, ঠাকুর! ঠাকুর একতলায় তখন লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে, কি যেন একটা তরকারী রাঁধছে। লঙ্কা ফোড়নের ঝাঁঝে পরেশের চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল বেরিয়ে এল। ঠাকুর রান্নাঘর থেকেই উত্তর দিল যাই মা।

পরেশ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। সমস্ত ঘর-বারান্দা সাদা পাথর দিয়ে মোড়ান। ঘরে ঘরে বন বন করে পাখা ঘুরছে. পাশের ঘরে কোথায় যেন কে গান করছে—বাঁশী বাজাচ্ছে। পরেশ অবাক হয়ে শোনে। ঘরে কত রকমের আয়না, কত ছবি, কত গদি-মোড়া চেয়ার! জিনিসপত্রের আর সীমা-সংখ্যা নেই। পরেশ হাঁ করে দেখে, আর অবাক হয়ে যায়। দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে দিদিমণিরা সেজেগুজে বই-খাতা হাতে করে ঘরের গাড়ী করে স্কুল-কলেজে যান। পরেশ হাঁ করে চেয়ে থাকে—মনে মনে ভাবে, যেন সব ডানাকাটা পরী, স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন। খাবার সময় পরেশ এক কাণ্ড করল। পাতের ওপর বড় বড় দু খানা মাছ আর এক গাদা ভাত-ডাল-তরকারী দেখে হাত গুটিয়ে নিল। ওর চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল। ঠাকুর বলল, আরে পরেশ, কাঁদ কেন—কি হ'ল ?

মাছ আর ভাত দেখিয়ে পরেশ চুপ করে শুধু কাঁদতেই লাগল।

ঠাকুর বলল, দেখুন মা, পরেশ খাচ্ছে না—খালি কাঁদছে। হাঁসফাঁস করতে করতে, গিন্নীমা তখন অতিকষ্টে সিঁড়ি ভেঙ্গে নীচেয় আসছিলেন, ঠাকুরের কথায় অবাক হয়ে বললেন, কেন, কি হ'ল পরেশ। বাড়ীর জন্ম মন কেমন করছে নাকি ? তা বাপু তোমার ত ছেলে-বউ কেউ নেই, তবে আবার ভাবনা কেন ?

পরেশ বলল, না মা—তা নয়। কাঁদছি, আজ কত ভাল ভাল খাবার খাচ্ছি। এই ভাত-ডাল-তরকারী এমন বড় মাছ, ছেলেমেয়েরা বড় ভালবাসত। দুটো ভাত তারা পায় নি—বউটাকেও খেতে দিতে পারি নি। তাই এত ভাত, এমন মাছ দেখে মনে পড়ে গেল, ওদের কথা। তারা যে মা পেটে খিদে নিয়ে মরেছে—তাই কাঁদছি মা। গিন্নীমা বললেন, আহাঃ। কিন্তু উপায় ত নেই—কারুর আর হাত নেই। এখন খেয়ে নাও।

চাকরগিরির কাজ পরেশের ভালই লাগতে লাগল।

কাজ যে খুব বেশী তাও না। তার মত আর একটা চাকর আছে—কিন্তু সে অন্য কাজ করে। পরেশকে বাটনা বাটতে হয়, গিন্নীমা আর দিদিমণিদের ফাই-ফরমাস খাটতে হয়। তাতে পরিশ্রম নেই বরং লাভই বেশী।

ভাল খাবার—চা-রুটি-বিস্কুট এগুলো পরেশের ভাগ্যেই জোটে।

মেজদিদিমণি বলেন, কি রে পরেশ, টোষ্ট খাবি ? যা নিয়ে যা!

মেজদিদিমণির যেন পাখীর আহার। কিন্তু চায়ের বেলায় অনেক কাপ চা দিনে-রাতে খান। শুধু যত গোলমাল বাধায় খাবার বেলায়। ভাল ভাল দামী সব খাবারের এক কোণ ভেঙে একটুখানি মুখে দিয়ে দিদিমণি ঠেলে দেন পরেশকে। এতে পরেশেরই লাভ। তাই অল্পদিনের মধ্যে পরেশের চেহারা ফিরে গিয়েছে। রুক্ষ ভাব আর নেই। সমস্ত শরীরে এসেছে চিকন চিকন ভাব। বেশী কাজের মধ্যে দুপুর বেলায় গিন্নীমার পা টিপে দিতে হয়। গিন্নীমা শুয়ে শুয়ে কত গল্প করেন। সমস্ত গল্পের মধ্যে পরেশকে হুঁ হুঁ করে সায় দিতে হয়। নইলে গিন্নীমা বলেন, কি রে পরেশ, শুনছিস নে।

পরেশ জোরে জোরে পা টিপতে টিপতে বলে, হাঁ শুনছি বৈকি গিন্নীমা! বলুন, ভারী মজার গল্প ত। অবশ্য এই খাটুনীর জন্য পরেশ গিন্নীমার কাছ থেকে বখশিসও পায়। কিছু পয়সা দিয়ে গিন্নীমা বলেন, যা পরেশ বায়স্কোপ দেখে আয়। আহাঃ কি ছবিই না হয়েছে! দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। ঠাকুরদের নাম—ঠাকুরদের কথা। বলি, প্রহ্লাদের গল্প জানিস ত? জানিস নে? ওমা—প্রহ্লাদের গল্প যে এই এতটুকু ছেলেও জানে! যা বইখানা দেখে আয়, তার পর আমার কাছে গল্প শুনিস।

কিন্তু পরেশের সব চেয়ে ভাল লাগে মেজদিদিমণিকে। ওনার কথা কেমন মিষ্টি, মুখখানাও তেমনি মিষ্টি। সেদিন পরেশ মেজ-দিদিমণির পা টিপে দিয়েছিল। আহাঃ, পা দুখানি যেন পদ্ম ফুলের মত। যেন সে নরম ফুলে হাত বুলোচ্ছে এমনি মনে হয়েছিল। পরেশ ভাবে, আর একদিন যদি মেজদিদিমণি পা টিপে দিতে বলেন, তবে সে ধন্য হয়ে যাবে।

বাবুদের বাড়ীর একটা রাস্তার পরেই নটবর আইচের বিড়ির দোকান। তার একটা ঘরে, চাকরদের আড্ডা বসে। পরেশও সে আড্ডায় যোগ দেয়। ওরা পুরোনো তাস নিয়ে খেলতে বসে।

বিড়ির ধোঁয়ার সঙ্গে, গাঁজার ধোঁয়া মিশে যায়। অন্ত চাকররা বলে, লে পরশা টেনে নে।

পরেশ বলে, উঁহু, ওটা পারব না দাদা। দেহটা বেজুত।

ওরা হৈ হৈ করে উঠে, বলে, বেজুত কি রে পরশা। টেনে দেখ—তবেই শরীরে জুৎ পাবি। ডাক্তারবাড়ীর চাকর, তাদের দিদিমণিদের নিয়ে অশ্লীল মন্তব্য করে, সকলে হিঃ হিঃ করে হেসে ওঠে। পরেশের এ সব ভাল লাগে না। ওরা পরেশের দিকে তাকিয়ে ফিসফাস করে, কি সব বলতে থাকে। পরেশ ভাবে, না, আর এখানে আসবে না। কিন্তু সন্ধ্যে হলেই প্রতিজ্ঞা রাখতে পারে না। নটবর আইচের আড্ডা ওকে ডাকতে থাকে।

মাঝে মাঝে পরেশ আনমনা হয়ে যায় তার বউ আর ছেলেমেয়েদের কথা ভেবে। সে আজ কত রাজভোগ খাচ্ছে বড় বড় মাছ—থালা ভর্তি ভাত। তার বউটা খেতে কতই না ভালবাসত! ছেলেমেয়ে দুটো সন্দেশ আর বিস্কুটের নামে লাফ দিত। কিন্তু কি কপাল! আজ যখন হাতের কাছে সেই সব জিনিষ, এখন তারা কোথায়? তাদের দেশের শ্মশান-ঘাটের কথা মনে হতেই পরেশের গা কাঁটা দিয়ে উঠল।

সন্ধ্যেবেলায় গিন্নীর ডাকে ওপরে এল পরেশ। কে একজন মোটা ফরসা মতন বাবু গিন্নীমার পাশে গদি-মোড়া চেয়ারে বসে পা নাচাচ্ছে।

—এই নাকি তোমার নতুন চাকর? কিন্তু এ যে বাবু! যে ফরসা কাপড়-জামা ধরিয়েচ শেষ পর্যন্ত টিকলে হয়।

গিন্নী বলেন, কি যে বলিস ভোলা! ফরসা কাপড় পরলেই বুঝি পালায়?

না—না—পালাবে কেন? এখানে ত কোন কষ্ট নেই।

পরেশ বুঝল, ইনিই গিন্নীমার ভাই। শ্যামবাজার না বাগবাজারে কোথায় যেন থাকেন! ওখানেই গিন্নীমার বাড়ী। কর্তার শালাবাবু কাজকর্ম করেন না। কিন্তু তা বলে টাকার অভাব নেই। যদিও নিজের উপায় নেই। শোনা যায় গিন্নীমার বাপের বাড়ীর অবস্থাও খারাপ। তা হোক গিন্নীমার অবস্থা ত ভাল। ভোলাবাবু বিয়ে-থা করেন নি, কিন্তু নানা দোষ। গিন্নীমার দৌলতেই ভোলাবাবু রাজার হালে চলেন। গিন্নীমা লুকিয়ে লুকিয়ে টাকা দেন—তা কর্তাবাবু জানতে পারেন না।

ভোলাবাবু পা নাচাতে নাচাতে বললেন, কি নাম বাপু? পরেশ বললে না। বেশ—বেশ। দে দেখি পা টিপে। জুত করে টিপে দে। চাষাড়ে হাতে যেন টিপবি নে, বুঝলি। নরম হাতে টিপে দে। ভোলাবাবু দু'খানা পা ছড়িয়ে দিলেন। পা টিপতে টিপতে পরেশ কান খাড়া করে থাকে। ভাই-বোনে যে কথা হয়, কিছুটা বোঝে—আবার কিছু বোঝে না। তবে পরেশ বুঝল, ভোলাবাবু গিন্নীমার কাছে দু'হাজার টাকার আবেদন পেশ করেছেন।

গিন্নীমা বলেন—অত টাকা নিয়ে তুই সবই ত সেই সর্বনাশীর বুক ভরাবি—ছিঃ লজ্জা লাগে না—

ভোলাবাবু ক্যাক্ ক্যাক্ করে হেসে বললেন, মাইরী বলছি দিদি এসব কোন দুষ্ট লোক তোমার কান ভারী করেছে। তাই কি হয় —ছিঃ ছিঃ। গিন্নীমা আর কোন কথা না বলে, জর্দা আর গোটা-কতক পান মুখে ফেলে দেন।

সে দিন কিসের যেন একটা মস্ত ভোজ ছিল বাড়ীতে। কর্তাবাবু বোধ করি মোটা মুনাফা করেছেন ব্যবসায়ে। অত খোঁজ রাখে না পরেশ। তবে ভোজের আয়োজন যে সকাল থেকে সুরু হয়েছে তা দেখতে পাচ্ছে। সকাল থেকে আসছে নানা ফুল-পাতা, গেট সাজান হচ্ছে—গেটের দু'পাশে কলাগাছ আর মঙ্গলঘট বসান হয়েছে। আমের শাখা—নানান্ আলপনা—রঙীন বাতি ফানুস দিয়ে, বাড়ী যেন বিয়ের আসরের মত সেজেছে। সন্ধ্যে হতেই সারা বাড়ী ইলেক্ট্রিকের আলোয় ফুট ফুট করছে। ঘরে ঘরে হাসি, লোকজনের ভীড়। ওদিকে নীচের রান্নাঘরে বিরাট আয়োজন। পোলাও—কালিয়া—কোর্মা মাংসের গন্ধে, বাতি মৌ মৌ করছে। ভাল খাবারের লোভে পরেশের চোখ দুটো জ্বলছে—আর জিভ সক্ সক করছে।

রাত বোধ করি ন'টা। বন্ধু-বান্ধব-অতিথিতে বাড়ী গম্ গম্ করছে। ভোলাবাবু মটকার পাঞ্জাবী পরেছেন, হাতে দিয়েছেন অনেক কটা আংটি! রুমালে ঢেলেছেন আতর। এ ঘর ও ঘর করছেন, মাঝে মাঝে গেলাসে কি ঢেলে খাচ্ছেন আর রেশমী রুমালে মুখ মুছে লবঙ্গ মুখে ফেলছেন। দিদিমণিরা আকাশের পরীর মতন সেজেগুজে এদিক সেদিক ঘুর ঘুর করছেন। পরেশ দেখে দেখে তাজ্জব হয়ে গেল। তার মনে হচ্ছে এই স্বর্গ। হায় অদেষ্ট—এই সময় তার ছেলে বউ যদি থাকত, তবে তারা কত না অবাকই হ'ত—

কাজে কর্মে ঘোরাঘুরির মধ্যে, পরেশ দেখল, ভোলাবাবু কর্তার ঘরে ঢুকে কি যেন নিয়ে পা টিপে টিপে বাইরে চলে গেলেন। কি যে নিলেন ভোলাবাবু, পরেশ তা দেখতে পেল না। ব্যাপারটা ভাল ঠেকল না পরেশের কাছে। কেমন যেন সন্দেহ হ'ল তার। মনে হ'ল, শালাবাবু কি যেন চুরি করলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আপন মনে জিভ কাটল পরেশ! ছিঃ ছিঃ এ সব কি ভাবছে সে। ভদ্দর লোকের ছেলে—তায় অত বড় মানী লোকের শালা, ওঁরা কি ঐ রকমের মানুষ? তবুও সন্দেহটা কাঁটার মত খচ খচ করতে থাকে!

রাতটা কেটে গেল—বোঝা গেল না কিছু। কিন্তু সকাল হতেই হৈ হৈ রব পড়ে গেল। চুরী হয়েছে কাল রাত্রিতে। খোদ কর্তার পকেট থেকে, পাঁচশো টাকা—আর এক আত্মীয়ের সোনার ঘড়ী আর বোতাম এক সেট।

কর্তা বললেন, কি রে পরেশ তুই নিয়েছিস? বল সত্যি করে, বল এখনও—

পরেশ কেঁদে বলল, না বাবু! আমি নিতে যাব কেন? না, না, আমি চোর নই।

কিন্তু লালাবাবু রুখে উঠলেন। না, তুমি সাধু! বল এখনও, পরেশ তাকাল ভোলাবাবুর দিকে। চটাস করে একটা চড় বসিয়ে লালাবাবু মারলেন এক লাথি। পরেশ কাৎ হয়ে পড়ে গেল।

ভোলাবাবু বললেন, তখনই বলেছিলাম, এই সব অপরিচিত লোক রাখবেন না। ও ত আবার নটবর আইচের আড্ডার লোক। গাঁজাগুলিও খায়—পরেশ কোন কথা বলতে পারল না। তার চোখের ওপর ভেসে উঠল, আর এক দিনের ছবি। নীল জামা গায়ে চৌকিদাররা তার হাত বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল থানায়। সেখানে জমাদারের রুলের গুতো—সারাদিন হাজত, তার পর হাত-কড়ি দিয়ে কোমরে দড়া বেঁধে চালান দিয়েছিল সদরে। তার পর হ'ল জেল। জেল থেকে বেরিয়েই শুনল, তার বউ নেই, ছেলে-মেয়ে নেই! হায় কপাল—বান তার শুধু বাড়ী-ঘরই নেয় নি—তার যথাসর্ব্বস্ব নিয়েছে। তার ইহকাল—পরকাল সবকে খেয়েছে ঐ এক বান।

পরেশ ডুকরে কেঁদে ওঠে, খালি বলে, আমি নই—আমি চোর নই।

গিন্নীমা তাকাল ভোলাবাবুর দিকে। আর এক সঙ্গে অনেকটা পান—অনেকটা জর্দ্দা মুখে ফেলে দেন।

গিন্নীমা বলেন, পরেশ তুই কি নিয়েছিস—বল, কোন ভয় নেই—

—না মা, আমি নই। এই আপনার পায়ে হাত দিয়ে বলছি আমি নই। আমি যদি নিয়ে থাকি, তবে মাথায় যেন বাজ পড়ে—

—তবে কে নিল? পরেশ নিরুপায়। কিন্তু কি বলবে সে। তার কথা কেউই বিশ্বাস করবে না। সে ত দাগী চোর। আজ হোক—কাল হোক, প্রমাণ হবে একবার সে চুরি করে জেলে গিয়েছিল। কিন্তু এবার সে চুরি করে নি—তবুও তার সন্দেহের কথা কেউ বিশ্বাস করবে না—উল্টে তার পিঠ আর আস্ত থাকবে না! এবার সে নিরপরাধ—তবুও তার জেল এবারও অনিবার্য্য। কর্ত্তার টাকা, এ ত আপনজন নেবে না। অপরাধের বোঝা চাপল চাকরের ওপর—আবার যে চাকর নতুন, তারই ওপর।

পরেশকে যেতে হ'ল পুলিশের হাতে—

ক'দিন পর খবর আনলেন কর্ত্তা। উল্লসিত হয়ে বললেন, দেখলে ঠিক ধরেছি আমি। বেটা দাগী চোর—এর আগে ছ'টি মাস জেল খেটেছিল। কিন্তু দেখ, কি ভালমানুষ সেজেই না থাকত! হাত-সাফাইয়ের বাহাদুরী আছে। ভাবছি—টাকাকড়ি ঘড়ি, বোতাম ও সরাল কোথায়?

গিন্নীমা কিছু বললেন না। খানিকক্ষণ কি ভেবে গোটাকয় পান মুখে দিয়ে খানিকটা জর্দ্দা গালে ফেললেন।

নব্যন্যায়ের বিকাশধারা

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মাইতি

নব্যন্যায়ের পূর্ণবিকাশের যে কৃতিত্ব তাহা গৌড় ও মিথিলারই তুল্যাংশে প্রাপ্য ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু এই কৃতিত্বের হিসাবনিকাশে বহু অসুবিধা আছে।

উদ্যোতকর ভরদ্বাজের "ন্যায়বার্তিক" রচিত হইবার পর গৌতমসূত্রের পাশে একটি ছেদ পড়িয়াছিল বটে কিন্তু উহার উপর বাচস্পতির তাৎপর্যটীকা রচনার পরও ঐ ছেদের স্বরূপ বুঝা যায় নাই। বৈশেষিকের প্রশস্তপাদভাষ্যের উপর ব্যোমশিবাচার্য যে "ব্যোমবতী" টীকা লিখিলেন তাহাতেও ঐ দর্শন ন্যায়ের নবরূপ গঠনে যে কোনও কার্যকরী পন্থা দিতে পারে তাহা ধরা পড়ে নাই, তবে বাচস্পতি মিশ্রের সমকালীন যুগান্তকারী গ্রন্থ "ন্যায় কন্দলীকার" শ্রীধরাচার্য দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্গত ভুরিসৃষ্টিতে বসিয়া প্রশস্তপাদভাষ্যের সঙ্গে যে "ন্যায়" নাম জুড়িয়া দিলেন, তাহাতে পূর্ব-ভারতের সারস্বত সমাজ নূতন ঈপ্সিত প্রাপ্ত হইলেন। অবশ্য রাঢ়ের এই আলোকবর্তিকা দীর্ঘকাল গৌড়ের কোনও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সৃজন-প্রতিভা দিতে পারে নাই এবং "যোগ্নোক" প্রভৃতি যাহা কিছু ক্ষীণ জ্যোতি সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা কালের অতলতলে ডুবিয়া গিয়াছে। মিথিলায় ঐ আলোক কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা সুপ্রসিদ্ধ উদয়নগুরু শ্রীবৎসাচার্যের গ্রন্থ উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত বলা চলে না। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বদ্রীনাথ শাস্ত্রী সরস্বতী ভবন প্রকাশিত (১) কিরণাবলী প্রকাশ ও (২) ঐ দধীতি গ্রন্থদ্বয়ের ভূমিকায় উক্ত গ্রন্থের নাম "ন্যায় লীলাবতী" বলিয়া উল্লেখ করিলেও উপযুক্ত প্রমাণাভাবে তাহা স্বীকার করা যায় না, তবে উহা যে শ্রীধরের ন্যায় কন্দলীর পরে রচিত অন্যতম প্রশস্তপাদভাষ্য টীকা-গ্রন্থ এবং অনেকখানি ন্যায়-

দর্শনের নবরূপ গঠনের সহায়ক তাহা ঐ গ্রন্থের প্রকরণ-বিভাগ ও আহ্নিক বিভাগের সূক্ষ্ম সঙ্গতিবিচার উদয়নের সশ্রদ্ধ উদ্ধৃতি প্রমাণে সূচিত হইতেছে। মিথিলানিবাসী পরম ন্যায়াচার্য এই উদয়নের গ্রন্থ রচনাদ্বারা নব্যন্যায় গঠনের পথ পরিষ্কৃত হইল এবং একদিকে তদ্রচিত "ন্যায়বার্তিক তাৎপর্য পরিশুদ্ধি" (অথবা সংক্ষেপে "নিবন্ধ") নামক টীকা 'চতুর্গ্রন্থী'র অন্তর্ভুক্ত হইয়া সর্বশেষ আকররূপে অন্য গ্রন্থ "ন্যায় পরিশিষ্টে"র সহিত গৌতমনির্দিষ্ট ধারার পূর্ণচ্ছেদ সৃষ্টি করিল আর অন্য দিকে "কুসুমাঞ্জলি" ও "আত্মতত্ত্ব-বিবেক", কিরণাবলী টীকাসহ নব্যন্যায়ের প্রাচীনতম আকর-রূপে স্বীকৃত হইল। ন্যায়শাস্ত্রের যে নব্য সম্প্রদায় গঙ্গেশের তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থকে মূল করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা এই বৈশেষিক দর্শনাশ্রয়েই সূত্রপাত করিল। উক্ত গঠনের ইতিহাসে গৌড় বা বাংলার শ্রীধরাচার্যের ন্যায় কন্দলীর অন্ততঃ নামের ঈপ্সিত কিছু কাজ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু মিথিলার এই গৌরবসূর্যের কিরণে তত্রত্য সারস্বত-সমাজ যেভাবে তাঁহাদের বিকাশধারা প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন বাংলা বা গৌড়ের সারস্বত সমাজে তাহা কিভাবে বিকশিত হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। ইহা সত্য যে, পালবংশের অভ্যুদয়ের পূর্বেই এই গৌরব-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল কিন্তু তৎপরে সেনযুগ, পাঠান-যুগ ধরিয়া যাহা কিছু পাণ্ডিত্যের বিকাশ হইয়াছিল তাহার কোনও চিহ্ন নাই। এমনকি মোগল আমলে বর্ধমান রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠার ফলে ভুরসুট, চেতুয়া প্রভৃতি রাজ্যের বিনাশের সহিত বাংলার সারস্বত ইতিহাসের উপকরণরাজির চিরবিলুপ্তি ঘটিয়াছে এবং সেজন্য এই সকল বিদ্যাকেন্দ্রের বর্তমান অবস্থান হাওড়া জেলা পরিত্যাগ করিয়া কি করিয়া সুদূর নবদ্বীপে ভবিষ্যতে তাহার পূর্ণ জাগরণপীঠ রচনা করিল তাহার সূত্রও চিরতরে হারাইয়া গিয়াছে।

কাজেই মিথিলার সারস্বত সূত্র ধরিয়া এই ক্রমাভি-ব্যক্তির পর্যায়-নির্ণয়ে দেখা যায় যে, বৈশেষিক প্রশস্তপাদ-ভাষ্যের "কিরণাবলী" গ্রন্থে "মূর্তত্ব" অর্থাৎ পাশ্চাত্য ন্যায় মতে mood এবং "চিত্ররূপ" অর্থাৎ পাশ্চাত্য ন্যায় মতে diagramatic Representation of proposition ছাড়া সমবায় অর্থাৎ Inductive system of Indian Logicএর অঙ্কুর মিলে। গ্রন্থকারের "প্রবোধসিদ্ধি" ও "নিবন্ধ" গ্রন্থদ্বয় প্রাচীন ন্যায়দর্শনধারাকে নব্যন্যায়ের পরি-পূর্ণ প্লাবন প্রবাহের যুগেও অব্যাহত রাখিয়া সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত জগদ্‌গুরু জয়রাম ন্যায়পঞ্চাননের "ন্যায়-সিদ্ধান্তমালা" গ্রন্থে "কথা" আলোচনা-প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য Proposition বিষয় আলোচনা-সূত্র যোগাইতেছে।

তবে "কিরণাবলী" রচনার পরে মিথিলার পণ্ডিতেরা আর বৈশেষিক ভাষ্যের উপর নির্ভর করা সঙ্গত মনে করেন নাই। এজন্য সুপ্রসিদ্ধ শিবাদিত্য মিশ্র তাঁহার "সপ্তপদার্থী" গ্রন্থে ন্যায় ও বৈশেষিকের সম্মিলিত আলোচনার প্রবর্তন করিলেন এবং কিছু পরেই বল্লভাচার্যও তাঁহার "ন্যায় লীলাবতী" গ্রন্থে উক্ত ধারা অনুকরণ করিয়াছেন। সূত্রাকারে রচিত "সপ্তপদার্থী" গ্রন্থে প্রাচীন ন্যায়ের "অবিনাভাবে"র পাশে উদয়ন কর্তৃক মীমাংসা দর্শন হইতে ন্যায়ালোচনার জন্য সংগৃহীত "ব্যাপ্তি" সূত্রের আলোচনা মিলে কিন্তু ইহাতে অনুমানের কেবল বিভাগ-নির্দেশ ছাড়া কোনও বিস্তৃত প্রসঙ্গ নাই। প্রকরণাকারে লিখিত "ন্যায় লীলাবতী" গ্রন্থে অনুমানের দ্বিবিধ বিভাগের মধ্যে "স্বার্থানুমান" সম্বন্ধে "হেত্বাভাস" প্রকরণে একবার মাত্র উল্লেখ (চৌখাম্বা সংস্করণ, পৃ ৬১৪) রাখিয়া কেবল "পরমার্থানুমানে"র বিশেষ আলোচনা দেখা যায়। ইহাতে সমবায়ের বিস্তৃত সূত্র নির্দেশ ছাড়া আর যাহা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উল্লেখ তাহা এই যে, পাশ্চাত্য Aristotle Dictum-এর সূচনা-সূত্র—"অতএব হেতুপদমপি সাধ্যস্বরূপ মাত্রবৎ (পৃ ৬০৩)" আমরা পাইতেছি। পরে দেখা যাইবে যে, এই সূত্রের প্রকাশভাষ্য এবং তৎটীকা "মেঘ বা বিবৃতি"তে আমরা পাশ্চাত্য নৈয়ায়িক হোয়েটলি এবং মিলের বিবৃতি অনুযায়ী সমস্তসূত্র পাইতেছি।

মহানৈয়ায়িক উদয়নের পর যে সকল মৈথিল নৈয়ায়িক আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাঁহাদের নাম-পরিচয় এমনকি গ্রন্থের নাম বহুলাংশে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। "নারায়ণ-সর্বস্ব", "রবীশ্বর", সুবিখ্যাত "সোন্দড়োপাধ্যায়" প্রভৃতির গ্রন্থনাম ও গ্রন্থকার পরিচয় কালের কবলে বিলুপ্ত। শ্রীকণ্ঠের "ন্যায়ালঙ্কার" দিবাকরোপাধ্যায় "(১) পরিমল, (২) ন্যায় নিবন্ধোদ্যত, (৩) দ্রব্যকিরণাবলী বিলাস, (৪) বৌদ্ধাধিকারা-লোক", প্রকাকরোপাধ্যায়ের "(১) কিরণাবলী টীকা (২) ন্যায় নিবন্ধের টীকা", তরণী মিশ্রের "রত্নকোষ" গ্রন্থরাজির নামমাত্র পাইতেছি; কিন্তু তাহাদের বিষয়বস্তুর সমূহ পরিচয় চির অজ্ঞাত রহিয়া যাইতেছে। ২৬ প্রকরণে বিভক্ত শশধরাচার্যের "ন্যায় সিদ্ধান্তদীপ" গ্রন্থে প্রাচীন ন্যায়ের ষোড়শ পদার্থের আলোচনামধ্যে অনুমান প্রসঙ্গে ব্যাপ্তিবাদের আলোচনা করা হইয়াছে। মণিকণ্ঠের "ন্যায়রত্ন" গ্রন্থের ভাষা ও বিচার পরিপাটি, অনেক স্থলে চিন্তামণিকার গঙ্গেশের তুল্য। কিন্তু তাহাও প্রাচীন ন্যায়ের গ্রন্থানুরূপ। বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে প্রত্যক্ষ ও উপমানের আলোচনা

নাই। অনুমানের আলোচনায় গুরুত্ব ব্যাপ্তির সপ্তবিভাগের দ্বারা দেখা গেলেও স্বার্থ ও পরার্থ বিভাগ আলোচনার একান্ত অভাব। ইহার পূর্বে আবির্ভূত সোন্দড়োপাধ্যায়ের গ্রন্থনাম বা গ্রন্থকার পরিচয় না জানা গেলেও তৎকল্পিত "ব্যধিধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাব"বাদ ইহাকে চিরস্মরণীয় রাখিয়াছে। কারণ তাঁহার এই আলোচনার ফলেই নব্যন্যায়ে অনুমানখণ্ড ক্রমশঃ গুরুত্বপ্রাপ্ত হইয়া ন্যায়ের শেষ পরিণতিতে একমাত্র শ্রেষ্ঠ বিচারাত্মক প্রসঙ্গরূপে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আচার্য গঙ্গেশের প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারি খণ্ডে বিভক্ত "তত্ত্বচিন্তামণি" রচনার ফলে নব্যন্যায় সম্পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করে। প্রাচীন ন্যায়ের একমাত্র "প্রমাণ" আশ্রয় করিয়াই ইহা বিকশিত। তাঁহার গ্রন্থে সিংহ ও ব্যাঘ্র উপাধিধারী দুই জন প্রাচ্য (সম্ভবতঃ বঙ্গজ) দেশীয় পণ্ডিতের প্রকরণ এবং "অমৃতবিন্দু" ও "নয় রত্নাকর" নামক প্রভাকর-মীমাংসা মতের নির্বন্ধকর্তা রাঢ়ীয় পোষলী গ্রামী মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় গৌড়দেশের সারস্বত চিন্তা সে সময়েও গৌরবময় ছিল কিন্তু ঐ পোষলী গ্রাম কোথায় এবং মহামহোপাধ্যায়ের বা সিংহ-ব্যাঘ্রনামা পণ্ডিতগণের পরিচয় কি তাহা পাইবার আশা রাখি না। নব্যন্যায়ের এই প্রখ্যাত মণিকার শুধু যে স্বীয় প্রতিভায় মিথিলার তথা নব্যন্যায়ের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ বিকীরণ করিয়াছিলেন তাহা নহে, তৎপুত্র বর্ধমানোপাধ্যায়ও পিতৃগ্রন্থ আশ্রয় না করিয়াই স্বীয় মনীষার প্রভাবে অতুলনীয় ছিলেন। শুধু "কিরণাবলী প্রকাশ" গ্রন্থে কেন, তাঁহার অন্যান্য সমূহগ্রন্থেও প্রাচীন ও নব্যন্যায়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা আমরা পাইতেছি। তিনি "ন্যায় লীলাবতী প্রকাশ" টীকায় পূর্বোল্লিখিত ন্যায়সূত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা Aristotle Dictum সূত্রের দ্বিতীয় ধারার বিকাশরূপে গ্রাহ্য করিয়া হোয়েটলির সমসূত্ররূপে "মৈথিলীসূত্র" এই বিশেষ সংজ্ঞায় স্বীকার করা কর্তব্য। তিনি এখানে বলিয়াছেন যে—"সাধ্যস্য বিষয়ত্বেঽপি তত্পরক্ত সাধনস্যাপি বিষয়ত্বাৎ (পৃ ৬০৩) এবং ইহার ব্যাখ্যা রূপে—" কোন ব্যাপ্য পদের সম্বন্ধে যাহা স্বীকার বা অস্বীকার করা যাইতে পারে তাহা সেই পদের অন্তর্ভুক্ত যে কোনও বস্তু সম্বন্ধে স্বীকার বা অস্বীকার করা যাইতে পারে (Dictum-de-Omni-et-nullo)" পাওয়া যাইতেছে।

গঙ্গেশের এই যুগান্তকারী গ্রন্থ প্রকাশের পরে যখন মিথিলার পণ্ডিতসমাজ একমাত্র মণিগ্রন্থটিকে উপজীব্য করিয়া টীকা-টিপ্পনী রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন তখন কেবল বৈশেষিক-দর্শন-ভাষ্যকার সম্প্রদায় বৈশেষিকের স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় যত্নবান হইবার প্রয়োজনীতা বুঝিলেন। অবশ্য "কিরণাবলী" গ্রন্থের গুরুত্ব নব্যন্যায় আলোচনার অন্তিমকাল পর্যন্ত থাকিলেও "কিরণাবলী নিরুক্ত প্রকাশ (অধুনা বিলুপ্ত)"-কার শঙ্কর মিশ্র তাঁহার "বৈশেষিক সূত্রোপকার" নামক মূল্যবান গ্রন্থে উক্ত দর্শনকে ন্যায়স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে গ্রথিত করিয়াছেন। চিন্তামণি গ্রন্থের প্রকাশফলে নৈয়ায়িক জগতে অন্য যে বিলোড়ন হইয়াছিল তাহা এই যে, বঙ্গীয় নবদ্বীপ পণ্ডিত সমাজের বিকাশ। কিন্তু ইহারও আদি ইতিহাস বিস্মৃতির গর্ভে। পূর্বেই আমরা বলিয়াছি যে, ভূরিশ্রেষ্ঠী প্রভৃতি গৌড়কেন্দ্র হইতে কিরূপে নবদ্বীপে বিদ্যাকেন্দ্র স্থানান্তরিত হইল তাহা আমাদের অজ্ঞাত বস্তু। নবদ্বীপই বা কিরূপে এই পণ্ডিতমণ্ডলীর পদরজপূত হইয়াছিল তাহার সন্ধান বিস্মৃতির গর্ভে, কিন্তু ইহা যে শীঘ্রই দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা নব্যন্যায়ের পরবর্তী ইতিহাস সুপ্রমাণ করিতেছে।

নবদ্বীপের পাণ্ডিত্যানুশীলনের প্রথমেই আমরা যাহা দেখিতে পাই তাহা সত্যই বিস্ময়কর। এখানকার পণ্ডিতসমাজ সোন্দড়ের "ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন অভাব"বাদবিষয়ক সূক্ষ্ম আলোচনায় নিজস্ব পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া ইতিমধ্যেই (১) চক্রবর্তী লক্ষণ, (২) প্রগল্ভ লক্ষণ (৩) সার্বভৌম লক্ষণের উদ্ভাবন করিয়াছেন এবং এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিন্তাপ্রবাহ মিথিলার পণ্ডিতসমাজকেও যে বিচলিত করিতেছিল তাহার প্রমাণ পক্ষধর ওরফে জয়দেবের তর্কসভার মাধ্যমে "পণ্ডিতাগ্রগণ্য" খ্যাতিলাভ প্রচেষ্টা হইতে বুঝা যায়। নব্যন্যায়ের বিকাশধারার সহিত সে ঘটনার বিশেষ সম্বন্ধ না থাকায় উক্ত কাহিনীবর্ণনা স্থগিত রাখিয়া আমরা তৎশিষ্য ভগীরথ ঠক্কুরের (নামান্তর মেঘ) অবদান সম্বন্ধে আলোচনা সঙ্গত মনে করিতেছি। মাত্র ২০ বৎসর বয়সে জয়দেবের নিকট পাঠ সমাপন করিয়া শিরোমণির অগ্রজ সমসাময়িক এই পণ্ডিত "লীলাবতী প্রকাশে"র যে "বিবৃতি" রচনা করিয়াছেন, তাহাতে Aristotle Dictum-এর বিখ্যাত ও শেষ ব্যাখ্যাকার জে. এস. মিলের Dictum এর সমতুল্য সূত্র পাইতেছি। উপরে উল্লিখিত "মৈথিলসূত্রের" ব্যাখ্যায় তাঁহার উক্তি এই যে—"পদানাং প্রত্যেকমেব তাদৃশ জ্ঞান জনকত্বাদতিব্যাপ্তিরিতি বাক্যপদং তাদৃশ ফলোপহিত সমুদায় পরম্" এবং ইহার ব্যাখ্যারূপে "কোনও শ্রেণী সম্বন্ধে যাহা স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় তাহা তাহার অন্তর্ভুক্ত যে-কোনও বস্তু সম্বন্ধে স্বীকার বা অস্বীকার করা যাইতে পারে" —স্বীকৃত হয়।

মিথিলা ও নবদ্বীপ এই দুই ন্যায়-কেন্দ্র জয়দেবের বিজীগিষুলিপ্সায় এইবার সংঘর্ষের সম্মুখীন হইল। তাহাতে

নব্যন্যায়ের অদ্ভুত মনীষার অধিকারী কানভট্ট রঘুনাথের প্রতিভার স্ফুরণ ও প্রচার এবং শেষ পর্যন্ত মিথিলার গৌরব-রবি অস্তমিত হইয়া বাংলা দেশ আশ্রয় করিল। "লীলাবতী প্রকাশদীধিতি" এতাবৎ মুদ্রিত না হওয়ায় উল্লিখিত "সমবায়" বা "মৈথিলসূত্রে"র অন্য কোনও পরিণতি হইয়াছিল কিনা জানা যাইতেছে না কিন্তু অনুমানখণ্ড ব্যাখ্যা আরও সুপরিস্ফুট করিবার জন্য তিনি তাঁহার দীধিতিপ্রস্থান রচনার সঙ্গে সঙ্গে অনুমানখণ্ডের পরিপূরকরূপে যে "অবচ্ছেদকত্ব নিরুক্তি দীধিতি" রচনা করিয়াছেন, তাহাতে বাঙালী মাত্রেরই গৌরব অনুভব করা উচিত। এতদ্ব্যতীত তাঁহার পদার্থখণ্ডন (বা পদার্থতত্ত্ব নিরূপণ)" গ্রন্থে কারণত্ব ও সমবায় সম্বন্ধে যে অভিনব আলোচনা করিয়াছেন তাহা পাশ্চাত্ত্য Logic শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের ভারতীয় ন্যায়ানুশীলনের পক্ষে পরম উপজীব্য সন্দেহ নাই। উক্ত গ্রন্থের রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার ব্যাখ্যায় আলোচিত "অন্যথা সিদ্ধি"-সূত্রে পাশ্চাত্ত্য Logic সিদ্ধ Probabilityর সমতুল্য বিষয় বলিয়া ভারতীয় Inductive system অর্থাৎ সমবায় প্রকরণ গঠনের পরম সহায়ক। তাঁহার অধুনালুপ্ত শব্দমণি দীধিতির উপলভ্যমান (ক) বাজপেয়বাদ, (খ) নিয়োজ্যান্বয়বাদ প্রভৃতি অধ্যায় স্বীয় বৈশিষ্ট্যে এতাবৎ মূল্যবান এবং মীমাংসা দর্শনের বিষয় সম্পর্কিত বলিয়া উহার আধুনিক রূপগঠনে বিশেষ ভাবে উপজীব্য।

সুপ্রসিদ্ধ মীমাংসক ভট্টকুমারিলের ব্যাপ্তিচিন্তা এবং বৈশেষিকের (সমবায় প্রভৃতি) বাস্তবতা আশ্রয় করিয়াই নব্য-ন্যায়ের চিন্তা দানা বাঁধিয়াছে। এই সমন্বয়ধারা ইহার পূর্ণ পরিণতিতে সক্রিয় থাকা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে উল্লিখিত দর্শন-দ্বয়ের স্বাতন্ত্র্য আনিবার প্রচেষ্টা হইয়াছে, যাহার ফলে শব্দমণি দীধিতিতে মীমাংসা দর্শনের বিষয় আশ্রয় পাইয়া উক্ত মণি দীধিতির বিলুপ্তি ঘটাইয়াছে। উপস্কারকার শঙ্কর মিশ্রের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করিয়াই শূলপাণি-দৌহিত্র রঘুনাথ স্বয়ং বৈশেষিক সংস্রব পরিত্যাগমানসে "পদার্থ খণ্ডন" রচনা করিয়াছেন কিন্তু এই সমন্বয় প্রচেষ্টা কখনও দূরীভূত হয় নাই। সেই জন্য কৃষ্ণদাস সার্বভৌম লিখিত বিখ্যাত "ভাষা পরিচ্ছেদ" গ্রন্থ একাধারে ন্যায় বৈশেষিক ও মীমাংসার প্রবেশিকা পাঠ্যরূপে আদৃত হইতেছে। বিখ্যাত গদাধরের সতীর্থ রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার কাশীতে বসিয়া শিরোমণির উক্ত গ্রন্থব্যাখ্যায় পঞ্চবিভাগযুক্ত "অন্যথাসিদ্ধি" প্রভৃতির অবতারণা করিয়াছেন এবং উক্ত স্থানে বসিয়াই বাঙালী পণ্ডিত জগদ্গুরু জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন প্রাচীন ও নব্যন্যায়ের সম্মিলনে "ন্যায় সিদ্ধান্তমালা" প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন।

সুবিখ্যাত মীমাংসক-ধুরন্ধর পার্থসারথি মিশ্র মিথিলার লোক ছিলেন কিনা সঠিক জানা যাইতেছে না, তবে তিনি যে আচার্য উদয়নের সমসাময়িক ইহা প্রমাণিত। যদি পার্থ-সারথি ও উদয়ন একদেশবাসী হন তবে বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যখন নব্যন্যায়ের আকর সৃষ্টি হইতেছিল তখনই মিথিলার অন্য মনীষী তাঁহার "ন্যায়রত্নমালা" গ্রন্থে মীমাংসার মাধ্যমে ন্যায়শাস্ত্রের ত্রিবিধ নিয়ম প্রণয়ন করিয়াছেন। অবশ্য তাহা এই সকল নব্য নৈয়ায়িকগণ তাঁহাদের প্রকরণমধ্যে গ্রথিত করেন নাই কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে আসিয়া এই গৌরবময় শাস্ত্রের পুনরনুশীলন জন্য যে ঐ নিয়মগুলি একান্ত আবশ্যক তাহা ধরা পড়িয়াছে। ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে লিখিত কাঞ্চীনিবাসী বেঙ্কটনাথ বেদান্তাচার্য্য বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্তদর্শন মাধ্যমে "ন্যায় পরিশুদ্ধি" লিখিয়াছেন, তাহাতেও আমরা বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তি (Evolutionism) সূত্র পাইতেছি।

নবদ্বীপের মনীষী সম্প্রদায়—ভবানন্দ, গুণানন্দ, মথুরানাথ, জগদীশ, গদাধর প্রভৃতি ন্যায়দিকপালগণ এই শাস্ত্র প্রচারে যে প্রতিভা দেখাইয়াছেন তাহা বাংলার গৌরবের বস্তু। ইঁহাদের মধ্যে জগদীশ তাঁহার "শব্দশক্তি প্রকাশিকা" গদাধর তাঁহার "ব্যুৎপত্তিবাদ" প্রভৃতি নব্যন্যায় শব্দ মতে যে নূতন দিগদর্শন করিয়াছেন তাহাও মূল্যবান। গদাধর গুরু মহামহোপাধ্যায় জগদ্গুরু হরিরাম তর্কবাগীশ স্বয়ং কোন বৃহৎ টীকাগ্রন্থ রচনা না করিলেও "বিষয়তাবাদ, অপূর্ববাদ" প্রভৃতি যে সকল বাদগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহাতে তিনি যে ন্যায়ের সর্বপ্রধান পণ্ডিত ছিলেন, তাহা সহজেই প্রমাণিত হয়। তৎশিষ্য রঘুদেবের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। গদাধর সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তদতিরিক্ত এই যে, স্বীয় গুরুর গ্রন্থাখ্যায়িকার নাম লইয়া তিনিও যে "বিষয়তাবাদ" রচনা করিয়াছেন তাহাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সব লক্ষ্য করিয়া নবদ্বীপ ও মিথিলার হৃতগৌরব, শাস্ত্রগুলির পুনরুদ্ধারের সময় আসিয়াছে। মিথিলার অবদান, ভূরিশ্রেষ্ঠী ও নবদ্বীপের সম্মানের কথা স্মরণ রাখিয়া এই ধারায় অগ্রসর হইতে হইবে।

পঞ্জিকা সংস্কার—শ্রীক্ষেত্রমোহন বসু। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুয্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৬৭ পৃষ্ঠা, মূল্য—৫০ (।০) নয়া পয়সা।

পুস্তকখানি ছোট হইলেও, ভারত সরকারের পঞ্জিকা-সংস্কার সমিতির রিপোর্টের তথ্যবহুল বিষয়ের সারাংশে পূর্ণ। গ্রন্থকার স্বয়ং বৈজ্ঞানিক, বঙ্গভাষায় সুপণ্ডিত এবং বর্ত্তমান বিদগ্ধ সমাজের প্রখ্যাত অধ্যক্ষ। বিজ্ঞানের দুর্ব্বোধ্য বিষয়সমূহ বঙ্গভাষায় বোধগম্য করিতে, গ্রন্থকারের প্রভূত দক্ষতা আছে। আলোচ্য স্বল্পকলেবর পুস্তকেও তিনি পঞ্জিকা-সংস্কার সমিতির বৃহদায়তন দুর্ব্বোধ্য বিষয়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত জ্যোতির্ষিক গবেষণার কতকাংশ সহজ বঙ্গভাষায় জনসাধারণের বোধগম্যের উপযোগী করিয়াছেন। বর্ত্তমানে জনসাধারণের মধ্যে, সরকারী পঞ্জিকা-সংস্কারের তথ্য জানিবার আগ্রহ বিশেষ ভাবে দেখা দিয়াছে। এই স্বল্পকলেবর পুস্তকে সর্ব্বশ্রেণীর পাঠকগণের জ্ঞানলাভের ইচ্ছা পূরণ করিবে। বিশুদ্ধ পঞ্জিকা সভ্য মানবজাতির ধর্ম্ম, কর্ম্ম বা সংযমকে নিয়মিত করিবার দিগদর্শন যন্ত্র। বিশ্বপ্রকৃতি এবং জীবজগত রবিচন্দ্রের সংযোগ-চ্যুতিজনিত তিথির প্রভাব এড়াইতে পারে না। জোয়ার-ভাটার হ্রাসবৃদ্ধি, মানবের দেহযন্ত্রের রসভাগের বিকৃতি, আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন, তার পর ধর্ম্মকর্ম্ম সকলই বিশুদ্ধ তিথির উপর নির্ভর করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রাচীনপন্থী পঞ্জিকায় তিথি-গণনাই ভুল। এই ভুল তিথি-গণনার বিরুদ্ধে অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে বঙ্গের পুরুষসিংহ বিচারপতি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ প্রাজ্ঞগণ পঞ্জিকা-সংস্কারের আন্দোলন আরম্ভ করেন। ইহার ফলে ইং ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে মাধব চট্টোপাধ্যায়ের গণিত বিশুদ্ধ সারণী সাহায্যে 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা' প্রকাশিত হয়। দীর্ঘ দিবসের পঞ্জিকা-সংস্কারের আন্দোলনের পর, ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিকগণ, ভ্রান্ত তিথির পঞ্জিকা ব্যবহার না করিয়া, বিশুদ্ধ গণিত তিথি দ্বারা পঞ্জিকা-সংস্কার করিয়া, দেশের মহৎ উপকার করিলেন। গ্রন্থকার পঞ্জিকা-সংস্কার সমিতির প্রবর্ত্তিত শকাব্দ এবং আবহমান গতিশীল, অয়নগতিকে স্থিরীকরণ সম্পর্কে, কতকটা সরকারী ত্রুটি সংশোধন করিয়া অস্পষ্ট ইঙ্গিতে স্বভাবসুলভ সত্যজ্ঞান প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিষয় দুইটি সম্পর্কে কতকটা আলোচনা আবশ্যক। (১) শকাব্দ সম্পর্কে গ্রন্থকার তাঁহার 'নিবেদন ।৴' বলিতেছেন যে—'শকাব্দর' উৎপত্তি সংক্রান্ত ইতিহাস কিছু গোলমেলে, এজন্য ঐ অব্দ বাতিল করে 'স্বরাজ অব্দ' নাম দিয়ে এক অভিনব অব্দ করতে'। এই কথা গ্রন্থকার বঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকটে বলিয়াছিলেন। গ্রন্থকারের মতে—শকাব্দের উৎপত্তির ইতিহাসই যে গোলমেলে, তাহা নহে—সরকারী রীতিতে শকাব্দ প্রবর্ত্তনই গোলযোগের।

শকাব্দ গণনার নিয়ম—১লা বৈশাখ, সূর্য্যের নিরয়ণ মেষ রাশিতে প্রবেশের সময় হইতে। কিন্তু সরকারী শকাব্দ প্রবর্ত্তিত হইল, ১লা বৈশাখ হইতে ২৩ দিন পিছু হটিয়া নিরয়ণ ৮ই চৈত্র হইতে। সরকারী পঞ্জিকায় ৮ই চৈত্র হইতেই (২১-৩-১৯৫৭) শকাব্দ গণনা চালু করিলেন। এই রীতিতে শকাব্দ গণনার প্রথা কোথায় (?)। উত্তর এবং মধ্যপ্রদেশে হিন্দী ভাষাভাষী প্রদেশে ৮ই চৈত্রের কাছাকাছি বা কিছু পূর্ব্বাপর তাঁহাদিগের প্রচলিত অব্দ বিক্রম সম্বৎ আরম্ভ হয়। আলোচ্য সরকারী শকাব্দ কি বিক্রম সম্বতের নামান্তর না অন্য কিছু (?)। এই স্থলে স্বভাবসিদ্ধ প্রশ্ন জাগে যে, ভারত সরকারের যাবতীয় জাতীয় প্রতীক সম্রাট অশোকের। কিন্তু সর্ব্বভারতের একজাতীয় অব্দ প্রবর্ত্তনে 'অশোকাব্দ' গ্রহণ করিতে বাধা কোথায় (?)। সম্রাট অশোকের রাজ্যাভিষেকের সময়, অশোকাব্দ প্রবর্ত্তিত হয়। তারপর ৩১৯ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তরাজ পঞ্জিকা-সংস্কার করিয়া গুপ্তাব্দ নামকরণ করা হয়। স্বাধীন ভারতের অব্দ প্রবর্ত্তনে শাকদ্বীপাগত অব্দ শকাব্দ প্রবর্ত্তন না করিয়া 'অশোকাব্দ' চালু করিতে আপত্তির কারণ কি?

২। পঞ্জিকাসংস্কার সমিতির রিপোর্টের ১৭ পৃষ্ঠায় ২৩° ১৫′ অয়নগতির অংশ স্থিরীকরণ (···fixed ayanamsa of 23°15′ as already decided) বিষয়ে লেখক মহাশয় (৫১ পৃঃ) অয়নাংশ স্থিরীকরণের অবৈজ্ঞানিক কথা সংশোধন করিয়া ২৩°১৫ ক্রান্ত্যংশে সূর্য্য প্রবেশ করিলে বর্ষারম্ভ হইবে এই সত্যজ্ঞান প্রকাশ করায় তাঁহার স্বভাবসুলভ বৈজ্ঞানিক সত্যের পরিচয় দিয়াছেন। অয়নগতি—রাশিচক্র বা ক্রান্তিবৃত্তের উপরে বিষুববৃত্তের বার্ষিক ৫০″২১ বিকলা করিয়াও সতত গতিশীল থাকে। এই গতি ৭২ বৎসরে ক্রান্তিবৃত্তের ১° ডিগ্রী পশ্চাৎ অপসরণক্রমে ৩৬০ ডিগ্রী রাশিচক্রাবর্ত্তন বা ক্রান্তিবৃত্তাবর্ত্তন করে। পঞ্জিকা-সংস্কার সমিতি—নিরয়ণ মেষরাশির আদি বিন্দু হইতে অয়ন পিছু হটিয়া যখন ২৩°১৫′ (২১ মার্চ্চ ১৯৫৬) স্থানে পৌঁছিল তখনই রামচন্দ্রের সমুদ্রে সেতুবন্ধনের ন্যায় উহাকে চিরতরে বাঁধিয়া রাখিলেন। ঐ সময় ক্রান্তিবৃত্তের ৩৩৬ ডিগ্রী ৪৫ মিনিটে অয়নগতির পশ্চাৎ অপসরণ বাকী। সরকারী পঞ্জিকায় কি প্রকারে উহা বাঁধিয়া রাখিবেন? গ্রন্থকার অয়নগতির স্থিরীকরণ কথা যে

অবৈজ্ঞানিক হইয়াছে তাহা বুঝিয়াই ২৩°১৫´ অয়নাংশকে ২৩°১৫ ক্রান্ত্যাংশ পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করিয়া সংশোধন করিলেন। সরকারী পঞ্জিকায় আবহমান গতিশীল অয়নকে চিরতরে সেতুবন্ধন না করিয়া ক্রান্ত্যংশ কথা ব্যবহার করিলে কলেজের গণিত-জ্যোতিষের ছাত্রগণের Precession movem nt বা অয়নগতি সম্পর্কে স্থিরীকরণের কথায় কোন সংশয় থাকিত না। গ্রন্থকারের এই স্বল্প-কলেবর গ্রন্থে বিশ্বপঞ্জী সংস্কার, ভারতীয় পঞ্জিকা-সংস্কার, সপ্তাহ-চক্রের উৎপত্তি, মিলনচক্র প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বিষয় সহজভাষায় পরিবেশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ যে সর্বজনসম্মান লাভ করিবে তাহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বাগল

রূপম্—শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী। এ, মুখার্জ্জী এ্যাণ্ড কোং (প্রাইভেট) লিঃ, ২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২। মূল্য ৩·৫০ নয়া পয়সা।

কন্যা বরয়তে রূপম্—এই বহু-প্রচলিত শ্লোকটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্যই আলোচ্য উপন্যাসের বিষয়বস্তু। এই উদ্দেশ্যে লেখক দু'টি কালকে গল্প ও প্রবন্ধের ডোর বাঁধিয়া একত্র মিলাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্য ভূমিকায় জানাইয়াছেন ঐতিহাসিক কোন মত প্রচারের উদ্দেশ্য ইহাতে নাই। নাই থাকুক—লেখকের ইতিহাসনিষ্ঠ স্বভাবের পরিচয় ইহাতে আছে। কাহিনীটিও—এই কারণে বাজার-চলিত উপন্যাসের গোত্র হইতে ভিন্ন। লেখকের উদ্যম প্রশংসনীয়।

কিন্তু বিষয়বস্তু যেমনই হউক—উপন্যাসের সার্থকতা কাহিনীর সুগ্রন্থনে। শুধু সমস্যা নহে—নরনারীর চিত্তক্ষেত্রে ঘটনার গতিপ্রবাহ যে দ্বন্দ্ব ঘনাইয়া তোলে—তাহা বাস্তব সূত্রে বিধৃত করিয়া সুষ্ঠু পরিণতিতে পৌঁছাইয়া দিতে পারাটাই সব চেয়ে কঠিন কাজ। কালের ব্যবধান মানুষের বহিরঙ্গের কতকগুলি আচার নিয়মে স্পষ্ট হয়। মনের ক্ষেত্রে এই ব্যবধান সব সময়ে মারাত্মক নহে। সেখানে সংস্কারে সঙ্কীর্ণ অথবা সংস্কৃতিতে প্রসার্যমান বৃত্তিগুলির ক্রিয়া সব কালেই প্রায় একধর্মী। তাই কন্যা প্রার্থিতের যে রূপ কামনা করে—তাহার প্রকৃতিটি কয়েক শতাব্দীর ব্যবধান সত্ত্বেও প্রায় অভিন্ন। কাহিনীগত এই তথ্যে লেখক ভুল করেন নাই। শুধু দু'টি বিপরীত-রুচি চরিত্রের পার্থক্যটা অনতিস্পষ্ট হওয়ায় কন্যার মনোক্ষেত্রে কামনার ক্রমবিকাশ তেমন উজ্জ্বল হয় নাই। এ ছাড়া কালিদাসের কাল লইয়া গবেষণাটি দীর্ঘ এবং হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। গল্পপিপাসু পাঠক অনুযোগ তুলিতে পারেন—গল্প ও প্রবন্ধ দুটিতেই যখন লেখকের দক্ষতা আছে—তখন গবেষণামূলক বিতর্ককে সংক্ষিপ্ত করিয়া…গল্পটিকে প্রাধান্য দিলে ক্ষতি ছিল কি? ··

…মাষ্টার মশাই, রত্নাবলীর মা প্রভৃতি চরিত্রগুলি বাস্তবানুগ হইয়াছে। নবাগত হইলেও—উগ্র আধুনিকতার ভঙ্গী লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে পদার্পণ করেন নাই লেখক—লেখার মধ্যে শুচিতা ও সংযম আছে।

চমৎকার প্রচ্ছদপট।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

বাংলার ভূমিব্যবস্থা—শ্রীনৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য্য। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। পৃষ্ঠা ৩৮ মূল্য ॥০।

বইখানি বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের ১২৩তম পুস্তক। গ্রন্থকার আলোচ্য বিষয়টিকে 'সেকাল' ও 'একাল' দুই ভাগে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করিয়াছেন। বৈদিক যুগে, মনুসংহিতায় এবং কৌটিল্যের অর্থ-শাস্ত্রে রাজা-প্রজার ও ভূমি সম্পর্কের চিত্তাকর্ষক আলোচনার পর পরবর্ত্তী হিন্দু রাজত্বকালের অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে। সুলতানী আমলের (১২০২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে) পরিবর্ত্তন অতঃপর আলোচিত হইয়াছে—এই পরিবর্ত্তন পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের পুরোপুরি অনুকরণ না হইলেও নব-সংস্করণ। দিল্লীর পাঠান রাজত্ব, শের শাহের আমল, আকবর-টোডরমলের সময়ে, শাহ সুজার ও মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ের চিত্র—চলচ্চিত্রের মত লেখক পাঠকের চোখের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন। ইহার পরেই ভারত-ইতিহাসে তথা বাংলায় ইংরেজ বণিক তথা বিদেশী শাসকের আবির্ভাব।

'একালে' ইংরেজ আমলের প্রায় দুই শত বৎসরের ভূমিব্যবস্থার সুন্দর আলোচনা। এই কালেই বিদেশী শাসক প্রাচীন ব্যবস্থার বহুল পরিবর্ত্তন করিয়াছে। ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লবের আঘাতে স্বদেশী শিল্প মৃত বা মৃতপ্রায় হইয়াছে। জমির উপর জনসংখ্যার চাপ বাড়িয়াছে। ইংরেজ-প্রবর্ত্তিত জমিদারী-প্রথা শাসকের মুনাফা দেখিয়াছে, প্রজার দিকে তাকায় নাই। নানা সময়ে প্রজাকে রক্ষা করিবার জন্য কতকগুলি প্রজাস্বত্ব আইন পাস হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে সমস্যার সমাধান হয় নাই। স্বাধীনতা লাভের পরে জমিদারী উচ্ছেদ করিয়া নূতন ভাবে ভূমিব্যবস্থার উদ্যোগ চলিতেছে। এই উদ্যোগে যদি চাষী লাভবান না হয় তবে সমস্তই নিষ্ফল হইয়া যাইবে। বাংলার ভূমিব্যবস্থার ইতিহাস দেশের আর্থিক ও সামাজিক ভাঙাগড়ার ইতিহাস ইহা ভুলিলে চলিবে না। শোষিত অবজ্ঞাত বাংলার চাষী এবং প্রজা নূতন ব্যবস্থায় সুদিনের মুখ দেখিবে ইহাই সকলে আশা করে। 'লাঙল যার, জমি তার' এই পণ বাস্তবে পরিণত হউক। মৃতপ্রায় পল্লীসমাজ পুনরুজ্জীবিত হউক। কৃষির এবং গৃহশিল্পের প্রতিষ্ঠা হউক ইহাই স্বাধীন ভারতের আদর্শ। এরূপ সহজ, সুলিখিত এবং সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যপূর্ণ গ্রন্থের বিপুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

ভূদানযজ্ঞ গীতিকা—শ্রীকিশোরীমোহন নস্কর। প্রকাশক: শ্রীসনৎকুমার বর্মণ। ক্যানিং টাউন, ২৪ পরগণা। মূল্য ৵০।

ভূদানযজ্ঞ আমাদের সমাজ-জীবনে নূতন আদর্শ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। এক্ষেত্রেও চারণের প্রয়োজন। কিশোরীবাবু সেই প্রয়োজন সাধনের ভার নিয়েছেন এবং তাতে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন।

মৃতসঞ্জীবন—শ্রীবিবেকশরণ দেব, বি-এস-সি, এম-বি। ১৩, ব্যানার্জিপাড়া ষ্ট্রীট, পোঃ উত্তরপাড়া, হুগলী। মূল্য ।০।

তাড়াতাড়ি শবদাহ বা প্রোথিত করার ফলে অনেক সময়ে আমরা সম্পূর্ণ প্রাণবিয়োগের পূর্বেই মানুষকে মেরে ফেলি। প্রমাণাদি সহ লেখক এ বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং আপাতমৃতকে বাঁচাবার কৌশলও নির্দেশ করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য সাধু। মৃত্যুবিষয়ক ভ্রান্তি সম্পর্কে বহু কিংবদন্তী প্রচলিত। রবীন্দ্রনাথের 'জীবিত ও মৃত' গল্প এই ভ্রান্তি নিয়েই লেখা। বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য, সন্দেহ নেই।

পাথেয়—শ্রীস্নেহলতা দেবী, ভারতী। শ্রীবিদ্যা পাবলিশিং হাউস, রঙ্গনাথপুর, পোঃ বড়িশা, কলিকাতা—৮। মূল্য ৩৲।

"পথের শেষও নাহি পাই, বিশ্রাম লভিব কোন্ ঠাঁই?
তবু ত অনুদিন, চলিতে তনু ক্ষীণ,
লক্ষ্যহীন চলিছে সবাই, শেষ—সে ত এ পথেতে নাই।"

একটি সরল আন্তরিক আবেগ কবিতাগুলিতে মর্মস্পর্শী করে তুলেছে। আজকের কৃত্রিম সাজসজ্জা ও ভঙ্গীসর্বস্বতার যুগে এই আন্তরিকতা বড়ই তৃপ্তিকর মনে হয়। পড়তে পড়তে অনেক সময়ে কামিনী রায় ও মানকুমারী বসুকে মনে পড়ে।

অস্তাচল—শ্রীনকুলেশ্বর পাল। ২২ডি, শ্রীনাথ মুখার্জি লেন, কলিকাতা—৩০ হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সাহা কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ২।০।

"বালুকার বুকে আঁকা পথচলা পদচিহ্নগুলি
হারান সুরের মত স্মৃতিপথে উঠিছে চঞ্চলি।"

সকল কবিতাতেই এমনি একটি সুরের স্পর্শ লেগেছে। ভাষা বা ছন্দ নিয়ে চমকে দেবার মত কোনও নূতন পরীক্ষায় না নেমে কবি পরিচিত পথে অগ্রসর হয়েছেন: ফলে সাধারণ পাঠক সহজে তাঁর ভাবানুসরণ করতে পারেন, পদে পদে তাঁকে বিভ্রান্ত হতে হয় না।

সূর্যমুখী—অরুণ গুপ্ত। নব চেতনা, ৩৯ ক্ষেত্র ব্যানার্জি লেন, শিবপুর, হাওড়া। দাম ১৲।

"১৯৪৫ থেকে ১৯৫৫ সাল, এই দীর্ঘ দশ বছরের বিভিন্ন সময়ে লেখ

কয়েকটি কবিতা নিয়ে এই সংকলন। অধিকাংশ কবিতাই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় পূর্ব প্রকাশিত।" বেশীর ভাগ গদ্য কবিতা, কিন্তু ছন্দোহীন নয়। ...বেশগুণে কবিতাগুলি সুখপাঠ্য, ভাবসম্পদেও সমৃদ্ধ।

"হঠাৎ ভোরের রঙে ঘুম ভাঙলো।
হে বিদ্যুদ্‌গর্ভ মহাকাশ,
তোমার আলোর স্পর্শে
সেই শিশুর জন্ম হলো,
তোমায় প্রণাম।"

সেই "ভোরের রঙ" কবির চোখে স্বপ্ন এনে দিয়েছে, খুলে দিয়েছে কল্পনার ভাণ্ডার।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

নতুন মিছিল—কুমারেশ ঘোষ। গ্রন্থ-গৃহ, ৪৫এ গড়পার রোড, কলিকাতা—৯ বা ৬ বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য দু' টাকা।

সুকবি ও সুলেখক কুমারেশ ঘোষের নাম বর্ত্তমান বাঙালী পাঠকের কাছে বহু পরিচিত। ব্যঙ্গ তাঁর লেখনীতে মধুর হয়ে ওঠে, জীবনের অসঙ্গতি তির্য্যক হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ধরা দেয়। তিনি বক্তৃতা দেন না, পেশাদারী বিদ্রোহের জ্বালাও তাঁর নেই—কিন্তু জীবনে যেখানে আমাদের আবেগের, মননের—এমনকি জীবনধারণের অসঙ্গতি—তা অতিরঞ্জনের হোক বা দীনতার হোক—সেখানে তাঁর দৃষ্টি গিয়ে পড়েই এবং ছোট্ট একটি প্রশ্ন তুলে হাসিমাখা মুখে তিনি বলেন, এসব কি! কিন্তু এ ছাড়াও আরও একটি রূপ তাঁর আছে—সে তাঁর কবি-রূপ। তাঁর সত্তায় এই কবি-ব্যক্তিত্বই বুঝি সবচেয়ে প্রখর। তাই, যেমন মানবপ্রীতিতে তাঁর মন সুন্দর:

আমি ত একলা নই।...
আমরা সবাই দেখি একই চাঁদ, একই তারা,
একই আকাশতলে জন্মেছি, হবো সারা॥
তাই তো একলা নই, আছি মোরা, আছি মোরা॥
(আমি ত একলা নই)
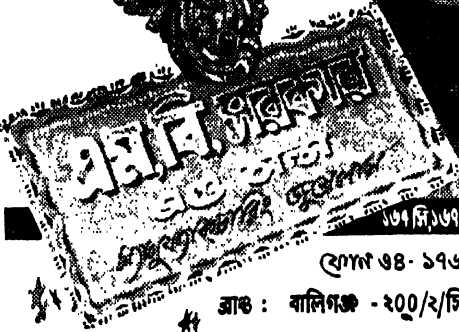
কিংবা :

মানুষকে আমি
বড় ভালবাসি।
ভুল বোঝা, ভুলে ভরা
পদে পদে ভুল করা
মানুষকে আমি বড় ভালবাসি।
(আমি ভালবাসি)

আবার নিত্যদিনের সংসারযাত্রা থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়ার জন্য—অহেতুক অবারণ চলার জন্য—তাঁর কাছে ডাক এসে পৌঁছায় :

যত দূর যায় যাক—
মন যাক
আরো আরো দূরে
হুইসিলের হাঁক-ডাকা সুরে।
থামাবার লাল আলো
জ্বেলো
পথশ্রান্ত হয়ে যদি পড়ি পথপাশে।
(হুইসিল)

কিংবা :

দুঃখ ?
আমার কাছে নয় সে এমন মুখ্য।
ঘরে তাকে বন্ধ করে
বেরিয়েছি মন সুধায় ভরে
গাইছি গান আপন মনে, হোকগে বেসুরো !
(পথে পা এখন)

হয় তো এই স্বল্প উদ্ধৃতিতে বইয়ের মূল সুর ধরা পড়বে না। এই বইয়ে 'ভবিষ্যৎ' নামে একটি কবিতা আছে। নিজেকে নিয়ে এমন মারাত্মক ব্যঙ্গ বড় চোখে পড়েনি।

শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী

বকুলমালা—শ্রীনির্ম্মলকুমার মুখোপাধ্যায়। মাতৃ প্রকাশনী, ৮।১বি শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য—২৷৷০।

রহস্যোপন্যাস। মদের বোতল, নারী হরণ ও ধর্ষণ, স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে ভগ্নীপতির নিকট স্বীয় ভগ্নীকে চরিত্রহীনা প্রতিপন্ন করিয়া তাহাকে বিপথে টানিয়া আনা হইতে সুরু করিয়া ধর্ষিতা নারী সুলেখাকে পুনঃ সংসারে প্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতি বহু ঘটনার সমাবেশে পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। কাহিনী কোথাও জমিয়া উঠিতে পারে নাই। ভাষা দুর্ব্বল। প্রচুর ছাপার ভুল।

সাধক কমলাকান্ত—শ্রীবলাইদাস ভক্তিবিনোদ সাহিত্যরত্ন। বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। ১৲+২৬০ পৃষ্ঠা, মূল্য আড়াই টাকা মাত্র।

আলোচ্য গ্রন্থে রত্নপ্রসবিনী বাংলার শক্তি-সাধকদের অন্যতম প্রসিদ্ধ সিদ্ধমহাপুরুষ, কবি ও সুপণ্ডিত 'কমলাকান্ত' যিনি বর্দ্ধমানের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া তদানীন্তন বর্দ্ধমানাধিপতির সমাদর লাভে আজীবন সাধনভজনের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন, সেই সাধকোত্তমের জীবনালেখ্য গ্রন্থকার বহুলায়াসে চিত্রিত করিয়াছেন।

মহাপুরুষদের জীবনীচিত্রণ এক দুরূহ ব্যাপার ! প্রথম—তাঁহাদের নিজ প্রচারের বিরোধিতা, দ্বিতীয়—ধারাবাহিক আত্মজীবন লিপিবদ্ধ করিতে পূর্ণ উদাসীনতা, তৃতীয়—জীবনের গৌরবময় বহুলাংশই লোকচক্ষুর অন্তরালে সঙ্ঘটিত হওয়ায় সে সব সংগ্রহের দুর্লভতা, চতুর্থ—বিশ্বাস ও অবিশ্বাসযোগ্য অলৌকিক জনপ্রবাদের বহুলতা...ইত্যাদি।

অদম্য-সন্ধানী গ্রন্থকার অতীব দরদের সহিত প্রায় বিগত দুই শত হইতে একশত চল্লিশ বৎসরের মধ্যবর্ত্তী সময়ের পুর্ব্বেকার ঘটনা খুঁটিয়া খুঁটিয়া সংগ্রহক্রমে মাঝে মাঝে সাময়িক পত্রাদিতে এই বীর সাধকের চরিতকথা কতক প্রকাশ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান গ্রন্থ সেই শুভ প্রচেষ্টার ফল।

তন্ত্র-সাধনার সহজ সাবলীল ধারা সাধকের জীবনে কিরূপে প্রতিফলিত হইয়া মাতৃ-আরাধনায় সিদ্ধি, সাহিত্যরচনায় কবিত্ব এবং সঙ্গীত মুখরতায় দেশময় কৃতিত্ব উজ্জ্বলতর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল তার বর্ণনা গ্রন্থমধ্যে পাঠ করিয়া অনুরাগী মাত্রেই মুগ্ধ হইবেন।

গ্রন্থের শেষার্দ্ধে সাধকের রচিত গীত—শ্যামাবিষয়ক ২০৭টি, উমাবিষয়ক ৩৩টি, কৃষ্ণবিষয়ক ১৭টি এবং বিবিধবিষয়ক ১৫টি অমূল্য সঙ্গীত পরিবেশিত। গ্রন্থে সাধকের ছবি, জন্মস্থান, সাধন-স্থান, আরাধ্য দেবী-মন্দিরাদি এবং সাধনসহায়ক বর্দ্ধমানাধিপতিদের চিত্রাদি থাকিলে শোভন হইত।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

কথাশিল্পী—সম্পাদনা : শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ ও পরেশ সাহা। ভারতী লাইব্রেরী, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য—৫৲ টাকা।

বাংলার জীবিত কথাশিল্পীদের সহিত পাঠকসমাজের পরিচয় করাইবার উদ্দেশ্যেই পুস্তকখানি প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহাতে মোট আশীজন লেখক ও লেখিকার জীবনী ও পরিচিতি স্থান লাভ করিয়াছে। তন্মধ্যে ৫০ জন স্ত্রী ও পুরুষ কথাশিল্পীর ফটো তাঁহাদের জীবনীর সহিত ছাপা হইয়াছে। বহু ক্ষেত্রেই শিল্পী-জীবনের একটি বিশেষ দিক গল্পের মত করিয়া বলা হইয়াছে। ইহা ছাড়া আরও প্রায় ১৩০ জন লেখক ও লেখিকার নামও প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা সংযোজিত হইয়াছে।

লেখকদের সম্বন্ধে পাঠকসমাজের একটা বিশেষ কৌতূহল আছে। তাঁহাদের সহিত পরিচিত হইবারও একটা সহজাত আকাঙ্ক্ষা অনেকের মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু এই ইচ্ছা পূরণ করা সহজ নয়—কষ্টসাধ্য। এক প্রকার অসাধ্য বলিলেও ভুল বলা হয় না। 'ভারতী লাইব্রেরী' এই কষ্টসাধ্য কাজটিই "কথাশিল্পী" প্রকাশ করিয়া অনেকখানি সহজসাধ্য করিয়া তুলিয়াছেন।

পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

জ্যোতির্ম্ময়ী সেবাভবন
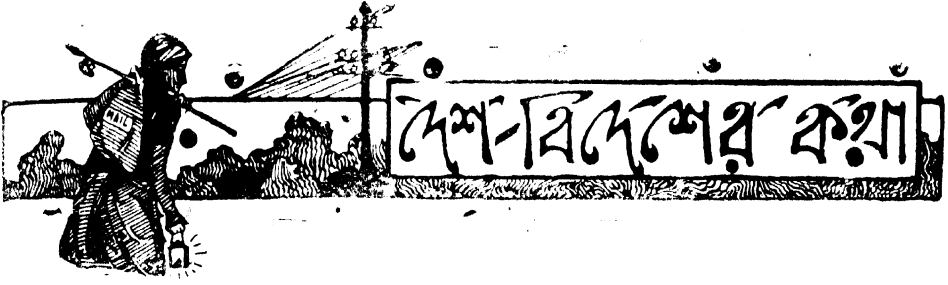
জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম বর্ত্তমান যুগের বাঙালীর নিকট সুপরিচিত। ত্যাগে ও সেবায় তাঁহার জীবন উৎসর্গীকৃত ছিল। একটি দুঃখের অবস্থার মধ্যে ১৯৪৬ সনের প্রথমে তিনি আকস্মিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহারই গঠিত স্মৃতি বহন করিতেছে 'জ্যোতির্ম্ময়ী সেবা ভবন' নামক প্রতিষ্ঠানটি। ১৯৫২ সনের ১০ই ডিসেম্বর কয়েকজন সেবাব্রতী মহিলা ও পুরুষ উদ্যোগী হইয়া কলিকাতায় বেলিয়াঘাটা অঞ্চলে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন।

তখন পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত দুর্দ্দশাগ্রস্ত নরনারীর ভীষণ ভীড়। ইহাদের ভিতরকার কর্ম্মী মায়েদের (Working mother) শিশু-সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যেও এই সেবাভবনটি গঠিত হইয়াছিল। অবশ্য, সেবাভবন অধিকসংখ্যক কর্ম্মী-মায়েদের সাহায্য পাইয়াছিল প্রতিষ্ঠাকালে, তবে ক্রমশঃ ভবনের কর্ত্তৃপক্ষ কার্য্যক্ষেত্র বাড়াইতে সক্ষম হইয়াছেন। মাত্র ছয়টি শিশু লইয়া ভবনের কার্য্য প্রথমে আরম্ভ হইয়াছিল, বর্ত্তমানে এই শিশুসংখ্যা বাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে একশত বারজনে। জ্যোতির্ম্ময়ী সেবাভবনের মহৎ উদ্দেশ্য, সেবাকার্য্যের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার ইহার দ্বিতীয় বৎসর হইতে প্রতিটি শিশুর মাথাপিছু পঁচিশটি টাকা প্রদান করিতেছেন। অবশ্য বার্ষিক বিবরণীগুলি দৃষ্টে বুঝা যাইতেছে, স্থানীয় কর্ম্মী-মায়েদের সন্তানদেরও এখানে গ্রহণের কিছু কিছু ব্যবস্থা হইতেছে।

জ্যোতির্ম্ময়ী সেবাভবনে আশ্রয়প্রাপ্ত শিশুদের বয়স সর্ব্বনিম্ন চারি বৎসর এবং সর্ব্বোচ্চ দশ বৎসর। ইহাদের মধ্যে ছেলে ও মেয়ে দুই-ই রহিয়াছে। সেবাভবনের উদ্যোগে যেমন তাহাদের ভরণ-পোষণ ও লালন-পালনের ব্যবস্থা হইতেছে তেমনি তাহাদের যথাযথ শিক্ষা ও আমোদ-প্রমোদেরও ব্যবস্থা হইয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক শিশুগণকে সমীপবর্ত্তী নিখিল-ভারত মহিলা সম্মেলন কর্ত্তৃক পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং কাহাকে কাহাকেও উচ্চতর বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানার্থ পাঠানো হইয়া থাকে। যে সব শিশু অনেক বয়স্ক তাহাদিগকে বুনিয়াদি শিক্ষার ভিত্তিতে ভবনে বসিয়াই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। সঙ্গীত ও নৃত্য শিক্ষারও সুন্দর ব্যবস্থা আছে এখানে। কিন্তু এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থার যে বিভাগটি সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ও জনহিতকর তাহা হইল শিল্প-শিক্ষা-প্রণালী। ছোট ছোট ছেলেরা যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে সুন্দর সুন্দর হাতের কাজ শিখিয়া থাকে। তাঁতবোনা, সেলাই ও বুনন, কাপড়ে নক্সা তোলা, কাগজের ফুল, মাটির কাজ, ন্যাকড়ার ও মাটির পুতুল তৈরী প্রভৃতি শিশুরা শিখিয়া থাকে। শরীরচর্চ্চার দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়। শিশুদের সাঁতার কাটা, উদ্যান-রচনা প্রভৃতিও শিক্ষা দেওয়া হয়। একটি নির্দ্দিষ্ট নিয়মের ভিতরে তাহাদের দিন কাটে। বিনয় ও সংযমের মধ্যে যাহাতে দেহ-মনের উৎকর্ষ সমভাবে সাধিত হয় সে বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের প্রখর দৃষ্টি রহিয়াছে।

আমরা সম্প্রতি জ্যোতির্ম্ময়ী সেবাভবনের একটি প্রীতি-অনুষ্ঠানে গিয়া শিশুদের হাতের কাজের প্রদর্শনী, নৃত্য, গীত প্রভৃতি দেখিয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। প্রদর্শনীতে হাতের কাজের নমুনাগুলি যথাযথ প্রদর্শিত হইয়াছে। এরূপ প্রদর্শনীর একটি অর্থনৈতিক দিকও আছে। গৃহস্থের উপযোগী ও আনন্দদায়ক দ্রব্যাদি উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইলে এবং প্রাপ্ত অর্থের সদ্ব্যবহার হইলে এই ধরণের শিল্পশিক্ষার সার্থকতা সর্ব্বত্র বিশেষভাবে অনুভূত হইবে। জ্যোতির্ম্ময়ী সেবাভবনের কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়টি ভাবিয়া দেখিবেন। মহিলাকর্ম্মীরা যে এই ভবনটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন তাহারও পরিচয় আমরা সেদিন পাইয়াছি। প্রতিষ্ঠাবধি শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেন এই ভবনটির সঙ্গে যুক্ত আছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সেবাভবনের কর্ম্মক্ষেত্র অধিকতর প্রসারিত হইবে, এবং ইহার আর্থিক দিকটিও দৃঢ়তর ভিত্তির উপরে স্থাপিত হইবে। সেদিনকার সভায় কয়েকজন অবাঙালী অর্থ-সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। সেবাভবনের গুরুত্ব ও দায়িত্ব এইরূপে স্বীকৃত হওয়ায় তাঁহারা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। জ্যোতির্ম্ময়ী সেবাভবনের উত্তরোত্তর উন্নতি হউক ইহাই কামনা করি।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

গত ২৯শে ডিসেম্বর ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সাধারণ সমিতির বার্ষিক অধিবেশন কলিকাতাস্থিত প্রধান কার্য্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্ঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দজী সভাপতিত্ব করেন। ১৯৫৫-৫৬ সনের আয়-ব্যয়ের একটি পরীক্ষিত হিসাব আলোচনা করিয়া সঙ্ঘের যুগ্ম-সম্পাদক স্বামী যোগানন্দজী ভাষণ দেন। সাধারণ তহবিলে আয়—৩,৫৯,৫৬১ টাকা ১৫ আনা ৬ পাই, ব্যয়—২,৭১,৬৯০ টাকা ২ আনা ৯ পাই এবং সেবাবিভাগে আয় ২,৫৮,৩২৯ টাকা ৬ আনা ৩ পাই, ব্যয়—১,৯৭,৫৪৯ টাকা ৪ আনা ৯ পাই। হিসাব সংক্রান্ত উক্ত প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। উক্ত প্রস্তাবে এস, সি, দত্তকে পরবর্ত্তী বৎসরের জন্য হিসাব-পরীক্ষক

থাকিবার অনুরোধ করা হয়। সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বেদানন্দজী ১৯৫৬-৫৭ সনের নিম্নলিখিত কার্যবিবরণী দান করেন।

ধর্মপ্রচার—৮টি প্রচারকদল ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে জাতিগঠন-মূলক বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রচার করে। এতদ্ব্যতীত ২০টি বৃহৎ সম্মেলন, সহস্রাধিক ধর্মসভা, ৫ শতাধিক ছায়াচিত্র যোগে বক্তৃতা, বহু সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক অধিবেশন, শতাধিক পুস্তক প্রণয়ন, ২টি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ ও ব্যক্তিগত আলোচনা ইত্যাদির দ্বারা ধর্মপ্রচারকার্য পরিচালিত হয়।

তীর্থসংস্কার—গয়া, কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, পুরী ও কুরুক্ষেত্রের তীর্থসংস্কার কেন্দ্রগুলিতে ৫,৬৯,৩৭কে আশ্রয় এবং ১,৩০,৯৯কে আহার্য দান করা হয়। এতদ্ব্যতীত তীর্থকেন্দ্রগুলিতে ছাত্রাবাস, দাতব্য চিকিৎসালয়, জনসেবাও পরিচালিত হয়। সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এক প্রস্তাবে তীর্থস্থানে পাণ্ডার জুলুম নিবারণের পন্থা আলোচিত হয় এবং সম্প্রতি বৃন্দাবনে জনৈক সন্ন্যাসীর উপর পাণ্ডার অত্যাচারের প্রতিবাদ করা হয়।

জনসেবা—১১টি বিরাট মেলাক্ষেত্রে, পূর্ব-পাকিস্থানের কলেরা-সংক্রামিত গ্রামে, বাত্যাবিধ্বস্ত ২৪ পরগণা ও মেদিনীপুরের গ্রামাঞ্চলে, ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত কচ্ছপ্রদেশে, বন্যা-প্রপীড়িত পশ্চিম-বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ব্যাপকভাবে সেবাকার্য পরিচালনা করা হয়। ১৬টি দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে ১,৬৫,৭১৯ জনকে চিকিৎসা করা হয়। ৩১টি দুগ্ধ-বিতরণ কেন্দ্র হইতে প্রতিদিন গড়ে ২৫ সহস্র ব্যক্তিকে দুধ দেওয়া হয়।

শিক্ষাবিস্তার—২০২ জন ছাত্রের ১২টি ছাত্রাবাস, ১৮টি দিবা, ৯টি নৈশ বিদ্যালয়, ১টি হিন্দী বিদ্যালয়, ১টি শিল্প শিক্ষায়তন, ১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হয়। ১৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাসিক সাহায্য প্রেরণ করা হয়। সঙ্ঘের পরিচালনায় ৬০টি বিদ্যালয়ের সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পরীক্ষা দান করে, সন্ন্যাসিগণ শতাধিক বিদ্যালয়ে নৈতিক চরিত্র গঠনের শিক্ষা প্রচার করেন।
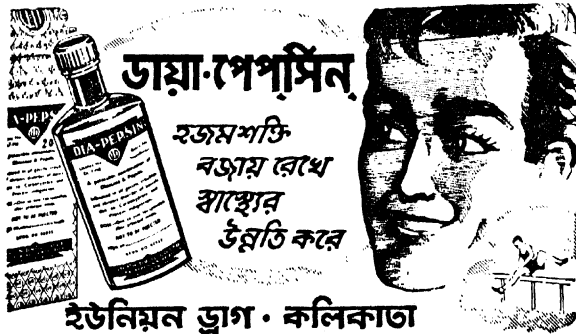
সমাজ উন্নয়ন—অস্পৃশ্যতা, ভেদ-বিবাদ, অনৈক্য-পার্থক্য দূরীভূত করিয়া হিন্দু সমাজকে শক্তিশালী করিবার জন্য বৃহৎ বৃহৎ শহরে ২৫টি, গ্রামাঞ্চলে সহস্রাধিক ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্মেলন উদ্‌যাপিত হয়। ৫ শতাধিক বৈদিক শান্তিযজ্ঞ ও অসংখ্য পার্বণিক অনুষ্ঠানাদির মধ্যে সমাজ-সংগঠন ও জাতিগঠনের বিষয় আলোচিত হয়। ২৬৯টি নূতন হিন্দু মিলন-মন্দিরের মাধ্যমে শিক্ষাবিস্তার, স্বাস্থ্যরক্ষা, আদিবাসী উন্নয়ন, অনুন্নত কল্যাণ, রক্ষীদল গঠন, গ্রাম-পঞ্চায়েৎ স্থাপন, ধর্মগোলা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি গঠনমূলক কার্য পরিচালিত হয়। সীমান্তবর্তী গ্রামাঞ্চলে হিন্দুগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্য এবং বৈদেশিক ধর্মপ্রচারকগণের ধর্ম পরিবর্তনে উৎসাহদান কার্যের অপচেষ্টা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্য-প্রস্তাব গৃহীত হয়।

আদিবাসী কল্যাণ—৫টি কেন্দ্র হইতে আদিবাসী ও অনুন্নত-গণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, নৈতিক চরিত্র উন্নয়ন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ, আদর্শ কৃষিক্ষেত্র রচনা, ব্যায়াম অনুশীলন, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন প্রভৃতি কার্য করা হয়।

বহির্ভারতে প্রচার—আলোচ্যবর্ষে দক্ষিণ-আমেরিকার বৃঃ গায়েনায় ২০ একর জমির উপর নূতন শাখাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ কেন্দ্রে একটি ছাত্রাবাস, একটি পাঠাগার এবং হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি ও প্রচারকেন্দ্র সংযোজিত হয়।

যে কতিপয় ব্যক্তি সঙ্ঘের গঠনমূলক কার্যে সহায়তা দান করিয়াছেন তাঁহাদের ধন্যবাদজ্ঞাপক এক প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সর্বশ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র গুপ্ত, ললিতমোহন সরকার, কুমুদবিহারী সেন, সাতকড়িপতি রায়, এস, সি, রায়, ধনেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় স্বামী আত্মানন্দজী প্রমুখ বক্তাগণ ভাষণ দেন।

কলিকাতাস্থ বঙ্গীয় মূক-বধির এসোসিয়েশনের প্রথম বার্ষিকী বিজয়া সম্মেলন

মূক-বধিরদের সম্মেলন

গত ২০শে অক্টোবর বঙ্গীয় মূক-বধির এসোসিয়েশনের ৪১এ, সদানন্দ রোডস্থ কার্যালয়ে এক মনোরম সম্মেলন-উৎসব পালিত হয়। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, বাংলা দেশে মূক-বধিরদের ইহাই প্রথম 'বিজয়া সম্মেলন।'

এই উৎসবে পৌরোহিত্য করেন শ্রীনলিনীমোহন মজুমদার। তিনি সরকার বাহাদুরকে এই মূক-বধিরদের কুটীরশিল্পের মাধ্যমে সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন, মানুষ হইয়াও ইহারা মানুষ নহে তথাপি উহারা বুদ্ধিমত্তায় সাধারণ মানুষের মতই কাজ করিয়া যাইতেছে। চেষ্টা ও যত্ন লইলে ইহারা জীবনে প্রতিষ্ঠাও লাভ করিতে পারে। সভাপতি সাঙ্কেতিক ভাষার সাহায্যে উপস্থিত মূক-বধির সদস্যদিগকে তাঁহার সুন্দর ভাষণটি বুঝাইয়া দেন। উৎসব সমাপনান্তে জলযোগ দ্বারা সকলকে আপ্যায়িত করা হয়। সেক্রেটারী মূক-বধির শ্রীদিলীপকুমার নন্দী এই উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে বিশেষ চেষ্টা করেন।

কলিকাতার শেরিফ

কলিকাতার শেরিফ একটি বিশেষ সম্মানের পদ। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে এই পদটির সৃষ্টি হয়। কলিকাতায় শেরিফদের উপরে "Bengal Past and Present"—এই ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। অনুসন্ধিৎসুরা এই তথ্যমূলক প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া দেখিবেন। এই সম্মানিত পদটিতে এক বৎসরের জন্যই এক এক ব্যক্তি নিয়োজিত হইয়া থাকেন। কিন্তু এই নিয়ম ১৮৩৯ সনে সর্বপ্রথম ভঙ্গ হইয়াছে, সেরিফ সে যুগে প্রধানতম নাগরিক হিসাবে কলিকাতা টাউন হলে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া সাধারণ জনসভা আহ্বান করিতেন। ১৮৩৯ সনের পর এই বৎসর ১৯৫৮ সনে দ্বিতীয় বার উক্ত নিয়মটি ভঙ্গ হইল। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় পর পর দুই বৎসর এই পদে নিযুক্ত হইয়া বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছেন, তিনি এই পদটির প্রাপ্য দক্ষিণা দুই হাজার টাকা গ্রহণ করিবেন না জানাইয়াছেন। এইজন্য সরকার কর্তৃক নিয়মেরও পরিবর্তন করা হইয়াছে।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস (প্রাইভেট) লিঃ, ১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

বিষয়-সূচী—ফাল্গুন, ১৩৬৪

বিষয়-সূচী—ফাল্গুন, ১৩৬৪

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

নীড়হারা পাখী
শ্রীপঞ্চানন রায়

শ্রমের জয়যাত্রা

[শিল্পী : শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৭শ ভাগ ২য় খণ্ড | ফাল্গুন, ১৩৬৪ | ৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

শিক্ষক ও শিক্ষিকাদিগের অনশন

এই সংখ্যা প্রকাশের সময় কলিকাতায় সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে কয়েকজন শিক্ষক এবং শিক্ষিকা অনশন-সঙ্কল্প উদ্‌যাপন করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে দুই-এক জনের শারীরিক বিকার কিছু দেখা গিয়াছে, অন্যদের এখনও কোনও ভয়ের কারণ দেখা দেয় নাই। এই বিষয়টি জনসাধারণের মনে কোনও বিশেষ চাঞ্চল্য আনিতে পারিয়াছে ইহা মনে হয় না, যদিও কলিকাতার দৈনিক সংবাদপত্রের মধ্যে কয়েকটি কিছু আন্দোলন সৃষ্টির চেষ্টায় উৎসাহ দিতেছেন। আন্দোলনের মধ্যে শুধু একদিন তরুণ ছাত্রছাত্রীর দল মহা উল্লাসে লেখাপড়া ছাড়িয়া পথেঘাটে ঘুরিয়াছে, কিন্তু স্কুল পলাইবার সুযোগ ভিন্ন অন্য কিছু তাহারা বুঝিয়াছে বলিয়া মনে হয় নাই। অন্ততঃ আমরা তাহাদের কয়েকটিকে প্রশ্ন করায় কিছু উদ্ধত কটুবাক্য এবং তাহাদের যথেচ্ছাচার করিবার অধিকার জ্ঞাপন ভিন্ন আর কিছু পাই নাই।

শিক্ষকশিক্ষিকাদের বিষয়ে কোন মন্তব্য প্রকাশ করা আমাদের কাছে অত্যন্ত অপ্রিয় কর্তব্য। একদিকে তাঁহাদের—নিম্ন পর্য্যায়ের দিকে—যেরূপ বেতনাদি দেওয়া হয় তাহাতে আমাদের সকলেরই মাথা নীচু হইয়া যায়, কেননা যে দেশের শিশু ও কিশোরদিগের শিক্ষকশিক্ষিকাদের ভদ্রস্থ রক্ষায় ব্যবস্থা নাই, সেই দেশকে কিরূপে ভদ্র বা সভ্য বলা যায়? যাহারা ভবিষ্যতের আশাভরসা, সেই সন্তানসন্ততির জীবনের ভিত্তিগঠনের ভার যাঁহাদের হাতে, তাঁহাদেরই জীবনযাত্রা যদি অতি দুর্গম ও কণ্টকময় হয় তবে শিশুর চরিত্র ও মনের বিকাশ যাহাতে নির্ম্মল এবং সুস্থ-সবল হয় সেদিকে দৃষ্টি তাঁহারা কিরূপে রাখিবেন? সেই জন্য, তাঁহাদের দুঃখকষ্টের কথা চিন্তা করিয়া কোনও বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে আমরা সঙ্কোচ বোধ করি।

কিন্তু বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে তাঁহাদের এই অনশন-সঙ্কল্পকে আমরা সত্যাগ্রহ বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতেছি না। কেননা তাঁহাদের এই কার্য্যপদ্ধতির মধ্যে আমরা প্রশংসার কিছুই খুঁজিয়া পাইতেছি না, বরং নিন্দনীয় অনেক কিছুই আছে। সত্যাগ্রহের পিছনে যে আদর্শবাদ, ত্যাগ এবং প্রস্তুতি থাকা উচিত তাহার নাম-গন্ধও ইহাতে আমরা পাই না। উপরন্তু যাহা দেখিতেছি তাহা যোগ্যতার পরীক্ষা এড়াইয়া যোগ্য-অযোগ্যকে একাসনে বসাইবার একটা অতি অন্যায় ও অসঙ্গত চেষ্টা।

ছেলেমেয়েদের যাঁহারা শিক্ষাদান করেন—যাঁহারা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পরীক্ষার মাধ্যমে ভালমন্দ, যোগ্য-অযোগ্য বিচার করেন—তাঁহারা নিজেরা যদি এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখান তবে তাঁহারা ছাত্রদের পরীক্ষা লইবেন কোন্ মুখে? অবশ্য যেভাবে আজকাল শিক্ষার দ্রুত অবনতি হইতেছে, তাহাতে তাঁহারা বলিতে পারেন পরীক্ষা-নিরীক্ষারই বা কোন্ প্রয়োজন আছে?

বাংলার ছেলেমেয়েরা একদিন বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের ফলে শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গৌরবের আসন অধিকার করিয়াছিল। আজ সে গৌরব ম্লান ও মলিন, কেননা সকল প্রতিযোগিতায়ই বাঙালী হটিয়া যাইতেছে। ইহার কারণ খুঁজিতে যাইলে গোড়ার দিকের, অর্থাৎ উচ্চ ও মধ্যম পর্য্যায়ের স্কুলের গলদ দেখিতে পাওয়া যায়। সেইখানেই শিক্ষার বনিয়াদ গঠিত হয় এবং সেই বনিয়াদ যদি দৃঢ় না হয় তবে পরে যত চেষ্টাই হউক, ছাত্রছাত্রীর শিক্ষার মান উন্নত করা প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

আমরা পুনর্ব্বার বলি যে, শিক্ষকশিক্ষিকার অভাব-অভিযোগের যথেষ্ট কারণ আজ রহিয়াছে। এই অনশন ও আন্দোলনের চেষ্টা যদি সেগুলির কোনটির জন্য হইত তবে আমরা তাহার পূর্ণ সমর্থন জানাইতাম। কিন্তু যে পন্থা তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা চরম পন্থা, বহু বিচার বিবেচনা এবং অন্য সকল চেষ্টা করিবার পর ইহা গ্রহণ করা উচিত। যদি উদ্দেশ্য মহৎ হয় তবে তাহার জন্য সত্যাগ্রহ যথার্থই সঙ্গত।

দুঃখের বিষয়, আমরা সে সব কিছুরই সন্ধান পাইতেছি না।

সুতরাং আমরা শুধু অনুরোধ করিব যে, অনশনকারীগণ যেন এ বিষয়ে পুনর্ব্বিবেচনা করেন। একজন ষ্টাফ রিপোর্টার একটি সংবাদপত্রে নিম্নরূপ বিবৃতি দিয়াছেন, যাহা মাসের শেষ দিনে প্রকাশিত হইয়াছে :

"পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সম্মুখে মাধ্যমিক শিক্ষকদের উপস্থিত হইবার প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গের এক দল মাধ্যমিক শিক্ষকের রাজ্যব্যাপী বর্ত্তমান অনশন ধর্ম্মঘট 'আন্দোলন' নহে, সরকারী শিক্ষাদপ্তরের 'হৃদয় পরিবর্ত্তনের জন্য আবেদন মাত্র'। মঙ্গলবার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক এবং অন্যতম অনশনব্রতী শ্রীসত্যপ্রিয় রায় উপরোক্ত মন্তব্য করিয়া জানান যে, এই অনশন ধর্ম্মঘট সরকারের 'অপমানজনক' নীতি পরিবর্ত্তনে সফল না হইলে মাধ্যমিক শিক্ষকগণ একযোগে বিদ্যালয়ের কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া দিবেন। প্রয়োজন দেখা দিলে এপ্রিল মাসের শেষভাগ হইতেই এই ধর্ম্মঘট সুরু করা হইবে বলিয়াও তিনি জানান।

পক্ষান্তরে এই দিন শিক্ষা-দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র বলেন যে, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সম্মুখে মাধ্যমিক শিক্ষকদের উপস্থিত হওয়া 'অপমানজনক', এই মত যুক্তিহীন। শিক্ষামন্ত্রী রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বলেন, ঐ সম্পর্কে সরকারের পক্ষ হইতে নূতন করিয়া বলিবার কিছু নাই।

গত সোমবার সন্ধ্যা হইতে সমগ্র রাজ্যব্যাপী এই অনশন ধর্ম্মঘট সুরু হইয়াছে। এই দিন সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে পূর্ব্ব দিনের ২৮ জন অনশনব্রতীর সঙ্গে আরও ৫ জন শিক্ষিকা সহানুভূতিসূচক ধর্ম্মঘটিরূপে দুই দিনের জন্য এই অনশন ধর্ম্মঘটে যোগ দেন।"

এই ব্যাপারকে "সমগ্র রাজ্যব্যাপী অনশন ধর্ম্মঘট" আখ্যা দেওয়া কতটা সমীচীন তাহার বিচার ঐ সংবাদপত্রের পাঠকবর্গই করিবেন। ঐদিনেই নিম্নের সংবাদটিও প্রকাশিত হয়।

"পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে বাছাই করিয়া পশ্চিমবঙ্গে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বর্দ্ধিত হারে বেতন দিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন লাভ করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের নিকট প্রেরিত এক পত্রে জানান যে, রাজ্য সরকারের এই নীতি "ঠিক পথেই" পরিচালিত হইতেছে এবং ইহার ফলে শিক্ষকদের চাকুরীর অবস্থা ভালর দিকে যাইবে।

ঐ পত্রে আরও উল্লেখ করা হয় যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত এই নীতি অন্যান্য রাজ্য সরকারের নজরে আনা হইবে।"

উপরোক্ত সংবাদে বুঝা যায়, যোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষিকা, অর্থাৎ যাঁহারা বি-টি পাস ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা কমিশনের মতে উক্ত পদবী না থাকা সত্ত্বেও যোগ্য বলিয়া বিবেচিত তাঁহাদের বেতন বৃদ্ধি নিশ্চিত।

পশ্চিমবঙ্গে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত ১১০১টি এবং অন্যান্য ৫৭৯টি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে। জুনিয়র মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা মোট ১১৪৮টি—তাহাদের মধ্যে ১২৮২টি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত। সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকসংখ্যা ১৩,৬০৮ এবং অন্যান্য উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকসংখ্যা ৮,১০৭। জুনিয়র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কার্য্যে নিরত শিক্ষকদিগের মধ্যে ৫২৩০ জন সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে কাজ করেন এবং ১৮৪৯ জন অন্যান্য বিদ্যালয়ে কাজ করেন। সরকারের নূতন বিধান অনুযায়ী এই সকল বিদ্যালয়ের মোট ২৮,০০০ জন শিক্ষকের মধ্যে ১৮,৮৩৮ জনকে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে। যে সকল বিদ্যালয় সরকার হইতে অর্থসাহায্য পায় না—তাহারাও যদি সাহায্য গ্রহণ করে তবে ঐ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকেও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে।

শিক্ষকগণ এই ব্যবস্থায় আপত্তি জানাইয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করিবার পর সেই কাজের জন্য তাঁহারা নূতন করিয়া পরীক্ষা দিতে রাজী নন। এইরূপ পরীক্ষাতে তাঁহাদের মর্য্যাদা হানি ঘটে। প্রথম কিস্তিতে প্রায় ৩৯০০ জন শিক্ষককে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য ডাকা হয়, তাঁহাদের মধ্যে ১৪০০ জন ইতিমধ্যেই কমিশনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন এবং আরও ৬০০ জন উপস্থিত হইবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। আমরা যতদূর জানি কমিশন এ পর্য্যন্ত কাহাকেও পরীক্ষায় ফেল করান নাই। তাহাতে মনে হয় যে, যাঁহারা দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করিয়া যথেষ্ট অভিজ্ঞ, তাঁহাদের অভিজ্ঞতার পূর্ণ মূল্য দিবার সরকারী নির্দ্দেশ রহিয়াছে।

সর্ব্বশেষে যে নেতৃবর্গ এই শিক্ষকশিক্ষিকাদিগকে চালাইতেছেন, তাঁহাদের নিকটও আমরা অনুরোধ করিতেছি যে, এ বিষয়ে তাঁহারা পুনর্ব্বিবেচনা করুন। তাঁহাদের মধ্যে সকলেই নিছক ধ্বংসবাদী নহেন, কয়েকজন সুবিবেচকও রহিয়াছেন। এদেশের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের বিষয় চিন্তা করিবার অবকাশ তাঁহাদের হইয়াছে কিনা জানি না। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, এই ব্যাপার উহার সহিত নিবিড়ভাবে যুক্ত। যদি এই পরীক্ষার কার্য্যক্রমের কিছু বদল তাঁহারা চাহেন, তবে সে বিষয়ে তাঁহারা যুক্তির সহিত দাবী জ্ঞাপন করুন। কিন্তু নিছক জিগিরের বশে শিক্ষা-ব্যাপারে যাহাতে সংশোধনের পথ রুদ্ধ না হইয়া যায় তাহা তাঁহাদের দেখা প্রয়োজন।

বীমা কর্পোরেশনের তদন্ত ও তাহার তাৎপর্য্য

বীমা কমিশন সংক্রান্ত তদন্ত ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ ঘটনা। এই তদন্তে প্রচলিত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংগঠনিক বহু প্রশ্নই জড়াইয়া আছে। এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন। অবশ্যই তাহা সময়-

সাপেক্ষ। তবে এই তদন্ত সম্পর্কে কয়েকটি কথা আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

বীমা কর্পোরেশনের দৈনিক আয় প্রায় দশ লক্ষ টাকা। যথাসম্ভব শীঘ্র কর্পোরেশনকে এই অর্থ লগ্নী করিতে হয়। তাহা না করিতে পারিলে কর্পোরেশনের অর্থহানি ঘটিবার সম্ভাবনা। সুতরাং কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষের হাতে উপযুক্ত ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন, এবং তাহা ছিলও। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, মুন্দ্রা কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ের সময় কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের ক্ষমতা কার্য্যকরী করেন নাই। কেন্দ্রীয় অর্থদপ্তরে মুখ্য সচিব (Principal Secretary) শ্রী এইচ, এম, প্যাটেলের হস্তক্ষেপেই উহা সম্ভব হইয়াছিল তদন্ত কমিশন রায়ে তাহা বলিয়াছেন।

এই ঘটনা হইতে এমন কয়েকটি সিদ্ধান্ত করিবার চেষ্টা হইতেছে যাহা নিতান্তই বিপজ্জনক—এবং যে সম্পর্কে অবিলম্বে জনমত জাগ্রত হওয়া প্রয়োজন। প্রথমতঃ বীমা কর্পোরেশনের এই গোলমালের সুযোগে একদল লোক বলিতেছেন যে, জাতীয়করণের ফলেই এরূপ অনুচিত কার্য্য ঘটা সম্ভব হইয়াছে। অতএব এখন হইতে আর কোন শিল্প যেন জাতীয়করণ না হয়। এই যুক্তি যে কেবলমাত্র ভ্রান্ত তাহাই না, ইহা সবিশেষ উদ্দেশ্যমূলক। প্রথমতঃ জাতীয়করণ না হইলে বীমা কর্পোরেশনের এই কার্য্যের কথা জনসাধারণ কোনদিনই জানিতে পারিত না। ইতিপূর্ব্বে ডিরেক্টরদের অসাধুতা এবং অকর্ম্মণ্যতার দরুণ বহু ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স কোম্পানী এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠান ফেল পড়িয়াছে। তাহাতে সাধারণ মানুষের কষ্টসঞ্চিত কোটি কোটি টাকা নষ্ট হইয়াছে—কিন্তু নগণ্য দুই-একটি ক্ষেত্র ব্যতীত জনসাধারণ সে সম্পর্কে কিছুই জানিতে পারেন নাই—এবং কোন কোম্পানী ডিরেক্টর সেই সম্পর্কে কোন তদন্ত কমিশন নিয়োগ করেন নাই। বীমা-কোম্পানী জাতীয়করণের সময় বহু ডিরেক্টর এবং ম্যানেজারের চরম অসাধুতা ধরা পড়িয়াছে।

দ্বিতীয় আর একদল যুক্তি দিতেছেন যে, অতঃপর কোন স্বয়ংশাসিত কর্পোরেশনের উপর সরকারের কর্তৃত্ব রাখা উচিত নহে। ইহা একটি বিপজ্জনক যুক্তি। কর্পোরেশনগুলি জনসাধারণের সম্পত্তি—সুতরাং তাহাদের উপর জনসাধারণের, অর্থাৎ পার্লামেণ্টের এবং সরকারের কোন কর্তৃত্বাধিকার থাকিবে না ইহা এক অদ্ভুত যুক্তি। ইতিমধ্যেই এই সকল প্রতিষ্ঠান কয়েকটি ব্যক্তি-বিশেষের ব্যক্তিগত কর্তৃত্বের কেন্দ্ররূপে পরিণত হইয়াছে। স্বাধীন ভারতের প্রথম কনট্রোলার ও অডিটর-জেনারেল শ্রীনরহরি রাও বলিয়াছিলেন যে, এই সকল কর্পোরেশন এবং প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীগুলি "a fraud on the constitution" তিনি ঠিকই বলিয়াছেন। পার্লামেণ্ট এবং সরকার নিয়ন্ত্রণের সর্ব্বশেষ অধিকারটুকুও যদি ছাড়িয়া দেন তবে এই সকল প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ এবং বেসরকারী মুনাফাখোর প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তৃপক্ষের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিবে না।

বীমা কর্পোরেশনে যে অন্যায় ঘটিয়াছে তাহার কারণ সরকারের হস্তক্ষেপ নহে। তাহার কারণ আরও গভীরে নিহিত। আমাদের রাষ্ট্র এবং সমাজ-জীবন যে কিরূপ কলুষিত হইয়াছে, ইহা তাহার প্রমাণ। এই সমাজ-ব্যবস্থায়, সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং স্বাধীনচিত্ততার কোন মূল্য নাই, প্রয়োজনও নাই, উপরওয়ালার মন যোগাইতে পারিলেই যথেষ্ট। সুতরাং কোন সরকারী কর্ম্মচারী (এমনকি উচ্চতম আই-সি-এস অফিসারগণ পর্য্যন্ত) এখন আর কোন কাজের উপযুক্ততা বিচার করিয়া দেখেন না, সর্ব্বদা তাঁহারা উপরওয়ালাদের তোষামোদেই ব্যস্ত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহাতে তাহাদের কর্ম্মদক্ষতা থাকে না—কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না, তাঁহাদের প্রমোশন আটকায় না। এই সরকারী নীতির ফলে উচ্চতম পদগুলিতেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিতান্ত অনুপযুক্ত লোকদেরই সংখ্যাধিক্য ঘটিয়াছে। বীমা কর্পোরেশনের ঘটনা তাহারই সাক্ষ্য বহন করিতেছে। যে ভাবে মুন্দ্রার শেয়ার ক্রয় হইয়াছে তাহা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তদন্ত কমিশনের সম্মুখে বীমা কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর বৈদ্যনাথন বলিয়াছেন যে, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের আদেশ মনে করিয়াই শেয়ার কিনিয়াছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের আদেশ কি গড়ের মাঠে বসিয়া জানানো হইবে! প্রথমতঃ আইনানুযায়ী সরকারের নির্দ্দেশ লিখিতভাবে দেওয়ার কথা—তাহা করা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ সরকারী সিদ্ধান্ত সরকারী-ভবনে অথবা বীমা কর্পোরেশনের আপিসে জানানো উচিত। কিন্তু এক্ষেত্রে সরকারের আদেশ এক তৃতীয় স্থানে বসিয়া জানানো হইয়াছে। যে-কোন কর্তব্যজ্ঞানসম্পন্ন কর্ম্মচারীই এইরূপ কর্ম্ম-পদ্ধতিতে অস্বস্তি বোধ করিতেন, কিন্তু বীমা কর্পোরেশনের চেয়ার-ম্যান শ্রীকামাথের মনে কোন অস্বস্তি আসে নাই। কামাথ যদি প্যাটেলের নির্দ্দেশকে সরকারী নির্দ্দেশ বলিয়াই মনে করিতেন, তথাপি শেয়ার-ক্রয়ের পরও প্রধানমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীর নিকট এইরূপ অযৌক্তিক আদেশ সম্পর্কে অভিযোগ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা করা হয় নাই। আংশিকভাবে সরকারী নীতি যে এই নিষ্ক্রিয়তার জন্য দায়ী, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কামাথ হয়ত বুঝিয়াছিলেন যে, অভিযোগ জানাইলে পদচ্যুতি ব্যতীত তাঁহার কপালে আর কিছু জুটিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং নিতান্ত অস্বাভাবিক ব্যবস্থাও তিনি নির্ব্বিকার চিত্তে মানিয়া লইলেন।

এ সম্পর্কে এখন আর কোন সন্দেহ নাই যে, মুন্দ্রা শেয়ারগুলি কোন সরকারী নীতির ভিত্তিতে ক্রয় করা হয় নাই। সুতরাং এক্ষেত্রে যাহা ঘটিয়াছে তাহা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত লোভ, অযোগ্যতা বা অন্যান্য দুর্ব্বলতার জন্যই ঘটিয়াছে। মন্ত্রী কৃষ্ণমাচারী এই সকল ঘটনা জানিয়াও কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। সুতরাং তিনি দায়ী এবং ক্যাবিনেট কৃষ্ণমাচারীকে অস্বীকার করেন নাই, সুতরাং সরকারও এ ব্যাপারে দায়ী।

কৃষ্ণমাচারীকে লিখিত জহরলাল নেহরুর পত্রে ইহাই ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, প্রকাশ্য তদন্ত করিয়া সরকার বিশেষ ফাঁপরে পড়িয়া-ছেন। উক্ত পত্রে তদন্ত কমিশনের উপর যে কটাক্ষ রহিয়াছে

তাহা না বুঝিবার কথা নহে। নেহরু এমনও বলিয়াছেন যে, কমিশনের সম্মুখে সরকার তাঁহার বক্তব্য বলিতে পায়েন নাই। এই বক্তব্যের অর্থ হৃদয়ঙ্গমে আমরা সম্পূর্ণ অপারগ। এটর্নী-জেনারেল শ্রীশীতলবাদ সরকারের পক্ষ হইয়াই সওয়াল করিয়াছেন—সরকার স্বচ্ছন্দে তাঁহার মারফত তাঁহাদের বক্তব্য বলিতে পারিতেন। সুতরাং সরকারকে বক্তব্য বলিবার সুযোগ দেওয়া হয় নাই—একথা সম্পূর্ণ নিরর্থক। আমরা মনে করি পণ্ডিত নেহরুর মতামত এই ভাবে প্রকাশ করা সুবুদ্ধির বা সুবিবেচনার পরিচায়ক হয় নাই।

কৃষ্ণমাচারী সম্পর্কে সরকার এবং কয়েকটি পত্রিকা যে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেছেন তাহার অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। কৃষ্ণমাচারীর অন্ত কোন দায়িত্ব না থাকিলেও তিনি যে সমস্ত ব্যাপার জানা সত্ত্বেও তিন মাস যাবত সে সম্পর্কে ক্যাবিনেট এবং পার্লামেণ্টকে জানান নাই, তাহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। সকলেই বলিতেছেন যে, মুন্দ্রার শেয়ার ক্রয় সংক্রান্ত সকল তথ্যাদি প্রকাশিত হয় নাই। কয়েকটি বিরোধী পত্রিকা এই সম্পর্কে আরও কয়েক-জন মন্ত্রী সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছে। কৃষ্ণমাচারী সম্পর্কে নেহরুর কোমলতা দেখিয়া মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, এই সকল সন্দেহ অমূলক নাও হইতে পারে। বস্তুতঃ নেহরু উক্ত পত্রে যে মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই যদি সরকারী মনোভাব হয় তবে এখনই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তদন্তের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে।

বৈদেশিক বাণিজ্য পরিস্থিতি

সম্প্রতি রপ্তানী উপদেষ্টা মণ্ডলীর অধিবেশনে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, বৈদেশিক সাহায্য সত্ত্বেও ভারতের মুদ্রা-পরিস্থিতির কোনও প্রকার উন্নতি হয় নাই। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার হইতে সম্প্রতি ভারতবর্ষ ২০ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছে তাহার বৈদেশিক আমদানীর ঋণ শোধের জন্য। কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন যে, ভারতের পক্ষে রপ্তানী-বৃদ্ধি অতি অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং এই রপ্তানী-বৃদ্ধির জন্য মুনাফা প্রবৃত্তি বাদ দিতে হইবে। বৈদেশিক মুদ্রা-আয়ের ক্রমহ্রাসমান গতিতে বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার অত্যন্ত বিব্রত। পণ্ডিত নেহরু ভূতপূর্ব্ব অর্থমন্ত্রী শ্রীদেশমুখকে চিঠি লিখিয়া জানিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার মন্ত্রিত্ব-কালে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা এত অধিক পরিমাণে খরচ করা হইয়াছে কেন। ইহার উত্তরে শ্রীদেশমুখ জানাইয়াছেন যে, আমদানীর অনুমতি অনেকক্ষেত্রে তাঁহার অনুমতি ব্যতীত দেওয়া হইত। এই উত্তরে অবশ্য পণ্ডিত নেহরু সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই।

ভারতের বৈদেশিক মুদ্রাহ্রাসের প্রধান কারণ এই আমদানী যদিও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, রপ্তানী ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে এবং আমদানীর মধ্যে অপ্রয়োজনীয় আমদানীর পরিমাণ অত্যধিক। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতবর্ষের আমদানীর যে তথ্য যোগাড় করিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, মোট আমদানীর মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হইতেছে যানবাহন এবং যানবাহনের মধ্যে বিদেশী বাসের সংখ্যাই অধিক। যেমন পশ্চিমবঙ্গ সরকার ক্রমাগতই অত্যধিক হারে বিদেশ হইতে বাসগাড়ী আমদানী করিতেছেন। ব্যক্তিগত বাস যদি কলিকাতার রাস্তায় আরও কয়েক বৎসর চলিত তাহাতে রাষ্ট্রের বিশেষ কোনও ক্ষতি হইত না, অন্তত বৈদেশিক মুদ্রা বহুল পরিমাণে বাঁচিয়া যাইত।

বৎসরে প্রায় ২০০।২৫০ কোটি টাকার যানবাহন আমদানী করা হইতেছে কেন? বর্ত্তমানে বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্কটময় সময়ে বাস আমদানী করা জাতীয় স্বার্থবিরোধী। দেশে যখন টাটা-মার্সিডিজ প্রথম শ্রেণীর গাড়ী নির্ম্মাণ করিতেছে, তখন সরকার বিদেশ হইতে যানবাহন আমদানী করা বন্ধ করিয়া দিতেছেন না কেন? বৈদেশিক মুদ্রাহ্রাসের আর একটি প্রধান কারণ এই যে, সকল বৈদেশিক মুদ্রার আয় ভারতবর্ষে আনা হয় না, এবং এগুলিকে গোপন রাখা হয়। যেমন বহু ভারতীয় ফার্ম্ম বিদেশী ফার্ম্মের এজেণ্ট হিসাবে বিদেশী দ্রব্য আমদানী করে। এই আমদানীর জন্য প্রতি বৎসর তাহারা বেশ মোটা কমিশন লাভ করে। বিদেশী ফার্ম্মগুলি বিদেশী ব্যাঙ্কে এতদ্দেশীয় ফার্ম্মের নামে এই এজেন্সী কমিশন জমা দেয়। এই টাকা প্রধানতঃ এদেশে আনা হয় না এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই গোপন আয় ধরিতে পারে না।

ভারতের প্রধান রপ্তানী হইতেছে চা ও পাটজাত দ্রব্য। গত বৎসর অর্থাৎ ১৯৫৭ সনে চা ও পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানী যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। সিংহলে চা রপ্তানী বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং সেই তুলনায় ভারতীয় চা রপ্তানী হ্রাস পাইতেছে। বর্ত্তমানে চা রপ্তানীর উপর এত প্রকার করভার আরোপিত করা আছে যে, সিংহলের চায়ের সহিত তুলনায় ভারতীয় চা প্রায় দুর্মূল্য। চা-শিল্প বহুদিন হইতে দাবী করিয়া আসিতেছে যে, রপ্তানীশুল্ক রহিত করিয়া দেওয়া হউক। কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী যখন মুনাফাহ্রাসের আবেদন করিয়াছেন তখন রাষ্ট্রেরও উচিত রপ্তানীশুল্ক রদ করিয়া দেওয়া। রাশিয়া ও ব্রিটেন সিংহল হইতে অধিক পরিমাণে চা ক্রয় করিতেছে। ভারতীয় বাণিজ্য-ঘাটতির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হইতেছে পশ্চিম জার্ম্মানীর সহিত। কিন্তু পশ্চিম জার্ম্মানী ভারতবর্ষ হইতে যথেষ্ট পরিমাণে চা ও পাটজাত দ্রব্য ক্রয় করিতেছে না, সুতরাং ভারতের উচিত পশ্চিম জার্ম্মানী হইতে আমদানী কমাইয়া দেওয়া।

ভারতের সীমান্ত-নীতি

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় দেশরক্ষামন্ত্রী কলিকাতায় একটি ভাষণে প্রকাশ করেন যে, ভারতবর্ষ তাহার সীমান্তে অশান্তির জন্য অত্যন্ত বিব্রত, শুধু তাহাই নহে, সীমান্ত-গণ্ডগোলের জন্য সামরিক নিরাপত্তার দিক হইতেও ভারতবর্ষ বর্ত্তমানে বিপদাপন্ন। ভারতবর্ষের প্রায়

তিন দিকেই সমুদ্র, সুতরাং সীমান্ত বলিতে প্রধানতঃ উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব্বই বোঝায়। উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে ব্রহ্মদেশের সহিত ভারতবর্ষের যথেষ্ট সৌহার্দ্দ্য আছে, সুতরাং সেই দিক হইতে ভারতবর্ষের সদ্য কোনও বিপদের সম্ভাবনা নাই এবং নাগা-আন্দোলন দমনে ব্রহ্মদেশের কোনও সক্রিয় বিরোধিতা ছিল না। সুতরাং প্রধানতঃ উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত লইয়া ভারতের যত দুশ্চিন্তা। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আছে পাকিস্থান ও কাশ্মীর; কাশ্মীর-বিবাদকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিকট পেশ করিয়া চিরন্তন ভাবে ভারতবর্ষ নিজেই তাহার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তকে বিপদাপন্ন করিয়া রাখিয়াছে। যতদিন পর্য্যন্ত রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে বিরোধ বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত কাশ্মীর বিরোধের কোনপ্রকার নিষ্পত্তি হইবে না, এবং তৃতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলা সংঘটিত না হওয়া পর্য্যন্ত রাশিয়া-আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা বন্ধ হইবে না, কারণ ইহা পারস্পরিক ধ্বংসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এমন অবস্থায় কাশ্মীরকে উভয়পক্ষই দাবাখেলার ব'ড়ের চালের মত ব্যবহার করিবার প্রচেষ্টা করিবে। সুতরাং কাশ্মীর সমস্যা কেবলমাত্র ভারতবর্ষের জাতীয় সমস্যা নহে; ইহা আন্তর্জ্জাতিক বিরোধের অঙ্গস্বরূপ। কাশ্মীর সমস্যাকে জিয়াইয়া রাখার জন্য দায়ী প্রধানতঃ ইংলণ্ড ও আমেরিকা, কারণ কাশ্মীর-বিরোধ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্থায়িত্ব ও সামরিক সংহতিকে ব্যাহত করিয়া রাখিবে। ইহার ফলে ভারতবর্ষ একটি বিরাট সামরিক শক্তিশালী দেশরূপে সহজে পরিণত হইতে পারিবে না।

তৃতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক এলাকায় পর্য্যবসিত হইবে। মধ্যপ্রাচ্যকে নিয়ন্ত্রণ করার অর্থ ভূমধ্যসাগর তথা আফ্রিকাকে দখলে রাখা। হিটলারের আফ্রিকা বিপর্য্যয় তাঁহার পতনের একটি প্রধান কারণ। সেই কারণে মধ্যপ্রাচ্যকে দখলে রাখার রাজনীতি দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের শেষ হইতেই সুরু হইয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র আইসেনহাওয়ার নীতি দ্বারা ক্রমে ক্রমে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে জড়াইয়া পড়িতেছে। পাকিস্থান মধ্যপ্রাচ্যের সামরিক বন্ধনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। আনবিক বোমা দ্বারা ধ্বংস সম্ভবপর, কিন্তু ইহার দ্বারা যুদ্ধজয় সম্ভবপর নহে। যুদ্ধজয়ের জন্য স্থলবাহিনী অবশ্য প্রয়োজন এবং যেহেতু কাশ্মীরের সহিত রাশিয়ার ভৌগোলিক সংযোগ আছে, সেইহেতু কাশ্মীরের মধ্য দিয়া রাশিয়ার সৈন্য-পরিচালনা আমেরিকার পক্ষে সহজসাধ্য হইবে এবং তাহা সামরিক প্রয়োজন। সুতরাং কাশ্মীর-বিরোধের আশু কোনও প্রকার নিষ্পত্তি সম্ভবপর নহে।

সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যে বাগদাদ চুক্তির যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে তাহাতে আইসেনহাওয়ার নীতিকে আর এক ধাপ আগাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বে কেবলমাত্র মধ্যপ্রাচ্যে কম্যুনিষ্ট আক্রমণকে প্রতিরোধ করিবার জন্য আমেরিকা অগ্রধাবণ করিবে বলিয়া বলা হইয়াছিল। এবারের অধিবেশনে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বাগদাদ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত যে কোনও দেশের বিরুদ্ধে আক্রমণ অন্যান্য সমস্ত সভ্যদেশগুলির (member states) বিরুদ্ধে আক্রমণ হিসাবে পরিগণিত হইবে। এই বৎসরের আঙ্কারা অধিবেশনে বাগদাদ চুক্তির প্রধান কর্ম্মসচিব মিঃ খলিদি ঘোষণা করিয়াছেন, যে কোনও সভ্যদেশের বিরুদ্ধে স্থানীয় আক্রমণও চুক্তিভুক্ত সমস্ত দেশগুলির বিরুদ্ধে আক্রমণ বলিয়া গৃহীত হইবে। অর্থাৎ কাশ্মীর লইয়া ভবিষ্যতে যদি ভারত-পাকিস্থানের মধ্যে যুদ্ধ হয় তাহা হইলে তাহা সমস্ত বাগদাদ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলিয়া ধরা হইবে।

ভারতবর্ষের সীমান্ত পরিস্থিতি শুধু কাশ্মীর ও পাকিস্থানকে লইয়াই নহে, সমস্ত উত্তর-সীমান্ত আজ বিজড়িত ও বিপদাপন্ন। সিকিম ও ভুটানের সহিত ভারতবর্ষের ১৯৪৯ সনে যে চুক্তি হইয়াছে তাহার ফলে এই দুই রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি ও সম্পর্ক পরিচালনা করার ভার ভারতবর্ষের উপর অর্পণ করা হইয়াছে; কিন্তু ভারতবর্ষ ইহাদের আভ্যন্তরিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবে না। ভুটানকে লইয়া কোন সমস্যা দেখা দেয় নাই; কিন্তু সিকিমকে লইয়া ইদানীং কিছু কিছু বিরোধিতা ভারতবর্ষকে সহ্য করিতে হইতেছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা গণ্ডগোল বর্ত্তমানে দেখা দিয়াছে নেপালকে লইয়া। ভারতের উত্তর-সীমান্তে নেপাল বৃহত্তম রাষ্ট্র এবং বর্ত্তমানে ইহা স্বাধীন ও রাষ্ট্রসঙ্ঘেরও সভ্য।

ব্রিটিশ আমলে নেপালের নিজস্ব বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করার অধিকার ছিল না, এবং ইহা উপরাষ্ট্র (client state) হিসাবে পরিচিত ছিল। ব্রিটিশ আমলে নেপালকে লইয়া কোনও সমস্যা দেখা দেয় নাই; কিন্তু বর্ত্তমানে ইহা আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতির বীজাধার, কিংবা নরককুণ্ডজার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভারতের বিরুদ্ধে নেপালের উষ্মা কথায় কথায় প্রকাশ পায়। ভারতবর্ষ নেপালকে যে অর্থসাহায্য দিয়াছে কিংবা ত্রিভুবন-পথ তৈয়ার করিয়া দিয়াছে তাহাতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বার্থ ও উদ্দেশ্য নেপালীরা দেখে। নেপাল সরকারের অনুরোধে একটি ভারতীয় মিলিটারী মিশন বর্ত্তমানে নেপালে আছে নেপালী সৈন্য-বাহিনীকে আধুনিকতম যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য; তাহাতে নেপালের অধিবাসীরা মনে করে যে, ভারতবর্ষ নেপালের আভ্যন্তরিক রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করিতেছে। চীনের প্রভাব তিব্বতের মধ্য দিয়া নেপালের রাজনীতির মধ্যে দিন দিন প্রকট হইয়া উঠিতেছে। চীন কর্ত্তৃক তিব্বত দখলের পর হইতে কম্যুনিষ্ট চীন দ্রুতগতিতে ভারতের উত্তর-সীমান্তের রাজ্যগুলিতে, প্রধানতঃ নেপালে প্রবিষ্ট হইতেছে এবং তাহার ফলে এই সকল রাজ্যের আভ্যন্তরিক রাজনীতিতে কোনও স্থায়িত্ব নাই এবং গোলযোগ লাগিয়াই আছে। নেপালই আজ সর্ব্বাপেক্ষা ভুক্তভোগী এবং রাজনৈতিক দলাদলিতে নেপাল আজ বিপর্য্যস্ত। এই রাজনৈতিক বিপর্য্যয়ের জন্য কম্যুনিষ্ট চীনের প্রভাব যে বিশেষভাবে কার্য্যকরী, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। একদিন ভারত চীনের তিব্বত দখলকে নির্ব্বিকারে সমর্থন করিয়াছে, কিন্তু তাহার তখনই বোঝা

উচিত ছিল যে, তিব্বতকে দখল করার অর্থই হইতেছে যে, ভারতের দুই হাজার মাইল উত্তর-সীমান্ত শুধু বিপদাপন্ন নহে, ইহা ভারতের এতদিনকার বন্ধু সীমান্ত রাজ্যগুলির রাজনৈতিক স্থায়িত্বকে বানচাল করিয়া দিতেছে। সামরিক পরিস্থিতির দিক হইতে ইহা ভারতের পক্ষে যথেষ্ট অশুভ।

উত্তর-সীমান্ত রাজ্যগুলির বর্ত্তমান রাজনীতিক গোলযোগের জন্য ভারতবর্ষ অবশ্য নিজেই বহুলাংশে দায়ী। ভারতবর্ষ ভালমানুষী দেখাইয়া অনেকখানি আলগা দিয়াছে যাহার ফলে আজ নেপাল ও সিকিমে ভারত-বিরোধী মনোভাব বিস্তারলাভ করিতেছে। আর চীনের তিব্বত দখলকে ভারতের প্রতিরোধ করা উচিত ছিল, অবশ্য সামরিক শক্তির দ্বারা নহে, কূটনৈতিক পর্য্যায়ের দ্বারা। তিব্বতীরা চীনা নহে, এবং ১৯০৪ সনে তিব্বত সম্বন্ধে ব্রিটেন ও চীনের মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছিল, তাহাতে কার্য্যতঃ তিব্বতের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করা হইয়াছিল। প্রত্যেক উপনিবেশ ও পরাধীন জাতের স্বাধীন হইবার অধিকার আছে এবং ভারতবর্ষ এই নীতি স্বীকার করিয়া আসিতেছে। সারা পৃথিবীর পরাধীন জাতির স্বাধীনতালাভের জন্য ভারতবর্ষ মুরুব্বীয়ানা করিয়া আসিতেছে, কেবলমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে তিব্বতের বেলায়। ১৯১২ হইতে ১৯৫৩ সন পর্য্যন্ত তিব্বত ছিল স্বাধীন ও নিরপেক্ষ এবং নিরপেক্ষ তিব্বতের জন্য ভারতবর্ষের উত্তর-সীমান্তে এতদিন পর্য্যন্ত কোন প্রকার সামরিক ও রাজনৈতিক বিপর্য্যয়ের ভয় ছিল না। সাম্রাজ্যবাদ সর্ব্বতোভাবেই সাম্রাজ্যবাদ এবং চীনের তিব্বত-দখল সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টা ব্যতীত কিছু নহে।

সীমান্তে পাকিস্থানী হামলা ও ভারত সরকার

ভারতের পূর্ব্ব-সীমান্তে পাকিস্থানী হামলা লাগিয়াই রহিয়াছে। সীমান্ত বহুবিস্তৃত হওয়ায় এই সকল হামলারও বিস্তৃতি ঘটিয়াছে এবং তাহাতে সীমান্তবর্তী ভারতীয় নাগরিকদের ধনপ্রাণমান বিশেষভাবে বিপন্ন হইতেছে। এই সকল সীমান্ত হামলা সম্পর্কে ভারত সরকার অত্যন্ত দুর্ব্বল নীতি গ্রহণ করায় এই উৎপাত হ্রাসের কোন চিহ্নই দেখা যাইতেছে না। কিছুদিন পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত রঘুনাথগঞ্জ থানার অধীন দয়ারামপুর ইউনিয়নের পিরোজপুর ও বাজিতপুর মৌজার নবোদ্ভূত চর লইয়া ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। সম্প্রতি রাজসাহী এবং মুর্শিদাবাদের জেলাশাসকদ্বয় এক বৈঠকে ঐ চরকে বিবদমান এলাকা (disputed area) বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

এই বিষয় সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে স্থানীয় সাপ্তাহিক "ভারতী" লিখিতেছেন যে, প্রাপ্ত তথ্যাদি হইতে কোনক্রমেই ঐ চরটিকে বিবদমান এলাকা বলিয়া স্বীকার করা যায় না। উহা নিঃসন্দেহে ভারত-রাষ্ট্রের অংশ।

"কারণ, সরকারের রাজস্ব বিভাগের কর্ম্মচারীগণের সাম্প্রতিক জরিপমূলে "বাগে লাইনের" বহু দক্ষিণে অবস্থিত এই চর ভারত এলাকাভুক্ত বলিয়া চূড়ান্তভাবে স্থিরীকৃত হইয়াছে এবং তদনুযায়ী সরকার পক্ষ হইতে খাজনা আদায়ও করা হইয়াছে। সুতরাং হঠাৎ এক কলমের খোঁচায় ইহাকে দয়ারামপুর ইউনিয়ন হইতে বিচ্যুত করার কোন সঙ্গত কারণ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। এই প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি যে, ১৯৫৫ সনের জানুয়ারী মাসে এই দয়ারামপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত চরবাগডাঙ্গা, বাখরালি, খামরা, লাড়ুখাকী, হরিশ্চন্দ্রপুর প্রভৃতি কয়েকটি মৌজা অনুরূপ দ্বিপাক্ষিক চুক্তিমূলে বিরোধীয় এলাকা ঘোষণা করা হয় এবং ইহার ফলে আজ পর্য্যন্ত উক্ত অঞ্চল কার্য্যতঃ ভারত ইউনিয়ন হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রহিয়াছে এবং পাকিস্থানীরা নির্ব্বিবাদে ইহা ভোগদখল করিতেছে। কাজেই এই মৌজা দুইটিরও যে অনুরূপ অবস্থা হইবে ইহা একপ্রকার সুনিশ্চিত। নিজেদের স্বত্ব-দখলীয় এলাকাকে একের পর এক বিরোধীয় এলাকা ঘোষণা করার পশ্চাতে যে পরাজিতের মনোভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে তাহা শুধু নিন্দনীয়ই নহে, রাষ্ট্রীয় স্বার্থের বিচারে রীতিমত আশঙ্কাজনক। বিরোধীয় এলাকার অর্থ কি ইহাই যে, ভারত ইউনিয়নের অংশবিশেষ পাকিস্থানীদের দখলে ছাড়িয়া দেওয়া? বিরোধীয় এলাকার অর্থ কি ইহাই যে, ভারত ইউনিয়নের নাগরিকগণ তাহাদের স্বত্ব-দখলীয় জমি হইতে পশ্চাদপসরণ করিবে ও পাকিস্থানীরা তাহাদের এই হাজার হাজার বিঘা জমির ফসল বৎসরের পর বৎসর লুঠপাট করিয়া লইয়া যাইবে? বিরোধীয় এলাকা ঘোষণার ফলে যদি চূড়ান্ত মীমাংসা-সাপেক্ষে এই সমস্ত জমি ইহার মালিকগণের দখলে রাখিবার ব্যবস্থা করা হইত বা কাহারও দখলে না রাখিয়া পতিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখার ব্যবস্থা করা হইত তাহা হইলেও হয়ত সান্ত্বনা থাকিত কিন্তু অপর পক্ষের সঙ্ঘবদ্ধ গুণ্ডামীর নিকট নতি স্বীকার করিয়া তাহাদিগকে লুণ্ঠনের সুযোগ দেওয়া এক তাজ্জব ব্যাপার বলিয়াই আমাদের মনে হইতেছে।"

"ভারতী" লিখিতেছে :

"চুক্তির অপর সর্তটি সম্পর্কে আমাদের অভিমত এই যে, আপাতদৃষ্টিতে ইহা সম্পূর্ণ যুক্তিসহ হইলেও কার্য্যতঃ বিরোধীয় এলাকায় যাহাদের জমি আছে তাহাদের পক্ষে পদ্মা পার হইয়া লাঙ্গল-বলদ লইয়া চাষ-আবাদ করিতে যাওয়া মোটেই নিরাপদ নয়। বিরোধীয় চরগুলির সমস্ত জমিই ভারতীয় নাগরিকগণের স্বত্ব-দখলীয়। ইতিপূর্ব্বে তাহারা বিরোধীয় অঞ্চলে চাষ-আবাদ করিতে যাইয়া পাকিস্থানীদের হাতে বহুবার নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত হইয়াছে এবং অনেকে তাহাদের লাঙ্গল-বলদ পর্য্যন্ত হারাইয়াছে। আমাদের সরকারের পক্ষ হইতে তাহাদের নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থাই করা হয় নাই। সুতরাং পাকিস্থান পুলিসের সাহায্যপুষ্ট পাকিস্থানী গুণ্ডাদের হাত হইতে ভারতীয় নাগরিকগণকে রক্ষার কোন ব্যবস্থা না করিয়া তাহাদিগকে বিরোধীয় চরে নিজ নিজ জমি চাষ-আবাদ করিতে বলা একটি হাস্যকর প্রস্তাব মাত্র। এই অবস্থায়

এই সর্ত্তকে যদি সত্যসত্যই কার্য্যকরী করিতে হয়, তবে ভারত সরকারের পক্ষ হইতে এই নবোদ্ভূত চর এলাকায় অবিলম্বে পুলিস ঘাঁটি স্থাপন করা একান্ত কর্ত্তব্য। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, এই বিরোধীয় এলাকায় আমাদের সরকার কোন পুলিস-ঘাটি স্থাপন করিতে পারেন কিনা। এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, এইরূপ অপর একটি বিরোধীয় চর চরবাগডাঙ্গায় যদি বর্ত্তমানে আমাদের পুলিস-ঘাটি রাখা সম্ভব হইয়া থাকে তবে নবোদ্ভূত পিরোজপুর, বাজিতপুর চরে পুলিস-ঘাটি স্থাপন করা সম্ভবপর না হইবার কোন কারণ নাই।"

এই বিষয়ে 'যুগশক্তি' লিখিতেছেন :

"গত কয়েক মাস মধ্যে আসাম, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে পাকিস্থানী সীমান্ত পুলিস ও সৈন্যাদির নানারূপ উপদ্রব অত্যাচারের বহু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই উপদ্রুত ভারতীয় এলাকার কর্ত্তৃপক্ষ যথারীতি পাকিস্থানের নিকট প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন ইহাও সংবাদপত্রাদিতে প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু প্রতিবাদের ফল কোথাও কিছু হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ পায় নাই।

"আমাদের এতদঞ্চলে কাছাড়, খাসিয়া, জৈন্তিয়া পাহাড় ও ত্রিপুরা সীমান্তে সম্প্রতি পাকিস্থানীদের যেসব হামলা হইয়াছে তাহার মোটামুটি বিবরণ আমাদের পাঠকপাঠিকারা অবগত আছেন। ভারতীয় নাগরিকদের উপর গুলীবর্ষণ করিয়া আহত এমনকি নিহত করা; নদীতে নৌকা, বাঁশ ও কাঠের চালি ইত্যাদি আটকাইয়া রাখা; আরোহীদের মারধোর করা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ধরিয়া লইয়া যাওয়া; ভারতীয় এলাকা হইতে শন, বাঁশ, ধান্যাদি কাটিয়া লওয়া; সীমানা জরিপকারীদের বেআইনী গ্রেপ্তার; সম্পূর্ণ ভারতীয় অধিকারভুক্ত সুরমা নদীর চর বেদখল করিয়া তাহাতে শাকসব্জীর চাষ ইত্যাদি কত ঘটনাই ত ইতিমধ্যে ঘটিয়াছে এবং আমাদের সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ অনেক ক্ষেত্রেই 'তীব্র প্রতিবাদ'ও জানাইয়াছেন।

"কিন্তু কোন একটি ক্ষেত্রেও প্রতিকারের কোন সুব্যবস্থা হইয়াছে এরূপ সংবাদ আমরা পাই নাই। অবস্থা দেখিয়া বরং মনে হয় যে, ভারতীয় উদাসীনতা বা উদারতাকে দৌর্ব্বল্য রূপে গণ্য করিয়া পাকিস্থানী কর্ত্তৃপক্ষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এইসব দুষ্কার্য্যের প্রশ্রয়ই দিতেছেন।

এই গুরুত্বজনক পরিস্থিতিতে ভারতের পক্ষে কর্ত্তব্য কি তাহা অবিলম্বে নির্দ্ধারণ ও তদনুযায়ী সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক নহে কি?"

সরকার ও সরকারী কর্ম্মচারী

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারী কর্ম্মচারীদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সকল রাষ্ট্রেই সাধু, সৎ এবং পরিশ্রমী কর্ম্মচারীদের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে; কিন্তু সমাজতান্ত্রিক, কল্যাণকামী রাষ্ট্রে এই প্রয়োজনীয়তা সমধিক। ভারতরাষ্ট্রেও সেইরূপ সৎ, পরিশ্রমী, এবং নিষ্ঠাবান কর্ম্মীর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যতই দিন যাইতেছে এবং যতই অধিকসংখ্যক শিল্প সরকারী আওতায় আসিতেছে, নিষ্ঠাবান কর্ম্মীদের গুরুত্বও সেই অনুপাতে ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। রাষ্ট্রের উৎপাদন, বণ্টন এবং নিরাপত্তা অনেকাংশে এই সকল কর্ম্মীদের উপরই নির্ভর করিতেছে। বীমা কর্পোরেশনের ঘটনাবলী হইতেও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, স্বাধীনচিত্ত কর্ম্মীর প্রয়োজনীয়তা বুঝা যাইতেছে।

কিন্তু উপযুক্ত কর্ম্মীর জন্য উপযুক্ত পরিবেশ প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, সেই পরিবেশ এখন নাই। সরকারী কর্ম্মচারীদের চাকুরীর যে সকল সর্ত্তাবলী রহিয়াছে, তাহাতে কোন সৎ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ এবং স্বাধীনচিত্ত কর্ম্মী গড়িয়া উঠিতে পারে না। এই সকল নিয়মাবলীর অধিকাংশই জনসাধারণের ব্যাপক অংশের প্রতি অবিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। এই ব্যবস্থায় সাধারণ কর্ম্মীদের কোন সার্থক ভূমিকা গ্রহণের সুযোগ নাই। ব্রিটিশ সরকার ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা কায়েম রাখিবার জন্য যে সকল সর্ত্তাবলী প্রণয়ন করিয়াছিল, স্বাধীন ভারতের নাগরিকদিগকেও সেই সকল সর্ত্তের সাহায্যে শাসন করিবার প্রচেষ্টা হইতেছে। বাস্তবে যে এই প্রচেষ্টা সুফল প্রসব করিতেছে না, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। ব্রিটিশ শাসনে উচ্চতম পদে মুষ্টিমেয় ইংরেজ কর্ম্মচারী কাজ করিতেন, নিম্নতম পদগুলিতে ভারতীয়গণ কাজ করিতেন—যাহাতে ভারতীয়গণ কোন স্বতন্ত্র কাজ করিতে না পারেন, তজ্জন্য সকল ক্ষমতাই উচ্চতম পদগুলিতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। তখন সরকারী বিভাগগুলিও ক্ষুদ্র ছিল—কোনক্রমে সেই ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইত।

বর্ত্তমানে অবস্থা অনেকাংশে স্বতন্ত্র। প্রথমতঃ সরকারী বিভাগগুলির কর্ম্মপদ্ধতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক বিভাগেরই বিস্তৃতি ঘটিয়াছে—ফলে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় সুদক্ষভাবে কার্য্যকরী হইতে পারিতেছে না। অপর পক্ষে এই অস্বাস্থ্যকর কেন্দ্রীকরণ দেশের সমূহ ক্ষতিসাধন করিতেছে। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় উপরওয়ালার অন্যায় এবং রাষ্ট্রবিরোধী কার্য্যের কোনরূপ সমালোচনা করিবারও অধিকার নিম্নতম কর্ম্মীর নাই। লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশনের ঘটনায় এই অক্ষমতা এবং উহার বিপজ্জনক রূপ বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশনের ন্যায় সংস্থার চেয়ারম্যানের পক্ষেও অন্যায় বুঝা সত্ত্বেও উপরওয়ালার আদেশ অমান্য করা সম্ভব হয় নাই। এমনকি সে সম্পর্কে কাহাকে জানানোও সম্ভব হয় নাই। শ্রীবৈদ্যনাথন্ যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, একদিকে তাহা যেমন হাস্যকর, অপরদিকে উহা তেমনই করুণ। তাঁহার সাক্ষ্যে এবং শ্রীকামাথের সাক্ষ্যে কর্ম্মচারীদের অসহায়তার একটি চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। যখন উচ্চতর আই. সি. এস কর্ম্মচারীদের মধ্যেই এইরূপ দুর্ব্বলতা তখন নিম্নতর কর্ম্মচারীদের আত্মবিশ্বাস

এবং স্বাধীনতার অভাব সহজেই কল্পনা করা যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনৈক কর্ম্মরত আই. সি এস কর্ম্মচারী এক বিদেশী সরকারের নিকট তাহার নিজের সরকার সম্পর্কে যে অবমাননাকর বিবৃতি পাঠাইয়াছে—বহু কর্ম্মী জানা সত্ত্বেও সেই সম্পর্কে কিছু করিতে পারিতেছে না। এ ঘটনা উচ্চতর সরকারী মহলে জানানোও তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে।

শাসন-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করিতে হইলে এই তোগলকী ব্যবস্থার অবসান ঘটাইতে হইবে। উপযুক্ত ক্ষেত্রে নিম্নতন কর্ম্মচারীগণ যাহাতে তাঁহাদের উচ্চতর কর্ম্মচারীগণ সম্পর্কে সমালোচনা করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ব্যবস্থায় যেমন নিম্নতন কর্ম্মীবৃন্দ তাঁহাদের উপরওয়ালাদের কথা মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেন তেমনি উচ্চতন কর্ম্মীবৃন্দের স্বেচ্ছাচারিতা সীমাবদ্ধ থাকিবে। বর্ত্তমানে বহু সরকারী আপিসেই উচ্চতন কর্ম্মচারীবৃন্দ অনেকক্ষেত্রে নানারূপ বে-আইনী কার্য্য করিতেছেন—কিন্তু তাহার কোন প্রতিবিধান হইতেছে না। এই সকল অফিসার যখন নিম্নতন কর্ম্মীদের শাস্তিবিধান করিতে যান স্বভাবতঃই তাহা অন্যেরা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিতে পারে না।

সংবাদে প্রকাশ যে, ভারত সরকার সরকারী কর্ম্মে রত কর্ম্মীদের চাকুরীর সর্ত্তাবলী সংশোধনের জন্য অবিলম্বেই ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। বেতন কমিশনও এই বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় এই দিকগুলি তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন—সকলে ইহাই আশা করেন। যদি বে-সরকারী ফ্যাক্টরী, আপিস প্রভৃতিতে ওয়ার্কস কাউন্সিল, কনসিলিয়েশন কাউন্সিল প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, তবে ততোধিক বৃহৎ সরকারী বিভাগগুলিতেই বা অনুরূপ ভাবে কর্ম্মীপরিষদ গঠন করা যাইবে না কেন, তাহা বুঝা অসম্ভব। কোন কোন বিভাগের কর্ত্তা এই সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত এ সম্পর্কে কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। এ বিষয়ে আর বিলম্ব করা উচিত নহে।

ত্রিপুরার প্রশাসনিক সমস্যা (সরকারী ভাষাসমস্যা)

ত্রিপুরার প্রশাসনিক ব্যবস্থায় জনসাধারণের কোন অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ নাই। পূর্ব্বে শাসনবিভাগে জনসাধারণের যতটুকু সুযোগ ছিল, ক্রমশঃই তাহা সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। ত্রিপুরা রাজ্যে জনসাধারণের সহিত সরকারের সংযোগ হ্রাসের অন্যতম কারণ সরকারী কার্য্যে ব্যবহৃত ভাষার পরিবর্ত্তন। ত্রিপুরা রাজ্যে পূর্ব্বে সরকারী কার্য্যে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হইত। কিন্তু কেন্দ্রীয় রাজ্যরূপে গঠিত হইবার পর হইতেই বাংলা ভাষার অপসারণ ঘটিয়াছে।

ত্রিপুরা রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থার সমালোচনা করিয়া স্থানীয় সাপ্তাহিক "সেবক" লিখিতেছেন :

"অধুনা, ভারত সরকারের কর্ম্মচারী নিয়োগনীতি দেখিয়া শঙ্কিত না হইয়া পারা যায় না। বহুকাল পূর্ব্ব হইতে বাংলাই ত্রিপুরার সরকারী ভাষারূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল। সরকারী অফিসে বাংলার স্থলে ইংরেজী কিভাবে আসিল তাহা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয় বলিয়া এই সম্বন্ধে আলোচনায় বিরত রহিলাম। এখানকার জনসাধারণ বাংলা ভাষার মাধ্যমেই তাহাদের দৈনন্দিন কাজ সম্পাদন করে। কিছুকাল যাবত ভিন্ন প্রদেশের লোক এখানে নিয়োগ করা হইতেছে যাহারা স্থানীয় ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞান রাখে না, এবং স্থানীয় লোকেরাও তাহাদের ভাষা বুঝে না। ইহাতে যে অন্যান্য প্রদেশ হইতে আগত লোক এবং জনসাধারণেরই অসুবিধা হয় তাহা নয়, ইহাতে জনসাধারণ ক্রমেই প্রশাসনকে যতদূর সম্ভব এড়াইয়া চলিতে প্রয়াস পায় এবং কার্য্যক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে। প্রশাসনের কর্ম্মকর্ত্তার পদসমূহে আজ এমন সব ব্যক্তি রহিয়াছেন যাহাদের সংস্পর্শে আসিয়া জনসাধারণ ভাষার বিভ্রাটে নিজের কথাই বুঝাইয়া বলিতে পারে না।"

"সেবক" লিখিতেছেন, "প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, ভিন্ন প্রদেশবাসী দুইজন জেলাশাসক, একজন ট্রাইবেল অফিসার আছেন। জনসাধারণের সঙ্গে তাঁহাদের সম্পর্ক কতদূর ভাল হইতে পারে বোধ হয় তাহার ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন পড়ে না। তাঁহাদের তিনজনের একজনও স্থানীয় ভাষা জানেন না। ফলে তাঁহাদের সঙ্গে সব সময় একজন দু'ভাষী দরকার হয়। বাংলায় দরখাস্ত লিখিয়া দিলে ইংরেজী তর্জ্জমা করার জন্য কেরাণী, কালি, কলম, কাগজ, টাইপরাইটার চাই। ইহাতে সরকারী খরচ বাড়ে, সময় নষ্ট হয়, কোন কাজের কাজও হয় না।

"ইহাই শেষ নয়, ইহার আর একটা দিকও চিন্তা করিতে হইবে। যাঁহারা আসেন তাঁহারা ত্রিপুরা সম্বন্ধে কোন জ্ঞান লইয়া আসেন না, যদিও ত্রিপুরার বহু সমস্যা আছে। এই সমস্ত সমস্যা সম্বন্ধে উপলব্ধি করিতেই দুই-এক বৎসর সময় কাটিয়া যায়। অতএব স্বভাবতঃই কাজে যোগদান করার দিন হইতেই কিছু সাহায্যকারী অথবা পরামর্শদাতা রাখার প্রয়োজন দেখা দেয়। সাহায্যকারী কিম্বা পরামর্শদাতা নিরপেক্ষ না হইলে ঐ সকল অফিসারও নিরপেক্ষভাবে কাজ করিয়া যাইতে পারেন না। ইহার ফলস্বরূপ যাহা পাওয়া যায় তাহা এই যে, সুযোগ-সন্ধানীর দল নিজেদের সুবিধা আদায় করে ; জনসাধারণ বঞ্চিত হয়।

"আজ যদি জনসাধারণ ত্রিপুরা প্রশাসনের সংস্রব ত্যাগ করিয়া চলে তাহার জন্য দায়ী জনসাধারণ নয়, দায়ী তাহারা যাহারা এইরূপ অবস্থা জানিয়াও প্রতিকারের প্রতি চরম উদাসীনতা প্রদর্শন করিতেছেন।"

সরকারী কাজের ভাষা ও ভারতীয় ঐক্য

হিন্দীকে অবিলম্বে ভারতের সরকারী ভাষা করা সম্পর্কে যুক্তির অভাবে হিন্দীসমর্থকরা এখন ভারতের ঐক্যের দোহাই পাড়িতেছেন। জনস্বার্থবিরোধী ব্যবস্থাগুলি চাপাইবার চুক্তি হিসাবে সর্ব্বক্ষেত্রেই

ভারতীয় ঐক্যের দোহাই পাড়া এক ফ্যাশনে পরিণত হইয়াছে। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ চাও, তুমি দেশদ্রোহী, রাষ্ট্রদ্রোহী মাতৃভাষা মাধ্যমে শিক্ষালাভ করিতে চাও, তুমি ভারতের ঐক্য-বিনাশকারী। নয়াদিল্লীর শাসকবৃন্দ যাচাই করিবেন, তাহা মানিতে না পারিলেই দেশদ্রোহিতা করা হয়।

সম্প্রতি দক্ষিণ-ভারতে উত্তর-ভারতীয়দের বিরুদ্ধে এক আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। কোন সুস্থমনসম্পন্ন ভারতবাসী তাহা সমর্থন করিবেন না। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে, দক্ষিণ-ভারতের শ্রেষ্ঠ সন্তানগণও এই আন্দোলনের অংশীদার হইয়াছেন, তখন কেবল ইহাকে নিন্দাবাদ করিয়া ক্ষান্ত হওয়া উচিত নহে। এই বিধ্বংসী শক্তির সৃষ্টির মূলে কি রহিয়াছে তাহার অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। সমাজ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা যদি এমন হয় যে, সাধারণ মানুষ তাহার বিকাশের কোন সহজ পথই খুঁজিয়া না পায় তখন তাহার পক্ষে বিদ্রোহী হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না। বাংলা দেশ এবং বাঙালীদের উপর বহু অন্যায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বাংলা দেশ এবং বাঙালী অর্থনীতি সংক্রান্ত বহু সিদ্ধান্তই বাঙালীদের সহিত পরামর্শ না করিয়াই করা হইতেছে। বাংলা দেশে সত্য কথা বলিবার মত চরিত্রবান এবং সাহসী নেতা নাই। সুতরাং সকল অন্যায়-অত্যাচার বাঙালী-দিগকে অসহায় অবস্থায় সহ্য করিতে হইতেছে। বাংলার রাজনৈতিক ক্লীবত্ব এমন পর্য্যায়ে পৌঁছিয়াছে যে, সরকারী ভাষা সম্পর্কে রাজ্য সরকার কোন মতামত পর্য্যন্ত দিতে পারেন নাই। অপরাপর রাজ্য-সরকারগুলি যখন স্থানীয় শাসনকার্য্যে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে তখন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এক বিবৃতি দিয়াছেন যাহার অর্থ হইল তিনি বাঁচিয়া থাকিতে বাংলা কখনও রাষ্ট্রভাষা করিতে দিবেন না। সরকারী ব্যাপারে বাংলা (তথা যে কোন ভারতীয়) ভাষার প্রচলনে গোড়াতে নানারূপ অসুবিধা দেখা দিবে সত্য। কিন্তু সেই অসুবিধার কথা চিন্তা করিয়া যদি বাংলা ভাষা প্রবর্ত্তনের বিরোধিতা করা হয় তবে গত দশ বৎসরের ন্যায় আরও বহু দশ বৎসর কাটিয়া যাইবে, কিন্তু বাংলা কোনদিনই রাজ্যের সরকারী ভাষা হইবে না। রাজ্যে বাংলা প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে যদি কেন্দ্রে হিন্দী প্রবর্ত্তিত হয় তবে বাংলা ভাষার অপমৃত্যু ঘটিতে বিশেষ বিলম্ব হইবে না।

মানুষ মাতৃভাষার মাধ্যমেই আপন বিকাশের পথ সহজে খুঁজিয়া পায়। সেই মাতৃভাষার পরিবর্ত্তে যদি জোর করিয়া অন্য ভাষা শিখিতে তাহাকে বাধ্য করা হয় তাহাতে কেহ শান্ত থাকিতে পারে না। নেতৃত্বের অভাবে বাঙালীর প্রতিবাদ দুর্ব্বল বটে; কিন্তু দক্ষিণ-ভারতের নেতৃত্ব এরূপ পঙ্গু নহে। সেইহেতু দক্ষিণ-ভারতীয়গণ বজ্রনিনাদে ঘোষণা করিয়াছে যে,তাহাদের বিনানুমতিতে তাহারা কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষার পরিবর্ত্তন গ্রহণ করিবে না। প্রয়োজন হইলে তাহারা স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপেও সংগঠিত হইবার চেষ্টা করিবে।

এই সকল ঘোষণা নিতান্ত অপ্রীতিকর—অস্বাস্থ্যকর। ভারত-রাষ্ট্রের বিভাগে কোন ভারতীয়ই লাভবান হইতে পারেন না। কিন্তু জনসাধারণের নিতান্ত সাধারণ দাবীগুলি যদি কর্ত্তৃপক্ষ স্বীকার করিতে না পারে তবে জনসাধারণের পক্ষে শৃঙ্খলারক্ষা কঠিন হইয়া পড়ে।

এ কথা সত্য ভারতের সরকারী ভাষা চিরকাল ইংরেজী থাকিতে পারে না, থাকা উচিত নহে বলিয়াই। কিন্তু উহার পরিবর্ত্তন কি উপায়ে এবং কতদিনের মধ্যে সাধন করা সম্ভব সে সম্পর্কে নিশ্চয়ই আলাপ-আলোচনার সুযোগ রহিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যের কথা বিস্মৃত হইয়া কেবল যদি মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষীর স্বার্থকেই ঐক্যের স্তম্ভরূপে দেখিতে আরম্ভ করা হয়, তবে সেই ঐক্য কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। দ্রাবিড় কাজাঘাম এবং দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাঘাম রাতারাতি সৃষ্টি হয় নাই, বহু অন্যায়-অবিচার তিলে তিলে জমা হইয়া এই দানবীর শক্তির খোরাক জোগাইয়াছে। কেবলমাত্র ধীর, সুস্থ এবং নিরপেক্ষ বিবেচনার দ্বারাই এই সকল ঐক্য-বিরোধী শক্তির ভিত্তি অপসারণ সম্ভব। আস্ফালনে কোন কাজ হইবে না।

সরস্বতীপূজা ও যুবসমাজ

সরস্বতীপূজা উপলক্ষে বাংলাদেশের যুবসমাজের মধ্যে যে রুচি-বিকার ঘটিয়াছে, সেই সম্পর্কে আলোচনা করিয়া "ভারতী" পত্রিকা লিখিতেছেন :

"সরস্বতীপূজা বাঙালীর একটি মহৎ অনুষ্ঠান। আমাদের জীবনে যাহা কিছু সুন্দর ও সুকুমার, আমাদের শিল্প, সঙ্গীত, ললিতকলা, আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সবকিছু এই একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে ভাব-রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বাণী-বন্দনার এই অনুষ্ঠান অন্যান্য অনুষ্ঠান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। এখানে উৎসব-অনুষ্ঠান সুরুচিপূর্ণ ও শিক্ষণীয় হইবে। আনন্দের প্রকাশভঙ্গী হইবে শান্ত, সংযত ও পরিমিত। সর্ব্বশুভ্রা সরস্বতীপূজাকে কেন্দ্র করিয়া বাঙালী সংস্কৃতির মহত্তম ও সুন্দরতম রূপ বিকশিত হইবে ইহাই অভিপ্রেত।

কিন্তু আজ বাঙালী যুবসমাজ সরস্বতীপূজাকে কোথায় নামাইয়া আনিয়াছে? আমাদের এই জঙ্গীপুর-রঘুনাথগঞ্জ শহরের কথাই ধরা যাক। যথারীতি স্কুল-কলেজের পূজাগুলি আছে। কিন্তু আজ আর ছেলেরা সেইগুলি লইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছে না। এক-সঙ্গে সকলে মিলিয়া পূজা করিতে হইলে নিজেদের মাতব্বরি ও খেয়াল-খুশি চরিতার্থ করার সুযোগ থাকে না। কাজেই ৭৮ জন ছেলে মিলিয়া এক-একটি দল গড়িতেছে এবং ব্যাঙের ছাতার মত যত্রতত্র সর্ব্বজনীন (?) পূজা গজাইয়া উঠিতেছে। আর এই পূজাধিক্যের মাশুল গুনিতে হইতেছে নিরীহ জনসাধারণকে। পাড়া, বে-পাড়া, স্কুল-সকল পূজার উদ্যোক্তাদিগকেই দরাজ হাতে চাঁদা

গুনিয়া দিতে হইবে। তারপর সুরু হইবে পূজার মাতব্বরদের প্রতিমার খোঁজে কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, কুমারটুলি অথবা বহরমপুর অভিযান। সকলের উপর টেক্কা দিতে পারে এরূপ হালফ্যাসানী প্রতিমা চাই। প্রতিমার দাম যদি পঞ্চাশ টাকা পড়ে, প্রতিমা আনার জন্য উৎসাহী উদ্যোক্তারা ১০৮০ টাকা ব্যয় করিতেছেন। দেশের শিল্পী মৃতপ্রায়, সেদিকে আমাদের দৃষ্টি নাই। পূজামণ্ডপ সাজানোর দুই-চারিটি ব্যতিক্রম ছাড়া অন্য কোথাও বিশেষ রুচিজ্ঞান ও শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া যায় না। মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে মূল পূজানুষ্ঠান ও প্রসাদ বিতরণের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নমঃ নমঃ করিয়া এই অপরিত্যাজ্য বাহুল্য-অংশটি পালন করা হইয়াছে। জোর দেওয়া হইয়াছে আলোকসজ্জা ও মাইকের উপর। "ছম্-ছমা-ছম্"জাতীয় হিন্দী সিনেমা-সঙ্গীত পূজামণ্ডপে মাইকে দেবীমাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়াছে। আর নাটকের শেষ অঙ্ক প্রতিমা-নিরঞ্জনকে জমাইয়া তোলার জন্য উদ্যোক্তাগণ জীবনপাত করিয়াছেন। যাহার "যেদিন খুশী পক্ষকাল ধরিয়া প্রতিমা-নিরঞ্জন চলিবে। আলো, ঢাক, ঢোল, মাইক, নাচওয়ালী, সং—প্রতিমা-নিরঞ্জন শোভাযাত্রার নরক গুলজার করিতে চেষ্টার আর কোন ত্রুটি থাকে না। সর্ব্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় যে, কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শোভাযাত্রাও এই ধরণের রুচি-বিকৃতি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়।"

"ভারতী" লিখিতেছেন, "কিন্তু প্রশ্ন এই আমাদের যুবসমাজ কোথায় চলিয়াছে? সরস্বতীপূজায় আনন্দ করার এই আসুরিক পদ্ধতি কেন? সরল, অনাড়ম্বর অথচ রুচিসম্পন্ন ও মর্য্যাদাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করিতে কি আমরা অক্ষম? অনাবশ্যক ব্যয়বাহুল্য বর্জ্জন করিয়া সর্ব্বসাধারণকে আনন্দ পরিবেশন করার সুষ্ঠু অন্য কোন পন্থা কি আর নাই? এই পূজা-অনুষ্ঠানে দেশের শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতা করার, গ্রামের লুপ্তপ্রায় সঙ্গীত ও অভিনয়ধারাকে উৎসাহ দেওয়ার কথা আমাদের মনে পড়ে না কেন? অভিনয়, সুপরিকল্পিত বিচিত্রানুষ্ঠান, হস্তশিল্প প্রদর্শনী প্রভৃতির ব্যাপক ব্যবস্থাপনা হয় না কেন? সংস্কৃতিগর্ব্বী বাঙালীর জীবনে শিক্ষা-সংস্কৃতির দেবীকে কেন্দ্র করিয়া এ কোন্ বিজাতীয় প্রহসন চলিয়াছে?"

আমাদের উৎসবাদির এই ক্রম-অবনতির রূপ ও কারণ সম্পর্কে আলোচনা করিয়া করিমগঞ্জের "যুগশক্তি" লিখিতেছেন:

"নিতান্ত দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হয়—আমাদের পূজা-পার্ব্বণে ব্যসনের ভাব প্রশ্রয় পাইতেছে। সর্ব্বজনীন পূজা সংঘ-শক্তির বৃদ্ধি না করিয়া ঈর্ষার বৃদ্ধি করিতেছে। একই পাড়ায়, এমন কি একই প্রাঙ্গণে একাধিক পূজা কোন বিষয়ে সম্মিলিত ভাবে কিছু করার অপারগতার নিদর্শন। এই বিষয়ে অভিভাবক-দের দায়িত্ব সমধিক। তাঁহারা উদ্যোগী হইলে তরুণ ও যুবকদের মধ্যে এইরূপ বিভেদ-ভাব দূর হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ পূজার সামগ্রী সংগ্রহে কোন কোন স্থলে যেরূপ নীতিজ্ঞানহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাও সর্ব্বথা নিন্দার্হ। তৃতীয়তঃ অনুষ্ঠানের সহিত সঙ্গতি না রাখিয়া মাইক-লাউডস্পীকার সহযোগে অতি উচ্চগ্রামে যদৃচ্ছা সংগীতাদি প্রচার এক বীভৎসতার সৃষ্টি করে। প্রতিমা-নিরঞ্জনের শোভাযাত্রায় স্থান লইয়া কলহ অনেক সময় সংঘর্ষে পরিণত হয়। ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।"

যুবসমাজের এই উচ্ছৃঙ্খলতার দায়িত্ব অভিভাবকদের। "যুগশক্তি" বলিতেছেন:

"একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্পর্কে সচেতন হইলে যুবসমাজ উন্মার্গগামী হইতে পারে না। আমাদের তরুণ বা যুবকগণ স্বভাব-দুর্বৃত্ত নহে। তাহাদের মহৎ বৃত্তিনিচয় বিকাশের সহায়তা করিলে তাহারা আদর্শ নাগরিক হিসাবে গড়িয়া উঠিতে পারে। মনে রাখিতে হইবে উন্নত সমাজ-জীবন গঠন মহৎ চেষ্টার ফল; উহা অমনি হয় না। এই প্রসঙ্গে আমরা করিমগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এবারকার প্রশংসনীয় কার্য্যাবলীর উল্লেখ করিতে চাই। তিনি এবার কলেজে সারস্বত উৎসবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া যাহাতে উপাসনার তাৎপর্য্য ছাত্রছাত্রীদের হৃদয়ঙ্গম হয়, যাহাতে তাহারা আমাদের শাস্ত্রাদির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়া পার্ব্বণাদির মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে এবং যাহাতে উৎসবের প্রতিটি অঙ্গ শালীনতার সহিত সম্পন্ন হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি প্রভূত পরিশ্রম করিয়া মন্ত্রাদির তাৎপর্য্য সঙ্কলন পূর্ব্বক পূজা-মণ্ডপে ছাত্রদের নিকট তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাদের লইয়া স্তবগান করিয়াছেন এবং আচার্য্যরূপে উপনিষদের শিক্ষাধ্যায় পাঠ করিয়া ইহার মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া ছাত্র-ছাত্রীগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। বার বার তাহাদের মনে বদ্ধমূল করিতে চাহিয়াছেন,—"শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্।" ইহাই প্রকৃত সারস্বত উৎসব। যদি প্রতি বিদ্যালয়ে, প্রতি পল্লীতে এই মহান আদর্শ অনুসৃত হয় তবে সমগ্র সমাজ প্রভূত উপকৃত হইবে। এই বিষয়ে শিক্ষাবিদ-গণের দায়িত্ব অনস্বীকার্য্য। মন্ত্র যাহাতে প্রাণহীন ব্যাখ্যা না হয়, উপাসনা যাহাতে অনুপযুক্ত পুরোহিতকৃত কতকগুলি আচারমাত্র না হয় এবং পূজা যাহাতে ব্যসনে পরিণত না হয়—তাঁহারা তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিলে বর্ত্তমান অবাঞ্ছনীয় অবস্থার অবসান হইবে—ইহাই আমাদের বিশ্বাস।"

আমরা ইতিপূর্ব্বে একবার লিখিয়াছিলাম যে, সরস্বতীপূজার চাঁদার একটি বিশেষ অংশ দুস্থ ছাত্রছাত্রী বা শিক্ষক পরিবারের সাহায্যার্থে রাখা উচিত। যাঁহারা চাঁদা দিয়া থাকেন তাঁহাদের এ বিষয়ে দৃষ্টি থাকিলে ভাল হয়। পূজার সঙ্গে সৎকার্য্যের যোগ না থাকিলে তাহা বৃথা।

অসাধু ব্যবসায়ী ও সরকার

"হিন্দুবাণী" লিখিতেছেন, "রাশিয়া ভারতের নিকট কিছু জুতা ক্রয় করিতে চাহিয়াছিল। ভারত সরকার জুতা-প্রস্তুতকারকদের

নিকট হইতে নমুনা লইয়া অনুমোদনের জন্য পাঠান। নমুনা দেখিয়া সোভিয়েট সরকার এক লক্ষ জোড়া জুতার অর্ডার দেন।

"ভারত সরকার ষ্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনকে জুতা সরবরাহ করিতে বলেন। উক্ত কর্পোরেশন স্বীয় সদস্যদের নিকট হইতে জুতা তৈরী করায় এবং তাহা রাশিয়ায় পাঠায়।

"জুতাগুলি রাশিয়ায় পৌঁছাইবার পর তাহারা ঐগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখে যে, নমুনা হইতে সেগুলি অত্যন্ত নিকৃষ্ট। জুতা বাছাই করিয়া ১০ হাজার রাখে এবং ৯০ হাজার ঐ জাহাজেই ফেরত পাঠাইয়া দেয়।

"ইহার ফলে দ্বিবিধ লোকসান হইয়াছে। প্রথমতঃ ফেরত-দেওয়া জুতাগুলি কে সরবরাহ করিয়াছিল, তাহা জানা সম্ভব না হওয়ায় তাহার দাম শেষ পর্য্যন্ত ভারত সরকারকেই গচ্চা লাগিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ফেরত আনার জন্য জাহাজের ভাড়াও গুনিতে হইয়াছে।

"যে বা যাহারা এজন্য দায়ী তাহাদের শাস্তিবিধানের কোন ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত হয় নাই।"

বলা বাহুল্য দেশের ব্যবসা বাণিজ্য যাহাদের হাতে গিয়াছে তাহাদের শতকরা ৮০ ভাগই এই প্রকার অসাধু ও অসৎ লোক। সরকার, অর্থাৎ সরকারী কর্ম্মচারী, এ বিষয়ে কিছু মাথা ঘামানো প্রয়োজন মনে করেন না। কেন না কংগ্রেসও ঐ জাতীয় লোকের সমর্থক, এবং কংগ্রেস বিরোধী দলও তথৈবচ! সুতরাং দিনগত পাপক্ষয়ই যথেষ্ট।

"স্বতন্ত্র গোয়া" আন্দোলন

ডক্টর ত্রিস্তাও ব্রাগাঞ্জা কুন্‌হা গোয়া স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "ফ্রি গোয়া" পত্রিকা গোয়া স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে ভারতীয় জনমতকে ওয়াকিবহাল থাকিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। "ফ্রি গোয়া" পত্রিকায় তিনি যে সর্ব্বশেষ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে গোয়া সম্পর্কে ভারত সরকারের ভ্রান্ত নীতির বিপজ্জনক ফল সম্পর্কে অনেকেই সচেতন হইবেন।

গোয়া স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ এতদিন পর্য্যন্ত গোয়ার ভারত-ভুক্তির জন্যই আন্দোলন চালাইতেছিলেন। কিন্তু ভারত সরকারের নীতিতে হতাশ হইয়া তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এখন ঐ আন্দোলন পরিত্যাগ করিয়া নূতন আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন। গোয়ার নেতৃবৃন্দের একাংশ এখন বলিতেছেন যে, তাঁহারা আর গোয়ার ভারতভুক্তি চাহেন না; গোয়ার আত্মকর্তৃত্বাধিকার পাইলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকিবেন। এই "স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের" মধ্যে অনেক সুবিধাবাদীই রহিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে এমন কয়েকজন গোয়া নেতা রহিয়াছেন, যাহাদের স্বার্থত্যাগ, চারিত্রিক সততা এবং স্বাধীনতা-স্পৃহা সম্পর্কে সন্দেহ করিবার কোন অবকাশ নাই।

ডক্টর কুন্‌হা লিখিতেছেন যে, ভারত সরকারের দ্বিধাগ্রস্ত নীতির ফলেই এই সকল "গোয়া আবতুল্লার" সৃষ্টি হইয়াছে যাহারা ভারতের সহিত গোয়ার মিলনের জন্য আন্দোলনের পরিবর্তে ফ্যাসিষ্ট পর্ত্তুগীজ ডিক্টেটরশিপের সহিত হাত মিলাইতে অধিকতর উৎসুক হইয়াছে।

ইংরেজী সাপ্তাহিক "ভিজিল" পত্রিকায় এক প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধে শ্রীমনোরঞ্জন গুহ লিখিতেছেন যে, ডক্টর কুন্‌হা ভারত সরকারের নীতির যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণরূপেই প্রযোজ্য। গোয়া সম্পর্কে ভারতের নীতি এবং কার্য্যের মাধ্যে যে কোন সম্বন্ধ নাই, কেবল তাহা নহে, গোয়া সম্পর্কে ভারত সরকার একটি সুসমন্বিত নীতিও ঘোষণা করিতে পারেন নাই।

ডঃ হো চি মিন

ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক রিপাবলিকের প্রতিষ্ঠাতা এবং নেতা ডঃ হো চি মিন সম্প্রতি ভারত সফর করিয়া গেলেন। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসরেই বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দ সফরে আসিতেছেন সত্য, কিন্তু ডঃ হো চি মিনের সফর সে ধরণের নহে। ডঃ হো. চি. মিন (তাঁহার নামের অর্থ "আলোকদাতা") ভারতে আসিয়া যে মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন, রাজনৈতিক মতবাদ নির্ব্বিশেষে তাহা অধিকাংশ ভারতবাসীর হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে।

ডঃ হো চি মিন-এর জীবনী ভারতবাসীর নিকট অল্প-বিস্তর পরিচিত। যদিও আমরা অনেকে পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম—আসল মানুষটিকে দেখিবার পূর্ব্বে আমাদের জ্ঞান যে কতদূর অসম্পূর্ণ ছিল, ডঃ হো-কে প্রত্যক্ষ দেখিবার পর তাহা ধরা পড়িয়াছে। অন্যান্য দেশের নেতৃবৃন্দের কথা বাদ দেওয়া যাউক, তাঁহার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহারই স্বদেশবাসী দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাষ্ট্রনায়ক মিঃ ডিয়েম ভারত পরিদর্শনকালেও ডঃ হোর ন্যায় ভারতীয় জনচিত্তে অনুরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই।

ডঃ হো একজন স্বাভাবিক নেতা। তিনি অপূর্ব্ব দক্ষতার সহিত তাঁহার স্বদেশবাসীকে স্বাধীনতা-সংগ্রামে জয়যুক্ত করিয়াছেন। সত্য, তাঁহার দেশ ভিয়েতনাম সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে আজ দ্বিধা-বিভক্ত—কিন্তু তাহাতে তাঁহার কৃতিত্ব কোনক্রমেই হীন হয় না। তিনি নিজে একজন শ্রেষ্ঠ নেতা বলিয়াই তাঁহার পক্ষে অপরের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা সহজ। ইতিপূর্ব্বে ক্রুশ্চেভ, বুলগানিনসহ বহু রাষ্ট্রনেতাই এ দেশে আসিয়াছেন, যাঁহাদের নেতৃত্ব দুই-এক বৎসরের অধিক পুরাতন নহে কিন্তু তাঁহাদের কেহই ডঃ হোর মত বিনয় প্রদর্শন করেন নাই। ডঃ হোকে একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীজী যে ভূমিকা গ্রহণ করেন ভিয়েতনামের স্বাধীনতা-সংগ্রামে ডঃ হো সেইরূপ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা। উত্তরে ডঃ হো বলেন যে, তিনি গান্ধীজীর একজন শিষ্যমাত্র।

দিল্লীতে সম্বর্দ্ধনা-সভায় ডঃ হোকে স্বর্ণখচিত চেয়ারে উপবেশন করিতে বলিলে তাহাতে তিনি বসিতে অস্বীকৃত হন। তাঁহাকে যে

কার্পেটটি উপহার দেওয়া হয় তাহা তিনি নিজ স্কন্ধে বহন করেন। প্রধানমন্ত্রীর ভবন হইতে পদব্রজে তিনি রাষ্ট্রপতির ভবনে গমন করেন। তাঁহার এই সরলতা সকলকেই স্পর্শ করিয়াছে।

ভারতের উন্নতি সম্পর্কে ডাঃ হো যাহা বলিয়াছেন তাহার আন্তরিকতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের কর্ণধার হইয়াও তিনি বলিয়াছেন, ভারতের সাফল্য, ভিয়েতনামের সাফল্য। ভিয়েতনামের স্বাধীনতা-আন্দোলনে ভারতের সমর্থনের জন্যও তিনি অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন।

আসামে শিক্ষা বিভাগের অকর্মণ্যতা

"যুগশক্তি" লিখিতেছেন :

"আসাম মধ্যস্কুল পরীক্ষার ফল কবে বাহির হইবে তাহা কর্তারাই বলিতে পারেন। স্কুল সেশনের একমাস অতিবাহিত হইয়া দ্বিতীয় মাস চলিয়াছে। যে সকল ছাত্রছাত্রী মধ্যস্কুল পরীক্ষা দিয়াছিল তাহারা এই মাসও ঘুরিয়া ফিরিয়া কাটাইবার সুযোগ পাইবে নিশ্চয়ই। এর মধ্যে পরীক্ষকগণ হয়ত তাড়াহুড়া করিয়া যেভাবেই হউক উত্তরের খাতাগুলি দেখিয়া ফেলিবেন। কোন কোন বিষয়ে প্রশ্নপত্রের দ্বিতীয় ভাগের উত্তরের খাতা নাকি আসামের শিক্ষাধিকর্তার আপিসের নিম্নবিভাগের কেরাণীরা পরীক্ষা করিতেছেন। উক্ত দ্বিতীয় ভাগ (Part II) এবারকার মধ্যস্কুল পরীক্ষার অভিনব সংযোজন ; ইহার পরীক্ষকগণও অভিনব শ্রেণীর হইয়া থাকিলে শিক্ষাধিকরণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই চলিতেছেন বলিতে হইবে। উপরন্তু সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীগণ এবং তাহাদের অভিভাবকদের ধৈর্য্যের পরীক্ষাও সঙ্গে সঙ্গে হইয়া যাইতেছে—মন্দ কি?"

শিক্ষক ও শিক্ষিকার বেতনবৃদ্ধি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা-বিভাগের যে নূতন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিতেছে তাহার বিবরণ দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষকদের বর্দ্ধিত হারে বেতনদানের পরিকল্পনায় পাঁচ বৎসরের জন্য এক কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। তন্মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার অর্দ্ধাংশ বহন করিবেন। পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক ইণ্টারভিউয়ের ভিত্তিতে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বাছাই-করা শিক্ষকগণ বর্দ্ধিত হারে বেতনলাভের অধিকারী হইবেন। বাছাই-করা মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রথম তালিকায় প্রায় ১৩ শত নাম ইতোমধ্যে রাজ্য সরকারের শিক্ষাদপ্তরের নিকট পৌঁছিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

বাছাই-করা ঐ সকল শিক্ষককে ১৯৫৭ সনের ১লা এপ্রিল হইতে হিসাব করিয়া বাড়তি প্রাপ্য টাকা দেওয়া হইবে। কমিশন কর্তৃক বাছাইয়ের কাজ এখনও চলিতেছে এবং আগামী মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত চলিবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে মোট ১,৬৮০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা ১,১০১ এবং মোট প্রায় ২৪ হাজার মাধ্যমিক শিক্ষকের মধ্যে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের সংখ্যা ১৩,৬০৮। তন্মধ্যে গ্র্যাজুয়েট বা তদূর্দ্ধ যোগ্যতাধিকারী শিক্ষকের সংখ্যা ৮,৩৫২ এবং আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েটের (ইণ্টারমিডিয়েট) সংখ্যা ৩,১৩১। গ্র্যাজুয়েট আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট মিলাইয়া এই ১১,৪৮৩ জন শিক্ষকের নাম রাজ্য শিক্ষাদপ্তর পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নিকট পাঠাইয়াছেন। কমিশন রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সাতটি কেন্দ্র খুলিয়া শিক্ষকদের ইণ্টারভিউয়ে ডাকিতেছেন।

মাধ্যমিক শিক্ষকদের একাংশ অভিজ্ঞ শিক্ষকগণকে ইণ্টারভিউয়ে হাজির করানোর নীতিতে বিরোধিতা করায় কোন কোন কেন্দ্রের ইণ্টারভিউয়ে শিক্ষকদের উপস্থিতির সংখ্যা আশানুরূপ হয় নাই। ঐ ইণ্টারভিউ নেওয়ার প্রতিবাদে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি ১০ই ফেব্রুয়ারী, সোমবার হইতে রাজ্যব্যাপী অনশন ধর্ম্মঘট সুরু করিতেছেন।

জানুয়ারী পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হিসাবে প্রকাশ, বর্দ্ধমান কেন্দ্রে শতকরা অনুমান ২০ জন এবং কৃষ্ণনগর কেন্দ্রে শতকরা অনুমান ১৬ জন শিক্ষক কমিশনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন এবং কলিকাতার তিনটি কেন্দ্রের মধ্যে শিক্ষিকাদের কেন্দ্রে শতকরা ১৬ জনের অধিক উপস্থিত হন নাই। তবে কলিকাতার অন্য দুইটি কেন্দ্রসহ অন্যান্য কেন্দ্রে উপস্থিতির সংখ্যা শতকরা ৬০ ভাগের অধিক বলিয়া জনৈক সরকারী মুখপাত্র উল্লেখ করেন। তন্মধ্যে মেদিনীপুর কেন্দ্রে শতকরা ৭৫ জন শিক্ষক ইতোমধ্যে কমিশনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করা হয়।

সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট ও আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট মিলাইয়া মোট ১১,৪৮৩ জন শিক্ষকের মধ্যে এম-এ, এম-এস-সি ও অনার্স বি-এ, বি-এস-সি ট্রেণ্ড শিক্ষকের সংখ্যা ৮৯৩ এবং সাধারণ বি-এ, বি-এস-সি পাশ ট্রেণ্ড শিক্ষকের সংখ্যা ১,৯৬৯। পাঁচ বৎসরের শিক্ষকতাকার্য্যে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ৭৮৪ জন এম-এ, এম-এস-সি ও অনার্সযুক্ত বি-এ, বি-এস-সি শিক্ষককে এবং দশ বৎসরের শিক্ষকতায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ১,৫৮২ জন সাধারণ বি-এ, বি-এস-সি পাশ শিক্ষককে 'ট্রেণ্ড' বলিয়া ধরা হইয়াছে। উপরোক্ত শ্রেণীর এই মোট ৫,২২৮ জন 'ট্রেণ্ড' শিক্ষক ব্যতীত বাকী ৬,২৫৫ জন 'আন-ট্রেণ্ড' শিক্ষকের মধ্যে যাঁহারা পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন, তাঁহাদের সরকারী ব্যয়ে 'ট্রেনিং' দেওয়া হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।"

শিক্ষা ও মৌলানা আজাদ

মৌলানা আজাদের নিম্নে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিতে কিছু তথ্য আছে :

"নয়াদিল্লী, ৬ই ফেব্রুয়ারী—কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা মন্ত্রী মৌলানা আবুলকালাম আজাদ আজ এখানে শিক্ষা-বিষয়ক কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা বোর্ডের ২৫শ সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে দেশে

শিক্ষাবিস্তারে অর্থের অপ্রতুলতা দূরীভূত করার উপায় হিসাবে উন্মুক্ত স্থানে ক্লাস করিবার এবং অল্পব্যয়ে নির্মিত গৃহ ব্যবহারের প্রস্তাব করিয়াছেন।

মৌলানা উক্ত বোর্ডের চেয়ারম্যান। মৌলানা আজাদ ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরেজীর স্থান সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি এই অবস্থায় কুঞ্জরু কমিটির রিপোর্ট সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করিবেন না, কারণ রাজ্য সরকারসমূহের মতামত জানিবার জন্য উহা তাঁহাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। তিনি আরও বলেন, আমাদের বর্তমান অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার উপযুক্ত মান বজায় রাখিতে হইলে ইংরেজীতে জ্ঞান অত্যাবশ্যক। তজ্জন্য মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি আমাদিগকে যথেষ্ট মনোযোগ দিতে হইবে। মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজী শিক্ষার উন্নতি জরুরী প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। আপনারা শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে, ব্রিটিশ কাউন্সিল ও ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের সহায়তায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইংরেজী শিক্ষার জন্য হায়দরাবাদে একটি জাতীয় পরিষদ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছেন।

মৌলানা আজাদ আরও বলেন যে, নিখিল-ভারত মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ একটি পরীক্ষা সংস্থা স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ঐ সংস্থা পরীক্ষাক্ষেত্রে গবেষণা চালাইবে।"

হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্ম্মঘট

আনন্দবাজার পত্রিকার নিম্নস্থ সংবাদে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এত দিনে সচেতন হইয়াছেন এ কথা জানাইতেছেন :

"হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ধর্ম্মঘট নিষিদ্ধ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার শীঘ্রই একটি বিল আনিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। মঙ্গলবার রাজ্য সরকারের মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ সম্পর্কে আলোচনা হয়।

সরকার মনে করেন হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ লাভজনক সংস্থা নহে। অন্যান্য সাধারণ শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পার্থক্যহেতু ঐগুলিকে শিল্পবিরোধ আইনের আওতা হইতে সরাইয়া ফেলার বিধান ঐ বিলে থাকিবে বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ, কর্ম্মীদের ন্যায়সঙ্গত অভিযোগ পূরণ করার জন্য পৃথক একটি পর্ষদ গঠনের কথা সরকার চিন্তা করিতেছেন। হাসপাতাল বা ঐ ধরণের অত্যাবশ্যক প্রতিষ্ঠানে কোনরূপ বিরোধ দেখা দিলে ঘটনাস্থলেই মীমাংসা করার বিধানও নাকি বিলে থাকিবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কিছুদিন পূর্ব্বে দিল্লীতে সর্ব্বভারতীয় শ্রমমন্ত্রী সম্মেলনে এই সম্পর্কে প্রথম আলোচনা হয়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় উপযোক্ত বিষয়ে একখানি পত্র প্রেরণ করেন। উহার ভিত্তিতেই দিল্লী সম্মেলনে আলোচনার সূত্রপাত হয়। পশ্চিমবঙ্গের ন্যায় অন্যান্য রাজ্যেও অনুরূপ বিল আনা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।"

পশ্চিমবঙ্গের চাকুরিয়া চিকিৎসক

নিম্নে আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে যে নূতন সরকারী ব্যবস্থার বিবরণ দেওয়া হইল তাহা বিশেষ চিন্তার কারণ। যেভাবে এই নূতন ব্যবস্থা করা হইল, তাহাতে মনে হয় না যে, কোনও বিশেষজ্ঞ দলের সঙ্গে এ বিষয়ে কিছু পরামর্শ করা হইয়াছে। অবশ্য এ বিষয়ে শেষ কথা এই নহে। দেশের চিকিৎসকদের সমিতি সংগঠন অনেক আছে। সে সকলের মন্তব্য কি হয় তাহা দ্রষ্টব্য। আমাদের ভয় যে এরূপ বাঁধাধরার ফলে হাসপাতালগুলি বড় ডাক্তার ও সার্জ্জনদিগের সহায়তা হইতে বঞ্চিত হইতে পারে :

"পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে চাকুরিয়া চিকিৎসকগণের এযাবৎ যে শ্রেণীবিন্যাস ছিল, তাহার আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া রাজ্য সরকার রাজ্যপালের নির্দেশবলে গত ১লা জানুয়ারী হইতে পশ্চিমবঙ্গ হেলথ সার্ভিস নামে একটি সম্মিলিত চিকিৎসক-বাহিনীর চাকুরী প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

নূতন নিয়মাবলী অনুসারে ঐ নূতন সম্মিলিত চিকিৎসক-বাহিনী প্রবর্ত্তিত হইবার ফলে অতঃপর পশ্চিমবঙ্গে সরকারী ডাক্তারদের মধ্যে সিভিল সার্জেন, সাব-এসিষ্ট্যান্ট সিভিল সার্জেন প্রভৃতি অতিপরিচিত নামগুলি আর থাকিতেছে না। উহাদের পরিবর্ত্তে অতঃপর সকল প্রকার সরকারী ডাক্তারই একমাত্র মেডিক্যাল অফিসার নামে অভিহিত হইবেন এবং তাঁহাদের বেতন মাসিক সর্ব্বনিম্ন ২৫০৲ টাকা হইতে সর্ব্বোচ্চ ১৬০০৲ টাকা পর্য্যন্ত একটি সম্মিলিত স্কেলের মধ্যে নির্দ্ধারিত হইবে।

হেলথ সার্ভিসের এই সম্মিলিত শ্রেণী সম্বন্ধে নূতন যে নিয়মাবলী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। উহা হইতে হেলথ সার্ভিসের এই নয়া বিধানের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। তন্মধ্যে প্রথম বৈশিষ্ট্য এই যে, সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্র বাদে আর সব ক্ষেত্রেই সরকারী ডাক্তারদের পদ নন-প্র্যাকটিসিং করা হইয়াছে। অর্থাৎ সরকারী ডাক্তারগণ অতঃপর আর বাহিরে রোগী দেখিতে বা প্রাইভেট প্রাকটিস করিতে পারিবেন না। কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া অধ্যাপক বা বিশেষ পদের চিকিৎসকগণের কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম আছে বটে, কিন্তু তাহাও খুব সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে।

এই নূতন বিধানে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি এরূপ—(১) মেডিক্যাল অফিসারদের জন্য বেতনের তিনটি গ্রেড করা হইয়াছে, যথা, বেসিক গ্রেড—(২৫০৲-২০৲-৬০০৲ টাকা) সিলেকশন গ্রেড (৬০০৲-৫০৲-১২০০৲ টাকা) এবং স্পেশ্যাল গ্রেড (১২০০৲-১০০৲-১৬০০৲ টাকা)। (২) যে সব মেডিক্যাল অফিসার প্রাইভেট প্রাকটিস করিতে পারিবেন না তাঁহাদিগকে নন-প্রাকটিসিং পরিপূরক ভাতা দেওয়া হইবে। (৩) এই রাজ্যের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ শ্রেণী (স্পেসালিষ্ট পুল) সৃষ্টি করা হইবে এবং

প্রত্যেক স্পেশালিষ্টকে 'স্পেশালিষ্ট বেতন' দেওয়া হইবে। (৪) সমস্ত মেডিক্যাল অফিসারকেই এই রাজ্যের মধ্যে যে কোন স্থানে বদলী করা যাইবে। (৫) কোন অফিসারেরই বেতন-ভাতায় মোট প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ মাসিক ২০০০৲ টাকার বেশী হইতে পারিবে না; অবশ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের ডিরেক্টরের ক্ষেত্রে সর্ব্বোচ্চ প্রাপ্য ২২৫০৲ টাকায় নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই হিসাবের মধ্যে বাড়ীভাড়া ও মাগগী ভাতা ধরা হইবে না।

কোন কোন শ্রেণীর অফিসারের জন্য শিক্ষাদান ভাতা জনস্বাস্থ্য বেতন এবং প্রশাসনিক বেতন দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু যক্ষ্মা, কুষ্ঠ ও অন্যান্য সংক্রামক-ব্যাধির হাসপাতালগুলিতে নিযুক্ত ডাক্তারদের এযাবৎ যে বিপদের ঝুঁকি-ভাতা দেওয়া হইত তাহা প্রত্যাহৃত হইয়াছে। তবে কোন অফিসার বা চিকিৎসক কার্য্যকালে কোন সংক্রামক রোগের দ্বারা আক্রান্ত হইলে তজ্জন্য তাঁহাকে বিশেষ ভাতাদি দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

মেডিক্যাল অফিসারদের সমস্ত পদই ১৯৫৮ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে নন-প্র্যাকটিসিং করা হইয়াছে। তবে বিশেষজ্ঞের যোগ্যতাসম্পন্ন অথবা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন যে সব মেডিক্যাল অফিসার জেলা সদর ও মহকুমা সহরের হাসপাতালসমূহে কাজ করিবেন তাহাদের ক্ষেত্রে ঐ নন-প্রাকটিসিং নিয়ম প্রযোজ্য করা হয় নাই। তাহা ছাড়া যে সব হাসপাতালে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হয় না সেই সব প্রতিষ্ঠানে কর্ম্মরত ঐ শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ বা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অফিসারদেরও ঐ নন-প্র্যাকটিসিং নিয়মের বাহিরে রাখা হইয়াছে। ঐ সব ডাক্তারকে সরকারের ইচ্ছাধীনে সময়ে সময়ে নির্দ্ধারিত সর্ত্তাবলীতে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাকটিস করিতে অনুমতি দেওয়া হইবে।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ, নীলরতন সরকার হাসপাতাল, পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট প্রভৃতি যে সকল প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের অধ্যাপনার ব্যবস্থা আছে এবং জেলা ও মহকুমা সহরগুলির হাসপাতাল ছাড়া অন্যান্য যেসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেওয়া হয় না, সেই সব সংস্থায় যে সকল মেডিক্যাল অফিসার নিযুক্ত থাকিবেন, তাঁহাদের কোনক্রমেই প্রাইভেট প্র্যাকটিস করিতে দেওয়া হইবে না। এইসব ডাক্তারগণ—যাঁহাদের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে প্র্যাকটিস করিতে দেওয়া হইবে তাঁহারা কোনরূপ নন-প্র্যাকটিসিং ভাতা পাইবেন না। অন্যান্য সকল ডাক্তার নিম্নোক্ত-হারে মাসিক পরিপূরক ভাতা পাইবেন; (১) বেসিক গ্রেডে ৭৫৲ টাকা (৫ বৎসর চাকুরীকাল পর্য্যন্ত); (২) এবং ১০০৲ টাকা (৫ হইতে ১০ বৎসর চাকুরীকাল পর্য্যন্ত: (২) সিলেকশান গ্রেডে ২০০৲ টাকা; (৩) বিশেষ সিলেকশান গ্রেডে ৩০০৲ টাকা এবং স্বাস্থ্য-দপ্তরের ডিরেক্টর ৪০০৲ টাকা (মাসিক)।

ইহা ছাড়া স্বাস্থ্য-দপ্তরের ডিরেক্টার মাসে আরও ২৫০৲ টাকা প্রশাসনিক ভাতাও পাইবেন।

এই সম্পর্কে ৩১শে জানুয়ারী তারিখের কলিকাতা গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।"

ডাকবিভাগের অব্যবস্থা

বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতের ডাক ও টেলিগ্রাফ বিভাগের খ্যাতি ছিল যে, উহা একমাত্র সরকারী বিভাগ যেখানে জনগণের সেবা অকুণ্ঠভাবে ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার সহিত করা হয়। যুদ্ধের মধ্যে এই খ্যাতি ম্লান হইতে আরম্ভ হয় এবং এখনও অধোগতি চলিতেছে। সম্প্রতি আনন্দবাজার পত্রিকার "চিঠিপত্রে জনমত" বিভাগে শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মিত্র যাহা লিখিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্য। মফস্বলেও অনুরূপ ব্যাপার।

"শ্রীদুর্মুখ" লিখিতেছেন:

"ডাক বিভাগের নূতন নিয়ম অনুসারে রবিবার ছাড়া অন্যদিনে সকাল থেকে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত টিকিট পাওয়ার কথা। কিন্তু কার্য্যত: দেখা যায় বিকেল ৫টার পরে বাঁকুড়া পোষ্ট আপিসের কাউণ্টার বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেখানে টেলিগ্রাফ কাউণ্টারে টিকিট কিনিতে গেলে বলা হয় R. M. S. আপিসে যান। R. M. S. আপিসে গেলে সেখানেও ঘণ্টাখানিক দাঁড় করাইয়া রাখিয়া বলা হয় পাওয়া যাইবে না। এই অবস্থার প্রতিকার হওয়া আবশ্যক। R. M. S, কর্ম্মচারীদের এরূপ ব্যবহারের কোন সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ দৃষ্টি দিলে জনসাধারণ উপকৃত হইবে।"

"গীতাঞ্জলি"র সংস্কৃতানুবাদ

কবিগুরু 'রবীন্দ্রনাথে'র "গীতাঞ্জলি" পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। সম্প্রতি ইহার সংস্কৃতানুবাদ প্রস্তুতের চেষ্টা হইতেছে। অনুবাদের প্রচেষ্টা করিতেছেন শিলচরের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীকামিনীকুমার অধিকারী ভাগবতভূষণ। তাঁহার এই প্রচেষ্টাকে ভারতের প্রখ্যাত সুধীজনবর্গ অকুণ্ঠচিত্তে অভিনন্দন জানাইয়াছেন; আমরাও জানাইতেছি। পাঠকদের অবগতির জন্য আমরা নীচে তৎকৃত রবীন্দ্রনাথের "অন্তর মম বিকসিত কর অন্তরতর হে" এবং "গীতাঞ্জলি"র প্রথম কবিতাটির ("আমার মাথা নত করে দাও হে তব চরণধূলার তলে") সংস্কৃত অনুবাদ "যুগশক্তি" পত্রিকা হইতে তুলিয়া দিলাম। "অন্তর মম বিকসিত কর" কবিতাটির অনুবাদ এইরূপ:—

মম মানসমিহ সুষ্ঠু বিকাশয়
মানসপুর সুপ্রিয় হে,
কুরু নির্ম্মলমপি ভাস্বরতরমপি
কুরু সুন্দরতরমপি হে।
কুরু নিরতোন্মুখ নির্ভয় মঙ্গল
নিঃসংশয়িতমতন্দ্রম্,
যুক্তং কুরু মাং সর্ব্বজনৈরিহ
মোচয় খলু ভববন্ধম্।

সঞ্চারয় হে কর্ম্মণি নিখিলে
স্বদীয়ং ছন্দঃ শান্তম্,
চরণকমলয়ো শ্চিত্তং মম হে
কুরুতাম‌পি নিস্পন্দম্।
কুরুতাং নন্দিত মতিশয় নন্দিত
মানন্দিতমিহ মাং হে,
মম মানসমিহ স্বচ্ছবিকাশয়
মানসপুর সুপ্রিয় হে।

"আমার মাথা নত করে দাও" কবিতাটির অনুবাদ এইরূপ :
শীর্ষং মে তব পাদসক্ত রজসাং
নীচৈঃ প্রভো ধারয়
সর্ব্বং গর্ব্বচয়ং মমাহমিতি হে
নেত্রাম্বুভিঃ প্লাবয়।
মানং দাপয়িতুং নিজার নিয়তং
মানং নিজং হারয়ে
আত্মানং পরিবারয়ন্নিহ সদা
ভ্রামান্ ম্রিয়ে কেবলম্।
যেনাহং করবানি নাহ নিজকৃতৈঃ
স্বীয়ং প্রচারং খলু
তৎ পূর্ণং তব মানসং বিজয়তাং
হে নাথ মে জীবনে।
শান্তিং তে চরমাং তবৈব
পরমাং কান্তিং ধিয়া কাময়ে
গোপায়ন্নিভৃতং মমত্বমিহ মে
প্রোত্তিষ্ঠ হৃৎপঙ্কজাম।

গান্ধী ও লিঙ্কন

গত ১২ই ফেব্রুয়ারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট মহামনীষী আব্রাহাম লিঙ্কনের জন্মতিথি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক সভায় কলিকাতাস্থিত মার্কিন প্রচার দপ্তরের অন্যতম সদস্য মিঃ জন্ এইচ, ষ্টামফ (John H. Stempf) আমেরিকার গৃহযুদ্ধ এবং তাহাতে লিঙ্কনের ভূমিকা সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত ভাষণ পাঠ করেন। উল্লিখিত ভাষণে মিঃ ষ্টামফ মার্কিন গৃহযুদ্ধের কারণ এবং ফলাফল সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেন।

এই প্রসঙ্গে গান্ধীজীর কথাও সহজেই মনে আসে। বস্তুতঃ মার্কিন মহামনীষী লিঙ্কন এবং ভারতের মহামানব গান্ধীজীর জীবনে বহু সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এই সাদৃশ্য যে কেবলমাত্র জাতীয় অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার পর আততায়ীর হস্তে নিহত হওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তাহা নহে। উভয়ের জীবনই জাতি এবং বৃহত্তর মানবতার কল্যাণসাধনে উৎসর্গীকৃত ছিল। বিশ্ব-ইতিহাসে লিঙ্কনের অবদান সম্পর্কে আমরা মোটামুটি ধারণা করিতে পারি। আমরা গান্ধীজীর এরূপ ঘনিষ্ঠ ছিলাম যে, আমাদের পক্ষে বিশ্বের উপর গান্ধীজীর প্রভাব সম্পর্কে অবহিত হওয়া সম্ভব নহে। তথাপি একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, লিঙ্কনের প্রভাব যেরূপ কোনক্রমেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নাই, অনুরূপভাবে গান্ধীজীর প্রভাবও ভারতের জাতীয় পরিধির বাহিরে প্রসারিত হইবে। এই বিস্তৃত প্রভাবের পরিচয় আমরা এখনই পাইতেছি।

হাসপাতালের শিক্ষা ও চিকিৎসা

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রকাশ :—

"কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ১২৩তম প্রতিষ্ঠা-দিবস উদ্‌যাপন-অনুষ্ঠানে ভাষণ প্রসঙ্গে ঐ কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ এস. সি. বসু মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতিবিধানের নিমিত্ত তথায় ছাত্র এবং রোগী উভয়েরই ভর্ত্তিসংখ্যা হ্রাস করিবার প্রস্তাব করেন। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু।

অধ্যক্ষ ডাঃ বসু প্রস্তাব করেন যে, ছাত্র ভর্ত্তির সংখ্যা হ্রাস করিয়া বর্ত্তমানে ১৩৭ জনের স্থলে ১০০ জন করা উচিত। স্বাধীনতার পূর্ব্বেও এই ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। তাঁহার মতে বর্ত্তমান অবস্থায় শিক্ষকদের পক্ষে ছাত্রদের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে মনোযোগ দেওয়া ক্রমেই অধিকতর দুরূহ হইয়া উঠিতেছে। এই অবস্থা চলিতে থাকিলে 'উন্নতির ঘড়ি' মন্থর হইবে বলিয়া তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

ডাঃ বসু মনে করেন যে, অনুরূপভাবেই হাসপাতালে রোগী-ভর্ত্তির সংখ্যাও হ্রাস করা দরকার। ছাত্ররা যাহাতে 'ক্লিনিক্যাল মেডিসিন' সম্পর্কে উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে তাহার সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার জন্যই মুখ্যতঃ এই হাসপাতাল স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, বর্ত্তমানে প্রধানতঃ জনসাধারণের প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই যেন এই হাসপাতালের অস্তিত্ব। পূর্ব্বে এই হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা ছিল ৭৫০। এক্ষণে উহার নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ৮৫৩। কিন্তু চাহিদা মিটাইবার জন্য ১৬০০ শয্যার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। শয্যাসংখ্যার আধিক্যের দ্বারা কোন মেডিকেল সংস্থার ভালমন্দ বিচার করা যায় না। সুতরাং অবিলম্বে হাসপাতালে রোগীর অত্যধিক ভিড় বন্ধ করা দরকার।

ডাঃ বসু চিকিৎসকদের 'কর্ত্তব্যের দুরূহতা' উপলব্ধি করিয়া সহিষ্ণুতা এবং পরস্পর বোঝাপড়ার মনোভাব লইয়া তাঁহাদের সহিত সহযোগিতা করার জন্য জনসাধারণের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানান। 'চিকিৎসকদের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী'র অভাব নাই ; কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে জনসাধারণের 'আবেগপ্রবণতা'র জন্য উহা প্রমাণ করার সুযোগ পাওয়া যায় না। কলিকাতার মেডিকেল কলেজের কর্ম্মচারী এবং ছাত্রগণ রোগীদের পীড়া নিরসনে সর্ব্বদাই তাঁহাদের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন বলিয়া তিনি গর্ব্ব অনুভব করেন।

ডাঃ বসু জানান যে, গত বৎসরে ১১৬ জন ছাত্রী এবং ২৪২ জন সংক্ষিপ্ত এম-বি বি-এস কোর্সের ছাত্রসহ মেডিকেল কলেজের ছাত্রসংখ্যা ১০৪৪ জন ছিল। এই বৎসর মে মাসে গৃহীত পরীক্ষায় ১২ জন ছাত্রীসহ ১১৮ জন ছাত্র ফাইন্যাল এম-বি-বি-এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। সংক্ষিপ্ত এম-বি-বি-এস কোর্স আলোচ্য বৎসর হইতে বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া তিনি জানান।

অধ্যক্ষ মহাশয় এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন যে, ৪৫টি সরকারী বৃত্তির (৪০টি ছাত্র এবং ৫টি ছাত্রী) মধ্যে মাত্র ২২টি বৃত্তি দেওয়া সম্ভব হইয়াছে। তিনি মন্তব্য করেন, ইহা 'শোচনীয় চিত্র' সন্দেহ নাই।

ডাঃ বসু বলেন, হাসপাতালে রোগীর যেরূপ ভিড় হয় তাহাতে ছাত্রদের শিক্ষাদান গুরুতররূপে ব্যাহত হয়। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রোগীর চাপ হ্রাস করিয়া তাহাদের অন্যান্য হাসপাতালে ছড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা করার জন্যও তিনি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান। কলেজের গ্রন্থাগার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে চলতি বৎসরের জন্য দশ হাজার টাকা এবং অতিরিক্ত চার হাজার টাকা সাহায্য দেওয়ার জন্য রাজ্যসরকারকে অনুরোধ জানান হইয়াছে।

ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ

ফরাসী জাতি যে ভাবে সাম্রাজ্যবাদের মোহে আচ্ছন্ন হইয়া নিজেদের ধ্বংসের ও জগতে অশান্তিবৃদ্ধির পথে চলিতেছে নীচের সংবাদটি তাহার দৃষ্টান্ত। বলা বাহুল্য এ বিষয়ে আমেরিকা ও ব্রিটেন একেবারে চুপ।

"তিউনিস, ৮ই ফেব্রুয়ারী—তিউনিসিয়ার সীমান্তের গ্রাম সাকিয়েতসিদি-ইউসেফে ফরাসীগণ কর্তৃক বোমাবর্ষণের ফলে ৯ জন স্ত্রীলোক ও ১২ জন শিশুসহ ৭২ জন নিহত এবং ৮০ জন আহত হইয়াছে বলিয়া সরকারীসূত্রে ঘোষণা করা হইয়াছে। ৩৪টি বাসভবন এবং ৮৪টি দোকানসহ গ্রামের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বে প্রচারিত (গতকল্য সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশিত) সংবাদে বলা হইয়াছিল যে, প্রায় একশত ব্যক্তি নিহত হইয়াছে।

প্রকাশ তিউনিসিয়া ফ্রান্স হইতে তাঁহাদের রাষ্ট্রদূতকে অবিলম্বে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের নির্দ্দেশ দিয়াছে এবং ফ্রাঙ্কো-তিউনিসিয়ান চুক্তিবলে তিউনিসিয়ায় যে সমস্ত ফরাসী সৈন্য আছে, তাহাদিগের অপসারণ দাবী করিয়াছে। এ চুক্তিদ্বারাই তিউনিসিয়া কিছুদিন পূর্ব্বে স্বাধীনতা লাভ করে।

ফরাসী সামরিক কর্ম্মচারিগণ দাবী করেন যে, উক্ত গ্রামের নিকটে সংস্থাপিত বিমানবিধ্বংসী কামান হইতে একটি ফরাসী পর্য্যবেক্ষক বিমানকে লক্ষ্য করিয়া গোলা নিক্ষেপের পরই ২৫টি বোমারু জঙ্গী বিমান প্রেরিত হয়। ফরাসী প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী ঘটনাটিকে বিমানবিধ্বংসী কামানের বিরুদ্ধে 'ন্যায়সঙ্গত প্রতিরক্ষা-মূলক' ব্যবস্থা বলিয়া বর্ণনা করেন।

তিউনিসিয়ান কর্ম্মচারিগণ বলেন যে, সাকিয়েত সিদি-ইউসেফ গ্রামে ১,২০০ লোকের বাস। দেড় ঘণ্টা যাবত ঐ গ্রামে বোমা-বর্ষণ করা হয় এবং গুলী নিক্ষেপ করা হয়। একটি বিদ্যালয়ের উপর একটি বোমা পড়ায় প্রায় সমস্ত ছাত্রই মারা যায়।

তিউনিসিয়াগণ আলজিরিয়ার বিদ্রোহীদের সাহায্য করিতেছে, ফরাসীগণ এরূপ মন্তব্য করায় তিউনিসিয়ানদের মধ্যে ফরাসীদের প্রতি বিরুদ্ধভাব প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে।

তিউনিসিয়ার প্রেসিডেণ্ট হবিববুর গুইবা এখানে মন্ত্রিসভার এক বিশেষ অধিবেশন ডাকেন। অধিবেশনান্তে এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, তিউনিসিয়াস্থিত ফরাসী সৈন্যদের চলাচল নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।"

অরবিন্দ চৌধুরী

ডাঃ অরবিন্দ চৌধুরী ইংলণ্ডের এসেক্সের অন্তর্গত বার্কিংসাইডে সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স চুয়ান্ন বৎসর হইয়াছিল। বিগত ১৯৪০ সনে তিনি ঐ স্থলে চিকিৎসা-কার্য্য আরম্ভ করেন। একাদিক্রমে পনের বৎসর এই কাজের মাধ্যমে জনচিত্তে তিনি স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে এসেক্সবাসী আপামরসাধারণ বিশেষ শোকগ্রস্ত হইয়াছেন। ডাঃ চৌধুরী ধনী-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলেরই শ্রদ্ধাপ্রীতি অর্জ্জন করিয়াছেন বটে, কিন্তু দরিদ্র ব্যক্তিরা এবং শিশুরা তাঁহার সোহার্দ্দ্যপূর্ণ আচরণ কখনও ভুলিতে পারিবে না। তিনি ছিলেন দরিদ্রের বন্ধু এবং শিশুদের বড় প্রিয়। হাজার হাজার অধিবাসী শবযাত্রায় যোগদান করিয়া তাঁহার প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন। লণ্ডনের বিভিন্নদলভুক্ত বিখ্যাত সংবাদপত্রগুলি ডাঃ চৌধুরীর মৃত্যুসংবাদ প্রকাশকালে তাঁহার বিশেষ স্তুতিবাদ করিয়াছেন। 'দি টাইমস' 'ডেলি হেরাল্ড', 'ডেলি মেল' প্রভৃতি সংবাদপত্রসমূহের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে হয়। ডাঃ চৌধুরী একান্ত নিষ্ঠার সহিত রোগীদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করিতেন। ইহাতে দরিদ্র ব্যক্তিরা যে কত উপকৃত হইতেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। শিশুরা তাঁহাকে একেবারে আপন করিয়া লইয়াছিল। তাহারা তাঁহার নিকটে যেমন আদর পাইত এমনটি অন্যত্র পাওয়া ভার। তাঁহার সেবাপরায়ণতা বার্কিংসাইডবাসীদের একান্ত আপন করিয়া লইয়াছিল। বিলাতের সংবাদপত্রগুলিতে তাঁহার সম্বন্ধে যতটুকু খবর বাহির হইয়াছে তাহাতে তাঁহার এই অকুণ্ঠ সেবাপরায়ণতার কথাই নানাভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে। বাংলা দেশের কোথায় তাঁহার বসতি ছিল, তাঁহার পিতৃ-মাতৃ পরিচয় কি, তাহা আদৌ জানা যায় নাই। এ বিষয়ে আমাদিগকে কেহ জানাইলে পাঠক-পাঠিকাদের গোচরার্থ তাহা আমরা প্রকাশ করিতে পারি। এই আদর্শ-চিকিৎসক বিশ্রাম বলিয়া কিছু জানিতেন না। তিনি দিনের সর্ব্বক্ষণই রোগীর সেবায় সঁপিয়া দিতে ব্যস্ত হইতেন। তাঁহার স্বল্পায়ু হয়ত এই অতিরিক্ত পরিশ্রমের হেতু। তথাপি সেবাপরায়ণ, মানবদরদী এই আদর্শ মানুষটির মৃত্যুতে আমরা সকলেই দুঃখিত। ঈশ্বর তাঁহার পর-লোকগত আত্মার শান্তিবিধান করুন, এই কামনা।

দর্শন-চারিত্র্য

ডক্টর শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

মানুষের ভেদবাদী বুদ্ধির অনাদিকালের জিজ্ঞাসা হ'ল অসঙ্গ যে সত্তা তা কি প্রকাশনিরপেক্ষ? ভক্তিবাদী মানুষ বিহ্বল-চিত্তে অনন্ত প্রকৃতির সৃষ্টি-বৈচিত্র্যে তাঁর স্বাক্ষর প্রত্যক্ষ করে। আদিম কাল থেকে মানুষের অসংস্কৃত মন স্রষ্টাকে তাঁর সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছে। সর্বভূতে বুঝি তাঁর প্রতিষ্ঠা! কালক্রমে এই আদিম ভগবানই ব্রহ্মবাদীর পরম সৎরূপে আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হলেন বিশ্বসংসারের অণুতে পরমাণুতে। সৃষ্টিতেই সবের স্বাক্ষর। তাই ত যুগে যুগে আমরা দেখেছি বৃক্ষ প্রস্তরের দেবায়ত্ত মহিমা। এই জড়-পূজায় জড়-অধিষ্ঠাতৃ শক্তি পূজা পেয়েছে। সৃষ্টির আদিতে অসহায় মানুষ চরম দুর্যোগের মধ্যে আশ্রয় পেল, ক্ষুধার অন্ন পেল বৃক্ষের কাছ থেকে। তার অসহায় অস্তিত্বের চরম লাঞ্ছনার দিনে সে প্রশান্তির নিবিড়তা উপলব্ধি করল বনস্পতির অকম্প সৌন্দর্যে। তাই ত বৃক্ষ পূজা পেল। নানা গোষ্ঠীর কাছে নানা জন্তু পূজা পেল—পবিত্র পূজা-প্রতীক হ'ল তারা ঘটনার আকস্মিকতায়। বিজ্ঞান-নিষ্ঠ যে মন সেখানে কুসংস্কার সার্বভৌম হয়ে ওঠে। তবু সে কুসংস্কার-ঘনিষ্ঠ যে আলাপন, যে মনন মানুষের আদি ইতিহাসে আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠ করে গেল তার পিছনে মানুষের অনুসন্ধিৎসার সজ্ঞান প্রয়াস। যা অস্তিত্ববান তাই কি নিত্য সত্য? অস্তিত্ব এবং সৎ কি সমার্থক? যা কিছু আছে তাই কি সৎ বা সতের রূপভেদ? মানুষের বস্তু-অতিক্রমা আত্মা ভারতবর্ষের মাটিতে যে প্রশ্ন উচ্চারণ করল তা হ'ল 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম'? মানুষের অন্তরের এই নিরন্তর প্রশ্ন দেশে দেশে কালে কালে কত না দেব-দেবীর সৃষ্টি করেছে। পুরাতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক এবং গবেষণারত পণ্ডিতের দল তেত্রিশ কোটি হিন্দু দেবদেবী-অধ্যুষিত স্বর্গলোকে আপন বিশ্বাস এবং দর্শনগত সততা-নির্ভর হয়ে আরও অগণিত দেবদেবীর আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু মানুষ তার অস্তিত্বের অন্তরতম সত্যটুকুকে আবিষ্কার করতে চেয়েছে। তার ভগবানকে দেখতে চেয়েছে অন্তর্যামী রূপে। মানুষের সেই নিরন্তর প্রয়াস তার ভাবনাকে, তার ধ্যান-ধারণাকে আচ্ছন্ন করেছিল। তাই ত একদিন বোধির স্বচ্ছ আলোয় প্রত্যক্ষ করল: ১

"What we call worship is the form in which the finite spirit realises the presence of the infinite within it. Worship is the ever-deepening consciousness that the infinite is within and not without us, that it is an everpresent reality in us and not a distant goal which is yet to be realised."

পূজা হ'ল মানুষের আপন অন্তরে অসীম সত্তাকে সীমায়িত রূপে প্রত্যক্ষ করা। ভগবদ্‌পূজায় মানুষের এই মহাসত্যের উপলব্ধি ঘটে যে, আদ্যন্তবিরহিত চিৎসত্তা মানুষের অন্তরশায়ী এবং তা হ'ল নিত্য-বিরাজিত। তার সন্ধানে মানুষের অভিসার অর্থহীন। ভগবান দূরাশ্রিত লক্ষ্য নন; তিনি মানবের অন্তরলোকে নিত্য সত্য। বেদাশ্রয়ী ঋষি-প্রশ্নের উত্তর দিল উত্তরসূরীরা বিভিন্ন দেশে এবং কালে। দর্শনচিন্তার বহমানতায় দেশ-কাল অতিক্রান্ত।

মানুষের অনুসন্ধিৎসা হ'ল দর্শন-জননী। জীবন এবং জগৎ যে সমস্যার উপস্থাপনা করে মানুষের বুদ্ধির সীমানায়, মানুষ তার যে সমাধান করে তাই হ'ল দর্শন। বস্তুর রূপ-রহস্য মানবমনে অন্তহীন জিজ্ঞাসার উৎসার ঘটায়। বস্তুর স্বরূপ-নির্ণয়-প্রচেষ্টা বার বার ভ্রম দ্বারা খণ্ডিত হয়। দ্রষ্টা কখন কখন রজ্জুতে সর্প অবলোকন করে। বুদ্ধিশাসিত মননধর্ম ভ্রম-প্রমাদের উৎস খোঁজে। রজ্জুতে যখন আমরা সর্প দেখি তখন কোন্ মন্ত্রবলে রজ্জুসত্তার অবলোপ ঘটে, রজ্জু আবৃত হয়? সর্পরূপ অধ্যাস্ত হওয়ার সুষ্ঠু মনোবৈজ্ঞানিক অথবা তত্ত্ববৈজ্ঞানিক কোন ব্যাখ্যা আজও সর্বজনগ্রাহ্য হ'ল না। বস্তুর স্বরূপলক্ষণ আজও যথাযথভাবে নির্ণীত হ'ল না। পশ্চিমী দর্শনে বস্তুর 'কে' এবং 'কি' (That and what) এর সম্মিলন ঘটে কোন্ পথে, সে তত্ত্বটা অতি দুরূহ। ভাবমুখীনতা (ideality) বস্তু-সত্তার কতখানি, ভাবমুখীন-তারই বা স্বরূপ কি, সে সম্বন্ধেও আলোচনার অন্ত নেই। ideality বস্তুসত্য হতে চায়; এই হতে চাওয়ার মধ্যেই তার সত্যতা। বস্তুসত্তার২ এই idealityটুকু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হয়েও ইন্দ্রিয়জ সত্তা-অতীত সত্তায় সত্তান্বিত। এই ভাব-

---

১। John Caird লিখিত The Philosophy of Religion গ্রন্থের পৃঃ ৩২৭ দ্রষ্টব্য।

২। ডক্টর কালিদাস ভট্টাচার্যের 'The Business of Philosophy' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য [Proceedings of the Thirteenth Indian Philosophical congress, Nagpur]

মুখীনতা বা ideality ইন্দ্রিয়-অতীত হলেও তাকে অস্বীকার করা যায় না। তাকে অস্বীকার করলে দৃশ্যমান 'দ্যাবা-পৃথিবী'র রূপরসগন্ধস্পর্শের আধারটুকু অন্তর্হিত হয়।

মানুষ অনাদিকাল থেকে বস্তুর সহজতম, আদিমতম রূপটুকু দেখতে চেয়েছে। আদিমতম বস্তু (matter) আবিষ্কার প্রত্যাশায় মানুষ যুক্তিসিন্ধু মন্থন করেছে। গ্রীক দার্শনিক থেলিস বললেন, জলই হ'ল আদিমতম বস্তু—সর্ব রূপবৈচিত্র্য, বস্তুবৈচিত্র্য, প্রাণবৈচিত্র্যের মূলে রয়েছে অপ্। মাইলেশীয় ত্রয়ীর অন্য দু'জন চিন্তাবীর—আনাক্সিমেন্দার এবং আনাক্সিমিনিস ভিন্নমত পোষণ করলেন। আনাক্সিমিনিস বায়ুকে সৃষ্টিকারণ বলে উল্লেখ করলেন। আনাক্সিমেন্দার যে কথা বললেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। মানব-চিন্তার সেই অভ্যুদয়-প্রত্যুষে এক অসীম সত্তার কথা তিনি শোনালেন। এই অসীম সত্তাই সৃষ্টিকারণ। গ্রীসদেশে যখন দার্শনিক চিন্তার উদ্বর্তন চলেছে এই ভাবে, তখন ভারত-বর্ষের অনুসন্ধিৎসা হিরণ্যগর্ভ পুরুষকে আবিষ্কার করেছে। এই বিশ্বসংসারের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারণ যে চিন্ময় সত্তা, যে অপরূপের রূপময় প্রকাশ হ'ল এই বিশ্বসংসার,তার আবিষ্কার ঘটেছে আমাদের দেশে। যে গাছ আদিম মানুষকে আশ্রয় দিল, ছায়া দিল, ক্ষুধায় অন্ন দিল তাকে মানুষ পূজা করেছে অতিপ্রাকৃতের মোহে, অন্ধ অজ্ঞানতায় এবং গভীর কৃতজ্ঞতা-বোধের অনুপ্রেরণায়। তার পরেও মানুষ সন্ধান করেছে জগতের কারণকে। সে কারণ বস্তুভূত পরমাণুই হোক আর সগুণ পরব্রহ্মই হোক, সেখানে রয়ে গেছে দার্শনিক মানুষের আদিমতম দর্শনচিন্তার স্বাক্ষর। সে চিন্তা কখনও কর্তা-ভজনা করেছে, আবার কোথাও-বা সে চিন্তায় রয়েছে মানুষের দুর্মদ মননশীলতা আত্মস্বাতন্ত্র্য। ভারতীয় দর্শন-চিন্তার কথাই বলি :

"The systems of Indian Philosophy fall into three main divisions. (i) Systems which are based on the recognition of the outhority of the Vades and profess to teach what is embodied in Sruti (Vaidika), (2) Systems which profess to be based on agama i. e. on an authority not strictly Vadic and yet also not being Veda-virodhi or inconsistent with Vedic authority (Vedavatya), (3) Systems which are not merely unvedic but anti-vedic (Vedovirodhi),[৩]

এই তৃতীয় শ্রেণীতে রয়েছে চার্বাক, বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শন ; দ্বিতীয় শ্রেণীতে রয়েছে শাক্ত, বৈষ্ণব, জৈন এবং তন্ত্রাভিসারী দার্শনিক মতবাদ এবং প্রথম শ্রেণীতে রয়েছে ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, পূর্ব এবং উত্তর মীমাংসা। ভারতীয় দর্শনের এই বর্ণবৈষম্য মানুষের জীবন-জিজ্ঞাসার তার ক্রমিক স্বমননির্ভরতার অভিজ্ঞান।

জগৎ কি সদসৎ অতিক্রান্ত? আমাদের নিত্যদিনের ভ্রম এই প্রশ্নটি বার বার চোখের সামনে তুলে ধরে। বস্তুর সার সত্য কি চরমতত্ত্বে লভ্য? না বস্তুর সত্য বস্তুর অন্তরে নিহিত? রূপময় যে বিশ্বজগৎ তা কি মানুষের জ্ঞান-নিরপেক্ষ? এ সব হ'ল দার্শনিক মানুষের প্রশ্ন। এমনই ধরনের প্রশ্ন সাধারণ অশিক্ষিত মানুষেরাও করে থাকেন আর এক ভঙ্গিতে। তাদেরও যেমন সত্য-দিদৃক্ষার অন্ত নেই দার্শনিকেরাও তেমনই সত্যসন্ধানে নিত্যপ্রয়াসী। দার্শনিকপ্রবর বার্ট্রাণ্ড রাসেলের কথা বলি। তাঁর সত্যদর্শন-অভীপ্সা নতুন নতুন দার্শনিকতত্ত্বের অবতারণা করল। বস্তু-বাদী (Realist) রাসেলের 'Problems of Philosophy' গ্রন্থে আমরা তাঁকে পুরোপুরি বস্তুবাদীর (Realist) ভূমিকায় পেলাম। জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় অভিন্ন নয়। বস্তুসত্তার জ্ঞান-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। রং, রূপ এবং বস্তু-দার্ঢ্য (hardness) প্রমুখ গুণাবলী হ'ল বস্তুর অবভাস (Appear-ance)। এই বস্তুনিচয় হ'ল জ্ঞাতা-নিরপেক্ষ সত্য বস্তু। কিন্তু এই অবভাস-বস্তু-সম্বন্ধ নিরূপণ দার্শনিকের অবশ্য-কর্তব্য। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবভাস কি বস্তুর সত্তা-আশ্রয়ী? ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ কি বস্তু লক্ষণ বলে পরি-গণিত হবে? এই সব দুরূহ প্রশ্নের উত্তর রাসেলের আলোচ্য গ্রন্থখানিতে মিলল না। কখনও তিনি প্রাকৃতজনার মতই বলেছেন যে, আমরা বস্তুর যে রূপ সম্বন্ধে সচেতন তার যথা-ক্রমিক কারক গুণগুলি বস্তু-আশ্রয়ী। আবার কখনও-বা পদার্থবিদ্যার অনুসরণে তিনি বললেন যে, বস্তুর অবভাস তার সত্যধর্মকে উদ্‌ঘাটন করে না। তবে এ সত্যটুকু এখানে প্রতিষ্ঠিত হ'ল যে, বস্তু সত্তায় বিশ্বাসটুকু নির্ভরযোগ্য নয়। ইন্দ্রিয়জ্ঞান বস্তু-সত্তায় নিত্যসত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে না। বস্তুর যে জ্ঞাতাত্মনির্ভর সত্তায় সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে তা আমাদের সংস্কারপ্রসূত। মহাদার্শনিক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বললেন যে, আমাদের বস্তুনিষ্ঠ যে সংস্কার তার জন্যই আমরা বস্তুকে জ্ঞাননিরপেক্ষরূপে দেখি। বাস্তববাদীর স্বতঃসিদ্ধ সত্য হ'ল বস্তুর জ্ঞাননিরপেক্ষ অস্তিত্ব। বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রমুখ জ্ঞানচর্চ্চার মূলে রয়েছে বাস্তববাদী মননধর্মের এই অন্ধ সংস্কার। এই সংস্কারই বস্তুকে জ্ঞাতা-নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠা

৩। ডক্টর সুশীলকুমার মৈত্রের 'Fundamental Questions of Indian Metaphysics and Logic' দ্রষ্টব্য।

দিয়েছে।[৪] জ্ঞাতার মননিরপেক্ষ বস্তু-সত্তা যে নেই একথা বার্ট্রাণ্ড রাসেলও তাঁর পরবর্তী গ্রন্থে স্বীকার করলেন। বস্তুকে তিনি যুক্তিসিদ্ধ কল্পনা বা logical constructions আখ্যা দিলেন। দৈনন্দিন জীবনে প্রাকৃতজনের জীবনধর্ম যে বস্তুকে কেন্দ্র করে নিত্য আবর্তিত—দার্শনিক সূক্ষ্ম চিন্তার আলোকে সমীক্ষণ দ্বারা তাকে অস্বীকার করলেন। যে 'আমি' সর্ব প্রাকৃত-জ্ঞানাতীত, যে 'আমি' নিত্য জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় সম্বন্ধ-নিরপেক্ষ, সে 'আমি'র প্রতিষ্ঠা ঘটল দর্শন-জগতের সার্বভৌম সম্রাট হিসেবে। এই 'আমি'র জ্ঞান বস্তু-সত্যের ক্রমান্বিত অস্বীকারের মধ্য দিয়ে আসে না। এর জ্ঞানলাভ হ'ল অধ্যাত্ম কর্ম (spiritual function); যুক্তিবাদী মননধর্মে বস্তুর অসারতা প্রত্যক্ষ হলেও এই 'আমি'র জ্ঞান বুদ্ধি-অতীত।

জীবন দুঃখময়—একথা দুঃখবাদীর কথা। আশাবাদী বলবেন যে, বছরের যে ক'টা দিন দুঃখ পেলে সে দিন-গুলোকেই বড় করে দেখবে কেন? যে অন্তহীন আনন্দের মেলা বসেছে তোমার সামনে তা থেকে তোমার প্রাণের পেয়ালায় রস ভরে নাও না কেন? দুঃখকে দুঃখ বলে স্বীকার করেও আনন্দের আস্বাদন করা যায়। একথা অগ্রাহ্য যে, দুঃখ নেই, বা দুঃখ আমাদের দর্শনভঙ্গিগত বিকার। এ কথা আর যে কেউ বলুক না কেন বাস্তববাদীরা এ তত্ত্বকে পুরোপুরি অস্বীকার করবেন। সে অস্বীকৃতির পিছনের যুক্তি হ'ল প্রত্যক্ষবাদীর যুক্তি। দুঃখকে স্বীকার করে নিয়েও দার্শনিক ব্রাডলির মত ভাববাদীরা বললেন যে, মানুষের আত্মশুদ্ধির জন্য দুঃখের প্রয়োজন রয়েছে। মানুষ তার চিন্ময় সত্তাকে প্রোজ্জ্বল করে তোলে এই দুঃখ-পাবকে শুচি-স্নানের মধ্য দিয়ে। দুঃখ সত্য, তবে সে একমাত্র সত্য নয়। এই দুঃখের স্বীকৃতি দার্শনিকের কণ্ঠে, কবির কণ্ঠে বার বার যুগে যুগে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে:

> 'দুঃখেরে আমি ডরিব না আর
> কণ্টক হোক কণ্ঠের হার,
> জানি তুমি মোরে করিবে অমল
> যতই অনলে দহিবে।'

মানুষের জীবনে যদি দুঃখকে সত্য বলে স্বীকার করি তবে দুঃখের উৎসকেও স্বীকার করতে হয়। দুঃখ আনন্দের বৈপরীত্যসূচক। ভগবান যদি কল্যাণের সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে নিত্যযুক্ত হন তবে দুঃখ-বেদনাকে কোন্ অনাদি উৎস মুখ থেকে আবিষ্কার করব? ভগবান যদি সকল মঙ্গলকর্ম, চিন্তা এবং আনন্দের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন তবে দুঃখের, বেদনার উৎসমুখ কোথায়? এই জটিল প্রশ্নের সমাধান ঘটেছে নানা দর্শনশাস্ত্রীর হাতে নানা উপায়ে। হিব্রু দার্শনিক তোতলের কল্পনায়, খ্রীষ্টধর্মীয় শাস্ত্র শয়তানের প্রকল্পে, পার্শী-ধর্ম আহুর-ই-মান এবং আহুর-ই-মাজদার ভাবনায় জগতের দুঃখ, কষ্ট, অভাব-বেদনার ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। নব্য দর্শনশাস্ত্রীদের মধ্যে অনেকেই আবার এই দ্বৈতবাদকে সমর্থন করেন না। দার্শনিক লোট্‌হা বললেন: "এ তত্ত্ব অভাবনীয় যে, বিশ্বসংসারে পরস্পরবিরোধী সৃষ্টিসত্তা ক্রিয়া-শীল থাকবে।[৫] এই বিরোধী সত্তা-উত্তর উন্নততর কোন তৃতীয় সত্তার স্বীকৃতি ব্যতীত সত্তাদ্বয়ের বিরোধ-পরিণতি অকল্পনীয়।" অন্য দিকে আবার ভগবদ্‌সত্তায় অশুভকে আরোপ করা সমীচীন কিনা তাও চিন্তার বিষয়। পরম কারুণিক সর্বশক্তিমান ভগবানের মঙ্গলময় সত্তায় কেমন করে অমঙ্গল অধিষ্ঠিত থাকে তা ব্যাখ্যা-অতীত। ভগবান যদি সর্বমঙ্গলময় হন তবে অশুভ তাঁর চিদ্‌সত্তায় অপ্রাসঙ্গিক, অনভিপ্রেত। পৃথিবীর অমঙ্গল-অস্তিত্ব উদ্দেশ্য-অপ্রণোদিত। মানুষের আত্মানুশীলনের জন্য অমঙ্গল রয়েছে, এমন ব্যাখ্যাও গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। এই অনুশীলন-তত্ত্বে মানুষের স্বইচ্ছা-বশ্যতা তত্ত্ব অব্যাখ্যাত থেকে যায়। মানুষের কর্মে স্বাধীনতা আছে কিনা এ দুরূহ প্রশ্নের কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না। অমঙ্গলের অনড় অস্তিত্বে আস্থা স্থাপনায় নিরাশা-বাদীরা আপন আপন মতবাদ গড়ে তুলল। নিরপেক্ষ সমা-লোচক বলবেন যে, জীবন এবং জাগতিক ঘটনা-বৈচিত্র্যকে আশ্রয় করে যে দর্শনশাস্ত্র ন্যায়মার্গী হবে, তা আশাবাদী অথবা নৈরাশ্যবাদী হতে পারবে। জীবনকে দর্শনের ভঙ্গির ওপরে এই দুটি প্রান্তিক দর্শন-মতের প্রতিষ্ঠা। দুঃখবাদীর দল জীবন এবং জগৎ-কারণকে ব্যাখ্যা করার জন্য এক শক্তিমান সত্তাকে স্বীকার করবেন। ষড়ৈশ্বর্যশালী ভগবানের কোন গুণেরই অসদ্ভাব থাকবে না এই কারণ-সত্তায়। শুধুমাত্র ভগবানের মঙ্গলময়তা এই সত্তা-কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত থাকবে না। জগতে দুঃখ, বেদনা, অশুভের উপস্থিতি এই কারণ-সত্তার মঙ্গলময়তাকে প্রমাণ করে না। দুঃখকে অস্বীকার না করে মানুষের মঙ্গলময় ভগবদ্‌ধারণার উপযোগী ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা হয়েছে। তাঁরা বলেছেন, দুঃখ পাওয়ার সার্থকতা রয়েছে আত্মশুদ্ধিতে।[৬] এই তত্ত্ব জটিলতর হয়ে ওঠে যখন এর সঙ্গে

৪। Our Knowledge of the External World.

৫। Outlines of a Philosophy of Religion, পৃঃ ১৪০ দ্রষ্টব্য।

৬। মহাদার্শনিক প্লেতো তাঁর Republic গ্রন্থের ৩৭৯-৮০ পৃষ্ঠায় বলেছেন যে, মানুষ দুঃখ পেয়ে আত্মশুদ্ধি লাভ করে। সেটাই তার পরম লাভ।

প্রযুক্ত হয় মানুষের কৃতি বা আত্মস্বাতন্ত্র্যের প্রশ্ন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে৭ বলা হয়েছে যে, মানুষ তাবৎ ভ্রাম্যমাণ যাবৎ সে আপনাকে কর্মপ্রবাহের কর্তা মনে করে। তার ব্রহ্মলাভ ঘটে না। অমৃতত্ব লাভের সম্ভাবনাও তার কাছে সুদূরপরাহত থেকে যায়। ব্রহ্মচক্রে ভ্রাম্যমাণ জীব আমরা। আমাদের স্বরূপ-সত্তার পরিচয় থেকে আমরা বঞ্চিত। এই বঞ্চনার শেষ হয় ব্রহ্ম-সাযুজ্যলাভে। আমাদের সত্তার ব্রহ্মময়তাই যদি সত্য হয় তবে ব্যক্তি-আমির স্ববশ্যতা অস্ববশ্যতার প্রশ্নটি অবান্তর হয়ে পড়ে। আবার মানুষ যদি স্ববশ হয় পরিপূর্ণরূপে তবে আর এক দুরূহ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় আমাদের। ভগবানের সঙ্গে আত্মবশ মানুষের সম্বন্ধ নিরূপণের প্রশ্ন ওঠে। আত্ম-কর্তৃত্বে যে মানুষ বিশ্বাসী, পরম সত্তার ওপর যে অনির্ভর, সে কি বিশ্ববিধাতার প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠে না? তার সঙ্গে তার স্রষ্টার সম্বন্ধের প্রকৃতি নিরূপণ সহজসাধ্য থাকে না। ধর্মীয় যে পরম সত্তা, হিন্দুশাস্ত্র যাকে ষড়ৈশ্বর্যশালী বলেছেন, মানুষের আদিমতম বিশ্বাস যাকে সর্বশক্তিমান বলে মেনে নিয়েছিল, তার সর্বব্যাপ্ত প্রতাপ কি ক্ষুণ্ণ হয় না এই স্ব-ইচ্ছা-অধিষ্ঠিত মানুষের অস্তিত্ব-প্রত্যয়ে? প্লেটো ভগবানের করুণাঘন রূপটুকুকে রক্ষা করলেন তাঁর সর্বশক্তিমানতাকে খর্ব করে। তাঁর কথা উদ্ধৃত করে দিই:

"We must be prepared to deny that God is the cause of all things, what is good we must ascribe to no other than God but we must seek elsewhere and not in him, the causes of what is evil."

অমঙ্গলের উৎস ভগবান নন, এই তত্ত্বই গ্রীক দার্শনিক আমাদের শোনালেন। গ্রীক দার্শনিকেরা অনাদি স্বতন্ত্র বস্তু-সত্তার কল্পনা করেছেন। জগতের অকল্যাণ বুঝি এখানেই নিহিত রয়েছে। তাই বলছিলাম যে, বহুধা-বিস্তৃত দার্শনিক চিন্তা-সর্জন জীবন-বৈচিত্র্য-আশ্রয়ী। জীবনের সমগ্র ব্যাপ্তিটুকুকে দর্শনচিন্তার অন্তর্ভুক্ত করাই হ'ল দার্শনিকের কাজ। এমন কোন অভিজ্ঞতা নেই যার দর্শনের মানদণ্ডে বিচার হয় না। দর্শন জীবনকে ব্যাখ্যা করে তার সমগ্রতায়। দর্শনশাস্ত্রের এই সামগ্রিক আবেদনের কথা উল্লিখিত হ'ল সদ্যপ্রকাশিত একখানি গ্রন্থে।৯ গ্রন্থকার বিজ্ঞানের খণ্ডিত পরিধির উল্লেখ করে বললেন: 'পরন্তু দর্শনশাস্ত্র সমগ্র অভিজ্ঞতাটুকু নিয়ে আলোচনা করে। কোন ব্যতিক্রম নেই, কোন অবচ্ছেদ নেই তার আলোচ্য বিষয়বস্তুতে। যদি অভিজ্ঞতার কোন ক্ষেত্র দর্শনে স্বীকৃতি না পায় অথবা সুপ্রতিষ্ঠ কোন তথ্য অগ্রাহ্য হয় তবে সে দর্শন দর্শন-নাম ধারণের যোগ্যতাটুকু হারায়।' তাই বলছিলাম দর্শন-চিন্তা নানা অভিজ্ঞতার সমপ্রসারী।

দুঃখ-বাস্তবতায় সার্বিক প্রতীতি অনস্বীকার্য। দর্শনে জন্মান্তরবাদের উদ্ভাবন ঘটল এই দুঃখের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে। কোন কোন দেশের দর্শনে জন্মান্তরবাদের স্বীকৃতি মিললেও হিন্দুধর্মে তার যে দার্শনিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তার জুড়ি অন্যান্য দর্শনমতে দুর্লভ।১০ আত্মার অমরত্ব জন্মান্তরতত্ত্বে স্বীকৃতি পেল। আত্মা জীর্ণ বস্ত্রের মত জরা-জীর্ণ দেহকে পরিত্যাগ করে নবজন্মে নতুন দেহ গ্রহণ করে। হিন্দুর দর্শনসার ভগবদ্‌গীতা এই তত্ত্বের১১ প্রচার করলেন। মানব-আত্মা যদি অক্ষয়, অব্যয়, অবিনশ্বর হয়, তবে জন্মান্তরে বিশ্বাস সহজ ও সুসাধ্য হয়। এই পরা-দার্শনিক ব্যাখ্যা ব্যতীত নীতি-দর্শনেও জন্মান্তরবাদের সমর্থন মেলে। এমনতর অভিজ্ঞতা একেবারেই দুর্লভ নয় যে সততা-আশ্রয়ী ধর্মভীরু মানুষ আজীবন কষ্ট পেল আর অসদাচারী মানুষ ঋদ্ধিবান হয়ে উঠল বিশ্ববিধাতার কোন এক দুর্জ্ঞেয় বিধানে। সাধারণ মানুষ মূক বিস্ময়ে পণ্ডিত-জনার পানে তাকাল। দুর্বোধ্যতার ভারে তারা ভ্রষ্টবুদ্ধি। পূর্বদেশের দার্শনিক ভেবেচিন্তে বললেন, 'পূর্বজন্মকৃত কর্মণঃ ইহ ফলরূপেণ পরিণতি।' পশ্চিমদেশের দার্শনিকেরা বললেন, 'Fruiction of antenatal acts'; তত্ত্বটা একই—সেই জন্মান্তরবাদকে স্বীকার। পরমবিচারক হলেন ভগবান। তাঁর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শাস্তি-পুরস্কারের হিসাবনিকাশ ঘটে জন্ম-জন্মান্তরের আবর্তনফলে। কালাতীত ভগবানের কাছে নশ্বর মানব-জীবনের অপরিসর ব্যাপ্তি এতই সঙ্কীর্ণ যে, মানব-কর্মের সবটুকু দেনাপাওনার পুরো মূল্য চুকিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁর প্রয়োজন হয় জন্মজন্মান্তরব্যাপী বিরাট বিস্তৃতির। আজ যে ভ্রষ্টবুদ্ধি মানুষ ঋদ্ধিবান হয়ে উঠেছে তার মূলে রয়েছে পূর্বজন্মের সুকৃতি। আজ যে দুঃখ পাচ্ছে সত্যাশ্রয়ী হয়েও তার প্রত্যাশা রয়েছে জন্মান্তরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। জন্মান্তর-বাদীরা জীবনের এক দুরূহ সমস্যার অনায়াস সমাধান করে দিলেও মার্ক্সবাদীরা এর মধ্যে দেখলেন শ্রেণীশোষণের মন্ত্র-গুপ্তি। যারা শোষিত, যারা সর্বহারা, তাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখা হ'ল আগামী জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের লোভ দেখিয়ে। মার্ক্সবাদীরা জন্মান্তরবাদে শ্রেণীবিপ্লব ঠেকিয়ে রাখার কৌশল প্রত্যক্ষ করলেন। হয়ত মার্ক্সবাদীরা একেবারে ভ্রান্ত নয়,

---

৭। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, ১, ৬।

৮। Republic পৃঃ ৩০৫-৩০৬ দ্রষ্টব্য।

৯। ডক্টর সুশীলকুমার মৈত্রের 'The Main Problems of Philosophy' পৃঃ ৪ দ্রষ্টব্য।

তাদের ব্যাখ্যায় শ্রেণীসচেতনতার প্রোজ্জ্বল স্বাক্ষর থাকলেও এই ব্যাখ্যাকে একেবারে উপেক্ষা করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। ব্যক্তি-পুরুষের চারিত্র-বৈচিত্র্য অনায়াসে ব্যাখ্যাত হয় জন্মান্তর তত্ত্বের সহায়তায়। একই পরিবারের সন্তান-সন্ততি বিভিন্ন চারিত্র-ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান হয়ে ওঠে। প্রায়শঃ এমনটা ঘটে যে, একই পরিবেশে মানুষ হয়ে এক ভাই সাধু, বিদ্বান, সদাচারী হ'ল আর অপর এক ভাই কদাচারী হয়ে উঠল। এমনটা কেন ঘটল? এর উত্তরও রয়েছে ঐ জন্মান্তরবাদীদের কাছে। ওঁরা বলবেন যে, এই জীবনের চারিত্র-উৎকর্ষ যেমন এই জন্মের শিক্ষাদীক্ষা, পরিবেশ-নির্ভর ঠিক তেমনি আবার পূর্বজন্মের সুকৃতিসঞ্জাত উৎকৃষ্ট মনন-ধর্মের উপরও নির্ভরশীল। বীজ বপন করলেই ফসল ফলে না, জন্মান্তরের পলিমাটি-সমৃদ্ধ উর্বর ক্ষেত্রে এ জন্মে যদি সংশিক্ষার বীজ বপন করা হয় তবেই সোনার ফসল ফলে। যার মধ্যে বুদ্ধিদীপ্ত জীবনের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রইল না পূর্ব-জন্মের দুষ্কৃতির জন্য, সে যতই প্রয়াস করুক না কেন বিদ্যার্জনের সব প্রচেষ্টা তার ব্যর্থ হবে। এখানেও জন্মান্তর-বাদ ব্যাখ্যা করে মানুষের এ জীবনের আত্যন্তিক অপূর্ণতাকে। জীবন যেখানে প্রশ্নময় হয়ে ওঠে, আপাতঃ-রহস্যের মায়াজাল মেলে ধরে, সেখানে দর্শন সৃষ্ট হয় মানুষের জানার প্রয়োজনে। সেখানে অনুভূতির তাগিদে আত্ম-নিবেদনের প্রেরণায় মানুষ এক মহৎ সত্তার কল্পনা করে শান্তি পায়, সান্ত্বনা পায়, সেখানে তার ধর্মজীবনের শুভারম্ভ। যেখানে অজ্ঞানতা থেকে জ্ঞানের পথে তার প্রথম পাদ-সঞ্চালন ঘটল সেখানে এল দর্শন। ঐতিহ্যবাহী ভারতীয়, গ্রীক এবং ইউরোপীয় দর্শনে এক সর্বগ্রাসী বিরাট সত্তাকে আশ্রয় করে বিশ্বসংসারের ব্যাখ্যা করতে চাইল। অবশ্য কোন কোন শাখা-মত আবার ব্যতিক্রমী মতবাদকেও যে আশ্রয় করে নি, তা নয়। ভারতীয় মতে দর্শন আত্মজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞানের প্রকৃষ্ট সাধন এবং জীবের মুক্তি-প্রয়োজন সিদ্ধির উপায়। ভারতীয় দর্শনাচার্যগণের মতে দর্শন হ'ল আত্ম-সাক্ষাৎকার বা তত্ত্বজ্ঞানের সাধন-শাস্ত্র। অবশ্য অধ্যাত্ম বিষয় ছাড়াও নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে ভারতীয় দর্শনে। ন্যায়দর্শনে প্রমাণ, প্রমেয় প্রভৃতির বিশদ আলো-চনা আছে, বৈশেষিক দর্শনে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ প্রভৃতির সূক্ষ্ম বিচার করা হয়েছে। সাংখ্যদর্শনে কার্যকারণ সম্বন্ধ ও প্রকৃতির পরিণামের বিস্তৃত আলোচনা দেখা যায় এবং মীমাংসাদর্শনে বৈদিককর্মের অতি সূক্ষ্ম এবং অতি বিস্তৃত পর্যালোচনা করা হয়েছে। কাজে কাজেই দর্শনকে অধ্যাত্মবিদ্যার সমার্থক হিসেবে নেওয়াটা যুক্তিযুক্ত হবে না।[১২] দর্শনে এক বিরাট সর্বব্যাপী সত্তার ধারণার আবিষ্কার ও তদ্দ্বারা সর্ব সৃষ্টির ব্যাখ্যা যে অপরিহার্য, এমন কথা স্বতঃসিদ্ধ নয়। লোকায়ত দর্শনের অস্তিত্ব সর্ব দেশেই প্রত্যক্ষ। নাস্তিকচূড়ামণি চার্বাক, পাশ্চাত্য জড়বাদী দার্শনিকেরা এবং অগস্ত কোম্‌তের মত দৃষ্টবাদীরা তাঁদের দর্শনে আত্মা, ঈশ্বর, পরলোক প্রভৃতির আধ্যাত্মিক তত্ত্বের মূলোচ্ছেদ করেছেন। ইহলোক, ভৌতিক জগৎ এবং মানুষের ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগত সুখসমৃদ্ধির আলোচনাতে তাঁদের দার্শনিক মত-বাদের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। আধুনিক যুগের উগ্র যুক্তিবাদী দর্শনের বাহক এবং প্রচারকেরা বললেন যে, দর্শনের উদ্দেশ্য হ'ল সর্বব্যাপী সত্তের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা নয়; দর্শনের উদ্দেশ্য চিন্তা-স্বচ্ছতা। পরামতের আবিষ্কার দর্শনের অবশ্যকরণীয় কর্ম নয়। দর্শন মানবের জীবনজিজ্ঞাসা-প্রসূত মননকর্মের স্বচ্ছতা-বিধায়ক। মহাদার্শনিক হোয়াইটহেড বললেন:

Philosophy begins in wonder. And at the end when philosophic thought has done its best, the wonder remains. There have been added, however, some group of the immensity of the things, some purification of emotion by understanding.

বিস্ময় হ'ল দর্শন-জননী। এই বিস্ময়ের অন্ত নেই, পার নেই। দর্শন পঠন-পাঠনে এই বিস্ময়ের নিরসন হয় না। তবে বিশ্বের বিরাটত্ব সম্বন্ধে ধারণা হয় আর মানুষের মনন-শীলতা অনুভূতির শুদ্ধি ঘটায়। ইংরেজী 'ফিলজফি' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হ'ল জ্ঞানানুরাগ। জ্ঞানানুরাগই যদি দর্শনের স্বরূপ-লক্ষণ হয় তবে বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের প্রভেদ করা দুরূহ হয়ে পড়বে। অবশ্য এমন কথা হয়ত বলা চলবে যে, বিজ্ঞান খণ্ডজ্ঞানের আধার আর দর্শন পূর্ণ জ্ঞানের। পৃথক্‌করণের এই সীমারেখাকে অগ্রাহ্য করলে এবং বিজ্ঞানের প্রামাণ্যের দিকটাকে যথাযথ স্বীকার করে নিলে দর্শনের আর প্রয়োজন থাকে না। এই জন্যই ন্যায়সাপেক্ষ দৃষ্টবাদীর দল (Logical Positivists) 'দর্শন' নাম ত্যাগ করে 'ন্যায়-সাপেক্ষ দৃষ্টবাদে'র কথা প্রচার করেছেন পরম নিষ্ঠার সঙ্গে। তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণী হ'ল অদূরভবিষ্যতে দর্শন বলে কোন শাস্ত্র থাকবে না।

১০। ডক্টর সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃত 'The Fundamentals of Hinduism' গ্রন্থের 'The Doctrine of Rebirth' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১১। গীতা, ২, ১২-১৩, ১৮, ২২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

১২। বিস্তৃত আলোচনার জন্য ডাঃ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃত 'তত্ত্বজিজ্ঞাসা' গ্রন্থে দর্শনের স্বরূপ প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

নূতন প্রশ্ন

শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পিতামাতার শেষ কাজ মিটিয়ে ফুরসৎ পেয়ে সুনীতি যখন তার হৃতসর্বস্ব ভাগ্যটার কথা ভাবতে বসল তখন চারিপাশে তাকিয়ে দেখল, সে এদেশে আর যাই করুক সংসারে একা থাকতে পারবে না, যত শক্তই হোক। তাই সামান্য একখানা ঠিকানার ক্ষীণ সূত্রে ধরে এ জগতে তার একমাত্র জীবিত আত্মীয় দূর সম্পর্কের দাদা শিবনাথকে চিঠি দিল। যদিও শিবনাথের মুখখানা ঝাপসাও মনে করতে পারল না। সে ফেরত-ডাকে উত্তর পেয়ে গেল, চলে এস। চিঠিতে, যে ক্ষতিটা হয়ে গেল যথাসময়ে তার খবর না দেওয়াতে অনুযোগ এবং দুঃখপ্রকাশের আরও গোটাকতক কথা ছিল।

অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে সামান্য কয়েক শ' টাকা এবং একটামাত্র পোর্টম্যাণ্ট সম্বল করে সুনীতি একদিন পানিহাটীতে তার দাদার কোয়ার্টারে এসে উঠল। সে সেখানে একটা সুপ্রতিষ্ঠিত ফ্যাক্টরীর বড়বাবু। শিবনাথের বাজে-কাজের ঘরখানা এতদিন পরে কাজে লাগল। আর একটা উঞ্ছবৃত্তি বন্ধ হ'ল। উড়নচণ্ডী হাজারী সংসারের কাজ-কর্মগুলো অল্প অল্প করে শিখে নিল। এ আজ পাঁচ বছর আগেকার কথা।

তার পরে কখন কোন্ সময়ে তাদের সম্পর্কের মধ্যের ব্যবধানটা ঘুচে গিয়ে আর একটা নতুন সম্পর্ক অঙ্কুর-উদ্গমের মত প্রবল শক্তি নিয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল, তা তারা উভয়েই টের পেল না!

টেবিলে গালার পালিসের উপরে নক্সাকাটা ড্রাগনটা সুদ্ধ চীনীয় ফুলদানীর ছায়া পড়েছে। স্নান করে অপর্য্যাপ্ত গাঢ় কালো চুলগুলি পিঠে এলিয়ে দিয়ে সুনীতি ঘরে ঢুকল। টেবিলের কাছে সরে গিয়ে বলল, বইটা তুলুন। শিবনাথ মনোযোগ দিয়ে একখানা ইংরেজী উপন্যাস পড়ছিল। সে বইখানা নিয়ে পিছনে হেলে বসলে, সুনীতি সাবধানে রজনীগন্ধাগুলো তুলে সেখানে একটা প্রকাণ্ড সূর্য্যমুখী বসিয়ে দিলে। ঘুমন্ত কচি ছেলেকে বিছানায় শুইয়ে দিতে আর-একজনের কোল থেকে নিয়ে তার সঙ্গে দুটো কথা বলার জন্যে মা যেমন দাঁড়ায়, সে তেমনি ফুলগুলোকে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, আজ কলকাতায় যাবেন? বইতে অক্ষরে অক্ষরে কাহিনীর যে ভাবটা ধরা পড়েছে শিবনাথ তখন সেখানে। সে সেই বিষয়ে চিন্তা করতে করতে বলল, কেন?

সবুজ ডাঁটাগুলো থেকে জল পড়ে তার সাদা শাড়ীর জায়গায় জায়গায় ভিজে গেছে। এই ভাবে ভিজে গিয়ে তার সমস্ত অস্তিত্ব ফুলের মতই আর্দ্র হয়ে উঠল। সে বলল, মিস লুইসকে নিষেধ করে আসবেন, কাল থেকে পড়ব না।

পূর্বে কখন এ আলোচনা হয় নাই, ভবিষ্যতে হতে পারে, তার অনুমান পর্য্যন্ত নেই। তাই শিবনাথ মুখ তুলে বলল, কিন্তু কেন পড়বে না—আমাকে কি এরই মধ্যে অক্ষম জেনে নিলে।

সুনীতি 'না' বলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে পুনরায় বলল, তা নয়। আমি খরচ কমাচ্ছি আর একটা কারণে।

শিবনাথ বলল, সংসারের খবর নিতে পারি না। বোঝা দিয়ে নিশ্চিন্ত।

সে একথার প্রতিবাদ করে বলল, যা এনে দিচ্ছেন তাতে চলে যাচ্ছে। কিন্তু আমি খরচ বাঁচালাম—না থাক এখন বলব না।

শিবনাথ বইটা রেখে দিল। টেবিলে ঝুঁকে বসে বলল, জমানো ভাল কথা যদি উদ্বৃত্ত থাকে। আর একটু খাটলে আরও কিছু আয় করতে পারি। আজ গিয়ে আপিসে সেই ব্যবস্থাই করে আসব।

সুনীতি প্রবল বেগে ঘাড় নেড়ে আপত্তি করল, আমি তা বলি নি। আপনি চাইলেও আমি তা দেব কেন। এই যা করছেন, এর পরে আমারই বিধাতা আমাকে নিন্দে করবে।

শিবনাথ বলল, সংসারে শুধু কি দিলাম,—সে আরও কি বলতে গেল। কথাগুলো বলতে না পেরে একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলল, থাক, হিসেবনিকেশ করার দিন যদি কখনও আসে সেদিন শুনো।

সুনীতি একদিন তার ডান হাতখানা পেতেছিল, সে-হাত গুটিয়ে নেবার অবকাশ তার আর এল না। সে নিলে, অহরহ এই লজ্জায়ই মর্ম্মে মরে গেল। শিবনাথ জানায়, এ তার প্রাপ্য, তার অধিকার শুধু নয়—সেও পেয়েছে বই কি! সুনীতি এ সমস্ত বিশ্বাস করে না, তাই সে বলল, উপোসী দেবতা মন্দিরে থাকে না, থাকতে পারে না।

সুনীতি নেই। তার বিচিত্র অতলান্ত মনের শেষ সীমায় যত দূর পারল ডুব দিয়ে তলিয়ে গিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও

একটাও মণিমুক্তা তুলে আনতে পারল না। সে দক্ষ ডুবুরী নয়, তাই ওই মিথ্যা তলিয়ে গেল। শিবনাথ কথাগুলোর তাৎপর্য্য বুঝতে পারল না, আর তা পারল না বলে সেগুলো ভুলেও গেল না। খোলা বইখানার সামনে বসে তার তুচ্ছ কথার সূক্ষ্ম ভাবের হিসাব নিতে লাগল।

সকাল ন'টায় তাকে খাইয়ে একসেট আনকোরা পোশাক বার করে দিয়ে সুনীতি বলল, এ মাসে এই হাওয়াই সার্ট, ট্রাউজারটা করিয়েছি, আজ পরে যান।—দেখি, কি রকম ফিট করল।

—এগুলো কবে করালে!

সুনীতি বলল, বাঃ, ভুলে গেলেন! এই ত সেদিন অনিল এল, গায়ের মাপ নিলে।—আলমারী বন্ধ করে চাবি দিতে দিতে বলল, সব ভুলগুলো ধরিয়ে দিতে কি চিরদিন কেউ থাকবে!

শিবনাথ ভীত হয়ে বলল, তুমি চলে যাবে!

ভোলানাথ! আমি শুধু তোমাকে খাওয়াবো, পরাবো, তোমার ঘর গুছিয়ে দেব, আর কিছু না! তুমি কেন বোঝ না। তুমি কি সংসারে থাকো না? তুমি ব্রহ্মচারী, সাধু, যতি—তুমি কি পাষাণ! তোমার রক্তের রং কি লাল নয়? তার সারা শরীরটা একবার থরথর করে কেঁপে উঠল। সুনীতি মৃদুকণ্ঠে বলল, আমাকে কি চিরকাল ধরে রাখবেন! একদিন নিজের সংসার ত হবে।

শিবনাথের এই পৃথিবী। এই পৃথিবীর বাইরে শিবনাথ পা দেয় না, ভাবে না, সে একথা জানে। শিবনাথ আশ্বস্ত হ'ল, হাঁফ ছেড়ে বলল, ও তাই! আমি কি রকম ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

ছাড়া ধুতিখানা নিয়ে পাট করতে করতে সুনীতি বলল, কলম, চশমা, ঘড়ি সব টেবিলে রেখে দিয়েছি, নিতে ভুলবেন না। শিবনাথ আপিসে গেল। ছাড়া ধুতিখানা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে সে ভুলেই গেল, ভাবনায় ডুব দিল। ফুটন্ত দুধে লেবুর রস মিশালে সেই দুধটা যেমন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়, সে তেমনি তার অন্তরটা ছিন্নভিন্ন করে দেখল। সে গিঁটায় গিঁটায় বাঁধা পড়েছে। এ বাঁধন ছিন্ন করলে তার বুকখানা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে, হৃদপিণ্ডের সমস্ত রক্ত একসঙ্গে বেরিয়ে আসবে, ছড়িয়ে পড়বে। সুনীতি উন্মত্তের মত আর্ত্তনাদ করে উঠল, না না, আমি পারব না! এই মুহূর্ত্তে হাজারী উচ্ছিষ্ট থালাবাসন নিতে এসে বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে গেল। বলল, কি হয়েছে দিদি?

দেহের সমস্ত রক্ত মুখে উঠে এল, অপরিসীম লজ্জায় লাল হয়ে উঠে সে আঁচলে মুখ ঢাকল—কিছু না, কিছু না—বলতে বলতে ঘর থেকে পালিয়ে গেল।

সংসারের স্থূল প্রয়োজন মিটিয়ে দিন কাটাতে কাটাতে অন্তরের সূক্ষ্ম বাসনাগুলো কখন কোন অসতর্ক মুহূর্ত্তে আত্মপ্রকাশ করে বলা কঠিন। কিন্তু যখন প্রকাশ হয়ে পড়ে, তার তীব্রতা তখন একমাত্র ইটালীর ভিসুবিয়াসের সঙ্গেই তুলনা করা চলে। অনেক দিন ধরে কুরে খেতে খেতে একদিন সমস্ত শক্তি নিয়ে ফেটে পড়ে। সুনীতি তার ওই একটা ক্ষুদ্র বুকে গোটা ভিসুবিয়াসটা নিয়ে এযাবৎ দিন কাটিয়ে আর পারে নি। এতদিন যে সত্যটা সন্দেহে শঙ্কায় পুরাপুরি বুঝে উঠতে পারে নি, আজ সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে সেই সত্যটার অন্তর্নিহিত রূপের একমাত্র নির্দ্দেশ পেয়ে গিয়ে সে লজ্জায় মধুর, সঙ্কোচে লাল হয়ে উঠল। সে কারণে-অকারণে ব্রীড়াবনত, অপবিত্র ভাবের মানসিক নির্যাতনে কুণ্ঠাবোধ নেই। আজকাল সে সাদা কথাটা সাদা করে দেখে না।

শিবনাথ আপিসে ওভারটাইম কাজ করে উপার্জ্জন বাড়িয়েছে। সংসারে পুরানো ব্যবস্থা বহাল আছে। বাজারের তরিতরকারীর সঙ্গে প্রত্যহ ফুলটাও আসে। সে এইমাত্র আপিস থেকে ফিরেছে। গায়ের সার্জের কোট খুলে আলনায় রাখতে গেলে সুনীতি দু'পা এগিয়ে গিয়ে বলল, আমাকে দিন। সেটা হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে বলল, বসুন। চা নিয়ে আসি।

শিবনাথ চেয়ারখানায় বসে একখানা বই টেনে নিল। না পড়ে একটার পর একটা পাতা ওলটাতে লাগল। মানুষের ভাবনার বিষয়গুলি গড়িয়ে গড়িয়ে যে পথে অগ্রসর হয় সে পথের সমস্ত বিস্তারটা মসৃণ নয়। পথের দু'ধারের ফুল, লতাপাতা সুরভি ছড়িয়ে মুগ্ধ করে। পথিক একবার রওনা হয়ে পথটা বহুবার আবর্ত্তন করে। কিন্তু অলক্ষ্যে অজ্ঞাত সেই মসৃণ পথ অতিক্রম করে মানুষ কখন আর এক ধাপ এগিয়ে যায়, তার হুঁস থাকে না। পথের দু'দিকে তাকিয়ে দেখে লতাপাতা ত দূরের কথা, একগাছি সবুজ ঘাসও নেই। তার দু'পাশের রুক্ষতা বীভৎসতা দেখে শিউরে ওঠে। শিবনাথ তার বাঁ পাখানা বাড়িয়েছিল। কিন্তু ওইটুকুর চেহারা দেখেই আতঙ্কে চীৎকার করে উঠল, না না!

এই ছোট ছুটো কথার একান্ত আবেগের তরঙ্গ গিয়ে আছড়িয়ে পড়ল সুনীতির হাতে গরম চায়ে। সে সমস্ত শরীরে একবার বিদ্যুতের প্রচণ্ড শক্তি অনুভব করল। কঠিন সংযমে শান্ত হয়ে চায়ের কাপ নিয়ে এগিয়ে গিয়ে বলল, কি না, কি ভাবছেন!

শিবনাথ অসহায় চোখ তুলে তার চোখের দিকে তাকিয়ে পরক্ষণে মুখ নামাল, অসংলগ্ন প্রলাপ বকে উঠল, না—মানে—কিছু না!

মনে যে ভাবেরই উদয় হোক, সুনীতি সেগুলো প্রশ্রয় না দিয়ে বলল, ক্ষুর এনে দিই।

শিবনাথ রাত্রে দাড়ি কামিয়ে স্নান করে বিছানায় ওঠে। এতক্ষণ ধরে ক্ষুব্ধ ঝড়ের উজানে পথ হেঁটে এসে সে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সে নতকণ্ঠে বলল, আন।

স্নান করে খেতে বসে আজ সে খেতে পারল না। সুনীতি অনুযোগ করল, ও কি! কিছুই খেলেন না, উঠে পড়লেন!

—কি জানি, খেতে ইচ্ছে নেই। সে আঁচিয়ে ঘরে গেল।

তামাকের টিন ইত্যাদি বিছানায় রেখে সুনীতি এক-পাশে সরে দাঁড়িয়ে সিগারেট পাকানো দেখতে লাগল।

শিবনাথ একটা সিগারেট ধরিয়ে ওই ধুম্রকুণ্ডলীর মত বিষয়টার কথা ভাবতে লাগল। সুনীতি জিজ্ঞাসা করল, শরীর ভাল?

শিবনাথ এত তন্ময় হয়ে বিষয়টা ভাবছিল যে, সে প্রথমে কথাটা শুনতে পায় নি। অনেকক্ষণ পরে বলল, কি বললে?

—বলছি, শরীর ভাল?

—হাঁ, তুমি যাও অনেক রাত হ'ল।

—শুয়ে পড়ুন, মশারী ফেলে দিয়ে যাই।

শিবনাথ বলল, তুমি কষ্ট করবে কেন, আমি ফেলে নেব।

সুনীতি মৃদু হেসে বলল, পুরুষমানুষের জন্যে সংসারে এটুকু করতে হয়। না হলে তারা সারাদিন বাইরে খাটবে কি পেয়ে!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে শিবনাথ বলল, চিরদিন কি তুমি থাকবে!

—যাতে চিরকাল থাকি সে ব্যবস্থা করুন। পরমুহূর্তে লজ্জায় কুণ্ঠায় সুনীতি নিজেরই হাতে মুখ চেপে ধরল।

শিবনাথ কথাটা খেয়াল করে নি, সে তারই ভাবনার পুনরাবৃত্তি করে বলল, ভাবতে পারি না, এ সংসারে তুমি নেই!

সুনীতি একথার উত্তর না দিয়ে মশারী ফেলে খাটের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে তোশকের ভাঁজে গুঁজে দিল। টেবিলের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে বলল, ঘুমিয়ে পড়ুন।

অসংখ্য ছোটবড় তারা সমস্ত আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। সুনীতি বাইরে বেরিয়ে উন্মুক্ত আকাশের দিকে চেয়ে বলে উঠল, ভগবান! পৃথিবীর সমস্তকিছুর অস্তিত্ব বিস্মৃত হয়ে সে নিবিড় চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেল। আকাশের মতই ব্যাপক বিস্তারে তার সেই চিন্তার বস্তু দিগ্বিদিকে প্রসারিত হ'ল! আলো নেই, অন্ধকার নেই, সুন্দর নয়, মন্দ নয়, মানুষের অনুভূতি অতিক্রম করে সমস্তকিছুর ঊর্দ্ধে শুধু এক শূন্য বস্তুর আকর্ষণে সে এই কেন্দ্রহীন বিস্তারে ভেসে বেড়াল। সেখান থেকে ফিরবার শক্তি নেই। এই রাতটা সে দাঁড়িয়ে কাটাত। শিবনাথের ডাকে বাস্তবের সংসারে ফিরে এল। সে তার উপলব্ধির কথা ভুলতে পারল না, বলে উঠল, কেন তুমি টানছ? এ পাপ!

শিবনাথ কিছুই বুঝতে না পেরে বলল, কে টানছে, কি পাপ!

নিজেকে ফিরে পেয়ে সুনীতি অপ্রতিভ কণ্ঠে জড়িয়ে জড়িয়ে বলতে লাগল, আপনি বেরুলেন কেন, জল রেখে দিই নি বুঝি, একেবারে ভুলে গেছি। ঘরে যান, নিয়ে যাচ্ছি। বুকের যে একান্ত ইচ্ছাটাকে এইভাবে প্রকাশ করে ফেলেছে সেটাকে ঢাকবার জন্যে বিহ্বল শিবনাথকে ওইখানে দাঁড় করিয়ে রেখে সে পালিয়ে গেল।

রাত্রির স্তব্ধতায় তারা যেভাবে নিজেদের উন্মুক্ত করে দিলে, দিনের আলোয় তা কিছুতেই পারত না। তারা প্রথম লজ্জার হাত থেকে এই ভাবে নিষ্কৃতি পেয়ে গেল।

শিবনাথ এখনও শুয়ে আছে। সুনীতি ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মশারীর জালের মধ্য দিয়ে আবছায়া অন্ধকারে দু' চোখ ভরে তাকে দেখল। মানুষ ঘুমোলে বোধ হয় ওই টেবিল-চেয়ারের মত জড় পদার্থে পরিণত হয়! সুনীতি তার শিয়রে গিয়ে দাঁড়াল।

শিবনাথ সকালে নিদ্রার তরল আমেজটুকু উপভোগ করছিল। স্পর্শমাত্র ডান হাত দিয়ে তার হাতখানা ধরে বলে উঠল, কে!

এইভাবে ধরা পড়ে যাওয়াতে সুনীতি না পারল সাড়া দিতে, না পারল হাতখানাকে মুক্ত করে ঘর ছাড়তে। ধৃত বন্দী হাতখানাকে নিয়ে কি করবে ঠিক করতে না পেরে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকল।

পূর্ব্বদিকে উন্মুক্ত জানলা দিয়ে উদয়সূর্য্যের লাল আভা ঘরখানাকে নতুন করে সাজিয়ে দিয়েছে। রজনীগন্ধার বিষণ্ণ পাপড়িগুলো মলিন মুখে অবনত। ডাঁটায় কতকগুলি কুঁড়ি নয়ন মুদে এখনও কিসের অপেক্ষা করছে। সাড়া না পেলেও শিবনাথ বুঝেছে কার হাত। সে বলল, ওই সূর্য্যটা কি এর আগে কোনদিন উঠেছে!

সুনীতি তার কথার উত্তর না দিয়ে হাতখানা ছাড়িয়ে নিতে নিতে নতকণ্ঠে বলল, ছাড়ুন। সকালে এ ঘরের যে কাজটা সে হাসিমুখে করত তা না করে চলে গেল।

স্নান করে ফরসা সাদা শাড়ী পরে সে যখন পুনরায় এ

ঘরে এসে দাঁড়াল, তখন তাকে দেখে গত রাত্রের সুনীতি বলেই মনে হ'ল না। সে ক্ষিপ্রহস্তে বাসি ফুলগুলো তুলে নিয়ে ফুলদানীতে একটা টাটকা ফুল বসিয়ে দিয়ে বলল, এখনও শুয়ে আছেন, ঘড়ি দেখেছেন?

শিবনাথ হাই তুলে বলল, উঠতে ভাল লাগছে না।

—ন'টা বাজল।

—বাজুক।

—আপিসে যাবেন না?

—না, কোথাও যাব না। এ ঘর ছেড়ে আজ স্বর্গেও যাব না।

দীর্ঘদিন এসংসারে থেকে সুনীতি একবারও মনে করতে পারল না যে, সে এতখানি চপল। শিবনাথ শুধু চপলতা করে নি ছেলেমানুষী করেছে। সে কৌতুক করে বলল, স্বর্গে কি কি বস্তু মেলে সে জ্ঞান থাকলে কি এ ক্ষুদ্র ঘরখানা আঁকড়ে পড়ে থাকতেন। আপিসে না গেলেন, তা বলে আর শুয়ে থাকতেও দেব না। উঠে পড়ুন।

যে অদৃষ্ট বুকের মধ্যে বসে অহরহ মানুষকে চালায়, কোন মানুষকে নিয়ে সে কি করতে চায় তার ইচ্ছার কথা সেই জানে, সেই বলতে পারে। আজ সকালে সুনীতি ভেবেছিল, তার এ মুখ নিয়ে শিবনাথের সামনে কিছুতেই দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু এক ঘণ্টাও যায় নি।

শিবনাথ ডাকল, শোন।

সুনীতি তাকে আড়চোখে দেখে বলল, কেন?

—এস, বলব।

—না।

সে কতখানি দৃঢ়তার সঙ্গে 'না' বলতে পারল তার পরিমাপ করতে গিয়ে শিবনাথ এই কথাটা বুঝল যে, এই 'না' সেই 'না' নয়, যা তার সমস্ত অর্থ নিয়ে হাজির হয়, পৃথিবীতে ইতিহাসকে শক্তিশালী করে। তার আনত মুখের দিকে চেয়ে শিবনাথ বলল, যা শুনতে চাও না সেটাই কি সত্য?

সুনীতি নতমুখে নীরবে কি ভেবে পরিপূর্ণ চোখে তাকে দেখে পুনরায় চোখ নামিয়ে নিলে। হেঁটমুখে আস্তে আস্তে বলল, জানি না। আপনি উঠে পড়ুন। আমি চললাম।

শিবনাথ উঠে বসল, বলল, আমি আকাশের ভগবান বিশ্বাস করি না, বুকের ভগবান মানি। তোমার সে ভগবানকে আর কোন মহৎ বস্তু দিয়ে ঢাকছ, বলে যাও।

সুনীতির পা দুখানার গতি শ্লথ হয়ে গেল। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়ে সে বলল, সংসার।

শিবনাথ সুদৃঢ় প্রশ্ন করল, সংসার কি শুধু হাজার বছরের একটাই অর্থ নিয়ে পড়ে থাকবে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের নতুন অর্থ তোমার সংসার মানবে না?

সুনীতি দ্বিধায় অস্পষ্টতায় বলতে লাগল, যে নবজীবন কল্যাণের বলে জানি না, তা নতুন হলেও মেনে নিই কি করে? মনের সমস্ত ইচ্ছে সমাজে কোনদিন স্থান পেয়েছে?

—কিন্তু মানুষের দামও কি আর কিছু থেকে কম? এর মূল্য স্বীকার করে কোন ইতিহাস কি রচিত হয় নি?

সুনীতি বলল, বিড়ম্বনা তারা কম ভোগ করে নি।

—তাতে অন্তরের মাধুর্য্য এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নি।

সুনীতি অন্তরে বাইরে আর বুঝতে না পেরে ম্লান-বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল, কেন আমাকে টানছেন! বহু ব্যবহারে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মাধুর্য্যও নষ্ট হয়।

শিবনাথ কি একটা বলতে চেয়েছিল কিন্তু তার ওই স্পষ্ট কথার সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে অপরিসীম বেদনা বোধ করে খোলা জানলাটার দিকে চাইল, কথাটা বলল না। তার করুণ অসহায় মুখের দিকে চেয়ে সুনীতি আহত কণ্ঠে বলে গেল, আমাকে ক্ষমা করবেন।

শিবনাথ অলস ভাবে পড়ে আছে। তার উঠবার স্পৃহাটা পর্য্যন্ত লোপ পেয়েছে। কে যেন কি একটা কঠিন বস্তু দিয়ে তার মাথায় প্রচণ্ড জোরে আঘাত করেছে। তার মাথায় কিছু ঢুকছে না, সে ভাবতেও পারছে না। সে চেয়ে আছে, তার দৃষ্টি ঝাপসা, ফাঁকা, এ ঘরের কোন কিছুই তার চোখের তারায় ফুটছে না।

হাজারী এক কাপ গরম চা হাতে করে ঘরে ঢুকে ডাকল, বাবু!

—হুঁ।

—চা এনেছি। আর কতক্ষণ বসে থাকবেন।

শিবনাথ যন্ত্রের মত তার হাত থেকে কাপটা নিয়ে কি ভেবে বলল, হাজারী! আমরা আগে ভাল ছিলাম, না!

বাবু কোন্ বিষয়ে ভাবছে বুঝতে না পেরে হাজারী দুবার মাথা চুলকিয়ে বলল, না বাবু। তেনারা না থাকলে কি ঘরবাড়ী মানায়। দিদি আছেন, বাইরে বেরুলে লোকে বলে, হাজারী তোর বাড়ীটা যেন হাসছে! আজ এই প্রথম এই বাড়ীর সুখ্যাতির কথা বলতে পেরে হাজারীর বুকখানা ফুলে উঠল।

শিবনাথ এত কথার উত্তরে শুধু বলল, দিদিকে তোর ভাল লাগে?

হাজারী এ কথার উত্তর না দিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

এর পরে কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল। সুনীতি দীর্ঘ পাঁচ বছর উৎকণ্ঠায় অপেক্ষায় তার তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রয়োজন মিটিয়ে দিনগুলো ভরিয়ে তুলে সার্থক। এখন সে সামনে

আসে না, দাঁড়ায় না। এসব সত্ত্বেও শিবনাথ লক্ষ্য করে, আড়ালে আর একজনের দৃষ্টি না থাকলে হাজারীর চোদ্দ পুরুষের সাধ্য নেই কাজগুলো এমন নিখুঁত ক'রে করে। সে ফুলদানী নিয়ে কাজ করলে একফোঁটাও জল টেবিলে পড়ে না। আলমারী খুলে জামাকাপড় বার করলে একখানা গেঞ্জীও থাকের থেকে সরে গিয়ে এদিক-ওদিক হয় না। সামনে হাজির না থাকলেও শিবনাথ বেরিয়ে গেলে সুনীতি ছুটে আসে, তার ঘরের সমস্ত কিছুর ঘ্রাণ নেয়, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে।

মিথ্যা অভিমানের নিরর্থক সঙ্কোচে সুনীতি সারাক্ষণ ঘুরে বেড়ায়। অকস্মাৎ শিবনাথ সামনে পড়ে গেলে সে স্পর্শ বাঁচিয়ে পাশ কাটিয়ে সরে যায়। কিন্তু ওই ভঙ্গীটুকুর মধ্যেই বলে দেয় তার নিরুপায় দুঃখময় জীবনের কথা। এইভাবে আরও কতকাল কাটত বলা কঠিন। একদিন শিবনাথ প্রবল জ্বর নিয়ে আপিস থেকে ফিরল। সে কাঁপতে কাঁপতে কোনরকমে বিছানায় উঠে ক্ষীণকণ্ঠে ডাকল, হাজারী,এক গ্লাস জল দিয়ে যা! তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে!

পীড়িতের এ তৃষ্ণা সুনীতি বুকে হাত দিয়ে অনুভব করল। সে বুকে তীব্র জ্বালা নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকল, তবু কার এক অলঙ্ঘনীয় নির্দ্দেশে ক'পা এগিয়ে গিয়ে শিবনাথের মুখে জলের গেলাসটা তুলে দিতে পারল না। হাজারীকে দিয়ে এক গ্লাস জল পাঠিয়ে দিল। সমস্ত মনপ্রাণ চাইলেও শিবনাথ হাজারীকে বলতে পারল না, সুনীতিকে পাঠিয়ে দে। সে জল খেয়ে জ্বরে বেহুঁশ হয়ে এ রাতটা কাটাল। কখন ডাক্তার এল, তাকে দেখে গেল, ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা হ'ল তার স্মরণ নেই। তৃতীয় দিন সকালে চোখ মেলে সে একটু ভাল বোধ করল। কপালে কার হাতের শীতল স্পর্শ পেয়ে পাশ ফিরে আরামে একরকম বিচিত্র শব্দ করে প্রশ্ন করল, ক'দিন ভুগলাম?

কথা আটকিয়ে গেল। সুনীতি আঁচলে চোখ মুছে বলল, তিন দিন।

শিবনাথ দুর্ব্বল ক্ষীণকণ্ঠে বলতে লাগল, তোমরা ঘরে ঢুকছ, যাচ্ছ; কি বলাবলি করছ বুঝতে পারছিলাম, কিন্তু আশ্চর্য্য, খেয়াল করতে পারছিলাম না আমার কি হয়েছে! —আমার কি অসুখ?

—ইনফ্লুয়েঞ্জা। তার অবিন্যস্ত চুলগুলো ঠিক করে দিতে দিতে সুনীতি প্রশ্ন করল, ভাল বোধ করছেন?

—হুঁ।

সে শিয়র থেকে পাশে সরে এসে র‍্যাগটা টেনে তাকে ভাল করে ঢেকে দিয়ে বলল, একা থাকুন, গরম জল আনি। হাজারীকে বাজারে পাঠিয়েছি কিনা।

কপালের জোর শিবনাথ বেশীদিন ভুগল না। সুপথ্য ও সুসেবায় সে তাড়াতাড়ি বল ফিরে পেল।

শিবনাথ আজ আপিসে যাবে। সুনীতি তাকে এক ঘণ্টা আগে খাইয়ে ইজিচেয়ারে বসে বিশ্রাম করতে বলে গেছে। রান্নাঘরে তাড়াতাড়ি একটা কাজ শেষ করে সে এ ঘরে ঢুকল। শিবনাথের যে কাজগুলো সে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছিল সে কাজগুলো পুনরায় নিজের হাতে নিল।

চেয়ারে বসে বাঁ পায়ে মোজা পরতে পরতে শিবনাথ বলল, ঠিকাদারবাবুর সঙ্গে বসে কথা পাকা করতে পারলাম না।

তার কথা শেষ না হতে সুনীতি বলল, জ্বরের মধ্যে এসেছিলেন, আমি কথা বলেছি, আজ তিনটের সময় আসবেন।

—আচ্ছা।

শিবনাথ দশ হাজার টাকায় তাকে একতলা ছোট বাড়ী করে দিচ্ছে। বাড়ীর নক্সা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজকর্ম্মগুলো হয়ে গেছে। ঠিকাদারবাবুকে কেবল একটা সুদিন দেখে ভিত খুঁড়তে বলাটাই বাকী। শিবনাথ যেতে যেতে বলে গেল, তুমি তা হলে দিনটা পাকা করে নিও।

জ্বরটা গেলেও উপসর্গ গেল না। মাথা ভার, শরীর দুর্ব্বল লেগে থাকল। শিবনাথ বিকেলে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে সুনীতিকে ডেকে বলল, বড় দুর্ব্বল লাগছে।

—তা দু'একদিন লাগবে। এত বড় জ্বরটা গেল। বাইরে বারান্দায় ইজিচেয়ার পেতে দিতে বলেছি, জামাকাপড় ছেড়ে আসুন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। অন্ধকার আকাশে তারারা কেবল ফুটছে। সামনের বাগান থেকে সন্ধ্যার ফুলের সুরভি ভেসে আসছে। শিবনাথ ক্লান্তিতে চোখ বুঁজিয়ে বসে থাকল।

সুনীতি ডান পাশে। শিবনাথ বলল, পড়া ছেড়ে দিলে এর পরে কি করবে?

সুনীতি বলল, কি করব ভেবে কিছুই আরম্ভ করি নি। অনেক পথ হেঁটে মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে ভাবলে সত্যি উত্তর পাওয়া যায় না। যতদিন বাবা ছিলেন, মা ছিলেন তাঁরা ভেবেছেন। তার পর। তার পরে—

শিবনাথ বলল, তার পরে কি?

সুনীতি মৃদু হেসে বলল, নিজেই জানি না। সে সুকৌশলে কথাটা এড়িয়ে গেল।

শিবনাথ ওই ভাবে আধশোওয়া হয়ে থেকে সুনীতির বাঁ হাতখানা তুলে নিল। সে আজ বাধাও দিল না প্রতিবাদও

করল না। তার পাশে দাঁড়িয়ে সেও দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। শিবনাথ বলল, বল, তুমি কোথাও যাবে না।

সুনীতি বাঁ হাত দিয়ে শিবনাথের চুলগুলো টেনে টেনে দিতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে বলল, আমাকে দূরে পাঠাবার আর কে আছে!

এই সামান্য কথাটার অসামান্য অর্থটা বুঝে নিয়ে নিজকে অপরাধী মনে করে শিবনাথ প্রশ্ন করল, তুমি কি যেতে চাও নীতি?

সুনীতি বলল, আমার ভালমন্দর ভার আপনার ওপর।

—এত বড় কাজ আমাকে দিও না। বিচার ত আমি জানি না।

—আমার সমস্তই তোমাকে দিয়েছি। এর দায়িত্বও তোমার।

তার এই নতুন ডাকে শিবনাথ চমকে উঠল। সে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথা বলতে পারল না। এই নতুন ভাবনার কথা ভাবতে লাগল। এক সময়ে ধরা গলায় বলল, আমাকে এ কি কঠিন পরীক্ষায় ফেললে।

সুনীতি তার হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

শিবনাথ কিছুক্ষণ পরে প্রশ্ন করল, নীতি আমার ভালবাসা কি সত্যই অপরাধ!

সুনীতি বলল, যে প্রেম সংসারে যা ক্ষুদ্র যা তুচ্ছ তাই নিয়ে তুষ্ট সে অনুদার। অপরাধ আমি বলছি নে, প্রত্যেকে নিজে নিয়ম করে নিজের পথে চললে সংসারে বাঁধন থাকে কি করে।

তবে এর সার্থকতা কোথায়? আর কোন বড় আশায়?

—বাঁধা পথে চলতে না পারলে বলি হতেই হয়।

—এর কি কোন দ্বিতীয় উপায় নেই?

—না।

—একে অস্বীকার ত করা যায়?

সুনীতি মৃদু হেসে বলল, সংসারের কোন নিয়মটাকে ভাঙা যায় না। নিয়ম লঙ্ঘন করা অনুদার মনের পরিচয়। এ জীবনের ত এখানেই শেষ নয়। এর জের টেনে চলে অনেক দূর ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত। হাহাকারের মধ্যে আয়ুষ্কাল কাটান এর একমাত্র পরিণাম।

—ওই একটা ভবিষ্যতের কথা ভেবে সারা জীবন কাটিয়ে দিতে বল? শিবনাথ আজ থামতে ভুলে গেছে। সে একটার পর একটা প্রশ্ন করে গেল।

তার এই শেষ প্রশ্নের উত্তরে সুনীতি ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলল, তুমি আমাকে যা করতে বল তাই করব। আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা কিছু নেই।

তার পরিবর্ত্তিত কণ্ঠস্বর শুনে শিবনাথ ব্যথিত হয়ে বলল, রাগ করলে নীতি?

সুনীতি তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে থাকল, কোন উত্তর দিল না।

বাইরে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছিল। শিবনাথ সবে অসুখ থেকে উঠেছে। তার কথা ভেবে সুনীতি বলল, ঘরে চল, হিম লাগিয়ে আবার একটা অসুখে পড়বে।

সুনীতি ঘরে হাজারীকে ডেকে শিবনাথের দুধটা আনতে বলল। সে খানিকক্ষণ পরে দুধের বাটিটা এনে নামিয়ে দিল। গরম দুধের বাটিটা চামচ দিয়ে নাড়তে নাড়তে সুনীতি বলল, ঠিকাদারবাবু এসেছিলেন।

শিবনাথ বলল, কি ঠিক হ'ল?

সুনীতি বলল, সামনের মাসের শেষ দিকে একটা দিন আছে। সেদিনই ভিত কাটবেন।

শিবনাথ বলল, আচ্ছা।

এর পরে আর কথা জমল না। সুনীতি দুধের খালি বাটিটা হাতে নিয়ে বলল, হাজারীকে গিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি মশারী ফেলে আলো নিভিয়ে দিয়ে যাবে। তুমি রাত করো না।

সে চলে গেলে শিবনাথ এই কথাটাই ভাবল, সমস্ত থেকেও কেন সে তার হতে পারল না। সে একটা বুকভরা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে নিজেকে প্রশ্ন করল, কি করে বিচার করি?

সকালে সে বিশেষ কথা বলল না। খেয়ে আপিসে চলে গেল। আপিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এল। হাজারীকে ডেকে শুধু বলল, হাজারী আমার একটা বিছানা আর জামা-কাপড় পুরে একটা বাক্স তৈরী কর। সে এর কিছু বুঝতে না পেরে হাঁ করে চেয়ে থাকল।

শিবনাথ যেভাবে কথাটা বলেছিল তার রেশ গিয়ে পৌঁছেছিল অন্দরে। সুনীতি ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করল, ওকে কি বলছিলে?

শিবনাথ উত্তর করল না। হাজারী বলল, বাবু বিছানা বাঁধতে বলছেন, সুটকেস গুছিয়ে দিতে বলছেন।

সুনীতি বলল, আচ্ছা তুই যা।

সে বেরিয়ে গেল। সুনীতি ঘরে গিয়ে প্রশ্ন করল, এর মানে?

—আমি চলে যাচ্ছি। যে ক'মাস তোমার বাড়ী না হচ্ছে মেসে গিয়ে থাকব।

—কেন?

—আজ সহজেই যেতে পারব কিন্তু সেদিন রিক্ত হাতে কিছুতেই যেতে পারব না।

সুনীতি মলিন মুখে বললে, তুমি এত ছোট।

সে সেখানে আর দাঁড়াতে পারল না। ভিতরে গিয়ে হাজারীকে পাঠিয়ে দিল।

আর একটা সন্ধ্যা এল। সূর্য্যটা তখনও দিগন্তের শেষ রেখার এপারে। তার তেজ, ছটা কমে গেছে, শুধু রক্ত-বর্ণটা রয়ে গেছে। কি সব বিচিত্র পাখী এদিক-ওদিক চতুর্দ্দিকে আকাশে ছুটোছুটি করছে। তারা ঘরে ফিরছে।

হাজারী মোট নিয়ে গেছে। শিবনাথ বাধা পেল। সুনীতি তার পথরোধ করে দাঁড়িয়ে। সে বলল, মানুষ হয়ে মানুষের দেওয়া বিশ্বাস মেনে নিলাম, তোমাকে কষ্ট দিলাম, এ জোর তুমি আমাকে দিলে।

যাবার মুহূর্ত্তে শিবনাথ আর কিছু ভাবতে পারল না, শুধু বলল, যেদিন তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া শেষ হবে সেদিন ডেকো।

সুনীতি গলায় আঁচল জড়িয়ে যখন তাকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল তখন তার দু'গাল বেয়ে টপটপ করে জল পড়ছে। সে চোখের জল মুছতে চেষ্টা করল না। তার আরও কাছে সরে গিয়ে প্রশ্ন করল, এই তোমার শেষ আদেশ?

ডাইনী চর

শ্রীকৃষ্ণধন দে

[কিংবদন্তী আছে, মেঘনার মোহানার কাছে কোন একটি রহস্যময় বালুচরে ঘটনাচক্রে রাত্রে কেউ আশ্রয় নিলে সে হঠাৎ তখনি আশ্চর্য্যভাবে অন্তর্হিত হয়ে যায়। দলে একাধিক লোক থাকলেও তাদের মধ্যে অন্ততঃ একজনকে সে চরে আর খুঁজে পাওয়া যায় না।]

হুঁসিয়ার মাঝি, সামনে ঘুর্ণি, অথৈ জল,
চেপে ধর্ হাল, দাঁড় টেনে জোরে বেয়েই চল্।
ডুবন্ত চাঁদ ছুঁতে গিয়ে ঢেউ বাড়ায় হাত,
হু-হু বয় ঝড়, হা-হা হাসে আজ মায়াবী রাত।
ডান পাশে আছে শুধু যে বালুর ডাইনী চর,
হাতছানি দেয়—"আয় না এখানে, বাঁধবি ঘর!"
ছলাৎ ছলাৎ ঢেউয়ের কান্না মানে না মানা,
ওড়ে রাতজাগা গাঙ্ চিলগুলো ঝাপ্‌টে ডানা,
হুঁসিয়ার মাঝি, সঙ্গে রয়েছে নতুন বৌ,
সাধভরা রাত, উপচে উঠেছে জীবন-মৌ।

হুঁসিয়ার মাঝি, ওড়ায় বালু যে ঘুর্ণি হাওয়া,
পিশাচীর মত আসে মানুষের-গন্ধ-পাওয়া!
বাঁধে যারা চরে নৌকা, এড়াতে তুফান ঢেউ,
হঠাৎ তারা যে কোথায় হারায় জানে না কেউ!
সামনে পিছনে ঘোরে আবর্ত্ত নিকষ জলে,
এপার ওপার হয় একাকার আঁধারতলে!
ধু ধু বালুচর ফাঁদ পেতে রাখে কী হিংসায়,
গুনতি মানুষ হঠাৎ লুকায় যাদুতে কার!

নির্জ্জন রাতে হেসে ওঠে চর প্রেতিনীপ্রায়,
হুঁসিয়ার মাঝি, দেখো যদি তারে এড়ানো যায়!

ভয়ে-কাঁপা হাতে চেপে ধরো হাত, হারাও পাছে,
এস বৌ, বসো আরো সরে এসে বুকের কাছে।
থমথমে রাতে উতলা হয়েছে বিপুলা নদী,
মিশে থাকো বুকে এ চরের মায়া এড়াবে যদি!
নদী মোহানায় এলোমেলো ঝড় ফোঁপায় তাই,
রাক্ষুসী চর ওৎ পেতে আছে, মানুষ চাই!
লুটাক কবরী, জড়াও দু'হাতে কণ্ঠ মোর,
শোনো বউ, আরো বাকি আছে পথ, হয় নি ভোর।
ধোঁয়ার মতন কুয়াসা নেমেছে মোহানা জলে,
শুধু ছপ ছপ দাঁড়ের কান্না, নৌকা চলে।

হুঁসিয়ার মাঝি, নৌকা টানিছে কে কুহকিনী,
চর রূপ ধরে রাত জেগে থাকে, ওকে যে চিনি!
বালুর সাঁড়াশী চেপে ধরে যেন পাষাণ হাতে,
নির্জ্জন তটে কোন্ শঙ্খিনী শিকারে মাতে!
ডোবে যে নৌকা, হ'ল বানচাল, ভিড়াও চরে,
অন্ধ যে চোখ, উড়ে আসে বালু দমকা ঝড়ে!
ক্ষণ অবসর, মায়াবিনী চর ছলনা জানে,
দুর্য্যোগ রাতে বুক থেকে কেড়ে শিকার টানে!
হা হা হাসি হাসে আকাশ বাতাস দিগন্তর,
কোথা গেল বউ! একেলা যে আমি, শূন্য চর!

সাগর-পারে

শ্রীশান্তা দেবী

রোম ত ক্যাথলিকদের ধর্ম্মরাজ্যেরও রাজধানী। তবে সে রাজ্যের রাজারা অর্থাৎ পোপরা সাধারণ রোমে বাস করেন না। তাঁদের ভ্যাটিক্যান এক বিরাট ব্যাপার। ভ্যাটিকানের বাইরে পোপদের বেরোনো বারণ। তবে আজকাল বোধ হয় কড়াকড়ি একটু কমেছে। ভ্যাটিকান শহর ১০৮ একর জোড়া। এই রাষ্ট্রের নিজস্ব ষ্টেশন, ডাকবিভাগ, রেডিও, মুদ্রা ইত্যাদি সবই আছে। এখানকার কেবলমাত্র সেণ্ট পিটারের স্কোয়ারে সর্ব্বসাধারণ যেতে পারেন এবং ইতালীয় পুলিস এটির তত্ত্বাবধান করেন। আধুনিক পোপ দ্বাদশ পায়দের আশী বছরের বেশী বয়স। এঁর এলাকায় বাইরের লোকের ঢোকা বারণ।

যে অংশটুকু বাইরের লোক দেখতে পায় সেটুকু দেখবার আশায় আমরা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে ধীর গতিতে ভ্যাটিক্যান যাত্রা করলাম। কিন্তু সেখানেও ছুটির জন্য ইত্যাদি মিউজিয়ম বন্ধ। অগত্যা সেণ্ট পিটারের গীর্জ্জা ও চত্বরটুকু দেখেই ফিরতে হ'ল। বহুদুর থেকেই দেখা যায় তোর বিরাট প্রবেশ-পথ, প্রাচীর-সীমানার মাথার উপর ১৬২ জন সেণ্টের মূর্ত্তি সারি সারি দাঁড়িয়ে। ভিতরে গীর্জ্জাটি অপূর্ব্ব ও বৃহৎ। এটি খ্রীষ্টীয় জগতে সর্ব্বাপেক্ষ বৃহৎ ও খ্যাতিমান মন্দির লোকে বলে। গীর্জ্জার শিল্প কাজ এবং খিলান প্রভৃতি ইউরোপী ধরণের নয়, অনেকটাই তাজমহলের ধরণের। শ্বেতপাথরের চৌকো থাম, গোল ডোম, ভিতরে প্রচুর সোনালী কাজ এবং ভিতরেই পোপদের সমাধি। আধুনিক পোপের ঠিক আগে যিনি পোপ ছিলেন, একজন সন্ন্যাসিনী আমাদের টেনে নিয়ে গিয়ে তাঁর সমাধি দেখালেন। বেশী দিনের নয় বলে এটিকে তাঁরা পরম ভক্তির সঙ্গে সকলকে দেখান।

এক জায়গায় মাইকেল এঞ্জেলো গঠিত মেরীমা আহত যীশুকে কোলে নিয়ে মুখ নীচু করে বসে আছেন। ঘোমটা-দেওয়া বউয়ের মত ভারি মিষ্টি মুখটি, করুণা ও ভালবাসায় ভরা। এর ছবি কিনতে পাওয়া যায়। মাইকেল এঞ্জেলো এই গীর্জ্জার আধুনিক পরিকল্পনার সঙ্গে অনেকাংশে জড়িত। ডোমটি তাঁরই পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরী। প্রাচীন গীর্জ্জা সেণ্ট পিটারের সমাধির উপর পনের-ষোল শত বৎসর আগে তৈরী হয়। কিন্তু আধুনিক গীর্জ্জা বোধ হয় চার শত বৎসর হয়েছে। এখানে জেরুজালেমের একটি ভাঙা স্তম্ভ আছে, দড়ির মত পাকানো পাকানো। তারই অনুকরণে আরও চারটি স্তম্ভ গঠন করে একটি বেদী সাজানো।

রোমের এই গীর্জ্জা ও প্রাসাদ প্রভৃতি দেখলে বোঝা যায় কেন লোকে বলে তাজমহল ইটালীয়ানের তৈরী। আমার যদিও বলতে ইচ্ছা হয় তাজমহলকেই তারা অনুকরণ করেছে। তাজমহলে এত মর্ম্মরমূর্ত্তি, ছবি প্রভৃতি নেই এবং হীরা, সোনা যা ছিল কবে লোকে লুটে নিয়েছে। তাই এর গাম্ভীর্য্য ও মহিমা আরও বেশী মনে হয়। সত্যই 'কালের কপোল তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল এক বিন্দু জল'। কিন্তু সেণ্ট পিটারের গীর্জ্জায় ধর্ম্মের নামেই যেন ঐশ্বর্য্য ও আড়ম্বর সবচেয়ে ফুটে উঠেছে। অবশ্য মূর্ত্তি ও চিত্রগুলির ঐতিহাসিক মূল্য বিবেচনা করলে নিরলঙ্কার মন্দির রাখার সমর্থন হয় ত করা যায় না। মানুষের সৌন্দর্য্যসৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম অনুপ্রেরণা ধর্ম্মের ভিতর দিয়েই এসেছে এগুলি দেখলে বোঝা যায়। যুগে যুগে সব দেশেই দেখা যায় পূজার মন্দির, দেবতার মূর্ত্তি কি দেবদেবীর ছবির ভিতর দিয়ে মানুষ তার সৌন্দর্য্য সৃষ্টির পরাকাষ্ঠা দেখাতে চেষ্টা করেছে। তবু অলঙ্কারের আতিশয্যে যে মহান সৌন্দর্য্যের অনেকখানি হানি হয়, এটাও খুব বড় সত্য।

সেণ্ট পিটারের গীর্জ্জাতে টুরিষ্টদের খুব ভীড় এবং তাদের প্রথামত সকলের হাতে ক্যামেরা। ভারতবর্ষীয় মেয়ে দেখলেই ছবি তোলা এক বাতিক। কেউ বা অনুমতি চায়, কেউ বা না বলেই তোলে।

পর পর ছুটি চলেছে, কাজেই বাজারে জিনিস কেনা, হোটেলে খাওয়া এবং গীর্জ্জা দেখা ছাড়া আর কিছু করা যায় না। কারণ এই তিনটি জিনিস সব দিনই খোলা। বাজারে গহনা খুব সুন্দর পাওয়া যায়, তবে দামও সেই রকম। পথে যেতে যেতে আধুনিক রোমে মুসোলিনীর বাড়ী এবং প্রাচীন রোমের অনেক ধ্বংসাবলী দেখা যায়। গ্রাম্য ধরণের মেয়েরা মাথায় ঝুড়ি ও পুঁটলি নিয়ে চলে। অনেকের গায়ের রং আমাদের মতও আছে। ফরাসীদের মত অত চাঁচাছোলা এরা নয়, কিন্তু যারা দেখতে সুন্দর তারা ফরাসীদের চেয়ে অনেক সুন্দর।

সেণ্ট পলের গীর্জ্জাও একটি দ্রষ্টব্য। রোম-বাসের শেষ

দিনে সেটাও ঘুরে আসব ঠিক হ'ল। অনেক দূরের পথ, ঘোড়ার গাড়ী করেই যাওয়া সুবিধা, বেশ সব দেখা যায়। পথে ইংরেজ কবি শেলী ও কীটসের সমাধি। অত্যন্ত সাদাসিধা নির্জ্জন একটি জায়গা, সমাধিরক্ষক একজন আছে। অনেকগুলি সমাধির মধ্যে ছোট্ট একটি জায়গায় পাথরের একটি ফলকমাত্র বসানো, তার গায়ে শেলীর নাম ও সেক্সপীয়র হতে উদ্ধৃত দু'ছত্র লেখা। একটুকরা সামান্য পাথরের উপর ওই দু'ছত্র মাত্র লেখা দেখতে পৃথিবীর কত দূরদূরান্তর থেকে মানুষ এসে শ্রদ্ধাভরে দাঁড়াচ্ছে। কাছেই কীটসের সমাধি, তাঁর বন্ধুর সমাধির ঠিক পাশে। কবির সমাধিতে নাম নেই, শুধু কবির পরিচয় আছে। কবি তরুণ বয়সেই দুরন্ত ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পৃথিবী ত্যাগ করেন। তিনি তাঁর তরুণ জীবনে যে বহু দুঃখ ভোগ করেছিলেন তারই চিহ্ন তাঁর সমাধির উপর লিখিত ওই দুই ছত্রে ফুটে ওঠে। তাঁর নিজের ইচ্ছা বা আদেশ ছিল যে, সমাধির উপর লেখা থাকবে শুধু: "যাহার নাম কেবল জলের অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল এই সমাধিভূমিতে তিনি শায়িত আছেন।"

কীটসের মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাঁর সমাধিস্থান নির্ব্বাচন করে এসে তাঁকে স্থানটির স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের কথা বিশদভাবে বলা হয়। কবি যেন কল্পনায় দেখে বন্ধুকে বলেন, তিনি এখনই সমাধির উপর তৃণগুচ্ছ ও ভায়োলেট ফুলের ফুটে ওঠা অনুভব করছেন। কবিজীবনীতে বর্ণিত তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর ও ফুলের শোভা দেখে আমাদের মনও বিষাদে পূর্ণ হয়ে যায়। যে বন্ধু কীটসের সমাধির লেখা প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন, পাশে বোধ হয় সেই বন্ধুরই সমাধি পরে হয়। একটু দূরে এক প্রাচীনকালের রাজার পিরামিড-আকৃতি সমাধি আছে।

আমরা আবার ঘোড়ার গাড়ীতে যাত্রা করে সেণ্ট পলের গীর্জ্জায় এলাম। এটি ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে অনেকাংশ পুড়ে গিয়েছিল। পরে সব নূতন করে করা হয়। গীর্জ্জার সামনেই বড় চকমিলানো দালান, এ রকম অন্য কোথাও দেখি নি। গীর্জ্জার মাথায় পল, পিটার, যীশু প্রভৃতির ছবি সোনালী ভূমিতে আঁকা। তারও উপরে মেষপালের ছবি।

আজ কি একটা পর্ব্ব ছিল। তাই ভিতরে আবালবৃদ্ধবনিতা এসে সমবেত হয়েছেন। পূজায় উপবিষ্টা সব মেয়েদের মাথায় ওড়না অথবা রুমাল চাপা দেওয়া। এটাই রীতি। সুন্দর সুরে অর্গান বাজছিল, সঙ্গে সঙ্গে পাদ্রীরা মিছিল করে গান গাইতে গাইতে বিশপকে নিয়ে এলেন। আমাদের দেশের মোহান্তদের চেয়েও বেশী সাজসজ্জা, জরি-জড়োয়ায় মোড়া। মাথায় মস্ত উঁচু রত্নখচিত টুপী, মুকুটের মত। ধূপধুনা-আলো দিয়ে আরতি হ'ল, তার পর মন্ত্রপাঠ ও গান। কে বলবে অন্য দেশ অন্য ধর্ম্ম!

এখানে প্রাচীন গীর্জ্জার মত জানলায় রঙীন কাচের ছবি নেই, কাঠ ও পাথরের স্বাভাবিক নক্সা এবং বনের অনুকরণে রং করা। ছাদটি চেপ্টা, তাতে ভিতরপিঠে সোনালি ফুল ও চৌখুপীর কাজ। কতকগুলি পাথরের থামে গাছের ভিতরের রেখার ভঙ্গীতে রঙের রেখা, মনে হয় গাছই পাথর হয়ে গিয়েছে।

সেণ্ট পলের একটি মূর্ত্তি ভারী সুন্দর। দেওয়ালের অন্য সব ছবিও আশ্চর্য্য উজ্জ্বল সুন্দর, মনে হয় যেন কাল এঁকেছে। এসব দেশে মন্দিরের কি যত্ন আর কি পরিচ্ছন্নতা দেখলে আমাদের দেশের পাণ্ডাদের নোংরামির জন্য লজ্জায় মাথা হেঁট হয়। ভুবনেশ্বর প্রভৃতি মন্দিরে কত জায়গায় যে শত বৎসরের আবর্জ্জনা পড়ে আছে বলবার নয়।

বিকালে এখানকার শ্রীযুক্ত প্রেমকিষণের বাড়ী চা খাবার নিমন্ত্রণ। বাড়ীর সকলেই দেখতে ভারী সুন্দর। ছোট ছোট মেয়েগুলি দেশী পোশাক পরে ইটালীয়ান পরিচারকদের সঙ্গে ঘুরছিল। ভদ্রলোক এক সময় রাশিয়াতে ছিলেন। সেখানের কথা বলছিলেন অনেক। বাড়ীটি ভারী চমৎকার, ভারতবর্ষীয় সুন্দর সুন্দর জিনিস ও বাসনে সাজানো। খুব জমকালো পাড়া দিয়ে একটা পুরনো গেট পার হয়ে যেতে হয় ওদিকে। এই গেটটি আদত রোমে ঢোকবার পুরনো পথ, রেলপথ তৈরীর পূর্ব্বে লোকে এই উত্তরদিকের গেট দিয়ে রোমে ঢুকত। এই গেটের বাইরে Villa Borghese একটি প্রকাণ্ড উদ্যান সমন্বিত প্রাসাদ। এটি পূর্ব্বে ছিল বিখ্যাত শিল্পরসবেত্তা বর্গীষ পরিবারের। এখন রাষ্ট্রের অধিকারে। অনেক শিল্পসম্ভার এখানে আছে, উদ্যানটিতে বড় বড় অন্ধকার করা গাছ, দেখতে ভারী ভাল লাগে। সাধারণ লোকে দিনের বেলা সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দেখতে পায়।

রোজ আমরা যে হোটেলে খেতাম আজ সেখানে শেষ ভোজ হ'ল আমাদের। হোটেলওয়ালা খুব ভদ্রতা করে। তার স্ত্রী ইংরেজ, সম্প্রতি অনুপস্থিত। আমাদের ছবি দেখাল স্ত্রীর। আমরা কি খেতে ভালবাসি জিজ্ঞাসা করে আজ ঠিক সেইমত করবে বলল। তার একটি ছোট মেয়ে ছিল, মেয়ের হাতে অমৃতীপাকের বালা। বলল, 'একজন ভারতবর্ষীয় নাবিক আমার মেয়েকে এটা দিয়েছিল।' হোটেলে যাওয়া আসার পথে একটা চুল কাটানোর ঘর দেখতাম। সেই সাহেব নাপিতের একটি খুব মোটাসোটা সুন্দর মেয়ে ছিল, আমাদের ক্যামেরা দেখলেই ছুটে আসত আর বলত, 'আমার ছবি তোল।' ছবি যদি বা তোলা হ'ল ত তখনই ত ছাপা যায় না। কিন্তু মেয়েটি রোজ দু'বেলা পথের ধারে দাঁড়িয়ে

থাকত এবং আমাদের দেখলেই দৌড়ে এসে ছবি চাইত। অগত্যা তাকে অনেক করে বোঝানো হ'ল আমরা অন্ত দেশ থেকে তাকে ছবি পাঠিয়ে দেব। তার ঠিকানা নিয়ে ছবি সত্যই ডাকে পাঠানো হয়েছিল।

রোম মহানগরীর পথেঘাটে আমরা অনেক ঘুরেছি বটে, কিন্তু যে সব মিউজিয়মে শিল্পসম্ভার দেখবার সম্ভাবনা ছিল, আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে ছুটির জন্ত সেগুলি সবই তখন বন্ধ। বড় বড় রাজপথে ধ্বংসস্তূপ অথবা আধুনিক ভিক্টর ইমানুয়েলের স্মৃতিসৌধ বা বড় বড় চত্বরে মর্ম্মরমূর্ত্তি শোভিত ফোয়ারা এইগুলিই রোজ চোখে পড়ত।

যেদিন ভোরে রোম ছেড়ে নেপলস যাত্রা করলাম, সে দিনও ট্রেনে সুদীর্ঘ পথ ধরে প্রাচীন প্রাচীরমালা দেখতে দেখতে চললাম। হয় ত এটি কোনকালে রোমের সীমানা ছিল, আমি ঠিক জানি না। না হলে মাইলের পর মাইল এত লম্বা প্রাচীর কিসের?

ঘণ্টা দুই ট্রেনে কাটিয়েই নেপলসের একটা ছোট ষ্টেশন এল। আমাদের দেশে যেমন কলকাতার ষ্টেশনের নাম হাওড়া এবং শেয়ালদা, কাশীতে বেনারস ক্যান্টনমেন্ট প্রভৃতি দুই তিনটা ষ্টেশন, এখানেও সেই রকম তা আমরা বুঝতে পারি নি। আমরা গাড়ীর জানলার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলাম,তাই দেখে কয়েক জন পোর্টার আমাদের ডাকাডাকি করতে লাগল। একজন যাত্রী আমাদের জিনিস নামাতে বারণ করল, কেন যে বারণ করল বুঝতে পারলাম না। বরং ভাবলাম অল্প সময়ে এত জিনিস নামাতে হলে তাড়াতাড়িই করা ভাল। পোর্টারদের বললাম, "জিনিস নামাও।" নিজেরাও নেমে পড়লাম। যেই না নামা মহা হৈচৈ গণ্ড-গোল সুরু হয়ে গেল। পুলিস, রেলকর্ম্মচারী, যাত্রীরা, পোর্টার সবাই সমস্বরে চেঁচাচ্ছে। ডাঃ নাগ তাদের গলা ছাপিয়ে চেঁচাচ্ছেন। তখন বুঝলাম আমরা ভুল ষ্টেশনে নেমে পড়েছি। পুলিসের লোকেরা পোর্টারদের ভীষণভাবে বকতে লাগল, কেন তারা বিদেশী লোকদের ভুল জায়গায় নামিয়েছে বলে। তাদের নামে রিপোর্ট করা হবে শুনে তারা বার বার আমার দিকে হাত দেখাতে লাগল, কারণ আমিই তাদের জিনিস নামাতে বলেছিলাম। যাই হোক বিদেশী বলে আমার ভুলটা ধর্ত্তব্যের মধ্যে গেল না। রেল কোম্পানী একটা স্থানীয় ছোট ট্রেনে আবার আমাদের তুলে আসল ষ্টেশনে পৌঁছে দিল। পোর্টাররা আমাদের সঙ্গেই উঠল, না হলে তাদের মজুরি মারা যায়। বেচারীরা আবার মাল তুলল এবং নামাল। তার পর বসে রইল জাহাজে মাল তুলে দেবার অপেক্ষায়। যদিও সাহেব, কিন্তু সাজপোশাক ধরণধারণ আমাদের দেশের রেলের কুলিদেরই মত প্রায়। তাদেরই মত বাক্স-পেঁটরার উপর ক্লান্ত হতাশ ভাবে বসে থাকে।

কিন্তু ডকে কি হয়রানি! ট্যাক্সি করে এসে সাত দরজায় ঘুরলাম, অথচ বেলা একটা পর্য্যন্ত কেউ কিছুই করে দিল না। সকাল থেকে খাওয়া হয় নি। জিনিসপত্র ফেলে বাইরে খেতে যেতে পারি না, অথচ অত বড় বিরাট জায়গায় কোন খাদ্য পাওয়া যায় না। উপরতলায় কেবল "বার" আছে। বসবারও কোন স্থান প্রায় নেই। মাল রাখবার কতকগুলো তাক আছে তাইতে বসে আমেরিকান টুরিষ্ট-দের হয়রানি দেখছিলাম। তারাও চুঙি আপিসের কাছে হতাশভাবে বসে। যাদের কমবয়স তারা সময়টা অকারণ নষ্ট না করে যতটা পারে প্রেমালাপ করে নিচ্ছিল।

আমরা একটা 'বারে' ক্ষুদ্রতম পেয়ালায় একটু একটু কফি খেয়ে আবার ঘণ্টা-মিনিট গুনতে লাগলাম। হঠাৎ মেয়েরা একজন বলল, "পাসপোর্টের কিছু কাজ আছে কিনা খুঁজে দেখি চল।" একটা আপিস-ঘরে ঢুকে দেখি অনন্ত-কাল ধরে সব 'কিউ' করে দাঁড়িয়ে। তার পর জন পনের কর্ম্মকর্ত্তার অঙ্গুলিসঙ্কেতে একতলা, দোতলা, তিনতলা ঘুরে ঘুরে ওঠানামা করে সর্ব্বশেষে গিয়ে পৌঁছলাম মালের ঘরে। ইটালীয়ান মহাপ্রভুরা কিছু বলেও দেয় না, কোন কথা বোঝেও না। আমাদের মালপত্র কিছু সেখানে নেই। আবার মেয়েরা উপরে দৌড়ল। শুনল রেলষ্টেশনের সেই পোর্টারটা সব মাল জাহাজে তুলে দিয়েছে। লোকটা একে-বারে মূর্খ সাধারণ মানুষ, কিন্তু এদিকে বুদ্ধি আছে। শিক্ষিত অফিসার ইটালীয়ানদের চেয়ে কাজ সহজে করে দিল। খানিকটা বোধ হয় নিজেদের আগের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত। তাকে বকশিশ দিয়ে খুশী করে বিকাল চারটায় একেবারে অনাহারে জাহাজে উঠলাম। আমেরিকান বিরাট ফ্যাসনেবল জাহাজ। নাম কনষ্টিটিউশন।

জাড়গ্রাম

(বর্দ্ধমান)

শ্রীশিবসাধন চট্টোপাধ্যায়

বর্দ্ধমান জেলায় জামালপুর থানার অন্তর্গত জাড়গ্রাম একটি সুপ্রাচীন গ্রাম। বহু বৎসর হইতেই ইহার নাম অপরিবর্ত্তিত আছে। কবিকঙ্কন চণ্ডীতে (মুকুন্দরাম) ধনপতি সওদাগরের পিতৃশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে জাড়গ্রাম হইতে রঘু দত্ত নামে এক বণিক নিমন্ত্রিত হন। উক্ত চণ্ডীকাব্যের ১৮০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—"কাইতি হইতে আসে যাদবেন্দ্র দাস। রঘুদত্ত আইসে যার জাড়গ্রামে বাস।" রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে উল্লেখিত আছে—"জাড়গ্রামের কালু রায়"। রামদাস আদকের অনাদি মঙ্গল বা ধর্ম্মপুরাণে জাড়গ্রামের কালুরায় ও তাঁহার মন্দিরের বর্ণনা আছে। রামদাস আদক অনাদিমঙ্গল রচনা করেন ১৫৮৪ শক অর্থাৎ ১৬৬২ সনে (শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত)। অনাদিমঙ্গল কাব্যে উল্লেখিত আছে:

"আজি হইতে রামদাস কবিবর তুমি।
জাড়গ্রামে বাস কালুরায় আমি।"

মন্দিরের বর্ণনায়:

জাড়গ্রাম বড়স্থান ধর্ম্ম যেথা অধিষ্ঠান
দয়ার ঠাকুর কালুরায়

* * *

ধর্ম্মগৃহ মনোহর সম্মুখেতে দামোদর
সদাই সঙ্গীত হয় নাটে! (৩য় পৃষ্ঠা)

কালুরায়ের মন্দিরে পোড়ামাটির ইষ্টক-ফলকে লেখা আছে—১৬৩২ শক উহা অনুমান ১৫৩২ শকাব্দা হইবে। বহুদিনের প্রাচীন মন্দিরে লেখা বেশ ভাল বুঝা যাইতেছে না। এখনও বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে কোন এক মঙ্গলবারে ঘটস্থাপনা হইয়া গাজন আরম্ভ হয়। ১২ দিন প্রত্যহ দুইটি করিয়া ঘনরামের ধর্ম্মপুরাণের ২৪টি পালাগান হয়। দ্বাদশদিন শনিবার প্রাতে "পশ্চিম উদয়" পালাগান হইয়া সারাদিনব্যাপী মেলা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

জাড়গ্রামের পশ্চিমপাড়ায় হিন্দুরাজত্বের আমলের একটি দুর্গ এবং দুর্গের চতুর্দিক-বেষ্টিত "গড়"-খাগড়াই ছিল। গড়ের চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান - স্থানে স্থানে খাদ ও জল আছে। অন্যান্য অংশ ভরাট হইয়া জমি হইয়াছে। গড়ের মধ্যস্থলে রাজবাড়ী বা দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে এবং দুর্গগৃহের ভিত গাঁথা আছে। ভগ্নস্তূপ হইতে কয়েকখানি পোড়ামাটির ইষ্টক-ফলক ও শিলা-নির্ম্মিত দেবতার মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। দেবতার কপালের সিন্দুরের দাগ এখনও আছে। গালার ভাঙা চুড়ি বাটুল প্রভৃতি কয়েকটি দ্রব্যও সংগৃহীত হইয়া জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারের মিউজিয়ামে সযত্নে রক্ষিত আছে। ভগ্নস্তূপে প্রাপ্ত একখানি পোড়ামাটির ইষ্টক ফলক পাওয়া গিয়াছে, উহাতে খোদিত আছে—"দেবশর্ম্মা—১০৪২ শকাব্দা।

অতি পূর্ব্বকালে নীলপুরের দেববংশে দুই সহোদর গন্ধর্ব্ব খাঁ বাহাদুর দেব নিয়োগী এবং পুরন্দর খাঁ বাহাদুর দেব নিয়োগী জন্মগ্রহণ করেন। পুরন্দর খাঁ শোভাবাজারের রাজবাটীর দেব-বংশের আদিপুরুষ এবং গন্ধর্ব্ব খাঁ জাড়গ্রাম নিবাসী দেব নিয়োগী-দের পূর্ব্বপুরুষ। প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে সাহজাহান অথবা আওরঙ্গজীবের রাজত্বকালে গন্ধর্ব্ব খাঁর বংশে গোপালচন্দ্র দেব নিয়োগীর দুই পুত্র শ্যামাচরণ ও হরিচরণ বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত ইন্দাস থানার অন্তর্গত বোঁয়াই গ্রাম হইতে জাড়গ্রামে আসিয়া পত্তনিদার হইলেন এবং যে দুর্গ সে সময়ে জাড়গ্রামে ছিল তাহা রাজাদেশে দখল করিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। দুর্গটিকে "গড়বাড়ী" বলা হইত। ইহা প্রায় ১০০০ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুরাজত্বকালে জাড়গ্রামের পশ্চিমে নির্ম্মিত হইয়াছিল (ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে)। শুনা যায় ঐ গড়ের রাজার উপাধী "রায়" ছিল। বর্ত্তমানে পলাশীতে ঐ রাজবংশের "রায়" উপাধিধারী বংশধরেরা বাস করেন।

শ্যামাচরণের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ গড়বাড়ীর দেওয়ান ছিলেন এবং ঐ অঞ্চলের স্থানসমূহের কর আদায় করিয়া রাজসরকারে প্রেরণ করিতেন।

লক্ষ্মীনারায়ণের পৌত্র রত্নেশ্বর মুর্শিদাবাদের নবাব আলিবর্দ্দির রাজত্বকালে "হাবেলী" এবং "ছুটিপুর" এই দুই পরগণায় শিকদার অর্থাৎ কালেক্টর হইয়া বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন এবং সম্পত্তিশালী হন। তিনি জাড়গ্রামের পূর্ব্ব-পাড়ার কুলীন ব্রাহ্মণ-দিগের পূর্ব্বপুরুষ কালীকান্ত তর্কপঞ্চানন এবং ঘোষেদের পূর্ব্ব-পুরুষ নিত্যানন্দ ঘোষ ও চৈতন্য ঘোষকে নবগ্রাম-ময়না হইতে আনাইয়া এবং জমি-জায়গা দান করিয়া জাড়গ্রামে বসতি করান। তাঁহারই অর্থবলে দেবালয় (গোপীনাথ), দোলমন্দির (এখনও অভগ্ন অবস্থায় অবস্থিত—১৬৫৮ শকাব্দায় নির্ম্মিত), নূতন রাস্তাঘাট, "শানপুকুর" (বর্ত্তমান আছে) নামে পুষ্করিণী নির্ম্মিত হয়।

গোবিন্দরাম দেব নিয়োগী (রত্নেশ্বরের দ্বিতীয় পুত্র) জল-সেচনের জন্য একটি খাল খনন করাইয়াছেন, ইহা হোদল বা হরিদোল গ্রামের উত্তরে "গোবিন্দখালী" বলিয়া এখনও পরিচিত।

সিপাহী বিদ্রোহের পর কয়েকজন গোরা সৈন্য দেশী সৈন্য লইয়া জাড়গ্রাম ঘেরাও করে। যাহারা গোপনে পলায়ন করিতে চেষ্টা করে তাহারা ইংরাজের গুলীতে প্রাণ হারায়। পরে তাহারা গ্রামে প্রবেশ করিয়া বহু বলিষ্ঠ বাগ্দীকে বিনা কারণে সর্ব্বসমক্ষে ফাঁসী দেয়। ইহাতে গ্রামে অত্যন্ত ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছিল।

জাড়গ্রাম তারকেশ্বর হইতে ১০।১১ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

পথ থেকে প্রাসাদে

শ্রীঅধীর দত্ত

আমাদের যাত্রা হ'ল সুরু। শিলিগুড়ি পেরিয়ে, যেদিকে তাকাও শুধু পাহাড় আর পাহাড়। নানান দেশের নানান মানুষ ঘর বেঁধেছে, মন বেঁধেছে ঐ পাহাড়ের গায় গায়। বাইরের নীল আকাশের দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে একভাবে চেয়েছিলাম। অলস অপরাহ্নের প্রসন্ন আকাশে সাঁতার কেটে ফিরে চলেছে সাদা বকের দল পাতার নীড়ে। কি অদ্ভুত যে দেখাচ্ছিল সেই পাখীদের তা বলতে পারব না। কবি হলে হয়ত বা দু' লাইনের একটা কবিতা লিখতে পারতাম। কিন্তু সে সৌভাগ্য নিয়ে কি জন্মেছি। পাহাড়ের গায়ে নিতান্ত অবহেলার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেছে কত

দার্জ্জিলিঙের সাধারণ দৃশ্য

রঙ-বেরঙের মরসুমি ফুল। ফুলের গন্ধ নিয়ে ভেসে আসছে বসন্তের বাতাস। কি সুগন্ধি সুবাস। যদি আরও একটু যত্ন নেওয়া যেত—তা হলে হয়ত বা আরও ভাল দেখাত। পূর্ণাঙ্গ হ'ত ওদের বিকাশ। না অযত্নের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেছে বলে অত সুন্দর দেখাচ্ছে কে জানে!

কখনও বা বনজঙ্গল, কখনও বা পাহাড়ের উপর দিয়ে ট্রেন ছুটে চলেছে। এ পাশে পাহাড় আর ওপাশে বিরাট খাদ। একটু বেসামাল হলেই যাত্রীবাহী যন্ত্রের নিশ্চিত পতন। কারুর রোধ করবার কোন ক্ষমতা নেই। যদি ঐ পাহাড়ের একটা চাঙড় হঠাৎ খসে পড়ে তা হলে ধূলোয় ধূলো হয়ে যাবে সব। অদূরে দেখা যায় একটা ধূ ধূ-করা দিগন্ত-বিস্তৃত চর। আগে হয়ত ওটা গঙ্গার একটা শাখা ছিল। জল শুকিয়ে গেছে। মরা গাঙের 'পর জেগেছে নতুন চর। তারই উপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে এক পথিক। কতদূর ওর পরিক্রমণ কে জানে। পাশেই তিনটে পাহাড়। লোকে বলে ত্রি-পাহাড়। অনেকখানি জায়গা জুড়ে পড়ে রয়েছে গায়ে গায়ে হেলান দিয়ে। অপরাহ্ণ বেলা। পশ্চিম দিগন্তে লাল সূর্য্য ঢলে পড়েছে। ওর রক্তিম আভা ত্রি-পাহাড়কে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। এত রূপ, এত রঙ পৃথিবীর। আমার জীবনে এক নতুন পৃথিবী। এতদিন আমার পৃথিবী ছিল আপিস, বাড়ী, মাঝে মাঝে গেছি গড়ের মাঠে আর বালিগঞ্জের লেকে। অন্ধ দৃষ্টি। সে দৃষ্টি দিয়ে কি বোঝা যায়—জানা যায় প্রভাতসূর্য্যের কত আলো। কত রঙ। সে দৃষ্টি দিয়ে কি

দার্জ্জিলিং ষ্টেশন
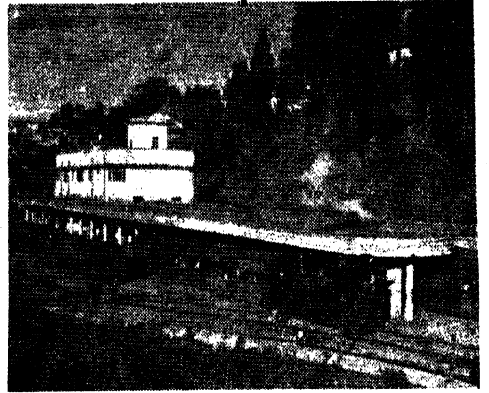
বোঝা যায় বিকালের ম্লান পাণ্ডুরতার মধ্যে ডুবে যাওয়া। দিনের শেষ আলোর দীপ্তি কত করুণ, কত অসহায়! অনেক অদেখা অনেক অজানা আজ জানা হয়ে গেল পথ চলতে গিয়ে। এ যেন এক পৃথিবী থেকে আর এক পৃথিবীর স্বর্ণসিংহাসনে উত্তরণ।

মহানদী পেরিয়ে সুরু হ'ল রিমঝিমি বর্ষণ। জানালা দিয়ে চোখ বাড়ালে দেখা যায় আকাশের কোল বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে কুয়াসা। সাদায় সাদা হয়ে গেছে সারা দিকচক্রবাল। আকাশ আর মাটি মিশে আছে একাত্ম হয়ে। এতক্ষণ গায়ে জামা দেওয়া যাচ্ছিল না। আর এখন গরমজামা, চাদর জড়িয়েও শীত মানছে না। একেবারে আমাদের দেশের পৌষ-মাঘ মাসের শীত যেন। একটু পরেই ট্রেন এসে থামল দার্জ্জিলিংয়ে। নিশ্চল ষ্টেশনটি আবার কর্ম্মব্যস্ততায় মুখর হয়ে উঠল। একটা লোক এসে বলল, হোটেল-এ যাবেন বাবু?

আমি বললাম, মাউণ্ট এভারেষ্টে যাব। সেটা কত দূর বলতে পার?

লোকটা বলল, "সে ত অনেক দূরে বাবু। তা ছাড়া আমাদের হোটেলে চলুন না। কোন অসুবিধা হবে না। আপনাদের সকল রকম সুবিধা করে দেওয়া হবে। তা ছাড়া এটা দার্জ্জিলিংয়ের সবচেয়ে পুরনো হোটেল। পুরনো লোক যারা আসে, তারা এখানেই এসে ওঠে।"

সঙ্গের বন্ধুটি বলল, 'ও যখন এত করে বলছে, তখন চল, গিয়ে দেখি না। আমরা ত আর সেখানে সংসার পাততে যাচ্ছি না। ভাল না লাগলে থাকবো না। এখানে ত আর হোটেলের অভাব নেই।"

অগত্যা তাই হ'ল। কোন রকম তর্ক না করেই ওর যুক্তি মেনে নিলাম। অবশেষে মাউন্ট এভারেষ্টকে পেছনে ফেলে ল্যাডেন লা রোড ধরে চলতে লাগলাম। পথ চলতে চলতে বাহাদুর হঠাৎ এক জায়গায় থেমে পড়ল। বলল, "এই আমাদের হোটেল।" বড় বড় করে দেওয়ালে লেখা রয়েছে "হিন্দু বোর্ডিং ১৯২১।" অনেক কালের প্রাচীনই বটে। প্রথম অবস্থায় এর যা জৌলুষ ছিল, আজ আর তা নেই। লক্ষ্য করলে হয়ত বা দেখা যাবে দেওয়ালের কোথাও কোথাও প্লাষ্টরিং চটে গেছে। সিঁড়ি ক্ষয়ে ক্ষয়ে লাল খোয়া বেরিয়ে পড়েছে। বাঁক-ঘোরান সিঁড়ি দিয়ে বাহাদুর আমাদের নিয়ে চলল ওপরে। একটা লোককে দেখিয়ে বাহাদুর বললে, "এই আমাদের প্রোপ্রাইটার বাবু।"

হাত তুলে নমস্কার করলাম। বললাম, "আমরা দিন দশ-পনর এখানে থাকব। আমাদের জন্য একটা ভাল ঘরের ব্যবস্থা করে দিন। যাতে কোন অসুবিধা না হয়।" বাহাদুরের দিকে তাকিয়ে প্রোপ্রাইটার বলল, "১৩নং ঘরে এদের নিয়ে যাও।" বাইরে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে। এদেশে বৃষ্টির কোন সময় নেই। শীতের কোন ঋতু নেই। সূর্য্য ওঠা, সূর্য্য ডোবার দৃশ্য দেখার ভাগ্য খুব কম লোকেরই হয়। ১৩নং ঘরে ঢুকতেই অবাক হয়ে গেলাম। দু'খানা চৌকি। পরিষ্কার করে বিছান বিছানা। ড্রেসিং টেবিল। ডাইনিং টেবিল। জামা ঝুলানোর ব্রাকেট। আরও কত কি!

সঙ্গের সঙ্গীটি বলল,"যত্নের কোন ত্রুটিই রাখে নি প্রোপ্রাইটার। এ যেন মনে হচ্ছে একটা পরিষ্কার সংসারের পরিচ্ছন্ন রূপ।" হঠাৎ দরজায় কড়া নড়ে উঠল। বাহাদুর খাবার নিয়ে ঘরে ঢোকে। বাহাদুর বলল, "প্রয়োজন হলে আমায় ডাকবেন। পাশেই আছি।" অতবড় রাতটা যে কোথা দিয়ে কেটে গেল বুঝতেই পারি নি। বাহাদুরের ডাকে ঘুম ভাঙল। বাহাদুর বলল, "সকাল হয়ে গেছে। আপনারা কি এখন বেরোবেন, না খেয়ে-দেয়ে বেরোবেন?"

আমি বললাম, "এখানে ত আমরা কিছু চিনি নে, তুমি একটা গাইড ঠিক করে দেবে বাহাদুর?"

বাহাদুর বলল, "গাইড কি হবে বাবু? পথে বেরোলে অনেক লোক পাবেন। মিথ্যে কতকগুলো পয়সা দিতে যাবেন কেন?"

মাঝখানের দরজা খুলে দিলে একটা গোল বারান্দা দেখা যাবে। এটা যেন সারা দার্জ্জিলিংয়ের একটি মনুমেণ্ট। এখান থেকে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলে পরিষ্কার দেখা যায়। এ পাশে বৌদ্ধ মন্দির আর ওপাশে ধীরধাম। দৃষ্টিকে আরও একটু প্রসারিত করলে দেখা যাবে, 'বর্দ্ধমান মহারাজার বাড়ী আর ওপাশে গবর্ণর হাউস। ক্রমেই ফরসা হচ্ছে। আলোয় আলো হচ্ছে সারা দিকচক্রবাল। পূবের রক্তিম সূর্য্যের লাল আলো এসে লুটোপুটি খাচ্ছে বাইরের গোল বারান্দায়। শহরের কর্ম্মব্যস্ত জীবন সুরু হয়ে গেছে। লোক জমতে সুরু করেছে। ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত, বর্দ্ধমান মহারাজার বাড়ী লেবোন-এ। আজকের এই সোনালী সকাল মানুষের কাছে কি আবেদন নিয়ে হাজির হবে, কে জানে! ওধারে বিমল ঘুমুচ্ছে অঘোরে। চিরকালের একটু ঘুমকাতুরে মানুষ। তার পর বেচারীর তিন রাত্রি ঘুম হয় নি। ঘুমোবার কথা বৈকি! বিমলকে ডাকতেই ধড়মড় করে উঠে বসল। বললাম, নে মুখ-হাত ধুয়ে কিছু খেয়ে নিয়ে চল বেড়িয়ে আসি। এখানকার সকালটা খুব স্বাস্থ্যকর। এ দেশের হাওয়ার সঙ্গে যে জমাট-বাঁধা কুয়াসা ভেসে বেড়ায় তা নাকি স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী।

'ল্যাডেন লা' রোড ধরে চলতে গিয়ে হঠাৎ চোখে পড়ল সরু সুতোর মত একটা ক্ষীণ রেখা। কৌতূহলী হয়ে একটা লোককে জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে, এটা 'রোপ ওয়ে।' এরই সাহায্যে দুর্গম পথে জিনিসপত্র পাঠান হয়। কোথায় যে এর সুরু, আর কোথায় যে এর সারা, তা কেউ বলতে পারে না।

আর একটু এগোলে চোখে পড়বে বর্দ্ধমান মহারাজার প্রাসাদ। দার্জ্জিলিংয়ের অদ্ভুত এবং অত্যাশ্চর্য্য হর্ম্ম্যমালার মধ্যে এটি অন্যতম বলা চলতে পারে। ঢুকতেই চোখে পড়বে একটা ছোট জলাধার। নানা ধরণের রঙ-বেরঙের মাছ খেলা করে বেড়াচ্ছে এর মধ্যে। উপরের আবরণটা যেন শরতের নীলাকাশের মত সুন্দর। সমস্ত আকাশটা যেন ভেঙে পড়েছে ওর উপর। তাতে যেন প্রাসাদের জৌলুষ আরও বেড়েছে। কুমারের উপস্থিতি প্রাসাদের ভিতরে ঢুকবার পথে অন্তরায় হ'ল। গাইড বলল—"কুমারের প্রাসাদে অবস্থানকালীন সময়ে কারও ঢোকবার অনুমতি নেই।" তাই অন্দর না দেখার অপেক্ষা নিয়েই আমাদের সেখান থেকে ফিরতে হ'ল। ওখান থেকে বিদায় নিয়ে ভিক্টোরিয়া ফলস দেখতে গেলাম। দার্জ্জিলিংয়ের দর্শনীয় বস্তুর তালিকায় এটা পড়ে। উপর থেকে জল নীচের দিকে অশ্রান্ত বেগে গড়িয়ে পড়ছে। কি দুরন্ত তার গতিবেগ! কল্পনা করা যায় না। তার মুখে যে কোন জিনিস পড়লে গুঁড়ো হয়ে যাবে। নায়েগ্রা জলপ্রপাত চোখে দেখা থাকলে একটা ছোটখাট তুলনা করতে পারতাম এর সঙ্গে।

ওখান থেকে বেরিয়ে তেনজিংয়ের বাড়ীর পথে যেতে যেতেই মুষলধারে বৃষ্টি এল। এ দেশের বৃষ্টি কোন ইঙ্গিত দিয়ে আসে না। এই দেখে গেলাম রৌদ্রে ঝলমল করছে সব, একটু পরেই আকাশ মেঘলা করে বৃষ্টি এল। তাই বাধ্য হয়ে আবার হোটেলে

বৰ্দ্ধমান প্রাসাদ

ফিরে এলাম। বেলা তখন ১২টা। যারা বেরিয়ে ছিল তারা সব ফিরতে সুরু করে দিয়েছে। বাহাদুর ছোটাছুটি করছে ভাতের থালা নিয়ে। বিমল বলল—"তাড়াতাড়ি করে স্নান করে খেয়ে নে। একটু বিশ্রাম করে আবার ত বেরোতে হবে। বলা যায় না আবার বৃষ্টি সুরু হলে সব পণ্ড হয়ে যাবে।" খেতে খেতে বললে বিমল—"এবার কোথায় যাবি ?"

আমি বললাম—"এ বেলায় ষ্টেপ এ্যাসাইড, ম্যালএ যাওয়া যাবে নেহরু রোড থেকে সুরু করে ম্যালে অবধি—দার্জ্জিলিংয়ের সব চেয়ে কর্ম্মচঞ্চল জায়গা। যত বড় বড় রেস্তোরা, মনোহারী দোকান, বড় বড় প্রাসাদ ভীড় করে আছে এই অঞ্চলে।

ম্যালের রাস্তায় ঢুকতেই একরাশ ছেলেমেয়ে ভীড় করে এল। হাতে তাদের ক্রুশকাঁটা। আর অর্দ্ধ-সমাপ্ত সোয়েটার।

বলল—"বাবু ঘোড়া চাই ?"

আমি বললাম : "না আজকে আমাদের দরকার নেই।"

অনেক পথ এগিয়ে গেছি একটা ছোট ছেলে ঘোড়া নিয়ে ছুটে এল। বলল :—"চলুন বাবু।"

দেখে বড় মায়া হ'ল ছেলেটার ওপর। সুন্দর ফুটফুটে গায়ের রঙ। কত আর বয়স হবে ! বড় জোর ৭।৮। ইস ! এটুকু বয়সে জীবন-যৌবন-ভবিষ্যৎ সব কিছুকে পেছনে ফেলে এ পথে পা বাড়িয়েছে। কে জানে কত অভাব কত অভিযোগ ওদের সংসারে। হয় ত বা গোটা পরিবারকে ওর আয়ের উপর নির্ভর করতে হয়।

আমি বললাম :—"আজ ত যাব না ভাই। কাল যাব।" চলেই আসছিলাম—হঠাৎ পিছনে তাকিয়ে দেখি দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটি প্রাণহীন পুতুলের মত। বুকটা ব্যথিয়ে উঠল অকারণ। তাকিয়ে দেখি তার নীল চোখে দিগন্ত-বিস্তৃত আকাশের স্পষ্ট আভাস। কিন্তু সেই চোখেও জল।···দিন ক্রমশ ধীরে ধীরে সূর্য্যহীন রাত্রির দিকে গড়িয়ে চলেছে। একটা বিষণ্ণ ম্লান আলো

ষ্টেপ-এ্যাসাইড

সারা শহরের ওপর ছড়িয়ে আছে।···আর লক্ষ্য করলাম একটুকরো ম্লান বৈকালী আলোর ছেলেটার মুখের ওপর কে যেন কান্নার রঙ টেনে দিল এক নিমিষে। খাকী রঙের বুশ-শার্টটার বোতাম ছেঁড়া। এক ফালি ছোট্ট বুক।··· দিন-রাত্রি পৃথিবীর আবর্ত্তনের সঙ্গে অবিরাম স্পন্দনহীন সেই ছোট্ট হৃদয়টা। মাথার রুমালটা উড়ছে আকাশে। মনে পড়ল মিশরের পথে পথে এমন ছোট ছোট ছেলের দল দেখেছি। যারা মিশরের ভবিষ্যত ছিল একদা—তারাই পথে পথে পথে 'সু-সাইন' যন্ত্র কাঁধে নিয়ে ঘুরেছে ব্রিটিশ-ভ্রমণকারীদের জুতা পালিশ করবার জন্য। আর মিশরের তৎকালীন শাসনকর্ত্তা শুধু মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙ্গে এ পাশ ও পাশ করেছেন।

ছেলেটাকে কাছে ডেকে কয়েকটি পয়সা হাতে দিলাম। আর আমার ঠিকানাও দিলাম। ম্যালের পাশ দিয়ে নেমে গেছে ষ্টেপ এ্যাসাইডের সরু রাস্তা। খানিকটা গেলে ষ্টেপ এ্যাসাইড। বিমল বলল :—"যার কথা ইতিহাসে পড়েছি এই সেই ষ্টেপ এ্যাসাইড ? এইখানেই চিরকালের জন্য আলোর দিকে তাকিয়ে চোখ বুজেছেন চিত্তরঞ্জন। বাংলা দেশের প্রাণ।"

আমি বললাম :—"হ্যাঁ, এক প্রাতঃস্মরণীয় মানুষের পুণ্যস্মৃতিকে আশ্রয় করে প্রণম্য হয়ে আছে এই ষ্টেপ এ্যাসাইড সর্ব্বকালের সর্ব্ব-দেশের মানুষের কাছে। তাঁর জীবনের শেষ বসন্তগুলি এখানেই কেটেছিল।" গেটে ঢুকতেই চোখে পড়বে কালো বোর্ডের উপর লেখা আছে ষ্টেপ এ্যাসাইড। গাইড বলল :—"ভিতরে আসুন।" জুতো খুলে ভিতরে ঢুকলাম। চিত্তরঞ্জন আজ নেই। তারই পুণ্য-স্মৃতিকে নিয়ে গড়ে উঠেছে পাঠাগার। সেবাসদন। সিঁড়ি বেয়ে

উপরে উঠলে চোখে পড়বে পাঠাগার-ভবন। একটা বিরাট সংগ্রহশালা বলা চলতে পারে। চোখে পড়ল রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি', গোর্কির 'মা', টলষ্টয়ের 'ওয়ার এণ্ড পীস', পার্ল এস বার্কের 'গুড আর্থ।' এমনি অনেক যা বলে শেষ করা যায় না। আর একটু এগোলেই চিত্তরঞ্জনের ঘর চোখে পড়বে। চিত্তরঞ্জনের ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। একটা রাইটিং টেবিল আর একটা ছোট আলমারী। এ ছাড়া আর কোন আসবাবপত্র চোখে পড়ল না। পাশেই একটা বিছানা। পরিষ্কার চাদরের উপর ছড়ান কতকগুলি ফুল। গাইডকে জিজ্ঞাসা করলাম :—"এগুলো কি ?" গাইড বললে :—"চিত্তরঞ্জনের পূজা করা হয় রোজ। মরবার পর থেকে এই নিয়মই চলে আসছে।
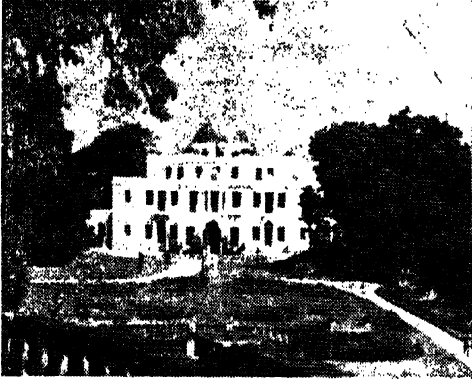
গবর্ণর হাউস

প্রথম ঢুকতেই যতটুকু অবাক হয়েছিলাম—তার চেয়ে বেশী অবাক হলাম চিত্তরঞ্জনের কথা ভেবে। এই সেই মানুষ যাঁর জীবন একদিন বিলাস আর ব্যসনের মধ্যে দিয়ে কেটেছিল। একি সহজ, সাধারণ জীবন! বিশ্বাস করা যায় না। ঘরের মধ্যে ঝুলান রয়েছে চিত্তরঞ্জনের নিভে-যাওয়া প্রাণ। কবিগুরুর ব্যথা-প্রবণ কথাগুলি লেখা আছে তার গায়ে—

"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।"

কর্মের আর ত্যাগের মধ্যেই ত সত্যিকারের মানুষ বেঁচে থাকে। চিত্তরঞ্জন বুঝেছিলেন বিলাস-জীবনের পেছনে আছে নির্মম পরিণতি। আত্মার অবমাননা। তাই ত চিত্তরঞ্জন সব হারিয়ে, সব বিলিয়ে পথে নামলেন; মানুষের সাথে মিশলেন একাত্ম হয়ে। শুনলেন তাদের সুখ-দুঃখ অভাব-অভিযোগের কথা। তাই ত বাংলার মানুষ চিত্তরঞ্জনকে এত বড় করে দেখল। মানুষের দরবারে 'দেশবন্ধু' নামে বিভূষিত হলেন তিনি।

টেশ এ্যাসাইড থেকে বিদায় নিয়ে আবার ফিরে এলাম ম্যালেতে একটু আগে যে যায়গাগুলো শূন্য দেখে গিয়েছিলাম এটুকু সময়ের মধ্যে তা পূর্ণ হয়ে গেছে লোকে লোকে। ম্যালের সবচেয়ে উপভোগ্য সময় এইটাই। যে যেখানে থাকুক এ সময়টা তারা এখানে এসে মিলবেই। এটা যেন দার্জ্জিলিংয়ের একটা মিলন-তীর্থ। এইখানে বসে আলাপ হয়েছিল মিস মীরা মিত্রের সঙ্গে। দার্জ্জিলিংয়ের কোন এক কলেজের সাহিত্যের ছাত্রী।

মীরা বলল :—"আপনারা কি এখানে বেড়াতে এসেছেন ?"

আমি বললাম :—হ্যাঁ।

ও বলল :—"দেখবেন এ দেশে যত ঘুরবেন, তত আনন্দ পাবেন। মনে হবে যেন একটা নূতন জন্ম ফিরে পেয়েছেন।"

এমনি আরও অনেক কথা হয়েছিল মিস মীরা মিত্রের সঙ্গে। দূরে কোথায় ৯টা বেজে বেজে থেমে গেল।

মীরা বলল :—"চলুন ওঠা যাক এবার।" বোর্ডিং কাছে আসতেই মীরা বলল :—"হিন্দু বোর্ডিংয়ে থাকেন বুঝি আপনারা ?"

আমি বললাম :—"হ্যাঁ। ১৩ নং ঘরে। আসুন না দেখে যাবেন।"

মীরা বলল :—"আজ আর নয়। আর একদিন আসব।" পরে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে ছোট্ট একটা কার্ড দিয়ে বলল :—"সকালে আপনাদের চায়ের নিমন্ত্রণ থাকল আমার ওখানে। আসবেন কিন্তু। না আসলে ভারী রাগ করব।" পরে মীরার মা বললেন :—"এসো বাবা। তোমাদের পেলে খুসী হব।"

আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলাম সেদিন মা ও মেয়ের সহৃদয়তা দেখে। পরের দিন ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরীই হয়েছিল। হাত-মুখ ধুয়েই বেরিয়ে পড়লাম। বাইরের বারান্দায় চঞ্চল হয়ে আমাদের জন্ম অপেক্ষা করছিল মীরা মিত্র। আমরা যেতেই মীরা মিত্র এগিয়ে এল। বলল :—"আমি ত মনে করেছিলাম আর বোধ হয় এলেন না।" আমি বললাম—"হ্যাঁ, একটু দেরীই হয়ে গেল।"

ঘরে ঢুকতেই চোখে পড়ল দেওয়ালে ঝুলান রয়েছে একপাশে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ছবি—আর একপাশে ঝুলান রয়েছে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ছবি গুণী মনের একটা সুন্দর পরিচয় পেলাম। একটু পরেই মীরা মিত্র একরাশ খাবার নিয়ে ভিতরে ঢুকল। আমি বললাম :—"একি করেছেন মিস মিত্র! মতামাম্ভ অতিথিদের কি এত আপ্যায়ন না করলেই চলত না!" একটু লজ্জা পেয়ে মীরা বলল :—"ছিঃ ছিঃ কি যে বলেন।" ভাবছিলাম পথের সামান্য একটু আলাপে মানুষ মানুষকে কত কাছে টানতে পারে! মীরা মিত্র আমাদের কে ? কেউ নয়। এমন কি কোন দূরতম সম্বন্ধ নেই তার সঙ্গে। অথচ আজ অবাক লাগে তাকে আলাদা করে দেখতে। হৃদয়ের সবখানি জুড়ে যেন মীরা মিত্র বসে আছে।

মীরা বলল :—"কি ভাবছেন অত ? নিন খেতে সুরু করুন।" খেতে খেতে মীরা বলল :—"বুঝলেন অধীরবাবু, এ জীবনে অনেক দেশ ঘুরলাম। একবার দিল্লী, একবার কলকাতা, একবার এলাহাবাদ

—কোন দেশে গিয়ে শান্তি পেলাম না। এমন কি একটু স্বস্তিও জুটল না কোথাও। এ দেশের সঙ্গে তার কোন তুলনাই চলে না। স্বাস্থ্যোদ্ধার করতে এসে এদেশের একেবারে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছি। এদেশে যখন প্রথম এল'ম তখন অত্যন্ত কৃশ ছিলাম।
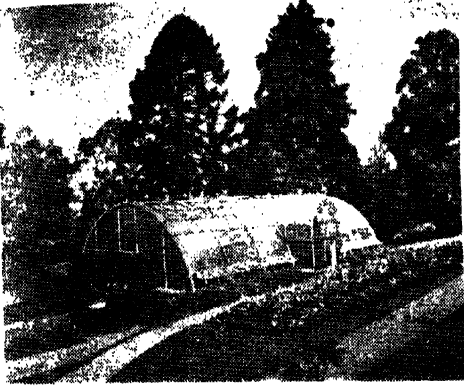
বোটানিক্যাল গার্ডেন

দেহের সঙ্গে মনের কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারতাম না। দার্জ্জিলিঙের জল-হাওয়া আজ আমার জীবনের দিক ঘুরিয়ে দিয়েছে। আজ আমি সম্পূর্ণ সুস্থ, সবল। কোন অভাব নেই, কোন অভিযোগ নেই দেহ কিম্বা মনের। বাবা থাকেন কলকাতায়। আমরা মা ও মেয়ে থাকি এখানে। মাঝে মাঝে এসে আমাদের দেখে যান।" আমি বললাম—"সত্যি। এ দেশের পথে পথে যে এত ঐশ্বর্য্য জড়িয়ে আছে তা আমার জানা ছিল না। যা দেখছি তাই যেন অসাধারণ ঠেকছে। নিজে না দেখলে যেন বিশ্বাসই করা যায় না।" মীরা বলল—"এ দেশে সব চেয়ে আমার ভাল লাগে এ দেশের মানুষকে। কত উন্নত, কত উদার হৃদয় তাদের! কপটতা তারা জানে না, ছলনা তারা জানে না। শুধু জানে প্রীতি ভালবাসা দিয়ে মানুষকে বেঁধে নেবার মন্ত্র।"

মিস মিত্রের বাসা থেকে যখন বেরোলাম তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। ওখান থেকে আর কোথাও না গিয়ে বরাবর হোটেলে চলে এলাম। ঘরের দরজা খুলে দিলে ভাসা ভাসা দেখা যায় পাহাড়ের কোল বেয়ে নেমে আসা ঘন বসতি।

বোটানিক্যাল গার্ডেন, বার্চ্চ হিল। রাত হলে যেন আরও অদ্ভুত, আরও সুন্দর দেখায়। মনে হয় যেন দেওয়ালী উৎসব বসেছে। বিকালবেলায় পথে বেরোতেই আবার সেই ছেলেটার সঙ্গে দেখা যাকে সেদিন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম জল-পাহাড়ে যাবার। একা একা ঘোড়ায় চড়তে সাহস হ'ল না। পড়ে গিয়ে বিদেশ-বিভূঁইয়ে আবার একটা বিপদ হবে। তাই ছেলেটাকেও ঘোড়ায় পিঠে তুলে নিলাম। ঘোড়ায় চড়তে অদ্ভুত পারদর্শী এরা। জীবনের প্রাক-উষা থেকে হয়ত অনুশীলন করে আসছে। লাগামটা ধরে উর্দ্ধশ্বাসে আমাদের ছুটিয়ে নিয়ে চলল। অবশেষে এক জায়গায় এসে লাগাম কষে ধরল। বলল—"এই জল-পাহাড়।" মনে হ'ল যেন দার্জ্জিলিংয়ের সব চেয়ে উঁচু জায়গা। এই জল-পাহাড়! এখানে দেখবার মত তেমন কিছু চোখে পড়ল না। শুধু একটা সেনানিবাস আছে। একটু দেখে-শুনে আবার রওনা দিলাম। এক জায়গায় এসে ছেলেটা লাগাম কষে ধরল। নেমে দেখি ফটকের দেওয়ালে ছোট্ট করে লেখা রয়েছে 'মহারাজা, দীঘাপাতিয়া।' ছেলেবেলায় বাবার মুখে দীঘাপাতিয়ার নাম শুনেছিলাম। শুনেছিলাম তাঁর বিক্রম আর ঐশ্বর্য্যের কথা। তাই একটা কৌতূহল নিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। ভিতরে ঢুকতেই অবাক হয়ে গেলাম। পুকুরগুলো সব শুকিয়ে গেছে। বাগানগুলো সব যত্নের অভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। দেওয়ালের ফাটলে ফাটলে জন্ম নিয়েছে শ্যাওলা আর বটের চারা।

দীঘাপাতিয়া মহারাজার সমৃদ্ধির চিহ্নগুলি যেন আজ ব্যঙ্গ করছে সমস্ত প্রাসাদটাকে। অথচ শোনা যায় এর মত ধনী তখন এ অঞ্চলে আর কেউ ছিলেন না। গাইডের কাছে অন্দরে ঢুকবার অনুমতি চাইলে গাইড বলল—"ভিতরে গিয়ে আর কি করবেন? কিছুই নেই। সব নষ্ট হয়ে গেছে।"

ভাবছিলাম ভাগ্য মানুষকে কোথায় নিয়ে যায়! আজ যে আছে রাজা, কর্ম্মফলে কাল হয়ত হবে সে ফকির। আজ যে প্রাসাদে নূতন জীবন সুরু করল, কাল হয় ত সে পথে ঘর বাঁধবে। একদিন মহারাজা দীঘাপাতিয়ার কি না ছিল! সুখ, সমৃদ্ধি, ঐশ্বর্য্য—কত মানুষ তাঁর আশ্রয়ে থেকে প্রতিপালিত হয়েছে। কি পরিণতি আজ সেই মানুষের! এই ত হয়! উত্থান আর পতনের মধ্য দিয়েই ত মানুষের সত্যিকারের ইতিহাস ফুটে ওঠে। ওখান থেকে চলে এলাম বোর্ডিংএ। কিছু খেয়ে-দেয়ে বোর্ডিং ম্যানেজার নির্ম্মল ভট্টাচার্য্যকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম 'ধীরধাম' মন্দির দেখতে। এই অবসরে বোর্ডিং ম্যানেজার নির্ম্মল ভট্টাচার্য্য সম্বন্ধে কিছু বলে নিই। আমাদের সমবয়সী হবে অথবা দু'এক বছরের বড় হবে বয়সে। পরে কথাবার্ত্তায় আচার-ব্যবহারে একেবারে বন্ধুর মত হয়ে গিয়েছিলাম আমরা। একদিন আমাদের টিফিন সুপারভাইস করতে এসে একেবারে রীতিমত গল্প জুড়ে দিল।

নির্ম্মল বলল—"অধীরবাবু! আমার এ জীবনে অনেক বোর্ডারের সান্নিধ্যে এসেছি, মিশেছি একাত্ম হয়ে। কিন্তু প্রীতিভালবাসা খুব অল্পের কাছ থেকেই পেয়েছি, তাদের সঙ্গে আপনাদের কোন তুলনা হয় না, আপনারা সত্যই ব্যতিক্রম!"

মনে হ'ল যেন অনেক আঘাত, অনেক যন্ত্রণার সমুদ্র পেরিয়ে ভাঙা-ঘাটের পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছে। এত দিন ধরে শুধু মানুষের অনাদর আর উপেক্ষাই ওর কপালে জুটেছে। তাই ত কাঙালমনটা একটু ভালবাসা, স্নেহ পাবার জন্য এত উদগ্র, কিন্তু আজও খুঁজে পাই না, একটু সহানুভূতি, একটু আন্তরিকতা দিলে যদি ত

আর এক মানুষের সাশ্রয় হয়—তা দিতে মানুষের এত কুণ্ঠা, এত কৃপণতা কিসের! কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে ভেসে আসছে কাঁসর-ঘণ্টার আওয়াজ। একটু এগিয়ে গিয়ে দেখলাম 'ধীরধাম' মন্দির। অনেকটা বৌদ্ধ প্যাগোডার অনুকরণে তৈরী। মন্দিরের চূড়ায় উড়ছে সাদারঙের পতাকা। বৌদ্ধধর্মের প্রতীক-চিহ্ন।
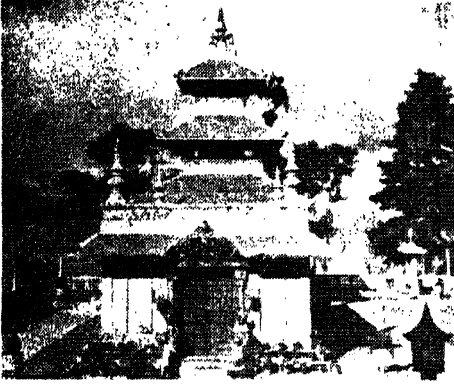
ধীরধাম মন্দির

এখান থেকে ওখান থেকে অনেক লোক এসে মেলে সেই সময়। সুন্দর আরতি করেন পুরুতঠাকুর। পঞ্চপ্রদীপ নিয়ে যখন আরতি করেন পুরুতঠাকুর—তাঁর ধ্যানাবদ্ধ চোখের দিকে চেয়ে মনে হয় যেন দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গিত এক প্রাণ। ধূপ-ধুনায় ভরপুর হয়ে আছে পূজাপ্রাঙ্গণ। পরের দিন সকালেই তেনজিঙের বাসার দিকে রওনা হলাম। বাড়ীর কাছে এসে দেখি লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে সারা বাড়ীটা। শুনলাম তেনজিং তখনও আসেন নি। একটু পরে তেনজিং এল। মানুষের মধ্য থেকে চীৎকার উঠল 'তেনজিং তেনজিং।' দেখলাম তেনজিং মানুষের হাতে হাত দিয়ে রেলিং বেয়ে উপরে উঠছেন। বেশ সুন্দর সুঠাম চেহারা। মুখে সুস্মিত হাসি। তার সঙ্গে কি দেখা করা যায়, না কথা বলা যায়! মানুষে ছেঁকে ধরেছে তাঁকে, তাই উপর উপর ভাসা ভাসা একবার দেখে নিলাম। তেনজিং বাইরের ঘরে অভিযান-পথের সাজসরঞ্জাম নিয়ে একটা প্রদর্শনী বসিয়েছেন, তাই দেখতে গেলাম। ঘরের মধ্যে ঢুকতেই দেখলাম বাঁ ধারের দেওয়ালে ঝুলান রয়েছে দুটো ব্র্যাকেট ক্রশ করে। গাইডকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম এ দুটোর একটা তেনজিং স্কীতে লাগিয়ে বরফের উপর দিয়ে হেঁটেছিলেন। আর অপরটা হাতে নিয়েছিলেন ব্যালান্স রাখবার জন্য। আর একটু এগিয়ে গিয়ে দেখলাম একটা বিরাট টেবিল। ওতে সাজান রয়েছে অভিযানে ব্যবহৃত নানান ধরণের জিনিসপত্র। কয়েকটি মাত্র বুঝতে পেরেছিলাম। কারণ গাইডকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় সে বেশ বিরক্তি বোধ করছিল! ওর মধ্যে ছিল নানান ধরণের মূল্যবান স্কী! দুটো অম্লজানবাহী যন্ত্র। শোনা যায় এ দুটো তেনজিংকে অভিযানের পথে অনেকটা সাহায্য করেছিল। তারপর আছে ক্যাম্প সু, স্লিপিং ড্রেস, আরও নানা রকমের জিনিস। আরও একটু এগিয়ে গিয়ে দেখলাম রাষ্ট্রপতি-প্রদত্ত মানপত্র: "Special gold medal presented by the President Dr. Rajendra Prasad to Shri Tenzing Norgay at Rastrapati Bhawan." New Delhi, June 29, 1953.

বেরিয়ে আসবার সময় দেখলাম তেনজিঙের অনেকগুলি ছবি। টাইপের লেখায় বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে কোথায় কোন ফটো গৃহীত হয়েছে। তেনজিং বাড়ী থেকে ফেরার পথে আবার দেখা হয়ে গেল ম্যালের মীরা মিত্রের সঙ্গে। সেই প্রথমে হাসিভরা মুখটা নিয়ে এগিয়ে এল। জিজ্ঞাসা করল, "এ ধারে কোথায়?" বললাম, "তেনজিঙের বাড়ীতে।" বলল, "কেমন দেখলেন?" বললাম, "ভালই।" পথ চলতে চলতে মীরা শুধালে, "গবর্ণর হাউস দেখেছেন।" বললাম, "না। ওইটা আর বোটানিক্যাল গার্ডেনটা দেখলে মোটামুটি আমাদের সব দেখা হয়ে যায়।" মীরা বলল, "বেশ তা হলে চলুন গবর্ণর হাউসে। ও বেলায় বোটানিক্যাল গার্ডেন যাওয়া যাবে।" গবর্ণর হাউস দেখাশোনা করার জন্য একজন সাব-ডিভিশনাল অফিসার আছেন। তার অনুমতি-পত্র নিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। ঢুকতেই চোখে পড়ল অশোক-স্তম্ভ। 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'-এর প্রতিমূর্ত্তি। মনে পড়ল অশোকের কলিঙ্গযুদ্ধের কথা। কত দূর রাজ্যলোলুপ নিষ্ঠুর হতে পারে একজন মানুষ। অশোক নিজেই তার একটা প্রমাণ। কলিঙ্গের প্রান্তরে দাঁড়িয়ে তিনি দেখেছিলেন নারকীয় ধ্বংসের বীভৎসলীলা। তবু বলব কলিঙ্গযুদ্ধের প্রয়োজন ছিল অশোকের জীবনে। কারণ ধ্বংসের মধ্য দিয়েই ত সৃষ্টির সূচনা। কলিঙ্গযুদ্ধ তাঁর জীবনের একটা দিক ঘুরিয়ে দিয়েছে। কারণ কলিঙ্গযুদ্ধ যদি তাঁর জীবনে না ঘটত তবে মানুষ অশোককে এমন সহজ, সত্য, সুন্দর ভাবে পেতাম কিনা বলা শক্ত। ঢোকার পর প্রথমেই চোখে পড়ল প্রাইভেট সেক্রেটারির প্রশস্ত ঘরটা। আর একটু এগোলেই ডাইনিং হল। বিরাট একটা টেবিলের উপর সাজান রয়েছে অসংখ্য চেয়ার। এমনি আরও নানা রকমের কত ঘর। তাস খেলার ঘর, সিগারেট খাওয়ার ঘর, ধোবার ঘর। প্রতি ঘরেই আছে Electric fire-place। গবর্ণর হাউসের উপরের আবরণটা অবিকল বর্দ্ধমান মহারাজার প্রাসাদের মত। সব সময় ঝলমল করছে। সূর্য্যের আলো পড়লে আরও অদ্ভুত আরও সুন্দর দেখায়। এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যায় 'লেবোন' রেস কোর্সের গোলাকার সীমানাটা। দেখা যায় ফার্ণ গাছের মধ্য দিয়ে চলে গেছে বোটানিকসের সরু রাস্তা।

মীরা বলল, "এখনকার মত এই থাক। বিকেলে আবার বেরোনো যাবে।" তাই হ'ল। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে

ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত

মীরাকে নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লাম বোটানিকসের পথে। আবার পথ। বিশ্রাম নেই, বিরাম নেই, শুধু পথ ভেঙে ভেঙে চলা। পথের নেশা যেন আমাদের পেয়ে বসেছে। পথ চলতে গিয়ে কতবার হোঁচট খেয়েছি, কতবার পায়ে কাঁটা বিঁধেছে। তবু চলছি, পথের শেষ মিলবে, কি মিলবে না সে হিসেব আজ নয়। আজ যেন অকারণে অনির্দিষ্টের পথে হাঁটতে ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে যেন এমনি করে পথের পর পথ পেরিয়ে আমরা অনায়াসে দিন-রাত্রি কাটিয়ে দিতে পারি। আর একটু এগোলেই বোটানিক্যাল গার্ডেন। অদূরে পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় রোদের সোনা ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে। সামনেই একটি গ্রাম্য মন্দির। পাহাড়িয়ারা পূজা করে। মন্দিরের গায়ে নানান ধর্মের নানান দেবতার প্রতিমূর্ত্তি নীচে কি যেন ভাসা ভাসা লেখা। ঠিক বুঝতে পারলাম না। মীরা বলল, "অধীরবাবু, এসে গেছি আমরা। এইবার যত পারেন দেখে নিন। ঘুরে নিন, পরে অনুযোগ করবার কিছু না থাকে।" বোটানিকসের ভিতরে ঢুকে আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলাম। ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যে ভরপুর বোটানিকসটা। চারিদিকে শুধু ফুল আর ফুল। ফুলে ফুলে যেন বসন্ত জেগেছে। ফুলের পাশে টিনের প্লেটে খোদাই করা নানা বৈদেশিক নাম। কখনও বা কচিৎ চোখে পড়ে বনযুঁই, কনকচাঁপা, বকুল ফুল। ফুলের প্লাবনকে দু'হাতে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে চলতে লাগলাম। কত ফুলের কুঁড়ি অজান্তে গায়ে এসে পড়েছে। কখনও বা আলতো কুঁড়িগুলো সামান্য স্পর্শে ঝরে পড়ছে বনতলে। বাতাসে ভাসছে মৃদু গন্ধ। হয়ত বা লেবুপাতার ছন্দের দোলা হয়েছে উত্তাল। একটা জায়গা দেখিয়ে মীরা বলল, "আসুন এখানে বসা যাক! তার পর কেমন লাগছে বলুন?"

সূর্য্যোদয়

"অসম্ভব ভাল লাগছে মিস মিত্র। কবির কথায় বলতে ইচ্ছা যাচ্ছে:

"বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করে বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়াছি পর্ব্বতমালা
দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু,
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘরের বাহিরে দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের 'পর
একটি শিশির বিন্দু।"

মাটির মধ্য দিয়ে চলে গেছে সরু পাইপ। দুটো বাজতে না বাজতেই সারা বাগানটা ভিজে ওঠে। দু'ধারে দুটো কাঁচের ঘর। তার মধ্যে রকমারি ফুল। যেন ফুটন্ত ফুলের হাট বসেছে কাচের ঘর আলো করে। বিকালের পড়ন্ত সূর্য্য কাঁচের সাশি বেয়ে পিছলে পিছলে পড়ছে। একভাবে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকলেও তৃষ্ণা মেটে না—বরং বেড়ে ওঠে। রাজ্যের ঐশ্বর্য্য যেন ভীড় করে আছে। মীরা বলল, "জানেন অধীরবাবু, এ একটা এমন দেশ যেখানে একটা জীবন নির্ঝঞ্ঝাটে কাটিয়ে দেওয়া যায়।"

বললাম, "সত্যি, মীরা দেবী, তাই। এখন ভাবছি এ পথে না আসলে হয়ত ভাল করতাম। ঘরমুখো মনটা যেন আর ঘরে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না। কেবলই যেন মনে হচ্ছে এমনি করে পৃথিবীর পথে পথে ছুটে বেড়াই।"

পরের দিন রাত তিনটার সময় যাত্রা করলাম কাঞ্চনজঙ্ঘার পথে। যার আকর্ষণে দূরদূরান্তের মানুষ ছুটে এসেছে এখানে।

কাঞ্চনজঙ্ঘার সূর্য্যোদয় দেখা নাকি একটা ভাগ্যের কথা। সবার কপালে এ যোগ্যতা দেখা হয়ে ওঠে না। চড়াই আর উৎরাইয়ের পথ পেরিয়ে অবশেষে উপস্থিত হলাম "টাইগার হিলে।" এখান থেকে পরিষ্কার ভাবে দেখা যায় কাঞ্চনজঙ্ঘার সূর্য্যোদয়।

একটু পরেই অজস্র স্বপ্ন-সম্ভার নিয়ে ভোরের সূর্য্য যেন লাফ মেরে উঠেছে। কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথায়। কত রূপ, কত রঙ সে সূর্য্যের? কে যেন মুঠো মুঠো আবীর ছড়িয়ে দিয়েছে ওর কপোলে। সে আলোর দ্যুতি জ্বলে জ্বলে ছুটতে লাগল শৃঙ্গ থেকে শৃঙ্গান্তরে। আজ বুঝতে পারছি কেন কাঞ্চনজঙ্ঘার সূর্য্যোদয় মানুষের মনকে এমন ভাবে নাড়া দেয়, কেন বিভিন্ন দেশের মানুষ বিভিন্ন দিক থেকে ছুটে আসে কাঞ্চনজঙ্ঘার সূর্য্যোদয় দেখতে। এমনি করেই দার্জ্জিলিঙের শৈলসানুতে সুখতপ্ত দিনগুলো কেটে গেল, যাবার দিন এগিয়ে এল। আসন্ন বিদায়-বেদনায় মনটা গুমরে গুমরে উঠতে লাগল। মনে পড়ল বাহাদুরের ছোট্ট কথাটা—"পথে বেরোলে অনেক লোক পাবেন।" সত্যি ওরা ত শুধু পথচারী নয়। অনেক কালের পরিচয় ওদের সঙ্গে। হৃদয়ের একটা নিকটতম যোগ আছে ওদের আত্মার সঙ্গে। সেই যুগযুগান্তরের প্রীতি-মৈত্রীর সূত্র ধরে আজ আমরা আবার মিলেছি পরস্পরের সঙ্গে।

পরের দিনই দার্জ্জিলিং ছেড়ে চলে যেতে হবে। পিছনে পড়ে রইবে সবুজ বনের সৈকত, ম্যালের মধুরতম সন্ধ্যা, মীরা মিত্রের স্নেহ-প্রীতি, নির্ম্মলবাবুর ভালবাসা, বাহাদুরের স্নেহবাৎসল্য। পরের দিন ষ্টেশনে অনেকেই অনেককে বিদায় দিতে এল। আমাদেরও বিদায় দিতে এল মীরা মিত্র, নির্ম্মলবাবু, বাহাদুর।

মীরা বলল, "অধীরবাবু, পথের উপরে কথায় কথায় যে পরিচয় হ'ল তা যেন পথের ধূলায় ধূসর হয়ে না যায়। সত্যিকারের একটা পরিচয় যেন থাকে অনন্তকাল ধরে।"

বললাম, "নিশ্চয়ই থাকবে মীরা দেবী! তোমাদের সহৃদয়তার কথা কোনদিনই ভোলবার নয়। আবার যদি কোনদিন এ পথে আসি তবে নিশ্চয়ই দেখা হবে।" ওধারে গার্ড হুইসল দিচ্ছে। গাড়ী ছাড়বার সময় হয়ে গেছে। নির্ম্মলবাবু বলল, "অধীরবাবু, গিয়েই চিঠি দেবেন। আবার যদি পারেন একবার আসবেন।" আমি বললাম, নির্ম্মলবাবু, ইচ্ছে ত করে সারাটা জনম ধরে এখানকার মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকি। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই।"

বাহাদুরের কাছে গিয়ে বললাম, "তুমি ত কিছু বললে না বাহাদুর!"

বাহাদুর বলল, "আপনারা সুখে থাকুন, আবার আসবেন।"

বললাম, "আসব বাহাদুর। অন্ততঃ তোমাদের টানে আর একবার আসব।

বাঁকের মাথায় শেষবারের মত পাহাড়ের দিকে চেয়েছিলাম। একটা মধুময়, স্বপ্নিল জগৎ। তাও পড়ে রইল ঐ পথের বাঁকে। অপসৃয়মান পাহাড়ের দিকে চেয়ে কেন জানি না মনটা ব্যথায় টনটনিয়ে উঠল। বিদায়ের মোহনায় কি এমন রেখে গেলাম যে, দৃষ্টিকে পেছনে ঘোরাতেই হবে!

নিঃসীম

শ্রীউমা দেবী

হৃদয়ের শিলাপট্টে তোমারই ও নাম
খোদাই করেছি রাঙা বাসনার অন্তঃসূচীমুখে,
একটি নিটোল ক্ষণ রেখেছে গোপন করে মধুর বিরাম
জাগরণ ভেঙে পড়ে সুষুপ্তির সুখে।

আর একবার চাও মুখ তুলে—দেখাও দৃষ্টিতে
প্রচ্ছন্ন গোপন শিখা হৃদয়লোকের,
আর একবার আনো নূতন সৃষ্টিতে
নূতন প্রেমের রাজ্যে দীপ্তি আলোকের।

কি বলে তোমায় ডাকি? ভাই? বন্ধু? পিতা? পুত্র? প্রিয়?
কিছু নয়—সমস্ত মিলেও জানি কিছু নয় তোমার সমান—
সমগ্র সত্তায় তুমি ভরে দিলে অলোক অমিয়,
দেহের অর্গল ভেঙে মুক্ত করে দিয়েছ পরাণ।

অতল সমুদ্রতলে হারিয়েছি অস্তিত্ব আমার,
অনন্ত আকাশ 'পরে ভেসে যাই যেন শূন্যপ্রায়—
জ্যোতির উত্তাপে গলে গেল বুঝি হৃদয়ের দ্বার,
একটি বিন্দুর মধ্যে মহাব্যাপ্তি লুপ্তি পেতে চায়।

সে বিন্দু তুমিই শুধু জানি—
অস্পষ্ট ধ্বনির পরে তুমি পূর্ণ পঙ্কজের স্পষ্টাক্ষর বাণী।

রিলিফ ক্যাম্প

শ্রীবাণী চট্টোপাধ্যায়

উঁচু দীঘির পাড়। তালবন আর কাঁটা ঝোপঝাড়ের পাশ দিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে মধুসূদন। পেছনে ছোট একটা জনতা। নীচে আধ মাইল লম্বা দীঘির কালো জলের পাতাল-ছোঁয়া স্তব্ধতা। কাঁথি বেয়ে চারিদিকে নলখাগড়ার বনে বাবুই পাখীর বাসা দুলছে। অবোধ্য ভাষায় চীৎকার করে পাখীর দল, দোল খায় নলখাগড়ার মাথায় বসে। একটা মাছরাঙা শূন্যে স্থির, হঠাৎ কেঁপে লক্ষ্য ভেদ করে। বোমার মত ঝাঁপিয়ে পড়ে জলে, হয়ত ছোট একটা মাছ নিয়ে দূরে গাছে গিয়ে বসে, না হয় আবার লক্ষ্যভেদের মহড়া চলে। মধুসূদন থামল একটা তাঁবুর সামনে। ধোঁয়াটে তাঁবুর সারির মাঝামাঝি একটা জায়গা। "এই—এই কলের জলে বাসন মাজে কে?" একখানা থালা হাতে ছুটে পালায় একটি মহিলা। মধুসূদন সিগারেট বের করে ধরায়। ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসি ফুটে ওঠে। তার কর্ত্তৃত্বে সন্ত্রস্ত সবাই। কর্ত্তৃত্বের চাকুরী, ট্র্যানজিট ক্যাম্পের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট। ট্রাউজারের পকেট থেকে বাঁ হাতটা বের করে রিষ্টওয়াচের দিকে তাকাল। বেলা সাড়ে তিনটা। টাইলমাফিক সিগারেট টেনে চলে দূরে মাঠের দিকে তাকিয়ে। ধানের সবুজ ঢেউয়ের ওপারে উঁচু কালো বনটা ঐতিহাসিক গড়। একে একে কত রাজবংশ বিলীন হয়েছে ওখানে। উদ্বাস্তুদের দ্বারা নতুন গড়ে-ওঠা ছোট সহরটার ধারেই। রাইস মিলের চোংটার মাথায় গাঢ় ধোঁয়ার কুণ্ডলী। স্থান এবং কাল কবিত্বের পক্ষে চমৎকার, কিন্তু মধুসূদনের সে মন এখন আর নাই—অবসরও নাই। মুসলিম যুগের কীর্ত্তি দীঘিটার পাড়ে—এখানে ওখানে ভাঙা দরগা, কবরের পাথর ছড়িয়ে পড়ে আছে। সার সার তাঁবুতে সর্ব্বহারাদের হুতাশে শান্তির রেশ মিলিয়ে গেছে। ধোঁয়াটে রঙের তাঁবুতে ওদের মনটাও ধোঁয়াটে হয়ে এসেছে। শান্তিতে বসবাসকারীদের চোখে ধোঁয়ায় জ্বালা ধরিয়ে দেয়। শিক্ষার গর্ব্ব এদের কাছে বিষিয়ে ওঠে। সহস্র কামনা এদের, শুধু দাও দাও। দুটি বয়স্কা মহিলা আসছে এদিকে। নিশ্চয় কোন প্রার্থনা। তাড়াতাড়ি ঘুরে এগিয়ে চলল মধুসূদন। কলসীকাঁখে ডাগর চোখে বউরা জল নিতে আসছে কলে। কারও নিঃশঙ্ক ভাব, কেউ বা কপাল পর্য্যন্ত ঘোমটা টেনে ঠোঁটের কোণে সলজ্জ হাসি লুকাল। দৈনন্দিন ইন্সপেক্সন্। তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে হয়, সন্ধ্যায় বঙ্কিমবাবুর বাসায় চায়ের নিমন্ত্রণ আছে। কাবেরী গান শোনাবে, চমৎকার গায়। মুক্তা-ঝরা হাসিতে মধু-দা'র সঙ্গে গল্প করে, বড় বড় আলোচনাও হয়। সে কথা মনে হতেই এগিয়ে চলল। কয়েক পা গিয়েই ঘুরে দাঁড়ায়, জোর গলায় হুকুমজারী করে—কলের জল শুধু খাওয়ার জন্যই ব্যবহার হবে। অন্য কোন কাজে কোনক্রমেই কেউ ব্যবহার করতে পাবে না। বাজে কাজের জন্য দীঘির জল পড়ে আছে। ক্যাম্প-গার্ড সঙ্গের ক্ষুদ্র দলটাকে লক্ষ্য করে বললেও কথাটা সার্ব্বজনীন ভাবে জাহির করে এগিয়ে চলল সে। জোরেই চলেছিল মধুসূদন, আধ মাইল দীঘিটায় তিন পাড়ই ঘুরতে হবে। এ ব্লকের অর্দ্ধেকটা হয়েছে মোটে, ওদিকে বি ব্লক। থমকে দাঁড়াতে হ'ল। পেছনে দূরে একটা করুণ সুর ভেসে আসছে। নারীকণ্ঠের বিলাপ। এগিয়ে আসছে এদিকেই। মধুসূদন ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকায়। একটি নারী। অল্পবয়সী যুবতী তাঁবুর পাশে পাশে সরু পায়ে-চলা-রাস্তা বেয়ে কেঁদে চলেছে—মা—মাগো, কোথায় তুমি। মধুসূদন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সঙ্গীয় দলটির দিকে তাকায়। একজন বললে—বোধ হয় স্বামীতে ধরে ঠেঙিয়েছে। এদিকে আসছে যখন তখন নিশ্চয়ই সাহেবের কাছে নালিস জানাবে। মধুসূদন মনে মনে ঠিক করে, কি ভাবে মীমাংসাটা করবে। মেয়েটি অনেকটা কাছে এসে গেছে, গৌরাঙ্গী যুবতী সুতরাং মধুসূদনের চোখে সুন্দরী। বুঝিয়ে-সুজিয়ে একটু ধমকিয়ে মিলন করে দিতে হবে। কিন্তু মেয়েটি টলতে টলতে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। বিপর্য্যস্ত বেশভূষা, রুক্ষচুল, পায়ে কাদা, চোখ-মুখ বসা, গলার স্বরে অদ্ভুত কাতরতা, জীবন নিংড়ে যেন সে স্বর বেরুচ্ছে। সঙ্গের লোকদের জিজ্ঞেস করে, কোন তাঁবুর লোক? কেউ বলতে পারে না যে, ওকে কখনও দেখেছে। আশপাশের তাঁবু থেকে মেয়েরা বিস্মিত হয়ে দেখছে। এতে আশ্চর্য্যের কিছু নেই। আশ্রয়প্রার্থী বিভিন্ন স্থান থেকে এসেছে সকলে, পরস্পর জানা-শোনা এখানেই। একটা ব্যবস্থা হলেই চলে যায়। মনটা খুঁত খুঁত করতে থাকে মধুসূদনের। মরুকগে। ঠোঁটে একটা কায়দা ফুটিয়ে আবার এগিয়ে চলল। বিভিন্ন লোকের সঙ্গে নানা খোঁজ-খবর নিতে নিতে দীঘির পাড়টা ঘুরে বাসার দিকে যেতে হঠাৎ লক্ষ্য করল, সেই মেয়েটিই—বোধহয় তাঁবুর সীমা ছাড়িয়ে একটা গাছতলায় বসে কেঁদে চলেছে, ও মাগো কোথায় তুমি! প্রাক্-সন্ধ্যার সেই কান্নার সুর বড় করুণভাবে এসে চঞ্চল করে তুলল মধুসূদনকে। ক্যাম্পের একদল মেয়ে বিস্মিতভাবে দেখছে দাঁড়িয়ে। খোঁজ নেওয়ার প্রবল ইচ্ছাটা দমন করে বাসার দিকে এগিয়ে চলল। ওদের ব্যাপার ওরাই দেখে নেবে। আমার মাথা দেওয়ার কি দরকার?

বাসায় ফিরতেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। অফিসের বারান্দায় কয়েক-জন লোক বসে। মধুসূদনকে দেখেই উঠে দাঁড়ায়। কি খবর হে?

—আজ্ঞে স্যার, একটা দরকার আছে।

দিন-রাত সব সময়ই এ রকম অভিযোগপ্রার্থীদের ভীড় লেগেই আছে। তাড়াতাড়ি এ পাট মিটিয়ে ফেলার জন্ম সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ল। ওদিকে মিষ্টি সন্ধ্যাটা নষ্ট না হয়।

উত্তেজিত ভাবে ওরা যা বললে তার মর্ম্মার্থ—নিবারণ নামে ১৩ নং ক্যাম্পের লোকটি কায়স্থ পরিচয়ে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করেছে, আজ তার দেশের একজন লোক আসায় জানা গেল ওরা নিয়স্তরের কোন জাতি। দেখেন ত স্যার, আমাগো এমনি কইরা জাতি মারল ঐ ছোটলোক।

মধুসূদন বিরক্ত হয়ে ওঠে। এ জাতীয় অভিযোগ আরও এসেছে। বললে—বড় সাংঘাতিক কথা ত—দেখি, আপনার জাতি মারায় চেহারাখানার কি হাল হয়েছে? জামা খুলুন ত—

সাহেব এ নিয়ে পরিহাস করছে! বৃদ্ধ টগর দত্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলে উঠল—স্যার আপনি ঠাট্টা করত্যাছেন কিন্তু আমরা সব সহ্য করছি, বাড়ী ছাড়ছি ঘর ছাড়ছি জোত-জমা ভিটা বাগান পুকুর সব ছাইড়া চইলা আসছি এক জাতির জন্য। আজ আপনাগো কাছে ভিখারীর মত ক্যাশডোলের টাকায় কোন রকমে আধ-পেটা খাইয়া আছি শুধু বাপদাদার এই জাতির লাইগ্যা।

—তা হলে ফিরে যান দেশে। আমাদের গভর্ণমেণ্ট আপনাদের জাতটি আগে মেরে তবে ক্যাশ ডোল দেবার হুকুম দিয়েছেন। এখানে কোন জাত নাই, সব সমান। আপনারা আর এ সম্বন্ধে কোন অভিযোগ আনবেন না।

ভূপতি মিত্র বললে—আচ্ছা স্যার, জাত ভাঙ্গিয়ে যে লোক ঠকায় সে ভাল লোক নয় নিশ্চয়ই। এ রকম বদ লোক···

—বদ যদি হয় আপনারা প্রমাণ দিন। চুরি করে, ডাকাতি করে, রাত্রে তাঁবুতে না থাকে, ধরিয়ে দিন। তার যোগ্য ব্যবস্থা হবে। কিন্তু জাত হিসাবে আপনারা সবাই আশ্রয়প্রার্থী। যান এ নিয়ে হাঙ্গামা করবেন না, বলে উঠে চলে গেল ভিতরে। এসব নালিশ আসে মাঝেমাঝেই। কে কার কাপড় ছুঁয়ে দিল, কার গায়ে জল দিয়ে আবার চান করিয়েছে, হামেশাই এসব অভিযোগ আসছে। সংস্কারটাই জীবনে সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছে এদের। দেশের বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য এদের দাবিয়ে দিতে হবে। দেশসেবার প্রকৃষ্ট সুযোগ এটা। ভিতরে গিয়ে ধরাচূড়া ছাড়তেই আর্দ্দালী এবং কম্বাইণ্ডহ্যাণ্ড কাশীনাথ চা দিয়ে গেল। জানালার ধারে গিয়ে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে আমেজ করে চায়ে চুমুক দিল। এতক্ষণ খেয়াল করে নাই, এখন স্পষ্ট শুনতে পায়, সেই মেয়েটি কেঁদে চলেছে, মা—মাগো কোথায় তুমি। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, আঁধারের কালো ছায়া চারিদিকে। ঝিঁঝির ডাক, বাতাসের মর্ম্মর-ধ্বনি ছাপিয়েও ক্ষীণ ক্রন্দন ভেসে আসে কানে। মনটা কেমন করে ওঠে। গিয়ে বুঝিয়ে স্বামীর কাছে দিয়ে এলে হ'ত। কিন্তু উপরওয়ালার অলিখিত নির্দ্দেশ। এদের সঙ্গে সহানুভূতি সহকারে চলবে কিন্তু ঘনিষ্ঠতা করবে না। ম্যানেজ ট্যাক্টফুলি। বড় হুঁসিয়ার হয়ে চলতে হয়। একটা রাষ্ট্রের সমস্যা আর একটা উদ্বাস্তু ক্যাম্পের সমস্যা সমান। খাওয়া, পরা, চিকিৎসা, শাসন, পালন, রক্ষণ, তার উপর বসবাস করানো। কত বড় দায়িত্ব! নিজের পদমর্য্যাদা চিন্তা করে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে। এসব তুচ্ছ ব্যাপারে অযাচিত ভাবে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। হঠাৎ সে শুনতে পায় সেই মেয়েটিই আর্ত্তনাদ করে উঠল, ওগো কে কোথায় আছ, বাঁচাও! বাঁচাও আমায়!

রাস্কেল! মাঠের মধ্যে এসে আবার বৌকে ঠেঙ্গাচ্ছে!

সোজা হয়ে বসল মধুসূদন। আকুল আর্ত্তনাদ, বাঁচাও বাঁচাও!

টর্চ্চটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল ঝড়ের বেগে। আর্দ্দালীকে সঙ্গে ডেকে নিল। কাছাকাছি গিয়ে টর্চ্চের আলো ফেলতেই মেয়েটি ছুটে আসে কাছে। কে? কে আপনি?

—তুমি কে? শান্ত গলায় মধুসূদন জিজ্ঞাসা করে।

মেয়েটি অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকে। মধুসূদন জিজ্ঞেস করে আবার, কত নম্বর ক্যাম্পের লোক তুমি?

—আমি ক্যাম্পের লোক নই।

—তবে?

—আমার পেছনে কয়েকজন গুণ্ডা লেগেছিল। ঐ ক্যাম্পেরই লোক হবে। আপনার সাড়া পেয়ে পালিয়ে গেল। আপনি না আসলে···

—কাঁদছিলে কেন?

—অদৃষ্টে কান্না থাকলে কাঁদব না।

—কোথায় যাবে?

—চুলোয়।

মধুসূদন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকায়। এস আমার সঙ্গে।

বাসায় এসে লণ্ঠনের আলোয় ভাল করে দেখে ওরা। ভদ্রঘরের মেয়ে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। চেয়ারে বসে বললে, কি ব্যাপার বলুন! আপনার বাড়ী কোথায়? মেয়েটি সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আকুলভাবে বলে উঠল—এটা কি···ক্যাম্প?

—হ্যাঁ। কিন্তু আপনি কোথা থেকে আসছেন?

—আমার মা আছে এই ক্যাম্পে। আমি মায়ের কাছে এসেছি।

—আপনি আসছেন কোথা থেকে? এখানে আপনার মায়ের সঙ্গে আর কে আছেন?

—আমি পাকিস্থান থেকে আসছি। মায়ের সঙ্গে আমার ছোট দু'ভাই আছে।

মধুসূদন রিফিউজি রেজিষ্ট্রারটা টেনে নিয়ে আসে—কি নাম আপনার মা-ভাইয়ের বলুন।

—বড় ভাই পরেশচন্দ্র মুখার্জ্জি, ছোট বিমলেন্দু মুখার্জ্জি। মা শীতলাসুন্দরী দেবী।

মধুসূদন রেজিষ্ট্রার খুঁজে নাম বের করে। হ্যাঁ এই যে পাওয়া গেছে। বয়স পনের, ছয় আর শীতলা দেবীর চুয়াল্লিশ।

—হ্যাঁ এই রকমই হবে বয়স।

মধুসূদন উঠে দাঁড়ায়, চলুন আপনাকে দিয়ে আসি মায়ের কাছে। মেয়েটি কি যেন চিন্তা করে একটু, তারপর বলে, আমি আজ দুদিন থেকে কিছু খাই নাই, কাল সন্ধ্যায় দু'আনার শুধু চানাচুর খেয়েছি ষ্টেসনে। দশ হাত রাস্তা হাঁটার ক্ষমতাও আর নাই।

মধুসূদন ব্যস্ত হয়ে উঠল। আর্দ্দালী কোথায় গিয়েছে। নিজেই ছুটে যায়। নিজের ভাগেরই এক বাটি দুধ-চিড়া ও এক ঘটি জল এনে দিল। মেয়েটি বিনা ভূমিকায় খেয়ে নিল সঙ্গে সঙ্গে। তার পর বড় ঘটির জলটাও এক নিঃশ্বাসে শেষ করল। এবার অনেকটা সুস্থ হয়েছে সে। বারান্দার বেঞ্চটায় বসে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। একটু পরে মাথা ঢেকে শুয়ে পড়ে বেঞ্চে। মধুসূদন চাকরকে দিয়ে ব্লক-ইন-চার্জ্জের কাছে একটা স্লিপ লিখে পাঠাল। ২৭ নং ক্যাম্পের শীতলাসুন্দরী দেবী যেন এখুনি আসেন। বিশেষ জরুরী প্রয়োজন। আমার চাকর সঙ্গে করে আনবে। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর শীতলা দেবী এলেন। সঙ্গে ছোট ছেলে বিমল। মধুসূদন বারান্দাতেই বসে ছিল, বললে আপনার একটা সুখবর আছে।

—কি খবর বাবা? ক্যাশডোলের টাকা বেশী মঞ্জুর হয়েছে?

—না না, ঐ দেখুন শুয়ে আছে।

—কে?

—আপনার মেয়ে।

—আমার মেয়ে! আমার ত মেয়ে নাই বাবা! আর্ত্তনাদ করে ওঠেন শীতলা দেবী—মেয়েটি নিস্পন্দভাবে শুয়ে আছে—

—না না—আপনাদেরই ত নাম সব ঠিক বলল। এই যে, উঠুন ত—জোরে ডাক দেয় মধুসূদন। মেয়েটি ওঠে না। কাঁপছে সে বোঝা গেল। শীতলা দেবী জোরের সঙ্গে বললেন, না— আমার মেয়ে অনেকদিন মরে গেছে। আমার মেয়ে থাকতেই পারে না। ছেলের হাত ধরে রওনা দেন তিনি। মধুসূদন চেঁচিয়ে উঠল—আপনি না দেখেই চলে যাচ্ছেন! নিজের মেয়ে না থাকলেও পরিচিত কেউ হবেন। থতমত খেয়ে শীতলা দেবী দাঁড়ালেন। মেয়েটি ধীরে ধীরে উঠে বসে এবার মুখের ঢাকা খুলে কম্পিত কণ্ঠে ডেকে উঠল—মা—

শীতলা দেবী ঘুরে দাঁড়ালেন। তার দিকে না তাকিয়ে শক্তভাবে বললেন—মিথ্যা পরিচয় দিও না বাছা! আমার মেয়ে মরে গেছে। অপরিসীম ব্যথা কিন্তু কণ্ঠে চেপে রাখতে পারেন না। ছেলের হাত ধরে এবার চলে যান তিনি।

—তুমি আমার মা নও? চেঁচিয়ে ওঠে বালিকা।

—না—

মেয়েটির মুখখানা কালো হয়ে ওঠে। ছুটে গিয়ে ছেলেটির হাত চেপে ধরল। আমি আজ তোমার মেয়ে নই। বিমল তুইও কি দিদিকে চিনবি না ভাই? কয়েক পা সরে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে কোলে টেনে নেয়—বল, আমি তোর দিদি হই কি না। বিমল গলা জড়িয়ে আত্মসমর্পণ করে ডেকে ওঠে, 'দিদি'।

শীতলা দেবী এসে দুম দুম শব্দে কয়েকটা কিল বসিয়ে দেন বিমলের পিঠে, তার পর বাহুটা শক্ত হাতে ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলে যান।

মধুসূদন চীৎকার করে উঠল—আপনি থামুন! পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে আপনারই মেয়ে, কেন আপনি এমন করছেন বলুন।

শীতলা দেবী থেমে যান। ধীর কণ্ঠে বললেন, আমাদের রিফিউজি পেয়ে সম্ভ্রমহানি করতে চাও বাবা?

—সম্ভ্রমহানি আমি করি নাই। আপনিই এই মেয়েটির সম্ভ্রমহানি ক'রছেন। কি ব্যাপার বলুন আমাকে!

—আমি জানি না। আমি জানি না। বিমলের হাত ধরে ছুটে পালান শীতলা দেবী।

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে এবার কঠিন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে মধুসূদন, কি ব্যাপার আপনার খুলে বলুন!

মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেছে মেয়েটির। নির্লিপ্তভাবে বললে, যার মা চিনতে ভয় পায় তার কথা নাই বা শুনলেন!

—কি করতে চান এখন?

—কি করা উচিত যদি আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি?

—আপনার সব কথা খুলে না বললে এখান থেকে চলে যেতে হবে। আমি কিছুই বলতে পারব না।

—পথেই পড়ে আছি, আবার চলব। যার মায়ে চেনে না তার জন্য সারা দেশটাই ত পড়ে আছে। গাছতলা আর ভিক্ষার ঝুলি, কিংবা জীবনের চরম হীনতায় যেখানে দুটো খেতে-পরতে পারব সেখানে।

মেয়েটির কথাবার্ত্তায় তার শিক্ষা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না মধুসূদনের। কোমল কণ্ঠে বললে, আমাকে আপনি নিশ্চিন্তমনে বন্ধু মনে করতে পারেন, সব কথা খুলে বলুন। আপনার সুব্যবস্থা করব।

—আমার দুঃখ কারও প্রাণে লাগবে না দাদা। একমাত্র যদি ঐ দীঘির জলে নিজেকে মিলিয়ে দিতে পারি তখন হয় ত আপনারা হতভাগিনীর দুঃখে কায়দাদুরস্তভাবে হায় হায় করবেন। আমাদের জীবনের বিনিময়ে আমাদের দুঃখের ভাগী হন আপনারা। আমি চললাম, অতর্কিতে উঠে রওনা দেয় বালিকা।

মধুসূদন সজাগ হয়ে ওঠে, এমন অবস্থায় একে কখনই ছেড়ে দেওয়া যায় না। তাকে আটকিয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ক্যাম্পেরই একজন প্রৌঢ়া বিধবার তত্ত্বাবধানে রেখে দেওয়া হ'ল আপাততঃ।

শীতলা দেবী ক্যাম্পের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে ছিলেন। সার সার তাঁবু। সামনে চার হাত চৌকোণা একটা জায়গা পরিষ্কার। পাটকাঠির রান্নাঘরে রান্না চলে না। বাইরেই রান্না হয়। উইঢিপি আর কাঁটাবনের ভিতর সাময়িক আশ্রয়-নিবাস গড়ে উঠেছে।

অপরিষ্কার লাইনটাই প্রত্যেকের সীমানা। একটু বড় গাছগুলোকে কাটে নাই কেউ, কাপড় শুকোন হয়। উইচিপির বেদীতে টুকিটাকি সাজিয়ে রাখে অনেকে। মেঘনার তীরে ছোট্ট গ্রামের কথা মনে ভাসছে তাঁর। আত্মীয়-পরিবেশে মশগুল ছোট গৃহের আনন্দময় দিনগুলি। দেশ ভাগ হ'ল, আত্মীয় স্বজন কে কোথায় ছিটকে চলে গেল জীবনের সন্ধানে। শীতলা দেবী তবু গ্রামেই পড়েছিলেন। রাষ্ট্রের কর্ণধারদের স্বগোত্রের অনেকে কত অভয়বাণী শুনিয়েছিল। কতভাবে সাহায্যও করেছিল, তবু দেশ ছেড়ে আসতে হয়েছে জীবনের তিক্ততম অভিজ্ঞতা নিয়ে। গ্রামের পথঘাট, কচুরীর ডোবাটা, সুবচনী তলার বটগাছ, মিত্তিরদের দুয়ারের পেয়ারা গাছটা পর্যন্ত কত প্রিয় ছিল—এখন মনে ঘা দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে। পাড়ার খেঁকী কুকুরটা শেষ চলে আসার সময় পিছে পিছে এসেছিল বহু দূর পর্যন্ত। অবলা জীব, তারও বোধ হয় প্রাণ কেঁদেছিল। আজ এই অনিশ্চিত জীবন—দুই নাবালক ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বুক বেঁধে পড়ে আছেন এখানে। লেখাপড়া বন্ধ হয়েছে। কোন সম্বল নাই। একবস্ত্রে রাতের আঁধারে চলে আসতে হয়েছে। শিয়ালদহ ষ্টেসন, সেখান থেকে উল্টাডাঙ্গা, তার পর এখানে। নাবালক ছেলে, কোথায় যে একটু আশ্রয় মিলবে কে জানে! এ দুধের বালক নতুনভাবে সংসার গড়ে তুলবে কেমন করে? সুপারিনটেণ্ডেণ্ট পি, এল ক্যাম্পে পাঠাতে চায়। সরকারী অনাথ আশ্রম। মরে গেলেও সেখানে যেতে পারবে না। এখানে যতদিন চলে তার পর পথে গিয়ে দাঁড়াব। ভিক্ষা করতে না পারি রাঁধুনীগিরি করতে পারব। বড় ছেলে সকালে একটা জায়গা দেখতে গিয়েছে, পছন্দ হলেই সেখানে চলে যাব।

পাশের ক্যাম্পের মতি হালদারের বৌ এসে দাঁড়াল।—কি করতে আছেন দিদি?

শীতলা দেবী বললেন, বস ভাই, কি খবর?

—আমি ত দিদি ক্যাম্প ছাড়িয়া আন্দামানে চলিয়া যাইতে আছি।

—ও মা ফাঁসীদ্বীপ?

—এহানে সবাই ফাঁসীদ্বীপ নাম দিলেও এহন আর সেই সব নাই। আগে ফাঁসীর আসামীগো এহানে চালান দিত। এহন খুব ভাল হইচে। আমাগো কত্তা ভাল করিয়া খোঁজ নিছে। তা ছাড়া ক্যাম্প যহন ছাড়তেই হইছে তহন আমাগো কাছে কালাপানি কি, কলিকাতা আর দিল্লীই কি, সবই সমান। এহন এহানে অনেক বাঙ্গালী গেছে, আমরাও যাইতে আছি। ভাল জমি দেবে বাড়ী দেবে হাল-গৃহস্থালীর মোটা টাকা দেবে।

জমি ও বাড়ীর নামে শীতলা দেবী চঞ্চল হয়ে ওঠেন। আচ্ছা আমরা গেলে দিবে না?

—হ্যাঁ হ্যাঁ যে যাইতে চাইবে তারেই দিবে। আপনারা যাইবেন?

—আমার এ ছেলে দুটোকে মানুষ করার জন্য যেখানে দরকার সেখানেই যাব। শুধু যমের বাড়ী ছাড়া—

—তবে আপনি সুপারিনটেনকে কয়েন যাইয়া, হেলেই ব্যবস্থা করিয়া দেবে।

—আমার পরেশ আসুক, ওর সাথে বুঝে যাব। ছোট ছেলে ক্যাম্পের ইস্কুল থেকে পড়ে আসলো, শীতলা দেবী তাকিয়ে দেখলেন। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল, ছেলের কি চেহারা হচ্ছে দিন দিন। কেমন চাঁদের মত ছেলে, এখন দুটো পেট ভরে খেতে পায় না, ভালমন্দ চোখেও দেখতে পায় না। এই দীঘির পাড়, বর্ষা-বাদল রোদ-ঝড় সব আজ মাথার উপর দিয়ে চলেছে। বিমল বই-শ্লেট ধপ করে রেখে দিয়ে বললে, খেতে দাও।

শীতলা দেবী বাটিতে করে মুড়ি ঢেলে আনেন। গুড় নাই, গুড়ের হাঁড়িটা ধুয়ে ঢেলে দেন বাটিতে। বাটিটা ছেলের হাতে দিয়ে অনুনয় করে বলেন, গুড় ফুরিয়েছে বাবা, আজকের মত এই দিয়ে খেয়ে নাও। বিমল বাটিটা হাতে নিল। একটু দুধ দাও না মা। দেশ ছাড়ার পর দুধের মুখ দেখে নাই ওরা। এখানে কিছুদিন হ'য় পাউডার দুধ দিচ্ছে তারই এক পাউণ্ড পেয়েছিল ওরা। শীতলা দেবী এক চামচ দুধ নিয়ে মুড়ির মধ্যে ছিটিয়ে দিলেন। বিমল হাসিমুখে বাটিটা হাতে নিয়ে সামনে রাস্তায় গিয়ে বসল। পাশের তাঁবু থেকে মোহিনী চন্দের বৌ বেরিয়ে আসে। হাসিখুসি আমুদে লোক। মুখটা বিকৃত করে কাছে এসে দাঁড়াল। —রিফিউজীদের এখানে কি হচ্ছে?

হালদারের স্ত্রী হেসে উঠল।

—অ্যা হাসি। রিফিউজী হয়ে হাসতে লজ্জা করে না? চাল নাই চুলা নাই ঢেকী নাই কুলা নাই তাদের আবার হাসি। সব ক্যাম্পের মধ্যে শান্তশিষ্ট হয়ে বসে থাকবে। তর্জ্জনী বাড়িয়ে হুকুম করে।

হালদার-গৃহিণী উঠে ওয়াক্ ওয়াক্ করতে থাকে। তার পর শীতলা দেবীকে বলে, দিদি দেখেন ত কি মুস্কিল, রিফিউজী দেখলে আমার বমি আসে তবু ঐ রিফিউজী এসে দাঁড়িয়েছে। রিফিউজীর কি দরকার এখানে? সরে বস দিদি। ওর ছায়াটা না হলে এসে গায়ে লাগবে তোমার।

চন্দ-গৃহিণী হাতে তালি দিয়ে গাইতে আরম্ভ করে:

জানলা দিয়া ঘর পলাইল কেমন কইরা জানলাম না।
আমি চুপি চুপি ভাইস্যা আইলাম তবু ত কুল পাইলাম না।
ভাসতেছি গো অকুলে কেমনে যাই গোকুলে
মনের বাথায় গুমড়ে মরি তবু ত ঘর মিলল না।
ঘাটে ঘাটে শ্যামের খোঁজে কত ঘাটে আইলাম রে,—
তবু নিঠুর নাগর দেয় না দেখা কত ঠোকর খাইলাম রে।
এই ঘাটেতে যারেই দেখুম কণ্ঠ-বেড়ি তারেই রাখুম
কানা খোঁড়া কোমড় বাঁকা পাইমু রতন পাইলাম রে—
গড়াগড়ি দুঃখু জ্বালা আর ত প্রাণে সয় না রে।

গানের সঙ্গে কোমর দুলিয়ে নাচও আরম্ভ করল চন্দ-গৃহিণী। আশ-পাশ থেকে আরও কয়েক জন মেয়েলোক এসে দাঁড়িয়েছে। বেশ জমিয়ে তুলেছে। গান থামিয়ে চন্দ-গৃহিণী বক্তৃতা আরম্ভ করে। রিফিউজিগণ তোমরা সর্ব্বদা মিলেমিশে ভালভাবে চলবে। ঝগড়া-বিবাদ করবে না। ক্যাম্পের বাহিরে গেলে আমার হুকুম নিয়ে যাবে, না হলে আমি চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশে এসটার (extern) করব। ক্যাশডোলের টাকা কেটে দিব।

একটি চটুল বধূ এসে গলা জড়িয়ে ধরে চন্দ-গৃহিণীর—সুপারিন্টি সাহেব, আমাগো আর একটা তাম্বুরা ছাড়া যে চলে না, আর একটা তাম্বুরার হুকুম দিয়া দেন।

—তুমি আপনার দুঃখু পরকে দেখাইয়া কও না?

না—না, অস্ফুটে কি বলতে বলতে সরে দাঁড়ায় বউটি।

চন্দ-গৃহিণী চোখ টেনে বলতে থাকে, এবার আমাগো চামেলীর বড় দুঃখু। সারারাত কাইন্দা কাটায়।

একজন বয়স্ক মহিলা বলেন—তা কাঁদে আর না কাঁদে। শ্বশুর, শাশুরী, বেটা, বউ এক তাম্বুরায় থাকে কেমন কইরা। পাঁচ জনের বেশী না হলে বাড়তি তাঁবু দেয় না। দরখাস্ত করলে মঞ্জুর করব কিনা কে জানে। যত সব নাবালক পোলাপানেরে সুপারিনটেন কইরা দিছে—হে না বোঝে আমাগো দুঃখু, না বোঝে আমাগো কথা।

একজন যুবতী বলে, পাঁচ জন না হলে বাড়তি তাঁবু দেয় না, কিন্তু হয় কেমন করে? তবে আমাদের চন্দদিদি মনে করলে ঠিক আদায় করে দিতে পারে।

আর এক জন বললে, মনে আবার করব কি? দিদি একেবারে গলায় কাছি লাগাও যাইয়া।

কে এক জন বললে, ঐ যে তালগাছ আইতেছে। সুপারিন-টেণ্ডেণ্টের দীর্ঘ দেহ দেখা গেল দূরে। সুপারিনটেণ্ডেণ্টের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী প্রস্থে কিছু কম, দৈর্ঘ্যটাই নজরে পড়ে আগে। ক্যাম্পে তাই তালগাছ নাম চলতি হয়ে গিয়েছে।

চন্দ-গৃহিণী বললে, তা আমারে কি ভাবছেন; ঐ তালগাছের গলায় কাছি লাগাইয়া রস খাইতে পারি।

এক জন চোখ টেনে হাত নেড়ে বলে, তালের রস খাইও না, খাইও না—বড় নেশা!

—নেশা না হলে আমরা যে দুঃখু ভুলতে পারি না—

একজন তাকে ঠেলে দেয়, তবে যাও ভাল কইরা নেশা কইরা ঐ দীঘির জলে ডুব্যা মর।

অপর একজন বলে ওঠে, ঐ কাঠঠোকরার কাছে রস বার করতে গেলে তার আগেই মাথায় তাল পড়ে ছেচে দিবে। ও-গাছের রস নাই, আছে শুধু বড় বড় তাল।

—তালের কাঁদি ঝুরেই রস বের করতে হয়, তবে তার কায়দা জানা চাই। রস আছে কিনা আমি দেখছি।

মধুসূদন অনেকটা কাছে এসে গিয়েছে। চন্দ-গৃহিণী কপাল পর্য্যন্ত ঘোমটা টেনে কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মধুসূদনকে থামতে হয়। জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকাল, মুখে মধুর হাসি ফুটিয়ে চন্দ-গৃহিণী বললে, একটা আর্জ্জি ছিল।

—বলে ফেলুন।

হঠাৎ চন্দ-গৃহিণী উবু হয়ে প্রণাম করে ফেলে। মধুসূদন দু' পা পিছিয়ে যায়। এখানে প্রণাম করা অন্যায়। গ্রামোফোনের রেকর্ডের মত কথাটা বেজে ওঠে গলায়।

—ন্যায়-অন্যায় বুঝি না। প্রাণ চাইল করলাম একটা প্রণাম।

—এবার বলুন কি কথা।

—ভয়ে বলব কি নির্ভয়ে বলব। আবার মিষ্টিহাসি খেলে গেল চোখে।

—কোন ভয় নাই—স্বচ্ছন্দে বলুন। আপনাদের কথা শোনাই ত আমাদের কাজ।

—বলছিলাম, ঐ ২১নং ক্যাম্পের ওরা চার জন মা বাবা ছেলে বৌ এক তাঁবুতে থাকে কি করে? বড় দুঃখ বউটার। পাঁচ জন না হলে বাড়তি তাঁবু পায় না, কিন্তু হয় কি করে?

—কই দেখি তাকে ডেকে আনুন।

চন্দ-গৃহিণী জোর করে পাশের তাঁবু থেকে ধরে আনে চামেলীকে। চামেলী চন্দ-গৃহিণীর পিঠে মুখ লুকোচ্ছিল। মধুসূদন ডাক দেয়, কই সামনে আসুন! চামেলী একটু পরে স্থিরভাবে সামনে এসে দাঁড়াল।

—আপনার তাঁবুর দরকার?

—না হলে বড় অসুবিধা···

—দরখাস্ত দেওয়া হয়েছে?

—না।

—কাল সকালে দরখাস্ত দিয়ে তাঁবু আনতে বলবেন। চামেলী চলে যায় সেখান থেকে। তার নীরব চোখের কৃতজ্ঞতা মনে তৃপ্তির আমেজ আনে একটা। মধুসূদন পা বাড়াতেই চন্দ-গৃহিণী আবার ধরল—

—আমি যে এক পাউণ্ড দুধ পেয়েছিলাম, সব মাটিতে পড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আর এক পাউণ্ড দুধ দিবার হুকুম—

—আচ্ছা আর কিছু?

—আর দুঃখের কথা কি কইব—একখানা বস্ত্র যদি দেন। একখানা পেয়েছিলাম সেখানা খানিকটা পুড়ে গিয়ে বিছানায় চাদর করেছি। আপনার দয়ার সীমা নাই ইচ্ছা করলেই···

মধুসূদনের পদমর্য্যাদা প্রকট হয়ে ওঠে। তোষামোদে গলে না সে, তবে দোলে। লক্ষ্য পড়ল আশপাশের অনেকগুলো মুখ ঘোমটার ফাঁকে মুচকে হাসছে। তালগাছের রস বের করা দেখছে সকলে। সেদিকে নজর পড়তেই মধুসূদনের মনটা নরম হয়ে আসে। আত্মপ্রসাদে বিভোর হয়ে বললে, আচ্ছা কাল সকালে আমার অফিসে লোক পাঠিয়ে দেবেন। দেখব দিতে পারি কিনা। 'রূপে গুণে আপনার সীমা নাই'—হাত জোড় করে নমস্কার করে

ওদিকের তাঁবুর পেছনে চলে গেল সে। একটু পরেই হাল্‌কা হাসির হর্‌রা ছুটে গেল সেখানে। মধুসূদন খুসী মনে শীতলা দেবীর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। তাঁকে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে কোনরকম ভূমিকা না করে বলে, কাল সন্ধ্যাবেলা যে মেয়েটি আপনার কাছে এসেছিল, পরিষ্কার বুঝতে পারছি সে আপনারই মেয়ে। কি ব্যাপার খুলে বলুন।

শীতলাদেবী নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকেন চোখ বুজে। মধুসূদন আবার বলে, আপনি আমাকে বিশ্বাস করে সব খোলসা জানান। আপনার ভালই হবে তাতে।

—আমি কিছুই বলতে পারব না বাবা।

—আমি যদি আপনাকে অনুরোধ করি ওকে আশ্রয় দিতে?

—ও আছে এখানে?

—হ্যাঁ, আছে। তবে আপনি নিজের কাছে না নিলে কোথায় চলে যাবে, পথে পথে ঘুরবে নাহয় আত্মঘাতী হবে। সেটা আপনার পক্ষে কি ভাল হবে? যে দেশ ছেড়ে চলে এসেছেন সেখানের জের এখানে পর্য্যন্ত টেনে আনা ঠিক হবে না। আপনি অবুঝ নন।

—আমি ক'দিন না ভেবে কিছুই বলতে পারি না বাবা।

—আচ্ছা বুঝুন আপনি। সাত দিন পর্য্যন্ত থাকবে এখানে। তার পর তার সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব আমার থাকবে না। মধুসূদন পা বাড়ায়। শীতলা দেবী ডাক দেন 'বাবা আন্দামানে আমরা যেতে চাইলে যেতে দেবে?'

—আপনারা যেতে চান? বলেই, আন্দামানের সুযোগ-সুবিধা সবিস্তারে বলতে থাকে: ভাল ধানী-জমি পাঁচ একর, অপরিষ্কার জমি পাঁচ একর, গৃহ-নির্ম্মাণ লোন ৮০০৲, চাষের বলদ খরিদ বাবদ ১০০৲, চাষের যন্ত্রপাতি বাবদ ১৩০৲, বীজ ও সার বাবদ ১০০৲, প্রথম দুই বৎসর খাজনা মাপ, বনের কাঠ ফ্রি, ভরণ-পোষণ বাবদ ৮৪০৲।

মধুসূদন এই সঙ্গে দৈনন্দিন ইন্‌স্পেকসনটাও সেরে ফেলতে চায়। বিকেল হয়ে এসেছে, তাঁবুর সারির ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলল সে। বাঙালী মেয়ের দৈনন্দিন প্রসাধনের সময় এটা। দেশ ছেড়েছে, শত দুঃখ-কষ্টেও বৈকালিক গা ধোওয়া, চুলবাঁধা, টিপ-পরে কাচা কাপড়খানা পরে ফিটফাট হওয়া ভুলে যেতে পারে নাই। ওর মাঝেই কেউ কেউ বেড়িয়ে আসে এদিকে-ওদিকে। পথিকের নীরব প্রশংসা কুড়োয়। মধুসূদনের কেমন দুর্ব্বলতা—এ সময়ে ইন্‌স্পেকশনে না এসে পারে না।

প্রৌঢ়া বৃদ্ধারা কাঁথা সেলাই করছে। একটি বধূ আয়নার সামনে বসে বিনুনী গেঁথে ফিতা বেঁধে দাঁতে কামড়ে ধরে কবরী রচনায় ব্যস্ত। মধুসূদনকে দেখে একটু লাল আভা খেলে গেল মুখে। কচি বিধবা মেয়ে সযতনে চুল বেঁধে দেয় একটি বধূর, তাড়াতাড়ি আঁচলটা দিয়ে মাথা ঢাকল। একটা তাঁবুতে একটি বধূ চুল বেঁধে সিঁদুরের টিপ পরছিল। মধুসূদন জিজ্ঞেস করে—হরমোহন ওরা ফিরে আসে নাই?

—না, নিঃসঙ্কোচে জবাব দেয় বউটি। হরমোহন সকালে ছুটি নিয়ে একটা জায়গা দেখতে গিয়েছে। এ বউটি নিঃসঙ্কোচে আলাপ করে মধুসূদনের সঙ্গে। জিজ্ঞাসাটা কথা বলার ছল। কয়েকটি মেয়ে লুডো খেলছে। হাল্‌কা হাসিতে গুলজার করেছে জায়গাটা। মধুসূদনকে দেখে ইস্‌স্‌ একটা শব্দ করে একটি মেয়ে। ওদিকে তাস খেলছে, চার জন। তাদের ঘিরে আছে আরও জনা আষ্টেক।

—মার মার সাহেব মার।

মধুসূদন গিয়ে দাঁড়িয়েছে। একজন রসিকা বললে, সাহেব মারলেই জিত হয়ে যায়, না? ঐ দেখ। চাপা হাসির গুনগুনানি ওঠে মেয়েমহলে। অল্পবয়সী একটি মেয়ে বললে, সাহেব দিয়ে তুরুপ করল যে। আর একটি তরুণী তার গালটা টিপে দিয়ে বললে, বোকা মেয়ে শুধু সাহেব দিয়ে তুরুপ হয় না, রঙের সাহেব হওয়া চাই বুঝলে?

আর একজন যুবতী টিপ্পনী কাটে, রঙের সাহেব, তার সঙ্গে রঙের বিবিতে কিন্তু খেলা জমে সবচেয়ে ভাল। দুটি বৌ মাথা ঢেকে উবু হয়ে লুকিয়েছে ভীড়ের মধ্যে। মধুসূদন এগিয়ে চলল। মনটা বেশ ভাল লাগছে। দিন-রাত আই ঝাই কেচ-কেচির মধ্যে এইটুকুই মধুর। প্রতি তাঁবুর পেছনেই চার হাত লম্বা-চওড়া জায়গায় শাকসব্জী আবাদ করেছে, পুঁইশাক পালং কপি টম্যাটো লাউ কুমড়া। দু'এক সার আলুর গাছও নজরে পড়ে। একটি প্রৌঢ়া সযতনে লাউয়ের ডগা তুলে দিচ্ছে মাচায়। কেউ কেউ নিড়ানী দিয়ে ঘাস তুলছে। একটা বুড়া চশমা চোখে জাল বুনছে। ছেলের দল ওদিকে 'দাড়িয়া-বাঁধা' খেলায় মেতে উঠেছে। পুরুষের সংখ্যা কম, বিভিন্ন ধান্দায় বাইরে গিয়েছে। ঐ তাঁবুর সামনে যতীন ভদ্রের পাগলী মেয়ে সত্যবালা আ—ও—আ—ও—করে অদ্ভুতভাবে কাতরাচ্ছে। সান্তাহারে ট্রেন-কাটাকাটির সময় সে স্বামীর সঙ্গে ছিল সেই ট্রেনে। ছুটাছুটি আর্ত্তনাদের মধ্যে জানালা গলিয়ে সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিল। কয়েকজন সহৃদয় আন্সার যুবক তার পরিচর্য্যা করে বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়। খবর পাওয়া গেছে তার স্বামী সেখান থেকেই হিন্দুস্থানে পালিয়েছে, কেউ বলে কাটা পড়েছে। সত্যবালার মাথা খারাপ সেই থেকে। ওর বিশ্বাস স্বামী বেঁচে আছে হিন্দুস্থানে কোথাও, কিন্তু খোঁজ পাওয়া যায় নি। সত্যবালা মা-বাবার সঙ্গে চলে এসেছে এদেশে। মধুসূদনকে দেখেই সামনে এসে দাঁড়ায়—কি হ'ল?

—এই এসে পড়বে শিগগিরই, তুমি কাঁদাকাটি কর না। মেয়েটি বুক চাপড়ে আ—আ—করতে থাকে। একে দেখলেই বুকটা কেমন করে মধুসূদনের। ওর স্বামীর খোঁজ-খবর করার চেষ্টাও করেছে সাধ্যমত। তাড়াতাড়ি পালিয়ে যায় সেখান থেকে। ঐ ক্যাম্পের সুধীর সূত্রধর তন্ময় হয়ে বাঁশীতে তেল মাখাচ্ছিল। মধুসূদনের সাড়া পেয়েই ছুটে এসে প্রণাম করে। মধুসূদনের ইনস্পেকসনে বরাবর সঙ্গে থাকে সে। বেশ হাসিখুশী স্মার্ট।

মুখে চড়-বড় করে খই ফোটে। মধুসূদনের ভাল লাগে ওকে। গতকাল কাবেরীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করা হয় নাই, রাগ করেছে হয় ত। সেকথা মনে হতেই জোর পায়ে বাসার দিকে এগিয়ে চলল। সুধীর ক্যাম্পের অনেক গোপন খবর জানাতে থাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে। কোন মেয়ে রাত্রে বাইরে গিয়েছিল, কোন্ লোক কোন্ তাঁবুতে এসেছিল, কোন্ তাঁবুর লোক কোন্ তাঁবুতে গিয়ে রাত কাটায়। মধুসূদন আগে এসব কথা কানে নিত না, কিন্তু এখন আগ্রহের সঙ্গে শোনে। যার চার্জ্জে এতগুলো জীবন তাদের ভিতরের খুটিনাটি জানার দরকার আছে বৈকি। রাজ্য এবং ট্র্যানজিট ক্যাম্প চালাতে গুপ্তচর অপরিহার্য্য।

সুধীর বললে, ঐ ১৫ নং ক্যাম্পের সুন্দরী মালাবতী বড় কষ্টে পড়েছে স্যার। আপনার কাছে জানাতে ভয় পায় যদি অভয় দেন ত আসতে বলি।

—না—না—কেউ যেন আসে না। গলার স্বরে কিন্তু দৃঢ়তা ফোটে না, সুধীর বুঝতে পারে। একটু মুচকে হাসে। সাহেব বড় ডাটী। তবে অনেকটা নরম হয়েছে আগের চেয়ে। দেখা যাক ধীরে ধীরে ফাঁস লাগাতে পারি কি না। সাহেবদের সম্বন্ধে কত কথা শুনে আবার আসলাম। সবই কি মিথ্যা! বললে, আমায় স্ত্রীকে খুব ধরেছে সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে।

না—না—না—অস্ফুটে বলতে বলতে পালালো মধুসূদন। অথচ আগে এমন কেউ বললে কঠিন দণ্ড দিয়ে দিত।

সুধীর চোখ মিটিমিটি করে তাকিয়ে ফিক করে হাসল। ওর ভেতরের খবর কেউ জানে না। রিফুজী হওয়াই ওর পেশা। দেশ ভাগ হওয়ার পরই এসেছিল কলকাতা পরেশ পরামাণিক নাম নিয়ে। কিছুদিন ক্যাম্পে কাটিয়ে যায়গা ঠিক করে ডেরা করেছিল একটা। গৃহনির্ম্মাণের মোটা সাহায্য নিয়ে অন্ধকারে ডুব দেয় পাকিস্থানে। আবার কিছুদিন পর নগেন দত্ত হয়ে শেয়ালদহে রিফুজী হয়েছিল। আবার ঐ ভাবে মোটা টাকা হাতিয়ে পাকিস্থানে চম্পট দেয়। এবার এসেছে সুধীর সূত্রধর হয়ে। কোন ভাবনা নেই। যতদিন চলে চলুক, তার পর একটা যায়গা ঠিক হলেই হাউস বিল্ডিং লোন নিয়ে ভেগে পড়বে। সঙ্গে শুধু স্ত্রী প্রমীলা ভাড়া-করা। অর্দ্ধাঙ্গিনী নয় অর্দ্ধভাগিনী। সাহেবদের সম্বন্ধে নানা কথা শুনে প্রমীলাকে বাজার থেকে এনেছে। যোগানদারের কাজ ভালই পারবে সে। মোটা টাকা লোন্ এবার নিতেই হবে।

সুধীর তাড়াতাড়ি চলে আসে ক্যাম্পে। প্রমীলাকে এখুনি মালাবতীর কাছে পাঠাতে হবে। আর কার কার সঙ্গে কতখানি এগুলো, সে সম্বন্ধে তাগিদ দিতে হয়। এদিকে সব রেডী রাখতে হবে।

শীতলা দেবী রান্নার উদ্দেশ্যে পা বাড়ান। বেলা বেশী আর নেই। দিনের মধ্যেই রান্না সারতে হবে। রাত্রে আলানী অত কোথায় পাওয়া যাবে! কি রাঁধবেন? ভাত আর দিঘীর জল থেকে শাক তুলে কয়দিন চলেছে। নিজেদের কোন সম্বল নেই। ক্যাশ:ডোলের টাকা কয়টি ভরসা। খাওয়া-পরা কাঠখড়ি বিছানা-পত্র সবই ওতে করতে হয়। একদিক করতে গেলে আর একদিক হয় না। বিছানা মানে চটের উপর ছেঁড়া কাঁথা একখানা। নিজে মাথায় দুটো ইট দিয়ে কাটান। ছেলেরা পরবার কাপড়গুলি বালিশ করে মাথায় দেয়। জ্বালানী কাঠের জন্য ত প্রাণান্ত অবস্থা। কদিন ইলসেগুঁড়ি বৃষ্টি আর ঝাপ্টা বাতাস গেল। এক দিন রান্নাই হ'ল না। পিচপিচে কাদা মেঝেতে আঙ্গিনায়। বিমল এদিক ওদিক থেকে কাঠখড়ি খুঁটে কুড়িয়ে আনে। তাও ছেলেমানুষ—সবদিন হয় না। শুকনো পাতাও অমিল হয়ে গেল। কিনতে গেলে কাঠের যে দাম ক্যাশ ডোলের অর্দ্ধেক টাকা ওতেই চলে যাবে। সবারই অবশ্য এমন অবস্থা নয়। কেউ কেউ বেশ সম্বল এনেছে দেশ থেকে। ঐ যে ২৬ নং ক্যাম্পে আছে। সিদ্ধিডাঙ্গার বাবুদের ছোট সরিক ওরা। কি চকমিলান বাড়ী দেশে ওদের। বাগানটাই কত বড়। সব ফেলে ওরাও এসে ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছে, কোন হৈ-চৈ নেই। নীরবে বিধির বিধান স্বীকার করে নিয়েছে। সব ফেলে আসলেও যেটুকু এনেছে তাতেই ভাল খাচ্ছে—পরছে। শান্তিতেই আছে এখনও। এমন আরও অনেকে আছে তবে তাদের সংখ্যা বেশী নয়। ক'দিন আগে কনক বৈরাগী ঐ পাড়ায় একটা শুকনো ডাল কাটতে গিয়েছিল, মুসলমানদের গাছ। তারা থানায় নালিস করে দিল, তার পর কি কাণ্ড। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট পর্য্যন্ত ছুটে এসেছিল। ছেকুলার রাষ্ট্র না কি বলে গেল। আমরা রিফুজী হয়ে এ দেশী লোকের কোন অনিষ্ট করলে গভর্ণমেণ্ট সইবে না। হায় রে কপাল! পরেশ একটা যায়গা দেখার জন্য ক্যাম্পের কয়েকজনের সঙ্গে গিয়েছে —এখান থেকে চার ক্রোশ দূরে। কিছু খেয়ে যায় নাই, চার আনা পয়সা শুধু নিয়ে গিয়েছে, বাজার থেকে মুড়ি কিনে খাবে। তাঁবুর ধারে একগোছা বাখারী পড়ে আছে,বিমল কোথা থেকে এনে রেখেছে। রাস্তার দিকে একবার তাকিয়ে দেখে পরেশ আসছে নাকি। তাড়াতাড়ি যা হয় ফুটিয়ে ত রাখি। ছেলে আসবে হাঁ হাঁ করে। বালতীটা হাতে নিয়ে টিউবওয়েলে জল আনতে যান। উনিশ নম্বর তাঁবুর মাখন বিশ্বাসের বৌ ছোট্ট উঠানটুকুতে রান্না চাপিয়েছে। কোন খড়ি নাই, একটা কাঁচা ডাল উমুনে গুজে ফু দিয়ে হয়রান হয়ে গেছে। ধোঁয়ায় চোখ লাল, হাঁটুতে গালটা রেখে চোখ মুছছে। তার স্বামীও গিয়েছে একটা যায়গা দেখতে। খিদের মুখে ফিরে আসবে, দুটো তৈরী ভাত না পেলে কুরুক্ষেত্র বাধবে, দিন-রাত অভাব-অভিযোগ, পুরুষদের মেজাজ খিঁচড়েই থাকে। ভাল কথা বলতে গেলেও খেঁকিয়ে ওঠে, সকালে চলে যাবার সময় জালানীর কথা বলতে গিয়েও বলতে পারে নাই। একা স্ত্রীলোক আর বুড়ী শাশুড়ী, দুটো কচি ছেলে। শাশুড়ী কোথা থেকে কাঁচা কাঠটা এনে দিয়েছে। শীতলা দেবী দেখে

বুঝলেন ওর অবস্থা। বললেন, ঐ দিয়ে কি রান্না হয় ভাই ?

—কি করি দিদি, আজ দুঃখু আছে কপালে।

—একটু ঘুরে-ফিরে দেখ যদি কিছু যোগাড় করতে পার—

ওদিকে ২৩ নং তাঁবুর সুধীর সূত্রধর ছোট মাচার মত একটা করে নিয়েছে। সেখানে বসে বাঁশী বাজিয়ে চলেছে। দৃষ্টি তার টিউবওয়েলের দিকে। জল নেওয়ার জন্য মেয়েদের ভীড় লেগেছে সেখানে। শীতলা দেবীকে দেখেই ছুটে আসে সুধীর। পিসিমা ভাল আছেন ?

এই লোকটিকে বেশ ভাল লাগে শীতলা দেবীর। এখানেই আলাপ। অল্প দিনেই বেশ নিজের হয়ে গেছে। সুধীর বললে ঐ ভীড়ে আপনি পারবেন না পিসিমা। দেন বালতীটা আমি এনে দিই। জোর করেই বালতীটা নিয়ে কলের দিকে চলে গেল। পাশের তাঁবু থেকে একটি বধূ কুড়ুল হাতে বেরিয়ে এসে অনভ্যস্ত ভাবে একটা বাঁশে কোপাতে লাগে। শীতলা দেবী কলের দিকে তাকান। সুধীর মেয়েদের ভীড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

—বউদিদিরা এবার আমি নেব। শীতলা দেবীর ভাল লাগে না। তিনি এগিয়ে যান। কয়েকটি বধূ সরে দাঁড়িয়েছে। একটি বধূ ভরা কলসীটা তুলে নিয়ে যাওয়ার কালে হাতে করে একছিটে জল দিয়ে যায় সুধীরের গায়ে। সুধীর কল থেকে এক আঁজলা জল নিয়ে বউটির দিকে ছুড়ে দেয়, মুখে তার ফচকে হাসি। শীতলা দেবী বিরক্ত হয়ে ওঠেন। সুধীরের উপর মনটা তাঁর মুহূর্তে বিষিয়ে ওঠে। এগিয়ে গিয়ে হ্যাণ্ডেলটা ধরে শক্তভাবে বললেন, আমিই ভরে নিচ্ছি—তুমি যাও এখান থেকে। নেন নেন পিসিমা, বলে চলে আসে সুধীর। জল নিয়ে আসার পথে দেখেন, সেই বউটির কাছ থেকে কুড়ুলখানা নিয়ে সুধীর খড়ি করে দিচ্ছে। একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন সুধীরের দিকে। ছেলেটি ভাল নয়। জোর পায়ে নিজের তাঁবুর দিকে চলে গেলেন। এদিকে তারিণী পরামাণিক বসে আছে চটীতে, পাশে ছেলে-কোলে বউ। চোখে বিষণ্ন হাসি। শুধু ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের আশায় এসেছিল ওরা। হিন্দুস্থানে গেলে বাড়ী-জমি-টাকা কত কি পাওয়া যাবে! গভর্ণমেণ্ট উজাড় করে দেয়! দুঃখের কপালে যদি সুখ হয়! সে মোহ ঝিমিয়ে এসেছে তার। এত কষ্ট জানলে কে আসত ? পরামাণিকের বউ, রান্না হ'ল ? বলে জবাবের অপেক্ষা না রেখে এগিয়ে চললেন তিনি। বিমল কোথা থেকে ছুটে এসে বলে, মা আমাদের মাছ নাই ? মাছের দেশের লোক ওরা, কত মাছ খেয়েছে, বিলিয়েছে। এখানে সপ্তাহে চার পয়সার করে মাছ আনেন। শীতলা দেবীর মনটা ছ্যাং করে ওঠে। বললেন, বাড়ী-ঘর হোক বাবা তখন মাছ খেয়ো। আমরা যে রিফুজী সোনা, মাছ কোথায় পাব ? বিমল হাত দিয়ে দেখিয়ে বলে, ঐ যে তাঁবুতে কত বড় মাছ আনলো, আমিও মাছ খাব। শীতলা দেবী ঠাস করে এক চড় লাগিয়ে দিলেন, হতভাগা ছেলে! লোকের সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ! বিমল কাঁদতে থাকে দাঁড়িয়ে—শীতলা দেবী রান্নায় যেতে উঠলেন।

সন্ধ্যার মধ্যেই পরেশ ফিরে আসে জায়গা দেখে। খাওয়া-দাওয়া করে শান্ত হয়ে বসল পরেশ। শীতলা দেবী পাশে এসে বসলেন। তাকিয়ে দেখলেন বিমল গাল ফুলিয়ে পেছন ফিরে বসে আছে। মুখ টিপে হাসলেন। এখন খাওয়ানো যাবে না। কথা বলতে গেলে অনর্থ বাধাবে। ভাব-ভঙ্গীতে তার প্রতি অবহেলা দেখিয়ে পরেশের সঙ্গে গল্প করেন। কেমন জায়গা কেমন দেশ। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব খবরই নেন। বড় শুকনো দেশ। ধান হয় খুব। যদি হরমোহন বাবুরা পছন্দ করেন তবে আমরাও যাব মা। বোঝা গেল পরেশের একেবারে অপছন্দ নয়। শীতলা দেবী আন্দামানের কথা তোলেন। সেখানে গেলে অনেক সাহায্য পাওয়া যাবে, ভাল জমি দেবে।

—কালাপানি দ্বীপ! আঁৎকে ওঠে পরেশ। না মা, যাই না যাই, বাংলা দেশেরই এক কোণে পড়ে থাকব।

—কিন্তু ওখান সম্বন্ধে যা শুনেছিস তা ঠিক নয়। এখন ভাল হয়েছে, এই ত মতি হালদার যাচ্ছে—জমি বাড়ী কত কি কি পাওয়া যাবে!

—দেশে যদি জায়গা না-ই হয় তখন না হয় দেখা যাবে। এখানে একটু আশ্রয় পাই ত সব করে নেব মা। আমাদের সম্বল এখন শুধু দেহের বল, মনের সাহস আর সবার উপরে তুমি। তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি নতুন সংসার গড়ব, তুমি শুধু আশীর্ব্বাদ কর।

শীতলা দেবী তাকে দু হাতে বুকে চেপে ধরলেন। ছল ছল চোখ দুটো ভিজে এলো। সেদিনের একগুঁয়ে অবুঝ ছেলে দায় ঘাড়ে পড়ে কেমন বুদ্ধিমান হয়েছে! এই ক'মাস আগে বাপ গেল। তার পর আর এক সর্ব্বনাশ। ঘা খেয়ে খেয়ে ছেলে আমার শক্ত হয়ে গিয়েছে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তোদেরই জন্ম আমার সব। যা ভাল বুঝিস কর। পরম তৃপ্তিতে পরেশের পিঠে হাত বুলিয়ে দেন।

ওদিকে ফোঁৎ করে নাক ঝেড়ে বিমল তার উপস্থিতি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে—শীতলা দেবী একটু হেসে পরেশের মাথাটা বাহুর উপর নিয়ে চোখ বুজে ঘুমের ভান করে পড়ে রইলেন। বিমল এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে একটু, হঠাৎ বালিশ টেনে নিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, আমার বালিশে শুতে দেব না। ক্লান্ত পরেশ তাকায়। মায়ের আদরে হিংসা বুঝতে পেরে নির্ব্বিকার ভাবে শীতলা দেবীর গলাটা জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ে।

শীতলা দেবী তাকিয়ে বলেন, ঐ পা তলায় শো যা।

আও—আও—আও করে মুখ ভেংচে ওঠে বিমল। তার পর পরেশের পা ধরে হিড় হিড় করে টানতে থাকে। পরেশ উঠে বসে। ভাইকে ভালবাসে সে, এ অত্যাচার আনন্দের সঙ্গেই উপভোগ করে। শীতলা দেবী উঠে বসেছেন। মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছেন। কোন শৈশবের পুতুল খেলার বাস্তব রূপ। কত আশা আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্নের ধন। তৃপ্তি যেন মেটে না। এত কষ্ট-দুঃখের মধ্যে এই-

টুকুই তাঁর মৃতসঞ্জীবনী। উঠে বিমলের হাত ধরে টেনে নিয়ে বলেন, লক্ষ্মী বাপ, খেয়ে নাও চল! বিমল ক্ষীণ আপত্তি করে এগিয়ে চলল। জঠরানলের জ্বালা আর নতুন কোন উৎপাতের প্রেরণা দিল না তাকে।

বিমলকে খাইয়ে দু' পাশে দু' ছেলে নিয়ে শুয়ে পড়েন শীতলা দেবী। ওরা ঘুমিয়ে পড়ে, তাঁর চোখে ঘুম আসে না। পরেশের একটা কথা কানে বাজছে, 'তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে নতুন সংসার গড়ব।' সস্নেহে পরেশের পিঠে হাত বুলিয়ে দেন। আমার দিকে তাকিয়েই ছেলে বুকে বল করেছে। কেমন করে হবে! আমি ত খুব বেশী কিছু চাই না, শুধু পরেশ-বিমলের একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয়! ভগবান কতদিনে সেই সুদিন দেবেন! ছোট বাড়ী একখানা। শাক-সবজি লাউ-কুমড়া আনাচে কানাচে ভরে থাকবে, আম-কাঁঠাল নারিকেল গাছ, গাঁদা, সাদা মালতী ফুল। তুলসী-তলার বেদিতে প্রদীপ জ্বলবে সন্ধ্যাবেলা। পরেশ কঠোর পরিশ্রমে এলিয়ে পড়বে এসে, আচলে ঘাম মুছিয়ে দেবেন, বাতাস করবেন। তার পর সেই বাড়ীতে ঘুর ঘুর করে ঘুরবে একটি টুকটুকে বৌ, পায়ে আলতা, কানে ফুল, কপালে লাল সিঁদুর। দুপুরে শাশুড়ীর জটপাকানো চুল নিয়ে বসবে উকুন বাছতে। পরেশ লুকিয়ে লুকিয়ে দেখবে, জল চাইবে ঘন ঘন, বৌএর হাসি-খেলা গৃহিণীপনা দেখে তৃপ্তি মিটবে না। মুখ টিপে হেসে বলবেন, পরেশকে জল দিয়ে এস বৌমা! হঠাৎ কি খেয়াল হ'ল উঠে আলোটা বাড়িয়ে দিয়ে পরেশের মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। ঠিক বাপের মত হয়ে আসছে। ওর বাপও এই বয়সে এমন ছিল। নিজের বিয়ে হওয়ার দিনটা স্বপ্নের মত মনে পড়ে। আট বছরের মেয়ে কিছুই বুঝত না। ওর বাবা কত ভাবে যে কাঁদাতো! তার পর ক্রমে বড় হয়ে এলে কাছে কাছে ঘুর ঘুর করে ঘুরত। হঠাৎ খেয়াল হ'ল, পরেশের মধ্যে নিজের হারানো জীবনটারই স্বপ্ন দেখছেন, নিজের জীবনে যা ফিরবে না তাই দেখতে চান জীবনের ফসলের মাঝে। নারীজীবনের চরম সার্থকতা! না—না—এরা আজকালকার ছেলে, দিনকাল বদলাচ্ছে! এদের পছন্দমতই সংসার গড়ে তুলবে, আমি দেখেই সুখী।

পাশের ওদিককার তাঁবুটায় ছেলেটা অনেকক্ষণ ধরে ককিয়ে ককিয়ে কাঁদছে। কেমন মা! ছেলে কেঁদে সারা তবু ঘুম ভাঙ্গে না! কোন দিন বোধ হয় ঘা খায় নাই তাই। কুম্ভকর্ণ! অস্বস্তিতে উঠে বের হয়ে আসেন। ৩১নং তাঁবুর সামনে গিয়ে ডাকেন, সরযূ, ও সরযূ, ওঠো ওঠো। কিন্তু কোন সাড়া নেই! ছেলেটা শোবার বাঁশের মাচাটার নীচে পড়ে গোঙাচ্ছে। দুয়ারের পর্দাটা ফাক করে লণ্ঠনটা তুলেই চমকে ওঠেন। ঘরে কেউ নাই। ছেলেটা নীচে গড়াগড়ি খাচ্ছে। তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নেন ছেলেটাকে। মানুষের সাড়া পেয়ে অবোধ শিশু হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবেন। মনে একটা কালো ছায়া ঘনিয়ে আসে, ক্যাম্পজীবনে অনেক কিছু আলোচনা শোনেন, অনেক কিছু দেখেন, আজ কি এও দেখতে হ'ল? একবার ইচ্ছা হয় ফেলে দিয়ে পালাই। কিন্তু অবোধ শিশু পরম নিশ্চিন্তে পড়ে আছে ঘাড়ে। দাঁড়িয়ে পায়চারী করতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর আসে ওর মা সন্তর্পণে হাঁফাতে হাঁফাতে, শীতলা দেবীকে দেখেই চমকে উঠে।

—কোথায় গিয়েছিলে বাছা ছেলে ফেলে?

সন্ত্রস্তভাবে দু' একবার ঢোক চেপে সরযূ বললে, ঐ 'এ' ব্লকে ভাল গান করছে কে তাই শুনতে গিয়েছিলাম। আপনি যান না এগিয়ে, শুনতে পাবেন।

সন্দেহ খালনের জন্যই শীতলা দেবী এগিয়ে চলেন। মনে হয় এর স্বামী প্রায় পনের দিন হলো বায়গা দেখতে কলকাতার দিকে কোথায় গিয়েছে। মেয়েমানুষের এ রকম চলন ভাল নয়। কিছুটা এগিয়ে যেতেই থমকে দাঁড়ান। ঠিকই ঐ A ব্লকের কোন তাঁবু থেকে মিষ্টি করুণ সুরের গান ভেসে আসছে। পরিচিত —অতি পরিচিত সুরের রেশটা। বুকের ভিতরটা হু হু করে উঠল তাঁর, নিশ্চয়ই আমার মালতীর গলা, কি গানই গাইত! ঐ গানই বুঝি কাল হ'ল। গান করে মেডেল পেয়েছে। কোন সভাসমিতিতে মালতীর গান ছাড়া চলত না। পাকিস্থানের পরও ম্যাজিষ্ট্রেট, এস, ডি-ওদের সভায় ওকে ডেকে নিয়ে যেত গান গাইতে। ঝিম ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি! দু' চোখ বেয়ে জল পড়ছে। কি খেয়াল হ'ল লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিয়ে এক পা এক পা করে এগিয়ে চললেন। কাল কত বড় দাগা দিয়েছি ওকে! মা বলে কাছে এসেছিল, চিনেও চিনি নাই। ভগবান আমার মরণ দাও! সাথে সাথে শিউরে ওঠেন। না—না—আমার পরেশ-বিমলের জন্য বাঁচতেই হবে। কাছাকাছি এসে দেখেন তাঁর মালতীই গান করছে। একদল মেয়েলোক শুনছে। একটা শেষ হ'লে আবার অনুরোধ। কিছুটা ফাঁকে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন, হঠাৎ 'কে' বলে টর্চের আলো পড়ে, একজন মহিলা এসে হাত ধরে। এখানে অন্ধকারে কেন? চলুন, কাছে গিয়ে শুনবেন। বড় সুন্দর গান।

না—না—না—বলে তার হাত ছাড়িয়ে ছুটে পালিয়ে আসেন নিজের তাঁবুতে।

পরদিন দুপুরের খাওয়া মিটিয়ে শীতলা দেবী হরমোহন বাবুর তাঁবুর দিকে পা বাড়া'ন। তাঁদের মতামত শুনতে হবে। বিমল কোথা থেকে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে। সামনে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের বড় রাস্তা। বাদামওয়ালা চলেছে—গরম বাদা—ম! তার ঠাণ্ডা-নীরস কণ্ঠস্বর বড় মিষ্টি লেগেছে বিমলের, চারটা পয়সা দাও না মা, বাদাম ভাজা খাব। শীতলা দেবী না করতে পারেন না। বললেন, যা ওকে ডেকে আন, আমি পয়সা আনছি। পয়সা এনে দেখেন, বিমল প্রাণপণে ডাকছে, বাদামওয়ালা, ও—বাদামওয়ালা, বাদাম দিয়ে যাও! বাদামওয়ালা হন্ হন্ করে এগিয়ে চলেছে। বিমলের বার বার ডাকে মুখ ফিরিয়ে বললে, রিফিউজীদের বাদাম খেতে

হয় না। শীতলা দেবীর প্রাণটা কেমন করে ওঠে। মনে পড়ল, ঠিকই ত—ক'দিন আগেই এক বাদামওয়ালা বাদাম বেচতে এসে সুপারিনটেণ্ডেণ্টের কাছে কড়া ধমক খেয়ে গিয়েছে। কোন বাদামওয়ালা বা ফেরীওয়ালা যেন ক্যাম্পের সীমানায় না আসে। কোন বাজে খরচ করার জন্য ক্যাশডোলের টাকা দেওয়া হয় না। সত্যিই ত। আমারা রিফুজী। দেশ ছেড়ে যারা ভিখারীর মত বাস করে তাদের সাধারণ মানুষের তুচ্ছ সখ করাও অন্যায়ই ত! সাধারণ মানুষের চেয়ে আমরা ভিন্ন মনে রাখতে হবে। পয়সা চারটা বিমলের হাতে দিয়ে চুপে চুপে বলেন, যা বাবা বাজার থেকে কিনে খেয়ে আয়! রিফুজী হলেও সাধারণের থেকে অসাধারণ হতে পারি না যে। হরমোহন বাবুর তাঁবুর দিকে এগিয়ে যেতেই কয়েকজন মহিলা কি আলোচনা করছে দেখে দাঁড়িয়ে পড়েন। একজন বলে, দিদি শুনেছেন কাল আবার ভেরিফিকেশন প্যারেডের হুকুম হয়ে গেল। এত জুলুম মানুষ সইতে পারে? শীতলাদেবীর মুখেও বিরক্তি ফুটে ওঠে। বিনা ছুটিতে কেউ অনুপস্থিত থাকে বা অপ্রাপ্তবয়স্ক কেউ বড়দের বরাদ্দ না নেয় তারই জন্য এই হুসিয়ারী, সারবন্দী দাঁড়াতে হবে। নাম-বয়স মিল করে দেখে নেবে সাহেব। কি করা যাবে ভাই, জেলখানায় আছি, চোখ-কান বুজে সইতেই হবে, বলে এগিয়ে চললেন তিনি।

হরমোহন বাবুর ওখান থেকে ফিরছিলেন শীতলা দেবী। এখানেই জানাজানি হয়েছে, ওরা একই থানার লোক। ছন্নছাড়া জীবনে আত্মীয়ের মতই মনে হয়। যায়গা তাঁদেরও পছন্দ হয়েছে, ভালই। পরেশের তা হলে পছন্দ হবে। আর এ জেলখানায় থাকা যায় না। খাই বা না খাই একটু শান্তিতে নিঃশ্বাস ফেলতে পারব। যত তাড়াতাড়ি হয় চলে যেতে হবে। এদেশের লোকজন কেমন, একটু খোঁজ নেওয়ার ইচ্ছা হয়। কাছেই বাঁশঝাড়ের ভিতরে ছোট ছোট ঘরগুলো কি সুন্দর! যাই ও-পাড়া থেকে বেড়িয়ে আসি। একা যেতে কেমন লাগে, কাকে সঙ্গে নেওয়া যায়। সামনেই ছেঁড়া-পড়া তাঁবুটার সামনে একটা জটলা হচ্ছে মেয়েদের। শীতলা দেবী দাঁড়িয়ে পড়েন। নগেন বিশ্বাসের বউ একখানা শান্তিপুরী শাড়ী পরেছে, তাকে কেন্দ্র করে রসিকতা হচ্ছে, মেয়েদের প্রায় সবারই পরনে সস্তা তাঁতের শাড়ী। কেউ ভাল শাড়ী পরলেই সকলে তাকে নিয়ে পড়ে। রসিকতায় নিজের দৈন্য ভুলতে চায়। হঠাৎ ওদের মধ্যে ও প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে ফিসফিসানি আরম্ভ হয়। ধ্রুব রাহার বউ সবিতা রাহা আসছে এদিকে। রিফিউজি হলেও সবিতার বেশ-ভূষায় উন্নত রুচির ছাপ। চোখে-মুখে কথাবার্তায় বেশ শিক্ষিত মনে করাতে চায়। চোখে চশমা, অতি পুষ্ট মেদময় দেহ, সবমেয়েকেই সে যেন একটা হীন নজরে দেখে। সাধারণ মেয়ের চেয়ে সে উচ্চস্তরের, কথাবার্তায় ভাব-ভঙ্গীতে সব সময়েই সেটা জাহির করতে চায়। শিক্ষিত পুরুষ দেখলে যেচে রাজনৈতিক বা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করে। মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্তায় কিন্তু খবরদারিটাই প্রবল হয়ে ওঠে। ক্যাম্পের কোন মেয়েই ওকে সুনজরে দেখে না। বিদ্রূপ করে কেউ বলে সর্দ্দারনী, কেউ বলে গেজেট, কেউ বলে মুটকী-হাতী—অবশ্য অন্তরালে। তার পুরুষ ঘেঁষা স্বভাব নিয়ে টিপ্পনী কাটে, আলোচনাও হয় অনেক। সবিতা জটলার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে।

—কি আলোচনা হচ্ছে আপনাদের?

—এই আজেবাজে গল্প, একজন জবাব দেয়।

—বেশ—বেশ বুঝে-সুঝে চলবেন, দুঃসময় আমাদের।

একজন বললে, কি করা যায় বলুন ত? কাল আবার ভেরিফিকেশন প্যারেডের হুকুম হয়েছে।

—তা ত উপায় নাই, যেখানে আছি সেখানের আইন মানতেই হবে।

আর একজন মেয়ে বলে, আমার মনে হয় আমাদের সবিতাদি ইচ্ছা করলেই বন্ধ করতে পারেন, শুধু মুখের কথা।

—তা পারি নিশ্চয়ই! তবে বুঝলেন—কি দরকার?

৬নং ক্যাম্পের ভট্টাচার্জ্জিমশায় বসে আছেন দেখা গেল। অতি বৃদ্ধ, সামনে টাক, পেছনে সরু টিকি, পুরু কাচের চশমা চোখে, কি যেন লিখছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, ঠিকুজী-কুষ্ঠি করেন,পূজা-পার্ব্বণ পেশা। কাশী থেকে নাকি স্মৃতিরত্ন উপাধি পেয়েছিলেন। করকোষ্ঠিও বিচার করতে পারেন। বিধবা মেয়ে ও কয়েকটা নাতি-নাত্নি নিয়ে দেশ ছেড়ে এসেছেন। একটা ছেলে অবশ্য আছে। সে মিলিটারীতে কাজ করে। বাপের খোঁজ রাখে না, ক্যাম্পে প্রায় সবাই চেনে তাঁকে। শীতলা দেবীর হঠাৎ মনে হয় অদৃষ্টে এত অশান্তি, হাতখানা দেখাই দেখি, দুঃখ ঘুচবে কিনা—কাছে গিয়ে দাঁড়ান।

—ভটচাজমশায় কি করেন?

—কি করব মা, বসুন্ধরার হালচাল দেখছি। ঘোর কলি এটা, সব একাকার হয়ে যাবে। শাস্ত্রের বচন মিথ্যা হয় না।

—আমার হাতখানা দেখুন ত কপালে আর কত দুঃখ আছে?

সবিতা দেবীও কয়েকজনের সঙ্গে এসে ঘিরে দাঁড়ালো। ভটচাজমশায় বললেন, হাত আর কি দেখব মা, এই কবরস্থান না ছাড়লে আমাদের কারো দুঃখ দূর হবে না। শীতলা দেবী চমকে ওঠেন—কবরস্থান এটা?

—হাঁা, এই চারিদিকে ভাঙা দরগা আর ছড়ান পাথর দেখে বুঝতে পারছ না এটা কবরস্থান? নবাব-আমলে আমির-ওমরাহদের কবর হ'ত এখানে। সবিতা দেবী বললেন, তা হলে দরখাস্ত করা উচিত।

দরখাস্ত করে আর কি হবে মা। আমরা এমনিতেই সব শ্মশানপথের যাত্রী। শ্মশানে সবাই সমান। আমরা এখানে সকলে সমান হয়ে গেছি। আমার এ চুরাশী বছরের জীবনে

অনেক কিছু দেখলাম মা, জগৎ পরিবর্তনশীল। প্রতি মুহূর্তে বদলাচ্ছে সব কিছু। মানুষের জীবনে যা লাগে কিন্তু সয়ে যায় সবই। আমাদেরও সব সয়ে নিতে হবে। শ্মশানের বিভূতি আমাদের নীলকণ্ঠের অমর আশীর্বাদে আমরাও নীলকণ্ঠ হয়ে উঠব। অনাহার, অপমান, লাঞ্ছনা, অত্যাচার, অবিচার সবকিছু হাসিমুখে সহ্য করব আমরা, আমাদের বাঁচতেই হবে। সাময়িক দুর্যোগে আমরা লুপ্ত হয়ে যাব না।

সবিতা দেবী চঞ্চল হয়ে উঠলো: ঠিক বলেছেন আপনি। আমরা আবার নতুন ভারত গড়ব। আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, আশীর্বাদ করুন!

সকালে মধুসূদন কেবল চায়ের কাপে চুমুক দিয়েছে, 'এ' ব্লকের ইনচার্জ্জ সুশান্ত এসে বললে, স্যার এখুনি আপনাকে আসতে হবে। গুরুতর গোলযোগ আমার ব্লকে। মধুসূদন সংক্ষিপ্ত ঘটনাটা জানতে চাইল।

—আমি কিছু বলতে পারব না। আপনি গিয়ে শুনবেন, সুশান্ত জবাব দেয়।

ধরা-চুড়া পরে মধুসূদন রওনা হয়ে যায় তাড়াতাড়ি। কাছাকাছি গিয়ে দেখে অনেকগুলো মেয়ে জটলা করছে। নিকটেই একদল পুরুষ। তাকে দেখেই ওদের মধ্যে চাপা উত্তেজনা দেখা গেল। একজন মধুসূদনকে নিয়ে চলল—চলুন আপনি নিজে কানে শুনবেন। সেই মেয়েটি যাকে সে আশ্রয় দিয়েছিল তাকে কেন্দ্র করেই জটলা। মেয়েরা পথ ছেড়ে দাঁড়ায়।

মালতী বলতে থাকে, স্যার, আপনি আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন, না হলে কোথায় থাকতাম কে জানে। কিন্তু আমি এখানে আসার পর থেকেই আপনার আর্দ্দালী আমার পেছনে লেগেছে। মধুসূদন চেঁচিয়ে ওঠে—আমার আর্দ্দালী কাশীনাথ?

—হ্যাঁ, আপনারই আর্দ্দালী শুনছি। জিজ্ঞাসা করুন ঐ বুড়িমাকে। তার আশ্রয়দাত্রী বৃদ্ধা এবার সমর্থন করেন, হ্যাঁ বাবা, ও এখানে আসার পরদিনই আপনার আর্দ্দালী এসে আমার কাছে ওর সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করে। আপনার লোক বলে আমি ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করি নাই। রোজই আমার কাছে এসে জানতে চায়, মেয়েটির বাড়ী কোথায়, বাবার নাম কি, কে কে আছে বাড়ীতে। জানি না বলে বিদায় করেছি।

মালতী বলে, এবার পরশুদিন আমাকে একা পেয়ে আলাপ জমাতে চেয়েছিল। আমি সরে গিয়েছিলাম। গত রাত্রে তাঁবুতে ঢুকে হাতের আঙুল ধরে টান দেয়। আমার ঘুম ভাঙতেই ফিসফিস করে ডাক দেয়—তোমার সঙ্গে বিশেষ কথা আছে, একটু বাইরে এস। আমি চীৎকার করে বুড়িমাকে জাগিয়ে দিই। লোকটা ছুটে পালায়। আপনার লোক—আপনাকে জানাচ্ছি—কি করবেন করুন।

সবিতা রাহা ভীড় ঠেলে এগিয়ে আসে হঠাৎ। তার জীবনে পুরুষমাত্রেই তাকে সমীহ করেছে সর্ব্বত্র, বাস্তুহারা-জীবনে এই সুপারিনটেণ্ডেণ্ট-এর কাছেই কোন আমল পায় নাই শুধু। আজ চাঁদকে দেখে নিতে হবে। এবার নাকের জলে চোখের জলে হয়ে এই সবিতা রাহার কাছে করুণাভিক্ষা করতে হবে। হাত নেড়ে বলে, উনি কি করবেন, বড় আশা করে আপনাকে আশ্রয় দিয়েছেন, তাই চর পাঠিয়ে মোলাকাত করতে চেয়েছিলেন, এখন যা করবার তা আমাদেরই করতে হবে। আমরা অরসিক রিফিউজী, রসিকের মর্য্যাদা কি বুঝব!

মধুসূদন চেঁচিয়ে উঠল—কি বলছেন আপনি?

—আমরা কি বলব! হায়রে রিফুজী, বাড়ী নাই ঘর নাই, আপনার মত সুপারীণ্ঠেনঠন বাবুকে কিছু বলতে পারি? মেয়েদের মধ্যে চাপাহাসির গুঞ্জন ছাপিয়ে কে বলতে থাকে সুপারীণ্ঠেনঠন সুপারীণ্ঠেনঠন। হিঃ হিঃ!

মধুসূদন ভ্যাবলার মত চেয়ে থাকে। মাথা ঘুরে গিয়েছে তার। সবিতা হাত নেড়ে বলতে থাকে, হতভাগা রিফিউজীদের আস্পর্দ্ধা দেখে চমকে উঠছেন, না? অত সহজে চমকালে চলবে কেন?

পুরুষদের ভিতর থেকে চাপা হুঙ্কার শোনা যায়—নো খাতির নো খাতির। সেই দিকে লক্ষ্য করে সবিতা এবার বাঘিনীর মত হুঙ্কার ছাড়ে, মা, ভগ্নী ও ভাইগণ! আমরা সর্ব্বহারা হলেও কারও ছিনিমিনি খেলার সামগ্রী হব না। এর উপযুক্ত ব্যবস্থা আমাদের করতেই হবে। আজকেই দরখাস্ত লিখে রিলিফ অফিসার, ম্যাজিষ্ট্রেট, পুনর্ব্বাসন মন্ত্রী, দিল্লীদপ্তর সব জায়গায়ই পাঠাচ্ছি। দেখি হতভাগাদের প্রতি অন্যায়ের কোন প্রতিবিধান হয় কিনা। আপনারা উত্তেজিত হবেন না, আমিই এর যোগ্য ব্যবস্থা করছি—কথাটা বলে একটা আত্মপ্রসাদের ভাব ফুটে ওঠে তার মুখে। তার কর্তৃত্ব রিফিউজীদের অনেকেই স্বীকার করতে চায় না। এবার তাকে কে ঠেকায়! মধুসূদন ফ্যাকাসে মুখে দাঁড়িয়ে আছে। পদমর্য্যাদার ছাপ মুখ থেকে মুছে গিয়েছে। বড় সাংঘাতিক অভিযোগ, তার অপরাধ ইনকোয়ারীতে প্রমাণসাপেক্ষ। কিন্তু এখনই যে অবস্থাটা দাঁড়াবে তাতেই সে মুষড়ে পড়ে। সঙ্গের ষ্টাফ চোখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে ঘামছে। কাছেই রাজনৈতিক বিরোধীদলের ঘাটি, হৈ-চৈ করে উঠবে। ভাগাড়ে শকুনের মত রিপোর্টাররা ডানা মেলে আসবে। খবরের কাগজে ফলাও করে প্রকাশ হবে। পরিচিত আত্মীয়-বন্ধুরাও চোখ মিটিমিটি করে ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসবে। তবু পদাধিকারবলেই সোজা হয়ে দাঁড়াল সে। শুকনো গলায় বললে, আপনারা উত্তেজিত হবেন না। আমি আর্দ্দালীকে এখুনি ডাকাচ্ছি, আপনারা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করুন এ সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। আর্দ্দালী অপরাধ করলে উপযুক্ত দণ্ড সে নিশ্চয়ই পাবে। ক্যাম্প-গার্ড ছুটল আর্দ্দালীকে ডাকতে।

সবিতা জিজ্ঞাসা করে, আপনার আর্দ্দালী দোষ ঘাড়ে নেবে ত?

—দোষী প্রমাণ হলে ঘাড়ে নেবার প্রশ্ন আসে কি করে?

—ও তো আপনার হাতিয়ার তাই জিজ্ঞাসা করছি।

—হাতিয়ার নয়, তবে মিথ্যা কথা বলতে পারে।

—ও তা হলে মিথ্যা বলে আপনাকে জড়াবে কেমন ?

—দোষীরা বাঁচবার জন্ত চিরকালই মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে। হাঃ হাঃ হাঃ—থিয়েটারী ভঙ্গীতে হেসে ওঠে সবিতা রাহা। বড় চমৎকার সাফাই আপনার! মধুসূদন কিছুটা ফাঁকে গিয়ে একটা খুঁটি ধরে দাঁড়াল। কাশীনাথ চালাক, চতুর বুদ্ধিমান। এখানে এসেই অবস্থাটা বুঝতে পারবে। ঐ মুটকীই হয়ত ওকে সচেতন করে দেবে। সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে জড়ালেই সে খালাস পাবে এটা যদি বুঝতে পারে, তবে? কলঙ্ক, দুর্নাম, পদচ্যুতি, তার পর হয়ত ক্রিমিন্যাল স্যুট। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসে। টলতে টলতে পায়চারী করতে লাগে। মেয়েমহল থেকে তীক্ষ্ণ হাসির টুকরো ভেসে আসে কানে।

কাশীনাথ আসছে দেখা গেল। একটু দূরেই কোথায় ছিল সে। কয়েক মাস আগে এই উদ্বাস্তু-যুবক মধুসূদনকে এসে একটা চাকরীর জন্ত ধরে। তার কথাবার্ত্তা ভাল লাগে মধুসূদনের। তার নিজের আর্দ্দালীপদে লোকের প্রয়োজন ছিল, তাকেই ভর্ত্তি করে নেয় মিনিয়েল ষ্টাফে। ও কাছাকাছি আসতেই মধুসূদন গিয়ে হাত ধরে। সবিতা চেঁচিয়ে ওঠে, ধমক দেবেন না ওকে। ওর বক্তব্য স্বাধীনভাবে বলতে দিন। মধুসূদন সে কথা কানে না নিয়ে কাশীনাথকে টেনে নিয়ে মালতীর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। তর্জ্জনী বাড়িয়ে বলে, তোমার সম্বন্ধে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে, নিজের ভালর জন্ত অকপটে সত্য কথা বলবে।

সমস্ত জনতা রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে। কাশীনাথ সোজা হয়ে দাঁড়াল। স্বাস্থ্যবান যুবক। স্মিতহাস্যে বলে, অভিযোগ আমি জানি এবং তা আমি স্বীকার করে নিচ্ছি। মালতীকে দেখিয়ে বলে, উনি কখনও মিথ্যা কথা বলেন নাই। কিন্তু কয়েকটি কথা ওঁকে জিজ্ঞেস করতে চাই, তার পর আপনার অভিযোগের জবাব দেব।

—কি জিজ্ঞাসা করতে চান বলুন, রুক্ষস্বরে মালতী জবাব দেয়।

—আপনি নিশ্চয়ই শঙ্খধবল গ্রামের তারিণী মুখুজ্যের মেয়ে।

—সে খবরে আপনার প্রয়োজন ?

—প্রয়োজন-অপ্রয়োজন ঠিক জানি না তবে সেটা জানার জন্তই আপনার আশেপাশে ঘুরেছি কয়েক দিন। আমি মণিহারা গ্রামের কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য।

—আপনিই! উদভ্রান্তভাবে চেঁচিয়ে উঠল মালতী, বড় বড় চোখে তাকিয়ে কোলে মাথাটা গুঁজে দিল। উদ্দাম কান্নার বেগে সমস্ত দেহটা থর থর করে কাঁপছে তার। স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে সকলে। মালতী মুখ তুলল, যোড়হাতে কাশীনাথকে বলে, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। এক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন ভীড়ের মাঝ থেকে। কি ব্যাপার আপনাদের খুলে বলুন ত।

কাশীনাথ স্থির দাঁড়িয়ে ছিল—বললে, হ্যাঁ সে কথা বলতেই হবে আমাকে। না বললেই হয়ত ভাল হ'ত। এক বছর আগেও উনি আমার শয়নে-স্বপনে অন্তর জুড়ে ছিলেন। ওনাকে কেন্দ্র করে কত স্বপ্নজাল বুনেছিলাম, আকাশকুসুম গড়তে চেয়েছিলাম, ওনাকে চিনেছিলাম, তবু নিঃসংশয় হওয়ার জন্ত ওনার পরিচয় জানতে চেয়েছি। ওনার সঙ্গেই আমার জীবনতরী ভাসাতে চেয়েছিলাম, হলুদ মেখে থুবড়ো খেয়ে বিয়ের দিন সকালে শুনলাম, কুলত্যাগ করে উনি বেরিয়ে গেছেন। স্বর্গ থেকে এক আছাড়ে জীবনের সব কিছু চুরমার হয়ে গেল।

—মিথ্যা কথা! মালতী হুঙ্কার ছেড়ে ওঠে।

—কিন্তু সেইটাই সকলে জানে, এমন কি আপনার মাও অস্বীকার করতে পারবেন না, বোধ হয় তাঁরা এখানেই আছেন, আমি চিনি।

—মায়ের ধারণা আমি কুলত্যাগিনী! মিথ্যা ধারণা পোষণ করেছেন তিনি। সেই জন্ত কাল আমায় চিনতে পারেন নাই। উঃ ভগবান!

মধুসূদন স্ব-মর্য্যাদায় ফিরে এসেছে আবার, পাষাণের বোঝা নেমে গিয়েছে বুক থেকে। স্ব-মূর্ত্তিতে বুক টান করে দাঁড়িয়ে পদোচিত হুকুম দিল ক্যাম্পগার্ডকে, বি ব্লকের ২১ নং ক্যাম্পের শীতলা দেবীকে ডেকে আন এখুনি। ক্যাম্পগার্ড ছুটল।

পরেশ-বিমলের হাত ধরে শীতলা দেবী এলেন ঘোমটায় মুখ ঢেকে। মালতী জিজ্ঞেস করে, আমি কুলত্যাগ করে এসেছি এই তোমার ধারণা মা?

শীতলা দেবী পাষাণমূর্ত্তির মতই দাঁড়িয়ে থাকেন। কোন কথা বের হয় না তাঁর মুখ দিয়ে। কাশীনাথ জবাব দিল, উনি কি বলবেন! আপনার জবানবন্দী আদালতে আমরা নিজ কানে শুনেছি।

—হ্যাঁ জবানবন্দীতে বলেছিলাম স্বেচ্ছায় কুলত্যাগ করে এসেছি, কিন্তু কেন? কেন?

—কেন তা আপনিই বলতে পারেন।

—কারণ আমি বাঙালীর মেয়ে বাঙালীর বোন। মা-ভাইএর জন্ত আমরা সব করতে পারি। তাঁদের মুখ স্মরণ করেই···

—হ্যাঁ তাঁদের মুখ স্মরণ করেই তাঁদের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। জগতের একটা আদর্শ বটে! কাশীনাথের কণ্ঠে তীব্র শ্লেষ বেজে ওঠে।

মালতী কথাটা কানেই নেয় না যেন: আমি বলতে বাধ্য হয়েছিলাম আমার দু'ভাই আর মায়ের কথা চিন্তা করে। এ কথা না বললে ঐ মা-ভাইকে ওরা টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলত। ওদের মুখ চেয়েই আমি ও রকম জবানবন্দী দিয়েছিলাম। আমায় বিশ্বাস কর মাগো, তোমার মেয়ে যাই হোক কুলত্যাগিনী নয়। স্তব্ধ জনতা, দীঘির কালো জলের মতই গাম্ভীর্য্যময় পরিবেশ। মালতী এবার হাত নেড়ে বলতে থাকে—উনি আমায় সত্য পিতৃহীন জেনে স্বেচ্ছায় বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। সভা-সমিতিতে গান

শুনে পছন্দ করেছিলেন, কোন দাবী-দাওয়াও করেন নাই। ওনাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার নাই। আমি ওনাকে ঠিক দেখি নাই তাই চিনতে পারি নাই, সেজন্য ক্ষমা চাচ্ছি। বিয়ের আগের দিন সন্ধ্যায় আমি ঘাটে গিয়েছিলাম, হঠাৎ পেছন থেকে কে এসে মুখে কাপড় গুজে বেঁধে ফেলে। আমি টু শব্দ করতে পারি নাই। সঙ্গে সঙ্গে তিন-চার জন লোক আমাকে ঘাড়ে করে নিয়ে ছুটতে থাকে। একটা ছোট ঘরে বন্ধ করে রাখল, মিটমিটে প্রদীপের আলোয় দেখি একটি মেয়ে খাবার দিয়ে গেল। আমি কিছু বলার আগেই বেরিয়ে গেল সে, সারারাত মা খেয়ে পড়ে কাঁদলাম, সকালে যে আমার ঘরে এল আমি চমকে উঠলাম দেখে, আমাদের গাঁয়েরই ইউনিস মিঞার ছোট বৌ, এরা সকলেই আমার পরিচিত। ছেলেবেলা থেকে কতবার এসেছি এদের বাড়ীতে। এরাও আমাদের বাড়ী গিয়েছে। বিশেষ অবস্থাপন্ন লোক ইউনিস মিঞা, এ অঞ্চলের মাথা, কত অযাচিত সাহায্য করেছে আমাদের। কোথাও গান গাইতে ভাইদের সঙ্গে গেলে সেও সঙ্গে থাকত। বাড়ীতে দুই বৌ তার। ছোট এসে বোঝাতে লাগে তার স্বামীর ঐশ্বর্য্য ধন-দৌলত টাকা-পয়সার পরিমাণ। আমাকে তার সাধের বৌ করার জন্যই এনেছে। অনর্থক গোলযোগ যেন না করি। গোলযোগ করে ফিরে গেলেও সমাজে আমাকে কেউ ছোঁবে না। এখন ইউনিস মিঞাকে বিয়ে করা ছাড়া উপায় নাই। আমি সোজা হয়ে বসে তার হাতখানা চেপে ধরলাম, তুমি মেয়েমানুষ হয়ে কি মেয়েমানুষের মর্য্যাদা বুঝবে না ভাই? আমাকে বিষ এনে দাও। দোহাই তোমার, আমার মরার ব্যবস্থা কর তুমি, আমার সেই ভাব দেখে ঝিম ধরে বসে থাকে সে। কিছুক্ষণ পর দেখি তার চোখে জল। ফিসফিস করে বললে, কি করব ভাই উপায় নাই, না হলে যে অশান্তি আমি পাচ্ছি তাতে আর একজনকে এনে নিজের দুঃখ কেউ সাধ করে বাড়ায়! মিঞার হুকুমে সবই করতে হয় আমাদের। আমাকে মাপ কর, বলে বেরিয়ে গেল সে। দুপুরে ইউনিস মিঞা নিজেই আসে। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, দাদা আমি তোমার ছোট বোন। দোহাই দাদা, তুমি আমার সর্ব্বনাশ কর না। ছোট বোনকে দয়া কর, আমাকে মায়ের কাছে রেখে এস।

বেশ শান্ত ভাবেই বলে সে, যা করেছি তোমার জন্যই। বোন ছিলে এখন আরও নিকট আরও নিজের করে নিতে চাই, এ ছাড়া তোমার কোন উপায় নাই আর। তবু যদি হাঙ্গামা কর তবে অশেষ দুর্গতি ভোগ করতে হবে।

আমি বললাম, দুর্গতির ভয় হিন্দু মেয়েরা করে না দাদা। যেমন করেই হউক আমাকে মরতে হবে।

ইউনিস মিঞার মুখখানা কঠিন হয়ে আসে। চাপা গলায় বললে, দুর্গতির ভয় হিন্দু মেয়েরা করে না হয়ত কিন্তু তারা কি মা-ভাইকে ভালবাসে না?

আমি বললাম, মা-ভাইকে ভালবাসে না কে? তুমি ভালবাস না তোমার মাকে ভাইকে?

—তবে তাদের মঙ্গলের জন্য কোন রকম গোলমাল করবে না।

আমি চীৎকার করে উঠলাম, কেন? কেন?

কেন দেখবে? তার চোখ দিয়ে আগুন ঠিক্‌রে বেরিয়ে গেল। আমিও শিউরে উঠলাম। লুঙ্গির ভিতর থেকে বের করল একখানা ভোজালী। ঝক্ ঝক করে ঝলসে উঠল। সেখানা আমার মুখের সামনে তুলে ধরে বলল, আমার কথা মত না চললে এই ভোজালী তোমার মা-ভাইকে তাজা রক্তে স্নান করিয়ে দেবে। আমার হুকুমে বাঘে বকরীতে এক ঘাটে জল খায় জেনে রেখ।

আমি আৎকে উঠলাম, তার পায়ের উপর আছড়ে পড়লাম। দোহাই দাদা, আমার মা-ভাইয়ের কোন অনিষ্ট করো না।

—তবে আমার কথা মত চলবে তুমি।

—আমার মা-ভাইয়ের জন্য সব করতে পারি। হু হু করে কাঁদতে লাগলাম। সে আমাকে একটু আদর করে বেরিয়ে গেল। পরদিনই সে রটিয়ে বেড়ায়, আমি স্বেচ্ছায় ঘর ছেড়ে এসেছি। তার বোসনাই আমাকে ঘরছাড়া করেছে। তার পর একদিন আদালতে গিয়ে স্বেচ্ছায় জবানবন্দী দিয়ে এলাম।

সবিতা জিজ্ঞাসা করে, তবে আপনি এখানে এলেন কি করে?

—সেও এক মুসলমান যুবকের অসীম করুণায়। তারই ভাই ইলিয়াস দাদা। গ্রামে হিন্দুমহলে তার সুনাম ছিল না। আমাদের সঙ্গে বিশেষ মিলত না। কিন্তু আমি পেলাম তার প্রাণের পরিচয়। আমাকে চুরি করার ব্যাপার সবই জানত সে। এক দিন এই নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে বাদানুবাদও কানে এল। আমি নির্জ্জীবের মত দিন কাটাতাম। ইউনিস মিঞা প্রভাবশালী লোক, নানা কাজে তাকে সহরে যেতে হ'ত, মাঝে মাঝে ঢাকাতেও যেত। সেই সুযোগেই সে একদিন আমাকে তার ঘরে ডেকে নিয়ে যায়। আমার মায়ের ঠিকানা সেই কি করে যোগাড় করেছিল। আমি যেতে চাইলে সে পৌঁছে দিতে রাজী হ'ল। আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারি না। বললাম, এত বড় মহত্ব আমি কি করে বিশ্বাস করব দাদা, সে জবাব দেয়,আমি পাকিস্থানের অধিবাসী, পাকিস্থানকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি, তাই পাকিস্থানের মর্য্যাদা যাতে এতটুকু ক্ষুণ্ণ না হয় তার জন্য আমি মা-বাবা ভাই-বন্ধু সকলের বিরুদ্ধেই দাঁড়াতে সব সময়েই প্রস্তুত। পাকিস্থানকে আমি সব সময়েই গৌরবময় দেখতে চাই। দাদার কুতকর্ম্মে যে আমার পাকিস্থানে, আমার ইছলামে কলঙ্ক পড়বে বোন! সে কণ্ঠস্বরে তার দেবত্ব আমার কাছে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, নিঃসংশয়ে সেই রাতেই আমি বেরিয়ে পড়লাম। সীমান্ত ষ্টেশনে নেমে অন্ধকারে আমার সীমানা পার করে দিয়ে পথের নির্দ্দেশ দিলেন তিনি। আমি শুধু সাষ্টাঙ্গে তাঁর পায়ের ধূলা মাথায় নিয়ে অনিশ্চিতের উদ্দেশ্যে পা বাড়াই। জীবনে ইলিয়াস দাদার ঋণ শোধ করতে পারব না। মোটর-ষ্ট্যাণ্ডে এসে নেমেছিলাম। নিজে মায়ের কাছে যেতে

সাহস পাই নাই, ক্যাম্পের ভিতর দিয়ে তাই কেঁদে কেঁদে ফিরেছি, মা নিজে ডেকে নেন কিনা। কিন্তু মা আমাকে চিনতে পারেন নাই। পরেশ এগিয়ে আসে। একখানা হাত ধরে বলে, মা যদি তোমায় না নেয় দিদি—আমরা ভাই-বোনে এক যায়গায় বাস করব। শীতলা দেবী এগিয়ে আসেন এবার। আমি তোর মা হইনি; ভুল বুঝিসনি মালতী, আমার মেয়ে কুলত্যাগিনী.এ যে কত বড় মর্ম্মান্তিক তা আমার থেকে আর কে বুঝবে? আমার দিদিমার মা স্বামীর সঙ্গে স্বেচ্ছায় সতী হয়েছিলেন, সেই রক্ত আমারও দেহে আছে। যখন শুনলাম নিজ কানে তুই স্বেচ্ছায় ঘর ছেড়েছিস তখন আমি মর্ম্মে মরে যেয়ে তোর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ভুলতে চেয়েছিলাম। আমি বাংলারই মা একজন। এবার তিনি মধুসূদনের দিকে ঘুরে যোড় হাতে বলেন, বাবা আমাদের আন্দামানে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা কর। দেশ ছেড়ে সেখানে গিয়ে আমরা নতুন সংসার গড়বো।

মধুসূদন কাশীনাথকে দেখিয়ে বলে, আপনারা চলে যেতে চান কিন্তু ইনি?

—ওনার দয়া আমি জীবনে ভুলবো না, বি-এ পাশ ছেলে, দয়া করে আমার এই বাপ-মরা মেয়েকে উনি নিতে চেয়েছিলেন, কোন দাবীদাওয়াও করেন নাই—কিন্তু আমি ওনাকে মুখ দেখাতে পারছি না, ভগবান ওঁর মঙ্গল করুন।

মধুসূদন চমকে ওঠে বি-এ পাশ শুনে। কাশীনাথ নিজ যোগ্যতা গোপন করেছে। অন্তরের দাবানল তাকে আত্মপ্রচারণার উৎসাহ দেয় নাই, তাই জীবিকার জন্য অতি সাধারণ কাজ গ্রহণ করেছে বিনা দ্বিধায়। তার উপর শ্রদ্ধা সবারই জেগে ওঠে। মধুসূদনও সচেতন হয়। দেশাত্মবোধ তার কারও চেয়ে কম নয়। বিখ্যাত কংগ্রেস কর্ম্মীর ছেলে সে। শত্রুরা বলে সেই সূত্রেই চাকুরী। এবার দেশের একটু কাজ করার সময় উপস্থিত।

বললে, উচ্চশিক্ষিত ছেলেকে আপনি ভুলতে চান কেন?

—তোমরা ত সব শুনলে বাবা! আমি ওনার দয়া আর কোন মুখে চাইব?

মধুসূদন ডাক দেয়, কাশীনাথ! মালতী দেবীর চলে আসাটাই তাঁর সততার অগ্নিপরীক্ষা। তুমি শিক্ষিত যুবক হয়ে তাকে গ্রহণ করতে পারবে কিনা?

মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে কাশীনাথ। মধুসূদন আবার বলে, যুগ যুগ ধরে আমরা নারীকে যে ভাবে বিচার করেছি আজও কি আমরা সেই ভাবে বিচার করব? আজ দেশ আমাদের খণ্ডিত, এবং তাতে আমাদের ভুল কিছু কম নাই। চরম দণ্ড তার, আপনারা গৃহ-তাড়িত। আমরা আবার সেই ভুলই করব? মাতৃত্ব, পত্নীত্ব, ভগ্নীত্ব খাঁটি সোনা। এ কোন ভাবেই নষ্ট হয় না। জোর করে খাদ মিশালে স্নেহ-পরশে নিখাদ হয়ে যায়। বল তুমি পারবে কিনা।

বৃদ্ধ ভটচাজ্জিমশায় এসে দাঁড়ালেন। বললেন, বাপধন, শাস্ত্রে বলেছে কলিতে সব একাকার হয়ে যাবে। বুড়োর কথা শোন। বয়স ঢের হয়েছে, অনেক কিছু দেখেছি। আরও হয়ত কিছু দেখার সময় হবে না, তবে বুঝতে পারছি স্রোতের সঙ্গে তাল রেখে আমাদের চলতে হবেই। সংস্কারমুক্ত হয়ে ঐ লক্ষ্মীকে হৃদয়লক্ষ্মী করে নাও। বুক ঠাণ্ডা হবে। আমি নিষ্ঠাবান জীবনযাপন করেছি চিরকাল, এখন বুঝতে পারি, বিশ্বের গতির সঙ্গে মানুষের গতি ঠিক রাখতে ওর পরিবর্ত্তন দরকার।

মধুসূদন কায়দাদুরস্ত ভাবে জবাব দেয়, এবার ঐ জ্ঞানবৃদ্ধের উপদেশের সম্মান দান করা প্রত্যেক মানুষের কর্ত্তব্য। তাঁর কথা অন্ধভাবে পালন করাই তোমার উচিত। আমিও তোমাকে ঐ অনুরোধ করছি—কি বলছ?

—আজ্ঞে এটা আশ্বিন মাস।

—অল্ রাইট! আর কয়েক সপ্তাহ পরেই অগ্রহায়ণ মাস সুড় সুড় করে এসে হাজির হবে।

আশে-পাশে মেয়েমহল হৈ-হৈ করে আনন্দধ্বনি করে ওঠে, হুলুধ্বনি দিতে থাকে কেউ কেউ। আগামী অগ্রহায়ণেই শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হবে ঠিক হয়ে গেল।

কাশীনাথ সন্ধ্যায় শীতলা দেবীর ক্যাম্পে চলেছিল। পাশের ক্যাম্পের একজন বধূ ফিক্ করে হেসে বললে, তেষ্টা পেয়েছে না কাশীনাথ বাবু? কাশীনাথ সলজ্জে হাসল। আজ দুই মাস ধরে প্রায় রোজই সে আসে এখানে। লোকে কিছু বললে বলে, এই এদিকে এসেছিলাম পিপাসা পেল তাই। একটা নীরব চোখের চোরা-চাহনীর মাদকতা, না এসে পারে না। শীতলা দেবীর সঙ্গে দীর্ঘ সময় গল্প করে। ডাগর চোখের গোপন দৃষ্টি সচকিত করে রাখে তাকে। পুলক-শিহরণ বয়ে যায় দেহে। বিমলের হাতখানা ধরে আর একখানা কোমল হাতের স্পর্শ খুঁজতে চায়। আজও তৃষ্ণার ছলে এসে দাঁড়াল। ক্যাম্পে কেউ নাই। ভিতরে যে ছিল, সরে গিয়ে আত্মগোপন করল। মনটা আনন্দে ভরে ওঠে কাশীনাথের। আজ একেবারে একা, কত কথা বলতে ইচ্ছা করে, আজ নিভৃতে আলাপ জমতে অসুবিধা হবে না। আর দশটা দিন, তার পরই···

দুই মিনিট, চার মিনিট, দশ মিনিট! কিন্তু অভিপ্সীত মূর্ত্তি জল নিয়ে এল না। মুখ বাড়িয়ে বললে, এত লজ্জা! একটু জলও পাব না? উঠে গিয়ে তাঁবুর মুখটাতে দাঁড়াল। মালতী কাঁপছে হাঁটুতে মুখটা গুঁজে। পুলকে নয়, কি একটা বেদনায় অব্যক্ত কম্পন।

—কই মুখ তোল তো দেখি।

চকিতে উঠে দাঁড়াল মালতী। কাশীনাথ চমকে উঠল। এতদিনের পরিচিত লজ্জারুণ মূর্ত্তি ত এ নয়! হিমশীতল কণ্ঠে মালতী বললে, আপনি আর আসবেন না এখানে। আমার আশা ছেড়ে দিন, আমার সঙ্গে আপনার বিয়ে হতে পারে না।

প্রত্যাখ্যাত পৌরুষে মুহূর্তে কাশীনাথের মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড রোষে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল সে।

—এই যদি তোমার মনে ছিল তবে এত ঠগবাজীর কি দরকার ছিল? আমি বুঝতে পারি নাই, তাই একটা ঘৃণিত মেয়েকে সীমাহীন দয়া দেখাতে গিয়েছিলাম। মালতী তাঁবুর কাপড় ধরে বসে পড়ল। উদ্দাম কান্নায় ভেঙে পড়ে বললে, আপনি চলে যান। যা খুসী বলুন, পারেন তো আমায় খুন করুন। আমি পারব না। আমি পারব না।

—সে তো বুঝলাম—কিন্তু কেন শুনতে পাই কি?

—অন্তের ছোঁয়া এই দেহ আপনাকে তুলে দিতে পারি না। আমি হিন্দুর মেয়ে—যে সংস্কার আমার বাপ-পিতামহের তাকে ত্যাগ করতে পারি না। আপনি মনে করবেন—আমি মরে গেছি।

—এই কি তোমার শেষ কথা?

—হাঁ, শেষ কথা—আমাকে ক্ষমা করবেন। বলে মালতী সামনে থেকে ছুটে পালাল।

শরৎকালের স্মৃতি

শ্রীকরুণাময় বসু

কত দিন ভাবি গেয়ে চলে যাব
　　শরৎকালের গান;
নবপল্লবে বনলক্ষ্মী কি
　　রেখে যাবে কিছু দান?
তরুণ অরুণ আলো ফুটে ওঠা ভোরে
সবুজ ভ্রমর ফিরেছে বনান্তরে;
পদ্মদীঘির নবীন কুঁড়ির
　　ভেসে আসে আঘ্রাণ;
কত দিন ভাবি গেয়ে চলে যাব
　　শরৎকালের গান।

কভু উজ্জ্বল, কভু ছলোছল
　　দিনগুলি যায় ভেসে,
মেঘের পাখায় রামধনু আঁকা,
　　চলেছে নিরুদ্দেশে।

বনের হারানো পথ বুঝি ডেকে যায়,
ঘর ছেড়ে আসা পথিক কে আছে আয়;
ছুটির বাঁশী কি বেজেছে বাতাসে
　　হাসির ললিত ছন্দে;
হাঁসের বলাকা ডানার মিছিল
　　মেলেছে শূন্যতলে।

চলে যায় দিন ছায়ায় নিলীন
　　শিউলি ঝরানো বনে;
গন্ধের স্মৃতি, কবেকার প্রীতি
　　ভেসে আসে অকারণে।
কুসুমলতায় জড়ানো পাতার ফাঁকে
পূর্ণিমা চাঁদ ছায়া আল্পনা আঁকে;
নারিকেল বনে চিকণ পাতায়
　　ঝিরি ঝিরি হাওয়া বয়;
প্রবাসী মানুষ কতকাল পরে
　　ঘরে ফেরে এ সময়।

শঙ্করের "মায়াবাদ" ও "উপাধিবাদ"

(২)

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

পূর্ব সংখ্যায় শঙ্কর কি ভাবে তাঁর ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য এবং বিভিন্ন উপনিষদ-ভাষ্যে তাঁর দর্শনের মূলীভূত মায়াবাদ প্রপঞ্চিত করেছেন, সে সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করা হয়েছে।

একই ভাবে, শ্রীমদ্‌ভাগবত গীতা-ভাষ্যেও শঙ্কর বহুস্থলে মায়াবাদ বিশদভাবে আলোচনা করেছেন (ভাষ্যোপক্রমণিকা ৪।৬, ৭।১৪ প্রভৃতি)। ভাষ্যোপক্রমণিকায় তিনি বলছেন—

"স চ ভগবান্ জ্ঞানৈশ্বর্য শক্তি-বল-বীর্য-তেজোভিঃ সদা সম্পন্নস্ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং স্বাং মায়াং মূলপ্রকৃতিং বশীকৃত্য অজোঽব্যয়ো ভূতানামীশ্বরো নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাবোঽপি সন্ স্বমায়য়া দেহবানিব জাত ইব চ লোকানুগ্রহং কুর্বন্নিব লক্ষ্যতে।" (গীতা, শঙ্কর-ভাষ্যোপক্রমণিকা)।

অর্থাৎ, সেই জ্ঞানৈশ্বর্য-শক্তি-বল-বীর্য-তেজসম্পন্ন ভগবান স্বীয় বৈষ্ণবী মায়া বা ত্রিগুণাত্মিকা মূল প্রকৃতিকে বশ করে', অজ, অব্যয়, ভূতগণের ঈশ্বর, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব হয়েও, যেন দেহবান হয়ে, যেন জাত হয়ে, যেন লোকানুগ্রহ করছেন বলে লক্ষিত হন।

এস্থলে শঙ্কর "ইব" ("যেন") শব্দটি তিনবার ব্যবহার করেছেন এই নির্দেশ করবার জন্য যে, ব্রহ্মের দেহধারণ, জন্মগ্রহণ ও লোকানুগ্রহসাধন কোনটিই বাস্তব সত্য বা পারমার্থিক তত্ত্ব নয়, তিনি সত্যই কোনটিই করছেন না, কেবল মনে হচ্ছে যেন তিনি এ সকল করছেন—অর্থাৎ, তাঁর দেহধারণ, জন্মগ্রহণ, লোকানুগ্রহসাধন সকলই মায়িক, মিথ্যা প্রতীতিই মাত্র।

গীতায় অন্যত্রও তিনি একই ভাবে বলেছেন—

"প্রকৃতিং স্বাং মম বৈষ্ণবীং মায়াং ত্রিগুণাত্মিকাং যস্যা বশে সর্বং জগদ্ বর্ততে, যয়া মোহিতং সৎ স্বমাত্মানং বাসুদেবং না জানাতি, তাং প্রকৃতিং স্বাম্ অধিষ্ঠায় বশীকৃত্য সম্ভবামি দেহবান্ ইব ভবামি জাত ইব আত্মমায়য়া, ন তু পরমার্থতো লোকবৎ।" (গীতাভাষ্য ৪।৬)

অর্থাৎ, সমগ্র জগৎ যে প্রকৃতির বশীভূত হয়ে আছে, যে প্রকৃতির দ্বারা মোহগ্রস্ত হয়ে জনগণ নিজেদের আত্মা বা পরব্রহ্মকে জানতে পারে না, সেই ত্রিগুণাত্মিকা, মায়াস্বরূপা প্রকৃতিকেই বশীভূত করে', আমি যেন দেহবান হয়ে, জন্মগ্রহণ করি, নিজের মায়ার মাধ্যমেই কেবল, পারমার্থিক দিক থেকে নয়।

এস্থলেও শঙ্কর "ইব" শব্দটি দু'বার ব্যবহার করেছেন।

এরূপে শঙ্করের মতে, মায়া উপাধিবিশিষ্ট অথবা মায়াশক্তি-বিশিষ্ট ঈশ্বরই ব্যবহারিক দিক থেকে জগৎ স্রষ্টা—সেজন্য জগৎ মায়িক বা মিথ্যাই মাত্র।

"মায়া"র সংজ্ঞা দান করে শঙ্কর বলছেন—

"অত্রোচ্যতে"। যদি বয়ং স্বতন্ত্রাং কাঞ্চিৎ প্রাগবস্থাং জগতঃ কারণত্বেনাভ্যুপগচ্ছেম, প্রসঞ্জয়েম তদা প্রধানকারণবাদম্। পরমেশ্বরাধীনা ত্বিয়মস্মাভিঃ প্রাগবস্থা জগতোঽভ্যুপগম্যতে, ন স্বতন্ত্রা। সা চাবশ্যমভ্যুপগন্তব্যা, অর্থবতী হি সা। ন হি তয়া বিনা পরমেশ্বরস্য স্রষ্টৃত্বং সিধ্যতি, শক্তিরহিতস্য তস্য প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। মুক্তানাঞ্চ পুনরনুৎপত্তিঃ, বিদ্যয়া তস্যা বীজশক্তের্দাহাৎ। অবিদ্যাত্মিকা হি সা বীজশক্তিরব্যক্ত-শব্দ-নির্দেশ্যা। পরমেশ্বরাশ্রয়া মায়াময়ী মহাসুষুপ্তিঃ, যস্যাং স্বরূপ-প্রতিবোধ-রহিতাঃ শেরতে সংসারিণো জীবাঃ।...অব্যক্তা হি সা মায়া, তত্ত্বান্যত্বনিরূপণস্যাশক্যত্বাৎ।" (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ১।৪।৩)।

অর্থাৎ, জগতের প্রাগবস্থা, যাকে সাংখ্যকারগণ প্রকৃতি, প্রধান, অব্যক্ত প্রভৃতি নামে অভিহিত করেন—তাই হ'ল "মায়া"। প্রভেদ এই যে, সাংখ্য প্রকৃতি স্বাধীনা, মায়া ঈশ্বরাধীনা। এরূপ মায়াকে স্বীকার করে নিতে হয়, কারণ তার একটি বিশেষ প্রয়োজন আছে। সেটি হ'ল এই যে, এই মায়া-শক্তি ব্যতীত ঈশ্বর সৃষ্টি করতে অক্ষম, তাঁর সৃষ্টি-প্রবৃত্তিও হয় না। বিদ্যার দ্বারা এই সংসার-বীজ-শক্তি দহন করতে সমর্থ হয়েছেন বলে, মুক্তদের পুনর্জন্ম নেই। এই সংসার-বীজ-শক্তি মায়া অবিদ্যাত্মিকা', এবং 'অব্যক্ত' নামে অভিহিতা। পরমেশ্বরাশ্রিতা এই মায়া মহাসুষুপ্তিতুল্যা—যার স্বরূপ উপলব্ধি না করে' সংসারী জীব মোহনিদ্রায় অভিভূত হয়ে থাকে। এই মায়া সৎও নয়, অসৎও নয়, কিন্তু অনির্বচনীয়া।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও "মায়া"কে "প্রকৃতি" বলা হয়েছে—

"মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্"।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৪.১০।

গীতাভাষ্যেও শঙ্কর মায়াকে বারংবার "প্রকৃতি" বলেছেন, যা উপরে বলা হয়েছে।
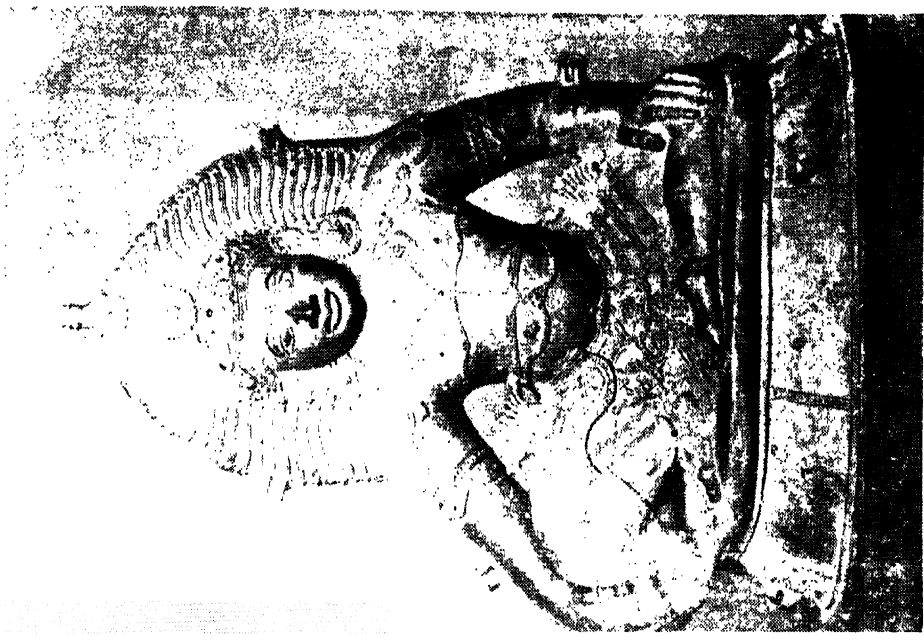
সেণ্ট পিটারের গীর্জায় মাইকেল এঞ্জেলো গঠিত 'করুণা' (মেরীমাতা)

ত্রিবেন্দ্রাম মিউজিয়মে রক্ষিত ব্রোঞ্জের বিষ্ণুমূর্ত্তি

ভিয়েৎনামের প্রেসিডেণ্ট মিঃ ঙো দিন দিয়েমের সহিত ভারতের প্রধানমন্ত্রী
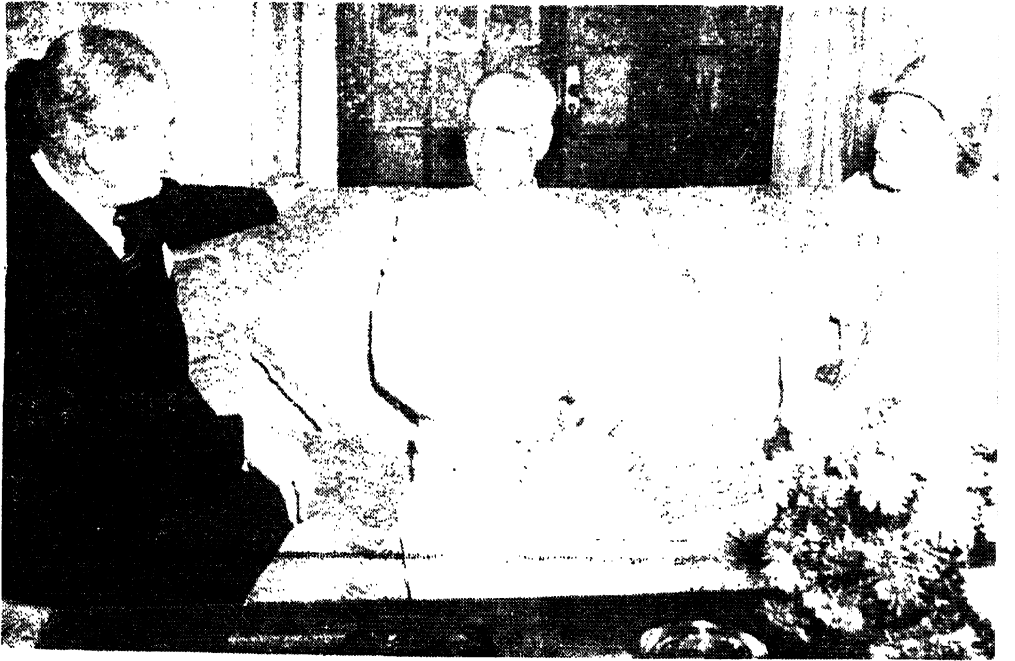
ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণণের সহিত আলাপ-রত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ হ্যারল্ড ম্যাকমিলান
এবং তদীয় পত্নী লেডী ডরোথী ম্যাকমিলান

বিশ্বপ্রপঞ্চের মায়াময়ত্ব ও মিথ্যাত্ব বোঝাবার জন্য শঙ্কর নানারূপ উদাহরণ দিয়েছেন। তাঁর প্রসিদ্ধতম গ্রন্থ ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে তিনি যে সকল উদাহরণ দিয়েছেন, তা হ'ল নিম্নলিখিত রূপ—

(১) রজ্জুসর্প।

"মায়ামাত্রং হ্যেতৎ পরমাত্মনোঽবস্থাত্রয়াত্মনাবভাসনং রজ্জ্বা ইব সর্পাদিভাবেনেতি।"

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ২।১।৯)।

রজ্জুসর্প ভ্রমকালে, রজ্জুতে সর্প-প্রতীতি যেরূপ মিথ্যা, সেরূপ পরমাত্মায় জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি-প্রমুখ অবস্থা-প্রতীতিও মায়ামাত্র।

(২) শুক্তি-রজত।

"সর্বথাপি তু অন্যস্যান্যধর্মাবভাসতাং ন ব্যভিচরতি। তথা চ লোকেঽনুভবঃ—শুক্তিকা রজতবদবভাসতে। একশ্চন্দ্রঃ সদ্বিতীয়বদিতি।" (অধ্যাস-ভাষ্য)।

অধ্যাসের অর্থ হ'ল, এক পদার্থে অন্য পদার্থের ও অন্য ধর্মের প্রতীতি। যেমন, শুক্তিতে রজতের প্রতীতি। এক চন্দ্র স্থলে দ্বিচন্দ্র প্রতীতি অধ্যাসমূলক, অবিদ্যাত্মক, মায়াময় ও মিথ্যা। একই ভাবে, ব্রহ্মেও সংসারের আরোপ মিথ্যা।

(৩) দ্বিচন্দ্র-জ্ঞান বা তিমির রোগগ্রস্ত কর্তৃক বহুচন্দ্র-দর্শন।

যেরূপ অঙ্গুলীরূপ উপাধির দ্বারা, অর্থাৎ, অঙ্গুলী দ্বারা চক্ষু চেপে ধরলে, একচন্দ্রও দ্বিচন্দ্র রূপে দৃষ্ট হয়, সেরূপ মায়ারূপ উপাধি দ্বারা এক ব্রহ্মও বহু রূপে প্রতিভাত হন।

(ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য ৪-১-১৫)

"ন হ্যবিদ্যা-কল্পিতেন রূপভেদেন সাবয়বং বস্তু সম্পদ্যতে। ন হি তিমিরোপহতনয়নেনানেক ইব চন্দ্রমা দৃশ্যমানোঽনেক এব ভবতি।"

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ২।১।২৭)

(তৈত্তিরীয়-ভাষ্য ৭-২)

অবিদ্যা-কল্পিত রূপভেদের দ্বারা ব্রহ্ম সাবয়ব হয়ে পড়েন না। যেমন, তিমিররোগগ্রস্ত ব্যক্তি একচন্দ্রকে বহুরূপে দর্শন করলেও চন্দ্র বহু হয়ে যায় না।

(৪) জল-সূর্য।

(৫) অঙ্গুলি-আলোক।

(৬) ঘট গমনে আকাশ-গমন।

"যথা প্রকাশঃ সৌর্যশ্চান্দ্রমসো বা বিয়দ্ব্যাপ্যাবতিষ্ঠমানোঽঙ্গুল্যাদ্যুপাধি-সম্বন্ধাৎ তেষৃজু-বক্রাদি-ভাবং প্রতিপদ্যমানেষু তত্তদ্ভাবমিব প্রতিপদ্যমানোঽপি ন পরমার্থতস্তত্তদ্ভাবং প্রতিপদ্যতে, যথা চাকাশো ঘটাদিষু গচ্ছৎসু গচ্ছন্নিব বিভাব্যমানোঽপি ন পরমার্থতো গচ্ছতি, যথা বা উদশরাবাদি-কম্পনাৎ তদ্গতে সূর্য-প্রতিবিম্বে কম্পমানেঽপি ন তদ্বান্ সূর্যঃ কম্পতে, এবমবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতে বুদ্ধ্যাদ্যুপাধ্যুপহিতে জীবাখ্যেঽংশে দুঃখায়মানেপি ন তদ্বানীশ্বরো দুঃখায়তে।"

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ২।৩।৪৬)

যেমন, সূর্যালোক বা চন্দ্রালোক সমস্ত আকাশব্যাপী হলেও অঙ্গুলি রূপ উপাধির যোগে, অর্থাৎ, অঙ্গুলির ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হবার কালে, স্বয়ংই ঋজু বক্রপ্রমুখ বিবিধ আকার ধারণ করেছে বলে প্রতীতি হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সত্যই তা করে না;

যেমন, ঘটাদির গমনে তন্মধ্যস্থিত আকাশও গমন করছে বলে প্রতীতি হয়, কিন্তু সত্যই তা করে না;

যেমন, জল প্রভৃতির কম্পনে জলস্থ সূর্য প্রতিবিম্বও কম্পিত হয়, কিন্তু সত্যই স্বয়ং সূর্য কম্পিত হয় না;

তেমনি অবিদ্যাপ্রসূত, বুদ্ধিপ্রমুখ উপাধিবিশিষ্ট জীবের দুঃখে ঈশ্বর দুঃখক্লিষ্ট হন না।

"আভাস এব চৈষ জীবঃ জলসূর্যকাদিবৎ প্রতিপত্তব্যঃ। ...আভাসস্য চাবিদ্যাকৃতত্বাৎ তদাশ্রয়স্য সংসারস্যাবিদ্যাকৃতত্বোপপত্তিরিতি।" (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ২।৩।৫০)।

জলে যেমন সূর্য প্রতিবিম্বিত হয়, জীবও তেমনি অবিদ্যায় পরমাত্মার প্রতিবিম্ব। এই প্রতিবিম্ব অবিদ্যামূলক বলে প্রতিবিম্বস্বরূপ সংসারও অবিদ্যামূলক।

অপর একস্থানেও এই দৃষ্টান্তটি ব্যাখ্যা করে শঙ্কর বলছেন যে, জল বৃদ্ধি বা হ্রাস প্রাপ্ত হলে, জলস্থ সূর্য-প্রতিবিম্বই কেবল বৃদ্ধি বা হ্রাস প্রাপ্ত হয়; জলের কম্পনে, জলস্থ সূর্য-প্রতিবিম্বই কেবল কম্পিত হয়; জলের ভেদে, জলস্থ সূর্য-প্রতিবিম্বই কেবল ভিন্ন বা বহু বলে বোধ হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, স্বয়ং সূর্য সেরূপ কিছুই হয় না, কেবল সূর্য-প্রতিবিম্বই জলধর্মানুযায়ী বা জলের হ্রাস, বৃদ্ধি, কম্পন, নানাত্ব প্রভৃতি গুণভাগী হয়, স্বয়ং সূর্য কদাপি নয়। একই ভাবে, পারমার্থিক দিক থেকে ব্রহ্ম অবিকৃত ও একরূপ, সৎ—কিন্তু, তিনি অবিদ্যারূপ উপাধিতে প্রতিফলিত হলে, সেই প্রতিবিম্ব বা জীবই কেবল উপাধির ধর্মসংস্পৃষ্ট হন, স্বয়ং ব্রহ্ম কদাপি নন।

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ৩.২.২০)

(৭) মৃগতৃষ্ণিকা।

"তস্মাদ্ যথা ঘটকরকাদ্যাকাশানাং মহাকাশানন্যত্বং, যথা চ মৃগতৃষ্ণিকোদকাদীনামূষরাদিভ্যোঽনন্যত্বং, দৃষ্টনষ্ট-

স্বরূপত্বাৎ, স্বরূপেণ ত্বনুপাখ্যত্বাৎ, এবমস্য ভোগ্য-ভোক্তৃত্বাদি-প্রপঞ্চজাতস্য ব্রহ্মব্যতিরেকেণাভাব ইতি দ্রষ্টব্যম্।"

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ২।১।১৪)

যেমন, ঘট প্রভৃতির মধ্যস্থিত আকাশ ও মহাকাশ এক ও অভিন্ন, যেমন মৃগতৃষ্ণিকা-দৃষ্ট মরুস্থান ও মরুভূমি এক ও অভিন্ন, তেমনি ব্রহ্ম ও বিশ্বপ্রপঞ্চও এক ও অভিন্ন—সংসার-ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত কোন বস্তু নয়।

(৮) সমুদ্র-তরঙ্গ।

"সমুদ্রাদুদকাত্মনোঽনন্যত্বেঽপি তদ্বিকারাণাং ফেনবীচি-তরঙ্গ-বুদ্বুদাদীনামিতরেতর-বিভাগ ইতরেতর-সংশ্লেষ-লক্ষণশ্চ ব্যবহার উপলভ্যতে।

অতঃ পরমকারণাৎ ব্রহ্মণোঽনন্যত্বেঽপ্যুপপন্নো ভোক্তৃ-ভোগ্য-লক্ষণো বিভাগঃ সমুদ্র-তরঙ্গাদিন্যায়েনেত্যুক্তম্।... অভ্যুপগম্য চেমং ব্যবহারিকং ভোক্তৃ-ভোগ্য-লক্ষণং বিভাগং 'স্যাল্লোকবৎ' ইতি পরিহারোঽভিহিতঃ, ন ত্বয়ং বিভাগঃ পর-মার্থতোঽস্তি।"

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ২।১।১৪-১৫)।

ব্যবহারিক দিক থেকে, ফেনা, বীচি, তরঙ্গ, বুদ্বুদ প্রভৃতি সমুদ্র-জলাত্মক হলেও পরস্পর ভিন্ন বলে গৃহীত হয়, এবং এই ভাবে ভোক্তৃ-ভোগ্য-বিভাগ রক্ষিত হয়। কিন্তু পারমার্থিক দিক থেকে ব্রহ্ম ও জীবজগৎ অভিন্ন, যেমন সমুদ্র ও ফেন-বীচি-তরঙ্গ-বুদ্বুদাদি অভিন্ন।

(৯) নদী-সমুদ্র।

"যথা লোকে নদ্যঃ স্বাশ্রয়মেব নামরূপং বিহায় সমুদ্রমুপ-যন্তি, এবং জীবোঽপি স্বাশ্রয়মেব নামরূপং বিহায় পরং পুরুষ-মুপৈতি।"

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ১-৪-২১)

যেমন নদী নিজস্ব নাম ও রূপ ত্যাগ করে সমুদ্রে বিলীন হয়, তেমনি জীব নিজস্ব নাম ও রূপ ত্যাগ করে পরমপুরুষে বিলীন হন।

"চৈবমাদীনি মুক্ত-স্বরূপ-নিরূপণ-পরাণি বাক্যান্যবিভাগ-মেব দর্শয়ন্তি নদী-সমুদ্রাদি-নিদর্শনানি চ"।

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ৪।৪।৪)

নদী যেমন সমুদ্রে পতিত হয়ে সমুদ্রেই নিঃশেষে বিলীন হয়ে যায়, সমুদ্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ এক ও অভিন্ন হয়ে যায়, তেমনি মুক্ত জীবও ব্রহ্মের সঙ্গে স্বীয় একত্ব ও অভিন্নত্ব উপলব্ধি করেন।

(১০) আকাশ-তলমলিনতা।

"অপ্রত্যক্ষেঽপি হ্যাকাশে বালাস্তল-মলিনতাদ্যধ্যস্যন্তি।"

(অধ্যাস-ভাষ্য)।

"অথাপ্যগৃহীতং শারীরস্য ব্রহ্মণৈকত্বং তদা মিথ্যাজ্ঞান-নিমিত্তঃ শারীরস্যোপভোগঃ; ন তেন পরমার্থরূপস্য ব্রহ্মণঃ সংস্পর্শঃ। ন হি বালৈস্তল-মলিনতাদিভির্ব্যোম্নি বিকল্প্যমানে তল-মলিনতাদি-বিশিষ্টমেব পরমার্থতো ব্যোম ভবতি।"

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ১।২।৮)

বালক বা অজ্ঞ ব্যক্তিরা অপ্রত্যক্ষ আকাশেও তল বা কটাহতলের গোলাকার ও মলিনতা বা নীলবর্ণ আরোপ করে থাকে।

ব্রহ্ম ও জীবের একত্ব যখন অজ্ঞাত থাকে, তখনই জীবের তাদৃশ মিথ্যা-জ্ঞানমূলক ভোগ থাকতে পারে। কিন্তু পরমার্থস্বরূপ ব্রহ্ম সেই ভোগ দ্বারা কদাপি স্পৃষ্ট হন না, যেমন, বালক বা অজ্ঞ ব্যক্তিরা আকাশে কটাহতলের গোলা-কার ও নীলবর্ণাদি আরোপ করলেও, আকাশ কদাপি গোলাকার ও নীলবর্ণ হয়ে পড়ে না।

(১১) দেবদত্ত-হস্তপাদ।

"ন চ বিশেষ-দর্শনমাত্রেণ বস্ত্বন্যত্বং ভবতি। ন হি দেব-দত্তঃ সঙ্কোচিত-হস্ত-পাদঃ প্রসারিত-হস্ত-পাদশ্চ বিশেষেণ দৃশ্য-মানেঽপি বস্ত্বন্যত্বং গচ্ছতি।"

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ২।১।১৮)

আকারগত ভেদ থাকলেই বস্তু ভিন্ন হয়ে যায় না। যেমন কোন সময়ে দেবদত্ত হস্তপদ সঙ্কুচিত করে রাখেন, কোন সময়ে প্রসারিত করেন, এবং এই ভাবে তাঁর দুই বিভিন্ন আকার বা রূপ হতে পারে। কিন্তু সেজন্য তিনি অন্য ব্যক্তি হয়ে যান না—সেই একই দেবদত্ত থাকেন। সমভাবে, ব্রহ্ম ও বিশ্বপ্রপঞ্চ আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন হলেও, প্রকৃতপক্ষে এক ও অভিন্ন।

(১১) নটবৎ।

"ন কারণাদন্যৎ কার্যং বর্ষশতেনাপি শক্যতে কল্পয়িতুম্। তথা চ মূল-কারণমেবান্ত্যাৎ কার্যাৎ তেন তেন কার্যকারেণ নটবৎ সর্বব্যবহারাস্পদত্বং প্রতিপদ্যতে।"

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ২।১।১৮)

কারণ ও কার্যকে শতবর্ষেও বিভিন্ন রূপে কল্পনা করা যায় না। সেজন্য একমাত্র মূল কারণই শেষ পর্যন্ত নানারূপ কার্যের আকার ধারণ করে' নটের ন্যায় লোকযাত্রা নির্বাহ করে। একজন নট বা অভিনেতা নানারূপ বেশভূষা ধারণ করে', নানা ব্যক্তির আকারে সজ্জিত হয়ে, দর্শকবৃন্দের সম্মুখে রাজা, মন্ত্রী, দাস প্রভৃতির অভিনয় করেন, এবং সেই সময়ের জন্য তাঁকে রাজা, মন্ত্রী, দাস প্রভৃতি বলে বোধ বা প্রতীতি হতে পারে সত্য। কিন্তু সেজন্য তিনি সত্যই রাজা, মন্ত্রী, দাস প্রভৃতি হয়ে যান না কোন দিনও, সর্বদাই সেই একই ব্যক্তি থাকেন। একই ভাবে, ব্যবহারিক দিক থেকে, মহা-মায়াবী ঈশ্বর জীবজগৎ রূপে প্রতিভাত হন; কিন্তু পার-

মার্থিক দিক থেকে এই সকল রূপ মিথ্যা, মায়ামাত্র; এবং ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু—যেমন নটের রাজা, মন্ত্রী, দাস প্রভৃতির রূপ মিথ্যা, একমাত্র স্বরূপই বা স্বসত্তাই সত্য।

(১৩) মায়াবি-মায়া।

"পরমেশ্বরস্ত্ববিদ্যা-কল্পিতাচ্ছরীরাৎ কর্তুর্ভোক্তুর্বিজ্ঞানাত্মাখ্যাদন্যঃ; যথা মায়াবিনশ্চর্ম-খড়্গাধরাৎ সূত্রেণাকাশমধিরোহতঃ স এব মায়াবী পরমার্থরূপো ভূমিষ্ঠোঽন্যঃ।"

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ১।১।১৭)

"উৎপন্নস্য জগতো নিয়ন্তৃত্বেন স্থিতি-কারণং, মায়াবীব মায়ায়াঃ।"

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ২।১।১)

যে অর্থে, খড়্গ-চর্মধারী, সূত্রমাত্র অবলম্বনে আকাশারোহণকারী মায়াবী, ভূতলস্থ প্রকৃত মায়াবী থেকে ভিন্ন, কেবল সেই অর্থেই কর্তা, ভোক্তা ও জ্ঞাত, অবিদ্যাকল্পিত জীব পরমেশ্বর থেকে ভিন্ন। অর্থাৎ, ব্যবহারিক দিক থেকে, দর্শকবৃন্দের দিক থেকে, আকাশবিহারী মায়াবী ও ভূতলস্থ মায়াবী ভিন্ন বলে বোধ হলেও, প্রকৃতপক্ষে আকাশবিহারী মায়াবী ও ভূতলস্থ মায়াবী এক ও অভিন্ন, অর্থাৎ, আকাশ-মায়াবী মিথ্যা প্রতীতিই মাত্র, ভূতলস্থ মায়াবীই একমাত্র সত্য। একই ভাবে, ব্যবহারিক দিক থেকে; বদ্ধ, সৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত জীব থেকে স্রষ্টা ও নিয়ন্তা ঈশ্বর ভিন্ন বলে বোধ হলেও, প্রকৃতপক্ষে, জীব ও ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন, অর্থাৎ, জীবজগৎ মিথ্যা প্রতীতিই মাত্র, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য।

(১৪) ঘটাকাশ-মহাকাশ।

"অত্রোচ্যতে—সত্যং নেশ্বরাদন্যঃ সংসারী, তথাপি দেহাদিসংঘাতোপাধি-সম্বন্ধ ইষ্যত এব, ঘটকরক-গিরিগুহাদ্যুপাধি-সম্বন্ধ ইব ব্যোম্নঃ। তৎকৃতশ্চ শব্দ-প্রত্যয়-ব্যবহারো লোকস্য দৃষ্টঃ: ঘটচ্ছিদ্রং করকচ্ছিদ্রমিত্যাদিরাকাশাব্যতিরেকেঽপি, তৎকৃতা চাকাশে ঘটাকাশাদি-ভেদ-মিথ্যা-বুদ্ধি-দৃষ্টা, তথেহাপি দেহাদি-সংঘাতোপাধি-সম্বন্ধ-বিবেক-কৃতেশ্বর-সংসারি-ভেদ-মিথ্যাবুদ্ধিঃ।"

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ১।১।৫)

"পরমেশ্বরস্ত্ববিদ্যা-কল্পিতাচ্ছরীরাৎ কর্তুর্ভোক্তুর্বিজ্ঞানাত্মাখ্যাদন্যঃ,...যথা ঘটাকাশাদ্যুপাধিপরিচ্ছিন্নাদনুপাধি-পরিচ্ছিন্ন আকাশোঽন্যঃ।"

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, ১।১।১৭)

"তস্মাদ্ যথা ঘট-করকাদ্যাকাশানাং মহাকাশাদনন্যত্বং ...এবমস্য ভোগ্য-ভোক্তৃত্বাদি-প্রপঞ্চজাতস্য ব্রহ্মব্যতিরেকেণাভাব ইতি দ্রষ্টব্যম্।" (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ২।১।১৪)

"বুদ্ধ্যাদ্যুপাধি-নিমিত্তং ত্বস্য প্রবিভাগ-প্রতিভানমাকাশস্যেব ঘটাদি-সম্বন্ধ-নিমিত্তম্।"

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ২।৩।১৭)

পারমার্থিক দিক থেকে ব্রহ্ম ও জীব ভিন্ন নন, কিন্তু ব্যবহারিক দিক থেকে, দেহাদি উপাধি দ্বারা তাঁরা ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হন। যেমন, প্রকৃতপক্ষে, আকাশ এক ও অভিন্ন, কিন্তু তা সত্ত্বেও, ঘট, করক বা জলপাত্র, গুহা প্রভৃতি উপাধি দ্বারা তা ভিন্নরূপে প্রতীত হয়। সেই জন্যই 'ঘট-ছিদ্র' 'জলপাত্র-ছিদ্র' প্রমুখ ভেদসূচক প্রত্যয় হয় এবং সেইরূপ শব্দ ব্যবহারও করা হয়। বাস্তবপক্ষে, ঘটের মধ্যস্থিত আকাশ, জলপাত্রের মধ্যস্থিত আকাশ, গুহার মধ্যস্থিত আকাশ ও বাহিরের মহাকাশ পরস্পর-ভিন্ন নয়—এক ও অভিন্ন। সেজন্য ঘট, জলপাত্র, গুহা প্রভৃতিকে ভেঙ্গে ফেলে দিলে, তাদের মধ্যবর্তী আকাশ মহাকাশে নিঃশেষে বিলীন হয়ে যাবে—ঘটাকাশ, করকাকাশ, গুহাকাশ ও মহাকাশে বিন্দুমাত্র প্রভেদ থাকবে না। তা সত্ত্বেও, যত দিন ঘট, করক, গুহাপ্রমুখ উপাধির অস্তিত্ব থাকবে, তত দিন ঘটাকাশ, করকাকাশ, গুহাকাশকে পরস্পর-ভিন্ন এবং মহাকাশ থেকেও ভিন্ন বলে ভ্রম বা মিথ্যা জ্ঞান হবে। একই ভাবে, দেহাদি উপাধির জন্যই চৈত্র, মৈত্র প্রমুখ জীবগণকে পরস্পর-ভিন্ন এবং ব্রহ্ম থেকেও ভিন্ন বলে ভ্রম বা মিথ্যা জ্ঞান হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, সকলেই সেই একই ব্রহ্ম—ব্রহ্মই একমাত্র সত্য।

(১৫) মৃত্তিকা-ঘট, সুবর্ণ-রুচক, অবনি-ভূতগ্রাম।

এই উদাহরণসমূহ পরিণামবাদসম্মত। কিন্তু তা সত্ত্বেও, শঙ্কর কিভাবে এইগুলির সাহায্যেও স্বীয় অদ্বৈতবাদ স্থাপন করেছেন তা পূর্ব সংখ্যায় বলা হয়েছে।

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ২।১।১)

(১৬) স্ফটিক-জপাকুসুম।

"ন হ্যুপাধি-যোগাদপ্যন্যাদৃশস্য বস্তুনোঽন্যাদৃশ-স্বভাবঃ সম্ভবতি। ন হি স্বচ্ছঃ সন্ স্ফটিকোঽলক্তকাদ্যুপাধি-যোগাদস্বচ্ছো ভবতি, ভ্রমমাত্রত্বাদস্বচ্ছতাভিনিবেশস্য। উপাধীনাঞ্চাবিদ্যা-প্রত্যুপস্থাপিতত্বাৎ।"

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ৩।২।১১)

"যথাশুদ্ধস্য স্ফটিকস্য স্বাচ্ছ্যং শ্লৌক্ল্যঞ্চ স্বরূপং প্রাগ্ বিবেকগ্রহণাদ্ রক্ত-নীলাদ্যুপাধিভিরবিবিক্তমিব ভবতি, প্রমাণজনিত-বিবেক-গ্রহণাত্তু পরাচীন-স্ফটিকঃ স্বাচ্ছ্যেন শ্লৌক্ল্যেন চ স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত ইত্যুচ্যতে।"

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ১.৩.১৯)

উপাধিযোগের নিমিত্ত এক প্রকার বস্তু অন্য প্রকার হয় না। যেমন, স্বচ্ছ স্ফটিকপাত্রে রক্তবর্ণ পুষ্প ন্যস্ত হলে সেই পাত্রটি অস্বচ্ছ রক্তবর্ণ হয়ে যায় না, যেহেতু তার রক্তবর্ণ-প্রত্যক্ষ ভ্রমই মাত্র, এবং উপাধিযোগ বা স্বচ্ছ স্ফটিকে রক্ত-বর্ণারোপ অবিদ্যামূলক।

যতদিন বিবেকজ্ঞান, অর্থাৎ বস্তুস্বরূপ ও বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে পরস্পর ভেদজ্ঞান না থাকে, ততদিন শুদ্ধ, স্বচ্ছ, শুভ্র স্ফটিককে তার উপরে ন্যস্ত রক্তবর্ণ, নীলবর্ণ পুষ্পের ন্যায়ই রক্তবর্ণ, নীলবর্ণ বলে বোধ হয়। এরূপ বিবেকজ্ঞান হলেই, স্ফটিকের স্বরূপজ্ঞান, তার শুদ্ধ, স্বচ্ছ, শুভ্র রূপটি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। একই ভাবে, দেহাদি উপাধির সঙ্গে আত্মার ভিন্নতা যখন উপলব্ধি করা হয়, তখনই আত্মার স্বরূপোপলব্ধিও হয়।

উপরের উদাহরণ ব্যতীত, শঙ্কর অন্যান্য স্থলে আরও কয়েকটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন। যথা:

(১৭) স্থাণু পুরুষ।

"ন হি রজত-সর্প-পুরুষ-মৃগতৃষ্ণিকাদি বিকল্পাঃ শুক্তিকা রজ্জু স্থাণুষরাদি-ব্যতিরেকেণ অবস্তাস্পদাঃ শক্যাঃ কল্পয়িতুম্।"

(মাণ্ডুক্যোপনিষদ-কারিকা ভাষ্য ১।৭, আগমপ্রকরণম্)

"যথা স্থাণৌ পুরুষনিশ্চয়ঃ ন চৈতাবতা পুরুষধর্মঃ স্থাণোর্ভবতি স্থাণুধর্মো বা পুরুষস্য, তথা ন চৈতন্যং ধর্মঃ দেহধর্মো বা চৈতন্যস্য।"

(গীতা-ভাষ্য, ১৩।২)

অধ্যাস-কালে, এক সত্য বস্তুকেই অপর এক বস্তু বলে ভ্রম করা হয়—অধ্যাস নিরধিষ্ঠান ভ্রম নয়। সেজন্য যেমন, শুক্তিকে রজত, রজ্জুকে সর্প, শুষ্ক বৃক্ষকে পুরুষ, মরুভূমিকে মৃগতৃষ্ণিকাদৃষ্ট মরূদ্যানরূপে ভ্রম করা হয়, তেমনি ব্রহ্মকেও জীবজগৎরূপে ভ্রম করা হয়।

তা সত্ত্বেও যেমন স্থাণু বা শুষ্ক বৃক্ষের ধর্ম পুরুষে এবং পুরুষের ধর্ম স্থাণুতে উপগত হয় না, তেমনি চৈতন্যের ধর্ম এবং দেহের ধর্ম চৈতন্যে উপগত হয় না।

(১৮) দর্পণ-ছায়া।

"ছায়ামাত্রেণ জীবরূপেণানুপ্রবিষ্টত্বাৎ দেবতা ন দৈহিকৈঃ স্বতঃ সুখ-দুঃখাদিভিঃ সংবধ্যতে। পুরুষাদিত্যাদয় আদর্শোদকাদিষু ছায়ামাত্রেণানুপ্রবিষ্টা—আদর্শোদকাদি দোষৈর্ন সংবধ্যন্তে, তদ্বৎ দেবতাপি।"

(ছান্দোগ্যোপনিষদ-ভাষ্য ৬।৩।২)

জীব ঈশ্বরের ছায়ামাত্র, সেজন্য তিনি জীবে প্রবেশ করেও জীবের সুখ-দুঃখভাগী হন না, যেমন দর্পণে প্রতিবিম্বিত ছায়া বা জলে প্রতিবিম্বিত ছায়া দ্বারা পুরুষ বা সূর্য দর্পণ বা জলের দোষে দূষিত হয় না।

(১৯) অলাতচক্র।

"যথা হি লোকে ঋজু বক্রাদি প্রকারাভাসম্ অলাত-স্পন্দিতম্ উল্কাচলনম, তথা গ্রহণ-গ্রাহকাভাসং বিষয়িবিষয়াভাসম্ ইত্যর্থঃ।"

(মাণ্ডুক্যোপনিষদকারিকা-ভাষ্য ৪।৪৭)

একটি জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ডকে স্পন্দিত বা বিবর্তিত করলে তা যেমন সরল, বক্রপ্রমুখ নানা আকারে প্রতিভাত হয়, তেমনি বিজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মও গ্রহণ-গ্রাহক, বিষয়ি-বিষয় প্রভৃতি রূপে প্রতিভাত হন। অর্থাৎ, একটি জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ডকে দ্রুতভাবে বিবর্তিত করলে, একটি অগ্নিময় চক্র প্রত্যক্ষ করা যায় যদিও কোন চক্র সেস্থলে নেই। সেজন্য চক্রটি মিথ্যা প্রতীতিই মাত্র। একই ভাবে, ব্রহ্মে ভেদ দর্শনও মিথ্যাপ্রতীতি।

(২০) গন্ধর্ব-নগর।

"যথা চ প্রসারিত-পণ্যাপণগৃহ-প্রাসাদ-স্ত্রীপুংজনপদ ব্যবহারাকীর্ণমিব গন্ধর্বনগরং দৃশ্যমানমেব সৎ অকস্মাদভাবতাং গতং দৃষ্টম, যথা চ স্বপ্ন-মায়ে রূপে অসদ্রূপে, তথা, বিশ্বমিদং দ্বৈতং সমস্তমসদ্দৃষ্টম।"

(মাণ্ডুক্যোপনিষদকারিকা-ভাষ্য ২।৩১)

যেমন প্রসারিত, পরিপূর্ণ গন্ধর্ব-নগর, প্রত্যক্ষগোচর হয়েও অকস্মাৎ অন্তর্ধান করে বলে অসৎ, তেমনি, স্বপ্ন ও মায়ার ন্যায়, বিশ্বপ্রপঞ্চও সমগ্র ভাবে অসৎ।

এস্থলে "অসৎ" শব্দটি সাধারণ অর্থে গ্রহণ করা হয় নি, কারণ সেই অর্থে বিশ্বপ্রপঞ্চ অসৎও নয়, সৎও নয়। পুনরায় বিশ্বপ্রপঞ্চ স্বপ্ন বা মায়াও নয়।

(২১) তটস্থ পর্বতবৃক্ষাদির গতি-দর্শন।

"নৌস্থস্য নাবি গচ্ছন্ত্যাং তটস্থেষু অগতিষু নগেষু প্রতিকূল গতিদর্শনাৎ দূরেষু চক্ষুষা অসন্নিকৃষ্টেষু গচ্ছৎসু গত্যভাবদর্শনাৎ। এবমিহাপি অকর্মণি অহং করোমীতি কর্মদর্শনং, কর্মণি চ অকর্মদর্শনং বিপরীতদর্শনম।"

(গীতাভাষ্য ৪-১৮)

যেরূপ নৌকাস্থ ব্যক্তি, নৌকা চলতে থাকলে, তটস্থ বা নিকটস্থ গতিবিহীন পর্বত-বৃক্ষাদিকেও গতিশীল, এবং দূরস্থ, চক্ষুর অসন্নিকৃষ্ট গতিশীল বস্তুকেও গতিবিহীন বলে দর্শন করেন, সেরূপ অজ্ঞ ব্যক্তিও অকর্মে বা আত্মায় কর্ম বা প্রপঞ্চ, এবং কর্মে বা প্রপঞ্চে অকর্ম বা আত্মা দর্শন করেন। এরই নাম হ'ল 'বিপরীত দর্শন।' কিন্তু গতিবিহীন পর্বত-বৃক্ষাদিতে গতি দৃষ্ট হলেও, তত্ত্বজ্ঞানীর গতিজ্ঞান হয় না, গতির অভাবজ্ঞানই হয়।

(২২) চন্দন-জল।

"যথা চন্দনাগর্বাদেরুদকাদি-সম্বন্ধজ-ক্লেদাদিজমৌপধিকং দৌর্গন্ধ্যং তৎস্বরূপ-নির্ঘর্ষণেন আচ্ছাদ্যতে স্বেন পারমার্থিকেন গন্ধেন, তদ্বদেব হি স্বাত্মন্যধ্যস্তং স্বাভাবিকং কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি লক্ষণং জগৎ—দ্বৈতরূপং জগত্যাং পৃথিব্যাং, জগত্যামিত্যুপ-লক্ষণার্থত্বাৎ সর্বমেব নামরূপ কর্মাখ্যং বিকারজাতং পরমার্থ-সত্যাত্ম-ভাবনয়া ত্যক্তং স্যাৎ।"

(ঈশোপনিষদ্-ভাষ্য ১)।

অর্থাৎ, যেরূপ চন্দন, অগুরু প্রমুখ গন্ধদ্রব্য জলাদির সংস্পর্শে ক্লেদযুক্ত হয়ে দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু ঘর্ষণ করলেই তাদের স্বভাবসিদ্ধ সুগন্ধ প্রকাশিত হয় এবং দুর্গন্ধ দূর হয়ে যায়—সেরূপ স্বাভাবিক কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদিবিশিষ্ট, বিভিন্ন নামরূপ ও ক্রিয়াবিশিষ্ট জগৎ আত্মায় অধ্যস্ত হলে, আত্মাকেও দ্বৈত বা জগৎকেও সত্য বলে বোধ হয়, কিন্তু সত্য অদ্বৈতজ্ঞান দ্বারা সেই মিথ্যা দ্বৈতবোধ বা জগতের সত্যতা-ভ্রম দূর হয়ে যায়।

বৃহদারণ্যকোপনিষদ-ভাষ্যেও একইভাবে শঙ্কর রজ্জু-সর্প, শুক্তি-রজত, সলিল-ফেন, গগন মলিনতা প্রভৃতির এবং সেই সঙ্গে পরিণামবাদসম্মত মৃত্তিকা ঘটেরও দৃষ্টান্ত দিয়েছেন (যথা বৃহদারণ্যকোপনিষদ্-ভাষ্য ৩।৫।১)। এ সম্বন্ধে, পূর্বেই বলা হয়েছে।

ছান্দোগ্যোপনিষদ্-ভাষ্যেও শঙ্কর রজ্জু-সর্প, শুক্তি-রজত, গগন-মলিনতা প্রভৃতির উদাহরণ দিয়েছেন (যথা, ছান্দোগ্যোপনিষদ-ভাষ্য ৮।১২।১)। এসম্বন্ধেও পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

রজ্জু-সর্পের দৃষ্টান্ত পৃথক্ ভাবে অন্যান্য বহু স্থলে দিয়ে শঙ্কর বলছেন—

"নিরবয়বস্য সতঃ কথং বিকার-সংস্থানমুপপদ্যতে ? নৈষ দোষঃ, রজ্জ্বাদ্যবয়বেভ্যঃ সর্পাদি-সংস্থানবৎ। বুদ্ধিপরি-কল্পিতেভ্যঃ সদবয়বেভ্যো বিকার-সংস্থানোপপত্তেঃ।"

(ছান্দোগ্যোপনিষদ্-ভাষ্য ৬।২।২)

"রজ্জ্বামিব সর্পাদি-বিকল্পজাতমধ্যস্তম্ অবিদ্যয়া, তদস্য জগতো মূলম্।"

(ছান্দোগ্যোপনিষদ-ভাষ্য ৬।৮।৪)

নিরবয়ব সত্য বস্তুর বিকার সম্ভব হয় কিরূপে ?—এই প্রশ্নের উত্তরে শঙ্কর বলছেন যে, রজ্জুর অবয়ব থেকে যেমন মিথ্যা সর্পরূপ বিকার উৎপন্ন হয়েছে বলে ভ্রান্তি বা মিথ্যা প্রতীতি হয়, তেমনি অবিদ্যা-পরিকল্পিত সৎ বস্তুর অবয়ব থেকেও যেন সংসাররূপ বিকার উৎপন্ন হয়েছে বলে ভ্রান্তি বা মিথ্যা প্রতীতি হয়। সেজন্য, অবিদ্যামূলক সংসার রজ্জু-সর্প ভ্রমকালে দৃষ্ট সর্পেরই ন্যায় অলীক বা মিথ্যা।

ছান্দোগ্যোপনিষদ-ভাষ্যেও, শঙ্কর নদী-সমুদ্র (৬।১০।১), সমুদ্র-তরঙ্গ (৬।১০।১), জল-সূর্য (৬।৮।১), রজ্জু-সর্প (৮।১২।১) প্রভৃতির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। নদী-সমুদ্র-প্রসঙ্গে তিনি অতি সুন্দরভাবে বলেছেন যে, সৃষ্টির পূর্বে নদী-সমুদ্রই ছিল—পরে সমুদ্রের জল সূর্য-কিরণে বাষ্প হয়ে মেঘের আকার ধারণ করে এবং সেই মেঘ থেকে বৃষ্টি পতিত হয়ে তথাকথিত স্বতন্ত্র নদীর সৃষ্টি করে। তারও পরে পরিশেষে সেই নদীই পুনরায় সমুদ্রে পতিত হয়ে "সমুদ্র এব ভবতি", সমুদ্র হয়ে যায়। এরূপে নদী চিরকালই সমুদ্রই মাত্র—সমুদ্র থেকে ভিন্ন বস্তু নয়। একই ভাবে, জীবও চিরকালই ব্রহ্ম—ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন বস্তু নয় (৬।১০।১)।

মাণ্ডুক্যোপনিষদ-কারিকায় শঙ্কর বহুস্থলে তাঁর প্রিয় রজ্জু-সর্প (১।৬, ১।৭, ১।৯, ১।১০, ১।১৪, ১।১৭, ২।১৬, ২।১৮, ৩।১৯ ইত্যাদি), শুক্তি-রজত (১।১৭), মৃগতৃষ্ণিকা (১।৬, ১।১৭, ২।৬), ঘটাকাশ-মহাকাশ (৩।৩), আকাশ-তল-মলিনতা (৩।৮), বহুচন্দ্রদর্শন (৩।১৯), মায়াবী (১।৭, ১।১৭, ১।২৭, ৩।২৩), জলসূর্য (১।৬) প্রভৃতির উদাহরণ দিয়েছেন।

গীতা-ভাষ্যেও শঙ্কর শুক্তি-রজত (১৮।১৭), মৃগতৃষ্ণিকা (৫।৮-৯), আকাশ-তলমলিনতা (১৮।১৭) প্রভৃতি নানাবিধ উদাহরণের সাহায্যে স্বীয় মায়াবাদ প্রপঞ্চিত করেছেন।

এই ভাবে, শঙ্কর তাঁর অপূর্ব মনীষাবলে, কেবল যে, নিগূঢ়তম দার্শনিক তত্ত্ব প্রপঞ্চিতই করেছেন, তাই নয়—সেই সঙ্গে সঙ্গে, বহু সাধারণ দৃষ্টান্তের সাহায্যে সেই সুকঠিন তত্ত্বকেও সুগম করে তুলবার প্রয়াস করেছেন প্রতি ক্ষেত্রে।
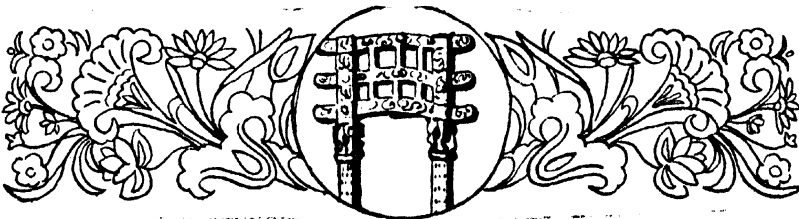
উৎসবের শেষে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

সম্প্রতি আমরা পর পর তিনটি বিশেষ দিন উদযাপন করেছি—নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন, সরস্বতী পূজা এবং সাধারণতন্ত্র দিবস; আমাদের জাতীয় জীবনে এই তিনটি দিনই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই তিনটি দিনেই আমরা নূতন সঙ্কল্প গ্রহণ করি।

সুভাষচন্দ্র ছিলেন সমগ্র ভারতের; তাঁর আসন আজও সমস্ত জনসাধারণের মধ্যে, কিন্তু তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে যে সকল সভাসমিতি হয়, সে সব দেখে মনে হয় সুভাষচন্দ্র যেন বিশেষ এক 'পার্টি'র প্রতিভূ। আমাদের মধ্যে অনৈক্য এমনই ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে যে, সেই বিরাট ব্যক্তি পুরুষের জন্মোৎসব উপলক্ষেও আমরা সমগ্র জাতির সম্মিলিত শ্রদ্ধা তাঁকে জানাতে পারি না। অথচ তিনিই একদিন একাই দাঁড়িয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধীর আকাশস্পর্শী ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে আর তাঁকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছিল এক সংগ্রামী জনমত। আজকের বাংলা দেশে সুভাষচন্দ্রের নিঃস্বার্থ আদর্শবাদ গ্রহণের এবং প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন আছে। বাংলা দেশে আজ কংগ্রেসই হোক বা বিরোধী কোন 'পার্টি'ই হোক, উভয়ের মধ্যেই চলেছে অন্তর্দ্বন্দ্ব; নেতৃত্ব নিয়ে চলছে লজ্জাকর রেষারেষি। ভেতরের এই অনৈক্যের সুযোগে বাংলা দেশকে ভারতবর্ষের বৃহত্তর রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে হটিয়ে দেবার চেষ্টা অনেক দিন থেকেই হচ্ছে। সর্বভারতীয় নেতৃত্বে বাংলার বর্তমান দৈন্যদশা একদা কল্পনাতীত ছিল। সভাসমিতি, শোভাযাত্রা, হৈ হুল্লোড়ের মধ্যে নেতাজীকে স্মরণ করাটাই আজ আমাদের মধ্যে মুখ্য হয়ে উঠেছে, কিন্তু তাঁর মহান আদর্শ এবং কর্মপন্থা অনুসরণের চেষ্টা নেতাদের বা বক্তাদের মধ্যেও দেখি না, শ্রোতাদের মধ্যেও দেখি না। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে সভাপতি আদর্শের ফাঁকা বুলি উচ্চারণ করে গেলেন, কিন্তু তাঁর আচরণে আদর্শের কণামাত্র রূপায়ণ দেখা যায় না। অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে যে, "ট্রেজ" ও "গ্রীণরুমে"র সঙ্গে তুলনা করা যায়। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিকের আজ দরকার আমাদের বর্তমান অস্বস্তিকর আবহাওয়া দূর করতে। সুভাষচন্দ্র দেশপ্রেমের যে জলন্ত আদর্শ রেখে গেছেন, তাঁর জন্মদিনে তা অনুসরণ করার কঠোর সঙ্কল্প নিলেই এবং সেই সঙ্কল্প অনুযায়ী কাজ করলেই তাঁকে সমুচিত শ্রদ্ধা জানানো হয়। আজ একটু আত্মানুসন্ধানের ফলেই আমরা অনুভব করতে পারি আমরা কাজে, কর্মে, ভাবনা, চিন্তায় কত পঙ্গু, কত হীন হয়ে পড়েছি; সরকারী শাসনের চাপে আমরা রুদ্ধশ্বাস; আজ এমন কোন নেতা, এমন কোন আদর্শ নেই যাকে অনুসরণ বা অবলম্বন করে আমরা এই অন্ধকার ঠেলে আলোর সম্মুখীন হতে পারি। সুভাষচন্দ্রের অগ্নিময় জীবনের কথা মনেপ্রাণে স্মরণ করে আমরা হয় ত ফিরে পেতে পারি আমাদের হারানো প্রতিষ্ঠা। সুতরাং কেবল বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ উৎসব সমারোহ না করে আরও গভীর ভাবে আমাদের পালন করতে হবে সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন; বর্তমান প্রচলিত ও আচরিত হুজুগসর্বস্ব প্রথা পরিত্যাগ না করলে ভবিষ্যতে নেতাজীর নাম ইতিহাসের পাতায় থাকবে না, থাকবে না জাতির দৈনন্দিন জীবনে।

নেতাজী জন্মোৎসবের আনন্দের রেশ ও লেশ মিলিয়ে যেতে না যেতেই বেজে উঠল কাঁসর, ঘণ্টা সংস্কৃতি আর শিক্ষার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর আহ্বানে। আজকাল সরস্বতী পূজা পার্কে পার্কে, পথে পথে সর্বত্র অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বর্তমানে কেবলমাত্র ছাত্রসমাজের মধ্যেই আবদ্ধ নেই এই পূজা। সবার মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে সরস্বতীর আরাধনা। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েও মায়ের পূজা করা হচ্ছে। শিক্ষার মান যত নেমে যাচ্ছে, শিক্ষার্থীর নিষ্ঠা যত নিম্নাভিমুখী হচ্ছে পূজার সংখ্যা এবং তার আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানও ততই বেড়ে যাচ্ছে, শ্রদ্ধাসিক্ত অঞ্জলিদান আজ মুখ্য নয়, উৎসবটাই মুখ্য। এই বিষয়ে প্রতিযোগিতাও চলছে। সরস্বতীর পূজা ত ছাত্রদের প্রতিদিনের পড়াশোনার মধ্যেই হয়ে থাকে, অন্ততঃ তাই হওয়া উচিত। কিন্তু আজকাল খেলাধুলো, উৎসব সমারোহ, দিবস পালন ইত্যাদির মধ্যে সময় এমন ভাবে বণ্টন করে দেওয়া হয় যে, পড়াশোনার জন্যে নিরবচ্ছিন্ন অধিক সময় পাওয়া দুষ্কর। আচার ব্যবহারে ছাত্ররা এতটা অবিনয়ী এবং অনিয়মিত হয়ে উঠেছে, মনে হয় সংস্কৃতিকে এরা নিজেরা নতুন অর্থ দান করেছে অথচ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের হট্টগোলে এদের অনেকের রজনী ভোর হয়ে আসে। শিক্ষার্থীর কথার মধ্যেই মনে এসে যায় শিক্ষা সমস্যার কথা। দেশের প্রয়োজনে যুগোপযোগী শিক্ষার দরকার, এটা অবশ্যস্বীকার্য, কিন্তু সরকার এমন ত্বরিৎগতিতে

হুগলী জেলার আঁটপুর গ্রামে নব প্রতিষ্ঠিত "অঘোর কামিনী" প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়

সংস্কারে ব্রতী হয়েছেন, মনে হয়, রাতারাতি পরিবর্তন সাধন না করলে দেশের সমূহ সর্বনাশ। শিক্ষার উপরই আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ প্রধানতঃ নির্ভর করছে; সুতরাং শিক্ষার ক্ষেত্রে সুস্থির চিন্তা এবং শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যার অবধান করে তার পর কাজে অগ্রসর হওয়া দরকার। আর এই অগ্রসর ধাপে ধাপে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। শিক্ষক, শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষাবিদ্‌গণের ক্ষোভ এই যে, সরকার শিক্ষা সংস্কার করছেন তাঁদের বাদ দিয়ে; ফলে এক দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছে এবং এই দ্বন্দ্ব শিক্ষার ক্ষেত্রকে পঙ্কিল করে তুলছে; আর মাঝখান থেকে শিক্ষা ও শিক্ষকের প্রতি ছাত্রদের শ্রদ্ধা কমে আসছে। কবে সেদিন আসবে কে জানে—যেদিন উপযুক্ত পরিবেশে ছাত্র শিক্ষা লাভ করে সরস্বতীর সার্থক সেবক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলবে।

মা সরস্বতীর বিসর্জনের বাজনা শেষ হতেই ২৬শে জানুয়ারীর আবির্ভাব ঘটল। ১৯৫০ সনে এই দিনে আমাদের সংবিধান চালু হয়েছিল; আর বিশ্ব রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে ভারতবর্ষ প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল, আর তারও অনেক আগে ১৯২৯ সনে লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল এই দিনে। তাই ২৬শে জানুয়ারী আমাদের জীবনে বিশেষগুরুত্বপূর্ণ দিন। উৎসব আনন্দের মধ্যে এই দিন উদ্‌যাপিত হয়, বাণী আর বক্তৃতার ছড়াছড়ি লেগে যায়। এবারেও ২৬শে জানুয়ারীর পূর্ব সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি বক্তৃতা করেন। তার মূল কথা ছিল আরও কৃচ্ছ্রসাধন কর। দেশের উন্নতিতে তোমাকে প্রচণ্ডতম কষ্ট স্বীকার করতে হবে; কিন্তু ফলশ্রুতির কোন রকম আশা করবে না। জনসাধারণের কৃচ্ছ্রসাধন যে শেষ সীমায় পৌঁচেছে সেটা সম্ভবতঃ রাষ্ট্রপতির কর্ণে প্রবেশ করে না। তাঁর কৃচ্ছ্রসাধনের উপদেশ আমরা সাধারণ মানুষ যত মেনে চলি তার অল্পমাত্র যদি বর্তমান ক্ষমতাসীনেরা মেনে চলতেন, তবে আমাদের কষ্টের ভার হয় ত লাঘব হ'ত; কিন্তু যখন দেখি ৬৩ হাতীর শোভাযাত্রার পুরোভাগে চলেছেন কংগ্রেস সভাপতি, যখন ছবি দেখি হাজার হাজার প্রস্ফুটিত ফুলের টব সমাকীর্ণ জায়গায় তাঁর বাসস্থানের ব্যবস্থা, তখনই স্বতঃই স্মরণে আসে আমাদের জাতীয় ভাগ্যের দুর্দশার কথা। একদিকে চলেছে অর্থের হিসাবহীন অপব্যয়, অন্যদিকে অর্থের নিদারুণ অভাবে অনশনে, অর্দ্ধাশনে দিন কাটাচ্ছে বহু লোক। সরকারী ভাবগতিক দেখে মনে হয়, দেশগড়ার জন্যে সমস্ত কষ্ট স্বীকারের দায় সাধারণ মানুষের, আর সমৃদ্ধির আস্বাদ গ্রহণ করবে মুষ্টিমেয় কয়েক জন ভাগ্যবান। দুর্নীতি এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে যে, শাসনযন্ত্র বিকল হয়ে গেছে। কে কার দোষ দেখবে? কর্মের যে উপযুক্ত, সুপারিশের অভাবে সে পায় না কাজ,

আর অক্ষম চাটুকার মোসাহেবী করে উচ্চপদে আসীন ; এ দৃষ্টান্ত আজ বিরল নয়। সুতরাং বিশেষ দিনে উপদেশ বর্ষণ করে লাভ নেই কোন ; রাষ্ট্রের কর্ণধারদের মায়া মমতা ত্যাগ করে সুশাসনের প্রবর্তন করতে হবে, তাতে হয় ত তাঁদের প্রিয়পাত্রদের ওপর নির্মম হতে হবে। কিন্তু ফলস্বরূপ তাঁরা সমস্ত জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন পাবেন ; দেশ কয়েকজন চাটুকার বা স্তাবকের নয়, দেশ সাধারণ মানুষের, তাদের সন্তুষ্টিই দেশের শান্তি এবং সমৃদ্ধি।

সুতরাং বিশেষ দিনগুলো কেবল বাহিক অনুষ্ঠানের মধ্যে উদযাপন না করে তাদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে অনুধাবন করে সেই পথে চলা উচিত।

পাখী

শ্রীমিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়

পূর্ব্বে টেরডাক্টিলের বিষয় যা বলা হয়েছে তাতে অনেকের মনে হবে যে, ডাইনসর গোষ্ঠির এই খেচরকুল আধুনিক পক্ষীর পূর্ব্বপুরুষ,—তা মোটেই নয়। ওদের বিবর্ত্তন অন্য ধারায় ; বিশেষ সম্বন্ধ নেই পাখীদের সঙ্গে, তবে সরীসৃপই যে পাখীদের পূর্ব্বপুরুষ এতে কোন সন্দেহ নেই। সরীসৃপ আঁশের জন্য প্রসিদ্ধ, পাখীর কান ও আঙুলে আঁশের চিহ্ন আজও আছে ; এলবেট্রস পাখীর চঞ্চু ঠিক সরীসৃপের ন্যায় জটিল, আলাদা আলাদা অস্থি দ্বারা নির্ম্মিত। পাখীর চক্ষুর চারিপাশে যে অস্থি গোলকের মালা অধুনালুপ্ত সরীসৃপ দেহে তার সুস্পষ্ট নিদর্শন। পক্ষী ও সরীসৃপ উভয়েরই বৃদ্ধির গতি ও প্রকৃতি সমান, কুমীরের ডিমের পরিস্ফুরণের সঙ্গে হংস ডিম্ব অথবা কাছিম ডিমের সঙ্গে পারাবত ডিম্বের তুলনা করলে এ তথ্য বেশ প্রকট হয়।

ভূতল পরিত্যাগ করে গগনবিহারী হওয়ার কারণ পূর্ব্বে বর্ণনা করা হয়েছে। বায়ুস্তরে আশ্রয় গ্রহণ করে লাভবান হয়েছিল নিশ্চয়ই, তাই জীবকুলের একটা বৃহৎ অংশ উর্দ্ধগামী। দৌড়বাজ যারা, তাদের পদাঙ্গুল প্রায় সমান, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ একটু ছোট হয়ে যায় এবং কনিষ্ঠা বড়। শক্তিশালী পদের অধিকারীরা সাধারণতঃ সামনের দিকে ভর দিয়ে দৌড়ায় এবং শেষের দিকে অনেক সময় লাফিয়ে উত্তীর্ণ হয়। দৌড়বার সময় হস্তদ্বয় শিকার ধরবার সুবিধার জন্য প্রায়শঃ ওপর দিকে থাকে, অর্দ্ধবৃত্তাকারে ঘুরে যায় লাফাবার সময়—এ হ'ল শূন্যে ভর দিয়ে চলবার গোড়ার কথা। তারপর নরম চর্ম্মের ঝিল্লি প্রস্তুত হতে অনেক দেরী হয় নি। এর পরের ধাপে উদ্ভব হয়েছিল ডানাওয়ালা হোত, অর্থাৎ আঙুলগুলি সব ঝিল্লি দিয়ে জুড়ে বাহুর নীচের দিক পর্য্যন্ত প্রসারিত হচ্ছিল। দৌড়বার সময় ও লাফিয়ে চলবার সময় এই ডানাওয়ালা হাতের উপর ভর দিয়ে শরীরের ভারসাম্য রক্ষা হইত ; পিছনের অংশকে ধারণ করে থাকত দেহের চেয়ে দীর্ঘ হালের মত লেজ। লাফিয়ে দূর অতিক্রমকালে ঝাপটা মারার প্রয়োজন, এক বৃক্ষ হতে অন্য বৃক্ষে যেতে হলে খানিকটা ধীরে বায়ু প্রবাহে ভেসে (গ্লাইডিং) যাওয়া দরকার : এই প্রণালীতে কালক্রমে (বাদুড় চামচিকের মত) কোমল-ত্বকঝিল্লিতে আবরিত হয়েছিল হস্ত এবং ক্রমশঃ পালক দেখা দিয়েছিল ডানায়। এরূপ পাখী আধুনিক বিহংগকুলের আদিপুরুষ নাম দেওয়া হয়েছে আর্কিওটেরিক্স। এরা কোনক্রমে আকাশে উঠত, যতক্ষণ আকাশে থাকত পাখসাট মারতে হত। উড়বার সময় এরোপ্লেনের মত ভূমিতে খানিকটা গতিবেগ সঞ্চয় করে নিয়ে আকাশে ভ্রমণ ; অবতরণও তেমনি, যথেচ্ছা নামা সম্ভব ছিল না, বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে নামতে হত। না পারত আধুনিক পাখীদের মত বৃত্তাকারে ঘুরতে, না পারত বেগ ইচ্ছামত কমাতে বাড়াতে। আকাশে কিছুকাল বিচরণ করবার পর ক্রমোন্নতি হলো। বারংবার উল্লম্ফনে পশ্চাদভাগ ও সম্মুখভাগের দূরত্ব গিয়েছে কমে এবং বায়ুচাপে বাহুর পুরোভাগ চেপ্টা চওড়া, লেজের দুই পাশে আঁশের স্থায় লম্বা লঘু রোমের সূত্রপাত। বায়ুর সঙ্গে অবিরল সংঘর্ষে আঁশে ক্ষয়ক্ষতি প্রচুর, শেষে অনুভূতিহীন অসাড় লম্বা পালকের আভাস। প্রতিনিয়ত অভ্যাসে ডানার পাশ দিয়ে লেজের ধার পর্য্যন্ত ঘন পালক ছড়িয়ে পড়ল সর্ব্বদেহে। হস্তের সবিরাম চলাচলে মাংসপেশী দৃঢ়তর, বক্ষাস্থির দুই পার্শ্ব সম্পূর্ণরূপে সংলগ্ন হয়ে পৃষ্ঠের উপস্থিভাগের মাংসপেশী সুগঠিত।

প্রথম পাখী আর্কোটেরিক্সের পাখনায় নখযুক্ত তিন আঙুল সুস্পষ্ট পায়ে চারিটি আঙুল, সরীসৃপের মত দীর্ঘ মেরুদণ্ড, দীর্ঘ লেজে ২৬টি কশেরুকা। সরীসৃপরক্ত শীতল তাপ নিয়ন্ত্রণের শক্তি নেই, শীত ঋতুতে নির্জীব। দেহাভ্যন্তর উষ্ণ রাখতে হলে উত্তাপ উৎপাদনের জন্য অধিক খাদ্যের প্রয়োজন, দেহে গরম আচ্ছাদন থাকলে উত্তাপ উৎপাদনের প্রয়োজন যায় কমে, সঙ্গে সঙ্গে অনুপাতে খাদ্যবস্তুরও হ্রাস হয়। নিয়মিত ব্যোম-ভ্রমণে দেখা দিল ডানা ও পালকে গরম আস্তরণ সুতরাং আঁশ হারিয়ে লাভ হ'ল ডানা

আকাশে উঠে শরীরে আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তনের সূচনা হলো হৃৎপিণ্ড থেকে ; হৃৎপিণ্ড ধমনী দ্বারা দেহের শিরা-উপশিরায় কোষে কোষে প্রেরণ করে নির্ম্মল রক্ত, সেজন্য পক্ষীদের দূর ভ্রমণে বা পরিশ্রমে কষ্ট নেই, সরীসৃপ দেহে অক্সিজেন সরবরাহের কোনও ব্যবস্থা না থাকায় এরা বিশেষ কষ্টসহিষ্ণু নয়। আর্কোটেরিক্সরা প্রথম প্রথম অধিক দূর উড়তে অক্ষম ছিল, আকাশে সাঁতার দেওয়া অভ্যাস করতে হয়েছিল সহস্র সহস্র বৎসর ধরে, শত শত বৎসর একাদিক্রমে দূর পরিভ্রমণের পাঠ গ্রহণ করতে হয়েছিল। বায়ুস্তরে দূর-দূরান্তর ভেসে যাওয়ার চেষ্টা যত বৃদ্ধি পেতে লাগল, দিন দিন হৃৎপিণ্ড সেই অনুপাতে বৃদ্ধি করতে লাগল পরিষ্কার রক্ত জোগান। হস্ত থেকে ডানা-বিবর্তনের পরিচয় আছে, বাহু কব্জি ও আঙুলগুলির অস্তিত্ব পৃথক পৃথক বর্তমান ছিল, এগুলির প্রভেদ আধুনিক পক্ষী ডানায় বিলুপ্ত। পরবর্ত্তীকালে প্রকাণ্ড লেজ খসে সারিবদ্ধ পালকের উদয়, পশ্চাদপদদ্বয় বৃক্ষশাখা আঁকড়ে ধরবার উপযোগী হওয়ায় ভদ্রভাবে উড়বার মত দেহ তৈরী হয়েছে।

আর্কোটেরিক্স প্রকৃতপক্ষে অর্দ্ধেক পাখী ও অর্দ্ধেক সরীসৃপ, লেজের দৈর্ঘ্য ক্ষুদ্র হস্তপদ দস্ত আঙুল এদের পূর্ব্বপুরুষের সম্যক্ পরিচয় দেয়। হাক্সলে পাখীদের 'গৌরবান্বিত সরীসৃপ' বলেছিলেন ; তার সত্যতা এইখানে অর্থাৎ উৎকর্ষে। পক্ষীভ্রূণ প্রথম দিকে অবিকল সরীসৃপাকার ; দন্তের আভাস থাকে প্রথমে শেষে বিলুপ্ত, প্রথম দিককার সরীসৃপ-অংশ পরে পরিণত হয় পালকে। মেসোজয়িকের শেষ থেকে আরম্ভ করে তৃতীয় ভূস্তর বা 'টেরটেরী' আরম্ভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভূপৃষ্ঠের যে অনন্য সাধারণ আলোড়ন চলছিল তাতে জীব জগতে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হয়। আর একটি তুষার যুগ, জলপ্লাবন ভূমিকম্প ও পৃথিবীপৃষ্ঠের প্রভূত অবস্থান্তর। প্রাণী-জগতে এর ভয়াবহ ফলের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হয়েছে—সরীসৃপ ডাইনসর গোষ্ঠি নির্ম্মূল! উষাযুগে গগনে পক্ষীকুলের আবির্ভাব, তারা পক্ষ বিস্তারে বায়ুভরে উড়ে চলেছে, আদিম আর্কোটেরিক্সের চেয়ে উন্নত 'ওডোনটেরিক্স' জাতের, দেখা গেল পরিবর্ত্তন কেবল পক্ষতে নয়, দেহ মনও অনেক বদলেছে। সরীসৃপ-পূর্ব্বপুরুষ যখন ভূমিতলে বিচরণ করত, অঘ্রাণ-শক্তি তখন সুতীব্র, আত্মরক্ষা, শত্রুর হস্ত হতে পরিত্রাণ ও খাদ্যান্বেষণের পক্ষে তা ছিল একান্ত অপরিহার্য্য। ভূপৃষ্ঠ ছাড়িয়ে উঠে তার দরকার রইল না, সেই থেকে পক্ষীর ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অধোগতি। অন্য দিকে উত্তরোত্তর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে দৃষ্টিশক্তি, চক্ষু উজ্জ্বল। শূন্যে আহার মেলে না বলে ভূমিতে অবতরণ করতে হয়, উৎকৃষ্ট দৃষ্টিশক্তি না থাকলে উঁচু থেকে দেখতে পাওয়া অসম্ভব। নিয়ত চক্ষুর ব্যবহার গুরু মস্তিষ্কে স্থান দখল করল বেশ খানিকটা, কমে গেল আঘ্রাণস্থান। ধর্ম্মলক সরীসৃপের চেয়ে উন্নত পরিবর্ত্তিত ও সু-উচ্চ প্রতিবেশে ক্রমে ক্রমে দেহ ও মাংসপেশীর চলন-চালন নির্দ্ধারণ-উপযোগী। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, মস্তিষ্কের সম্মুখাংশ কর্ম্মক্ষমতায় ও আকারে বেড়ে গেছে অনেক। অতীত অভিজ্ঞতা তথা কার্য্যাবলী বর্ত্তমান অবস্থার উপর যথেষ্ট আলোকসম্পাত করে এই স্থানের মধ্য দিয়ে। পাখীদের স্মরণশক্তির পরিচয় আছে এবং তা দূর-প্রসারী। নিজেদের জীবনকালের সীমারেখা অতিক্রম করে সে স্মৃতিশক্তি আহরণ করে পিতামহ-প্রপিতামহের কার্য্যকলাপ। সুদূর অতীতকালের হয়ত তমসাচ্ছন্ন আদিম অবস্থায় বিষয়টি আরও প্রাঞ্জল করা দরকার।

মেরুদণ্ডীর মধ্যে এযাবৎ যত গোষ্ঠী আলোচিত হয়েছে কোথাও দেখি নি যে, তারা সহজভাবে নিজেদের সন্তান লালন-পালন করছে অথবা ঘর-গৃহস্থালীতে মনোযোগী। মৎস্য-উভয়চর সরীসৃপ, ডাইনসর, টেরডক্টিল,—কোথাও বিশেষ প্রচেষ্টা দেখা যায় না। এরা কেবল উদরপূর্ত্তিতে ব্যস্ত এবং শৃংগার-ঋতুতে শুধু স্ত্রী-পুরুষে মিলিত হয়। সেও ক্ষণিক মাত্র, তারপর যে যার পথ দেখে। স্ত্রীরা ডিম পেড়ে খালাস, বাচ্চাদের কি হ'ল সে নিয়ে মস্তিষ্ক-চালনার অবসর থাকে না। সংকীর্ণ ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়া অন্য সকলই তুচ্ছ। নিজের ক্ষুদ্র সীমার বাইরে যাওরার শক্তি নেই। কোমল ভাবের ক্ষণিক উদয় সারা বৎসরান্তে একটিবার স্ত্রী-পুরুষের মিলনকালে। আর যে কোথাও সুকুমার ভাবের কণামাত্র আছে খুঁজে পাওয়া কঠিন। এই দিক দিয়ে দেখলে পাখীরা বেশ উন্নত। এদের মিলন কেবল যৌন-সম্মিলনে পর্য্যবসিত নয়, বহুকাল স্থায়ী অনেক ক্ষেত্রে জীবনভোর।* প্রকৃত বাৎসল্যরস এদের মধ্যে দেখা দেয় প্রথম, বাসা বেঁধে নীড় রচনা করে এরা সর্ব্বপ্রথম সমাজ-জীবনের প্রতিষ্ঠা করেছিল সে হিসাবে পথ-প্রদর্শক বললে অত্যুক্তি হয় না। তবে জীব-জগতের ক্রমিক-স্তরে খুব বেশী পার্থক্য নেই, কিছু অতি সামান্য মাতৃস্নেহের পূর্ব্বাভাষ দেখা যায় মাছেদের মধ্যেও। যেমন পুরুষ ষ্টিকলব্যাক সন্তানদের সতর্ক দৃষ্টির বাইরে যেতে দেয় না ; পাইথন কুণ্ডলীকৃত হয়ে ডিম ফোটায়, রাশি রাশি পাতা ইত্যাদি জড় করে ডিম লুকিয়ে নজর রাখে কুমীর পেকে, কিন্তু বাচ্চা বার হলে আর গ্রাহ্য নেই—চরে খাও। পাখীদের উন্নতির প্রধান কারণ সমাজ-জীবনের আবশ্যকতা ও উপকারিতা উপলব্ধি, অন্যথায় ঘর-সংসার পেতে সন্তান প্রতিপালনের দুরূহ দায়িত্ব গ্রহণ করত না। সন্তান-প্রতিপালনের গোড়ার কথা স্বার্থত্যাগ, খানিকটা সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বর্জ্জন না করলে সন্তান 'মানুষ' হয় না। হয়ত আহারে ভাগ দেওয়ার সময়েই দ্বিধাবোধ হয়েছিল, অদ্ভুত লেগেছিল স্বার্থসর্ব্বস্ব মনের কাছে কিন্তু সে বাধা দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উদ্‌ঘাটিত হ'ল বিশাল একটা দিক, যে দিক দিয়ে ক্রম-বিবর্ত্তন ঘটেছে—প্রিয়-সম্মিলন প্রেম মায়া-মমতা দয়া করুণা সমবেদনা শেষে পরার্থপরতার অভ্যুদয়। এই ধারায় উপনীত হয়েছি আমরা, আমাদের যা কিছু শ্রেয়, যা কিছু মঙ্গলকর ও মহৎ তার জন্ম আদিমকালে সেই পক্ষীমাতার সন্তানের প্রতি করুণা-প্রদর্শনে।

* লেখকের 'মাতৃস্নেহের বিকাশ,' প্রবাসী, পৌষ '৬০-এ আলোচিত।

কোমলবৃত্তির উন্মেষ

কোন স্মরণাতীত যুগে পক্ষীজননী দুঃস্থ শাবকের অক্ষমতায় কাতর হয়ে তার সঙ্গে নিজের মুখের গ্রাস বন্টন করে নিয়েছিল, সেই অনুকম্পা জন্ম দিল জগতের সমুদয় সখ্য ও শান্তিকে, কৃচ্ছ্র-সাধনায় যে তৃপ্তির আনন্দ, দুঃখের ভিতর যে সুখের রেশ তারও একটা ভূমিকা হয়ে থাকল। আহারের সঙ্গে আশ্রয়ের নিকট সম্বন্ধ, পাখী নিজের চেয়ে আশ্রিতের জন্যই বাসা বাঁধে; সন্তান-লালন-পালন বিষয়ে অস্পষ্ট কর্তব্যবোধ জাগল। এগুলি আবার সংক্রামক। একজনকে নীড় রচনায় ব্যাপৃত দেখে অন্য জনের মনে জেগে ওঠে বাসা তৈরীর স্পৃহা,* সন্তানের প্রতি মমত্ববোধ। জানি না বিহগ-মনে সামাজিক কীট-পতঙ্গের জীবনযাত্রা দেখে সন্তান রক্ষা প্রবৃত্তির উদয় হয়েছিল কিনা! পর্যবেক্ষণ শিক্ষার প্রধান অঙ্গ। পতঙ্গ-জগতে যে প্রবৃত্তি ছাঁচে-ঢালা নিষ্প্রাণ যন্ত্রবৎ ছিল, উন্নত মনে তা' মানসিক অভিব্যক্তিকে অগ্রগতির পথে পরি-চালিত করল।* সামাজিক বৃত্তি বোধ উদয়ের সহায়ক কীট-পতঙ্গরা বহু পূর্বে গৃহনির্মাণ ও সন্তান পালনে পারদর্শিতা দেখিয়েছিল তবে একে প্রকৃত অপত্যস্নেহের পর্যায়ভুক্ত করা চলে কিনা সে বিষয়ে বাক-বিতণ্ডার অবসর আছে; প্রবৃত্তিগুলি সঙ্কীর্ণ ও একদেশদর্শী, মেরুদণ্ডীদের বুদ্ধি এসে মিলেছে প্রবৃত্তির সঙ্গে। যে প্রবৃত্তি মনের মধ্যে দানা বাঁধছিল বংশপরম্পরায়, উচ্চ মেরু-দণ্ডীরা তাকে উন্নতির সোপান হিসাবে ব্যবহার করেছে, তার ক্রীতদাস হয়ে পড়ে নি। বুদ্ধির খাতে পাখীরা উন্নত কীটদের চেয়ে, কীটজগতে বুদ্ধির প্রভাব মাঝে মাঝে দেখা দেয় না এমন নয়, তবে সে বুদ্ধি অচেতন আচ্ছন্ন, সে বুদ্ধি ব্যক্তিগত আশা-অভিলাষকে নির্মমভাবে অবদমিত করে, নির্বিকারকল্পে জাতির উন্নতির পরি-পোষকতা করে (যথা পিপীলিকা, মধুপ)। পাখীরা অনেকে যূথচর, এদের ব্যক্তিগত জীবনও আছে। পক্ষীজীবন যাপন করবার নিমিত্ত সেখানে শাবকদের শিক্ষিত করা হয়, কীট-জগতে শিক্ষার প্রভাব নেই, স্বয়ংসিদ্ধ হয়ে অবতীর্ণ হয় পৃথিবীতে। পাখীরা অণ্ডজ হলেও বিবর্তন অন্য ধারায়। কে না দেখেছে চড়ুই-মা বাচ্চাগুলিকে উড়তে শেখাচ্ছে; মাতার প্রত্যাবর্তনের জন্য নীড়স্থিত অসহায় শাবকের ব্যাকুলতা লোকপ্রসিদ্ধ। শাবক ও মাতার মধ্যে এই মধুর সম্বন্ধ থাকে বহুদিন, এর ফল সুদূরপ্রসারী। এমন কি যে সব পাখীরা কতকটা স্বাবলম্বী হয়ে জন্মায় (হাঁস কুক্কুট অণ্ড থেকে বার হয়ে আসবার কিছুক্ষণের ভিতর চঞ্চু দ্বারা ঠোকরাতে ঠোকরাতে খাদ্য খোঁজে) তারাও কিছুদিন মাতার সঙ্গ-ছাড়া হয় না। স্বজনপ্রীতি স্নেহ-ভালবাসা সৌহার্দ্য শিষ্টাচার প্রভৃতি সামাজিক গুণ বাৎসল্য-রস-ধারায় বিবর্তিত হয়ে একসূত্রে গ্রথিত রেখেছে ব্যক্তি-জীবনকে।

অপত্যস্নেহে বিহঙ্গমকুল অদ্বিতীয় কিন্তু তার পূর্বে যে বৃত্তির অভ্যুদয় হচ্ছিল ধীরে ধীরে এবং মনে হয় যে প্রবৃত্তি-ধারা পক্ষী-বিবর্তনের মূল কারণ তার বিষয় আলোচনা আবশ্যক। পাখীদের প্রেম ও সঙ্গী নির্বাচনে বুদ্ধির সুস্পষ্ট স্বাক্ষর। এক স্তন্যপায়ী ব্যতীত উচ্চপ্রাণীর কোনও স্তরে জীবনসাথী নির্বাচন হয় না, হয় পৈশাচিক অনুষ্ঠান। পক্ষীকুল কিন্তু এ বিষয়ে অনুপম। এদের প্রণয়-নির্বাচন দুই প্রকারে: কোকিল পাপিয়া নাইটিংগেল লার্ক ইত্যাদি পাখীরা সঙ্গিনীকে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করে সুমধুর সঙ্গীতে। আরেক দল রঙ-বে-রঙের জমকালো পোষাক-পরিচ্ছদ পরে বা অঙ্গভঙ্গী সহকারে মুগ্ধ করে সঙ্গিনীকে।* আমাদের দেশে ময়ূরের কলাপীনৃত্য সুপরিচিত, বার্ড-অব-প্যারাডাইসের লেজ ও পক্ষ বর্ণালী-সমাবেশে সজ্জিত, 'কাউণ্টরীগি' 'প্রিন্স রুডলফে'র লেজ মনোমুগ্ধকর, ইংলণ্ডের ফেসেণ্টরাও সুন্দর। পুরুষরা মনোহর, স্ত্রীরা কুৎসিত। নাচ দেখিয়ে যাদের স্ত্রী-লাভের প্রয়াস, ঈগল গ্রেব ফেসেণ্ট সেই দলে। কারও বা মাথায় ঝুটি, রঙিন চঞ্চু, কেউ বা চক্ষুর সাজে সজ্জিত। কোন কোন ক্ষেত্রে অভিসারে যাবার সময় প্রিয়ার করকমলে সমর্পণের জন্য নেয় উপহার—পেঙ্গুইন একটুকরা পাথর, গ্রেব কচি শাখা। প্রিয়াকে সন্তুষ্ট রেখে তার হৃদয়-অধিকার-চেষ্টার অন্ত নেই। গানের অর্থ শুধু অচিন প্রিয়াকে জীবনসঙ্গিনী হতে আমন্ত্রণ নয়, এর মধ্যে স্বাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার সঙ্কল্প, সপ্তম স্বরে গাইবার ভাবখানা যে—এতদূর আমার রাজ্য, প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রবেশ নিষেধ। নৃত্যগীত ক্রীড়া-কৌশলে লম্ফঝম্ফে যে যা জানে দেখিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করে প্রিয়াকে পরিতুষ্ট করতে এবং বরমাল্য যে তাকেই দেওয়া সমীচীন তার যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে। স্বয়ংবর-সভায় নির্বাচনের মান বেশ উঁচু, রূপ-গুণ যার কিছুই নেই সে নিতান্ত দুর্ভাগ্য, সারা জীবনে তার সাথী জুটবে না, নিঃসঙ্গ জীবন চিরকাল। পক্ষী দম্পতির বিহার যে লক্ষ্য করেছে সে মুগ্ধ না হয়ে পারে নি, ক্রীড়া-কৌতুক চাপল্য-পুলকের আতিশয্য দেখে বিস্ময়াপ্লুত হতে হয়, মনে হয় জীবনটা ব্যর্থ, সত্য সত্যই এদের প্রেমালাপ ও মিলন তুচ্ছ করে দেয় মানব-মানবীর প্রেমকে। অনেক ক্ষেত্রে দম্পতি-যুগল পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত জীবনভোর। চখাচখি মাণিকজোড় একের বিহনে অন্যটি কিরূপ কাতর হয় তার পরিচয় সুবিদিত।

ক্রীড়া-কৌতুহল উদ্ভাবন

পাখীর নীড় রচনায় অসাধারণ কলা-কৌশলের নিদর্শন পাওয়া যায় মাঝে মাঝে। প্রত্যেক জাতি আপন আপন বিশিষ্ট পদ্ধতিতে বাসা বাঁধে, বাবুই অপূর্ব দ্বিতল বাসা নির্মাণ করে লম্বমান অবস্থায়

---

* লেখকের 'সভ্যতায় স্নেহ-মমতা' নিবন্ধে আলোচিত।

* 'ধনেশের গৃহস্থালী' প্রবন্ধে খগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র এদের ঘর-সংসারের কথা চমৎকার বর্ণনা করেছেন। রবিবাসরীয় যুগান্তর ৩১ জুলাই ১৯৩৭।

* লেখকের 'প্রাণীজগতে প্রেম ও পূর্বরাগ', রবিবাসরীয় আনন্দবাজার, ২৫শে শ্রাবণ '৫৯ দ্রষ্টব্য।

দের ঝুলিয়ে, সোয়ালো চড়ুই প্রভৃতির বাসা কার্নিশের কোণে দেয়ালের ফোকরে, ধনেশের বাসাদ্বার মাটি দিয়ে বন্ধ, ভিতরে ডিম্ব-সহ গৃহিণী, হামিং পক্ষীর শৈবাল-গৃহ দুর্ভেদ্য, ব্রেজিলের হোটজিনের ঝোলানো বাসা ঝরণার ওপর, সর্প ও বনের-শত্রুর দর্শনে শাবক লাফ দেয় জলে, তাঁতী পাখীর (উইভার) বাসা সমবায়ের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত, বাসা তৈরি করে একসঙ্গে অনেকে বাস করে একত্রে এবং বিপদ-সঙ্কেতও সময়মত সকলের নিকট গিয়ে পৌঁছায়।

কিছু কিছু কার্য্যক্রম বুদ্ধিমান মানুষকে তাক লাগিয়ে দেয়, যেমন ক্রীড়া-কৌতুক। অনেকে মনে করেন সে বিশুদ্ধ খেলাধূলার সূত্রপাত কীট-জীবন থেকে। অপর সমস্ত নিম্নস্তরে ক্রীড়া দেখা যেতে পারে কখন কখন তবে সে যৌন-আবেদনের পন্থামাত্র। কেবল খেলাচ্ছলে আনন্দ উপভোগ মনুষ্যেতর প্রাণীতে দেখা যায় না, পাখীদের প্রবৃত্তিময় সঙ্কীর্ণ জীবনে এর প্রকাশ শ্লাঘনীয়। একবার এক পানাপুকুরের উপর মাছরাঙা জাতীয় পাখী একটি ক্ষুদ্র শাখা নিয়ে লোফালুফি খেলছিল, ফেকড়িটা উঁচু থেকে ছেড়ে দিয়ে নীচে এসে লুফে নিচ্ছিল। এ কি শিকার অভ্যাস না শুধুই খেলা? সে স্থান তন্ন তন্ন করে খুঁজে অন্য কোন পক্ষীর অস্তিত্ব বর্ত্তমান লেখকের দৃষ্টিগোচর হয় নি। আরও অনেক লেখক এরূপ দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। পাখীদের সাধারণ খেলা আকাশে পক্ষ-সঞ্চরণ। গোধূলি-আকাশে সূর্য্যের ম্লান আলো ও সন্ধ্যার ধূসর ছায়ায় আকাশের কোলে ছোট পাখীগুলিকে বায়ুতরঙ্গ তোলপাড় করতে কে না দেখেছে! হাক্সলে (জুলিয়ান) একবার দাঁড়িয়ে ছিলেন নিঃশব্দে প্রভাত-প্রকৃতির স্নেহচ্ছায়ায়, দেখলেন একদল পাখী সুউচ্চে উঠে পক্ষ সঞ্চালন বন্ধ করে হেঁটমুণ্ডে হু হু শব্দে নেমে আসছে; উত্তেজনায় কিচমিচ করে উঠছে, বাসাবৃক্ষের একটু উপরে এসে সশব্দ পতন বাঁচাতে পক্ষে ভর দিল—কৌতূহলজনক খেলা বটে! যে কার্য্যে খাদ্যান্বেষণ বা যৌন-আবেদনের আভাস নেই, তার অপর কোন বিশিষ্ট লক্ষ্য না থাকায় এ বিশুদ্ধ ক্রীড়া গোত্রের। এই ধারায় গোড়াপত্তন হয়েছে কয়েকটি মুখ্য সহজ প্রবৃত্তির, উচ্চতর জীবনে বিশেষতঃ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যাদের অপরিমেয় প্রভাব। গড়-পড়তা হিসাবে পক্ষী যে স্তন্যপায়ী অপেক্ষা বুদ্ধিমান তা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিশ্বাস করবে না, তবে অনুভূতি, বিশেষ ভাবে কয়েকটি প্রক্ষোভ এদের অত্যন্ত গাঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত। পক্ষিজীবন পর্য্যবেক্ষণে কয়েকটি অপূর্ব্ব ঘটনা দেখা যায়, কোন ক্রমেই যাদের প্রশংসা না করে উপায় নেই। এক পাখী ছাড়া সঙ্গীর খাদ্য নিয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করতে দেরী হচ্ছে দেখে ব্যাকুল অনুসন্ধানে বার হয়ে পড়ে কে? কেউ না। স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধ এরূপ নিবিড়ভাবে গড়ে উঠেছে যে, অনেক জাতীয় (জলপ্রেব) পুরুষের নিকট অন্য কোনও স্ত্রীর সান্নিধ্য নিষেধ, যদি কোন ক্রমে একটি চপলা এসে পড়ল তাকে পক্ষীবধূর নিকট প্রহৃত হতে হয়। চঞ্চল-চিত্ত স্বামির শাস্তি কি? যা সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে নারীকুল দিয়ে থাকে—কিছুই না। সংযম বলা উচিত একে? পক্ষীর চেয়ে নিম্নস্তরে নেই।

পুরাতন ও নূতন

মেরুদণ্ডী বিবর্ত্তনের মধ্যভাগে পাখীদের উদয় এবং অভিব্যক্তি একটি বিশেষ ধারায়। মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তির হয়ত সে দিক নয় তবু তাকে অবহেলা করা চলে না। জুরাসিকের 'আর্কোপ্যাটিক্স' থেকে আরম্ভ করে খড়িস্তরের দন্তসমন্বিত পাখী ও উষাযুগের টার্ণ পাতিহাস ইত্যাদিতে ব্যবধান দুস্তর। আয়তন আকৃতি স্বভাব সকলই পরিবর্ত্তন হয়েছে। আধুনিক হামিং পাখী সবচেয়ে ছোট। অতীতের পক্ষহীন অতিকায় 'ডিনরনিস' দাঁড়ান অবস্থায় কমপক্ষে ১০ ফুট উচ্চ, ম্যাডাগাস্কারে পাওয়া গেছে ডিনরনিস জাতের কিছু অস্থিকঙ্কাল ও কয়েকটা ডিম যার ব্যাস প্রায় ১৩৷১৪ ইঞ্চি (৪৮টা রাজহংস ডিম্বের সমান)। পাখী জলচর তথা স্থলচর দুই জাতের। জলচরদের মধ্যে বলাকা মরাল জলকুক্কুট প্রভৃতি চেনা পাখী এবং পেঙ্গুইন কর্মরাণ্ট পেলীকান প্রভৃতির আদিপুরুষ দেখা গিয়েছিল মাইয়সিনে,* গাঙচিল পানকৌড়ি টার্ণ ফ্লেমিঙ্গ ইত্যাদির জন্ম তখনই। এই দুইয়ের অন্তর্ভাগে এরূপ পক্ষী আবির্ভূত হ'ল যারা জলার ধারে বসে থাকে এবং জলার উপর দিয়ে আনাগোনা করে, হ্রদ বা নদীতট, অনতিগভীর পুষ্করিণী বিলে ওৎ পেতে থাকে, গলা বাড়িয়ে শিকার করে, সেজন্য গলা ও চঞ্চু লম্বা; অধিকদূর একটানা উড়তে অসমর্থ। আধুনিক বক সারস চাহা প্রভার মাছরাঙা ইত্যাদির পিতামহ এই জাতের। কয়েক জাতের পাখী উড়তে পারে না মোটে, উটপাখী তার সাক্ষ্য। উটপাখী পুরাতন জাত, প্লিয়সিন যুগে ও ভারতের সিবলিক পর্ব্বতে বাস এবং দক্ষিণ-রুশ ও চীনে ডিম পাওয়া গেছে। এমু ও রীহা ভূচর ছিল, উড়তে পারত না। বোধ হয় সেজন্য অসীম শক্তি এদের পদদ্বয়ে, দৌড়াতে ওস্তাদ। বর্ত্তমানে অষ্ট্রেলিয়া ছাড়া অপর কোথাও না থাকলেও ভারত আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়া নিউজিল্যাণ্ডের প্লিয়সিন স্তরে এদের খোঁজ আছে। 'মোয়া' আর একটি বিরাটবপু পাখী, সপ্তদশ শতক অবধি পৃথিবীতে ছিল, মাংসাশী নাবিকদের হাতে পড়ে দফারফা হয়েছে, ম্যাডাগাস্কারে ডোডোরও সেই পরিণাম। আধুনিক গায়ক পক্ষীদের (কোকিল লার্ক বুলবুল) পূর্ব্বপুরুষ ও শিকারী (পেচক ঈগল বাজ শকুন)-দের পূর্ব্বপুরুষরা তৃতীয় স্তরের শেষের দিকে এসেছিল। 'ডায়াট্রিমা' ও 'ইনভা' উচ্চতায় ও প্রস্থে উটপাখীর দোসর, বিরাট চঞ্চু দেখে মনে হয় পুরাতন স্তন্যপায়ী, ভক্ষণে কালাতিপাত করত। আবার সমুদ্রবেষ্টিত নির্জ্জন দ্বীপে স্থানে স্থানে পক্ষীকুলও বিশালকায় হয়ে উঠত, আকাশে উঠবার প্রয়োজন না থাকায় এরা বৃহদায়তন হয়েছিল। প্যাটাগোনিয়ায় যে পক্ষী-দানবের মস্তক আবিষ্কৃত হয়েছে তার দৈর্ঘ্য এক গজ, ম্যাডা-গাস্কারের 'আপিয়রনিসের' ডিম্বের আয়তন ৬টি উটপাখী ও ১৪৮টি মুরগী-ডিম্বের সমান। জলরাশির নির্ব্বিঘ্ন সংরক্ষণের অবসানে মানবীয় জলযানের আবির্ভাবে এদের নিরাপত্তা শেষ।

পক্ষীকুল স্তন্যপায়ী আদি-সরীসৃপ হতে উদ্ভূত দুই বিভিন্ন ধারায়। কেবল হৃদপিণ্ড মস্তিষ্ক মেরুমজ্জা রক্ততাপ প্রভৃতি

শারীরিক বিবর্ত্তনই হয় নি, মানসিক বৃত্তিসমূহের ক্রমবিকাশ সার্থকতামণ্ডিত হয়ে উঠেছে এই দুই সমসাময়িক অভিব্যক্তি ধারায়। অভিজ্ঞতা-পুষ্ট মানসিক বৃত্তি-বস্তু-ভেদে দিয়েছে শিক্ষা, সহজ পরিচয়ের সুযোগ; স্তন্যপায়ীরা বুদ্ধির ধারায় অগ্রসর, পক্ষীকুল হয়ে উঠেছে তীব্র অনুভূতিপ্রবণ। এই দিক থেকে পাখীর চমকপ্রদ জীবনযাত্রা আমাদের আশ্চর্য্যান্বিত করে, মনে হয় মানব-জীবনের অপরিণত প্রতিচ্ছায়া। সহজ আনন্দপূর্ণ জীবন এদের—ঈর্ষাও হয়। আদিম পাখীদের মধ্যে সহজাত বৃত্তির উন্মেষ হয়েছিল, নিকট প্রতিবেশ (অর্থাৎ শত্রু-মিত্র, খাদ্য-গাছপালা বাসবাড়ী) ও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া তাদের প্রতিকূলতা করে নি, এখনকার পাখী ও পুরাকালের পাখীদের ভিতর নেই খুব বেশী তফাৎ। দেহ ও মনের দিক থেকে প্রায় সমভাবই আছে, বদল যদি হয়ে থাকে ত আয়তনে। সরীসৃপ স্তন্যপায়ীদের মধ্যে প্রকারান্তর এদের চেয়ে অধিক। জীববিদ্যার দিক থেকে আমরা বলব যে, প্রতিবেশে অভিযোজন এদের পূর্ণাঙ্গ, খুঁত নেই বললেই চলে। তুলনামূলক মনস্তত্ত্বের দিক থেকে পাই যে, স্নেহ-প্রীতি, আনন্দ-বিষাদ অসূয়া, কৌতূহল অতিমাত্রায় বর্ত্তমান। এই জটিল মনোভাব সমুদয় পূর্ব্বেকার কোন প্রাণীর মধ্যে ছিল না বিন্দুমাত্র, স্তন্যপায়ীদের মধ্যেও করুণা-বিষাদ-কৌতূহলের পূর্ণ বিকাশ হয়েছে কিনা সন্দেহ। যেখানে শুধু উচ্ছ্বসিত জৈবিক প্রাণের রাজ্য, বিচার-বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন সেখানে, পক্ষীবুদ্ধি একেশ্বর, অনেক-স্থলে শ্রেষ্ঠ মানুষের চেয়ে আনন্দময়।

আর একটি গুণের কথা বলে বিহগ-বিবর্ত্তন-পাঠ শেষ করব। অভিজ্ঞতা-পুষ্ট বুদ্ধি শুধু মানুষের একচেটিয়া—এই আমরা জানি। মানুষ দেখে শেখে। তার নীচের স্তরে ঠেকে শেখা। অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান বিফল হয় না উচ্চস্তরের মনে। ক্যাটল মাছ অমেরুদণ্ডী জীব, কিছু শিক্ষা করলেও অচিরে ভুলে যায়। মাছেরা আর একটু উন্নত কারণ এরা মেরুদণ্ডী, দু-চার দিন মনে রাখতে পারে বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের ব্যথা, সরীসৃপের স্মরণশক্তির পরিচয় বিশেষ নেই। পাখির কোন কোন বিষয়ের স্মৃতি সারাজীবন। আত্মরক্ষা থেকে আরম্ভ করে খাদ্যান্বেষণ, মাতৃস্নেহ, ভালবাসা সকল বিষয়েই অভিজ্ঞতার প্রলেপ, কুলস্মৃতির সার্ব্বভৌমিক সাহায্য আছে বটে কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা সুচারুরূপে জীবনধারণের কর্ম্মপন্থা করেছে নির্দ্ধারণ।

উপমা

শ্রীঅচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

তুমি কি কান্নার সুর,
যত কাঁদো ততই কাঁদাও;
সেতারের তারে তারে
মিড়ে মূর্চ্ছনায়
জল হয়ে নেমে আসে
মল্লারের মেঘ,
সে প্লাবনে ভেসে যাই আমি।

তুমি কি উত্তর মেরু,
ঘনীভূত অশ্রুর বরফ,
আমার উত্তাপ দিয়ে
সে তুষারে প্রাণের সঞ্চার
যত করি
তত মরি আমি,
ডুবে যাই অগাধ সলিলে।

দীপ্তি

দেবাচার্য্য

পুরুষ চরিত্রে

সত্যজিৎ	ইউনিভার্সিটির মেধাবী ছাত্র (নায়ক)
ক্ষীরোদ	নায়কের বন্ধু
মনতোষ	নায়কের বন্ধু
প্রভাস	নায়কের বন্ধু
শরৎবাবু	মেদিনীপুরে উকিল (নায়কের পিতা)
বিশ্বজিৎ	নায়কের কনিষ্ঠ ভ্রাতা
মনোমোহন বাবু	জ্ঞাতিসম্পর্কে দীপ্তির জ্যেঠামশায় ও শরৎবাবুর মুহুরী
(রাধিকামোহন)	
চক্রবর্ত্তী	ট্রাম ড্রাইভার (দীপ্তির পিতা)
শোভন	ঐ পুত্র (বালক)
মিঃ (পরিমল) চ্যাটার্জ্জী	ধনী ব্যারিষ্টার (শরৎবাবুর বন্ধু)
ত্রিলোচন পণ্ডিত	জ্যোতিষী ও তান্ত্রিক
হরেন্দ্র	ত্রিলোচনের ছাত্র
বিধুভূষণ	মিঃ চ্যাটার্জ্জীর ক্লার্ক
বিহারী	ত্রিলোচনের ভৃত্য
বজরঙ্গি	পাকাকলা-বিক্রেতা ফেরিওয়ালা।
	জনৈক পরিচারক

স্ত্রী চরিত্রে

দীপ্তি	(রাধিকামোহন) চক্রবর্ত্তীর কন্যা (নায়িকা)
মিনতি	মিঃ চ্যাটার্জ্জীর শিক্ষিতা কন্যা
উৎপলা	দীপ্তির সখী বা বান্ধবী
বিন্দুবাসিনী	দীপ্তির ঠাকুরমা
সুশীলা	ঠিকে ঝি
মিসেস (ছায়া) চ্যাটার্জ্জী	মিনতির মা
সর্ব্বানী দেবী	সত্যজিতের মা
(নেপথ্যে) সুরমা (উন্মাদিনী)	দীপ্তির মা
জনৈকা পরিচারিকা	

প্রথম অঙ্ক

[প্রথম দৃশ্য—চক্রবর্ত্তীর বারান্দা, দীপ্তি, শোভন, বিন্দুবাসিনী, চক্রবর্ত্তী, নেপথ্যে সুরমা ও উৎপলা।

দ্বিতীয় দৃশ্য—সত্যজিতের ঘর, সত্যজিৎ, মনতোষ, চক্রবর্ত্তী ও ক্ষীরোদ।

তৃতীয় দৃশ্য—চক্রবর্ত্তীর বারান্দা, দীপ্তি, শোভন, বিন্দুবাসিনী, সুশীলা ও সত্যজিৎ।

চতুর্থ দৃশ্য—চক্রবর্ত্তীর বারান্দা, বিন্দুবাসিনী, দীপ্তি, সুশীলা, উৎপলা, শোভন ও নেপথ্যে সুরমা।

পঞ্চম দৃশ্য—চক্রবর্ত্তীর বারান্দা, দীপ্তি ও সত্যজিৎ, বিন্দুবাসিনী।

ষষ্ঠ দৃশ্য—ব্যারিষ্টার চ্যাটার্জ্জীর বসবার ঘর। মিনতি, মিসেস ও মিঃ চ্যাটার্জ্জী এবং সত্যজিৎ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—চক্রবর্ত্তীর বারান্দা, দীপ্তি, উৎপলা, বিন্দুবাসিনী, সত্যজিৎ, শোভন ও চক্রবর্ত্তী।

দ্বিতীয় দৃশ্য—বোটানিকাল গার্ডেনের নির্জ্জন একাংশ-সিনের সামনে একটি বেঞ্চ, সত্যজিৎ, দীপ্তি ও শোভন।

তৃতীয় দৃশ্য—পার্কের সিনের সামনে একটি বেঞ্চ, প্রভাস, মনতোষ, ক্ষীরোদ ও সত্যজিৎ।

চতুর্থ দৃশ্য—চক্রবর্ত্তীর বারান্দা, দীপ্তি ও উৎপলা।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—একটি সুসজ্জিত হলঘরের দৃশ্য। সত্যজিৎ ও মিনতি। জনৈক বয়।

দ্বিতীয় দৃশ্য—মিঃ চ্যাটার্জ্জীর বসবার ঘর। মিঃ চ্যাটার্জ্জী, বিধুভূষণ, মিসেস চ্যাটার্জ্জী ও মিনতি।

তৃতীয় দৃশ্য—সত্যজিতের হলঘর। সত্যজিৎ, প্রভাস, মনতোষ ক্ষীরোদ, শরৎবাবু, বিশ্বজিৎ, সর্ব্বাণী দেবী, পরিচারক ভৃত্য ও মিঃ চ্যাটার্জ্জী।

চতুর্থ দৃশ্য—সত্যজিতের শয়নকক্ষ, সত্যজিৎ ও মিনতি, জনৈকা পরিচারিকা।

পঞ্চম দৃশ্য—মনতোষের বৈঠকখানা। মনতোষ, প্রভাস ক্ষীরোদ, সর্ব্বাণী দেবী ও ত্রিলোচন পণ্ডিত।

ষষ্ঠ দৃশ্য—জ্যোতিষী ত্রিলোচনের ফরাস, মনতোষ, প্রভাস, ক্ষীরোদ, হরেন্দ্র, বেহারী, দীপ্তি, সৌমেন্দ্র, বিশ্বজিৎ, শরৎবাবু, মিঃ চ্যাটার্জ্জী ও ত্রিলোচন পণ্ডিত।]

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বস্তীবাড়ীর—চক্রবর্ত্তীর বারান্দা

[বস্তীবাড়ীর ভিতরকার দৃশ্য। পাঁচিলের পাশে একটি গ্যাস-পোষ্ট। সদর দরজা দিয়ে প্রথমে উঠোনে প্রবেশ। 'এল'

শেপে একটি খোলার চালের বস্তীবাড়ী। দুখানা শোবার ঘর। বারান্দার সঙ্গে সংযুক্ত রান্না-ঘর। রান্নাঘরের সামনে বারান্দায় বসে চা তৈরি করছে দীপ্তি। উনিশ-কুড়ি বছরের একটি শ্যামলশ্রী মেয়ে। দীপ্তির বাবা ট্রাম-ড্রাইভার রাধিকামোহন চক্রবর্ত্তী ট্রামওয়ে কোট আর টুপী হাতে বারান্দায় খুটি ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে। নেপথ্যে দীপ্তির মা সুরমা (উন্মাদিনী) মাঝে মাঝে চীৎকার করে উঠছে: ও মা, ও বাবা, কাটিয়া ফালছে ও বামনদিদি, বামনদিদি, একেবারে দুইখান করিয়া কাটছে।

দীপ্তির ঠাকুরমা বুড়ি বিন্দুবাসিনী বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে বসেছেন ঘরের বেড়ায় ঠেস দিয়ে, নিকেলের চশমা চোখে মহাভারত পাঠ বন্ধ রেখে উপবিষ্ট পৌত্র শোভনের (নয়-দশ বছরের প্রায় বোবা ছেলে) দিকে একবার, আর একবার পুত্র (প্রৌঢ়) চক্রবর্ত্তীর দিকে তাকিয়ে বলেন]

বিন্দুবাসিনী। কি কইল বরপক্ষ?

চক্রবর্ত্তী। কইবে কি আর, যা কইবার কইল।

বিন্দুবাসিনী। কি কইল ক' না।

চক্রবর্ত্তী। কইল আমার পিণ্ড, আমার ছেরাদ্দ।

বিন্দুবাসিনী। বালাই ষাট! ও কি কথা!

চক্রবর্ত্তী। পায়ে ধরতে কি বাকী রাখছি!

বিন্দুবাসিনী। কি কইল তা' ত কইস না।

চক্রবর্ত্তী। কইল, বংশ আপনার ভালই, সেই জন্তেই ত আসছিলাম দ্যাখতে আপনার মাইয়ারে। তার পর আর কিছু কয় না।

বিন্দুবাসিনী। পণ চায়, পণ চায়, তা নি বোঝতে পারছ।

চক্রবর্ত্তী। চায় ত পণ, দিমু ক্যামনে। পণ দিবার সাধ্য নাই, কইলাম পর, উপীন মুখটির মুখ কালো হইয়া গেল। কয় আমারে, পণ দিতে পারবেন না, অথচ কালো মাইয়া, মা পাগল, গছাইয়া দিবেন ক্যামনে? একটা যুক্তি থাকা চাই ত। প্রকৃত সুন্দরী গৌরবর্ণা পাত্রী হইলে একটা কথা হইত। তা নয় পণ ছাড়িয়া দিতেও পারতাম। তা ছাড়া ল্যাখাপড়াও শেখছে কই, মেট্রিক পাশ ত আইজ ঘরে ঘরে।

বিন্দুবাসিনী। তা অগো পোলাও ত বি, এ পাশ করে নাই শুনি।

চক্রবর্ত্তী। তা হইলে কি হয়, মুখুটি কয়—সোনার টুকরা ছেইলা আমাগো, পোষ্টাফিসে অর্থাৎ একেয়ারে খাস দিল্লী গবর্ণমেন্টের অধীন চাকরী। ভাগিনার সুখ-দুখের কথাও ভাবতে হইবে। আমি আর কথা না বাড়াইয়া বিদায় লইলাম। কই রে, হইল চা?

দীপ্তি। দেই বাবা।

[দীপ্তি প্লেটের উপর কাপ হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসে। চক্রবর্ত্তী দুই-তিন চুমুকে চা পান শেষ করে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে যায় বাইরের দরজা দিয়ে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটি কুড়ি-একুশ বছরের ফর্সা রং, সুশ্রী চেহারা, কিন্তু শীর্ণ-কায়া তরুণী প্রবেশ করে। দীপ্তি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ের সুরে বলে]

দীপ্তি। একি উৎপলা—তুমি! এস ভাই এস। কি সৌভাগ্য আমাদের, তা হলে কথা রেখেছ দেখছি।

উৎপলা। তুই যখন তোর কথা রেখেছিস, আমিও রাখব না কেন?

দীপ্তি। আমার সঙ্গে তোমার কথা। তোমার ত সখ করে ঝামেলা পোয়ানো। ম্যাট্রিক পাশ করেছ, সেলাই-স্কুলে মাষ্টারণী না হয়ে যে কোন সাধারণ স্কুলের মাষ্টারণী হতেও পারতে। প্রয়োজন হলে হবেও তা। কিন্তু আমার ত সে আশা নেই।

উৎপলা। তুইও পাশ করতিস, যদি না অঙ্কে—। তা অঙ্ক না কষলে কি অঙ্কে পাশ করা যায়? তোর সময় কোথায়? আমার তাও মা, বৌদি, দুজনেই আছেন। তোকে ত—

[দীপ্তি বিন্দুবাসিনীর দিকে ইঙ্গিত করে উৎপলাকে থামায়]

দীপ্তি। আয় ভাই আমরা ওখানটায় বসি। খোকন, ঘর হইতে আর একটা মাদুর লইয়া আয়।

[শোভন ঘর থেকে মাদুর আনে। দীপ্তি হাত বাড়িয়ে মাদুরটা ধরে, বারান্দার এক কোণে মাদুর পাতে। রান্নাঘরের কাছাকাছি। বিন্দুবাসিনী যেখানে মাদুর পেতে বসেছেন, সেখান থেকে একটু দূরে]

উৎপলা। উনি বুঝি তোর ঠাকুরমা? মা কই?

দীপ্তি। ঐ যে ঘরের ভিতরে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছেন।

[নেপথ্যে ক্রন্দনধ্বনি—ও বাবা, ও মা]

উৎপলা। কি দুঃখের কথা! তোর দাদামশায়-দিদিমারা অবস্থাপন্ন ছিলেন, তাঁদের একমাত্র সন্তান ছিলেন তোর মা। আজ যদি তাঁরা বেঁচে থাকতেন, আর দোকানটা লুঠ না হ'ত, তোদের কি এই দুর্দ্দশা হ'ত! ভগবানের কি বিচার!

দীপ্তি। ভগবানকে জড়াস কেন ভাই। এ ত সব মানুষের কাজ।

উৎপলা। দাঁড়া, আসছি এখুনি।

[উৎপলা উঠে গিয়ে বিন্দুবাসিনীকে প্রণাম করে ফিরে আসে]

বিন্দুবাসিনী। (নাকের ডগায় চশমা সরিয়ে)—এই বুঝি তগো উৎপলা?

দীপ্তি। হ্যাঁ, দিদুভাই।

[বিন্দুবাসিনী গম্ভীরভাবে সামনের দিকে তাকিয়ে আবার পাঠে মন দেন]

উৎপলা। ফাঁড়ার কথা কি যেন বলছিলি তখন? জ্যোৎস্না-দির সামনে বলতে গিয়ে থেমে গেলি? কি ব্যাপার রে?

দীপ্তি। সত্যি বড় ফাঁড়া গিয়েছে আমার। বাবাও প্রায় রাজী হয়ে গিয়েছিলেন। ভাগ্যিস দিদুভাই, মানে আমার ঠাকুরমা বাধা দিলেন।

উৎপলা। কিছুই বুঝলাম না।

দীপ্তি। ঐ যে দেখছিস, জানলা দিয়ে তাকিয়ে ত্যাখ—ঠিক সোজা, হ্যাঁ, ঐ ঘরে থাকে শৈলেনবাবু। ম্যাসেজ ক্লিনিকের দালাল। মানদাসুন্দরী বলে বছর ত্রিশ বয়সের একটি মেয়েলোকও আছে ঘরে। লোকের কাছে পরিচয় দিয়েছে মানদাসুন্দরী নাকি স্ত্রী, কিন্তু আসলে—

উৎপলা। আসলে, রক্ষিতা। তার পর?

দীপ্তি। এককালে মেসের ভিতর আমার যাতায়াত ছিল। শৈলেনবাবু ডেকে বসাতে চাইত তার ঘরে।

উৎপলা। মানদা থাকত না?

দীপ্তি। থাকত বৈকি, তাই ত সাহস করে একদিন গিয়েছিলাম ওর ঘরে। আমি কি এত সব কথা জানি। ওকে বৌদি বলে ডেকেছি, চাও খেয়েছি। কি লোভেই না পড়েছিলাম, কি বলবো তোকে।

উৎপলা। বলেছিল নিশ্চয় তোকে, ট্রেনিং-পিরিয়ডে ৪৫৲ টাকা, ট্রেনিং শেষ হলে ৮৫৲ টাকা, তাই না?

দীপ্তি। আশ্চর্য্য, কি করে জানলি তুই?

উৎপলা। কলকাতায় ঐ শৈলেনবাবুর মত অনেক দালালই আছে।

দীপ্তি। আরও বলেছিল কি জানিস, মিডউইফারী যদি শিখে নিতে পারি, তা হলে ত কথাই নেই। মাইনে হবে তখন আড়াইশো টাকা।

উৎপলা। এক-একটা ডেলিভারী কেশে অন্ততঃপক্ষে একশো টাকা উপরি আয় আছে।—বলে নি?

দীপ্তি। সত্যি ভাই আশ্চর্য্য লাগছে, তাও বলেছে।

উৎপলা। আজ সকালের কাগজে একটি ক্লিনিকের গুপ্তরহস্য ফাঁস হয়ে গিয়েছে।

দীপ্তি। আড়াইশো টাকার লোভ সংবরণ করা কি সোজা? কাল পর্য্যন্তও দোমনা ছিলাম। আমি ভাবি বুঝি হাসপাতালের মতন ব্যাপার, নার্সের মত কাজ করতে হবে। উঃ, ভাবলেও বুক কাঁপে। বরাত-জোরে বেঁচে গিয়েছি।

উৎপলা। এখনও বলতে পার না সে কথা। তোমার যা ফিগার, ঐ ফিগার নিয়ে গরীব হওয়ায় বিপদ আছে। আবার কালো মেয়ের বিপদ বেশী। ফর্সা লোকগুলো ভাবে—

দীপ্তি। কি ভাবে?

উৎপলা। ভাবে, কালো মেয়ের উপর অত্যাচার করছি না ত, অনুগ্রহ করছি। আমি তাই ফর্সা লোক দেখলেই ভয় পাই।

দীপ্তি। তোর আর কি ভয়। তোর রং ত ফর্সা।

উৎপলা। আমার জন্যে নয়। আমি বিয়েই করব না কোন দিন। সাধ করে জেলখানায় পচে মরে আমার লাভ কি।

দীপ্তি। তা হলে কার জন্যে তোর ভয়?

উৎপলা। ভয় আমার, এই সরল নিষ্পাপ বোনটির জন্যে।

[উৎপলা দীপ্তির মুখটা নিজের বুকের উপর টেনে নেয়, দীপ্তি স্মিতমুখে নিজেকে মুক্ত করে।]

দীপ্তি। যাক্ এত দিনে আমিও একটা দিদি পেলাম। তা ভাই দিদি, তুমি কেন বিয়ে করবে না?

উৎপলা। আমি যে হাঁপানীর রুগী। আমার কি বিয়ে করা উচিত? সেই তোর কখনও-হবে-না যে-ভগ্নিপতি সেই ঘোষ, মিত্তির অথবা বোস একজন কাউকে কল্পনা করে নে। তার কি দুর্দ্দশা হবে হাঁপানী রুগী একটি মেয়ে বিয়ে করলে?

দীপ্তি। তা, তুই ত ভাই সব কাজই পারিস।

উৎপলা। সব কাজ পারি, কিন্তু একটা কাজ পারি না। হাঁপানীর টান এলে পর আর আমার কিছুই ভাল লাগে না।

দীপ্তি। কিছুক্ষণ যদি তোর কিছুই ভাল না লাগে, তাই বলে কি সব সময়ের জন্যে একলা থাকবি? তোর কি—মানে—

উৎপলা। বল্ বল্, বলতে বলতে থামলি কেন? সত্যি কথাগুলো জানাও দরকার।

দীপ্তি। দূর, আমি ও-সব কথা মুখ ফুটে কারও কাছে বলতে পারি না।

উৎপলা। আমার কাছেও নয়?

দীপ্তি। শুধু তোর কাছে পারি। কানে কানে। কিন্তু আজকে নয়, আর একদিন বলব।

উৎপলা। দীপ্তি, তোর ভাইকে একবার ডাক তো এখানে। ওর মুখখানা যেন কেমন কেমন দেখাচ্ছে—তাই না?

দীপ্তি। খোকন, এদিকে আয় ত। তোর আর এক দিদি। বড়দিদি।

[শোভন বিন্দুবাসিনীর কাছ থেকে উঠে এসে উৎপলাকে প্রণাম করতে যায়, উৎপলা বাধা দেয়]

উৎপলা। আরে আরে, আমি কায়স্থ, শূদ্র—বড় জোর ক্ষত্রিয়ের মেয়ে। ব্রাহ্মণের প্রণাম কি নিতে পারি ভাই? এস, এস, বস এইখানে।

[শোভন উৎপলার কাছে এসে বসে। উৎপলা আদর করে কপালের উপর স্নেহের স্পর্শ বুলোয়, বলে]

ইস, কপাল যে পুড়ে যাচ্ছে।

দীপ্তি। আবার জ্বর এল। দেখত কাণ্ড, কিন্তু ম্যালেরিয়া ত হবার কথা নয়। বোধ হয় ইনফ্লুয়েঞ্জা।

উৎপলা। ওকে খাটে শুইয়ে দিয়ে আয়। ওর বোধ হয় শীত করছে। খোকন বুঝি তোর বাবার কাছে শোয়?

দীপ্তি। না, দিদুভাইয়ের কাছে। ওঠ খোকন।

[শোভনকে খাটে শুইয়ে দীপ্তি বেরিয়ে আসে, বলে]

আয় ভাই, তুইও আয়, ঘরে বসা যাক। সব জয়েই গরম জল খেতে দেওয়া ভাল, কি বলিস?

[উৎপলা দীপ্তির পিছনে যেতে যেতে বলে]

উৎপলা। তা হবে, আমি ভাই নার্সিংয়ের কিছুই জানি না।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সত্যজিতের ঘর

[সত্যজিতের ঘর। একটি টেবিল, একটি বুক-শেলফ, আর একটি সিঙ্গল-বেড তক্তাপোষ, টুকিটাকি আসবাবপত্র। দেওয়ালে হাতে-আঁকা বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, রম্যাঁ রোঁল্যা, আব্রাহাম লিঙ্কন প্রভৃতির চারকোল-স্কেচ। টেবিলের পাশে চেয়ারে বসে একমনে সত্যজিৎ লিখে চলেছে। একুশ-বাইশ বছরের সুদর্শন যুবক। একটি খাতা হাতে বন্ধু মনতোষের প্রবেশ।]

মনতোষ। না, এবার তোর ফার্ষ্টক্লাশ ফার্ষ্ট রাহু-শনি মিলেও আটকাতে পারবে না। প্রফেসর মুখার্জী বলছিলেন—

সত্যজিৎ। (মুখ ফিরিয়ে) বস বস, বিছানার ওপরেই বস। দাঁড়া, তোর সঙ্গে কথা কইব পরে। শেষ প্যারাগ্রাপটা লিখে নি।

[মনতোষ তক্তাপোষের উপর খাতাটা রেখে দেওয়ালের ছবিগুলি দেখে। সত্যজিৎ লিখে চলে। মনতোষ ঘুরতে ঘুরতে সত্যজিতের পিছনে এসে দাঁড়ায়। উঁকি দিয়ে দেখে, সত্যজিৎ কি লিখছে। অতর্কিতে খাতা টেনে নিয়ে মঞ্চের সম্মুখে এগিয়ে এসে চেঁচিয়ে পড়তে শুরু করে।]

মনতোষ। "…বাঙ্গালীর জীবন…? এ যেন অনন্ত অন্ধকার পথ বেয়ে দিনের পর দিন এগিয়ে চলা।

সত্যজিৎ। ভাল হচ্ছে না বলছি, মনতোষ। অন্তরের কথা কি চেঁচিয়ে পড়তে হয়?

মনতোষ। থাম তুই। বাঃ, ইংলিশের ছাত্র হয়েও তুই ত মন্দ লিখিস নি বাংলায়। তবে, তোর অনেক চন্দ্রবিন্দু ভুল। আমি ইকনমিকসের ছাত্র হয়েও চন্দ্রবিন্দুর ভুল করি না।

সত্যজিৎ। চন্দ্রবিন্দু সম্বন্ধে তোর কোন জ্ঞানই নেই। যতটা পড়েছিস, তার মধ্যে একটা অক্ষরেও চন্দ্রবিন্দু নেই। দে দে, আমাকে দে, আমি পড়ে শোনাচ্ছি। লিখছি একটা প্রবন্ধ, নাম দিয়েছি 'সাহিত্য ও সমাজ', বিশ্ববন্ধুর সম্পাদকের তাগিদে। কিছু টাকাও দেবে বলেছে।

মনতোষ। টাকার তাগিদে লিখছিস, না প্রাণের তাগিদে তাই আগে বল, তবে শুনব।

সত্যজিৎ। ঠিক জানি না, কিসের তাগিদে লিখি। তবে, মনে অনুভব যে একেবারে করি না, তাও ঠিক নয়।

মনতোষ। আমার কিন্তু সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা নেই। তাঁরা কলমের আঁচড়ে যতটা নিজেদের আদর্শবাদী বলে প্রচার করেন, হৃদয়ের নিভৃত কোণে তাঁরা এক-একজন—না আর বললাম না, প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, সত্যং ব্রূয়াৎ, মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।

সত্যজিৎ। সাহিত্যিককে কেন শুধু গালাগালি দিচ্ছিস? শিক্ষিত সমাজের লোকমাত্রেই আনকরচুনেট। মনের মধ্যে দুটো মানুষ এক দেহে বাস করে।

মনতোষ। মানে, তুমি বলতে চাও, বিংশ শতাব্দীর সব এডুকেটেড লোকই ডক্টর জেকিল ও মিঃ হাইডের আধুনিক সংস্করণ। মনে-মুখে এক হবার চেষ্টা করেও সব সময় হতে পারে না। শয়তান পিছনে লেগেই আছে। তাই বলতে চাইছিস ত?

সত্যজিৎ। আমি কিছুই বলতে চাই না। বুঝতে চাই। আচ্ছা ও কথা থাক। আমার লেখাটা একটু তোকে শোনাই। তোর অভিমতকে যদিও আমি খুব গুরুত্ব দি না।

মনতোষ। তবে একেবারে অগ্রাহ্যও কর না। ভাল হয় নি বললেই চোখ-মুখ লাল হয়ে ওঠে।

সত্যজিৎ। শোন, [সত্যজিৎ খাতা নিয়ে পড়ে শোনায়।]

তাই মাঝে মাঝে আমার বলতে ইচ্ছে করে—যাক, যাক সব ভেঙ্গেচুরে শেষ হয়ে যাক। এ পৃথিবী ধ্বংস হ'ক…তিলে তিলে মনুষ্যত্বের অপমৃত্যুর চেয়ে প্রলয়-বিনাশ, সেও বুঝি—

[সত্যজিৎ জলের গেলাস উঠিয়ে জল খায়, গেলাশটা টেবিলের কোণে রাখে, আবার পড়তে শুরু করে।]

সেও বুঝি—[সশব্দে জলের গেলাশ পড়ে যায় মেঝেয়। উত্তেজিত ও অন্যমনস্ক সত্যজিতের হাতে লেগে।]

মনতোষ। (এগিয়ে এসে মৃদুহাস্যে) দেখলি ত, আমার ভগবান চান না তোদের মত অবিশ্বাসীদের উত্তেজনায় পৃথিবীটা ধ্বংস হ'ক। তাই শুধু জলের গেলাসের উপর দিয়েই 'ক্যাটাষ্ট্রফি' অর্থাৎ জগতের ফাঁড়াটা কেটে গেল। বাঁচলাম, উঃ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। তোরা সাহিত্যের ছাত্রেরা সত্যি—সত্য কি বস্তু, তা কোন দিনই হয়ত চিনবি না।

সত্যজিৎ। (গেলাসটা উঠিয়ে)—কেন?

মনতোষ। কেন আবার, সহজ-সরল বস্তুর উপর ত তোদের লোভ নেই। সাহিত্য মানেই জিলিপির প্যাঁচ, তাই ত সাহিত্য আর সাহিত্যিকদের এড়িয়ে ইকনমিকস নিয়েছি। যেদিন পড়লাম শঙ্করাচার্য্য লিখেছেন মোহমুদগরে—অর্থম্ অনর্থম্, বুঝতে পেরেছিলাম তাঁকে। কারণ, তিনি সাধু পুরুষ। চাল, নুন, তেলের খবর রাখবার তাঁর প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী, কার্লাইল, রাস্কিন সবাই যখন কোমর বেঁধে লাগলেন অর্থনীতির বিরুদ্ধে তখন বুঝলাম—

সত্যজিৎ। কি বুঝলি?

মনতোষ। বুঝলাম, এরা সব রামখোকা। জীবন-বেদ অধ্যয়নের জন্য আধুনিক শূদ্রদের শূলে দিতেও এদের কিছুমাত্র আপত্তি নেই। অথচ এই শূদ্রদের সাহায্য না পেলে এদের একদিনও ব্রেড জুটত কিনা সন্দেহ। সুন্দরের নেশায় যারা অসুন্দরকে এড়িয়ে যেতে চায়—

[জুতোর শব্দ, ট্রামওয়ে ড্রাইভারের বেশে চক্রবর্তীর প্রবেশ। হাতে টিফিন-ক্যারিয়ার]

সত্যজিৎ। আসুন, আসুন, চক্রবর্ত্তী মশায়! এটি আমার বন্ধু মনতোষ। খালি পা, একি আপনি নিজে কেন টিফিন-ক্যারিয়ার বয়ে নিয়ে এলেন? শোভনের কি হ'ল? বসুন, চেয়ারে বসুন, না না বসুন, আমরা খাটে বসছি।

[খালি-পা চক্রবর্ত্তী ঘরের কোণে টিফিন-ক্যারিয়ার রাখে। সত্যজিতের এগিয়ে দেওয়া চেয়ারটা টেনে নেয়। সত্যজিৎ ও মনতোষ দুজনে খাটের উপরে বসে]

চক্রবর্ত্তী। শোভনের আইজ ভোর হইতেই জ্বর। তাই আমি আনলাম। মাইয়াটা বরো হইয়া গ্যাছে কিনা। আপনাগো এই মেসবাড়ীর হগগল লোকের মন ভাল নয়।—কইছিল দীপ্তি, আমি না হয় এক ফাকে দিয়া আসি। শুধু ঘরের দরজায় পৌছানই ত কাজ, তা আর পারমু না ক্যান? ক্যান, ক্যান—সব কথা কি মাইয়ারে বাপ হইয়া বুঝানো যায়! বড়ো খারাপ এই পাড়ার লোকেরা। তিলেরে তাল করিয়া লোকের দুর্নাম রটাইতে এই পাড়ার লোকের জুরী আর পাইবেন না। তাই দীপ্তিরে মানা করলাম।

সত্যজিৎ। তা বেশ করেছেন, কিন্তু আপনি, আপনি ত রোজ সময় পাবেন না।

[চক্রবর্ত্তী সত্যজিতের কথার উত্তর না দিয়ে মনের আবেগে বলে চলে]

চক্রবর্ত্তী। দীপ্তি কইছিল, সত্যজিৎবাবু ত আমাদের দাদারই মতন, দেবতুল্য লোক, কত এল, এ, বি, এ, পাশ করছেন —তাঁর দরজায় ঐ বাটি কয়টা পৌছাইয়া আমু, ইয়ার মধ্যে দোষ কি।

[হঠাৎ হাঃ হাঃ করে চক্রবর্ত্তী হেসে ওঠে

মাইয়াটা কি বলব সত্যজিৎবাবু—এমনই বোকা, কয় কি জানেন, মেট্রিক ফেল করছে এইবার, হাউ হাউ করিয়া কাঁদে, আর কয়, তার পরীক্ষার খাতা একজামিনারেরা হারাইয়া ফ্যালছেন। তাই সে ফেল করছে, না হইলে সে ফেল করতেই পারে না। আমি কই বুঝাইয়া—ফেল করছ মণি, তাইতে দোষ কি হইল। কোন্ বড়লোকের ঘরের মাইয়ারা তোমার চাইয়া—কি কন্ জিতুবাবু দুর ছাই, আপনার নাম—আমার জিহ্বার আগায় কেবল জিতুবাবু বাইর হয়। তা, জিতুবাবু নামটাও মন্দ নয়, হার ঐ আপনার যা নাম সেও ত জয়েরই ব্যাপার—কি কন্ আপনি?

সত্যজিৎ। তা বলুন না কেন জিতুবাবু, দুই অক্ষরের নাম বলাই সুবিধা। তবে কিনা আমি একটা সত্যও আজ পর্য্যন্ত জয় করতে পারি নি। না না, তা বললে ভুল হবে—একটা সত্য সম্বন্ধে আমার দৃঢ় ধারণা হয়েছে। দারিদ্র্য নিষ্ঠুর সামাজিক সত্য —চরম গ্লানি।

মনতোষ। সে চৈতন্য হয়েছে কি তোমাদের? তবে বাপু ইকনমিকসের ওপর এত রোষ কেন?

সত্যজিৎ। তোর কথাও একজন টোলের ছাত্র কবিতায় লিখেছে। যাদারিদ্র্য দোষো হি গুণরাশি নাশী।

চক্রবর্ত্তী। আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারাও এক ভাগ্যের কথা। কি সুন্দর করিয়া যে আপনি কথা গুছাইয়া লেখতে পারেন।

সত্যজিৎ। সে কি!! আপনি কি আমার লেখা পড়েছেন?

চক্রবর্ত্তী। না না, আমার কি সেই বিদ্যা আছে। তা হইলে ত কথাই ছিল না। এতদিন কি ট্রাম-ড্রাইভার হইয়া থাকতাম নাকি। দীপ্তি সেলাইয়ের ইস্কুলের মাষ্টারণী কিনা—অগো ইস্কুলের এক মাইয়ার কাছ হইতে চাইয়া নিয়া পড়ছে।

সত্যজিৎ। সেলাইয়ের স্কুলের মাষ্টারণী?

চক্রবর্ত্তী। হাঁ, দুপার বেলা হইতে বেলা চারট্যা পর্য্যন্ত কাজ করতে হয়। সেলাই, বোনন, আরও কত কি সব ব্যাপার আছে —যারে কয় টেলারিং। আমার মাইয়ার সেলাই যদি ছ্যাখতেন— ছেইলাটাও সোন্দর ছবি আঁকতে পারে। আমিও এককালে একটু-আধটু পারতাম কিনা। ওর গরভধারিণী তানারও শিল্পকাজে দেশজোড়া—[চক্রবর্ত্তী লজ্জিত হয়, শুধরে বলে] দেশজোড়া অর্থ ঐ গ্রামজোড়া যারে কয়। দূরদূরান্তর হইতে ভদ্দর ঘরের কত বউরা আইত সেলাই শ্যাখতে। আমার শ্বশুর—

[চক্রবর্ত্তী হঠাৎ হাত কচলে উঠে দাঁড়ায়]—মাপ করবেন আপনাগো সাথ কথা বলবার সুযোগ পাইলেই আমার জিহ্বারে আর বাগ মানাইতে পারি না। কেবলই কথা বলতে ইচ্ছা করে। আমি চললাম, আমার আবার ডিউটিতে যাইতে হইবে, আর আধঘণ্টাক্ষণ সময় আছে।

[চক্রবর্ত্তীর প্রস্থান]

মনতোষ। কে রে? চক্রবর্ত্তীমশায় বললি? ট্রাম-ড্রাইভারের পোশাক পরা কিন্তু—

সত্যজিৎ। কিন্তু ভদ্রলোকের মতন চেহারা। তা ট্রাম-ড্রাইভারেরা কি ভদ্রলোক হতে পারে না?

মনতোষ। পারবে না কেন। আমি তা বলি নি—মানে জানতে কৌতূহল হচ্ছে—টিফিন-ক্যারিয়ার দিয়ে গেলেন। দীপ্তিটি কে—শোভনের জ্বর হয়েছে—শোভনই বা কে?

সত্যজিৎ। দীপ্তি হ'ল চক্রবর্ত্তীর মেয়ে। শোভন হ'ল দীপ্তির ভাই।

মনতোষ। তা আন্দাজে বুঝতে পেরেছি, তা জানতে চাইছি না।

সত্যজিৎ। ও তুই জানতে চাইছিস আমার সঙ্গে এদের কি সম্পর্ক! সম্পর্ক কিছুই নেই। এরা হলেন পাকিস্থানের ব্রাহ্মণ। আমার বাবার মুহুরী মনমোহনবাবু তাঁর আত্মীয় এরা। এদেরও

একটু উপকার হয়, আর আমার খাওয়াটা স্বাস্থ্য ও ধর্ম্মসম্মত হয়, তাই—

মনতোষ। পেয়িং গেষ্ট ?

সত্যজিৎ। ঠিক তা নয়, থাকি মেসের দোতলায়। আর ওঁরা থাকেন—ঐ ছাখ, এখান থেকে কুড়ি ফুটও হবে কিনা সন্দেহ, ঐ বস্তীবাড়ীতে। জানলায় দাঁড়ালে ওঁদের উঠোন, ঢেঁকিঘর ও লাউয়ের মাচা পর্য্যন্ত দেখা যায়। ভোর রাত্রে যখন চক্রবর্ত্তী উঠে হাঁকে, কই রে দীপ্তি, হইল চা, তাও লেপের তলায় শুয়ে শুয়ে শুনতে পাই। বড় হতভাগ্য এই পরিবারটি।

মনতোষ। কি রকম ?

সত্যজিৎ। গুণী সঙ্গীতশিল্পী, ভাল কীর্ত্তন গাইতে পারেন চক্রবর্ত্তী, কিন্তু করেন ট্রাম-ড্রাইভারের কাজ। ওঁর স্ত্রী পাগল। একমাত্র ছেলে শোভন—নয়-দশ বছরের সুন্দর ছেলেটি, সেটি হ'ল বোবা—বড় জোর বলতে পারে দাঁ—দা—দি—দি—বা—বা—মা—মা। শ্বশুর-শাশুড়ীকে জবাই করেছে গুণ্ডারা। ওঁর শ্বশুরের অবস্থা নাকি ভাল ছিল। আর পোষ্যের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। বুড়ী মা এখনও বেঁচে। সুস্থের মধ্যে শুনি ঐ চক্রবর্ত্তী, আর ওঁর কালো মেয়েটি। এই চক্রবর্ত্তীর ছায়া নিয়ে একটা বাংলা রচনা করেছি, নাম দিয়েছি "ট্রাম-ড্রাইভার।" শোন্, তোকে একটু শুনিয়ে দি। একেবারে তোদের সাবজেক্ট, মানে মার্শাল সাহেবের অর্ডিনারী বিজনেস অব লাইফ নিয়ে লেখা—শোন্।

[সত্যজিৎ উঠে গিয়ে আবার চেয়ার টেনে টেবিলের প্বাশে বসে]

মনতোষ। (বিছানায় কাৎ হয়ে) শোনাও। তবে, কবিত্ব কি সাহিত্য করেছ কি, আমি ঘুমিয়ে পড়ব। তা বলে দিলুম। তার পর এখানেই ভোজনপর্ব্ব সমাধা করতে হবে। অর্থাৎ টিফিন-ক্যারিয়ারে তোমার জন্যে অবশিষ্ট আর কিছু থাকবে না। সেটা বুঝে তার পর পড়।

[লম্বাধরণের ছিপছিপে ক্ষীরোদের প্রবেশ]

ক্ষীরোদ। (মনতোষের দিকে তাকিয়ে) বাঃ, যা ভেবেছি তাই। ঠিক ভাবছিলাম, তোর সঙ্গে দেখা হবে এখানে আমার। কি কাণ্ড, তোর পিসীমা আবার আমার মাসীমার বেয়ান তা কি জানতাম। আমাকেও নেমন্তন্ন করেছেন আজ।

মনতোষ। (খাতার মধ্যে আঙ্গুল রেখে বন্ধ করে) হ্যাঁ, গোপেন বলছিল বটে সেদিন। কি যেন একটা, আই মিন, খুব দূর সম্পর্কও নয়, আছে বটে একটা সম্বন্ধ। তা ভালই হ'ল, এক সঙ্গে যাওয়া যাবে। শুয়ে পড় খাটে। (সত্যজিৎ গেঞ্জীর ওপর সার্ট পরে]

ক্ষীরোদ। সত্যজিৎ, চললি কোথায় সার্ট গায়ে ? আমি এলাম—

সত্যজিৎ। বোস, আসছি এখুনি। একটা ফাউন্টেন পেনের কালির দোয়াত কিনব।

ক্ষীরোদ। দোয়াত কিনবি, না কালি কিনবি ?

সত্যজিৎ। দোয়াতের মধ্যে কালি থাকে, সুতরাং একই কথা, বোস আসছি। [সত্যজিতের প্রস্থান]

ক্ষীরোদ। একই কথা! লজিকে লেটার পেয়েও লজিক ভুলে যায়।

মনতোষ। তোর লজিক রাখ। শোন্, সত্যজিতের লেখা শোন্। ওর মনটা যতটা রুক্ষ ধরণের ভেবেছিলাম, ততটা রুক্ষ ও নয় কিন্তু। মাঝে মাঝে এমন কথা বলে, যেন সারভাইভ্যাল অব দি ফিটেষ্ট থিয়োরীতেই ও পুরোপুরি বিশ্বাস করে। এমন কি পৃথিবীটা হাতের মুঠোয় ছাই হয়ে উবে গেলেও ওর বিশেষ কিছুই এসে যায় না, এমন ভাব দেখায়। কিন্তু, শোন কি লিখেছে। (মনতোষ পাতা ওলটায়)

ক্ষীরোদ জুতো খুলে সত্যজিতের বিছানাটা ভাল করে পাতে, সটান পা লম্বা করে বালিশের ওপর দুহাতের মধ্যে মাথাটা একটু উঁচু করে বলে।

ক্ষীরোদ। পড় দেখি, কি লিখেছে হতভাগাটা। বললাম ওকে, ফিলসফি নে।

মনতোষ। দূর দূর, ফিলসফি নয়—ইকনমিকস।

(মনতোষ তখনও খাতার পাতা ওলটায়)

ক্ষীরোদ। আচ্ছা, ওসব কথা হবে'খন পরে। পড় দেখি কি লিখেছে। জানিস, মিনতি চটে গিয়েছে ওর ওপর।

মনতোষ। চটল কেন ? ও, তোর চক্রান্ত—কবিতার লাইনগুলো মনে আছে ?

ক্ষীরোদ। সব মনে নেই। প্রথম লাইন দুটো হ'ল।

গোকুল, গোকুল, বাঁধো এ গাভী গোয়ালে।
চটিতা মিনতি আসে বঙ্কিম চোয়ালে।

মনতোষ। এ্যাঃ! এই কবিতা তুই দিয়ে এলি মিনতির হাতে! বললি সত্যজিতের রচনা! সত্যি ক্ষীরোদ, তোর নাম হওয়া উচিত ছিল নারদ।

(কালির দোয়াত হাতে সত্যজিতের প্রবেশ)

সত্যজিৎ—ক্ষীরোদ, ভাই আর একটু বস। আমি এক মিনিটে মাথাটা ধুয়ে আসি।

(সত্যজিৎ তোয়ালে টেনে নেয়, শার্টটা খুলে ব্র্যাকেটে রাখে, একশিশি গন্ধতেল হাতে নিয়ে, কি ভেবে সব টেবিলে পুনরায় রেখে, শেলফের পিছন থেকে একটা পালকের ঝাড়ন বের করে

দাঁড়া, ওঠ মনতোষ, তুই একটু খাটে গিয়ে বস। আমি টেবিলটা একটু ঝেড়ে দি। বড্ড ধুলো পড়েছে।

ক্ষীরোদ। (শুয়ে শুয়ে চোখ মিট মিট করে) ভাল ভাল সেলফহেলফ ভা। আমি কিন্তু কোনদিন—

সত্যজিৎ। (দরজা দিয়ে পুনরায় বেরিয়ে যাবার সময় মুখ ফিরিয়ে হেসে) দাঁড়া আসছি।

মনতোষ। কি বলছিলি, বলে ফেল।

ক্ষীরোদ। বলছিলাম নিজে নিজেকে কোনদিনই সাহায্য করি না, করবার প্রয়োজনও অনুভব করি না। ওসব কাজের ভার ছেড়ে দিয়েছি মিসেসের হাতে।

মনতোষ। ক্ষীরোদ, তোর মিথ্যে কথা বলতে একটু আটকায় না। মিসেস! মিসেস কোথায় তোর?

ক্ষীরোদ। প্রত্যেক যুবকের একটি মিসেস বা মিস আছে। অন্দরে না থাকলে অন্তত: অন্তরে থাকা উচিত। অন্তরেও যদি না থাকে, তা হলে নিশ্চয়ই প্রান্তরে আছে। থাকতেই হবে।

মনতোষ। যাঃ, যা তা বকিস নি। ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ। ব্রহ্মচারী হয়ে সাধনা না করলে বিদ্যা দেবীর আশীর্ব্বাদ পাওয়া যায় না।

ক্ষীরোদ। ওকথা আমি মানি না। আমাদের কল্যাণ হালদার এই ত সেদিন হেলসিং থেকে ফিরে এল। পথে মস্কো গিয়েছিল, সেখানে নাকি ছাত্রছাত্রীরা স্বর্গে বাস করে।

মনতোষ। কি রকম?

ক্ষীরোদ। ধর, তুই বিয়ে করলি মিস ধবলীকে।

মনতোষ। ধবল রোগ আছে যার, তাকে বিয়ে করতে যাব কোন দুঃখে?

ক্ষীরোদ। ঐ ত তোর দোষ। আমি কি বললাম তাই? ধবলী মানে ওখানকার শ্বেতাঙ্গিনী একটি বান্ধবীকে।

মনতোষ। তার পর?

ক্ষীরোদ। তার পর আর কি। ইউনিভারসিটি থেকে ফ্যামিলি কোয়ার্টার্স পাবি। দু'জনে লাইব্রেরীতে একটু বসবি। মাঝে মাঝে নোট নিবি। আর ছেলেপিলে যদি হয়ে পড়ে, তা হলে একস্ট্রা এলাওয়েন্স আদায় করবি। অবশ্য পিটিশন দিতে হবে। কি মজা! আমার ভাই রাশিয়ায় চলে যেতে ইচ্ছে করছে, এক্ষুনি! যদিও আমি ডেমক্রেসীভক্ত, তা হলেও বলব ডেমক্র্যাটরা ছাত্র ছাত্রীদের দিকে মোটেই আজকাল সুনজর দিচ্ছে না।

মনতোষ। দে একটা চিঠি ঝেড়ে পণ্ডিত নেহরুকে।

ক্ষীরোদ। তাই দেব ভাবছি।

(পুনরায় সত্যজিতের প্রবেশ)

(ক্ষীরোদ বিছানা ছেড়ে তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে, পকেট থেকে রুমাল বের করে জপের মালার মত রুমালটা হাতে নিয়ে আশীর্ব্বাদের ভঙ্গীতে)

বৎস সত্যজিৎ! এতক্ষণ তোমার জন্যে আমি শায়িত অবস্থায় বসেছিলাম। এইবার ভূতভয়সূদন ধূর্জ্জটির আদেশে আমি উঠে দাঁড়িয়ে তোমাকে আশীর্ব্বাদ জানাই।

অতঃপর হে অস্থিরচিত্ত ও অসত্যে প্রবঞ্চিত যুবক। তোমাকে নিমন্ত্রণ জানাই, আজ সন্ধ্যায়, হার মোষ্ট সুইটনেস কুমারী মিনতি চট্টোপাধ্যায়, বি-এ, অধুনা ফিফথ ইয়ার, রোল নং ১১, সাবজেক্ট ইংলিশ, এয়ারেস, অর্থাৎ মালটিমিলিয়নেয়ারস ওনলি ডটার এই পত্রবাহকের হাতে এই পত্রী দিয়ে (পকেট থেকে একটি নিমন্ত্রণ লিপি বের করে ক্ষীরোদ সত্যজিতের হাতে দেয়)

আদেশ জানিয়েছে, বন্ধুবর্গের মধ্যে কেউ যেন রাত্রে অন্যত্র আহার না করে, অনুরোধ করেছে—অন্য কেউ আসুক আর না আসুক।

সত্যজিৎবাবু যেন একবার অন্তত: তার জন্মদিনে শ্রীমুখটি দেখিয়ে আসে। খেলে খুশি হবে, না খেলে মর্ম্মাহতা হবে কি না স্পেশাল ইনষ্ট্রাকশান কিছুই পাই নি। এইবার ধূমপান করাও বৎস। হুঁকো হলেও চলবে। কণ্ঠে আমার আর সুর নেই। ভাষাও ফুরিয়ে এল।

সত্যজিৎ। (চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে) আমি যেতে পারব না। আমার বিশেষ জরুরী কাজ আছে সন্ধ্যার পর।

ক্ষীরোদ। তা সন্ধ্যায় যেতে না পার রাত্রে যেও। তাই বলে গভীর রাত্রে যেও না। সেটা ভদ্রবংশীয়া কুমারীর পক্ষে একটু এমব্যারাসিং হতে পারে।

তৃতীয় দৃশ্য

[চক্রবর্ত্তীর বাসাবাড়ীর বারান্দা। বারান্দায় বসে দীপ্তি। মাদুর বিছানো। রাত্রির আলোছায়া। একটি গ্যাস পোষ্টের আলো পাঁচিলের উপর দিয়ে বর্শার ফলকের মতন এসে পড়েছে বারান্দায়। দীপ্তির হাতে একটা জ্যামিতির বই। স্লেট-পেনসিল নিয়ে গ্যাসের আলোর দিকে ঝুঁকে দীপ্তি। গ্যাসের আলোয় একটি ত্রিভুজ আঁকবার চেষ্টা করছে। দরজার পাশে একটি মাদুরের উপরে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শোভন শুয়ে আছে। ঠাকুরমা বিন্দুবাসিনী মাদুরের এক কোণে বসে শোভনের কপালে পুরনো ঘি মালিশ করছেন। হারিকেন লণ্ঠনের চিমনি ফাটা, পোষ্টকার্ড দিয়ে খানিকটা ঢাকা। হারিকেন লণ্ঠনটি কমানো রয়েছে ঘরের দরজার বাইরে দেওয়াল ঘেঁষে। বারান্দায় শোভনকে পরিষ্কার দেখা যায় না। বিন্দুবাসিনীকে (একপাশ) খোলা দরজা দিয়ে দেখা যায়]

বিন্দুবাসিনী। অ দীপ্তি, তর মা নি ঘুমাইছে?

দীপ্তি। (স্লেটে আঁকা বন্ধ রেখে মুখ ফিরিয়ে) হ্যাঁ।

বিন্দুবাসিনী। স্লেট লইয়া কি আঁকে?

দীপ্তি। চতুর্ভুজ, ত্রিভুজ।

বিন্দুবাসিনী। অর্থ কি?

দীপ্তি। অর্থ কি আমি জানব কি করে? জ্যামিতি, জ্যামিতি। বোঝছ?

বিন্দুবাসিনী। বোঝব না ক্যান। আমাদের নি মূর্খ ভাব, ওই যে শরৎবাবুর পোলা মেসবাড়ীর সত্যজিৎ অর আজামশায়—মস্ত পণ্ডিত, রামজীবন ন্যায়রত্ন, তিনিও কইতেন তর বাবার বাবারে—ন্যায়শাস্ত্র শেখতে চাও, বৌদির লগে আগ হইতে পাঠ লও।

দীপ্তি। (ঠাকুরমার কথায় কান না দিয়ে) রাতভির নয়টা বাজল। বাবা ত এখনও ফিরে না। সত্যজিৎবাবুর টিফিন-ক্যারিয়ার পৌঁছাবে কে? সুশীলার ছোঁয়া ত খান না।

বিন্দুবাসিনী। ভাত ডাইল কি অন্য জাতের ছোঁয়া হইলে খাওয়া উচিত? অর বাবাও ত সন্ধ্যা আহ্নিক করেন শুনছি। দোকানের জিলাবিও খান না। বাপের ধারা নি পাইছে। আচার বিচারের নিষ্ঠা না থাকিলে কি ব্রাহ্মণ হওয়া যায়?

[দীপ্তি শ্লেট পেনসিল বই ইত্যাদি কুলুঙ্গীতে উঠিয়ে রেখে সদর দরজার বাইরে যায়, আবার ফিরে আসে। বিন্দুবাসিনী পূর্ব্বের মতন শোভনের কপালে পুরনো ঘি মালিশ করেন, মাঝে মাঝে বাঁ হাতে চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে শোভনকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করেন]

বিন্দুবাসিনী। দাদুসোনা, দাদুসোনা—ঘুমাইয়া পড়ো, কাইল ভোর হইলেই জ্বর ছাড়িয়া যাইবে। আমি শিব গড়িয়া বিল্বপত্র দিছি, আর ভয় নাই।

[হাত বাড়িয়ে দীপ্তি শোভনের কপালের উপরে হাত রাখে। দরজার গোড়ায় বসে সিঁড়ির উপর পা নামিয়ে]

দীপ্তি। জ্বর ত কম নয় দিদুভাই।

[শোভন বিছানা ছেড়ে উঠে বসে। মূক হলেও সে ইঙ্গিতে জানায়, সে টিফিন ক্যারিয়ারটা পৌঁছে দিতে পারবে]

না না, তুই শুইয়া থাক। আমি যাইতে পারতাম, কিন্তু বাবা যে মানা করে।

[শোভন আবার কাঁথামুড়ি দেয়, দীপ্তি রান্নাঘরের দরজা খুলে ভিতরে যায়। কুপী হাতে ফিরে আসে। কুপীটা হারিকেন লণ্ঠনের কাছে রাখে]

বিন্দুবাসিনী। রান্নাঘরের কুপী আনছিস ক্যান?

দীপ্তি। লণ্ঠনটায় তেল ভরতে হইবে। ফিতাও কাটা দরকার। দ্যাখো না কোণা উঠছে।

[ঠাকুরমার ঘরে ঢুকে দীপ্তি খাটের তলা থেকে একটি বোতল বের করে বারান্দায় আসে, হারিকেন লণ্ঠনে তেল ভরে হারিকেন নিভিয়ে ফিতে কাটে কাঁচি দিয়ে, ফিতে কাটতে কাটতে বলে]

দীপ্তি। দিদুভাই, তোমার বাতের ব্যথাটা এখন কি একটু কমছে?

বিন্দুবাসিনী। কি কইস তুই? আমার বাতের ব্যাদনা? তা, যেমন নাই থাক, বাতের ব্যাদনার লগে কোন কামটাই ফালাইয়া রাখছি—ক' তুই?

দীপ্তি। (মৃদু হাস্যে) তাই ত কইছি তোমায়। ঠ্যাকায় পড়লে তোমারে ছাড়া বলি কাকে? ঐ বাটি কয়টা লইয়া সিঁড়ি দিয়া ওঠতে পার যদি, তা হইলে সত্যজিৎবাবুর রাত্রে খাওয়া হয়। বাবা, কি জানি বারটার আগে ফিরতে নাও পারেন। কইয়া গেলেন ওভারটাইমের মরশুম পড়ছে, অনেক কয়জন ড্রাইভার নাও আসতে পারে ডিপোয় আইজ।

বিন্দুবাসিনী। (কপাল চাপড়িয়ে) হয় ভগমান! ইয়াও ল্যাখা ছিল আমার কপালে। যার নি শ্বশুরের ঘরের হাথনায় ভাতজল পাইতে ত্যাশ হুদ্দা ছাততরেরা পাত পাততো, তাঁনার ব্যাটার বউ কিনা যাইবে আইবা বাঁদী হইয়া—কোন বাবুর লগে ক্যারাইয়ার লইয়া!

[বুড়ী সুহাসিনী, বাতে পঙ্গুপ্রায়। উঠবার চেষ্টা করেন, কিন্তু পিঠ সোজা করে উঠতে পারেন না। দীপ্তি ছুটে যায়, ঠাকুরমাকে ধরে]

দীপ্তি। থাক্, থাক্ দিদুভাই, তুমি বরং এই জায়গায় বইসা থাক, খোকনের কপালে হাত বুলাইয়া দাও। আমি একবার সুশীলার খোঁজ নেই। তারে দিয়ে কইয়া পাঠাই, বাবু যেন আজকের রাতটার মতো নিজ হাতে ক্যারাইয়ারটা নিয়া যান। যদি আমাদের বারান্দায় খাইতে তাঁর আপত্তি না হয়, তা হইলে ত কথাই নাই।

[দীপ্তি আবার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় হারিকেন লণ্ঠন হাতে। ফিরে আসে একটু পরে। হাতে হারিকেন লণ্ঠন। দরজায় দাঁড়িয়ে ঠাকুরমার দিকে তাকায়]

বিন্দুবাসিনী। যাইতে পারবি একলা রাত্রবেলায়? ভয় করবে না?

দীপ্তি। ভয় কিসের। কয়টা বাড়ী পরেই ত সুশীলাদের বস্তী। গ্যাসের আলো জ্বলছে না। হারিকেনটা নিলাম। সুশীলাদের দরজার গোড়ায় আবার মস্ত এক গর্ত্ত আছে।

বিন্দুবাসিনী। সাবধান হইয়া যাস।

দীপ্তি। আমি আসছি। ভয় নাই।

[চট গায়ে সুশীলার প্রবেশ]

কি ব্যাপার—সুশীলা—তুমি? ঢুকলে কি করে? তাই ত! দরজা ত আমিই খুলে এলাম!—বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছি!

সুশীলা। দরজা খুলে রেখ না। ধর, আমি না এসে যদি চোর আসত!

দীপ্তি। নিত আর কি—ভাঙা বাসনকোশন, আর ছেঁড়া শাড়ী।

সুশীলা। (হেসে) তোমাকে সুদ্ধ চুরি করবার লোক এ পাড়ায় আছে। সাবধান হওয়াই ভাল।

দীপ্তি। ইস!

সুশীলা। ইশ বল না দিদিমণি, চোর-ছ্যাচড়দের আজকাল সাহস কতটা বেড়েছে, তা ত জান না তুমি!

[দীপ্তি লণ্ঠনটা হাত থেকে মেঝেয় নামিয়ে রাখে]

দীপ্তি। আচ্ছা, আচ্ছা, এবার থেকে না হয় আরও সাবধান হব। তার পর—তুমি হঠাৎ কি মনে করে?

সুশীলা। দিদিমণি, একটু দোক্তাপাতা দিতে হবে। দাঁতের

ব্যথাটা আবার বেড়েছে খুব। গিয়েছিলাম যাত্রা শুনতে, কিনব কিনব করে ভুলে গিয়েছি। দোকানও বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

দীপ্তি। যাত্রা শুনতে গিয়েছিলে কোথায়?

সুশীলা। রাজার বাড়ী। তোমাকে ত বললাম সকালে। কি এক ছাইপাঁশ যাত্রা!

দীপ্তি। ভাল নয় বুঝি?

সুশীলা। আগে থেকে জানলে যেতাম না। না আছে সাজ, না আছে পোশাক। কেবল বক্তিমে। অত বক্তিমে কি ভাল লাগে? ক্যাবলি শুনি—কাপড়চোপড় পরিষ্কার কর, যেখানে সেখানে থুতু ফেলো না।

দীপ্তি। তাই নাকি!

সুশীলা। শুধু কি তাই, আরও বলে, চাল খাও কম, রুটি খাও বেশী। দূর দূর—এ একটা যাত্রা নাকি!

দীপ্তি। ঢু'ঘণ্টায় যাত্রা শেষ হ'ল?

সুশীলা। ঝ্যাটা মার, ঝ্যাটা মার।

[দীপ্তি লণ্ঠনটা তুলে ঘরের কোণে কুলুঙ্গী থেকে একটা কৌটো বের করে। লণ্ঠনের আলোয়, একটুখানিক দোক্তার পাতা ছিঁড়ে সুশীলাকে দেয়]

দীপ্তি। হবে এতে?

সুশীলা। হবে।

দীপ্তি। দিদুভাই, তোমার কৌটো থেকে একটু তামাকপাতা দিলাম।

বিন্দুবাসিনী। দিছ, দিছ, আবার কওনের কি প্রয়োজন!

দীপ্তি। সুশীলা তুমি নিজেই এসে গিয়েছ, আমায় আর যেতে হ'ল না তোমার কাছে। আমিও যাচ্ছিলাম তোমার বাসায়। দিদুভাই ভয় পাচ্ছিল।

সুশীলা। আমার কাছে যাচ্ছিলে? এত রাত্রিতে? কেন—কি হয়েছে?

দীপ্তি। তোমাকে একবার সত্যজিৎবাবুর কাছে যেতে হবে। শোভনের জ্বর, বাবা কখন ফিরবেন ঠিক নেই। তিনি যদি টিফিন-ক্যারিয়ারটা নিজে এসে নিয়ে যান। যদি আপত্তি না থাকে, আমাদের বারান্দায় বসেও খেয়ে যেতে পারেন।

সুশীলা। (হেসে ও ভ্রূকুটি করে) আ মরণ আবার! এইজন্যে আবার দিদিমণিকে যেতে হচ্ছিল আমার কাছে, এত রাত্রে। ভারী ত বাবু, থাকেন এক ভাঙা বাড়ীর ঘরে। কি এমন লাটসাহেব যে, তোমাদের বাড়ী এসে খেয়ে যেতে পারবেন না! আচ্ছা, যাচ্ছি আমি। একটু চুণ দাও দিকি।

[দীপ্তি খাটের তলায় চুণের পাত্র থেকে একটু চুণ তুলে সুশীলাকে দেয়]

দীপ্তি। সুশীলার গরম শালটা ত বেশ।

সুশীলা। (গায়ের চটের দিকে চোখ ফিরিয়ে) তা দিদিমণি আমাদের চট ছাড়া পশমি শাল দেবে কে!

দীপ্তি। আচ্ছা, ওতে শীত যায়? তা হলে আমিও একটা চট কেটে বানিয়ে নেব।

সুশীলা। তুমি দিদিমণি কেন এ পরবে? না না, ছিঃ, আমাদের কি তোমার মতন বয়েস আছে! তোমার মতন ঢলঢলে মুখই কি কোনদিন আমাদের ছিল গো।

দীপ্তি। যাও, তুমি কেবল বাড়িয়ে বল। আমি ত কালো কুচ্ছিৎ। চট যদি পরি, কারও কিছু এসে যাবে না।

সুশীলা। ইস, তাই বুঝি। তোমার মতন চোখ-মুখ কার? কতই বড়লোকের মেয়ে দেখলাম, সব মোটা ধুমসো, রংটাই শুধু ফর্সা।

দীপ্তি। (হেসে) আচ্ছা হয়েছে, যাও এইবার। সত্যজিৎ-বাবুকে খবর দাও। রাত্রি হয়ে যাচ্ছে।

[সুশীলার প্রস্থান]

[দীপ্তি আবার জ্যামিতির বই ও শ্লেট-পেন্সিল নিয়ে বসে।]

বিন্দুবাসিনী। অ' দিদুভাই, শোনছ!

দীপ্তি। কি কও।

বিন্দুবাসিনী। খোকন ত'রে গান করতে কয়।

দীপ্তি। আমি জ্যামিতি পড়ছি, এখন নয়। জ্বর হইছে শুইয়া থাকুক।

[ভিতর থেকে শোভনের গলা শোনা যায়—না-না-না-দি-দি-দি—]

চুপ করিয়া শুইয়া থাক্—এত রাত্রে গান গাওয়া যায় নাকি!

বিন্দুবাসিনী। কাল সকালে শুনাইবে, ঘুমাও।

[শোভনের না না—গা-গা —গা-ন আবার শোনা যায়]

আচ্ছা, তবে আমি ছড়া শুনাই। চক্ষু বুজিয়া ঘুমাইতে ঘুমাইতে শোনতে হবে কিন্তু।

দীপ্তি। (জ্যামিতির বই হাতে) ঘুমাইতে ঘুমাইতে তোমার ছড়া শোন্‌বে কি করে?

বিন্দুবাসিনী। শোনা যায়, শোনা যায়। পোলাপানেরা শোন্‌তে পায়। আমার যখন বয়স ছয়, দিদি-শাশুড়ীর ঘরে শুইতাম, তিনি এই ছড়া কাটতেন, আমরা দু'জনাই ঘুমাইতে ঘুমাইতে শোন্‌তাম, আর ঘুমাইয়া পড়তাম।

[বিন্দুবাসিনীর দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে]

দীপ্তি। দিদুভাই, তোমার বরের বয়স ছিল কত? তিনিও ঘুমাইতেন তোমার সাথে, তোমার দিদি-শাশুড়ীর বিছানায়।

বিন্দুবাসিনী। ইহাতে দোষ কি। আমি একধারে, মধ্যখানে তাহার ঠাকুরমা, তার পর উনি।

দীপ্তি। শুনছি নাকি, তিনি তোমারে ধরিয়া মারতেন খুব।

বিন্দুবাসিনী। কার কাছে শোন্‌ছ—মিথ্যা কথা। আমারে মারতেন উনি—তা হইলে হাত কাঁমড়াইয়া রক্ত বাইর করতাম

না ! চুল ধরিয়া হঠাৎ টান দেওয়া একটা রোগ ছিল এই যা, না হইলে অমন আমা-অন্ত প্রাণ আর কাউরে দেখি নাই।

দীপ্তি। তোমা-অন্ত প্রাণ আর কয়জনকে দেখতে চাও ?

বিন্দুবাসিনী। হ, কথাটা ঠিক বলা হয় নাই। আমারে খুব ভয়ও করতেন—

দীপ্তি। তোমারে ভয় না করলে, আর কারে ভয় করবেন কও।

বিন্দুবাসিনী। ক্যান আমারে ভয় করবেন ? কি কইস তুই ! আমি কি বাঘ-ভাল্লুকের মতো ছাখতে নাকি ?

দীপ্তি। আউ ছিঃ, বাঘ-ভাল্লুকের নাম লও ক্যান ? অন্ধকারের মধ্যে তুমি হইলে আলোকের বিন্দু। তোমা-অন্ত প্রাণ আর একজনাও আছে।

বিন্দুবাসিনী। কি কইস আবার ? কিটা সেইজন ?

দীপ্তি। বেশী দূর নয়, নিকটেই আছে।

[নেপথ্যে কড়ানাড়া ও ডাক শোনা যায়]

—কই দিদিমণি, দরজা খোল। বাবু দাঁড়িয়ে আছেন।

[দীপ্তি হারিকেন লণ্ঠন হাতে মঞ্চের উপর দিয়ে ছুটে যায়। সদর দরজা খোলে।]

দীপ্তি। (আঁচলটা গলার উপর আর একটু ভালভাবে জড়িয়ে) আসুন। উঠোনটা একটু দেখে আসবেন।

[দীপ্তি হারিকেন নিয়ে এগিয়ে যায়, পিছনে পিছনে সত্যজিৎ মঞ্চের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়, বলে]

সত্যজিৎ। ও, তুমি বুঝি দীপ্তি ! তোমার কথা শুনেছি অনেক সুশীলার কাছে। ওটা বুঝি রান্নাঘর ? কি ওটা ?—প্রদীপ নয় বুঝি ?

দীপ্তি। কুপী।

সত্যজিৎ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কুপী—জানি জানি, এইবার নামটা মনে পড়েছে। বাংলা দেশে বেশীর ভাগ রান্নাঘরেই কুপী জ্বলে। কালির দাগ লেগে যায়, এই যা মুশকিল। হঠাৎ কিন্তু নেভে না।

দীপ্তি। না, জোর বাতাস এলে নিভে যায়।

[দরজায় দাঁড়িয়ে সুশীলা এতক্ষণ দু'জনের দিকে তাকিয়ে ঈষৎ হেসে দোক্তার পাতা ছিঁড়ে মুখে পোরে]

সুশীলা। (চেঁচিয়ে) দিদিমণি, সদর দরজা বন্ধ কর, কুকুর ঢুকবে। দাদাবাবু—এইবার আমি যাই।

সত্যজিৎ। (মুখ ফিরিয়ে, স্মিত হাস্যে)—আচ্ছা এস।

[বারান্দায় একটি আসনের উপর সত্যজিৎকে বসিয়ে হারিকেনটা নাবিয়ে রাখে দীপ্তি। ফিরে গিয়ে সদর দরজা বন্ধ করে ফিরে আসে সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায়, তার পর খোলা দরজা দিয়ে ঠাকুরমার ঘরে ঢোকে। আবার বারান্দায় ফিরে আসে।]

সত্যজিৎ। (দীপ্তির দিকে একনজরে তাকিয়ে)—হারিকেনটা এখন জ্বলছে বটে, কিন্তু যে হাওয়া তাতে তোমার আলো নিভে না যায়, ভয় হচ্ছে।

দীপ্তি। (মৃদু হাস্যে) নিভবে না।

[হারিকেনটা সত্যজিতের সামনে রেখে, দীপ্তি রান্নাঘরে প্রবেশ করে। একঘটি জল এনে সত্যজিতের সামনে খানিকটা জায়গায় ধুলো-জলের ছিটে দিয়ে মুছে দেয়। বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে ঘটি থেকে জল ঢেলে হাত ধুয়ে ফেলে। তার পর ঘটিটা হাতে নিয়ে আবার রান্নাঘরে ঢোকে। একটু পরে থালা ও জলের গেলাস ও টিফিন-ক্যারিয়ার হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসে। টিফিন-ক্যারিয়ার খুলে একে একে ক'খানা রুটি সাজিয়ে দেয়। একটু নুনও দেয়। সত্যজিৎ অন্য দিকে মুখ করে—দেখতে পায় না।]

সত্যজিৎ। নুন দিয়েছ ?

দীপ্তি। দিয়েছি। বসুন, খেতে বসুন। এই বাটিতে তরকারী, এই বাটিতে মাছ।

সত্যজিৎ। তা ত দেখতেই পাচ্ছি।

দীপ্তি। হাত ধোবেন ?

সত্যজিৎ। তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন ! আমার যা প্রয়োজন তা আমি জানি, মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই।

(দীপ্তি অপ্রস্তুত ভাবে ঘাড় হেঁট করে)

তোমাদের বাসাটা কিন্তু ভারী পরিষ্কার। আমার ভাল লাগছে। —মানে, বেশ, ভাল লাগছে। পরিষ্কার রাখতে হলে খাটতেও হয়। (দীপ্তি মুখ তোলে)

দীপ্তি। (সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে)—রুটিগুলো গরম করে দেব ? এখনও বোধ হয় উনোনে আগুন আছে।

সত্যজিৎ। (বারান্দা থেকে নেমে এসে, চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে)—তুমি নিশ্চিন্তে বস। আমার রুটির জন্যে চিন্তার কারণ নেই। কারণ রোজই আমি ঠাণ্ডা রুটি খাই। আচ্ছা, জানলায় দাঁড়িয়ে তোমাদের ঢেঁকিঘর দেখি রোজ। কলকাতাতেও ঢেঁকি ! ঢেঁকি দিয়ে কি কাজ হয় ?

দীপ্তি। ওটা বরাবরই ছিল। বেলগেছিয়া কলকাতার মধ্যে হলে কি হবে, আশেপাশে অনেক তরকারী-ক্ষেত আছে। ঢেঁকি দিয়ে খোল কুটে জমিতে সার দেয়। মালীরা কেউ কেউ চিঁড়েও কোটে। বাবা সারিয়ে নিয়েছিলেন। প্রথমটা আমরা ভেবেছিলাম ধান কিনে চাল করব।

সত্যজিৎ। করলে না কেন ?

দীপ্তি। ধান পাওয়া মুশকিল। তা ছাড়া সেলাই-স্কুলে একটা কাজ পেয়ে গেলাম। ভাবছি কারি-পাউডার করে বোতলে ভরে সস্তায় বাড়ী বাড়ী বিক্রয় করা যায় কিনা।

সত্যজিৎ। খবরদার, খবরদার, ও চেষ্টা করতে যেও না। সুপরামর্শ দিচ্ছি।

দীপ্তি। (বিস্মিতভাবে)—কেন?

সত্যজিৎ। (গম্ভীরভাবে)—কারণ, যে বাড়ীতেই যাও না কেন, সেই বাড়ীর গিন্নীমা বলবেন, হলুদের বদলে ধুলো মিশিয়েছ।

দীপ্তি। তাই বুঝি!

(সত্যজিৎ আবার বারান্দায় উঠে বসে)

সত্যজিৎ। উঠোনের ও-কোণে রজনীগন্ধা, আবার লাউয়ের মাচাও দেখতে পাই। এগ্রিকালচার করে কে? তুমি না, তোমার বাবা?

দীপ্তি। আমি, আর শোভন—বাবার সময় কোথায়? ওকি, খান! রান্না এবেলা কেমন হয়েছে কি জানি।

[সত্যজিৎ দীপ্তির চোখে গভীর দৃষ্টিতে তাকায়। এক মুহূর্ত্তের জন্য চার চোখ এক হয়। দীপ্তি মুখ নীচু করে]

সত্যজিৎ। না, রান্নার চেহারা দেখে খাশা মনে হচ্ছে! খেতেও নিশ্চয় খাশা হবে! তোমার রান্নার নিন্দে করবে যে, সে সত্যিই নিন্দুক।

(দীপ্তি আবার মুখ নীচু করে)

আচ্ছা, কাল থেকে যদি আমি নিজে এসে তোমাদের বারান্দায় খেয়ে যাই, তা হলে তোমাদের একটু সুবিধে হয়—না?

দীপ্তি। তা একটু হয়।

সত্যজিৎ। কাল থেকে আমি নিজে এসে খেয়ে যাব। শোভন বা তোমাদের কারুর হাতে টিফিন-ক্যারিয়ার পাঠাবার দরকার নেই।

(সত্যজিৎ থালাটা কোলের দিকে টেনে নেয়)

হো চী মীন

শ্রীমোহনলাল চট্টোপাধ্যায়

হাহা হাহা বুকের মাঝে হঠাৎ এ কি ব্যাকুল বীণ!
বৈরাগী গো প্রণাম তোমায়, দীনের বন্ধু হো চী মীন!
অঙ্গ কাঁপে, কণ্ঠে কাঁদন, এ কি স্মৃতির সঞ্চরণ!
ভাঙ্গীসখা হে প্রাণপ্রিয় শিষ্য তোমার এ কোন্ জন?
তনুটি তার কঠিন-ঋজু তাপসপারা মুখের ভাব,
দৃষ্টি অতি শান্ত সুদূর হাস্য মধুর প্রসন্নাভ।
সেরা হাতের ডাকে অটল রইলে, মনে কিসের ঘোর?
ছটাক পথে যানের পাড়ি? পায়ে তোমার অনেক জোর।
ধন্য তুমি ঠিক বুঝেছ দেশের যত গরীব দল
একটু পথের আশায় শুধু, জানে অধিক সুনিষ্ফল।
রাষ্ট্রাভিনার সজ্জা না ও বর্ণ যাহার অলক্ত,
সারা দেশের হাজার দুখীর কঠোর-শ্রম রক্ত।
বীরকেশরী চরণ তোমার ওখানে কি পড়তে পারে?
কৃচ্ছ সাধক গুরু তোমার স্মরণে আজ বারে বারে।
ঐ দেখা যায়, ঐ দেখা যায় পরিক্রমী পা দুটি,
চীরবসনের রৌদ্রনাশা সিক্তবারি খণ্ডটি।
পিতার মত ত্রুটির 'পরে অসীম স্নেহের পক্ষপাত,
বিপুল আঁধার স্তব্ধ ভেদি' অন্তরে কার আলোকপাত?
হায় কতকাল পরে আবার পড়ছে মনে পড়ছে গো!
রতন-আসন অস্বীকারের মর্ম্ম সবাই বুঝছে গো!
হায় কতকাল পরে আবার বাংলা মায়ের দামালটিরে
কুলিশ-কোমল ভঙ্গিভরে হঠাৎ তুমি দিলে ফিরে!
বাংলা মায়ের যোদ্ধ তনয় কল্পনা তাঁর সুদুর্গম,
ক্ষুৎ-পিপাসার সমান ভোগে কোহিম দেশে পারঙ্গম।
কালের নূতন আবর্ত্তনের আমন্ত্রিত উদ্বোধী
একলা চল কিসের তেজে একটু বলে যাও যদি!
একলা চল কিসের বলে মূর্ত্তিমন্ত ভিয়েটমীন?
বৈরাগী গো প্রণাম তোমায় দীনের বন্ধু হো চী মীন।

'জীবনস্মৃতি'

শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

[আমি অজ্ঞাত অখ্যাত—আমার জীবনস্মৃতির অনুমাত্র মূল্যবত্তা নাই, বেশ জানি; তবে এই নিরর্থক প্রয়াস কেন?—উত্তরে বক্তব্য—সাধারণ পাঠকের নিকটে ইহা একেবারেই ব্যর্থ, সত্য, কিন্তু আমার অধস্তন সন্তান-পরম্পরায় কাহারও আমার জীবন-বৃত্তান্ত জানিবার কৌতূহল হইতে পারে মনে করিয়া তাহাদেরই ঔৎসুক্য নিবারণার্থ এই জীবনস্মৃতির সংক্ষেপ।]*

পিতামহ কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। যশোহর জেলার অন্তর্গত ঝাপামস্তিনগরে তাঁহার পৈতৃক ভিটা। তিনি একপ্রকার যাযাবর ছিলেন, অর্থাৎ তিনি এক স্থানে অধিক দিন অবস্থান করিতে পারিতেন না। আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের সহিত দেখা করা প্রসঙ্গে তিনি মধ্যে মধ্যে প্রায়ই ঘুরিয়া বেড়াইতেন। ২৪পরগণা জেলার, বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত যশাইকাটি গ্রামের সমৃদ্ধ রায়-বংশের রামসুন্দর রায়ের মধ্যমা কন্যা গোপীমণি দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বাড়ীর নিকটেই শ্বশুরমহাশয় যে একটু ব্রহ্মোত্তর জমি তাঁহাকে দিয়াছিলেন, তিনি সেখানে একটি ছোট ঘর নির্ম্মাণ করেন। পিতামহী পুত্র-কন্যার সহিত এইখানে বাস করিতেন। তাঁহার বাবার বাড়ীতে অতিথি ও কুটুম্বগণের সমাগম প্রায়ই হইত। আমার পিতামহী যেমন পরিশ্রমী তেমনই ভাল রাঁধুনী ছিলেন। বাবার বাড়ীতে এইরূপ আত্মীয়াদি সমাগমে যে নৃযজ্ঞ (অর্থাৎ অতিথি প্রভৃতির ভোজনের জন্য যে অনুষ্ঠান) হইত, তিনি তাহার সুনিপুণ পাচিকা ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র। আমার পিতা নিবারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জ্যেষ্ঠ পুত্র ও কনিষ্ঠ উমেশচন্দ্র। কনিষ্ঠের অল্প বয়সেই মৃত্যু হয়। পিতার বয়স যখন সাত বৎসর তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। মাতামহ তখন স্বর্গগত। মাতুল নীলকণ্ঠ তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। নিবারণচন্দ্রের বয়স যখন ১২ বৎসর তখন ২৪পরগণা জেলার অন্তর্গত বসিরহাট মহকুমার রামনারায়ণপুর গ্রামনিবাসী বালকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যম কন্যা পঞ্চমবর্ষীয়া জগৎমোহিনী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। আমিই পিতামাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান। এই মাতুলালয়ই আমার জন্মস্থান। ১২৭৪ সালের ১০ই আষাঢ় (১৮৬৭ সনের ২৩শে জুন) রবিবার, শতভিষা নক্ষত্রযুক্ত ষষ্ঠী আমার জন্মতিথি।

বাবা জমিদারীতে কাজ করিতেন। মধ্যে মধ্যে রামনারায়ণ-পুরে আসিতেন ও যশাইকাটির বাটীতে মাকেও দেখিতে যাইতেন। আমি মার সহিত মামারবাড়ীতেই থাকিতাম। আমরা চার সহোদর। দ্বিতীয় ও চতুর্থের শৈশবেই মৃত্যু হয়। তারাচরণ তৃতীয়। চার বৎসর বয়সে আমি মায়ের সহিত যশাইকাটীর বাটীতে গিয়া-ছিলাম। পল্লীতে নিকটেই একটি ছোট বঙ্গ-বিদ্যালয় ছিল। মনে হয় এই বিদ্যালয়েই আমার বিদ্যারম্ভ। পাঁচ-ছয় বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমি এইখানেই বাংলা পড়িয়াছিলাম। পরে রামনারায়ণপুরে আসি। সে সময় বসিরহাটে একটি মাইনর স্কুল ছিল। নয় বৎসর বয়সে আমি মামাত ভাইদের সঙ্গে সেই স্কুলে পড়িতে যাইতাম। সীতানাথ মুখোপাধ্যায় তখন বসিরহাটের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহারই উদ্যোগে ও বিশেষ চেষ্টায় এই মাইনর স্কুল, হাইস্কুল হয়। এই স্কুলে আমি পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলাম। তখন আমার বয়স প্রায় বার বৎসর। এই সময়ে আমার পাঠ্যবিষয় সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। হাইস্কুল ছাড়িয়া মধ্যবাংলা ছাত্রবৃত্তির স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলাম। মনে হয় এই সময় পড়াশুনায় কিছু রস পাইতাম। এইখানে একবার পরীক্ষার ফল কিছু খারাপ হওয়ায় প্রধান শিক্ষক মহাশয় আমাকে যে তিরস্কার করিয়াছিলেন তাহা বেশ একটু কটু হইয়াছিল। আমি পিতাকে এ বিষয় জানাইলে, তিনি আমাকে এই মধ্যবাংলা ছাত্রবৃত্তির স্কুল হইতে ছাড়াইয়া মাতুলালয়ের নিকটেই চাঁপাপুকুরিয়া গ্রামের উচ্চপ্রাথমিক (upper primary) বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। পর বৎসর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া এক বৎসরের জন্য মাসিক দুই টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলাম। তৎপরবৎসর মধ্য বাংলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলাম। এই সময়ে বাদুড়িয়ায় লণ্ডনমিশনারী হাইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইংরেজী পড়িবার জন্য আমি মায়ের সহিত যশাইকাটীর বাটীতে আসিলাম এবং ঐ স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলাম। বাদুড়িয়া স্কুলে আমার সহপাঠী শ্রীশচন্দ্র দত্তের সহিত বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। প্রায় দুই বৎসর পর যখন আমি তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি তখন ঐ স্কুল আগুনে পুড়িয়া যায়। এই সময়ে আড়বালিয়া ও ধান্যকুঁড়িয়ায় দুইটি হাইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। বন্ধু শ্রীশ (শ্রীশচন্দ্র দত্ত) আড়-বালিয়ায় এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে গৃহশিক্ষকতার ব্যবস্থা করিলে, আমি সেইখানে থাকিয়া আড়বালিয়া হাইস্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতে আরম্ভ করি। দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইলে আমি ধান্য-কুঁড়িয়া হাইস্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হই। এখানে একটি ছাত্র পড়াইয়া যাহা পাইতাম তাহাতে বোর্ডিং-এর খরচ চলিত। এই সময়ে গ্রীষ্মাবকাশে আমি কলিকাতা যাই। গাড়ীতে আমার সমবয়স্ক একটি যুবার সহিত আমার পরিচয় হয়। ইহার নাম শশিভূষণ দাস, বাস বাদুড়িয়ায়। শশির সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তায় জানিতে পারিলাম শ্রীশের সহিত তাহার বন্ধুত্ব আছে। আমি

* শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুলিখিত।

শ্রীশের নিকট ইহার নাম পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম। তখন শশিকে শ্রীশের সহিত আমার বন্ধুত্বের কথা বলিলাম। এইরূপ কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তায় তাহার সঙ্গে আমার বেশ একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইল; সুতরাং সম্ভ্রম ছাড়িয়া উভয়ে বন্ধুর মতই কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলাম। সে বলিল, "তুমি কোথায় পড়?" আমি ধাত্রকুঁড়িয়া বিভালয়ের নাম করিলাম। তখন সে বলিল, "আমি কলিকাতায় জেনারেল এসেম্বলীজ ইন্‌ষ্টিটিউসনে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি। তুমি এইখানে এস, আমার সঙ্গে পড়।" আমি বলিলাম, আমি দরিদ্র, এত টাকা কোথায় পাইব?" সে বলিল, "সাহেবেরা বড় দয়ালু। তুমি এস, খরচের বিষয় পরে ব্যবস্থা করা যাবে।"

আমার বড়দাদা (পিসতুত দাদা) যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সদরে খাজাঞ্চি ছিলেন। আমি শশির পরামর্শে গ্রীষ্মাবকাশের পর কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার বাসায় থাকিয়া শশির সহিত স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতে আরম্ভ করিলাম। স্কুলের একজন শিক্ষকের সহিত শশির বিশেষ পরিচয় ছিল। সাহেবেরা তাঁহাকে ভালবাসিতেন। শশি আমাকে তাঁহার বাসায় লইয়া গেল ও আমার পরিচয় দিয়া বলিল, "এ দরিদ্রের ছেলে, স্কুলে যদি একটু ব্যবস্থা করে দিতে পারেন ত ভাল হয়।" তিনি বলিলেন, "আগামী পরীক্ষার ফল দেখে এ বিষয় ব্যবস্থা করব।" এইরূপ কথাবার্ত্তার পর আমরা চলিয়া আসিলাম। মফস্বল স্কুল হইতে আসিয়াছি এখানকার পরীক্ষা সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণা নাই সুতরাং সাহায্য সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তিত হইলাম।

তখন ক্লাসে ছাত্র সংখ্যা প্রায় আশি। আমার বিদ্যাবুদ্ধির গভীরতা বেশ জানিতাম, তাই এত ছাত্রের মধ্যে আমার পরীক্ষার ফল যে বিশেষ অনুকূল ও সুবিধাজনক হইবে তাহা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। তবে পক্ষান্তরে ভবিতব্যতা ভাবিয়া একেবারে নিরাশও হইলাম না। পরীক্ষার্থ প্রস্তুত হইলাম, পরীক্ষাও দিলাম, যথাসময়ে ফলও বাহির হইল। কিন্তু শশিকে পরীক্ষার ফল জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। কি জানি কি অপ্রিয়ই না শুনিব, নীরবই রহিলাম। শশিও আমাকে কিছুই বলিল না। পরীক্ষার পরে নিয়মিত ক্লাসে পড়া আরম্ভ হইল। তখন রেজিষ্টারে লিখিত নামের সংখ্যায় জানিলাম পরীক্ষার ফলে আমি প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়াছি। সাহস করিয়া তখন শশিকে পরীক্ষার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল, "তুমি জান না?—তোমার পরীক্ষার ফল ভালই হয়েছে। পরীক্ষায় তুমি দ্বিতীয় হয়েছ। বিনা বেতনে পড়তে পারবে।" ইহা জানিয়া বড় আনন্দ হইল—আনন্দ হইল, ভগবৎকৃপায় আশাতীত সুফল জানিয়া, আর দরিদ্র আমার পাঠোন্নতির পথ অবাধ হইল ভাবিয়া। ছাত্র অবস্থায়ই শশির এই বন্ধুচিত সহৃদয়তার পরিচয় জীবনে ভুলিবার নয়। বিশেষ দুঃখের বিষয় শশি আজ ইহজগতে নাই।

এই স্কুলে পড়িয়া প্রবেশিকা (এন্‌ট্রান্‌স) পরীক্ষা দিলাম এবং উত্তীর্ণ হইয়া পর বৎসর কলেজে এফ, এ, ক্লাসে ভর্ত্তি হইলাম। ছেলে পড়াইয়া বেতন সংগ্রহ করিতাম, কিন্তু অর্থাভাবে পাঠ্যপুস্তক সবগুলি কিনিতে পারিলাম না। কোথাও হইতে সংগ্রহ করাও সম্ভব হইল না, ফলে সে বৎসর বৃথা গেল। ভাবিলাম অর্থাভাবে হয়ত এখানেই আমাকে লেখাপড়া শেষ করিতে হইবে।

এই সময়ে শুনিলাম পটলডাঙ্গার মল্লিকবাবুদের ফণ্ড হইতে মেট্রোপলিটন কলেজে ছাত্রদের বেতন দিবার নিয়ম আছে। যখন দেশে পড়িতাম তখন রবীন্দ্রনাথ আমাকে মাসিক কিছু সাহায্য করিয়াছিলেন। বড়দাদা সেই কথা বলিয়া, রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে আমাকে এ বিষয়ে একটি সার্টিফিকেট লইয়া দিয়াছিলেন। সার্টিফিকেটের কথাগুলি আমার ঠিক মনে নাই।

তবে তার ভাবার্থ এইরূপ: এই বালকটি দরিদ্র। আমি ইহাকে কিছুদিন বৃত্তি দিয়াছিলাম। এ কোনও স্থান হইতে সাহায্য পাইলে সুখী হইব।

মল্লিকবাবুদের ফণ্ডে সাহায্যের জন্য আমি একখানি দরখাস্ত করিলাম ও তাহার সহিত এই সার্টিফিকিট গাঁথিয়া ফণ্ডের সভাপতি ইণ্ডিয়ান মিররের এডিটর নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের নিকট গিয়া দিলাম। তিনি প্রথমে দরখাস্ত পড়িয়া অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। আমি তখন তাঁহাকে বলিলাম দরখাস্তের সহিত রবীন্দ্রনাথের একখানি সার্টিফিকেট আছে। রবীন্দ্রনাথের সার্টিফিকেটের কথা শুনিয়া তিনি আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন ও ফণ্ডের সম্পাদক কুঞ্জবিহারী মল্লিক মহাশয়ের নিকটে দরখাস্ত লইয়া যাইতে বলিয়া দিলেন। দরখাস্তের উপর লিখিয়া দিলেন:

To be forwarded to the Secretary.

দরখাস্ত লইয়া আমি সম্পাদক মহাশয়ের সহিত দেখা করিলে, তিনি দরখাস্ত দেখিয়া বলিলেন, "আপনি এফ, এ, ক্লাসের ছাত্র? নিশ্চয় সাহায্য পাইবেন। আমি সভায় সমস্ত ঠিক রাখব, আপনি কয়েকদিন পরে আসবেন।"

তাঁহার কথামত কয়েকদিন পরে দেখা করিলে তিনি ছাপা ফর্ম্ম, আমার নাম, ক্লাস ও বেতনের কথা লিখিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "মেট্রোপলিটন কলেজের প্রিন্সিপাল মহাশয়ের হাতে এই পত্র দিবেন।" চিঠি লইয়া আমি চলিয়া আসিলাম।

পরে তাঁহার কথামত মেট্রোপলিটনে গিয়া অধ্যক্ষ মহাশয়ের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে পত্রখানি দিলে, তিনি পড়িয়া, ক্লার্ককে আমার নাম রেজিষ্ট্রার বইতে লিখিয়া লইতে বলিলেন। এইরূপে আমার বেতনের প্রশ্নের মীমাংসা হইল ও আমার শিক্ষার পথ কিঞ্চিৎ সুগম হইল। কোনও ক্রমে পাঠ্য পুস্তকাদি কিছু ক্রয় করিয়া ও কিছু সংগ্রহ করিয়া দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। পরবর্ত্তী সেসনে তৃতীয় বার্ষিক বি-এ, ক্লাসে পড়িতে আরম্ভ করিলাম। পাঠ্যপুস্তক কিছু কিনিয়াছিলাম, কিছু সংগ্রহও করিয়াছিলাম। গ্রীষ্মাবকাশের পর চতুর্থবর্ষে কলেজে আসিয়া ফণ্ডের সম্পাদক মহাশয়ের নিকটে গিয়া বেতনের বিষয় জানাইলে, তিনি বলিলেন, "আপনি অনেকদিন আসেন নাই, নাম কাটা

গিয়াছে।" আমি গ্রীষ্মাবকাশের কথা বলিলাম, গ্রাহ্য হইল না। আমি এইরূপে বিশেষ ভাবে নিরাশ হইলাম, পড়া বন্ধ হইল। নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকা আমার স্বভাববিরুদ্ধ, পড়াশুনার চর্চ্চায় বিশেষ আনন্দ পাইতাম। তাই চুপচাপ সময় নষ্ট না করিয়া এই সময়ে সংস্কৃত অধ্যাত্ম রামায়ণের বঙ্গানুবাদ করিয়া সমাপ্ত করিয়াছিলাম। তাহা অদ্যাবধি, আমার কাছে অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি অবস্থায়ই আছে। ছাপার কোনও সুবিধা করিতে পারি নাই।

এই ভাবে কলিকাতায় কিছুদিন কাটাইয়া পরে বাড়ী আসিয়া বাদুড়িয়া হাইস্কুলে হেড পণ্ডিতের কাজ করিয়াছিলাম। এখানে বেতন খুবই সামান্য ছিল। কিছুদিন পর ধান্যকুড়িয়া হাইস্কুলে তৃতীয় শিক্ষকের পদে সামান্য বেতন বৃদ্ধি পাওয়ায় কিছুদিন তৃতীয় শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছিলাম।

১৩০৬ সালের শেষে আমি কলিকাতায় আসিয়াছিলাম। এই সময়ে বঙ্গবাসীর কর্ম্মচারী দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত আমার বেশ পরিচয় হইয়াছিল। তিনি পরে মেদিনীপুরের অন্তর্গত নাড়াজোলের রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। তাঁহাকে রাজবাড়ীতে কাজের কথা লিখিলে তিনি রাজা নরেন্দ্রলাল খানের পুত্র দেবেন্দ্রলাল খানের গৃহশিক্ষকতার ব্যবস্থা করিয়া আমাকে নাড়াজোল রাজবাড়ীতে যাইতে লেখেন। ১৩০৭ সালের প্রথমে আমি নাড়াজোলে গিয়া গৃহশিক্ষকের কার্য্য গ্রহণ করি। প্রায় দেড় বৎসর নাড়াজোলে থাকিয়া ১৩০৮ সালে পূজার সময় বাড়ী আসিলে পিতাঠাকুর অল্পবেতনে অতদূরে গিয়া চাকুরী করিতে নিষেধ করিলেন। আমি নাড়াজোলের রাজাকে পদত্যাগের বিষয় জানাইলাম।

ইহার পর কলিকাতা আসিয়া টাউনস্কুলে হেড-পণ্ডিতের কার্য্য গ্রহণ করিলাম। এই সময়ে চৈত্রমাসে পিতার মৃত্যু হয়। আমি সাংসারিক বিষয়ে আমার কনিষ্ঠ তারাচরণের উপর ভার দিয়া টাউন-স্কুলে আসিয়া পড়াইতে আরম্ভ করিলাম। গ্রীষ্মাবকাশের পর আমি ঐ কাজ ত্যাগ করিয়া কিছুদিন কলিকাতায় ছিলাম। এই সময়ে প্রায়ই জোড়াসাঁকোয় বড়দাদার আপিসে আসিতাম। কথাপ্রসঙ্গে বড়দাদার মুখে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কথা শুনিতাম। ভাবিতাম এখানে আসিবার আমার কোনও সম্ভাবনা নাই।

বড়দাদা যদুনাথ কবি রবীন্দ্রনাথের নিকট আমার একটি চাকুরী প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রার্থনানুসারে কবি রাজসাহীর অন্তর্গত কালীগ্রাম জমিদারীর পতিসর কাছারীতে আমাকে সুপারিন-টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত করিলেন। আমি তাঁহার নিয়োগানুসারে ১৩০৯ সালের শ্রাবণের প্রথমে পতিসর গিয়া কর্ম্ম গ্রহণ করি। এই সময়ে কবির উপর জমিদারীর কাজ দেখার ভার ছিল। তিনি শ্রাবণের শেষে বোটে পতিসর উপস্থিত হন। কাছারীর ম্যানেজার প্রভৃতির সঙ্গে আমি বোটে কবির সহিত দেখা করিতে যাই। কবিকে নিয়মিত নজর দিয়া আমি বাসায় আসিয়া বসিলে কবির ভৃত্য আসিয়া আমাকে বলিল—"বাবু মহাশয় আপনাকে ডাকছেন।" কবির আদেশে আমি বোটে গেলে, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করি-লেন—"তুমি দিনে কি কর?" আমি বলিলাম—"আমিনের সহিত জরীপের চিঠা লইয়া কাজ করি।" তিনি বলিলেন—"রাত্রে কি কর?" আমি বলিলাম—"সংস্কৃতের আলোচনা করি এবং ইংরেজী হতে সংস্কৃতে অনুবাদের একটি পাণ্ডুলিপির প্রেস-কপি করি।" শুনিয়া তিনি বলিলেন—"তোমার সেই পাণ্ডুলিপি আন, দেখব।" আমি বাসায় আসিয়া পাণ্ডুলিপি আনিয়া তাঁহার হাতে দিলাম। তিনি খুলিয়া কিছুক্ষণ দেখিয়া আমায় দিলেন, কিছুই বলিলেন না। আমি বাসায় চলিয়া আসিলাম।

কিছুদিন পর শান্তিনিকেতনে আসিয়া ম্যানেজার শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে লিখিত পত্রে লিখিয়াছিলেন—"শৈলেশ, তোমার সংস্কৃতজ্ঞ কর্ম্মচারীকে এখানে পাঠাইয়া দাও।" শৈলেশ বাবু কবির আদেশ আমাকে জানাইয়া বলিলেন—"আপনি কি সেখানে যাবেন?" আমি বলিলাম—হাঁা যাব! এ পথ আমার নয়। লেখাপড়ার চর্চ্চায় আমার বিশেষ অনুরাগ আছে। সংসারের তাড়নায় আপাততঃ এই পথে এসেছি।" শৈলেশবাবু বলিলেন—"তবে প্রস্তুত হন, আজই যান।"

আমি ঐ দিনই যাত্রা করিয়া সন্ধ্যার পর কলিকাতায় বড় দাদার বাসায় আসিয়া পৌঁছিলাম। পরদিন সকালের ট্রেনে রওনা হইয়া দুপুরে শান্তিনিকেতনে আসিয়া পৌঁছিলাম। কবি তখন অতিথিশালার উপরে থাকিতেন। ভৃত্যের মারফৎ তাঁহাকে আমার পৌঁছান-সংবাদ দিলাম। সংবাদ পাইয়া তিনি নীচে নামিয়া আসিলেন। আমি নমস্কার করিয়া দাঁড়াইলে তিনি বলি-লেন—"আমার সঙ্গে এস।"

তখন আশ্রমের ম্যানেজার ছিলেন কালীপ্রসন্ন লাহিড়ী। তাঁর কাছে গিয়া তিনি বলিলেন,—"এ এখানে থাক্‌বে। এখানে এর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দাও।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। যে বিষয় আমি কখনও ভাবি নাই, যাহা আমার মত নগণ্যের পক্ষে আকাশকুসুম, তাহাই এতদিনে কার্য্যে পরিণত হইল। আমি আমার চির-আকাঙ্ক্ষিত বিদ্যাসাধনার পীঠভূমি ব্রহ্ম-চর্য্যাশ্রমে কবির আশ্রয়লাভ করিলাম।

আমি যখন এখানে আসিয়াছিলাম, তখন আশ্রমে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজির, জগদানন্দ রায় গণিত ও বিজ্ঞানের, সুবোধচন্দ্র মজুমদার ইংরেজি ও ইতিহাসের, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বাংলার অধ্যাপক ছিলেন। আমি সংস্কৃতের অধ্যাপনায় নিযুক্ত হইলাম। বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা তখন দশ বারটি। রথীন্দ্রনাথ, সন্তোষ মজুমদার তখন প্রবেশিকা বর্গের ছাত্র।

আশ্রমে ছাত্রদের তখন কোনও সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক ছিল না। কবি একদিন আমাকে একখানি ছয়-সাত পাতার খাতা দিয়া বলিলেন—"এই প্রণালীতে তুমি সংস্কৃত পাঠ্য লেখ।" আমি তাঁহার আদেশে বালকদিগের পাঠোপযোগী, সহজবোধ্য "সংস্কৃত

প্রবেশ" পাঠোন্নতিক্রমে তিন খণ্ডে শেষ করি। কথাপ্রসঙ্গে কবি একদিন বলিলেন—"বাংলায় ভাল অভিধান নাই। তোমাকে সময়োপযোগী একখানি বাংলা অভিধান লিখতে হবে।" "সংস্কৃত প্রবেশ" লেখা শেষ হইলে তাঁহাকে বলিলাম, "অভিধান আরম্ভ করব।" তিনি বলিলেন—"হাঁ, কর।" সেই দিন হইতেই তাঁহার অনুমতিক্রমে অভিধান রচনায় নিরত হইলাম। সে অনেক দিন পূর্ব্বেরই কথা, তখন ১৩১২ সাল।

অভিধান প্রণয়নে কেহই আমার পথপ্রদর্শক ছিলেন না। কোন বিজ্ঞ আভিধানিকের সাহায্যলাভের আশাও করিতে পারি নাই। নিজ বুদ্ধিতে যে পথ সহজ বুঝিয়াছিলাম, তাহাই আশ্রয় করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলাম, ফলে অসহায় ভাবে কার্য্য করায় ব্যর্থ পরিশ্রমে আমার অনেক সময় নষ্ট হইয়াছে। মূঢ় বুদ্ধিতে প্রথমে ইহা যেরূপ সুখসাধ্য মনে করিয়াছিলাম, কিছুদূর অগ্রসর হইলে আমার আর সে বুদ্ধি রহিল না; তাহা ভ্রমাত্মক বুঝিতে পারিলাম। তখন অভিধান রচনার অনুরূপ উপকরণ সঞ্চয়ের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলাম এবং অধ্যাপনার অবসরে নানা প্রাচীন বাংলা পুস্তক পাঠ করিয়া প্রয়োজনীয় বিষয় সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। আশ্রমের গ্রন্থাগারে যে সকল প্রাচীন গ্রন্থ ছিল, প্রথমে তাহা হইতেই অনেক শব্দ সংগৃহীত হইল। এই সময়ে প্রাচীন ও আধুনিক প্রায় পঞ্চাশখানি গদ্য-পদ্য-গ্রন্থ দেখিয়াছিলাম। তদ্ভিন্ন সেই সময়ে প্রকাশিত বাংলা ভাষার অভিধান, "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ" পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত প্রাদেশিক শব্দমালা ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃত 'শব্দসংগ্রহ' হইতে অনেক শব্দ সংগৃহীত হইয়াছিল। প্রাকৃত ব্যাকরণ হইতেও অনেক বাংলা শব্দের মূল সংস্কৃত শব্দ এবং তদ্ভব শব্দও কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। ইহাতে আমার প্রায় দুই বৎসর অতীত হয়। ১৩১৪ সালের ১৬ই চৈত্র আমার প্রথম শব্দসংগ্রহের সমাপ্তির দিন।

ইহার পরে সংগৃহীত শব্দমালা মাতৃকাবর্ণানুক্রমে নিবদ্ধ করিতে প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া যায়। ১৩১৭ সালের বৈশাখের প্রারম্ভেই শব্দানুক্রমণিকা সমাপ্ত হয়। পরে বাংলা শব্দের সহিত বর্ণানুক্রমে সংস্কৃত শব্দ সংযোজন করিয়া শব্দের ব্যুৎপত্তি ও শিষ্ট প্রয়োগসহ অর্থ প্রভৃতি লিখিতে আরম্ভ করি। ইহাই প্রকৃতপক্ষে অভিধানের আরম্ভ।

অভিধান রচনা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে ১৩১৮ সালের আষাঢ় মাসে আর্থিক অসঙ্গতির জন্য আশ্রমের শিক্ষকতায় অবসর লইয়া আমাকে কলিকাতায় আসিতে হয়। এই সময়ে একদিন আমি শ্যামবাজারের দিকে যাইতেছিলাম, পথে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম বসু মহাশয়ের সহিত দেখা হয়। তিনি আমাকে দেখিয়া কুশল প্রশ্নাদির পর জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি এখন কি করছ?" আমি বলিলাম, "কলিকাতায় চাকুরীর সন্ধানে এসেছি।" শুনিয়া তিনি বলিলেন—"বেশ, তুমি আজ কিম্বা কাল হতে আমার কলেজে সংস্কৃত অধ্যাপনার কাজ কর।" তাঁহার কথানুসারে আমি সেণ্ট্রাল কলেজে কার্য্য গ্রহণ করিলাম।

সেণ্ট্রাল কলেজে কার্য্য করিয়া অর্থকৃচ্ছ্রতার কিছু লাঘব হইল বটে, কিন্তু অভীষ্ট বিষয়ে ব্যাঘাত জন্য মনে শান্তি ছিল না। এই সময়ে অভিধানের কার্য্য কিছুদিন একবারেই বন্ধ ছিল। অভীষ্ট বিষয়ে ব্যাঘাত জন্য বেদনা সুতীব্র ও মর্ম্মস্পর্শী হইলেও আমার এই দুঃখ নিবেদনের স্থান আর কোথাও ছিল না—কেবল মধ্যে মধ্যে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে গিয়া কবিবরের নিকটে জানাইয়া মনের গুরুভার কিছু লাঘব করিয়া আসিতাম। এই সময়ে কবির সঙ্গে প্রথম দেখা হইলে তিনি একটু বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন—"তুমি চলে এসেছ, আমার বিদ্যালয়ের বিশেষ ক্ষতি হ'চ্ছে।" আমি বলিলাম—"আমি আপনাকে যে পত্র লিখেছিলাম, তার উত্তরে আপনি জানিয়েছিলেন, 'তুমি অন্যত্র চেষ্টা দেখ।' তাই শান্তিনিকেতনে যাই নাই।" কবি তখন বলিলেন—"যাক্ সে-কথায় আর এখন কাজ নাই।"

একদিন কবি বলিলেন—"মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র এখানে আছেন কিনা জানতে পারলে একটা ব্যবস্থা করব।" এই সময় জন্মাষ্টমীর ছুটি নিকটবর্ত্তী। জন্মাষ্টমীর ছুটি উপলক্ষে কলেজ বন্ধ থাকিবে। আমি ছুটিতে বাড়ী যাইবার কথা কবিকে জানাইলে, তিনি অনুমতি দিলেন, আমি বাড়ী গেলাম। এই সময়ে কবি মহারাজের সঙ্গে দেখা করিয়া আমার অভিধান প্রণয়নের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন—"আমার আশ্রমের একটি অধ্যাপক বাংলা ভাষায় একখানি অভিধান রচনা আরম্ভ করেছেন, যদি মহারাজ তাঁহাকে কিছু বৃত্তি দেন, তা হলে তিনি এ বিষয়ে অগ্রসর হতে পারেন।" মহারাজ বলিলেন—"আমার ত বাজেট হয়ে গিয়েছে, এখন বৃত্তি দেওয়া সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।" কবি বলিলেন—"বেশী নয়, মাসিক পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি দিলেই হবে।" তখন মহারাজ বলিলেন—"তা হলে আমি পারব।"

কবি এইরূপে বৃত্তি স্থির করিয়া বড়দাদা যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়কে বলিলেন—"হরিচরণকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।" বড়দাদা বলিলেন—"সে জন্মাষ্টমীর ছুটিতে বাড়ী গিয়েছে।" কবি একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"আমি তার জন্য চেষ্টা করছি, সে এখন বাড়ী গেল?"

আমি বাড়ী হইতে ফিরিয়া বাসায় গেলে বড়দাদা বলিলেন—"বাবু মহাশয় তোমার অভিধানের জন্য বৃত্তি স্থির করেছেন, তুমি এখনই তাঁর সঙ্গে দেখা কর।"

আমি সন্ধ্যার পর জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে যাইয়া শুনিলাম, কবি তখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা দিতে গিয়াছেন, ফিরিতে রাত্রি নয়টা হইবে। আমি বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন সকালে তাঁহার সহিত দেখা করিলে কবি একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"আমি তোমার জন্য চেষ্টা করছি, আর তুমি এখন বাড়ী গিয়েছিলে?" আমি বলিলাম—"আমি আপনার

অনুমতি নিয়েই ত গিয়েছিলাম।" তখন তিনি বলিলেন—"আমি মহারাজের সঙ্গে দেখা করেছি, তিনি মাসিক পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি দেবেন বলেছেন। তোমার কাছে অভিধানের যে পাণ্ডুলিপি আছে তা নিয়ে এখনই তাঁর সঙ্গে দেখা কর।" তাঁহার মুখে বৃত্তির কথা শুনিয়া অভিধান প্রণয়নে উৎসাহিত ও বিশেষ আশান্বিত হইলাম। ভাবিলাম আমি সর্ব্বপ্রকারেই নগণ্য, আমারই নিমিত্ত কবিবরের যাচক বৃত্তি, ইহা চিন্তা করিতে করিতে আমি তাঁহার চরিত্রের মহত্বে ও কর্ত্তব্যকর্ম্মে ঐকান্তিক নিষ্ঠায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম, আমার বাক্‌শক্তি রোধ হইয়া গেল, কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না; আমার আকার প্রকার ও মৌনভাব আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। আমার হৃদয়গত ভাব বুঝিয়া কবিবর ধীরকণ্ঠে বলিলেন—"স্থির হও, আমি কর্ত্তব্যই করেছি।" আমি আর কিছু বলিলাম না, প্রণতিপূর্ব্বক বিদায় লইয়া চলিয়া আসিলাম।

কবিবরের নিকট বিদায় লইয়া আমি বাসায় ফিরিলাম ও তাঁহার কথানুযায়ী অভিধানের পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ লইয়া মহারাজের শিয়ালদহের বাড়ীতে গিয়া দেখা করিলাম। মহারাজ পাণ্ডুলিপি দেখিলেন। দেখিয়া বলিলেন—"কতদিনে শেষ করতে পারবেন?" আমি বলিলাম—"এ বলা সম্ভব নয়।" মহারাজ বলিলেন—"তা আমি জানি, মোটামুটি একটা স্থির করে বলবেন।" আমি বিদায় লইয়া চলিয়া আসিলাম ও আমার এক বন্ধুর কাছে একথা বলিলাম। বন্ধু বলিলেন—"আপনি পাঁচ বৎসরে শেষ করার কথা বলবেন, এর বেশী বললে হয় ত বৃত্তি পাবেন না।" আমি বলিলাম—"বৃত্তি পাই বা না পাই, আমি হিসাব করে যা বুঝতে পারব তাহাই বলব।"

পরদিন আমি মহারাজের কাছে গিয়া দেখা করিলাম ও তাঁহাকে জানাইলাম যে, আমি বোধ হয় নয় বৎসরের মধ্যে অভিধান লেখা শেষ করিতে পারিব। শুনিয়া তিনি বলিলেন—"আচ্ছা বেশ, তাই করুন। প্রতিদিন চার ঘণ্টা পরিশ্রম করলেই হবে। কাশিমবাজার যাবেন কখন?" মহারাজের কথায় বুঝিলাম, কাশিমবাজারে যাওয়া ও থাকার কথা কবির সঙ্গে হইয়াছিল, তিনি আমাকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। আমি মহারাজের এই কথায় বলিলাম—"শান্তিনিকেতনে, লাইব্রেরীতে আমি অনেক বই দেখিয়াছি, সেখানে থাকিলে আমার বিশেষ সুবিধা হয়। মহারাজ বলিলেন—"কাশিমবাজারে আমার বড় লাইব্রেরী আছে, সেখানে কোনও বইয়ের অভাব হবে না।" আমি আর কিছু না বলিয়া বিদায় লইয়া জোড়াসাঁকোয় কবির কাছে আসিয়া মহারাজের সকল কথা তাঁহাকে জানাইলাম। সমস্ত শুনিয়া কবি বলিলেন—"তুমি শান্তিনিকেতনে চলে যাও। তুমি চলে আসায় আমার স্কুলে বিশেষ ক্ষতি হচ্ছে। আমি মহারাজের সঙ্গে দেখা করে সব ঠিক করব।" আমি কবির কথায় বিদায় লইয়া বাসায় চলিয়া গেলাম ও পরদিনই শান্তিনিকেতনে চলিয়া আসিলাম ও কার্য্য আরম্ভ করিলাম।

কবি মহারাজের সহিত দেখা করিয়া এ বিষয় স্থির করিলে, মহারাজ প্রতি মাসে শান্তিনিকেতনেই প্রথমে ৫০৲ ও পরে ৬০৲ বৃত্তি পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সময়ে আমাকে সকালে চার পিরিয়ড পড়াইতে হইত। অবশিষ্ট সময় কোষের শব্দ সঙ্কলন করিয়া প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অভিধানের কাজ করিতাম। এইরূপে বার বৎসরে' ১৩৩০ সালে আমার অভিধান লেখা শেষ হইল। কবিকে ইহা জানাইলে, তিনি বলিলেন—"তুমি মহারাজকে পত্রে জানাও, বিশ্বভারতী হতে এই অভিধান আমরা ছাপার ব্যবস্থা করব।" তদনুসারে মহারাজকে একথা জানাইলে তিনি পত্রে জানাইলেন—"আমি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলাম, বিশ্বভারতী ছাপেন ভালই, তাতে আমার কোনও আপত্তি নাই।"

ইহার পরেই বিশ্বভারতীর আর্থিক অবস্থা সুবিধাজনক না হওয়ায় ছাপা আরম্ভ হয় নাই। আমিও আর কবিকে একথা বলিয়া লজ্জিত করি নাই। ইহার পরে কয়েক বৎসর নানা বিষয়ে অতীত হইয়া গেল। তখন ইংরেজী ১৯২৯ সনের ১৮ই ফেব্রুয়ারী, আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "Post-Graduate Teaching in Arts"এর ব্যবস্থাপক সমিতির সভাপতি মহাশয়ের নিকটে মুদ্রাঙ্কণের নিমিত্ত কবিবরের প্রসংশাপত্র সহ আবেদন করি। সভাপতি মহাশয় আমার এই আবেদনে অভিধান বিষয়ে অভিমত প্রকাশের নিমিত্ত অধ্যাপক ডাঃ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে জানাইলেন। অধ্যাপক মহাশয় পূর্ব্বেই আমার অভিধানের পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছিলেন; সুতরাং এইরূপ পত্র পাইয়া তিনি নিঃসংশয়ে গ্রন্থের অভিমত প্রকাশপূর্ব্বক ইহা বিশ্ববিদ্যালয়েরই প্রকাশের যোগ্য সন্দেহ নাই বলিয়া সবিশেষ অনুরোধ করিলেন এবং পাণ্ডুলিপি পরীক্ষার্থ সভা নির্দ্দেশপূর্ব্বক একটি সমিতি সংগঠন করিলেন। কয়েকদিন পরেই আমি সভাপতি মহাশয়ের পত্র পাইয়া সমিতির নির্দিষ্ট অধিবেশন দিনে অভিধানের পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হইলে সভ্য মহাশয়েরা পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করিয়া অভিধানখানি প্রকাশের যোগ্য বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেন। কিন্তু গ্রহ প্রতিকূল, ব্যয়বাহুল্য-ভয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মুদ্রণ কার্য্যে অগ্রসর হইতে তখন সাহস করিলেন না—মনে হইল কবি রায়গুণাকর সত্যই বলিয়াছেন—"হা-ভাতে যদ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়, হেদে লক্ষ্মী হৈল লক্ষ্মীছাড়া।" শ্রীযুত সুনীতিবাবু সেদিন গ্রন্থ প্রকাশের নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই বিঘ্ন—দৈব প্রতিকূলতা, ফল ফলিল না। বিদ্যোৎসাহী, গুণজ্ঞ, বিচারক আশুতোষ তখন স্বর্গগত, ইহাও গ্রহবৈগুণ্য। যাহা হউক আমি নিরাশ হইয়া ফিরিলাম। কিন্তু নৈরাশ্যে হতবুদ্ধি হই নাই,—পরিশ্রমের পুরস্কার আছেই—এ বিশ্বাসে কার্য্যে বিরত হইলাম না। ঠিক জানি, মুদ্রিত না হইলেও যদি আমার জীবনান্ত না হয়, তবে অভীষ্ট গ্রন্থ একদিন না একদিন মুদ্রাঙ্কিত হইয়া আমার ইচ্ছানুরূপ পূর্ণাঙ্গ হইবে।

পরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আমি এবিষয়ে চেষ্টা করিয়া-

ছিলাম। তখন অমূল্য বিদ্যাভূষণ মহাশয় ধনাধ্যক্ষ। তিনি পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছিলেন, কিন্তু ধনাভাব হেতু মুদ্রণের সাহায্য করিতে পারেন নাই বলিয়া বিশেষ দুঃখিত হইয়াছিলেন। এইরূপে আমার সে চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছিল।

বিশ্বকোষ প্রেসের অধিকারী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের সহিত কোনও সূত্রে পূর্ব্ব হইতেই আমার পরিচয় ছিল। অনন্যোপায় হইয়া তাঁহার কাছে গিয়া অভিধানের বিষয় জানাইলাম। তিনি বলিলেন, "অভিধানখানি ত ভালই হয়েছে বোধ হচ্ছে। আচ্ছা, আপনি শান্তিনিকেতন গিয়ে কপি আমাকে পাঠান। এখন আপনি খালি কাগজের দামটা দিন, ছাপার ব্যয় পরে দেবেন।" তাঁহার এইরূপ কথায় বিশেষ আশান্বিত হইয়া শান্তিনিকেতনে আসিয়া, পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ পাঠাইলাম, কাগজের মূল্যও কিছু পাঠাইয়া দিলাম। তখন ১৩৩৯ সাল। গ্রীষ্মাবকাশের পরে ছাপা আরম্ভ হইল। এই বৎসর আগষ্ট মাসে কবি আমাকে অধ্যাপনা-কার্য্য হইতে অবসর দিলেন ও অভিধানের কার্য্য যাহাতে অগ্রসর হয় সে বিষয়ে সচেষ্ট হইতে বলিলেন। এই বৎসরেই চৈত্র মাসে অভিধানের দুই খণ্ড ছাপা শেষ হয়। আমি চৈত্রের শেষে একখণ্ড লইয়া প্রবাসী সম্পাদক মাননীয় শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত দেখা করিয়া এ বিষয়ে তাঁহার পত্রিকায় সমালোচনা করিতে প্রার্থনা করি। তিনি প্রবাসীতে অভিধান সম্বন্ধে যে সারগর্ভ স্বল্প সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাহার ফল প্রচুরই হইয়াছিল। ইহার পর আমি প্রতিদিন অভিধানের গ্রাহক কিছু কিছু পাইয়াছিলাম। স্বল্পদিনের মধ্যেই গ্রাহকের সংখ্যা বেশ কিছু হওয়ায় ঐ আয়ে ছাপার ব্যয় চলিয়াছিল। এতদ্-ভিন্ন বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারেও নগদ কিছু কিছু বিক্রয় হইত। বিশ্ব-ভারতী এবং কোন কোন ছাত্রও আমাকে এই সময়ে কিছু কিছু অর্থসাহায্যও করিয়াছিলেন। এইরূপে ছাপার ব্যয় চলিয়াছিল। বসু মহাশয়কে যখন যাহা দিয়াছি তখন তাহা লইয়াছেন। এই-ভাবে বিশ্বকোষ প্রেসে পঞ্চাশত্তম খণ্ড পর্য্যন্ত ছাপা হইয়াছিল। এই সময়ে বসু মহাশয়ের অকস্মাৎ মৃত্যু হয়। ইহাতে বিশেষ দুঃখিত হইয়াছিলাম। বিশ্বকোষ প্রেস বন্ধ হইয়া গেল; অভিধান ছাপাও বন্ধ হইল। পুনরায় অভিধান ছাপার বিষয়ে বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলাম। এই সময়ে বিশ্বকোষ প্রেসের হেড-কম্পোজিটার মন্মথনাথ মতিলাল মহাশয় অনেক চেষ্টা করিয়া ২৬নং বারানসী ঘোষ ষ্ট্রীটে শ্যাঙ্কো প্রেসে ছাপার ব্যবস্থা করিলে পুনরায় ছাপা আরম্ভ হয় ও তাঁহারই একান্ত চেষ্টায় ১০৫ খণ্ডে ১৩৫৩ সালে অভিধানের মুদ্রাঙ্কণ পরিসমাপ্ত হয়। এ বিষয় তাঁহার এই আন্তরিক প্রচেষ্টা আমার চিরস্মরণীয়।

অভিধানের পরিসমাপ্তির কিছু পূর্ব্বে ১লা বৈশাখ ১৩৫১ সালে 'আশ্রমিক সংঘের' আমার প্রাক্তন ছাত্রেরা এক সংবর্দ্ধনা-সভার অনুষ্ঠান করেন। ছাত্রগণের সহিত আমার গুরু-শিষ্য সম্বন্ধের বিষয় ও অভিধানের কথা উল্লেখ করিয়া "ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম" নামে যে প্রবন্ধ আমি লিখিয়াছিলাম, তাহা আমি নিজে পাঠ করি।

পর বৎসর ১৩৫২ সালের ফাল্গুন মাসে বিদ্যোৎসাহী বিচারপতি বি, কে, গুহ মহাশয় স্বভবনে একটি সম্বর্দ্ধনা-সভার অনুষ্ঠান করেন। এই সময়ে পাঠ্য প্রবন্ধ ছিল অভিধানের পরিসমাপ্তি বিষয়ক প্রবন্ধ 'ব্রতোদযাপন।'

১৩৫৩ সালের ১লা বৈশাখ বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ যে সংবর্দ্ধনা-সভার আয়োজন করেন তাহাতে পাঠ্য ছিল 'সাধ্যসিদ্ধি' অর্থাৎ অভিধানের পরিসমাপ্তি।

পূর্ব্বে বলিয়াছি কবির আদেশে আমি অভিধান লিখিতে উদ্যোগী হই। অভিধানের মুদ্রাঙ্কণ সময়ে আমি মধ্যে মধ্যে উত্তরায়ণে তাঁহার সহিত দেখা করিতাম। তিনি অভিধানের কার্য্য অগ্রসর হওয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমার এই কঠোর পরিশ্রমের ফল পরে পাবে, আমি জানি।" কবির এই ভবিষ্যদ্বাণী নানাপ্রকারে সার্থক হইয়াছে। বিশেষ বিষাদের বিষয় অভিধানের পরিসমাপ্তি খণ্ড তাঁহার হাতে দিয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে পারি নাই।

অভিধানের উৎকর্ষ সম্বন্ধে কবির ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহার পরিচয় পত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"শান্তিনিকেতন-শিক্ষাভবনের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সুদীর্ঘকাল বাংলা অভিধান সঙ্কলন কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার এই বহুবর্ষব্যাপী অক্লান্ত চিন্তা ও চেষ্টা আজ সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট উপস্থিত হইল। তাঁহার এই অধ্যবসায় যে সার্থক হইয়াছে, আমার বিশ্বাস সকলেই তাহার সমর্থন করিবেন।"—৮ই আশ্বিন ১৩৩৯। প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয়ও মধ্যে মধ্যে যখন শান্তিনিকেতনে আসিতেন, তখন তিনি আমার ঘরে গিয়া দেখা করিতেন, এবং অভিধানের উৎকর্ষ জন্য আমাকে পরামর্শ দিতেন। তাহার লিখিত ২১২২ খানি পত্র এখনও আমার কাছে আছে। তাঁহার এই হিতচিকীর্ষা আমার প্রতি তাঁহার একান্ত সুহৃদ্ভাবেরই পরিচায়ক, আমার চিরস্মরণীয় বিষয়। বিশেষ দুঃখের বিষয়, তিনি এখন স্বর্গগত, তাঁহাকে অভিধানের পরিসমাপ্তি দেখাইতে পারি নাই।

অভিধান প্রণয়নে বৃত্তিদাতা দানবীর মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র অস্তমিত। তিনি মুদ্রাঙ্কণ আরম্ভের পূর্ব্বেই স্বর্গগত হইয়াছিলেন, সুতরাং অভিধানের মুদ্রিত একখণ্ডও তাঁহাকে দেখাইতে পারি নাই। ইহাও বিশেষ পরিতাপের বিষয়।

১৯৫৬ সালের ৭ই মার্চ তারিখে 'বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে'র অনুষ্ঠিত সংবর্দ্ধনা-সভায় আমি আমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলাম। সভা মহাশয়েরা এই সভায় অভিধানের উৎকর্ষ বিষয়ে মানপত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার কয়েক পঙক্তি এখানে উদ্ধৃত করিলাম।—

"বাংলা সাহিত্যে আপনার সমৃদ্ধ দানের কথা আমাদের অবিদিত নাই। পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিককাল আপনি নিরবচ্ছিন্ন ও অনলস ভাবে বঙ্গভারতীর সেবা করিয়াছেন। আপনার সেই অকুণ্ঠ সাহিত্য-প্রীতি ও অপরিসীম অধ্যবসায়ের ফল—বঙ্গীয় শব্দকোষ পাঁচ খণ্ড।

এ এক বিরাট কীর্ত্তি, যে কীর্ত্তি আপনাকে বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।...” এখানে পরবর্ত্তী দুইটি বিষয়ের উল্লেখ না করিলে জীবনস্মৃতি অঙ্গহীন হইবে মনে করিয়া তাহাও লিপিবদ্ধ করিলাম।

(১) ১৯৪৪ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ সমাবর্ত্তনে “সরোজিনী স্বর্ণপদক” উপহারদানে আমাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন, তাহা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে উল্লেখ করিলাম।

(২) ১৯৫৭ সনের ১৫ই জানুয়ারী বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় আচার্য্য শ্রীযুত জবাহরলাল নেহরু বার্ষিক সমাবর্ত্তন-সভায় বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ সম্মানসূচক “দেশিকোত্তম” উপাধি স্বহস্তে দান করিয়া আমাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন, তাহাও কৃতজ্ঞতার সহিত লিপিবদ্ধ করিলাম।

আমার এই দীর্ঘ জীবন, সংবর্দ্ধনা ও উপাধিতে কবিবরের ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক করিয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন, “তোমার এই কঠোর পরিশ্রমের ফল পরে পাবে।” ‘বঙ্গীয়-শব্দকোষ’ ছাপা প্রসঙ্গে এ কথাও বলিতেন, “এ কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কখনও তোমার জীবনান্ত হবে না।”

যাঁহার সান্নিধ্যে ও সাহচর্য্যে আমার জীবনপথে নানা বিষয়ে উপকৃত হইয়াছি, সেই স্বর্গগত কবিগুরুর আত্মার উদ্দেশে ভক্তি-পূর্ব্বক প্রণতি করিয়া প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করিলাম।

হিন্দীসাহিত্যে র'সো ও সন্ত-কাব্যের ধারা

শ্রীঅমল সরকার

মানবের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই ভাষারও জন্ম হয় কারণ জন্মাবার পরই নিজের ভাব প্রকাশ করবার একটা স্বাভাবিক প্রচেষ্টা থাকে মানুষের। প্রথমে সে নানা রকম শব্দ, আকার-ইঙ্গিত করে মনের সেই ভাবকে ব্যক্ত করতে আরম্ভ করে, তার পর ধীরে ধীরে সেই সব শব্দের সংমিশ্রণে ভাষার উৎপত্তি হয়। ভাষার ইতিহাস মানব সমাজের ইতিহাসের মতই পুরাতন, তবে ঠিক কোন্ সময় কি ভাবে মানব-সমাজের জন্ম ও অভ্যুত্থান হ'ল এ যেমন রহস্যজালে আবৃত তেমনই ভাষার উৎপত্তি-স্থান ও কাল একেবারে ঠিক নির্দ্ধারিত করা আজও সম্ভবপর হয় নি। পণ্ডিতেরা ও ভাষাবিদেরা বলেন যে, একদিন নাকি এ রকম এক সময় ছিল যখন গ্রীস, পারস্য ও ভারতবর্ষের লোকেরা একই ভাষায় কথা বলত। আমরা অনেকেই জানি যে, যে হিন্দীভাষা আজ কথিত ও পঠিত হয় সেটা নিশ্চয় দুশ' বছর আগের হিন্দীভাষা অপেক্ষা অনেক বিভিন্ন, আবার দুশ' বছর আগেকার হিন্দীভাষার সঙ্গে ছশ' বছর আগেকার হিন্দীর বহুলাংশে পার্থক্য আছে—এর একটা ধারাবাহিক ইতিহাস না পাওয়া গেলেও, যত দূর সম্ভব এর একটা ক্রমোন্নতির ইতিহাস পাওয়া যেতে পারে।

একদিন মধ্য-এশিয়ার প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে পড়ে হঠাৎই আর্য্যরা সিন্ধুনদের উপত্যকায় এসে উপনিবেশ স্থাপন করলেন এবং সেইখানেই বেদের জন্ম হয়—সিন্ধুর পূর্বদিক তখন তাঁদের একেবারে অজ্ঞাত। এইখানেই ঋক্-সংহিতার ওঙ্কার-মন্ত্র ধ্বনিত হয়ে ওঠে বৈদিক ভাষায়। তার পর আর্যরা যখন এই দেশেই চিরদিনের মত ঘর বেঁধে ফেললেন তখন এখানকার আদিম অধিবাসীদের অনেক কথাই এঁদের ভাষায় বিনা বাধায় এসে পড়ল। একথা সত্য যে, এইরূপ সংমিশ্রণকে আটকানো একেবারে অসম্ভব—ঠিক এমনি করেই অনেক ইংরেজী, ফারসী, আরবী প্রভৃতি বিদেশী শব্দ ভারতীয় ভাষায় ঢুকে গেছে, আমরা জেনেশুনে বা জোর করে এই সব শব্দ আমাদের ভাষায় গ্রহণ করি নি। এরা নিজেরাই সবার অজ্ঞাতসারে আমাদের ভাষার সঙ্গে মিশে গিয়েছে এবং কোনদিনই হয় ত আমরা সেগুলোকে আমাদের ভাষার থেকে বাদ বা বার করে দিতে পারব না। সে যাই হোক, যখন আর্যরা দেখলেন যে, তাঁদের ভাষা এ-দেশীয় লোকেদের (যাদের তাঁরা অনার্য, অনাস, অব্রহ্মম বলে অভিহিত করতেন) ভাষার সঙ্গে মিশে অশুদ্ধ হয়ে যেতে পারে, তখন তাঁরা নিজেদের ভাষার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবার জন্য কতকগুলি নিয়মের বন্দোবস্ত করে ফেললেন এবং সেই নিয়মগুলি দিয়ে ভাষার সংস্কার আরম্ভ করলেন—এই সংস্কার-করা ভাষার নাম হ'ল ‘সংস্কৃত’ ভাষা। কিন্তু এই সংস্কারকরা ভাষা নিয়মের গণ্ডীর মধ্যে বাঁধা ছিল, কাজেই সে জনসাধারণের ভাষা না হয়ে একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের ভাষা বলেই পরিগণিত হ'ল—জনসাধারণের কাছে সে অবোধ্য ও দুর্গম থেকে গেল। এই সীমাবদ্ধতার একটা বিষময় ফল এই হ'ল যে, সংস্কৃত ভাষার প্রসার হয়ে গেল রুদ্ধ, নিয়মের কারা-প্রাচীরের অন্তরালে গুটিকয়েক মানুষকে নিয়ে সে বেঁচে

থাকল, শুধু তাদেরই মধ্যে হ'ল তার আদান-প্রদান, বিচার-বিনিময়। ব্যাকরণের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করে যাবার ক্ষমতা তার ছিল না, কাজেই এই ব্যাকরণ যাঁরা বুঝতেন অর্থাৎ যাঁরা বিদ্বান ছিলেন তাঁরাই কেবল সংস্কৃত ভাষার অধিকারী হতে পারলেন। এর ফলস্বরূপ একদিকে সংস্কৃত শুধু বিদ্বান-মণ্ডলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে গেল,অপর দিকে জনসাধারণের ভাষা লাগামহীন হয়ে ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াতে লাগল। কিন্তু সমাজ বা দেশ ত কেবল কয়েক জনবিদ্বানকে নিয়ে ছিল না, তাই যথনই কোন নূতন উদ্দেশ্য বা আদর্শ জনসাধারণকে বোঝাবার প্রয়োজন হ'ল তখন সংস্কৃত ভাষার দ্বারা এ প্রচার-কাজ সম্ভব হ'ল না, জনসাধারণের ভাষার সাহায্য নিতে হ'ল। গৌতম-বুদ্ধ সংস্কৃত ভাষার অসামর্থ্যতার কথা বুঝতে পেরে ধর্মপ্রচারের সময় লৌকিক ভাষায় নিজের বাণী প্রচার করা স্থির করেন। বৌদ্ধেরা জনসাধারণের এই ভাষাকে 'মাগধী' বা মূলভাষা বলে অভিহিত করল। পরে এই ভাষাই 'পালী' নামে খ্যাতিলাভ করে। মহারাজ অশোক তাঁর শিলালেখে এই ভাষাই ব্যবহার করেন। অনেকের মতে বিশেষ করে হিন্দু পণ্ডিতদের ধারণা যে, সংস্কৃত থেকেই পালীর উদ্ভব। এঁদের বক্তব্য হ'ল এই যে, উচ্চারণের ও ব্যবহারের সুবিধার জন্য সংস্কৃত ভাষার কড়া নিয়মগুলি সরিয়ে দেওয়া হয় ও ধীরে ধীরে সেই সংস্কৃতই পালীতে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু অন্য এক দলের মতে জনসাধারণের ভাষাকে স্বাভাবিক বা প্রাকৃত (পালী) আখ্যা দেওয়া হয় এবং সংস্কার-করা, ব্যাকরণের নিয়ম দ্বারা পরিচালিত ভাষা যা কেবলমাত্র বিদ্বানমণ্ডলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তাই সংস্কৃত, এবং পালী বা প্রাকৃতের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নেই।

ধীরে ধীরে জনসাধারণের এই ভাষা (প্রাকৃত বা পালী) বিকশিত হতে ক্রমে সাহিত্যিক রূপ ধারণ করতে লাগল কিন্তু এ বিকাশ প্রাকৃতিক নিয়মের প্রভাবে হতে থাকে, মনুষ্যরচিত ব্যাকরণের মাধ্যমে নয়। স্থানবিশেষে আবার এই প্রাকৃতের চারটি অপভ্রংশের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, অর্ধমাগধী ও ব্রাচড় বা কৈকেয়ী। অপভ্রংশ শব্দের অর্থ হ'ল কুৎসিত বা নষ্ট-হয়ে-যাওয়া। অর্থাৎ সংস্কৃত, পালী-প্রাকৃত ভাষার নষ্ট হয়ে যাওয়া অনেক রূপ এই ভাষার মধ্যে প্রচলিত হয়। ৫০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রায় ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ভাষায় সাহিত্য-রচনা চলতে থাকে। এই অপভ্রংশ থেকেই হিন্দীভাষার জন্ম হয়। সপ্তম শতাব্দীর কাছাকাছি পুরাতন হিন্দীর রচনার নমুনা পাওয়া যায়। আর এই সময় থেকেই জনতার ভাষা সাহিত্যিক ভাষার পর্যায়ে আসতে আরম্ভ করে। আমরা যাকে ব্রজভাষা বলে জানি সে ভাষা শৌরসেনী অপভ্রংশের ক্রমবিকাশ।

হিন্দী সাহিত্যের প্রথম যুগ

এটা অবশ্য বলা বেশ কঠিন যে হিন্দীর আরম্ভ ঠিক কবে থেকে হ'ল। তবে হিন্দীসাহিত্যের জন্ম প্রায় ঐ সময় হয় যখন ভারতবর্ষে মুসলমানদের আক্রমণ সুরু হয়ে গেছে। হিন্দুরাজারা নিজের নিজের রাজ্যরক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন—মুসলমানরা কথনও বীরবিক্রমে অগ্রসর হতে সক্ষম হয় আবার কথনও রাজপুতানার বীর যোদ্ধাদের কাছে পরাস্ত হয়ে পালিয়ে যায়। এই রকম ভাবে দু'দিক থেকে পাল্টা জবাবের অন্ত থাকে না। রাজপুত যোদ্ধারা বীর ছিলেন বটে কিন্তু দেশের সর্বাঙ্গীণ বিপদের কথা তাঁরা বড় একটা ভাবতেন না। নিজেদের গৌরব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠাতেই তাঁরা মত্ত থাকতেন—এমনকি প্রতিবেশী হিন্দু রাজার খ্যাতি ও মান সহ্য করতে পারতেন না ও পরস্পরের এই দলাদলির সুযোগ নিয়েই মুসলমানরা শেষে দিল্লীর মসনদ অধিকার করতে সক্ষম হয়েছিল। এই সময় কনৌজ, দিল্লী, আজমীঢ়, গুজরাট প্রভৃতি স্থান এই সব রাজাদের ক্রীড়াভূমি ছিল এবং তাঁদের পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সবাইকে যেন 'যুদ্ধং দেহি' মন্ত্রে দীক্ষিত করে তুলেছিল। আমরা জানি যে, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সাহিত্য গড়ে ওঠে। অর্থাৎ সাহিত্যের মধ্যে আমরা যা কিছু পাই সেগুলি তৎকালীন সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিস্থিতির ও ভাবনার চিত্র মাত্র ; এক যুগের সাহিত্য-নির্মাতারাও সেই যুগের পরিস্থিতির দাস ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই সময়ের কল্পনা ও ভাবনা তাঁদের যেদিকে টেনে নিয়ে যাবে সেই দিকে তাঁরা যেতে বাধ্য। কাজেই এর বেলায়ও হ'ল তাই। সাহিত্যে-বীরত্বের ছাপ পড়ল। এই সময়ের সাহিত্য-নির্মাতা ছিলেন চারণ-কবিরা এবং সাহিত্যের এই কালকে বীরগাথা-কাল বা চারণ কাল বলা হয়। এই যুগকে হিন্দী-সাহিত্যের আদিকাল বলা হয়—১০৫০ সম্বত থেকে আরম্ভ হয়ে প্রায় ১৩৭৫ সম্বতের কাছা-কাছি এই যুগের শেষ হয়ে যায়। চারণ-কবিরা আপনাপন আশ্রয়দাতার যশগান করে তাঁদের কাব্যে রাজাদের প্রেরণা ও উৎসাহের খোরাক যোগাতেন। কি করে আপন আশ্রয়-দাতার প্রশংসাভাজন হওয়া যায় এই ছিল চারণ-কবিদের প্রথম লক্ষ্য, কাজে কাজেই এঁদের কাব্যে পক্ষপাতিত্বের দোষ পাওয়া যায় ও এই কারণেই এই যুগের কাব্যে রাষ্ট্রীয়তা বা সর্বাঙ্গীণ ভাবের অভাব দেখা যায়। এই সব কবিদের বাণী থেকে যুদ্ধের সময় সৈন্যেরা পেত উৎসাহ, সাহস ও প্রেরণা এবং শান্তির সময় এঁরা রাজার গুণ, রূপ, ঐশ্বর্য ও

দানের কথা বলে তাঁর মনোরঞ্জন করতেন। ভাট বা চারণ-কবিদের কবিতায় বীররসের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু রাজার রূপ, গুণ ও ঐশ্বর্য বর্ণনা করতে গিয়ে শৃঙ্গার-রস আপনা হতেই এসে পড়েছে। কাব্যের বিষয়বস্তু প্রায়ই নারীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠত, কারণ রাজাদের মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব বা ঝগড়া দেখা যেত এর মূলে প্রায়ই থাকত কোন নারী—হয় ত কোন রাজা কোন রাজকুমারীকে বাসে ভাল, এর মধ্যে অপর এক রাজা সেই কুমারীটিকে নিতে চায় কেড়ে, ফলে তাদের মধ্যে বেধে ওঠে ঝগড়া। চারণ-কবিরা তখন নিজেদের আশ্রয়দাতার গান গায়—এমনি করেই বীরগাথা কাব্যের জন্ম হয়। এই যুগের প্রবন্ধ-কাব্য 'রাসো'-গ্রন্থ নামে খ্যাত। কেউ কেউ 'রাস'-এর অর্থ 'আনন্দ' বলেন আবার কারু কারু মতে 'রাস' মানে 'রহস্য'। রাসো-গ্রন্থের মধ্যে 'খুমান-রাসো', 'পৃথ্বীরাজ-রাসো' ও গীতকাব্যের মধ্যে 'বীসলদেব-রাসো' ও 'আলহখণ্ড' খুব বেশী খ্যাতি লাভ করেছে।

দলপতি বিজয় 'খুমান-রাসো' রচনা করেন। 'খুমান-রাসো'তে চিতোরের দ্বিতীয় খুমানের (৮৭০-৯০০ খ্রীষ্টাব্দ) যুদ্ধের বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে এখন যে 'খুমান-রাসো'র প্রতিলিপি পাওয়া গেছে তাতে রাণা প্রতাপসিংহ পর্যন্ত উল্লেখ পাওয়া যায়। বীরগাথা যুগের সব গ্রন্থের মধ্যে 'পৃথ্বীরাজ রাসো' সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। এই প্রবন্ধ-কাব্যকে এই যুগের প্রতিনিধি রচনা বলে ধরা হয়। এই হ'ল হিন্দীভাষার প্রথম মহাকাব্য তবে রামায়ণ-মহাভারতের মত রাষ্ট্রীয় চেতনা এর মধ্যে পাওয়া যায় না। 'পৃথ্বীরাজ রাসো'র রচয়িতা চন্দ বরদই—ডক্টর শ্যামসুন্দর দাসের মতে চন্দ পৃথ্বীরাজের সমকালীন ছিলেন। কথিত আছে যে, পৃথ্বীরাজ আর চন্দ বরদই একই দিনে জন্মগ্রহণ করেন ও একই দিনে দুজনে মৃত্যুও বরণ করেন। এ দুজনের মৃত্যু-কাহিনী বড় অদ্ভুত—শহাবুদ্দীন ঘোরী পৃথ্বীরাজকে গজনীতে ধরে নিয়ে যায়—চন্দও বন্ধুবিচ্ছেদ সহ্য করতে না পেরে গজনীতে গিয়ে উপস্থিত হন। পৃথ্বীরাজ শব্দভেদী বাণ দিয়ে শহাবুদ্দীনকে হত্যা করেন ও চাঁদের হাতে নিজের মৃত্যু বরণ করলেন, চন্দকবিও (চাঁদ) প্রিয়বন্ধুবিয়োগে আত্মহত্যা করলেন। বরদইয়ের 'পদ্মাবতী' কাব্যে পদ্মাবতী পৃথ্বীরাজকে চায়, একটি তোতাকে দূত করে পৃথ্বীরাজের কাছে নিজের মনের ইচ্ছা জানিয়ে পাঠায়—পদ্মাবতীকে অন্য কোন রাজা কেড়ে নিয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কায় পৃথ্বীরাজ সৈন্যসামন্ত সঙ্গে নিয়ে পদ্মাবতীকে বিয়ে করতে আসে। সৌভাগ্যক্রমে কেউ কোন বাধা দিতে আসে না—দুজনের বিয়ে হয়ে যায়।

'বীসলদেব-রাসো'র রচয়িতা ছিলেন নরপতি নাল্‌হ নামে এক কবি। ইনি চতুর্থ বিগ্রহরাজ বা বিসলদেবের (উপনাম) সমসাময়িক। ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে, চতুর্থ বিগ্রহরাজ এক পরাক্রমী রাজা ছিলেন ও কয়েকবার মুসলমানরা এঁর কাছে পরাজিত হয়ে পালাতে বাধ্য হয়। কিন্তু নরপতি তাঁর গ্রন্থে বিগ্রহরাজের বীরত্বের কাহিনী বর্ণনা করে ভোজরাজকুমারী রাজমতীর সঙ্গে তাঁর প্রণয়-গাথার ও বিয়ের কথাই উল্লেখ করেছেন। এর ভাষা রাজস্থানী হলেও এর মধ্যে কিছু কিছু আরবী, ফারসী ও তুর্কী শব্দ পাওয়া যায়।

'আল্‌হখণ্ডে'র প্রধান রচয়িতার নাম জগনিক, যিনি চন্দেলরাজ পরমালের রাজদরবারের কবি ছিলেন। এই রচনায় আল্‌হা ও ঊদল এই দুই বীরের কৃতিত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। এঁরা পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। এই বীর-গাথাগুলিতে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, তার সঙ্গে তৎকালীন কথিত ভাষার কোন সম্বন্ধ নেই। মীর খুসরোর রচনার মধ্যে আমরা প্রথম কথিত ভাষার প্রয়োগ দেখতে পাই কিন্তু খুসরোর রচনার মধ্যে পশ্চিম প্রান্তের চলতি ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, কারণ খুসরো ছিলেন পশ্চিমের। মুসলমান ছিলেন বলে তাঁর রচনায় অনেক আরবী ও ফারসী কথা এসে পড়েছে। নমুনাস্বরূপ খুসরোর কবিতার কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

বহ্ আয়ে তব শাদী হোয়।
উস বিন দিজা অরও ন কোয়॥
মীঠে লাগে বাকে বোল।
এ্যায় সখি সাজন! না সখি ঢোল॥

সাধারণ একটা নখের কথা তিনি কবিতার ছন্দে এমন সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন:

না মারা না খুন কিয়া,
মেরা সির কেঁও কাট লিয়া॥

বাংলা ভাষায় আমরা অনেক সময় অনেক 'ছড়া' বা ধাঁধাঁ শুনতে পাই যার ভাষা অনেকটা খুসরুর নখের বর্ণনার মত। আকাশকে এক জায়গায় ছন্দের বন্ধনে কবিতা করে বললেন:

এক থাল মোতিসে ভরা
সবকে সিরপর অওঁধা ধরা।
চারোঁ ওর বহ থালা ফিরে,
মোতী উসসে এক ন গিরে।

পশ্চিমে যেমন মীর খুসরো চলতি ভাষায় লিখছিলেন, পূর্বে তেমনি বিদ্যাপতি চলতি ভাষা ব্যবহার করে কবিতা-রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। বিদ্যাপতির কবিতায় বৈষ্ণীর

ভাগ কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণভজনের উল্লেখ পাওয়া যায় ও এই কারণে যুগের মাপকাঠিতে বিচার করলে বিদ্যাপতিকে পরবর্তী যুগের একজন কবিই বলা উচিত—কিন্তু সময়ের হিসাবে তিনি আদিকালের মধ্যে গণ্য হন। বিদ্যাপতি মহাকবি 'মৈথিল কোকিল' নামে প্রসিদ্ধ। প্রথমেই বলে রাখা প্রয়োজন যে, বিদ্যাপতি শিবের উপাসক ছিলেন ও শিব-ভক্তি সম্বন্ধে অনেক পদ লেখেন যেগুলিকে 'নচারী' বলে। তবে এই পদগুলিকে আমরা যদি কৃষ্ণভক্তির ভাবনার সঙ্গে তুলনা করি তা হলে যে এই পদগুলিতে শিবের প্রতি যে ইঙ্গিত আছে তা একেবারেই বুঝতে পারা যায় না। বিদ্যাপতির শৃঙ্গার-বর্ণনা উন্মুক্ত ও উলঙ্গ এবং এই নিয়ে অনেকে অনেক তর্ক করেছে ও বলেছে যে, বিদ্যাপতির শৃঙ্গার-বর্ণনা ভক্তি-ভাবনার পরিধি অতিক্রম করে গেছে ও শ্লীলতা বজায় রাখতে পারে নি। সে যাই হোক না কেন, এঁর এই পদাবলী শুনেই শ্রীগৌরাঙ্গ পাগল প্রায় হয়ে সংসার স্ত্রীপুত্র সব ছেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন। আসলে (যা আনন্দ কুমারস্বামী ও ডাঃ গ্রিয়ার্সনের মত) এঁর পদাবলী জীব ও পরমাত্মার মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে তারই রূপক মাত্র। বাংলা দেশে বিদ্যাপতির ভাষাকে বাংলা ভাষার অন্তর্গত বলে ধরা হয় কিন্তু মিথিলা বাংলা দেশের কাছাকাছি হওয়ায় এঁর পদাবলীর মধ্যে বাংলা ভাষার ভাব পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির ভাষা বিহারী, হিন্দী ও মৈথিলীর সঙ্গে বিশেষভাবে সম্বন্ধিত। ইনি ত্রিহুতের রাজা শিবসিংহের দরবারে থাকতেন বলে কথিত আছে ও এঁর রচনার অনেক জায়গায় শিবসিংহের বিশেষ রূপে উল্লেখ পাওয়া যায়। এঁর কয়েকটি প্রসিদ্ধ পদের উল্লেখ করা যেতে পারে :

> জনম অবধি হম রূপ নিহারল
> নয়ন ন তিরপিত ভেল।
> সেহো মধুর বোল শ্রবণ হি সুনল
> স্রুতিপথে পরসন গেল।
> কত মধু জামিনি রভস-গমওল
> ন বুঝল কইসন কেল।
> লাখ লাখ জুগ হিয়-হিয় রাখল
> তইও হিয় জুড়ল ন গেল।

এর মধ্যে দিয়ে বোধ হয় জীব ও পরমাত্মার চিরকালের অবিচ্ছেদ্য বন্ধনের দিকে বিদ্যাপতি ইঙ্গিত করেছেন। জীব ও পরমাত্মার সম্বন্ধ কোন নির্দিষ্ট কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না, যুগযুগান্তর অনাদিকাল ধরে ও অনাগত কালের জন্য চাওয়া পাওয়ার এই অদম্য আকুতিই ছিল বিদ্যাপতির চরম দর্শন। আর এই ছিল বৈষ্ণব-ধর্মের মূল মন্ত্র। কৃষ্ণকে তাই রাধিকা হাতের কাছে পেয়েও বেঁধে রাখতে পারলেন না, রাধিকার চোখের জলে সারা বৃন্দাবন ভেসে গেল তবুও কৃষ্ণকে পাবার জন্যে তাঁকে কেঁদেই যেতে হ'ল।

শিবের উপাসক বিদ্যাপতি ভৈরবীর মূর্তি আঁকতে গিয়ে তাঁর ভয়ঙ্কর রূপের বর্ণনা করলেন :

> বাসর-রণি সবাসন সোভিত চরণ
> চন্দ্রমণি চূড়া।
> কতওক দৈত্য মারি মুঁহ মেলল
> কতও উগিল কৈল কুড়া।

আদিকালে বীরগাথা-কাব্যের দু'রকম রচনা দেখা যায়। এক অপভ্রংশ এবং অন্যটি দেশীয় ভাষায় রচিত হয়। শুধু চারটি গ্রন্থকে অপভ্রংশ কাব্যের সাহিত্যিক পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে। (১) বিজয়পাল রাসো, (২) হম্মীর রাসো, (৩) কীর্তিলতা ও (৪) কীর্তিপতাকা। দেশীয় ভাষায় বা তৎকালীন চলতি ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে ( ) খুমান রাসো, (২) বীসলদেব রাসো, (৩) পৃথ্বীরাজ রাসো, (৪) ভট্ট-কেদার রচিত জয়চন্দ্রপ্রকাশ, (৫) মধুকর কবি-রচিত জয়ময়ঙ্ক রসচন্দ্রিকা, (৬) পরমাল রাসো, (৭) খুসরুর পহেলিঁয়া অথবা পদাবলী ও (৮) বিদ্যাপতির পদাবলী অন্যতম। এই সব কাব্যে নিম্নলিখিত বিশেষত্বগুলি পাওয়া যায় এবং এইগুলিই বীরগাথা কাব্যের বৈশিষ্ট্য : (১) আশ্রয়দাতার প্রশংসা, (২) বীররসের সঙ্গে শৃঙ্গার-রসের অবতারণা, (৩) যুদ্ধের সুন্দর ও সজীব চিত্র অঙ্কন, (৪) কল্পনার বহুলতা ও (৫) ঐতিহাসিক অপেক্ষা কাব্যিক ভাবের প্রাধান্য।

ভক্তিযুগ (১৩২৫ ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ)

যে যুগে বীরগাথা রাজা-রাণীদের প্রেমের কথা গাইছিল ঠিক সেই সময় মুসলমানদের আগমনে হিন্দুধর্মের ভিত্তি কেঁপে উঠল। মুসলমানরা এই সময় ভারতবর্ষের লোকেদের সঙ্গে এক রকম মিশে যাবার চেষ্টা করছিল—তারা নিজেদের ভারতবাসী বলে পরিচয় দিতে লাগল কিন্তু হিন্দু বিদ্বেষের ভাব অন্তরে পোষণ করতে থাকল। হিন্দু ও মুসলমান দুজনেই অন্তরে অন্তরে কেউ কাউকে দেখতে পারত না, এই বিদ্বেষের যে কি ভীষণ পরিণাম তার কল্পনা করেও সবার মন ভয়ে শিউরে উঠল। এই দুই বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মধ্যে একটা প্রীতি ও স্নেহের, মৈত্রী ও বন্ধুত্বের ভাব কি করে আনা সম্ভব! মুসলমানদের ঐশ্বর্য বা রাজ্যলিপ্সা যতই থাক কেন, তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ধর্মপ্রচার। ধর্ম যাদের মজ্জার সঙ্গে মিশে আছে, রক্তের প্রতিটি কণার সঙ্গে যাদের সম্বন্ধ তারা এ জুলুম সহ্য করবে কেন? এক দল উদার-

চেতা জ্ঞানী ব্যক্তি তাই লোকেদের প্রেম-মন্ত্রে দীক্ষিত করতে লাগলেন। যদি মানুষ মানুষকে ভালবাসে তবে সেই পরম দেবতাও সন্তুষ্ট হবেন এবং এ ভেদাভেদ অচিরে লুপ্ত হবে। এই পথকে তাঁরা জ্ঞানমার্গ আখ্যা দিলেন, কিন্তু এখানেও রাজনৈতিক প্রভাব তদানীন্তন সাহিত্যের ওপর গিয়ে পড়ল। এঁরা ছিলেন নিগুর্ণপন্থী। ভগবানের কোন রূপ এঁরা মানতেন না। মুসলমানরা মানে এক আল্লাকে, তাদের মূলমন্ত্র ছিল 'লা ইলা ইল ইল্লাহ', হিন্দুদের মধ্যে বহু ঈশ্বরবাদ, বিভিন্ন দেবদেবী সেই এক পরম দেবতারই অংশ বৈ আর কিছু নয়। ভগবানের এই এক বিরাটত্বের কল্পনাকে নিগুর্ণবাদ বলত—রাম ও রহিম এক, হিন্দু-মুসলমানদের কুসংস্কার দূর করে এক সরল, সাবলীল গতির জীবনযাত্রা নির্বাহ করাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। এই বৈষম্যভাব শুধু হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে নয়, হিন্দুদের মধ্যে উচ্চনীচ ভেদাভেদের বিষময় ফল ফলতে লাগল যা আজও আমরা শত চেষ্টা করেও বোধ হয় কিছুমাত্রও দূর করতে পারি নি।

এই বৈষম্যের বিরুদ্ধেই ছিল গৌতম বুদ্ধের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। বুদ্ধের সাম্যবাণী শুধু ভারতকে জয় করল না, সুদূর প্রাচ্য ও পূর্ব এশিয়া তথাগতের বাণীকে নিল এক-বাক্যে স্বীকার করে আর বুদ্ধের ধর্ম অবলম্বন করে অনেকেই গৌতমের অমর বাণীকে অমর করে রাখল চিরকাল ধরে। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের জন্মস্থান ভারতবর্ষ হওয়া সত্ত্বেও নানা রাজ-নৈতিক কারণে এখানে বৌদ্ধধর্মের পতন হ'ল ও আবার ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিষ্ঠা হ'ল। ঠিক এই সময় বিধর্মী মুসল মানদের হ'ল আগমন, ফলে স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের প্রশ্ন, জাতি-ভেদের ব্যবস্থা আরও গুরুতর আকার ধারণ করল। ব্রাহ্মণরা এই বিধর্মী মুসলমানকে যবন, ম্লেচ্ছ বলে ঘৃণা করতে লাগল, মুসলমানেরাও কোরাণের দোহাই দিয়ে হিন্দুদের 'কাফের' বলে দূরে সরে থাকতে চাইল—শুধু ঘৃণা নয়, যখন হিন্দুস্থান তাদের করায়ত্ত হ'ল, নানা রকম অমানুষিক অত্যাচার করে তাদের নিজেদের বলিষ্ঠতর, সভ্য ও 'মুসলমান' বলে জাহির করতে লাগল। এই সময়ে সন্ত কবিদের আবির্ভাব হয়—তাঁরা এলেন এই দুই জাতির মিলন মন্ত্র নিয়ে—এই দুই জাতির মধ্যে যা কিছু ভুল, কুসংস্কার সেগুলিকে অচিরে পরিত্যাগ করতে হবে—সেই ত্যাগের মধ্যে রয়েছে মহান্ ভারতের চরম আদর্শ। তাঁরা মুসলমান ও হিন্দুদের গোঁড়ামীকে একেবারে প্রশ্রয় দিতেন না। মুসলমানদের রোজা, নমাজ, হজ, তাজিয়াদারীর থেকে তাঁরা যেমন দূরে দূরে থাকতেন তেমনই হিন্দুদের ব্রত, শ্রাদ্ধ, তীর্থযাত্রা প্রভৃতির প্রতিও তাঁরা বিমুখ ছিলেন। সন্ত কবিদের মধ্যে অনেকেই নীচজাতি ছিলেন। বিদ্যাভ্যাস করবার সুযোগ এঁরা পান নি। প্রদেশে প্রদেশে ঘুরে বেড়িয়ে এঁরা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন এবং সৎসঙ্গ ও আপন কল্পনা এবং ধারণার ভিত্তির ওপর এঁদের রচনা গড়ে ওঠে। নানা স্থানে এঁরা ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, কাজেই অনেক সময় এঁদের ভাষার মধ্যে নানা প্রদেশের ভাষার সমাবেশ ও বিভিন্ন স্থানের প্রচলিত শব্দ পাওয়া যায়। সন্ত কবিরা ভগবানকে নানা নামে অভিহিত করেছেন যেমন রাম, রহিম, গোবিন্দ, হরি প্রভৃতি।

কবীরদাস

সন্তকবিদের মধ্যে প্রথমেই যাঁর নাম উল্লেখযোগ্য তিনি হলেন কবীরদাস। কথিত আছে যে, কবীর এক হিন্দু বিধবার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং নীরু নামে এক মুসলমান তন্তুবায়ের ঘরে প্রতিপালিত হন। পয়সার অভাবে কবীরের পড়াশুনা করবার সৌভাগ্য হয় নি। ছেলেবেলায় নীরুর সঙ্গে তাঁতের কাজ করতেন এবং সাধু-সন্তদের রচিত গান গেয়ে বেড়াতেন—এমনই ভাবে প্রেম, অহিংসার মধ্যে দিয়ে, আড়ম্বরহীন সহজ-সরল জীবনের মাঝে কবীরের দিনগুলো কেটে যেতে লাগল। যৌবনে পদার্পণ করেই লোঈ নামে একটি রমণীর পাণিগ্রহণ করেন এবং তাঁর গর্ভে যে পুত্র-সন্তান হয় তার নাম রাখলেন কমাল। কবীর স্ত্রী লোঈকে আপনার সহজ মন্ত্রে দীক্ষিত করতে সক্ষম হন কিন্তু কমালকে কিছুতেই এ রাস্তায় আনতে পারলেন না। কবীর স্ত্রী লোঈয়ের সাহায্যে নিজের কর্তব্য করে চললেন ও শেষে মগহর নামে এক স্থানে তাঁর দেহাবসান হয়। মৃত্যুর কিছু-দিন আগে তিনি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর দিন এগিয়ে আসছে। তিনি মগহরে যাওয়া ঠিক করলেন কারণ সবাইয়ের ধারণা ছিল যে, মগহরে যারা মারা যায় তাদের নরকে স্থান হয়—এই মিথ্যা ধারণাকে দূর করতেই হবে, লোকেদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে,মৃত্যুর পর স্বর্গ বা নরকপ্রাপ্তি আপন জীবনের কর্মফলের উপর নির্ভর করে, স্থানের বৈশিষ্ট্যের ওপর নয়। তাই তিনি বললেন :

জো কবিরা কাশী মরৈ রামায় কৌন নিহারা রে।

নানা স্থানে পর্যটন করার ফলে তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মহাত্মা-সাধুদের সঙ্গে পরিচিত হন ও এমনি করে বেদ, পুরাণ, উপনিষদ ও কোরাণের অনেক তথ্য জানতে পারেন। হিন্দু পণ্ডিত ও মুসলমান মৌলবীদের ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেন ও তিরস্কার করে বলেন :

মালা ত করমেঁ ফিরৈ, জিভ ফিরৈ মুখ মাঁহি।
মনুআ ত চহুঁ দিস ফিরৈ, য়হ ত সুমিরণ নাহিঁ।

অথবা

কাঁকর-পাথর জোরি কৈ, মসজিদ লই চুণায়।
তা চঢ়ি মুল্লা বাঁগি দৈ, বহরা ভয়া খুদায়।

কবীরের বাণীর মধ্যে রহস্যবাদের প্রভাব বিশেষ মাত্রায় দেখা যায়। হিন্দুপ্রথা অনুসারে ইনি নিজেকে ভগবানের 'কনে' (পত্নী) বলে মনে করতেন। পত্নী পতিসঙ্গ পাবার জন্য বা মিলনের জন্য যেমন উদগ্রীব হয়ে থাকে তেমনি কবীরও ভগবানের সঙ্গে মিলনের জন্য উৎসুক হয়ে বসে থাকতেন। তিনি নিজেকে রামের স্ত্রী বা 'রাম কী বহুরিয়া' বলতেন। কিন্তু এ রাম দাশরথী রাম নয়, পরমপুরুষ রাম ভগবান। শুধু লোকেদের মাঝখানে ভগবান ও মানুষের এই সম্বন্ধকে মধুর করে তুলবার জন্য তিনি শৃঙ্গার ভাবের বর্ণনা করতেন। কিন্তু আসলে তিনি নির্গুণবাদী ছিলেন, ঈশ্বর নিরাকার, ঈশ্বরের কোন রূপ নেই :

সাধো এক রূপ সব মাহীঁ।
অপনে মন বিচারিকৈ দেখৈ কোঈ দুসরা নাহীঁ।

কবীরের সমস্ত বাণী 'বীজক' নামক গ্রন্থের রূপে সংগৃহীত করা হয়েছে। বীজকের তিনটি ভাগ আছে—রমৈনী, সবদ ও সাখী। ভাষা 'খড়ী বোলী', অবধি ও পূর্ব বিহারীর সংমিশ্রণে গঠিত হয়েছে। কখনও কখনও অনেক পাঞ্জাবী শব্দও এসে পড়েছে :

গুরু গোবিন্দ ত এক হৈঁ, দুজা যহু আকার।
আপা মেট জীবত মরৈ তৌ পাবৈ করতার।
কবীর মালা মন কী, ঔর সংসারী ভেষ।
মালা পহরয়্যা হরি মিলৈ, ত অরহট কৈ গলি দেখ।

কবীরের প্রতিটি সাখী হৃদয়ের নিগূঢ়তম প্রদেশে গিয়ে আঘাত করে, কেবলই মনে হয় যে, যার 'মসি কাগদ্' (কালি কাগজ) অর্থাৎ লেখাপড়ার সঙ্গে এতটুকু পরিচয় হয় নি তার পক্ষে এত জ্ঞানগর্ভ, কল্পনাপ্রবণ, দার্শনিক কথা জানা কি করে সম্ভব হ'ল! এক মহান আদর্শ, আড়ম্বরহীন জীবন-যাত্রা যাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, পার্থিব দলাদলির বহু ঊর্দ্ধে যিনি নিজের আদর্শকে খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন, সংসারের সমস্ত সঙ্কীর্ণতা, কালিমা ধুয়ে-মুছে যিনি এক সুন্দর ভব্য সমাজ নির্মাণেরই স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁর পক্ষে কিছুই অসম্ভব ছিল না। কবীরের সাখীর কয়েকটি উদ্ধৃত করা হ'ল—এর থেকে বোঝা যাবে যে, তাঁর কল্পনা ও জ্ঞান সত্যই কত গভীর ছিল—প্রত্যেকটি যেন পঙ্কিলতায়ডোবা পৃথিবীর মানুষকে সচেতন করে দেবার এক-একটি ইঙ্গিত :

পানী কেরা বুদবুদা, অস মানুসকী জাত।
দেখত হী ছিপ জায়গা, জ্যোঁ তারা পরভাত॥

কস্তুরী কুণ্ডল বসৈ, মৃগ ঢুঁঢ় বন মাহিঁ।
ঐসে ঘটমে পীব হৈ, দুনিয়া জানৈ নাহিঁ।

প্রেম ন বাড়ী উপজে, প্রেম ন হাট বিকায়।
রাজা পরজা জেহি রুচৈ, সীস দেই লৈ জায়।

সাঁচ বরাবর তপ নহীঁ, ঝুট বরাবর পাপ।
জাকে হিরদৈ সাঁচ হৈ, তাকে হিরদৈ আপ।

নারী কী ঝাঁঈ পড়ৈ, অন্ধা হোত ভুজঙ্গ।
কবিরা তিন কী কৌন গতি নিত নারী কা সঙ্গ॥

পোথী পঢ়ি জগ মুআ, পণ্ডিত ভয়ো ন কোঈ।
ঢাই অক্ষর প্রেম কা, পঢ়ে সো পণ্ডিত হোঈ॥

মনুআ কৈসে বাব্‌রে রে, পাথর পূজন জাঈ
ঘর কী চকিয়া কোঈ ন পূজে, জাকো পিসো খাঈ॥

নানক (১৪৬৯—১৫৩৯)

গুরু নানক শিখ সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ও সন্ত কবিদের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পাঞ্জাবে সন্তভাবের প্রচার আরম্ভ করেন। লাহোর জিলার তিলবন্দী গ্রামে নানক জন্মগ্রহণ করেন, এঁর পিতার নাম ছিল কালুচন্দ ও মাতার নাম তৃপ্তা। ১৯ বছর বয়সে গুরুদাসপুরের মূলচন্দ ক্ষত্রীর কন্যা সুলক্ষণার সঙ্গে এঁর বিবাহ হয় এবং এঁরই গর্ভে শ্রীচন্দ ও লক্ষ্মীচন্দ নামে দুই পুত্র হয়। শ্রীচন্দ 'উদাসী' সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। শিখরা হিন্দুধর্মের প্রতি কোন বিরুদ্ধ ভাবনা পোষণ করে না, তবে 'উদাসী' সম্প্রদায়ের লোকেরা হিন্দুধর্মের প্রতি শিখদের অপেক্ষা বেশী মান্যতা দেয়।

কবীরদাসের মত নানকও অশিক্ষিত ছিলেন ও ঠিক কবীরের মত নানাস্থানে পর্যটন করে ইনি জ্ঞান ও ভক্তি-মার্গকে সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। নানকের রচনার কয়েকটি পাঞ্জাবী ভাষায় রচিত আর কয়েকটি পাঞ্জাবী শব্দবহুল ব্রজভাষায় লিখিত। একবার এঁর পিতা কালুচন্দ ব্যবসার জন্য কতকগুলি জরুরী জিনিস কিনে আনতে এঁকে বেশ কিছু টাকা দিয়ে বাজারে পাঠান—নানক সেই সমস্ত টাকায় সাধুর সেবা করে শুধু হাতে বাড়ী ফিরে আসেন। পিতা জিজ্ঞেস করলে নানক উত্তর দেন যে, ওই টাকায় তিনি সত্যিকারের জিনিস কিনতে সক্ষম হয়েছেন। এঁর সমস্ত বাণী 'গুরু-গ্রন্থসাহব'-এ সংগৃহীত আছে। এঁর যে কতখানি সরলতা, নম্রতা, সহৃদয়তা ছিল তা এই বাণীগুলি থেকে

পরিচয় পাওয়া যায়—ঈশ্বর-ভক্তি ও সদাচার তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল :

স্বরা এক[illegible] আঁখিয়ন, জো লজ্জনি রূপা মেঁ জায়।
স্বয়ে সৌঁপি 'নানক' [illegible] হুকুম রজায় ॥
হিরদে জিনকে হরি বসে, সে জন কহিয়হি স্বর।
কহী ন জাঈঁ 'নানকা' পূরী রহ্যা অটপূর ॥

নানকের মতে সেই মানুষ প্রকৃত মানুষ :

জো নর দুখমেঁ দুখ নহিঁ মানৈ।
সুখ সনেহ ঔর ভয় নহি জাকে,
কনচন ভারী জানৈ ॥

দাদূদয়াল (১৫৪৬—১৬০৩)

দাদূদয়াল গুজরাটনিবাসী ছিলেন। রাজস্থানের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ইনি পরিভ্রমণ করেছিলেন ও আপন ঈপ্সিত পথকে 'দাদূপথ' আখ্যা দেন। অনেকের মতে ইনি মুসলমান ছিলেন ও এঁর আসল নাম ছিল দাউদ। জয়পুরের কাছে নরানা নামক স্থানে এঁর মৃত্যু হয়। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন দাদূর আদর্শ ও বিচারের ওপর বাংলা ভাষায় 'দাদূ' নামে একটি বই লেখেন যার থেকে আমরা দাদূ ও তাঁর আদর্শ-পথের অনেক তথ্য জানতে পারি। শিখেদের 'সৎশ্রীকালে'র মত দাদূপন্থীরা 'সত্তনাম' বলে একে অপরকে অভিবাদন জানায়। দাদূর বাণী হিন্দীভাষা ছাড়া গুজরাটী ও পাঞ্জাবী ভাষায়ও পাওয়া যায়। আরবী-ফারসী শব্দ বহুল পরিমাণে এঁর বাণীর মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। কবীরের মত ইনি কারু প্রতি তিরস্কার বা কটাক্ষ করেন নি—সহজ,শান্ত, সরলভাবে ইনি আপন ভাব ব্যক্ত করেছেন :

ঘীব্ দুধমে রমি রহ্যা, ব্যাপক সব হো ঠৌর।
দাদূ বকৃতা বহুত হৈঁ, মথি কাঢ়ে ন ওর ॥
সুখ কা সাথী জগত সব, দুখ কা নাহী কোই।
দুখ কা সাথী সাইয়া, দাদূ সদ্‌গুরু হোই ॥

সুন্দরদাস (১৫৯৬—১৬৮১)

জয়পুর রাজ্যের দৌসা নগরে এঁর জন্ম হয়। জাতিতে ইনি বৈশ্য ছিলেন। অন্যান্য সন্ত কবিদের মত দেশভ্রমণের দ্বারা ইনি জ্ঞান আহরণ করেন নি, সাধারণ নিয়ম অনুসারে ইনি বিদ্যাভ্যাস করেন। এঁর সবৈয়া ছন্দ খুবই সুন্দর এবং অনুপ্রাস ও যমকাদি শব্দালঙ্কার ও উত্তমোত্তম অর্থালঙ্কার এঁর কবিতাকে আরও সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছে। সুন্দরদাস রচিত অনেকগুলি ছোট ছোট রচনা পাওয়া যায় যেগুলির মধ্যে 'সুন্দর-বিলাস' সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ। পরিমার্জিত ব্রজভাষায় সুন্দর-বিলাসে'র রচনা। এঁর নীতি-বিষয়ক রচনাগুলি হিন্দীসাহিত্যের সামগ্রী—উদাহরণস্বরূপ এঁর কয়েকটি কবিতার পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা হ'ল :

বোলিএ ত তব জব বোলিবে কী বুধি হোই,
ন ত মুখ মৌন গহি চুপ হোই রহিয়ে।
বেদ থকে কহি তন্ত্র থকে কহি,
গ্রন্থ থকে নিস বাসর গাতৈঁ।
শেষ থকে শিব চন্দ্র থকে পুনি পোথ
কিয়ৌ বহুভাতি বিধাতৈ।

এলাহাবাদের কড়া জিলা নিবাসী মলুকদাসের (১৫৭৪—১৬৮২) নাম দূরদূরান্তরে প্রসারিত হয়েছিল ; জয়পুর, গুজরাট, পাটনা, এমনকি নেপাল ও কাবুল পর্যন্ত ইনি প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সাধারণ সন্ত কবিদের অপেক্ষা এঁর ভাষা অনেক শুদ্ধ ও সংস্কৃত-ঘেঁষা ছিল। এঁর রচিত দুখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়—'রত্নখান' ও 'জ্ঞানবোধ'। অলস ব্যক্তিদের চেতনা দেবার জন্য ইনিই বলেছিলেন "অজগর করৈ ন চাকরী, পনছী করৈ ন কাম।" এঁদের ছাড়াও যে কয়জন সন্ত কবির কাছে হিন্দী সাহিত্য ঋণী, তাঁরা হলেন নিশ্চলদাস, যারী সাহব, বুল্লা সাহব, তুলসী সাহব ও সহজোবাই।
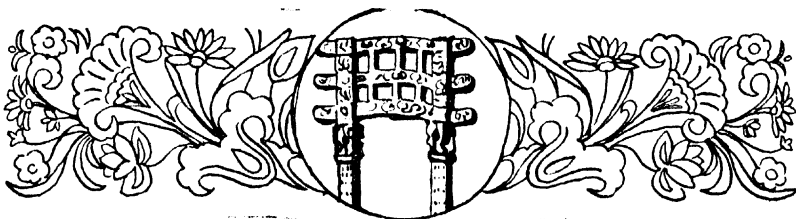
দেবীপ্রসাদের 'শ্রমের জয়যাত্রা'

শ্রীরাধিকা রায়চৌধুরী

আজও যাদের মুখে কথা নেই চোখের সামনে তাদের দেখি কিন্তু ঠাঁই দেই না মনের তলায়। পুঞ্জীভূত দারিদ্র্যের বোঝা নিয়েও এরা প্রতিনিয়ত কঠোর পরিশ্রম করে চলেছে—

ওরা কাজ করে
দেশে দেশান্তরে
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের, সমুদ্র নদীর ঘাটে ঘাটে
পাঞ্জাব বোম্বাই গুজরাটে।

... ...

সুখ দুঃখ দিবস রজনী
মন্দ্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি।

কবির লেখনী যাদের দিয়েছিল পরিচিতি, ভাস্করের অঙ্গুলীস্পর্শে তারা হ'ল শক্তিমান—বক্তব্যে শাণিত।

দেবীপ্রসাদ দক্ষ শিকারী। তাই তিনি অবকাশমত শিকারের সন্ধানে ছুটে বেড়ান এটাই জানতাম। কিন্তু একদিন শিকার-প্রসঙ্গে আলোচনায় তিনি বলেছিলেন—"শিকারের উপলক্ষে ছুটে বেড়াই সত্য কিন্তু তার চেয়ে বেশী আকর্ষণ অরণ্যের। গভীর অরণ্যের বৈচিত্র্যময় রূপ, অসংখ্য শাখা প্রশাখায় জরাগ্রস্ত বিরাট বৃক্ষের নির্বাক বক্তব্য আমার নিঃসঙ্গতাকে গভীরতর অনুভূতিতে পূর্ণ করে তোলে—এদের মধ্যে পাই আমার নব নব সৃষ্টির প্রেরণা—আর পাই মানুষের মাঝে। যারা শহর থেকে দূরে—সহজ সরল জীবনে কর্মমুখর - মাটীর জীবনরসে শক্তিমান—তাদেরকে আমি দেখেছি আমার সৃষ্টির নিবিড়তায়। তারা আমার শিল্পীমনকে বার বার আলোড়িত করেছে—এঁকেছি ছবি, গড়েছি মূর্তি। এদের প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি আমার ভাষায়।"

গভীর অনুধ্যানের সঙ্গে ছবির বিভিন্ন ভাষার পাণ্ডিত্যে তিনি তা প্রকাশও করেছেন। কখনও বা প্রকাশের যন্ত্রণা রং ও রেখায় তৃপ্তি খুঁজে পায় নি, তাই একই বক্তব্যকে স্পর্শের ব্যাকুলতায় রূপায়িত করে তুলেছেন ভাস্কর্যে। শিল্পীমনের অতৃপ্তি সেখানে গভীরতর অনুভূতির স্পর্শে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে—ঘটেছে বেদনার পরিসমাপ্তি।

তারই একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'শ্রমের জয়যাত্রা'। দেবীপ্রসাদের আন্দোলিত চেতনার নির্বাক বক্তব্য—রঙে-রেখায়-মাটিতে নানাভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রকাশ-বৈচিত্র্যে আমরা তাদের দেখে মুগ্ধ হয়েছি—আর অতৃপ্তির বেদনায় গুমরে উঠেছেন দেবীপ্রসাদ। 'এরা কি তারা' এই আত্মজিজ্ঞাসার বিচারে নিজের সৃষ্টিকে তিনি বার বার ধ্বংস করেছেন, আবার নবরূপায়ণে গড়ে তুলেছেন। শুধু সৃষ্টি নয়, ধ্বংস করার এত বড় সাহসী শিল্পী দুর্লভ।
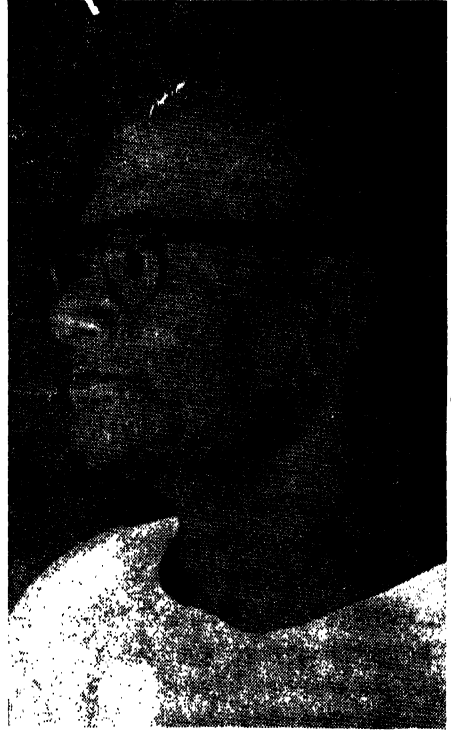
শিল্পী দেবীপ্রসাদ

১৯৫৬ সনে নয়াদিল্লীতে All India Contemporary Sculptural Exhibition হয়েছিল। 'শ্রমের জয়যাত্রা' প্রদর্শনীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের মর্যাদা লাভ করে পুরস্কৃত হ'ল। ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারির কর্তৃপক্ষ এই মূর্তিগুলির পূর্ণাঙ্গ 'ষ্ট্যাচু' তৈরীর ভার দিয়েছিলেন শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়-চৌধুরীকে।

ছুটির অবকাশে মূর্তিগুলি দেখার জন্য মাদ্রাজ গিয়ে-

ছিলাম। মাদ্রাজ শহর থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে Bronze Casting-এর কারখানা। এই কারখানায় পাটনার শহীদ-স্মারকের সাতটি বড় মূর্তির ব্রোঞ্জ-কাষ্টিং হয়। উল্লেখযোগ্য যে, এত বড় বড় মূর্তির ব্রোঞ্জ-কাষ্টিং ইতিপূর্বে আর হয় নি। সমস্ত বড় মূর্তি বিদেশ থেকে ব্রোঞ্জ-কাষ্টিং হয়ে আসত।

দেবীপ্রসাদ নিজের অর্থসাহায্যে ও তত্ত্বাবধানে দরিদ্র কারিগর জি, মাসলামুনিকে দিয়ে এত বড় বড় কাজগুলি করে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, সুযোগ পেলে এদেশের কারিগরও তা করতে পারে। বিদেশের দ্বারস্থ হওয়ার দরকার করে না।

জি, মাসলামুনি সবিশেষ আগ্রহ নিয়ে ব্রোঞ্জ-কাষ্টিংএর পূর্ববর্তী অবস্থা ও তার ক্রমবিকাশের পদ্ধতি বুঝিয়ে দিলেন। তিনি ইংরেজী বা হিন্দী জানেন না, বন্ধুবর চুণী বিশ্বাস দোভাষীর কাজ করলেন। জি, মাসলামুনি বললেন ছোট ছোট ব্রোঞ্জের মূর্তি তৈরী করা তাঁদের বংশগত পেশা। শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর সাহায্য ও পরামর্শে এত উন্নততর ব্রোঞ্জ-কাষ্টিং করার সুযোগ পেয়েছেন বলে বার বার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছিলেন।

শ্রমের জয়যাত্রার ব্রোঞ্জ-কাষ্টিংএর কাজ তখন প্রায় শেষ হতে চলেছে। কারখানার এক কোণে শ্রমের জয়যাত্রার একটি ব্রোঞ্জের পূর্ণাঙ্গ মূর্তি পড়ে ছিল। চুণীবাবু বললেন, দেবীপ্রসাদ একজন নূতন কারিগরকে এটা তৈরী করবার সুযোগ দিয়েছিলেন কিন্তু সূক্ষ্ম কাজগুলি কাষ্টিংএর পর ভাল উৎরায় নি বলে তা শেষ পর্যন্ত পরিত্যাগ করা হয়েছে। এই জন্য কয়েক হাজার টাকা ব্যয় হয়ে গেছে। নূতন কর্মীকে গড়ে তোলার জন্য এত বড় ব্যক্তিগত ক্ষতি স্বীকারের মহৎ উদারতা আমাকে বিস্ময়ে অভিভূত করেছিল।

ফিরে এলাম দেবীপ্রসাদের ষ্টুডিওতে। এদিকে-ওদিকে সমাপ্ত-অসমাপ্ত অনেকগুলি বড় মূর্তি এবং ছোট মূর্তিও রয়েছে। নূতন আঁকা দুখানা খুব বড় অয়েল-পেন্টিং নৈপুণ্য ও চরিত্র-চিত্রণে স্বকীয় বলিষ্ঠতায় সুপরিস্ফুট।

পূর্বাপেক্ষা এবার দেবীপ্রসাদকে বেশী স্বল্পভাষী আর ধ্যান-গম্ভীর বলে মনে হচ্ছিল। সর্বক্ষণ যেন বৃহতের ভাবনায় ডুবে আছেন। আর ছোট ছোট মূর্তি নয়—যেন বড় বড় মূর্তিতে বক্তব্যকে স্পষ্টতর করে তুলতে চান। নির্বাক-মূর্তি-নির্মাণের চরম সাধনায় হয় ত এইরূপ সমাহিতির প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেন যে ক'দিন সেখানে ছিলাম সমস্ত পরিবেশ থেকে এটাই অনুধ্যান করেছিলাম।

এর কয়েক মাস পর ১৯৫৬ সনের ১৪ই জুন মাদ্রাজ আর্ট কলেজের অধ্যক্ষপদ থেকে অবসর গ্রহণ করে শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী দিল্লী যাত্রা করেন। "শ্রমের জয়যাত্রা"র মূর্তিগুলি বসাবার জন্য ছাত্র চুণী বিশ্বাস, জি, মসলামুনি ও অন্যান্যদের সঙ্গে নিয়ে যান। ৪ঠা জুলাই জাতীয় চিত্রশালা ভবন "জয়পুর হাউসে"র সামনে মূর্তিগুলি বসাবার কাজ শেষ হয়েছে।

দর্শকদের দৃষ্টিতে উৎসুক জিজ্ঞাসা, "এরা কারা" ?

রাজধানীর মানুষ ত এরা নয়! 'তবে এরা কারা' ?

চারিদিক থেকে ঘুরে ঘুরে যতই দেখছে, চোখ ফেরাতে পারছে না। রাজধানীর অভিজাত রঙ্গমঞ্চে ওদের প্রবেশ শুধু বিস্ময়কর নয়—আরও কিছু।

চারজন দিনমজুর একখণ্ড পাথরকে প্রাণপণ চেষ্টায় স্থানচ্যুত করছে। কর্মনিরত মানুষগুলির চোখেমুখে দারিদ্র্যের স্পষ্টতা—তবু উদ্যমের দৃঢ়তায়, ঐক্যবদ্ধ প্রতিটি পেশীর সংঘর্ষ ও সংঘাত যে প্রাণশক্তির সৃষ্টি করেছে—সেই শ্রমশক্তিতে তারা অপরাজেয়—শক্তিমান। এটিই "শ্রমের জয়যাত্রা"র বক্তব্য।

অন্তরালের মানুষকে শিল্পীর একাত্মবোধ প্রাণবন্ত করে গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছে। জীবন-দরদী দেবীপ্রসাদ সমস্ত সাধনা নিংড়ে এই সব উপেক্ষিতদের ভাষা দিয়েছেন। মূর্তিগুলির শাণিত বক্তব্য সকল শ্রেণীর দর্শকমনকে চাঞ্চল্যে বিস্ময়ে করেছে আত্মজিজ্ঞাসার সম্মুখীন। এই আত্মজিজ্ঞাসার যথার্থ উত্তর দেবে আগামী কাল।

আমরা নীরবে শ্রদ্ধা নিবেদন করব শিল্পীর অমর সৃষ্টিকে, যা জাতীয় ভাস্কর্যে এক নূতন ইতিহাসের সূচনা করেছে। আর অভিনন্দন জানাব নয়াদিল্লীর জাতীয় চিত্রশালার কর্তৃপক্ষকে যাঁরা জাতীয় মর্যাদায় একে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

শ্রমের জয়যাত্রার শিল্পমান সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না বলে শুধু এই কথা বললেই যথেষ্ট হবে যে, এদেশের মাটিতে স্থাপিত বিখ্যাত বিদেশী ভাস্করদের নির্মিত মূর্তিগুলির শ্রেষ্ঠত্বকে ম্লান করে দিয়ে দেবীপ্রসাদ জাতীয় মর্যাদাকে উচ্চতর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং দেশীয় মূর্তি শিল্পীদেরও আত্ম-সমালোচনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উন্নততর নৈপুণ্যের সন্ধানী হতে অনুপ্রাণিত করেছেন।

প্রসঙ্গতঃ আমাদের বর্তমান ভাস্কর্য ও ভাস্করদের দুরবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলার গুরুত্ব অনুভব করি।

এটা লক্ষ্যণীয় যে, শিল্পকলার উন্নয়ন-প্রচেষ্টায় চিত্রশিল্পে যতটা সুযোগ এসেছে ভাস্কর্যে তা আসে নি। এর ফলে জাতীয় ভাস্কর্য অগ্রগতির পথে না গিয়ে অবনতির পথে নেমে যাচ্ছে। এর সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় প্রতিনিধিত্বমূলক প্রদর্শনীগুলিতে।

এই অধোগতির প্রথম কারণ হচ্ছে ভাস্কর্যে অর্থোপার্জনের

ক্ষেত্র এত সঙ্কুচিত যে, একে আঁকড়ে শিল্পীর বেঁচে থাকার কোন নিরাপত্তা নেই। উপার্জনের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা বিরামহীন সাধনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে। শিল্পীর আপন স্বাতন্ত্র্য নিয়ে এগোতে পারা ত দূরের কথা, আঘাতে আঘাতে ঘটে তার মৃত্যু—বেঁচে থাকে কারিগর। কখনও বা ভাস্করের রূপান্তর ঘটে মৃৎশিল্পীতে।

দ্বিতীয় কারণ—শিল্পকলা বিদ্যালয়গুলিতে ভাস্কর্য্য-শিক্ষা দেওয়ার যে ব্যবস্থা তা পর্য্যাপ্ত বলা চলে না।

উন্নততর ভাস্কর্যশিক্ষার জন্য একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্বতন্ত্রভাবে স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন। সেখানে বিভিন্ন ধারার প্রয়োগ-পদ্ধতি, বড় বড় মূর্তির Stone Covering, ব্রোঞ্জ-কাষ্টিং শিক্ষা দেওয়া এবং এর সঙ্গে গবেষণা চালানো। শিক্ষা সমাপ্ত হলে যাতে তারা বাস্তব-ক্ষেত্রে তা প্রয়োগের দ্বারা দেশকে সমৃদ্ধ করার সুযোগ পান, সেইজন্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের গঠনের কাজে ভাস্কর্যকে স্থাপত্যের সহিত সংযোজিত করা সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন। তাতে শিল্পীদের আর্থিক নিরাপত্তা থাকবে বলেই, ভাস্কর্যের সুস্থ ক্রমবিকাশও সামগ্রিক ভাবে সম্ভব হবে।

শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর মত সুদক্ষ ভাস্কর এবং অভিজ্ঞ আচার্যের উপর এই কর্মভার ন্যস্ত করাই ফলপ্রসূ ও মঙ্গলদায়ক হবে বলে মনে করি। দেশের শিল্পকলা-উন্নয়ন-বিভাগের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষকে জাতীয় ভাস্কর্যের বর্তমান অবস্থার কথা গভীর ভাবে চিন্তা করে আন্তরিকতা নিয়ে সক্রিয় হতে অনুরোধ করি।

সুদীর্ঘ আটাশ বছরের সাধনায় ভাস্কর দেবীপ্রসাদ শুধু মূর্তি নির্মাণ করেন নি, বহু মূর্তি ভেঙে ভেঙে শিক্ষার্থীর মত নানা গবেষণায় যে পরিমাণ অর্থব্যয় করেছেন, দেশবাসীরা সেই কষ্টার্জিত অর্থের পরিমাণ না জানেন ক্ষতি নেই—কিন্তু ভুল করা হবে যদি না দেবীপ্রসাদের জীবন-সাধনায় সঞ্চিত অমূল্য সম্পদে ভাবী উত্তর-সাধকদের সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার ব্যবস্থা না হয়। এর ফলে জাতীয় ভাস্কর্যের যে পরিমাণ ক্ষতি হবে তা শুধু অপরিসীম নয় অপূরণীয়ও বটে।

অনির্ব্বাণ শিখা

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

শিখা থেকে শিখা জ্বালতে হয়। গান্ধীজীর মুক্ত দীপ্ত মহাজীবনের আলো থেকে জ্বালিয়ে নিতে হবে আমাদের জীবন-প্রদীপ। সেই কৌপীন-পরিহিত নগ্নকায় রুদ্র সন্ন্যাসী বসে আছেন মধ্যভারতের এক নগণ্য পল্লীর পর্ণকুটীরে। নেই সেখানে বিজলিবাতী, নেই রেডিও, নেই টেলিফোন। তবু তিনি ছিলেন আসমুদ্রহিমাচল-ভারতের মুকুটহীন রাজা।

কোন্ যাদুমন্ত্রবলে এমন অসম্ভবকে তিনি সম্ভব করতে পেরেছিলেন? চালাকীর দ্বারা নিশ্চয়ই নয়। চালাকীর দ্বারা আজ পর্যান্ত পৃথিবীতে কোন মহৎ কার্য্যই সম্পন্ন হয় নি। নানা প্রদেশের, নানা ভাষার, নানা ধর্ম্মের লাখো লাখো নরনারীকে এমন করে তিনি যে আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন—এর মূলে ছিল তাঁর প্রেম। জনসাধারণের অবর্ণনীয় দুঃখকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন তিনি। তাদের তিনি ভালবেসেছিলেন সমষ্টিগত-ভাবে তো বটেই, ব্যক্তিগতভাবেও। তাঁর সংস্পর্শে যারাই আসতো তারাই অনুভব করতো তাঁর এই প্রেমের অতলস্পর্শী গভীরতাকে। আর ভালোবাসলে তবেই তো ভালবাসা পাওয়া যায়। গান্ধীজী ভালোবাসা দিয়েছিলেন যেমন, ভালোবাসা পেয়েছিলেনও তেমনি। এই ভালোবাসার জোরেই শতধাবিভক্ত ভারতবর্ষকে একসূত্রে বাঁধতে পেরেছিলেন তিনি। প্রেমের ক্ষমতা ছাড়া আর তো কোন ক্ষমতা ছিল না তাঁর। শাস্তির ভয় অথবা ধন-দৌলতের লোভ দেখিয়ে মানুষকে দলে টানবার তাঁর কোন শক্তি ছিল না। তাঁকে ভালোবেসেই জনসাধারণ তাঁকে মাথায় করে রেখেছিল। কেমন করে বাঁচতে হয় এবং কেমন করেই বা মরতে হয়—এ শিক্ষা তাঁর কাছ থেকেই তো আমরা পেয়েছি। আইন অমান্য আন্দোলনে মৃত্যুর সম্মুখীন হবার জন্যে বারম্বার তিনি আহ্বান করেছেন জনসাধারণকে আর সেই দুর্জ্জয় আহ্বানে সাড়া দিতে তারা একটি বারও দ্বিধা করে নি। দলে দলে কারাগার পূর্ণ করেছে তারা, লাঠির নীচে নির্ভয়ে পেতে দিয়েছে তাদের মাথা, বন্দুকের গুলীর সামনে পেতে দিয়েছে তাদের সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট, বুকের উত্তপ্ত শোণিতে ভিজিয়ে দিয়েছে দেশের মাটি।

ভালোবাসার চরম প্রকাশ প্রেমাস্পদের জন্যে জীবনের সমস্ত প্রিয়বস্তুকে ত্যাগ করবার ক্ষমতায়। অন্তরের মধ্যে যখনই তিনি এই দৈববাণী শুনেছেন, দুর্বলকে রক্ষা করবার জন্যে বলি দাও তোমার জীবন, অমনি সুরু হয়েছে তাঁর প্রায়োবেশন। অথচ

জীবনকে তিনি কতই না ভালোবাসতেন। এক শো পঁচিশ বৎসর বেঁচে থাকার ইচ্ছা কতবার কত ভঙ্গীতে তিনি প্রকাশ করেছেন!

কিন্তু কর্ত্তব্যের কাছে জীবনের মূল্য কতটুকু? নিজের পরিচ্ছন্ন বুদ্ধির শুভ্র আলোতে একটা পথ সত্যপথ বলে একবার প্রতিভাত হলেই হ'ল। বাস, আর কোন কথা নেই। গান্ধীজী একলাই চলেছেন সেই দুর্গম পথে রক্তমাখা চরণতলে পথের কাঁটা দলতে দলতে। স্বর্গে-মর্ত্তে-পাতালে এমন কোন শক্তি নেই তাঁকে কর্ত্তব্যের পথ থেকে বিচলিত করতে পারে।

ভেদবুদ্ধির প্রাবল্যে দেশ ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেল। সুদীর্ঘ-কালের তপস্যার বলে যে-জগৎ গান্ধী সৃষ্টি করেছিলেন, হায়, সে-জগৎ ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামায় দিকে দিকে বয়ে চলেছে রক্তের নদী। সারা জীবনের সাধনার এমনি একটা শোচনীয় পরিণতির সামনে আর কেউ হলে নৈরাশ্যের ভারে ভেঙে পড়তো। গান্ধী কিন্তু অসীম মানসিক শক্তির জোরে নিজের জীবনকে গড়ে তুলেছিলেন গীতার স্থিতপ্রজ্ঞের মহান আদর্শে আর স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ সুখে কখনো আত্মহারা এবং দুঃখে কখনো অভিভূত হন না। নৈরাশ্যের জগদ্দল বোঝা মন থেকে সবলে সরিয়ে ফেলে গান্ধী শোকার্ত্ত এবং ভয়ার্ত্ত নরনারীর মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন কণ্ঠে আশার এবং সান্ত্বনার বাণী নিয়ে। তিনি চেয়েছিলেন অখণ্ড স্বাধীন ভারতবর্ষ যার নাগরিকেরা সিংহের মতো সাহসী, স্ফটিকের মতো নির্ম্মল, আকাশের মতো উদার। কিন্তু গৃহযুদ্ধে বিপর্য্যস্ত এবং বিধ্বস্ত এ কোন্ দুর্ভাগা স্বদেশের পঙ্কিল ছবি চোখের সামনে তিনি দেখতে পাচ্ছেন? স্বপ্নের স্বরাজের সঙ্গে রূঢ় বাস্তবের এ কি মর্ম্মন্তুদ বৈসাদৃশ্য।

কঠিন বাস্তবের তমসাচ্ছন্ন পটভূমিতে গান্ধীর চরিত্রবল অপূর্ব্ব-গরিমায় ফুটে উঠেছে। উলঙ্গ বর্ব্বরতার দিগন্তপ্রসারী তাণ্ডবনৃত্যের সামনে গান্ধী মানবাত্মার মজ্জাগত মহিমায় বিশ্বাস হারালেন না। বিশ্বাসের দৃঢ়তার দিক থেকে তিনি ছিলেন কলম্বাসেরই সগোত্র। নিজের হৃদয় থেকে ভেদবুদ্ধিকে যদি নিঃশেষে অপসারিত করা যায় তবে পরম শত্রুকেও আপন করা সম্ভব—এই বিশ্বাস তিলমাত্র শিথিল হলে গান্ধী ভগ্নহৃদয়ে হিমালয়ে প্রস্থান করতেন।

গান্ধীর জীবন থেকে যে দুটি পরমসম্পদ আমরা আহরণ করি তার একটি সত্যানুরাগ এবং অপরটি প্রেম। গান্ধীজীর বিশ্বাস, আচরণ এবং বাণী—এই তিনের মধ্যে একটি সুন্দর সামঞ্জস্য ছিল। যা তাঁর বিশ্বাস ছিল তাই তিনি বলতেন এবং যা তিনি বলতেন তা তিনি করতেন। বিশ্বাস, আচরণ এবং বচন—এই তিনকে একসূত্রে গেঁথে তোলাই হচ্ছে ইন্‌টিগ্রিটি বা সত্য। বিশ্বাসে, কর্ম্মে এবং বাক্যে যেখানে এই মিল ঘটেছে সেখানেই শুধু আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যকে অটুট রাখা সম্ভব। যখন কথার সঙ্গে কাজের এবং কাজের সঙ্গে বিশ্বাসের বিরোধ ঘটে তখনই মানুষের জীবন-বীণা আর ঠিক সুরে বাজতে চায় না, তার ব্যক্তিত্ব ভিতরে ভিতরে চিড় খেয়ে যায়, সে মনের স্বাস্থ্য হারিয়ে ফেলে। যেহেতু গান্ধীজীর কথায়, কাজে এবং বিশ্বাসে মিল ছিল সেইহেতু অটুট ছিল তাঁর মানসিক স্বাস্থ্য, অন্তরের মধ্যে তিনি অনুভব করতেন একটি সঙ্গতির আনন্দ এবং সেই আনন্দে এত দুঃখের বোঝা তিনি এমন সহজে বইতে পারতেন। নিজের বিবেকবুদ্ধির বিচারে নিজে যদি অপরাধী বলে সাব্যস্ত হই তবে আনন্দ পাবো কেমন করে? গান্ধীর মুখে প্রায় সর্ব্বদার জন্য খেলা করতো শিশুর নির্ম্মল হাসি—কারণ নৈতিক কর্ত্তব্যে তিনি কখনো ত্রুটি ঘটতে দিতেন না, সত্যে তাঁর নিষ্ঠা ছিল অবিচলিত।

সত্য ছিল গান্ধীর কণ্ঠহার, প্রেম ছিল তাঁর শিরোভূষণ। মার্কিন মনীষী লুই ফিসার ঠিকই লিখেছেন, এই দুই ব্রহ্মাস্ত্রের সাহায্যে ভারতবর্ষকে তিনি শৃঙ্খলমুক্ত করেছিলেন। সত্যের আহ্বানে, ভালোবাসার ডাকে সর্ব্বনাশের পথে চলতে পারে যারা তাদেরই কাছে জনসাধারণ যুগে যুগে ছুটে আসে সাহায্যের প্রত্যাশায়। জনসাধারণের প্রতি গান্ধীর অপরিমেয় প্রেম, সত্যে গান্ধীর জ্বলন্ত অনুরাগ, সত্যকে অনুসরণ করবার সেই অনন্যসাধারণ মহাবীর্য্য—এই সব গুণেই গান্ধী সমস্ত মানব-পরিবারের চিরকালের পরমসম্পদ হয়ে থাকবেন। ইতিহাসে মহামানব বলে যাঁরা কীর্ত্তিত, দুঃখের বিষ পান করে সবাই তাঁরা নীলকণ্ঠ। তবু সেই নীলকণ্ঠ-দের মুখে আনন্দের জ্যোতি, কণ্ঠে আনন্দের মন্ত্র। তাই তো আমাদের মর্ম্মমূলে তাঁদের জন্যে বিছিয়ে দিই আসন, তাঁদের জীবন থেকে জ্বালিয়ে নেই আমাদের জীবনের শিখা।

সুদীর্ঘকাল ধরে গান্ধী অনেক লেখা লিখেছেন, অনেক ভাষণ দিয়েছেন। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার ভাণ্ডারে তাঁর পরম দান হচ্ছে তাঁর জীবন। এই জড়বাদের যুগে ভোগসর্ব্বস্ব মানুষ যখন সিগার, শ্যাম্পেন আর মোটরের জন্যে সমস্ত কিছু আদর্শকে বলি দিতে প্রস্তুত তখন গান্ধী জীবন দিয়ে, মরণ দিয়ে প্রমাণ করে গেলেন, বিংশ শতাব্দীতেও মানুষ চরিত্র-গৌরবে বুদ্ধের অথবা খ্রীষ্টের সমতুল্য হতে পারে। সংকল্পের পবিত্রতা, সত্যের প্রতি নিষ্ঠা, নম্রতা, চিত্তের ঔদার্য্য আর চরিত্র-গৌরব সবকিছু মিলে গান্ধীকে বিংশশতাব্দীর মুকুটমণি করেছে, এতে কি কোন সন্দেহ আছে? গত উনিশশত বৎসরের মধ্যেই বা এমন মানুষ কবার জন্মেছেন? তাই ভারতে জন্মগ্রহণ করেও আজ তিনি সারা পৃথিবীর। তাঁকে আমাদের প্রণাম।

---

* অল্ ইণ্ডিয়া রেডিওর সৌজন্যে।

শ্রীদীপক চৌধুরী

সুতপার বিবৃতি

দুই

আপিসের গাড়ী ছেড়ে দিতে হ'ল। দমদম থেকে বাস ধরব। পৌঁছতে দু'তিন ঘণ্টা লাগবে। তা লাগুক, ভাববার সময় পাওয়া যাবে। নতুন ভাবনার মুখে এসে দাঁড়িয়েছি।

বিমানঘাঁটির সামনের রাস্তাটি ভাল লাগল আমার। সেই রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলাম। যত্ন নিয়ে রাস্তাটিকে শুধু তৈরী করা হয় নি, সন্তান-পালনের মত কর্তৃপক্ষ এটাকে রক্ষাও করছেন। কোথাও একটু ভাঙাচোরা নেই, আবর্জনার চিহ্ন পর্যন্ত নজরে পড়ল না। দিল্লীর বড়মানুষেরা এখান দিয়ে যাতায়াত করেন বলেই বোধ হয় ভারতরাষ্ট্রের এই অংশটা পরিচ্ছন্ন।

মাথার ওপর দিয়ে উড়োজাহাজ উড়ে যাচ্ছে—শুধু যাচ্ছে না, নামছেও। যাওয়া-আসার বিরাম নেই। হাওড়া ষ্টেশনের মত এখানেও দেখলাম, সর্বক্ষণই ভিড় লেগে আছে। কিন্তু আমি ভাবছিলাম শুধু একটা প্লেনের কথা—যে প্লেনটা বড়-সাহেবকে তুলে নিয়ে চলে গেল বেলজিয়ামের দিকে। একটা নতুন পৃথিবী জন্ম নিতে নিতে হঠাৎ মাঝপথে ভেঙে চৌচির হয়ে গেল! বড়সাহেবকে কেন্দ্র করেই পৃথিবীটা গজিয়ে উঠছিল। বিজয়বাবু, চণ্ডীদা চাকরী পেতেন, ভাল করে বাঁচতে পারতেন তাঁরা। সরকার-কুঠিও হয় ত রক্ষা পেত। কিংবা আরও অনেকের হয় ত অনেক রকমের উপকার হ'ত তাঁর দ্বারা। কিন্তু এগুলোও ত সেই শিশু-পৃথিবীর বড় খবর ছিল না। বড়সাহেবকে দেখে যে ভাঙা মানুষগুলো উঠে দাঁড়িয়েছিল, সেইটেই ছিল পৃথিবীটার সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা। আমি পর্যন্ত ভবিষ্যতের ছায়াটাকে বাস্তব অস্তিত্ব ভেবে নতুন করে ঘর গুছোবার জন্যে লোভের জালে আটকে পড়েছিলাম। সরকার-কুঠির খালি ঘরগুলোর দিকে আমারও কি দৃষ্টি পড়ে নি? পড়েছিল—অবশ্যই পড়েছিল। অসহায় মানুষের নিষ্ফল দম্ভ বড়সাহেব-সুড়ঙ্গ দিয়ে ঢুকে পড়েছিল আমার মনের রাজ্যে। স্বাধীন ভারতবর্ষের রাজপথ দিয়েও এমন লোভ কখনও ঢুকতে পারে নি।

একটু আগেই উপস্থিত-অস্তিত্বের সচেতনতা ফিরে পেলাম আমি। খণ্ড-সীমান্তের বাস্তবতা পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। মৃত্যুর মত বাস্তবতার গায়ে পায়েও সীমা টানা আছে। মৃত্যুর নিশ্চয়তার বাইরে আর কোন নিশ্চয়তা নেই। মানুষের চোখ থাকলে কি হবে, সে অন্ধ। সে নিষ্ঠুরও।

বড়সাহেবের নিষ্ঠুরতা খানিকটা আগে আকাশে উড়ল। ভারতবর্ষকে ভালবাসলেন তিনি। অথচ সেই ভালবাসা বেলজিয়ামের মঠ পর্যন্ত পৌঁছতে পারল না। ধোঁয়ার মত মিলিয়ে গেল ঊর্দ্ধ আকাশে। ওপরের রহস্যে গা ঢাকা দেবার প্রলোভন তিনি ত্যাগ করতে পারলেন কই? পালিয়ে গেলেন ক্যাপটেন হেওয়ার্ড।

বেলা কম হয় নি, দশটা প্রায় বাজে। শ্যামবাজারের মোড়ে এসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। হ্যারিসন রোডে মহী-তোষের ওখানে একবার যাব। ওর হোটেলটায় ত একদিনও যাই নি, আজ চললাম।

একতলাতেই খবর পেলাম, মহীতোষ বাইরে বেরিয়েছে। ভোরের দিকেই বেরিয়েছে, চা পর্যন্ত খেয়ে যায় নি। দুপুর-বেলায়ও খেতে আসবে না। কোথায় কি একটা শহীদ-স্মৃতি-সৌধ তোলা হয়েছে সেইখানে তার যাওয়ার কথা। খদ্দর-পরিহিত হোটেল-মালিকের মুখ থেকেই খবরগুলো পেলাম। তিনি আমায় বসতে বললেন। সুন্দর চেহারার পুরুষমানুষকে তিনি বসতে বললেও চা খেতে অনুরোধ কর-তেন না। আমার জন্যে এক পেয়ালা চা এল। বড় তেষ্টা পেয়েছিল আমার।

খদ্দর দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম, মালিকের কথা এখনও ফুরোয় নি। হঠাৎ শখ করে কেউ খদ্দর পরতে যায় না। খদ্দরের পেছনে খবর থাকে। তিনি আমায় খবর শোনাতে লাগলেন, "অসহযোগ আন্দোলনে ঢুকে পড়ে-ছিলাম, তাই খদ্দর পরি—"

"আজ্ঞে—খদ্দরের মধ্যে আন্দোলন কতটুকু আছে জানি না, গরীব তাঁতীদের আয়ের কিছু সুবিধে আছে।" গোড়াতেই আলোচনার সুতোটা কেটে দেওয়ার চেষ্টা করলাম, ফলও পেলাম।

তিনি হাই তুললেন বার দুই। আমি খদ্দর পরি নে, আমি তাঁর খদ্দেরও নই। এক পেয়ালা চা সবদিক দিয়েই

নষ্ট হ'ল। তিনি খবর দিলেন, "গান্ধীজী ছাড়া ভারতবর্ষে দ্বিতীয় কোন শহীদ নেই। মহীতোষ আমার কথা বিশ্বাস করল না। ছুট করে বেরিয়ে গেল ভোরবেলা, চা পর্যন্ত খেয়ে গেল না।"

"ওর ভাগটা বোধ হয় আমিই খেয়ে গেলাম। আপনার হিসেব তাতে ঠিকই রইল। আমি উঠি।"

"এক আপিসেই কাজ করেন বুঝি ?"

"আজ্ঞে।"

আর একবার হাই তুলে তিনি বললেন, "কাল রাত্রে ঘুমোতে পারি নি। আপনি যাবেন না ? মানে, ওই যে কোথায় শহীদ স্মৃতির মঠ তৈরী হয়েছে—"

"যাব। তবে এখখুনি যাওয়ার দরকার নেই। বেলা তিনটের সময় উদ্বোধন হবে। কে একজন রাষ্ট্রনেতা আসবেন।"

"রাষ্ট্রনেতা ? কে তিনি ? কি নাম তাঁর ?"

"আমি ঠিক নামটা জানি না।"

"শুনলে বুঝতে পারতাম আমার কলিগ কিনা—মানে অসহযোগ আন্দোলনের সময় একসঙ্গে জেলে ছিলাম কিনা।"

"আপনি জেলে গিয়েছিলেন ?" খদ্দরের প্রতি সম্মান দেখাবার জন্যে কৌতূহল প্রকাশ করতে বাধ্য হলাম।

খুশী হলেন হোটেলের মালিক। খদ্দেরদের মধ্যে কেউ তাঁর খবর শুনতে চায় না। তিনি বললেন, "একবার নয়, দু'বার জেলে গিয়েছি। জেলে গিয়েছি বটে, কিন্তু জেল খাটি নি। আমরা ত হিংসাত্মক আন্দোলনে বিশ্বাস করতাম না। সেইজন্যেই বোধ হয় শোবার জন্যে ইংরেজরা আমাদের খাটপালঙ্ক দিত। সপ্তাহে মাংস খেতাম দুবার। খবরের কাগজ, মাসিকপত্র যা চাইতাম সবই পাওয়া যেত। আমরা দেখুন, খাটপালঙ্কে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ে পড়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা নিয়ে এলাম। আমার কলিগরাই ত এখন ভারতবর্ষ শাসন করছেন। ইংরেজের গুলী খেয়ে এঁরা কেউ শহীদ হওয়ার চেষ্টা করেন নি। দেখতে পাচ্ছেন ?"

বললাম, "পাচ্ছি। শহীদ হলে, আমি কেন, কেউ এঁদের দেখতে পেত না। বলুন, ঠিক বললাম কিনা ?"

আশাতীত ভাবে খুশী হলেন মালিক। বললেন, "আর এক পেয়ালা চা আনি ?"

"আজ্ঞে না, যাব এবার। আমারও কাল রাত্রে ঘুম হয় নি, আজ রবিবার বলে ঘুমতে পারব।"

"বেশ, বেশ—আবার কবে আসবেন ? খুব খুশী হলাম। মহীতোষরা ত আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে পাত্তা দিতে চায় না।"

"আমি দিলাম, কিন্তু ইতিহাস দেবে কি ? নমস্কার।"

কি মনে করে হ্যারিসন রোড আর কলেজ স্ট্রীটের মোড় থেকে দশের-এ নম্বর দেওয়া বাসে উঠে বসলাম। আমি জানি এই বাসটা হাজরা রোড দিয়ে যায়। দু'পা হাঁটলেই দেওদার স্ট্রীটে পৌঁছনো চলে, পৌঁছলামও।

একতলার দরজাটা খোলা। সিঁড়ির পাশে চেয়ার তিনখানাও সাজানো ছিল। কিন্তু সেই কাগজগুলো দেখতে পেলাম না। টেবিলের ওপর শুধু একটা ফুলদানী রয়েছে। বেয়ারাটা বোধ হয় ওপরে গেছে ভেবে ওইখানে বসে পড়লাম। দশ মিনিট পরেও কাউকে দেখতে পেলাম না, সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এলাম। সামনেই লাহিড়ীসাহেবের ড্রইং-রুম, ভেতরে গিয়ে ঢুকে পড়লাম। মনে হ'ল বাড়ীতে কেউ নেই। আসবাবপত্র সব আগের মতই সাজানো, কোন কিছু নড়চড় হয়েছে বলেও মনে হ'ল না। ঘরের বাইরে ল্যাণ্ডিংএর পাশে খোকার ছবিটা টাঙান ছিল, এখন দেখলাম ছবিটা সেখানে নেই।

একটু বাদেই লাহিড়ীসাহেবের শয়ন-কামরা থেকে পুরনো বেয়ারাটি বেরিয়ে এল। জিজ্ঞাসা করলাম, "মেমসাহেব কোথায় ?"

"তাঁরা চলে গেছেন।"

"কোথায় গেছেন ?"

"শুনেছি শ্যামবাজার। লাহিড়ীসাহেব বদলী হয়ে গেছেন, নতুন একজন সাহেব আসবেন। কাল তিনি এখানে এসে উঠবেন।"

"ওঃ, বেশ। তুমি বুঝি ঘরদোর গুছোচ্ছিলে ?"

"জী। নতুন সাহেবের বৌ নেই—"

"তাতে তোমার কি সুবিধে ?"

"আমার কাজ মেমসাহেবদের পছন্দ হয় না। আসুন না দেখবেন, শোবার ঘরটা সাজানো ঠিক হ'ল কিনা।"

দেখবার লোভ আমার আগেই হয়েছিল। বেয়ারার আমন্ত্রণ তাই তখনই আমি লুফে নিলাম। শোবার ঘরের আসবাবও সব দেখলাম আগের মতই আছে। মস্ত বড় চওড়া খাটখানা ঘরের ঠিক মাঝখানে পাতা। সবিতা দেবী বলেছিলেন, এত বড় খাট দেখে সীতাংশু আবার ভয় না পায়। খাটের পাশে ঝালর-দেওয়া ল্যাম্প-ষ্ট্যাণ্ড। তার তলায় ছোট্ট একটা পেগ-টেবিল। আপাততঃ টেবিলের ওপর বেয়ারাটি এক গেলাস জল রেখেছে। ঘরের পশ্চিম দিকে দুটো আলমারী রয়েছে পাশাপাশি। লাহিড়ীসাহেব বিবাহিত, দুটো আলমারী তাই ব্যবহার করা হ'ত। কিন্তু সীতাংশু রায় দুটো আলমারী দিয়ে কি করবেন ? বাড়ীটার

সবকিছু ব্যবস্থাই দুজনের জন্যে করে রাখা হয়েছে। কোম্পানী কোথাও কার্পণ্য করে নি। আমার মনে হ'ল, একজন মানুষ এ বাড়ীতে বাস করতে পারবে না। প্রতি মুহূর্তের অভাববোধ একা মানুষকে অসুস্থ করে তুলবে। সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনীর পরে বিশ্রাম পাবে না লোকটি।

বেয়ারাটি হঠাৎ আমায় প্রশ্ন করল, "খাটের দিকে অমন করে চেয়ে রয়েছেন কেন? খাটখানা কি ঠিক জায়গায় রাখা হয় নি? একটু সরিয়ে দেব কি?"

প্রশ্ন শুনে চমকে উঠলাম। এতক্ষণ খাটের দিকে চেয়ে আমি মনে মনে একা মানুষের বিপর্যয়ের কথা ভেবে মরছিলাম। সামলে নিতে হ'ল। বললাম, "হ্যাঁ, একটু সরিয়ে দেওয়া ভাল। ঐটে ত দক্ষিণ দিক?"

"জী।"

"তা হলে খাটখানা দক্ষিণ দিকে সরিয়ে দাও। তোমার নতুন সাহেবের গায়ে হাওয়া লাগবে। জান ত দক্ষিণ দিক দিয়ে হাওয়া আসে?"

মাথা নেড়ে সায় দিল বেয়ারা। কিন্তু ও ত জানে না, কলকাতার বাড়ীওয়ালারা হাওয়া আসবে বলে দক্ষিণ দিক খোলা রাখেন না। বাড়ী তৈরীর প্ল্যানে তাঁদের হাওয়া নেই।

আমার পরামর্শ মত খাটখানা সরানো হ'ল। বেয়ারাটি একা সরাতে পারল না, আমাকেও সাহায্য করতে হ'ল। দক্ষিণের জানালাটা খুলে দিলাম আমি—সত্যিই হাওয়া আসে কিনা পরীক্ষা করবার জন্যেই খুললাম, কিন্তু দেখলাম হাওয়া আসবার পথ নেই। চার ফুট কি পাঁচ ফুট দূরে অন্য একটা উঁচু বাড়ীর পেছন দিকটা জানালাটার সঙ্গে প্রায় লেগে দাঁড়িয়ে আছে। বেয়ারাটা এত দিন এখানে কাজ করছে, অথচ চার ফুট দূরের উঁচু বাড়ীটা সে আজও দেখতে পায় নি। আমিও আর দেখাতে চাইলাম না, জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে বললাম, "হ্যাঁ, দক্ষিণ দিক দিয়েই হাওয়া আসে। এখন বন্ধ থাক। আমি চলি।"

আমার সঙ্গে সঙ্গে সে একতলা পর্যন্ত নেমে এল। বললাম, "দরজাটা বন্ধ করে রেখ। কেউ হয় ত সোজা ওপরে উঠে যাবে, দু'একটা জিনিস খোয়া গেলে তুমি টেরও পাবে না। পয়সা সব কোম্পানীর, তা হলেও সতর্ক থাকা ভাল।"

রাস্তায় বেরিয়ে এলাম, বেয়ারাটা জিজ্ঞাসা করল, "আপনি আমাদের নতুন সাহেবকে চেনেন না?"

কি অদ্ভুত প্রশ্ন!

গড়িয়ায় পৌঁছতে বেলা দুটো বেজে গেল। বাস থেকে নেমে ছুটতে ছুটতে এলাম। তিনটের সময় শহীদ-স্মৃতি-সৌধ উদ্বোধন করতে রাষ্ট্রনেতা আসবেন। এতক্ষণে নিশ্চয়ই সরকার-কুঠিতে ভিড় জমেছে। বড় ফটক দিয়ে ঢুকতে পারব ত? গড়িয়া পোলের পাশ দিয়ে শর্টকাট ধরলাম—নেমে পড়লাম নীচে। ষষ্ঠীদা নিশ্চয়ই রাগ করেছে—কোন কাজেই তাকে সাহায্য করতে পারি নি। আজ আমার আগে থেকেই উপস্থিত থাকা উচিত। মাসীমাও বোধ হয় দুঃখিত হয়েছেন। দুঃখ পেলেও তিনি প্রকাশ করেন না। নইলে—খালের দিক দিয়ে বিপ্রদাস বাবু যাচ্ছেন না? তিনিই ত। সরকার-কুঠি থেকে তিনি বেরিয়ে যাচ্ছেন, ফিরে যাচ্ছেন বাড়ীর দিকে। তিনিও দেখছি শর্ট-কাট ধরেছেন। এমন দিনটিতে তিনি কোট-প্যাণ্ট পরে এসেছিলেন কেন? এলেন যদি আবার ফিরছেনই বা কেন? বোধ হয় তিনি শুনতে পেয়েছেন, বড়সাহেব আসবেন না। প্যাণ্ট-কোট খুলে তিনি নিশ্চয়ই ধুতি পরতে যাচ্ছেন। কিন্তু আজকের দিনটিতে বড়সাহেবের উপস্থিতির চেয়ে অনুষ্ঠানটাই কি বড় ছিল না?

ফটকের কাছে এসে দেখলাম, বড় রাস্তা দিয়ে হেঁটে এলেই পারতাম, ছোটবার দরকার ছিল না। ভিড় নেই। ভিড়? জনপ্রাণী একটিও নেই। ব্যাপার কি? তবে কি উদ্বোধনের তারিখ পালটানো হয়েছে। বাগানের ভেতর ঢুকে এবার আমি সত্যিই দৌড়তে লাগলাম। তিনটে সিঁড়ি লাফিয়ে উঠে পরলাম বারান্দায়। সামনেই বসবার ঘর, ঢুকে পড়লাম ঘরে।

কোটি বছরের প্রাচীন নৈঃশব্দ্য যেন ঘরের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। কেউ কথা বলতে চাইল না—মহীতোষ, কেতকী, চণ্ডীদা, বিজয়বাবু, মেসোমশাই—কেউ না। ষষ্ঠীদা আর বলরাম শুধু অনুপস্থিত। মাসীমা'ত তাঁর নিজের ঘরে। আমি বসে পড়লাম মহীতোষের পাশে। বসবার সুবিধে হ'ল, জায়গাটা খালি। প্রশ্ন করতে ভয় পাচ্ছিলাম। মাসীমার স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়েছে। হার্টের ওপর দুবার আক্রমণ হয়ে গেছে। তৃতীয় আক্রমণের সম্ভাবনা সব সময়েই ছিল। তবে কি—

মেসোমশাই বললেন, "মহীতোষের কাছ থেকেই সব কথা শুনলাম। খবর নিয়ে মহীতোষ এক ঘণ্টা আগেই এখানে এসে পৌঁচেছে। জেটমলের গ্রাস থেকে বাড়ীটাকে আর রক্ষা করা গেল না। ক্যাপটেনকে পূর্ব-আফ্রিকার আপিসে বদলী করে দিয়েছে। লণ্ডনের হেড-আপিস থেকে খবর এসেছে। এই জন্যে দায়ী কে জানিস? তোদের

লাহিড়ী, মিষ্টার তপন লাহিড়ী। তপা, সোমবার থেকে তোদের আপিসে ক্যাপটেন আর থাকবেন না।"

ঘোষণা করতে বাধ্য হলাম, "তিনি এতক্ষণে হয় ত করাচী পৌঁছে গেছেন। ক্যাপটেন চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। ইউরোপে বাস করবেন এখন।"

"আমাদের সঙ্গে দেখা করে গেল না?" মেসোমশাইর সুর কর্কশ।

"সেই জন্যে তিনি খুবই দুঃখিত। গতকাল সকালে অবশ্য তিনি এসেছিলেন, তুমি বাড়ী ছিলে না। সব কথা মাসীমাকে তিনি খুলে বলতে পারেন নি। বার বার করে মাপ চেয়ে গেছেন।"

বিজয়বাবু উঠে পড়লেন। পা টলছিল তাঁর। ঠোঁটের কাঁপুনি আয়ত্তে আনতে পারছিলেন না। সেই অবস্থায়ই তিনি বলবার চেষ্টা করলেন, "সত্যিই কি তিনি নেই? মানে ভারতবর্ষে নেই?"

"না, বিজয়বাবু।"

"মাত্র তিন দিন হ'ল ইস্কুলের চাকরীটা ছেড়ে দিয়ে এসে-ছি।"

"বড়সাহেব ত আপনাকে চাকরী ছাড়তে বলেন নি—"

"না—তা তিনি বলেন নি।" এই বলে বিজয়বাবু টলতে টলতে চলে গেলেন বাইরে।

চণ্ডীদা অনেকক্ষণ আগেই বোধ হয় ফতুয়াটা খুলে ফেলেছিল। সেটাকে গামছার মত ভাঁজ করে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, "আমার গণনার ষাট ভাগই ফলে। বড়-সাহেবকে বলেছিলাম, তুমি পালাও। তপাদি, তোমার সময় এল।"

চণ্ডীদা উঠে পড়ল। যেতে যেতে বলল, "আজ ত বলরাম ব্যস্ত আছে। কাল সকালে আবার মালপত্রগুলো গোবিন্দপুর নিয়ে যাওয়ার ঝামেলা রইল, বলরামের সঙ্গে ফুরণ করে নেব। চলি—"

এবার আমি মেসোমশাইকে বললাম, "ক্যাপটেনের ওপর তোমরা এত বেশী নির্ভর করছিলে বুঝতে পারি নি। কিন্তু তুমি, মেসোমশাই তুমি ত কখনও ক্যাপটেনের কথা বিশ্বাস করো নি? তুমি এতটা ভেঙে পড়লে কেন? ভেঙে পড়বার কথা মাসীমার। তিনি কেমন আছেন? সব কথা শুনে-ছেন?"

"শুনেছেন। মহীতোষের মুখ থেকে খবর শোনবার পরে মনে হ'ল আমিই শুধু ক্যাপটেনের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে বসেছিলাম। এমন একটা অদ্ভুত আবিষ্কারে নিজেই আমি অবাক হয়ে গেছি। অথচ তোর মাসীমা দেখলাম, খবর শুনে একটু শুধু হাসলেন। এমন ভাবে হাসলেন যেন তিনি এক মুহূর্তের জন্যেও ক্যাপটেনের ওপর নির্ভর করেন নি! তপা, লালুর মাকে আজও আমি চিনতে পারলাম না।"

বুঝতে আমার অসুবিধে হ'ল না, কেবল বিপ্রদাসবাবুই নন, এ সংসারের কেউ আজ লালুদার কথা ভেবে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাশীল হন নি? লালুদার কথা সরকার-কুঠির সবাই ভুলে গেছেন। আমিই শুধু তিনটের আগে পৌঁছবার জন্যে গড়িয়া পোলের পাশ দিয়ে শর্ট কাট রাস্তা ধরেছিলাম।

নৈঃশব্দ্য আবার ঘন হয়ে আসছিল। তাই আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "সময় ত বেশী নেই, ষষ্ঠীদাকে দেখতে পাচ্ছি নে যে!"

মেসোমশাই যেন চমকে উঠলেন! বললেন তিনি, "তাই ত—ষষ্ঠীর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।"

"লালুদার কথাও আমরা ভুলে গেছি, মেসোমশাই।"

মনে করিয়ে দেবার জন্যে ঘরে ঢুকল ষষ্ঠীদা। খদ্দরের ধুতি পরেছে সে। সতর্কতার অভাব দেখলাম না। একে-বারে মাপমত ধুতির প্রান্ত টেনে রেখেছে হাঁটুর ওপরে। আমরা সবাই চেয়ে রইলাম ষষ্ঠীদার দিকে। ষষ্ঠীদা বলল, "রাষ্ট্রনেতা আসবেন না!"

"কেন?" প্রশ্ন করল মহীতোষ। এত জোরে করল যেন মহীতোষের প্রশ্নটা প্রতিধ্বনি তুলতে তুলতে ধাক্কা খেতে লাগল সারা ভারতবর্ষে। মহীতোষ ছাড়া এমন প্রশ্ন করবেই বা কে?

ষষ্ঠীদা জবাব দিল, "রওনা হওয়ার আগের মুহূর্তে রাষ্ট্র-নেতা বুঝতে পারলেন, লালু সরকার শহীদ নয়। সে হিংসাত্মক আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। পুলিসের পুরনো ফাইলে তাকে খুনী বলে অভিযুক্ত করা আছে।"

"পুলিস?" উত্তেজিত হয়ে উঠলাম আমি, "কোন্ পুলিসের ফাইলে? হংকং না জাপানী পুলিসের?"

সবাই অবাক হয়ে চেয়ে রইল আমার দিকে। নিজের ভুল আমি বুঝতে পারলাম। আমি বোধ হয় লালুদার সঙ্গে সঙ্গে লুসের কথাও ভাবছিলাম। লজ্জা পেয়ে বললাম, "পিকিং আর দিল্লী যে দুটো আলাদা জায়গা ভুলে গিয়েছিলাম, ষষ্ঠীদা!"

এই সময়ে ছুটে এল বলরাম। ওর আগে আগে এল টাইগার। টাইগার খোঁড়াচ্ছিল, তবুও সে আগে এসে পৌঁছল।

বলরাম বলল, "ষষ্ঠীদা, শীগগির এস—আমাদের মন্দির ওরা ভেঙে দিয়েছে!"

"ওরা? কে ওরা?"

"তা ত জানি না। অনেক লোক। টাইগার এক

জনকে কামড়ে দিয়েছে। টাইগারের পায়ে ওরা লাঠি মেরেছে ষষ্ঠীদা।"

এই বলে বলরাম সত্যি সত্যি কেঁদে ফেলল।

কান্না শুনে চণ্ডীদা এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। বিজয়বাবুকে দেখলাম না। আমরা সবাই ভাঙা মন্দির দেখতে চললাম। মাসীমার গলা শুনতে পেলাম আমি। তিনি ডাকছিলেন, "বলরাম, বলরাম—"

বলরাম গেল মাসীমার ঘরের দিকে। পেছন ফিরে আমি দেখলাম, মাসীমা ওকে ডাকতে ডাকতে বারান্দায় বেরিয়ে পড়েছেন।

আমরা যখন এসে পৌঁছলাম, তখন মন্দিরের চূড়া আর ছিল না। প্রাচীরগুলোও ভেঙে সমান করে দিয়েছে, শুধু মন্দিরে ওঠবার সিঁড়ি ক'টি আছে। মেসোমশাই বললেন, "খাল পার হয়ে যারা চলে গেল, তারা সব লক্ষ্মণ গয়লার লোক। জেটমল ওদের দিয়ে মন্দিরটা ভাঙিয়ে দিলে! জেটমলকে দেখতে পাচ্ছিস না, তপা?"

"না ত!"

"ঐ যে আমগাছটার আড়ালে বসে আছে। টাইগার বোধ হয় জেটমলকেই কামড়ে দিয়েছে। আমাদের ঘরে ত কোন ওষুধপত্তর নেই, না তপা?"

"যা আছে তা দিয়ে কুকুরের বিষ নষ্ট করা যাবে না মেসোমশাই।"

মহীতোষ বড্ড বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল, কেতকীও কম হয় নি। চণ্ডীদার হাত থেকে ফতুয়াটা ত আগেই পড়ে গিয়েছিল, তবু তারও রাগ দেখলাম কম নয়। শুধু ষষ্ঠীদার মুখেই দেখলাম নির্লিপ্ত ভাব। অহিংসার প্রতিযোগিতায় রাষ্ট্রনেতাকেও আজ সে হার মানিয়েছে।

কেতকী জিজ্ঞাসা করল, "এখান থেকে থানা কত দূর?"

মৃদু হেসে মেসোমশাই বললেন, "লণ্ডনে, মা কেতকী।"

"তার মানে?"

"জেটমল ব্যবস্থা সব পাকা করেই এসেছে। এখন কেউ আসবে না। ছুটে গিয়ে হাঁপিয়ে পড়াটাই লোকসান হবে। কাউকে পাওয়া যাবে না, কাউকে না। ওরে তপা, জেট-মলের পা দিয়ে যে বড্ড বেশী রক্ত পড়ছে। ব্যবস্থা একটা কর, মা। ষষ্ঠী, ষষ্ঠী গেল কোথায়?"

বললাম, "এই ত, ষষ্ঠীদা তোমার সামনেই।"

"ওরে ও ষষ্ঠী, যা না ফটকের কাছে গিয়ে দেখে আয়, জেটমলের মোটরগাড়ীটা এল কিনা। কি ভীষণ রক্ত পড়ছে।"

কেতকী বলল, "পড়ুক না রক্ত, আমরা তার কি করব? ওদের রক্ত পড়তে আরম্ভ করলেই কি শেষ হয়, মেসোমশাই?"

"তা নয় মা—লালুর রক্তের সঙ্গে যেন ছোঁয়াছুঁয়ি না হয়। দেখিস, তোরা চোখ রাখিস—জেটমলের রক্ত যেন গড়িয়ার খালে গড়িয়ে না যায়। দাগ যেন না পড়ে।"

ভাঙা মন্দিরের সামনে বসে পড়লেন সরকার-কুঠির মালিক শ্রীবসন্তকুমার সরকার।

শেষ দৃশ্যটা বড় অদ্ভুত ঠেকল আমার চোখে। শুধু অদ্ভুত বললেই কথা ফুরলো না। ভেবে দেখলাম, নতুন ভাষার সন্ধান না পেলে বলরাম আর মাসীমার শেষটুকু বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তিনি বলরামের ঘাড়ে ভর দিয়ে এগিয়ে আস-ছিলেন মন্দিরের দিকে। গুনগুন করে গান ধরেছেন মাসীমা, "মেরে তো গিরিধর গোপাল—"

বলরামের হাতে বাঁশী, সেই পুরনো বাঁশীটা। বাসন মাজতে মাজতে আর মশলা বাঁটতে বাঁটতে অনেক দিন হ'ল বাঁশীতে আর হাত দিতে পারে নি ও। আজ সে মাসীমার সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বাঁশী বাজাচ্ছে। দূর থেকেও শুনতে আমার ভাল লাগছিল। শুধু ভাল বললেও ব্যাখ্যা এর শেষ হ'ল না। সুরের গভীরতা আমাদের সবাইকে টানতে লাগল। মহীতোষ এবং কেতকীর হিংসাত্মক মনোভাব সব এরই মধ্যে উবে গেছে। থানা-পুলিসকে অনেক পেছনে ফেলে এল ওরা, অনেক দূরে। এই মুহূর্তে বলরাম আর মাসীমাকে ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, ক্ষয়ক্ষতি এবং ক্ষত তাও যেন আর নেই। জেটমল পর্যন্ত উঠে দাঁড়াল। পায়ের ক্ষত দিয়ে রক্ত পড়ছে—তবুও।

মাসীমা এসে বসে পড়লেন ভাঙা মন্দিরের সিঁড়ির ওপরে। লুটিয়ে পড়লেন তিনি, গানের সুর চড়তে লাগল। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে জেটমলও এসে মাসীমার সামনে দাঁড়িয়েছে। মাসীমা হঠাৎ মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, "ওরে তোদের রাজপুতনায় কি মন্দির নেই? তপা, তপা কই রে? এই দ্যাখ গোপাল—বলরাম আজ সকালে কালী-ঘাট থেকে দশ পয়সা দিয়ে গোপালকে কিনে এনেছে। "মেরে তো গিরিধর গোপাল—"

গান করতে করতে মাসীমা সত্যিই আঁচলের তলা থেকে দশ পয়সার গোপালটি বার করলেন। বসিয়ে রাখলেন সব-চেয়ে উঁচু সিঁড়িটাতে। চোখমুখ হয় ত তৈরী হওয়ার সময় ছিল। সকালের কেনা গোপাল, এখন আর কালীঘাটের নেই! কুমোরের সাধ্য কি এখন একে সনাক্ত করতে পারে?

শেষ দৃশ্যটা সত্যিই অদ্ভুত! অদ্ভুত বটে, কিন্তু আমি এর

অংশ নই। সবাই তাদের বিচারবোধ হারিয়েছে, আমি হারাই নি। আমি দেখছি, ওরা অনুভব করছে। গান আর বাঁশীর সুর ক্রমশঃই চড়তে লাগল। শুধু চড়লেই কাজ হ'ত না, আরও কিছু একটা হ'ল। ষষ্ঠীদা সুরের তালে তালে নাচতে আরম্ভ করল। দৃশ্যটা জমে উঠেছে। সেই জন্যেই আমি দাঁড়িয়ে রইলাম, নইলে আমার পালিয়ে আসাই উচিত ছিল। পালাবার চেষ্টা করেছি। বড়সাহেব পালিয়ে গেছেন বেলজিয়ামের মঠে। আমি পালাতে চাই সরকার-কুঠির মঠ থেকে। কিন্তু পারলাম না। দৃশ্যটা জমে উঠেছে। ষষ্ঠীদার গা থেকে খদ্দরের চাদরটা পড়ে গেল মাটিতে, ভ্রুক্ষেপ নেই তার। প্রত্যেকেরই পায়ের দাগ লাগছে—দাগ লাগল রক্তের। জেটমলের পা থেকে তখনও রক্ত পড়ছিল।

মাসীমা এবার হাঁপিয়ে পড়লেন—বন্ধ করলেন গান। চোখ ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন সবাইকে। মনে হ'ল, কাউকে তিনি স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছেন না। সত্যিই তাই। দৃষ্টি তাঁর নিশ্চয়ই আবছা হয়ে এসেছে। আমি তাঁর কাছেই দাঁড়িয়েছিলাম। কাছে ছিল ষষ্ঠীদাও। মাসীমা ডাকলেন, "তপা কই রে? ষষ্ঠী? ষষ্ঠী কোথায়?"

"এই ত ষষ্ঠীদা—" জবাব দিলাম আমি।

মাসীমা দেখবার চেষ্টা করলেন না। মন্দিরের দিকে মুখ রেখে তিনি বলতে লাগলেন, "তপা, ষষ্ঠীকে ক্ষমা করিস, ওর অপরাধের কাহিনী ওর নিজের মুখেই শুনিস। কাহিনী ও লিখছে। ষষ্ঠী, আমি তোকে ক্ষমা করে গেলাম রে। গোপাল—আমার গোপাল বলেছেন ক্ষমা করতে।" এই পর্যন্ত বলে মাসীমা এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। হাঁপিয়ে পড়েছিলেন তিনি। আমরা সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়েছিলাম তাঁর দিকে। মেসোমশাইর কাছে কতবারই ত শুনেছি যে, তিনি তাঁর সহধর্মিণীকে আজও চিনতে পারেন নি। এই বোধ হয় চেনবার শেষ মুহূর্ত এসে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু বৃদ্ধের চোখ দেখলাম শুকনো নয়। বার বার তিনি ধুতির প্রান্তটা হাতের মুঠোতে চেপে ধরতে লাগলেন। চোখের জল মুছতে লাগলেন সরকার-কুঠির মেসোমশাই।

মাসীমা এবার উঠে দাঁড়ালেন। হাত বাড়িয়ে গোপালকে ধরবার চেষ্টা করতে করতে পুনরায় তিনি গান ধরলেন, "মেরে তো গিরিধর গোপাল, দুসরো ন কোঈ—"

বলরাম মাসীমার পাশে দাঁড়িয়ে বাঁশীর সুর ক্রমশই চড়াতে লাগল। কেউ আর চুপ করে থাকতে পারছিল না। মাসীমার সুরের সঙ্গে সুর মেলাল ষষ্ঠীদা। কেতকীর পাশে দাঁড়িয়ে চণ্ডীদা পর্যন্ত গান করছে! আর জেটমল? সেও চুপ করে ছিল না। হাত জোড় করে সে ক্ষমা চাইছে আর মাঝে মাঝে গানের কলিতে টান দিচ্ছে। আমিই শুধু সরে এলাম দলের বাইরে। একটু বাদে সরে এল মহীতোষও। আমার পাশে দাঁড়িয়ে মহীতোষ জিজ্ঞাসা করল, "কি দেখছ তুমি?"

বললাম, "ওদের পাগুলো!"

"পাগুলো?"

"হ্যাঁ, তালে তালে পা ফেলবার চেষ্টা করছে সবাই। সত্যিই ত ওগুলো পা নয়।"

"তবে?"

"মহীতোষ, এরা বলবেন, ভক্তির টানে পাগুলো সব নাচের ভঙ্গিতে নড়ছে। কিন্তু আমি জানি, ওগুলো সব ধনতান্ত্রিক সমাজের খুঁটি। আহা, জেটমলের পা দিয়ে কি রকম রক্ত পড়ছে, দেখ! ষষ্ঠীদার গায়ের চাদরটা যে লাল হয়ে উঠল—"

"সুতপা!"

"মহীতোষ, নতুন বিপ্লবের বিগ্রহ আমি আজও খুঁজে পেলাম না। বলতে পার, এ কোন্ মাসীমা? এ কোন্ জেটমল? আর এ কোন্ গোপাল?"

জবাব দিল না মহীতোষ। সে অবাক হয়ে চেয়ে রইল সামনের দিকে।

গান থেমে গেল হঠাৎ। গোপালের নাম করতে করতে মাসীমা পড়ে গেলেন ভাঙা মন্দিরের সিঁড়ির ওপর। চোখ বুজলেন সরকার কুঠির মাসীমা। ভিড়ের পেছন থেকে এগিয়ে এলেন মেসোমশাই। ষষ্ঠীদার চাদরটা মাটি থেকে তুলে নিলেন। তার পর চাদর দিয়ে মৃতদেহটা ঢেকে দিলেন তিনি।

আমি দেখলাম, একটা বিরাট মৃত্যুর ওপর ছড়িয়ে রইল অসংখ্য মানুষের পায়ের দাগ।

বলরাম এবং জেটমলের পায়ের দাগগুলোও যেন সব মিলেমিশে ওতে একাকার হয়ে গেল!

শ্মশান থেকে তখনও কেউ ফিরে আসে নি। রাত প্রায় শেষ হয়ে এল। আমি দাঁড়িয়েছিলাম দোতলার বারান্দায়। সারাটা রাত এখানেই ছিলাম। সরকার-কুঠি শূন্য। এমনকি রতন পর্যন্ত আজ শ্মশানে গেছে! বাধা আমি ওকে দিই নি। সুস্থবোধ না করলে রতন নিশ্চয়ই এতটা পথ হাঁটতেও পারত না।

গড়িয়াখালের দিকেই চেয়েছিলাম আমি। দেখলাম, চোখের সামনে কালো আকাশ ক্রমে ক্রমে সাদা হচ্ছে। পূবের দিগন্তে একটা মানুষের ছায়া যেন ক্রমশঃই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। মনে হ'ল, বলরাম। সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটা

দিগন্তের ছবিও দেখতে পেলাম আমি। ছবিটা চিনতে আমার বিন্দুমাত্র অসুবিধে হ'ল না। বুকের ছাতি চওড়া করে চ্যাং চলেছে এগিয়ে। সারা দেশ ওকে ডাকছে। কোটি কোটি হাত উঠে রয়েছে ওপর দিকে। সু-উচ্চ হিমালয়ের শিখরশ্রেণী পর্যন্ত হাতের ইসারা ঢেকে ফেলতে পারে নি। চ্যাঙের চতুর্দিকে কোটি হাতের আহ্বান! আর এই দিগন্তে বলরাম একা। ওর চারদিকে একটা হাতও আমি দেখতে পাচ্ছি না।

হঠাৎ আমার মনে হ'ল, বলরাম শুধু পূর্ববঙ্গের বাস্তহারা নয়। মানব-ইতিহাসের সেই লাঞ্ছিত, ধূলিম্লান, দৈন্যক্লিষ্ট মানুষটি আজও একা—আজও সে বাস্তু খুঁজে পায় নি।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

সম্প্রতি বাংলার তথা ভারতের বিপ্লবীযুগের রাজনৈতিক গগনের এক দীপ্তিমান্ নক্ষত্র কক্ষভ্রষ্ট হয়ে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গেল! ময়মনসিংহ-গৌরীপুরের ভারতবিখ্যাত দাতা ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী আজ আর জীবিত নেই। তাঁর জীবন-চরিত লিখবার সময় হয়ত এখনও আসে নি, কিন্তু পাছে কেউ তাঁর সম্বন্ধে ভুল কথা প্রকাশ করে বসেন তাই আমার এই প্রবন্ধের অবতারণা। উত্তরবঙ্গের বারেন্দ্রভূমের রাজসাহী জেলান্তর্গত নওগাঁ মহকুমাধীন বলিহার নামক এক বিশাল গণ্ডগ্রামের জোত-ব্রহ্মোত্তরভোগী এক মধ্যবিত্ত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণবংশে তিনি ১২৮১ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা হরিপ্রসাদ (ভাদুড়ী) ভট্টাচার্য্য পরমপূত চরিত্রের নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্রজেন্দ্রকিশোরের জননীও ছিলেন বড়ই সরলা, তাঁর পিত্রালয় বরিশাল—হিজলা গ্রামে। প্রতাপী কাহিলী বংশের তেজস্বিনী কন্যা ছিলেন তিনি। ব্রজেন্দ্রকিশোর জন্মদাতার নিরহঙ্কার, অক্রোধ, পরদুঃখ-কাতরতা, অতিথিপরায়ণতা ও সারল্য এবং গর্ভধারিণীর স্বাধীনতা-প্রিয়তা ও তেজস্বিতার সম্পূর্ণরূপে উত্তরাধিকারী ছিলেন।

ব্রজেন্দ্রকিশোরের পিতৃদত্ত নাম ছিল রজনীপ্রসাদ। তাঁরা ছয় ভাই এবং চার বোন ছিলেন। রোহিণীপ্রসাদ, রজনীপ্রসাদ, তারাপ্রসাদ, রমণীপ্রসাদ, নলিনীপ্রসাদ ও সাগরপ্রসাদ—এই ছয় জনের মধ্যে বর্ত্তমানে অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তার নলিনীপ্রসাদ স্ত্রী-পুত্রাদি-সহ বলিহারে নিজ বাটীতে এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ সাগরপ্রসাদ স্ত্রী-পুত্রাদি-সহ কাশীধামে আছেন। কামিনীসুন্দরী, মনোমোহিনী, কুমুদিনী ও কুসুমকুমারী এই চারটি বোনের মধ্যে বিধবা কুমুদিনী মাইথনে একমাত্র পুত্রের কর্ম্মস্থলে এবং বিধবা কুসুমকুমারী কাশীধামে কনিষ্ঠ ভাই সাগরপ্রসাদের কাছে আছেন। ছোট দুটি ভাই এবং ছোট দুটি বিধবা বোন ছাড়া ব্রজেন্দ্রকিশোরের আপন কোনো ভাই-বোন আর বেঁচে নেই এখন। ব্রজেন্দ্রকিশোর ছিলেন পিতার দ্বিতীয় পুত্র।

ময়মনসিংহ-গৌরীপুরের স্বর্গত জমিদার রাজেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরীর অপরিণামদর্শিতার ফলে অকালে, অপুত্রক অবস্থায়, ভগিনী

ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

কৃষ্ণমণি দেবীর বাটীর ঘাটে বলুহা নদীতে কৃষ্ণপুরে অল্পবয়সে দেহত্যাগ করলে তাঁর পূর্ব্বকৃত উইল অনুসারে বিধবা পত্নী বিশ্বেশ্বরী দেবী চৌধুরাণী, যাগ-যজ্ঞ-ক্রিয়াকাণ্ডের পর রজনীপ্রসাদকে ৫।৬ বৎসর বয়সে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। রজনীপ্রসাদের

নামও পরিবর্ত্তন করে ব্রজেন্দ্রকিশোর রাখা হয়। বলিহারের রাজা কৃষ্ণেন্দ্র রায়ের অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন হরিপ্রসাদ। রাজা বন্ধুকে বাধ্য করার পর হরিপ্রসাদ ও সারদাসুন্দরী রজনী-প্রসাদকে দত্তক দিয়েছিলেন। সেই গরুর গাড়ীর যুগে, নৌকায় জলপথে যাতায়াতের কালে, সুদূর পূর্ব্ববঙ্গে আত্মজ পুত্রকে দত্তক দিয়ে, মা-বাবা বড়ই দুঃখানুভব করতেন। পোষ্যপুত্রও তাঁদেরকে দেখার জন্য ব্যাকুল হতেন। তাই এই উভয় দিকের ব্যথা-বেদনা ভুলিয়ে রাখার জন্যই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভাই রোহিণীপ্রসাদ ব্রজেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে সঙ্গেই থাকতেন। ১৩২৫ বঙ্গাব্দের ৫ই অগ্রহায়ণ ৪৮ বৎসর বয়সে গৌরীপুরে ব্রজেন্দ্রকিশোরের চক্ষুর সমক্ষে তাঁর সর্ব্বাধিক প্রিয় বড়ভাই রোহিণীপ্রসাদ মাত্র দুই দিনের এশিয়াটিক কলেরায় অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ব্রজেন্দ্রকিশোরের জীবনের প্রারম্ভেই এক অপ্রিয় ঘটনা ঘটে। দত্তক-গ্রহণকারিণী মাতা বিশ্বেশ্বরী তাঁর পিতৃব্য গৌরীপুরের তৎকালীন দেওয়ান জয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং পিতৃকুলের কতিপয় আত্মীয়ের প্ররোচনায় ব্রজেন্দ্রকিশোরকে পরিত্যাগ করে পিতৃকুলেরই একটি পুত্রকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করবার জন্যে অস্থির হন। ব্রজেন্দ্রকিশোরের জীবন বিপন্ন হবার উপক্রম হ'ল। সংবাদ পেয়ে হরিপ্রসাদ স্ত্রী-পুত্রাদিসহ গৌরীপুর ছুটলেন এবং ব্রজেন্দ্রকিশোরকে নিয়েই বলিহারে ফিরবেন সঙ্কল্প করলেন। তাঁর ময়মনসিংহ-গৌরীপুরে পৌঁছবার পর সঙ্কল্পের কথা মুক্তাগাছার মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরীর কর্ণগোচর হ'ল। ব্রজেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে মহারাজার অত্যন্ত হৃদ্যতা ছিল। হরিপ্রসাদের এই পলায়ন-মনোবৃত্তি মহারাজা মেনে নিতে পারলেন না। দত্তক অসিদ্ধ করবার এই হীন প্রচেষ্টাকে পূর্ব্ববঙ্গের সমস্ত জমিদারের কলঙ্কস্বরূপ মনে করে' মহারাজা সর্ব্বপ্রথম ব্রজেন্দ্রকিশোরের পক্ষাবলম্বন করলেন। তৎপর গোলকপুরের কুমার উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী ও কাশীপুরের জমিদার "ভারত ভ্রমণ" প্রণেতা ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী সাহায্যে এগিয়ে এলেন। মহারাজা সূর্য্যকান্ত, কুমার উপেন্দ্রচন্দ্র, ধনী ধরণীকান্ত—এই তিন মহাপুরুষ এবং তৎকালীন ময়মনসিংহের জেলাশাসক ঐতিহাসিক-ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত—এই চার জনের চেষ্টায় আদালতে মামলা বেশীদূর অগ্রসর হ'ল না। আদালতে বিশ্বেশ্বরী অনায়াসেই রমেশচন্দ্রের কথায় সম্মত হয়ে আপোষ করতে উদগ্রীব হলেন। মামলা আপোষেই নিষ্পত্তি হ'ল। দেবী বিশ্বেশ্বরী জীবিতকাল পর্য্যন্ত সম্পত্তির চারি আনা ভোগ-দখল করবেন এবং ব্রজেন্দ্রকিশোর বার আনা সম্পত্তির মালিক হবেন। বিশ্বেশ্বরীর মৃত্যুর পর তাঁর জীবনস্বত্ব ব্রজেন্দ্রকিশোরের বারো আনা সম্পত্তিভুক্ত হবে এবং ষোল আনার মালিক ব্রজেন্দ্র-কিশোরই হবেন।

এই মামলা নিষ্পত্তির পর বিশ্বেশ্বরী দেবী চৌধুরাণী আর স্থায়ীভাবে গৌরীপুরে বাস করেন নি। তিনি তাঁর এক ভাইপো ও ভগিনী-পুত্রদ্বয় সহ দেওঘরে বসবাস করতে লাগলেন এবং আমৃত্যু সেখানেই থেকে গেলেন। ব্রজেন্দ্রকিশোর গৌরী-পুরেই বাস করতে লাগলেন। অনেক সময় কলকাতার ৫৩ নং সুকিয়া ষ্ট্রীটের (এখন ১নং সুকিয়া ষ্ট্রীটের) ভাড়াটে বাড়ীতে এবং পরবর্ত্তীকালে নিজভবন ৫৫নং বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড ঠিকানায় শেষ জীবনটা কাটিয়ে গেছেন। বিশ্বেশ্বরী দেবী চৌধুরাণী পৌত্র বীরেন্দ্রকিশোরের উপনয়নের সময়ে সুদীর্ঘকাল পর একবারমাত্র শেষবারের জন্য গৌরীপুরে পদার্পণ করেছিলেন।

ব্রজেন্দ্রকিশোর পিতৃমাতৃহীনা পবিত্রচরিত্রা অপূর্ব্বসুন্দরী পরমাসাধ্বী ধর্ম্মপ্রাণা অনন্তবালা নাম্নী এক কাশীবাসিনী বারেন্দ্র-বংশসম্ভূতা মহীয়সী নারীকে বিয়ে করেছিলেন। হরিপ্রসাদই এই বিয়ে সুস্থির করেছিলেন—অনন্তবালার প্রমুখাৎ শ্রবণ করেছি। বিপুল এক জমিদারীর একমাত্র মালিকের ধর্ম্মপত্নী হয়েও, কোনদিন তিনি ঘুণাক্ষরেও ধনগর্ব্ব প্রকাশ করেন নি। সাধারণ ভদ্রগৃহস্থ ঘরের নারীর মতই জীবন যাপন করে গেছেন তিনি। ধর্ম্মশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল, তাঁর প্রাণটা ছিল বড়ই সরল ও নির্ম্মল এবং নিষ্কলুষ। গর্ভে দুটি পুত্র হয়ে মরার পর অধিকাংশ সময়েই নিস্পৃহ, উদাসীন ও শোককাতর থাকতেন তিনি। সেই দুর্ব্বহ শোক অপনোদনের জন্যই স্বামীর পিতৃকুলের আপন ভাসুরপুত্র (নাদুস-নুদুস ছিল বলেই) 'নেদু'কে বলিহার থেকে গৌরীপুরে আনান এবং পরম স্নেহে অপত্য-নির্ব্বিশেষে পালন করতে লাগলেন। দ্বিতীয় মেয়ে বসন্তবালা যখন হামাগুড়ি দিত, তখন "নেদু' ওরফে 'বতে' গৌরীপুরে আসে। বড় মেয়ে হেমন্তবালা ১৩০১ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসের উত্থান একাদশীতে এবং দ্বিতীয় মেয়ে কান্তবালা ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ১১ই পৌষ রবিবার বেলা ১১টায় ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। হেমন্তবালার চার বছরের বড় এই 'বতে'। এর বহু পরে ব্রজেন্দ্রকিশোরের ধীমান কৃতবিদ্য সুরশিল্পী পুত্র বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী গৌরীপুরে ভূমিষ্ঠ হন। এখন বড় মেয়ে হেমন্তবালা এবং একমাত্র পুত্র বীরেন্দ্রকিশোর জীবিত। দুর্ভাগ্য যে, বীরেন্দ্রকিশোর যৌবনেই বিপত্নীক। তাঁর একমাত্র পুত্র উচ্চ-শিক্ষিত বিনোদকিশোর এবং উচ্চশিক্ষিতা একমাত্র কন্যা 'রাণু' বীরেন্দ্রকিশোরের শোকের সান্ত্বনা। ব্রজেন্দ্রকিশোরের একমাত্র দৌহিত্র, হেমন্তবালার কৃতী সুরজ্ঞ পুত্র বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী এখন দাদুর অভাবে ম্রিয়মান। বর্ত্তমানে জনককুল, দত্তককুল, শ্বশুরকুল এবং আত্মীয়-অনাত্মীয়-দুঃস্থ বহুকুলের সাহায্যপ্রাপ্ত সকলেই মহাশোকে মুহ্যমান।

তীক্ষ্ণধী ব্রজেন্দ্রকিশোর সবই বুঝতেন, দেখতেন, শুনতেন; কিন্তু সহজে যখন-তখন উর্দ্ধতম কর্ম্মচারীর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করতেন না। কোথাকার জল কোথায় গড়ায়, তাই দেখতেন। তাঁর অনন্যসাধারণ মমতা ছিল। বুক-ভরা সুগভীর স্নেহ, প্রীতি, মমতাই ছিল তাঁর প্রধান দুর্ব্বলতা। এই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে অনেক অযোগ্যও উচ্চ-পুরস্কৃত হয়েছে। তাঁর এই মনের কোমল-তার পাশে তেজস্বিতাও দেখেছি খুব। ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির মতই

দেখেছি তাঁকে। বাইরে তরু-আচ্ছাদিত শ্যামলশ্রী, অন্তরে প্রজ্জ্বলন্ত আগুন। প্রয়োজন উপস্থিত হ'লে অগ্নি উদ্গীরণ করতেও ত্রুটি হ'ত না। ঘাত-প্রতিঘাতের জীবনে নাটকীয় আচরণ মহাপ্রস্থানের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত পরখ করে দেখেছি। নাটকীয় কলা-কৌশল বিশেষ-ভাবে জানা ছিল তাঁর। সাবালক হয়ে যখন জমিদারীর কর্তৃত্ব হাতে পেলেন তখন আয় ছিল তার মাত্র তিন লাখ—সোয়া তিন লাখ টাকা। তাঁর গৌরীপুর গ্রাম অতিশয় জঙ্গলাকীর্ণ নেহাৎ নগণ্য পাড়াগাঁ মাত্র। তাঁর গৃহশিক্ষক পরে সুযোগ্য কীর্ত্তিমান্ দেওয়ান কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রখর দৃষ্টিতে ও একনিষ্ঠ কার্য্য পরিচালনায় গৌরীপুরের স্থানমাহাত্ম্য এবং জমিদারীর গৌরবশ্রী ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। শ্রীহট্ট জেলার বংশীকুণ্ডা পরগণার জমিদারী-ক্রয়ের পর ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হ'ল। প্রজাপত্তনে, জমিদারী বন্দোবস্তে, পতিত জমির বিলি-ব্যবস্থায় ও বছর বছর বিস্তৃত জলমহাল ইজারা দেওয়ায় ক্রমশঃ এই জমিদারী শেষকালে বারো লাখ টাকা আয়ের সম্পত্তিতে পরিণত হ'ল। মহানুভব নির্লোভী চরিত্রবান্ দেওয়ান কুমুদিনীকান্ত যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হয়ে গৌরীপুরে "অনন্ত সাগরে"র উত্তরপাড়ে নিজ বাসার সম্মুখভাগে ছোট্ট তাঁবুতে মৃত্যু-প্রতীক্ষায় থেকেও কর্ম্মচারীবৃন্দকে কাছারী থেকে ডাকিয়ে এনে আদেশ, উপদেশ ও পরামর্শ প্রদানে জমিদারী-কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন করে গেছেন। 'কর্ত্তা' ব্রজেন্দ্রকিশোর ও 'কর্ত্রী' অনন্তবালার আন্তরিক স্নেহাতিশয্যে কুমুদিনীকান্ত মনে মনে এই স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, 'নেতু' বা 'বতে'ই হ'ত ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী। ব্রজেন্দ্রকিশোর এবং ধর্ম্মপ্রাণা পত্নী অনন্তবালার সুগভীর স্নেহ তাঁদের মৃত্যুকাল পর্য্যন্তই অব্যাহত ছিল 'বতে'র প্রতি। চরিত্রবান্ নির্লোভী মহানুভব প্রধান কর্ম্মচারী পাওয়া সৌভাগ্যের কথা বৈকি!

বাস্তবিকই ব্রজেন্দ্রকিশোর মহা ভাগ্যবান্। সুখ-দুঃখ, শোক-সৌভাগ্য মানুষ মাত্রেরই প্রাপ্য। গীতার ভগবদুক্তিমতে তিনি ধনবান্ কুলে না জন্মালেও, এক পূতচরিত্র জনক-জননীর পবিত্র গৃহেই ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। "শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে" এই যোগ-ভ্রষ্ট মহাপুরুষ এসেছিলেন।

১৩১৮ বঙ্গাব্দের ২৩শে পৌষ সোমবার দেওয়ান কুমুদিনীকান্ত মহাপ্রস্থান করার পর পরবর্ত্তী দেওয়ান শ্রীনলিনীমোহন রায় এলেন গৌরীপুরে। পরবর্ত্তীকালে ইনি গৌরীপুরের নালা-ডোবা-খানা-খন্দ বুজিয়ে রাস্তা-ঘাট বানিয়ে বড় বড় পুকুর-দীঘি কাটিয়ে দালান-কোঠা-প্রাসাদ সুসজ্জিত করিয়ে শ্রেণীবদ্ধভাবে কর্ম্মচারীদের ও আশ্রিত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বাসাবাড়ী তৈরী করিয়ে বহু চা-বাগান কিনিয়ে নূতন নূতন পন্থায় আয় বাড়িয়ে গৌরীপুরের মত এক ক্ষুদ্র গ্রামকে সুন্দর শহরে পরিণত করেছিলেন। এঁর কীর্ত্তিকাহিনী সবিস্তারে বলার স্থান নেই এখানে। টালীগঞ্জের এক ভাড়াটে বাসায় পুত্রদের সন্নিধানে বার্দ্ধক্যে বিপত্নীক হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে আছেন এখন ইনি। দেওয়ান কুমুদিনীকান্ত ও দেওয়ান শ্রীনলিনীমোহনকে পাওয়া না গেলে গৌরীপুরের গৌরব ও জৌলুস এত খোলতাই হ'ত কিনা সন্দেহ। তিন লাখ টাকা থেকে বারো লাখ টাকা আয়ের এষ্টেট হওয়ার মূলে এই দুই দেওয়ান।

ব্রজেন্দ্রকিশোরের বিপুল জমিদারী বেশ সুষ্ঠুভাবেই পরিচালিত হয়ে এসেছে। তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল এই জমিদারীটি।—গৌরীপুর সদর বিভাগ, জামালপুর বিভাগ ও সুনামগঞ্জ বিভাগ। দেওয়ানই সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী। প্রত্যেক বিভাগের ছিলেন এক-একজন বিভাগীয় ম্যানেজার। প্রত্যেক ম্যানেজারের অধীনে সহকারী ম্যানেজার এবং একজন করে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এবং একজন করে ইন্সপেক্টর। বিভাগীয় ম্যানেজারত্রয়ের অধীনে ১২।১৪টি করে ডিহি ও সাবডিহি কাছারীর নায়েবগণ তাঁদের ৫।৭ জন কর্ম্ম-কুশল তহশীল কর্ম্মচারী সহযোগে খাজনাদি আদায় করতেন। প্রত্যেক বিভাগীয় কাছারীতে ইন্সপেক্টর, জমানবীশ, সুমারনবীশ ও মুন্সী (মামলা-মোকদ্দমা সেরেস্তার কর্ম্মচারী) থাকতেন। ইন্সপেক্টর কাছারীগুলো পরিদর্শন করতেন ও রিপোর্ট দিয়ে ভাল-মন্দ সব কিছু ওপরওয়ালাকে জানিয়ে দিতেন। জমানবীশ পতিত জমি পত্তন ও জমিসংক্রান্ত কাজ-কর্ম্ম করতেন। সুমারনবীশ শুধু টাকা-কড়ির হিসাব ও সর্ব্বস্তরের কর্ম্মচারীবৃন্দের বেতনাদি দিতেন। মুন্সীর কাজ ছিল কেবল মোকদ্দমা পরিচালন করা। ব্রজেন্দ্র-কিশোর প্রজাদের হিতে বহু পুকুর নলকূপ খনন, স্কুল, পাঠশালা, উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন, মক্তবে সাহায্যপ্রদান ইত্যাদি করে গেছেন।

মুক্তাগাছার স্বনামধন্য বিরাট জমিদার মহারাজা সূর্য্যকান্তের চারিত্রিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত ব্রজেন্দ্রকিশোর ১৯০৫-৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বেপরোয়াভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু বাগ্মী বিপিন পালের মত বজ্রনিনাদী বক্তৃতা দিয়ে তিনি দেশকে মাতিয়ে না তুললেও চিরদিনই বিপ্লবী দেশপ্রেমিক ছিলেন এবং সকল স্তরের দেশভক্তদের সঙ্গে বিশেষ হৃদ্যতা ছিল তাঁর। ভারতের স্বাধীনতার জন্য অকাতরে অকুণ্ঠচিত্তে ধন-জন দিয়ে সাহায্য করে গেছেন তিনি। তাঁর গৌরীপুরস্থ বাসভবনে বিপিন পাল, সুবোধ মল্লিক, অরবিন্দ প্রভৃতি জাতির মহারথীবৃন্দ কয়েকদিন অবস্থান করে সকলকে আনন্দ দিয়ে আপ্যায়িত করে গেছেন। গোলোকপুরের উদারচেতা জমিদার কুমার উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরীর আগ্রহে তাঁর বাড়ীর বহির্ব্বাটীর বিরাট প্রশস্ত আঙিনায় বড় স্বদেশীসভায় আমরা সর্ব্বপ্রথম বিপিন পালের কণ্ঠে প্রাণমাতানো বজ্রনির্ঘোষ শ্রবণ করি। লোকের কি উন্মাদনা প্রত্যক্ষ করেছিলাম সেদিন! অরবিন্দকে সেদিন বক্তৃতা দিতে দেখি নি। তিনি একটি আরামকেদারায় উপবিষ্ট হয়ে হেলান দিয়ে সম্মুখস্থ দক্ষিণাকাশে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে স্থিরনেত্রে বসে বসে কি যেন এক মহাচিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। গৌরীপুর ভবনের সুউচ্চ প্রাসাদের দোতলায় সর্ব্বপূর্ব্বপ্রান্তের শেষ কামরায় ব্রজেন্দ্র-কিশোরের অনুপস্থিতিতে অরবিন্দকে পরিচর্য্যা করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করি আজ। অরবিন্দের সেই সেদিনের অপূর্ব্ব চেহারা

এখনও আমার মনের পটে দেদীপ্যমান। বঙ্গলক্ষ্মী মিলের আন্‌কোরা ধুতি-পরা, মোটা চাদরাবৃত দেহ, বিস্তৃত ললাট, উস্কু-খুস্কু অবিন্যস্ত এলো চুল, অতল দীঘির সুস্থির স্বচ্ছ-সলিল-সদৃশ শান্ত অথচ চিন্তান্বিত চক্ষু—সুদীর্ঘকাল পর এই ৬৮ বৎসর বয়সেও ঐ দিব্যমূর্ত্তি চোখে যেন ভাসছে আমার।

আজ যে কলকাতার উপকণ্ঠে যাদবপুরের এত জৌলুস এবং যাদবপুর টেক্‌নিকাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, তার মূলে প্রধানতঃ এবং প্রধানতঃ ব্রজেন্দ্রকিশোরের পাঁচ লাখ টাকা দান। জাতীয় শিক্ষা ও শিল্প-পরিষদের তহবিলে এই পাঁচ লাখ টাকা দান দিয়ে অরবিন্দের নেতৃত্বে প্রথম তা চালু করান তিনি। আবার মদনমোহন মালব্যজী যখন এসে বলেছিলেন, "বাবু ব্রজেন্দ্রকিশোর, আপনি সর্ব্বপ্রথম হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে দান না দিলে, আমার স্বপ্ন সার্থক করে তোলা অসম্ভব হবে!"—তখনই তিনি কাশীর হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে এক লাখ টাকা দিয়ে দিলেন। মহৎ কার্য্যের জন্যে তাঁর কাছে চাইতে দেরী হতে পারে, কিন্তু দিতে কখনও দেরী করেন নি ব্রজেন্দ্রকিশোর। এ আচরণ শেষ পর্যন্ত দেখা গেছে।

ব্রজেন্দ্রকিশোরের নির্ভীকতা ও তেজস্বিতা বরদাস্ত করতে না পেরে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বিশেষ বক্রদৃষ্টিতে দেখতে লাগল তাঁকে। মহারাজা সূর্য্যকান্ত উগ্রপন্থী ছিলেন না; কিন্তু তাঁর মন্ত্রশিষ্য ব্রজেন্দ্রকিশোর মনে-প্রাণে তেজস্বী উগ্রপন্থী ছিলেন। তাই গৌরীপুরে যখন তিনি থাকতেন, তখন এবং পরে যখন সুকিয়া ষ্ট্রীটের রাজা প্যারীমোহন রায়ের বাড়ী ভাড়া করে বসবাস করতেন, তখন সি-আই-ডির লোক সাধারণ পোষাকে সর্ব্বদা কেউ-না-কেউ বাড়ীর অদূরে দাঁড়িয়ে থাকত এবং ব্রজেন্দ্রকিশোরের কাছে লোকজনের যাতায়াত নিরীক্ষণ করত এবং উপরওয়ালাকে জানাত। তাঁর কাছে থেকে কলকাতায় পড়ার সময় এই প্রবন্ধ-লেখকের প্রতিও গুপ্তচরদের প্রীতিপূর্ণ চোরা চাউনি নিক্ষিপ্ত হ'ত। ঠিক এই সময়েই ময়মনসিংহ জেলার জবরদস্ত ম্যাজিষ্ট্রেট ক্লার্কসাহেব ময়মনসিংহ শহরের 'স্বদেশী বাজার'টার দু-পাশের বহু দোকান লণ্ডভণ্ড করে লুঠ করান এবং ব্রজেন্দ্রকিশোরের জামালপুর কাছারীর দুর্গাপ্রতিমা বেকুবদেরকে লেলিয়ে দিয়ে চূর্ণ করান। হাইকোর্টের বিচার পরিচালন সময়ে বারাণসী-তীর্থবাসী বৃদ্ধ পিতা হরিপ্রসাদও বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখককে সঙ্গে নিয়ে ব্রজেন্দ্রকিশোরের কাছে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যারাকপুরস্থ ক্যাণ্টনমেণ্টের বাড়ীতে ভাড়াটে হিসাবে বাসকালে পদার্পণ করেই ব্রজেন্দ্রকিশোরকে সরকারের বিরুদ্ধে মামলা না চালিয়ে তুলে নিতে কতই না কাতর অনুরোধ করেছিলেন। তিনি তাঁর বৃদ্ধ পিতাকে তখন স্বাগতঃ অনুযোগের ঝাঁজালো সুরে বলেছিলেন, "না, আপনার কথা শুনব না। মামলা আমি তুলে নেব না! আমি দেখব ইংরেজের আইন কেমন! ওদের এক ম্যাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে ওদের কাছেই নালিশ দায়ের করেছি। দেখি, কি হয়।"

হরিপ্রসাদ প্রত্যুত্তরে পুনরায় নরম সুরে বলেছিলেন, "বাবা, তুমি সর্ব্বস্বান্ত হবে! এই বিরাট জমিদারী বাজেয়াপ্ত হবে। লোকে তোমাকে ও সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও খুব নিন্দা করবে।" "তা হোক, করুক নিন্দা। বলিহারেই তখন আমি চলে যাব এবং ভাই-বোনদের সঙ্গে থাকব। আমার সব ভাই-বোনদের ভাত হ'ল সেখানে, শুধু আমারই সেখানে হ'ল না। দত্তক দিয়ে সরিয়ে দিয়েছেন, না, আর শুনব না আপনার কথা!"—বলে, ব্রজেন্দ্রকিশোর ছল ছল নেত্রে চুপ করে বসে রইলেন ফরাসে। অবশেষে নিরুপায় হয়ে তিনি তাঁর বৌমা অনন্তবালাকে গিয়ে ধরলেন এবং 'কোম্পানী'র বিরুদ্ধে মামলা তুলে নিতে 'বাবু'কে পরামর্শ দিতে বললেন। তিনি সহাস্যবদনে বললেন, "বেশ ত, ভালই হবে। আমি ধর্ম্মপত্নী স্বামীরই অনুসরণ করব। জমিদারী বাজেয়াপ্ত হলে বলিহারে যেয়ে সবাই একসঙ্গে থাকব আমরা।"

সেদিনকার সে সব কথা এখনও জ্বলজ্বল করছে আমার মনে। যেন নাটকীয় কথোপকথন। ব্রজেন্দ্রকিশোরের চারিত্রিক দৃঢ়তা কেমন ছিল সেই প্রসঙ্গে এই কথাগুলো না জানিয়ে পারলাম না।

ক্রোধান্ধ ক্লার্ক হাইকোর্টেও হেরে গিয়ে বিলাতের প্রিভি-কাউন্সিলে জয়যুক্ত হলেন এবং শেষে মামলার ক্ষতিপূরণসমেত খরচ পাওয়ার অধিকারী হলেন।

এর ফল খুব ভালই হ'ল। ব্রজেন্দ্রকিশোর ধন-মন-প্রাণ দিয়ে বহু বিপ্লবীকে গুপ্ত দানের সাহায্যে অত্যন্ত বেশী করে উৎসাহ দিতে লেগে গেলেন। বহু স্বদেশভক্ত আত্মত্যাগেচ্ছু যুবাকে বিদেশে যেতে অর্থসাহায্য দিলেন। একদা বিনয় সরকারও তাঁর কাছে বিশেষ ভাল হাতে আর্থিক সাহায্য পেয়েছিলেন, জানি। ব্রজেন্দ্রকিশোর ধরি-মাছ-না-ছুঁই-পানি-গোছের, মুখসর্ব্বস্ব নিরামিষ স্বদেশসেবী ছিলেন না। শাক্তমন্ত্রে দীক্ষিত, বোমা-পিস্তলপ্রিয় স্বদেশভক্তদেরকেই ভালবাসতেন বেশী। নিরামিষ-যজ্ঞের চাইতে আমিষযজ্ঞেই একান্ত বিশ্বাসী ছিলেন। ইংরেজ-শাসন অবসানের জন্যে সারা দেশময় বোমার সদ্ব্যবহারের বিশেষ পক্ষপাতী বলেই বোমারুদেরকে শ্রদ্ধা ও সুগভীর প্রীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করতেন। বিপ্লবী-বীরাগ্রগণ্য বারীন ঘোষকে খুবই ভালবাসতেন তিনি। সামিষ যজ্ঞের জন্যে কেউ সাহায্য চাইতে কুণ্ঠিত হয়ে দেরী করলেও, শোনামাত্র দিতে দেরী হত না কোনদিনই তাঁর। দেশের মুক্তির জন্যে নির্ব্বিচারে নিঃসঙ্কোচে লোকলোচনের অগোচরে বহু অর্থ-সাহায্যই করে গেছেন তিনি।

প্রাচীন তপস্বী-মুনি-ঋষিদের সন্তান এবং ব্রাহ্মণ বলে একটা প্রচ্ছন্ন গর্ব্ব ও আত্মশ্লাঘা ছিল তাঁর অবচেতন মনের মর্ম্মস্থলে। তাই অর্থলোভী, দুঃস্থ, হীনবীর্য্য ব্রাহ্মণকুলকে সঞ্জীবিত করে তুলতে বিপুল অর্থ প্রতি বছর অকাতরে ঢেলে দিয়েছেন তিনি। 'বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা'র প্রাণ-প্রতিষ্ঠার মূলেও তিনি। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বিরাট ছবিটি সর্ব্বদা তাঁর নয়নসমক্ষে দেদীপ্যমান থাকত। বৃদ্ধকালেও মন্ত্র গ্রহণ করি নি এবং সে রুচি নেই দেখে মৃদু

তিরোধান করে একদিন নির্জ্জনে আমায় একটি শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করে গেছেন।

যাই হোক ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কিছুতেই ব্রজেন্দ্রকিশোরকে দমাতে না পেরে অন্যপথ ধরল। তাঁকে 'রাজা', 'মহারাজা' উপাধিরূপ আফিমের বড় বড়ি গলাধঃকরণ করাতে চাইল। ভেবেছিল এই বড়ি গিলিয়ে নেশায় মশগুল করে নানান চাঁদা-আদায়ের চাপে পিষ্ট করা যাবে তাঁকে এবং শেষকালে বশীভূত করাও সম্ভব হবে। স্বাধীনচেতা ব্রজেন্দ্রকিশোর অধিকতর সতর্ক হলেন তাতে। পরবর্তীকালে গৌরীপুরের ১নং ইউরোপীয় গেষ্ট-হাউসে জেলার এক সুচতুর ম্যাজিষ্ট্রেট (নাম স্মরণ নেই এখন) একদা এসে সমুপস্থিত হলেন। জমিদার হিসেবে তাঁর সঙ্গে দেখা করা ব্রজেন্দ্রকিশোরের অবশ্য কর্ত্তব্য। সুতরাং বর্তমান প্রবন্ধকারকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে, ঐ হল-ঘরের মধ্যেকার কামরায় বসে উভয়ে পরস্পরের কুশলবার্ত্তা জানার পর, আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন। সাহেব কথাচ্ছলে গবর্ণমেণ্টের 'রাজা' উপাধি প্রদানের কথা তাঁকে জানালেন। ব্রজেন্দ্রকিশোর হাসিমুখে বললেন, "আমাকে আমার প্রজাবৃন্দ ও আশ্রিত লোকজন 'রাজা' সম্বোধন সর্ব্বদাই করে থাকে। দেশের শিক্ষিত সবাই 'বাবু ব্রজেন্দ্রকিশোর' বলেন, এই-ই যথেষ্ট আমার পক্ষে। গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ, আমার আর উপাধি অনাবশ্যক।" ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আবার বললেন, "আপনি ছয় মাস পরই 'মহারাজা' হবেন। আপাততঃ ছয় মাসের জন্যে এই 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করুন।" হেসে তিনি পুনরায় সাহেবকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, "এই রাজা-মহারাজার ভার বহনে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম, আমাকে রেহাই দিন এই চাপ থেকে।" প্রত্যাখ্যাত হয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব চলে গেলেন ময়মনসিংহ শহরে। ব্রজেন্দ্র-কিশোরকে বাগে আনতে পারলেন না তাঁরা।

খেলা-ধুলায় তাঁর বিশেষ সখ ছিল, ক্রিকেট খুব ভালই খেলতেন দেখেছি। অনেক ক্রীড়া-প্রতিষ্ঠানকে বার্ষিক অর্থসাহায্যও দিতেন তিনি।

সঙ্গীতাদির আলোচনায় এবং বৈঠকে তিনি আহার-নিদ্রা একেবারে ভুলে যেতেন। তিনি চমৎকার পাখোয়াজ ও খোল বাজাতে পারতেন। গৌরীপুরস্থ সখের থিয়েটারের দৃশ্য ও সাজ-পোষাকাদির জন্যে প্রতি বৎসর বরাদ্দমাফিক অর্থ ব্যয় করতেন। অনেক অভিনেতাকে সাময়িক অর্থসাহায্য দিতেন এবং অনেক সঙ্গীতজ্ঞ, সুঅভিনেতাকে এষ্টেটে চাকুরী দিয়ে সবাইকে নিবে গৌরীপুরে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্যে বাড়ীঘর ও জোত-জমি দিয়ে প্রতিপালন করতেন। অভিনয়ের দিন রঙ্গমঞ্চের অন্তরালে একপার্শ্বে সকলের সঙ্গে চুপটি করে বসে বেশ মশগুল হয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে পাখোয়াজ বাজিয়ে সঙ্গত দিতে বহুকাল দেখেছি তাঁকে। বহু সঙ্গীতের স্বরলিপি ও গ্রন্থাদির বঙ্গানুবাদ করিয়ে বাঁধানো বড় বড় খাতায় বেতনভোগী সুলেখক দিয়ে লিখিয়ে স্তূপাকৃতি করে রেখে গেছেন তিনি। তাঁর এই মূল্যবান্ বিপুল সংগ্রহের অধিকারী এখন তাঁর ভারতবিখ্যাত সুযোগ্য সুরশিল্পী সেতার ও স্বরোদ বন্ত্রবাদক পুত্র বীরেন্দ্রকিশোরই তা সযত্নে রক্ষা করে আসছেন। ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁ গৌরীপুরে পৃথক সুন্দর বাসভবনে খোরাকী খরচ ও মোটা বেতনে স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করে গেছেন। বরিশালের গায়ক শীতল মুখুজ্যে ও বিপিন চট্টোপাধ্যায় বারোমাস ব্রজেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে সঙ্গেই থাকতেন। বিখ্যাত ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ ও ওস্তাদ দবীর খাঁও অধিকাংশ সময় গৌরীপুরে গিয়ে অবস্থান করেছেন। গান-বাজনার মজলিস গৌরীপুরে বারোমাস লেগেই থাকত। গৌরীপুরে প্রায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে নাট্যনিকেতন নির্ম্মাণান্তে প্রতিষ্ঠার সময় মদীয় অধ্যাপক, উত্তরকালের স্বনামখ্যাত অভিনেতা শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী একবার গৌরীপুর গিয়েছিলেন এবং বাংলার তথা ভারতের কোন প্রধান নগরীতেও এত বড় সুশোভন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিশাল নাট্যনিকেতন তিনি দেখেন নি এবং শোনেনও নি বলে বারংবার ভূয়সী প্রশংসা করে এসেছিলেন। কলিকাতার অন্যতম খ্যাতনামা বিত্তশালী হরেন্দ্র শীলের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় ছিল তাঁর। হরেন্দ্র শীল ব্রজেন্দ্র-কিশোরের বাড়ীতে গৌরীপুরে একবার গিয়েছিলেন।

এখন সর্ব্বশেষে ব্রজেন্দ্রকিশোরের তরু-লতিকার প্রতি প্রীতির কথা জানিয়ে উপসংহার করি। বলার বহু কথা বুকের ভিতর তোলপাড় করলেও বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করার এখানে স্থানাভাব। গৌরীপুরের রাজভবন আগে দক্ষিণ-মোখা ছিল, প্রাসাদ, কাছারী-দালান, সুচিত্রিত দুর্গাদালান ও বৃহৎ নাটমন্দির ইত্যাদি দক্ষিণ-মোখা থাকলেও, পরে বাড়ীর সম্মুখদিকটা পূব-মোখা করেছিলেন। পূবদিকেই উত্তর-দক্ষিণে লম্বিত অর্দ্ধক্রোশ-বিস্তৃত হাট-বাজার ও মাড়োয়ারী এবং অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ের দোকানীদের বড় বড় সুন্দর টিনের ঘর-বাড়ী। তাই রাজভবনের পূবদিকটা ছাড়া আর তিন দিক, উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে ফল-বাগান, ফুল-বাগান ও দুষ্প্রাপ্য নানান বিদেশীয় তরুবীথিকা। হিং, কর্পূর, তেজপাতা ইউক্লিপটাস বৃক্ষ ও নানা জাতীয় ফলফুল ও গাছ-গাছড়ায় সুশোভিত বৃহৎ ভূমিখণ্ডের ভিতর তাঁর বাড়ীটি। ৫০.৬০ হাত লম্বা একটি কাচের হাউস ও কাচের বেড়া দেওয়া অপরূপ ঘরের ভিতরে শীতপ্রধান দেশের নানা জাতীয় ক্রোটন গাছ কাঠের খাঁচায় ঝুলন্ত টবে দোদুল্যমান এবং মাটিতে টবে টবে নানা দেশের নানা রকমের নতুন নতুন পাতাবাহারের গাছ বিরাজমান। সন্তানবৎ তিনি এসব পালন করতেন। সকালে বিকালে অধিকাংশ সময় অন্দর-মহলের পশ্চিমদিকের এই ফল-বাগানের ছায়াচ্ছন্ন তরুতলে আরাম-কেদারায় দিন কাটিয়ে দিতেন। এবং জমিদারীকার্য্যও সেই তরুতলে শুনে শুনে আদেশ-উপদেশ দিয়ে পরিচালনা করতেন।

কোন গাছের ডালে পোকা ধরলেই স্বহস্তে নিজেই মালীকে দিয়ে কি সব আনিয়ে নানাভাবে প্রলেপ দেওয়াতেন, শুকনো ডাল ছোট্ট ছোট্ট করাত দিয়ে ধীরে ধীরে কাটতেন—পাছে গাছের কষ্ট হয় বা আঘাতে মারা যায়। কাঁচি দিয়ে শুকনো মরাপাতা ছেঁটে

ফেলে দিতেন তিনি। তরুলতারও যে প্রাণ আছে, প্রাচীন ঋষিদের মত আধুনিক অমর বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসুর মত তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন। সাধারণ লেবু থেকে নানান রকমের লেবু, সুগন্ধী লেবু—মায় এলাচী-গন্ধবিশিষ্ট লেবুর এক বৃহৎ বাগান ছিল তাঁর। নিজে ভোগ করতেন এসব ফল ফুল খুব কমই। দেওয়ান, ম্যানেজার, নায়েব, আত্মীয়-স্বজন ও কর্ম্মচারীবৃন্দের বাসায় বাসায় বিতরণ করে দিতেন তিনি। গেরুয়া বহির্ব্বাস লুঙ্গীর মত পরিধান করতেন এবং গায়ে হাত-কাটা ফতুয়া বারোমাস ব্যবহার করতেন। এই ছিল তাঁর অন্দরমহলের পোষাক। বাইরে বিশিষ্ট লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে হলে পামসু জুতো, মোজা, ফিনফিনে পাতলা ধুতি, গেঞ্জি, চুড়িদার পাঞ্জাবী বা কোট পরিধান করতেন।

এমন সাদাসিদে চাল-চলনের পোষাক-পরিচ্ছদ ব্রজেন্দ্রকিশোর ব্যবহার করে গেছেন বারোমাস। গাছ-গাছড়ার ভিতর যখন নির্জ্জনে বসে বসে বই পড়তেন বা কিছু লিখতেন, তখন কি এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বন্য পরিবেশে ফুটে উঠত! মনে হ'ত যেন মুনি-ঋষি ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন সেখানে। তাঁর শান্তিভঙ্গ না করে ধীর পদবিক্ষেপে ফিরে আসতাম সেখান থেকে। যে শ্রদ্ধার সঙ্গে ঐ আরণ্যক পরিবেশের মধ্যে তাঁর স্বাভাবিক ধ্যানস্থ সৌন্দর্য্য স্বচক্ষে নিরীক্ষণ না করেছে, সে ব্যক্তি আমার কথার যাথার্থ্য আদৌ উপলব্ধি করতে পারবে না। স্বীকার করব—দোষে-গুণেই মানুষ। দেওয়ালে কোন দোষ করে না। দেওয়াল সে দেওয়ালই থাকে। সেই অল্পে তুষ্ট আশুতোষতুল্য মহাপুরুষ শয়নে-স্বপনে নিদ্রায়-জাগরণে দুঃখের আশ্রয়, সুখের আনন্দ, শোকের সান্ত্বনা, বিপদের অভয় ও সম্পদের সহায় ও গৌরব। এ শুধু আমার ধারণা নয়, সারা বাংলার এই ধারণা।

মহাপ্রয়াণে মহাত্মাজী

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

মহামানবের মহাপ্রয়াণ মহাতিরোধান আজি
ঘনীভূত কালো শোণিতে ডুবিল আজিকে বিবস্বান্
মুক্তিযজ্ঞে পূর্ণাহুতির মূর্ত্ত প্রতীক সাজি
আপন রক্তে মুক্ত দেশেরে করিলে তিলক দান।

মৃণ্ময়ী মার চরণে তোমার লিখি অলক্ত লিখা
হিন্দু মুসলমানে জনে জনে মনোবন্ধন রাখী
মণিবন্ধনে বাঁধি লিখাইলে স্বীকৃতি স্বাক্ষরিকা
সন্ধি করিয়া গৃহ দ্বন্দ্বের ফুটালে অন্ধ আঁখি।

সারা ধরণীতে চলে নরমেধ, জিঘাংসু যজমান
সত্যাগ্রহী মহা ঋত্বিক বলি দিলে নিজ প্রাণ
অশ্রু রক্তে স্বেদে নির্বেদে ফুৎকারি করুণায়
জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে নিবাইলে তুমি তায়।

পল্লীপথের তীর্থঙ্কর খুলি মন্দির দ্বার
ধর্ম্মের গ্লানি করিয়াছ দূর দুর্যোগে অবতার
আপনি মরিবে, মারিবে না তবু তুলিবে না কভু হাত
রাকা-শশাঙ্ক কলঙ্কহীন জ্যোৎস্না প্লাবিত রাত।

জনগণমনে অতল গহনে অতলান্তিক পারে
সে-চন্দ্রমার প্রবল জোয়ার রোধিতে কেহ কি পারে?
গৌতমসম বৈরাগ যার শঙ্কর সম জ্ঞান
খ্রীষ্টের মত দুষ্টের করে পরম আত্মদান।

ভীষ্মের মত শৌর্য্য বীর্য্য ধৈর্য্যের হিমাচল
চৈতন্যের ভগবৎ প্রেম কৌপীন সম্বল
পঞ্চশীলের পঞ্চপ্রদীপ যষ্টিতে বিশ্বাস
জীবন্মৃতের সঞ্জীবনী সে জয়তু মোহন দাস।

ফাগ, বা হোলী উৎসব

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

ভারতবর্ষে হোলী একটি বড় উৎসব, এই সময় জনসাধারণ, পুরুষ ও নারী নৃত্য-গীত আনন্দ-উল্লাসে মত্ত হয়ে উঠে। দোল-পূর্ণিমা বা হোলীর পূর্ব্বে উত্তর ও মধ্যভারতে হোলীকা-জ্বালানো উৎসব খুব সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের নানা স্থানে এই হোলীকা জ্বালাবার উৎসবের উপলক্ষে বহুপ্রকার নৃত্য-গীত সুরু হয়। দোল-পূর্ণিমাতে দেশভেদে এই উৎসবের ভিন্ন ভিন্ন নামও আছে।

এই হোলীকা-জ্বালানো উৎসবের একটি পৌরাণিক কাহিনী আছে। হিরণ্যকশিপু যখন অনেক চেষ্টা করেও প্রহ্লাদকে বধ করতে পারল না, তখন সে তার হোলীকাকে রাজী করাল যে, সে প্রহ্লাদকে কোলে নিয়ে বসবে ও তার চারদিকে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হবে, প্রহ্লাদ পুড়ে মরবে, কিন্তু হোলীকা মায়াবলে উদ্ধার পাবে। কিন্তু ফল দাঁড়াল অন্যরূপ, ভগবানের কৃপায় অগ্নি ভক্ত প্রহ্লাদের একটি কেশও স্পর্শ করতে পারল না আর মাঝখান থেকে হোলীকা জ্বলে-পুড়ে মরল। বলা হয়, এই ঘটনা ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে হয়েছিল, তাই জনসাধারণ প্রতি বৎসর এই হোলীকা-জ্বালানো উৎসব করে।

রাজস্থানে একাদশীতেই হোলীকা সুরু হয়ে যায়, ঘরে ঘরে স্ত্রীলোকেরা গোবর দিয়ে ঢাল তলোয়ার চন্দ্র-সূর্য্য ইত্যাদি বানিয়ে শুকিয়ে রাখে, আর ওগুলি পূর্ণিমার দিন হোলীকার সঙ্গে জ্বালায়, প্রহ্লাদের জয়-জয়কার করে আর দ্বিতীয় দিন রং-খেলা সুরু করে দেয়।

মহারাষ্ট্রে হোলী জ্বালাবার পর বীরদের স্মৃতিতে তলোয়ার নিয়ে নাচ-গান করে আর হোলীর আগুনে জল গরম করে সেই রাত্রেই স্নান করে।

বিহারের ভোজপুরে হোলীকাদাহ শবদাহের সমান মনে করে। তারা হোলীকা জ্বালিয়ে ঘরে ফিরে স্নানাদি করে শুদ্ধ হয়।

বিহারে গ্রাম্যভাষায় হোলীকে 'তাল' বলে। বসন্ত পঞ্চমীতে ঢোলক বাজিয়ে খুব গান গায়, ঘরে ঘরে নারীরা নানারূপ মিষ্ট-দ্রব্যাদি তৈরী করে, চারদিকে আনন্দ-উৎসবের সাড়া পড়ে যায়।

দেশের যে যে স্থানে এই হোলীকা-জ্বালানো উৎসব হয়, সেই সেই স্থানের বালক ও যুবারা পনের-বিশ দিন আগে থেকেই বাড়ী বাড়ী চেয়ে ও চুরি করে বহু ঘুঁটে ও কাঠ স্তূপীকৃত করে রাখে এবং দোল পূর্ণিমার রাতে সেই স্তূপে আগুন ধরিয়ে নারিকেল উৎসর্গ করে ও "হোলী" "হোলী" বলে চেঁচিয়ে উঠে। তারপর প্রসাদ বিতরণ করে। অনেকে নূতন ফসলের কচি কচি দানা আগুনে ঝলসে তা বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করে খায়। অনেক স্থানেই মাটি-খড় দিয়ে একটি স্ত্রী মূর্ত্তি তৈরী করে, তার হাতে ধরা থাকে একটি শিশু, হোলীকা ও প্রহ্লাদের প্রতীক হিসাবে তা পূজা করে তবে হোলী জ্বালায়।

এই সময়টা উৎসবের পক্ষে খুবই উপযোগী। ফসল কেটে ঘরে তোলার সঙ্গে সঙ্গে নবান্নের অনুষ্ঠান হয়। হাড়-ভাঙ্গা খাটুনীর পর কৃষক সমাজে মেলে অফুরন্ত অবসর। গোলা-ভরা ধান আর প্রাণ-ভরা আনন্দ নিয়ে কৃষক ও কৃষক-বধূরা মেতে ওঠে নাচে-গানে। ফাগুনের ফাগ, বা হোলী হ'ল এই আনন্দের প্রাণ, বসন্তের রাগে রঙীন হয়ে উঠে দেহ-মন, আর তারি প্রকাশ পায় হোলীর রং-খেলাতে।

উত্তর-ভারতের ব্রজভূমিতে এই হোলীকা উৎসবে নর-নারীর প্রাণে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। ঋতুরাজ বসন্ত এসে দোলা দিয়ে যায় সবার প্রাণে। শীতের জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করে প্রকৃতি বসন্তের নব ফুলসাজে সজ্জিত হয়ে ওঠে, গাছের শাখে শাখে কোকিল গেয়ে ওঠে কুহু কুহু, বিরহী-বিরহিণীর প্রাণ হয়ে ওঠে ব্যাকুল, প্রিয়ের সঙ্গে মিলনের আশায় প্রাণে জেগে ওঠে নৃত্যের ছন্দ, আনন্দ-বিহ্বল নর-নারীর সুরু হয়ে যায় রং-খেলা, হৃদয়ও রঙীন হয়ে ওঠে কল্পনার জালে।

কল্পনায় রাধা-কৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি সজীব হয়ে ওঠে, ব্রজের কুঞ্জে কুঞ্জে গলিতে গলিতে গোপবালাদের নূপুরের নিক্কণ ওঠে। অপূর্ব্ব বসন-ভূষণে সুসজ্জিতা সুন্দরী রাধিকা তার সুরসিকা সখীদের নিয়ে চলেছেন রং খেলতে শ্রীহরির সঙ্গে। সখীদের পরণে লাল রং-এর ঘাঘরা, বাসন্তী রং-এর ওড়না কুঙ্কুম ও বিন্দি-শোভিত মুখচন্দ্রমাকে মেঘের মত ঢেকে রেখেছে। মেন্দীরঙানো চম্পককলি অঙ্গুলীতে ধরে রেখেছে রং-ভরা পিচকারী—সে অতুল শোভা দেখে পথিকের বিভ্রম লাগে।

ফাল্গুন-অষ্টমীতে নন্দগ্রামের পুরুষরা বরসানা গ্রামে হোলী খেলতে যায়। নন্দগ্রাম হ'ল শ্রীকৃষ্ণের বাসভূমি, আর বরসানা হ'ল শ্রীরাধিকার। এই হোলী-উৎসবে নন্দগ্রামের যুবকরা রং-আবীর-পিচকারী নিয়ে দল বেঁধে বরসানা গ্রামে গিয়ে নারীদের রঙে গুলালে হাসি-ঠাট্টায় ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। বরসানার নারীরাও কিছু কম যায় না, তারাও হাতে লাঠি নিয়ে তৈরী থাকে, আর যুবকদের হাস্যক্রীড়াচ্ছলে লাঠি নিয়ে তাড়া করে, পিঠেও দু'চার ঘা লাগায়। তারপর যখন বরসানার যুবকরা নন্দগ্রামে যায় রং খেলতে, তখন সেখানকার নারীরা তার শোধ তোলে বেশ ভাল করে। এ ভাবে গ্রাম দুটি নৃত্য-গীতে হাস্যে-লাস্যে রংয়ে গুলালে সজীব হয়ে উঠে।

পরণে পীতাম্বর, এক হাতে মুরলী, অন্য হাতে আবীর-গুলাল ও রং-ভরা পিচকারী নিয়ে শ্যাম তৈরী হয়ে আছেন, রাধার সঙ্গে খেলবেন হোলী। সখীরা উৎফুল্ল হৃদয়ে রাধা আর শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করছে সাদরে রং খেলতে—

প্রথম হি লাল জুহার কিয়ো
মৃদুমুরলী ঝাঁঝ বজায়,
ইততে কুটিল কটাক্ষন্ম পিয়তন
চিতয়ো মৃদু মুস্কায়।
অরী চল নওল কিশোরী
গোরী মোরী হোরী খেলন আয়।

হে লাল, তুমি প্রথমে রং খেলতে সুরু কর। তোমার বাঁশরীতে মধুর সুর তুলে, করতাল বাজিয়ে নয়নে কুটিল কটাক্ষ হেনে মৃদু হেসে তুমি রং খেল, ওগো কিশোরী রাধা চল, কিশোরী কুমারীরা এস হোলী খেলতে।

উড়ত গুলাল, লাল ভয়ে বাদর
অবীর কি ধুন্দ মচী—

ধীরে ধীরে রং-খেলা সুরু হ'ল, বাসন্তী রং-ভরা পিচকারী চারদিকে ফোয়ারা ছুটাল,—দিকে দিকে আবীর উড়তে লাগল, আকাশ লাল হয়ে উঠল, আবীর আর গুলাল নিয়ে চারদিকে মাতামাতি সুরু হয়ে গেল।

রাধবর খেলত হোরী
নন্দগাঁওকে গোয়াল সখা হ্যায়, বরসানে কি গোরী
খেলত ফাগ পরস্পর হিলমিল
সুখরং মেঁ রস ভোরী।

রাধা হোলী খেলছেন। নন্দগ্রামের গোয়াল সখা, আর বরসানের কিশোরী প্রীতিরসে স্নিগ্ধ হয়ে পরস্পরে মিলে রং খেলছে, তাদের হৃদয় আনন্দ রসে ভরে উঠেছে।

বহুদিনন কে রুঠে শ্যাম
চলো হোলী মে মনাই লয়ো।

বহুদিন পর বিরহের অবসান হয়েছে, মিলনের দিন আগত, চলো আমরা অভিমানী শ্যামের অভিমান দূর করে খুশী করে দি হোলী খেলে।

নিত নিত হোরী ব্রজমে রহো
বিহরত হরিসঙ্গ ব্রজ যুবতীগণ
সদা আনন্দ লহো।
প্রফুল্লিত ফলিত রহো বির্দাওন
মধুপ কৃষ্ণগুণ কহো
হরীচন্দ্র নিত সরস সুধাময়
প্রেম প্রবাহ বহো।

হোলীর মধুর আনন্দে বিহ্বল হয়ে কবি গেয়ে উঠেছেন, আহা সর্ব্বদাই যেন ব্রজে এমনি হোলীর উৎসব হয়। শ্রীহরিসঙ্গে ব্রজবালারা আনন্দে মগ্ন হয়ে বিহার করছে। এ রকম আনন্দ চিরদিন থাক্। বৃন্দাবন ফুল্ল কুসুমে সুশোভিত থাক্, আর মধুকর ফুলে ফুলে উড়ে কৃষ্ণগুণগান করুক্। শ্রীহরি চিরসরস, সুধাময়, চারদিকে প্রেমের বন্যা বয়ে চলুক।

অতি রুচিকারী প্যারী হোই রহী হোরিয়া
গিরধর দাস ঘুম ঘুমন গুলেলিন সী
গোয়ালিন কি গোরী, ব্রজবাল বর জোরিয়া
ঝোরিন প্যায় ঝোরী, ঝকঝোরী কঝোরিন প্যায়
বোরী প্যায় বোরী ঔ কমোরী প্যায় কমোরিয়া।

হোলী খেলা কি সুন্দর ও মধুর ভাবে হচ্ছে, আবীর ও লাল যেমন চারদিকে ঘুরছে, গিরিধর দাসও সে ভাবে চারদিকে ঘুরছে। গোপকুমারীরাও সবল ব্রজবালকরা হোলী খেলছে, গোপকুমারীদের কোমরে কোমরবন্ধ, আর হাতে থলের পর থলে ভর্ত্তি আবীর ও গুলাল, তারা এ ওর গায়ে থলে ঝেড়ে ঝেড়ে আবীর ফেলছে।

রং ন ডার জসমুত কে লাল
ভীজ গই মোরি চুনর সাড়ী।

হে যশোমতী-নন্দন আর আমাকে রং দিও না, আমার সব ওড়না ভিজে গেছে।

হোলীর পনের-বিশ দিন পূর্ব্ব থেকেই নারীদের নৃত্য-গীতে মালব মুখরিত হয়ে উঠে, অধিকাংশ গীতই বিরহ-প্রেম নিয়ে রচিত।

মালবে বাসন্তী রংয়ের বড় আদর, নারীরা পরিশ্রম করে বাসন্তী রং তৈরী করে আর পিচকারী ভরে ভরে রং খেলতে সুরু করে।

সাজন সঙ্গ খেলুগী হোরী
কায়ন কো তো রং বনো হ্যয়,
তো কায়ন কো পিচকারী,
কাচী কলিন কো রং বন্যো হ্যায়
তো কঞ্চন কী পিচকারী,
ভরে পিচকারী ম্যারে মুখ প্যো ডারী
তো ভীগ গই গুলসাড়ী।

আজ প্রিয়র সঙ্গে হোলী খেলব। তোমার রং কি দিয়ে তৈরী? তোমার কিসের পিচকারী?

বাসন্তী রং আমার, আর সোনার পিচকারী। প্রিয় রং ভরে পিচকারী দিয়ে আমার মুখে রং ছড়িয়ে দিল, আর আমার রঙীন শাড়ী ভিজে গেল।

ননদবাই বরজো মতী
বনশীওয়ালাসে খেলুঙ্গী ফাগ।
ওহী বনশীওয়ালো, ওহি মুরলীওয়ালো
তো ওহী মারো জীব কো আধার।

ওগো ননদ ঠাকরুণ, তুমি আমাকে মানা করো না, আজ বাঁশরীওয়ালার সঙ্গে ফাগ খেলব। সেই বাঁশীওয়ালা, সেই মুরলীওয়ালা, যে আমার অন্তরের অন্তরতম।

ফাগুন মাসি বসন্ত ঋত আওয় জহে ন সুপেশি
চাচরিকই মিস খেলতী, হোলী ঝাপাওয়ে সি।

ফাগুন মাস, বসন্ত ঋতু এসেছে তার অপূর্ব্ব রূপ-সম্ভার নিয়ে, বিরহিণীর প্রিয়তম আজও এল না, তাই বিরহিণী চাচরি নাচতে নাচতে অধীর হয়ে বলছে হোলীর আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

বিহারে হোলীকা জালাবার সময় গায়—

লঙ্কা ক্যাইসে জলে? লঙ্কা ক্যাইস: জলে?
পুছহু অঞ্জনিকুমারসে
লঙ্কা ফুর্ক দিহলে হনুমান
থনাও রাম কে বাজী
জরী অরু লঙ্কা জারায় দিয়ো হ্যায়
সো কোই রোক সকৈ না।
বড়ে বড়ে বীর লঙ্কা মে বাঠে
পাবক প্রবল বুঝৈ না
যুক্তি কছু এক লহৈ না
রঘুবর জী সে বৈর করো না।

লঙ্কা কি করে জ্বলল? লঙ্কা কি করে জ্বলল? অঞ্জনিকুমার হনুমানকে জিজ্ঞাসা কর। রামের নাম নিয়ে হনুমান লঙ্কা উড়িয়ে দিল, লঙ্কাকে জ্বালিয়ে দিল তা কেউ বন্ধ করতে পারল না। বড় বড় বীর লঙ্কাতে আছে, কিন্তু তারা প্রবল অগ্নির ক্ষমতা বুঝল না, কোন যুক্তিও নিল না, তাই বলি রঘুবীরের সঙ্গে শত্রুতা কর না।

বিহারে সারাদিন দল বেঁধে খুব রং খেলা হয় ও সন্ধ্যাবেলা সবাই স্নান করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে নেয়, তারপর আবার যে যার বন্ধু-বান্ধবের বাড়ী সদলবলে উপস্থিত হয়। সবাই তাদের খুব আদর-যত্ন করে সম্বর্দ্ধনা করে, খাওয়া-দাওয়া নাচ-গান হয়। বন্ধুদের বিদায় দেবার সময় তারা গায়—

সদা আনন্দ রহে এহী দ্বারে
মোহন খেলে ফাগ রে।
এক ঔর খেলে কুঁওর কন্হাইয়া
এক ঔর রাধা প্যারী রে।
ইততে নিকলী নওল রাধিকা
ওততে কুঁওর কন্হাই,
খেলত ফাগ পরস্পর হিলমিল
শোভা বরণি ন জাই।

সবার দ্বারে দ্বারে যেন এই আনন্দ থাকে, মোহন ফাগ খেলছে। একদিকে কুমার কানাইয়া, আর একদিকে পিয়ারী রাধা রং খেলছে। এদিক দিয়ে সুকুমারী রাধিকা, আর ওদিক দিয়ে কুমার কানাই এসে দুজনে মিলেমিশে ফাগ খেলতে লাগল, আহা এর শোভা বর্ণনা করা যায় না!

মধ্যপ্রদেশের বুন্দেলখণ্ডের প্রাকৃতিক শোভা অপূর্ব্ব, চারদিকে শ্যামল বনানী, শাখে শাখে রং-বেরংয়ের পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়ে সুগন্ধ বিতরণ করছে, নানাবিধ বন্য পাখীর কূজনে পথ-ঘাট-মাঠ মুখরিত, সেখানে বসন্তে প্রকৃতিরাণীর সঙ্গে সঙ্গে পল্লীবধূরাও দেহ-মনে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে।

রং-বেরংয়ের ঘাঘরা-পরা বধূরা বাসন্তী রংয়ের চুনরীতে মুখ ঢেকে অঙ্গনে গোলাকার হয়ে বসে যায়। ঢোলক বাজাতে বাজাতে তারা সুললিত রাগিণীতে হোলীগীতের মধুর তান তোলে, গ্রামে সুরের বন্যা বয়ে যায়।

সুরসিকা বধূ গাইছে:

ফুল চম্পা মেঁ বেলা কলী
ভওঁরা হোই কে আওয়া হো।
ভওঁরা হোই আওয়া মোরী গলী
ভওঁরা হোই কে হো।

হে প্রিয়তম, তুমি চম্পা আর বেলী ফুলের কলিতে ভ্রমর হয়ে এস। আমার গলিতে তুমি ভ্রমর হয়ে এস, ওগো তুমি ভ্রমর হয়ে এস।

আসমন লাগৈ কি কুন্দী দহার
পিয় লৈ জা গৌনয়া,
পিয় লৈ জা গৌনয়া কি অগহন মঁ।
অসমন লাগৈ কি কুন্দী দহার।

ওগো প্রিয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আমার কাছে ভাল লাগে না, আমাকে তোমার কাছে নিয়ে যাও। ওগো প্রিয়, অগ্রহায়ণ মাসে আমাকে তোমার কাছে নিয়ে যাও, আমার কাছে এসব প্রাকৃতিক শোভা অসহ্য লাগে।

বোল মোরওয়া ঘহরায় রে ঘটা
মোহী নীকা না লাগৈ নৈহরওয়া
কোনে মাস কোহলিয়া বোলে?
অরে কোয়েল বোল বোল,
ও কোন মাস বোলে রে?
কোন মাস বোলৈ মোরওয়া
মোহী নীকা না লাগৈ নৈহরওয়া।

চারদিকে গগনে ঘনঘটা, ময়ূর একবার তোমার কেকারব তোল, আমার আর (নৈহর) পিতৃঘর ভাল লাগছে না।

কোন্ মাসে কোকিল ডাকে? ও কোকিল তোর মধুরস্বরে একবার ডাক।

ওগো কোন মাসে কোকিল ডাকে? কোন মাসে ময়ূর ডাকে? আমার ত আর নাইহর ভাল লাগে না।

ধরতী কা মেরানা বনাওয়া ছয়ল
বদরে কা ওহার,
অরে চন্দা কৈ বিন্দী মংগায়া
গওনে হম জায়।

বিরহিণী পতিকে লিপি লিখে পাঠিয়েছে—

ওগো প্রিয় পৃথিবীকে পাল্কী বানিয়ে নাও, আর রং-বেরংয়ের মেঘ দিয়ে তার ঢাকনা দাও, চন্দ্রমাকে সৌভাগ্যের চিহ্নস্বরূপ মাথার

বিন্দি কর। এভাবে চারদিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে সৌন্দর্য্যময়ী করে তোল, আমি তোমার কাছে চলে যাব।

ঘুমড়ে আরে কালে বাদল
জওয়ানী ফির না রহৈ।
কাসে কহী দুঃখ অপনা
পিয়া আয়ে না হো
পিয়া ন আয়ে মোর
কাসে কহী দুঃখ অপনা
হায় কাসে কহী দুঃখ অপনা
পিয়া আয়ে না মোর।

চারদিকে কাল বাদল ঘিরে এসেছে, যৌবন আর চিরকাল থাকবে না। কাকে নিজের দুঃখের কথা বলি, আমার প্রিয় ত এল না। কাকে আমার দুঃখের কথা বলি, আমার প্রিয় ত এল না, হায় আমার প্রিয়তম ত এল না!

দুঃখ রোয় রোয় গোরী বতাঁই হওয়াল
পরদেশৈ নিকরিগে বালম
পরদেশৈ নিকরিগে বালম হমার
পরদেশৈ নিকরিগে বালম।

কাঁদতে কাঁদতে বিরহিণী তরুণী তার দুঃখের বর্ণনা দিচ্ছে—পরদেশে স্বামী চলে গেছে, হায়রে পরদেশে আমার স্বামী চলে গেছে।

বাজী জমুন কে তীরে হো বঁসিয়া বাজী
জমুন কে তীরে লাল
এ জিয়া ধরৈ না ধীর
বঁসিয়া বাজী জমুন কে তীরে লাল।

যমুনার তীরে বাঁশী বাজছে, যমুনার তীরে 'লাল' বাঁশী বাজাচ্ছে, এ হৃদয় ত আর ধৈর্য্য ধরতে পারছে না, যমুনাতীরে 'লাল' বাঁশী বাজাচ্ছে।

এ সমস্ত পল্লীগীতিতে শব্দের সমারোহ বা ঝঙ্কার নেই, নিতান্ত সহজ সরল গ্রাম্যভাষায় বধূরা মনের কথা ব্যক্ত করেছে কিন্তু যখন প্রতি সন্ধ্যায় পল্লীবালারা একত্রিত হয়ে তাদের মধুর স্বরে এ সমস্ত গীত গাইতে থাকে তখন শ্রোতারা আত্মহারা হয়ে যায়। গ্রাম্য ললনারা স্বাভাবিক মধুর উচ্চকণ্ঠে যখন সুরের ঝঙ্কার তোলে তখন এ সমস্ত নিতান্ত সাধারণ কথাই অপূর্ব্ব হয়ে ওঠে শ্রোতার মনে, বিরহিণীর করুণ-মধুর সুর হৃদয়ে ঝঙ্কার তোলে, "ওগো আমার প্রিয় পরদেশে চলে গেছে, সে ত আর ফিরে এল না।"

এ সব পল্লীগীতিতে আর একটা জিনিস লক্ষ্য করবার মত। পল্লীবধূরা শুধু রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-বিরহ অবলম্বন করে হোলীর গীত রচনা করে নি। তাদের সীতামাঈ আর রাম লছমন, যাঁরা নিয়ত তাদের হৃদয় আলো করে আছেন, তাঁদের নিয়েও পল্লীবধূরা শ্রদ্ধা-ভক্তি দিয়ে সুন্দর সুন্দর গান রচনা করেছে, আর সাধারণ হোলী-গীতগুলির ভিতর দিয়ে তারা কৌশল্যানন্দন আর জনক-তনয়ার মানবীয় ভাব সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছে।

বুন্দেলখণ্ডের পল্লীবধূরা ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে গায়—

ওরী এ অওধ মা খলৈ
হাঁ, হাঁ রে অওধ মা খলৈ
ধরী এ অওধ মা
সঙ্গ লীন্হে জানকী মাই
অওধ মা।
কেকরে হাথে ঢোলকিয়া শোহে
কেকরে হাথে শহনাই?
রামাকে হাথে ঢোলকিয়া শোহে
লছিমন হাথ শহনাই।
ভরতকে হাথ মুরলিয়া সোহৈ
শত্রুঘ্ন বীণ বজাই।
অওধ মা খলৈ সঙ্গ লীন্হে জানকী মাই।
অরী এ অওধ মা খেলৈ সঙ্গ লীন্হে জানকী মাই
অওধ মা খলৈ।

চল আমরা অযোধ্যায় হোলী খেলতে চাই, আমাদের সঙ্গে নেব জানকী মাকে। কার হাতে ঢোলক শোভা পায়, কার হাতে শানাই?

রামের হাতে ঢোলক, লক্ষ্মণের হাতে শানাই শোভা পায় ভরতের হাতে মুরলী শোভা পায়, শত্রুঘ্ন বীণা বাজায়। অযোধ্যায় রঙ খেলব সঙ্গে নেব জানকী মাকে।

মালব-ললনা গাইছে—

—জনকপুর সীতা খেলে হোলী
এক বন খেলে রাম লছমন
দুজে বন সীতা অকেলী
ভান্ত ভান্ত কা রং বনায়া
কঞ্চন কী পিচকারী।
হোরী খেলকে গোরী নিকল্যা
মেরে রামা, শাসননদ কী ইয়া জোড়ী
পিও পরদেশ নে দেবর মথারি ছোটী
মেরে রামা কিন সঙ্গ খেলু হোরী।

জনকপুরে সীতা হোলী খেলেন। একদিকে রাম-লক্ষ্মণ, আর একদিকে সীতা একেলা। কত রকমের রং তৈরি করে রাখা হয়েছে, আর সোনার পিচকারী।

হোলী খেলতে তরুণী বের হয়েছে, আরে রামা, শাশুড়ী-ননদের কেমন জোড়া দেখো। প্রিয়তম আমার পরদেশে, দেবরও ছোট, হায় রামা, আমি কার সঙ্গে হোলী খেলব?

আজ প্রভু খেল রহে হ্যায় হোরী
সঙ্গ লখন, রিপুসুদন সোহৈ
ভরত লিএ পিচকারী।

উড়ত গুলাল চহু দিসিতম মে
ঝ প গয়ো ব্যোম তমারি
সঙ্গ সখা সুগ্রীব বিরাজৈ
জামবন্ত অতিভারী
বৈঠে মৌন নিহারত প্রভুছবি
হনুমান গিরিধারী।

আজ প্রভু হোলী খেলছেন, সঙ্গে শত্রুদমনকারী লক্ষ্মণ আছেন। ভরত পিচকারী নিলেন, চারদিকে গুলাল উড়ল, আকাশ-বাতাস আবীর-গুলালে ঢেকে গেল। সঙ্গে সখা সুগ্রীব আর বীর জামবন্ত শোভা পাচ্ছেন, নীরবে বসে হনুমান শ্রদ্ধার সঙ্গে তার প্রভুর ছবি নিরীক্ষণ করছে।

অখিল ভারত প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলন

উনবিংশ অধিবেশন, দিল্লী

অধ্যাপক শ্রীঅনন্তলাল ঠাকুর

অখিল ভারত প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনের উনবিংশ অধিবেশন বিগত ২৭শে ডিসেম্বর হইতে ২৯শে ডিসেম্বর পর্যন্ত দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত এবং অন্যান্য দেশের প্রাচ্যবিদ্যানুরাগী পণ্ডিতগণ সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। ভারত-রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহার সুচিন্তিত উদ্বোধনী বক্তৃতায় প্রাচ্যবিদ্যাসেবকদিগের দৃষ্টিতে পরিবর্তন আনয়নের প্রয়োজন বর্ণনা করেন। রাষ্ট্রপতির মতে অতীত গৌরবের বিচারবহুল এবং পাণ্ডিত্যসূচক বিবরণ অপেক্ষা বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সর্বজনীন মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া লিখিত ইতিহাস অধিক উপযোগী হইবে। প্রাচীন ভারতে এই পন্থাই অনুসৃত হইত। এই জন্যই ভারতে ক্রমবদ্ধ ইতিহাসের অভাবজনিত আক্ষেপ শুনা যায়। ভারতীয় সাহিত্য ও পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলিতে নিবদ্ধ যে অক্ষয় সম্পদ আজও জনসাধারণের দৃষ্টির অগোচরে রহিয়াছে, তাহার সন্ধান দিয়া জাতিগঠনের পবিত্র কর্তব্যে উদ্বুদ্ধ হইতে রাষ্ট্রপতি উপস্থিত প্রাচ্য-বিদ্যা-প্রেমিকদিগকে অনুরোধ করেন।

সম্মেলনের মূল সভাপতি ডক্টর শ্রীঅনন্ত সদাশিব আলতেকর ভারতীয় বিদ্যার উপযোগিতা বর্ণনা করিতে গিয়া জাতীয় জীবনে ইহার নিরবচ্ছিন্ন প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন যে, ভারতের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণও প্রাচীন ভারতের সর্বজনমঙ্গলের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছে। ভারতীয় সভ্যতা ভারতের ভৌগোলিক সীমার বাহিরে বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। বিভিন্ন দেশের জন-জীবনে এবং সাহিত্যে তাহার সুস্পষ্ট চিহ্ন বর্তমান। ঐতিহাসিক ডক্টর আলতেকর প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বিষয়টি বিবৃত করেন এবং নূতন ভারতের পক্ষে বিশ্বের সঙ্গে প্রাচীন সম্বন্ধের পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করেন।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতীয় এবং অ-ভারতীয় গবেষকদের অবদানের কথা উল্লেখ করিয়া সভাপতি প্রাচ্যবিদ্যাসেবিদিগকে কর্তব্য সম্পাদনে কঠোর পরিশ্রম এবং ঐক্যবদ্ধ চেষ্টা করিতে অনুরোধ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ভারতীয় দর্শন এবং ধর্মশাস্ত্রচর্চার দ্রুতক্ষীয়মান অবস্থার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সময়োপযোগী কার্য্য করিয়াছেন। প্রাচীন পণ্ডিত সম্প্রদায় বিভিন্ন শাস্ত্রের ধারক ও বাহক ছিলেন। তাঁহারা ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যাইতেছেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহে সংস্কৃতের নামে প্রধানতঃ কাব্য, নাটক এবং অলঙ্কারেরই চর্চা হয়। এ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ এখনই বিশেষ অবহিত না হইলে ভারতীয় বিদ্যার অপূরণীয় ক্ষতি হইবে। এই প্রসঙ্গে বেদ ও অবেস্তার, সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃতের তুলনামূলক অধ্যয়ন এবং ফরাসী, রুশ, জর্মন ও জাপানী ভাষার অধ্যয়নের দিকেও তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ভারত ও ভারত বহির্ভূত দেশসমূহে ভারত-সম্পর্কিত যে অমূল্য মুদ্রা, চিত্র, দলিল, পুথি প্রভৃতি লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহার বিবরণ-সংগ্রহ এবং রক্ষার জন্য ডক্টর আলতেকর জাতীয় সরকারকে অনুরোধ করেন। পরিশেষে তিনি ভারতবিদ্যা অনুশীলন সংস্থা স্থাপনের সরকারী প্রস্তাবকে অভিনন্দিত করিয়া উহার মারফত আফগানিস্থান, পারস্য, আসিরিয়া, চীন, তিব্বত, সিংহল প্রভৃতি দেশের ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাস অধ্যয়নের দ্বারা ভারতবিদ্যার প্রকৃষ্ট পোষণের সম্ভাবনা বিবৃত করেন।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডক্টর রাও তাঁহার স্বাগত ভাষণে দিল্লীতে ভারতবিদ্যার মুখ্য গবেষণাগার, গ্রন্থাগার এবং পুরাতত্ত্বশালা নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন।

এই অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি ডক্টর বেলভেলকর মহাশয়কে তাঁহার শিষ্য ও মিত্রবর্গের পক্ষ হইতে এক অভিনন্দন-গ্রন্থ উপহার দেন। ডক্টর পি. ভি. কাণে মহাশয়ের ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাসের পঞ্চম খণ্ডের প্রথম ভাগ প্রকাশের সংবাদ ঘোষিত হয় এবং ইহার একখণ্ড রাষ্ট্র-পতিকে উপহার দেওয়া হয়।

এবারের অধিবেশনে উপস্থিত সদস্যের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী মনে হইল। সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ ইহাতে কিছুটা বিচলিত। সদস্যদের চাঁদার হার বৃদ্ধি করিয়া তাঁহারা ক্রমবর্দ্ধমান সদস্যসংখ্যা সংযত করিতে চাহিয়াছেন।

আগামী অধিবেশন হইতে সম্মেলনে 'বৃহত্তর ভারত' শীর্ষক একটি নূতন শাখা যোজনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু সম্মেলনের আকার, কার্য্যবৈচিত্র্য এবং অনেকগুলি শাখার পরস্পর সম্বন্ধের কথা বিবেচনা করিলে অনেক স্থলে শাখাগুলির পুনর্ব্বণ্টনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই প্রসঙ্গে ধর্ম্ম ও দর্শন শাখায় হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন এই তিন বিভাগের সমাবেশের কথা চিন্তনীয়। ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব একশাখাভুক্ত হইতে পারে। আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে প্রত্যেক অধিবেশনে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য অনুসারে এক বা একাধিক শাখা যুক্ত হইয়া থাকে। ইহার পরিবর্ত্তে একটি স্থায়ী আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য শাখা গঠন যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। হস্তলিখিত পুঁথি সম্পর্কে সম্মেলনে বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শিত হইলেও এ সম্পর্কে কোন নূতন শাখা এখনও সৃষ্ট হয় নাই।

শাখা সভাপতিদের ভাষণ সম্পর্কে প্রাচীন অভিযোগ এখনও দূর হয় নাই। সকলের পক্ষে প্রত্যেক শাখায় যোগদান সম্ভবপর নহে। অথচ অনেক সদস্যই একাধিক বিভাগ সম্পর্কে ঔৎসুক্য রাখেন। দীর্ঘকাল পরে অভিভাষণগুলি কার্য্য-বিবরণীতে ছাপা হইয়া থাকে। সভাপতিবৃন্দ এবং কর্তৃপক্ষ একটু তৎপর হইলে অভিভাষণগুলি প্রবন্ধ-সারাংশের সঙ্গে পূর্ব্বাহ্নেই সদস্যদের হস্তগত হইতে পারে। ইহাতে অভিভাষণগুলি দুইবার ছাপিতে হয় না। এ বিষয়ে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের আদর্শ অনুসরণীয়। শাখা-সভাপতিদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ সময়োপযোগী মন্তব্যসমূহ সদস্যদের কাছে সময়মত না পৌঁছান অনভিপ্রেত।

বিভিন্ন বিভাগে প্রায় দুই শত প্রবন্ধ পঠিত অথবা পঠিতব্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। প্রবন্ধ পাঠ এবং আলোচনা সম্পর্কে এবার পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল ব্যবস্থা দেখা গিয়াছে। অনেকস্থলে নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রবন্ধ না পাঠানর জন্য তাহার সারাংশ ছাপার সুযোগ হয় নাই। ফলে প্রবন্ধ সম্পর্কে আলোচনা ব্যাহত হইয়াছে। প্রবন্ধ-প্রকাশ সম্পর্কে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় দীর্ঘকাল পরে কয়েকটি বিশিষ্ট প্রবন্ধ কার্য্য-বিবরণীতে ছাপা হয়। ইতিমধ্যে অনেকে প্রবন্ধ অন্যত্র প্রকাশ করেন। যাঁহাদের প্রবন্ধ কার্য্য-বিবরণী-ভুক্ত হয় তাঁহারাও কোন রিপ্রিণ্ট পান না। এই অবস্থায় কার্য্য-বিবরণীতে প্রবন্ধ-প্রকাশ সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া উপযুক্ত উল্লেখসহ অন্যত্র উহা প্রকাশের ব্যবস্থা করা সুবিধাজনক। অবশ্য অন্যত্র প্রবন্ধ ছাপা হইলে সম্মেলন-কর্তৃপক্ষের কাছে রিপ্রিণ্ট প্রেরণের নিয়ম বিধিবদ্ধ করা যাইতে পারে।

এবার অধিবেশনে কয়েকটি ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। ভিন্নরুচি সদস্যবৃন্দের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিভিন্ন ব্যবস্থায় কার্পণ্য না করিলেও অভ্যর্থনা সমিতি ভূতপূর্ব্ব অধিবেশন-স্থানের মত এখানকার সংস্কৃতি এবং ইতিহাসগত বৈশিষ্ট্যদ্যোতক কোন গ্রন্থ প্রকাশ করেন নাই। অথচ দিল্লী সম্পর্কে সদস্যদের ঔৎসুক্য অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অধিক হওয়া স্বাভাবিক। প্রাচীন পণ্ডিতদের দ্বারা অনুষ্ঠিত স্বতন্ত্র পণ্ডিত পরিষৎ পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক অধিবেশনেরই শোভাবর্দ্ধন করিয়াছে। দিল্লীতে তাহাও দেখা গেল না। বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের আলোচনা-চক্র পূর্ব্বের অধিবেশনগুলিতে অনুষ্ঠিত হইত। এবার সেরূপ কোন ব্যবস্থাও ছিল না। এ সম্পর্কে অভ্যর্থনা সমিতির কিরূপ সুবিধা বা অসুবিধা ছিল, তাহা আমাদের জানা নাই। তবে তিন দিনের মধ্যে সমস্ত অপেক্ষিত বিষয় সমাবেশ করা সহজসাধ্য ছিল না।

অভ্যাগতদের আনন্দবিধানের জন্য নানা ব্যবস্থা ছিল। ইন্দ্রপ্রস্থ কলেজের ছাত্রীরা ভাসকৃত স্বপ্নবাসবদত্তম্ অভিনয় করিলেন। দর্শনীয় স্থানগুলি প্রদর্শন, সঙ্গীত, নৃত্য, জলযোগ এবং ভোজনের প্রচুর ব্যবস্থা অভ্যর্থনা সমিতি, বিশিষ্ট নাগরিক-বৃন্দ এবং সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলির পক্ষ হইতে করা হইয়াছিল। অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে ডক্টর আর্নেস্ট ওয়াল্‌ডস্মিড্‌ট মধ্য-এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ সম্পর্কে আলোকচিত্রযোগে বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন। আগামী ১৯৫৯ সনে মহামহোপাধ্যায় ডক্টর ভি. ভি. মিরাশী মহাশয়ের সভাপতিত্বে ভুবনেশ্বরে সম্মেলনের পরবর্ত্তী অধিবেশন হইবে। আশা করি, কর্তৃপক্ষ বড়দিনের পরিবর্ত্তে পূজাবকাশে অধিবেশন অনুষ্ঠানের বিষয় বিবেচনা করিবেন। বড়দিনের ছুটি এখন অনেকস্থলে সংক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে। ঐ সময় শীতের দৌরাত্ম্যও বিবেচনীয়।

প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। অতীতে অখিল ভারত প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনে বঙ্গদেশের পণ্ডিতবৃন্দ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু কিছুদিন যাবৎ এদিকে তাঁহাদের মনোযোগের অভাব দেখা যাইতেছে। নূতন কর্ম্মীবৃন্দের এদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

যে-কোন কারণেই হউক সম্মেলনের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে প্রদেশবিশেষের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আসিয়া গিয়াছে। প্রয়োজন হইলে বিধান সংশোধন করিয়াও সম্মেলনের সর্ব্বভারতীয় রূপ রক্ষা করা উচিত। এখনও দেশে এমন অনেক শাস্ত্রসেবী পণ্ডিত বর্ত্তমান রহিয়াছেন, যাঁহাদের অবদানের কথা স্মরণ করিয়া অনেকদিন পূর্ব্বেই সম্মেলনে তাঁহাদের উপযুক্ত স্থান দেওয়া সঙ্গত ছিল। এ সম্পর্কে আচার্য্য শ্রীযুক্ত বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ এবং ভারতের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুলকালাম আজাদ প্রমুখ অনেকেরই নাম মনে আসে। এদিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

LIFEBUOY
FOR SAVING LIFE
FOR PRESERVATION OF HEALTH
SOAP
MADE IN INDIA FROM PURE VEGETABLE OILS ONLY
HINDUSTAN LEVER LIMITED
LIFEBUOY SOAP
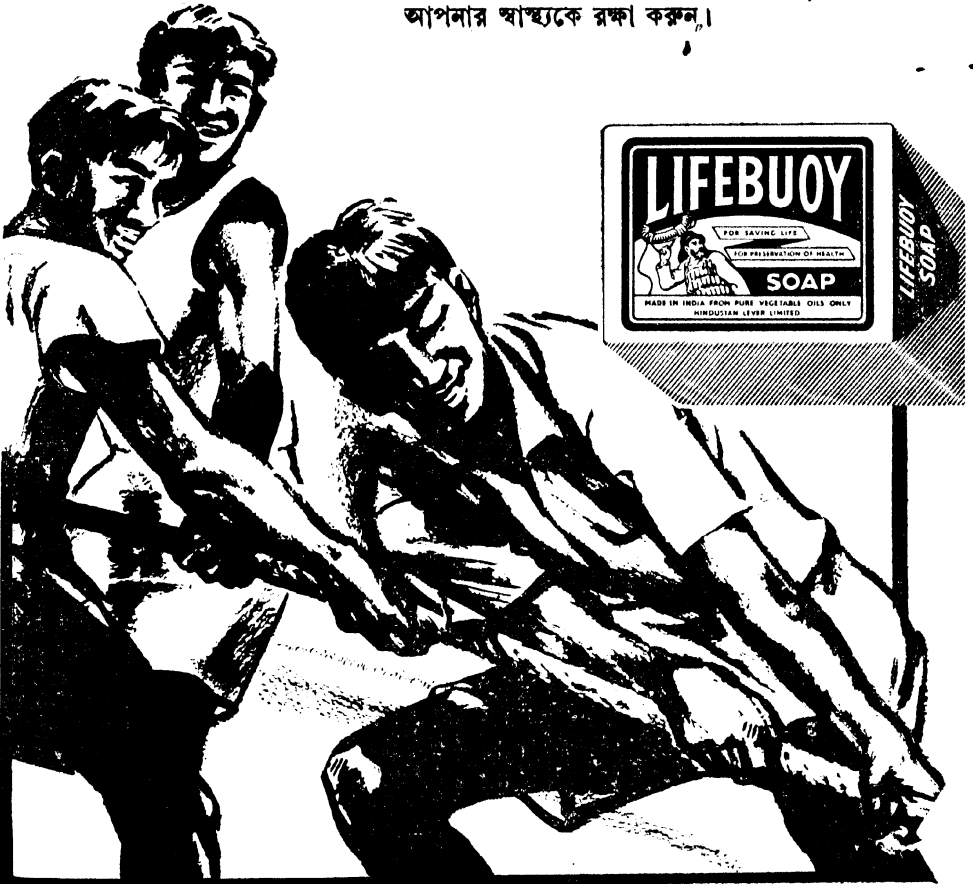
ভারত সরকার ও বৈদেশিক তহবিলের ঘাটতি

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত

ভারত সরকার নাকি বর্ত্তমানে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, সমস্তপ্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও বৈদেশিক তহবিলে ছয় শত কোটি টাকার মত ঘাটতি থেকে যাবে। অবশ্য দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা তৈরি করার সময় ঘাটতির পরিমাণ আরও বেশী ধরা হয়েছিল। অর্থাৎ পাঁচ বছরে বৈদেশিক তহবিলে মোট আট শত কোটি টাকা ঘাটতি পড়ার সম্ভাবনা আছে বলে সরকার মনে করেছিলেন। পরিকল্পনা রচিত হবার পর নানা সূত্র থেকে কিছু কিছু অর্থ সংগৃহীত হয়েছে, সন্দেহ নেই। তবে যেভাবে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং যন্ত্রপাতির দাম চড়ে গেছে তাতে বৈদেশিক তহবিলের থাকতি ঠেকান সম্ভবপর হয় নি। এই থাকতি ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হয়েছে। তাই বলে নূতন নূতন ক্ষেত্র থেকে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা বন্ধ হয়ে যায় নি। অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টা এখনও চলছে। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, বৈদেশিক তহবিলের ঘাটতির পরিমাণ ছয় শত কোটি টাকার কম হবার কোন আশা আছে কিনা। আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক যদি পঞ্চাশ কোটি টাকার মত ঋণ দেন এবং ব্রিটেনের কাছ থেকেও যদি কমপক্ষে এক শত ষাট কোটি টাকার মত কর্জ্জ পাওয়া যায় তা হলে ঘাটতি কিছুটা পূরণ করা যেতে পারে। আমাদের অনেকেরই হয় ত জানা আছে, অনুন্নত অঞ্চলে যাতে অর্থ নৈতিক উন্নতি সাধিত হতে পারে সেজন্য মাকিন কংগ্রেস তহবিল মঞ্জুর করেছেন। তহবিলটির মেয়াদ হ'ল তিন বছর। যেহেতু ভারত অনুন্নত দেশগুলোর অন্যতম, সেহেতু কোন কোন অর্থনীতিবিদ্ এই মর্ম্মে আশা প্রকাশ করেছেন যে, তহবিল থেকে ভারতের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হবে। এ ছাড়া যন্ত্রপাতি সরবরাহ সম্বন্ধে ভারত এবং সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, ভারতের দিক থেকে সে চুক্তির গুরুত্ব অনেকখানি। এই চুক্তি অনুযায়ী ভারত মূল্য বাকী রেখে সামান্য সুদে রাশিয়া থেকে প্রচুর পরিমাণে যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করতে পারবে।

কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে যোগদানের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু মাত্র অল্প কয়েকদিন আগে লণ্ডনে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি ভারতের বৈদেশিক তহবিলের ঘাটতি হ্রাস করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। প্রচারিত খবরে প্রকাশ, তাঁর চেষ্টা সম্পূর্ণভাবে সফল হয় নি। তিনি ব্রিটেনের কাছ থেকে কমপক্ষে ২৬৩ কোটি টাকা ঋণ সংগ্রহ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর আশা ছিল, এই ঋণ সংগ্রহ করতে অসুবিধা হবে না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, অত টাকা ঋণ পাবার সম্ভাবনা নেই। হয়ত শেষ পর্য্যন্ত এক শত ত্রিশ থেকে এক শত ষাট কোটি টাকা ঋণ পাওয়া যেতে পারে। কাজেই পণ্ডিত নেহরুর চেষ্টা সম্পূর্ণভাবে সফল হয়েছে, একথা বলা চলে না। তিনি আংশিক সাফল্য অর্জ্জন করেছেন।

আমাদের অনেকেরই হয় ত জানা আছে, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে তৃতীয় দফায় দেড় শত কোটি টাকার গম সংগ্রহ করার জন্য ভারত সরকারের তরফ থেকে আলোচনা চালান হচ্ছে। এই আলোচনা নাকি বেশ কিছুটা পাকাপাকি হয়ে এসেছে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে, ভারত কিভাবে গমের মূল্য পরিশোধ করবে, কারণ ভারতের অর্থনৈতিক সামর্থ্য আজ যে স্তরে এসে পৌঁছেছে

তাতে গমের মূল্য একেবারে চুকিয়ে দেওয়া ভারতের পক্ষে সম্ভবপর নয়। ভারত সরকার বলেছেন, চল্লিশ বছরে মূল্য পরিশোধ করা হবে এই সর্তে মার্কিন সরকার যদি গম সরবরাহ করতে রাজী হন কেবলমাত্র তা হলেই ভারত গম নেবেন। মনে হচ্ছে, মার্কিন সরকার রাজী হয়ে যাবেন, কারণ প্রচারিত খবরে প্রকাশ, মার্কিন সরকার ভারতের আর্থিক সামর্থ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত বিষয়টি বিবেচনা করে দেখছেন এবং এই সম্পর্কে ভারত-মার্কিনী আলোচনাও সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। যদি শেষ পর্য্যন্ত দেড় শত কোটি টাকার গম পাওয়া যায় তা হলে ভারতের উপকার হবে সন্দেহ নেই, কারণ একদিকে যে রকম ভারত চল্লিশ বৎসরে মূল্য পরিশোধ করতে পারবে সে রকম অন্যদিকে খাদ্যাভাবজনিত সমস্যার সমাধান করাও হয়ত কিছুটা সহজ হবে। কিন্তু চল্লিশ বৎসরে যে টাকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দিতে হবে সে টাকার উপর সুদ নেওয়া হবে না এই ধরণের কোন প্রতিশ্রুতি যুক্তরাষ্ট্র দেয় নি। কাজেই মূল্যবাবদ দেয় অর্থের উপর সুদ চাপান হবে বলে মনে হচ্ছে। অবশ্য সুদ বাবদ যে টাকাটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দেবার কথা সে টাকাটা যদি ভারত সরকার এমন সব পরিকল্পনায় লগ্নী করেন যেগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক অনুমোদিত, তা হলে মার্কিন সরকার হয়ত আপত্তি করবে না।

ভারত সরকার এবং শ্রীনেহরুর ব্যক্তিগত চেষ্টার ফলে ব্রিটেনের কাছ থেকে হয়ত একশত ষাট কোটি টাকা ঋণ পাওয়া যেতে পারে। একই খাতে এই ঋণ পাওয়া যাবে না। দুটো পৃথক খাতে ঋণ
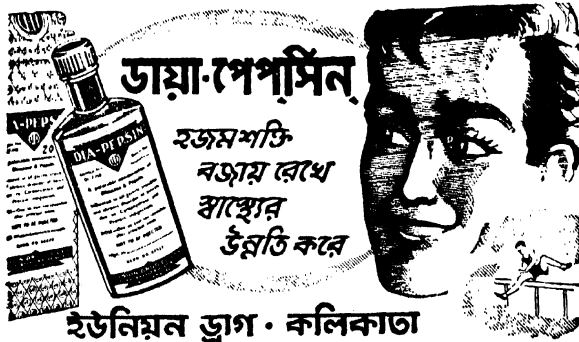
সংগ্রহের জন্য আলাপ-আলোচনা চলছে। তবে এর বেশীর ভাগই দেওয়া হবে নগদ ঋণ হিসাবে। ব্রিটেন এই ঋণের জন্য বার্ষিক ছয় শতাংশ সুদ দাবী করেছেন বলে জানা গেছে। যেটুকু বাকী রইল সেটুকু ভারতকে নগদ ঋণ হিসাবে দেওয়া হবে না। ভারত যাতে মূল্য বাকী রেখে ব্রিটেনে যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণকারীদের কাছ থেকে মাল ক্রয় করতে পারেন সে জন্য ভারতকে সুযোগ দেওয়া হবে। তবে সর্ত্ত হ'ল কমপক্ষে সাতটি বার্ষিক কিস্তিতে টাকাটা পরিশোধ করতে হবে। তা ছাড়া কমপক্ষে বার্ষিক ছয় শতাংশ সুদ দিতেও ভারত বাধ্য থাকবে। স্বভাবতঃই প্রশ্ন হতে পারে, ভারত ব্রিটেনের কাছে যে কর্জ্জ চাইছে, সে কর্জ্জের উপর কেন বার্ষিক ছয় শতাংশ সুদ দাবী করা হয়েছে। যেহেতু ব্রিটেনের বে-সরকারী ক্ষেত্র থেকে কর্জ্জ দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে সেহেতু বার্ষিক ছয় শতাংশের কম সুদের হার ধার্য্য করা হয়ত অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্ত্তমানে অধমর্ণদের কাছ থেকে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড পাঁচ শতাংশ সুদ আদায় করে থাকেন। কাজেই এর উপর যদি এক শতাংশ ব্যাজ না চাপান হয় তা হলে ব্রিটেনের বে-সরকারী লগ্নীকারীরা ঋণ সরবরাহ করতে চাইবেন না, কারণ তাঁদের আনুষঙ্গিক খরচের ভার বহন করতে হয়। ব্রিটেন নাকি দাবী করেছে, তার কাছ থেকে ঋণ পেতে হলে ভারতকে আরও একটা সর্ত্ত মেনে নিতে হবে। সে সর্ত্তটি হ'ল এই যে, ব্রিটেনে ভারতের যে তহবিল গচ্ছিত রয়েছে ভারত সে তহবিল আর সঙ্কুচিত করতে পারবেন না। হিসাব করে দেখা গেছে, বর্ত্তমানে তহবিলটির পরিমাণ হ'ল সাড়ে চার শত কোটি টাকার কিছুটা বেশী।

এখন বিবেচ্য বিষয় হ'ল, ভারত বার্ষিক ছয় শতাংশ সুদ দিতে পারবে কি না কিম্বা দিলে কি ধরণের প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। যদি ধরে নেওয়া হয়, ভারত অতটা চড়া হারে সুদ দিতে রাজী আছে, তা হলে এর প্রতিক্রিয়া ভাল হবে না। ভারত কেবলমাত্র ব্রিটেনের কাছ থেকে ঋণ সংগ্রহ করতে চেষ্টা করছে না। অন্যান্য সূত্র থেকেও ভারত ইতিমধ্যে ঋণ পেয়েছে। প্রয়োজনের তাগিদে ভারতকে আরও হয়ত ঋণ করতে হতে পারে। লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, ব্রিটেন ছাড়া অন্যান্য যে সব ক্ষেত্র থেকে ঋণ সংগৃহীত হয়েছে, সে সব ক্ষেত্রে সুদের হার বার্ষিক ছয় শতাংশের অনেক কম। কাজেই ব্রিটেনকে যদি চড়া হারে সুদ দেওয়া হয় তা হলে অন্যান্য লগ্নীকারীরাও চড়া হারে সুদ দাবী করবেন। ফলে বৈদেশিক কর্জ্জের উপর সুদ বাবদ বার্ষিক দায় ক্রমে ক্রমে বেড়ে যেতে থাকবে। এ ছাড়া ভারতের অভ্যন্তরে টাকার বাজারের উপরও চড়া সুদের প্রতিক্রিয়া উপেক্ষা করা চলে না। অর্থাৎ ভারত সরকারকে যদি লণ্ডনের বাজার থেকে চড়া হারে সুদ দিয়ে ঋণ সংগ্রহ করতে হয়, তা হলে ভারতের অভ্যন্তরে নূতন ঋণের উপর সুদের হার চড়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। শুধু তাই নয়। এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রাচীন কোম্পানীর কাগজ-গুলোর দামও কমে যাবে। ভারত সরকারের পক্ষে এই ধরণের পরিস্থিতি মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।
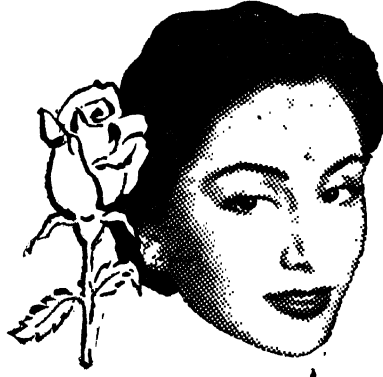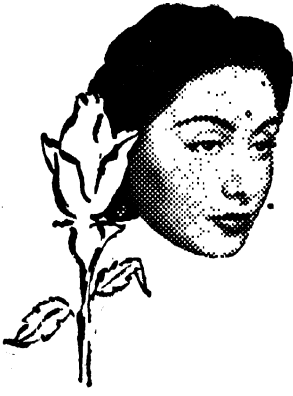
Rexona
BLENDED WITH CADYL

হাসির তুবড়ী—শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্র মজুমদার। দ্বারকানাথ সাহিত্য সংসদ, ২৮।৪এ বিডন রো, কলিকাতা—৬। দাম দেড় টাকা, সুলভ সংস্করণ এক টাকা।

শিশু-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এখনও যথেষ্টসংখ্যক ভাল লেখক ও কবি আগমন করেন নাই। নগেন্দ্রকুমার সাহিত্যের এই বিভাগটি বাছিয়া লইয়া ভালই করিয়াছেন। তরুণ হইলেও তাঁহার লেখায় মুন্সিয়ানা এবং ছন্দে নিপুণতা আছে। ছোটদের জন্য রচনা সহজ কাজ নয়। সেই কঠিন অথচ আনন্দের কাজে তাঁহার চেষ্টা নিয়োজিত। "হাসির তুবড়ী"তে কুড়িটি ছড়া ও কবিতা আছে। 'নিবেদনে' স্নেহের ভাইবোনদের উদ্দেশ্যে লেখক বলিতেছেন,—

হাসতে যে জন পারে সে যে দুখের মাঝেই হাসে,
সুখে যাহার নেইকো হাসি, যায় কে বা তার পাশে।

সেরা পালোয়ান ভজা ও কেনারামের কথা, কলির মহাদেবের কাহিনী, চিংড়ীঘাটার হিরণবাবু ও বেলেঘাটার রতনবাবুর 'স্থান-পরিবর্ত্তনের গল্প প্রভৃতি পড়িয়া শিশুদের মুখে হাসি ফুটিবে। বই-খানি সুচিত্রিত। "হাসির তুবড়ী"র কবিতা ও ছবি ছেলেমেয়েদের আনন্দদান করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

নদীয়ার মহাজীবন—শ্রীকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স, ৬১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য—১.৭৫ নয়া পয়সা।

এমন কতকগুলি জীবনী এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে— যেগুলি শুধু নদীয়া বা বাংলায় নয়, সারা ভারতবর্ষের গৌরব। পৃথিবীর ইতিহাসেও তুঙ্গ-দর্শন দু'একটি মহাজীবনের কথা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যুগাবতার শ্রীচৈতন্য, তদীয় প্রথমা পত্নী শ্রীলক্ষ্মীদেবী, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, মনোমোহন ও লালমোহন ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (ডি, এল, রায়) বাঘা যতীন প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা ছাড়াও রামায়ণকার বাংলার আদিকবি কৃত্তিবাসের জন্মকাল লইয়া আলোচনা করিয়াছেন লেখক···এই মহাজীবনগুলিকে গতানুগতিক ধারায় প্রকাশ না করিয়া নূতন আলোকপাত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইতিহাসের ধারাটিও অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা দেখা যায়। লেখকের উদ্যম প্রশংসনীয়।

এ ছাড়াও নদীয়ায় আরও অনেক সাধক, পণ্ডিত, বাগ্মী, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক, দানবীর প্রভৃতি আছেন। পরবর্ত্তী খণ্ডে লেখক তাঁহাদেরও জীবন কথা আমাদের জানাইবেন আশা করিতেছি।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

কেরালার গল্পগুচ্ছ—অনুবাদক শ্রীবি. বিশ্বনাথম। পপুলার লাইব্রেরী, ১৯৫।১বি, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৪৬; দাম দু'টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

গ্রন্থখানিতে চৌদ্দটি ছোটগল্প আছে। গল্পগুলি কেরালার বিভিন্ন লেখক কর্তৃক মালয়ালম্ ভাষায় রচিত। গ্রন্থকার মালয়ালম থেকে বাংলা ভাষায় গল্পগুলিকে তর্জ্জমা করেছেন। বাংলা সাহিত্য উৎকৃষ্ট ছোটগল্প-সমৃদ্ধ। বাংলায় অনুবাদ-সাহিত্য প্রধানতঃ ইউরোপীয় ছোটগল্প-উপন্যাসে গড়ে উঠেছে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের গল্প-উপন্যাস তার মধ্যে যা আছে তা সামান্যই। আর যা আছে তার মধ্যেও যেগুলি জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছে তার সংখ্যা বেশী নয়। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থখানির এক বৎসরে দুটি সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় প্রমাণিত হয় গল্পগুলি বাঙালী পাঠককে আনন্দ-দানে সক্ষম হয়েছে। আমরাও অধিকাংশ গল্পের বিষয়বস্তু ও রচনা-কৌশলের প্রশংসা করি। অনুবাদক মহাশয়ের কথায় "ভাষা ও সংস্কৃতিগত পার্থক্য"—কেরালা ও বাংলায় যথেষ্ট থাকলেও অধি-বাসীদের জীবনযাত্রা-সমস্যা ও তার মূলগত কারণে কিছু তফাৎ নেই। গল্পগুলি জীবনের ঘটনাকে ভিত্তি করেই রচিত। রচয়িতার দৃষ্টিভঙ্গী অনেক সময়েই রচনাকে উৎকৃষ্ট ও জনপ্রিয় করে। গল্প-গুলি পাঠে কেরালার সমাজ-চিত্রের কিছু অংশ চোখে পড়ে, বোঝা যায় কেরালার সাহিত্যও সমৃদ্ধ, অন্ততঃ ছোটগল্পে। এই গল্প-গুলির চেয়েও উৎকৃষ্ট গল্প কেরালার সাহিত্যে আছে কিনা জানি না, অনুবাদকও সে কথা ভূমিকায় লেখেন নি, তবে "আমি বেঁচে আছি কেন", "পাগলা কুকুর", "বিজেনেস", "কুটুম্ব", "দারুণ তৃষ্ণা", "একের পর এক" গল্প কয়টি উল্লেখযোগ্য। অনুবাদক মালয়ালম ও বাংলা উভয় সাহিত্যেরই উপকার করেছেন।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

বিনোবা—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ। অভয় আশ্রম, সি২৮ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২, মূল্য এক টাকা।

'ভূদান যজ্ঞে'র প্রবর্ত্তক ঋষি বিনোবা ভাবের নাম আজ সর্ব্ব-জনবিদিত। কিন্তু এই একমাত্র তাঁহার পরিচয় নয়। গান্ধীজী যেমন আপন চরিত্রকে একটু একটু করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, বিনোবাজীও সেইরূপ স্বীয় চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। যদিও তাঁহার আদর্শ গান্ধীজী, তবু একদিক দিয়া তিনি গুরুকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। গান্ধীজী ইহা স্বীকারও করিয়াছেন।

আলোচ্য পুস্তকখানি বিনোবার জীবনী নহে—ইহা তাঁহার জীবনের দিগদর্শন। গীতা যাহাকে কর্ম্মযোগ বলিয়াছে, বিনোবার

কর্মধারা সেই পথেই অনুসৃত হইয়াছে। কর্মের সহিত মনের সংযোগকেই গীতা কর্ম বলিয়াছে। বিনোবার কর্মজীবন এইরূপ দরদে পূর্ণ। তিনি বলেন, 'যা কর্ম, তাই ভক্তি আর তাই জ্ঞান'। এই তিনের সমন্বয়ই তাঁহার জীবনবাদ।

জীবনের প্রথম অধ্যায় তিনি গান্ধী-আশ্রমেই কাটাইয়াছেন। পরবর্তী জীবনে যে নূতন পরীক্ষায় তিনি নামিলেন, ইহা তাঁহার সারাজীবনের চিন্তার ফল। এই পরীক্ষাই তাঁহাকে পরিণতির দিকে লইয়া চলিয়াছে। তিনি সাধক—গীতাকে তিনি তাঁহার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কাজে লাগাইয়াছেন। সে দিক দিয়া তিনি সার্থক—পূর্ণ।

আজ দেশ স্বাধীন হইয়াছে, কিন্তু বিনোবা দেখিলেন—"দুনিয়ায় পয়সার প্রভুত্ব চলিতেছে। আর দুনিয়ার মূলে রহিয়াছে পয়সা ও পয়সার খেলা। পয়সার প্রভুত্বের অবসান না ঘটাইতে পারিলে ধনের উৎপাদক শ্রমিকের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিবে না, সুতরাং দুনিয়ার ব্যাধিও দূর হইবে না।"

তাই বিনোবা সাম্যযোগী সমাজ-রচনার ভিত্তি পত্তন করিলেন। এই সমাজ-রচনার অপর নাম ভূদান যজ্ঞ। "জমির ন্যায্য বণ্টন ভারতের জরুরী সমস্যা ত বটেই। দুনিয়ার অন্যত্রও আজ না হউক কাল ভূমি-সমস্যা মুখ্য হইবে। কোন দেশে লোকের মাথা রাখার ঠাঁই নাই, আবার কোন দেশে দিগন্ত-বিস্তৃত জমি পড়িয়া আছে—জনমানব নাই বলিলেই হয়। কিন্তু সেখানে অন্য অন্য দেশের লোকের প্রবেশ নাই। অতএব ভূমির ন্যায্য বণ্টন আজ যুগের দাবি।"

জমির মালিক ব্যক্তিবিশেষ নহে, জমির মালিক গ্রাম—বিনোবা লোককে দিতেছেন এই আদর্শে দীক্ষা। বিনোবা লোক-শক্তি সংগঠন করিতেছেন, আত্মশক্তি ছাড়া কাহারও উদ্ধার নাই—জনগণের মনে এই বোধের সঞ্চার করিতেছেন। বিনোবা কর্তৃত্ব-বিভাজনের মন্ত্র লোকের কানে জপিতেছেন। নূতন জাতি গঠন করিতেছেন।

বিনোবার এই কর্মধারায় অস্পষ্টতা যদিও বা কোথাও থাকে, গ্রন্থকার লিখন-চাতুর্যে তাহা দূর করিয়া দিয়াছেন। বিনোবার জীবন-দর্শনের এইরূপ পরিচিতির প্রয়োজন ছিল।

শ্রীগৌতম সেন

নিঃসঙ্গ মেঘ—শ্রীঅচ্যুত চট্টোপাধ্যায়। এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স (প্রাইভেট) লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৲।

ইতিপূর্ব্বে অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়ের কোন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে বলে মনে করতে না পারলেও, তাঁর কবিখ্যাতি যে বহু পূর্ব্বেই তৎসমসাময়িক পত্রিকাগুলির মাধ্যমে স্বীকৃত হয়েছে, তাতে আর সন্দেহ নেই। আলোচিত কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি পাঠ করে রসপিপাসু বিদগ্ধপাঠক কবির সহজাত কাব্যশক্তির তারিফ করবেন। মাত্রা, যতি ও রসকে অব্যাহত রেখে, সূক্ষ্ম ভাবতত্ত্বের বাস্তব রূপদান, যা ইদানীন্তন কাব্যে অত্যন্ত বিরল, অচ্যুতবাবুর এই কাব্যগ্রন্থের ৫২টি কবিতার মধ্যে সেই সর্ব্বাঙ্গীণ সুস্থতা প্রায় সর্ব্বত্রই লক্ষণীয়। পরিদৃশ্যমান বহির্জগতে ও অদৃশ্য অন্তর্জগতে যে রূপান্তর ও ভাবান্তর নিরন্তর আবর্ত্তিত হয়ে চলেছে, তারই আবেক্ষণ ও চিত্রাঙ্কন সার্থক রূপ পরিগ্রহ করেছে—রোদ্দুরের রঙ, ল্যাম্পপোষ্ট, চুণ বালি সুরকী, হাসপাতালের বুকে এবং অতৃপ্ত তৃষ্ণা, বিস্মরণ, প্রথম প্রেম, প্রতীক্ষার পর, অমৃতস্য পুত্রাঃ, মৃত্যু প্রভৃতি কবিতাগুলির মধ্যে। সাজসজ্জা কাব্যগ্রন্থের উপযোগী মনোরম।

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

খাদ্যের নববিধান—শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। প্রাকৃতিক চিকিৎসালয়, ১১৪.২বি ও সি হাজরা রোড, কলিকাতা—২৬। পৃঃ ২২৬, মূল্য ২·৫০ টাকা।

রোগ-নিরাময়ে ঔষধের সহিত উপযুক্ত পথ্যের গুরুত্বও অনস্বীকার্য্য। অনেক চিকিৎসক ঔষধ অপেক্ষা পথ্যের উপরই সমধিক জোর দিয়া থাকেন। আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতেও অনেক সময় খাদ্য-নির্ব্বাচনের মূল্য বুঝিতে পারি। মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটি হাসপাতালের অবসরপ্রাপ্ত চিকিৎসক শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায় আলোচ্য পুস্তকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণের নির্দ্দিষ্ট পথে পথ্যের দ্বারা স্বাস্থ্যরক্ষা এবং রোগ-আরোগ্য সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিয়াছেন। লেখকের একটি বিশেষ গুণ এই যে, কোন মন্তব্যই তিনি বিশদভাবে আলোচনা না করিয়া ছাড়েন নাই এবং প্রতিটি আলোচনাতেই তিনি দেশী, বিশেষতঃ বিদেশী বিশেষজ্ঞদের মন্তব্য উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে পুস্তকের আলোচনার গুরুত্ব বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। লেখকের আন্তরিক এবং অসামান্য পরিশ্রমের ফল এই পুস্তকটি। দৈনন্দিন জীবনে অনেকেই এই পুস্তক হইতে মহামূল্য সাহায্য পাইতে পারেন।

শ্রীসুভাষচন্দ্র সরকার

শূন্য প্রান্তরের গান—শ্রীশিবদাস চক্রবর্ত্তী। মণ্ডল পাব্লিশিং হাউস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা—৩৭। মূল্য ১৷০।

এখানি গ্রন্থকারের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। অধিকাংশ কবিতাই বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। ভাব ও ভাষার পরিচ্ছন্নতা এবং ছন্দের বিশুদ্ধতা কাব্যখানির প্রধান গুণ। প্রথমদিকের কয়েকটি কবিতা দেশপ্রেমমূলক। "আমরা চিরপুরাতনের দেশে চিরনূতন আশার আলো আনি"—তরুণ হৃদয়ের এই উৎসাহে সেগুলি প্রোজ্জ্বল। দেশের বর্ত্তমান অবস্থার বাস্তবচিত্রও কোথাও কোথাও ফুটেছে। কবি যা দেখেছেন এবং অনুভব করেছেন, তা নিঃসঙ্কোচে এবং স্পষ্টভাবে বলেছেন; রচনায় হেঁয়ালি নেই।

সাহিত্যজিজ্ঞাসা—শ্রীকুমুদনাথ দাস। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৪৲, সুলভ সংস্করণ ২৷০।

আটটি প্রবন্ধ: সাহিত্যের পথে, মধুসূদন, কবিবর মধুসূদনের সমাধিস্তম্ভমূলে বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিমের স্বপ্ন, রবীন্দ্রনাথ, সূর্য্যাস্ত, বঙ্গসাহিত্যের ধারা।

লেখক প্রবীণ। পূর্ব্বে ইংরেজীতে তাঁর বঙ্গসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত দু'খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ এবং অধ্যয়নের চিহ্ন বর্ত্তমান গ্রন্থেও পরিস্ফুট। তবে আলোচনা বড়ই ক্ষুদ্র পরিসরে নিবদ্ধ এবং কতকটা বিক্ষিপ্ত। ভূমিকায় লেখক বলেছেন, "যখন যা মনে হইত, তাহাই নোটবুকে লিখিয়া রাখিতাম।" সেইগুলি অবলম্বনেই এ গ্রন্থ রচিত।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ছবি আঁকা—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত। শিশু-সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ, ৩২এ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। ২৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲।

শিক্ষার প্রধানতঃ দুটো দিক আছে, প্রথমতঃ অর্থকরী শিক্ষা এবং দ্বিতীয়তঃ জ্ঞানের জন্য শিক্ষা, যাকে ইংরেজীতে বলা যেতে পারে education for education sake, এর মানে অবশ্য এই বোঝায় না যে, সমাজের উন্নতির কোনও প্রশ্ন থাকবে না।

আমাদের দেশে এখন পর্য্যন্ত শিক্ষা জিনিষটাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছাত্র এবং অভিভাবক উভয়েই যে ভাবে নিয়ে থাকেন তাতে প্রধানতঃ আর্থিক উন্নতির দিকটার দিকেই লক্ষ্য থাকে। এর জন্য রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক পরিস্থিতির প্রশ্ন এসে পড়লেও আমি সে আলোচনায় না গিয়ে বলতে চাই যে, বস্তুতঃপক্ষে অবস্থাটা কি। প্রকৃতপক্ষে উপযুক্ত শিক্ষার্জ্জনের চিন্তা সাধারণভাবে মানুষের মন থেকে অনেক দূরে। এহেন অবস্থায় ছবি আঁকা শেখানোটা, বাড়ীর ছেলেমেয়েদের—এমন কি যারা নিজের থেকেই এ বিষয়ে আগ্রহশীল তাদেরও, বাড়ীর অভিভাবকগণ কোন রকম উৎসাহ দেবার প্রয়োজন অনুভব করেন না, এমন কি অধিকাংশ স্কুলেও এই বিষয় শেখানর নিয়তম ব্যবস্থাও নেই। কারণ স্কুলের কর্ত্তাব্যক্তিরাও ত একদিক থেকে অভিভাবকদের দলভুক্ত, কাজেই তাঁদের কাছেও এর বিশেষ কোন মূল্য নেই। কি কারণ—না এই বিষয় শিখে কি
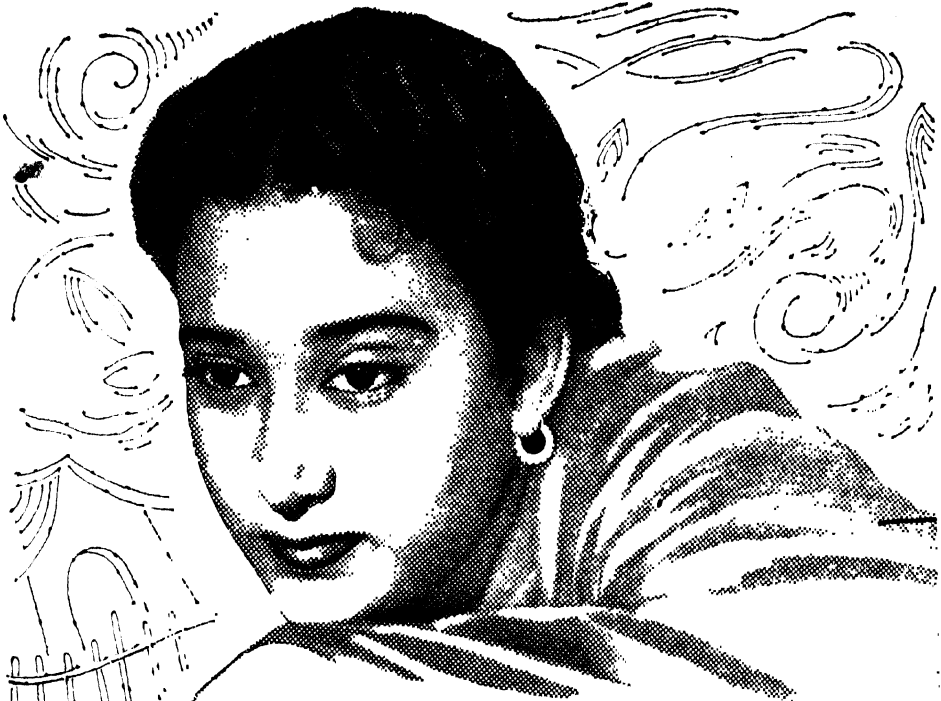
সবিতা চ্যাটার্জ্জী

বলেন "আমি সর্বদা লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করি—এটি এমন একটি বিশুদ্ধ, শুভ্র সাবান!"

সবিতা এখন বাংলা দেশে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় চিত্রতারকাদের অন্ত-তম। কিন্তু শুধু তাঁর অভিনয় নয়, তাঁর সুকোমল সৌন্দর্য্য এবং অপূর্ব লাবণ্যও চিত্রামোদীদের মুগ্ধ করেছে। এই লাবণ্যের যত্ন তিনি নেন মোলায়েম লাক্স টয়লেট সাবানের সাহায্যে। আপনিও বিশুদ্ধ, শুভ্র লাক্স টয়লেট সাবানের সাহায্যে ত্বকের যত্ন নিন। সর্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্যের জন্যে বড় সাইজের সাবান কিনুন।

লাক্স টয়লেট সাবান

চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান

LTS. 530-X52 BG

হবে, ভবিষ্যতে সে রকম utility কোথায়, এই সব প্রশ্নের কয়েকটি প্রধান উত্তর লেখক তাঁর ভূমিকায় দেবার চেষ্টা করেছেন। তিনি লিখেছেন "...তা ছাড়া শিক্ষার অন্যান্য বিষয়—যেমন ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিকের সব কিছু, ভূগোল, জ্যামিতি, প্রাণীতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, সবেতেই প্রচুর ড্রইং করার দরকার হয়।" আমার মনে হয় লেখকের ছবি আঁকা শেখার এই দিকটির উপর আরও বেশী জোর দেওয়া উচিৎ ছিল। কারণ, এই দিকটিই অভিভাবক-মনে অন্ততঃ ছেলেমেয়েদের elementary ছবি আঁকা শেখানর পক্ষে খানিকটা উৎসাহিত করবে। সবচেয়ে বেশী উৎসাহিত করত অবশ্য যদি বলা যেত যে, ছবি আঁকা শিখে ভবিষ্যতে প্রচুর অর্থোপার্জ্জনের সম্ভাবনা আছে। পূর্ব্বেই আমি বলে নিয়েছি যে, শিক্ষার উপযুক্ত অর্থে শিক্ষাকে গ্রহণ করা আমাদের দেশে অধিকাংশের মনে এখনও পর্য্যন্ত রপ্ত হয় নি। সুতরাং সে অবস্থায় রুচিবোধ, ছবির দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করা, রং বোঝা, ভাব প্রকাশে রঙের প্রভাব, শিল্পী হওয়া, শিল্পীর সৃষ্টিকে উপলব্ধি করা এবং তার থেকে আনন্দ পাওয়া ইত্যাদির প্রশ্ন এখন ওঠান নিরাপদ না হওয়া সত্ত্বেও—যে কতিপয় অভিভাবক এবং শিক্ষক ছবি আঁকা শেখানর গুরুত্ব উপলব্ধি করেন তাদের উদ্দেশ্যে এবং যারা করেন না তাদের উদ্দেশ্যেও বলব যে, বইটি অতিশয় সুন্দর। যদিও দু'এক স্থানে কলার্ড-ব্লকের সেটিং একটু এদিক-ওদিক হয়েছে; তবুও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছাপা। প্রথমেই ছাত্রদের রং সম্পর্কে বেশ পরিষ্কার ধারণা হবার মত একটি কলার্ড চার্ট দেওয়া হয়েছে। কোন্ কোন্ রঙে মিশে কি রং হয় ছবির দ্বারা বেশ সুন্দর করেই তা বোঝান হয়েছে। তারপর ধাপে ধাপে—ফুল, ফল, পাতা ইত্যাদি দিয়ে আরম্ভ করে পশু-পক্ষী, মডেল-ড্রইং—যেমন, হাঁড়ি, কলসী, কুঁজো, কাঁচের পাত্র, টেবিল, চেয়ার, আলমারী ইত্যাদি, তারপর মানুষের মুখ, তার বিশেষ বিশেষ মনের অবস্থায় মুখের বিশেষ বিশেষ ভাব, কার্টুন, বিভিন্ন ঘরোয়া জিনিষের ছবি, তারপর জাহাজ, ইঞ্জিন, এরোপ্লেন ইত্যাদির লাইন-ড্রইং, পশু-পক্ষী ইত্যাদির ছায়াছবি এবং সেড ব্যবহার করে আঁকা, মানুষের বিভিন্ন গতিকে কি ভাবে ধরে রাখা যায়, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ছবি, নক্সার নমুনা, আলপনা, শেষে রঙিন ফুলদানি, গেলাস এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকার মোটামুটি নিয়মগুলি বেশ ভালভাবেই বোঝান হয়েছে। আশা করি, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বইটি পেয়ে বেশ উপকৃতই হবে এবং ড্রইংয়ের মোটামুটি নিয়মকানুনগুলি অতি সহজেই আয়ত্তে আনতে পারবে।

শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার

মীরাবাই—শ্রীব্যোমকেশ ভট্টাচার্য্য। 'মীরাবাণী প্রচার মন্দির' ৩৪।১৩৬নং গণেশমহল্লা, বারাণসী। ২৪+২৬৪ পৃঃ, মূল্য সাড়ে চারি টাকা মাত্র।

আলোচ্য গ্রন্থে ভক্তিজগতের পরমারাধ্যা অসামান্যা ভজননিষ্ঠাবতী, ভক্তিসঙ্গীতময়ী, জন্মসিদ্ধা, গিরিধারীপ্রেয়সী, নিত্য-ভগবৎপ্রেম-পাগলিনী রাজস্থান তথা ভারতের চিরগরবিণী 'মীরাবাই' যিনি কিঞ্চিন্ন্যন পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে এই ধরাধামে দিব্যভক্তিজ্যোতিঃরূপে বিরাজিতা ছিলেন এবং যাঁহার রচিত ও গীত অমর ভজনাবলীর পদ, শব্দ, ছন্দ, স্বর, তান, লয়াদির ঝঙ্কার ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নগরে, শহরে, পল্লীতে, বনে, পাহাড়ে, কান্তারে, দরিয়ায় সর্ব্বত্র নিত্য ধ্বনিত, তাঁহারই অমৃত-চরিতকথা অদ্ভুতকর্ম্মা সত্যান্বেষী গ্রন্থকার কর্ত্তৃক পরিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রথম চব্বিশ পৃষ্ঠায় মুখবন্ধ, প্রস্তাবনা, শুভেচ্ছাদি। প্রথম খণ্ডে ১-১২০ পৃষ্ঠায় ঐতিহাসিক সত্য, সঙ্গতিপূর্ণ যুক্তি এবং বহু ভাষার বহু গ্রন্থাদি আলোচনা ও লীলাস্থানাদি পর্য্যটন এবং পরিদর্শনক্রমে সন্দেহাতীত তথ্য সংগ্রহকরতঃ সাক্ষাৎ ভক্তিময়ীর ভাববৈচিত্র্যময় অমর চরিত্র চিত্রণ; দ্বিতীয় খণ্ডে ১০৩-১২০ পৃষ্ঠায় তাঁহার রচিত গ্রন্থ ও ভজনাবলীর ভাষা, কাব্য-প্রতিভা, অলঙ্কার ও ছন্দ সম্পদাদির বিশ্লেষণ; তৃতীয় খণ্ডে ১২১—২০২ পৃষ্ঠায় তাঁহার অধ্যাত্ম জীবন আলোচনা প্রসঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য ও ভক্তিমার্গের উৎকর্ষতা প্রদর্শন; এবং চতুর্থ খণ্ডে ২০৩-২৬৪ পৃষ্ঠায় বাংলা পদ্যানুবাদ ৫০টি মীরাভজন, ভজনাবলীর বর্ণানুক্রমিক সূচী এবং এই গ্রন্থ-প্রণয়নে-সহায়ক গ্রন্থাদির উল্লেখন যথাক্রমে স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে ১০টি ছবির ভিতর পূজারিণী, ভক্তশিরোমণি, গুরুসমীপে শিষ্যা, ভাববিভোরা ও ভজনে মীরা এই পাঁচটি অতীব ভক্তিভাবোদ্দীপক। প্রচ্ছদপটটিও বেশ মনোজ্ঞ।

বহু আয়াসলব্ধ গবেষণামূলক তথ্যবহুল এই গ্রন্থপাঠে ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, ভাবুক ও রসিক ভক্তমণ্ডলী সকলেই নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী যথেষ্ট খোরাক পাইবেন এবং ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অভিষিক্ত হইয়া অপার্থিব আনন্দলাভে ধন্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত বহু ভ্রান্ত ধারণার কবল হইতে নিশ্চিত মুক্তিলাভে উপকৃতও হইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

দেশ-বিদেশের কথা

ত্রিবেন্দ্রামের সরকারী যাদুঘর

ত্রিবেন্দ্রামের সরকারী যাদুঘরের শতবার্ষিকী গত ২২শে জানুয়ারী সম্পন্ন হইয়াছে। এই যাদুঘরটির খ্যাতি আজ সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বহু দর্শনীয় জিনিস এখানে সংরক্ষিত আছে। ইহাদের মধ্যে খোদাই-করা কাঠের জিনিসগুলি সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। কেরালা রাজ্যে নানা ধরণের কাঠ পাওয়া যায় এবং এখানে কাঠ-খোদাই শিল্পের একটি বিশেষ ঐতিহ্য রহিয়াছে। তবে যাদুঘরে রক্ষিত কাঠের জিনিসগুলি চার শত বৎসরের অধিক পুরাতন নহে।

যাদুঘরের প্রবেশ পথেই যে মণ্ডপটি রহিয়াছে তাহা কেরালার শিল্পীদের কাঠ খোদাই নৈপুণ্যের সার্থক পরিচয়। একটি পুরাতন মন্দিরের টুকরা টুকরা অংশ একত্র করিয়া এই মণ্ডপটি নির্ম্মিত হইয়াছে। মণ্ডপটির কারুকার্য্যখচিত স্তম্ভ ও ছাদ দর্শককে মুগ্ধ করে। এই মণ্ডপের উপর রাখা আছে ব্রঞ্জের এক অপূর্ব্ব নটরাজ মূর্ত্তি।

কাঠের কুঠাপানম (নাটমন্দিরের নমুনা) আর একটি অত্যাশ্চর্য্য জিনিস। 'কুঠু' নৃত্য কেরালার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এই নৃত্যে 'চাকিয়ার' বা নর্ত্তক পুরাণ এবং মহাকাব্য হইতে কাহিনী বর্ণিত হয় এবং সকল কাহিনীর সূত্রপাত এই কেরলেই হইয়াছিল বলিয়া দাবী করা হয়। এই নাটমন্দিরে স্তম্ভগুলি এমনভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে যে, যে কোন স্থান হইতে নর্ত্তককে পরিষ্কার দেখা যায়, স্তম্ভগুলি কোন বাধার সৃষ্টি করে না।

পদ্মনাভপুরমের কাঠের রথটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা প্রায় তিন শত বৎসরের পুরানো। রথটি তিনতলা, ৯ ফুট উচ্চ। নীচের তলাটি ১৩ ফুট লম্বা ও ৯ ফুট চওড়া। এই ধরণের রথ এখনও মন্দিরের শোভাযাত্রায় ব্যবহৃত হয়। এই রথের গায়ে হিন্দু দেবদেবী, জন্তু ও ফুল খোদাই করা আছে।

হিন্দুর ধ্যান-ধারণায় বিশ্বেশ্বরের মূর্ত্তি পুষ্পবিমানমে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। কাঠ-খোদাইয়ের কাজে কেরালার শিল্পীগণ যে কতখানি পারদর্শিতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, ইহা তাহারই নিদর্শন।

ব্রোঞ্জের দ্রব্যগুলির মধ্যে উত্তর-ত্রিবাঙ্কুরে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্ত্তিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা হাজার বৎসরের পুরানো এবং প্রাচীন শিল্পীদের শিল্প-চাতুর্য্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন।

'শিব ও সতী' মূর্ত্তিটি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিব মৃতা সতীকে কাঁধে লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন আর একটি অসুর শিঙ্গা বাজাইয়া সতীর মৃত্যুঘোষণা করিতেছে।

আর একটি উল্লেখযোগ্য মূর্ত্তি হইতেছে গজতাণ্ডব। তবে মূর্ত্তিটির দাঁড়াইবার ভঙ্গী প্রচলিত মূর্ত্তির ভঙ্গী হইতে পৃথক। এবং মূর্ত্তিটির পদতলে অসুরের পরিবর্ত্তে একটি হাতীর মাথা রহিয়াছে। মূর্ত্তিটি তত প্রাচীন নহে।

যাদুঘরের প্রবেশপথের নিকটে কথাকলি নৃত্যভঙ্গিমায় ছয়টি ক্ষুদ্রাকার মূর্ত্তি আছে। নিখুঁত অভিনয় ও ভঙ্গী শিল্পীর তুলিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

যাদুঘরের অন্যান্য দ্রষ্টব্যবস্তুর মধ্যে ব্রঞ্জের বাতি তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ব্যবহৃত অলঙ্কার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বাতিগুলির মধ্যে পাখীর আকারের বাতিটি দেখিবার মত। পাখীর মাথায় তৈল পলিতা থাকে, লেজটি ধরিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্বে উৎসবের সময় রাজাকে মন্দিরের পথ দেখাইবার জন্য বাতিটি ব্যবহৃত হইত।

কেরালার অলঙ্কারগুলির আনুষ্ঠানিক তাৎপর্য্য আছে। পলাকাই মদিরম (পলাবীজের আংটি) মালয়মীদের রক্ষাকর্ত্রী দেবী ভাগবতীর করুণালাভের উদ্দেশ্যে পরা হয়। বাঘনখের গহনা পরিলে নাকি লোকে দুঃস্বপ্ন দেখে না।

এসব ছাড়া এই যাদুঘরে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র আছে। ইহাদের মধ্যে কেরালার নিজস্ব পঞ্চবাদ্যম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অমরেন্দ্রনাথ রায়

গত ১০ই আশ্বিন, ২রা অক্টোবর, মহানবমীর দিন প্রখ্যাত সমালোচক এবং সাহিত্যিক অমরেন্দ্রনাথ রায় পরলোকগমন করেন। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগে অমরেন্দ্রনাথ সাহিত্যজগতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। মাত্র ষোল-সতের বৎসর বয়সে বাংলা নাটকের উপর একটি গবেষণাধর্ম্মী প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি গিরিশচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে ভূয়সী প্রশংসা ও প্রচুর উৎসাহ প্রাপ্ত হন। কালক্রমে সাহিত্য, নারায়ণ, হিতবাদী, বঙ্গবাসী, ভারতবর্ষ, অর্ঘ্য, অর্চনা, বঙ্গবাণী, সময়, ছোটগল্প, সচিত্র শিশির প্রভৃতি সাময়িক পত্রাদিতে সমালোচনামূলক নিবন্ধ লিখিয়া তিনি খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তাঁহার রচনার শাণিত দীপ্তি এবং তীক্ষ্ণ বিচার-বিশ্লেষণ-ক্ষমতা তদানীন্তন পাঠকসমাজে

তাঁহাকে সবিশেষ প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। 'ভারতবর্ষে' তাঁহার ধারাবাহিক 'সাহিত্যপ্রসঙ্গ' একদা বঙ্গীয় পাঠকগণের নিকট কম আগ্রহ এবং কৌতূহলের সঞ্চার করে নাই! শুধু সমালোচক হিসাবেই নহে, সাংবাদিক হিসাবেও তাঁহাকে বহুদিন লেখনী নিয়োজিত করিতে হইয়াছিল। গতযুগের সুপ্রসিদ্ধ দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক নায়ক, প্রবাহিনী, বাঙ্গালী, সারথি, বাসন্তী, সুদর্শন, হিন্দুস্থান, বঙ্গদর্শন, দর্শক প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার সম্পাদকরূপে এবং সুরেশ সমাজপতির 'সাহিত্য'-পত্রের সহ-সম্পাদক হিসাবে তিনি প্রভূত যশোলাভ করিয়াছিলেন। সে ফলপ্রাপ্তির মূলে ছিল তাঁহার নির্ভীক সততা এবং মতবাদের সুস্পষ্টতা।

সমালোচক ও গবেষক অমরেন্দ্রনাথের উনবিংশ শতাব্দীর আদি, অন্ত এবং মধ্যভাগের সাহিত্য সম্পর্কিত জ্ঞানের পরিধি ছিল সুবিস্তৃত। আধুনিক পাঠককুলের স্মৃতি হইতে বিলুপ্তপ্রায় বহু প্রাচীন সাহিত্য ও সাহিত্যিকের বিষয় পুনঃপ্রচারিত করিতে তিনি অগ্রণী হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'ভ্রান্তিবৈর' প্রবন্ধ এবং উইলিয়ম কেরী, হেরসিম লেবেডেফ, রামনিধি গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি সংক্রান্ত বহুবিধ তথ্যের প্রথম আবিষ্কারের গৌরব তাঁহার। এই সব এবং ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রমুখ সুলেখকগণের রচনার প্রচারের জন্য প্রাচীন সাহিত্যবিদ হিসাবে তিনি বহুজনমান্য ছিলেন। তাঁহার সে ধরনের রচনাসকল পরবর্তীকালের গবেষকদের জন্য সুপ্রশস্ত পথ সৃষ্টি করিয়া দিয়া গিয়াছে। তৎরচিত বঙ্গসাহিত্যে স্বদেশপ্রেম ও ভাষাপ্রীতি, শাক্ত পদাবলী, সমালোচনা-সংগ্রহ, বাঙ্গালীর পূজা-পার্ব্বণ, বাংলা রচনাভিধান, বঙ্কিম-পরিচয় প্রভৃতি গ্রন্থগুলি অমরেন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্যসম্পর্কীয় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও মনীষার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর বহন করিতেছে। জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ ছাড়া ব্যঙ্গাত্মক রস-রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার শ্রীদুর্গার বঙ্গে আগমন, বঙ্গের রঙ্গকথা, ছটাকী (গিরিশচন্দ্রের অসমাপ্ত প্রহসনের সমাপ্তি) প্রভৃতি গ্রন্থ সমুদয় পাঠে তাহার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

১৯৩৫ সনে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গিরিশচন্দ্র ঘোষ অধ্যাপক'-পদে বৃত হন। তাঁহার গিরিশ বক্তৃতামালা 'গিরিশ নাট্যসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৩৭ সনে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের আহ্বানে বাংলা গ্রন্থ প্রকাশন বিভাগের সম্পাদক হিসাবে তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত হন এবং কর্ম্মজীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তাঁহার সাহিত্যসাধনা সেখানেই নির্ব্বাহিত করিয়া যান। মৃত্যুকালে অমরেন্দ্রনাথের বয়স হইয়াছিল ৬৯ বৎসর। প্রবীণ সাহিত্যসেবীর লোকান্তরগমনে বাংলা সাহিত্য জগতের যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে।

কেশবচন্দ্র সেন

পত্র-পত্রিকা পরিচালন ও সম্পাদন

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

The Indian Mirror: পত্র-পত্রিকা সম্পাদন ও পরিচালনে কেশবচন্দ্রের কার্য্যকলাপ বিষয়ের উল্লেখ আমরা ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি। তিনি প্রতিষ্ঠাবধি (১লা আগষ্ট ১৮৬১) ইংরেজী পাক্ষিক-পত্র 'ইণ্ডিয়ান মিররে'র বৈষয়িক সম্পাদক ছিলেন। ১৮৬৫ সনে এই পত্রিকাখানি তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচালনাধীনে আসে। ইহার সম্পাদক হন নরেন্দ্রনাথ সেন। নরেন্দ্রনাথ পূর্ব্বে ইহার নিয়মিত লেখক ছিলেন। তিনি ১৮৬৬ সনে এটর্নিশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এটর্নি হন ও মিররের সংস্রব ত্যাগ করেন। ইহার পর 'মিরর'-সম্পাদন ও পরিচালন-ভার কেশবচন্দ্র গ্রহণ করেন। 'মিরর' ১৮৬৯, ১লা জানুয়ারী তারিখে সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। ১৮৭১, ১লা জানুয়ারী দৈনিক পত্রিকারূপে এখানি প্রকাশিত হইল। সম্পাদনা ভার পুনরায় অর্পিত হয় নরেন্দ্রনাথ সেনের উপর। তদবধি ইহার সম্পাদনায় তিনি সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিলেন। পত্রিকার স্বত্বাধিকারও ক্রমে তাঁহারই হইয়া যায়। পত্রিকাখানির শিরোভূষণ ছিল "Velutien Speculum"।

The Sunday Mirror: কেশবচন্দ্রের অধ্যক্ষতায় ১৮৭৩, ২৯শে জুন হইতে প্রতি সপ্তাহে রবিবার এখানি প্রকাশিত হইতে থাকে। প্রধানতঃ ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয় ও রচনাসমূহ ইহাতে স্থান পাইত। ইহার শিরোভূষণ ছিল "Glory to God in the highest, and on earth peace, good will toward man"।

ধর্ম্মতত্ত্ব: কার্ত্তিক ১৭৮৬ শক (অক্টোবর ১৮৬৪) হইতে মাসিকরূপে পত্রিকাখানি বাহির হয় মুখ্যতঃ কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে। ইহার উদ্দেশ্য এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে: "ধর্ম্ম-নীতি; ধর্ম্মতত্ত্ব; সামাজিক উন্নতি; ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি; নীতিগর্ভ আখ্যায়িকা; সাধুদিগের জীবন; বেদ পুরাণ বাইবেল কোরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মপুস্তক হইতে সত্যধর্ম্ম প্রতি-পাদক ভাব" প্রকাশ। দ্রঃ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', অগ্রহায়ণ, ১৭৮৬ শক।

'ধর্ম্মতত্ত্ব' ১৭৯০ শকে পাক্ষিক পত্রে পরিণত হয়। তখন হইতে ইহার শিরোভূষণ হয়:

> "সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
> চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
> বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
> স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥"

সুলভ সমাচার: ভারত-সংস্কার সভার 'সুলভ সাহিত্য' বিভাগের অন্তর্গত হইয়া কেশবচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক এখানি প্রকাশিত হয় ১লা অগ্রহায়ণ ১২৭৭ সাল হইতে। ইহার পরিচালনার ভার উক্ত সভার পক্ষে কেশবচন্দ্র গ্রহণ করেন। 'সুলভ সমাচারে'র সম্পাদক প্রতি বৎসর এক-একজন নিয়োজিত হইতেন। ইহার প্রথম সম্পাদক—উমানাথ গুপ্ত। সমাচারের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ বর্ণিত হয়: "হিত উপদেশ, নানা সংবাদ, আমোদজনক ভাল ভাল গল্প, আমাদের দেশের এবং বিদেশের ইতিহাস, বড় বড় লোকের জীবন, যে সকল আইন সাধারণের পক্ষে জানা নিতান্ত আবশ্যক, চাল ডাল প্রভৃতির দর এবং বিজ্ঞানের মূল সত্যসকল যত দূর সহজ কথায় লেখা যাইতে পারে…" ইত্যাদি প্রকাশ।

'সুলভ সমাচারে'র বৈশিষ্ট্য দুইটি। প্রথমতঃ এখানি একপয়সা মূল্যের সাপ্তাহিক। পূর্ব্বে এরূপ স্বল্পমূল্যে পত্রিকা এদেশে প্রকাশিত হয় নাই। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যই মুখ্য: ইহার ভাষা অতি সহজ, সরল, অথচ সরস এবং প্রসাদগুণবিশিষ্ট। সুলভ সমাচারের ভাষা ও ভাবাদর্শ কেশবচন্দ্র দ্বারা অনুপ্রাণিত ইহা নিঃসংশয়ে বলা চলে। তিনি ইহার অন্যতম নিয়মিত লেখক ছিলেন। ভাষায় এবং ভাবে অন্য লেখকগণও তাঁহার অনুসরণ করেন। একারণ কোন্ কোন্ লেখা কেশবচন্দ্রের, তাহা বাছাই সম্ভব নয়। সুলভ সমাচারের প্রথম শিরোভূষণ:

> "ধনমান লাভ করি সকলেই চায়;
> সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটে ওঠা দায়।
> জ্ঞান ধর্ম্ম চাও যদি অবারিত দ্বার;
> দরিদ্র ধনীর সেথা সম অধিকার।"

বর্ত্তমানে বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশিত হওয়া একটা রেওয়াজে পরিণত হইয়াছে। ইহার সূচনা দেখি 'সুলভ সমাচারে'র মধ্যে। শারদীয়া পূজা উপলক্ষ্যে লঘু রচনা ও লঘু চিত্রাবলী সমন্বিত হইয়া সমাচারের একখানি ক্রোড়পত্র বাহির হইত।

বামাবোধিনী পত্রিকা: ভারত-সংস্কার সভার অন্তর্গত স্ত্রীজাতির উন্নতি বিভাগের মুখপত্রস্বরূপ পূর্ব্ববৎ উমেশচন্দ্র দত্তের সম্পাদনায় এই পত্রিকাখানি পরিচালিত হয়। সভার মুখপত্রবিধায় ইহার পরিচালনায় কেশবচন্দ্রের যে বিশেষ হাত ছিল তাহা বলা চলে। ইহাতে কেশবচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত 'বামাহিতৈষিণী সভা'র যাবতীয় সংবাদও বাহির হইত। কি স্বদেশে কি বিদেশে স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রীজাতির উন্নতিবিষয়ক বিবিধ সংবাদ ও প্রবন্ধ, এবং ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীদের রচনাও সাগ্রহে 'বামাবোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ করিতেন।

মদ না গরল ?: ভারত-সংস্কার সভার অন্তর্গত "সুরাপান ও মাদক দ্রব্য নিবারণ" বিভাগের মুখপত্র। শিবনাথ শাস্ত্রী বলেন, কেশবচন্দ্র ইহার সম্পাদনা-ভার তাঁহার উপরে অর্পণ করিয়াছিলেন। এখানি মাসিকপত্র, বৈশাখ ১২৭৮ হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার হাজার খণ্ড মুদ্রিত হইয়া বিনামূল্যে বিতরিত হইত।

ধর্ম্মসাধন: সাপ্তাহিক পত্র, ২১শে বৈশাখ ১৭৯৪ শক (১৮৭২) হইতে প্রকাশিত হয়। ইহা কেশব-মণ্ডলীর সঙ্গত-সভার মুখপত্র। ইহার সম্পাদনা-ভার ছিল উমেশচন্দ্র দত্তের উপর। এখানিও এক পয়সা মূল্যের পত্রিকা। ইহাতে কেবল সঙ্গতের বিবরণ ও ব্রহ্মমন্দিরের উপদেশের সারমর্ম্ম পরিবেশিত হইত।

'ধর্ম্মসাধনে'র শিরোভূষণ:

ভবে সাধন বিনা সে ধন মিলে না,
কর সাধন, পূর্ণ হবে মনস্কাম।"

বালকবন্ধু: পাক্ষিক পত্র। ২০শে বৈশাখ ১৮০০ শকে (১৮ এপ্রিল ১৮৭৮) পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয়। সম্পাদক—কেশবচন্দ্র স্বয়ং। নাম হইতেই বুঝা যায়, বালক-বালিকাদের পাঠোপযোগী রচনা ইহাতে পরিবেশিত হইত। পত্রিকাখানি সচিত্র, নগদমূল্য মাত্র এক পয়সা। গল্প, কবিতা, নীতিকথা, হেঁয়ালি, অঙ্ক প্রভৃতি ইহাতে স্থান পাইত। কিছুদিন বাহির হইবার পর 'বালকবন্ধু' বন্ধ হইয়া যায়। কেশবচন্দ্রের জীবিতকালে, ১৮৮১ সনের ১৫ই ডিসেম্বর এখানি পুনরায় মাসিক পত্রাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

পরিচারিকা: ভারত-সংস্কার সভার অন্যতম মুখপত্র। নারী-জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি বিষয়ে কেশব-মণ্ডলীর কার্য্যকলাপের বিবরণ যথারীতি ইহাতে প্রকাশিত হইত। কুচবিহার-বিবাহের পর সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত কেশব-বিরোধী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম কর্ণধার হন। তখন একখানি স্বতন্ত্র মহিলা-পত্রিকার প্রয়োজন অনুভূত হইল, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের পক্ষে গিরিশচন্দ্র সেনের প্রস্তাবে ও উদ্যোগে প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় 'পরিচারিকা' নামে একখানি মাসিকপত্র ১২৮৫, ১লা জ্যৈষ্ঠ প্রকাশিত হয়। কয়েক বৎসর পরে 'পরিচারিকা'-পরিচালনার ভার লইলেন কেশবচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত 'আর্য্য নারীসমাজ'। বলা বাহুল্য, আরম্ভ হইতেই 'পরিচারিকা'র সঙ্গে কেশবচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। কেশব-প্রবর্ত্তিত নারীজাতির উন্নতিমূলক অভিনব প্রচেষ্টাসমূহের সকল বিবরণই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে 'পরিচারিকা'য় প্রদত্ত হইত।

বিষ-বৈরী: কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ব্যাণ্ড অফ হোপ বা আশালতা দলের মুখপত্র। কেশবচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দলাল সেনের সম্পাদনায় ১২৮৭ (ইং ১৮৮০) বৈশাখ মাসে মাসিক-রূপে প্রকাশিত হয়। এখানি বিনামূল্যে বিতরিত হইত।

The New Dispensation: 'নববিধান'-এর ভাব প্রকাশ ও প্রচারার্থ কেশব-মণ্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৮৮১ সনের ২৪শে মার্চ এই ইংরেজী সাপ্তাহিক-পত্র প্রকাশিত হয়। প্রতি সপ্তাহে কেশবচন্দ্র নববিধানের উচ্চ ভাবাদর্শ বিভিন্ন দিক হইতে ইহাতে ব্যাখ্যা করিতেন।

The Liberal: কেশবচন্দ্রের অনুজ কৃষ্ণবিহারী সেনের সম্পাদনায় এই সাপ্তাহিক পত্র ১৮৮২, জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত হয়। এখানি সংবাদপত্র আখ্যা পাইবার যোগ্য। কিছুকাল পরে ইহা The New Dispensation-এর সঙ্গে মিলিত হইয়া The New Dispensation and The Liberal নাম গ্রহণ করে।

কেশবচন্দ্র যুগন্ধর মানুষ। যে কাজেই যখন হাত দিয়াছেন তাহাতেই সোনা ফলিয়াছে। ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনার দ্বারা এবং সহজ-সরল ভাষায় সংবাদ পরিবেশন দ্বারা জনসাধারণের জ্ঞানবর্দ্ধনের বাহন করিয়া লইয়াছিলেন এই সকল পত্র-পত্রিকাকে। তাঁহার প্রয়াস সাফল্যলাভ করে, নিঃসন্দেহ। তাঁহার জীবিতকালে ও মৃত্যুর পরে তাঁহার অনুবর্ত্তীরা এবং বিপক্ষীয়েরা এই উভয়বিধ উদ্দেশ্যে ইংরেজী-বাংলা বহু পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করিতে থাকেন। কেশবচন্দ্রের সাংবাদিক-প্রয়াসও সমাজে বদ্ধমূল হইল।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২, আপারসারকুলার রোড, কলিকাতা

বিষয়-সূচী—চৈত্র, ১৩৬৪

বিষয়-সূচী—চৈত্র, ১৩৬৪

রঙীন ছবি

নববধূ—শ্রীপঞ্চানন রায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

নববধূ
শ্রীপঞ্চানন রায়

বংশবাটী—হংসেশ্বরী মন্দির

[ফোটো : শ্রীআনন্দ মুখার্জি

হাটের পথে

[ফোটো : শ্রীতুলসীদাস সিংহ

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"
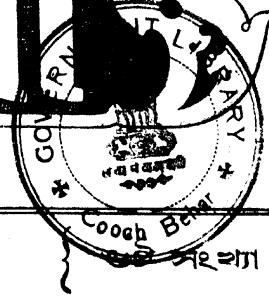
৫৭শ ভাগ
২য় খণ্ড

চৈত্র, ১৩৬৪

৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

দেশের গতিপথ

কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের এক বিশিষ্ট বন্ধু বলিয়াছিলেন যে, বাঙালী শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত সমাজ এখন ছিন্নমস্তা রূপ ধারণ করিয়াছে, অর্থাৎ নিজের মস্তক কর্ত্তন করিয়া রুধির পানে প্রমত্ত। কিছুদিন যাবৎ পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষতঃ কলিকাতায় যাহা চলিতেছে তাহাতে মনে হয় সত্যই বাঙালী আত্মঘাতী হইবার চেষ্টায় বদ্ধপরিকর। এবং মনে হয় বাঙালী জাতির পরিত্রাণ অসম্ভব।

নহিলে মুষ্টিমেয় স্বার্থসন্ধানী নেতৃবর্গের তথাকথিত বামপন্থী অভিযানে এইভাবে দেশের লোকের নাগরিক ও শ্রমিকজীবন বিধ্বস্ত ও দেশের সকল প্রগতির যাত্রাপথ বাধাপূর্ণ ও ব্যাহত হইত না। নহিলে পশ্চিমবঙ্গের দুর্দ্দশা এই ভাবে দিনে দিনে নিদারুণ ও শোচনীয় রূপ পরিগ্রহ করিত না।

অবশ্য এই ব্যাপারে দোষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পশ্চিমবঙ্গের সন্তান-সন্ততির। তাঁহাদের নির্জ্জীব ও শ্লথপূর্ণ জড়ভরত অবস্থা না হইলে কি পথেঘাটের সকল কাজ এই ভাবে বিপর্য্যস্ত হইতে পারিত? তাঁহাদের বুদ্ধিবিভ্রম না হইলে কি আজ যাঁহারা ক্ষমতার অপব্যবহার বা বিচারবুদ্ধির অভাব দেখাইতেছেন তাঁহারা নেতৃত্বের বা অধিকারীর পদ পাইতে পারিতেন? আজও যদি দেশের লোকের চৈতন্যের উদয় হয় তবে কি পশ্চিমবঙ্গের ও সেই সঙ্গে সমস্ত বাঙালী জাতির অতীত গৌরবের পুনরুদ্ধার সম্ভব হয় না?

আমরা তো ধ্বংসের পথে চলিয়াছি। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা এখনও যাহা আছে তাহাতে উহাকে "সোনার বাংলা" বলা চলে, কিন্তু সেই স্বর্ণ আহরণের অধিকার বাঙালীর হাত হইতে প্রায় সব-কিছুই চলিয়া গিয়াছে এবং এই অবনতির কারণ আমাদেরই কার্য্যকলাপের ধরন-ধারণ।

আমরা বুঝি অধিকারের ষোল আনার অধিক, অর্থাৎ আমাদের প্রাপ্য যাহা তাহা সম্পূর্ণ অপেক্ষাও অধিক পাইতে আমাদের সীমা-হীন আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু সেই অধিকার প্রাপ্তির মূলে যে দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য তাহা স্বীকার করিতে আমরা আদৌ প্রস্তুত নহি। আমরা পুরা খাইব অথচ পূর্ণ মূল্য দিব না, সেই জন্যই বাংলাদেশ ভেজালের দেশ। ষোল আনার জিনিস সিকি মূল্যে লইলে যে সাচ্চার বদলে মেকী চলিবেই একথা সারা জগৎ বুঝে, বুঝে না শুধু বাঙালী—বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী।

এই কারণেই আজ বাঙালীর সকল প্রতিষ্ঠান সকল ব্যাপার রাহুগ্রস্ত হইতে চলিয়াছে। আজ যে কাজ-কারবার জোর চলিতেছে কাল তাহার মূল কীটগ্রস্ত হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার সকল দিকে ক্ষয়রাময় ব্যাধির লক্ষণ দেখা দিবে এবং তাহার ধ্বংস ক্রমেই নিশ্চিত হইয়া আসিবে।

বাঙালী শ্রমিক একদিন কৌশলী ও কর্ম্মঠ বলিয়া বিখ্যাত ছিল। সমগ্র ভারতে ও ভারতের বাহিরে এডেন হইতে হংকং পর্য্যন্ত সকল যন্ত্রশালা, সকল লৌহ ও কাঠের কলকারখানায়, জাহাজঘাটা ও রেল-পথে, বাঙালী কারিগরের দক্ষতার খ্যাতি আজও শোনা যায়। আজও নয়া দিল্লী ষ্টেশনের কাছে বিশ্বকর্ম্মার পাকা মন্দিরের গাত্রে বাঙালী মিস্ত্রী ও কারিগরের কার্য্যক্ষমতার পরিচয় বাংলা অক্ষরে সুস্পষ্টভাবে লিখিত রহিয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও বাঙালী কারিগর ও মিস্ত্রীর কতটা কোমরের জোর, বুকের পাটা ও কাজের যোগ্যতা ছিল।

আজ কলিকাতা শহরে বাঙালী শ্রমিকের স্থান ক্রমেই সঙ্কুচিত ও রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। কলিকাতার বাহিরে ত আর কিছুদিন পরে তাহাকে দেখাই যাইবে না। আজও বাঙালী পরিচালিত কাজ-কারবারে অধিকাংশ কর্ম্মী বাঙালী, অ-বাঙালী প্রতিষ্ঠানে বা কাজ-কারবারে বাঙালীর স্থান নাই বলিলেই চলে। সেই সঙ্গে ইহাও বলা প্রয়োজন যে, যেখানে বাঙালী কর্ম্মীর আধিক্য সেখানেই কারবারে মন্দা বা আন্দোলন—অব্যবস্থার ছায়া। ইহা অতি রূঢ় ও অপ্রিয় সত্য। ভাবোচ্ছ্বাসে আমরা নিজেদের সন্তান-সন্ততির শত দোষ চাপা দিতে চেষ্টা করি ভিন্ন প্রদেশীয়ের বাঙালী বিদ্বেষের অজুহাতে, পক্ষপাতিত্বের দোষে। কিন্তু কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বিচার

করিলে দেখা যায় যেখানেই বাঙালী, সেখানেই দাবি ষোল আনার উপর আঠার আনা, অথচ দায়িত্বের কোঠায়, কর্ত্তব্যের কোঠায়··· ?

এই দায়িত্বশূন্য বিচারবিহীন দাবি-দাওয়ার ফলে বাঙালীর যাহা ছিল সবই প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। লাভ কিছুমাত্র হয় নাই এবং হইতে পারে না। অনেক মহাবুদ্ধিমান আছেন যাঁহারা কাগজেকলমে যাদু দেখাইতে পারেন এবং বাক্যবাগীশ অনেক আছেন যাঁহারা কালোকে সাদা ও মিথ্যাকে সত্য করিয়া ভানুমতীর খেল প্রত্যহই দেখান এবং তাঁহাদের সকলেই কিছু বামপন্থী নহেন। কিন্তু বাম বা দক্ষিণ, উদ্বাস্তু বা বাস্তুঘুঘু, ইহারা সকলেই বাঙালী অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ব্যস্ত, শুধু যা অন্তে ইষ্টের বদলে হইতেছে অনিষ্ট।

এই উদ্বাস্তু-অভিযানে লাভ কাহারও নাই—এমনকি যে বুদ্ধিমানের দল তাহাদের নাচাইতেছেন তাঁহাদেরও নয়। লোকসান বেশীর ভাগ ঐ বামপন্থীদিগের অভাগা ক্রীড়াকন্দুকের, কেননা এই ভাবে তাহাদের দেহ-মন-প্রাণের অবনতি ত হইতেছেই, পরিশেষে যে কি হইবে তাহা এখন বুঝা যাইতেছে। লোক-সানের অন্য ভাগ এই পশ্চিম বাংলার অধিবাসীদিগের কেননা সরকারী অধিকারীবর্গের কৃপায় তাহারা এখন সর্ব্বক্ষেত্রেই বঞ্চিত ও উচ্ছেদিত হইতে চলিয়াছে এবং নির্ব্বীর্য্য জড়ভরতের যাহা হয় তাহাই হইতেছে।

এই কর্ম্মী-আন্দোলন যে ভাবে চলিতেছে তাহাতে ঘায়েল হইতেছে বাঙালী প্রতিষ্ঠানগুলিই। ব্যাঙ্ক ত বাঙালীর প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে, অন্য কাজকারবারও প্রায় সেই পথে। দৈনিক সংবাদপত্রে যাহা দেখা যায় তাহাতে অনেক কিছু উহ্য বা বিকৃত থাকে কিন্তু দেশের সন্তানদের গতিমুখ কোন দিকে তাহা বেশ বুঝা যায়। অথচ বাঙালীর প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান, প্রত্যেকটি কর্ম্মী ভাবে "অন্যের সর্ব্বনাশ হইতে পারে কিন্তু আমার কিছুই হইবে না।" সকলের চেয়ে এই অপরূপ উষ্ট্রপক্ষীভাবাপন্ন মতিগতি আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী সরকারের। দিনগত পাপক্ষয় হইলেই তাঁহাদের হইল। After me the deluge!

বেঙ্গল কেমিকেল বাঙালীর এক প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। উহা এককালে জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে বিবেচিত হইত কিন্তু পরিচালক-দিগের সিন্ধুঘোটক জাতীয় দৃষ্টিকোণের কৃপায় সে খ্যাতি বহুদিন গিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও উহা বাঙালীর কৃতিত্বের ও কার্য্য-কৌশলের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, সেই জন্য প্রত্যেক বাঙালীর উচিত উহার মঙ্গলকামনা করা। সম্প্রতি সেখানে নানা গণ্ডগোল হওয়ার ফলে একাংশে লক-আউট ও অন্য অংশে ধর্ম্মঘট চলিতেছে। দৈনিক সংবাদপত্রে শ্রমিকসঙ্ঘের পক্ষ হইতে অনেক কিছুই প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের কোনও বিবৃতি প্রথমে প্রকাশিত হয় নাই। পরে দেখা গেল তাহা প্রকাশিত হইল বিজ্ঞাপন হিসাবে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করায় আমরা যাহা শুনিলাম তাহা আশ্চর্য্যের বিষয়। তাহার পর বিবৃতিও পাইয়াছি, যাহার চুম্বক আমরা নিম্নের প্রসঙ্গে দিলাম। অন্য দিকের কোনও বিবৃতি আমরা পাই নাই যদিও সকল দৈনিক সংবাদপত্রে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে।

বেঙ্গল কেমিকেলের লক-আউট

বেঙ্গল কেমিকেলের লক-আউট ঘোষণার কথা আজ কাহারও অবিদিত নাই। সংবাদপত্রে এই সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় আমাদের দেশে যে কয়টি শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল, বেঙ্গল কেমিকেল তাহাদের মধ্যে অন্যতম। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এবং কর্ণধার রূপে পরিচালনার সকল দায়িত্ব লইয়া একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠানরূপে ইহাকে দাঁড় করাইয়াছেন শ্রীরাজশেখর বসু মহাশয়। এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে লক-আউট ঘোষণা সত্যই বড় দুঃখের কথা।

সম্প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের তরফ হইতে যে বিবৃতি আমরা পাইয়াছি তাহা সংক্ষেপে নিম্নে দিলাম:

"গত ১৯৫৬ হইতে ১৯৫৮ পর্য্যন্ত বেঙ্গল কেমিকেলের কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কর্ম্মীগণ নানারূপ আন্দোলন করিয়া আসিতেছেন। এই আন্দোলন ক্রমশঃই বিসদৃশ আকার ধারণ করিতে থাকে। প্রথমে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের নিকট হইতে দাবী আদায়ের অছিলায় তাঁহাকে গৃহমধ্যে আটক রাখা হয়। তিনি তাহাদের দাবী সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন বলা সত্ত্বেও, কয়েকজন কর্ম্মী তাঁহাকে গালাগালি এবং অপমান করে। ঐ কর্মীদের বিরুদ্ধে আইনসঙ্গতরূপে ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিলে, তাহারা পুনরায় উপদ্রব সুরু করে। যদিও শেষ পর্য্যন্ত কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই।

ইউনিয়ন নেতাদের পরামর্শে মাগগী ভাতাবিষয়ক প্রস্তাব ট্রাইবুনালে পাঠান হয়, কিন্তু উহা বিচারাধীন থাকাকালীন তাহাদের উস্কানীতে কর্ম্মীরা আবার উত্তেজিত হইয়া ফ্যাক্টরীর মধ্যেই নানারূপ বে-আইনী ও অসামাজিক পন্থা অবলম্বন করে। ইহার ফলে ফ্যাক্টরীর কাজকর্ম্ম একরূপ বন্ধই হইয়া যায়। তখন কর্ত্তৃপক্ষ ট্রাইবুনালের রায় সাপেক্ষে ১৩৬৩ অগ্রহায়ণ মাস হইতে প্রত্যেক কর্ম্মীকে মাসিক দুই টাকা অতিরিক্ত মাগগী ভাতা দিতে সম্মত হন। তবে কর্ত্তৃপক্ষ ছয় জন অপরাধী কর্ম্মীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন এবং একথা ট্রাইবুনালকেও জানান হয়। কিন্তু ইউনিয়ন নেতাদের পরামর্শে আবার তাহারা ধর্ম্মঘট সুরু করে। লেবার কমিশনারের মধ্যস্থতায় কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ বরখাস্ত-কর্ম্মীদের পুনরায় কাজে যোগ দিতে অনুমতি দেন।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, মাগগী ভাতা সম্পর্কে ট্রাইবুনালের চূড়ান্ত রায় বাহির হওয়া সত্ত্বেও, কর্ম্মীরা আবার ধর্ম্মঘট সুরু করে। শুধু তাহাই নহে, তাহারা পথে পথে মিছিল করিয়া কোম্পানীর কুৎসা করিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং ইউনিয়নের নেতারা কর্ম্মী-দের লইয়া সভা-সমিতিও করিতে থাকে। এই সব বক্তৃতার সার কথাই হইল তাহাদের উত্তেজিত করা। এতদ্‌সত্ত্বেও কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ ইউনিয়নের নেতাদের এই অনুরোধই করেন, যে সুপ্রীম কোর্ট হইতে স্থগিত-আদেশ না আসা পর্য্যন্ত যেন তাহারা কোম্পানী-বিরোধী কোন কাজ না করে। কিন্তু ইহাতে তাহারা কর্ণপাত না করিয়া কয়েকজন উপরিতন কর্ম্মীকে সম্পূর্ণ একরাত্রি

আটক করিয়া রাখে। তাহারা ফ্যাক্টরীর ভিতরে সভা করে এবং ফ্যাক্টরীর যাবতীয় সম্পত্তি দুই দিন পর্য্যন্ত নিজেদের দখলে রাখে। ইহার ফলে ফ্যাক্টরীর অত্যাবশ্যক দ্রব্যগুলি তছনছ হইয়া যায়। যাহা হোক, ইহার পরেও কোম্পানী কর্ত্তৃপক্ষ আপোষের মনোভাব লইয়া মাগগী ভাতার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ইহাতেও ইউনিয়ন নেতৃবর্গ নিরস্ত না হইয়া কর্ম্মীদের নিরন্তর উস্কাইতে থাকে এবং যাহাতে তাহারা বে-আইনী কার্য্যাদি অবলম্বন করে সে বিষয়ে পরামর্শও দেয়।

এই সব কার্য্যকলাপ দেখিয়া স্বতঃই মনে হয় নিয়ত গোলমাল চালু রাখাই ইহাদের উদ্দেশ্য। অতঃপর কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ কয়েকজন উপরিতন কর্ম্মচারীকে লইয়া একটি 'এনকোয়ারি কমিটি' গঠন করেন। এই কমিটির কাজ যখন পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে তখন নেতারা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিনাসর্ত্তে চার্জ্জসীটগুলি প্রত্যাহার করিয়া লইতে বলে। ইহাতেই তাহারা ক্ষান্ত হয় নাই—দুই শত কর্ম্মীদের সহযোগে তাহারা আমাদের স্পেশাল অফিসারকে আপিস-গৃহে আটক রাখিয়া তাঁহাকে অপমান এবং মারপিট পর্য্যন্ত করিয়াছে। এই মারপিট ততক্ষণ পর্য্যন্তই চলিতে থাকে, যতক্ষণ তাহাদের কথামত লিখিতপত্রে সহি না করেন। তিনি অস্বীকৃত হইলে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে লাথি মারিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। ইহার ফলে তাঁহার পরিধেয় কাপড় ছিঁড়িয়া যায়, ব্যবহৃত চশমাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাহারা আপিস অধিকার করিয়া টেলিফোন বন্ধ করিয়া দিয়া আপিসের যাবতীয় আসবাবপত্রের ক্ষতিসাধন করে। এই জয়ের উল্লাসে তাহারা নানারূপ শ্লোগান দিতে থাকে। এই গুরুতর অবস্থায় কোম্পানীর সম্পত্তি নাশ ও কর্ম্মচারীদিগের প্রাণসংশয় হওয়ায় কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষ গত ১লা মার্চ্চ ১৯৫৮ হইতে মাণিকতলার ফ্যাক্টরীতে লক-আউট ঘোষণা করিতে বাধ্য হন।

পানিহাটির কর্ম্মীরাও অত্যন্ত বিসদৃশ অবস্থার সৃষ্টি করায় কর্ত্তৃপক্ষ পানিহাটি ফ্যাক্টরীও অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হন।"

বেঙ্গল কেমিকেলের সম্মুখে হাঙ্গামা

বেঙ্গল কেমিকেলের পানিহাটি কারখানার সম্মুখে উক্ত কারখানার অনুগত শ্রমিক এবং ধর্ম্মঘটি শ্রমিকদের মধ্যে এক সংঘর্ষকালে পুলিস ২৫ রাউণ্ড কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করে ও লাঠি চালায়।

এই হাঙ্গামা সম্পর্কে ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। শ্রমিকদের উভয়পক্ষের কয়েকজন এবং হাঙ্গামা থামাইতে গিয়া পুলিসের কয়েকজন আহত হয়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, মানিক-তলায় বেঙ্গল কেমিকেলের কারখানায় লক-আউট ঘোষণার প্রতিবাদে উক্ত প্রতিষ্ঠানের পানিহাটি কারখানায় কয়েকদিন হইতে ধর্ম্মঘট চলিতেছে। ঘটনার দিন কারখানার অনুগত শ্রমিকগণ কারখানা অভিমুখে অগ্রসর হইলে ধর্ম্মঘটী শ্রমিকগণ তাহাদের বাধাদান করে। ফলে গোলমালের সৃষ্টি হয় এবং ক্রমশঃ সেই গোলমাল সংঘর্ষে পরিণতি লাভ করে। অবশ্য অবস্থা স্বল্পকালের মধ্যেই পুলিসের আয়ত্তাধীন হয়।

দুর্নীতি ও সরকারী কর্ম্মচারী

শাসকতন্ত্র ও রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্র দুর্নীতি-পরিপূর্ণ হওয়ায় দেশের যে অবনতি হইয়াছে, তাহার বিষময় ফলে এখন সমগ্র জাতি জর্জ্জরিত। এই দুর্নীতি দূর করিতে হইলে উভয় ক্ষেত্রেই পরিষ্কার করা প্রয়োজন। একটির উপর কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি পড়িয়াছে মনে হয়, নীচের সংবাদে :—

"১২ই ফেব্রুয়ারী—বুধবার লোকসভায় যখন ফৌজদারী আইন (সংশোধন) বিল গৃহীত হয়, তখন উক্ত বিলে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন করা হয়। দেশে বর্ত্তমান দুর্নীতিবিরোধী আইনসমূহ আরও কঠোরতর করার উদ্দেশ্যে এই বিল আনীত হইয়াছে। বিল-প্রণেতাগণ যেরূপ মনস্থ করিয়াছিলেন, এইরূপ সংশোধনের ফলে আইনটি তাহার চেয়ে আরও কঠোরতর রূপ পরিগ্রহ করে। এই সংশোধন অনুযায়ী দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত কোন সরকারী কর্ম্মচারী কারাদণ্ডাদেশ হইতে অব্যাহতি পাইবেন না।

রাজস্থান হইতে কংগ্রেস সদস্য শ্রী এন. সি. কাসলিওয়াল সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া দুর্নীতিবিরোধী আইনে এইরূপ সুদূরপ্রসারী পরিবর্ত্তন সাধন করেন।

স্বরাষ্ট্র বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী বি. এন. দাতার কর্ত্তৃক আনীত বিলে এইরূপ বিধান ছিল যে, আদালতকে যে ক্ষেত্রে প্রয়োজন হইবে, সেইরূপ ক্ষেত্রে দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্ম্মচারীকে সর্ব্বনিম্ন এক বৎসরের কারাদণ্ডাদেশ প্রদান করিতে হইবে। তবে লিখিত-ভাবে বিশেষ কারণ উল্লেখপূর্ব্বক আদালত কারাদণ্ডাদেশ প্রদান করা হইতে বিরত থাকিতে পারেন, অথবা এক বৎসরের কম কারা-দণ্ডাদেশ প্রদান করিতে পারেন।

'কারাদণ্ডাদেশ প্রদান করা হইতে বিরত থাকা' এই কথাটির দ্বারা আইনের যে ফাক সূচিত হইতেছে, তাহা দূর করিতে কংগ্রেস সদস্যদের পক্ষ হইতে এবং পার্লামেণ্টারী বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহের মধ্যস্থতায় শ্রীকাসলীওয়ালের সংশোধন প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য পীড়াপীড়ি করার ফলে শ্রীদাতার উহা গ্রহণ করিতে সম্মত হন। ইহার ফলে আদালত যদি মনেও করেন যে, এক বৎসর কারাদণ্ডাদেশ প্রদান না করার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে, তথাপি সংশ্লিষ্ট দুর্নীতিপরায়ণ কর্ম্মচারীকে আদালত মুলতুবী না হওয়া পর্য্যন্ত দণ্ডাদেশ ভোগ করিতে হইবে।

ইতিমধ্যে অর্থদণ্ড ছাড়াও সর্ব্বনিম্ন কারাদণ্ডাদেশ দুই বৎসর হইতে সর্ব্বাধিক দশ বৎসর পর্য্যন্ত করার জন্য যেসব সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, তাহা অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

যদি কোন সরকারী কর্ম্মচারীর প্রকাশ্য আয় হইতে তাহার আর্থিক সম্পদের পার্থক্য দেখা যায়, তাহা হইলে সরকার উক্ত কর্ম্মচারীকে দুর্নীতিপরায়ণ বলিয়া মনে করিতে পারেন বলিয়া মূল আইনে যে বিধান সন্নিবেশিত আছে, তাহা লইয়া সদস্যদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য দেখা যায়।"

পশ্চিম বাংলার বাজেট

বিগত কয়েক বৎসরের ন্যায় পশ্চিম বাংলার নূতন বৎসরের বাজেট ঘাটতি বলিয়া ধরা হইয়াছে। রাজস্ব খাতে ঘাটতির পরিমাণ ১·৭৬ কোটি হইবে এবং গত বৎসরের ২৭ লক্ষ টাকা ঘাটতি ধরিলে মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইবে ২·০৩ কোটিতে। মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সাহায্য ও দ্বিতীয় রাজস্ব বাঁটোয়ারা কমিশনের তীব্র সমালোচনা করেন। কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম বাংলাকে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান করিতে শুধু যে দেরী করেন তাহা নহে, এই প্রকার সাহায্য দিতে সহজে রাজী হন না। ঋণ হিসাবে যে সাহায্য দেন তাহার উপর অতিরিক্ত হারে সুদ আদায় করেন। বৈদেশিক ঋণের উপর কেন্দ্রীয় সরকার যে হারে সুদ প্রদান করেন, তাহার অপেক্ষা অধিক হারে প্রদেশগুলিকে ঋণ দেওয়ার বাবদ সুদ আদায় করেন। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য যে সাহায্য দেওয়া হয় তাহা উঁহাদের নিকট হইতে আদায় করিয়া পরিশোধের দাবী কেন্দ্রীয় সরকার করেন। কিন্তু এই ঋণ প্রকৃতপক্ষে আদায় করা যায় না।

নূতন বাজেট পরিকল্পনায় অবশ্য নূতন কোনও প্রকার করধার্য্য করা হয় নাই; ইহার কারণ এই যে, নূতন কোনও প্রকার করধার্য্য করার আর নূতন কোনও উৎস নাই। করধার্য্যের উৎস পশ্চিম বাংলায় নিঃশেষিতপ্রায়। গত বৎসরের বাজেটে বিক্রয়কর-হার বৃদ্ধি করা হইয়াছে ও প্রবেশ-কর ব্যাপকতর করা হইয়াছে; ইহার পর আর নূতন উৎস প্রায় দেখা যায় না। ১৯৪৮-৪৯ সনে পশ্চিম বাংলার রাজস্ব-আয় ছিল ৩২ কোটি টাকা ও ব্যয় ছিল ২৯ কোটি টাকা। ১৯৫৭-৫৮ সনে রাজস্ব-আয় হইবে ৬৮·৮৭ কোটি টাকা এবং ব্যয় হইবে ৭২·৬৯ কোটি টাকা; ঋণ প্রভৃতির আয় হইতে ঘাটতির পরিমাণ হ্রাস করা হইবে।

ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশে যখন বাজেটে উদ্বৃত্ত থাকে, তখন পশ্চিম বাংলার ক্রমাগত বাজেট ঘাটতি বিস্ময়কর। আয় বুঝিয়া ব্যয় করিলে পরমুখাপেক্ষী হইতে হয় না। ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলি নিজেরা অনেক শিল্প-উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজেদের আয়বৃদ্ধির উপায় করিয়াছে, কিন্তু বাংলাদেশ এই বিষয়ে একেবারে নিশ্চেষ্ট বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ বাংলাদেশেই সরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠা অতীব প্রয়োজনীয় কারণ শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা পশ্চিম বাংলাতেই সর্ব্বাধিক, মোট বেকারের ২২ শতাংশ বাংলা দেশে শিক্ষিত বেকার।

পশ্চিম বাংলায় একমাত্র ষ্টেট ট্রান্সপোর্টের দ্বারা বেকার সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা করা হইতেছে; কিন্তু ইহার সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ। বোম্বাই প্রদেশে ইদানীং বৃহৎ বৃহৎ কলকারখানা স্থাপিত হইতেছে, তাহাতে উত্তর-পশ্চিম ভারতের বেকার সমস্যা প্রায় নাই বলিলেই চলে। সম্প্রতি দুইটি যে বৃহৎ তৈল-পরিশোধন কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতেও বহু লোক কার্য্য পাইয়াছে। কিন্তু বাংলাদেশে পুরাতন পাটের কল ব্যতীত কার্য্য-সংস্থানের উপযোগী নূতন বৃহদায়তন শিল্প কিছু প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না, সেদিকে পশ্চিম বাংলার বিশেষ কোনও ঝোঁক নাই। ষ্টেট ট্রান্সপোর্টের মূলধনী ব্যয় সমস্তটাই প্রায় আসে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে। পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রের কার্পণ্যের বিষয়ে শুধু অভিযোগ প্রকাশ করেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন খাতে টাকা দিয়া যে সাহায্য করিয়াছেন ও করিতেছেন, সে সম্বন্ধে তিনি নীরব থাকেন। রাষ্ট্রীয় পরিবহন ব্যবস্থার প্রায় সমস্ত রুটেই ভাড়া বৃদ্ধি করা হইয়াছে। পূর্ব্বে ১০নং বাসে বালিগঞ্জ হইতে হাওড়া দশ পয়সা ভাড়া ছিল, ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট এই রুটটি লওয়ার পর হইতে ভাড়া করা হইয়াছে চৌদ্দ পয়সা। সমস্ত রুটে এবং মাধ্যমিক সীমানাগুলির মধ্যেও ভাড়া অত্যধিক হারে বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

পশ্চিম বাংলার করধার্য্য করার উৎসগুলি নিঃশেষিতপ্রায়। সুতরাং বর্ত্তমান কর যাহাতে ভাল করিয়া আদায় করা হয় সে দিকে নজর দেওয়া উচিত। কলিকাতায় এবং বাহিরে বিক্রয়কর বহুলাংশে ফাঁকি দেওয়া হয়। বিক্রয়করের পরিবর্ত্তে উৎপাদন-শুল্ক আরোপ করা প্রয়োজন, ইহাতে ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ থাকিবে না। সিমেণ্টের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লইয়া টন প্রতি ৫৲ টাকা করিয়া বিক্রয়কর বসাইলে রাজ্যের অনেক লাভ হইবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে পশ্চিম বাংলা কেন্দ্রের নিকট হইতে ৭৩·৭ কোটি টাকার সাহায্য পাইবে। ইহাতে দামোদর পরিকল্পনার ব্যয় অবশ্য ধরা হয় নাই। এই সাহায্য-পরিমাণের ২৫ কোটি টাকা দান হিসাবে পাওয়া যাইবে এবং তাহা পরিশোধ করিতে হইবে না। বাকী ৪৮·৭ কোটি টাকা ঋণ হিসাবে পাওয়া যাইবে। ২৫ কোটি দানের মধ্যে পশ্চিম বাংলা গত দুই বৎসরে সাড়ে ছয় কোটি টাকা পাইয়াছে এবং অবশিষ্ট ১৮·৫ কোটি টাকা আগামী তিন বৎসরে পাওয়া যাইবে। টাকার যখন অভাব তখন ক্রমাগত বৃহৎ বৃহৎ ইমারত কেন তৈয়ার করা হইতেছে তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না। এই অর্থে পশ্চিম বাংলায় কাপড়ের কল কিংবা যন্ত্র-শিল্প প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারিত। অন্যান্য প্রদেশে সেই চেষ্টাই করা হইতেছে। এই প্রদেশে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া অর্থের অপচয় করা হইতেছে এবং ইহার জন্য অভাব পড়িলেই কেন্দ্রের নিকট হইতে ঋণ লওয়া হইতেছে।

রাষ্ট্রভাষা ও মাতৃভাষা

'কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে' যে নিখিল ভারত-ভাষা সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গেল, তাহাতে সভাপতিরূপে ডঃ রাধাবিনোদ পাল ভারতের জাতীয় ভাষা ও সরকারী ভাষা সম্বন্ধে কি নীতি অবলম্বিত হওয়া উচিত সে বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি ইহার সমাধানকল্পে কয়েকটি নির্দ্দেশ দিয়াছেন। (১) সর্ব্বভারতীয় ভাষাটি এমন হওয়া চাই যাহা ভারতের জাতীয় ঐক্য রক্ষা করিতে ও উহাকে দৃঢ়তর করিতে

পারিবে। এই ঐক্যবোধ সংস্কৃত ভাষার উপরেই প্রতিষ্ঠিত, অন্য কোন ভাষার উপরে নহে; ইংরেজী ইহার সহায়তা করিয়াছে। (২) প্রশাসনিক কার্য্য যোগ্যতার সহিত চালাইতে হইলে দীর্ঘকালের জন্য ইংরেজীর প্রয়োজন হইবে। (৩) জ্ঞানের প্রসারের জন্য এবং উচ্চতর বিষয়ে অধ্যাপনার জন্য ইংরেজীর উপযোগিতা সমধিক। (৪) সকলকে সমান অধিকার দেওয়া হইবে এবং কাহাকেও কোন বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইবে না, ইহাই নীতি। অহিন্দী-ভাষীরা মনে করে হিন্দীর মারফতে ইহা সম্ভব নয়। (৫) স্বাধীন দেশের অধিবাসী হিসাবে ভারতবাসীদের আত্মমর্য্যাদা রক্ষার প্রশ্ন যদি বিবেচনা করা হয়, সেই হিসাবে সংস্কৃতকে গ্রহণ করাই আদর্শ হওয়া উচিত। ভারতের ন্যায় বহু ভাষাভাষী রাজ্যে ইংরেজীর ব্যবহারও চলিতে পারে।

ডঃ পান্ডের অভিভাষণের মধ্যে যে দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে অসুবিধার কথাও আমাদের চিন্তা করিতে হইবে।

সংস্কৃতকে সরকারী ভাষারূপে ঘোষণার দাবি এই প্রথম নহে। সত্য বটে, সংস্কৃত ভাষা ভারতের প্রাচীন ভাষা। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, দর্শন প্রভৃতি যাবতীয় শাস্ত্রগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষাতেই লেখা। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সহিত সংস্কৃত ভাষা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আজও ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান প্রভৃতিতে সংস্কৃত অপরিহার্য্য।

কিন্তু কথা হইতেছে, ইহাকে রাষ্ট্রভাষা করিতে হইলে যে বাধার সম্মুখীন হইতে হইবে তাহাও ঐ সঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। এই ভাষাকে যথেচ্ছ ব্যবহার করিবার মত সম্যক জ্ঞান বর্ত্তমানে আমাদের দেশে প্রায় কাহারও নাই বলিলেই চলে। ইহাকে আয়ত্ত করিতেও সময় লাগিবে। তাহা ছাড়া দেশ-বিদেশের জ্ঞান আহরণ করিতে হইলে ইংরেজী অপরিহার্য্য। বর্ত্তমান যুগ—বিজ্ঞানের যুগ। এই বিজ্ঞানের অনুশীলন করিতে হইলে এবং পৃথিবীর সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতে হইলে ইংরেজী ভাষার সাহায্য লইতেই হইবে। ইংরাজী আজ শুধুমাত্র একটি জাতির ভাষা নয়—ইহা বিশ্বজনীন ভাষা। আজ দেশের পরিধি সীমাবদ্ধ নয়—ভৌগোলিক সীমাকে অতিক্রম করিয়া পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে তাহার আর্থিক যোগসূত্রে। এই যোগসূত্র রাখিতে হইলে ইংরেজীকে রাখিতেই হইবে। রাজাজী ঠিক এই কারণেই ইংরেজীকে এতখানি প্রাধান্য দিয়াছেন।

এই একই কারণে হিন্দীকেও রাষ্ট্রভাষা করা চলে না। প্রাদেশিক ভাষা হিসাবে আপন আপন মাতৃভাষাই হইবে শিক্ষার বাহন। শিক্ষার সকল পর্য্যায়ে মাতৃভাষা ব্যবহার করার যে বাস্তব অসুবিধা তাহাও হয় ত অনুশীলন-প্রভাবে একদিন দূর হইবে। কিন্তু মাতৃভাষাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিলে, নদী-প্রবাহ বন্ধের মতই তাহার বিলুপ্তি ঘটিবে। সুতরাং সমস্যা খুব গুরুতর নয়—উদার মনোভাব লইয়া ইহার সমাধান অতি সহজেই হইতে পারে। জোর করিয়া কাহারও ঘাড়ে হিন্দী চাপাইবার চেষ্টা করিলেই অনর্থ হইবে।

ভাষাসমস্যা ও রাজাজী

হিন্দী কমিশনের অতি উৎসাহী মনোভাবে ভারতের সুস্থ জনমত সর্ব্বত্রই বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হইয়াছে। গত ৮ই মার্চ্চ সরকারী ভাষারূপে অবিলম্বে হিন্দী প্রবর্ত্তনের বিরোধিতা করিয়া কলিকাতায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক চক্রবর্ত্তী শ্রীরাজাগোপালাচারী যে ভাষণ দেন তাহার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। আমরা রাজাজীর ভাষণের অংশবিশেষ নীচে তুলিয়া দিলাম। রাজাজী বলেন:

ইংরেজী ভাষা একটি বিদেশী ভাষা এবং সেই কারণে উহাকে ভারতবর্ষের সরকারী ভাষারূপে রাখা যাইতে পারে না, ইহাই এই ভাষার বিরুদ্ধে একমাত্র আপত্তি। ইংরেজী ভাষার বিষয়-বস্তু, সরকারী কাজ চালাইবার এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলনের পক্ষে উহার যোগ্যতা প্রভৃতির বিরুদ্ধে একটি কথাও বলা হয় না। এক শত বৎসর ধরিয়া বা তাহারও অধিককাল ইংরেজী এই দেশে ব্যবহৃত হইয়াছে। উহার বিরুদ্ধে বলা হইতেছে যে, উহা একটি বিদেশী ভাষা—ফ্রাঙ্ক এন্টনীর কথায় ইংরেজী বিদেশজাত ভাষা। ইংরেজীকে যে বিদেশী ভাষা বলা হয় দক্ষিণ-ভারতে তাহার একটা প্রতিক্রিয়া হয়। দক্ষিণ-ভারতে হিন্দী ইংরেজীর মতই বিদেশী ভাষা। হিন্দী শব্দগুলি এবং হিন্দী ব্যাকরণও দক্ষিণ-ভারতে বিদেশী। হিন্দীবাদীরা যদি ইংরেজীকে পরভাষা বলিয়া উল্লেখ না করিতেন, তাহা হইলে দক্ষিণ-ভারতে হিন্দীর বিরোধিতা হয় ত কিছু কম হইত। হিন্দী সমর্থকরা ইহা বুঝিতে পারেন না। কোন লোককে যখন গোঁড়ামিতে পাইয়া বসে তখন তিনি অনেক বিষয় পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা নিজেদের সাধারণ বুদ্ধি খোয়াইতে সুরু করেন।

এক ভাষা ঐক্যের সহায়ক, এই যুক্তির উত্তরে তিনি বলেন যে, ইহা উল্টা যুক্তি। মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হইতে মেঘ হয় না। রোদ লাগিলে ঘাম হয়, ঘাম হইতে রোদ হয় না।

কারণ হইতে যে কার্য্যের সৃষ্টি হয়, সেই কার্য্যের দ্বারা কারণের পুনঃ সংঘটন হয় না। ব্রিটিশ আমলে আমরা স্বাধীনতার প্রতি অন্ধ-অনুরাগের বশে কিছুটা কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া বলিয়াছিলাম যে, একটি ভাষাকে আমরা রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিব। আজ যেহেতু আমাদের দেশে ঐক্য আসিয়াছে সেইহেতু আমরা এক ভাষার সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছি। কার্য্যকারণের সম্পর্ক এই ভাবে উল্টাইয়া দেওয়া অসম্ভব।

আমাদের দেশে বহু ভাষা, বহু ধর্ম্ম, এই অজুহাতে ইংরেজরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অধিকার অস্বীকার করিয়াছিল। আমরা স্বাধীন হইয়াছি বলিয়া কি এখন এক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিতেছি? আমরা এক জাতি হইয়াছি বলিয়া এক ভাষার সৃষ্টি করার চেষ্টাও এক ধর্ম্ম দেশময় করার চেষ্টার মত সমান ভ্রান্ত।

রাজাজী বলেন যে, পঞ্জাবে যাহা ঘটিতেছে তাহা হইতে

আমাদিগের শিক্ষা গ্রহণ করিবার আছে। বলা হইতেছে যে, হিন্দী জোর করিয়া চাপান হইতেছে। যাহা হইতেছে তাহা যদি জোর করিয়া হিন্দী চাপানো না হয় তাহা হইলে উহা যে কি, তাহা তিনি জানেন না। হিন্দী-সমর্থকরা দলীয় শৃঙ্খলার দ্বারা রাজ্য সরকার-গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। যদি রাজ্যগুলিকে যেমন-তেমন করিয়া রাজী করানো যায় এবং এত হৈ চৈ সত্ত্বেও হিন্দীকে যদি জোর করিয়া ঠেলিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে যে কি বিপদ ঘটিবে তাহা পঞ্জাবের ঘটনা হইতে শিখিতে হইবে।

তিনি প্রশ্ন করেন যে, হিন্দীর দ্বারা যদি ভারতবর্ষের ঐক্য সৃষ্টি করিতে হয় তাহা হইলে কি ইহা বুঝিতে হইবে যে, এখন ভারতবর্ষে ঐক্য নাই? যে ঐক্যের দ্বারা আমরা স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছি তাহা অপেক্ষা বেশী ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে যাওয়া বিপজ্জনক। রাজাজী বলেন যে, এই সম্মেলনই দেখাইয়া দিতেছে যে, হিন্দী ভাষা ভারতবর্ষের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে নাই।

রাজাজী বলেন যে, হিন্দীকে ভারতবর্ষের সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ করায় তাঁহাদের আপত্তি নীতিগত, এই আপত্তি সময়ের প্রশ্নে নহে অথবা হিন্দী ভাষা গ্রহণের জন্য তাঁহারা এখনও প্রস্তুত হন নাই, সেই কারণে তাঁহারা আপত্তি করিতেছেন না। হিন্দীকে যদি সরকারী ভাষা করিতে হয় তাহা হইলে যখন হইতেই তাহা করা হউক না কেন এখন হইতেই তাহার আয়োজন সুরু করিতে হইবে এবং একজন সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ হিসাবে রাষ্ট্র-পতিও এই সকল আয়োজন সুরু করিবার জন্য আগ্রহান্বিত। "হিন্দীকে যদি একটা খুব ভাল ভাষা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় তাহা হইলেও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে একটা বৈষম্য হইবে ইহা আপনারা মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন কি?" (সভার মধ্য হইতে 'না', 'না' ধ্বনি)। হিন্দীভাষীদের মাতৃভাষা যদি সর্ব্বোচ্চ পর্য্যায়ে সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃত হয় তাহা হইলে হিন্দী যাঁহাদের মাতৃভাষা নহে, তাঁহারা স্বতঃই মর্য্যাদায় খাটো হইয়া যাইবেন।

রাজাজী বলেন, 'আসল কথা হইল তাঁহারা ভারতবর্ষের এক ভাষার সহিত আর এক ভাষার বৈষম্য করার বিরোধী।'

তিনি বলেন যে, হিন্দী ভারতবর্ষের একটি প্রধান ভাষা এবং হিন্দী যথাসাধ্য শিক্ষা করা উচিত, ইহা তিনি স্বীকার করেন। 'কিন্তু অকস্মাৎ হিন্দীভাষীরা বিজয়ী বীর বলিয়া ঘোষিত হইয়া যাউক, ইহা আমরা কখনও মানিয়া লইতে পারি না। ভোটের জোরে তাঁহারা রাজত্ব করুন, যে ভাষা আমার মাতৃভাষা নহে তাহার জোরে অন্ততঃ তাঁহারা যেন রাজত্ব না করেন।'

ভারত ও ব্রিটিশ পত্রপত্রিকা

ব্রিটিশ পত্রপত্রিকাগুলি ভারতীয় ঘটনাবলী সম্পর্কে এক অদ্ভুত মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেয়। সকল পত্রিকা সম্পর্কে এই কথা সমান ভাবে প্রযোজ্য না হইলেও অধিকাংশ পত্রপত্রিকাই যে, ভারত সম্পর্কে বিশেষ বিরূপ মনোভাব পোষণ করিয়া থাকে তাহা বিশেষরূপে সত্য। চাগলা কমিশন সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলির মন্তব্য হইতে এই উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণ হয়। ভারতীয় জীবনবীমা কর্পোরেশনের অর্থ শ্রীহরিদাস মুন্দ্রা নামক এক বিশেষ ব্যক্তি পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলির শেয়ার ক্রয়ে নিয়োজিত হওয়ায় পার্লামেণ্টে ফিরোজ গান্ধী যে প্রশ্ন উত্থাপন করেন তাহার ফলেই ভারত সরকার বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীমহম্মদ করিম চাগলাকে লইয়া একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেন। চাগলা কমিশন বীমা কর্পোরেশনের অর্থলগ্নী ব্যাপারে প্রত্যক্ষ ভাবে এবং পরোক্ষ ভাবে যাঁহারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন, সেই সকল সরকারী এবং বেসরকারী ব্যক্তিদিগের সকলের বক্তব্য শ্রবণ এবং সাক্ষ্য গ্রহণের পর রায় দেন যে, উপরোক্ত বিনিয়োগের জন্য বিশেষ ভাবে দায়ী অর্থমন্ত্রী শ্রীথাট্টাই থিরুমল কৃষ্ণমাচারী এবং তাঁহার বিভাগীয় প্রধান সচিব শ্রীএইচ. এম. প্যাটেল। সাধারণ ভাবে কোন সৎ ভারতবাসীই তদন্ত কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে বলিবার কিছু খুঁজিয়া পান নাই। কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্য প্রদানকালে উচ্চতর সরকারী কর্ম্মচারীদের ব্যবহারের যে সকল অসঙ্গতি প্রকাশিত হয় তাহাতে সকলেই বিশেষ উদ্বিগ্ন হন। বিশেষ ভাবে অর্থমন্ত্রী এবং তাঁহার বিভাগীয় প্রধান সচিবের ব্যবহারে সকলের মধ্যেই জিজ্ঞাসার মনোভাব দেখা দেয়।

দেখা যাইতেছে যে, একদল ব্রিটিশ সংবাদপত্রের নিকট এই সকল তথ্যের কোন গুরুত্বই নাই। চাগলা কমিশনের তদন্তে ভারতের শাসনব্যবস্থার যে সকল ত্রুটিবিচ্যুতি প্রকাশিত হইয়াছে ব্রিটিশ পত্রিকাগুলি তাহার কারণ এবং প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে কোনরূপ আলোচনা না করিয়া সমস্ত তদন্তটিকেই নিন্দা করিয়াছে। তদন্তে প্রকাশিত ত্রুটিবিচ্যুতি অপেক্ষা তদন্ত অনুষ্ঠানের ব্যাপারটির প্রতিই বিশেষ ভাবে এই সকল পত্রিকার লক্ষ্য পড়িয়াছে। তাহা-দের মন্তব্য হইতে এই কথাই ফুটিয়া বাহির হয় যে ভারতের যাহাই ঘটুক না কেন, কৃষ্ণমাচারী এবং প্যাটেল থাকিলেই তাহারা নিশ্চিন্ত। লণ্ডনের প্রখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ইকনমিষ্ট' ২২শে ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় যে ধরণের মন্তব্য করিয়াছে তাহা উপরোক্ত দৃষ্টি-ভঙ্গীরই পরিপোষক। উক্ত প্রবন্ধে পত্রিকার লেখক এই বলিয়া অশ্রুপাত করিয়াছেন যে, একজন কর্ম্মদক্ষ অর্থমন্ত্রী (কৃষ্ণমাচারী) এবং একজন অতিপরিশ্রমী সেক্রেটারী (প্যাটেল)কে চাপে পড়িয়া সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হইল। ইহাদের দুই জনের ব্যবহারে যে অসঙ্গতি কমিশনের তদন্তে প্রকাশ পাইয়াছে প্রবন্ধ লেখক সে সম্পর্কে অবশ্য কোন কিছুই বলা প্রয়োজন বোধ করেন নাই। অপরপক্ষে লেখক এমন কথাই বলিতে চাহিয়াছেন যে, কমিশন নিয়োগের ব্যাপারে এই তথ্যই প্রকাশিত হইয়াছে, সরকারের মন্ত্রিমণ্ডলী এবং স্থায়ী কর্ম্মচারীদের মধ্যে এক সংঘর্ষ চলিতেছে।

কোন বিষয় সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্ত হইলে তাহাতে সৎ এবং

কর্ম্মক্ষম কর্ম্মীদের ভয়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না। যাঁহারা এইরূপ নিরপেক্ষ তদন্তে আপত্তি জানায় স্বভাবতঃই তাহাদের উপর সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। মুন্দ্রা শেয়ার ক্রয়সংক্রান্ত সকল তথ্য যে প্রকাশিত হয় নাই, বিচারপতি শ্রী চাগলা, প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু, বিভিন্ন দায়িত্বশীল সংবাদপত্র এবং পার্লামেন্টের সদস্যগণ একবাক্যে সকলেই তাহা বলিয়াছেন। পরিপূর্ণ তথ্য জানার জন্য অপর একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগ করা উচিত কিনা সে সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা চলে। এইরূপ পরিপ্রেক্ষিতে যদি কেহ মন্ত্রীমণ্ডলী এবং উচ্চতর সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে বিরোধের অজুহাতে পরিপূর্ণ তথ্যানুসন্ধানে বাধা দেয় তবে তাহার পিছনে বিশেষ কোন অভিসন্ধি থাকাই স্বাভাবিক। ইকনমিষ্টের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাতে মনে হয়, ভারতের শাসনতান্ত্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে যাহাতে পরিপূর্ণ অনুসন্ধান-কার্য্য না চালান হয় তাহার জন্য ভারতে এবং বিদেশে প্রভাবশালী মহল সচেষ্ট রহিয়াছে। তাহা না হইলে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত ভারতীয় সিভিল সার্ভিস (রিটায়ার্ড) এসোসিয়েশনের সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবটির কোন অর্থ খুজিয়া পাওয়া যায় না। প্রাক্তন ইংরেজ আই-সি-এসদের সমিতির প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, যে সকল আই-সি-এস গত দশ বৎসর যাবত বিশেষ কৃতিত্বের সহিত ভারতের সেবা করিয়া আসিতেছেন তাহাদের উচ্ছন্ন দিবার জন্যই একদল নীতিজ্ঞানশূন্য, স্বার্থান্বেষী রাজনীতিবিদ চাগলা কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন। একজন হাইকোর্টের বিচারক সকলের সাক্ষ্য গ্রহণের পর যে রায় দেন এই সকল "ভারতপ্রেমিক" ব্রিটিশ নাগরিকদের নিকট তাহার কোনই মূল্য নাই। এইরূপ ধৃষ্টতামূলক প্রস্তাব সম্পর্কে কোন মন্তব্য করার কোন প্রয়োজন নাই, সকল ভারতবাসীই ইহার নিন্দা করিবেন। কিন্তু এখানে একটি কথার উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। এই প্রাক্তন আই-সি-এসদের সমিতির এক সভায় স্বয়ং রাণী এলিজাবেথ আসিয়া একটি স্মারক-ফলকের উদ্বোধন করেন। ভারতে ১৮৫৮ সন হইতে ১৯৪৭ সন পর্য্যন্ত যে সকল আই-সি-এস কর্ম্মচারী কাজ করিয়াছিল তাঁহাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যেই ফলকটি স্থাপিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে লণ্ডনস্থিত ভারতের হাইকমিশনার শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। মুন্দ্রা বিষয় সম্পর্কে উক্ত সমিতি যে প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন তাহা বিশেষ পুরাতন নহে—ঐ প্রস্তাবে ভারত সরকার সম্পর্কে যে প্রত্যক্ষ দোষারোপ করা হইয়াছে শ্রীবিজয়লক্ষ্মী তাঁহার প্রতিবাদ করিয়াছেন কিনা সে সম্পর্কে কোন সংবাদ প্রকাশিত হয় নাই। আমরা এই বিষয়ে ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ওয়াকফ আইনের সংশোধন দাবী

শ্রীমবিনল হক্ সম্পাদিত সাপ্তাহিক "বর্দ্ধমানবাণী"র একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হইয়াছে :

"পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আধা অধীন পশ্চিমবঙ্গ ওয়াকফ বিভাগের কার্য্য কিভাবে পরিচালিত হয় তাহার সংবাদ বোধ হয় কেহই রাখেন না। রাখিলে বুঝিতে পারা যাইত যে, এই বিভাগটি কেন আছে, কাহার জন্য আছে এবং কিসের জন্য আছে। প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দী হইতে চলিল বঙ্গীয় ওয়াকফ আইন প্রস্তুত করিয়া ওয়াকফ এষ্টেটসমূহের খবরদারীর ভার লওয়া হয়। আইন এমন যে, করিবার কিছুই নাই। শুধু ওয়াকফ এষ্টেট হইতে সেস জাতীয় একটি অর্থ গ্রহণ করা এবং তাহা কর্ম্মচারীদের মাহিনা ইত্যাদি বাবদ ব্যয় করা। তাহাও আবার সব সময় হয় না—এমন এক একটা পাবলিক ষ্টেট আছে যাহার লক্ষাধিক টাকা আদালতে জমা হইয়াছে। সেই অর্থ তুলিয়া একটা কল্যাণমূলক কোন কাজ করিবার আগ্রহ ওয়াকফ কমিশনারের নাই—আইনও হাতে ক্ষমতা দেয় নাই। শোনা গিয়াছিল ওয়াকফ আইন সংশোধন করা হইবে—কিন্তু সেরূপ কোন আয়োজনের সংবাদ আমরা পাই নাই। সত্বর ওয়াকফ আইন সংশোধন না করিলে এই বিভাগ রাখার কোন যৌক্তিকতা আছে বলিয়া মনে করি না। আগামী বাজেট অধিবেশনে ওয়াকফ বিল উত্থাপিত হইতে দেখিলে সুখী হইব।"

ওয়াকফ দেবোত্তর ইত্যাদির মূল উদ্দেশ্য পুত্র-কলত্রের অন্ন-সংস্থান-ব্যবস্থা নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ করা। দেবতার নাম শুধু সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য দেওয়া হয় যাহাতে ঋণদায়ে বা অন্য কারণে তাহা বিক্রয় বা নষ্ট না হয়। এতদিন এই কারণেই ঐরূপ সম্পত্তির কোনও মা-বাপ ছিল না। কিন্তু এখন সময় হইয়াছে ঐ সকল প্রথারই সংশোধন করা এবং সাধারণের হিত-সাধনে উহার আয়ের আংশিক ভাগ প্রয়োগ করা। আমরা সহযোগীর মত সমর্থন করি।

কর্ম্মরতা নারীদের সমস্যা

১৭ই মার্চ, জেনেভাতে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিশ্বের কর্ম্মরতা নারীদের পারিবারিক সমস্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা হইবে। পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে নারীরা সাংসারিক জগতের বাহিরে নানারূপ কর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়াছেন—এই সমস্যা সেইহেতু পাশ্চাত্ত্য নারীদের সমস্যা হইলেও ভারতেও বহু নারীর জীবনেই এই সমস্যা দেখা দিয়াছে। যুদ্ধোত্তর যুগে ভারতীয় রাষ্ট্র ও সমাজে নারীদের ভূমিকার গুরুত্ব বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে কয়লার খনি, কাপড়ের কল এবং অন্যান্য কয়েকটি শিল্পে নিম্নতন পর্য্যায়ের কাজের মধ্যেই নারীদের ভূমিকা সীমাবদ্ধ ছিল। শিল্পের বাহিরে নারীদের কর্ম্মক্ষেত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে শিল্প, রাষ্ট্রশাসন এবং সাংস্কৃতিক সংস্থা প্রভৃতির সর্ব্বস্তরেই নারী-কর্ম্মীর সংখ্যা বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। গৃহস্থালীর বাহিরে নানা কাজে নারীদের ক্রমবর্দ্ধমান অংশ গ্রহণের ফলে পাশ্চাত্ত্য সমাজের ন্যায় ভারতীয় সমাজেও কর্ম্মরতা নারীদের সাংসারিক জীবন পুনর্গঠনের প্রশ্ন গুরুত্ব লাভ করিয়াছে।

বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে কর্ম্মরতা নারীদের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা লইয়া সম্প্রতি একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্টটি প্রকাশ করিয়াছেন রাষ্ট্রসংঘ। উক্ত রিপোর্টে দেখা যায় যে, ব্রিটেন এবং ফিনল্যাণ্ডে স্বামীরা গৃহস্থালীর কার্য্যে স্ত্রীদের যথেষ্ট সহায্য করিয়া থাকে। কোপেনহেগেনের নারীদের অবস্থা সম্পর্কিত রিপোর্টে প্রকাশ যে, কর্ম্মরতা নারীদের শতকরা নয় জন কোন সাংসারিক কাজ করে না। অপরপক্ষে সর্ব্বক্ষণ কর্ম্মরতা নারীদের এক-চতুর্থাংশের স্বামীরা তাহাদের স্ত্রীদের রান্নাবান্নার কাজে সাহায্য করিয়া থাকে। উত্তর-আয়র্লণ্ডেও স্বামীরা এখন গৃহস্থালীর কাজকে কর্ত্তব্যের অঙ্গ বলিয়া ধরিয়া লইতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু ফ্রান্স এবং অষ্ট্রিয়াতে শ্রমিক স্বামীরা তাহাদের স্ত্রীদের বাহিরের কাজে যোগদান করিতে দিতে অনিচ্ছুক।

কর্ম্মরতা মহিলাদের সন্তানসন্ততিদের উপর তাহাদের অনুপস্থিতির প্রভাব কিরূপ সে সম্পর্কে মতপার্থক্য রহিয়াছে। একদল মনে করেন যে, দীর্ঘসময় মায়ের অনুপস্থিতিতে সন্তানদের শারীরিক এবং মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়। কিন্তু একটি অষ্ট্রিয়ান গবেষণার ফলে বলা হইয়াছে যে, অত্যধিক মাতৃস্নেহপ্রাপ্ত সন্তান অপেক্ষা কর্ম্মরতা মায়েদের সন্তানদের বিকাশ সুষ্ঠুতর হওয়া স্বাভাবিক।

কর্ম্মরতা রমণীদের মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা সম্পর্কেও মতপার্থক্য রহিয়াছে। কর্ম্মরতা রমণীদের শারীরিক এবং মানসিক প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়া যায় এবং সাংসারিক গোলযোগের সৃষ্টি হয়। স্বামী এবং স্ত্রী অধিকাংশ সময় পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকায় তাহাদের রুচি এবং মতবিরোধের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় এবং গৃহবিবাদের সম্ভাবনা দেখা দেয়। শিল্পপ্রধান দেশগুলিতে স্ত্রীলোকগণ অধিক সংখ্যায় বাহিরে কর্ম্মরত থাকায় জন্মহারের অনভিপ্রেত অবনতি ঘটিয়াছে বলিয়াও অনেকের ধারণা।

কিন্তু কয়েকটি দেশের রিপোর্টে দেখা যায় যে, বাহিরের কর্ম্মেরত থাকিলে স্ত্রীলোকদিগের কয়েকটি দিকে উন্নতিও ঘটিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে গৃহস্থালীর বাহিরে কর্ম্মগ্রহণের পর স্ত্রীলোকদিগের স্বাস্থ্য এবং মনের উন্নতিও পরিলক্ষিত হইয়াছে। কোপেনহেগেনের একটি রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, যদিও দেখা যায় যে বাহিরের কর্ম্মেরতা রমণীরা অন্যান্যদের অপেক্ষা একটু বেশী অসহিষ্ণু হয় কিন্তু গৃহকর্ম্মেরতা রমণীরা অসহিষ্ণু হয় তাহার দ্বিগুণ।

ভারতে অদূরভবিষ্যতে আরও বহু নারী গৃহস্থালীর বাহিরের কার্য্যে নিযুক্ত হইবে। ইতিমধ্যেই কর্ম্মরতা নারী আমাদের সমাজের একটি বিশেষ অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশগুলি এ সম্পর্কে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে, আমাদের সমাজও ইতিমধ্যে তাহার সম্মুখীন হইয়াছে। অচিরেই এই সমস্যা আরও বৃদ্ধি পাইবে। এ সম্পর্কে জেনেভাতে যে সকল আলাপ-আলোচনা চলিবে তাহা পাঠে স্বভাবতঃই আমাদের সমাজ-নায়ক এবং বুদ্ধিজীবিগণ উপকৃত হইবেন।

কাছাড় ও ষ্টীমার সমস্যা

সম্প্রতি আসামের কাছাড় জেলার অঞ্চলবিশেষে ষ্টীমার সার্ভিস বন্ধ হইবার যে আশঙ্কা দেখা দিয়াছে, সেই সম্পর্কে আলোচনা করিয়া করিমগঞ্জের "যুগশক্তি" লিখিতেছেন :

"বিদেশী-পরিচালিত জয়েণ্ট ষ্টীমার কোম্পানী যে কারণেই হউক এদেশে তাহাদের কারবার ক্রমশঃ গুটাইবার উদ্দেশ্যে কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে। ফলে বিহারে তাহাদের জাহাজ চলাচল বন্ধ হইয়াছে এবং আসামেও এই কর্ম্মপন্থা অনুসৃত হইতে যাইতেছে। ইতোমধ্যে আসামের ডিব্রুগড় এজেন্সি, এস, পি, আর, টি সার্ভিস এবং কোন কোন ষ্টীমার ষ্টেশন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন কলিকাতা-কাছাড় লাইন বন্ধ করার প্রস্তুতি হিসাবে করিমগঞ্জ হইতে শিলচর পর্য্যন্ত মধ্যবর্ত্তী জাহাজ ষ্টেশনগুলি বন্ধ করিয়া দিবার পরিকল্পনা হইয়াছে।"

"জলপথে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের বন্দরসমূহ, বিশেষতঃ কলিকাতার সহিত কাছাড় তথা আসামের জাহাজ-চলাচল ব্যবস্থা অব্যাহত না থাকিলে এখানকার লোকের দুর্দ্দশার অন্ত থাকিবে না। শুধু লিঙ্ক লাইনের রেলগাড়ীর উপর নির্ভর করিলে সম্প্রতি চিনির ব্যাপারে যে শোচনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল, অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বেলাও অহরহ তাহা ঘটিবে। এই অবস্থায় নদীপথ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য। অবশ্য পাকিস্থানের মধ্য দিয়া জাহাজ চালাইবার অসুবিধা আছে তাহা আমরা জানি। কিন্তু তজ্জন্য হাত-পা গুটাইয়া আমাদিগকে বসিয়া থাকিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই।"

সমুদ্রের স্বত্ব

উড়িষ্যা সম্প্রতি সমুদ্রের স্বত্ব লইয়া পশ্চিমবঙ্গকে হুমকি দিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের মাছ-ধরা ট্রলার সমুদ্রোপকূলে কিছুদিন ধরিয়া মাছ ধরিতেছে। উড়িষ্যা সরকার ইহাতে আপত্তি তুলিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, সরকার ঐ সীমানা উড়িষ্যার ধীবরদের ইজারা দিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ এখানে অনধিকার প্রবেশ করিয়া ধীবরদের ব্যবসায়ে ক্ষতিই করিতেছেন।

উড়িষ্যা সরকারের এইরূপ হাস্যকর যুক্তির প্রত্যুত্তরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবশ্য বলিয়াছেন, উড়িষ্যা সরকারের এইরূপ আপত্তি করিবার কোন অধিকার নাই। কারণ উহা হইল ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বত্ব, ভারতের আঞ্চলিক অধিকার—উহা কোন রাজ্যবিশেষের এলাকা হইতে পারে না। তাহা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমুদ্রে মাছ-ধরার উদ্যোগ, একটি ব্যবসায়িক উদ্যোগ। সংবিধান অনুযায়ী ভারতের যে-কোন অঞ্চলের লোক ভারতের যে-কোন স্থানে গিয়া ব্যবসা করিতে পারে। এই মৌলিক অধিকারে কেহ বাধা দিতে পারে না। বাধা দিলে সাংবিধানিক নীতিকেই ক্ষুণ্ণ করা হইবে।

উড়িষ্যা সরকার বলিয়াছেন, ধীবরদের ঐ এলাকা তাঁহারা ইজারা দিয়াছেন। এই যুক্তিও হাস্যকর। কাহার জায়গা কে ইজারা দিতেছে—এই অধিকারই বা তাঁহাদের কে দিল? একই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত পাশাপাশি রাজ্যগুলির এইরূপ মনোভাব সত্যই বেদনাদায়ক। ইহা সাম্প্রদায়িকতাকেই স্মরণ করাইয়া দেয়।

বেকার বৃদ্ধিতে আশঙ্কা প্রকাশ

কলিকাতায় বেকারের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে আতঙ্কিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। ব্যাঙ্ক, সওদাগরী আপিস, বীমা কোম্পানী, কারবারী সংস্থা, পেট্রোল বিক্রয়, কেন্দ্র-প্রভৃতির ছয়টি প্রধান কর্মী প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই রাজ্যের মুখ্য-মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নিকট ইহার ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়াই এক স্মারকলিপি পেশ করিয়াছে। কাজের অভাবে হাজার হাজার নিম্নমধ্যবিত্ত কর্মী বেকার হইয়া যাইবে—ইহাই ঐসব প্রতিষ্ঠানের উৎকণ্ঠা।

তাঁহারা মুখ্যমন্ত্রীকে জানাইয়াছেন, ইহার মধ্যেই কতক লোকের চাকরি গিয়াছে—অবস্থা ক্রমশঃই অবনতির দিকে যাইতেছে। ইহা রোধ করিতে না পারিলে, শিল্পক্ষেত্রগুলি অচল হইয়া যাইবে।

বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন, ফেডারেশন অব মার্কেণ্টাইল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নস, ওভারসিজ এণ্ড ইনল্যাণ্ড ইনস্যুরেন্স এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন, পেট্রোলিয়াম ওয়ার্কমেনস এসোসিয়েশন এবং ইনস্যুরেন্স এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন এই স্মারক-লিপিতে স্বাক্ষর করিয়াছে।

এই সব সংস্থা-পরিচালকদের অনুমান, বিদেশী মুদ্রার বিনিময় ও আমদানী-নীতি এবং কোম্পানী আইনের বিধান পরিবর্ত্তনের ফলেই আপিসগুলিতে এইরূপ ব্যাপক ছাঁটাই সুরু হইয়াছে এবং অনেক আমদানীকারক ইহার মধ্যে বহু কর্মীর উপর ছাঁটাই পত্রাঘাতও করিয়াছে।

ব্যবসায়-কারবার গুটাইয়া লইয়া অথবা পশ্চিম বাংলা হইতে সদর কার্য্যালয়গুলি স্থানান্তর করিয়া অবস্থা আরও জটিলতর করিতেছে ইহাও তাহাদের অভিমত।

এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের কো-অর্ডিনেশন কমিটি মুখ্যমন্ত্রীকে এই সম্পর্কে তাহাদের এক প্রতিনিধিমণ্ডলীর সহিত আলাপ-আলোচনার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। এই সঙ্গে একথাও উঠিয়াছে, প্রতিকার না হইলে এক ব্যাপক আন্দোলন সুরু করা হইবে।

কলিকাতার বস্তী অপসারণ

কলিকাতার বস্তীগুলি যে কোনও সভ্যসমাজের গ্লানির বস্তু। বিগত প্রায় কুড়ি বৎসর ধরিয়া এই বস্তীসমূহ অপসারণ করিবার প্রচেষ্টা করা হইতেছে, কিন্তু তাহা কার্য্যকরী হয় নাই। কলিকাতার বস্তী-এলাকা প্রায় ৪,০৫১'৪৫ বিঘা ব্যাপিয়া বিস্তৃত। বস্তীতে প্রায় ১,৩২,৮০০ পরিবার বাস করে এবং ইহাদের মোটসংখ্যা ৫'৩১ লক্ষ। বস্তীর কোনও কোনও লোকের মাসিক আয় দুই হাজার টাকার অধিক। যে সকল পরিবারের মাসিক আয় সাড়ে তিনশ' টাকার অধিক তাহাদের সংখ্যাও যথেষ্ট। বস্তীবাসীদের ৫৮ শতাংশের মাসিক আয় ১০০৲ টাকার অনধিক, ৩২ শতাংশের আয় ১০১৲-২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ছয় শতাংশের আয় ২০১৲-৩৫০৲ টাকা এবং দুই শতাংশের মাসিক আয় ৩৫১৲-৭০০৲ টাকা। যাহাদের মাসিক আয় ৭০০৲ টাকার অধিক তাহাদের সংখ্যা ০'৩৮ শতাংশ। মোট অধিবাসীর ৬২ শতাংশ বাঙ্গালী, ২৫ শতাংশ বিহারী, ৫ শতাংশ উত্তরপ্রদেশের অধিবাসী, ০'১৫ শতাংশ মাড়োয়ারী ও ০'১৫ শতাংশ মদ্রদেশবাসী। বস্তীর ৭৭ শতাংশ বাড়ী কাঁচা এবং অবশিষ্টাংশ পাকা। ৮৪ শতাংশ অধিবাসী ভাড়াটে হিসাবে বাস করে এবং বাকী অংশ বস্তীর মালিক। একখানি ঘরের জন্য ভাড়া মাসে ১১৲ টাকা হইতে ২২৲ টাকা পর্য্যন্ত হয় যদি বৈদ্যুতিক আলো থাকে। যেখানে বৈদ্যুতিক আলো নাই সে সকল ঘরের ভাড়া মাসে ১০৲ টাকা হইতে ১৩৲ টাকা পর্য্যন্ত হয়। প্রতি ঘরে গড়ে সাড়ে তিন জন অধিবাসী বাস করে। অধিকাংশ বস্তীতেই পরিষ্কার জলের বন্দোবস্ত নাই। ৩৫ শতাংশ কাঁচা ঘরে এবং ২৭ শতাংশ পাকা ঘরে জল-সরবরাহের কোনও প্রকার বন্দোবস্ত নাই।

বস্তী-অপসারণের জন্য সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে বিলটি আইন-পরিষদে উত্থাপন করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতবিরোধ দেখা দিয়াছে। এই বিলটির বিরুদ্ধে বিরোধী দল বিরোধিতা করিবে তাহা স্বাভাবিক, কিন্তু আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান যথা, ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যানও বিলটিকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেন নাই। বস্তী-উন্নয়নের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বস্তির অপসারণ, কিন্তু সেই সঙ্গে অধিবাসীদের অপসারণ যেন অতি অবশ্য না হয়। বর্ত্তমানে জমির মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় বস্তির মালিকরা বস্তি অপসারণ করিতে খুবই উৎসাহী, কিন্তু এই কয়েক লক্ষ গরীব অধিবাসী কোথায় যাইবে?

কয়েকমাস পূর্ব্বে দক্ষিণ কলিকাতার একটি জনবহুল বস্তী আগুনে ভস্মীভূত হইয়া যায়, কি কারণে আগুন লাগে সে সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ তেমন কোনও অনুসন্ধান করেন নাই, কিন্তু আগুন লাগার কারণ যে খুব স্বাভাবিক কিংবা আকস্মিক ছিল তাহাও মনে হয় না। এই বস্তীর বর্ত্তমান মালিক কে বা কাহারা? এই বস্তিটিকে সরকারী আয়ত্তে আনা অতি অবশ্য প্রয়োজনীয়। ব্যক্তিগত মালিকরা যেন এই সুযোগে জমি বিক্রয়ের ফাটকাবাজী খেলিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা উপায়-উদ্দেশ্যে গরীব অধিবাসীদের গৃহহারা করিতে না পারেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বেচু চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীটের একটি বস্তিকে একেবারে তুলিয়া দেওয়া হয়। গরীব অধিবাসীদের যখন গৃহচ্যুত ও বিতাড়িত করা হয় তখন কর্ত্তৃপক্ষ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন ছিলেন। বস্তীগুলিতে গরীবদের সংখ্যাই অধিক, প্রায় ৫৮ শতাংশ। সুতরাং বস্তিগুলিকে অপসারণ না করিয়া

উন্নয়ন করা প্রয়োজন। যাহাদের মাসিক ১০০৲ টাকার অনধিক আয় তাহাদের সকলকেই উন্নত বস্তিতে বাস করিতে দিতে হইবে। ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টকেই বস্তি-উন্নয়নের ভার দেওয়া উচিত ছিল।

বস্তী অপসারণে সমস্যা কোথায়

বস্তী সংস্কারের কথা ইহার পূর্ব্বে বহুবার হইয়াছে। কিন্তু কোন চেষ্টাই ফলবতী হয় নাই। সত্য বটে, বস্তীগুলি নাগরিক সভ্যতার বিঘ্ন ঘটাইতেছে এবং স্বাস্থ্যের পক্ষেও ইহা ক্ষতিকর। কারণ ইহার পয়ঃপ্রণালী, পায়খানা, জল-সরবরাহের ব্যবস্থা এবং বাসগৃহের ধরণধারণ এমন পরিবেশ গড়িয়া তুলিয়াছে যে, তাহা মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতিকূল। এই বস্তী-সংস্কার সম্বন্ধে যাঁহারাই চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহারা বস্তীকে যথাযথ রাখিয়া সংস্কারের কথাই তুলিয়াছেন—ইহাতে জোড়াতালিই দেওয়া হয়, কোন পরিবর্ত্তিত রূপ-পরিগ্রহ করে না।

বস্তীতে যাহারা বাস করে, তাহারা দরিদ্র। কেবল জন-মজুরই নয়—অনেক অল্প-আয়ের মধ্যবিত্ত পরিবারও নিরুপায় হইয়া এই বস্তীতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে। বস্তী অপসারণ করিলেই ইহাদের সেই সঙ্গে যোগ্য আশ্রয়ও দিতে হইবে। শোনা যাইতেছে, সরকার ইহাদের জন্য কাশীপুরে উপযুক্ত গৃহনির্ম্মাণ করিতেছেন। কিন্তু কাশীপুর বা অনুরূপ কোথাও বাড়ী নির্ম্মিত হইলেই সমস্যা মিটিবে না। কারখানার শ্রমিক বা যাহারা জন-মজুরের কাজ করে, তাহারা তাহাদের কর্ম্মস্থল হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে—অতদূর হইতে যথাসময়ে কাজে যোগ দেওয়ার কথাও ঐ সঙ্গে ভাবিতে হইবে। একমাত্র উপযুক্ত পরিবহনের ব্যবস্থা করিলেই ইহার সুষ্ঠু সমাধান হইতে পারে। বস্তীগুলি ভাঙিয়া যদি বাড়ী নির্ম্মিতই হয় তবে ঐ বস্তীবাসীদেরই উহাতে অগ্রাধিকার থাকিবে একথা ভুলিলে চলিবে না। মোট কথা, দরদী-মন লইয়া ইহাদের সম্বন্ধে বিচার করিলে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না।

এস. রাও এবং আদিত্য চট্টোপাধ্যায়

একটি সংবাদে প্রকাশ যে, আদিত্যনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় নামক জনৈক যুবক মিথ্যাপরিচয় প্রদানের অপরাধে নয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোর্টের সম্মুখে তাহার দোষ স্বীকার করে। তবে কোর্ট তাহার প্রতি দয়া প্রদর্শনের কোন কারণ দেখিতে পান নাই। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, আদিত্যনারায়ণ দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান শ্রী পি, এস. রাও আই-সি-এস'এর নিকট যাইয়া বলে যে, সে নিজে একজন এম-এ ডিগ্রীধারী এবং পশ্চিমবঙ্গের অপর একজন উচ্চপদস্থ আই-সি-এস কর্ম্মচারীর ভ্রাতা। শ্রী রাও তাহাকে সাক্ষাতের জন্য আহ্বান করেন এবং পরে গত জুন মাস হইতে তাহাকে এসিষ্ট্যাণ্ট পাবলিক রিলেশনস অফিসার হিসাবে চাকুরীতে নিয়োগ করেন। কিন্তু পরে চ্যাটার্জ্জীর ফাঁকি ধরা পড়ে এবং জানা যায় যে, সে এম-এ পাস নহে এবং কোন আই-সি-এস কর্ম্মচারীর ভ্রাতাও নহে।

বাংলাদেশের যুবসমাজ আজ বিশেষ সঙ্কটের সম্মুখীন। সে কথা স্মরণ রাখিয়াও আমরা আদিত্যনারায়ণের আচরণের তীব্র নিন্দা না করিয়া পারিতেছি না। বিচারক তাহার যথার্থ সাজা দিয়াছেন এবং এই কারাবরণে সে নিজকৃত পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত করিবে। কিন্তু এই ঘটনাটিতে যে বিষয়টি আমাদিগকে বিশেষভাবে আলোড়িত করিয়াছে তাহা হইতেছে ঘটনাবিন্যাসের ধারাটি। যদি আদিত্যনারায়ণকে কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বেই কোর্টে আনা হইত তাহা হইলে কোনদিক হইতেই কিছু বলিবার থাকিত না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আদিত্যনারায়ণকে কোর্টে আনা হইয়াছে কর্ম্মে নিয়োগের পর। সরকারী আপিসগুলিতে সাধারণতঃ যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হইয়া থাকে তাহাতে নূতন কর্ম্মীকে কাজে যোগদানের পূর্ব্বে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট হইতে তাহার চরিত্র সম্পর্কে দুইটি সার্টিফিকেট দিতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা এবং সার্টিফিকেটগুলিও দেখাইতে হয় (নকল দেখাইলে চলে না)। আদিত্যনারায়ণকে কর্ম্মে যোগদান করিতে দিবার পূর্ব্বে যদি এই পদ্ধতি অনুসৃত হইত তবে তৎক্ষণাৎ ধরা পড়িত যে, সে এম এ পাস নহে। এক্ষেত্রে স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম কি কারণে ঘটিয়াছিল স্বভাবতঃই সে সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে। যেহেতু চ্যাটার্জ্জী নিজেকে একজন উচ্চপদস্থ আই-সি-এস কর্ম্মচারীর আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল সেইজন্যই কি এই ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল? এই আত্মীয়তার জন্যই কি কেবলমাত্র চ্যাটার্জ্জীকে চাকুরীতে লওয়া হইয়াছিল?

আদিত্যনারায়ণ চ্যাটার্জ্জীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল সে মিথ্যা পরিচয়ে চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিল। কর্ত্তৃপক্ষ সজাগ থাকিলে কিরূপে মিথ্যা পরিচয়ে চাকুরী লওয়া যায় তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। ইহা স্বভাবতঃই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, কর্ম্মে নিয়োগের পূর্ব্বে প্রার্থীর গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া লওয়া হয়। যদি প্রার্থীর উপযুক্ত গুণ না থাকে তবে তাহাকে নিয়োগের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। চ্যাটার্জ্জীকে কাজে লইবার পূর্ব্বে কি পরীক্ষা করিয়া লওয়া হইয়াছিল? চ্যাটার্জ্জীর বিরুদ্ধে অযোগ্যতার কোন অভিযোগ আনা হয় নাই। স্বভাবতঃই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, তাহার কাজকর্ম্ম সম্পর্কে কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ কোন অভিযোগ ছিল না। চ্যাটার্জ্জীকে কোর্টে অভিযুক্ত করা হইতে স্বভাবতঃই এরূপ ধারণা হইতে পারে যে, সে যে আই-সি-এস অফিসারের আত্মীয় নহে, ইহাতেই কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষরূপে বিচলিত হইয়াছিলেন। স্বাভাবিক অবস্থায় কর্ম্মী নিয়োগে কর্ম্মীর নিজস্ব গুণাগুণের উপরই কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষভাবে জোর দেন; তাহার আত্মীয়তা প্রভৃতিকে যোগ্যতাবিচারে কখনই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত নহে। সুতরাং চ্যাটার্জীর প্রতি দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষ যে প্রতি-শোধ-স্পৃহা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা হইতে যদি কেহ মনে করেন যে, চ্যাটার্জীর নিয়োগের ব্যাপারে তাঁহারা তাহার ব্যক্তিগত যোগ্যতা অপেক্ষা তাহার আত্মীয়তার উপরই অধিকতর গুরুত্ব

আরোপ করিয়াছিলেন, তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না। বিজ্ঞ বিচারক সত্যই বলিয়াছেন, আদিত্যনারায়ণের পক্ষে বলিবার কোন যুক্তি নাই—আমরাও তাহা মনে করি। কিন্তু প্রশ্ন এই, দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের অভিজ্ঞ কর্তৃপক্ষমণ্ডলীকেও কি এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলা চলে?

ভারত সীমান্তে পাকিস্থানী দৌরাত্ম্য

ভারত সীমান্তে পাকিস্থানীদের হামলা লাগিয়াই রহিয়াছে। পূর্ব্ব সীমান্তে প্রায় প্রতি মাসেই কোন না কোন স্থানে পাকিস্থানী-দের হামলা ঘটে। আমরা একাধিকবার তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এ সম্পর্কে ২রা মার্চ্চ ত্রিপুরা রাজ্য হইতে প্রকাশিত 'সেবক' পত্রিকা যাহা লিখিয়াছেন আমরা নীচে তাহা তুলিয়া দিলাম:

"সীমান্ত অঞ্চলে পাকিস্থানী দৌরাত্ম্যের সংবাদ প্রায়ই পাওয়া যায়। গত কিছুকালের মধ্যে কয়েকটি পাকিস্থানী হামলার সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশ পায়। পাক-সীমান্তে সেনাবাহিনীর লোক মোতায়েন হওয়ার পর এইরূপ ঘটনা বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারি। ভারতীয় ভূমি বেদখল করা, ভারতীয় নাগরিককে অহেতুক লাঞ্ছিত করা পাকিস্থানীদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজের অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে।

"এই সকল সীমান্ত অঞ্চলের ঘটনাসমূহের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে পাকিস্থানের নিকট গতানুগতিকভাবে প্রতিবাদ জানান হয়। এর পরবর্ত্তী ঘটনা জনসাধারণে খুব কমই প্রকাশ পায়। তিন দিক পাকিস্থান পরিবেষ্টিত ত্রিপুরার আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলীও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সম্বন্ধে স্বভাবতই শঙ্কিত করিয়া তুলে। রুজি রোজগারের সন্ধানেই হউক আর যে কোন কারণেই হউক বিরাটসংখ্যক পাক-মুসলমান ত্রিপুরায় প্রবেশ করিয়াছে এই জাতীয় সংবাদ সর্ব্বত্রই শুনা যায় এবং এই সংবাদ পূর্ব্বেও সংবাদপত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। ঐ সকল পাকিস্থানীদের ত্রিপুরায় অবস্থান করাকে কোন সদ্‌বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি সমর্থন করিবে না। আশ্চর্য্যের বিষয় ত্রিপুরার কর্তৃপক্ষ পাকিস্থানীদের বে-আইনী অবস্থানকে সহ্য করিতেছেন। বিশ্বস্তসূত্রে প্রকাশ পাইয়াছে যে, অধুনাকালে কর্তৃপক্ষ মহলের কেহ কেহ নাকি ত্রিপুরায় পাক-মুসলমানের অবস্থানজনক সংবাদ মিথ্যা বলিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই জনরব সত্য কিনা জানি না; তবে সত্য হইলে স্বভাবতঃই বিচলিত হইতে হয়। ত্রিপুরায় পাক-মুসলমান বে-আইনী ভাবে অবস্থান করে, কি করে না ইহার বাদ প্রতিবাদ করিয়া রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাইবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের সরাসরি তদন্তকার্য্য দ্বারা এই ব্যাপারের সত্য উদ্‌ঘাটিত হউক ইহাই আমাদের প্রস্তাব।"

পাকিস্থানের জাতীয় সঙ্গীত

পাকিস্থান সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পাকিস্থানের জাতীয় সঙ্গীত বাংলাভাষায় করা হইবে। কারণ পূর্ব্ব-পাকিস্থানের অধিকাংশ লোক ফারসী শব্দ বহুল উর্দ্দু ভাষায় রচিত জাতীয় সঙ্গীত বুঝিতে পারে না।

ভারতের জাতীয় সঙ্গীত দুইটিও বাংলা। পাকিস্থান সরকার একটি বাংলা রচনাকে জাতীয় সঙ্গীত করিবার সিদ্ধান্ত করায় বাঙালীমাত্রেই আনন্দিত হইবেন। আমরা এবিষয়ে পাকিস্থান সরকারের সুবিবেচনার প্রশংসা করি।

তৈল ও রাজনীতি

মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক সঙ্কটের মূল অনুসন্ধান করিতে হইলে মধ্যপ্রাচ্যের তৈল-সম্পদের কথা আলোচনা করা প্রয়োজন। নাসের সুয়েজ খাল জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত করিলে মধ্যপ্রাচ্য হইতে পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রসমূহে তৈল সরবরাহ বন্ধ হইতে পারে আশঙ্কা করিয়াই ব্রিটেন এবং ফ্রান্স মিশর আক্রমণ করিয়াছিল। সুয়েজ যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ব্রিটেন এবং ফ্রান্সে পেট্রল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের কথা স্মরণ রাখিলে পাশ্চাত্ত্য অর্থনীতিতে মধ্যপ্রাচ্যের তৈলের গুরুত্ব বুঝিতে কষ্ট হয় না। ১৯৫৭ সনে অবশ্য পাশ্চাত্ত্য দেশ-গুলিতে তৈলের অভাব হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ভবিষ্যতে কোন অভাব হইবে না এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত তৈল অর্থনীতিবিদ ওয়াল্টার জে. লেভি বলেন যে, ১৯৬৫ সনে মধ্যপ্রাচ্যকে পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রগুলির প্রয়োজন মিটানোর জন্য দৈনিক ৫০ লক্ষ ব্যারেলেরও অধিক পরিমাণে তৈল সরবরাহ করিতে হইবে। মধ্যপ্রাচ্যের তৈলের উপর পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রগুলির এই নির্ভরতার কথা কেবল যে পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রনীতিবিদ-গণই অবগত রহিয়াছেন তাহা নহে, মধ্যপ্রাচ্যের শাসকবৃন্দ এবং জনসাধারণও তাহা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অপরপক্ষে মধ্যপ্রাচ্যের জনসাধারণ স্বভাবতঃই তাঁহাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার কায়েম করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। যেহেতু তৈলই মধ্য-প্রাচ্যের প্রধান সম্পদ, সে হেতু এই আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা মধ্য-প্রাচ্যের তৈলের উপর পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রগোষ্ঠীর অধিকারকেও প্রভাবিত করিতে বাধ্য এবং কার্য্যতঃ তাহা করিতেছেও। মূলতঃ মধ্যপ্রাচ্যের স্বাধীনচেতা নেতৃবৃন্দ এবং জনসাধারণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, যদি তাঁহাদের তৈল-অর্থনীতির উপর হইতে ইঙ্গ-মার্কিন একচেটিয়া অধিকার ভাঙিতে না পারেন তবে তাঁহাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা সর্ব্বদাই ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা থাকিবে। অপরপক্ষে পাশ্চাত্ত্য শক্তি-বর্গেরও বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, একবার যদি তৃতীয় কোন শক্তি আসিয়া মধ্যপ্রাচ্যের তৈলশিল্পে ভাগ বসায় তবে পশ্চিমের দুর্দ্দিন ঘনাইয়া আসিবে।

ঠিক সেই কারণেই গত বৎসর যখন সৌদি আরবের রাজা একটি জাপানী তৈল কোম্পানীর সঙ্গে উপকূলবর্ত্তী তৈলসম্পদ আহরণের চুক্তি করেন, তাহাতে পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গের মনে বিশেষ অস্বস্তির সৃষ্টি হয়। বর্ত্তমানে সৌদি আরব সরকার এবং মার্কিন প্রতিষ্ঠান "আরব-আমেরিকান তৈল কোম্পানী"র মধ্যে যে চুক্তি

বলবৎ রহিয়াছে, তাহার বলে সৌদি আরবে বিক্রীত তৈলের জন্ম যে লাভ হয় সৌদি আরব সরকার তাহার অধিক পাইয়া থাকেন। কিন্তু সৌদি আরবের বাহিরে তৈল বিক্রয়ে যে লাভ হয় তাহার কোন অংশ সৌদি আরব সরকার পান না। ঠিক এই কোমল জায়গাটিতেই জাপানী প্রতিষ্ঠানটি আঘাত দিয়াছে। সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী জাপানী কোম্পানীটি মোট মুনাফার শতকরা ৫৬ ভাগ (অর্থাৎ অর্দ্ধেকের বেশি) আরব সরকারকে দিতে স্বীকৃত হইয়াছে, কেবল তাহাই নহে, জাপানী কোম্পানীটি বলিয়াছে যে, সৌদি আরবের মধ্যে অথবা বাহিরে যেখানে যে ভাবেই ঐ তৈল বিক্রীত হউক না কেন, মুনাফার অংশ সৌদি আরব সরকার পাইবেন। উপরন্তু তৈল আহরণের জন্ম যে নূতন প্রতিষ্ঠানটি গঠন করা হইবে তাহার এক-তৃতীয়াংশ ডিরেক্টর এবং এক-তৃতীয়াংশ কর্ম্মচারী সৌদি আরবের নাগরিকদের মধ্য হইতে লওয়া হইবে বলিয়াও জাপানী কোম্পানী স্বীকৃতি দিয়াছে। স্বভাবতঃই মার্কিন তৈল কোম্পানীগুলি এই ব্যবস্থায় বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়াছে। ইতিমধ্যে আর একটি ইতালীয় কোম্পানী এজিপ মিনানেরিয়া ('AGIP Minaneria) কয়েকটি সর্ত্তাধীনে ইরান সরকারকে লভ্যাংশের শতকরা ৭০ ভাগ পর্য্যন্ত দিতে সম্মত হইয়াছে। যদিও ইতালীয় কোম্পানীর প্রস্তাবটি বিশেষ জটিল, তথাপি ইহাতেই মার্কিন তৈলমহলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

সৌদি আরবের তৈল-সংক্রান্ত মুখ্য পরামর্শদাতা শেখ আবদুল্লা তারিকি সৌদি আরবের তৈল নিষ্কাশন সম্পর্কে যে প্রস্তাব গ্রহণের সুপারিশ করিতেছেন, মার্কিনী মহল তাহাতেও বিচলিত হইয়াছে। তারিকি বলিয়াছেন যে, সৌদি আরব হইতে পাইপ লাইনের সাহায্যে যে তৈল বাহিরে যায় তাহার লভ্যাংশেরও শতকরা ৫০ ভাগ সৌদি আরব সরকারকে দিতে হইবে। উহার পাল্টা জবাব হিসাবে আমেরিকান তৈল কোম্পানীর মালিকরা প্রস্তাব করিয়াছেন যে, তৈলের পাইপ লাইন যে কয়টি দেশের উপর দিয়া গিয়াছে সেই সকল রাষ্ট্রের প্রত্যেককেই লভ্যাংশ দেওয়া হউক। এই প্রস্তাব এখনও গৃহীত হয় নাই—কারণ লভ্যাংশের কত অংশ কোন রাষ্ট্র পাইবে সে সম্পর্কে আরব রাষ্ট্রগুলি একমত হইতে পারেন নাই। কেহ কেহ মনে করিতেছেন যে, এইভাবে আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ সৃষ্টি করিবার জন্মই মার্কিন তৈলপতিরা এরূপ একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছে।

মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন

মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দ্রুত এবং অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। এই সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল মিশর ও সিরিয়ার সম্মিলনে "সংযুক্ত আরব রিপাবলিকে"র প্রতিষ্ঠা। গত ফাল্গুন মাসের প্রথমভাগে মধ্যপ্রাচ্যের অন্ততম দুইটি আরব রাষ্ট্র—মিশর এবং সিরিয়া—নিজেদের অস্তিত্ব বিসর্জ্জন দিয়া একটি নূতন রাষ্ট্র গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরে এক গণভোটে এই নূতন রাষ্ট্র গঠনে মিশর ও সিরিয়ার জনসাধারণের মতামত গ্রহণ করিলে দেখা যায় যে দুই রাষ্ট্রের জনসাধারণই আরব রাষ্ট্রগুলির ঐক্যের বিশেষ সমর্থক। সংযুক্ত আরব রিপাবলিকের প্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন প্রাক্তন মিশরের প্রেসিডেণ্ট কর্ণেল গামাল আবদেল নাসের। নূতন রাষ্ট্রের রাজধানী হইবে কায়রো।

নূতন রাষ্ট্রের অস্থায়ী সংবিধানে বলা হইয়াছে যে, সংযুক্ত আরব রিপাবলিক একটি গণতান্ত্রিক স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে অবস্থান করিবে। ঐ রাষ্ট্রে নাগরিকদের সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতা এবং ভোটাধিকার থাকিবে। একটি জাতীয় পরিষদের উপর আইন প্রণয়নের ভার থাকিবে। এই পরিষদের সদস্যদের মনোনীত করিবেন প্রেসিডেণ্ট (নাসের)। তবে এই পরিষদের অর্দ্ধেক সদস্য গৃহীত হইবেন প্রাক্তন মিশরীয় পার্লামেণ্টের সদস্যদের মধ্য হইতে, অপরার্দ্ধ গৃহীত হইবেন প্রাক্তন সিরীয় পার্লামেণ্টের সদস্যদের মধ্য হইতে। রাষ্ট্রের সকল কার্য্যকরী ক্ষমতা ন্যস্ত থাকিবে প্রেসিডেণ্টের উপর। বিচার-বিভাগ সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনভাবে কার্য্য পরিচালনা করিবেন। মিশর এবং সিরিয়া ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত যে সকল চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিল, নবগঠিত রাষ্ট্রের ঐ সকল অংশে সেই চুক্তিগুলি এখনও বলবৎ থাকিবে।

মিশর এবং সিরিয়ার এই মিলনে একাধিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। ইয়েমেন প্রথম হইতেই এই মিলনের বিশেষ উৎসাহী ছিল এবং ৮ই মার্চ্চ স্বাক্ষরিত এক চুক্তিতে এই নূতন রাষ্ট্রে যোগদান করিয়াছে। তবে ইয়েমেন পুরাপুরি ভাবে নূতন রাষ্ট্রের সহিত এখনও মিলিয়া যায় নাই। প্রেসিডেণ্ট নাসের এবং ইয়েমেনের ইমামকে লইয়া গঠিত একটি নেতৃ পরিষদ (Council of Heads of State) পূর্ণ মিলন সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। আরব রাষ্ট্রগুলির বিভেদের সুযোগ লইয়া বিভিন্ন পাশ্চাত্ত্য শক্তিগোষ্ঠী মধ্যপ্রাচ্যের বিপুল সম্পদ শোষণ করিয়া লইবার সুযোগ পাইয়াছিল। মধ্য-প্রাচ্যে ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী আরব রাষ্ট্র গঠিত হইলে বহিরাগত শোষকদের খুবই অসুবিধা হইবে, এ কথা বুঝিতে বিশেষ কষ্ট হয় না। স্বভাবতঃই একাধিক পাশ্চাত্য রাষ্ট্র সেহেতু আরব রাষ্ট্রগুলির এই মিলনের প্রচেষ্টায় সুখী হইতে পারেন নাই। ঐ অঞ্চলের বিভেদ জাগাইয়া রাখিবার জন্ম তাহারা এখন নূতন চাল চালিবার চেষ্টা করিতেছে। নবগঠিত সংযুক্ত আরব রিপাবলিকের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে তাহারা আর একটি সম্মিলিত আরব রাজ্য গঠনে সচেষ্ট হইয়াছে।

যুদ্ধোত্তর যুগের রাজনৈতিক পরিস্থিতির অন্ততম বৈশিষ্ট্য হইল রাষ্ট্রবিভাগ। জার্ম্মানী, কোরিয়া, ভারত, চীন, ইস্রায়েল এবং ইন্দোচীন প্রতিটি ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত্তে রাষ্ট্রগুলির বিভাগ ঘটে। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এই বিভাগ কৃত্রিম—ভারত এবং

ইস্রায়েল ব্যতীত অপর সকল ক্ষেত্রেই এই বিভাগ আরম্ভ হইয়াছিল একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে—কিন্তু "অস্থায়ী ব্যবস্থাই এখন স্থায়ী" হইতে চলিয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বেচ্ছায় পরস্পর মিলন আধুনিক রাজনৈতিক ইতিহাসের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

দুর্নীতির দণ্ড

একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন বিশেষ পুলিশসংস্থার কর্ম্মনৈপুণ্যের ফলে ১৯৫৭ সনের অক্টোবর মাসের মধ্যে দুর্নীতির দায়ে ২৪ জন সরকারী কর্ম্মচারী এবং ২০ জন বে-সরকারী ব্যক্তির জেল ও জরিমানা হইয়াছে। ইহা ছাড়া, ১১ জন গেজেটেড অফিসারসহ আরও ৬৩ জন সরকারী কর্ম্মচারী বিভাগীয় শাস্তিভোগ করিতেছে। গেজেটেড অফিসারদের মধ্যে একজনের চাকুরী গিয়াছে, আর একজনের উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়াছে, তিনজনের বাৎসরিক মাহিনাবৃদ্ধি বন্ধ হইয়াছে এবং ছয়জনের অন্যান্যরূপ শাস্তি হইয়াছে। নন-গেজেটেড কর্ম্মীদের মধ্যে ১০ জনকে বরখাস্ত করা হইয়াছে, ছয়জন কর্ম্ম হইতে অপসারিত হইয়াছে, একজনকে নিম্নপদে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে, একজনের পদোন্নতি বন্ধ হইয়াছে, ১৫ জনের বাৎসরিক মাহিনা বৃদ্ধি বন্ধ হইয়াছে, এবং ১৮ জনের অন্যান্যরূপ শাস্তি হইয়াছে।

দুর্নীতির দায়ে ৪৭টি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের আমদানী-রপ্তানী লাইসেন্স দেওয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সরকার এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন সুখের বিষয়। কিন্তু ঐ বিজ্ঞপ্তিতে আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। দুর্নীতির প্লাবন চলিতেছে দেশময়। সে তুলনায় প্রতিকার অতি সামান্যই হইয়াছে।

ভারতীয় মন্ত্রীসভার পুনর্গঠন

মৌলানা আজাদের মৃত্যু এবং অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারীর পদত্যাগের ফলে ভারতীয় মন্ত্রীসভার পুনর্গঠন আসন্ন ছিল। গত ১৩ই মার্চ্চ পুনর্গঠিত মন্ত্রীসভার নাম ঘোষণা করা হইয়াছে। নূতন মন্ত্রীসভায় অর্থমন্ত্রীরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন শ্রীমোরারজী দেশাই। শ্রী দেশাই বোম্বাই রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাক্তন বাণিজ্যমন্ত্রী। শিক্ষা-মন্ত্রণাদপ্তরের ভার দেওয়া হইয়াছে রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী কে. এল. শ্রীমালীর উপর। এই পুনর্গঠনে কয়েকজন নূতন সদস্যকেও মন্ত্রীসভায় গ্রহণ করা হয়। এই সকল নূতন সদস্যদের নাম হইল হাফিজ মোহম্মদ ইব্রাহিম, শ্রী বি. গোপাল রেড্ডী, শ্রী এস. ভি. রামস্বামী, শ্রী আহমেদ মহিউদ্দীন, শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিংহ এবং শ্রীপূর্ণেন্দুশেখর নস্কর।

নিম্নে নবগঠিত ভারতীয় মন্ত্রীসভার সদস্য এবং তাঁহাদের উপর ন্যস্ত বিভাগের একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া হইল :

(১) পণ্ডিত জহরলাল নেহরু—প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র দপ্তর ও পরমাণু শক্তি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ; (২) শ্রীগোবিন্দবল্লভ পন্থ—স্বরাষ্ট্র সচিব ; (৩) শ্রীমোরারজী দেশাই—অর্থসচিব ; (৪) শ্রীজগজীবন রাম—রেলওয়ে সচিব ; (৫) শ্রীগুলজারীলাল নন্দ—শ্রম, কর্ম্মসংস্থান এবং পরিকল্পনা সচিব ; (৬) শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী—শিল্প ও বাণিজ্য সচিব ; (৭) সর্দ্দার শরণ সিং—ইস্পাত, খনি ও জ্বালানী দপ্তরের মন্ত্রী ; (৮) শ্রী কে. সি. রেড্ডী—পূর্ত্ত, গৃহনির্ম্মাণ ও সরবরাহ সচিব ; (৯) শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন—খাদ্য ও কৃষি সচিব ; (১০) শ্রী ভি. কে. কৃষ্ণমেনন—প্রতিরক্ষা সচিব ; (১১) শ্রী এস. কে. পাতিল—যানবাহন ও যোগাযোগ সচিব ; (১২) মিঃ হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম—সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী।

রাষ্ট্রমন্ত্রী

(১) শ্রী এস এন সিংহ—পার্লামেণ্টারী দপ্তরের মন্ত্রী ; (২) ডাঃ বি. ভি কেশকার—তথ্য ও বেতার দপ্তরের মন্ত্রী ; (৩) শ্রী ডি. পি. কারমারকার—স্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রী ; (৪) ডাঃ পি. এস. দেশমুখ—খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের মন্ত্রী ; (৫) শ্রী কে. ডি. মালব্য—ইস্পাত, খনি এবং জ্বালানী দপ্তরের মন্ত্রী ; (৬) শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না—পুনর্ব্বাসন দপ্তরের মন্ত্রী ; (৭) শ্রীনিত্যানন্দ কানুনগো—শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী ; (৮) শ্রীরাজ বাহাদুর—যানবাহন ও যোগাযোগ দপ্তরের মন্ত্রী ; (৯) শ্রী বি. এন. দাতার—স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী ; (১০) শ্রীমানুভাই শাহ—শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী ; (১১) শ্রী এস. কে. দে—সমাজ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী ; (১২) ডাঃ কে. এল. শ্রীমালী—শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী ; (১৩) শ্রী এ. কে. সেন—আইন দপ্তরের মন্ত্রী ; (১৪) মিঃ হুমায়ুন কবীর—বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী ; (১৫) শ্রী বি. গোপাল রেড্ডী—অর্থনৈতিক দপ্তরের মন্ত্রী।

উপমন্ত্রী

(১) সর্দ্দার এস. এস. মাজিথিয়া—প্রতিরক্ষা দপ্তরের উপমন্ত্রী ; (২) মিঃ আবিদ আলি—শ্রম দপ্তরের উপমন্ত্রী ; (৩) অনিলকুমার চন্দ—পররাষ্ট্র দপ্তরের উপমন্ত্রী ; (৪) শ্রী এম. ভি. কৃষ্ণাপ্পা—খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের উপমন্ত্রী ; (৫) শ্রীজয়সুখলাল হাতী—সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তরের উপমন্ত্রী ; (৬) শ্রীসতীশচন্দ্র—শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের উপমন্ত্রী ; (৭) শ্রীশ্যামনন্দন মিশ্র—পরিকল্পনা দপ্তরের উপমন্ত্রী ; (৮) শ্রীবলীরাম ভগৎ—অর্থ দপ্তরের উপমন্ত্রী ; (৯) ডাঃ মনোমোহন দাস—শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা দপ্তরের উপমন্ত্রী ; (১০) মিঃ শাহ নওয়াজ খান—রেলওয়ে দপ্তরের উপমন্ত্রী ; (১১) শ্রীমতী লক্ষ্মী এন মেনন—পররাষ্ট্র দপ্তরের উপমন্ত্রী ; (১২) শ্রী এস. ভি. রামস্বামী—রেলওয়ে দপ্তরের উপমন্ত্রী ; (১৩) মিঃ আহমেদ মহিউদ্দীন—অসামরিক বিমান চলাচল দপ্তরের উপমন্ত্রী ; (১৪) শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিংহ—অর্থনৈতিক দপ্তরের উপমন্ত্রী ; (১৫) শ্রী পি. এস. নস্কর—পুনর্ব্বাসন দপ্তরের উপমন্ত্রী ; (১৬) শ্রীমতী ভায়োলেট আলভা—স্বরাষ্ট্র

দপ্তরের উপমন্ত্রী ; (১৭) শ্রীকোঠা রঘুরামাইয়া—প্রতিরক্ষা দপ্তরের উপমন্ত্রী ; (১৮) শ্রীঅলুঙ্গল মাথি টমাস—খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের উপমন্ত্রী ; (১৯) শ্রীরামচন্দ্র মার্ত্তাণ্ড হজরনবিশ—আইন দপ্তরের উপমন্ত্রী।

পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীমণ্ডলীতে ভাঙন

পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীমণ্ডলীতে ভাঙন দেখা দিয়াছে ও মন্ত্রীসভার অন্যতম সদস্য শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় পদত্যাগ করিয়াছেন। যদিও এই প্রসঙ্গ লেখা হওয়ার সময় পর্য্যন্ত শ্রীরায়ের পদত্যাগের কারণ সম্পর্কে সরকারীভাবে কিছু জানা যায় নাই, তথাপি মন্ত্রীসভা এবং শ্রীরায়ের মধ্যে যে অনেক দিন যাবতই মনকষাকষি চলিতেছিল সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই। গত শিক্ষক ধর্ম্মঘটের সময় "আনন্দবাজার পত্রিকা" প্রকাশ্যেই লিখিয়াছিলেন যে, মন্ত্রীসভার মধ্যে গুরুতর মতপার্থক্য রহিয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় একটি বিবৃতিতে তখন ঐরূপ মতভেদের কথা অস্বীকার করেন। সর্ব্বশেষ ঘটনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, মন্ত্রীমণ্ডলীর আভ্যন্তরীণ অনৈক্যের সংবাদ মিথ্যা ছিল না।

শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের পদত্যাগের ফলেই যে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীমণ্ডলীর আভ্যন্তরীণ সমস্যাবলী দূর হইয়া যাইবে এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। যে পদ্ধতিতে এত দিন পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রীমণ্ডলীর নির্ব্বাচন এবং কার্য্য-ব্যবস্থা পরিচালিত হইতেছে অবিলম্বে তাহার পরিবর্ত্তন অবশ্য প্রয়োজন। জনসাধারণের অর্থ-ব্যয়ে এতগুলি মন্ত্রীপোষণের কোন অর্থ হয় না। যদি মন্ত্রীদের মধ্যে পৃথক ও সম্মিলিত ভাবে কার্য্যকরী, পূর্ণ ক্ষমতা না থাকে এবং ঐক্যবদ্ধ ভাবে কার্য্য চালনার যোগ্যতা না থাকে। যাহা ঘটিয়াছে তাহার পূর্ণ আলোচনার সময় এখনও আসে নাই।

বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগে ডাক কর্ম্মচারী

বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগে দশঘরার পোষ্টমাষ্টার শ্রীপশুপতি মুখার্জ্জি এবং উক্ত ডাকঘরের পিয়ন শ্রীমণীন্দ্র বসুকে গ্রেপ্তার করিয়া ধনিয়াখালি পুলিস চুঁচুড়া সদরে চালান দিয়াছে। সদর এস-ডি-ও উভয়ের জামীনের দরখাস্ত না-মঞ্জুর করিয়া উঁহাদের প্রতি জেল-হাজতবাসের আদেশ দিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, শ্রীসুবল দাস আসামী পশুপতি মুখার্জ্জির নিকট ১,৫০০৲ টাকা এবং ঐ সঙ্গে পাসবহি জমা দেন। তিনি পাস বহিখানি পরে লইতে বলেন, কিন্তু বিভিন্ন অছিলায় ঐ পাসবহি আর ফেরৎ দেন নাই। ইহাতে সুবল দাস চুঁচুড়ার ডাকঘর পরিদর্শকের নিকট অভিযোগ করেন। উক্ত পরিদর্শক তদন্তে দেখিতে পান যে, ঐ অর্থ নির্দ্দিষ্ট তারিখের অনেক পরে ডাকঘরে জমা পড়িয়াছে। পোষ্টমাষ্টার নাকি পরিদর্শককে জানান, আরও কয়েকটি দফায় প্রায় ২,৯৫০৲ টাকা ডাকঘর হইতে তছরূপ হয় এবং সেগুলি পিয়ন মণীন্দ্র বসুর ভীতি প্রদর্শনের জন্যই ঘটিয়াছে।

শ্রীমতী সুধা যোশীর অনশন ধর্ম্মঘট

গোয়া জাতীয় কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী শ্রীযুক্তা সুধা যোশী ১৯৫৫ সন হইতে গোয়াতে পর্তুগীজ কারাগারে বন্দিনী রহিয়াছেন। কারাগারে "সভ্য" পর্তুগীজ সরকারের কর্ম্মচারীরা বন্দীদিগের সহিত যে দুর্ব্যবহার করিতেছে তাহার তুলনা বিরল। বিশেষতঃ মহিলা বন্দীদিগের প্রতি এই সকল কর্ম্মচারীর ব্যবহার বর্ব্বরোচিত। এই সকল অস্বস্তিকর ব্যবহারের অবসানের দাবি জানাইয়া শ্রীযুক্তা যোশী অনশন ধর্ম্মঘট আরম্ভ করেন। প্রথমে পর্তুগীজ সরকার তাঁহার দাবীর প্রতি কর্ণপাত করা প্রয়োজন বোধ করেন নাই। পরে অবশ্য জেলের ওয়ার্ডেনকে সরাইয়া দেওয়ার আদেশ হইয়াছে।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

মৌলানা আবুল কালাম আজাদের মৃত্যুতে ভারতের যে ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে। বিগত চারিদশক ব্যাপিয়া মৌলানা আজাদ ভারতে রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সহিত এরূপ ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন যে আজাদ নাই একথা ভাবা অনেকের পক্ষেই বিশেষভাবে কঠিন। মৌলানা আজাদের পাণ্ডিত্য সর্ব্বজনবিদিত। তাঁহার চরিত্রে পাণ্ডিত্য, স্বদেশানুরাগ, স্বধর্ম্মপ্রীতি, পরধর্ম্মপ্রীতি এবং সর্ব্ববিষয়ে উদারতার যে সমন্বয় দেখা গিয়াছিল তাহা বর্ত্তমান জগতে বিশেষ দুর্ল্লভ। সেই জন্যই মৌলানা আজাদ জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল ভারতীয়ের হৃদয়েই একটি বিশেষ আসন লাভ করিয়াছিলেন। মৌলানা আজাদ নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। উর্দ্দু ভাষায় কোরাণের যে অনুবাদ তিনি প্রণয়ন করেন তাহার মূল্য সর্ব্বজনস্বীকৃত। কিন্তু এরূপ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজেকে কখনও বিচ্ছেদমুখী লীগ রাজনীতির সহিত খাপ খাওয়াইতে পারেন নাই। তিনি জীবনে ধর্ম্মকে রাজনীতি হইতে সর্ব্বদাই দূরে রাখিতেন। ফলে তিনি হিন্দু-মুসলমাননির্ব্বিশেষে সকল ভারতীয়েরই অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। গত সাধারণ নির্ব্বাচনে মৌলানা আজাদ যে কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, সেই স্থানে তখন পর্য্যন্ত অকংগ্রেসীদেরই প্রাধান্য ছিল। মৌলানা আজাদ ঐ কেন্দ্রে একজন জনসঙ্ঘ প্রার্থীকে প্রায় নব্বই হাজার ভোটাধিক্যে পরাজিত করেন। অপর কোন কংগ্রেস-প্রার্থী তথায় এরূপ সাফল্য লাভ করিতেন কিনা তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। এখনও কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ হাফিজ মোহাম্মদ ইব্রাহিমের ন্যায় বিখ্যাত নেতাকেও উক্ত কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে দিতে সাহস পাইতেছেন না।

কংগ্রেসের মধ্যে মৌলানা আজাদ প্রগতিবাদীদের অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার প্রতি পণ্ডিত নেহরু এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের অকুণ্ঠ আস্থা এবং শ্রদ্ধা ছিল। কংগ্রেসের মধ্যে যে কয়জন মুষ্টিমেয় নেতা দলমতনির্ব্বিশেষে সকল ভারতীয়ের শ্রদ্ধার পাত্র, মৌলানা আজাদ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন।

শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রেও মৌলানা আজাদের কৃতিত্ব কম ছিল না।

বিনা প্রয়োজনে তিনি কখনও বিভাগীয় প্রশাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। তাঁহার পরিচালনাধীনে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় যে কয়টি উল্লেখযোগ্য কার্য্য করিয়াছে তাহাদের মধ্যে বিশ্বভারতীকে একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবর্ত্তন, ললিতকলা আকাদমী, সঙ্গীত নাটক আকাদমী, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাণ্টস কমিশন গঠন প্রভৃতির ফল বিশেষ সুদূরপ্রসারী।

দৌরাত্ম্য, গুণ্ডামি ও রাহাজানি

দেশের শান্তিশৃঙ্খলার অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছে তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ নীচের ছয়টি সংবাদ দেওয়া হইল। বলা বাহুল্য, এইগুলি নমুনামাত্র, সম্পূর্ণ নহে।

হাওড়ায় গুণ্ডামি এবং রাহাজানি প্রায়ই লাগিয়া আছে। প্রকাশ্য দিবালোকে এক সাইকেল আরোহীকে ছোরা দেখাইয়া কয়েকজন দুর্বৃত্ত তাহার পকেট হইতে টাকা ছিনাইয়া লইয়াছে। লোকটি কোন রংয়ের দোকানের কর্ম্মচারী। এ অঞ্চলে প্রায়ই ব্যবসায়ীদের বিল আদায়কারীগণের নিকট হইতে এই ভাবে টাকা ছিনাইয়া লওয়া হইতেছে। এই গুণ্ডাদল কাহারা এবং কেনই বা পুলিসের হাতে ইহারা ধরা পড়িতেছে না, ইহাও এক রহস্য।

এই হাওড়ারই নিউ শীল লেনে একটি গুদামের তালা ভাঙিয়া আনুমানিক ৪ হাজার টাকা মূল্যের গুড়া দুধ চুরি হওয়ার সংবাদও পাওয়া গিয়াছে। শোনা যাইতেছে, এক পতিতালয় হইতে পুলিস দুই বাক্স দুধ উদ্ধার করিয়াছেন। সন্দেহক্রমে কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করা হইয়াছে।

মফঃস্বল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, মুর্শিদাবাদ-লালগোলার স্থল শুল্ক বিভাগের কর্ম্মচারীগণ কৃষ্ণপুর রেল ষ্টেশনে এক ব্যক্তির নিকট হইতে ২টি সুটকেশ ভর্ত্তি বে-আইনী গাঁজা উদ্ধার করেন। আবার ঐ ষ্টেশনেই ছাপড়া জেলার এক ব্যক্তির সুটকেশ হইতে এক মণ আট সের গাঁজা পাওয়া যায়। এই গাঁজার মূল্য ১২০০০ টাকারও অধিক। উক্ত দুই জনকেই গ্রেপ্তার করিয়া লালবাগ কোর্টে প্রেরণ করা হইয়াছে।

মুরারই থানার কনকপুর গ্রামের শ্রীউদ্দৎ মিশ্রার গৃহে অনুষ্ঠিত নরহত্যা সহ যে সশস্ত্র ডাকাতি হইয়া গিয়াছে, তাহাতে ধৃত সোলেমান জঙ্গীপুর আদালতে এক চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তি করিয়াছে। সে বলিয়াছে, তাহার বাড়ী পূর্ব্ব-পাকিস্থানে। তাহারা আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দলপতি জামসেদ সেখকে সঙ্গে লইয়া এবং মুর্শিদাবাদের কয়েকজন দুর্ব্বৃত্তকে দলে পাইয়া এই ডাকাতি করে। এই কনকপুর গ্রাম মুর্শিদাবাদ সীমান্ত হইতে মাত্র তিন মাইল দূরে বীরভূম জেলায় অবস্থিত। এই উভয় জেলার ঐ অঞ্চলগুলি মুসলমান-অধ্যুষিত। এখানে ডাকাতির সংখ্যাও সর্ব্বাধিক। এই ডাকাতসর্দ্দার জামসেদ সেখের বহু আত্মীয়স্বজন ঐ এলাকায় বসবাস করে। এই ডাকাতি করিয়া তাহারা উদ্দৎ মিশ্রার গৃহ হইতে ৫,০০০ হাজার টাকা পায়। লুণ্ঠনরত ডাকাত-দলকে গ্রামবাসীরা ঘেরাও করিয়া ফেলে। তখন তাহারা বারংবার গুলী বর্ষণ করে। উভয় পক্ষের এই আক্রমণের ফলে তাহাদেরও এক ব্যক্তি গুরুতর ভাবে আহত হয়। আহত সেই ব্যক্তিকে তাহারা কিছু দূর বহন করিয়াও লইয়া যায়, শেষে বাধ্য হইয়া তাহাকে পথিমধ্যে ত্যাগ করে। সেই আহত ব্যক্তি পরে গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পড়ে, কিন্তু সে পরিচয় দিবার আগেই মারা যায়। মৃতদেহ সনাক্ত করিয়া পরে পুলিস তাহার নাম সাহার আলি বলিয়া জানিতে পারে। ইহাকেই সূত্র করিয়া পুলিস তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সোলেমানকে গ্রেপ্তার করে। পরে অনেকেই ধরা পড়ে। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন বিহার প্রদেশের পাথরঘাটার অধিবাসীও আছে।

আরামবাগ থানার বাকরথবা গ্রামে শ্রীগোবিন্দ কুণ্ডুর বাড়ীতে প্রায় ৩০ জন ডাকাত নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ডাকাতি করিয়াছে। ডাকাতগণ পাড়ার প্রত্যেক বাড়ীতে বাহির হইতে শিকল তুলিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া আগ্নেয়াস্ত্রসহ পাহারা বসাইয়া রাখে। তাহারা দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া সকলকে মারপিট করিয়া প্রায় আট হাজার টাকার গহনা লইয়া পলায়ন করে। পরদিন নিকটবর্ত্তী মাঠে তিনটি তাজা বোমা পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। একটি কৌতূহলী বালক বোমা হাতে লইয়া নাড়াচাড়া করিবার সময় উহা ফাটিয়া গিয়া গুরুতর ভাবে জখম হয়। অপর দুই জন লোকও অনুরূপ ভাবে ঐ বোমা ফাটিয়া আহত হইয়াছে। আহত ব্যক্তিদের আরামবাগ হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হইয়াছে।

সাংঘাতিক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ডাকাতি এবং গণেশচন্দ্র এভেনিউয়ে গ্রেপ্তারের সময় ছোরা ও তরবারি লইয়া পুলিসকে আক্রমণ করিবার অভিযোগে শঙ্করপ্রসাদ গোয়ালা, নন্দকুমার ক্ষেত্রী এবং আবদুল আজিজ অভিযুক্ত হইয়াছে।

গণেশচন্দ্র এভেনিউ হইতে আর একটি রাহাজানির খবরও পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের হাতেও আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। সাদা পোশাকে পুলিস নিকটেই কর্ত্তব্যরত ছিল। সংঘর্ষের ফলে তিনজন পুলিস আহত হয়। আসামীদের পরে গ্রেপ্তার করা হইলে, তাহাদের মধ্যে বসন্ত সাহা রাজসাক্ষী হইয়াছে।

মঙ্গলবার রাত্রে কলিকাতায় প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা যায় যে, ঐদিন এক দুর্ব্বৃত্তদল বর্দ্ধমানের অধীন মেমারী ও রসুলপুর ষ্টেশনের মাঝামাঝি এক স্থানে মোকামা এক্সপ্রেস ট্রেন থামাইয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে তৃতীয় শ্রেণীর একটি কামরায় যাত্রীদের আক্রমণ করে এবং তাহাদের অনেকের টাকা পয়সা লুণ্ঠন করে।

সংবাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণে প্রকাশ যে, কলিকাতা হইতে মোকামাগামী মোকামা এক্সপ্রেস ট্রেনটি (৩০৫ আপ) উপরোক্ত ষ্টেশন দুইটির মাঝামাঝি কোন স্থানে একদল দুর্বৃত্ত চেন টানিয়া থামাইয়া দেয়। তার পর তাহারা ঐ ট্রেনের অষ্টম বগীতে হানা

দেয়। ঐ বগীর অর্দ্ধেকটা ছিল মেলভ্যান এবং অপর অর্দ্ধেকটিতে ছিল একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরা। দুর্বৃত্তেরা ঐ তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় যাত্রীদের আক্রমণ করিয়া টাকা পয়সা লুঠ করিতে আরম্ভ করে। ট্রেনের অন্যান্য যাত্রীরা এবং গার্ড ও রেলের অন্যান্য কর্ম্মীরা এই সময় হৈ চৈ করিতে থাকে। নিকটবর্ত্তী একটি পল্লী হইতে গ্রামরক্ষী দল তাহাদের সাহায্যে অগ্রসর হয়।

ইতিমধ্যে একজন গেটম্যান দৌড়াইয়া গিয়া রসুলপুর ষ্টেশনে এরূপ সংবাদ দেয় যে, ঐ ট্রেনটি দুর্বৃত্তদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আরও লোকজন ছুটিয়া আসে। খবর পাইয়া মেমারী থানার পুলিশ, বর্দ্ধমানের রেল পুলিশ ও কলিকাতার রেলপুলিশের লোকজন ট্রাক ও মালগাড়ীতে অকুস্থানে যায়। তৎপর ঐ ট্রেনের বিভিন্ন কামরা তল্লাসী করিয়া ছয় ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহাদের মধ্যে করতার সিং নামে একজন লোকও আছে।

প্রথমে পুলিশ এরূপ সংবাদ পায় যে, মেল ভ্যান লুণ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু পরে ঘটনাস্থলে গিয়া নাকি দেখা যায় যে, ঐ সংবাদটি ঠিক নহে। পুলিশ পৌঁছিবার পূর্ব্বেই দুর্বৃত্তদের অনেকে গা ঢাকা দেয়। অভিযোগে প্রকাশ, ধৃত ব্যক্তিদের কয়েকজন নাকি ধৃত হইবার পূর্ব্বে কোন কোন বস্তু অন্ধকারে বাহিরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়। ঐগুলি টাকার থলি বলিয়া পুলিশ সন্দেহ করিতেছে। পুলিশ ধৃত ব্যক্তিদের নিকট হইতে ২৬০ টাকা পাইয়াছে।

লরীচালকের উৎপাত

এদেশের পথঘাট কাহাদের অধিকারে তাহা নিম্নোক্ত সংবাদে বুঝা যায়:

হাওড়া ২৬শে ফেব্রুয়ারী—আজ সকালে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, বালী ব্রিজ এলাকা হইতে উত্তরপাড়া পর্য্যন্ত সমগ্র জি টি রোডের উপর প্রায় ছয় শত লরী পরিত্যক্ত অবস্থায় রাখিয়া লরী-চালকগণ সমগ্র রাস্তায় যানবাহন চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করে। ফলে জনসাধারণের দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ সম্পূর্ণভাবে ব্যহত হয়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, আজ সকালে পুলিশ যখন বালী ব্রিজ এলাকায় অবস্থিত চেকিং সেণ্টার হইতে একটি লরীতে তল্লাসী চালাইতেছিল সেই সময় দুইখানি কয়লা বোঝাই লরী পরস্পর পরস্পরকে ধাক্কা দেয় ফলে দুইটি লরীই আংশিক বিধ্বস্ত হয়। এই ঘটনায় লরী চালকগণ উত্যক্ত হইয়া পুলিশের কার্য্যে দোষারোপ করিতে থাকে। এই ঘটনার সংবাদ অবিলম্বে লরী চালকদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে এবং একের পর এক লরীচালক আসিয়া নিজ নিজ লরী পথিমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। যাহার ফলে বেলা নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত উক্ত রাস্তার উপর যানবাহন চলাচল বিপর্য্যস্ত হয়। এই সংবাদ পাইবামাত্রই হাওড়া পুলিশ-সুপার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং পুলিশবাহিনী, রেজিষ্ট্রেশন গ্রুপের স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ ও স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতায় সাড়ে আট ঘটিকা হইতে সুরু করিয়া নয়টার মধ্যেই সমস্ত পরিত্যক্ত লরী সরাইয়া লইতে সমর্থ হন। পুলিস এই সম্পর্কে লরীচালক বলিয়া বর্ণিত সাত ব্যক্তিকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করে এবং চৌদ্দটি মাল বোঝাই বেওয়ারিশ লরী বালী থানায় আটক করিয়া রাখে। সংবাদে প্রকাশ যে, পুলিস বালী থানা এলাকায় সাতচল্লিশ জন এবং উত্তরপাড়া এলাকায় সাতানব্বই জনকে এই ঘটনা সম্পর্কে অভিযুক্ত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে। এই ধরণের ঘটনা জি-টি-রোড এলাকায় প্রায়ই সংগঠিত হইয়া থাকে এবং স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা ব্যাহত করিয়া দেয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র শহরে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং লরীচালকদের কার্য্যের নিন্দা করিতেও শুনা যায়।

পশ্চিমবঙ্গে অবাঙালী

এদেশের টাকা পায় কাহারা তাহার আংশিক সংবাদ নীচে দেওয়া হইল:

"বুধবার পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন বক্তৃতা কালে প্রকাশ করেন যে, মাসিক প্রায় ১০ কোটি টাকা মণিঅর্ডার-যোগে পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে চলিয়া যায়। উড়িষ্যা, বিহার, উত্তর-প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধ্রপ্রদেশের লোকেরা পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে পরিশ্রম করিয়া ঐ টাকা রোজগার করে বলিয়া তিনি জানান: শ্রীসেন বলেন, তিনি কোন প্রাদেশিক মনোভাব লইয়া এই কথা বলিতেছেন না। পশ্চিমবঙ্গে বেকার সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে ঐ তথ্য উদঘাটিত করিতেছেন। তিনি রাজ্যের অধিবাসীকে পরিশ্রমী হইতে আহ্বান জানান।

অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (স্ব) পশ্চিমবঙ্গের জটিল বেকার সমস্যার উল্লেখ করিয়া প্রস্তাব করেন যে, পৃথক একজন মন্ত্রীর অধীন ঐ সম্পর্কে আলাদা একটি দপ্তর থাকা দরকার।"

গ্রাহকদের প্রতি নিবেদন

যাঁহারা সন ১৩৬৪ সালে প্রবাসীর গ্রাহক আছেন আশা করি, আগামী ১৩৬৫ সালেও তাঁহারা গ্রাহক থাকিবেন।

গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক আগামী বর্ষের বার্ষিক মূল্য ১২ বারো টাকা মনি-অর্ডার যোগে পাঠাইয়া দিবেন। মনি-অর্ডার কুপনে তাঁহাদের স্ব-স্ব গ্রাহক নম্বর উল্লেখ না করিলে টাকা জমার পক্ষে অসুবিধা হয় এবং তিনি নূতন বা পুরাতন গ্রাহক ইহা ঠিক করিতে না পারায় ভি-পিও চলিয়া যায়।

অতএব প্রার্থনা যেন তাঁহারা গ্রাহক নম্বরসহ টাকা পাঠান, অন্যথায় পূর্ব্ব গ্রাহক নম্বরে ভি-পি যাইতে পারে; তাহা ফেরত দিবেন।

যাঁহারা আগামী ২৬শে চৈত্রের মধ্যে টাকা পাঠাইবেন না তাঁহাদের নামে বৈশাখ সংখ্যা ভি-পিতে পাঠানো হইবে।

যাঁহারা অতঃপর গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক তাঁহারা দয়া করিয়া আমাদিগকে ২০শে চৈত্রের পূর্ব্বেই জানাইয়া দিবেন।

ভি-পিতে টাকা পাইতে কখনো কখনো বিলম্ব ঘটে, সুতরাং প্রবাসী পাইতে গোলমাল হয়। মনি-অর্ডারেই টাকা পাঠানো সুবিধাজনক। ইতি—

প্রবাসী-ম্যানেজার

শঙ্করের "মায়াবাদ" ও "উপাধিবাদ"

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

৩

পূর্ব সংখ্যায় শঙ্কর কিভাবে নানাবিধ উপমা বা সাধারণ, দৃষ্টান্তের সাহায্যে তাঁর নিগূঢ়তম মায়াবাদ প্রপঞ্চিত করেছেন, সে বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

পূর্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণী থেকেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে, শঙ্করের অদ্বৈতবাদের মূল ভিত্তি হ'ল—অজ্ঞান, অবিদ্যা, মায়া। এস্থলে প্রশ্ন হতে পারে: এই তিনটি কি সমার্থক অথবা তাদের মধ্যে কোনরূপ প্রভেদ আছে? প্রত্যেকটির প্রকৃত অর্থই বা কি? স্বভাবতঃই, এ বিষয়ে বহু বাগ-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে এবং বহু বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব হয়েছে। এ সম্বন্ধে সারসংগ্রহ করে "সর্ব-দর্শন-সংগ্রহ"কার সায়ণমাধব যে বিবরণী দিয়েছেন, তা হ'ল সংক্ষেপে এই:

পূর্বপক্ষীয় আপত্তি হতে পারে এই যে, "অবিদ্যা" ও "মায়া" দুটি ভিন্ন পদার্থ। তার কারণ হ'ল এই যে, মায়া মায়াবীর আশ্রয়ে উৎপন্ন হলেও, স্বাশ্রয় মায়াবীকে মোহিত করতে পারে না। যেমন, মায়াবী বা ঐন্দ্রজালিক ইন্দ্রজালের সাহায্যে দর্শকবৃন্দকে মায়ামুগ্ধ করেন সত্য, কিন্তু স্বয়ং মোহ-গ্রস্ত হন না। এরূপে, এক্ষেত্রে মায়া মায়াবীর কর্তৃত্বাধীন এবং মায়াবীকে স্পর্শও করতে পারে না। কিন্তু অবিদ্যার ক্ষেত্রে এর বিপরীত ব্যাপারই দৃষ্ট হয়। যেমন, কোন ব্যক্তি রজ্জুকে সর্প বলে ভ্রম করলে, তা তাঁর অবিদ্যারই ফল এবং তিনি অবিদ্যার দ্বারা মোহগ্রস্ত হয়েই এরূপ ভ্রমে পতিত হন। এক্ষেত্রে অবিদ্যা তাঁর কর্তৃত্বাধীন নয়—ইচ্ছা ব্যতীতই তিনি এই ভাবে অবিদ্যা-কবলিত হতে বাধ্য হন। সেজন্য পূর্বপক্ষীয় মত এই যে, "মায়া" ও "অবিদ্যা" বিভিন্ন পদার্থ —মায়া স্রষ্টা ঈশ্বরের অধীন এবং জগদ্‌ভ্রমের কারণ, অবিদ্যা সৃষ্ট জীবকেই অধীন করে রেখেছে এবং রজ্জু-সর্পাদি ভ্রমের কারণ।

এর উত্তরে অদ্বৈতবাদিগণ বলছেন যে, বাস্তবপক্ষে "মায়া" ও "অবিদ্যা" দুটি ভিন্ন পদার্থ নয়, যেহেতু প্রথমতঃ তাদের লক্ষণ ও স্বরূপ একই। উভয়েই একই ভাবে পার-মার্থিক তত্ত্ব প্রকাশের পথে বাধাস্বরূপ, এবং উভয়েই একই ভাবে মিথ্যাপ্রতীতির কারণ। দ্বিতীয়তঃ, মায়া ও অবিদ্যা উভয়েরই মোহসৃষ্টি করা বা মুগ্ধ করাই স্বভাব, এবং যথা-ক্রমে প্রযোক্তা ও দ্রষ্টা উভয়কেই তারা এই ভাবে মোহগ্রস্ত করে। বস্তুতঃ, এরূপ কোন নিয়ম নেই যে, মায়া প্রযোক্তাকে কোন দিনও মোহগ্রস্ত করে না; কিন্তু অবিদ্যা দ্রষ্টাকে সর্বদাই মোহগ্রস্ত করে। উপরন্তু, মায়ার যে যে প্রযোক্তার ও অবিদ্যার যে যে দ্রষ্টার এই মায়া ও অবিদ্যার মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয় জ্ঞান আছে, অথবা ঐ সকল মায়ামন্ত্রাদির প্রতীকার সম্বন্ধে জ্ঞান আছে—তাঁরা কোন দিনও মায়া ও অবিদ্যা দ্বারা মোহগ্রস্ত বা প্রতারিত হন না। কিন্তু যে যে প্রযোক্তা ও যে যে দ্রষ্টার সেরূপ জ্ঞান নেই, তাঁরা স্বভাবতঃই মায়া ও অবিদ্যা দ্বারা মোহগ্রস্ত ও প্রতারিত হন। অবশ্য, একথা সত্য যে, মায়ার প্রযোক্তা প্রায়ই মোহগ্রস্ত হন না, কিন্তু অবিদ্যার দ্রষ্টা প্রায়ই হন। কিন্তু যা পূর্বেই বলা হয়েছে, সেরূপ কোন স্থির নিয়ম না থাকাতে, কোন কোন ক্ষেত্রে এর বিপরীতও দেখা যায়। যেমন, মায়া বিষ্ণুর আশ্রিত হলেও, বিষ্ণুর অবতার শ্রীরাম মায়ামৃগ দ্বারা মোহগ্রস্ত হয়েছিলেন, যেহেতু তিনি সেই মায়ার প্রতিকারের অনুসন্ধান করেন নি। অপরপক্ষে, জলে ঊর্ধ্বমুখ বৃক্ষকে অধোমুখরূপে সামান্য ভাবে প্রত্যক্ষ করলেও, দ্রষ্টা সত্যই বৃক্ষকে অধোমুখরূপে গ্রহণ করে মোহগ্রস্ত বা প্রতারিত হন না, যে হেতু তীরস্থ ঊর্ধ্বমুখ বৃক্ষবিষয়ে তাঁর প্রকৃত জ্ঞান আছে। সেজন্য মায়া প্রযোক্তাকে মোহগ্রস্ত করেন না, কেবল অবিদ্যাই দ্রষ্টাকে মোহগ্রস্ত করে—এই কারণে মায়া ও অবিদ্যা ভিন্ন, তা বলা চলে না। তৃতীয়তঃ, মায়া ইচ্ছাপ্রযুক্ত, অবিদ্যা ইচ্ছাপ্রযুক্ত নয়—সেজন্যও মায়া ও অবিদ্যা ভিন্ন, তাও বলা চলে না। মায়ার ক্ষেত্রে যেমন ঐন্দ্রজালিক মণিমন্ত্রাদির সাহায্যে ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করেন, তেমনি অবিদ্যার ক্ষেত্রেও যে কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় স্বাধীন ভাবেই অঙ্গুলি দ্বারা চক্ষু চেপে ধরে দ্বিচন্দ্ররূপ মিথ্যা প্রত্যক্ষ করতে পারেন, পুনরায় তার প্রতিকার করে বা অঙ্গুলি সরিয়ে নিয়ে সেই মিথ্যাজ্ঞানের নিরসনও করতে পারেন। সেজন্য—

"শ্রুতি-স্মৃতি-ভাষ্যাদিষু মায়াবিদ্যয়োরভেদেন ব্যবহারঃ সংগচ্ছতে।"

শ্রুতি-স্মৃতি-ভাষ্য প্রভৃতিতে "মায়া" ও "অবিদ্যা"কে অভিন্ন বলেই গ্রহণ করা হয়েছে।

এরূপে, মায়া ও অবিদ্যা প্রকৃতপক্ষে এক, এবং কেবল

উপাধি-যোগেই তাদের মধ্যে ভিন্নতা সাধিত হয়। বস্তুতঃ, একই "অজ্ঞানের" ঔপাধিক দুটি রূপ : "মায়া" ও "অবিদ্যা"। ঈশ্বর অজ্ঞানের "মায়া"রূপ উপাধিবিশিষ্ট, জীব অজ্ঞানের "অবিদ্যা"রূপ উপাধিবিশিষ্ট। "অজ্ঞানের" আবরণ ও বিক্ষেপরূপ শক্তিদ্বয়ের মধ্যে যে স্থলে আবরণশক্তির প্রাধান্য, সে স্থলে 'অবিদ্যা' শব্দটি ব্যবহৃত হয় ; এবং যেস্থলে বিক্ষেপ শক্তির প্রাধান্য, সেস্থলে "মায়া" শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সেজন্য "সর্বদর্শনসংগ্রহ"-কার বলছেন :

"কচিদ্ বিক্ষেপ-প্রাধান্যেনাবরণ-প্রাধান্যেন চ মায়া-বিদ্যয়োর্ভেদে তদ্‌ব্যবহারো ন বিরুধ্যেত। তদুক্তম্ :

"মায়া বিক্ষিপদজ্ঞানমীশেচ্ছাবশবর্তি বা।

অবিদ্যাচ্ছাদয়ত্তত্ত্বং স্বাতন্ত্র্যানুবিধায়িবা॥" ইতি

অর্থাৎ, বিক্ষেপ-শক্তিমান ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন যে "অজ্ঞান", তাকে "মায়া" বলা হয়; আবরণ-শক্তিমান স্বতন্ত্র যে "অজ্ঞান", তাকে "অবিদ্যা" বলা হয়। এই দুটি বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করা হলেও প্রকৃতপক্ষে "মায়া" ও "অবিদ্যা"র মধ্যে কোনরূপ ভেদ নেই।

সেজন্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে "মায়া"কে "অবিদ্যাত্মিকা" বলে গ্রহণ করে "মায়া" ও "অবিদ্যার" অভেদত্ব স্বীকার করেছেন :

"অবিদ্যাত্মিকা হি সা বীজশক্তিরব্যক্ত-নির্দেশ্যা। পরমেশ্বরাশ্রয়া মায়াময়ী মহাসুষুপ্তিঃ, যস্যাং স্বরূপ-প্রতিবোধ-রহিতাঃ শেরতে সংসারিণো জীবাঃ।"

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, ১।৪।৩)

অর্থাৎ, পরমেশ্বরের সৃষ্টির বীজশক্তি অব্যক্ত বা প্রকৃতি অবিদ্যাত্মিকা এবং এই হ'ল পরমেশ্বরাশ্রয়া মায়াময়ী মহা-সুষুপ্তি, যাঁর স্বরূপ জানতে না পেরে জীবগণ মোহনিদ্রায় মগ্ন হয়ে থাকে।

শঙ্করের ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের টীকা, পদ্মপাদ-বিরচিত "পঞ্চপাদিকা" টীকা, প্রকাশত্মযতি রচিত "পঞ্চপাদিকা-বিবরণে"ও বলা আছে :

"ভাষ্যকারেণ অবিদ্যাত্মিকা মায়াশক্তিরিতি নির্দেশাৎ, টীকাকারেণ চাবিদ্যা মায়া মিথ্যাপ্রত্যয় ইত্যুক্তত্বাৎ। তস্মাল্লক্ষণৈক্যাদ্ বৃদ্ধব্যবহারে চৈকত্বাবগমাৎ একস্মিন্নপি বস্তুনি বিক্ষেপ-প্রাধান্যেন মায়া আচ্ছাদন-প্রাধান্যেন অবিদ্যেতি ব্যবহার-ভেদঃ।"

(পঞ্চপাদিকা-বিবরণ, পৃ ৩২)

অর্থাৎ, ভাষ্যকার শঙ্করের মতে মায়াশক্তি অবিদ্যাত্মিকা, টীকাকার পদ্মপাদের মতে অবিদ্যা ও মায়া মিথ্যাপ্রত্যয়-রূপা। সেজন্য প্রাচীন মতানুসারে মায়া ও অবিদ্যা এক হলেও বিক্ষেপশক্তির প্রাধান্যের জন্য "অবিদ্যা"—এই ভেদ ব্যবহার হয়।

"অজ্ঞান" এই শব্দটি নঞ্‌-মূলক হলেও অদ্বৈত-বেদান্ত-মতে অজ্ঞান অভাবরূপ নয়, ভাবরূপ। কারণ, অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপ—এই দুটি কার্য আছে। এরূপে, অজ্ঞান নিষ্ক্রিয় জ্ঞানাভাবই মাত্র নয়, সক্রিয় সত্য জ্ঞানাবরক ও মিথ্যাজ্ঞান-স্রষ্টা। কিন্তু কোন অভাব কার্যকরী হতে পারে না—ভাবপদার্থই কেবল তা হতে পারে। সেজন্য অজ্ঞানও ভাবপদার্থ, জ্ঞানপ্রাগভাব নয়।

"সর্ব-দর্শন-সংগ্রহ"কার সায়ণমাধব "পঞ্চপাদিকা-বিবরণ" কার প্রকাশাত্মযতি, "কল্পতরু"কার অমলানন্দ প্রভৃতির মত-বাদের সারার্থ সঙ্কলিত করে অজ্ঞানের ভাবরূপত্ব সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা হ'ল সংক্ষেপে এই। বিদ্যারণ্য মুনীশ্বরকৃত "বিবরণ-প্রমেয়সংগ্রহ" প্রমুখ সুপ্রসিদ্ধ অদ্বৈত বেদান্ত-গ্রন্থেও একই ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। রামানুজের ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য "শ্রীভাষ্যেও" এই একই বিবরণ পূর্বপক্ষীয় বিবরণরূপে গ্রথিত আছে।

প্রথমতঃ, "অহমজ্ঞো, মামন্যঞ্চ ন জানামি", "আমি অজ্ঞ, আমি আমাকে ও অন্যকে জানি না"—এই ভাবে অজ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয়। এই অজ্ঞান জ্ঞানপ্রাগভাব নয়, কারণ অভাব 'অনুপলব্ধি' নামক প্রমাণের বিষয়, 'প্রত্যক্ষে'র বিষয় নয়। কিন্তু "আমি অজ্ঞ" এই জ্ঞান "আমি সুখী" এই জ্ঞানের মতই অপরোক্ষ ও প্রত্যক্ষাত্মক। সেজন্য অজ্ঞানও ভাব-পদার্থ—যেহেতু কেবলমাত্র ভাবপদার্থেরই প্রত্যক্ষ হতে পারে, অভাবের নয়।

দ্বিতীয়তঃ, অভাব-জ্ঞানকালে অভাবের 'প্রতিযোগী' ও অনুযোগী'—উভয়েরই জ্ঞান পূর্বে থাকা আবশ্যক। যে বিষয়ের অভাব তাকে অভাবের 'প্রতিযোগী' এবং যে স্থলে অভাব, তাকে অভাবের 'অনুযোগী' বলে। যেমন, 'ভূতলে ঘট নেই' এরূপ ঘটাভাবজ্ঞানস্থলে, 'ঘট' হ'ল প্রতিযোগী এবং 'ভূতল' হ'ল অনুযোগী। এস্থলে ঘট ও ভূতল সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলে, ভূতলে ঘটাভাব সম্বন্ধেও জ্ঞান থাকতে পারে না। একই ভাবে, "আমি অজ্ঞ" এই প্রতীতিকালে 'জ্ঞান' হ'ল প্রতিযোগী এবং 'আত্মা' হ'ল অনুযোগী। সে-জন্য অজ্ঞান যদি জ্ঞানপ্রাগভাব মাত্রই হয়, তা হলে একটি উভয়-সঙ্কটের সৃষ্টি হবে। সে ক্ষেত্রে বলতে হবে যে, হয় জ্ঞানাভাব ও জ্ঞান একত্রে আছে, যা অসম্ভব ; নয় জ্ঞান নেই এবং সেজন্য জ্ঞানাভাবের প্রতীতিও নেই।

বস্তুতঃ, "আমি অজ্ঞ" এই প্রতীতিও একটি ভাবমূলক জ্ঞান, অথবা আমার অজ্ঞতা সম্বন্ধে ভাবমূলক (positive) জ্ঞান। আমার অজ্ঞতা বিষয়ে আমার নিজেরই পরিষ্কার,

প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকলে, "আমি অজ্ঞ" এরূপ বলা আমার পক্ষে সম্ভবপর কিরূপে? সেজন্য আমার অজ্ঞতা বা অজ্ঞান যদি জ্ঞানাভাবমাত্রই হয়, তা হলে "আমি অজ্ঞ" এরূপ প্রত্যক্ষস্থলে সেই জ্ঞানাভাবেরই জ্ঞান হচ্ছে, অথবা জ্ঞানাভাব ও জ্ঞান একত্রে বিরাজ করছে—এই অদ্ভুত মত স্বীকার করে নিতে হয়। কিন্তু অজ্ঞান যদি ভাবপদার্থ হয়, তা হলে সে দিক থেকে কোন আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, "ময়ি জ্ঞানং নাস্তি"—"আমাতে জ্ঞান নেই"—এরূপ প্রতীতিও স্বভাবসিদ্ধ। এস্থলে, প্রথমে "ময়ি" বা আমার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় এবং পরে সেই আমাতে জ্ঞানের অভাব বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। সে ক্ষেত্রেও উপরে যা বলা হয়েছে, আমার বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকলে, সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সঙ্গে একত্রে জ্ঞানের অভাবের জ্ঞানই বা থাকবে কি করে? এস্থলে দুটি প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে:—আমার বিষয়ে জ্ঞান, এবং আমাতে জ্ঞানাভাবের বিষয়ে জ্ঞান। সেজন্য পুনরায় এস্থলে জ্ঞানের অভাব থাকতেই পারে না। এই কারণেও অজ্ঞান জ্ঞানাভাব নয়, ভাব-পদার্থ।

চতুর্থতঃ, "ত্বদুক্তমর্থং শাস্ত্রার্থং বা ন জানামি" "তুমি যা বলেছ বা শাস্ত্রের অর্থ আমি জানি না"—এরূপ নির্দিষ্টবিষয়-শূন্য প্রতীতিস্থলেও আমার অজ্ঞানের বিষয়ে আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে; অর্থাৎ আমি যে কিছু জানি না—সে বিষয়ে আমিই ত জানছি। সেই কারণেও অজ্ঞান ভাবরূপ।

পঞ্চমতঃ, অজ্ঞানই রজ্জু-সর্প-ভ্রমকালে, মিথ্যা রজ্জুর উপাদান কারণ। কিন্তু অভাব ত উপাদান হতে পারে না, সেজন্য অজ্ঞান ভাবপদার্থ।

এরূপে, প্রত্যক্ষ দ্বারা ভাবরূপ অজ্ঞানের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ, সত্য বস্তুর আবরক ও মিথ্যা বস্তুর উপাদান ও স্রষ্টারূপে সক্রিয় বলে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় বলে এবং জ্ঞান ও জ্ঞানাভাবের সহাবস্থিতি অসম্ভব বলে অজ্ঞানকে ভাবপদার্থ বলে স্বীকার করে নিতে হয়।

একই ভাবে, অনুমানও ভাবরূপ অজ্ঞানের অস্তিত্ব সিদ্ধ করে। সেই অনুমানটি হ'ল এই:

"বিবাদপদং প্রমাণজ্ঞানং, স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত-স্ববিষয়াবরণ-স্বনিবর্ত্য-স্বদেশগত-বস্ত্বন্তরপূর্বকম্ অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশকত্বাৎ, অন্ধকারে প্রথমোৎপন্নপ্রদীপ-প্রভাবদিতি।" (সর্বদর্শন-সংগ্রহঃ)।

এই একই অনুমান-প্রণালী প্রকাশাত্মযতির "পঞ্চপাদিকা-বিবরণে" আছে। রামানুজের ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য "শ্রী-ভাষ্যেও" পূর্বপক্ষীয় মতবাদরূপে এটি দেওয়া আছে।

এরূপ অনুমান-প্রণালীর অর্থ হ'ল এই: অন্ধকারে যখন প্রথম প্রদীপ প্রজ্জলিত করা হয়, তখন সেই প্রদীপ তিনটি কার্য করে: স্বীয় প্রাগভাব ধ্বংস করে, অন্ধকার ধ্বংস করে, এবং অন্ধকারাবৃত অপ্রকাশিত ঘটপটাদি বস্তুকে প্রকাশিত করে। এস্থলে আলোকের প্রাগভাব ও অন্ধকার কিন্তু এক পদার্থ নয়। একই ভাবে, জ্ঞানের উদয় হলে জ্ঞানও তিনটি কার্য করে—জ্ঞানের প্রাগভাব ধ্বংস করে, অজ্ঞান ধ্বংস করে, ও অজ্ঞানাবৃত অপ্রকাশিত ঘটপটাদি বস্তু প্রকাশিত করে। এস্থলেও, জ্ঞানের প্রাগভাব ও অজ্ঞান এক পদার্থ নয়। এরূপে, এই অনুমান প্রণালীর একটি ব্যাপ্তি গ্রহণ করা যেতে পারে।

যে সকল পদার্থ উৎপন্ন হয়ে, অপ্রকাশিত বা অবিজ্ঞাত বস্তুর স্বরূপ প্রকাশ করে, সেই সকল পদার্থের উৎপত্তির পূর্বে সেই সকল স্থানে এরূপ এক-একটি পদার্থ বিদ্যমান থাকে, যা সেই সকল পদার্থের প্রাগভাব নয়, যা সেই সকল পদার্থের বিষয় আবৃত করে রাখে, যা সেই সকল পদার্থ দ্বারাই নিবৃত্ত হয়, যা সেই সকল পদার্থেরই আশ্রিত।

যথা, অন্ধকারে প্রথম উৎপন্ন প্রদীপালোক।

একই ভাবে, জ্ঞানও উৎপন্ন হয়ে অপ্রকাশিত বা অবিজ্ঞাত ঘটপটাদির স্বরূপ প্রকাশ করে।

সেজন্য সিদ্ধান্ত এই যে: জ্ঞানের উৎপত্তির পূর্বে সেই স্থানে এরূপ একটি পদার্থ বিদ্যমান থাকে, যা জ্ঞানের প্রাগভাব নয়, যা জ্ঞানের বিষয় ঘটপটাদিকে আবৃত করে রাখে, যা জ্ঞান দ্বারাই নিবৃত্ত হয়, যা জ্ঞান বা বুদ্ধিতেই আশ্রিত।

এরূপ অনুমানগম্য পদার্থই হ'ল "অজ্ঞান"। "অজ্ঞানের" চারটি লক্ষণ: অজ্ঞান জ্ঞানের প্রাগভাব নয়, ভাবপদার্থ; অজ্ঞান জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশ্য বিষয়সমূহকে জ্ঞাতার নিকট থেকে আবৃত করে রাখে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে স্থলে স্থলে মিথ্যা জ্ঞানেরও সৃষ্টি করে; অজ্ঞান জ্ঞানের দ্বারাই নিবৃত্ত হয়; অজ্ঞান জ্ঞাতার আশ্রয়েই বিদ্যমান থাকে।

সেজন্য, অদ্বৈত-বেদান্ত মতে, আলোক অথবা আলোকের দ্বারা প্রকাশ্য বিষয়সমূহের আবরক অন্ধকার আলোকের প্রাগভাব মাত্রই নয়, একটি ভাব পদার্থ। তার প্রমাণ এই যে, উজ্জ্বল ও পূর্ণ আলোকে আলোকিত গৃহে সমস্ত বস্তুই স্পষ্ট ভাবে দেখা যায়; কিন্তু অস্পষ্ট ও অনুজ্জ্বল আলোকে আলোকিত গৃহে সেই সকল বস্তু স্পষ্ট ভাবে দেখা যায় না। এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে, এরূপ অস্পষ্ট ও অনুজ্জ্বল আলোকে আলোকিত গৃহে কেবল আলোকই নেই, সেই সঙ্গে সঙ্গে কিছু অন্ধকারও আছে, যা পূর্ণ ও স্পষ্ট প্রত্যক্ষের পথে বাধা জন্মাচ্ছে। কিন্তু অন্ধকার যদি আলোকের অভাবই মাত্র হ'ত, তা হলে আলোক ও অন্ধকার একত্রে থাকতে পারত না। সেজন্য অন্ধকারকে আলোকাভাব ব্যতিরিক্ত একটি ভাব-পদার্থ বলে স্বীকার করে

নিতে হয়। পদ্মপাদ তাঁর "পঞ্চপাদিকা" টীকায় এই কারণে বলছেন :

"দৃশ্যতে হি মন্দপ্রদীপে বেশ্মনি অস্পষ্টং রূপদর্শনমিতরত্র চ স্পষ্টম্। তেন জ্ঞায়তে মন্দপ্রদীপে বেশ্মনি তমসোঽপি ঈষদনুবৃত্তিরিতি।"

(পঞ্চপাদিকা, পৃঃ ৩)

একই ভাবে, "তমঃস্বভাবা অবিদ্যাও" জ্ঞানের অভাবমাত্রই নয়, অন্ধকারের ন্যায়ই জ্ঞানের আবরক একটি ভাব-পদার্থ। যে স্থলে সাধারণ ঘটপটাদি বস্তুসমূহের জ্ঞানের অভাবমাত্রই আছে, সে স্থলে এই ভাবরূপ অজ্ঞান জ্ঞানকে বা সেই সকল বস্তুকে আবৃতই মাত্র করে রাখে। কিন্তু যে স্থলে রজ্জু শুক্তি-প্রমুখ বস্তুসমূহের জ্ঞানের অভাবমাত্রই কেবল নেই, সেই সঙ্গে সঙ্গে সর্প-রজত-প্রমুখ মিথ্যা বস্তুর জ্ঞানও আছে, বা ভ্রমও আছে, সে স্থলে এই ভাবরূপ অজ্ঞান সেই সকল বস্তুকে কেবল আবৃতই করে রাখে না, সেই সঙ্গে সঙ্গে যেন তাদের স্থলে ভিন্ন বস্তু সৃষ্টি বা বিক্ষিপ্ত করে তাদের সেই সেই ভিন্ন বস্তুরূপে প্রতিভাত করে।

সেজন্য মণ্ডনমিশ্র তাঁর "ব্রহ্মসিদ্ধি"তে দু'প্রকার অবিদ্যার কথা বলেছেন—অগ্রহণ ও অন্যথাগ্রহণ বা মিথ্যা গ্রহণ।

"তস্মাদগ্রহণ-বিপর্যয়গ্রহণে দ্বে অবিদ্যে কার্যকারণ-ভাবে-নাবস্থিতে"

"দ্বিপ্রকারেয়মবিদ্যা, প্রকাশাচ্ছাদিকা বিক্ষেপিকা চ।"

(ব্রহ্মসিদ্ধি, পৃঃ ১৪৯)

প্রথম ক্ষেত্রে যা উপরে বলা হয়েছে, সত্য বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানাভাবই মাত্র থাকে; দ্বিতীয় ক্ষেত্রেই সে সঙ্গে মিথ্যা জ্ঞানেরও উদয় হয়।

অবশ্য মণ্ডনমিশ্রের এই মতবাদ খণ্ডিত হয়েছে সুরেশ্বর-রচিত বৃহদারণ্যক ভাষ্যবার্তিকে (শ্লোক ১৯৯, পৃ ১০৬৫, তৃতীয় ভাগ) তা তাঁরা এক বা ভিন্ন ব্যক্তি যাই হোন না, কেন। কিন্তু উপরে "সর্ব-দর্শন-সংগ্রহ"কার পদ্মাচার্য অমলানন্দ প্রমুখ অদ্বৈত-বেদান্ত ধুরন্ধরগণের মতবাদ উদ্ধৃত করে অজ্ঞানের যে স্বরূপ বর্ণনা করেছেন, তাতে এরূপ দু'প্রকারের অবিদ্যা স্বীকার করা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নেই।

বাচস্পতি মিশ্র তাঁর সুবিখ্যাত "ভামতী" টীকায় "মূলাবিদ্যা বা কারণাবিদ্যা" এবং "তুলাবিদ্যা বা কার্যবিদ্যা"—এই দ্বিবিধ অবিদ্যার কথা বলেছেন। "ভামতী"র প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণেই তিনি বলছেন :

"অনির্বাচ্যাবিদ্যাদ্বিতীয়-সচিবস্য প্রভবতো
বিবর্তা যস্যৈতে বিয়দনিল-তেজোঽবনয়ঃ।
যতশ্চাভূদ্ বিশ্বং চরমচরমুচ্চাবচমিদং
নমামস্তদ্ ব্রহ্ম পরিমিত-সুখ জ্ঞানমমৃতম্॥"

অর্থাৎ যিনি দ্বিবিধ, অনির্বাচ্য অবিদ্যার সাহায্যে আকাশ-বায়ু-তেজ-পৃথিবী বিবর্তরূপে সৃষ্টি করেছেন, যাঁর থেকে এই ভাবে চরাচর, উচ্চনীচ বিশ্ব উৎপন্ন হয়েছে, সেই অপরিমিত সুখ-জ্ঞান-অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মকে আমরা নমস্কার করি।

"মূলাবিদ্যা বা কারণাবিদ্যা" ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রমের কারণ, এবং মুক্তি বা ব্রহ্মোপলব্ধি পর্যন্ত এই অবিদ্যা অনুবর্তন করে। "তুলাবিদ্যা বা কার্যাবিদ্যা" জগতের মধ্যেই রজ্জুতে সর্প, শুক্তিতে রজত প্রমুখ সাধারণ ভ্রমের কারণ এবং অল্প পরেই রজ্জু, শুক্তি প্রভৃতির জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই এরূপ ভ্রম বিদূরিত হয়ে যায়।

পদ্মপাদ তাঁর "পঞ্চপাদিকাতে"ও এই দুইপ্রকার অবিদ্যার উল্লেখ করেছেন।

এরূপে, শঙ্করের মতে সদসদ বিলক্ষণ, অনির্বচনীয়, ভাবরূপ, অনাদি "অজ্ঞান"ই সৃষ্টি বা এই বিশ্বপ্রপঞ্চের মূলীভূত কারণ—যদিও যা পূর্বেই বলা হয়েছে, স্রষ্টা ঈশ্বরের দিক থেকে তাকে বলা হয় "মায়া" এবং সৃষ্ট জীবজগতের দিক থেকে তাকে বলা হয় "অবিদ্যা"। সেজন্য "সর্ব-দর্শন-সংগ্রহ"-কার সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছেন :

"যদেব পররূপাদর্শনং সৈবাদে,তি ভাবরূপাজ্ঞানানভ্যুপগমে জীবেশ্বরাদি-বিভাগানুপপত্তেঃ। ন চ ভাবিকঃ পরমাত্মনোংশোজীব ইতি বাচ্যম।"

(সর্ব-দর্শন-সংগ্রহ, পৃঃ ৪৫৮)

অর্থাৎ পর বা ব্রহ্মের স্বরূপ অদর্শনের নামই হ'ল "অবিদ্যা"। এরূপ ভাবরূপ অজ্ঞানের জন্যই ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও জীবজগতের মধ্যে যেন ভেদের সৃষ্টি হয় ব্যবহারিক দিক থেকে। কিন্তু পারমার্থিক দিক থেকে জীবজগৎ ব্রহ্মের অংশ নয়, স্বয়ংই ব্রহ্ম।

বিশ্বপ্রপঞ্চ যে মিথ্যা মায়ামাত্র এবং এই মায়ার মাধ্যমেই যে তথাকথিত সৃষ্টি, সেকথা বলা হয়েছে আর একটি শ্লোকে :

"অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশ-পঞ্চকম্।
আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততোদ্বয়ম।"

(দৃগ্‌ দৃশ্য বিবেক)

ব্রহ্মের বিবর্তরূপী বিশ্বের প্রতি বস্তুই পঞ্চরূপী—এই পঞ্চরূপ হ'ল অস্তিত্ব, প্রকাশত্ব, প্রিয়ত্ব, নাম ও রূপ। এর মধ্যে প্রথম তিনটি হ'ল ব্রহ্ম, শেষ দুটি হ'ল জগৎ বা অজ্ঞান বিকার।

এরূপে, নানারূপ যুক্তিতর্কের সাহায্যে শঙ্কর তাঁর যে মায়াবাদ প্রপঞ্চিত করেছেন, তার অন্তর্নিহিত মহিমা ও গরিমা সকলকেই, এমনকি, মায়াবাদ-বিরোধীদেরও মুগ্ধ না করে পারে না।

কলহান্তরিতা

শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়

এখন আর ক্ষান্ত বর্ষণ নয়, এখন চলেছে পুরো বর্ষণ। মাঝে মাঝে সাইক্লোনের আবহাওয়া আসে ঘন ঘোর করে। তার পরই সুরু হয় বর্ষণ। দুর্যোগ চলেছে ক'দিন ধরে, চলেছে একাদিক্রমে। এর যেন শেষ নেই, বিরাম নেই।

অথচ অপলাকে বিয়ে করেছে সুধীর, পুরো দু'বছরও হয় নি এখনও। নিজে পছন্দ করেই বিয়ে করেছে তাকে। দিন কাটছিল তাদের সুখেই, আমোদ-আহ্লাদে। হঠাৎ মেঘ দেখা দিল ঈশান কোণে। তার পর সেই মেঘ রাতারাতি ফেলল আকাশটাকে ঢেকে। নিরবচ্ছিন্ন সুখের দাম্পত্য-জীবনে ঝড় উঠল সেদিন।

দোষ অপলাকে দেওয়া যায় না। মেয়েদের ঈর্ষাকাতর মন। বিশেষতঃ স্বামীর ব্যাপারে। সংরক্ষিত এলাকার মত স্বামীটিকে সে রাখতে চায় ঘিরে, গণ্ডী দিয়ে রাখতে চায় অন্য মেয়ের ছোঁয়াচ থেকে। এই গণ্ডীকে ডিঙিয়েও সন্দেহ যদি ঢোকে একবার, সংশয় করে আত্মপ্রকাশ, তা হলে রক্ষে নেই আর। তখন গণ্ডীর ফাঁদ সঙ্কুচিত হয়ে আসে, কণ্ঠে রজ্জু হয়ে চেপে বসে। এ ফাঁদ সুধীরেরও কণ্ঠে রজ্জু হয়ে বসল একদিন।

দোষ সুধীরের। এ স্বখাত সলিলে আত্মনিমজ্জন। প্রয়োজন ছিল না বহিরাঙ্গনের সব কথা টেনে আনবার গৃহাঙ্গনে। তাদের আপিসে নবাগতা লেডি টাইপিষ্ট সুন্দরী তরুণী তড়িৎকণাকে নতুন পরিচয়ের উৎসাহে মে-ফেয়ার রেস্তোরাঁয় সে চা খাইয়েছিল একদিন, এ কথাটাও সে শোনাতে ভোলে নি স্ত্রীকে। নিজের নাম বাড়াবার জন্যে বেশ একটু রং চড়িয়েই সে শোনাল অপলাকে। ব্যস! তার পর থেকেই সুরু হ'ল দক্ষযজ্ঞ। প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় অঙ্ক শেষ হ'ল একে একে। ঝড়ঝঞ্ঝা, সাইক্লোন বয়ে চলল পর পর। স্ত্রীর মেজাজ হ'ল উগ্র, তার পর আর এক ধাপ পেরিয়ে উগ্রতর। তার পর? তার পরের আর শেষ নেই। শেষে কথা বলা দায়। সন্দেহ অন্তরকে করে তোলে ভারাক্রান্ত, চিত্তকে শ্রান্ত। সময় সময় একটা হিংস্র উত্তেজনা বিক্ষিপ্ত করে রাখে মনকে। সামান্য কথা—মিষ্টি হয় নি চায়ে বা স্বাদ হয় নি তেমন এটুকুও সহ্য হবে না তার, ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে! বলবে মুখ-চোখ রাঙা করে, ওর চেয়ে ভাল স্বাদ হবে না আমার দ্বারা। এবার থেকে চা খেও মে-ফেয়ার রেস্তোরাঁয় তড়িৎকণাকে পাশে বসিয়ে। চায়ে স্বাদও পাবে, চা মিষ্টিও লাগবে।

কথার ঝাঁজ দেখে সুধীর থমকে যায়। হয় ত ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলে, চা না হয় খেলাম রেস্তোরাঁয়। কিন্তু ডাল-তরকারী? সেগুলো ত রেস্তোরাঁয় পাওয়া যাবে না। তার সোয়াদ হয় না কেন আজকাল?

ব্যস, আর যায় কোথা। অপলা ঝাঁপিয়ে পড়ে, পারব না, পারব না আমি ওর চাইতে ভাল রাঁধতে। যে পারে, সেই তড়িৎকণাকে নিয়ে এস, সেই দেবে সোয়াদী রান্না রেঁধে। আর না হয় বাবুর্চি রাখ, আমায় রেহাই দাও এবার। জীবনটা জ্বলে পুড়ে গেল।

কিন্তু চরম হ'ল সেই দিন যেদিন ডাইভোর্স বিলের কথাটা উঠল বাড়ীতে।

অপলা বলল, বেশ ত, ভালই ত, এই ত সুযোগ, ব্যবস্থা করে ফেল একটা।

সুধীর বলল, চাকরীজীবি গরীবের ছেলে। চাকরী করে খাই, এত সব কিচলেমী মারপ্যাঁচ বুঝি না আমরা, উকীলের মেয়ে তুমি, উকীলের বোন। তোমার রক্তে রক্তে এর স্বাদ। সুব্যবস্থা করতেও তোমার যতক্ষণ, অব্যবস্থা করতেও ততক্ষণ। চেষ্টা করেই দেখ না একবার, পুরনো মালিককে উচ্ছেদ করে নতুন মালিকের আমন্ত্রণ—মন্দ কি। জীবনে এও একটা বিচিত্রতা।

চোখ-মুখ লাল হয়ে ওঠে অপলার। রাগে চীৎকার করতে যায় সে, কিন্তু পারে না—গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে যায়। তবুও বলে কোনমতে, এ আমার ব্যবসা নয়। বাপ-মা আমার ভদ্রমনা, তাই মেয়েকে এ সব শিক্ষা দেন নি কোন দিন। তাঁদের বরাতগুণে জামাই পেয়েছেন গুণবান, তাই যত সব অনামা আস্তাকুঁড়ের মেয়েদের সঙ্গে মিশে মিশে মনের গতিও হয়েছে সেই রকম। ছোটলোকদের মত এই সব ইতরামি শিখলে কোথায়?

এত দিন রাগের পালা একচেটে ছিল অপলার। সুধীর ধারে কাছে ঘেঁষত না এ সবের। মাঝে মাঝে দু'-একটা টিপ্পনি কাটত যা সে শুধু স্ত্রীর রাগটাকে উপভোগ করবার জন্যে। আজ এই সর্বপ্রথম রাগ হ'ল তার। চরিত্রের ওপর কটাক্ষপাত সয়ে এসেছে সে, কিন্তু মানসিক সৌন্দর্য, কৃষ্টি

এদের ওপর কটাক্ষপাত একেবারে অসহ্য। সুধীর গুম হয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে, এ সব চলে বাগদীদের কথা, ভদ্রসমাজে এ অচল। রাগের মাথায় তুমি যে নেমে আসতে পার এতখানি, এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। ব্যস আর নয়, এইখানেই হোক এর শেষ। তুমি থাক তোমারটা নিয়ে," আমি আমারটা। এর পর কথাবার্তা আমাদের মধ্যে না থাকাই ভাল। তা হলে 'না যাব নগর, না হবে ঝগড়।'

অপলাও রাজী হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। বলে, সেই ভাল।

কথাবার্তা বন্ধ—চঞ্চল হয়ে ওঠে দুজনেই। দুজনেই চুরি করে তাকায় পরস্পরের দিকে, ধরা পড়ে চোখ নামিয়ে নেয়, আবার তাকায়। উত্তেজনার মুখে যা ছিল সহজ, অনুত্তেজনায় তা হয়ে ওঠে কঠিন। অপরিণামদর্শিতার চাপে দুজনেই অস্থির। শেষ পর্যন্ত থাকতে পারে না অপলা। বলে, এক বাড়ীতে থাকব, বাস করব একসঙ্গে অথচ কথা বলব না, এ আবার কি। সময়-অসময়, দায়-অদায় আছে, কথা না বলে চলে কি করে?

সুধীর বলে, যেমন চলবার ঠিকই চলবে। আর তেমন যদি প্রয়োজন হয়, এই রইল খাতা, এই রইল কলম, লিখে জানালেই হবে। ব্যবস্থাও হবে সেই মত। বলে সত্যি সত্যিই খাতা আর কলম পাশাপাশি সাজিয়ে রাখে টেবিলের ওপর।

—এতে লাভ?

—অন্ততঃ মুখ-খিঁচুনির হাত থেকে রেহাই পাব আমি। খাতায় কলমে ও কাজটি হবে না।

—বেশ, ভাল কথা। গুম হয়ে যায় অপলা।

আবার কথা বন্ধ। অপলা হাঁপিয়ে ওঠে, যাকে ভালবাসে সে, যার ওপর নির্ভর করে তার এই সংসার, তারই সঙ্গে কথা না বলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন কাটে কি করে? স্বামীকে ভালবাসে বলেই না সে খিটিমিটি বাধায়! এর মধ্যেও যে একটা সুখ আছে এ বোঝে না কেন সুধীর? অভিমানে জল গড়িয়ে পড়ে অপলার চোখ দিয়ে। সে মুখ ফিরিয়ে নেয়, দাঁতে দাঁত চেপে নিরস্ত করে নিজেকে। কথা সে বলবে না, কিছুতেই না। খাতার দিকে একবার দেখে তাকিয়ে, একবার কলমের দিকে। যখন থাকতে পারে না, তখন লেখে উঠে গিয়ে, এটা কি ভাল হচ্ছে?

খাতাটা টেবিলের ওপরই রেখে দেয় সুধীরের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে।

সুধীর পড়ে তলায় লেখে, কোনটা!

আবার লেখে অপলা, এমনি করে থাকা একেবারে কথা বন্ধ করে? খাতাখানা সে ঠেলে দেয় স্বামীর দিকে।

জবাবে সুধীর লেখে, মন্দ কি। তবু ত শান্তিতে আছি।

অপলা রেগে যায়। রাগ করে লেখে, বেশ, শান্তিতেই থাক তবে। যত অশান্তির মূল আমি। আমিই তোমার আপদ।

অন্য সময় হলে সুধীর বলত, ও কথা বলো না পলা, তুমিই আমার শান্তি, তুমি আমার সম্পদ। কিন্তু সে চুপ করে গেল ইচ্ছে করেই।

আপিস থেকে ফিরতে দেরী হয়ে যায় সুধীরের। হয়ত ইচ্ছাকৃত এ দেরী। ঘরে ঢুকেই চোখে পড়ে খাতাখানা, টেবিলের ওপর পড়ে আছে চোখের সামনে। তার ওপর লেখা আছে বড় বড় অক্ষরে, এত দেরী হ'ল যে আজ?

অপলা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। সুধীর তলায় লেখে ছোট্ট করে, এমনিই।

অর্থাৎ ব্যাপারটা এমন কিছু অসাধারণ নয় যার জন্যে জবাবদিহি করতে হবে সকলের কাছে।

অপলা ঘরে ঢোকে, কিন্তু উত্তর দেখে জ্বলে ওঠে। মনঃপূত হয় না তার, তবে রাগ প্রকাশ করে না। খাতাখানা টেনে নিয়ে লেখে, চা এনে দেব?

—ন্‌নাঃ।

খাতা চলাফেরা করে মাকুর মত। এ ঠেলে দেয় ওর দিকে, ও দেয় এর দিকে।

—জলখাবার?

সুধীর লেখে সেই একই উত্তর—ন্‌নাঃ।

এতখানি তাচ্ছিল্য সইতে পারে না অপলা। গরগর করে রাগে, কিন্তু মনের রাগ কথায় প্রকাশ্য হলেও, খাতায় থাকে অপ্রকাশ্য। তবুও সে কলমের ওপর রাগ দেখিয়ে লিখে যায় তরতর করে, জলযোগটা কি শেষ করে আসা হ'ল মে-ফেয়ার রেস্তোরাঁয়।

—না।—সেই উত্তর; সুধীর যেন প্রতিজ্ঞা করেছে অন্য কিছু লিখবে না আজ। চিত্তদাহে ছটফট করে বেড়ায় অপলা।

রাত্রের খাবার টেবিলের ওপর রেখে যায় অপলা; এক জনের খাবার। সাধারণতঃ স্বামি-স্ত্রীতে খেতে বসে এক সঙ্গে; এ নিয়ম চলে আসছিল এতদিন, শুধু ব্যাহত হ'ল আজ। সুধীর বুঝতে পারল, চা-জলখাবার না খাওয়ার প্রতিক্রিয়া এ। থালাখানাকে ঠেলে সরিয়ে দিল সে। খাতার ওপর লিখল, এত দিন ছিল দুই, আজ হ'ল এক। এত দিন একত্রে যা ছিল স-সঙ্গ, আজ তা হ'ল নিঃসঙ্গ। কারণটা জানতে পারি কি?

অপর পক্ষ নিরুত্তর। যেমন দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনই দাঁড়িয়ে রইল। লেখবার তাগিদ দেখা গেল না এতটুকু।

সুধীর অপেক্ষা করে। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষায় থেকে তার পর আবার লেখে, দুয়ের জায়গায় এক, এ স্থান সঙ্কোচ কেন ?

অপলা এগিয়ে আসে। থালাখানা সুধীরের দিকে সরিয়ে দেয়। কলমটা তুলে নিয়ে লেখে, স্থান-সঙ্কোচ কি ব্যয়-সঙ্কোচ জানি না। তবে দুয়ের একজন গেছে মরে। শেষ পর্যন্ত কি ভেবে 'মরে গেছে' কথাটা কেটে দিয়ে লেখে, এক জন দেহ রেখেছে।

সুধীর যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল। জিভ এবং তালুর সহ-যোগে খেদসূচক একটা শব্দ করে লিখল, আহা বেচারী! কাজটা ভাল করে নি কিন্তু, এক যাত্রায় পৃথক ফল শাস্ত্রেই বারণ। অতএব একজন যখন দেহ রেখেছেন তখন আর একজনকে রাখতেই হবে। সুতরাং—

'সুতরাং'-এর প্রয়োজন হ'ল না। শেষ পর্যন্ত দেহও রাখতে হ'ল না কাকেও। যে যার দেহ নিয়ে সশরীরেই বসে গেল পাশাপাশি। ভোজনকার্য চলল বটে, তবে নিঃশব্দে। একজনের চোখে কৌতুক, একজনের মুখ গম্ভীর।

পরদিন আপিস থেকে ফিরল সুধীর যথাসময়ে। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় অপলা। সেই সুযোগে খাতাখানা দেখে নেয় সুধীর পোশাক পাল্টাবার আগেই। সাদা পাতা, পড়ে আছে মৌন মুক, নিষ্কলঙ্ক বুক তার। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সে। এ ক'দিনেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বেজায়। এ নাটকের যবনিকাপাত হলেই যেন বাঁচে।

কিছুক্ষণ পর।

আপিসের পোশাক বদলে বসেছিল সুধীর। যতই খিটিমিটি হোক না তাদের, এ সময়টিতে কাছে থাকে অপলা, বড় ভাল লাগে তার। ফুটফুটে মেয়েটি, কিন্তু খরখরে মেজাজটি—অভিমানের প্রস্রবণ।

ঘরে আলো জেলে দিয়ে যায় চাকর মধু। এও এক ব্যতিক্রম; এ কাজ অপলার, সে নিজে করে। এ সময়টিতে সে সঙ্গছাড়া হয় না কোন দিন। পাশটিতে বসে থেকে উল্টো দিকে মুখ করে তার কাঁধের ওপর দিয়ে লতিয়ে দেয় হাতখানি তার। তার পর ছোট্ট একটি আওয়াজ খুট, সঙ্গে সঙ্গে ঘরখানি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে আলোতে। কিন্তু আজ হ'ল না কিছুই। রান্নাঘর থেকে অপলার গলা শোনা যায় অথচ সে এ ঘরে আসে না, বড় ব্যস্ত সে সেইখানে। আজ না এল চা, না জলখাবার। সুধীর বুঝল, কালকের জের চলেছে আজও। একটু বিরক্তও হ'ল সে। বিরক্ত কণ্ঠেই হাঁক দিল, মধু, চা খাওয়াতে পারিস রে এক কাপ। পাশের ঘরে এ শব্দ পৌঁছতে বিলম্ব হয় না। ঝঙ্কার ওঠে সঙ্গে সঙ্গে, কেন রে মধু, মে-ফেয়ার রেস্তোরাঁয় চা আজ ফুরিয়ে গেল নাকি? ঘরের চা অত সস্তা নয় যে, রোজ রোজ ফেলে দিতে হবে তা। আমি পারব না অপচয় করতে এ ভাবে।

কিন্তু অপচয় করতেই হ'ল—চা এবং জলখাবার দুয়েরই, প্লেটে করে সাজিয়ে দিয়ে গেল মধু।

অপলা যখন ঘরে এসে ঢোকে তখন দাগ পড়ে গেছে খাতার পাতায়। শুভ্র পাতার ওপর কালির আঁচড়—সুধীর আগে থেকেই জানিয়ে রেখেছে, রাত হবে ফিরতে।

দেখে গুম হয়ে যায় অপলা। অবশ্য এই রকমই কিছু একটা প্রত্যাশা করছিল সে মনে মনে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তার পর প্রশ্ন জানায় লিখে, রাত হবে বুঝলাম, কিন্তু কত রাত হবে?

সুধীর গম্ভীর মুখে লিখে দেয়, জানি না; দশটাও হতে পারে, আবার এগারটা-বারটাও হতে পারে।

চমকে ওঠে অপলা। লেখে তাড়াতাড়ি, অত রাত? আমি থাকব কি করে একা?

—কেন, মধু রইল। তা ছাড়া রাস্তার ধারে বাড়ী; লোকজন, গাড়ী-ঘোড়া গমগম করছে সর্বদা। ভয়ের কোন কারণ ত দেখি না।—গম্ভীর মুখে খাতাখানা এগিয়ে দিল সুধীর।

অপলা বেঁকে বসে, যত রাগ গিয়ে পড়ে তার খাতার ওপর। জোর দিয়ে লেখে, না না না। আমি পারব না, কিছুতেই পারব না।

—পারব না কি?

—একলা থাকতে।

লেখার বিরাম নেই দুজনের। খাতা ছুটোছুটি করে আবার মাকুর মত এদিক-ওদিক।

সুধীর লেখে, তা হলে?

অপলা লিখতে যায়, তা হলে বন্ধ করতে হবে রাত্রি-বিহার। বন্ধ করতে হবে তড়িৎকণার সঙ্গে গোপন মেলা-মেশা। চলবে না এ সব অনাচার। কিন্তু অত না লিখে লেখে শুধু, তা হলে অত রাত করা চলবে না।

—চলবে না?

—না। অপলা যেন টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত করল, না।

—বেশ, আমি যাব না।

সুধীর শুয়ে পড়ে বিছানার ওপর বালিশটাকে জড়িয়ে।

কিন্তু মৃদু হাসি ফুটে ওঠে অপলার মুখে। এ জয়ের হাসি। অপলা ঘর ছেড়ে চলে যায় এ হাসিটি মুখে নিয়ে।

পর দিন।

সকালে ঘুম থেকে চোখ খুলেই সুধীর দেখে খাতাখানা পড়ে আছে তার পাশে, সেই সঙ্গে কলমটিও। লেখা আছে গোটা গোটা অক্ষরে—বাজারে যেতে হবে একবার। অপলার হাতের লেখা ভাল কিন্তু সুধাবর্ষী নয়, সুধাবর্ষণও করল না সুধীরের প্রাণে। চোখেও করল না, মনেও করল না। খাতা-খানাকে একপাশে ঠেলে দিয়ে সে শুয়ে রইল।

ঘরের মধ্যে এল অপলা, চারিদিকে উঁকিঝুঁকি মারল একবার। তার পর গেল বেরিয়ে। কিছু পর আবার এসে ঢুকল ঘরে। ততক্ষণে সুধীর লিখে রেখেছে খাতার পাতায়, এতখানি অনুগ্রহ কেন? মধু করছে কি?

আলমারী খোলবার ছল করে অপলা দেখে লেখাটি। তার পর কলমটি নিয়ে লিখে দেয় নীচে, মধুকে দিয়ে পোষাচ্ছে না। আজকাল চুরির দিকে নজরটা তার বেশী। খাতাখানা আবার যথাস্থানে রেখে দেয় সে।

উত্তর মনঃপূত হয় না সুধীরের। তাই উত্তরে জানায়, ওদিকে নজর যে আমারও যাবে না তার প্রমাণ কি?

—নতুন কথা! নিজের জিনিস নিজে চুরি করে কেউ? প্রশ্ন লেখে অপলা খাতায়।

—করে। নিজের অনেক জিনিসই লোকে চুরি করে নিজে—সুধীর লিখে যায়, মনের ইচ্ছাও চুরি করে, মনের গোপন ভাবটাও চুরি করে।

অপলা রাগ করে। লিখে যায় খস্‌খস্ করে, অত ভাব-ভালবাসার কথা বুঝি নে আমি। কবিত্ব করবারও সময় নেই আমার। ইচ্ছে হয় যাবে, না হয় যাবে না। বয়ে গেছে আমার এত সব হাঙ্গামা পোয়াতে।—রাগে গর্‌গর্ করতে করতে চলে যায় সে।

—বাঁচা গেল। সুধীর বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে আড়-মোড়া ভেঙে।

একটা ছুতো খুঁজে ফিরছিল অপলা, জুটে গেল ঠিক। জুটিয়ে দিল মধু।

অসাবধানে সুধীরের সখের ফুলদানিটা ভেঙে দিল চুর-মার করে। অপলারই আদেশে টেবিল পরিষ্কার করতে গিয়েছিল সে।

গুম হয়ে সুধীর তাকিয়ে রইল সেই দিকে। দু'চোখে শাণিত দৃষ্টি নিয়ে। তার পর গর্জে উঠল এক সময়ে—সকলকে শুনিয়ে গজরাতে লাগল সে, জাহান্নামে যাক, রসাতলে যাক সব। সেই সঙ্গে আমাকেও দাও পাঠিয়ে। শেষ করে ফেল আমায় সব দিক থেকে।—সুধীর থামে, একটু চুপ করে থেকে আবার ওঠে গর্জে, বাড়ীতে আর কি মানুষ নেই যে, ভূতকে দিয়ে এই অপচেষ্টা। শান্তিতে আমায় থাকতে দেবে না কিছুতেই, অতিষ্ঠ করে তুলেছে জীবনটাকে। তিলে তিলে এ ভাবে দগ্ধ না করে স্পষ্টই বল না, যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাই। থাক তোমরা সব মনের সুখে।

উদ্দেশ্য ব্যর্থ হ'ল না সুধীরের। যাকে লক্ষ্য করে এ শরক্ষেপ, বিঁধল গিয়ে ঠিক তার বুকে। অপলা শুনল সব দাঁড়িয়ে, একটা প্রতিবাদ করল না, টুঁ পর্যন্ত না, শুধু দাঁত দিয়ে অধরৌষ্ঠটাকে রইল চেপে।

কিছুক্ষণ পর।

ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে যায় সুধীর। জিনিসপত্র সব অগোছালো, কাপড়ের রাশি মেঝেয় ঢালা। অপলা ট্রাঙ্ক গোছাতে ব্যস্ত। খাতাখানা টেবিলের ওপর রাখা, খোলা পাতায় লেখা, ভবানীপুরে চললাম আমি।—অপলার বাপের বাড়ী ভবানীপুরে।

সুধীর দাঁড়িয়ে দেখে। তার পর লেখে, বেশ ত, ভাল কথা। মধু সঙ্গে যাবে, সন্ধ্যের সময় ফিরে এলেই হবে।

উত্তর পেতে বিলম্ব হয় না। সংক্ষিপ্ত উত্তর, না।

—না মানে?—জিজ্ঞাসার চিহ্নটা খুব স্পষ্ট করে দেয় সুধীর।

ও পক্ষ নিরুত্তর। জিনিস গোছাতে ব্যস্ত।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সুধীর লেখে আবার? উত্তর দিচ্ছ না যে বড়? না এলে চলবে কি করে?

এবার উত্তর দেয় অপলা। লেখে, মধু রইল।

—মধু?—চমকে ওঠে যেন সুধীর, তার পর লেখে খস্ খস্ করে, মধু-বিধুকে দিয়ে কি হবে আমার? থাকব কি করে আমি?

অপলা লেখে। যেন ঠোঁট টিপে মুচকি হেসে লেখে সে, কেন, রাস্তার ধারে বাড়ী। লোকজন গাড়ী-ঘোড়া চলা-ফেরা করছে সর্বদাই। ভয়ের কোন কারণ নেই এখানে।

—ভয়ের নয় ভাবনার।—সুধীর লিখে চলে বিচলিত হয়ে, আমার চা, জলখাবার, রান্না-বাড়া এ সবের ব্যবস্থা হবে কি?

—ব্যবস্থা! ব্যবস্থা মে-ফেয়ার রেস্তোরাঁ। কথাটা যেন কলমের ডগায় যুগিয়ে ছিল অপলার। সে এতটুকু ইতস্ততঃ না করেই লিখে চলল, সেখানকার চা বিখ্যাত, সেখানকার চা মিষ্টি। এখানকার তৈরী চা বিস্বাদ, বড্ড কটু। এখানকার তরকারি আলোনা, স্বাদ-বর্জিত। সেখানকার তরকারী কত সুস্বাদু, অমৃতস্বাদী। ভাববার নেই কিছু।

—তা না থাক, কিন্তু এভাবে যাওয়া হতে পারে না,

আমার মত নেই। কলমটা ঠুকে খাতাখানা সজোরে এগিয়ে দেয় সুধীর।

—মানে? অপলা যেন ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে খাতার পাতার ওপর। কলম না থামিয়ে লিখে যায় সবেগে, আমি কারও দাসী বা বাঁদী নই যে, হুকুম পেলে যাব, না পেলে যাব না। আমি থাকলেই যখন অশান্তি তখন কাজ কি অশান্তি বাড়িয়ে। একজনের জন্যে পাঁচ জনে অতিষ্ঠই বা হতে যাবে কেন? এইখানে অপলার লেখা জড়িয়ে আসে। অভিমানে হাত কাঁপতে থাকে তার। আবার লেখে কোন মতে, তার চাইতে পাপ বিদায় হোক, থাকুক সব শান্তিতে। একবিন্দু জল অপলার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে খাতার ওপর।

অপলার চোখের জল বিচলিত করে তোলে সুধীরকে। সে লিখে দেয়, তা হোক, অশান্তিই আমার ভাল। একলা থাকতে আমি পারব না।

একটা গোঁ চেপে বসে অপলার ঘাড়ে। জোরে জোরে লেখে, আমি যাবই। কারও জীবনকে আমি দগ্ধ করতে চাই না তিলে তিলে বা নষ্ট করতে চাই না। আমি যাই, সুখে থাকুক সকলে।

সুধীর ভাবে কয়েক মুহূর্ত। তার পর লেখে অনিচ্ছার সঙ্গে, বেশ জোর যখন নেই আমার, বাধা আমি দেব না কাউকে। তবে আমারও এই শেষ। এর পর সব ছেড়েছুড়ে চলে যাব যে দিকে দু'চোখ যায়।

তার পর চুপচাপ দুজনেই, গম্ভীর দুজনেই। আজ সকাল থেকেই বড় ঘোলাটে আবহাওয়া।

কিন্তু এভাবে দিন চলে না আর। ভার গুরু হয়ে ক্রমশঃই চেপে বসে বুকের ওপর। একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলতে চায় সুধীর এবং আজই। আজই সে চায় যবনিকা ফেলে দিতে এ নাটকের। তাই আপিসে থেকে ফেরে একটু সকাল সকাল। বাড়ীতে ঢুকেই মধুকে দেখে প্রশ্ন করে দুরুদুরু বুকে, মা কোথায় রে মধু? অন্তরের উদ্বেগ সে চাপতে পারছিল না কিছুতেই।

মধু কথা বলে স্বভাবতঃ জোরে। সেই ভাবেই বলল সে, মা ঘরেই আছেন, বাবু। ডেকে দেব?

—না, না থাক। ত্রস্তে বলে ওঠে সুধীর।

কিন্তু যাকে নিয়ে আলোচনা সে তখন দাঁড়িয়েছিল, পাশে, একটু আড়ালে। শুনল প্রভু-ভৃত্যের দুজনারই কথা। বুঝলে প্রভুর এতখানি উদ্বেগ কি জন্যে। পরিতৃপ্তির একটা হাসিতে ভরে উঠল তার সারা মুখখানি।

সুধীর ঘরে ঢোকে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। আপিসের পোশাক না ছেড়েই একেবারে শুয়ে পড়ে বিছানার ওপর।

অপলা আসে। ধীরে ধীরে দাঁড়ায় এসে ঘরের মাঝখানে। আজকের সকালের ব্যবহারে সেও লজ্জিত, রূঢ়তায় মর্মাহত। স্বামীর বিরাগের ভয়ে বাপের বাড়ী যাওয়া হয় নি তার। আরও যায় নি স্বামীর শেষের কথাগুলিতে—পুরুষমানুষকে বিশ্বাস নেই, সত্যি সত্যিই কিছু যদি করে বসে; রাগের মাথায় সত্যি সত্যিই যদি চলে যায় কোথাও? তাই অপলা বাড়ী ছেড়ে নড়তে পারে না সারাদিন। স্বামীর ফেরবার পথের দিকে তাকিয়ে থাকে দৃষ্টি মেলে। ভেবে ভেবে স্থির করে আজই সে ধরা দেবে স্বামীর কাছে। ক্ষমা চেয়ে নেবে দোষ স্বীকার করে।

অসময়ে স্বামীকে শয্যাশ্রয়ী হতে দেখে ভয় পেয়ে যায় অপলা। তাড়াতাড়ি লেখে, শুয়ে পড়লে যে বড়? শঙ্কিত দৃষ্টিতে খাতাখানা সে এগিয়ে দেয় স্বামীর কাছে।

—শরীরটা ভাল নয়। সুধীর লেখে কোনমতে।

মুখ শুকিয়ে ওঠে অপলার। লিখে প্রশ্ন করে, ভাল নয় কেন?

জানি না।

অপলা থাকতে পারে না। উদ্বেগও চেপে রাখতে পারে না সে। উদ্বেগভরেই লেখে, লক্ষ্মীটি, মাথার দিব্যি আমার, কি হয়েছে বল? অমন ভাবে শুয়ে পড়লে কেন?

—উঃহ। একটা কাতরোক্তি বেরিয়ে আসে সুধীরের মুখ দিয়ে। মাথা না তুলেই আঁচড় টেনে দেয় খাতার ওপর কোন মতে, বড্ড যন্ত্রণা। মাথা ছিঁড়ে গেল।

অপলা এগিয়ে আসে, মুখ শুকিয়ে ওঠে তার। তাড়াতাড়ি লেখে, টিপে দেব মাথাটা?

—না।

—একটু হাত বুলিয়ে দেব।

—না, না।

—জলপটি দিয়ে দেব মাথায়।

—না, না, না। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে আমার। সুধীর কলম আর খাতাখানা ঠেলে দেয় ক্লান্ত ভাবে। যেন আর সে পারে না লিখতে।

—জ্বর? অপলার কণ্ঠ ভেদ করে স্বর ফুটে বেরোয়। এতকাল কুলুপ আঁটা ছিল গলায়। আজ কুলুপ গেল খুলে, খাতা ফেলে দিল ছুঁড়ে। স্বামীর বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ে শঙ্কা-ব্যাকুল কণ্ঠে বলে ওঠে, জ্বর? সে কি? এল কখন? দেখি, দেখি? নরম হাতখানা সে চেপে ধরে সুধীরের কপালের ওপর।

সুধীর এক হাত দিয়ে চেপে ধরে সে হাতখানা। নরম হাত, স্নিগ্ধ হাত, বহু-আকাঙ্ক্ষিত হাত এ। এ হাতে আছে শান্তি, আছে তৃপ্তি। আঃ—

—জ্বর কোথায়! উঃ। কী ভয় পেয়েছিলাম আমি। তুমি এমন দুষ্টু!

নববর্ষ

শ্রীসুখময় সরকার

কাল চক্রের আবর্তনে পুনরায় নববর্ষ ঘুরিয়া আসিল। পুরাতন বৎসরের সমস্ত গ্লানি বিস্মৃত হইয়া নবীন আশা ও উৎসাহ বক্ষে লইয়া আমরা নববর্ষকে আহ্বান করিতেছি। ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবনে যতই অভাব-অভিযোগ থাকুক, যতই ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকুক, নববর্ষে সে সকল ক্ষুদ্রতা ক্ষণেকের জন্যও পশ্চাতে ফেলিয়া আমরা ভাবিতেছি, নূতন বৎসর আমাদের সম্মুখে আনন্দের পসরা লইয়া আবির্ভূত হইবে, জীবনের সমস্ত অতৃপ্তি পরিতৃপ্ত হইবে, সকল অপূর্ণতা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। নববর্ষে মানুষের এই ভাবনা নূতন নয়, অতি পুরাতন। যেদিন হইতে মানুষ দিন-মাস-ঋতু-বৎসর গণনা করিতে শিখিয়াছে, সেই দিন হইতেই সে নববর্ষের সহিত জীবনের বহু আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বিজড়িত করিয়া আনন্দ পাইয়াছে। নববর্ষ তাই একটা বৃহৎ উৎসবের দিন। অতি প্রাচীনকালেও যে লোকে নববর্ষে আনন্দোৎসব করিত বৈদিক সাহিত্যে তাহার প্রচুর প্রমাণ আছে। কেবল ভারতবর্ষে নয়, সকল সভ্যদেশেই মানুষ নববর্ষে উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া আমোদ-আহ্লাদ করিত, এখনও করে। 'উৎসব' বলিতে দেবার্চনা, দান-ধ্যান, নৃত্যগীত, প্রিয়জন-সমাগম, উত্তম পান-ভোজন, নববস্ত্র পরিধান ইত্যাদি বুঝায়। এইগুলি নববর্ষোৎসবের অপরিহার্য অঙ্গ বিবেচিত হইত।

বঙ্গদেশে আমরা সৌর বৈশাখের প্রথম দিবসে নববর্ষ আরম্ভ করি। কিন্তু এই দিনে আমরা বিশেষ কোন উৎসবের অনুষ্ঠান করি না। অল্পস্বল্প যে উৎসবের আয়োজন করি, তাহাও ইংরেজদের ১লা জানুয়ারীর উৎসবের অনুকরণে। এবং তাহা নগরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, পল্লী-অঞ্চলে ১লা বৈশাখ কোন উৎসবই অনুষ্ঠিত হয় না। ব্যবসায়ীরা ১লা বৈশাখ নূতন-খাতা করেন; সেই উপলক্ষ্যে বিপণি সজ্জিত করিয়া ক্রেতৃগণের নিকট বিগত বর্ষের প্রাপ্য আদায় করেন এবং ক্রেতৃগণকে 'মিষ্টিমুখ' করাইয়া আপ্যায়িত করেন। ১লা বৈশাখের উৎসবে ইহা অধিক কিছুই হয় না। আমাদের স্মৃতি-গ্রন্থে ১লা বৈশাখ কোন দেব দেবীর অর্চনার বিধান নাই, সুতরাং পঞ্জিকাতেও তাহার উল্লেখ নাই। ১লা বৈশাখ আমরা নববস্ত্র পরিধান করি না, বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া উত্তম পান-ভোজনে আপ্যায়িত করি না। ইহা হইতে বুঝিতেছি, আমরা যে বঙ্গদেশে ১লা বৈশাখ নববর্ষ ধরিতেছি, এই গণনাটি বিশেষ প্রাচীন নহে। বস্তুতঃ ৩১৯ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে চৈত্র রবির মহাবিষুব সংক্রান্তি হইয়াছিল, সেই বৎসর হইতেই ১লা বৈশাখ নববর্ষ ধরা হইতেছে। ৩১৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে গুপ্তাব্দ আরম্ভ হয়, কিন্তু বঙ্গাব্দ আরম্ভ হইয়াছে আরও ২৭৪ বৎসর পরে—৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। প্রাচীন কালে জ্যোতিষিক যোগ ব্যতীত নববর্ষ আরম্ভ হইত না। ৩১৯ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে চৈত্র মহাবিষুব দিন হইয়াছিল; সুতরাং সেই যোগ ধরিয়া পরদিন ১লা বৈশাখ নববর্ষ ধরা হইয়াছিল। কিন্তু ৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দে, বঙ্গাব্দ-মুখে, ৩০শে চৈত্র সেরূপ কোন জ্যোতিষিক যোগ ছিল না। বঙ্গাব্দ প্রবর্তনের মূলে কোন ঐতিহাসিক ঘটনা থাকিতে পারে, অথবা কোন পরাক্রান্ত রাজা বিশেষ প্রয়োজনে উহার প্রবর্তন করিয়া থাকিবেন। এ বিষয়ে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ আছে এবং সকল মতই এক-একটি বৃহৎ অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। সে যাহা হউক, বঙ্গাব্দ প্রবর্তনের মূলে কোন জ্যোতিষিক যোগ না থাকায় ১লা বৈশাখ আমাদের স্মৃতিগ্রন্থে কোন উৎসব বিহিত হয় নাই। অবশ্য ৩০শে চৈত্র 'শিবের গাজন' একটি বৃহৎ উৎসব বটে; কিন্তু তাহার সহিত গুপ্তাব্দের স্মৃতি জড়িত আছে, বঙ্গাব্দের সহিত ইহার সম্বন্ধ নাই। না থাকিলেও বাঙালী ১৩৬৪ বৎসর ধরিয়া যে অব্দ গণিয়া আসিতেছে, তাহার প্রতি বাঙালীর একটা মমতা আছে। বঙ্গাব্দ-গণনার সহিত বাঙালীর ১৩৬৪ বৎসরের বহু স্মৃতি বিজড়িত আছে। ইহাতে বাঙালীর প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য রক্ষিত আছে; বাঙালী এই অব্দ-গণনা কখনও পরিত্যাগ করিতে পারিবে না।

ইংরেজ আমাদের দেশে প্রভুত্ব বিস্তার করার পর সমগ্র ভারতে রাজকার্যে খ্রীষ্টাব্দ গণনা গৃহীত হয়। পরে খ্রীষ্টাব্দ গণনা আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও অনুপ্রবিষ্ট হইয়া যায়। অদ্যাপি খ্রীষ্টাব্দ গণনা আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। কিন্তু ভারতের ন্যায় প্রাচীন সংস্কৃতিসম্পন্ন দেশের পক্ষে ইহা গৌরবের বিষয় নহে। তাই আমাদের জ্যোতিষিক ব্যাপারে নিত্য-ব্যবহৃত শকাব্দ-গণনা ভারত পঞ্জিকায় গৃহীত হইল। গত বৎসর বঙ্গাব্দের ৮ই চৈত্রকে ১৮৭৯ শকাব্দের ১লা চৈত্র ধরিয়া সর্বভারতীয় বর্ষ-গণনা আরম্ভ হইয়াছে;

আগামী ৭ই চৈত্র বর্ষশেষ হইবে। খ্রীষ্টীয় ৭৮ অব্দে, গুপ্তাব্দ আরম্ভের ২৪১ বৎসর পূর্বে, শকাব্দ গণনা আরম্ভ হইয়াছিল। তখন মহারাজ কণিষ্কের যুগ। কেহ কেহ মনে করেন, মহারাজ কণিষ্কই এই শকাব্দ গণনার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই মতের পক্ষে কোন দৃঢ় যুক্তি নাই। নানা কারণে মনে হয়, শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণই এই অব্দ-গণনার প্রবর্তক এবং তাঁহারা স্বদেশ হইতেই এই গণনা-রীতি আনয়ন করিয়াছিলেন। শকাব্দ-গণনার আদিতে কোন জ্যোতিষিক যোগ ছিল কিনা এখন তাহা নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার। কারণ, ইহা ভারতে প্রবর্তিত হয় নাই। কিন্তু পরবর্তীকালে ইহা গুপ্তাব্দ-গণনার ৩০শে চৈত্র (মহাবিষুব দিন) অঙ্গীকার করিয়া লইয়াছে এবং এই অব্দ-গণনাতেও ১লা বৈশাখ নববর্ষ ধরা হইয়াছে।

ভারত-পঞ্জিকায় শকাব্দকে কিঞ্চিৎ সংশোধিতরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রচলিত গণনায় ১লা বৈশাখ হইতে বৎসর গণনা আরম্ভ হয়, কিন্তু সংশোধিত গণনায় ৮ই চৈত্র হইতে নূতন বৎসর ধরা হইতেছে। ইহার কারণ কি? পূর্বে বলিয়াছি, জ্যোতিষিক যোগ ধরিয়া নববর্ষ আরম্ভ করাই ভারতের পুরাতন ঐতিহ্য। বিষুব-দিন এবং অয়ন-দিন সেই জ্যোতিষিক যোগ। বিষুব-দিন দুইটি—মহাবিষুব (বাসন্ত বিষুব) ও জল-বিষুব (শারদ-বিষুব)। অয়ন-দিন দুইটি—উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন। বিষুব-দিন ও অয়ন-দিন স্থির থাকে না, শনৈঃ শনৈঃ পশ্চাদ্গত হয়। এক মাস পশ্চাদ্গত হইতে ২১৬০ বৎসর লাগে। ৩১৯ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে চৈত্র মহাবিষুব দিন হইয়াছিল, কিন্তু তাহা পশ্চাদগত হইতে হইতে এখন ৭ই চৈত্রে আসিয়া পড়িয়াছে। ৭ই চৈত্র বিষুব-দিন; এই জ্যোতিষিক যোগ ধরিয়া ভারত-পঞ্জিকায় ৮ই চৈত্র হইতে নূতন বৎসর গণনার বিধান হইয়াছে। অবশ্য বঙ্গাব্দের ৮ই চৈত্রকে শকাব্দের ১লা চৈত্র ধরিতে হইবে। ভারত সরকার পঞ্জিকা-সংস্কার করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। কিন্তু পঞ্জিকা-সংস্কার ক্রটিহীন করিতে হইলে আরও কয়েকটি চিন্তনীয় বিষয় আছে; "প্রবাসী"তে (আশ্বিন, ১৩৬৪) আমরা তাহা আলোচনা করিয়াছি, বাহুল্য-ভয়ে পুনরুল্লেখ করিলাম না। কিন্তু একটি বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি।

আমরা যে সর্বভারতীয় বর্ষগণনা আরম্ভ করিলাম, জনসাধারণ এ বিষয়ে ত বিন্দুমাত্র সচেতন নহে। রেডিয়ো এবং সংবাদপত্র ব্যতীত কুত্রাপি এই গণনার উল্লেখও হইতেছে না। সবুজ কথায় আমাদের ভারতীয় শকাব্দ-গণনা কেবল কাগজে-কলমে থাকিয়া যাইতেছে, লোক-ব্যবহারে ইহার কিছুমাত্র প্রয়োগ দেখিতেছি না। বলা বাহুল্য, ইহা আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু কি উপায়ে আমরা জনসাধারণকে আমাদের নূতন বর্ষগণনা সম্বন্ধে অবহিত করিতে পারি? ভারতীয় নববর্ষ দিবসে ছুটি ঘোষণা করিতে হইবে এবং ঐ দিন উৎসবের প্রবর্তন করিতে হইবে; তাহা হইলে জনসাধারণ নববর্ষ দিবসের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবে। খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ও শেষ দিবসে এখন আর ছুটি ঘোষণার আবশ্যকতা কি? এবারেও স্কুল-কলেজে, আপিসে আদালতে ৩১শে ডিসেম্বর ও ১লা জানুয়ারি ছুটির দিন গণ্য হইয়াছে কিন্তু ভারতীয় নববর্ষ দিবসে এখনও ছুটি ঘোষণা করা হয় নাই। সরকারের এই ঔদাসীন্য হেতু আমাদের ভারতীয় বর্ষগণনায় গৌরব আরোপিত হইতেছে না।

ভারতীয় নববর্ষ দিবসে কেবল ছুটি থাকিলেই চলিবে না; সেদিন যথাযোগ্য উৎসবের ব্যবস্থা করিতে হইবে। উৎসবের প্রধান ও প্রথম অনুষ্ঠান দেবার্চনা। ভারতীয় নববর্ষ দিবসে আমরা কোন্ দেবতার অর্চনা করিব? 'ভারত মাতা' অথবা 'ভারত-ভাগ্য-বিধাতা' সেই পুণ্যদিবসে আমাদের অর্চনীয় দেবতা। সে দেবার্চনায় মন্ত্র হইবে, 'বন্দে মাতরম্' অথবা 'জনগণ-মন অধিনায়ক জয় হে।' ভারতের মুক্তিযজ্ঞে যাঁহারা আত্মাহুতি দিয়াছিলেন এবং জ্ঞান, ত্যাগ ও বীর্যের সাধনায় যাঁহারা নিদ্রিত ভারতকে উদ্‌বোধিত করিয়াছিলেন, সেই মহাপুরুষগণের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে আমরা সেদিন শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিব। ভারত-পতাকাকে সেদিন গৃহশীর্ষে উদয়াস্ত উড্ডীন রাখিব। সেদিন প্রাতঃস্নান করিয়া দরিদ্রকে যথাসাধ্য দান করিব। সেদিন প্রিয়জন-সমভিব্যাহারে যথাসাধ্য উত্তম ভোজ্য ও পানীয় গ্রহণ করিব এবং সম্ভব হইলে নববস্ত্র পরিধান করিব। সেদিন রাত্রিকালে নৃত্যগীতাভিনয় ইত্যাদি দ্বারা আত্মবিনোদন ও অপরের মনোরঞ্জন করিব এবং রাত্রি জাগরণ করিব। আর শুদ্ধচিত্তে জগন্মাতার নিকট প্রার্থনা করিব, যেন যুগ যুগ ধরিয়া ভারতবাসীর জীবনে এইরূপ নববর্ষ ফিরিয়া আসে।

নববর্ষ দিবসে এবম্প্রকার উৎসবানুষ্ঠানের পরামর্শ দিতেছি বলিয়া কেহ কেহ বিস্মিত হইবেন, কেহ বা মনে মনে বিদ্রূপ করিবেন। কিন্তু ইহাতে বিস্মিত হইবার অথবা বিদ্রূপ করিবার কিছু নাই। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস যাঁহারা পর্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, পুরাকালে নববর্ষ দিবসে যে উৎসব অনুষ্ঠিত হইত তাহা অনেকটা এইরূপই ছিল। এখনও উত্তর-ভারতে দোলপূর্ণিমার দিন এবং মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে দীপালীর দিন নববর্ষ আরম্ভ হয়; এবং সে সে দেশে নববর্ষ উপলক্ষ্যে যে কিরূপ সাড়ম্বর উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তাহা অনেকেই অবগত আছেন। এখানে আমরা প্রাচীনকালের কয়েকটি নববর্ষ দিবস স্মরণ করিতেছি।

বিষুব-দিন ও অয়ন-দিন নববর্ষারম্ভের উপযুক্ত জ্যোতিষিক যোগ, একথা পূর্বেই বলিয়াছি। বিষুব-দিন ও অয়ন-দিন যে স্থির থাকে না, শনৈঃ শনৈঃ পশ্চাদ্‌গত হয়, তাহাও উল্লেখ করিয়াছি। এখন ৭ই চৈত্র রবির মহাবিষুব সংক্রান্তি হইতেছে, দুই সহস্র বৎসর পূর্বে ৭ই বৈশাখ এবং চারি সহস্র বৎসর পূর্বে ৭ই জ্যৈষ্ঠ মহাবিষুব দিন হইত। প্রায় ৩৫০০ বৎসর পূর্বে বৈশাখী পূর্ণিমায় মহাবিষুব সংক্রান্তি হইত এবং সেদিন নববর্ষ আরম্ভ হইত। এখন আমরা বৈশাখী পূর্ণিমায় 'ধর্মের গাজন' করিয়া থাকি। ইহা যে এককালের নববর্ষোৎসবের স্মৃতি বহন করিতেছে তাহা 'ধর্মের গাজন' প্রবন্ধে ("প্রবাসী"—আশ্বিন, ১৩৬২) প্রতিপন্ন করিয়াছি। ধর্ম সূর্য-দেবতা। নববর্ষ দিবসে সূর্যদেবের পূজা খুব স্বাভাবিক। কারণ, সূর্যদেবই বর্ষাধিপতি। প্রাচীনকালে সকল সভ্য-জাতিই সূর্যের পূজা করিতেন। আমরাও সূর্যপূজাকে নববর্ষোৎসবের অঙ্গীভূত করিতে পারি। একদা ঋষি বিশ্বামিত্র গায়ত্রীচ্ছন্দে সবিতার স্তুতি করিয়াছিলেন; অদ্যাপি তাহা ব্রাহ্মণের নিত্য সন্ধ্যা-বন্দনার মন্ত্র হইয়া রহিয়াছে। বর্তুলাকার শালগ্রাম শিলায় আমরা যে বিষ্ণুর পূজা করি, তাহাও প্রকৃতপক্ষে সূর্যোপাসনা। শক-গণনা সৌরগণনা। অতএব ভারতীয় নববর্ষে সূর্যের উপাসনা সর্বতোভাবে বিধেয়। সুপ্রাচীন কাল হইতে ভারতে সূর্যদেব যে কত প্রকারে পূজিত হইয়া আসিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। ভারত-পতাকায় চরকা কিংবা অশোকচক্রের পরিবর্তে সূর্যের চিত্র লিখিত হইলে তাহা আমাদের প্রাচীনতর ঐতিহ্যকে বহন করিতে পারিত।

এক অতি প্রাচীনকালে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাদশমীতে মহাবিষুব দিন হইত এবং সেকালে উক্ত দিবসে নববর্ষ আরম্ভ হইত। সে দিবসটি এক্ষণে "দশহরা" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

রঘুনন্দন প্রমাণ দিয়াছেন ঃ

জ্যৈষ্ঠস্য শুক্লদশমী সংবৎসরমুখী স্মৃতা।
তস্যাং স্নানং প্রকুর্বীত দানঞ্চৈব বিশেষতঃ॥

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাদশমী সংবৎসরের মুখ। সেদিন স্নান-দান করিতে হয়। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় সূক্ষ্ম জ্যোতিষিক গণনায় পাইয়াছেন, খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৫৬ অব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাদশমীতে মহাবিষুব দিন হইত। কাল অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, এখন আর দশহরায় মহাবিষুব হয় না; সেদিন আর কোথাও নববর্ষ আরম্ভ হয় না। কিন্তু সেই পুরাতন কথা অদ্যাপি আমরা ভুলিতে পারি নাই, অদ্যাপি দশহরার দিন ভাগীরথীর পুণ্যসলিলে স্নান ও প্রার্থীদিগকে দান করিয়া প্রাচীন স্মৃতি বাঁচাইয়া রাখিতেছি।

পূর্বকালে কেবল যে মহাবিষুব দিনেই নববর্ষ আরম্ভ হইত, তাহা নহে। জল-বিষুব, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন দিনেও নববর্ষ আরম্ভের প্রমাণ আছে। বিশাল ভারতভূমির এক-এক অঞ্চলে এক-এক প্রকার বর্ষ-গণনার প্রচলন ছিল। মহাবিষুব দিন হইতে যে বর্ষগণনা প্রচলিত ছিল, তাহার নাম 'বসন্ত-বর্ষ'। আমাদের সর্বভারতীয় শকাব্দ-গণনাও বসন্ত বর্ষ গণনা। মহাবিষুব দিনের পূর্ববর্তী এক মাস এবং পরবর্তী এক মাস—এই দুই মাস লইয়া বসন্ত ঋতু। ঋগবেদের যুগে উত্তরায়ণ দিনে নববর্ষ আরম্ভ হইত। সে বর্ষের নাম ছিল 'হিমবর্ষ'। তখন ফাল্গুন চৈত্র মাসে রবির উত্তরায়ণ হইত। এখন আমরা ফাল্গুনী পূর্ণিমায় 'দোলযাত্রা' নামক যে বৃহৎ পর্বের অনুষ্ঠান করি, তাহা ঋগবেদের যুগের নববর্ষোৎসবের স্মৃতি। ইহা প্রায় ৬০০০ বৎসর পূর্বের কথা। সেদিন নববর্ষের নবসূর্যের রক্তিমচ্ছটা আবীর ও রঞ্জিত-বারি নিক্ষেপে দ্যোতিত হয়। সমগ্র উত্তর-ভারতে সেদিন নববস্ত্র পরিধান, উত্তম পানভোজন, বন্ধুসমাগম এবং নৃত্যগীতাদি আমোদ-প্রমোদ হইয়া থাকে। ২০১৫ বৎসর পূর্বে এই দিবসে আবার নূতন করিয়া সংবৎ গণনা আরম্ভ হইয়াছে। দোলপূর্ণিমার উৎসব 'বসন্তোৎসব নয়, ইহা নববর্ষোৎসব। ফাল্গুনী পূর্ণিমা এখন বসন্তঋতুতে হয়; কিন্তু যে কালে দোলযাত্রা পর্বের প্রবর্তন হইয়াছিল, সে কালে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় বসন্তঋতু হইত না।

চৈত্র মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে বারুণী স্নান। যেকালে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় রবির উত্তরায়ণ হইত তাহার প্রায় ১০০০ বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ অদ্যাবধি প্রায় ৭০০০ বৎসর পূর্বে, চৈত্র কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে উত্তরায়ণ হইত। বারুণী স্নান বহু ফল-জনক; স্নানান্তে দান বিহিত হইয়াছে। সেই সুদূর অতীত কালে বারুণী-দিবসে নববর্ষ আরম্ভ হইত। "প্রবাসী"তে (বৈশাখ, ১৩৬৪) তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

ঋগবেদের ঋষিগণ বর্ষ-চক্রের ৩৬০টি 'অর' কল্পনা করিতেন। অর্থাৎ, তাঁহারা ৩৬০ দিনে বৎসর ধরিতেন। ঋগবেদের কয়েকটি সূক্তে তাহার উল্লেখ আছে। কিন্তু ৩৬৫ দিনে সৌর বৎসর পূর্ণ হয় তাহাও ঋষিগণ জানিতেন। বৎসর আরম্ভের পূর্বে পাঁচ দিন তাঁহারা 'সত্রে'র অনুষ্ঠান করিতেন। ইহাকে নিঃসংশয়ে নববর্ষোৎসব বলিতে পারা যায়।

যজুর্বেদের কালে জলবিষুব বা শারদবিষুব দিনে নববর্ষ আরম্ভ হইত। এই বর্ষের নাম ছিল 'শরৎ বর্ষ'। যজুর্বেদে 'শরৎ' শব্দ বর্ষবাচক হইয়া পড়িয়াছে। 'জীবেম শরদঃ শতম্' ইত্যাদি প্রার্থনা মন্ত্র তাহার প্রমাণ। সংস্কৃত 'শরৎ' এবং ফারসী 'শাল' শব্দ মূলতঃ একই। যজুর্বেদের কালের 'শারদোৎসব' বর্তমান কালে দুর্গোৎসবে রূপান্তরিত হইয়াছে,

আচার্য যোগেশচন্দ্র 'পূজাপার্বণ' গ্রন্থে দেখাইয়াছেন, শারদোৎসব প্রকৃতপক্ষে সেকালের নববর্ষোৎসব ছিল। সে কালে অবশ্য অগ্রহায়ণ মাসে শরৎ ঋতু হইত এবং সেই শরৎ বর্ষের প্রথম মাস ছিল অগ্রহায়ণ। অগ্রহায়ণ শব্দের অর্থ, 'বৎসরের প্রথম মাস' (অগ্র = প্রথম, হায়ণ = বৎসর)। শরৎ ঋতু এখন ভাদ্র-আশ্বিন মাসে আসিয়া পড়িয়াছে এবং স্মৃতি ধরিয়া অদ্যাপি আমরা শরৎকালে জগন্মাতার অর্চনা করিতেছি, নববস্ত্র পরিধান করিতেছি, উত্তম পান-ভোজন করিতেছি এবং বিজয়াদশমীতে সকলের বিজয়কামনা করিতেছি। এ সমস্তই নববর্ষোৎসবের লক্ষণ।

দক্ষিণায়ন দিনেও নববর্ষ আরম্ভ হইত; আমাদের বহু পূজাপার্বণে তাহার স্মৃতি রক্ষিত আছে। দক্ষিণায়ন দিনে বর্ষাকাল আরম্ভ হয়। বৎসর-বাচক 'বর্ষ' শব্দ এই দক্ষিণায়ন দিনেরই ইঙ্গিত করে। এককালে বর্ষাঋতু আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে বৎসর আরম্ভ হইত বলিয়া বৎসরের নাম হইয়াছিল 'বর্ষ'। ইন্দ্র বর্ষণের দেবতা। বৈদিক যুগে দক্ষিণায়ন দিনে ইন্দ্রদেবের উদ্দেশে যজ্ঞ হইত। ভাদ্র শুক্ল-একাদশীতে শক্রোত্থান উৎসবে (প্রবাসী—পৌষ ১৩৬১) এবং আশ্বিন কৃষ্ণাষ্টমীতে জিমুতবাহনের পূজায় (প্রবাসী—ভাদ্র, ১৩৬১) সেই স্মৃতি রক্ষিত আছে। শক্রোত্থান উৎসবের আমোদ-আহ্লাদ এবং জিতাষ্টমীর (আশ্বিন কৃষ্ণাষ্টমী) রাত্রিজাগরণ নববর্ষোৎসবের অঙ্গীভূত ছিল। এ সকল পাঁচ ছয় সহস্র বৎসরের পূর্বের কথা।

এক স্মরণাতীত কালে, প্রায় ৯০০০ বৎসর পূর্বে, কার্ত্তিকী অমাবস্যায় রবির দক্ষিণায়ন ও নববর্ষ হইত। দীপালী উৎসবে আমরা সেই প্রাচীন স্মৃতি রক্ষা করিতেছি। প্রবাসীতে (মাঘ, ১৩৬০) এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে অদ্যাপি দীপালী দিনে নববর্ষ আরম্ভ হয়। উক্ত দুই দেশ ব্যতীত ভারতে অন্যান্য অঞ্চলেও দীপালী উৎসব যে কিরূপ আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সকলেই জানেন।

শকাব্দ, সংবৎ ও বঙ্গাব্দ ব্যতীত নানাপ্রকার অব্দগণনা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত ছিল এবং আছে। এই সকল অব্দগণনা হইতে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষগণের কৃষ্টির গৌরব ও বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করিতে পারি। কিন্তু যে কারণেই হউক, জ্যোতিষিক ব্যাপারে শকাব্দগণনা বহু-কাল হইতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সর্বভারতীয় অব্দ-গণনায় শকাব্দের ব্যবহার সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু ভারতীয় নববর্ষ দিবসকে আমাদের ঐতিহ্য অনুযায়ী স্মরণীয় ও গৌরবান্বিত করিবার নিমিত্ত যথোপযুক্ত উৎসবের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সন্ধান

শ্রীআশুতোষ সান্যাল
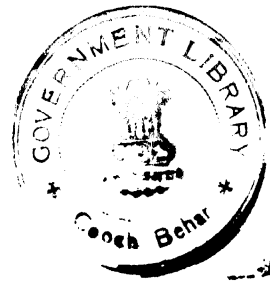
রমণীর বিম্বাধরে খুঁজেছিনু সুখ;
মেলে নাই!
পঞ্চশর সাথে কতো করিনু কৌতুক,
ভাবি তাই!
দেখিয়াছি প্রেম-যমুনায় অবগাহি',
কতো জল!
সে যে শুধু দুর্বিষহ পিপাসায় ভরা
অবিরল।
ভেবেছিনু করি যদি অর্থ রাশি রাশি
আহরণ—
সুখের হিল্লোলে সদা উঠিবে উল্লসি'
প্রাণমন।

দুই হাতে আনি' কড়ি দিনু ছড়াইয়া
দুই হাতে,—
কোথা তৃপ্তি! আজো কাঁদি চির-অতৃপ্তির
বেদনাতে!
খ্যাতিমায়ামরু মাঝে অন্বেষিণু সুখ
মরীচিকা!
ভেবেছিনু কাব্যলক্ষ্মী দিবে সে যৌতুক
জয়টীকা।
সেথা দেখি একাকার কাঁচ ও কাঞ্চন,
ভেদ নাই,
কোথা গেলে হায় সুখ, হৃদয়ের কাছে
তোমা পাই?

সারেংহাটি কালভার্ট

'নিরঙ্কুশ'

ট্রেনটা স্টেশন থেকে ছাড়বার পরই, পয়েন্টসম্যান জিৎ-নারায়ণ ডিস্টান্ট সিগনালটার দিকে একবার তাকিয়ে—'কবিন থেকে বেরিয়ে এল। ইঞ্জিনের ধোঁয়ার কুণ্ডলীটা এখনও ওভারব্রীজের দু'পাশ থেকে মন্থরগতিতে উপর দিকে উঠছে।

—সারেংহাটির পাশে আজ যাত্রা আছে, রামায়ণ গানের একজন সমজদার ভক্ত জিৎনারায়ণ, সমস্ত রাত ধরে শুনবে—অবশ্য এক ছিলিম খেয়ে নেবে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই ফাগুয়াটা এসে গেছে, জমবে ভালই—যা শীত পড়েছে।

বেশ শীত পড়েছিল সে রাত্রে, কিন্তু জিৎনারায়ণের আর মৌজ করে রামযাত্রা শোনা হয় নি।

কালভার্ট পার হবার মুখে সারেংহাটি জংশন আসার পূর্বেই ইঞ্জিনটা বে-লাইন হয়েছিল। চব্বিশ ফুট উঁচু থেকে ইঞ্জিনটা নীচে পড়েছিল। হঠাৎ দেখলে মনে হয় বিরাট একটা দৈত্যশিশু শুয়ে যেন ফোঁপাচ্ছে।

বাঁ দিকে কাৎ হয়ে ইঞ্জিনটা পড়েছিল, চাকাগুলো উপরের শূন্য আকাশের দিকে যেন তাকিয়ে রয়েছে। ইসরাইল সাহেব—এসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়ার, রিলিফ ট্রেনের সঙ্গেই এসেছিলেন, এসে দাঁড়ালেন ইঞ্জিনটার পাশে। সামনের দিকের অর্দ্ধেকটা গেঁথে গেছে নীচের নালাটার ভিতরে। তখনও ষ্টীম রয়েছে, ভ্যাকুয়াম ব্রেকটা লাগান ছিল কিনা কে জানে?

নালার জল বেয়ে চলেছে ইঞ্জিনটার গায়েতে এঁকে-বেঁকে, যেন দামাল দুরন্ত ছেলেটা রৌদ্রে দৌড়াদৌড়ি করে এইমাত্র ফিরেছে।

ইসরাইলের লক্ষ্য পড়ল চিমনীর উপর—ফেটে গেছে? আরও এগিয়ে গেল ইসরাইল, জুতোটা কাদায় বসে গেল—না ফাটার দাগ নয়, একটা লম্বা কেঁচো ফানেলের গায়ে এঁকে বেঁকে উঠছে। এইটে দেখার জন্য অনেক কাদা ঘাঁটতে হ'ল তাকে। বদ্ধ জলাশয়ে অনেক দিন থাকবার পর কেঁচোটার দেশ ভ্রমণের সখ হ'ল নাকি? ইসরাইল আশ্চর্য্য হ'ল—এই পরিবেশের মধ্যেও মানুষের মন সচেতন থাকে?

লক্ষ্য করল ইসরাইল ইঞ্জিনটা ডবলিউ-পি টাইপের। অনেক টাইপের ইঞ্জিন আছে, যেমন—সি-ডবলিউ-ডি, এ-ডবলিউ-ডি, এ-পি, ডবলিউ-পি, ডবলিউ-জি।

স্মোক বক্সের দরজাটা খুলে গেছে—ভিতর থেকে ছাই, টুকরো কয়লা, বাইরে বেরিয়ে এসে জড়ো হয়েছে। নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করার পর শেষ পর্য্যন্ত ইঞ্জিনটা একরাশ ভস্ম-মিশ্রিত কয়লা প্রসব করল?

ইসরাইলের ঠোঁটে ব্যঙ্গের হাসি ঝলসে উঠল।

ইঞ্জিনের পনি হুইল দুটো দেখা যাচ্ছে। লাইনের উপরে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে ওরা, ঠিক টাটু ঘোড়ার মত। পিছনের বড় চাকাগুলির মত পনি হুইল দুটো শুধু এক-ঘেয়ে রকমের অবিরাম ঘুরে চলে না—লাফিয়ে লাফিয়ে বেঁকে চুরে লাইনকে নির্ভুলভাবে অনুসরণ করে—পতিব্রতা স্ত্রীর মত। পতিদেবতার পদাঙ্ক অবিচল ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করে, ভুল দেখে প্রতিবাদের ভঙ্গীতে হঠাৎ পিছু ফিরে থমকে দাঁড়ায় না।

ইসরাইলের মনে পড়ল ছেলেবেলায় দাদীর সঙ্গে পাটনা-সরিফ গিয়েছিল। পাশের লাইনে একটা ট্রেন ছাড়বার মুখে ইঞ্জিনের চাকাগুলো ঘুরে যেতে লাগল। ট্রেনটা গতিহীন, কিন্তু লাইনের উপর চাকাগুলো শুধু ঘসঘস ঘুরে পিছলে পিছলে যাচ্ছে—ওকে স্লেসিং বলে। পরে অবশ্য ইসরাইল জেনেছিল বয়লারের ভেতর ময়লা জমলে কিংবা জলের আধিক্যে ও রকম হয়। লিভারটা ঘুরিয়ে ইঞ্জিনটা একটু পিছনে নিয়ে যেতে হয়—তার পর আবার সামনে, তখন চলতে সুরু করে ইঞ্জিন, প্রথম ধীরে ধীরে তার পর দুলকী চালে।

ফায়ার বক্সের উপর তামার ক্রাউন প্লেটটার দিকে নজর পড়ল—হ্যাঁ ঠিক আছে। সীসের প্লাগগুলোও গলে যায় নি—এখনও অক্ষত রয়েছে। গেজ গ্লাসের কাঁচটাও ভাঙে নি। রেগুলেটার যেটা নামালে ইঞ্জিনটা চলতে সুরু করে সেটাও অক্ষত। পিষ্টন কভারটা ফেটে গেছে। বড় চাকা-গুলোর জার্নাল ঢাকাই আছে। এক্সেলবক্সেরও ক্ষতি হয় নি—চাকার তলায় ব্যালেন্সটা এখনও কালো চকচক করছে। ইঞ্জিনের পিছনে টেণ্ডারটা ইঞ্জিনের সঙ্গেই নীচে

পড়েছে। পাথুরে কয়লা স্তূপাকারে টেণ্ডারের পাশে পড়ে রয়েছে।

ইসরাইলকে লাইনটা এবারে দেখতে হবে। ট্রলিটা এখনও পর্য্যন্ত এসে পৌঁছয় নি—সেটা এলে অনেকদূর পর্য্যন্ত দেখে আসা যেত।

তিনটি বগী ইঞ্জিনের সঙ্গে নীচে পড়েছিল, খবরের কাগজের টীকায় বলতে হয়—"দেশলাইয়ের বাক্সের মত গুড়া হইয়া গিয়াছে"। চতুর্থ এবং পঞ্চম বগী দুটি নীচে পড়ে নি বটে, কিন্তু টেলিস্কোপের মত একটা আর একটার মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

ক্রেন এসেছে, একটা নয়—দুটো। বগীগুলোকে দাঁড় করাবার চেষ্টা চলছিল। ক্ষিপ্রহাতে আসগর চেন টেনে চলেছে। প্রকাণ্ড লোহার হুকটা গলিয়ে দিয়েছে একটা পার্টিসনের কব্জার ভিতরে। তাড়াতাড়ি করা দরকার—ভিতরে হয় ত অনেকগুলো মানুষ আটকে রয়েছে। কাঠ, লোহার পাত, মোটা তার, ষ্টীলের কাঠামো, সব মিলে যেন তালগোল পাকিয়ে গেছে।

—বাঁয়ে লাগাও। চীৎকার করে উঠল আসগর, কপালের শিরাগুলো ফুলে উঠেছে ওর। জীবনরাম চিরকালই দরকারের সময় বোকা হয়ে যায়, মাংসপেশীগুলো যেন অকেজো হয়ে যায় ওর, কাজের কথা শুনতেই পায় না—এমনকি আসগরের ইঙ্গিত ও বুঝতে পারে না। আরিয়া—আবার চীৎকার করল আসগর, থরথর করে কেঁপে উঠল ভাঙা বগীটা—হ্যাঁ, ক্রেনটা চালু হয়েছে এবার। কর্কশ একটানা আওয়াজ হচ্ছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে সারেংহাটির অদূরে ৩নং কালভার্টের কাছে যেন একটা বিরাট কারখানা গজিয়ে উঠেছে। হাজার হাজার কামার একযোগে হাতুড়ি পিটতে সুরু করেছে যেন।

জনস্রোতের কোলাহল, আহতদের আর্ত্তনাদ ও গোঙানি, লোহার সঙ্গে লোহার ঘর্ষণ, কুলীদের কলরোল, অফিসারদের চিৎকার সব মিলিয়ে যেন একটা তাণ্ডবের সৃষ্টি হয়েছে। এতক্ষণে একটা একটা করে দেহগুলো বের করা হচ্ছে।

মেজর কল্যাণসুন্দরম্ পাশেই একটা তাঁবু খাটিয়েছেন। রোগীদের ভাগ করে নিয়েছেন দু'ভাগে—ব্লাড ট্রান্সফিউশানের কেসগুলো নিয়ে যাওয়া হচ্ছে রিলিফ ট্রেনের কামরায়।

নিহত ও আহতদের ষ্ট্রেচারে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মাত্র ছয়টি ষ্ট্রেচার এসেছে, তাই কম্বল এবং লাঠি দিয়ে ষ্ট্রেচার তৈরী করে নিতে হয়েছে।

দুর্ঘটনা ঘটে রাত সাড়ে ন'টার পর, তখন সারেংহাটি গ্রাম ঘুমন্ত বলা যায়।

সারেংহাটি জংশনের অব্যবহিত পূর্ব্বে তিন নম্বর কালভার্টের কাছে ট্রেনটা লাইনচ্যুত হয়েছিল। তখন সারেংহাটি গ্রাম জনহীন নিস্তব্ধ—কেবল চকের কাছে দোকানগুলো খোলা আছে।

সারেংহাটি আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের অবশ্য কাজ মেটে সেই রাত একটায়। সামনে হ্যাজাগ জ্বালিয়ে হরিদাস জিলিপীর জন্যে বেশন ও সবেদা গুলে রাখছে।

পাশেই বেণের দোকানের ধীরেন আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের আলোতে খাতা লিখছে। রোজ সে এই কাজটি করে—তেলের খরচও বাঁচে, চোখের কষ্টও কম হয়। রাত্রে কম আলোতে লিখতে চেষ্টা করলে ধীরেনের চোখ জ্বালা করে তা সে জানে। গনি মিঞা তার জুতোর দোকানটা বন্ধ করে চলে গিয়েছে, দোকানের সামনে অর্দ্ধদগ্ধ কাগজটা পড়ে রয়েছে, রোজ দোকান বন্ধ করার সময় গনি মিঞা এটি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে।

বলাই ডাক্তারের ডাক্তারখানার একটা কপাট ভেজান। টেবিলের উপরে পা তুলে দিয়ে ডাক্তারবাবু বসে আছেন—ডান ধারের টুলে বসে মহেশ বাঁড়ুজ্যে তাঁর প্রাত্যহিক যকৃত এবং পেটের ব্যাধির অবিকল বিবরণটি পেশ করছিলেন। ডাক্তারবাবুও নিয়মানুসারে সামনের দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেণ্ডারের ছবিটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে গভীর মনঃসংযোগের মহড়া দিচ্ছিলেন। বস্তুতঃ তিনি দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণীর কথাই চিন্তা করছিলেন। তিন মাসের মধ্যেও প্রতিশ্রুত শাড়ীটি এতাবৎকাল পর্য্যন্ত তাকে উপহার দেওয়া সম্ভব হয় নি।

মেজর কল্যাণসুন্দরম্ এ কাজেও অভ্যস্ত, গত মহাযুদ্ধে সেনাবিভাগে তিনি বেশ সুনাম করেছেন।

কিন্তু মেজর আসবার আগে সারেংহাটি ট্রেন দুর্ঘটনায় আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন ডাঃ বলাই পালচৌধুরী, আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের হরিদাস, বেণের দোকানের ধীরেন, পয়েণ্টসম্যান জিৎনারায়ণ এবং গ্রামের অনেকেই।

হঠাৎ বিপদে পড়ে তারা প্রথমে সকলে স্তম্ভিত ও দিশাহারা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই সকলে সামরিক কায়দায় যেন কাজ সুরু করে দিলে। এত নিয়মানুবর্ত্তিতা ওদের মধ্যে ছিল একথা ভাবাও শক্ত। কোথা থেকে একরাশ কম্বল, পানীয় জল, খাটিয়া, দুধ, ব্যাণ্ডেজের জন্যে ছেঁড়া কাপড়, তুলো, বিছানা, ওষুধ জড়ো হ'ল তা ভাবতেও আশ্চর্য্য লাগে। অকৃপণ ভাবে সব দিক দিয়েই সারেংহাটি গ্রামের লোকেরা সেদিন যে সাহস এবং

সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছিলেন, মেজর কল্যাণসুন্দরমের রিপোর্টে সেকথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ আছে।

মেজর কল্যাণসুন্দরম্ একবার তাকিয়ে দেখলে রেবার দিকে—আশ্চর্য্য এই বাঙালীনার্স টা। যুদ্ধের সময়ও বহু নার্স তিনি দেখেছেন কিন্তু একসঙ্গে এত বিপদ এবং ঝুঁকি মাথায় নিয়ে সতর্ক ও স্থির মস্তিষ্কে কাজ করতে তিনি কখনও দেখেন নি।

ট্রান্সফিউসান সেটটা খাটান ছিল, তার ছুঁচ একজন লোকের ডান হাতের ধমনীর ভিতর দেওয়া রয়েছে। অত প্লাজমা আছে ত? ভাবছে রেবা, শীতকালের রাতেও রেবার কপালে ঘামের বিন্দু জমে উঠেছে।

আর একটা ষ্ট্রেচার ঢুকল, ওদিকের লম্বা বেঞ্চিটায় তাকে শোয়ানো হ'ল। অন্য একজন নার্স লোকটার ডান হাতের জামাটা তুলে দিলে। নির্ভুল ভঙ্গীতে ছুঁচটা ধমনীর ভেতর ঢুকিয়ে দিলে রেবা। লোকটার গলা দিয়ে যেন একটা অস্বাভাবিক গোঙানি বেরুচ্ছে—তাকিয়ে দেখলে রেবা।

দূর থেকে মেজর কল্যাণসুন্দরম্ লক্ষ্য করলেন—রেবা যেন পড়ে যাচ্ছে। দ্রুতপদে এসে রেবার একটা হাত ধরে ঝাঁকানি দিলে।

—হোয়াটস আপ?

রেবা ঘাড় নাড়লে—না কিছু হয় নি তার!

অধ্যাপক সুরেন চৌধুরীর নাম হয় ত অনেকে জানেন না, তার কারণ সহজে তিনি লোকচক্ষুর সম্মুখে আসতে চান না। জীবন্ত মানুষকে তিনি একটু ভয় করেন যেন। তাঁদের কার্য্যকলাপে তাঁর বিশেষ ঔৎসুক্য নেই। বিগত দিনের মানুষের কীর্ত্তিকলাপ এবং রীতিনীতি জানতেই তাঁর ভাল লাগে। চল্লিশ বৎসর ধরে তিনি তাই করেছেন। প্রত্ন-তত্ত্বের গবেষণায় আজীবন তিনি মনঃপ্রাণ ঢেলে দিয়েছেন, তাঁর জীবনে অন্য কোন জিনিসের স্থান নেই, এমনকি নিজের সংসার সম্বন্ধেও তাঁর মনোযোগ নেই! এক রকম উদাসীন বলা যায়।

লীলা দেবী—মানে তাঁর স্ত্রী অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির ছিলেন। আত্মভোলা স্বামীটিকে নিয়ে দুটি মেয়ের মুখ চেয়ে সংসারকে জোড়াতাড়া লাগিয়ে দিন যাপন করেছিলেন। লীলা দেবী বেঁচে থাকতে অধ্যাপক চৌধুরীর কোন দিকেই লক্ষ্য করতে হয় নি। হঠাৎ সেদিন মালতীর দিকে নজর পড়ল—তাঁর বড় মেয়ে মালতী। ঠিক দেখতে লীলার মত, এতটুকুও তফাৎ নেই, সেই ঘাড় ফিরিয়ে হাসির ভঙ্গীটিও যেন নকল করেছে ও। ঘন কালো কোঁচকানো চুল, লম্বা ছিপছিপে ঋজু দেহ, হ্যাঁ বেশ বড় হয়েছে, বি-এ পর্যন্ত পড়েছে কিন্তু লেখাপড়ার চেয়ে সংসারের কাজ করতেই যেন বেশী ভালবাসে। এষা—তাঁর ছোট মেয়ে কিন্তু ঠিক বিপরীত। তাঁর নিজের রংটা এষাই পেয়েছে, চোখ দুটো বড় বড়, লীলার মত। কিন্তু মেয়েটা যেন একটু একগুঁয়ে বলে মনে হয়। লেখাপড়ায় ভালই। সিঁড়িতে রমেনবাবুর গলা শোনা গেল। রমেনবাবু অধ্যাপক চৌধুরীর প্রতি-বেশী। সুযোগ পেলেই গায়ে আলোয়ানটি জড়িয়ে তিনি এখানে আসেন। রমেনবাবুকে অধ্যাপক চৌধুরী দস্তুরমত ভয় করেন। কোন্ অসতর্ক মুহূর্ত্তে তিনি যে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করবেন তা বলা বেশ শক্ত। শিষ্টাচার সম্ভাষণ এবং পরস্পর কুশল সংবাদাদি বিনিময়ের পর অধ্যাপক চৌধুরী আশা করেন রমেনবাবু বোধ হয় ফিরে যাবেন, কিন্তু তা কোন দিনই হয় নি। রমেনবাবু ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনর্গল বকে যেতে পারেন। অপরপক্ষে শ্রোতা যথেষ্ট মনোযোগী কিনা সে দেখার অপেক্ষাও তিনি রাখেন না। রমেনবাবুর গলা শুনতে পেয়ে অধ্যাপক চৌধুরী একটু শঙ্কিত হয়ে উঠলেন, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই মালতীর কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। রমেনবাবুর ত অনেক জায়গায়ই যাতায়াত আছে—অনেক খবরই রাখেন—মালতীর বিয়ের সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে দেখলে হয়।

—এই যে প্রফেসার চৌধুরী কেমন আছেন? ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই প্রশ্ন করলেন রমেনবাবু।

—আসুন! উত্তর দেন অধ্যাপক। স্বরে উৎসাহের লেশ নেই, তাতে কিন্তু রমেনবাবুর কিছু এসে যায় না।

—যা ঠাণ্ডা পড়েছে, শীতে যেন জমে যাচ্ছি। চেয়ারে বসতে বসতে বললেন রমেনবাবু।

—হ্যাঁ তা বটে। আবহাওয়া সম্বন্ধে অধ্যাপক চৌধুরীর মতভেদ নেই।

—এই দারুণ শীত, আপনি মশাই ও পাথরটা নিয়ে কি নাড়াচাড়া করছেন?

—এটা গুপ্তযুগের প্রস্তরলিপি।

—লিপি মানে চিঠি নাকি?

—না ঠিক চিঠি নয়, তবে তখনকার দিনে ত কাগজ ছিল না তাই সবই পাথরে খোদাই করা থাকত।

আবার ঘরে ঢুকল মালতী।

—বাবা তুমি চান করবে না?

—ও হ্যাঁ করব, আমি যাচ্ছি এখুনি।

মালতী পাশের বারান্দা পেরিয়ে চলে গেল।

অধ্যাপক চৌধুরী তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত্ত, আচ্ছা রমেনবাবু!

—অ্যাঁ !

—আপনার জানা কোন ভাল ছেলে আছে ?

—কেন বলুন ত ?

—মালতীর বিয়ের কথা ভাবছিলাম।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ আছে বইকি, যেমন দেখতে শুনতে তেমনই চৌধস। মানে এই বয়সে খুব উন্নতি করেছে, গাড়ী, বাড়ী সব। আর যা খেলে না তা আর কি বলব।

—খেলে !

—হাঁ ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস—ঐ যে বললাম যাকে বলে চৌখস, আমারই সম্পর্কে শালক। গর্ব্বিত ভাবে কথাটি শেষ করলেন রমেনবাবু।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ, সুনীলকে দেখলেই ভালবাসতে ইচ্ছে করে। বিয়ে দেবার জন্যে সকলে ত ঝুলোঝুলি। কিন্তু বিয়ে ও করতে চায় না। রহস্যের ভঙ্গীতে বললেন রমেনবাবু।

—কেন ?

—আর বলেন কেন ? হাসলেন রমেনবাবু—বলে আগে লাখ পঁচিশ ব্যাঙ্কে আসুক তার পর বিয়ের কথা ভাবা যাবে। অবশ্য আপনি যদি বলেন ত কথাটা পাড়তে পারি।

—ছেলের কে আছেন ?

—বাবা নেই, মা আছেন।

—আপনি ইচ্ছে করলে খবর নিয়ে দেখতে পারেন কোন খুঁত পাবেন না, সে আমি বলতে পারি।

—না না, আপনি যখন বলছেন আর আপনার যখন আত্মীয় তখন আর বলার কি আছে ?

রমেনবাবু ঠিকই বলেছিলেন সুনীল রায় খেলোয়াড় লোক। সেটা বুঝা গেল মালতীর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কিছু দিন পরে। প্রথম জানতে পারে এষা। বিয়ের কিছুদিন পরেই এষা লক্ষ্য করল মালতী যেন নিভে গেছে। শাড়ীর আঁচলের বেণীর চাঞ্চল্য যেন থেমে গেছে। মুখখানি ঘিরে যে কোমলতা মালতীর নিজস্ব ছিল সেটা যেন অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়ে গেছে। আবরণের উপর আর একটা নতুন আবরণ যেন এসে পড়েছে। এষা নিজে মেয়ে সুতরাং সে জানে নতুন আবরণের মানে কি ? সেটা শুধু ব্যক্তিত্বকে ঢাকা দেয় না, অন্তরের অন্তঃস্থলটা পর্য্যন্ত যেন একটানা পাথর দিয়ে মুড়ে ফেলে। মালতী হাসে বটে কিন্তু সেটা হাসি নয়। সজ্জা আছে ঠিক, কিন্তু মনের পটভূমিতে সে সজ্জা খুবই বেমানান বলে এষার মনে হয়েছিল। হাস্যমুখী চঞ্চল মেয়েটা হঠাৎ নিশ্চুপ স্তব্ধ হয়ে গেল কেন ? ও হাসি ত কান্নারই রূপান্তর, ও কান্না ত ফুলশয্যাকে ভুলবারই চেষ্টা।

এষা জানে মা নেই, বাবার কোন দিকে নজর নেই, তাই তাকেই বুঝতে হবে, তাকেই ভার নিতে হবে, ভাগ নিতে হবে। তাই জোর করে একদিন কথাটা পারলে সে।

—তোর কি হয়েছে বল্ ত ?

—কেন হবে আবার কি ? মালতী যেন হতচকিত হয়ে গেল এষার প্রশ্নে।

—তোর যেন কি হয়েছে ?

—বিয়ে হয়েছে, সে ত জানিদই ; প্রধান ব্যবস্থাপক ত তুই-ই ছিলি।

—আমার কথার উত্তর কিন্তু এটা হ'ল না, আমাকে লুকোস নি দিদি, সব কথা খুলে বল্। এষা এগিয়ে গিয়ে মালতীকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল।

মালতীর চোখের সামনে ঘন অন্ধকার নেমে এল, হঠাৎ শুনতে পেল, কানের কাছে একটানা ক্রমবর্দ্ধমান গুঞ্জনধ্বনি, নিস্তব্ধ মাঠের মাঝে-থেমে যাওয়া ইঞ্জিনের কর্কশ শব্দের মত। তলার ঠোঁট আর চিবুক থরথর করে কেঁপে উঠল।

সমবেদনায় বাঁধের মুখ বুঝি ভেঙে গেল। বন্যার ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে মালতীকে তলিয়ে দিলে। মেয়েছেলের লজ্জার ইতিহাস সেদিন মালতী তাঁর বোন এষাকে বলেছিল। সুনীল রায়ের মুখোস খুলে গিয়েছিল, তাঁর জলন্ত নির্লজ্জ স্বরূপটা সেদিন এষা দেখে চমকে উঠেছিল। মালতীর দুঃখের ভারে এষা যেন নিজেই ভেঙে পড়ল। এষার জীবনে তাঁর প্রতিক্রিয়া দেখা গেল কিন্তু অন্যভাবে। সঞ্জীব বোঝাবার চেষ্টা করেছিল একাধিকবার, কিন্তু এষা তার কর্ত্তব্য ঠিক করে ফেলছে, বিয়ে সে করবে না।

—তুমি ভুল করছ এষা, আমাদের জীবনে অন্য দৃষ্টান্তের ছাপ পড়ার কোন প্রয়োজন দেখি না। ঐ বিষয়ে আলোচনা চলছিল ওদের মধ্যে।

—আছে সঞ্জীব, সব দৃষ্টান্তেরই মূল্য আছে, বিশেষতঃ প্রিয়জনের।

—সুনীল রায় ত সবাই নয়। সঞ্জীবের স্বরে বিরক্তির আভাস।

—আমি কিন্তু মালতীর বোন। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় এষা।

—ভালবাসার মূল্য তবে কোথায় ? যেন গর্জ্জে উঠল সঞ্জীব।

—মূল্য আছে বলেই আমি বিয়ে করব না। তুমি কোন-দিন আমার গায়ে হাত তুলবে, তা আমি নিশ্চয়ই হতে দেব

না। তুমি কোনদিন আমায় ফেলে অন্য মেয়েকে নিয়ে আনন্দ পেতে চেষ্টা করবে তা কি আমায় সহ্য করতে বল ?

—সেকথা এখানে ওঠে কেন, তোমার-আমার মধ্যে এ প্রশ্ন আসে কেন ?

—আমি তোমায় ভালবাসি সঞ্জীব, তোমার ক্ষতি আমি করতে পারি না।

—আমার ক্ষতি ? তোমায় বিয়ে করলে আমার ক্ষতি হবে, বলছ কি এষা ?

—ঠিক বলছি সঞ্জীব, পাবার আকুলতায় তুমি অন্ধ হয়ে গেছ।

—সে কথা ঠিক, তোমার মত ভালবাসাটা মেপে করতে শিখি নি বোধ হয়। সঞ্জীবের স্বরে সুস্পষ্ট ব্যঙ্গ।

—তুমি আমায় ভুল বুঝ না সঞ্জীব, তোমাকে মিনতি করি, ভুল বুঝ না। ব্যাকুল হয়ে উঠল এষা, তোমাকে আমি পেয়ে হারাতে চাই না মালতীদির মত।

—ঐ একটা দৃষ্টান্ত তোমার মনকে বদ্ধ করে ফেলেছে এষা, "অবসেসানে"র মত, স্থিতিস্থাপক রবারের মত, যতই তোমাকে টানার চেষ্টা করি না কেন ঠিক ফিরে যাবে তুমি আগের জায়গায়।

—কিন্তু এ ত ভুল নয়।

—নিশ্চয়ই ভুল, শুধু ভুল নয় অন্যায়।

—অন্যায় ? যেন আর্তনাদ করে উঠল এষা।

—হাঁ অন্যায়। তোমার মানসিক ব্যাধির জন্য আমি বঞ্চিত হব কেন ? আমি কেন পাব না ভালবাসতে, আমি কেন দূরে ঠেলে দোব আমার যৌবনের সুখ আর বার্দ্ধক্যের স্বাচ্ছন্দ্যকে, কেন আমার অঙ্কুরকে নিঃশেষ করব জন্মাবার আগে ?

—আমারও কি স্বপ্নের শেষ আছে সঞ্জীব !

—আমি বাস্তব চাই এষা। নির্ব্বিরোধ আত্মা নয়, অমূলক স্বপ্ন নয়। কল্পনার মালা গেঁথে নিজের গলায় পরে পরের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে আমি চাই না।

—আমি তোমায় হারাতে পারব না সঞ্জীব, পেয়ে হারাতে পারব না। তুমি আমার, আমার একার, আর কারও নয়, এক মুহূর্ত্তের জন্যও তোমায় হারাতে পারব না।

—কিন্তু আমি কি করব এষা ?

—আমি যা করব।

—তা হয় না, আমি পুরুষ, আমার স্ত্রী চাই !

—আমি ত তোমার স্ত্রী সঞ্জীব। আমি তোমার জীবন, আমি তোমার সূর্য্যের আলো, শরতের স্নিগ্ধতা, মাধুর্য্যের মাধুরিমা।

—ও ত কমলাকান্তের কবিতা হ'ল।

—কে কমলাকান্ত ?

—মনে নেই আমাদের সঙ্গে পড়ত কমলাকান্ত সরকার। আমাদের চারণ, আমাদের ভালবাসার ছোঁয়ায় যে কবি হয়ে উঠল।

—হাঁ মনে পড়েছে। না সঞ্জীব এ কবিত্ব নয়, এ আমার জয়, মালতীদি হেরেছে কিন্তু আমি জিতব।

—কিন্তু আমি যদি অন্য মেয়েকে বিয়ে করি ?

—তা করতে দেব না সঞ্জীব, সেইখানেই ত আমার জোর, সেইখানেই ত আমার জয়। আমি দেখাব তুমি আমার, একান্ত আমার।

—অধিকারই যদি না দিলে তবে জোর কোথায় এষা !

—একথার জবাব ফিরে এসে দোব। শান্তস্বরে উত্তর দিলে এষা।

—ফিরে এসে, যাচ্ছ নাকি কোথাও ?

—হাঁ, চাকরি পেয়েছি, কালই যাচ্ছি।

—কিন্তু এত ব্যস্ত কেন ?

—নিজেকে বুঝতে চাই সঞ্জীব, তোমাকে দূর থেকে বুঝতে চাই। কাল একবার আসবে ?

—কোথায় ?

—স্টেশনে, ৭নং প্ল্যাটফর্মে। আর তোমার ছাদে আলসের ধারে যে মাধবীলতা হয়েছে, তা থেকে কয়েকটা ফুল আনবে ?

সঞ্জীব গিয়েছিল ষ্টেশনে ফুল নিয়ে।

লাইনটা দেখে ইসরাইল ফিরে এল। ফিসপ্লেটগুলো ঠিক আছে, হস্তক্ষেপ করে নি কেউ। পয়েণ্টসম্যানের কোন ত্রুটি হয় নি বলেই মনে হ'ল। এবার সারেংহাটি কালভার্টের অন্দর অংশগুলো ভাল করে দেখতে হবে। দুর্ঘটনার সরেজমিন তদন্তের প্রথম অংশ তার রিপোর্টের উপরই নির্ভর করবে হয় ত। আবার ইসরাইল ফিরে এল ইঞ্জিনটার কাছে। লিভার থেকে যে লম্বা লোহার পাতটা পিষ্টন-বক্সের সঙ্গে লাগান আছে, তাকে বিডল রড বলে। বিডল রডটা একটু বেঁকে গেছে বলে মনে হ'ল। খুলে যায় নি বটে তবে অকেজো হয়েছে নিশ্চয়ই।

আসগরের কাজ পুরোদমেই চলেছে। ক্রেনে করে বগীর বিভিন্ন অংশগুলি সরানো হচ্ছে। পার্টিশনের কাঠ-গুলো এবং ধ্বংসাবশেষ জড়ো করা হয়েছে খালের ওধারে—যেখানে নলখাগড়ার বন, তারই পাশে। আসগরের হঠাৎ নজর পড়ল একটা ভাঙা পার্টিশনের উপর, সেটা এখনও বিচ্ছিন্ন করা হয় নি, হুকে যেন একটা কি ঝুলছে, ভাল করে

নজর করে দেখলে আসগর, একটা সবুজ রঙের লেডিজ কোট। হুঁঃ, লেডিজ কোট, ফুলদার রঙীন লেডিজ কোট, চিৎকার করে উঠল আসগর—আরিয়া। আবার জীবনরাম বোকার মত হাঁ করে অন্য দিকে তাকিয়ে আছে। থর থর করে আওয়াজ হ'ল ক্রেনের, রাত্রিজাগরণের পর কোন বৃদ্ধ যেন ধরা গলায় ক্রমাগত কেসে যাচ্ছে। পার্টিশনের সঙ্গে সবুজ রঙের লেডিজ কোটটা ঢুকে দুলতে দুলতে অপর পাশে গিয়ে পড়ল।

হাসনুর সবুজ রং ভাল লাগে তাই সুনীল তাকে এই কোটটা কিনে দিয়েছিল. সুনীল রায়ের সঙ্গে হাসনুর সম্প্রতি আলাপ হয়েছে। দেশাই ফিল্মসের ডাইরেক্টার ধীরেন ভড় হাসনুর সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। তবে এ যোগাযোগের একটা উদ্দেশ্য ছিল। স্ত্রীলোকের সঙ্গে সুনীল রায় সহজেই জমিয়ে ফেলতে পারে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে নিজেই জমে গেল। সুরমা-আঁকা চোখের নেশায় সুনীল যেন পাগল হয়েছিল। হাসনুর—মানে ফিল্মের শ্রীলেখা সত্যিই সুন্দরী, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে একটা ফিল্মষ্টারের আজ্ঞাবহ হ'ল নাকি, সুনীল রায় একথা কয়েকবারই ভেবেছে কিন্তু জীবনটা ভালভাবে উপভোগ করতে হবে বৈকি? আর মালতী? সে ত তার স্ত্রী, সে ত আছেই—তার জন্য ব্যস্ত হবার দরকার কি?

পার্কসার্কাসের একটা ফ্ল্যাটে হাসনু থাকে। ফিল্ম ডাইরেক্টর ধীরেন ভড়ের সঙ্গে সুনীল একদিন ওর ফ্ল্যাটে গিয়েছিল। সুনীলের সঙ্গে ধীরেন ভড়ের অনেক দিনের আলাপ, বয়সের পার্থক্য থাকলেও সম্পর্কটা প্রায় পুরনো বন্ধুত্বের। সিনেমা লাইনে ধীরেন ভড় অনেক মেয়ের নাগাল পেয়েছে সুনীল রায়ের সাহায্যে। সুনীল রায়ের চেহারার খ্যাতি আছে। মাঝারি ধরনের উচ্চতা, মুখে গ্রীসীয় ভঙ্গীর সুস্পষ্ট ছাপ, খুঁচালো সতেজ চিবুক, তীক্ষ্ণ নাক, মাথার চুল অল্প কোঁচকানো এবং ব্যাকব্রাশ করা। গৌরবর্ণ মুখে লালচে আভাস—কোথায় যেন একটা শিশুসুলভ কোমলতা লুকানো আছে ওর মুখে। দরকার হলে ধীরেন ভড় সুনীলকে টোপ করে, ছোকরার চেহারা যেমন, চালচলনও তেমনি। সেদিন নির্দিষ্ট সময়ে ধীরেন ভড়ের ডালহৌসি স্কোয়ারের আপিসে সুনীল রায় উপস্থিত হ'ল। সুনীলের পরণে কালো আচকান, চোস্ত পাজামা, হীরের বড় বড় বোতাম এবং আংটি। সজ্জাটা চমকপ্রদ বলা যায়, অবাক হয়ে ধীরেন ভড় সুনীল রায়ের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল।

—কি দেখছ কি? আত্মপ্রশংসা শুনবার জন্য ব্যগ্র হয় সুনীল রায়।

—আঃ, যা সেজেছ না মাইরী, চোখ ট্যারা হয়ে যাবে হাসনুর।

—তা হলে চল, আর দেরী কেন?

– হাঁ চল, কিন্তু একটা কথা।

—বল।

—অপর পক্ষও কম নয়, হাসনুর গান বা নাচের বোধ হয় স্বাদ পাও নি, আর শুধু গান-নাচ কেন বাবা, পরে ত···কালচে দাঁত বার করে ধীরেন ভড় অট্টহাস্য করল।

গাড়ী চৌরঙ্গী হয়ে পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে এল।—হাঁ, আর একটা কথা। বললে ধীরেন ভড়।

—কি?

—কল্পনার মত অত খরচ করতে পারব না।

—কেন? লোকসান হয়েছিল নাকি তোমার?

—না ইয়ে, তা অবশ্য হয় নি। ধীরেন ভড় আমতা আমতা করলে।

—ভাল জিনিস পেতে হলে একটু খরচ করতে হয়। মনে করিয়ে দিলে সুনীল রায়।

—হাঁ তা কি আর জানি না, অত কষ্ট করে জোগাড় করলাম আমি আর শেষ পর্য্যন্ত দেখ···

—দখল পেলে নানুভাই দেশাই। কথাটা শেষ করলে সুনীল রায়।

—বল ভাই, দুঃখ হয় কিনা বল?

—তা বোধ হয়। সিগারেট ধরালে সুনীল রায়।

—আর একটা কথা।

—বল।

—ঝট্ করে বিয়ে করলে কেন ব্রাদার?

কয়েক মুহূর্ত সুনীল রায় সিগারেটের নীলচে ধোঁয়ার কুণ্ডলীটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল, তার পর বললে—জীবনে স্থৈর্য্য চাই ধীরেন, প্রতিষ্ঠার জন্যে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে টাকা চাই আর তার সঙ্গে একটি স্ত্রী।

—এবং শাঁসাল শ্বশুর, এঁ্যা কি বল? নিজের রসিকতায় নিজেই মুগ্ধ হ'ল ধীরেন ভড়।

গাড়ী পার্কসার্কাসের একটা ম্যানসনের মধ্যে ঢুকল।

সুনীল রায় কিন্তু হঠাৎ নিজেকে হারিয়ে ফেললে—হাসনুর সুরমা-আঁকা দীঘল চোখের নেশায় বেসামাল হয়ে গেল। এত দিনের লোভনীয় টোপটা অকস্মাৎ অকেজো হয়ে গেল। অনায়াসে টোপটাকে গলাধঃকরণ করে নিলে হাসনু বানু—ধীরেন ভড়ও দস্তরমত ঘাবড়ে গেল। এ কি কাণ্ড! কন্ট্রাক্ট সই হ'ল বটে, কিন্তু হাসনুও যে নতুন খেলা পেয়ে মেতে গেল। স্যুটিংয়ে যায় না, টেলিফোনেও পাওয়া যায় না, ধীরেন ভড় যেন হাঁপিয়ে উঠল। দু'মাস

হয়ে গেছে অথচ একটা স্যুটিংও সম্ভব হয় নি। কর্তাকে আজে-বাজে কৈফিয়ৎ দিয়ে আর ত ঠেকান যাবে বলে মনে হচ্ছে না। নানুভাই দেশাই পাকা ঝানুলোক। দেশাই ফিল্ম কোম্পানীর পয়সা নিশ্চয়ই খোলামকুচি নয়। সেদিন আর রোখ গেল না, নানুভাই বোমার মত ফেটে পড়ল:

—কেন এত দেরী হচ্ছে, ঠিক করে বল। হুঙ্কার দিল নানুভাই।

—প্রেমে পড়েছে স্যর। ভয়ে ভয়ে বললে ধীরেন ভড়।

—কে? আবার হুঙ্কার।

—সুনীল রায়কে পাঠিয়েছিলাম হাসনুকে আনবার জন্যে কিন্তু একেবারে জমে গেছে।

—তুমি একটা বুদ্ধু আছ।

—ধীরেন ভড় কেশবিরল মাথা চুলকোতে সুরু করলে।

আউটডোর সিন ক'টা আছে? প্রশ্ন করল নানুভাই।

—পাঁচটা।

—ঠিক আছে, পাহাড়ে জায়গা চাই ত?

—হাঁ।

—তা হলে নিয়ে যেতে হবে ওদের। বলে দাও ওদের জন্যে আলাদা বাংলো দোব, অন্য সব ব্যবস্থাই থাকবে, যত তাড়াতাড়ি পার ব্যবস্থা করে ফেল, আর শোন, গাড়ী রিজার্ভেশনের কথাটা ভুলো না।

—কিন্তু আগের স্যুটিংগুলো—বোকার মত প্রশ্ন করে বিপদে পড়ল ধীরেন ভড়।

—চোপরাও। চীৎকার করে উঠল নানুভাই দেশাই—আগের স্যুটিং হবে কি করে, ওদের বাইরে বার করতে না পারলে?

—তা ঠিক, আচ্ছা আমি তাই ব্যবস্থা করছি। পালাতে পারলে বাঁচে ধীরেন ভড়।

সুনীল রায়কে খুঁজে বার করতে বেশ বেগ পেতে হ'ল ধীরেন ভড়ের, কারণ সুনীল রায় নিজেই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। নানাদিক দিয়ে অবাঞ্ছিত বিপদ এসে গেছে। একটার পর একটা যেন মিছিল করে পরামর্শ করে জড়ো হয়েছে তার পাশে। হঁ, টাকা তার চাই, প্রচুর টাকা, তা না হলে হাসনুর কাছে মান থাকে না। হাসনু ভাববে সে বিত্তহীন! তা হলে ত মূল্যহীন হয়ে যেতে হবে তার কাছে! মালতীর কথা অবশ্য ভাববার মত নয়, তার দাবীও কিছুই নেই বললেই হয়, উপরন্তু সম্প্রতি তাকে যেন মালতী এড়িয়ে চলে, ভালই। তবে সবচেয়ে বড় কথা হ'ল টাকা, ধীরেন ভড়ের কাছ থেকে আর কিছু পাওয়া যাবে বলে ত মনে হয় না।

সুনীল রায় বসে আছে ঘরে, একসঙ্গে অনেকগুলো চিন্তা এসে জড় হয়েছে। হঠাৎ যে এত টাকার টানাটানি হবে, একথা সুনীল রায় ভেবে দেখে নি। মালতীর কাছে বোধ হয় কিছু টাকা আছে, শ্বশুরমশাইয়েরও অর্থাভাব বলে ত মনে হয় না।

মালতী ঢুকল ঘরে, অনেক দিন পরে সুনীলকে দেখলে যেন, তীব্র বেদনার মধ্যেও মনটা দুলে উঠল তার।

—এই যে মালতী। কথাটা সুরু করল সুনীল—কোথায় ছিলে?

ভঙ্গিতে মনে হ'ল, মালতী যেন তার কাছে দুষ্প্রাপ্য।

—এখানেই, কেন? মালতীর স্বরে কৌতূহল—আশা এখনও বেঁচে আছে নাকি?

—তোমাকেই খুঁজছিলাম, বিশেষ দরকার, তুমি একবার বালিগঞ্জে বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাবে?

—কেন, বাবার সঙ্গে কি দরকার! মালতী বুঝতে পারে না সুনীলের মনের কথা।

—কিছু টাকার দরকার, বাবার কাছ থেকে যদি···

—না। দৃঢ়স্বরে উত্তর দেয় মালতী—ও তাই তাঁর খোঁজ পড়েছিল। কানের পাশে কে যেন আগুন জ্বেলে দিয়েছে, রক্তবর্ণ হয়ে উঠল তার মুখ।

—একটা নতুন ব্যবসা সুরু করেছি। উৎসাহের সঙ্গে সুনীল বললে।

—ব্যবসাটা নতুন নয়, অনেক দিনের পুরনো। বাধা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় মালতী।

—তার মানে? ভ্রূকুঞ্চিত হ'ল সুনীল রায়ের।

—তার মানে, তোমাকে এবং তোমার ব্যবসাকে আমি ভালভাবেই চিনি। স্পষ্টভাবে এবং ধীরে ধীরে কথাগুলো উচ্চারণ করে মালতী।

—তোমার কথাটা খুব স্পষ্ট হ'ল না মালতী।

—না হোক, কথাটা বুঝতে তোমার পক্ষে দেরী হওয়া উচিত নয়, আর না জানার ভান করলেও বিশেষ সুবিধে হবে বলে মনে হয় না।

—তুমি হয় ত আমার বিরুদ্ধে একটা মনগড়া অভিযোগ খাড়া করেছ মালতী, হয় ত কানে তোমার কেউ বাজে কথা ঢুকিয়েছে, লোকের কথায় কান দিলে অনেক দুঃখ পাবে।

একটা সিগারেট ধরালে সুনীল, অগ্নিসংযোগ করার সময় সুনীলের হাতটা একটু কেঁপে উঠল। লক্ষ্য করেছে সুনীল আজকাল প্রায়ই এটা হয়। ইচ্ছাশক্তির উপর ওটা নির্ভর করে না। যখন হাতটা কাঁপে তখন সেটা বেশ ভালভাবেই

বুঝতে পারে, কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করলেও কাঁপুনিটা বন্ধ করা যায় না, আঙুলের মাংসপেশীগুলো যেন আর ইচ্ছাধীন থাকে না।

—কোন কিছুতেই দুঃখ পাব না আমি। মুখ ফিরিয়ে বলল মালতী—তুমি যদি ভেবে থাক আমার ওপর চাপ দিয়ে বাবার কাছ থেকে টাকা আদায় করবে তা হলে ভুল করছ। নিজেকে পুরুষ ভেবে যদি আমার দুর্ব্বলতার সুযোগ নেবার চেষ্টা কর তা হলেও ভুল করবে।

—না, তুমি দুর্ব্বল হবে কেন, বাবার টাকা রয়েছে, তা ছাড়া নিজেও সুন্দরী। ব্যঙ্গ করল সুনীল।

—হাঁ, সেটাও একটা মনের জোরের কারণ বইকি। মালতী উত্তর দিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

সুনীল উঠে পড়ল, মিথ্যা তর্কে লাভ নেই, অন্য ব্যবস্থা করে নিতে হবে। কাপড়-জামাগুলো বদলে নিলে সুনীল, ধোপদুরস্ত স্যুট আর ম্যাচ-করা টাই পরলে। টাকা সে জোগাড় করে নেবে, কোনদিন তার কিছু অভাব হয় নি, শুধু একটু কষ্ট করে জোগাড় করে নেওয়ার অপেক্ষা। মালতী তার রূপের গর্ব্ব আর বাবার টাকা নিয়ে বসে থাকুক, তাতে তার আপত্তি নেই।

রাস্তায় নেমে নৃপেনের কথা মনে পড়ল, একবার দেখলে হয় চেষ্টা করে। নৃপেন উত্তরাধিকারসূত্রে বেশ কিছু পেয়েছে, তা ছাড়া নিজে ডাক্তারীতে পশার জমিয়েছে।

সুনীল যখন ডাক্তার নৃপেন মুখার্জ্জির বাড়ী পৌঁছল তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

—এস কন্দর্পকুমার!- অভ্যর্থনা করলে নৃপেন—হঠাৎ কি ব্যাপার?

—দরকার না হলে কি ডাক্তারের বাড়ী লোক আসে? উত্তর দিলে সুনীল।

—হ'ল কি বল ত? মুখে রেখা পড়েছে, না দু'একটা চুল পাকল বলে ভয় পেলে?

—না। হাসল সুনীল—নার্ভের ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে।

—ও ত একটু হবেই, ড্রিঙ্কটা একটু কমাও। প্রকৃতির প্রতিশোধের জন্মে এখন অনুযোগ করলে ত চলবে না। সে কথা আগে ভাবা উচিত ছিল। আর তাকে যখন সম্মান দাও নি তখন সে কেন ছাড়বে? ডাক্তারী ভঙ্গিতে বললে নৃপেন—কিন্তু শুধু এই জন্মেই আমার কাছে এসেছ? আরও কিছু প্রয়োজন আছে বলে মনে হচ্ছে।

—হাঁ, কিছু টাকারও দরকার।

—সে ত সকলেরই দরকার।

—তা ঠিক, কিন্তু আমার বিশেষ দরকার।

—তোমার বিশেষ দরকারটি কি, তা অনুমান করা শক্ত নয়, যাই হোক ওটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, ও বিষয়ে আমার কিছু বলা উচিত নয়।

—বলতে আর বাকি রাখলে কি?

—ডাক্তারের বিশেষ অধিকারের মধ্যে বিনামূল্যে উপদেশ বিতরণ করাটা একটা—

—উপদেশ দিও তার আগে ডুবন্ত লোকটাকে জল থেকে তোল।

-- ডুবন্ত লোকটির দেহের সঙ্গে একটা বিশ মণ পাথর বাঁধা রয়েছে, তুলতে গেলে আমি শুদ্ধ তলিয়ে যেতে পারি। আর তা ছাড়া দেবার মত অবশিষ্ট কিছুই নেই।

—সে কি তুমি তো প্রচুর টাকার মালিক শুনেছি।

—ভুল শুনেছ—বাবার কিছু টাকা পেয়েছি বটে, তবে তা থেকে অধিকাংশ টাকাই খরচ করেছি। হাসপাতালে কিছু দিয়ে পুণ্যলাভ করলাম, একটা দেশী গাছ গাছড়ার ওষুধের কারখানা খুলেও বেশ কিছু লোকসান দিয়েছি। সম্প্রতি পোলট্রি করে নূতন জাতের হাঁস এবং মুরগী সৃষ্টি করবার চেষ্টা করা গেল। আর তা ছাড়া টাকা থাকলেও তোমাকে আমি দিতাম না।

—কেন?

—অসুখ যাতে না হয় তার জন্মে আমরা টাকা দিই জান ত?

—হ্যাঁ, তা জানি।

—সুতরাং ডাক্তার হয়ে রোগীর সংখ্যা বাড়াতে সাহায্য করা নিশ্চয়ই উচিত হবে না। টাকাটা তুমি যেভাবে খরচ করবে তাতে রোগ হওয়া খুব স্বাভাবিক।

—আমার ধারণা ছিল ডাক্তাররা ব্যবসায়ী হিসাবে বুদ্ধিমান, কিন্তু এখন ত অন্য রকম মনে হচ্ছে—অবশ্য ব্যবসার খাতিরে জ্ঞানমার্গের কথার অবতারণা যদি করে থাক তা হলে অন্য কথা।

অট্টহাসি হাসল নৃপেন। সুনীল রায় ঠিক তেমনি আছে। মেডিকেল কলেজে এক সঙ্গে দু'জনে ভর্তি হয়েছিল। কোনক্রমে প্রথম ধাপটা উত্তীর্ণ হয়েছিল বটে তারপর জগন্নাথের রথের মত নিশ্চল হয়ে পড়ল সুনীল। অবশ্য কারণ ছিল বৈকি। ডাক্তারী পড়তে গেলে মন এবং দেহকে যেভাবে তৈরী করতে হয় সেদিকে সুনীল নজরই দিলে না-- সুতরাং নিষ্কৃতি পেয়ে যেন সে বেঁচে গেল।

ক্রমশঃ

লছমনঝোলা—মহাদেবের জটাপ্রান্ত

শ্রীপরিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

মহাদেবের জটা চিরে গঙ্গা যেখানে পৃথিবীর মাটিতে নামলেন তার নাম হরিদ্বার। রামায়ণের সগর উপাখ্যান তাই বলে। কাজেই হরিদ্বার পেরিয়ে ভারতের সমস্ত উত্তরখণ্ডকে শিবের জটা বলে মেনে নিতে হয়। জটাই বটে! কিন্তু সেই জটা ভস্মমাখা পেশাধারী সাধুর কদাকার জটা নয়! যে শিবের রূপ কোটিচন্দ্র বিনিন্দিত-অনুপম, তার জটাও যে অনবদ্য তা অনুভব করতে হলে আপনাকে বেশীদূর যেতে হবে না। হরিদ্বারের পর হৃষিকেশ। সেখান থেকে মাত্র তিন আনা বাস ভাড়া দিয়ে মাইল তিনেক পথ অতিক্রম করলেই আপনি যখন লছমনঝোলার প্রান্তে উপনীত হবেন তখনই উপলব্ধি করবেন কেন উমা জটাধারীর পায়ে নিমগ্ন হয়েছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি লছমনঝোলাকেই গিরিরাজের জটাপ্রান্ত বলা যায়। সেই যে শুরু হ'ল, তার পর ঢেউয়ের পর ঢেউ—উচ্চ থেকে উচ্চতর। উঠে উঠে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে থেমে গিয়েছে কৈলাসশিখরে। সাগরতরঙ্গ চঞ্চল—আপনাকে মাথায় তুলে আছাড় মারে। কিন্তু হিমালয়ের ঢেউ শান্ত সমাহিত—সবুজঘন শীতল-রোমাঞ্চিত। ফাঁকে ফাঁকে বয়ে চলেছে ক্ষীণকটি গঙ্গা। ক্ষীণকায় দেখেই বুঝি গর্ব্বোদ্ধত ঐরাবত সগরবংশ-উদ্ধারকারীকে উপেক্ষা করতে সাহসী হয়েছিল। কিন্তু সেই ইন্দ্রবাহন যদি সামান্যতম মনোনিবেশ দিয়ে তার কলনাদ শুনতে চেষ্টা করত তবে তাকে আর অপমান, লাঞ্ছনা ভোগ করতে হ'ত না। মানুষও যে ভুল করে না তা নয়। ভাল সাঁতার না জেনে গভীর জলে নামতে গিয়ে প্রাণ হারানোর উদাহরণ বিরল নয়।

লছমনঝোলার পুল

বাস থেকে নেমে নদী পার হয়ে তবে লছমনঝোলায় পৌঁছাতে হবে। কিছুটা পায়ে হাঁটা পথে এগিয়ে এসে ইস্পাতের একটা প্রকাণ্ড পুল আপনাকে অভিনন্দন জানাবে। গঙ্গার কটিতট সরু হলেও পুলের বিস্তার ছোট নয়। আপনার চলার ছন্দে ছন্দে পুলটাও দুলতে থাকবে। তাই এ স্থানের নাম লছমনঝোলা। লক্ষ্মণের নামের সঙ্গে এ স্থানের নামকরণের কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। পুলের গঠন-চাতুর্য্য মনোরম ও মজবুত। নীচে চলেছে জল গড়িয়ে গড়িয়ে। পুলের উপর থেকে জলের দিকে তাকালে মনে হয় যেন মাথা ঘুরছে। পায়ের তলার পুলটা তখন একান্ত অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়।

এখানে পাণ্ডার বালাই নেই। কিন্তু বানর আছে প্রচুর। আর তারা অনেক সময় পুলের দু'ধারের ধন্নাতে বসেই নীরব আবেদন জানায়। কখনও কখনও যে নানা মুখভঙ্গী করে আপনাকে কিছু বেসামাল না করে তা নয়। ভয়ের জন্যই বলুন কৌতূহল মেটানোর জন্যই বলুন এদের জন্য দু'চার পয়সা খরচ না করে উপায় নেই।

এখানে মানুষ যা কিছু বৈচিত্র্য গড়ে তুলেছে তা প্রায় সবই ইদানীং কালের। শতাব্দীর পুরানো বলতে বিশেষ কিছু নেই। সত্যিকারের তীর্থক্ষেত্র বলতে যা আমাদের মনে জাগে তা লছমন-ঝোলা নয়। একে সাধুসন্তের আবাস আর প্রকৃতির লীলাভূমি বলাই ঠিক হবে। তবে যে ভাবে দ্রুত গতিতে সংস্কার হতে চলেছে তাতে এর অঙ্গসৌষ্ঠব কতখানি বজায় থাকবে তা এখনই বলা শক্ত। যদিও ইট-পাথরের উপর সিমেণ্টের পলেস্তারা পড়ছে দ্রুতগতিতে, আর কুটীরের বদলে গড়ে উঠছে কুঠি, কিন্তু একমাত্র অনন্ত-প্রবাহিনী গঙ্গা ভিন্ন এখানকার জীবনের গতি মন্থর। কৃত্রিম চাঁদের আলোর বিকিরণ এখানকার জগতে আলোড়ন জাগায় না। রকেট কিম্বা আণবিক বোমার ভীতি—মানুষের মন সঙ্কুচিত করে না। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে পাখীর কলকাকলী শুরু হওয়ার আগে আজও শুনতে পাবেন গুরুগম্ভীর কণ্ঠের বেদমন্ত্র—দেখতে পাবেন পুরাণ-

বর্ণিত গঙ্গাস্নানরত কৌপিনধারী সন্ন্যাসী। তার পর আকাশের রং যতই ফ্যাকাশে হয়ে আসতে থাকে, ততই সবুজ-ছোঁয়া বাতাস বন-উপবন জাগিয়ে আপনার সারা দেহ-মনে রোমাঞ্চ জাগিয়ে তুলবে। ধীরে ধীরে রঞ্জিত হয়ে উঠবে পূর্ব্বাকাশ। এক অপূর্ব্ব সুষমার স্পর্শ সমস্ত অনুভূতিকে: দেহাতীত অনন্তের সন্ধান দিয়ে উপগ্রহ-সভ্যতার উন্মাদনা একান্ত অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। দু'মিনিটের জন্য এলেও যাদের দৃষ্টি আছে তারা এর ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে আসতে পারে না। স্নিগ্ধ স্মৃতি অনেকদিন ধরে ক্লান্তি হরণ করে চলে।

এখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা পরিশ্রমী, সরল। চেহারা আর চালচলনে আরও দশটা পাহাড়ী অঞ্চলের সঙ্গে যথেষ্ট মিল আছে। অপরের কোন কাজে এলে সানন্দে হাত বাড়িয়ে দেয়। পোশাকে-আশাকে সাদাসিধে। অধিকাংশের আর্থিক সঙ্গতি খুব বেশী নেই। সঙ্গতি থাকলেও অবশ্য এরা ভোগবিলাসী তেমন নয়। অন্তত এদের বাইরের আবরণ দেখে সে সব কিছু বোঝার উপায় নেই। একথা বলাই বাহুল্য যে, এতদঞ্চল গরমের দিনেও তেমন উষ্ণ হয় না। অবশ্য আমরা তাই ভাবি। কিন্তু ওখানকার বাসিন্দারা কেউ কেউ আরও উপরে চলে যাচ্ছে শীতলতর স্থানের সন্ধানে। ঘরবাড়ী যাবতীয় সম্পত্তি ওরা পাহাড়ী টাট্টু কিংবা টানা গাড়ীতে বোঝাই করে বয়ে নিয়ে যায়। মেয়েরা এ ব্যাপারে পুরুষের সমান কিংবা অধিক কাজ করে থাকে। মোটরের ধার এরা ধারে না। অবশ্য ধারলেই যে সব যায়গায় মোটর ব্যবহার করা যেত, তা নয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মোটর অচল।

এখানকার মন্দির ইত্যাদি যেমন পুরোন ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে আনছে না, তেমনি স্থাপত্য-শিল্পের দিক থেকেও বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য নেই। তবে এর মধ্যে পরমার্থনিকেতন আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। দেখতে পাবেন মহাবিষ্ণুর মূর্তি—তার দুদিকে আছে গরুড় আর হনুমান।

পুল পার হয়ে অনেকটা পথ হেঁটে গিয়ে দেখতে পারেন গঙ্গার তীর আলো করে দাঁড়িয়ে আছে স্বর্গদ্বার আর গীতাভবন। শুধু লছমনঝোলা নয়, উত্তর-ভারতের প্রায় সবটা পাহাড়ী অঞ্চলেই গেরুয়াধারী অনেক বাঙালী সাধুর সাক্ষাৎ পাবেন। অতি আগ্রহে আপনার সঙ্গে কথা বলবে। তাদের কারুর কণ্ঠে যেন শুনতে পাওয়া যায় বাংলা মাকে ছেড়ে আসবার বিষণ্ন সুর। নাম-ধাম জিজ্ঞেস করলে কিন্তু জিভ কেটে পূর্ব্বাশ্রমের অস্তিত্ব অস্বীকার করবে।
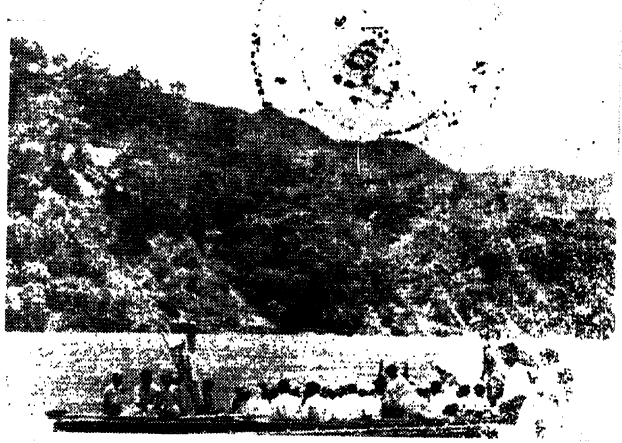
পারের খেয়া

গোরক্ষপুরের গীতা প্রেস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গীতাভবনের দেয়ালে সমস্ত গীতা-শ্লোক মুদ্রিত করা। গরমের সময় বহু যাত্রীর ভিড়ে এর বিশাল হলঘর ধর্ম্মব্যাখ্যায় মন্দ্রিত হয়। একে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বিরাট ধর্ম্মশালা। যাত্রী-সাধারণ এখানেই কোন প্রকারে ঠাঁই করে নেয়।

তীর্থক্ষেত্র কিংবা এতদসংক্রান্ত স্থানগুলিতে ধর্ম্মশালাই বহুলাংশে সাধারণ যাত্রীর অভাব পূরণ করে আসছিল এতদিন। কিন্তু এ ছাড়াও ভারতবর্ষ বিদ্যমান তার রূপ-ঐশ্বর্য্য আর ইতিহাসের সাক্ষ্য নিয়ে। যারা এগুলি দেখতে চায়, প্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করতে চায়, তাদের সুখ-সুবিধের কথাটা নেহাৎ তুচ্ছ নয়।

কত বিচিত্র নরনারী। কত কত আচার-অনুষ্ঠান। তবু সবাইকে নিয়ে একক ভারতবর্ষ। এই ঐক্যকে বইয়ের পাতা থেকে মানুষের মনের গহনে গেঁথে দিতে হলে প্রয়োজন অবাধ ভ্রমণের সুযোগ। বাঙালী চায় বাঙলার বাইরে আর সবার সঙ্গে আত্মীয়তা-বন্ধনে আবদ্ধ হতে। তেমনি আর সব রাজ্যের লোকেরাও। এরা সবাই বুঝতে চায়, শিখতে চায় ভারতের পূর্ণ রূপ। এক কথায় অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে চায়, এই আমার সোনার ভারত। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভ্রমণ ব্যয়বহুল বলে অতি নগণ্যসংখ্যক লোকের পক্ষে মনের গোপন আশা পূর্ণ করা সম্ভব হয়। যান-বাহনের ব্যয় মিটিয়ে হোটেলে থাকার ব্যয় নির্ব্বাহ করা শুধু কষ্টসাধ্য নয়, অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে ওঠে। কেননা, যে সব স্থানে ধরমশালা নেই সেখানে হোটেলগুলি ব্যয়-বহুল।

ভ্রমণেচ্ছু নরনারীর সংখ্যা যে ভাবে দিন দিন বেড়ে চলেছে তাতে চারুশিল্প হিসেবে একে সুপ্রতিষ্ঠ করতে হলে যাত্রী-সাধারণের

সবুজ ঘন পরিবেশ

চারুশিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে প্রচুর অর্থ উপায় করতে পারি। যে বিদেশী মুদ্রার অভাবে আমরা অভাবগ্রস্ত, তারও অনেকটা সুরাহা হয় এর মাধ্যমে। এক হিসেবমত দেখা যায় একমাত্র '৫৬ সনেই পাকিস্থান বাদে প্রায় ৬৯,০০০ হাজার বিদেশী ভারত-ভ্রমণে এসেছিলেন। আর তাঁদের কাছ থেকে ভারতবাসী উপায় করেছে প্রায় ১৫ কোটি টাকা। এ অঙ্ক আমাদের বিদেশীলব্ধ অর্থের একটা মোটা অংশ। বিদেশী যাঁরা আসেন তাঁরা সাধারণত দু'পয়সা খরচ করতে পেছপা হন না। কিন্তু সে জন্য প্রয়োজন ভারতে থাকাকালীন তাঁদের জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার আকর্ষণ ও আরামের ব্যবস্থা করা। সুতরাং যানবাহন বা হোটেল ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে পথঘাটের উন্নতিবিধান করা প্রয়োজন। এমন যায়গা বিরল নয়, যেখানে যেতে প্রাণ চায় কিন্তু পথের কথা ভাবলে আর যাওয়ার নাম করতে ইচ্ছে হয় না। স্বদেশবাসীর পক্ষে যদিও এটা মেনে নেওয়ার কথা বলা চলতে পারে কিন্তু বিদেশীর বেলায় এ যুক্তি অচল।

স্বর্গদ্বার আর গীতাভবন দেখে আপনাকে গঙ্গা পার হতে হয় খেয়ানৌকায়। লছমনঝোলাই বোধ হয় একমাত্র স্থান যেখানে খেয়াপারের কড়ির প্রয়োজন হয় না।

লছমনঝোলার জল ও আবহাওয়ায় আকৃষ্ট হয়ে বহু কুষ্ঠরোগী এ অঞ্চলে অবস্থান করছে। ভিক্ষাবৃত্তিই অধিকাংশের উপজীব্য। আমাদের নাগরিক চেতনা যে পর্য্যায়ের তাতে এদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলা অনেক কষ্টকর। শুধু জনসাধারণ নয়, যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এদিকে দিলে অবস্থা আয়ত্তের বাইরে যাওয়ার নয়। সত্যিই যদি এখানকার জলহাওয়া এদের পক্ষে স্বাস্থ্যকর হয়,তবে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে এই সমস্ত দুর্ভাগ্যপীড়িত নরনারীকে সাধারণ সমাজে নিয়ে আসা সম্ভব হতে পারে।

দুপুরের রোদ পশ্চিমের দিকে গড়িয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীর কলরব কমে আসতে থাকে। মুষ্টিমেয় যাত্রী যারা ধরমশালার আশ্রয়ে থেকে গেল, তারা এক শান্ত-শীতল অপরাহ্নের ছোঁয়ায় সমাহিত হয়ে গঙ্গার ধারে বসে বসে পতিতপাবনী গঙ্গার চিরন্তন স্রোতের মধ্যে নিজের মনকে ঢেলে দেয়। মন জুড়িয়ে যায়। বিক্ষিপ্ত চিত্তকে মানুষ ফিরে পায় একান্তে আপনার আয়ত্তে।

আকাশের উজান বেয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী নানান বেশে নানান রঙ্গে ভাসতে ভাসতে সবুজ সমুদ্রে মিলিয়ে যায়। কখন এক সময় চুপি চুপি সন্ধ্যার রক্তিম আবরণ গড়িয়ে রাত তার তারায়-ভরা চাদর আপনার ক্লান্ত দেহের ওপর বিছিয়ে দিয়ে কানে কানে বলে যায়—ঘুম আয়, ঘুম আয়। চোখের পাতা ঘুমের কোলে লুটিয়ে পড়ে পরম নিশ্চিন্তে।

সুখ-সুবিধের দিকে প্রথম দৃষ্টি দিতে হবে। যাতায়াতের অবাধ সুযোগ যেমন করে দিতে হবে তেমনি তার সঙ্গে প্রয়োজন অল্পখরচায় পরিচ্ছন্নভাবে থাকবার মত হোটেল। এর ফল সুদূরপ্রসারী। শুধু যে যান-বাহনবাবদ সরকারী তহবিল স্ফীত হবে তা নয়—হোটেল এবং আর দশটা কাজে বহু লোকের অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা হবে। ধরমশালায় বিনা পয়সায় থাকার ব্যবস্থা থাকলেও এগুলির উন্নতি আবশ্যক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলি কোন ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানবিশেষের বদান্যতায় পরিচালিত। সুতরাং অর্থাভাব এদের উন্নতির প্রধান প্রতিবন্ধক। তবে এ কথা বলতে বাধা নেই যে, যাত্রী-সাধারণ আর একটু সহযোগী মনোভাব নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্য নিলে আরও দ্রুততর উন্নতি হয় এবং বাসস্থান-ব্যবস্থাও সুখকর হয়। পরের ঘরে বাস করছি সুতরাং একটু পরিশ্রম করে একে পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব সম্পর্কে অধিকাংশ লোক একান্ত উদাসীন। আপনি যদি এ বিষয়ে কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তবে তিনি খুব তুষ্ট চিত্তে তা গ্রহণ করবেন না, এ কথা এক রকম নিশ্চয় করেই বলা চলে।

সুইজারল্যাণ্ড ছোট্ট একটু দেশ। আমাদের দেশের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ মাত্র। কিন্তু প্রচার আর সুযোগ-সুবিধের সৃষ্টি করে ওরা লক্ষ লক্ষ ভ্রমণকারী আকৃষ্ট করে। তাদের কাছ থেকে কামিয়ে নেয় কোটি কোটি টাকা। আমাদের ভারত শুধু বিশাল নয়, সমুদ্রের মতই রত্নগর্ভা। হাজার হাজার বছরের পুরনো ইতিহাসের বিস্ময়কর সাক্ষ্য দাঁড়িয়ে আছে ভারতের কোণে কোণে। মনোরম প্রকৃতি হাতছানি দিয়ে ডাকছে মানুষের সুন্দর লোভী মনকে। কোটি কোটি বিদেশী উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। ইতিহাস ও প্রকৃতি দুই-ই যখন আমাদের সহায় তখন শুধু আমরা এ বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত হলেই ভ্রমণকে

দীপ্তি

দেবাচার্য্য

চতুর্থ দৃশ্য
চক্রবর্ত্তীর বারান্দা।

[বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে দীপ্তি উঠে যায়। তার হাতে মাজা-ঘষা বাসন-কোসন, শাড়ীর তলার দিকটা ভিজে। বারান্দা পার হয়ে রান্নাঘরে ঢোকে, বাসন-কোসন নামিয়ে রেখে শোবার ঘরে যায়। একটু পরে শাড়ী বদলে চুল পিছনের দিকে জড়াতে জড়াতে বেরিয়ে আসে। বগলে একটি মাদুর। মাদুর পাতে বারান্দায়। তার পর আবার শোবার ঘরে ফিরে যায়। একটা শ্লেট ও অঙ্কের বই হাতে বেরিয়ে আসে। শোভনও বেরিয়ে আসে দিদির পিছন পিছন আর একটা শ্লেট কোলে করে।

দুজনে মাদুরে বসে শ্লেটের ওপর লিখে যায়। মাঝে মাঝে দীপ্তি শোভনের শ্লেটটা নিয়ে দেখে, ভুল দেখিয়ে দেয়। তার পর একাগ্রমনে অঙ্কের বই দেখে দেখে অঙ্ক কষবার চেষ্টা করে দীপ্তি।

(মাঝে মাঝে শোভন মুখ তুলে দিদির দিকে তাকায়। কড়া নাড়ার শব্দ শোনা যায়)

(নেপথ্য হইতে) বিন্দুবাসিনী—অ' দীপ্তি, কাণের মাথা নি খাইছ, কড়া নাড়তেছে কিটা, শোনছ না।

দীপ্তি। (শোভনের দিকে তাকিয়ে) এই খোকন, যা ত, খিলটা খুইলা দে।

(খোকন উঠে গিয়ে ভিতরের দিককার খিল খুলে দেয়)
বালতি হাতে সুশীলার প্রবেশ]

সুশীলা। (রান্নাঘরের দিকে নজর দিয়ে) আজও বাসন মেজেছ। তা হলে টাকাটা তুমিই নাও।

দীপ্তি। এ আর কতটুকু কাজ। দুধ-বার্লির বাটি মাজতে কি খুব কষ্ট হয় কারুর ?

সুশীলা। আজ না হয় দুধ-বার্লির বাটি মেজেছ! কিন্তু, এতদিন যে ভাতের এ টো বাসন-কোসন সবই মেজে দিলে।

দীপ্তি। তুমিও ত আমার অনেক কাজ করে দিয়েছ ও দিচ্ছ এখনও। বাজার করে দাও, আবার গোবর কুড়িয়েও আন। মনে কর ধার শোধ দিচ্ছি।

সুশীলা। (মুচকি হেসে) তোমাদের ঝ্যাটাটা নিলাম। দাদাবাবুর ঘর ঝাড় দেওয়া হয় নি এখনও। আমাদের ঝ্যাটার বাঁধন খুলে গিয়েছে।

দীপ্তি। তা নিয়ে যাও। তবে আবার ফিরিয়ে দিয়ে যেও। আমাদেরও ঐ একটিমাত্র ঝাটার বাঁধন ঠিক আছে।

সুশীলা। (আবার হেসে) দেব দেব ফিরিয়ে। তোমার ঝ্যাটার ওপর দাদাবাবুর একটুও লোভ নেই।

দীপ্তি। কেমন আছেন আজ ? জ্বর খুব ?

সুশীলা। আমি কি আর তাঁর গায়ে হাত দিয়ে দেখেছি ? তবে চোখ দুটো খুব লাল। কি সব ইঞ্জিরী-মিঞ্জিরী বকে যাচ্ছেন আপন মনে সেই সকাল থেকে। মাঝে মাঝে ওয়াক্ ওয়াক্ কচ্ছেন, কিন্তু বমি হচ্ছে না। ভাল কথা, পিকদানিটা কোথায় ? ওটাও মেজেছ নাকি ?

দীপ্তি। হ্যাঁ, ওই দ্যাখো, দরজার গোড়ায়।

[সুশীলা বারান্দায় উঠে গিয়ে দরজার পাশ থেকে পিকদানিটা তুলে নেয়, তার পর আর এক হাতে বালতি ও ঝাটা নিয়ে নেমে আসে। সুশীলার প্রস্থান]

[দীপ্তি গালে হাত দিয়ে বসে থাকে। একটু পরেই উৎপলার প্রবেশ]

উৎপলা। দরজা খুলে গালে হাত দিয়ে কি এত ভাবছিস ? তোর হ'ল কি! আমি এসে দাঁড়িয়ে রয়েছি পুরো পাঁচ সেকেণ্ড। তুই টেরও পেলি না! আশ্চর্য্য!

দীপ্তি। (লজ্জিতভাবে) আয় ভাই। বোস, মাদুরে বোস।

(উৎপলা বারান্দায় উঠে গিয়ে মাদুর টেনে বসে)

উৎপলা। তোর মুখটা এত ফ্যাকাশে কেন ?

দীপ্তি। ভারী মুশকিলে পড়েছি, ভাই। না, তুমি ত ভাই নও, তুমি হলে দিদি।

উৎপলা। আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে। কি মুশকিল ?

দীপ্তি। ওই যে ভদ্রলোকের কথা বলেছিলাম তোকে, সেই ভদ্রলোকের আজ তিন দিন জ্বর। জ্বর ছাড়ছে না।

উৎপলা। ও, এই কথা। আমি ভাবলাম কি জানি কি।

দীপ্তি। না ভাই, তুই বুঝতে পারছিস না। ওর বাবা-মা থাকেন মেদিনীপুরে। শরৎবাবু নামকরা উকিল। আমার জেঠামশায় ঐ শরৎবাবুর কাছেই কাজ করেন। সেই সূত্রেই আমাদের সঙ্গে পরিচয়। আমি ওকে—

উৎপলা। দাদার মতন দ্যাখো। তা বেশ। তাতে কি হ'ল ?

দীপ্তি। না, বলছি—কে দেখবে ওকে, কে করাবে চিকিৎসা। আমি ত আর ওর ঘরে যেতে পারি না।

উৎপলা। তা গেলেই বা কি দোষ!

দীপ্তি। না না, ওর ঘরের নীচে, মানে দোতালায় সিঁড়িতে উঠতে যে ঘর সেই ঘরে শৈলেনবাবু আর মানদাসুন্দরী থাকে।

উৎপলা। ওঃ, সেই ক্লিনিকের দালাল আর তার কুটনি।

দীপ্তি। হ্যাঁ। তা ছাড়া, বাবাও নিষেধ করেছেন, মেসের ভিতর আর যাই না অনেকদিন।

উৎপলা। ভাবনার কিছু নেই। তোর বাবা বাসায় ফিরলে বাবাকে দিয়ে একটা টেলিগ্রাম করিয়ে দিস শরৎবাবুকে।

দীপ্তি। কাজ ফেলে হয় ত শরৎবাবু আসবেন। এসে যদি দ্যাখেন জ্বর ছেড়ে গিয়েছে তাঁর ছেলের? ম্যালেরিয়া জ্বর ত, যেমন তেড়ে আসে, আবার পট করে ছেড়েও যায়। টেলিগ্রাম করাটা কি বাড়াবাড়ি হবে না? বাবার উপর হয় ত ওরা দুজনেই চটে যাবেন।

উৎপলা। তবে, তোমার মাথাব্যথার দরকার নেই।

দীপ্তি। কিন্তু, যদি জ্বরটা অন্য কোন জ্বর হয়—যদি কোন বিপদ ঘটে—তা হলে? একা একা জ্বরে হয় ত বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছেন। কি জানি! কতবার আর সুশীলাকে পাঠাব? দুধ-বার্লি পড়েই আছে, খেতে চাচ্ছেন না। নিজের বাড়ীর কেউ থাকলে কি আর বার্লি না খেয়ে পারতেন! পিত্তি পড়লে ত আরও শরীর খারাপ হবে।

উৎপলা। এতই যদি তোমার ভাবনা মনে, তা হলে টেলিগ্রাম করিয়েই না হয় একটু বাড়াবাড়ি কর।

দীপ্তি। টেলিগ্রাম কি করে লিখতে হয়, তাও যে জানি না।

উৎপলা। কলকাতা শহরে টেলিগ্রাম লেখবার অনেক লোক পাবে। আমিই না হয় লিখে দেব।

দীপ্তি। তুই হাসছিস!

উৎপলা। হাসব না কি কাঁদব পোড়ারমুখী তোর কালোমুখ দেখে?

দীপ্তি। তুই জানিস না ত কি কষ্ট পাচ্ছেন উনি, তাই হাসছিস। উঃ, সে কি কাঁপুনি!

উৎপলা। তুই তা হলে গিয়েছিলি দেখতে! তবে যে বললি, তুই আর মেসবাড়ীতে যাস না?

দীপ্তি। না, আমি যাই নি। খোকন আর সুশীলার মুখে শুনেছি।

উৎপলা। ওর আত্মীয়স্বজন কেউ নেই কলকাতায়?

দীপ্তি। তা হলে ত কথাই ছিল না। এক শুনেছি, মনতোষ বাবু বলে কে একজন নাকি বন্ধু আছেন, বোধ হয় দেখেছিও তাঁকে—তিনি থাকেন বালিগঞ্জের দিকে। কিন্তু, তাঁরও ত ঠিকানা আমি জানি না।

উৎপলা। কেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেই ত জানা যায়।

দীপ্তি। জিজ্ঞাসা করবে কে? খোকন ত কথাই বলতে পারে না। সুশীলাকে দিয়ে একটা চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিলাম মনতোষ বাবুর ঠিকানা। তা তিনি নাকি বলেছেন, কিছু দরকার নেই, আজকালের মধ্যেই তিনি ভাল হয়ে যাবেন। ভারী একগুঁয়ে লোক। কারুর সেবাযত্ন নিতে চান না। একবার বলেছিলেন, বেশ গর্ব্বের সঙ্গে, আমার জন্যে কেউ কষ্ট পাবে, তা আমি চাই না।

উৎপলা। কষ্ট কি কেউ পেয়েছিল?

দীপ্তি। না না, তেমন কিছু ব্যাপার নয়। একদিন একটু বেশী রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করেছিলাম। পঁচিশে বৈশাখ আবার ওঁর জন্মদিন। বলেছিলেন ঠাট্টা করে, রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনেই তাঁর জন্ম, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শুধু একজনই হয়েছেন। জ্যোতিষীদের উনি মোটেই বিশ্বাস করেন না। বাবা খেতে বসে ওঁকে বলেছিলেন কিনা, জ্যোতিষীদের দিয়ে গুণিয়ে নিয়ে তারপর পরীক্ষার টাকা জমা দেওয়া উচিত। দিনক্ষণে বাবার অগাধ বিশ্বাস।

উৎপলা। সাবধান, আর বেশী জলে নেমো না।

দীপ্তি। (লজ্জিতভাবে) যাঃ, তুই কি যা তা বলছিস। এ ক্ষেত্রে কোথাও জল নেই। শুধু শুকনো ডাঙ্গা।

উৎপলা। বাঁধ ভাঙলে শুকনো ডাঙ্গাতেও জল আসে।

(দীপ্তি উত্তর দেয় না, অন্যমনস্কভাবে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে)

এক মনে কি দেখছিস আকাশের দিকে তাকিয়ে?
দেবদূত এল বুঝি স্বর্ণরথ হাঁকিয়ে?

দীপ্তি। (মৃদু হাস্যে, উৎপলার দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে) আচ্ছা, তুই চিলের বাসা দেখেছিস কোন দিনও?

উৎপলা। না।

দীপ্তি। আকাশ দিয়ে একটা চিল খুব উঁচুতে উড়ে যাচ্ছিল। কাল বাসায় ফিরছিলাম বিকেলে—

উৎপলা। থামলি কেন?

দীপ্তি। ঐ পার্কের কাছে আর্মড পুলিশ-ব্যারাকের গোল টিনের ছাউনি দেখেছিস—ঐ ছাউনির উপর একটা চিল উড়ে এসে বসেছিল। আমি যতক্ষণ চিলটার দিকে তাকিয়ে থাকলাম—কি আশ্চর্য্য, চিলও আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। আজ পর্য্যন্ত একটা চিলের বাসাও আমার চোখে পড়ে নি। শুনেছি বেলগাছে বাসা বাঁধে।

উৎপলা। চিলের বাসা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভে আমার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই। ঐ চিল-জাতটা ভয়ঙ্কর স্বার্থপর, অসামাজিক ও হিংস্র। একবার রাণাঘাট ষ্টেশনে খাবারের ঠোঙ্গা হাতে রেল-গাড়ীতে চড়তে যাব, এমন সময়ে হঠাৎ কোথা থেকে ছোঁ মেরে আমার হাতের ঠোঙ্গাটা নিয়ে পালিয়ে গেল। আমি বোকার মত তাকিয়ে রইলাম। ভদ্রলোকেরা না থাকলে কেঁদেই ফেলতাম। কারও কারও শরীরে আবার নখের আঁচড়ের জ্বালাও থেকে যায়, শুনতে পাই।

দীপ্তি। তা হলে কোন্ পাখীটা তোমার মতে বুদ্ধিমান অথচ সামাজিক ও অহিংস। কোকিল বুঝি?

উৎপলা। দূর, কোকিল একেবারেই বোকা। কেবল কুহু-কুহু করে অপরের তৃপ্তির জন্যে গান গেয়ে যায়। সোনার পিঞ্জরে কেই-বা কোকিলকে আদর করে ঘরে রেখে পোষে?

দীপ্তি। তবে যে লোকে বলে, কোকিলরা কাকের বাসায় ডিম পাড়ে। বোকা হ'লে কি তাই করে?

উৎপলা। বোকা নয় ত কি! মদ্দাটা ফেলে পালাল, বাসাও বাঁধল না, উড়ে গেল কোন দ্বীপান্তরে নব বসন্তের সাড়া পেয়ে।

দীপ্তি। বলিস কি, মদ্দা কোকিল তাই যায় নাকি?

উৎপলা। হ্যাঁরে, পোড়ারমুখী ঐ কোকিল কালমুখ আরও কাল করে শেষ পর্য্যন্ত কাকের বাসায় নিজের সন্তানকে পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়ে আসে। দিতে বাধ্য হয়, কারণ তখন আর অন্য কোন উপায় নেই। মদ্দা কোকিল বাসা বাঁধব-বাঁধব করে, কিন্তু বাঁধে না কোন দিন।

দীপ্তি। আমি কিন্তু কোকিল দেখেছি। সবটা তার কাল, কেবল চোখ আর ঠোঁট কাল নয়। কোকিলকে পোড়ারমুখী বলা কি ঠিক হ'ল?

(বাইরে কড়ানাড়ার শব্দ)

উৎপলা। তোর বাবা বোধ হয় এলেন। আজকে তবে চলি। তুই যাস আমাদের বাড়ীতে। এ বাড়ীতে আর বেশী দিন নেই আমরা।

দীপ্তি। (বারান্দা থেকে নেমে আসে, সদর দরজার খিল খোলে, ফিরে এক হাত খিলে রেখে) কোথায় যাবি তোরা?

উৎপলা। টালিগঞ্জ।

(দীপ্তি এইবার দরজার পাল্লা দুটো টেনে খোলে)

দীপ্তি। কই, বাবা ত আসেন নি। পাশের বাড়ীর দরজায় কড়া নাড়ছে।

উৎপলা। চলি ভাই, তুই যাস কিন্তু।

[উৎপলার প্রস্থান।

(দীপ্তি বারান্দায় গালে হাত দিয়ে বসে। বিন্দুবাসিনীর প্রবেশ)

বিন্দুবাসিনী। সদর দরজা খুলিয়া রাখছিস ক্যান? গালে হাত দিয়া চিন্তা করিস কারে?

দীপ্তি। (গাল থেকে হাত সরিয়ে) সুশীলা ঝাঁটা নিয়ে গ্যাছে, এখনি ফিরে আসবে। তাই সদর দরজা খোলা রাখছি। চিন্তা করছি তোমারে। বয়স হ'ল ষাট, কিন্তু বুড়া ত দেখায় না, তাই চিন্তা করছি। দাঁত পড়েছে এই যা, কিন্তু চুল পাকে নাই তেমন, চক্ষুও ঠিক আছে।

বিন্দুবাসিনী। অত দাঁতের গরব করতে হইবে না। তর বয়সে আমার দাঁতের পাটি যা শোভা নি ছিল তা যদি দ্যাখতা—পান খাইয়া যখন ঠোঁট দুইটা লাল করিয়া হাসতাম, তখন তর বাবার বাবায় কইত কি—

দীপ্তি। কি কইতেন তিনি?

বিন্দুবাসিনী। সংস্কৃত শ্লোক দিয়া কইতেন, মনে নাই কথা-গুলা—তবে অর্থ হইল আমার দাঁতগুলা যেন কামোটের দাঁত হইতেও সুঁচাল—উনি ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতেন। অমন রসিক আর দেখি নাই।

দীপ্তি। তোমারে ঠাট্টা করছেন, তুমি বোঝতে পার নাই।

বিন্দুবাসিনী। বোঝতে পারিস নাই তুই। রাত্রকালে যখন—

(হাঁফাতে হাঁফাতে সুশীলার প্রবেশ)

কি হইল সুশীলা হাঁফাও ক্যান?

দীপ্তি। কি হয়েছে সুশীলা? তোমার দাদাবাবু কেমন আছেন?

সুশীলা। (বিচলিত স্বরে) দিদিমণি গো, দাদাবাবু অজ্ঞান, মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছেন মেজেয়। সারা ঘরে বমি, শুধু পিত্তি।

(দীপ্তি তড়াক করে লাফ দিয়ে ওঠে। এক মুহূর্ত্তের জন্যে সুশীলার দিকে তাকায়। মরার মতন নিষ্প্রভ মনে হয় দীপ্তির মুখ)

সুশীলা। তা হলে আমার আন্দাজই ঠিক।

দীপ্তি। তার মানে?

সুশীলা। না, বলছিলাম, দাদাবাবুর ম্যালোয়ারী হয়েছে, তবু গোড়া থেকে ডাক্তার দেখানোই উচিত ছিল।

দীপ্তি। আচ্ছা, ও আলোচনা এখন থাক্। তুমি যাও ত সুশীলা, ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে এস।

সুশীলা। কোন ডাক্তার?

দীপ্তি। মোড়ের ওষুধখানার ডাক্তার। ওই যে নীরেন ডাক্তার, মোটা মত, টাকমাথা। এই সময়ে থাকেন তিনি। দাঁড়াও! না, যাও! ভিজিটের টাকা পরে দিলেই চলবে।

(সুশীলার প্রস্থান)

(দীপ্তি মাদুর, শ্লেট, পেনসিল, বই যেমন তেমনি রেখে নেমে আসে বারান্দা থেকে। খোকনকে ইঙ্গিতে ডাকে)

দীপ্তি। খোকন, আয় ত আমার সাথে।

(খোকন ও দীপ্তি সবেগে বেরিয়ে যায়। মেসের দিকে)

বিন্দুবাসিনী। (চীৎকার করেন) অ দিদুভাই, অ দীপ্তি, অ দাদু, অ খোকন! যাইস কোন দিশা?

(নেপথ্য থেকে দীপ্তির পাগলী মা সুরমা হাততালি দেয়)

নেপথ্যে। যাউক, যাউক—মরতে চান—মরতে চান। কান্দতে চায়, কান্দুক না ক্যান্। বাধা দিয়া লাভ নাই। খুন করবে যখন—করউক খুন, আর ভয় নাই। বাধা দিবেন না। কাইটা ফালাক্—রামদাও দিয়া গলাটা একেবারে কাইট্টা ফালাক! —ও বামনদিদি! বামনদিদি!! পোড়াইয়া ছাড়খার করল যে —ও মা, ও বাবাঃ···(বিনিয়ে বিনিয়ে কান্দতে শুরু করে সুরমা)

পঞ্চম দৃশ্য

[দীপ্তিদের বারান্দা। সত্যজিৎ ও দীপ্তি। শোভন, বিন্দুবাসিনী একটু দূরে। সত্যজিৎ একটা মোড়ায় বসে। দীপ্তি আঁচল নিয়ে আঙুলে জড়াতে জড়াতে সত্যজিতের মুখের দিকে তাকায় ও চোখ ফেরায়। বিন্দুবাসিনী মহাভারত পাঠ করেন মনে মনে, নাকে চশমা। শোভন ঝুঁকে মহাভারতের ছবি দেখে]

দীপ্তি। এখন আর মাথা ঘোরায় না আপনার?

সত্যজিৎ। না।

দীপ্তি। ক্লাশে যাচ্ছেন ত?

সত্যজিৎ। যাচ্ছি, কাল থেকে যাচ্ছি।

দীপ্তি। যা ভয় পেয়েছিলাম আমরা!

সত্যজিৎ। তোমাদের কাছে, বিশেষ করে তোমার কাছে আমি ঋণী, মানে কৃতজ্ঞ। বল, কি প্রতিদান চাও দীপ্তি!

[লজ্জায় কালো মেয়ের কালো গালেও লাল আভা দেখা দেয়—আলোক দ্বারা দেখাতে হবে]

না না, কিই বা এমন করেছি। সুরেনবাবু সব কিছু করেছেন। তাঁর কাছেই আপনার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। তিনি না এলে, আপনাকে ত ওঠাতেই পারতাম না। আমি আর খোকন—দুজনে কি পারি—

(আর বলতে পারে না দীপ্তি, মুখ টিপে হাসে। সত্যজিৎও হাসে)

সত্যজিৎ। কি করে তুলবে তোমরা? তোমাদের গায়ে কি জোর আছে—পাঞ্জাবী মেয়ে হলে ঠিক তুলতে পারত।

দীপ্তি। ইশ!

সত্যজিৎ। আমি অবশ্য পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি আর ওজনে পাকা দু'মণ। তোমার ঐ রোগা হাত দুটো আর খোকনের কচি আঙুলের জোরে আমাকে মেঝে থেকে চৌকিতে ওঠান সম্ভব নয়। তোমরা আজ থেকে আধ ছটাক করে ঘি খাবে, বুঝলে?

দীপ্তি। (বিস্ময়ের সুরে) ঘি খাব? পয়সা কৈ?

সত্যজিৎ। আমারও শরীরটা সারা দরকার। আর তোমাদের দেহেও বলসঞ্চারের প্রয়োজন, কারণ—কারণ—কি জানি যদি আবার ম্যালেরিয়া তেড়ে আসে। টেরাইএর ম্যালেরিয়া ঠিক ভল্লুকের মতন, সহজে ছাড়ে না। আজই বিকেলে দশ পাউণ্ড অষ্ট্রেলিয়ান 'বাটার' কিনে আনব। তুমি জ্বালিয়ে নিও। খাঁটি গাওয়া ঘি হবে, ভেজালের ভয় নেই।

দীপ্তি। (মৃদু হাস্যে) তা ঘি খেতে চান, আপনি খাবেন। আমরা গরীব মানুষ, আমাদের ঘি খাওয়ার প্রয়োজন নেই। ম্যালেরিয়া যাতে না ধরে, তার ব্যবস্থা আমি করে দেব।

সত্যজিৎ। কি করে?

দীপ্তি। বাঃ, খোকনের ম্যালেরিয়াও ত আমি সারিয়েছি। তিন মাস কুইনাইন অমাবস্যা-পূর্ণিমায়, তার পর টনিক খাইয়ে। কিছুদিন ধরে খেয়ে যেতে হবে, আর মশারি টাঙিয়ে শোবেন। তা হলে আর ভয় নেই।

সত্যজিৎ। তার মানে, আমি আর মেঝেয় পড়ে থাকব না, আমাকেও তোমাদের টেনে হিঁচড়ে খাটে তুলতে হবে, না!

দীপ্তি। ধরুন তাই।

সত্যজিৎ। তার অর্থ, তুমি আর খোকন আমার টাকায় কেনা ঘি খাবে না—এই ত?

দীপ্তি। না না, তা নয়, তা নয়।

সত্যজিৎ। তবে?

দীপ্তি। আচ্ছা, আচ্ছা, খাব। আপনি কিনে আনুন টিন, আমি জ্বাল দিয়ে দেখি কতটা ঘি বের হয়, তার পর চিন্তা করা যাবে।

সত্যজিৎ। দ্যাটস লাইক্ এ গুড গার্ল। তার পর বল, আর কি চাই তোমার?

দীপ্তি। আমার! আমার আর কিই বা চাওয়ার আছে?

সত্যজিৎ। কিছু নেই?

[দীপ্তি 'না' বলতে গিয়ে বলতে পারে না। বিন্দুবাসিনী এতক্ষণ বারান্দার কোণে বসে মহাভারতের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন, কিন্তু কাণ ছিল দীপ্তি ও সত্যজিতের মধ্যে কথাবার্তার দিকে। কথাবার্তার মাঝে ভ্রূ কুঁচকিয়ে কি যেন বলতে গিয়ে বারবার থেমে গিয়েছেন। এইবার মুখ খোলেন]

বিন্দুবাসিনী। অ' দিদুভাই, তর্ হইয়া আমারে কথা কইতে দে। কি কইতেছো আমাগো দীপ্তিরে, কও, আমারে কও। তোমার নাম কিন্তু সত্যজিৎ—ভোলবা না কথাটা।

[সত্যজিৎ বিন্দুবাসিনীর দিকে স্মিতমুখে চেয়ে থাকে]

তোমার আজামশায় রামজীবন ন্যায়রত্ন হলেন আমার শ্বশুরের, অর্থাৎ আমাগো দীপ্তির ঠাকুর্দার বাবা, বোঝ্ঝ নি—

[সত্যজিৎ ঘাড় নাড়ে]

তানার টোলের ছাত্র। আমিই না পরিবেষণ করিয়া খাওয়াছি তাঁরে পুরা তিন বৎসর! কিন্তু, তুমি তোমার আজামশায়ের পায়ের যুগ্যাও নও। জোয়ান মদ্দ চেহারা হইলে কি হয়। এক মুঠা ভাত যদি দীপ্তি বেশী দিয়া ফেলে, তুমি অমনি হাত উঠাও।

সত্যজিৎ। বেশী ভাত খাওয়া কি ভাল? ভাত বেশী খেলে ঘুম আসে।

বিন্দুবাসিনী। ঘুম আইলে ঘুমাইয়া পড়বা। ইতে দোষ নাই।

সত্যজিৎ। কিন্তু, ক্লাশে ত খাট থাকে না। ঘুমোব কোথায়?

বিন্দুবাসিনী। কেলাশ—কেলাশ! কেলাশে না যাইলেই হইল।

সত্যজিৎ। লেকচার শুনতে পাব না যে।

বিন্দুবাসিনী। লেকচার শুনিয়া কি কাম? আমার শ্বশুর কইতেন টোলের ছাত্তরদের—খাইবা, দাইবা, ঘুমাইবা। বিদ্যান

হইয়া লাভ নাই যদি না শরীলে বল থাকে। দিনমানে নিদ্রাটা অবশ্য ভাল নয় কইতেন শুনছি। তাও আবার কইতেন, গ্রীষ্মকালে দিনমানে নিদ্রা যাইলে শরীলে মাংস হয়। তোমরা যে আজকালকার ছাত্তরেরা শুনছি প্যাটরোগা, তার কারণ হইল খাইবার পরই লেকচার শোন্‌তে তোমাগো ছুটিয়া যাইতে হয়। হয় টেরামে, নয় বাসে। দাঁড়াইবার স্থানও নাই। কিন্তু, তোমার আজা যখন ছাত্তর ছিলেন—

সত্যজিৎ। সে কাল ত আর ফিরে আসবে না।

বিন্দুবাসিনী। তা সত্ত্য। তোমার আজার চেহারা নি দ্যাখছ। পুরা চার হাত উঁচা, আর প্যাটটা যতখানিক, তার চাইয়াও বুকের ছাতিটা বড়। এক সের চাউলের ভাত আর জোড়া ইলিশ নি খাইয়া ফ্যালছেন। তার পর আছিল মিঠাই, যাই দেওয়া যাউক না ক্যান, বলতেন না কইদিনও, প্যাট ভরিয়া গেছে—আর দেওনের আবশ্যকতা নাই।

দীপ্তি। (বিব্রতভাবে) আঃ দিদুভাই, তুমি কি যে কও!

[সত্যজিতের সামনে বাঙ্গাল টানে কথা বলে যেন একটু লজ্জিত মনে হয় তাকে]

আপনি কিছু মনে করবেন না। ঠাকুরমার কথাবার্তার ধরণই ঐ রকম।

বিন্দুবাসিনী। আমার পোরা কপাল! আমি জানি না কথা কইতে। আর ষোল বছরিয়া ছেমড়ী হইয়া—

দীপ্তি। (বাধা দিয়ে) ষোল বছর নয়, আমার বয়েস এখন উনিশ পার হয়ে কুড়ি।

বিন্দুবাসিনী। অই হইল। ষোলও যা, উনিশও তা, কুড়িও তাই। বুড়ী ত হইস নাই অখনও। তুই কস তুই জানিস জিহ্বা লাড়তে! কই, কইতে ত পার নাই, সত্ত্য ছাড়া মিথ্যা কয় না আমাগো সত্তজিৎ—তবে কইল সে—কি চাও। আর তুই কইয়া বইলি, কি আর চাওন যায়! ক্যান্, বংসর হুদ্দা আমার কাণের কাছ ফ্যাচফ্যচ কর নাই—বই কিনতে পারতাম, দেখাইয়া দিবার লোক থাকত, মেটরিক পাশ আমারে আটকাইত কোন গ্রহে?

তা, সত্তজিতের লগে কইতে পারলা না, আমারে বিকাল-বেলায় আইয়া প্রত্যেক দিন ঘণ্টাখানেক যাবত কাল বসিয়া শিখাইয়া যান। বই না হয় বাধুই কিনিয়া দিত।

[দীপ্তির কান দিয়ে আগুন ছোটে। কানের ওপর আলোর ফোকাস। সত্যজিৎ উঠে দাঁড়ায়। নেমে আসে মঞ্চের উপর বারান্দা থেকে। যাবার বেলায় বলে]

সত্যজিৎ। দীপ্তি, কাল থেকে আমি তোমাকে পড়াব। বিকেলে সাড়ে চারটে থেকে সাড়ে পাঁচটা। টাইমলি রেডী থেক। এক মিনিট কিন্তু দেরী করতে পারব না। [প্রস্থান]

(দীপ্তি খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। সত্যজিতের দিকে একবারমাত্র চোখ তুলেছিল। তার পর চোখ নীচু করে কি যেন ভাবে।)

ষষ্ঠ দৃশ্য

ব্যারিষ্টার পরিমল চ্যাটার্জ্জীর লাইব্রেরী-ঘর।

[সুসজ্জিত কক্ষ। ঐশ্বর্য্যের আবেষ্টন। মিনতি, মিনতির বাবা মিঃ (পরিমল) চ্যাটার্জ্জী, মা মিসেস (ছায়া) চ্যাটার্জ্জী। মিসেস চ্যাটার্জ্জী অনতিক্রান্তযৌবনা, ঢলঢলে লাবণ্যভরা মুখ। মিঃ চ্যাটার্জ্জীর মুখে পাইপ, দেখতে সুস্থদেহ প্রৌঢ়, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। মিনতিকে দেখলে মনে হয় বুদ্ধিমতী। কুড়ি-একুশ বৎসরের যুবতী, শোভনাঙ্গী ও গৌরী। নেপথ্যে কিছুক্ষণের জন্য পিয়ানোর আওয়াজ শোনা যায়, বাজনা বন্ধ হবার একটু পরেই পর্দা ঠেলে সকলের প্রবেশ। আসন গ্রহণ করবার পর]

সত্যজিৎ। কেমন লাগল, এটা রবীন্দ্রনাথের মাথা 'নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে'—কবিতাটির সুর। সুরযোজনা অবশ্য আমার। আজকাল পড়াশুনার মধ্যে সঙ্গীতচর্চ্চা করতে পারি না। (হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে—নমস্কার জানিয়ে) আচ্ছা, আজকে তা হলে উঠি।

মিসেস চ্যাটার্জ্জী। এখনই যাবে?

সত্যজিৎ। প্রায় দু'ঘণ্টা কাটিয়ে গেলাম, এখনও বলছেন, এখনি—। বাবার যেমন কথা, তিনি আপনাদের জানিয়েছেন আমি গান জানি। সেই জন্যে আপনারা ডাকবেন, তা কিন্তু আমি ভাবতে পারি নি।

মিসেস চ্যাটার্জ্জী। ভাবতে পারলে কি আসতে না?

সত্যজিৎ। (স্মিতমুখে) না, অনেক দিন চর্চ্চা নেই কিনা, তাই কোথাও গাই না, বাজনাও বন্ধ করে দিয়েছি।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। অন্যায় করেছ।

সত্যজিৎ। আপনাদের কি ভাল লেগেছে?

মিসেস চ্যাটার্জ্জী। কি বলিস মিনতি, ভাল লেগেছে বললে কম বলা হবে, খুব ভাল লেগেছে। তোমার উচিত, গ্রামোফোন কোম্পানীতে রেকর্ড করানো। রেডিওতেও ত গাইতে পার। রাতারাতি নাম কিনতে পারবে আমার ধারণা।

সত্যজিৎ। তা হলে পড়াশুনা ছেড়ে দিতে হয়। সঙ্গীত ও বিদ্যাচর্চ্চা একসঙ্গে যে চালিয়ে যেতে পারে তাকে আমি মহাপুরুষ বলি।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। মহাপুরুষদের খবর জানি না। তবে আমাদের মিনতি দুটোরই চর্চ্চা সমানভাবে চালিয়ে এসেছে এতদিন। লেখা-পড়ার রেজাল্টও ত খারাপ হয় নি।

সত্যজিৎ। ওঁকে তা হলে 'মহামানবী' আখ্যা দিতে হবে। মিনতিকে বললাম গাইতে—তা মিনতি আমার অনুরোধ রাখল না। আমার উপর চটে আছে ভীষণ। ক্ষীরোদটা কি যেন লাগিয়েছে। আচ্ছা, আজকে উঠি, আর একদিন আসব, নাছোড়-বান্দা হয়ে মিনতির গান আদায় করব। নমস্কার, চলি।

[সত্যজিতের প্রস্থান।

মিসেস চ্যাটার্জ্জী। তুই কেন গান গাইলি না মিনতি? সত্যজিৎ ত তোকে অনুরোধ করেছিল।

মিনতি। তোমরা ওকে জান না। ও ভয়ঙ্কর গর্ব্বিত। একবার অনুরোধ করেছিল বটে, আর একবারও সে অনুরোধের পুনরাবৃত্তি করে নি।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। ঠিক ত, পুরুষরা যেখানে সিভালরাস নয়, লেডীজদের সেখানে অভিমান করবার যথেষ্ট কারণ থাকতে পারে। আমি মিনতিকে সমর্থন করি।

মিনতি। অভিমান! অভিমান করব ওর ওপর! বাবা, তুমি জান না ওকে। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। মানুষ নয়।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। (ভয়ের ভাণ করে) তবে কি ও ডেভিল?

মিসেস চ্যাটার্জ্জী। (স্মিতমুখে) আমি ত জানতাম শরৎবাবু মানবীকেই বিয়ে করেছিলেন। মানে, তুমি বলতে চাচ্ছ, সত্যজিৎ মানুষ নয়, এঞ্জেল?

[মিনতির মুখ পাংশুবর্ণ। সে হঠাৎ উঠে পড়ে]

মিনতি। না, না, না। আমি কিছুই বলতে চাই না। তোমরা থাক তবে তোমাদের ইলিউশন নিয়ে। আমি চললাম।

[মিনতির চোখে উদ্গত অশ্রু। মিনতি ঘর ছেড়ে উঠে যায়]

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। (জিজ্ঞাসুভাবে মিসেসের দিকে তাকিয়ে) কি ব্যাপার? কি অনুমান করছ?

মিসেস চ্যাটার্জ্জী। (হেসে) তাও কি আমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে। কেন, মনে পড়ে না, তুমি যখন একদিন—মানে—অবশ্য তুমি বেহালা বা পিয়ানো বাজাও নি—বাজাতে জানও না—গানও গাও নি—গাইতেও পার না—এখন পর্য্যন্ত তোমাকে হারমোনিয়ামের একটা রীডও টিপতে আমি দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। তা নয় দেখ নি। আমিও আর এই বয়সে তোমার মনের নিগূঢ় ক্ষোভকে বি-ক্ষোভ অর্থাৎ বিতাড়িত করবার হাস্যকর প্রচেষ্টা করব না। সেটা তুমি ভালভাবেই জান। কিন্তু হ্যাঁ, তুমি যেন আরও কিছু বলছিলে। আমার ত কিছুই মনে নেই। তুমি কি কোন দিন রাগ করে উঠে গিয়েছিলে হঠাৎ? মানে, বাবা-মার সামনে থেকে, আমার প্রশংসা শুনে?

মিসেস চ্যাটার্জ্জী। (ঠোঁট বেঁকিয়ে) আমি কি আর পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাশে পড়েছি? আমি ছিলাম বনেদী ঘরের মেয়ে। তোমাদের মত তিন-পুরুষের বড়লোকের ঘরে জন্মাই নি। বেথুন কলেজের দরজায় গাড়ী থেকে নামবার সময় ছাড়া কোন পুরুষই আমাদের দেখতে পেত না। চলে গিয়েছিলাম বাপের বাড়ী।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। বাই জোভ, এইবার মনে পড়েছে। কিন্তু ছায়া, তোমার সঙ্গে যে তখন আমার গাঁটছড়া পড়ে গিয়েছে। তোমার রাগ করবার আইনত অধিকার জন্মেছিল তখন। আর তোমার মেয়ের যে এখনও লীগ্যাল রাইট, আই মিন—এখনও সেটা এষ্টাব্লিশড হয় নি।

মিসেস চ্যাটার্জ্জী। ও, একই কথা।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। একই কথা! এখনও শত 'যদি'—তারপর সপ্তপদী—সবই বাকী, এর আগেই যদি তোমার মেয়ে রাগ করতে শুরু করে, তা হলে—না না, ব্যাপার খুব সিম্পল নয় মনে হচ্ছে। এর মধ্যে কোন থার্ড ফ্যাক্টর আছে। ছেলেটিকে অনুরোধ করলাম—কিছুতেই রাখল না অনুরোধ। বোর্ডিং নয়, থাকে কোথায় এক বস্তীর পাশে কোন এক মান্ধাতা-যুগের প্রায় পোড়ো-বাড়ীর একটা ঘর নিয়ে। কিছুতেই রাজী হ'ল না আমাদের এখানে এসে উঠতে। বললে, এত প্রাচুর্য্যের মধ্যে সাহিত্যের 'স'-ও তার মাথায় ঢুকবে না। তুমি ত সবই শুনেছ। না, তুমি বুঝি তখন ভিতরে গিয়েছিলে?

মিসেস চ্যাটার্জ্জী। হ্যাঁ, আমি তখন ভিতরে।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। বললাম, আমার ফার্ণ রোডে ছোট একটা দোতালা বাড়ী আছে। উপরতালার ফ্ল্যাটটা সামনের মাসেই খালি হবে। তুমি সেখানে এসেই ওঠ না কেন। তোমার বাবা আমার বাল্যবন্ধু. ইনফ্যাণ্ট ক্লাশ থেকে একসঙ্গে এক স্কুলে, এক কলেজে পড়েছি। তা, ও কি বলল জান—ফার্ণ রোডের ফ্ল্যাটটার ভাড়া কত? বেশী ভাড়া দিয়ে থাকবার মতন হাতে আমার টাকা নেই।

মিসেস চ্যাটার্জ্জী। ও কি কিছুই জানে না?

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। মিনতি কি কিছু জানে?

মিসেস চ্যাটার্জ্জী। মিনতিকে আজ সকালে আমি বলেছি। শরৎবাবুর চিঠি পাবার পর থেকেই ভাবছিলাম, বলি। কিন্তু, সাহস হচ্ছিল না। যা মেয়ের ধরন-ধারণ। আর বলিহারি তোমাদের।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। তার মানে?

মিসেস চ্যাটার্জ্জী। তার মানে, মেয়েকে ধিঙ্গী না বানিয়ে তোমাদের কালচারের চাষ হয় না। কেন, আমার ত তের বৎসরেই বিয়ে হয়েছিল, তার পরেও আমি স্কুল-কলেজে পড়েছি। তুমি যতদিন বিলাতে ছিলে, রীতিমত নিষ্ঠার সঙ্গে পড়ায় মন ছিল আমার।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। ওগো নিষ্ঠাবতী! এখন যে আইনেতেই আটকাবে। এখনকার দিনে যদি আমি তোমাকে ঐ বয়সে বিয়ে করতাম, তা হলে আমাকে ধরে নিয়ে যেত পুলিশে।

মিসেস চ্যাটার্জ্জী। যাও, তোমার সব কথাতেই ঠাট্টা। এখন আর দেরী কোরো না। বয়সে সমান প্রায়, এই যা দোষ—তা, অমন ছেলে পাওয়াও সহজ নয়। ব্যাটাছেলে—ওর ত একটু তেজ থাকবেই। গরীবের ছেলে ত আর নয়। যেখানে খুশী থাকুক, তুমি আর দেরী কোরো না। শরৎবাবুকে লিখে—বরং যাও, একবার মেদিনীপুর, হাজার হোক ছেলের বাপ ত।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। আচ্ছা আচ্ছা, সে যা করবার, করব আমি। তুমি ব্যস্ত হয়ো না।

মিসেস চ্যাটার্জ্জী। (স্মিতমুখে) ভারী সুন্দর মানাবে কিন্তু

খুঁজনে। দেখেছ ছেলেটার নাক-চোখ-মুখ। ঠিক যেন রাজার মতন চেহারা। আর তেমনি লম্বা, এ্যাথলেটিক ফিগার। পুরুষদের এই রকমই হওয়া উচিত।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। এ্যাঃ! সব পুরুষকেই রাজার মতন হতে হবে! না বাপু, রাজাদের চেহারা ভাল নয়। সব মহারাজারই পেট মোটা। লম্বা রাজা বড় একটা চোখে পড়ে নি।

মিসেস চ্যাটার্জ্জী। যাও, সব কথায় তোমার ফোড়ন কাটা চাই। আচ্ছা, ও রাজী হয়েছে, I. A. S. দেবে? কি বলল?

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। দেবে, দেবে। যা মন্তর দিয়েছি কানে, তাতে আর ওপথ না মাড়িয়ে চলবার উপায় নেই। ছেলেটির একটা গুণ দেখলাম। ও হচ্ছে সিরিয়াস টাইপের মানুষ। ওর নাম সত্যজিৎ। খুব এপ্রোপ্রিয়েট নাম দিয়েছে শরৎ।

মিসেস চ্যাটার্জ্জী। তুমি কি বললে ওকে, প্রথমে?

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। বললাম, I. A. S. পরীক্ষা দেবে না কেন? এখন ত আর বিদেশী সরকার নয়। আমাদেরই সরকার।

মিসেস চ্যাটার্জ্জী। ও কি বললে তোমার কথা শুনে?

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। বললে, তা আমার মন যে চায় সাহিত্য নিয়ে দিন কাটাই। আমি বললাম, কেন ঐ যে আমাদের গৌরীপদ পাঠক I. C. S. আছেন, উনি ত সাহিত্যের চর্চ্চাই করে এলেন সারা জীবন। সরকারী চাকরী করবে, তার সঙ্গে ত সাহিত্যের কোন বিরোধ নেই।

ও অবশ্য বলল, পাঠক চাকরী ছেড়ে দিয়েছেন। আমি বললাম, প্রিমেচিওর রিটায়ারমেণ্ট, তা তুমি না হয় তাই কর। আর ইংরেজীতে এম-এ দিতে চাও, পড়ে-শুনে অবসর মতন দিও। তা ছাড়া, ইংরেজীর এম-এ না হলেই যে সাহিত্যিক হওয়া যাবে না, এমন ত কোন কথা নেই। পরীক্ষকরা কি আর অরিজিন্তালিটি বিচার করেন? ট্রাডিশন্তাল মতের বিরুদ্ধে লিখেছ কি অমনি সেকেণ্ড ক্লাশ।

মিসেস চ্যাটার্জ্জী। তুমি এমন কথা গুছিয়ে বলতে পার!

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। বলব না, এই ত আমার পেশা। শরতের ছেলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে বুঝলাম, ও একজন যোদ্ধা। মনোজগতের যোদ্ধা।—ও যুদ্ধ করতে করতে চলেছে জীবনপথে এগিয়ে। ট্রুথের উপর ভিক্‌ট্রি চায়। And, what is the truth? এই হ'ল ওর মূলমন্ত্র। অন্ততঃ, আমার কাছে এই মনে হয়েছে। ছেলেমানুষ, ছেলেমানুষ। এখনও আসল বস্তু কি জানে না। কোন অভিজ্ঞতাই নেই, জানবে কি করে? একবার ভেবেছিলাম, বলি—My dear boy, here's the truth:

…Sleep and dream, dream and sleep—
We'll never wake,
The coming Morn abashed shall go
And tell the world how poesy lives.

কিন্তু বলতে পারলাম না। হাজার হোক দু'দিন বাদে যে সম্পর্কটা দাঁড়াবে—সে সম্পর্কে ত আর আমি এই কবিতা আওড়াতে পারি না। এই কবিতাটা কার লেখা বলত?

মিসেস চ্যাটার্জ্জী। শেলী, কীটস বা ব্রাউনিং কারুর হবে।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। হ'ল না, হ'ল না।

মিসেস চ্যাটার্জ্জী। তবে কার লেখা ওটা?

মিঃ চ্যাটার্জ্জী। কাছে এস, কানে কানে নাম বলব। চেঁচিয়ে বলবার মত খ্যাতি নেই কবির।

মিসেস চ্যাটার্জ্জী। যাও, ও সব বাজে কথা রাখ। যা বলছিলাম—হ্যাঁ, আর দেরী করা ঠিক হবে না—তুমি কালকেই যাও মেদিনীপুর—শরৎবাবুর সঙ্গে—একেবারে পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে এস। সামনের মাসেই যাতে বিয়েটা হয়ে যায়।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[প্রায় এক বছর পরে। দীপ্তি বারান্দায় দেওয়ালে ঝুলানো ক্যালেণ্ডার বদলায়, তার পর দাঁড়িয়ে থাকে খুঁটি ধরে অন্যমনস্কভাবে সামনের দিকে তাকিয়ে। আকাশে একটি মাত্র তারা। দীপ্তির পাশে উৎপলা বারান্দায় উঠতে এক ধাপ সিঁড়িতে পা ঝুলিয়ে বসে।]

উৎপলা। দেখেছিস আকাশে একটিমাত্র তারা। তোদের বাসাটা বস্তীবাড়ী হলে কি হবে, এখানে পরিষ্কার আকাশ দেখা যায়।

দীপ্তি। আচ্ছা উৎপলা, তুই ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'লুসী' কবিতাটি পড়েছিস?

উৎপলা। আমার যদি অত ইংরেজী বিদ্যে থাকত, তা হলে কি সেলাই-স্কুলের মাষ্টারনী হয়ে দিন কাটাতাম? ইংরেজীতে টায়ে টায়ে পাশ করেছি ম্যাট্রিকে। শুনেছি ইংরেজী ভাষারও কোন মা-বাপ নেই। বিদ্যাসাগর মহাশয় নাকি তাই বলতেন।

দীপ্তি। কেন?

উৎপলা। তাঁকে যখন ইংরেজী শেখানো হচ্ছিল, তিনি প্রশ্ন করেছিলেন পি, ইউ, টি পুট, কিন্তু—বি, ইউ, টি বাট কেন? সদুত্তর পান নি বলেই চটে গিয়ে ঐ কথা বলেছিলেন। বোধ হয় সঙ্গত কারণেই চটতেন, তাই বিদ্যাসাগরী চটিজুতো এখনও তার খ্যাতি হারায় নি।

দীপ্তি। তোর যত সব উদ্ভট কল্পনা! শোন্, লুসী কবিতাটা তোকে পড়ে শোনাই। সত্যজিৎবাবু আমাকে কবিতাটা বুঝিয়ে দিয়েছেন।

(দীপ্তি ঘরের ভিতর যায়, একটা বই হাতে বেরিয়ে আসে)

উৎপলা। ও বইটা কার?

দীপ্তি। আমার। সত্যজিৎবাবু আমাকে উপহার দিয়েছেন।

উৎপলা। অসুখের সময় দুধ-বার্লি খাইয়েছিলি বলে?

দীপ্তি। তা কি জানি। শোন্।

উৎপলা। তোর পরীক্ষার ফল বের হবে কবে?

দীপ্তি। সামনে সোমবার বোধ হয়। শোন্—

উৎপলা। কিছু জানতে পেরেছিস ?

দীপ্তি। নাঃ, তোর মোটেই কবিতার ওপর টান নেই। কেবল—

উৎপলা। না না, কবিতা ভালবাসি না, বললে মিথ্যে কথা বলা হবে। তবে কবিতার সত্য থেকে অকাব্যিক জীবন-সত্যের প্রতি আমার ঝোঁক বেশী। অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই বিশ্বাসও বেশী। আচ্ছা পড় দেখি। তোর আর তোর সত্যজিৎবাবুর দৌলতে যদি একটু-আধটু কবিতা শিখতে পারি। কি বললি সুসী কবিতা—ওয়ার্ডসওয়ার্থ লিখেছেন ?

দীপ্তি। 'সুসী' না 'লুসী'।

উৎপলা। নামটা মোটেই ভাল নয়। নরম লুচির কথা মনে হয়ে গেল।

দীপ্তি। নাঃ, তোকে নিয়ে আর পারা গেল না। দুঃখিনীকে নিয়ে আর হাসাহাসি করিস না। তুই নিজেই ত একজন 'লুসী'। শোন্, মন দিয়ে শোন। কবিতাটা আমার ভারী ভাল লেগেছে।

উৎপলা। পড়।

দীপ্তি (পড়ে)—

A maid whom there were none to praise,
And very few to love,
A violet by a mossy stone
Half hidden from the eye !
—Fair as a star, when only one
Is shining in the sky.

আশঙ্কা ও আশ্বাস, নিরাশা ও আশার দ্বন্দ্বে একা মেয়েটির চোখ দুটো জলছিল। সুদূর আকাশের ওই তারার মতন। একটা নয়, কবির বলা উচিত ছিল দুটো তারা। শ্যাওলা-ঢাকা পাথরের পিছনে অর্দ্ধাবৃত।

উৎপলা। না রে, তা নয়। জীর্ণ, অসার সেগুনের খুঁটি। তাকে জড়িয়ে দাঁড়িয়েছিল 'লুসী'। সরল রেখায় দু' ভাগ করা দীঘল দেহটার দিকে হঠাৎ চোখ পড়ল কবির। কয়েক মুহূর্তের জন্যে কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ-ভক্তের চোখের পলক আর নড়ে না। তরুণ যুবক এগিয়ে এল দ্বার হতে অঙ্গনে। আর 'লুসী'র মনে হ'ল :

(উৎপলার গান :)

"আজি মর্ম্মরধ্বনি কেন জাগিল রে,
মম পল্লবে পল্লবে হিল্লোলে হিল্লোলে
থরথর কম্পন লাগিল রে।
আজি কোন্ ভিখারী হায় রে,
এল আমারি এ অঙ্গনদ্বারে,
বুঝি সব মম ধন মন মাগিল রে।
আজি মর্ম্মরধ্বনি কেন জাগিল রে ...."

দীপ্তি। তোর গলা কিন্তু ভারী মিষ্টি। তোর গান শুনলে মনে হয় রবিঠাকুর বাংলা দেশের মেয়েদের মনের গোপন কথা সব কিছুই যোগবলে জেনে নিয়েছিলেন।

উৎপলা। শোন, শোন, আরও আছে।

লুসীর সেই মূর্ত্তি দেখে কবি, অবশ্যই সে বাঙালী সাহেব ত হতে পারে না, সাহেবরা কটাক্ষের কিই বা জানে।

দীপ্তি। বলে ফ্যাল, অত ভনিতায় কাজ নেই। এখুনি হয়ত বাবা এসে পড়বেন, তখন ত তুই উঠে পালাবি।

উৎপলা। কবির চোখে আনন্দ ও বেদনার অশ্রু। টপটপ করে পড়তে লাগল মাটিতে। কেমন—শুনতে ভাল লাগছে ?

দীপ্তি। যাঃ, কি বলছিস !

উৎপলা। তাহলে, আমি কিছু বলব না ; চুপ করে গেলাম। লুসী যদি অসহযোগিতা করে, তা হলে লুসীর দিদির রাগ হওয়া স্বাভাবিক।

দীপ্তি। আচ্ছা, আচ্ছা, মন্দ লাগছে না—দূর, ব্যাটাছেলের চোখে কি জল আসে ? তুই কিছু জানিস না।

উৎপলা। যিনি কবি তিনি অর্দ্ধ-নারীশ্বর, চোখে জল আসতে পারে। সুতরাং শুধু ওরকম বললে চলবে না।

দীপ্তি। কি বলতে হবে ?

উৎপলা। বলতে হবে, আমার খু-উ-উব ভাল লাগছে।

দীপ্তি। যাঃ, আমি অত ঢং করতে পারব না। তাতে তুই না বলিস ত নাই বললি, ভারী বয়ে গেল।

উৎপলা। অচ্ছোদ সরসীতীরে দাঁড়িয়ে যেখানে তলার ঝিনুক পর্য্যন্ত দেখা যায়, সেখানে—তুই না বললি ত আমারও ভারী বয়ে গেল।

দীপ্তি। হার মানছি ভাই। তোকে আবার দিদি বলতে রাজী আছি।

উৎপলা। বেশ, এইবার ক্ষমা করলাম ! তবে শোনো আমার ছোট্ট বোনটি, আমাদের সেই ওয়ার্ডসওয়ার্থ ভক্তের মনে হ'ল এ যেন সেই অমৃতমন্থন-যুগের একটি নারীমূর্ত্তি। শুধু রংটা কাল। সমুদ্র থেকে উঠে এসেছিল দু'জন। এক হাতে ছিল সুধাভাণ্ড, আর এক হাতে—না না—এ ত সে নয়। এর চোখে কি আছে সেই কটাক্ষ যার আঘাতে অকস্মাৎ জেগে ওঠে উন্মত্ত উল্লাস, শিরায় শিরায়—

দীপ্তি। শিরায় শিরায় ?

উৎপলা। তার পর আর ত জানি না।

দীপ্তি। যাঃ, তুই এমন বানিয়ে বানিয়ে বলিস ! এমন-ভাবে কোন পুরুষ কি কোন মেয়েকে দেখে ভাবে ? পাগল হয়ে যাবে যে।

উৎপলা। পুরুষমাত্রেই পাগল।

দীপ্তি। তা কি কখনও হতে পারে ? তা হলে সংসার চলছে কি করে ? কত ভাল লোকই ত আছেন।

উৎপলা। ভাল-মন্দের কথা হচ্ছে না। সুস্থ মনের কথা বলছি। কেউ নারীকে দেবী ভাবে, কেউ ভাবে রাক্ষসী, বাঘিনী—যা মনে আসে, অনুরাগ, বিরাগ বা রাগের বশে।

দীপ্তি। তুই বলতে চাস, আমরা মানবী। সুস্থ মানবের কাছে ভদ্র ব্যবহার আশা করতে পারি।

উৎপলা। বাঃ, তুইও ত কথা শিখে গিয়েছিস পোড়ারমুখী। না না, মুখটা তোর মোটেই আগুনে পোড়া নয়, (উৎপলা দীপ্তির গাল ধরে আদর করে)।

আচ্ছা চলি, রাত্রি হয়ে গেল।

[কাপড়ের ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে উৎপলার প্রস্থান]

(নেপথ্যে বিন্দুবাসিনীর গলা শোনা যায়)

অ দিদুভাই, ছাখ কড়া নাড়ে কে?

দীপ্তি। আমাদের সদর দরজা খোলাই আছে। ও পাশের বাড়ীতে কে যেন কড়া নাড়ে।

(ঘরের ভিতর থেকে বিন্দুবাসিনী বারান্দায় এসে দাঁড়ান)

বিন্দুবাসিনী। রাধুই যেন আইয়া গ্যালো। দরজার গোড়ায় কার লগে কথা কয়?

(চক্রবর্তী ও সত্যজিতের প্রবেশ)

ওমা, সততাজিৎ। ও রাধু, কি সংবাদ? দীপ্তি পাশ করছে?

[চক্রবর্তী—ট্রামওয়ে-কোট-পরা, টুপী হাতে, কোন কথা বলে না। উঠানের মাঝে দাঁড়িয়ে। শোভন, হাফপ্যান্ট-পরা গেঞ্জী গায়ে, বিহ্বল নয়ন—যেন ভয় পেয়েছে এমন ভাব—এগিয়ে এসে দিদির হাত ধরে। একবার দুবার দিদির চোখের দিকে তাকায়]

সত্যজিৎ। দীপ্তি, তোমার মুখ অত শুকনো কেন?

দীপ্তি। পাশ করেছি? কোন ডিভিশন? থার্ড ডিভিশনে বুঝি?

সত্যজিৎ। না।

দীপ্তি। তা হলে, সেকেণ্ড ডিভিশন? যাক, এবার আমি হেড নার্শ হতে পারব!

সত্যজিৎ। হেড নার্স হবে!

দীপ্তি। বাঃ, আমাদের তালপুরের উষাদি ত ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন বলে হেড নার্স হলেন।

সত্যজিৎ। হেড নার্স হয়ে কি খুব সুখ পাবে?

দীপ্তি। তা, আমাদের মত কালো মেয়ের আর কি উঁচু আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে? রুগীর সেবা করব, বাপ-মা, ভাই, ঠাকুরমাকে যত্ন করতে পারব, এ সুযোগ যখন পেতে পারি, তখন সুখী হব না কেন?

সত্যজিৎ। কিন্তু আমি যদি বলি, তুমি থার্ড ডিভিসনেও পাশ কর নি, সেকেণ্ড ডিভিসনেও কর নি।

দীপ্তি। (বিবর্ণভাবে) এ্যাঃ, ফেল করেছি। তা হলে এতক্ষণ পরিহাস করছিলেন! এ রকম পরিহাসের কোন মানে—

[দীপ্তি দু'হাতে দু'চোখ ঢেকে দৌড়ে দরজা ঠেলে ভিতরে চলে যায়। দড়াম করে খিল দেয়]

সত্যজিৎ। কি মুশকিল, কথাটা শেষও করতে দিল না।

চক্রবর্তী। (হাসিমুখে) কইছিলাম না, মাইয়াটা সত্যাই বড় বোকা। বোঝলেন না, যার মা পাগল, বাপ টেরাম ড্রাইভার, আর রং যার কালো—তার মনে উচ্চ আশা হইবে ক্যামন করিয়া? আপনি যা কইতেছিলেন, আমি শোনতেছিলাম, আর হাসতেছিলাম,

অ' দীপ্তি, দীপ্তি, শোনছ নি কথাটা, তুই ফেল হইস নাই, ফেল হইস নাই। দরজা খোল। বাইর আয়। এক নম্বর যারে কয়—সেই বিভাগেই পাশ করছ।

[চোখ মুছতে মুছতে দীপ্তির প্রবেশ। আঁচল দিয়ে আর একবার চোখ মোছে]

প্রণাম কর, সত্যজিৎবাবুরে প্রণাম কর। ওনার জন্যই ত পাশ করছ। না হইলে কি করতা, কিটা জানে।

[দীপ্তি এইবার হাসিমুখে এগিয়ে আসে। সত্যজিৎকে, বাবাকে, ঠাকুরমাকে প্রণাম করে]

সত্যজিৎ। আচ্ছা দীপ্তি, তুমি কি করে এমন অপবাদটা আমাকে দিতে পারলে? আমি তোমার সঙ্গে ওই রকম নিষ্ঠুর পরিহাস করব—একথা তুমি ভাবলে কি করে?

দীপ্তি। আমাকে ক্ষমা করুন। আমি [চোখে হাত দিয়ে, আঁচলে আবার চোখ মুছে]

ভাবতেই পারি নি যে আমি কোন দিন ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করতে পারি।

সত্যজিৎ। ওই রকম তোমার মতন Full many a gem আমাদের বাংলা দেশের অলিতে-গলিতে আছে, কেই বা তাদের পড়া বলে দেয়!

দীপ্তি। সত্যি, আমার ভাগ্যটা যতটা খারাপ ভেবেছিলাম, আসলে ততটা খারাপ নয়।

সত্যজিৎ। (হেসে) যেহেতু আমার মত একজন কর্তব্যনিষ্ঠ টিউটর পেয়েছ।

চক্রবর্তী। তা সত্য, সম্পূর্ণ সত্য কথা।

সত্যজিৎ। অতএব, অন্ততঃ আমি একাই এক সের সন্দেশ দাবী করতে পারি, কি বলেন চক্রবর্তীমশায়।

চক্রবর্তী। (স্মিতমুখে) নিশ্চয়, নিশ্চয়।

দীপ্তি। এক সের সন্দেশ খাইয়ে কি হবে। খাবেন আর ভুলে যাবেন। আর ক'দিন পরেই ত শুনেছি এ পাড়া ছেড়ে যাচ্ছেন ভবানীপুরে। জীবনে হয়ত আর দেখাও দেবেন না। আমি আপনার জন্যে একটা গরম কোট সেলাই করে রেখেছি। আমি বরং সেইটা এনে আপনাকে দি।

[দীপ্তি আবার ছুটে যায় ঘরের ভিতর, একটা খয়েরী রঙের কোট হাতে বেরিয়ে আসে]

এর চেয়ে দামী গুরু-দক্ষিণা দেবার সামর্থ্য আমাকে ভগবান দেন নি।

সত্যজিৎ। অতএব আপনি প্রসন্নচিত্তে এটা গ্রহণ করুন,

সামনের শীতে হয়ত আপনার কাজে লাগতেও পারে। এই ত বলতে চাইছ? হয়ত নয়, নিশ্চয়ই কাজে লাগবে। কিন্তু সন্দেশ আমি খাবই। কারণ, তুমি শুধু ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ কর নি, বাংলা ও সংস্কৃতে লেটার পেয়েছ। অঙ্কেও পেতে যদি আমার কথা শুনতে। কুকারে যদি সব রান্না সারতে—ঠিক ঠিক—আই এম সিওর। আক কষা চাইত। প্র্যাক্‌টিসের উপরেই রেজাল্ট।

দীপ্তি। আলাউদ্দীনের আশ্চর্য্য প্রদীপের সেই গল্পটার মতই যেন মনে হচ্ছে। শেষকালে যদি আলনাস্কারের স্বপ্নের মত অবস্থাটা দাঁড়ায়? আপনি ঠিক জানেন—আমি লেটার পেয়েছি? সোমবারে রেজাল্ট বের হবে, কাগজে দিয়েছে। তার আগে আপনি কি করে জানলেন?

সত্যজিৎ। জেনেছি, জেনেছি, জানতে কি কারুর বাকী থাকে? মোষ্ট রিলাইএবল সোর্স থেকে জেনেছি। এই নাও মার্কস, সাবধান অন্য কেউ যেন না জানতে পারে। তা হলে পার্ব্বতীবাবুর ট্যাবুলেটরশিপ যাবে।

বিন্দুবাসিনী। ট্যাবুলেটর, ট্যাবুলেটর কারে কয়?

সত্যজিৎ। পরীক্ষার ফল একত্রে যিনি যোগ দেন তিনি হলেন ট্যাবুলেটর।

চক্রবর্ত্তী। তা হইলে জ্যোতিষ পন্ডিতেরাও এক হিসাবে ট্যাবুলেটর।

বিন্দুবাসিনী। হরভগবান হইলেন সবার উপর।

চক্রবর্ত্তী। সত্য কইছ মা, তুমি জান কিনা জানি না, পণ্ডিত-মশায় নি কন—হরভুগমান অর্থাৎ শিব হইলেন চিকিৎসা ও জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রধান দেবতা।

দীপ্তি। তা যদি হয়, শিবের কাছেই ত—

[দীপ্তি কথা শেষ করে না, থেমে যায়]

সত্যজিৎ। তুমি বলতে চাইছ তোমার বাকী সব পরীক্ষার ফলাফল আগে থেকেই শিবই বলে দিতে পারেন। সুতরাং শিবের পূজা করাই বুদ্ধিমতির কাজ।

চক্রবর্ত্তী। (উচ্চহাস্যে) হাঃ হাঃ, যা'নি কইছেন সত্যজিৎ-বাবু! শিবঠ কুরের ভক্ত হওয়াই সুবিধা। আর এ্যামন দেবতাও পাইবেন না। ছোঁয়াছুয়ি নাই। নারায়ণরে মাইয়ালোক ছুঁইতে পারে না। ছুঁইলে পর পঞ্চগব্য দিয়া অভিষেক করতে হয়।

[ক্রমশঃ]

ফুল

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ফুলে বাড়ী উঠুক ভরি—সুদিন গণিয়ো,
দেহে মনে ফুলের ধনে ধনী বনিয়ো।
ফুটাও পূজার ফুল,
ভুবনে অতুল,
ভাবিনি ত ফুল যে এত প্রয়োজনীয়।

২

দেবতাকে দেবার জিনিস এমন আছে কি?
অনায়াসে স্বর্গ আসে এমন কাছে কি?
ফুলকে সদা দেখো,
ফুলের কাছে থেকো,
ফুল বিনে যে বিফল সোনারূপার রাজপি।

৩

ফুল শুধু নয় রূপের খনি, ভাবের খনিও,
কাছে আসে, ভালবাসে ফুলকে ফনীও।
ফুল যে আনে জয়,
বয় সাথে অভয়,
জীবনেতে ফুল যে পরম প্রয়োজনীয়।

৪

বিকিকিনি যতই কর, কর হাটবাজার,
ফুল কিনিতে ভুল করো না—সাধি বারম্বার।
ফুল যে আনি সুধা
ঘুচায় মনের ক্ষুধা,
সমৃদ্ধ-মন গড়তে কেহ তুল্য নাহি তার।

৫

ভক্ত, ভাবুক, প্রেমিক কবি নীরব কথা কয়,
অপার্থিবের সঙ্গে করায় নিবিড় পরিচয়।
আরাধনার দেশ
সেই ত চেনে বেশ,
অমন সাধু-সঙ্গ নিজেই সম্পদ অক্ষয়।

৬

ফুলের আবাদ করতে বলি—আদেশ শুনিয়ো,
পুণ্যঘন, শুধু ও ত নয় কমনীয়।
হরির কাছে হায়
সেই যে নিয়ে যায়,
সকল প্রয়োজনের আগে প্রয়োজনীয়।

হিন্দী সূফীকাব্য ও সাকারবাদ

শ্রীঅমল সরকার

সূফীকাব্য

প্রেমমার্গী শাখার কবিরা সূফী-সম্প্রদায়ভুক্ত। এঁরা আসেন প্রেমের বাণী নিয়ে; প্রেমের এমন এক মহিমা আছে যা অতি সহজেই মানব-হৃদয় জয় করতে পারে। তাই সূফী-কবিরা কবীরের যুগের কবিদের মত শুধু হিন্দু-মুসলমানদের ভেদাভেদ সমন্বয়ে মেতে রইলেন না, ভগবান ও জীবের প্রকৃত সম্বন্ধ বার করাই তাঁদের জীবনের একমাত্র ধ্যেয় ও লক্ষ্য হ'ল। 'ভগবান ও জীবের সম্বন্ধ প্রেমের, ভয়ের নয়' এই বাণীই তাঁরা প্রচার করতে লাগলেন 'সূফী' শব্দ 'সূফ' থেকে উদ্ভূত—সূফের অর্থ সাদা পশম বা 'সফেদ উন'। সহজ সরল, নিরাড়ম্বর জীবন নির্বাহ করবার জন্য এঁরা সর্বদা সাদা ও মোটা পশমের কাপড় পরতেন—সাদা পশম ছিল তাঁদের কাছে সরল জীবনের প্রতীক, যেমন গৈরিক বসন ত্যাগের একমাত্র নিদর্শন। হজরত মহম্মদের প্রায় দুশ' বছর পর সূফীমতের প্রচলন হয়। সূফীকবিরা পীর' বা গুরুকে সবার ওপরে স্থান দিতেন। এঁরা সর্বেশ্বরবাদী ও সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। আসল কথা গোঁড়া বা 'কট্টর' মুসলমানদের সঙ্গে এঁদের একেবারেই মিল ছিল না ও হিন্দুধর্মের অনেক কিছুই এঁরা মেনে চলতেন।

স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যেমন পরস্পরের প্রতি এক স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, এ আকর্ষণকে কেউ কোনদিন রোধ করতে পারে না তেমনি ভগবানের প্রতি প্রত্যেক জীব স্বাভাবিক ভাবে আকৃষ্ট হয়—সংসারে স্ত্রীর প্রতি যেমন পুরুষের কর্তব্য রয়েছে, অধিকার রয়েছে ও পুরুষের প্রতিও প্রত্যেক স্ত্রীর অধিকার ও কর্তব্য আছে তেমনই জীব ও ভগবান দুজনাই পরস্পরের প্রতি কর্তব্য ও অধিকারের গণ্ডীতে বাঁধা! ভালবাসা বা প্রেম 'দেওয়া' ও 'নেওয়া'র মধ্যে পরিসমাপ্তি হয় না —অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে দিয়ে তার চরম বিকাশ পরিণতি। এক রাজকুমার এক সুন্দরী রাজকুমারীর রূপে ও গুণে আকৃষ্ট হয়, সহজে সেই রাজকুমারীকে পাওয়া যাবে না; তাই আসে বাধা, কত ঝড়-ঝঞ্ঝা, রাজকুমারী যায় হারিয়ে; রাজকুমার পাগলের মত বেরিয়ে পড়ে, কত কান্তার-পাথার অতিক্রম করবার পর, অক্লান্ত কষ্ট করবার পর রাজকুমারীর পায় সন্ধান, শেষে দুজনেই পায় দুজনকে; ঠিক তেমনি করে ভগবানের অলৌকিক শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে মানুষ ভগবানকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে, অদম্য বাসনা নিয়ে সে সাধনা করে চলে, কঠোর সাধনার মধ্য দিয়ে তার মন্ত্রের হয় জয় ও সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে প্রপঞ্চময় মায়ারূপী জগতে যে রাজকুমারের মত সত্যিকারের সাধনা করে যেতে পারে তার কাছে রাজকুমারীর মত ভগবান আপনা থেকেই ধরা দেন, যে বাধা-বিঘ্ন দেখে মাঝপথেই হারিয়ে ফেলে সাহস সেইখানেই হয় তার পরিসমা'প্ত! জীবের এই চাওয়া, ভগবানের এই ধরা-দেওয়া—এর সঙ্গে স্ত্রী-পুরুষের চাওয়া-পাওয়ার এক অদ্ভুত মিল আছে—এই ভাবনার ওপর সূফীকবিরা বেশীর ভাগ তাঁদের কবিতা রচনা করেন। হিন্দু দেব-দেবীদের প্রতি সূফীকবিদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল—ধর্মের গোঁ যা এঁদের স্পর্শ করতে পারে নি; হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রেম ও সৌহার্দ্যের ভাব ও একতা আনাই সূফীকবিদের একমাত্র আদর্শ ছিল, তাই এঁদের প্রেমমার্গী কবি বলা হ'ত। সূফীকবিরা অবধী ভাষায় কবিতা রচনা করেন, চৌপাই ছন্দ এঁদের বৈশিষ্ট্য। এই মার্গের কবিদের মধ্যে কুতবন, মনঝন, উসমান, শেখ নবী ও জায়সী বিশেষ প্রসিদ্ধ।

জায়সীর আগে চারখানি কাব্যগ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় —মুগ্ধাবতী, মৃগাবতী, মধুমালতী ও প্রেমাবতী—এগুলির মধ্যে মৃগাবতী ও মধুমালতীর সন্ধান পাওয়া গেছে। কুতবন মৃগাবতীর রচনা করেন। মৃগাবতী কাব্যে চন্দ্রনগরের রাজা গণপতিদেবের রাজকুমার ও কাঞ্চনপুরের রাজকুমারীর প্রেম-লীলার বর্ণনা আছে। রাজকুমার রাজকুমারী মৃগাবতীকে ভালবাসতেন—মৃগাবতী উড়ে চলে যাবার যাদু শিখেছিলেন —একদিন রাজকুমারকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন। মৃগাবতীর বিরহে রাজকুমার সংসারধর্ম ত্যাগ করে প্রিয়ার খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে আর একটি সুন্দরী রমণীকে তিনি বিবাহ করে বসলেন, পরে মৃগাবতীর সঙ্গে দেখা হলে মৃগাবতীকেও বিয়ে করে দুই রাণী নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। রাজকুমার একদিন হাতী থেকে পড়ে গিয়ে মারা যান— স্বামী-বিয়োগে দুজন রাণীই সতী হয়ে যান।

'মধুমালতী' কাব্যের রচয়িতা মনঝন। কারু কারু মতে

'মৃগাবতী'র চেয়ে 'মধুমালতী'র বর্ণনা আরও বেশী মর্মস্পর্শী ও সুন্দর :

রতন কি সাগর সাগর হি, গজ মোতী গজ কোই।
চন্দন কি বন বন উপজৈ, বিরহ কে তন তন হোই।

জায়সী (১৫০০—?)

কুতবন ও মনঝানের পরেই জায়সী সাহিত্য-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। রায় বরেলীর 'জায়স' নামক স্থানে এঁর বেশীর ভাগ সময় কেটেছিল বলে ইনি জায়সী নামে প্রসিদ্ধ। বিখ্যাত সুফী ফকীর শেখ মোহদী (মুহিউদ্দীন)র ইনি শিষ্য ছিলেন। গুরু এক ফকীর, কাজেই প্রথম থেকেই জায়সীর চাল-চলনও সাধু-ফকীরদের মত হয়ে গেল। অথেঠী রাজবংশীয়েরা জায়সীর খুব সম্মান করতেন। জায়সী তাঁর রচনায় বাবর ও শেরশাহের প্রভৃত গুণগান করেছেন। বসন্ত হবার দরুণ এঁর একটি চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। প্রথম একবার শেরশাহ জায়সীকে কাণা দেখে হেসে উঠেছিলেন। জায়সী আঘাত পেয়ে শেরশাহকে প্রশ্ন করেছিলেন "মোহিকাঁ হঁসেসি কি কোহর হি ?" অর্থাৎ 'আমাকে দেখে হাসছেন না সেই কুমোরকে দেখে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন'। শেরশাহ এই উত্তর শুনে লজ্জিত হয়ে পড়েন। অথেঠীর দুই মাইল দূরে এক জঙ্গলে জায়সীর মৃত্যু হয়। যদিও ইনি মুসলমান ধর্মে পূর্ণ বিশ্বাস করতেন তবুও হিন্দু দেব-দেবীকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। শুধু একবার আপন কাব্যের নায়ক রতন সেনের মুখ দিয়ে মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে কিছু বলে ফেলেন। তবে বিরহ বা দুঃখের সময় আমরা এমনিতেই অনেক সময় ভগবানকে দোষী সাব্যস্ত করি। জায়সী 'পদ্মাবত', 'অখরাবট' ও 'আখরী কলাম' নামে তিনটি কাব্যগ্রন্থের রচনা করেন। 'পদ্মাবত' রাজা রতনসেন ও চিতোরের রাণী পদ্মিনীর প্রেমের বর্ণনা। হীরামন তোতা এদের প্রেমের বারতা পরস্পরের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়—পাঠকগণ যেন এখানে চন্দ বরদঈয়ের পদ্মাবতের সামঞ্জস্য লক্ষ্য করেন। পদ্মাবতের ঘটনাগুলি প্রায়ই ঐতিহাসিক, তবে কবি কল্পনা অনুসারে অনেক জায়গায় অদল-বদল করেছেন। রাজার প্রথম রাণী নাগমতীর বিরহ-বর্ণনা খুবই হৃদয়স্পর্শী। প্রেমের সাধনার মধ্যে দিয়েই যে ভগবানকে পাওয়া যায় জায়সী পদ্মাবতে তাই দেখাতে চেয়েছেন। পার্থিব ও ঐশ্বরীয় প্রেমের মধ্যে যে একটা সাদৃশ্য আছে তা আমরা পদ্মাবত থেকে বুঝতে পারি। ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে আরাকান-রাজ অদোমিন্তারের শাসনকালে প্রধানমন্ত্রী কোরেশী মগন ঠাকুরের আজ্ঞায় পদ্মাবতের বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়—বাংলা দেশের মুসলমান কবি আলাওলের 'পদ্মাবতী' মালিক মহম্মদ জায়সীর হিন্দী 'পদ্মাবত' কাব্যের ভাবানুবাদ। 'পদ্মাবতী'ই আলাওলের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। পদ্মাবতীতে পদ্মিনীর বয়ঃসন্ধি বর্ণনা সত্যই অপরূপ :

উপনীত হইল আসি যৌবনের কাল।
কিঞ্চিত ভূরুর ভঙ্গে বচনে রসাল॥
আড়-আঁখি বঙ্ক দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে হয়।
ক্ষণে ক্ষণে লাজে তনু যেন সঞ্চরয়।

ঐতিহাসিক আধারের ওপর নিজের কল্পনার তুলিকা বুলিয়ে জায়সী এক সুন্দর কাব্যের রচনা করেন পদ্মাবতে। এর প্রথম ভাগ কল্পিত—দ্বিতীয় অর্ধেক ঐতিহাসিক ঘটনার সমাবেশ। প্রেম-গাথার মধ্যে পদ্মাবতের স্থান সর্বপ্রথম ও প্রবন্ধ-কাব্যে এর স্থান দ্বিতীয়, কারণ তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস' হিন্দী প্রবন্ধ-কাব্যের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জন্য তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। জায়সী সংস্কৃত জানতেন না, কাজেই ফারসী কাব্য-রচনা পদ্ধতিতে ইনি 'পদ্মাবত' রচনা করেন। কিন্তু পদ্মাবতের ভাব ও ভাবনা একেবারেই ভারতীয়—পরমাত্মার প্রতি জীবের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে তার দিকে ইঙ্গিত করে জায়সী 'পদ্মাবত' কাব্যের শেষে বলেন :

তন চিত উর, মন রাজা কীন্হা।
হিয় সিহল, বুদ্ধি পদমিনি চিন্হা।

'পদ্মাবত' ও 'অখরাবট' থেকে একথা বেশ ভালভাবে বোঝা যায় যে, বিরহ বর্ণনায় অন্যান্য কবিদের অপেক্ষা অনেক বেশী সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বিরহ মানব-জগতের প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, পৃথিবীর পশুপক্ষীও বিরহ-বেদনায় হয়ে ওঠে কাতর—বিরহানলে দগ্ধ হয়ে কাক কালো হয়ে গেছে। জায়সী শুধু কবিই ছিলেন না, জ্যোতিষ শাস্ত্র, হঠযোগ, পাশা প্রভৃতিতে ইনি বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। জায়সীই প্রথম হিন্দী সাহিত্যে সাত-সমুদ্রের বর্ণনা করেন।

জায়সী, কুতবন, মনঝান ছাড়া সুফী সম্প্রদায়ের আরও অনেক কবি ছিলেন যাঁদের মধ্যে উসমানের নাম উল্লেখযোগ্য—এঁর 'চিত্রাবলী' কাল্পনিক হওয়া সত্ত্বেও বেশ প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল।

সাকারবাদ

এই সব সন্ত ও সুফীকবিদের কাব্য হয় ত আরও বেশী জনপ্রিয় হয়ে উঠত যদি না এই সময় তুলসী-সুর রাম ও কৃষ্ণলীলার কথা গাইতেন ; মানব হৃদয় পার্থিব প্রেমের প্রতি আকৃষ্ট হয় সন্দেহ নেই, তার ভক্তি-ভাবনার মধ্যে একটা মহিমা আছে। সে প্রেম ও ধর্মকে দেয় মিলিয়ে, রাম-কৃষ্ণের কথা শুনিয়ে দুঃখ-পীড়িত হৃদয়ে এনে দেয় শান্তি। ভক্তি-

কালের সাকারবাদী কবিরা আপন ইষ্টদেবের গুণগানের মধ্য দিয়ে সেই পরমপুরুষকে খুঁজে বার করতে চেষ্টা করলেন। আপন অভিলাষ প্রকাশ ও জাগতিক কল্যাণের জন্য তাঁরা কবিতাকে অভিব্যক্তির সাধন বা মাধ্যমরূপে গ্রহণ করেছিলেন। কবিতা লিখে যশ বা অর্থ অর্জন করবার জন্য তাঁরা কবিতা লিখতেন না অর্থাৎ কবিতা লেখা এঁদের পেশা ছিল না, আপন ভাব ও ভাবনাকে মানব এবং সমুদয় মানব-সমাজের কাছে পৌছে দেবার জন্য কবিতার আশ্রয় তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন।

আমরা জানি যে, হিংসাবাদের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বৌদ্ধ-ধর্মের আবির্ভাব হয় কিন্তু হিংসাবাদ লুপ্ত হয়ে গেলেও তন্ত্র-বাদ (বা মায়াবাদে যাকে রূপান্তরিত করা হয়) ধীরে ধীরে জন্ম নেয়। পরে রামানুজ সংসারের সত্যতার ওপর এক সম্প্রদায় গড়ে তোলেন ও নাম দেন অদ্বৈত সম্প্রদায়। এঁদের মতে সমস্ত জীব ও জগৎ ব্রহ্মার প্রকাশ এবং সংসার মিথ্যা নয়। রামানুজ ভক্তিমার্গের ওপর বিশেষ জোর দেন ও বাসুদেবের শ্রীচরণে তনু-মন সঁপে দেওয়ার মধ্যে সত্যিকারের ভক্তি নিহিত আছে এই বাণীই প্রচার করেন। এঁর পরে আসেন রামানন্দ; রৈদাস, মলুক প্রভৃতি সন্তকবিরা রামানন্দ স্বামীর পরম ভক্ত ছিলেন; রামানন্দ রাম-ভক্তির প্রচার আরম্ভ করেন। শ্রীরামচন্দ্রের জীবনের এক-একটি অধ্যায় নিয়ে রাম ভক্ত কবিরা তাঁদের রচনা আরম্ভ করেন এবং এই জন্য এই সব রচনার মধ্যে শ্রীরামের পুত্র, মিত্র, ভ্রাতা, রাজা ও পতি সমস্ত রূপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। ঠিক এমনিভাবে বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের কবিরা, যাঁরা 'অষ্টছাপ' বলে বিখ্যাত ছিলেন, কৃষ্ণ ভগবানের জীবন নিয়ে রচনা আরম্ভ করেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ও গোপী-বিরহ বর্ণনার মধ্যেই এঁদের রচনা সীমাবদ্ধ ছিল।

তুলসীদাস (১৪৬৭ বা ১৫৩২—)

রাম ভক্ত কবিদের মধ্যে যিনি সবার অগ্রগণ্য তিনি হলেন তুলসীদাস। রামচন্দ্র ও তুলসীর মধ্যে এমনই একটা সম্বন্ধ আছে যে, একজনের নাম মনে হলেই আর এক নাম আপনা হতেই এসে মনের কোণে ধরা দেয়।

গোস্বামী তুলসীদাসের জন্মকাল ও জন্মস্থান নিয়ে নানা মুনির নানা মত। কেউ বলেন এঁর জন্ম ১৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দে, আবার কারুর মতে ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। হস্তিনাপুর ও চিত্রকূটের পাশে হাজীপুর নামক স্থানে তুলসী-দাসের জন্ম হয়, আবার কারুর মতে বাঁদা জেলার কালিন্দীর কূলে রাজাপুর নামক স্থানে এঁর জন্ম হয়। রামনরেশ ত্রিপাঠী বলেন যে, হাজীপুরই হোক বা রাজাপুরই হোক তাঁর জন্ম-স্থানের নাম ছিল 'সোরোঁ' অর্থাৎ শূকর-ক্ষেত্র। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, হাজীপুর ও রাজাপুর দুই জায়গায় শূকর-ক্ষেত্র আছে। তুলসীদাসের পিতার নাম আত্মারাম ও মাতার নাম হুলসী।

তুলসী জাতিভেদ প্রথাকে কোন স্থান দিতেন না—বাল্যাবস্থা থেকে ইনি সাধু-সংসর্গে আসেন ও সাধু-ফকীরের মত থাকতে ভালবাসতেন—তুলসী বলতেন:

"ধূত কহৌ, অবধূত কহৌ, রজপুত কহৌ
মুলহা কহৌ, কোউ,
কাহু কী বেটী সোঁ বেটা ন ব্যাহব, কাহু কী
বিগারন সোউ।"

মেরে ন জাতি-পাঁতি, ন চাহৌঁ কাহু কী জাতি-পাঁতি।
মেরে কোউ কাম কো, ন হোঁ কাহু কে কাম কো।

জন্মের কিছুদিন পরেই এঁর মাতৃবিয়োগ হয়—কোনও কারণবশতঃ পিতাও এঁকে ত্যাগ করেন। হতভাগ্য তুলসী মানুষ হবার সুযোগ পেলেন না, অনাথের মত পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। সৌভাগ্যক্রমে এই সময় মহাত্মা নরহরিদাসের সঙ্গে তুলসীর পরিচয় হয়; নরহরিদাসের কাছে তিনি বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ করলেন ও তাঁর সঙ্গে নানা দেশ পর্যটন করে বেড়ালেন। যৌবনে পদার্পণ করে তিনি রত্নাবলী নামে এক সুন্দরী বিদুষী রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। স্ত্রীকে তুলসী বড় ভালবাসতেন, এক মুহূর্ত তাঁকে ছেড়ে তিনি থাকতে পারতেন না; কাজেই কখনও স্ত্রীকে চোখের আড়াল করতে চাইতেন না এবং এই কারণে স্ত্রীকে তাঁর বাপের বাড়ীও যেতে দিতেন না। একদিন একটি বিশেষ কাজে তুলসীদাসকে গ্রাম ছেড়ে বাইরে যেতে হ'ল ও সেই সুযোগে রত্নাবলী তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে বাপের বাড়ী চলে গেলেন। তুলসী ফিরে এসে দেখেন ঘরে নেই স্ত্রী—সেই মুহূর্তে পাগলের মত তিনি রওনা হলেন স্ত্রীর পিতৃগৃহে—যখন পৌছলেন তখন অর্ধরাত্রি সমাপ্তপ্রায়। স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হবামাত্রই স্ত্রী লজ্জিত হয়ে পড়েন। বিদুষী স্ত্রী তুলসীকে আঘাত করে পদ্যের ছন্দে কয়েকটি কথা বললেন:

"লাজ ন আবত আপকো, দৌঁড় আএহু সাথ।
ধিক ধিক ঐসে প্রেমকো কহা কবহুঁ হৌঁ নাথ।
অস্থি-চর্মময় দেহ তামেঁ এতী প্রীতি।
হোতী জো শ্রীরাম মহঁ, হোতি ন ত ভবভীতি।"

কথাগুলো শুনে তুলসীদাস মনে ভীষণ আঘাত পেলেন, মর্মাহত তুলসী সেই মুহূর্তে স্ত্রী-সংসার ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন শ্রীরামের খোঁজে এবং কথিত আছে প্রায় পঁচিশ বছর অবিরাম ভ্রমণের পর তিনি শ্রীরাম দর্শনে সমর্থ হয়েছিলেন।

সেদিন রাত্রে স্ত্রী রত্নাবলী যদি তাঁকে প্রত্যাখ্যান না করতেন তা হলে তুলসী আজকের বিশ্ববিখ্যাত তুলসীদাস হতে পারতেন কিনা কে জানে! তুলসীদাস সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে। তিনি একটি অশ্বথ গাছে রোজ জল দিতেন, ঐ গাছে একটি প্রেত বাস করত। সেই প্রেত তুলসীর নিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হয়ে একদিন প্রকট হয়ে বলে, 'আমি তোমার গুণে বড় প্রীত হয়েছি, তুমি আমার কাছে যা চাইবে তাই পাবে।' তুলসীদাস বললেন যে, তাঁর জীবনের একমাত্র কামনা শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন পাওয়া। প্রেতটি বলে যে, অমুক স্থানে গেলে পর তিনি একটি ব্রাহ্মণকে দেখতে পাবেন—এই ব্রাহ্মণ হনুমানজী নিজে, তিনিই তাঁকে শ্রীরামের দর্শন করাতে পারবেন। তাঁর ইঙ্গিতমত তুলসী দাস সেই ব্রাহ্মণের কাছে যান ও নিজের ইষ্টদেবতা শ্রীরামের দর্শনলাভ করেন। আর একবার একটি বড় মজার ঘটনা হয়। তুলসীদাসের সমকালীন মোগল বাদশাহ আকবর তুলসীকে একবার রাজদরবারে ডাকান ও বলেন যে, তুমি ত অনেক অদ্ভুত জিনিস দেখাতে পার শুনেছি, আজ আমাদের ঐরকম একটা যাদু দেখাও। তুলসী উত্তর দেন যে, শুধু রামনাম ছাড়া তিনি ত আর কিছুই জানেন না—আকবর ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে কারাগারে বন্দী করে রাখবার হুকুম দিলেন। তুলসী হনুমানজীর নাম স্মরণ করে প্রার্থনা আরম্ভ করলেন—ফলে অসংখ্য বানর কোথা থেকে এক জোটে এসে বাদশাহ আকবরকে আক্রমণ করতে উদ্যত হ'ল—বাদশাহ উপায়-হীন হয়ে তুলসীকে মুক্ত করে দেন।

তুলসীদাস বেশ কিছু বয়সে প্রভু রামচন্দ্রের গুণগানে গ্রন্থ-রচনা আরম্ভ করেন—এর কারণ জীবনের অনেক দিন পর্যন্ত শ্রীরামের খোঁজে দেশ-পর্যটন ও সাধুসঙ্গের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত করেন। কিন্তু এই ব্যাপক পর্যটন ও নিয়মিত সাধুসঙ্গের ফলে তিনি অন্যান্য কবিদের অপেক্ষা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন অনেক বেশী, ও জীবনের প্রতিটি পটে কৃতী চিত্রকরের মত চিত্র অঙ্কন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। গোস্বামী তুলসীদাসের এ পর্যন্ত বাইশটি রচনার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে নিম্নলিখিত চৌদ্দটি হিন্দী-সাহিত্যের অমূল্য গ্রন্থ :

১। রামচরিত মানস। তুলসী-রামায়ণ, যার খ্যাতি বোধ হয় সারা বিশ্বে। ২। কবিতাবলী। কবিত্ব ও সবৈয়া ছন্দে শ্রীরামের চরিত্র-বর্ণনা। ৩। বিনয়পত্রিকা। ভক্তি-ভাবনার অমূল্য সম্পদ। ৪। গীতাবলী। গীতিকাব্য মাধ্যমে কৃষ্ণচরিত্র বর্ণনা। ৫। কৃষ্ণগীতাবলী। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে রচিত কাব্য। ৬। দোহাবলী। গীতিমূলক সংগ্রহ। ৭। জানকী মঙ্গল। মঙ্গল-কাব্য—সীতা সম্বন্ধীয়। ৮। পার্বতী মঙ্গল। মঙ্গল-কাব্য—উমা সম্বন্ধীয়। ৯। রামললা নহছু। মাঙ্গলিক গীতিকাব্য। ১০। বরবৈ রামায়ণ। বরবৈ ছন্দে শ্রীরামের চরিত্র-বর্ণনা। ১১। বৈরাগ্য সন্দীপনী। বৈরাগ্য সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। ১২। রামাজ্ঞা। জ্যোতিষ-গ্রন্থ। ১৩। সতসঈ। ১৪। হনুমান-বাহুক। এগুলি ছাড়া আরও আটটি গ্রন্থ আছে—ছন্দাবলী, কড়খা রামায়ণ, ঝুলনা রামায়ণ, রামসলাকা, সঙ্কট মোচন, ছপ্পা রামায়ণ, রোলা রামায়ণ ও কুণ্ডলিয়া রামায়ণ।

উপরের চৌদ্দটি গ্রন্থের মধ্যে প্রথম সাতটি অপেক্ষাকৃত বড় এবং এই সাতটির মধ্যে 'রামচরিত মানস' সর্বাপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী ও বিশ্ববিশ্রুত। ভারতের প্রতি ঘরে ঘরে রাম-চরিত মানস (বা যাকে আমরা তুলসী-রামায়ণ বলে জানি) আজও ঠিক আগের মত সমাদৃত হয়। শুধু 'রামচরিত মানসে' নয়, 'বিনয়-পত্রিকা', 'দোহাবলী', 'বৈরাগ্য সন্দীপনী' প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁর লেখনী এক নূতন আলোকের সন্ধান এনে দেয়, এই গ্রন্থগুলি পড়লে সত্যই আমাদের মনে হয় যে, আমরা এক নূতন জগতে এসে উপনীত হয়েছি। এর কারণ বোধ হয় এই যে, তুলসীদাস জনহৃদয়ের নিগূঢ়তম প্রদেশ পর্যন্ত স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং জীবন-বীণার প্রতিটি তন্ত্রী তাঁর কৃতী হস্তের মূর্চ্ছনায় বেজে উঠেছিল; আমাদের রবীন্দ্রনাথ যেমন মানব হৃদয়ের যে-কোন ভাবনাকে নিজের কল্পনায় বেঁধে এনেছিলেন তার রূপ ও ভাষা, ঠিক তেমনি করে তুলসীদাসও মানব-মনের প্রত্যেকটি ভাবের অভিব্যক্তি করেছিলেন তাঁর রচনার মধ্যে দিয়ে। সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, মিলন-বিরহ, শিক্ষা-ধর্ম সব কিছুরই সমাবেশ রয়েছে তুলসী-রামায়ণে—দুঃখে ভারাক্রান্ত মন তুলসীকে পড়ে পায় আনন্দ ও আশা, আবার বেপরোয়া নাস্তিক জীবন-ধর্মের প্রতি হয় আকৃষ্ট, পায় শিক্ষা ও কৃষ্টির আলোক। তিনি আমাদের যে কেবল শ্রীরাম-চন্দ্রের গাথাই শুনিয়েছেন তাঁর রচনায় তা নয়, কৃষ্ণ-চরিত্রের ওপরেও তাঁর যথেষ্ট টান ছিল। তবে শ্রীরামই ছিলেন তাঁর প্রভু, একমাত্র উপাস্য দেবতা। তুলসীর রাম পরব্রহ্ম; ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ ও অন্যান্য সব দেবতা তাঁর কাছে মাননীয় শুধু এই জন্য, কারণ তাঁরা রামের প্রতি অনুরক্ত ও তাঁরা তুলসীকে রাম-ভক্তির প্রেরণা দান করেছেন। তুলসীর মতে যার মধ্যে রাম-ভক্তির ভাবনা নেই, যে নিজেকে শ্রীরামচন্দ্রের দাস বলে মনে করে না সে শত জ্ঞানী হলেও পশুর সমান। তাঁর কাছে :

এক ভরোসো, এক বল, এক আস বিশ্বাস।
এক রাম ঘনশ্যাম-হিত, চাতক তুলসীদাস॥

তুলসী হনুমানজীকে যথেষ্ট সম্মান দেখিয়েছেন—এমনও

বোধ হয় প্রধান কারণ হনুমানজী তাঁরই মত শ্রীরামেরই একমাত্র ভক্ত ও সেবক ছিলেন—লক্ষ্মণও বোধ হয় এই কারণে তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল—কিন্তু এইখানেই আবার সুরদাসের সঙ্গে তুলসীর পার্থক্য—তুলসীর সঙ্গে শ্রীরামের সম্বন্ধ প্রভু ও সেবকের কিন্তু সুরদাস শ্রীকৃষ্ণকে সখা ও ক্রীড়ার সঙ্গী ছাড়া আর কোনও রূপে দেখেন নি। তুলসীদাস শ্রীরামচন্দ্রের গৌরব, বীরত্ব ও শক্তির পূজারী কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সুরদাসের বন্ধু ও সখা। রামচন্দ্র শুক্ল বলেছেন :

"যদি হম্ তুলসীমেঁ সেব্য সেবক ভাব্ দেখতে হৈঁ, ত ইসীলিয়ে কি তুলসী কী দৃষ্টি হমেশা রামকে গৌরব ঔর প্রতাপ কী ওর লগী রহতী হৈ। ইসসে ভিন্ন সুর কৃষ্ণকে রূপ-মাধুর্য ঔর উনকী দিন-ফরেব অদাওঁ পর হী লট্টু হৈঁ।"

তুলসীর কাছে :

'সেবক-সেব্য ভাব বিনু, ভব ন তরিয় খগেশ।'

আর সুরের কাছে :

এ'কৈ নিশ্চয় প্রেম কো, জীবন-মুক্তি রসাল।
সাঁচো নিশ্চয় প্রেম কো, জিহিঁ রে মিলৈ গোপাল।'

তুলসীদাস তাঁর আপন যুগ ও আপন সম্প্রদায়ের অর্থাৎ রামভক্তি-শাখার প্রতিনিধি-কবি। অনেকগুলি ভাষার ওপর তাঁর পূর্ণ অধিকার ছিল—ইনি সংস্কৃতের এক বড় পণ্ডিত ছিলেন। অবধী ও ব্রজ এই দুই ভাষায় তিনি কবিতা রচনা করেন, প্রয়োজনমত ফারসী ও আরবী শব্দ ব্যবহারে ইনি দ্বিধাবোধ করেন নি। এতগুলি ভাষার ওপর এর অধিকার প্রয়োগের কারণ ছিল তাঁর বিভিন্ন দেশ-পর্যটন। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন সমাবেশে বিভিন্ন প্রকারের রচনা আমরা পাই তুলসীদাসের কাছ থেকে। প্রবন্ধকাব্য, স্ফুটকাব্য, গীতিকাব্য, দোহা-চৌপাই, কবিত্ব-সবৈয়া, গ্রাম্য-গীত কোনটাকেই তিনি বাদ দেন নি। সত্যই তুলসীদাস ছিলেন বিরাট ও সর্বজ্ঞ, কোন মাপকাঠি দিয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও বিরাটত্বের বিচার করা যায় না; যতদিন ভারতবর্ষের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন তুলসীদাসকে কেউ ভুলতে পারবে না। তুলসীদাসকে সম্মান প্রদর্শনে কেউ কোনদিন কার্পণ্য করে নি, কোনও দিন করবেও না, শুধু আমাদের দেশ নয় পাশ্চাত্য সুধীমণ্ডলী এই মহাকবির গুণে হয়েছেন মুগ্ধ—তুলসীদাসের স্থান যে কত উচ্চে তা বিখ্যাত ঐতিহাসিক ভিন্সেন্ট স্মিথের উল্লেখ থেকেই বোঝা যায়—তিনি যা বলেছিলেন তার হিন্দী অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করা হ'ল :

"বহ কবি হিন্দী-কবিতা-কানন মেঁ সবসে বড়া বৃক্ষ হৈ। উনকা নাম ন ত আঈন-এ-অকবরী মেঁ মিলেগা ঔর ন মুসলমান ইতিহাসকারোঁ কী পুস্তকোঁ সে, ঔর ন উনকা পতা কিসী ফারসী ইতিহাসকার কে বয়ান সে তৈয়ার কী হুঈ কিসী ইউরোপীয় লেখক কী পুস্তক মেঁ হী লগেগা। তো ভী বে অপনে সময় মেঁ ভারত মেঁ সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ থে। যহাঁ তক কি উনহেঁ অকবর সে ভী বড়া কহা জা সকতা হৈ। ক্যোঁ কি লাখোঁ স্ত্রী ঔর পুরুষোঁ কে হৃদয় পর উন্ হাঁনে জো বিজয় প্রাপ্ত কী হৈ, বহ উস বাদশাহ কী জীতী হুঈ কিতনী লড়াইয়োঁ সে অধিক চিরস্থায়িনী হৈ।"

রাম ভক্তি শাখার প্রতিনিধি-কবি ছিলেন তুলসীদাস। তবে আরও কয়েকজন কবি শ্রীরামের গুণগানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং তাঁদের সম্বন্ধে কিছু না বললে এই শাখার পূর্ণ পরিচয় হয় না। এঁদের মধ্যে যাঁর নাম সর্বাগ্রে মনে পড়ে তিনি হলেন নাভাদাস। নাভাদাসের গুরু ছিলেন অগ্রাহাস—এঁরই প্রেরণায় নাভাদাস হিন্দী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ভক্তমাল' লিখেছিলেন। ভক্তমালের ভক্তবৃন্দের মাঝে ভেদাভেদ নেই, সবাই এক ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদন করেছে, সবাই সেই পরম দেবতার কৃপাপ্রার্থী। ভক্তমাল গ্রন্থের বাংলা ভাষায় অনুবাদ হয়ে গেছে। নাভাদাস গোস্বামী তুলসীদাসের সমকালীন ছিলেন এবং তুলসীদাসের সঙ্গে সাক্ষাতের কথাও তিনি তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। নাভাদাস আরও দুইটি গ্রন্থ অবধী ও ব্রজভাষায় লেখেন।

প্রাণচন্দ্র ও হৃদয়রামজী এই শাখার কবি। প্রাণচন্দ্র 'রামায়ণ মহানাটক' ও হৃদয়রামজী 'হনুমান নাটক' লেখেন। অযোধ্যার আরও কয়েকজন কবি রামচরিত সম্বন্ধে কয়েকটি কাব্য লেখেন। এই কবিরা শ্রীরামচন্দ্রকে শ্রীকৃষ্ণের মত শৃঙ্গারী-নায়কের রূপে বর্ণনা করেন। কৃষ্ণের যমুনাতীরের মত, শ্রীরামচন্দ্র সরযূতীরের নায়ক কিন্তু এই জাতীয় রচনাগুলির ওপর কৃষ্ণকাব্যের যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলকথা এই যে, যেখানে তুলসী তাঁর লেখনী দিয়ে এক নূতন আলোকের সন্ধান দিয়েছিলেন সেখানে এই সব কবিদের প্রতিভা একেবারে ম্লান হয়ে গেছে।

সুরদাস

যেমন ভাবে রামানন্দ সম্প্রদায় তুলসীদাসের প্রতিনিধিত্বে শ্রীরামচন্দ্রকে সকল ভগবানের উপরে স্থান দিয়েছিলেন ও রামভগবানের স্তুতিগানে দিগদিগন্ত মুখরিত করে তুলেছিলেন, ঠিক তেমনি ভাবে বল্লভাচার্য সম্প্রদায় সুরদাসকে প্রতিনিধি করে নিজেদের উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। কৃষ্ণ-ভগবানের দুই রূপ ছিল—বৃন্দাবনে যমুনার তীরে যাঁর বাঁশীর সুমধুর তানে গোপিনীদের মন হয়ে উঠেছিল চঞ্চল, যাঁর ক্ষণিক সঙ্গলাভের জন্য রাধিকা নিজেকে পর্যন্ত ফেলেছিল হারিয়ে, কুরুক্ষেত্রে রণাঙ্গনে সেই কৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খের নিনাদে দশদিক উঠে-

ছিল কেঁপে আর তারই রাজনৈতিক কূটবুদ্ধিতে পাপী কুরু-বংশ হয়েছিল নির্মূল। কিন্তু এ যুগে লোকেদের কাছে বৃন্দাবনের গোপীকৃষ্ণই হ'ল বেশী প্রিয়, কাজেই তাঁর লোক-রঞ্জক রূপ পড়ে গেল চাপা। কৃষ্ণকাব্যের ওপর দুটি প্রধান প্রভাব পরিলক্ষিত হয়—একদিকে বল্লভাচার্য সম্প্রদায় (যাঁরা অষ্টছাপ কবি বলে পরিচিত)-এর বালকৃষ্ণের উপাসনা ও তাঁর যৌবনের লীলাখেলার চিত্রাঙ্কন ; অন্য দিকে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস স্ত্রী পুরুষের সাধারণ লীলার মধ্য দিয়ে গীতকাব্যের রূপে রাধাকৃষ্ণের দিব্যলীলার কথা মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। কৃষ্ণকাব্যের সবাই ব্রজভাষায় রচনা করেন। কৃষ্ণকাব্যের বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, এর মধ্যে শৃঙ্গাররসের প্রাধান্য দেখা যায়। সংযোগ ও বিয়োগ শৃঙ্গারের বর্ণনা এমন আর কোথাও পাওয়া যায় না। তবে কৃষ্ণের বাল্যজীবনের পরিচয় দেবার সময় আপনা হতেই বাৎসল্য-রস তার নিজ বৈশিষ্ট্যে কাব্যগুলিকে আরও সুমধুর ও সরস করে তুলেছে। কৃষ্ণভক্ত কবিরা তুলসীর 'বিনয়-পত্রিকা'র মত কতকগুলি বিনয়পদ রচনা করেন যাদের মধ্যে আমরা শান্ত রসের প্রয়োগ দেখতে পাই, আবার কৃষ্ণের বীরত্বের ও অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা করবার সময় বীররসের সাহায্যে রচনাগুলি ওজস্বীতায় ভরে উঠেছে। কৃষ্ণকাব্যে আর একটি লক্ষ্য করবার বিষয় হ'ল যে, এই শাখার কবিরা তাঁদের রচনাগু[illegible] কোন একটি বিশেষ গল্পকে আধার করে [illegible], [illegible]ন যা তাঁদের ভাল লেগেছে তাকেই কাব্যিক [illegible]য়ে করে তুলেছেন মূর্ত ও স্ফূর্ত। কৃষ্ণকাব্যের প্রায় সব পদগুলি লোকেদের মাঝে গানের সুরে শোনাবার যোগ্য, তাই এগুলির মধ্যে সঙ্গীত-শাস্ত্রের রাগ ও রাগিনী ছন্দে-তালে ধরা দিতে যেন বাধ্য হয়েছে।

রামভক্তি শাখায় যেমন তুলসীদাস ছিলেন সবার অগ্রগণ্য তেমনি সুরদাস ছিলেন কৃষ্ণভক্ত কবিদের মধ্যে সবার সেরা। ইনি মহাপ্রভু বল্লভাচার্যের শিষ্য ছিলেন। সুরদাসের জন্ম ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে মথুরার নিকটবর্তী রণকুতা নামক স্থানে হয়। কারু কারু মতে ইনি জন্মান্ধ ছিলেন। আবার কারু মতে এঁর অন্ধ হবার পিছনে প্রচ্ছন্ন আছে এক মর্মান্তিক ঘটনা। কথিত আছে যে, সুরদাস এক সুন্দরীর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন—সুরের মন সর্বদা সেই সুন্দরীকে দেখবার জন্যে হয় বিচলিত ও পদে পদে বাধা পড়ে তাঁর দৈনন্দিন কর্মজীবনে, কাজেই তিনি ঠিক করলেন যে,চোখ দুটি উপড়িয়ে ফেললেই তিনি এই আসক্তি থেকে হবেন মুক্ত এবং সেই সুন্দরীর হাত দিয়েই চোখ দুটি উপড়িয়ে ফেলেন। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'সুরদাসের প্রার্থনা' নামক কবিতা এই বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা। হতে পারে তিনি জন্মান্ধ ছিলেন কিন্তু তাঁর কবিতার বর্ণনা পড়লে বার বার কেবলই মনে হয় যে, স্বচক্ষে অনুভব না থাকলে অপরের কাছ থেকে শুনে কখনই কুঞ্জবিহারীর লীলার এমন সজীব চিত্র তিনি আঁকতে পারতেন না।

কৃষ্ণ-কাব্যের সেরা কবি সুরের পাঁচটি রচনার খোঁজ পাওয়া যায়—(১) সুর-সাগর, (২) সুর-সারাবলী, (৩) সাহিত্য-লহরী, (৪) নল-দময়ন্তী ও (৫) ব্যাহলী। এগুলির মধ্যে সুর-সাগর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। এর মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, মথুরা-প্রবাস, গোপী-বিরহ ও উদ্ধব-গোপী সংবাদের একটা ধারাবাহিক বর্ণনা পাওয়া যায়। সুর-সাগরের লক্ষ্যণীয় বিষয় হ'ল এই যে, আগাগোড়া কবি তাঁর মৌলিকত্ব বজায় রেখেছেন। বিরহ-বর্ণনায় কবির অনুপম চাতুর্য সুর-সাগরের দশম সর্গে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বৃন্দাবনের গোপ-গোপিনীদের ছেড়ে কৃষ্ণকে কর্তব্যের ডাকে ছুটে যেতে হ'ল মথুরায়—কৃষ্ণবিহনে সারা বৃন্দাবন উদ্‌ভ্রান্ত ও আনমনা কিন্তু বৃন্দাবন ছেড়ে গেলেও কৃষ্ণ কিছুই ভুলে যেতে পারে না—তাই ত উদ্ধবকে পাঠাতে হয়েছে সেখান-কার সব খবর নিয়ে আসার জন্য। উদ্ধব-সংবাদে গোপিনী-দের অনুরোধ করা হয়েছে যে, তারা যেন ভগবানের নির্গুণ রূপের কল্পনা করে। উদ্ধব তাই বারবার গোপিনীদের বোঝাবার চেষ্টা করেছে যে, ভগবান নিরাকার, নিরাকারের প্রতি তাদের পার্থিব আসক্তি রাখা ভুল, ত্যাগের ভেতর দিয়েই সেই নির্গুণ রূপের পূজা হয়। কিন্তু বাসনায় উন্মুখ গোপিনীরা কেমন করে ভুলে যাবে সেই মনমোহনের সঙ্গ, তারা যে প্রথম দর্শনেই কৃষ্ণ কনৈহাকে সঁপে দিয়েছে তাদের দেহ-মন, তাকে পাবার মধ্যেই যে তাদের পূর্ণ শান্তি। উদ্ধবের তর্ক যুক্তিপূর্ণ হলেও মন তাদের কিছুতেই মানে না, তারা ভ্রমরকে দূত করে পাঠাতে চায় কৃষ্ণের কাছে তাদের সব অভিযোগ জানিয়ে। ভ্রমরকে সম্বোধন করে গোপিনীরা তাদের মনের সব কথা খুলে বলে। গোপিনীরা দেখেছে যে, ভ্রমরের চরিত্রের সঙ্গে এক অদ্ভুত সামঞ্জস্য আছে কৃষ্ণ-চরিত্রের—ভ্রমর সব ফুলের কাছে যায়, তাদের রস নিঙড়িয়ে নিয়ে চলে যায়, ভালবাসার ভান দেখায় হয় ত, সত্যিই কি ভালবাসে! কোন ফুলই তাকে কোনদিন পায় না। ভ্রমরের রং ত কৃষ্ণের মত কালো! সব গোপিনী কৃষ্ণের স্পর্শ পেয়েছে সত্যি, কিন্তু কেউ কি তাঁকে একেবারে নিজের করে পেতে পেরেছে! গোপিনীদের এই অপূর্ণ প্রেম, এই অতৃপ্ত বাসনা, বিচ্ছেদ-ভরা এই মিলনের পাত্র যুগে যুগে কবিদের বিরহ-বর্ণনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা ছাড়া এইখানেই রয়েছে জীব ও পরমাত্মার প্রকৃত সম্বন্ধের ইঙ্গিত। এই যে চেয়েও না-পাওয়া এরই মধ্যে রয়েছে জীবের ভগবানকে পাবার আকুল-প্রয়াস। কিন্তু সে যে

প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের সহিত ত্রিপুরার আদিবাসী-নেতা আলাপরত

প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল, প্রেসিডেন্ট ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং ডঃ রাধাকৃষ্ণণ দিল্লীর পালাম বিমান ঘাঁটিতে আফগানিস্তানের রাজাকে অভ্যর্থনা করিতেছেন
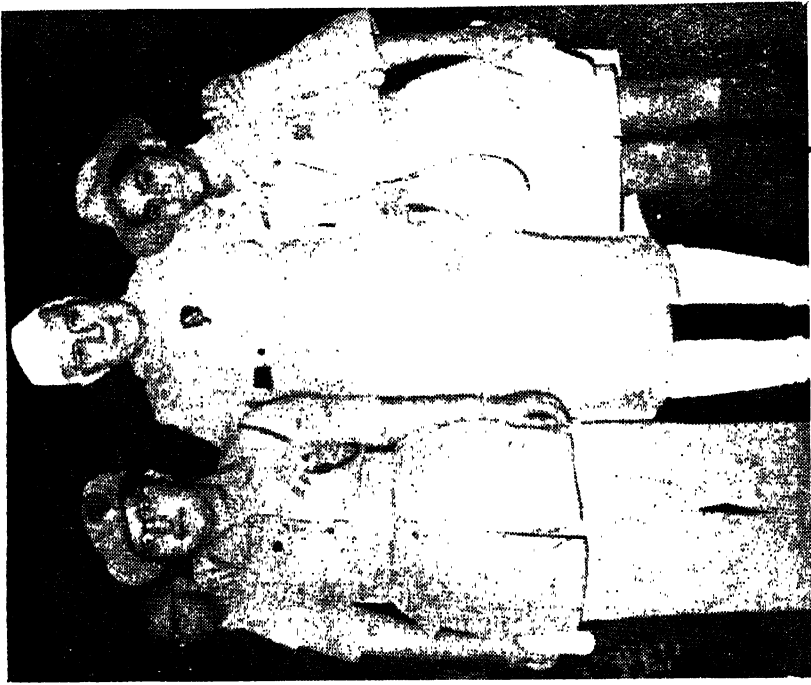
ভিয়েৎনামের প্রেসিডেন্ট হো-চি-মিনকে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ
একটি বোধিবৃক্ষের চারা উপহার দিতেছেন

গণতন্ত্র দিবসে পুরস্কারপ্রাপ্ত দুটি ছাত্র অবিনাশ কাউর এবং
হরিশ্চন্দ্রের সহিত জওহরলাল

আদি-অনন্ত, তাঁকে কি পার্থিব উদ্দেশ্যে বেঁধে আনা যায় বা বেঁধে রাখা যায়? নন্দদাস প্রভৃতি পরবর্তী কবিরাও ভ্রমরকে দূত করে গোপিনীদের বিরহ-বর্ণনা করে গেছেন এবং এই বিশেষ অংশ 'ভ্রমর-দূত' নামে খ্যাত। সুরদাস গোপিনীদের বিরহ-বর্ণনায় বিরহিণীর মনোবেদনার প্রতিটি ভাব-তন্ত্রীতে আঘাত করেছেন বলেই বিরহ-বেদনার শাশ্বত রূপ প্রকাশ পেয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে। 'ভ্রমর-দূত' বিয়োগ শৃঙ্গারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সন্দেহ নেই কিন্তু এর ভেতর সগুণ ও নির্গুণবাদের যে কাব্যিক আলোচনা আছে তার জন্য 'ভ্রমর-দূত' হয়েছে আরও বেশী লোকপ্রিয়। কৃষ্ণের বাল্য-লীলা বর্ণনে আমরা সুরদাসের এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিচয় পাই। এ হ'ল মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। বালক-মনের ছোট ছোট সরল ও সহজ প্রশ্নের উত্তর আছে, বড় ভাই বলরামের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে কৃষ্ণ ছুটে যায় মাতা যশোদার কাছে, বিনা কারণেই তার বালক-মন হয়ে ওঠে চঞ্চল ও বিদ্রোহী। এইখানে বাৎসল্য-রসে প্রভাবিত হয়ে সুরের কাব্য আরও সুমধুর হয়ে উঠেছে :

(ক) মৈয়া মোহি দাউ বহুত খিঝাউ।
মোসো কহত মোল কো লীনোঁ তোহি
জসুমতি কব জায়ো॥

(খ) মৈয়া কবহিঁ বঢ়েগী চোটী॥
কিতীবার মোহি দূধ পিয়ত ভই হৈ
অজহূঁ যহ ছোটী।
তূঁ জো কহতি বল কী বেণী জ্যোঁ হৈ হৈঁ
লাম্বী চোঁটী॥

সুরের রচনার আর এক বৈশিষ্ট্য হ'ল যে, ভগবদ্-চিন্তা ও ভাবনা এত ওতঃপ্রোত ভাবে মিশে গেছে যে, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নাস্তিকও সুরদাসের রচনার সংস্পর্শে এলে কিছুক্ষণের জন্যও বোধ হয় সে ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হবে। এবং হয় ত সুরের সঙ্গে একমত হয়ে বলে উঠবে 'জো সুখ সুর অমর-মুনি দুর্লভ সা নন্দ-ভামিনী পাবৈ।'

সুরদাসের ভাষা সাহিত্যিক ব্রজভাষা ও হিন্দী-সাহিত্যে শুদ্ধ ব্রজভাষায় লেখা কেবলমাত্র একটি রচনা পাওয়া যায় আর সেই রচনা হ'ল সুরদাসের 'সুর-সারাবলী', অবশ্য কখনও কখনও সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়। ব্যঞ্জনা হ'ল সুরদাসের ভাষার আর এক বৈশিষ্ট্য। সুর প্রবাদ ও প্রবচনের প্রয়োগও বেশ সহজভাবেই করেছেন। 'গহিবী' 'সাহিবী' আদি বুন্দেলখণ্ডী শব্দেরও কখনও কখনও ব্যবহার করেছেন।

সুর-কাব্যের আরও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য এই সূত্রে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, ভগবানে অটল-ভক্তি সুর-সাহিত্যের অপরিহার্য্য অঙ্গ। সকল ভাবনা অপেক্ষা ভক্তি-ভাবনার স্থান অনেক ঊর্ধ্বে এই ছিল সুরদাস এবং তাঁর পরবর্তী কৃষ্ণ কবিদের মূলমন্ত্র। ভগবানের রূপ ও গুণ বর্ণনায় তাঁদের পারিপার্শ্বিক জগতের কিছুই খেয়াল ছিল না। সমাজের অস্তিত্ব বা প্রয়োজনের দিকে তাই তাঁদের কোন লক্ষ্য ছিল না। ভগবানের প্রতি এই অবিচল ভক্তি তাঁদের কর্মভেদ, জাতিভেদ সব কিছুরই বহু ঊর্ধ্বে নিয়ে গিয়েছিল। কৃষ্ণকবিদের (যাঁরা পরে অষ্টছাপ সম্প্রদায় নামে খ্যাত হয়েছিলেন) মূলমন্ত্র ছিল 'সবার ওপর মানুষ সত্য এবং জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণে আত্ম-সমর্পণ'। দ্বিতীয়তঃ, সুরের ভাষা শুদ্ধ ব্রজভাষা। এতে অন্য ভাষার শব্দ সংমিশ্রণ বিরল। মাধুর্য ও প্রসাদগুণের কারণে এঁর ভাষা আরও শ্রুতিমধুর হয়ে উঠেছে। তৃতীয়তঃ, নায়িকা-ভেদ ও নব-শিব বর্ণনা—আমাদের মনে রাখতে হবে যে রাধাকৃষ্ণের প্রেম কাহিনীর যে মহিমা-গান সুরদাস ও অন্যান্য বৈষ্ণব কবিরা গেয়েছিলেন সেই গানের আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল রীতিকালে অর্থাৎ পরবর্তীকালে। ভগবৎ-ভাবনা দূর হয়ে গিয়ে তার জায়গায় এসে দাঁড়াল লৌকিক-ভাবনা, তৎকালীন মুসলিম সমাজের প্রভাবে ওমর খৈয়ামের সাকী ও সুরা এসে ভক্তি ও শ্রদ্ধার স্থান অধিকার করে বসল। রাধা ও কৃষ্ণের মহিমা এবং ঐশ্বরীয় প্রেমকে ভুলে গিয়ে সেই কালের কবিরা আপন আপন আশ্রয়দাতাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলাকে বিকৃত করে সাধারণ নর-নারীর দৈহিক প্রেমে রূপান্তরিত করলেন এবং পার্থিব প্রেম বর্ণনায় তাঁরা কখনও কখনও শ্লীলতার মাত্রা পর্যন্ত ছাড়িয়ে গেলেন। প্রেমের এই বিকৃত রূপ বর্ণনায় তাঁরা শৃঙ্গাররসের পূর্ণ ব্যবহার করতে লাগলেন; 'নায়িকা-ভেদ' ও 'নব-শিব-বর্ণন' তাঁদের কাব্যের প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়াল। সুরদাসের কাব্যেও আমরা নায়িকা-ভেদের উদাহরণ পাই কিন্তু রীতিকালীন গ্রন্থের থেকে একেবারে ভিন্ন। চতুর্থতঃ, সুরদাসের কাব্যে আমরা পুরাতন আখ্যান ও গাথার প্রচুর উল্লেখ পাই।

বক্ষোলগ্না

শ্রীভূদেব চট্টোপাধ্যায়

খবরটা বৃদ্ধ হরনাথের কাছেও আর গোপন রইল না। পল্লী-গ্রামের সাদাসিধে মানুষ তিনি। সারা জীবনটা কাটিয়েছেন দেবতার পূজা-অর্চনা করে। একান্ত সরল অনাড়ম্বর এক ভদ্রলোক। তাই কথাটা প্রথমে বিশ্বাসই করেন নি! গৃহিণীর সন্দেহটাকে এক কথায় নাকচ করে দিয়ে বলেছিলেন, তুমি পাগল হয়েছ বড়বৌ। অশোক ত আমারই ছেলে, তাকে আমি ভাল করেই চিনি। ওসব মিথ্যা কুৎসা-রটনায় মাথা খারাপ করো না তুমি।

কিন্তু এ মাসেও টাকা এল না অশোকের। গত দু'মাস ধরে টাকা দেওয়া বন্ধ করেছে সে। বহুকষ্টে সংসার চালিয়েছেন হরনাথ। কতটুকুই বা সংসার! বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা—দুটি মাত্র প্রাণী সংসারে। তবু দু'মাস ধরে এই সংসারেরই হাল ধরে থাকতে হিমসিম খেয়ে গেছেন বৃদ্ধ হরনাথ।

মাঝে একটা চিঠি দিয়েছিল অশোক। কি এক বিশেষ কারণে টাকা পাঠানোর অক্ষমতা জানিয়ে ক্ষমা চেয়েছিল। তার পর এক মাস গত হ'ল, না এল কোন চিঠি, না টাকা। অবশ্য চিঠিপত্র সে কমই লেখে, বলে, চিঠি লেখার নাকি সময় পায় না। আপিসে হাড়ভাঙা খাটুনী, তার উপর আবার টিউশনী আছে। তাই নিয়মিত চিঠিপত্র লেখা ঘটে ওঠে না।

নিয়মিত না হোক, অন্ততঃ মাসে একখানা করে ত চিঠি আসা উচিত। আর কি সেই 'বিশেষ কারণ' যার জন্য এই একান্ত অসহায় দুটি বৃদ্ধ-বৃদ্ধার গ্রাসাচ্ছাদনের একমাত্র অবলম্বন গোটাকয়েক টাকা না পাঠানোর নিষ্ঠুরতা অশোককে পেয়ে বসেছে। কর্ত্তব্যচ্যুত অর্বাচীন! তৃতীয় মাসেও টাকা না পেয়ে গর্জ্জে ওঠেন হরনাথ।

তবে কি অতুলের কথাটাই সত্য! এখনও বিশ্বাস হয় না হরনাথের। জীবনে দারিদ্র্যের বহু নিষ্ঠুর আঘাত তিনি সহ্য করেছেন সত্য কিন্তু ধর্ম্মের পবিত্র পথ হতে একদিনের জন্যও বিচ্যুত হন নি, আজন্ম শুদ্ধাচারী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ তিনি! তাঁরই ছেলে অশোকের এমনতর অধঃপতন হবে—একথা যে স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না হরনাথ।

গৃহিণী বললেন, অতুল স্বচক্ষে দেখে এসেছে—

ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন হরনাথ, কি দেখে এসেছে! ডাক তোমার অতুলকে। আমি সব কথা তার মুখ থেকেই শুনতে চাই।

—বেশ ত, আমি এখুনি ডেকে আনছি অতুলকে। অমন রাগ করছ কেন তুমি। যা সত্যি তাই বললাম। ডাইনীর কবলে না পড়লে আমার সোনার অশোক আজ তিন মাস ধরে টাকা না পাঠিয়ে এমন চুপচাপ বসে থাকতে পারে! চোখে আঁচল ঢেকে বেরিয়ে গেলেন গৃহিণী।

এও কি সম্ভব! অনুগত অশোকের বুদ্ধিদীপ্ত চেহারাটা হরনাথের মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে। একমাত্র সন্তান অশোক! হরনাথের নিবিড় ভরসা, সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার একটি মাত্র আশ্রয়স্থল। বৃদ্ধের এই অন্তর্বেদনা সে কি ক্ষণিকের জন্যেও অনুভব করবে না!

অতুল এলে তার দিকে স্তিমিত চোখে তাকিয়ে হরনাথ বললেন, অশোকের ব্যাপার কি বল ত অতুল! তুমি কলকাতায় থাক, তুমিই সঠিক সংবাদ দিতে পারবে।

— ব্যাপারটা জানি বলেই ত কাকীমাকে পূর্ব্বে বলেছিলাম, সেকথা আপনারা বিশ্বাস করেন নি। আগে হতে সাবধান হলে এটা এত দূর গড়াত না। এখন ত দেখি, দুটিতে একেবারে গদগদ ভাব!

— মেয়েটির সন্ধান জান তুমি?

— খুব বড়লোকের মেয়ে। সুন্দরীও বটে। শুনেছি ওকেই নাকি পড়ায় অশোক। পড়া না অষ্টরম্ভা! হামেশাই ত দুজনে মোটরে করে ঘুরে বেড়ায় দেখেছি।

—তাই নাকি! অশোকটা এত দূর জাহান্নামে গেছে!

—সত্যি কথা বলতে কি, অশোকের তত না দোষ হরকাকা, মেয়েটা একেবারে নাছোড়বান্দা! হাতের কাছে একটা সুন্দরী মেয়ে যদি অনবরত ঘুরঘুর করতে থাকে তা হলে পুরুষমানুষের মন আর কতক্ষণ স্থির থাকতে পারে? আজকাল ত দেখি মেয়েটাই অশোকের বাসায় যাতায়াত করে।

—এবার অশোকের সঙ্গে তোমার দেখা হলে তাকে বলে দিও অতুল যে দারিদ্র্যে, অনশনে তোমার বাবার যত কষ্টই হোক, পাপাচারী সন্তানের মুখ তিনি আর জীবনে

কোনদিন দর্শন করবেন না, আর কোন অবস্থাতেই তার দেওয়া অর্ঘও তিনি গ্রহণ করবেন না।

রাগে, অপমানে, দুঃখে হরনাথের সারা দেহটা থরথর করে কাঁপতে থাকে। গৃহিণী একান্তে বসে চোখের জল ফেলেন। সারা বাড়ীটার সমস্ত আনন্দটুকুকে একটা বিশ্রী বিষণ্ণতার কালো ছায়া যেন নিমেষে গ্রাস করে ফেলে।

গৃহিণী বললেন, আর কেন বাপু, মানদাদিদি আশায় আশায় বসে থাকেন, তাঁকে এবার জবাব দিয়ে দাও গে।

চমকে ওঠেন হরনাথ। নিজের দিকটাই এতক্ষণ চিন্তা করছিলেন তিনি। সহায়-সম্বলহীন জীবনের শোচনীয় ব্যর্থতার বিলাপে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এদিকটা যে আরও সাংঘাতিক, আরও সমস্যাসঙ্কুল!

ওপাড়ার আবাল্যবন্ধু দীননাথ যখন মারা যান তখন সেই মৃত্যুপথযাত্রীর শেষশয্যার পাশে বসে তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন হরনাথ, তুমি নিশ্চিন্ত হও দীনু, তোমার কন্যার সকল ভার আমি গ্রহণ করলাম। আশীর্ব্বাদ করে যাও আমার অশোককে, তার সঙ্গেই তোমার মেয়ের বিয়ে দেব। কৃতজ্ঞতায় অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল সেই পরপারযাত্রীর দীপ্তিহীন দুটি চক্ষু!

তখন আর অমলা কতটুকু! আট-ন'বছরের মেয়ে মাত্র! আর আজ সে অষ্টাদশী। পল্লীগ্রামে এত বড় মেয়ের অনূঢ়া থাকা রীতিও নয়, আর থাকেও না। একমাত্র অশোকেরই ইচ্ছায় বিধিসম্মতভাবে কেবল মন্ত্রপাঠটাই এত দিন হয় নি। কিন্তু মনে মনে হরনাথ জানেন, অমলা তাঁর পুত্রবধূ আর অমলার মাও জানেন অশোক তাঁর জামাতা।

আর অমলা! কিশোরী-জীবনের সমস্ত স্বপ্নমাধুরী দিয়ে তিলে তিলে অশোককে সে যে গড়ে তুলেছে আপনার স্বামী-রূপে। অন্তরের স্বর্ণ-সিংহাসনে একান্ত নিষ্ঠায় অশোককে প্রতিষ্ঠা করে দীর্ঘদিন যে নারী তার কুমারী-জীবনের সকল অর্ঘ্য সাগ্রহে নিবেদন করে এসেছে, সেই প্রতীক্ষা-বতা নারীকে কি করে এমন নিষ্ঠুরভাবে নিরাশ করবেন হরনাথ?

সংবাদটা পল্লবিত হয়ে অমলার কাছেও এসে পৌঁছল। প্রথমটা অমলা বিশ্বাস করে নি। কিন্তু মায়ের শোকাচ্ছন্ন মুখটা দেখে তার আর বুঝতে বাকি থাকে না কিছু। তড়িতাহতা লতার মত থরথর করে কাঁপতে থাকে। সমস্ত পুরুষজাতির প্রতি ঘৃণায় অবিশ্বাসে তার সারা মনটা ভরে যায়। ছিঃ ছিঃ, এই তার আবাল্যসহচর অশোক! এরই প্রেমে সে এতখানি বিশ্বাস করেছিল!

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আজ প্রথম অমলার মনে হ'ল তার মুখে কোন সৌন্দর্য্য নাই, রূপে কোন জৌলুস নাই, দেহে কোন লালিত্য নাই যার অমোঘ আকর্ষণে পুরুষচিত্ত দীর্ঘদিন ধরে বাঁধা থাকে। পরাজয় হয়ে গেছে অমলার। সৌন্দর্য্যসুষমার প্রতিযোগিতায় সে হেরে গেছে। আর সেই বেদনাময় পরাজয়ের সূচীতীক্ষ্ণ কণ্টকে ক্ষণে ক্ষণে রক্তাক্ত হয়ে ওঠে অমলার রিক্ত-শূন্য ঈর্ষাকাতর অন্তরস্থল।

সেদিন অশোকের মা অমলাদের বাড়ীতে বেড়াতে এসেছিলেন। এখনও আশা ছাড়েন নি তিনি। অমলার মাকে আশ্বস্ত করে বললেন, দেখি ভাই, আমি নিজে একবার কলকাতা যাব কর্ত্তাকে নিয়ে। গঙ্গাস্নানের নাম করে যাব। অবশ্য কর্ত্তা রাজী হবেন কিনা জানি না। যে রকম আবার মানুষ তিনি।

অমলার মা বললেন, ভগবান মুখ তুলে যেন তাকান। এ কি বিনামেঘে বজ্রাঘাত বল দেখি!

অমলা সাগ্রহে বলে, আপনি কলকাতায় যাবেন জ্যেঠাইমা?

—যাব বৈকি মা, যেমন করে পারি অশোককে তোর কাছে ফিরিয়ে আনব।

—আমিও আপনার সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যাব জ্যেঠাইমা।

—যাবি মা! তা হলে ত খুব ভাল হয়।

বিরক্তভাবে অমলার মা বললেন, কালামুখ নিয়ে তুই কি করতে যাবি হতভাগী?

যাবে, নিশ্চয়ই যাবে অমলা। অশোকের কাছে ভিক্ষে করতে নয়, তার কাছে চোখের জল ফেলতেও নয়—শুধু একবার তার প্রতিদ্বন্দ্বিনীকে দেখে আসবে। দেখে আসবে, সে মায়াবিনীর কি এমন মোহিনী রূপ যার প্রলোভনে ভুলে অশোকের মত পুরুষ ভুলে গেল তার কর্ত্তব্যবোধ, ব্যর্থ হ'ল অমলার আজীবন তপস্যা।

দৃঢ়কণ্ঠে অমলা জানাল, আমি আপনার সঙ্গে যাব জ্যেঠাইমা।

—আজই আমি কর্ত্তাকে বলে রাজী করাব মা। দেখি কি হয়। তার পর মা মঙ্গলময়ীর ইচ্ছা।

সন্ধ্যার সময় হরনাথকে কলকাতা যাবার কথা বলতেই তিনি একেবারে রাগে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে গেলেন। বললেন, ক্ষেপেছ, সে ছেলের মুখদর্শন করতে আছে!

—কিন্তু অমলার মুখ চেয়েও ত একবার চেষ্টা করা উচিত। তা ছাড়া অমলা শুদ্ধ যখন যাবে বলছে।

অমলার কথায় গম্ভীর হয়ে গেলেন হরনাথ। গতাসু দীননাথের আত্মা শান্তি পাবে না। প্রতিশ্রুতিভঙ্গের মহা-

পাপে লিপ্ত হবেন হরনাথ। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে বললেন, বেশ, আমি কলকাতা যেতে রাজী আছি কিন্তু কোন ফল হবে বলে মনে হচ্ছে না!

—দেখই না, আমাদের অশোক ত এমন নিষ্ঠুর ছিল না কোনদিন। আমরা গেলে কি আর সে···

—না না, আমাদের জন্য যেন কাঁদাকাটা ক'রো না। সে আমার কিছুতেই সহ্য হবে না।

কোন রকম সংবাদ না দিয়ে অকস্মাৎ যাবার সঙ্কল্প করলেন হরনাথ। স্বচক্ষে সেই পাষণ্ডের অধঃপতন দেখে আসবেন। ঘণ্টাখানেকের বেশী এক মুহূর্ত্তও সেখানে থাকবেন না। অভিশাপ দেবেন অশোককে। আর যে ছলনাময়ী লাস্যবিভ্রমা নারী তাঁর সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্নকে নিষ্ঠুর আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে—তার উদ্দেশে এই নিষ্ঠাবান সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত ছিন্ন করে আসবেন হরনাথ। পিতৃহৃদয়ের কোন দুর্ব্বলতা তার পথরোধ করতে পারবে না।

পরদিন রাত্রের ট্রেণে যাত্রা করলেন হরনাথ। সঙ্গে বৃদ্ধা স্ত্রী এবং কুমারী অমলা।

অতুলের কাছ থেকে খবর পেয়েছেন হরনাথ, অশোক এখন আর পূর্ব্বের মেসের ঠিকানায় থাকে না। বৌ-বাজারের একটা বিরাট বাড়ীতে থাকে। তা ত থাকতেই হবে। ধনীকন্যাকে নিয়ে ত আর কুটীরে থাকা সম্ভব নয়। অতুল অবশ্য বাড়ীটার নম্বরও যোগাড় করে দিয়েছে।

হাওড়া ষ্টেশনে নেমে নিজেকে কঠোর করে তোলেন হরনাথ। অশোকের সঙ্গে সব চুকিয়ে কালীঘাটে গঙ্গাস্নান করে মায়ের পূজা সেরে যে ট্রেণ পাওয়া যাবে সেই ট্রেণেই বাড়ী ফিরবেন তিনি।

বেলা যখন দশটা তখন সেই প্রাসাদতুল্য বাড়ীটার দরজায় এসে দাঁড়াল ঘোড়ার গাড়ীটা। কোচম্যানের ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন হরনাথ। হঠাৎ বাড়ীটায় ঢুকতে ইতঃস্তত করেন।

সেই সময় একটা হিন্দুস্থানী চাকরকে দরজা হতে দেখতে পেয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে অশোক বাঁড়ুজ্জে বলে কেউ থাকে?

—জী।

—বাড়ীতে আছেন তিনি?

—হাঁ, হুজুর।

—তাকে বলগে ত যে কৃষ্ণপুর হতে হরনাথ বাঁড়ুজ্জে এসেছে।

অল্পক্ষণ পরেই একটি সপ্তদশী কুমারী ব্যস্ত হয়ে নেমে আসে। ক্ষীণাঙ্গী এক শ্যামা। সদ্যস্নানে সিক্ত কেশভার আলুলায়িত। আবরণে আভরণে কোথাও ধনীকন্যার প্রকাশ মাত্র নেই। শুধু দৃঢ়নিবদ্ধ ওষ্ঠে একটা যেন কি আছে যার জন্যে অল্পবয়স্কা হলেও তাকে যেন অগ্রাহ্য করার উপায় নেই।

মেয়েটি মিষ্টি হেসে নমস্কার জানিয়ে বললে, আসুন।

হরনাথের দৃষ্টি রুক্ষ হয়ে উঠেছে। গৃহিণীর মুখখানা বিরক্তিতে অপ্রসন্ন। শুধু আশ্চর্য্য হয়ে গেছে অমলা। অতিসাধারণ তুচ্ছ একটা নারী আর একেই নাকি ভয় করেছিল সে। এ অশোকের সাময়িক মোহ ছাড়া আর কিছু নয়। দু'দিনের মধ্যেই তা কর্পূরের মত উবে যাবে।

অশোকের ঘরে ঢুকে অশোককে দেখেই আর্ত্তনাদ করে ওঠেন হরনাথ, এ কি অশোক, তুমি অসুস্থ?

শীর্ণ, পাণ্ডুর অশোকের চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে। রোগজীর্ণ অক্ষম দেহখানা শুধু যেন একটা শয্যালীন নর-কঙ্কাল।

—কতদিন তুমি এমন ভাবে ভুগছ অশোক? ককিয়ে ওঠেন হরনাথ।

—আজ তিন মাস বাবা। আপনাকে জানাই নি শুধু এই ভেবে যে, এই কঠিন ব্যাধির নাম শুনে বৃদ্ধবয়সে আপনি হয়ত তা সহ্য করতে পারতেন না। আমার অনেক তপস্যার ফল, যে এই অরুণাকে আমি ছাত্রীরূপে পেয়েছিলাম। এর সেবাযত্ন, অর্থব্যয় আর অকুণ্ঠ ত্যাগ দেখে মনে হয়েছে গত জন্মে ও হয় ত আমার মা ছিল আর আমি ছিলাম ওর সন্তান।

—কি হয়েছে তোমার অশোক।

—টি-বি।

—টি-বি অর্থাৎ রাজযক্ষ্মা? হে ভগবান!

অরুণা তাড়াতাড়ি অভয় দিয়ে বলে, কিছু ভাববেন না বাবা। এখন রোগটা ভালোর দিকে। ডাক্তারে যথেষ্ট আশা দিয়েছেন। আর আজকাল এ ব্যাধি মারাত্মক ত নয়ই বরং সেরেও উঠছে অনেকে। বিশ্বাস করুন আপনি, নিশ্চয়ই মাষ্টারমশাইকে রোগমুক্ত করে আপনাদের কাছে ফিরিয়ে দিতে পারব।

হরনাথ সজল চোখে অরুণার দিকে তাকিয়ে বললেন, জানি না মা তুই কে। তুই জানিস না, এই হতভাগ্য বৃদ্ধ মূর্খ ব্রাহ্মণ তোর কাছে কতখানি অপরাধী। তুই আমাকে ক্ষমা করিস মা।

—ছিঃ ছিঃ, এ কি বলছেন আপনি। চলুন, রাত্রি জেগে এসেছেন, এখন স্নান করে জল খেয়ে সুস্থ হন। আসুন মা।

অমলার দিকে ফিরে অরুণা বলে, তুমি নিশ্চয়ই অমলা।

তুমি ভাই একটু বস মাষ্টারমশায়ের কাছে। ওঁদের ব্যবস্থা করে পরে তোমায় নিয়ে যাব।

অমলা যেন আর কথা বলতে পারছে না। অরুণার কাছে নিজেকে বড়ই তুচ্ছ ও হীন মনে হয়। মিথ্যা কুৎসায় বিশ্বাস করে কাকে সে কি মনে করেছিল!

অমলা বল্লে, অতুলদাই এর জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী। সেই-ই ত প্রচার করলে, তুমি কোন্ একটা বড়লোকের মেয়ের প্রেমে পড়েছ।

অশোক তার শীর্ণ ওষ্ঠে মৃদু হাসির রেখা টেনে বললে, সত্যি কথাই বলেছিল অতুল। প্রেমে আমি পড়েছি অমলা, আর সে মেয়ে ধনীকন্যাই বটে! দেখবে আমার প্রেমিকার রূপ?

পাশের টেবিল হতে একখানা এক্স-রে প্লেট বের করে বুকের বাঁ দিকের সাদা-কালো দাগগুলো দেখাতে দেখাতে বলল অশোক, এই দেখ আমার বাম-পার্শ্ববর্তিনী বক্ষোলগ্না প্রেয়সী—যার আশ্লেষবিলোল নিবিড় প্রেমের কঠিন আলিঙ্গনে আমার বুক হতে রক্ত ঝরে পড়ে। বলতে বলতে অশোক হেসে উঠল।

সে হাসি শুনে অমলা আর স্থির থাকতে পারল না—চীৎকার করে কেঁদে উঠল, তুমি অমন করে হেসো না—তুমি অমন করে হেসো না!

বসন্তের পাখী

শ্রীকালিদাস রায়

বসন্ত ফুরায়ে যায় কি করি এখন?
তাতিয়া মাতিয়া উঠে মলয় পবন।
মঞ্জরী পড়িছে গলি
গুঞ্জরি ফিরে না অলি
উৎসব গিয়াছে চলি, কে শোনে কূজন?

জানি না বসন্ত কবে ফিরিবে আবার,
কেমনে জীবন ধরি আশে আশে তার?
বসন্তের পাখী হেন
আমারে করিলে কেন?
চারণ করিলে কেন কুসুম-সভার?

করিলে না কেন তুমি কপোত আমায়?
বারো মাস কূজিতাম ঘরের সাঙায়।
আমার মধুর গান
মাতাত বধূর প্রাণ,
ঝরিয়া পড়িত ঘুম চপল ডানায়।

এর চেয়ে করিলে না কেন মোরে কাক
সমান যাহার কাছে ফাল্গুন বৈশাখ?
তোমারে স্মরণ করে
সবাই জাগিত ভোরে
সহসা ঘুমের ঘোরে শুনি মোর ডাক।

আমারে করিলে কেন বসন্তের পাখী?
বসন্ত ক'দিন থাকে? এ তোমার ফাঁকি!
আর যত ঋতু মোরে
পর ভেবে যায় সরে,
বসন্ত ফুরায়ে গেল, লও মোরে ডাকি।

সমুদ্রের মাছ

শ্রীঅণিমা রায়

যে সকল লোকের মনের ভাব সহজে বোঝা যায় না বা ধরতে পারা যায় না, চলিত বাংলা ভাষায় তাদের গভীর জলের মাছ বলা হয়। অর্থাৎ গভীর জলের মাছ ধরা যেমন শক্ত, এই সব লোকের মনের ভাব ধরাও তেমনি সুকঠিন। যা হোক এ প্রবন্ধে মানুষের কথা বলা হবে না; গত সাত বৎসরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার যে অতি-প্রয়োজনীয় শিল্পটি পশ্চিম বাংলায় প্রতিষ্ঠিত করছেন, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হবে।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, সুইডেন, নরওয়ে, জার্মানী, ডেনমার্ক, আমেরিকা, রাশিয়া ও জাপান প্রভৃতি অগ্রগামী দেশে বহুকাল থেকে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরা চলছে। বহু গবেষণা করে এই সব জাতি গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার পন্থা ঠিক করে নিয়েছেন এবং সমুদ্রে মাছ ধরবার উপযোগী জাহাজ তৈরি করেছেন। এই সব জাহাজকে "ট্রলার" বলে। ট্রলারের সাহায্যে এরা গভীর সমুদ্র থেকে নানাবিধ মাছ ধরে সেগুলি বেশ ভাল অবস্থায় স্ব-স্ব দেশে নিয়ে আসেন। সুখাদ্য মাছ জনসাধারণে খায় আর নিরেশ কতকগুলি মাছ থেকে নানাবিধ তেল ও সার তৈরি করা হয়। ঐ সব দেশে গভীর সমুদ্রের মাছ ধরে আনা আজ একটি বড় শিল্পে দাঁড়িয়েছে এবং সেইসঙ্গে বেশ একটি বড় রকমের বাণিজ্য গড়ে উঠেছে। এই সব শিল্প-বাণিজ্যে কাজ করে বহু লোক অন্নসংস্থান করে থাকে। ইংলণ্ড, ডেনমার্ক, জাপান প্রভৃতি দেশে চাষের জমি খুব কম, সমুদ্রের মাছ সেখানে কতক পরিমাণে খাদ্যাভাব মোচন করেছে।

ভারতের তিন দিকে সমুদ্র; অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে, ইংরেজ আমলে ভারতে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরবার ব্যাপকভাবে কোন চেষ্টা হয় নি। অবশ্য ১৯০৮ সনে তৎকালীন মৎস্যবিভাগের কর্তা স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত ইংলণ্ড থেকে "গোল্ডেন ক্রাউন" নামক একটি ষ্টীমসবী ট্রলার আনিয়ে বঙ্গোপসাগরের একটি মোটামুটি মৎস্যজরীপ করান এবং কিছু কিছু গভীর সমুদ্রের মাছও ধরান। কিন্তু তাঁর কর্মবিরতির সঙ্গে এই কাজ বন্ধ হয়ে যায়। গুপ্তকৃত বঙ্গোপসাগরের এই মৎস্যজরীপ প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল (১৯৫২ সন পর্যন্ত) বঙ্গোপসাগরের একমাত্র মৎস্যজরীপ বলে পরিগণিত হয়েছে।

মাছ বাঙালীর একটি প্রয়োজনীয় এবং প্রিয় খাদ্য। বাঙালী জাতি মৎস্যাশী। বাংলার নদী, খাল, বিল ও পুষ্করিণী থেকে যা মাছ পাওয়া যায় এবং সুন্দরবনের ধৃত মাছ একত্র করলেও বাংলার মাছের চাহিদা মেটান যায় না। তৎকালীন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার মৎস্যবিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর শ্রী টি. এ সাউথওয়েল, বহুকাল গবেষণা করে তাঁর লিখিত পুস্তিকায় এ বিষয়ে ভাল করে লিখে গেছেন। (Bulletin no4, Some remarks on fishery questions in Bengal, 1914)। এখন দেশটি ভাগ হয়ে গেছে। বাংলার নদী, খাল, বিল এবং সুন্দরবনের বহু অংশ পূর্ব্ব-পাকিস্থানের অন্তর্গত হয়ে পড়েছে। পশ্চিম বাংলার লোক-সংখ্যা বাস্তুহারা সমেত অসম্ভব বেড়েছে। ফলে আজ মৎস্য-সমস্যা এমন জটিল হয়ে পড়েছে যে, শতকরা পঞ্চাশ জন বাঙালী মাছ খেতে পায় না এবং পঁচিশ জন নামেমাত্র মাছ খায়। অথচ পশ্চিম বাংলার দক্ষিণে লাগোয়া বঙ্গোপসাগর এবং এই সমুদ্রে অফুরন্ত মাছ ঘুরে বেড়ায়। এ মাছ চাষ করতে হয় না—শুধু ধরে আনতে পারলেই হয়। লোকসংখ্যার তুলনায় পশ্চিম বাংলায় মৎস্য চাষের জমি খুব কম। কাজেই খাদ্যাভাব লেগেই আছে। বঙ্গোপসাগর কলিকাতা থেকে মাত্র ষাট মাইল দূরে। পর্য্যাপ্ত সামুদ্রিক মাছ আনতে পারলে পশ্চিম বাংলার খাদ্যাভাব কতক পরিমাণে কমে এবং বাঙালী মাছ খেতে পায়।

এই সব চিন্তা করে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ১৯৫০ সনের গোড়ায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে ট্রলার যোগে বঙ্গোপসাগরে গভীর জলের মাছ ধরবার সঙ্কল্প করেন এবং বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে এই কাজের জন্য একটি পরিকল্পনার খসড়া তৈরি করান। ২রা জুন ১৯৫০ সনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই পরিকল্পনা মঞ্জুর করেন এবং প্রথম বৎসরে খরচের জন্য ১৮'৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেন। পরিকল্পনাটির উদ্দেশ্য:

(১) বঙ্গোপসাগরের কোন কোন স্থানে বেশি মাছ পাওয়া যায় এবং বৎসরের কোন কোন মাস মাছ ধরবার প্রশস্ত সময় তা নির্দ্ধারণ করা; সমুদ্রের তলায়, তলা ও উপরের মাঝামাঝি জলে এবং উপর থেকে পাঁচ-ছয় হাত নিচের জলে কি রকমের মাছ পাওয়া যেতে পারে তা বুঝে নেওয়া, বঙ্গোপসাগরে কি রকমের জালে ও যন্ত্রপাতিতে ভাল কাজ হবে তা ঠিক করা।

(২) সমুদ্রে মাছ ধরা।

(৩) একদল ভারতীয়কে ট্রলারের ও গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার কাজে সুশিক্ষিত করা বা ধীবর-নাবিক তৈরি করা।

সময় নষ্ট না করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ডেনমার্কে স্কারেক্লিষ্ট ও শ্রীশ্চানব্রডার নামক দুটি পুরাতন ট্রলার কেনেন। প্রত্যেকটির মূল্য তিন লক্ষ টাকা। ট্রলার দুটি ১৯৫০ সনের অক্টোবর মাসের গোড়ায় ডেনমার্ক থেকে বেরিয়ে নিজ শক্তিতে ১৯৫০ সনে ১২ই

এবং ১৩ই ডিসেম্বরে কলিকাতা বন্দরে এসে পৌঁছায়। প্রত্যেকটি ট্রলারের সঙ্গে এসেছিল ডেনমার্কদেশীয় কাপ্তেন, ইঞ্জিনীয়ার, মেট এবং ছজন ধীবর-নাবিক। ১৪ই ডিসেম্বর স্বারেক্লিষ্ট ও ব্রীশ্চান-প্রভারের নতুন নাম দেওয়া হয় সাগরিকা এবং বরুণা। ১৯৫০ সনে ২৫শে ডিসেম্বরের মধ্যে সমুদ্রে মাছ ধরবার যোগাড়যন্ত্র সম্পূর্ণ করা হয় এবং ২৬শে সকালে ট্রলার ছুটি বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরবার জন্য প্রথম যাত্রা করে।

১৯৫১ সনে ২২শে অক্টোবরের মধ্যে সাগরিকা ও বরুণা পনেরো বার সমুদ্রযাত্রা করে এবং ৬৯৯৮ মণ মাছ বেশ ভাল অবস্থায় কলিকাতায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। প্রথম বৎসরেই এতটা কৃতকার্য্য হওয়া আনন্দের কথা। নিম্নলিখিত পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় যে, কাজ ভালই হয়েছিল :

ইংলণ্ডের ট্রলার উত্তর-সমুদ্রে দৈনিক মাছ ধরে	·৭১	টন
জার্ম্মানীর ,, ,, ,, ,,	১·৬৭	,,
হল্যাণ্ডের ,, ,, ,, ,,	১·৮৭	,,
স্কটলণ্ডের ,, ,, ,, ,,	১·২৭	,,
সাগরিকা ও বরুণা বঙ্গোপসাগরে ,, ,,	১·০	,,
গোল্ডেন ক্রাউন ,, ,, ,,	·৬৬	,,

প্রথমে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বহু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ট্রলার ছুটি তীরে লাগাবার, ট্রলার থেকে মাছ নামাবার এবং ট্রলারে জিনিসপত্র তোলবার জন্য কোনও জেটি ছিল না। জাহাজের ঠাণ্ডা খোল থেকে মাছ নামাবার, মাছ থেকে বরফ ছাড়িয়ে ওজন করবার কোনও অভিজ্ঞ লোক ছিল না। গুঁড়া বরফের সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল না। হাঙ্গরে যে সব জাল ছিঁড়ে দিত তা মেরামতের জন্য উপযুক্ত লোক ছিল না। যা হোক পশ্চিমবঙ্গ সরকার যতদূর সম্ভব অল্প সময়ে এই সব সমস্যার সমাধান করেন।

কলিকাতায় ৩নং গার্ডেনরীচ রোডে ধীবর-নাবিকদের একটি বিশ্রামাগার, একটি জেটি, একটি ছোট কারখানা, ঠাণ্ডাঘর প্রভৃতি ১৯৫১ সনে তৈরি করা হয়েছে। প্রথম বৎসরেই দশ জন ভারতবাসীকে শিক্ষানবীশ নিয়ে ধীবর-নাবিকের কাজ শিখিয়ে তিনজন ডেনমার্কদেশীয় ধীবর-নাবিককে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

সাগরিকা ও বরুণা প্রথম বৎসরে শুধু মাছ ধরেই সময় কাটায় নি। ২৪ পরগণা জেলার মাতলা নদীর মুখ থেকে আরম্ভ করে গাঞ্জাম জেলার ফুলিয়া নদীর মোহানা পর্য্যন্ত বঙ্গোপসাগরে মৎস্যজরীপ করে এগারটি মাছ ধরবার উপযুক্ত স্থান খুঁজে বার করেছে। এতদ্ভিন্ন তিন রকম জাল নিয়ে পরীক্ষা করেছে।

(১) ভাসা জাল—ভাসা মাছ ধরবার জন্য। এই রকম জালে বিশেষ ফল হয় নি।

(২) সমুদ্রের উপর ও তলার মধ্যবর্ত্তী জলের জন্য টানা জাল। ছুটি ট্রলারের মাঝে এই জাল ঝুলিয়ে টানা হয়। এতে প্রচুর মাছ পড়ে বটে, কিন্তু জালে আবদ্ধ মাছ খাবার জন্য হাঙ্গরেরা জালটি শতছিন্ন করে দেয়। উপস্থিত এই রকম জালে মাছ ধরা স্থগিত রাখা হয়েছে। ভবিষ্যতে এটি নিয়ে আরও পরীক্ষা করা হবে।

(৩) সমুদ্রের তলদেশের জন্য লোটানো জাল, এই জাল দিয়ে মাছ ধরা হয়ে থাকে এবং বেশ ভাল ফল পাওয়া যাচ্ছে।

প্রথম বৎসরে ধৃত মাছ বিক্রী করে ১,০৭,০৬৫ টাকা পাওয়া যায়। এতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচুর লোকসান হয় বটে কিন্তু উপরিউক্ত এতগুলি কাজ করলে এ রকম লোকসান অবশ্যম্ভাবী।

১৯৫২ সনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমুদ্রের গভীর জলে মাছ ধরবার পরিকল্পনাটি ভারতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বৎসরে নয় মাসকাল গভীর সমুদ্রে মাছ ধরা হয়। বাকী তিন মাস বর্ষাকাল—সমুদ্র অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ থাকে, ভাল মাছ পাওয়া যায় না। এই সময়ে জাল, যন্ত্রপাতি ও ট্রলার মেরামত করা হয়।

১৯৫৫ সনের মার্চ্চ মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকার টি. সি. এ প্রোগ্রামে তিনটি জাপানী বুল-ট্রলার প্রাপ্ত হন। তখন সাগরিকা ও বরুণার নাম বদলে কল্যাণী (১) এবং কল্যাণী (২) রাখা হয় এবং জাপানী ট্রলার তিনটির নাম কল্যাণী (৩) কল্যাণী (৪) এবং কল্যাণী (৫) দেওয়া হয়।

ডেনমার্কদেশীয় একটি ট্রলার গত দেড় বৎসর ভগ্ন অবস্থায় পড়ে আছে; উপযুক্ত ডক না থাকাতে মেরামত করা যায় নি, ডেনমার্ক সরকারকে এ বিষয়ে জানান হয়েছে এবং তাঁরা জাহাজখানি মেরামত করবার জন্য যন্ত্রপাতিসহ একজন অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ার পাঠিয়েছেন। এই ট্রলারটি শীঘ্র কর্ম্মক্ষম হবে।

উপস্থিত ডেনমার্কদেশীয় একজন ক্যাপ্টেন ছাড়া বাকী সব ডেনমার্ক-দেশীয় ধীবর-নাবিকদের বিদায় দেওয়া হয়েছে এবং ভারতীয় ধীবর নাবিকেরা এই কাজ বেশ ভালভাবে করছে। এখনও ক্যাপ্টেন, ইঞ্জিনীয়ার, মেট প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ভারতীয় কর্ম্মচারীর যথেষ্ট অভাব রয়েছে। ভারতীয়দের এই কাজ শেখাবার জন্য বৈদেশিক বিশেষজ্ঞ আনার প্রয়োজন। এই কাজের জন্য এফ. এ ও একজন বিশেষজ্ঞ জাপানী ভদ্রলোককে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট পাঠিয়েছেন। দু'জন জাপানী ইঞ্জিনীয়ারও রাখা হবে শোনা যাচ্ছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদকালে কল্যাণী (১) এবং কল্যাণী (২) ১২৭ বার সমুদ্রযাত্রা করেছিল এবং ১৪৮৮ টন মাছ ধরে আনে। এই সময়ের মধ্যে কল্যাণী (৩), কল্যাণী (৪) এবং কল্যাণী (৫) ৪৬ বার সমুদ্রযাত্রা করে এবং ২৭০ মাছ ধরে আনে। ৪৩ জন ভারতীয়কে ধীবর-নাবিকের কাজে সুশিক্ষিত করা হয়।

১৯৫৬ সনে কল্যাণী (১) এবং কল্যাণী (২) ৮বার সমুদ্রযাত্রা করে ১৬৫ টন মাছ ধরে আনে এবং কল্যাণী (৩), (৪), (৫) ১৯ বার সমুদ্রযাত্রা করে ৩১৭ টন মাছ ধরে আনে।

সমুদ্র কলকাতা থেকে ষাট মাইল দূরে। এখান থেকে ট্রলার যাতায়াত করতে বহু সময় নষ্ট হয় এবং ধৃত মাছও মাঝে মাঝে খারাপ হয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেইজন্য কাকদ্বীপে হারউড পয়েন্টের পাশে একটি মাছের ষ্টেশন নির্ম্মাণ করবার সঙ্কল্প করেন। ষ্টেশনে একটি বড় জেটি, ধীবর-নাবিকদের বাসস্থান বরফ-কল, মাছ রাখবার ঠাণ্ডাঘর, রাস্তা প্রভৃতি তৈরি করা হবে। কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ সব কাজের জন্য ২৭.৪৭ লক্ষ টাকা মজুত রাখা হয়েছে। ১০ লক্ষ টাকা ১৯৫৬-৫৭ সনে খরচ করা হয়েছে এবং ১৯৫৭-৫৮ সনে ১৭.৪৭ লক্ষ টাকা খরচ করা হবে। হারউড পয়েন্টে জেটি ও ষ্টেশন তৈরি হয়ে গেলে আরও কয়েকটি ট্রলার আনা হবে এবং একসঙ্গে অনেকগুলি ট্রলার সমুদ্রযাত্রা করতে পারবে। এখন মাসে একটি ট্রলার মাত্র দুবার সমুদ্রযাত্রা করতে পারে, ষ্টেশনটি তৈরি হয়ে গেলে তিন বা ততোধিকবার সমুদ্রযাত্রা করতে পারবে। পাশেই মেরামতের কারখানা থাকায় কোন ট্রলারকে বেশিদিন বসে থাকতে হবে না। পূর্ব্বে প্রতি ক্ষেপে প্রায় ৭০০ মণ মাছ ধরা হ'ত এখন ১,০০০ মণের উপর মাছ ধরা হয়। নূতন ষ্টেশনটিতে কাজ আরম্ভ হলে প্রতি ক্ষেপে আরও বেশি মাছ ধরা যাবে। কাজেই খরচ অনেক কমে যাবে।

যাঁরা পুরীতে বা দীঘায় বেড়াতে গেছেন তাঁরা দেখেছেন যে, স্থানীয় জেলেরা ডিঙ্গী চড়ে সমুদ্রে মাছ ধরতে যায় এবং ঢেউয়ের সঙ্গে লড়তে লড়তে ডিঙ্গী বোঝাই করে নানাবিধ মাছ নিয়ে আসে। তারা ২৫.৩০ ফুট জলে মাছ ধরে। ট্রলার সমুদ্রের আরও অনেক দূরে যায় এবং ৬০ ফুট থেকে ৩০০ ফুট গভীর জলে মাছ ধরে। ট্রলারযোগে ৯২ রকমের মাছ ধরা পড়েছে; তবে তার মধ্যে সব মাছ মানুষের খাওয়ার উপযুক্ত নয়। মানুষের খাওয়ার উপযোগী মাছ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে:

১ম শ্রেণীর—পমফ্রেট, ইলিশ, ভেটকি, চিংড়ী, গুড়জাউলী, তপসে, সিলি প্রভৃতি।

২য় শ্রেণী—নানাবিধ চাঁদা খয়রা, ভোলা, সারেডিন, ফ্যাসা, হেরিং, বম্বেডাক, কুচো চিংড়ী প্রভৃতি।

৩য় শ্রেণী—ছোট হাঙ্গর, কুচে, নানাবিধ বানমাছ, মাগুর জাতীয় মাছ প্রভৃতি।

এসব মাছের চাহিদা আছে এবং কলিকাতার প্রায় সব বাজারেই এই সব মাছ।০ আনা থেকে ১।০ টাকা পর্য্যন্ত সেরে বিক্রী হচ্ছে। অল্প আয়ের গৃহস্থের পক্ষে এ সব মাছ অশেষ কল্যাণপ্রদ হয়েছে। সমস্ত পশ্চিম বাংলায় এই মাছ ছড়িয়ে ফেলতে হবে যাতে জনসাধারণ ভাল করে মাছ খেতে পায়।

সম্প্রতি শিক্ষানবীসহ জাপান সরকারের একটি ট্রলার কলকাতা বন্দরে এসেছিল। ফেরবার পথে বঙ্গোপসাগরে এই ট্রলারটি একটি "টুনা"মৎস্যস্থল স্থানের সন্ধান পায় এবং বহু মাছ ধরে। আমাদের এই ট্রলার এই সঙ্গে গিয়েছিল, তার ধীবর-নাবিকেরাও "টুনা" মাছ ধরে। এ মাছ অত্যন্ত সুস্বাদু এবং ইউরোপ ও জাপানে এ মাছের আদর আছে।

এই ভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পশ্চিম বাংলায় একটি বড় এবং অতি-প্রয়োজনীয় শিল্প গড়ে তুলেছেন। এখন অবশ্য প্রতি বৎসরই লোকসান হচ্ছে এবং লোকসানের মাত্রা খুব কম নয়। অজ্ঞলোকেরা বলাবলি করছে যে, এ কাজটি বিধানবাবুর পাগলামী—একেবারে নিছক ছেলেমানুষী। কিন্তু যে টাকাটা লোকসান ভাবা হচ্ছে, সেটি কি সত্যই লোকসান? সমুদ্রে মৎস্যজরীপ করা, জাল-যন্ত্রপাতি ঠিক করা, ট্রলার কেনা, ঘরবাড়ী, জেটি, কারখানা, ঠাণ্ডাঘর প্রভৃতি তৈরি করা এসব কাজে বহু টাকা ব্যয় হয়ে গেছে। এ ব্যয় আশুফলপ্রদ নয়। কিন্তু এটি কি লোকসান? তা ছাড়া মোটা মাহিনায় বিদেশ থেকে ধীবর-নাবিক এনে একদল বাঙালীকে ট্রলারের ও ধীবর-নাবিকের কাজ শেখান হয়েছে—এতেও বহু টাকা ব্যয় হয়ে গেছে। এ সব ব্যয়ের সুফল ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে। টাকার অপব্যয় হওয়া নিন্দনীয় কিন্তু এ কাজে আমরা একেবারে অজ্ঞ ছিলাম—কিছুটা অপব্যয় হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আশা করেন যে, আগামী দু' বৎসরের মধ্যে লোকসান হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে এবং সব টাকা ক্রমে লাভ থেকে ফেরত আসবে। এই শিল্পটি এইভাবে দাঁড়িয়ে গেলে দেশের ধনী কারবারীদের এদিকে নজর পড়বে। তাঁরাও ট্রলারযোগে মাছ ধরবার কাজে নেমে পড়বেন এবং টাকা ঢালবেন। অন্যান্য দেশের ন্যায় পশ্চিম বাংলায় সরকারী ও বেসরকারী ট্রলারবাহিনী গড়ে উঠলে সমস্ত পশ্চিম বাংলায় সুলভমূল্যে প্রচুর মাছ পাওয়া যাবে এবং এই নূতন শিল্পে এবং তৎসংশ্লিষ্ট বাণিজ্যে বহু বাঙালী জীবিকার্জ্জন করবেন।

পশ্চিম বাংলায় আজ দারুণ খাদ্যাভাব এবং জটিল বেকার-সমস্যা। মৎস্যের এই বিকল্প খাদ্যের ব্যবস্থা করে এবং একটি নূতন পথে একদল লোকের জীবিকার্জ্জনের ব্যবস্থা করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমস্ত চিন্তাশীল বাঙালীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন।

ব্রিটিশ গায়েনা

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

অবস্থান ও অধিবাসী

ব্রিটিশ গায়েনা দক্ষিণ-আমেরিকার উত্তর-সমুদ্রকূলের একটি দেশ। ইহার উত্তরে ভেনেজুইলা, পশ্চিমে এবং দক্ষিণে ব্রেজিল এবং পূর্বে ডাচ-অধিকৃত সুরিনাম। ৮৩,০০০ বর্গমাইল স্থান লইয়া দেশটি বিস্তৃত। তিনটি বৃহৎ নদী—এসেকুইবো, ডেমেরারা এবং বার্বিস এই দেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। সমুদ্র-তীরবর্তী ভূমি ২৭০ মাইল দীর্ঘ এবং প্রায় দশ মাইল চওড়া; ভূমি পূর্ণ জোয়ারের জলস্ফীতি অপেক্ষা নিম্নবর্তী হওয়ার দরুণ নানা উপায়ে এবং জল-নিকাশের খাল কাটিয়া উহাকে রক্ষা করিতে হয়। অথচ উপনিবেশের এই অংশই জনবসতিপূর্ণ এবং উন্নত—শতকরা ৯০ জন অধিবাসীর বাস এই স্থানে, প্রচুর পরিমাণে চিনি ও ধান্য উৎপন্ন এখানেই হয়। দেশের ভিতরের অধিকাংশ স্থান অগম্য—নদীপথেও প্রবেশ করা যায় না, কারণ অনেক স্থলেই জলপ্রপাত এবং নদীগুলি পার্বত্য বন্ধুর পথে প্রবাহিত। জঙ্গলে বৃক্ষাদি প্রচুর, কিন্তু অনেক গাছই মানুষের কাজে লাগে না—যদিও বেশ কিছু কাঠ বিদেশে চালান হয়। দেশের সমুদ্র-তীরবর্তী দক্ষিণ-পূর্ব অংশ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত প্রচুর ঘাসের জমি বা সাভানায় পূর্ণ। এই সকল জমিতে দুগ্ধের জন্য বা মাংসের জন্য পশুপালন করা হয়। ব্রিটিশ গায়েনায় নানা প্রকার ধাতুদ্রব্যাদি পাওয়া যায়, তন্মধ্যে বাকসাইট (যাহা হইতে এলুমিনিয়ম হয়), ম্যানগ্যানিজ, হীরক এবং স্বর্ণ উল্লেখযোগ্য।

ব্রিটিশ গায়েনার বহু জাতির বাস, ১৯৫৬ সনে ইহাদের মোট সংখ্যা ছিল আনুমানিক ৪,৯৯,০০০ জন। ভারতীয়ের সংখ্যা অর্দ্ধেকের কিছু কম, আফ্রিকা হইতে আগতদের বংশধরের সংখ্যা প্রায় এক-তৃতীয়াংশ, অল্পসংখ্যক চীনা ও পর্তুগীজ। আর দেশের অভ্যন্তরে বাস করে প্রায় ১৯,০০০ এমার-ইণ্ডিয়ান—যাহারা দক্ষিণ-আমেরিকার আদিমতম অধিবাসীগণের বংশধর।

আফ্রিকান অধিবাসিগণ ক্রীতদাসের বংশধর—১৮৩৪ সনে ইহারা দাসত্বমুক্ত হয়। দাসপ্রথা রোধ হইলে এষ্টেটের মালিকগণ চুক্তি করিয়া চীনা ও পর্তুগীজ শ্রমিক আমদানী করে—কিন্তু ইহারাও পরে চাষ ছাড়িয়া শহরে ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত হয়—বর্তমান চীনা ও পর্তুগীজেরা ইহাদের বংশধর। অতঃপর চিনির এষ্টেটের মালিকেরা চুক্তি করিয়া ভারতীয় মজুর আমদানি করে। চুক্তির সর্ত অনুযায়ী অনেকে দেশে ফিরিবার জন্য অর্থ পাইবার অধিকারী হইয়াও সেই দেশেই থাকিয়া যায়—আজ তাহাদের সন্তান-সন্ততিরাই সংখ্যায় সর্বাধিক।

ব্রিটিশের প্রভুত্ব

ইউরোপীয়ের এদেশে আসিবার পূর্বে এ দেশ কিরূপ ছিল তাহার ইতিহাস জানা যায় না। স্পেনীয় নাবিকেরা পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে দক্ষিণ-আমেরিকার এই সমুদ্র-তীরভূমি আবিষ্কার করে। ষোড়শ ও সপ্তদশ এই দুই শতাব্দীতে স্পেনীয়, পর্তুগীজ, ইংরেজ, ফরাসী এবং ডাচ অভিযানকারীরা তাহাদের স্বপ্নের "সুবর্ণ ভূমির" (El Dorado) সন্ধানে এই অঞ্চলে খুবই আনাগোনা করে। তখন এ দেশের অধিবাসী ছিল আদিম ইণ্ডিয়ানগণ—সাধারণতঃ ক্যারিব, আরাওয়াক এবং ওয়ারো উপজাতীয় লোকেরা।

১৫৩০ এবং ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইংরেজ নাবিকগণ ব্রেজিল উপকূলে বাণিজ্যের জন্য বহুবার যাতায়াত করে। ইহার প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পরে—স্যার ওয়াল্টার র্যালে ১৫৯৫ সনে তাঁহার প্রথম নৌ-অভিযানের পরে "গায়েনা আবিষ্কার" (Discoveries of Guiana) নামক গ্রন্থে এ দেশে একটি উপনিবেশ স্থাপনের প্রস্তাব করেন। তিনি লেখেন যে, ওরিনোকো এবং এ্যামাজন এই দুই নদীর মধ্যবর্তী দেশে এক উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ইংলণ্ডের রাণীর অধীনে এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়িয়া তোলা সম্ভব।

১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াপেক নদীর ধারে, যাহা এখন ফরাসী গায়েনার অন্তর্ভুক্ত, ইংরেজরা সর্বপ্রথম একটি উপনিবেশ স্থাপন করিতে চেষ্টা করে। ১৬১৩ এবং ১৬২৭ সনেও এই চেষ্টা করা হয় কিন্তু কোন স্থায়ী উপনিবেশ স্থাপিত হইতে পারে নাই। ১৬৫০ সনে, এ দেশের যে অংশ এখন সুরিনাম নামে পরিচিত ইংরেজরা সেখানে একটি উপনিবেশ স্থাপন করে, কিন্তু ১৬৬৭ সনে ডাচেরা তাহা দখল করিয়া লয়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ডাচেরা এসেকুইবো এবং বার্বিস নদীর ধারে এবং ইহার কিছু পরে ডেমেরারা নদীর তীরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া এগুলিকে খুব শক্ত ভাবেই আঁকড়াইয়া থাকে যদিও ইংরেজ, ফরাসী এবং পর্তুগীজেরা মাঝে মাঝে কিছুকালের জন্য তাহাদের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করিতে ছাড়ে নাই। ১৭৯৬ সনে—ফরাসী বিপ্লবের যুদ্ধের সময়ে ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ বারবাদো হইতে আসিয়া এই উপনিবেশগুলি দখল করে। কিন্তু দেশগুলি ১৮০২ সনে ডাচদের প্রত্যর্পণ করা হয়। পরের বৎসর আবার ইহা ইংরেজরা দখল করিয়া লয়। ১৮১৪ সনে ডাচেরা দেশটিকে সম্পূর্ণভাবে ইংরেজের হাতে ছাড়িয়া দেয়। ১৮৩১ সনে তিনটি উপনিবেশ—এসেকুইবো, বার্বিস

এবং ডেমেরারা (বর্ত্তমান উপনিবেশের তিনটি বিভাগ) একত্র করিয়া কলোনী গঠিত হয়।

রাষ্ট্রীয় ক্রমবিকাশ

১৮০৩ সনে যখন উপনিবেশটি ইংরেজের অধিকারে আসে তখন ঔপনিবেশিকগণের অধিকার সম্বন্ধে গ্যারাণ্টি দেওয়া এবং শাসন-ব্যবস্থা ডাচেদের সময় যাহা ছিল তাহাই অপরিবর্ত্তিত রাখা হয়। আইন-সম্পর্কীয় সকল কাজ ছিল কোর্ট অব পলিসির হাতে। ইহা গবর্ণরসহ চারিজন সরকারী এবং চারিজন বে-সরকারী সদস্য লইয়া গঠিত ছিল। গবর্ণরের একটি অতিরিক্ত ভোট থাকিত। উপনিবেশের প্লাণ্টারগণ একটি 'নির্ব্বাচক মণ্ডলী' গঠন করিত; ইহারাই কোর্ট অব পলিসিতে চারিজন বে-সরকারী সদস্য নির্ব্বাচন করিত। ইহা ছাড়া একটি 'কম্বাইণ্ড কোর্ট' নামক সংস্থা ছিল। কোর্ট অব পলিসির সকল সদস্যই ইহার সভ্য ছিল এবং ইহা ব্যতীত 'নির্ব্বাচক মণ্ডলী' ইহাতে ছয় জন আর্থিক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিত। শাসন ও আইন সম্পর্কীয় সকল কাজ ছিল গবর্ণর এবং কোর্ট অব পলিসির এলাকা, কর-স্থাপন, আয়-ব্যয়-নিয়ন্ত্রণ ছিল কম্বাইণ্ড কোর্টের হাতে। বার্ষিক ট্যাক্সের আইন (ordinance) ব্যতীত অন্যান্য সকল আইন প্রণয়ন করিত কোর্ট অব পলিসি।

শাসন-কর্তৃত্ব ও রাজস্বের অধিকার বিভিন্ন সংস্থায় বর্ত্তাইবার দরুণ কাজের অসুবিধা হইত। প্লাণ্টারগণের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্ট ক্রীতদাসগণের মুক্তি দিয়াছিল। কিন্তু আর্থিক ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের স্বাধীনতা ছিল না এজন্য কাজের অসুবিধা হইত। ক্রমে নির্ব্বাচকমণ্ডলীও অপেক্ষাকৃত কম-প্রতিনিধিত্বমূলক হইয়া পড়িল। ১৮৪৭ সনে ১,৩০,০০০ জনের মধ্যে ৫৬১ জন ভোটের অধিকারী ছিল, ১৮৫০ সনে ভোটদানের যোগ্যতা কমাইয়াও ভোটদাতার সংখ্যা বাড়িয়া মাত্র ৯১৬ হইল।

১৮৯১ সনে একটি আইন দ্বারা কোর্ট অব পলিসির একটি এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিল সৃষ্টি করা হইল—ইহার সভ্য হইলেন গবর্ণর, ৪ জন সরকারী কর্ম্মচারী এবং ৩ জন বে-সরকারী সদস্য। এখন কোর্ট অব পলিসির মোট সভ্যসংখ্যা হইল ১৬ জন—৮ জন সরকারী এবং ৮ জন বে-সরকারী সভ্য। আইন করিবার ভার ইহার উপর রহিল। গবর্ণর ইহা ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবেন এরূপ ক্ষমতা তাঁহাকে দেওয়া হইল। কম্বাইণ্ড কোর্টও রহিল এবং উহার ক্ষমতাও বাড়াইয়া দেওয়া হইল। 'নির্ব্বাচক মণ্ডলী' তুলিয়া দিয়া ভোটাধিকারীর সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়া হইল এবং প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করা হইল। ১৯০৯ সনে ভোট দিবার অধিকার বাড়াইলেও ৩,০০,০০০ লোকের মধ্যে মাত্র ১১,০০০ জন ভোট দিবার অধিকারী হইল।

১৯২৮ সনের গঠনতন্ত্র

১৯২৮ সনে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট এক আইন দ্বারা কোর্ট অব পলিসি এবং কম্বাইণ্ড কোর্ট তুলিয়া দিল এবং তৎস্থানে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল বা ব্যবস্থাপক সভা স্থাপন করিল। ইহার সভ্য হইলেন গবর্ণর (সভাপতি), ১০ জন সরকারী এবং ১৯ জন বে-সরকারী সদস্য—১৯ জনের মধ্যে ১৪ জন বে-সরকারী ভাবে নির্ব্বাচিত এবং ৫ জন গবর্ণরের মনোনীত। ব্যবস্থাপক সভায় বে-সরকারী সদস্যের সংখ্যাধিক্য হইলেও নির্ব্বাচিত বে-সরকারী সদস্যগণের সংখ্যাধিক্য হইল না। ১৯৩০ এবং ১৯৩৫ সনে এই-ভাবে যথারীতি নির্ব্বাচন হয় কিন্তু ১৯৪০ সনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য নির্ব্বাচন স্থগিত থাকে।

১৯৪৩ এবং ১৯৪৫ সনে আইন সংশোধন করিয়া শাসনতন্ত্রে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করা হয়। ১৯৪৫ সনে সামান্য কিছু সম্পত্তির অধিকারী অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই ভোটাধিকার দেওয়া হয় এবং এই নূতন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সনের নির্ব্বাচন হয়।

১৯৫০-৫১ সনের গঠনতন্ত্র কমিশন

১৯৫০ সনে স্যার ই, জে ওয়াডিংটনের সভাপতিত্বে উপনিবেশের ভোটাধিকার, শাসনতন্ত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার জন্য একটি কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনের সুপারিশ ঔপনিবেশিক সেক্রেটারীর অভিমতের সহিত ১৯৫১ সনে প্রকাশিত হয়। কমিশন প্রাপ্তবয়স্কের সার্ব্বজনীন ভোটাধিকার, ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচিত বে-সরকারী সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতা, নির্ব্বাচিত সদস্যগণের নিকট মন্ত্রিসভার দায়িত্বের জন্য সুপারিশ করেন। এই সকল সুপারিশ গ্রহণ করিয়া ১৯৫৩ সনের গঠনতন্ত্রে ইহাকে রূপদান করা হয়।

১৯৫৩ সনের গঠনতন্ত্র

১৯৫৩ সনের গঠনতন্ত্রে দ্বিকক্ষ সম্বলিত ব্যবস্থাপক সভার ব্যবস্থা করা হইল। নিম্নকক্ষ বা বিধান সভায় নির্ব্বাচিত সদস্যের সংখ্যাধিক্য হইল। উচ্চকক্ষ বা বিধান পরিষদে গভর্ণরের মনোনীত ব্যক্তি থাকিবেন এরূপ ব্যবস্থা হইল। বিধান সভায় ৩ জন সরকারী এবং ২৪ জন নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি থাকিবেন (এজন্য কলোনীকে ২৪টি নির্ব্বাচন-কেন্দ্রে ভাগ করা হইল)। বিধান সভার সভাপতি বা স্পীকার বাহির হইতে মনোনীত হইবেন কিন্তু সহকারী-সভাপতি বিধান সভার সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত করিবেন। বিধান পরিষদে ৬ জন সদস্য থাকিবেন সকলেই গবর্ণর কর্ত্তৃক মনোনীত—২ জনকে শাসন পরিষদের নির্ব্বাচিত সদস্যগণের সুপারিশে নিযুক্ত করা হইবে এবং ১ জনকে বিধান সভার স্বতন্ত্র এবং সংখ্যালঘু সভ্যগণের সহিত পরামর্শ করিয়া গভর্ণর নিযুক্ত করিবেন। নূতন গঠনতন্ত্রমতে শাসন পরিষদের সভ্য হইবেন গবর্ণর, ৩ জন সরকারী সদস্য, বিধান পরিষদ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ১ জন সদস্য এবং বিধান সভা হইতে

৬ জন নির্ব্বাচিত সদস্য। এই শেষের ৬ জন মন্ত্রী হইবেন—ইঁহাদের ১ জন হইবেন বিধান সভার লীডার বা নেতা। বিধান পরিষদের নির্ব্বাচিত ব্যক্তি মন্ত্রী হইলেও কোন বিশেষ বিভাগ তাঁহার দায়িত্বে থাকিবে না। বিধান সভা এবং শাসন পরিষদের নিকট এই মন্ত্রীর একমাত্র দায়িত্ব হইবে এমরি-ইণ্ডিয়ানদিগের স্বার্থরক্ষা। গভর্ণর সকল ক্ষমতার অধিকারী রহিলেন, তবে ঠিক হইল সাধারণতঃ শাসন পরিষদের পরামর্শ মানিয়া চলার রীতি তিনি অনুসরণ করিবেন।

এই গঠনতন্ত্রমতে একটি পাবলিক সার্ভিস কমিটি ১৩৫৯ সনের জুন মাসে গঠন করা হইল।

নির্ব্বাচন—এপ্রিল ১৯৫৩

১৯৫২ সনে আইন দ্বারা অক্ষরজ্ঞান এবং সম্পত্তির ভিত্তিতে যে নির্ব্বাচনের যোগ্যতা, তাহা তুলিয়া দেওয়া হইল এবং তৎস্থানে যে কোন ব্রিটিশ প্রজা ২১ বৎসর বয়স্ক এবং কলোনীর কিছুকালের বাসিন্দা হইলেই ভোটার হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিল। এইরূপে প্রাপ্তবয়স্কের সার্ব্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্ত্তিত হইল। ১৯৫৩ সনের এপ্রিল মাসের নির্ব্বাচনে বামপন্থী পিপল্স প্রোগ্রেসিভ পার্টি (পি পি পি) বিধান সভার মোট ২৪টি আসনের মধ্যে ১৮টি দখল করিল, ২টি আসন লাভ করিল ন্যাশনাল ডিমক্রেটিক পার্টি এবং ৪টিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী জয়লাভ করিয়াছিল।

বিধান সভার প্রথম অধিবেশনে ৬ জন মন্ত্রী এবং ১ জন ডেপুটি স্পীকার নির্ব্বাচিত হইলেন—ইঁহারা সকলেই পি-পি-পি দলের।

সংখ্যাগরিষ্ঠ নূতন দলের নেতা ছিলেন ডাঃ ছেদী জগন একজন মার্কিন-ফেরত দন্ত-চিকিৎসক—ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ ভারত হইতে আগত। নূতন দল অবিলম্বে নানা শাসন-সংস্কারে হাত দিলে ইংরেজ প্লান্টারগণ তাহাদের স্থায়ী স্বার্থ ও অধিকার ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কায় মরিয়া হইয়া উঠিল। নূতন শাসকদলকে সাম্যবাদী বা কম্যুনিষ্ট বলিয়া প্রচার করা হইল এবং সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত ইহাদের যোগাযোগ আছে তাহাও বলা হইল। কিন্তু পি-পি-পি এই অপবাদ অস্বীকার করিল। এবং দেশের জনসাধারণের আর্থিক অসাম্য ও দারিদ্রের বিশেষতঃ শ্রমিকগণের দুঃখ দূর করিবার জন্য নূতন আইনের ও অন্যান্য ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য বলিয়া দৃঢ়তা দেখাইল। অবস্থা চরমে পৌঁছিল ১৯৫৩ সনের অক্টোবর মাসে যখন ইংলণ্ডের সরকার কমিউনিষ্টগণ কর্ত্তৃক সরকার উৎখাত ও দেশে শান্তি ও সুশৃঙ্খলা ভঙ্গের ভীষণ বিপদ হইতে কলোনীকে রক্ষা করিবার অজুহাতে সে দেশের শাসনতন্ত্র সাময়িক ভাবে বাতিল করিয়া দিল।

পি-পি-দল অবশ্য ইহাতে দমিল না তাহাদের নেতা ডাঃ ছেদী জগন ও অন্যান্য নেতা ব্রিটিশ সরকারের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে ও কমনওয়েলথের নানা দেশে প্রচারে বাহির হইয়াছিলেন। তাঁহারা ঐ সময় ভারতবর্ষেও আসিয়াছিলেন। পাকিস্থানে তাঁহাদের প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। ভারত সরকার তাঁহাদের উপর কোন নিষেধ আরোপ না করিলেও তাঁহাদিগকে বিশেষ উৎসাহ দেন নাই, তবে ভারতের কোন কোন বামপন্থীদল তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিয়াছিল।

কমিশন নিয়োগ ও অন্তর্বর্তী সরকার

১৯৫৩ সনের ডিসেম্বর মাসে সার জন রবার্টসনের সভাপতিত্বে একটি কমিশন নিয়োগ করিয়া উহার উপর এই কলোনীর ভবিষ্যৎ শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে সুপারিশ করিতে বলা হইল।

১৯৫৪ সনের জানুয়ারী মাসে সাময়িকভাবে গভর্ণরের মনোনয়নে আবার শাসন পরিষদ গঠিত হইল—ইহাতে গভর্ণর নিজে এবং ৩ জন সরকারী সদস্য এবং ২৪ জন গভর্ণর-মনোনীত বে-সরকারী সদস্য রহিলেন। একটি পরামর্শদাতৃ সমিতিও গঠিত হইল—ইহাতে থাকিলেন গভর্ণর স্বয়ং। পূর্ব্বোক্ত ৩ জন সরকারী সদস্য এবং গভর্ণর কর্ত্তৃক মনোনীত ৭ জন সদস্য—ইঁহাদের ৪ জনকে পরে মন্ত্রিত্ব দেওয়া হইল। এদিকে কমিশনের রিপোর্ট বাহির হইলে দেখা গেল যে, কমিশন অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে, কলোনীর গঠনতন্ত্রে কোন ত্রুটি ছিল না, তবে পি-পি-পি দল অন্যায়ভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করাতে এবং নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করায় অনর্থ ঘটিয়াছে। যে পর্য্যন্ত দেশের লোক সজাগ না হয় এবং পি-পি-পি নিজেদের কার্য্যাবলী এবং নীতি না বদলায়, ততদিন কলোনীর কোন স্থায়ী মঙ্গল হইতে পারে না।

ইংরেজ সরকার দাবী করেন যে, অন্তর্বর্ত্তী সরকারের শাসনকালে কলোনীতে ধীরে ধীরে আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে, এজন্য ক্রমে ক্রমে ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ এবং সভা-সমিতি নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি আপৎকালীন আইন প্রত্যাহার করা হইয়াছে। পুনরায় নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে বিধান সভা এবং শাসন-পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১৯৫৬ সনের ডিসেম্বর মাসে এক অর্ডার ইন কাউন্সিলের দ্বারা স্থির হয় যে, অন্তর্ব্বর্ত্তীকালের সরকার ভাঙ্গিয়া দিয়া একটি নূতন বিধান পরিষদ গঠিত হইবে। ইহাতে ১ জন স্পীকার, ৩ জন সরকারী সভ্য, অনূন ১৪ জন নির্ব্বাচিত এবং অনধিক ১১ জন মনোনীত সভ্য থাকিবে। শাসন-পরিষদ সাধারণতঃ গবর্ণর, ৩ জন সরকারী সদস্য, ২ জন মনোনীত এবং ৫ জন বিধান পরিষদের নির্ব্বাচিত সদস্য লইয়া গঠিত হইবে।

স্থানীয় স্বায়ত্ব-শাসন

রাজধানী জর্জ্জটাউন (জনসংখ্যা ৯৬,০০০) এবং নিউ আমষ্টার্ডাম (জনসংখ্যা ১৪,০০০) এই দুই শহরে মিউনিসিপ্যালিটি আছে। দুইটি শহরই টাউন কাউন্সিল দ্বারা এক-একজন মেয়রের অধীনে পরিচালিত। জর্জ্জটাউনের ৯টি ওয়ার্ড হইতে নির্ব্বাচিত কাউন্সিলারের সংখ্যা ৯ জন, ইহা ব্যতীত গবর্ণর-ইন-কাউন্সিল

একজন কাউন্সিলর মনোনীত করেন। নিউ আমষ্টার্ডামে নির্ব্বাচিত কাউন্সিলের সংখ্যা ৬, মনোনীত কাউন্সিলার সংখ্যা ৩।

কলোনীতে মোট ৪৬টি পল্লী-কাউন্সিল আছে, কাউন্সিলের প্রতি ২ জন নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির স্থানে ১ জন মনোনীত সভ্য আছে। একটি-কেন্দ্রীয় লোক্যাল গবর্ণমেণ্ট বোর্ড এই পল্লী-কাউন্সিলগুলির উপরে কর্ত্তৃত্ব করে।

অবশ্য দেশের খুব অভ্যন্তরে কোন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান নাই।

এমরি-ইণ্ডিয়ান শাসন নীতি

এমরি-ইণ্ডিয়ানগণ মূলতঃ এশিয়ার অধিবাসী—অনুমান করা হয় যে, ইউরোপীয়গণ এদেশে আসিবার বহু পূর্ব্বে বেরিং প্রণালী পার হইয়া ইহারা এই নূতন দেশে আসিয়াছে। ইহাদের কোন কোন জাতি আধুনিক সভ্যতার আলোক পাইয়াছে কিন্তু এখনও অনেকে দেশের অভ্যন্তরে নানা দুর্গমস্থানে আদিম জীবন যাপন করে। ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার কমিশনার অব ইন্টিরিয়রের উপর। এই শাসন-বিভাগটি ১৯৪৬ সনে সৃষ্টি করা হয়। বিশেষ-ভাবে সংরক্ষিত অঞ্চলে এমরি-ইণ্ডিয়ানগণ বাস করে। বহু বৎসর চেষ্টা করিলে এবং বহু অর্থ ব্যয় করিলে তবে ইহাদিগকে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার আওতায় আনা যাইবে।

আর্থিক পরিচয়

আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য

	আমদানি		রপ্তানি	
১৯৪৮	১.০৬	লক্ষ	০,৭৭	লক্ষ
১৯৫০	১,১৭	,,	১,০৭	,,
১৯৫২	১,৭২	,,	১,৭১	,,
১৯৫৪	১,৬৭	,,	১,৭৯	,,
১৯৫৬	২,০৯	,,	১,৯৮	,,

প্রধান প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য

	১৯৩৮					১৯৫৬				
চিনি	১,৮৩,০০০	টন	মূল্য	১৫,৭৮,০০০	পাউণ্ড	২,৪৫,৯১১	টন	মূল্য	৮৬,৭১,২৯১	পাউণ্ড
বাসকাইট	৩,৭৬,০০০	,,	,,	৪,২১,০০০	,,	২১,০৭,৬৪৩	,,	,,	৬১,১১,৪৭৯	,,
চাউল	১৩,০০০	,,	,,	১,২০,০০০	,,	৪১,৩২৬	,,	,,	২০,৫৩,২৬২	,,
রম (মদ্য)	১০,৬৯.০০০	গ্যালন	,,	৯৯,০০০	,,	২৬,১৬,৩৭২	গ্যালন	,,	৭,৮১,৮৩২	,,
কাঠ	৪,৩৯,০০০	কি. ফুট	,,	৫২,০০০	,,	১২,৮০,৪৯৯	কি, ফুট	,,	৬,২৯,৫৭১	,,
হীরক	৩৪,০০০	ক্যারাট	,,	৭৯,০০০	,,	৩০,০৫৭	ক্যারাট	,,	২,৭৭,৮৪১	,,
চিটাগুড়	৫৮,৯২,০০০	গ্যালন	,,	৬৩,০০০	,,	৬২,০৯,১৮৮	গ্যালন	,,	২,০৬,৭৭০	,,
*বালাটা	৪,৮৫,০০০	পাউণ্ড	,,	৩৪,০০০	,,	৪,৫০,৪২০	পাউণ্ড	,,	৯১,৯২৫	,,
স্বর্ণ	৪০,০০০	ট্রঃ আউন্স	,,	২,১৫,০০০	,,	৬,৫৫২	ট্রঃ আউন্স	,,	৮২,৬৭৬	,,
কফি	১,০৫,০০০	পাউণ্ড	,,	১,০০০	,,	৪,৯৬,৯৪৪	পাউণ্ড	,,	৭৮,৮১২	,,

* এক প্রকার আঠা (Gum)

রাজস্ব আয় এবং ব্যয়

বৎসর	আয়		ব্যয়	
১৯৩৮	১৩,০৩,০০০	পাঃ	১৩,১২,০০০	পাঃ
১৯৫০	৪৫,১১,০০০	,,	৪৯,০৪,০০০	,,
১৯৫২	৬২,২০,০০০	,,	৫৯,২৯,০০০	,,
১৯৫৪	৭৫,৩৮,০০০	,,	৭১,৯৩,০০০	,,
১৯৫৫	৮৮,৫৪,০০০	,,	৮৩,৩৭,০০০	,,

উপসংহার

১৯৫৭ সনের আগষ্ট মাসে ব্রিটিশ গায়েনার নূতন বিধান পরিষদের নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। ১৯৫৩ সনে বিধান সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়ার পরে আবার নূতন করিয়া নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে (যদিও সঙ্কীর্ণভাবে) বিধান সভা ও সরকার গঠন করিবার এই চেষ্টা। অন্তর্বর্ত্তী সরকারের বিধান পরিষদ ও শাসন পরিষদের সদস্যেরাই ছিলেন গবর্ণর-মনোনীত।

নূতন বিধান পরিষদের মোট ২৮ জন সদস্যের ১৪ জন নির্ব্বাচিত হইবেন। ১৯৫৩ সনের বিধান সভায় ২৭ জন সদস্যের মধ্যে ২৪ জন ছিলেন নির্ব্বাচিত সদস্য, সুতরাং অধিকাংশই ছিলেন নির্ব্বাচিত। এবারে শাসন-পরিষদে নির্ব্বাচিত সভ্যের সংখ্যা ৫ জন হইবে অর্থাৎ মোট ১০ জনের মধ্যে অর্দ্ধেক মাত্র এবং ইহার সভাপতিত্ব করিবেন গবর্ণর।

এবারের নির্ব্বাচনেও ডাঃ ছেদী জগনের দল বিধান পরিষদের অধিকাংশ আসন দখল করিয়াছে কিন্তু গঠনতন্ত্র পরিবর্ত্তন হওয়ার আর চরম শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করিতে পারিবে না। তবে জন-গণের প্রতিনিধি হিসাবে সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে এবং ব্রিটিশ সরকারের সহিত আপোষে ক্ষমতা পরিচালন করিয়া এই উপনিবেশের আর্থিক উন্নতিতে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে। ব্রিটিশ গায়েনার প্রায় অর্দ্ধেক নাগরিক ভারতীয়গণের বংশধর, এজন্য এই উপনিবেশের উন্নতিতে স্বাধীন ভারত স্বভাবতঃই আগ্রহশীল।

কৃষি পরিবার ও কৃষি

শ্রীসারদাচরণ চক্রবর্ত্তী

এদেশে অধিকাংশের অবস্থা যে কত শোচনীয় হইয়াছে তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বসবাসের জন্ম অত্যধিক লোক চলিয়া আসাতে জনবহুল পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়াছে। বেকারত্ব ও অসচ্ছলতা ভিন্ন, বসবাসের জন্ম অধিকাংশের ঘর-বাড়ীর অসুবিধার জন্ম সাধারণের নৈতিক অবস্থারও অবনতি ঘটিয়াছে। যে কোন কর্ম্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে অস্বাভাবিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্ম মানসিক অবস্থাও শোচনীয় হইয়াছে। ইহা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সংক্রামিত হওয়াতে উচ্চনীচ সকল স্তরের লোকেরই অশান্তি বাড়িয়া চলিয়াছে। বেকার-সমস্যা সমাধানের সহিত নৈতিক অবস্থার উন্নতি না হইলে সাধারণের কোন স্থায়ী উন্নতির সম্ভাবনা নাই। যুগধর্ম্মানুযায়ী বৈষয়িক ও সামাজিক নানাবিধ পরিবর্ত্তন ও উন্নতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া আমাদের বিশেষ বিবেচনা করিয়া ইহার সমাধান করিতে হইবে। আমেরিকা-ইউরোপের আদর্শে জীবন-ধারণের মান উন্নত করিয়া আর্য্যাবর্ত্তের আদর্শে নৈতিক, ধর্ম্ম-জীবন ও সমাজের উন্নতি না হইলে, বর্ত্তমান শোচনীয় পরিস্থিতির প্রকৃত সমাধান হইবে না। বর্ত্তমানে সমাজকল্যাণ বিভাগ (community Development) বহু গ্রামে বিভিন্ন প্রকার কাজ করিয়া যে সাহায্য করিতেছেন, সকলেই তাহার সুযোগ লইয়া সহযোগিতা করিলেই তাহাদের উন্নতি সহজ হইবে। যে দেশের শতকরা ৮০ জন লোক গ্রামে বাস করে সে দেশে তাহাদের উন্নতি বিষয়ে সচেতন না হইলে যে প্রকৃত উন্নতি হয় না, ইহা বিবেচনা করিয়া সমাজকল্যাণ বিভাগের কাজ অপরিহার্য্য এবং প্রশংসনীয়।

বহিরাগত এবং দুঃস্থ চাষীদের জন্ম অনেকের ২০।২৫ একর জমিতে কয়েকটি পরিবার বসবাস করিয়া যাহাতে চাষ-আবাদ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারে, সেই প্রকার পরীক্ষামূলক ব্যবস্থার কথা ভাবিতেছেন। এ প্রকার একটি পরিকল্পনা বিষয়ে আলোচনা আবশ্যক। কেবলমাত্র চাষ জীবিকা হইলে বৎসরের অনেক সময় কাজ পাওয়া যায় না। সে সময় গ্রামে মজুর হিসাবেও কর্ম্মসংস্থান হয় না। সেজন্ম আনুষঙ্গিক কুটীর-শিল্পের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কোন কোন চাষী-পরিবারে স্বামী, স্ত্রী, তিন-চারটি সন্তান, মা, বাবা, ছোট ভাই-ভগ্নী লইয়া একটি বৃহৎ চাষী পরিবার গঠিত হইলেও সাধারণতঃ স্বামী, স্ত্রী, দুই-তিনটি সন্তান একটি পরিবারে দেখা যায়। পাঁচ জনের খাওয়া-পরার জন্ম মাসিক একশত টাকা আয়ের সংস্থান থাকা আবশ্যক। একটি লাঙ্গলে ১৫ বিঘা আবাদ হইতে পারে। এই পরিমাণ জমি হইতে মাসিক এক শত টাকা আয় হইতে পারে। কাজেই একটি পরিবারের জন্ম ১৬।১৭ বিঘা জমি থাকা আবশ্যক। চাষীকে অধিক দিন নিযুক্ত রাখার কথা এবং গরু হইতে যে মলমূত্র সার রূপে পাওয়া যায় সে বিষয়ে ভাবিয়া কলের লাঙ্গল হইতে গরু-চালিত উন্নত লাঙ্গলই শ্রেয়।

নদীয়া জেলার কোন কোন স্থানে ২৫।৩০ একর জমি এক লপ্তে পাওয়া যায়। সেখানে অধিকাংশই আশুধান বপনোপযোগী জমি। পাঁচ-ছয় জন সমন্বিত একটি পরিবারে অন্ততঃ ৪০ মণ ধান, ৫।৬ মণ ডাল, বিবিধ তরিতরকারী, ডিম, দুধ এবং পরিধেয় বস্ত্রের সংস্থান করিতে হইবে। জমি বণ্টন ও চাষের ব্যবস্থার সময় এসকল বিষয়ে ভাবিতে হইবে। চার-পাঁচটি পরিবার সমবায় নীতিতে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা-মূলে একত্রে কাজ করিলে, জলসেচনের ব্যবস্থা, পরস্পরের মধ্যে লাঙ্গল ও মজুরীর বিনিময়-ব্যবস্থা, বীজ, সার, উন্নত ধরণের কৃষিযন্ত্র এবং উৎপন্ন কৃষিজাত ফসলের বিক্রয় বিষয়ে অনেক সুবিধা হয়। সকলের ব্যবহার-উপযোগী একটি ধর্ম্মঘর ব্যবস্থা করিয়া তাহাতে নৈশবিদ্যালয়, কীর্ত্তন, গান, পাঠাগার, কথকতা প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া নিজেদের নানা বিষয়ে উন্নতি করা যায়। বৎসরের যে সময়ে কাজ থাকে না সে সময়, চরকাতে সূতা কাটিয়া নিজের আবশ্যকীয় বস্ত্রের সম্পূর্ণ না হইলেও আংশিক সমাধান হইতে পারে। মহাত্মা গান্ধীর উপদেশ মত প্রত্যেকে কিছু সময় চরকা কাটিলে দেশের অবস্থার অনেক উন্নতি হইত। দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বাংলার ঘরে ঘরে কার্পাস জন্মাইয়া তাহা দ্বারা চরকায় সূতা কাটা হইত। বহু বৎসর পূর্ব্বে চরকার প্রচলন সম্পূর্ণ লোপের পর, ১৯০৫ সন হইতে চরকার পুনঃপ্রচলনের জন্ম বহু অর্থ ব্যয়িত হইলেও বাংলায় ইহার প্রতিষ্ঠা হয় নাই। তুলা সহজলভ্য নয় বলিয়াই বাংলায় চরকার প্রচলন হইতেছে না। অথচ যে সকল প্রদেশে তুলা উৎপন্ন হয় তথায় এখনও ঘরে ঘরে চরকার প্রচলন আছে। এমনকি শিশুরাও ক্রীড়াচ্ছলে চরকা কাটিয়া আনন্দ পায়। বাংলায় চরকার প্রবর্ত্তন করিতে হইলে আমাদেরও প্রতি ঘরে সামান্য পরিমাণে কার্পাস উৎপন্ন করিতে হইবে। কার্পাসের বীজ ছাড়ানো টাটকা তুলার বস্তাবন্দি পুরাতন তুলার মত, ধুনন আবশ্যক হয় না এবং তাহা সহজে পাঁজ করিয়া চরকায় দ্রুত শক্ত সূতা প্রস্তুত হয়। বস্ত্রশিল্পে কাপড় প্রস্তুতে টাকাপ্রতি দশ আনা তুলা খরিদে ব্যয়িত হয়। কাজেই নিজের উৎপন্ন তুলা দ্বারা সূতা কাটিলে একরকম বিনা খরচেই ভাল সূতা

পাওয়া যায়। তাঁতীরা মজুরীবাবদ সমপরিমাণ সূতা পাইলে আবশ্যকমত সূতা বাঙ্গাইয়া বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া দেয়। মজুরী হিসাবে ধরিতে গেলেও দৈনিক কৃষাণ-চরকায় ছয়-আট আনা মজুরী হইলেও অম্বর-চরকায় এক টাকা উপার্জ্জন করা সম্ভব হয়। উপার্জ্জন হিসাবে এই আয় সামান্য হইলেও আজ পর্য্যন্ত গ্রামবাসীদের জন্য ব্যাপকভাবে অন্য বিকল্প কুটীর-শিল্পের প্রচলনে কেহ সমর্থ হয় নাই। দৈনিক নিয়মিতভাবে অল্প সময় সূতা কাটিলে পর নিজ ব্যবহারের বস্ত্রসমস্যা সহজে সমাধান হইতে পারিবে।

একটি পরিবার চাষ আবাদ করিয়া যাহাতে মাসিক অন্ততঃ এক শত টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে তাহার একটি হিসাব এতৎসঙ্গে পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

চারটি পরিবারের সংস্থান উদ্দেশ্যে এইপ্রকার পরিকল্পনানুযায়ী ২৪ একর জমি লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে (প্রতি পরিবারে ১৮ বিঘা বা ৬৷০ একর হইলে চারটি পরিবারে ২৪ একর) এই পরিকল্পনায় প্রায় ৩০,০০০্ ব্যয় হইবে। এই কার্য্যের জন্য প্রত্যেকের জন্যব্যয়িত ৭,৭০০্ (মোট ৩০,৮০০্) প্রতি বৎসর ৫০০্ হিসাবে ২০ বৎসরে মাত্র সুদসহ পরিশোধ করা সম্ভব হইবে।

এ প্রকার একটি পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে ইহার পরিচালনা-ভার রামকৃষ্ণ মিশনের অধিকাংশ সন্ন্যাসীদের মত দেশপ্রেমিক অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের উপর থাকা বাঞ্ছনীয়। কোন ধনী সহৃদয় ব্যক্তি এই পরিকল্পনানুযায়ী কার্য্য আরম্ভ করিলে লোকশান দিবেন না। ইহা আমার দীর্ঘ ৪০ বৎসরের উপর চাষী-জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে নিশ্চিত বলিতে পারি। দণ্ডকারণ্যে যে বহিরাগতদের প্রতিষ্ঠিত করার ব্যবস্থা হইতেছে তথায়ও অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিয়া এই পরিকল্পনানুযায়ী কার্য্য হইতে পারে। ইহাতে প্রত্যেক চাষী-পরিবারের জন্য তাহাদের পরিশ্রম বাবদ মাসিক এক শত টাকা ধার্য্য হইবে। নদীয়াতে চাষীরা দৈনিক দেড় টাকা হিসাবে উপার্জ্জন করে। কাজেই ৪টি স্থলে ৮টি পরিবারের উপর কার্য্যভার দিয়া পরে অভিজ্ঞতার পর যাহারা এ কার্য্যে যোগ্য নয় তাহাদের জন্য অন্য কাজের ব্যবস্থা হইতে পারে। বলা বাহুল্য যে, এই প্রতিষ্ঠানের জমিজমা ও যাবতীয় সম্পত্তি অর্থ-বিনিয়োগকারীর সম্পত্তি থাকিবে। কর্ম্মীরা সুদসহ নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে সম্পূর্ণ অর্থ শোধ করিতে পারিলেই মালিকানা তাহাদের নামে হস্তান্তরিত হইবে। পরিচালক প্রত্যেকের কর্ম্ম ও যোগ্যতা বিষয়ে বরাবর তাহার মন্তব্য লিখিয়া রাখিবেন। বহিরাগত চাষীদের মধ্যে অধিকাংশই স্বাভাবিকভাবে বিবেচক, সৎ, কর্ম্মঠ, পরিশ্রমী ব্যক্তি। আংশিক সরকারী সাহায্য পাইয়া কিংবা একেবারেই সাহায্য না পাইয়া অনেকস্থলে তাহারা ঘরবাড়ী করিয়া স্বাবলম্বী হইয়া সুখে জীবনযাপন করিতেছে। বন্যা-বিধ্বস্ত বহু ব্যক্তিই সরকারী সাহায্য পাইয়া ইট প্রস্তুত করিয়া নিজেদের বাড়ীঘর প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছে। অবস্থার চাপে পড়িয়া নানা অসুবিধা ও অভাবের চাপে সরকারী সাহায্যের অপব্যয় করিয়াছে এ প্রকারও বহু লোক আছে। এ জন্যই অর্থ-বিনিয়োগ বিষয়ে ও পরিচালনা বিষয়ে সতর্কতা আবশ্যক। চাষের উন্নতির জন্য বহুরকম কাজ হইলেও বিভিন্ন ফসলের উৎপাদনে আয়-ব্যয় হিসাবের অভাব অনুভূত হয়। প্রবন্ধে লিখিত কার্য্যের ফল বিস্তারিত বিবরণসহ প্রকাশিত হইলে ইহাকে ভিত্তি করিয়া অনেকেই এ প্রকার কার্য্যে উৎসাহিত হইবেন আশা করি। এই পরিকল্পনা বিষয়ে কোন মন্তব্য নিম্নের ঠিকানায় (Po. & Vil. Fulia, Dist Nadia) বিশেষ ধন্যবাদের সহিত গ্রহণ করা হইবে।

মূলধন বিনিয়োগ

	খরচের বিবরণ	টাকা
১।	১৮ বিঘা জমির মূল্য ২০০্ বিঘা হিসাবে	৩৬০০
২।	গৃহাদি প্রস্তুত ৬খানা ২০০্ হিসাবে (বাসের ঘর ২খানা, রান্নাঘর ২খানা, গোয়ালঘর ১খানা, হাঁস, মুরগী, ছাগল রাখা ঘর ও ঢেঁকিঘর ১খানা, গোলাঘর ১খানা, মোট ৬ খানা)	১২০০্
৩।	বলদ ১ জোড়া	৩০০্
৪।	গাভী ২টি	২০০্
৫।	হাঁস, মুরগী, ছাগল	১০০্
৬।	লাঙ্গল, দা, কোদালি, সাবল, নিড়ানি, লণ্ঠন, বাল্টি	১০০্
৭।	তুলার বীজ ছাড়ানো কুকি, অম্বর-চরকা কৃষাণ-চরকা	২০০্
৮।	৪টি পরিবারের ব্যবহারোপযোগী জলসেচের জন্য ২″ টিউবওয়েল, পাম্প, ইঞ্জিন ৩০০্ মধ্যে (ধর্ম্মঘর সংশ্লিষ্ট ৪টি পরিবার ভিন্ন গ্রামের অপরাপর লোকেও ব্যবহার করিবে) ১খানা ধর্ম্মঘর, আড়াই শত টাকা একটি ছোট পুষ্করিণী আড়াই শত টাকা, ধর্ম্মঘরের সতরঞ্চ, লাইব্রেরী, খোল-করতাল	১০০০্
৯।	১ বৎসর মেয়াদে পরিশোধনীয় ফসল না হওয়া পর্য্যন্ত নিজ খরচ চালাইবার জন্য হাওলাত	১০৯০্
	মোট	৭৭০০্

আয়

ফসল	জমির পরিমাণ বিঘাতে	উৎপন্ন ফসল মণ	উন্নত প্রণালীতে বর্দ্ধিত	দর	মূল্য
১। আশু ধান	৫	২৫	৪০	১০৲	২৫০৲
২। কার্পাস ও আশুধান মিশ্রিত ফসল	৫	১৮	২৫	১০৲	১৮০৲
(বীজ সহিত) কার্পাস ৫/	—	১০	—	৫০৲	৫০০৲
৩। পাট ও মেস্তা	২	৮	১২	২০৲	১৬০৲
৪। আশুধানের পর রবিশস্য ৫/, পাট ও মেস্তার পর ২/					
মোট ৭/	—	—	২১	৮৲	১৬৮৲
৫। গাভীর খাদ্য	১	৫০	—	।০	২৬৲
৬। তরিতরকারী (যথা বেগুন, পটল, মূলা, কপি, টমেটো)	২	—	—	—	৩০৯৲
৭। বাগান (পেঁপে, কলা, আনারস, লেবু, আম, কাঁঠাল, লিচু ইত্যাদি বাঁশ ১ ঝাড়)	২	—	—	—	৩০০৲
৮। বাড়ী-সংলগ্ন জমিতে লতানো ফসল (লাউ, সীম, কুমড়া ইত্যাদি)	১	—	—	—	৫০৲
৯। গরুর দুধ, ডিম, খাসি, হাঁস, মুরগী	—	—	—	—	৩০০৲
	মোট ১৮ বিঘা				মোট ২২৩৩৲

আয়

বিবরণ	টাকা
১। নিজ খরচ বাবদ বাৎসরিক আবাদে নিজের পরিবার ও সন্তানদের পারিশ্রমিক	১২০০৲
২। লাঙ্গল, মজুর অতিরিক্ত নিযুক্তি বাবদ	২০০
৩। সার খরিদ	১০০৲
৪। কৃষিযন্ত্রাদি মেরামত	২০৲
৫। গৃহাদি মেরামত	৫০৲
৬। গাভী, মুরগী, হাঁস, ছাগলের খাদ্য	২০০৲
৭। জমির খাজনা এবং ইউনিয়ন ট্যাক্স	৪০৲
৮। অন্যান্য অপ্রত্যাশিত খরচ	৫০৲
৯। গরু-মুরগী আদির অভাবপূরণ খাতে	৫০৲
	১৯১০৲
জমিজমা ও সরঞ্জামাদি বাবদ নিয়োজিত মূলধন বাৎসরিক কিস্তিবন্দী হিসাবে সুদসহ আসল শোধ খাতে বাগানের লভ্য ও নিজ আয় তহবিল হইতে মোট দেয়	৬০০৲

মীরাবাঈ

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

(হিন্দী থেকে অনুবাদ)

আমারি ত গিরিধর গোপাল এ,
দ্বিতীয় ত কেহ নয়।
যার শিরে শোভে ময়ূর-মুকুট,
মোর পতি সেই হয়।
ছেড়ে দিয়েছি ত কুলসম্মান,
কি করিবে কেবা আজ!
সাধুদের পাশে বসিয়া বসিয়া
ভুলিয়াছি লোকলাজ।

আঁখিজল শুধু সিঁচিয়া সিঁচিয়া
বপিয়াছি প্রেমলতা,
এবে সে লতিকা বেড়ে উঠিয়াছে,
আনন্দ-ফলে-নতা।
ভকতি দেখিয়া হইলাম রাজী,
কাঁদি সংসার দেখে;
দাসী মীরা তার গিরিধর প্রভু,
উদ্ধার কর তাকে।

বাঁধ

শ্রীঅমলেন্দু মিত্র

আপিস থেকে যোগেশ ফিরে এসে স্ত্রীকে বললে স্ফূর্তিভরে, তুমি না বাঁধের কাজ দেখতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছ! নাও পাওয়া গেছে একজনকে—বাঁধে কাজ নিয়ে এসেছে! সে আমাদের নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আনবে।

—লোকটি কে গো, সীমন্তী ঔৎসুক্য প্রকাশ করে।

যোগেশ একটুখানি হেসে বলে, তুমি বেশ ভাল করেই চেনো তাকে। এলেই টের পাবে!

—আমি আবার কাকে চিনলাম এই কয়দিন এসে?

—চেন বৈকি! আগে দেখ খুশি হও কি না। সহজে ভাঙ্গছি নে! কাল রবিবার দুপুরে সে আসবে গাড়ী নিয়ে। বেশ মানীগুণী লোক। বিকালের জন্য ভাল ভাল খাবার তৈরি করে রেখ। ফিরে এলে খাইয়ে দিও বেশ করে।

সীমন্তী যোগেশকে পীড়াপীড়ি করেও জানতে পারল না, ওর পরম বান্ধবটি কে বা কি তার পরিচয়!

রবিবার দুপুরের খাওয়ার পর সীমন্তী সাজতে গেল। এমন সময় মূর্তিমান ভগ্নদূত অফিসারের স্লিপ নিয়ে হাজির। সদর থেকে জরুরী ফনোগ্রাম এসেছে। যোগেশকে এক্ষুণি আপিসে গিয়ে একটা ষ্টেটমেণ্ট করতে হবে।

সীমন্তী হতাশ হয়ে পড়ল, হ'ল ত? দেখছি আমার কপালে আর বাঁধ দেখা নেই। যদি বা দাতা দেয় ত বিধাতা বিরূপ হন।

যোগেশের উৎসাহ অত সহজে দমে না। বলল সমান স্ফূর্তিভরে, এতে তোমার ক্ষোভের কি আছে! একাই যাও না। সঙ্গী ত বিশ্বাসী লোককেই পাচ্ছ....ঐ যে এসে গেছে, তুমি শীঘ্র তৈরি হয়ে নাও। আমি গাড়ীতে বসছি গিয়ে—এই পথে আপিসে নামিয়ে দিয়ে যাবে!

সীমন্তীকে কিছু ভাববার বা বলবার অবকাশ না দিয়ে যোগেশ ধড়ফড় করে বের হয়ে গেল। সুতরাং সীমন্তীও অবশিষ্ট সাজ দ্রুত শেষ করে বেরিয়ে এল।

দরজায় একটা জিপগাড়ী দাঁড়িয়ে। যোগেশ উঠে বসেছে আগেভাগেই। বললে, এস!

কাছে আসতেই যোগেশ হাত বাড়িয়ে ওর একখানা হাত ধরে টেনে তুললে ভিতরে। চালককে এখনও দেখে নি সীমন্তী। কাঁধের উপর সাড়ীখানা ঠিকমত গুছিয়ে নিচ্ছিল, কানে এল ষ্টার্ট দাও লোকেশ!

চমকে উঠে সামনের সিটে চাইতেই একেবারে কাঠ হয়ে গেল সীমন্তী। তার চিন্তাশক্তি, বুদ্ধি সব যেন গুলিয়ে যায়। শুধু অবরুদ্ধ নিঃশ্বাসে নিষ্পলকে চেয়ে রইল লোকেশের পানে। হয়ত সে দৃষ্টির মধ্যে ঘৃণা ছিল, জ্বালা ছিল, ক্রোধ ছিল, শঙ্কা ছিল।

যোগেশ বললে, লোকেশকে দেখে ভারী অবাক হলে, না?

রুষ্ট হয়ে উঠল সীমন্তী, এর মানে?

হো-হো করে হেসে ওঠে যোগেশ, বাপের বাড়ীর লোককে দেখলে লোকে খুশিই হয়! তার উপর একপাড়ার লোক, অথচ তুমি চটেমটে জিজ্ঞাসা করছ, তার মানে? আশ্চর্য্য ত!

সীমন্তী ভেবে পেল না কি জবাব দেবে! সামনের ষ্টিয়ারিং-এ বসা ঐ লোকটার অসহ্য উপস্থিতি যে তার কাছে কতখানি ঘৃণ্য, কি করে যোগেশকে বোঝাবে! বিয়ের পর একবার আলাপ হয়েছিল যোগেশের সঙ্গে খানিকক্ষণের জন্য, তাতেই সদাশিব স্বামী গলে গেছে ওর ব্যবহারে।...কিন্তু লোকেশ কি সাংঘাতিক! অত অপমানের পরও নির্ব্বিকারে খুঁজে-পেতে এতদূর এসে ভাব জমাতে এসেছে! উঃ, কি কৌশলই না জানে!

আপিসের সামনে এসে গাড়ী দাঁড়াল। যোগেশ লাফ দিয়ে নামে, কুছপরোয়া নেই সীমন্তী! আমার জন্য দুঃখ কর না, লোকেশ ভারী এক্সপার্ট ছেলে। ও তোমাকে সব দেখিয়ে শুনিয়ে আনবে, অ্যাণ্ড আই শ্যাল মিট ইউ ইন দি ইভনিং টি!

সীমন্তীর ইচ্ছা করল এক লাফে সেও নেমে যোগেশের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে খানিকটা আশ্বস্ত হয়, অথবা চীৎকার করে ওঠে, না-না আমি যেতে চাই নে—ওকে ফিরে যেতে বল, কিন্তু কেন জানি না, একটা কথাও গলায় সাড়া তোলে না। আগের মতই কাঠ হয়ে বসে রইল এক জায়গায়। চোখের সামনে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যোগেশ হাত তুলে বিদায় জানালে আর পরমুহূর্ত্তে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে জিপটা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটল দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে।

সীমন্তী মনেপ্রাণে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। বলতে চায়, থামাও গাড়ী, গাড়ী থামাও। কিন্তু বলতে গিয়েও বলে না কেন, তা সে নিজেই বুঝে ওঠে না। পরমুহূর্ত্তে মনে হয়, এ একটা ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র। যোগেশ আর লোকেশ তার সর্ব্বনাশ করবার জন্য কোন মতলব এঁটেছে। কিন্তু কেন? কি এর অর্থ! গতকাল যোগেশই বা ওর নাম চেপে গেল কোন উদ্দেশ্যে। যোগেশ কি জেনে ফেলেছে সব কিছু? নিশ্চয়ই লোকেশ বলে দিয়েছে সব কথা। সেই কারণে যোগেশ তাকে ওর হাতে তুলে দিয়ে এড়িয়ে গেল কাজের ছুতোয়। সর্ব্বনাশ! কথাটা ভাবতে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত হিম হয়ে আসে! বিবাহিতা স্ত্রীকে অপরের হাতে সঁপে দিয়ে গেল স্বামী হয়ে! কি তার অপরাধ! মুহূর্ত্তমধ্যে নিজেকে

সামলায় সীমন্তী। সে কিছু অবলা খুকী নয়। যোগেশ বা লোকেশ ইচ্ছামত তাকে চালাতে পারবে না কিছুতেই। দেখে নেবে একবার লোকেশ কত শয়তান। কত চাতুরী জানে। কিন্তু ও ত পিছু ফিরে দেখবার কোন চেষ্টাও করলে না একবারও। কি ভাবছে, মস্ত সাধুতার ভাণ করে সুযোগ আদায় করবে? খানিকটা আগুন-ঝরা দৃষ্টিতে চেয়ে রইল লোকেশের পানে—যদি ও মুখ ফেরায়। কিন্তু না, এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হয় সীমন্তী। লোকেশ পিছু ফিরবে না ইচ্ছা করেই। গাড়ীর পাশের দিকে এতক্ষণ পর তাকায় সীমন্তী। গাছপালা, মাঠ-প্রান্তর অসম্ভব বেগে ছিটকে পিছনে চলে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে কোন সময় সীমন্তীর চিন্তা-ভাবনা ছিটকে পড়ল পিছনে।

লোকেশ তাকে কেন্দ্র করে কি একটা উন্মাদনার জাল সৃষ্টি করেছিল। স্তুতি আর আত্মনিবেদনের কত রকমারি ভঙ্গী। স্ত্রী বলেও ডেকে বসেছে কতদিন। তাকে ছাড়া আর কাউকে জীবনসঙ্গিনী করবে না বলে জানিয়েছে কত প্রকারে। সীমন্তীর মনখানা ছলছল করে উঠেছে কতবার। ভেবেছে হাত-পা ছেড়ে ঝাঁপ দেয়। কিন্তু আবার সামলে নিয়েছে, সামাজিক বিধিনিষেধ বা সমস্যার কথা ভেবেছে। কোনদিনই লোকেশকে নিজের মনের কথা জানতে দেয় নি। অসতর্ক মুহূর্তে মুখ টিপে রহস্য-হাসি হেসেছে যার অর্থ হাঁ অথবা না, দুইই হতে পারে।

অথচ লোকেশকে নিজের অগোচরেই শত সতর্কতা সত্ত্বেও মনে মনে আত্মদান করে বসেছিল। সেটা টের পেল একদিন। লোকেশকে ভালবেসেছিল রঞ্জনী। সীমন্তীর ধারণা জন্মাল, লোকেশ তাকে যেমন স্তব করে, তেমনি তার অগোচরে স্তব করে রঞ্জনীর। সেই জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে নিষ্ঠুরভাবে অপমান করে বসল লোকেশকে। লোকেশ প্রথমটা বললে না কিছুই। মুখ বুজে জল-ভরা চোখে চেয়ে রইল কিছুকাল, তার পর বললে ধরা গলায়, আমায় মাপ কর সীমন্তী। আজ থেকে তোমাকে ভুলবার চেষ্টা করব।

লোকেশের ভাবপ্রবণতা দেখে দুঃখ বোধ হওয়া দূরে থাক, আরও জ্বলে উঠেছিল সীমন্তী। এতটুকু দয়া হয় নি তার। নিষ্ঠুরতর আঘাতে জর্জ্জরিত করে বিদায় করেছিল লোকেশকে।

তার পর মনে মনে নিজেও কম জর্জ্জরিত হয় নি। লক্ষ লক্ষ বার আলোড়ন চলেছে অন্তরে অন্তরে। রঞ্জনীর অন্যত্র বিয়ে হয়ে গেছে। কুৎসিত ধারণাটা বদলে গেছে সীমন্তীর। ইচ্ছা হয়েছে কতবার লোকেশের সঙ্গে মিটমাট হয়ে যাক। ত্রুটি স্বীকার করে লোকেশকে আবার আপনজন করে নিক। অথচ তা আর সম্ভব হয় নি। অসীম আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন লোকেশ যে এত সহজে তাকে ত্যাগ করে যাবে, কে জানত। কত সহজভাবে সুকঠিন আঘাত দিতে সে জানে!

ভালবাসার উল্টোপিঠটা সামনে দেখা দিয়েছে আবার। লোকেশকে সে ঘৃণা করে। চাই না তার সাহচর্য্য। চাই না তার মিথ্যা স্তুতি, নির্জ্জলা স্তাবকতা।

তার বিয়েতেও লোকেশ আসে নি, পাঠায় নি কোন উপহার। সীমন্তী মনেপ্রাণে ওকে ঝেড়ে মুছে জীবন থেকে বাদ দিয়েছিল। নতুন জীবনযাত্রায় ওর স্মৃতির কণামাত্রও যেন না থাকে।

কিন্তু এতদিন পর তাদের সুখনীড়ের মাঝে এ কোন উৎপাত। যাকে ভেবেছিল আত্মসম্মানজ্ঞান, তা শুধু নিছক ছলনা।

ভাবতে পর্য্যন্ত পারা যায় না। লোকেশ যদি আবার সেদিনের মত জুতোশুদ্ধ পা চেপে ধরে বলে বসে, বিশ্বাস কর সীমন্তী, আমি তোমায়···।

না···না···ছিঃ একি ভাবছে!—শিউরে ওঠে সীমন্তী। সেদিনের মত ভীরু কুমারী সে নয়। আজ পা দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে এক ধাক্কায় দূরে ছুঁড়ে দেবার মত বল জন্মেছে তার। প্রয়োজন হলে দাঁতের কয়েক পাটিই ভেঙে দিতে হবে।···

চিন্তায় ছেদ পড়ল। গাড়ী এসে থেমেছে রিভার সাইডে। আর চলবে না। এবার হাঁটতে হবে।

ধ্বক্‌ধ্বক্ করে উঠল সীমন্তীর অন্তরাত্মা। এবার মুখোমুখি হতে হবে লোকেশের। একমুখ হাসি নিয়ে বেহায়ার মত সামনে এসে বলবে: এবার? একেবারে মুঠোয় পেয়ে গেছি!

আশ্চর্য্য! লোকেশ এসে সামনের পথ ছেড়ে দিয়ে সম্ভ্রমভরে একপাশে দাঁড়িয়ে বলল: দয়া করে নেমে আসুন!

'আসুন!' কথাটা খট করে কানে বাজল সীমন্তীর। এ আবার কী শুনছে! ছলনার নতুন আশ্রয়। কে লোকটা? গাড়ী থেকে নেমে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে লোকেশের পানে তাকালে সীমন্তী। হাঁ লোকেশ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ভয়ানক ভান করছে একটা। সীমন্তীর যে দৃষ্টিপাতের লোভে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জন দিতে পারত একদিন, সে দৃষ্টির লোভ থেকে বিবাগী হয়ে চোখ তার দূরে ওয়ার্কসাইটে নিবদ্ধ। চোখে চোখ পড়বার আশায় সীমন্তী বারকয়েক তাকালে। অথচ লোকেশের কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। মনে মনে এবার একটা কৌতুক বোধ করলে সীমন্তী। অমূলক ভয়টা তার মনকে পীড়িত করছিল এতক্ষণ। এ লোকটা তার কোন ক্ষতিই করতে পারে না। অথচ পরিস্থিতিটা বিসদৃশ ঠেকছে! তাই জড়তা কাটিয়ে বলে: চল লোকেশদা!

—হাঁ চলুন···লোকেশ এগিয়ে যেতে যেতে বললে: বুঝেছেন, এই জায়গাটায় দুটো পাহাড়ের মধ্যে নদীটা সবচেয়ে সরু। দেখুন কেমন করে বাঁধ তোলা হয়েছে···বলতে বলতে লোকেশ তাকে নিয়ে এসে দাঁড়ায় একেবারে রিভার-বেডে!

সীমন্তীর কানে কতক যায় কতক যায় না! কুমারী বয়সের ভীরু ভীরু উদ্বেল ভাবটুকু কোত্থেকে ঘুরে ফিরে এসে মনের তটে ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে অনেক দূরে। বাঁধ এলাকার এতবড় কাজের মহিমা তার কাছে যেন তুচ্ছ! দেখছে শুধু লোকেশকে! প্রথমটায় আড়চোখে, তার পর পূর্ণদৃষ্টি মেলে! পিছু পিছু হাঁটছিল পূর্ব্ব ভয়টাকে স্মরণ করে! এবার পাশে পাশে হাঁটে সন্তর্পণে ছোঁয়া বাঁচিয়ে! আগের দিনে সুবিধা পেয়ে হাতে হাত-ছুঁইয়ে-

নেওয়া কাঁধের উপর আলগা একটুখানি চাপ দিয়ে ছেড়ে দেওয়ার সুযোগ লোকেশ কখনও বাদ দেয়নি ! সেই আশঙ্কায় যথাসম্ভব ছোঁয়া বাঁচিয়ে নিজেকে যথেষ্ট নিরাপদ রাখবার প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে শাড়ীর প্রান্ত ধরে টানাটানি করে শালীনতা বজায় রাখছিল ! অথচ লোকেশের ওদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই ! সম্পূর্ণ অপরিচিতার মত সম্ভ্রম বজায় রেখে চলেছে ! ওর অভিনয়-দক্ষতাকে মনে মনে প্রশংসাই জানায় সীমন্তী ! একবার নাম ধরে ডাকলেও ত পারত ! তাতে কি এমন চণ্ডী-মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত !

রিভার-বেড ছাড়িয়ে বাঁধে উঠল ওরা। বাঁধের প্রশস্ত পথের উপর হাঁটতে হাঁটতে এক জায়গায় নেমে পড়ে লোকেশ সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে। বলে: আসুন গ্যালারির ভিতরটা দেখে যান।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে গ্যালারি। ভিতরে ঢুকে সীমন্তী সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। রবিবার বলেই হয়ত লোকজন নেই। সরু একটা পথ কয়লার খাদের মত বাঁধের দেওয়ালের ভিতরে কর' হয়েছে। যদিও ইলেকট্রিকের আলো জ্বলছে সারি সারি—তবু ত নির্জন। সীমন্তীর বুকের কাছটা একটু কেঁপে উঠল যেন। লোকেশ এ সুযোগ ছাড়বে না। জনসমাকীর্ণ বাইরের বাঁধ-এলাকার অন্তরে নিভৃতে এমন একটি গুপ্তস্থান আছে জানলে কখনও পা বাড়াত না সীমন্তী। লোকেশ যদি হাত চেপে ধরে ! এমন কি বুকের মধ্যে টেনে নেয়, তার পর আরও যদি কিছু করে···না···ভাবতে পারে না। অভিনয়ের মুখোশ খুলে লোকেশের স্বরূপ এই বুঝি প্রকট হয়ে উঠল ! সঙ্কীর্ণ পথে পাশাপাশি হাঁটতে চায় না সীমন্তী। লোকেশের পিছু পিছু চলেছে। একবার পিছনে তাকিয়ে দেখলে, পথটা কতখানি পিছনে ফেলে এসেছে। শেষ প্রান্ত দেখা যায় না। শুধু শুধু সারি সারি বাল্ব জ্বলছে—আর ছাপকা ছাপকা দাগধরা নির্জন মূক সরু গলি পথটা সামনে পিছনে লম্বালম্বি পড়ে আছে। মাঝে মাঝে এক একটা সিঁড়ি পথ নীচে নয় উপরের পানে উঠে গেছে। লোকেশ একবার বললে: যান উঠে দেখুন এটার উপর, ঘুলঘুলি পাবেন—ঠিক বাঁধের মাঝখানে এসেছি—নীচেই জল।

জায়গাটা আরও খারাপ। সোজা পথে পাশের খাঁজ। অন্ধকার অন্ধকার, ধরা পড়বার মুহূর্ত। আর বুঝিবা দেরী নেই, তবু আপনার অজান্তেই সীমন্তী এগিয়ে যায় খাঁজটার পাশে। তিন-চারটে সিঁড়ি উঠে ঘুলঘুলি—ঘুলঘুলিতে মুখ বাড়িয়ে অবাক হয়ে যায় ! সামনেই অগাধ জল, যেন মস্ত একটা হ্রদ—দু'পাশে পাহাড়। সবুজের সমারোহ নেমেছে এপার, ওপারে। ক্ষণকাল আত্মবিস্মৃত হয়েছিল যেন, তার পর মনে হ'ল, ঠিক তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে লোকেশ। ওর বুকের স্পর্শ পাচ্ছে ঠিক তার পিঠে। এই বুঝি মুখ ফেরাবার সঙ্গে সঙ্গেই চেপে ধরবে তাকে। কেমন একটা অস্বাভাবিক চেতনায় শিহরণ পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত বইতে থাকে সীমন্তীর। সত্যিই যেন ইচ্ছা করতে লাগল, লোকেশ তার মাথাটা চেপে ধরুক দু'হাতে। চোখটা বুজেই ফেলে, এই বুঝিবা···এক···দুই···তিন। তার পর ভয়ে ভয়ে পিছন ফিরে নিজের অসার কল্পনায় লজ্জিত হয়ে ওঠে। হাত দশেক দূরে সেই গলিপথে একটা বাল্বের সামনে লোকেশ দুটি বাহু বুকে ভেঙে কঠিন ভঙ্গী নিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে আছে। ভাবলে সীমন্তী, লোকেশ এ সুযোগও নিলে না ! এর চেয়ে বড় কিছু কৌশল তার হাতে আছে। তবু ভাল ! পরম স্বস্তিতে নিঃশ্বাস ছেড়ে ওর পিছনে এসে দাঁড়াল। বললে: ভারী সুন্দর লাগল কিন্তু ! ইচ্ছা করে নৌকা চড়ে বেড়াই !

লোকেশ জবাব দিলে সহজভাবে: বেশ ত ! বোট ভাড়াও পাওয়া যায়। একদিন যোগেশবাবুর সঙ্গে এসে বোটে ঘুরে নেবেন। সত্যিই ভাল লাগে !

বলতে বলতে বাঁধের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছে যায়। গলিটা এইখানেই শেষ। ষোল সতেরটা গেট বসানোর যন্ত্রপাতি। গেট-গুলির নীচে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের যন্ত্রপাতি বসান হবে। এই জায়গাটি বেশ চওড়া। চারিপাশে বৈদ্যুতিক কলকব্জা, সুইচ। লোকেশ বোঝাতে লাগল: কোন সুইচটা টিপলে কোন গেটটা উঠবে—ঘণ্টায় কত 'কিউসেক' জল বেরুতে পারে—কেমন ভাবে কণ্ট্রোল করা হয় জলের চাপ···ইত্যাদি, যার বিন্দুবিসর্গও ঢুকল না সীমন্তীর মগজে।

ঐখানে গলিটা শেষ হয়েছে, কয়েকটা ধাপ উঠে গেটগুলির মাথায় চড়া যায়, দেখা যায় হ্রদটা ভাল করে, অবশ্য সে জায়গায় দু'পাশই খোলা। নীচে পড়ে যাবার আশঙ্কা, তবু ইচ্ছা করল সীমন্তীর উঠে দাঁড়ায় ওখানে। নীচের গেটগুলি দেখে নেয় ভাল করে, লোকেশকে জিজ্ঞাসা না করেই সীমন্তী উঠে পড়ল টক্‌টক করে, তার পরমুহূর্ত্তেই চীৎকার করে ওঠে: লোকেশদা, ধর, ধর, মাথা ঘুরছে !

সিঁড়ির নীচের ধাপে দাঁড়িয়ে ছিল লোকেশ, হাসিমুখে মাথার ক্যাম্বিশ টুপিটা খুলে বাড়িয়ে ধরল, সেটা চেপে ধরে আস্তে আস্তে নেমে এল সীমন্তী ! সত্যিই ভয় পেয়েছিল ও, হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যেমন, তেমনি আবার দুরন্ত অভিমানে ভরে উঠল মন, ইস কি শুচিবাই, কেন হাতটা বাড়াতে কি হয়েছিল ! ছোঁবেন না, যেন কোন দিন ছোঁননি, ভুলে গেছেন যেন সরস্বতী পূজার এক ভোরের কাহিনী, গরদের শাড়ীপরা সীমন্তীকে গাছতলায় একলা পেয়ে আচমকা ঝাপটে ধরে গালের উপর···ভাবতে গিয়ে চোখ মুখ রাঙা হয়ে ওঠে সীমন্তীর।

কিন্তু লোকেশ কোন কথা বললে না, ফিরতে লাগল। সীমন্তী এবার পাশে পাশে চলেছে। লোকেশের সাবধানতা দেখে অবাক মানে সীমন্তী, ওকি নারী হয়ে উঠেছে, পাছে হাতে হাত ছোঁয়া লাগে, তাই হাত দুটি দিয়ে টুপীটাকে কোলের উপর ধরে হাঁটছে। হঠাৎ মনে হ'ল সীমন্তীর, তার উপর রাগ করে আছে লোকেশ, তাই বলে ফেলে ফস করে: আমার উপর রাগ কি এখনও তোমার যায় নি লোকেশদা ?

লোকেশ বলল : জানেন সব শুদ্ধ কত কোটি খরচ হয়েছে এই প্রজেক্টে ?

হোক খরচ, শুনতে চায় না সীমন্তী এসব কথা। কে চেয়েছে শুনতে! প্রশ্নটা এড়িয়ে যাওয়া মানেই অপমান। ঝাঁঝিয়ে উঠে কি যেন বলতে গেল সীমন্তী, কিন্তু বলতে গিয়েই সামলে নেয়। লোকেশ গভীর তত্ত্ববহুল আলোচনা সুরু করে দিয়েছে। ভাবতে থাকে সীমন্তী ওসব কথায় কান না দিয়ে, সে নিজেই ভুল করছে। লোকেশ তার কে? বিয়ের পর ত সব সম্পর্ক মুছেই গিয়েছে, ও যদি নিজেকে গুটিয়ে নিতে চায়, তাতে সীমন্তীর ক্ষোভ কি? তবু মনে হয় সীমন্তীর, সেদিনের বোঝাপড়াটা হয়ে গেলে যেন স্বস্তি পেত, নিজের অপরাধ বারবার খচ খচ করে বেঁধে। আর এই লোকেশের নির্লিপ্ত ভঙ্গী, 'আপনি' সম্ভাষণ সহ্য করাও চলে না। ও কি মনে করেছে অনাসক্ত ভঙ্গী নিয়ে সামনে দাঁড়ালেই সীমন্তী আসক্তিতে গলে পড়বে, এ অভিমানের রূপকে ভাল করেই চেনে সীমন্তী, লোকটা যেমন নীচ, তেমনি শঠ! তার বিয়েতে আসেনি, একটা উপহার পর্যন্ত দেয় নি, এতদিনে কৌশল ফলাতে এসেছে, ওকে সোজাসুজি জানিয়ে দেওয়া দরকার—ভবিষ্যতে ফের কোনদিন যেন না আসে তার বাড়ীতে, মনে মনে শক্ত হবার চেষ্টা করে সীমন্তী, কইবার মত জোরাল চোখা চোখা শব্দবাণ গুছাতে থাকে। লোকেশ একটি বাঁকা কথা বলেছে কি, এক সঙ্গে ছুড়ে মারবে। অব্যর্থ লক্ষ্যে আহত হয়ে কেমন দেখাবে লোকেশের মুখখানা, চোখে টলটল করে উঠবে জল—দেখবে সীমন্তী আর খুশি হবে।

গলিপথটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। উদার আকাশ-বাতাসের তলে বিস্তীর্ণ বাঁধের এলাকা, একপাশে শুকনা নদীর খাত, অন্যপাশে জল, শুধু জল যতদূর দৃষ্টি যায়। দুটো পাহাড়ের কোলে সংখ্যাতীত ঢেউয়ের লীলা তুলেছে। লোকেশ বললে, আসুন সামনের এই ছোট পাহাড়টায় চড়ি। এখান থেকে চারিপাশের দৃশ্য চমৎকার দেখায়।

উঁচু উঁচু ধাপ কয়টা পার হয়েই হাঁফ ধরে গেল সীমন্তীর। আর উঠতে চায় না। সেইখানেই দাঁড়িয়ে চোখমুখ রাঙা করে শ্বাস ফেলতে লাগল ঘন ঘন।

পাহাড়ের উপরটা ভারী চমৎকার। নানা জাতীয় শিশু গাছ-পালার একটা আস্তরণ। ছোট ছোট পাথর। ধূলো বালির লেশমাত্র নেই। আর নীচে তাকিয়ে চোখ ফেরানো যায় না।

পাশে না তাকিয়েই অনুভব করতে পারে সীমন্তী, তার পানে অপলকে তাকিয়ে আছে লোকেশ। জায়গাটা একেবারে জনহীন। মানুষ ওঠবার সম্ভাবনাও নেই। থাকলেও আশেপাশে শাখাপথ ধরে নানা গাছ বা পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করবার অবাধ সুযোগ। বাঁধের গলিপথটার চেয়েও অনেক সুবিধাজনক জায়গাটা। সেখানে সরকারী এলাকা। যন্ত্রপাতির জায়গা। কোথায় কোন অলিন্দে মিস্ত্রী কাজ করছে কে জানে? কিন্তু এখানে? সীমন্তীর মনে হ'ল, লোকেশ এতক্ষণ ধরে তার বিশ্বাস জমিয়ে এসেছে শুধু এই সুবিধারই লোভে।

লোকেশ এ সময় বললে, আসুন এইখানটায় একটু বসা যাক।

সীমন্তী চমকে উঠল ভয়ানক। বসা মানেই সামনের পাথরটার নীচের পথ, বাঁধ এলাকা, সব ঢাকা পড়ে যাওয়া। লোকেশের উদ্দেশ্য তার কাছে, কিছুমাত্র অজানা নেই। তাই ফোঁস করে ওঠে, তার মানে? লজ্জা করে না তোমার?

এতক্ষণ পর লোকেশ তাকালে সীমন্তীর পানে। ক্লান্ত করুণ সে চাউনী। সে চোখ দেখেই সীমন্তী মুহূর্তে বুঝলে তার ভুল। আর যাই থাকুক মনে, কোন মন্দ অভিপ্রায় নিয়ে বসতে অনুরোধ করে নি। লোকেশ আস্তে আস্তে বলল, বসতে না চান বসবেন না। বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন কিনা! শীতের বেলা হলেও রৌদ্র ত কম নয়!

লজ্জিত সীমন্তীর ইচ্ছা করল বসে পড়ে। এমন কি লোকেশ যদি তার পাশে বসতে চায় আপত্তি করবে না। কিন্তু কেন না জানি, যেমন পা দুটো অবাধ্য হয়ে উঠল, তেমনি গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে থাকে। না জোগায় ভাষা, না পারে পরিস্থিতিটাকে সরল করে তুলতে। নিতান্ত অপ্রয়োজনেই লোকেশকে ঝাঁঝের সঙ্গে কথাটা বলেছে সীমন্তী। ও এত কষ্ট স্বীকার করে সারাটা দুপুর তাকে দেখিয়ে নিয়ে বেড়াল, একটু কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত ছিল সীমন্তীর। তবু নিজকে কৃতজ্ঞ বোধ করতে পারে না। কেবলই মনে হয়, এ অনুগ্রহের পশ্চাতে এমন কিছু আছে, যার অর্থ এখনও দুর্ভেদ্য প্রহেলিকার আড়ালে ঢাকা।

সামনের বড় পাথরটায় হেলান দিয়ে সীমন্তী নির্নিমেষে চেয়ে রইল রৌদ্রের চিকনছটা মাখা হ্রদটার উর্ম্মিমালার পানে। আশ্চর্য একটি ভাললাগা নরম ভাবে বুকের মধ্যে ছুঁয়ে যেতে থাকে। লোকেশ নির্য্যাতন ভোগ করেছে বোকার মত। অথচ এমন সুন্দর পরিবেশ! ওপাশে মেঘমালা ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঢেউ তোলা নীল পাহাড়ের সারি, দিকচিহ্নহীন হ্রদটা, আর এপাশে শীতের আমেজ-মাখা ছোট ছোট গাছ-পাথরের সারির মধ্যে দু'জনে দাঁড়িয়ে কি একটা মহাকাব্যই না সৃষ্টি করা চলত! ঐ বাঁধটা যেমন নদীকে কেটে দু'ভাগ করে দুর্ভেদ্য নিষেধ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তেমনি সীমন্তীর রাঙা সীমন্তরেখা কঠিন শাসনের প্রাচীর তুলে দিয়েছে। একপাশে উচ্ছল জলরাশি, ওপাশে শুকনা শীর্ণ খাতটা। ঐ বিপুল আবদ্ধ জলাধারের মতই উদ্দাম প্রবাহ সীমন্তীর দেহ মনে আটকানো আছে। ইচ্ছা করলে ছোট্ট একটি সুইচ টিপে লোকেশ নিজেকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। কতদিন আগে তার এ রকম ফেনিল উচ্ছলতা দেখতে পছন্দ করত ও। বলত, তোমার প্রবাহে নেয়ে উঠতে ভারী ভাল লাগে সানু! আর আজ! বাঁধটাকে সামনে রেখে উভয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কতক্ষণ থাকত বলা যায় না। লোকেশই নীরবতা ভাঙ্গালে; চলুন তাহলে নামা যাক।

নাঃ লোকটা সত্যিই আজ মচকাবে না, ঠিক করেছে। এত কাছাকাছি পেয়েও অপরিচয়ের সংশয় দিয়ে আচ্ছন্ন করে রেখেছে নিজেকে।

কেমন অবলীলায় নেমে গেল লোকেশ। নীচের পথে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। সীমন্তী নিজকে বোধ করলে অসহায়। দাঁড়িয়ে পা ফেলতে ভয় হয়। বসে বসে সন্তর্পণে নামতে লাগল, প্রতি মুহূর্ত্তে ভয়, বুঝিবা পা হড়কে গড়িয়ে পড়ে। শরীর কাঁপতে লাগল গড়ান পথটা দেখে, লোকেশ কি হাত বাড়িয়ে দিতে পারে না?

অনেক কষ্টে, অনেক যত্নে সীমন্তী নেমে এল।

লোকেশ হাঁটতে লাগল আবার।' সীমন্তী ভাবলে, কিছু একটা জিজ্ঞেস করা নিছক ভদ্রতা। পাথরের উপর দাঁড়িয়ে অযথা একটা আঘাত করেছে। অন্ততঃ সে অপরাধটুকু স্খালন না করলে স্বস্তি কই?

কিন্তু লোকেশ যেন সেটুকুও দান করতে প্রস্তুত নয়। সোজা গিয়ে দাঁড়াল জীপ গাড়ীটার সামনে চায়ের দোকানে। এতক্ষণ পর পিছন ফিরে বললে: আসুন, একটু চা খাওয়া যাক, রোদে ঘুরে ঘুরে গলা শুকিয়ে গেছে।

সীমন্তী জবাব দিলে: দোকানের চা ত খাই না!

লোকেশের তবু পীড়াপীড়ি করা উচিত ছিল। করলে ভদ্রতার খাতিরে সীমন্তী কি না বলত? কিন্তু লোকেশ কিছুই বললে না আর। সোজা চা'য়ের দোকানটায় ঢুকে পড়ল। সীমন্তী গলা চড়িয়ে বলে, চা ছাড়া আর কিছু খাবেন না যেন। বাড়ীতে অনেক খাবার করা হয়েছে।

লোকেশ শুনতে পেল কিনা, কে জানে। গাড়ীতে বসে বসে দেখল সীমন্তী, গোটা এক পট চা চেয়ে নিয়ে খাকুসে পান করে বেরিয়ে এসে সোজা বসল গাড়ীতে। ষ্টার্টারে চাবি ঘোরাতে ঘোরাতে পিছন ফিরে বলে লোকেশ; আজ আপনার দেখবার সুবিধা হ'ল না যোগেশবাবুকে বাদ দিয়ে। অন্য একদিন আসবেন। শুধু শুধু কষ্টই দিলাম।

প্রত্যুত্তরে অভিমান থমথম করে ওঠে সীমন্তীর কণ্ঠে; লোকেশদা! তুমি আমাকে যেন চিনতেই পারছ না, এও কি কম কষ্ট! কেন বল ত, এমন কি দোষ করেছি?

লোকেশ জবাবে বললে, পিছনে বসতে যদি কষ্ট হয়, সামনে আসতে পারেন। জোরে ছুটবে—ঝাকুনী হবে খুব!

সীমন্তী এবার আর ভাবে না অন্য রকম। লোকেশের পাশে বসে বোঝাপড়া করে নেবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছে খুবই। তাড়াতাড়ি উঠে এসে বসে পড়ল লোকেশের পাশের আসনে।

গাড়ী ছুটেছে আবার দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে। লোকেশের যেন ভ্রূক্ষেপ নেই। সন্ধ্যার আগেই পৌঁছোতে হবে। কুলি বস্তী থেকে ধোঁয়া উঠে চারপাশের হিমভেজা গাছপালায় লুকিয়ে পড়ছে। দূরের কাঁটা পাহাড়ে একটুকরা মেঘ গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে। যেন চিমনীর মুখ থেকে খানিকটা ধোঁয়া ধীর-মন্থর চালে উপরে উঠছে। দু'পাশের মাঠ-প্রান্তর থেকে ভিজে ভিজে হাওয়া এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে গাড়ীটার দু'পাশে। লোকেশের টুপিটা পাশে নামানো। চুলগুলো বিপর্যস্ত হয়ে লুটোপুটি খাচ্ছে কপালের উপর। কেমন একটা মমতা বোধ করে সীমন্তী। ওর সঙ্গে দুটো কথা বলতে ইচ্ছা করে। একটু ইতঃস্তত করে বলে, জান লোকেশদা! তোমার জন্য অনেক ভাল ভাল খাবার করেছি।

লোকেশ জবাব দিলে কিনা বোঝা গেল না। শুধু গাড়ীর ঝাকানি আর ইঞ্জিনের অশ্রান্ত গর গর শব্দ সামনে শোনা যেতে লাগল। আগের মতই গাছপালা, পথ, মানুষ, কাছের দূরের গ্রাম ছিটকে ছিটকে যেতে লাগল। সীমন্তী ওদের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারে না। কেমন বোকা বোকা মনে হয়। কে যেন তাকে হারিয়ে দিয়েছে। অনেক কিছু ঠকিয়ে কেড়ে নিয়েছে। লোকেশ এত সাধারণভাবে সুকঠিন আচরণ করবে তা তার স্বপ্নেরও অতীত ছিল। একদিন পাশাপাশি বসবার জন্য কি আকুল প্রয়াস তার ছিল। সিনেমার সিটে পাশাপাশি না বসলে রাগ করে থেকেছে সাতদিন। আর পাশের আসনে বসে চুপি চুপি হাতখানা ধরে একটু চাপ দেওয়া, সন্তর্পণে জুতোর ফিতে খুলতে গিয়ে সীমন্তীর পায়ের পাতায় হাত বুলিয়ে নেওয়ার কি চেষ্টা! সবই বুঝত সীমন্তী। পুলকের আনন্দে মনে মনে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত। আজ সেই লোকেশ তার কাছে রহস্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে ওর মনোবৃত্তি বিশ্লেষণ করতেই পারছে না। এক মনে বাইরের পানে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সহসা মনে হ'ল সীমন্তীর, লোকেশকে সে একদিন খুবই ভালবাসত, আজও বাসে। শুধু মাঝখান থেকে যোগেশ দুষ্ট গ্রহের মত হাজির হয়ে তাদের কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত করেছে। লোকেশ আবার তার কাছে ধরা দিক, কিন্তু কেমন করে? ভাবতে গিয়ে আকুল হয়ে ওঠে যেন। তারপর বলে ওঠে সহসা: তুমি কি ঠিক করেছ লোকেশদা, আজ নিজে থেকে কথাই বলবে না?

লোকেশ ষ্টিয়ারিং-এ হাত রেখে বাইরে তাকিয়েই বললে, কত কথাই ত বললাম, তবু অভিযোগ করছেন?

এ কি তোমার উপযুক্ত কথা লোকেশদা! আপনি—আদেশ করে—তুমি যা অপমান আমাকে আজ করলে তা ভাবতে পর্য্যন্ত পারছি নে। বল কি অপরাধ করেছি আমি?

পথটা বেশ সোজা। তাই স্বচ্ছন্দে পাশে ঘাড় ফিরিয়ে পূর্ণ দৃষ্টি মেলে লোকেশ বললে, আপনি কি বলছেন, তার মানে আমি ঠিক বুঝতে পারছি নি। যদিও মেয়েদের আচরণ সব সময়ই দুর্ব্বোধ্য!...কথার শেষে একটুখানি ফিকে হাসি ফুটে উঠল লোকেশের ঠোঁটের কোণে।

চোখ দুটো দপ করে জ্বলে উঠল সীমন্তীর। বললে উদ্দীপ্ত হয়ে: মেয়েদের যে বিশ্বাস করে না, সে মূর্খ!

স্বীকার করি সীমন্তী দেবী।···লোকেশ প্যান্টের পকেটে হাত পুরে ছোট একটা ডায়েরী বের করে বললে, সম্ভবতঃ এটা চিনতে পারবেন আপনি।

সীমন্তী চমকে উঠল ওটা দেখে। তারই ছোট ডায়েরীটা। অধিকাংশ পাতাই লোকেশের উদ্দেশ্যে লেখা। যত উচ্ছাস প্রকাশ করেছে লোকেশ, তার জবাব লিখেছে এর পাতায় পাতায়। উৎসর্গ-করা প্রিয়তম লোকেশের জন্য। তারপর তারিখ ধরে ধরে লোকেশ কি বলেছিল, তার প্রত্যুত্তরে সীমন্তীর মনের কথা। ইচ্ছা ছিল এর সবটাই একদিন লোকেশকে দান করবে শেষ হয়ে গেলে, কিন্তু কিভাবে সেটি খোয়া যায়। তারপর থেকে কতদিন ভেবে মরেছে। উৎকণ্ঠায় রাত্রে ঘুম হয় নি, কে জানে বিয়ের পর যোগেশের হাতে যদি পড়ে থাকে। তাই ওটা দেখে অন্তরটা ব্যাকুল হয়ে উঠল নিমেষে তারপর ছো মেরে ছিনিয়ে নিয়ে নেয় লোকেশের হাত থেকে। রুদ্ধনিঃশ্বাসে পাতার পর পাতা উল্টে যায়। সবই অবিকৃত আছে। একটুক্ষণ সেটা হাতে নিয়ে দম নেয়, তারপর দ্রুত ছিঁড়তে থাকে একটি একটি পাতা। হাওয়ার মুখে উড়িয়ে দিলে গোটা ডায়েরীটাকে। আর কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ রইল না। ভাগ্যে লোকেশ তাকে এটি ফিরিয়ে দিয়েছে। ওর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে দেরী করলে চলে না। বাড়ী পৌঁছোতে আর দেরী নেই। আকুল হয়ে ষ্টিয়ারিং শুদ্ধ লোকেশের একটা হাত জড়িয়ে ধরে, আমায় ক্ষমা কর লোকেশদা। তোমার উপর অবিচার করেছি।

লোকেশ কাঠের পুতুলের মত সামনে চেয়ে রইল। একটু পর সীমন্তী নিজেই উচ্ছাস দমন করে। সোজা হয়ে সাড়ীখানা সামলে নিয়ে বলে: উঃ তুমি কি ভিজে বেড়াল টের পেলাম! দেখ, চা না খেয়ে চলে যাবে না বলছি। যদি যাও, তা হলে মাথার দিব্যি রইল। বুঝেছি তোমার রাগ হয়েছে খুব। হওয়াই ত স্বাভাবিক। রজনীই আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছিল। সত্যি বিশ্বাস কর, আজও তোমাকে আমি পূজো করি মনে মনে···।

গাড়ী এসে দাঁড়াল যোগেশের বাড়ীর সামনে। তখন চারিদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে। সীমন্তী গাড়ী থেকে নেমে তর তর করে এগিয়ে যায়, এস লোকেশদা!···এই ভজু! উনি বুঝি এখনও ফেরেন নি আপিস থেকে?···যা ত বাবুকে নিয়ে বসাগে বৈঠকখানায়।

সিঁড়িতে উঠে বারান্দায় পা দিতেই কানে এল গাড়ীতে ষ্টার্ট দেওয়ার শব্দ। সীমন্তী ঘাড় ফেরাবার সঙ্গে সঙ্গেই জিপখানা সোঁ করে উধাও হয়ে গেল।

খানিকক্ষণ ভাবলে সীমন্তী, অবপর ম্লান-বিষণ্ণমুখে এসে দাঁড়ালে শয়নকক্ষের পশ্চিম-জানালায়। বেশ-বাস ছাড়ার কথা মনে রইল না।

জানালার বাইরে সুদূর গোলামেলা। শীতের আমেজে ভরে গেছে বহু দূর পর্যন্ত? পাতায় পাতায় শিশির গড়াচ্ছে হয়ত টুপ-টাপ করে। দু'একটি ক্ষীণ প্রদীপ দূরে দূরে জ্বলে উঠে নিভে গেল। একরাশ জোনাকি বারে বারে নিভে যাচ্ছে চোখের সামনে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সব কিছুই ঝাপসা হয়ে আসে।

হাতের উপর এক ফোটা গরম জল পড়তেই সীমন্তী টের পেল শিশির নয় অশ্রু।

অতীতে লোকেশ একদা বলেছিল: যতই কঠিন হও, আমাকে স্মরণ করে একদিন তোমাকে চোখের জল ফেলতেই হবে···।

বসন্তে

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

বাতাবী পুষ্পের গন্ধ ছড়ায়ে বাতাসে
শিমুলে পলাশে রাঙা বন-পথে আসে
বসন্ত—ঋতুর রাজা। আম্রমঞ্জরীর
সৌগন্ধে মদির আজি দখিনা সমীর।
মর্ম্মরিত বনে বনে কার দীর্ঘশ্বাস?
আগন্তুক পাখীদের আনন্দ-উচ্ছ্বাস;
নবোদ্গত পল্লবের স্নিগ্ধ শ্যামলিমা;
রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশের নির্ম্মল নীলিমা;
—সব নিয়ে এ ধরণী প্রাণের বীণায়,
আজিকে স্বর্গের কোন্ রাগিণী বাজায়!
বসন্ত, তোমারে মোর মালিকা পরাই!
ফিরে ফিরে আসো তুমি, আমি চলে যাই!
করেছো আমারে তুমি আনন্দে উচ্ছল
বর্ষে বর্ষে; স্মরি আঁখি করে ছলোছল!

১৯৫৮-৫৯ সনের রেলওয়ে বাজেট

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত

বিগত ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে লোকসভায় ভারতের রেল-মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম ১৯৫৮-৫৯ সনের রেলওয়ে বাজেট পেশ করেছেন। তাঁর প্রদত্ত ভাষণ থেকে জানা যায়, মাশুল নির্দ্ধারণ কমিটি যে সব সুপারিশ করেছেন সে সব সুপারিশ এখন চূড়ান্ত পর্য্যায়ে পৌঁচেছে। কাজেই কমিটির সুপারিশগুলি সম্বন্ধে শেষ পর্য্যন্ত যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে, সরকার নিকট-ভবিষ্যতে সে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করবেন। বোধ হয় এজন্য রেল-মাশুলের বর্ত্তমান কাঠামোর কোনপ্রকার পরিবর্ত্তনের আভাস রেলমন্ত্রীর বক্তৃতায় পাওয়া যায় নি। রেলমন্ত্রী বলেছেন, আগামী বছরে রেলওয়েকে অতিরিক্ত এক কোটি বিশ লক্ষ টন মাল বহন করতে হবে। প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা যেতে পারে, ভারতের দ্বিতীয় বৈষয়িক পরিকল্পনায় ষোল কোটি বিশ লক্ষ টন রেলওয়ের মাল বহনের লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। অথচ রেলমন্ত্রীর ভাষণ অনুযায়ী আগামী বছরে যদি রেলওয়ে অতিরিক্ত এক কোটি বিশ লক্ষ টন মাল বহন করে, তা হলেও রেলওয়েতে মোট মাল বহনের পরিমাণ দাঁড়াবে চৌদ্দ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টন। অর্থাৎ রেলওয়ে যদি আরও এক কোটি সত্তর লক্ষ টন মাল বহন করে তা হলে দ্বিতীয় বৈষয়িক পরিকল্পনায় উল্লিখিত লক্ষ্যে পৌঁছান যাবে। প্রশ্ন হতে পারে, কি কারণবশত: দ্বিতীয় বৈষয়িক পরিকল্পনায় অতিরিক্ত মাল চলাচলের উপর অতটা জোর দেওয়া হয়েছে। কারণ হল দুটো। প্রথমত: ইস্পাত শিল্প বিশেষভাবে প্রসারিত হবার সম্ভাবনা আছে। দ্বিতীয় কারণ হ'ল অতিরিক্ত কয়লা উৎপাদন।

ভারতের রেলপথের সম্মুখে সমস্যার অন্ত নেই। তবে আজকের দিনে কিভাবে জাতীয় চাহিদার সঙ্গে তাল রেখে যান-চলাচল ব্যবস্থা প্রসারিত করা যেতে পারে, সেটাই হ'ল সব চাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। অবশ্য এই সমস্যার জটিলতা অতটা বেড়ে যেত না যদি ব্রিটিশ শাসকবৃন্দ যান-চলাচল ব্যবস্থা প্রসারের ব্যাপারে সক্রিয় হয়ে উঠতেন। ব্রিটিশ আমলে অবলম্বিত রেলপথ সম্পর্কীয় ব্যবস্থা যদি বিশ্লেষণ করা হয়, তা হলে কতখানি সত্যের উপর এই অভিযোগটি প্রতিষ্ঠিত সেটা সুস্পষ্টভাবে জানা যাবে। সে আমলে যে এলাকা জুড়ে রেলপথ বিস্তৃত হয়েছে সে এলাকাকে মোটামুটি ভাবে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম ভাগের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী অঞ্চল। দ্বিতীয়ত: হিমালয় পর্ব্বতমালা থেকে দক্ষিণে কিছুসংখ্যক রেলপথ দেখা গেছে। অর্থাৎ ব্রিটিশ আমলে ভারতের বিরাট অঞ্চল রেলপথের সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। অথচ যদি ব্রিটিশ শাসকরা উত্তর-বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা, উত্তর-বিহার, উত্তর-প্রদেশের উত্তরাংশ এবং দাক্ষিণাত্যে বিরাট এলাকায় রেলপথ প্রসারের জন্য সচেষ্ট হতেন তা হলে এই সব স্থানে প্রাকৃতিক সম্পদ যথাযথভাবে ব্যবহার করা খুব সহজ হত। যেহেতু ব্রিটিশ শাসকেরা এই সব স্থানের প্রাকৃতিক সম্পদ সদ্ব্যবহার করার কথা চিন্তা করেন নি সেহেতু ব্রিটিশ শাসকবৃন্দকে যান-চলাচল ব্যবস্থা প্রসারিত করতে সচেষ্ট হতে দেখা যায় নি। তাই আজ সমস্যা অতটা গুরুতর আকার ধারণ করেছে। স্বাধীন ভারতে যাঁদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ন্যস্ত হয়েছে তাঁরা জাতীয় চাহিদার সঙ্গে তাল রেখে এই সব স্থানে রেল-চলাচল ব্যবস্থা প্রসারিত করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করছেন। অবশ্য প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়া এক কথা, আর প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ করা আর এক কথা। জাতীয় প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে কাজ করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সরকার প্রধানত: দুটো কারণ বশত: রেল-চলাচল ব্যবস্থা আশানুরূপ ভাবে প্রসারিত করতে পাচ্ছেন না। প্রথম কারণ হ'ল এই যে, আমাদের দেশে ইঞ্জিন, কলকব্জা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির অভাব রয়েছে। অবশ্য এই অভাব দূর করার উদ্দেশ্যে সরকার একদিকে যে রকম দেশের মধ্যে প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরী করার জন্য উৎসাহ দিচ্ছেন, সে রকম অন্য দিকে আন্তর্জ্জাতিক সংস্থাগুলোর কাছ থেকে ঋণ নেবার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। এ ছাড়া রেলপথের জন্য বাইরে থেকে অধিকতর পরিমাণে প্রয়োজনীয় কলকব্জা, ইঞ্জিন, যন্ত্রপাতি এবং উপকরণ আমদানীর জন্য সরকার অন্যান্য জিনিসের আমদানী কমিয়ে দিতে চাইছেন। আমাদের অনেকেরই হয়ত জানা আছে, রেলওয়ে বোর্ড দেশীয় পণ্য সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট নীতি কার্য্যকরী করেছেন। অর্থাৎ যাতে দেশীয় পণ্যের জন্য অপেক্ষাকৃত চড়া দর দেওয়া হয় সেজন্য বোর্ড সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তাই এই মর্ম্মে আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে, যন্ত্রপাতি, উপকরণ ইত্যাদি সম্পর্কে ভারত ক্রমে ক্রমে স্বাবলম্বী হতে পারবে। অর্থাৎ ধীরে ধীরে ভারতের পরনির্ভরতা কমে যাবে। দ্বিতীয়ত: অন্যান্য বহু প্রকার কাজের চাপে সরকারের পক্ষে খুব তাড়াতাড়ি রেল-চলাচলের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হচ্ছে না। রেলপথের তাগিদের চাইতে এই সব কাজের তাগিদ মোটেই কম নয়। রেলমন্ত্রীর বিশ্বাস, যাতে রেলওয়ের খুব প্রয়োজনীয় উপকরণ, বিশেষ করে লৌহ এবং ইস্পাত সরবরাহের উন্নয়ন সম্ভবপর হয় সেজন্য এতদিন পর্য্যন্ত যে সব ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে, সে সব ব্যবস্থার সাফল্য কিছুতেই উপেক্ষা করা চলে না, কারণ এই সব ব্যবস্থা থেকে সন্তোষজনক ফল পাওয়া গেছে। তিনি আশা করেন, বাজেট বছরে

ইস্পাতের লাইন সংস্থাপনের উপকরণ সরবরাহের আরও উন্নয়ন সম্ভবপর হবে যদিও এখনও পর্য্যন্ত ব্রীজ-গার্ডার এবং সিগন্যালিং সরঞ্জাম সরবরাহের ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে সন্তোষজনক বলা যায় না।

প্রচারিত খবর থেকে জানা যায়, ১৯৫৭-৫৮ সনের আমাদের দেশে রেলগাড়ী উৎপাদনের ক্ষমতা বেশ বেড়ে গেছে। রেলমন্ত্রীও এই কথা বিগত ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে লোকসভায় জোর গলায় ঘোষণা করেছেন। আমাদের অনেকেরই হয়ত জানা আছে, বেশ কিছু দিন আগে থেকে সাধারণ কাজের ওয়াগন আমদানী বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া বর্তমানে বাষ্প-চালিত ইঞ্জিন আমদানীও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য তাই বলে বাইরে থেকে ইঞ্জিন আমদানী একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয় নি। রেলমন্ত্রী বলেছেন, ন্যারো গেজ লাইনের জন্য এখনও কিছু কিছু ইঞ্জিন আমদানীর প্রয়োজন আছে।

লোকসভায় যে বাজেট পেশ করা হয়েছে সে বাজেট থেকে জানা যায়, বাজেট বছরে নানাপ্রকার নির্ম্মাণকার্য্য, যন্ত্রপাতি এবং রেলগাড়ী বাবদ দুইশত ষাট কোটি টাকা ধরা হয়েছে। ঐ বছরে দুটো নূতন রেললাইন খোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। প্রথমটি হ'ল ববাটগঞ্জ-গাড়োয়া রোড লাইন। এটা উত্তর রেলওয়ের অন্তর্গত এবং এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে একশত মাইল। অনুমান করা হয়েছে, এই লাইনটি খুলতে সতের কোটি টাকা খরচ পড়বে। দ্বিতীয়টি হ'ল মুরী-রাঁচী সংযোগ লাইন। এটা চল্লিশ মাইল দীর্ঘ। লাইনটি পূর্ব্ব রেলওয়ের অন্তর্গত। এর দরুণ পাঁচ কোটি নব্বই লক্ষ টাকা খরচ পড়বে। মোট কথা হ'ল রেলমন্ত্রী দেশের জনসাধারণকে অনেক প্রকার আশার বাণী শুনিয়েছেন এবং অগ্রগতির ইতিহাস বিবৃত করে জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করেছেন। তবুও "Many who listened to this story of progress must have wondered to what extent envisaged expension would help to close the expected gap between the demand for and the supply of railway transport during the later stages of the second plan."

রেলমন্ত্রীর ভাষণ থেকে জানা যায়, ১৯৫৭-৫৮ সনে আনুমানিক উদ্বৃত্ত ত্রিশ কোটি তিরাশী লক্ষ টাকার স্থানে মাত্র একুশ কোটি ছেব লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হয়েছে। তবে এই মর্ম্মে আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে, ১৯৫৮-৫৯ সনে সাতাশ কোটি চৌত্রিশ লক্ষ টাকা নীট উদ্বৃত্ত হবে। রেলমন্ত্রী বলেছেন, এই টাকা উন্নয়ন তহবিলে জমা দেওয়া হবে। এছাড়া মাল এবং যাত্রী পরিবহন বাবদ আদায় ১৯৫৮-৫৯ সনে চার শত সাত কোটি আটচল্লিশ লক্ষ টাকায় দাঁড়াবার আশা আছে। অবশ্য ১৯৫৭-৫৮ সনের সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী মাল এবং যাত্রী পরিবহন বাবদ আদায় তিন শত চুরাশী কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকায় দাঁড়াবে বলে অনুমান করা হয়েছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে ১৯৫৭ ৫৮ সনের তুলনায় ১৯৫৮-৫৯ সনে আদায়ের পরিমাণ বর্দ্ধিত হবার সম্ভাবনা আছে বলে সরকার মনে করেন। আমরা দেখেছি, রেলপথের মোট আয় ১৯৫৪-৫৫ সনে দু শত ছিয়াশী কোটি আটাত্তর লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে ১৯৫৬-৫৭ সনে তিন শত সাতচল্লিশ কোটি সাতার লক্ষ টাকায় দাঁড়িয়েছিল। আগেই বলা হয়েছে, ১৯৫৮-৫৯ সনে এই আয় চার শত সাত কোটি আটচল্লিশ লক্ষ টাকায় দাঁড়াবার আশা আছে। অর্থাৎ সরকারী অনুমান অনুযায়ী পাঁচ বৎসরের মধ্যে একশত বিশ কোটি সত্তর লক্ষ টাকা আয়বৃদ্ধি পাবে। এই অনুমান থেকে জনসাধারণ হয়ত স্বভাবতঃই মনে করবেন, সুষ্ঠুভাবে রেলওয়ে পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু একটু ভালভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, আনন্দিত হবার সত্যিকারের কোন কারণ নেই। রেলমন্ত্রী যে আয়ের হিসাব দিয়েছেন সে আয় নিঃসন্দেহে ভাড়া এবং মালের মাশুল চড়িয়ে সংগৃহীত হয়েছে। শুধু তাই নয়। সংগৃহীত ভাড়ার বেশীর ভাগই এসেছে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের কাছ থেকে। অবশ্য একথা ঠিক যে, আগের চাইতে যাত্রীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়েছে এবং মাল বহনের পরিমাণ বেড়েছে। তবে যাত্রীসংখ্যা এবং মাল বহনের পরিমাণ বর্দ্ধিত হবার ফলে রেলওয়ের আয় তেমন বর্দ্ধিত হয় নি। চড়া ভাড়া এবং মাশুলই হ'ল আয়বৃদ্ধির আসল কারণ। যেক্ষেত্রে যাত্রী-ভাড়া বাবদ মোট আদায়ের শতকরা নব্বই ভাগ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়ে থাকে, সে ক্ষেত্রে দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে চড়া ভাড়া কিরকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে সেটা সহজেই অনুমেয়। তাছাড়া যে ধরণের দুঃসহ অবস্থার মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের যাতায়াত করতে হয় সেটা এখানে উল্লেখ না করলেও চলে। অথচ সরকার এর কোন প্রতিকার করতে পারছেন না। এটা সত্যি দুঃখের বিষয়।

রেল বাজেটটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ১৯৫৮-৫৯ সনে রেলগাড়ীর জন্য সাতাশী কোটি পঁচানব্বই লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় হ'ল এই যে, বরাদ্দকৃত টাকার সবটাই এদেশে ব্যয় করা হবে না। অর্থাৎ বরাদ্দকৃত টাকার কিছুটা অংশ বিদেশী গাড়ী আমদানীর জন্য খরচ করা হবে। কতটুকু ভারতে এবং কতটুকু আমদানীর জন্য ব্যয় করা হবে সেটা বাজেটে সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। সাতাশী কোটি পঁচানব্বই লক্ষ টাকার মধ্যে ষাট কোটি সতের লক্ষ টাকা ভারতে এবং বাকী টাকা বিদেশী গাড়ী আমদানীর জন্য ব্যয় হবে। এছাড়া ১৯৫৮-৫৯ সনে বৈদ্যুতিকীকরণ পরিকল্পনাগুলোর জন্য মোট যোল কোটি উনত্রিশ লক্ষ টাকা খরচ পড়বে বলে অনুমান করা হয়েছে।

লোকসভায় রেলমন্ত্রী বলেছেন, ১৯৫৮-৫৯ সনে সাধারণ পরিচালনা ব্যয় দু'শত আটষট্টি কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা হবে। অর্থাৎ ১৯৫৭-৫৮ সালের সংশোধিত হিসাবে এই বাবদ যে খরচ পড়বে বলে অনুমান করা হয়েছে সে খরচের তুলনায় ১৯৫৮-৫৯

সনে নয় কোটি উনিশ লক্ষ টাকা বেশী খরচ পড়বে বলে রেল-মন্ত্রী মনে করেন। তাঁর ধারণা, এই ব্যয়বৃদ্ধির পিছনে পাঁচটি কারণ আছে। প্রথম কারণ হ'ল রেলকর্ম্মচারীদের বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি। দ্বিতীয়তঃ গোটা বছর ধরে বর্দ্ধিত হারে অন্তবর্ত্তীকালীন মহার্ঘ ভাতা দিতে হবে। তৃতীয়তঃ যাতে অতিরিক্ত মাল এবং যাত্রী চলাচলের পথে অন্তরায় দেখা না দেয় সেজন্য আবশ্যক কর্ম্মচারী নিযুক্ত করতে হবে। চতুর্থতঃ অনুমান করা হয়েছে, মেরামতী ব্যয় আড়াই কোটি টাকা বেড়ে যাবে। পঞ্চম কারণ হ'ল, কয়লা এবং অন্যান্য ধরণের জ্বালানীর ব্যয়বৃদ্ধি।

দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, রেলমন্ত্রী গাড়ীতে ভীড় কমাবার কোন আশ্বাসই দিতে পারেন নি। বরঞ্চ শীঘ্র ভীড় কমাবার কোন সম্ভাবনা নেই বলে তিনি লোকসভার সদস্যদের সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ যে অসুবিধা এখন বিদ্যমান সে অসুবিধা দূর হবার আশা নেই। অবশ্য কেন এখন সরকারের পক্ষে এই অসুবিধা দূর করা সম্ভবপর হবে না—সেটা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রেলমন্ত্রী আর্থিক অনটন, বগী নির্ম্মাণের পরিমিত ক্ষমতা এবং লাইনের গাড়ী ধারণ ক্ষমতার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তবুও একথা অনস্বীকার্য্য যে, এই অসুবিধা সরকারী নীতির ব্যর্থতা প্রমাণিত করছে। বিগত ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রকাশিত ষ্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধের এক স্থানে বলা হয়েছে :—

"Mr. Jagjivan Ram's references to passenger amenities seemed almost perfunctory, especially when he reiterated the old policy that goods would get preference over people and suggested, in effect, that crowding in trains will get worse before it gets better. Despite the addition of hundreds of trains in the past few years it is still not possible for a passenger travelliug on a hot summer's night from, say, Calcutta to Patna to leave his compartment for a drink of water without risk of not being able to get in again."

এর পর কোন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

শুধু তুলে ধরা ডালি

শ্রীবিভুপ্রসাদ বসু

রাত্রির স্বপন হেরি কাটে দীর্ঘদিন—
নিশার বাসনা মাগে দিনের আশ্লেষ···
আঁধার অন্তরে যদি জলে জ্যোতিঃ লেশ
জানে না কেমনে হায় শুধিবে সে ঋণ।···
তবু করপুট পাতি' করুণ মলিন
কত তীক্ষ্ণ বাসনার আজও নাই শেষ,
কিবা পায়, তবু চেয়ে থাকা নির্নিমেষ
শুধু তুলে ধরা ডালি দুরাশা-কঠিন।···

সেই ভালো থাকা বসে' খোলা বাতায়নে
যদি বা পরশে তনু আলো আধ-ছোঁয়া···
ভাঙা অনুরাগটুকু ভীরু শুভক্ষণে
নিবিড় গোপনে যদি যায় ক্ষণ খোয়া।

শিহরি' উঠুক নিশা দিনের গভীরে
রজনী জাগুক তার দিবা-স্বপ্ন ঘিরে।···

মন্দিরময় ভারত—গুহা-মন্দির, নাসিক

শ্রীঅপূর্ব্বরতন ভাদুড়ী

এলিফ্যাণ্টা গুহা-মন্দির দেখতে গিয়ে মন্দিরের অধ্যক্ষের সঙ্গে পরিচিত হই। ক্রমে সেই পরিচয় ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। প্রায় বছরখানেক পরে তিনি নাসিকে বদলি হন। তাঁরই পুনঃ পুনঃ পত্রাঘাতে ও সনির্বন্ধ অনুরোধে একদিন স্ত্রী ও কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে নাসিকে গিয়ে উপস্থিত হই। দর্শন হয় পুণ্যতীর্থ নাসিক, দেখলাম তার অনুপম মন্দিরগুলিও। বহু দিনের এক বাসনা যা লুক্কায়িত ছিল মনের মনিকোঠায়, তা পূর্ণ হ'ল।

দেখলাম স্বপ্নলোক অজন্তা; পবিত্র তীর্থ বৌদ্ধ শ্রমণের, শ্রেষ্ঠ কীর্তিস্থল বৌদ্ধ স্থপতির আর চিত্রশিল্পীর স্বপ্নপুরী ইলোরা। বৌদ্ধ, হিন্দু আর জৈন স্থপতির শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলি দেখলাম, ঐ সঙ্গে কার্লি ভাজা ও বিদিশা আর কানেরি গুহা-মন্দিরও। নাসিক দেখলে, দেখা হবে পশ্চিম-ভারতের প্রায় সবগুলি গুহা-মন্দিরই।

নাসিক বোম্বাই-কলিকাতা লাইনে বোম্বাই থেকে একশ' কুড়ি মাইল দূরে অবস্থিত। আমরা তখন বোম্বাইপ্রবাসী, রওনা হই কলিকাতা মেলে চড়ে রাত্রি ন'টায়। রাত্রি বারটায় ট্রেন নাসিক ষ্টেশনে এসে থামে। ট্রেন থেকে নেমে দেখি বন্ধুবর ষ্টেশনে উপস্থিত। একটি ট্যাক্সি করে তাঁর গৃহে উপনীত হলাম। বন্ধুপত্নী সাদরে অভ্যর্থনা করে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে যান। মুগ্ধ হই তাঁর সৌজন্যে। বাড়ী থেকে খাওয়ার পাট চুকিয়ে রওনা হয়েছিলাম। তাই মুখ-হাত ধুয়ে শয্যায় শুয়ে পড়ি।

পরের দিন সকালে উঠে চা ও জলযোগ শেষ করে সকলে মিলে গুহা-মন্দির দেখতে রওনা হলাম। নাসিকের দক্ষিণ-পশ্চিমে বোম্বাই-এর রাস্তায় প্রায় পাঁচ মাইল অতিক্রম করে আমাদের ট্যাক্সি গুহা-মন্দিরের সামনে এসে থামে।

দেবতারা সমুদ্রমন্থন করেন। ওঠে এক সুধাকুম্ভ, পরিপূর্ণ অমৃতে। অসুরেরা অপহরণ করলেন সেই সুধাকুম্ভ। কয়েকবিন্দু সুধা পড়লো ধরিত্রীর অঙ্গে—হরিদ্বারে, গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে প্রয়াগে, শিপ্রা নদীতীরে উজ্জয়িনীতে আর গোদাবরীতীরে নাসিকে। মহাতীর্থে পরিণত হ'ল এই সব স্থান। প্রতি দ্বাদশ বৎসরে সমাগত হন এখানে কত সাধু-মহাত্মা, আসেন কত দর্শনার্থী, উদাসী, বৈরাগী, আর নাগা সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী। মহাসম্মেলনে পরিণত হয় এই সব স্থান। অমাবস্যা তিথিতে কর্কট রাশিতে আর বৃহস্পতিতে অবস্থান করেন যদি সূর্য্য চন্দ্র তবে গোদাবরী তীরে—এই নাসিকে, কুম্ভ হয়।

সূর্য্যবংশের প্রথম রাজা ইক্ষ্বাকু, বৈবস্বত মনুর পুত্র। সেই বংশেরই রাজা দশরথ রাজত্ব করেন পুণ্যতোয়া সরযূর তীরে—অযোধ্যা নগরীতে। তাঁর তিন রাণী—কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রার গর্ভে চার পুত্র—রাম, লক্ষ্মণ, ভরত আর শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ
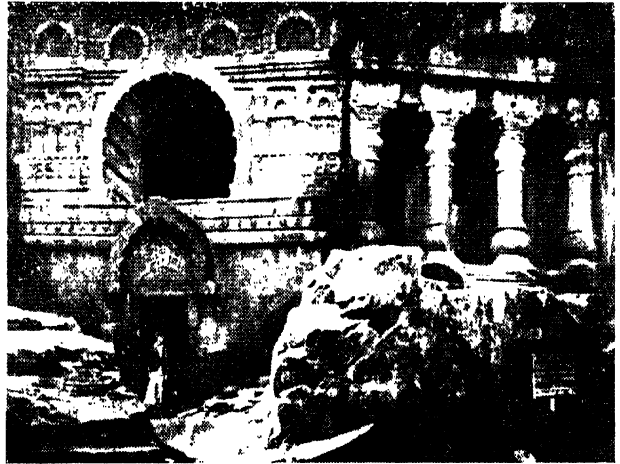
পাণ্ডুলেনা—গুহার উত্তর ভাগ

করেন। রাম বিদেহ-নৃপতিরাজর্ষি জনকের কন্যা সীতা দেবীকে বিবাহ করেন।

বিমাতা কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্রে নির্ব্বাসিত হন রামচন্দ্র চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য, ছেড়ে দেন ভরতকে অযোধ্যার সিংহাসনের অধিকার। তিনি দাক্ষিণাত্যে দণ্ডকারণ্যে যান, তাঁর অনুগমন করেন সীতাদেবী ও প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণ। সেখানে কিছুদিন গোদাবরীতীরে, পুণ্য-তীর্থ নাসিকে পঞ্চবটীতে বাস করেন।

রাক্ষসের অত্যাচারে উৎপীড়িত নাসিকের অধিবাসীরা, বিঘ্ন হয় মুনি-ঋষিদের জপ-তপের। রাম নির্ম্মম হস্তে নিবারণ করেন রাক্ষসের অত্যাচার। লঙ্কার রাক্ষস-রাজা রাবণের ভগ্নী সূর্পনখার নাসিকা কর্ত্তিত হয় এইখানে। খবর পেয়ে লঙ্কাধীশ রাবণ ক্রোধে উন্মত্ত হন। শেষে একদিন ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে এসে রামের অনুপস্থিতিতে

সীতাদেবীকে হরণ করে নিয়ে যান লঙ্কায়, প্রতিশোধ নেন ভগ্নীর অপমানের।

[illegible] শোকে মুহ্যমান শ্রীরামচন্দ্র। শেষে বেলারী জেলায় কিষ্কিন্ধ্যাধিপতি সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। তাঁর অনুগত হন হনুমান ও আরও অনেক বানর সেনানায়ক। তাঁদের সাহায্যে নির্ম্মিত হয় এক সেতু, সেতুবন্ধে। সেই সেতু অতিক্রম করে তাঁরা লঙ্কায় উপনীত হন। যুদ্ধে নিহত হন লঙ্কাধীশ রাবণ।

উদ্ধার করেন সীতাদেবীকে অশোককানন থেকে। শেষে পুষ্পক রথে আরোহণ করে রামেশ্বরমে এসে অবতরণ করেন। সেখানে সমুদ্রতীরে পিতৃতর্পণ করে অযোধ্যায় ফিরে আসেন, সঙ্গে আসেন ভক্তশ্রেষ্ঠ হনুমান।

আবার অযোধ্যার সিংহাসনে শ্রীরামচন্দ্র। উৎসবে মুখরিত হয় সারা অযোধ্যা। কিন্তু এক অসন্তোষের আগুন থেকে যায় প্রজাদের অন্তঃকরণে। সীতাদেবী বহুদিন রাক্ষস-রাজার অন্তঃপুরে ছিলেন—সন্দেহ হ'ল তাঁর সতীত্বে। দূতের মুখে রামচন্দ্র শোনেন তাদের অসন্তোষের বাণী। প্রজার মনোরঞ্জনের জন্যে নির্ব্বাসিত হলেন সীতাদেবী। সরযূতীরে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে এলেন তিনি। সেখানে তাঁর দুই পুত্র হলো—যমজ পুত্র। লব ও কুশ নামে খ্যাতিলাভ করে সেই পুত্রদ্বয়।

ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করেন লব আর কুশ। বাল্মীকি তাঁদের অযোধ্যায় নিয়ে আসেন। তাঁরা ফিরে পান তাঁদের পিতৃরাজ্য। রচিত হলো মহাকাব্য—রামায়ণ। রচনা করেন আদিকবি বাল্মীকি।

প্রাচীনতম যুগে রাষ্ট্রীকরা বাস করতেন নাসিকে। যখন স্থাপিত হয় ভারতে চারিটি প্রাচীনতম শক্তিশালী রাষ্ট্র—অবন্তি বৎস, কোশল আর মগধ,নাসিক অবন্তির অধিকারে আসে। ভারত-সম্রাট অশোক অলঙ্কৃত করেন মগধের সিংহাসন খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৭২ থেকে ২৩২ পর্য্যন্ত। বিস্তৃত হয় তাঁর রাজ্যের সীমানা উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে মহীশূরের চিতল দুর্গ এবং পূর্ব্বে বঙ্গদেশ ও কলিঙ্গ আর পশ্চিমে সুরাষ্ট্র ও আরব সাগর পর্য্যন্ত। নাসিক মগধের অধীনে আসে। গড়ে উঠে স্তম্ভ, স্তূপ, চৈত্য গবাদ (রেল) আর বিহার সারনাথ—বৌদ্ধ গয়ায়, কটকে, বরাবরে, উদয়গিরিতে, বিদিশাতে, মথুরাতে, ভারহুতে, দাক্ষিণাত্যে, পশ্চিম-ঘাটে, ভাজাতে। আজও বুকে নিয়ে আছে তারা শ্রেষ্ঠ মৌর্য্য-স্থাপত্যের নিদর্শন।

১৮৭ খ্রীষ্টপূর্ব্বে পতন হয় মৌর্য্যদের। সুঙ্গ পুষ্যমিত্র অধিরোহণ করেন মগধের সিংহাসনে। এবং মগধে সুঙ্গ-সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। নাসিক আসে তখন সুঙ্গদের অধিকারে। মহাপরাক্রমশালী তাঁর পুত্র অগ্নিমিত্রও অধিরোহণ করেন পিতৃ-সিংহাসনে পিতার মৃত্যুর পর। রাজত্ব করেন একে একে জ্যেষ্ঠমিত্র, বসুমিত্র আর ভদ্রক। ভদ্রকের রাজসভা তক্ষশীলায় গ্রীক রাজা প্রেরণ করেন এক গ্রীক দূত—হেলিয়োডোরাস নামে যিনি পরিচিত। দীক্ষিত হন তিনি বৈষ্ণব-ধর্ম্মে। নির্ম্মিত হয় এক গরুড়ধ্বজ। ধর্ম্ম, সাহিত্য ও শিল্পের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রস্থল তখন ভারত—ভারতের তখন স্বর্ণযুগ—সমপর্য্যায়ে পড়ে পরবর্ত্তী গুপ্তযুগও। সোনার্দ্ধে পতঞ্জলি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক এই যুগের। রচিত হয় বিদিশাতে গজদন্ত-নির্ম্মিত কত সূক্ষ্মতম শিল্প-সম্ভার, নির্ম্মিত হয় অনবদ্য স্তম্ভ, স্তূপ, চৈত্য, বিহার আর গবাদ (রেল) ভাজাতে নাসিকে, বিদিশাতে, কার্লিতে, অজন্তাতে আর সাঁচীতে—যা বুকে নিয়ে আছে শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের নিদর্শনরূপে। অমর হন শিল্পীরা, অমর হয় সোনার্দ্ধ, সাঁচী আর ভারহুত। অমরত্ব লাভ করেন সুঙ্গরাজারা ইতিহাসের পাতায়।

খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৭৩ অব্দে নিহত হলেন শেষ সুঙ্গরাজা দেবভূতি, অস্তমিত হয় সুঙ্গ-ক্ষমতা, সেই সঙ্গে সুঙ্গকৃষ্টি, সুঙ্গ-সভ্যতা আর সংস্কৃতি।

মগধে কণ্ববংশ স্থাপন করেন বাসুদেব। তিনি পঁয়তাল্লিশ বছর রাজত্ব করেন। অন্ধ্র প্রাচীনতম জাতি। তাঁরা বাস করতেন কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে। তাঁরাও রাজত্ব করেন প্রবল প্রতাপে দাক্ষিণাত্যে তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত দীর্ঘ চারি শত বৎসর। প্রতিষ্ঠিত হয় এক মহাশক্তিশালী সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্য দাক্ষিণাত্যে, বিস্তৃত তার সীমানা—কৃষ্ণা-গোদাবরীর উপত্যকা থেকে নাসিক আর উজ্জয়িনী পর্য্যন্ত। স্থাপিত হয় রাজধানী গোদাবরীতীরে প্রতিষ্ঠানে, দ্বিতীয় রাজধানী বৈজয়ন্তীতে, তৃতীয় অমরাবতীতে। ত্রিশ জন নৃপতি অধিকার করেন সাতবাহন সিংহাসন, তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীসাতকর্ণী, গৌতমীপুত্র বশিষ্ঠপুত্র পুলুমায়ী আর যজ্ঞশ্রীসাতকর্ণী। নাসিক আসে সাতবাহনদের অধিকারে। বিস্তৃত হয় দাক্ষিণাত্যে আর্য্য-সভ্যতা, আর্য্য-সংস্কৃতি। তাঁরাই রচনা করেন সাঁচীর অপরূপ তোরণ, বুকে নিয়ে আছে এই তোরণ শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের নিদর্শন রূপে।

কিছুদিনের জন্য নাসিক শক ক্ষত্রপ রুদ্রদামনের অধিকারে আসে। রাজত্ব করেন তিনি ৩০ থেকে ১৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, উজ্জয়িনীতে স্থাপিত হয় রাজধানী। বিবাহ হয় তাঁর কন্যা সাতবাহন বশিষ্ঠপুত্র পুলমায়ীর সঙ্গে।

সাতবাহনের ক্ষমতা তৃতীয় শতাব্দীতে অস্তমিত হয়। নাসিক অভীররাজ ঈশ্বর সেনের অধিকারে আসে। অভীরদের পতন হলে নাসিক বাকাটকদের অধিকারে আসে। বাকাটক রাজা দ্বিতীয় রুদ্রসেন সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের কন্যা প্রভাবতীকে বিবাহ করেন। তাঁদের সন্তান-সন্ততিরা নাসিকে কয়েকপুরুষ ধরে রাজত্ব করেন। হরি সেন শেষ রাজা বাকাটক বংশের। তাঁর মন্ত্রী বরাহদেব অজন্তাতে নির্ম্মাণ করেন ষোড়শ আর সপ্তদশ বিহার ৪৭০ থেকে ৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে। পরে নাসিক মালবের কলচুরীদের অধিকারে আসে। তাঁদের কোন দান ভারতীয় স্থাপত্যে নাই।

প্রাচীনতম যুগে এই নাসিককেই কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে পশ্চিম-ভারতের সভ্যতা, তার সংস্কৃতি, তার কৃষ্টি। তীর্থস্থানে পরিণত

হয় বুদ্ধগয়া, সাঁচী আর ভারহুত, নির্ম্মিত হয় কত গুহা-মন্দির— নাসিকে আর নাসিকের দু'শ মাইল পরিধি নিয়ে।

নির্ম্মিত হয় প্রথম চারিটি চৈত্য খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে, বাকী তিনটি খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে। কানেরির চৈত্য খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে নির্ম্মিত হয়। সবগুলি চৈত্যই হীনযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধরা নির্ম্মাণ করেন, তাই নাই এই চৈত্যে বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি। জুনারেও দুটি হীনযান চৈত্য নির্ম্মিত হয়।

মহারাজ অশোকের রাজত্বকালে খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে পাহাড়ের অঙ্গ কেটে নির্ম্মিত হয় চারিটি গুহা-মন্দির। নির্ম্মিত হয় কর্ণ কৌপর, সুদামা, লোমশ ঋষি ও বিশ্ব ঝোপড়ি। নির্ম্মাণ করেন বৌদ্ধ স্থপতি।

পশ্চিম-ঘাট পর্ব্বতমালাই গুহা-মন্দির নির্ম্মাণের উপযুক্ত স্থান। তাই বেছে নেন বৌদ্ধ স্থপতি এই পর্ব্বতমালাকেই গুহা-মন্দির নির্ম্মাণের জন্য। পাহাড়ের অঙ্গ কেটে নির্ম্মাণ করেন চৈত্য, বৌদ্ধ উপাসনামন্দির, খ্রীষ্ট ধর্ম্মমন্দিরের অনুকরণে। নির্ম্মিত হয় খিলান-সংযুক্ত প্রশস্ত ঘর (হল), বৃত্তাকারে রচিত হয় তার প্রান্তদেশ। দুই সারি দীর্ঘচ্ছেদ অনুপম স্তম্ভ দিয়ে পৃথক করা হয়েছে দু' পাশের গলি-পথকে ঘরের প্রশস্ত কেন্দ্রস্থল থেকে।

চৈত্যের সংলগ্ন একটি সঙ্ঘারাম বা বিহার, বাসস্থান বৌদ্ধ শ্রমণের। দাগোবার অনুরূপ বিহার কথাটিও সিংহল থেকে আমদানি হয়েছে। কেন্দ্রস্থলে রচিত হয় একটি প্রশস্ত সভাগৃহ (হলঘর)। রচিত হয় একটি বা একাধিক প্রবেশ-দ্বার, তার সম্মুখে একটি আচ্ছাদিত অপরূপ তোরণ বা অলিন্দ। রচিত হয় চতুষ্কোণ-প্রকোষ্ঠ পাহাড়ের অন্তরতম প্রদেশে, সভাগৃহের চতুর্দ্দিকে। প্রবেশ পথ দিয়ে সভাগৃহের সঙ্গে সংযুক্ত হয় সেই প্রকোষ্ঠগুলি। এই সব প্রকোষ্ঠেই বাস করেন বৌদ্ধ শ্রমণেরা। ক্রমে বাড়ে বৌদ্ধ শ্রমণের সংখ্যা, নির্ম্মিত হয় একাধিক বিহার। হয় বোধিসত্ত্বদের জন্য পৃথক বিহারও। সোপানের শ্রেণী দিয়ে যুক্ত হয় বিহারগুলি।

প্রথমে নির্ব্বাচিত হয় মন্দির-নির্ম্মাণের স্থান, নির্ভর করে সেই নির্ব্বাচন পাহাড়ের আকৃতি ও প্রকৃতির উপর। নির্ব্বাচন করেন সঙ্ঘের অধিকর্ত্তা, তিনিই প্রস্তুত করেন মন্দিরের পরিকল্পনা। নিযুক্ত হন স্থপতি, সুনিপুণ স্থাপত্যের ও পর্ব্বত খননের কাজে। ঋজু করে কাটা হয় চূড়ার নীচের পাহাড়ের খাড়া দিক, রচিত হয় মন্দিরের সম্মুখভাগ সেই লম্বতলে। কেন্দ্রস্থলে রচিত হয় একটি বৃহৎ গবাক্ষ, প্রবেশ-পথ মন্দিরের আলো-বাতাসের-পথ, পাহাড়ের ভিতরের কাজের আর রাবিশ ও ধ্বংসাবশেষ নির্গমনেরও। এই ধ্বংসাবশেষ দিয়েই রচিত হয় মন্দিরের সম্মুখের প্রাকার আর প্রাঙ্গণ।

স্তম্ভের শীর্ষদেশে গরুড়মূর্ত্তি—কোথাও জোড়া, কোথাও বা তিনটি দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি। কোথাও এক বা একাধিক সিংহ। কোথাও স্তম্ভের শীর্ষদেশে দেখি এক বা একাধিক হস্তী, অনবদ্য তাদের গঠন-সৌষ্ঠব। জীবন্ত প্রতীক তারা, এর পৌরাণিক অর্থ আছে। হস্তী পূর্ব্বদিগের রক্ষাকারী, অশ্ব দক্ষিণের, ষণ্ড পশ্চিমের আর সিংহ উত্তরের, তারা অভিভাবকত্ব করে চারিদিকে। ঋক্‌বেদে কিন্তু সিংহই লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন। দ্রুতগামী
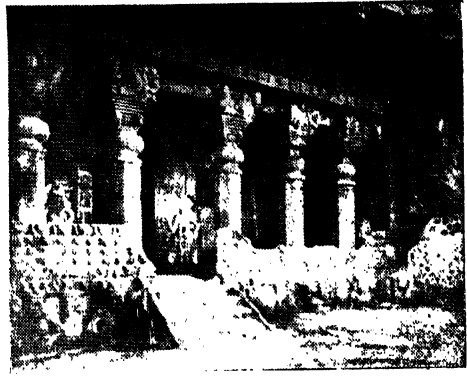
পাণ্ডুলেনা গুহার উত্তর-পূর্ব্ব ভাগ

অশ্ব সূর্য্যের প্রতীক, ষণ্ড দেবরাজ ইন্দ্রের। স্তম্ভের অঙ্গগুলিও বিভিন্ন। কেউ বৃত্তাকার, কেউ চতুষ্কোণ, কেউ অষ্ট, কেউ ষোল-কোণ বিশিষ্ট। কারুর অঙ্গ মসৃণ, নাই কোন শিল্প সম্ভার, কারও অঙ্গে খোদিত লতা, পল্লব, কারও অঙ্গে মূর্ত্তি। মূর্ত্তি কত জন্তুর, কত মানুষের—অপরূপ তাদের গঠন-ভঙ্গিমা!

প্রাচীরের গাত্রে কার্নিশের নীচেও সারি সারি মূর্ত্তি আর লতা। তার নীচে কত বুদ্ধের মূর্ত্তি। বিভিন্ন তাদের আকৃতি, বিভিন্ন তাদের ভঙ্গী—কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ পদ্মাসনে বসে, কারও হাতে অভয়-মুদ্রা, কারও বরদা, সবগুলিই জীবন্ত যেন। প্রবেশ-পথের দুই পাশের শীর্ষদেশ অনবদ্য লতা-পল্লবে আর মূর্ত্তি-সম্ভারে সাজান। তার ছাদে আর প্রাচীরের অঙ্গেও খোদিত অপরূপ লতা-পল্লব আর মূর্ত্তি। প্রবেশ পথের সম্মুখে একটি আচ্ছাদিত তোরণ, তার ছাদের আর স্তম্ভের অঙ্গেও কত সুন্দর, আর সূক্ষ্ম লতা-পল্লব। মূর্ত্তি আর লতা-পল্লবে শোভিত মন্দিরের সম্মুখ ভাগও।

পাহাড়ের অঙ্গ কেটে, পাহাড়ের অন্তরতম প্রদেশে চৈত্য আর বিহার, যেন স্বপ্নলোক।

চৈত্য আর বিহারের মধ্যে চৈত্যই পায় শ্রেষ্ঠত্বের আসন। নির্ম্মিত হয় নাসিকে একটি চৈত্য, পরিচিত পাণ্ডুলেনা নামে। রচিত হয় বাইশটি বিহারও, শ্রেষ্ঠ তাদের মধ্যে নাহাপনা (অষ্টম), গৌতমী পুত্র (তৃতীয়), আর শ্রীজ্ঞান (পঞ্চদশ গুহা-মন্দির)। দশম, একাদশ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ, বিংশতি ও একবিংশতি বিহারও আছে অক্ষত অবস্থায়। ধ্বংসে পরিণত হয়েছে অবশিষ্ট বিহারগুলি। এই বিহারগুলি খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী থেকে দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত হয়। সবগুলি মন্দিরই হীনযান সম্প্রদায়ের তৈরি।

আমরা প্রথমে পাণ্ডুলেনা, উনবিংশ গুহা-মন্দির দেখতে যাই। এই চৈত্যের সম্মুখে কোন কাঠের কাজ নাই। অজন্তার নবম গুহা-মন্দিরের সম্মুখভাগেও কোন কাঠের কাজ নাই। পাণ্ডুলেনা ত্রিরশ্মি পর্ব্বতমালার পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত, এই পর্ব্বতের শিখরে তিনটি চূড়া। দু হাজার বৎসর আগের তৈরি এক চৈত্যের সম্মুখ ভাগের অপরূপ শিল্প-সম্ভার দেখে মুগ্ধ হই। এই চৈত্যটি খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে, নির্ম্মিত হয়—নির্ম্মাণ করেন সুঙ্গ-রাজারা।

সম্মুখভাগে দুটি তল, নীচের তলের কেন্দ্রস্থলে আছে একটি প্রবেশ-পথ, অর্দ্ধচন্দ্রাকারে রচিত তার শীর্ষদেশ। অর্দ্ধচন্দ্রাকারে রচিত হয়েছে দ্বিতলের কেন্দ্রস্থলের চৈত্যের বিশাল বাতায়নটিও।

আমরা সম্মুখভাগ দেখে চৈত্যের ভিতরে প্রবেশ করি। দেখি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে একটি যক্ষ প্রতিহারী। দেখি প্রাচীরের গাত্রে একটি খোদিত লিপিও, লেখা আছে তাতে "ধাম্বিকা গ্রামবাসী প্রবেশ-পথের উপরের ক্ষোদিত শিল্প-সম্ভারের ব্যয় বহন করেছিলেন।" মুগ্ধ বিস্ময়ে এই শিল্প সম্ভার দেখি।

ভিতরে প্রবেশ করে দেখে বিস্মিত হই স্তম্ভ-অঙ্গের আর শীর্ষদেশের কারুকার্য্য। হাঁড়ির আকারে নির্ম্মিত স্তম্ভের তলদেশ, শীর্ষদেশের বন্ধনীর নীচেও তাই। নাই কোন কারুকার্য্য স্তম্ভের অঙ্গে। কারও শীর্ষদেশে মঞ্চের উপর শোভা পায় চতুষ্কোণ জোড়া হস্তী, কারও জোড়া গরু, অপরূপ তাদের গঠন-সৌষ্ঠব। দীর্ঘ ও সরু এই স্তম্ভগুলি, ব্যাস তাদের উচ্চতার অষ্টমাংশ, তাই শোভন, সুন্দর গঠন। সমপর্য্যায়ে পড়ে সুন্দরতম গ্রীক ও রোমান স্তম্ভের।

চৈত্যের প্রান্তদেশে, বৃত্তাংশে দেখি, রচিত হয়েছে পাহাড় কেটে একটি বৃহৎ স্তূপ, বৃত্তাকার তার তলদেশ।

আমরা চৈত্য দেখে অষ্টাদশ গুহা-মন্দির দেখি। প্রাচীনতম বিহার নাসিকের সমসাময়িক পাণ্ডুলেনা চৈত্যের এই বিহারটি।

তারপর নাহাপনা বিহার। এই বিহারটি ১০০ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। নির্ম্মাণ করেন অন্ধ্র সাতবাহনেরা। প্রাচীনতম তিনটি শ্রেষ্ঠ বিহারের মধ্যে, প্রাচীনতর গৌতমীপুত্র আর শ্রীজ্ঞানের, দাঁড়িয়ে আছে নাহাপনা এক সুন্দর শোভন মূর্ত্তিতে। অনুপম তার অলিন্দটি, বুকে নিয়ে আছে চারিটি স্তম্ভ, আকৃতি তার পিরামিডের মত। তাদের শীর্ষদেশে আছে একটি করে ঘণ্টা, তার উপর উল্টো করে রক্ষিত আর একটি ঘণ্টা। তার উপর বসে আছে জোড়া ষণ্ড অথবা জোড়া হস্তী। তাদের পাদদেশে পদ্ম, দুই প্রান্তে দুইটি অর্দ্ধ স্তম্ভ। অলিন্দ অতিক্রম করে ভিতরের কেন্দ্রস্থলের প্রশস্ত ঘরে প্রবেশ করি। নাই কোন স্তম্ভ এই সভাগৃহে। অনেক-গুলি প্রকোষ্ঠ সভাগৃহের সংলগ্ন। তারা পরস্পর সংযুক্ত প্রবেশ পথ দিয়ে। নাই কোন কারুকার্য্য এই সব প্রকোষ্ঠে, এক-একটি প্রস্তর-শয্যা প্রকোষ্ঠের কেন্দ্রস্থলে।

নাহাপনা দেখে আমরা গৌতমীপুত্র (তৃতীয়) দেখতে যাই। শ্রেষ্ঠ গুহা-মন্দির নাসিকের, অন্ধ্র সাতবাহনেরাই ১৩০ খ্রীষ্টাব্দে এই বিহারটি নির্ম্মাণ করেন।

অলিন্দের সম্মুখভাগে একটি নীচু প্রাচীর, গরাদে দিয়ে তৈরী সেই প্রাচীর। তার নীচে ক্ষোদিত এক সারি বৃহৎ মূর্ত্তি, স্কন্ধে নিয়ে বিশালকায় চন্দ্রাতপ। দানব তারা, ভূগর্ভ থেকে উঠে এসেছে, এই চন্দ্রাতপ দিয়ে ধারণ করে আছে সমস্ত বিহারটিকে। মন্দিরের ভারে বিস্তৃত তাদের চক্ষুর তারকা, স্ফীত বাহুর পেশী, কম্পিত সারা অঙ্গ। তারা শাশ্বত, নিযুক্ত করা হয়েছে তাদের বুদ্ধের কাজে, তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

গরাদের (রেলের) অন্তরালে দাঁড়িয়ে আছে অলিন্দের স্তম্ভ-গুলি, অদৃশ্য হয়ে আছে তাদের নীচের অংশ। অলিন্দের শীর্ষদেশে একটি প্রশস্ত খিলান—বিস্তৃত হয়ে আছে অলিন্দের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত। দাঁড়িয়ে আছে খিলানটি সারি সারি স্তম্ভের উপর, শীর্ষে নিয়ে আছে স্তম্ভ জোড়া হস্তী, জোড়া ষণ্ড আর জোড়া সিংহ। অনবদ্য তাদের গঠন।

বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে দেখি অলিন্দের শোভা, দরজার সামনে এসে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যাই, দেখি দ্বারের শীর্ষদেশের আর তার পাশের মূর্ত্তি-সম্ভার!

গৌতমীপুত্র দেখে আমরা শ্রীজ্ঞানে (পঞ্চদশ) বিহারে উপনীত হই। এই বিহারটি ১৮০ খ্রীষ্টাব্দে অন্ধ্র সাতবাহন রাজারা নির্ম্মাণ করেন। এটি অন্যতম তিনটি শ্রেষ্ঠ বিহারের, নির্ম্মিত হয় সবার শেষে।

বহুশত বৎসর অতিক্রম করে প্রবল হ'ল মহাযান সম্প্রদায়, হীন-বল হ'ল হীনযান। প্রবর্ত্তিত হ'ল মূর্ত্তির পূজা বৌদ্ধ চৈত্যে। অন্তর্হিত হ'ল স্মৃতির পূজা, তাই দাগোবার (স্তূপের) পরিবর্ত্তে চৈত্য আর বিহারের প্রান্তদেশে, মন্দির রচিত হ'ল। বুদ্ধমূর্ত্তি, মূর্ত্তি বোধিসত্ত্বের ও মূর্ত্তি পদ্মপাণি আর বজ্রপাণির—অবলোকিতেশ্বর আর মৈত্রেয়ীর। তাই যখন এই মন্দিরগুলি মহাযান সম্প্রদায়ের অধীনে আসে, পরিবর্ত্তিত হয় এই বিহারটির আকৃতি তাঁদের প্রয়োজনের চাহিদা মেটাতে। সপ্তম শতাব্দীতে রচনা করেন গুপ্ত স্থপতি, গুপ্ত রাজাদের অর্থে। স্থাপিত হয় সেই মন্দিরে এক মহা-মহিমময় বুদ্ধমূর্ত্তি।

বেরিয়ে এসে দশম গুহা-মন্দির দেখতে যাই। অন্যতম সুন্দর-তম এই বিহারটি সমপর্য্যায়ে পড়ে গৌতমীপুত্র বিহারের—অলিন্দের শীর্ষদেশের আর স্তম্ভের অঙ্গের শিল্প-সম্ভারে। কিন্তু নাই তার স্তম্ভের অঙ্গের মসৃণতা, নাই স্তম্ভের শীর্ষদেশের হাঁড়ির আকৃতির সৌষ্ঠবতাও।

আমরা একে একে দেখি একাদশ, সপ্তদশ, বিংশতি ও এক-বিংশতি গুহা-মন্দির, সবগুলিই বিহার বা সঙ্ঘারাম। কিন্তু নাই তাতে গৌতমীপুত্রের সূক্ষ্মতা, নাই সে সৌন্দর্য্যও তাদের অঙ্গের কারুকার্য্যে। পড়ে না তারা শ্রেষ্ঠত্বের পর্য্যায়ে।

সপ্তদশ ও একবিংশতি গুহা-মন্দিরে রচিত দেখি অনেকগুলি বুদ্ধ-

মূর্ত্তি, রচনা করেন দক্ষিণ-ভারতের চালুক্য রাজারা—৬০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে। দেখি সপ্তদশ মন্দিরে শয়ন করে আছেন একটি বিশালকায় মহিমময় বুদ্ধ, আছেন পরিনির্ব্বাণ মূর্ত্তিতে। সমপর্য্যায়ে পড়ে এই মূর্ত্তিটি অজন্তার ষষ্ঠ বিংশতি গুহা-মন্দিরের বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ মূর্ত্তির সঙ্গে।

শ্রদ্ধা জানাই স্থপতিদের, জানাই শ্রদ্ধা শিল্পীদেরও—অমর তাঁরা, অমর করেছেন ভারতবর্ষকে, দিয়েছেন শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের দরবারে। ফিরে যখন আসি, সঙ্গে নিয়ে আসি স্মৃতি, যা আজও হয় নি ম্লান, আছে উজ্জ্বল হয়ে মনের মণিকোঠায়।

গীতহারা

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

এখনি থামালে কেন গান ?
ফাল্গুন বিদায় যাচে, আজো চৈত্র আছে আছে,
ফুটন্ত ফুলের দিন এখনো হয় নি অবসান।
কে জানে হাসির ছলে ভাসিয়া নয়ন-জলে
কেহ যদি চ'লে যায় অন্যমনে আনত-বয়ান!
ডাকে দুঃখ, ডাকে সুখ, ফিরায়ে নিও না মুখ,
বিচিত্র ভাগ্যের 'পরে কোরো না, কোরো না অভিমান।
বনের মনের কাছে যে কথা লুকানো আছে,
ব্যাকুল বাতাস কেঁদে ফেরে—তার মেলে না সন্ধান।
আম্রমঞ্জরীর বাসে ভ্রমর গুঞ্জরি আসে,
অরণ্য-মর্ম্মরে মেশে মধ্যাহ্নের মধুপের তান।
এখনি থামালে কেন গান ?

বসন্তের এল আমন্ত্রণ,
সে এক অপূর্ব্ব রাগে অশান্ত জীবন জাগে,
রক্তের আগুনে লাগে ফাগুনের নেশার মাতন।
ভাবের গঙ্গার মাঝে শব্দের তরঙ্গ বাজে,
ছল ছল নদীজলে সঙ্গীতের ওঠে কলধ্বনি,
কোন্ সমুদ্রের পানে ছুটে চলে কে-বা জানে,
পুলকে শিহরি ওঠে শ্যামাঙ্গিনী সুন্দরী ধরণী।
বর্ণের ঐশ্বর্য্যময় পূর্ব্বাকাশে সূর্য্যোদয়
ঝঙ্কৃত করিয়া তোলে নিখিলের সপ্ততন্ত্রী বীণা।
সে সুরের মায়াস্পর্শে প্রকৃতি জাগিল হর্ষে,
অসীম সৌন্দর্য্যে সাজি' দেখা দিল ধরিত্রী নবীনা।
তমসার পরপারে জ্যোতির তোরণ-দ্বারে
জাগ্রত সে জীবনের শোন নি কি অশ্রান্ত আহ্বান ?
এখনি থামালে কেন গান ?

ছড়ালো কে আবীর-কুঙ্কুম ?
উষার গোলাপী গাল হয়ে গেল লালে লাল,
রঙে রাঙা কৃষ্ণচূড়া, গরবিনী করবী-কুসুম।
ডেকে ডেকে হ'ল সারা সুরে সুরে আত্মহারা,
হৃদয়ে হৃদয়ে সাড়া জাগালো কে কলকণ্ঠ পিক ?
মলয় উতল হ'ল, রুদ্ধ দ্বার খোল খোল,
ঘরে ফিরে এল কোন্ পথভ্রান্ত প্রবাসী পথিক!
দক্ষিণের সে উচ্ছ্বাসে বিমূঢ় লজ্জায় ত্রাসে
পলায় বিবাগী যত শাখা-ঝরা শুষ্ক পত্রদল।
সে দিনের মধুগীতি সে কি শুধু স্বপ্ন-স্মৃতি,
বিহ্বল জীবন তাই অনুক্ষণ বিক্ষুব্ধ চঞ্চল।
ফাল্গুন চলিয়া গেছে, মধুমাস এসেছে সে,
আসিবে মাধুরী নিয়ে মাধবের মধুর বিধান।
এখনি থামালে কেন গান ?

যায় নি—যায় নি চলে দিন,
এখনো যে পুষ্পবনে কার স্পর্শে ক্ষণে ক্ষণে
প্রলাপ-জাগানো সুরে বেজে ওঠে বসন্তের বীণ।
শ্যামলীর স্নিগ্ধ প্রেমে নীলাকাশ আসে নেমে,
অফুরন্ত-জ্যোৎস্না-ঝরা মাধবী পূর্ণিমা লাগে ভালো।
এখনো গোধূলি-ছায়া মনেতে বুলায় মায়া,
এখনো নয়নে তার ঝিকিমিকি তারকার আলো।
মৃদু গন্ধ বুকে বহি' বায়ু বহে রহি রহি,
পূজারিণী চলে পথে হাতে লয়ে কুসুমের ডালা।
মর্ম্মের ব্যাকুল বাণী আজো অকথিত, জানি,
মর্ম্মরিত বনবীথি এখনো ত হয় নি নিরালা।
ফাল্গুন বিদায় যাচে আজো চৈত্র আছে আছে,
কে আনে অঞ্জলি ভরি' মধু-মাধবের অবদান ?
এখনি থামালে কেন গান ?

সাগর-পারে

শ্রীশান্তা দেবী

আমেরিকান 'কনষ্টিটিউশন" জাহাজটি বিরাট, যাত্রীও অসংখ্য মনে হয়। নানা শ্রেণী, তবে এক শ্রেণীর সঙ্গে অন্য শ্রেণীর কোন সম্পর্ক নেই। কড়া জাতিভেদ। সব শ্রেণীর আলাদা ডেক, আলাদা খাবার ঘর, আলাদা বসবার ঘর। ক্যাথলিক, প্রোটেষ্টাণ্ট ও ইহুদীয় উপাসনা প্রতি সপ্তাহে হয়, তার সময় ও স্থান লিখে যাত্রীদের জানানো হয়, তবে আমরা যাই নি বলে জানি না এখানেও শ্রেণীভেদ আছে কিনা।

কেবিনগুলি ছোট ছোট; টুরিষ্ট ক্লাসের যাত্রী আমরা, আমাদের তিন মেয়ে ও মাকে একটা ছোট এয়ারকণ্ডিশণ্ড ঘর দিয়েছিল। এতই ছোট ঘর যে, দিনের বেলা শোবার গদিগুলি দেওয়ালে ঢুকিয়ে রাখতে হয়, শুধু বসবার মত একটা গদি থাকে। কিন্তু ছোট হলে কি হয় তার রংচং পালিশ সব আনকোরা নূতন। ঘরেই পর্দাঘেরা স্নানের কল আছে, স্নানের জন্য গরম জলের, এটা মস্ত সুবিধা। স্নানের পর সারাদিনই বাইরে কাটে, ডেকেই হোক কি বসবার ঘরে হোক।

ঘড়িবাঁধা সময়ে খাওয়া; সকলের আসন নির্দিষ্ট। প্রথম দিন ত আমরা জাহাজেই প্রথম অন্নের মুখ দেখলাম সূর্য্যাস্তের পর। প্রচুর খেতে দেয় এরা, আমাদের ভারতীয় ক্ষুধায় অত খাওয়া সম্ভব নয়। তার উপর বেগুনী রঙের এক বোতল করে পানীয় আছে। আমরা না খেলেও রোজ পাশে সাজানো থাকত। এত ঘটা না থেকে এক প্লেট ঝোল-ভাত থাকলে আমার ভাল লাগত বেশী। নিগ্রো এবং আধা-নিগ্রো পরিবেশনকারী সব। ষ্টুয়ার্ডদের মধ্যে মেক্সিকানও আছে, তবে আমি চিনতে পারি না। নেপল্স থেকে যখন জাহাজ ছাড়ল তখন কি লোকের ভীড় তীরে! রঙীন কাগজের অসংখ্য ফিতা দিয়ে জাহাজ বাঁধা তীরের বন্ধুদের হাতে। কত লোকের যে চোখে জল, যতক্ষণ জাহাজ দেখা যায় তারা রুমাল নাড়ছে। ফিতার বন্ধন ছিঁড়ে যখন জাহাজ বেরিয়ে গেল তখন বিদেশ থেকেই বিদেশে যাত্রা হলেও আমাদেরও মনটা বিষণ্ণ হয়ে এল।

আটচল্লিশ দিন জাহাজে ভেসে আবার চল্লিশ দিনের জন্য কূল পেয়েছিলাম। ফ্রান্স বা ইটালীতে বন্ধুবান্ধব যে কেউ হয়েছিল তা নয়, তবু মাটির মায়া! পাঁচ-সাত দিনের সব পরিচয়, পয়সার সম্পর্ক! কিন্তু মানুষ ত! কেউ যত্ন করে খেতে দিত, কেউ বাংলায় 'নমস্কার' বলতে শিখেছিল, সকালে লিফটে দেখা হলেই হেসে 'নমস্কার' বলত। বাকি সময়টা আমাদের সত্যই মাটির সঙ্গেই সম্পর্ক ছিল বেশী। ছবি আর গীর্জা দেখে দেখে এত হেঁটেছি যে, জাহাজে পনের দিন ধরে পায়ে তেল মালিশ করলে হয় ত সারত। টুরিষ্ট-বাহী 'বাসে' যেখানে যেখানে বেড়িয়েছি সেখানেও ক্রমাগত নামাওঠা আর ঘোরা এবং থেকে থেকে ঐতিহাসিক বক্তৃতা শোনা। অন্য কিছু ভাববার বেশী সময় পেতাম না। এবার বিরাট খাঁচায় বন্দী!

এত দিন পরে মনে হচ্ছে সত্যি বিদেশে যাচ্ছি। কলকাতা ছাড়বার পর ত প্রথম দেড় মাস স্বদেশী জাহাজেই ছিলাম, তাতে কায়দাকানুন সবই সাহেবী হলেও, মানুষ-গুলো ছিল সবই প্রায় ভারতবর্ষীয়, মাত্র সাত জন ইউ-রোপীয়। ভারতীয়রা সেখানে "পরেন বটে জুতো মোজা, চলেন বটে সোজা সোজা, বলেন বটে কথাবার্ত্তা অন্য দেশী চালে" তবু তাঁরা সেই রাম-শ্যাম-হরিই।

লণ্ডনে যতদিন ছিলাম মনে হ'ত ভারতবর্ষেরই মাজা-ঘষা একটা অন্য সংস্করণ। শৈশবকাল থেকে সাহেবপাড়ায় অনেক থেকেছি এবং দেখেছি, তাই মনে হ'ত আবার বুড়ো বয়সে আর একটা জমকালো সাহেবপাড়ায় এসেছি, তাতে অনেক স্বদেশী লোকই ঘুরে বেড়াত এদিক-ওদিক ভারতীয় আবহাওয়া সৃষ্টি করে।

কিন্তু 'কনষ্টিটিউশন' জাহাজে ঢুকে অবধি মনে হচ্ছে এ এক নূতন মুল্লুকে এলাম। যাত্রীরা সব সাহেব আর মেম, ভৃত্যরা সব নিগ্রো বা অর্দ্ধ নিগ্রো, অফিসাররা আমেরিকান। একজন মানুষকে মাঝে মাঝে ভারতবর্ষীয় মনে হ'ত, তাও সত্য কিনা জানি না। সি-সিক হয়ে সারাক্ষণই শুয়ে পড়ে থাকত সে।

এক আমেরিকান পরিবারের সঙ্গে এক টেবলে আমরা খেতে বসতাম—মা, বাবা, বিধবা কন্যা ও পাদ্রী শিক্ষানবীশ ছেলে। ওদেশের বিধবা মেয়ের চেহারাতেও একটা বাল-বৈধব্যের বেশ করুণ ছাপ আছে। তার ভাইটি বাঙালী ব্রাহ্মণ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের মত দেখতে। সবাই খুব মিশুক, নানা ঘরোয়া বিষয়েই গল্প করত। ছেলেটি ভারত-

বর্মীয় শাড়ী প্রভৃতি বিষয়ে খুব কৌতূহল দেখাত, কিন্তু এদিকে বলত তাদের নাচা বারণ, মেয়েদের স্পর্শ করা বারণ, কারণ পাদ্রী (ক্যাথলিক) হতে হলে সন্ন্যাসীর মত চলা নিয়ম। আমাদের পিছনে খেতে বসত একটি ইটালীয়ান মেয়ে তার আড়াই বছরের ছেলে নিয়ে। বাচ্ছা ছেলেটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেত এবং ডাঃ নাগকে 'ম্যান' বলে ক্রমাগত ডাকাডাকি করত। তার ভাষার প্রাচুর্য্য মোটেই ছিল না, কিন্তু সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার ইচ্ছাটা ছিল প্রবল। আমার সোনার চুড়িগুলো হাতে পরে এবং আমার হ্যাণ্ডব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে সোজা 'বারে' চলে যেত বয়স্ক সহযাত্রীদের পিছন পিছন। সে নিজের নাম বলত, 'মি (me) টমি।' মার নাম বলত, "মামি ব্রুনো।" সেটা অবশ্য তাদের পদবী। অর্থাৎ তার পুরা নাম টমি ব্রুনো। নিজের টেবিল থেকে রুটি ছুঁড়ে সে আমাদের খেতে দিত।

নেপলসে জাহাজ থাকতে আমাদের সারাদিন এমন তীর্থের কাকের মত বসে কাটাতে হয়েছিল যে, ডাঙ্গায় পোর্ট ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে নি। কিন্তু পরদিন সকালে জাহাজ জেনোয়া পর্য্যন্ত চলে এসেছে দেখে অনেকেই সকালে ব্রেক- ফাষ্ট খেয়ে পাসপোর্ট দেখিয়ে ডাঙায় নেমে পড়ল। আমরাও দলে ভিড়লাম। ট্রামে বাসে চড়লে অনেক জায়গায় যাওয়া যায় ডক থেকে বেরিয়েই, কিন্তু দেরী করে ফেলার ভয়ে আমরা পায়ে হেঁটেই যতটুকু পারি ঘুরলাম। পাহাড়ে পথ, কোথাও সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়, কোথাও বা ঢালু গলির মত রাস্তা। খানিক উপর দিকে উঠে ক্রিষ্টোফার কলম্বাসের মূর্ত্তির কাছে এলাম। গ্লোব, কম্পাস এবং বই নিয়ে কলম্বাস দাঁড়িয়ে আছেন। মূর্ত্তির চার পাশে তাঁর জীবনের প্রধান প্রধান অধ্যায় অঙ্কিত :—গ্লোব দেখিয়ে বিজ্ঞদের পৃথিবীর উল্টাদিকের কথা বলছেন, চেন দিয়ে বিদ্রোহীরা তাঁকে বাঁধছে, সমুদ্রের ওপারে জমি দেখতে পেয়ে একজন তাঁকে অভিনন্দন করছে, স্পেনের রাণী তাঁকে আমেরিকা দান করছেন এবং পরিশেষে আমেরিকান রেড ইণ্ডিয়ানদের সামনে ক্রশ পুঁতছেন।
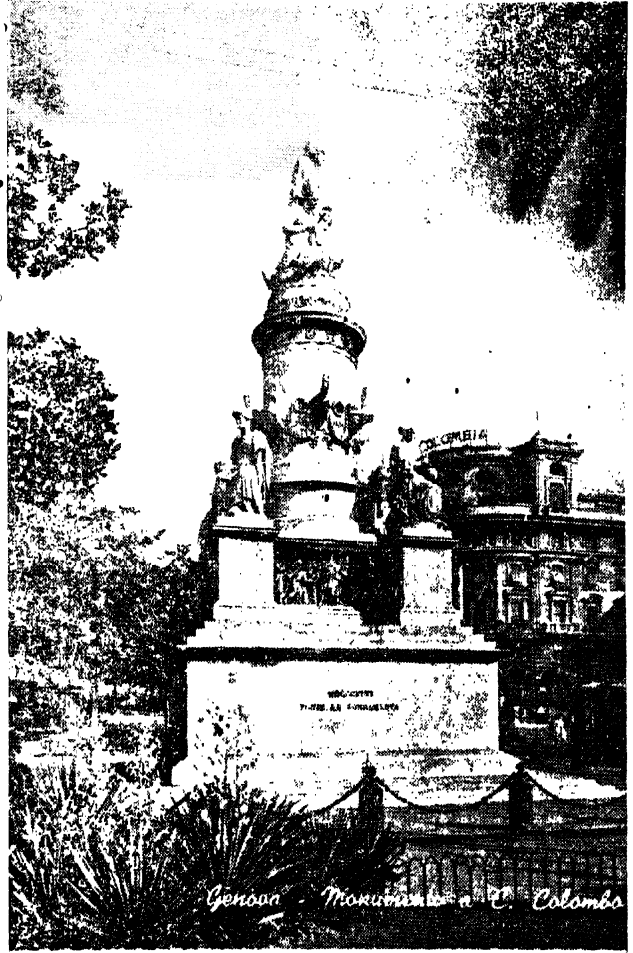
জেনোয়াতে 'কলম্বাসে'র স্মৃতিস্তম্ভ

আমেরিকা যাবার মুখে আবিষ্কর্ত্তাকে দেখে গেলাম, ভালই হ'ল। তার পর অল্পসময়ে কি আর হয়? বাজারে ঘুরে তিন-চার গুণ দাম দিয়ে কাগজ-খাম ইত্যাদি খুঁটিনাটি কেনা হ'ল। এখানেও ক্যামেরা নিয়ে রাস্তায় লোকেরা মেয়েদের ছবি তুলছে। পোর্ট থেকে অদূরে অনেক বোমা-বিধ্বস্ত বাড়ীঘর, শহরের ভিতরেও একটা বিরাট ভাঙা গীর্জ্জা, তার কাছেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ী। সেদিন কোন

চিকিৎসাবিদ বড়লোকের মৃত্যু হয়েছে। সেখানে লোকে লোকারণ্য, তার ভিতরে কফিন-গাড়ী এল। ভীড়ের ভিতর আমাদের বিদেশী দেখে এক ইটালীয়ান এসে ভাব করতে সুরু করল—উদ্দেশ্য গল্প জমিয়ে গাইড হয়। কিন্তু সময় যে নেই, কাজেই তার ভারত-প্রবাসের কথা অর্দ্ধসমাপ্ত শুনেই জাহাজমুখী রওনা হতে হ'ল। পাহাড়ে রাস্তাগুলি জল পর্য্যন্ত নেমে গিয়েছে, দেখতে ভারী সুন্দর লাগছিল।

ক্রমে জাহাজ রিভিয়েরার ধার দিয়ে এগিয়ে চলতে লাগল। সারা পৃথিবীর বড়লোকেরা ছুটির সময় স্ফূর্ত্তি করতে এই সব জায়গায় আসে, আমাদের দেশের রাজা-মহারাজা, নবাব-আগারাও বাদ যান না। কত বিলাসব্যসনের গল্প, কত অজস্র অর্থ ছড়ানোর কাহিনী এই সব জায়গার নামের সঙ্গে জড়িত।

বিকালবেলা 'ক্যানে' জাহাজ থামল। আমাদের টেবলের পাদ্রী তার বাবা, মা ও বোনের সঙ্গে নেমে গেল। তার আগে তারা আমাদের সকলের ছবি নিল। এটা ত ইউরোপ-আমেরিকায় সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষণ চলছে। যুবক পাদ্রী একদিন বাঙালী সাজবার চেষ্টাও করেছিল। এক বৃদ্ধা ইংরেজ মহিলা আমাদের অল্পস্বল্প সাহায্য করতেন, তিনিও এখানে নেমে গেলেন। মানুষ অনেক নূতন নূতন উঠল। তা ছাড়া উঠল আমাদের ছয়টা বিরাট বাক্স, যা টেনে বেড়াবার ভয়ে আমরা লণ্ডন থেকে মালজাহাজে এখানে চালান করে দিয়েছিলাম।

পাদ্রী পরিবারের টেবলের স্থানটি দখল করল এক দল অল্পবয়সী ফরাসী শিক্ষানবীশ। এরা নৌবিদ্যা আর আকাশ-ভ্রমণ বিদ্যা শিক্ষা করতে চলেছে। ভাল ইংরেজী জানে না, কেউ কেউ ভাঙা ভাঙা ইংরেজী বলে, কেউ বা একেবারেই পারে না। ইংরেজদের উপর এরা ভীষণ চটা, জিব্রাল্টারে ইংরেজ দেখবে বলে তাদের মধ্যে ১৭ বছরের ক্ষুদ্রতমটির মহা উৎসাহ। সে বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে কখনও ইংরেজ দেখে নি। গলায় সোনার মাদুলি পরে ঘরে থেকে সবে বাইরে পা বাড়িয়েছে। বলে "ইংরেজরা চিরকাল আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করেছে।" ভারতীয়দের বিষয়েও খুব কৌতুহল আছে। "তোমরা কপালে (টিপ) কি পর, কেন পর?" ইত্যাদি নানা প্রশ্ন। তাতে একটি বড় ছেলে লজ্জিত হয়ে ছোটটিকে বললে, "তুই কেন গলায় মাদুলি পরিস?"

জাহাজে খেলাধুলো গল্প, নাচ, গান ছাড়া আর একটা কাজে মেয়েদের খুব উৎসাহ। সারাদিন সর্ব্বাঙ্গ খুলে রোদে শুয়ে থাকা। কয়েকজন ছিলেন যাঁরা মাথায় টুপী, গায়ে তিন-চারটা জামা, পায়ে জুতো এবং চোখে চশমা সবই পরতেন, কিন্তু অধমাঙ্গে কৌপীন ছাড়া আর কিছু নেই। এটা কোন্ দেশী সভ্যতা জানি না। পুরুষমানুষরা বেশী লজ্জাশীল, জনদুই ছাড়া সবাই কাপড়-চোপড় পরতেন। মেয়েদের মধ্যে নানা স্তর; এক দল পুরো পোশাক পরে, এক দল আধা আর এক দল যা পরে তাকে কাপড় বা পোশাক নাম দেওয়া যায় না। তাদের পায়ের জুতো জোড়া ছাড়া আর কিছু প্রায় চোখে পড়ে না এতই সামান্য তা। সুতরাং এর আলোচনা না করাই ভাল।

জাহাজে প্রায়ই সিনেমা দেখাত। বেশ বড় সিনেমা হল। আমি ডাঙ্গায় থাকতে ঐ জিনিসটার সঙ্গে বিশেষ যোগ রাখি না। কিন্তু জাহাজে বসে অনেক বড় বড় ছবি দেখলাম। সিনেমা হলটায় যেতে এত মোড় ফিরতে হয় এবং সিঁড়ি ভাঙতে হয় যে আমি রোজই পথ হারিয়ে ফেলতাম, অন্যেরাও যে হারাত না তা নয়। জাহাজ মাত্রেই কেবিনের নাম মুখস্থ না করে রাখলে দিনকতক পথ ভুল করে সবাই। রবীন্দ্রনাথের "ইউরোপ প্রবাসীর পত্রে"ও তার মজার গল্প আছে। রাত্রে শুতে যাবার সময় অন্য লোকের কেবিনে ঢুকে পড়েছিলেন।

আমেরিকান বৃদ্ধারা আমাদের অনেক মজার প্রশ্ন করত। একদিন একজন জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের কি কোন 'রয়াল হেরিটেজ' আছে?" আমাদের বেশভূষা কথাবার্ত্তা কি চেহারায় রাজোচিত কিছু ছিল বলে কোনদিন মনে হয় নি। ভদ্রমহিলার মনে কেন এ প্রশ্ন জাগল বোঝা শক্ত। আমরা নানা রঙের শাড়ী পরতাম। একজন জানতে চাইলেন, "লাল শাদা হলদে কোন্ শাড়ী পরার কি অর্থ?" আমাদের সম্বন্ধে তাদের কৌতুহলের অন্ত ছিল না; কাজেই যে কোন প্রকার প্রশ্নে আমাদের ভারতীয়তার রহস্য তাঁরা মোচন করতে চাইতেন। কপালের টিপটা ত প্রত্যেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করত। তদুপরি বিস্ময় উদ্রেক করত জাহাজে সারাদিন শাড়ী পরে' থাকার অভিনবত্ব। জাহাজে, সমুদ্র-তীরে, সকালে, সন্ধ্যায় আমরা যে ভিন্ন কালে ও ভিন্ন স্থানে ভিন্ন বেশ ধারণ করি না এটা তাদের কাছে একটা নূতন আবিষ্কার।

কোন দিন কোন যাত্রীর জন্মদিন থাকলে তার জন্য বিশেষ 'বার্থডে কেক' তৈরী করানো এবং তাতে আলো জ্বালানোর রীতি ছিল। ঐ কয়দিনেই কয়েকটা জন্মদিন হয়ে গেল। জাহাজবাসের ঐ কয়টা দিন সবাই সবাইকার আপনার লোকের মত একত্রে সব আনন্দে যোগ দেবে, এই ধরা হয়। তিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধা থেকে শিশু পর্য্যন্ত সকলের

জন্মদিনেই সমস্বরে গান ও কেক-বিতরণ ঘটা করেই করা চলত। আমারও এক মেয়ের ঐ সময়েই জন্মদিন পড়ল। বিনা খরচে একটু উৎসব করা গেল। মানুষ দলবদ্ধ ভাবে একজনকে শুভ ইচ্ছা জানালে কার না ভাল লাগে? তবে এর মধ্যে আন্তরিকতা সামান্যই।

জিব্রাল্টারে যেদিন জাহাজ থামল সেদিন এক অভিনব দৃশ্য চোখে পড়ল। ব্রেকফাষ্টের পর অন্য দিনের মতই ডেকে গিয়ে দেখলাম আজ তার চেহারা বদলে গেছে। চারধারে 'হোস পাইপ' লাগান এবং তা দিয়ে সমুদ্রে অনেক দূর পর্য্যন্ত জল পড়ছে চারিধার ঘিরে। অনেকগুলো নৌকায় চড়ে লোক দূর থেকে জাহাজের দিকে আসছে এবং তাদের গায়েও অঝোরে জল পড়ছে! লোকগুলো কিন্তু নির্ব্বিকার ভাবে এগিয়ে আসছে। খুবই আশ্চর্য্য হয়েছিলাম উভয় পক্ষের আচরণ দেখে। এ রকম কাণ্ডও যে জগতে হয়, চর্ম্ম-চক্ষে না দেখলে বিশ্বাস হ'ত না। নৌকায় করে বেসাতি নিয়ে বেচারীরা জাহাজে বিক্রী করতে এসেছে এবং জাহাজ কোম্পানী তাদের আপাদমস্তক জলে ভিজিয়ে দিচ্ছে ইচ্ছা করে, এ রকম অভ্যর্থনার কারণ কি জানতে চাইলাম। যাত্রীরাই একজন বললেন, "ওদের মধ্যে অনেকে গোপনে আফিং প্রভৃতি জাহাজে চালান করে। তাই জাহাজ পর্য্যন্ত যাতে তারা কিছুতেই না আসতে পায় এই উদ্দেশ্যে ওই কৃত্রিম জলপ্লাবনের সৃষ্টি।" কিন্তু নৌকারোহীরা জিনিস বিক্রী করবেই। ক্রেতাদেরও উৎসাহ সমান। তারা ওদের ডাকাডাকি করে খুব দরাদরি করছে। জলে চুপচুপে হয়ে বিক্রেতারা কাগজে ব্রেসলেট মুড়ে ছুঁড়ে জাহাজে ফেলে দিচ্ছে। এক ডলারে পাঁচ জোড়া ব্রেসলেট। কাগজে মুড়েই ডলার ছোঁড়া হচ্ছে নৌকা অভিমুখে। ঐ সামান্য লাভের জন্য কত জলঢালাই বেচারীরা সহ্য করছে।

যাত্রী ত অসংখ্য। কিন্তু বেশীরভাগরা ভারতীয়দের সঙ্গে মেশে না। কয়েকজন বয়স্কা মহিলা ও দুই-চারটি ছোট ছেলে আমাদের সঙ্গে খুবই গল্প করতেন। ছোট ছেলেগুলি আমাকে পর্য্যন্ত তাস খেলা শেখাবার জন্য মহা ব্যস্ত। আমি ত জীবনে কখনও তাস খেলি নি। একটি ছেলে বলে "আমি ঠিক শিখিয়ে দেব।"

আর এক বৃদ্ধ ভাল পিয়ানো বাজাত। সে প্রায় বলত, "খ্রীষ্ট ত পূর্ব্ব দেশের লোক। তিনি ত কালো ছিলেন।"

ভারতীয় ঠাকুমার মত দুই-এক বৃদ্ধা পকেটে নাতিদের ছবি নিয়ে ঘোরেন আর তাদের গল্প করেন। একজনের বাড়ী 'ডেল-হাই' বলে একটা জায়গায়। তার বানান Delhi। আর একজন মিসেস ভেটার। ইনি সবচেয়ে বেশী আত্মীয়তা করতেন এবং কোন আমেরিকান কিছু অভদ্রতা করলে ভীষণ চটে যেতেন, বলতেন, "তোমরা মনে করবে আমেরিকানরা বুঝি সবাই ঐ রকম।"

অনেকেরই শাড়ী কেনার ভীষণ সখ। প্রায় গায়ের কাপড় কিনে নিতে চায়। বাড়তি থাকলে কয়েকটা বিক্রী করা যেত। ওদের জিনিস কেনার উৎসাহ দেখে অগত্যা একটা রূপার গহনা বিক্রী করলাম। একজন কেনাতে দশজনের আপসোস হ'ল "আমরা কেন পেলাম না?"

ইজরাইল থেকে কয়েকটি মেয়ে আমেরিকাতে পড়তে চলেছে। দেশের নবজাগরণের দিনে কত রকম কাজ তাদের করতে হয় তার গল্প শুনতাম। সৈন্যবাহিনীতেও তারা যোগ দেয়, মাটি কেটে পথও তৈরি করে। এদের বড় ভাষা-বিভ্রাট। একটি মেয়ে শিশুকালে রাশিয়ান বলত, পরে বলত জার্ম্মান। কিন্তু হিটলারযুগের জন্য সাত বছর বয়সে জার্ম্মান ছেড়ে দিয়েছিল। এখন সে বলে ইংরেজী, তবে অন্য ভাষা দুটিও জানে। এরা শাড়ীপরা শিখতে ভীড় করে আমাদের ঘরে আসত।

'ফ্যান্সি ড্রেস বল' হওয়া জাহাজের একটা ফ্যাসান। ফ্যান্সি ড্রেস হবার আগেই এমনি যুগল নাচ খুব চলে। আমি মানুষটা কুনো, কাজেই নাচগানে বিশেষ যাই না। জাহাজে অপরিচিত ছেলেমেয়েরা পরস্পরের গলা জড়িয়ে এবং গালে গাল ঠেকিয়ে নাচছে এটা দেখতে আমি অভ্যস্ত নই, কাজেই আমার যে বিসদৃশ লাগবে তা বলাই বাহুল্য। বিশেষতঃ যারা সর্ব্বদা খুব মান্যগণ্য হয়ে ঘুরে বেড়ায় তাদের এইরূপ নৃত্যপরায়ণ অবস্থা আরও দৃষ্টিকটু লাগে।

ফ্যান্সি ড্রেসে ভারতীয় সাজা একটা সহজ উপায়। মাথায় গান্ধী টুপী চড়িয়ে একজন হ'ল জওয়াহরলাল এবং আমার মেয়ের শাড়ী পরে একজন হ'ল কমলা নেহরু। একজন 'ভগ্নতরী' ও একজন খবরের কাগজ মন্দ সাজে নি। প্রাইজ পাবার মত সাজ কারুরই হয় নি, কিন্তু কাউকে দিতে ত হবে! কাজেই কয়েকজন প্রাইজও পেলেন।

একদিন সিনেমায় 'রবিনহুডে'র ছবি দেখাল। দেশে থাকতে যখন দেখেছিলাম তখন শুধু ছবি হিসাবেই দেখেছি এখন ইউরোপের দৃশ্য, ঘরবাড়ী, পাথরে-গাঁথা কাস্‌ল, সব চেনা লাগে বলে গল্পটা আরও উপভোগ করা যায়। এদের প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র, বর্ম্মও নানা মিউজিয়মে সবে দেখে এসেছি।

জিব্রাল্টার ছাড়ার পর খালি জল আর জল, জাহাজও চোখে পড়ে না, দ্বীপও দেখা যায় না। অকস্মাৎ একদিন শুনলাম কে নাকি দূরে তিমি দেখেছে। ডেকে অনেক ছুটোছুটি করেও কিন্তু আমরা দেখলাম না। বিলিতি খানা

খেয়ে ডেকে বেড়িয়ে আর সিনেমা দেখে কোন রকমে দিন কাটাতে হয়। তিমি দেখতে পেলে নূতন একটা কিছু দেখা হ'ত। ডাঙায় নেমে কবে নিজের হাতে দুটি বেঁধে খাব আর গাছ, পাতা, ঘাস, মাটি একটু দেখব মাঝে মাঝে ভাবি।

নিউইয়র্ক আসে আসে করে সবাই মহা উত্তেজিত ও ব্যস্ত। দুই-একদিন আগে বৃষ্টি হওয়াতে সেখানে নেমে বৃষ্টিতে পড়তে হবে কিনা এটাও একটা ভাবনা। তার মধ্যে জাহাজের প্রথামত ক্যাপ্টেন একদিন বিশেষ ডিনার দিলেন —বিদায়ভোজ। খাবারঘর রংচং-নিশান বেলুন দিয়ে সাজান হ'ল। খেতে বসবামাত্র ষ্টুয়ার্ড সকলের মাথায় একটা করে টুপী পরিয়ে দিয়ে গেল এবং হাতে দিল একটা একটা ঝুমঝুমি। টমি ভদ্রলোকে একটা ঝুমঝুমি দিয়ে দিলাম। আর একজন বাচ্চা ছিল তার মা ইটালীয়ান, বাবা নিগ্রো অধ্যাপক। সেই বাচ্চাকেও একটা দিলাম, বাচ্চাটির রং ফর্সা, চুল কিন্তু কোঁকড়া।

২৪শে আগষ্ট দুপুরবেলাই আমাদের জিনিসপত্র সব বাইরে বার করে দিল। ২৫শে আমাদের নিউইয়র্কে নামিয়ে দেবে। এতদিন যে ষ্টুয়ার্ডটা আমাদের সঙ্গে ভীষণ অসভ্যতা করত, আজ সে মহা ভদ্র। কারণ কাল যাবার সময় মোটা বকশিশ পাবার লোভ। তার ব্যবহারের বিষয় বললে, সহযাত্রিনীরা বলেন, "ওটা মেক্সিকান, তাই ও রকম।"

এদিকে আমাদের সঙ্গে পয়সা-কড়ি কিছু নেই, শুধু ভারত সরকারের কাগজ আছে, যা নেমে ব্যাঙ্কে ভাঙালে তবে ডলার হবে। নামবার সময় অনেক খরচ আছে, তাই জিনিস বেচে ১৫ ডলার জোগাড় করলাম এবং এক ভদ্রমহিলার কাছে ২০ ডলার ধার নিলাম। ভদ্রমহিলা খুব ভাল বলতে হবে, নিজে যেচে ধার দিলেন, আমরা নিতে চাই নি। বললেন, "তোমাদের হাতে টাকা এলে পাঠিয়ে দেবে, তাতে আমার কিছুই অসুবিধা হবে না।"

পরদিন অন্ধকার থাকতেই সবাই ডেকে ছুটছে জমি দেখবার আশায়। ৬টার সময় দূর থেকে ডাঙা দেখা গেল। জাহাজ অতি ধীরে চলেছে। আর একটু বেলায় দেখা গেল সমুদ্রের মাঝখানে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছেন মূর্ত্তিমতী স্বাধীনতা। কেউ আর ডেক ছেড়ে নড়ে না। এত দেশ ঘুরলাম, কিন্তু আধুনিক শহর হিসাবে নিউইয়র্ক ছাড়া আর কোনও শহর এমন বিস্ময় উদ্রেক করে না। ভিতরের কথা বলছি না, আকাশ পটে আঁকা ম্যানহ্যাটানের রেখাচিত্র। ত্রিশ-চল্লিশ তলা বাড়ী আকাশে উদ্ধত মাথা তুলে দানবের মত দাঁড়িয়ে আছে, যেন মানুষে গড়ে নি, নিজ শক্তিতে বেড়ে উঠেছে। সমুদ্রের ধার থেকে উঁচু উঁচু চূড়াগুলি দেখা যায়। ছবিতে দেখা এই উচ্চচূড়া শহরের আকাশস্পর্শী মাথার ধারণা, না দেখলে করা শক্ত।

সকালে ৭টা না বাজতেই ব্রেকফাষ্ট দেওয়া সুরু হ'ল। খাওয়া-দাওয়ার পর ক্রমাগত নাম ডাকা, পাসপোর্টে ছাপ দেওয়া হবে। আমরা বসে বসে ঘণ্টা মিনিট গুণছি, আমাদের আর কেউ ডাকে না। শেষে শুনলাম সব আমেরিকানদের ডাকা হলে তবে আমাদের বিদেশীদের ডাক পড়বে। এ দিকে জাহাজ ক্রমেই জমির কাছে এগিয়ে আসছে। তীরের বাড়ীগুলো দেখতে দেখতে যেন ফুলে উঠে বড় হয়ে কাছে এগিয়ে এল, একটু একটু করে মানুষ চেনা যেতে লাগল। অনেকে এপার-ওপার থেকে ডাকাডাকি করতে লাগল। কত ফেরীজাহাজ পাল পাল যাত্রী নিয়ে আপিসে পৌঁছে দিচ্ছে। আপিসযাত্রীরা 'কনষ্টিটিউসন' দেখে দল বেঁধে হাত নাড়তে সুরু করলে। সকলের মুখে হাসি। এত লোকের সাদর অভ্যর্থনা—যদিও ব্যক্তিগত ভাবে নয়—মনটাকে খুশী করে। এত আইন-কানুনের বাঁধনের ভিতর দিয়ে পার হবার সময় যখন মনটা মুসড়ে যায়, তখন এতগুলো হাসিমুখ মনে একটু ভরসা আনে।

অবশেষে আমরা বিদেশীরা উপরে উঠলাম। আমাদের নিমন্ত্রণ-পত্র, মেয়েদের কলেজে ভর্ত্তির চিঠি সব ওরা দেখতে চাইল। ছাত্রদের পরামর্শদাতা একজন আছেন, তিনি মেয়েদের নাড়ী নক্ষত্রের খবর নিলেন, তাঁর কাছে সব নামের ফর্দ্দ থাকে। তারপর নানা আইনের ঘাঁটি পেরিয়ে পেরিয়ে ডাঙায় পা দিলাম। বন্ধু মণি মৌলিক ও শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারী দাঁড়িয়েছিলেন অভ্যর্থনা করতে। এর পর কাষ্টমসের পালা। বন্ধুরা পরামর্শ দিলেন আমাকে আগে যেতে। আমি গিয়ে ছাড়পত্র চাইলাম। বললেন, "কত তোমাদের জিনিস, কত দাম বইগুলোর, কেন এনেছ?" আন্দাজে বললাম, "একশত ডলার।" বিরাট একটা কাঠের বাক্স হয়ত হাজার টাকার বই হতেও পারত; কিন্তু বই-এর দাম জিজ্ঞাসা করবে তা ত আগে ভাবি নি, সুতরাং যা মনে এল বলে দিলাম। বললে, "এত বই দিয়ে কি করবে?" বললাম, "পড়াবার কাজ করতে হলে বই না হলে চলবে কি করে?" আর বেশী জেরা করল না। কেবল একটা বাক্স খুলে বাংলা বই পড়বার একটু বৃথা চেষ্টা করল এবং অন্য বাক্সটা একটু ফাঁক করে দেখল। ছাড় পেলাম তবে মাল ছাড়িয়ে ষ্টেশন পর্য্যন্ত পৌঁছে দিতেই চল্লিশ ডলার অর্থাৎ ২০০ টাকা বিল হ'ল। জাহাজে বকশিশ দেবার পর সম্বল তখন ১৫ ডলার মাত্র। অগত্যা ইণ্ডিয়া আপিস থেকে হেঁটে আগে ব্যাঙ্কে দৌড়তে হ'ল। ভারত সরকার দু'জনকে মাত্র চারশত ডলার নেবার অনুমতি দিয়েছেন। সেটা ভাঙিয়ে চল্লিশ

ডলার মাল ভাড়া এবং ২৫০ ডলার ট্রেন ভাড়া ইত্যাদি দিয়ে ক্ষুদ-কুঁড়ো যা রইল তাই নিয়ে পথে পা দিলাম। যেতে হচ্ছে মিনেসোটা প্রায় কানাডার কাছে, সেখানেও মালভাড়া আছে, পথে খেতেও হবে কিছু, শিকাগোতে ট্রেনবদলের খরচ আছে, সুতরাং ইষ্টনাম জপ করা ছাড়া উপায় নেই। এত খরচ আগে বুঝতে পারলে মেয়েদের নামের টাকাটাও ভাঙাতাম। কিন্তু এখন আর ব্যাঙ্কে দৌড়বার সময় নেই, একটু খেয়ে-দেয়ে ট্রেন ধরতে হবে ত!

একবার নিউইয়র্কের পথের দিকে তাকালাম। আকাশ-স্পর্শী প্রাসাদের তলায় ভাঙা ফুটপাথ দুই একটা দেখে হাসি এল। নিউইয়র্ক বলতে কোন দিন ভাঙা ফুটপাথের ভিজে মাটির কথা আগে ভাবি নি, কেবল মেঘচুম্বী সৌধমালাই ভাবতাম। ঐ ভিজে মাটিটুকু আমাদের কুঁড়েঘরের দেশের মাটির মতই, ঐখানে আমরা সবাই এক।

মৌলিক মহাশয়ের আতিথ্যে একটা কাফেটেরিয়ায় মধ্যাহ্ন ভোজন করে নিউইয়র্কের একটা ছোট পশুশালার আশ-পাশ ঘুরে ট্যাক্সিতে চললাম বিরাট ষ্টেশনের দিকে। ডলার তখনও চিনি না, এক ডলার পাঁচ ডলারে তফাৎ চোখে পড়ে না। ভাড়া দেবার সময় মৌলিক মশায় যা বললেন, তার অর্থ ঠিক না বুঝেই দুটো নোট দিয়ে দিলাম। ট্যাক্সিওয়ালা অম্লানবদনে নিয়ে নিল। পরে বুঝলাম পাঁচ ডলার অর্থাৎ ২৫ টাকা বেশী দিয়েছি। আমাকে রাজা-উজির ভেবে বোধ হয় লোকটা বকশিশ নিয়ে চলে গেল। শূন্য-প্রায় পকেট নিয়ে শিকাগোর ট্রেন ধরলাম।

সন্ধ্যারাণী

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

তোমারে ভুলিনি পথে যেতে যেতে, সন্ধ্যারাণী!
দিনের শেষে।
নভোনীলিমায় একে একে তারা উঠিছে হেসে
প্রদীপ লয়ে।
গাঁয়ের বধূরা গাগরী ভরিয়া নদীর ঘাটে
মনের ছায়ায় আলো জ্বেলে জ্বেলে এসেছে ঘরে।
বেসাতিরা আর কেনা-বেচা লয়ে নেইকো হাটে,
খেয়ার আশায় পারের যাত্রী রয়েছে চরে।
রাত্রিদিনের প্রাণ-সঙ্গমে নাহন করি
এসেছ একা।
কাজল আঁচল ছড়ায়ে দিয়েছ ক্ষণেক দেখা
—মৃদুল বায়ে!
কুহকের জালে মায়াবীর মায়া রচিয়া একি!
পান্থজনেরে অন্ধ করেছ হরিয়া আলো।
কণ্টকবনে ভ্রান্ত পথিক ঘুরিছে দেখি,
অমন করিয়া বেদনা দিতে কি লেগেছে ভালো!

তন্দ্রায় ঢুলে পড়েছে কুসুম পরশে তব
—ঝিঁ ঝিঁরা ডাকে।
ঝাপসা আলোকে বৎসতরী খুঁজিছে মাকে!
গোহাল পানে।
আকাশের পথে উড়ে গেছে পাখী দিনের সাথে,
কুলায় ফিরেছে দূরে ছিল যারা তোমারে হেরি;
ঘুমের ঘুঙুর বাজিছে তোমার চরণপাতে,
জ্বলে জোনাকিরা বনে প্রান্তরে তোমারে ঘেরি।
আয়ুসূর্য্যের শেষ রেখা মম মিশায়ে নভে
কে যেন আসে!
তোমারি মতন কাজল রূপেতে দাঁড়ায়ে হাসে
—দূরের দূতী।
মহাযাত্রার আহ্বান লয়ে সে আনে তরী
বিস্ময়নীরে ভেসে ভেসে যেতে অচেনা পারে;
বিদায়ের শেষ লহমায় সে যে হাতটি ধরি'
কে জানে কোথায় নিয়ে যাবে মোর পরাণটারে!

পল্লী-প্রদর্শনী

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

শহরের বড় বড় প্রদর্শনীর সহিত পল্লী-অঞ্চলের জনসাধারণের কোনও রকমের যোগাযোগ নাই বলিলেই চলে; অথচ, শহরের উপরই প্রদর্শনীর হিড়িক পড়িয়া যায় এবং উহাদের অনুষ্ঠানের জন্য বিপুল ব্যয় হয়। এই সকল প্রদর্শনীর দ্বারা শহরবাসীদের কিভাবে, কি পরিমাণ ব্যবসা-বাণিজ্যে, শিল্পে, কৃষিতে এবং অন্যান্য বিষয়ে আগ্রহ ও উৎসাহ বাড়ে জানি না; কিন্তু পল্লী-অঞ্চলে ছোট ছোট আড়ম্বরবিহীন, মাইক্ ও লাউডস্পীকার বর্জ্জিত প্রদর্শনীর দ্বারা স্থানীয় কৃষক-সম্প্রদায় ও শিল্পী-সম্প্রদায়ের প্রভূত শিক্ষা ও উপকার সাধিত হয়, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। যখন সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম, তখন পল্লী-অঞ্চলে এইরূপ ছোট ছোট প্রদর্শনী প্রবর্ত্তন করিবার সুযোগ ও সুবিধা পাইয়াছিলাম, এবং ইহার ফলে নানাবিধ উন্নত শ্রেণীর ফসল সেই সেই অঞ্চলে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পরেও এইরূপ কয়েকটি ছোট ছোট পল্লী-অঞ্চলের প্রদর্শনীর সহিত জড়িত আছি। তন্মধ্যে, আঁটপুর পল্লী-উন্নয়ন প্রদর্শনী অন্যতম। গত ১৯৫০ সন হইতে আঁটপুর পল্লী-উন্নয়ন প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইহার প্রধান বিশেষত্ব এই যে, স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীগণের উদ্যোগে বিদ্যালয় গৃহেই উহা অনুষ্ঠিত হয়। ইহার ফলে, বিদ্যালয়ের বালক-বালিকাগণের স্থানীয় কৃষি ও শিল্পের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে, এবং উহাদের উৎকর্ষ সাধন সম্বন্ধে তাহারা সচেতন হয়। ইহা বলা বাহুল্য, পল্লী-অঞ্চলের বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ প্রধানতঃ কৃষক ও শিল্পী-সম্প্রদায়ভুক্ত; এবং এই সকল ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমেই তাহাদের অভিভাবকগণের মনে উন্নত কৃষি এবং শিল্পের জ্ঞান সঞ্চারিত ও প্রবর্ত্তিত হয়। গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী আঁটপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে আঁটপুর পল্লী-উন্নয়ন প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন সভায়, উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীসন্তোষকুমার চক্রবর্ত্তী পৌরোহিত্য করেন। সভায় বহু সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। মনে হয়, বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এইরূপ অনুষ্ঠানে প্রধান শিক্ষকের পৌরোহিত্য করাই সমীচীন ও কালোপযোগী। ইহার ফলে, শিক্ষকগণের সহিত ও ছাত্র-ছাত্রীগণের সহিত একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

প্রদর্শনীতে বিভিন্ন বিভাগ ছিল। যথা, জাঙ্গীপাড়া জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লক, জনস্বাস্থ্য বিভাগ, কৃষি বিভাগ, প্রচার বিভাগ, পশু-চিকিৎসা বিভাগ, স্থানীয় কৃষি ও শিল্প বিভাগ, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ও স্থানীয় বালক-বালিকাগণের কৃষি ও কুটীর-শিল্প বিভাগ ইত্যাদি। প্রত্যেক বিভাগেই শিক্ষাপ্রদ দ্রষ্টব্য বস্তু ছিল। তন্মধ্যে জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লক ও স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রী এবং বালক বালিকাদের বিভাগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমোক্ত বিভাগে একটি বৃহৎ মডেলের সাহায্যে আদর্শ গ্রাম দেখান হইয়াছিল। শেষোক্ত বিভাগে হস্তজাত কুটীর-শিল্প দর্শকবৃন্দের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। ধানের সিংহাসন, সোলার ফুলদানি ও ফুল, বোতামের ফুলদানি, খেজুর পাতায় তৈয়ারী সূর্য্যমুখী ফুল, গ্লোব, ভারতের রিলিফ ম্যাপ, অঙ্কিত চিত্র, ইত্যাদি দর্শকবৃন্দকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছিল। বাস্তবিক এই সকল শিল্পকার্য্যের পশ্চাতে কোন রকমের সুষ্ঠু শিক্ষা ও নেতৃত্ব নাই। সেই জন্য মনে হয়, পল্লী-অঞ্চলের কত ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতীর উপযুক্ত শিক্ষা ও নেতৃত্বের অভাবে প্রতিভা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়।

এই প্রদর্শনীর সহিত একটি "শিশু-প্রদর্শনী"ও সংযুক্ত ছিল। মহৎ উদ্দেশ্য লইয়াই এই শিশু-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু বৎসরে একবার হাড়-জিরজিরে, রুগ্ন শিশুদের পুরস্কার দিবার সার্থকতা কোথায়? তাহাদের মাতাদের পরনে জীর্ণ বস্ত্র, অন্নাভাবে দেহ ক্লিষ্ট, স্তনে দুগ্ধ নাই—শিশুরা ছিটে-ফোঁটা গোদুগ্ধও পায় না;—এই শিশুরাই দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক! যাহা হউক, প্রদর্শনীর পুরস্কারস্বরূপ শিশুদের মিল্ক পাউডার, মধু, খেলনা প্রভৃতি প্রদত্ত হইয়াছিল। অথচ, এই সামান্য পুরস্কারেই মাতাদের ও শিশুদের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পুরস্কারপ্রাপ্ত শিশুদের মাতারা গর্ব্ব অনুভব করিয়াছিলেন। এই সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী গর্ব্ব ও আনন্দেরও মূল্য আছে। কত দিকে, কত রকমে, কেবলমাত্র আড়ম্বর, জাঁকজমক ও হৈ-হুল্লোড়ের জন্য হিসাবহীন অর্থের অপচয় ঘটিতেছে; কিন্তু এই সব শিশুদের মুখে এক ফোঁটা দুধও পড়িতেছে না।

প্রদর্শনীর সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-দিবস পালিত

হইয়াছিল। ১৯২২ সনের ২২শে ফেব্রুয়ারী বেলুড় মঠের প্রথম সভাপতি স্বামী ব্রহ্মানন্দজী এই বিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই বৎসর প্রতিষ্ঠা-দিবসে বেলুড় মঠের স্বামী অচিন্ত্যানন্দজী সভাপতিত্ব করেন। তাঁহার ভাষণ-প্রসঙ্গে তিনি আঁটপুরের 'সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের কথা অতি সংক্ষেপে বলেন। তিনি বলেন, কেবল স্বামী প্রেমানন্দের জন্মস্থান বলিয়াই আঁটপুর বিখ্যাত নহে, 'ভারতবর্ষে এমন কোনও গ্রাম নাই, যে গ্রামে ঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার অন্তরঙ্গদের আট জন পদার্পণ করিয়াছেন; এবং এই আঁটপুরেই স্বামী প্রেমানন্দের গৃহে স্বামী বিবেকানন্দ অন্তরঙ্গ আট জন বন্ধুসহ সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনের চরম সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। সুতরাং আঁটপুরের রাস্তাঘাট তাঁহাদের পদরেণুতে পবিত্র হইয়া আছে। ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, "তোমরা সর্ব্বদা মনে রেখো, তোমরা আঁটপুরের অধিবাসী। তোমাদের চরিত্রে, আচারে, ব্যবহারে—তোমাদের এমন একটি বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন, যাতে সর্ব্বত্র তোমাদের একটি বিশেষত্ব পরিস্ফুট থাকে।" প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে বিদ্যালয়ের পাঁচ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীকে ভিক্ষালব্ধ অর্থে ভোজন করান হইয়াছিল।

২৩শে ফেব্রুয়ারী প্রদর্শনীর সমাপ্তি হয় এবং ঐ দিনই অপরাহ্ণে প্রদর্শনী ও বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী সভার অনুষ্ঠান হয়। হুগলী জেলার শাসক শ্রীঅবনীমোহন কুশারী আই-এ-এস পৌরোহিত্য করেন এবং পশ্চিমবঙ্গের ডাইরেক্টার অব ল্যাণ্ড রেকর্ডস এণ্ড সার্ভেজ শ্রীরঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আই-এ-এস প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীমতী কুশারী পুরস্কার বিতরণ করেন।

প্রদর্শনী উপলক্ষে স্থানীয় যাত্রাভিনয় ও সরকারী প্রচার-বিভাগের চলচ্চিত্রাদির ব্যবস্থা ছিল। স্থানীয় যাত্রাভিনয়ের মাধ্যমেই গ্রামের প্রাণস্পন্দন অনুভব করা যায়। দুর্য্যোগ সত্ত্বেও জনসমাগম কম হয় নাই।

পরিশেষে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, এই ক্ষুদ্র প্রদর্শনীর সাহায্যে, এই কয়েক বৎসরের মধ্যে স্থানীয় কৃষি ও শিল্পের অগ্রগতি পরিলক্ষিত হইতেছে। সরকার বাহাদুর পল্লী-অঞ্চলের প্রদর্শনীর প্রতি অধিকতর দৃষ্টি ও মনোযোগ দিলে এবং একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা অনুসারে এই সকল প্রদর্শনী পরিচালিত হইলে অচিরেই স্থানীয় কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সম্ভবপর হইবে।

এই প্রসঙ্গে স্থানীয় অর্থনৈতিক অবস্থার আভাস অতি সংক্ষেপে দিতেছি। শ্রীএককড়ি মালিক দশ বিঘা জমিতে ভাগে ধানের চাষ করিয়াছিল। দশ বিঘা জমিতে মোট বাইশ মণ ধান উৎপন্ন হইয়াছিল; তাহার ভাগে পড়িল এগারো মণ। শ্রীসতীশচন্দ্র মালিক দশ বিঘা জমি ভাগে চাষ করিয়াছিল। এই দশ বিঘা জমিতে মোট ফলন হইয়াছিল বত্রিশ মণ, সে ভাগে পাইল ষোল মণ। শ্রীনকুড়চন্দ্র সাঁতরা পাঁচ বিঘা জমিতে চাষ করিয়া উৎপন্ন মোট ধান্য দশ মণের অর্দ্ধেক পাঁচ মণ তাহার ভাগে পাইয়াছে। শ্রীনকুড়ের আরও কুড় বিঘা জমির ধান কাটিবারই প্রয়োজন হয় নাই, কেননা, তাহাতে কাটিয়া তোলায় ও ঝাড়াইয়ের খরচও উশুল হইবে না। লেখকের দুই বিঘা জমিতেও এই অবস্থা ঘটিয়াছে। এই অঞ্চলে, বর্ত্তমান বৎসরে ধান চাষের ইতিহাস এইরূপই। জলাভাবই ইহার একমাত্র কারণ। স্থানীয় 'জাওনা'-গুলি সংস্কার করিয়া দিলেই এই প্রতিবন্ধক অনেকাংশে দূর হয়। কে করিবে?

এবার আলুর চাষেও কৃষকগণ জলাভাববশতঃ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কেবল একজনের হিসাব দিতেছি। আড়াই মণ বীজ ও আট মণ সার ব্যবহার করিয়া উনিশ মণ আলু পাওয়া গিয়াছে। বীজের মূল্য মণ প্রতি ছাব্বিশ টাকা, সারের মূল্য মণ প্রতি বার টাকা। কেবল বীজ ও সারের মূল্য ১৬১ টাকা; ইহা ছাড়া চাষ, সেচ প্রভৃতির ব্যয় আছে। আলুর বাজার দর বর্ত্তমানে ৭.৮ টাকা মণ। সুতরাং লাভ হওয়া দূরে থাকুক তাহাকে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার এবং "পণ্ডশ্রম" করিতে হইয়াছে। চাউলের মূল্য মণ প্রতি ২৪।২৫ টাকা। কৃষকদের অবস্থা উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আভাস হইতেই উপলব্ধি করা যাইবে। বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই।

শ্রীশ্রীবিশালাক্ষী দেবী

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

সন ১৩৬৩ সালের ফাল্গুন মাসের প্রবাসীতে "পল্লীর দেবদেবী" প্রবন্ধে কোথায় কোথায় বিশালাক্ষী দেবীর মূর্ত্তি বা "আস্তান" আছে, তৎসম্বন্ধে কিছু বিবরণ দিয়াছিলাম। পরে আরও কয়েকটি স্থানে বিশালাক্ষী বলিয়া পূজিত দেবীর সন্ধান পাইয়াছি। বাসলী বা বাশুলী দেবী বিশালাক্ষী হইতে বিভিন্ন কিনা জানি না। তবে বাসলী যে তন্ত্রসম্মত মহাবিদ্যা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। একটি শ্লোকে এইরূপ আছে :—

কামাখ্যা বাসলী বালা মাতঙ্গী শৈলবাসিনী।
ইত্যাদ্যাঃ সকলা বিদ্যাঃ কলৌ পূর্ণফলপ্রদাঃ॥

সম্প্রতি সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (৬০ ভাগ) 'বিশাললোচনী বা বিশালাক্ষীর গীত' নামক পুথি প্রকাশিত হইয়াছে। পুথিতে রচনাকালের পরিচয় এইভাবে দেওয়া আছে :—

সাকে রস রস বেদ সসাঙ্ক গনিতে।
বাসুলীমঙ্গল গীত' হৈল সেই হইতে॥

রচনাকাল আন্দাজ ইং ১৫৭৭ সন বলিয়া মনে হয়।

চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী "তন্ত্রকথা" পুস্তিকায় লিখিয়াছেন :—

"কবিশেখরের কালিকামঙ্গলে বিক্রমপুরের বিশালাক্ষীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ঘাটালে ও টিটাগড়ে বিশালাক্ষীর মন্দির বর্ত্তমান। ওয়ার্ড সাহেব বর্দ্ধমানের সেনহাটি গ্রামে বিশালাক্ষীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছেন। বিশালাক্ষীকে ইষ্টদেবীরূপে পূজা করে এরূপ সম্প্রদায়ের কথাও তিনি বলিয়াছেন। চণ্ডীদাসের উপাস্যা বাসুলী বা বিশালাক্ষী দেবীর প্রকৃত স্বরূপ লইয়া পণ্ডিতসমাজে বিস্তর মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়।" (৫৬ পৃষ্ঠা)

বিশালাক্ষীর যে নাম-ভেদ আছে তাহা বেশ বুঝা যায়— কোথাও তিনি বাশুলী বলিয়া পূজিতা, কোথাও বা বিশাললোচনা; আবার কোথাও, যেমন কেতুগ্রামে, তিনি বেহুলা নামে পরিচিতা।

মুকুন্দরাম কবিকঙ্কনের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আছে :—

১। কলিঙ্গরাজকে চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ প্রসঙ্গে আছে।

"হয়ে তোরে কৃপাময়ী　　সমরে করাব জয়ী
একছত্রা পালিবে অবনী।
ভুবন করাব বশ　　তোমার বাড়াব যশ
করিব নৃপতি-চূড়ামণি॥
কংস নদীর তীরে　　ইঙ্গিয়া কুসুমনীরে
নিরমিয়ু দেহারা আপনি।
প্রজা পুত্র পুরোহিত　　সঙ্গে লৈয়া সাবহিত
আমারে পূজিবে নৃপমণি॥
দক্ষসুতা আমি দাক্ষী　　কাশীপুরে বিশালাক্ষী
লিঙ্গধারা নৈমিষকাননে।
প্রয়াগে ললিতা নামে　　বিমলা পুরুষোত্তমে
কামবতী শ্রীগন্ধমাদনে॥"

কাশীপুর সম্ভবতঃ মেদিনীপুর জেলায় কাঁসাই নদীর নিকট হইবে। এই কাশীপুর কোথায় তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারি নাই।

২। খুল্লনার বিবাহ-প্রস্তাবে জনার্দ্দন পণ্ডিতের পাত্র নির্ব্বাচন প্রসঙ্গে আছে :—

"বর্দ্ধমানে ধুস দত্ত　　যার বংশে সোম দত্ত
মহাকুল বেণের প্রধান।
বাশুলীর প্রতিদ্বন্দ্বী　　দ্বাদশ বৎসর বন্দী
বিশালাক্ষী কৈল অপমান॥"

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, মুকুন্দরামের সময় বিশালাক্ষীর পূজা প্রচলিত ছিল এবং কেহ কেহ বিশালাক্ষীর পূজার বিরোধিতাও করিয়াছিলেন।

এই ধুস দত্ত জাতিতে গন্ধবণিক ও শ্রেষ্ঠ কুলসম্ভূত।

"গঙ্গার দু'কুল কাছে　　গন্ধবেণে যত আছে
খুল্লনার যোগ্য নাহি বর।"

কুটুম্ব-সমাগম অধ্যায়ে আছে :—

বর্দ্ধমান হৈতে বেণে আইসে ধুসদত্ত।
সর্ব্বজনে গায় যার কুলের মহত্ত্ব॥"

কোন কোন বিশালাক্ষীর মন্দির বহু পুরাতন। ইহাদের প্রাচীনত্ব নির্দ্ধারণ করা শক্ত—প্রবাদ সব সময়ে নির্ভর করা যায় না। প্রবাদের স্বপক্ষে অন্য প্রমাণ থাকিলে তবে মন্দিরের কাল নির্ণয় করা যায়। অনেক স্থলে দেবতা পুরাতন, মন্দির পরে নির্ম্মিত হইয়াছে। আবার কোন কোন স্থলে মন্দির পুরাতন, দেবতার মূর্ত্তি অপেক্ষাকৃত নূতন। পুরাতন দেবী-মূর্ত্তি মুসলমানে ভাঙ্গিয়া দিলে বা অপবিত্র করিলে, নূতন দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। আবার কোন কোন স্থানে পুরাতন মূর্ত্তির অঙ্গহানি ঘটিলে তাহা জলশায়ী করিয়া তৎস্থলে নূতন মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত "বিশাললোচনী বা বিশালাক্ষীর গীতে" আছে যে :—

"বাঘাণ্ডায় আসি ডিঙ্গা হইল উপনীত।
দেউল দেখিয়া ডিঙ্গা ঠেক দিল তাহে॥

× × ×

"বল ভাইয়া কর্ণধার সমুখে দেউল কার
কেমন দেবতা আছে ইথি।
শুন সাধু ধুস দত্ত দেউল দিল মহারথ
বাশুলী স্থাপিল নরপতি॥
এ বোল শুনিঞা কোপে দেবীর দেউল ভাঙ্গে
বাঘাণ্ডায় বসিয়া আপুনি।"

(সাঃ পঃ পত্রিকা ১৩৬১ সাল, ১৭২ পৃঃ ইত্যাদি)

নরপতির স্থাপিত বাশুলীর মন্দির ধুস দত্ত ভাঙ্গিয়া দেন ; তৎপরে ধুস দত্তর পুত্র মন্দির পুনরায় নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এই সব ঘটনা নিশ্চয়ই পুঁথি লিখিবার (ইং ১৫৭৭ সনের) বহু পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। কত পূর্ব্বে তাহা ঠিক বলা যায় না বটে ; তবে একটা মোটামুটি হিসাব আমরা পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিব। এই হিসাব কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহা পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখিবেন।

বাঘাণ্ডা বলিয়া দুইটি গ্রামের সন্ধান বর্ত্তমানে পাওয়া যায় ; একটি হুগলী জেলার জাঙ্গিপাড়া থানায় ; অপরটি হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানায়। কোন বাঘাণ্ডায় এই মন্দির ছিল তাহা নির্ণয় করিতে পারি নাই। বাঘাণ্ডা বলিয়া একটি পরগণা হুগলী জেলায় আছে। বর্ত্তমানে বাঘাণ্ডা গ্রামে কোন বিশালাক্ষীর মন্দির বা মূর্ত্তি বা 'স্থান' আছে কি না বলিতে পারি না।

কবির উক্ত বাঘাণ্ডায় বাশুলীর উপাসনা কত পুরাতন তাহার একটা হিসাব দিতেছি।

নরপতি প্রথমে বাশুলীর মূর্ত্তি স্থাপনা করেন। মন্দিরও করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এই মন্দির কালক্রমে ভাঙিয়া যাইলে মহারথ সু-উচ্চ মন্দির করিয়া দেন। এই মন্দির প্রখ্যাত মন্দির—মাঝি-মাল্লারা প্রভৃতি সাধারণ লোকেও তাহার ইতিহাস জানে। এই মন্দির ধুস দত্তর মন্দির ভাঙিবার ৫০ বৎসর পূর্ব্বে যে তৈয়ারি হইয়াছিল তাহা সহজে ধরিয়া লওয়া যায়। বাশুলীর পূজা বহু-প্রচলিত বা জনপ্রিয় না হইলে নরপতি বাশুলীর মূর্ত্তি স্থাপিত করিতেন কি না, সন্দেহ। নরপতির মন্দিরও লুপ্ত হইলে মহারথ নূতন মন্দির করিয়া দেন। এমতে নরপতির মন্দির মহারথের মন্দিরের ১০০ বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল ধরিতে পারি। ধুস দত্তর পুত্র মন্দির ভাঙিবার এক পুরুষ পরে (২৫ বৎসরে এক পুরুষ ধরিলাম) পুনরায় মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এই নূতন মন্দিরের ১৭৫ বৎসর পূর্ব্বে নরপতির মন্দির হইয়াছিল। এই নূতন মন্দির তৈয়ারিও যখন প্রবাদে, ঐতিহ্যে (tradition-এ) পরিণত হইয়াছে তখন বিশাললোচনীর গীত রচিত হইয়াছে—এই ব্যবধানও ১০০ বৎসরের। এমতে ইং ১৫৭৭ সনের ২৭৫ বৎসর পূর্ব্বে নরপতি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আজ হইতে ৬০০।৬৫০ বৎসর পূর্ব্বে এই অঞ্চলে বাশুলীর পূজা প্রচলিত হইয়াছিল—ইহার আরও পূর্ব্বে হইতে পারে কিন্তু সে বিষয়ে সাক্ষাৎ প্রমাণ পাই নাই।

এই ধুস দত্ত কবিকঙ্কণের ধুস দত্তের সহিত অভিন্ন হইলে গন্ধবণিক জাতীয় ধনী বণিকের পক্ষে দেবমন্দির ভাঙিয়া দেওয়া ধর্ম্মান্ধতার চরম বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়ে সমাজতত্ত্ববিদগণ আলোচনা করিলে ভাল হয়।

মুকুন্দরাম তাঁহার চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে রাজা রঘুনাথের আদেশে রচনা করেন। রঘুনাথের রাজত্বকাল ইং ১৫৭৩ সন হইতে ইং ১৬০৩ সন পর্য্যন্ত। ইহার মধ্যেই তাঁহার কাব্য রচিত হইয়াছিল। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে ইং ১৫৯৪ সনে কাব্য রচনা শেষ হয়। সূক্ষ্ম বিচারের প্রয়োজন নাই। ইহা ঐ সময় আন্দাজ রচিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বোদ্ধৃত পদ দেখিয়া মনে হয় যে, কাশীপুরের বিশালাক্ষী বিখ্যাত ও বহু পুরাতন। বর্দ্ধমানের ধুস দত্ত প্রথমে বিশালাক্ষী দেবীর পূজার বিরোধী ছিলেন—পরে পূজা করিতেন। কবি যে সময়ের কথা লিখিতেছেন, সে সময়ে চণ্ডীপূজার তাদৃশ প্রচলন না হইলেও বিশালাক্ষীর পূজা প্রচলিত হইয়াছে। ইহা হইতে যদি আমরা কবির কাল হইতে আরও ১০০ বৎসর যোগ দিই ত অন্যায় হইবে না। এ মতেও মনে হয় বিশালাক্ষীর পূজা এই অঞ্চলে আজ হইতে ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে প্রচলিত হইয়াছিল। এ বিষয়ে আরও আলোচনা উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা হওয়া আবশ্যক।

ধুস দত্ত বলিয়া কোন ব্যক্তি বিশালাক্ষীর পূজার বিরোধী ছিলেন, পরে নানা কারণে পূজা মানিয়া লয়েন। বিশাললোচনীর গীতের ধুস দত্ত ও কবিকঙ্কনের ধুস দত্ত একই ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। এই ধুস দত্ত ঐতিহাসিক ব্যক্তি না হইলেও কাল্পনিক ব্যক্তি নহেন—কোন বিশিষ্ট সত্যাকারের ব্যক্তি নিশ্চয়ই হইবেন।

এইবার আমরা জেলাওয়ারী হিসাবে বিশালাক্ষীর অবস্থান দিব। যথা:—

জেলা ২৪ পরগণা	গ্রামের নাম
১। থানা বরাহনগরের অন্তর্গত	কামারহাটিতে
২। ,, টিটাগড়ের ,,	টিটাগড়ে
৩। ,, বারুইপুরের ,,	বারুইপুরে
৪। ,, কুলপী ,,	করঞ্জলি-কাঁটাবেড়িয়া

জেলা হুগলী	গ্রামের নাম
১। থানা হরিপাল	ইলাহিপুর
২। ,, জাঙ্গীপাড়া	মথুরাবাটি
৩। ,, চণ্ডীতলা	কলাছড়া
৪। ,, চণ্ডীতলা	শিয়াখালা
৫। ,, গোঘাট	কামারপুকুর-আমুড়
৬। ,, আরামবাগ	বিক্রমপুর
৭। ,, সিঙ্গুর	পুরুষোত্তমপুর

৮। ,, আরামবাগ	নারায়ণপুর
জেলা বর্দ্ধমান	গ্রামের নাম
১। থানা কেতুগ্রাম	কেতুগ্রাম
২। ,, গলসী	চাস্তো বা চন্না
৩। (* * *)	সেনহাটী
জেলা বাঁকুড়া	গ্রামের নাম
১। থানা ছাতনা	ছাতনা
জেলা বীরভূম	গ্রামের নাম
১। থানা নান্নুর	নান্নুর
জেলা মেদিনীপুর	গ্রামের নাম
১। থানা ঘাটাল	বরদা
জেলা হাওড়া	গ্রামের নাম
১। থানা শ্যামপুর	গাজীপুর-গণেশপুর
২। ,, × × ×	গড়কুম্বক
৩। × × ×	নস্করপুর
৪। × × ×	মোল্লা
৫। ,, শ্যামপুর	শিবাগঞ্জ
৬। × × ×	গোয়ালবেড়ে
৭।	সাকরাইল

(১ হইতে ৬ নং অহিভূষণ দত্তের চিঠি হইতে গৃহীত)

চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের লিখিত কালিকামঙ্গলের বিক্রমপুর কোথায় আমরা তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারি নাই। বোম্বাই বেঙ্গলী এসোসিয়েশনের সভাপতি হইতে শ্রীযুক্ত অহিভূষণ দত্ত B. L মহাশয় যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"হাওড়া জেলায় বহু দেবীমূর্ত্তি আছে এবং তাহাদের ৯০% বিশালাক্ষী দেবীর মূর্ত্তি। আমাদের গ্রাম হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানায় অন্তর্গত গাজীপুর গ্রামে (উলুবেড়িয়া মহকুমা পোঃ গণেশপুর—পূর্ব্বে ছিল আমড়দহ) আমাদের আশেপাশে যে কয়টি বিশালাক্ষী দেবী মূর্ত্তি আছে তাহাদের নাম :

১। গড়কুম্বক গ্রামে—১টি (দামোদর নদের তীরে)
২। নস্করপুর ,, —১টি
৩। মোল্লা ,, —১টি
৪। শিবাগঞ্জ ,, —১টি
৫। গোয়ালবেড়ে ,, —১টি (দামোদরের অপর পারে)

সব দেবীমূর্ত্তিই ব্যাঘ্রারূঢ়া, দশভুজা।

২।১টি স্থান ছাড়া প্রতি দেবীস্থানেই গাজন-উৎসব ও বৈশাখী পূর্ণিমায় নীল হয়—সমারোহসহকারে। আমার মনে হয় আমাদের এই অঞ্চল পূর্ব্বে জঙ্গলাকীর্ণ ছিল, এজন্য বিশালাক্ষী মূর্ত্তির এত প্রাচুর্ভাব। আজও সুন্দরবনে প্রথমেই বিশালাক্ষী দেবীর পূজা করিয়া তবে বন-প্রবেশ করিতে হয়, ঐ অঞ্চলে বন প্রচুর।

এ ছাড়া আমাদের পাশের রতনপুর নামক গ্রামে দেবী 'রত্নমালা' আছেন। * * * সন্ধ্যায় ও ভোরের যে নিশানবাদ্য হয়, তাহা নাকি শ্রীমন্ত সদাগরের বাণিজ্য-যাত্রার প্রাক্কালে উক্ত সদাগর কর্ত্তৃক দামামা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা বলিয়া বহুলোকের ধারণা।"

যে গ্রাম বা মৌজাগুলির নাম Howrah District Hand-book-এ পাইয়াছি, তাহাদের থানা দিলাম।

খেয়ালী

শ্রীসুনীলকুমার লাহিড়ী

যে কুসুমটিরে ধরেছিলে তুমি তব অঙ্গুলি-প্রান্তভাগে—
কখন তাহারে অন্যমনায়, ছুঁয়েছ বিরাগী-অধর-কোণায়,
হৃদি-রঞ্জিত হয়েছে তাহার তব দুর্ল্লভ-ওষ্ঠ-রাগে।
আবার কখন অলস খেলায়, রাঙাদলগুলি ঝরালে হেলায়,
তোমার প্রখর নখরাঘাতে।
হায় প্রিয় হায় এ বারতা কভু জানিল না কোন জন ;—
ও কি ছিল শুধু বনেরই কুসুম ?
ও যে ছিল মোর রঙীন মন।

যে পান-পেয়ালা ধরেছিলে তুমি তব অঙ্গুলি-প্রান্তভাগে—
হেলাভরে তারে অন্যমনায়, তুলেছ বিরাগী-অধর-কোণায়,
হৃদি-রঞ্জিত হয়েছে তাহার তব দুর্ল্লভ-ওষ্ঠ-রাগে।
পান শেষে তারে তেমনি হেলায়, দূরে ফেলি দিলে খেয়াল খেলায়
চূর্ণিলে তারে কঠোরাঘাতে।
হায় দুনিয়ায় প্রেমিক কোথাও মিলিল না কোনখান ;—
ও কি ছিল শুধু পানেরই পেয়ালা ?
ও যে ছিল মোর দরদী প্রাণ।*

* শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর 'Caprice' কবিতার ভাবানুবাদ।

ইংলণ্ডের একটি গ্রাম্য শিশু-বিদ্যালয়

(কুক্‌হাম নার্সারী স্কুল)

শ্রীচারুশীলা বোলার

ইংলণ্ডের বার্কসায়ার-এর অন্তর্গত কুক্‌হাম একটি গ্রাম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর গ্রামটির চারিদিক থেকে অনেক উন্নতি হয়। পেশাদার ও মজদুর সম্প্রদায়ের বহুসংখ্যক লোক এখানে বসতি স্থাপন করে। সরকার কর্তৃক বহু ঘরবাড়ীও এখানে তৈরী হয়।

গ্রাম্য পরিবেশে একটি আদর্শ নার্সারী স্কুল স্থাপন সম্বন্ধে সরকার বিবেচনা করেন। সহজ উপায়ে, কম খরচে এবং রুচিসম্পন্ন-ভাবে স্কুলটি তৈরী হবে, এই পরিকল্পনায় একটি প্ল্যান তৈরী হয়। নার্সারী-স্কুল-এসোসিয়েসনের বিলডিংস এডভাইসরি কমিটি নতুন ও আধুনিক নক্সায় স্কুল-বাড়ীটি তৈরী করেন। ১৯৫০ সনে বার্ক-সায়ার কাউন্টি কাউন্সিলের অধীনে এই অবৈতনিক নার্সারী স্কুলটি খোলা হয়।

স্কুলটির অবস্থিতি খুবই যুক্তিযুক্ত—বড় রাস্তার কাছে এবং প্রত্যেক শিশু অত্যন্ত সহজ উপায়ে এখানে আসা-যাওয়া করতে পারে। স্কুল-বাড়ীটির বাইরের এবং ভিতরের কারিগরি অত্যন্ত রুচিসঙ্গত। শিশুদের জন্য মাত্র একটি বড় ঘর—সেটিকেই প্রয়োজন অনুযায়ী দুই-তিনটি অংশে ভাগ করা হয়েছে আসবাব-পত্রের সাহায্যে। ফলে একটি বড় ও একটি ছোট খেলাঘর (playroom) ও একটি পায়খানা ও হাত-মুখ ধোয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। পায়খানার ফ্লাশ সিসটেম থাকলেও যাতে কোনরকম দুর্গন্ধ না হতে পারে তার জন্য বৈদ্যুতিক পাখা খুব কায়দা করে লাগানো আছে।

ঘরগুলিতে আলো ও বাতাস প্রচুর এবং ঠাণ্ডার সময় ঘর গরম রাখারও ব্যবস্থা আছে। ছোট ছোট হাল্কা আসবাবপত্র, উপযুক্ত খেলার সরঞ্জাম ও উপকরণ দিয়ে ঘরগুলি সাজানো। শিশুরা জানে কোথায় কি আছে এবং কোথায় আবার গুছিয়ে রাখতে হবে। খেলার জন্য প্রসারিত স্থান, ফুলের কেয়ারী, সবুজ ঘাস। এমন একটি পরিবেশে শিশুরা কেনই বা আনন্দ পাবে না?

পাশেই আছেন শিক্ষয়িত্রীর দল। দুই বৎসর থেকে পাঁচ বৎসর বয়সের ৪০টি শিশুকে এখানে স্থান দেওয়া হয়। এই ৪০টি শিশুর জন্য একজন প্রধানা শিক্ষয়িত্রী, একজন শিক্ষয়িত্রী ও একজন সহ-শিক্ষয়িত্রী। এছাড়া নার্সারী-নার্সেস-ট্রেনিং-সেন্টার থেকে দুই জন ছাত্রীকে কার্যসূচী অনুযায়ী নয় মাস নার্সারী স্কুলে কাজ করতে হয়। শিক্ষয়িত্রীগণ শিক্ষাবিভাগের বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত।

প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ভর্ত্তির তালিকাভুক্ত পর পর নাম অনুযায়ী শিশুকে স্কুলে স্থান দেন। লণ্ডন শহরের অন্যান্য নার্সারী স্কুলের মত এখানেও শিশুকে মায়ের কাছ থেকে ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে নিয়ে নতুন পরিবেশে খাপ খাওয়ানো হয়। অর্থাৎ পিতামাতা প্রথম দিনেই শিশুকে ভর্ত্তি করে স্কুলে ছেড়ে দিয়ে আসতে পারেন না। স্কুলে স্থান পাবে এ কথা জানা মাত্র মা তাঁর শিশুকে অল্প সময়ের জন্য স্কুলে নিয়ে আসেন। ক্রমশঃ সময় বাড়াতে থাকেন—শিশু সেই সময়ের মধ্যে অনেকখানি নতুন পরিবেশে খাপ খাওয়াবার চেষ্টা করে। যেদিন সে সকলের সঙ্গে খেতে বসে সেদিন থেকে তার নাম রেজিষ্টার-এর তালিকাভুক্ত হয়। এতদিনে মা খাওয়ার সময় পর্যন্ত শিশুকে ছেড়ে থাকেন কিন্তু বিশ্রামের সময় আবার তাঁকে আসতে হয় যাতে শিশু ঘুম থেকে উঠেই মাকে দেখতে পায়। ক্রমশঃ শিক্ষয়িত্রীদের ওপর বিশ্বাস জন্মাতে থাকে। দুই-চারদিন পর মায়ের থাকা আর প্রয়োজন হয় না। এই ভাবে ধীরে ধীরে নতুন পরিবেশে শিশুকে খাপ খাওয়াবার সুযোগ দিলে তার আত্ম-বিশ্বাস জন্মায়, ভয়-সঙ্কোচ কেটে যায়—অন্যান্য শিশুদের জানবার সুযোগ পায় এবং নিরাপত্তা-বোধ দৃঢ় হয়।

শিশুর স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। ভর্ত্তির সময় শিশুকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা হয় এবং প্রতি টার্মে একবার ডাক্তার এসে প্রয়োজন মত শিশুকে পরীক্ষা করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। একজন স্কুল-নার্স আছেন যিনি সপ্তাহে একবার আসেন এবং প্রয়োজন হলে যে কোনদিন তাঁকে আসতে হয়। সামান্য অসুস্থতার ভার তাঁর ওপর। এ ছাড়া ছোটখাটো দুর্ঘটনা-গুলি শিক্ষয়িত্রীরাই প্রাথমিক চিকিৎসা করে সামলিয়ে নেন।

সরকার থেকে বিনামূল্যে দুধ, বোতলে কমলালেবুর রস ও কডলিভার অয়েল-এর ব্যবস্থা আছে। প্রতি শিশু দুই-তৃতীয়াংশ পাইণ্ট দুধ পায় রোজ। সরকার-প্রদত্ত একটি সুসজ্জিত রান্নাঘর আছে যেটি স্কুলেরই একটি অংশ। প্রতিদিন শিশুদের মধ্যাহ্ন-ভোজনের ব্যবস্থা এখানেই হয়। রান্নার জন্য গার্হস্থ্য বিজ্ঞান পাশ-করা রাঁধুনি একজন নিযুক্ত আছেন। রান্নাঘরের প্রতিটি কাজ—শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার্থে কি কি প্রয়োজন, পুষ্টিকর খাদ্যের তালিকা নির্ণয় এসব সম্বন্ধে তিনি বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত। বার্কসায়ার মিলস এসোসিয়েসনের তত্ত্বাবধানে উক্ত রাঁধুনি সাপ্তাহিক খাদ্য-তালিকা রচনা করেন। তাঁকে সাহায্য করার জন্য একজন সহকারীও আছেন তিনি আংশিক সময়ের জন্য কাজ করে যান।

সুস্থ ক্রমবিকাশের জন্য সমস্ত দিনের কাজের মধ্যে কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম শিশুর পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এখানে সে ব্যবস্থাও আছে। বরফ, কুয়াসা ও বৃষ্টির দিন ছাড়া প্রচণ্ড ঠাণ্ডার দিনেও শিশুদের বাইরে ঘুমোবার ব্যবস্থা হয়। প্রত্যেক শিশুর জন্য ছোট ছোট হালকা খাট, চাদর ও কম্বল আছে।

পিতামাতার সঙ্গে প্রতিদিন শিশুরা স্কুলে আসে। বেশীর ভাগ সময় মায়েরাই আসেন। দুই বৎসরের শিশুকে pushing chair-এ ঠেলে মা নিয়ে আসেন—কিন্তু তিন বৎসর বয়স থেকে শিশুরা মায়ের হাত ধরে কত গল্প করতে করতে স্কুলে আসে। স্কুলের কর্তৃপক্ষ পিতামাতার সহযোগিতা সম্পূর্ণভাবে পেয়ে থাকেন। প্রতিদিন পিতামাতা শিশুর খেলা ও কাজ দেখতে পাচ্ছেন। তাদের জন্য কি কি ব্যবস্থা আছে সব তাঁরা ভালভাবে জানেন। প্রতিদিন শিক্ষয়িত্রীদের সঙ্গে তাঁদের কথাবার্তা হয়। প্রয়োজন হলে প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শিশু সম্বন্ধে তার মায়ের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং কর্তব্যবোধে উপদেশও দিয়ে থাকেন। ডাক্তারের পরীক্ষার ফলাফল পিতামাতাকে জানানো হয় এবং দরকার হলে সাহায্য দাবী করা হয়। শিশুদের সাপ্তাহিক খাদ্য-তালিকা বাইরে নোটিশ-বোর্ডে টাঙানো থাকে পিতামাতাকে জানানোর জন্যে। এ ছাড়া প্রতি উৎসবে পিতামাতাকে নিমন্ত্রণ করা হয় এবং তাঁদের কাছ থেকে নানাভাবে সাহায্য পাওয়া যায়।

ছয়-সাত ঘণ্টা শিশুরা এই পরিবেশে থাকে। সমস্ত দিনের কাজের মধ্যে কোনও বাধা নাই। কাজ ও বিশ্রাম দুইয়েরই ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত ও পর্যাপ্ত। কতকগুলি সু-অভ্যাস শেখানো হয়। প্রত্যেক শিশুর জন্য তোয়ালে, মাজন, চিরুণী, জামা রাখার হুক্ এবং তাতে নিজস্ব চিহ্ন দেওয়া থাকে যাতে সহজেই নিজেরটা চিনতে পারে। দিনের মধ্যে বেশী সময় দেওয়া হয় তাদের খেলা-ধূলার জন্য। এ ছাড়া নির্দিষ্ট সময় থাকে খাওয়া ও বিশ্রামের জন্য। শিশুর সারাদিনের কাজের ওপর শিক্ষয়িত্রীর নজর আছে। তিনি জানেন কখন বাধা দিতে হবে এবং কখন ছেড়ে দেবেন স্বাধীনভাবে খেলার জন্য। প্রয়োজন মত তাদের রক্ষা করেন এবং নানারকম ঝগড়া-মারামারির ওপর হস্তক্ষেপ করেন। কোনও মূল্যবান উপকরণ যাতে নষ্ট না করে সেদিকেও তিনি চোখ রাখেন। শিশুদের সকল রকম প্রশ্নের উত্তর দেন এবং সাহায্য বা পরামর্শ চাইলে সঙ্কেতে বুঝিয়ে দেন। শিশু স্কুলে প্রবেশ মাত্র শিক্ষয়িত্রী ব্যক্তিগতভাবে তাকে অভ্যর্থনা করেন।

একটি দিনের কাজ ও শিশুদের গতিবিধি, কথাবার্তা থেকেই বোঝা যাবে তাদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা হয়েছে এবং কোন্ বয়সে কি ভাবে শিশুর ক্রমিক বিকাশের গুণাবলী ফুটে উঠছে।

সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে সকল শিক্ষয়িত্রী স্কুলে হাজিরা দেন এবং খেলার উপকরণগুলি জায়গা মত সাজিয়ে রেখে শিশুদের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত থাকেন। ৮টা ৪৫ মিনিট থেকে শিশুরা আসতে আরম্ভ করে ও ৯টা ৩০ মিনিট মধ্যেই সকল শিশু স্কুলে উপস্থিত হয়। দুই-তিন জন ছাড়া আর সকলেই ঐ এলাকায় থাকে। স্কুলে আসামাত্র প্রত্যেক শিশু তার ওপরের জামাটি খুলে নিজের হুকে টাঙ্গিয়ে রাখে। যারা খুব ছোট মায়েরাই তাদের সাহায্য করেন।

তার পর এক-তৃতীয়াংশ পাইন্ট দুধ খেয়েই খেলাধূলা আরম্ভ করে দেয়।

সে দিন আমি স্কুলে ঢুকতেই দেখি বাইরে এক জায়গায় কয়েক-জন ৪.৫ বৎসরের ছেলেমেয়ে কয়েকটি কাঠের প্যাকিং বাক্স ও মোটরের পুরাতন চাকা নিয়ে খেলছে। আমায় দেখেই একজন বলে উঠল, "Look we are in a cart." একজন বিদেশী মহিলা দেখেও তাদের সঙ্কোচ বা ভয় কিছুই নাই। এই বয়সে সামাজিকতা বিকাশ যে তাদের অনেকখানি হয়েছে বেশ বোঝা গেল। "Cart"খানির কারিগরিও আমাকে কিছুটা বুঝিয়ে দিল। তখনই প্রধানা শিক্ষয়িত্রী সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে আমাকে ভিতরে নিয়ে গেলেন এবং স্কুল সম্পর্কে নানা রকম কথাবার্তার পর শিশু-পর্যবেক্ষণের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেন।

তখন ছিল জুন মাস—ইংলণ্ডের 'Summer'—ভাগ্যবশতঃ দিনটিও ছিল পরিষ্কার। সুতরাং শিশুদের বাগানে ও ঘরের ভিতরে—দুই জায়গাতেই খেলাধূলা দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। একটি ৪ বৎসরের মেয়ে অন্য একটি মেয়েকে দেখিয়ে আমায় বলল, "She is Vivien, and I have a Michael (বড় ভাই)।" বাইরে বাগানে যাওয়া মাত্র সাতটি ছেলেমেয়ে আমাকে ঘিরে ফেলে প্রশ্নের পর প্রশ্ন সুরু করল—"Do you live in London? Are you a lady? Can you laugh? Can you sing?"

এই ধরণের আরও কত প্রশ্ন। হঠাৎ একজন বলে উঠল, "Are you allowed to come to our wash-room?" আমি 'হাঁ' বলাতে আর দেরী না, দলটি যেন আমায় টেনে নিয়ে চলল তাদের নির্দিষ্ট জায়গায়। প্রত্যেকে নিজের নিজের তোয়ালে এবং মুখ ধোয়ার ফ্লানেলে আঁকা ছবিগুলি আমায় দেখিয়ে প্রশ্ন করতে লাগল এবং প্রত্যেকেই নিজের ছবি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে লাগল। এ ছাড়াও নিজের বাড়ীর নানা রকম খবর শোনাতে লাগল। একান্ত নিজের জিনিস এবং তারা যে সেগুলি ব্যবহার করতে পারে এ সম্বন্ধে কতখানি আত্মবিশ্বাস। একজন অপরিচিত বিদেশী মানুষ সম্বন্ধেও তাদের কত কৌতূহল—প্রশ্ন এবং কথা-বার্তার ভেতর দিয়ে জানবার কি আকাঙ্ক্ষা।

দুই বৎসরের শিশুরা আপন মনেই খেলে চলেছে—কারও কোলে পুতুল, কেউ বা পুতুলের গাড়ী ঠেলছে, কেউবা বালির ট্রেতে ছোট ছোট উপকরণগুলির সাহায্যে বালি ভরছে আর ঢালছে। কেউ কেউ অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে—কিছু জিজ্ঞাসা করলে মুখ ঘুরিয়ে চুপ করে নিজের খেলার দিকে মনোযোগ দিচ্ছে।

দুই-এক জন নিরাপত্তার দাবী নিয়ে শিক্ষয়িত্রীর পিছন পিছন ঘুরছে।

বড় খেলার ঘরটিতে ৪ বৎসরের দুটি মেয়ে শিক্ষয়িত্রীর সাহায্যে সাজ-পোষাকে ব্যস্ত। একজন সেজেছে লাল টুকটুকি—লাল জামা লাল টুপী পরে হাতে একটি ফলের টুকরী নিয়ে বেরিয়ে গেল। অন্যজন সেজেছে ঘরের গৃহিণী—পরনে তার লম্বা ঘাগরা,ঢিলা লম্বা-হাতা জামা, মাথায় বনেট ও হাতে প্রকাণ্ড একটি হাণ্ডব্যাগ। সেজেগুজে গৃহিণী চললেন বাজার করতে। এখানে দেখা যাচ্ছে শিশু কত অনুকরণপ্রিয়—কল্পনার ভেতর দিয়ে একজন গল্পের লাল টুকটুকী এবং অন্যজন তার মাকে রূপ দিয়েছে। এই খেলার ভেতর দিয়েই সে বাস্তব সমাজে বাস করতে নিজেকে উপযোগী করে তুলছে। সবকিছু হয় ত ফুটিয়ে তুলতে পারে না কিন্তু তার সত্যকারের যে চাহিদা, যে অনুভূতি মুহূর্তের জন্য উত্তেজিত হচ্ছে তারই খানিকটা এই ভাবে প্রকাশ হওয়াতে সে স্বস্তি বোধ করে।

তিন বৎসরের তিনটি ছেলেমেয়ে ঘরের অন্যদিকে শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে বসে একমনে ছবি কেটে চলেছে পুরাতন পত্রিকা থেকে। একটি দুই বৎসরের ছেলে বালি খেলতে খেলতে অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল—হাতে তার একমুঠো বালি চেয়ে থাকতে থাকতে মুঠির বালি ঝুর ঝুর করে পড়ে নিঃশেষ হ'ল; কোনও খেয়ালই নেই তার। হঠাৎ জোর গলায় কান্নার শব্দে সকলেই চমকে উঠে দেখল ছোট্ট জীন্ পড়ে গিয়ে হাঁটুতে চোট পেয়েছে—শিক্ষয়িত্রী তখনই প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন।

বাগানে একদল ছেলেমেয়ের (চার থেকে সাড়ে চার বৎসর বয়স) খেলা দেখে সত্যিই আমি অভিভূত হয়েছিলাম। কাল্পনিক হাসপাতাল—একটি ছেলে রোগী হয়ে খাটে শোয়া—তার আপাদমস্তক কম্বলে ঢাকা। পাশে একটি বেঞ্চি, তার ওপর নানা রকমের ওষুধের বোতল ও ব্যাণ্ডেজের ফালি। চার জন মেয়ে সাদা ইউনিফর্ম ও সাদা কাপড়ের টুপী পরে নার্স সেজেছে। দুই জন ছেলে সাদা এপ্রন্ পরে ডাক্তার সেজেছে, হাতে তাদের দুটি ষ্টেথেস্কোপ। রোগীকে একবার ওষুধ খাওয়ানোর পর নার্স ক্রিষ্টিন্ বললে, "Good night dear, go to sleep." এই বলে সে চলে গেল। অন্য তিন জন নার্স তিনটি চেয়ার টেনে উন্মুখ হয়ে বসে রইল রোগী জাগবে বলে। রোগীও জাগল—

—প্রত্যেক নার্স তখন তার হাতে ও মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে সুরু করল। রোগী একটু নড়তেই একজন নার্স ঠাস করে তার গালে এক চড় কষাল—সঙ্গে সঙ্গে অন্য দুই জনও মারতে লাগল। তবে সেই মুহূর্ত্তেই আবার মিটমাটও হয়ে গেল। নার্স ক্রিষ্টিন আবার এসে হাজির। আদেশের সুরে হাত নেড়ে বললে, "Look, you stay here till I come back" নার্স তিন জন আবার সেইভাবে চুপচাপ বসে রইল। ডাক্তার দুটি অন্যদিকে দৌড়ঝাঁপেই ব্যস্ত, এবং মাঝে মাঝে রোগীর ভালমন্দ খবর নিয়েই আবার চম্পট।

এই যে কাল্পনিক খেলা এটা আবিষ্কারের জন্যও নয় বা নিপুণতা লাভের জন্যও নয়। এই খেলা শিশুদের সামাজিক বিকাশে সহায়তা করে। শিক্ষয়িত্রীর এখানে কোনও হস্তক্ষেপ নাই। এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও কাল্পনিক খেলার দুটি বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। প্রথম হচ্ছে এতে শিশুর বুদ্ধিসংক্রান্ত গতিবৃদ্ধির উত্তেজনা সৃষ্টি করে। একটি বাস্তব জগত সে তৈরি করে যেখানে পর্য্যবেক্ষণ ও তুলনা করার সুযোগ পায়। মনে রাখার সুযোগ ঘটে কারণ অতীতের বাস্তব ঘটনা তার মনে পড়ে যায় যেগুলো তার অভিনীত খেলায় জীবন্ত রূপ ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করে। দ্বিতীয় হচ্ছে কাল্পনিক খেলায় শিশুর ভূত ও ভবিষ্যৎ জ্ঞানবোধের পুষ্টি সাধন করে। সে পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা স্মরণ করে বর্ত্তমান সমস্যা সমাধান করতে চেষ্টা করে। বাইরের জগতের আভ্যন্তরিক প্রতিক্রিয়া এই নাটকীয় খেলার ভিতর সে ফুটিয়ে তোলে এবং আত্মপ্রকাশের সাহায্যে সেই প্রবল উত্তেজনার উপশম হয় এবং দোষ ও দুষ্ট চিন্তার হাত থেকে এই ভাবে তারা নিজেদের মুক্ত করে।

১১টা ৩০ মিনিট পর্য্যন্ত এইভাবে তাদের খেলা চলে না। শিক্ষয়িত্রীর তত্ত্বাবধানে দলে দলে শিশুরা সুশৃঙ্খলভাবে হাত-মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হ'ল খেতে বসার জন্য। ইতিমধ্যে বড় খেলার ঘরটিকে খাবার-ঘরে পরিণত করা হয়েছে। ৪।৫টি দলে ভাগ করে এক-একটি টেবিলের চারিদিকে চেয়ার পাতা হয়েছে. টেবিলগুলিতে পরিষ্কার চাদর বিছানো—প্লেট, গ্লাস, কাঁটা-চামচ দিয়ে সাজানো। ছেলেমেয়েরা যে যার নির্দ্দিষ্ট জায়গায় খেতে বসল। প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ট্রলি-ট্রেতে ঠেলে খাবার নিয়ে এলেন রান্নাঘর থেকে। থালায় থালায় খাবার দিতেই সকলে খেতে সুরু করল। এই সময় কডলিভার অয়েল খাওয়ান হয়। স্বাধীনভাবে কথাবার্ত্তা-গল্পের ভিতর দিয়ে আনন্দে তারা খেতে লাগল। শিক্ষয়িত্রীরা কাছেই আছেন প্রয়োজন মত সাহায্য করবেন বলে। প্রচণ্ড খিদে নিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে সকলে খেয়ে উঠল। মুখ ধুয়ে এবং অন্যান্য কাজ সেরে সকলে আবার বাগানে গেল—তখন ১২টা ৩০ মিনিট।

খাবার ঘর এবার শোবার ঘরে পরিণত হ'ল। ছোট ছোট হালকা ক্যানভাসের খাট—ব্যক্তিগত চিহ্ন আঁকা। জুতো খুলে ছেলেমেয়েরা যে যার খাটে শুয়ে পড়ল। একজন শিক্ষয়িত্রী এই সময় এদের কাছে থাকেন যাতে শিশুরা নিরাপত্তা বোধ মনে রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে। ১—২টা সময় পর্য্যন্ত এরা ঘুমোয়। যাদের বেশী ঘুমের প্রয়োজন তারা একটু দেরীতে ওঠে। ঘুম থেকে উঠে প্রত্যেক শিশু কমলালেবুর রস খায় এবং আবার খেলা সুরু করে।

এই সময় কিছু কিছু বিভিন্ন ধরণের উপকরণ তাদের দেওয়া হয় সকালের যা কিছু তা ত আছেই। চার বৎসরের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে জল-খেলায় মত্ত—একটি গরম জলের ব্যাগে ক্যানেল দিয়ে জল ভরছে। কত রকম ভাবে পরীক্ষা চলছে, এবং

একজন অন্যজনকে বুঝিয়ে দিচ্ছে। এই খেলাই শিশুর পরীক্ষা-মূলক খেলা—এর ভিতর দিয়ে তাদের কত রকম গবেষণা চলে, কত কিছু আবিষ্কার করে। Rosemary ও Elizabeth, বয়স তাদের তিন চার বৎসর। রবারের এপ্রন পরে সাবান-জলে-ভিজান জামাগুলি কাচতে সুরু করল। সর্দ্দি কাশি-জ্বর হবে বলে অকারণে এদের সুরু থেকেই তুলোয় মোড়া বাক্সের অঙ্কুর তৈরি করা হয় না। জলের বালতী, কাপড় নিংড়োবার কাঠের একটি সরঞ্জাম, কাপড় শুকোতে দেবার টাঙ্গান দড়ি—সব রকম সুযোগ-সুবিধা হাতের কাছেই রয়েছে। কত হাসি, কত গল্প, কত রকম গবেষণা চলছে দুজনের ভিতর। Elizabeth-এর মা সেদিন একটু আগেই এসেছেন বিশেষ প্রয়োজনে। মেয়েকে নিয়ে যাবার জন্য। মেয়ে যাবে কেন! মনের মত কাজে সে এখন ব্যস্ত! খুব অনিচ্ছায় সেদিন তাকে যেতেই হ'ল। এদিকে Rosemary একলা পড়ে একটু দমে গেল এবং পরক্ষণেই জামা কাচা ছেড়ে পাশের ঘরে বাজনা শুনতে গেল।

২টা ৩০ মিনিটে এ প্রধানা শিক্ষয়িত্রী পিয়ানো বাজাতে সুরু করলেন। খুশীমত কেউ কেউ এসে ছন্দ বজায় রেখে নাচতে লাগল। কেউ কেউ বা শিক্ষয়িত্রীকে ঘিরে বসে মন দিয়ে গল্প শুনছে বা ছবির বই দেখছে। ৩টা নাগাদ খেলারই এক ফাঁকে বাকী ১/৩ পাইণ্ট দুধ প্রত্যেকে খেয়ে নিল। কেউ কেউ দোলনায় দুলছে। কতগুলি ছেলেমেয়ে বাগানে বালির মধ্যে বসে নানা রকম উপকরণ দিয়ে কত রকম ভাবে বালি নিয়ে খেলছে। একটি ছেলে আমেরিকার 'Cow boy'-এর পোষাক পরে বন্দুক হাতে ফটাফট সকলকে গুলী করে বেড়াচ্ছে, কখনও বা উঁচু মাচায় উঠে সকলের মাথা লক্ষ্য করছে যদি বিশেষ কাউকে মারতে পারে। এই ভাবে ৩টা ১৫ মিনিট পর্য্যন্ত খেলা চলতে থাকল।

এইবার মায়েরাও আসতে সুরু করেছেন। শিশুরা হাত-মুখ ধুয়ে চুল আঁচড়িয়ে পুলো-বাধা জামাটি পরে শিক্ষয়িত্রীদের বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে যে যার মায়ের সঙ্গে চলে গেল। ৩টা ৩০ মিনিটের পরেই শিশু-কণ্ঠস্বরে মুখরিত স্থানটি একেবারে নিস্তব্ধ। শিক্ষয়িত্রী সকলে জিনিসপত্র গুছিয়ে, ঘর পরিষ্কার করে, স্কুল বন্ধ করে যে যার বাড়ী গেলেন ৪টার সময়।

একটি সহজ ও সুন্দর পরিবেশে শিশুদের স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাধীন-ভাবে খেলতে দেখে বুঝলাম ক্রমিক বিকাশের পুষ্টিসাধনের জন্য কত বড় সুযোগ তাদের দেওয়া দরকার। লেখাপড়া সুরুর পূর্ব্বে তাদের প্রস্তুতির প্রয়োজন। এই খেলার ভিতর দিয়েই তারা বাস্তবের জ্ঞানলাভ করেছে। তাদের হাত-পা-মন এবং ইন্দ্রিয়-সকল সচল হচ্ছে, পর্য্যবেক্ষণের ক্ষমতা জাগছে, এবং সর্ব্বোপরি নিজের নিজের বিশিষ্ট অস্তিত্বের অনুভূতি এবং প্রাণচাঞ্চল্যের আনন্দ-স্পন্দনের মধ্যে দিয়ে পরিপূর্ণ জীবনসত্তার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এই বয়সের শিশুদের জন্য এই রকম স্কুলের ব্যবস্থা থাকলে পরবর্ত্তী জীবনে তারা প্রত্যেকটি কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করবার প্রয়াসী হবে এতে কোন সন্দেহ নাই।

গুঞ্জন

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দত্ত

তোমার অন্তরে ঢেলে গুঞ্জন কেটেছে দীর্ঘদিন
তবুও মনের ইচ্ছা মেটে নি ক্লান্তি আসে নি প্রাণে ;
নিজের কথা ত ভুলেই গিয়েছি! তোমার প্রেমের ঋণ
এক তিলও যদি শোধ করা যায় সারা জীবনের গানে!

সুপ্ত ভাবনা ব্যক্ত হয় নি পৃথিবীর মন থেকে
তা হলে বন্ধ হ'ত গুঞ্জন ; অসম্ভব তা জানি
এবং অষ্টপ্রহর এভাবে দিতেম না এঁকে এঁকে
সুরের আল্পনা তোমার হৃদয়ে, জগত-মক্ষি-রাণী!

একটু আভাস! বাদবাকী সবই ব্যঞ্জনা, ইংগিত!
কামনার পাখা অজ্ঞাতসারে কেঁপে ওঠে নিঃচুপ—
ফসিলের ঠোঁটে ফোটে না তুচ্ছ জীবনের হারজিত ;
তবু কত আশা! প্রকৃতির বুকে সঞ্চিত রস ও রূপ!

অবলা পৃথিবীর আবেগ হলেও ব্যক্ত-নিরুদ্দেশ
অতল মনের এ-গুঞ্জন ধ্বনি কখনও হবে না শেষ!

গান্ধীজী

শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়

আজকের গল্পের আসর। গল্প শুনবে আমাদের বালক আর শিশুগণ। আজকের গল্প একটি মানুষ সম্বন্ধে। এই মানুষটি মহামানুষ। রবীন্দ্রনাথ এঁর নাম দেন মহাত্মা। বুঝতেই পাচ্ছ ইনি আমাদের মহাত্মা গান্ধী। আমাদের জাতির জনক। আমাদের ভারতবর্ষের প্রাণের প্রাণ ইনি। এঁর কথা মহাপুরুষের কথা। সে কথা মহাভারতেরই কথার মত। কথায় বলে, এক নিঃশ্বাসে মহাভারত। সত্যি, এক নিঃশ্বাসে ত আর মহাভারত শেষ করা যায় না। তেমনি এক নিঃশ্বাসে গান্ধী-কথাও বলা চলে না। কিন্তু কথা আরম্ভ করা ত চলে। মহাপুরুষের কথা শ্রদ্ধা করে বলতে হয়, আর তেমনি শ্রদ্ধা করে শুনতে হয়। তাতে পুণ্য হয়, মন পবিত্র হয়, হৃদয় উন্নত হয়। কত জ্ঞান হয়, মানুষ যে কত বড় হতে পারে তা বোঝা যায়। মানুষের মধ্যে দেবতা আছেন তার খবর পাওয়া যায়।

তাঁরই গল্প একটু বলব। কত তাঁর গল্প, কত তাঁর কথা! কত বিচিত্র কাজ তিনি করে গেছেন। তবেই না আজ ভারত স্বাধীন হয়েছে! ভারত নবজীবন লাভ করেছে! রবীন্দ্রনাথ আমাদের মহাকবি। আর গান্ধীজী আমাদের মহামানব। এই দুই মহাপুরুষের মধ্যে ছিল গভীর প্রেম। রবীন্দ্রনাথ গান্ধী সম্বন্ধে তোমাদের কি বলেছেন একটু শোন! রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"তোমরা সকলে তাঁকে দেখেছ কিনা জানি না। কারও কারও হয়ত দেখার সৌভাগ্য ঘটেছে। কিন্তু জানে তাঁকে সকলেই। সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁকে জানে। সবাই জানে, সমস্ত ভারতবর্ষ কত রকম করে তাঁকে ভক্তি দিয়েছে। একটি নাম দিয়েছে—মহাত্মা। আশ্চর্য্য, কেমন করে চিনলে?" ভারতবর্ষে কোটি কোটি লোক, সবাই ত কিছু তাঁকে চোখে দেখে নি। তিনি ভারতবর্ষে প্রদেশে প্রদেশে কত ঘুরেছেন। শহরে শহরে গেছেন। আর গ্রামেই ত এদেশে সবচেয়ে বেশি। গ্রামেই থাকে ভারতবর্ষের শতকরা ৯০ জন লোক। কত গ্রামে কত লোকের কাছে তিনি গেছেন। তবুও সব গ্রামে তিনি যেতে পারেন নি। ভারতের সকল মানুষ কিছু তাঁকে দেখতে পায় নি। তা হলে তারা তাঁকে চিনলে কেমন করে। ঐ যে রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেছেন—আশ্চর্য্য, কেমন করে চিনলে? রবীন্দ্রনাথ নিজেই তার উত্তর দিচ্ছেন। তিনি বলছেন—"একটা জিনিস বুঝতে কঠিন লাগে না। সেটা ভালবাসা।" গান্ধীজী সবাইকে ভালবাসা দিয়েছেন। তাই সবাই তাঁকে একরকম করে বুঝতে পেরেছে। তিনি কত বড় ছিলেন, কত মহান ছিলেন। তোমরা বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইনের নাম নিশ্চয়ই শুনেছ। এ যুগে আইনষ্টাইনের তুলনা ত নেই। আইনষ্টাইন গান্ধীজীর কথা খুব ভাল করে জেনেছিলেন। তাঁকে চোখে কখনও দেখেন নি। তবু তাঁর মহত্ত্ব বুঝতে পেরেছিলেন। আইনষ্টাইন তাঁর সম্বন্ধে কি বলেছেন জান? শোন তবে—তার মর্ম্মটুকু বলি। আইনষ্টাইন বলেছেন—পৃথিবীতে এত যুদ্ধ, এত নরহত্যা, এত মিথ্যা, এত কুটনীতি, এত লোভ, এত প্রতারণা, এরই সঙ্গে গান্ধীজী লড়াই করে গেছেন। তাঁর পথ সত্যের পথ। তিনি বিজয়ী বীর। কিন্তু তাঁর অস্ত্র ছিল না। মানুষের মহিমায় তিনি জলজ্বল করতেন। সঙ্কল্প ছিল তাঁর বল। দেশের লোকের সেবা ছিল তাঁর ব্রত। এমন আশ্চর্য্য মানুষও তিনি ছিলেন। অথচ অপর সকলের মত তাঁর ছিল রক্তমাংসের শরীর। অপর সকলের মতই তিনি এই পৃথিবীর মাটিতে বিচরণ করেছেন। মানুষের সুখ-দুঃখের ভাগী হয়েছেন। এ সব কথা ভবিষ্যতের লোকে হয়ত বিশ্বাসই করতে পারবে না।

গল্প এখনও আরম্ভ হ'ল না। গল্পের ভূমিকাই চলেছে। প্রথমে ত চাই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা, তার পর তাঁর পুণ্যকথা শ্রবণ করা। এইবার তাঁর বাল্য ও কৈশোরের দুটো কথা বলব। আসরটা ত বালক আর কিশোরদের।

গান্ধীজী গুজরাটের লোক। পোরবন্দরে তাঁর জন্ম হয় ১৮৬৯ সনে। এই ২রা অক্টোবর তাঁর জন্মদিন। এস, তাঁর জন্মদিনে আমরা তাঁর পুণ্যকথা আলোচনা করি। তাঁকে আমাদের হৃদয়ের ভক্তি নিবেদন করি।

গান্ধীজীর পিতার নাম ছিল কাবা গান্ধী। মাতা ছিলেন পুতলীবাই। কাবা গান্ধী ছিলেন খুব তেজী লোক। যেমন তাঁর সাহস তেমনি তাঁর বুদ্ধি। তিনি ছিলেন রাজকোটের দেওয়ান। গান্ধীজীর মা ছিলেন খুব ভক্তিমতী। পূজাপাঠ, ব্রতনিয়ম তাঁর ছিল নিত্যকর্ম্ম। সেই জন্যে বাড়ীতে একটি পুণ্যের হাওয়া ছিল। তিনি প্রতিদিন মন্দিরে যেতেন। বিষ্ণুমন্দির, রামমন্দির। পুষ্পপত্র ফল-জল দিয়ে দেবতার পূজা করতেন। মোহনদাস মায়ের সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরে যেতেন। ভক্তি করে নমস্কার করতেন। পুতলীবাই একটি ব্রত নিলেন। চাতুর্ম্মাস্য ব্রত। চার মাস নিয়ম পালন করে পূজাপাঠ করতে হবে। পূজাপাঠের পর সূর্য্যদর্শন করে তবে আহার। সূর্য্যদর্শন না হলে খাওয়া চলবে না। তখন বর্ষাকাল। সূর্য্য প্রায়ই মেঘে ঢাকা থাকেন। মায়ের আহারের সময় হয়ে গেছে। ছেলেরা আকাশের দিকে চেয়ে আছে—মেঘের ফাঁকে কখন সূর্য্য দেখা যাবে। হঠাৎ সূর্য্য দেখতে পেয়েই

মোহনদাস মায়ের কাছে ছুটে এল। বললে, ও মা ঐ যে—ঐখানে মেঘের ফাঁকে সূর্য্য দেখা যায়। মা বাইরে এলেন। ততক্ষণে সূর্য্য আবার মেঘে ঢেকে গেছে। মা হেসে ঘরের কাজে ফিরে গেলেন। বললেন, আজ দেবতা আমার ভাগ্যে অন্ন মাপান নি। সেদিন আর তাঁর খাওয়া হ'ল না। উপবাস তিনি প্রায়ই করতেন। গান্ধী অনেকবার অনশনব্রত গ্রহণ করেছিলেন। সেকথা হয়ত তোমরা কিছু কিছু জান। অনশন তিনি শিখেছিলেন তাঁর মার কাছ থেকে। অনশনের সেই নিষ্ঠা, সেই সংযম, সেই শক্তি। আমাদের দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস তোমরা কিছু কিছু নিশ্চয়ই জান। আমাদের দেশের অস্পৃশ্যতা সমস্যার জন্যে গান্ধীজী আমরণ অনশন নিয়েছিলেন। হিন্দু-মুসলমান সমস্যার জন্যেও তিনি কত বার অনশন করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুভয় ছিল না। অনশন করে তিনি অনেকবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলেন। তাঁর অন্তরে ভগবান্। হৃদয়ে প্রেমের আগুন। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছিলেন মৃত্যুঞ্জয়। সেই সব কথা তোমরা ক্রমে ক্রমে জানবে। সে সব যে তোমাদেরই দেশের মহাপুরুষের কথা। তোমাদেরই দেশের ইতিহাস।

তাঁর ছেলেবেলার কথা আরও দুই-একটা বলি। তাঁদের বাড়ীতে মেথর খাটত। যে পথে মেথর আসত সে পথে তাঁরা কখন যেতে পারতেন না। সে পথে গেলে স্নান করে শুদ্ধ হতে হ'ত। বালক মোহনদাস ভাবতেন, মানুষের ছোঁওয়া লাগলে মানুষ কি করে অপবিত্র হতে পারে? তিনি এতে বিশ্বাস কখনও করেন নি। তোমরা জান ছুঁৎমার্গ উঠিয়ে দেবার জন্যে গান্ধীজী কত চেষ্টা করে গেছেন। তিনি বলতেন, ছুঁৎমার্গ যদি থেকে যায় তবে হিন্দুধর্ম্ম মরে যাবে। আর হিন্দুধর্ম্ম যদি বেঁচে থাকে তবে ছুঁৎমার্গ মরবে।

তাঁদের বাড়ীর দাসীর নাম ছিল রম্ভা। মোহনদাস তখন ছোট ছেলে। রম্ভা তাঁকে বলেছিল রাম নামে ভূত পালায়। ভয় যখন পাবে তখন রাম নাম করবে। মোহনদাসের যখন ভূতের ভয় হ'ত তখন সরল মনে সে রাম নাম করত। তখন আর ভয় থাকত না। এই রাম নাম তিনি সারা জীবন ধরে করে গেছেন। তাঁর রামধুন—'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, পতিতপাবন সীতারাম', আজ আমাদের দেশের ছেলেদের মুখে মুখে। গান্ধীজী বলেছেন, তুলসীদাসের রামায়ণে ভক্তির ধারা। ভক্তির কথা এমন করে আর কোন পুস্তকে লেখা হয় নি।

হরিশ্চন্দ্রের কথা মোহনদাসের বড় ভাল লাগত। একবার একটা যাত্রায় হরিশ্চন্দ্রের পালা গাওয়া হ'ল। মোহনদাস প্রাণ ভরে সেই যাত্রা শুনল। কত তৃপ্তি সে পেল, কত আনন্দ তার হ'ল তার আর শেষ নেই। রাজা হরিশ্চন্দ্র সত্যরক্ষার জন্য সব ছাড়লেন। রাজ্য ছাড়লেন। স্ত্রী-পুত্র ছাড়লেন। দুঃখের আগুনে পুড়তে লাগলেন। পথে পথে ভিখারী হয়ে ঘুরলেন। রাজরাণী শৈব্যা পথের ভিখারিণী হলেন। পুত্র রোহিতাশ্ব সর্পাঘাতে মারা গেল। এত দুঃখেও তিনি সত্যকে ছাড়লেন না। ছেলেবেলায় এমনি করে মোহনদাস সত্যের মহিমা বুঝলেন। সত্যের মহিমায় মুগ্ধ হলেন। তোমরা জান, তাঁর জীবনও ছিল সত্যেরই উপর। সত্য রক্ষার জন্য তিনি কখনও মরতে ভয় পান নি। ভারতবর্ষে ও পৃথিবীতে তিনি নূতন করে সত্যের মহিমা প্রচার করে গেছেন। জীবনে কত কাজ তিনি করেছেন। স্বাধীনতার জন্য কত প্রচেষ্টা করেছেন। সকল ব্যাপারেই কিন্তু সত্য ছিল তাঁর লক্ষ্য। সত্যই তাঁর সাধনা। তাঁর নিজের জীবনী তিনি লিখেছেন। তার নাম দিয়েছেন সত্যের প্রয়োগ।

মোহনদাসের পিতা তাকে একখানি বই এনে দিয়েছিলেন। বইখানির নাম শ্রবণের পিতৃভক্তি। শ্রবণের বাপ-মা বৃদ্ধ হয়েছেন। শ্রবণ তাঁদের বাঁকে করে কাঁধে নিয়ে তীর্থযাত্রায় চলেছে। বাপ-মায়ের প্রতি শ্রবণের এই ভক্তি দেখে মোহনদাসের চোখে জল এল। সে শ্রবণের মত বাপ-মাকে ভক্তি করতে শিখল। আর একটি কাহিনী মোহনদাসের মনকে একেবারে মুগ্ধ করেছিল। সে হ'ল প্রহ্লাদের কাহিনী। সে কাহিনী আমাদের দেশে ছেলে-বুড়ো কে না জানে? ছোট ছেলে প্রহ্লাদ—কিই বা তার বুদ্ধি, কতটুকুই বা তার শক্তি। কিন্তু কি তার বিশ্বাস! কি তার হরিভক্তি! কি কঠিন তার পণ! কি দুর্জ্জয় তার সাহস! প্রহ্লাদকে মত্ত হাতীর পায়ের তলায় ফেলে দিলে। পাহাড় থেকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলে। সাপের মুখে, আগুনের মুখে পড়েও প্রহ্লাদ অটল, ভগবানকে প্রহ্লাদ নিয়ত স্মরণ করেছে। সব ভয়-বিপদ তার কেটে গেছে। গান্ধীজীর জীবনের ঘটনা তোমরা লক্ষ্য করেছ কি? প্রহ্লাদের জীবনের সঙ্গে কত মিল! ইংরেজের বিরুদ্ধে তিনি দেশকে দাঁড় করিয়েছিলেন। অস্ত্রশস্ত্র তাঁর ছিল না। তিনি সত্যকে বুকে ধরে অগ্রসর হয়েছিলেন। কত অত্যাচার, অপমান, নির্য্যাতন, বিপদ এসেছিল। সবই তিনি পার হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে সমস্ত দেশ নির্ভয়ে এগিয়ে গিয়েছিল। গান্ধীজী বলেছেন, প্রহ্লাদের পণ, সত্যাগ্রহের পণ, প্রহ্লাদ পূর্ণ সত্যাগ্রহী।

গান্ধী পরিবার ছিল বৈষ্ণব। তাদের ঘরে মাংস খাওয়া মহাপাপ। মোহনদাস ছেলেবেলায় তখন বদ্‌সঙ্গে পড়েছে। দুই-একটা বদ্ অভ্যাসও তার হয়েছে, যা সব ছেলেরই প্রায় হয়ে থাকে। লুকিয়ে লুকিয়ে ২।৪ বার মাংস খেয়েছে। মোহনদাসের খুব অনুতাপ হ'ল। লুকিয়ে লুকিয়ে এ কি অপকর্ম্ম! একদিন মাংস খেয়ে রাত্রে আর মোহনদাসের ঘুম হয় না। বিভীষিকা দেখতে লাগল। যেন ছাগলটা তার পেটের ভিতর ব্যা ব্যা করে ডাকছে। মোহনদাস তার পর মাংস খাওয়া ছেড়ে দিল। বুঝল লুকিয়ে লুকিয়ে কোন কিছু করাই ভাল নয়। গোপন করবার জন্যে কেবল মিথ্যা বলতে হয়। মিথ্যা মোহনদাসের ধাতে সইত না। সত্যের খোলা পথ তার চিরকাল ভাল লাগত। তাই এক এক করে সব বদ্

অভ্যাস তার শুধরে গেল। একটি গুজরাটি কবিতা মোহনদাসের প্রাণে গেঁথে গিয়েছিল। কবিতাটি বাংলায় শোন :—

"যে তোমারে দেয় জল অন্ন দিয়ে শোধ তার ঋণ।
প্রণতি করহ তারে যে তোমারে করে নমস্কার।
এক কড়ি পাও যদি মোহরেতে কর প্রতিদান।
প্রাণ যে বাঁচাল তব, তার তরে দাও তুমি প্রাণ।
কথায় মনে ও কাজে এক গুণে দশ গুণ দাও।
মন্দের কর ভাল, নিজ গুণে বিশ্ব জিনে লও।

তোমরা বুঝতে পার ভারতবর্ষের জন্য মহাত্মা গান্ধী কত দিয়ে গেছেন, কি করে গেছেন! তিনি ভুবিদ, জাতির জনক তিনি। আমরা তাঁর কাছে কত ঋণী! এস তাঁর কাজ করে আমরা সেই মহাপুরুষের ঋণ শোধ করি।*

* অল ইণ্ডিয়া রেডিও—কলিকাতা কেন্দ্র হইতে ২-১০-৫৭ তারিখে কিশোরদের উদ্দেশ্যে কথিত এবং রেডিও কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে প্রকাশিত।

স্তন্যপায়ীর অভ্যুদয়

শ্রীমিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়

সরীসৃপরা যেমন আকস্মিক এসেছিল তেমনি নাটকীয়ভাবে অবলুপ্ত হয়ে গেল। এ কথা মনে করবার কারণ নেই যে, স্তন্যপায়ীরা এদের সাক্ষাৎ বংশধর, এরা সম্পূর্ণ অন্য বংশের, খুড়তুতো মাসতুতো ভাই বলা যেতে পারে।

এক-এক গোষ্ঠিবর্গ প্রবল হয়ে উঠবার পূর্ব্বে শিক্ষানবিশী করতে হয় বহুকাল। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীদের থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্য যুদ্ধ, সমগোত্রদের সঙ্গে খাদ্য অনুসন্ধানের প্রতিযোগিতা, টিকে থাকতে পারলে উন্নতির সম্ভাবনা। জীব-বিবর্ত্তনের ইতিহাসে এর পুনরাবৃত্তি বার বার। সরীসৃপের অস্তিত্ব পাওয়া যায় পার্মিয়ান স্তর থেকে অথচ এরা প্রবল প্রতাপান্বিত ডাইনসরে পরিণত হয় বহু পরে। স্তন্যপায়ী ভীরু পদে বিচরণ করে বেড়াত ট্রিয়াস-স্তরে, কমসে কম আট কোটি বৎসর অপেক্ষা করতে হয়েছে সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হবার জন্য। তার পূর্ব্বে এদের যে দুর্দ্দিন গেছে তা মনে করলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। মেসোজয়িকের বিশ কোটি বৎসর ধরে ডাইনসরদের অখণ্ড প্রতাপ, তদানীন্তন ক্ষুদ্র স্তন্যপায়ী দেখলেই দফা নিকেশ করে দিত। আদিম স্তন্যপায়ী কয়েক ইঞ্চি মাত্র লম্বা ৮০টন ওজনের ডাইনসর এদের কয়েকটিকে একসঙ্গে বিশাল পদতলে চেপে দিয়ে টেরও পেত না। তবুও এই ক্ষুদ্রেরাও বেঁচে রইল। দৈহিক শক্তির প্রতিযোগিতায় সর্ব্বথাই পরাজয়, বুদ্ধির প্রতিযোগিতায় বিজয়, শক্তি প্রদর্শনের চেয়ে কৌশল অবলম্বনকে আশ্রয় করেছিল, পালিয়ে বেঁচে গেল। নিরাপদ পলায়নকে আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ পন্থা হিসাবে গ্রহণ করেছিল, বর্ব্বর শক্তির আদান-প্রদানে বুদ্ধি নিষ্প্রভ কিন্তু আত্মরক্ষার কৌশল উদ্ভাবনে প্রতিনিয়ত মস্তিষ্কচালনা দরকার। যে দল কৌশল উদ্ভাবনে আত্মরক্ষার পথ প্রশস্ত করল স্তন্যপায়ীর পূর্ব্বপুরুষ তারা। কিছুটা ভয়ে কিছুটা ক্ষুধার তাড়নায় পালিয়েছিল পার্ব্বত্য কন্দরে নির্জ্জন গুহায় শৈল-শিখরের শীতপ্রধান স্থানে, যে জায়গাগুলি ছিল শৈত্যভয়ে অগম্যস্থান ডাইনসরদের। সেখানে সেই ডাইনসর-বর্জ্জিত স্থানে এরা বেড়ে উঠল, তনু-মন গড়ে উঠল, কষ্টসহিষ্ণু সদাসতর্ক হয়ে উঠল, ধমনীতে উষ্ণ রক্তপ্রবাহ, পৃষ্ঠে ঘন রোমরাজির আবরণ।

ডাইনসর ও স্তন্যপায়ী যুগের মাঝে হিমযুগ চলেছিল অনেকদিন যাবত। পর্দ্দা যখন উঠল, সেই তমসাচ্ছন্ন অধ্যায়ের পর দেখা গেল ভূপৃষ্ঠের অপূর্ব্ব দৃশ্যান্তর। বর্ত্তমান পৃথিবীর গগনচুম্বী চিরতুষার-মৌলি গিরিগুলি আকাশপানে চেয়ে আছে সদর্পে। যে ভারতের উত্তরে অতলস্পর্শী পারাবারের অশান্ত জলকল্লোল ছিল, যেখানে মোজাসর ইথথাইসরেরা নিরঙ্কুশ দস্যুবৃত্তি করে বেড়াত সে সময়কার সুবৃহৎ কটিলস, এমোনাইট, মাছেদের উপর, কোথায় গেল সে মহাসাগরের তরঙ্গভঙ্গ, কোনও ঠিকানাই রইল না তার অদ্ভুত অধিবাসীদের। দেখা গেল সেখানে দাঁড়িয়ে আছে নগরাজ হিমাচল অটল গাম্ভীর্য্য সহকারে। আজও প্যালিয়জোয়িকের জীবজন্তু-কঙ্কাল হিমালয়-স্তর থেকে বেরিয়ে এসে পুরাতন কথা সপ্রমাণ করে। দক্ষিণ-আমেরিকার আণ্ডিজ পর্ব্বতমালা ও ইউরোপের আল্পস মেদিনী ভেদ করে উঠে দাঁড়াল এই সময়ে, জলবায়ু পরিবর্ত্তন হ'ল প্রভূত, সহস্র সহস্র বৎসরব্যাপী তুষারস্তূপের অপসারণে রবিকিরণোজ্জ্বল প্রভায় আলোকিত চতুর্দ্দিক। মাঠে মাঠে জাগল কচি নম্র তৃণাঙ্কুর, ক্ষিতিতলে আর্দ্র মাটির প্রথম শ্যামল সমারোহ ব্যর্থ হবার নয় বলেই তৃণভোজী স্তন্যপায়ীর উদয় হতে বেশী দেরী হয় নি। তার পরেই দেখা দিয়েছিল শত্রু মাংসাশী ঠিক যেমন কোটি কোটি বর্ষ আগে উদ্ভিজভোজী নিরীহ ডাইনসরদের অনুগামী মাংসাশী হিংস্র ডাইনসর, যারা তাদের মাংসে ক্ষুন্নিবৃত্তি করত।

প্রথম স্তন্যপায়ী

হিংস্র ডাইনসরদের ভয়ে এরা পালিয়েছিল দুরধিগম্য পার্ব্বত্য-

প্রান্তের গুহায়। নেমে এল শক্র নিপাতের পর, দেহ লোমে ঢাকা, সরীসৃপের মত অনাবৃত ত্বক নয়। আঁশ লোমে পরিবর্ত্তিত হওয়ায় সময় অসময়ে শীতল বায়ু স্পর্শকাবু করতে পারে না,এরা কষ্টসহিষ্ণু। আদি স্তন্যপায়ীদের সঙ্গে তদানীন্তন সরীসৃপদের বিশেষ পার্থক্য ছিল না, তফাৎ সুরু হয় মেসোজয়িকের মধ্যভাগে, ডাইনসরেরা যখন মহীতল সরগরম করে রেখেছে। নিজেদের আত্মরক্ষার সঙ্গে চিন্তা হ'ল অসুরদের কবল থেকে বাচ্চাদের রক্ষা করা, সেজন্য এদের আবির্ভাবের উষাকালে প্রসূতি ও সন্তানের ভিতর যে সান্নিধ্য গড়ে উঠেছিল, সে বৃত্তি পরবর্তীকালে সমস্ত সুকুমার প্রবৃত্তির উদ্গীতা।

স্তন্যপায়ী সহসা আবির্ভূত হয় নি। সরীসৃপ মহলেই একদল ধীরে ধীরে ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করছিল। তখন সম্ভবতঃ ট্রিয়াসিক যুগ চলছে। খারমরকস মাংসাশী, দৌড়াদৌড়িতে পটু। সাইনোডণ্টদের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হ'ল পা থেকে, হামাগুড়ি দেওয়া বা বুকে হাঁটা গেল ভুলে, দীর্ঘ পদে ভর করে সচ্ছন্দ গতি। দন্ত ও দন্তপংক্তিতে পরিবর্ত্তনের ফলে পৃথক ছেদনদন্ত শ্বাদন্ত চর্ব্বণ দন্তের আবির্ভাব—এদের সরীসৃপ-স্তন্যপায়ী বলা চলে। উত্তর ক্যারলিনার ভূস্তর থেকে এরূপ একটি জীবের অস্তিত্ব টের পাওয়া গেছে, নাম 'ড্রমোথেরিয়াম'। এরা কেবল যে শক্রর কবল থেকে আত্মরক্ষায় দক্ষ ছিল তাই নয়, পরমশক্র আবহ-পরিবর্ত্তনের অনিষ্টকর প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে পেরেছিল নিজেদের। দক্ষিণ-আফ্রিকা এদের মাতৃভূমি, শীত-গ্রীষ্ম পর্য্যায়ক্রমে সেখানে আসায় আবহ-পরিবর্ত্তনে কতকটা অভ্যস্ত। প্রথম স্তন্যপায়ীদের জন্ম চঞ্চল আবহাওয়ার মধ্যে, আবহ-পরিবর্ত্তনের যথেচ্ছাচার, হিমযুগ, নিদারুণ শৈত্য ও শুষ্ককাল, মধ্যবর্তী উষ্ণকাল, পুনরপি তুষার-যুগ সরীসৃপের একটি শাখাকে ধীরে ধীরে করে তুলছিল কষ্টসহিষ্ণু এবং শীততাপনিয়ন্ত্রণশক্তিবিশিষ্ট দেহ। এবং দৈহিক ওজনের তুলনায় উত্তাপ উৎপন্ন করে বেশী, রোমরাজির কল্যাণে দেহস্থিত তাপ ধরে রাখতে পারে আবার দেহ ঠাণ্ডা করতে হলে স্বেদগ্রন্থি দিয়ে বাষ্পীকরণে সক্ষম। আবহ-পরিবর্ত্তনের খেয়াল-খুশিকে উপেক্ষা করে যারা আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের উদ্ভব করেছিল, স্তন্যপায়ী-কুলের জনক তারা।

আদি স্তন্যপায়ী উদ্ভূত অণ্ড হতে, এ অণ্ড পাখীর মত খানিকটা ভ্রূণ, বাকিটা ভ্রূণের খাদ্য। পরে অবশ্য সজীব সন্তান জন্ম দেবার প্রথা প্রবর্ত্তন করেছিল, তথাপি পুরাতন স্তন্যপায়ী বংশ আজও সে সরীসৃপ প্রথা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। 'হংসচঞ্চু প্লাটিপাস' থাকে অষ্ট্রেলিয়ার ঝরণা বা হ্রদের কূলে, জলেই অতিবাহিত অধিক সময় সাঁতার বা ডাইভ দিয়ে, কেবল শোবার জন্য ও প্রসব করবার সময় বাসা করে মাটির ভিতর। ছুঁচোজাতীয় এই প্রাণী অণ্ড প্রসব করে আবার বাচ্চাদের স্তন্যও পান করায়। কর্দ্দমাক্ত স্থানে গর্ত্তে থাকে, পায়ের আঙুল জোড়া অর্থাৎ সাঁতারে পটু। অষ্ট্রেলিয়ায় আর একটি গণ আছে, পিপীলিকাভূক সজারু, স্বভাবে পরিচয়ে সরীসৃপ স্তন্যপায়ীর মধ্যবর্তী সোপান। পুরাকালে এদের অস্তিত্ব পাওয়া যায় নি তবে আশা আছে এদের পূর্ব্বপুরুষের অস্থি-কঙ্কাল একদিন গুপ্তস্থান থেকে বাইরে এসে আমাদের প্রসঙ্গ সপ্রমাণ করে দেবে।

জৈব-বিবর্ত্তনে ক্রমিক তালিকা দেওয়া অসম্ভব। জলবায়ু ও মৃত্তিকা-স্তরে পরিবর্ত্তন এত অধিক যে, ফসিল-জীবদের তালিকা অন্তর্হিত। ভেঙে-চুরে মাটির ধূলায় মিশিয়ে গেছে অনেকে, সমুদ্র এসে স্থানে স্থানে সমস্ত জীবাশ্ম সাক্ষী-সাবুদ করেছে।

উষ্ণরক্তের বিকাশ

প্রাণিদেহের অন্যতম ঐশ্বর্য্য দৈহিক তাপনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, বাইরের উঠতি-পড়তি উত্তাপের প্রভাব এড়াবার প্রকৃষ্ট উপায়। জীবদেহ বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি। সারা অমেরুদণ্ডী জগতের কোথাও উত্তাপ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নেই, কীট-জগৎ সম্পূর্ণভাবে এই ব্যবস্থা বিরহিত। মৌমাছিরা অবশ্য মৌচাকের ভিতরে কিছুটা পরিমাণে গরম রাখতে সক্ষম কিন্তু তা জৈবিক নয়, বৈশিষ্ট্য নেই, প্রত্যেক শীতে মারা পড়ে কাতারে কাতারে। সরীসৃপদের মধ্যে একমাত্র বিষধর ভাইপার ও অজগর-দেহ ১০° ডিগ্রী উষ্ণ রাখতে পারে মনে হয়, সেজন্য সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন যে সমস্ত শীতকাল মাটির তলায় ঘুমিয়ে কাটায় সর্প কচ্ছপ ইত্যাদি সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ীরাও অনেকে। পক্ষী ও স্তন্য-পায়ী উষ্ণরক্তপ্রধান। জৈব-বিবর্ত্তন-ধারায় ক্রমশ সুষ্ঠু শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত-দেহ গঠিত হয়েছে, নীচের দিকের প্রাণীকুল তার সাক্ষী। নিম্নস্তরের স্তন্যপায়ীদের রক্তের উত্তাপ অধিক হয় না ঋতুভেদে কালভেদে আভ্যন্তরীণ উত্তাপের তারতম্যও তাদের নেই।

আবার ঘুমিয়ে যারা শীত কাটায় তাদের দৈহিক তাপের তারতম্য অধিক। সজারু বাদুড় ইঁদুরজাতীয় মার্ম্মট ডরমাউস ইত্যাদির তাপ-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আছে তবে শীতকালে যখন জড়-ভরত হয়ে নিদ্রায় অচেতন তখন দেহের উত্তাপ মাত্র ৩।৪ ডিগ্রী। কুকুর বিড়ালছানা খরগোসবাচ্চাদের বাইরে আনলে হু-হু করে কমতে থাকে উত্তাপ আবার গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীত প্রভৃতি ঋতুভেদে হ্রাস-বৃদ্ধি।

ব্যারণ নপসার মতে টেরডাক্টিলদের শরীরে উষ্ণরক্ত প্রবাহিত ছিল যদিও এ মত নির্ভরযোগ্য নয়, কেন না আজ পর্য্যন্ত কোন সরীসৃপদেহে উষ্ণরক্তপ্রবাহ দেখা যায় নি। যতদূর জানা যায় বিহঙ্গমকুল এ বিষয়ে অগ্রণী। দুই প্রকারে এ ক্ষমতা শ্রেণী বিভক্ত: পায়রা চড়ুই কোকিল কাক জন্মকালে দুর্ব্বল অন্ধ অসহায়। হাঁস মুরগী অস্ট্রিচ জন্মেই সাবালক, নিজেরাই চরে চরে খায়, মাতৃ-সাহায্য নিষ্প্রয়োজন। পক্ষীডিম্বের উত্তাপ ১০৪ ডিগ্রী যখন স্ত্রী-পক্ষী তা দিতে বসে। মানবশিশুও শৈশবে অসহায়, অনেকদিন লাগে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে। এই দলের বনমানুষ বানর প্রভৃতি অনেকের বেলায়ও তাই, হাতী ঘোড়া গরু জিরাফ হরিণসন্তানদের অসহায়ত্ব থেকে ৫ ঘণ্টা মাত্র, তার পর স্বাধীন।

পাখীদের চারখরা হৃৎপিণ্ডের আবির্ভাব হওয়ায় পরিক্রান্ত ও

অপরিষ্কার রক্ত রাখবার ব্যবস্থা পৃথক, রক্তসঞ্চালক অঙ্গগুলি সুষ্ঠু। এইরূপে উষ্ণরক্তবিকাশে পাখীদের আহারে যথেষ্ট উন্নতি দেখা দিল, কার্যক্ষমতা বর্দ্ধিত হ'ল বহুগুণ। চরাচরে পাখীরাও অন্যতম প্রধান ও বহুধাবিস্তৃত জীব হয়ে উঠল ক্রমে ক্রমে। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের সব রকম সম্ভাব্য অসম্ভাব্য উপায়গুলির পরীক্ষা চলতে লাগল; খড়ি-যুগের শেষের দিকে জলজ-দানব সরীসৃপকুল নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়ে জলভাগ প্রায় নিষ্কণ্টক, কেউ কেউ নাইল জলে। জল-স্থল-শূন্যমার্গে উষ্ণরক্তপ্রধান জীবকুলই ক্রমশ আধিপত্য বিস্তার করলে।

ভ্রূণবৃদ্ধি জাতি-বিবর্ত্তনের পুনরাবৃত্তি

পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, প্রতি প্রাণী ডিম্ব থেকে আরম্ভ করে পরিণত বয়স পর্য্যন্ত নিজ নিজ জাতীয় জীবনেতিহাসের সংক্ষিপ্ত পুনরুক্তি। ভ্রূণ আবার জাতিজনিত সমস্ত অবস্থার পুনরাবৃত্তি করে আপন নির্দ্দিষ্ট সীমায়। ভ্রূণের উত্তরোত্তর বৃদ্ধির সঙ্গে আকৃতিও বদলায় অনুরূপভাবে, হয় নিজ জাতীয় ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি।

মেরুদণ্ডী অমেরুদণ্ডী সকলকে জন্ম নিতে হয় ডিম্ব অবস্থায়—অর্থাৎ কঠিন বা নরম খোলসের ভিতর থানিকটা। তরল পদার্থের উপর ভাসমান অবস্থা—মনে করিয়ে দেয় যে, আদি প্রাণের উন্মেষ হয়েছিল জল-কাদা বালি-পঙ্কে। এমিবা হ'ল আদিম প্রাণী, প্রতি জীবকে, সে যত বৃহৎ বা শক্তিশালী হোক না কেন, এমিবা অবস্থা হতে জীবনারম্ভ করতে হয়। ভ্রূণ একটু বড় হলে দেখতে অমেরুদণ্ডীর মত অব্যক্ত ভাষায় প্রকাশ করে, 'একদিন প্রাণী বলতে আমরা ছাড়া কিছু ছিল না, সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর আমরা।' গর্ভ-মধ্যস্থিত ভ্রূণ—আহার পায় মাতৃদেহের রক্তকণিকা হতে, একটি চোষক (ফুল) মাতৃদেহের সহিত সংযোগ রক্ষা করে।

আশ্চর্য্য রকমের বৃদ্ধি মানব ভ্রূণের; প্রথমাবস্থায় হাঙ্গরের মুখের সঙ্গে মুখমণ্ডলের যথেষ্ট সাদৃশ্য, তার পর বেঙাচীর মাথা যেমন একটি সঙ্কীর্ণ গলা দিয়ে দেহ-সংলগ্ন, ভ্রূণের মাথা তদনুরূপ,কানকো-সমন্বিত এই গলা ক্রমে চর্ম্ম দ্বারা দেহের সঙ্গে যায় ঢেকে, উভয়চর সালমান্ডারের মত চারিটি রক্তবাহের এই সময়ে উন্মেষ, ক্রমে এই ভ্রূণ পরিণত হয় চতুষ্পদ জন্তুতে কিন্তু হস্তপদের আঙ্গুলগুলি ভেকের মত জোড়া, সন্দেহাতীতরূপে এই সময়ে লেজের আভাস এবং জন্মের কিছুদিন পূর্ব্ব থেকেই সারাদেহে ঘন রোমের আমদানী, পদদ্বয়ের গঠন অবিকল বনমানুষের। বলা বাহুল্য, মনুষ্যেতর প্রাণীরা এ পর্য্যায়ে পৌঁছায় না,তারা যে স্তরের জীব ভ্রূণের অভিব্যক্তি ঠিক তার পূর্ব্ববর্ত্তী স্তর পর্য্যন্ত। খুর-সমন্বিত স্তন্যপায়ী (অশ্ব-গর্দ্দভ ইত্যাদি) ভ্রূণ আদিম স্তন্যপায়ী পর্য্যন্ত এসে স্তব্ধ, তার পরে বৃদ্ধি ব্যক্তির, ভ্রূণের নয়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, গর্ভস্থ ভ্রূণের এই সংক্ষিপ্ত পুনরুক্তির মূল কারণ কুলস্মৃতি, দৈহিক তথা মানসিক অচেতন অবস্থার সকল কাজ এর সাহায্যে সুসম্পন্ন হয়। আর একটা বিষয় বেশ প্রকট। প্রথম দৃষ্টিতে এক জাতি তথা বর্গ থেকে অন্য জাতি-বর্গকে যতটা পৃথক মনে হয় প্রকৃতপক্ষে ততটা নয়, থানিকটা মিল পাওয়া যায় কোথাও না কোথাও, পারম্পরিক সম্বন্ধ কিছু আছেই। তা ছাড়া ধরণীতে কে আগে এসেছে কে পরে এসেছে তা পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায়। ভূস্তর ব্যতীত অন্য কোথাও এরূপ চমৎকার সাক্ষ্যপ্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় না বলে তথ্যের দিক থেকে এ অতি মূল্যবান। আমাদের এই বর্ণনা ভ্রূণবৃদ্ধির অবিকল প্রতিচ্ছবি নয়, থানিকটা অনুমানের উপর নির্ভর করতে হয় তবে ভ্রূণপরিস্ফুরণ থানিকটা এইভাবে অগ্রসর হয়। আকারগত এ অসাধারণ বিষয় নিঃসন্দেহে জৈব-অভিব্যক্তির ধারা-নির্দ্দেশক।

স্তন্যপায়ীর শারীরস্থানের বিশেষত্ব

বিভিন্ন স্তন্যপায়ীর শারীরিক ক্রিয়া ও অঙ্গগঠনের সাদৃশ্য জৈব-বিবর্ত্তনের মূল ধারণাকে দৃঢ়তর করেছে। দেহ ব্যবচ্ছেদ করে শারীরিক গঠন নির্ণীত হয়েছে অনেকাংশে, বিভিন্ন অস্থি-কঙ্কাল মেরুদণ্ড প্রভৃতিতে সৌসাদৃশ্য এক জাতীয় জীবকুলের সঙ্গে অপর জাতীয় জীবকুলের সান্নিধ্য-পরিচয় নির্ভুলভাবে করেছে নির্দ্দেশ। এক গোত্রের সঙ্গে অন্য গোত্রের সম্বন্ধ বিশিষ্টার্থবোধক পারম্পরীণ অনুক্রমে আত্মীয়তার ইতিহাস নিহিত। জানা গেছে,শারীরস্থানের দিক থেকে :—

(১) রাজা কাঁকড়া (লিমুলস) আসল কাঁকড়াদের অপেক্ষা বিছা ও মাকড়সার সহিত অধিকতর সংশ্লিষ্ট ;

(২) মৎস্যকুল মেরুদণ্ডীর ভিতর ঘনিষ্ঠ সবচেয়ে উভয়চর-দের সঙ্গে ;

(৩) পক্ষীকুলের নিকটাত্মীয় সরীসৃপকুল ;

(৪) তিমি-শুশুকের নৈকট্য খুর-ওয়ালা স্তন্যপায়ীর সঙ্গে সর্ব্বাধিক ;

(৫) মাংসাশী স্তন্যপায়ী প্রচুর বর্ত্তমান। অপর কোন স্তন্য-পায়ীর চেয়ে এদের নিজেদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ অধিক ;

(৬) বনমানুষদের অন্য স্তন্যপায়ী অপেক্ষা নিজেদের মধ্যে সাদৃশ্য গভীর।

শরীর স্থানের মূল ঐক্য নিবিড় হয়ে উঠেছে জীব-জীবন যত কাছে এসেছে মাংসাশী বাঘ বিড়ালজাতীয়, সমশ্রেণীর অপর বাঘেদের সঙ্গে এর দেহের যতটা ঐক্য, গণপৃথক হলে সে ঐক্য যায় কমে। সুন্দরবনের রাজা বাঘ নিশ্চয়ই অন্যান্য সাধারণ বাঘ অপেক্ষা ভিন্ন (যেমন আসামের কৃষ্ণ ব্যাঘ্র বা হিমালয়ের শ্বেত ব্যাঘ্র); চিতাবাঘ, জাগুয়ারের দেহভান্তর আরও পৃথক; তার পর অন্যান্য শ্রেণীর মাংসাশীরা (যথা নেকড়ে, ভল্লুক) আরও অধিক ভেদবিশিষ্ট। স্তন্যপায়ীবর্গের গরু-ঘোড়া-বানরের সঙ্গেও এদের সম্পর্ক বর্ত্তমান তবে সে সম্পর্ক আরও দূরের, সমগ্র মেরুদণ্ডী সম্প্রদায় কেবল কাঠামোর ঐক্যে এদের সমীপস্থ। সুদূর অতীতে সমগ্র স্তন্যপায়ীকুল যে একই গোত্র হতে উদ্ভূত এ কথা বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান। নিজ নিজ স্বভাবধর্ম্ম অনুসারে গঠিত হয় দেহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। মনুষ্যেতর প্রাণিবর্গের স্বভাবধর্ম্মে প্রতিবেশের অবিচ্ছিন্ন

সংযোগ, জলদলের পালা চলেছে নিরন্তর। দেহে প্রতিবেশের ছাপ, নিজের জীবন-যাপনের প্রয়োজনে কার্য্যকলাপকে মানিয়ে চলতে হয়।

দন্তপংক্তি আহারের অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ, যত রকমের আহার, দন্তগঠনও তত প্রকার। শাকাহারভোজী গো-মহিষ ক্যাঙ্গারুদের ছেদনদন্ত সুগঠিত ও তীক্ষ্ণ উদ্ভিদ-গাছপালা কাটবার উপযোগী। শ্বাদন্ত নিষ্প্রয়োজন, সেজন্য জন্মায় না কিংবা অত্যন্ত ছোট। রোমন্থক গো-মহিষ উট-ভেড়া এর উদাহরণ। কসের দাঁত বড় ও দৃঢ় যাদের দ্বারা চর্ব্বণ করে অনেকক্ষণ ধরে, সেজন্য রোমন্থক। আক্রমণ, যুদ্ধ ও কামড়ের জন্য শ্বাদন্তের প্রয়োজন সর্ব্বাধিক সেজন্য শ্বাপদের প্রধান অস্ত্র শ্বাদন্ত এবং ব্যবহার সর্ব্বদা। হিংস্র প্রাণীর শ্বাদন্ত সুচাল ও তীক্ষ্ণ, শিকার দৃঢ়রূপে ধরবার জন্য দূরে দূরে অবস্থিত; ছেদনদন্ত অপ্রয়োজনীয় সেজন্য ক্ষুদ্র, শ্বাদন্তের কার্য্যক্রমে বিঘ্ন ঘটায় না। ছুরির ফলার মত চর্ব্বনদন্ত অস্থি হতে ছোট পেশীগুলি সুচারুরূপে পৃথক করতে নিয়োজিত হয়। শূকর ইত্যাদি সর্ব্বভুক প্রাণীদের ছেদনদন্ত পরিমিত, শ্বাদন্ত বৃহৎ হলে আহারপর্ব্বে বেকার, মারামারিতে সক্রিয় সেজন্য পুরুষদের একচেটিয়া, চিবোবার সুবিধের জন্য কসের দাঁত উঁচু ও সমান। শুশুকের মত মৎস্যভুক প্রাণীদের দন্ত মোচাকৃতি, বক্র, তীক্ষ্ণ ও সমান—কারণ শিকার পাকড়েই গিলে ফেলে, ধরাটাই এখানে প্রধান কাজ। গজদন্ত কেবল হাতীরই আছে তা নয়, বন্য বরাহও এ বিষয়ে সৌভাগ্যবান, সিন্ধু-ঘোটক, চীনা জলমৃগ ও বিবর প্রভৃতি জাতের গজদন্ত দেখা যায় এবং ব্যবহার প্রায় সমকার্য্যে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, খাদ্য-গ্রহণ প্রণালী তথা খাদ্যানুসন্ধান স্তন্যপায়ীকুলকে পরিচালিত করেছিল বিভিন্ন ধারায়, প্রাণীর স্বাভাবিক কাজকর্ম্ম জন্ম দিয়েছে জৈব-বিবর্ত্তনের বিভিন্নমুখী ধারাকে। ফলোৎপাদক কার্য্যকারিতা ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে বিবর্ত্তন-ধারায়। আদি জীবসমূহের দৃষ্টি বা শ্রবণশক্তি নেই, আদি মেরুদণ্ডী অঙ্গ দেহ-বহনোপযোগী ছিল না, খুর-সমন্বিত স্তন্যপায়ীকুলের পূর্ব্বপুরুষ কেউ দ্রুতগামী ছিল না। না ছিল এদের চর্ব্বণোপযোগী দন্তপংক্তি, না ছিল স্তন্যপায়ী বিবর্ত্তনের প্রধান কারণ মস্তিষ্কের শ্রীবৃদ্ধি। তবে মস্তিষ্ক যেমন ক্রমশঃ অঙ্গ-চালনার যন্ত্ররূপে সংহত হয়ে উঠছিল বিভিন্ন ইন্দ্রিয়স্থানেরও সেইরূপ উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছিল।

এক-একটি কার্য্যকারিতা যেন বিরাট বিটপীর শাখা-প্রশাখা, জৈব-জীবন গড়ে উঠেছে অনুরূপভাবে, অধুনাবিভক্ত সুগঠিত শাখাসমূহ একদিন মূল কাণ্ডের অন্তর্গত ছিল তার প্রমাণ শরীরাভ্যন্তরের অস্থি-কঙ্কাল ও সংস্থান।

যতদূর মনে হয় স্তন্যপায়ীরা পাখীদের সঙ্গে এক সময়ে বেড়ে উঠেছে সমস্ত উষা-যুগ ধরে, এরা মেরুদণ্ডীর শেষ পর্ব্ব। জৈব-বিবর্ত্তন প্রবাহে এর পর অন্য কোন বড় রকমের উল্লেখযোগ্য পর্ব্ব জন্মায় নি, জৈব-বিবর্ত্তনের চরম অভিব্যক্তি 'মানুষ' এই পর্ব্বের অন্তর্গত।

অন্য পর্ব্বের সঙ্গে তফাৎ এই যে, এদের শরীরের বিস্তৃদংশ কেশাচ্ছাদিত। সে যে কোন সময়েই হোক না কেন, সন্তানকে স্তনের দ্বারা দুগ্ধপান করায়—এবং তা সন্তানের শৈশবের একমাত্র আহার। দেখা যাচ্ছে সন্তানপালনে এরা পাখীর চেয়ে উন্নত, আহার অনুসন্ধানে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে হয় না, আপন দেহের স্তনগ্রন্থি হতে দুগ্ধ নিঃসরণ—সমস্ত জৈবরাজ্যে এ অনুপম।

আশা

শ্রীজয়ন্তী রায়

তুমি আর আমি এখানেই এ মাটিতে
সুরের স্বপ্ন-সৌধ রচনা করে,
মানস-লোকের অমরাবতীর গান
শোনাবো, শুনবো, রাখবো হৃদয়ে ভরে।
তুমি আর আমি সুন্দর এ আকাশে
মুঠো মুঠো নীল আবেশ ছড়িয়ে দেব,
তোমার আমার মনের সুরবাহারে
গভীর রাতের মিল খুঁজে খুঁজে নেব।
প্রাণের স্পন্দ অনাবিল উচ্ছ্বাসে
মূর্চ্ছিত হবে ছন্দের দোলনায়,
চামেলি যেমন গন্ধে হারিয়ে ফেলে
শুভ্র সুতনু তনুহীন জ্যোছনায়।

তোমার আমার স্পর্দ্ধিত কল্পনা
আকাশেরও চূড়া ছাড়িয়ে উঠবে দূরে,
রূপ-পৃথিবীতে অরূপের আনাগোনা
অনায়াসে হবে মর্ত্ত্য-অলকাপুরে।
তোমার আমার অপরূপ সেই সুর,
শুনে চমকাবে গভীর রাতের তারা:
হঠাৎ-জাগানো মালতীর সৌরভ
হেসে খসে যাবে—হবে সে আপনহারা।
পৃথিবী আর ঐ সুচির অভ্র-লোক
এর মাঝে আর থাকবে না ব্যবধান,
তোমার আমার এমনি দুঃসাহসে
রচা হবে এই মাটির বুকের গান।

কালিদাস সাহিত্যে 'বাণ'

শ্রীরঘুনাথ মল্লিক

কোনও যোদ্ধার বক্ষে যখন শত্রুর নিক্ষিপ্ত বাণ বিদ্ধ হইয়া যায় ও রক্ত ঝরিতে থাকে। সে করুণ দৃশ্যকেও মহাকবি উপমা দিয়া কি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

'দিলীপসূনোঃ স বৃহদ্ভুজান্তরং
প্রবিশ্য ভীমাসুর শোণিতোচিতঃ।
পপাবনাস্বাদিত পূর্বমাশুগঃ
কুতূহলেনেব মনুষ্য শোণিতম্।' (রঘু—৩।৫৪)।

ভীষণ অসুরদের রক্তপানে অভ্যস্ত (দেবরাজ ইন্দ্রের) বাণ দিলীপপুত্রের বিশাল বক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া রহিল, দেখিয়া মনে হইল সে বুঝি পূর্বে কখনও মনুষ্যশোণিত আস্বাদন করিতে পায় নাই বলিয়া মানুষের রক্ত কৌতূহলী হইয়া পান করিয়া লইতেছে।

ইন্দ্রের সহিত রঘুর যুদ্ধ হইতেছে, ইন্দ্র রঘুর বক্ষ লক্ষ্য করিয়া এমন এক বাণ নিক্ষেপ করিলেন যে, বাণটা রঘুর বুকে আমূল বিদ্ধ হইয়া রহিল, আর বুক হইতে তাজা রক্ত পড়িতে লাগল। ইন্দ্রের বাণ অসুরদের সহিত যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়, অসুরদের রক্তপান করা তাহার অভ্যাস, মানুষের রক্ত আস্বাদ করার সুযোগ সে কখনও পায় নাই, তাই আজ প্রথম মানুষের রক্ত পান করিতে পাইয়া কৌতূহলের সহিত তাহা পান করিয়া লইতেছে। সব রক্ত তাহার মুখের মধ্যে যাইতেছে না বলিয়া বাহিরে খানিকটা পড়িয়া যাইতেছে।

'কুমারসম্ভব' কাব্যেও মহাকবি বাণেদের রক্ত আস্বাদন করার লোভের কথা বলিয়াছেন—

'অধাবন্ রুধিরাস্বাদ-লুব্ধা ইব রণৈষিণাম্। (কু-১৬।১৩)।

বাণগুলি যেন যোদ্ধাদের রক্ত আস্বাদন করার লোভে ছুটিতেছিল।

যুদ্ধে উভয়পক্ষের বীরেরা পরস্পরের প্রতি যে শর নিক্ষেপ করিতেছিলেন সেগুলি এত বেগে চলিতেছিল দেখিয়া মনে হইতেছিল যে, তাহারা বুঝি যোদ্ধাদের রক্ত পান করার লোভে ধৈর্যহারা হইয়া ছুটিতেছে।

নিক্ষিপ্ত বাণের অস্বাভাবিক বেগ বর্ণনা করিতে গিয়া মহাকবি যে ভাবটি ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার তুলনা যেন পাওয়া যায় না! শ্লোকটি দেওয়া গেল—

'তৈস্ত্রয়াণাং শিতৈর্বাণৈ র্যথা পূর্ববিশুদ্ধিভিঃ।
আয়ুর্দেহাতিগৈঃ পীতং রুধিরন্তু পতত্রিভিঃ॥' (রঘু-১২।৪৮)।

রামের শাণিত বাণগুলি তিনপ্রকার (খর, দূষণ ও ত্রিশিরা রাক্ষসদের), দেহ এত দ্রুতগতিতে ভেদ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল দেখিয়া মনে হইতেছিল যে, তাহারা বুঝি শকুনি প্রভৃতি পক্ষীদিগকে রক্ত পান করিতে দেওয়ার জন্য নিজেরা কেবল আয়ু পান করিয়া চলিয়া যাইতেছে।

রক্ত পান না করিয়া বাণগুলি কেবল 'আয়ু পান' করিয়া চলিয়া যাইতেছে, এইরূপ অভিনব ভাব ব্যক্ত করা একমাত্র মহাকবি কালিদাসের মত প্রতিভাবান পুরুষের পক্ষে সম্ভব।

'কুমারসম্ভবে' ষোড়শ সর্গেও এই ভাবটি পাওয়া যায়। দেবাসুরের সংগ্রামের বর্ণনা দিতে গিয়া মহাকবি বলিতেছেন—

'অশোণিতমুখা ভূমিং প্রাবিশন্বরমাশুগাঃ॥' (কু-১৬।৯)

বাণগুলি যখন যোদ্ধাদের দেহ ভেদ করিয়া ভূমির ভিতর চলিয়া যাইতেছিল, তাহাদের মুখে শোণিত লাগিতেছিল না।

বাণগুলি এত জোরে নিক্ষিপ্ত হইতেছিল ও এত তাড়াতাড়ি তাহারা যোদ্ধাদের দেহ ভেদ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল যে, তাহাতে রক্ত লাগিবারও অবসর ছিল না।

নায়ক যখন প্রথম দর্শনে নায়িকার প্রেমে পড়িয়া যান, তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে প্রেমের এই সহসা আবির্ভাবকে মহাকবি কন্দর্প বাণ দ্বারা কৃত ছিদ্রের মধ্য দিয়া হৃদয়ের মধ্যে নায়িকার প্রবেশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

রাজা পুরূরবা অপ্সরা উর্বশীকে প্রথম দর্শনেই ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিলেন, তাই বলিতেছেন—

"আদর্শনাৎ প্রবিষ্টা সা মে সুরলোক সুন্দরী হৃদয়ং।
বাণেন মকরকেতোঃ কৃতমার্গমবন্ধ্যপাতেন॥"
(বিক্রম-২য় অঙ্ক)।

স্বর্গের সেই সুন্দরীকে (অপ্সরা উর্বশীকে) যেমন দেখিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের ঠাকুর তাঁহার অব্যর্থ বাণ নিক্ষেপ করিয়া আমার হৃদয়ে যে ছিদ্র করিয়া দিলেন, সে সেই পথ দিয়া আমার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ফেলিল।

মহাকবি এখানে কাল্পনিক বাণের দ্বারা হৃদয়ে কাল্পনিক ছিদ্রের কথা বলিলেন। 'রঘুবংশে' প্রায় এই ধরণের যে উপমাটি দিয়াছেন সেটি কাল্পনিক নয়, বাণের আঘাতে বাস্তব ছিদ্র।

'মচ্চকার বিবরং শিলাঘনে
তাড়কোরসি স রাম সায়কঃ।
অপ্রবিষ্ট বিষয়স্য রক্ষসাং
দ্বারতামগমদন্তকস্য তৎ ॥' (রঘু-১১।১৮)।

রামের বাণ তাড়কার প্রস্তরের মত কঠিন বক্ষে যে ছিদ্রটি করিয়া দিল, যম যিনি রাক্ষসদের দেশে প্রবেশ করিতে পারিতেছিলেন না, এবার প্রবেশের দ্বার পাইয়া গেলেন।

কুয়াশায় আচ্ছন্ন অস্পষ্টভাবে দৃষ্ট সূর্যের সহিত মহাকবি শত্রুপক্ষের নিক্ষিপ্ত অসংখ্য বাণের দ্বারা আচ্ছন্ন যোদ্ধার উপমা দিয়াছেন।

শত্রুপক্ষ অজস্র বাণ নিক্ষেপ করিতে থাকায় অজের রথ যখন আচ্ছন্ন হইয়া গেল ও কেবলমাত্র ধ্বজাটি অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছিল, মহাকবি সেই দৃশ্যটি এই ভাবে বর্ণনা করিতেছেন—

'সোহস্ত্রব্রজৈশ্ছন্নরথঃ পরেষাং
ধ্বজাগ্রমাত্রেণ বভূব লক্ষ্যঃ।
নীহার মগ্নোদিন পূর্বভাগঃ
কিঞ্চিৎ প্রকাশেন বিবস্বতেব ॥' (রঘু-৭.৬০)

শত্রুপক্ষের নিক্ষিপ্ত অজস্র শরের দ্বারা রথ আচ্ছন্ন হইয়া যাওয়ায়, প্রাতঃকালের সূর্য কুয়াশায় আচ্ছন্ন হইয়া যাইলে তাঁহাকে যেরূপ অস্পষ্ট দেখায়, অজেরও রথের ধ্বজাটি সেইরূপ অস্পষ্টভাবে লক্ষিত হইতে লাগিল।

এই প্রকারের একটি উপমা 'কুমার-সম্ভবে' পাওয়া যায়।

দেবাসুরের যুদ্ধে অসুররাজ তারক যখন দেব-সেনাপতি কার্তিকের প্রতি অজস্র বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কার্তিক তখন মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকারময় আকাশের মত হইয়া পড়িলেন, তারপর তিনি যখন নিজের শক্তিশালী শরের দ্বারা দৈত্যপতির সমস্ত শর কাটিয়া ফেলিলেন, তখন—

'দেবঃ প্রভাপ্রভুরিব স্মরশত্রুসূনুঃ
প্রদ্যোতনঃ সুখন দুর্ধরধামধামা ॥' (কু-১৭ ২৩)।

শররূপ মেঘের আবরণ কাটিয়া যাওয়াতে স্মররিপুর (শিবের) পুত্র কার্তিক সূর্যের মত প্রকাশমান ও দুবিষহ তেজের আস্পদ হইয়া প্রকাশিত হইলেন।

উপরোক্ত শ্লোক দুইটিতে মহাকবি যেমন কুয়াশায় অথবা মেঘে আচ্ছন্ন সূর্যের সহিত রাশি রাশি বাণের দ্বারা আচ্ছাদিত যোদ্ধার উপমা দিলেন, তেমনি 'রঘুবংশের' একটি শ্লোকে বর্ষাকালের বৃষ্টির ধারার সহিত অজস্র বাণবর্ষণের উপমা দিয়াছেন।

দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া রঘু যখন মহেন্দ্র পর্বতে কলিঙ্গরাজের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন মহাকবি বলেন—

'দ্বিষাং বিসহ্য কাকুৎস্থ স্তত্র নারাচ দুর্দিনং
সন্মঙ্গলস্নাত ইব প্রতিপেদে জয়শ্রিয়ম্ ॥' (রঘু ৪.৪১)।

রঘু সেখানে শত্রুপক্ষের নিক্ষিপ্ত নারাচ বাণের ধারা সহ্য করিয়া যখন জয়ী হইলেন, দেখাইল যেন, বাণের ধারায় তাঁহার অভিষেক স্নান সম্পন্ন হইল বলিয়া জয়লক্ষ্মী তাঁহাকে বরণ করিয়া লইলেন।

রাজ্যে অভিষিক্ত হওয়ার পূর্বে যুবরাজকে যেমন অভিষেক স্নান সম্পন্ন করিতে হয়, রঘুকেও তেমনি জয়লক্ষ্মী লাভ করার পূর্বে বাণ বর্ষণ রূপ জলের ধারায় অভিষেক স্নান সম্পন্ন করিতে হইয়াছিল।

'রঘুবংশের' চতুর্থ সর্গে মহাকবি সূর্য-রশ্মির সহিত বাণের উপমা দিয়াছেন।

রঘু যখন দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া পশ্চিমদিকের রাজ্যগুলি জয় করিয়া উত্তর মুখে চলিতে লাগিলেন, তখন :—

'ততঃ প্রতস্থে কৌবেরীং ভাস্বানিব রঘুর্দিশম্।
শরৈরুস্রৈরিবোদীচ্যানুদ্ধরিষ্যন্ রসানিব ॥' (রঘু ৪।৬৬)।

সূর্য যেমন তাঁহার কিরণজালের দ্বারা ভূমির রস আকর্ষণ করিয়া লন, রঘুও তেমনি শরের দ্বারা উত্তরদিকস্থ রাজন্যদিগকে শোষণ করার জন্য উত্তর দিকে যাত্রা করিলেন।

'বিক্রমোর্বশীর' পঞ্চমাঙ্কে কালিদাস বাণের সহিত ক্রোধের উপমা দিয়াছেন।

রাজা পুরূরবার 'সঙ্গমনীয়' নামক অমূল্য মণি এক গৃধ্র মুখে করিয়া তুলিয়া লইয়া আকাশ পথে পলাইয়া যাওয়ার পর যখন এক অজ্ঞাতজনের বাণের আঘাতে পক্ষীটা হত হইয়া ভূমির উপর পড়িয়া গেল, রাজার কঞ্চুকী বাণটি দেখিয়া বলিতেছেন—

'অনেন নির্ভিন্নতনুঃ স বধ্যো রোষেণ তে মার্গণতাং গতেন'
(বিক্রম-৫ম অঙ্ক)

আপনার ক্রোধ যেন এই বাণের মূর্তি ধরিয়া সে পক্ষীর দেহ বিদারিত করিয়াছে।

ইন্দ্রধনুর সহিত মানুষের ধনুর উপমা দেওয়ার মধ্যে অভিনবত্ব থাকিলেও অস্বাভাবিকতা কিছু নাই। রাজা যখন শরৎকালে মৃগয়ায় বাহির হইলেন, মহাকবি বলিতেছেন —

'অথ নভস্য ইব ত্রিদশায়ুধং
কণকপিঙ্গ তড়িদ্‌গুণ যুতম্।
ধনুরধিজ্য মলাধিরূপাদদে
নরবরো রবরোষিত কেশরী ॥' (রঘু-৯।৫৪)।

তারপর ভাদ্রমাস যেমন সোনার মত পিঙ্গলবর্ণের বিদ্যুৎরূপ ছিলাযুক্ত ইন্দ্রধনু ধারণ করে নরশ্রেষ্ঠ দশরথও তেমনি

ছিলা পরাইয়া ধনু গ্রহণ করিলেন, ধনুকের টঙ্কার শব্দে সিংহরাও রুষ্ট হইয়া উঠিল।

'রঘুবংশে' মহাকবি যেমন ইন্দ্রধনুর সহিত ধনুকের ও বিদ্যুতের সহিত জ্যা বা ছিলার উপমা দিলেন, 'বিক্রমোর্বশীর' প্রথম অঙ্কে তেমনি মহাসর্পের সহিত বাণের ও সাপের গর্তের সহিত তূণীরের উপমা দিয়াছেন।

রথের সারথী রাজা পুরূরবাকে বায়ব্য অস্ত্রের দ্বারা দৈত্যদিগকে উড়াইয়া সমুদ্রগর্ভে ফেলিয়া দিতে দেখিয়া বলিতেছেন—

'বায়ব্যমস্ত্রং শরধিং পুনস্তে
মহোরগঃ শ্বভ্রমিব প্রবিষ্টম্ ॥' (বিক্রম-১ম অঙ্ক)।

আপনার বায়ব্য অস্ত্র এইবার মহাসর্পের বিবরে প্রবেশ করার মত পুনরায় তূণীরের মধ্যে চলিয়া যাউক।

'অভিজ্ঞান শকুন্তলে' অগ্নির সহিত বাণের উপমা পাওয়া যায়।

রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়া করিতে গিয়া যখন এক হরিণকে লক্ষ্য করিয়া বাণ নিক্ষেপ করিতে যাইতেছেন দুইজন মুনি তাঁহাকে বাণ নিক্ষেপ করিতে নিষেধ করিয়া বলিতেছেন—

'ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোয়মস্মিন্
মৃদুনি মৃগশরীরে তূলরাশাবিবাগ্নিঃ।' (শকু-১ম অঙ্ক)

এই কোমল মৃগের দেহে তুলারাশিতে অগ্নির মত আপনার শর নিক্ষেপ করিবেন না।

বাণেরাও যে চেতনাবিশিষ্ট প্রাণীদের মত প্রিয়জনকে প্রিয়সংবাদ দেওয়ার জন্য যাইতে পারে, মহাকবি তাহা রাম রাবণের যুদ্ধের বিবরণ দিতে গিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকে জানাইয়া দিতেছেন—

'রাবণস্যাপি রামাস্তো ভিত্ত্বা হৃদয়মাশুগঃ।
বিবেশ ভুব মাখ্যাতুমুরগেভ্য ইব প্রিয়ম্ ॥' (রঘু-১২ ৯১)।

রামের নিক্ষিপ্ত বাণ রাবণের হৃদয় ভেদ করিয়া ভূমির ভিতর যখন চলিয়া গেল মনে হইল, সে বুঝি এ প্রিয়সংবাদ সর্পদিগকে জানাইবার জন্য ভূমির ভিতর প্রবেশ করিল।

'রঘুবংশের' নবম সর্গে মহাকবি বেশ একটি অভিনব উপমা রচনা করিয়াছেন। দশরথ বাহির হইয়াছেন মৃগয়ায় সম্মুখে বাঘ হাঁ করিয়া খাইতে আসিতেছে দেখিয়া তিনি ক্ষিপ্রহস্তে কতকগুলি বাণ তাহার মুখের ভিতর নিক্ষেপ করিয়া দিলেন, তখন সে বাঘটিকে কিরূপ দেখাইতেছিল?

'তূণীচকার শরপূরিত বক্ত্ররন্ধ্রান্।' (রঘু-৯।৬৩)।

ব্যাঘ্রের মুখ-গহ্বর শরে পূর্ণ হওয়ায় উহা যেন একটি তূণীরে পরিণত হইয়া গেল।

বর্ষা শেষ হইয়া যখন শরৎকাল আসিল, রঘুও দিগ্বিজয়ে বাহির হইবেন, মহাকবি এই সময়টির বর্ণনায় বলিতেছেন—

'বার্ষিকং সংজহারেন্দ্রোধনুর্জৈত্রং রঘুর্দধৌ।' (রঘু-৪ ১৬)

ইন্দ্র তাঁহার 'বার্ষিক' ধনু ত্যাগ করিলেন, আর রঘু 'জৈত্র' ধনু গ্রহণ করিলেন।

এখানে বার্ষিক ধনু শব্দে বুঝিতে হইবে বর্ষাকাল, বর্ষাকাল শেষ হইল, শরৎকাল আসিল, সুতরাং দিগ্বিজয়ে বাহির হইবার ইহাই প্রকৃষ্ট সময় বুঝিয়া রঘু তাঁহার জয়শীল ধনু গ্রহণ করিলেন,—যুদ্ধে বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

তরুণী যদি সুন্দরী হয় ও নৃত্যগীত প্রভৃতি শিল্পকলায় পারদর্শিতা লাভ করেন, মহাকবি 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকে তাঁহাকে কামদেবের 'বিষলিপ্ত' বাণ বলিয়াছেন।

'অব্যাজ সুন্দরীং তাং বিজ্ঞানেন ললিতেন যোজয়তা।
উপকল্পিতো বিধাত্রা বাণঃ কামস্য বিষদিগ্ধঃ ॥' (মাল ২য় অঙ্ক)

এই অনিন্দ্য রূপসীকে সুকুমার শিল্পকলায় পারদর্শিনী করিয়া তোলায় বিধাতা যেন তাহাকে কামদেবের বিষলিপ্ত বাণ রূপে কল্পনা করিয়াছেন।

'অভিজ্ঞান শকুন্তলে'র ষষ্ঠ অঙ্কে মহাকবি 'সবিষ শল্যের' উপমা দিয়াছেন।

রাজা দুষ্মন্ত স্মৃতিভ্রংশ হওয়ায় শকুন্তলাকে চিনিতে না পারিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়া দেওয়ার পর যখন নিজের দেওয়া অঙ্গুরীটি ফিরিয়া পাইলেন ও শকুন্তলার সমস্ত কথা আবার তাঁহার মনে আসিল অনুতাপের অনলে তিনি দগ্ধ হইতে লাগিলেন। এই সময় একদিন দুঃখ করিয়া প্রিয়বন্ধু মাধব্যকে বলিতেছেন যে, শকুন্তলাকে যখন কণ্বমুনির শিষ্যেরা রাজসভা হইতে তাঁহাদের সহিত ফিরিয়া যাইতে কঠোর বাক্যে নিষেধ করিয়া দিলেন তখন শকুন্তলা যে দুঃখ পূর্ণ সকাতর দৃষ্টি লইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়াছিলেন সেই দৃষ্টি—

'পুনর্দৃষ্টিং বাষ্পপ্রকর কলুষামর্পিতবতী
ময়ি ক্রূরে যত্তৎ সবিষমিব শল্যং দহতি মাম্ ॥'
(শকু-৬ষ্ঠ অঙ্ক)

আমার মত এই নিষ্ঠুর লোকটার দিকে সে যে বার বার জলভরা চোখের কাতর দৃষ্টি দিয়া চাহিতেছিল, তাহার সে দৃষ্টি বিষযুক্ত শল্যের মত আমায় দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে।

ভারতের কাগজশিল্পের অবস্থা

শ্রীপ্রফুল্ল বসু

কোন দেশে যে কাগজের সর্ব্বপ্রথম জন্ম হয় সে সম্পর্কে এখনও যথেষ্ট মতভেদ আছে। অনেকের ধারণা খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে চীন দেশে কাগজের প্রথম জন্ম হয় অবশ্য আমাদের দেশেও বহুকাল পূর্ব্বে হস্তনির্ম্মিত কাগজের প্রচলন ছিল। তন্মধ্যে মুরশিদাবাদ জেলার নাম উল্লেখযোগ্য।

যতদূর খবর পাওয়া যায় ভারতের মধ্যে কাশ্মীরেই প্রথম কাগজের প্রথা প্রচলিত হয়। শ্রীরামপুরে মহামতি কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড পাদ্রী কর্ত্তৃক ১৮১৪ সনে প্রথম কাগজের কল স্থাপিত হয়। শ্রীরামপুর ও বালী তাঁদেরই দেওয়া নামে আজও প্রচলিত। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-ভারতে আর একটি কল স্থাপিত হয়। পরে টিটাগড় কাগজ কল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে। এর পরই খুব ধীরে ধীরে কাগজের প্রচলন বাড়িতে থাকে। তার পরই কাগজশিল্প প্রসার লাভ করে। ১৯০৩ সনে 'ইম্পিরিয়াল পেপার মিল' কাজ আরম্ভ করে। তার কিছুদিন পরে আরও দু-তিনটি কাগজের কল কাজ সুরু করে। ১৯৩৫-৩৬ সনের হিসাবে দেখা যায়, ভারত মোটামুটিভাবে উৎপাদন করিতেছে কিন্তু তৎকালীন যুগে যন্ত্রপাতির দুষ্প্রাপ্যতা, অর্থাভাব, বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার অভাব, কাঁচামালের অভাবের দরুণ জনসাধারণের চাহিদা মিটাইতে অক্ষম বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ১৯৪৬ সনে ভারতীয় টেরিফ বোর্ডের দৃষ্টি এই শিল্পের উপর আসিয়া পড়ে এবং ভারত সরকার ১৯৪৭ সন হইতে শিশু-শিল্পকে বাঁচাইবার চেষ্টা করে। ১৯৪৭ সনের পর হইতে ভারতে প্রচুর কাগজের চাহিদা বাড়িতে থাকে এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেখা যায় যে, বৎসরে শতকরা আট ভাগ কাগজের চাহিদা বাড়িয়াছে আরও আশা করা যায় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কাগজের ব্যবহার বর্দ্ধিত হইয়া শতকরা ১০ ভাগ হইবে। বর্ত্তমানে কাগজের সর্ব্ব-উচ্চ ক্ষমতা ২,০০,০০০ টনের কিছু বেশী কিন্তু চাহিদা প্রায় ২,৫০,০০০ টনের মত। ভারত সরকার বর্ত্তমানে ২২টি কল চালাইবার পারমিট দিয়াছেন তার ভিতর ২১টি কল কাজ করিতেছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতের কাগজশিল্পের স্থিরীকৃত লক্ষ্য নিম্নরূপ:

হাজার টনের হিসাব

	বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা	১৯৬০-৬১ সনে উৎপাদন
কাগজ এবং মোটা কাগজ	৪৫০'০	৩৫০'০
সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ	৬০'০	৬০'০
ষ্ট্র বোর্ড, মিল বোর্ড ইত্যাদি (Fibre Board ছাড়া)	৫৯'৩	৩৫'০ হইতে ৪০'০

উপরিউক্ত লক্ষ্যে পৌঁছাইতে সরকারকে প্রায় ৫৪ কোটি টাকার মত অর্থ বিনিয়োগ করিতে হইবে। বর্ত্তমানে এই শিল্পে প্রায় এক লক্ষের কিছু বেশী শ্রমিক নিয়োজিত আছে।

নিম্নের চিত্র হইতে ভারতের কাগজ উৎপাদন ও আমদানীর হিসাব উপলব্ধি করা যাইবে।

হাজার টনের হিসাব

	উৎপাদন	আমদানী	ব্যবহার (উৎপাদন ও আমদানী সহ)
১৯৫১-২	১৩৫'০	৩৩'০	১৬৮'০
১৯৫২-৩	১৩৭'০	৩৯'০	১৭৬'০
১৯৫৩-৪	১৩৭'০	৪২'০	১৭৯'০
১৯৫৪-৫	১৬৯'০	৩৮'০	২০৭'০
১৯৫৫-৬ (প্রথম নয় মাসের হিসাব)			
	১৪০'০	৩৭'০	১৭৭'০
১৯৫৫-৬ (আশা করা যায়)			
	২০০'০	৩৮'০	২৩৮'০

এক্ষেত্রে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে ভারতে মাথাপিছু কাগজের ব্যবহার অতি অল্প। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২৫০ পাউণ্ড, যুক্তরাজ্য ১৫০ পাউণ্ড, জার্ম্মানী ৭৭ পাউণ্ড, মিশর ৫ পাউণ্ড এবং ভারত মাত্র ১'২৫ পাউণ্ডের মত।

ভারত তাহার প্রয়োজনীয় কাগজ সাধারণতঃ গ্রেট ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, নরওয়ে এবং সুইডেন হইতে আমদানী করে।

প্ল্যানিং কমিশনের মতে ১৯৫৫-৫৬ সনে সংবাদপত্র মুদ্রণের উপযোগী কাগজের ব্যবহার হইবে এক লক্ষ টনের মত। ১৯৬১ সনের মধ্যে আশা করা যায় যে, চাহিদা প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার টনের মত হইবে। আমরা গত কয়েক বৎসরে নিম্নরূপ সংবাদপত্র মুদ্রণের উপযোগী কাগজ আমদানী করিয়াছি।

সন	টন
১৯৫১-৫২	৫০,০০০
১৯৫২-৫৩	৫৪,০০০
১৯৫৩-৫৪	৭০,০০০
১৯৫৪-৫৫	৭৯,০০০
১৯৫৫-৫৬	৭৫,০০০

১৯৫৬ সনে ভারতের Nepa Mills হইতে সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ উৎপাদন হইয়াছে ৪,২০০ টন মাত্র। ভারত সরকার শীঘ্রই আর একটি সংবাদপত্র মুদ্রণের উপযোগী কারখানা অনুধ

প্রদেশে খুলিবার চেষ্টায় আছেন এবং এই কারখানা কাজ আরম্ভ করিলে এখানেও Nepa Mills-এর মত কাগজ উৎপাদন হইবে। তাহা সত্ত্বেও ভারতে অন্ততঃ সংবাদপত্র মুদ্রণের উপযোগী কাগজ উৎপাদনের জন্য আরও দুইটি কারখানা খোলা প্রয়োজন যাহাতে অদূরভবিষ্যতে আমাদের চাহিদা মিটিতে পারে।

পুস্তক প্রকাশ, লিখিবার কাগজ, স্কুল ও কলেজের পাঠ্যপুস্তক ছাপিবার কাগজ, ধর্মপুস্তক, ক্যালেণ্ডার প্রভৃতির বহুল ব্যবহার হওয়ায় লিখিবার এবং ছাপিবার কাগজের ব্যবহার দিনের পর দিন বাড়িতেছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ধারণা করা হইয়াছিল চাহিদা প্রায় ৭২,১৫০ টন হইবে কিন্তু বর্ত্তমানে চাহিদা ১,২৫,০০০ টনের মত। মোড়ক কাগজের (wrapping) উৎপাদন প্রায় একশত ভাগ বাড়িয়াছে। কলিকাতার নিকটে ত্রিবেণী নামক স্থানে একটি সিগারেট কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এই কলে সিগারেট মুড়িবার উপযোগী কাগজ (tissue) সামান্য পরিমাণে উৎপন্ন হইয়াছে। বর্ত্তমানে আরও বহুপ্রকার স্বচ্ছ কাগজ (transperent paper) ভারতে উৎপাদিত হইতেছে।

আমাদের দেশে কাগজ উৎপাদনের জন্য প্রধানতঃ কাষ্ঠমণ্ড, বংশ-মণ্ড, সবজি ঘাস, বাগাসি (bagasse), ফার এবং অন্যান্য বন্য ঘাস ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া রাসায়নিক মণ্ডও বর্ত্তমানে আসামে সামান্য পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে এবং এই কারখানা ভালভাবে কাজ আরম্ভ করিলে বৎসরে ৩৬,০০০ টনের মত রাসায়নিক মণ্ড শুধু কাগজশিল্পের জন্য উৎপাদিত হইবে। ইহা ছাড়াও ভারত সরকারের আরও দুইটি কারখানা Rayon Trade মণ্ড উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা করিতেছে।

কাষ্ঠমণ্ড আমাদের দেশে বর্ত্তমানে ব্যবহার হয় না বলিলেই চলে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ভারত নরওয়ে ও উত্তর-আমেরিকা হইতে ইহা আমদানী করিত। পাইন, ফার, spurce প্রভৃতি সরলবর্গীয় বৃক্ষ হিমালয়ের পাদদেশে প্রচুর জন্মে, কিন্তু যানবাহনের অসুবিধার দরুণ ঐ সমস্ত বৃক্ষ কাজে লাগান যায় না। বলা বাহুল্য, এ জাতীয় বৃক্ষ হইতে ইউরোপীয় দেশগুলিতে প্রচুর পরিমাণে কাষ্ঠমণ্ড উৎপন্ন হয়।

বাঁশ বাংলাদেশে প্রচুর জন্মে। এই বাঁশ যত কাটা যায় ততই শীঘ্র গজায়। বাংলার কাগজের কলগুলিতে সেজন্য বাঁশের মণ্ড বেশী ব্যবহৃত হয়। কারণ অন্যান্য যে কোন মণ্ড অপেক্ষা বাঁশের মণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা। আসাম, বিহার, মাদ্রাজ ও বোম্বাইতেও প্রচুর বাঁশ জন্মে। এই বাঁশ হইতে যে মণ্ড প্রস্তুত হয় তাহা ভারতের সমস্ত কলের চাহিদা মিটাইয়াও অনায়াসে বিদেশে রপ্তানী করিবার মত উদ্বৃত্ত থাকে।

কাঠ ও বাঁশের পরে আমাদের দেশে সবজি ঘাসের স্থান। ইহা প্রধানতঃ সংযুক্তপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা ও পঞ্জাবেই জন্মায়। সাবাই ঘাস অপেক্ষা বাঁশের মূল্য বেশী কিন্তু সাবাই ঘাসের প্রচলন এখনও বেশী হয় নাই।

ইহা ছাড়া কাগজশিল্পের জন্য ছেঁড়া ন্যাকড়া, শন্, পাট, ময়লা কাগজ প্রভৃতির প্রচলন আছে। নিকৃষ্টতর বিভিন্ন মোড়ক কাগজের জন্য আমরা যে ময়লা তুলা, কাপড় প্রভৃতি ফেলিয়া দিয়া থাকি তাহাও প্রয়োজনে লাগে। বৈজ্ঞানিকগণ রসবিহীন আখের ছিবড়া যাহাতে কাগজের মণ্ডে ব্যবহার করা যায় সে বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টিত।

প্ল্যানিং কমিশন কাঁচামালের ব্যবহার অপ্রতিহত রাখিবার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্দ্দেশ দিতে বলিয়াছেন।

(ক) ভারতের বনসম্পদ সংরক্ষণ।

(খ) বাঁশ এবং ঘাস যাহা কাগজশিল্পে ব্যবহৃত হইবে তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট মূল্য স্থির করা।

(গ) বন-অঞ্চলে যানবাহন চলাচল উপযোগী রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ করা।

(ঘ) শন্, পাট, কাপড়ের টুকরাগুলি যাহাতে পরিপূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয় তাহার জন্য সজাগ দৃষ্টি।

রাজ্যসরকার যে সমস্ত বনে বাঁশ এবং ঘাস পাওয়া যায় সেগুলি লীজ দেওয়ার পক্ষপাতী নন কারণ তাহা হইলে সরকার অনেক আয় হইতে বঞ্চিত হইবে। বর্ত্তমানে রাজ্য সরকার অকশন্ করিয়া বনসম্পদ বিক্রয় করিলে বেশী লাভ হয়। মিঃ মানুভাই এম. শাহের মতানুসারে ভারতে বাঁশ ব্যবহৃত হয় ৩০,০০০ টন। ১৪৩টি চিনির কলে ৩·৭৫ লক্ষ টন বাগাসি পাওয়া যায় এবং বর্ত্তমানে এই সমস্ত বাগাসি পোড়াইয়া ফেলা হয়। অল্প দামের কয়লা বাগাসির পরিবর্ত্তে ব্যবহার হইলেও বাগাসিগুলি কাগজ-শিল্পের প্রয়োজনে অনায়াসে ব্যবহৃত হইতে পারে। ভারত সরকার বিদেশ হইতে বিশেষজ্ঞ আনিয়া তাঁহাদের দৃষ্টি এইদিকে নিবদ্ধ করিয়াছেন।

কাগজশিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির এখনও অভাব। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি আমাদের বিদেশ হইতে আমদানী করা ছাড়া উপায় নাই। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশ হইতেও লোকজন পাঠাইয়া বিদেশে কিভাবে কাজ হইতেছে তাহাও অচিরে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, সরকারের দৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং ইহা আশা করা যুক্তিহীন নয় যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কাগজশিল্পের ভবিষ্যৎ বিশেষ সম্ভাবনাপূর্ণ।

ডাঃ অরবিন্দ চৌধুরী

শ্রীঅনাথবন্ধু দাস

"স্বর্গে বুঝি ভগবানের ভাল ডাক্তার নেই, তাই তিনি ইঁহাকে চান" —কোন চিকিৎসকের সমাধিস্তম্ভের উপর ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর প্রশংসার বাণী আর হইতে পারে না। গ্রেট ব্রিটেনের এসেক্স অঞ্চলে বার্কিংসাইডের সার্জ্জারীর বাঙ্গালী ডাক্তার অরবিন্দ চৌধুরীর শবাধারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আট বৎসরের শিশু হেলেন পেইন তাহার জননীকে এই কথাটি বলিয়াছিল। শ্রদ্ধাপ্লুত এবং অশ্রুসিক্ত পুষ্পার্ঘ্য লইয়া যে সহস্র সহস্র নর-নারী সেদিন তাহাদের অতি প্রিয় চিকিৎসকের অন্তিম শয্যার পার্শ্বে আসিয়া শেষ দর্শনের জন্য সমবেত হইয়াছিল, এই শিশুর কণ্ঠে তাহাদের সকলের শোক-ভারাক্রান্ত অন্তরের বেদনা প্রকাশ পাইয়াছিল।

ডাঃ অরবিন্দ চৌধুরী ১৩০৮ বঙ্গাব্দের ২রা আশ্বিন (১৬ সেপ্টেম্বর ১৯০১) শ্রীহট্ট (দেশবিভাগের পর বর্ত্তমানে কাছাড়) জেলার মৈনা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺অনিরুদ্ধ চৌধুরী ও মাতার নাম ৺সুশীলা চৌধুরাণী। ৮ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পণ্ডিত "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত"-প্রণেতা পরলোকগত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় ডাঃ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠতাত ছিলেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে অরবিন্দ শিলচর গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সমগ্র আসামে উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনি হোয়াইট মেমোরিয়াল এওয়ার্ড পদক লাভ করেন। অতঃপর শ্রীহট্টের মুরারীচাঁদ কলেজ হইতে আই-এস-সি পাশ করিয়া ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হন। পঠদ্দশার সময়েই ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার মার্টিন রেলওয়ের চীফ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীহট্টবাসী রায় বাহাদুর গিরীশ-চন্দ্র দাসের তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী সংযুক্তার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে কৃতিত্বের সহিত এম-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে এফ. আর. সি. এস. পরীক্ষার জন্য তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে তিনি ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে বাধ্যতামূলক আইন অনুসারে রাজকীয় নৌবহরে চিকিৎসকরূপে যোগদান করেন। কঠোর পরিশ্রমের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় এবং বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই কার্য্য পরিত্যাগ করেন। অতঃপর তিনি বেন্থল গ্রীণে প্রাইভেট চিকিৎসা-ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং পরে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে এসেক্স অঞ্চলের বার্কিংসাইডে তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র স্থানান্তরিত করেন। মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত তিনি এই স্থানেই বাস করিয়াছেন।

ইংলণ্ডের ন্যাশনাল হেলথ স্কীম অনুসারে এই অঞ্চলের সাড়ে তিন হাজার অধিবাসীর স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার দায়িত্ব ডাঃ চৌধুরীর উপর অর্পিত ছিল। ইহারা সাধারণ শ্রেণীর লোক, অপেক্ষাকৃত দরিদ্র। ডাঃ চৌধুরী ইহাদের সেবাতেই নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজস্ব ছুটি বলিয়া কিছু ছিল না, এমন কি রবিবারেও তিনি আর্ত্তের সেবায় মগ্ন থাকিতেন। রাত্রে তাঁহার সার্জ্জারীর এক ঘরে টেলিফোনের পাশে নিদ্রা যাইতেন, পাছে কোন রোগী তাঁহাকে ডাকে। গত ৩০শে জানুয়ারী রাত্রে সাড়ে দশ ঘটিকার সময় এক পার্টিতে গিয়া তিনি হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হন এবং রাত্রি ১টার সময় পরলোকগমন করেন।

তাঁহার মৃত্যুসংবাদে সমগ্র অঞ্চল স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। শত শত নর-নারী তাঁহার সার্জ্জারীতে ছুটিয়া আসে। তাঁহার রোগীরা অনুরোধ জানায় শেষকৃত্যের পূর্ব্বে যেন "শেষদর্শনের" (lying-in-state) ব্যবস্থা করা হয়। সংবাদপত্রের রিপোর্টারে তাঁহার বাড়ী পূর্ণ হইয়া যায়। তাঁহার মৃত্যুসংবাদ বি-বি-সি রেডিওতে প্রচার করা হয়। শেষদর্শনের দৃশ্য টেলিভিসনে প্রচারিত হয়। একজন বাঙ্গালী গৃহ-চিকিৎসক শুধু ভালবাসা, ত্যাগ ও আর্ত্তের সেবা দ্বারা রক্ষণশীল ব্রিটিশ জাতির হৃদয় কিভাবে জয় করিয়াছিলেন, তাহা বেদনা-মধুর ভাবে ফুটিয়া ওঠে তাঁহার অকস্মাৎ পরলোকগমনে।

গ্রেট-ব্রিটেনের প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রগুলিতে ডাঃ চৌধুরীর যে স্তুতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল:

ডেইলি হেরাল্ড (৩. ২. ৫৮): রাষ্ট্রনেতা নহেন, খ্যাতনামা যুদ্ধবিশারদ নহেন, শুধুমাত্র দরিদ্রের সেবায় নিয়োজিত একজন গৃহ-চিকিৎসক।

এসেক্সের বার্কিংসাইডের ৮-এ হাইষ্ট্রীটের সার্জ্জারীতে চুয়ান্ন বৎসর বয়স্ক ডাক্তার অরবিন্দ চৌধুরী যেখানে আর্ত্তের সেবা ও চিকিৎসা করিতেন সেখানে তাঁহার "শেষদর্শন" অনুষ্ঠান হইবে।

তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁহার রোগীরা একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। শত শত লোক এই মর্ম্মান্তিক সংবাদ বিশ্বাস করিতে চায় নাই, ঠিক খবর জানিতে তাহারা সার্জ্জারীতে ছুটিয়া আসিয়াছে, আর অশ্রুপাত করিতে করিতে ফিরিয়া গিয়াছে। কারণ ১৫ বৎসর পূর্ব্বে ডাঃ চৌধুরী বাট ছাড়িয়া আসিয়া যেদিন হইতে হাইষ্ট্রীটে চিকিৎসা আরম্ভ করেন, সেই দিন হইতে তিনি ইহাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হইয়াছিলেন। তিনি কোন দিন ছুটি গ্রহণ করেন নাই। রোগীর সেবায় সপ্তাহের সাত দিন এবং দিন-রাত্রি ২৪ ঘণ্টা কর্ত্তব্যকর্ম্মে নিয়োজিত থাকাই তিনি কর্ত্তব্য মনে

করিতেন। কবিতাপাঠ ছিল তাঁহার একমাত্র অবসর-বিনোদন। রাত্রে টেলিফোনের পাশে সার্জ্জারীতে নিদ্রা যাইতেন। শিশুরা তাঁহাকে খুব ভালবাসিত। রোগ দেখাইতে গেলে মিষ্টি ও ফল পাইবে এ বিষয়ে তাহারা নিশ্চিত ছিল।

ডাঃ চৌধুরীর রোগ-নির্ণয় ক্ষমতার প্রশংসা করিয়া রাজার চিকিৎসক লর্ড হোর্ডার প্রভৃতি অনেক বিশিষ্ট চিকিৎসক তাঁহাকে পত্র লিখিতেন। তাঁহার খ্যাতি শুনিয়া ধনীরা চিকিৎসার জন্য তাঁহার নিকট আসিত, তিনি চিকিৎসা করিতেন, কিন্তু টাকা নিতেন না। একজন নার্স তাঁহার সঙ্গে বহু বৎসর কাজ করিয়াছিলেন। গত রাত্রে তিনি আমাকে বলেন, তাঁহার রোগ-নির্ণয়ের ক্ষমতা অদ্ভুত ছিল, তিনি রোগীর মুখ দেখিয়াই অনেক কিছু বলিতে পারিতেন।

সার্জ্জারী বন্ধ হইলেও তিনি রোগীকে ভুলিতেন না, তাহাদেরই চিন্তায় তাঁহার সময় কাটিত—'আমি কি এদের জন্য যথাসাধ্য করিয়াছি?'

ডাঃ অরবিন্দ চৌধুরী

ডেইলি মেইল (৩. ২. ৫৮): ডাঃ চৌধুরীর সার্জ্জারীর রিসেপসনিষ্ট গত রাত্রে আমাকে বলেন, তিনি পীড়িতদের নিকট ভগবান-সদৃশ ছিলেন। সার্জ্জারীর একজন নার্স বলেন—অদ্ভুত ছিলেন তিনি, এক-এক সময় তাঁহার মন তাঁহাকে বলিয়া দিত কোথায় কে অসুস্থ হইয়াছে, অমনি তিনি সেখানে ছুটিয়া যাইতেন। আগামী কল্য শত শত, সম্ভবতঃ হাজার হাজার নর-নারী সার্জ্জারীর ঘরে পুষ্পস্তবকে আবৃত ডাঃ চৌধুরীর নশ্বর দেহের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য উপস্থিত হইবে।

ডেইলি মিরর (৫. ২. ৫৮): তাঁহার মৃত্যুতে সমগ্র পূর্ব্ব-লণ্ডন অভিভূত হইয়া পড়ে। শোকে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া সমগ্র দেশ হইতে বার্ত্তা আসিতে থাকে। যে কেহ তাঁহাকে একবার মাত্র দেখিয়াছে সেও অশ্রুসিক্ত পুষ্পার্ঘ্য প্রেরণ করে। বিভিন্ন সংস্থা, সহকর্ম্মী চিকিৎসকমণ্ডলী, স্থানীয় পুলিশ, দোকানী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, এমন কি শিশুরাও ফুল পাঠায়। গম্ভীর স্বভাবের ইংরাজের মধ্যে এরূপ ভাবাবেগের দৃশ্য বড় দেখা যায় না।

ইভিনিং নিউজ (৪. ২. ৫৮): ২৫ জন স্ত্রীলোক রাত্রেই সার্জ্জারীতে আসিয়া কাঁদিতে থাকে। ভোর হইতে শত শত নর-নারী পুষ্পার্ঘ্য সহ আসিয়া উপস্থিত হয়। মিসেস জিনেট সেফার বলেন, আমরা যখন তাঁহার রোগী হইলাম তখন ডাক্তার একদিন আমাদের বলিয়াছিলেন, "আমি টাকা রোজগারের জন্য এখানে আসি নাই, আমার কাজ লোককে সুস্থ রাখা।"

ইলফোর্ড রেকর্ডার (৬. ২. ৫৮): এই ভারতীয় ডাক্তার সাধারণ চিকিৎসক ছিলেন না। বস্তুতঃ তিনি সাধারণ লোকও ছিলেন না। তাঁহার নিজের সার্জ্জারীতে আজ তিনি ওক কাঠের এক পুষ্পাবৃত কফিনে অন্তিমশয্যায় শায়িত। মৃত্যুর মহিমায় তাঁহার বদনমণ্ডল আরও উজ্জ্বল হইয়াছে। সারাটা প্রভাত

অবিরাম প্রবাহে শোকার্ত্ত নরনারীরা তাঁহার শেষ শয্যাপার্শ দিয়া শোভাযাত্রা করিয়া চলিয়াছিল। আমি একজন নারীকে বলিলাম, মৃতের কাছে শিশুদের নিয়া আসা কি ভাল হইয়াছে? তিনি উত্তর দিলেন, এ দৃশ্য মহিমময়, এতে লজ্জিত হওয়ার কোন কারণ নাই। একজন স্ত্রীলোক ডাক্তারের ষ্টেথেস্কপের উপর ফুল দিতে দাবী করেন। বলেন, উহা দিয়া ডাক্তার আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন।

ষ্টার (৪. ২. ৫৮): তিনি দয়ালু ডাক্তার বলিয়া পরিচিত ছিলেন। স্থানীয় লোক তাঁহাকে দেবতা বলিয়া মনে করিত। শিশুদের তিনি বিশেষভাবে ভালবাসিতেন। ২২ মাস বয়সের শিশু রয় কলবি ডাক্তারের শবাধারে সর্ব্বপ্রথম লিলি পুষ্প অর্পণ করে। তার মা মিসেস জিল কলবি অশ্রুনেত্রে আমাকে বলেন, ডাক্তার বড় দয়ালু, বড় ভাল লোক ছিলেন।

মৃত্যুকালে ডাঃ চৌধুরী তাঁহার পত্নী ও দুই পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা কলিকাতায় বাদুড়বাগান ষ্ট্রীটে রায়বাহাদুরের বাড়ীতে আছেন।

কবি চন্দ্রাবতী

শ্রীমঞ্জুশ্রী সিংহ

'ময়মনসিংহ গীতিকা' শীর্ষক সঙ্কলন গ্রন্থে দীনেশ সেন মহাশয় যে কয়টি গীতিকা দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে সব কয়টিরই মূল সুর এক। ইহাদের প্রধানতম উপজীব্য প্রেম ও তৎসংশ্লিষ্ট বিরহ-জনিত কারুণ্য-রস। ইহাদের মধ্যে একটিমাত্র ব্যতিক্রম 'দস্যু কেনারামের পালা।' কি ভাবে তদানীন্তন প্রখ্যাত কবি দ্বিজ বংশীদাসের সংস্পর্শে আসিয়া দস্যু কেনারামের মানসিকতার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিল—তাহাই বর্ণিত হইয়াছে এই পালায়। রচয়িত্রী কবি চন্দ্রাবতী উপর্যুল্লিখিত দ্বিজ বংশীদাসের আত্মজা।

বর্ত্তমান যুগে সাহিত্যক্ষেত্রে মহিলাদিগের ক্রমবর্দ্ধমান পদক্ষেপে আশান্বিত হইবার কারণ থাকিলেও দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হয় যে, তাঁহাদের মধ্যে একটি বৃহৎ অংশই 'মন্দঃ কবিযশ প্রার্থিনী।' তবু যে, ইঁহারা স্বীকৃতি পাইয়া সমসাময়িক পুরুষ লেখকদের পার্শ্বে স্থান পাইতেছেন তাহার কারণ হয় ত পুরুষের বৈলাতিক শিভলরি, কিন্তু চন্দ্রাবতীর ক্ষেত্রে একথা খাটিবে না। তাঁহার নাম তাঁহার সমকালীন (১৬শ শতক) যে কোনও পুরুষ লেখকের সহিত এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হইবার যোগ্য। যদিও স্বীয় প্রতিভার সম্যক বিকাশের পূর্ব্বেই কবি চন্দ্রাবতী অমর্ত্ত্যলোকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার স্বল্পায়ত জীবনে তিনি যে কয়টি পালা রচনা করিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার প্রতিভার স্বাক্ষর বর্ত্তমান। ঘটনা-বিন্যাসে, চরিত্র সৃষ্টিতে, অনাড়ম্বর কবিত্বে ও রচনার সরল আন্তরিকতায় চন্দ্রাবতীর রামায়ণ, দেওয়ান ভাবনা ও দস্যু কেনারামের পালা যথার্থ ই কবিত্ব-মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ফুলেশ্বর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন কবি চন্দ্রাবতী।' পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সেদিনকার সুবিখ্যাত মনসা-ভাসান-রচয়িতা কবি বংশীদাস ছিলেন তাঁহার পিতা। কৈশোরে পিতার জন্য প্রত্যহ পুষ্পচয়ন করিতে যাইতেন চন্দ্রা। সেখানে জয়ানন্দ চক্রবর্ত্তী নামে একটি তরুণের সহিত পরিচয় হয় তাঁহার। পরিচয় অচিরেই ঘনিষ্ঠতায় দাঁড়াইল। অবশেষে এক দিন জয়ানন্দ প্রেম নিবেদন করিলেন। একটি পুষ্পপাতে তিনি লিখিলেন—

> "যেদিন দেখ্যাছি কন্যা তোমার চান্দ বদন।
> সেই দিন হয়্যাছি আমি পাগল যেমন।
> তোমার মনের কথা জানতে আমি চাই।
> সর্ব্বস্ব বিকাই বাম পায় তোমার যদি পাই॥"

চন্দ্রাবতী প্রথম দর্শনেই জয়ানন্দকে স্বামী বলিয়া জানিয়াছিলেন। তথাপি সমাজ ও ধর্ম্মের অনুরোধে তিনি উত্তর দিলেন—

> "ঘরে মোর আছে বাপ আমি কিবা জানি।
> আমি কেমনে দেই উত্তর অবলা কামিনী॥"

যাহাই হউক পিতার আনুকূল্যে ও ঘটকের মধ্যস্থতায় জয়ানন্দ চক্রবর্ত্তীর সহিতই বিবাহ স্থির হইল চন্দ্রাবতীর। সব উদ্যোগ-আয়োজন সম্পূর্ণ। হেনকালে লোকমুখে এক নিদারুণ সংবাদ আসিল। জয়ানন্দ এক লাস্যময়ী মুসলমানীতে আসক্ত হইয়া বিবাহ করিয়াছেন তাহাকে। এই সংবাদে—

> "ধূলায় বসিল ঠাকুর শিরে দিয়া হাত।
> বিনা মেঘে হইল যেন শিরে বজ্রাঘাত॥"

আর চন্দ্রা? তিনি কবি-বর্ণিতা বিরহিণীদের ন্যায় বিকীর্ণমূর্দ্ধজা হইয়া বসুধালিঙ্গনপূর্ব্বক কাঁদিতে বসিলেন না। অথবা, 'আমার বন্ধুয়া আনবাড়ী যায়' ইত্যাদি বলিয়া করুণ সুরে বিলাপ গীতিও গাহিলেন না। বস্তুতঃ তাঁহার মধ্যে শোকের কোনওরূপ বাহ্য প্রকাশ দেখা গেল না। কিন্তু একান্ত বিশ্বাসভাজন দয়িতের বিশ্বাসভঙ্গে তাঁহার জীবনমূলে টান পড়িল।

> "না কান্দে না হাসে চন্দ্রা নাহি বলে বাণী।
> আছিল সুন্দরী কন্যা হইল পাষাণী॥

দেখুন! অর্দ্ধেকটী সানলাইট
সাবানেই এসব কাচা
হয়েছে!
অতিরিক্ত ফেণার দরুণই
এ সম্ভব হয়
সানলাইট
সাবান
জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে কাচে
S. 240-X52 BG

মনেতে ঢাকিয়া রাথে মনের আগুনে।
জানিতে না দেয় কন্যা জল্যা মরে মনে॥"

কন্যার মুখের প্রতি চাহিয়া পিতা বংশীদাস অনুভব করিলেন তাঁহার মর্ম্মবেদনা। তাই তিনি সহজেই অনুমোদন করিলেন চন্দ্রার চির-কুমারী থাকিবার প্রার্থনা। কিন্তু বাঁচিয়া থাকিবার জন্য একটি অবলম্বন ত চাই। তাই:—

"অনুমতি দিয়া পিতা কহে কন্যার স্থানে।
শিবপূজা করো আর লেখ রামায়ণে॥

তাহাই হইল:—

"নির্ম্মাইয়া পাষাণ শিলা বানাইলা মন্দির।
শিব পূজা করে কন্যা মন করি স্থির॥
অবসর কালে কন্যা লেখে রামায়ণ।
যাহাতে পড়িলে হয় পাপ বিমোচন॥"

দুঃখের আগুনে পুড়িয়া চন্দ্রা কবিত্বে বিকশিত হইয়া উঠিলেন। বিংশ শতাব্দীর কবি নিজেকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

"আমার এ ধূপ না পোড়ালে,
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে
দেয় না কিছুই আলো॥"

সত্যই তাই। ভাগ্যের হস্তে এইরূপ নির্ম্মম আঘাত না পাইলে চন্দ্রাবতীর সুপ্ত প্রতিভা সুপ্তই থাকিয়া যাইত।

যাহাই হউক অল্পকাল মধ্যেই মোহভঙ্গ ঘটিল জয়ানন্দের। তিনি বুঝিলেন—

"অমৃত ভাবিয়া আমি খাইয়াছি গরল।
কণ্ঠেতে লাগিয়া রইছে কাল হলাহল॥"

চন্দ্রাবতীর শুচিস্মিত মুখখানির জন্য তাঁহার হৃদয় উতল হইয়া উঠিল। অনুতপ্ত চিত্তে চন্দ্রাবতীর দর্শন কামনায় পত্র দিলেন জয়ানন্দ। চন্দ্রাবতীর সুপ্ত নারীত্ব পুনর্ব্বার জাগরিত হইয়া উঠিল। কিন্তু তাঁহার প্রেম গভীর ও একনিষ্ঠ হইলেও উহা বৈষ্ণবরমণীসুলভ কূলপ্লাবী ও উচ্ছ্বাস ছিল না। তাই তিনি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে পিতার উপদেশ চাহিলেন। কিন্তু আজন্ম শুদ্ধাচারী দ্বিজ বংশীদাস কন্যার মুখ চাহিয়াও যবনাসক্ত ব্যভিচারিকে ক্ষমা করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন—

"না লাগে উচ্ছিষ্ট ফুল দেবের কারণে।

চন্দ্রাবতী পুনরায় একাগ্র হইয়া শঙ্করপূজায় নিমগ্ন হইলেন। ইহার পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। একদিন জয়ানন্দ আকাঙ্খোন্মত্ত হইয়া চন্দ্রাবতীর মন্দিরদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং যখন বুঝিলেন যে, ঐ কপাট তাঁহার নিকট চিরকাল রুদ্ধই থাকিয়া যাইবে তখন তীব্র ক্ষোভে সন্নিকটস্থ মালতী পুষ্পবৃক্ষ হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া রুদ্ধ কপাটের উপর লিখিলেন এই অনুতাপদগ্ধ বাণীটি—

"শৈশবকালের সঙ্গী তুমি যৌবনকালের সাথী।
অপরাধ ক্ষমা কর তুমি চন্দ্রাবতী॥
পাপিষ্ঠ জানিয়া মোরে না হইলা সম্মত।
বিদায় মাগি চন্দ্রাবতী জনমের মত॥"

বিদায় লইলেন জয়ানন্দ এবং নদীতে গিয়া ঝাঁপ দিলেন। হেনকালে নদীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন চন্দ্রাবতী। তখন উজান-স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে জয়ানন্দের দেহ। নিরুপায় হতাশায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিলেন চন্দ্রা।

"আঁখির পলক নাই মুখে নাই সে বাণী।
পারে খাড়াইয়া দেখে উমেদা কামিনী॥"

জয়ানন্দের মৃত্যুর কিছুকাল মধ্যেই চন্দ্রা ইহলোক ত্যাগ করিলেন। ফুলেশ্বরী নদীর তীরবর্ত্তী পাতুয়ার গ্রামে চন্দ্রাবতীর শিব-মন্দিরটি আজিও জীর্ণ অবস্থায় বিদ্যমান।

চন্দ্রাবতীর কাব্যে বিরাট পাণ্ডিত্য সুললিত উপমাও উৎপ্রেক্ষা, খুঁজিলে হতাশ হইতে হইবে। ভাষার আড়ম্বর, ছন্দের পরিপাট্যও ইত্যাদি ইহাতে নিতান্তই অভাব। তাই তাঁহার কাব্য প্রসাধন-বিহীনা, কলানভিজ্ঞা পল্লীসুন্দরীর ন্যায়ই মনোহরা। চন্দ্রাবতী জীবনে যত দুঃখ-বেদনা পাইয়াছিলেন তাহার সবটুকু উজাড় করিয়া দিয়াছেন তিনি তাঁহার কাব্যে। চন্দ্রাবতী-হৃদয়ের কারুণ্যরসে অভিসিঞ্চিত হইয়া পল্লীবালিকা "সুনাই" অপূর্ব্ব সুষমা-মণ্ডিতা হইয়া উঠিয়াছে।

মৈমনসিংহ-গীতিকার 'দেয়ওয়ান ভাবনা' পালাটিতে রচয়িতার নাম না থাকিলেও ইহাকে চন্দ্রাবতীর রচনা বলিয়াই চিনা যায়। এই পালাটিতে 'ভাবনা' নামক দেওয়ানের লাম্পট্য ও কিভাবে স্বীয় সাহস ও বুদ্ধিবলে বালিকা 'সুনাই' জীবন দিয়াও নিজের সতীত্ব ও স্বামীর জীবন রক্ষা করিল—তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। বলবান অবাধে উৎপীড়ন করিবে এবং দুর্ব্বল তাহা সহ্য করিবে—ইহাই ছিল সেদিনের রীতি। তাই যাঁহারা সেদিন বলবানদিগের অত্যাচারের বিষয় বর্ণনা করিতেন তাঁহাদের কাব্যে—তাঁহারা স্বাভাবিক আত্মরক্ষার প্রেরণাতেই নিজেদের নাম দিতেন না। নাম না দিলেও—অত্যাচারী শাসকের জীবৎকালেই অকুণ্ঠ ভাষায় তাঁহার অত্যাচারের প্রতিবাদ জানানো চন্দ্রাবতীর মত একজন তরুণীর পক্ষে অল্প সাহসিকতার পরিচায়ক নয়।

কবি চন্দ্রাবতীর দেহত্যাগের পর ন্যূনাধিক চারি শত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, তথাপি তাঁহার রামায়ণ পালা আজিও পূর্ব্ব ময়মনসিংহ মহিলা সমাজে নিয়মিত পঠিত হইয়া থাকে। আজিও 'দেওয়ান ভাবনা' কেন্দুয়ার নিকটবর্ত্তী কোনও কোনও স্থানের মাঝিদের মুখে গীত হইয়া থাকে। আজিও 'দস্যু কেনারামের পালা' সরল পল্লীবাসীদের চক্ষু অশ্রুসজল করিয়া তুলে। আর, চন্দ্রাবতীর জীবনী? আজিও চন্দ্রাবতীর জীবনী (নয়ান চাঁদ ঘোষ প্রণীত) পূর্ব্ববঙ্গে মাঠে-প্রান্তরে নিয়মিত গীত হয় আর শত শত চাষী লাঙ্গলের উপর বাহু ভর দিয়া দাঁড়াইয়া শোনে। চন্দ্রাবতীর অশ্রু আজ শুকাইয়া গিয়াছে—কিন্তু কবি চন্দ্রাবতী পালাটির শ্রোতাদের অশ্রু কখনও শুকাইবে না।

ঠগী ও পিণ্ডারী

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্য মধ্যপ্রদেশ বিখ্যাত। বিন্ধ্য পর্ব্বতের সারি, তার বুকে সুদূরবিস্তৃত গহন শ্যামল বনানী দর্শকের মন মুগ্ধ করে, আবার আতঙ্কেও পূর্ণ করে তোলে। আতঙ্কের কারণ এসব পর্ব্বতমালার ভেতর এমন সব দুর্গম স্থান আছে যেখানে চোর-ডাকাতরা অনায়াসে আত্মগোপন করে থাকতে পারে। আজকাল মধ্যপ্রদেশের পুলিশ ডাকাত দমনে হেস্তনেস্ত হচ্ছে। ডাকাতদের সর্দ্দার বিখ্যাত মানসিং বহুকাল পরে পুলিশের গুলীতে প্রাণ হারিয়েছে, সেদিন মেয়ে ডাকাত পুতলীবাঈও পুলিশের গুলীতে মারা পড়েছে। কিন্তু ডাকাত দেবীসিং এখনও ধরা পড়েনি, সে তাদের দলবলসহ মধ্যপ্রদেশের এসব দুর্গম গিরিকন্দরেই আত্মগোপন করে আছে। এসব পর্ব্বত-গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে হঠাৎ জনপদ আক্রমণ করে আবার ফিরে এসে পুলিশের চক্ষে ধূলো দেওয়া যত সহজ, দেশের সমতল ক্ষেত্রে সেটা তত সহজ নয়।

শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে এ সমস্ত নিবিড় অরণ্যসঙ্কুল পর্ব্বতমালা ভয়ঙ্কর প্রকৃতি দস্যু, ঠগ ও পিণ্ডারীদের আবাসস্থল ছিল। তারা দিনে লোকালয়ে এসে অমানুষিক অত্যাচার ও লুঠতরাজ করত, আর রাত্রের অন্ধকারে পর্ব্বতগুহায় আশ্রয় নিত। তাদের অত্যাচারে মধ্যপ্রদেশ, বিশেষ করে জব্বলপুর ও নিকটস্থ শহর ও গ্রামের অধিবাসীরা আতঙ্কে কাঁপত। মধ্যপ্রদেশের এ সমস্ত পর্ব্বত-মালার ভেতর দিয়ে চলবার সময় এ সব কথা মনে হয়। কৌতূহলী হয়ে ঠগ ও পিণ্ডারীদের ঐতিহাসিক কাহিনীর খোঁজ করতে গিয়ে মধ্যপ্রদেশের বহু পুরনো গেজেটিয়ার থেকে কিছু কাহিনী পাওয়া গেল। তা থেকেই আমি নিম্নলিখিত বিবরণ সংগ্রহ করেছি। আধুনিক ঐতিহাসিকরা এ বিষয়ে অনুসন্ধান করলে হয় ত আরো সঠিক খবর বের করতে পারবেন।

ঠগী ও পিণ্ডারীরা এক-একটি দল গঠন করে তাদের সেনাপতি নির্ব্বাচিত করত এবং তার অধীনস্থ হয়ে দৈনিক ৪০।৫০ মাইল পর্য্যন্ত হানা দিয়ে লুঠতরাজ করত। এরা বুন্দেলখণ্ড থেকে মান্দ্রাজ এবং গুজরাট থেকে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত দৌরাত্ম্য করত। ওরা যে গ্রামে পৌঁছত, খবর পেলেই সে-গ্রামবাসীরা ঘর-সংসার ফেলে উর্দ্ধশ্বাসে নিজেদের প্রাণ নিয়ে পালাত।

এদের পৈশাচিক অত্যাচারে সন্ত্রস্ত হয়ে অধিবাসীরা মনের শান্তি হারাল। বাংলা ও অন্যান্য দেশে যাদের বর্গী বলা হ'ত, তাদের দলেও অনেক পিণ্ডারী ও ঠগী থাকত। তখনকার দিনে মায়েরা শিশুদের ঘুম পাড়াবার সময় বর্গীর ভয় দেখিয়ে ছড়া বলতেন :

'খোকা ঘুমোল, পাড়া জুড়োল, বর্গী এল দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে।'

এ সব ঠগী ও পিণ্ডারীরা দশরার পর তাদের অভিযান সুরু করত। তারা লুঠতরাজ করে সব জিনিসপত্র ত কেড়ে নিতই উপরন্তু মানুষদের কারণে-অকারণে হত্যা করতে কুণ্ঠিত হ'ত না। এরা এদের সর্দ্দারকে লহর্বরিয়া বলত। এদের নিষ্ঠুরতার অন্ত ছিল না। এরা লোহা আগুনে দিয়ে লাল টকটকে করে তুলত, আর সেই সব জ্বলন্ত লোহা দিয়ে লোকেদের শরীরে ছ্যাঁকা দিত, কখনও বা উত্তপ্ত ছাই বা লঙ্কা গুঁড়ো-ভরা পান মুখে ঠেসে দিত, পিঠে মেরে বুকে পাথর চাপিয়ে তার উপর চড়ে বসত। মা-বাপের চোখের সামনে শিশুকে হত্যা করা পিণ্ডারীদের দৈনিক কর্ম্ম ছিল। তাদের মধ্যে দৌলতসিং বলে এক ব্যক্তি অত্যন্ত ক্রূর ছিল। তার এক চক্ষু কাণা ছিল; সে একটা দল গঠন করে দস্যুদলপতি হয়ে বসল এবং জব্বলপুরের চারদিকে খুব লুঠতরাজ ও অত্যাচার সুরু করল। লুঠপাট সারা করে দলবলসহ মধ্যপ্রদেশের নিবিড় অরণ্যে লুকিয়ে থাকত। পুলিশরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল কিন্তু দৌলতসিং ধরা পড়ল না, চার দিকে গুপ্তচর তার বাসস্থান সন্ধান করতে লাগল। একবার দৌলতসিং একটা বড় রকমের আক্রমণ শেষ করে জঙ্গলে এসে আশ্রয় নিল। সাফল্যের আনন্দে দলের লোকেরা খুব স্ফূর্ত্তি করতে লাগল। কেউ কেউ কাঠ-কুটো সংগ্রহ করে আগুন ধরাল রান্না করতে। সেই আগুনের ধোঁয়া দেখে গুপ্তচর দৌলতসিংয়ের আস্তানার সন্ধান পেল, তখুনি পুলিশদের খবর দিল, বহুদিন পর ক্রূর প্রকৃতির দস্যু ধরা পড়ল, বিচারে তার মাথা কেটে ফেলা হ'ল।

এই ঠগীর দল ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগল, চতুর্দ্দিকে তাদের অমানুষিক নিষ্ঠুরতার খবর ছড়িয়ে পড়ল, রাজারা পর্য্যন্ত এদের ভয় করে চলতে সুরু করলেন। করীম খাঁ নামক এক পিণ্ডারীর এত প্রতিপত্তি হয়েছিল যে, দেশীয় রাজাদের নিকট থেকে বাৎসরিক ২৪ লক্ষ টাকা করস্বরূপ আদায় করত। সিন্ধিয়া আর হোলকার নিজেদের শত্রুদমন করবার সময় প্রথমেই পিণ্ডারীদলকে শত্রুদের উপর লেলিয়ে দিতেন। এরা শিকারী কুকুরের মত শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত, লুঠতরাজ করে শত্রুদের অর্দ্ধমৃত অবস্থায় ফেলে যেত, তখন রাজসৈন্য রণক্ষেত্রে নেমে অনায়াসে শত্রুদমন করত।

জব্বলপুরে আমীর খাঁ পিণ্ডারী এত লুঠতরাজ ও অত্যাচার করেছে যে, তার নাম শুনলে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে শহরবাসীরা যে যেদিকে পা'রে পালিয়ে যেত, তার হাতে পড়ার চেয়ে নরকবাস শ্রেয় মনে করত। ভোঁসলের রাজত্বের সময় পর্য্যন্ত

এই আতঙ্ক ছিল, ১৮১৭ সনে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এদের দমন ও নির্ম্মূল করেন।

পিণ্ডারীরই আর এক দল হ'ল ঠগ। ঠগীরা এমন সুকৌশলে লোকের প্রাণনাশ করত যে, লোক আর্ত্তনাদ করবার ফুরসৎ পর্য্যন্ত পেত না। এরা নানা প্রকার ছল-চুতো করে ধনাঢ্য যাত্রীদের সঙ্গে মিশত এবং সুযোগ বুঝে রুমাল দিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে নিঃশব্দে তাদের মেরে ফেলত ও সমস্ত ধন-সম্পত্তি লুঠ করে পালাত। এই ঠগীদের মধ্যে ফিরিঙ্গিয়া ও আমীর আলি বিখ্যাত ছিল। আমীর আলি তার এক জীবনে ৭০০ ব্যক্তির প্রাণনাশ করেছে। সে জব্বলপুরে কোন উৎপাত করে নি, কিন্তু নর্ম্মদা-তীরে ও সাগরের আশে পাশে ছোট ছোট স্থানে বহু উৎপাত করেছে।

একবার স্থিড়োতে এক ইংরেজ অফিসার অন্যত্র যাত্রা করবার সময় নিরাপদ হবে বলে তার সঙ্গে বহু যাত্রীদলও রওনা হ'ল। আমীর আলি সে খবর পেয়ে ছদ্মবেশে যাত্রী সেজে ঐ দলে ভিড়ে গেল। সে তার বাকচাতুর্য্যে যাত্রীদের ভুলিয়ে আগে আগে নিয়ে রওনা হ'ল এবং শিকারপুর গ্রামে পৌঁছে হতভাগ্য স্ত্রী-পুরুষ ও শিশুদের গলায় ফাঁস দিয়ে মেরে মাটিতে পুতে ফেলল। এক ছোট বালককে না মেরে বলল, "তুই আমার সাকরেদ হবি চল।" কিন্তু ঐ বালকটি তার সঙ্গে যেতে চাইল না, নিষ্ঠুর ঠগীকে গালি-গালাজ দিতে লাগল, তখন আমীর আলি তলোয়ারের এক কোপে তার মাথা উড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে চলল। গুপ্তচররা ঐ বালকের লাস দেখতে পেয়ে সেখানকার জমিদারকে খবর দেয়, তিনি চল্লিশ জন সশস্ত্র লোককে পাঠালেন, কিন্তু আমীর আলি তার দলসহ তাদের আক্রমণ করে হারিয়ে দিল।

ফিরিঙ্গিয়া ঠগী জব্বলপুরের নিকট এক স্থানে ক্রমান্বয়ে ষাট জনকে মেরে ফেলে, তাই ঐ স্থানকে আজও "ষাঠরূপ" বলে।

ঠগীরা নিজেদের পেশাকে এক বড় বিদ্যা বলে মনে করত এবং সেজন্য তাদের বহুপ্রকার সংস্কার ছিল। দেবী ভবানী তাদের আরাধ্যা দেবী এবং যত মানুষ হত্যা করা হ'ত তা সবই দেবীর নিকট বলিস্বরূপ বলে গণ্য করা হ'ত। এজন্য যারা দীক্ষিত ঠগী তারা নরহত্যাকে পাপ মনে করত না বা এজন্য অনুতাপ করত না। হিন্দু-মুসলমান যে কোন জাতের লোকই ঠগীধর্ম্মে দীক্ষা নিতে পারত।

এ সব ঠগীদের নরহত্যা করার এক বিশেষ কৌশল ছিল। এক-একজন ঠগী অপর তিন ঠগীসহ ছদ্মবেশে ধনাঢ্য যাত্রীদলে মিশে যেত, দলপতির সঙ্কেত পেলেই গলায় রুমাল-ফাঁস দিয়ে যাত্রীকে মেরে ফেলত। হতভাগ্যের টুঁ শব্দ করবারও শক্তি থাকত না। মৃত যাত্রীকে তখুনি মাটির নীচে পুতে ফেলত।

মৃতদেহ লুকিয়ে ফেলবার জন্য একদল ঠগী পূর্ব্বেই নালা-ডোবা-বিলে মাটি খনন করে জায়গা প্রস্তুত করে রাখত। কোন কোন স্থানে নরহত্যা করে তাদের লুকোবার কোন জায়গা না পেলে নিজেদের বাসস্থানেই মাটি খনন করে মৃতদেহ পুতে ফেলত এবং শয্যা পেতে সেখানে শুয়ে পড়ত যাতে অন্য কেউ সন্দেহ না করতে পারে।

বিখ্যাত ঠগী আমীর আলি তার মৃত্যুর পূর্ব্বে তার যে জীবন-বৃত্তান্ত বলে গিয়েছে তা থেকে উদ্ধৃত করছি:

"আমাকে ঠগধর্ম্মে দীক্ষা দেওয়া স্থির হ'ল। প্রথমে এরা আমাকে স্নান করিয়ে আনল, তার পর নূতন শ্বেতবস্ত্র পরাল। আমার সঙ্গী আমাকে হাত ধরে এক কক্ষে নিয়ে এল। সেখানে দলের সব প্রধানরা ধৌত শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে বসে ছিল। আমার সঙ্গী এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, ভাইসব, তোমরা একে দলভুক্ত করতে চাও কিনা। সভাস্থ সকলে সমবেতভাবে বললে, হাঁ আমরা রাজী।

"তখন সবাই আমার সঙ্গীর সঙ্গে উঠে দাঁড়াল এবং আমাকে এক খোলা ময়দানে নিয়ে এল। আমার সঙ্গী উপরের দিকে চোখ তুলে দু'হাত যোড় করে গম্ভীরস্বরে বলতে সুরু করল—

হে ভবানী, জগতের মাতা, তোমার এই দীন ভক্তকে দয়া কর, একে রক্ষা করবে এমন কোন শুভেচ্ছা প্রকাশ কর যাতে আমরা তোমার কি অভিপ্রায় বুঝতে পারি।

"এই প্রার্থনার পর কিছু সময় আমরা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলাম, তার পর আমার মাথার উপর এক বৃক্ষের ডালে একটা ছোট পেঁচা ডাকতে সুরু করল। এটা শুনেই সব সর্দ্দাররা একসঙ্গে চীৎকার করে উঠল, জয় ভবানী মাতার জয়। আমার সঙ্গী আমার গলা ধরে বলল, 'বন্ধু এবার তুমি খুসী হও, তোমার ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন, পেঁচার ডাক খুব শুভ লক্ষণ, আমাদের ভাগ্যে এমন শুভ চিহ্ন মিলে নি—ভবানী মাতা তোমার উপর খুবই প্রসন্ন।' এই বলে সে আবার আমাকে পূর্ব্বের সেই কক্ষে নিয়ে গেল, এবং আমার ডান হাতে একটা সাদা রুমাল ও একটা কোদাল দিয়ে বলল, 'এই ধর আমাদের জীবিকা নির্ব্বাহের সম্বল।' আমাকে এই কোদালটা বুক পর্য্যন্ত উঠিয়ে একটা ভয়ঙ্কর শপথ করতে বলল। আমি বাঁ হাত আকাশে তুলে ঐ শপথ করলাম, আর বললাম, 'আজ হতে আমি মাতা ভবানীর সেবক।' তার পর কোরাণ শরীফের নাম নিয়ে আবার ঐ রকম ভয়ঙ্কর শপথ করতে হ'ল। এর পর আমাকে গুড়ের এক রকম সরবৎ পান করতে দিল, এবং আমার ঠগী বনবার উৎসব শেষ হ'ল।

"তখন আমার সঙ্গীকে সবাই খুব ধন্যবাদ দিল, আর আমাকে বলল, তোকে সাবাস, তুই সবচেয়ে পুরনো ও খোদার পছন্দ অনুযায়ী অর্থ উপার্জ্জনের পথ অবলম্বন করেছিস। তুই শপথ করেছিস যে, বিশ্বাস ও খুনীর সঙ্গে আমাদের সঙ্গে থেকে এ ভাবে অর্থ রোজগার করবি এবং এর গুপ্ত পন্থা কাউকে বলবি না। আর তোর ফাঁদে যদি কোন লোক পড়ে তবে তাকে যে ভাবেই হউক মেরে ফেলবি, ছাড়বি না, কেবল আমাদের শাস্ত্রে নিষিদ্ধ যারা তাদের মারবি না। যারা আমাদের বধের উপযুক্ত নয় তারা হ'ল ধোবী, তেলী, লোহার, নাচওয়ালা, গানওয়ালা, মেথর, ভাট, ফকীর। এদের দেবী ভবানী পছন্দ করেন না।

মীনাকুমারী তাঁর ত্বকের যত্ন নেন
লাক্স টয়লেট সাবানের সাহায্যে "এটি এত
লাক্স টয়লেট সাবান
চিত্র-তারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান
LUX
TOILET SOAP
LTS. 544-X52 BG

এছাড়া অন্য যত লোক আছে তাদের কায়দায় পেলেই মেরে ফেলবি ও লুঠতরাজ করবি। কিন্তু একটা খেয়াল রাখবি সগুন, অর্থাৎ শুভলক্ষণ দেখে কাজে নামবি। তোকে যা জানি তা সব বলে দিলাম। এবার তুই তোর নিজের রোজগার করতে সুরু কর, আর যা বাকী থাকে তা তোর গুরু শিখিয়ে দেবেন।

"আমি তখন উত্তর করলাম, যথেষ্ট বলেছ, আমি মৃত্যু পর্যন্ত তোমাদের সঙ্গী থাকব। খোদার কাছে প্রার্থনা করছি যে, তিনি যেন আমাকে শীঘ্রই এমন কোন সুযোগ দেন যা দ্বারা আমি আমার কৃতিত্ব আর তোমাদের প্রতি অনুরাগ দেখাতে পারি।

"এ ভাবে আমি ঠগধর্ম্মে দীক্ষা নিলাম। যখন ঠগীরা রোজগারের জন্য ঘর ছেড়ে বের হয় তখন শুভলক্ষণ দেখে বের হতে হয়। ছোট হোক বড় হোক প্রত্যেক ঠগীই সগুণ দেখে কাজে নামবে। যখন আমি প্রথম আক্রমণ করতে বের হলাম তখন সগুণের অপেক্ষা করতে লাগলাম। প্রথমে একজন অভিজ্ঞ ঠগ হাতে কোদালী নিয়ে 'কে খুসী' এই কথা বলতে বলতে প্রথমে অগ্রসর হ'ল, তার পেছনে পেছনে আমি, আমার পিতা ইসমাইল, আর তিন জমাদার এবং বাকী ঠগীরা চললাম।

"আমার পিতা ইসমাইল এই দলের নায়ক ছিল, সেজন্য জলপূর্ণ একটা ঘট রশি দিয়ে লটকিয়ে মুখে ঝুলিয়ে ডান দিকে চলল। যদি এই ঘট পড়ে যায় তবে যাত্রা অশুভ, এই বৎসর বা পরের বৎসর দলের সবাই মৃত্যুমুখে পড়বে সুনিশ্চিত। ইসমাইল দক্ষিণ দিকে মুখ ফিরিয়ে তার দলের লোক যে দিকে যাত্রা করবে সেদিকে ফিরে বাঁ হাত বুকের উপর রেখে আকাশের দিকে চোখ তুলে চেয়ে চীৎকার করে বলল, 'হে জগৎমাতা, আমাদের রক্ষাকর্ত্রী।' যদি তুমি আমাদের এই যাত্রা শুভ মনে কর এবং অনুমতি দাও, তবে এমন কোন শুভ চিহ্ন দেখাও যে, বুঝতে পারি আমাদের যাত্রা সফল হবে। দলের সবাই "জয় ভবানী মাতার জয়" বলে চীৎকার করে প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল। সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে কি জানি কি সগুণ আছে আমাদের ভাগ্যে। আধ ঘণ্টা পর বাঁ দিকে সগুণ হ'ল, একদল গাধার ডাক শোনা গেল।

"এর চেয়ে ভাল সগুণ আর কি হতে পারে? এক বৎসরের মধ্যে এমন ভাল শুভলক্ষণ আর বড় রকম লুঠের সুযোগ পাওয়া যায় নি, সবাই জোরে 'ভবানী মাতার জয়' বলে চেঁচিয়ে উঠল আর আনন্দে সব গলাগলি করতে লাগল। এই আমার প্রথম শিকার-যাত্রার কাহিনী"—এই বলে ঠগী আমির আলি চুপ করল। এই আমির আলি বহু চেষ্টার পর ধরা পড়ে ও তার ফাঁসী হয়।

এই সব ঠগীর নিজেদের শিকারকে বাণিজ্য বলত। তারা লুটতরাজ করতে যাবার পূর্ব্বে গুড়ের বিশেষ সরবত তৈরী করে ও গরম করে খেত। তাদের বিশ্বাস এটা খেলে দয়া-মায়া দূর হয়ে যায়। এই সরবৎটা খেলে নাকি ঠগী বনবার জন্য এত ইচ্ছে হয় যে, লোকটা যদি খুব ধনীও হয়, বা সুখী গৃহস্থ হয় তবু তার মনে একটা দুর্দম নেশা জাগবে ঠগী হবার। ঠগীদের নিয়মের খুব বেশী কোন কড়াকড়ি না থাকলেও নিষিদ্ধ জাতের লোকদের হত্যা করলে ও লুঠতরাজ করলে দেবী ভবানী বলিদান গ্রাহ্য করবেন না বলে বিশ্বাস ছিল এবং তারা এদের ছেড়ে দিত।

শ্লীমন সাহেব এই সব ঠগীদের দমন করেছেন। তিনি ১৮২৫ সাল থেকে ১৮৩৫ সাল পর্য্যন্ত দুই হাজার ঠগী ধরে ফাঁসী দিয়েছেন বা কালাপানিতে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দিয়েছেন। ১৮৪৮ সালের মধ্যে প্রাণপণ চেষ্টায় দুই শত বৎসরের ঠগীদের পুরনো সংস্থা নষ্ট করেছেন। যে ঠগীরা অন্য ঠগীদের ধরিয়ে দিয়েছে, তাদের পরিবার পালন করবার জন্য জব্বলপুরে তিনি এক ঠগী কারখানা স্থাপন করেন। সেখানে তাদের দড়ি-শতরঞ্চি ইত্যাদি তৈরী করার কাজ শেখান হ'ত। ক্রমে ক্রমে এদের বংশধররা এ সব কাজ শিখে নিজেদের ভরণপোষণ নিজেরাই করতে লাগল। শেষকালে সেটা সংশোধক-স্কুলে পরিণত হ'ল এবং তাকে গুরুন্দে বলা হ'ত।

ফুলের মত...

আপনার লাবণ্য রেক্সোনা

ব্যবহারে ফুটে উঠবে

Rexona

BLENDED WITH CADYL
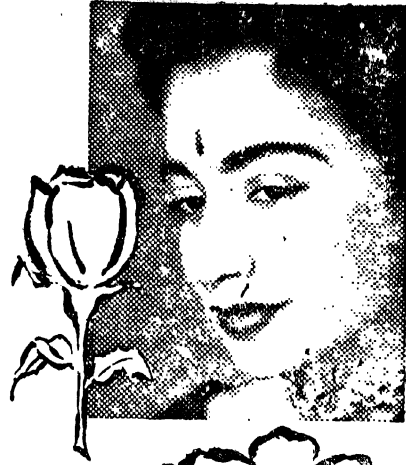
রেক্সোনা সাবানে আছে ক্যাডিল অর্থাৎ ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্যে তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা আপনার **স্বাভাবিক** সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করে তুলবে।
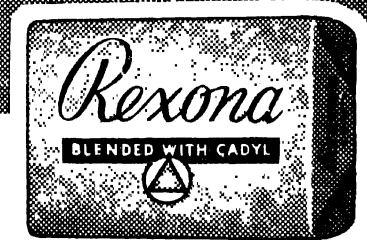
একমাত্র ক্যাডিলযুক্ত সাবান

রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারী লিঃ, এর পক্ষে ভারতে প্রস্তুত

R.P. 148-X52-BG

পঞ্চপ্রদীপ—মণীন্দ্রনারায়ণ রায়। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস—৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা ৩৭। মূল্য ২॥ টাকা।

বাংলা কথা-সাহিত্যে গল্প-লেখকের সংখ্যা আজ কম নয়, অনেক ভাল গল্পও চোখে পড়ে। সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ, কাহিনী গ্রন্থনে, সুসংবদ্ধ আঙ্গিকে ও প্রকাশ-ভঙ্গিমায় যথেষ্ট কৃতিত্বও দেখা যায়, এবং সেগুলির বৈচিত্র্যও যথেষ্ট। আলোচ্য পুস্তকের গল্পগুলি—মনোবিশ্লেষণের ভারে ভারগ্রস্ত না হইয়াও গল্প বলার সহজ রীতিতে কৌতূহল সঞ্চার করে, সূক্ষ্ম রসানুভূতির আনন্দও জাগায় মনে। আড়ম্বরহীন বর্ণনার মধ্য দিয়া চমৎকার সুরের বিস্তার ঘটিয়াছে কোন-কোনটি গল্পে। 'আলো ও আলেয়া' 'ছিন্ন তার' গল্প দুটি এই পর্য্যায়ের। 'এলোমেলো', 'আগমনীর সুরে' সঞ্চিত হৃদয়ের আশা-বেদনার ছবি চমৎকার ফুটিয়াছে। 'গ্রহণ' গল্পটি অপেক্ষাকৃত বড়—ইহার ঢিলেঢালা গঠনের জন্য উপন্যাসের গতি-প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ একটি বেদনাকে কাহিনী-সূত্রে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করা হইলেও সেটি কেন্দ্রাতিগ হইয়াছে··· রচনার পারিপাট্যে ও গল্প-রচনার নিষ্ঠায়—কোন গল্পই নীরস বা একঘেয়ে লাগে না।

বিনয় স্মৃতি-তর্পণ—প্রকাশক 'বিনয় ভবন', ৪৫, গিরীশ-চন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা—১৪, মূল্য ২ টাকা।

'বিনয় সরকার স্মৃতি-রক্ষা কমিটি' কর্তৃক প্রকাশিত এই স্মরণিকা গ্রন্থে বাংলার অন্যতম কৃতী সন্তান বিনয়কুমার সরকারের মতবাদ ও বহুমুখী কর্ম্মপ্রচেষ্টার পরিচয় দিয়াছেন—তাঁহার গুণমুগ্ধ সতীর্থ, বন্ধু ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। বাংলার নবজাগরণে উনবিংশ শতাব্দী সবচেয়ে উজ্জ্বল। অধ্যাপক সরকার এই গৌরবময় শতাব্দীর শেষাংশে জন্মগ্রহণ করিলেও—তাঁহার কর্ম্মপ্রতিভার স্ফুরণ বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। বিশিষ্ট একটি মতবাদের ধারক ছিলেন তিনি। বাংলা ভাষায় 'অর্থনৈতিক' সাহিত্য-সৃষ্টির প্রবর্ত্তন করেন তিনি। এই উদ্দেশ্যে 'আর্থিক উন্নতি' নামে একখানি পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। এই ধরণের রস-সাহিত্যসম্পর্কহীন পত্রিকাকে দীর্ঘকাল বাঁচাইয়া রাখা কম কৃতিত্বের কথা নহে। পত্রিকা প্রকাশ ছাড়াও ইংরেজি ও বাংলায় বহু প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনা করিয়াছেন তিনি। তন্মধ্যে তের খণ্ডে প্রকাশিত 'বর্ত্তমান জগৎ' গ্রন্থমালা তাঁর অক্ষয় কীর্ত্তি।

হাতে-কলমে কাজ করিবার জন্য ধনবিজ্ঞান পরিষৎ, বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান পরিষৎ, বঙ্গীয় মার্কিন-সংস্কৃতি পরিষৎ, বঙ্গীয় এশিয়া পরিষৎ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি তিনিই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই পরিষৎগুলিকে একত্র করিয়া সম্প্রতি 'বিনয় সরকার একাডেমী' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এ ছাড়াও তিনি ছিলেন সুবক্তা ও বহু ভাষাবিৎ। ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মান, ইতালিয়ান প্রভৃতি ভাষায় অনর্গল বক্তৃতার ফলে বিদেশে তাঁহার মতবাদের মূল্য স্বীকৃত হইয়াছে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে

বক্তৃতাদানের পর গৃহে ফিরিবার পরে অকস্মাৎ তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং এই রোগেই তাঁহার মৃত্যু হয়। অধ্যাপক সরকারের নিরলস কর্মপ্রচেষ্টা, নিরহঙ্কার স্বভাব, গভীর স্বদেশানুরাগ ও চরিত্র-শক্তির পরিচয় আলোচ্য পুস্তকের নিবন্ধগুলিতে পাওয়া যায়। এই স্মরণিকা-গ্রন্থের বহু উপকরণ তাঁহার জীবনী রচনার সহায়ক হইবে—এ কথা বলাই বাহুল্য।

গল্প-সংগ্রহ—শ্রীসরলাবালা সরকার। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা—৯। মূল্য ৫৲ টাকা।

একাধিক ভাল গল্প লিখিয়া বাংলা সাহিত্যে খ্যাতিমান হইয়াছেন বহু লেখক, কিন্তু অর্দ্ধশতাব্দীকাল ধরিয়া একটানা গল্পের আসর জমাইয়া রাখার ক্ষমতা ও সৌভাগ্য অল্প কথাকারেরই হয়। প্রায়ই দেখা যায় বয়সের ভার চাপিলে খ্যাতিমান লেখকের স্ব-রচনার ধার কমিয়া যায় এবং প্রাচুর্যও থাকে না। আলোচ্য গল্প-সংগ্রহটি এই নিয়মের ব্যতিক্রম। আশীর পারে পৌঁছিয়াও লেখিকার রচনা-ক্ষমতা এতটুকু হ্রাস হয় নাই, কল্পনা কিংবা চিন্তাশক্তিও পরিচ্ছন্ন রহিয়াছে। ১৩১৬ সাল হইতে ১৩৬৩ সাল পর্য্যন্ত এই ধারা অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে চলিয়াছে। শুধু তাই নয়—বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে ও পটভূমিকা নির্ব্বাচনে লেখিকার দক্ষতা লক্ষ্যণীয়। অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া বাংলা কথা সাহিত্য যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়া ক্রমবিকাশ লাভ করিয়াছে—তাহার নমুনাও এই সংগ্রহে মিলিতে পারে।

লেখিকা বহু দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন। নিজ এবং ভিন্ন সমাজের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর এবং তাঁহার দরদী দৃষ্টির দূরবীণে মানুষ এবং ঘটনা-প্রবাহ আশ্চর্য্যভাবে ধরা পড়ে। ফলে বাঙালী সমাজের চিত্রগুলি যেমন সার্থক হইয়াছে—তেমনি বিহার বা উত্তর প্রদেশের গ্রাম, মানুষ, সমাজ ব্যবস্থা প্রভৃতি বাস্তব অভিজ্ঞতায় জীবন্ত হইয়াছে। প্রায় প্রতিটি চিত্রই একটি করুণ সুরের স্পর্শ দিয়া পাঠককে উন্মনা করিয়া তোলে। যে কাল অতীত হইয়াছে তাহার প্রতি প্রচ্ছন্ন মমতা পোষণের কারণ যে এটি হইয়াছে তাহা নহে, প্রত্যেক কালেই সুখ-সম্পদকে লাভ করিবার চেষ্টায় বঞ্চনা আর বিয়োগের বেদনা জমে। ইচ্ছা করিলেও মানুষ এই দুর্লঙ্ঘ্য শক্তির বৃত্ত হইতে সরিয়া যাইতে পারে না—অথবা তেমন প্রবল ইচ্ছাও তার জাগে না। বিয়োগান্তের জন্যই এই ভূমিকা।

মোট ছত্রিশটি গল্প আছে এই সংগ্রহে। ছোট গল্পের যে সংজ্ঞা বিদগ্ধজন নির্ণয় করিয়া দেন—এই সংগ্রহের অধিকাংশ রচনা হয়ত সে পর্য্যায়ে পড়িবে না—সেগুলিকে অনেকে চিত্রজাতীয় বলিবেন।...আনন্দের বিষয় এই চিত্রজাতীয় রচনাই লেখিকার স্বচ্ছ-উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও দরদী মনের বাহন হইয়াছে এবং বিগত দিনের নানা দেশ, মানুষ, ঘটনা, প্রথা, সমাজব্যবস্থা প্রভৃতিকে একেবারে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। এ যেন গল্পের চেয়েও বেশী ইতিহাস। ছোট গল্পের মান-মূল্যায়নে প্রকাশভঙ্গী ও মনোবিশ্লেষণের নজীর তুলিয়া অথবা অর্দ্ধসত্য কাহিনীর পর্য্যায়ে ফেলিয়া এগুলিকে নস্যাৎ করিয়া দেওয়া কঠিনই। মানুষের অত্যন্ত নিকটে বসিয়া, গভীর অনুভূতির রসে তুলি ডুবাইয়া ছবি আঁকিতে না শিখিলে সত্যকারের জীবনকে ও সেইসঙ্গে চলমান যুগকে ধরিয়া রাখা যায় না। চিত্রগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেশ-কালের ব্যবধান ঘুচাইয়া সার্ব্বজনীন মানবতা-বোধকে যুক্ত করিয়াছে।

সামান্য দু'-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ১৯১৭ সালে প্রকাশিত চিত্রপট পুস্তকের একটি গল্পে (পুরানো ডায়েরী) প্রশ্ন তুলিয়াছে নায়ক, সব চুরিই কি এক রকমের চুরি? চুরি করিলেই সে চোর, কেন চুরি করিয়াছিল তাহার খবর কয়জন রাখে।

'বরিয়াত' গল্পে পঞ্চাশ বছর আগেকার দানাপুরের গঙ্গার ধারের ছবি ও বিহারী সমাজের বরিয়াত প্রথার একটি চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। দানাপুরের গঙ্গার ধারের সেই দৃশ্য আজ হয়ত বদলাইয়াছে, কিন্তু বঙ্গসমাজের কলঙ্কস্বরূপ পণ-প্রথাটির মত বিহারী সমাজের বরিয়াত প্রথাও অর্দ্ধ শতাব্দীর পূর্ব্বেকার দুর্ভাগ্যকে তেমনি স্বচ্ছন্দে বহন করিতেছে কি না গল্প পড়িলে এই প্রশ্ন স্বতঃই মনে জাগিবে। বিহারে ভূমিকম্প, বিদ্যাসাগর-প্রবর্ত্তিত বিধবা বিবাহ, ফরিদপুরের মিশন হাউস কিংবা সেকালের পল্লীমানুষ প্রভৃতি চিত্রগুলি ইতিহাসের নজীর হইয়া রহিবে। বাংলা কথা-সাহিত্যে আলোচ্য গল্প-সংগ্রহটি একটি সার্থক সংযোজন।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সব সময়

লাইফবয় দিয়ে স্নান করেন

খেলাধূলো করা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই দরকার—কিন্তু খেলাধূলোই বলুন বা কাজকর্ম্মই বলুন ধূলোময়লার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে কখনই থাকা যায় না। এই সব ধূলোময়লায় থাকে রোগের বীজাণু যার থেকে সবসময়ে আমাদের শরীরের ক্ষতি হতে পারে। লাইফবয় সাবান এই ময়লা জনিত বীজাণু ধুয়ে সাফ করে এবং স্বাস্থ্যকে সুরক্ষিত রাখে।

প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করুন—ময়লা জনিত বীজাণু থেকে আপনার স্বাস্থ্যকে রক্ষা করুন। এতে আপনার শরীর ঝরঝরে করে তুলবে।

L. 266-X52 BG

দেশ-বিদেশের কথা

সেবায়তন ঝাড়গ্রাম

সেবায়তনের চতুর্দ্দশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে বামে দণ্ডায়মান বক্তৃতারত সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দজী, মধ্যস্থলে উপবিষ্ট আশ্রমাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ গিরি মহারাজ ও তাঁহার বামে উপবিষ্ট মূল সভাপতি উপমন্ত্রী শ্রীচারুচন্দ্র মহান্তি।

গত উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিন ঝাড়গ্রাম সেবায়তনের চতুর্দ্দশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে এক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আশ্রমাচার্য্য স্বামী সত্যানন্দ গিরিজী মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। অপরাহ্নে সহস্রাধিক নরনারীর সম্মেলনে উপমন্ত্রী শ্রীচারুচন্দ্র মহান্তি মহাশয় সভাপতিত্ব করেন।

সেবায়তন, ঝাড়গ্রাম

আশ্রম-সম্পাদক স্বামী শুদ্ধানন্দজীর বিবরণে জানা যায় যে, স্বামী প্রেমানন্দজীর পৃষ্ঠপোষকতায় যে সামান্য আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা এই ১৩ বৎসর যোগ মন্দির, কেবলানন্দ সংস্কৃতি ভবন, সর্ব্বার্থসাধক উচ্চ বিদ্যালয়, অনুন্নত জনশিক্ষা কেন্দ্র, মুদ্রণ-বিভাগ, কৃষি ও গো-পালন, চিকিৎসালয় প্রভৃতি বিভিন্ন শাখাবিভাগসহ বিস্তারলাভ করিতেছে। উৎসব উপলক্ষে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত, ভজন ও কীর্ত্তনাদির দ্বারা সকলকে মুগ্ধ করা হয়। পরদিন প্রাতে যোগীরাজ শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় প্রদর্শিত ক্রিয়াযোগের আলোচনা ও সাধক-সম্মেলনের পর সন্ধ্যায় সেবায়তন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীপাঁচকড়ি দে মহাশয়ের সভাপতিত্বে প্রাক্তন ছাত্রদের বার্ষিক মিলনোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীনবকুমার মুখোপাধ্যায়

বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র ও কর্ম্মী শ্রীনবকুমার মুখোপাধ্যায় ইউরোপের নানা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করিয়া কৃতবিদ্য হইয়া সম্প্রতি দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি ডেনমার্কের বোরিসে তিন বৎসর কৃষি ও তাহার আনুষঙ্গিক পশুপালনাদি এবং সমবায় কৃষিপদ্ধতি শিক্ষা করেন। ইহা সমাপ্ত করিয়া তিনি আস্কভ পিপলস কলেজে শিক্ষকদের শিক্ষাপদ্ধতি অধ্যয়ন করেন।

অতঃপর তিনি ডক্টর এল, কে, এলমহার্ষ্ট সাহেবের বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ডার্টিংটন হইতে বৃত্তিলাভ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। সেখানেও তিনি কৃষি ও অর্থনীতি বিশেষজ্ঞের অধীনে কৃষিবিষয়ক গবেষণাদি পর্য্যবেক্ষণ ও অধ্যয়ন করেন।

শ্রীনবকুমার মুখোপাধ্যায় প্রবাসীর নিয়মিত লেখক এবং ইনি বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

শ্রীনবকুমার মুখোপাধ্যায়

'প্রবাসী' মাসিক সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকার ও অন্যান্য বিশেষ বিবরণ প্রতি বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ তারিখের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিতব্য :—

ফরম্ নং ৪

(রুল নং ৮ দ্রষ্টব্য)

১। প্রকাশিত হওয়ার স্থান— কলিকাতা (পশ্চিমবঙ্গ)

২। কিভাবে প্রকাশিত হয়— প্রতি মাসে একবার

৩। মুদ্রাকরের নাম— শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস
   জাতি — ভারতীয়
   ঠিকানা — ১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯

৪। প্রকাশকের নাম — ঐ
   জাতি — ঐ
   ঠিকানা — ঐ

৫। সম্পাদকের নাম — শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
   জাতি — ভারতীয়
   ঠিকানা — ১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯

৬। (ক) পত্রিকার স্বত্বাধিকারীর নাম — প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
   ঠিকানা — ১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯
   এবং
   (খ) সর্বমোট মূলধনের শতকরা এক টাকার অধিক অংশের অধিকারীদের নাম-ঠিকানা—

১। শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
   ১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯
২। মিসেস্ অরুন্ধতী চট্টোপাধ্যায়
   ১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯
৩। মিস্ রমা চট্টোপাধ্যায়
   ১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯
৪। মিস্ সুনন্দা চট্টোপাধ্যায়
   ১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯
৫। মিসেস্ ঈষিতা দত্ত
   ১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯
৬। মিসেস্ নন্দিতা সেন
   ১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯
৭। অশোক চট্টোপাধ্যায়
   ১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯
৮। মিসেস্ কমলা চট্টোপাধ্যায়
   ১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯
৯। মিস্ রত্না চট্টোপাধ্যায়
   ১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা ৯
১০। মিস্ অলোকানন্দা চট্টোপাধ্যায়
   ১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯
১১। মিসেস্ লক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়
   ১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯

আমি, প্রবাসী মাসিক সংবাদপত্রের প্রকাশক, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরি-লিখিত সব বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

প্রকাশকের সহি—স্বাঃ শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস

তারিখ—২৮।২।১৯৭৮ ইং

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস প্রবাসী প্রেস, প্রাইভেট লিঃ ১২০.২, আপারসারকুলার রোড, কলিকাতা